বিকৃতির কার্য্য তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদের পক্ষে অনায়াসেই কোন্ কার্য্যের ফলে আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়ের সবলতা, মনের দৃঢ়তা ও বুদ্ধির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে পারে, অথবা উহার কোনটির অবনতি ঘটিতে পারে, তাহার নির্বাচন করা অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, মনুষ্য-সমাজের মধ্যে, ভাষাবিজ্ঞানানুসারে যাঁহাদিগকে ধর্ম্ম-যাজক বলা যাইতে পারে, একমাত্র তাঁহাদের অভ্যুদয় ঘটিলেই জনসাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। একমাত্র ধর্ম্মযাজকের অভ্যুদয় ঘটিলেই জনসাধারণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে দুঃখ-মুক্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কেবলমাত্র ধর্ম্ম-যাজকের দ্বারাই জনসাধারণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয় না, কারণ ধর্ম্ম-যাজকগণকে জীবনের অধিকাংশ সময়ই শরীরাভ্যন্তরের প্রকৃতি ও বিকৃতির অনুভব-কার্য্যে অতিবাহিত করিতে হয়।

জনসাধারণ যাহাতে আর্থিক অ-প্রাচুর্য্য, শারীরিক অস্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়ের ক্ষীণতা, মনের চাঞ্চল্য, বুদ্ধির মলিনতা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় কায়িক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে আবার কোন্‌টি মানুষের অর্থ এবং কোন্‌টী অনর্থ, কোন্ উপায়ে অনর্থের উৎপত্তি ক্লিষ্ট করিয়া অর্থের উৎপত্তি সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, কেনই বা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সময় সময় মানুষের পক্ষে লোকসানজনক হইয়া থাকে এবং কেনই বা তাহা আবার সময় সময় লাভজনক হয়, কোন্ উপায়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য যাহাতে কখনও লোকসানজনক না হইয়া সর্ব্বদা লাভজনক হয় তাহা করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, কোন্ অবস্থাটী মানুষের স্বাস্থ্যের অবস্থা আর কোন্‌টীই বা মানুষের অস্বাস্থ্যের অবস্থা, কোন্ উপায়ে অস্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা তিরোহিত করিয়া মানুষকে সর্ব্বদা স্বাস্থ্যবান্ রাখা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, এবংবিধবিষয়ক জ্ঞান ও সংগঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। দিবসের অধিকাংশ সময়ই শরীরাভ্যন্তরস্থ প্রকৃতি ও বিকৃতির অনুভব-কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া ধর্ম্মযাজকগণের পক্ষে অতগুলি সমাজ-সংগঠনের কার্য্য নির্ব্বাহ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। ইহারই জন্য সমাজসংগঠন ও পরিচালনার কার্য্যের জন্য বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইন-প্রণেতা, আইন-ব্যবসায়ী, কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিগণের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

জনসাধারণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখমুক্ত হইতে পারে, তাদৃশ সমাজ-সংগঠন ও সমাজ-পরিচালনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে ধর্ম্ম-যাজকগণের পরই বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। ভাষা-বিজ্ঞান অনুসারে যাঁহারা কোন্ কোন্ বস্তু ও বিষয় মানুষের অর্থ এবং কোন্ কোন্‌টী মানুষের অনর্থ, কোন্ উপায়ে মানুষের অনর্থ বিনাশ করিয়া অর্থের প্রাচুর্য্য সংঘটিত হইতে পারে, কেনই বা মানুষের শারীরিক স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের উদ্ভব হয়, কোন্ উপায়ে অস্বাস্থ্যের কারণ সমূলে উৎপাটিত করিয়া সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক স্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, কোন্ পন্থায় মানুষের ও খেচর, ভূচর, জলচর ও অচর প্রভৃতি জীবের শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিভিন্ন শক্তির উন্মেষ হইয়া থাকে, কৃত্রিম উপায়ে কোন্ কৃত্রিম বস্তুতে শব্দ-স্পর্শাদি-শক্তি সংযুক্ত করিবার পন্থা কি কি এবং ঐ কৃত্রিমতার উপায় ও অপায় কি কি; জীবের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এই তিনের পরস্পরের কার্য্যের প্রভেদ কি কি এবংবিধ তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া সাধারণের বুঝিবার উপযোগী ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলা হইয়া থাকে। নিজ শরীরাভ্যন্তরে যে প্রকৃতি ও বিকৃতির কার্য্যের উপলব্ধি-ফলে যে তত্ত্বগুলি ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বগুলির মধ্যে যেগুলি অব্যক্ত তাহা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ ধর্ম্ম-যাজকগণের মত প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না বটে, কিন্তু যাহা অব্যক্ত নহে পরন্তু ব্যক্ত তাহা ধর্ম্ম-যাজকগণের উপদেশানুসারে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং উহার মধ্যে যাহা অব্যক্ত তাহাও তাঁহারা ধর্ম্ম-যাজকগণের উপদেশ শুনিয়া বিচারবুদ্ধির দ্বারা অনুমান করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ধর্ম্মযাজকগণ যে তত্ত্বগুলি গবেষণা দ্বারা নিজ

ভাবে আবিষ্কার করেন তন্মধ্যে যেগুলি সাধারণ মানুষের সংগঠন ও পরিচালনার জন্ম প্রয়োজনীয়, সেইগুলিকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ কোথায়ও বা প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করিয়া কোথায়ও বা বিচার-বুদ্ধির দ্বারা অনুমান করিয়া, বুদ্ধিজীবী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্ম তদুপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন।

এইরূপ ভাবে যে তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ বুদ্ধিজীবী সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্ম তদুপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই তত্ত্বগুলি কোন্ বিধানে প্রতিপালিত হইলে, সর্ব্বসাধারণের সর্ব্ববিধ বিকৃতির প্রবৃত্তি তিরোহিত হইয়া প্রাকৃতিক ভাব জাগ্রত হইতে পারে, তাহা যাঁহারা নির্দ্ধারণ করেন, তাঁহাদিগকে ভাষাবিজ্ঞানানুসারে আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী বলা হইয়া থাকে। নিজ শরীরাভ্যন্তরে প্রকৃতি ও বিকৃতির কার্য্যের উপলব্ধি-ফলে যে তত্ত্বগুলি ধর্ম্ম-যাজকগণ প্রত্যক্ষ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হন, ধর্ম্ম-যাজকগণের উপলব্ধির ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে তত্ত্বগুলি বুদ্ধিজীবী সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, সেই তত্ত্বগুলি কোন্ বিধিতে প্রতিপালিত হইলে, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে পরস্বাপহরণের, অথবা প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইয়া কাহারও কোন অশান্তি উৎপাদন না করিয়া সম্পূর্ণ শৃঙ্খলিত ভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্যপ্রতিপালনে মনযোগী হওয়া সম্ভব, এবং অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা স্থির করা আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়িগণের সর্ব্বপ্রধান দায়িত্ব।

ধর্ম্ম-যাজকগণের উপলব্ধির ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ যে তত্ত্বগুলি বুদ্ধিজীবিগণের সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, সেই তত্ত্বগুলি বুদ্ধিজীবী সর্ব্বসাধারণকে শিখাইবার কার্য্য যাঁহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়া থাকে, ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে তাঁহাদিগকে অধ্যাপক বলা হইয়া থাকে। কোন্ শিক্ষার্থীকে কিরূপ ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে ঐ দুরূহ তত্ত্বসমূহে সর্ব্বশ্রেণীর মেধাবী ছাত্রগণের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবযোগ্য তাহা নির্দ্ধারণ করা অধ্যাপকগণের প্রধান দায়িত্ব।

প্রকৃতির কি কি লইয়া মানুষের শরীরের, ইন্দ্রিয়ের, মনের এবং বুদ্ধির স্বাস্থ্য সংগঠিত হয়, কেনই বা ঐ স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, কোন্ উপায়েই বা ঐ স্বাস্থ্য পুনঃসঞ্চারিত করা সম্ভবযোগ্য হয়, এতদ্বিষয়ে উপলব্ধির ফলে, ধর্ম্মযাজকগণ যে সমস্ত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-বিষয়ক সেই সমস্ত তত্ত্ব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ বুদ্ধিজীবী সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত তত্ত্ব অধ্যাপকগণের সাহায্যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বিদিত হইয়া যাঁহারা সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার অথবা ভগ্ন স্বাস্থ্য নিরাময় করিবার দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করেন, ভাষাবিজ্ঞানানুসারে তাঁহাদিগকে বৈদ্য অথবা চিকিৎসক বলা হইয়া থাকে। সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত অধ্যাপক না থাকিলে প্রকৃত চিকিৎসকগণের বিদ্যমানতা সম্ভবযোগ্য হয় না। অন্যদিকে, প্রকৃত ধর্ম্মযাজক এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত চিকিৎসকগণের উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে এবং তখন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে অস্বাস্থ্য, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু অসম্ভবযোগ্য হয়।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় যে সমস্ত তত্ত্ব ধর্ম্মযাজকগণ আবিষ্কার করিয়া থাকেন এবং ঐ ঐ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ বুদ্ধিজীবী সাধারণের বুঝিবার উপযোগী করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত তত্ত্ব অধ্যাপকগণের সাহায্যে বিচারবুদ্ধির দ্বারা বিদিত হইয়া যাহাতে কৃষি-শ্রমজীবী কৃষকের পক্ষে, শিল্প-শ্রমজীবী শিল্পীর পক্ষে বাণিজ্য-শ্রমজীবী বণিকের পক্ষে কদাচিৎ কোনক্রমে লোকসানজনক না হইতে পারে, তদুপযোগী শিক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্বভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ভাষাবিজ্ঞানানুসারে তাঁহাদিগকে যথাক্রমে কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক বলা হইয়া থাকে। প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজক, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-বিষয়ক প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিদ্যমান না থাকিলে প্রকৃত সুনিপুণ, কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক ও বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকগণের উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। অন্যদিকে, প্রকৃত

ধর্ম্ম-যাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিদ্যমান থাকিলে, প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক, প্রকৃত শিল্প-তত্ত্বাবধারক ও প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকের উৎপত্তি হওয়া অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে এবং তখন জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক অপ্রাচুর্য্য বিদ্যমান থাকা একরূপ অসম্ভব হয়।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, সমাজ-মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক বিদ্যমান থাকিলে অনায়াসে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের উদ্ভব হইয়া থাকে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত আইন-প্রণেতার উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, প্রকৃত ধর্ম্মযাজক এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত-আইন-প্রণেতা বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত অধ্যাপকের উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, প্রকৃত ধর্ম্মযাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রকৃত আইন-প্রণেতা এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত চিকিৎসক, প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক, প্রকৃত শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকের উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে; প্রকৃত চিকিৎসক, প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক, প্রকৃত শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক বিদ্যমান থাকিলে শ্রমজীবী কৃষক, শ্রমজীবী শিল্পী, শ্রমজীবী বণিক্, কতকগুলি কর্ম্মচারী ও পরিচারক লইয়া সমাজের যে জনসাধারণ, সেই জনসাধারণের মধ্যে কোন অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু বিদ্যমান থাকিতে পারে না।

আমাদিগের এই উপরোক্ত চিত্রটিকে, আজকালকার পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত কাল্পনিকের একটি নিছক কল্পনা বলিয়া মনে করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ইহাও মনে করিয়া থাকেন যে, জনসাধারণকে সর্ব্ববিধ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আধুনিক সভ্যতা ও বিজ্ঞানের ফলে মানুষ যে শিক্ষা ও সাধনা-নিরত হইতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত মনোভাবকে সম্পূর্ণ অলীক বলিয়া উপহাস করা চলে না। এই পাঠকগণ যদি প্রকৃত ধর্ম্মযাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রকৃত আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, প্রকৃত অধ্যাপক, প্রকৃত চিকিৎসক, প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক, প্রকৃত শিল্পতত্ত্বাবধারক এবং প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকের গুণ ও দায়িত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে মানসনেত্রে দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃত ধর্ম্মযাজক প্রভৃতির উদ্ভব সম্ভবযোগ্য হইলে, জনসাধারণের মধ্য হইতে সর্ব্ববিধ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যে সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত করা সম্ভব, ইহা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না। ইহার পর পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ সৌভাগ্যক্রমে যথাযথ অর্থে ঋক্, সাম এবং যজুর্বেদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, এখনও প্রকৃত ধর্ম্মযাজকের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে; আর যদি ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে অথর্ব্ববেদ অথবা কোরাণ অথবা বাইবেলের মধ্যে যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, ঐ তিনখানি গ্রন্থের প্রত্যেকখানির মধ্যে, বিজ্ঞান ও দর্শন, আইন-প্রণয়নপদ্ধতি, অধ্যাপনাপদ্ধতি, চিকিৎসাপদ্ধতি, কৃষিতত্ত্বাবধারণ-পদ্ধতি, শিল্পতত্ত্বাবধারণপদ্ধতি এবং বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারণ-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে; ঐ তিনখানি গ্রন্থের যে কোন খানি প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে এখনও প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রকৃত আইন-প্রণেতা, প্রকৃত অধ্যাপক, প্রকৃত চিকিৎসক, প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক, প্রকৃত শিল্পতত্ত্বাবধারক এবং প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক হওয়া সহজসাধ্য হইয়া থাকে। বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের অধ্যয়ন সত্ত্বেও যে উহা এখন আর সম্ভব হয় না তাহার কারণ, এখন আর কেহ প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত নহেন এবং প্রকৃত ভাষা-বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত নহেন বলিয়াই এখন আর কেহ ঐ তিনখানি গ্রন্থের কোন খানিতেই যথাযথ অর্থে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না।

আমরা এক্ষণে ভারতবাসী কোন্ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে এবং হইতেছে এবং আমাদের নেতৃবর্গ তাঁহাদের কার্য্য ও দায়িত্ব কিরূপভাবে সম্পাদন করিতেছেন তাহার আলোচনা করিব।

জনসাধারণকে যে তাহাদের অর্থাভাব এবং স্বাস্থ্যাভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করা সম্ভব তাহা আমাদের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, তাঁহাদিগকে আমরা একবার মানসনেত্রে আমাদিগের শ্রমজীবিগণের কুটীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে অনুরোধ করি।

আমাদের অন্নদাতা ঐ দুঃখী ও দুঃখিনীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার আগে একবার স্মরণ করুন যে, এক্ষণে আষাঢ় মাস কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাও স্মরণ করুন যে, অগ্রহায়ণ মাস না আসিলে আর পুনরায় প্রচুর পরিমাণে ইহাদের পক্ষে খাদ্য পাওয়া সম্ভব হইবে না। অর্থাৎ, এখনও পাঁচমাস ইহাদিগকে ইহাদের জীবনধারণের জন্য প্রায়শঃ সঞ্চিত শস্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

দুঃখী ও দুঃখিনীগণের সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ কত তাহার পর্য্যবেক্ষণে উদ্যত হইলে দেখিতে পাইবেন যে, উহাদের বার-আনা-সংখ্যক মানুষের সঞ্চিত শস্য সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে এবং এই সম্মুখবর্ত্তী পাঁচ মাস ইহাদিগকে প্রায়শঃ অনশনে, অর্দ্ধাশনে, বিকৃত-অশনে, পরোক্ষভাবে বিষপানে কালাতিপাত করিতে হইবে। ইহাদের পরিধেয়ের দিকে চাহিয়া দেখুন, ইহাদের অনেকেই লজ্জা-নিবারণের বসনখানি হইতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত। যাদের বা এক-আধখানি আছে, তাহাও শতছিদ্র-পরিবেষ্টিত এবং রং-বেরঙের সূত্রের দ্বারা গ্রন্থিত। বিছানা বলিয়া কোন জিনিষ ইহারা প্রায়শঃ জানে না।

আষাঢ় মাসের বৃষ্টির সময় কোন্ শ্রেণীর গৃহে বাস করিয়া ইহারা জল-প্রবাহ হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়া থাকে তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহাদের গৃহ প্রায়শঃ প্রয়োজনসাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাধ্য হইয়া ইহারা সন্ন্যাসীর মত প্রকৃতিদেবীর সমস্ত ঋতুর সর্ব্ববিধ প্রকোপের সহিত উলঙ্গ ভাবে মিলিত থাকে।

ইহাদের স্বাস্থ্য ও চেহারার দিকে চাহিয়া থাকিলে ইহারা সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যাবয়বযুক্ত কি না তদ্বিষয়ে প্রায়শঃ সংশয়ের উদ্ভব হইবে। ইহারাই আমাদের ছত্রিশ কোটীর ৩৩ কোটী। পাঠক এই ছত্রিশ কোটীর তেত্রিশ কোটী শ্রমজীবীর প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া যদি ভারতের প্রকৃত জনসাধারণের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে সক্ষম হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এক্ষণে একবার বাকী তিন কোটী বুদ্ধি-জীবীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার জন্য সহরে সহরে ঘুরিতে প্রস্তুত হউন।

দেখিতে পাইবেন, ইহাঁদের মধ্যে কোথাও বা টিকি ও নামাবলীধারী, কোথাও বা আলখেল্লা প্রভৃতি-পরিহিত ধর্ম্ম-যাজক আছেন, কিন্তু ঐ ধর্ম্ম-যাজকগণের মধ্যে প্রায়শঃ ধর্ম্ম-জ্ঞান বিদ্যমান নাই। ইহাঁরা অর্থাভাবে ক্লিষ্ট হইয়া প্রায়শঃ সর্ব্ববিধ স্বভাব-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইহাঁরা সরলতার নামে রমণীগণকে কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট করিতে প্রায়শঃ কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইহাঁদের কোন ইন্দ্রিয়ই প্রায়শঃ সংযত নহে। পরন্তু, শ্রমজীবিগণের মধ্যে যে সঙ্কোচ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সঙ্কোচ পর্য্যন্ত ইহাঁরা চাতুরী-জালের দ্বারা তিরোহিত করিয়া ফেলিয়াছেন। নিজ-শরীর-মধ্যে মন ও বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ করা তো দূরের কথা, মন ও বুদ্ধি কাহাকে বলে তাহা পর্য্যন্ত ইহাঁরা বিদিত নহেন।

বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের দিকে তাকাইলেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। নামে ইহাঁরা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কিন্তু বিজ্ঞান ও দর্শন কাহাকে বলে তাহার সংজ্ঞা পর্য্যন্ত ইহাঁরা প্রায়শঃ বিদিত নহেন। ইহাঁরা এক একজন এক একটি কথার ঝাড় (Chatter-Box) এবং নিত্য নূতন নূতন শব্দ-প্রবাহের সৃষ্টি করিতেছেন। কিন্তু, কেন যে জনসাধারণ এতাদৃশ দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কি করিলে জনসাধারণ রক্ষা পাইবে তৎসম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে ইহাঁদিগের প্রায়শঃ কোন মুখ-ব্যাদান শুনা যাইবে না। ইহাঁরাও প্রায়শঃ অর্থাভাব-প্রপীড়িত ও স্বাস্থ্য-সুখ-বঞ্চিত। একমাত্র দম্ভ ইহাঁদের সম্বল। দম্ভ ছাড়া আর কোন সম্বল ইহাঁদিগের নিকট থাকিলে জনসাধারণ এতাদৃশ দুঃখে নিপতিত হইতে পারিত কি? চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিয়া ক্লাব করিয়া নারীগণকে লইয়া বিবিধ রকমের পান-ভোজনে ব্যাপৃত থাকিবেন, তাহার নিত্য নূতন পরিকল্পনা আবিষ্কারের জন্য ইহাঁরা সর্ব্বদা সচেষ্ট।

আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়িগণের কৃতিত্ব স্বতঃই প্রকাশমান রহিয়াছে। ইহাঁদের আইন-প্রণয়ন ও আইন-

ব্যবসায় যদি সার্থক হইত, তাহা হইলে মানবসমাজের মধ্যে এত অধিক পরিমাণে নিত্য নূতন নূতন ভাবের পরস্বাপহরণ ও প্রবঞ্চনার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। তথাপি, ইহাঁদের সমালোচনা করাও বিপজ্জনক, কারণ আজকালকার দিনে ইহাঁরাই স্যর, সি. আই. ই, প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়া সমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদের বাগ্‌জালে শ্যামের ধন অনায়াসে রামের হস্তে চলিয়া যাইতেছে, নিরপরাধ ফাঁসির কাঠে ঝুলিতেছে, নরহন্তা উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেছে, পরস্ত্রী-লোলুপ সম্ভ্রমের উচ্চ শিখরে উঠিতে পারিতেছে। সমাজের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির কোন সহায়তা না করিয়া সময় সময় নিরীহ মানুষগুলিকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ইহাঁরা দস্যুর মত নিজদিগকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। ইহাঁদের অনেকে প্রায়শঃ ভুলক্রমেও সত্য কথা না কহিয়া সত্যের ছটা প্রদান করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। তথাপি, ইহাঁরা সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ের এক একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি!

অধ্যাপকগণের গুণ ও কার্য্যক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করিলেও প্রায়শঃ একই রকমের নৈরাশ্যোদ্দীপক অবস্থা পরিলক্ষিত হইবে। স্কুলের ছোট ছোট শিক্ষকগণের কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রায়শঃ অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনার নিপুণতার চিহ্ন ছাড়া আর সমস্ত রকমের কার্য্যতৎপরতা, এই অধ্যাপকগণের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। আলস্যতৎপরতা, সত্যাসত্য-মিশ্রিত আত্ম-বিজ্ঞাপন-প্রিয়তা, কোন বিষয়ে আমূলভাবে প্রবিষ্ট না হইয়া তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞতাজ্ঞাপক-কৌশল-পারদর্শিতা বিষয়হীনবক্তৃতা-দক্ষতা ইহাঁদের সহিত প্রায়শঃ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। চরিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলেও ইহাঁদের মধ্যে অবৈধ-প্রণয়-প্রণয়ন কুশলতার অভাব দেখা যায় না। ইহাঁরা যদি বাস্তবিক পক্ষে কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতেন তাহা হইলে ইহাঁদের চেলাদিগকে এত অধিক পরিমাণে নকরতার জন্য লোলুপ এবং বেকার হইতে হইত না।

চিকিৎসকগণ রুগ্নকে নিরোগী করিতে পারুন আর না-ই পারুন, নিরোগীকে যে প্রায়শঃ উত্তরোত্তর রোগী ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহাঁদের স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের ফলে মানব-সমাজের মধ্যে রোগের সংখ্যা ও রোগীর সংখ্যা ও হাসপাতালের সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া ইহাঁদের কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে তাহা বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাইলে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ইহাঁরা নিপুণ হউন আর না-ই হউন, পাঠ্যাবস্থা হইতেই ইহাঁদের অনেকে যে মদ্যপান ও প্রণয়-সংঘটনকার্য্যে পারদর্শী হইয়া থাকেন, তাহার বহু দৃষ্টান্ত জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। প্রতারণার কার্য্যেও যে ইহাঁরা অনেক স্থলে অসঙ্কুচিত তাহার সাক্ষ্য জীবন বীমা-কোম্পানীসমূহের মামলামোকদ্দমার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে।

কৃষি-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা ও বাণিজ্য-বিদ্যাসমূহে উপাধি-ধারী মানুষের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, মানবসমাজের মধ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের লাভজনকতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা ততই প্রসারলাভ করিতেছে—এই সত্য হইতেই আধুনিক কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকগণের কার্য্যনিপুণতার নিদর্শন দেখা যাইবে। আমাদের মতে, নর্ত্তন-কুর্দ্দন, পরস্বাপহরণ, উৎকোচ-প্রদান ও শঠতা প্রভৃতি বিষয়ে ইহাঁদের দক্ষতার পরিচয় যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, ইহাঁদের আসল কর্ত্তব্য-নির্ব্বাহের নিপুণতা তাহার শতাংশের একাংশ পরিমাণেও বিদ্যমান থাকিলে, জনসাধারণকে অর্থাভাবে এতাদৃশভাবে বিব্রত হইতে হইত না।

বুদ্ধিজীবিগণের সন্তান-সন্ততিসমূহের মধ্যে বেকার ও চরিত্রহীনের সংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা আরও হৃদয়বিদারক।

মোটের উপর, ভারতবাসিগণের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে সাধারণ শ্রমজীবিগণের অবস্থা যেরূপ হৃদয়বিদারক, বুদ্ধিজীবিগণের অবস্থাও সেইরূপ নৈরাশ্যজনক। এক দিকে জনসাধারণ দুঃখে হাবুডুবু খাইতেছে, অন্য দিকে বুদ্ধিজীবিগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া তাণ্ডব-নৃত্যে ধেই ধেই করিয়া নাচিতেছেন। এক কথায়, সাধারণের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইতে সঙ্গীনতর হইয়া পড়িতেছে, অথচ যাঁহাদের দ্বারা ঐ অবস্থার উন্নতিসাধন করা

সম্ভবপর, তাঁহাদেরও মোহমুগ্ধতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই সময় ভারতের নেতৃবর্গ কি করিতেছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারিলে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য নহে, এই অজুহাতে কংগ্রেস কোমর বাঁধিয়া স্বাধীনতার যুদ্ধে লাগিয়া গিয়াছেন। অথচ, কেহই ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, স্বাধীনতা হইলেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভবযোগ্য নহে। স্বাধীনতা হইলেই যদি জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের কোন দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু, বাস্তব সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

এই সময় গান্ধীজী ও জওহরলালজী ও কংগ্রেস-সভাপতি সুভাষচন্দ্র কি করিতেছেন তাহাও বিশেষ মনোযোগের যোগ্য।

গান্ধীজী এক্ষণে সঙ্ঘের সেনাদলগঠনে ব্যাপৃত, জওহরলালজী আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা-নিরূপণে অভিনিবিষ্ট, আর সুভাষচন্দ্র অভিনন্দনগ্রহণে মাতোয়ারা।

ইহারই জন্য আমাদের প্রশ্ন—আমরা কোন্ দিকে?

আমাদের প্রশ্ন কি বিন্দুমাত্রও অপ্রাসঙ্গিক?

আমাদের রক্ষার উপায় কি?

ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী এই উভয় শ্রেণীর মানুষই যে প্রায়শঃ সর্ব্ববিধ বিষয়ে উত্তরোত্তর হীনতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং হইতেছে তাহা গত সপ্তাহের "আমরা কোন্ দিকে?"—শীর্ষক সম্পাদকীয় সন্দর্ভে দেখান হইয়াছে। এই অবনতির গতি অনতিবিলম্বে ফিরাইতে না পারিলে ভারতবাসিগণের প্রকৃত ভারতবাসী হিসাবে অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে, ইহা আমাদিগের অভিমত।

মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া যত্থপি চারিটি অন্ন সংস্থানের জন্য ব্যক্তিগত ভাবে স্বকীয় বুদ্ধি-বিবেচনা বিসর্জ্জন দিয়া বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া চিরজীবন যন্ত্রের মত অপরের আদেশানুবর্ত্তিতা করিতে হয়, অথবা প্রতিনিয়ত ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করিতে না করিতেই যত্থপি প্রতিদিন কোন না কোন ব্যাধিতে বিধ্বস্ত হইয়া বাকীজীবন জরাগ্রস্তের মত কাটাইতে হয়, অথবা চত্বারিংশৎ বৎসর অতিক্রম করিতে না করিতেই যত্থপি পরিজনকে দুঃখসমুদ্রে ভাসাইয়া শতকরা ৬৭ জনের মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে মনুষ্য-জন্ম ধারণ করিবার যে কোন সার্থকতা থাকে না, ইহা বলাই বাহুল্য। ভারতবাসীর বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ভারতবাসিগণ ঠিক ঠিক উপরোক্ত অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। অথচ, এই ভারতবর্ষে কিছু দিন আগেও এমন এক দিন ছিল, যখন এখানকার শতকরা ৯৯ জন, কাহারও কোনরূপ বেতনভোগী নফরগিরি না করিয়া এবং ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, স্বাধীনভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারিত এবং অধিকাংশ মানুষই নীরোগী হইয়া ৭০।৮০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন রক্ষা করিতে পারিত ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিত।

কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে পুনরায় আগেকার মত কাহারও কোনরূপ নফরগিরি না করিয়া সম্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত হইয়া ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিয়া, নীরোগী যুবকের মত দীর্ঘ জীবন ধারণ করা সম্ভব হইতে পারে, প্রধানতঃ তাহার আলোচনা করা আমাদের বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

আমরা গত সপ্তাহের "আমরা কোন দিকে?"—শীর্ষক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, মানুষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, যথাঃ—(১) বুদ্ধিজীবী ও (২) শ্রমজীবী; মানুষ যেরূপ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, সেইরূপ মানুষের জীবনও দুই শ্রেণীর কার্য্যে বিভক্ত, যথাঃ—(১) ব্যক্তিগত ও (২) সঙ্ঘগত। বুদ্ধিজীবী মানুষ প্রধানতঃ আট শ্রেণীতে বিভক্ত, যথাঃ—(১) ধর্ম্ম-যাজক, (২) বৈজ্ঞানিক ও

দার্শনিক, (৩) আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, (৪) অধ্যাপক, (৫) চিকিৎসক, (৬) কৃষি-তত্ত্বাবধারক, (৭) শিল্পতত্ত্বাবধারক, (৮) বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক। আর, শ্রমজীবী মানুষ প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(১) শ্রমজীবী কৃষক, শ্রমজীবী শিল্পী, (৩) শ্রমজীবী বণিক, (৪) পরিচারক। যে দুই শ্রেণীর কার্য্য লইয়া প্রত্যেক মানুষের জীবন গঠিত হইয়া থাকে, সেই দুই শ্রেণীর কার্য্যের প্রত্যেকটি আবার প্রধানতঃ পাঁচ শ্রেণীর বিষয় লইয়া পরিচালিত হয়, যথা (১) অর্থগত, (২) শরীরগত, (৩) ইন্দ্রিয়গত, (৪) মনো-গত এবং (৫) বুদ্ধিগত।

আমাদের গত সপ্তাহের উপরোক্ত সন্দর্ভ অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যাহাতে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত হইয়া, কাহারও কোনরূপ নফরগিরি না করিয়া, ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এবং নীরোগ যুবকের মত দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ আর্থিক প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন আছে, অন্যদিকে আবার শারীরিক স্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়ের সবলতা, মনের একনিষ্ঠতা এবং বুদ্ধির নিপুণতারও সমান পরিমাণের আবশ্যকতা বিদ্যমান আছে। কি করিয়া মানুষের উপরোক্ত আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়ের সবলতা, মনের একনিষ্ঠতা এবং বুদ্ধির নিপুণতা যুগপৎ ভাবে প্রয়োজনীয় পরিমাণে সংঘটিত হইতে পারে, তাহার কথা ভাবিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যাহাতে তাহার আদর্শস্থলে পৌঁছিতে পারে, তজ্জন্য আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, ইন্দ্রিয়ের সবলতা, মনের একনিষ্ঠতা ও বুদ্ধির নিপুণতার যুগপৎ ভাবে প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আর্থিক প্রাচুর্য্য সম্যক্ ভাবে লাভ করা সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শারীরিক স্বাস্থ্য প্রভৃতি অপর চারিটীবিষয়ক প্রাচুর্য্য লাভ করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। কাজেই বলিতে হইবে যে, কোন দেশের একটি জাতি যাহাতে আদর্শস্থলে উপনীত হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে ঐ জাতির প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত হইয়া, কাহারও নফরগিরি না করিয়া, ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে এবং নীরোগ যুবকের মত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কোন জাতির প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে সর্ব্বরকমের উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে মুক্ত হইয়া কাহারও কোন রকমের নফরগিরি না করিয়া ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে ও নীরোগ যুবকের মত দীর্ঘজীবন লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাহা করিতে হইলে, দেশের মধ্যে যাহাতে প্রত্যেকের আর্থিক প্রাচুর্য্য সংঘটিত হইতে পারে, সর্ব্বপ্রথমে তাহার চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করিতে হয়।

যাহাতে কোন জাতির প্রত্যেকের আর্থিক প্রাচুর্য্য সংঘটিত হয়, তাহা করা অনায়াসসাধ্য নহে। কোন জাতির প্রত্যেকের যে আর্থিক প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা সম্ভব, তাহা পর্য্যন্ত আজকালকার বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করেন না। ইঁহারা মনে করেন যে, যখন কোন জাতির মোট লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন যাহাতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি না ঘটে, তাহা করিতে না পারিলে, দেশের কতকগুলি লোকের অর্থাভাব ঘটা অনিবার্য্য। ইঁহারা পরোক্ষভাবে "জীব দিয়াছেন যিনি আহার দিবেন তিনি", এই মহাবাক্যের সত্যতা পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া থাকেন। মানুষ যদি মূর্খতায় ও পাপে লিপ্ত না হইয়া যথাযথভাবে বিবিধ সংগঠনের কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহা হইলে যে, সর্ব্বাবস্থায়ই প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক মানুষটির আর্থিক প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা সম্ভব, তাহা আমরা একাধিক সন্দর্ভে প্রমাণিত করিয়াছি। কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে কোন জাতির প্রত্যেক মানুষটির আর্থিক প্রাচুর্য্য সংঘটিত করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা বর্ত্তমান সন্দর্ভে বিস্তৃতভাবে পুনরায় উত্থাপিত করিব না।

আমরা পাঠকগণকে শুধু ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, কোন জাতি যাহাতে জাতীয় আদর্শস্থলে উপনীত হইতে পারে তাহা করিতে হইলে, বহুবিধ কার্য্য ও সংগঠনের প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেক মানুষটি যাহাতে প্রয়োজনমত আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ

করিতে পারে তাহা করিতে হইলে, প্রধানতঃ দুইটিবিষয়ক কার্য্যের আবশ্যক হইয়া থাকে,যথা—(১) জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি এবং (২) বিবিধ দ্রব্যমুল্যের মধ্যে সমতা (parity)-সাধন।

কোন জাতির প্রত্যেক মানুষটি যাহাতে প্রয়োজনমত আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করিতে পারে তাহার এতাদৃশ সহজ উপায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেক জাতির প্রায় প্রত্যেক মানুষটির এতাদৃশ পরিমাণে আর্থিক অভাবের তাড়না সহ্য করিতে হয় কেন, তদ্বিষয়ক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ, বিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে ও দায়িত্ব-নির্ব্বাহে অবহেলা। (১) বুদ্ধিজীবী মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষ একত্র মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে যে সমাজের সর্ব্বরকমের দুঃখ দুর করা সম্ভব, (২) শ্রমজীবী মানুষের পরিচালনা করা যে বুদ্ধিজীবী মানুষের হস্তে স্বভাবতঃ ন্যস্ত, (৩) শ্রমজীবী মানুষ কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলে তাহার জন্য যে বুদ্ধিজীবী মানুষের উপর দায়িত্ব আরোপিত করিতে হয়, (৪) কাযেই, সমাজে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে তজ্জন্য যুক্তিসঙ্গতভাবে বুদ্ধিজীবী মানুষই যে সর্ব্বাধিক দায়ী হইয়া থাকেন, এই চারিটি সত্য স্বীকার করিয়া লইলে মানব-সমাজের বর্ত্তমান আর্থিক অভাবের জন্য যে সর্ব্বাধিক দায়িত্ব বুদ্ধিজীবী মানুষগণের স্কন্ধে আরোপিত করিতে হয়, তদ্বিষয়ে অস্বীকার করা চলে না। বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষের কিরূপ চেষ্টার ফলে মানুষের এতাদৃশ অবনতির অবস্থা সত্ত্বেও পুনরায় প্রত্যেক মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য আনয়ন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা আমাদের এই সন্দর্ভের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা মনে রাখিতে হইবে।

কোন্ কোন্ শ্রেণীর মানুষের কিরূপ চেষ্টার ফলে মানুষের এতাদৃশ অবনতির অবস্থা সত্ত্বেও পুনরায় প্রত্যেক মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য আনয়ন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহা আমরা গত সপ্তাহের "আমরা কোন্ দিকে ?"-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। ঐ প্রবন্ধে ইহাও দেখান হইয়াছে যে, সমাজমধ্যে প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজক বিদ্যমান থাকিলে অনায়াসে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের উদ্ভব হইয়া থাকে; প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত আইন-প্রণেতার উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়; প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এবং প্রকৃত আইন-প্রণেতা বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত অধ্যাপকের উদ্ভব হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়, প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজক, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রকৃত আইন-প্রণেতা এবং প্রকৃত অধ্যাপক বিদ্যমান থাকিলে প্রকৃত চিকিৎসক,প্রকৃত কৃষি-তত্ত্বাবধারক,প্রকৃত শিল্প-তত্ত্বাবধারক ও প্রকৃত বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকের উদ্ভব হওয়া অনায়াস-সাধ্য হয়।

আমাদের উপরোক্ত কথাগুলির যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করিতে পারিলে ইহা সহজেই বুঝা যাইবে যে, ধর্ম্মযাজক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, আইন-প্রণেতা ও আইনব্যবসায়ী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্পতত্ত্বাবধারক ও বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক, এই আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের কোন শ্রেণীই অপর এক শ্রেণীর সাহায্য ব্যতীত সম্যক্ ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিতে সমর্থ হন না এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মযাজকের উদ্ভব না হইলে অন্য কোন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর উদ্ভব হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে।

বর্ত্তমানে যে সমস্ত গ্রন্থ ইতিহাস বলিয়া প্রচলিত, সেই সমস্ত গ্রন্থ কার্য্যকারণের মাপকাঠির সহায়তায় অধ্যয়ন করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার অনেক স্থলই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। উপরোক্ত ইতিহাসের মধ্যে যাহা প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া পরিচিত, তাহার যে সমস্ত অংশ অবিশ্বাসযোগ্য তাহা বাদ দিয়া, যাহা কার্য্যকারণসঙ্গত তাহা মানস-নেত্রে অনুমান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রাচীন মানবসমাজে এমন একদিন ছিল, যখন বস্তুত-পক্ষে যাহা আজ প্রবাদবাক্য বলিয়া অবিশ্বাসযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই 'রাম-রাজত্ব' সত্যসত্যই বিদ্যমান ছিল এবং তখন মানবসমাজের কুত্রাপি অর্থাভাব বলিয়া কোন অবস্থা বিদ্যমান ছিল না। যখন মানবসমাজে এতাদৃশ অর্থাভাবহীনতা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছিল, তখন মানসনেত্রে ইহাও

দেখা যাইবে যে, তখন সর্ব্বত্রই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মযাজকগণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অধ্যাপক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কৃষিতত্ত্বাবধারক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিল্পতত্ত্বাবধারক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকগণও সমাজের সর্ব্বত্র পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

সংস্কারাবিষ্টতা পরিত্যাগ করিয়া অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষের অভ্যুদয়ের ফলে একদিন মানব-সমাজ হইতে অর্থাভাব সম্যক্ ভাবে বিদূরিত হইতে পারিয়াছিল, সেই আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী মানুষ এখনও বিদ্যমান আছেন, কিন্তু এখন আর তাঁহাদের কেহই প্রায়শঃ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নহেন। পরন্তু, উহাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই নামে মাত্র বিদ্যমান আছেন। বর্ত্তমানকালে যাঁহারা ধর্ম্মযাজক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক ও বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারক বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের অধিকাংশই যে ঐ ঐ নামের কলঙ্ক, তাহাও আমরা আমাদের গত সপ্তাহের "আমরা কোন্ দিকে?" শীর্ষক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি।

কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে পুনরায় আগেকার মত, মানবসমাজ সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব-পরিশূন্য হইতে পারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমাদের মতে, ধর্ম্ম-যাজকাদি যে আটশ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ সমাজের সর্ব্বত্র পরিশোভিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিলুপ্তি কেন ঘটল এবং তাঁহাদের নামে কেন কতকগুলি কলঙ্কময় মানুষ সমাজে স্থান পাইল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ঐ সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, কি করিয়া মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দারিদ্র্যাবস্থা হইতে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং পুনরায় ঐ সমৃদ্ধিশালী মানুষের বংশ কিরূপে দরিদ্র হয়, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতগুণসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মী না হইতে পারিলে কোন দরিদ্র মানুষের পক্ষে প্রকৃতপক্ষে সমৃদ্ধিশালী হওয়া সম্ভব হয় না। বর্ত্তমানকালে জুয়াখেলার দ্বারা সময় সময় প্রকৃত-গুণসম্পন্ন ও কর্ম্মী না হইয়াও কাহারও কাহারও পক্ষে ধনী হওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ ধন প্রায়শঃ প্রকৃত সুখের কারণ না হইয়া দুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে। বাস্তব জগৎ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যাঁহারা জুয়াখেলার দ্বারা ধনবান্ হইতে সক্ষম হন, তাঁহাদের অধিকাংশই ধনের অপব্যবহার করিয়া, স্বাস্থ্য-সুখ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। যে-ধন স্বাস্থ্য-সুখ ও পারিবারিক শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে অসমর্থ, সেই ধন আমাদের মতে প্রকৃত সমৃদ্ধির কারণ হইতে পারে না।

প্রকৃত-গুণসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মী না হইতে পারিলে, যেরূপ দারিদ্র্যাবস্থা হইতে প্রকৃত সমৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না, সেইরূপ প্রকৃত-গুণসম্পন্ন হইয়া, প্রকৃত কর্ম্মী না হইতে পারিলে, সমৃদ্ধিশালীর বংশধরগণের পক্ষে সমৃদ্ধি রক্ষা করাও সম্ভব হয় না।

দরিদ্রগণের পক্ষে দুনিয়ার চাটুকারিগণের অন্তরালে থাকিয়া প্রকৃত-গুণসম্পন্ন ও কর্ম্মী হওয়া যত সহজ, সমৃদ্ধিশালিগণের বংশধরগণের পক্ষে চাটুকারিগণের উপাসনার বস্তু হইয়া প্রকৃত-গুণসম্পন্ন ও কর্ম্মী হওয়া তত সহজ নহে।

স্বভাবের এই নিয়মবশে দুনিয়ার প্রত্যেক স্থানে দেখা যাইবে যে, দরিদ্রগণ অহরহঃ প্রকৃত-গুণসম্পন্ন ও কর্ম্মী হইয়া প্রকৃতভাবের সমৃদ্ধি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন; আর, সমৃদ্ধিশালীর বংশধরগণ চাটুকারিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া অল্পাধিক পরিমাণে আত্ম-প্রতারণাপরায়ণ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাদের পক্ষে প্রায়শঃ প্রকৃত-গুণসম্পন্ন ও কর্ম্মী হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইরূপ প্রতিনিয়ত মানুষ ব্যক্তিগতভাবে দরিদ্রাবস্থা হইতে সমৃদ্ধিশালী হইতেছেন এবং তাঁহাদের বংশধরগণ সমৃদ্ধিশালী হইতে দরিদ্র হইতেছেন।

সমৃদ্ধিশালিগণের বংশধরগণ যাহাতে দরিদ্র না হইতে পারেন, অথবা দরিদ্র হইলেও তাঁহারা যাহাতে পুনরায় ব্যক্তিগত ভাবে সমৃদ্ধিশালী হইতে পারেন তাহা কোন্ উপায়ে করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহাঁদের পতনের

মূল কারণ প্রধানতঃ দুইটী—(১) চাটুকারিগণের সংখ্যার বৃদ্ধি এবং (২) আত্ম-প্রতারণা-পরায়ণতার বৃদ্ধি। কাজেই, উহাঁরা যাহাতে পতিত না হইতে পারেন, অথবা পতিত হইলেও পুনরায় যাহাতে উহাঁদের উন্নতি হয় তাহা করিতে হইলে, সমাজ-মধ্যে উহাঁদের চাটুকারিগণের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি না পায় এবং উহাঁরা নিজেরাও যাহাতে আত্ম-প্রতারণা-পরায়ণ না হন, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যেরূপ দরিদ্রাবস্থা হইতে সমৃদ্ধিশালী হয় এবং সমৃদ্ধাবস্থা হইতে দরিদ্র হয়, জাতিগতভাবেও মানুষের একই রূপে সমৃদ্ধি ও দারিদ্র্য ঘটিয়া থাকে।

কার্য্য-কারণের সঙ্গতির মাপকাঠির সহায়তায় মানব-সমাজের প্রাচীন ইতিহাসে যথাযথভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আজকাল যেরূপ মানবসমাজ হইতে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক প্রভৃতি আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর বিলুপ্তি ঘটিয়াছে এবং তৎস্থানে ঐ ঐ নামের কলঙ্কময় কতকগুলি মানুষের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, বার হাজার বৎসর আগেও ঠিক ঠিক সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। আজকাল যেরূপ মানবসমাজের সর্ব্বত্রই দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্যের জন্য হাহাকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, মানবসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া পড়িয়াছে, বার হাজার বৎসর আগেও মানবসমাজ ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। আজকাল যেরূপ ভণ্ডগণ কোনরূপ প্রকৃত সাধনায় নিপুণতা লাভ না করিয়া এবং সর্ব্বতোভাবে চরিত্রহীন হইয়াও জনসমাজের কতিপয় অংশের নেতৃত্বলাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিতেছেন, বার হাজার বৎসর আগেও একদিন মানবসমাজে ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল।

বার হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের উপরোক্ত ইতিহাস আজকালকার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন তাহা আমরা জানি, তথাপি কর্ত্তব্যের খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য যে, এখনও যজুর্ব্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে নিপুণতা লাভ করিয়া, অথর্ব্ববেদ অথবা বাইবেল অথবা কোরাণে ভাষা-বিজ্ঞানের সাহায্যে যথাযথ অর্থে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে, অথবা ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের কতকগুলি কথা বুঝিতে পারিলে আমাদের উপরোক্ত ইতিহাস যে বর্ণে বর্ণে সত্য তাহা উপলব্ধি করা যাইবে।

বার হাজার বৎসর আগে মানবসমাজ যখন এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তখন কয়েক বৎসর কয়েকজন ভণ্ডের পক্ষে কোনরূপ প্রকৃত সাধনায় নিপুণতা লাভ না করিয়াও এবং সর্ব্বতোভাবে চরিত্রহীন হইয়াও জনসমাজের কতিপয় অংশের নেতৃত্ব লাভ করা সম্ভব হইয়াছিল বটে; কিন্তু, অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এই চরিত্রহীন ও সাধনাহীন ভণ্ডগণের প্রভাবের ফলে, তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণের ও নিরীহ জনসাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তখন চরিত্রহীন ও সাধনাহীন ভণ্ডগণের বিপদাপন্নকারী প্রভাবের ফলেই যে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহা তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ ও নিরীহ জনসাধারণ বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যাহাতে চরিত্রহীন ও সাধনাহীন মানুষ নেতৃত্ব লাভ না করিতে পারে, তজ্জন্য জনসাধারণ বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল। এই বদ্ধপরিকরতার ফলে, অনতি-বিলম্বে বুদ্ধিজীবী মানুষগণের মধ্যে প্রকৃত সাধনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছিল। এই জাগরণের ফলে, ক্রমে ক্রমে প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজক, সাধনানিরত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, নিষ্ঠাবান্ আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, চিন্তাশীল অধ্যাপক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসক ও কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং বাণিজ্য-তত্ত্বাবধারকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। এই আট শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর অভ্যুদয়ের ফলে শ্রমজীবী কৃষক, শ্রমজীবী শিল্পী, শ্রমজীবী বণিক্ প্রভৃতি লইয়া যে জনসাধারণ, সেই জনসাধারণের মধ্য হইতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যু তখনকার মত সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হইয়াছিল।

কাযেই, কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া মানব-সমাজ পুনরায় আগেকার মত সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাবপরিশূন্য হইতে পারে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পুনরায় যাহাতে ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজে প্রকৃত ধর্ম্মযাজক, প্রকৃত সাধনা-নিরত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, নিষ্ঠাবান্ আইন-প্রণেতা ও আইন-ব্যবসায়ী, চিন্তাশীল অধ্যাপক এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চিকিৎসকের অভ্যুদয়

হয়, তদুদ্দেশ্যে ঐ ঐ বিষয়ে যাহাতে বুদ্ধিজীবী মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাধনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

ধর্ম্ম-যাজকতা, বৈজ্ঞানিকতা ও দার্শনিকতা, আইন প্রণয়ন ও তদ্ব্যবসায়-তৎপরতা, অধ্যাপকতা, চিকিৎসা-নিপুণতা, কৃষি তত্ত্বাবধারকতা, শিল্প-তত্ত্বাবধারকতা এবং বাণিজ্য তত্ত্বাবধারকতা-সম্বন্ধীয় সাধনার প্রবৃত্তি যাহাতে জাগ্রত হয় তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ, এক্ষণে যাঁহারা চরিত্রহীন ও সাধনাহীন হইয়াও ধর্ম্ম যাজক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, আইন-প্রণেতা, আইন-ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, চিকিৎসক, কৃষি-তত্ত্বাবধারক, শিল্প-তত্ত্বাবধারক এবং বাণিজ্য-তত্ত্ববধারক বলিয়া পরিচিত তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণকে উহাঁরা যাহাতে সাধনানিরত ও প্রকৃতপক্ষে চরিত্রবান্ হইতে চেষ্টা করেন, তজ্জন্য বদ্ধভাবে অবহিত হইতে হইবে। ঐ অনুবর্ত্তিগণের চেষ্টা সত্ত্বেও উপরোক্ত চরিত্র-হীন ও সাধনা-হীন ধর্ম্ম যাজক প্রভৃতি বুদ্ধিজীবিগণ যদি নিজদিগকে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে উহাঁরা যাহাতে সমাজমধ্যে অবজ্ঞেয় হন এবং প্রকৃতভাবে চরিত্রবান্ ও সাধনা-তৎপর না হইয়া কোন নেতৃত্ব যে বিপজ্জনক তাহা যাহাতে উহাঁরা বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য ঐ অনুবর্ত্তিগণকে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই আমাদের রক্ষার উপায়।

বর্ত্তমান নেতৃবর্গের অনুবর্ত্তিগণ যদ্যপি উপরোক্ত দ্বিবিধ চেষ্টা করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন, অথবা তাঁহাদের চেষ্টা যদ্যপি বিফল হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির নিয়মবশে জনসাধারণে অনশনে ও অর্দ্ধাশনে বিপর্য্যস্ত হইয়া, চরিত্রবান্ ও সাধনাযুক্ত না হইয়া নেতৃত্বাসনে সমাসীন হওয়া যে বিপজ্জনক, তাহা এই নেতৃবর্গকে বুঝাইয়া দিবে। তখন রক্ত-গঙ্গা প্রবাহিত হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে।

আমরা এখনও বর্ত্তমান ভণ্ড নেতৃবর্গকে সাবধান হইতে অনুরোধ করি।

গবর্ণমেণ্ট ও বর্ত্তমান কংগ্রেস

গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান কংগ্রেসের প্রতি যে কার্য্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন, উহার ফলে কংগ্রেসকে জনসাধারণের চক্ষে অবজ্ঞাভাজন হইতে হইবে এবং ভারতীয় জনসাধারণের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ বৃদ্ধি পাইবে; যে যে ব্যবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণের অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব, সেই সেই ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে।

কংগ্রেস-পন্থিগণের প্রতি কোন্ নীতি অবলম্বিত হইলে কাহারও পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ভাবে গভর্ণমেণ্টের প্রতি দোষারোপ করা অসম্ভব হইতে পারে, তদুত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, প্রথমতঃ, প্রকৃত কংগ্রেস যে দেশের জনসাধারণের দলাদলি মিটাইবার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয়তঃ, বর্ত্তমান কংগ্রেসের নেতৃবর্গ যে কোন প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত করিবার চেষ্টা না করিয়া কংগ্রেসের নামে একটা দলবিশেষ মাত্র গঠিত করিয়াছেন এবং তাহারই ফলে ভারতবর্ষের দলাদলি এবং অর্থ-সমস্যা ও স্বাস্থ্য-সমস্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তৃতীয়তঃ, প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত করিতে হইলে যে, হয় বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মনোভাব যাহাতে পরিবর্ত্তিত হয়, নতুবা তাঁহারা যাহাতে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হন তাহার চেষ্টা জনসাধারণকে করিতে হইবে, চতুর্থতঃ, প্রকৃত কংগ্রেস গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত যে, কংগ্রেস-পন্থিগণের গভর্ণমেণ্টের কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে—এই চারিটি সত্য যাহাতে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়, তাহার ব্যবস্থায় যদি মন্ত্রিমণ্ডল অথবা রাজপুরুষগণ হস্তক্ষেপ করেন, তাহা হইলে কংগ্রেসের প্রতি গভর্ণমেণ্টের কার্য্য-নীতির উপর ন্যায়তঃ কোন দোষারোপ করা সম্ভব হইবে না।

কালের লীলা

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

চরিত্র

দাদু।
দিদিমা।
মণ্টু—নাতি।
শচীরাণী—নাৎনী।
কেষ্ট—তরুণ প্রতিবেশী।

দৃশ্য

[দাদু ঘরে বসিয়া আছেন—সামনে একরাশ পুতুল, খেলনা ছড়ানো। দাদু নিবিষ্ট মনে খেলনা-পুতুলগুলা নাড়িতেছেন।]

[দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। ওমা, বেলা বারটা বাজে—রাজ্যের সেই পুতুল আর খেলনা পেড়ে বসে আছ! নাইতে হবে না?

দাদু। মণ্টু, শচীর খাওয়া হয়েছে?

দিদিমা। শচী খেয়েছে,—মণ্টু এখনও বাড়ী ফেরে নি।

দাদু। এত বেলায় বাড়ী ফেরে নি! কোথায় গেছে?

দিদিমা। ওদের কি টেনিস্ খেলা হবে রোব্‌বারে—তারি ব্যবস্থা করতে।

দাদু। নাঃ, ভারী অন্যায় এ··এত বেলা পর্যান্ত পিত্তি পড়লো!···তা হলে সে আসুক।

দিদিমা। শচী বলছে, ওর দাদা হয়তো খেয়েই বাড়ী ফিরবে। তুমি ওঠো, উঠে চান করো গে···! এখন আর পুতুল পেড়ে চুপচাপ বসে থেকো না! ওঠো গো···আর দেরী কর না—আমি যাই, রোদ উঠেচে, আমসত্বগুলো রোদে দিই··ঐ আসছে তোমার গুণের নাৎনি, শচী—তোমার রূপসী ছোট গিন্নি··না তুলে ছাড়বে না, জেনো! এই যে দিদি! দেখবে এসো, তোমার দাদু পুতুল নিয়ে ধ্যানে বসে আছে···আমি পারলুম না, তুমি যদি পারো দাদুর ধ্যান ভঙ্গ করো এসে [প্রস্থান]

[শচীর প্রবেশ]

শচী। ওমা, সত্যি! না, তোমার দেখছি বাতিক দাঁড়িয়েছে। এই সব ভাঙ্গা পুতুল, কাঠের বল, ঝুঁতির ঝালা, কাঠের ঘোড়া—এসব নিয়ে কিসের তুমি ধ্যান করো বলতো? আজকাল প্রায় দেখি, তোমার এই কাজ! বারোটা বেজে গেছে এখনো এই ভাঙ্গা পুতুলগুলো নিয়ে বসে আছো, চান্ করবার নামটি নেই—দাঁড়াও, দিচ্ছি তোমার খেলনা-পত্তর টান্ মেরে রাস্তায় ফেলে।

(গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন)

দাদু। (বাধা দিয়া) আহা, করিস্ কি দিদি! যেগুলোকে তোরা দিখছিস্ খেলনা পুতুল—সেগুলো আমি দেখি খেলনা নয়, পুতুল নয়··ছেলেবেলার রূপকথার গল্প বলতো তোমার দিদিমা—সে গল্পে শুনেছিলে, রাক্ষসের প্রাণ থাকতো কালো দীঘির অথৈ জলে মাছের বুকে···আমার প্রাণ তেমনি আছে এই পুতুল আর খেলনার মধ্যে।

শচী। (রাগিয়া) কি যে তুমি বল! এ সেঞ্চুরিতে ঐ কথা বলে তুমি ভুলাতে চাও আমাদের! তার উপর আমি এখনো কচি খুকী আছি না কি যে, ও-কথা বলে আমাকে ভুলোবে?

দাদু। তুমি এখন আমার রূপসী বিদুষী তরুণী ভার্য্যা—কিন্তু তাই বলে আমার উপরে রাগ করে পুতুল আর খেলনার উপরে যেন পীড়ন করিস নি দিদি।

শচী। লোকে বলে, বুড়ো হলে মানুষের আবার ধরণ হয় ছেলেমানুষের মত, এ সত্যি দাদু? তাই বুঝি সেকালের এই খেলনা-পুতুল পেড়ে খেলাতে বসো।

দাদু। কখনো তো পুতুল নিয়ে খেলাগি নে, তা'ছাড়া এই খেলনা, পুতুল এসবে কত ইতিহাস, কত কাহিনী মিশে আছে দিদি···তা যদি জানতিস! সে-সব কাহিনী নিয়ে কত কত পুরাণ লেখা যায়।

শচী। ইতিহাস-পুরাণ?

দাদু। তাই।

শচী। এই মাটির বেনে-পুতুলটা···রং চটে গেছে, নাক ভাঙ্গা—মাথা [illegible]লানো··

দাদু। ও মাটীর পুতুলটির প্রত্যেক কথা আমার মনে আছে—এতটুকু ভুলি নি।

শচী। তবু যদি মিকি-মাউস হতো…এ পুতুলের কি কথা শুনি।

দাদু। শুনবি? এ পুতুলটি প্রথম যেদিন এলো আমাদের ঘরে তোর মার বয়স তখন পাঁচ বছর।…রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলুম…তোর মা ছিল চাকরের কোলে কত কি কিনে দিলুম—যেটা চায়…তালপাতার বাঁশী, মাটীর রথ মা যশোদা…তখন এই সেলুলয়েডের বড় বড় পুতুলের আমদানী হয়েছে, মার একটা বড় বেবি পুতুল কিনলুম—কিন্তু তোর মার বায়না…এই পুতুলটা তার চাই…দিলুম কিনে। এ পুতুলের মূর্ত্তি তখন এমন ছিল না…মাথায় ছিল ঝকঝকে পালিশ করা কালো রঙের খোঁপা…দিব্যি টিকোলো নাক—মা-দুর্গার মতন মুখখানি…এ পুতুলটি পেয়ে তোর মার কি সে আহ্লাদ! চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছি দিদি…(ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন)। আজ কোথায় গেল জীবনের দেনাপাওনা চুকিয়ে তোর সেই মা বুক থেকে সরে…পুতুলটি কিন্তু যায় নি আমার বুকে রয়েছে আজও…কত কত বৎসরের স্মৃতি মেখে…

শচী। পুরোণো সব কথা তোমার মনে আছে দাদু?

দাদু। সব মনে আছে ভাই—

শচী। আচ্ছা, আগে তো এসব খেলনা-পুতুল নিয়ে বসতে না। আমাদের এসব হাত দিতে দিতে না, এখন এসব নিয়ে বসো যে—

দাদু। তখন তোমাদের দুটি ভাইবোনের কাজ ছিল না—আমাকে দু'দিক থেকে দুজনে ঘিরে থাকতে…এখন তোমরা ডাগর হয়েছ তোমাদের নিজেদের কত কাজ লেখাপড়া, নিজেদের সখের খেলা-গল্প, গান-বাজনা—আমি একা কি নিয়ে থাকি বল তো ভাই—তাই এই পুরোনো দিনের স্মৃতির মালাছড়াটি পেড়ে বসি…এই কাঠের গাড়ী, টিনের বাঁশী, মাটীর পুতুল, পুঁতির ছড়া দিয়ে যে মালা গাঁথা আছে…

শচী। তোমার কথা শুনে এত কষ্ট হয়, দাদু—ভাবি, মা, বাবা কেন চলে গেলেন। আজ যদি থাকতেন…একসঙ্গে মিলে-মিশে সকলে…(স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল)।

দাদু। ও-কথা থাক দাদু—এ কথা ভেবে কত সয়েছি যদি জানতিস! একটুকু বয়স থেকে দিনে দিনে তোরা দু'ভাই-বোনে বেড়ে উঠেছিস…খেলা করেছিস, লেখেছিস, গল্প করেছিস…দেখে যত ভালো লেগেছে, তত ব্যথা পেয়েছি, দিদি কেবলি মনে হয়েছে, এ হাসিখেলা দেখতে মা, বাবা দেখতে পেলো না।

শচী। আমার তখন কত বয়স দাদু, যখন মা, বাবা…

দাদু। তুই ছ'মাসের…তোর দাদা মন্টু দু'বছরের…

শচী। (after a pause) আচ্ছা তোমার মার কথা, তোমার বাবার কথা…সে সবও তোমার মনে আছে?

দাদু। নেই? কারো কথা ভুলি নি…যতদিন যাচ্ছে, সকলের কথা তত বেশী করে ঘন হয়ে জমাট বেঁধে এ বুকে চেপে চেপে বসছে…কথায় কথায় বুকখানা যেন কথাসরিৎ-সাগর হয়ে আছে ভাই।

শচী। বল না দাদু…আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছা করে।

দাদু। (ভাবমুগ্ধচিত্তে) এই বাড়ী এই বাড়ীরই কত মূর্ত্তি দেখলুম…ঐ ভাঙ্গা পাঁচিল তখন ছিল আস্ত…এতখানি লম্বা, সেই রাস্তার ধার পর্য্যন্ত টানা…মস্ত ঠাকুর-দালান, ধুমধামে পুজো হতো, দুর্গাপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, দোল, অন্নপূর্ণা পুজো…

শচী। সব পুজো?

দাদু। এক রকম তাই। যাত্রা হতো, গান-বাজনা হতো…আমার বয়স তখন কত? সাত না আট, আট…বছর। সেবারে বাড়ীতে হলো গোলোক অধিকারীর যাত্রা, অক্রুর-সংবাদের পালা…আহা, সেই একটি গান আজও আমার কানে বাজছে—শ্রীরাধা আকুল মিনতি ভরে অক্রুরকে বলছেন—"রথ রাখ, রথ রাখ ক্ষণেক লাগি, আমরা একটিবার দেখব শুধু—আমরা প্রেমের অনুরাগী!" সে গান শুনে কি কান্নাই কেঁদেছিলাম! এখনো গান শুনি…কিন্তু কাঁদি না, হয়তো যে প্রাণ সেদিন গান শুনে কাঁদতো, সে প্রাণ আজ নেই—না হয় আজকের এ সব গান প্রাণহারা হয়েছে!

শচী। এত কথা মনে আছে দাদু…সেই তোমার সাত আট বছর বয়সে গান শুনেছিলে, আমাদের এবেলার কথা ওবেলায় মনে থাকে না।

দাদু। তার মানে আছে দিদি—সেকালে আমাদের চারিদিকে গণ্ডীটানা ছিল। আমাদের ছেলে বয়সের কল্পনা গ্রামের মাঠের দিগন্ত-রেখা পার হয়ে তার বেশী যেতে পারতো

না—আশে-পাশে যারা ছিল, তারা গায়ে-গায়ে চেপে থাকতো! খেলাধুলো, কথা, গল্প ত সমস্তই ছিল একটা সীমার মাঝে বন্দী। একালে তোমাদের চারিদিকে কি ভিড়। একদণ্ড চুপ করে তোমারা বসবে, জো কি? তোমাদের কল্পনা চলেছে আজ সাগর ডিঙ্গিয়ে সেই উত্তর-মেরু দক্ষিণ-মেরু পার হয়ে—এস্‌কিমো জাতকে তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী বলে ভাবো,—মেক্সিকোর গানের সুরে তোমাদের প্রাণ নেচে ওঠে· সেই যে সেদিন বাজাচ্ছিলে রুম্বা-সুর—মেক্সিকোর প্রাণ ঢালা সুর—

শচী। এরোপ্লেন, টকি-ফিল্ম, টেলিভিশন এ সবের তোমরা কল্পনাও করতে না কোনদিন দাদু?

দাদু। না ভাই। পুরাণে পুষ্পক-রথের কথা পড়ে মনে মনে ভাবতুম পশ্চিমের ঐ এক্কা গাড়ীর ছদিকে প্রকাণ্ড ছ'খানা পাখা এঁটে আমাদের পুরাকালের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ফুস্-মন্তর বোলে আকাশে উঠতেন। [illegible] মধ্যে তোমরা জান কত কি—টেনিস্, টেবল-টেনিস্, [illegible], হকি, ক্রিকেট ···আমরা জানতুম, গুলিডণ্ডা [illegible] ঝুলঝাঁপ।

শচী। কে জানে, বুঝতে পারি না···সেকাল ভাল ছিল না, এ কাল ভাল হয়েছে। তোমাদের মুখে গল্প শুনে মনে হয় মন্দ ছিল না—তোমরা প্রত্যেক দিনটিকে ভালো করে নিতে পারতে···আমাদের দিনগুলো যেন রোজই ফাঁকি দিয়ে পালায়, আমরা যেন দাঁড়াতে জানি না, বসতে পারি না · কেবলি ছুটছি আর ছুটছি—আশপাশের বাড়ীঘর লোকজন—এরা মনের পাশে দাঁড়াতে পারে না—দাঁড়ায় না···ঝড়ের মতো বয়ে চলে যায়·· মনে হয়।

দাদু। মনে হয়? এই বয়সেই? আমাদের কিন্তু এসব মনে হতো না. দিনের পর দিন আসতো-যেতো, দিয়ে যেতো অনেক···নিয়েও যেতো, দেওয়া-নেওয়ার হিসেব কখনো মিলিয়ে দেখি নি, আজ কাজের ছুটী হতে সন্ধ্যাবেলায় দেখছি মনের পাতায় পাতায় জমা-খরচের সব অঙ্ক জল্ জল্ করছে, তার কোনখানটা অস্পষ্ট নয়।

শচী। বলো না দাদু তোমার ঐ পুরাণের কথা—যেখানটা খুব স্পষ্ট মনে আছে, সেইখান থেকে সুরু করে···

দাদু। শুনিবি?···তা হলে সুরু করি তোর দিদিমার এ বাড়ীতে আসার কথা দিয়ে···নবৎ বাজছে সানাইয়ের সুরে সকালে ঘুম ভাঙ্গল, মনে হল, যেন আজ থেকে আমার নতুন জীবন সুরু হল। রঙকরা কাপড় পড়ে দাস-দাসীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে; ছুটোছুটি···গোলমাল···সে সবের উপরে জাগল সানাইয়ের সুর···কবিতা পড়িস ত? পড়েছিস অলকাপুরীর কথা? না তোদের এ কালের গীতা বুঝি অলকাপুরীকে নির্ব্বাসন দেছে—আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল ছবি ···অলকাপুরীর ছবি···সেই পুরীতে সোনার পালঙ্কে বসে লাল রঙ্গের বেনারসী-পরা পরী, পরীর কপালে টিপ, মুখে চন্দনের অলকা-তিলকা দুকোণে আশায় আর আনন্দের প্রদীপ জ্বলছে—

শচী। চতুর্দ্দোলায় চড়ে গড়ের বাদ্যি বাজিয়ে দিদিমাকে বিয়ে করতে গিয়েছিলে?

দাদু। শুধু গড়ের বাদ্যি? না সেই সঙ্গে রশুনচৌকি কনসার্ট, ঢাক-ঢোল-কাঁশি, বাজনার জগঝম্প একেবারে; তোরা দেখলে মনে করতিস, আফ্রিকার কোন্ জুলু সর্দ্দার হিপো শীকার করতে চলেছে? তখনকার দিনে বাজনার এমনি সমারোহ হত ভাই। একটাতে মন খুসী হত না—একটা বাজনা হলে, তার উপরে·· তার উপরে—তারো উপরে আরও বাজনা চাই। যত রকম পাওয়া যায়। 'আজ কষে' মিহি-সুর উপভোগ করচ তখনকার দিনে সে ধারাই ছিল না। তখন ছিল, যা করবে, চূড়োন্ত ভাবে করা। ছোটখাট সুরের ছোটখাট আয়োজনে মন ভরত না। সব কাজেই মানুষ প্রাণখানা ঢেলে দিত...পরের দিন সে প্রাণ বাঁচবে কি না সে কথা মনে করত না। আমোদ-প্রমোদে ছিল যেমন অজস্রতা—তেমনি বাহুল্য···তোদের আজকালকার আর্ট তাতে দমবন্ধ হয়ে মরত—কিন্তু মানুষের প্রাণ হত এত বড়···

শচী। যাক্, তার পরে কি হল, তুমি বল

দাদু। বাজনাবাদ্যি নিয়ে কনের বাড়ীতে পৌছুলুম—শাঁখ-উলু-চীৎকার, সে একটা হৈ হৈ ব্যাপার, আমার মন কিন্তু এ সব বাজনাবাদ্যি হাঁকডাক ঠেলে আকুল অধীর হয়ে আছে তোর দিদিমাকে কেমন দেখবো, কেমন মুখ, কেমন চোখ, কেমন রঙ···

শচী। বিয়ের আগে দিদিমাকে বুঝি চোখেও ছাখোনি?

দাদু। না, তখনকার দিনে না দেখে না জেনে মানুষ বিয়ে করত···যেন লটারির খেলা; না-দেখা, না-জানার

মধ্যে যে-মায়া, যে-মোহ, যে-রহস্য আছে, তা কি তোদের এই একালের দেখা-জানা বিয়েতে আছে রে ; যে-বই পড়িস নি সে-বই পড়বার জন্য মন কতখানি অধীর হয়, বল ত ?··· তার পাতায় পাতায়, লাইনে লাইনে না-জানা কত কথা, কত ভাবের সন্ধান পাবো, পাতায় পাতায়, লাইনে লাইনে না জানি কত নব নব রস, নব নব বৈচিত্র্য নব নব মাধুরী আনন্দ আশায় বিভোর তার কোন সীমা থাকে না।

শচী। দিদিমাকে কখন দেখলে ?

দাদু। শুভদৃষ্টির সময়। ছাদ্‌নাতলায় দুজনের মাথার উপরে বিছিয়ে দিলে একটা বড় চাদর··বললে, শুভদৃষ্টি কর—দুজনে দুজনের পানে চাও—

শচী। চাইলে ?

দাদু। চাইলুম।

শচী। কি দেখলে ?

দাদু। একজোড়া কাল চোখের তারা···কাল হীরে কখনো দেখিনি ভাই···হীরের মত জলজলে দুটি তারা···যেন প্রদীপের শিখা···কাঁপছে, জ্বলছে ; সে শিখা আমার বুকের ভিতরটাকে পর্যান্ত আলোয় আলো করে তুলল···সুখে—।

[দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। রূপসী ছোট গিন্নিকে নিয়ে শাস্ত্রালোচনা চলছে···বাঃ —

শচী। দিদিমা এমনি ছিল দেখতে ?

দাদু। আর কেউ চিনতে না পারুক, আমি পারি। মাথায় ঐ চুল এখনকার মত গঙ্গা-যমুনার মত সাদায় কালয় মিশে ছিল না···তখন মাথা জুড়ে ছিল রাশি রাশি কুচ্‌কুচে কাল চুল ; এখনকার মত দাঁত পড়ে নি, গালে টোল ছিল না—মুখখানি ছিল নিঁখুত, নিটোল ; মুখের কথায় এখনকার মত বকুনির হুঙ্কার ছিল না, ছিল সেতারের ঝঙ্কার।

দিদিমা। ব্যাখ্যানা রাখা রেখে চান করতে যাও ত।

শচী। ও দিদিমা, যেয়োনা। বলো গো, বলো লক্ষীটি, ফুলশয্যার রাত্রে প্রথমে কি কথা কয়েছিলে ?

দিদিমা। কি কথা আবার কইবে ?, তোদের মতো আমরা সে কালে কি এত কথা জানতুম যে, কথা কইব। •

শচী। তবে কি চুপ করে ছিলে ?...ও দাদু, তুমি বলো···

দাদু। ছাড়িস্ নে দিদি··যে কথা উনি বলেছিলেন, তার আর তুলনা নেই ; তোরা এত কবিতা পড়িস, গল্প পড়িস, নভেল পড়িস্, তেমন মিষ্টি কথা তোদের কোনো কবিতায় কেউ বলেনি—গানে বলেনি, গল্পে বলেনি··

শচী। তুমি বল দাদু···দিদিমার লজ্জা হচ্ছে ফুলশয্যার রাত্রের কথা বলতে...

দাদু। প্রথমেই উনি কথা কয়েছিলেন···

দিদিমা। (সলজ্জ আনন্দে) আমি ; নাৎনির কাছে মিছে কথা বলোনা বলছি...খবর্দ্দার !···না রে, আমি প্রথমে কথা কই নি। আমি তখন বলে, ভয়ে-লজ্জায় জড়োসড়ো কাঠ হয়ে পড়ে আছি—জানা নেই, শোনা নেই একজন ডাগর পুরুষ মানুষের কাছে···তোর দাদু বললেন···

শচী। কি বললেন ?

দিদিমা। উনি বললেন, পায়ে মল পরে' কেউ ঘুমোয় না ; মলটা খুলে রাখো···বলো যদি তো আমি না হয় মলটা দিই খুলে···এই কথা বলে, উনি গেলেন আমার পায়ের মল খুলতে।

শচী। (সহর্ষে) দাদু···

দাদু। তোদের আমলে নায়কের দল নায়িকার পায়ের জুতো মোজা খুলে দেয়···আমাদের সেকালে তো জুতো মোজার ফ্যাশান ছিল না··

শচী। দিলে তুমি তোমার বৌয়ের পায়ের মল খুলে ?

দাদু। তেমন বরাত হলো না দিদি। তোমার দিদিমা ধড় মড়িয়ে উঠে নিজের হাতেই পায়ের মল খুললেন···

দিদিমা। খুলে সে মল রাখতে গেলুম টেবিলে উনি আমার হাত থেকে সে মল কেড়ে নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

শচী। হোয়াট ইজ শিভাল্‌রি।

দাদু। তোরা ভাবিস্ তোদের বরেরাই chivalry একচেটে করেছে ; একালের ছেলেরা chivalryর ছাই জানে !

শচী। দিদিমা কি কথা বললে···এখন বলো।

দাদু। ওঁকেই বলতে বল।

শচী। বলো দিদিমা।

দিদিমা। কথা কওয়ার জন্যে তোমার দাদুর কি সাধ্য-সাধনা! কি করে' আমি কথা কই ভাই, বল্ তো? বাইরে একবাড়ী লোক আড়ি পেতে আছে, কথা কইলেই শুনে ফেলবে, শেষে তোর দাদু কি করলে, জানিস?

দাদু। আমি বললুম, বুঝেছি তোমার মনে সন্দেহ হচ্ছে —এ লোকটা আবার কে রে? ভাবছ সে দিন তোমার শুভ-দৃষ্টি হয়েছিল তোমাদের বেনী নাপিতের সঙ্গে; এ এলো কোথা থেকে—তাই অমন অবাক্ হয়ে আছ, কথা কইছ না।

শচী। দিদিমা এ কথা শুনে কি বললে?

দাদু। ডাগর ছুটি চোখ তুলে আমার পানে চেয়ে রইলো সে চোখ···না, তার বর্ণনা করলে বোধ হয় তুই আজ বিশ্বাস করবি নে! তোর দিদিমা মুখে কোন কথা বললে না। আমি বললুম, বাইরে অনেক লোক আছে তো তাদের আমি ডাকি, তুমি ওদের জিজ্ঞাসা করো আমি তোমার কে হই।

শচী। (রুদ্ধ বিস্ময়ে) ডাকলে তুমি লোকজন শুভদৃষ্টি প্রমাণ করতে? মা গো!

দিদিমা। কম ফন্দী ওঁর! গেলেন উনি দরজার কাছ পর্য্যন্ত; আমি ভাবলুন, কি জানি, চিনি না কেমন লোক, যদি সত্যি ওদের ডাকেন?

দাদু। দোরের কাছে যেমন আমি এসেছি, অমনি তোর দিদিমা খাট থেকে নেমে ছুটে এসে, আমার হাত ধরে ফেললেন। আমি বললুম, কে আমি তুমি জানো? উনি মাথা নেড়ে জানালেন, জানেন। আমি বললুম,—কে, বলো; না বললে ওদের ডাকব, ওরা বলে দিয়ে যাবে। এ কথায় উনি বললেন, 'তুমি আমার বর।'

শচী। (উচ্চ কৌতুক-হাস্যে ফাটিয়া পড়িল)

দাদু। হাসিছিস কি, এমন মিষ্টি কথা একালের নভেল-পড়া, কবিতা-পড়া কোন্ তরুণী মেয়ে বলতে পারে, বল্ তো?

[শচী কেবল হাঁসিতে লাগিল, তার সে হাঁসি থামিতে চায় না]

[মণ্টুর প্রবেশ]

মণ্টু। তোমাদের কিসের মজলিস বসেছে?

শচী। দাদুর সঙ্গে দিদিমার বিয়ে হয়ে গেছে, ফুলশয্যার সময় তুমি এসে হাজির?

দাদু। বৌভাতের নেমন্তন্ন রাখতে!

দিদিমা। না, ঠাট্টা নয়। হ্যাঁ রে মণ্টি, কি রকম ছেলে তুই। বেলা একটা বাজে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ভাবনায় পেটের পিলে চমকে যাচ্ছে।

মণ্টু। ভাবনা কিসের?

দিদিমা। ভাবনা হবে না? যে দিনকাল পড়েছে। মোটরগাড়ী ডাণ্ডা তুলে যেরকম মারমূর্ত্তি ধরে ছুটোছুটি করছে।

মণ্টু। ঐ তোমাদের সেকালের শিক্ষার দোষ! ডাগর ছেলে মেয়ে তাদের চাও আঁচল-চাপা দিয়ে ঘরে রাখতে! ছোট ঘর তার মধ্যে মানুষ বাড়তে পারে কখনো?

দিদিমা। শোনো কথা?

শচী। দাদাবাবুর খেয়ে আসা হয়েছে নিশ্চয়! সুপ, কারী, ফ্রাই···বাড়ীর ডালভাত ভাল লাগে না যে···জানো দাদু, দাদার যা ষ্টাইল হয়েছে।

দাদু। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মণ্টু। আমাদের টেনিস্ টুর্নামেণ্টের ব্যবস্থা হচ্ছে·· গিয়েছিলুম মিষ্টার রায়ের বাড়ী, তিনি হলেন কম্পিটিশনের প্রেসিডেণ্ট।

শচী। প্রেসিডেণ্ট মিষ্টার রায় হলেন মিস্ অশোকা রায়ের বাবা, সে কথাটা বলো দাদুকে।

মণ্টু। যত idle gossip. মেয়েগুলোকে যত শিক্ষাই দাও, অন্তরঙ্গ ন মুক্ততি। আমার এখন সস্তা রসিকতা করবার সময় নেই, চান করা হয়নি, চান করি গে।

দিদিমা। হাঁরে খেয়ে দেয়ে চান করবি কি! অসুখ করবে যে।

মণ্টু। (সহাস্যে) তোমাদের ও অশ্বিনীনন্দনদের থিওরি একালে অচল হয়ে গেছে, দিদিমা। এই জন্যেই তো বলি, একালে বাস করলে কি হবে, সেকালের আবহাওয়ার মধ্যে নিজেকে জুজু করে রেখেছো; ডাগর হয়েছ শুধু, মানুষ হওনি! একালের অশ্বিনীনন্দনরা বলেন, চান যত করবে, ততই মঙ্গল—pores গুলো থাকবে clean গায়ের চামড়া হবে healthy!

দাদু। একালে একটা মস্ত লাভ হয়েছে এই যে, মানুষ সর্ব্বজ্ঞ হয়ে উঠেছে, সমাজশাস্ত্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যন্ত

সব তার একেবারে নখদর্পণে, তবু আদালতে মামলা বাড়ছে ভারে-ভারে, ডিস্পেন্সারী যে খোলে, সেই হয় লক্ষপতি !

মণ্টু। Age of civilisation—demand and supply অজস্র না হলে জীবনও হবে অচল !

দাদু। বোস্ দাদা বোস্, যা বলবি, বসে বসে বল্, এটা টাউন হল নয়—বাড়ীর বসবার ঘর।

শচী। তোমাকে বল্‌তে হবে না দাদু, চান করতে চলো। যার মুখ চেয়ে বসেছিলে, সে তোমার কথা মনে ত করেনি। পরের বাড়ীর সুভোজ্য সুপেয়তে পরিতৃপ্তি লাভ করেছে !

মণ্টু। জ্যাঠামি করাটাকেই মেয়ে-জাত চিনে রাখলো শিক্ষার পরিচয় দেবার একমাত্র উপায়…নাঃ, আমার বসা চলবে না, চান করে নিই ; সকাল থেকে বাসি গেঞ্জী গায়ে রয়েছে, কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে—

দিদিমা। যা বাপু, যাতে তোর সোয়াস্তি বোধ হয়, তাই কর। (দাদুর প্রতি) তুমি ও-ঠো—একটা বাজে, আর বসে থেকো না, তুমি খেলে আমি তবে মুখে দুটি অন্ন দেবো। আমার কথা মনে করেই না হয় গা তুললে।

দাদু। চলো যাচ্ছি। তুমি একটি কাজ করো দিদি—এই সব খেলনা পুতুল একটি একটি করে আমার ঐ আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখ।

শচী। খেয়ে দেয়ে তুমি আবার বলো দাদু তোমার পুরাণের কাহিনী।

দাদু। গানের ক্লাশ আজ বন্ধ থাকবে তোমার ?

শচী। একদিন যদি ছুটী নি, অপরাধ হবে ?

দাদু। তোদের একালের মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে। তোরা কথা বলতে জানিস্। বিনয়ের ভঙ্গীতে এমন আদেশ করিস যে, সে আদেশ শিরোধার্য্য করা ছাড়া উপায় থাকে না।…আমি তা হলে চললুম দিদি চান করতে… তুই এগুলো তুলে রাখ…না হলে তোর দাদা হয়তো বর্ব্বরতা বলে প্রচণ্ড তামাসা করবে…

শচী। তামাসা করে, আমি তার জবাব দিতে পারবো। সে সম্বন্ধে তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো…

দাদু। (উচ্চ কণ্ঠে) ওরে নিমাই ! আমার চানের ব্যবস্থা কর্…

দিদিমা। এসো—

দাদু। চলো—			(দাদু ও দিদিমার প্রস্থান)

শচী। (আলমারি খুলিল—আলমারি খোলার শব্দ—) খেলনা পুতুল প্রভৃতি তুলিয়া রাখিতে লাগিল, সেই সঙ্গে মৃদুস্বরে গান)।

[মণ্টুর প্রবেশ]

মণ্টু। শচী…

শচী। দাদা…

মণ্টু। অশোকার কথা তোমায় বলেছিলাম… in confidence…sacred trust…সে কথা নিয়ে আজও রসিকতা হলো কেন ?

শচী। রসিকতা !

মণ্টু। তাই…তার কথা নিয়ে কোন কথা কবে না… neither in earnest, nor in jest।

শচী। কিন্তু…

মণ্টু। কিন্তুর মানে ?

শচী। তার সম্বন্ধে তোমার যা বাসনা—সে বাসনা…

মণ্টু। I could help myself in the matter…

শচী। (উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদছলে) দাদা…

মণ্টু। বিয়ে করা… that's a matter concerning parties alone—none else…

শচী। তাহলে তুমি বলতে চাও, যাঁদের স্নেহে তুমি বড় হয়েছো, তোমার বিয়েতে তাঁদের কোন দাবী নেই ?

মণ্টু। দাবী ! এ কথার মানে ?

শচী। এ কথায় তোমরা কি মানে করো জানি না। তবে আমি বুঝি, আমাদের ইচ্ছাকে বড় করে নিজেদের সুখ-সুবিধার পানে না চেয়ে, দুঃখ-যাতনা পেয়েও যাঁরা আমাদের ইচ্ছা পূরণ করে এসেছেন…তাঁদের যদি একটু তৃপ্তি হয়, তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁদের মত করিয়ে কোন কাজ করা…

মণ্টু। কিন্তু আমি যা ভেবেছি—ধরো, যদি অশোকা রায়ের দিক্ থেকে এ-বিবাহে কোন আপত্তি না ওঠে, তখন যদি দাদু কি দিদিমা বলেন, না এ বিয়ে হবে না—

শচী। কি করে তুমি জানলে দাদা, যে, দাত্তুর বা দিদিমার মত হবে না? যাঁরা নিজেদের বিসর্জন দিয়ে আমাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন…

মণ্টু। তুমি ভুলে যাচ্ছো শচী, দিদিমা কথা দিয়ে রেখেচেন…কে আছেন শৈলবতী দেবী তাঁর মেয়ে মলিনা…

শচী। এই শৈলবতী দেবীর সঙ্গে মা ছোটবেলায় 'গঙ্গাজল' পাতিয়ে ছিলেন, দুজনে খুব ভাব ছিল চিরকাল …দিদিমার কাছে শুনেছি, তুমি হতে মা ওঁকে বলেছিলেন, তাঁর মেয়ে হলে তোমার সঙ্গে সে মেয়ের বিয়ে দেবেন।

মণ্টু। হুঁঃ! সে মুখের কথা শুধু! তামাসা করে মানুষ এমন অনেক কথাই বলে; সে কথার উপরে ভর করে জীবন নিয়ে risk…

শচী। সত্যি দাদা, তোমরা যখন কেতাব-পত্রের বড় বড় কথা নিয়ে তর্ক তোলো, আমার তখন ভারি হাসি পায়।… জীবন…risk…এমন কথার কি বোঝ—শুনি?

মণ্টু। তোর চেয়ে অনেক বেশী বুঝি। আচ্ছা, ধর্ তুই লেখাপড়া শিখেছিস্, গান শিখেছিস্, তোর মন যেভাবে developed হয়েছে—ধর্, দাতু যদি বলে, আমাদের ঐ ভট্টাচার্য্যি মশায়ের ছেলে শ্রীধর ভট্টাচার্য্যির সঙ্গে তোর বিয়ে হবে…অমন কুলীন বামুন এ-যুগে আর মেলে না…, করতে পারবি তুই ঐ শ্রীধরকে বিয়ে?

শচী। দাতু-দিদিমা চিরদিন আমাদের ভাল করেছে, চিরদিন করবেন—। তাঁরা যদি মনে-প্রাণে শ্রীধরের সঙ্গে আমার বিয়ে ভাল বলে মনে করেন,…হয়তো আমি তাতে আপত্তি করতে পারবো না।

মণ্টু। ওঃ! sacrificing spirit এর noble example দেখাবেন! আমার স্পষ্ট কথা one must live first তার পরে রাজ্যের প্রতি তার কর্ত্তব্য।…তুই বলিস্ কি শচী? আমার মন যে-ভাবে বেড়ে উঠেছে, সে সে-রকম companionship চায়…

শচী। দিদিমাকে বিয়ে করবার আগে দাতু তাকে চক্ষে ছাখেন নি… দুজনের দেখা ছাদ্নাতলায় শুভদৃষ্টির সময়ে… সারা জীবনে সেজন্য দুজনের মনে তো কোন অমিল, কোন বিরোধ জাগে নি…

মণ্টু। ওঁরা love-টাবের কিছু বুঝতেন না। ওঁরা বুঝতেন, বিয়ে—বিয়ে তো বিয়ে; বিয়ে একটা হলেই হলো —তা সে বিয়ে শ্রীমতী কালিন্দীর সঙ্গে হোক, কি, মিস শুকতারা পালের সঙ্গেই হোক!

[দিদিমার প্রবেশ]

দিদিমা। দুই ভাই-বোনে কি নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে…?

মণ্টু। ও কিছু নয়। মানে, এ তুমি বুঝবে না…

দিদিমা। নাঃ…তোমাদের এত বড়টা করলুম,… তোমাদের বুঝবো না!…তুই অবাক্ করলি ভাই।…তা হাঁা, মণ্টু! মলিনার বাপ কলকাতায় এসেছে…হাকিমী করে… আসতে তো পায় না। কাল চলে যাবে...তোমার দাতুকে ধরেছে, মলিনার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি দিতে হয় তো সে কথা উনি পাকা করে যেতে চান।

মণ্টু। তোমরা কি জবাব দিয়েছ?

দিদিমা। তোমার দাতু বলেছেন, ছেলে ডাগর হয়েছে… তার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু বলতে পারেন না। এই আজই এসেছিল মলিনার বাবা…তুমি বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টা পরেই…না রে শচী?

শচী। হাঁা।

দিদিমা। তা কি বলবো?…মলিনার মা আর তোর মা দুজনে এতটুকু বেলা থেকে ছিল ভাব। সে ভাব একটি দিনের জন্য কম হয় নি…বিয়ের পরেও মলিনার মা শৈল যখনি কলকাতায় এসেছে তোর মার কাছে থাকতো সারা দিন…তোর মা বলেছিল তুই হোতে…সেই আঁতুড়েই… শৈলই তো আঁতুড় থাকতো… তোকে ধরা, দেখা, নেওয়া …তাই তোর মা বলেছিল, তোমার মেয়ে হলে গঙ্গাজল, আমার এই ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দেবো। তারপরে শৈলর মেয়ে হল…মলিনা…তখন কোথায় তোর মা…

মণ্টু। এ-কথা রাখা কতখানি শক্ত, তা তুমি বুঝবে না দিদিমা।

দিদিমা। কেন রে…এর মধ্যে শক্ত কি আছে? মলিনা সুন্দরী…ডাগর হয়েছে…তোদের একালে যেমন চাস, মলিনা লেখাপড়া জানে…একটা পাশও বুঝি করেছে…গাইতে জানে …বাজাতে জানে…আপত্তিটা কি হতে পারে? মলিনার বাপ একটা জেলার হাকিম…

মন্টু। মেয়ের বাপ হাকিম হলেই বুঝি সে মেয়ে শিরোধার্য্য করবার যোগ্য হল ?

দিদিমা। তাহলে তোর মত নেই।

মন্টু। না।

দিদিমা। কেন মত নেই…শুনি। না বল্‌তেই হবে, না হলে আমি ছাড়ব না !

শচী। আমি বলবো'খন দিদিমা…

মন্টু। আমার একটু কাজ আছে, টুর্ণামেন্টের একখানা নোটীশ লিখতে হবে, বেলা চারটেয় সে নোটীশ নিয়ে যেতে হবে মিষ্টার রায়ের কাছে…হ্যাঁ, যাবার আগে বলে যাই দিদিমা, দাদুকে বলো, তোমাদের ঐ নলিনার হাকিম-বাবা মশায়কে যেন সাফ বলে দেন, মন্টুর সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে হবে না, হতে পারে না। [প্রস্থান]

শচী। দিদিমা

দিদিমা। (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) উনি বড্ড ব্যথা পাবেন মনে।

শচী। কিন্তু দাদুই তো বলেছে, একালের ছেলে…দাদার মত না জেনে তিনি কথা দিতে পারেন না।

দিদিমা। সেটা বলেছেন, কর্ত্তব্য বুঝে—মনে মনে কিন্তু জানেন, এতদিন ধরে কথা দেওয়া—কথা দিয়েছে ওর মা, সে কথার মর্য্যাদা মন্টু নিশ্চয় রাখবে।

শচী। (Softly) দাদা চায় কি জানো দিদিমা, ওর সঙ্গে কলেজে পড়ে মিষ্টার রায়ের ছেলে আলোক রায়, সেই আলোক রায়ের বোন্ অশোকা, দাদার তাকে খুব পছন্দ।

দিদিমা। তাকে বিয়ে করবে, আমাদের সঙ্গে তারা কথা কবে না ? ওর সঙ্গে কথা কয়েই সব হবে ?

শচী। ওরা বলে, যার সঙ্গে বিয়ে, তাকে নিয়েই তো কথাবার্ত্তা।

[নেপথ্যে শুষ্ককণ্ঠে—দাদু আছো ?]

দিদিমা। কে ?

শচী। পাশের বাড়ীর কেষ্টদা।

দিদিমা। কে ? কেষ্ট ?

[কেষ্টর প্রবেশ]

কেষ্ট। হ্যাঁ…(তার উত্তেজিত ভাব), দাদু কোথায় ?

দিদিমা। তিনি চান করতে গেছেন, বোসো।

কেষ্ট। (উত্তেজিত ভাবে) না, বসবার সময় নেই আমার, এ-অবিচারের প্রতিকার দাদু করে দিন, নাহলে আমি কোর্টে যাবো।

দিদিমা। অবিচার !

শচী। কোর্ট !

কেষ্ট। হ্যাঁ, তুমি দ্যাখো তো শচী, দাদুর কত দেরী !

[দাদুর প্রবেশ]

দাদু। ব্যাপার কি কেষ্ট ? এমন রণমূর্ত্তি !

কেষ্ট। আপনি কেবল আমারি দোষ দেখেন ! যা হয়েছে, এতে রণমূর্ত্তি না হয়ে উপায় কি, বলুন ?

দিদিমা। হ্যাঁ গা, গায়ে-মাথায় তেল মেখে নাই বা দাঁড়াতে, মাথায় জল ঢেলে এসো, এসে করো তোমাদের মামলা-ফয়শালা।

দাদু। নাঃ—ছেলেছোকরার ব্যাপার, এতে কি জার্ম্মান-ওয়ারের মতো পাঁচ-সাত-দশ বৎসর সময় লাগে ? বলো কেষ্ট, কি হয়েছে ?

কেষ্ট। ঐ নালু।—

দাদু। মায়ের পেটের ভাই নালু, সে কি এমন করেছে ?

কেষ্ট। কি না করছে দাদু ? সেবারে আপনিই মীমাংসা করে দিলেন, দু'ভাইয়ে যখন বনে না, হাঁড়ি হেঁসেল আলাদা করো, তাই করা হলো। এদ্দিন কোনো গোল যোগ ছিল না ! শুনছি, আজ সাতদিন না কি নালুর অসুখ—কাল থেকে বাড়ীতে হাঁড়ি চড়ে নি, মা তাই আমার ভাঁড়ার থেকে চাল ডাল দেছেন ছোট বৌমাকে, অবিচার নয় ? যে যার নিজের খাবে, তুমিই ব্যবস্থা করে দেছ, মা থাকবে তিন মাস করে' এক একজনের কাছে, মায়ের খাবার পরবার যা ব্যবস্থা, তাও তুমি ঠিক করে দেছ, তিনমাসে আমরা দু'ভাইয়ে মাকে কিনে দেবো একখানা করে সাদা ধুতি…আমার কাজ আমি করে যাচ্ছি—এখন শুনছি, নালু ওর গ্যালো-পালার সময় মাকে কাপড় দ্যায় নি ! অবিচার নয় ?

দাদু। তা এখন আমাকে কি করতে বলো কেষ্ট-ভাই ?

কেষ্ট। আমার ভাঁড়ার থেকে মা যে নালুকে চাল ডাল দিলেন, সেটার খেসারৎ দিক নালু, আর মাকে গ্যালো-পালার সাদা ধুতি কিনে দিক্।

দাদু। মা নালিশ জানিয়েছে—সাদাধুতির জন্তে ?

কেষ্ট। তা কেন জানাবে ? মা যে ভয়ঙ্কর 'পার্শিয়াল' নালুর দিকেই ওঁর টান।

[মণ্টুর প্রবেশ]

মণ্টু। ব্যাপার কি—এত হাঁক-ডাক লম্ফঝম্ফ কিসের কেষ্ট দা ?

কেষ্ট। ঐ নালুকে নিয়ে-না দাদু, আপনি এর বিচার করে দিন।

দাদু। নালু তোমার মায়ের পেটের ভাই কেষ্ট, সে যদি না খেতে পায়, দেখবে না ?

কেষ্ট। কেন দেখবো' দুজনকেই ভগবান হাত পা দেছেন, খেটে যা করতে পারো করো।

দাদু। তুমি যদি দুদিন অসুখে পড়ো ও হাত-পা চালাতে না পার কেষ্ট ?

কেষ্ট। উপোস করে পড়ে থাকব, তবু কারুর দোরে হাত পাতবো না।

দাদু। বুঝেছি তোমার যা গেছে, তুমি তার খেশারৎ চাও ?

কেষ্ট। নিশ্চয়।

মণ্টু। তা কিন্তু মানতেই হবে, প্রত্যেকে প্রত্যেকের চরকায় তেল দেবে Law of Economy তোমরা ঐ একদল idle dronesকে পুষে দেশে ধনসম্পদ্ হতে দিলে না।

দাদু। চুপ কর দাদা সকলে মিলে মিশে যখন ছিলে মনের মিলে তখন এ অভাব-হাহাকার ছিল না, হাহাকার এনেছে তোমাদের ego তা ছাড়া তাছাড়া বিলেতি শাস্ত্র-গুলোকে মাথায় তুলে তার চাপে বুকের মধ্যে যা প্রাণটুকু আছে, সে প্রাণকে হত্যা কর না। প্রাণ যদি এতটুকু হয়ে গেল, তোমার ও-শাস্ত্র নিয়ে কার কি উপকার হবে ? শাস্ত্র তৈরী হয়েছে মানুষের বুকের বল দেখে।

কেষ্ট। তা হলে আমার বিচার ?

দাদু। তুমি যাও কেষ্ট তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর' তোমার কতটা চালডাল তিনি নালুকে দেছেন···আপাতত তার খেশারৎ নিয়ো আমার কাছ থেকে !

কেষ্ট। বাঃ তা কেন নেব, আপনি কেন নিজের ক্ষতি করবেন।

দাদু। আমরা সেকেলে লোক···এযুগের Economics, Civics এ সব বই তো পড়বার ভাগ্য হয় নি···কাজেই লাভ ক্ষতির মাপ কষে চলতে পারি না। প্রাণের দিকে যেমন যখন টান পড়ে, সেই প্রাণের পানে চেয়ে কাজ কর্ম্ম করে যাই···ভুল করি, ঠকি···কিন্তু সে জন্ত চীৎকার তুলি না···তা ছাখো এ বিচারে যদি খুশী না হও···

মণ্টু। কোর্ট আছে কেষ্ট দা···

দাদু। form whose bourne man comes back ruined যেখানে গেলে মানুষের আর কিছু থাকে না···গায়ের শক্তি···ধন সম্পত্তি···

কেষ্ট। না, কোর্টে আমি যাব না···দাদুর বিচারই মেনে নেবো।

দাদু। তা হলে এখন বাড়ী যাও, আমি চান করে নি। সন্ধ্যার দিকে এসো একটা ফয়শালার আসর বসাবো'-খন।

কেষ্ট। বেশ, তা হলে চললুম...আপনিই আমার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট দাদু।

মণ্টু। আমিও আসি···একবার যেতে হবে এস্প্লানেড।

দাদু। সকাল সকাল ফিরো···একটা পাকা পরামর্শ আছে, হাসি বাঁশীর ব্যাপার দাদা।

মণ্টু। বুঝেছি। সেই রাণী শৈলবতীর মেয়ে রাজকন্যা দুর্গেশনন্দিনী তো ? দিদিমার সঙ্গে সে কথা হয়ে গেছে। মাপ কর দাদু ঐটি পারব না। বিয়ে করব কি না, জানি না, যদি করি, চারিদিক বুঝে দাদু।

দাদু। ও আগুনে ঝাঁপ খাবার ব্যাপার, তাই চারিদিক্ দেখবে বুঝবে।

মণ্টু। কিছু মনে করো না দাদু, ভাল করে এ বিষয়ে বুঝিয়ে দেবো'খন। তোমার আমলে বিয়ে হতো যে আব-হাওয়ায় এখন সে আবহাওয়া গেছে বদলে ; life এখন লাইফ নেই, মানে, জীবন আজ জীবন নেই, জীবন হয়েছে এখন সমস্তা—বিরাট্ বিপুল সমস্তা। না আমি আসি, দেরী হয়ে যাবে না হলে—

[প্রস্থান

[a pause, soft music]

শচী। দাদু।

দাদু। দিদি।

শচী। কি ভাবচো।

দাদু। মানুষের মন নিয়ে কালের কি খেলাই চলেছে। আমার মনে হচ্ছে, আমি যেন দাঁড়িয়ে দেখছি ঐ সরে সরে চলে যাচ্ছে দূরে—আরো দূরে মানুষের বুকের মধ্য থেকে প্রাণ ···দেখছি চেয়ে মানুষের সে খালি বুকে এসে বসেছে মেশিন; সে মেশিনে বাঁধা economics, politics, civics, physics; আমাদের পুরানো শাস্ত্র-সংহিতা মেনে চলতে আজ মানুষের বাধছে, এরা চলতে চায় একালের ঐ সব -ics শাস্ত্র ধরে—সেকালে একালে সেই বইয়ের আইন-কানুন মেনেই চলা, শুধু বইগুলোর লাইনে আইনে যা রকমফের। আবার এ আইন-কানুনেও একদিন মতি থাকবে না মানুষের—সে সব মানুষ আসবে তোদের পরে (নিশ্বাস ফেলিলেন) তোরা এ-স্রোতে নামিস নে দিদি—ধরিত্রী দেবী জাতে মেয়ে তাই তিনি সেকাল একাল সব কালকে ধারণ করে আছেন বলে সব কালের মানুষ বেঁচে থাকচে—তোমারও ধরিত্রী, সওয়া বওয়ার কাজ তোমাদের; ধৈর্য্য সহ্য হারাইও না দিদি তা হলেই সব বজায় থাকবে!

শেষ

পল্লীপথে

—শ্রীগোপেশ্বর সাহা

সহরের সৌধ হ'তে ফিরতে তোমার বুকে
কত কি যে হেরিলাম আজ,
সেই সে "কালিদহ", সেই "জোড়া বটগাছ"
সেই সব পুরাতন সাজ।

পাতায় পাতায় ঢাকা, মাঝে ঘন শাখাদল
কী নিবিড় প্রেম-আলিঙ্গন,
আলো-ছায়া পরস্পরে এঁকেছে ধরার বুকে
অভিনব শুভ-আলিম্পন।

নীলিমে শ্যামলে মিলি মিশে গেছে পরস্পরে
মহান্ সে মধুর মঙ্গল;
দূর পদ্মার পাড়ে ঘন কাজলের রেখা
সোণালী কিরণে সমুজ্জ্বল।

ছোট ছোট বাড়ীগুলি শান্তির নিকেতন,
কলাগাছ-ঘেরা চারিধার,
রায়েদের "বড়-বাড়ী" ভেঙে চুরে ধূলিসাৎ
ভাঙা সেই পুকুরের পাড়।

ভাঙা পুকুরের ঘাটে জল ভরে কুল-বধূ
কলসীর ঢেউ লেগে যায়,
আমারো পরাণে আজি এ যেন কিসের ঢেউ
আসিয়া লাগিছে পুনঃ তায়।
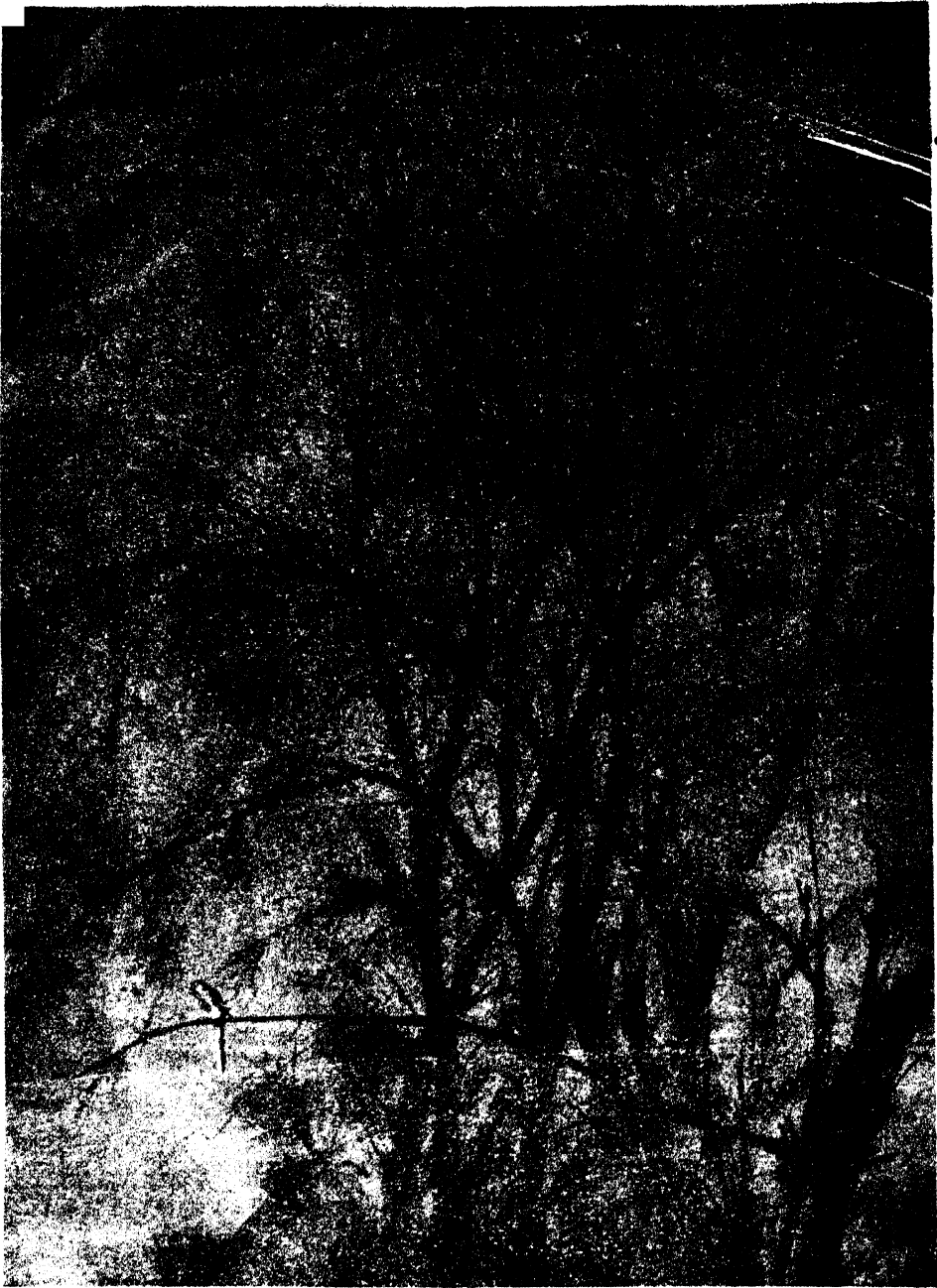
নিভৃত বনানী

শিল্পী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[২৪]

দেখাইব পত্নী আমি,
স্বনে মাথার মণি,
রক্ষা করে দলিত ফণিনী।

জটা পাগলার গলা শুনিয়া তিন যায়ে মাথার কাপড় টানিয়া কলসী-কাঁখে বাড়ী ঢুকিল।

জটা পাগলার কোন দিকে লক্ষ্য নাই—কোদাল ধরিয়া ঢেঁকিশালার পাশের জঙ্গল কাটিতেছে। খানিকক্ষণ পরে হাত-পা ধুইয়া আগুন চাহিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বড়-বৌ বারান্দায় তরকারী কুটিতেছে—মেজ-বৌ আমসত্ত্ব দিতে দিতে বলিল, 'ঘাটে বেদেনীর নৌকা দেখলে, দিদি?'

'কই দেখিনি ত?'

মিত্রা-বাড়ীর ঘাটে দেখনি?

সরলা রান্না চড়াইয়া দিয়া চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইল—বলিল, 'দেখেছি, সেই বেদেনীটা দিদি—সেই যে অল্প বয়স, হাসি-খুসী, এবার একটি ছেলে দেখলাম বছর খানেকের হবে—ও বেশ ভাল ভাল জিনিষ আনে।'

বড়-বৌ বলিল, 'এবার কতকগুলি জিনিষ বেশী করে কিনে রাখব—ও বড় সুন্দর ছুঁচ আনে, হাটে বাজারে পাওয়া যায় না তেমন'—

—'বাঃ—এই যে আমার তিন মা, তিন মা রান্নাঘরে, তবে আর খাওয়ার দুঃখ কি? একটু আগুন দে দেখি, ভাল করে তামাক খাই গে। ততক্ষণ তোদের রান্না হোক্—বড়-মা শোন্, শোককে ভয় করিস্ নে, ভাল মনে নিস্—তা হলেই জিতে যাবি। আর মেজ-মা তোর কোন ভয় নেই, ঝড়ঝাপটা খেলেও ডুববি নে—তোর কর্ণধার ঠিক আছে রে। ছোট-মা গো—তোমায়ও বলি, দুঃখ-কষ্টকে ভগবানের দান বলে মনে করিস্। মনটাকে বেঁধে ফেলতে পারিস্ না? তা হলে বড় ভাল হয়।'

জটা পাগলার বকুনি অভ্যাস—একবার আরম্ভ হইলে থামিতে চায় না। আবার চুপ করিয়া যখন থাকে তখন শত প্রশ্নেও জবাব দিবে না। ছোট-বৌ হাতা ভরিয়া আগুন তুলিয়া হাতাটি বারান্দার কিনারায় নামাইয়া রাখিল—জটা পাগলা আগুন লইয়া চলিয়া গেল।

রান্না সারিয়া সরলা ঘরে শিকল দিয়া উঠানে নামিল। এবার কাপড় কাচিয়া আসিয়া পরশমণির অনাবস্থা উপবাসের জলযোগের আয়োজন করিবে। মেজ-বৌ পাঁচ-ছ'খানা আমসত্ত্ব দিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া বারান্দার এক কোণে বসিয়া পাখা ঘুরাইয়া বাতাস খাইতেছে। বড়-বৌ আমের আঁটিগুলি এদিক ওদিক চারার জন্য ছড়াইয়া দিল এবং খোসাগুলি একটা ঝুড়ি ভরিয়া রাখিয়া বারান্দাটা সাফ করিতে লাগিল।

একটি অল্পবয়স্কা সুশ্রী বেদেনী সামনা-সামনি পড়িতেই সরলা থামিল—বলিল, 'দিদি, বেদেনী এসেছে'।

বেদেনী হাসিমুখে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ঝুড়ি নামাইয়া বসিল। মেজ-বৌ একখানা পিঁড়ি আগাইয়া দিয়া বলিল, 'ছেলে তোর না কি?'

'আমার নয়, আমার সতীনের।'—বেদেনী মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

'তোর আবার সতীন কোথায়? তোর জ্বালাতেই অস্থির—তোর বেদে আবার বিয়ে করবে? তা ছেলে কই?'

'নৌকায় বাপ-বেটা রইল, আমি আটকা থাকতে পারি নে।'

বড়-বৌ বলিল, 'তা জানি, সে রেঁধে বেড়ে রাখবে। তুই গিয়ে সেবা করবি—'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিল, 'তা বুদ্ধি করেছ ভাল—ও জিনিষ বেচতে বেরিয়েছে—ও যত লাভ করবে, বেদে তার সিকিও পারবে না। ওর মুখ দেখলে কেউ না কিনে থাকতে পারবে না।'

বেদেনী বলিল, 'আচ্ছা, তোমরাই তার পেরমাণ দাও না?'

সুখেন বলিল, 'তোমরা কি কি দেবে বলেছিলে যে?'

'সে আমি পুঁটলী বেঁধে রেখেছি—কিন্তু সরলা যে ঘর-দোর ঝাঁট দিচ্ছে, আনব কি করে?'

'কোথায় আছে বল, বলে তোমরা কোন কাজে যাও, আমি নিয়ে নেব'—

'আমার বালিসের কাছে কাঁথা ভাঁজ করে চাপা দিয়ে রেখেছি, আর শোন, একজোড়া কাপড় আর কিছু সেমিজের কাপড় কিনে দিও, কাপড় জোড়া লাল-পেড়ে ডুরে দিও'—

মেজ-বৌ কোন কাজের ছুঁতা খুঁজিয়া পাইল না, সব ঘরের দরজা খোলা, সরলা এক এক করিয়া ঘর ঝাঁট দিতেছে—

সুখেন আসিয়া বলিল, 'একটা টাকা দাও দেখি, ভাগ্নের জন্যে একটিন বিস্কুট আনব—'

'তা হলে সেই বোতাম বিস্কুট এনো'—বলিয়া হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া সরলা নিজের ঘরে টাকা আনিতে গেল। এই অবসরে সুখেন মেজ-বৌয়ের ঘরে গিয়া পুঁটলিটা লইয়া কাপড়ের আড়াল করিয়া একেবারে নৌকায় গিয়া বসিল।

সরলা টাকা আনিয়া দেখিল, সুখেনের নৌকা ঘাট ছাড়াইয়া গিয়াছে। বলিল, 'দেখলে মেজ-দি আক্কেল? আমায় টাকা আনতে বলে চলে গেল, তুমি টাকাটা দিয়ে এস, এগিয়ে ডাক না—

মেজ-বৌ মাথায় ঘোমটা টানিয়া ঘাটের কিনারায় গেল—জটা পাগলা ঘাটের তক্তাগুলি ভাল করিয়া বসাইতেছে। মেজ-বৌ বলিল, 'টাকাটা ঠাকুরপোকে ডেকে দাও না—'

জটা টাকা ছোঁয় না, বলিল, 'রাখ ঐখানে। কি রে—জলে ফেলে দেব, খুঁজে নিবি, না এসে নিয়ে যাবি?'—

'তোকে দিয়ে কিছু অসম্ভব নেই'—ঘাটে নৌকা ভিড়াইয়া সুখেন উঠিয়া আসিয়া টাকাটা তুলিয়া লইল। বলিল, 'জটা, চিলহাটি যাই চল'—

'কেন রে?'

'এমনি বলছি, তুই গান গাইবি শুনতে শুনতে যাব। জলের উপর তোর গান যেমন শোনায়—এমন বাড়ীতে নয়। চল্'—

'চল্—কিন্তু রাত্রে আমি কোথাও থাকিনে; কোথাও খাইনে; পীড়াপীড়ি করবি না?'

'না—তা কেন করব একসঙ্গে যাই চল্।'

জটা নৌকায় উঠিল। নৌকা বাহিতে বাহিতে সুখেন বলিল, 'কাঞ্চনপুর ছাড়িয়ে গান ধরবি—'

জটা কি ভাবিতেছে বলিল, 'না রে, আমার কেমন কেমন লাগছে, কারও কথা শুনে কাজ করিনে কি না—যেন বাধ্য-বাধকতা আসে। যাঃ তোর সঙ্গে যাব না, বন্ধন—সব বন্ধন।' বলিতে বলিতে জটা জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার দিয়া চলিল।

বৈকালে গা ধুইয়া, যে যার ঘরে প্রসাধন করিতেছে। বড়-বৌকে বিশাল একটা হাত-দেড়েক লম্বা-চওড়া আয়না আনিয়া দিয়াছে। বেড়ায় সেটি ঝুলান, তার নীচে একটা তক্তার তাকে চিরুণী, সিঁদুর, ফিতে ও কাঁটা রহিয়াছে। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া বড়-বৌ চুল বাঁধিতেছিল—এখন সে 'বিনুনী' করিয়া বেশ সুদৃশ্য খোঁপা বাঁধে।

সরলা আসিয়া বলিল, 'দিদি, তুমি ও-বেলা যে জিনিষ-গুলো কিনেছ, গিরি একবার দেখতে চাইলে, সে কিছু পছন্দমত জিনিষ পায় নি। ওরা দু'যায়ে বড় মন খারাপ করে রয়েছে। তা তুমি আর মেজদি তো দু'প্রস্থ করে কিনেছ সব। তার এক এক ভাগ দাও না? বেদেনী দিন-সাতেক পরই আবার এনে দেবে বলেছে—'

বিনুনী, খোঁপা সব ভুলিয়া বড়-বৌ অত্যন্ত বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া উঠিল। সরলা বলিল, 'তোমার সবই যে পুরোনো জিনিষ দেখছি তক্তার ওপর—নূতন কিছুই খোল নি?'

'এখনো অনেক রয়েছে—ফুরোলে নতুন নোব—' বলিয়া বড়-বৌ হাত-বাক্স খুলিয়া সাবান, ব্রোচ, চিরুণী, ফিতা ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল।

সরলা বাক্সের ভিতর দেখিয়া বলিল, 'এ কি দিদি? আর কই—আর গুলো কি করলে?'

বাক্স বন্ধ করিতে করিতে ক্ষীণ সুরে বড়-বৌ কি বলিল, বোঝা গেল না।

পথ-নির্দ্দেশক

আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতা দেবীকে পথ দেখাইয়া যে-স্থানে লইয়া আসিয়াছে, সে-স্থানে আসিয়া সভ্যতা দেবী ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিয়াছেন।

আধুনিক বিজ্ঞান এতকাল যাহা দ্বারা সভ্যতা দেবীকে সেবা করিতেছিল—তাহার পরিণাম দেখিয়াই সভ্যতা দেবী ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

'করলে কি বল না? দু' বাক্স সাবান, দুটো চিরুণী, দুটো ফিতে, সবই তো দুটো করে—কই সে-সব?

মাথা নীচু করিয়া বড়-বৌ বাক্সের ঢাকনীটা ঝাড়িয়া পাতিতে লাগিল।

'আচ্ছা দিদি, আমার কাছে লুকোতে তোমাদের মায়া হয় না? আমি একটি ছোট কাজও তোমাদের অজ্ঞান্তে করি নে—তা জেনেও তোমরা আমার সাথে কেবলি লুকোচুরি কর!'

পিছন হইতে মেজ-বৌ বলিল, 'লুকোচুরি করি বোন, তুই মনে কষ্ট পাবি বলে।'

'কেন? সত্যি কথা বলবে, আমার মনে যখন যা হয়, চেপে রাখতে পারি নে, তাতে যে কষ্ট পায় পাক। আমি কি বুঝি নি? বুঝেও জিজ্ঞেস্ করছি, দেখি তোমরা কি বল—'

বড়-বৌ স্নেহের সঙ্গে বলিল, 'জানিস্ যদি, তবে আর লজ্জা দিস্ নে। সধবা বৌ—কে বা একটু আলতা কিনে দেয়, কে বা একটু সিঁদুর—ঠাকুরপোর কল্যাণ-অকল্যাণ তোর হাতেও যেমন, তার হাতেও তো তেমনি; তাই মধ্যে মধ্যে দু'একটা জিনিষ কিনে পাঠিয়ে দিতে হয়, তার জন্যে তুই রাগ করিস্‌নে; তোরই তো সব।'

'আমারই সব? তাই বটে!' তীক্ষ্ণ স্বরে কথাটা বলিতে বলিতে, সরোষে মুখ ফিরাইয়া সরলা ঘর হইতে চলিয়া গেল।

[২৫]

অজ্ঞাতে কেমনে চিত্রিতেছে ভবিষ্যৎ—

বাঁশ-ঝাড়ের পিছনে খালটির বাঁদিকে বিঘাখানেক জমি। জমিটা রায়দের। কিন্তু, কাজে লাগে বিশ্বাসদের। বিশ্বাসদের গোয়াল-ঘর ও বাহিরের ঘরের পিছন হইতে রান্না ও ঢেঁকি-ঘরের কোণ পর্য্যন্ত এই জমিটার প্রসার। বিশ্বাসদের বাড়ী ঘেঁসিয়া চৌদ্দ-পনেরটা ছোট বড় আম গাছ। তার পরে খাসে ঢাকা মাটী—বর্ষায় এটা ডুবিয়া যায়। আর অন্য সময় ধনে, পাট ইত্যাদি বুনিয়া সুখেনরা কিছু লাভ করে। আমের সময় এখানে ছেলে-মেয়েদের মেলা বসে।

বাড়ীর উত্তর দিকের পথ দিয়া রায়-বাড়ীর সেজ-বৌ ও মেজ-বৌ আসিয়া ছেলেপিলেদের খেলা দেখিতে দাঁড়াইল। সেজ-বৌ বলিল, 'দেখ দেখি কি সুন্দর বাতাস, —তুমি তো আসতেই চাইছিলে না। বোস না একটু—যাবে ওখানে?'

'নাঃ, যা চেঁচামেচি লাগিয়েছে ওরা—ওর ভেতর মানুষে যায়? এখানেই বসি আয়—'

বর্ষাকালে যে যজ্ঞডুমুর-গাছ ও কৃষ্ণচূড়ার গাছটার তলায় রায়দের উত্তরের ঘাট বাঁধা হয়—সেইখানে দুইজন বসিল।

মেজ-বৌ বলিল, 'এত ছেলেপিলে কার রে? একটিকেও তো চিনি না।'

'ঐ যে তিনটে ছেলে, শ্যাম-শ্যাম রং, ওরা সুখেনের ছেলে—আর একটি কোলে, দু'মাসের; সেটি খুব ফুটফুটে ফরসা হয়েছে, সন্তুর মতন। আর ঐ-যে মেয়েটি—ওটি সেই বেলি। আর পরশদিদি যেটিকে কোলে করে বসে রয়েছে, ওটি শ্যামলের ছোট ছেলে। এদিককার এরা নতুন-বাড়ীর। ডুরে-পরা মেয়ে দুটি মিস্ত্রীদের।'

'তিন বছর আসি নি, এর মধ্যে কত নূতন মানুষ হয়েছে দ্যাখ্—ঠাকুরঝিও সন্তুকে নিয়ে হাজির। ঠাকুরঝি পা মেলে বসে রয়েছেন, সন্তু আম কুড়িয়ে ওঁর কোলে ধুপ ধাপ করে ফেলছে!'

নিজ নিজ ছেলে-মেয়েদের খোঁজ খবর লইতে ও একটু হাওয়া খাইতে বিশ্বাসদের বৌয়েরা বাঁশ-বনের পথ দিয়া আমগাছের তলায় আসিতে আসিতে এ-দিকে চাহিয়া, সেজ ও মেজ-বৌকে দেখিতে পাইল। সরলা বলিল, 'বেশ, মেজ খুড়ি মা! আমাদের বাড়ী এলে জাত যায় নাকি?'

মেজ বৌ বলিল, 'সবে তো কাল রাত্তিরে এসেছি—সময় পেলাম কৈ?'

বড়-বৌ বলিল, 'এইখানে এসো না খুড়িমা!'

দুজনে উঠিয়া গেল। দুই বাড়ীর পাঁচটি বৌ গাছের তলা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কথা কহিতে লাগিল।

রায়দের মেজ-বৌ বলিল, 'অনেক কাল পর দেখা—তোরা ভাল আছিস্ তো ?'

'আর ভাল কি ? দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে নিস্তার নেই কারুর। তুমি তো ভুলে থাক একেবারে—আমরা সব সময় তোমার কথা বলি—জিজ্ঞেস কর মেজ খুড়িমাকে।'

'না স্বর্ণ, ভুলে থাকি নে। বিদেশে পড়ে পড়ে মনটা কেবল বাড়ীর দিকে টানে। তা উনি এবার চাকরী একরকম ছেড়ে দিয়েই বাড়ী এলেন। ক'বছর ধরেই ভুগছেন—সেরে উঠলেও আর বিদেশে যেতে দেব না।'

'তা বাড়ী এসে ভাল আছেন একটু ?'

'কাল সবে এসেছি—দু'দিন না গেলে, ভালমন্দ বোঝা যায় না।'

সেজ-বৌ বলিল, 'তুমি দেখো, এবার ভাল হয়ে উঠবেন। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে না থাকলে, না শরীর, না মন, কিছুই ভাল থাকে না।'

'সে তোর হাতের গুণে; উনি রোজ বলতেন, সেজ-বৌমার হাতের চচ্চড়ি খেলে অরুচি সারে; আর তোমার হাতে একদিনও তেমন হয় না।'

—সেজ-বৌ বলিল, 'ও কথা বটঠাকুরের বাড়িয়ে বলা—রান্নায় তোমার সব চেয়ে নাম।'

স্বর্ণ বলিল, 'সব জিনিস সবার হাতে ভাল হয় না। তা দিয়েছিলে আজ চচ্চড়ি রেঁধে ?'

সেজ-বৌ বলিল, 'না রে, উনি সেই ভোর বেলা গিয়ে নদীর ঘাটে বসে রইলেন—মেজ বটঠাকুরের জন্যে মাছ আনবেন বলে—তা আনলেন এত বেলায় এক কই—চচ্চড়ির মাছ পাওয়াই গেল না, এমনি দরাত।'

সরলা বলিল, 'কাল পাবে—সব দিন সব মাছ পাওয়া যায় না। আমাদের বাড়ীর এঁরা কেউ মাছ নইলে ভাতে হাত দিতেন না—এখন হাটবার ছাড়া মাছ আনাই হয় না।'

মেজ-বৌ বলিল, 'কেন রে, মাছ কি বাজারে ওঠে না তমন ? তা হলে ওঁর বড় মুস্কিল হবে।'

বড়-বৌ একটু ম্লান হাসিয়া বলিল, 'সে কথা বলছিনে, বাজারে যেমন মাছ ওঠে তেমনিই উঠছে—পয়সায় টান ধরেছে—কাজেই হিসেব করে চলতে হয়।'

হঠাৎ জোরে বাতাস উঠিল, কচি কচি আমগুলি ঝুপ-ঝাপ ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেপিলেদের মধ্যে বিষম কলরব—একা সন্তোষ সমস্ত দলটাকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার কিল, চড় ও ধাক্কা খাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বীরা একে একে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হটিয়া যাইতেছে—একা রথী, অগণ্য শত্রু। পরশমণি ও পিসিমা ডাকাডাকি বাধাইয়া দিয়াছেন। সোঁ সোঁ শব্দে ভীষণ বেগে ঝড় আসিতেছে, আকাশের চারিদিক ঘন কাল মেঘে ঢাকা।

পিসিমা সন্তোষের হাত ধরিয়া সকলের আগে বাড়ীতে চলিয়া আসিয়া সোজা ঘরে গিয়া উঠিয়াছেন,—শনিবারের বাতাসটা ছেলের গায়ে লাগিল! কাল সকাল বেলা মুচিরাম পরামাণিককে ডাকিতে হইবে—একটু ঝাড়-ফুঁক করিয়া দিয়া যাইবে, রাত্তিরটা ভালয় ভালয় কাটিয়া গেলে হয়! বিছানায় শুইয়া কত সংখ্যা রাম-নাম জপ করিবেন তাহাই ভাবিতে না পলেন।

মেজ-বৌ ফিরিয়া ঘরে আসিতে আসিতে বলিল, 'হ্যাঁরে স্বর্ণ ওকথা বললে কেন ? পয়সায় টান ধরেছে, তার মানে কি ?'

মেজ-বৌ বলিল, উপরো উপরি দু'বছর অজন্মা গেল যে—পাটের দর নেই—অথচ অন্যেকের বেশী জমিতেই পাট বুনেছিল। পাটের টাকাই ওদের মস্ত বড় আয়। ধান অল্প কিছু বুনেছিল, তা একরকম মন্দ হয় নি, কিন্তু কলাই, সরষে কিছু হয় নি—এক কাহাও না, তবু গেল বারে যা ছিল তাতেই চলেছে, এবার অনেক টাকা কর্জ্জ করেছে।

—'কেন রে, ওদের অত জমি—আর সব ভাল ভাল জমি যে ?—'

'তা হলে কি হবে ? এবার অনেকেরই এ দশা। তবু এ বছর পাটের দর নেই বলে অনেকেই এবার পাট অল্প বুনে ধান বেশী বুনেছে। কিন্তু, ওরা ভাবলে একবার যখন দর নেমে গেল, পরের বার খুব বেশী চড়ে যাবে, উনি কত বারণ করেছিলেন শুনলে না। এবার ত' পাটের দর একেবারেই নেমে গেছে—যেখানে পাঁচ ছ'শো টাকা

পেত, সেখানে পঞ্চাশটা টাকাও পায় নি, তায় পোষ্য দিন দিন বাড়চে। এখন টানাটানি চলছে খুবই। সরলার আবার খরচে হাত বেশী, তিন ছেলেরই খুব ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন দিয়েছে। আর দেখনা ছেলেদের গায়ে গহনা কত?'

'তা দেবে বৈ কি, দেবে না? তোদের মতন নাকি? ন'মেয়ের পর এক ছেলে, তারও শুধু গলা, শুধু হাত।'

'ও মেজদি—ছেলের গুণ জান না। সেবার ছোট্ট দেখে গিয়েছিলে তাই বলছ,—গলার হারটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে' কোথায় ফেললে সবটা পেলামই না।'

'তারি এক সুতোর মতন হার দিয়েছিলি, ছিঁড়বে না ত কি? বেশ করেছে। আচ্ছা, সুরেনের যে বৌ, সেই আগেকার বৌ?'

'সে মায়ের কাছে আছে, সুরেন খোঁজ-খবর করে, তবে এই কিছুদিন হল আর বড় যেতে পারে না, কাজ-কর্ম্মে অবসর পায় না, আর যা কিছু সব এরাই নেয়—একটি পয়সা তাকে দিলে না।'

'পয়সায় কি সুখ হয়? সুখ মনে। স্বামীই পর হয়ে গেল—টাকা-পয়সা দিয়ে করবে কি? দেখ্ দেখ্ সরলা আম কুড়িয়ে বাড়ি জড় করে ফেললে, এখনো আমে আঁটি হয় নি, এত আম করবে কি?'

'কেটে আমচুর করে রাখে। যাদের দরকার হয়, ওর কাছ থেকে কিনে নিয়ে যায়।'

'তা মন্দ বুদ্ধি করেনি ত?'—মেজ-বৌ ঠিক সামনে একটি আম কুড়াইয়া পাইল—বাড়ীর সব ঘরের পিছনেই দু' চারটি করিয়া আম কাঁঠাল গাছ আছে। উত্তর দিকের মহলটা মেজ বৌয়ের—এ-আমটা মেজ-বৌয়ের ঘরের পিছনের সিঁদুরে আমগাছের।

'কাঁচাতে কাঁচা-মিঠে, পাকলে চিনি, এ আমের জুড়ি নেই: নে, মেজ ঠাকুর-পোকে দিস্।'

মেজ-বৌ হাসিয়া বলিল, 'আর সে দিন নেই, সব দাঁত নড়ে গেছে, কাঁচা আম দূরের কথা, পাকা আমও রস করে না দিলে খেতে পারেন না।'

'বলিস্ কি রে? এই বয়সে দাঁত গেল? তোর মেজ ভাসুরের একটি দাঁতও নড়েনি।'

'মেজ ভাসুর কেন, বটঠাকুরের দাঁত কি সুন্দর আছে, ছোলা, মটর, চাল-ভাজা সব খেতে পারেন। তোমার ছাওরের দাঁত নিজের দোষেই গেল—সমস্ত রাত্তির পান খাবেন আর যা মাংস খাওয়ার ঝোঁক—ওতে দাঁত থাকে কখন?' বলিয়া মেজ-বৌ হাসিতে লাগিল। মাছের মুড়ো নইলে ভাত উঠতো না, এখন মুড়োটি অমনি পড়ে থাকে, চুপ করে উঠে যান।'

'আহা, আহা, এমন দশা হয়েছে অমন খাইয়ে মানুষের? আজ রাত্তিরে দেখব, এমন বসে বসে খাওয়াটি! এই দেখ্ ঝড় বাতাসে মেঘ উড়িয়ে নিয়ে গেল, বৃষ্টি আর হবে না বোধ হয়। ঠাকুরঝি বকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন, শুনতে পাচ্ছিস্?'

'ও সারা দিনই শুনছি, মন্তর জপ্তে আর কি? চল একেবারে কাপড় কেচে আসি, এসে মণ্ডপে আলো দেবো।'

[২৬]

চিন নাই তুমি সেই চক্রী দুরাচার—

পঙ্কমী ঘরের বারান্দায় মাদুরে বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিল, ঘরে ঘরে এবার চরকার আওয়াজ, কে নিজে সুতা কাটিয়া সেই সুতা তাঁতিকে দিয়া কাপড় বুনাইয়া কাপড় পরিতে পারে তাহারই প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। পঙ্কমীর মা শুক্ল দ্বিতীয়ার দিন দিয়া তুলার গাছ লাগাইয়া দিয়াছিলেন—এবার সেই তুলারই সুতা হইতেছে, তুলা আর কিনিতে হয় না।

পঙ্কমীর লম্বা লম্বা চুল মাটীতে ছড়াইয়া রহিয়াছে—চাবী-বাঁধা আঁচলও মাটীতে, সুতা কাটিতে কাটিতে মাঝে মাঝে তাহার মুখে হাসি দেখা যায়—আজকাল এত মিহি সুতা হয় যে, কেনা কাপড়ের সঙ্গে এই সুতার কাপড়ের তফাৎ থাকে না।

পঙ্কমীর ও-বাড়ীর দিদি এক-জোড়া নূতন কাপড় হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, 'দেখ্—'

'দেখি—তা বেশ ভাল হয়েছে ত? পাড়টি লাল দিলে না কেন? আচ্ছা, এ কাপড় তুমি পরবে? প্রথম জিনিষ কাউকে না দিয়েই পরবে?'

'শাশুড়ীকে দেবো—তোর এ কাপড়জোড়া খুব মিহি হবে দেখিস্, আমার প্রথম হাত—তাই অত মোটা হল, এর পরে সরু হবে, না? আচ্ছা তুই ত কাপড়, চাদর, সাড়ীতে বাক্স বোঝাই করেছিস, অত সব করবি কি? ধুতি, গামছা, চাদরগুলো ত সুখেনের—কিন্তু সাড়িগুলো কি সরলার?'

পঞ্চমী হাসিয়া বলিল, 'দিলে দোষ কি?'

'দোষ না, খুব গুণ! দিয়েই দেখিস্ না?'

'দিয়েছিলাম দিদি, ওঁর হাতে দিই নি অবশ্য, দাদা বট্‌ঠাকুরের হাতে হাটে দিয়েছিল দিদিরা পরেছে, 'সরলা ছোঁয়ও নি—'

'সেটা কি হল তবে?'

'কি জানি, খোঁজ নেই নি আর।'

'সুখেনের খুব বিপদ্ যাচ্ছে জানিস্?'

'বিপদ্ ত দু'তিন বছর খুবই গেল। তা এবার যা পাট-ধান হয়েছে, তিন বছরের ক্ষতি সুদে আসলে উঠল। বড় করে দু'খানা ঘর দিচ্ছেন বাড়ীতে—'

'দাদা বললে, ছোট ছেলেটি মারা গেছে মাসখানেক হল।'

'সর্ব্বনাশ! সত্যি? তার খুব অসুখ যাচ্ছিল, সরলা বাপের বাড়ী রয়েছে এখন, সেইখানে? আমি কই খবর পাইনি—'

'হাঁ, সুখেন ও খবর পেয়ে এসেছিল, ওদিকে সরলা আঁতুড়ে গেল, এদিকে ছেলেটি যায় যায়, যে দিন আঁতুড় থেকে বেরিয়েছে, তার পরদিনেই মারা গেছে, এ একটা মাসই সুখেন সেখানে ছিল—'

'তাই কোন চিঠিপত্র দেন নি, আসেনও নি। আহা যার বছর এই দিনে কত ধুম-ধাম করে তার অন্নপ্রাশন য়েছে—আজ সব শেষ, আজ বেঁচে থাকলে দেড় বছরের। বচেয়ে সেই সুন্দর হয়েছিল—'

পঞ্চমী চরকা-সুতা ফেলিয়া গালে হাত দিয়া ম্লান মুখে সিয়া রহিল, পঞ্চমীর দিদি বলিল, 'সুখেন আজ আসবে, দাকে বলে দিয়েছে, তুই চুল টুল বাঁধ, না আমি বেঁধে য়ে যাব?'

'থাক্‌গে, দিদি আজ চুল বাঁধব না, আজ ঘরে পান নেই—তুমি পান পাঠিয়ে দিয়ো কিন্তু, বেশী করে দিয়ো। রাত্রে শীতের মধ্যে ভাতটা আর দিতে চাইনে, দেখি ময়দা কতটা আছে, না থাকে তাও চারটি দেবে—'

'তোকে কিছু হাঙ্গামা করতে হবে না—আমি খাবার এনে খাইয়ে যাব—দাদার কাছে শুনেই বৌদি আয়োজন করতে বসেছে, বেলা বেশী নেই, নে' তুই ওঠ, ঘর টর গোছা,—আমিও সব সেরে ফেলিগে।—'

চরকা, সুতা, তুলা সব গুছাইয়া তুলিয়া ফেলিয়া পঞ্চমী ঘর গুছাইতে লাগিল। বিছানাটা ময়লা হইয়া গিয়াছে, চাদর, বালিশের ওয়াড় সব বদলাইয়া দিল। এ ঘরে লেপ নাই—কার্ত্তিক-পূজার পরের দিন সুখেন আসিয়াছিল তখন কাঁথাই যথেষ্ট। তার পর আর আসে নাই,—এখন কাঁথা-কম্বলে চলে না। লেপ বাহির করতেই হবে।

অগ্রহায়ণের প্রথমেই আড়ার সঙ্গে টাঙানো লেপের বস্তা নামাইয়া রোদ দেওয়া হয়। পঞ্চমী নিজের হাতের কাটা সুতায় খদ্দরের থান বুনাইয়া আনিয়া তাই কাটিয়া লেপ-বালিশের ওয়াড় করিয়াছে। বিছানার চাদরও এই হাতে-কাটা সুতার,—চারিদিকে ময়ের রংয়ের সরু সরু ক্লিপাড় দেওয়া।

বাক্স খুলিয়া ওয়াড় বাহির করিয়া লেপ লাগাইয়া লেপ দিয়া বিছানাটা ঢাকা দিয়া রাখিয়া পঞ্চমী ঘর ঝাঁট দিল। পান, খাবার জল, দিয়াশলাই সব ঠিক ঠাক করিয়া চুল বাঁধিবার জন্য আয়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, মুখ দেখিতে দেখিতে নিজের মনে বলিল,—'ছেলে মরবার খবর পেয়ে মা চুল বাঁধিতে পারে না কি? চোখে না-ই দেখলাম, ছেলে ত বটে! এইটাও ঠিক ওঁর মত দেখতে হয়েছিল, রংই যা বেশী ফরসা। আর সকলের বড়টি সেটির রং চেহারা একেবারে ওঁর মতন—যেন রামের ছেলে লব-কুশ—মাঝের দুইটি ঠিক সরলার মত হয়েছে দেখতে, তাদের জন্য আমার মন কেমন করে না, দেখতেও ইচ্ছে করে না, কিন্তু এই দুটিকে বড় দেখতে ইচ্ছা হয়, একটি ত চলেই গেল, আর একটি এখন ভাল থাকলে হয়—'

চুল আঁচড়াইয়া পঞ্চমী জড়াইয়া রাখিয়া দিল, সিঁদুর পরিতে পরিতে ভাবিল, 'আজ আর খোঁপায় ফুল টুল

দেবো না, ওঁর মন খারাপ হয়ে রয়েছে, দেখে দুঃখ পাবেন। সরলা পড়ে পড়ে দিন-রাত্রি কাঁদছে, আমি কি না বেশ-ভূষা করছি, মনটা খুব খারাপ লাগছে সত্যি, কিন্তু কান্না একটুও পাচ্ছে না, আমার স্বভাবটাই হয়ত নিষ্ঠুর, সেই জন্যে চোখে জল আসে না—'

কাপড় কাচিয়া পঙ্কজী আজ আর নীলাম্বরী পরিল না, একখানা হাতে-কাটা সূতার লাল-পেড়ে ধবধবে সাড়ী বাহির করিয়া পরিল। চৌকাঠে জল ছড়া দিয়া লণ্ঠনটা ঘরে একেবারে ছোট করিয়া রাখিয়া ধূপ দিতেছে, ওঘর হইতে মা ডাকিলেন 'পঙ্ক'—

ধূপ-দানীটা চৌকীর তলায় রাখিয়া দরজার পাল্লা দুইটি টানিয়া ভেজাইয়া পঙ্কজী মার কাছে আসিল। মা সন্ধ্যা সারিয়া মালা-হাতে জপের আসনেই বসিয়া রহিয়াছেন, বলিলেন, 'বোস।'

একটা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া পঙ্কজী তাঁহার কাছে বসিল, মা কন্যার বেশ-ভূষার নূতনত্ব লক্ষ্য করিলেন, তাঁহার মুখ একটু বিষণ্ণ ও অপ্রসন্ন দেখাইতে লাগিল। বলিলেন, 'সুখেন এসেছিল, ওরা ও-বাড়ী ধরে নিয়ে গেল, একেবারে খেয়ে দেয়েই আসবে, শীতের রাত্রি বড় খাওয়ার লেঠা মেটে ততই ভাল। তা তোকে সেটাকতক কথা বলি!'

মা কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন, পঙ্কজী ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না যে, মা কি বলিবেন।

মালাটি মাথায় ঠেকাইয়া মা বলিলেন, 'দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে মা, পরকালের কিছুই করতে পারলেম না, তোকে নিয়ে পড়ে রইলাম, তোরও জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। আমরা এ জন্মের সুখ-সুবিধে বড় ধরি না, পরকালের দিকে চেয়ে থাকি। সেই পরকালে যে সুখে থাকব তার কি করছি? বড়দি, বট্‌ঠাকুর, সেজ ঠাকুরঝি আবার বৃন্দাবন যাচ্ছে, আর ফিরবে না। আমার এত সাধ ছিল তোর বিয়ে দিয়ে আমি বৃন্দাবন গিয়ে থাকব। তা তোর সবই ফুরিয়ে গেল। তাই ঠিক করেছি, তোকে নিয়ে আমিও ওঁদের সঙ্গেই যাব, ওঁদের কাছে থাকব, যতদিন বাঁচি। এবার বাড়ীটুকু জমিটুকু সব বেচে ফেলে টাকা বট্‌ঠাকুরের হাতে দেবো। ওতে আমাদের দু'জনের আজীবন চলে যাবে—'

পঙ্কজীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইল,—বৃন্দাবন? সেখানে গিয়া মা দিবানিশি জপ-সন্ধ্যা করবেন, আর সে সুখেনকে দেখিতে পাওয়া দূরে থাক, তার একটা সংবাদ পর্য্যন্ত পাইবে না। জীবন তার শতদলে পূর্ণ ও সার্থক—মা তা বুঝিবেন না, বৃন্দাবন গেলেই যে তার জীবনটা নষ্ট হইয়া যাইবে, একথা সে মাকে কেমন করিয়া বুঝায়?

ম্লান আলোকে মায়ের মুখ দেখিয়া পঙ্কজী মনে ব্যথা পাইল, মায়ের ধর্ম্ম-কর্ম্মের পথেও সে বিঘ্ন হইয়া রহিয়াছে।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন, 'তোর কাছে সুখেনের নিন্দা করা আমার উচিত নয়; কিন্তু এই যে চোরের মত আসা-যাওয়া, দিনে মুখ দেখাবার সাহস নেই, এতে আমার মনটা ঘৃণায় বিষিয়ে রয়েছে। এই নীচতা, ভীরুতা আমি কোন দিনই সইতে পারি নি—অথচ, তা-ই আমার কপালে হয়েছে। পুরুষ মানুষ—দুটো বিয়ে করে ফেলেছে যখন, উপায় নেই; তা বলে পৌরুষ হারিয়ে ফেলবে? ও যদি জোর করে তোকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যেতো, নিয়ে নিজেরই বাড়ীতে তোর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়ে তোকে সেখানে রাখত, আমি মনে মনে সত্যি সুখী হতাম। নীলমণি দে, শশী মুন্সেফ, সত্যব্রত রায়—শিক্ষিত হয়েও দু'বিয়ে করেছিল—মনে নেই তোর; তুই তখন ছোট, তখন আমরা মেদিনীপুরে, তা তাদের দেখেছি, দু'বৌয়ের জন্য এক বাড়ীতেই দু'মহল। কোন ঝগড়া-ঝাঁটি গোলমাল নেই। আর ও তোকে পায়ে ঠেলে, সেই তাকেই সর্ব্বেশ্বরী করে রেখেছে, তুই এতেই গলে গেছিস্! তুই যার মেয়ে, কত তেজস্বী ছিলেন তিনি!'

পঙ্কজী মায়ের কথা শুনিতেছিল বটে, কিন্তু ঐ রকম দু'মহল করিয়া থাকার চেয়ে সে যে সুখ-শান্তিতে রহিয়াছে তাহা মাকে বুঝান যায় না। সে একটা কি অদ্ভুত ব্যাপার! একই বাড়ীতে দু'ভাগ, বগলা-বিন্দীর মতন সে ও সরলা দু'জনেই যদি সুখেনকে খাইতে ডাকে, তবে সুখেনের অবস্থা কি হইবে, ভাবিতে গিয়া এত হাসি পাইল যে, পঙ্কজী মাথা নীচু করিয়া ফেলিল। আর, সেই ব্যবস্থাই কি সুবিধা হয় না কি? মায়ের কাছে নীলমণি, শশী মুন্সেফ, সত্যব্রতদের পারিবারিক কাহিনী গল্পচ্ছলে অনেক দিন সে শুনিয়াছে।

মুখ নীচু করিয়াই সে বলিল, 'আচ্ছা মা, তুমি যে বললে, নীলমণি বাবু তো বড়-বৌকে দেশের বাড়ীতে রেখে ছোট-বৌকে নিয়ে বিদেশে থাকতেন বরাবর। শুধু খরচ পাঠাতেন। তারপর পেন্সন নিয়ে যখন দেশে এলেন, দু'মহল করলেন, কিন্তু নিজে থাকতেন—ছোট বৌয়ের মহলে। ভুলেও বড়-বৌয়ের বাড়ীর দিকে হাঁটিতেন না। একদিন বড়-বৌ নেমন্তন্ন করেছিল, তাও এলেন না। বড় বৌয়ের ছেলেদের সঙ্গেও কথা কন নি ভাল করে। ছোট বৌয়ের ঘরের বারান্দায় ছোট-বৌয়ের ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি খেতে বসতেন, বড়বৌয়ের ছেলেরা উঠানে দাঁড়িয়ে দেখত—কোন দিন একটা ডাক দেন নি পর্য্যন্ত।'

'তা না দিন, তবু বড়-বৌয়ের মর্য্যাদা ছিল, সবাই তারই বাধ্য ছিল, তাকেই ভালবাসত। আর বড়-বৌয়ের ছেলেরা সবাই মানুষ হয়েছে। ছোট-বৌয়ের ছেলেদের পেছনে যে অত টাকা খরচ করলেন, তারাই এখন বড়-বৌয়ের ছেলেদের কাছে এসে রয়েছে।'

'আর তোমার সত্যবাবু? দু'মহল করেছিলেন বটে, কিন্তু ছোট মহলেই থাকতেন। শশী মুন্সেফ বড়-বৌয়ের মুখ দেখতেন না। ইন্দুবাবু বড়-বৌয়ের অমন সুন্দর ছেলেকে পড়ালেন না পর্য্যন্ত। শেষে কোন এক ভদ্র লোক নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কলেজে পড়ালে ছেলেটিকে।' বলিয়া মনে মনে বলিল, 'ওদের সঙ্গে তুলনা? মা যে, কি বলেন, তার ঠিক নেই। সরলা কত কষ্ট পাচ্ছে। এই দুটো বছর কত কষ্ট পেয়েছে টানাটানিতে। ছেঁড়া ঝুলি কাপড় পরেছে, তবু নূতন কিনবার টাকা জোটেনি। এই করে সংসার করছে, আর আমি কি তাই?'

মা বলিলেন, 'তবু তাদের সত্যিকার মর্য্যাদা আছে, ভাল বাসুক আর না বাসুক, সম্মান দিয়ে রেখেছে। সম্মান হচ্ছে আসল। যাক, সে তুই বুঝবিনে, সে বুদ্ধি তোর নেই-ই। থাকলে, এ দশা হত না। আমি বলছি কি, এই ভাঙ্গা ঘরে তোকে নিয়ে আমি শান্তি পাচ্ছিনে, ভয়ে মরছি। বটঠাকুর ছিলেন চিরকালটির প্রধান, তাঁর ভয়ে কেউ মাথা তুলতে সাহস করেনি। একটু চুরি অবধি হয়নি কখনও এখানে। কিন্তু, তাঁর এই যাওয়ার কথা শুনে, চারদিকের বদমাইসরা জোট পাকাচ্ছে। বদমাইসের দল দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। বটঠাকুর চলে গেলে, একটা দিনও তোকে নিয়ে এখানে থাকতে সাহস পাইনে। আমি তাই ঠিক করেছি, তোকে নিয়ে ওঁদের সঙ্গেই চলে যাব।'

'মা'—পঙ্কজী একটু থামিয়া আস্তে আস্তে বলিল—'ওঁকে একবার জিজ্ঞেস্ করি না?'

'সুরেনকে? কি জিজ্ঞাসা করবি?'—মার চাহনীর তীক্ষ্ণতায় পঙ্কজী যেন মাটিতে মিশিয়ে গেল। কিন্তু, তার বাঁকানো গ্রীবার উপরের প্রকাণ্ড এলো খোঁপা এক পাশ দিয়া অল্প দেখা, চোখের কোণ, কপালের চুলের তরঙ্গ দেখিতে দেখিতে মায়ের চোখ সজল হইয়া উঠিল। মেয়ের রং ও রূপ যেন দিন দিন বাড়িতেছে, কে বলিবে উহার বয়স পনেরর বেশী? ভুবন-মোহিনী মেয়ে তাঁহার, কোন পাপের ফলে এ দশা? এমনি অবোধ যে, নিজের দশা বুঝিবারও শক্তি নাই। স্বামীই চিনিয়াছে, স্বামীই সব, সুরেনকে না দেখিয়া এ কি বাঁচিবে?

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া কোমল স্বরে সস্নেহে মা বলিলেন, 'কি বলবি বল?'—

'আচ্ছা আমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে থাকিনে কেন? দিদিরা বটঠাকুররা সবাই ত' আছেন—'

'ওদের বাড়ী গিয়ে থাকবি? আমার এই সব কথা শুনে ভেবে ভেবে এই শেষে ঠিক করলি?'

'তুমি শোন মা, রাগ করো না—আমি বলছি কি, আমি কাকাবাবুদের যাই, যদি সবাই ভাল ব্যবহার করেন ত থাকবো, তুমি বৃন্দাবন চলে যেয়ো। আর যদি খারাপ ব্যবহার করেন, চলে আসব, তখন দুজনেই বৃন্দাবনে গিয়ে থাকব। কেমন হয় মা সেটা?'

আবার মাথাটি কপালে ঠেকাইয়া মা চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'তা বেশ, তাই কর, ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোকে আমি কিছু করতে বলব না। বড় ঠাকুরদের সঙ্গে আর যাওয়া হয় না তা হলে, তবে ওরা চলে গেলে রাতে তোকে নিয়ে এ বাড়ী থাকতে আমি সাহস পাব না, ও বাড়ীতে গিয়েই থাকব। আজই সুরেনকে বলিস্। মানুষ যা ভাবে, তা হয় না। ভাবতে যাওয়াই ভুল। ভগবান্ যা করবেন, হবে।' [ক্রমশঃ

জরথুস্ত্র

—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতিই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, তিনিই বহুরূপে আপনাকে প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনিই অগ্নিতে, জলেতে, ওষধিতে, বনস্পতিতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাগণের পরম দৈবত। কিন্তু, কালক্রমে তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল—তিনি মূর্ত্ত না অমূর্ত্ত? প্রকাশ না অপ্রকাশ? সাকার না নিরাকার? সত্যদর্শী ঋষিগণ ধ্যানযোগে দর্শন করিলেন,—তিনি মূর্ত্তও বটেন, অমূর্ত্তও বটেন; যেহেতু তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং যাহা কিছু মূর্ত্ত, তাহাতেই অনুপ্রবিষ্ট।

পরবর্ত্তী কালে ব্রহ্মের উপাসকগণ দুইটি পৃথক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাঁহারা ব্রহ্মের অমূর্ত্ত স্বরূপের উপাসক, তাঁহারা অসুরোপাসক আর মূর্ত্ত স্বরূপের উপাসকগণ দেবোপাসক নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদের রচনাকালে এই দুই সম্প্রদায়ে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছিল। এই বিরোধ হইতেই অসুরের উপাসকগণ সিন্ধুর পশ্চিমপারে ইরাণভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'পারসিক' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, আর দেবোপাসকগণ সিন্ধুর পূর্ব্বতটবাসী হইয়া 'হিন্দু' নাম ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং হিন্দুর ও পারসিকের সংস্কৃতি একই বৈদিক সংস্কৃতির দুইটি অঙ্গ, হিন্দুধর্ম্ম ও পারসিকধর্ম্ম একই বৈদিক ধর্ম্মের দুইটি ধারা মাত্র।

কোন্ সুদূর অতীতকালে, মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে—গৌতম বুদ্ধেরও জন্মের প্রাক্কালে—আর্য্য অধ্যুষিত ইরাণভূমিতে মহাপুরুষ জরথুস্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আজও তাহা পারসিক জাতির কর্ম্ম ও চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং বৈদিক সাধনার একটি ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পারস্যের রাজধানী তিহারাণের তিন মাইল দক্ষিণে চৈত্র মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে জরথুস্ত্রের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম পুরুষাশ্ব, মাতার নাম দুগ্ধদা।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জরথুস্ত্রের জীবন-বৃত্ত অন্ধকারে বিলীন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মমত ও বাণী চিরকাল গাথা-সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম একসময়ে বর্ত্তমান পারস্যের পশ্চিমে এবং ক্রমে এশিয়া মাইনর ও মিশরে বিস্তৃতি লাভ করে কিন্তু, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩৩১ অব্দে একিমিনীয় রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্ম্মের প্রভাব অনেকটা লুপ্ত হয়। পরে সিসোনীয় রাজ্যের অভ্যুদয়ে এই ধর্ম্ম পুনরায় নষ্ট গৌরবলাভে সমর্থ হয়। কিন্তু, ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের আক্রমণে পারস্যের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় এবং পারস্যবাসিগণকে ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কেবল যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধি-রক্ষায় বদ্ধপরিকর ছিলেন, তাঁহারা স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষের বোম্বাই-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু, পারস্যের অধিবাসিগণ ইসলাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এবং আচারে ব্যবহারে মুসলমান হইলেও পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে যে তাঁহাদের মনের যোগসূত্র কোন দিন ছিন্ন হয় নাই, পরবর্ত্তী পারস্য সাহিত্যই তাহার প্রমাণ।

জরথুস্ত্রের ধর্ম্মমত অতি সহজ ও সরল। এই ধর্ম্মে অহুরমজদার অর্থাৎ চিদানন্দময় অসুরের (পরমেশ্বরের) উপাসনা, শয়তানকে পরিত্যাগ, দেহ ও আত্মার পবিত্রতা-রক্ষা এবং গো-পালন অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম মূর্ত্তিপূজা, সন্ন্যাস ও চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিরোধী। পরবর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় এই ধর্ম্মও কতকগুলি উদার ও অসাম্প্রদায়িক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, গাথা ও ধর্ম্মপদের তুলনা করিলে এই তথ্য সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। কিন্তু, অহিংসার আদর্শ সম্বন্ধে এই দুই ধর্ম্মে যে অনৈক্য রহিয়াছে, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল নীতি এই—

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে এবং অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। কিন্তু, পারসিকগণের গাথায় এইরূপ প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়, যে আমার হিতকারী, তাহার প্রতি যেন অধিকতর হিতাচরণ করি, এবং যে আমার অনিষ্টকারী, তাহার প্রতি যেন অধিকতর অনিষ্টাচরণ করি। এই বিষয়ে ইহুদীধর্ম্মের সঙ্গেই পারসিক ধর্ম্মের অধিকতর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

আর একটি বিষয়ে জরথুস্ত্রের মতানুসারীদিগের সহিত বৌদ্ধগণের পার্থক্য আছে। বৌদ্ধদিগের মতে নির্ব্বাণ-লাভের দ্বারা ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি ঘটে, আর এই নির্ব্বাণলাভের উপায়—সর্ব্ববিধবাসনা-ত্যাগ। এই মতবাদ হইতেই সন্ন্যাস গার্হস্থ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রব্রজ্যাই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু, পারসিকগণের ধর্ম্মের সুস্পষ্ট অনুশাসন এই—গার্হস্থ্যই শ্রেষ্ঠ আশ্রম, (ইহার সহিত মনুর—'চতুর্ণাম্ আশ্রমাণান্তু গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্' তুলনীয়), আর সাধুভাবে ধনোপার্জ্জন সকল গৃহস্থেরই প্রধান কর্ত্তব্য। সকলে ধনোপার্জ্জনে রত থাকিলে পাপীর সংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং সকলেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে রত থাকিয়া ধন সঞ্চয় করিবে। কেহ উপবাসের দ্বারা দেহকে কর্ষণ করিবে না, বরং পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা ইহাকে দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। এইজন্য শ্রীযুক্ত জে, পি, মোদি বলিয়াছেন—

'If utility is taken to be the true basis of morality, Zoroastrianism represents a very high phase.'

অর্থাৎ, ব্যাবহারিক জীবনে সফলতা যদি নীতিশাস্ত্রের ভিত্তি হয়, তবে জরথুস্ত্রের অনুশাসনের স্থান অতি উচ্চে।

সঙ্ঘের উপযোগিতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বিশ্বমৈত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধে পারসিক ধর্ম্মে ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। পারসিক-ধর্ম্মে আমরা মানবতার যে আদর্শ দেখিতে পাই, একমাত্র বৈদিক 'মানব-ধর্ম্ম' ছাড়া, তাহার চেয়ে উন্নততর আদর্শ পৃথিবীতে অদ্যাপি প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। জরথুস্ত্রের অনুশাসন এইরূপ—

১। কায়মনোবাক্যে পবিত্র হইবে।

২। এমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে যাহাতে সজ্জনগণের প্রশংসাভাজন হইতে পার।

৩। সর্ব্বদাই মনে মনে পুণ্য কর্ম্মের চিন্তা করিবে,—সমস্ত পাপ চিন্তা পরিহার করিবে এবং পাপ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকে চিরতরে বর্জ্জন করিবে।

৪। শুদ্ধাত্মাদিগকে বহুমান দান করিবে, আর কখনও কোন যাদু-বিদ্যার চর্চ্চা করিবে না।

৫। অহুরমজ্‌দার উপাসনায় রত হইবে।

৬। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

৭। সাধুভাবে ধনোপার্জ্জন করিবে।

৮। ধর্ম্মনিষ্ঠ শাসনকর্ত্তার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইবে।

৯। বন্ধুগণের প্রতি শিষ্টাচারী হইবে এবং তাহাদের কল্যাণ কামনা করিবে।

১০। কদাপি ক্রোধের বশীভূত হইবে না এবং কখনও পরনিন্দা বা কাহারও প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবে না।

১১। কৃত পাপকে আচ্ছাদিত করিবার জন্য কখনও পাপের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে না।

১২। লোভকে কখনও প্রশ্রয় দিবে না। অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করিবে না। (ঈশোপনিষদের 'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্' তুলনীয়)।

১৩। লোভী ব্যক্তির সাহচর্য্য করিবে না এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকের সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না।

১৪। যাহারা কর্ম্মদক্ষ নহে, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না।

১৫। যাহাদের অখ্যাতি বা কলঙ্ক লোকমুখে কীর্ত্তিত হয়, এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব করিবে না, বা দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইবে না।

১৬। সভাসমিতিতে সর্ব্বদা সারগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করিবে।

১৭। রাজসমীপে যথাযোগ্য বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে বাক্যালাপ করিবে।

১৮। পূর্ব্বপুরুষগণের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিবে।

১৯। মাতাকে শ্রদ্ধা করিবে এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবে।

২০। যথারীতি দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিবে।

এই সমস্ত অনুশাসন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জরথুস্ত্র একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে সকল বিরোধ তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু, জরথুস্ত্র কেবল কর্ম্ম-যোগীই নহেন,—তিনি ভক্ত, তিনি প্রেমিক ও রসের সাধক। বৈষ্ণব ধর্ম্মে আমরা পঞ্চ রসের সাধনা দেখিতে পাই, সুফী ধর্ম্মে কান্ত বা মধুর রসের উপাসনা দেখিতে পাই,—কিন্তু, এই সমস্তেরই বীজ জরথুস্ত্রের গাথায় নিবদ্ধ রহিয়াছে। মহাত্মা যীশু যেমন বলিয়াছেন—'Thy will be done, my Lord,' তেমনি জরথুস্ত্র বলিয়াছেন—

'তাঁহার ইচ্ছাই আমাদের জীবনকে চালিত করুক'। তিনি আরও বলিয়াছেন—

'ভক্তের নিকট মজদা কখনও পিতারূপে প্রকাশিত হন (উপনিষদের ঋষিগণের 'ওঁ পিতা নোঽসি' এবং বাইবেলের 'Thy Father which art in heaven' তুলনায়), কখনও বা পতিরূপে আবির্ভূত হন (বৃন্দাবনের গোপীগণ, সুফী সাধকগণ এবং খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বহু মরমী সাধক ইহার দৃষ্টান্তস্থল), কখনও বা সখারূপে প্রকট হন (শ্রীদাম, সুদাম, বসুদাম প্রভৃতি এই রসের সাধক), কখনও কর্ত্তারূপে প্রতীয়মান হন (বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পণ্ডিতগণের মনীষা এই পর্য্যন্ত যাইয়া ক্ষান্ত হয়), কখনও বা সাধু অর্থাৎ পরিপূর্ণতার আদর্শরূপে প্রতিভাত হন (God as Perfection)। জরথুস্ত্রের মতে ঈশ্বর সর্ব্ববিধ আনন্দের আকর,—তিনি রসঘন, সান্দ্রানন্দ। তাই তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—

'বন্ধু বন্ধুকে যে আনন্দ দেয়, পতিপত্নী পরস্পরকে যে আনন্দ দেয়, তুমি সেই আনন্দ আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত কর'।

—জরথুস্ত্র কর্ম্মযোগী হইয়াও ভক্তি ও প্রেমের উৎকর্ষ স্বীকার করিয়াছেন,—পরবর্ত্তী যুগের নিরীশ্বর বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত এই খানেই তাঁহার পার্থক্য। বৈষ্ণব-ধর্ম্মে আমরা প্রেমের যে চরম বিকাশ দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মধ্যে তাহার মূল অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বেই জরথুস্ত্র ইরাণ-ভূমিতে ভক্তি-যোগের মূল-সূত্র প্রচার করিয়াছেন।

জরথুস্ত্রের 'গাথা'য় ভক্তিযোগের ন্যায় জ্ঞানযোগেরও মূল-সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ব্রহ্ম যে এক হইয়াও বহুরূপে নিজকে প্রকাশিত করিয়াছেন—এই তত্ত্ব গাথার প্রতিপাদ্য। কিন্তু, যে অদ্বৈতবাদ কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অস্বীকার করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-প্রতিপাদনে ব্যস্ত, সেই অদ্বৈতবাদ জরথুস্ত্রের প্রচারিত ধর্ম্মের অনুকূল নহে।

পরিপূর্ণ মানবতার সাধনায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। জরথুস্ত্র প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শই প্রচার করিয়া-ছিলেন। একই চিরন্তন সত্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে নানা মহাপুরুষের মধ্য দিয়া প্রচারিত হয় বলিয়াই আমরা তাঁহাদের বাণীর মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র খুঁজিয়া পাই। পারসিকগণের গাথা, বৌদ্ধদিগের ধম্মপদ (ধর্ম্মপদ) ও খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল এই জন্যই কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সম্পত্তি নহে,—বেদের মত বিশ্ব-মানবের সাধারণ সম্পত্তি। তাই এই সকল শাস্ত্র আজও ত্রিতাপদগ্ধ মানবকে শান্তির পথে, কল্যাণের পথে, অমৃতত্বের পথে লইয়া যায়,—মানব এই সমস্ত শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াই অ-ভয় হয়, অ-শোক হয়, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। আজ আমরা মহাপুরুষ জরথুস্ত্রের উদ্দেশ্যে এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও মহাপুরুষগণের উদ্দেশ্যে সশ্রদ্ধ প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি।*

* এই প্রবন্ধের কোন কোন অংশে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের 'রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্র' হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি।

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ

—শ্রীললিতমোহন হাজরা

মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অন্তর শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল। সংসারে তাঁহার মন বসিতেছিল না – রাজপ্রাসাদ শূন্য বোধ হইতেছিল। কেন? বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন – পুত্র নন্দ—পৌত্র রাহুল প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া সংসার-মায়া ত্যাগ করিয়াছেন এবং মহারাজা শুদ্ধোদন দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই শোকে তাঁহার অন্তর ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল। মহাপ্রজাপতি গৌতমী শোকানল শীতল করিবার নিমিত্ত প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎকালে গৌতম-বুদ্ধ ন্যগ্রোধারামে বাস করিতেছিলেন। তথায় উপনীত হইয়া গৌতমী পুত্রের নিকট আবেদন জানাইলেন – আমি তোমার সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে চাই। সংসারের মায়াজালে আমার অন্তর আর বদ্ধ থাকিতে চাহে না। গৌতমী অন্তরে কত আশা – কত আনন্দ লইয়া পুত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্র তাঁহার সকল আশা-ভরসায় কুঠারাঘাত করিলেন। তথাগত এক মহা সমস্যার সম্মুখীন হইলেন। এ পর্য্যন্ত কোন মহিলা সঙ্ঘভুক্তা হন নাই। এদিকে বিমাতার মর্ম্মস্পর্শী আবেদন ও কাতর অনুনয় তথাগতের বিরাট অন্তরকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু, অন্তরদ্বার যেখানে বজ্র-অর্গলে রুদ্ধ তথা হইতে মর্ম্মবাণী প্রতিঘাত মাত্র হইয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তথাগত বিমাতাকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন না, বিষণ্ণমনে মহাপ্রজাপতি রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অনতিকাল পরেই তথাগত মহারাজ কপিলবাস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৈশালী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় আগমন করিয়া তিনি বেণুবনে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাগত মহারাজ যেদিন কপিলবাস্তু পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, সেই দিন হইতেই মহাপ্রজাপতি গৌতমীর হৃদয় প্রবোধ মানিতে পারিল না। অন্তরাগ্নি হু' হু' রবে জ্বলিতে লাগিল। পুনরায় কোমল নারী-হৃদয় আশাবাদী হইয়া উঠিল। অভিমানিনী নারী এইবার সঙ্ঘে প্রবেশ করিবেনই, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া সঙ্গীদিগকে আহ্বান করিলেন। সখীগণ তাঁহার এই আহ্বানে সাড়া দিলেন, সকলে একত্র হইয়া মনস্থ করিলেন যে, তাঁহারা স্বীয় কেশদাম ছেদন করতঃ গৈরিক-বসনা হইয়া পদব্রজে বৈশালী যাত্রা করিয়া বুদ্ধের নিকট সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইবার অনুমতি লাভ করিবেনই। প্রস্তাব-মত তাঁহারা রক্তাক্ত এবং ক্ষত-বিক্ষতপদে বিহার-দ্বারে উপস্থিত হইয়া আনন্দকে আপনাদের আন্তরিক বাসনা জানাইলেন। মহাপ্রজাপতি এবং তাঁহার সখীবৃন্দের রক্তাক্ত এবং ক্ষতবিক্ষত পদগুলি লক্ষ্য করিয়াই আনন্দের অন্তর কাঁদিয়া উঠিল। কোমলপ্রাণ আনন্দ সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া বুদ্ধসমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আনন্দ নিবেদন করিলেন, 'হে ধাম্মিকপ্রবর! বিহারদ্বারে মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং তাঁহার সখীবৃন্দ কেশদাম ছেদন করিয়া, গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক কপিলবাস্তু হইতে পদব্রজে আগমন করিয়াছেন; সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইয়া নারীজাতিকে ধর্ম্মপথে জীবনযাপন করিতে দিতেছেন না বলিয়া বিলাপ করিতেছেন। আপনি নারীজাতির প্রতি সদয় হউন, দয়াপরবশ হইয়া আপনি নারীজাতিকে সঙ্ঘভুক্তা হইবার অনুমতি দান করুন।'

পুনরায় তথাগত নিরুত্তর রহিলেন। এ সম্বন্ধে আনন্দ আলোচনা করিতে সাহস পাইলেন না। কিন্তু, না করিলেও উপায় নাই। আনন্দ পুনরায় নিবেদন জানাইলেন, 'নারীজাতি কি এতই অপদার্থ যে, তাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অনাগামী, সকৃদাগামী, অর্হৎ এবং স্রোতাপন্ন পদগুলি পাইতে পারেন না?'

তথাগত জানাইলেন, 'হাঁ, তাঁহারা পাইতে পারেন।' আনন্দ পুনরায় নিবেদন করিলেন, 'তাহাই যদি হয়, তবে কেন আপনি মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্তা হইবার অনুমতি দিতেছেন না?'

তথাগত এইবার সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু জানাইলেন, তিনি আটটি গুরুধর্ম্ম পালনের সর্ত্তে নারী জাতিকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিতে পারেন। আনন্দ এই আটটি গুরুধর্ম্ম জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে তথাগত জানাইলেন—

১। ভিক্ষুণী শতবর্ষে প্রাচীন হইলেও ভিক্ষুদিগকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিবেন;

২। যে স্থানে ভিক্ষু নাই, এমন স্থানে কোন ভিক্ষুণী কদাপি বাস করিবেন না;

৩। ভিক্ষুণীগণ প্রতিপক্ষে ভিক্ষুগণকে উপবাস অনুষ্ঠানের দিন-নির্দ্দেশ এবং ঐ দিনে কোন ভিক্ষুকে তাঁহাদের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিবেন;

৪। প্রতিবর্ষা-বাসের শেষে ভিক্ষুণীকে উভয় সঙ্ঘের সমক্ষে প্রবারণা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে;

৫। উভয় সঙ্ঘ-সমক্ষে ভিক্ষুণীকে বিহিত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হইবে;

৬। দুই বৎসর শ্রমণেরা রূপে শিক্ষা লাভ করিয়া সঙ্ঘভুক্তা প্রত্যেক স্ত্রীলোককে উভয় সঙ্ঘের নিকট উপসম্পদা-দীক্ষা লইয়া ভিক্ষুণী হইতে হইবে;

৭। কোন শ্রমণকে কোন ভিক্ষুণী নিন্দা বা অপমান করিতে পারিবেন না; এবং

৮। ভিক্ষুরা ভিক্ষুণীর দোষ-ত্রুটি ভর্ৎসনার দ্বারা সংশোধন করিতে পারিবেন, কিন্তু কোন ভিক্ষুণী কোন ভিক্ষুর ত্রুটিহেতু তৎপ্রতি ভর্ৎসনা-বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিবেন না।

তথাগত ভাবিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এই আটটি গুরুধর্ম্ম পালন করিতে নারীজাতি অক্ষম হইবেন। ফলে, নারীজাতি সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু প্রাণের আবেগ যেখানে প্রচণ্ড আকার ধারণ করিয়াছে, সেখানে কোন বাধা-বিপত্তিই মানব-হৃদয়কে দমন করিতে পারে না। মহাপ্রজাপতির নিকট আনন্দ এই সমুদয় সর্ত্ত উপস্থাপিত করিলে তিনি মহানন্দে এই আটটী গুরুধর্ম্ম পালন করিতে রাজী হইলেন। মহাপ্রজাপতি সঙ্ঘভুক্তা হইলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তথাগত মহারাজ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, "আনন্দ! যদি নারীজাতি সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে না পারিত, আমার ধর্ম্ম-বিজয় সহস্র-বর্ষব্যাপী তিষ্ঠিতে পারিত, কিন্তু এধর্ম্ম আর পঞ্চশত বর্ষের অধিক বিরাজ করিবে না।"

মহাপ্রজাপতির দীক্ষার অনতিকাল-মধ্যেই তাঁহার সখীবৃন্দ ভিক্ষুদের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুণী হইলেন। তাঁহাদের লইয়া সর্ব্বপ্রথম ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইল। মহাপ্রজাপতি ভিক্ষুণী-সঙ্ঘের অধিনায়িকা হইলেন। মহাপ্রজাপতির সঙ্ঘভুক্তির সংবাদ পাইয়া যশোধরা পুনরায় শ্রাবস্তীতে গমন করিলেন। বৈশালীতে উপস্থিত হইয়া তিনি মহাপ্রজাপতির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেব তৎকালে শ্রাবস্তীতে ছিলেন। তখন যশোধরা পুনরায় শ্রাবস্তী গমন করিলেন। তথায় তথাগত মহারাজ তাঁহাকে উপসম্পদা দান করিলেন এবং তিনি সঙ্ঘভুক্তা হইলেন; তথাগতের নির্দ্দেশানুসারে নব-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের শৃঙ্খলার নিমিত্ত কঠোর নিয়মাবলী নির্দ্দিষ্ট হইল। ভিক্ষুণীগণ দেশ-দেশান্তরে তথাগতের শান্তির পথ এবং মুক্তির বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে ধর্ম্মপ্রচারের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল। কারণ, তাঁহারা অন্তঃপুরচারিণীগণের প্রীতির এবং শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। অন্তঃপুরে ভিক্ষুণীদের অবাধ মেলামেশার ফলে অন্তঃপুরচারিণীগণ ভিক্ষুণীদিগের আশ্রমে আসিতে লাগিলেন এবং নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নবজীবন লাভ করিতে প্রয়াস পাইলেন।

ভিক্ষুণীগণ তথাগতের মুক্তির এবং শান্তির বাণী দেশময় প্রচার করিতে লাগিলেন, একথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই কোমল বামাকণ্ঠে শান্তির ও মুক্তির বাণী অতীব মধুর হইয়া উঠিল। আবালবৃদ্ধবনিতা এই নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে নারীগণ এই ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। মগধ-সম্রাট্ বিম্বিসারের প্রধানা মহিষী অনিন্দ্যসুন্দরী ক্ষেমা অতীব রূপ-গর্ব্বিতা ছিলেন। একদিন তথাগত উদ্যানে যোগসাধনায়

বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে মহিষী ক্ষেমা ভ্রমণ করিতে করিতে তথাগতের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তথাগত যোগদৃষ্টিবলে ক্ষেমার সম্মুখে এক অনিন্দ্যসুন্দরী অপ্সরা-মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। এই অপরূপ অপ্সরামূর্ত্তি একে একে কৈশোর, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হইলেন। তথাগত ক্ষেমার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার নিমিত্ত এই দৃশ্য দেখাইলেন। তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইল। ক্ষেমার সংসারে বৈরাগ্য জন্মিল। ক্ষেমা বিম্বিসারের অনুমতি লাভ করিয়া ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। অল্পকাল-মধ্যেই ক্ষেমা বুদ্ধের 'অগ্রশ্রাবিকা'-রূপে পরিগণিতা হইলেন। ক্রমে নন্দা, শোনা, শুক্লা, ধম্মদত্তা, কুণ্ডলকেশী, ভদ্রকপিলানী, কৃশা, গৌতমী, পটচারা, উৎপলবর্ণা প্রভৃতি বিদুষী নারীগণ সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। এই সমুদয় ভিক্ষুণীগণ বাগ্মী এবং বক্তা ছিলেন।

জনসমাজে ভিক্ষুণীগণ যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। জনমণ্ডলী ভিক্ষুণীসঙ্ঘের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেন। ভিক্ষুণীগণ স্বীয় ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারিতেন না, কারণ পথিমধ্যে স্বভাব-দুর্ব্বৃত্তগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিত। এইজন্য বহু স্বভাবদুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

যে নারী সঙ্ঘভুক্তা হইতেন তিনি আইনের আমলে আসিতেন না। এমন দেখা গিয়াছে, অনেক নারী অপরাধ করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়াছেন। ফলে, রাজদণ্ড-ভোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

বারনারীগণও ভিক্ষুণীসঙ্ঘের প্রতি আকৃষ্টা হইলেন। তাঁহারা জঘন্য রূপ-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে মনস্থ করিলেন। তাঁহাদের পাপময় জীবনের প্রতিক্রিয়ারূপে হৃদয়ের উজ্জ্বলতা অধিকতররূপে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আম্রপালী-নাম্নী এক পতিতা নারী রূপ-ব্যবসায় বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বপ্রথম সঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। আম্রপালী বৈশালী নগরীতে বাস করিতেন। তথায় আম্রপালীর এক সুরম্য আম্রবন ছিল। তথাগত পাটলিগ্রাম, নালন্দা প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া বৈশালী নগরীর দিকে যাত্রা করিলেন। বৈশালী নগরীতে প্রবেশ করিবার পথে তথাগত আম্রপালীর আম্রবনে উপনীত হইলেন। স্বীয় আম্রবনে তথাগতকে দেখিয়া আম্রপালী সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তথাগত তাঁহাকে নানা উপদেশ দিলেন। এই উপদেশরাজি শ্রবণ করিয়া পতিতা রমণীর হৃদয় নিষ্কলুষ হইয়া গেল। আম্রপালী সঙ্ঘকে স্বীয় আম্রবন দান করিলেন। "বুদ্ধের সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া আম্রপালীর অন্তর আজ হঠাৎ উৎসবে মাতিয়া উঠিল। সমস্ত দিবস কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি হৃদয়ে এক লোকাতীত আনন্দ অনুভব করিলেন। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশ্রাবকগণের সেবা করিয়া তিনি নিজেকে ধন্যা জ্ঞান করিলেন। আম্রপালী সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের স্বহস্তে দীক্ষিত শেষ উপাসিকা-রূপে পরিগণিতা হইলেন।" আম্রপালীর দৃষ্টান্ত অনুসরণকারিণী অম্বরপালী, অর্দ্ধকাশী প্রভৃতি বারনারীগণের ভিক্ষুণী-জীবন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জীবনের সন্ধ্যায় আম্রপালীর কণ্ঠে যে মুক্তি ও শান্তির গীতি নিঃসৃত হইয়াছিল—সে সঙ্গীত কবির কাব্যের উপাদান এবং দার্শনিকের ভাবধারার সন্ধান দিয়াছিল।

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। তথাগতের মহানির্ব্বাণের অল্পকাল পরেই সুশৃঙ্খলার অভাবে সঙ্ঘ লোপ পায়।

স্ত্রীজাতির সমানাধিকার ?

…স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের চারিটী সম্বন্ধ। কখন বা স্ত্রীলোক পুরুষের মাতা, কখনও বা ভগিনী, কখনও বা পত্নী আর কখনও বা কন্যা। স্ত্রীলোক মাতাই হউন, আর ভগিনীই হউন, আর পত্নীই হউন, আর কন্যাই হউন, সর্ব্বদা যে পুরুষের রক্ষণীয়া তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে কি ?

যাঁহারা আমাদের রক্ষণীয়া তাঁহাদের রক্ষার কার্য্যে ব্রতী না হইয়া তাঁহাদিগের সমানাধিকারের কথা কহিয়া পুরুষের মত স্ত্রীলোকের জীবিকার্জ্জনের ভার স্ত্রীলোকের স্কন্ধে ন্যস্ত করিবার চেষ্টা করা কি কাপুরুষোচিত নহে ?…

মধ্য ইউরোপ

—শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন

ইতিমধ্যে অন্যত্র যাতায়াত উপলক্ষে বার কয়েক জার্ম্মানীর উপর দিয়া যাইতে ও দুই এক দিন থাকিতেও হইয়াছে, কিন্তু দুই বৎসর পরে প্রাহা ছাড়িয়া কিছু দিন স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য আবার হাম্বর্গে আসিতে হইল।

প্রাহা ছাড়িবার আগে কয়েকদিন মহা উদ্বেগে ও উত্তেজনায় কাটিল। ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ এমন ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে এদিকে ওদিকে এমন সাড়ম্বরে বিজলিবিকাশ ও মেঘগর্জন হইতেছে যে, মনে হয় যে-কোনও মুহূর্ত্তে অশনিসম্পাতে গৃহ বুঝি ধরাসাৎ হইয়া পড়িবে। আজ পাঁচ বৎসর এই আব-হাওয়ায় বাস করিতেছি, কখনও বা মনে হইয়াছে যে, মেঘের আড়ালে প্রতীয়মান সূর্য্য শীঘ্রই প্রকাশ হইবে, কখনও মনে হইয়াছে, না, সঙ্কট আসন্ন। সমর-বজ্রাঘাত শঙ্কা করিয়া বসিয়া আছে এখানকার যে সব গৃহবাসীরা, তাহাদের মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া ঘন মেঘ অন্যত্র দূর দূর স্থানে, যেমন, আবিসিনিয়া, স্পেন, চীনে প্রবল রণধারা বর্ষণ করিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মধ্য-ইউরোপে এত দিন লাগি' লাগি' করিয়াও লড়াই লাগিয়া যায় নাই।

মুসসোলিনি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করিলেন, তখন মনে করা গিয়াছিল যে, বাধিল বুঝি এবার ইংলণ্ডে ইটালিতে। হিটলার যখন রাইনল্যাণ্ড পুনরধিকার করিলেন, তখন খুব সম্ভাবনা ছিল জার্ম্মানি-ফ্রান্সে একটা কিছু লাগিয়া যাইবার। স্পেন লইয়া ইটালী জার্ম্মানি রাশিয়াতে কত কিছুই হইতে পারিত। কিন্তু, সে সব এখন পুরাতন ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। মুসসোলিনির আবিসিনিয়া-ধর্ষণ এখন সকলেই ন্যায্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, লীগ অভ্ নেশন্‌সের সভ্য যে সব দেশ ইটালীর বিরুদ্ধে "স্যাংশনে" যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এখন নিজেদের অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছেন! জেনারেল ফ্রাঙ্কো স্পেনে জয়ী হইলে রাশিয়া ছাড়া অনেকেই প্রকাশ্যে বা গোপনে উল্লসিত হইবেন।

অতি সম্প্রতি ঘটিল ইংলণ্ডের বিদেশ-মন্ত্রী মিঃ ইডেনের পদত্যাগ। তাহা লইয়া পার্লামেণ্টের হাউস অভ্ কমনসে যে আলোচনা হইয়া গেল, এমন মজার ব্যাপার বহু কাল ঘটে নাই। বুড়া লয়েড জর্জ ফরাসি রিভিয়েরাতে শীত কাটাইতেছিলেন, পার্লামেণ্টে রগড় হইবে শুনিয়া সত্বর আসিয়া লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে হারাইয়া লয়েড জর্জ আবার প্রধান মন্ত্রী হইবেন এমন কোন আশাই ছিল না, কিন্তু তবু এই বুড়া পার্লামেণ্ট-ঘুঘু রগড় জমাইয়া চেম্বারলেনকে জব্দ করিবার মতলবে রিভিয়েরা ছাড়িয়া লণ্ডনে আসিয়া খুব সিংহনাদ করিলেন। পার্লামেণ্টে এমন হৈ হৈ ব্যাপার, দুই পক্ষের পরস্পরকে প্রবল কটূক্তি করা, গণ্ডগোল, চীৎকার, প্রভৃতি হইল যে, রসিকমাত্রেই তাহাতে আমোদ পাইয়াছেন। সেদিনকার পার্লামেণ্টের যে গুরুগম্ভীর রিপোর্ট "টাইমসের" মত কাগজে বাহির হইয়াছিল, তাহাতে ব্র্যাকেটের মধ্যে মুহুর্মুহু পড়া গেল যে, মেম্বার মহাশয়েরা অন্য অনেক রকম গণ্ডগোল ও হৈ চৈ ছাড়া "বু বু" চীৎকারও ঘন ঘন করিয়াছিলেন।

তারপর হঠাৎ ঘটিল বেখটেস্‌গাডেনে হিটলারের সহিত অষ্ট্রিয়ান চান্সেলার ফোন্ শুষনিগের সাক্ষাৎ ও ফলে ডাঃ সাইস্-ইংকোয়ার্টের মন্ত্রিত্বে নিয়োগ। অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট যে অষ্ট্রিয়ান নাট্‌সিদলকে বে-আইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন ডাঃ সাইস-ইংকোয়ার্ট সেই দলের প্রতিনিধি। মন্ত্রিত্বে নিয়োজিত হইয়াই ডাঃ সাইস্-ইংকোয়ার্ট ছুটিলেন হিটলারের কাছে হুকুম লইবার জন্য। ব্যাপার যে ঠিক কি হইল, তখন বুঝা গেল না। এই সময়ে হিটলার রাইশটাগে যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন তাহাতেও ব্যাপার কিছুই পরিষ্কার হইল না; সাধারণতঃ হিটলারের

বক্তৃতায়, তাহা যতই দীর্ঘ ও ওজস্বিনী হউক না কেন, কোন ব্যাপারই, দুঃখের বিষয়, বিশেষ পরিষ্কার হয় না। তারপর ফোন্ শুষনিগ ও ডাঃ সাইস-ইংকোয়ার্ট অষ্ট্রিয়ার নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলেন। হিটলারের সঙ্গে শুষনিগ ও সাইস-ইংকোয়ার্টের সাক্ষাতের ফল মনে হইল এই হইবে যে, নামে স্বাধীন হইলেও অষ্ট্রিয়ার বাস্তবিক স্বতন্ত্রতা লোপ হইল, অষ্ট্রিয়াকে এখন হইতে জার্ম্মাণীর আজ্ঞাবাহী সামন্তরাজ্য মাত্র হইয়া থাকিতে হইবে। কিন্তু, শুষনিগ অষ্ট্রিয়ায় ফিরিয়া যে ভাবে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ও তাহাতে অষ্ট্রিয়ানদের যেমন সহানুভূতি দেখা গেল তাহাতে পূর্ব্ব অনুমানে খটকা বাধিল। এমন সময় শুষনিগ ঘোষণা করিলেন, তিনি অষ্ট্রিয়ান স্বাধীনতা সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ার জনমত লইবেন। এই জনমতে শুষনিগের পক্ষে যে কি পরিমাণ ভোট হইতে পারে তাহা লইয়া অনেক জল্পনা চলিল। এই ঘটনার অনেক পূর্ব্বে অর্থাৎ বৎসর খানেক আগেও জানিতে চেষ্টা করিয়াছি, অষ্ট্রিয়ার জনমত কোন পক্ষে বেশী, ডলফুস্ শুষনিগের ফাটারলাণ্ট দলের পক্ষে, না ন্যাশনাল সোশালিষ্টদের পক্ষে। নাট্‌সিরা তখন বলিয়াছেন, অষ্ট্রিয়ার ন্যূনপক্ষে শতকরা নব্বুই জন লোক তাঁহাদের পক্ষে, আমার নিজের মনে হইয়াছে, শতকরা নব্বুই না হউক, শতকরা ষাটজন লোক নিশ্চয়ই নাট্‌সিদের পক্ষে। জনমতের কথায় কিন্তু শুষনিগের পক্ষে এত সহানুভূতি দেখা গেল যে, অনুমানে এবার খটকা বাধিল। উৎসাহীরা বলিলেন, শুষনিগেরা নিশ্চয় শতকরা নব্বুইটি ভোট পাইবেন, সাবধানীদেরও স্বীকার করিতে হইল যে, ন্যূনতমপক্ষে শতকরা ষাটটি ভোট শুষনিগ পাইবেনই। ভোটের আগের রাত্রে কাফেতে দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া আমরা এই সব জল্পনা করিতেছিলাম, শুষনিগের জয় ত স্থির, তারপর শুষনিগ কি করিবেন, হিটলারই বা কি কি করিতে পারেন, ইত্যাদি।

পরদিন রবিবার। সকলেই দেরিতে উঠিয়াছে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় হরফগুলি দেখিয়া চক্ষু-স্থির! প্রথমটা বিশ্বাসই হইল না যে, এমন কাণ্ড ঘটিতে পারে। Finis Austrie! বারে বারে চোখ রগ-ড়াইয়া শেষটা বাস্তবিকই যখন ব্যাপারটা আর অস্বীকার করিবার উপায় রহিল না, তখন ক্রমে পড়া গেল, গতকল্য-কার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কি কি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে,—বিশিষ্ট দূতের হাতে এরোপ্লেনে করিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় বার্লিন হইতে ভিয়েনায় একটির পর একটি "আল্টিমেটাম্" আসিয়াছে, "প্লেবিসাইট বন্ধ কর" "শুষনিগ পদত্যাগ করুন," "সাইস্-ইংকোয়ার্ট চান্সেলার নিয়োজিত হউন" ইত্যাদি। সাইস্-ইংকোয়ার্ট জার্ম্মানির মিলিটারি সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সীমান্তে প্রতীক্ষ-মান লক্ষ জার্ম্মান সেনা, এরোপ্লেন, কামান প্রভৃতি বিনা প্রতিরোধে জনতার উল্লাসনাদে অভিনন্দিত হইয়া ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সারা অষ্ট্রিয়া অধিকার করিয়া ফেলিল।

অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইটালি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, জার্ম্মানিও বলিয়াছিলেন, অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু, ন্যাশনাল-সোশালিষ্ট জার্ম্মানির একটি মূল-নীতি হইতেছে, সমগ্র জার্ম্মান-ভাষাভাষী জনগণের ঐক্য-সম্পাদন, বিশেষতঃ অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানির একত্রীভবন। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রিয়ান স্বাধীনতার প্রধান পরিপোষক ছিলেন মুসসোলিনি, কারণ তাঁহার রাজ্যের উত্তর-সীমান্ত ঘেঁষিয়া কোন বড় রাজ্য না থাকিয়া ছোট এবং তাঁহার বশবর্ত্তী অষ্ট্রিয়া থাকায় তাঁহার স্বার্থ ছিল। ১৯৩৪ সালে ডলফুস্‌কে হত্যা করিয়া নাট্‌সিরা যখন অষ্ট্রিয়ায় বিদ্রোহ ঘটাইবার উদ্যোগ করিয়া-ছিলেন, তখন মুসসোলিনি বিদ্যুদ্‌বেগে সীমান্তে ইটালিয়ান বাহিনী উপস্থাপিত করিয়া সে পথ রোধ করিয়াছিলেন, এবারে কিন্তু প্রকাশ যে, শুষ্‌নিগ বিপদের সময় বার বার টেলিফোন করিয়াও মুস্‌সোলিনির নাগাল পান নাই, হয়ত মুস্‌সোলিনি স্কি করিতে গিয়াছিলেন, নয়ত ঐরূপ অন্য কিছু একটা ওজুহাতে দুচে-মহাশয় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলেন। ফ্রান্সে তখন গবর্ণমেণ্ট নাই, একদল পদ-ত্যাগ করিয়াছেন, নূতন দলের তখনও নিয়োগ হয় নাই। লণ্ডনে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া শুষ্‌নিগ জানিলেন, ইটালি ও ফ্রান্স যদি যোগ দেয়, তবে ইংলণ্ডও যোগ দিবে। ইটালি যে যোগ দিবে না এবং ফ্রান্সের যে

যোগ দেওয়া অসম্ভব, এ কথা অবশ্য ইংলণ্ডের অজ্ঞাত ছিল না।

আসল কথা, ইটালির স্বার্থ ছিল না। ডুচে-মহাশয় যখন রাজকীয় সমারোহে সে দিন বার্লিনে আসিয়াছিলেন, তখন হিটলারের সঙ্গে তাঁহার এবিষয়ে নিশ্চয় একটা বন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। অষ্ট্রিয়া অধিকারের পর "রোম-বার্লিন অ্যাক্সিসের" দুই প্রান্তের দুই দিকপাল টেলিগ্রামে পরস্পরের পিঠ চাপড়া-চাপড়ি করিলেন, মুস্‌সোলিনি জানাইলেন যে, তিনি শুষ্‌নিগকে আগেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, হিটলার জানাইলেন যে, অষ্ট্রিয়াবিজয়ে নির্লিপ্ততা দেখাইয়া ডুচে-মহাশয় তাঁহার যে উপকার করিয়াছেন, তাহা হিটলার জীবনে ভুলিবেন না। অষ্ট্রিয়া-অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, হিটলার আগেই বিশেষ দূতের হাতে এরোপ্লেনে চিঠি দিয়া মুসসোলিনিকে সব ব্যাপার জানাইয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি অষ্ট্রিয়া-ইটালির বর্ত্তমান সীমান্ত ব্রেনেরো গিরিবর্ত্ম কখনও লঙ্ঘন করিবেন না (এই প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন হইয়াছিল এই জন্য যে, ব্রেনেরো সীমান্তের পরও ইটালির উত্তরাংশের অধিবাসীরা জার্ম্মানভাষী)। অতএব দেখা গেল, হিটলারের অষ্ট্রিয়া অভিযানে মুস্‌সোলিনীর পূর্ণ সম্মতি ছিল।

লণ্ডন ও প্যারিস অষ্ট্রিয়ার পতনের পর বার্লিনে কড়া "নোট" পাঠাইয়াছিলেন। গত কয়েক বৎসর হইতে অবশ্য এটা একটা রেওয়াজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—ইটালি, জার্ম্মানি, জাপান বা স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কো যাহা ইচ্ছা তা করিয়া যাইতেছেন। অন্যদের প্রত্যেক বারেই কড়া কড়া "নোট" পাঠান ছাড়া আর কিছুই শক্তিসামর্থ্যে কুলাইয়া উঠিতেছে না। লণ্ডনের নোটের উত্তরে বার্লিন জানাইয়াছিলেন যে, ইংলণ্ডের এ বিষয়ে মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই, কারণ মধ্য-ইউরোপীয় দেশগুলির বা অষ্ট্রিয়ার সুখ-দুঃখের ভার ইংলণ্ডের উপর, এমন দাবী বার্লিন স্বীকার করেন না। ইউরোপীয় পলিটিক্সে ব্রিটিশের মুরুব্বিয়ানা খর্ব্ব করিতে পথ দেখাইয়াছিলেন মুস্‌সোলিনি। প্রথমে কিছুদিন হিটলার ব্রিটিশের খোসামোদ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডকে খুসি করিবার জন্য অপ্রয়োজনে ভারতীয়দের বিরুদ্ধেও মন্তব্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ভবি ভুলিল না, ইংরেজ অত বোকা জাত নয়। এখন হিটলার নিজের সামরিক শক্তি বাড়াইয়া স্বাবলম্বী হইয়াছেন, তাহাতে আবার ডুচের সঙ্গে প্রণয় স্থাপন করিয়া শক্তিমান্ সহায়ক লাভ করিয়া এখন ইংলণ্ডের সঙ্গে অন্য সুরে কথা বলিতেছেন। জার্ম্মানির কলোনি

রোমে হিটলারের সংবর্দ্ধনায় আলোকের ঝরণা।

দাবী উপলক্ষ্যে অনেক ইংরেজ হোমরারা বলিয়াছিলেন যে, যে-সব কলোনি পূর্ব্বে জার্ম্মানদের অধিকারে ছিল এবং ভার্সাই সন্ধির ফলে, যাহা জার্ম্মানদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অন্যদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল, এখন তাহা জার্ম্মানিকে প্রত্যর্পণের আগে, সেই কলোনি-বাসী লোকদের মত লওয়া উচিত যে, তাহারা জার্ম্মানির হাতে আসিতে চায় কি না? ইহার উত্তরে হিটলার সে দিন তাঁহার রাইস্‌টাগ্ বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যে সব ইউরোপীয় ডেমোক্রাটিক দেশবিদেশে কলোনি ও এম্পায়ার স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহারা কি পূর্ব্বে এই কলোনি ও এম্পায়ারের লোকদের এ-বিষয়ে মত লইয়াছিলেন? জার্ম্মান পাদ্রী নীম্যোলারকে জার্ম্মান গবর্ণমেণ্ট আইন-

ভঙ্গের অপরাধে রাষ্ট্রদ্রোহী রূপে আদালতে অভিযুক্ত করায় বিলাতে খুব প্রতিবাদ হইল; একখানি জার্ম্মান কাগজ সেদিন উত্তরে লিখিয়াছেন যে, এ প্রতিবাদ করা ইংরেজদের শোভা পায় না, কারণ তাঁহারা গান্ধীর মত অতবড় ধর্ম্মপ্রাণ লোককেও তো রাজদ্রোহীরূপে বহুবার গুরু শাস্তি দিয়াছিলেন! বাস্তবিক রাজনৈতিক কাণ্ড-কারখানায় কিরূপ অদ্ভুত ছুতা ও যুক্তি প্রভৃতি যে কাজে লাগান হয়, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যও হইতে হয়, হাসিও পায়।

অষ্ট্রিয়া-অধিকারে আপত্তি যাহা ছিল, তাহার নিরাকরণ হইয়াছে প্লেবিসাইটের দ্বারা। কাল যাহারা শুষ্‌নিগের জন্য চেঁচাইতেছিল, আজ তাহারা হিটলারের জন্য ৯৯% ভোট দিল, অষ্ট্রিয়ানদের এই লঘু প্রকৃতি ও অব্যবস্থিতচিত্ততায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রকৃতি ও চিত্ত যেমনই হউক, একভাষাভাষী একজাতিজাত দুইটি দেশ যদি অন্য কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া পরস্পরের সঙ্গে সম্মিলিত হইতে চায়, তবে অন্যের তাহাতে আপত্তি করিবার কি থাকিতে পারে? এ বিষয়ে চরম নির্দ্ধারণ Vox populi ছাড়া আর কি হইতে পারে? জার্ম্মানির ও অষ্ট্রিয়ার সংযোগ সাধিত হইয়া "বৃহৎ-জার্ম্মানি"র (Grossdeutschland) প্রতিষ্ঠায় অতএব এই হেতু উপলক্ষ্য করিয়া কেহ আপত্তি করিতে পারেন না যে, অষ্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য যখন ভার্সাই-সন্ধিতে স্থিরধার্য্য হইয়াছিল, তখন কেন উহাকে জার্ম্মানির বলায়ত্ত হইতে দেওয়া হইবে। আপত্তি যদি হইতে পারে তাহা অতীত বা বর্ত্তমানকে আশ্রয় করিয়া নয়; ভবিষ্যতে এই সংযোগের ফলে ও সহায়তায় অন্য কাহারও অন্যায় ক্ষতি করিবার যদি জার্ম্মানির অভিসন্ধি থাকে, তবেই সেই অন্যায়-ক্ষতি-ভীত দেশের ইহাতে আপত্তি করার অধিকার আছে। নতুবা জার্ম্মানভাষী দেশসমূহ একত্র হইলে, জার্ম্মানী বড় ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, কেবলমাত্র এই কারণে জার্ম্মানির প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি যদি আপত্তি করেন, তবে সে আপত্তির অর্থ অন্যরূপ।

শুধু ইংলণ্ড-ফ্রান্সের মত প্রতিদ্বন্দ্বী বড় দেশ নয়, জার্ম্মানির প্রভাব ও প্রসার-বৃদ্ধিতে, ইউরোপের কয়েকটি ছোট ছোট দেশেরও আতঙ্কের কারণ হইয়াছে, কারণ এই দেশগুলিতে জার্ম্মান-ভাষী কিছু লোকের বাস হওয়ায় ভয় হইতেছে যে, জার্ম্মানি ইহাদের অংশবিশেষকে কবলসাৎ করিবার অভিলাষ পোষণ করে। ডেনমার্ক, সুইটজারল্যাণ্ড, হলাণ্ড প্রভৃতির চেয়ে চেকোস্লোভাকিয়াতে এই ভয় অতি গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চেকোস্লোভাকিয়ার পশ্চিম প্রদেশের নাম বোহেমিয়া। এই বোহেমিয়ার উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত-দেশ ব্যাপিয়া জার্ম্মান-ভাষীদের বাস। ইহারা জাতিতে অষ্ট্রিয়ান। ভার্সাই-সন্ধির সময় কথা উঠে যে, এই অংশ জার্ম্মানি বা অষ্ট্রিয়ার অধিকারে থাকিবে, না নব-গঠিত চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের অধিকারে আসিবে। চেক নেতা মাসারিক সে সময়ে সন্ধিসভায় দাবী করেন যে, বোহেমিয়ার উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতমালা চিরদিনই বোহেমিয়ার ঐতিহাসিক সীমান্ত বলিয়া মানা হইয়াছে এবং অষ্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলেও বোহেমিয়ান রাজাদের রাজ্যসীমা বরাবর এই পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। মাসারিকের এই ঐতিহাসিক যুক্তি প্রেসিডেন্ট উইলসনের খুব মনে লাগে; এই রাজনৈতিকদ্বয় উভয়েই সুপণ্ডিত অধ্যাপক ছিলেন। উইলসনের অনুমোদন লাভ করিয়া মাসারিক নিজের দাবী সহজেই পূরণ করেন। নূতন চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের সীমা এই পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত ধার্য্য হয় এবং ফলে পর্ব্বতমালার ভিতরের দিকের জার্ম্মানভাষী ভূখণ্ড চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অংশের নাম সুডেটেন খণ্ড, অধিবাসীরা সুডেটেন জার্ম্মান নামে পরিচিত। ইহারা সংখ্যায় চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের অধিবাসীদের শতকরা কুড়ি ভাগ।

চেকোস্লোভাক গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সুডেটেন জার্ম্মানদের অনেকদিন ধরিয়া বিবাদ। চেকোস্লোভাকিয়া গণতান্ত্রিক দেশ। ফ্রান্সের মত এখানকার পার্লামেণ্টেও অনেক রাজনৈতিক দল, গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় বহু পার্টির সংযোগ বা "কোয়ালিশন" দ্বারা। সুডেটেন জার্ম্মান পার্টি বরাবরই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধ দল, তা ছাড়া সোসাল ডেমোক্রাট, আগ্রারিয়ান প্রভৃতিরও ছোট ছোট দল ইহাদের মধ্যে আছে। এই ছোট জার্ম্মান দলগুলি এ-যাবৎ

কোয়ালিশন গবর্ণমেন্টে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহারা কোয়ালিশন ছাড়িয়া সুডেটেন জার্ম্মান দলের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

সুডেটেন জার্ম্মানদের মুখে তাহাদের অনেক অভাব-অভিযোগের কথা শুনিয়াছি। তাহারা বলে, তাহারা নিজ বাসভূমিতে চেক গবর্ণমেন্টের কাছে প্রবাসীর মত ব্যবহার পায়, যেন তাহারা এদেশের প্রজা নয়। মিলিটারিতে তাহারা উচ্চতম অফিসারের পদ লাভ করিতে পারে না; সরকারি চাকুরি চেকরাই পায়, যদিও পার্লামেণ্টে ব্যবস্থা হইয়াছিল যে, খালি চাকুরির নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সুডেটেন জার্ম্মানরা পাইবে, তবু কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল চেকরাই শুধু চাকুরি পায়। আমার একটি ছাত্র (সুডেটেন-জার্ম্মান) সরকারি চাকরি পাইয়াছিলেন, তিনি বলিলেন, সুডেটেন জার্ম্মানদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের আইন যেদিন হইতে বলবান্ হইবার কথা, তাহার আগেই চেক গবর্ণমেণ্ট সব চাকরি চেকদের দ্বারা এমন ভর্ত্তি করিয়া ফেলেন যাহাতে বছর কয়েক আর কোন চাকরি খালিই হইতে না পারে, অবশেষে যদি বা খালি হইল, তখনই গবর্ণমেণ্ট জানাইলেন যে, তাহার জন্য আগে হইতে "ওয়েটিং লিষ্টে" সুযোগ্য প্রার্থীরা অপেক্ষা করিয়া আছে (ইহারা অবশ্যই চেক!)। এ সবের উদ্দেশ্য, যাহাতে সুডেটেন জার্ম্মানরা চাকরি না পায়। আমার ছাত্রটির কাকা যে সময়ে কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্টে মিনিষ্টরের পদে ছিলেন, এতবড় মুরুব্বির জোর না থাকিলে তাহার পক্ষে চাকরি পাওয়া নাকি একেবারে অসম্ভব হইত। সরকারি কনট্রাক্ট প্রভৃতি সবই মাত্র চেকরাই পায়। সুডেটেনখণ্ডের পুলিশ, রেল প্রভৃতির কর্ম্মচারীরাও সবাই চেক। সুডেটেনখণ্ড আগে কারখানা, কারবার প্রভৃতির কল্যাণে খুব লক্ষ্মীবান্ ছিল, এখন সেখানে দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যা প্রবল, এখানকার দুরবস্থা মোচনের জন্য চেক গবর্ণমেণ্ট কোন চেষ্টা করেন নাই, যদিও যে সব জায়গায় চেকদের বাস তাহার উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক উদ্যম ও অনেক অর্থ ব্যয় করেন।

সুডেটেন-খণ্ডে একটা সরকারী কাজের জন্য মজুরের প্রয়োজন হইল। যে জায়গায় কাজ সেখানে হাজার হাজার জার্ম্মান মজুর বেকার অবস্থায় আছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিয়োগ না করিয়া শ'খানেক মাইল দূর হইতে রোজ স্পেশ্যাল ট্রেনে কয়েক শত চেক মজুর আনিতেন, রোজ সন্ধ্যায় আবার ইহারা স্পেশাল ট্রেনে বাসায় ফিরিয়া যাইত।

জার্ম্মান ভাষার ব্যবহারে সর্ব্বত্র অনুমতি নাই। জার্ম্মানভাষীদের জাতীয় কালচার সংরক্ষণে ও সংবর্দ্ধনে গবর্ণমেণ্টের কোন উৎসাহ নাই। জার্ম্মান ইউনিভার্সিটির ঘরবাড়ী জীর্ণ দশায়, অথচ চেক ইউনিভার্সিটির জন্য বড় বড়

রোম ষ্টেশনে মুসোলিনি হিট্‌লারকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

নূতন বাড়ী বানানো হইয়াছে। সুডেটেন-খণ্ডে যেখানে মাত্র কয়েকজন চেকের বাস, সেখানে জাঁক-জমকের সহিত চেক স্কুল বানান হইতেছে।

এরূপ বহু অভিযোগ সুডেটেন-জার্ম্মানদের কাছে শুনা যায়। চেকদের জিজ্ঞাসা করিলাম, 'বল বাপু, এ বিষয়ে তোমাদের কি উত্তর?' প্রত্যেক জার্ম্মান অভিযোগের চেকরা বিশদ উত্তর দিল। সত্যমিথ্যা নির্দ্ধারণ করা এক রকম অসম্ভব। যত যুক্তি চেকরা দেয়, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে এই যে, আইনতঃ সুডেটেন-

জার্ম্মানদের প্রতি কোন বৈষম্য দেখান হয় না, কার্য্যতঃ যেখানে (যেমন উচ্চতর মিলিটারি অফিসার, পুলিশ প্রভৃতির নিয়োগে) এই বৈষম্য দেখান হয় তাহার উচিত কারণ আছে, সে কারণ এই যে, সুডেটেন-জার্ম্মানরা চেকোস্লোভাকিয়াকে তাহাদের স্বদেশ ও মাতৃভূমি মনে করে না, উহাদের সহানুভূতি জার্ম্মানির সঙ্গে, উহারা চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবসম্পন্ন। উহারা যখন দেশদ্রোহী তখন উহাদের কেমন করিয়া সব বিষয়ে সাম্য দেখান যায়? তাহাতে উহারা জার্ম্মানদের সঙ্গে যোগ দিয়া চেকোস্লোভাক্ রিপাব্লিক্ ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

সুডেটেন-জার্ম্মানদের বলিলাম, 'দেখ তো, তোমরা যখন দেশদ্রোহী তখন কি করিয়া তোমরা আশা করিতে পার যে, চেকরা তাহাদের মাতৃভূমিতে তোমাদের যথেচ্ছ অধিকার দিতে পারে? তোমরা যখন দেশদ্রোহী তখন এটা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক ও উচিত যে চেকরা তোমাদের সন্দেহের চক্ষে দেখিবে ও তোমাদের সম্বন্ধে সাবধান হইয়া চলিবে।' উত্তরে সুডেটেন-জার্ম্মানরা বলিল, 'এ কথা সত্য যে, আমরা দেশদ্রোহী, কিন্তু আমরা কেন দেশদ্রোহী হইলাম? আমরা যখন দেশে সুবিচার সম-ব্যবহার ও ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত, তখন তো আমরা দেশদ্রোহী হইবই!'

ব্যাপারটা একটা "ভিশাস্ সার্কল্"। দুপক্ষেরই দোষ আছে। অষ্ট্রিয়ান রাজত্বের সময় সুডেটেন-জার্ম্মানরা নবাব ছিলেন ও চেকদের প্রতি অবজ্ঞাপ্রকাশ ও দুর্ব্ব্যবহার করিতেন। পরে স্বাধীন হইয়া চেকরা তাহার শোধ লইল ও ফলে জার্ম্মানরা দেশদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। জেনীভার "ইন্‌ষ্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাডীস্"-এর খ্যাতনামা অধ্যাপক আন্তর্জ্জাতিক আইনের বিশেষজ্ঞ প্রোফেসর কেল্‌জেনের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। কেল্‌জেন ঠিকই বলিয়াছিলেন, "ষ্ট্রেজেমানের সময়ের জার্ম্মানি চেকদের প্রতি বিরুদ্ধ ছিল না, কিন্তু তখন চেকরা সুডেটেনদের সমস্যা মিটায় নাই; এখন যখন মিটাইতে চাহিতেছে, তখন জার্ম্মানি বিরুদ্ধপক্ষ ও সুডেটেনরাও দেশদ্রোহী দাঁড়াইয়াছে, এখন চেকদের পক্ষে সুডেটেনদের দাবী মিটান অসম্ভব।"

এই জন্যই সমস্যা এত জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, মনে হইতেছে এই উপলক্ষ্যে যে কোনও দিন লড়াই লাগিয়া যাইতে পারে। একদিকে সুডেটেনরা অসন্তুষ্ট ও প্রায় বিদ্রোহী, তাহারা স্বায়ত্তশাসন চাহিতেছে, বলিতেছে যে, চেকোস্লোভাকিয়ায় শুধু তো চেকদের বাস নয়, এ দেশে জার্ম্মান, স্লোভাক, হাঙ্গেরীয়ান, পোল প্রভৃতি বহুসংখ্যায় বাস করে এবং ইহাদের মধ্যে জার্ম্মানরাই সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। জার্ম্মানদের নিজেদের জাতীয়ত্ব আছে এবং তাহারা নিজেদের চেকদের দ্বারা দলিত হইতে দিবে না। এখন সুডেটেনদের প্রধান সহায় হইয়াছে, শক্তিশালী জার্ম্মানি। হিটলার প্রকাশ্যে সুডেটেনদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহার স্বজাতীয়দের প্রতি, যদিও তাহারা অন্য দেশে বাস করে, অন্যায় তিনি সহ্য করিবেন না। স্বজাতীয়দের জন্য এই দাবী করার অধিকার নিশ্চয় সব দেশেরই আছে।

চেকরা বলিতেছে, 'জার্ম্মানির আসল উদ্দেশ্য সুডেটেনখণ্ড স্ব-কবলায়ত্ত করিয়া জার্ম্মানির আকার বৃদ্ধি করা ও চেকোস্লোভাকিয়াকে ধ্বংস করা, কারণ, প্রথমতঃ চেকোস্লোভাকিয়া জার্ম্মানির শত্রু, ফ্রান্স ও রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ এবং দ্বিতীয়তঃ যে পূর্ব্ব-ইউরোপ ও দানিয়ুব-ধৌত প্রদেশে জার্ম্মানি স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিতেছে, তাহার পথ হইতেছে চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দিয়া। চেকরা বলিতেছে, সুডেটেন-সমস্যা তাহাদের নিজেদের ঘরোয়া সমস্যা, তাহার সমাধানের জন্য জার্ম্মানির হস্তক্ষেপ তাহারা সহ্য করিবে না। সুডেটেনদের প্রতি পূর্ণ সুবিচার তাহারা করিবে, কিন্তু স্বায়ত্ত-শাসন তাহারা সুডেটেনদের দিতে পারে না, কারণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইলেই সুডেটেনরা বলিবে, "আমরা সুডেটেন-খণ্ড জার্ম্মানির সঙ্গে সংযুক্ত করিব।" ইহা কোন মতেই চলিবে না, কারণ ইহাতে চেকদের মাতৃভূমির ও রাষ্ট্রের কলেবর-হানি হইবে। ইহা নিবারণের জন্য চেকরা প্রস্তুত—তাহাদের জুগোস্লোভিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে "ছোট আঁতাং" (Little Entente) আছে, রুশিয়া ও ফ্রান্সের সঙ্গে মিলিটারী সর্ত্ত আছে যে, অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হইলে, ইহারা পরস্পরকে সহায়তা করিবে, নিজেদের

সীমান্ত দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত আছে, উৎকৃষ্ট সামরিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের কারখানা আছে এবং সুশিক্ষিত সেনা ও বায়ুবল যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত আছে। যদি জার্ম্মানির যুদ্ধ বাধাইবার উদ্দেশ্য থাকে, তবে চেকরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু, অষ্ট্রীয়া জার্ম্মানির অধিকারভুক্ত হইবার পর চেকোস্লোভাকিয়ার অবস্থা একটু অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছে। আগে জার্ম্মানি চেকোস্লোভাকিয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষিয়া ছিল; এই দুই দিকে নূতনতম রকমের ভূগর্ভস্থ দুর্গ বানাইয়া সীমান্ত সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। দক্ষিণদিকের সীমান্তে অষ্ট্রিয়া ছিল বলিয়া দক্ষিণ দিকে দুর্গাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয় নাই, কারণ অষ্ট্রিয়া কখনও চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ করিতে দিত না। এখন কিন্তু অষ্ট্রিয়ার বিলোপ হওয়ায় জার্ম্মানি চেকোস্লোভাকিয়ার দক্ষিণ দিক্ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিন দিকে শত্রুবেষ্টিত, বিশেষতঃ তাহার মধ্যে এক দিক্ অরক্ষিত, ইহা দুর্ভাবনার বিষয়, সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, "ছোট আঁতাঁৎ" অন্য সব বিষয়ে পরস্পর-সহায়ক হইলেও যুদ্ধ বাধিলে যে রুমানিয়া ও জুগোস্লাভিয়া চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করিতে আসিবে এমন কোন কথা নাই, বিশেষতঃ ইদানীং ব্যবসা-বাণিজ্যবিষয়ে জার্ম্মানির সঙ্গে রুমানিয়া ও জুগোস্লাভিয়ার খুব নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, চেকোস্লোভাকিয়ার প্রতিবাসী উত্তরে পোলাণ্ড ও দক্ষিণ-পশ্চিমে হাঙ্গেরি, এই দুই দেশ, চেকোস্লোভাকিয়ার শত্রু ও জার্ম্মানির মিত্র। চতুর্থতঃ, ফ্রান্স ও রাশিয়া কি সত্যই যুদ্ধ বাধিলে চেকোস্লোভাকিয়ার সহায়তায় অগ্রসর হইবে? রুশিয়ার নিজের অনেক আভ্যন্তরীণ আপদ্ আছে। তাহার উপর আবার রুশিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার মাঝখানে জার্ম্মান-মিত্র পোলাণ্ড; রুশিয়া বলিয়াছে, ফ্রান্স যদি যোগ দেয় তবে রাশিয়াও যোগ দিবে। ফ্রান্স যে যোগ দিবে বলিয়াছে, কিন্তু তাহা তত সহজ হইবে না, কারণ ফ্রান্সেরও আভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে এবং ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার মাঝখানে সারাটা জার্ম্মানি। জার্ম্মানি নিশ্চয়ই এত দুর্ব্বল নয় যে, ফ্রান্সকে দিন কতক ঠেকাইয়া রাখিতে না পারিবে। এক সপ্তাহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেই যথেষ্ট, কারণ চেকদের যুদ্ধ-সজ্জা যতই পটু হউক না কেন, অন্যের বিনা সহায়তায় তিনদিক্ হইতে জার্ম্মানির আক্রমণ তাহাদের পক্ষে দিন কয়েকের বেশী রোধ করা অসম্ভব। পঞ্চমতঃ, ইটালির মত শক্তিশালী দেশ এখনকার মৈত্রীবলে জার্ম্মানির কোন কাজে বাধা দিবে না।

কথা উঠিতে পারে, ইংলণ্ড কি করিবেন? চেকরা ইংলণ্ডের সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। কিন্তু, কিছুদিন আগে লর্ড হ্যালিফাক্স যখন হিটলারের সঙ্গে

রোমে হিটলারের সংবর্দ্ধনায় আলোকোদ্ভাসিত কলোসিউম।

কথা-বার্ত্তা বলিতে আসেন তখন প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, লর্ড হ্যালিফাক্স হিটলারকে জানাইয়াছিলেন যে, অষ্ট্রিয়া ও সুডেটেনখণ্ড জার্ম্মানির সঙ্গে সংযুক্ত হইলে ইংলণ্ডের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। জার্ম্মানিকে এইভাবে মধ্য-ইউরোপে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহার কলোনি লাভের প্রয়াস ঠেকাইয়া রাখাই বোধ হয় ইংলণ্ডের উদ্দেশ্য। "টাইম্‌স" সে সময়ে প্রকাশ করেন যে, সুডেটেনদের প্রতি অবিচার করিয়া চেকোস্লোভাকিয়া যদি জার্ম্মানির শত্রুতা অর্জ্জন করে ও ফলে জার্ম্মানির হাতে লাঞ্ছিত হয়, তবে

সে জন্য চেকরাই দায়ী। চেকরা জার্ম্মানির দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইংলণ্ড যে চেকদের সহায়তায় আসিবেনই, এমন প্রতিশ্রুতি দিতে চেম্বারলেন অস্বীকার করিয়াছেন। সত্যকথা এই যে, আরও বৎসর দুই পরে ইংলণ্ডের রণসজ্জা সম্পূর্ণ না হইবার আগে লড়াইয়ে যোগদান করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব, তা ছাড়া ইংলণ্ডের ভারত, প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি অন্য বহু দুশ্চিন্তা আছে।

সম্প্রতি ফরাসী মন্ত্রিদ্বয় যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা চেকোস্লোভাকিয়ার সহায়তার জন্য যে সব প্রস্তাব করেন, তাহা ইংরেজ মন্ত্রীরা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এখন ইংলণ্ড প্রস্তাব করিয়াছেন, তাঁহারা জার্ম্মানি, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আপোষে চেক-জার্ম্মান বিবাদ মিটাইবার সব রকম চেষ্টা করিবেন। এই চেষ্টা যদি সফল হয়, তবে হয়ত চেকদের নিজ দেশের কিয়দংশ জার্ম্মানি প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। নতুবা অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে জার্ম্মানি অর্থ ও অস্ত্রবল যোগাইয়া সুডেটেনদের দ্বারা চেকোস্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহ ঘটাইয়া পরে তাহাতে যোগ দিয়া সুডেটেনখণ্ড আত্মসাৎ করিবেন ও চেকোস্লোভাক্ রাজ্যও ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।

মেটে না ডাকার তৃষা

—শ্রীসুধীর গুপ্ত

মেটে না ডাকার তৃষা,
শতবার ডাকিলেও;
কি অতৃপ্তি জেগে থাকে
বুকে বুক রাখিলেও।
মুখে মুখ রাখিলেও
সারাটী জীবন ভোর,
রহস্য-অমৃত পান
সাঙ্গ কি হবে না মোর?

প্রেমের অমৃত-সিন্ধু—
অরূপ-রতন লোভে,
তনু মন প্রাণ মোর
যতই সেথায় ডোবে,
তল নাই তীর নাই
এ কোন্ রহস্য হায়!
সুধার তরঙ্গে প্রাণ
সুধা হয়ে যেতে চায়!

আছাড়িয়া আকুলিয়া
ব্যাকুলিয়া ওঠে তাই;
তৃপ্তির অতৃপ্তি এ কী!
এর কি বিরাম নাই?
ব্রহ্মাণ্ড-রহস্য সম
প্রেমের রহস্য তাই,
ধারণ করার শক্তি
তাও কি নরের নাই?

ভারতের শিল্প-সংস্থান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে কাগজ, কালি, তামাক, যব, মণ্ট, বিস্কুট প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এদেশীয় প্রাণিজ সম্পদ্ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে, জীবন্ত অথবা মৃত প্রাণিজাত দ্রব্যের রপ্তানী ও আমদানীর মূল্য কত।

(মার্চ্চ, ১৯৩৭ হইতে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮ অবধি)

রপ্তানী	পরিমাণ	মূল্য
জীবন্ত গো, মহিষ, ছাগ, মেষ — (সংখ্যা)	৩০, ৪৫৭	৬,৩০,৭৮৩ টাকা
মাখন	৬,২০৪ হন্দর	৫,৫৫,৬৪১ "
ঘৃত	৪০,৯১৪ "	২৫,৯৯,৪৩৩ "
ছানা	৬,৮৫৭ "	৬,২০,৭৮২ "
পাকা চামড়া, চামড়ায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি		৬,৭৩,৩৫,০৬১ "
কাঁচা চামড়া	৪৭, ৮২৯ টন	৪,৭১,০৫,১০৭ "
ছাগ-চর্ম্ম	১৭,২৬৯ "	২,৮৯,৯২,৪৯৬ "
মেষ-চর্ম্ম	৭১২ "	১২,৫৩,১৬৯ "
চামড়ার ছাঁট, টুকরা চামড়া	৯,৮২৭ "	৯,০৬,৬৪১ "
শিঙ, শিঙের টুকরা	৫৪,১৭৭ "	৩,৭৮,৪৮৭ "
অস্থি (সারের জন্য)	৩০,০৮৪ "	৩০,২০,৯৬ "
" (অন্যান্য ব্যবহারের জন্য)	৫৮,০২২ "	৪১,৩৯,৬৭৯ "
অস্থিচূর্ণ	৩৪,৬৩২ "	১৮,৭১,৩৩৫ "
পশম (কাঁচা)	৩৫,৫২৭,১২৭ পাউণ্ড	২,১১,৫০,৪২২ "

আমদানী

আমদানী	পরিমাণ	মূল্য
জমান দুগ্ধ	৫৪,২৬৩ হন্দর	১৭,৬৫,২২৬ টাকা
দুগ্ধজাত খাদ্য	৭,৭২১ "	১৫,১৮,১২৮ "
মাখন	৭,০০৪ "	৬,৬০,৩৮৮ "
উদ্ভিজ্জাত ঘৃত	১৩,৯২০ "	৪,৩৪,৪৭১ "
কৃত্রিম চর্ম্ম	১,৩৬২,৮৫৬ বর্গ গজ	৬,৫২,৩৩৫ "
জুতা (চর্ম্মনির্ম্মিত)	৭৫,৮৮৫ জোড়া	১৫,৫৪,১০৩ "
বেল্টিং		২৫,৩৯,৬৬৮ "
সার	৭০,২০৯ টন	৭০,৮৮,২৯৪ "
সুপার্ ফস্ফেট	৬,৭৫৯ "	৫,১২,৩৯২ "
পশম (কাঁচা)	৬,৬০৫,৯৭১ পাউণ্ড	৭২,৭০,১১৪ "

সুদূর অতীতকাল হইতেই গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু ভারতের বিশিষ্ট সম্পদ্‌রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। গো-পালন ও গো-পরিচর্য্যা অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে করা হইত, ইহার প্রধান কারণ এই যে, ভারবহন ও কৃষি-কার্য্যের সহায়করূপে এই সকল গৃহপালিত জন্তু মানবের পরম উপকার করিয়া আসিতেছে। ঘৃত, মাখন, দধি প্রভৃতি খাদ্য স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকর, গো-দুগ্ধ মানবের সর্ব্ববয়সেই উপকারী ও শক্তিদায়ী।

বিগত প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এদেশের গো-মহিষাদির সংখ্যা ও তাহাদের দুগ্ধের পরিমাণ অপ্রত্যাশিত ভাবে কমিয়া যাওয়ায়, এইরূপ শক্তিদায়ী খাদ্যের যথেষ্ট অভাব ঘটিয়াছে। গো-পালনের বিবিধ অসুবিধা ও অর্থসঙ্কটের ফলে এই অতিপ্রয়োজনীয় প্রাণদায়ী খাদ্যের অভাব ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান দুর্দ্দশাগ্রস্ত গো-জাতির উন্নতি বর্ত্তমান অবস্থাতেই সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ের আলোচনা করা উদ্দেশ্য নহে, তবে এতাদৃশ হীনাবস্থায়ও দেশীয় গৃহপালিত জন্তুগুলি যে কিরূপ মূল্যবান্ সম্পদ্ সেই বিষয়ই আলোচিত হইবে। ১৯৩৫ সালের সরকারী গণনা হইতে দেখা যায় যে, ভারত ও ব্রহ্মদেশে বিবিধ গৃহপালিত জন্তুর সংখ্যা ছিল মোট ৩১ কোটী ৬০ লক্ষ। এই সকল জন্তুর নাম ও সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ষণ্ড		৬ কোটী	৬০ লক্ষ
গাভী		৫ "	৩০ "
শাবক		৪ "	৯০ "
	মোট	১৬ "	৮০ "
মহিষ	(পুং)		১০ "
মহিষ	(স্ত্রীং)	২ "	২০ "
শাবক		১ "	৮০ "
	মোট	৪ "	১০ "

মেষ	৪ কোটী	৩০ লক্ষ
ছাগ	৫ "	৩০ "
অশ্ব		২০ "
অশ্বতর ও খচ্চর		২০ "
উষ্ট্র		১০ "
	মোট—১০ "	১০ "

বিভিন্ন অবস্থায় ইহাদের মূল্য নিম্নলিখিতরূপে ধার্য্য করা হইয়াছে :—

কৃষি-বিষয়ে সহায়করূপে পরিশ্রমের মূল্য—		৪০৮ কোটি টাকা	
ভারবাহী রূপে	" "	১২৭ "	"
সার ও অন্যান্য দ্রব্যের	"	২১০ "	"
দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা প্রভৃতির	"	৫৪০ "	"
	মোট—১,২৮৫	"	"

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এই সকল জন্তু তিনটি অবস্থায় বিভক্ত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ, জীবন্ত গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি; দ্বিতীয়তঃ, এই সকল প্রাণিজাত দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, পশম প্রভৃতি ও তৃতীয়তঃ, মৃতজন্তুর চর্ম্ম, অস্থি প্রভৃতি।

বিগত বর্ষে এদেশ হইতে ৬ লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের গো, মহিষ, ছাগ, ও মেষ, রপ্তানী হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৩০ সহস্রেরও অধিক।

দুগ্ধ : মাখন, ঘৃত, ছানা, দুগ্ধ-শর্করা

গো-দুগ্ধ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহাতে বর্ত্তমান আছে :—শতকরা ৪·৮ ভাগ দুগ্ধ-শর্করা, ৩·৬ ভাগ মাখন, ৪ ভাগ ছানা, লবণাদি ০·৭ ভাগ ও অবশিষ্ট ৮৬·৮ ভাগ জল। এই কয়েকটি উপাদান এমনভাবে মিশ্রিত থাকে যে, মিশ্রণটী দুগ্ধরূপে মানবের পরম উপকারী। গাভীর বয়স, খাদ্য, স্বাস্থ্য, স্থানীয় জলবায়ু প্রভৃতির তারতম্যে দুগ্ধের উপাদানগুলিরও তারতম্য ঘটে। এ দেশের সকল প্রদেশেই এমন অঞ্চল আছে, যে-স্থানে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পাওয়া যায়। কয়েকটি মাত্র সহরে ট্রেনযোগে অনতিদূর হইতেই সংগৃহীত দুগ্ধ ও ছানা আনীত হয়। কিন্তু, এই সকল দ্রব্য সুদূর পল্লী হইতে অবিকৃত অবস্থায় সহরে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। ছানা, দধি, "জমান দুগ্ধ" (condensed milk) দুগ্ধ-চূর্ণ (milk powder), ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা যাইতে পারে।

'জমান দুগ্ধ' প্রস্তুত করিতে হইলে তদুপযোগী যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। দুগ্ধকে উত্তপ্ত করিলে ছানা ও ঘৃতের অংশ পৃথক্ হইয়া যায় বা জমিয়া যায়, কিন্তু বিশেষ উপায়ে দুগ্ধকে মৃদুতাপে ফুটাইলে ইহার কোন উপাদানই পৃথক্ হইতে পারে না। প্রত্যেক তরল দ্রব্যই একটি বিশেষ উত্তাপে (temperature) ফুটিতে আরম্ভ করে। ঐ উত্তাপকে তরলটীর স্ফুটনোত্তাপ (boiling point) বলে। উপরিস্থ বায়ুচাপের তারতম্য হইলে স্ফুটনোত্তাপেরও তারতম্য ঘটে। বায়ুচাপ লঘু করিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত অল্পতাপেই তরলটি ফুটিতে থাকে। দুগ্ধকে এইরূপে মৃদুতাপে ফুটাইলে উহার কোন উপাদানই পূর্ব্ববৎ পৃথক হইয়া যাইতে পারে না, কেবলমাত্র জলীয় অংশ বাষ্পাকারে চলিয়া যায় ও 'ঘনীভূত' দুগ্ধ বা 'জমান' দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকে। কিঞ্চিৎ পরিষ্কার চিনি মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধটি ইচ্ছামত গাঢ় অবস্থায় রাখা যায়। ইক্ষুরসকেও এইরূপে মৃদুতাপে ঘনীভূত করিয়া চিনি প্রস্তুত হয়।

ভ্যাকম্ প্যান্ (vacuum pan) নামক যন্ত্রের সাহায্যে জমান দুগ্ধ প্রস্তুত করা সহজ-সাধ্য। এই যন্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে আবৃত একটি কটাহ-বিশেষ। বাষ্পের সাহায্যে মধ্যস্থিত বায়ু নিষ্কাশিত করিলে উহার উপরিতন চাপের হ্রাস ঘটে। নলের সাহায্যে কটাহ-মধ্যে দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়। কটাহ-গাত্রে সজ্জিত নলের মধ্য দিয়া ষ্টিম্ চালিত করিলে দুগ্ধটি ফুটিতে থাকে ও ক্রমেই ঘন হইয়া যায়। অধিকক্ষণ এই অবস্থায় রাখিয়া দিলে দুগ্ধটি শুষ্ক হইয়া যায়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত ঘন দুগ্ধ বা শুষ্ক দুগ্ধের বিশেষত্ব এই যে, উহাকে উষ্ণজলে দ্রবীভূত করিলে পুনরায় স্বাভাবিক দুগ্ধের ন্যায় প্রায় সকল গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অনেকস্থলে প্রথমে দুগ্ধ হইতে মাখনটি তুলিয়া লওয়া হয় ও মাখন-শূন্য দুগ্ধটি জমাইয়া ফেলা হয়। শুষ্ক দুগ্ধে জলীয়াংশ ব্যতীত স্বাভাবিক দুগ্ধের সকল উপাদানই বর্ত্তমান থাকে। ইহা হইতে রোগী ও শিশুদিগের উপযুক্ত বিবিধ প্রকারের সহজপাচ্য খাদ্য (milk food) প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইংলাণ্ড ও জাপান এই শিল্পে বিশেষ অগ্রণী। বিগতবর্ষে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকার জমান দুগ্ধ (condensed milk) ও ১৫ লক্ষ টাকার দুগ্ধজাত খাদ্য (milk foods) ভারতে আমদানী হইয়াছে।

ভাল মাখনে শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ ঘৃত ও অবশিষ্ট ১৪-১৬ ভাগ জল থাকে। কাঁচা অবস্থায় মাখনের বর্ণ শ্বেত বা ঈষৎ পীতাভ হইয়া থাকে। ইহাতে সামান্য লবণ ও কৃত্রিম বর্ণাদি মিশ্রিত করিয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়। লবণযুক্ত হইলে মাখন কিছুকাল অবিকৃত থাকে ও উহার স্বাভাবিক স্বাদও বজায় থাকে। বিগত বর্ষে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের মাখন বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। মাখন গলাইলে ঘৃতে পরিণত হয়। ইহারও রপ্তানীর পরিমাণ অল্প নহে। বিগত বর্ষে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকার ঘৃত রপ্তানী হইয়াছে। দেশীয় মাখন ও ঘৃতে এ দেশের চাহিদার সঙ্কুলান হয় না; সে জন্য এই উভয় দ্রব্যই যথেষ্ট পরিমাণে আমদানীও করা হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার মাখন ও ৪ লক্ষ টাকার উদ্ভিজ্জাত ঘৃত (vegetable ghi) আমদানী হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেশ-জাত মাখন-ঘৃত ব্যতীত বিদেশ হইতে আনীত মাখন ও উদ্ভিজ্জাত ঘৃতের চাহিদাও যথেষ্ট রহিয়াছে।

এসেটিক্ এসিড্, ছানার জল বা ফটকিরির সাহায্যে দুগ্ধ হইতে ছানা কাটান হয়। সাধারণতঃ, এই জন্য মাখন-তোলা দুগ্ধই ব্যবহৃত হয়। ছানা অতীব পুষ্টিকর খাদ্য। দেশীয় মিষ্টান্ন-প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ছানা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকার ছানা এদেশ হইতে রপ্তানী হয়। উপরে লিখিত প্রণালীতে প্রস্তুত ছানাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। মৃদুক্ষারের সাহায্যে পরিষ্কৃত করিয়া ছানা হইতে বিবিধ প্রকারের প্রয়োজনীয় ও সৌখীন দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয়। শুষ্ক ছানার গুঁড়া হইতে পুষ্টিকর 'পেটেণ্ট ফুড' (patent foods) প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে মূল্যবান্ রং, আঠা, নকল হস্তিদন্ত প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া এদেশেই পুনরায় আমদানী হয়।

ছানার জলে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় দুগ্ধ-শর্করা। এই জলকে মৃদু তাপে ঘনীভূত করিলে দুগ্ধ-শর্করা (milk-sugar বা lactose) প্রস্তুত হয়। এদেশে দুগ্ধ-শর্করার ব্যবহারও অল্প নহে। ছানার জল বা দুগ্ধ-শর্করাকে পচাইলে ল্যাক্টিক্ এসিড্ (lactic acid) নামে একটি মৃদু এসিড্ প্রস্তুত হয়। ইহা চামড়া পাকাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অব্যবহার্য্য ছানার জল শূকর ও হংসাদির পুষ্টিকর খাদ্য।

পশম, ল্যানোলিন্

বিগত বৎসর এদেশ হইতে প্রায় আড়াই কোটী টাকার কাঁচা পশম (raw wool) রপ্তানী হইয়াছে। যদিও কম্বল ও পশমী বস্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য এদেশের প্রতিষ্ঠানগুলিতে দেশীয় পশম ব্যবহৃত হইতেছে, তথাপি প্রায় সাত লক্ষ টাকার পশম বিদেশ হইতে আনীত হইয়াছে। কাঁচা পশমে ল্যানোলিন্ নামক এক প্রকার তৈলময় পদার্থ থাকে। উহার সহিত ধূলিকণা লিপ্ত হওয়ায়, স্বাভাবিক অবস্থায় পশমের বর্ণ ঈষৎ মলিন দেখায়। পরিষ্কার করিলে, কাঁচা পশম হইতে ল্যানোলিন্ ও ধূলিকণা মুক্ত হইয়া যায়। ল্যানোলিনের বিশেষ গুণ এই যে, ইহা লেপন করিলে সহজেই গাত্রমধ্যে প্রবেশ করে এবং চর্ম্ম মসৃণ ও কমনীয় করে। এই জন্য 'মিল্ক্ অব্ রোজেস্' (milk of roses) প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রসাধন-দ্রব্যে এবং ঔষধাদিতে ল্যানোলিন ব্যবহৃত হয়। এদেশ হইতে প্রেরিত কাঁচা পশমের সহিত এই দ্রব্যটীও পশমের দরেই চলিয়া যায় ও সুপরিষ্কৃত হইয়া পুনরায় আমদানী হয়।

চর্ম্ম, চর্ম্ম-নির্ম্মিত দ্রব্য

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বদেশেই এদেশ হইতে চামড়া রপ্তানী হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে প্রায় পাঁচ কোটী টাকার কাঁচা চামড়া (raw hides and skins) রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া পাকান (tanned) চামড়া, আংশিকভাবে পাকান চামড়া ও চামড়া হইতে প্রস্তুত বিবিধ দ্রব্যাদিও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়াছে। ইহার মূল্যও প্রায় সাত কোটী টাকা। এদেশজাত ছাগচর্ম্ম সুবিখ্যাত। প্রায় তিন কোটী টাকার ছাগচর্ম্ম ও সাড়ে বার লক্ষ টাকার মেষচর্ম্ম রপ্তানী হইয়াছে। ইহা ছাড়া যে-পরিমাণ টুক্‌রা চামড়া বা চামড়ার ছাঁট রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মূল্যও প্রায় দশ লক্ষ টাকা। ইদানীং চর্ম্মনির্ম্মিত দ্রব্যের বহুল প্রচার হওয়ায়, এই সকলের চাহিদাও যথেষ্ট হইয়াছে। বিগত বর্ষে প্রায় সাড়ে পনর লক্ষ টাকার জুতা ও পঁচিশ লক্ষ টাকার বেল্‌টিং আসিয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার কৃত্রিম বা নকল চামড়াও (artificial leather) আমদানী হইয়াছে।

ভাগাড় ও সহরের পশুবধশালা হইতে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ

করা হয়। একশ্রেণীর লোকের দেশব্যাপী সহযোগিতায় এত চর্ম্ম একত্র করা হয়। সাধারণতঃ, ঐগুলিকে লবণ মাখাইয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া, প্রধান প্রধান বন্দরে প্রেরিত হয়। রপ্তানীর পূর্ব্বে প্রয়োজনমত রাসায়নিক উপায়ে চর্ম্ম-গাত্রস্থিত জীবাণুগুলি নষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কাঁচা চামড়া পচনশীল। স্বাভাবিক নমনীয়তা যথাসম্ভব রক্ষা করিয়া উহাকে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় রাখাই চামড়া পাকাইবার বা ট্যান্ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। এদেশে চর্ম্ম-পাদুকা ও চর্ম্মপাত্রের ব্যবহার বহুদিন হইতেই প্রচলিত থাকায়, চামড়া পাকাইবার সময়োচিত প্রণালীও জানা ছিল। হরিতকী, বাবলার ছাল, খদির, ফটকিরি, তৈল, ক্রোমিয়াম্ লবণ, ফর্ম্যালডিহাইড প্রভৃতির সাহায্যে একাধিক প্রকারে চামড়া পাকান যাইতে পারে। ট্যানিন্ (tannin)-ঘটিত কষায় দ্রব্যগুলি এদেশে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায় এবং রপ্তানীও হয়।

শুষ্ক চামড়াগুলি কারখানায় আনীত হইলে, প্রথমে ঐগুলিকে জলে ভিজাইয়া নরম করা হয়। ভিতরের দিকে সংলগ্ন মাংস ও চর্ব্বির টুক্‌রাগুলি পরিষ্কার করিয়া ফেলা হয়। পরে চুণের জলে ডুবাইয়া রাখিলে লোমগুলি আল্‌গা হইয়া যায়। এইরূপে পরিষ্কৃত চর্ম্মের মধ্যে কিঞ্চিৎ চুণের জল থাকিয়া যায়। মৃদু এসিডের দ্রবণে ডুবাইয়া চর্ম্মগুলি ক্ষারমুক্ত করা হয়। উপরিলিখিত কষায় দ্রব্যগুলির কাথে পর পর কয়েকটি চৌবাচ্চা পূর্ণ করা থাকে। পরিষ্কৃত চামড়াগুলিকে এই দ্রবণে ডুবাইয়া রাখা হয়। কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিলে চামড়াগুলি ট্যান্ হইয়া যায়। পরে ঐগুলিকে শুষ্ক করিয়া রোলারের সাহায্যে সমান করিয়া দেওয়া হয়। ব্যবহারভেদে চামড়া পাকাইবার প্রণালীও বিভিন্ন হইয়া থাকে এবং প্রণালীভেদে চামড়া পাকাইবার জন্য অল্প বা অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। জুতার উপরিভাগ ও তলদেশের চামড়া বিভিন্ন প্রণালীতে পাকান হয়। ক্রোমিয়াম্ নামে একটী ধাতু আছে, ঐ ধাতু হইতে প্রস্তুত লবণের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে চামড়া পাকা করা যায়। ঐ প্রণালীকে ক্রোম্-ট্যানিং (chrome tanning) বলে ও প্রস্তুত চামড়াকে ক্রোম্ চামড়া (chrome leather) বলে। গ্রেসি কিড, মরোক্কো, শ্যাময় প্রভৃতি চামড়া যথাক্রমে ছাগ, মেষ ও হরিণের চামড়া হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কানপুরের উপকণ্ঠে কয়েকটী ট্যানিং-এর কারখানা আছে। যুগব্যাপী ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফলে, এই সকল স্থানে প্রস্তুত চামড়া এক্ষণে বিদেশী চামড়ার সমকক্ষ ও অনেকাংশে উৎকৃষ্টতর হইয়াছে। সম্প্রতি শ্যাময় চামড়াও এদেশে প্রস্তুত হইয়াছে। যদিও আংশিকভাবে পাকান চামড়ার প্রতিযোগিতায় বিশেষ ক্ষতি হইতেছে, তথাপি দেশীয় ক্রোম্ চামড়া সর্ব্বত্র যথেষ্ট সমাদর লাভ করিতেছে। এই শিল্প ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। চামড়ার কারখানায় ব্যবহৃত জলে ফল ও সব্জীর উপযোগী তেজস্কর সার-দ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। প্রয়োজন হইলে এই জলকে বীজাণু ও দুর্গন্ধমুক্ত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অস্থি : অস্থিচূর্ণ, সুপারফস্‌ফেট্, অস্থি-অঙ্গার

অস্থি ও মজ্জায় ক্যালসিয়ম্ ও ফস্‌ফরাস্ নামে দুইটী তেজস্কর দ্রব্য থাকে। অস্থি-সংলগ্ন শুষ্ক মাংস প্রভৃতিতে নাইট্রোজেন্-ঘটিত দ্রব্য থাকে। নামমাত্র মূল্যে সংগৃহীত কাঁচা অস্থিকেই গুঁড়া করিয়া চালান দেওয়া হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ৯০ লক্ষ টাকার অস্থি ও অস্থিচূর্ণ রপ্তানী হইয়াছিল, তন্মধ্যে অস্থিচূর্ণই ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার। অস্থিচূর্ণকে উপযুক্ত পরিমাণ সাল্‌ফিউরিক্ এসিড্ দিয়া পাক করিয়া লইলে ক্যাল্‌সিয়ম্ সুপারফস্‌ফেট্ (calcium superphosphate) প্রস্তুত হয়। কাঁচা অস্থিচূর্ণ ফসল, সব্জী ও ফসলের সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সুপারফস্‌ফেট্ সহজেই দ্রবণীয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে আশু ফলদায়ী হয়।

কাঁচা অস্থিকে পরিষ্কৃত ও বর্ণমুক্ত করিয়া বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বায়ুশূন্য আধারে উত্তপ্ত করিলে চর্ম্ম, মেদ প্রভৃতি দগ্ধ হইয়া যায় ও অস্থিগুলি অঙ্গারে পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইহাতে যাবতীয় ক্যাল্‌সিয়মের অংশ থাকিয়া যায়। পরিষ্কৃত অস্থি-অঙ্গারের সাহায্যে ইক্ষু-রস ও উদ্ভিজ্জাত আরকের স্বাভাবিক বর্ণ মুক্ত করা যায়।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, একদিকে যেমন গৃহপালিত পশুজাত প্রাণশক্তিদায়ী খাদ্যের অভাব ঘটিতেছে, অপর দিকে সব্জী ও ফসলের তেজস্কর সার-দ্রব্যও রপ্তানী হইতেছে। বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতিবিধান ও নব নব প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, এই উভয়ই আমাদের স্বাস্থ্য ও আর্থিক অবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক।

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

[৩]

দুইজনে পথে বাহির হইলে নবীন বলিল, 'দাদা মশাই সেকেলে লোক, মনটি বেশ সাদা।'

নলিনী বলিল, 'সাদা না আরও কিছু, কি সব বললেন শুনলেন না, ভারি দুষ্টু!'

গলির রাস্তায় চলিতে চলিতে নবীন বলিল, 'গোদুলিয়া পর্য্যন্ত হাঁটতে পারবেন ত?'

নলিনী। হাঁটতেও পারি, ছুটতেও পারি, কি করতে হবে, তাই বলুন!

নবীন। এমন গলি কোথাও দেখেছেন? আট দিন চলছি ফিরছি, এখনও সড়গড় হয় নি; আপনাকে একলা ছেড়ে দিলে হারিয়ে যাবেন, কিছুতেই বেরুতে পারবেন না।

নলিনী। গোলোক-ধাঁধাঁ আর কার নাম, কেবলি ঘুরপাক খেতে হয়, বলুন।

নবীন। না তা বলি না।

নলিনী। তবে কি বলেন?

নবীন। আমি কিছুই বলি না।

নলিনী। দু'শ লোক পথ চল্‌ছে, হারাব বল্‌লেই হারাব? আপনি এমন সব কথা বলেন, যার মানে হয় না।

নবীন। পারব না আপনার সঙ্গে, চুপ করলাম।

নলিনী। বেশ আমিও চুপ করলাম, এর পর দরকার হলে ইসারায় বলবেন।

নবীন হাসিল, নলিনীও মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গলির পর গলি ছাড়াইয়া সদর রাস্তায় পড়িল। ক্রমে গোদুলিয়া আসিল। এখানে অনেক টঙা ও এক্কা দাঁড়াইয়া আছে, নবীন একটা টঙা বাছিয়া ভাড়া করিল, গাড়ীর পিছনের দিকে বসিবার স্থানে নলিনীকে উঠাইয়া দিয়া নবীন গাড়োয়ানের পাশে বসিবার জন্য উঠিতেছিল, নলিনী বলিল—

'ও কি ওখানে বসছেন যে, আমার পাশে অনেক জায়গা রয়েছে, শুধু তাই নয়, যে রকম গাড়ীর শ্রী, ছুটলে পড়ে যেতে পারি।'

অগত্যা নবীনকে নলিনীর পাশে আসিয়া বসিতে হইল, টঙা পথে ছুটিতে সুরু করিল।

নবীন বলিল, 'জুতা খুলে পা মুড়ে বসুন, পাশের ওই হাতলটা ধরে থাকুন। বিশ্বাস নেই, গাড়ী যে রকম নেচে চলেছে।'

বেলা দেড়টা, রাস্তায় অল্পই লোক চলাচল করিতেছে, দুই পাশে বাড়ী। দোকান-পাট, কতক পথ আসিয়া টঙা একটা লোহার পোলের উপর উঠিল, নীচে নদী। গাড়োয়ান বলিল, 'বরুণা'।

নবীন বলিল, 'কাশীতে শোনেন নি, এক দিকে বরুণা অন্য দিকে অসী, মধ্য স্থান পঞ্চক্রোশী বারাণসী।'

সহর যদি ছাড়াইল, রাস্তায় দুই পাশে বাগান-বাড়ী, প্রত্যেকটায় অনেক খানি জায়গা পাঁচীলে ঘেরা, মধ্যে কোঠা, চারদিকে গাছপালা, ঠিক বাঙ্‌লার মত, কলিকাতার উপকণ্ঠে যেমন সব বাগানবাড়ী আছে, এগুলিও সেইরূপ।

একটা বড় বাড়ী দেখিয়া নবীন গাড়োয়ানকে বলিল, 'বাপু, এটি কার বাড়ী'?

গাড়োয়ান ঘোড়ার লাগাম টানিতে টানিতে বলিল, 'মহাজনের'।

নলিনী বলিল, 'ওকে আর ত্যক্ত করবেন না, আমি বলে দেব।'

টঙা হু হু চলিতেছে, খুবই চওড়া পাথরের রাস্তা, দুই দিকে মাঠ, আর আম গাছ। পাঁচ মাইল পথ আসিয়া টঙা বাম দিকে এমনি চওড়া আর একটি রাস্তার মোড় ফিরিল, পথের ধারে লেখা সারনাথ। কিছুদূর আসিলে রেলের লাইন দেখা যায়, গাড়োয়ান বলিল, 'সারনাথে রেলেও আসা যায়।' সম্মুখে উঁচু পাহাড়ের মত ঢিবি, তাহার উপর গম্বুজ, গাড়োয়ান বলিল, 'ওই সারনাথ।' টঙা স্তূপের নিকটে আসিয়া থামিল, নবীন নলিনীকে নামাইয়া দুইজনে স্তূপের দিকে চলিল, স্তূপটি নিতান্ত ছোট নয়, ছোট পাহাড়ের মত, উপরে ইষ্টক-নিৰ্ম্মিত গোলাকার একটি ঘর। স্থানটি লোকশূন্য।

স্তূপে আরোহণের কালে নবীন নলিনীকে সাবধানে উঠিতে বলিয়া পশ্চাতে উঠিতে লাগিল। যখন তাহারা শীর্ষ-দেশে গম্বুজের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, এই নির্জ্জন ঘরটির ভিতরটা একটি যুবক ও একটি যুবতী দখল করিয়া রাখিয়াছে। ঘরটির মধ্যদেশে রেলিং দেওয়া কতকটা স্থান ঘেরা, একধারে একখানা সাদা ধপধপে চাদর বিছান। যুবকটি কোট-প্যাণ্ট-পরিহিত, চাদরটির উপর দাঁড়াইয়া, আকৃতি ইউরেশীয়ানের মত, যুবতীটি নীল-শাড়ী-পরিহিতা, সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী, নলিনী যে-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতেছিল তাহার বিপরীত দিকে খোলা অলিন্দে বসিয়া শ্রীমুখে আহার্য্য পুরিয়া গাল নাড়িতেছেন।

নলিনী নির্জ্জন লোকচক্ষুর অন্তরালে নর-নারীর সমাগম ও বিহার-শয্যার অভিনব ব্যবস্থা দেখিয়া মুখ বাঁকাইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া পড়িল, নবীনকে চুপি চুপি বলিল—'চলুন নেমে যাই, দিন দুপুরে একি কাণ্ড, মুখে আগুন!'

নবীন বলিল, 'হোক না, আসুন ওই রেলিং-এর ভিতর কি আছে দেখে নিই।'

নবীন ও নলিনী ঘরের মধ্যস্থলে রেলিং-এ ঘেরা অন্ধকার কূপ দেখিয়া অতি অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া বাহিরে আসিল এবং অবতরণ করিবার কালে নবীন নলিনীকে পিছনে রাখিয়া আগে আগে নামিতে লাগিল, নলিনী বলিল, মেয়েটা আমার দিকে চেয়ে হাস্‌ছিল।

পুনরায় টঙায় উঠিয়া রাস্তার দক্ষিণ দিকে হাসপাতালের মত একতলা লম্বা দালানযুক্ত কোঠা, টঙাওয়ালা গাড়ী থামাইয়া জানাইল, মিউজিয়াম। নবীন নলিনীকে লইয়া দুইখানা টিকিট ক্রয় করিয়া প্রদর্শনীর পয়লা নম্বরের ঘরে আসিল। খুব লম্বা-চওড়া ঘর, মধ্যভাগে গ্লাস আঁটা শো-কেসের পর শো-কেস্ ছোট ছোট পাথরের মূর্ত্তিতে বোঝাই, দেওয়ালের ধারে ধারে নানা বর্ণের ছোট-বড় মূর্ত্তি, কোনটি অটুট কোনটি হস্তপদশূন্য। পূর্ব্বকালের শিল্পী হাতে কাটিয়াছে, কারু-কার্য্য এত সূক্ষ্ম, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়, নবীন ও নলিনী একটির পর একটি চোখ বুলাইয়া দেখিয়া যাইতে লাগিল, একস্থানে একটি পাথরের ছত্র এত বৃহৎ, যাহার ব্যাস নয় ফুট, ওজনও অসম্ভব রকমের। প্রত্যেক মূর্ত্তিতে টিকিট আঁটা আছে।

উভয়ে দেখিতে দেখিতে চলিল, এক ঘর শেষ করিয়া অপর ঘরে প্রবেশ করিয়া পুরাকালের মনুষ্য-ব্যবহারোপযোগী হাঁড়ি, কলসী, কুঁজা, জালা, কড়া প্রভৃতি পাথরের তৈজস-পত্র, ব্রঞ্জ ধাতু-নির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রদর্শিত আছে দেখিয়া চলিল, এব স্থানে দক্ষযজ্ঞের এক বিরাট মূর্ত্তি দেওয়াল-সংলগ্ন রহিয়াছে।

নলিনী বলিল, 'চলুন আর কোথায় কি আছে, দেখা যাক্।

নবীন বলিল, 'যা কিছু দেখছেন এর একটিও এ কালের নয়। অন্তত দুহাজার বৎসর পূর্ব্বেকার কালে ভারতবর্ষ শিল্প-বিজ্ঞানে যে কত উন্নত ছিল, তা অনুমান করা যায়, এরূপ প্রদর্শনীতে যথেষ্ট উপকার আছে।'

প্রদর্শনীর বাহিরে আসিয়া উভয়ে সারনাথের ভগ্ন বৌদ্ধ স্তূপের মধ্যে আসিয়া পড়িল।

এক প্রশস্ত চত্বরের সম্মুখে পুরাকালের বৌদ্ধ মঠের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, মঠ-গৃহের ইষ্টক-নির্ম্মিত ভিত্তি এখনও জাগিয়া আছে, নবীন নলিনীকে লইয়া ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া বলিল,'এক একটি ছোট ছোট ঘরের আয়তন দেখুন, কতকাল পূর্ব্বে যে সকল সাধু মহাত্মারা এই ঘরে ব'সে তপস্যা করেছিলেন, জীবনাবসানে তাঁদের দেহাস্থি এই ভূমি-সংলগ্ন কোথাও না কোথাও সমাহিত আছে; কত মহাপ্রাণ বহুদর্শী মহা মহা পণ্ডিত, যাঁদের দেখতে কত দূরদেশ থেকে লোক-সমাগম হ'ত, আজ তার কিছুই নেই, শুধু নামমাত্র সার নাথের ভগ্ন স্তূপ সাক্ষী দিচ্ছে। গবর্ণমেণ্ট খনন ক'রে, স্তূপের মধ্য থেকে প্রদর্শনীতে যা দেখে এলেন, সেই সকল প্রোথিত মূর্ত্তি পুনরুদ্ধার ক'রে মিউজিয়াম করেছেন, আমরা তার কতক আজ দেখেছি।'

চলিতে চলিতে উভয়ে একটি ছোট স্তম্ভের কাছে আসিয়া পড়িল, বহু বৃহদাকার প্রস্তর-খণ্ড অযথা পড়িয়া আছে, খনন করিয়া একটি সুড়ঙ্গ বাহির করিয়াছে, যাহার কতক অংশ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উভয়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া সকল দেখিতে লাগিল, পুষ্করিণীর আকারে এক স্থানের মাটি-খনন হইয়াছে, অনেকটা স্থান খুঁড়িয়া গভীর ভাবে খনন-কার্য্য চলিতেছিল, এখন বন্ধ আছে। নবীন নলিনীর সহিত তাহার পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। নলিনী বলিল, 'চলুন নীচে নামি, নবীন নিষেধ করিল, বলিল, 'এত ঢালু, আপনার যাওয়া নিরাপদ নয়, এখান থেকেই দেখুন।'

নলিনীর জেদ নীচে নামিয়া দেখিবে, নামিতে উঠিতে কত আমোদ।

নবীন বলিল, 'একান্তই যদি নামিতে চান, অপেক্ষা করুন, আমাকে নাম্‌তে দিন, আগে দেখে আসি আপনার পক্ষে সম্ভব কি অসম্ভব।'

নবীন পা টিপিয়া টিপিয়া ধীরে ধীরে খাতে নামিতে সুরু করিল, অতি সন্তর্পণে পায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কতকটা নামিয়া আসিলে একটা গুরু দ্রব্য-পতনের শব্দ নবীনের কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল, নবীন পশ্চাতে ফিরিয়া যাহা দেখিল, অতীব ভয়াবহ—নলিনী পদ-স্খলিত হইয়া গড়াইয়া খাতে পড়িতেছে, নবীন মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নলিনীকে ধরিয়া তুলিয়া লইল।

নবীন নামিতেছে দেখিয়া নলিনী চুপে চুপে অজ্ঞাত-সারে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, দুর্ঘটনা যে ঘটিতে পারে একটি বারও ভাবে নাই, বাটীর বাহির হইয়াই আনন্দে ভাসিতেছিল, মনটা বড়ই প্রফুল্ল, নবীন নীচে নামিয়া হঠাৎ যখন তাহাকে দেখিবে কতটা বিস্ময়ান্বিত হইবে, এইটিই ছিল মনের অভিলাষ; নামিবার কালে পদস্খলন হইয়া-ছিল, তখনি আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়,—অসমতল খাদের পাড়ে কিছুই দাঁড়ায় না, নলিনী উলটি-পালটি খাইয়া গড়াইয়া নীচের দিকে পড়িতেছিল, নবীন হতবুদ্ধি হইয়াও আপন অবশ্য-কর্ত্তব্য ভুলে নাই, একটিও মুহূর্ত্ত নষ্ট করে নাই, উপরে নীচে দুই দিকে নিজ পদযুগলকে রক্ষা করিয়া, দুই বাহু প্রসারণ করিয়া নলিনীকে একটি ছোট শিশুর মত তুলিয়া ধরিয়াছে। নলিনী ভয়ে চক্ষু মু'দয়াছিল, জ্ঞান হারায় নাই, যথাসময়ে সাহায্য আসিয়াছে বুঝিয়া চোখ খুলিল। নবীন ধীরে ধীরে নলিনীকে ভূমিতে নামাইয়া দিল। নলিনীর মুখ নীলবর্ণ, সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত; নলিনী কাঁপিতেছিল।

নবীন জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথাও লেগেছে? নলিনী বলিল, 'বুঝতে পারছি না।'

নবীন। তুলে আপনাকে ও-পারে নিয়ে যাব?

নলিনী। না।

নলিনী ক্লিষ্টমুখে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, নবীন নলিনীর একখানি সুকোমল বাহুর মধ্যদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিল, 'কিছু ভয় পাবেন না, এই কয় পা অক্লেশে নিয়ে যাব, সাহস আনুন।'

নবীন কালবিলম্ব না করিয়া অতি-সাবধানে পায়ে পায়ে পাহাড়ের উপর সমতল ভূমির একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় আনিয়া নলিনীকে বসাইয়া দিল। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া নলিনীর সম্মুখে রাখিয়া বলিল, 'রুমালে গায়ের ধূলা ঝাড়ুন, আমাকে দু'মিনিট সময় দিন, এখনি আসছি'। নবীন উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া খরপদে চলিয়া গেল; নলিনী বসিয়া বসিয়া দেখিতে পাইল, নবীন ছুটিতেছে। নলিনী একাকিনী অনেক কথা একসঙ্গে ভাবিয়া ফেলিল, 'তুমি সঙ্গে না থাকিলে আজ কি দুর্গতি হত, তুমি প্রাণদাতা, তোমায় নমস্কার করি। আমাকে বুকে তুলে ধরেছিলে? এতে লজ্জা পাবার কথা নেই, বিপদে কিছুই বাধে না, কে যেন ঠেলে তোমার বুকের ওপর আমায় ফেলে দিলে, আমার নারী-জন্ম বৃথা হয়েছে ঠিক করে বসেছিলাম, কে গো তুমি তোমার এই কমনীয় অথচ যথার্থ পুরুষের মত সাহস, বীর্য্য ও বল নিয়ে দেবতার মত আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ? কিন্তু, আমার এ কি হল? এত দিনের সংযম কোথায় চলে গেল!'

নবীন তেমনি ছুটিয়া ফিরিতেছে, নলিনী দেখিতে পাইল। দুই হাত জোড় করিয়া নলিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ঠাকুর বল দাও, আত্মঘাতী ক'র না, আবেগের দ্বারে অর্গল দাও, সময় হলে খুলে দিও, যেমন পূর্ব্বে ছিলাম ঠিক তেমন ভাবে থাকতে ক্ষমতা দাও।'

হাঁপাইতে হাঁপাইতে দুটি লেমনেডের বোতল লইয়া নবীন আসিয়া দাঁড়াইল, যেখানকার রুমাল সেই খানেই পড়িয়া আছে, নলিনী কিছুই করে নাই।

একটা বোতলের মুখ খুলিয়া আপন উত্তরীয়-বস্ত্রে ভাল করিয়া মুছিয়া নবীন নলিনীর সম্মুখে ধরিয়া বলিল, 'পান করুন।'

নলিনী কিছুই বলিল না, বোতলের সব জলটুকু পান করিল।

নবীন। গায়ের যেমন ধূলা তেমনি রয়েছে, ঝাড়লেন না কেন? ঝেড়ে দেব?

নলিনী। কি ক'রে ঝেড়ে দেবেন?

নবীন। রুমালের ঝাপটায়।

নলিনী। ওঃ মারবেন বলুন, কেন আপনার কি করেছি?

নবীন। কথা বলেন না কেন?

নলিনী। তার ত উত্তম-মধ্যম সাজা হয়েছে, এখনও আক্ষেপ যায় নি?

উত্তর পাইয়া এত বিপদের ভিতরেও নবীনের ঠোঁটে হাসি জাগিয়া উঠিল।

নবীন। ওই সাণ্ডেল জোড়াটা পায়ে থেকে ফেলুন, ওই দুটোয় একটা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যতদূর পারেন মুখের, পায়ের, গায়ের ধুলা ঝেড়ে ফেলুন, যেন পাউডার মেখে বসে আছেন।

নলিনী। দুটো বোতল এনেছেন কেন?

নবীন। এটা যাবার সময় খেয়ে যাবেন।

নলিনী। আমার দরকার নেই, আপনি খান।

নবীন। পড়েও যাই নি, তৃষ্ণাও নেই।

নলিনী। এত ছুটলেন, গলা শুকোয় নি বলতে চান?

নবীন। একটু ছুটেছি তাতে হয়েছে কি? এটাও আপনার নাম করে এনেছি।

নলিনী। নাম লেখা আছে? খান আমার সামনে, মাথা খান।

ইহার উপর আর কথা চলে না, নবীন বোতলের জল তৃপ্তির সহিত পান করিল, নলিনী দেখিতে লাগিল।

নলিনী বলিল, 'এখনও দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না।'

নবীন ভূমিতে উপবেশন করিয়া বলিল, 'পায়ে হাতে কোথাও লাগে নি ত? ভাল করে দেখেছেন?'

নলিনী। দু এক জায়গায় ছড়ে গেছে, বিশেষ কিছু নয়।

নবীন। দাদামশাই শুনলে কি বলবেন?

নলিনী। আপনি যেন শুনিয়ে দেবেন না! আর একদিনও বেরুতে দেবেন না।

নবীন। আজকের আমাদের যাত্রাটা অশুভ।

নলিনী। ভারি শুভ।

নবীন। পড়ে যাওয়াও শুভ?

নলিনী। হাঁ।

নবীন। বাড়ী যাবেন? আরত ঘোরা চল্‌বে না।

নলিনী। ব'সে ব'সে দেখছি। কত উঁচু ওই আর একটা গম্বুজ দেখুন।

নবীন খাতের বিপরীত দিকে একটি সুউচ্চ মীনার দেখিয়া বলিল, 'ঝড়ে বৃষ্টিতে ইটগুলো আধখানা হয়ে গেছে, এটাও সেই সাবেক কালের, কিন্তু এখনও খাড়া আছে। কি ক'রবেন, যাবেন? টঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে।'

নলিনী। মন চাইছে না। কেন? বেশত ব'সে আছি।

নবীন। শুধু ব'সে থাকা, একটা সেতার পেলে বাজিয়ে শোনাতাম।

নলিনী। আপনার বাজনা শুনেছি মনে হচ্ছে, আপনাদের বাইরের ঘরে সে'দিন বাজনা শুনছিলাম, সে কি আপনি বাজাচ্ছিলেন?

নবীন। হাঁ।

নলিনী। ভাল বাজনা বোধ হয়, বাসাতে বাজাতে হবে, আমি শুনবো।

নবীন। সেতার কোথায়?

নলিনী। কিনবেন, কাশীতে নেই কি?

নবীন। দাদা নীচের বৈঠকখানাটা দিয়ে দিলেন, দু-পাঁচজন বন্ধু-বান্ধব আসে, বাজনা নিয়ে ব'সলে কেউ যদি ঠেকা দেয়—সংসারের দুঃখ-কষ্ট ভুলে যাই।

নলিনী। ওপরে আসতে ভাল লাগে না, নয়?

নবীন। না।

নলিনী। কেন বিয়ে করলেন না?

নবীন। আপনারও দেখছি আপনার দিদির মত রোগে ধরলো।

নলিনী। সত্যি, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আর একটি মেয়েও কি আপনার মনে ধরে না?

নবীন। মনের কথা খুলে বলব কেন? আপনি কিছু বলেছেন?

নলিনী। আমার কি এমন লুকানো কথা আছে যে বলবো, আমি ত আপনার মত মাথা বিকিয়ে বসে নেই, মন হয় নি, করি নি, যখন মন হবে করবো। তবে, সমস্যা ক্রমেই গুরুতর হয়ে আস্‌ছে, আমি এখন বাপ-মার গলগ্রহ, বিধবা মেয়ের মত সংসারের আবর্জ্জনার সামিল হয়েছি, হয় ত বন-বাসের মত চিরদিন কাশীতেই থাকতে হবে।

নবীনের মুখ গম্ভীর হইল, নিশ্বাস ফেলিয়া নবীন বলিল, 'চলুন বেলা পড়ে আসছে, আট মাইল পথ, রাত্রি হয়ে যেতে পারে।'

নলিনী নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই জনে পাশাপাশি অথচ নীরবে পথ চলিয়া টঙ্গায় উঠিল, টঙ্গা কাশী অভিমুখে ঘোড়া ছুটাইল। পড়ন্ত রৌদ্রটা নলিনীর মুখে পড়িতেছে দেখিয়া নবীন আপন উত্তরীয়খানা পাট করে টঙ্গার চালে ঝুলাইয়া দিল।

সারনাথ হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, টঙ্গায় চাপিয়া নলিনী একটি কথাও নবীনকে বলে নাই, টঙ্গা ছাড়িয়া পথ চলিবার সময়ও নয়। বাসায় ফিরিয়া নিত্য কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হইলে নলিনী নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া দিল, অন্য অন্য দিন তিনতলায় যায় কিংবা দাদামহাশয়ের কাছে বসিয়া কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করে, আজ কিছুই করিল না। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, নলিনী একখানা বই লইয়া পড়িতে বসিল, গীতায় জন্মান্তরবাদ ও পুনর্জ্জন্মের প্রমাণাভাব দুইটি মতের বিচারবিষয়ে প্রবন্ধকার অনেক সুযুক্তিপূর্ণ কথা লিখিয়াছেন, নলিনী যত্ন করিয়া কলিকাতা হইতে অন্য বইয়ের সহিত ইহা আনিয়াছিল, একখানা পূরা পৃষ্ঠা পড়িয়া গেল, এক বর্ণও বোধগম্য হইল না। বই মুড়িয়া যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল, কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে বসিল, চিন্তা অশেষ, এও যেন পুনর্জ্জন্ম, এ-চিন্তা জীবনে নূতন। মন বলিল, 'ভাবিতে সুরু কর।' বুদ্ধি বলিল, 'সে যে অনেক সময়, কঁাহাতক আলো জ্বেলে বসে কাটাবে? আলো নিভাও, শয্যায় ওঠ, যত পার ভাব আপত্তি নাই।' নলিনী আলো নিভাইয়া শয্যা আশ্রয় করিল। প্রথম চিন্তা, কেন সে অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া সারনাথ দেখিতে গিয়াছিল! দুইবার পদস্খলন হইয়া গেল, একটি দেহের, অপরটি মনের। প্রথমটিতে খাদে পড়িতে, আশ্চর্য্যরকম একটুর জন্য বাঁচিয়া গিয়াছে, কেন না একজন দেখিয়াছিল এবং ঠিক সময়ে সাহায্য দান করিয়াছিল। মনের স্খলন হইল কেন? হয় ত ইচ্ছাকৃত। এ কয় দিন অবাধ মেলামেশা চলিতেছিল, কেন বল দেখি? দোষ ত ওই; সকলে বাসা লইয়াছিল, যেন দেখিয়াও দেখ নাই, বুঝিয়াও বুঝিতে পার নাই, এমনিটি নয়? আগুন আর ঘি এক স্থানে কর দেখি? ঘি পুড়িয়া জ্বলিয়া ছাই হবে, কেহ বাঁচাইতে পারে? এ-টি যে স্বতঃসিদ্ধ জানিয়াও সাবধান হও নাই কেন? এ কি করিয়া বসিলে? সংযমের সুদৃঢ় নৌকাখানি কাল-বোশেখীর ঝড়-তুফানে বজ্রমুষ্টিতে হাল ধরিয়া বাহিয়া সহজে এড়াইয়া আসিলে, কাম করিলে হাল ছাড়িয়া। ছি ছি অসময়ে বড় সাধের তরণীটি কূলের কাছে ডুবাইয়া বসিলে? নবীন সুপুরুষ শতের একটা, সন্দেহ নাই, শিক্ষিত, তাও বটে, মিষ্টভাষী, কে অস্বীকার করে? চরিত্রবান্ কি না, ঠিক জানি? মৃতদার তো প্রেতের মত নিরালম্ব অবস্থা, হয় ত নিয়তই আশ্রয় অবলম্বন খুঁজিতেছে, তোমার বিগত যৌবনশ্রীতে, এমন কি মাদকতা বর্ত্তমান আছে, যাহার লোভে পড়িয়া পবিত্র বিবাহবন্ধনে তোমাতে আবদ্ধ হইতে চাহিবে? প্রেমের ভিখারী হইলেও হইতে পারে, সে প্রেম কি বস্তু? বিবাহ না গোপনে মধুলুণ্ঠনের গভীরতম আত্ম-প্রবঞ্চনার ষড়যন্ত্র! এ সর্ব্বনাশের পথে আর একটি পা-ও বাড়ানর মত দ্বিতীয় পাপ নাই, দাদামহাশয়ের মত দুর্বুদ্ধি কোথাও যদি থাকে? তিনিই ত আগুনের মুখে ঠেলিয়া দিলেন। চিন্তাস্রোত প্রতিকূল ছাড়িয়া অনুকূলের দিকে ফিরিল। এবার নলিনী শান্তমনে ভাবিল, হয় ত অকারণে একজন যথার্থ নির্দ্দোষীর উপর ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া গুরুতর অবিচার করা যাইতেছে, ওরূপ নির্ভীক পুরুষ এ পর্য্যন্ত দেখি নাই, এটি খুব সত্য কথা, এত বড় বিপদে আপনাকে বিপন্ন বুঝিয়াও সম্মুখীন হইয়াছিলেন, একবর্ণও আত্মশ্লাঘা করেন নাই, নিরাপদ জানিয়া প্রাণপণ শক্তিতে ছুটিয়াছিলেন, জল আনিয়া মুখে দিলেন, সুস্থ বোধ করিলাম, এও কি কৃত্রিম? না, না, সে মুখ দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, সেখানে কৃত্রিমতার গন্ধও নাই, আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট দেখিয়াছিলাম, দুষ্ট লোভীর চাহনি আলাদা, এঁর চোখ দুটি যেন শান্ত-শিষ্ট, স্নিগ্ধ, লালসার লেশমাত্র নাই, মনে হয়, এইটিই ওঁর সত্যকার পবিত্র মূর্ত্তি! হায়, হায় এতদিন পরে বিকাইলাম, সারনাথের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া নিজের ধ্বংস নিজে দেখিলাম, সত্যই কি মজিয়া গেলাম?

নলিনীর মাথা গরম হইয়া উঠিল, সে শয্যায় উঠিয়া বসিল,

একবার মনে করিল, দাদামহাশয়ের ঘরে গিয়া বসে। রাত অনেক, দাদামহাশয় হয়ত জেগে নাই, আবার শয্যায় শয়ন করিল, সংকল্প স্থির করিল, এবার সত্যসত্যই ঘুমাইতে চেষ্টা করিবে, কোন কিছু মনে আসিতে দিবে না। কতক্ষণই বা দৃঢ়তা, মনের সে জোর আজ কোথায় মিলাইয়া গেল? কে জানে, কোথা দিয়া মনের আকাশে নবীনের মুখচন্দ্র আবার ভাসিয়া ওঠে কেন? তাহার শুভ্র উন্নত ললাট, আয়ত চক্ষু, সুগঠিত নাসা, ইহার যে তুলনা নাই, মাত্র কয়দিনের দেখা, দেখিয়া এত তৃপ্তি ত আর কিছুতে হয় না, যাদু করিল কি? ভাবিয়া ভাবিয়া পাগল হইব কি?

নলিনী আবার ভাবিল, তিনি আমায় চান কি? কিছু কিছু আভাস পেয়েছি বটে, তোমার অনুমান হয়ত ভুল, তাঁহার সব একদিন ছিল, বর্ত্তমানে তাঁহারই সুখ-স্মৃতিতে হৃদয় পূর্ণ, আমার স্থান কোথায়? নলিনী অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিল কাঁদিল, নিস্তেজ হইয়া পড়িল, তবুও ঘুম আসিল না, ও কি! কেদারের মঙ্গল-আরতির ঘণ্টারব! স্তব্ধ রজনীর শেষ ভাগে সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে, সুপ্ত কাশীর নর নারী এ শব্দ শুনিতে পায় না, নলিনী শুইয়া থাকিয়া শুনিতেছে। হঠাৎ সুদূর কলিকাতায় মার কথা মনে হইল, মা থাকিলে তাঁর কোলে আশ্রয় লইলে, তার স্নেহ-স্পর্শ পাইলে ঘুমাইয়া পড়িতাম। মা ত এখানে নাই, কাল প্রভাতেই কলিকাতা যাইবার কথা দাদামহাশয়কে অতি অবশ্য বলিবে। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া জাগরণে নলিনীর মাথা ব্যথা করিতে লাগিল, চোখজ্বালা সুরু হইল এবং প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর দেখা দিল। দাদামহাশয় আসিলেন, শিয়রে বসিলেন, নবীনের মাও আসিলেন, নলিনীর গায়ে হাত দিলেন, বলিলেন, জ্বর বটে, আজ আর উঠো না। নলিনী বলিল, 'কলিকাতায় যাব, মার কাছে গেলেই অসুখ সেরে যাবে।' দাদামহাশয় চিন্তিত হইলেন, বলিলেন, 'বেশ ত ছিলে, জ্বর হ'ল কেন? জ্বরগায়ে কলকাতায় যাবে?'

নবীনের-মা বলিলেন, 'এখন কি কোথাও যায়? ঠাণ্ডা লেগে দুনো অসুখ হবে।' নবীনও যে আসে নাই এমন নহে, নবীন নলিনীর ঘরের দ্বারটিতে দাঁড়াইয়াছিল।

নলিনী দেখে নাই, নবীনের মা রহিয়া গেলেন, দাদামহাশয় বাহিরে আসিলেন, নবীনের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, বৈকাল পর্য্যন্ত দেখা যাক্ জ্বরের গতি কোন্ দিকে যায়।

বৈকালে দেখা গেল, জ্বর ছাড়ে নাই, নলিনী মাথা-ব্যথায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। নবীন বাহির হইয়া এক শিশি ওডিকলোন কিনিয়া আনিল। নলিনীর মাথায় ওডিকলোনের পটী লাগাইতে সময়মত ব্যথা নিবৃত্তি বোধ করিল, রাত্রে কিন্তু জ্বর বাড়িল, থার্ম্মোমিটারে জ্বর উঠিল তিন। দাদামহাশয় ভাবিত হইয়া পড়িলেন, রাত্রে আহারে বসিলেন মাত্র, মুখে কিছুই রুচিল না। নবীনের-মা নলিনীর কাছে রাত্রিবাস করিবার জন্য রহিলেন, নবীন অনেক রাত পর্য্যন্ত দাদামহাশয়ের ঘরে কাটাইয়া তিন তলায় গেল।

পরের দিন সকালে জ্বর সামান্যমাত্র কম, নলিনী নবীনের মাকে বলিল, 'বুকে ব্যথা হয়েছে, কাসি এলে বুঝতে পারি, বুকটা কন্‌কন্ করে।'

দাদামহাশয় নবীনকে বলিলেন, 'গোধুলিয়ার মুকুন্দ ডাক্তার আমার চিকিৎসা করেছিলেন, বয়োবৃদ্ধ, বিচক্ষণ, ডেকে আন, বিনা চিকিৎসায় আর ফেলে রাখতে পারি না।'

মুকুন্দ ডাক্তার আসিলেন, নলিনীকে পরীক্ষা করিলেন, ঔষধ লিখিলেন, বলিয়া গেলেন, 'নিউমোনিয়ার লক্ষণ কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, দু একদিনে প্রকাশ হবে, সেইরূপ ঔষধ দিলাম।' নবীন ডাক্তার বন্ধুর সহিত একত্রে বাহির হইল। নবীন ঔষধ আনিল, রোগিণীর জন্য বাছিয়া বাছিয়া কিছু ফল আনিল, গেলাসে ঔষধ ঢালিয়া মায়ের হাতে দিল, মা ঔষধ খাওয়াইলেন। নবীন ঘরে আসিয়াছে জানিতে পারিলেই নলিনী চক্ষু বোজে। মধ্যাহ্নে জ্বর উঠিল চার, রোগের যন্ত্রণা বেশী। দাদামহাশয় বলিলেন, 'কলকাতায় রমেশকে খবর পাঠান উচিত।'

নবীন বলিল, 'পত্রের অপেক্ষা 'তার' করাই ভাল, আপনার বধূমাতা এলে ভাল হয়।' দাদামহাশয়ও স্বীকার করিলেন, নবীন টেলিগ্রাফ আপিসে গিয়া তার পাঠাইয়া ফিরিয়া আসিল।

বৈকালে মুকুন্দ বাবু আসিলেন, বরফের ব্যবস্থা করিলেন, ঔষধও দু-একটা যোগ করিয়া নূতন করিয়া দিলেন।

আর দূরে দূরে থাকিলে চলে না, মা বরফের থলি মাথায় ধরিয়া অধিকক্ষণ বসিতে পারেন না, দাদামহাশয়ও তথৈবচ,

নবীন সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া নলিনীর শয্যায় উঠিয়া রোগিণীর পার্শ্বে বসিল, বরফের থলি মাথায় ধরিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবে সম্মুখে ঘড়ি রাখিয়া শুশ্রূষায় ব্রতী হইল। নলিনী জ্বরে আচ্ছন্ন, তবুও কে যে আসিয়া মুখের কাছে বসিয়াছে, কাহার হাত বরফের থলি মাথায় ধরিয়া আছে, বুঝিল। জ্বর কমিল, নবীন বরফ, ঔষধ ও আহার্য্য মার হাতে আগাইয়া দিয়া দাদামহাশয়ের ঘরে আসিল। রাত্রি তখন দশটা বাজিয়াছে। উভয়ে আহার শেষ করিলেন। ব্যবস্থা হইল, রবি দাদামহাশয়ের ঘরে স্বতন্ত্র বিছানায় ঘুমাইবে, মা নলিনীর ঘরে থাকিবেন, নবীন দাদামহাশয়ের কাছে থাকিবে, মাঝে মাঝে মাকে জাগাইয়া রোগিণীর পরিচর্য্যা করিবে, রাত্রে বরফের প্রয়োজন না হইলেও, প্রভাতে জ্বরের প্রকোপ কম নয়ই, বরং পূর্ব্বদিনের অপেক্ষাও বেশী। ডাক্তার আসিলেন, রোগী দেখিয়া বলিলেন, 'কাল সন্দেহ ছিল, আজ স্পষ্ট, এখন বাড়েরই মুখ, তদারক তদ্বির যেন ভাল ভাবে হয়, বুক তুলায় বাঁধিয়া দিবেন, ইত্যাদি।

নবীন ডাক্তারবাবুর সহিত ডাক্তারখানায় চলিয়া গেল।

কলিকাতা হইতে রমেশবাবু সস্ত্রীক আসিয়া পড়িলেন: মাকে দেখিয়া নলিনী কাঁদিয়া ফেলিল, মাও মেয়ের শয্যায় উঠিয়া নলিনীকে দুই বাহুপাশে আবদ্ধ করিলেন, নলিনী মায়ের বুকে মুখ রাখিয়া অজস্র অশ্রু ফেলিতে লাগিল। রমেশবাবুও অনেকক্ষণ কন্যার রোগ-শয্যায় বসিয়া রহিলেন, নলিনীর কান্না থামিয়া আসিলে বলিলেন, 'ভয় কি? সব অসুখ সেরে যাবে, আমরা এসে পড়েছি, টেলিগ্রাম পেয়ে একটি বেলাও সেখানে থাকতে পারি নি, ছুটে এসেছি।'

দাদামহাশয় ও নবীনের মা আসিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরদা বলিলেন, 'তোমার বেয়ান ছিল, ওঁর ছেলে নবীন ছিল, তাই রক্ষে, এঁরা দুজনে সব করেছেন।'

নবীনের-মা বলিলেন, 'বেয়ান এসেছেন, আমাদের ভাবনা গেছে, এই মাত্র ডাক্তার চ'লে গেল, নবীনও ওষুধ আনতে গেল।'

রমেশবাবু বলিলেন, 'আপনি আছেন জানি, তাই কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম, বাবা একলা হ'লে কি যে হত ভাবা যায় না।'

নবীন ফিরিয়া আসিল, দাদার শ্বশুর ও শাশুড়ীকে দেখিয়া বলিল, 'মনে হয়েছিল, আপনারা আজই আস্‌বেন; যথাসাধ্য আমরা সকলেই কিছু কিছু করেছি।'

বৈকালের দিকে জ্বর বাড়িল, সাড়ে চার। নবীন প্রস্তুত ছিল, রবারের থলিতে বরফ পুরিয়া নলিনীর মার হাতে আগাইয়া দিল, রমেশবাবুর হাতে পাখা দিয়া মাথায় বাতাস দিতে বলিল। ঔষধ, রোগিণীর আহার একটির পর একটি এমন ভাবে সময়মত যোগাইতে লাগিল, দেখিয়া রমেশ-বাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়েই একবাক্যে নবীনের প্রশংসা না করিয়া পারিলেন না। সন্ধ্যার পর জ্বর আরও বাড়িয়া উঠিল, রমেশবাবু নিজে বরফের থলি ধরিলেন, তাঁহার স্ত্রী পাখা লইলেন, রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল, রমেশবাবু নবীনকে বলিলেন, 'ভারি অস্থির হল, কি করা যায়?'

নবীন বলিল, 'জ্বর বেড়েছে, বরফ ছাড়া উপায় নেই।'

রমেশবাবু। তুমি থলিটা ধরবে? ধর না, আমি ঠিক দিতে পারছি না।

নবীন নলিনীর শিয়রে বসিল, থলি চাহিয়া লইয়া গত রাত্রের মত একভাবে বসিয়া রহিল, জ্বর নামিয়া তিনে পৌঁছিলে নবীন থলি রাখিয়া দিল। নলিনী ঘুমাইতেছে, রমেশবাবুর স্ত্রী স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া নবীনকে শ্বশুরের ঘরে শয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন।

দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই মন্দের দিকে চলিয়াছে, আট দিনে জ্বরের মাত্রা হইল পাঁচ, জ্বরের সময় নলিনী দুটো একটা অসংলগ্ন কথা বলিতে লাগিল। ডাক্তারবাবু নবীনকেই সব কথা বলিয়া যান, নবীন এখন সব কাজের ভার নিজহাতে লইয়াছে, রমেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সাক্ষিগোপালের মত শুধুই রাত জাগেন। দশ দিনের রাত্রে নলিনী অনেক প্রলাপ বকিল, এক কথা বহুবার বলিতে লাগিল—'পড়ে গেলাম, ভাগ্যিস্ ধরে ফেল্‌লেন, তাই না বাঁচলুম।'

বাপ-মা এ কথা শুনিলেন, শুধুই শোনেন, কিছু বুঝিতে পারেন না, নবীন বুঝে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া বলে না।

মুকুন্দবাবু নিত্য দুইবার আসেন, একাদশ দিবসে সকালে রোগী দেখিয়া বলিলেন, 'বুক পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে, আজকের রাতটা সকলেই সাবধান হবেন, জ্বর ছাড়তে পারে।' নবীনকে

বলিলেন, 'চলুন, আরও গোটা দুই ওষুধ দেব, আলাদা করে রাখবেন।' নবীনকে লইয়া ডাক্তারবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তারবাবু সমস্ত ব্যবস্থার কথা নবীনকে বুঝাইতে লাগিলেন, দুইটি স্বতন্ত্র ঔষধ দিয়া রোগীর কোন্ অবস্থায় কত পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে, বুঝাইয়া দিলেন, নবীন শিশি দুইটি লইয়া চিন্তা-ভারাক্রান্ত মনে বাসায় ফিরিয়া আসিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে; নলিনীর জ্বর বাড়িয়াছে, বরফ চলিতেছে। নবীন ডাক্তারের কোন কথা কাহাকেও বলিল না, রাত্রি বাড়িতে চলিল, দাদামহাশয় আপন ঘরে নিদ্রা গেলেন, নবীনের মা তিন তলায় রবির সহিত শয্যা গ্রহণ করিলেন, রমেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নলিনীর দুই পাশে রহিলেন, রমেশবাবু বসিয়া বসিয়া আলস্যে শুইয়া পড়িলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। রমেশবাবুর স্ত্রী অর্দ্ধ-জাগরিতা, নবীন নলিনীর শিয়রে, নলিনী জ্বরে অচৈতন্য, কেবল নিঃশ্বাসটি পড়িতেছে মাত্র। নবীন ঘড়ি দেখিল, বারটা বাজিয়াছে। থার্ম্মোমিটার ঝাড়িয়া রোগীর মুখে লাগাইয়া দেখিল জ্বর সাড়ে পাঁচ হইতে তিনে নামিয়াছে। নবীন বরফ বন্ধ করিল, ঘরের বাহিরে ষ্টোভ জ্বালিয়া ফুড ফুটাইল। নলিনীর মা এক চামচে ফুড ঢালিয়া মুখে দিলেন, নলিনী খায় না, মা বলিলেন, 'খায় না কেন, ঘুম ত নয়?'

নবীন নিজে চামচ ধরিল, মুখে ঢালিতে পারিল না, নলিনী সত্যই অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে। জ্বর কমিয়াছে অথচ রোগিণীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, নবীন ফুডের চামচ ছাড়িয়া অতি সত্বর ডাক্তারের উপদেশ-মত শিশির ঔষধ ঢালিয়া কোনমতে ঔষধটি নলিনীর গলাধঃকরণ করাইয়া মাকে বলিল, 'এইবার ফুড দিন, খাবে।'

নলিনীর-মা বলিলেন, 'আমার হাত উঠছে না, দেখ না চোখ যেন শিবনেত্র।'

নলিনীর-মা রমেশবাবুকে জাগাইলেন, ক্রন্দনের সুরে বলিলেন, 'আর ঘুমিও না, দেখ বুঝি বা সর্ব্বনাশ হয়।'

রমেশবাবু ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন, নলিনীর মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, নবীন ফুড হাতে করিয়া কঠোরভাবে বলিল, 'আপনাদের আর একটি কথাও বল্‌তে দেব না, হয় আমার কাজে সাহায্য করুন, নয় উভয়েই ঘরের বাইরে যান। জীবন-মরণ সমস্যা, দেখেও বুঝেন না?'

নবীন অতিকষ্টে একচামচ ফুড খাওয়াইতে পারিল, নলিনীর নাড়ী দেখিল, উদ্বেগে নবীনের মুখখানা কালীবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, 'বাইরে ষ্টোভ জ্বল্‌ছে, শীগ্‌গির জল গরম করুন।'

আধঘণ্টা কাটিল, ঔষধ কার্য্যকরী হইয়াছে, রোগিণী চোখের পাতা ফেলিতেছে। আশা জাগিল, নবীন আবার থার্ম্মোমিটারের সাহায্য লইল, জ্বর এক, ঘাম দেখা দিয়াছে। নবীন অপর ঔষধটির সময় বুঝিয়া খাওয়াইয়া দিল, রমেশবাবু ঘাম মুছাইতে লাগিলেন, নবীন ঘরের বাহিরে আসিয়া বোতলে গরম জল পুরিয়া ফেলিল।

নলিনীর-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঁচবে?'

নবীন বলিল, 'আপনারা অধৈর্য্য হলে বাঁচান যাবে না।'

নলিনীর মা অঞ্চলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, 'না বাবা আর কাঁদব না, যা বলবে শুনব।'

গরম জলের বোতল নলিনীর পায়ে গায়ে সেঁক হইতে লাগিল, দশ মিনিট অন্তর এক চামচ দু'চামচ ফুড চলিতে লাগিল, নবীন নলিনীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বুঝিল, নাড়ী ক্ষীণ হইলেও এক ঘণ্টা পূর্ব্বের অবস্থা হইতে অনেকটা ভাল, জ্বর ক্রমেই কমিতে লাগিল, নলিনী অনর্গল ঘামিতেছে, বাবা ও মা দুইজনে পড়িয়া মুছাইয়া শেষ করিতে পারিতেছেন না, আর একবার ঔষধ ব্যবহার করিতে হইল। রাত্রি তিনটা বাজিলে ঘাম কমিল, জ্বর নরম্যালে দাঁড়াইয়াছে, নলিনী অত্যন্ত দুর্ব্বল, কিন্তু সজাগ, চক্ষু মেলিতেছে। মুখে রক্ত আসিয়াছে, মা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছ মা?'

নলিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, 'ভাল।'

নবীন বুঝিল, পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, এ যাত্রা রক্ষা হইয়াছে। তথাচ আর একবার নাড়ী পরীক্ষা করিল, নাড়ীর গতি এখন সহজ, সবল, একভাবে একটানে বহিয়া চলিয়াছে।

নবীনের আনন্দ বাড়িয়াছে, প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, নলিনীর মার উদ্দেশে বলিল, 'মা, যদি রাগ না করেন, একটা কথা বলি।'

নলিনীর মা আশু বিপদ্ কাটিয়াছে, কন্যা নিরাপদ্ বুঝিতে পারিয়াছেন, বলিলেন, 'তুমি ছেলেরও বেশী, তোমার ওপর রাগ? বল না কি চাই?'

নবীন বলিল, 'বেশী কিছু নয়, কেবল এক বাটি গরম চা পেলে ভাল হয়, আর যেন বস্‌তে পারছি না, কিন্তু ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত এখনও জাগ্‌তে হবে।'

নলিনী নবীনের কথাগুলি শুনিতেছিল, নলিনীর মা বলিলেন, 'আহা, সত্যই ত বাছা আর পারে না, আজ এগার দিন রাত জাগ্‌ছে, কত পরিশ্রম করছে ইয়ত্তা নেই, তোমাকে একবাটি চা করে দেব, এটা কি বড় কথা? জন্ম জন্ম তপস্যার ফল। নলি ত গেছল!'

নলিনীর মা উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিলেন, গৃহিণী চা করিতে চলিয়াছেন দেখিয়া রমেশবাবুও মনের অবসাদ-মোচনার্থ পাছু পাছু আসিয়া বলিলেন, 'আমিও কিঞ্চিৎ প্রার্থী।'

নলিনী নবীনের মুখের দিকে চাহিয়াছিল, নবীন মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পাইল, সেই পরম শোভাময় পাণ্ডুর মুখখানি ক্ষীণ হাসিতে রঞ্জিত হইয়াছে।

প্রভাতের পূর্ব্বে নলিনী ঘুমাইয়া পড়িল।

পল্লীবুকে

—শ্রীগোপেশ্বর সাহা

বেড়ার আড়ালে হোথা মেলিয়া ডাগর চোখ
হেরিলাম কিবা অপরূপ,
সুষমার খনি যেন পল্লীর বধূ ওই
দাঁড়ায়ে হেরিছে ঠায় চুপ!

হোথা ওই পাঠশালা কত কি যে কল-রোল,
—চড়িয়াছে সুর নামতার,
রাঙ্‌চিতা বেড়াপাশে ফুটেছে গাঁদার ফুল
শালিক নাচিয়া যায় আর।

কামারের ঢং ঢং মুদির সে দব্‌দাম্‌
শোনা যায় বাউলের গান,
উলঙ্গ শিশুর দল দাঁড়াইয়া দুই পাশে
আনচান্‌ করে মোর প্রাণ।

ডোবাটার পাশে ওই জাল ফেলে একজন,
ছিপ-হাতে বসে কেহ ঠায়,
জলের কিনারা ঘেঁসে নীরবে বসেছে বক
মাছরাঙা ঠোক্‌ দিয়ে যায়।

দেখিলাম "তাঁতীপাড়া" তাঁতীদের ছোট ঘর,
নাহি সেই তাঁত খটাখট্‌,
বৈরাগীর "আখড়া"র দেবতা ঝিমায় শুধু
ভরে নাকো কেহ তাঁর ঘট।

বিপুল পদ্মার ঢেউ, বিশাল বিক্রমে তার
ভাঙিয়া গিয়াছে কত ঠাঁই,
শুধু কি স্মৃতির ব্যথা জাগায়ে তুলিতে মনে
এটুকু ভাঙিতে পারে নাই?

ভেঙেছে সে "নলেপাড়া" বিরাট সে "পোল" তার
ভাঙিয়াছে হাট-খোলা আর,
বাবুদের "গোলাবাড়ী" তার পরে "ডাক-ঘর"
ভেঙেছে যে পদ্মার ধার।

ভেঙেছে ইস্কুলঘর "সন্ন্যাসী বটতলা"
"রথতলা" তারো নাই চিন,
বিরাট বালির চর ধূ ধূ করে নিরন্তর
কোনরূপে কেটে যায় দিন।

উৎসব গিয়াছে থামি' শুধু তার স্মৃতিটুক
বসে' বসে' উপভোগ সার;
"গোবিন্দ দ্বাদশী দোল" আজ যে মুখের বোল,
মনে শুধু জাগে স্মৃতি তার।

জলধি-বেষ্টিত জাপান

—শ্রীসুরেশ চন্দ্র ঘোষ

(১)

চারিদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তাল উর্ম্মিমালার তাণ্ডব নৃত্য, মধ্যে পাঁচটি প্রকাণ্ড দ্বীপ বারিধি-বক্ষে বিরাজিত, পঞ্চ-প্রদীপ বা পঞ্চ-পুষ্পের মত অবস্থিত। জগদ্বিখ্যাত জাপান এই পঞ্চ-দ্বীপের দ্বারা গঠিত। ইহাই এশিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্বাংশ—ইহাই প্রতীচীর পক্ষে দূরতম প্রাচী। লাটিচুড্ বা অক্ষাংশ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই দ্বীপমালা ৩০° এবং ৪৫° (উত্তর) ডিগ্রির মধ্যবর্ত্তী এবং লঙ্গিচুড্ বা

টোকিয়োর কাবুকি-অভিনয়-ভবন।

দ্রাঘিমা বিষয়ে বিচার করিলে বুঝা যায়, ইহারা ১৩০° হইতে ১৪৫°(পূর্ব্ব) ডিগ্রির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমে বিস্তৃত বারিরাশি যেমন গভীর নহে, পূর্ব্বে প্রসারিত সমুদ্র-সলিল তেমনই সুগভীর। এই গভীরতা প্রায় দুই হাজার মাইল ব্যাপিয়া বিরাজিত। আমরা উপরে শুধু খাস জাপানের ভৌগোলিক পরিস্থিতি প্রদান করিলাম। জাপ-সাম্রাজ্য ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর। এই স্থানে জানা প্রয়োজন, পাঁচটি প্রধান দ্বীপের দ্বারা জাপান গঠিত হইলেও ইহার মধ্যে আরও বহু দ্বীপ বিদ্যমান।

জাপানের আয়তন প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ মাইল। যে দ্বীপটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সেই হণ্ডোর আয়তন প্রায় ৮৭ হাজার বর্গ মাইল। হণ্ডোর পর ইয়েজো উল্লেখযোগ্য, যাহার পরিমাপ ৩০ হাজার ৫ শত বর্গ মাইল। ইয়েজোর পর কিউশিউ উল্লেখনীয়। ইহার আয়তন ১৫ হাজার ৭ শত বর্গ মাইল। ইহা ছাড়া স্কিকোকু (৭ হাজার বর্গ মাইল), কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ (৬ হাজার ১ শত), লুচু দ্বীপমালা প্রভৃতি দ্বীপ খাস জাপানের অন্তর্গত। সমগ্র জাপ-সাম্রাজ্যের পরিমাপ প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৮ শত বর্গ মাইল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারী অনুসারে খাস জাপানের লোক-সংখ্যা ৫ কোটী ৫৯ লক্ষ ৬০ হাজার।

জাপানের আবহাওয়ার মধ্যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ইহার দক্ষিণাংশ গ্রীষ্ম-মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত, উত্তরাংশ তুষার-শীতল মেরু-মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী এবং মধ্যাংশ নাতিশীতোষ্ণ প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বিরাজিত। জাপানের আবহাওয়া এবং অবস্থিতির সহিত আটলান্টিক মহাসমুদ্রবক্ষে অবস্থিত ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক পরিস্থিতি ও জলবাতাসের সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। জাতীয়তার ক্রম-বিকাশের দিক্ দিয়া বিচার করিলেও উভয় বারিধি-বেষ্টিত দেশের সাদৃশ্য আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। বিষুব-রেখা হইতে বহুদূরে বিরাজিত রহিলেও উহা হইতে প্রবাহিত উষ্ণ অন্তঃস্রোত এই দ্বীপমালার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। অন্যদিকে উত্তর ও পশ্চিমাংশের উপর উত্তর-মেরু মহাসাগরের তুষার-শীতল প্রবাহের প্রভাব প্রসারিত আছে। শরৎ ঋতুতেই জাপান বিশেষ উপভোগ্য হইয়া থাকে। গুমোট-গরমের জন্য গ্রীষ্মকালে য়ুরোপীয়দের

পক্ষে ইহা আদৌ প্রীতিপ্রদ হয় না। বর্ষায় প্রচুর বারিপাত হইয়া থাকে। তুষারপাতসত্ত্বেও জাপানের শ্যামল সুষমা শীতেও সমুজ্জ্বল থাকে।

এই দেশের অধিকাংশই পর্ব্বত-বন্ধুর। এখানকার বেগবান্ নদ-নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে বালুকাদি রাবিশ (ডেট্রাইয়াস) বহন করে বলিয়া তীরবর্ত্তী ভূমি-ভাগ প্লাবনের প্রভাবে উর্ব্বর না হইয়া শুধু উচ্চতর হইয়া পড়ে। এই সকল আবর্জ্জনার জন্য নদীর মুখ অনেক সময় বুজিয়া যায়। জাপানের নদ-নদীসমূহের মধ্যে শিনানো সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। তবে, ইহার দৈর্ঘ্য দুই শত মাইলের অধিক হইবে না। বালুস্তূপের দ্বারা এই নদীর মোহনাও ক্রমশঃ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। নদীর তীরগুলি বালুকাদির দ্বারা এরূপ উচ্চ হইয়া পড়ে যে, জাপানে রেল-রাস্তা বিস্তৃত করিবার কালে অনেক সময় নদীর তলদেশ দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে হয়।

গ্রীষ্মকালে এখানকার নভোমণ্ডল প্রায়ই মেঘ-মালায় মণ্ডিত থাকে। প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার মত প্রকৃতিও স্তম্ভিতমূর্ত্তিতে গম্ভীরভাবে অবস্থান করে। সহসা প্রবল বাদল-ধারা মেঘ-দল হইতে নামিয়া আসে—বজ্র-গর্জ্জনে দশদিক্ কম্পিত হয়। ইহার পর কয়েক দিন ব্যাপিয়া প্রবল প্লাবনের পালা চলে। এই সকল বন্যার বেগ এত বেশী যে, চারিদিকে প্রচণ্ড প্রলয়-লীলা অভিনীত হইতে দেখা যায়। বারিরাশির বেগে পর্ব্বত-পার্শ্ব বিদীর্ণ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড নামিয়া আসে, প্রস্তরের আঘাতে পর্ব্বত-পার্শ্বস্থ পাদপদল উৎপাটিত হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃক্ষ-বিশোভিত শ্যাম-সুন্দর গিরিগাত্র তরুলতা-বিরহিত ভয়ঙ্কর গহ্বর হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে এই দ্বীপপুঞ্জে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বারিধি-বক্ষে প্রচণ্ড ঝটিকার দ্বারা যে তাণ্ডব-নৃত্য অভিনীত হয় তাহাও অতিশয় ভয়ানক।

জাপানের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস বেপুর সাধারণ দৃশ্য।

ভূ-গর্ভস্থ অগ্নির দ্বারা যে প্রলয়-লীলা অভিনীত বা ধ্বংস-ধারা প্রবাহিত হয়, তাহার ভীষণত্বও কম নহে। অনেক সময় উহা পূর্ব্বকথিত ব্যাপারগুলি অপেক্ষা অধিকতর ভয়ঙ্কর ধ্বংসকর হইয়া পড়ে। এই অগ্নির জন্য জাপানে ভূমিকম্প

প্রায়ই সঙ্ঘটিত হয়। এই অদ্ভুত দেশে সামান্য কম্পন প্রায় সকল সময়েই অনুভূত হয়। মধ্যে মধ্যে যে সকল অসামান্য কম্পন দেখা দেয়, তাহার ফলে, হাজার হাজার নর-নারী কালের কবলে পতিত হইয়া সমগ্র দেশকে হাহাকারে পূর্ণ করে। জাপানকে আগ্নেয়গিরির দ্বারা পূর্ণ বলিলেও ভুল বলা হয় না। এই সকল আগ্নেয়গিরির কতকগুলি নির্ব্বাপিতাগ্নি এবং কতকগুলি এখনও অগ্নি-উদ্গিরণে সক্ষম। এই সকল অগ্নি-উদ্গিরণে সক্ষম আগ্নেয়গিরির চতুর্দ্দিকে গাইযার বা উষ্ণপ্রস্রবণ এবং গন্ধক-উদ্গারী উৎস প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়া ভূ-গর্ভস্থ বহ্নির বহিরাগমনের উৎকট আকাঙ্ক্ষার বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিতেছে। বৃহত্তম দ্বীপ হণ্ডোর প্রায় সকল শৈলশিখরই আগ্নেয়গিরি-সুলভ প্রকৃতির। জাপানের বিশেষ জনপূর্ণ স্থানগুলিতে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প ইদানীং তত বেশী সংঘটিত হইতে দেখা যায় না। তবে, অগ্নি-গর্ভ গিরির পার্শ্বে যাহারা বাস করে, তাহাদিগকে কখন কি ঘটে ভাবিয়া সর্ব্বদা শঙ্কাকুল থাকিতে হয়। যাহার আকাশে ভৈরবী ঝঞ্ঝা, ভূতলে প্রবল প্লাবন, ভূগর্ভে প্রচণ্ড অগ্নি. সেই জাপান কেমন করিয়া ক্রমশঃ এমন শ্রীমান্ ও শক্তিমান্ হইয়া পড়িল, তাহা অনেকের নিকট বিস্ময়কর রহস্যরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে। কিন্তু, আমাদের মনে হয়, প্রকৃতির এই প্রতিকূলতাই জাপ-জাতিকে তন্দ্রালস-নয়নে বসিয়া রহিবার অবকাশ না দিয়া সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছে। অনুকূল প্রকৃতির ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চীনারা যখন নিবিড় নিদ্রায় নিমগ্ন, স্বভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া জাগ্রত জাপ-জাতি তখন সযত্নে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে।

জাপানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণী (টোকিয়ো)।

স্যর হেনরী নর্ম্মান্ ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জাপান যান। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার কাহিনী 'রিয়াল জাপান'-নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি একটি এমন জায়গায় যান, যেখানে স্বল্পকালমাত্র পূর্ব্বে অগ্নি উদ্গীরিত হইয়া বহু-শত নর-নারীকে পরলোকের পথে প্রেরণ করিয়াছিল। প্রকাণ্ড একটি পর্ব্বতের অধিকাংশই ভূ-গর্ভস্থ বহ্নির বহিরাগমনের প্রবল প্রয়াসে শুষ্ক তৃণরাশির মত উড়িয়া গিয়াছিল; যেন ভূগর্ভস্থ একটি বিরাট বয়লার সহসা বিদীর্ণ হইয়া কিংবা ভূ-নিম্নস্থ বারুদের কারখানায় সহসা আগুন লাগিয়া এই প্রচণ্ড কাণ্ড ঘটাইয়াছিল। ফুটন্ত কর্দ্দম ভূ-গর্ভ হইতে বাহির হইয়া অদ্ভুত দৃশ্য প্রকটিত করিয়া তুলিয়াছিল। ত্রিশ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপ্ত করিয়া এই ফুটন্ত কর্দ্দমরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ডাকগাড়ী যেরূপ বেগে ধাবিত হয় সেইরূপ বেগে উত্তপ্ত কর্দ্দম ও ভস্মরাশি ছুটিয়া গিয়াছিল। হাজার হাজার প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উৎক্ষিপ্ত হইয়া শত শত হতভাগ্য নরনারীর সমাধি-ফলকে পরিণতি পাইয়াছিল। এই প্রলয়-লীলার ফলে সহসা সমুৎপন্ন এক মাইল উচ্চ বা গভীর একটি তুঙ্গ স্থানে দাঁড়াইয়া দর্শক-দল বিস্ময়-বিস্ফারিতনয়নে ও ভীতিবিহ্বলভাবে নির্ম্মমা নিয়তির অনুষ্ঠিত সেই নৃশংস ধ্বংসলীলা দেখিতেছিল। স্যর হেনরী নর্ম্মান্ এই হৃদয়-বিদারক দারুণ দৃশ্যের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম প্রদান করিলাম।

"যেদিকে চাহিতেছি সেই দিকেই আগ্নেয়-গিরির শীর্ষস্থ গর্ত্তের মত নানা আকারের গহ্বর। বৃক্ষ সকল উৎপাটিত ও খণ্ড-বিখণ্ড ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ছয় ইঞ্চি গভীর ধূসর আটাল কর্দ্দম প্রত্যেক পদার্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে আমাদের পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত এই

কর্দ্দমে ডুবিয়া যাইতেছিল। দলের একজন অগ্রসর হওয়া বিপজ্জনক জানিয়া ফিরিয়া গেলেন। ভূমি সমতল বলিয়া যে সকল স্থানে জল দাঁড়াইতে পারে তথায় গন্ধকযুক্ত জলপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যে সব জায়গা কয়েকঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে তরুলতা ও তৃণরাজির শ্যামল সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত ছিল, এখন সেখানে সবুজের একটি রেখাও দেখা যায় না।"

জাপানের প্রধান দ্বীপের বক্ষে দণ্ডায়মান সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সক্ষম আগ্নেয়গিরি আসামা-ইয়ামা আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ইহার অভ্যন্তর হইতে অগ্নিশিখা, ভস্মরাশি ও গলিত প্রস্তর বা লাভা-প্রবাহ নির্গত হইয়া পঞ্চাশখানি গ্রামকে বিনাশ করিয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে হাজার হাজার গৃহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। অনেকেই জানেন, এখানকার গৃহগুলির অধিকাংশই কাষ্ঠ ও কাগজের তৈয়ারী। সুতরাং অগ্নিই ইহাদিগের প্রধান শত্রু। অনেক সময় ভূমিকম্পের সময় ভূগর্ভ হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া কাষ্ঠ ও কাগজ-রচিত কারুকার্য্যে কমনীয় গৃহগুলিকে ভস্মরাশিতে পরিণত করে। সময়ে সময়ে সমগ্র নগর অসংখ্য অধিবাসী সহ পুড়িয়া ছারখার হয়। সময়ে সময়ে ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে বারিধিবক্ষ স্ফীত হইয়া প্রবল প্লাবন প্রেরণপূর্ব্বক উপকূলবর্ত্তী জনপদসমূহকে ডুবাইয়া দেয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত এই-রূপ দারুণ দুর্ঘটনার ফলে ৩০ হাজার নরনারী ভাসিয়া গিয়া সমুদ্রে সমাধিলাভ করিয়াছিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেবারও উত্তর উপকূলের দুইশত মাইল ব্যাপিয়া প্রমত্ত পয়োধির প্রলয়-লীলা চলিয়াছিল।

আবহাওয়া বা জল-বাতাসের বৈচিত্র্যের জন্য আমরা জাপানে উৎপন্ন পদার্থের মধ্যেও বৈচিত্র্য দেখিতে পাই। উত্তর-চীনে যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন হয় জাপানেও প্রায় সেই সব জিনিষ জন্মিতে দেখা যায়। উত্তর চীন এবং জাপান উভয় স্থানেই চা এবং বাঁশ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। ধান্যই জাপানের সমতল বা প্রান্তর-প্রধান প্রদেশগুলির প্রধান শস্য। গম, যব, যই প্রভৃতি শস্য উচ্চস্থানগুলিতে জন্মিয়া থাকে। কার্পাস ও তামাকের চাষ দ্বীপমালার দক্ষিণাংশেই বেশী দেখা যায়। জাপানের জঙ্গলে নানাপ্রকার পাইন বা

জাপানের অন্যতম বিচিত্র-দর্শনীয় মাৎশুশিমা।

দেবদারুবৃক্ষ জন্মগ্রহণ করে। এখানকার বন্য পাদপদলের মধ্যে কর্পূর-বৃক্ষ বিশেষ উল্লেখনীয়। এক একটি বৃক্ষের গুঁড়ির পরিধি প্রায় পঞ্চাশ ফুট। যে সকল অস্থায়ী বৃক্ষ আমেরিকায় জন্মায় তাহাদিগের অধিকাংশই জাপানে দৃষ্ট হয়। প্রাচীর প্রান্তস্থিত এই বিচিত্র দ্বীপপুঞ্জকে এশিয়া-সুলভ এবং আমেরিকা-সুলভ তরুলতার মিলন-ক্ষেত্র বলা চলে। জাপানের বহু অংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন। কিয়দংশ সবুজ শোভায় আচ্ছাদিত শৈলমালায় পরিপূর্ণ। যাহাই হউক, জাপানের প্রত্যেক প্রান্তর ও উপত্যকা এই অধ্যবসায়ী জাতির শ্রমশীলতা ও কর্ম্মকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। ভূমির ক্ষুদ্রতম খণ্ডকেও ব্যর্থ বা পতিত-রূপে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। যাহা বিরাট আকারে বিদ্যমান, কলা-কুশলী জাপানীরা তাহারই শিশু-সুলভ ক্ষুদ্র একটি সংস্করণ নিজ নিজ গৃহ-পার্শ্বে গড়িয়া তুলিয়া প্রবল সৌন্দর্য্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করে।

জাপানীদের ন্যায় পুষ্পপ্রিয় জাতি পৃথিবীতে অতি অল্পই আছে। প্রস্ফুটিত পুষ্প-পুঞ্জকে অবলম্বন করিয়া জাপ জাতি বহু গল্প, গাথা ও গীতি রচনা করিয়া স্বীয় সাহিত্যকে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। যে দেশের নরনারী পুষ্পকে এত ভালবাসে সেই দেশের পুষ্প-পুঞ্জ বর্ণ-বৈচিত্র্যে যতই মঞ্জুল মূর্ত্তি হউক, সুমধুর সৌরভ সম্বন্ধে তাহাদের দীনতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, গ্রীষ্মকালে জাপানী ফলেরও স্বাদ ও গন্ধ হ্রাস পাইতে দেখা যায়। কমলালেবু, আঙ্গুর, আনারস, কলা, আপেল, কুল, চেরি, মালবেরি প্রভৃতি ফল জাপানে জন্মায়। শাক-সব্জির মধ্যে ছিমি, পেঁয়াজ ও এক প্রকার দীর্ঘদেহ মূলা এই দেশে উৎপন্ন হয়। এক গজ লম্বা মূলা এখানকার বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়।

জাপ-মহিলাদের পুষ্প-প্রীতি ও কেশ-প্রসাধনের প্রণালী লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ছাগ, মেষ, ও গর্দ্দভ—ইহারা আদৌ জাপান সুলভ জীব নহে। এই ত্রিবিধ পশু পূর্ব্বে এই দেশে ছিল না, পরে অপর দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। এই দেশে উৎপন্ন গরু ও ঘোড়াও উৎকৃষ্ট নহে। এখানকার ঘাসগুলির কোমলতা ও সরসতা কম বলিয়া উহারা পালিত পশুপালের শারীরিক বৃদ্ধি বা বিকাশের পক্ষে তেমন অনুকূল বা সহায়ক নহে। চীনের ন্যায় এখানে শূকরের সংখ্যাধিক্যও আমরা দেখিতে পাই না। এক প্রকার দীর্ঘপুচ্ছ পালিত পক্ষী এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহাদের পুচ্ছগুলি কয়েক গজ লম্বা হইয়া থাকে। উত্তরস্থ তুষার-ক্ষেত্রের পার্শ্বে এক প্রকার বাঁদর বাস করে। অরণ্য প্রদেশে ভল্লুক, শূকর, নেকড়ে প্রভৃতি হিংস্র-স্বভাব জন্তু দৃষ্ট হইয়া থাকে। জাপানীরা এই সকল হিংস্র পশু অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ মক্ষিকা ও মশকাদি পতঙ্গের আক্রমণের জন্যই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকে।

স্যার এডউইন্ আর্ণল্ডকে জাপান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ বলা চলে। ইনি "লাইট অফ এশিয়া" নামক বুদ্ধদেবের পবিত্র চরিত্রমূলক কাব্য রচনা করিয়া বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। জাপানের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক বহুবার্ত্তা আমরা ইঁহার রচনা বা বর্ণনা হইতে অবগত হইয়া থাকি।

প্রত্যেক জাপানী গৃহের সহিত একটি করিয়া বাগান সংলগ্ন থাকে। জাপানীরা ফুল ও ফল দুয়েরই চাষ করিতে বিশেষ ভালবাসে। তাহারা কৃত্রিম উপায়ে বাগানের বুকে একটি ক্ষীণা স্রোতস্বিনী বা ক্ষুদ্র হ্রদ রচনা করে। এমন কি, সেই নদীর উপর বিস্ময়কর কলা-কৌশলের পরিচায়ক ছোট একটি সেতু পর্য্যন্ত গড়িয়া তোলে। প্রকৃতির বুকে

জাপানে বহু প্রকার বিচিত্র বর্ণের কীট-পতঙ্গ দেখা যায়। জাপানের দীর্ঘপুচ্ছ, পক্ষ, বা পদ-বিশিষ্ট বিশেষ বিচিত্র-দর্শন কীটগুলি দেখিলে স্রষ্টার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের বিষয় চিন্তা করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। ঈগল হইতে কাক পর্য্যন্ত বহু প্রকার পক্ষী জাপানে বাস করে। ঈগল ও কাক এখানে প্রচুর দেখা যায়। এই দেশের সরীসৃপ-সংখ্যা তেমন অধিক নহে। সালামাণ্ডার নামক এক প্রকার বিশেষ বৃহদাকার সরীসৃপ এই দ্বীপপুঞ্জে দৃষ্ট হয়। কতিপয় সর্প দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা তেমন ক্ষতিকারক নহে।

জাপানের চতুর্দ্দিকস্থ জলরাশি মৎস্যে পরিপূর্ণ। মহা-সমুদ্রের অন্য কোন অংশে এত মৎস্য দেখা যায় না—বিশেষজ্ঞগণ এই মত প্রকাশ করেন। স্বাদু-সলিলপূর্ণ নদী-হ্রদাদিতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্রাকার মৎস্য সকল বাস করে। এই সকল মৎস্যের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য, দুইটি, তিনটি বা তদধিক পুচ্ছ। জাপানীরা পুচ্ছবিহীন মার্জ্জার পুষিয়া থাকে এবং এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার সুদৃশ্য কুকুর পুষিতে ভালবাসে। এই সকল জাপানী কুকুর ইংরেজরাও সযত্নে পুষিয়া থাকে। ইতর প্রাণীর প্রতি অনুকম্পা জাপানীদের গুণাবলীর অন্যতম।

ধাতু-পদার্থের মধ্যে তাম্র, লৌহ ও রৌপ্য জাপানে পাওয়া যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে প্রচুর পাথুরে কয়লা এখানে বিদ্যমান। আগ্নেয়গিরি-প্রধান স্থানগুলিতে প্রচুর গন্ধক অবস্থিত। জাপানে পেট্রোলিয়ম্‌ও পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক কাউণ্টি হইতে চায়না-ক্লের অন্যতম উপাদান কেওলিন জাপানে চালান যায়। কলা-কুশলী জাপানীদের পক্ষে ইহা পরম প্রয়োজনীয় পদার্থের অন্যতম বলিয়া গণ্য।

জাপান-দ্বীপমালার বৃহত্তম দ্বীপ হণ্ডো সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ প্রদেশও বটে। ইহার বক্ষে বিশাল বাহুর মত চারিদিকে শৈলমালা প্রসারিত। এই সকল শৈলমালার সর্ব্বোচ্চ শিখর দক্ষিণ উপকূলের সন্নিকটে অবস্থিত। ইহার নাম ফুজি-ইয়ামা বা ফুজি-সান। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২ হাজার ৪ শত ফিট উচ্চ। জাপানী শৈলসমূহের সম্রাট্ স্বরূপ মহান্ মূর্ত্তি ফুজি-সানকে একশত মাইল দূর হইতেও দেখা যায়। এই সমুন্নত শৈল-শিখরের পাদ-পীঠ ১ শত ২০ মাইল দীর্ঘ। এই দূর-প্রসারিত পাদ-পীঠের উপর তুষার-মুকুট-মণ্ডিত মস্তকে দণ্ডায়মান ফুজিসান দর্শকের অন্তরে স্বতঃই একপ্রকার সম্ভ্রম-গম্ভীর ভাব সঞ্চারিত করে। জাপানীদিগের নিকট এই তুষার-শুভ্র-শীর্ষ অভ্র-ভেদী পর্ব্বত শুধু প্রীতিপ্রদ নয়, পরম পূজনীয় পদার্থ। দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র জাপানীরা ইহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে। হাজার হাজার
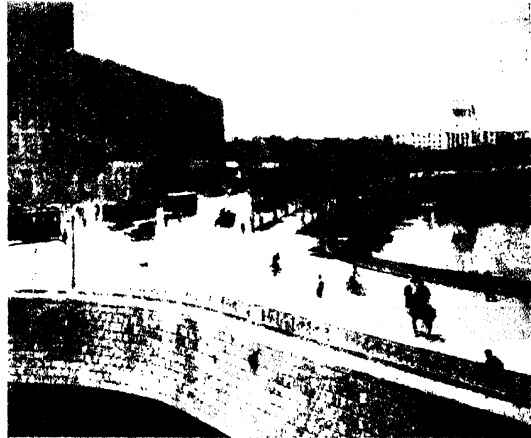
আধুনিক টোকিয়ো।

তীর্থযাত্রী শুচিতার পরিচায়ক শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক এই পবিত্র পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য বলিয়া গণ্য করে। ফুজি-ইয়ামা বা ফুজি-সান শব্দের অর্থ অতুলনীয় শৃঙ্গ।

হণ্ডো-দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত রেলপথ প্রসারিত। প্রত্যেক নগর ও বন্দর রেলপথের সহিত সংযুক্ত। সমুদ্রের তীরে তীরেও রেল-রাস্তা রচিত রহিয়াছে। চলিবার পথগুলি উৎকৃষ্ট না হইলেও বৃক্ষ-বীথী-বেষ্টিত বলিয়া বিশেষ সুদৃশ্য। মধ্যে মধ্যে বিরাজিত উদ্যানাবলী-মণ্ডিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি পথের মনোহারিত্ব আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। এই সকল পথের উপর দিয়া জাপানের জাতীয় যান রিক্‌শ, পাল্কী, ভারবাহী পশুর দল

চলিয়াছে। বর্ত্তমানে অশ্বযানই অধিক দেখা যায়। অধুনা মোটরের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া জাপানের ক্রম-বর্দ্ধমান সমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রধান দ্বীপ হণ্ডোর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, গভীর ইয়েডো উপসাগরের পার্শ্বে বা শীর্ষে জাপানের রাজধানী টোকিয়ো মহানগর অবস্থিত। পূর্ব্বে শোগান-নামক শাসন কর্ত্তা-দিগের আধিপত্যকালে ইহা 'ইয়েডো' আখ্যায় বিখ্যাত ছিল। এই শাসন-কর্ত্তৃপদ বিলুপ্ত হইলে জাপ-সম্রাট্ বা মিকাডো 'টোকিয়ো' বা "প্রাচ্য রাজধানী" নাম দিয়া এই নগরকে স্বীয় বাসস্থান ও শাসন-কেন্দ্রে পরিণত করেন। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক হইবে। পরিখা, প্রণালী, উদ্যান, ময়দান ও মঠ-মন্দিরাদি-মণ্ডিত এই মহান্ জনপদ বর্ত্তমান জগৎ বা নবযুগের বৃহত্তম নগরসমূহের অন্যতম বলিয়া গণ্য। এসিয়ার সহরসমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল। এই মহানগর প্রায় একশত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া বিরাজিত। এই জনপদের অধিকাংশ একটি নদীর দক্ষিণ তীরে দণ্ডায়মান। এই নদী নগরের অদূরে সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। নদীর বক্ষে একটি সুদীর্ঘ ও সুদৃশ্য সেতু বিদ্যমান।

অধুনা ইউরোপীয় প্রণালীর অনুকরণে এই বিরাট নগরে প্রশস্ত পথ ও বড় বড় বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রধান পথটি গিঞ্জা (Ginja) আখ্যায় অভিহিত। ইহার উপর দিয়া ট্রাম যাওয়া-আসা করে। পথের দুই ধারে ফুটপাথ, ফুট-পাথের পার্শ্বে বড় বড় দোকান, দেখিলে ইউরোপীয় নগর বলিয়া ভ্রম হওয়া অসম্ভব নয়। নগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শিরো-নামক অংশে সম্রাট্ বাস করেন।

ব্যথার গান

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

স্বামী তা গিয়াছে দূরে বহু দূরে পনর বছর আগে,
স্মৃতিটি তাঁহার রহিয়া রহিয়া মনের পটেতে জাগে।
শ্বশুর ছিল যে 'লাখপতি' মোর সেও ত' গিয়াছে চলি,
ঘাত-প্রতিঘাতে শুষ্ক মলিন পরাণ কুসুম কলি।
বেদনায় রচা ধরণীর ঘরে থাকিতেও সাধ নাই—
হৃদয়-বীণায় ঝঙ্কারি ওঠে বেদনা যে একঘাই।
অতুল বিভব ধন-ধান সব কিছুই আজিকে নাই,
রাজার রাণী যে ভিখারী সেজেছে বিশ্ব কাঁদিছে তাই!
লতা-পাতা-ঘাসে ছেয়ে গেছে মোর শ্বশুরের ভিটে-খান,
শ্বাপদে বাসা বাঁধিয়াছে কত, প্রাণ করে আনচান।
বৈঠকখানা ফুলের বাগান স্বামীর বিহার আজ,
নিলামে চড়েছে শ্মশান হয়েছে—হানিছে শতেক বাজ।
সখের পুকুর, কত যে ফসল ফলিত তাহার পারে,
এ সব এখন কল্পনা শুধু সহিতে পরাণ নারে।
পাঠায়ে ছিলেন হাজার টাকা যে বাগান কিনিব বলে,
পরাণেতে সাধ বাঁধিয়া তিনি গো কোথায় গেলেন চলে।
আমি যে অভাগী কাঁদি দিবারাত নাহিক দুঃখের বাড়া,
করুণ কাহিনী শুনিবে কি কেউ আমি যে বিশ্বছাড়া!
স্বামীর ভিটাই নারীর নিকট কাশী ও বৃন্দাবন,
তাহারি বুকেতে কাঁদিবার স্থান পাই নাক অনুখন।
তুলসীর মূলে সাঁজের বেলায় ধরিব প্রদীপ খান,
সেটুকু ভাগ্য দেয় নিক হায় অকরুণ ভগবান্।
জননী আমার আশ্রম এক দিলেন হোথায় গড়ি,
পুঁজি-পাটা তাঁর শেষ সম্বল বিলান নিঃশেষ করি।

সাধু-মহারাজ ভিটেখান তবু বলেন করিতে দান,
বাল-বিধবার শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাঁদে নাই তাঁর প্রাণ!
বিশ্ব-মানবে বলে যাই শুধু করুণ গাথার শেষে
কত প্রতারক বেড়ায় ঘুরিয়া সাধু-ফকিরের বেশে।
বাল-বিধবার অশ্রু-পাথার ঝরিছে অনর্গল,
ব্যথীরে কাঁদানো মহানের কিগো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বল?

দাঙ্গাহাঙ্গামার দমদল

সহর অঞ্চলে যেমন আগুন লাগিলে আগুন নিভাইতে দমকল ছুটিয়া আসে, গান্ধীজী তেমনি দাঙ্গা বাধিলে দাঙ্গা থামাইতে ছুটিয়া যাওয়ার জন্য শান্তি সেনা গঠনের পরিকল্পনা করিয়াছেন। ফায়ার ব্রীগেড দমকলের সাহায্যে জল দিয়া, অন্য উপায়ে গ্যাস প্রভৃতি দিয়া আগুন নিভায়, শান্তি ব্রীগেডও তেমনই গান্ধীজীর আবিষ্কৃত অহিংসা-বরফ গলান রস দিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামার উত্তেজনা শান্ত করিতে পারিবে ভরসা করা

সমস্যা

—শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

অনুপমা তার স্বর্গগতা সপত্নীর সন্তান গৌরকে কিছুতেই ভালবাস্‌তে পারলে না। অবশ্য, সে নিজেই বুঝতে পারত না কতখানি ভালবাসে সে, কিন্তু তার মনে হতে লাগল যে, সে ভালবাস্‌তে পারছে না। ইতিপূর্ব্বে সে আত্মীয়দের কাছ থেকে শুনেছে সৎমাদের অত্যাচারের কাহিনী, গল্পে-উপন্যাসেও পড়েছে ঐ একই কথা, তাতে তার ধারণা হয়েছিল যে, সৎমা বুঝি কখনও সপত্নী-সন্তানকে ভালবাস্‌তে পারে না। বিয়ের আগে যখন সে শুনল যে, তার ভাবী স্বামীর একটি সন্তান বর্ত্তমান, তখন সে সব লজ্জার বাধা কাটিয়ে বাবাকে বলল, 'বাবা, আমি বিয়ে করব না।' বাবা প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলেন, তারপরে বললেন,—'কেন ?'

'আমাকে তা'হলে সৎমা হতে হবে',—ভয়ে তার গলা কেঁপে গেল। বাবা এবারও তার কথা ভাল বুঝলেন না, বললেন, 'তাতে হয়েছে কি? অনেকেই ত হয় আর ছেলে এমন কিছু বড় নয়, মোটে চার বছরের।'

অনুপমা কেঁদে ফেলল, বলল, 'না না লোকে বলবে, সৎমা, সে আমি সইতে পারব না।'

বাবা এইবার তার দুঃখ বুঝলেন, মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'কাঁদিসনে মা, ভুপতি বড় চাকুরী করে, স্বভাব-চরিত্র ভাল, তোকে সুখে রাখবে। শাশুড়ী, ননদ নেই, তুই হবি বাড়ীর গিন্নী, আর ছেলে মানুষ করা? সে ত গৌরবের বিষয় মা, তোর ছেলে যদি দশজনের মধ্যে একজন হয় তাহলে তোর কত গৌরব বল্‌ত মা?' অনুপমা কিছু বলল না। বাবা বল্‌তে লাগলেন, 'আর আমার বিষয়টাও ত ভাবতে হবে। পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে আমি কদিক্‌ই বা সামলাতে পারি। ছেলেদের পড়াশুনা আছে, সংসার আছে, বাড়ীর ভাড়া আছে, তোকে যে অপাত্রে দিতে হচ্ছে না, এইটিই আমার ভাগ্য।'

অতঃপর অনুপমার ভুপতির সঙ্গেই বিয়ে হয়ে গেল ভুপতির বয়স বেশী নয়, বছর আটাশ, প্রথম বিয়ে হয় বাইশ বছর বয়সে। ভুপতিকে দেখেই অনুপমার ভাল লাগল—সুন্দর চেহারা, স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহ, স্নেহপূর্ণ কোমল মুখের ভাব। ভুপতিও অনুপমাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল —গৌরকে সঙ্গে করে এনে 'নতুন' মায়ের হাতে সঁপে দিল। অনুপমা ছেলেকে দেখল,—তাকে না ভাল-বাসবার মত কিছুই ছিল না। গৌরবর্ণ সুশ্রী ছেলেটিও নতুন মাকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনুপমা তাকে বুকে টেনে নিল ভুপতি যথার্থ সুখী হল, চোখের কোণে জল মুছে ফেলে অন্যদিকে চলে গেল।

অনুপমা ঘর-সংসার বুঝে নিল। বোঝবার মত বিশেষ কিছু ছিল না, বড় বাড়ী, ঠাকুর চাকর দরোয়ান সবই রয়েছে। এক বুড়ো পিসীমা আছেন, কিন্তু নাম-মাত্র আছেন, ঘর-সংসারের দিকে তাকান্ না, পূজা অর্চ্চনা নিয়েই থাকেন। অনুপমার যা কাজ সেটি হচ্ছে খোকার আদর যত্ন করা। অনুপমা এই জিনিষটাকেই ভয় করেছিল। সে ভেবেছিল, রান্নাবান্নার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখলে হয়ত ছেলেকে নিয়ে আর গণ্ডগোলে পড়তে হবে না, কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল, রান্নাঘরে আর সে আমল পেল কই? খোকাও যেন নতুন মাকে পেয়ে অন্য খেলা ভুলে গেছে, দিনরাত তার কাছেই থাকে। অনুপমাও তার যত্নের ত্রুটি রাখল না। খোকা কাছে থাকলে সে যে অসন্তুষ্ট হত তা নয়, কিন্তু তার কেবলি মনে হত, যে তার নিজের সন্তান নয় তাকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখবে কি করে? খোকার নাওয়া খাওয়ায় কিছুমাত্র অযত্ন সে হতে দিত না, তাকে কিছুমাত্র অনাদর করত না, কিন্তু তবু যেন তার মনে হত, সে তাকে ভালবাসতে পারছে না। এ ধারণা যেন অনুপমাকে পেয়ে বসল, কোন উপায়ে কিছুতেই সে শান্তি পেল না। সে ভেবে দেখল, তার নিজের বাড়ীর কাজে তার ভাইদের নাওয়ান খাওয়ানর মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়তার সুর বাজত,

কিন্তু, এখানে সে সুর বাজে না। গৌর যখন তাকে মা বলে ডাকে তখন সে খুসী হয়ে তাকে কোলে নেয় বটে, কিন্তু তার পরেই তার মনে হয়, সেই তৃপ্তি সে পাচ্ছে না ছেলেকে কোলে নিয়ে। এ বাড়ীতে নিঃসঙ্গ জীবনে একটা অদ্ভুত ধারণা তাকে প্রতিনিয়ত পীড়া দিতে লাগল। একদিন সকালবেলা সে সোজা স্বামীর কাছে গিয়ে হাজির হল। ভূপতি তখন খাসকামরায় অফিসের কাগজ-পত্র দেখছে। পর্দ্দা ঠেলে অনুপমা ঢুকতেই অতিমাত্র ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, 'হয়েছে কি, এমন সময় এখানে?'

অনুপমা সহজভাবে বলল, 'হয়নি কিছু, তুমি রোজ কি কর তাই দেখতে এলুম।'

'—ওঃ', ভূপতি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর কলমটা ফেলে দিয়ে একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে বলল, 'কেমন লাগছে তোমার অনুপমা?'

'বেশ; কিন্তু কাগজের ওপর ছেলেমানুষের মত কালি ফেলছ কেন?'

'আমি ফেলিনি', ভূপতি হাসতে হাসতে বলল, 'ওটা তোমার ছেলে ফেলেছে। কিছু তো বলবে না ওকে,—দিন দিন দুষ্টু হচ্ছে কেবল।'

অনুপমা চম্‌কে উঠল 'তোমার ছেলে' কথাটাতে। সে ভাবতে লাগল, কেমন সহজভাবে ভূপতি কথাগুলি বলল, কিন্তু সে মেনে নিতে পারল কৈ? তার ছেলে····· লোকের চোখে সে তো তারই ছেলে, কিন্তু সে নিজে তো ভাবতে পারে না এ কথা! 'আচ্ছা—' সব লজ্জার বাধা কাটিয়ে অনুপমা প্রশ্ন করল, '—আমি তো ওর সৎ-মা?'

প্রশ্ন শুনে ভূপতি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বললে, 'সৎ-মা কিনা জানি না, কিন্তু আমি শুধু জানি যে, তুমি ওর মা।'

অনুপমা কি বলবে ভেবে পেল না। স্বামীর এই বিশ্বাসের মর্য্যাদাকে সে অপমান করে এসেছে ভেবে তার বুকটা তোলপাড় করে উঠল। একবার মনে করল, স্বামীকে এত বড় লজ্জার কথাটা আর জানিয়ে কাজ নেই, কিন্তু সে নাকি আজ প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল যে, স্বামীকে সে আজ মনের কথা অকপটে খুলে বলবে-ই, তাতে যে-শাস্তিই তার কপালে থাক, তাই কোন রকমে সে মাটির দিকে চেয়ে বলল, 'না না, তুমি ভুল বুঝেছ, আমি তাকে ভালবাসতে পারি নি,—কিছুতেই পারছি না।' অনুপমা উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল, দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রইল, বড় বড় জলের ফোঁটা আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল টেবিলে।

ভূপতি স্তম্ভিত হয়ে গেল। একে তো সহসা এ-প্রসঙ্গে সে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল—কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না, তার উপর অনুপমার ক্রন্দন দেখে সে অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল—খানিকক্ষণ কিছু বলতেই পারল না। তারপর উঠে এসে অনুপমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'অনু! কি বলছ?'

অনুপমা উত্তর দিল না।

ভূপতি ধীরে ধীরে ক্লিষ্টস্বরে বলল, 'সত্যই কি গৌরকে তুমি ভালবাস না?'

অনুপমা আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

ভূপতি বিচলিত হয়ে উঠল, ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল। দু'হাতের ওপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'তা হলে ওকে এত যত্ন কর কেন?'

অনুপমা স্বামীর দিকে তাকাইল; বলল, 'আমি মেয়েমানুষ, যত বড় পাষাণই হই না—ছেলের অযত্ন দেখতে পারি না।'

ভূপতি বুঝে উঠতে পারল না, অনুপমা তাকে কি বোঝাতে চায়। অনুপমা ছেলেকে আদর করে, যত্ন করে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না। এ কি ভয়ানক জটিল ব্যাপার এবং এর সমাধানই বা হবে কেমন করে?

অনুপমা কম্পিতকণ্ঠে বলল, 'একটা কথা বিশ্বাস করবে?'

ভূপতি উত্তর দিলে, 'কি?'

'—তবে, এ কথা জেনে রেখ যে, কোন অনিষ্ট বা অত্যাচার হবে না ওর ওপর। ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি, আমি ওকে ভালবাসতে আপ্রাণ চেষ্টা করছি, কিন্তু আমি যে সৎমা—কি করে ওকে মায়ের মত ভালবাসব!'

ভূপতি কিছু বলল না, অনেকক্ষণ চুপ করে রইল,

তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'চল আমরা যাই এখান থেকে।'

এর পরে একটা বিচ্ছেদ স্বাভাবিক। ভূপতির দিন বাইরে বাইরে-ই কাটতে লাগল। ও-দিকে গৌরকে আর অনুপমা কাছে কাছে পায় না। চাকরকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, 'বাবু বেড়াতে নিয়ে গেছেন।' স্বামীর অবহেলা অনুপমার অসহ্য হ'ল। স্বামীর নীরবতা তাকে নিরন্তর পীড়া দিতে লাগল। সে বুঝতে পারল, স্বামী কি ভেবেছেন। এই ধারণায় তার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তিনি কি মনে করেন, সে গরীবের মেয়ে, টাকা-পয়সা হলেই তার সব হ'ল! সে গরীব, কিন্তু সে নীচ নয়। অনুপমা আবার একদিন খাস্‌কামরার পর্দ্দা উঠিয়ে ঘরে ঢুকল।

ভূপতি গম্ভীরভাবে অভ্যর্থনা করে বলল, 'এস।'

অনুপমা একটা চেয়ারে বসল। খানিকক্ষণ দু'জনের কোন কথা হ'ল না; তারপরে অনুপমাই আরম্ভ করল, 'আমাকে তুমি তা'হলে বিশ্বাস কর না?'

কাগজপত্র থেকে চোখ উঠিয়ে ভূপতি বলল, 'কেন?'

'খোকাকে তা' হলে ছিনিয়ে নিলে কেন?'

'ছিনিয়ে তো নিই নি।' সহজভাবে ভূপতি উত্তর দিল, 'কিন্তু, খোকার জন্য কি আজ হঠাৎ মনটা কেমন করে উঠল?'

এ-কথার উত্তর দিতে গিয়ে অনুপমার ঠোঁট কেঁপে উঠল। সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে বলল, 'দেখ, অন্য লোক আমাকে সৎ-মা বলে গাল দিতে পারে, কিন্তু তুমি আমার স্বামী হয়েও কি এমন করে বলবে?'

ভূপতি ব্যস্ত হয়ে পড়ল,—কথাটা বাস্তবিক রূঢ় হয়ে গেছে। এ-রকম বলবার ইচ্ছা তার ছিল না। তাড়া-তাড়ি উঠে অনুপমার হাত চেপে ধরে বলল, 'আমায় মাপ করো অনু! সত্যই অন্যায় হয়ে গেছে।'

অনুপমা কিছু বলল না, টেবিলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।

ভূপতি অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। অনেক-ক্ষণ পরে ভূপতি বললে, 'অনুপমা! তুমি না হয় কিছুদিনের জন্য বাড়ী থেকে ঘুরে এস।'

অনুপমা মুখ তুলে চাইল, বলল 'কেন?'

'তাই ভাল অনু! এ-বিরোধ মেটাবার জন্য কিছুদিন আমাদের পরস্পরের দূরে থাকা দরকার।'

'কি লাভ হবে?' অনুপমা প্রশ্ন করল।

'দূরে থাকলে আমরা হয়তো পরস্পরকে ঠিকভাবে বোঝবার অবকাশ পাব।'

অনুপমা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তা' হলে আমাকে বাড়ীতেই পাঠিয়ে দাও, আমি আর এখানে থাকতে চাই নে।'

'তাই যাও'—ভূপতি বলল, 'কিন্তু, আমাকে ভুল বোঝ না অনুপমা, আমি তোমার স্বামী, তুমি আমার স্ত্রী, গৌর তোমার ছেলে, এর বেশি তুমি আর কি চাও? গৌরকে ভালবাসতে না পার, শুধু একটু যত্ন কোরো তা হলেই তার হবে।' শেষটায় ভূপতির গলা ধরে এল, অনুপমা তাকিয়ে রইল অপরাধীর মত।

অতঃপর ভূপতি খোকাকে নিয়ে গেল দার্জ্জিলিংএ, আর অনুপমা একলা গেল বাপের বাড়ী। ভূপতি হয় ত অনুপমাকে কতকটা বুঝতে পেরেছিল তাই দূরে যাবার প্রস্তাব করল। অনুপমা যে গৌরকে ভালবাসে তার পরিচয় ভূপতি পেয়েছে, কিন্তু এই যে হৃদয়কে অবিশ্বাস, এর মূলে হয় ত আছে, সৎমা সম্বন্ধে অনুপমার বিপরীত ধারণা। ভূপতি ভেবেছিল, কিছুদিন দূরে থাকলে হয় ত অনুপমা ঠিক বুঝতে পারবে, গৌরকে সে ভালবাসে কি না, তা হলে আর কোনই সন্দেহ থাকবে না তার মনে। আর অনুপমাও চেয়েছিল মুক্তি, শুধু শুধু মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। দার্জ্জিলিং-এ ভূপতি খবর পেল অনুপমার ছেলে হবে। এ সংবাদে ভূপতি খুসী হল, কিন্তু অনুপমা শান্তি পেল না। এতকাল সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল, যেন তার সন্তান না হয়, তা হলে সে হয় ত গৌরকে ভালবাসতে পারবে না। কিন্তু, ভগবান্ তার সে ইচ্ছায় বাধা দিলেন। অনুপমার মনে হল সে পাগল হয়ে যাবে। অন্ধকার রাতে ছাদের উপর একলা বসে সে ভাবতে লাগল··· স্বামীর কথা। গৌর এতক্ষণ অঘোরে ঘুমোচ্ছে তার বাপের কাছে, সে কেমন আছে কে জানে? অনুপমার

চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই সুকুমার শিশুদেহ, আর মিনতিপূর্ণ চোখ দুটি। হঠাৎ গৌরের জন্য অনুপমা ব্যথা বোধ করতে লাগল। এতদিন পরে সে বোঝবার অবকাশ পেলো, গৌরকে সে মায়ের মত ভালবাসে কি না। মায়ের ভালবাসা কি, এতদিন সে বোঝে নি, তাই কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু আজ সে বুঝল আপনার হৃদয় দিয়ে। কিছুদিন পরে সে হবে সন্তানের জননী, তার হৃদয়ে যে মাতৃস্নেহ উদ্বেলিত হোয়ে উঠেছে, তাই দিয়ে সে আজ বুঝলে গৌরকে সে দূরে রাখতে পারবে না। যে স্নেহ দিয়ে সে আপন সন্তানকে ঘিরে রাখবে, সেই স্নেহ থেকে গৌরকে বঞ্চিত রাখতে পারে না, যদি পারত তা হলে অনুপমা নিজেকে নিজের সন্তানের মা বলতে পারত না। আজ তার মনে হল, এত দিন যাকে আপনার ভেবেছে, তার কাছ থেকে সরে গিয়ে কখন গোপনে গোপনে যাকে পর ভেবেছে, তাকেই আপন করে নিয়েছে। তার মনে পড়ল, স্বামী মিনতি করে বলেছিলেন,—গৌরকে একটু যত্ন কোরো, আজ সে ভাবল গৌরকে সে আদরও কর্‌তে পারে, অনাদরও করতে পারে, মায়ের মত অনাদর, কারুর কিছু বল্‌বার থাক্‌বে না সে অনাদরে।

নিবিড় অন্ধকারে তার দু' চোখ ছাপিয়ে নাবল অশ্রু। সেই অশ্রুধারায় তার সব কষ্ট ধুয়ে গেল, নক্ষত্র-খচিত আকাশের দিকে চেয়ে নীরবে সে ভগবানের উদ্দেশ্যে অজস্র প্রণতি পাঠাতে লাগল।

পরদিনই সে স্বামীকে খুলে লিখে দিল তার মনের সব কথা।

বঙ্গশ্রী

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

উদয়ে যাঁদের উজ্জ্বল দিবা,
বিলয়ে আঁধার রাতি,
এমন মানুষ অনেক এসেছে
গড়েছে বাঙালী জাতি
যাঁদের জীবন, যাঁহাদের প্রাণ
জাতির জীবনে এনেছিল বান,
সাধ জাগে তারি খুঁজিতে প্রমাণ
তাই করি আতি-পাতি।
কোথা বঙ্গের হেমঘটে সেই
চারু পল্লব-পাঁতি?

ক্ষীণ-দ্যুতি মোরা খদ্যোতের সম
মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলি,
শত জ্যোতিষ্ক-জ্যোতি-কণা বুকে
গরবেতে উচ্ছলি!
যে-পথে তাঁদের উড়ে উত্তরী
প্রাণের কামনা সে-পথে বিচরি,
তাঁহাদেরি পূত পদ-রেখা ধরি'
যাঁরা এ জাতির সাথী।
বঙ্গের শ্রী এ পূর্ণ ঘটের
কোথা পল্লব-পাঁতি?

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

জনসংখ্যা

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রথম আদমসুমারী বা জনসংখ্যা-গণনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়। তারপর হইতে আজ অবধি যতগুলি গণনার বিবরণ আমরা পাইতেছি, তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। কালক্রমে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু নদীয়ায়, সেই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এইখানকার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ত হয়ই নাই, বরং তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে।

১৮৭২ খৃঃ আদমসুমারীতে নদীয়ার অঙ্ক পাইতেছি—১৫,০০,৩৯৭। এই বৎসর যে-ভাবে গণনা করা হইয়াছিল বলিয়া হাণ্টার সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে এই সংখ্যা অবশ্য মোটেই নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। হাণ্টার সাহেব তাঁহার নদীয়ার বিবরণী ('Statistical Account of Nadia') গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, এই সময়ে সর্ব্বপ্রথম লোক-গণনার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিতে গেলে ইহার উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া নূতন কর ধার্য্য হইবার আশঙ্কায় জনসাধারণ বিশেষ উত্তেজিত হইয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। এইখানকার কোন সুচতুর জমিদার, যুবরাজের এ দেশে আগমন উপলক্ষ্যে মিষ্টান্ন-বিতরণের লোভ দেখাইয়া অশিক্ষিত প্রজাবর্গকে কিয়ৎ পরিমাণে শান্ত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। তথাপি, অনিশ্চিতের আশঙ্কা ও কুসংস্কারের বশে প্রথম বৎসরে অনেকেই প্রকৃত সংখ্যা গোপন রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে প্রথম বৎসরের গণনার কোনও বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। অবশ্য, আদমসুমারীর প্রদত্ত সংখ্যা যে, কোন বৎসরেই ঠিক যথাযথ পাওয়া যায় তাহা নহে, জনসাধারণের সততার উপরেই ইহার সত্যতা অনেকাংশে নির্ভর করে, এবং কুসংস্কারের বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সত্য সংখ্যা গোপন করিবার বা বৃদ্ধি করিয়া দিবার সম্ভাবনা যে একেবারে নাই, এমন নহে। তা ছাড়া কাগজ-পত্রে সংখ্যা-সঙ্কলনেও ত্রুটি থাকিবার সম্ভাবনা। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যাইতে পারে, একই বৎসরের জনসংখ্যা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টে বিভিন্ন প্রকার করিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

১৯২১ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার মোট জনসংখ্যা—১৪,৯৫০,৯৮

(Bengal District Gazetteer, Vol. B 1933)

১৯২১ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার মোট জনসংখ্যা—১৪,৮৭,৫৭২

(Bengal District Gazetteer, Vol. B 1923)

অন্যান্য শিরোনামাতেও এই প্রকার সংখ্যার পার্থক্য অনেক আছে এবং সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে উক্ত প্রকার বহু সন্দেহের কারণ পাওয়া যাইবে। তৎসত্ত্বেও ইহাই এক-মাত্র প্রাপ্তব্য সংখ্যা এবং মোটামুটি ভাবে কাজ চালানর মত অনেকটা নির্ভরযোগ্যও বলা যাইতে পারে।

ইহার নয় বৎসর পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর সংখ্যা পাই—১৬৬২৭৯৫; অর্থাৎ জনবৃদ্ধির হার শতকরা ১০.৮। বলাই বাহুল্য, প্রথম বৎসরের সংখ্যা বিশেষ সন্দেহ-যুক্ত হওয়ায়, এই প্রকার তুলনার কোন মূল্য নাই।

ইহার পর হইতে নদীয়ার মোট জনসংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতে থাকে। নিম্নে ১৮৭১ খৃঃ হইতে ১৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত জনসংখ্যার একটা মোট হিসাব দিলাম।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে	১৫০০৩৯৭ (?)
১৮৮১ "	১৬৬২৭৯৫
১৮৯১ "	১৬৪৪১০৮
১৯০১ "	১৬৫৮২৮১
১৯১১ "	১৬১৭৪৬২
১৯২১ "	১৪৮৭৫৭২
১৯৩১ "	১৫২৯৬৩২

এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরে নদীয়ার জনসংখ্যা-বৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, নিম্নে প্রদত্ত গ্রাফ-চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, যেরূপ দ্রুতবেগে ইহা ধ্বংসের পথে ছুটিয়াছে তাহাতে এই জেলার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হইবার কারণ আছে।

পূর্ব্বে অবশ্য নদীয়া জেলার আয়তন বর্ত্তমান অপেক্ষা আরও বিস্তৃত ছিল এবং ১৮৭২ ও ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনার সময়ে বনগ্রাম সবডিভিশন ছিল নদীয়ার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু, সেইজন্য উপরোক্ত সংখ্যার হিসাবে কোনই * গণ্ডগোল হয় নাই, কারণ এই দুই বৎসরের সংখ্যা যথোপযুক্ত হিসাব নিকাশ করিয়াই নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।
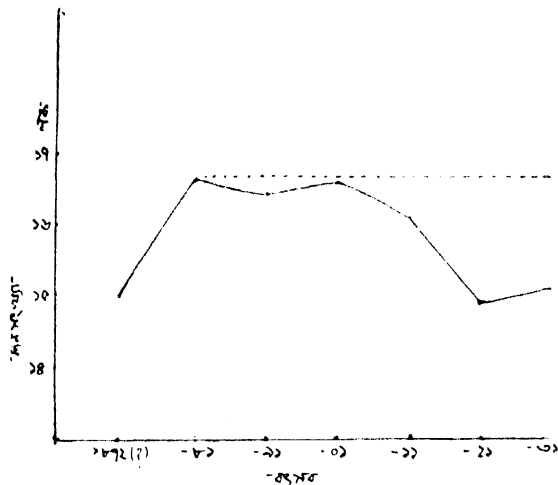
মানচিত্র।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে বর্ত্তমানে নদীয়ার মোট জনসংখ্যা—১৫,২৯,৫৩২। নিম্নে ইহার বিশদ বিবরণ দিলাম।

সবডিভিশন	বর্গমাইলে আয়তন	সহর-গ্রাম সংখ্যা	জন-সংখ্যা সংখ্যা	বর্গমাইলে জনসংখ্যা	গত ১০ বৎসরে হ্রাস, বৃদ্ধি − +
কৃষ্ণনগর সদর	৭২৬	২	৫৫৭	৩১৪৩৮৭	৪৮৮,	+৬১
রাণাঘাট	৪৩৮	৪	৪৬৯	১৯৮৭২০	৪৫৪ ;	—১.৮
কুষ্টিয়া	৫৫৭	২	৬১৭	৪৫৯৪২৪	৬৯৯ ;	৩.৩
মেহেরপুর	৬২৬	১	৩৮৪	৩০৩৯৩২	৪৮৮ ;	+৪.৫
চুয়াডাঙ্গা	৪৩৭	০	৩৭৪	২১৩১৬৯	৪.৮ ;	—.৪
নদীয়া	২৮৮১	৯	২০০১	১৫২৯৬৭২	৫৩১ ;	+২৩

* At the Census of 1872 and 1881, the district included the Subdivision of Bongaon, which was transferred to Jessore district between 1881 & 1891, but the effect of this change upon the population of the district has been taken into account and the figures have been adjusted accordingly.

(*Garrett -Nadia district Gazetteer, Vol. 1*)

উপরোক্ত তালিকা হইতে দেখা যায়, নদীয়ার মধ্যে কুষ্টিয়া সবডিভিশনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জনবহুল এবং কুষ্টিয়ার মধ্যে কুষ্টিয়া ও দৌলতপুর থানার বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। গত দশ বৎসরে দৌলতপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ১৫.৫ এবং ইহাই নদীয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধির হার। অবশ্য, সদর সবডিভিশনের অধীন নবদ্বীপ থানার শতকরা বৃদ্ধি দেখা যায় আরও বেশী, +১৭.১। তবে, এই বৃদ্ধির কারণ স্বতন্ত্র।

মহাপ্রভুর জন্মভূমি, গঙ্গাতীরবর্ত্তী বাংলার একমাত্র তীর্থস্থান নবদ্বীপে বাংলার সর্ব্বত্র হইতে সর্ব্বদাই যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে এবং গণনার সময়ে তাহারা নদীয়ার লোক-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। এই হিসাবে উক্ত সংখ্যা হইতে নবদ্বীপের স্থায়ী বাসিন্দার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ অনুমান করা সহজ নহে।

নদীয়ার মধ্যে রাণাঘাট সবডিভিশনই সর্ব্বাপেক্ষা জন বিরল এবং ইহার অধীনে একমাত্র শান্তিপুর ছাড়া চাকদহ, হরিণঘাটা, রাণাঘাট প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত থানাতেই গত দশ বৎসরে প্রভূত ক্ষয় ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে হরিণঘাটা ও চাকদহ থানাতেই ক্ষয়ের হার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

গত দুই বারের গণনায় নদীয়ার মহকুমাগুলির অন্তর্গত থানাগুলিতে কি পরিমাণ জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব এইখানে দিলাম।

	১৯১১—২১ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি	১৯২১—৩১ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি
সদর মহকুমা		
কালীগঞ্জ থানা	—১০.৭	+১২.৩
নাকাশিপাড়া "	— ৫.৮	+ ৭.৩
কৃষ্ণগঞ্জ "	—২০.৩	+ ১.২
হাঁসখালি "	—১১.০	— ৮.০
কৃষ্ণনগর "	+ ৭.৬	+ ৫.৭
চাপড়া "		+ ৬.৩
নবদ্বীপ "		+১৭.১
রাণাঘাট মহকুমা		
শান্তিপুর থানা	— ৬.২	+ ২.৮

সদর মহকুমা	১৯১১—২১ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি	১৯২১—৩১ পর্য্যন্ত ১০ বৎসরে শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি
রাণাঘাট ,,	— ৬·৮	— ৪·২
চাকদাহ ,,	— ১·৫	—১০·৭
হরিণঘাটা ,,		—১৩·৬
কুষ্টিয়া মহকুমা		
কুষ্টিয়া থানা	— ১·০	— ৪·৭
মিরপুর ,,	—১২·৫	+ ৪·২
ভেড়ামারা ,,	,,	— ৮·৮
কুমারখালি ,,	+ ১·৬	— ১·৯
খোকসা ,,		+১২·১
দৌলতপুর ,,	—৩·৩	+১৫·৫
মেহেরপুর মহকুমা		
করিমপুর	—১১·৭	+ ৬·৫
গাঙ্গনি থানা	+ .২·৫	+ ৩·৬
মেহেরপুর ,,	—১৩·৮	+ ১৪·৪
তেহট্ট ,,	— ৯·১	+ ৪·৮
চুয়াডাঙ্গা মহকুমা		
চুয়াডাঙ্গা থানা	—১২·১	+ ·৫
আলম ডাঙ্গা ,,	— ৯·৩	+ ৪·৫
দামুরহুদা ,,	—১৪·২	— ১·৮
জীবননগর ,,	—১০ ৩	—১২·০

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অঙ্ক ও হ্রাস-বৃদ্ধির চিহ্নগুলির দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেই নদীয়ার ক্রমক্ষয়িষ্ণু গ্রামগুলির অবস্থা অনেকটা অনুমান করিতে পারা যাইবে। অবশ্য, গত দশ বৎসরে (১৯২১—৩১) জনসংখ্যা যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে বটে, তবু এখনও পূর্ব্বেকার সংখ্যারই সমান হয় নাই। (গ্রাফ-চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আমাদের একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, পল্লীবহুল দেশের অবনতির একটি প্রধান কারণ, জনসাধারণের পল্লী ছাড়িয়া সহরবাসী হইবার উন্মুখতা। অর্থাৎ, নূতন নূতন পল্লীর পল্লীশ্রী ভ্রষ্ট করিয়া সম্পদশালী সহর গড়িয়া উঠিতেছে এবং পল্লীর জনসংখ্যা যেরূপ দ্রুত ধ্বংসোন্মুখ সহরবাসীর সংখ্যাও সেই অনুপাতে ক্রমবর্দ্ধমান। অথচ, নদীয়ার আদম-সুমারীতে ইহার বিপরীত ফলই দেখা যাইতেছে। এই জেলায় নয়টি মাত্র সহর আছে এবং সেই সহরগুলির জন-সংখ্যা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও দেখিতে পাইব, একমাত্র নবদ্বীপ ও রাণাঘাট ব্যতীত সকল সহরেই জনসংখ্যা কমিয়া যাইতেছে।

আরও একটি কথা—নদীয়ার জন-হ্রাস ঘটিলেও বাংলার বাহির হইতে পেটের দায়ে আগত অর্থান্বেষীর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ১৯৩১ সালের রিপোর্টেই নদীয়ায় বিদেশীর সংখ্যা—হিন্দুস্থানী ১১৫৮৯, উড়িয়া ৮৪৮ ও অন্যান্য-ভাষাভাষী শতাধিক।

বলা বাহুল্য, গণনার সময়ে ইহারা সকলেই নদীয়ার জনসমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বদিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নদীয়ায় প্রকৃত নদীয়াবাসীর সংখ্যা গণনায় প্রাপ্ত সংখ্যা হইতেও যে, আরও দ্রুতগতিতে ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মোটামুটিভাবে ইহাই এখন নদীয়ার জনসংখ্যার অবস্থা। ভবিষ্যতে ইহাকে জাতি, ধর্ম্ম ও শ্রেণীগত ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া এই ভয়াবহ পরিস্থিতির সঙ্গত কারণ অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিব।

কৃষি ও কৃষক

...রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক আলো, বৈদ্যুতিক পাখা, রেডিও, বেতার, সিনেমা, থিয়েটার প্রভৃতি বিলাসিতার উপকরণ মানবসমাজে বিদ্যমান না থাকিলেও মানুষের পক্ষে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হইতে পারে বটে, কিন্তু কৃষি ও কৃষকের অবস্থা সন্তোষজনক না থাকিলে, মানুষের অস্তিত্ব বজায় রাখা পর্য্যন্ত ক্লেশকর হইয়া থাকে। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, কৃষি ও কৃষকের অবস্থা যখন পতিত হইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার উন্নতি করিতে হইলে যদি মানবসমাজ হইতে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, বৈদ্যুতিক আলো প্রভৃতি বিলাসের উপকরণের বিলোপ সাধন করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাতে পর্য্যন্ত পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না।...

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

বিশ্বকর্ম্মার ছুটি

দেশে যাওয়া

বিশ্বকর্ম্মা লম্বা ছুটি লইয়া ফেলিয়াছেন।

চাকরীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াই এবার ছুটি লইয়াছেন। কাঁহাতক আর খাটিতে পারা যায়? তিনিও মানুষ, বিশ্রাম করিবেন না, এ কোন দেশী কথা?

বার্ত্তা বড় অভিনব!—একটানা কয়েক বছর চাকরী করিতেছেন, পূজা ও বড়দিনের ছুটি ভিন্ন বড় ছুট লইবার অভ্যাস নাই—এবার বিশ্রাম করিবেন ভাবিয়াই ছুটি লইয়াছেন। তবে, কিছু দীর্ঘ দিনের ছুটি, তাই হঠাৎ শুনিলে চমক লাগে।—'এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে।'--

বাঙ্গালী কি অবসর যাপন করিতে জানে? তাহারা চাকরীতে লাগিয়া থাকে জোঁকের মত—টানিয়া ছাড়াও দেখি, নুন বা চুন বিনা?

এ ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক্ না কেন যে কিছু চুনের মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে, মানে, অত্যধিক পরিমাণ খাটুনীতে বিরক্তি ধরিয়াছে? তা বাঙ্গালী কোন দিন সোজা বুঝ বুঝিবে না,—সরল কথার পিছনে গভীর 'থট' আছে ভাবিয়া বসিয়া থাকিবে।

কেনই বা থাকিবে না? চাকরী আর বাঙ্গালী, বাঙ্গালী আর চাকরী,—বাঙ্গালী ছাড়া চাকরী নাই—চাকরী ছাড়া বাঙ্গালী নাই--সম্বন্ধ কেমন? না, চুম্বক আর লোহা—

ব্যবসা-বাণিজ্য নাই,—শিল্পকলা, কৃষি বিজ্ঞান ভারত ছাড়িয়া সাগর-পারে পলায়ন করিয়াছে বহুকাল,— বাঙ্গালীই তাড়াইয়াছে—একজন বাঙ্গালী প্রাণপণে একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া খাড়া করিল তো—দশজন বাঙ্গালী লাগলে কোমর বাঁধিয়া, দাঁড়াইল সেটা পণ্ড করিতে,—বাংলায় কি টিকিবে? কে টিকিবে? কেমন করিয়া টিকিবে? বাঙ্গালীর জন্তই বাংলা গেল!—

কাজেই, আজ চাকরী ভিন্ন গতি কি? দ্রাক্ষাফলের মত চাকরী ডালে ডালে ঝুলিতেছে, নীচে উল্লম্ফন-শীল বাঙ্গালী প্রাণপণে ডাকিতেছে, কই চাকরী—কোথা চাকরী।—চাতক যেমন জল-বিন্দুকে ডাকে।—

যাক্—যাক্, এ সব বাজে অবান্তর কথা পাড়িয়া শেষে বিশ্বকর্ম্মাকে হারাইয়া ফেলিব কি?

না, ভয় নাই, বিশ্বকর্ম্মা দিব্য স্বপ্রভামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী হইয়া আছেন।

সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। সব-শুদ্ধই সাজিল। পূজার ছুটির পরে সরোজ, সুধীর ফিরিয়া বোর্ডিং-এ থাকিবে। ফণী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়িয়া হয়রাণ হইয়া গিয়াছে, অতএব পড়া শেষ,—ছুটির পরে রাজসাহী যাইবে নূতন চাকরীতে। এইখানে বলা দরকার, অহি, কমল, সুশান্তর প্রকৃত নাম ফণী, সরোজ, সুধীর।

'শোনো শোনো, এবার বাড়ী, বুঝলে, বাড়ী!—'

'সুসংবাদ'—

—'সুসংবাদ? সে আমার, তোমার নয়— মজা করে হাওয়া খাওয়া চলবে না, বাহাদুরি চলবে না, আমার উপর চোট-পাট চল্‌বে না, বুঝেছ? এবারে ট্রেনিং কলেজ, বৌ সেজে থাকতে হবে—'

'আচ্ছা—'

শ্বশুর-বাড়া মেয়েদের ট্রেনিং কলেজ—বিবাহের পরে সেখানে কিছুদিন না থাকিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সুরুচির খুব অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছে—বিবাহের বছর দুই পরেই বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মস্থান।—পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের বিদেশের বাসা দেশের লোকেই বোঝাই থাকে,—কেহ সহর দেখিতে, কেহ চাকরী খুঁজিতে, দলে দলে যাতায়াত করেন নিতান্ত বালিকা-বয়স হইতে গিন্নীপনা করিয়া এবং লোকের সুখ্যাতি পাইয়া সুরুচির মনের কোণে কিছু গর্ব্বও আছে যে, তিনি একজন পাকা গৃহিনী, কিন্তু হায়!—দেশের বাড়ীতে পদার্পণ-মাত্র চারিদিক্ হইতে শোনা যায়—'ছোট বৌটা কোন কর্ম্মের নয়!—'

সুরুচির পিতার মতবাদ একেবারে প্রাচীন-তন্ত্রের। সব মেয়ের বিবাহই তিনি বিপুল একান্নবর্ত্তী পরিবারে দিয়াছেন এবং বিশ্বকর্ম্মা অত অল্প বয়সে সুরুচিকে বিদেশের বাসায় লইয়া যাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মেয়েদের বাপের বাড়ী বেশীদিন থাকার পক্ষপাতীও তিনি মোটেই নন, দু'বছর পরে একমাস যথেষ্ট, নিজে উদ্যোগ করিয়া মেয়েদের শ্বশুর-বাড়ী পাঠাইয়া দেন।

সুরুচির ট্রেনিং কলেজে যেটুকু শিক্ষা হইয়াছিল, সেটা স্থায়ী বটে!—জায়ে জায়ে অত্যন্ত ভালবাসা, দেশের বাড়ীর উপর গভীর টান—বিশ্বকর্ম্মার চেয়েও বেশী। তবে, অকর্ম্মা বলিলে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে বৈ কি—

বাঁধা ছাঁদা আরম্ভ হইয়া গেল। সুরুচির একান্ত সাধ নৌকায় বেড়ানো ও পুতুল-নাচ দেখা,—বিবাহের পর একবার মাত্র দেখিয়াছেন, আর সুযোগ হয় নাই এবং ও-জিনিষটা আর কোথাও দেখা যায় নাই।

বিশ্বকর্ম্মা একবার শ্বশুর-বাড়ী দেখা করিয়া আসিবেন নিশ্চয়—তিনি সেই চেষ্টায় আছেন।

হেনকালে দ্বিজেন আসিয়া উপস্থিত—

—'কি রে? কি?'

—'কিছু না—এমনি, আমিও যাব জামাইবাবু, আপনার সঙ্গে—'

—'বেশ বেশ, চল্—'

পরের দিন পিতার এক পত্র আসিল—

পরম কল্যাণবরেষু—

তুমি যাইবার আগে অবশ্য আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবে, অন্যথা না হয়, অসুবিধা না হইলে শ্রীমতীকেও আনিবে, কবে আসিবে জানাইলে ষ্টেশনে বন্দোবস্ত রাখা যাইবে। অপর সংবাদ, শ্রীমান্ বীরেনের বিবাহ উপলক্ষে গুপু, গোপু আজ দুই মাস যাবৎ লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিবারাত্র হৈ-চৈ লইয়া থাকে, সরযূ বার বার উপদেশ দেওয়ায়ও কোন ফল হয় নাই। তাহার কথা উহারা না শোনায় আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলাম, এই জন্ত কয়েক দিন হইল আমি শ্রীমান্ গোপুকে উত্তমরূপ প্রহার করায় সে সংযত হইয়াছে, কিন্তু গুপুর পরিবর্ত্তন হয় নাই—উপরন্ত সরযূর সহিত চটাচটি করায় অন্ত তাহাকে গুরুতর প্রহার করিয়াছি,—খুব সম্ভব, সে তোমার তথায় গিয়াছে, তুমি পত্রপাঠ তাহাকে রওনা করিয়া দিবে—যদি না আইসে, তবে তাহার অদৃষ্টে বিশেষ কষ্ট আছে। আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা লইবে। ইতি—

সুরুচি চিঠি পড়িয়া হাসিয়া গড়াগড়ি!—'বাবা কি সুন্দর লিখেছেন। হ্যাঁ রে, গুরুতর প্রহার খেয়ে এলি—দেখে কিছু বোঝা গেল না তো? এখানে এলি বাবা জানলেন কি করে?'

—'ষ্টেশনে দীনেশবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ও, এই করে এসেছ তুমি? ভয় নেই—আমি লিখে দিচ্ছি তাঁকে।'

দেড়টার গাড়ীতে দ্বিজেন আবার বাড়ী চলিল, 'নাঃ, বাবাকে বিশ্বাস নেই—বাড়ীই যাই।'

তার পরে চিঠিতে জানা গেল—দ্বিজেন বাড়ী গিয়া পিতার হাতে পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, 'আমার কাছে কি, তোমার দিদির কাছে মাপ চাও—' তখন পরম খুসী-মনে দ্বিজেন বাড়ীর ভিতর গিয়া দূর হইতে ডাকিয়া বলিয়াছে, 'ছোড়দি মাপটাপ্ করবে কি না বলো।'

দ্বিজেনকে দেখিয়াই দিদি আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, আর মাপ!

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'—কর্ত্তার সে সব নেই—

সুরুচি বলিলেন, 'বাবা ছেলে মেয়ে কাউকে গ্রাহ্য করেন না—এক ছোড়দি ছাড়া।'

'নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা'?

গোয়ালন্দ মানে দেশ—ষ্টীমার মানে বাড়ী—ঢাকা ময়মনসিংহের ইজারা করা মহল। 'আপনি কোথা যাবেন?' —'ঢাকা!—আপনি?'—'ময়মনসিং'—

ট্রেন হইতে নামিতে না নামিতে এবং ভোরের আলোকে ষ্টীমারোদ্দেশে যাইতে—'এই যে'—'কবে এলেন?' 'বাড়ী যাচ্ছেন'? 'বেশ বেশ'—'কদ্দিনের ছুটি?' ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে অবিরত প্রশ্ন-তরঙ্গ—তুমি কোন্ দিকে চাইবে? কার কথার উত্তর দিবে?

—'আজ্ঞে—ছোট কর্ত্তা অনেক কাল পরে দেহি',

—'হ্যাঁ ছমির ভাই—তুমি কোত্থেকে ?'—

—'উত্তুর—উত্তুরে আছি—ছাড়্টা বচ্ছর পরে বাড়ী আইলাম,—ইষ্টিমারে কথা কমু অনে—টিকিটটা নিয়া আহি আগে,—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আঃ, কতদিন পরে দেশের কথা শুনছি।'

—'বাড়ীতে আসতে হয় বছরে একবার—না এলে সব অচেনা অচেনা মনে হয়,—দেখ এরা কত ভালবাসে—ভালবাসতে জানে—দেশের মত কি আর কোথাও ?'

সারি সারি ষ্টীমার নদীকূলে দাঁড়াইয়া ধূমোদ্গিরণ করিতেছে—পদ্মার চেহারা দেখিবার যো নাই।

কেবিনের ভিতর ভয়ানক গরম। অথচ, গোয়ালন্দ পা দিয়াই বৌ হইতে হয়—শেষে কি হঠাৎ কোন শ্বশুর, ভাসুর দেখিয়া ফেলিবেন, বৌ খোলা-মাথায় বাহিরে ঘোরা-ফেরা করিতেছে ?—সে বার্ত্তা কাহারও অগোচর থাকিবে না যে !

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, আশ্বিন-শেষের নদী কূলে কূলে ভরা, মনে মনে অনেক বিচার-বিতর্কের পরও কেবিনের ভিতর থাকা সম্ভব হইল না। রেলিংয়ের ধারে ডেকের উপর বসিতে হইল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'গৈরিক-বসনা পদ্মানদী।'

সুরুচি বলিলেন, 'পদ্মা নদী নয়—নদ, মহাপদ্ম নদ।'

—'আপনি কোথা পেলেন এ বার্ত্তা ?'

—'মহাভারতে—পড়ে দেখো—পদ্মাবতী নদী কোথাও পাবে না, কিন্তু এ কি সত্যিই পদ্মা ?'

'না ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, যমুনা একসঙ্গে মিশেছে।'

ষ্টীমারপথে স্পষ্ট দেখা যায় যেখানে পদ্মা-যমুনার সংমিশ্রণ—একদিকে মিশ কালো স্বচ্ছ অতল স্থির যমুনা, অপর দিকে গৈরিকবর্ণা বিপুলতরঙ্গময়ী পদ্মা, মিশিয়াও মেশে নাই—মিলন-রেখাটি স্পষ্ট করিয়া দাগ টানিয়া রাখিয়াছে, একাকার হইয়া যায় নাই। নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া বহিয়া চলিয়াছে—আশ্চর্য্য রূপ—আশ্চর্য্য দর্শন।

সূর্য্যোদয়ের আগে ষ্টীমার ছাড়িল।

জোর বাতাসের ঝাপ্টায় ক্যাম্বিসের পর্দ্দাগুলি আছড়াইতে লাগিল, ষ্টীমারের লোকেরা তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া বাঁধিয়া দিয়া গেল। তখন হইতে বাতাস ডেকের উপর বহিতে আরম্ভ করিল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন—'এই বেলা ঝগড়া যা করার করে নাও—বাড়ী পৌঁছে ও কাজটা কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখতে হবে ত ? তোমার দিন কাটবে কি করে আমি তাই ভাবছি।'

—'তোমার ভাবনার দরকার নেই।'

—'নিশ্চয় আছে— ধর্ম্ম সাক্ষী করে তোমার সব ভার নিয়েছি—ভাববো না ? বাড়ী গিয়ে তোমার দশা মনে করে আমার যা হাসি পাচ্ছে—'

—'হাসি পাচ্ছে ?'

—'ওঃ—না না—ভুল বলেছি—ভুল বলেছি—কান্না—কান্না পাচ্ছে, মনে আজকাল কি হয়েছে আমার—একটা বলতে আর একটা বলে ফেলি—'

অকূল জল-পথে ষ্টীমার ছুটিয়াছে। লোকজনের ব্যস্ততা ও চলা-ফেরা কমিয়া গিয়াছে—যার যার মত আস্তানা গাড়িয়া বসিয়াছে। ষ্টেশনের যাত্রীরাও ডেকে আসর জমাইয়াছে। অদূরে ফিমেল ও মেল্ ইণ্টার ক্লাস পাশাপাশি, তাহার ধারে ষ্টীমারে কোনের দিকে রেলিংয়ের কাছে সতরঞ্চি পাতিয়া জন আট-দশ লোক খুব আরাম করিয়া বসিয়া মজলিস্ করিতেছে—ইহারা উত্তর-ফেরৎ—অর্থাৎ দেশে অভাব-কষ্ট, খাইতে না পাইয়া কয়েক বছর আগে উত্তরে চলিয়া গিয়াছিল, সেখানে বেশ জঙ্গল কাটিয়া চাষবাস করিয়া অবস্থা ফিরাইয়াছে, কেহ কেহ সেখানে বাড়ী-ঘর করিয়া রহিয়া গিয়াছে, কেহ বা দেশে আনাগোনা করে স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে কিংবা লইয়া যাইতে আসে। জিজ্ঞাসা কর, জায়গার নাম বলিবার অভ্যাস নাই, কোথা থেকে এলে ? 'উত্তর থেকে'—

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'দেখ কি আনন্দ ওদের—অনেক দিন পর বাড়ী যাচ্ছে কি না—'

—'আমরাও যাচ্ছি—অমন আনন্দ আমাদের কই'—

—'সেটার একটা কারণ—মানে, তুমি যদি বাড়ী থাকতে আর আমি এই রকম অনেক দিন পর যেতাম—ঠিক ওদের মতই হত—তার চেয়ে বেশী মনে হত, পদ্মায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে সাঁতরে যাই, কিন্তু সে কি তুমি বুঝবে ? তুমি আমার দোষই দেখ—প্রাণটা দেখ্লে না—'

—'আচ্ছা—এখন চুপ কর।'

বিশ্বকর্ম্মা কি একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারেন? একবার উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, চেনা জানা লোকের সঙ্গে আলাপ করেন, আবার বসেন। হাওয়ার ঝাপটায় সিগারেট ধরে না, তখন ক্যাবিনে ঢুকিতে হয়।

লোকগুলির গায়ে সাফ ছিটের ফতুয়া, কোরা ধোলাই নূতন ধুতি পরা, কাঁধে নূতন গামছা, মাথার তেল চকচকে, চুলে টেরি কাটা, একান্তমনে নিজেদের সুখ-দুঃখ ও কঠোর অভিজ্ঞতার কথা বলিতে ও শুনিতে ব্যস্ত।

কয়েক জন এক জোড়া নূতন তাস বাহির করিয়া খেলিতে বসিল, খেলা জানে না ভাল, উৎসাহেই অজ্ঞতা ঢাকা পড়িয়াছে। দুই জন গলা মিলাইয়া গান ধরিল—

ও মাঝি রে ভাই, ভিড়াও তোমার নাও—
সোনার বন্ধু কান্দে আমার একবার দেখা যাও—
ভিড়াও তোমার নাও—
বন্ধু কান্দে ঘাটের পারে বস্যা আউলা চুলে—
উথাল পাথাল করে নদী বন্ধুর চৈক্ষের জলে—
ভাই রে—ভিড়াও তোমার নাও।

দুইজন রং-চংয়ে টিনের সুটকেস বাঁয়া-তবলার মত বাজাইয়া গানের তাল দিতেছে, গানের সুর গভীর ও উদাস, ঝড়ো বাতাস, ঢেউয়ের কল্লোল, ষ্টীমারের বাঁশীর হুঙ্কার গানের সঙ্গে মিশিয়া যে অস্ফুট সুর-সঙ্গতি সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বিচিত্র প্রকৃত ভাটিয়ালী সুর কোন রেকর্ডে, কোন রেডিয়োতে বাজিতে পারে না, জলপথে যাহার উৎপত্তি ও বিকাশ, স্থলে তাহা ফুটিবে কি করিয়া?

বিশ্বকর্ম্মা হাতের উপর চিবুক রাখিয়া গভীর মনোযোগের সহিত গান শুনিতেছেন, বিখ্যাত ভাগ্যকুলের এক ভাগ্যধর ষ্টীমারের আরোহী, তিনিও নভেল ফেলিয়া গান শোনায় মন দিয়াছেন।

আরিচা, নগরবাড়ী ছাড়াইয়াছে অনেকক্ষণ। এবার একটা ষ্টেশন দেখা দিল। ক্রমেই তটভূমি কাছে সরিয়া আসে, খাড়া সবুজ পাড়, যাত্রীরা ষ্টীমারের আশায় দাঁড়াইয়া আছে, দলের একটি অল্পবয়সী ছেলে আসিয়া ডাকিল, 'অ মামু ইষ্টিশান আইল—'

কেহ তাহার কথায় কাণ দিল না।

সশব্দে ষ্টীমার ভিড়িল, কত যাত্রী উঠিল, নামিল, সেই গোলমালেও তাহাদের তন্ময়তা ভাঙ্গিল না, গানের সুর এখন নামিয়াছে, গায়কেরা গুণ-গুণ করিয়া গাহিতেছে—,

ছেলেটি আবার ডাকিল, 'অ—চাচা, অ—মামু, আরে নাম না, ইষ্টিমার ছাইরা দিব যে—'

গায়কেরা চোখ বুজিয়া আছে, চোখ চাহিল না, উত্তর দিল না, একজন বাদক ভয়ানক বিরক্ত হইয়া ধমকাইয়া উঠিল, 'দেয় দেবে, তোর কি? যাঃ, দেক্ করিস্ না—'

ছেলেটি রাগিয়া মুখ ভারি করিয়া সরিয়া গেল।

একটু পরেই ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল, সুরুচি মনোযোগ ভাঙ্গিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'সত্যি ওরা নামলে না?

'—বিরহীরা বাহ্যিক জগৎ সম্বন্ধে চিরদিন উদাসীন, যথা—

'—যথা কি?'

'যথা, এই শর্ম্মা—'

'—শর্ম্মা নয় কর্ম্মা, কিন্তু ষ্টীমার ছেড়ে দিলে, ওরা কি করবে এখন?

'আর কি করবে? গানের ধাক্কা সামলাক এবার'। বিশ্বকর্ম্মা বড় খুসী!

এমন সময় হঠাৎ এক গায়কের হুস হইল, বোধ হয় বাঁশীর গর্জ্জনে, সচকিত হইয়া চোখ চাহিয়া বলিল, 'এ কি, এ কোন্ ইষ্টিশান?'

তট-ভূমি তখন সরিয়া যাইতেছে, অপর এক যাত্রী বলিল, 'আরাইলে' (আরালিয়া)—

—'অঁ্যা—অঁ্যা—আমরা যে এইখানে নামব! অ—চাচা, কও না কি করি? সারেংরে কমু?'

সেই যাত্রীটি বলিল, 'অনেক দূর এসেছে, সারং এখন ষ্টীমার লাগাবে না—'

তখন সকলেরই চৈতন্যোদয় হইয়াছে, 'অঁ্যা, উপায় কি? করি কি? বেলা বারোডার আগে বাড়ী যাওনের কথা, এডা অইল কি?'

এবার সেই ছেলেটি আসিয়া একটু জোরের সঙ্গেই বলিল, 'বাল অইচে, তিনবার ডাকলাম, তা উইন্টা দমক! যাও এহন বাড়ী, রাইত অদ্দেক না অলি আর না—'

কেহ দাঁড়াইয়া রেলিংয়ে ঝুকিয়া বিলীনপ্রায় ষ্টেশনটা

দেখে, কেহ অস্থির হইয়া পায়চারি করে, কেহ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, শেষে ভারিক্কি একজন লোক, দলের সে মামু, সে-ই বলিল, 'স্থাও, স্থাও ভাবনাডা কি? জেনানা নাই সাথি, ভয়ডা কিসের? স্মুমুকের ইষ্টিশ'নে নামব, নাও ভাড়া করে শো শো করে চলে আসব, স্থাও—পান-তামুক খাও, সোমায় দেখ্‌তি দেখ্‌তি যায়, বহ, বহ—'

অতঃপর আবার তাস-খেলা আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু গা-ছাড়াভাবে, বেলা বারোটায় ঘরে পৌছিবার কথা, পৌছিবে কি না রাত বারোটায়, সোনার বন্ধু ঘুমাইয়া পড়িবে না?

পরে ষ্টেশন না আসিতেই তাহারা পোটলা-পুটলি বাঁধিয়া নামিয়া গেল। নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবে, যতক্ষণ ষ্টীমার না ভিড়ে।

বিশ্বকর্ম্মার ষ্টেশন আর আসে না, বেলা প্রায় দুইটা, ষ্টীমার প্রায় খালি, তবু তাঁহাদের যাত্রার বিরাম নাই। কেবিনে আধঘণ্টা-খানেক ঘুমাইয়া আসিয়াছেন, অলসভাবে চেয়ারে পড়িয়া পড়িয়া কতক্ষণ কাটান যায়? দারুণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'এই দুঃখেই বাড়ী আস্‌তে চাইনে—শা··· ষ্টেশন দেশ ছেড়ে পালিয়েছে,—তাই কি নিস্তার আছে? নৌকোয় আর পাঁচটি মাইল—'

গভীর দুর্গমতন প্রদেশে বাড়ী। সহজে নাগাল পাওয়া যায় না। তবে, নৌকা পথে স্বাধীন—স্বচ্ছন্দ গতি—তেমন আরাম বাড়ীতেও মেলে না,—এই ষ্টীমারই যা মারিয়া ফেলে।

টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ধুপুরিয়ার মিয়াভাইদের কয়েক জন ষ্টীমারে ছিলেন, তাঁহারাও বিশ্বকর্ম্মার ষ্টেশনেই নামিবেন। রেঙ্গুনের বিখ্যাত ব্যবসাদার—লক্ষপতি বংশ—গ্রামে আসা-যাওয়া আছে, মস্ত এক বাজার বসাইয়াছেন নিজেদের জন্য, বিদেশের অন্ধ মোহে পড়িয়া দেশের মায়া বিসর্জ্জন দেন নাই, অধিকাংশ বাঙ্গালীর মত। তাঁহারা দিব্য মনের আনন্দে রহিয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মার মত অধৈর্য্য নন, ষ্টেশন যখন আসিবে, নামিবেন, ব্যস্ততার কি আছে?

অভিযোগ

—শ্রীরঘুনাথ কুণ্ডু

তোমার অঙ্গনে দেব আমি আজ সেই বর মাগি
অমৃতের গাহি শুধু গান
দিগন্তের মর্ম্মব্যথা ফুকারিছে, উঠিয়াছে জাগি,
সপ্তসিন্ধু-পারের আহ্বান,
প্রাণ-পুষ্পকোরকের দল ছিঁড়ি দিব উপহার
হে মৌনী দেবতা
কেন আজি কাঁদে বিশ্ব দিকে দিকে চলে অভিসার?
—হানিব সে কথা?
যুগান্তের ব্যথাবহ্নি পুঞ্জীভূত চেতনার মূলে
যে সৌন্দর্য্য আশা
অনন্ত কালের বক্ষে যে মধু সঞ্চিত ছিল
ছিল জানি ভাষা,
সে মধুতে বীতস্পৃহ আজি তব অন্তরে কিসের
খেল প্রভু খেলা
আজি বুঝি চাহ রক্ত? চাহ ঘৃণ্য গলিত কঙ্কাল?
প্রলয়াগ্নি-বেলা।
নিষ্করুণ জীবদাহে কম্পে ধর্ম্ম ব্যাকুলিত দিক্
নিশ্বাস স্তবধি রহে বুকে,
আলোক-রশ্মির শেষে মর্ম্মে মর্ম্মে জাগে কোলাহল
বুঝি সব গীতি গেল চুকে;
পথপারে অমাবস্যা পাতে তার কৃষ্ণাভ আসন
মেঘে মেঘে ঘোর অন্ধকার,
উন্মত্ত আকুলে পান্থ হাহাকারে কাঁদি ওঠে আজ—
আনে যদি তব অর্ঘ্যভার;
তব তীর্থ? ওহে দেব আজি তার হোল কীর্ত্তিনাশ
কে করিবে পূজা?
নির্ম্মম বার্থতা সহি' মর্ম্মে ম'রে সহি অত্যাচার—
—কোনরূপে মাথাটুকু গোঁজা।

বাঙ্গালায় বর্গী

—নিখিলনাথ রায়

[৩]

মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণ কিছুদিনের জন্য নিবৃত্ত হইলে, নবাব জৈনুদ্দীনকে পাটনায় গমন করিতে আদেশ দিলেন। *

এই সময়ে ঢাকার শাসন-কার্য্য লইয়া এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। ঢাকার রাজস্ব-কর্ম্মচারী গোকুলচাঁদ উক্ত প্রদেশের সহকারী শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলী খাঁর কতিপয় দোষ-প্রদর্শনের জন্য মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। তিনি নবাবের নিকট এইরূপ আবেদন করেন যে, হোসেন কুলী খাঁ নামে মাত্র সহকারী শাসনকর্ত্তা, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনিই সর্ব্বে-সর্ব্বা। তজ্জন্য রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। গোকুল চাঁদ রাজস্ববিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী হওয়ায়, নবাব তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া, হোসেন কুলী খাঁকে যথেষ্ট তিরস্কার করেন। অতঃপর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, ঢাকার ফৌজদার ইয়াসিন খাঁকে উক্ত পদ প্রদান করা হয়, মীর কালেন্দর ঢাকায় ফৌজদার নিযুক্ত হন। হোসেন কুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে আগমন করিয়া তাঁহার পদ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে থাকেন। নবাবের জ্যেষ্ঠা কন্যা নওয়াজিস্ মহম্মদের পত্নী ঘেসেটী বেগমের সহিত হোসেন কুলী খাঁর বিশিষ্টরূপে পরিচয় থাকায় * ঘেসেটী স্বীয় পিতা ও পতিকে তাঁহার জন্য যথেষ্ট অনুরোধ করেন। তজ্জন্য পুনর্ব্বার হোসেন কুলীকে ঢাকার সহকারী শাসন-কর্ত্তার পদ প্রদান করা হয়। হোসেন কুলী খাঁ একটী চাকচিক্যময় খেলাৎ প্রাপ্ত হইয়া মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় উপস্থিত হন এবং তথায় গোকুলচাঁদের অভিযোগের প্রতিশোধের জন্য তাঁহার রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। পরে নানা প্রকার কৌশলে তাঁহার দোষ সপ্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া রাজবল্লভকে উক্ত পদ প্রদান করা হয়। হোসেন কুলী খাঁ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হোসেন উদ্দীন খাঁকে সহকারিস্বরূপে ঢাকায় রাখিয়া মুর্শিদাবাদে আগমন করেন এবং স্বীয় উপকারিণী ঘেসেটী বেগমের সন্নিকটে বাস করিতে থাকেন। তদবধি তাঁহার ক্ষমতা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে।

জৈনুদ্দীন আহম্মদ নবাবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

* Every evil attending destructive war, (Marhatta invasion) was felt by this unhappy country in the eminent degree, a scarcity of grain in all parts, the wages of labour greatly enhanced, trade, foreign and inland, labouring under every disadvantage and oppression; —and though during the recesses of the enemy from June to October, the manufactures of this opulent kingdom raised their drooping heads, yet the duration of their reprieves from danger, was so short that every species of cloth of the Aurungs were hastily. and consequently badly fabricated, though immensely raised in their prices, and from these causes, came into disrepute at all the foreign markets, particularly at the western parts of Juddah, Mocha and Bossorah.

—Holwell, p. 151,

ইউরোপীয় বণিকদিগের ব্যবসায়ের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। তাহাদের দ্রব্যাদি মহারাষ্ট্রীয়েরা লুণ্ঠন করে। তাহার পর নবাবের অতিরিক্ত করে তাহারা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নবাব অর্থ-সংগ্রহের জন্য জগৎশেঠের নিকট হইতেও লইতে ছাড়েন নাই। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ২২ লক্ষ টাকা দিতে হইবে, এই কথা রাষ্ট্র করিয়া ৫ কোটী টাকা আদায় করেন। তন্মধ্যে প্রায় সমস্তই নিজের জন্য ব্যয় হয়। তিনি ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া জৈনুদ্দীনের একটী শির-পেঁচ নির্ম্মাণ করেন। —Holwell, pp. 151-53.

রিয়াজুস সালাতীনে ভাস্করের হত্যার পর বালাজী রাও-এর আগমনের কথা লিখিত আছে। তিনি ৩০ হাজার সৈন্য লইয়া বীরভূম প্রদেশে আলিবর্দ্দীর সহিত মিলিত হন। আলিবর্দ্দী তাঁহার সহিত ধর্ম্মসম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাঁহাকে পিতা সম্বোধন করিয়াছিলেন।

* ঘেসেটি বেগমের চরিত্র অত্যন্ত দূষিত ছিল। হোসেনকুলী খাঁ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও সুপুরুষ ছিলেন। ঘেসেটী বিবি তাঁহার সহিত অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হন। তাঁহার চরিত্র এতদূর কলুষিত ছিল যে, মুর্শিদাবাদের রাজপথ দিয়া যে কোন সুন্দর ও বলিষ্ঠ ব্যক্তি গমন করিত, সকলকেই তিনি আপনার প্রণয়ে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন।

—Mutakherin, vol. I. p, 428 (Foot note).

করিয়া বিহারে উপস্থিত হইলেন। তিনি আজিমাবাদে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে টিকারী প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রদেশে গমন করার বিশেষ কারণও ছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা হেদাৎ আলির উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করিবার জন্য হেদাৎ আলি যে সমুদায় প্রদেশ শাসন করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া লোকমুখে তাহার পরিচয় পাইবার জন্য চেষ্টা করেন। হেদাৎ আলি বিহার প্রদেশের টীকারী প্রভৃতি স্থান হইতে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগ শাসন করিতেন। সেরেস ও কুটুম্বা প্রভৃতি স্থানও তাঁহার অধীন ছিল। উক্ত প্রদেশের জমীদারগণ, বিশেষতঃ রাজা সুন্দর সিংহের সহিত তাঁহার বিশেষ আনুগত্য থাকায়, জৈনুদ্দীন তৎসমুদায় প্রদেশে উপস্থিত হইয়া হেদাৎ আলির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নবাব সুজাউদ্দীনের দেওয়ান রায় রায়ান আলম চাঁদের পুত্র রাজা কীর্ত্তিচাঁদকে ঐ সমস্ত প্রদেশের রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত করিয়া হেদাতের ক্ষমতা হ্রাস করিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। হেদাৎ আলি সমস্ত অবগত হইয়া জৈনুদ্দীনকে শীঘ্র শীঘ্র আজিমাবাদে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করিয়া পাঠান। জৈনুদ্দীন তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ব্যগ্র হইতে হইবে না। হেদাৎ আলি অগত্যা আজিমাবাদে থাকিতে বাধ্য হইলেন। ইতিমধ্যে পুনর্ব্বার মহারাষ্ট্রীয়েরা আজিমাবাদে উপস্থিত হইবে, এইরূপ কথা প্রচারিত হওয়ায়, পাটনার শাসনকর্ত্তা আজিমাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হয়। জৈনুদ্দীন মিঠিপুরের চৌক নানক স্থানে উপস্থিত হইলে, হেদাৎ আলি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান করেন এবং আজিমাবাদে লইয়া আসেন। ইহার কয়েকদিন পরে জৈনুদ্দীন হেদাৎ আলির উপর নবাবের অসন্তোষের কারণ জানাইয়া তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে যাইতে অনুরোধ করেন এবং তথায় নবাবের সাক্ষাতে স্বীয় দোষক্ষালনের চেষ্টা করিতে বলেন। হেদাৎ আলি তাঁহার কথায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কয়েকদিন জৈনুদ্দীন তাঁহাকে কর্ম্মত্যাগের জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হেদাৎ আলি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করিয়া আজিমাবাদ হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি নবাবের প্রতিনিধি রায় বালকৃষ্ণের চৌকীর নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেহেদী নেসার খাঁ তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। মেহেদী নেসার খাঁ জৈনুদ্দীনের এক জন প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং জৈনুদ্দীনের দ্বারা তিনি অশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু, স্বীয় জ্যেষ্ঠের এই প্রকার অবমাননায়, তিনি সমস্তই বিস্মৃত লইয়া জৈনুদ্দীনের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া, হেদাৎ আলির নিকট গমন করেন। জৈনুদ্দীন তাঁহার ভবনে উপস্থিত হইয়া মেহেদী নেসার খাঁকে বলপূর্ব্বক আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হন নাই। মেহেদী নেসার খাঁ গমন করিতে করিতে শ্রবণ করিলেন যে, ভোজপুরের জমীদারেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য গুপ্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তিনি তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, সেই পথ দিয়াই গমন করিলেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আজিমাবাদে আগমন করিলেন এবং সাধারণ লোকের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। হেদাৎ আলি বর্ষার কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিতে করিতে আবদুল মনসুর খাঁর রাজধানী ফয়জাবাদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে আবদুল মনসুর তাঁহাকে কিছু বৃত্তি দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু, হেদাৎ আলি তাহা লইতে অস্বীকার করিয়া তথা হইতে দিল্লী যাত্রা করেন।

জৈনুদ্দীন আজিমাবাদে উপস্থিত হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আগমনের কথা প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি নগরবাসিগণের ও আপনার ধন-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য আজিমাবাদকে প্রাচীরবেষ্টিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। আজিমাবাদে পূর্ব্ব হইতে একটী প্রাচীর ছিল, কিন্তু তাহার প্রতি যত্ন না থাকায় উক্ত প্রাচীর ক্রমে ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হয়। তদ্ভিন্ন তাহার পার্শ্বে এরূপ ভাবে গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়ার উপায় ছিল না। জৈনুদ্দীন একটী গভীর

পরিখা খনন করাইয়া তাহার মৃত্তিকা দ্বারা পুরাতন প্রাচীর উচ্চ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু, এইরূপ ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইলে অনেক গৃহাদি নষ্ট হইবার সম্ভাবনায় যাহারা পুরাতন প্রাচীরের নিকট গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা সকলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া জৈনুদ্দীনের নিকট আবেদন উপস্থিত করিল। কিন্তু, উক্ত রূপ প্রাচীরের নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল না। প্রাচীর নির্ম্মিত হইলে, তাহার মধ্যে অবস্থিত সকলেই নিশ্চিন্ত হইল এবং অনেকে প্রাচীরের মধ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। যাহারা প্রাচীরের বহির্ভাগে ছিল, তাহারাও প্রাচীরস্থিত কামান, বন্দুকাদির সাহায্যে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। এইরূপে গ্রামবাসিগণের প্রশংসাভাজন হইয়া এবং আপন প্রাসাদও নিরাপদ্ জ্ঞান করিয়া জৈনুদ্দীন অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত হইলেন। এই সময়ে তিনি নবাবের নিকট হইতে ত্রিহুত পরগণা জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত প্রদেশ পরিদর্শন করিবার জন্য গঙ্গা পার হইয়া যাত্রা করেন। পূর্ব্ব হইতে মেহেদী নেসার খাঁর উপর তাঁহার অত্যধিক অনুরাগ থাকায়, তিনি তাঁহাকে পুনর্ব্বার কর্ম্মগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং ত্রিহুত যাত্রাকালে তাঁহাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া আপনার সহিত লইয়া যান। জৈনুদ্দীন ধনবার প্রদেশে গমন করিয়া, মেহেদী নেসার খাঁকে উক্ত প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, মেহেদী নেসার খাঁর শাসনে থাকিলে, উক্ত প্রদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ও রাজস্বের বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। অন্যান্য প্রদেশও তিনি এইরূপে আপনার বিশ্বাসী বন্ধুবর্গের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদায় প্রদেশের অধিবাসী ও রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার এই সমুদায় প্রদেশে অধিকদিন অবস্থানের সম্ভাবনা থাকায় তিনি স্বীয় প্রণয়িনী আমিনা বেগমকে সন্তানসন্ততি সহ আজিমাবাদে প্রেরণ করেন। হেদাৎ আলির পত্নীকে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হয়। হেদাৎ আলির পাটনা-পরিত্যাগের পর জৈনুদ্দীন মধ্যে মধ্যে তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার প্রতি জৈনুদ্দীনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকায় তিনি তাঁহাকে এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার অনুরোধ যথাসাধ্য রক্ষিত হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুস্তাফা খাঁর প্রাধান্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার সেই প্রাধান্য হইতেই তাঁহার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। আমরা পরে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করিব। নবাবের নিকট তাঁহার এরূপ প্রতিপত্তি ছিল এবং সমগ্র দেশ-মধ্যে তাঁহার এরূপ প্রভুত্ব ছিল যে, তৎকালে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি নবাবের নিকট হইতে যে কতবার পুরস্কার পাইয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। এক সময়ে তিনি নবাবের নিকট হইতে বার লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। তিনি সাত হাজার সৈন্যের অধিপতির সম্মান লাভ করেন এবং তাঁহার পিতৃব্য উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অধীন পঞ্চ সহস্র সৈন্য রক্ষার আদেশ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আবদুল রসুল খাঁ উক্ত পরিমাণ সৈন্য-রক্ষার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মুস্তাফা খাঁ শিবিকাদি সম্মানের দ্রব্য ও ধনসম্পত্তি অনেক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের পঞ্চাশটি হস্তী ছিল, এবং শাসন, রাজস্ব ও যুদ্ধসংক্রান্ত বিষয়ে তাঁহার এতদূর প্রভুত্ব ছিল যে, আলিবর্দ্দী খাঁর স্বসম্পর্কীয় ব্যক্তিগণও সময়ে সময়ে আপনাদের আবেদন পূরণ করিতে তাঁহাকেই অনুরোধ করিতেন। মুস্তাফা খাঁর এইরূপ প্রাধান্যের জন্য আলিবর্দ্দীর আত্মীয়েরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া উঠেন। এমন কি, হাজী আহম্মদের ক্ষমতারও দিন দিন হ্রাস হইতে থাকে। তিনি মুস্তাফা খাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধি দেখিয়া মুর্শিদাবাদ দরবার পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করেন। প্রথমতঃ তিনি হুগলী প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃত্ব-প্রাপ্তির জন্য নবাবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু, নবাব হাজীর দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ আহম্মদকে উক্ত পদে মনোনীত করায়, হাজীর অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগত হইয়া মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি

করিতেছিলেন। এ জন্য নবাব তাঁহাকে হুগলীর শাসন-কর্ত্তৃত্ব-প্রদানের ইচ্ছা করেন। হাজী আপনার অনুরোধ রক্ষিত হইল না দেখিয়া, অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া আলিবর্দ্দীর অনুমতি লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র জৈনুদ্দীন আহম্মদের নিকট উপস্থিত হন। তথায় তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন।

[৪]

১৭৪৪ খৃঃ অব্দের বর্ষার অপগমে রঘুজী ভোঁসলার আদেশক্রমে ভাস্কর পণ্ডিত আলি কাড়ওয়াল-নামক দাক্ষিণাত্যের একজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষের সহিত প্রায় বাইশ হাজার সৈন্য লইয়া বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য উপস্থিত হন। তিনি উড়িষ্যা প্রদেশ অতিক্রম করিয়া কাটোয়ায় আগমন করেন। ভাস্কর নিজের গৌরব-রক্ষার জন্য আলিবর্দ্দী খাঁকে যুদ্ধে পরাজিত অথবা তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ গ্রহণ করিবেন এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁ উপর্য্যুপরি মহারাষ্ট্রীয় আক্রমণে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন অত্যন্ত পরিশ্রমে তিনি এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, তাঁহার কার্য্যতৎপরতার অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ না করিয়া কোন প্রকার কৌশলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন।*

তাঁহার সৈন্যগণ বারংবার আক্রমণে ক্লান্ত হইয়া কিছুদিন বিশ্রামের ইচ্ছা করিতেছিল। নবাব মুস্তাফা খাঁর সহিত এই সমস্ত বিষয়ের পরামর্শ স্থির করিতে ইচ্ছা করেন। মুস্তাফা খাঁ এই সময়ে স্বীয় পদ পরিত্যাগের ইচ্ছা করিতেছিলেন। কিন্তু, নবাব তাঁহাকে আজিমাবাদের শাসন-কর্ত্তৃত্ব প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়া ভাস্কর ও তাঁহার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে স্বকীয় আয়ত্ত কোন স্থানে আনিবার জন্য অনুরোধ করেন। মুস্তাফা খাঁ এই প্রকার প্রলোভনে উৎসাহিত হইয়া ভাস্করকে বাগুরাবদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। তিনি ভাস্করের সহিত সন্ধির প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। প্রথমতঃ নবাব ক্লান্ত হওয়ায় ভাস্কর যাহাতে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী না হন, এবং যাহাতে তিনি সন্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, মুস্তাফা খাঁ তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভাস্কর স্বভাবতঃ শান্তচিত্ত হওয়ায় সন্ধির দিকে তাঁহার মন ধাবিত হইল। তিনি মুস্তাফা খাঁর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলে, মুস্তাফা খাঁ রাজা জানকীরামের সহিত কাটোয়ায় ভাস্করের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। নবাবের মনোগত ভাব এইরূপ ছিল যে, ভাস্করকে কোন প্রকারে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিতে পারিলে, তিনি তাঁহাকে আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে দিবেন না। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম উভয়ে ভাস্করকে নানা প্রকারে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। ভাস্করও তাঁহাদের ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, তাঁহার হৃদয় হইতে সন্দেহ একেবারে অপনীত না হওয়ায়, ভাস্কর আলি কাড়োয়ালকে নবাবের নিজের ও তাঁহার সৈন্যগণের প্রকৃত উদ্দেশ্য পরীক্ষার জন্য আলিবর্দ্দীর শিবিরে যাইতে আদেশ দিলেন। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম উভয়ে আলি কড়োয়ালকে সঙ্গে লইয়া নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় আলি কড়োয়ালকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহাকে সমাদর করিয়া এরূপ ভাবে আপ্যায়িত করিলেন যে, আলি কড়োয়ালের হৃদয়ে কোন প্রকার অন্য ভাবের উদয় হইল না। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ এরূপ মিষ্টভাষী ও সুচতুর ছিলেন যে, তাঁহার সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে সকল লোকই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি আলি কড়োয়ালকে নানাপ্রকার উপহার প্রদান করিয়া মুস্তাফা খাঁর সহিত ভাস্করের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা ভাস্করকে এরূপ ভাবে আলিবর্দ্দীর ব্যবহার জ্ঞাত করাইলেন যে, উক্ত সেনাপতির হৃদয় হইতে সমুদয়

* নবাবের সন্ধির ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ভাস্কর বর্দ্ধমানের সমুদায় অধিকার এবং তদপেক্ষা আরও গুরুতর বিষয়ের উল্লেখ করেন। তাহাতে লিখিত থাকে যে, আলিবর্দ্দীকে সরফরাজের বংশীয়দিগকে সুবা বাঙ্গালা প্রদান করিতে হইবে। মীর হাবীবের পরামর্শে ভাস্কর এইরূপ করেন। মীর হাবীবের ইচ্ছা ছিল না যে, সন্ধি হয়। সন্ধি হইলে তাঁহার বিলক্ষণ ক্ষতি হইত। নবাব ভাস্করের প্রস্তাবে স্বীকৃত হন নাই। উভয় পক্ষের মধ্যে কতিপয় ক্ষুদ্র যুদ্ধের পরে নবাব-সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

—Holwell, Hist. Events, p. 131.

সন্দেহ দূরীভূত হইল। এইরূপে সন্ধি-প্রস্তাবের সময় নবাব মধ্যে মধ্যে ভাস্করকে নানাবিধ কারুকার্য্যযুক্ত দ্রব্য, কদলী ও অন্যান্য দেশজাত সুমিষ্ট ফল-মূলাদি উপঢৌকন দিতে আরম্ভ করেন। ফলতঃ, ভাস্কর আলিবর্দ্দী খাঁর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। উভয় পক্ষের শপথ ও প্রতিজ্ঞাদির পর পরস্পরের সাক্ষাতের জন্য মনকরা * নামক স্থান স্থির হইল। নবাব মুর্শিদাবাদের নিকটে আমানিগঞ্জে শিবির সন্নিবেশ করিয়া ছিলেন। ভাস্করও কাটোয়ায় † অবস্থিতি করিতেছিলেন। মনকরা এই উভয় স্থানের মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় এবং তৎসন্নিধানে একটি প্রকাণ্ড প্রান্তর থাকায় উক্ত স্থান উভয় পক্ষের সাক্ষাতের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল ‡। রাজা জানকীরাম সর্ব্বদাই ভাস্করের সহিত বাস করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেছিলেন। অবশেষে ভাস্কর নবাবের সহিত সাক্ষাৎ-করণার্থ মনকরা অভিমুখে যাত্রা করিলে নবাবও আমানিগঞ্জ পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইলেন।

মনকরার বিস্তৃত প্রান্তরে § প্রকাণ্ড শিবির সন্নিবেশিত হইল। শিবিরের চতুর্দ্দিক কানাত দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তাহাকে আরও বিশাল করিয়া তুলিল। সাক্ষাতের দিবস নবাব তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনার সৈন্যদিগকে পশ্চাতে কিছু দূরে অবস্থান করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, আতাউল্লা খাঁ এবং মীর কাসেম খাঁ প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিবর্গ তাঁহার সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, নবাবের গূঢ় উদ্দেশ্য মুস্তাফা খাঁ, জানকীরাম ও মির্জ্জা হাকিম বেগ খাঁ ব্যতীত আর কেহই অবগত ছিলেন না। ভাস্করের সহিত নবাবের এই প্রকার মিলন দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অনেক লোক তথায় সমবেত হইল। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির নিকট গম্ভীরভাবে শপথ করার পর তাঁহাকে লইয়া নবাবের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নবাব শিবিরমধ্যে মসনদে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শিবিরের পশ্চাদ্ভাগে কিছুদূরে দণ্ডায়মান ছিল। নবাবের কোন আদেশ প্রাপ্তিমাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার প্রতিপালনে সক্ষম হইবে, এইরূপ ভাবে তাহারা অবস্থিতি করিতেছিল।* ভাস্করের আগমনের পূর্ব্বে নবাব মির্জ্জা হাকিম বেগের দ্বারা, সৈয়দ আহম্মদ ও আতাউল্লা খাঁকে তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করাইয়া তাঁহাদিগকে সতর্ক হইবার জন্য পরামর্শ দেন। মির্জ্জা হাকিম তাঁহাদিগকে নবাবের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া সাবধান হইতে উপদেশ দেন। এই সময়ে কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক কৌতূহলপরবশ হইয়া এবং নবাবকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য শিবিরে উপস্থিত হন। ইতিমধ্যে পঞ্চাশ জন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ব্যক্তি শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাদের মধ্যে ভাস্করের বাইশ জন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। পরক্ষণেই ভাস্কর আপনার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুস্তাফা খাঁর ও বাম হস্তে জানকীরামের হস্ত ধারণ করিয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎস্থিত সৈন্যগণ বিভক্ত হইয়া তাঁহার দুই পার্শ্বে ও অন্য একদল তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এই সময়ে মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম কিছুক্ষণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শিবির হইতে প্রস্থান করিলেন। ভাস্কর কয়েকপদ অগ্রসর হইলে, নবাব বারত্রয় জিজ্ঞাসা

* মনকরা বহরমপুরের নিকট।

† রিয়াজে লিখিত আছে যে, দিলু নগরে মহারাষ্ট্রীয় শিবির ছিল।

‡ অর্ম্মে বলেন যে, আলিবর্দ্দী ভাস্করের সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, যে সময়ে শিবিরে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইবে, সেই সময়ে নবাবের বেগমও শিবিকারোহণে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিবেন। তজ্জন্য অনেকগুলি শিবিকা পার্শ্বে রক্ষিত হইয়াছিল এবং ভাস্কর শিবিরে উপস্থিত হইলে, উক্ত শিবিকাগুলি যেন নবাবের বেগমকে লইয়া মহারাষ্ট্রীয়-শিবিরে যাইতেছে, এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক তাহারা অন্য স্থানে চলিয়া যায়। —Orme Ii, p 367

§ মনকরার নিকটে যে সময়ে ভাগীরথী প্রবাহিত ছিলেন। ভাগীরথীতীরেই প্রকাণ্ড প্রান্তর ছিল। এক্ষণে যে প্রান্তর আছে বটে, কিন্তু ভাগীরথী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন ভাগীরথী এক্ষণে মনকরার বাঁওর নামে খ্যাত।

* ১৭৪৪ খৃঃ অব্দের অক্টোবর, নবেম্বর মাসে এই ঘটনা হয়। কিন্তু, অর্ম্মে সাহেব ভ্রমক্রমে ১৭৪২ খৃঃ অব্দের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মুতাক্ষরীণে হিজরী ১১৫৭ লেখা আছে, সুতরাং তাহা ১৭৪৪ খৃঃ অব্দ বলিয়াই স্থির হয়। ষ্টুয়ার্ট ও ডফ সাহেবও ১৭৪৪ অব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, হলওয়েল্ কিন্তু ১৭৪২ অব্দের কথা বলিয়াছেন।

করিলেন যে, ইহাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ভাস্কর পণ্ডিত? মির্জ্জা হাকিম বেগ তিন বারই অঙ্গুলি দ্বারা ভাস্করকে দেখাইলে, নবাব তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। অধিকাংশ কর্ম্মচারী তাঁহার মনোগত ভাব জ্ঞাত না হওয়ায় সহসা এইরূপ আদেশে বিস্ময়ান্বিত হইল। কিন্তু, মীরকাসেম খাঁ তাঁহার আদেশের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার তরবারি নিষ্কোষিত করিলে, বেরখদ্দরি বেগ এবং অন্যান্য কতিপয় কর্ম্মচারীও মীরকাসেমের পথানুসরণ করিল। সেই সময়ে মুস্তাফা খাঁর অধীন পাঁচ-ছয় জন কর্ম্মচারী নিষ্কোষিত তরবারি-হস্তে প্রবিষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপরে পতিত হইল। মীরকাসেম খাঁ অগ্রসর হইয়া এক আঘাতে ভাস্করকে ভূতলশায়ী করিলেন।* মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমতঃ আত্মরক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চতুর্দ্দিক্ হইতে যুগপৎ আক্রান্ত হইয়া তাহারা ধরাশায়ী হইতে লাগিল। তাহাদিগের রক্তে শিবিরমধ্যে নদী প্রবাহিত হইল। যাহারা দর্শকরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন আরম্ভ করিল। এই সময়ে কানাতের প্রাচীর পাতিত করায় মুস্তাফা খাঁ অশ্বারোহণে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবকে তাঁহার সাহায্যের জন্য আসিতে সংবাদ প্রেরণ করেন। নবাব মসনদ হইতে উত্থিত হইয়া † শিবিরের বহির্ভাগে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণে ধাবিত হইলেন। তিনি মুস্তাফা খাঁর সংবাদ জিজ্ঞাসায় জ্ঞাত হইলেন যে, মুস্তাফা খা মহারাষ্ট্রীয়দের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছেন ও নবাবকে তাঁহার সাহায্যার্থে গমন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সে কথায় তত মনোযোগ না দিয়া ভাস্করের মুণ্ড আনয়নের আদেশ করিলেন। পরে ভাস্করের মুণ্ড দর্শনে বাস্তবিক তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে জ্ঞাত হইয়া, কাটোয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া, তিনি একজন মহারাষ্ট্রীয়কেও তথায় দেখিতে পান নাই। তাহার কারণ, তাহারা ইতিপূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। ভাস্করের সহিত রঘু গায়কোয়াড় নামক একজন প্রধান কর্ম্মচারী আগমন করিয়াছিলেন। তিনি মনকরায় উপস্থিত হইয়াও নবাবের শিবিরে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। মুস্তাফা খা, ভাস্কর ও আলি কাড়োয়াল কেহই তাঁহাকে সম্মত করিতে পারেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, ভাস্কর প্রত্যাগত হইলে তিনি পরদিবস নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। নবাব শিবির মধ্যে ভীষণ গোলমাল তাহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে অশ্বারোহণে কাটোয়ায় উপস্থিত হন এবং যাবতীয় দ্রব্যাদি ও সৈন্যগণের সহিত পলায়ন আরম্ভ করেন। তজ্জন্য নবাব কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের চিহ্নমাত্র দেখিতে পান নাই। রঘু গায়কোয়াড় যাত্রাকালে চতুর্দ্দিক হইতে জমীদারগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তথাপি তিনি যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিতে করিতে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যা অতিক্রম করিয়া আপনাদিগের অধিকার মধ্যে উপস্থিত হন।* তাহার পরামর্শে যদি মহারাষ্ট্রিয়গণ কাটোয়া হইতে পলায়ন না করিত, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজনও আর স্বদেশে উপস্থিত হইতে পারিত না। আলিবর্দ্দী খার

---

* হলওয়েল্ বলেন যে, উভয় পক্ষের অভ্যর্থনাদি শেষ হইলে যখন তাঁহারা উপবেশন করেন, সেই সময়ে সঙ্কেতানুসারে শিবিরাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ২০০ শত অস্ত্রধারী পুরুষ ভাস্কর ও তাঁহার অনুচরদিগের উপর পতিত হইয়া তাঁহাদিগকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলে। (Holwell, Hist. Events, P. 133).

† নবাব আলিবর্দ্দী সম্বন্ধে এই সময়ের একটি কৌতুকপ্রদ গল্প আছে। তিনি মসনদ হইতে উঠিবার সময় তাঁহার এক পদের পাদুকা না পাওয়ায় তাহা অন্বেষণ করিতেছিলেন। এই সময়ে একজন বলিয়াছিল যে, এই কি পাদুকা অন্বেষণের সময়? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, যদিও ইহা পাদুকা অন্বেষণের সময় নয়, তথাপি বিনা পাদুকায় বাহিরে গমন করিলে, তোমরাই বলিবে, নবাব এই বিপদ্ হইতে পলায়নের জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছিলেন যে, নিজের পাদুকা পর্য্যন্ত পরিবার অবকাশ পান নাই। তাহার পর পাদুকা-প্রাপ্ত হইলে তিনি বাহিরে গমন করেন।—Vide, Mutakherin, Vol. Stewart p, 288.

* হলওয়েল্ বলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা মীর হাবীবের পরামর্শে আলিবর্দ্দীর সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। তাহারা এই সময়ে আলি-ভাই (Alibhey) নামক একব্যক্তিকে আপনাদের সৈন্যাধ্যক্ষ করে এবং ক্রোধান্বিত হইয়া বক্স বন্দর আক্রমণপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করে। আলিভাই আলি কড়োয়াল। (Holwell, Hist. Events, PP. 14-35)

প্রথম আক্রমণে তাহারা তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া যাইত। এইরূপে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত নিহত করিয়া নবাব জয়োল্লাসে মুর্শিদাবাদে গমন করেন। বিশ্বাসঘাতকতাই তাঁহার চরিত্রের প্রধান কলঙ্ক। প্রথমতঃ বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বলপূর্ব্বক সরফরাজের সিংহাসন অধিকার করেন; এক্ষণে সেই বিশ্বাসঘাতকতা অবলম্বনে ভাস্করের ন্যায় একজন অসাধারণ বীরের রক্তে তিনি মেদিনী রঞ্জিত করিয়া আপনার চরিত্রকে কলুষিত করিয়া তুলেন। রণক্ষেত্রে ভাস্করকে পরাজয় করিবার সাহস না হওয়ায়, তিনি এই চাতুরী অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে এরূপ চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা যে অত্যন্ত দূষণীয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আমরা তাঁহার চরিত্রবর্ণনে ইহার আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিব। নবাব বিজয়দম্ভে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া এইরূপে সহজে শত্রু-বিজয় করার জন্য তাঁহার সৈন্য ও প্রজাবর্গের নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হইলেন। তিনি সৈন্যদিগকে দশ লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিকস্বরূপ প্রদান করিলেন। বাদশাহ এই সময়ে তাঁহাকে সুজা উলমুল্‌ক উপাধি প্রদান করেন, এবং তাঁহার অনুরোধে মুস্তাফা খাঁকে বাবরজঙ্গ ও মীরজাফর খাঁ, ফকির উল্লা বেগ প্রভৃতিকেও সম্মান দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। এইরূপে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূরীভূত করিয়া নবাব বঙ্গদেশে কিছুদিনের জন্য শান্তি-স্থাপনে সক্ষম হন।

নিশান্তে

—মহারাজকুমারী সুচারু দেবী

করুণ সুন্দর ছবি, স্নিগ্ধধীর নিশান্ত-পবন,
প্রসুপ্ত নীরব ধরা, রুদ্ধ দ্বার যতেক ভবন।
প্রভাত মেলেনি তার অভিনব আলোক ইঙ্গিত,
কলকণ্ঠে পক্ষিকুল ধরে নাই প্রভাত-সঙ্গীত,
পক্ষে পক্ষে জাগরণ চঞ্চলতা উঠে নি কাঁপিয়া,
বিপুল প্রাণের সাড়া জাগে নাই ভুবন ব্যাপিয়া,
আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে ভীতা নিশি পাণ্ডুর আননে
আপনা লুকাতে চায় তরুতলে কাননে কাননে।

প্রতীচী-গগন-মূলে হীনপ্রভ অর্দ্ধ-অঙ্গ শশী,
অপেক্ষিছে নিরুপায় মৃত্যু-বেলা—সূর্য্যোদয় বসি।
আমি বসে ভাবিতেছি কেন এই নিষ্ঠুর বিধান,
পরম লগন কেন নাহি আসে সকলে সমান।
প্রাপ্তির পূর্ণতা নিয়ে একে যবে প্রসন্ন অন্তর,
হাসিবে গাহিবে সুখে, অন্যজন হ'বে সতন্তর।
সমগ্র প্রাণের সাধ চক্ষে আনি চা'বে লুব্ধপ্রায়,
পাগল পাগল কবি, এ কি চিন্তা পেয়েছে তোমায়।

প্রহেলিকা প্রহেলিকা—অর্থ তার বৃথায় ভাবন,
অহেতুক প্রাণপণে আলেয়ার পশ্চাতে ধাবন।

লোক-সমস্যা

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ

লোকবল আলোচনায় আমরা 'জন্মহার' ও 'মৃত্যুহার' দুটী ব্যবহার করে থাকি। কোন একটা দেশের মধ্যে এক বৎসরে যতগুলি লোক জন্মে বা মরে, তার সঙ্গে মোট জনসংখ্যার তুলনা করে প্রতি সহস্রে ব্যক্ত কর্‌লেই জন্ম ও মৃত্যুহার পাওয়া যায়। মৃত্যুর চেয়ে জন্মহার বেশী হলে বলি 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি', কম হলে বলি 'স্বাভাবিক হ্রাস'।

কোন একটা দেশের জন্ম-মৃত্যুহার নির্দ্ধারণ কর্‌তে হলে শুধু কত লোক জন্মেছে বা মরেছে জান্‌লেই চলে না, জান্‌তে হয় মোট কত লোক এই জনপদে আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতের লোকসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে জন্ম-মৃত্যু রেজিষ্ট্রি করার প্রথা দেখা দেয়; কিন্তু এই হিসাব রাখার দায়িত্ব পল্লীর মোড়লদের হাতে ছিল বলে নির্ভুল হিসাব পাওয়া যায় না।

যদি বলি যে, বাংলায় মৃত্যুহার হাজার-করা ২০, তা হ'লে বুঝতে হবে যে, বৎসর আরম্ভ হবার সময় যদি ১০০০টি লোক বেঁচে থাকে, তা হ'লে দেখা যাবে যে, বছরের শেষে তাদের মধ্যে ২০ জন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মৃত্যুহার সব সময়ে একই রকম থাকে না। যে সব আধিব্যাধির জন্য মৃত্যু ঘটে, সেগুলি যদি ঘন ঘন দেখা দেয়, তা হ'লে মৃত্যুহার বাড়াই সম্ভব। মৃত্যু-সূচক ব্যাধির প্রকোপ বাড়লে মৃত্যুহার বাড়তে পারে; আবার মানুষের প্রতিরোধ-শক্তি হ্রাস পেলেও মৃত্যুহার বাড়ে। যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষের সময় মৃত্যু-সূচক শক্তিগুলির (Death dealing agencies) প্রকোপ বেড়ে যায়; আর স্বাস্থ্য-বিষয়ক মূল নীতিগুলি অনুসৃত হতে থাক্‌লে ব্যাধির প্রকোপ কমে—তাই মৃত্যুহারও কমে। কিন্তু, তাই বলে যে, সমগ্র জন-সমাজের মধ্যে মৃত্যুহারের তারতম্য হবে তা বলা শক্ত; কেননা শিশু ও বৃদ্ধের পক্ষে ব্যাধির আক্রমণে প্রাণত্যাগ করা যতদূর সম্ভব, মাঝ-বয়েসী লোকের পক্ষে তা নয়; অধিকন্তু একটা জনসমাজের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধের অনুপাত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হয়ে থাকে। মনে করা যাক্, ব্যাধির প্রকোপ কিছুমাত্র বাড়ে কমে নি, অর্থাৎ বৎসরের মধ্যে কোন লোকের মৃত্যু-সম্ভাবনা পূর্ব্বের অনুরূপই আছে; এখন মনে করা যাক্ যে, কালের প্রবাহে লোকসংখ্যা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, সেই লোক-সমাজে বৃদ্ধদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। এরূপ সমাজে মৃত্যুহার নিশ্চয় বাড়বে, কিন্তু তার কারণ এই নয় যে, মৃত্যু-সূচক ব্যাধিগুলির প্রকোপ বেড়েছে; তার কারণ, বৃদ্ধদের সংখ্যা বেশী হওয়ার জন্য সমাজের প্রতিরোধক শক্তি সমগ্রভাবে কমে গেছে। সুতরাং মৃত্যুহার বেড়েছে দেখে বলা যায় না যে, দেশের মধ্যে আধি-ব্যাধির প্রকোপ বেড়েছে, বা মৃত্যুহার কম হয়েছে দেখে বলা চলে না যে, দেশের স্বাস্থ্যোন্নতি হয়েছেই।

একটা জন-সমাজের মধ্যে একবৎসরে যত সন্তান জন্মে, তাকে প্রতি-সহস্রে ব্যক্ত করলেই তা ঐ জন-সমাজের জন্মহার।

একমাত্র নারীরাই সন্তান প্রসব করিতে পারে এবং তাও সকলে নয়, মাত্র যাদের বয়স ১৫ থেকে ৫০শের ভেতর তারাই। সুতরাং সন্তান-প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যার উপর জন্মহার নির্ভর করে। অন্যান্য অবস্থার যদি কোন ব্যতিক্রম না হয়, তা হ'লে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা দ্বিগুণিত হলে জন্মহারও দ্বিগুণিত হবে। যত বয়স বাড়তে থাকে নারীর প্রজনন-শক্তি তত কমে আসে। তাই কোন্ বয়সের কত প্রজননক্ষম নারী আছে, জন্মহার নিরূপণের সময় তাও লক্ষ্য করতে হয়, যেমন প্রজননক্ষম নারীদের মধ্যে ৩৫ থেকে ৪৫ বৎসর বয়সের নারীর সংখ্যাই যদি তুলনায় বেশী হয়ে দাঁড়ায়, তা হ'লে জন্মহার কমেই যাবে। কোন একটা বিশেষ বয়সের (যেমন ২৫) বিবাহিতা নারীগণের এক বৎসরে কত সন্তান জন্মায় জানা থাক্‌লে, আমরা হিসাব করে বল্‌তে পারি যে, ঐ বয়সের একজন বিবাহিতা নারীর এক বৎসরে কতগুলি সন্তান জন্মানর সম্ভাবনা।

এই ভাবে 'বিশেষ প্রজনন-হার' বা 'স্পেসিফিক্ ফার্টিলিটী রেট্' পাওয়া যায়। এই প্রজনন-হারের তারতম্যও সহজেই হ'তে পারে ; যদি নারীরা জন্মশাসন-প্রক্রিয়া গ্রহণ করে বা অধিকতর মাত্রায় ব্যবহার করতে আরম্ভ করে, তা হ'লে প্রজনন-হার কমার জন্য জন্মহারও হ্রাস পাবে। যদি সমগ্র জনসমাজের মধ্যে অবিবাহিতের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যায়, তা হ'লেও জন্মহার ব্যাহত হওয়াই সম্ভব।

জন্মশাসন-প্রক্রিয়া অবলম্বনের ফলে প্রজনন-শক্তি ব্যাহত হয়। সন্তান-জন্মে বাধা দেওয়ার জন্য যে-কোন প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, ব্যাপক অর্থে তা-ই হ'ল জন্ম-শাসন-প্রক্রিয়া ; যথা গর্ভনাশ জন্মশাসন ও সংযম। কিন্তু, প্রশ্ন এই যে, যদি যৌনসহবাসের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়, তা হ'লে কি বিশেষ কিছু লাভ হয় ? জীববিজ্ঞান বলে, দীর্ঘ সময়ের অন্তরে যৌন সহবাস করলে প্রজনন-হার কমাই সম্ভব।

গর্ভ নষ্ট করলে যে সন্তান জন্মাবে না সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। জন্মশাসন বা 'কন্ট্রাসেপ্টীভ্স্' কতদূর কার্য্যকরী তা বলা সহজ নয়। অব্যর্থ কন্ট্রাসেপটীভ্ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। জন্মশাসনের যে-সব পদার্থ পাওয়া যায়, সেগুলি ব্যর্থ হয় দুই কারণে ;—প্রথমতঃ, ব্যবহারের পূর্ব্বে খুব খানিকটা যত্ন ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ; দ্বিতীয়তঃ, এত যত্ন ও সতর্কতা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে সব ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং কন্ট্রাসেপটীভের কার্য্যকারিতা শতকরা কতখানি, সঠিক ভাবে বলা যায় না, যদিও আজকাল অনেকেই বলছেন যে, আধুনিকতম কন্ট্রা-সেপটীভ্ ব্যবহারের ফলে জন্ম সম্পূর্ণ ভাবে শাসন করা সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে ডাঃ রেমণ্ড পার্ল জন্ম-শাসনের ব্যপকতা সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান করেন ; ৫০০০ বিবাহিত নারী ছিল তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়। আয় হিসাবে চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করে তিনি দেখেন যে, দরিদ্রতমদের শতকরা ৩২'৭ জন নারী জন্ম-শাসন করে ; এই শতকরা হার ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে ধনী স্ত্রীলোকদের মধ্যে ৭৮'৩ হয়ে দাঁড়ায়। যারা জননী হয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে স্বেচ্ছায় জননীত্ব বরণ করে নিয়েছিল ; সুতরাং বলা যায় যে, এই অর্দ্ধেকের বেলায় অন্ততঃ জন্মশাসন সার্থক হয়েছে। কার্য্যকরী প্রক্রিয়ার কথা জানত না বলে এক-তৃতীয়াংশকে জননী হতে হয়েছিল ; আর এক-ষষ্ঠাংশ নির্ভুল প্রক্রিয়ার সংবাদ রাখলেও প্রয়োগ করেছিল আনাড়ীর মত, তাই জননী হ'তে বাধ্য হয়েছিল। আমাদের দেশেও কিছুদিন ধরে জন্ম-শাসন-বিষয়ক পুস্তকাবলীর প্রচার বেশ বেড়ে গেছে ; জন্ম-শাসন-বিষয়ক দ্রব্যাদি কত বিক্রয় হচ্ছে, তার হিসাব পাবার উপায় নেই ; তবু বিজ্ঞাপন, পুস্তকের প্রচার ও আন্দোলন দেখে বোঝা যায় যে, কন্ট্রাসেপটীভের ব্যবহার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে সাবানের ব্যবহার ইদানীং খুব বেড়ে গেছে, বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সাবানের খুব তরল ফেনাও শুক্রকীটের প্রাণনাশ করে (Spermacide)। পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সময়ে প্রজনন-হার কমেছে, ঠিক সেই সময়ে সাবানের ব্যবহারও বেড়ে গেছে।

একটা সমাজের প্রজনন-হার যখন কমে, তখন দেখা যায় যে, সমাজের ধনী শ্রেণীর মধ্যেই প্রথমে হ্রাসটা লক্ষ্য করা যায় এবং ক্রমশঃ সেটা নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে সংক্রামিত হয়। তাই কথায় বলে, সামাজিক শ্রেণী ও প্রজনন-হার বিপরীত সম্বন্ধগত (negative cor-relation between social status and fertility).

সম্পৎশালী যারা তারাই প্রথম জন্ম-শাসন-প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে। আমরা জানি যে, প্রায়ই ফ্যাসান সমাজের উচ্চস্তর হতে ক্রমশঃ নিম্নস্তরে সংক্রামিত হয় ; অধিকন্তু জন্ম-শাসনের আসবাবপত্র এতই চড়াদামের হয় যে, গরীব লোকেরা সহজে ক্রয় করতে পারে না। বিলাতের কথা বলতে গিয়ে জর্জ্জ স্কট বলেছেন যে, সেখানকার মজুর শ্রেণীর নারীরা বার্থকন্ট্রোল মেথড অবলম্বন করতে পারে না ; কারণ প্রথমেই ১০ শিলিং (প্রায় ৭৲) খরচ করতে হয়। আর, সপ্তাহে ১ শিলিং থেকে ৩ শিলিং (৮০ থেকে ২।০) পর্য্যন্ত খরচ করতে হয়। আমাদের দেশবাসীর পক্ষে সেটা আরও কত দুঃসাধ্য। উপরে পার্লের অনুসন্ধানের যে ফল দিয়েছি, তা-ও এই যুক্তির স্বপক্ষে সায় দেয়। তিনি আরও দেখান যে, যে-সব মেয়ে জন্ম-শাসন করে না, তাদের মধ্যে

প্রজননহার সমান, তা সে যে-কোন শ্রেণীর হোক না কেন। যাঁরা লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ভয়ে জন্ম-শাসনের পক্ষে ওকালতি করছেন তাঁরা বলছেন যে, জন্ম-শাসন আন্দোলনটা জোরসে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে চালাও, তাহলে উচ্চ ও অনুচ্চ শ্রেণীর মধ্যে যে প্রজনন-হারের বৈষম্য আছে তা দূর হবে। কিন্তু, এখানে একটা কথা স্মরণ করতে হবে। শিক্ষা-প্রসারের জন্য তথাকথিত অনুচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে কিছু কম আন্দোলন করা হয় নি। কিন্তু, তা বলে তারা উচ্চ শ্রেণীর তুলনায় অধিকতর শিক্ষিত হয় নি। জন্মশাসনের বেলাও কিছু অন্যথা হবে

না; আন্দোলনের ফলে উন্নত শ্রেণীর লোকেরা বেশী করে জন্ম-শাসন করবে।

জন্ম-মৃত্যুর বহর লক্ষ্য করে যখন লোকবলের গতি-প্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করি, তখন আমরা এই কথা জানতে চাই যে, কোন একটা জন-সংখ্যা—ধরা যাক্ ১০০০ জন—চলতি (present) প্রজনন-শক্তি ও মৃত্যুহার থাকলে কত সন্তান দেশকে দান করবে? ঐ হাজারই, না তার চেয়ে বেশী বা কম? অর্থাৎ, এখনকার যা প্রজনন-শক্তি ও মৃত্যুহার, তা যদি অব্যাহত থাকে, তা হ'লে বর্ত্তমানের জনসংখ্যার বদলে অনুরূপ জনসংখ্যা ভবিষ্যতে থাকবে কি না। যতগুলি সন্তান মরে, তার চেয়ে বেশী-সংখ্যক সন্তান যদিও জন্মায় তবু একথা জোর ক'রে বলা যায় না যে, জনবল পরিপূরিত (replaced) হবেই; কেননা শুধু প্রজননশক্তি ও মৃত্যুহারের উপর জনবলের বৃদ্ধি-হ্রাস নির্ভর করে না, 'এজ্ কম্পোজিশন'ও (বয়স-সমষ্টি) লক্ষ্য করতে হয়। সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে সন্তান-প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক হলে আমরা অধিকতর সংখ্যায় সন্তান জন্মাতে দেখি; তেমনি আবার শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা অল্প হ'লে মৃত্যুহারও কম হয়, কেননা এরাই সহজে মরণের কোলে আশ্রয় নেয়।

'লোকবল পিরামিড' দেখেও লোকবলের গতি কোন্ দিকে বোঝা যায়। সংশ্লিষ্ট চিত্রে বাংলার লোকবল পিরামিড দেওয়া হয়েছে। নীচের দিক্ থেকে উপরের দিকে অগ্রসর হ'লে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রত্যেকটা ধাপই তার পরবর্ত্তী ধাপের চেয়ে বড়, শুধু একটা ধাপ ছাড়া। এ থেকে বলতে পারি যে, এই লোকবল বাড়তিরই দিকে। যে সময়ের পিরামিড দেওয়া হয়েছে, তার পাঁচ বৎসর পরে প্রত্যেকটা ধাপের স্থানই পরবর্ত্তী ধাপ পূরণ করবে অর্থাৎ ১৯৩১ (৫-১০) গ্রুপের যে লোকসংখ্যা ১৯৩৬ তার স্থান সম্পূর্ণভাবে দখল করতে পারবে (০-৫) গ্রুপ। শুধু দেখা যাচ্ছে যে (১৫-২০) বৎসরের ধাপটি পরবর্ত্তী ধাপের চেয়ে ছোট অর্থাৎ (২০-২৫)এর স্থান পূরণ করতে অসমর্থ। এখানে একটা কথা বলা যায় যে, সাধারণতঃ মেয়েদের বয়স গোপন করবার একটা ইচ্ছা দেখা যায়, তাই এই বিশেষ ধাপটি সত্যই ছোট কি না খুব জোর ক'রে বলা যায় না। পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক গ্রুপেরই (ধাপের) কিছু না কিছু লোক মরবেই, তাই প্রত্যেকটি ধাপ পরবর্ত্তী ধাপে উন্নীত হবার সময় ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়বে; মুসলমান জনসংখ্যার দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক ধাপের অন্তরটা (মার্জ্জিন) এতই সুপ্রশস্ত যে, ভয়ের লক্ষণ বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু হিন্দুদের বেলায় তা বলা যাচ্ছে না, ধাপগুলি এতই সমপর্য্যায়ের যে, পাঁচ বৎসর পরে নীচের ধাপ অব্যবহিত

পরের ধাপের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হতেও পারে। ১৯৩৬-এর পর আরও পাঁচ বছর গেলে হিন্দুদের অবস্থা আরও শোচনীয় হবে, হয় ত বৃদ্ধির চেয়ে হ্রাসই লক্ষ্য করা যাবে।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু 'স্বাভাবিক বৃদ্ধি' লক্ষ্য ক'রে জনবল সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রচার করা যায় না। বাংলায় হিন্দুর লোকবলে বাড়তি এখনও দেখা যায়, কিন্তু হিন্দুর লোকবল-পিরামিড দেখলে মনে হয় ঘাট্‌তি আসন্ন।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, শুধু মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে জন্মসংখ্যার আধিক্য দেখে বলা যায় না যে, ভবিষ্যতে লোকবল বাড়বেই। সেটা জানার জন্য অন্য উপায় দেখতে হয়। বর্ত্তমান জনসংখ্যার স্থান ভবিষ্যৎ সন্তানেরা পূরণ করবে কি না, জানা আবশ্যক হয়; এবং তার জন্য 'স্পেসিফিক্ ফার্টিলিটি রেট্' বা 'নিরূপিত প্রজনন-হার' জানা প্রয়োজন। প্রত্যেক সন্তান-জন্মের সময় প্রসূতির বয়সের হিসাব যে-দেশে রাখা হয়, সে-দেশে স্পেসিফিক্ প্রজনন-হার নিরূপণ করা যায়। এই হিসাব দেখে স্থির করা যায় যে, প্রজনন-ক্ষম বয়সের নারীর বিভিন্ন বয়সে বৎসরে কয়টি করে সন্তান জন্মে। সাধারণতঃ, পাঁচ বৎসরের একটা গ্রুপ হয়। এটকা উদাহরণ নেওয়া যাক।

বয়স গ্রুপ	প্রত্যেক গ্রুপের প্রতি সহস্র নারীর কন্যা সন্তান-সংখ্যা	প্রতি সহস্র কন্যা সন্তানের কয়টি জীবিত	জীবিত কন্যা সন্তান যাহারা এ যুগের নারীর স্থান দখল করিবে
১৫-১৯	১০০	৮০০	৮০
২০-২৪	৪০০	৭৫০	৩০০
২৫-২৯	২০০	৭০০	১৪০
৩০-৩৪	১৫০	৬৫০	৯৭.৫
৩৫-৩৯	১০০	৬০০	৬০
৪০-৪৪	৫০	৫৫০	২৭.৫
	১,০০০		৭৫০

১৫-৪৫ সাধারণতঃ নারীর প্রজননক্ষম বয়স ধরা হয়। এই বয়সটাকে আমরা ৫ বৎসরের গ্রুপে ভাগ করে উপরের প্রথম কলমে লিখেছি। ঐ এক-একটা বয়স-গ্রুপের প্রতি সহস্র নারীর কটি করে সন্তান জন্মে তা নিরূপণ করে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় কলমে; কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে যে, কেবল কন্যা সন্তানের কথাই বলা হয়েছে, ছেলেদের পরিমাণ
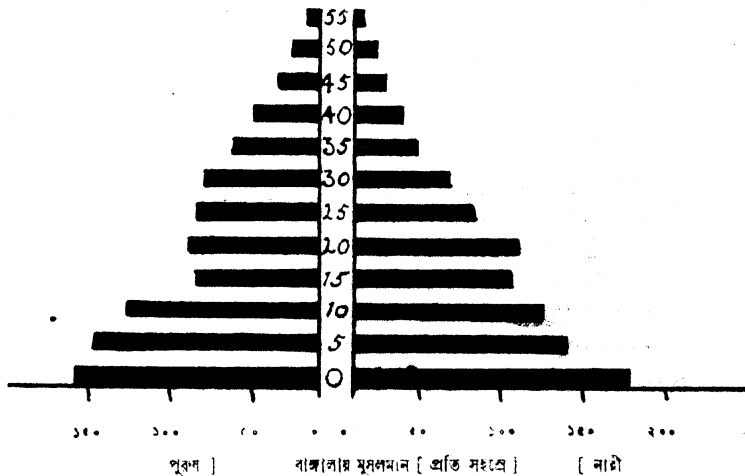
নেই। এর কারণ আর কিছুই নয়, নারীরাই শুধু সন্তান প্রসব করতে পারে, পুরুষের সে ক্ষমতা নেই। উদাহরণটি কাল্পনিক; এই উদাহরণ দেখে এইটা বোঝা যাচ্ছে যে, কোন এক কল্পিত দেশে এক বৎসরে ১৫ থেকে ১৯ বৎসরের ১০০০ সহস্র নারীর ১০০টি কন্যা সন্তান জন্মেছে, আর ২০-২৪ বৎসরের সহস্রটি নারীর মেয়ে হয়েছে ৪০০টি, ইত্যাদি।

এখন ধরা যাক, এই প্রজননহার বহুকাল ধরে অব্যাহত আছে, আর কোন কন্যা-সন্তান ৪৫ বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত মরছে না। তা হ'লে ফল কি হয়? দেখা যাচ্ছে, ১০০ কন্যা-সন্তানের বয়স ১৫ বৎসর পূর্ণ হবে, যখন

তাদের বয়স ১৫-১৯-এর মধ্যে তখন তাদের ১০০টি এবং ২০-২৪শের মধ্যে যখন বয়স তখন ৪০০টি কন্যাসন্তান জন্মাবে; অন্যান্য বয়স-গ্রুপের পূর্ব্বের অনুরূপ সন্তান জন্মাবে। সুতরাং যখন এরা ৪৫ বৎসরে উত্তীর্ণ হবে, তখন এদের মোট কন্যাসংখ্যা দাঁড়াবে ১০০০টি। এখানে দেখছি ১০০০টি কন্যার স্থান ১০০০ কন্যা-সন্তানে পূরণ করছে। অর্থাৎ, লোকবল নিজস্থান পূরণ করছে।

কিন্তু, বাস্তব জীবনে এরূপ ঠিক হয় না। প্রত্যেক বৎসরই কিছু পরিমাণ কন্যা সন্তান মরে এবং মরবেও। সুতরাং স্পেসিফিক্ প্রজনন-হারের মত স্পেসিফিক্ মৃত্যু-

পুরুষ] বাঙ্গালার হিন্দু [প্রতি সহস্রে] [নারী
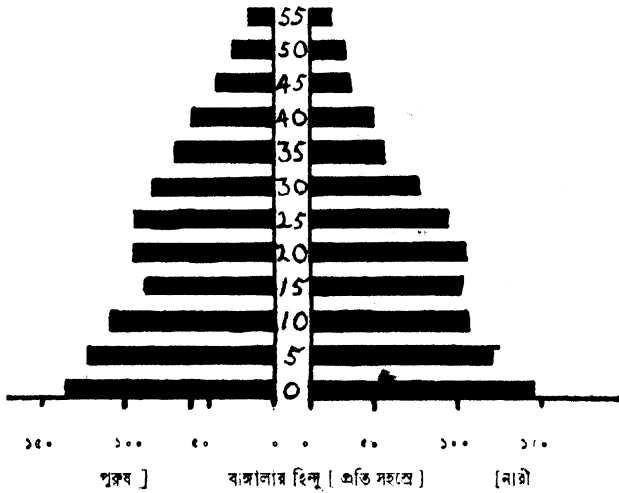
হার জানাও আবশ্যক; প্রত্যেক বয়স-গ্রুপে প্রতি সহস্রে মৃত্যুহার কত তা-ও জানা আবশ্যক। তা হ'লেও বোঝা যাবে, প্রতি সহস্রের মধ্যে কয়জন মেয়ে ১৫, ১৬ ইত্যাদি বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকবে। ধরা যাক, ১০০০টি মেয়ের মধ্যে ১৫ বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই ২০০টি মারা যায়; ১৫ থেকে ১৯ বয়স পর্য্যন্ত ৮০০টি, ২০-২৪ পর্য্যন্ত ৭৫০টি, ২৫-২৯ পর্য্যন্ত ৭০০টি বেঁচে থাকে। উপরে তৃতীয় কলমে এই হিসাব দেওয়া হয়েছে—দেখা যাচ্ছে ৪৫ বৎসরের শেষে কিছু বেশী ৫০০ মাত্র বেঁচে আছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখেছি, ১৫-১৯ বৎসরের ১০০০ নারী ১০০টি কন্যাসন্তান প্রসব করে; অতএব ৮০০ নারীর ৮৩টি কন্যাসন্তান জন্মাবে। ২০-২৪ বৎসরের ১০০০ নারীর ৪০০ মেয়ে জন্মায়; অতএব ৭৫০ জনের ৩০০টি মেয়ে হবে। অন্যান্য বয়স-গ্রুপের অনুরূপ ফল পাওয়া যাবে—৪র্থ কলম দ্রষ্টব্য। হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, ১০০০ জন নারীর স্থান দখল করবার জন্য পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৭৫০টি কন্যা-সন্তান, অর্থাৎ লোকবল নিজস্থান পূরণ করছে না।

একটা দেশের জনসংখ্যা বাড়বে, না কমবে জানবার জন্য লোকশাস্ত্রী ডাঃ কুচিনস্কি 'গ্রস প্রজনন-হার' (Gross reproduction rate) ও 'নেট প্রজনন-হার' (Net reproduction rate) প্রয়োগ করেন। এই দুটি হারের প্রয়োগ আমরা উপরের উদাহরণে পাব। শুধু প্রজননশক্তির প্রতি নজর দিলে গ্রস প্রজনন-হার পাওয়া যায়। উপরের উদাহরণে দেখেছি যে, ১০০০টী নারীর ১০০০টী কন্যা সন্তান জন্মায়, অর্থাৎ ১০০০টী ভবিষ্যৎ মাতার উদয় হয়—অতএব গ্রস্ প্রজননহার ১ বল্‌তে পারি। গ্রস্ প্রজননহার ১ হ'লে লোকবল অব্যাহত থাকে না; কারণ, ঐ হাজারটি কন্যা-সন্তানের মধ্যে কয়েকজন প্রজনন-ক্ষম বয়স হবার পূর্ব্বেই ইহলীলা সংবরণ করবে। সুতরাং জনসংখ্যা পরিপূরিত হবে কি না, জানার জন্য মৃত্যু-হারও দেখা প্রয়োজন। উপরের উদাহরণে ১০০০টী নারীর ১০০০টী কন্যা সন্তান জন্মালেও মাত্র ৭০৫টী প্রজনন-ক্ষম বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাক্‌ছে; অতএব বল্‌তে পারি যে, নেট প্রজননহার ০'৭৫। নেট প্রজননহার ১-এর কম হলে বুঝতে হবে, লোকসংখ্যা হ্রাস পাবে (not replacing itself)। ডাক্তার কুচিনস্কি জন-সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নিরূপণের এই যে উপায় বার করেছেন, তা যেমন সরল, তেমনি সুন্দর; তবে নেট প্রজনন-হার নির্দ্ধারণের জন্য জানা চাই স্পেসিফিক্ প্রজননশক্তি ও স্পেসিফিক্ মৃত্যুহার—এবং এটা পাওয়াই দুষ্কর। সন্তান-জন্মের সময় মাতার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে কোন ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ আমাদের দেশে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না; ভাইট্যাল

ষ্ট্যাটিস্টিক্স্ও ২০% ভ্রমপূর্ণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের দেশের জনবল-হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোন মতবাদ কি নিঃসংশয়ে দেওয়া যায় ?

মৃত্যু-হার যদি ক্রমশঃ কমে আসে, তা হ'লে প্রজনন-হার বৃদ্ধি না পেলেও লোকবল বাড়তে পারে। একথা ঠিক যে, এখনও আমাদের দেশে লোককে যমের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য অনেক কিছুই করার আছে—কিন্তু, যাদের বাঁচাতে পারলে লোকবল বাড়তে পারে তারা হ'ল প্রজননক্ষম নারীর দল। যারা প্রজননশক্তি হারিয়েছে বয়স বাড়ার জন্য তাদের মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচালে কোন এক সময়ে লোকসংখ্যা কিছু বাড়তে পারে বটে, তা বলে ভবিষ্যৎ লোকবলও যে বাড়বে তা কোন মতেই বলা যায় না। লোকবলের গতি নির্দ্ধারণের দিক্ থেকে মেয়েরা সন্তান-প্রজননশক্তি হারাবার অব্যবহিত পরেই মরে যায় কি, আরও একশত বৎসর বেঁচে থাকে, কিছু যায় আসে না; আমাদের জানা দরকার, ১০০০টা নারী হাজারটি মেয়ে রেখে মরেছে কি না, এরূপ ক্ষেত্রে যদি মেয়েদের বয়স ৪৫ হওয়া পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা যায় (অর্থাৎ মেয়েদের মধ্যে মৃত্যুহার কমিয়ে আনা যায়), তা হ'লে লোকবল কিছু বাড়লেও বাড়তে পারে। উপরে যে উদাহরণ দিয়েছি, সে ক্ষেত্রে যদি হাজারটা মেয়ের মধ্যে ৮০০টার জায়গায় ৯০০ জন বেঁচে থাক্‌ত ও ১৫-১৯ বয়স-গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হ'ত এবং ৫৫০-এর বদলে ৭০০ জন ৪০-৪৪ বয়স গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হত, তা হ'লে 'নেট প্রজননহার' বেড়ে যেত।

পূর্ব্বেই বলেছি, নেট্ প্রজনন-হার ১ এর কম হলে লোকবল হ্রাস পাবে; কিন্তু তবু আমরা দেখি যে, ঠিক্ তা হ'চ্ছে না, যেমন ইংল্যাণ্ড-ওয়েলস্। কুচিন্‌স্কি স্থির করেছেন যে, ইংল্যাণ্ড-ওয়েল্‌সের নেট প্রজনন-হার ০·৭৩৪; কিন্তু তবু এখনও প্রতি বৎসর লোকসংখ্যা বাড়ছে, কেননা মৃত্যুর চেয়ে জন্ম হচ্ছে বেশী। কুচিন্‌স্কি বলেন যে, যদি বেশী দিন নেট প্রজনন-হার এই ভাবে ১-এর কম থাকে তা হ'লে ইংল্যাণ্ড-ওয়েল্‌সের লোকসংখ্যা কমবেই। নেট প্রজনন-হার যদি ০·৭৫ থাকে, তা হ'লে এক পুরুষে এক-চতুর্থাংশ লোক কমবে; আর যদি ১·৫ হয় তা হ'লে এক পুরুষে লোকবল দেড়া হবে। এক পুরুষ বলতে ৩০ বৎসর ধরাই যুক্তিসঙ্গত। সুতরাং ১৯৩৪ সালে যদি ইংল্যাণ্ড-ওয়েল্‌সের নেট প্রজনন-হার থাকে ০·৭৩৪, তা হ'লে অনুমান করা যায়, ৪০ বৎসর পরে ১৯৭৪ সালে যদি লোক-সংখ্যা গণনা করা হয়, তাহ'লে দেখা যাবে, ঐ দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে ঠিক এরূপ ফল না পাওয়াও যেতে পারে, কেননা, এই ৪০ বৎসরে প্রজননশক্তি ও মৃত্যুহার (fertility and mortality) যে এখনকার মতই থাক্‌বে তা বলা যায় না।

দেশের মধ্যে বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখ্‌লেই আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে, লোকবল অত্যধিক বেড়েছে। কিন্তু, বেকার ও লোকবলের হিসাব নিয়ে দেখা গেছে, দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিশেষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিলাতের কথা যদি ধরা যায়, তা হ'লে দেখা যায় যে, ২।৪ বছর অন্তর বেকার-সংখ্যা বেড়ে গেছে। এখন যদি বলা হয় যে, বেকার-সংখ্যা বেড়েছে, অতএব লোক-বল অত্যধিক হয়েছে, তা হ'লে বল্‌তে হয় যে, ২।৪ বছর অন্তর লোকসংখ্যা বেড়েছে আবার কমেছে; কিন্তু লোকবল কার্ভ অঙ্কন করলে দেখা যায় যে, তা ধীরে ধীরে বেড়েই গেছে। অধিকন্তু, যুক্তরাষ্ট্রের কথা যদি আলোচনা করা যায়, তা হ'লে দেখা যায় যে,—কি শিল্পে, কি বাণিজ্যে, কি প্রাকৃতিক সম্পদে সে দেশ উন্নত বলেই চারিদিকে প্রচারিত; অথচ ১৯২৯ সালের পর থেকে সে দেশে বেকার-সমস্যা লেগেই আছে; কিন্তু তা বলে প্রত্যেক বর্গ মাইলে লোকের চাপ খুব বেশী নয়; ইংল্যাণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ৭৮০ লোকের বাস, আর যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ৫০ জনের বাস। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের লোক-বল যে অত্যধিক তা বল্‌তে পারি না, তবু দেখ্‌ছি সে দেশে বেকার-সমস্যা প্রবল। অতএব বলা যায় যে, বেকার না থাকলেও লোকবল অত্যধিক হতে পারে, বা বেকার বাড়ছে দেখলেই বলা যায় না যে, দেশ লোকবহুল (over-populated) হয়েছে।

ভারত এখনও প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। ভারতের সব অঞ্চলে লোক-বসতি সমান নয়; বাংলার প্রতি বর্গমাইলে ৬৪৬ জনের বাস; আর আসাম অঞ্চলে

১৫৭, বোম্বাই প্রদেশে ১৭৭, মধ্যপ্রদেশে ১৬৫, মাদ্রাজ প্রদেশে ৩২৮, নর্থ-ওয়েষ্ট ফ্রন্টিয়ারে ১৭৯, বিহার-উড়িষ্যায় ৪৫৪ ও যুক্তপ্রদেশে ৪৫৬ জনের বাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোন কোন অঞ্চলে লোকের চাপ একটু বেশী হ'লেও, এমন অনেক প্রদেশ পড়ে রয়েছে, যেখানে আরও লোক বাস করতে পারে। আমাদের দেশের উত্তরাধিকার-আইন অনুসারে সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হয়; সুতরাং জমি ক্রমশঃ খণ্ডিত হ'তে হ'তে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে এসে পৌছায় যে, সেরূপ ক্ষুদ্র একখণ্ড জমির আয়ের উপর যাদের নির্ভর করতে হয়, তাদের দুর্দ্দশার শেষ থাকে না; সুতরাং সমস্যা হচ্ছে, যাতে ভূমি খণ্ডিত হ'তে হ'তে অর্থ নৈতিক হিসাবে অ-লাভজনক হয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা করা এবং সেজন্য উত্তরাধিকার-আইন, প্রজাস্বত্ব-আইন প্রভৃতির যেটুকু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক তা-ই আগে করা উচিত।

পিতামাতা অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্ততির জন্ম কেন দিতে নারাজ হয়ে পড়েন, একটু চিন্তা করে দেখা যাক্। মানুষের মনে জনক-জননী হবার যে প্রকৃতিদত্ত ইচ্ছা বর্ত্তমান, তার ফলে পৃথিবীতে যতদিন মানুষ আছে, ততদিন সে সন্তান কামনা করবে; কিন্তু তার এই সন্তান পাবার ইচ্ছার নিবৃত্তির জন্য তার যতগুলি সন্তান জন্মান সম্ভব, সব কটাই যে জন্মান চাই, তার কোন মানে নেই; আজকাল জন্ম-শাসনের উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে; সুতরাং পিতামাতা কটি সন্তানের জনক-জননী হবে, তা নির্ভর করে দুটি বিপরীত শক্তির উপর—একদিকে আছে সন্তানের জন্ম দেবার কামনা, আর একদিকে আছে সন্তান জন্মালে যে সব দুর্ভোগ দেখা দেওয়া সম্ভব তাদের সমষ্টি। এই দুর্ভোগের সম্ভাবনা নিম্নরূপ:—

প্রথমতঃ, প্রসূতি-মৃত্যুর ভয়। সন্তান প্রসব করতে গেলে যে প্রাণ সংশয় হতে পারে, তা যে কোন কারণেই হোক, তার জন্য অনেক নারীই ২।১ সন্তানের পর বা একেবারেই জননী হতে চান না। অর্থনৈতিক কারণেও অনেকে সন্তানের জন্ম দিতে চান না। একটা কাজের জন্য ৮।১০টা সন্তানের জনক যে মাহিনা বা মজুরী পান, যাঁর কোনরূপ দায়িত্ব নেই, তিনিও অনুরূপ কাজের জন্য সেই একইরূপ অর্থ উপায় করেন। সুতরাং প্রত্যেক অতিরিক্ত সন্তান-জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি সন্তানের মাথা-পিছু ব্যয় বেড়ে যায়। একটি শিশুর লালন-পালন-খরচা, পরিণত বয়সের লোকের প্রায় অর্দ্ধেক; সুতরাং যে দম্পতীকে ২টি শিশু-সন্তান পালন করতে হয়, বলা যায় যে, সেই দম্পতী একটি বেকার লোক পালন করছে; অধিকন্তু বেকার লোক গৃহস্থের ঘরকন্নার খুটীনাটী কাজে লাগে; শিশুদের কাছ থেকে ত উপকার পাবার যো-ই নেই, বরং তাদেরই সারাক্ষণ আগলে আগলে বেড়াতে হয়। ছেলেদের শুধু পালন করলেই হয় না, তাদের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয়, ভবিষ্যতে যাতে তারা উপযুক্তরূপ উপার্জ্জন করতে সক্ষম হয়, তা-ও দেখতে হয়। ঘরে ঘরে যে রকম ভাবে বেকার-সংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতামাতাদের শঙ্কাকুল হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে পিতামাতা যে সন্তান-জন্ম প্রতিরোধ করতে চাইবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে আমরাও এক অদ্ভুত ভাবে উচ্চাভিলাষী হতে সুরু করেছি, বিশেষ করে আমাদের মধ্যে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে সমাজের চূড়ায় বসে আছেন। ছেলেকে বিলেত ঘুরিয়ে এনে অন্ততঃ নিজের তক্তায় অধিষ্ঠিত করে যাবেন, এই হ'ল অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষিত পিতামাতার মনোভাব; অধিক সংখ্যায় সন্তান জন্মালে পিতামাতার এ আশা নির্ম্মূল হয়, তাই তাঁরা বেশী সন্তান কামনা করেন না। জন্ম নিয়ন্ত্রিত করবার উপায় যতদিন জানা ছিল না, ততদিন লোকে গর্ভ নষ্ট করে সন্তান-সংখ্যা কম রাখতে চেষ্টা করত; জন্মশাসনের উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় আর সে দুঃখ সহ্য করতে হয় না। যে আবেষ্টনের মধ্যে আমরা গড়ে উঠেছি, তাতে জন্মশাসন-প্রক্রিয়াটা ছিল আমাদের কাছে বিশেষ অপ্রীতিকর; কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এবং জন্মশাসন-আন্দোলন ও বিজ্ঞাপনের প্রাবল্যে ক্রমশঃ এ অপ্রীতিকর ভাব কেটে যাচ্ছে; এখন অনেকেই জন্মশাসন করতে কোনরূপ লজ্জা বোধ করেন না। দেশের হাওয়া দেখে মনে হয়, জন্মশাসন ক্রমশঃ ব্যাপকতা লাভ করবে। অতএব, পরিবার-পিছু সন্তান-সংখ্যা যে কমে আসবে, সেটাই বেশী করে আশঙ্কা করা যায়।

লোকবল সম্বন্ধে কোন মতবাদ প্রচার করার পূর্ব্বে আমাদের এ-সব কথা আলোচনা করে দেখা কর্ত্তব্য।

আধুনিক দার্শনিক মতবাদ

—শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

আধুনিক দার্শনিকগণ ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত ও পূর্ব্বমীমাংসা, এই ছয়টি দর্শনকে 'আস্তিক' দর্শন বলেন। তাঁহাদের মতে চার্ব্বাক, মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক ও জৈন-ভেদে 'নাস্তিক' দর্শনও ছয়টী।

যাঁহারা বেদ মানেন না, যাঁহাদের পরলোকে বিশ্বাস নাই, তাঁহারাই নাস্তিক। ঈশ্বর না মানিলে নাস্তিক হয় না। ঈশ্বর একটি নাম মাত্র। কেহ কেহ ঈশ্বরকে পরমাত্মা বলিয়া জানেন, কেহ ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, কেহ যজ্ঞ-পুরুষ বলিয়া জানেন, আর কেহ বা আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া বুঝিয়া থাকেন; কাজেই ঈশ্বর বলিয়া কোন বস্তু স্বীকার না করিলেও আস্তিক্যে বাধা পড়ে না; তবে যদি কেহ বেদ না মানেন বা পরলোকে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে কিছুতেই আস্তিক বলা যায় না—তিনি বাস্তবিকই নাস্তিক। এই জন্যই নাস্তিক দর্শনে কোথাও বেদ, কোথাও বা পরলোক, আর কোথাও বা দুইটাই অস্বীকৃত হইয়াছে; আর এই জন্যই এগুলি নাস্তিক দর্শন।

যে কার্য্যকারণ-ভাবের ভাবনারূপ এক অকম্প্য ভিত্তির উপর এই সকল দর্শন-শাস্ত্র, এমন কি, জগতের সমুদয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা বুঝানের জন্য এদেশে যত প্রকার মত প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল মতের প্রভাব পাশ্চাত্ত্য দর্শনও ছাড়াইয়া যাইতে পারে নাই [১]। পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও আরম্ভবাদ (Atomic theory), পরিণামবাদ (Theory of evolution) ও বিবর্ত্তবাদ (Theory of illusion) স্থান পাইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জড়-বিজ্ঞানের মূলে যে একরূপ পরিণামবাদ (Theory of evolution) অবলম্বিত হইয়াছে, যাহা মহামতি ডারউইন সাহেবের (Dr. Darwin) নামে প্রচলিত, তাহা ভারতীয় সাংখ্যাদি দর্শনে ব্যবস্থাপিত পরিণামবাদেরই রূপান্তর। সাংখ্যেরা দার্শনিক চিন্তায় সূক্ষ্মের দিকেই চলিয়া গিয়াছেন; আর ডারউইন সাহেব জড়ের দিকেই জোর দিয়াছেন। সাংখ্যেরা জগতের মূল কারণ 'প্রধান' বা প্রকৃতি হইতে সৃষ্টির রহস্য বুঝাইয়া গিয়াছেন, আর ডারউইন সাহেব মূল উপাদানের তত্ত্ব না বলিয়া যুক্তির আশ্রয়ে ঐহিক স্থূল জড়বস্তুর স্বভাব বুঝাইবার জন্যই চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা যে, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয় [২]। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Idealism বলিয়া যে মতবাদ আজকাল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহা যে ভারতীয় বিবর্ত্তবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

যে মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় পাশ্চাত্ত্য দেশ আজকাল গৌরব বোধ করিয়া থাকেন, সেই মনোবিজ্ঞানের আলোচনাও প্রাচীন ভারতে যথেষ্ট হইয়াছিল। সাংখ্য দর্শনে এইরূপভাবে বুদ্ধির ভেদ দেখান হইয়াছে যে, তাহাতে মনোবিজ্ঞানের আলোচনা বিশেষভাবেই পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে [৩]। পাতঞ্জল দর্শনে পাঁচটী চিত্ত-ভূমির [৪] বিবরণ এইরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে যে, তাহাতে

১। A struggle arose between an idealistic conception which emphasized the purely spiritual interpretation of the religious ideas and their realistic or materialistic view which supported a clear and literal interpretation. Such a struggle occurs in many religions. In the *Upanisads* which give the idealistic exposition of the religion of the Vedas, we find it stated that Brahma, the deity is internal and since name, place, time and body perish, none of these can be predicated of Brahma. In Xenophanes' and Plato's criticisms of the religion of the Greeks we find a similar idealistic tendency.

Hoffding, *Philosophy of Religion*, 1906. p. 48.

২। The absorption of all separate existences in a single substance, as it is taught by Eleatics seems rather an echo of Indian Pantheism than a Principle of Hellenic Spirit.—*History of Philosophy*, Vol. I. 4th edition, p 85.

৩। এষ প্রত্যয়সর্গো বিপর্য্যয়াশক্তি-তুষ্টি-সিদ্ধ্যাখ্যঃ।
গুণবৈষম্যবিমর্দ্দাৎ তস্য চ ভেদাস্তু পঞ্চাশৎ॥
—সাংখ্যকারিকা, ৪৬

৪। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তম্ একাগ্রম্ নিরুদ্ধম্ ইতি চিত্তভূময়ঃ।
—পাতঞ্জল দর্শন, সূত্র ১, ভাষ্য।

মনোরাজ্যের আলোচনা করাই যে পাতঞ্জল দর্শনের প্রধান কার্য্য, ইহাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। বেদান্ত দর্শনের জ্ঞানতত্ত্ব ও মীমাংসা দর্শনের কর্ম্মতত্ত্ব অভাবনীয় বিষয়। এই জ্ঞানতত্ত্ব ও কর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের যেরূপ ধারা শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে মনোবিজ্ঞানের (Psychology), ও নীতি-বিজ্ঞানের (Ethics) সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে। ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন ও নব্য ন্যায়ে 'ব্যবসায়'-জ্ঞান ও 'অনুব্যবসায়'-জ্ঞান স্বীকার করিয়া ন্যায়াচার্য্যেরা জ্ঞান-তত্ত্বের যেরূপ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা দর্শন শাস্ত্রের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। 'এই ঘট' (অয়ং ঘটঃ)—এইরূপ জ্ঞান ব্যবসায় জ্ঞান, "আমি ঘট জানিতেছি" (ঘটমহং জানামি)—এইরূপ জ্ঞান অনুব্যবসায়-জ্ঞান। ন্যায়াচার্য্যদের মতে জ্ঞান নিজে প্রকাশমান নহে, অন্য জ্ঞান দ্বারা ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভারতে জ্ঞানতত্ত্বের ভিতর দিয়া মনস্তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। কেবল তাত্ত্বিক রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াই ভারতের দার্শনিকেরা স্ব স্ব কর্ত্তব্য শেষ করিয়া যান নাই, তাঁহারা কার্য্য-বিজ্ঞানেরও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়াদি দর্শনে "কদম্বকোরকন্যায়" ও "বীচিতরঙ্গন্যায়ে" শব্দের শ্রবণ-ক্রিয়ার তত্ত্ব অধুনা পাশ্চাত্য জড়-বিজ্ঞানের নূতন আবিষ্কারের পথ সহজ করিয়া দিয়াছে। প্রমাণ সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদে[১] জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষভাবেই পর্য্যালোচিত হইয়াছে।

তর্কশাস্ত্রের আলোচনা ভারতে এরূপভাবেই হইয়াছিল যে, ঐ বিষয়ে গঙ্গেশের নব্যন্যায় "তত্ত্বচিন্তামণি"র মত গ্রন্থ জগতে আর একখানি রচিত হইতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। গঙ্গেশ ঐ গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনুমান, তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপমান ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে শব্দ প্রমাণ সম্পর্কে বিচার করিয়া এক অভিনব ছাঁচে ন্যায়শাস্ত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। এজন্য তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি" নব্যন্যায় নামে প্রসিদ্ধ। গঙ্গেশ প্রমাণ-কাণ্ডের এরূপ-ভাবে বিচার করিয়াছেন এবং এরূপ নৈয়ায়িক ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাঁহার গ্রন্থ ন্যায় দর্শনেরই পরিশিষ্ট হইলেও, মৌলিক নূতন শাস্ত্রের আবিষ্কারক বলিয়া তাঁহার সম্মান না করিয়া পারা যায় না। তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক দুইটি মতকে এক ছাঁচে ঢালিয়া তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে তিনি যথেষ্ট আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার আবিষ্কৃত নব্যন্যায় একটি পৃথক্ শাস্ত্ররূপেই গণ্য হইয়াছে। সাংখ্যের পরিশিষ্ট হইলেও পাতঞ্জল দর্শন যেমন একটি পৃথক্ শাস্ত্র, সেইরূপ ন্যায়ের পরিশিষ্ট হইলেও গঙ্গেশের নব্যন্যায় একটি পৃথক্ শাস্ত্র। ইহাকে প্রমাণ-বিদ্যাও বলা যাইতে পারে। যদিও গঙ্গেশের পূর্ব্বেই প্রশস্তপাদভাষ্য, সপ্তপদার্থী, লক্ষণাবলী, ন্যায়লীলাবতী প্রভৃতি গ্রন্থেই নব্যন্যায়ের সূত্রপাত দেখা যায়, তথাপি "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থেই ইহার সর্ব্বপ্রথম পূর্ণ বিকাশ; এই জন্য গঙ্গেশের নামেই ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যাঁহারা নব্যন্যায়কেও ন্যায় দর্শনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহাদের মত কতটা যুক্তিসঙ্গত তাহা সুধীগণ ভাবিয়া দেখিবেন। যে সৃষ্টি-তত্ত্ব দার্শনিক গবেষণার মূল ভিত্তি, সেই সম্পর্কেও ভারত যে তিনটি মত আবিষ্কার করিয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোনরূপ মত এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আরম্ভবাদ এখন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাবে প্রচারিত। জড়-বিজ্ঞানবাদীরা এই মতের উপরই স্ব স্ব আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। অবশ্য, জড়-বিজ্ঞান-বাদীরা পরিণামবাদের উপরও অনেক আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তথাপি আরম্ভবাদই জড়-বিজ্ঞানে বিশেষ আদৃত। কারণ, পরমাণুর ব্যাপার লইয়াই জড়-বিজ্ঞান ব্যস্ত; আর, এই পরমাণু আরম্ভবাদেরই পদার্থ। সুতরাং আরম্ভবাদই জড়-বিজ্ঞানের প্রধান অবলম্বনীয় মত। আরম্ভবাদ যে একটা কল্পনামাত্র নহে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যদি কল্পনামাত্রই হইত, তবে এতদিন এত ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে ইহা টিকিয়া থাকিতে পারিত না। এই জন্য এই মতবাদটা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। অধুনা জড়-বিজ্ঞানের উন্নতিতে আরম্ভবাদের যে অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আধুনিক দার্শনিকেরা এই সকল মতবাদ নিয়াই বাগ্-বিতণ্ডায় রত, আজ ভারতীয় ঋষির 'দর্শন' তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণ 'অদর্শন'রূপেই রহিয়া গিয়াছে, জানি না, কবে তাহার দর্শন মিলিবে।

১। প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

—তার্কিকরক্ষা।

বিজ্ঞান-জগৎ

ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা ঃ

আটেব্রিন ও প্লাসমোকিন ব্যবহারের বিপদ্

—শ্রীসুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী

ম্যালেরিয়া বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পত্তি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা সম্বন্ধে বাঙালী মাত্রেরই কিছু কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে বহু রোগের চিকিৎসার নূতন নূতন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হইতেছে। আমাদের দেশের চিকিৎসকগণও সকলে না হইলেও অনেকেই—যথাসাধ্য বিচার ও বিবেচনা না করিয়াই নূতন নূতন ঔষধ লইয়া রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে রাসায়নিক প্রয়োগে রোগের চিকিৎসা—'কেমোথেরাপী' সম্পর্কে এই পত্রিকায় আলোচনা করা হইয়াছিল (ফাল্গুন, ১৩৪৪)। অনেক বৈজ্ঞানিক এখন মনে করিতেছেন যে, রাসায়নিক প্রয়োগে শরীরের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের ফলে রোগবীজাণু অথবা রোগগ্রস্ত অংশের পরিবর্ত্তন ঘটে না, কেবল বীজাণুর রোগ জন্মাইবার ক্ষমতা অল্প হ্রাস পায় মাত্র।

ম্যালেরিয়ার কারণ সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না। বেণ্টলী সাহেবের মতে খাদ্যাভাবই ম্যালেরিয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। কারণ যাহাই হউক, ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশের মত এত অধিক বোধ হয় আর কোথাও নাই। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কুইনিন এর প্রয়োগ সুপরিচিত ও সুপ্রচলিত। পূর্ব্বে দৈনিক ৩০ হইতে ৪০ গ্রেন কুইনিন রোগীকে দেওয়া হইত। সংপ্রতি লীগ অব নেশন্স এর ম্যালেরিয়া কমিশন তাঁহাদের চতুর্থ রিপোর্টে বহু গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে জানাইয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় উক্ত প্রথার পরিবর্ত্তে ৫।৭ দিন ধরিয়া ৩ বারে দৈনিক ১৫ হইতে ২০ গ্রেন কুইনিন প্রয়োগ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যায়। অধিকন্তু, অধিকমাত্রায় কুইনিন সেবনের প্রতিক্রিয়াসকলও ইহাতে হয় না। জ্বর ছাড়িয়া গেলে কয়েক দিনের জন্য দৈনিক ৬ গ্রেন পরিমাণ কুইনিন প্রতিষেধক হিসাবে সেবনীয়। পুনরাক্রমণ হইলে আবার পূর্ব্বের মত দৈনিক ১৫-২০ গ্রেন কুইনিন দেওয়া যাইতে পারে। ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ, গ্রীস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন।

বর্ত্তমানে কুইনিন-এর পরিবর্ত্তে 'আটেব্রিন' ও 'প্লাসমোকিন' নামে দুইটি রাসায়নিক ব্যবহৃত হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেকের ধারণা জন্মাইয়াছিল যে, কুইনিন প্রয়োগে ম্যালেরিয়া বন্ধ হইবার * পর পুনরাক্রমণ বন্ধ করিতে আটেব্রিন অথবা প্লাসমোকিন অধিকতর উপযোগী। পানামায় ব্যাপকভাবে ২ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্লাসমোকিন ব্যবহারের পরও শতকরা ৮৬ জনের উপর রোগীর দেহে ম্যালেরিয়ার বীজ বর্ত্তমান থাকে। আটেব্রিন সম্বন্ধেও বিশেষ অনুকূল ফল পাওয়া যায় নাই। মালাক্কায় পরীক্ষা করিয়া জনসন দেখেন যে, আটেব্রিন প্রয়োগের পরে শতকরা ৭৬ জন রোগীর পুনরায় জ্বর হয়। কলম্বোর ৬৪৭ জন রোগীর উপর পরীক্ষা করিয়া জনসন ও সন্দরসাগর দেখেন যে, কুইনিন প্রয়োগের পর যে সংখ্যক রোগীর পুনরায় জ্বর হয় আটেব্রিন প্রয়োগের পর তাহার প্রায় তিনগুণ রোগী পুনরাক্রান্ত হয়।

প্রথমে প্লাসমোকিন দৈনিক ১ হইতে ১½ গ্রেন হিসাবে প্রয়োগ করা হইত, কিন্তু তাহাতে দেখা যায় যে, ইহা বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে এবং পেটে ব্যথা, পেটের গোলমাল, সায়ানোসিস্ (নীল জণ্ডিস্) প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে দেখা যায়। ইহার পরে ঔষধের মাত্রা ½ হইতে ⅓ গ্রেন করা হয়। ইহাতে ঔষধের উপযোগিতা হ্রাস পায় এবং বিষক্রিয়াও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না।

সুস্থ ব্যক্তির যকৃতের উপরও ইহা খারাপ ক্রিয়া করে। অধিকন্তু, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্লাসমোকিন ও আটেব্রিন শ্বাসক্রিয়ার গোলযোগ ঘটায়।

আটেব্রিন ব্যবহারেরও বহু কুফল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আটেব্রিন আবিষ্কারের পরেই সিংহল, ভারত, চীন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ হইতে রিপোর্ট পাওয়া যায় যে, ইহা ব্যবহারে মাথার গোলমাল দেখা দেয়। ফিল্ড একটি পরীক্ষায় ১৩০ জন ব্যক্তিকে ২॥ হইতে ৯ মাস পর্যন্ত আটেব্রিন প্রয়োগের পর তিন জনের মধ্যে মাথার গোলমাল

অপারেশন ঘরে নূতন বীজাণু-নাশক বাতি।

দেখেন, কিন্তু কুইনিন-ব্যবহারকারী এবং কোন ঔষধ ব্যবহার করে নাই এরূপ ২৬৮ জনের কিছুই হইতে দেখেন নাই। আটেব্রিন প্রয়োগের ফলে স্নায়ুমণ্ডলীর গণ্ডগোল, বিশেষতঃ শিশুদের মধ্য হইতে দেখা গিয়াছে। আটেব্রিন প্রয়োগ করিলে যকৃতের মধ্য অনেক পরিমাণ আটেব্রিন সঞ্চিত হইয়া থাকে, ইহাতে যকৃতের স্থায়ী দোষ জন্মায়। প্রতি-ষেধক হিসাবে কিছুদিন ধরিয়া সাপ্তাহিক ·৪ গ্রাম হিসাবে আটেব্রিন সেবনের পর মালাক্কার দুইটি তামিল কুলির মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর তাহাদের শবব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখা যায় যে, তাহাদের যকৃৎ স্থায়ী, ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অপর একটি রোগী ৩ দিনে ·৭ গ্রাম আটেব্রিন ও ·০২ গ্রাম প্লাসমোকিন সেবনের পর ২ দিনের মধ্যে যকৃতের রোগে মারা যায়।

আটেব্রিন ইন্‌জেকশন করিলে আরও অধিক কুফল পাওয়া যায়। মাত্র ·১ গ্রাম আটেব্রিন মুসলেট দুই বার ইন্‌জেকশন দেওয়াতে ১০ বৎসর বয়সের কিছু কম দুইটি শিশুর মৃত্যু হইতে দেখা যায়। আসামের কোন চা-বাগানে ৫০ জন শিশুর মধ্যে পাঁচ জনের তড়কার মত হইতে দেখা যায়। আটেব্রিন ইন্‌জেকশনের ফলে সাময়িক ভাবে মৃগী এবং মাথার গোলমাল হইবারও বহু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ব্রায়ারক্লিফ ৬৮১ জন রোগীর চিকিৎসায় আটেব্রিন প্রয়োগ করিয়া দেখেন যে, উহার মধ্যে ২৩ জনের বমি এবং পেটে ব্যথা হয়, ১৩ জনের মাথার গণ্ডগোল জন্মায়, ২ জনের ধাত ছাড়িয়া যায় এবং ৪ জন মারা যায়; একই সময়ে কুইনিনসেবী ৪২৪ জন রোগীর মধ্যে মাত্র ২ জনের মধ্যে নূতন উপসর্গ দেখা দেয়।

অনেক সময়ে আটেব্রিন ও প্লাসমোকিন একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু, ইহাতে ফল আরও খারাপ হয়, দুইটির মিশ্রণে ঔষধের বিষক্রিয়া আরও বৃদ্ধি পায়। লীগ অব নেশন্সএর ম্যালেরিয়া কমিশন ইহা স্বীকার করিয়াছেন। কলিকাতার 'স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন'-এর অধ্যক্ষ রেভেট কর্ণেল চোপরা বলেন যে, কেবলমাত্র আটেব্রিন অপেক্ষা দুইটির সমবায়ে বিষক্রিয়া অধিক হয়।

বীজাণু ও আলোক

সূর্য্যালোকে রাখিলে বীজাণু নষ্ট হয় ইহা সকলেই জানেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বীজাণুগুলি সূর্য্যের অদৃশ্য আল্‌ট্রা-ভায়লেট আলোর ক্রিয়াতেই নষ্ট হয়। আল্‌ট্রা-ভায়লেট রশ্মির এই ক্রিয়া বহুদিন হইতেই সুবিদিত, কিন্তু তাহা ব্যাপকভাবে কাজে লাগাইবার বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ইহার কারণ সাধারণ আল্‌ট্রা-ভায়লেট বাতির অনেক অসুবিধা আছে। সাধারণতঃ, এই সকল বীজাণুনাশক আলোর সহিত প্রচুর তাপ জন্মায় এবং বাতাসের অক্সিজেনের উপর আল্‌ট্রা-ভায়লেট রশ্মির ক্রিয়ায় 'ওজোন' প্রস্তুত হয়। সাধারণ আল্‌ট্রা-

ভায়লেট বাতিতে কাচ ব্যবহার করা চলে না, কারণ কাচ আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি শোষণ করিয়া লয়। কাচের বদলে স্ফটিক ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহাতে বাতির দাম পড়ে অনেক। কেবলমাত্র দাম নহে, এই জাতীয় বাতিতে বিদ্যুতের খরচও হয় অত্যধিক। অধিকন্তু, এই সকল বাতি হইতে যে আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মি পাওয়া যায় তাহার অতি সামান্য অংশ জীবাণুনাশের কাজে লাগে।

এই সকল অসুবিধা দূর করিবার জন্য দুইজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক পাঁচ বৎসর চেষ্টার ফলে সংপ্রতি এক প্রকার নূতন ও সন্তোষজনক আল্ট্রা-ভায়লেট বাতি নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আল্ট্রা-ভায়লেট রশ্মির অংশবিশেষ মাত্র বীজাণুনাশের সহায়ক, সুতরাং বৈজ্ঞানিকদের প্রথম চেষ্টা হইল সেই বিশেষ অংশটি নির্ণয় করা এবং অদৃশ্য আলো বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে কোন্ কোন্ বিশিষ্ট তরঙ্গান্তরের (wavelength) আলো কি পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা। পরীক্ষার ফলে দেখা যায় যে, ২৫৩৭ আংষ্ট্রম য়ুনিটএর (এক আংষ্ট্রম য়ুনিট এক সেণ্টিমিটারের দশ কোটী ভাগ) নিকটবর্ত্তী তরঙ্গান্তর হইলে তাহা বীজাণুর পক্ষে মারাত্মক, কিন্তু মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর নহে। ইহার পর এই ভাবে বাতি নির্ম্মিত হইল যে সহজেই উহা হইতে আলো একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানের উপর পড়ে এবং স্থানটি অল্প সময়ের মধ্যেই বীজাণুশূন্য হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, স্ফটিকের মূল্য অত্যন্ত অধিক বলিয়া সাধারণ আল্ট্রা-ভায়লেট বাতির ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয় নাই, কাজেই স্ফটিকের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা চলে এরূপ কাচ আবিষ্কার করার চেষ্টা কিছুদিন ধরিয়া চলিল। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে, যে-কাচে লৌহের লেশমাত্র অস্তিত্ব নাই, মাত্র সেই কাচই এই জীবাণুনাশক রশ্মি ভেদ করিতে পারে।

গোলাকার রক্ষিত প্লেট দুইটির মধ্যে বাঁ দিকের প্লেটটিতে বায়ু হইতে বীজাণু জমিয়াছে, ডানদিকের প্লেটটি বীজাণুনাশক নূতন আলোর সাহায্যে বীজাণু হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে।

বর্ত্তমানে এই নূতন বাতি বহু হাসপাতালে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অপারেশন-এর সময়ে অপারেশন-টেবিলের উপর এই বাতি খাটাইয়া রাখিলে আলোর ক্রিয়ায় ঘরের মধ্যের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ বীজাণু মরিয়া যায়। ঠিক আলোর নীচে রাখিলে এই সংখ্যা ৯৯.৯এ দাঁড়ায়।
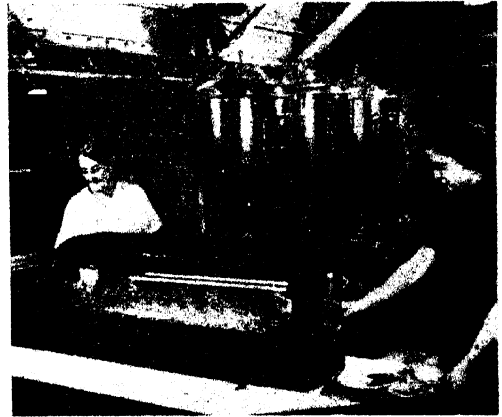
এই পান-ভোজনালয়ের খানসমূহে বায়ু হইতে বীজাণু সঞ্চিত হওয়া নিবারণ করিবার জন্য দুইটি বীজাণুনাশক বাতি টাঙ্গান আছে।

ভোজনালয়ে খাইবার পাত্র বহু লোকের সংস্পর্শে আসার ফলে অতি সহজেই বীজাণুর বাসস্থান হইয়া পড়ে সুতরাং হোটেল প্রভৃতিতে এই বাতি বিশেষ উপযোগী এবং প্রয়োজনীয়ও বটে। বর্ত্তমানে বহু মার্কিন প্রতিষ্ঠানে এই বাতি ব্যবহৃত হইয়াছে।

মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিবৃত্তি

সম্প্রতি জনৈক মার্কিন চিকিৎসক ডক্টর হেব 'অ্যামেরিক্যান সাইকোলজিকাল অ্যাসোসিয়েশন'এর একটি মিটিংএ জানাইয়াছেন যে, মস্তিষ্কের প্রয়োজনীয় অংশ অস্ত্রোপচার করিয়া খানিক বাদ দিলেও বুদ্ধিবৃত্তি হ্রাস পায় না। ডক্টর হেব চারটি রোগীর উদাহরণ দেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই রোগের জন্য মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

অস্ত্রোপচারের পরে আরোগ্য লাভ করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপ করিয়া দেখা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বাম দিকের অংশ কাটিয়া বাদ দেওয়া হয়। যাহারা ডান হাতে কাজ করে তাহাদের মস্তিষ্কের বাম দিকই অধিকতর সক্রিয়, সুতরাং আশঙ্কা করা গিয়াছিল যে, ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস হইবে। প্রথম ক্ষেত্রে বুদ্ধি মাপিয়া ১৫২ 'ইন্‌টেলিজেন্স কোশেণ্ট' পাওয়া যায়, এই সংখ্যা সুস্থ ব্যক্তির পক্ষেই অসাধারণ, কাজেই অস্ত্রোপচারের পর এই সংখ্যা পাওয়া সত্যই আশ্চর্য্যজনক। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমগ্র মস্তিষ্কের ৪.৫ হইতে ৭% কাটিয়া বাদ দেওয়ার পরেও
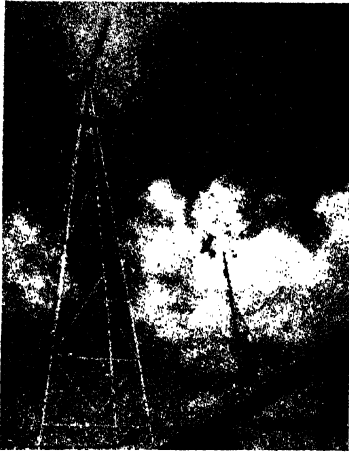
বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক।

রোগীর বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তৃতীয় ক্ষেত্রে রোগীর মস্তিষ্কের প্রায় ৪% অপারেশন করিয়া বাদ দেওয়া হয়, তা ছাড়া রোগে ইহার কিছু অধিক অংশ নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পরীক্ষা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির কোন লক্ষণীয় পার্থক্য ধরা পড়ে নাই। চতুর্থ ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধুর বোধ হয় যে, অপারেশনএর ফলে তাহার বুদ্ধি একটু খুলিয়াছে, যদিও ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহার উদ্যম সামান্য হ্রাস পাইতে দেখা যায়। এই সকল ঘটনার কারণ কি তাহা অজ্ঞাত। অধিক দিন এই অবস্থায় থাকিলে বুদ্ধি বিশেষ হ্রাস পাইবে কিনা তাহা এখনও বলা যায় না।

টেলিফোন লাইনের জন্য বাতাস হইতে বিদ্যুৎ-উৎপাদন

সংপ্রতি আমেরিকায় একটি সুদীর্ঘ টেলিফোন ট্রাঙ্ক লাইন খোলা হইয়াছে। এই লাইন বহু স্থানে পার্ব্বত্য ও দুরধিগম্য স্থান দিয়া গিয়াছে, সুতরাং টেলিফোন ব্যবহারের জন্য যে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রয়োজন তাহা পাওয়া সহজসাধ্য নহে। এই নূতন লাইনে নবাবিষ্কৃত 'ক্যারিয়ার কারেণ্ট' (বাহক বৈদ্যুতিক প্রবাহ) পদ্ধতিতে এক জোড়া তারে ১২টি বিভিন্ন কথোপকথন চলিতেছে। ভবিষ্যতে ১৬টি করিয়া কথোপকথন একসঙ্গে একজোড়া তারের সাহায্যে চালান হইবে। এই প্রকার লাইনে কিছুদূর অন্তর অন্তর বেতার যন্ত্রের মত পরিবর্দ্ধক বা 'অ্যামপ্লিফায়ার'-সাহায্যে ক্ষীণ প্রবাহকে বৃদ্ধি করা হয়। ইহার জন্যই বৈদ্যুতিক প্রবাহের প্রয়োজন। সাধারণ ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তি পাইবার অসুবিধার জন্য বেল টেলিফোন কোম্পানী টেলিফোন লাইনের নিকট কিছু দূরে দূরে বাতাস-চালিত চাকার দ্বারা বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বৈদ্যুতিক শক্তি ষ্টোরেজ ব্যাটারীতে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয় এবং প্রয়োজনমত বৈদ্যুতিক প্রবাহ ব্যাটারী হইতে পরিবর্দ্ধকে সরবরাহ হয়। যে অঞ্চলে বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদক বসান হইয়াছে সেখানে অধিকাংশ সময়ই বাতাস বহে। যদি কোন কারণে বহুক্ষণ বাতাস না বহে বা যন্ত্রটি খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে ষ্টোরেজ ব্যাটারীর বৈদ্যুতিক প্রবাহ একটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় নামিলে পেট্রল-চালিত একটি স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন আপনাআপনিই চলিতে থাকিবে। কোন কারণে ইহাও বন্ধ হইয়া গেলে ৬০।৭০ মাইল দূরের অপর একটি অনুরূপ কেন্দ্র বা রিপিটার ষ্টেশনে এই বিষয় জ্ঞাপন করিয়া একটি ঘণ্টা বাজিবে। টেলিফোন লাইনে বাতাস-চালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদকের ব্যবহার ইহার পূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

ভারতে কৃত্রিম রেশমশিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা

বর্ত্তমানে কৃত্রিম রেশম আসল রেশমশিল্পের বহু ক্ষতি করিয়াছে। জাপান রেশম-শিল্পে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী, ইহাই জাপানের বৃহত্তম শিল্প। কৃত্রিম রেশমের প্রধান

উপাদান তুলা। কাপড়ের কলে তুলার ছোট আঁশগুলি হইতে সুতা পাকান যায় না এবং এই অব্যবহার্য্য তুলা হইতেই প্রধানতঃ নকল রেশম তৈয়ারী করা হইয়া থাকে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভারতে প্রতি বৎসর প্রায় ৬০ হাজার গাঁইট বা ১০ হাজার টন ছোট আঁশযুক্ত তুলা এইভাবে নষ্ট হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে স্যর এম. বিশ্বেশ্বরায়া ভারতের কাপড়ের কল হইতে এই তুলা সংগ্রহ করিয়া নকল রেশম-শিল্প স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন।

সংপ্রতি এই সম্পর্কে ভারতে অনুসন্ধান চলিতেছে। নকল রেশম তৈয়ারী করিবার অপর উপাদান অ্যাসেটিক অ্যাসিড অর্থাৎ বিশুদ্ধ সির্কা। অ্যাসেটিক অ্যাসিড মাৎগুড় হইতে তৈয়ারী করা যায়। ভারতের বহু চিনির কলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাৎগুড় পাওয়া যায়। ইহার সদ্ব্যবহার করা চিনির কলওয়ালাদের পক্ষে একটি দুরূহ সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কানপুরের 'ইম্পিরিয়াল ইন্‌স্টিটিউট অব শুগার টেকনোলজী' মাৎগুড় হইতে অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও অ্যাসেটিক অ্যান-হাইড্রাইড তৈয়ারী করিতে কিরূপ খরচ পড়ে সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করিতে হইলে তুলাকে বিশুদ্ধ করিয়া সেলুলোজএ পরিণত করিতে হয় ('সেলুলোজ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫)। বোম্বাইএ 'ইণ্ডিয়ান সেণ্ট্রাল কটন কমিটী'র টেকনোলজিক্যাল ল্যাবরেটরীতে তুলা হইতে সেলুলোজ তৈয়ারী করিতে কত খরচ পড়ে তাহা নির্ণীত হইতেছে। সেলুলোজ ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড তৈয়ারী করার খরচ জানিতে পারিলে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করা লাভজনক হইবে কি না তাহা নির্ণয় করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য পদ্ধতিতে কৃত্রিম রেশম তৈয়ারী করা সম্ভবযোগ্য হইলে জাপানী নকল রেশমের আমদানী বহুলাংশে কমিয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কাপড়ের কল এবং চিনির কলও অধিকতর লাভ করিতে পারিবে।

রঙীন আখ হইতে সাদা চিনি

লাল মরিশাস (Purple Mauritius) নামে এক প্রকার আখ কিছুদিন হইতে এদেশের চাষীরা চাষ করিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে যে রস পাওয়া যায় তাহার বর্ণ ঘোর লাল। চিনির রস পরিষ্কার করিবার জন্য চিনির কারখানায় চুণ ও সালফাইট দেওয়া হয়, কিন্তু তাহাতেও ইহার বর্ণ দূর করা যায় না। এই কারণে চিনির কলে এই আখের চাহিদা মোটেই ছিল না। অন্য দিকে এই অসুবিধা সত্ত্বেও অন্য আখ অপেক্ষা ইহার ফসল বেশী হয়, রসের পরিমাণও অধিক এবং আখগুলি নরম হওয়ায় রস বাহির করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা হইতে অতি সহজেই ভাল গুড় পাওয়া যায়, কিন্তু চিনি তৈয়ারী করিলে তাহা ঘোর বাদামী রঙের হয়।

সংপ্রতি মিঃ এস. ভেঙ্কট রামানাইয়া লাল মরিশাস আখ হইতে প্রচলিত পদ্ধতিতেই পরিষ্কার সাদা চিনি তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, চুণ ও সালফাইট দিবার পর প্রয়োজনমত অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড দিলে এই আখের রস সম্পূর্ণ বর্ণহীন হইয়া যায়। তাহার পর ইহা হইতে সাদা চিনি তৈয়ারী করিবার আর কোন অসুবিধা থাকে না।

অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড তৈয়ারী করিবার জন্য ফটকিরি ও চুণ প্রয়োজন। এক সের ফটকিরির দাম প্রায় এক আনা এবং প্রতি টন আখের জন্য আধ সের পরিমাণ ফটকিরি প্রয়োজন হয়, সুতরাং পদ্ধতিটি ব্যয়বাহুল্যও নহে।

যক্ষ্মা নিবারণের ব্যবস্থা

যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা ধরা পড়িলে আরোগ্য করা সহজ বলিয়া চিকিৎসকরা মত প্রকাশ করেন, অথচ যক্ষ্মারোগের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে অন্ততঃ কমিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইহার একটি কারণ বোধ হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের অস্তিত্ব যখন ধরা পড়ে তখন তাহা এতদূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে যে, চিকিৎসার বিশেষ সুফলের আশা করা যায় না।

যক্ষ্মারোগ যাহাতে অল্প বয়সেই ধরা পড়ে, সে জন্য বহু মার্কিন স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের একস্‌-রে দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। সাধারণতঃ একস্‌-রে করা যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য এবং কিছু সময়সাপেক্ষও বটে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মার্কিন স্কুলসমূহের ব্যবহারের জন্য একপ্রকার একস্‌-রে যন্ত্র বাহির হইয়াছে। ইহার সাহায্যে একদিনে কয়েকশত ছাত্রছাত্রীকে অনায়াসেই পরীক্ষা করা চলিতে পারে। যন্ত্রটি

অত্যন্ত অল্প স্থান অধিকার করে এবং ইহাতে প্লেটের পরিবর্ত্তে সস্তা ফটোগ্রাফের কাগজের রোলে ব্যবহার করা হয়। ছাত্রদের মধ্যে কাহারও যক্ষ্মার লক্ষণ থাকিলে যথাসময়ে চিকিৎসা আরম্ভ হইতে পারে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যক্ষ্মার মৃত্যুহার হাজারকরা ২০১ জন ছিল, নিবারণের জন্য প্রচার এবং যথাযোগ্য চিকিৎসার ফলে বর্ত্তমানে এই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫৬। আরও ব্যাপকভাবে নিবারণের চেষ্টা করিলে আরও

দ্রুত যক্ষ্মা-রোগ ধরিবার জন্য ব্যবহৃত এক্স-রে যন্ত্র।

কমিবার সম্ভাবনা আছে। অবশ্য, ইহার সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মার কারণ যাহাতে না জন্মাইতে পারে তাহার জন্যও যথেষ্ট সজাগ থাকা উচিত।

সর্দ্দির চিকিৎসা

সংপ্রতি হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের ডক্টর আর্লি ভি. বক 'অ্যামেরিকান কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স'এ একটি বক্তৃতায় সর্দ্দির চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, সর্দ্দি, ব্রঙ্কাইটিস, সোর থ্রোট প্রভৃতি রোগের একমাত্র চিকিৎসা চুপচাপ বিছানায় শুইয়া থাকা। তিনি বলেন যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে হার্ভার্ড-এর প্রায় দুই হাজার ছাত্রের উপর পরীক্ষা করিয়া তিনি ইহার উপকারিতা বুঝিয়াছেন। সর্দ্দিতে নাকে স্প্রে করা, এফেড্রিন বা অ্যাড্রেনালিন প্রয়োগ করা এবং সোরথ্রোট হইলে গলায় আর্জিরল প্রভৃতি লেপন করায় স্থানীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া রোগের উপশম হইতে বিলম্ব হয় বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন যে, অত্যধিক দৈহিক বা স্নায়বিক উত্তেজনা থাকিলে এই সকল রোগ সহজেই আক্রমণ করে, সুতরাং এই বিষয়ে সকলকে সাবধান করা প্রয়োজন।

অগ্নিবারক বস্ত্র

শিশুদের পোষাক প্রভৃতি যে সকল বস্ত্রে আগুন লাগিবার সম্ভাবনা আছে, সেগুলি অতি সামান্য পরিশ্রম ও ব্যয়ে অগ্নিবারক করা যাইতে পারে। সাত আউন্স (প্রায় সাড়ে তিন ছটাক) সোহাগা ও তিন আউন্স বোরিক অ্যাসিড আড়াই সের গরম জলে গুলিয়া সেই দ্রবণে কাপড়টি ডুবাইয়া লইতে হইবে। তাহার পর উহা নিংড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই তাহা ব্যবহারোপযোগী হইবে। ইহার উপর ইস্ত্রি করিতে কোন অসুবিধা নাই। এই প্রকার কাপড় আগুনে বা অত্যধিক তাপে নষ্ট হয় না তাহা নহে, তবে আগুন জ্বলিয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই দ্রবণ ব্যবহার করিলে কাপড়ের রঙ্ নষ্ট হইবে না, কিন্তু প্রত্যেকবার কাচিবার পর আবার দ্রবণ প্রয়োগ করিতে হইবে। সাধারণ তুলাজাত বস্ত্র ছাড়া কম্বল এবং কৌচ প্রভৃতির আসন জাতীয় বস্তুতেও ব্যবহার করা চলিতে পারে। যে সকল জিনিস সহজে জলে ভিজিতে চায় না, যেমন ক্যাম্বিস, সেখানে সামান্য সাবান দ্রবণের সহিত ব্যবহার করা চলিতে পারে। যে সকল জিনিস জলে ডুবান অসুবিধাজনক সেগুলির উপর দ্রবণ ছড়াইয়া দিয়া শুকাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

গাঁয়ের মাষ্টার

—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

ক্ষান্ত-বর্ষণ চৈত্র সন্ধ্যা। কাঁঠাল গাছের পাতায় জল পড়ার শব্দ এখনও কানে আসছে। বাঁশের ঘর-কাটা জানালা দিয়ে ভিজে বাতাস আসছে প্রিয়জনের ডাকের মত শান্ত, সরস।

ছোট টেবিলের সামনে নারাণ বসে আছে হাতের উপর মাথাটা রেখে; মনে তার অনেক চিন্তার ভাঙা ঢেউ।

টেবিলে খোলা পড়ে রয়েছে চিঠি—বামনডাঙা হাইস্কুলের আমন্ত্রণ-চিঠি। বামনডাঙা তাদের গ্রাম হতে মাইল পনেরর রাস্তা। কিন্তু, নারাণ কোনদিন সেখানে যায় নাই, চেনেও না। ভূগোলে পাঁচ মহাদেশের সাথে তার পরিচয় ঘটেছে নিবিড়ভাবেই, কিন্তু গাঁয়ের পাশের অজস্র ভূ-বৃত্তান্ত তার কাছে অজানা আছে।

নারাণের মনের চোখে জীবন-খাতার আর একটি পাতা আজ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফুটবল খেলে সবাই হল্লা করে ফিরছিল। পথের ধারের দোকানঘর হতে নিতাই-দা ডেকে বল্‌ল, তোর চিঠি আছে নারাণ, সুসংবাদ।

কম্পিত হাতে চিঠিখানার অল্প কয়েকটি কথা এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেল্‌ল। বুক ওর অজানা পুলকে উঠ্‌ল ভরে। দৌড়ে গিয়ে পরীক্ষা পাশের সংবাদ দিল মাকে।

পল্লীর একখানা ছোট ঘরে সেদিন উৎসব সুরু হল। বুড়ো কাকা বল্‌লেন, সবার মুখ উজ্জ্বল কর বাবা —

তারপর অনেক বর্ষা তার জীবনের উপর দিয়ে চলে গেছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর আরও দুটি পাশের সংবাদ সে পেয়েছে। চাকুরীর চেষ্টায় অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত মানুষ ও দেশের সাথে তার পরিচয় ঘটেছে, অনেক অজানা পথে পড়েছে তার পদ-রেখা।

কিন্তু, সব অভিযান হয়েছে ব্যর্থ, চাকুরী মেলে নাই। অনেক চেষ্টা ও তোষামোদ করে বেড়াবার ফলে হৃদয়েই কেবল সঞ্চিত হয়েছে অপরিসীম গ্লানি।···

আজ এসেছে সেই বাঞ্ছিত অতিথি—চাকুরীর নিমন্ত্রণ-পত্র। জীবনের রঙিন স্বপ্নের সাথে এ পল্লী-স্কুলমাষ্টারীর কোন মিল নাই, নারাণ তা জানে। এমন একদিন ছিল, যখন পাড়াগাঁয়ের স্কুল-মাষ্টারীকে সে ঘৃণা করত; জীবন সেখানে জড়, সীমাবদ্ধ, তার ভিতর দিয়ে বাইরের বিরাট বিচিত্র জগতের সূর্য্যালোক আসে না, মনের ঘরে সেখানে নিঃসঙ্গতার চির-অন্ধকার।

কিন্তু সেদিন আজ অনেক পিছনে পড়ে গেছে, সে আজ বুঝেছে, শুধু স্বপ্ন দেখেই জীবন চলে না। সমস্ত দেহ যখন চায় আহার, মনের স্বপ্নের রঙ তখন কালো হয়ে যায়।

তাই বামনডাঙার স্কুলকেই সে জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র করবে ঠিক করে ফেলেছে। সেই ছবি তার মনের চোখে ভাসছে। ছোট্ট একখানা গ্রাম। মেটে রাস্তা চলে গেছে তার ভিতর দিয়ে সুদূরের সঙ্কেত নিয়ে, পাশেই কুমারের ক্ষীণ জলধারা, তার পরই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে খেঁজুর, তাল আর বটের গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, নিঃসঙ্গ যক্ষের মত।

হয়ত তারি দিকে মুখ করে নদীর তীরে টীনের ঘরে তাদের স্কুল। সেখানকার ছোট ছোট ছেলের দল, সহজ, সরল ও সৌম্য। বাইরে সৌন্দর্য্য তাদের অল্প, অমার্জ্জিত, কিন্তু অন্তরের সম্পদে তারা এক একজন কুবের।

নারাণের মন কল্পনার সাতঘোড়ার রথ ছুটিয়ে দেয়; নিজের সুন্দর ব্যবহারে ছেলের দল দুদিনেই হয়ে উঠবে তার অনুরক্ত ভক্ত, ওর প্রাণের সাথে তাদের অনেক ছোট প্রাণের হবে রাখী-বন্ধন, তাদের প্রাণের অভিনন্দনের ভিতর দিয়েই হবে ওর জয়যাত্রার সুরু।

ক্রমে ছোট স্কুলের ভিতর দিয়ে সে গড়ে তুলবে সত্যিকারের ভবিষ্যৎ মানুষের প্রতিষ্ঠা-মন্দির···ছেলেদের নিয়ে সে তৈরী করবে প্রাণের মুক্তিপথ···শিকল দিয়ে শিশু মনকে বেঁধে রাখবে না স্কুলের রুটিনের গণ্ডীতে··· তাদের ছেড়ে দেবে উদার মুক্ত কর্ম্মক্ষেত্রে··নিজ নিজ

পথে কিশোর মানব সব বিকশিত করবে তাদের ঘুমন্ত প্রতিভাকে। কর্তৃপক্ষের সাথে হয়ত তার লাগবে সংঘাত; তারা এ নব-বিধানকে মেনে নেবেন না। মনুষ্যত্বের বিকাশ যেখানে আহত হয় সেখানে নারাণও থাকতে পারবে না, তাই বামনডাঙ্গার নীড় ছেড়ে আবার সে নামবে খোলা পথে।

কিন্তু, ছেলেদের ও শুধু ছাত্রত্বেই দীক্ষা দেয় নাই, তাদের দীক্ষা দিয়াছে মানব-মন্ত্রে, স্বাধীন চিন্তার পথ তারা দেখেছে। এই হবে তার সান্ত্বনা।

বামনডাঙ্গায় নারাণের তাসের তাজমহলের শেষ চূড়া পর্য্যন্ত যখন প্রায় ভূমিসাৎ হয়েছে, লজ্জায় দুঃখে তার মুখ হয়েছে কালো তেমন সময় তার জীবনে আবির্ভাব হ'ল শরণের। শরণ তারই স্কুলের ছাত্র—তার স্বাস্থ্য ভাল, বাড়ীর অবস্থা ভাল, লেখাপড়ায় ভাল, অভাব এক রকম কিছুই নেই, তবু তার মুখে কেমন একটা কোমলতার ছাপ আছে যা দেখলেই মায়া হয়—মনে হয়, আহা ছেলেটি দুঃখী!

স্কুলের অনেক ছেলেকে মানুষ করে তুলবার যে কামনা নারাণের ছিল, শরণকে দিয়ে সে কামনা মেটাতে পারবে ভেবে সে অনেকটা তৃপ্তি বোধ করল। কয়েক মাসের মধ্যেই দুজনে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হল। জীবনে যত আদর্শ নারায়ণের ছিল, সব সে শরণের সামনে একে একে ধরে দিতে লাগল।

শরণ ক্লাসের সেরা ছেলে - পড়ায় ও ব্যবহারে। একটি কিশোর প্রাণের আকর্ষণে নারাণও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছে একটি অজানা পরিবারের সাথে। নানা দুঃখ-বিপদে তাদের দেখা-শোনা করা, আনন্দ-উৎসবে যোগ দেওয়া, অসময়ে সাহায্য করা, এমনি ছোট-খাট কর্ত্তব্য ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে। পাল-পার্ব্বণে শরণ মাষ্টার মশাইকে বাড়ী নিয়ে যায়, তার প্রৌঢ়া বিধবা মাতা সযত্নে পুত্রের এই হিতাকাঙ্ক্ষীর সেবা করেন। ফিরবার বেলা সজল চোখে বলেন, 'ওই আমার সব আশা-ভরসা, ওকে একটু দেখবেন, নিজের ছেলেরই মত। যাতে শরণ আমার মানুষ হতে পারে।...'

কিন্তু, মানুষ সংসারে চলে স্বার্থের ঠুলি চোখে এঁটে। নিঃস্বার্থপরতা তাই এখানে শুধু অন্যায় নয়, মহাপাপ। মাটির বুকে সাধুতার সাধনা মানুষের চোখে ভণ্ড প্রতিপন্ন হবারই নামান্তর।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। ফল বাহির হলে দেখা গেল, প্রতিবারের মত এবারেও শরণ সপ্তম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছে, সব বিষয়েই।

"নারাণের এ মহাগৌরবের বিষয়। কিন্তু, স্কুলের এই হল অসন্তোষের 'কারণ। প্রথমে ছেলেদের মধ্যে, তারপরে অনেক শিক্ষকদের মধ্যেও গুজব উঠল, এসবই নারাণবাবুর কারসাজী, তিনিই ইচ্ছা করে নিজের পোষ্য-পুত্রকে অনেক নম্বর দিয়েছেন, তাকে সব প্রশ্নই বলে দিয়েছেন। বোর্ডিঙের কে নাকি অনেক রাতে নারাণ-বাবুকে দেখেছে, শরণকে চুপে চুপে কি শিখাতে—এমনি অনেক কথা, অনেক জল্পনা।

সে দিন সন্ধ্যায় যতীনবাবু ঘরে ঢুকে বললেন, 'মাষ্টারী করে চুল পাকাতে বসেছেন, আর এখন কি এসব শোভা পায় নারাণবাবু?'

"নারাণ মনে মনে সব বুঝেও বল্‌ল, 'আপনি কি বলতে চান?'

'না, বলতে আমি কিছু চাই না, তবে হ্যাঁ', জানেন ত শিক্ষকরা চিরদিনই সমাজে পূজ্য, তাই সাধারণের সে শ্রদ্ধা-ভক্তি হারাতে হয়, এমন কোন কাজ করা কি আমাদের সাজে?' নারাণ বিরক্ত হয়ে বল্‌ল, 'কিন্তু কে আপনাকে বলেছে যে, তেমন কোন কাজ আমি করেছি—'

বাইরে চাপাহাসির সাথে মিলিত গলায় চীৎকার উঠল, 'ঠাকুর ঘরে কে, আমি কলা খাই নি' ।...

যতীনবাবু হাস্‌তে হাস্‌তে বেরিয়ে গেলেন। ফাঁদে-পড়া হরিণের মত নারাণ বসে রইল স্তব্ধ···স্থির···

সব মানুষেরই শরীরে সূঁচ বেঁধে, আর তার যন্ত্রণা নীরবে সইবার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। তাই এক কালবৈশাখীর ঝড়ো রাত শরণদের বাড়ীতে কাটিয়ে আসার পর স্কুল-আবহাওয়ায় যখন একটা বিশ্রী কুৎসিত ইঙ্গিতের শব্দবাণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বার বার বিঁধতে লাগল নারাণের মনে, তখন সব ধৈর্য্য সে হারিয়ে

ফেলল। সংসারে যার কেউ নাই, সমাজের কুৎসা-বান তাকেও জর্জ্জরিত করল।

রাত তখন অনেক। বোর্ডিঙের পিছনের মাঠে নীল আকাশ হতে জোছনা নেমেছে। ধূসর মাঠের বুকে যেন নিপুণ হাতের অজস্র আলপনা পড়েছে। শেষ বৈশাখের হাওয়া বইছে শাঁ-শাঁ করে। কি একটা পাখী ডাকছে করুণ সুরে।

কপালে হাত বুলিয়ে নারাণ শরণকে জাগাল, বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি শরণ, হয়ত আর দেখা হবে না'।

শরণ সবই বুঝল এক মুহূর্ত্তে, দৃঢ়স্বরে বলল, 'কিন্তু আপনি কি জানেন না এসবই মিথ্যা ?'

"জানি। কিন্তু মিথ্যাই যেখানে গদীতে বসেছে, কোণ-ঠাসা সত্য নিয়ে সে সভায় ত কিছুতেই বসে থাকতে পারছি না। জানি এ আমার দুর্ব্বলতা, কিন্তু তবু আমাকে যেতেই হবে।'

শরণ কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল, 'সামনের পরীক্ষায় আমার রেজাল্ট খারাপ হবে আপনি থাকুন।' নারাণ বলিল, 'আমার মিথ্যা দুর্নাম বাঁচাতে তুমি যদি ইচ্ছা করে খারাপ পরীক্ষা দাও, আমার দুঃখের সীমা থাকবে না।' মুখে আর কথা ফুটল না।

সব চুপ। বাতাসটাও থেমে গেছে। কাণ পেতে থাকলে মনে হয়, অনেক দূর হতে একটা ক্ষীণ কান্নার সুর ভেসে আসছে, যার আঘাতে ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে যাবে পৃথিবীর সব হাসি, সব আনন্দ।

নারাণ বলতে লাগল, 'ভেবেছিলাম, 'তোকে না জানিয়েই যাব, কিন্তু তা পারলাম না, তোরা আমায় ভুল বুঝিস না শরণ, আমায় মনে রাখিস, আর মাকে আমার প্রণাম জানাস।'

দূরে একটা গ্রাম্য কুকুরের নিষ্ফল চীৎকার মিলিয়ে গেল, কেউ সাড়া দিল না। জোছনা ক্রমে ডুবে আসছে।

শরণ অবনত মুখ তুলে বলল, 'কিন্তু মাষ্টার মশায়, আমিও ত এখান থেকে চলে যেতে পারি, তাহলেই ত সব আগুন নিভে যাবে।'

ঝড়ো রাতের হঠাৎ-চাওয়া তারার ক্ষীণ আলোর মত করুণ হেসে নারাণ জবাব দিল, 'তা কি কখনও হয় রে পাগল।..আর তা ছাড়া, সবাই সেদিন বলছিল, চুল গেল পেকে, আর,—কিন্তু আজ দেখ্‌ছি মনেও আমার পাক ধরেছে, মনের শক্তি হারিয়ে গেছে। তাই আমাদের মত পঙ্গুরই আজ দিন এসেছে বিদায় নেবার। অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে রে শরণ, এইবারে আসি। সত্যপথে চলিস।'

গলায় চাদরটি জড়িয়ে সুটকেশ হাতে নিয়ে নারাণ পা বাড়াল। দরজা খুলে যেতে যেতে বল্‌ল, 'আর মাকে আমার প্রণাম জানিয়ে বলিস, তোদের মঙ্গলের চেয়েও নিজের স্বার্থকেই যে বড় করে দেখলাম, এর জন্য তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কি করব ভাই, আমি উপায়হীন!'

নারাণের গলা আটকে গেল। দ্রুত পা ফেলে সে এগিয়ে চল্‌ল। নিষ্পলক জলভরা চোখে শরণ চেয়ে রইল সে দিকে।···

বন্ধন

—শ্রীগোপাল ভৌমিক

রাতের আকাশে শুনি কাণ পেতে মায়ের ক্রন্দন,
শতাব্দীর কোন্ ব্যথা ধরণীর বুকে উঠে ঘিরে',
মাতার কোমল বুকে কি অসীম বেদনা-বন্ধন
আঁধারের স্তব্ধতায় নিশিদিন বাজে ফিরে' ফিরে'!
দিবালোকে দেখি নাই ধরণীর সে বিষণ্ণ রূপ—
যে রূপ জাগিয়া উঠে ছায়াময় অন্ধকারতলে,—
আমার বক্ষের মাঝে ব্যথা-বোধ জাগে অনুরূপ,
মায়ের বাঁধনমুক্তি হবে না কি নয়নের জলে ?
যন্ত্রের দানব বুঝি মার বুকে হানিছে আঘাত—
বিবাদের বিভীষিকা জাগিয়াছে সন্তানের দলে ?
তাই বুঝি মার চিত্তে বেদনার এ বজ্রপাত,
তাই বুঝি বুকে তার শোকাবহ অগ্নিচিতা জ্বলে ?
মুক্তি কি পাবে না মাতা বেদনার এ নিগড় হ'তে
এমনি ভাসিবে ধরা নিরবধি ক্রন্দনের স্রোতে ?

বিচিত্র জগৎ

চীন-তিব্বত সীমান্তের আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতমালা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক লোকে বলে আজকাল ম্যাপে এমন জায়গা নেই, যা অনাবিষ্কৃত আছে। একজনও কেউ তাদের মধ্যে তিব্বত দেখেছে? পশ্চিম চীনের অদ্ভুত পর্ব্বতমালা ও গিরিসঙ্কুল সীমান্ত প্রদেশ দেখেছে?

বহু কষ্টে, বহু বিপদ্ উপেক্ষা করে আমি দু-হাজার মাইল দীর্ঘ পীত নদীর উৎপত্তি-স্থানের নিকটবর্ত্তী আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতমালা দর্শন করতে যাই। এই অঞ্চলে কোন সভ্য ভ্রমণ-কারী কখনও আসেনি। এই পর্ব্বতের উচ্চতা আটাশ হাজার ফুট, প্রায় এভারেষ্টের সমান। এ অঞ্চলে আমি অনেক বন্য-জন্তু দেখেছি, যারা মানুষকে ভয় করে না, কারণ মানুষের সংস্পর্শে তারা বড় একটা আসেনি।

বন-জঙ্গলে ঘেরা পর্ব্বতের মধ্য দিয়ে পীতনদী ঘোর রবে এসে নিম্নের সমতল ভূমিতে পড়ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় দশ হাজার ফুট। জুলাই মাসেও এ অঞ্চলে বরফ দেখা যায় এবং বরফের মধ্যেও ফুল ফুটতে দেখেছি।

পৃথিবী সম্বন্ধে এখানকার পার্ব্বত্য জাতিদের অদ্ভুত ধারণা। এরা বলে পৃথিবী সমতল, এর মাঝখানে একটা বড় পর্ব্বত আছে। সূর্য্য যখন অস্ত যায়, তখন এই পর্ব্বতের পেছনে চলে পড়ে। আমরা শুনেছি দূরে এমন সব দেশ আছে, যেখানে মানুষ ঈগল পাখীর পিঠে চড়ে আকাশে উড়তে পারে। কুকুরের ও ষাঁড়ের মত মুখ মানুষও অনেক দেশে আছে।

এ দেশ দুঃখ-দারিদ্র্যে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান জগতের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্ক নেই। এদের দেশে এরা নিজেদের আইন, সমাজ-নীতি ও ধর্ম্ম-বিধি অনুসারে চলে। কিন্তু, এখানে রেল নেই, রেডিও নেই, মোটরগাড়ী নেই, আধুনিক বিজ্ঞান এখানে প্রবেশ করেনি, মার্কোপোলো যখন চীন-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে।

চীনা লোকেরা এখানে ঢুকতে সাহস করে না। নব্বুই হাজার সমর-কুশল, কলহপ্রিয় নেগ্লোক জাতির লোক এখানে বাস করে, চীনাদের সঙ্গে তাদের পুরুষানুক্রমিক শত্রুতা চলে আসছে। এ যুদ্ধের কোন খবর বহির্জগতে কখনও পৌঁছায় না। এখানে আমি ত্রিশ ফুট লম্বা বর্শা দেখেছি মানুষের হাতে এবং একটা বৌদ্ধ মঠের বড় বারান্দায় পঞ্চাশটি বিদেশ থেকে আমদানী ঘড়ি এক সঙ্গে টিক্ টিক্ করে চলতে দেখেছি, কোনটার সঙ্গে কোনটার সময় সম্বন্ধে মিল নেই।

এ সব দেখে কি করে স্বীকার করি যে, পৃথিবীর ম্যাপে এমন জায়গা নেই, যা আজও অনাবিষ্কৃত আছে!

আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতমালা পীতনদীর বড় বাঁকের পশ্চিম দিকে কোকোনর প্রদেশে অবস্থিত। সাংহাই থেকে এর দূরত্ব প্রায় তেরশ' মাইল এবং রেঙ্গুন থেকে বারশ' মাইল। কখনও কোন সভ্য শ্বেতকায় ভ্রমণকারী এ দেশে আসেনি আগেই বলেছি, দু-এক জন মিশনারী প্রচারক ছাড়া। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে রাশিয়ান্ ভ্রমণকারী রেবোরভ্স্কি আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বত দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ম্যান্গাম গিরিপথের উত্তর-পূর্ব্বে তিব্বতী দস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয়।

আমার নিজের সে দেশে অবস্থান এত কম সময়ের জন্য ঘটেছিল যে, আমি বিস্তৃত ভাবে কোন কথা বলবার অধিকারী নই।

আমি কি ভাবে এ দেশে গিয়ে পড়েছিলাম, সে কথা বলি।

১৯২১ সালে আমার সঙ্গে ব্রিটিশ ভ্রমণকারী জেনারেল জর্জ্জ পেরেইরার সঙ্গে হঠাৎ দেখা শোনা হয়। আমি ব্রহ্মদেশ থেকে তিব্বতে যাচ্ছিলাম, পথে এক স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমায় বলেন, পিকিং থেকে পদব্রজে লাসা আসবার সময়ে প্রায় একশত মাইল দূর থেকে আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বত মালার তুষারাবৃত শিখর দেশ তাঁর চোখে পড়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বত ঠিক মত জরীপ হলে হয় তো এভারেষ্ট শৃঙ্গের চেয়েও উচ্চতর বলে প্রমাণ হবে। যে দুর্দ্ধর্ষ বর্ব্বর জাতি এই পার্ব্বত্য অঞ্চলে বাস করে তাদের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

জেনারেল পেরেইরার ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজে এই অঞ্চলে একবার যাবেন কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। সেই বৎসরেই চীন-তিব্বত সীমান্তের হিমময় পার্ব্বত্য মালভূমিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

জেনারেল পেরেইরার মুখে আম্‌নি-ম্যাচেন পর্ব্বতের কথা শুনে পর্য্যন্ত আমার ইচ্ছা হয়েছিল আমি নিজেও একবার সেখানে যাব। পেরেইরার মৃত্যুর পরে সে ইচ্ছা অদম্য হয়ে উঠল। এই ঘটনার অনেক দিন পরে আমি হার্ব্বার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তরফ থেকে চীন-তিব্বত সীমান্তের বৃক্ষলতা ও পক্ষী সংগ্রহের ভার পাই এবং তখন আমার মনে হয়, আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতমালা দর্শন করবার এই সুবর্ণ সুযোগ ছাড়া হবে না। আমি ছিলাম চীনেই। ইউনাফু থেকে বার জন বিশ্বস্ত ও কর্ম্মদক্ষ অনুচর নিয়ে যাত্রা করলাম। উত্তর-পশ্চিম কানসু প্রদেশের অন্তর্গত সিনিং নগর থেকে সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করে বার হব এই ছিল উদ্দেশ্য, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সেখানে সুবিধে হল না।

পনের সপ্তাহ ধরে দুর্গম পথে আমার মুষ্টিমেয় অনুচর নিয়ে দুরন্ত পার্ব্বত্য দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হয়ে এপ্রিল মাসের শেষে আমরা চোনি নগরে পৌছলাম। সেখানকার লোকে বলল, আম্‌নি-ম্যাচেন পর্ব্বতে যাবার সোজা পথ হচ্ছে, পীত নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত রাজা গোম্বা নামক স্থানে আগে পৌছানো। বড় বড় ঘাসের বনের মধ্য দিয়ে এই পথ। কিন্তু পরামর্শ দেওয়া যত সহজ, প্রকৃত পক্ষে সাহায্য করা তত সহজ নয়। চোনির সর্দ্দার প্রিন্স ইয়াং চি-চিংয়ের কাছ থেকে একখানা পরিচয় পত্র নিয়ে আমি লাব্রাং মঠের অধ্যক্ষ জীবন্ত বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম, যদি তিনি আমার কোন রকম সাহায্য করতে পারেন এই আশায়।

সংবাদ পাওয়া গেল, ইনি সম্প্রতি আংকুর গোম্বা নামে একটা ছোট মঠে অবস্থান করছেন, কারণ লাব্রাং মঠের পার্শ্ব-বর্ত্তী প্রদেশের লোকজনের সঙ্গে সিনিং প্রদেশের মুসলমানদের যুদ্ধ চলচে, মুসলমানদের দলপতি হচ্ছেন কোকোনর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা জেনারেল মা চি।

আংকুর গোম্বা মঠ যতই ছোট হোক্, জীবন্ত বুদ্ধ মহাশয়

রাজা মঠের প্রধান জীবন্ত বুদ্ধ।

সেখানে অবস্থান করার দরুন খুব প্রসিদ্ধ জায়গা হয়ে পড়েছিল তখন। আমরা যখন সেখানে গিয়ে পৌচেছি, তখন বিভিন্ন প্রদেশাগত একটি সুবৃহৎ যাত্রীদল জীবন্ত বুদ্ধ মহাশয়ের দর্শন প্রত্যাশায় মঠে ও তার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছে।

আমাদের বাসার নিকটবর্ত্তী একটা গাছের ডালে অসংখ্য ভেড়া ও ইয়াকের হাড় ঝুলছে। এই হাড়গুলোর গায়ে 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্' এই প্রার্থনা মন্ত্রটী লিখিত আছে। তীর্থযাত্রীরা

গাছের তলায় এসে সেই শুকনো হাড়গুলো একবার ঝুমঝুমির মত বাজিয়ে প্রার্থনাজনিত পুণ্য অর্জ্জন করছে। আমরা যখন মঠে গিয়েছি, তখন হাড়ের ঝুমঝুমি বাজানর শব্দে এবং ঢোল, শাঁখ প্রভৃতির শব্দে মঠে কান পাতা দায়।

এইবার আমরা জীবন্ত বুদ্ধের সামনে যাবার আদেশ পেলাম।

একটা খুব উঁচু মঞ্চের পরে পীতবর্ণ রেশমী পরিচ্ছদ পরিহিত একটি বালক বসে, ইনিই জীবন্ত বুদ্ধ। আমি অগ্রসর হতে বালক-দেবতা উঠে অভিবাদন করলেন আমাকে। আমি তাঁকে একখানা রেশমের চাদর উপহার দিলাম এবং আমার

জাঙ্গার মঠের বুদ্ধ খচ্চর-বাহিত পাল্কীতে চড়িয়া যাইতেছেন।

প্রদত্ত একটা উপহারপূর্ণ থালা জীবন্ত বুদ্ধের অনুচর দুজন লামা হাতে করে নিয়ে তাঁবুর ভেতরে চলে গেল।

এইবার আমার বক্তব্য নিবেদন করলাম।

আমি স্থানীয় ভাষা না জানার দরুন আমার পাচক দোভাষীর কাজ করলে। আমি জীবন্ত বুদ্ধকে অথবা তাঁর পিতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরই কাছে আমার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। রাজা মঠের বুদ্ধের কাছে একখানা এবং কয়েকটী নোগ্লোক সর্দ্দারের নামে কয়েকখানি চিঠি কি জীবন্ত বুদ্ধ মহাশয় দয়া করে লিখে দেবেন?

রাজা গোম্বা মঠের বুদ্ধের কাছে চিঠি দিতে ওঁরা কিছুমাত্র বিলম্ব করেন নি—কিন্তু নোগ্লোক সর্দ্দারের নামীয় পত্র পেতে কয়েক সপ্তাহ বিলম্ব হল এবং ইতিমধ্যে তিব্বতীয়দের সঙ্গে আর সিনিং-এর মুসলমানদের সঙ্গে একটা গুরুতর লড়াই হয়ে গেল।

এই যুদ্ধের কথা না বল্লে ঠিক বোঝান যাবে না এই সব দেশে চলাফেরা করা কি রকম বিপজ্জনক। এ ধরণের বর্ব্বরতা আমি জীবনে বেশী অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি।

যুদ্ধের প্রথম দিকে তিব্বতীয় দল মুসলমানদের লাব্রাং থেকে বিতাড়িত করে কিন্তু শীঘ্রই ওরা আবার ফিরে এল এবং সং চু উপত্যকায় তিব্বতীয়দের আক্রমণ করলে। উভয় পক্ষে ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলল। নগুরু নামে তিব্বতীয় পার্ব্বত্য জাতি ঘোড়ার পিঠে চড়ে সবেগে মুসলমান বাহিনীর ওপরে গিয়ে পড়ল এবং তাদের ত্রিশ ফুট লম্বা বর্শায় বহু মুসলমান সৈন্যকে গেঁথে ফেললে। তিব্বতীয়গণ জয়লাভ করত এ যুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধের মাঝামাঝি ওদের মিত্রপক্ষীয় আম্‌চোক জাতির যোদ্ধাগণ যুদ্ধ ছেড়ে পিছনে এসে ওদের তাঁবু লুঠ করে পালিয়ে গেল।

যে সব তিব্বতীয় যোদ্ধা জীবন্ত অবস্থায় শত্রুর হাতে পড়ল তাদের হাতের বুড়ো আঙুলে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হল এবং জীবন্ত অবস্থাতেই তলপেটের নাড়িভুঁড়ি বার করে ফেলে খালি তলপেটের মধ্যে গরম পাথর ভর্ত্তি করে দেওয়া হোল। এরকম নিষ্ঠুর ও বর্ব্বর আচরণের কথা কখনও শুনিও নি।

কাংসু গবর্ণমেণ্ট তিব্বতীয়দের সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা কেন সাহায্য করেন নি, তা জানা গেল না। ফলে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সমরকৌশলী মুসলমান সৈন্যদের হাতে বিশৃঙ্খল পার্ব্বত্য জাতীয় যোদ্ধাগণ পরাজিত হল। লাব্রাং মুসলমানদের হাতে পড়ল—তারা লাব্রাংয়ের আশপাশের লম্বা ঘাসের জমি খুঁজে বহু লুক্কায়িত স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকাদের তার মধ্য থেকে টেনে বার করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করল।

যুদ্ধের পরে লাব্রাংয়ের দৃশ্য অতীব বীভৎস হয়ে উঠল। মুসলমান শিবিরের বাইরে এক শ চুয়াল্লিশটি তিব্বতীমুণ্ড মালা-

কাঁধে প্রথিত করে ঝুলিয়ে রাখা হল। যাবার রাস্তার দুধারে চেরা বাঁশের সূক্ষ্ম অগ্রভাগে বালিকার মুণ্ড—এ ছাড়া প্রত্যেক সিনিং অশ্বারোহীর জিনের চারিপাশে ঝোলান দশ বারটি মুণ্ড।

এ বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে বেশীদিন টিকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। হতভাগ্য দেশের হতভাগ্য বিজিত ও বিজয়ী জাতিদের সান্নিধ্য থেকে দূরে গিয়ে মনকে কিছুদিন বিশ্রাম দিতে চাইলাম। ওখান থেকে চলে এসে সারা গ্রীষ্মকাল আমি কোকোনর ও রিথ্‌টেংফেন্-এ কাটালাম।

আর একটা কথা।

এই যুদ্ধে হেট্‌সো মঠ লুণ্ঠিত হল এবং সেখানকার জীবন্ত বুদ্ধ ও পনেরজন সন্ন্যাসী নিহত হলেন।

যাই হোক, যুদ্ধ থেমে গেলে আমি আবার আম্‌নি-ম্যাচেন পর্ব্বতে যাবার উদ্যোগ করলাম এবং এই উদ্দেশ্যে কিছুদিন পরে ফিরে এসে লাব্রাং মঠের বালক বুদ্ধের কাছ থেকে নোলোক সর্দ্দারদের নামে পরিচয়-পত্র নিলাম। তারপর একদিন আমরা চোনি পরিত্যাগ করে যাত্রা করলাম আম্‌নি-ম্যাচেনের উদ্দেশ্যে।

যাবার আগে লাব্রাং মঠের অধ্যক্ষ আমায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন—আপনি তো অনেক জায়গায় ঘোরেন, কুকুরের ও ভেড়ার মত মুখওয়ালা মানুষ কোথাও দেখেছেন?

আমি বললাম—না। ও রকম মানুষ কোথাও নেই।

অধ্যক্ষ মহাশয় মৃদুমন্দ হাসলেন। বললেন—নিশ্চয়ই আছে। আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থে লেখা আছে এ কথা। এর পরে আর তর্ক করা চলে না। আমি বিশেষ কিছু না বলেই তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। লাব্রাং থেকে রওনা হয়ে তুষারাবৃত সং চু উপত্যকা দিয়ে আমরা অগ্রসর হলাম। আমাদের সঙ্গে সশস্ত্র শরীররক্ষী প্রহরীদল ছিল প্রায় ত্রিশজন। রাত্রে এক জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে শিকারী কুকুর ছেড়ে দেওয়া হল পাহারার কাজ করবার জন্যে। আমি যখন গ্রামোফোনে গান বাজাতে আরম্ভ করলাম, আমার অনুচরবর্গ সকলে অবাক্ হয়ে গেল—এ জিনিষ তারা কখনও দেখে নি। তারা সকল বৈদেশিককে 'উরুসু' অর্থাৎ রাশিয়ান্ বলে উল্লেখ করে। আমার গ্রামোফোনের তারা নামকরণ করেন 'রুশীয় ম্যাজিক বাক্স'।

পরদিন আমরা যাত্রা সুরু করলাম। আমার জনৈক বালক ভৃত্য ঘোড়া থেকে পড়ে গেল, এবং ঘোড়াটা রেকাব উড়িয়ে দীর্ঘ তৃণভূমির মধ্যে দিয়ে দৌড়ে পালাল। কিছুদূর যেতে না যেতে আমাদের চোখের সামনে দশজন দস্যু তৃণের আড়াল থেকে বেরিয়ে ধাবমান ঘোড়াটাকে ঘিরে ফেলল এবং তাকে বেঁধে নিয়ে পালাল।

এ সব দেশের এই অবস্থা।

আমার অনুচরবর্গও বড় দুরন্ত প্রকৃতির লোক।

কাঙ্গার মঠে একাশী বৎসর বয়স্ক জীবন্ত বুদ্ধ।

একজনকে বলেছিলাম ঘোড়ার পিঠের বোঝাগুলি কম্বল দিয়ে ঢাকতে, এতেই সে আমায় বর্শা তুলে খোঁচা মারবার ভয় দেখাল। এই পথ অতিক্রম করতে আমাদের ভয়ানক বেগ পেতে হল, ভীষণ বরফের ঝড় আরম্ভ হল এ পথে, ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগে ঝড় বইতে লাগল, সাদা বায়ু-তাড়িত বরফের গুঁড়াতে আমাদের চোখ অন্ধ হবার উপক্রম হল। তের হাজার ফুট ওপরের মালভূমিতে সে ঝড়ের এমন জোর ঝাপটা যে, আমাদের ঘোড়ায় বসে থাকা কঠিন হয়ে উঠল।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে আমরা বাঁ ধারের একটা উপত্যকায় অবতরণ করলাম। ঝড় একটু কমলে আবার যাত্রা সুরু হল। টেক্‌-গার-টাং সমতলভূমি পার হয়ে আমরা মামো জাং নদীর তীরবর্ত্তী সোকা আরিক নামে পার্ব্বত্য জাতির শিবিরে পৌছলাম।

আমনি চাঙ্গান-এর শিখর হইতে পীত নদীর দৃশ্য।

আমাদের শিবিরের চারিদিকের বনে অংসখ্য বন্য মোরগ। আমি শিকার করে এনে তাদের মাংস খেতাম কিন্তু আমার অনুচরবর্গ মুরগী খেত না—তাদের ধর্ম্মে মুরগী খাওয়া নিষিদ্ধ। এখানে আবার গ্রামোফোন বাজালাম রাত্রে, সোকা আরিক জাতির লোকেরা গান শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। হয়ত তখন মেলুবা-র একটা অতি করুণ গান বাজছে রেকর্ডে।

এখান থেকে রওনা হয়ে এগার হাজার ফুট উঁচু স্থানে পীত নদী পার হই। কয়েক বছর আগে জার্ম্মান ভ্রমণকারী ফুটারার এইখানে পীতনদী পার হন এবং এই স্থানেই তিনি দস্যুদ্বারা আক্রান্ত হয়ে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় তাও-চো মঠে উপস্থিত হন। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমে আমি পঞ্চ চূড়াযুক্ত এক বৃহৎ অজানা পর্ব্বতশ্রেণী দেখতে পাই।

চোনাক নদীর নিকটে অবস্থানকালে আমার কাণে গেল নিকটবর্ত্তী একটা পশুলোমে তৈরী তাঁবুতে এক জীবন্ত বুদ্ধ বাস করছেন, তাঁর বয়েস হয়েছে একাশি বছর। আমি তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে দলাই লামার ছবি উপহার দিলাম। তিনি আমাদের চা খেতে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু নিয়মানুসারে জীবন্ত বুদ্ধের সঙ্গে বসে তো আমরা চা খেতে পাই না, কারণ তিনি দেবতা। আমরা চা খেলাম তাঁর ভাণ্ডারীর সঙ্গে রান্নাঘরে বসে। ঘরের মেজেতে একটা মাটীর চুল্লিতে সাজান আগুন। আমার পিছনে বহুলোক স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঢুকে পড়ল, বুদ্ধ মহাশয়ের রান্নাঘরে। তারা আমাকে দেখতে চায়। কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা কয়েকটি পাত্র ভেড়ার নাদি দিয়ে পরিষ্কার করে এনে সেই হাতেই সেই পাত্রে আমাকে চা ঢেলে দিলে। তখনও পাত্রের গায়ে শুক্‌নো ভেড়ার নাদির গুঁড়া লেগে রয়েছে।

আমার সম্মুখে কাঠের আর একটা বাক্স রাখা হল, বাক্সের তিনটি খাঁজ। প্রথম খাঁজে হরিদ্রা বর্ণের ইয়াক দুগ্ধের মাখন, দ্বিতীয় খাঁজে ভর্জ্জিত যব, তৃতীয় খাঁজে ছাতু। তিনটি খাদ্যদ্রব্যের উপর মিহি এক পুরু ধুলোর স্তর পড়েছে

এবং আমার পুর্ব্বেও যারা আঙ্গুল দিয়ে মাখন তুলে খেয়েছে, তাদের আঙ্গুলের স্পষ্ট দাগ তখনও মাখনের পিণ্ডের গায়ে লেগে। আমার প্রবৃত্তি হল না চা বা খাবার খেতে। মুখে তুলে সামান্য এক চুমুক পান করলুম, নইলে এদের মনে কষ্ট দেওয়া হবে।

দু'দিন ধরে দীর্ঘ তৃণভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাবার পরে গান মার উপত্যকায় তাঁবু ফেললাম। এই উপত্যকার ভেতর দিয়ে একটি নদী দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে বয়ে গিয়েছে। এত নেকড়ে বাঘও উপত্যকাটায় আছে! মানুষকে ভয় করে না এরা। আমাদের তাঁবু থেকে কিছু দূরে জঙ্গলের মধ্যে দিব্যি বসে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। বনের মধ্যে কৃষ্ণসার হরিণের দলও দেখা গেল।

এই উপত্যকার আবহাওয়ার যিনি দেবতা, তিনি বড় খামখেয়ালী। এই দিব্যি গরম হাওয়া বইছে, এমন কি যেন একটু গুমটও বোধ হচ্ছে, পরমূহূর্ত্তে কোথা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শক্ত তুষার কণা চোখে মুখে বর্ষিত হ'তে লাগল। ঘণ্টাখানেক তুষারবৃষ্টির পরে আবার খুব গরম। সে রাত্রে আমরা বার হাজার ফুট উপরে রুণা নদীর ধারে তাঁবু ফেললাম। এই বনে অসংখ্য রঙীণ তিত্তির পাখী এবং খরগোস ও মারমোট দেখা গেল। তৃণভূমির পেছনে ছেড়ে এসেছি। এখন আমরা পার্ব্বত্য পথে চলেছি, রডোডেনড্রন গাছ আমাদের চারিধারের পর্ব্বত-সানুতে ও নদীর গভীর খাতে।

ডাকসো উপত্যকায় লেখকের তাঁবু।

আমার কুকুরটা সারাদিন পলায়ন-পর মারমোটের পেছনে ছুটাছুটি করল। পথে পড়ল জাঙ্গার মঠ, মঠের ছাদে লামার দল চুপচাপ বসে নিরুৎসাহ চোখে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমরা মঠের প্রাঙ্গনে ঢুকে ইয়াকের পিঠ থেকে বোঝা নামাতে লাগলাম, কারণ এই স্থানেই আমরা রাত্রি বাস করব। পরদিন ইয়াক ও পথপ্রদর্শকের সঙ্গে আমরা পীত নদীর খাত দেখতে গেলাম। বনের মধ্যে গিয়ে কিছুদূরে একটা উচ্চ পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পীত নদী বয়ে যাচ্ছে দেখলাম, যে দৃশ্য আমার আগে কোন শ্বেতকায় লোক দেখেনি। পীত নদী যেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তার উচ্চতা ১০,২০০ ফুট। খাতের গভীরতা প্রায় ৭০০ফুট, স্প্রুস, বার্চ্চ ও উইলোর বন খাতের দেওয়ালের গায়ে।

পীত নদীর খাতে নামবার একটি সঙ্কীর্ণ পথ গিয়েছে বনের মধ্য দিয়ে। আমরা নেমে গেলাম সে পথে। পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে ঘন বন। এই উপত্যকায় গাছ কাটতে আমার অনুচরেরা বাধা দিলে। বনের দেবতা তাতে রুষ্ট হবেন। এখানে গাছ কাটলে মানুষের অনিষ্ট ঘটে।

জাঙ্গার মঠে ৫০০ লামা ও পনের জন জীবন্ত বুদ্ধ বাস করেন। এখানে পর্ব্বত-দেবতা আমনি ম্যাচনের এক প্রকাণ্ড ছবি আছে। এখান থেকে রাজা মঠে লোক পাঠিয়ে দিলাম, লোকের মজুরীস্বরূপ আমরা দিলাম কিছু কাপড়। কারণ, মুদ্রার প্রচলন নেই এসব দেশে।

তারপরে আমাদের সামনে নানা রকম সুন্দর দৃশ্য উন্মুক্ত হল পথিমধ্যে, ঠিক যেন কলোরাডো নদীর বৃহৎ খাতের (Grand canyon) দৃশ্য এই উপত্যকার নাম সুবর্ণ উপত্যকা—এখানে সোণা পাওয়া যায় কি না জানি না, কিন্তু এর চতুর্দ্দিকের কি বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য! বাতাসে ও জলে বেলেপাথর কেটে যুগ যুগ ধরে পাহাড়ের গায়ে কোথাও রাজপ্রাসাদ, কোথাও দুর্গ, কোথাও প্যাগোডা কোথাও স্তম্ভ, কোথাও মন্দিরচূড়া ইত্যাদি সৃষ্টি করছে—

তিব্বতীয় পার্ব্বত্য ভূমির চীনা পপি।

তাদের ওপরে পার্ব্বত্য ঈগলপাখী বসে আছে এবং নিম্ন দিকের শৈলসেতুর প্রত্যেক অন্ধি-সন্ধি ও ফাটল থেকে গজিয়েছে সুগন্ধ জুনিপারের বন—এক কথায় আমি এ দৃশ্যকে কলোরাডোর গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের দৃশ্য থেকে পৃথক করতে পারলাম না।

সুবর্ণ উপত্যকার পূর্ব্ব প্রান্তে সার চেন নদী পীত নদীর সঙ্গে মিশেছে। এখানে আমার আমেরিকান দোভাষী ও আমি দুজনে দুশো ফুট ওপর থেকে উভয় নদীর সঙ্গমস্থল দেখলাম। দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না যে, অত বড় বিরাট নদী মাত্র ৮০ ফুট চওড়া একটা সংকীর্ণ নদীখাতের মধ্য দিয়ে বার হয়ে আসছে।

পীত নদীর এই সব খাত এপর্য্যন্ত কোন শ্বেতকায় মানুষ পরিদর্শন করেনি—অথচ রাজা ও জাঙ্গার মঠের উত্তর অঞ্চলে অবস্থিত এই খাতগুলি শুধু যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের নিবাসভূমি তাহা নয়, নানাপ্রকার দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ্ ও জন্তুর বাসভূমি।

এই কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, পীত নদীর এই খাত এখানে তিন হাজার ফুট গভীর এবং আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে দুইদিকের দেওয়ালের গগন-স্পর্শী শিখর চোখেই পড়ে না। পীত নদীর খাত দেখবার শুভ মুহূর্ত্তকে সমাদরে অভিনন্দন করবার জন্যে আমি দুটি পার্ব্বত্য ঈগলপাখী শিকার করলাম—যে দুটি বর্ত্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

উঁচুনীচু কঠিন পার্ব্বত্য পথ দিয়ে চলেছি। এত দুর্গম রাস্তা এর আগে দেখিনি,—এ জগৎ জনশূন্য। এখানে কোন দিকে লোকালয় নেই, মথুর নীরা পার্ব্বত্য পথের উপর থেকে এইবার আমি সর্ব্বপ্রথম তুষারবৃত আমনি-ম্যাচেনের শিখর দর্শন করলাম। খুব কিছু যে দেখলাম তা নয়, দূর থেকে আমনি-ম্যাচেনের শিখরদেশ মনে হল, মার্ব্বেল পাথরের একটি মন্দিরচূড়া। বহুদূর দক্ষিণে আর একটি তুষারাচ্ছন্ন শৈল-মালাকে পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত দেখলাম। মথুর নীরা গিরিপথ বার হাজার আটশো ফুট উঁচু। আমরা বাঁ দিকের তের হাজার দুশ ফুট উঁচু আর একটা জায়গায় আরোহণ করলাম, আমনি-ম্যাচেনের দৃশ্য আরও ভাল ভাবে দেখবার জন্যে। দেখে মনে হল, আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতমালার উত্তর দিকের পৃষ্ঠগুলি দক্ষিণদিকের অপেক্ষা নীচু।

এখান থেকে বেশ দেখা গেল যে, আমনি-ম্যাচেনের পূর্ব্বদিকে আরও কয়েকটি শৈলশ্রেণী আছে, সেগুলি আমনি-ম্যাচেনের সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। এইবার আমরা নিম্নের একটা উপত্যকায় অবতরণ করলাম, রোডোড্রেণ্ডান গাছের বনে এই উপত্যকা পরিপূর্ণ—এখান থেকে আমরা পীত নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ফটো নিলাম। দু'হাজার ফুট নীচ দিয়ে এখানে পীত নদী এক বিরাট খাদের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে।

এখানে চারিদিকের পাথরের দেওয়াল প্রায় খাড়া, অতি ভয়ানক দৃশ্য! এই খাদের নাম ডাক্‌সো, এখানে নীচের দিকে বন ক্রমশঃ অত্যন্ত নিবিড় হয়েছে। আমরা দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষলতার সন্ধানে ডাক্‌সো ক্যানিয়নের বনের মধ্যে দু'তিন দিন ঘুরে কাটিয়ে দিলাম। এখান থেকে আমি উত্তর অঞ্চলের পর্ব্বতমালা ও পীত-নদী-খাতের ফটোগ্রাফ নিলাম। উত্তরে পর্ব্বত আরও উচ্চ, সুতরাং নদীখাতও গভীরতর।

পীত-নদীর খাদ থেকে আমনি-ম্যাচেনের তলদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত বনভূমি এক বিরাট পশুশালা। যে দিকেই চোখ পড়েছে সেই দিকেই বন্যজন্তুর দলকে শান্তভাবে চরতে দেখেছি,—নানা রকমের হরিণ, ওয়াপিতি, ইয়াক এবং আরও বহু অজানা জন্তু। আর, সমস্ত স্থানটা বড় বড় জুনিপার-গাছের নিবিড় বনে ভর্ত্তি, অনেক রকম ফুলও ফুটে আছে বনে, সর্ব্বত্র নীল পপি, প্রাইমুলা ও রোডোডেন্‌ড্রন। এ ধরণের অদ্ভুত পার্ব্বত্য দৃশ্য আমার কখনও চোখে পড়েনি।

আমনি-ম্যাচেন পর্ব্বতের আর একটি চূড়ার নাম আমনি ডুগু। ইনি স্থানীয় পার্ব্বত্য-জাতির শাস্ত্র অনুসারে আমনি-ম্যাচেন দেবতার ছোট ভাই এবং ইয়োনসি জাতির কুলদেবতা। বনের মধ্যে এক জায়গায় আমরা ইয়োনসি জাতির কয়েকটি তাঁবু দেখতে পেলাম। কিন্তু, তাঁবুর অধিবাসীরা অত শীতেও ইয়াক লোমের কম্বল গায়ে চাপা দিয়ে তাঁবুর বাইরে শুয়ে আছে। বারহাজার ফুটের উপরে একটা সরু পায়ে চলার পথ পাওয়া গেল—ঐ পথটা আমনি ডুগুর চূড়ায় আমাদের নিয়ে গেল। ইয়োনসি জাতির লোকেরা চৌদ্দহাজার সাতশ' ফুট উঁচু এই পর্ব্বত-পৃষ্ঠে মলিন নেকড়ায় পতাকা উড়িয়ে রেখেছে কুলদেবতার উদ্দেশ্যে।

আলোচনা

অনেক-তত্ত্ব

বিগত সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'তে আলোচনা-শীর্ষক প্রবন্ধে 'অনেক' শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা দেখিলাম। সংস্কৃতের 'অনেক' শব্দ যখন অনেকের কাছেই একটি সমস্যা, তখন পাঠকমণ্ডলীর অবগতির জন্য উহার তত্ত্ব বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রথমে বচনের কথাই ধরা যাউক। লেখকের সিদ্ধান্ত, অনেকঃ, অনেকস্য প্রভৃতি একবচনান্ত প্রয়োগই যুক্তিসহ, আর অনেকে, অনেকেষাম্ প্রভৃতি বহুবচনান্ত পদ কেবল কবিপ্রয়োগ বলিয়াই কোনও রূপে সিদ্ধ। আসলে যত গণ্ডগোল বাধাইয়াছে তৎপুরুষের ঐ উত্তরপদপ্রাধান্য —'উত্তর-পদার্থপ্রধানস্তৎপুরুষঃ।' সমাসে যে উত্তর-পদাদির প্রাধান্য উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায়িক অর্থাৎ সর্ব্বত্র নিত্য নহে। যদি তাহাই হইত, তবে পঞ্চনদম্, উন্মত্তগঙ্গম্ প্রভৃতি অব্যয়ীভাব, উদ্বেগঃ, প্রাপ্তজীবিকঃ প্রভৃতি তৎপুরুষ, চিত্রাঃ, পঞ্চষাঃ প্রভৃতি বহুব্রীহি এবং দন্তোষ্ঠম্, পাণিপাদম্ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সিদ্ধ হইতে পারিত না। এ বিষয়ে ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহার সিদ্ধান্ত-কৌমুদী-বৃত্তিতে স্পষ্টই বিচার করিয়াছেন। বিশেষতঃ, তৎপুরুষ কেবল উত্তরপদপ্রধান নহে, পূর্ব্বপদপ্রধানও বটে। 'বৈয়াকরণভূষণ' গ্রন্থে নঞ্‌তৎপুরুষের নঞর্থ-নির্ণয়-স্থলে একটি কারিকা আছে—

> অভাবো বা তদর্থোঽস্তু ভাষ্যস্য হি তদাশয়াৎ।
> বিশেষণং বিশেষ্যং বা ন্যায়তস্ত্বধার্য্যতাম্॥

ইহার ভাবার্থ এই যে—'পূর্ব্বপদস্থ নঞের অর্থ বিশেষণ অর্থাৎ অপ্রধান, এবং বিশেষ্য অর্থাৎ প্রধান, ন্যায়ানুসারে হইয়া থাকে। যখন বিশেষণ তখন পূর্ব্বপদ প্রধান নহে অর্থাৎ উত্তরপদ প্রধান, যখন বিশেষ্য তখন পূর্ব্বপদ প্রধান। উত্তরপদ-প্রাধান্যে না হয় একবচন হইল, কিন্তু পূর্ব্বপদ-প্রাধান্যে বহুবচন না হইবে কেন? যুক্তির দিক্ দিয়াও উত্তরপদার্থের প্রাধান্য প্রথমতঃ উপস্থিত না হইয়া পূর্ব্বপদার্থের প্রাধান্য প্রতিভাত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, তাহার সমর্থক ব্যাকরণের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাষা হিসাবে 'অনেক' শব্দের অর্থ হয়, একত্বের অভাব-যুক্ত অর্থাৎ এক নয়। অতএব, ভাষাভাষীর পক্ষে উত্তরপদার্থ-প্রাধান্যের কথা প্রথমেই স্মরণীয় কি না বিবেচ্য। তারপর পাণিনি যে "অনেক-মন্যপদার্থে' এই সূত্রে একবচনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহারও একটি যুক্তি আছে। সে যুক্তিটি হইতেছে এই, 'অনেক' শব্দে দ্বিবচন দিলে বহুপদের, আর বহুবচন দিলে দুই পদের বহুব্রীহি সিদ্ধ হয় না। তাই সাধারণ ভাবে একত্বের বিধান।—'অনেকমন্যপদার্থ' ইত্যাদাবেকবচনং বিবক্ষিতমু-রোধাৎ। কিঞ্চানেকশব্দস্য দ্বিবচনোপাদানে বহূনাং বহুবচনোপাদানে দ্বয়োর্বহুব্রীহির্ন সিধ্যেদিত্যুভয়সংগ্রহায় একবচনং জাত্যভিপ্রায়মৌৎসর্গিকং বা।' ঐ সূত্রটিকে একত্বের জ্ঞাপক ধরিলেও জ্ঞাপক-সিদ্ধি ত সর্ব্বত্র না-ও হইতে পারে—'জ্ঞাপকসিদ্ধং ন সর্ব্বত্র।' যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত কারিকাবলে একদিকে যেমন 'অনেকমন্যপদার্থে', 'অনেকমাশ্রিতং লিঙ্গম্,' 'কশ্চিৎ প্রস্থিতোঽনেকঃ' ইত্যাদি প্রয়োগ প্রচলিত, অন্যদিকেও তেমন—'অনেকে সেবন্তে', 'তবকাধিকগীর্ব্বাণনিবহান্',

'পতন্ত্যনেকে জলধেরিবোর্ম্ময়ঃ', 'প্রবৃত্তিভেদে প্রয়োজকং চিন্তমনেকেষাম্' প্রভৃতি প্রয়োগ অবিসংবাদিত। এই সব দেখিয়া শুনিয়াই বোধ হয় সুচতুর সুপদ্ম-ব্যাকরণ-কার একটী সূত্র করিয়াছেন—'নঞঃ সংখ্যার্থে চ' (একত্বে প্রাপ্তে বহুবচনং বা স্যাৎ)—অনেকে বদন্তি। আবার, নঞের অর্থ অন্যত্ব ধরিলেও ন একঃ অর্থাৎ একস্মাৎ অন্যঃ ও একস্মাৎ অন্যে—অনেকঃ, ও অনেকে, এই দুই পদ সিদ্ধ হইতে পারে।

প্রাচীন বৈয়াকরণগণের—বিশেষতঃ শব্দনিত্যত্ববাদী বা সমাসশক্তিবাদীদিগের বিশেষ বিচারে প্রতীত হয় যে, 'ন একঃ' এই বাক্য হইতে 'অনেকঃ' এই সমাস সম্পূর্ণ বিভিন্ন—'শব্দান্তরত্বাদত্যন্তং ভেদো বাক্য-সমাসয়োঃ' (ভর্ত্তৃহরি) পূর্ব্বপক্ষে 'এক' এই অবয়বটী একবচন হইতে পারে, কিন্তু 'অনেক' এই সমুদয়-পদ যে একবচন হইবে, তাহার কারণ কি? যেহেতু 'অবয়ব প্রসিদ্ধেঃ সমুদয়প্রসিদ্ধির্বলীয়সী'। আর, দেখিতে গেলে 'অনেক' পদটী প্রকৃতপক্ষে বহুত্ববোধক, সুতরাং 'বহুষু বহুবচনম্' এই সূত্রে উহাতে বহুবচনের বিরোধ নাই।—'অধ্যারোপিতৈকত্বানাং প্রকৃতার্থতয়া তত্র বাস্তববহুত্বাভিপ্রায়ং বহুবচনং ন বিরুধ্যতে' (শব্দ কৌস্তুভ)। সমাসশক্তিবাদিগণের মতে একবচনান্ত 'অনেক' শব্দ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন। পণ্ডিতকুলতিলক তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় বলেন—'ন একঃ একভিন্নতয়া উৎসর্গতঃ বহুবচনান্ততা। একশব্দস্য সর্ব্বনামত্বেন নঞ্‌, তৎপুরুষে তদ্ভিন্নবাচকতয়া গৌণত্বেঽপি অতচ্ছব্দবৎ সর্ব্বনামকার্য্যম্, তেন অনেকে ইতি, অনেকেষাম্ ইতি, অনেকত্রেত্যাদি। নাস্তি একঃ 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' ইতিবৎ একত্বং যত্র ইতি বহুব্রীহৌ অনেক-শব্দস্য একবচনান্ততাপীষ্যতে, 'অনেকমন্যপদার্থে ইতি'। আর একদল আছেন, তাঁহারা বলেন—'অনেকে' এইরূপ প্রয়োগস্থলে এক শব্দের অর্থ অল্প। তাহার প্রমাণ যথা—'একোঽল্পার্থে প্রধানে চ প্রথমে কেবলে তথা। সাধারণে সমানেঽল্পে সংখ্যায়াঞ্চ প্রযুজ্যতে'। সে হিসাবে উহাতে বহুবচন হইতে কোনই বাধা নাই।

তৎপুরুষ ভিন্ন একশেষ ও বহুব্রীহি করিয়াও 'অনেক' শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। তখন ক্ষেত্রবিশেষে উহা কেবল একবচন বা বহুবচন নহে, দ্বিবচনও হইয়া থাকে। যথা—একশেষ—ধবশ্চ খদিরশ্চ ইত্যুভৌ অনেকৌ, ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ ইত্যনেকাঃ। অনেকাঃ বৃক্ষাঃ ইত্যাদি স্থলে হয় একশেষ না হয় বহুব্রীহি। ইহা হইতে বুঝা যায়, 'অনেক' পদে অনেক পদেরই প্রাধান্য বিদ্যমান। সুতরাং প্রতিপদে গণ্ডগোল হইবারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ, শব্দটী প্রধানতঃ সর্ব্বনাম, কেবল বহুব্রীহিসমাসে উহা সর্ব্বনাম নহে, কারণ অপ্রধান স্থলে সর্ব্বনামসংজ্ঞা হয় না—'সংজ্ঞোপসর্জ্জনীভূতাস্তু ন সর্ব্বাদয়ঃ।' তবে, তৎপুরুষে ইষ্টসিদ্ধি হইলে আর গৌণভাবকল্পনার গৌরব অনাবশ্যক।

—শ্রীহিমাংশুপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

৮/ চন্দ্রবিন্দু

বিগত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধের একটি স্থান তারকা-চিহ্নিত করিয়া বঙ্গশ্রী-সম্পাদক মহাশয় "চন্দ্রবিন্দুটি কি তবে?" এই প্রকার যে প্রশ্নটি করিয়াছেন, উহাতে খুব সুখী হইলাম।

চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধেও কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল; বিস্তৃতির ভয়ে উহা আর বলি নাই। এক্ষণে বঙ্গশ্রী-সম্পাদক মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তর-কল্পে চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

"চন্দ্রবিন্দুটি কি তবে?" এই প্রশ্নটি যে স্থানে করা হইয়াছে, সেই স্থানানুসারে উক্ত প্রশ্নটিকে তিন প্রকারে ধরিয়া লইতে হইবে। ১। 'চন্দ্রবিন্দুটি একটি বর্ণ কি না?' ২। 'বর্ণ হইলে বর্ণমালায় উহার স্থান কোথায়?' ৩। 'যদি বর্ণ না হয়, তবে উহা (যাহা বর্ণমালায় নাই তাহা) আসে কোথা হইতে?' এই তিনটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারিলেই 'চন্দ্রবিন্দুটি কি তবে?' এই প্রশ্নের উত্তর এ স্থলে সমাধান হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে আমার বক্তব্য শেষ হইবে।

প্রথমতঃ, সুগৃহীতনামা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ব্যাকরণ-কৌমুদীতে প্রদত্ত (পৃঃ ৫, সূ ১৬) বর্ণ তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রথম প্রশ্নের উত্তর সমাধান করিতে ইচ্ছা করি।

"পঞ্চষষ্টির্বর্ণাঃ।

সংস্কৃত ভাষায় বর্ণের সংখ্যা সমুদয়ে পঞ্চষষ্টি। পাঁচ হ্রস্ব, নয় দীর্ঘ, নয় প্লুত, সমুদয়ে স্বরবর্ণের সংখ্যা ত্রয়োবিংশতি। ক অবধি 'ঃ' বিসর্গ পর্য্যন্ত ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা পঞ্চত্রিংশৎ। বিসর্গের জিহ্বামূলীয় ও উপধ্মানীয় নামে অপর দুই রূপ আছে। ক ও খ পরে থাকিলে, বিসর্গস্থানে যে বজ্রাকৃতি "+" বর্ণ হয়, তাহার নাম জিহ্বামূলীয়; আর প ও ফ পরে থাকিলে বিসর্গস্থানে যে গজকুম্ভাকৃতি '()' বর্ণ হয় তাহার নাম উপধ্মানীয়; ইহারাও দুই পৃথক্ বর্ণ বলিয়া পরিগণিত। আর, বৈয়াকরণেরা ঌকারের ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যেও গণনা করিয়া থাকেন; তদনুসারে ব্যঞ্জন ঌকার এক পৃথক্ বর্ণ। এতদ্ভিন্ন যম নামে চারিটি বর্ণ আছে; লৌকিক ব্যবহারে উহাদের প্রয়োগ নাই। এই সাত বর্ণ লইয়া ব্যঞ্জন বর্ণের সংখ্যা দ্বিচত্বারিংশৎ। এইরূপে বৈয়াকরণদিগের মতে তেইশ স্বর ও বিয়াল্লিশ ব্যঞ্জন, সমুদয়ে পঁয়ষট্টি বর্ণ।"

উক্ত তালিকানুসারে চন্দ্রবিন্দু একটি বর্ণ নহে, ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের চরম প্রমাণ-স্থল পাণিনি, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি (ত্রিমুনি) চন্দ্রবিন্দুকে বর্ণ হিসাবে ধরেন নাই।*। সর্ব্ববর্ম্মা, বোপদেব প্রভৃতি

---

*পাণিনীয়-শিক্ষা-প্রকরণে—

ত্রিষষ্টিশ্চতুঃষষ্টির্বা বর্ণাঃ শম্ভুমতে মতাঃ। প্রাকৃতে সংস্কৃতে চাপি স্বয়ংপ্রোক্তাঃ স্বয়ম্ভুবা॥ স্বরাঃ বিংশতিরেকশ্চ স্পর্শানাং পঞ্চবিংশতিঃ।

পরবর্ত্তী বৈয়াকরণ মণ্ডলীও এস্থলে প্রাচীনদের সঙ্গে এক মতেই চলিয়াছেন। সুতরাং, চন্দ্রবিন্দুটি একটি বর্ণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

উক্ত সিদ্ধান্তানুসারে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করা অনাবশ্যক।

অনুস্বার-বিসর্গের আলোচনায় এই প্রকার বলিয়াছি যে, "যে কোন নিমিত্তেই হউক, একটা বর্ণের স্থানে যে আর একটা বর্ণ হয়, সে বর্ণটা বর্ণমালার ভিতরেও থাকে, নতুবা আসে কোথা হইতে ?"

উপস্থিত তৃতীয় প্রশ্নটি আপাত দৃষ্টিতে উক্ত মন্তব্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ তাহা নহে।

সাধারণতঃ, 'ন্' বর্ণের অদর্শন হইলেই একটা চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন (ঁ) দেওয়া হয়। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, চন্দ্রবিন্দুটি বর্ণ নহে। অতএব, ন্-স্থানে চন্দ্রবিন্দু হওয়াটা একটা বর্ণের স্থানে আর একটা বর্ণ হওয়া হইল না। এক্ষণে দেখা গেল যে, চন্দ্রবিন্দুটি যদি একটি বর্ণ হইত, তবেই অনুস্বার-বিসর্গের আলোচনায় উল্লিখিত বর্ণাগমের মন্তব্যটির বিরুদ্ধবাদী হইত ; কিন্তু যখন চন্দ্রবিন্দু বর্ণ নহে, ইহা প্রমাণিত হইল, তখন আর কোন গণ্ডগোল থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

চন্দ্রবিন্দুটি অনুনাসিক উচ্চারণ-দ্যোতক চিহ্ন মাত্র।* ভাষায় কখন কোন বর্ণটার অনুনাসিক উচ্চারণ হইবে, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্যই চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করা হইয়া থাকে। 'ভবাল্ঁলিখতি', এ স্থলে 'ল্'-[এর উপর চন্দ্রবিন্দুদ্বারা ইহাই বলা হইতেছে যে, ঐ 'ল্'] বর্ণটার এ স্থলে অনুনাসিক উচ্চারণ হইবে। যদি কেহ ঐ প্রকার চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার না করিয়া লিখেন :—'ভবা (অনুনাসিক) ল্ লিখতি', তবে ঐ লেখাটা ভুল হইবে না। কিন্তু, ঐরূপ বিস্তারিত ভাবে যাহাতে লিখিতে না হয়, তাহার জন্যই চন্দ্রবিন্দুকে (অনুনাসিক উচ্চারণের সাংকেতিক চিহ্ন স্বরূপ) ব্যবহার করা হয়। একটি বর্ণকে স্বর-বিহীন বা হসন্ত বুঝাইতে হইলে উহার নিম্নে (্) এই প্রকার একটি চিহ্ন দেওয়া হয়। ছন্দো-বিজ্ঞানে বর্ণের লঘুত্ব গুরুত্ব, প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য (ং ।) এই প্রকার চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লিখিত ভাবে জিজ্ঞাসা করা বুঝাইতে হইলে '?' এই প্রকার চিহ্নের ব্যবহার হয়। এই সকল সাংকেতিক চিহ্নগুলি (ঁ, ্, ং, ।, ?) বর্ণমালার মধ্যে থাকে না এবং কোন কারণে উহাদের আগম হয় এ কথাও বলা চলে না। উহাদিগকে নিমিত্তানুসারে দরকারমত ব্যবহার করা হয় মাত্র।

লৌকিক সংস্কৃতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার বিরল। বর্ণমালায় প্রত্যেক স্বর-বর্ণেরই একটা অনুনাসিক উচ্চারণ আছে। ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, এই পাঁচটি এবং স্থানবিশেষে য্, ল্, ব্, এই তিনটি, মোট এই আটটি বর্ণ অনুনাসিক। ইহাদের প্রথম পাঁচটি খাঁটি অনুনাসিক বর্ণ ; উহাদের নিরনু-নাসিক উচ্চারণ নাই। সুতরাং উহাদের অনুনাসিকত্ব বুঝাইবার জন্য চন্দ্রবিন্দুর আবশ্যক হয় না। স্বরবর্ণ সমুদয় এবং য্, ল্, ব, ইহাদের অনু-নাসিক ও নিরনুনাসিক, এই দুই প্রকার উচ্চারণই আছে। এই দুই প্রকার উচ্চারণের কোনটা কখন হইবে, তাহা বুঝাইবার জন্যই চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার করা হয়। যখন উহারা নিরনুনাসিক-উচ্চারণযুক্ত হয়, তখন উহাদের উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় না এবং যখন যখন অনুনাসিক উচ্চারণযুক্ত হয়, তখন উহাদের উপর একটি চন্দ্রবিন্দু (ঁ) দেওয়া হয়।

কোন কোনও স্থানে যে বর্ণটার অনুনাসিক উচ্চারণ বুঝাইতে হইবে, সেই বর্ণটার উপর চন্দ্রবিন্দু (ঁ) না বসাইয়া উহার পূর্ব্ববর্ণে বসাইবার প্রথাও দেখা যায়। হিন্দি, উৎকল এবং বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত মার্কণ্ডেয় পুরাণা-ন্তর্গত চণ্ডী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে "যৈর্নিরস্তঃ ভবাঁল্লুকৈঃ" ইত্যাদি প্রকারে চন্দ্রবিন্দু-চিহ্নটি 'ল্' বর্ণের উপর না বসাইয়া পূর্ব্ববর্ণে বসান হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-প্রকাশিত 'সংস্কৃত-ব্যাকরণ-প্রবেশ' নামক পুস্তকের ৫ম পৃষ্ঠায় ৮ নং বিধিতে বলা হইয়াছে যে,—"বর্গের প্রথম তৃতীয় পঞ্চম বর্ণ এবং য্, র্, ল্, ব্, অল্পপ্রাণ (unaspirated), অপর ব্যঞ্জন মহাপ্রাণ (aspirated)। ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্, অনুনাসিক (nasals)। য্, ল্, ব্, কখন কখন অনুনাসিক হয়, তখন উহাদের উপরে চন্দ্রবিন্দু দেওয়া হয় ; যঁ, লঁ, বঁ।"

এই পুস্তকেরই ২০ পৃষ্ঠায় ৩১ নং বিধিতে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার যে ভাবে দেখান হইয়াছে, তাহা নিম্নে দেখান হইল।

"ল্ পরে থাকিলে পদান্ত ন্ স্থানে অনুনাসিক লঁ হয়। তান্ লোকান্ তাল্ঁলোকান্...।" এখানে চণ্ডী-গ্রন্থের ন্যায় চন্দ্রবিন্দুটি পূর্ব্ববর্ণের উপর বসান হয় নাই।

চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার সম্বন্ধে পণ্ডিত সারদারঞ্জন রায় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার 'উপক্রমণিকা' গ্রন্থের ২১শ পৃষ্ঠায় ৫৫ নং মূলে এবং ২নং পাদটীকায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"যদি ল্ পরে থাকে, ত্, দ্ ও ন্ স্থানে ল্ হয়। নকারের (১) পূর্ব্ববর্ণ চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত হয় (২)। যথা—মহাঁল্লাভঃ...। পূর্ব্ববর্ণে চন্দ্রবিন্দু দেওয়ার অর্থ এই যে চন্দ্রবিন্দুর পরবর্ত্তী বর্ণের অনুনাসিক উচ্চারণ হইবে। মহাঁল্লাভঃ, ভবাঁল্লভতে, ইহাদের প্রথম আ-কার চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়াছে। এই আ-কারের পর ল্ আছে ; এই ল্ অনুনাসিকরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে। ধরিতে গেলে, চন্দ্রবিন্দুটি প্রথম লবর্ণে বসান উচিত। অর্থাৎ, মহল্ঁ-লাভঃ...এইরূপ লেখা উচিত। মোট কথা, চন্দ্রবিন্দু যেখানেই বসুক, ল্এর উচ্চারণ অনু-নাসিক, আ অনুনাসিক নহে, একথাটি ভুলিও না।"

—শ্রীনলিনীভূষণ ভট্টাচার্য্য

যাদয়শ্চ স্মৃতা হ্যষ্টৌ চত্বারশ্চ যমাঃ স্মৃতাঃ। অনুস্বারো বিসর্গশ্চ ≍ক ≍পৌ চাপি পরাশ্রিতৌ। দুঃস্পৃষ্টশ্চেতি বিজ্ঞেয়ো ৯কারঃ প্লুত এব চ॥"

* চন্দ্রবিন্দু—The 'sign for the nasal'. Prof. V S Apte's Sans. Eng. Dictionary.

"চন্দ্র-bindu—'Moon-like spot', the sign for the nasal." M. William's Sans. Eng. Dictionary

মুদ্রাকর-প্রমাদ :—গত আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত ব্যাকরণ-বিভ্রাট নামক প্রবন্ধের মধ্যে "...স্বরবর্ণের পর অর্থাৎ 'অ'র পর..." এই প্রকার ছাপা হইয়াছে। উক্তস্থানে "...'ঊ'র পর..." এই প্রকার হইবে।

মেটে ঘরের বাসিন্দা

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

পর পর দু' বছর থেকে ধান পাট না হয়ে এ গাঁয়ের অবস্থাটা যা হয়ে দাঁড়িয়েছে,—বিশেষতঃ এই বাগ্দী পাড়াটার। এদের কারুরই দু' বেলা কখনই হাঁড়ি চড়ে না, এমন কি যখন ভাল অবস্থা ছিল, তখনও না। ভোর বেলার দুটো পান্তার জোরে অবেলা পর্য্যন্ত বেশ চলে যায়—বেঁচে থাকার পক্ষে ; তারপর যার যা জুটল তাই দিয়ে হাঁড়ি চড়ল। রাত্রের আহার সাধারণতঃ ছেলে-পিলের জন্ম শুক্নো দুটো-কিছু ছাতু কিংবা মুড়ি—সংস্থান অনুযায়ী। নিদেন অভাবী বাপ-মায়ের কিল-চড় খিদের বাঁওর ঘুরিয়ে দিয়ে কান্নার অবসাদ এনে দেয়—ছোট ছোট ছেলে মেয়ের প্রাণে, শেষে আসে ঘুম রাত কেটে যায়।......

এখন আর সে এক বেলাও জোটে না ; যারা কখনও একটি দিন বাড়ী ছেড়ে কোথাও থাকতে হাঁপিয়ে উঠতো তাদের মধ্যে অনেকেই এখন দিনের পর দিন বিদেশে কাটাচ্ছে—মজুরি খেটে বা চাকুরী করে, নিদেন ভিক্ষে করেও। হপ্তা দুয়েক আগে ১০।১৫ জনে একটি দল বেঁধে পশ্চিমে কুলী খাটতে গিয়েছে কোথায় কোন্ পুল তৈরী হচ্ছে, সেইখানে।

কালুয়া, লখনা পিঠে পিঠি দু' ভাই :—বাল্যকালেই বাপ [illegible] গড়পড়তা বয়সটা গোঁজামিলে ঠিক রেখে পাগল অবস্থায় সরে পড়ল, মা তখন ছেলে দুটোকে বুকে করে পথে পথে সাধারণের সহানুভূতি কুড়িয়ে বেড়াতে সুরু করল ; অল্প কিছু দিনেই দুঃখের নূতনত্বও কাটল, সহানুভূতিও ক্ষীণ হয়ে এল। তারপর এল ব্যাধি—জীবন-টাকে এমন করে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে ফেলল—যেন জীবনটা'ই ব্যাধি ; ওষুধ পেতেও দেরী হল না। ১৩১৪ সালের—কবি-জন-মনোহারী এক ফাগুন সন্ধ্যায় জীবনরূপ ব্যাধি দূরে গেল।

—এ সব অনেক দিনের কথা, কালুয়া, লখনা এখন নিঃসন্তান বিধবা মাসীর স্নেহে বড় হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, লখনার বউ ফুলুয়ার একটি ছেলেও হয়েছে—মাসী সাধ করে নাম রেখেছে মাণিক, গাঁয়ের অনেকেই মাণিক নামটাকে বিকৃত করে মান্কে বলেই ডাকে।

কালুয়ার বউ-এর কথা বলা নিষ্প্রয়োজন—তার জন্ম আদমসুমারীর খাতায় যে 'এক' অঙ্কটি লেখা হয়েছিল—সেটি কেটে দিলেই এখন তার সত্যতা রক্ষা পায়।

দেখতে দেখতে ভাদ্র মাসও কেটে গেলো, গত বছরের মত বরুণদেব তাঁর শ্রাবণ-করুণা ঢেলেই হাত গুটিয়ে বসলেন, মা লক্ষ্মীও মাঠে মাঠে গরু-বাছুরের খাবার জুগিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন—মানুষের ভাগ্য পর্য্যন্ত তাঁর করুণা পৌঁছিতে পারল না।

লখনা বয়সে বড় হলেও কালুয়ার দেহের দীর্ঘতা তা মান্তে চায় না। তাই বলে কালুয়া সবল-সুস্থ নয়,—প্রবর্দ্ধিত লতাটীর মত নড়বড়ে। পাঁজরার অস্থিগুলো নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্ম অন্তরাল থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। মাথার চুলগুলো নাপিত-কলুর সঙ্গে যুগপৎ দেদার অসহযোগ আন্দোলন চালাচ্ছে, চোখ দুটি যেন বাইরের আলোর সঙ্গে লুকোচুরী খেলছে,—এক কথায় বল্তে গেলে এই কথাই বল্তে হয় যে, কালুয়ার দেহখানা বয়সের নাগাল ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে।

'অ-ভোজনে চ অজনার্দ্দন' অবস্থায় ঘাটের ধারে ছিপ হাতে বসে' বসে' কালুয়া বেলা বারটা বাজিয়ে দিল। মাছ ধরা পেশাই হোক বা নেশাই হোক, পেট আর ধৈর্য্য মানে না—অগ্নিমন্ত্রে স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেছে ; কি করে, নিরুপায়, ছিপ গুটিয়ে বাড়ী চলল...

বাড়ী এসে' লখনার বউ ফুলুয়াকে জিজ্ঞেস্ করল, "ভাজবৌ ভাত হয়েছে ?" ফুলুয়া কোন উত্তর দিল না। এই উত্তর না দেওয়াটাতেই কালুয়া সব উত্তর পেল। তারপর ছিপখানি বারান্দায় একটি কোণে খাড়া করে রেখে মাঠের দিকে বেরিয়ে পড়ল।...ফুলুয়া

হাঁড়িতে শাক চাপিয়ে বসে আছে, চাল তখনও কোন্ অজ্ঞাত মুদীর দোকানে ধামার তলায় নিশ্চিন্তে সময় কাটাচ্ছে।

ও-পাড়ার ঘোষাল বাড়ীতে আজ বিয়ে - লোকলস্কর বাজনা, চারিদিকে উৎসবের সাড়া, বরপক্ষীয় সব আজ রাত্রে আসবে। কাছারী বাড়ীর সামনের উঠানটায় সামিয়ানা খাটানো হয়েছে, বাড়ীর ও নিমন্ত্রিত আত্মীয়বর্গের ছেলেপিলেরা সামিয়ানায়-ঘেরা নতুনত্ব পেয়ে আনন্দে আত্মহারা—একটা ছোট্ট বল নিয়ে ছুটোছুটী করছে। মানুকেও এসে পড়েছে। মানুকের এখানে আসা আজ কিছু নতুন নয় বা অস্বাভাবিক নয় - এমনি খেলার সূত্রে। অনেক খেলাই আছে যাতে এখনও আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য প্রবেশ করতে পায় নি, এই প্রকারের খেলার মধ্যে ফুটবল খেলাটা অন্যতম—এতে এমন কি লাথালাথিও চলে।… তাই মানকের ভাগ্যেও একটু স্থান জুটে যেত ঘোষাল মশায়ের অষ্টমবর্ষীয় নাতি মন্টু এবং মন্টুর ফুটবল-বন্ধুদের পাশে—অন্ততঃ খেলার সময়টা। নিত্যকার অভ্যাস বশতঃ আজকেও সে এসে পড়েছে, সন্ধ্যাবেলার বদলে এই দুপুর বেলাতেই। কিন্তু তার অভাবটা বহু আগেই পূরণ হয়ে গিয়েছে—নবাগত জ্ঞাতি কুটুম্বদের ছেলেপিলে দিয়ে; মানুকে দর্শক হিসাবে বাইরে দাঁড়িয়ে খেলাপরায়ণ বালকগণের কার্য্য-কলাপের ভাল-মন্দ বিচার অনুযায়ী কখনও বা 'ফাউল, ফাউল' বলে চীৎকার করছে, কখনও বা 'গোল-গোল' বলে হাত-তালি দিয়ে নাচছে। এ ছাড়া আরও কত মুখভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গিও আছে।

আবার বলটা বাইরে চলে গেলে মানুকে পিছু পিছু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে—নবাগত ছেলেদের মধ্যেও দু'একজন সেই দিকে ছুট দিচ্ছে, কি জানি মানুকে যদি বলটা নিয়ে সরে পড়ে, এবং কাছে গিয়ে মানুকে বলটা কুড়িয়ে তাদের হাতে ত্রস্তভাবে দেবার আগেই তারা দু'একটা চড় খরচ করে ফেল্‌ছে। তবু মানুকে মানে না, খেলার আনন্দ উপভোগ করবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, বাইরে থেকে খেলায় অযাচিত সাহায্য করে। মাঝে মাঝে বলটা আউট হয় হয় দেখে, আউট হবার আগেই ভুল করে ধরে ফেলছে তার জন্যে বেকুবের মত শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, তবু সে ভাবে, সে এদেরই একজন।

তাই বলে মানুকেকে অবিবেচক বলা চলে না, ঘোষাল মশাইয়ের মেজ ছেলে কুমারীশ বাবু শুভ্র পোষাক পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছে দেখে— মানুকে খানিকটা সরে গিয়ে ভীতিপূর্ণ শ্রদ্ধায় চেয়ে রইল। মানুকে জানে এবং এই বয়সেই তাকে খুব ভাল করে শিখতে হয়েছে—তার ওই ছিন্ন প্যান্ট-এর কাছে ওই মহামূল্য পোষাকের সম্মানের দাবী মানুষের সকল দাবী ছাড়িয়ে কত উর্দ্ধে উঠেছে।

কালুয়া মাঠে নেমেই সরাসরি বেড়া ডিঙিয়ে, একেবারে ঘোষালদের আকের জমিতে ঢুকে পড়ল। তারপর যেমনি দুখানা আক ভাঙা মালীও কোথায় যেন ওৎ পেতেই ছিল, ছুটে এসে কালুয়াকে খপ্ করে' ধরে' ফেলল - একেবারে বমাল সমেত; আর যাবে কোথায়! মালীর চীৎকারে পাড়াশুদ্ধ লোক এসে জুটল, কালুয়ার পালাবার পথ আর রইল না। ফুলুয়া ছুটতে ছুটতে এসে মালীর চরণতলায় রইল।—ব্যাপারটা কি তলিয়ে জানবার জন্য ফুলুয়াকে মোটেই বেগ পেতে হয় নি বা কাউকে কিছু প্রশ্ন করতে হয় নি—মালী যে কালুয়ার পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণ করছিল—তাতেই পাড়াশুদ্ধ লোক জানতে পেরেছিল, ঘটনাটা কি? ফুলুয়া বারে বারে মালীর পায়ে ধরে' কাকুতি-মিনতি করছে "আজকের দিনটা—আর হবে না—ছেড়ে দাও"। মানুকেও কার কাছে খবর পেয়ে ছুটে এসেছে—মায়ের আঁচল ধরে, একবার কাকার দিকে—একবার মালীর দিকে চেয়ে—কি যে হল ভাল বুঝতে পারছে না, তবু ভয়ে কাঁদছে।…মালী ফুলুয়ার পীড়াপীড়িতে বিষম ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ফস করে' কি একটা অশ্লীল কথা বলে ফেলল—উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী মনে মনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হলেও মুখ ফুটে কিছু বল্‌তে সাহস পেল না, কারণ, মালীর পিছনে মালিক মস্ত বড় ধনী।

তা হলে হবে কি, মধুর কাঁচা বয়সের রক্তটা কিছু তাজা, অগ্রপশ্চাৎ ভাববার শক্তিও হয়ত কিছু কম, তাই অঙ্গভঙ্গি সহকারে চোখ রাঙিয়ে ব'লে ফেলল, 'মুখ ভেঙে দেব' সঙ্গে সঙ্গে—"পায়ে ধরতে হবে না" বলে ফুলুয়ার

হাত ধরে' টেনে নিয়ে গেল; রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে মধু থর থর করে' কাঁপতে লাগল। মধুর সঙ্গে ফুলুয়ার পাড়া-পড়শী হিসেবে যেটুকু সম্বন্ধ—তা ছাড়া আর কুটুম্বিতা কিছু নাই, তবু মধু যে ফুলুয়ার হাত ধরে টান দিতে সাহস পেয়েছিল তার কারণ এদের অত কড়াকড়ি নেই।

মাসী কালুয়াকে টান্‌তে টান্‌তে ঘোষালদের বাড়ীর দিকে নিয়ে চলল। কালুয়া—ভাইপো—ভাজবৌ—পাড়াপড়শীর দিকে তাকাতে তাকাতে প্রায় উল্টো হয়েই চল্‌তে লাগল। ভাইপোর ছ হাতের কাপড়খানা মাসীর টানাটানিতে অস্থির হয়ে শেষ কর্ত্তব্যটুকু কোন প্রকারে বাঁচিয়ে চলেছে।

লখনা তখন বাজারে শেষ খাঁচাটী বিক্রীর চেষ্টায় হাঁকছে "ছ পয়সা কম দরেই ছেড়ে দেব"। বেলাও অনেক; বাড়ী যাবার জন্য লখনা ছটফট্ করছে, খাঁচা বিক্রীর পয়সায় আজকের পেট চলবে। কোন প্রকারে যদি খরিদদার জুটল, দাম কিছুই হল না; ৴৫ পয়সার মাল ১৫ পয়সায় দিতে চেয়েও—তাতেও দর-কষাকষি শেষে ১০ পয়সায় রফা হ'ল। বাজারে চাল ডাল তরী-তরকারী—সস্তাদরে সাধ্যমত যা-কিছু পেল, তাই নিয়ে সোজাপথে বাড়ীর পানে রওনা দিল।

ঘোষালবাবুর বাড়ীতে বেশ খানিকটা উত্তম-মধ্যম হওয়ার পর আগু-পিছু দুই চৌকিদারের নীল পাগড়ীর সাহায্যে কালুয়া (সেদিন পশ্চিমে কুলী খাট্‌তে যায় নি) আজ গাঁ ছেড়ে চলল। মাসী বাড়ী ছিল না ও-পাড়ায় দুটো যব পিসতে গিয়েছিল, তারপর যখনই বোনপোর সংবাদটা কাণে গিয়েছে তখনই উঠিপড়ি করে' ছুটে' এসেছে। বোনপো ততক্ষণ বাবুদের কাছারী বাড়ীতে; বাইরে দাঁড়িয়ে মাসী কাঁদছে।

পরণে বঙ্গলক্ষী মিলের সাদা থান কাপড়খানা বয়সের অনুপাতে বহুমিলের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মূলের সঙ্গে সম্বন্ধ প্রায় হারাতে বসেছে; আঁচলে দুটিখানি ছাতু বাঁধা—বোনপোর জন্য—স্নেহের দান। কিন্তু বোনপোকে দেবার সুযোগ হয়ে উঠল না, চৌকিদারদ্বয়ের তাড়াহুড়োতে।

গাঁ পেরিয়ে সদর রাস্তাতে পড়তেই লখনার সঙ্গে দেখা। কালুয়ার এই প্রকারের অবস্থা দেখে লখনা কেমন যেন হয়ে গেল—চোখের উপর অবিশ্বাসটা কেটে যেতেই ঘটনাটা বুঝ্‌তে দেরী হল না—আক-চৌকিদার-বাঁধন—এই সব দেখে। সজল সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল "খেয়েছিস কিছু"? কালুয়া নিরুত্তর, শুধু চোখ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। লখনা তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা ধপাস করে নামিয়ে খানিকটা চাল বের করল—চৌকিদার দুজনই পরিচিত ছিল - তাই চাল দুটো কালুয়াকে দিবার চেষ্টা করা কঠিন হল না, পরক্ষণেই দুখে চৌকিদার হঠাৎ "চল্ শালা" বলে হেঁচকা একটা টান দিয়ে বসল, অমনি চালগুলো—অর্দ্ধেকেরও বেশী—ঝুর্‌ঝুর্ করে মাটীতে ঝরে পড়ল। লখনা ছেলেমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, কালুয়াও সম্বরণ করতে পারল না।

দুখের এরূপ হঠাৎ হেঁচকা টান দেওয়াটা মোটেই অস্বাভাবিক হয় নি, কারণ অদূরে একজন ভদ্রলোক এই দিকে চাইতে চাইতে গাঁয়ে ঢুক্‌ছিলেন। বরং চোরকে এম্‌নি ভাবে আহার্য্য বস্তুর সুযোগ নিতে দেওয়াটাই আইনের চক্ষে অস্বাভাবিক। চোর-সে-চোর, অভাবেই হোক্ আর স্বভাবেই হোক, তবে অভাবের গুলোই বে-আইনি বলে বেশী ধরা পড়ে।

লখনা বাড়ী আস্‌তেই ফুলুয়া মাথা কুটোকুটী করতে লাগল। ফুলুয়ার বিশ্বাস, লখনা বাড়ী থাক্‌লে বলে কয়ে, হাতে পায়ে ধরে যা হোক করে' কালুয়াকে এ যাত্রা রক্ষা করা যেত। লখনা অন্যমনস্কের মত পুঁটুলিটা নামিয়ে ফুলুয়ার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বুঝাতে লাগল "কাঁদিস না ফিরে আসবে"। ফুলুয়ার চোখে প্লাবনের পর মহাপ্লাবন এল, লখনার স্পর্শ-সম্মিলিত 'কাঁদিস না' কথাটায়। সত্যি, যে সত্যিকার "কাঁদিস না" বল্‌তে পারে তার কথাতেই সত্যি সত্যি কান্না পায়। ছেলেটা পাশেই ভাঙ্গা একটা বাটীতে দুটো ছোলা-ভিজে চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করছে, "কাকা কই?" লখনা ছেলেটাকে বুকে টেনে নিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কথা সরল না, সশব্দে কেঁদে উঠল।

মাসী নিজের কুঁড়েঘরের বারান্দায় বসে হঠাৎ আবার কান্নাকাটি শুনে নতুন কিছু হল ভেবে ঘরপোড়া গরুর মত ছুটে এল। মাসী যে লখনার সঙ্গে একঅন্নে বাস করে না

তার কারণ, বউ-এর সঙ্গে বনিবনা হত না, তবুও মাসী সুখে-দুঃখে লখনার সঙ্গে স্নেহের সূত্রে বিজড়িত; মানুকে যখন তার তিনবর্গের প্রথম চতুর্বর্ণ বর্জ্জিত ভাষায় "ডিডি" বলে' মাসীকে ডাকত, তখন মাসী সব মন-কসাকসি ভুলে গিয়ে মানুকেকে বুকে আঁকড়ে ধরত। লখনার বাড়ী হতে মাসীর বাড়ী বেশী দূরে নয়, মাঝে একটি শুকন কাঁটাল গাছ, দুটো এ বছরেরই তৈরী সজনে গাছ, আর কতগুলো জিওল, জামাল, কোটা ইত্যাদির আগাছার ব্যবধান—মাত্র কাঠা পাঁচেক জমি। মাসী কতরকমে বউকে সান্ত্বনা দিচ্ছে—নিজেও কাঁদছে—বুঝাবারও চেষ্টা করছে, "বউ কাঁদিও না তোমার পেটে ছেলে এমন মাথা কুটোকুটি কর না।" বউ কোন কথাই শোনে না, যখন তখন কেবল কাঁদে, বউ ত আর কালুয়াকে চোর বলে' দেখছে না, সে যে আরও তলিয়ে দেখছে, অনাহারের ভয়াবহ উলঙ্গ রূপ।

মাসীর কথাই ঠিক হ'ল, দিন পনের পর—আটমাসে ফুলুয়ার যে ছেলে হ'ল, তা মরা ছেলে। ফুলুয়া কাঁদতে লাগল, ছেলের জন্য কাঁদতে গিয়ে কালুয়ার কথায় এসে পড়ল, ফুলুয়া কালুয়াকে যে এতখানি স্নেহ করত তার কারণ কালুয়া মানুকেকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না, এমনি করে মানুকেকে স্নেহের বাঁধনে বেঁধে কালুয়া ভাজবৌ'র এত প্রিয়পাত্র হয়েছিল।

দিন কেটে যায়,দিন থাকে না কিন্তু কেমন করে কাটে সেইটেই হচ্ছে কথা। অভাবের নিরন্তর জালা সইতে না পেরে লখনাও মন বেঁধে বসল, সে পশ্চিমে কুলী খাটতে যাবেই। ঘটী-বাটী বন্ধক দিয়ে পশ্চিম-যাত্রার ভাড়া সংগ্রহ হ'ল।

সন্ধ্যাবেলা, ফাল্গুন মাস; দা-কোদাল আধসের চাল একখানি কাপড়ার্দ্ধ, একখানি ছিন্ন কম্বল ইত্যাদির সহ-যোগে অগণিতজ্ঞের মত একটি পুঁটলি তৈরী করে লখনা আজ পশ্চিম-যাত্রী সেজে বসল। বউ-এর চোখে জল, মাসীও কাঁদছে, লখনা ছেলেটাকে মাসীর কোলে দিয়ে বলল, 'মাসী দেখিস সব।' মাসী-বউ-ছেলে সবাই মিলে লখনাকে বেলতলার বাঁক পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল, লখনা দুঃখের জীবনের অনেক কথা ভাবতে ভাবতে ষ্টেশন অভিমুখে চলতে সুরু করল।

ফুলুয়ার কান্নার অবসান নাই, ঘর নিকোতে নিকোতে, ভাত চড়িয়ে দিয়ে বা ভাতের থালা সাজিয়ে, মন যখনই একটু ভাববার ফুরসুৎ পায়, চোখ দিয়ে জল ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে। রাত্রে অফুরন্ত সময়; ছেলেটাকে বুকে নিয়ে ফুলুয়া কোন কোন দিন কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ে আবার হয় ত কাঁদতে কাঁদতেই বিছানা ছাড়ে। মাসী এখন কাছেই থাকে, শুধু সহজ স্নেহে সাবধান করে তুমি কাঁচা ছেলের মা, অমন করে কেঁদ না'। ফুলুয়া 'বউ অবুঝ।

বেশী দিন গেল না, কেঁদে কেদে ফুলুয়ার জ্বর হ'ল; সে জ্বর আজ ছাড়ছে কাল ছাড়ছে করে' যখন দিন দিন বাড়তেই লাগল, মাসী তখন তার নিজের অভিজ্ঞতাগত গাছগাছড়ার ডিসপেন্সারী বন্ধ করে' পাড়ারই মুরুব্বি, বৃদ্ধ অর্জ্জুন হাজারীর পরামর্শে দুর্লভ কবরেজকে সংবাদ দিল। কবরেজ মশাই রোগিণীর দুর্ব্বলতা দেখে সুচিন্তিত এক ব্যবস্থা দিলেন, ব্যবস্থা-পত্রখানি রোগিণীর রোগ অনুযায়ী হলেও মাসীর আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী হল না। অতি কষ্টে দু-এক পয়সা করে রেখে রেখে মাসী আট আনা পয়সা এক জায়গায় করেছিল, তারপর সহজে খরচ হবার ভয়ে আট আনা পয়সাকে একদিন আধুলি করে এনেছিল দিনু ময়রার দোকান হতে। সেই আধুলিটি মাসী আজ খুঁটী কেটে বের করে কবরেজ মশায়ের হাতে তুলে দিল, শুধু বউমার জন্য। কবরেজ মশায়ও আংশিক দাবীতে সমস্ত আধুলিটি ট্যাঁকে গুঁজে বিদায় নিলেন। রোগিণীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে গিয়ে শুধু কবরেজ মশায়ের দর্শনীর ব্যবস্থাই হল।

লখনাকে বউমার খবর দেবে বলে' শুক্রবারের 'বিটে' মাসী পিওনের কাছ থেকে একখানা পোষ্ট-কার্ড কিনে রেখেছে। সন্ধ্যে বেলায় রাখাল দফাদার যখন থানা থেকে এই পথে বাড়ী ফিরবে, সেই সময় তাকে দিয়ে চিঠিখানা লিখিয়ে নেবে। মাসীর অবস্থা এখন এমন যে, পোষ্ট-কার্ড খানা কিনতে নিজের পেটকে এক বেলা ফাঁক দিতে হয়েছে।

দুপুর বেলা ফুলুয়া দখিণ-দুয়ারী ঘরের বারান্দায় দড়ির খাটে শুয়ে জ্বরে কোঁ কোঁ করছে, পায়ের দিকের খানিকটা রোদ্দুরে, মাথার দিকটা ছায়ায়। মাথার নীচেই একটি কানা-ভাঙ্গা ঘটীতে জল, একখানা মাটীর মালসা দিয়ে ঢাকা। রোগীণী প্রয়োজন ও সক্ষমতা দুয়ের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে তাই পান করে।

মানুকে খানিক আগে যদু গয়লার বাড়ী এক পয়সার দুধ আনতে গিয়েছিল মায়ের জন্য, ঘটী মাথায় ফিরে এসে' তার নিজের ভাষায় মাকে বলছে "মা ডুড নেই।" মা চোখ মেলে চাইতেই, চোখে পড়ল, মানুকের কুড়িয়ে আনা অসম্পূর্ণ শুরু আকখানা। ফুলুয়ার দু চোখ বেয়ে হু হু করে জল ছুটতে লাগল, যেন ওই আকখানাতে কত দুঃখের কথা গাঁথা আছে। মাকে কাঁদতে দেখে' মানুকে মায়ের মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বারে বারে বলছে, "মা কেঁড না, বাবা আসবে, কাকা আসবে, সট্যি কাল" মা ছেলেকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। মানুকে এবার জিজ্ঞেস করছে, "বাবা কবে আসবে? মা, কাকা আসবে না?" বালক একটু আগেই যে মাকে বলছিল, 'বাবা আসবে, কাকা আসবে', তা শুধু মার চোখে জল দেখে।

আজ চার দিন হল ফুলুয়া পরপারের ছাড়পত্র পেয়ে গিয়েছে।

বোশেখ মাস, ঝন্ ঝনে দুপুর, চারিদিক খাঁ খাঁ করছে, মাসী নিজের বাড়ীতে মানুকেকে বুকে নিয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কখন চোখে তন্দ্রা ঘনিয়ে এসেছে। মানুকে উঠে ঘরের কোণে, কোথায় কুড়িয়ে-পাওয়া একটি ভাঙ্গা মার্বেল, কতগুলো তেঁতুল-বীচি, বোতল-ভাঙ্গা, খানিকটা সবুজ কাঁচ (এই কাঁচখানা চোখের উপর ধরে মানুকে জগতের রঙটাকে বদলে নিয়ে কাঁচা সবুজ করে দেখে) আর কতকগুলো চক্ষুকর্ণ-বিহীন পুতুল, এই সব নিয়ে খেলা করছে। হঠাৎ মনের কোণে খোঁজ পড়ল "মা কোথায়?" আস্তে আস্তে দিদিমাকে পেরিয়ে এসে' ঝাঁপ ঠেলে বেরিয়ে পড়ল, দিদিমা তখন অঘোর নিদ্রায়; বালক দিদিমার বাড়ী ছাড়িয়ে, সোজাসুজি—কাঁঠালতলা দিয়ে, মা যে ঘরে অন্তিমের ডাক শুনে চলে গিয়েছে, সেই ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকছে 'মা মা ঝাঁপ খোল'। মা ঝাঁপ খুলবে কেমন করে? কেমন করেই বা বন্ধ করবে, মা'র আর সে হাত নেই। দু চার বার 'মা মা' করে, ডাকতে ডাকতে অভিমানে ছেলের মন ভরে এল, চোখের কোণে এল জল, যেন কত দাবী—"খুলবে না"? জোরে ঝাঁপ ঠেলতেই ঝাঁপ খুলে গেল, বালক নিবিড় আকাঙ্ক্ষায় ঘরে ঢুকে পড়ল, আলো হতে হঠাৎ অন্ধকারে পড়ে আরও অন্ধকার দেখতে লাগল, তাই মায়ের প্রয়োজনটুকু আরও বেড়ে উঠল, বালক ধৈর্য্য হারিয়ে 'মা মা' করে কান্না জুড়ে দিল।

আবার কখনও মনে হচ্ছে, ওই তো মা—ওই আঁধারে। পেছনের আঁধার শুধু আশা তৈরী করছে, সামনের দৃষ্টি তা বারে বারে ভেঙ্গে দিচ্ছে। দিদিমা হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে' দেখে মানুকে ঘরে নেই তাড়াতাড়ি বাইরে আসতেই মানুকের কান্না কাণে গেল, বুকখানা দুরদুর করে এমনি কাঁপতে লাগল! সেই সঙ্গে মনে পড়ল, বউমার অন্তিম করুণ কাতরোক্তি "আমার সব কই"? চোখে পড়ল, দুপুরের পাষাণ-ফাটান রোদ সামনের শুষ্ক ত্বকবিহীন কাঁঠাল গাছটার অস্বাভাবিক দোলন, রুক্ষ বাতাসের অকরুণ ঝাপটা —পরিশ্রান্ত বাজ পাখীটা তবু উড়ে না মুচড়ে-পড়া শুষ্ক ডালে বসে' চোখে চোখে কি চাউনিটাই চাইছে। দিদি চোখমুখ বুজে' ছুটে গিয়ে অভিশপ্ত ঘরখানির ভিতর ঢুকে পড়ল। মাথার ঘোমটা পিঠের উপর নেতিয়ে পড়ছে, চোখে তখনও ঘুমের ঘোর, প্রাণে আতঙ্কের অনাসৃষ্টি। ঘরে ঢুকেই মানুকেকে হাতড়ে বুকে চেপে ধরে সেখান থেকে বেড়িয়ে পড়ল। মানুকে "মা মা" করে কেঁদে উঠল—সে যে ভুল করে আজ মাকে পেয়েছে, তাই তার আনন্দ—তাই অভিমান।

দিদিও বুঝতে পেরেছে মাণিক আজ মা ভুলে দিদিমাকে আঁকড়ে ধরেছে—প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দিদিমার বুকেও মাতৃত্বের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে বালকের ভুলটাকেই সত্যিকারের রূপ দেবার জন্য। ঘরে ফিরে এসে দিদিমা নাতির মুখে-চোখে জল দিয়ে নিরুপায়ের মত মাথায় হাত বুলাচ্ছে—নাতিও ভুল-ভাঙ্গা কান্না কাঁদছে।

আরো দিন দশেক পরে। এক প্রহর বেলাতে ঘাটের ধারে মান্‌কে দিদিমার কোলে চেপে মায়ের উদ্দেশ্যে কুশগাছে জল ঢালছে, দিদিমাও সশব্দে অশ্রু ঢালছে; ঠিক এই সময়েই গঙ্গার চর দিয়ে লখনা হন্ হন্ করে ছুটে আসছে—মাথায় সেই পুঁটুলী। চরের মাঝামাঝি আস্‌তেই লখনার মনে খট্‌কা বাধল, অস্পষ্ট কান্না শুনে। এ কান্না যে মাসীর কান্না—তা বুঝতে পারেনি এবং ছেলেটা যে মান্‌কে তাও চিন্‌তে পারেনি, তবে বিদেশ থেকে আসছে, বউ-এর অসুখ শুনে, তাই মনটা কেমন কেমন করে উঠল। তারপর এপারের কাছাকাছি হতেই মান্‌কে দিদিকে হাত দিয়ে দেখাতে লাগল, বাবা আস্‌ছে এবং মাসীকে টান্‌তে টান্‌তে দু'পা এগিয়েও গেল। লখনা দুঃসংবাদের ভয়ে কোন সংবাদই নিতে পারল না, শুধু চরণ দুখানি এতকাল চলার অভ্যাসে যেন একপা একপা করে' চল্‌তে লাগল। মান্‌কে ছুটতে ছুটতে এসে বাবার কোলে চেপে বারে বারে জিজ্ঞেস্ করছে, "মা কই বাবা"। লখনা কোন কথারই উত্তর দিতে পারল না, চোখে পড়ল গলার উত্তরীয়—মা মরার দিনে এই শ্মশান-ঘাটেই যা গলায় বেঁধে দিয়েছিল। মান্‌কে কোলে চেপে হাত পা ছুঁড়ে নিশ্চল পিতাকে চল্‌তে বল্‌ছে, আর আঙ্গুল দিয়ে নির্দ্দেশ করেছে, ওই চুলাটার দিকে—যেখানে মার মুখে সে নিজে আগুন তুলে দিয়েছে। সে চিতার আগুন লখনার বুকে আজ জ্বলে উঠল।

কর্ম্ম কর, কর্ম্ম কর, দুঃখের নাহি অবসর—

লখনা কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় বাড়ী এসে বউএর জন্য শোকাশ্রু ফেলবার একটি বেলাও সময় পেল না, সজল চক্ষে হারু গোমস্তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল—'বাবু' খাব কি'? বাবুও প্রত্যুত্তরে কাজ দিলেন, 'নতুন বাগানে লিচু গাছগুলোর গোড়ার মাটী আল্‌গা করগে'। হারু গোমস্তার কৃপা এত সহজে পাওয়া যে সম্ভব হয়েছিল—তা শুধু লখনার স্ত্রী-বিয়োগজনিত, করুণ দশার জন্য নয়—লখনা কতদিন নিষ্কাম হয়ে কত কাজ করে দিয়েছে এই হারু গোমস্তার,—আর চাষী মজুরদের দাবী যতখানিই হোক না কেন, তা পূরণ করতে দু' আনার বেশী বেগ পেতে হয় না, অন্ততঃ এখনকার দিনে—এমনি পাড়াগাঁয়ে।

দুপুর বেলা পড়ে গিয়েছে, লখনা তখনও একটির পর একটি লিচু গাছের গোড়ার মাটী আলগা করছে, মান্‌কে একখানা ছেঁড়া গামছার এক প্রান্তে দুটো মুড়ি বেঁধে এনেছে ওর বাপের জন্য—অপর প্রান্ত ছিন্নভিন্ন, নিদাঘ-সূর্য্যের অকরুণ আক্রমণ থেকে মস্তকরূপ দুর্গ কেন্দ্র মরিয়া হয়ে রক্ষা করছে। বাপ রৌদ্রশুষ্ক গাছের গোড়ায় কোদাল চালাচ্ছে ছেলে তারই পাশে একটি ছোট্ট লিচু-তলায় বসে দুটো ঢিল নিয়ে ঠাকুর ঠাকুর খেলতে খেলতে বাপকে তাগাদা দিচ্ছে, 'বাবা খাবে না তুমি?' বাপ ভাবছে, আর তো তিনটে গাছ—সব কাজটা সেরে নিয়ে মুড়ি চিবুতে চিবুতে ছেলের সঙ্গে বাড়ী যাবে;—পড়ন্ত বেলাটা বিশ্রাম।...নিদাঘের প্রবল রৌদ্র, স্ত্রী-শোক, কঠোর কর্ম্ম—চারিদিক থেকে যেন লখনাকে চেপে ধরেছে, জোর করে' কোদাল চালাতে চালাতে কেমন করে একটা চোট—লাগবি ত লাগ, একেবারে পায়ে, বুড়ো আঙ্গুলের নখটা থেঁতো হয়ে নিজের স্বরূপ হারিয়েছে। লখনা চেঁচিয়ে উঠল "জল আন মা-ন্-কে-জল-আন"। মান্‌কে তাড়াতাড়ি জল আন্‌তে আন্‌তে ঘটিটা হাত ফস্কে পড়ে গেল।

লখনা তখন রৌদ্রেই বসে পড়েছে—আবার হাঁকছে, "মান্‌কে-বাপ্-জল-আন" মান্‌কে কি করে' যে একটু জল পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে...তাই নিয়েই বাপের সামনে এসে দাঁড়ায়...অপরাধীর প্রায়। লখনা জল না পেয়ে মান্‌কের গালে ঠাস্ করে বিরাশী দশআনার এক চড় ঝেড়ে দিল। মান্‌কে তো টাল্ খেয়ে জাফ্‌রীর উপর পড়ল—জাফরীর আশ্রয় পেয়েও সামাল দিতে পারল না—মাটীতে লুটিয়ে পড়ল। এতক্ষণে লখনার জ্ঞান ফিরেছে...ঘটির জলটুকু ছেলের মুখে-চোখে ঢেলে দুজনে চোখে চোখে চাইছে, যেন কত স্নেহ, কত আকর্ষণ-দারিদ্র্যের চিতায় পুড়ে পুড়ে ক্ষার হচ্ছে, বাধা দিবার শক্তি নাই!

লখনার পায়ের ঘা এই পনের দিনে এত বেড়েছে যে, চলা-ফেরা ত বন্ধ হয়েছেই তা ছাড়া দুদিন থেকে কি জ্বর! বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে। মাসীর বিশ্বাস কেউ মন্দ করেছে—নজর দিয়েছে, যাই হোক মাসীর যত্নের

ক্রটী নেই। নিজের কুসংস্কার অনুযায়ী মাসী গরুর লেজের চুলে কড়ি গেঁথে লখনার পায়ের কব্জীতে বেঁধে দিয়েছে, যেন ভবিষ্যতে আর কেউ কিছু না করতে পারে। তা ছাড়া গাছ-গাছড়ার ওষুধ তো নিত্যই আছে। তবু বাগ মানে না, লখনা জ্বরের ঘোরে ছটফট করছে—আঙ্গুলের তাড়সে…

পায়ের ডিম পর্য্যন্ত ফুলে গিয়েছে, পায়ের পাতার তো কথাই নেই, পেকে বসে আছে,…কেউ কেউ বললে, সহরের হাঁসপাতালে গিয়ে পা কেটে বাদ দিতে হবে, মাসী ত শুনে শিউরে উঠল, যারা উপদেশ দিতে এসেছিল মাসী তাদেরকে গাল পাড়তে লাগল। তারপর হারু গোমস্তার সঙ্গে রাস্তায় একদিন মাসীর দেখা, গোমস্তা মশাই জাঁকিয়ে বললেন, 'পা কেটে বাদ না দিলে বাঁচবে না যে।'

এ দিকে কালুয়ার মেয়াদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। মাসীও দিন গুনছে, কালুয়া কবে আসবে। কালুয়া এসে যে কিছু করতে পারবে—তা পারবে না, তবু ভাবছে, কালুয়া আসুক, তারপর লখনার যা হয় ব্যবস্থা হবে।…

আর তো অপেক্ষা করা চলে না, লখনার যা অবস্থা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাতে যত শিগ্‌গির একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে, আপশোষে নিজের কাছেই জবাবদিহি হতে হবে।

হাঁসু মণ্ডল যে গরুর গাড়ী নিয়ে আজ সহরে যাবে—কি জানি কি আনতে—এ কথা মাসি জানত, তাই মানুকেকে পাঠিয়ে একটা ব্যবস্থাও করে রেখেছিল।…

লখনা গোঙাতে গোঙাতে, খালি গরুর গাড়ী চেপে হাঁসপাতালে চলল। সঙ্গে মাসী আর একমাত্র পুত্র মাণিক। দরিদ্র পাড়া-পড়শী অনেকেই পথের পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তিন দিন বোনপোর সঙ্গে হাঁসপাতালে কাটিয়ে—সন্ধ্যা লাগে লাগে, মাসী মানুকেকে কোলে নিয়ে বাঁশতলার পথ দিয়ে বাড়ী ঢুকল। সবাই জানত যে, মাসী হাঁসপাতাল হতে আসছে, তবু কারুর সাহস হল না তাকে জিজ্ঞেস করে, "লখনা কেমন আছে ?"

মাসীর উদাস রুক্ষ মূর্ত্তি যে দেখেছে, সেই সন্দেহ করছে লখনার সংবাদ নিশ্চয়ই ভাল নয়। মাসী বাড়ীর বারান্দায় নির্জ্জীবের মত উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ছে। কথা বলবার শক্তি বা ইচ্ছা দুই-ই শিথিল। কথা যদি বলে তা বোঝা যায় না। গলার স্বর ভেঙে গেছে, মানুকে দিদিমার মাথার চুলে হাত দিয়ে, মুখে মুখ লাগিয়ে অবিন্যস্ত ভাবে পাশাপাশি শোবার চেষ্টা করছে। দুলিয়ার মা আস্তে আস্তে গিয়ে পাশে বসল—পেছন পেছন, রাধা, সোনামুখী, কিরণবালা ইত্যাদি ছোট-বড় অনেকেই এল, দুচার জন পুরুষও এসে জুটল।

বোশেখের শেষাশেষি, লিচু বাগানে যোগান পড়েছে। কালুয়া যে বাগানে চুরি করে' জেলে গিয়েছিল, সেই বাগানেরই অপরাংশে সেই পুরাণো মালী বাদুড় তাড়াচ্ছে, টিন বাজিয়ে এবং গলাবাজী করে'। সন্ধ্যাবেলায় এক পসলা বৃষ্টি হওয়াতে—বাদুড়গুলো আজ ঝাঁকে ঝাঁকে হানা দিচ্ছে সুপক্ক লিচুর আশায়। মালী তাই ভাঙা লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে কুঁড়ে ছেড়ে বাইরে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং অনর্থ একটি সম্বন্ধ পাতিয়ে বাদুড়গুলোর উপর নানারূপ স্বর-বিকৃতিতে, নিজের কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিচ্ছে। এমনি সময় হঠাৎ পিছনে খানিকটা দূরে কিসের একটা অস্পষ্ট শব্দ শুনে (বোধ হয় চোর মনে করেছিল) মালী হেঁকে উঠল "কে রে ?" প্রত্যুত্তরে শুধু "আমি" এই কথাটাই শোনা গেল। মালী গলার স্বর চিনতে পেরে মিঠে গলায় বলে উঠল "কে রে কালুয়া ? কবে এলি ?" কালুয়া মালীর কথার উত্তর না দিয়ে উল্টো কত গুলো প্রশ্ন করে বসল। "দাদা কেমন আছে ভাজবৌ, মানুকে, মাসী ?" এক সঙ্গে সকলের কথাই জিজ্ঞেস্ করল। প্রথমতঃ মালী কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল, ভাল মন্দ কোন উত্তরই দিতে পারল না, কালুয়া ততক্ষণ রাস্তা দিয়ে যেতে মালীর কাছাকাছি জায়গায় এসে পড়েছে। এতক্ষণ যেন কালুয়ার কথা শুনতেই পায় নি, বাদুড় নিয়েই ব্যস্ত ছিল এমনি ভাব-ভঙ্গিতে গলার কাশি ঝেড়ে -মালী—কালুয়ার দিকে না তাকিয়েই চট করে বলে ফেলল "সব ভালই আছে" এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদুড়গুলোর উপর জোর খেঁকারী দিয়ে, বাদুড়-তাড়ানোর ব্যস্ততার অছিলায় কালুয়াকে এড়িয়ে গেল। মালী আজ যে কালুয়াকে মিথ্যাকথায় 'সব ভাল আছে

বলে' প্রতারণা করল, সে প্রতারণার হৃদয় সেদিন কোথায় ছিল—সেদিন কালুয়াকে দুখানা আকের জন্য জেলে পাঠিয়েছিল? এদের হৃদয়-আকাশের স্বাভাবিক নীলিমা যে প্রায়ই অস্বাভাবিক মেঘে ঢাকা থাকে!

কালুয়া দুমাস ধরে বন্দী অবস্থায় থেকে শুধু দাদা-ভাইপো-ভাজবৌ-মাসী আর পাড়াপড়শীর ছবিই বসে বসে এঁকেছে। প্রেরণা—মনুষ্যত্বকে বাড়িয়ে তোলার মত কিছুই নেই। আছে শুধু দৈন্যের পাথরে আছাড় খেয়ে চূর্ণ হওয়া করুণ অবসাদ।

কালুয়া দুয়ারে এসে কত আশায় "ভাজবৌ ঝাঁপ খোল" বলে' ঝাঁপে ২।৩ বার আঘাত করল। কোন উত্তর নেই। আবার ডাক দিল, "ঝাঁপ খোল ভাজবৌ", কি যেন অস্পষ্ট ধ্বনি সে শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু ঘরেত কেউ নেই, নিশ্চয় সে ধ্বনি কালুয়ার কল্পনাপ্রসূত। খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে আবার ডাক দিল, "ও গো ঝাঁপ খোল"। পাশের বাড়ী হতে মাসী কালুয়ার গলা চিনতে পেরেছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না জাগ্রত নয়নে যেন অন্ধকার দেখছে, কালুয়ার প্রতিটা কথা শুনে মাসী চমকে চমকে ঘুমন্ত মানুকেকে চেপে ধরছে।

নড়বার শক্তি নেই, পালাতে পারছে না। যেন স্বপ্নের মত—পালাতে গিয়ে পা চলছে না,বালিতে পা বসে যাচ্ছে অথচ ঠিক পেছনেই বাঘ। হঠাৎ বাড়ীর দুয়ারে "এসে কালুয়া" মাসী। বলে ডাক দিল, মানকে ঘুম ভেঙ্গে ঝাঁপ খুলে একেবারে কাকার কোলে কাকার গলা ধরে বলছে, "কাকা! বাবা কই, মা আসবে না?" কালুয়ার মনের প্রশ্ন, "দাদা কই, ভাইবৌ কোথায়?" মানকের প্রশ্ন দুটোতে আর জটিল হয়ে উঠল। এমন সময় মানকের গলার উত্তরীয় চোখে পড়ল, কালুয়া সন্দেহ আতঙ্কের দোদুল দোলায় দুলছে। তবু জিজ্ঞেস করতে পারছে না "কার মৃত্যুতে মানকের গলায় এ উত্তরীয়? দাদা? না বৌদি?" মানকের আশা তখনও যে, কাকা হয়ত বলে দেবে 'মা কোথায়, বাবা কবে আসবে'। তাই কাকার অন্যমনস্ক ভাবটা নিজের প্রশ্নের দিকে আকর্ষণ করছে, কাকার মুখখানা নিজের দিকে দু হাতে টেনে। কালুয়া বিচার করতে পারছে না, কার মৃত্যুটাই বা মন্দের ভাল। মানুকে কাঁদতে লাগল, "কেউ আসবে না" মাসী এতক্ষণ ঘরের কোণে শক্ত হয়ে খুঁটী ধরে বসে ছিল, মানুকের কান্নায় চমক ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ল, "ওরে আমি ডাইনি, নিজের স্বামী-পুত খেয়েছি, তোদের ঘরে এসেছিলাম তোর দাদা-ভাজবৌকে খেয়েছি, আমি মরব না",আরও এমনি ধরণের কত কথা বলতে বলতে লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে দিয়ে চলে গেল। কালুয়া দাদা ভাইবৌ দুজনকে এক সঙ্গে হারিয়ে, মানুকেকে বুকের কাছে পেয়েও বিশ্বাস করতে পারছে না—যে তাকে পেয়েছে, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে।

লহ নমস্কার

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

শতবর্ষ পরে আজি, দূর হ'তে দূর
ধ্বনিতেছে মন্ত্র তব উদাত্ত মধুর
এ বঙ্গের চিত্তভূমে ; দিকে দিকে দিকে
হেরিতেছি আজি এই স্তব্ধ অনিমিখে,—
চলিয়াছে শোভাযাত্রা, কোটি-কণ্ঠরোলে
উদ্বোধিত মাতৃস্তব, কাল-স্রোতে দোলে
জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃমূর্ত্তি অপূর্ণ-শোভনা।
সুজলা, সুফলা, শ্যামা, মত্তা-অতুলনা

হে ঋষি বঙ্কিম, লহ ভক্তি নমস্কার,
ধূপের সুরভিসম প্রাণে যাহা মোর
উৎসারিত রাত্রিদিন, কর আশীর্ব্বাদ
মাতার প্রসন্নদৃষ্টি, অমৃত-প্রসাদ
লভি যেন, যেন লভি চিত্ত ভরি' মোর
সর্ব্বার্থ-সাধিকা মূর্ত্তি দেশ-মাতৃকার।

মাইকেল মধুসূদন

এই সময়ে মধুসূদন বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যে চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁর যে করুণ চিত্র দেখিতে পাই—এমন আর কিছুতে নয়।

২রা জুন, ১৮৬৪।

বন্ধুবর,

তুমি যদি মাত্র সাধারণ লোক হইতে—তবে এত দিনের নিস্তব্ধতার জন্য আজ আমাকে নানা ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তবে পত্রের মুখবন্ধ আরম্ভ করিতে হইত। নিশ্চয়ই জান—অকপট বন্ধু বা শুভানুধ্যায়ী ভিন্ন অন্যের নিকট কেহ তাহার নিতান্ত দুঃসময়ে সাহায্যপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয় না। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে—যে লোক দুই বছর আগে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আকাঙ্ক্ষা লইয়া সমুদ্র-যাত্রার প্রারম্ভে তোমার নিকট বিদায় লইয়াছিল, সে আজ তাহার বন্ধুবান্ধবদের হৃদয়হীন ব্যবহারে—ভগ্ন ও মৃতপ্রায়। সমস্ত ঘটনা একটি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন গল্প মাত্র—তোমাকে গোপনে বলিতেছি।

কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে আমার পত্তনীদার মহাদেব চাট্টার্জ্জির সহিত ব্যবস্থা করি যে—সে পত্তনীর মুনাফা নাসিক ১৫০৲ দেড়শত টাকা হিসাবে আমার স্ত্রীর হাতে দিবে। এই বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণের ভার বন্ধু দিগম্বর মিত্র স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন—এবং সে সময় কিছু টাকা আদায় করিয়া আমি Oriental Bank-এ জমা রাখিয়া আসি। কিন্তু তারপর তাহারা আমার স্ত্রীর সহিত যে রূপ ব্যবহার করিয়াছে তাহা লিখিতে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছে। অবশেষে তাঁহাকে আমার শিশুপুত্রদ্বয় সহ কলিকাতা ত্যাগ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা ১৮৬৩ সালের ২রা মে ইংলণ্ড পৌঁছিয়াছেন, ১৮৬২ সালের প্রথম হইতেই আমার তালুকের পত্তনীর মুনাফা মহাদেব এক আধলা দেয় নাই। শুধু তাই কেন—বন্ধুবর দিগম্বরকে ৮ খানা পত্র লিখিয়াও তাহার জবাব এ পর্য্যন্ত পাইলাম না। তাহার শেষ চিঠি খানা পাই—ঠিক আজ হইতে দশ মাস আগে।

দেশে আমার ন্যায্য পাওনা ৪০০০৲ চারি হাজার টাকা বাকী থাকিতেও আজ আমি অর্থাভাবে ফরাসী জেলের দরজায় এবং আমার স্ত্রী, শিশু পুত্রসহ অনাথ-আশ্রমে যাইতে বসিয়াছে। গ্রেজ-ইন্ হইতে ৪৫০৲ টাকা ধার করার জন্য কর্তৃপক্ষ আমাকে suspend করিয়াছেন। এ বছরের তৃতীয় term চলিয়া গেল, কিন্তু, আমার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অপর একটি বন্ধু আমার নিকট ২৫০৲ টাকা পায়, সে বেচারার টাকার খুবই দরকার, কিন্তু, আমি নিরুপায়।

বন্ধুদের ব্যবহারে যে অবস্থায় আমি পড়িয়াছি—তাহাতে একমাত্র তোমার দয়া ও প্রতিভার কণামাত্র ভিন্ন কোনরূপে আর কেহ আমাকে উদ্ধার করিতে পারিবে না—ইহা নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু বন্ধু, এক মুহূর্ত্ত বৃথা ব্যয় ক'রও না।

কলিকাতায় আমার যে জমিদারী আছে—তাহার আয় বাৎসরিক ১৫০০৲ দেড় হাজার টাকা। নিশ্চয়ই জান যে—ঐ সম্পত্তি-ঘটিত সব মামলা-মোকদ্দমা মিটিয়া গিয়াছে—এবং আমার সত্ত্ব কায়েম হইয়াছে। বাবু দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র আমার কলিকাতার আমমোক্তার। তুমি ঐ জমিদারী সম্পত্তি তথাকার Land Mortgage Society-তে যদি বন্ধক রাখ তবে ১৫০০০৲ পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত পাইতে পার। আবশ্যকীয় দলিল-পত্র তাঁহাদের নিকটেই পাইবে—ইহা খুবই প্রয়োজনীয় জানিও। কিন্তু জানিও আমি সুদূর বিদেশে এবং সম্পূর্ণ সম্বলশূন্য, তাই পত্র প্রাপ্তি-মাত্র কিছু টাকা পাঠাইবে যাহাতে এখানে আমরা অসহায়ে না পড়ি।

দেশে আমার কয়েকজন মহাজন আছেন—এবং তাঁহারা সকলেই আমার বন্ধুস্থানীয়। তুমি ঐ টাকা হইতে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু দিও। আশা করি, তাঁহারা উহাতেই—আমার দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত, সময় দেবেন। অবশিষ্ট ১১০০০৲ টাকা আমাকে কিস্তিবন্দী করিয়া ৬ মাস অন্তর পাঠাইবে। ইহাতেই ভরসা করি, পাঠ সমাপ্ত করিয়া মাতৃভূমিতে ব্যারিষ্টার

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার পরিণতি

ওয়ার্দ্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিশুদিগের হাতে-কলমে শিক্ষা দিবার যে-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে শিশুরাই একদিন বড় বড় কল-কারখানার শ্রমিকের কার্য্য করিতে পারিবে।

হইয়া ফিরিতে সক্ষম হইব। যদি বন্ধু কার্য্যটি শীঘ্র সমাধা না করিতে পার তবে জানিও আমাদের অনাহারে মৃত্যু সুনিশ্চিত।

আশা করি, তোমার মহানুভবতা নিশ্চয়ই—আমাদের বিদেশে অনাহারে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করিবে। উপরের ঠিকানায় পত্র দিও, কারণ—উপরে স্বয়ং ভগবান এবং তাহার নীচেই একমাত্র তুমি ভিন্ন আর কেহ আমাদের এই ফ্রান্স ত্যাগ করাইতে অক্ষম। আজ আর লিখিবার মত মনের অবস্থা নয়। বিদায়।

ইতি—

তোমার চিরবিশ্বাসী

... ...

৯ই জুন, ১৮৬৪।

বন্ধুবর,

আশা করি, আমার ২রা জুন তারিখের লিখিত পত্রখণ্ড এতদিনে তোমার হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দিগম্বরকে আবার পত্র দেই—তাহার পত্রের উত্তর পাইব'র আশায় থাকিয়া এবারও হতাশ হইলাম। এতদিন দিগম্বরকে সহৃদয়, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতাম। কিন্তু, দুঃখের মধ্যে চিনিতে পারিয়াছি—বড়লোকের বন্ধুত্বের মূল্য কত অন্তঃসারশূন্য, ন্যায়-নিষ্ঠা কতই অসার, সহৃদয়তা—হৃদয়হীনতায় পরিণত হইতে কত অল্প সময় লাগে। আমার মত দরিদ্রের পক্ষে তাহার কিছুই প্রতিকার করা অসম্ভব,—কিন্তু হে স্পষ্টবাদী বিদ্যাসাগর! বল, সে তাহার নিজের বিবেককে কি বলিয়া বোঝাইবে?

জানিয়া সুখী হইবে যে, একটি তরুণী ফরাসী মহিলার সহিত আমার আলাপ হইয়াছে। সেই মহীয়সী ভদ্রমহিলা আমাকে নানাভাবে অর্থ, পরামর্শ দিয়া, কতটা রক্ষা করিয়াছেন—তাহা এই ক্ষুদ্র পত্রে লিখা যায় না। তাঁহারই কৃপায় এই জুন মাস পর্য্যন্ত এই বাসায় থাকিবার অনুমতি পাইয়াছি—নচেৎ, এতদিনে নিশ্চয় ফরাসী কারাকক্ষে আমার স্থান হইত। ক্ষুধার পীড়নে এখানে কয়েকটি বন্ধুদের নিকট ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছে—আসবাব-পত্র—এমন কি, স্ত্রীর অলঙ্কার পর্য্যন্ত বহুদিন বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু বন্ধু, আরও বড় বিপদ্ অপেক্ষা করিতেছে। সম্ভবতঃ, আগামী মাসের প্রথমেই আমার স্ত্রী প্রসব করিবেন।

পত্তনীদার মহাদেব সরল লোক নহে। তাহার নিকট ১৮৬১ সালের বকেয়া খাজনা ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বাকী। দিগম্বরকে বলিবে, যেন বকেয়া সাকুল্য টাকার উপর শতকরা ১২৲ হিসাবে সুদ আদায় করে।

আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমার বিষয়ে আগ্রহ লইবে। কারণ, কেহ কোন বিপদে পড়িয়া তোমার নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে—তাহা তো শুনি নাই। জানি কু-লোকে তোমার পথে নানা বাধা সৃষ্টি করিবে—কিন্তু বিশ্বাস করি, হে অপরাজেয় বন্ধু! তুমি সবাসাচীর মত—আমার জন্য একা হীনমতি মহাদেব এবং অন্যান্য চক্রান্তকারীদের সহিত যুদ্ধ করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবে না এবং জয় তো তোমার ললাট-লিখন। এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ে আমার প্রবাসকাল এক বৎসর বাড়িয়া যাইবে। মনে আশা, এই বৎসর মধ্যেই আমার ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিয়া দেশে ফিরিব। দুই বছর মাত্র কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছি—কিন্তু তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, এমন কষ্ট ও অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িব! কলিকাতাবাসী আমার নামে নানা মিথ্যা কথা তোমাকে লাগাইবে। কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিও না বন্ধু!—এই আমার মিনতি।

বন্ধকী ব্যাপার শেষ করিলে, মহাদেব চাট্টার্জ্জির নিকট হইতে বাকী পড়া টাকার সুদ বা ক্ষতিপূরণ নিশ্চয়ই আদায় করিও। একমাত্র তাহার গাফিলতিতেই আজ আমার এই দুর্দ্দশা। ইহা আমার দ্বিতীয় পত্র। আরও দুইখানা এই বিষয়েই তোমাকে এই মাসের শেষের দিকে লিখিব। জানি, তুমিই আমার এই বিপদে একমাত্র অকপট বন্ধু।

শুনিয়া সুখী হইবে যে, এই দুশ্চিন্তা ও বিড়ম্বনার মধ্যেও আমি ফরাসী ভাষা প্রায় শিক্ষা করিয়াছি। আমি এখন ফরাসী ভালই বলিতে পারি এবং লিখিতে আরও ভাল পারি। ইতালীয় ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছি। স্পেনিশ ও পোর্তুগীজ ভাষা না শিখিতে পারিলেও, য়ুরোপ ত্যাগের পূর্ব্বে জার্ম্মান ভাষা নিশ্চয় শিখিয়া যাইব।

ফরাসীরা সাধারণতঃ বিদেশী ভাষা পছন্দ করে না—অথচ সংস্কৃত ভাষা জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিও এই

ছোট সহরেও ৬৭ জন আছেন। এখানে আমি সংস্কৃত ভাষার একখানা চমৎকার ব্যাকরণ দেখিয়াছি। এবং তাহার লেখক কিন্তু একজন ফরাসী। একজন ব্যক্তির সহিত আমার এখানে আলাপ হইয়াছিল—যিনি মনু-সংহিতা বিশেষ যত্নের সহিত পড়িয়াছেন।

এইরূপ অর্থাভাব—দুর্ভাবনার মধ্যে আমার মনের ঠিক নাই; নচেৎ, তোমাকে এই বিষয়ে বহু খবর পাঠাইতাম। আজ এই পর্য্যন্ত। ইতি—

তোমার চিরস্নেহাস্পদ

... ...

১৮ই জুন ১৮৬৪।

সুহৃদ্বরেষু,

আজ তোমাকে আমি তৃতীয় পত্র লিখিতেছি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্র তোমাকে লিখিয়া মনে ক্ষীণ আশা পোষণ করিতাম যে, হয়ত—ইতিমধ্যে দিগম্বর বা মহাদেবের প্রেরিত টাকা ও পত্র পাইব। আজ ডাকবার—আজ আবার হতাশ হইলাম। অর্থাভাবে অবশেষে এক ইংরাজ পাদ্রীর নিকট আজ হাত পাতিতে হইয়াছে। পাদ্রী মহাশয় তাঁহাদের 'দরিদ্রভাণ্ডার' থেকে অনেক বদান্যতা দেখাইয়া শেষে মাত্র ৯৲ নয় টাকা ধার দিলেন। দেশে যথেষ্ট টাকা পাওনা থাকিতে এবং জমিদারী থাকিতে—আজ আমি বিদেশে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করিতেছি। জানি না—সেই কুচক্রিগণ ভগবানের নিকট কি জবাবদিহি করিবে। যদি আমার সহিত আমার স্ত্রী এবং হতভাগ্য শিশুগণ না থাকিত—তবে জীবনের সব জ্বালা—অর্থকষ্ট—এই দৈন্য, সব এক নিমেষে চুকাইয়া দিতাম। কিন্তু, বন্ধু, বিধি তাহে বাম। অর্থকৃচ্ছ্রতা দুর্ব্বল মানুষের জীবনে মানসিক দৈন্য আনিয়া দেয়, এবং ইহাতেই তাহার অধঃপতন হয়। এই অসম্ভব দীনতার মধ্যেও আজও আমি কেবলমাত্র—আমার সবল হৃদয়ের কৃপায় খাড়া আছি। অন্য কেহ হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, এতদিন একটা শেষ কিছু করিয়া ফেলিত।

ইতিপূর্ব্বে দুইখানা পত্রেই আমার আর্থিক অবস্থা বিশেষরূপে লিখিয়াছি। সেই পত্রগুলি নিশ্চয় তোমার হস্তগত হইয়াছে—এবং এই পত্রখানা সুদূর প্রাচ্যে তোমার হাতে পৌঁছাইবার আগেই—তোমার প্রেরিত টাকা পাইব। এবারের মত আর পরীক্ষা দেওয়া ঘটিয়া উঠিল না। কলেজ গতকল্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে—আবার সেই ২রা নভেম্বর খুলিবে। দেখ, বন্ধু, গত তিনবারের মত এ Termও যেন আমার বৃথা না যায়। এই পত্রখানাতে হতাশার সুর—প্রতি ছত্রে ছত্রে পাইবে। কিন্তু বন্ধু, এই প্রবাসীর অর্থকষ্ট স্মরণ করিয়া আশা করি—তাহা ক্ষমা করিবে। তোমার পত্র এবং টাকা যেন শীঘ্র পাই—নচেৎ দেশে গিয়া তোমার 'করুণা-সাগর' নাম প্রচার করিতে পারিব না। আজ আর বেশী কিছু লিখিব না, মানসিক অবস্থা একেবারে শেষ পর্দ্দায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। ইতি—

তোমারই—হতভাগ্য বন্ধু।

৪ঠা জুলাই, ১৮৬৪।

বন্ধুবর,

তোমাকে পত্র দেওয়ার পরে—সেদিন দিগম্বরের পত্র ও তাহার প্রেরিত ৮০০৲ মাত্র আটশত টাকা পাইলাম। মরুভূমিতে—জলবিন্দু সিঞ্চন ভিন্ন ইহাকে আর কি বলিব। আশা করি, এই খবর জানিয়া—তুমি যেন তোমাকে অর্পিত কার্য্যগুলির দায় হতে বাঁচিয়া গেলে—মনে না কর। কারণ সম্ভবতঃ তোমার তাড়নায় দিগম্বর এই সামান্য টাকা পাঠাইয়াছে—কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি নিশ্চিন্ত হইবে—সেই মুহূর্ত্তে সেও আবার সুখ-নিদ্রা আরম্ভ করিবে। তুমি উঁহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবে যে, আমার কত টাকা উঁহাদের নিকট প্রাপ্য। দেখিবে—আমি যাহা লিখিয়াছি—তাহার এক বিন্দুও মিথ্যা নয়। কলিকাতার Land Mortgage Societyতে আমার সম্পত্তি বন্ধক রাখার কথা লিখিয়াছি—তাহা শতকরা ৮৲ টাকা এমন কি ৯৲ টাকা হইলেও রাখিতে ইতস্ততঃ করিবে না। হুকুম চাও! কিন্তু তোমাকে কি আমি হুকুম করিতে পারি! যাহা তুমি করিবে—তাহাতেই আমার পূর্ণ সম্মতি।

হে করুণাসাগর, তুমি যদি আমাকে টাকা না পাঠাও—তবে আমার সামনের নভেম্বরে ইংলণ্ডে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এবং আমার চির-ঈপ্সিত—ব্যারিষ্টারী পাশ করাও হয়ত চিরতরেই শেষ হইয়া যাইবে। কলিকাতায় যদি কেহ আমার বিষয় বলে—তাহা বিশ্বাস করিও না, বন্ধু। এই পত্রখানা অতি ক্ষুদ্র হইল—কিন্তু পূর্ব্বের পত্রগুলিতে

সমস্ত সবিস্তারে লিখিয়াছি, সেইজন্যই আজ আর কিছু লিখিলাম না। আজ এই বিদায়ের কালে তোমাকে একটা কথা লিখি। হয়ত ভাবিতে পার, ধনী দিগম্বরের উপর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কেন আর বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। জানত বন্ধু, বাংলাতে একটা প্রবাদ আছে—"ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখলেই চম্‌কে যায়।" আজ আমার ঠিক সেই দশা। এই দীর্ঘদিন ধরিয়া মহাদেব ও দিগম্বর উভয়ে মহাভারতের অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের মত আমার জীবনে 'খাণ্ডবদাহ' করিয়াছে। বন্ধু, জান না—সেই দাহের কী অন্তিমকালে এক মহাপুরুষের নাম আবিষ্কার করিয়াছিলাম। ইহা পৃথিবীর অন্য কোন আবিষ্কার হইতে একবিন্দু কম নয়। সেই নাম উচ্চারণের সাথে সাথেই যেন আমার দুঃখ যন্ত্রণার অর্দ্ধেক কমিয়া গেল। বিদ্যাসাগর—করুণাসাগর—আহা কি প্রাণজুড়ান নাম। আর আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি—যে আমার সমস্ত দুঃখ-কষ্ট দূর করিবার জন্য এক বিশাল বলশালী করুণাময় হৃদয় এখন হইতে সুদূর কলিকাতা সহরে মাতৃস্নেহে সর্ব্বদা শঙ্কিত অবস্থায় জাগ্রত রহিয়াছে। আজ হইতে আমি নিশ্চিন্ত। আজ আমি সত্যই সুখী বন্ধু। বিদায়—

তোমার, প্রীতিমুগ্ধ

... ...

১১ই জুলাই, ১৮৬৬।

বন্ধু,

আশা করি, এত দিনে আমার সব চিঠিগুলি পাইয়াছ এবং আমার উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছ। অক্টোবর মাসে আমাকে আইন পাঠ শেষ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাইতে হইবে। সে জন্য বহু টাকার প্রয়োজন—দিগম্বরকেও লিখিয়াছি, বোধ হয় সে তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। মহাদেবের নিকট যত টাকা পাওনা সাব্যস্ত হয়—সব আদায় করিয়া লইবে।

তুমি হয়ত শুনে সুখী হইবে যে, সত্যেন এবারে I. C. S. পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে এবং সে কিছুদিন মধ্যেই দেশে ফিরিবে। বেচারা মনোমোহন! আবার সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—আমার মনে হয় না যে, সে পাশ করিতে পারিবে। প্রথমে আমার ধারণা ছিল—সত্যেন ঠাকুরের চেয়ে মনোমোহন ভাল ছেলে—কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

আমরা ইচ্ছা—য়ুরোপ ত্যাগের পূর্ব্বে য়ুরোপীয় ভাষায় আমি বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করি। আমি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছি—শীঘ্রই জার্ম্মান ভাষা আরম্ভ করিব। ল্যাটীন, ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা শিখিবার পরে—স্পেনের ভাষা ও পর্ত্তুগীজ ভাষা শেখা কঠিন হইবে না। ল্যাটীন ভাষায় যে কি সুন্দর কবিতা আছে—তাহা তুমি কল্পনা করিতে পারিবে না। সুকবি Tasso-কে তুমি য়ুরোপের কালিদাস বলিতে পার। সত্যেনকে আমি একখানা বড়চিঠি ইতালীয় ভাষায় লিখিয়াছিলাম—আশা করিয়াছিলাম যে, সে ইতালী ভাষায় উত্তর দিবে। সে ত গত বৎসর এখানে কিছু ইতালীয় ভাষা শিখিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, সে উত্তর দিল ইংরাজিতে।

আশা করি, কুশলেই আছ। আজ বিদায়—

তোমার চিরবন্ধু,—

২রা আগষ্ট, ১৮৬১।

হে বন্ধু,

জানি, এখনও তোমার উত্তর পাওয়ার সময় হয় নাই। কিন্তু তবুও আবার আজ তোমাকে আর একখানা চিঠি লিখিতে বসিয়াছি। তোমাকে যে বার বার পত্রাঘাত করিয়া বিরক্ত করিতেছি—আশা করি, সে জন্য তুমি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবে না। আমার মানসিক অবস্থা কি, তোমার অনবগত নাই। বিদেশে স্ত্রী-সন্তানে পরিবৃত অবস্থায় অর্থহীন না হইলে কেহ আমার অবস্থা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তোমাকে সেই 'কেহ'র মধ্যে ধরি না এবং এই জন্যই পর পর তোমাকে বিরক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইনি। কুক্রো মহাদেব চাটুর্য্যের দলে বৈদ্যনাথ মিত্র নিশ্চয়ই যোগ দিয়াছে—তাহা আমি এখানে বসিয়া বুঝিতেছি। কিন্তু দিগম্বর? না, দিগম্বরকে ত অত নীচ বলিয়া জানিতাম না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে কখনও ঐ চক্রান্তে যোগ দেয় নাই। দিগম্বর সেই ৮০০৲ আটশত টাকার সহিত যে পত্রখানা লিখিয়াছিল তাহাতে ছিল—শীঘ্রই এক মাস মধ্যে আরও হাজার টাকা পাঠাইতেছে। দিনে দিনে বহুদিন অতীত হইল—কিন্তু আর কোন সংবাদ বা টাকা পাইলাম না। আবার আমি ধারে ধারে দেনায় ডুবিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই তাহাদের ব্যবহার, এই তাহাদের টাকা পাঠানোর ধরণ! যেন নিজের টাকা তাহারা আমাকে পাঠাইতেছে। সম্ভবতঃ এখন ২।৩ মাস তাহারা আর কোন পত্র দিবে না। এখানে আমার ১৭।১৮ শত টাকা দেনা দাঁড়াইয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বৈদ্যনাথ আমাকে লিখে যে, আলিপুর কোর্টে আমার ১০০০৲ হাজার টাকা ডিপজিট রহিয়াছে। আমি তাহাকে তখনই ঐ টাকা অতি শীঘ্র পাঠাইয়া দিতে লিখি। কিন্তু, হায়, এই আগষ্ট মাস আসিল—এ পর্য্যন্ত না টাকা, না

তাহার একখানা উত্তর, কিছুই পাইলাম না। খিদিরপুরের হরি ব্যানার্জ্জির নিকট আমার ৫০০৲ পাঁচশত টাকা পাওনা কিন্তু কিছুই দিল না। দেখ বন্ধু—আমার প্রতি বন্ধুবর্গের ব্যবহার! তাহারা হয় ত মনে ঠিক করিয়াছে যে অনাহারে বিদেশে আমার যদি মৃত্যু হয়—তবে ঐ সব দেনা হইতে তাহারা বাঁচিয়া যাইবে। বিদ্যাসাগর তুমি আমাদের প্রাণ রক্ষা করিও—যেন এই সব ব্যবহারের প্রতীকারের জন্য আবার তাহাদের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, করুণাসাগরের নিকট হইতে প্রত্যাখ্যাত হইব না। কেহ কোন দিন তোমার নিকট সাহায্য না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে ইহা কি কেহ শুনিয়াছে? কিন্তু বন্ধু—অসম্ভবও সম্ভব হয়। যদি তোমার নিকটও সাহায্য না পাই, তবে—তবে কি করিব জান; যে প্রকারেই হউক দেশে ফিরিব—এবং ঐ দুটি লোককে স্বেচ্ছায়—সুনিশ্চিত খুন করিয়া নিজেও ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিব।

ইহা হইতেই আমার মানসিক অবস্থা তুমি বুঝিতে পারিবে। আর কোন পথ খোলা দেখি না—একমাত্র তুমি ভিন্ন। তাইত বন্ধু, তোমার দুয়ারে বারে বারে আঘাত করিতেছি—জানি যে বিফল হইব না। শরীর, মন খুবই খারাপ। আজ বিদায় বন্ধু।

ইতি।

১৮ই আগষ্ট, ১৮৬৪।

সুহৃদ্বরেষু,

আমি যে ভাবে তোমাকে চিঠির পর চিঠি লিখিতেছি—ভয় হয় পাছে, তুমি অসন্তুষ্ট হও। এ ছাড়া আর কি করিতে পারি! এবং অসময়ে তুমি ভিন্ন আর আমার দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? রাগ করিবে? কিন্তু আমি তোমার সে রাগকে ভয় করি না। যখন শয়তান মহাদেবদের কুচক্রে পড়িয়া দৈন্যের স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি—তখন একমাত্র করুণাসাগর ছাড়া আর ভরসা কোথায়? কে এমন নির্ব্বোধ আছে, আমার মত হীন অবস্থায়, বিদ্যাসাগরের নিকট, বাংলার সেই দানশীল বিরাট পুরুষের নিকট, সাহায্যের জন্য, অর্থের জন্য, হস্ত প্রসারণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র দ্বিধা করিবে?

আমি নির্ব্বোধ, নচেৎ কি দিগম্বরের ২০শে মে তারিখের স্তোক পত্র পড়িয়া তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিতাম না! তা না হইলে আজ একটা প্রতিবিধান করিয়া উঠিতাম। তার চিঠির উপর নির্ভর করিয়া আরও বেশী দেনাতে এখানে ডুবিতেছি। আজ তোমাকে চিঠি লেখার টিকিটটি পর্য্যন্ত বন্ধকী দোকান হইতে ধার করিয়া তবে লিখিতেছি। বন্ধুদের নিকট হইতে কেহ কি কোনদিন এমন জঘন্য ব্যবহার পাইয়াছে? এখন আমি একমাত্র তোমার দয়ার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছি।

বেচারা মনোমোহন এবারও ফেল করিয়াছে। আমার মনে হয়—গ্রীক্‌ ও ল্যাটীন ভাষায় তাহার অধিকার কম থাকাতেই সে বার বার ফেল করিতেছে। তাহার অকৃতকার্য্যতা নিশ্চয়ই দেশের পরীক্ষার্থীদের দমাইয়া দিবে না। আমার ধারণা, দেশী যুবকদের ১২।১৪ বৎসর বয়সেই য়ুরোপে শিক্ষার জন্য পাঠান উচিত, তাহাতে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষাটা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইটা আমাদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় মনে হয়।

সম্ভবতঃ, মনোমোহন এখন ব্যারিষ্টারী পাশ করিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু সে কেমন ইংরাজী জানে? সে কি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া জজ ও জুরীর কাণে তাহার বক্তব্য ঠিক সরলভাবে—অপর পক্ষের নানা বাধা সত্ত্বেও প্রবেশ করাইতে পারিবে? কি মনে হয়? গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষাজ্ঞান ও শিক্ষা বেশী আছে বটে, কিন্তু সেও মনে হয়, কোর্টে বক্তৃতা করিতে পারিবে না।

মনোমোহনের জন্য আমি সত্যিই খুব দুঃখিত। তাহাকে পত্র দিয়াছি যে, সে যেন আমার নিকট এখানে আসিয়া কিছুদিন থাকিয়া ইতালীয় ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে।

তুমিও বন্ধু, যদি আমাদের পরিত্যাগ কর—তবে আর ফরাসী জেল ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নাই ইহা নিশ্চয়ই জানিও। এখন ব্যারিষ্টারীর দুরাশা ত্যাগ করিয়া জেলের চিন্তা করিতে হয়।

আমার স্ত্রীর এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, নিশ্চয় তুমি এতদিন চুপ করিয়া বসিয়া নাই। তোমার প্রেরিত অর্থ ও পত্র আমাদের জন্য ভারতবর্ষ হইতে রওনা হইয়াছে, শীঘ্রই তাহা পাইব। যদি না পাঠাইয়া থাক—তবে পাঠাইতে কালমাত্র বিলম্ব করিও না। কারণ, এখন আমাদের চারিটি হতভাগ্যের জীবন-মরণ তোমার হাতে নির্ভর করিতেছে।

তোমাকে একটা কথা জানাইয়া রাখি যে, ফরাসী দেশের পুলিশের ব্যবস্থা অতি কড়া ও তাহারা সুচতুর—তাই দেশে চোর-বাটপাড়ের উপদ্রব খুব কম। এখানে রেজিষ্টারী চিঠিতে টাকা পাঠান মোটেই আশঙ্কাজনক নয়।

আজ এই পর্য্যন্ত বন্ধু। বিদায়।

ইতি—তোমার চিরবিশ্বাসী

... ...

চতুরঙ্গ ক্রীড়ায় নীতি-শিক্ষা

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বঙ্গশ্রী পত্রিকার ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ লিখিত "দাবা খেলার ইতিহাস" মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রবন্ধ-লেখক সম্পাদিত "চতুরঙ্গ-দীপিকা"* নামক গ্রন্থের ভূমিকায়ও দাবা খেলার ইতিহাস দেওয়া আছে। গৃহাশ্রয়ী (indoor) খেলাসমূহের মধ্যে দাবা খেলা অতি প্রাচীন। দাবা বা চতুরঙ্গ খেলার উল্লেখ সংস্কৃত ও পালী সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁহার একটি প্রবন্ধে চতুরঙ্গ ক্রীড়ার ইতিহাস সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়া উক্ত ক্রীড়ার দ্বারা জনসাধারণ কিরূপ নীতি-শিক্ষা লাভ করিতে পারেন তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এডুকেশন গেজেট পত্রিকার ১৩ই চৈত্র ১২৬৫ বঙ্গাব্দের সংখ্যাতে [২৫।৩।১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে] ডাক্তার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন লিখিত উক্ত প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ডাঃ টমাস হাইড্, স্যর উইলিয়াম জোন্স্, ক্যাপ্টেন কক্স, ডনকান্ ফরবেস্ প্রভৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের অনুরূপ ডাঃ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনেরও অনুমান এই যে, ভারতবর্ষই দাবার জন্মভূমি এবং ভারতবর্ষ হইতে সমগ্র পৃথিবীতে ইহা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

পারস্য দেশীয় "শতরঞ্চ", পহ্লবী "চত্রঙ্গ" ব্রহ্মভাষায় "সিত্তুয়িন" আনাম প্রদেশের "ছোএনএাঙ্গ" মালয় অঞ্চলের "চাতের" প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত "চতুরঙ্গ" শব্দের সহিত সম্পর্কিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কোন কোন ভাষাতত্ত্ব-বিদের মতে ইংরাজী "চেস্" শব্দও নাকি "চতুরঙ্গ" শব্দের গৌণ অপভ্রংশ মাত্র।

দাবা বা চতুরঙ্গ খেলার ইতিহাস-রসিকদের নিকট ডাঃ ফ্রাঙ্কলিনের প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনে আসিতে পারে মনে করিয়া নিম্নে তাহা যথাযথ উদ্ধৃত হইল :—

এডুকেশন গেজেট ১৩ই চৈত্র ১২৬৫ [২৫।১৮৫৯ ইং]

জ্ঞানী-বিশেষের বাক্য এই "তৃণ হইতেও মধু সংগৃহীতব্য।" বস্তুতঃ ধরাতলে এমং কোন বিষয় বা পদার্থ নাই যাহার পর্য্যালোচনায় মনুষ্যের জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে পারে না। অতএব এতৎ প্রবন্ধের শিরোভূষণ পাঠে পাঠক মহাশয়েরা সহসা কৈতব রসে আচ্ছন্ন না হন, ক্রীড়াচ্ছলেও নীতি-লাভের সম্ভাবনা আছে। চতুরঙ্গে নীতি লাভের বিষয়, ডাক্তার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন নামক জ্ঞানীপ্রবরের প্রবন্ধমালা মধ্যে গ্রথিত আছে আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ গ্রহণ করিতেছি।

চতুরঙ্গ অর্থাৎ শতরঞ্চ অতি প্রাচীন খেলা, শতরঞ্চ শব্দ সংস্কৃত চতুরঙ্গ হইতে নির্গত হইয়াছে, সংস্কৃত শব্দের এরূপ উচ্চারণ-বিকার প্রাচীন আরব্যাদি দেশীয়েরা করিতেন, তাহার ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, অতএব চতুরঙ্গ খেলার সৃষ্টি যে ভারতবর্ষে হয় তাহা এক প্রকার সিদ্ধ হইয়াছে; কোন কোন ভাষাজ্ঞ, ইংরাজি "চেস্" শব্দকেও চতুরঙ্গ শব্দের গৌণ অপভ্রংশ নিরূপণ করিয়াছেন। ইউরোপে এই খেলা সহস্র বৎসরাধিক প্রচলিত হইয়াছে। চতুরঙ্গ ক্রীড়া স্বয়ং এরূপ বিনোদ-দায়িনী, যে তৎপ্রতি চিত্তচালনায় দ্যূতাদি ক্রীড়ার ন্যায় আর্থিক পণ নিরূপণের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং এ খেলা দোষবিহীনা অথচ জিত পরাজিত উভয় ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ উপকারিণী, তাহা নিম্নভাগে সংস্থাপন করা যাইতেছে।

চতুরঙ্গ খেলা কেবল আলস্যত্যাগের উপায় নহে। সংসার ধর্ম্মে অতীব প্রয়োজনীয় অথচ উপকারি কোন কোন মানসিক গুণ এতদ্বারা উপার্জ্জিত এবং দৃঢ়ীভূত হইতে পারে, সেই সকল গুণ অভ্যস্ত হইলে সর্ব্ব সময়ে উপকারে আসিয়া থাকে। প্রত্যুত, মনুষ্য জীবন এক প্রকার চতুরঙ্গ খেলা, যেহেতু তাহাতে অনেক লভিতব্য লক্ষ্য আছে, অনেক প্রতিযোগির সহিত বিরোধের প্রয়োজন আছে, আর তাহাতে সাবধানতা এবং অসাবধানতা প্রযুক্ত ভূরি ভূরি মঙ্গলামঙ্গলের সংঘটনা হইয়া থাকে; চতুরঙ্গ খেলায় আমরা নিম্নলিখিত গুণাবলী লব্ধ হইতে পারি।

প্রথম পরিণামদর্শিতা। এতদ্বারা কোন্ কার্য্যের কি ফল

* কলিকাতা সংস্কৃত গ্রন্থমালা—নং ২৪।

হইবে তাহার কিয়ৎ ভাবি-জ্ঞান লাভ করিতে পারি ; কেননা ক্রীড়কের মনে প্রতিনিয়ত ইহাই উদয় হইতে থাকে যে "যদ্যপি আমি এই বল চালি, তবে আমার অভিনব পদে কি ফল লাভ হইবে ? আর আমার অপায় কল্পে প্রতিযোগীই বা কি পন্থা পাইতে পারে ? আর প্রতিযোগীর অনিষ্ট চেষ্টা হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ও স্বীয় পদ দৃঢ়ীভূত করণার্থ কি কি চালি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ?"

দ্বিতীয় সমীক্ষকারিতা, এই গুণ দ্বারা চতুরঙ্গ পট্টের সমুদায়াংশে বিশেষতঃ ক্রীড়াস্থলের প্রতি নেত্রপাত থাকে ; প্রত্যেক বলের পর পর কি সম্বন্ধ এবং তাহাদিগের অবস্থাই বা কি প্রকার, কি কি অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে, প্রতিযোগী কোন্ চালি চালিবেক তাহার নিশ্চয়তা এবং তদ্দারা আমার কোন্ বল আক্রান্ত হইতে পারে, ও তদাক্রমণ নিবারণের কি কি উপায় আছে, আর তাহার মন্দ ফল প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে ফলিতে পারে কিনা, এতাবৎ সমীক্ষিত হয়।

তৃতীয় সাবধানতা। এতদ্দারা সহসা অথবা ঝটিতি কোন চালি চালা অকর্ত্তব্য তাহা বিবেচিত হয়। ক্রীড়াঘটিত নিয়মাবলী যথা ন্যায়ে পালিত করিলে এই অভ্যাস জন্মিয়া থাকে, যথা "আমি যদি বল স্পর্শ করিয়া থাকি তবে স্থানান্তরে তাহাকে অবশ্যই বসাইব ; আর যদি বসাইয়া থাকি, তবে তাহার পদ যাহাতে অবিচলিত থাকে তাহার উপায়ানুসন্ধান করিব," এ নিমিত্ত নিয়মের পরিপালন অতি কর্ত্তব্য। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই ক্রীড়া সাধারণতঃ মনুষ্য জীবনের এবং বিশেষতঃ বিগ্রহ ব্যাপারের প্রতিকৃতি স্বরূপ, অর্থাৎ তাহাতে যদ্যপি তুমি অসাবধানতা প্রযুক্ত বিপত্তিপূর্ণ স্থানে যাইয়া দাঁড়াও, তবে তুমি স্বীয় সৈন্যদিগকে ফিরাইয়া আনিয়া উত্তম স্থানে স্থাপিত করণার্থ প্রতিযোগীর স্থানে অনুমতি প্রার্থনা করিতে পার না, অগত্যা তোমাকে তোমার দুঃসাহস এবং অনবধানতার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবেক।

চতুর্থ, চতুরঙ্গ দ্বারা আমাদিগের এই এক অভ্যাস জন্মে, আমাদিগের উপস্থিত অবস্থায় কোন অশুভ লক্ষণ দৃষ্টে আমরা একেবারে নিরাশ্বাস হই না, সময়ানুসারে ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকি, অবস্থাশোধনের নিমিত্ত উপায়ানুসন্ধানে আগ্রহাতিশয় জন্মে। এই খেলা এরূপ নানা ঘটনাপূর্ণ, ইহাতে এত ভিন্ন ভিন্ন চালি এবং সহসা অবস্থায় বিপর্যয় হইবার সম্ভাবনা আছে, অপিচ বহুক্ষণ চিন্তা করিলে দুস্তর বিপত্তি হইতে নিস্তার পাইবার এরূপ সর্ব্বদা উপায় সংস্থান হইয়া থাকে, যে জয় লাভের আশা শেষ পর্য্যন্ত উভয় ক্রীড়কের মনে জাগরূক থাকে, এক পক্ষের অনবধানতায় অপর পক্ষের মাৎ করিবার বাসনা কখন কোন পক্ষের অন্তর হইতে বিগত হয় না। আর ইহাও অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যে কোন কোন চালির প্রসাদাৎ জয় লাভের সম্ভাবনা হইলে ক্রীড়কের মনে অভিমানের সঞ্চার হয়, সেই অভিমানের সঙ্গে সঙ্গেই অনবধানতার সংযোগ আছে, আর সেই অনবধানতাকালে প্রতি পক্ষের মন্দাবস্থা সংশোধিত হইবার উপযোগিতা রহিয়াছে। যাঁহাদিগের এরূপ বোধ আছে, তাঁহারা প্রতিযোগিদিগের উপস্থিত সদবস্থা দৃষ্টে হতাশ্বাস হন না, আর মধ্যে মধ্যে মন্দাবস্থা প্রাপ্তি জন্য চরমে সৌভাগ্য লাভের আশা পরিত্যাগ করেন না।

ডক্টর ফ্রাঙ্কলিন, চতুরঙ্গ ক্রীড়ার দ্বারা সুনীতি লাভের এইরূপ উপায় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পশ্চাৎ তৎক্রীড়া বিষয়া কতিপয় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তদনুবাদ বাহুল্য বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিলাম। ফলতঃ ক্রীড়াদ্বারাই হউক, আর যে কোন পন্থা দ্বারাই হউক মানসিক বহুতর সদ্‌গুণাবলী যে উপার্জ্জিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বেত্তাদিগের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

[পৃঃ ১৫৩-১৫৪] *

* এডুকেশন গেজেটের এই সংখ্যা এবং আরও কতিপয় সংখ্যা চন্দন নগরের দশভুজা সাহিত্য মন্দিরে রক্ষিত আছে। প্রবর্ত্তক-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় মহাশয়ের সৌজন্যে ইহা দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি।

অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর

—শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রী

বেদান্ত-ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের দুইটী ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। এক—তাঁহার নির্গুণভাব; অপর—তাঁহার সগুণভাব। এই সগুণভাবকে শ্রুতিতে ঈশ্বর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়া থাকে।

'দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে। নাম-রূপ-বিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং; তদ্বিপরীতঞ্চসর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিতম্"। —ব্র০সূ০ভা০ ১।১।১১।

জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপাদি বিকারবিশিষ্ট রূপে ব্রহ্মকে মনে করিলে, ইহাই তাঁহার সগুণভাব বা ঈশ্বরভাব বলিয়া কথিত হয়। আর ব্রহ্মের যেটী সর্ব্বাতীত, নির্ব্বিকারভাব তাহাই নির্গুণভাব বলিয়া পরিচিত।

জগৎ-প্রপঞ্চের অতীত ব্রহ্ম, সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ-বিহীন (Transcendental)। 'নেতি' 'নেতি' শব্দদ্বারা, তিনি জগতের 'ইহা নহেন' 'উহা নহেন, এইরূপ শব্দদ্বারা, তিনি কোনপ্রকারে উদ্দিষ্ট হইতে পারেন। কিন্তু, সগুণভাবে ব্রহ্ম সম্বন্ধ-বিহীন নহেন। এই সম্বন্ধ হেতুই ব্রহ্ম, জগৎ-কারণ, জগতের নিয়ন্তা, পরমেশ্বর। এই সগুণভাব হেতুই ব্রহ্ম—জ্ঞেয়; আর এই সগুণভাব হইতেই কেবল তাঁহার নির্গুণ অক্ষর স্বরূপের আভাস পাওয়া যায়। আমার সহিত সম্বন্ধহেতু তিনি আমার আত্মার আত্মাস্বরূপে তিনি জ্ঞেয়। গীতায় এই ঈশ্বরতত্ত্ব সমগ্রভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। ঈশ্বরতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্বের অন্তর্গত; সমগ্র ঈশ্বরতত্ত্ব না জানিলে, প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব জানা যায় না। ব্রহ্ম-জ্ঞানে 'বহু হইবার' কল্পনা উদিত হইলে, শ্রুতিতে ইহাকে 'তপঃ' শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শঙ্কর ইহাকে 'জ্ঞানের একরূপ বিকার" বা অবস্থান্তর বলিয়াছেন। ইহাই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখাবস্থা।

নির্গুণ ব্রহ্মকে 'নেতি' 'নেতি' রূপে কোনপ্রকারে উদ্দিষ্ট করা হইয়াছে বটে*, কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাকে 'অসৎ', শূন্য, স্বরূপ বর্জ্জিত, (Negative) মনে করা সঙ্গত হইবে না। কেননা, শূন্য, অসৎ হইলে, তাঁহাকে জগৎ-কারণ বলিতে পারা যাইত না। গীতায় এই জন্যই সগুণ ঈশ্বর ভাবকে, ব্রহ্ম ব্যতীত 'অন্য' কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলা হয় নাই; ইহাকে 'মহদ্‌ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। ইহা নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই ভাবান্তর মাত্র, সুতরাং ইহা মহদ্‌ব্রহ্ম। এবং ইহা যে জগতের 'যোনি' বা কারণ-বীজ তাহাও বলা হইয়াছে—

"মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম, তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত।"

গীতায় আর বলা হইয়াছে যে, যাহা 'অসৎ' তাহার 'ভাব' বা কার্য্যাকারে অভিব্যক্তি হইতে পারে না; সতেরই ভাব হয়—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ"।

সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মকে শ্রুতিতে 'অসৎ' বলা হয় নাই। ব্রহ্ম যে জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইবার উন্মুখ হইয়া 'সৎ'রূপে, কার্য্যাকারে, আপনাকে বিকশিত করেন, ছান্দোগ্য-উপনিষদের ভাষ্যে তাহা এইরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে—

"তদসচ্ছব্দবাচ্যং প্রাগুৎপত্তেঃ, স্তিমিতমনিস্পন্দমসদিব,—সৎ-কার্য্যাভিমুখম্ ঈষদুপজাতপ্রবৃত্তি ("এতেন বীজস্য উচ্ছূনতাবৎ কারণস্য 'দিদৃক্ষাবস্থাং' দর্শয়তি"—আ০গিরি) সদাসীৎ। ততোঽপি লব্ধপরিস্পন্দং তৎ সমভবৎ—অঙ্কুরীভূতমিব বীজম্—ততোঽপি ক্রমেণ স্থূলীভবৎ"—ছা০ ভা০, ৩।১৯.১।

অর্থাৎ, "উৎপত্তির পূর্ব্বে সেই অসৎশব্দবাচ্য -স্পন্দন-রহিত ও স্তিমিতভাবহেতুক অসতের ন্যায় যাহা প্রতীয়মান ছিল—তাহাই সৎকার্য্যের অভিমুখ হইল, এবং তাহার মধ্যে ঈষৎ 'প্রবৃত্তি' (চেষ্টা বা ক্রিয়া) উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং এইরূপে ইহা 'সৎ' আকারে কার্য্যাভিমুখ হইল। তদনন্তর, বীজ হইতে যেমন অঙ্কুরের উদ্ভব হয়, তেমনি ভাবে স্পন্দিত হইয়া, নামরূপের সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি হইল। পরে উহাই ক্রমে স্থূলাকারে জগৎ-রূপে ব্যক্ত হইল।"

তবেই আমরা দেখিতেছি যে, নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যের মধ্যে নামরূপের বীজ নিহিত ছিল। এই জন্যই ঋগ্বেদে—

"আনীদবাতং স্বধয়া তদেকম্"।

—"সেই 'এক'ব্রহ্ম—স্বশক্তি মায়াযুক্ত, সগুণ ও জগদ্বীজ 'তমঃ' দ্বারা আবৃত"। তাহা—অসৎ, অভাব বা শূন্য নহে।

মাণ্ডুক্য-উপনিষদের ভাষ্যে, এই জগদ্বীজকে 'প্রাণবীজ' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে এবং ব্রহ্মের মধ্যে এই প্রাণবীজ 'অব্যক্ত' ভাবে ছিল। এই বীজযুক্ত ব্রহ্মই সগুণ ব্রহ্ম বা জগৎ-কারণ, একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে।—

"বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। যদ্যপি সদ্ব্রহ্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তত্র, তথাপি জীবপ্রসব-বীজাত্মকত্বমপরিত্যজ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ, সচ্ছব্দবাচ্যতা চ।" — ইত্যাদি, মাং ভাং। ১। ৬

অর্থাৎ, ব্রহ্মকে যে 'সৎ' শব্দে নির্দ্দেশ করা হয় এবং তাঁহাকে যে জগৎ-কারণ বলা হইয়া থাকে, ব্রহ্মের মধ্যে প্রাণ-বীজ নিহিত আছে বলিয়াই তাহা সিদ্ধ হয়। প্রাণ-বীজকে পরিত্যাগ করিলে, তাঁহাকে জগৎ-কারণ বলিতে পারা যায় না।

অতএব, নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বরূপ-বর্জ্জিত, অসৎ বলা যায় যায় না। উহা, তাঁহার মায়াশক্তি বা প্রাণশক্তি যোগে জগৎ-কারণ, সগুণ বলিয়া কথিত হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ ও সৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াও কথিত হইয়াছেন।

সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দ—এই তিনটীকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায়। ইহাদের কোনটীই কোনটীকে ছাড়িয়া থাকে না। উহারা পরস্পর এরূপ দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত যে, আমরা একটীকে না ভাবিয়া, অপরটীকে ভাবিতে পারি না। ইহারা ব্রহ্মের স্বরূপ হেতু, কোনটীই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, বিযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে না। স্বতন্ত্র হইলে, উহারা ব্রহ্মের বাহিরে (Outside of Divine essence) পড়িবে এবং তাহা হইলে আর উহাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিতে পারা যাইবে না। ব্রহ্মই একমাত্র জ্ঞান-স্বরূপ, সত্তা-স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞানেই আমার জ্ঞান, তাঁহার সত্তাতেই আমার সত্তা। তাঁহার সত্তাতেই এ জগৎ সত্তা-যুক্ত। সমস্তই অস্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু বস্তুর সত্তাকে অস্বীকার করা যাইতে পারে না। ব্রহ্মকে শ্রুতিতে "সত্যস্য সত্যম্" বলা হইয়াছে। এক ব্রহ্ম-সত্তার উপরেই তাবৎ পদার্থের সত্তা অবস্থিত। 'আমি আছি'—আমাদের এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ। আমি আছি এই জ্ঞানের সহিত, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন এ জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমার সত্তা আছে, অথচ সে সত্তার বোধ হইতেছে না—ইহা অসম্ভব। সত্তা আছে বলিলেই, সত্তার বোধ বা জ্ঞান হইতেছে, ইহাও বলিতেই হইবে। অতএব, সত্তা ও জ্ঞান - উভয়ই স্বরূপতঃ অভিন্ন। যদি একটীকে অপরটী হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে ত স্বরূপ-গত ভেদ (Dualism) উপস্থিত হইবে। তবে ত এক বস্তুর দুইটা ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ হইয়া পড়ে!

শঙ্কর বলিয়াছেন —

"ন হি সল্লক্ষণমেব ব্রহ্ম, ন বোধলক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম্।...কথং বা নিত্যচৈতন্যং ব্রহ্ম, চেতনস্য জীবস্য আত্মত্বেন উপদিশ্যেত? নাপি বোধ-লক্ষণমেব ব্রহ্ম, ন সল্লক্ষণমিতি শক্যং বক্তুম—'অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ। কথং বা নিরস্তসত্তাকং বোধোহভ্যুপগন্তব্যঃ?" (ব্রং সূং ভাং, ৩। ২। ২১)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ব্রহ্ম—কেবল 'সৎ' স্বরূপ, 'বোধ' স্বরূপ নহে,—একথা বলা যায় না। কেন না, তাহা হইলে, আত্ম-চৈতন্যকে আমাদের আত্মারও আত্মা—একথা কিরূপে বলা যায়? আবার, ব্রহ্ম কেবল 'বোধ' স্বরূপ, 'সৎ' স্বরূপ নহে,—ইহাও বলা যায় না। কেন না, তাহা হইলে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে 'অস্তি' বলিয়া ধারণা করিতে বলা হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অস্তিত্ব-শূন্য বোধ বা জ্ঞানের ধারণাই করা যায় না"।

ব্রহ্মের সমগ্র স্বরূপটাই, এই তিনের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ও ক্রিয়া করে। সুতরাং ইহাদের কোনটীই ব্রহ্মস্বরূপের একত্বকে নষ্ট করিতে পারে না। এই তিনটী মিলিতভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ। ইহাদিগকে তাঁহার 'আত্মভূত' বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাদিগকে, কোনটীকে কোনটী হইতে, ভিন্ন করিয়া লওয়া যায় না। ইহারা তিনটীই মিলিত রূপে ব্রহ্মের 'স্বরূপ' বলিয়া পরিগণিত। যাহা যে বস্তুর স্বরূপ বা স্বভাব, তাহা হইতে তাহাকে বিচ্যুত করা যায় না।—

"ন হি স্বাভাবিকস্য উচ্ছিত্তিঃ কদাচিদুপপদ্যতে, সবিতুরিব ঔষ্ণ্য-প্রকাশয়োঃ" (বৃং ভাং, ৪। ৩। ২০)

'উষ্ণতা ও প্রকাশকে যেমন সূর্য্যের স্বভাব বা স্বরূপ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না ; বিচ্যুত করিতে গেলে ত সূর্য্যই বিলুপ্ত হয়'। ব্রহ্ম-সম্বন্ধেও সেই কথা সত্য।

আমরা এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, সত্তা হইতে, বোধ বা জ্ঞানকে বিযুক্ত করিয়া, স্বতন্ত্র করিয়া, লওয়া যায় না। এইরূপ, আনন্দকেও বোধ হইতে পৃথক্ করা যায় না। শঙ্কর বলিয়াছেন—

"আনন্দ যখন ব্রহ্মের স্বরূপ, তখন ইহা নিশ্চয়ই নিত্য, সদা-অভিব্যক্ত। জ্ঞান যেমন নিত্য, আনন্দও তদ্রূপ নিত্য। নিত্য বলিয়া, উহা কদাপি জ্ঞানকে ছাড়িয়া, জ্ঞান হইতে ব্যবহিত হইয়া—বিযুক্ত হইয়া—অবস্থান করিতে পারে না। জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র করিতে গেলেই উহা অনিত্য হইয়া উঠিবে। কেন না, জ্ঞান হইতে ব্যবহিত হইলে, বিযুক্ত হইতে গেলেই, জ্ঞান উহাকে প্রকাশ করিতেছে না—ইহাই বলিতে হইবে ; উহা অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবে এবং তাহা হইলেই উহা অনিত্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু যাহা অনিত্য, তাহা কিরূপে ব্রহ্মের নিত্য স্বরূপ হইবে ? উহা যদি নিত্য না হয়, তাঁহার আত্মভূত না হয়, উহা তবে উৎপন্ন হয়—ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু যাহা উৎপন্ন হয়, নিত্য নহে, কোন বাহ্য-কারণের উপরে উহাকে নির্ভর করিতে হইবে।"

যাহা ব্রহ্মের 'আত্মভূত', তাহা উপলব্ধি (বোধ) হইতে ব্যবহিত (পৃথক্ বা দূরে) হইতে পারে না ; কেন না উহা নিত্য অভিব্যক্ত হইয়া আছে। যাহা কদাচিৎ অভিব্যক্ত হয়, যাহা অনিত্য, উহা অন্য দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ; কেন না উহা তো 'আত্মভূত' নহে ; উহা তো অনিত্য" (বৃ০ ভা০, ৪, ৪, ৬)।

শঙ্কর আরও বলিয়াছেন যে, "যাহা উপলব্ধি বা বোধের সহিত এক আশ্রয়ে থাকে, তাহারা পরস্পর ব্যবহিত হইয়া থাকে না। হয় উহারা নিত্য অভিব্যক্ত, অথবা অনভিব্যক্ত, না হইয়া পারে না"—

"উপলব্ধি সমানাশ্রয়ে তু, ব্যবধানকল্পনানুপপত্তেঃ ; সর্ব্বদাভিব্যক্তিঃ, অনভিব্যক্তি বা।"

শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—"কোন কিছুর স্বরূপভূত ধর্ম্মগুলি যদি এক আশ্রয়ে অবস্থিত থাকে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর বিষয়-বিষয়ী-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না"—

"ন চ সমানাশ্রয়াণামেকস্যাত্মভূতানাং ধর্ম্মাণাম্ ইতরেতর-বিষয়-বিষয়িত্বং সম্ভবতি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞান এবং আনন্দ একত্র আত্মায় অনুভূত হয়, একটী অপরটীর বিষয়-ভূত (object) হইতে পারে না। কেন না, যাহা বিষয়, তাহা কখনই বিষয়ীর ধর্ম্ম বা স্বরূপ হইতে পারে না।*

এই প্রকারে শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, সৎ, চিৎ ও আনন্দ ইহারা ব্রহ্মের স্বরূপ—ব্রহ্মের আত্মভূত এবং ইহারা কেহই কাহাকে ছাড়িয়া, স্বতন্ত্র থাকে না। উহারা একত্র মিলিত ভাবে ব্রহ্মের স্বভাব বা স্বরূপভূত ("আত্মভূতানাম্")।

অতএব নির্গুণব্রহ্ম—অসৎ, শূন্য বা অভাবাত্মক নহেন ("ন অভাবাভিপ্রায়ম্" —ব্র০সূ০ ভা০, ৩।২।২২)।

এবং এই সৎ-চিৎ-আনন্দই ব্রহ্মের স্বভাব বা স্বরূপ।

জগতে অভিব্যক্ত নামরূপাদি বিকারবর্গের মধ্যে, ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপটী সর্ব্বত্র অনুগত—অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

এই সম্বন্ধে কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রহ্মণোঽপি 'সত্তা'-লক্ষণঃ স্বভাবঃ আকাশাদিষু অনুবর্ত্তমানো দৃশ্যতে" ব্র০ সূ০ ভা০, ২.১।২।

"চিন্মাত্রানুগমাৎ সর্ব্বত্র চিৎস্বরূপতা গম্যতে"　　বৃ০ ভা০, ২, ৪, ৭

"আনন্দেন ব্যাবৃত্ত বিষয়বুদ্ধিগম্য আনন্দঃ অনুগন্তুং শক্যতে"

তৈ০ ভা০, ২।৭।

অর্থাৎ—"আকাশাদি পদার্থে ব্রহ্মের 'সত্তা' সর্ব্বত্র অনুগত হইয়া রহিয়াছে"।

"প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে 'জ্ঞান' অনুস্যূত থাকায়, সর্ব্ববস্তুকে চিৎ-স্বরূপ বলা যায়।"

"জগতে যে সকল পরস্পর ব্যাবৃত্ত (Mutually exclusive) পদার্থ আছে তাহাদের অন্তর্গত সুখদুঃখাদির মধ্যে 'আনন্দ' অনুগত হইয়া রহিয়াছে"।

তবেই, বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইহাই তাঁহার স্বভাব ; তিনি শূন্য বা অসৎ নহেন এবং জগতের প্রত্যেক বিকারের অন্তরালে, ব্রহ্মের এই সচ্চিদানন্দ স্বরূপটি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই জন্যই

---

* বিষয়ের মধ্যে বিষয়ীর স্বরূপ আংশিক ভাবে অভিব্যক্ত হয়। এইজন্য বিষয়টা বিষয়ীর অধীন (subordination)। উভয়ে সামানাধিকরণ্য (co-ordination) নাই।

আমরা আমাদের আত্মার মধ্য দিয়া এবং জগতের বস্তুগুলির মধ্য দিয়া ব্রহ্মচৈতন্যের আভাস প্রাপ্ত হই। তিনি জগৎ-কারণরূপে অভিব্যক্ত না হইলে, নাম-রূপাদির বিকাশ না করিলে, আমরা তাঁহার স্বরূপের কোন পরিচয়ই পাইতাম না।

বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে যে, পূর্ণব্রহ্ম যখন কার্য্যাকারে উদ্রিক্ত—উদ্বুদ্ধ—হইয়া উঠেন, তখনও তিনি আপনার স্বরূপগত পূর্ণতাকে ত্যাগ করেন না। আপন পূর্ণতাকে লইয়া তিনি কার্য্যাকারে অভিব্যক্ত হন। নাম-রূপাদি বিকার বিকাশিত হইলেও, তাঁহার নির্ব্বিকার, পূর্ণ, স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না।

শঙ্করের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার রামতীর্থের উক্তি উদ্ধৃত হইতেছে; উহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সচ্চিদানন্দ নির্গুণব্রহ্মকেই জগতের উৎপত্তির কারণ বলা হইয়াছে—

"জগদুৎপত্তি-স্থিতি-লয়কারণং সচ্চিদনন্তানন্দানামেকরসং ব্রহ্ম"।
(বেদান্ত-সার-টীকা)।

"সৎ-চিৎ ও আনন্দের একরসস্বরূপ ব্রহ্মই, জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণ"।

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব সম্বন্ধে বেদান্তের অভিপ্রায় এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে।

নাম-রূপাদি অসংখ্য ভেদগুলি, অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মের মধ্যেই 'অব্যক্তাবস্থায়' অনভিব্যক্তরূপে বিলীন ছিল ("চিদেকাত্মনা বিলীনত্বাৎ"। উপ৹ সাহস্রী)।

এই অবস্থাকে "সর্ব্ব" শব্দদ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আকাশাদি তাবৎ পদার্থ প্রলয়ে ব্রহ্মে উপরত ছিল বলিয়া, সর্ব্ববস্তুর উপরম হওয়ায়, প্রলয়াবস্থাকে "সর্ব্বোপরম"* বলা হইয়াছে। শঙ্কর স্বয়ং এই অবস্থার এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

"অপরিত্যক্তান্যতমবিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্" (বৃ৹ ভা৹ ১, ৪, ৭)

আবার—

"স্বকীয়সর্ব্ববিস্তারসহিতং কারণাপন্নং যুক্তং (সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ)—
(মা৹ কা৹ ৫)।

অর্থাৎ, "জগতের এই অব্যক্তাবস্থায় কোন প্রকার বিশেষ বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না"।

"সুষুপ্তি ও প্রলয় কালে, স্বীয় সর্ব্বপ্রকার বিস্তারের সহিত 'কারণ-ভাবকে' প্রাপ্ত হয় ইহাই যুক্তিযুক্ত"।

আমাদের নিজের জ্ঞানের মধ্যেও যেমন আমাদের চিন্তা, ভাব প্রভৃতি সমস্তই ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে জ্ঞানাকেরে অবস্থান করে, অব্যক্তভাবে বিলীন থাকে; ইহাও তদ্রূপ। জ্ঞেয়মাত্রই, অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে, আমাদের জ্ঞানের মধ্যে একাকার হইয়া অবস্থান করে, ইহা আমাদের সকলেরই সর্ব্বদা অনুভবসিদ্ধ।

অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে; ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য, নাম-রূপাদি অসংখ্য ভেদবিশিষ্ট বস্তুগুলিকে, বিবিধ বিকার-গুলিকে, এক নিতান্ত শূন্য, নির্ব্বিশেষ একত্ব (Empty, barren Unity) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ এই জন্যই তাঁহার মতবাদকে গ্রীক্ দার্শনিক পারমিনাইডিসের (Parmi-nides) সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। কিন্তু শূন্য 'এক' হইতে 'অনেক' উৎপন্ন হইবে কিরূপে? আমাদের বোধ হয় যে, শঙ্কর এই অসাধ্যসাধনের প্রয়াস কোন দিনই করেন নাই। তিনি এই নাম-রূপাত্মক জগৎকে যেমন পাইয়াছিলেন সেইরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ইহাই দেখাইতে তিনি প্রয়াস পাইয়াছিলেন যে, এই নাম-রূপাত্মক জগৎ—যাহা আমরা দেখিতেছি, যাহা আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মেরই প্রকাশ, এবং ব্রহ্ম ব্যতীত এ জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই' স্বাধীন সত্তা নাই। ব্রহ্মই এই জগতের আদি, ব্রহ্মই এই জগতের অবসান।

নিম্নোদ্ধৃত ভাষ্যাংশটী গ্রহণ করুন—

"এই যে অবিদ্যা দ্বারা উপস্থাপিত, ক্রিয়া ও কারক ও ফলাদি অসংখ্য ভেদ বিশিষ্ট 'যথাপ্রাপ্ত' জগৎটা আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে. শ্রুতি ইহার সত্যতা বা অসত্যতা লইয়া কোন কথা বলেন নাই। এই জগৎটাকে যেরূপ পাওয়া যাইতেছে, যেরূপে দৃষ্ট হইতেছে, শ্রুতি ইহাকে সেইরূপে গ্রহণ করিয়াই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে" (বৃ৹ ভা৹, ২।১।২০)।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, শঙ্কর এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎটাকে যেরূপ পাইয়াছিলেন, সেইরূপেই তিনি ইহাকে

* আকাশাদয়ঃ উপরমন্তেঽস্মিন্ ইতি 'সর্ব্বোপরমঃ', তাদৃগ্‌ভাবাৎ মহাসুষুপ্তিঃ প্রলয়ঃ ইতি অস্য 'সর্ব্বত্বম্'। (রামতীর্থ)।

গ্রহণ করিয়া, কেবল তিনি ব্রহ্মের সঙ্গে ইহার একত্ব বা অভেদ স্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন।

"জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশবাচক শ্রুতি-বাক্য-গুলি, পরমেশ্বরের সহিত একত্ব প্রতিপাদনের জন্যই উপস্থিত আছে; পরমেশ্বরের অংশাংশি কল্পনা বা অবয়বাদি কল্পনার জন্য নহে।"

কিন্তু শঙ্কর কি প্রকারে, জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের এই 'একত্ব' সংস্থাপন করিয়াছেন? তাঁহার প্রদত্ত নিম্নোদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করুন—

"স্ফুলিঙ্গগুলি, অগ্নি হইতে পৃথক্ হইয়া আসিবার, 'পূর্ব্বে', অগ্নির সহিত অভিন্নভাবে একরূপ হইয়াছিল; আবার অগ্নি হইতে পৃথক হইয়া বহির্গত হইবার 'পরও', উহা অগ্নি ব্যতীত অপর কিছু নহে।"

তবেই দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই এই জগতের আদি, ব্রহ্মই এই জগতের অন্ত, সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত; ব্রহ্ম হইতে ইহা পৃথক্ বস্তু নহে। জগৎকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না; ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহা থাকিতে পারে না।

আমরা তবেই পাইতেছি যে, এই বহুত্বপূর্ণ নাম-রূপাত্মক জগৎকে শঙ্কর, 'এক' হইতে বাহির করিবার প্রয়াস করেন নাই; তিনি জগৎকে স্বীকার করিয়া লইয়াই আরম্ভ করিয়াছেন; যেমন দেখিয়াছিলেন, তিনি জগৎকে সেইরূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কার্য্য-জগৎকে অবলম্বন করিয়াই, এই কার্য্যের সহিত দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ 'কারণের' জ্ঞানে পৌঁছিয়াছিলেন। এবং এই কারণের মধ্য দিয়াই, কার্য্য-কারণাতীত ব্রহ্ম-তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কথাগুলি আমরা এ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি:

"সর্ব্বপ্রথমে এই বিদ্যমান 'কার্য্য'-বর্গের যাহা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, সেই কারণ-বস্তুর 'সত্তার' জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইরূপে তাঁহার 'অস্তিত্বের' ধারণা করার পর, সর্ব্বপ্রকার বিশেষত্ববর্জ্জিত ব্রহ্মের যাঁহাকে শ্রুতি 'ইহা নয়', 'উহা নয়' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, —তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে—"

(কঠ০ ভা০, ৬।১৩)।

আবার—

"ব্রহ্ম, সর্ব্বপ্রকার উপাধিবর্জ্জিত হইলেও, তিনি জগতের মূল কারণ বলিয়া, নিশ্চয়ই তাঁহার অস্তিত্ব আছে। কেন না, যাহার মধ্যে কার্য্যসকল বিলীন হইয়া অন্তর্হিত থাকে, সেই কারণটি নিশ্চয়ই আছে। তাহাকে অস্বীকার করা যায় না। যে হেতু কার্য্যগুলি, স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে যাইতে যাইতে, আমাদের বুদ্ধি একটা মূল 'সত্তায়' গিয়া উপস্থিত না হইয়া পারে না। কোন বস্তু সৎ কি অসৎ, ইহার নির্দ্ধারণে আমাদের বুদ্ধিই একমাত্র প্রমাণ। কার্য্য এবং কারণের সত্তা বা সত্যতা অবধারণ করিতে গিয়া, আমরা ব্রহ্ম-বস্তুকে সকল 'সত্যের সত্য' বলিয়া বুঝিতে পারি।"

(বৃ০ ভা০, ২।২।১)।

শঙ্কর-ভাষ্য পড়িতে গেলে, এই কথাটা বিশেষরূপে মনে রাখিতে হইবে যে, শঙ্কর কখনই এ জগৎকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া, বিযুক্ত করিয়া, লন নাই;—তাহা অভিব্যক্তির পূর্ব্বেই কি, বা অভিব্যক্তির পরেই কি? তিনি কখনই 'অনেককে' 'এক' হইতে পৃথক্ করেন নাই। তিনি বারংবার বলিয়া দিয়াছেন যে, এই নাম রূপাত্মক জগতের, ব্রহ্ম হইতে কোন পৃথক্ সত্তা নাই। শঙ্কর সান্তকে (Finite), কখনই অনন্তের (Infinite) একটা বিরোধী বস্তুরূপে (Mere Correlate) ধরিয়া লন নাই। যেটি প্রকৃত অনন্তস্বরূপ, তাহা সান্তের মধ্য দিয়াই নিজের বিকাশ করিয়া থাকে। সান্ত জগৎ, অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি (Expression)। সান্ত বিকার-বর্গ কখনই অনন্ত ব্রহ্মকে ছাড়িয়া একা থাকিতে পারে না।

বেদান্তের "সৎ-কার্য্যবাদ" প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কার্য্যমাত্রেরই একটা অধিষ্ঠান (Substratum) থাকা চাই। এই অধিষ্ঠানের আশ্রয়ে, কার্য্যবর্গ বীজরূপে "(কারণাত্মনা)" অবস্থান করে—

"যাহার সত্তা আছে' তাহাকেই 'সত্তা' শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। ব্রহ্মের সত্তা অস্বীকার করা যায় না। কেন যায় না? যাহা হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহারই সত্তা বা অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ব্রহ্ম - আকাশাদি কার্য্যবর্গের 'কারণ'; সুতরাং ব্রহ্মের সত্তা বা অস্তিত্ব

আছে। যিনি সর্ব্বপ্রকার বিকারের আস্পদ, যিনি সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তির (ক্রিয়ার) বীজ, তিনি নির্ব্বিশেষ হইয়াও, তিনি আছেন,—তাঁহার সত্তা আছে। তিনিই ব্রহ্মবস্তু" (তৈ০ ভা০; ২।৬)।

শঙ্কর তাঁহার "আত্মবোধ" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে বলিয়া দিয়াছেন যে, ব্রহ্মকেই এই জগতের কারণ বলিতে হইবে; তাহা না বলিলে, অসৎ হইতে সদ্বস্তুর উৎপত্তি হয়,—এই অসঙ্গত কথা স্বীকার করা অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। কেন না, শঙ্কর নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কোন কার্য্য উৎপাদন করিতে গেলে, তাহার একটা আশ্রয় থাকা আবশ্যক। শক্তির কোন আধার বা আশ্রয় নাই, অথচ শক্তি ক্রিয়া করে, ইহা হইতেই পারে না। কোন আশ্রয়কে ছাড়িয়া শক্তি আছে, একথা কল্পনা মাত্র *।

"কেহ কেহ কারণের সত্তা নাই বলিয়া থাকেন; কিন্তু যাহা অসৎ, তাহা কাহারও কারণ হইতে পারে না। বীজ আছে বলিয়াই ত অঙ্কুর-উৎপাদিনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণকে অসৎ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতে ত, বন্ধ্যার পুত্রও কার্য্য করিতে সমর্থ—এই কথা বলিতে হয়।"

নাম-রূপাদি বিকারগুলির উৎপত্তির পূর্ব্বে, উহারা ব্রহ্মের মধ্যেই অব্যক্তরূপে, বীজাকারে, শক্তিরূপে অবস্থিত থাকে। "প্রাগবস্থায়াং বীজশক্ত্যবস্থম্" (বৃ০সূ০ভা০)। এই জন্যই নানা স্থানে ভাষ্যে, 'আত্মা' শব্দে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কেন না, উহারা যখন ব্রহ্মের মধ্যে একাকার হইয়া (Indistinguishible from Brahman) অবস্থান করে। "ইহারা 'আত্মভূত' হইয়া আছে বলিয়া, উহাদিগকে 'আত্মা'-শব্দেও বলা যায়" (তৈ০ ভা০)।

সে অবস্থায় নাম-রূপকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না। এই জন্যই তখন ব্রহ্মের একত্বেরও কোন ক্ষতি হয় না।—

* Compare :—"We can not conceive of activity without thinking on something which is active,—That which developes or acts must have a *character* in virtue of which it maintains a continuity between the past and present",

—*Galloway.*

"তৎকালে ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত হইয়া কোন বস্তুই, দেশে বা কালে, সূক্ষ্ম বা স্থূলরূপে, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকে না। এই জন্য, সকল অবস্থাতেই নাম-রূপগুলি, আত্মার স্বরূপ দ্বারাই "আত্মবৎ" (তৈ০ ভা০, ২।৬)।

মাকড়শা (Spider) যেমন আপন দেহ-ভাণ্ডার হইতে সূত্র উৎপাদন করিয়া থাকে, ব্রহ্মও আপন ভাণ্ডার হইতে জগৎ উৎপাদন করেন"। যখন নাম-রূপাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইয়া দেখা দেয় বটে, কিন্তু উহা ব্রহ্মকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। উহাকে ব্রহ্ম হইতে ভেদ (distinguished) করিতে পারা গেলেও, উহা ব্রহ্ম হইতে বিভক্ত হইয়া, পৃথক্ হইয়া (separated) থাকিতে পারে না।

শঙ্কর বলিয়াছেন—

"যখন পরমাত্মার মধ্যে একাকার হইয়া নাম-রূপ, অব্যক্ত ভাবে অবস্থান করে, এবং যখন নাম-রূপ উৎপন্ন হয়—অভিব্যক্ত হয়—তখনও নাম-রূপ, আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে না; দেশে ও কালে অপ্রবিভক্ত থাকিয়াই উহা উৎপন্ন হয়। অভিব্যক্ত হইয়াও নাম-রূপ—দেশে বা কালে আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া অভিব্যক্ত হয় না। কোন অবস্থাতেই নাম-রূপ, পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত হইয়া পরমাত্মাকে ছাড়িয়া, থাকে না" (তৈ০ ভা০, ২।৬)।

শঙ্কর-বেদান্তে, ব্রহ্ম সকলের অতীত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রহ্ম যে জগতের সঙ্গে নিতান্ত নিঃসম্পর্কিত, তাহা নহে। নির্ব্বিশেষ 'এককে' ত্যাগ করিলে 'অনেকের' কোন অর্থ থাকে না। নির্ব্বিশেষ 'এক' হইতে বিভক্ত বা বিযুক্ত হইয়া, এই বিশেষ বিশেষ বিকারগুলির কোন ধারণা হয় না। নাম-রূপাদি ভেদগুলিকে, শঙ্কর-বেদান্তে, ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া, বিভক্ত করিয়া, লওয়া যায় না। ব্রহ্মের বাহিরে উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা বা অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের বাহিরে উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিলে, উহাদের দ্বারা ব্রহ্মকে সীমাবদ্ধ (Limited) হইতে হয়; ব্রহ্মকে সান্ত (Finitised) হইতে হয়।

"ব্রহ্মের বাহিরে কোন পৃথক্ বস্তু থাকিতে পারে না। এক বস্তু হইতে অপর একটা বস্তু ব্যাবর্ত্তিত হইলে, ভিন্ন হইলে, বস্তুর একটা ভেদ, একটা পরিচ্ছেদ (Limit)

আসিয়া পড়ে। এইরূপে ব্রহ্মেরও একটা পরিচ্ছেদ আসিয়া পড়িবে। তাঁহার অখণ্ডতার ক্ষতি হইবে (ব্রং সূং ভাং, ৩.২, ৩১)।

অতএব নামরূপগুলি, ব্রহ্মের বাহিরে থাকিতে পারে না; উহারা ব্রহ্মেরই অন্তর্ভূক্ত।

"যে বস্তু হইতে যাহা উৎপন্ন হয়, সেই উৎপন্ন বস্তু তাহা হইতে বিভক্ত হইয়া, পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না। তাহা হইতে উহাকে ভিন্ন করিয়া, বিযুক্ত করিয়া, লওয়া যায় না। মৃত্তিকা হইতে ঘটকে কি পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়? (বৃং ভাং)"।

নাম-রূপকে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায় না; কিন্তু তাই বলিয়া, নামরূপগুলি ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপে, ব্রহ্মের স্বরূপভাবে, তাঁহার মধ্যে থাকে না। উহাদিগকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না। কেননা, তাহা হইলে ব্রহ্ম—নাম-রূপ বিশিষ্ট হইয়া পড়েন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ব্রহ্মকে (নাম-রূপগুলি দ্বারা) 'স-প্রপঞ্চ' বা সাবয়ব বা অংশবিশিষ্ট বলিতে হয়। অর্থাৎ, নাম-রূপ-গুলির সমষ্টিই ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু তাহা হইলে, ব্রহ্ম যে সকলের অতীত (Transcendent) তাহার ক্ষতি হয়। তাঁহার একত্ব বিনষ্ট হইয়া, তাঁহার অনেকত্ব উপস্থিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, নাম-রূপগুলি উৎপন্ন হইবামাত্রেই উহারা ব্রহ্মের 'বিষয়' রূপেই (Objects of His consciousness) উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহার জ্ঞান, এগুলি হইতে স্বতন্ত্র থাকিবেই। কেন না, বিষয়ীকে সর্ব্বদাই উহার বিষয় হইতে ভিন্ন হইতেই হয়। সুতরাং নাম-রূপগুলিকে কেমন করিয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম বা স্বরূপ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইবে?

শঙ্কর-ভাষ্যে বলা হইয়াছে—

"জ্ঞানই আত্মার স্বরূপ। অতএব উহা নিত্য। তথাপি যাহাকে আমরা সাধারণতঃ জ্ঞান বলি—শব্দজ্ঞান, রূপজ্ঞান রসজ্ঞান প্রভৃতি—এগুলি সেই আত্ম-জ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আত্মজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হইয়া, আত্মজ্ঞানের 'বিষয়' রূপেই উৎপন্ন হয়। যাহারা অবিবেকী, অজ্ঞানী, তাহারাই ঐ বিকারগুলিকে আত্মারই 'ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করে; আত্মা যেন ঐ সকল জ্ঞান দ্বারা বিকার-বিশিষ্ট—এইরূপ মনে করে। কিন্তু ইহা ভুল" (তৈং ভাং, ২।১)।

কিন্তু এই শব্দ-স্পর্শাদি বিজ্ঞানগুলিকে আত্মার 'ধর্ম্ম' বা 'স্বরূপ' বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না যেহেতু—

"ক্ষীর (দুগ্ধ) যখন দধির আকার ধারণ করে, তখন দুগ্ধ সর্ব্বাবয়বে দধিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। কিন্তু চেতন বিরাট্ পুরুষ কি সেই প্রকারে, নিজের স্বরূপের বিনাশে, জগৎ-রূপ ধারণ করে? না, তাহা নহে। ইনি আত্ম-স্বরূপে ঠিক্ থাকিয়াই, স্বরূপতঃ স্বতন্ত্র রহিয়াই, জগৎরূপে বিকাশিত হন। স্বরূপের একান্ত নাশ হয় না" (বৃং ভাং, ১. ৪. ৪)।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, জগৎ তাঁহার স্বরূপ নহে। জগৎ-আকার ধারণ করাতেও, তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষতি হয় না। উহা নির্ব্বিকারই রহিয়া যায়।

অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সগুণ ব্রহ্মকে প্রকৃত পক্ষে জগৎ-রূপে বিকৃত মনে করা অত্যন্ত ভুল। সেইরূপ আবার, নির্গুণ ব্রহ্মকে, এই জগৎ হইতে একেবারে নিঃসম্পর্কিত মনে করাও ভুল। এ জগৎ, নির্গুণেরই সগুণ ভাব।

শঙ্করের এই মন্তব্যটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা আমাদের আবশ্যক—

"যদিও ব্রহ্ম এই জগৎ-প্রপঞ্চদ্বারা অস্পৃষ্ট, এবং এই জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে স্বতন্ত্র, তথাপি এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। কিন্তু ভোক্তা জীব, ভোগ্য জগৎ এবং প্রেরয়িতা ঈশ্বর—এই তিনই ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ব্রহ্ম যদিও বিকার-গুলির আশ্রয়, তথাপি তিনি স্বরূপে নির্ব্বিকারই থাকেন।"

যদি ব্রহ্মকে একান্তরূপে এই জগতের সম্পর্কচ্যুত করা হয়; যদি তাঁহাকে একান্ত রূপে পৃথক্ করিয়া লওয়া যায়; যদি ব্রহ্মকে এই জগৎ-প্রপঞ্চের আশ্রয় বা অধিষ্ঠান (Ground) বলিয়া স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে এই জগৎ-প্রপঞ্চ একেবারে মিথ্যা, অলীক হইয়া পড়ে। কেন না, শঙ্কর নিজেই বলিয়া দিয়াছেন—

"পৃথিবীতে অতি ক্ষুদ্র, অতি স্থূল—যে বস্তুই বল না কেন, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র করিতে গেলেই, উহা 'অসৎ' হইয়া উঠিবে" (কঠং ভাং)।

তবেই ব্রহ্মকে জগৎ হইতে একান্ত ভাবে সম্পর্ক-চ্যুত

করা, স্বতন্ত্র করা যায় না। স্বতন্ত্র করিলে, শঙ্কর যে নানা স্থানে বলিয়াছেন যে,জগতে অভিব্যক্ত নাম-রূপাদি বিকার-গুলির* সাহায্যেই ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়,—সে কথার কোন মূল্য থাকে না। ব্রহ্ম নিগুর্ণ হইলেও, জগতের সঙ্গে একান্ত সম্বন্ধবর্জ্জিত নহেন।—

"ন পৃথগনুভবঃ কিন্তু তৎ-সাহচর্য্যাৎ" (শতশ্লোকী)।

অর্থাৎ, "ব্রহ্মকে জগৎ হইতে একেবারে পৃথক্ করিয়া অনুভব করা যায় না, কিন্তু জগৎকে ব্রহ্মের সহযোগেই অনুভব করিতে হয়।"

এই জন্যই বেদান্তে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ—উভয় বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

ব্রহ্মকেই জগতের উপদান কারণ না বলিলে, অপর একটা স্বতন্ত্র উপাদান কারণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা স্বীকৃত হইলে, জগৎকে ব্রহ্ম হইতে একান্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কিন্তু তাহা করিলে,—"নামরূপাদি বিকারগুলি আত্ম-স্বরূপের যোগেই 'সত্য', কিন্তু স্বাধীন, স্বতন্ত্ররূপে উহারা 'অসত্য' শঙ্করের এরূপ উক্তির কোন সার্থকতা থাকে না।

এতক্ষণ যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, যদিও শ্রুতিতে জগৎ-সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু তদ্বারা এক মূল তত্ত্ব হইতে বহুত্বের বিকাশ বলা ততটা অভিপ্রেত নহে; উহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের বিকাশভূত এই জগতের মধ্যে ব্রহ্মবস্তু নিয়ত অনুস্যূত—অনুগত—হইয়া রহিয়াছেন এবং ব্রহ্মের সহিত জগতের অভিন্নতা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্ম হইতে জগতের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই; জগৎ ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' কোন বস্তু নহে।

(ক) এই জগৎকে ব্রহ্ম হইতে কি প্রকারে স্বতন্ত্র করিয়া ভিন্ন করিয়া—লওয়া যাইবে? কেন না, জগৎকে যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া লওয়া হয়, জগৎটা ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' বস্তু—ইহা যদি ভাবা যায়, তাহা হইলে তাঁহার জগদ্বিষয়ক জ্ঞানটি অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের বাহিরে যাইয়া পড়িবে। কেন না, ব্রহ্মজ্ঞান ত পূর্ণস্বরূপ। অপর কোন জ্ঞান, সে জ্ঞানের ত পূর্ণতা সম্পাদন করিতে পারে না। সুতরাং এই জগৎ একটা অনর্থক বস্তু হইয়া পড়ে। শঙ্করাচার্য্য যে জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপেরই অভিব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহাও নিরর্থক হইয়া উঠে। অতএব জগৎকে ব্রহ্ম হইতে 'অন্য' বস্তু মনে করা যায় না। জগৎকে ব্রহ্মের বাহিরে ফেলান যায় না। পূর্ণ জ্ঞান স্বরূপের বাহিরে অপর কাহারও জ্ঞান কিরূপে থাকিবে? তাহা হইলে ত জ্ঞানের পূর্ণতারই ক্ষতি হয়।

(খ) আবার, ব্রহ্মকে যদি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ করা যায়, তাহাতেও দোষ উপস্থিত হইবে। কুম্ভকার যেমন পূর্ব্ব হইতে স্বতন্ত্র মৃত্তিকা লইয়া ঘট নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তদ্রূপ একটা স্বতন্ত্র উপাদান লইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন, ইহাই বলিতে হয়। এই দোষ নিবারণের জন্যই বেদান্তে ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান কারণ (Material cause) বলা হইয়াছে। ব্রহ্ম, জগতের বহিঃস্থিত (External) রূপে, 'কারণ' নহেন; কিন্তু তাঁহারই স্বরূপ জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হইয়া আছে।

(গ) আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই যে, নাম-রূপাদি বিকার—

(I) ব্রহ্মের মধ্যে অবস্থিত; উহা ব্রহ্মের সহিতই নিয়ত সম্পৃক্ত। "যাঁহারা 'মধ্যে' নাম-রূপ, অথচ যিনি নামরূপ হইতে ভিন্ন, তিনিই ব্রহ্ম" (ছা°উপ°)।

(II) আবার, এই নামরূপ ব্রহ্মেই একীভূত থাকে—

"নাম রূপ ব্রহ্মের 'আত্মভূত', সংকল্প বা কামনা—ব্রহ্ম হইতে 'অন্য', নহে" (তৈ°উ°)।

তবেই, শ্রুতিতে নাম-রূপকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও বলা হইয়াছে; আবার উহাকে ভিন্ন বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মের স্বরূপটিই নাম-রূপের মধ্যে অভিব্যক্ত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের ন্যায়, নাম-রূপকে কোন বহিঃস্থ শক্তি বা কারণ হইতে উৎপন্ন বলা হয় নাই। ইহার অর্থ এই যে, নামরূপাত্মক জগৎ ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অভিব্যক্তি; ব্রহ্ম নিজেই নিজের 'কর্ম্ম' রূপে বিকাশিত হইয়াছেন; উহা ব্রহ্ম ছাড়া কোন স্বতন্ত্র বস্তু নহে।

(ঘ) বেদান্তে জগৎকে 'সৎ'ও নহে, 'অসৎ'ও নহে—এই বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যদি উহা একান্ত অসৎ হয়—সত্তার অভাব বা সত্তা হইতে ন্যূন হয় তাহা

* "সদাত্মনা সত্যত্বং সর্ব্ববিকারাণাং, স্বতস্তু অনৃতত্বম্" (ছা° ভা°)

হইলে জগৎকে মিথ্যা, মায়াময় বলতে হয়। কেন না, পূর্ণ সত্তা ত ব্রহ্মেরই, জগতের নহে। এই জন্যই, বেদান্তে জগতের একপ্রকার সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মকেই জগতের 'সত্তাপ্রদ' বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া, জগৎকে একান্ত সদ্বস্তুও বলা যায় না। কেন না, তাহা হইলে জগৎ, ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র একটা বস্তু হইয়া উঠে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের একত্বের—অদ্বিতীয়ত্বের—হানি হইয়া উঠে।

(ঙ) আমরা দেখিতেছি, ব্রহ্ম তাঁহার সঙ্কল্পকে 'সত্তা-' বিশিষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প-প্রসূত জগতের তিনিই মূল কারণ এবং তিনিই উহার অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম এই জগতের অতীত বলিয়া (Transcendental), তাঁহার সত্তা জগতের সত্তাকে গ্রাস করে না। তাঁহার সত্তা বা শক্তি দ্বারা জগৎ প্রতিনিয়ত বিধৃত ও নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে জগতের "স্ফূর্ত্তিপ্রদ" বলিয়াও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

গীতার ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন—

"এই বিকারী জগতের সত্তা ও স্ফুরণ—'আমা'দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু 'আমি, নিজেই যে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছি তাহা নহে"।

জগতের দুইটা অংশ। উহার যেটা নাম-রূপাত্মক বিকার—সেটা উহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপ। কিন্তু এই দৃষ্ট বিকার-গুলির অন্তরালে যে 'সত্তা' ও 'স্ফুরন' অদৃশ্যরূপে ক্রিয়া করিয়া থাকে, উহা ব্রহ্ম হইতে আগত। এই জন্যই বেদান্তে ব্রহ্মকে ' সত্তা ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ" বলা হয়।

"অচেতন জড় জগতের অন্তরালে অন্তর্য্যামী চৈতন্য আছে বলিয়াই ত জড়ে ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়। চেতনের অধিষ্ঠান বলেই ত অচেতনে ক্রিয়া-সামর্থ্য দৃষ্ট হয়। সারথির পরিচালনা ব্যতীত জড় রথে গতি আসিবে কিরূপে?"

এই নিমিত্তই ব্রহ্মকে জগতের সত্তা ও স্ফূর্ত্তিদাতা বলা হইয়া থাকে।

"সর্ব্বপ্রকার বিকারের অন্তরে থাকিয়া তিনি সকলকে নিয়মিত, পরিচালিত করিতেছেন"—ব্র° সূ° ভা°, ১।২।১৪।

যদি এই সর্ব্বাতীত মূল ব্রহ্ম-বস্তুকে পরিত্যাগ কর বা ছাড়িয়া দেও, তাহা হইলে এই জগৎ মিথ্যা, অসত্য হইয়া যাইবে। তাঁহা হইতে বিচ্যুত করিলে এই জগৎ—

"স্বপ্ন, মায়া, মরীচিকার মত অলীক ও অসার হইয়া যায়" (বৃ° ভা°)।

শঙ্কর এই জন্যই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে—

"তদ্ যুক্তমখিলং বস্তু, ব্যবহারশ্চিদন্বিতঃ"—(আত্মবোধ)।

জগতের তাবৎ বস্তু, ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারা যুক্ত আছে এবং জগতের সমুদয় ব্যবহার সেই চিৎ-সত্তা দ্বারা অন্বিত হইয়া হইয়া অবস্থান করিতেছে।—

"ত্বয়া বিনাকৃতং (unrelated) ন কিঞ্চিদস্তি"—গী° ভা° ১১। ৪°

শঙ্কর-বেদান্তের কতিপয় সমালোচকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শঙ্কর নাকি ঈশ্বরকে অবিদ্যাত্মক সুতরাং অসত্য, মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই কথাটা কতদূর সত্য, আমরা এখন সেইটি পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

ব্রহ্ম হইতে নাম-রূপের অভিব্যক্তি হইয়াছে, একথা আমরা উপরে দেখিয়াছি। এই সকল নাম-রূপ উৎপন্ন হইবামাত্রই আমরা—সাধারণ, অজ্ঞ জীব—আমাদের 'অবিদ্যার' প্রভাবে, এই নামরূপগুলির সহিত ব্রহ্মকে অভিন্ন বলিয়া ধরিয়া লই। ব্রহ্ম যেন এই নাম-রূপাদি যোগে একটি 'অন্য', স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠিলেন মনে করি। অবিদ্যার প্রভাবই এইরূপ (আমাদের লিখিত "অবিদ্যা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। নাম-রূপগুলিকে এরূপভাবে ব্রহ্মের উপরে "আরোপিত" করা হয় যে, ব্রহ্ম যেন নিজের স্বরূপটি হারাইয়া, এই নাম-রূপ-বিশিষ্ট একটা অন্য কিছু হইয়া উঠিলেন। সাধারণ লোক ঈশ্বরকে এই ভাবেই ধরিয়া লয়। ঈশ্বর যে ব্রহ্মই, ব্রহ্ম যে নাম-রূপ-যোগে অন্য কিছু হন নাই, একথাটা একেবারে আমরা ভুলিয়া যাই। শঙ্কর এইজন্যই ঈশ্বরকে অবিদ্যাত্মক বলিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে মিথ্যা বলিয়া উড়ান নাই। ব্রহ্ম যে নাম-রূপাত্মক জগৎ রূপে অভিব্যক্ত হইয়াও নিজ স্বরূপে তিনি জগতের অতীতই আছেন, একথাটা অবিদ্যা-প্রভাবে মনে আইসে না।

"এতাবানেব আত্মা পরমেশ্বরো বা, নাতঃ পরমস্তীতি, ঈদৃশং জ্ঞানং (তামসানামেব ভবতি)"—গী° ভা°, ১৮। ২২

"জীবাত্মা বা ঈশ্বরের অতীত কোন বস্তু নাই, জীবাত্মা বা ঈশ্বর নামরূপের সহিত যুক্ত,ঈদৃশ ধারণা অজ্ঞ লোকের ধারণা"।

সগুণ-ভাবই একমাত্র তত্ত্ব, ইহা মনে করিলেই ভুল হইল। ইহা অবিদ্যার প্রভাবেই হয়। নামরূপাদির সহিত ব্রহ্মকে একেবারে অভিন্ন করিয়া হইয়া, সগুণ ঈশ্বরই একটী স্বতন্ত্র বস্তু, ইহা মনে করাই ভুল। নির্গুণ ব্রহ্মের কথাটা ভুলিলে চলিবে না। নির্গুণ ব্রহ্ম যে নাম-রূপে বিকাশিত হইয়াও—সগুণভাব ধারণ করিয়াও—নিজের নির্গুণস্বরূপ হইতে বিচ্যুত হন না, একথাটা ভুলিলে চলিবে না। অবিদ্যার প্রভাবেই এরূপ ভ্রম উপস্থিত হয়। সাধারণ লোক এইরূপেই ঈশ্বরকে ধারণা করে। শঙ্কর এইরূপ ধারণাকেই অবিদ্যাত্মক, অসত্য বলিয়াছেন। (অবিদ্যা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। শঙ্কর বলিয়াছেন—

"সর্ব্বাত্মকত্বাৎ 'তদ্বান্' ভবতি। কিন্তু ততোঽপি 'অধিকতরম্' এতত্তুবতি"

(ছৈ০ ভা০ ; ১।৬)

ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব অর্থাৎ, "সকলের 'কারণ' বলিয়া ব্রহ্ম — সর্ব্বাত্মক। ইহা ব্রহ্মের 'বিশিষ্ট' রূপ *। পরমেশ্বর—নামরূপাদিবিশিষ্ট। কিন্তু তিনি নাম-রূপাদি হইতেও 'অধিক', নামরূপাদি-বিকারের অতীত"।

শঙ্করের ইহাই প্রকৃত মত। ব্রহ্ম, সগুণ হইয়াও নির্গুণ।

রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণের মতে, চিৎস্বরূপ সগুণ ঈশ্বরই—পরমব্রহ্ম। রামানুজ নির্গুণ অক্ষর ব্রহ্ম স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। তিনি ব্রহ্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। তাঁহাদের মতে মুক্ত জীবই স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—নির্গুণ অক্ষর তত্ত্ব। মুক্ত না হইলে জীব ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে না।

রামানুজাদি পণ্ডিতগণের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ—সমুদয় হেয়-গুণ-বিরহিত। অতএব সগুণ-ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব, তিনিই সমস্ত হেয়গুণবিহীন বলিয়া নির্গুণ অথবা, মুক্ত জীবই—অক্ষর বা নির্গুণব্রহ্ম।

* cf : "সর্ব্বকারণত্বাৎ বিকারধর্ম্মৈরপি 'বিশিষ্টঃ' পরমেশ্বরঃ"।
(ব্র০ সূ০, ১।১।২০)।

বন্দিনীর ব্যথা

—কবি বার্ণস্

প্রকৃতি আপনি শ্যামল বসনে
তরুরে সাজাল আজি
কাননের বুকে রচে আবরণ
সিত কুসুমের রাজি।

আলোর পরেশ ঝলকে তটিনী
গগণ উঠিছে হাসি,
শুধু এ আমার ক্লান্ত হৃদয়ে
পুলক পশে না আসি।

পাপিয়ার কল কাকলীর মাঝে
প্রভাত মেলিল আঁখি,
শুদ্ধ দুপুরে কুঞ্জে কোকিল
কুহরিছে থাকি থাকি।

তন্দ্রা-আকুল ধরণীর কানে
শ্যামা ঝঙ্কারে সুখে
সবাই স্বাধীন আমোদে মগন
নিরাশা নাহিক বুকে।

পত্রে পুষ্পে মর্ম্মর-ধ্বনি
জাগায় দখিণ বায়
বন্দিনী আমি ব্যথা তারি সনে
নিঃশ্বাসে মিশে যায়।

মোর তরে যেন নিদাঘ প্রদোষে
পরশ না আনে তার
শরৎ শস্যে সমীরের খেলা
না হেরে নয়ন আর

শীতের শীতল নিঃশ্বাস যেন
বহে মোর হিম দেহে
বসন্ত পুনঃ আসি যেন ফুলে
সমাধিরে ঢাকে স্নেহে।

—অনুবাদক—শ্রীকল্যাণকুমার সেন

সিংহাসন-ত্যাগের হুমকি

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের সংখ্যাধিক্য-দল ফেডারেশন গ্রহণ করিলে তিনি পদত্যাগ করিবেন। ইহা লইয়া বিশেষভাবে আলোচনা হইতেছে।

পুস্তক-পরিচয়

চুক্তির দাবী (উপন্যাস)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস এম, এ, প্রণীত, প্রকাশক শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী ; চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজবজ। প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয় এবং ২৭ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীটস্থ সাহিত্য-ভবন প্রেসে। মূল্য দুই টাকা। প্রচ্ছদপট, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ প্রশংসনীয়। ডিমাই ষোল-পেজী ফর্ম্মার আকারে ২৬৫ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত।

প্রবীণ গ্রন্থকার বঙ্গ-সাহিত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। ইনি অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার লেখা এখনও নিয়মিতভাবে বাহির হয়। এ কারণে ইঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া পরিচয় দিবার আবশ্যক হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য প্রতিভা ও প্রভাব কালীপ্রসন্ন বাবুর মধ্যে নিহিত আছে, এ কথা আলোচ্য গ্রন্থখানিই পাঠকের নিকট প্রমাণ করিবে। যাহা হউক, সে-ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্রিত আলোকপ্রাপ্ত সমাজের বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করিতেছি এবং নৈতিক অধঃপতন দেখিয়া সে-সমাজের উপর আমাদের কোন সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা নাই, গ্রন্থকার সেই সমাজের পারিপার্শ্বিক গলদ, দুর্ব্বলতা এবং হীন মনোবৃত্তির পরিচয় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন এবং বঙ্গজননীর এই সমাজ-বিস্ফোটকের উপর শস্ত্রোপচার করিয়া সুবিজ্ঞ প্রাণাচার্য্যের কার্য্য দেখাইয়াছেন। লোকশিক্ষার পক্ষে 'চুক্তির দাবী'র মূল্য আছে।

আলোচ্য গ্রন্থের আখ্যান ভাগ বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার যোগে এরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ওঠা দুঃসাধ্য। দরিদ্র সন্তান নরেন্দ্রকুমার রায়কে রমাকান্ত বাবু বহু অর্থব্যয় করিয়া বিলাত ফেরত বড় ডাক্তার করিয়া আনিলেন। এক মাত্র মেয়ে বিনতার সহিত তাহাকে বিবাহ দিবেন এই চুক্তি ছিল, কিন্তু ডাক্তার রায়ের যেমনই কার্য্যোদ্ধার হইল, তিনি সে চুক্তি পালন করিবেন না বলিয়া দৃঢ়-সঙ্কল্প করিলেন। রমাকান্তবাবু ব্যবসায়ী এবং বহু লক্ষ টাকার মালিক। তাঁহার এটর্ণী বিনোদকৃষ্ণ বাবুর আইনের মারপ্যাঁচে পড়িয়া ডাক্তার রায় প্রাণের দায়ে আত্মীয়-স্বজন ও গুরুপুরোহিতের অগোচরে বিনতাকে বিবাহ করিলেন। রমাকান্ত বাবু স্বীয় প্রতিশ্রুতি মত জামাতাকে লাখ টাকা যৌতুক দিলেন। কিন্তু ডাক্তার রায় বিনতাকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া "চুক্তির দাবী" নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। স্যর আর, ডি. ঘোষের কনিষ্ঠা কন্যা কৌমুদীর সর্ব্বনাশ করিয়া এবং বিবাহের চুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া কিরূপে নায়ক নরেন্দ্রনাথ প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও শঠতা দ্বারা কতিপয় জীবনকে বিষাক্ত করিয়া তুলিলেন, তাহা পড়িতে গিয়া অশ্রুসংবরণ করা যায় না।

যাহা হউক আখ্যান শেষ হইল পুরীর সমুদ্র-সৈকতভূমির একপ্রান্তে আসিয়া। এখানে নরেন্দ্রের ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। বীরেন্দ্র ও কৌমুদী প্রেমালিঙ্গনবদ্ধ হইল। কৌমুদীর কথায় নরেন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া শেষে সংজ্ঞা হারাইলেন। তাঁহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইয়া হতভাগিনী ও উপেক্ষিতা স্ত্রী বিনতা স্বীয় ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে স্বামীর লুপ্ত চৈতন্য ফিরাইয়া আনিল সত্য কিন্তু তাহার জীবন-নাট্যের যবনিকাপাত হইল। নরেন্দ্র অনুতাপের অনলে পুড়িতে লাগিলেন।

'চুক্তির দাবী'র শেষ দৃশ্যটির একস্থানে গ্রন্থকার যে সব কথা বিনতার মুখ বলাইয়াছেন তাহা অবাস্তব এবং অসম্ভব। যেমন—"...আমার প্রাণশক্তি ওঁর ঐ দেহে প্রবেশ করুক, জীবিত করে ওঁকে তুলুক...যাচ্ছে। জীবন-গ্রন্থি ঐ দেহ থেকে—না! যাবে না! যাবে না! যেতে দেব না! এস! এস!—আমার এই দেহে প্রাণশক্তির যে ধারা বইছ সব আমার ললাটে কেন্দ্রীভূত হয়ে এস। যাও—যাও! সব বেরিয়ে যাও! সব বেরিয়ে যাও! ঐ দেহে প্রবেশ কর" ইত্যাদি ; যে ইন্দ্রজালিক ব্যাপার এখানে গ্রন্থকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা প্রহসনের মতই মনে হয়। ট্র্যাজেডি না ঘটাইয়াও, "চুক্তির দাবী পূর্ণ করা যাইত। আশা করি, পরবর্ত্তী সংস্করণের সময় গ্রন্থকার এ বিষয়ে অবহিত হইবেন এবং ২৩১ পৃষ্ঠায় বিনতার মুখ দিয়া যে অসম্ভব কথা বলাইয়াছেন তাহা পরিবর্ত্তন করিবেন।

গ্রন্থকারের লিখন ভঙ্গী এবং 'চুক্তির দাবীর' ভাষা চিত্তাকর্ষক ; তবে স্থানে স্থানে শব্দ বিড়ম্বনা আছে। যাহা হউক, উপন্যাসখানিতে সত্য শিব-সুন্দরের পূজাই করা হইয়াছে। কামায়ন বা স্ত্রৈণ সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম এবং বাংলার উপন্যাস বুভুক্ষুগণও তৃপ্ত হইবেন এ ভরসা আমার আছে।

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অরণ্য পথ প্রবোধ কুমার সান্যাল। প্রকাশক, শ্রীগজেন্দ্রনাথ মিত্র, মিত্র পাবলিশিং হাউস, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। মূল্য এক টাকা।

প্রবোধ বাবু এ ধরণের বই লিখিয়া যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার গল্প উপন্যাস লিখিবার যশ অপেক্ষা কম নয়, বরং বেশী। পুস্তকখানি পড়িতে পড়িতে বার বার মনে হইয়াছে, দক্ষিণ-বিহারের সে নিবিড় অরণ্য পথের মধ্যে দিয়া নিজে যাইতেছি—অরণ্যের রহস্য চারিদিক্ হইতে আমাকে নিবিড় করিয়া ঘিরিয়াছে। অরণ্যের বাণী শুনিবার কর্ণ আছে প্রবোধ বাবুর, তাই মনে হইয়াছে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ এ বাণী এ ভাবে আমাদের শুনাইতে পারিত না। পুস্তক খানির মধ্যে কয়েকটি শিকার-অভিযানের কাহিনী এক সঙ্গে গ্রথিত করিয়া অরণ্য-প্রকৃতির একটি গম্ভীর রহস্যময় রূপ পাঠকের সম্মুখে ধরা হইয়াছে, সে রূপ সত্যই মানুষের মনকে বহুদূর লইয়া গিয়া ফেলে। পুস্তকের ছাপা ও বাঁধাই ভাল।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংবাদ ও মন্তব্য

সুভাষ বসুর পদত্যাগ

২৩শে জুন। মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মারফতে কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেস কর্তৃক নির্দ্ধারিত কার্য্য করা সম্ভব নহে বলিয়া কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপদ এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যানের পদত্যাগ করিয়াছেন।

আমরা সুভাষবাবুর পদত্যাগের যুক্তিটা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। 'লেডি টিচার ঘটনা'র মত রোমাঞ্চকর ব্যাপার না হক, কর্পোরেশনের ছোটবড় নানা প্রকার ব্যাপার লইয়া অনেকগুলি কাগজে জনসাধারণের মুখরোচক তীব্র আলোচনা চলিতেছিল। কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কার্য্যপদ্ধতি ইহার জন্য দায়ী নহে, কারণ, কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের মারফতে এতকাল কংগ্রেসের নির্দ্ধারিত কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কর্পোরেশন পরিচালনা করা সম্ভব হয় নাই, পদত্যাগ করিয়া মিঃ বসু কি এই কথাটাই প্রমাণ করিতে চাহেন? কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে কংগ্রেসের মুখ-রক্ষা করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক বটে!

সুভাষ বাবুর পদত্যাগের হুম্‌কি ও মিঃ এস. সত্যমূর্ত্তি

৯ই জুলাই। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেস যদি ফেডারেশন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে তিনি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করিবার জন্য কংগ্রেসের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিবেন। সেণ্ট্রাল অ্যাসেম্বলির কংগ্রেস দলের নেতা মিঃ এস, সত্যমূর্ত্তি এতৎসম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, কংগ্রেসকে এভাবে ভয় প্রদর্শন করা কংগ্রেসের সভাপতির উপযুক্ত কার্য্য নহে। মিঃ গান্ধী পর্য্যন্ত কোনদিন এরূপ করেন নাই। মন্ত্রিত্ব বিরোধী পণ্ডিত জওহরলালও কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে পদত্যাগ করেন নাই, বরং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দেশীয় নেতৃবর্গ বাদ-প্রতিবাদ সমস্যার বিচার, মতামত-প্রচার প্রভৃতিতে যে ধরণের যুক্তি ব্যবহার করিয়া থাকেন, মিঃ সত্যমূর্ত্তির বিবৃতি হইতে পাঠকবর্গ তাহার পরিচয় পাইবেন। মিঃ সত্যমূর্ত্তির মতে কংগ্রেসকে ভয় দেখাইয়া মিঃ বসু অন্যায় করিয়াছেন, কারণ, মহাত্মা গান্ধীও কোন দিন এরূপ কাজ করেন নাই। মিঃ বসুর কাজটা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিতে চাহি না, আমরা কেবল মিঃ সত্যমূর্ত্তিকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, কোন নেতার কোন কার্য্য উচিত হইয়াছে কি অনুচিত হইয়াছে তাহা কি কেবল গান্ধীজী কি করিয়াছেন না করিয়াছেন তাহা দ্বারা স্থির করা হইবে? মিঃ সত্যমূর্ত্তি কি জানেন না যে, কংগ্রেসকে প্রকাশ্যভাবে ভয় দেখাইবার প্রয়োজন গান্ধীজীর কখনও আসে নাই, এরূপ কৌশলেই তিনি কংগ্রেসকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন! পণ্ডিত জওহরলাল সম্পর্কে মিঃ সত্যমূর্ত্তি যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা পণ্ডিতজীর পক্ষে প্রশংসার বিষয় বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। ক্ষণে ক্ষণে মত পরিবর্ত্তন করা দেশের ভাল-মন্দের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত নেতার পক্ষে সাজে না। যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য; নেতার কর্ত্তব্য নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি দ্বারা প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুসারে কাজ করিয়া যাওয়া।

রাজনৈতিক অশান্তি ও শ্রমিক অশান্তি

ভারত গবর্ণমেণ্টের শ্রম-বিভাগ হইতে প্রকাশ, ১৯৩৭ সালে ৩৭০টি ধর্ম্মঘট হইয়াছিল, ৬৮০০০ জন শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল এবং মোট ৮৯৮২০০০ দিনের কাজ নষ্ট হইয়াছিল।

১৯৩৬ সালের হিসাব হইতে আমরা জানিতে পারি ঐ বৎসর অপেক্ষা ১৯৩৭ সালের শ্রমিক ধর্ম্মঘট ও আনুষঙ্গিক দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি অশান্তি বহু পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার হিসাব ধরিলে দেখা যায় ১৯২১ সালেও ১৯৩৬ সাল অপেক্ষা ধর্ম্মঘট, দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রভৃতি অনেক বেশী হইয়াছিল। জগদ্ব্যাপী অশান্তির মধ্যে কেবল শ্রমিক-অশান্তি ধরিয়া বিচার করিলেও, মানুষের জীবন-ধারণের

পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির নিদারুণ অভাবই যে সমস্ত অশান্তির মূল কারণস্বরূপ আমাদের নিকট প্রকট হইয়া পড়ে, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষের এই নিদারুণ অভাবের ফলে মানুষের মধ্যে যে অশান্তি ও অসন্তোষ দেখা দিয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইবার জন্যও এক শ্রেণীর লোক যে ওৎ পাতিয়া থাকে, ধর্ম্মঘটের হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব হইতে তাহাও আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। হিসাব মতে ১৯৩৭ সালের পূর্ব্বে ১৯২১ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। ১৯২১ সালে সর্ব্বপ্রথম অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। আবার ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষে প্রোভিন্সিয়াল অটোনমী বা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক অশান্তি আরম্ভ হইলে অথবা রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সূচনা হইলে একদল লোক অন্নাভাবে জর্জ্জরিত শ্রমিকদের নানা প্রকার অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দিয়া ধর্ম্মঘটে প্রবৃত্ত করায় এবং নিজেরা কিছু লাভ করিয়া লয়।

সংবাদপত্র সম্পর্কে স্যর হোমী মোদী

সম্প্রতি বোম্বাই-এ ইউরোপীয়ান অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ্ গ্রুপের উদ্যোগে একটি তর্ক-সভার অধিবেশন হয়। তর্কের বিষয় ছিল—'সংবাদপত্রসমূহ আমাদের অভিশাপ স্বরূপ'। তর্ক-সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে স্যর হোমী মোদী বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্র না থাকা সত্ত্বেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমরাই বা তাহা করিতে পারিব না কেন?

স্যর মোদীকে আমরা একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব, সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইবার জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সংবাদপত্রের প্রয়োজন হয় নাই সত্য, কিন্তু সংবাদপত্র না থাকিলেই আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত সুখে-শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিব, ইহা কি তিনি বিশ্বাস করেন? সংবাদপত্র তুলিয়া দেওয়া ছাড়া আর কিছুই আমাদের করিতে হইবে না? আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সংযম, নিষ্ঠা, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক রীতিনীতি প্রভৃতি না হইলেও চলিবে? স্যর মোদী যে তর্ক সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা নিছক তর্ক-সভা কি না জানি না, কিন্তু যদি সত্য সত্যই কোন সমস্যা লইয়া সেখানে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় ও সত্য-নির্ণয়ের চেষ্টা চলে, তাহা হইলে প্রত্যেক সমস্যার বিচারের সময় যুক্তির দিকে একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে। আধুনিক যুগের সংবাদপত্রগুলি মানুষের পক্ষে অভিশাপস্বরূপ সন্দেহ নাই—কিন্তু মানুষের আরও অনেক অভিশাপ আছে। সেই অভিশাপগুলি দূর করিবার উদ্দেশ্যে আধুনিক সংবাদ-পত্রগুলিকে সংস্কৃত করিয়া কার্য্যে লাগাইলে এখন যাহা অভিশাপ তাহা আশীর্ব্বাদ হইয়া উঠিতে পারে।

স্বাধীনতার সংগ্রামের দুই অবস্থা সম্পর্কে মিঃ ভুলাভাই দেশাই

গত ২৬শে জুন বোম্বাই-এ কংগ্রেস-ভবনে পতাকা উত্তোলন করা উপলক্ষে মিঃ ভুলাভাই দেশাই তাঁহার পাশ্চাত্য-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুইটি অবস্থা আছে। প্রথমতঃ, স্বাধীনতা অর্জ্জন করা, দ্বিতীয়তঃ, অর্জ্জিত স্বাধীনতা বজায় রাখা। জনসাধারণকে এই উভয় অবস্থার জন্য শিক্ষিত ও প্রস্তুত করিতে হইবে, কারণ, স্বাধীনতা রক্ষা করা স্বাধীনতা অর্জ্জন করা অপেক্ষা কম গুরুতর ব্যাপার নহে।

মিঃ দেশাই কি পাশ্চাত্য-ভ্রমণের ফলে এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, আমরা বলিতে বাধ্য হইব, পাশ্চাত্যের পরাইয়া-দেওয়া চশমার ভিতর দিয়া দেশের সমস্যাকে দেখিবার যে অভ্যাস দেশীয় নেতাগণের আছে, তাহা সমগ্রভাবে নিন্দনীয় নহে, কিছু প্রশংসারও যোগ্য। কিন্তু আমাদের সন্দেহ জাগিতেছে, মুখে কথাটা বলিলেও মিঃ দেশাই কথাটা তলাইয়া বুঝিয়া দেখেন নাই, কারণ এই বক্তৃতাতেই তিনি যে সকল উত্তেজনাকর উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তিদ্বারা জনসাধারণকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহার সহিত এই কথাটার অন্তর্নিহিত সত্যের সামঞ্জস্য নাই। স্বাধীনতা অর্জ্জন ও স্বাধীনতা রক্ষার উপযোগী করিয়া যিনি দেশবাসীকে গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহার মুখে যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস কি শোভা পায়?

হিটলার সম্পর্কে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'

সম্প্রতি সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট মিঃ জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'হের হিটলার এবং মুসোলিনী সম্পর্কে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা

একমাত্র হিটলার ও মুসোলিনীর উপর নির্ভর করিতেছে। হিটলার অত্যন্ত হিসাবী লোক, যুদ্ধ না বাধাইয়া কতদূর অগ্রসর হওয়া চলিবে তিনি তাহা সঠিক জানেন। কিন্তু হিটলার এখন চরম সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবার তিনি যাহা করিবেন তাহাতেই হয়ত বিবাদ বাধিয়া যাইবে।

মিঃ বার্ণার্ড শ' যাহা বলেন, স্পষ্ট করিয়া বলেন যুক্তিযুক্ত কথাই হোক, আর নিছক তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত হোক, ভাসাভাসা ভাবে দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কথা বলার অভ্যাস তাঁহার নাই। কিন্তু বার্ণার্ড শ'র নাম যে ছড়াইয়াছে, তাহা কেবল তাঁহার কাটা কাটা কথা বলিবার ক্ষমতার জন্য নয়, অন্য সকলে যাহা বলে তাহার বিপরীত কথা বলিবার জন্য। এ ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পুরাতন পচা কথাটা তিনি বলিলেন কেন, বুঝা গেল না। কে না জানে যে, ইউরোপের আন্তর্জাতিক সংগ্রাম হিটলার বা মুসোলিনী যে কোন মুহূর্ত্তে বাধাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু সহজে বাধাইবেন না? বয়সের জন্য কি নূতন-কিছু বলিবার অভ্যাসটা মিঃ শ' ত্যাগ করিয়াছেন?

পল্লী-উন্নয়ন ও রবীন্দ্রনাথ

প্রকাশ, গত ১০ই জুলাই বাঙ্গালার মন্ত্রী মিঃ হাসান সুরাবর্দ্দী ও তাঁহার ভ্রাতা প্রফেসর সাহেদ সুরাবর্দ্দী শান্তি নিকেতনের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্য-সমিতিকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। অতঃপর ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পল্লী-উন্নয়ন-কার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়।

পল্লী-উন্নয়ন কার্য্য সম্বন্ধে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত আলোচনার প্রয়োজন বা সার্থকতা আমরা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহ উপগ্রহ দেখিয়া এ যুগের বৈজ্ঞানিকগণ গ্রহ উপগ্রহ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বাঙ্গালার তথা ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ততটুকু জ্ঞানও আছে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গালার আয়তন-বৃদ্ধির প্রয়োজন সম্পর্কে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

গত ৭ই জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস লিটারারী কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থনীতি-শাখার সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার কৃষির অধঃপতন এবং ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই অবস্থায় কেবলমাত্র আসামের আদিম বনভূমির কৃষিকার্য্যের বিস্তার এবং পশ্চিমাঞ্চলের যে অংশের সহিত বাঙ্গালা কৃষ্টিগত ও ঐতিহাসিক একত্ব দাবী করিতে পারে, সেই অংশে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা দ্বারাই কেবল বাঙ্গালী লাভহীন কৃষিকার্য্য ও জাতিগত অধঃপতনের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

গত ৭ই জুলাই ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস লিটারারী কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে অর্থনীতি-শাখার সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালার কৃষি ও শিল্পের মধ্যে সাম্য স্থাপনের জন্য লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ গ্র্যাফাইট ও অন্যান্য মূল্যবান্ ধাতব পদার্থে সমৃদ্ধ বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মানভূম, সিংহভূম এবং সাঁওতাল-পরগণাকে পুনরায় বাঙ্গালার সহিত সংযুক্ত করিতেই হইবে। কৃষির অধঃপতন এবং ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গালার দুই-তৃতীয়াংশ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই অবস্থায় কেবলমাত্র আসামের আদিম বনভূমিতে কৃষিকার্য্যের বিস্তার এবং পশ্চিমাঞ্চলের যে অংশের সহিত বাঙ্গালা কৃষ্টিগত ও ঐতিহাসিক একত্ব দাবী করিতে পারে, সেই অংশে শিল্পোন্নতির ব্যবস্থা দ্বারাই কেবল বাঙ্গালী লাভহীন কৃষিকার্য্য ও জাতিগত অধঃপতনের হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে।

ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যে আধুনিক অর্থনীতি-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালার সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, জগতের কোথাও সেই অর্থনীতি-শাস্ত্রের সাহায্যে আজ পর্য্যন্ত কেহ মানুষের কোন সমস্যার সঠিক সমাধান করিতে পারিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। বাঙ্গালার কৃষিকার্য্য যে বাঙ্গালার কৃষকের পক্ষে লাভজনক নহে, ইহা ডাঃ মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু কেন যে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা তিনি জানেন বলিয়া ভরসা হয় না, কারণ, জানিলে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য তিনি আসামের জঙ্গলে কৃষিকার্য্য বিস্তার করিবার পরামর্শ প্রদান করিতে ইতস্ততঃ করিতেন। কৃষিকার্য্য যে কৃষকের পক্ষে লাভজনক হইতেছে না তাহার কারণ, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট হইয়া যাওয়া। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা না করিয়া আসামের জঙ্গলে কৃষিকার্য্য বিস্তার করিয়া কোনই লাভ হইবে না—বরং প্রয়োজনীয় পরিমাণ বনভূমির অভাব হইবার দরুণ শেষ পর্য্যন্ত দেশের নিদারুণ অনিষ্টই সাধিত হইবে। এদিকে কৃষিকার্য্য যদি কৃষকের পক্ষে লাভজনক না হয়, শিল্পোন্নতির ব্যবস্থাও তাহা হইলে সম্ভব হইতে পারে না। বাঙ্গালার অর্থনীতিবিদ্‌গণ যদি কৃত্রিম প্রকৃতিবিরুদ্ধ উপায়ে বাঙ্গালার আয়তন-বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বাঙ্গালার জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি-বৃদ্ধির ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দেন, বাঙ্গালা দেশ তাহাতে উপকৃত হইবে।

তীর্থযাত্রী

[শিল্পী—শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"
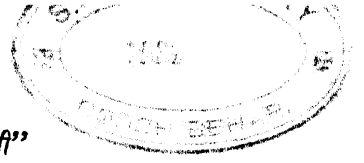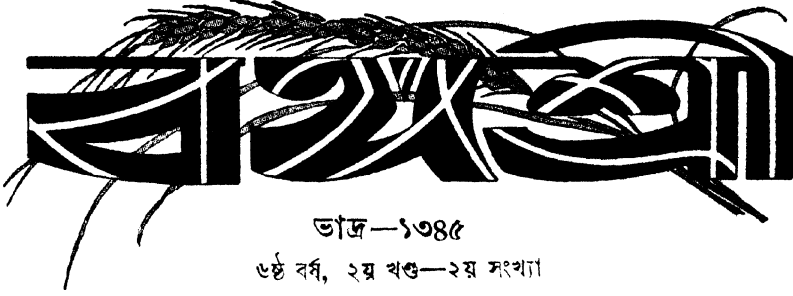
ভাদ্র—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড—২য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

[শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত]

দায়িত্ব কাহার?

ভারত ও ভারতবাসীর অবস্থা ও ভবিষ্যৎ-নির্ণায়ক যে সমস্ত ঘটনা গত এক মাসে ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যাপার কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) উত্তরবঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের অতি-বৃষ্টি ও জলপ্লাবন এবং তৎসঙ্গে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবিগণের অনশন ও বিভিন্ন রকমের দুর্দ্দশা।

(২) যুক্ত-প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং মান্দ্রাজে অতি-বৃষ্টি ও জলপ্লাবনের আশঙ্কা এবং শস্যের ক্ষতি।

(৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি কয়েকস্থানে অনাবৃষ্টি এবং কৃষকগণের মনে শস্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশঙ্কা।

(৪) শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বেকারের বৃদ্ধি।

(৫) অন্তরীণ-আবদ্ধ যুবকগণের মধ্যে আরও কয়েকজনের মুক্তি, তাহাদের মধ্যে বেকার সংখ্যার বৃদ্ধি এবং উহাদের পরিবারবর্গের দুর্দ্দশার বৃদ্ধি।

(৬) কোন কোন গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কৃষকগণের দুর্দ্দশা-মোচনকল্পে অধিকতর পরিমাণে তাহাদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা।

(৭) গান্ধিজী কর্ত্তৃক মধ্য-প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী ডাঃ খারের বিচার এবং তাঁহার পদত্যাগ।

(৮) ডাঃ খারের পদত্যাগে নাগপুরের ছাত্রগণের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং ভারতের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রসমূহের ক্ষোভ-প্রকাশ।

(৯) বাঙ্গালার মন্ত্রিমণ্ডলকে জনসাধারণের সমক্ষে অপ্রিয়ভাজন করিবার উদ্দেশ্যে মিঃ সুভাষচন্দ্র বসুর অধিনায়কত্বে কলিকাতার টাউন হলের সভা এবং জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার কোন চেষ্টা হইতেছে না বলিয়া তাহার দায়িত্ব মন্ত্রিমণ্ডলের স্কন্ধে আরোপ করা।

(১০) মুসলমানগণের পক্ষ হইতে মিঃ সুভাষচন্দ্রের উপরোক্ত সভার উক্তিসমূহের প্রতিবাদ এবং ইহার ফলে যদি জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্যের উদ্ভব হইয়া শান্তিভঙ্গ অথবা রক্তারক্তি

ঘটে, তাহা হইলে তজ্জন্য কংগ্রেস-পক্ষ দায়ী হইবেন, এতাদৃশ ভীতি-প্রদর্শন।

(১১) মুসলিম লীগের কার্য্যকরী সভার অধিবেশন এবং হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস পক্ষ হইতে যে চিঠির ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার উত্তর-প্রদান।

এই এগারটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রায় প্রত্যেকটি দৈনিক সংবাদপত্রসমূহে বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। এই ঘটনাগুলি তলাইয়া চিন্তা করিতে বসিলে সহজেই মনে হয় যে, অন্যান্য বৎসরের বর্ষাকালের মত এ বৎসরের বর্ষাকালেও ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই নদ ও নদীগুলির বক্ষে জলপ্লাবন দেখা দিয়াছে। এই জলপ্লাবনের বিস্তৃতি অন্যান্য বৎসরের তুলনায় অধিক কি না, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ বিস্তৃতি অধিকতর না হইলেও উহা যে কোন বৎসরের তুলনায় কম নহে এবং উহার তীব্রতা যে অধিকতর, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বর্ষাকালের এই প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী ও তাহাদের প্রতি নির্ভরশীল মধ্যবিত্তগণের মধ্যে অনশন ও অর্থাভাব তীব্রাকারে দেখা দিয়াছে। কৃষি ও কৃষকগণের এতাদৃশ অবস্থা দেখিলে মনে হয় যে, বর্ষাকালে নদীর জলপ্লাবন যেন একটি নিত্য-ঘটনারূপে দাঁড়াইয়াছে এবং কৃষি ও কৃষকের ধ্বংস যেন ভগবানেরই ঈপ্সিত।

এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে আমাদের গভর্ণমেণ্ট ও নেতৃবর্গ কি করিতেছেন, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে তাঁহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানানুযায়ী কোন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু নেতৃবর্গের পক্ষ হইতে কতকগুলি চর্ব্বিত-চর্ব্বণের পুনরুল্লেখ ছাড়া আর কোন চেষ্টায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

"যাহাতে কৃষকগণের দুরবস্থা দূর হয়, তাহা আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে করিতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন হইলে এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে", অথবা "যে মন্ত্রিমণ্ডল শ্রমজীবিগণের দুর্দ্দশা অপনয়নের জন্য চেষ্টা করে না, সেই মন্ত্রিমণ্ডল জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের অথবা সমগ্র জনসাধারণের অনাস্থার যোগ্য", এবংবিধ অনেক চর্ব্বিত-চর্ব্বণ ও ফাঁকা কথা আমাদের নেতৃবর্গের মুখে শুনা গিয়াছে বটে, কিন্তু কোন্ উপায়ে কৃষক প্রভৃতি শ্রমজীবী সকল এতাদৃশ জলপ্লাবনের অথবা দুর্দ্দশার হাত এড়াইতে পারে, তদ্বিষয়ক কোন গবেষণায় প্রবৃত্ত যে কোন নেতা করিতেছেন, তাহার কোন সাক্ষ্য তাঁহাদিগের চালচলন হইতে বুঝা যায় না।

এই নেতৃবর্গ জাতীয়তা-গঠনের ও একতা-সাধনের কথা মুখে বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা এতদ্বিষয়ে যাহা যাহা করিয়া থাকেন, তাহার প্রায় প্রত্যেক কার্য্যটী জাতীয়তা ধ্বংসের ও অনৈক্য-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত কোন ক্ষমতা ইঁহাদের হস্তগত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত ইঁহারা ব্রিটিশার, লিবারেল প্রভৃতি অন্যান্য দলের সহিত পশুর মত কলহ করিতে সঙ্কোচ বোধ না করিলেও নিজেদের মধ্যে কলহ করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন। কিন্তু, যে দিন হইতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইঁহাদের হস্তগত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ইঁহাদের নিজেদের মধ্যে কলহ করিবার কুণ্ঠাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। মিঃ নরিম্যান ও ডাঃ খারের প্রতি মিঃ গান্ধির ব্যবহার আমাদের উপরোক্ত অভিযোগের অন্যতম দৃষ্টান্ত।

ইঁহারা মুখে ফ্যাসিজম্, নাৎসিজম্, ডিক্টেটরশিপ প্রভৃতির বিরোধী কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ যাহা করেন, তাহাতে পুরা ফ্যাসিজম্, নাৎসিজম্ এবং ডিক্টেটরশিপের প্রতি অনুরাগেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

টাউন হলের সভায় হক-মন্ত্রিমণ্ডলের সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার অধিবেশনে—কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা মিঃ সুভাষচন্দ্রের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে যে মনোভাব বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে হয়, উহা একদিকে যেরূপ অন্যান্য দলের প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক এবং তদনুসারে জাতীয়তা গঠনের পরিপন্থী, অন্য দিকে আবার ডিক্টেটরশিপের প্রতি আকৃষ্টতার সাক্ষ্য।

জলপ্লাবন বশতঃ কৃষকগণ যাদৃশ দুরবস্থায় নিপতিত হয়, তাহার প্রতিকারের জন্য রাজপুরুষগণ তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি অনুযায়ী কোন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, রাজপুরুষগণের ঐ ঐ কার্য্যে কৃষকগণের দুরবস্থা দূর হওয়া তো দূরের কথা, তাহাদের দুর্দ্দশা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

কৃষকগণের দুরবস্থা-মোচনকল্পে রাজপুরুষগণ যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইটি কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য, যথা—(১) ব্যাপকভাবে কৃষকগণ যাহাতে অধিকতর পরিমাণে ঋণ পায় এবং এতাবৎ তাহারা যে সমস্ত ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা যাহাতে শীঘ্র পরিশোধ করিতে তাহারা বাধ্য না হয় তাহার ব্যবস্থা, (২) কৃষকগণ যাহাতে অনায়াসে তাহাদের জমি হস্তান্তরিত করিতে পারে এবং তজ্জন্য জমিদারগণকে যাহাতে সেলামীরূপে কিছু না দিতে হয় তাহার ব্যবস্থা। এই দুইটি কার্য্যে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশসমূহে যেরূপ হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে, সেইরূপ আবার কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের দ্বারা শাসিত প্রদেশসমূহেও সমানভাবেই ইহা গ্রহণ করা হইয়াছে। কাযেই, এই দুইটি কার্য্য সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, উহা যেরূপ গান্ধিজী-পরিচালিত কংগ্রেসের অনুমোদিত, সেইরূপ আবার কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দ্বারাও পরিগৃহীত। অথচ, এই দুইটি ব্যবস্থার পরিণাম কৃষকের পক্ষে কিরূপ হইতে পারে, তদ্বিষয়ে দূরদর্শিতার সহিত চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ইহার একটির দ্বারাও প্রকৃতপক্ষে কৃষকগণের কোন হিত সাধিত হওয়া তো দূরের কথা, তাহাদের অপকারই সাধিত হইবে।

কৃষকগণ যাহাতে ব্যাপকভাবে অধিক পরিমাণে ঋণ পায় এবং ঐ ঋণ যাহাতে তাহারা সহজে পরিশোধ করিতে বাধ্য না হয়, এতাদৃশ ব্যবস্থার ফলে কৃষকগণের ঋণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং তাহাদিগের মধ্যে অসাধুতা, প্রতারণাও অধিকতর মাত্রায় ছড়াইয়া পড়িবে। কৃষকগণের ঋণগ্রস্ততা লইয়া এক্ষণে সর্ব্বত্রই হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছে বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় কৃষকগণ যে পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর আগে তাহাদের মধ্যে তাহার বিংশতি ভাগের একভাগ পরিমাণের ঋণও বিদ্যমান ছিল না। যে ভারতীয় কৃষকগণের মধ্যে একদিন প্রায়শঃ ঋণের ব্যাপার একরূপ অজ্ঞাত ছিল, সেই ভারতের কৃষকগণ ক্রমে ক্রমে এতাদৃশ ভয়াবহ পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িল কেন, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ দুইটি, যথা—(১) প্রতিবিঘার উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের হ্রাসবশতঃ কৃষকগণের পর্য্যাপ্ত আয়ের অভাব এবং তদ্বিষয়ক উন্নতির প্রযত্নাভাব, (২) ঋণ প্রদান করিবার জন্য কো-অপারেটিভ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তরোত্তর প্রসার-সাধন। অভাবগ্রস্ত লোকের যাহাতে অভাবের কারণ দূরীভূত হয়, তাহা না করিয়া সহজে যাহাতে ঋণ জুটে এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলে যে তাহাদের ঋণ-গ্রহণ এবং অপটুতা বৃদ্ধি পায়, ইহা সহজেই অনুমান করা যাইবে।

অভাবগ্রস্ত কৃষক যাহাতে অনায়াসে তাহাদের জমি হস্তান্তরিত করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকিলে যে কৃষকগণের পক্ষে জমিশূন্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়, ইহাও সহজে বুঝা যাইতে পারে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহে দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে যাহা ঘটিতেছে এবং ঐ অবস্থার উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট ও দেশীয় নেতৃবর্গ যাহা করিতেছেন, তাহা উপরোক্তভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, দেশবাসীর প্রত্যেক স্তরের মানুষের আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা উত্তরোত্তর ভয়াবহ পরিমাণে হীনতাপ্রাপ্ত হইতেছে এবং তাহার প্রতিকারকল্পে গভর্ণমেণ্ট অথবা কংগ্রেসের নেতৃবর্গ কোনরূপ স্বাধীন গবেষণায় প্রযত্নশীল হইতেছেন না। দেশের সকলেই মুখে মুখে স্বাধীনতার কথা উড়াইয়া থাকেন বটে, কিন্তু গান্ধিজী হইতে আরম্ভ করিয়া হ্যাটকোট, চোগা-চাপকান, খদ্দর, আচকান, টিকি ও নামাবলী অথবা জি. ও. সি.-র পোষাকধারী ও বর-শয্যার সহিত তুলনার উপযোগী খদ্দরের টুপী-পরিহিত যে কোন নামকরা নেতার দিকে লক্ষ্য করা যাউক না কেন, কাহারও মুখে পাশ্চাত্য দেশের চর্ব্বিত-

চর্ব্বণ ছাড়া স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত নিজস্ব কোন কথা শুনা যায় না। ইহাঁরা কেহ বা স্বদেশপ্রেমিক, কেহ বা বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক নামে দেশবাসীর নিকট হইতে করতালি এবং বাহবা আদায় করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাঁদের কৃতকর্ম্মসমূহের প্রত্যেকটির ফলে দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা উত্তরোত্তর অধিকতর মাত্রায় শঙ্কাপ্রদ হইয়া পড়িতেছে। যাঁহাদিগের আচার-ব্যবহার ব্যভিচারিণীগণের আচার-ব্যবহারের সহিত তুলনীয়, সমাজের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত রমণীগণ একদিন সমাজ-পরিত্যক্তা হইয়া, অস্পৃশ্যা হইয়া থাকিতে বাধ্য হইতেন, তাঁহাদিগের সহিত অবাধে মেলামেশা করিয়া প্রায়শঃ এই নেতৃবর্গের মস্তিষ্কের শ্বেতাংশ এতাদৃশ পরিমাণে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, ইহাঁরাই যে দেশের ও দেশবাসীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন, তাহা পর্য্যন্ত ইহাঁরা বুঝিতে পারেন না। পাশ্চাত্ত্য দেশের চর্ব্বিত-চর্ব্বণে যে, কোন দেশের কোন মানুষের কোনরূপ স্থায়ী উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে পর্য্যন্ত বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় কোন পন্থায় যদি কোন মানুষের স্থায়ী হিত হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে ঐ পাশ্চাত্ত্য দেশবাসিগণের অবস্থা উত্তরোত্তর এত হীন হইতে পারিত না। অথচ, এই সাধারণ সত্য পর্য্যন্ত এখন আর ঐ গান্ধীজীপ্রমুখ নেতৃবর্গের মধ্যে প্রায়শঃ কাহারও বুদ্ধিগম্য নহে।

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অবস্থা কেন উত্তরোত্তর এতাদৃশ হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে এবং কেন উহার উন্নতি-কর পরিবর্ত্তন সাধন করা সম্ভব হইতেছে না, তদ্বিষয়ে আলোচনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

আমরা একাধিক সন্দর্ভে দেখাইয়াছি যে, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণের প্রত্যেক স্তরের মানুষের মধ্য হইতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং মানসিক শান্তির অভাব সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হইয়াছিল এবং তখনকার প্রায় প্রত্যেক মানুষটি আর্থিক প্রাচুর্য্য, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের শান্তি, দীর্ঘ-যৌবন এবং দীর্ঘ-জীবন আজীবন কাল উপভোগ করিত। শুধু এ দেশের মানুষ কেন, জগতে মানব-সমাজের প্রায় প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে মুক্ত হয়, তাহার চেষ্টা ভারতীয় ঋষিগণ একদিন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের চেষ্টার ফলে জগতের সর্ব্বত্রই আর্থিক প্রাচুর্য্য প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছিল। যে মনুষ্য-সমাজে একদিন আর্থিক প্রাচুর্য্য প্রভৃতি প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুটি যাহাতে প্রত্যেক মানুষটি লাভ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল, সেই মনুষ্য-সমাজ এতাদৃশ অবস্থায় উপনীত হইল কেন এবং চেষ্টা করিয়াও এই অবনতির গতি পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব হইতেছে না কেন, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটী, যথাঃ—(১) ঋষিগণের বিজ্ঞান ও দর্শন-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের সম্বন্ধে টিকিধারী পণ্ডিতগণের অবহেলা, এবং (২) হ্যাট-কোটধারী অথবা সতর্কতার সহিত অসতর্কোপম বেশ-পরিহিত, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ-মিলন-প্রয়াসী আধুনিক পণ্ডিত ও নেতৃবর্গের তাণ্ডব নৃত্য।

দেশ ও দেশবাসী যাহাতে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার পায়, তাহা করিতে হইলে যাঁহারা অসংযমী এবং অসাধু, যাঁহারা মুখে ব্রহ্মচর্য্যের কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ব্যভিচারিণীর সহিত তুলনীয় স্ত্রীলোকগণকে লইয়া তথাকথিত আশ্রম পরিচালনা করিয়া থাকেন, যাঁহারা মুখে চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াও কার্য্যতঃ চরিত্রহীনতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, তাঁহারা যাহাতে দেশবাসীর নেতৃত্বের সম্মান কথঞ্চিৎ পরিমাণেও লাভ করিতে না পারেন এবং অল্পপক্ষে যাহাতে নেতৃবর্গের মধ্যে স্বাধীন গবেষণা ও প্রকৃত সাধনার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

বর্ত্তমান বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও নেতৃবর্গ প্রায়শঃ যেরূপ চরিত্রহীন ও সাধনাহীন, তাহাতে তাঁহারা যাহাতে নাড়াচাড়া পান, তাহা করিতে না পারিলে আমাদিগের রক্ষার কোন উপায় নাই, ইহা জনসাধারণকে সর্ব্বাগ্রে বুঝিতে হইবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা

শিক্ষা সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তার ধারা এবং তাহার দুষ্টতা

দেশের মধ্যে যাঁহারা গণ্য ও মান্য, তাঁহাদের অনেকেই আজকাল শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা এই বিষয়ে যে সমস্ত কথা কহিয়া থাকেন, তাহার অনেক কথাই গভীর চিন্তাপ্রসূত নহে, পরন্তু অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক। এই কথাগুলির অধিকাংশই একেত' কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে, তাহার উপর আবার উহা কার্য্যে পরিণত হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে শুভজনক হইতে পারে না। যাঁহারা এতাদৃশ বিকৃতভাবে শিক্ষা-বিষয়ে মানব-সমাজকে উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রতিষ্ঠাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের উপদেশসমূহও অনেক স্থলে অন্ধভাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধাকর্ষণ করিয়া থাকে। এইরূপে যাঁহারা আমাদের শ্রদ্ধেয় ও উপদেষ্টা, প্রায়শঃ তাঁহারাই আমাদিগকে বিকৃত উপদেশ প্রদান করিয়া, বিকৃত পথে লইয়া যাইতেছেন। ইহারই ফলে মানুষ শিক্ষিত হইয়াও প্রায়শঃ শিক্ষার সুফল লাভ করিতে পারে না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করিয়াও নফরগিরী না করিয়া স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থানে পর্য্যন্ত সক্ষম হয় না। সমাজের মধ্যে যে অন্নাভাব, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু উত্তরোত্তর এত বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও অন্যতম কারণ, শিক্ষাগুরুগণের অনুপযুক্ততা এবং অপরিণামদর্শিতা।

দেশের মধ্যে যাঁহারা শ্রদ্ধেয় এবং শিক্ষাবিষয়ে উপদেষ্টা, তাঁহাদের উপদেশগুলি যে প্রায়শঃ গভীর চিন্তাপ্রসূত নহে, পরন্তু অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা আধুনিক কালের যে কোন উপদেষ্টার উপদেশ বিশ্লেষণ করিলে প্রমাণিত হইতে পারে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতে স্যাডলার কমিশন প্রভৃতি যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য কমিশনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার সভ্যগণ যে-সমস্ত মন্তব্য লিখিয়া রাখিয়াছেন, উহার যে কোনটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমাদের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবে। কোন কমিশনের মন্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা বর্ত্তমানে আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বাৎসরিক কনভোকেশনের বক্তৃতায় এবং প্রতিষ্ঠাপন্ন নেতৃবর্গের প্রবন্ধাদিতে শিক্ষাবিষয়ে আমাদিগকে যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা কিরূপ বিকৃত এবং অপরিণামদর্শিতার পরিচায়ক, তাহা দেখান এই সন্দর্ভের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

গত এক মাসের মধ্যে ভারতবর্ষে শিক্ষাবিষয়ক যে কয়েকটি বক্তৃতা ও প্রবন্ধ দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ও স্যর আকবর হাইদারীর বক্তৃতা, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে স্যর মির্জ্জা ইস্মাইলের বক্তৃতা, হরিজন পত্রিকায় মিঃ গান্ধীর 'A Clarification (অর্থাৎ, একটি বিশদ বিবৃতি)' নামক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের মন্তব্য যে সর্ব্বতোভাবে যুক্তিযুক্ত, তাহা ঐ তিনটি বক্তৃতা এবং একটি প্রবন্ধ বিচার করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে যে কয়টি বক্তৃতা প্রদান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতা সর্ব্বাধিক চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। স্যর রবার্ট রীড পর্য্যন্ত তাঁহার অভিভাষণে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তৃতার কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতার সারমর্ম্ম এই যে, "দেশের মধ্যে যত কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে এবং দেশবাসী যে কোন অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, তাহার প্রত্যেকটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অন্যায় ভাবে দোষারোপ করা হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়কে এই অবস্থার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জ্ঞান ও শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হয় উহার উপকারিতার (utility) তৌলের দ্বারা, আর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে-সমস্ত মানুষ শিক্ষিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের

মূল্য নির্দ্ধারিত হয়, পরবর্ত্তী জীবনের পার্থিব সাফল্যের তৌলের দ্বারা। ইহাও সঙ্গত নহে। এই স্রোতের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে স্কুল অথবা কলেজ নহে এবং ইহা যে ব্যবসায়-শিক্ষার স্থান নহে, তাহা স্পষ্টভাষায় প্রচারিত হওয়া সঙ্গত। ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ পৃথক্। জ্ঞান-বিতরণ ও নূতন নূতন সত্যের আবিষ্কারের দ্বারা শিক্ষার অগ্রগতি-সাধন এবং ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের উৎপত্তি; অথবা এক কথায়, বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতি-সাধন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। মানব-মাহাত্ম্য ইহার সঙ্কেত-বাক্য, সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানলাভ ইহার বৈশিষ্ট্য এবং সত্যের সন্ধান ইহার আদর্শ। অবশ্য, জীবন ধারণ করিতে হইলে যে কতকগুলি পার্থিব বস্তুর প্রয়োজন আছে, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে, উচ্চশ্রেণীর ব্যবসা-শিক্ষা যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত হইতে পারে, তদনুরূপ ইহার প্রসার সাধন করিতে হইবে। এতাদৃশ প্রসার সাধিত হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যবসা সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু একটি সহকারী কর্ত্তব্যমাত্র। এই সহকারী কর্ত্তব্য সাধনের জন্য ইহার মুখ্য কার্য্য, যথা কৃষ্টিসাধন, মনের বিশুদ্ধিসাধন, পণ্ডিতের মত নিঃস্বার্থভাবে শিল্প ও বিজ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা প্রবৃত্তির উৎকর্ষসাধনের কথা যাহাতে চাপা না পড়ে, তদ্বিষয়ে একান্তভাবে অবহিত থাকিতে হইবে।"

ইহার পর ডক্টর মজুমদার জগদ্ব্যাপী বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যার কথা আলোচনা করেন। এই দুইটি সমস্যা যে উত্তরোত্তর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া পড়িতেছে এবং উহা দ্বারা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া পড়িতেছেন, তাহা তিনি স্বীকার করেন। পাশ্চাত্ত্যগণ যে তাঁহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা ঐ দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই, তাহাও তিনি অস্বীকার করেন নাই। কি করিয়া ঐ দুইটি সমস্যার সমাধান হইবে, তাহা যে, কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় এতাবৎ স্থির করিতে পারেন নাই, তাহাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন এবং যাহাতে ঐ সমস্যা দুইটির সমাধান হয়, তাহার চেষ্টা করা যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ইহাও তিনি প্রকারান্তরে অস্বীকার করেন নাই। তাঁহার নিজের কথা:

> "To be quite honest we must confess that we have failed to tackle the problems. Cut and dried remedies with which our mind is familiar have proved insufficient and yet we feel that a way must be found to raise the people from the slough of despondency into which they have fallen."

অর্থাৎ, "সততার সহিত বলিতে হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, আমরা (বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ) ঐ সমস্যাসমূহের (বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যা) সমাধানে যথাযথভাবে হস্তক্ষেপ করিতে কৃতকার্য্য হই নাই। পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত যে সমস্ত ছিন্ন ও শুষ্ক সমাধান-পন্থার সহিত আমাদিগের মন সুপরিচিত, সেই সমস্ত সমাধান-পন্থা অপ্রচুর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তত্রাপি (বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যায়) ঐ বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যাহাতে নৈরাশ্যের পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।"

উপসংহারে ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন,

> "What is needed to-day in India, above everything else, is a band of men with the most disciplined intellect and character and equipped with the basic knowledge in Sciences and humanities, on which all real progress must necessarily depend."

অর্থাৎ, "যে বিজ্ঞান ও মানবত্বের সহায়তায় প্রকৃত অগ্রগতি সাধিত হইতে পারে, সেই বিজ্ঞান ও মানবত্বের জ্ঞানসম্পন্ন, চরিত্রবান্ ও সুনিয়ন্ত্রিত-বুদ্ধিযুক্ত এক দল মানুষের প্রয়োজন ভারতবর্ষে আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে।"

আগাগোড়া চিন্তা করিয়া দেখিলে, আপাতদৃষ্টিতে ডক্টর মজুমদারের উপরোক্ত বক্তৃতাটি যে চিত্তাকর্ষক, তাহা অস্বীকার করা যায় না। উহাতে যেরূপ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি একনিষ্ঠতার সাক্ষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ আবার জনসাধারণের দুঃখে সহৃদয়তার পরিচয়ও যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। তাহা ছাড়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ যে বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান করিতে পারিতেছে না এবং উহা করিতে চেষ্টা করা যে বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের অন্যতম

কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া ডক্টর মজুমদার অসঙ্কোচে সত্য-প্রিয়তার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। এতাদৃশ এক-নিষ্ঠা, সহৃদয়তা এবং সত্যপ্রিয়তা আজকালকার শিক্ষিত মানুষগুলির ভিতরে অত্যন্ত বিরল। এই হিসাবে ডক্টর মজুমদার আমাদিগের ধন্যবাদার্হ।

ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতাটি একনিষ্ঠা, সহৃদয়তা এবং সত্যপ্রিয়তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু উহাতে একদিকে যেরূপ দূরদর্শিতার অভাবের যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ আবার ডক্টর মজুমদারের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভবযোগ্য নহে।

দেশের বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যা জটিলতা প্রাপ্ত হওয়ায়, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর দায়িত্ব আরোপ করিয়া থাকেন বলিয়া ডক্টর মজুমদার তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথচ তিনিই আবার প্রসঙ্গান্তরে বলিয়াছেন যে, "বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যায় বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যাহাতে নৈরাশ্যের পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা করা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম কর্ত্তব্য।" ইহা ছাড়া, এতাবৎ যে সমস্ত ছিন্ন ও শুষ্ক সমাধান-পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা যে প্রায়শঃ বিফল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে —তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যায় বিক্ষুব্ধ মানুষগুলি যাহাতে নৈরাশ্যের পঙ্কিলতা হইতে উদ্ধার পায়, তাহার পন্থা আবিষ্কার করা যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তব্য এবং ঐ কর্ত্তব্য যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয় এতাবৎ পালন করিতে সক্ষম হয় নাই, ইহা স্বীকার করিয়া লইলে, দেশের বেকার ও দারিদ্র্য-সমস্যা উত্তরোত্তর জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে বলিয়া যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে যুক্তিসঙ্গতভাবে দূষণীয় বলিয়া মনে করা যায় কি ?

এই হিসাবে ডক্টর মজুমদারের চিন্তাসমূহ যেরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ (self-contradictory), সেইরূপ আবার উহার মধ্যে অপরিণামদর্শিতার পরিচয় রহিয়াছে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার চরম লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া ডক্টর মজুমদার বলিয়াছেন, "বুদ্ধি ও চরিত্রের চরম উন্নতিসাধন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।"

বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতিসাধন যে, কোন কোন মানুষের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া সঙ্গত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা-বিষয়ক দর্শন ও বিজ্ঞান আমূল ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্য-সমাজে এমন মানুষ জন্মপরিগ্রহ করেন, যাঁহাদিগকে কি করিয়া বুদ্ধি ও চরিত্রের চরম উন্নতি সাধন করিতে হয়, কেবলমাত্র তাহার শিক্ষা প্রদান করিলে মনুষ্য-সমাজ চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে অক্ষম হয় এবং তাহাতে সমাজের অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। কাযেই, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য যে বুদ্ধি এবং চরিত্রের চরম উন্নতি-সাধন, ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক ভাবে মনে করা চলে না।

ইহা ছাড়া, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মা-বিষয়ক বিজ্ঞান ও দর্শন আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যখন কাহারও শরীর অসুস্থ হয়, তখন তাহার ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং আত্মার স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভবযোগ্য হয় না ; এবং ইন্দ্রিয় প্রভৃতির স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে না পারিলে তাহাদের চরম উন্নতি সাধন করিতে কেহ সক্ষম হয় না। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বুদ্ধির এবং চরিত্রের কোন উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে কোন্ উপায়ে শরীরের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকে, তাহা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। কোন্ উপায়ে শরীরের স্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে বজায় থাকিতে পারে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য বহুবিধ বিধি ও নিষেধ পালন করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু অর্থাভাব বিদ্যমান থাকিলে ঐ বিধি ও নিষেধের কোনটাই পালন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সুতরাং যখন অর্থাভাব সমাজের মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখন ঐ অর্থাভাব কোন্ উপায়ে তিরোহিত হইতে পারে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জনসমাজ পরিজ্ঞাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অপর কোন শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগের বুদ্ধির এবং চরিত্রের চরম উন্নতি সাধন করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এতাদৃশ ভাবে চিন্তা করিলে ইহা

বলা যাইতে পারে যে, যখন সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থাভাব এবং বেকার-সমস্যা দেখা দেয়, তখন কি করিয়া অর্থাভাব দূরীভূত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক শিক্ষাই প্রত্যেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয়, নতুবা এবংবিধ অবস্থায় আর কোন উদ্দেশ্যকে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলে তাহা চরিতার্থ হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। বাস্তবিক পক্ষে, কোন কিশোর ও যুবকের পেট যখন ক্ষুধায় দাউ দাউ করিয়া জলিতে থাকে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা সম্ভব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্য কোন বিষয়ে তাহাকে শিক্ষিত করা সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য আধুনিক বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার আদর্শ সাফল্য লাভ করিতে পারিতেছে না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বুদ্ধির এবং চরিত্রের উন্নতির কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যেই যে প্রায়শঃ বুদ্ধিহীনতা ও চরিত্রহীনতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে অস্বীকার করা যায় না। ডক্টর মজুমদারের শ্রেণীর মানুষের মধ্যে অথবা তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যদি বাস্তবিক পক্ষে বুদ্ধির চরম উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কি জীবিকানির্ব্বাহের জন্য মাসিক বেতনের এবং নকরগিরির এত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইত? অন্যপক্ষে, কি করিয়া জন-সমাজ বেকার-সমস্যা ও অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার একটা সমীচীন পন্থাও কি এতদিনে আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিতে পারিত?

নিরপেক্ষ সমালোচক ভাবে ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতাটীর কথাগুলি চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ বক্তৃতায় আপাতদৃষ্টিতে চিত্তাকর্ষক কথা আছে বটে এবং উহার মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে ডক্টর মজুমদারের একনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও সত্যপ্রিয়তার সাক্ষ্যও দেখা যায় বটে, কিন্তু উহার একটী কথাও দূরদর্শিতার, অথবা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে, এবং উহার একটী উপদেশও কার্য্যে পরিণত হইবার উপযোগী নহে।

শুধু যে ডক্টর মজুমদারের বক্তৃতার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই এতাদৃশ ভাবে হতাশ্বাস হইতে হয় তাহা নহে। স্যর আকবর হাইদারীর বক্তৃতা, স্যর মির্জ্জা ইস্মাইলের বক্তৃতা এবং মিঃ গান্ধীর প্রবন্ধও সমানভাবে নৈরাশ্যোদ্দীপক।

স্যর আকবর হাইদারী ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য কথা দুইটী, যথা:

"(১) হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষের কথা আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম মনযোগের যোগ্য, (২) ভারতবর্ষের দারিদ্র্য আমাদিগের অন্যতম প্রধান সমস্যা"—

হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ কি করিয়া দূরীভূত হইতে পারে, তাহার আলোচনাপ্রসঙ্গে স্যর আকবর হাইদারী বলিয়াছেন যে, সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার উপকারিতা এবং ঘৃণা ও বিদ্বেষের অপকারিতা বুঝিতে পারিলে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষসমস্যা দূরীভূত হইতে পারে।

(In this University……we can earn and show to ourselves and to others the value and inherent virtues of toleration and sympathy and the baneful effects and the vice of hatred and jealousy.)

ভারতবর্ষে দারিদ্র্য-সমস্যার কেন উদ্ভব হয় এবং কি করিয়া উহা দূরীভূত হইতে পারে, তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, ঐ সম্বন্ধে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণা চলিতে পারে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে ক্রমে উহার অপনোদন সম্ভবযোগ্য হইতে পারে।

স্যর আকবর হাইদারী যে দুইটি কথা বিশেষভাবে তাঁহার বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সমীচীন হইয়াছে কি না, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, জনসাধারণের দারিদ্র্য যে আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তনীয় বিষয় হইয়া পড়িতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষের কথা আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম মনোযোগের যোগ্য কি না, তাহা লইয়া অনেক ভাবিবার কথা আছে। ভারতবাসীর দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিতে হইলে যে, সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই বটে, কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ-সমস্যার সমাধান হইলেই যে সমগ্র ভারতবাসী ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হইবে, ইহা বলা চলে না। ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, বিদ্বেষ যে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যেই বিদ্যমান আছে, তাহা নহে, হিন্দুর পরস্পরের মধ্যে এবং মুসলমানের পরস্পরের মধ্যে, হিন্দু-খৃষ্টানের মধ্যে, মুসলমান-খৃষ্টানের মধ্যে, খৃষ্টানের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অল্প নহে। ভারতবাসিগণের অনৈক্য দূর করিয়া তাহাদিগের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে এবং তাহাদিগের আর্থিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে শুধু যে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা করিলেই চলিবে তাহা নহে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতবাসিগণের পরস্পরের মধ্যের প্রত্যেক বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। রাগ-দ্বেষ-সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান ও দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া একদেশদর্শিভাবে উহা দূর করিবার চেষ্টা করিলে, ঐ চেষ্টা কখনও ফলবতী হয় না। পরন্তু, বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদিগের উপরোক্ত মত-বাদের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে যে বিদ্বেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার অপনয়নের কোন চেষ্টা না হইয়া কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিবার চেষ্টা চলিতেছে বলিয়াই যে, ঐ বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা দার্শনিক সত্য।

সুতরাং 'হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষের কথা আমাদিগের সর্ব্বপ্রথম মনোযোগের যোগ্য', স্যর আকবর হাইদারীর এই উপদেশ সমীচীন নহে।

মানুষের বিদ্বেষ কি করিয়া দূরীভূত হইতে পারে তৎ-প্রসঙ্গে স্যর হাইদারী যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন তাহাও সর্ব্বতোভাবে অনুসরণযোগ্য নহে। তাঁহার এইপ্রসঙ্গীয় কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মানুষের পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ দূর করিবার উপায় দুইটি, যথা :—

(১) সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তার উপকারিতা বুঝিয়া লইয়া সহিষ্ণু ও সহৃদয় হইবার চেষ্টা করা ;

(২) ঘৃণা ও বিদ্বেষের অপকারিতা বুঝিয়া লইয়া সর্ব্বদা তাহা বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা।

সহিষ্ণুতা যে সর্ব্বাবস্থায় উপকারী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সহিষ্ণু হওয়া সম্ভব নহে। এই-বিষয়ক দর্শন ও বিজ্ঞানে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যৌবনে উত্তেজক খাদ্য ও পানীয় বর্জ্জন না করিয়া নর্ত্তন-কুর্দ্দনে অথবা খেলা-ধূলায় মত্ত থাকিলে কখনও প্রয়োজনীয় সহিষ্ণুতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। পাঠার্থী ছাত্রদিগকে মুখে সহিষ্ণুতার কথা বলা, অথচ কার্য্যতঃ তাহাদিগকে স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ দেওয়া, অথবা মদ্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি খাদ্য দেওয়া কখনও বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ হইতে পারে না।

সহৃদয়তা সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে উপকারী কি না এবং তদ্দ্বারা ঘৃণা ও বিদ্বেষ দূর করা সম্ভব কি না, ইহা বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ।

যাহার প্রতি কোন মানুষ সহৃদয় হয়, তাহার পক্ষে উহা আপাতদৃষ্টিতে উপকারী বটে, কিন্তু যিনি সহৃদয়তা অবলম্বন করেন, তিনি উন্নতিলাভ অথবা অবনতিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সহৃদয়তা অবলম্বন করিলে অভিমানগ্রস্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। অধিকন্তু, যাঁহার প্রতি সহৃদয়তা অবলম্বন করা যায়, তাঁহার প্রতি যাঁহারা উদাসীন অথবা বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাঁহাদিগের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং বিদ্বেষের উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা প্রতিনিয়ত বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, সহৃদয়তার ফলে অভিমান, ঘৃণা এবং বিদ্বেষের উৎপত্তি হওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং উহা সর্ব্বাবস্থায় মানুষের উপকারী নহে। বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের মূল ভাগ চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, সাধকগণের পক্ষে যেরূপ সর্ব্বজীবের প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জনীয় বলিয়া উপদেশ রহিয়াছে, সেইরূপ আবার অনুরাগ অথবা প্রেম এবং সহৃদয়তাও বর্জ্জন করিবার পরামর্শ রহিয়াছে। সাধক, অর্থাৎ আত্মোন্নতি ও সমাজের উন্নতি-প্রয়াসী মানুষ যাহাতে রাগ ও দ্বেষ বর্জ্জন করিয়া কেবলমাত্র কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত

হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, একমাত্র তাহারই উপদেশ সমস্ত ঋষিকল্প মহাজনগণের নিকট হইতে পাওয়া যায়।

ঘৃণা ও বিদ্বেষ যে সর্ব্বাবস্থায় সকলের পক্ষে অপকারী, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা সকলের পক্ষে সর্ব্বাবস্থায় বর্জ্জন করা সম্ভব নহে।

একজন পান-ভোজনমত্ত জুয়াড়ী ধনিকের চরিত্রহীন পুত্র রসগোল্লার ছাল ছিঁড়িয়া খাইবে এবং অপর এক জনের ভগ্নী, অথবা স্ত্রীর শরীর লইয়া অবৈধ ভাবে খেলা-ধূলা করিলেও সম্মানভাজন হইতে পারিবে, আর, অন্য একজন দিবারাত্র সদ্‌ভাবে রৌদ্র-বৃষ্টিতে সাধকের মত পরিশ্রম করিলেও পুত্র-কন্যার ভরণ-পোষণোপযোগী শাকান্ন পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে না এবং ঘৃণার্হ হইয়া থাকিবে, এবংবিধ অবস্থা যতদিন পর্য্যন্ত সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ঘৃণা ও বিদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

কাযেই, এতাদৃশ অবস্থায় ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার অথবা ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার উপদেশ দেওয়া আমাদের মতে একটি সুন্দর হেঁয়ালী। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের ব্যাধি কিসে দূর হয়, তাহার পরামর্শ না দিয়া ব্যাধি না থাকিলে সে কিরূপ ভাবে চলাফেরা করিবে, তদ্বিষয়ক উপদেশ যেরূপ কার্য্যকরী হইয়া থাকে, সমাজের এবংবিধ অবস্থায় ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবার উপদেশও সেইরূপ কার্য্যকরী হইবে।

স্যর মির্জ্জা ইস্‌মাইল তাঁহার অভিভাষণে যে সমস্ত কথা কহিয়াছেন, তাহাও মুখ্যতঃ হিন্দু এবং মুসলমানের বিদ্বেষ দূর করিবার পরিকল্পনা-প্রসূত। ঐ কথাগুলিও প্রায়শঃ স্যর আকবর হাইদারীর উপদেশের অনুরূপ। কাযেই, পৃথক্ ভাবে উহার বিশ্লেষণ করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

৩০শে জুলাই তারিখের "হরিজন" পত্রিকায় 'বিশদ বিবৃতি' অথবা "A Clarification"-শীর্ষক যে প্রবন্ধ গান্ধীজী লিখিয়াছেন, তাহার মুখ্য কথা দুইটি, যথা :—

(১) জনসাধারণের শিক্ষা যাহাতে গবর্ণমেণ্টের খরচে নির্ব্বাহ করা হয় এবং উহা যাহাতে শিক্ষার্থিগণের পক্ষে অবৈতনিক (free) হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(২) উচ্চশিক্ষা যাহাতে একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যে লাভ করা সম্ভব হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজীর উপরোক্ত দুইটি কথার একটিও দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে।

শিক্ষা যাহাতে শিক্ষার্থিগণের পক্ষে অবৈতনিক (free) হয়, তাহার চেষ্টা করা সমাজহিতৈষিগণের পক্ষে যে অন্যতম সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু, যাহাতে শিক্ষকগণ বেতন না লইয়াও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অথবা প্রয়োজনীয় খরচ যোগাইতে ক্লেশ ভোগ না করেন, সমাজের মধ্যে এতাদৃশ অবস্থার উদ্ভব করা যতদিন পর্য্যন্ত সম্ভব না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের অথবা সাধারণের চাঁদা দ্বারা নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিলে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমরা কেন এই কথা বলিতেছি, তাহা বিশদভাবে বুঝাইতে হইলে প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়। স্থানাভাব-বশতঃ এখানে তাহা বলা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের মন্ত্রিত্ব-প্রণেতা গান্ধীজী যখন এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তখন হয়ত অদূর-ভবিষ্যতে কতকগুলি অবৈতনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব সাধিত হইবে এবং পাঠকগণ যদি তাহার ফলে শিক্ষক ও শিক্ষিতগণের কোন্ অবস্থার উদ্ভব হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখেন, তাহা হইলে আমাদিগের কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণিত হইবে।

মাতৃভাষার সহায়তায় উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার কল্পনা—শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সংজ্ঞা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানের অভাবের পরিচায়ক। শিক্ষা ও উচ্চ-শিক্ষা কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে প্রকৃতপক্ষে উচ্চ-শিক্ষা বলা যাইতে পারে, তাহা কখনও মাতৃভাষার সাহায্যে অর্জ্জন করা সম্ভব নহে। উহা একমাত্র সংস্কৃত, অথবা আরবী, অথবা হিব্রু ভাষার সাহায্যে অর্জ্জন করা যাইতে পারে।

এতৎসম্বন্ধে আমরা "শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম"-শীর্ষক সন্দর্ভে বিশদভাবে আলোচনা করিব।

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণীয় বিষয়-নির্ব্বাচন, শিক্ষক-নির্ব্বাচন এবং শিক্ষা-প্রদান-প্রণালীনির্ব্বাচন কোন্ সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত, তাহা যুক্তিসঙ্গত ভাবে স্থির করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত তাহাও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায় তাহা জানিতে না পারিলে স্থির করা সম্ভব হয় না। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তৎসম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক মানুষের কোন না কোনরূপ শিক্ষার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সকল মানুষের একই শ্রেণীর শিক্ষার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মকারকে কুম্ভকারের শিক্ষা দিলে যেরূপ সুফল পাওয়া যায় না, সেইরূপ স্ত্রীলোককে পুরুষজনোচিত শিক্ষা অথবা পুরুষকে স্ত্রী-জনোচিত শিক্ষা প্রদান করিলে সুফল পাওয়া সম্ভব হয় না।

কাযেই, শিক্ষার কি প্রয়োজনীয়তা এবং কোন্ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে মনুষ্য-সমাজে কত শ্রেণীর মানুষ ও শিক্ষা আছে এবং কোনও শিক্ষা প্রদান না করিলে কোন্ শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কিরূপ কুফলোদয় হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

মনুষ্য-সমাজে কত শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহা আমরা আমাদের "ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সমস্যা ও তাহা পূরণের উপায়"শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা উহা বিস্তৃতভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা ঐ প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি।

মনুষ্য-সমাজে কত শ্রেণীর মানুষ আছে, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র মানব-সমাজে অসংখ্য মানুষ বিদ্যমান আছে এবং কোন দুইটি মানুষ সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। আকৃতি, আয়তন, ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি, বুদ্ধি-শক্তি প্রভৃতি যে কোন দিকেই লক্ষ্য করা যায় না কেন, প্রত্যেক মানুষটি অপর মানুষটি হইতে বহুলাংশে পৃথক্। এই হিসাবে আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে অসংখ্য শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষটি অপর একটি মানুষ হইতে বহুলাংশে পৃথক্ বটে এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে মানুষের শ্রেণীর সংখ্যাও অনেক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, যেরূপ এতাদৃশ দুইটি মানুষ পাওয়া যায় না, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সমান, সেইরূপ এমন দুইটি মানুষও পাওয়া যায় না, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে পৃথক্। বস্তুতঃ পক্ষে প্রত্যেক মানুষটির মধ্যে যেমন তাহার নিজস্ব কতকগুলি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার কতকগুলি বিষয়ে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের মধ্যে সমতাও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমতা ও বৈশিষ্ট্য লইয়া মানুষের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য কোথায় এবং তাহাদের মধ্যে সমতাই বা কোথায়, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয় যে, মনুষ্য-সমাজ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক শ্রেণী শ্রমজীবী এবং অপর শ্রেণী বুদ্ধিজীবী। আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের প্রবৃত্তি, অথবা কায়িক শক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি সমস্ত মানুষের মধ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু উহার কোনটিই সমান পরিমাণে কোন দুইটি মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

মানব-সমাজের অধিকাংশ মানুষেরই ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির তুলনায় কায়িক-শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক। এই মানুষগুলি সাধারণতঃ আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই নিজদিগকে কৃতার্থ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইঁহারা কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করিতে সুপটু হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বুদ্ধি-সাধ্য পরিদর্শনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সুপটুতা তাদৃশ পরিমাণে অর্জ্জন করিতে কখনও সক্ষম হন না। ইঁহাদের শরীর যেরূপ শ্রমপটু হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়, অথবা মন, অথবা বুদ্ধি কখনও তাদৃশ শ্রমপটু হয় না।

এই শ্রেণীর মানুষকে শ্রমজীবী বলা হইয়া থাকে। যদি কোন সমাজে শ্রমজীবী মানুষের হস্তে কায়িক শ্রমের কার্য্য প্রদান না করিয়া বুদ্ধি-সাধ্য পরিদর্শনের কার্য্য ন্যস্ত হয়, তাহা হইলে সেই সমাজে বিশৃঙ্খলা অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

শ্রমজীবী মানুষগুলিকে বাদ দিলে মনুষ্য-সমাজে আর এক শ্রেণীর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির তুলনায় কায়িক শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প। এই মানুষগুলির মধ্যে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু ঐ তিনটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই নিজদিগকে কৃতার্থ বলিয়া ইঁহারা মনে করেন না, পরন্ত, ঐ তিনটি প্রবৃত্তি কি করিয়া সংযত করা যায়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইয়া থাকেন। ইঁহারা ইন্দ্রিয়-সাধ্য, অথবা মনঃ-সাধ্য, অথবা বুদ্ধি-সাধ্য পরিদর্শনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সুপটুতা অর্জন করিতে সক্ষম হইতে পারেন বটে, কিন্তু শ্রমজীবীর মত কায়িক-শ্রমসাধ্য কার্য্য নিজ হস্তে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন না। ইঁহাদের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি যেরূপ শ্রমপটু হইয়া থাকে, শরীর কখনও তাদৃশ শ্রমপটু হয় না। এই শ্রেণীর মানুষকে "বুদ্ধিজীবী" বলা যাইতে পারে এবং ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে ইঁহাদিগকে বুদ্ধিজীবী বলা হইয়া থাকে।

কালের প্রভাবে মানব-সমাজে সর্ব্বদাই শ্রমজীবীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। সময় সময় বুদ্ধিজীবী মানুষ, এমন কি বিকৃত হইয়া কার্য্যতঃ বিলুপ্ত পর্য্যন্ত হইয়া যায়। তখন শ্রমজীবিগণ বুদ্ধিজীবিগণের কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু, স্বভাবতঃ তাঁহারা ঐ কার্য্যে অপটু বলিয়া সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে থাকে। যখন বুদ্ধিজীবী মানুষ যথাযথভাবে সাধনা ও শিক্ষানিরত হইয়া সমাজ-পরিচালনা, সমাজ-রক্ষা ও সমাজের উন্নতির কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, তখন মনুষ্য-সমাজ সর্ব্বতোভাবে সুখের আগার হইয়া থাকে এবং তখন অর্থাভাব, পরমুখাপেক্ষিতা, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু জনসমাজের মধ্য হইতে প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হয়।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সহিত পৃথিবীর সম্পর্ক লইয়া কালের সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ষা, শীত, গ্রীষ্ম, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ এবং রাত্রিকালের রূপ*, জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও পৃথিবীর মধ্যে সম্পর্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কালের রূপের এবং জীবের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই পরিবর্ত্তনকে ভাষা-বিজ্ঞানানুসারে কাল-চক্র বলা হয়। কাল-চক্রের ফেরে কখন কখন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী, এই উভয় শ্রেণীর মানুষই মানব-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়, আবার কখন কখন উভয় শ্রেণীর মানুষই কর্ত্তব্যবিমুখ হইয়া পড়ে। তখন মনে হয়, যেন সমস্ত মানুষই এক শ্রেণীর হইয়া পড়িয়াছে। অধুনা মানব-সমাজে কর্ত্তব্যবিমুখতার কাল চলিতেছে। এই সময় বিশেষ অবধানের সহিত লক্ষ্য করিতে না পারিলে স্বভাবের বশে মানুষ যে প্রধানতঃ শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, তাহা বুঝিয়া উঠা সহজ-সাধ্য নহে।

বুদ্ধিজীবিগণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তাঁহারা নিজেরা যেরূপ শিক্ষা করিতে পারেন, সেইরূপ আবার অপরকে শিখাইবার ক্ষমতাও তাঁহাদের হইয়া থাকে। শ্রমজীবিগণ নিজেরা শিক্ষা করিতে পারেন বটে, কিন্তু অপরকে সুচারুরূপে শিখাইবার ক্ষমতা তাঁহাদের হয় না। অর্থাৎ, বুদ্ধিজীবিগণ শিক্ষার্থিতা ও শিক্ষকতা, এই উভয়বিধ কার্য্যেই নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, কিন্তু শ্রমজীবিগণ কেবল শিক্ষার্থিতার কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। শিক্ষকতার কার্য্যে তাঁহাদের নৈপুণ্য কখনও সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয় না।

---

* বর্ষা শীতং তথা চোষ্ণং প্রত্যুষং মধ্যমং দিনম্।
অপরাহ্ণং তথা নক্তং রূপং কালস্য কথ্যতে॥
কালে ফলন্তি তরবঃ কালে বীজং প্ররোহতি।
কালে পুষ্পবতী নারী সর্ব্বং কালেন জায়তে॥
কালেঽশনং চ তোয়ং চ কালে মেঘঃ প্রবর্ষতি।
কালে কর্ম্ম সমুদ্দিষ্টং বিপরীতং ন শোভনম্॥
কালাগ্নির্জঠরে জাতস্তস্য বাঞ্ছা চতুর্বিধা।
আহারমুদকং নিদ্রা কামশ্চৈব চতুর্থকঃ॥
(কাল-বিজ্ঞান)

মানুষ স্বভাবের বশে প্রধানতঃ শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বটে, কিন্তু গুণের সমতা ও বৈশিষ্ট্যকে ভিত্তি করিয়া জীবের শ্রেণীবিভাগের যে স্বাভাবিক নিয়ম বিদ্যমান আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত বুদ্ধিজীবী মানুষকে এক শ্রেণীর বলা চলে না, কারণ সকল বুদ্ধিজীবী মানুষই সমানভাবে ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তিতে সুপটু হইতে পারে না। বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে কেহ বা স্বভাবতঃ কেবল ইন্দ্রিয়-শক্তিতে সুপটু হইবার সামর্থ্য লাভ করেন, কেহ বা ইন্দ্রিয় ও মন, এই দুইটির শক্তিতে, কেহ বা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই তিনটির শক্তিতে নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

যাঁহারা স্বভাবের বশে কেবল ইন্দ্রিয়-শক্তিতে নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা কোন শব্দ, অথবা স্পর্শ, অথবা রূপ, অথবা রস, অথবা গন্ধের সংস্রবে আসিলে উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং উহার যত কিছু পরিবর্ত্তন অভিব্যক্ত হয়, তাহাও লক্ষ্য করিবার নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যাহা কিছু লক্ষ্য করেন, তাহাও অপরকে ভাষা দ্বারা বুঝাইতে সক্ষম হন। কিন্তু, প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্য ও অবস্থার মূলে যে অব্যক্ত একটা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা এই ইন্দ্রিয়প্রধান মানুষগণ নিজেরা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন না। এমন কি, অপর কেহ উহা বুঝাইয়া দিলেও তাহা উপলব্ধি করিতে প্রায়শঃ কৃতকার্য্য হন না। বুদ্ধি ও মনঃ-শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন মানুষ কৃষি, গো-রক্ষা ও বাণিজ্যের কার্য্যে, অর্থাৎ কি করিয়া সমাজের আর্থিক প্রাচুর্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার শিক্ষকতা ও পরিদর্শনের কার্য্যে সুপটুতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে সংস্কৃত ভাষায় বৈশ্য বলা হইয়া থাকে। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত মন ও বুদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইহাঁদের স্বাভাবিক কার্য্যশক্তি পরিস্ফুট হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনভাবে ইহাঁরা তাদৃশ কার্য্যক্ষমতাসম্পন্ন হইতে সক্ষম হয় না।

যাঁহারা স্বভাবের বশে ইন্দ্রিয় ও মন, এই উভয়-শক্তিতে নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন মানুষ যত কিছু সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্তই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। অধিকন্তু, প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্য ও অবস্থার মূলে যে অব্যক্ত একটা কিছু বিদ্যমান আছে, অপর কাহারও নির্দ্দেশ পাইলে, তাহাও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্য ও অবস্থার মূলে যে অব্যক্ত একটা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহা ইহাঁরা অপরের নির্দ্দেশানুসারে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু ঐ অব্যক্তের উৎপত্তি যে কোথা হইতে হইয়াছে, অব্যক্তসমূহের পরস্পরের মধ্যে কি যে সম্বন্ধ, কেহ কেহ এই অব্যক্তসমূহ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় কেন এবং কেহ কেহ বা উহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না কেন, এবংবিধ সত্যগুলি এই মনঃপ্রধান মানুষগণ সাধারণতঃ নিজেরা প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হন না। এমন কি, অপর কেহ উহা বুঝাইয়া দিলেও তাহা উপলব্ধি করিতে প্রায়শঃ কৃতকার্য্য হন না। বুদ্ধি ও মনঃ-শক্তিসম্পন্ন কোন মানুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে ইন্দ্রিয় ও মনঃ-শক্তিসম্পন্ন মানুষ শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি ও দক্ষতার কার্য্যে অর্থাৎ রাজ্য-পরিচালনা ও চিকিৎসার কার্য্যে সুপটুতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে সংস্কৃত ভাষায় ক্ষত্রিয় বলা হইয়া থাকে।

যাঁহারা স্বভাবের বশে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি, এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন এবং ইন্দ্রিয় ও মনঃ-শক্তিসম্পন্ন মানুষ যতকিছু সামর্থ্য লাভ করিতে পারেন, তাহার সমস্তই অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন। অধিকন্তু, অব্যক্তের উৎপত্তি যে কোথা হইতে হইতেছে, অব্যক্তসমূহের পরস্পরের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, কেহ কেহ এই অব্যক্তসমূহ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন কেন এবং কেহ কেহ বা উহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন না কেন, এবংবিধ সত্যগুলি পর্য্যন্ত ইহাঁরা স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাঁরা শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্যের কার্য্যে, অর্থাৎ, বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, ও আইন-প্রণয়ন ও উহার অধ্যাপনার কার্য্যে সুপটুতা লাভ

করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে সংস্কৃত ভাষায় ব্রাহ্মণ বলা হইয়া থাকে।

মানুষ স্বভাবতঃ কয় শ্রেণীর, তাহার আলোচনায় দেখা যাইতেছে যে, প্রধানতঃ মানুষ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর নাম শ্রম-জীবী এবং অপর শ্রেণীর নাম বুদ্ধি-জীবী। বুদ্ধি-জীবী মানুষ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই তিন শ্রেণীর এক শ্রেণীর নাম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম ক্ষত্রিয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর নাম বৈশ্য। সুতরাং মোটের উপর মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা:—(১) ব্রাহ্মণ, (২) ক্ষত্রিয়, (৩) বৈশ্য, (৪) শ্রমজীবী অথবা শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারিটি নাম শুনিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মানুষের শ্রেণীবিভাগের কথাই বলিতেছি। ভারতবর্ষে যেরূপ ঐ চারি শ্রেণীর মানুষ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইরূপ অ্যাসিয়ার অন্যান্য দেশে, ইয়োরোপে, আফ্রিকায়, অ্যামেরিকায়, অষ্ট্রেলিয়ান প্রভৃতি অপরাপর মহাদেশের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণাদি চারি শ্রেণীর মানুষ জন্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন।

কাঁচা-কদলীর চারাকে যেরূপ ঘসিয়া-মাজিয়া চাটিম-কদলীর বৃক্ষে পরিণত করা যায় না, সেইরূপ ব্রাহ্মণ্য, ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের উপাদান স্বভাবতঃ লাভ করিতে না পারিলে কাহারও দ্বারা যথাযথভাবে ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্যের কার্য্য সম্পূর্ণ ভাবে সুসাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় না। কদলীর চারা সকল রকমের ভূমিতে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব না হইলেও, উহা যেরূপ কেবলমাত্র ভারতবর্ষের ভূমির একচেটিয়া নহে, পরন্তু জগতের সর্ব্বত্রই উৎপন্ন হইতে পারে, সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সকল শ্রেণীর সমাজে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব না হইলেও, উহা ভারতবর্ষের একচেটিয়া নহে। পরন্তু, জগতের সর্ব্বত্রই অবস্থাবিশেষে উহার আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে। মোটের উপর মনে রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিতে হইলে যজ্ঞোপবীতের প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই মানুষ প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য হইতে পারে না। কতকগুলি গুণ এবং কার্য্যশক্তি অনুসারে মানুষ ব্রাহ্মণাদি অভিধানে অভিহিত হইয়া থাকে এবং ঐ গুণ ও কার্য্য-শক্তির বীজ অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশের মানুষের মধ্যেই নিহিত থাকিতে পারে।

এইরূপ ভাবে মানুষ কত শ্রেণীর এবং কোন্ কোন্ গুণ ও কার্য্য-শক্তির বিদ্যমানতা ও অভাববশতঃ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, শিক্ষা কয় শ্রেণীর হওয়া সঙ্গত, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

মানুষ কত শ্রেণীর এবং শিক্ষা কত শ্রেণীর, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহা বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। কি করিয়া কোন বৃক্ষ হইতে ব্যবহারোপযোগী ফুল ও ফল লাভ করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া উহাকে ঘসিতে মাজিতে না জানিলে অথবা উহার ঘসা-মাজা না করিলে যেরূপ উহা জঙ্গলা হইয়া যায় এবং উহার ফুল ও ফল ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়, সেইরূপ মানুষ, স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণেরই হউক, অথবা ক্ষত্রিয়েরই হউক, অথবা বৈশ্যেরই হউক, অথবা শূদ্রেরই হউক, যাহারই বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করুক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনায় পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

যে মানুষটি শ্রমজীবীর বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কায়িক-শক্তি স্বভাবতঃ অধিক বটে এবং স্বভাবের প্রভাবেই সে পরিশ্রম-নিরত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন্ আহার্য্যটি উপকারী, কোন্ আহার্য্যটি অপকারী, অথবা অত্যধিক আহার ও মৈথুন যে অপকারী, এবংবিধ শিক্ষা যাহাতে সে পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে, প্রকৃতিবশতঃ সে অবৈধ আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার ফলে তাহার কায়িক-শক্তির হ্রাস ও ক্রমে ক্রমে পরিশ্রম-বিমুখতার সূচনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, কোন্ কোন্ কায়িক পরিশ্রম-সাধ্য কার্য্য মানব-সমাজের হিতকর অথবা অহিতকর এবং ঐ ঐ কার্য্য সাধন করিবার সরল ও স্বাস্থ্যকর পন্থা কি কি, তাহাও শ্রমজীবিগণকে শিখাইবার প্রয়োজন হয়, নতুবা,

অজ্ঞতাবশতঃ যে যে কায়িক শ্রমসাধ্য কার্য্য জীবের অপকারী, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ শ্রমজীবিগণ মানুষের যথেষ্ট অপকার সাধন করিতে পারে।

সেইরূপ আবার, যে মানুষটি বৈশ্যত্বের বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়-শক্তি স্বভাবতঃ যথেষ্ট বটে এবং স্বভাবের প্রভাবেই তাঁহার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টি উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-বিষয়ে তাঁহার কর্ত্তব্য কি এবং কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎকর্ষ বজায় থাকে ও কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে ঐগুলি অপকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারে, তাহার শিক্ষা বৈশ্য-সন্তানকে দিবার প্রয়োজন হয়। নতুবা, প্রকৃতির প্রভাবে, তাঁহার যে আহার, নিদ্রা ও মৈথুনের প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, উহার অপব্যবহারের ফলে তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহের স্বাভাবিক শক্তি বিনষ্ট হইতে পারে। ইহা ছাড়া, মানুষের ইন্দ্রিয়শক্তির দ্বারা কত রকমের কার্য্য হইতে পারে, ঐ সমস্ত কার্য্যের কোন্ কোন্‌টি জীবের পক্ষে হিতকারী, কোন্ কোন্‌টি জীবের অহিতকারী, যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির কার্য্য জীবের পক্ষে হিতকারী, তাহা সাধন করিবার সহজ ও সরল উপায় কি, এবংবিধ শিক্ষাও বৈশ্য-সন্তানকে দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নতুবা যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়-শক্তির কার্য্য জীবের পক্ষে অহিতকারী, তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া বৈশ্য-সন্তানগণ সমাজের যথেষ্ট অমঙ্গল সম্পাদন করিতে পারেন।

যে মানুষটি ক্ষাত্রবীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে একদিকে যেরূপ শ্রমজীবীর শিক্ষা ও বৈশ্যের শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে মনের উৎকর্ষ বজায় থাকে, কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে মন অপকর্ষ লাভ করিতে পারে, মনঃ-শক্তির দ্বারা কত রকমের কার্য্য হইতে পারে, এই কার্য্য-গুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি জীবসমাজের পক্ষে উপকারী এবং কোন্ কোন্‌টি জীবসমাজের পক্ষে অপকারী, মনঃ-শক্তির যে কার্য্যগুলি জীবসমাজের পক্ষে উপকারী, তাহা সম্পাদন করিবার সহজ ও সরল উপায় কি কি, এবংবিধ শিক্ষা লইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নতুবা, একদিকে যেরূপ ক্ষত্রিয়-সন্তানের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃ-শক্তির অপকর্ষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, অন্যদিকে আবার ইন্দ্রিয়-শক্তি ও মনঃ-শক্তির যে কার্য্যগুলি জীব-সমাজের পক্ষে নিতান্ত অহিতজনক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্ষত্রিয়-সন্তানের দ্বারা অশেষবিধ অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

ব্রাহ্মণের বীজ লইয়া যে মানুষটী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে একদিকে যেরূপ শ্রমজীবী ও বৈশ্যের শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার তিনি যাহাতে ক্ষত্রিয়ের শিক্ষা গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে বুদ্ধির অপকর্ষ ঘটিতে পারে, বুদ্ধি-শক্তি দ্বারা কত রকমের কার্য্য হইতে পারে, ঐ কার্য্যগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টি জীব-সমাজের পক্ষে উপ-কারী এবং কোন্ কোন্‌টি জীব-সমাজের পক্ষে অপকারী, বুদ্ধি-শক্তির যে কার্য্যগুলি জীব-সমাজের পক্ষে উপকারী, তাহা সম্পাদন করিবার সহজ উপায় কি কি,এবংবিধ শিক্ষা-ও ব্রাহ্মণ-সন্তানের লইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। নতুবা, একদিকে যেরূপ তাঁহার স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি এবং বুদ্ধি-শক্তির অপকর্ষ ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, অন্যদিকে আবার বুদ্ধিশক্তির যে কার্য্যগুলি সমাজের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গলজনক, তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানের দ্বারা সমাজের যথেষ্ট অমঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

উপরোক্ত কথাগুলি ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, “শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়”, এবংবিধ প্রশ্নের কোন উত্তর এক কথায় দেওয়া চলে না।

চারি শ্রেণীর মানুষ স্বভাবতঃ চারি শ্রেণীর উৎকর্ষ লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এই চারি শ্রেণীর মানুষের স্বভাব ও স্বাভাবিক উৎকর্ষ কি কি, তাহা বুঝিয়া লইয়া তদুপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক উৎকর্ষ অটুট থাকে এবং সকলে মিলিয়া মনুষ্য-সমাজকে সুখের আগার করিয়া তুলিতে পারে। অন্যথা, অর্থাৎ যথোপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে প্রত্যেকের স্বাভাবিক উৎকর্ষ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অজ্ঞতার ফলে মনুষ্য-সমাজ বিশৃঙ্খলা প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ দুঃখের আগার হইয়া উঠে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিতে হইলে "শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়" তৎসম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

মানুষ যাহাতে শিক্ষা না পাইয়া বন্য বৃক্ষ অথবা বন্য পশুর মত না হইয়া যায়, তাহার ব্যবস্থা করার জন্য যেমন সকল মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেইরূপ আবার প্রত্যেক মানুষটি স্বভাবতঃ যে যে গুণ ও কার্য্য-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সেই গুণ ও কার্য্য-শক্তি যাহাতে কোনরূপে বিনষ্ট, অথবা সমাজের অপকারী না হইতে পারে, পরন্তু যাহাতে ঐ গুণ ও কার্য্য-শক্তি বজায় থাকে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বতোভাবে সমাজের প্রত্যেকের হিতকারী হয়, তাহা করার জন্য প্রত্যেক মানুষটির শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

সকল মানুষই স্বভাবতঃ আহার, নিদ্রা, ও মৈথুন-প্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং ঐ আহার, নিদ্রা ও মৈথুন-প্রবৃত্তি যদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত না হয়, তাহা হইলে সকল মানুষেরই আচার-ব্যবহারে বন্য পশুবৎ পরিবর্ত্তিত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকে। আহার, নিদ্রা ও মৈথুন যাহাতে নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা না করিতে পারিলে যে, মানুষের পশুবৎ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে, তাহা জগতের বাস্তব অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে প্রতীয়মান হইবে। ব্যক্তিগতভাবেই হউক, অথবা পারিবারিক ব্যাপারেই হউক, অথবা সামাজিক ব্যাপারেই হউক, অথবা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই হউক, যে সমস্ত অশান্তি ও অপরাধের উদ্ভব হয়, তাহার মূল কারণ কোথায়, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানবসমাজে যত কিছু অশান্তি ও অপরাধ ঘটিতেছে, তাহা মূলতঃ মানুষের আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংযমের দরুণ। সুতরাং, **প্রত্যেক মানুষ যাহাতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংযত অথবা অভাবগ্রস্ত না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ক শিক্ষাই প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।** অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক মানুষ যাহাতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংযত অথবা অভাবগ্রস্ত না হইয়া পড়ে, তদ্বিষয়ক শিক্ষাই প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে, কিন্তু সকল মানুষকে উহা এক প্রকারের শিক্ষা-প্রণালীর দ্বারা শেখান সম্ভব নহে এবং একই রকমের, অথবা একই পরিমাণের আহার, নিদ্রা ও মৈথুন সকল মানুষের পক্ষে উপযোগী নহে, কারণ বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ ও কার্য্য-শক্তি লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে।

মানুষ যাহাতে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন বিষয়ে অসংযত অথবা অভাবগ্রস্ত না হয়, তদ্বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, যে যে গুণ ও কার্য্য-শক্তি লইয়া মানুষ জন্মগ্রহণ করে, তাহা সহজে বিনষ্ট হয় না। মানুষের স্বাভাবিক গুণ ও কার্য্য-শক্তি অটুট থাকিলে মানুষের পক্ষে পারিবারিক জীবন কথঞ্চিৎ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে যাপন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কোন্ গুণ ও কার্য্য-শক্তির দ্বারা কত রকমের কার্য্য হইতে পারে এবং তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য মানুষের উপকারক ও কোন্ কোন কার্য্য অপকারক, এবং ঐ ঐ গুণ ও কার্য্য-শক্তির উন্নতি কিরূপে সাধিত হইতে পারে, এতদ্বিষয়ক শিক্ষা লাভ করিতে না পারিলে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-শান্তি পাওয়া এবং পারিবারিক জীবন সর্ব্বতোভাবে সুখময় করা সম্ভবযোগ্য হয় না। সুতরাং, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের যে বিভিন্ন শ্রেণীর গুণ ও কার্য্য-শক্তি স্বভাবতঃ বিদ্যমান থাকে, তদ্দ্বারা কত রকমের কার্য্য হইতে পারে, ঐ ঐ কার্য্যের মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে হিতকারী এবং কোন্ কোন্ কার্য্য তাহাদের পক্ষে অহিতকারী, যে যে কার্য্য মানবসমাজের প্রত্যেকের পক্ষে হিতকারী, তাহা সম্পাদন করিবার সহজ ও সরল উপায় কি কি, কোন্ কোন্ কার্য্যের ফলে কোন্ কোন্ গুণ ও কার্য্য-শক্তি কীদৃশভাবে উন্নতি অথবা অবনতি প্রাপ্ত হয়, এবংবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা মানুষের শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হওয়া বিধেয়।

কোন্ কোন্ গুণের ও কার্য্য-শক্তির স্বাভাবিক কিরূপ তারতম্যবশতঃ মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, তাহা স্মরণ করিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, শিক্ষার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে যে-রকম শিক্ষা-প্রণালীর প্রয়োজন হয়, তাহাও সকল শ্রেণীর মানুষের পক্ষে এক প্রকারের হইতে পারে না।

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কোথায় তদ্বিষয়ে গবেষণা-প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি বিষয়ের শিক্ষা মানুষ মানুষকে শিখাইতে পারে, আর কতকগুলি বিষয় কেহ কাহাকেও শিখাইতে পারে না, পরন্ত নিজের শিখিয়া লইতে হয়। কি করিয়া ব্যঞ্জনবিশেষ রন্ধন করিতে হয়, তাহা একজনের পক্ষে অপর একজনকে শিখান সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু কোন্ উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের কাছে ব্যঞ্জনবিশেষ সর্ব্বতোভাবে মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে, তাহা কাহারও পক্ষে অপর কাহাকেও শিখান সম্ভবযোগ্য হয় না। সেইরূপ, আবার বিভিন্ন মানুষ ও বিভিন্ন পশু দেখিতে কিরূপ দেখায় এবং বাহ্যতঃ পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা একজন আর একজনকে শিখাইতে পারে বটে, কিন্তু মানুষ ও পশুর যাদৃশ আকার, আয়তন ও চলাফেরা, তাহা তাদৃশ হইল কেন, এতদ্বিষয়ক আমূল শিক্ষা কোন মানুষের পক্ষে অপর মানুষকে শিখান সম্ভবযোগ্য নহে।

কোন্ কোন্-বিষয়ক শিক্ষা একজন মানুষের পক্ষে অপর একজনকে শেখান সম্ভব, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অথবা ব্যক্ত (manifest)। তদ্বিষয়ক শিক্ষা একজনের পক্ষে অপর একজনকে শেখান সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়(মন)গ্রাহ্য ও বুদ্ধি-গ্রাহ্য অথবা অব্যক্ত তদ্বিষয়ক কোন শিক্ষা কেহ কাহাকেও সর্ব্বতোভাবে শিখাইতে সক্ষম হয় না। এই অব্যক্ত-বিষয়ক বিবিধ শিক্ষার উপায় একজনের পক্ষে আর একজনকে বলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু দৃঢ়তা এবং মনোযোগের সহিত নিজে চেষ্টা না করিলে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ উপদেশ যথাযথ অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না এবং ঐ শিক্ষাও যথাযথ-ভাবে সম্পূর্ণ হয় না।

কাযেই বলিতে হয় যে, কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সর্ব্ববিষয়ক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভবযোগ্য নহে। তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রমজীবিগণকে ও ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন বৈশ্যগণকে যে যে বিষয়ে যে যে রকমের শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব ও প্রয়োজনীয়, তাহার দায়িত্ব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু মনঃ-শক্তিসম্পন্ন ক্ষত্রিয়গণকে ও বুদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণকে যে যে-বিষয়ক বিশেষ শিক্ষা দিবার প্রয়োজন তাহার দায়িত্ব কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

সুতরাং, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা কোথায়, তাহার উত্তরে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, শ্রমজীবীর ও বৈশ্যের বিদ্যা বিতরণ করিবার জন্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু যে-বিদ্যায় মানুষের ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সেই বিদ্যা এক সঙ্গে একাধিক ছাত্রকে শ্রেণীবিভক্ত করিয়া কোন অধ্যাপকের পক্ষে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা সম্ভব নহে।

আজকালকার তথাকথিত উচ্চ-শিক্ষার অধ্যাপকগণ প্রায়শঃ ঐ নামের ঘৃণিত কলঙ্ক বলিয়া শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-বিষয়ক এই প্রাথমিক সত্যগুলি পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন না এবং অধ্যাপনার নামে কতকগুলি অভিনয় সম্পাদন করিয়া যুবকগণের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিতেছেন এবং সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন।

শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম

"শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা" ও "শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা", এই দুইটি সন্দর্ভে যে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া অনুধাবন করিতে পারিলে "শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম" কি হওয়া উচিত, ইহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে।

শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং তাহার ক্রম কি হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সর্ব্বত্র মনে রাখিতে হইবে যে, সকল মানুষ একই রকমের গুণ ও কার্য্য-শক্তির বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন না, যাঁহার মধ্যে যে গুণ ও কার্য্য-শক্তির বীজ নিহিত নাই, তাঁহাকে সেই গুণ ও কার্য্য-শক্তি বিষয়ে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করা আর "গাধা পিটাইয়া ঘোড়া করিবার চেষ্টা করা" একই কথা।

ইহারই জন্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সে স্বভাবতঃ কোন্ কোন্ গুণ ও কার্য্য-শক্তির উৎকর্ষ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে হয়। এই পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি সহজসাধ্য নহে। সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে, বৈদ্যের পক্ষে যেরূপ হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিয়া পাকস্থলী, হৃদয় ও মস্তিষ্কের অবস্থা

যথাযথ ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়, সেইরূপ শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা প্রকৃত বুদ্ধিমান্ অথবা ব্রাহ্মণ হইতে পারিলে চোখের দ্বারা নিরীক্ষণ করিয়া শিশুর উৎকর্ষ তাহার মুখে, অথবা বাহুতে, অথবা উরুতে, অথবা পায়ে, অর্থাৎ শিশু স্বভাবতঃ কোন্ শ্রেণীর মানুষের উৎকর্ষ লইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহা স্থির করা সম্ভব হয়। ইহারই নাম "জাতকর্ম্ম"।

এইরূপ ভাবে জাত-কর্ম্ম-সমাপন করিবার পর স্বভাবতঃ যে শিশু ব্রাহ্মণ্যের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণ-জনোচিত শিক্ষা, যে স্বভাবতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হয় তাহাকে ক্ষত্রিয়-জনোচিত শিক্ষা, যে স্বভাবতঃ বৈশ্যত্বের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহাকে বৈশ্য-জনোচিত শিক্ষা, যে স্বভাবতঃ শ্রমজীবিত্বের উৎকর্ষ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহাকে শ্রমজীবি-জনোচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। বলা বাহুল্য, শিশুর শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবে তাহার মাতা, পিতা, অথবা উহাদের অবিদ্যমানে অভিভাবকের উপর ন্যস্ত থাকে।

শিশু ব্রাহ্মণ্যের উৎকর্ষ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করুক, আর ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব, অথবা শ্রমজীবিত্বের উৎকর্ষ লইয়াই জন্ম গ্রহণ করুক, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কোন শিশুকেই কোনরূপ শিক্ষার তাড়না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ শিক্ষার তাড়না দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন, যখন শিশুর প্রকৃতিতে বিকৃতির কোন আধিপত্য প্রবিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা উপস্থিত হয়। বিশ্ব-নিয়ন্তার এমনই নিয়ম যে, দন্তোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে শিশু-প্রকৃতিতে বিকৃতির উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কাহারও প্রকৃতিতেই বিকৃতির আধিপত্য স্থান পায় না। এই সময় শিশুর স্বভাবটি থাকে টলটলায়মান পারদের মত এবং তখন কোন্ শিশুর প্রকৃতিতে কোন্ শ্রেণীর বিকৃতির উন্মেষ হইতে থাকে, তাহা লক্ষ্য করা এবং বৈকৃতিক অবস্থা হইতে প্রাকৃতিক অবস্থায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা প্রত্যেক মাতা-পিতার সন্তান-বিষয়ক সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

শিশু যখন ষষ্ঠ বর্ষে উপনীত হয়, তখন প্রকৃতপক্ষে বাল্য-শিক্ষা আরম্ভ হইবার কাল উপস্থিত হয়। আগেই দেখান হইয়াছে যে, চারি শ্রেণীর শিশুর চারি রকমের শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, যে-শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে শ্রমজীবী অথবা বৈশ্য হইবে, তাহার পক্ষে যে শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা ব্যক্তবিষয়ক, আর যে-শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ হইবে বলিয়া আশা করা যাইবে, সেই শিশুর শিক্ষা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এই উভয়-বিষয়ক। আহার, নিদ্রা এবং মৈথুন, এই তিনটি প্রবৃত্তির আতিশয্য অথবা অভাব যাহাতে মানুষের অভ্যন্তরে স্থান না পায়, তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে শিখাইবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মণ্যের বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ প্রবৃত্তি তিনটি যত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা সম্ভব হয়, যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে উহা তত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। আবার যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ প্রবৃত্তি তিনটি যত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা সম্ভব হয়, বৈশ্যত্বের বীজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহা তত অধিক পরিমাণে প্রশমিত করা কখনও সম্ভব হয় না। সেইরূপ আবার, বৈশ্যত্বের বীজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে ঐ তিনটি প্রবৃত্তি যাদৃশ পরিমাণে দমিত করা সম্ভব হয়, শূদ্রত্বের বীজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহা কখনও তাদৃশ পরিমাণে দমিত করা সম্ভব হয় না।

যথাযথ শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে, কেন ও কখন ঐ তিনটি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং কোন্ কারণে ঐ প্রবৃত্তি তিনটির সম্পূর্ণ অভাব উপস্থিত হইয়া মানুষকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারে এবংবিধ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণত্বের বীজসম্পন্ন বালকগুলির পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনে ঐ তিনটি প্রবৃত্তিকে অনায়াসে ইচ্ছানুরূপ দমিত ও জাগ্রত করা সম্ভব হয়। কিন্তু, ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন বালক-গুলির পক্ষে ঐ ব্যক্ত ও অব্যক্ত ব্যাপারগুলি সম্পূর্ণ ভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না এবং তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ তিনটি প্রবৃত্তিকে অনায়াসে ইচ্ছানুরূপ দমিত ও জাগ্রত করাও সম্ভব হয় না। কোন্ মানুষের অভ্যন্তরে কোন্ কারণে কখন আহার, নিদ্রা, ও মৈথুন-প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহা ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ-সম্পন্ন মানুষের পক্ষে কোনক্রমেই নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু উপদেশ পাইলে ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষের পক্ষে উহা অনুমান করা সম্ভব হয় এবং তাহারা ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছানুরূপ

অনায়াসে দমিত ও জাগ্রত করিতে সক্ষম হয় না বটে, কিন্তু দ্রব্যবিশেষের সাহায্যে উহা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়া থাকে।

সেইরূপ আবার, ঐ তিনটী প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির যতটুকু জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয়, বৈশ্যত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির ঐ জ্ঞান ততটুকু হওয়া সম্ভব হয় না এবং শ্রমজীবিত্বের বীজসম্পন্ন মানুষের জ্ঞানের সম্ভাবনা তদপেক্ষাও কম হইয়া থাকে। প্রবৃত্তি-সমূহের দমন ও জাগরণ সম্বন্ধেও একই কথা। ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষ দ্রব্যবিশেষের সাহায্যে ঐ তিনটী প্রবৃত্তিকে প্রয়োজনানুরূপ দমিত ও জাগ্রত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু প্রবৃত্তির তৃপ্তি যাহাতে সাধিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত না হইলে বৈশ্যবীজসম্পন্ন মানুষের পক্ষে প্রবৃত্তি-সমূহের হাত এড়ান কখনও সম্ভব হয় না এবং শ্রম-জীবীর বীজসম্পন্ন মানুষগুলিকে, প্রবৃত্তির তৃপ্তি যাহাতে সাধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াও, উহাদের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যদিও আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনের দমন ও জাগরণ-সম্বন্ধীয় শিক্ষা চতুর্ব্বিধ মানুষকেই দিবার প্রয়োজন আছে এবং প্রথমতঃ তদুদ্দেশ্যেই শিক্ষার ব্যবস্থা রচিত হওয়া সঙ্গত তথাপি চতুর্ব্বিধ মানুষের পক্ষে প্রবৃত্তিসমূহের দমন ও জাগরণ সম্বন্ধে একই শ্রেণীর সাফল্য অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না এবং ইহার জন্য একই শ্রেণীর শিক্ষা-প্রণালীও চারি শ্রেণীর মানুষের পক্ষে ইষ্টপ্রদ হয় না।

শারীরিক শক্তি, ইন্দ্রিয়-শক্তি, মনঃ-শক্তি এবং বুদ্ধি-শক্তি-সম্বন্ধীয় শিক্ষা-বিষয়েও একই সূত্র প্রয়োগযোগ্য।

কি করিলে স্বাভাবিক শারীরিক শক্তি অটুট থাকিয়া ক্রমে ক্রমে উহার উন্নতি সাধিত হওয়া সম্ভব, শারীরিক শক্তির দ্বারা যে যে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য জীব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক, এবংবিধবিষয়ক শিক্ষা চারি শ্রেণীর মানুষের পক্ষেই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শারীরিক শক্তি-বিষয়ক ঐ ঐ শিক্ষা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবীজসম্পন্ন মানুষ-গুলির পক্ষে যত অধিক পরিমাণে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, শ্রমজীবীর বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে উহা তত অধিক পরিমাণে অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু কায়িক শ্রমের দ্বারা জীব-সমাজের মঙ্গলজনক যে যে কার্য্য করা সম্ভব হয়, তদ্বিষয়ক অভ্যাস যে-নৈপুণ্যের সহিত শ্রমজীবীর বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে আয়ত্ত করা সম্ভব হয়, অপর তিন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে উহা তাদৃশ নৈপুণ্যের সহিত অর্জ্জন করা কখনও সম্ভব হয় না।

সেইরূপ আবার, কি করিলে স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-শক্তি অটুট রাখিয়া ক্রমে ক্রমে উহার উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়, ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা যে যে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ কার্য্য জীব-সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অমঙ্গলজনক এবংবিধ-বিষয়ক শিক্ষা চারি শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজন বটে, কিন্তু শ্রমজীবিগণের পক্ষে উহা শিক্ষা করা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না। পরন্তু, ঐ শিক্ষা অপর তিন শ্রেণীর মানুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব-যোগ্য হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির ঐ শিক্ষা যত আমূল ভাবে অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, বৈশ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে উহা তত আমূল ভাবে অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। অন্যদিকে, ইন্দ্রিয়-শক্তির দ্বারা জীব-সমাজের মঙ্গলজনক যে যে কার্য্য সাধিত হইতে পারে, তাহা সম্পাদন করিবার অভ্যাস বৈশ্যত্বের বীজযুক্ত মানুষ-গুলির পক্ষে যত নৈপুণ্যের সহিত অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, অন্য দুই শ্রেণীর মানুষ তাহা তত নৈপুণ্যের সহিত অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না।

মনঃ-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তিবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

মনঃ-শক্তিবিষয়ক বিবিধ শিক্ষা চারি শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু শ্রমজীবী ও বৈশ্যগণ উহা অর্জ্জন করিতে কখনও সক্ষম হন না। অপর দুই শ্রেণীর মানুষ, অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলি উহা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-বীজসম্পন্ন মানুষগুলি এতদ্বিষয়ক শিক্ষায় যত আমূল ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারেন, ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে তত আমূল ভাবে প্রবেশ লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এতদ্বিষয়ক শিক্ষায় ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাকৃত অধিকতর সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন বটে, কিন্তু মনঃ-শক্তির দ্বারা জীব-সমাজের হিতজনক যে যে কার্য্য সম্পাদনের যোগ্য, সেই সেই কার্য্যের অভ্যাসে ক্ষত্রিয়ত্বের বীজসম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে যত অধিক

পরিমাণে কুশলতা লাভ করা সম্ভবযোগ্য হয়, ব্রাহ্মণ্যের বীজ-সম্পন্ন মানুষগুলির পক্ষে তাহা সম্ভবযোগ্য হয় না।

বুদ্ধি-শক্তিবিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস চারি শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজনীয় বটে এবং অল্লাধিক পরিমাণে ঐ শক্তি চারি শ্রেণীর মানুষই স্বভাবতঃ লাভ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ-বিষয়ক শিক্ষা ও অভ্যাস একমাত্র ব্রাহ্মণ্যের বীজসম্পন্ন মানুষগুলি ছাড়া আর কাহারও পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হয় না।

চারি শ্রেণীর মানুষের শক্তি, শিক্ষা-সামর্থ্য ও অভ্যাস-সামর্থ্যের এত তারতম্য হয় কেন, তাহাও ঋক্, সাম, যজুঃ, এই তিন বেদের কয়েকটী মন্ত্রে অভ্যস্ত হইতে পারিলে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয়। বর্ত্তমান শরীর-গঠন (Anatomy) ও শরীর-বিধান (Physiology) তত্ত্বানুসারে সকল মানুষেরই শরীরের গঠন ও বিধান একই রকমের বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে এবং ঐ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আধুনিক চিকিৎসকগণ চিকিৎসা-কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞানে গভীরতর-ভাবে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, সকল শ্রেণীর মানুষের শরীরের গঠনে ও বিধানে অনেকখানি সমতা আছে বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বতোভাবে সমান নহে। চারি শ্রেণীর মানুষের শরীরের গঠন ও বিধানে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থাকে এবং ঐ পার্থক্যবশতঃ তাহাদের শক্তি, শিক্ষা-সামর্থ্য ও অভ্যাস-সামর্থ্য চারিটী পৃথক্ শ্রেণীর হইয়া পড়ে।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, যদিও চারি শ্রেণীর মানুষের কোন কোন ব্যাপারে একইবিষয়ক শিক্ষা দিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তথাপি বাল্য হইতেই তাহাদিগের শিক্ষা-প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তক চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর হওয়া একান্ত বিধেয়, কারণ একদিকে যেরূপ তাহাদিগের শরীরের গঠন ও বিধানে কিছু কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থাকে, অন্য দিকে সেইরূপ তাহাদিগের শক্তি, শিক্ষা-সামর্থ্য এবং অভ্যাস-সামর্থ্যও পৃথক্ হইয়া পড়ে।

শুধু যে, শিক্ষা-প্রণালী ও পাঠ্য পুস্তকই চারিশ্রেণীর তাহা নহে, শিক্ষকতা ও পাঠ্য পুস্তকের ভাষাও পৃথক্ হওয়া একান্ত বিধেয়।

যাঁহারা স্বভাবতঃ শ্রমজীবীর বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা কখনও কোন পুস্তকের সাহায্যে সুচারুরূপে সাধিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে। মৌখিকভাবে উহা সাধন করিতে হয় এবং উহা যথাবিহিতরূপে সম্পাদিত হওয়ার ব্যবস্থা একান্ত বিধেয়।

যাঁহারা স্বভাবতঃ বৈশ্যত্বের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কতক শিক্ষা মৌখিকভাবে এবং বাকী শিক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে সম্পাদন করিলে তাঁহাদিগের প্রকৃতির সহিত সমঞ্জস হইয়া থাকে এবং উহা সুফলপ্রদ হয়।

যাঁহারা স্বভাবতঃ ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের বাল্যাবস্থার শিক্ষাও মৌখিকভাবে সম্পাদন করা বিধেয়। তাহার পর, তাঁহাদিগের ব্যক্ত-বিষয়ক শিক্ষা মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে ও অব্যক্ত-বিষয়ক শিক্ষা হয় প্রাচীন সংস্কৃত, নতুবা প্রাচীন হিব্রু, অথবা প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের সাহায্যে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

যাঁহারা স্বভাবতঃ ব্রাহ্মণ্যের বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন তাঁহাদের শিক্ষার ভাষা ক্ষত্রিয়ত্বের বীজ-সম্পন্ন মানুষের শিক্ষার ভাষার অনুরূপ হওয়া বিধেয়।

শিক্ষা-বিষয়ে আজকাল প্রায়শঃ প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ-শিক্ষা বলিয়া তিন শ্রেণীর কথা বলা হইয়া থাকে। এবংবিধ তিন শ্রেণীকে কোনরূপ অর্থযুক্ত বলিয়া ধরিয়া লইলে, শ্রমজীবিগণের শিক্ষাকে 'প্রাথমিক শিক্ষা', বৈশ্যগণের শিক্ষাকে 'মাধ্যমিক শিক্ষা' এবং ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণের শিক্ষাকে 'উচ্চ শিক্ষা' বলিয়া মনে করিতে হয়।

এতদনুসারে ধরিয়া লইতে হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বদা মৌখিক হওয়া এবং তাহাতে কেবলমাত্র মাতৃভাষার ব্যবহার হওয়া সঙ্গত।

মাধ্যমিক শিক্ষার কিয়দংশ মৌখিকভাবে এবং অপরাংশ মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত।

উচ্চশিক্ষার কিয়দংশ মৌখিকভাবে, কিয়দংশ মাতৃভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে এবং বাকী যে অংশ অব্যক্ত-সম্বন্ধীয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায়, নতুবা আরবী ভাষায়, নতুবা হিব্রু ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যে সম্পাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহার কারণ, অব্যক্ত-সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব কোন মাতৃভাষায় সম্যক্ পরিমাণে ব্যক্ত করা সম্ভবযোগ্য নহে।

যাঁহারা মনে করেন যে, উচ্চ-শিক্ষা একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যে সাধন করা সম্ভবযোগ্য, তাঁহারা যে, উচ্চ-শিক্ষা বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত নহেন, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

শিক্ষা অবৈতনিক করিবার কথা আজকাল অনেকের মুখ হইতেই বাহির হইয়া থাকে বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, শিক্ষার্থীর পক্ষে শিক্ষা যাহাতে অবৈতনিক হয়, তাহার ব্যবস্থার পরিকল্পনার মূলে বিশেষ কোন যুক্তি থা'ক আর না-ই থা'ক, উহা যাহাতে শিক্ষকগণের পক্ষে অবৈতনিক হয়, তাহার ব্যবস্থার অনুকূলে অনেক যুক্তি সহজেই দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থের জন্য লালায়িত হইলে, শিক্ষকগণের পক্ষে স্থিরভাবে শিক্ষার দায়িত্ব নির্ব্বাহ করা প্রায়শঃ সম্ভবযোগ্য নহে। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, শিক্ষকগণ যাহাতে কোনরূপ বেতন গ্রহণ না করিয়াও স্ব স্ব পরিবারের ভরণ-পোষণ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা যতদিন সাধিত না হয়, ততদিন তাঁহাদিগের পক্ষে অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদানের কার্য্যে টিকিয়া থাকা কখনও সম্ভবপর হইবে না।

সমাজের পরিচালনায় চারি শ্রেণীর মানুষের কি কি প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে অবহিত হইলে দেখা যাইবে যে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অথবা গুরুর নিকট যাহা যাহা একান্তভাবে শিক্ষণীয়, তাহা ষোড়শ বর্ষের মধ্যে শ্রমজীবীর, অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে বৈশ্যের, বিংশবর্ষের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাবিংশ বর্ষের মধ্যে ব্রাহ্মণের যাহাতে সম্পূর্ণ হয়, তদ্বিষয়ে সতর্কতার প্রয়োজন আছে।

'শিক্ষা লাভ করিবার উপায় এবং ক্রম'সম্বন্ধীয় সূত্র উপরোক্তভাবে স্থির করা যাইতে পারে।

এতদ্বিষয়ক বিশদ কথা অনেক। তাহা এতাদৃশ মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করা সম্ভবযোগ্য নহে।

উপসংহার

উপসংহারে আমাদের মুখ্য বক্তব্য দুইটি। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যর্থ হইতেছে কেন, তাহা আমাদিগের প্রথম আলোচ্য; আর দ্বিতীয়তঃ, মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষা-বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহার আলোচনা করিব।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা ব্যর্থ হইতেছে কেন, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে, উহার মূল কারণ পাঁচটী, যথা :—

(১) শিক্ষার্থীর শরীরের গঠন ও বিধানানুসারে শিক্ষাদান-প্রণালীর ভাবভঙ্গীর পার্থক্য কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধীয় সূত্রের অভাব।

(২) শিক্ষার্থীর শরীরের গঠন ও বিধানানুসারে শিক্ষার ভাষার পার্থক্য কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধীয় সূত্রের অভাব।

(৩) শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক শক্তির তারতম্যানুসারে শিক্ষার উদ্দেশ্যের তারতম্য কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক সূত্রের অভাব।

(৪) শিক্ষার্থীর শ্রেণীবিভাগানুসারে পাঠ্য পুস্তকের ভাষার ও রচনা-প্রণালীর তারতম্য কিরূপ হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক সূত্রের অভাব।

(৫) বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের শিক্ষকের জ্ঞান, চরিত্র ও চলাফেরার কিরূপ তারতম্য হওয়া উচিত তদ্বিষয়ক সূত্রের এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

এক কথায়, বর্ত্তমান সমাজে না আছে প্রকৃত শিক্ষক, না আছে প্রকৃত পাঠ্য-পুস্তক, অথবা প্রকৃত শিক্ষা বিজ্ঞান। ফলে মুড়ি ও মুড়কী একই ভাবে সিক্তিত হইতেছে এবং লেখা-পড়া শিখিয়াও বিশেষজ্ঞ যেমন প্রায়শঃ চরিত্রহীন ও সদসদ্ কার্য্যে কুণ্ঠাহীন হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ শিক্ষার্থিগণও প্রায়শঃ নর্ত্তন-কুর্দ্দনে এবং খেলা-ধূলায় মত্ত হইয়া জীবনের শিক্ষার সময়টা হেলায় কাটাইয়া দিতেছেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মানব-সমাজের মধ্যে নফরগিরী, অর্থাভাব এবং অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাইয়া চলিতেছে।

এতদবস্থায় শিক্ষা-বিষয়ে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহার আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে হইবে যে, সর্ব্বাগ্রে জনসাধারণ যাহাতে খাইতে পায়, তাহার চেষ্টায় আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষা শ্রমজীবিগণের মধ্যে আরও ব্যাপক ভাবে প্রবেশলাভ করিতে না পারে, তাহার জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে। পেটের ক্ষুধা যাহাতে নিবারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা না হইলে প্রকৃত উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া যে সম্ভবযোগ্য নহে, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

যাহাতে জনসাধারণের সকলেই খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা কোন্ উপায়ে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। প্রয়োজন হয় আবার বলিব।

জীবাণু

—ডাক্তার

জীব-জগতে সবচেয়ে ছোট যে প্রাণী, তাকে আধুনিক বিজ্ঞানে বলা হয় জীবাণু; ইংরাজীতে (বা ল্যাটীনে) ব্যাক্‌টীরিয়াম্ (bacterium)। কিন্তু গোড়াতেই মস্ত একটা ভুল হল—যে-সব প্রাণীকে আমরা জীবাণু বলে জানি, তারা সবচেয়ে ছোট মোটেই নয়, কারণ তাদের চেয়েও অনেক ছোট প্রাণী আমাদের জানা আছে। জীবাণুর চেয়েও যে-সব ছোট প্রাণী, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যদিও বৈজ্ঞানিকরা নিঃসন্দেহ, কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁদের চাক্ষুষ পরিচয় বড়ই কম। জীবাণু বা ব্যাক্‌টীরিয়াদের সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের চাক্ষুষ পরিচয় মাইক্রস্‌কোপের মারফৎ যথেষ্ট।

এই সব জীবাণু বা ব্যাক্‌টীরিয়া যে কত ছোট সে সম্বন্ধে ধারণা করা বেশ একটু কষ্টকর; জ্যামিতির বিন্দু বা রেখার অস্তিত্ব যেমন ধারণা করা শক্ত, এদের সম্বন্ধে ততটা শক্ত না হলেও খুব বেশী তফাৎ মনে হয় না। মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে, এক একটি জীবাণুর আকার, এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ—কথাটা লিখতে কিংবা বলতে মোটেই কষ্ট হয় না, কিন্তু একটু ভাবলে বুঝতে পারা যায়, এর ধারণা হয় না। তুলনামূলক একটা উদাহরণ দিলে হয়ত একটু সুবিধা হবে। ধরা যাক্, এমন একটা যন্ত্র পাওয়া গেল, যার মধ্য দিয়ে একটা জীবাণুকে দেখলে আধ ইঞ্চি মোটা এবং চার ইঞ্চি লম্বা দেখায়। সেই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে একটা মানুষকে দেখলে কত বড় দেখাবে জানেন? পনের মাইল উঁচু! পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু পাহাড় এভারেষ্টের তিনগুণ!

এদের দেহের পরিমাণ যদিও গড়ে এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ (অনেকগুলি আবার এর চেয়েও অনেক ছোট), কিন্তু দেখতে এরা সকলে একই রকম নয়। এদের মধ্যে কতকগুলি দেখতে বাংলা 'দাঁড়ি'র মতন এক একটি রড (rod), তাদের বলে ব্যাসিলস্ (bacillus), আবার কতকগুলি ইংরাজী ফুলষ্টপের মতন এক একটি ফুটকি—তাদের বলে কক্কস্ (coccus)। বেশীর ভাগ জীবাণুই এই দুয়ের এক রকম, তবে এ ভিন্ন অন্য অনেক রকম আকারও দেখা যায়; যেমন "কমা"-ব্যাসিলস্, ইংরাজী কমা (comma) চিহ্নের মতন কিংবা স্পাইরিলম্ (spirillum) আঁকা বাঁকা সাপের মতন।

দেখতে একই রকম হলেও সব ব্যাসিলাই-এর কিংবা সব কক্কাই-এর কাজ একরকম নয়। টাইফয়েডের ব্যাসিলাই এবং থাইসিসের ব্যাসিলাই-এর আকারে কোনও তফাৎ নেই, কিন্তু কাজ মোটেই এক ধরণের নয়, কিংবা স্বভাবও এক নয়। দেখতে এক রকমের হলে এদের চিনতে অসুবিধা হয়, এইজন্য ডাক্তারদের সুবিধা হবে বলেই বোধ হয়, ভগবান্ এদের ব্যবহার এবং স্বভাব আলাদা করে দিয়েছেন। কতকগুলি জীবাণু থাকে সারি বেঁধে লম্বা চেনের মত, কেউ বা থাকে এক এক জায়গায় থোকা বেঁধে, কতকগুলি থাকে জোড়া জোড়া, আবার কতকগুলি থাকে চারিটি করে এক এক জায়গায়, কেউ বা সচল, আবার কেউ বা নিশ্চল; এই রকম নানারকম প্রভেদ পাওয়া যায়। এত রকম ভাবে থাকা সত্ত্বেও এদের সব সময় চেনা যায় না। তখন তাদের পরিচয় নিতে হয় নানাভাবে রং করে। সব জীবাণুতে সব রকম রং ধরে না। আরও একটি চেনবার উপায় হচ্ছে, তাদের নানারকম খাদ্যে রেখে তাদের ব্যবহার লক্ষ্য করা। যেমন ধরুন, গ্লুকোজের জলে রাখলে কোনও কোনও ব্যাসিলাই তাকে অম্ল করে, কেউ বা তাতে গ্যাস তৈরী করে, আবার কেউ বা অম্ল এবং গ্যাস দুই করে। যখন এইরকম সব উপায়ই ব্যর্থ হয়, তখন তাদের ইঞ্জেক্‌সন্ করে দেওয়া হয় জন্তুদের (গিনিপিগ্, খরগোস প্রভৃতি) শরীরে—কি রোগ হয় তা দেখার জন্য। এত রকম কাণ্ড করেও অনেক সময় কোনও কোনও জাতের জীবাণু চেনা যায় না।

প্রাণী বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, তাদের হাত, পা, নাক, মুখ কিছু আছে; কিন্তু জীবাণুদের এ সব বালাই কিছুই নেই, এমন কি এদের হার্ট বা হৃদ্‌যন্ত্র বলেও কিছু নেই। এক কথায় এদের এক একটিকে একটি মাত্র কোষ (cell)

বলা যেতে পারে। কিন্তু তা হলেও ঠিক শাস্ত্রসঙ্গত হয় না। কোষের ভিতরে সাধারণতঃ একটি করে অন্ততঃ নিউক্লিয়াস্ থাকে—এদের মধ্যে তাও নেই। সাধারণ কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে সব জিনিষ একত্র সঞ্চিত থাকে, জীবাণুর মধ্যে সেই জিনিষগুলি সর্ব্বাঙ্গে ছড়ানো থাকে। এদের এক একটি সেল্ (cell) বা কোষ না বলে এক এক বিন্দু প্রোটোপ্লাজম্ বলাই ভাল।

এদের বংশবৃদ্ধির উপায় অদ্ভুত। একটা জীবাণু যদি মাইক্রসকোপের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, তা হলে দেখা যায় তার শরীরের ঠিক্ মাঝখানটায় ধীরে ধীরে সরু হয়ে একটু পরে ভিন্ন হয়ে গেল; ছিল মাত্র একটি জীবাণু—হল দুটো, কারণ অতি সামান্য ক্ষণ পরেই এই অর্দ্ধ-জীবাণুরা পূর্ণ আয়তন পায়, এই রকম ভাবে সেই দুটি জীবাণু থেকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে চারিটি জীবাণু হয়, আবার আরও কুড়ি মিনিট থেকে চারিটি থেকে আটটি হয়। এই রকম মোটা-মুটি কুড়ি মিনিট পরে পরেই যদি এরা এই রকম ভাবে ডবল হয়ে বাড়তে থাকে, তা হলে ২৪ ঘণ্টায় যে কত লক্ষ লক্ষ জীবাণু হবে, সেটা অনুমান করা খুব শক্ত নয়। জীবাণুর ঠিক ওপরের স্তরে যে সব জীব আছে, তাদের বংশ-বৃদ্ধির ব্যাপারে কিছু না কিছু যৌন সম্বন্ধ দেখা যায়, কিন্তু জীবাণুরা কোনও রকম যৌন সম্বন্ধ ব্যতিরেকে অনন্ত বংশ-বৃদ্ধি করে যায়। কেবল তাই নয়, জরা কিংবা মৃত্যু এদের স্বাভাবিক ভাবে হয় না—শক্র যদি এদের না মারে, তা হলে দেবতাদের মতনই এদের অনন্ত যৌবন এবং অনন্ত জীবন। শক্র অর্থে বুঝতে হবে খাদ্যাভাব, অত্যধিক গরম, কিংবা ঠাণ্ডা, কিংবা কোনও বিষাক্ত জিনিষ প্রভৃতি।

কচ্ছপকে আক্রমণ করলে তারা যেমন খোলার মধ্যে তাদের শরীর গুটিয়ে নেয়, যার দরুণ তাদের শক্ত আবরণের ওপরেই শক্রর আক্রমণ পড়ে—জীবাণুদের আত্মরক্ষার উপায়ও কতকটা সেই ধরণের। কচ্ছপের স্বভাবতঃই শক্ত আবরণ থাকে, কিন্তু জীবাণুদের সে-রকম নেই—তাদের সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিতে হয়। যখন, খাদ্যাভাবের জন্যই হোক কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থার (বেশী গরম কিংবা ঠাণ্ডা) জন্যই হোক্, জীবনরক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তখন এরা খুব ছোট্ট একটা বলের আকৃতি নেয় এবং সেই বলের ওপর শক্ত একটা আবরণ দিয়ে নেয়। এই অবস্থায় এদের বলা হয় স্পোর (spore) এবং এ অবস্থায় এরা বহুদিন থাকতে পারে, তখন তাদের খাদ্যেরও দরকার হয় না, আর তাদের সে অবস্থায় গরম দিয়ে কিংবা ঠাণ্ডা দিয়ে মেরে ফেলাও খুব শক্ত। সুদিন যখন ফিরে আসে, তখন তারা আবার তাদের পূর্ব্বাবস্থা ফিরে পায়। একটি জীবাণু থেকে একটি মাত্র স্পোর তৈরী হয় এবং একটি স্পোর থেকে একটি জীবাণুই হয়। জীবাণুর স্পোরের সঙ্গে অন্য প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের স্পোরের তফাৎ আছে। অন্য স্পোরের কাজ হচ্ছে প্রজনন, আর জীবাণুর স্পোরের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আত্মরক্ষা।

জীব-জগতের নিম্নস্তরের দিকে যেতে যেতে যখন আমরা জীবাণুর স্তরে এসে পৌঁছাই, তখন বলা শক্ত হয় এরা প্রাণী না উদ্ভিদ্! কতকগুলি জীবাণুকে উদ্ভিদ্ ছাড়া আর কিছু বলা শক্ত, আবার কতকগুলির স্বভাব যখন লক্ষ্য করা যায়, তখন তাদের প্রাণী বলেই মনে হয়। এদের দেখে মনে হয়, এরা যেন প্রাণী আর উদ্ভিদের সন্ধিস্থলের জীব।

সাধারণের কাছে রোগ আর জীবাণু অনেকটা একার্থ-বোধক শব্দ। এ কথা সত্য যে, ছোঁয়াচে রোগ জীবাণুর দ্বারাই সম্ভব, কিন্তু মানুষের যাবতীয় ব্যাধির জন্য এদের দায়ী করাটা অত্যাচার। যে-সব জীবাণু রোগের সৃষ্টি করে' মানুষের অপকার করে, তাদের সঙ্গদোষে পড়ে বেচারা অন্য সব জীবাণু যারা বাস্তবিক উপকার করে তারাও বদনামের ভাগী হয়।

নাইট্রোজেন জিনিষটা উদ্ভিদ্ এবং প্রাণীর পক্ষে সমান অপরিহার্য্য। হাওয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সেটাকে দেহসাৎ করা। জমিতে এমন অনেক জীবাণু থাকে, যারা হাওয়া থেকে কিংবা জমি থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে সেটাকে গাছের দেহসাৎ করবার উপযুক্ত করে দেয়। অনেক রকম ফসল আছে, যা চাষ করলে জমির উর্ব্বরাশক্তি বেড়ে যায়—তার কারণ হচ্ছে এক ধরণের জীবাণু। দেখা যায় এই সব গাছের শিকড় একটু ফোলা-ফোলা এবং তাতে অজস্র গুটির মত জিনিষ রয়েছে—এই গুটিগুলির জন্য দায়ী এক রকম জীবাণু এবং এই গুটি-গুলি নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার।

দুধ থেকে মাখন তৈরী ব্যাপারেও জীবাণুর অনেক কেরামতী আছে। মাখনের স্বাদ এবং গন্ধ খুব বেশী পরি-

মাণে নির্ভর করে, মাখন তৈরী হবার আগে দুধে যে ধরণের জীবাণু থাকে তার উপর। সেই জন্য বিভিন্ন স্থানের মাখনের গন্ধ এবং স্বাদ বিভিন্ন রকমের হয়।

ঘরে কোন জিনিষ পচে গেলে সে কথা জানতে মোটেই দেরী হয় না তার দুর্গন্ধের জন্য। এই পচে যাওয়া বা দুর্গন্ধের জন্য দায়ী জীবাণু। যদি এই দুর্গন্ধ সহ্য করে কিছুদিন ধরে সেই জিনিষটা লক্ষ্য করা যায়, তা হলে দেখা যাবে, সে জিনিষটার অস্তিত্ব লোপ পেতে মোটেই দেরী হয় না। প্রশ্ন হতে পারে, এতে জগতের কি উপকার হল? সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ অবধি যত প্রাণী মারা গেছে, যদি তাদের দেহ এ রকম ভাবে লুপ্ত না হত, তা হলে বহু বহু শত বছর আগে পৃথিবীতে ভীষণ ভাবে স্থানাভাব ঘটত। জীবাণুরা কেবল যে, জিনিষটাকে মেরে ফেলে তা নয়—সেই জিনিষটা যে-সব মূল পদার্থে তৈরী, যেমন, কার্ব্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেয় বলে, এই জীবাণুদের মারফতেই সেগুলি আবার জমিতে ফিরে আসে। জমি থেকে গাছের মধ্যে দিয়ে সেগুলি আবার প্রাণীদেরই কাজে আসে। এই সব জিনিষের (কার্ব্বন ইত্যাদি) পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট, অপচয় হলে এদের অভাব হতে মোটেই বেশীদিন লাগে না।

এই রকম ভাবে নানা দিক্ থেকে জীবজগৎ জীবাণুর কাছ থেকে উপকার পায়। দেখে শুনে মনে হয়, জীবাণু অপকার যা করে সেটা অনিচ্ছাকৃত, উপকার করাই তাদের বাসনা, কিংবা হয়ত উপকারটাই অনিচ্ছাকৃত! কে জানে?

সন্ধ্যার কুলায়ে

—শ্রীকালিদাস রায়

জীবনের অপরাহ্ণে ভাবিতেছি বসি বসি আজি
পড়েছি অনেক পুঁথি, লিখিয়াছি নিজে গ্রন্থরাজি,
ভাল হ'ক মন্দ হ'ক। লিখিয়াছি কত ঠেকে ঠেকে,
দেখেও শিখেছি কিছু, কতজনে শিখায়েছি ডেকে
মর্য্যাদা লভেছি কিছু। কেশ পক্ক জ্ঞানের উত্তাপে,
বিদ্যার ভারেতে ন্যুব্জ চলিয়াছি, হস্ত-পদ কাঁপে।
আজিকে সন্ধ্যায় বসি জীবনের করিতে হিসাব
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি ভাবি এত পেয়ে কি করিনু লাভ?
কি মূল্য দিয়াছি এর, পাইয়াছি বিনিময়ে তার
কতটুকু কি এমন? বাড়ায়েছে জীবনের ভার,
যাহা কিছু তাই মোর জীবনের রয়েছে সম্বল,
মুদি যদি আঁখি দুটি হেরি শুধু অক্ষরের দল,
চারি পাশে ঘিরে মোরে। দুর্লভ এ মানবজীবন,
অমূল্য সে জীবনের বাল্যকাল, কৈশোর, যৌবন,
কেটে গেল বিদ্যাজ্ঞান মরীচিকা আলেয়ার পিছে,
ছুটে ছুটে স্বেদসিক্ত ব্যর্থ শ্রমে। সবি হায় মিছে
রঙিন কাচের মোহে হেলাভরে কাঞ্চন রতন
পরিহরি ছুটিয়াছি। সন্ধ্যাভ্রের ঘটার মতন,
সবই স্বপ্ন, সবই মায়া। হ্রদে নদে পবনে গগনে
এমন সুন্দর ধরা—এত শোভা প্রান্তরে গহনে
এত ভোগ্য এ সংসারে, বিহঙ্গসঙ্গীতে এত সুধা
এত মধু ফুলে ফুলে। রুদ্ধ করি হৃদয়ের ক্ষুধা
ত্যজি বিশ্ব-মহোৎসব অভিমানে রইলাম স'রে,
বিধিদত্ত সৌভাগ্যেরে পায়ে ঠেলে হায় হেলা ক'রে।
কি সৌভাগ্য খুঁজিলাম সুখহীন গৌরবের লোভে,
ব্যর্থ হলো এ জীবন। আজি তাই মরিতেছি ক্ষোভে,
হেরিতেছি প্রজাপতি ঘুরিতেছে কুঙ্কুমের বনে
মধুচক্র রচিতেছে ভৃঙ্গগণ মধুর গুঞ্জনে,
ভরিয়া লতিকাকুঞ্জ। তরুশির করিয়া উজ্জ্বল,
দীপান্বিতা মহোৎসবে মাতিয়াছে খদ্যোত সকল
সবাই জীবন ভুঞ্জে। আর আমি গ্রন্থকীটরূপে,
কৈশোর যৌবন ব্যর্থ করিলাম হায় অন্ধকূপে।

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

গৃহিণীপণা

বিশ্বকর্ম্মা সুদক্ষ নাবিক—ছেলেবেলা দাঁড় বাহিয়া অষ্টপ্রহর বেড়াইয়াছেন, বহুদিন অনভ্যাস হইলে কি হয়—নৌ-বিদ্যা ভুলিবার লোক নন।

সুরুচির জলে বেড়াইবার সখ অসাধারণ, সাঁতার জানেন না, কোথাও যাইতে বিশ্বকর্ম্মা নিজে বৈঠা হাতে করেন, যখন তখন নৌকায় উঠিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।

পাশের বাড়ীর এক নূতন বৌ দ্বিরাগমনে আসিয়াছে—কিন্তু দুই বাড়ীর ঘাটে একটা নৌকা কি ডিঙ্গী নাই। ফণী বলিল, 'খুব বড় একটা কলা গাছের ভেলা বেঁধেছি, আসুন তাইতে করে পার করে দিই।'

বিশ্বকর্ম্মার দিদি বলিলেন, 'থাম্ না, নৌকো আসুক, এত তাড়াতাড়ি কি?'

সে কথা কে শোনে! ছেলেপিলে বৌ-ঝি সব ঝুপ্ঝাপ্ বাহির হইয়া গিয়া ভেলায় উঠিল, সুরুচি তখনও বাহির হন নাই।

দিদি বলিলেন, 'রও, যে কাপড় পরার 'ছিরি'—ছোট-বৌ আসবে এখনি।'

সুরুচি আসিলেন, ভেলায় বা নৌকায় চড়িবার নিয়ম জানেন না, বিশ্বকর্ম্মা উঠাইয়া নামাইয়া দেন। আজ তিনি ঘরে শুইয়া, চুপি চুপিই যাওয়া হইতেছে।

এক পা ঘাটে অপর পা ভেলার একেবারে কিনারায় রাখিয়া যেমন সুরুচি ভর দিয়া উঠিতে যাইবেন, ভেলার এ দিক জলের ভিতর তলাইয়া গিয়া ও দিক উঠিল খাড়া হইয়া!

তৎক্ষণাৎ পা পিছলাইয়া সুরুচি সড়াৎ করিয়া জলে পড়িয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে দাঁড় হাতে দণ্ডায়মান ফণী ভেলা হইতে ছিটকাইয়া গিয়া পাঁচ হাত দূরে ঝপাং করিয়া পড়িয়া গেল অগাধ জলে! - ছেলেপিলে শুদ্ধ মেজ বৌয়েরা ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইয়া উঠিলেন। ঐ ঘাট হইতে ও ঘাট পর্য্যন্ত জল তোলপাড় করিতে লাগিল, ভেলাটা আবার সোজা হইয়া ভাসিতে ভাসিতে গিয়া একটা গাছে ঠেকিয়া রহিল।

দিদি ছোট মেয়ের মত ঘাটের উপরে হাসিয়া কুটপাট! জলের মধ্যেও সকলের কি হাসি!—কেবল সুরুচি লজ্জায় বাঁচেন না!

ভিজা বিড়ালের মত একে একে সকলে উঠিয়া বাড়ীতে ঢুকিল, দিদি বলিলেন, 'ছোট-বৌটা একেবারে ধানের ছাগা, কোন বুদ্ধি শুদ্ধি নেই—দিলে সক্কলকে ভাল কাপড় শুদ্ধ, নাকানি চুবোনি খাইয়ে—অবেলায় নেয়ে উঠল!'

শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'ভেলায় চড়তেও জান না—শুধু আমার সঙ্গে লাগতে পার।'

'কোন দিন চড়েছি না কি?'

'ও আবার শিখতে হয়? সবাই জানে, স্বাভাবিক বুদ্ধিটি না থাকলেই এই দশা হয়।'

'তোমার খুব বুদ্ধি আছে, সব শুদ্ধ পড়ে গেলাম, একটু জিজ্ঞাসা-বাদ করবে, কি 'আহা' 'উহু' করবে, না উল্টে বকুনি! এমন বেদরদী দেখিনি।'

'ভুলে গেছি, ঠিক্ তো—আহা, আহা কোথায় লেগেছে? হাত পা ভেঙ্গে যায়নি তো? এস দেখি।'

'যাও—যাও—'

'না শোন, তুমি সেই মহাপদ্ম নন্দের আখ্যান শোনাবে বলেছিলে, বল।'

'আমার যেন কাজ নেই, না?'—সুরুচি চলিয়া গেলেন।

কর্ম্মজীবনে শুধু কাজ আর কাজ, বই পড়ার অভ্যাস বিশ্বকর্ম্মার নাই। অথচ কৌতূহল অসাধারণ, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক বা সামাজিক যে কোন কাহিনী শুনিতে বালকের মত আগ্রহশীল—আহার নিদ্রা ভুলিয়া যান এবং যদিও শুনিবার ঘণ্টা দুই পরে একেবারে বিস্মরণ, তবু শোনাই চাই। অসংখ্যবার শুনিয়াও মনে থাকে না: অম্বা অম্বিকা কার মেয়ে বা জয়দ্রথ কে।

ছুটিতে অখণ্ড অবসর, তবে স্থরুচিকে পাওয়া ভার। তিনি সুনাম অর্জ্জনের চেষ্টায় থাকেন। সকালবেলা দিদি দেখেন, স্থরুচি দুধ জ্বাল দিতে বসিয়াছেন, 'ও কি—তুমি পারবে না, ধরিয়ে ফেলবে, কেউ মুখে দিতে পারবে না, তুমি রাখ—লক্ষ্মী, কথা শোন, মেজ-বৌ আসুক।'

এমন কথা শুনিলে কার না রাগ হয়? বিশ্বকর্ম্মার বন্ধু-বান্ধবেরা স্থরুচির যে নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং শ্রদ্ধান্বিত—সেই সম্মান বাড়ীতে টেঁকে না।

কে একজন বেড়াইতে আসিয়াছে, 'তোমাদের ছোট-বৌকে দেখতে এলাম, সেই বিয়ের সময় দেখেছি। তা এখন কেমন? কাজ-কর্ম্ম শিখেছে? রাঁধতে বাড়তে পারে?'

'পারে এক রকম, বাপের আদুরে মেয়ে—কিছুই জানত না, একা একা বিদেশে থাকে, শিখবে কি?'

'তা বাড়ীতে রাখ না—শিখুক-পড়ুক।'

স্থরুচির মনের ভাব অবর্ণনীয়। হঠাৎ দুধ উথলিয়া পড়িতে পড়িতে সামলাইয়া লইলেন, একটুখানি পড়িয়া গেলই।

আবার শোনা গেল, 'কৈ তোমাদের ছোট-বৌ, ওখানে একটি মেয়ে দুধ জ্বাল দিচ্ছে দেখে এলাম।'

মেজ-বৌ হাসিয়া জবাব দিলেন, 'ঐ-ই ছোট-বৌ'।

'অ্যাঁ, বল কি? একেবারে মাথায় কাপড় নেই, কালে কালে হল কি? বৌ-ঝিরা মাথায় কাপড় দেবে না না কি? বৌ-রাজার দেশ হল যে?—'

সর্ব্বনাশ! কে কখন উঁকি দিয়া দেখিয়া গিয়াছে স্থরুচি টের পান নাই। কাপড়টাও কি অবাধ্য, কিছুতেই কি মাথায় থাকিবে না, আবার পড়িয়া গেলেও টের পাওয়া যায় না। স্থরুচি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, এবার কিছুতেই বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে যাইবেন না, ট্রেনিং কলেজে কিছুদিন থাকিবেনই।

স্ত্রীর দুর্গতি দেখিয়া বিশ্বকর্ম্মা মনে মনে হাসেন, সত্য-যুগের স্বামী-স্ত্রীর মত সুখে-দুঃখে এক কি কলিকালে হয়? আবার দলে দলে লোকে দেখিতে আসে, যেন নূতন বৌ! কি বিড়ম্বনা!

ইহার পরে যখন দিদি বলেন, 'ছোট বৌ তুমি, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেতে বস, অত বেলা পর্য্যন্ত থাকতে পারবে না,'—তখন সত্য সত্যই স্থরুচির কান্না পায়! এই কি গৃহিণীর সম্মান! অসহ্য!

ফণীও স্থরুচির গৃহিণী-পনা মানে না, বয়সে সে স্থরুচির বড়, সেই গর্ব্ব সে কিছুতেই ছাড়িবে না, কথায় কথায় উপদেশ দেয়, 'সেদিন বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলাম, তার এত বাহাদুরি কেন? আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করে কাজ করলে পিসিমার বকুনি খেতে হয় না—তা অহঙ্কারে গ্রাহ্যই নেই।'

ঘটকালি

বিবাহ ব্যাপারে বিশ্বকর্ম্মা বড় উৎসাহী, একজন ফার্ষ্ট ক্লাশ ঘটক (আশা করি কন্যাভারগ্রস্ত পিতারা আশ্বস্ত হইবেন)। তিনি মধ্যস্থ থাকিলে দেনা-পাওনার কথাই ওঠে না। অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে গ্রামের অনেকগুলি অরক্ষণীয়া কন্যা পরিণীতা হইয়া পিতা-মাতাকে নিশ্চিন্ত করিল।

এবার সেজ দাদার বড় মেয়ের পালা।

মামাতো ভাই বসন্ত দাদা বড় রঙ্গদার মানুষ, তিনি বলিলেন, 'হুঁ—মেয়ের মার পা ছড়িয়ে বসে আর সুপুরি কাটা চলবে না, মেয়ের বিয়ে আসছে।'

মেয়ের মা বলিলেন, 'আসছে তো আমাদের কি? সে বুঝবেন নিজেরা।'

আর একবার বসন্ত দা বাড়ীর ভিতর আসিয়া বলেন, 'দিদি!'

'কি?'

'বলছিলাম কি, খুব ভাল তাবিজ পাওয়া যায়, পরলে ছেলে পিলে হবেই, তা শৈলেশ বোসের বৌয়ের জন্যে একটি, আর আমার এই বৌদির জন্যে একটি—'

শৈলেশ বোস বসন্ত দার স্বগ্রামবাসী, তাঁর স্ত্রী পনেরটি সন্তানের জননী, সেজ দাদার স্ত্রী নয়টির মা।

দিদি অবাক্, 'ওমা—ওদের আবার তাবিজ কেন?'

'এই বাঁজা নামটা গেল না, একটা মস্ত ভাবনার কথা! আপনাদের হুঁসই নেই।'

দেওর-ভাজে ভীষণ বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়া গেল, স্থরুচি ঘরের ভিতর হাসিয়া গড়াগড়ি!

সেজ দাদা নিজে গেলেন কন্যার পাত্র দেখিতে, চৌদ্দ বছরের মেয়ে সামনে করিয়া তাঁহারা এতদিন বেশ নিশ্চিন্ত

ছিলেন, কিন্তু বিশ্বকর্ম্মার যন্ত্রণায় কি নিশ্চিন্ত থাকিবার যো আছে ?

সেজ দা ফিরিলে সকলে ঘিরিয়া ধরিল, কিন্তু অহঙ্কারে তিনি কথাই কন না।

রাত্রে বৈঠকখানায় সভা বসিল। বৌয়েরা শীত উপেক্ষা করিয়া আনাচে কানাচে উঁকি দিতে গিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিলেন—বৈঠকখানার দরজা জানালা বন্ধ। ঝি নিঃশব্দে একা বারান্দায় দরজার ফাঁকের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশ্বকর্ম্মার মামাতো ভাই বসন্ত দা প্রশ্ন করিতেছেন—ওদিকে বড় দাদা লেপ গায়ে অর্দ্ধ-শয়ান—তিনি ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারেন না। সেজদা তামাকই খাইয়া চলিতে লাগিলেন, চোখ বুজিয়া শেষে বলিলেন, 'এখান থেকে তো গেলাম, ষ্টীমার এল ঘণ্টা দুই পরে, বসেই আছি—বসেই আছি—'

বসন্ত দা বলিলেন, 'জামাই দেখলেন কেমন ?'

'দাঁড়া না—অত ব্যস্ত কি ?' বিস্তারিত বর্ণনা না করিয়া সেজ দা কথা বলিতে পারেন না।

'ষ্টীমারে এর—ওর—তার—অমুক ঘোষ, অমুক মিত্তিরের সঙ্গে দেখা হল—কত কথা—কত আলাপ।'

অসহিষ্ণু বসন্ত দা প্রশ্ন করিলেন, 'তার পরে ?'

'তার পরে পৌঁছলাম জামাইয়ের বাড়ী—কি আদর। কি ভদ্র—জামাই বাড়ী ছিল না—আফিসে কাজ করছিল।'

'তবে আদর করলে কে ?'

'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি নেই—নিরেট গাধাটা। জামাইয়ের মা নেই ? ভাই নেই ?'

'ওঃ—তার পরে জামাইকে খবর দিলেন বুঝি ?'

'না—আমার তাগাদা, ঘণ্টা তিনেক পরে আমরা ফিরব।'

'এত তাগাদা আপনার কি ছিল ?'

'তুই তার বুঝবি কি ? নতুন কুটুম-বাড়ী গিয়ে আমি রাত্রিবাস করি আর কি! তুই হলে সাতদিনে নড়তিস নে।'

'নিশ্চয়ই না, কুটুম-বাড়ী যাওয়াই ভাল-মন্দ খাওয়ার জন্যে—নড়ব কেন ? আচ্ছা, তার পরে ?'

'গেলাম, গিয়ে দেখি একটা টেবিল ঘিরে পাঁচ ছয় জন বসে আছে, সব একবয়সী। সরকারী চাকরী তো নয় যে দশটা পাঁচটা কাছারী করবে ? [illegible]—বাড়ীতে আসছে।'

'তা পাঁচ ছয়টার মধ্যে চিনলেন কি [illegible] জামাই কোন্‌টি ?'

'তুই চিনতে পারতিস নে—আমি কি তোর মত গাধা ? জামাইয়ের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম।'

'ও—আমি ভাবছি একাই গেলেন—তার পরে ?'

'কি প্রকাণ্ড টেবিলটা—আমাদের বাড়ীতে তত বড় টেবিল নেই, এই ফরাসটার মত বড় হবে, ঘরটা জুড়ে রয়েছে টেবিলের পায়াগুলো।'

'টেবিলের কথা শুনে আমাদের দরকার কি ? জামাই কেমন তাই বলুন না! আমরা কি টেবিলের সঙ্গে মেয়ে বিয়ে দেব ?'

'তুই থাম বসন্ত! তোর ভারি কু-অভ্যাস হয়েছে, কথায় কথায় বাধা দেওয়া।'

যা হোক, দুই ভাইয়ের বাদানুবাদের মধ্য দিয়া বিবিধ বর্ণনায় প্রকাশ পাইল যে, জামাই ভাল—দেখিতেও, স্বভাবেও। নিজে আসিয়া ভাবী শ্বশুরকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিয়াছে।

বিশ্বকর্ম্মা বিবাহ ঠিক করিয়া ফেলিলেন। সুধীর, সরোজ বড় দিনের ছুটীতে আসিয়াছে, তাহাদের আর যাইতে দিলেন না—বিবাহের পর যাইবে।

ইতিমধ্যে সুধীর বসন্ত দাদার সঙ্গে তাঁহার বাড়ীতে গেল। পাঁচ ছয়দিন পরে ফিরিল, তাহাদের সঙ্গে বসন্ত দাদার এক প্রতিবেশী আসিয়াছেন, নাম শৈলেশ বোস—বিশ্বকর্ম্মার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

শৈলেশ বোসের সন্তান-ভাগ্য চমৎকার। নয়টি মেয়ে, ছয়টি ছেলে। পঞ্চমা মেয়েটি এখন বিবাহযোগ্যা।

যেমন শোনা অমনি কাজ—ফণীর বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। শৈলেশ বোস এই উদ্দেশ্য লইয়াই আসিয়াছিলেন। সুধীরকে মেয়ে দেখাইয়া দিয়াছেন।

বিশ্বকর্ম্মা সরোজকে পাঠাইয়া দিলেন ফণীকে আনিতে। সেদিন ৬ই মাঘ—১২ই মাঘ সেজ দার মেয়ের বিবাহের দিন ঠিক হইয়াছে—ঐ তারিখেই দুই বিবাহ হইবে।

নিজের ঘরে সুরুচি নিমন্ত্রণের চিঠিতে ঠিকানা লিখিতে-

ছেন, নিমন্ত্রিতদের নামের লিষ্ট ও সমস্ত চিঠি বড় দাদা সুরুচিকে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ঝিকে বলিলেন, 'হলুদের ছাপ দিতে হবে, খানিকটা বাটা হলুদ নিয়ে এস।'

এমন সময় একখানা চিঠি আসিল ফণীর, ঝি এক তাল হলুদ আনিয়া সেই চিঠিটার উপর রাখিল।

'চিঠিটা নষ্ট করলে—পড়িও নি এখনও।'

ঝি হাসিয়া বলিল, 'আর পড়ে কি হবে ? দাদা বাবু আসবেই তো।'

সুরুচি চিঠিটা পড়িলেন—বিবাহে তীব্র আপত্তি করিয়া ফণী লিখিয়াছে—কিছুতেই বিবাহ করিবে না।

ঝি বলিল, 'সে হচ্ছে না চিঠিতে যখন হলুদ পড়েছে, বিয়ে করতেই হবে।'

'ভবিষ্যৎ বাণী রেখে চিঠিখানা বাইরে ওঁদের দিয়ে আয়!'

ওদিকে সরোজ কখনও মিথ্যা কখনও সত্য বলিয়া নানা ভয় দেখাইয়া ফণীকে লইয়া আসিয়াছে, সমস্ত পথ ঝগড়া করিতে করিতেই আসিয়াছে। বাড়ীতে পা দিয়াই সরোজ বলিল, 'নিন এখন যা খুসী করুন, কাকাকে বলুন। বিয়ে করুন বা না করুন আমার কি ? আমার ওপরে অত কেন ?'

তার পরে মেজ বৌকে ও সুরুচিকে বলিল, 'দাদার দিকে নজর রাখবেন, না পালায়।'

বাড়ী আসিয়া ফণী দেখিল, ব্যাপার সত্য। কাকাকে বাঘের মত ভয় করে—পলায়ন করিবার সাহস নাই, রাগ পড়িল ভাইদের উপর—এক ভাই পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছে, আর এক ভাই তাহাকে লইয়া আসিল। তখন রীতিমত বালী-সুগ্রীবের যুদ্ধ!

ফণী স্নান করে না, খায় না, মুখ ভার, কিছুতেই রাজী হয় না।

বিশ্বকর্ম্মা ছেলেদের মতামত গ্রাহ্য করেন না (মানুষ বলিয়া গণ্য করেন না বলিয়াই বোধ হয়), তথাপি অহরহ এর কাছে, তার কাছে শুনিয়া সন্ধ্যার মজলিস ছাড়িয়া নিঃশব্দে অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

ঘর-ভরা লোকের মধ্যে ফণী তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, 'ও বলে কি ?'

দিদি বলিলেন, 'ও বলে বিয়ে করব না, কি এমন চাকরী করি, খরচ চালাব কোথেকে ?'

বিশ্বকর্ম্মার পৌরুষ গর্ব্ব হুঙ্কার দিয়া উঠিল, 'কি এত বড় কথা! দাদারা আছেন, আমি আছি—খরচের ভাবনা ওর ? দুদিন রাজসাহী থেকে বড্ড বাহাদুর হয়েছে দেখছি, বৌয়ের খরচের ভাবনা তোর কি রে গাধা ? বাড়ী এসে ভারি লাফালাফি সুরু করেছে ? সাধে কি দাদা বলেন যে, বড় বড় পানসী চালিয়েছি, ডিঙ্গিতে হয়রাণ করে মারলে ? আর একটি কথাও বলবি তো'—

বিশ্বকর্ম্মা চলিয়া গেলে ফণী মাথা তুলিয়া দেখে ঘর-ভরা লোকের মুখে হাসি। অকস্মাৎ দুই ভাইকে দুই থাপ্পড় বসাইয়া দিয়া বলিল, 'তুই লক্ষ্মীছাড়া আমায় আনলি কেন বল!—তুই লক্ষ্মীছাড়া শালকে বেড়াতে গেলি কেন বল ?—আর জায়গা পেলিনে ?'

সুধীর বলিল, 'ভালর জন্যে গিয়েছিলাম।'

সরোজ বলিল, 'আপনি এলেন কেন ? মনে মনে ইচ্ছে আছে মুখে রাগ, হাত পা বেঁধে গাড়ীতে তুলিনি তো!' বলিয়াই পালাইল।

বিবাহ হইয়া গেল।

বৌ ছেলেমানুষ, সাক্ষাৎ সরস্বতীর মত দেখিতে—বিশ্বকর্ম্মার জয়-জয়কার। এক বছর আগে বৌয়ের শক্ত জর হইয়া চুল উঠিয়া গিয়াছিল। এখন কাঁধ পর্য্যন্ত চুল হইয়াছে, খুব ঘন কালো চুল, তবু ননদেরা ঠাট্টা করিয়া বলে—নেড়ী। একদিন বৌ কাঁদিয়াই ফেলিল, শুনিতে পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা মেয়েদের ডাকিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে, তাহাদের আত্মারাম গেল খাপছাড়া হইয়া, বৌ নিস্তার পাইল। বিশ্বকর্ম্মার পরে আবার নীহারের শাসন।

ফুলশয্যার রাত্রে ফণী বিছানায় টান টান হইয়া শুইয়া রহিয়াছে, ওঠে না। এদিন মান্যগণ্যারা এদিকে আসেন না। তথাপি গোলমাল শুনিয়া মেজ বৌ গেলেন, সুরুচিও পিছন পিছন।

অনেক বলায় ফণী উঠিয়া বসিল। ডাবের জলে পা ধোয়াইয়া চুল দিয়া বৌ মুছাইয়া দিবে। কিন্তু চুল কই, ঘর শুদ্ধ মেয়েদের হাসি, বৌ পিছন ফিরিয়া বসিল রাগ করিয়া।

মেজ বৌ বলিলেন, 'ঠাকুরপো যদি আসে দেখবি মজা—অত হাসিস কেন ?'

'তোমার ঠাকুরপোর ভয়ে আমোদ করব না ?'

সুরুচি বলিলেন, 'আঁচল দিয়ে মোছাক না, যা হয় শীগগির সেরে ফেল—অনেক রাত হয়েছে, ওঁরা এসে পড়েন যদি, সত্যি বকুনি খাবে।

বিশ্বকর্ম্মার দিন রাত্রি পরিশ্রম, গৌরবে আটখানা!—দুইটা বিবাহ নির্ব্বিবাদে দিয়াছেন, বিপুল ভোজযজ্ঞ চলিয়াছে, জলের মত টাকা খরচ করিয়াছেন, হিসাব-লেখার দায় সুরুচির ঘাড়ে চাপাইলেন, পরিবেশন করিয়া পা ভাঙ্গিলেন এবং জিনিসপত্র কম পড়িবে বলিয়া মেজ-বৌয়ের উপর রাগ করিয়া অনাহারে লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া রহিলেন এবং শেষ রাত্রে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সাধাসাধিতে ভ্রুক্ষেপ না করায় বড় দাদা আসিবামাত্র অতি সুবোধ ছাত্রের মত উঠিয়া খাইতে বসিলেন।

কিন্তু বেয়াই শৈলেশ বোস বড় ঠকাইয়াছে। কিছুই দেয় নাই—মেয়েটি ছাড়া। আবার নিজেরা পঁচিশ জন লোক আসিয়া পনের দিন কাটাইলেন মেয়ের বাড়ীতে। আড়ালে সবাই বলাবলি করে—ঘরের কড়ি এমনভাবে খরচ করিয়া ছেলের বিবাহ দেয় কেউ ?

বিশ্বকর্ম্মা পরের দান তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

ফণী যোড়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে না—বাঁকিয়া বসিয়া আছে। আবার বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব—তখন সুড় সুড় করিয়া পাল্কীতে চড়িয়া বসিল। নীহার, সুধীর, সরোজ সঙ্গে গেল।

কুটুম্ব বাড়ীর আদর যত্ন! কিন্তু বর বা বরের সঙ্গিগণ কিছু মুখে দেয় না, সব পড়িয়া থাকে। দেখিয়া দেখিয়া সকলে অসন্তুষ্ট। একদিন ফণীরা জলযোগে বসিয়াছে, নীহার নিজের পাতের মিঠাইগুলি তুলিয়া উঠানে কুকুরের সামনে ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'তুই খা—এই না কি ফরমাস দেওয়া রসগোল্লা।'

রসগোল্লাগুলি বাস্তবিকই শক্ত ও খারাপ ছিল—এ হেন কুখাদ্য তাহাদের দেওয়ায় নীহারের অত্যন্ত রাগ হইয়াছে।

পাতে আরও অনেক ভাল ভাল ঘরের তৈয়ারী জিনিস ছিল, কিন্তু সেকালের জামাইদের মত কেহই যেন কিছু ছুঁইবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, নামমাত্র স্পর্শ করিয়া একে একে চার জনই উঠিয়া পড়িল।

মেয়ের মা সবই দেখিলেন, বলিলেন, 'এই রকম তোমাদের খাওয়া—আধখানা লুচিও কেউ খেতে পার না ? তোমাদের বাড়ী কি কলকাতা ?'

আর কেহ উত্তর দিল না, নীহার বলিল, 'আমরা এই রকমই খাই—বড় মা কত বকে।'

'হ্যাঁ বুঝেছি, এই রকম খাওয়াই যদি হত তবে নিশীথ বাবুরা এত দিন সাত মহলা দালান তুলে ফেলত।'

তিন দিনের দিন বাড়ী হইতে পেয়াদা গিয়া উপস্থিত—বিশ্বকর্ম্মার ভাগিনেয়ের বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে।

জরুরী পরোয়ানা পাইবামাত্র ফণীরা বাড়ী অভিমুখে রওনা হইল।

ইংরাজ ও ভারতবাসী

...ভারতবাসী ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে যাদৃশ আর্থিক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে ইংরাজের প্রতি সখ্য-ভাব ঘোষণা করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের ভারত-শাসনের ইতিহাস যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এই দেশবাসীর আর্থিক অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, তাহার চেষ্টা তাঁহাদের বিদ্যা ও বুদ্ধি অনুসারে তাঁহারা করিয়াছেন। কিন্তু, ২১০ শত বৎসরের একটা জাতি তাহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও যে বিদ্যায় মানুষকে প্রকৃত ভাবে অর্থকৃচ্ছ্রতাদির হাত হইতে রক্ষা করা যায়, সেই বিদ্যা অর্জ্জন করিতে পারে না। ফলে, তাঁহাদের ঐ বিদ্যায় যে সংগঠন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যেমন ভারতবাসীর অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ আবার ইংরাজ জনসাধারণের নিজেদের অবস্থাও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই, আপাতদৃষ্টিতে দুইটি জাতির মিলন অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও, যে বিপদে দুইটি জাতির জনসাধারণ সমানভাবে হাবুডুবু খাইতেছে, সেই বিপদের সময় দুইটি জাতি কৃতবিদ্য নেতার নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হইলে, তাঁহাদের কার্য্যতঃ মিলন একেবারেই অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না।...

বাঙ্গালায় বর্গী

—নিখিলনাথ রায়

মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দূরীভূত করিতে না করিতে নবাব আলিবর্দ্দী আর একটী ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইলেন। মুস্তাফা খাঁ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, নবাব বহু আয়াসে সেই বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন।

দুর্দ্দমনীয় মুস্তাফা খাঁর সহিত নবাবের যুদ্ধে লিপ্ত থাকার সময়ে রঘুজী ভোঁসলা পুনর্ব্বার বাঙ্গালায় উপস্থিত হন। আবদুল রসুল খাঁ মুস্তাফার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য উড়িষ্যা পরিত্যাগ করিবার সময় দায়ুদ খাঁ নামক জনৈক আফগানের প্রতি উড়িষ্যার শাসনভার অর্পণ করিয়া যান। রাজা দুর্ল্লভরাম পূর্ব্ব হইতে উড়িষ্যার প্রতিনিধি সেনাপতিরূপে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নবাব দুর্ল্লভ-রামের পিতা জানকীরামের অনুরোধক্রমে তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত করিয়া নিয়োগপত্র ও সম্মানসূচক দ্রব্যাদি প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ল্লভরাম শাসনকার্য্যের তাদৃশ উপযোগী ছিলেন না। বাহিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার অনুরাগ থাকায় দুর্ল্লভরাম রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ না করিয়া সাধুসন্ন্যাসিগণের সহিত আলাপে সময় অতিবাহিত করিতেন। সৈনিক কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান হওয়ায়, তিনি কদাচ তাহাদিগের সহিত পরামর্শাদি করিতেন। এই সময়ে রঘুজীর চরসকল সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া দুর্ল্লভরামের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করিল। দুর্ল্লভরাম তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ায় তাহারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার রাজত্বের যাবতীয় বিবরণ রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিতে আরম্ভ করে। দুর্ল্লভরাম ক্রমে ক্রমে সেই ছদ্মবেশী মহারাষ্ট্রীয়গণের বশীভূত হন। রঘুজী এই সময়ে মুস্তাফা খাঁর নিকট হইতে বাঙ্গালা আক্রমণ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আপনার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। ভাস্করের শোচনীয় হত্যায় তিনি আলিবর্দ্দীর উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং প্রতিশোধের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রতিহিংসাগ্নি ক্রমে ক্রমে প্রধূমিত হইতেছিল। এক্ষণে মুস্তাফা খাঁর অনুরোধ ও দুর্ল্লভরামের অকর্ম্মণ্যতারূপ অনুকূল বাতাসে তাহা প্রজ্বলিত হইবামাত্র তিনি চৌদ্দহাজার অশ্বরোহিসহ বঙ্গভূমিকে ভস্মীভূত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। যৎকালে তিনি উড়িষ্যার সীমান্ত-প্রদেশে উপস্থিত হন, তৎকালে দুর্ল্লভরাম সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিগণে পরিবৃত হইয়া সময়ক্ষেপ করিতে-ছিলেন। তাঁহার সেনাপতি সাহসী ও কার্য্যদক্ষ মীর আবদুল আজিজ, মহারাষ্ট্রীয়গণের উপস্থিতির সংবাদ পাওয়া মাত্র অশ্বারোহণে দুর্ল্লভরামের নিকট গমন করেন। আবদুল আজিজ রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, রাজা নিশঙ্কচিত্তে নিদ্রাগমন করিতেছেন। নগরের চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিয়া, দুর্ল্লভরাম নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধ বিবসনা-বস্থায় শিবিকারোহণে বারাবতী দুর্গ গমনে প্রবৃত্ত হইলেন। আবদুল আজিজ তাঁহার পশ্চাতে গমন করিয়া নগরমধ্যে একস্থানে দেখিতে পাইলেন যে, কতকগুলি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং রাজা দুর্ল্লভরাম পদব্রজে যাইতেছেন ও অলক্ষিত ভাবে দুই একটি ভগ্নবাটীমধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছেন। আবদুল আজিজ তাঁহার হস্তধারণ করিয়া এইরূপ কাপুরুষতার জন্য তিরস্কার করিয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, কয়েকজন মাত্র মহারাষ্ট্রীয় উপস্থিত হইয়াছে ও তাঁহারা লুণ্ঠন ব্যাপারে নিবিষ্ট আছে। ইত্যবসরে দুর্গে গমন করিয়া তাঁহারা অনায়াসে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইতে পারেন। দুর্ল্লভরাম আবদুল আজিজ প্রদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া দুর্গে উপস্থিত হইলে, রাজার নিজের অনেকগুলি সৈন্যও তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই রঘুজী উপস্থিত হইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। দুর্ল্লভরাম ভয়ে

অভিভূত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্ঞান, ধৈর্য্য সমস্ত লোপ পাইল। বিশেষতঃ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মুস্তাফা খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয় অধিকতর ভয়ে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি আপনার জীবনরক্ষার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। যে কোন উপায়ে তাঁহার প্রাণরক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিগণের পরামর্শানুসারে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা তাঁহার প্রাণভিক্ষা দিয়া যাহা করিতে আদেশ করিবে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রতিপালনে সম্মত হইবেন, এইরূপ প্রকাশ করিলেন। রাজা দুর্ল্লভরাম অন্য কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য দুর্ল্লভরাম নানা প্রকার আয়োজন আরম্ভ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি আপন কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিরূপে এই ভীষণ আক্রমণ হইতে উদ্ধার লাভ হয়, তদ্বিষয়ে সকলেই বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনেকেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিরুদ্ধে উত্থান অপেক্ষা তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকারে রাজাকে উপদেশ প্রদান করিলেন। কারণ, এইরূপ অবস্থায় যাবতীয় সেনা সংগ্রহ করিয়া সেই ভীষণ কৃতান্তদূতগণের সম্মুখীন হওয়া কোন প্রকারে যুক্তিযুক্ত নহে। যদি পূর্ব্ব হইতে এ বিষয়ে উপায়াদি অবলম্বন করা হইত, তাহা হইলে সম্মুখীন হওয়ার কিছু সম্ভাবনা ছিল। এক্ষণে কোন উপায় আছে বলিয়া কাহারও বোধ হইল না। সুতরাং তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করা কর্ত্তব্য, ইহাই স্থির হইল। কিন্তু এই পরামর্শে আবদুল আজিজ ও অন্যান্য কতিপয় সামরিক কর্ম্মচারী সম্মত হইলেন না। তাঁহারা এ প্রকার আত্মসমর্পণ করাকে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর পক্ষে অপমানসূচক বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং সাধ্যানুসারে দুর্গরক্ষার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। দুর্ল্লভরাম আবদুল আজিজের পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া ছদ্মবেশী সন্ন্যাসীদিগের কথানুসারে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির বশ্যতা স্বীকারে অঙ্গীকৃত হইলেন। কয়েক দিন পরামর্শাদি করার পর রাজা একদিন দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিগণের এবং আবদুল আজিজের এক ভ্রাতার সহিত মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে গমন করিলেন। আবদুল আজিজ তাঁহাদিগের অনুগমন না করিয়া তিন চারি শত সৈন্য এবং আশ্রয়প্রার্থী কতিপয় নগরবাসী সহ দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহা রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে যত্ন করিতে লাগিলেন। দুর্ল্লভরাম রঘুজীর সহিত সাক্ষাতের পর প্রত্যাবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি তাঁহাকে মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রতাপে যাইতে নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে দুর্গমধ্যে আহার ও বিশ্রামের জন্য অনুরোধ করিলেন এবং রাজার কর্ম্মচারীদিগকে যথাযোগ্য আহার ও বিশ্রাম করাইবার জন্য তাঁহার অনুচরবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। রাজা দুর্ল্লভরাম ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণ আহারের পর কিঞ্চিৎ সময় বিশ্রামের জন্য অতিবাহিত করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে তাঁহারা সকলে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। তখন সকলের হৃদয় দুঃখ ও অনুতাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আবদুল আজিজ এই সংবাদ শ্রবণে দুর্গরক্ষার জন্য অধিকতর যত্নবান হইলেন। সেই সময়ে রাজা আবদুল আজিজের ভ্রাতাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়া রঘুজীকে দুর্গ প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। আবদুল আজিজের ভ্রাতার সহিত আরও কতিপয় লোক রাজার স্বীয় লোকদিগকে দুর্গ প্রদানের অনুরোধ করিতে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহারা উপস্থিত হইলে আবদুল আজিজ রঘুজীকে এই উত্তর দেন যে, 'আমরা সকলে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর ভৃত্য, কতিপয় কৃতঘ্ন লোক মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে বলিয়া আমরা তাহাদিগের পথানুসরণ করিতে প্রস্তুত নহি। যতদিন পারিব, ততদিন আমরা উৎসাহসহকারে দুর্গ রক্ষা করিব।' আবদুল আজিজ তাঁহার প্রতিজ্ঞাপালনে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একমাস পর্য্যন্ত বারাবতী দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এদিকে দুর্ল্লভরাম ও তাঁহার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বন্দী-অবস্থায় মহারাষ্ট্রীয় শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ আজিমাবাদে অবস্থিতি

করিতেছিলেন। নওয়াজিস মহম্মদ খাঁ তাঁহাকে রঘুজীর উড়িষ্যা আক্রমণের কথা লিখিয়া পাঠাইলে নবাব বিহার পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্ল্লভরামের বন্দী হওয়ার ও আবদুল আজিজের বারাবতী রক্ষার কথা শুনিয়াও দিল্লী হইতে আগত মুনাম আলি খাঁকে দূতস্বরূপে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করেন। রঘুজী তিন কোটী টাকা না পাইলে স্বদেশে গমন করিবেন না, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলে, নবাব, মুস্তাফা খাঁর পরাজয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুসংবাদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি রঘুজীকে এই মর্ম্মে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, যখন অর্থের দ্বারা শত্রুপক্ষের সহিত সন্ধির প্রস্তাব হয়, তখন অপর পক্ষ হয় ক্ষমতাহীন হয়, না হয় কোন একটি বিশেষ লাভের আশা করে। প্রথম কথার এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, মুসলমান সৈন্যগণ কখনও শত্রুর সম্মুখীন হইতে পশ্চাৎপদ হয় না। দ্বিতীয় কথার এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়া কি লাভ হইতে পারে? যখন তাহার সম্ভাবনা অল্প, তখন তাহাদিগের রক্তে সমরক্ষেত্র রঞ্জিত করিয়া তাহাদিগকে আপনাদের গহ্বরে আবদ্ধ রাখিবার জন্য নবাব-সৈন্যগণ ইচ্ছা করিতেছে। যুদ্ধে যে পক্ষ জয় লাভ করিবে, তাহার প্রস্তাবে তখন সন্ধির চেষ্টা করা যাইবে। রঘুজী নবাবের পত্রের এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আপনাদিগের দেশ হইতে বহুদূরে সহস্র ক্রোশ অন্তরে নবাবের রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু নবাবকে তাহারা তাঁহার রাজধানী হইতে একপদও অগ্রসর হইয়া তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেখার অর্থ বুঝিতে পরিতেছে না। নবাব তদুত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, এক্ষণে বর্ষাকাল, মহারাষ্ট্রীয়েরা আর কিছুদিন বঙ্গভূমিতে অবস্থান করিলে, বর্ষার অবসানে নবাব তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাদিগকে আপন দেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে স্বীকৃত আছেন। ইহার পর রঘুজী বীরভূম প্রদেশে অবস্থান করিয়া, মেদিনীপুর, হিজলী পর্য্যন্ত সমস্ত উড়িষ্যা এবং বর্দ্ধমানের অধিকাংশ আপনার অধিকারভুক্ত করেন। আবদুল আজিজ সাধ্যানুসারে বারাবতী দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যাদির অভাবে তিনি অবশেষে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। তিনি তাহাদের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি স্থাপন করেন যে, তিনি ও তাঁহার যাবতীয় লোক আপনাদিগের দ্রব্যাদির সহিত নিরাপদে গমন করিতে পারিলে এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও বলপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের অন্তর্নিবিষ্ট না করিলে, তিনি দুর্গপ্রদানে সম্মত আছেন। রঘুজী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া এক খানি পত্রে আপনার নাম ও মোহর ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর নাম সন্নিবেশ করিয়া আবদুল আজিজের নিকট প্রেরণ করিলেন। আবদুল আজিজ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে দুর্গ প্রদান করিয়া, কিছুদিন তাহাদিগের শিবিরে অবস্থান করার পর, মুর্শিদাবাদে গমন করেন। রাজা দুর্ল্লভরাম বৎসরাধিক কাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে বন্দী থাকিয়া কতিপয় ব্যবসায়ীর যত্ন ও মধ্যস্থতায় রঘুজীকে তিন লক্ষ টাকা প্রদানের পর মুক্তি লাভ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ দুর্ল্লভরামের পিতা জানকীরামের কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট থাকায় দুর্ল্লভরামের মুক্তির অর্থ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন।

রঘুজী বীরভূম প্রদেশে উপস্থিত হইলে, মুস্তাফা খাঁর পুত্র মর্ত্তেজা খাঁ ও বুলেন্দ খাঁ আফগানদিগের সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করেন। মুস্তাফা খাঁর মৃত্যুর পর পরাজিত হইয়া আফগানগণ বিহারের পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিল। উক্ত প্রদেশের জমীদারগণের উপদ্রবে তাহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আরণ্য ও পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং জৈনুদ্দীনের আদেশক্রমে পালোওয়ান সিংহ ও ছত্র সিংহ প্রভৃতি জমীদারগণ আফগানদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তাহারা সর্প ও পিপীলিকা পরিপূর্ণ জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করা দুষ্কর বিবেচনায় আপনাদিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া রঘুজীর নিকট এই মর্ম্মে আবেদন-পত্র প্রেরণ করে যে, তিনি তাহাদিগকে কোনরূপে উদ্ধার করিতে পারিলে, তাহারা চিরদিন তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া আপনাদিগের জীবন বলি দিতে প্রতিশ্রুত হইবে। রঘুজী কতকগুলি আফগান সৈন্যকে

আপনার অধীনতায় কার্য্য করিতে সম্মত দেখিয়া এবং তাহাদিগের সাহস ও কার্য্যদক্ষতা স্মরণ করিয়া বীরভূম প্রদেশ পরিত্যাগ করেন ও পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া আজিমাবাদ প্রদেশে উপস্থিত হন। টিকারী ও সাহেবনগর ও তত্তৎ প্রদেশস্থ যাবতীয় স্থান লুণ্ঠন করিতে করিতে শোণ নদ অতিক্রম করিয়া প্রথমে সাসারাম প্রদেশে আগমন করেন। তৎপরে আফগানদিগকে মুক্ত করিয়া তিনি আর্ব্বল নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। আফগান সৈন্যের সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্য-সংখ্যা প্রায় বিংশতি সহস্র হইয়া উঠিল। ইহার অব্যবহিত পরেই আলিবর্দ্দী খাঁ প্রায় দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ আজিমাবাদে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পর্য্যুদস্ত করিতে কৃতসংকল্প হন। রঘুজীও আফগানদিগের সহিত সম্মিলিত হওয়ায় তাঁহাকে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। তিনি আপনার প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী ও সুশিক্ষিত, সমরকুশল সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া রঘুজীকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিবার জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। আজিমাবাদের নিকটস্থ হইলে জৈনুদ্দীন অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করেন।

এই সময়ে একটি কারণে জৈনুদ্দীন ও আবদুল আলি খাঁর মধ্যে মনোবিবাদ সংঘটিত হয়। জৈনুদ্দীন আবদুল আলি খাঁকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন যে, 'আমার ভ্রাতা রাজা কীর্ত্তিচাঁদ মুস্তাফা খাঁর সহিত যুদ্ধে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি যথাসাধ্য তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি এরূপ কি কার্য্য করিয়াছেন যে, তাহার জন্য আপনি আপনার প্রাপ্য বলিয়া নবাবের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন?' এই পত্র পাইয়া আবদুল আলি জৈনুদ্দীনের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং নবাবের আগমন শ্রবণে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, আজিমাবাদের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ দরবারে অবস্থিতি করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিবেন। এইরূপ ইচ্ছা করিয়া তিনি একদিন নবাবের শিবিরে উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তথায় হাজী আহম্মদ, জৈনুদ্দীন, গোলাম হোসেন ও আরও কতিপয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। নবাব আবদুল আলির প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, এক্ষণে যেরূপ সময় উপস্থিত তাহাতে পিতা-পুত্রে ও ভ্রাতায়-ভ্রাতায় বিষম গোলযোগ চলিতেছে, সকলেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করিতেছে। সে দিবস হাজী আহম্মদ ও সৈয়দ আহম্মদের মধ্যে একটি সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং এরূপ সময়ে তোমাতে ও জৈনুদ্দীনে পরস্পরের মধ্যে সংস্রব ও আত্মীয়তা থাকায় যে এইরূপ বিবাদের সম্ভাবনা, তাহা অনায়াসে বুঝা যাইতেছে। আবদুল আলি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন যে, "ভ্রাতায়-ভ্রাতায় আত্মীয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় অনেক প্রকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে একজন সামান্য ভৃত্য মাত্র তাহার জন্য বিবাদ উপস্থিত হওয়াই দুঃখ ও আশ্চর্য্যের বিষয়। নবাব বিচার করিয়া দেখিতে পারেন যে, আমি আমার কর্ত্তব্য কার্য্য পালন করিয়াছি কি না। যদি করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য আমি পাইতে পারি। আর যদি তাহাতে আমি অবহেলা করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে পদচ্যুত করা হউক। কিন্তু এইরূপ পত্র লেখার উদ্দেশ্যই বা কি? এবং কীর্ত্তিচাঁদই বা কে যে, তাহার সহিত আমার তুলনা করা হইয়াছে।" আবদুল আলির বাক্যে জৈনুদ্দীন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন যে, "অনেক কারণে আমাকে কীর্ত্তিচাঁদের সম্মান রক্ষা করিতে হইতেছে। কীর্ত্তিচাঁদ এমন কেহ নহে, তবে সকলের পূর্ব্বপুরুষ তাহার পিতার পাদুকা মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন।" আবদুল আলি উত্তর করিলেন যে, "আমার পিতা কাহারও পাদুকা মস্তকে ধারণ করেন নাই।" উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া নবাব মধ্যস্থ হইয়া বলিয়া উঠিলেন যে, "জৈনুদ্দীন আমাকে উল্লেখ করিয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছে। কারণ যখন রায় রায়ান আলমচাঁদ নবাব সুজাউদ্দীনের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন তখন আমরা অনেক সময়ে তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য ছিলাম।" এইরূপে নবাব সে দিবস উভয়ের বিবাদের নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে নবাব জৈনুদ্দীনকে আবদুল আলির সহিত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আদেশ করেন এবং আবদুল আলিকে আনয়ন করিয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিতে বলেন। এইরূপে আবদুল আলি ও জৈনুদ্দীনের মধ্যে যে বিবাদ ছিল তাহার অবসান হইয়া যায়।

[ক্রমশঃ

দ্বিতীয় সংসার

—শ্রীবসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী

[৪]

নলিনী পথ্য পাইয়াছে, রমেশবাবু কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়াছেন, নলিনীর মা কন্যার সহিত কাশীবাস করিতেছেন। একদিন প্রভাতে দুই বেয়ান রবিকে লইয়া ঠাকুর দর্শন করিতে চলিয়া গেলেন, নবীন বাহিরে ছিল, বাসায় দাদামহাশয় আপন ঘরটিতে আরামে আছেন, নলিনী একা।

নলিনী দেখিল, নবীন ফিরিয়া আসিল, সরাসরি উপরে চলিয়া গেল। নলিনী এখনও দুর্ব্বল, চলাফেরা করিতে কষ্ট বোধ করে, অসুখের পর একদিনও তিন তলায় ওঠে নাই; নলিনী উঠিয়া এক পা এক পা করিয়া সিঁড়ি ধরিয়া তিন তলায় উঠিল। নবীন নলিনীকে দেখিয়া চমকাইয়া গেল, ঘরের মধ্যে অতি সত্বর একখানা ছোট সতরঞ্চ পাতিয়া দিয়া বলিল, 'এ বাহাদুরী কেন করলেন, বসে পড়ুন।'

নবীন সকল জানালা খুলিয়া দিল, শীতের পশ্চিমে হাওয়া ঘরের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নলিনী ঘরের মধ্যে আসিয়া সতরঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল।

নবীন আবার বলিল, 'দুর্ব্বল শরীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসা ভাল হয় নি।'

নলিনী বলিল, 'মা'রা রবিকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে গেলেন, একা থাকতে পারলাম না, খুব আস্তে আস্তে এসেছি, কষ্ট হয় নি।'

নবীন মেজের উপর নলিনীর সম্মুখে বসিল, বলিল, 'প্রথমেই একটা সুখবর দিই, দাদা চিঠি লিখেছেন আরও পনের দিন ছুটী পেয়েছি, এটি না পেলে কালই কলকাতায় ফিরতে হত।'

নলিনী। বেশ হয়েছে, যতদিন থাকেন আমাদেরই ভাল।

নবীন। আপনি সেরে গেছেন, আমরা থাকি বা যাই কিছু আটকাবে না, তবে কাশী আমার বড় ভাল লেগেছে, ছেড়ে যেতে মন চায় না।

নলিনী। কিছুই ত দেখলেন না, রুগী নিয়ে দিন-রাত জেগে কাটালেন, ভাল লাগবার ত কথা নয়, এত ভাল লাগল কিসে?

নবীন। নূতন জায়গা, নূতন লোক, তাই হয়ত হবে।

নলিনী। লোকটা কে? কাকে ভাল লাগল?

নবীন। আপনাদের সকলকেই।

নলিনী। এ খবরটা সত্যই আমরা কেউ পাই নি, ভেবেছিলাম, মনে মনে ভারি বেজার হয়েছেন, এলেন হাওয়া খেতে, দেশ বেড়াতে, কোথাকার এক আপদ সব মাটি করল, রোগ করে বসল।

নবীন। বেজার বোধ হয় নি, রোগের সেবা করে আনন্দ পেতাম, আপদের বদলে সম্পদ্ মনে হয়েছিল, আপনার রোগটি যে সামান্য নয়, ডাক্তার বুঝতে পেরেছিলেন। সম্পদ্ কেন বলছি—ডাক্তার আমাকেই উপযুক্ত মনে করে বলেছিলেন—ডাক্তার রুগী দেখে বেড়ায়, রোগ-নির্ণয় করে, ওষুধ লিখে দিয়ে খালাস, কিন্তু আসল দায়িত্ব সেই হাত পেতে নেয়, যে রোগীর পরিচর্য্যা করে, মরণ-বাঁচন তার হাতে। আমার সৌভাগ্য, সকলেই ইচ্ছা করে সে কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। রোগ বাড়ল, আপনি বিকারে অঘোর অচৈতন্য, হাতে সেবা করতাম, সর্ব্বদা চেয়ে থাকতে হত আপনার দিকে। গভীর রাত্রিতে আপনার বাবা মা ঘুমে ঢুলে পড়তেন, আমার কিন্তু মোটে ঘুম আসত না, ষোল আনা বিপদ্ যেন আমার, এমনি মনে হত। আপনার যখন জ্ঞান হত কেবলি আমার দিকে চেয়ে থাকতেন, কষ্ট বোধ হলে আমার হাতখানা মুঠো করে চেপে ধরতেন। যে রাত্রিতে জ্বর ছাড়ল সে রাত্রির কথা মনে হলে এখনও শিউরে উঠি; নাড়ী দেখি নাড়ী পাই না, পরামর্শ করি এমন লোক পাই না, আপনার মা কান্না জুড়ে দিলেন, ধমকে কান্না থামিয়ে দিলাম, তাঁকে দিয়ে আবার কত কাজ করিয়ে নিলাম, দু'রকম ষ্টিমুলেণ্ট এনে রেখেছিলাম, কাজে লাগালাম, কত রকম করে আপনার জ্ঞান হল। আমার যে কত আনন্দ বোঝাতে পারব না, মোহাচ্ছন্নের মত খালি

মনে হত, আপনি শুধু বৌদিদির বোন্ নন, আমারও যেন বড় আপনার জিনিষ। যাক সে সব কথা, রাত জাগলে সোজা মানুষ পাগল হয়, আমার তাই হয়েছিল, যখন সত্য সত্য দেখলাম ভয় কেটেছে, হুকুম করলাম আপনার মাকে চা করে দিতে, আমোদে কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না, সম্বন্ধে গুরুজন তাও ভুলে ছিলাম।

নলিনী আচ্ছন্নের মত বসিয়া নবীনের কথা শুনিতেছিল, নবীনের উপর আর এতটুকু সন্দেহ বা অবিশ্বাস রহিল না। নলিনীর যাহা জানিবার ছিল, জানা শেষ হইল, আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। নলিনী বলিল, 'মাও বলেন আপনি অসময়ে যা করেছেন, কেউ করে না; যাঁর অন্তঃকরণ মহৎ, তাঁর কাছে আপন পর নাই, সবই আপন। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের ভেতর দৈব প্রেরণায় এসে পড়েছিলেন, তাই এ যাত্রা বেঁচে উঠলাম, শুধু মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা জানান ছাড়া আমাদের আর কি আছে আপনাকে অর্পণ করে সন্তুষ্ট করতে পারি? যেটা আমার স্বভাব তারই কিছু পরিচয় দিলাম, এমন সব দুর্ব্বাক্য বললাম যার জন্য মনে ব্যথা পেলেন। আমার বিপদ্ সে সময়ে আপনার প্রতি আচরণ স্মরণ করিয়ে আমাকে লজ্জা দিলেন, অনুতাপ করছি এবং ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি।

নলিনী আর কিছু বলিতে পারিল না, মাথাটি নীচু করিয়া নখ দিয়া সতরঞ্চের সূতা খুঁটিতে লাগিল।

নবীন বলিল, 'বালক নই, যুবাও নই, প্রৌঢ়ত্বের দরজা ছেড়ে বৃদ্ধের ভূমিতে পা বাড়িয়েছি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য দিন দিন সঞ্চয় করছি, আমার মুখে যৌবনের বাচালতা শোভা পায় না, কিন্তু এত দিন পরে আমার এ কি রকম অবস্থা এল বলতে পারেন? আমার মনে হয়, সকলেরই মূল আপনি, আজকের মত এমন সুবিধা আর পাব না, কাল হোক বা পনের দিন পরে হোক, আপনার কাছ থেকে সরে যাব, হয়ত আর কখনও আমাদের দেখা হবে না, আমার মত দীন-দরিদ্রকে যথার্থই দুদিনে ভুলে যাবেন, কোথাও না কোথাও আপনার বিবাহ হবে। বড় ভাগ্যবান্, যিনি আপনাকে গৃহিণী ক'রে ঘরে তুলতে পারবেন।'

নলিনী মুখ তুলিয়া কঠোর স্বরে বলিল, 'থামুন ত! বসতে দেবেন না?'

নবীন থামিল না, বলিল, 'আপনি কি বলতে চান, আপনার বিয়ে হবে না?'

নলিনী। কে বললে বিয়ে হবে না? সকলকার হয়, আমারই বা হবে না কেন? বয়েস হয়েছে, নয়?

নবীন। বালিকা-বিবাহ, সে প্রথা অনেক দিন উঠে গেছে, বিলাতে বাইশ বছর মেয়েদের বয়েসের মধ্যেই ধরে না।

নলিনী। বাঙলা দেশ ত বিলাত নয়, আমিও সত্য মেম নই, আমার বিয়ে হোক, চাই নাই হোক আপনার এত মাথাব্যথা কেন বলুন ত?

নবীন। মার মুখে শুনেছিলাম, আপনি না কি বিয়ে করবেন না বলেছিলেন।

নলিনী। হাঁ, তাই ত ঠিক ছিল।

নবীন। এখন কি মত বদলেছেন?

নলিনী। এত পেটের কথা কেন বলব বলুন ত? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খালি আমারই কথা পাড়ছেন, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? জবাব দিন।

নবীন। হয়েছিল ত।

নলিনী। সে ত হয়ে চুকে গেছে, দিদি বলেছে, আপনি না কি বিয়ের নামে জ্বলে ওঠেন? ঠিক কি না?

নবীন। বৌদি ভুল বুঝেছেন, আমাদের সঙ্গে কাশী এলে কত ভাল হত, তিনি হলে আমার মনের কথা খুলে বার করতেন, আপনিও জানতে পারতেন।

নলিনী। আমি ত দিদির বোন্, আমাকেই বলুন না, লজ্জা করবেন না. বিশ্বাস করে ভেঙ্গে বলুন যদি কিছু উপকার করতে পারি—আপনি এত উপকার করলেন, এটুকু প্রত্যুপকার আর করতে পারব না!

নবীন। আমি যাঁকে ভালবেসেছি শুনবেন তাঁর কথা? তিনি আমার সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে আছেন, ঘুমুলেও তাঁকে দেখি—

সদরে রবির গলা শুনা গেল, নবীনের মুখের কথা মুখেই রহিল, বলিল, 'শীঘ্র দু'তলায় চলুন।'

নলিনী যতটা সম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত দু'তলায় নামিয়া আসিল, নবীনও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নলিনীকে তাহার ঘরে বসাইয়া দিল, ইতিমধ্যে দুই বেয়ান ও রবি উপরে উঠিয়া আসিলেন।

নলিনীর মা ফিস্ ফিস্ করিয়া বেয়ানকে বলিলেন, 'দু'জনেই ঘরে রয়েছে, তুমি নাতী নিয়ে উপরে পালাও, আমার কাজ শেষ করি।'

নবীনের মা রবির সহিত তিন-তলায় উঠিয়া গেলেন, নলিনীর মা ঘরে আসিয়া দেখিলেন, নলিনী শয্যার উপর বসিয়া, নবীন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে।

মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেশী দেরি হল কি ?'

নলিনীর মা নবীনকে দেখিয়া বলিলেন, 'ওমা নবীনও রয়েছে যে, বেশ হল, নবীন বাবা, এদিকে এসে বস ত। প্রসাদ দেব ?'

নবীন বলিল, 'দিন না।'

নবীন হাত বাড়াইয়া দিল।

নলিনীর মা বলিলেন, 'দাঁড়িয়ে প্রসাদ নেয় ? তোমরা দু'জনে এক জায়গায় বস।'

নবীন হাসিয়া বলিল, 'এইখানেই বসি।'

নলিনীর মা। তুমি বাপু বড় একগুঁয়ে, যা বলছি শোনই না।

নবীন নলিনীর শয্যার পাশটিতে বসিতে যাইতেছিল, মা ছাড়িলেন না, হাত ধরিয়া শয্যার উপর ঠিক নলিনীর পাশে বসাইয়া দিলেন। নবীন হাসিতে লাগিল। নলিনী মার কাণ্ড দেখিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। নলিনীর মা উভয়ের সম্মুখে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন—

'একটা আশ্চর্য্য গল্প বলব, আমরা দুই বেয়ানে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাবার পথে দু'জনে এক রকম সংকল্প করে মন্দিরে ঢুকেছিলাম, অথচ কেউ কারুকে মনের কথা খুলে বলি নি। আশ্চর্য্য, আমাদের ফুল-বিল্বপত্র সমস্ত বাবা মাথা পেতে নিলেন একটিও ফেলে দিলেন না, বেয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি কিছু চেয়েছিলে ?' বেয়ান বললেন, 'তোমার মেয়ে নলিনীকে।' আমি বললাম, 'ওমা সে কি গো, আমিও যে ঠিক তোমারই মত নবীনটিকে চেয়েছিলাম। আমাদের শুভ কামনার ফুল-বিল্বপত্র এক করে নিয়ে এসেছি, একবার তোমাদের দুজনার মাথায় ঠেকাব, তারপর একত্রে বেঁধে তুলে রেখে দেব, কলকেতায় নিয়ে যাব।'

নবীন ও নলিনী উভয়েই নির্ব্বাক, নলিনীর মা নবীনের দক্ষিণ হাতটি তুলিয়া লইলেন এবং নলিনীর বাম করপুটটি তাহার কোলের ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া দুইটি হাত এক করিয়া বলিলেন, 'আমার এই কোলের মেয়েটির জন্য ভাবনায় ঘুম হত না, বয়স বেড়ে চলেছে, অথচ বিয়ের ফুল ফুটল না। ও যা চায় এ বাজারে সে যে একেবারেই দুর্ল্লভ। ভাবনার অন্ত ছিল না, এখানে এসে নবীন তোমাকে ভাল করে দেখলাম, অসুখের সময় তোমাদের দুটির ভেতরে কতটা মনের টান জন্মেছে, বুঝতেও দেরি হল না, হঠাৎ যেন আগুনে জল পড়ল। তুমি আমার সকল জামাইয়ের সেরা হবে, তোমরা পাশাপাশি বসেছ, সাক্ষাৎ হর-গৌরীর মিলন দেখেছি। আমাদের দুই বেয়ানের বাগ্‌দান কার্য্য হয়ে গেছে, আমার দান নবীন হাসিমুখে হাত পেতে নাও, আমি নিশ্চিন্ত হই।'

নবীন নলিনীর মাকে প্রণাম করিয়া বলিল, 'আশীর্ব্বাদ করুন যেন যোগ্য হতে পারি।'

নলিনীর মা উভয়ের মস্তকে নির্ম্মাল্য স্পর্শ করাইয়া প্রসাদ বিতরণ করিলেন, পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'উপরে বেয়ান আছেন, তাঁকে জল খাইয়ে আসি।'

নলিনীর মা ঘরের বাহিরে আসিলেন, নবীন নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হল কি ?'

নলিনী লজ্জা গোপন করিয়া বলিল, 'যা হবার তাই হল, ভয় পেয়ে গেছেন ?'

নবীন। আমি নয়, বোধ হয় আপনি।

নলিনী বলিল, 'আপনি কি ? আজ থেকে আপনি বলা বন্ধ করতে হবে, সব কথা এখনও শোনা হয় নি, কে সে যে আপনার বুক জুড়ে বসেছে, রাতেও ঘুমুতে দেয় না ? তিন-তলায় বলতে বলতে থেমে গেলেন।'

নবীন। বিদ্যুতের আর এক নাম ক্ষণপ্রভা, কলকাতায় একদিন বৌদির ঘরে এই ক্ষণপ্রভা দেখেছিলাম, হঠাৎ দেখে চমকে উঠেছিলাম, একবার দেখা দিয়ে তখনি চলে গেল, কাশী এসে আবার তার দেখা পেলাম, সারনাথে সত্য সত্য তাকে বুকে তুলে নিয়েছিলাম, তার অসুখের সময় তাকে আগলে বসে থাকতাম, একটু আগে তার কোমল হাতখানি আমার হাতের মধ্যে ছিল, চেন কি তাকে ? সে কে ? তুমি ! তুমিই আমার সর্ব্বস্ব !

[৫]

নবীনের প্রগাঢ় প্রেম হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করিয়া নলিনীর কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়াছে; একমাস চাপিয়া চাপিয়া অন্তরের জ্বালা আর কতদিন কতকাল ধরিয়া রাখিবে, অপিসের ছুটী একদিন না একদিন অবশ্য ফুরাইবে আবার মোট-গাঁট বাঁধিয়া যেখানকার মানুষ সেখানে ফিরিতেই হইবে, যাহাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়াছে, সে তাহার ইঙ্গিতও জানিবে না? নবীন একটি দিনের অবসর খুঁজিতেছিল, নিরালায় এক দণ্ডকাল দুজনে মুখোমুখী হইয়া বসিবে, কিছুই গোপন করিবে না, সব কথা যেমন করিয়া হোক গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা করিবে, আজ খালি বাসা পাইয়া নবীন সেই অধ্যায় কৃতিত্বের সহিত শেষ করিয়াছে, নলিনী-লাভের আশা পাইয়া নবীনের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে।

নলিনীর প্রেম, অন্তঃসলিলা নদীর প্রায়, বাহিরে কিছুই প্রকাশ নাই, অন্তরে কুলু কুলু স্রোত বহিতেছে, নবীন কত কথা হুড়মুড় করিয়া বলিয়া গেল, নলিনী বলি বলি করিয়াও মর্ম্ম-কথার এক বর্ণও মুখে আনিতে পারিল না। সমস্ত দিন সে কেবল নবীনকেই ভাবিতেছিল, রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া ভাল ঘুমাইতে পারে নাই, কুমারী জীবনের শত কথা, সহস্র ব্যথা তাহার মাথায় খেলিয়া যাইতেছিল। প্রভাতের পূর্ব্বকাল, তখনও রাত্রির অন্ধকার সরিয়া যায় নাই, পক্ষীরব তখনও আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় নাই, নলিনী একখানা মোটা চাদর অঙ্গে ঢাকিয়া তিন-তলার ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। নবীন আপন শয্যায় সজাগ ছিল, নলিনীর মৃদু পদশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া নলিনীকে দেখিল, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এত ভোরে উঠেছ?'

নলিনী বলিল, 'ভাবনায় ভাবনায় ভেপসে উঠেছিলাম, ঘুমুতে পারিনি, বেশ মিষ্টি হাওয়া বইছে নয়?'

নবীন। কি ভাবছিলে, বলবে?

নলিনী। চার বৎসরের ব্রত একদিনে ভেঙ্গে গেল; নারী-জন্ম নিয়ে চিরজীবন কারু না কারুর অধীন হতে হবেই হবে, এতদিন মা-বাপের অধীন ছিলাম, সে এক রকম কেটেছে, অধীন হয়েও স্বাধীনের মত মাঝে মাঝে চালিয়েছি, তাঁরা অন্যায় জেনেও স্নেহের বশে অনেক ক্ষমা করেছেন, এইবার তোমার অধীন হতে চললুম, তুমি ভালবাসলে জীবন সার্থক বিবেচনা করব, তুমি রুষ্ট হলে সব আশা-ভরসা ব্যর্থ হবে, তোমার সুখে সুখী, দুখে দুঃখী হতে পারব কি? যদি ছোট বয়স আমার হত, ভাবনা ছিল না, যৌবন গত করে আমার বে হচ্ছে, বুদ্ধি একটুও কাঁচা নয়, সব পেকে গেছে, কেউ দাঁত ফোটাতে পারবে না, বুদ্ধির দোষে যদি তোমার মনের মত না হই? তখন কি করব? এই সব ভাবনা ভেবে ভেবে ঘুম এল না।

নবীন সস্নেহে নলিনীর বাহু আকর্ষণ করিয়া বলিল—

'সিঁড়ির ধাপে বসবে এস, কার্ত্তিকের হিমে আর তোমাকে ফাঁকায় দাঁড়াতে দিতে পারি না।'

উভয়ে সিঁড়ির ঘরে প্রবেশ করিয়া পাশাপাশি বসিয়া পড়িল।

নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমিও কি রাত্রিতে ঘুমাও নি? কেমন করে জানলে আমি এসেছি?'

নবীন। টানে, মন বাঁধা পড়েছে কি না, সব টের পাই।

নলিনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, 'ইস্ দরদি! ভুক্তভোগী কি না', অনেক রকম জানা আছে, কিছুতে আটকায় না। যখন ইস্কুল-কলেজে পড়তাম, অনেক বড় বড় লোকের মেয়ে, এমন কি জজ ব্যারিষ্টারের মেয়েদের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল, তারা সব বড় বড় মেয়ে, বিয়ে হয় নি তখনও, অনেকে লুকিয়ে লুকিয়ে যে যা কীর্ত্তি করেছে গল্প করত, শুনে আমার ভয় হত, ঘৃণা হত, প্রকাশ করতাম না। তিন চারজন পুরুষকে একসঙ্গে ভালবাসা দেওয়া—এ কি রে বাপু! কেমন করে যে সম্ভব হয় ভেবেই পেতাম না, এ কি খেলা করা, শুধু আমোদ হলেই হল? আগে বিয়ে কর তার পর যত পার ভালবেস।' কথা বলিতে বলিতে নলিনী নবীনের মুখের উপর কোপ-কটাক্ষে চাহিয়া বলিল, 'তুমি আর ঘেঁষে ব'স না বলছি, সত্যি আমরা সাহেব মেম হই নি, কোর্টসিপ আমাদের ধাতে সইবে না।'

নবীন ছাতের উপর হইতে সেই যে নলিনীর হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল, এখনও ছাড়ে নাই, বলিল, 'তোমার বন্ধুরা কত কি করছেন, তুমি কি তার কিছুই করতে চাও না?'

নলিনী। সত্যই চাই না। ছেড়ে দাও আমি উঠে পালাই।

নবীন নলিনীর হস্ত মুক্ত করিয়া দিল, বলিল, 'তুমি ভারি ভীরু, তোমাকে অসম্মান করতে পারি মনে কর? চল দেখি আমার সেই খালি ঘরে, যেখানে তোমার আসন পাতা আছে, তোমাকে দেখাব, সেখানে তুমি রাণী, আমি প্রজা।'

নলিনী বিদ্রূপের ভঙ্গী করিয়া বলিল, 'তোমার সখের বৈঠকখানা, প্রাণের বন্ধু-বান্ধব, এরা কি করবে? ভেসে যাবে?'

নবীন। রাণীর হুকুম হলেই, নিশ্চয় ঘুচে মুছে যাবে।

নলিনী। ছি, সকলে আমাকে উদ্দেশ করে গাল দেবে, তুমি এ দিক ও দিক দু দিক রাখবে, কেমন?

নবীন। তাই হবে।

নলিনী। সেই যে প্রথম দিন যাঁর গান শুনেছিলাম, তিনিও বন্ধু না কি?

নবীন হাসিয়া বলিল, 'সে কেবল মাত্র সেই দিন থেকে আসছে, বন্ধু নয়।'

নলিনী। তাকে নাচাও বুঝি?

নবীন। এক রকম তাই বই কি, সে আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আধা-খেপা, তবে খপ করে ধরা যায় না।

নলিনী। বিয়ে করেছে?

নবীন। হাঁ, ছোটবেলায় ওর বাপ বিয়ে দিয়েছিল, তাই হয়েছে, নয়ত হত না।

নলিনী। নাম কি তার?

নবীন। ভোলানাথ।

নলিনী। ভোলানাথের স্ত্রীকে দেখেছ?

নবীন। হাঁ, সে সৌভাগ্য একটিবার হয়েছিল, ভোলানাথের জ্বর, আমাকে ডেকে পাঠালে, আপিসে 'সিক্ রিপোর্ট' লিখবার জন্য।

নলিনী। সেই সুযোগে ঘটনা ঘটল বুঝি? আলাপটা কেমন করে হল সব বল?

নবীন হাসিল, ভ্রূ কোঁচকাইল, বলিল, 'কথার ছন্দটা বেঁকা, তা হোকগে, বলছি সব। আমি গিয়ে ভোলার কাছে তার বিছানায় বসেছি, কেমন আছেন, জিজ্ঞাসা করছি, সে বললে, ভারি অসুখ, কেউ দেখে না, কাছে বসে না, আমি বললাম, কেন বউ রয়েছে, সেবার ভাবনা কি?' ভোলা বললে, 'ও রে বাপরে, সে এসে বসবে? সেবা করবে? তবেই হয়েছে।' ভোলানাথের বউ আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল, গলা ছাড়লে। হুলস্থুল ব্যাপার, ভোলা আমাকে বললে, 'দোহাই নবীন বাবু, ওকে একটু বুঝিয়ে যাও, তুমি চলে গেলে আমায় না কিছু ছুড়ে মারে।'

নলিনী। তুমি বোঝাতে গেলে?

নবীন। ভোলানাথকে বুঝিয়ে এলাম, বউ ঠাকরুণের হাতে পায়ে ধরতে পরামর্শ দিলাম, তার পর পলায়ন।

নলিনীও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'দেখছ কি, ও দিকে ফরসা হয়ে গেছে, এইবার আমারও পলায়ন।'

নলিনী নীচে নামিয়া ধীরে ধীরে দ্বার ঠেলিয়া বিছানা লইল, কিছু পরে মা উঠিয়া দেখিলেন, মেয়ে অঘোরে ঘুমাইতেছে, মা ভাবিলেন, রোগা শরীর, আহা, খানিক ঘুমাক।

কাশীর দল কলিকাতায় ফিরিয়াছে, নবীনের সহিত নলিনীর বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে। ছোট নাতনীর বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন বলিয়া দাদা মহাশয় কাশীর বাসায় চাবি লাগাইয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, এইটি তাঁর শেষ কাজ। নবীনের মা বড় ছেলে ভূপেন্দ্রের মারফত বৈবাহিক রমেশ বাবুকে জানাইয়াছেন, এ বিবাহে কন্যাকে অলঙ্কারাদি কিছুই দিতে হইবে না, সমস্ত গহনা আমার আছে, আমি দিব, মাত্র নিয়মানুবর্ত্তী যথাসম্ভব মাঙ্গলিক দ্রব্য যাহা না কি অপরিহার্য্য, তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

নবীনের বৈঠকখানা সরগরম। বন্ধুরা এ বাটীর বৌদিদির ভগিনীর যথেষ্ট গুণগান করিতেছে, কমলিনীর হাতের বিরাম নাই, ঘন ঘন পান সাজিয়া বৈঠকখানায় পাঠাইতেছেন। হরিশ এত দিন মুখ বুজিয়া ছিল, তাহার বক্তৃতা-শক্তি হঠাৎ বাড়িয়াছে; হরিশ সকলকে বুঝাইতে চায়—ভাই সব, আমাদের প্রিয় বন্ধু নবীনের দেহের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, এরূপ স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়া বসিও না, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় নবীনকে তাজা করিয়াছে, আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালিনী একটি কামিনী, যিনি এই ঘোর দুর্দ্দিনে নবীনের বিকৃত-মস্তিষ্ক শীতল করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন, দেড় মাস একত্রে পান-ভোজন চলা-ফেরা, উপবেশন এবং আরও অনেক কিছু, যাহা পাইলে মৃতও সঞ্জীবিত হয়। আহা কত ঝড়-ঝাপটা সহ্য করিয়া নবীন আজ আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছে, কল্পনার চক্ষে

চাহিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে, তাহারই পশ্চাতে বালারুণ-জ্যোতি ছড়াইয়া কে উদয় হইতেছে, বলিতে পার? তোমাদের দূরদৃষ্টি জন্মায় নাই, তোমরা দেখিতেছ না, একমাত্র ভুক্তভোগী হরিশচন্দ্র কেবল দেখিতে পাইতেছে, নব-বধূ সিন্দুর-শোভিত শির উন্নত করিয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে, মেদিনী কাঁপাইয়া ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হইতেছে, আমাদের নবীন গললগ্নীকৃতবাসে দ্বারে দাঁড়াইয়া সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছে।

সকলে সমস্বরে উচ্চ হাসি হাসিল, ভোলানাথ একবার হরিশের দিকে দেখে, একবার জনসাধারণের পানে চাহিয়া থাকে, বক্তৃতার মর্ম্ম সম্যক উপলব্ধি করে নাই; মোটমাট এই মাত্র বুঝিয়াছে, নবীন বাবুর বিবাহের কথাই চলিতেছে।

আজ সন্ধ্যার পর কন্যাপক্ষ নবীনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, নবীনদের বাড়ীতে আজ উৎসব, ভিতর বাটীতে মধ্যাহ্নকাল হইতে রন্ধন চলিতেছে, বাহিরের বৈঠকখানা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, ধোপ-দোস্ত বড় জাজিম ঘর জুড়িয়া পাতা হইয়াছে, চার পাঁচটা তাকিয়া, বড় নলযুক্ত গড়গড়া আসিয়াছে। বন্ধুরা নিজেরাই উদ্‌যোগী; সন্ধ্যার পর বন্ধুরা ভোলানাথকে বুঝাইয়া পড়াইয়া উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বৈঠকখানার মধ্যভাগে পিছনে তাকিয়া রাখিয়া বসাইয়াছে, গড়গড়ার নল ভোলানাথের সম্মুখে শোভা পাইতেছে। আজিকার আসরে ভোলানাথ সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, ভোলানাথ বন্ধুদের একান্ত অনুরোধ এড়াইতে পারে নাই, যে যাহা বলিতেছে, কোথাও আপত্তি করে নাই, একখানা সোনার চশমা ভোলানাথের চোখে পরাইয়া দিয়াছে, চশমা পরিয়া ভোলানাথ ভাল দেখিতে পায় না, সকলেই একবাক্যে আনন্দ জানাইয়া বলিতেছে, চশমায় ভোলাবাবুর গাম্ভীর্য্য যেন শতগুণে বাড়িয়াছে। ভোলানাথ বলিল, 'ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কহিতে ভয় পাই, কর্ত্তা সাজা মুখের কথা নয়।'

এক জন বলিল, 'আপনি কোন কথা বলিবেন না, শুদ্ধ তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসিয়া থাকিবেন, কথাবার্ত্তা যাহা কহিতে হয় আমরাই কহিব, আপনি শুধু মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িবেন, আর কিছুই চাই না।' ভোলানাথকে ঘিরিয়া সকলে আনন্দ করিতেছে।

সংবাদ আসিল, কন্যাপক্ষীয় দল সদরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বন্ধুরা ভোলানাথকে একাকী রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, রমেশ বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র দলটিকে বৈঠকখানার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন, দাদামহাশয় লাঠি ধরিয়া সহাস্য মুখে ফরাসের মধ্যে প্রায় ভোলানাথের সম্মুখভাগে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, রমেশ বাবুর সম্বন্ধী মোহিত বাবু দাদা মহাশয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন, ইঁহাদের পশ্চাতে রমেশ বাবু এবং আরও দুই একজন অল্পবয়সের যুবক বসিলেন। তামাক সাজা ছিল, ভোলানাথের সম্মুখ হইতে নল উঠাইয়া একজন দাদামহাশয়ের হাতে তুলিয়া ধরিল, দাদামহাশয় বলিলেন, 'বিলক্ষণ', ভোলার দিকে নলের মুখ আগাইয়া দিলেন, কে একজন বলিল, 'উনি অনেক খেয়েছেন, আপনি খান।'

তথাপি দাদা মহাশয় বলিলেন, 'বিলক্ষণ'—ভোলা ঘাড় নাড়িতে লাগিল, মোহিত বাবু আসিয়া পর্য্যন্ত ভোলার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিলেন, বলিলেন, 'ভোলানাথ না?'

ভোলানাথ চশমা খুলিয়া মোহিত বাবুকে চিনিতে পারিল, লজ্জায় তাকিয়াটা দূরে ঠেলিয়া দিয়া যুক্তকরে মোহিত বাবুকে নমস্কার জানাইয়া বলিল, 'আপনি এখানে?'

মোহিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, 'আমার ভাগ্নীর বিবাহ, আমি ত আসবই, তুমি ত দেখছি ভুপেনদের পরম আত্মীয়।'

ভুপেন্দ্রনাথ চুপে চুপে মামা-শ্বশুরকে জানাইল, 'আমাদের কেহ নহে, নবীনের বন্ধু।'

মোহিত বাবু বলিলেন, 'ভোলানাথ আমাদেরই আপিসে কর্ম্ম করে, বাহিরে যে তার এত সম্মান কিছুই জানা ছিল না।'

হরিশ দূরে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, 'উনি একজন খেলোয়াড়, ওঁকে চেনে কটা লোক?'

ভোলানাথ রাগত চক্ষু দুইটায় হরিশের দিকে ফিরিয়া দেখিল, দাদা মহাশয় তামাকের গোল ধোঁয়া [illegible] করিয়া নলের মুখটা ভোলানাথকে আগাইয়া ধরিলেন।

ভোলানাথ বলিল, 'আমি খাই না।'

দাদা মহাশয় বলিলেন, 'সে কি? এই মাত্র কে যে বলিল, আপনি অনেক খেয়েছেন?'

ভোলানাথ মুখ ভার করিয়া বলিল, 'ফাজলামী [illegible]'

মোহিত বাবু উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহি[illegible]লেন, দেখিতে পাইলেন, সকলেই অল্প অল্প হাসিতেছে, মনে

মনে বুঝিলেন, আপিসের মত এখানেও এই দলটি ভোলানাথের জন্য স্বতন্ত্র গঠিত হয়েছে।

দাদা মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মোহিত, তুমি না বললে ইনি তোমাদের সঙ্গে এক আপিসে কর্ম্ম করেন?'

মোহিত। হাঁ, আপিসের সকলেই ভোলানাথকে ভাল রকম জানে, বড় ভাল মানুষ, ওদের ডিপার্টমেন্টে কতকগুলো পাজি ছোঁড়া ওকে জ্বালাতন করে, তাই নিয়ে এক একদিন খুব গোল হয়।

ভোলানাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল, মোহিত বাবু আপিসের লোক, এখনি যে সব কাহিনী আনিয়া ফেলিবেন, এই সভার মধ্যে নিতান্তই লজ্জাকর। ভোলানাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িল, ভোলানাথ বাহির হইয়া যায় দেখিয়া নবীন পথ আটকাইল।

ভোলানাথ [illegible] আসিয়াছিল, বলিল, 'কাণ্ডটা দেখুন গিয়ে, আমারই কথা চলছে, খাব না, এখনই বাড়ী যাব।'

নবীন অনেক বুঝাইয়া ভোলানাথকে বাহিরের বৈঠকে বসাইয়া রাখিল। বলিল, 'পাতা হলেই আপনাকে আলাদা খাইয়ে দেব।'

মোহিত বাবু বিজ্ঞ ব্যক্তি, আপিসের কথা তুলিতে ভোলানাথ উঠিয়া [illegible] তিনিও ভোলার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিলেন।

যথারীতি আশীর্বাদ কার্য্য শেষ হইলে আহারের ব্যবস্থা হইল, দাদা মহাশয় ভোলানাথকে পার্শ্বে বসাইয়া আহার করিলেন, ভোলানাথের আহারপটুতা দাদা মহাশয়কে চমৎকৃত করিল, তিনি বলিলেন, 'ভোলা বাবুর আহার দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়, সেকালের খাইয়ে লোকদের মনে করিয়ে দেয়।

নবীনের বিবাহ নিরুদ্বেগে সমাধা হইয়াছিল, কমলিনী বর রওনা করিয়া অতি সত্বর পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন, শুভ-দৃষ্টির সময় বলিলেন, 'স্বয়ম্বরায় আবার শুভদৃষ্টি কি?'

মা বলিলেন, 'কমলি, যা তা বলিস নে বাছা, বিয়ের পর শুভদৃষ্টি করতে হয়, করিয়ে দাও।'

কমলিনী ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ও গো লজ্জাশীলে! একটিবার মুখ তোল, চেয়ে দেখ, ভাল চোখে চেও, ঠাকুরপোর লজ্জা হয়েছে, কালীর সব কীর্ত্তি মনে পড়ছে কি না, নাও চাও, দুজনে ভাল করে চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলুক।'

নলিনীর আর আর সকল ভগিনীরা ছাঁদনাতলায় উপস্থিত ছিল, হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

বাসরে বর-কন্যা একত্রে বসিলে কমলিনী কিছুক্ষণের জন্য বাহিরে আসিয়া কাঁদিয়াছিলেন, নবীনের প্রথমা স্ত্রী কমলিনীর বড় আদরের, বড় প্রিয় ছিল, ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিত, এই ক্ষণে তাহাকে একবার মনে পড়িল, এত আনন্দের ভিতর কমলিনীর প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, কমলিনী যখন পুনরায় বাসরে ফিরিয়া আসিল, নবীন বৌদিদির গম্ভীর মুখ, জলে ভরা রাঙা চোখ লক্ষ্য করিল, নবীন বুঝিতে চেষ্টা করিল, কেন এ ভাবান্তর? কার জন্য, কে সে? হায় এ সুখের বাসরে তাহার স্থান নাই, তাহার কথা মুখেও আনিতে নাই, অতীতের সে অতীতে মিলিয়াছে, অতীতে বিলীন হইয়াছে।

পরদিন নবীন নব-পরিণীতা বধূ নলিনীর সহিত নিজ আলয়ে আসিল, কমলিনী পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন, বধূবরণ করিয়া ঘরে উঠাইলেন, নবীনের মা রবিকে লইয়া নিজ কক্ষে আবদ্ধা ছিলেন, রবি ঠাকুমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতেছে, কে আসিতেছে? কেন শাঁখ বাজিতেছে?

সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা করিয়া বড় বধূ শাশুড়ীকে ডাকিলেন, নবীনের মা রবিকে কোলে লইয়া নবীনের ঘরে উপস্থিত হইলেন, নলিনী দিদির চোখে জল দেখিয়া বিমর্ষ মুখে অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে বসিয়াছিল, উঠিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করিল, রবিকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিল, নবীনের মা দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'রবি এই তোমার মা।'

রবি নলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি কি তুমি আমার মা?'

নলিনী চোখের জল সামলাইতে পারিল না, কাঁদিয়া ফেলিল, দুই হাতে রবিকে বুকে চাপিয়া ধরা গলায় বলিল, 'হাঁ বাবা, তোমার জন্য তোমার মা হয়ে এসেছি।'

রবিও নলিনীর বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

[সমাপ্ত

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অন্তর ও বাহির

—শ্রীযামিনীকান্ত সেন

হিন্দু ভাস্কর্য্য হিন্দু চিত্তের বিচিত্র গমককে অনুসরণ করে' এক অনির্ব্বচনীয় রস-সঞ্চারের উপায় উদ্ভাবন করেছে। ভারতের রূপধর্ম্মের সহিত অরূপধর্ম্মের নিবিড় যোগ। এতদ্দেশের ভাবুকগণ অন্তর্লোককে বহু সুগভীর স্তরে দেখতে অভ্যস্ত, কাজেই এই সমস্ত ভাববীথিকা

মহাকালী (উত্তর-ভারত)।
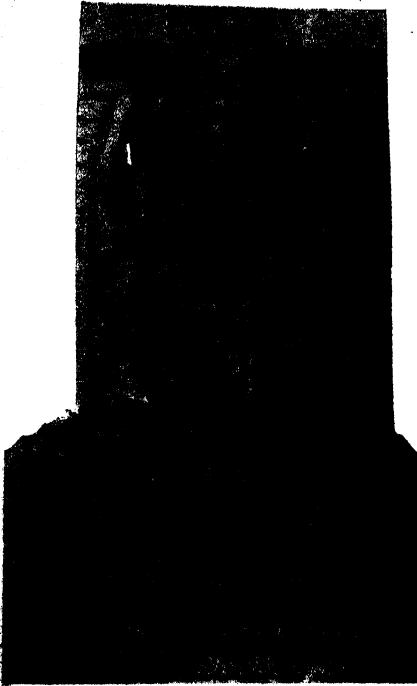
সকলকে বিস্ময়জনকভাবে আবিষ্ট করে এবং ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বহুমুখী সৃষ্টি-লালিত্য অনুধাবন করে।

বুদ্ধমূর্ত্তিতে ভারতবর্ষ ধ্যানের প্রকট অবস্থাকে লীলা-মিত করেছে। যাদের পক্ষে ধ্যান-ধারণা অলীক ব্যাপার বা আকাশকুসুম, তাদের পক্ষে এ সব মূর্ত্তি অবাস্তব বা realistic নয়, আবার যাদের পক্ষে এ সমস্ত চর্চ্চা সত্য-সাধনের অঙ্গীভূত বাস্তবের অনুসরণ, তাদের পক্ষে এ সব মূর্ত্তি বাস্তব। একে নব্য ইউরোপীয় ভাষায় sur-realistic বা অতিবাস্তব বলা যেতে পারে। কাজেই কোন্‌টি বাস্তব এবং কোন্‌টি অবাস্তব, তা ভাস্কর্য্যের বা সাধনার অন্তর ও বাহির দেখে বুঝতে হবে। হিন্দু ভাস্কর্য্য বহিরঙ্গ ব্যাপার নয়।

অপর দিকে প্রতীচ্য ভাস্কর্য্য একেবারে বহিরঙ্গ সৃষ্টি। গ্রীক ভাস্কর্য্যে মাংসপেশী-বহুল বলিষ্ঠতা, কোন অন্তরের

বিষ্ণু মূর্ত্তি (বাঙ্গালা দেশ)।

তথ্যের উপর সে-ভাস্কর্য্য বিকশিত হয় নি। বিখ্যাত ইতালীয় ভাবুক Dela Seta বলেছেন, "The Greeks regarded human face only as a part of the body," অর্থাৎ গ্রীকেরা শুধু অঙ্গ হিসেবেই মানুষের মুখকে দেখত,

মুখের ভিতর দিয়ে অন্তর্জ্জগতের যে বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত করা যায় সে সাধনা তাদের ছিল না। এ জন্য অবয়বের ভঙ্গীর সহিত মুখের সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নি। গ্রীক্‌দের মুখের ভিতর দিয়ে কোন বিচিত্র রস বা ভাবপ্রবাহ উদ্ঘাটিত হয় নি। এ জন্যই Guizot বলেছেন, "Complicated human emotions were beyond the scope of sculpture" অর্থাৎ মনোজগতের জটিল জগৎকে উপস্থাপিত করার ক্ষমতা মূর্ত্তিশিল্পের নেই।

গরুড় মূর্ত্তি।

এ কথা গ্রীক্ বা রোমক শিল্পের প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে, ভারতীয় শিল্পের প্রতি নয়। কারণ, ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে অন্তরের যে বৈচিত্র্য উদ্ঘাটিত হয়, তা একটা সত্যোপেত ব্যাপার, কাল্পনিক কুহেলি নয়। যেমন শিবমূর্ত্তি শুধু এক রকম বহিরঙ্গ বস্তু নয়। শুধু কয়েকটা অবয়ব যোগ করে সে মূর্ত্তি এ দেশে রচিত হয় নি। শিবের নটরাজ মূর্ত্তি, মহাশিব মূর্ত্তি, কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তি প্রভৃতি কল্পিত হয়ে ভাবের নানা অবস্থা দ্যোতিত হয়েছে। শুধু দেবমূর্ত্তি বৈচিত্র্যমাত্র নয়। বিশ্বজনীন ভাবগুলিও সার্থক মূর্ত্তি পেয়েছে অন্তরের দিক্ হতে। যবদ্বীপের মাতৃমূর্ত্তি একটা চমৎকার সৃষ্টি। মাতৃ-অঙ্কে উপবিষ্ট শিশুর সুষমা উদ্ঘাটিত করে অন্তর-জগতের একটা সার্ব্বভৌম অবস্থা হিন্দু ভাস্কর্য্য সেখানে উদ্ঘাটিত করেছে।

শুধু এই নিঃসঙ্গ ও খণ্ড-কল্পনা হিন্দু ভাস্কর্য্যের সীমান্ত রচনা করে নি। বুদ্ধ-জীবনের অতি পবিত্র ও সাত্ত্বিক মুহূর্ত্তগুলিকে চয়ন করে বহু দৃশ্যের সমবায়ে প্রতিফলিত করা হয়েছে মর্ম্মরের কঠিন ফলকে। এইরূপ ব্যাপার আর কোথাও দেখা যায় না। মিশরের শিল্পেও ফলক- শিল্প (bas-relief) আছে এবং তাতে বহু ঘটনার রূপলীলা উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। কিন্তু, তাতে কোন বিশিষ্ট ও মহার্ঘ মুহূর্ত্তের প্রকাশবার্ত্তা নেই। যে সমস্ত ঘটনা-পরম্পরা জগতের ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করে' এক নব্যলোককে সৃষ্টি করেছে, কোন রসশিল্প যদি সে সব সার্থকভাবে উপস্থাপিত না করতে পারে, তবে তা' শিল্প নামেরই যোগ্য নয়। শুধু ভারতীয় শিল্পের অন্তরে এই সমস্ত বিপুল বার্ত্তার প্রাণস্পন্দন আছে। ভারতীয় শিল্পী কোথাও ভীরুতার বশে বিরাট জগতের সমস্যাগুলির সামনে উপস্থিত হতে ইতস্ততঃ করেন নি।

তা' বলে জাগতিক ব্যাপারেও ভারতে তক্ষণকলা পশ্চাদ্‌পদ্ হয় নি। কুম্ভরাণার জয়স্তম্ভে ঐহিক জগতের জয়-পরাজয়, মহিমা, ব্যাপ্তি ও বিপুলতাকে শিল্পী রূপগ্রাহী করেছে। অসংখ্য মূর্ত্তি রচনা করে' জগতের জাগ্রত জীবনের সংগ্রাম ও সঙ্ঘর্ষকে প্রাণবান্ করে তুলেছে শিল্পীর অক্লান্ত সাধনা। এ ক্ষেত্রে বুদ্ধের ধর্ম্মজীবন নয়, রাজন্যের কর্ম্মজীবন উদ্ঘাটন করা মুখ্য ব্যাপার হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে কর্ম্মযোগের স্থান আছে। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে অবাঙ্‌মনসোগোচর লোকাতীতের বার্ত্তা লাভ করতে ভারতীয় সভ্যতা উদ্‌গ্রীব হয়েছে। সে বার্ত্তা পরিস্ফুট হয়েছে এই জয়স্তম্ভের পুলকিত প্রাগল্‌ভ্যের ভিতর।

অপরদিকে রূপকের ভিতর দিয়ে কাল্পনিক জগৎকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার সাধনা ভারতীয় শিল্পে প্রস্ফুট হয়েছে। ভারতীয় কল্পনায় নাগরাজের স্থান একটা অলীক ব্যাপার মাত্র নয়। এটা তান্ত্রিক ও ব্যাবহারিক ধর্ম্মমার্গের একটা

ভারহুট ভাস্কর্য্য।

কুতব'ণার জয়স্তম্ভ।
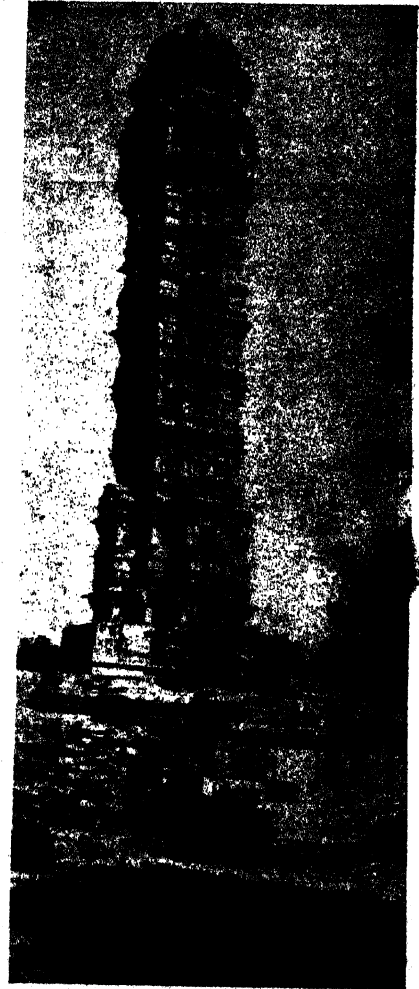
অপরিহার্য্য বস্তু। এ জন্য অজন্তা এবং অন্যত্র নাগকল্পনা একটা অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার হয়েছে। এক্কর ভাটে বিজয়-তারণের সামনে রচিত হয়েছে নাগরাজ—বহু মুর্ত্তি নাগ-রাজের শরীর বহন করছে। এ রকমের সৃষ্টিও জগতের ইতিহাসে অভিনব ও দুষ্প্রাপ্য।

ভারতের অন্তর-প্রেরণার বিচিত্র গমক এই রূপে নানা-ভাবে প্রতিফলিত করা হয়েছে রূপমার্গের বহুমুখী সাধনায়। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ফলিত করা হয়েছে অর্দ্ধনারীশ্বর কল্পনায়। অপর দিকে ত্রিমূর্ত্তি কল্পনায় বিকশিত করা হয়েছে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় এই ত্রয়ীর ঐক্য। বিশ্বরূপ কল্পনায়

লক্ষ্য করা হয়েছে বহুত্বের ভিতর একত্বের ঐক্য। এই রূপে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভিতর হিন্দুর হৃদয়-তত্ত্বের অন্তর ও বাহিরকে নানাভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে'। কাজেই ভারতের মূর্ত্তিকলা বা চিত্রালোচনা লঘুভাবে হওয়া সম্ভব নয়। একক মূর্ত্তি, দ্বৈতমূর্ত্তি ও বহুমূর্ত্তির ভিতর ভারতের রূপতত্ত্বের নব নব দিক্ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে।

অপর দিকে বাস্তব, অবাস্তব ও অতি-বাস্তববাদ ভারতীয় শিল্পে যেরূপভাবে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, এমন আর কোথাও নয়। গ্রীক্ শিল্পের পরিধি অতি সামান্য, মিশরের দেববাদ অতি লঘু ও বালকোচিত ব্যাপার। তার পেছনে গভীর কোন সার্থকতা নেই। বাস্তব রাজ্যে ভারতীয় শিল্পে যে প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিচিত্র আঁকা হয়েছে, তা জগতের ইতিহাসে লোভনীয় ব্যাপার। যাঁরা মনে করেন, ভারতবর্ষ শুধু কাল্পনিক রচনা ও চিন্তায় অগ্রণী, তাঁদের ভ্রান্তির তুলনা পাওয়া যায় না। মামলপুরের হাতীর

কৃষ্ণ-যশোদা (যবদ্বীপ)।

মূর্ত্তি, নেপালের রাজার ও প্রাকৃতিক বহু জীবজন্তুর মূর্ত্তিতে এবং অন্যান্য অসংখ্য রচনায় ভারতীয় বস্তুবাদ (realism) সার্থক হয়েছে। অবাস্তব বা কাল্পনিক সৃষ্টির ভিতর যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর, গন্ধর্ব্বাদি পরিপূর্ণ এক বিচিত্র জগৎকে উপস্থিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অবাস্তবকে বাস্তবের রাজ্যে নিপুণভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। বাঙ্গালাদেশে আড়িয়লের গরুড় মূর্ত্তি ও নেপালের গরুড় মূর্ত্তি মানবিকতায় সকলের বিস্ময় উৎপন্ন করে। গরুড়কে এ সব ক্ষেত্রে কেউ পক্ষীরূপে কল্পনা করেনি—তাকে মানবীয় রূপেই দীক্ষিত করেছে। অবাস্তবকে এমনি বাস্তব গণ্ডীতে উপস্থিত করার কৃতিত্ব ভারতবর্ষের। অপর দিকে অতি বাস্তব তত্ত্বও উদ্ঘাটিত করা হয়েছে নানাভাবে। তান্ত্রিক শক্তিমূর্ত্তির বহুমুখী কল্পনা অতি বাস্তবের দৃষ্টান্ত-স্থল। এ সমস্ত বহু মূর্ত্তি শুধু বহিরঙ্গ সুষমাকে মুখ্য করে নি। এ সব রূপকে ওতঃপ্রোত। বস্তুতঃ রূপ ও রূপকের এ রূপ মিলন জগতের রম্যকলাক্ষেত্রে আর কোথাও সম্ভব হয়নি। গ্রীক্ শীলতা বহিরঙ্গ লালিত্য মুখ্য করেছে—তাতে সুদূরগামী কোন সাধনার বার্ত্তা অবগুণ্ঠিত নেই। ভারতীয় ভাস্কর্য্যের আসন, আধার, মুদ্রা, কীরিট, প্রভাতোরণ সবই অর্থযুক্ত রূপকে বেষ্টিত হয়ে আছে। তাতে করে একদিকে অন্তরঙ্গ গভীর ভাবপুঞ্জ উদ্ঘাটিত করা হয়েছে, অপর দিকে বহিরঙ্গ কলালালিত্যকে উপস্থিত করে সৌন্দর্য্যকে জয়যুক্ত করা হয়েছে। এরূপ অঘটনঘটনপটু প্রেরণা শুধু ভারতীয় সভ্যতাই সম্ভব করেছে।

শুধু এ রকমের অভূতপূর্ব্ব চেষ্টায় ভারতের ভাস্কর্য্য পর্য্যবসিত হয়নি। দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিকে ভাস্কর্য্যের আধাররূপে পরিণত করা হয়েছে। অসংখ্য মূর্ত্তিকে মন্দিরের উপরে ও চারিদিকে উপবিষ্ট করান হয়েছে, তাতে স্থাপত্যের সহিত সামঞ্জস্য স্থাপন করা হয়েছে ভাস্কর্য্যের। এই দুটি কলার ভিতর এমনি ভাবে ঐক্য সাধন করে এবং অনেক সময় চিত্রকলা ও সঙ্গীতকেও অবিচ্ছেদ্য ভাবে মন্দিরের সহিত যুক্ত করে সমগ্র রম্যকলার ভিতর ঐক্য সাধন করা হয়েছে। বৈচিত্র্যের এই ঐক্য আর কোথাও স্থাপিত হয় নি।

বস্তুতঃ ভারতীয় ভাস্কর্য্যে হিন্দুর সামঞ্জস্য-প্রীতি ও ঐক্যের প্রতি আকর্ষণ বার বার প্রস্ফুট হয়েছে। যুগ-যুগান্তের জিজ্ঞাসা এমনি ভাবে মর্ম্মরের ভাষা পেয়ে দ্রষ্টার সামনে অহরহ উপস্থিত হচ্ছে। প্রতীচ্য চোখ নিয়ে ভারতীয় ভাস্কর্য্যের বিচার করতে গেলে বিপ্রলব্ধ হতে হবে। ভারতীয় চিন্তা পঞ্চকোষাত্মক অস্তিত্ব কল্পনা করেছে, একটি অন্যটির ভিতর প্রচ্ছন্ন ও [illegible] কলার ক্ষেত্রেও এই বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য নানাভাবে ও নানাদিকে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শুধু বাহিরের দিক থেকে বিচার করলে চলবে না—ভিতরে কোন্ ভাব বা আদর্শের প্রকাশ হয়েছে ভারতীয় ভাস্কর্য্যে, তা দেখতে হবে। ইউরোপীয় কলার ভাববাদ (idealism), রূপকবাদ (symbolism), গতিবাদ (dynamism), বস্তুবাদ (realism), অতিবাস্তববাদ (sur-realism) প্রভৃতি ভারতের সৃষ্টির সর্ব্বত্র প্রস্ফুট হয়ে উঠেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকার না থাকাতে কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এ দেশের সৃষ্টির বহুমুখী রূপ দেখতে পান নি এবং কোথাও উল্লেখ করেন নি। শুধু তত্ত্ব মাত্র নয়, ব্যাবহারিক দিকের অসংখ্য প্রেরণা, উচ্ছ্বাস ও রস-মাধুর্য্য এমনি করে ভারতের রম্যশিল্পে স্থান পেয়েছে।

হীন

—শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

সভ্যতা যারা গড়িয়া তুলেছে সকল শক্তি দিয়ে,
বহিয়া এনেছে নব নব দান কর্ম্মের ব্রত নিয়ে,
সমাজের চোখে তারা হ'ল হীন, তারা হ'ল অখ্যাত,
জগতে তাহারা নয় কি মানুষ ?—শুধুই অবজ্ঞাত ?
সত্য কি হ'বে মানুষের কাছে দম্ভ অহঙ্কার ?
তারই আশ্রয়ে বর্দ্ধিত হ'বে মিথ্যা ও অবিচার ?
অসভ্য বলি' দূরে যারা রাখে অবহেলি' তাহাদের,
তারা কি সভ্য—তারা কি মানুষ—শ্রেষ্ঠ কি সমাজের ?

এই শ্রমিকেরা গড়েছে প্রাসাদ, খুঁড়েছে গভীর খনি,
অতল-সলিলে ডুব দিয়ে তারা এনেছে সাগর-মণি ;
তাদের শ্রমের দান পেয়ে আজ যন্ত্রের জয়-গান,
—চলেছে জাহাজ, কল-কারখানা, রেল আর ব্যোমযান।
প্রতিটি দিনের মুখের অন্ন যোগায়েছে প্রতিদিন,
প্রাণ দিয়ে তারা খেটেছে নিয়ত—শরীর করেছে ক্ষীণ।
তারা কি পাবে না মানুষের কাছে—এক পাশে কিছু ঠাঁই ?
সভ্য জগৎ যাবে কি ভুলিয়া তারা আমাদের ভাই ?

জগতের মাঝে মানুষে মানুষে কত না দ্বন্দ্ব চলে,
যশ-সুখ্যাতি লাগিয়া সবাই মাতে কত কোলাহলে !
সভ্যতা তাই স্বার্থের খেলা, নাহি তায় মানবতা,
মানব-ধর্ম্ম পাশবিক বলে লভিয়াছে অন্ধতা !
হারায়ে ফেলেছে উদার দৃষ্টি—পোষি' দুর্দ্দম আশা,
শিক্ষা এদের করেনি প্রসার হৃদয়ের ভালবাসা !
শ্রমিক মজুর চাষীদের এরা নেছে শত শত দান,
অমানুষ এরা তাই তাহাদের করিয়াছে অপমান !

যুগ যুগ ধরে এই বঞ্চিত হতভাগ্যের দল,
জগতের পথে সারি সারি চলে—লাঞ্ছনা সম্বল।
সয়েছে আঘাত, সয়েছে বেদনা, সয়েছে অত্যাচার,
কারও কাছে কভু জানায় নি কিছু—নাই তারও অধিকার !
তাদের রক্তে এই পৃথিবীর রাজপথ গেল রাঙি,
দৃঢ়-সভ্যতা-ভিত্তি উঠিল তাদের পাঁজর ভাঙি'।
তাদের কণ্ঠ-আর্ত্ত-ধ্বনিতে আকাশ উঠিল ভরি',
তবু কি জাগেনা মানুষের প্রাণ—তাদের দুঃখ স্মরি ?

উচ্চ শিক্ষার আদর্শ

—শ্রীসুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চার্ব্বাক বলেছেন, "ভণ্ড-ধূর্ত্ত নিশাচরাঃ" একত্র মিলে বেদ প্রণয়ন করেছে। যাঁদের চেষ্টায় আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের কারুর প্রতি এরূপ অশিষ্ট আখ্যা প্রয়োগ করা চলে না; কিন্তু তাঁরা যে স্বতন্ত্র তিন শ্রেণীর লোক তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। প্রথমেই দেখা যায় একদল আদর্শবাদী ইংরাজকে, তাঁদের সহায়করূপে একদল আদর্শবাদী বাঙালীকে, কিন্তু নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়টি গড়ে তুলবার ও তার কার্য্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করবার ভার পড়ল একদল রাজ-কর্ম্মচারী ইংরাজের হাতে। এঁদের মধ্যে আদর্শবাদের কোন বালাই নেই, এঁরা জানতেন রাজ-কার্য্য চালাতে, সহজে, সুশৃঙ্খলায় ও অল্প ব্যয়ে। ফলে, মেকলে যখন চাচ্ছিলেন ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এমন একদল ভারতবাসী তৈয়ার করতে, যারা ভাবে, চিন্তায় ও জীবনের আদর্শে হবে সম্পূর্ণ ইংরাজ ও দেশের মধ্যে ইংরাজী সভ্যতার পতাকা বহন করবে; আর যখন রাজা রামমোহন রায় ভাবছিলেন যে, ইউরোপের প্রজ্ঞার স্ফীতালোকে দেশে যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত কুসংস্কার দূর হবে; তখন ইংরাজ কর্ম্মচারীর দল রাজকার্য্যের জন্য এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাহায্যেই ইংরাজী-অভিজ্ঞ, পরিশ্রমী, বিনীত, বিশ্বাসী, অল্প বেতনের কেরাণীর দল সৃষ্টি করে কাজে লাগিয়ে দিচ্ছিলেন। দৈনন্দিন রাজকার্য্য চালাবার ভার যাঁদের উপর, তাঁদের দাবী অগ্রাহ্য করা কঠিন, আর বিশ্ব-বিদ্যালয়টিকে চালাবার ও বাঁচিয়ে রাখবার ভার যাঁদের উপর, তাঁরা সেটিকে অনায়াসে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারেন। তাই মেকলের বড় আশা সফল হতে—এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরাজী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইংরাজেরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পেয়েছে, ভারতবাসীর সেই সকল দাবী করতে,—অনেক বিলম্ব হয়ে গেল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকের দল কয়েক বৎসরের মধ্যে চিন্তায়, আদর্শে ও মনে ইংরাজ হয়ে উঠে অনেক অনাচার অত্যাচার আরম্ভ করল বটে, কিন্তু এই বিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্রই ইংরাজী ছেড়ে বাঙলা ভাষার চর্চ্চা করে' আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টি করে' গেলেন, ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে পূর্ণ ইংরাজ মধুসূদন বাঙলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপূর্ব্ব বীররসাত্মক কাব্য প্রণয়ন করে গেলেন, আর এই বিদ্যালয়ের ছাত্রই রমেশচন্দ্র প্রথম সমগ্র ঋগ্বেদ বাঙলা ভাষায় অনূদিত করে' ভারতের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার জনসাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করে দিলেন। বামা ভাগ্যদেবী রাজা রামমোহনের আশাও অদ্ভুত ভাবে পূর্ণ করে' বক্রহাসি হাসলেন। ইউরোপীয় প্রজ্ঞার আলোক পেয়ে বাঙালী তার প্রাচীন শাস্ত্র ধূলি ঝেড়ে তুলে অধ্যয়ন আরম্ভ করে দিল, কিন্তু ফলে উদ্ভব হল ঘোরতর পৌত্তলিক বিবেকানন্দের ও সিদ্ধ-যোগী শ্রীঅরবিন্দের। ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদের আশাও সম্পূর্ণ সফল হল বলা চলে না। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে দলে দলে কেরাণী সৃষ্টি হয়ে অফিসের দ্বারে দ্বারে ফিরতে লাগল ও কেরাণীগিরির বেতন অসম্ভব রকম অল্প করে তুলল বটে, কিন্তু দুই-চারিটা ব্যক্তির সৃষ্টি হয়ে গেল, যারা মাথা হেঁট করে রাজকার্য্যের সোনার পিঞ্জরে প্রবেশ করতে চাইল না; আর এমন একদল ডানপিটে অসমসাহসী যুবকও সৃষ্ট হয়ে গেল, যারা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করতেও প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

একই শিক্ষায় এইরূপ বিভিন্ন ফল কেন ফলল, তা' অনুসন্ধান করতে গেলে, প্রথমেই দেখা যাবে যে, এই শিক্ষার প্রণালী এক হলেও, উদ্দেশ্য বা আদর্শের একতা কখনও ছিল না। বোধ হয় উদ্দেশ্য বা আদর্শকে স্পষ্ট করে দেখবার চেষ্টাও কখনও হয় নাই। যখন যে অনুষ্ঠানের অভাব বোধ হয়েছে, তাহাই পূর্ণ করা হয়েছে এবং এখনও এই আসন্ন-প্রতিকার-বৃত্তি চলে আসছে। ইংরাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাঁচে প্রথম আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠন করা হয়েছিল; সে জন্য কোন কিছু ত্রুটি দেখলেই মনে হয়েছে, বুঝি বা আদর্শের ঠিক অনুকরণ হয় নাই, তাই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না; ও আর একবার ইংরাজী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের

যে অংশগুলির হুবহু অনুকরণ হয় নাই, কোমর বেঁধে সেই-গুলির নকল আরম্ভ হয়ে যায়; আর বোট-ক্লাব, ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ন, ইউনিভার্সিটি পতাকা, ইউনিভার্সিটি ইউনিফর্ম, ফাউণ্ডেশন ডে প্রভৃতি আড়ম্বরে অর্থকোষ শূন্য ও বিদ্যার্থীর জীবন দুঃসহ, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রদত্ত ইংরাজী শিক্ষায় যতদিন জীবিকা-উপার্জ্জন সহজ ছিল, ততদিন কেহই কিছু ভেবে দেখে নাই, ভেবে দেখবার প্রয়োজনও বোধ করে নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে একটা সার্টিফিকেট, একটা বিদ্যাবত্তার ছাপ নিয়ে এলেই সরকারী আফিসে, কলেজে, স্কুলে, বা উকীল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের পৃষ্ঠ-পোষিত কোন না কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী সংগ্রহ করে নির্ভাবনায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলত। নানা কারণে আজ সরকারী অনুগ্রহের উৎসমুখ শুষ্ক হয়ে আসছে ও ইংরাজী-শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমে দেশের একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যতদিন চাকরী সুলভ ছিল, ততদিন ইংরাজী শিক্ষিতদের পক্ষে ইংরাজী অনভিজ্ঞ দেশবাসীদের অপেক্ষা আপনাদিকে সুসভ্য উন্নততর জীব বিবেচনা করে' আত্মপ্রসাদ লাভ করাও সহজ ছিল। আজ যখন জীবন-সংগ্রামে সেই সকল অশিক্ষিত ও অসভ্য দেশবাসীদের সঙ্গে একক্ষেত্রে নেমে পাশাপাশি যুঝতে হচ্ছে ও অনেক স্থলেই তাদের হাতে পরাজিত হতে হচ্ছে, তখন ইংরাজী-শিক্ষিত-দের একটু চমক লাগতে আরম্ভ হয়েছে, সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত এই সকল অশিক্ষিত অসভ্যদের মধ্যে এমন কিছু আছে, যার প্রভাবে তারা অন্য প্রতিবেশীদিকে পরাজিত করে টিকে থাকতে পারছে। পূর্ব-অভ্যাসের সঞ্চিত বেগ কিন্তু এখনও আমাদিগকে পূর্ব্বপথেই ঠেলে নিয়ে চলেছে। ইংরাজী বিদ্যামন্দিরের দ্বারে ছাত্রের ভীড়ের সীমা নাই, চাকুরীর স্থানে উমেদারের সংখ্যার সীমা নাই। এখনও অর্থশালী লোকের বাড়ীতে ছেলেদের ইংরাজী বা দো-আঁশলা গভর্ণেশ রেখে বাল্যকাল থেকে মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষাই শিখাবার ও ভারতীয় শিষ্টতার পরিবর্ত্তে ইংরাজী আদব-কায়দা শিখাবার চেষ্টা চলছে।

বাস্তবিক এতদিন যাকে আমরা উচ্চশিক্ষা বলে আসছি, তা ছিল প্রধানতঃ ইংলণ্ডীয় শিক্ষা,—ইংলণ্ডের ভাষা, সেই ভাষার বংশাবলীর সংবাদ, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ডের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, বাণিজ্যের ইতিহাস, শিল্পকলার ইতিহাস, আইন, কানুন, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত। সকল দিক্ দিয়ে ইংলণ্ডকে, ইংরাজের দেশকে, ইংরাজের মনকে, ইংরাজের কার্য্যকলাপকে,—জানাই ছিল উচ্চশিক্ষা। যেন ইংলণ্ডকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সভ্যজগতের বিবর্ত্তন চলে আসছে। আজ জীবন-সংগ্রামে এই বিদ্যায় অশিক্ষিত লোক-দের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে চমক ভাঙছে যে, এই শিক্ষা রাজকার্য্য পাওয়ার পক্ষে ও রাজপুরুষদের অনুগ্রহ আকর্ষণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হলেও, আমাদিগকে মানুষ করে তুলতে পারে নি। পৃথিবীর সুধী সমাজে আমাদের স্থান যেমনই সঙ্কীর্ণ, যাঁরা নিজেদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে বহু মানবের প্রভূত উপকার করে গিয়েছেন, সেই সকল কর্ম্মবীরের পংক্তিতেও তেমনই আমাদের আসনের অভাব। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত করে ছেলেদিকে কি করে তুলতে চান, তা বোধ হয় ছেলেদের পিতা বা অভিভাবকগণ কখনও ভাবেন নি। বোধ হয় যে সকল ভারতীয় মহাপুরুষদের হাতে এই শিক্ষাপদ্ধতি প্রয়োগ করার কতক ভার ছিল, তাঁরাও ভাবেন নি। ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন আদর্শও তাঁরা চিন্তা করিতে পারেন নি। তাই যখনই শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা হয়েছে, তখনই ইংলণ্ডের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠতর অনুকরণই করা হয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত এই ষড়্‌দর্শনের দেশে, ছাত্র ভারতীয় দর্শন বা চিন্তাধারার কোন পরিচয় না পেয়েও অনায়াসে দর্শনের সর্ব্বোচ্চ উপাধি লাভ করতে পারত। লর্ড রোনাল্ডশে বিদেশী হলেও, তাঁর চোখে ইহা এত বিসদৃশ ঠেকেছিল যে, তিনি ইহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ না করে থাকতে পারেন নি।

আশৈশব ইংরাজী বস্তুর উপাসনার ফলে, আমাদের দেশের সহিত ইংরাজী-শিক্ষিতদের একটা গভীর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। দেশের সহিত, পূর্ব্বপুরুষগণের সহিত তাঁদের চিন্তার ধারার সহিত, তাঁদের কীর্ত্তিকলাপের সহিত কোন সংস্রব না থাকায়, সে সকল বিষয়ে ইংরাজী-শিক্ষিতদের অজ্ঞতাও যেরূপ পর্ব্বত-প্রমাণ, সে সকলের উপর অবজ্ঞাও তেমনই অভ্রভেদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মানসিক দৈন্যের জন্যই ব্যাস-বাল্মিকীর বংশধর, শঙ্কর-রামানুজের মন্ত্রশিষ্যগণ

ইউরোপের শিক্ষা-প্রাঙ্গণে ইউরোপীয় সভ্যতার উচ্ছিষ্ট ভোজ্য-কণিকার লোভে ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে আছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হতে পারে!

আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার উৎসমুখে কোন আদর্শ না থাকায়, এই শিক্ষার ধারাও ঋজু, কুটিল, নানা বিচিত্র রেখায় বয়ে চলেছে। একযুগে ইংরাজী সাহিত্য নিয়ে মহা মাতামাতি আরম্ভ হয়ে গেল। কিছুদিন পরেই বিজ্ঞান-চর্চ্চার হুজুকে সাহিত্য-শিল্প চাপা পড়ে গেল, আবার ব্যাবহারিক শিক্ষার ধূয়ায় আজ কেবল সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ক্রমেই গৌণ হয়ে পড়ছে। এক যুগে যাঁরা সরস্বতীর বরপুত্র বলে গণ্য হতেন, তাঁরাই পরের যুগে অন্তঃসারশূন্য বাক্যবীর মাত্র বলে হেয় অবজ্ঞাত হচ্ছেন। বাস্তবিক, "অব্যবস্থিত-চিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ"।

আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রায় ৮০ বৎসর ধরে যে ইংরাজী উচ্চশিক্ষা পরিবেশন করে আসছে, তার যে কোথায় দুর্ব্বলতা, তা ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের কনভোকেশন উপলক্ষে অভিভাষণ পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টার উপর কটাক্ষ করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আদর্শের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, "বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আদর্শ হচ্ছে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল কালচার বিস্তার।" কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির এই ঐকান্তিক অনুশীলনই আমাদের উচ্চ শিক্ষাপদ্ধতির সকল রোগের মূল। ইহা এতই "উচ্চ" যে, ধূলিমলিন পৃথিবীর দাবী, শিক্ষার্থীর পাঞ্চভৌতিক দেহের অশন-বসনের অভাব, ইহার চোখেই পড়ে না, আর এই উচ্চ-শিক্ষার শিখরে যাঁরা আরোহণ করেন, তাঁরা এই সকল তুচ্ছ অভাব মেটাবার কোন শক্তিই অর্জ্জন করেন না। এই উচ্চশিক্ষা আবার এমনই "ব্যাপক" যে, এর প্লাবনে ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, সত্য, সরলতা সমস্তই ভেসে যাচ্ছে, প্রাচীন আদর্শ উপহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আধ্যাত্মিক জগৎ ক্রমে ছিন্নচ্ছিন্ন, অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

মানব-মনের সমস্ত সুকুমার, সমস্ত সূক্ষ্ম বৃত্তির অনুশীলন অবহেলা করে' নিছক বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের ফলে, আধুনিক ইংরাজীশিক্ষিতদের জীবনে কি বিপ্লব ঘটে গিয়েছে, তা আলোচনা করলে আশ্চর্য্য হয়ে থাকতে হয়। এই শিক্ষায় বুদ্ধির গর্ব্বে আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই প্রজ্ঞার কষ্টি-পাথরে কষে দেখতে চাই, যে বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব সেই পরীক্ষায় ধরা যায় না, তা আমরা নিঃসংশয়ে কুসংস্কার বলে আবর্জ্জনা স্তূপে ফেলে দিই। এই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয়ে ইংরাজী-শিক্ষিতদের জীবন থেকে পরমাত্মাকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে, পরমেশ্বরে আর বিশ্বাস করা চলে না, মানব-দেহ বিশ্লেষণ করে উচ্চশিক্ষিত চিকিৎসকগণ এখনও জীবাত্মা বা ষট্‌চক্র বা ইড়া পিঙ্গলা প্রভৃতি নাড়ী, কোন কিছুরই সন্ধান পান নি, হয়ত সে সকলের মমতাও ত্যাগ করতে হবে। জীবনের চারিটি আশ্রম মিশে একাকার হয়ে গেছে, ধর্ম্ম বা সামাজিক নীতি কুসংস্কার বলে পরিত্যক্ত হয়েছে, জীবনে আদর্শবাদ নির্ব্বুদ্ধিতা বলে ত্যাগ করা হয়েছে; নির্ম্মলতা, পবিত্রতা, স্বভাবের পূর্ণ পরিণতির পথে বৃথা বাধা মাত্র বলে পরিগণিত হচ্ছে। জীবনে একমাত্র কাম্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থ ও ক্ষমতা। প্রচুর অপরিমেয় অর্থ অর্জ্জন করবার জন্য ও অবাধে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার জন্য এমন কোন কার্য্য নেই, যা আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি করতে কুণ্ঠাবোধ করেন। আর যার অর্থ আছে, যার ক্ষমতা আছে, সে মূর্খ হলেও পণ্ডিত, শত শত মহামহোপাধ্যায় তার স্তবগান করতে সদাই ব্যগ্র; সে কুৎসিত হলেও রমণীয়, শত শত বরনারী গুণ্ডা হিটলারের করস্পর্শ লাভের জন্য ভিড় করে আসে। এই নিরঙ্কুশ বুদ্ধি-বৃত্তিসার শিক্ষায় আমাদের দেশে বংশমর্য্যাদা ও জ্ঞানই যে সমাজে সম্মানের শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড ছিল, তা প্রায় ভুলতে বসেছি।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের প্রধান আপত্তি উঠেছিল, তাঁর তথাকথিত হীনবংশ; রথকারের পুত্র বলেই কর্ণ রাজসভায় সম্মান পান নি। তেমনই বশিষ্ঠের আশ্রমে রাজা দিলীপ হোমধেনুর পরিচর্য্যা করতে কুণ্ঠিত হন নি, সন্ন্যাসী রামদাসের ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে তুলে নিতে ছত্রপতি শিবাজী গৌরব বোধ করেছিলেন, আর সর্ব্বরিক্ত চাণক্যের পদধূলি মস্তকে তুলে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে ধন্য মনে করেছিলেন। আর—আজ যদি কোন নির্ব্বোধ যুবক পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ পরে' দুকথা ইংরাজী গুছিয়ে বলতে পারে ত, তার সম্মান উত্তরীয়মাত্র-সম্বল মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অপেক্ষা অনেক অধিক। আমাদের দেশে

পণ্ডিতেরা কোন কালে সম্পূর্ণ নিরন্ন না থাকলেও কখনও ধনী ছিলেন না। অর্থাভাবে তাঁদের যত না ক্ষতি হয়েছে, প্রাচীন বিদ্যা ও প্রাচীন জ্ঞানের উপর দেশব্যাপী শ্রদ্ধার অভাবে ততোধিক ক্ষতি হয়েছে। আজ পণ্ডিতগণ তাঁদের সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিচ্ছেন, সমগ্র দেশের চিত্তভূমি যে প্রাচীন বিদ্যা ও জ্ঞানের ধারা সরস ও সুশোভন করে রাখত, তা সঙ্কীর্ণ হতে সঙ্কীর্ণতর হয়ে আসছে ও অচিরে ইউরোপের অনুকরণে উষর আধুনিক জীবনের মরুপথে হারিয়ে যাবে। প্রাচীন বিদ্যার প্রতিষ্ঠান টোল-চতুষ্পাঠীতে কৃপণহস্তে যে অকিঞ্চিৎকর বৃত্তি পরিবেশন করা হয়, তা থেকেই বোঝা যায়, এই বিদ্যার অনুশীলনকারিগণকে আমরা কোন চক্ষে দেখি। এই সকল প্রতিষ্ঠানে যে অধ্যাপকগণ পূর্ব্বে নির্ম্মল ব্রহ্মবিদ্যা দান করতেন, তাঁরা এখন সরকারী উপাধি পরীক্ষায় ছাত্র পাশ করিয়ে তাঁদের টোলে এই বৃত্তির পরিমাণ বাড়াবার চিন্তায় বিনিদ্র। প্রবলপ্রতাপ রাজবংশের বংশধর আজ অর্থহীন হয়ে সকল মর্য্যাদা হারিয়ে পথের ভিক্ষুক হয়ে বেড়াচ্ছে ও দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের বংশধর আদালতে শামলা পরে আট আনার কোর্টফি ষ্ট্যাম্প চুরি করছে। অর্থ ও ক্ষমতা, এই যে সম্মানের নূতন মানদণ্ড ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা প্রবর্ত্তন করেছি, এর স্পর্শে যে আমাদের সামাজিক সৌধ ক্রমে ধূলিসাৎ হয়ে আসছে, তা ভেবেও দেখি না।

আজ আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতার অক্ষম অনুকরণে ব্যস্ত, তার উচ্চাঙ্গ আমাদের চোখে পড়ে না; কত শতাব্দী ধরে কত পণ্ডিতের ঐকান্তিক সাধনা, অকুণ্ঠ স্বার্থত্যাগ, অক্লান্ত সত্যানুসন্ধানে ইহা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, তার সন্ধান আমরা রাখি না, সে সাধনার অনুকরণ করবার আমাদের শক্তি নাই, তার বহিরঙ্গের নকলই আমরা করে থাকি। এ দিকে এই সভ্যতার অন্ধকারাচ্ছন্ন পূতিগন্ধময় অংশের সংবাদও আমরা রাখি না। যে ক্রীতদাস প্রথার উপর গ্রীস ও রোমের সভ্যতা-সৌধ নির্ম্মিত হয়েছিল, তাই আধুনিক সভ্যতার শ্রমিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ও প্রচ্ছন্ন বিস্ফোরকস্তূপের মত ভীতিকর হয়ে আছে। মাঝে মাঝে আকস্মিক ভূমিকম্পে ও অগ্নিস্ফুরণে ইউরোপ ব্যাকুল হয়ে তাকে পাথর চাপা দিয়ে রাখছে, আর আমরা ভাবছি, আশঙ্কার কারণ নির্ম্মূল হয়ে গেল।

জাতীয় জীবনের ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে ইউরোপ তার সভ্যতা ও শিক্ষা-ব্যবস্থা আপনার প্রয়োজন মত গড়ে তুলেছে, ও যে পথে তার বিবর্ত্তন হয়ে আসছে, আমৃত্যু সেই পথেই চলবে। এ পথে যা কিছু বাধা-বিপত্তি আছে, তা অতিক্রম করবার শক্তি সে অর্জ্জন করে আসছে, কারণ এ তার আপনার সৃষ্ট পথ, এই সভ্যতা ও শিক্ষা তার অন্তরের রক্ত দিয়ে গড়ে তোলা বস্তু। এই সভ্যতা ও শিক্ষা আমাদের জীবনে একটা আগন্তুক উৎপাত মাত্র, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের ভিতর দীর্ঘমূল প্রসারিত করে জাতীয় জীবনের সুদূরতম, নিভৃততম প্রান্ত থেকে রস সংগ্রহ করে ইহা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে ওঠে নি। ইহা নিতান্তই টবে-বসান ক্ষণস্থায়ী সুন্দর গুল্ম মাত্র, আমাদের কাছে ইহার সুশীতল ছায়া নাই, সুরসাল ফল নাই, ইহা ক্ষণিক কৌতূহলের, নিমেষের আমোদের বস্তু। ইউরোপের জীবনে তার সভ্যতা ও শিক্ষা প্রাণের গভীরতম প্রদেশ থেকে স্বতঃ-উৎসারিত নির্ম্মল উৎস, সমগ্র ইউরোপকে তা স্নিগ্ধ, সরস, মনোরম করে রেখেছে, আমাদের জীবনে তা বালতী বালতী করে ঢালা চৌবাচ্চার জল।

আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি যে পথে আপন ধারা বয়ে বহু শতাব্দী ধরে চলে আসছিল, ইউরোপীয় সভ্যতার অনুকরণ ও ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করে সেই পথকে আমরা এরূপ তির্য্যক্ গতিতে ঘুরিয়ে নিয়েছি যে, সে সংস্কৃতির স্রোত শুকিয়ে যাচ্ছে, ইউরোপীয় সভ্যতার ক্ষীণ স্রোত এসেও তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। এই দুই সভ্যতার অন্তর্নিহিত বাণী বিভিন্ন, আদর্শ বিভিন্ন ও সেই আদর্শ ফুটিয়ে তোলবার পদ্ধতিও বিভিন্ন।

আমাদের শিক্ষা চিরকাল বলেছে, যা ক্ষণিক, যা ভঙ্গুর, তা থেকে চোখ ফিরিয়ে যা চিরন্তন, যা শাশ্বত তার আরাধনা করতে। আমাদের প্রার্থনাও তাই, "অসতো মা সদ্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতত্বং গময়।" ইউরোপের সভ্যতা ও শিক্ষা আমাদিগকে বলেছে, ভিতরে যা-ই থাকুক না কেন, বাইরে সুন্দর, সুস্থ, সৎ দেখাতে হবে। আমরা তাই পাণ্ডিত্য-বর্জ্জিত হয়ে পণ্ডিত সাজছি, রূপহীন হয়ে প্রসাধন-কৌশলে সুন্দর সাজছি, পরোপকার ও সাধুতার আড়ম্বর করতে করতে চুরি-ডাকাতি করে বেড়াচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষকে

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সাধন করে শান্তির আনন্দের সন্ধান করতে শিখিয়েছে। আর ইউরোপের সভ্যতা আমাদিগকে প্রতিদিনের আহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পূর্ণরূপে উপভোগ করতে পরামর্শ দিচ্ছে।

ইউরোপীয় সভ্যতা মানুষের জীবনে প্রজ্ঞার জয় ঘোষণা করে এসেছে, বুদ্ধিবৃত্তিকে সিংহাসনে বসিয়ে তার আরাধনা করেছে, আর তারই কাছ থেকে যা কিছু বর লাভ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি মানুষের সমগ্র চিত্তভূমি অধিকার করে তার প্রগতির পথ নির্দ্দেশ করেছে,—নশ্বর থেকে শাশ্বতের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে। আমাদের দেশেই প্রথম এ কথা উপলব্ধি হয়েছিল যে, মানুষের জীবনে বুদ্ধিই প্রধান নিয়ামক নয়, তার চিত্ত ভরে অনেক অস্পষ্ট বাসনা বেদনা আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হয়ে আছে ও তার অন্তর-পুরুষ নিভৃতে বসে এ সকল চরিতার্থ করবার জন্য তার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। জীবন-দেবতা মানুষের অন্তরের এই রহস্যময় প্রদেশে মণি-বেদিকায় উপবেশন করে তাঁর দুর্লঙ্ঘ্য অমোঘ আদেশ প্রচার করছেন, আর মানুষের বিচার-শক্তি, প্রজ্ঞাদেবী ক্রীতদাসীর মত সেই আদেশকে যুক্তিমণ্ডিত করে দেখাচ্ছেন। কোন লোককে বা কোন বস্তুকে আমাদের প্রথমেই ভাল লেগে যায়, বা ভাল লাগে না, জীবন-দেবতার যুক্তির অতীত, বিচারের অতীত অমোঘ আদেশের গরল বা অমৃত সিঞ্চিত হয়ে প্রকাশ পায়। তার পর বুদ্ধিমতী প্রজ্ঞাদেবী এই অন্ধ আদেশের দৃষ্টিহীন নয়নে যুক্তির অঞ্জন মাখিয়ে দৃষ্টি দান করেন, বিচারের ময়ূরকণ্ঠি পরিচ্ছদে তাকে সুশোভিত করেন, আর প্রজ্ঞাবাদী মানুষ এই লীলায় ভুলে তাঁকেই মানুষের সকল কাজের নিয়ন্ত্রী মনে করে।

বাস্তবিকপক্ষে প্রজ্ঞা মহাসমুদ্রতুল্য অসীম রহস্যাচ্ছন্ন বিপুল চিত্তবিস্তারের আলোকিত কেন্দ্র মাত্র, এই অজ্ঞাত বিস্তারের প্রচ্ছন্ন শক্তি থেকেই জ্যোতিঃকণা আহরণ করে আপনার চারিদিকের অল্প মাত্র স্থান আলোকিত করে মাত্র। এই বিশাল বিস্তারের কোথাও হয় ত পিতৃপুরুষের রক্ত থেকে সঞ্চারিত প্রতিভা বা দুশ্চরিত্রতার আবর্ত্ত ঘনিয়ে উঠছে, কোথাও বা পারিপার্শ্বিক সমাজ আবাল্য প্রভাব বিস্তার করে আছে, কোথাও বা যুগযুগান্ত-সঞ্চিত জাতীয় ঐতিহ্যস্রোত অন্তঃশীলা বয়ে যাচ্ছে,—আর এই সমস্ত আকারহীন শিথিল-গ্রন্থি সম্ভাবনাগুলিকে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরে অর্জ্জিত বাসনা, কামনা, আকাঙ্ক্ষা কর্ম্মফলে পরিণত করছে, ব্যাবহারিক জীবনের প্রকাশ্য কার্য্যে প্রকট করে তুলেছে। কেবল বুদ্ধি-বৃত্তিসার শিক্ষায় সকল কার্য্যের জন্মভূমি, সকল কল্পনার উপাদানভূত, সকল প্রচেষ্টার শক্তিকেন্দ্র জাগ্রত-চৈতন্যের বহু নিম্নস্থিত মানবচিত্তের এই বিপুল রহস্যময় প্রদেশকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা হয়, যুক্তির স্পর্দ্ধায় অন্তর-দেবতার আদেশ অমান্য করবার চেষ্টা করা হয়, উপহাস করে, অবজ্ঞা করে উড়িয়ে দেওয়া হয়। আধুনিক সামাজিক জীবন ও পাশ্চাত্য সভ্যতাও এইরূপ অবদমনের (repression) সপক্ষে সহায়তা করে। মানুষের অন্তরের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে আধুনিক মানবের যুক্তিনিয়ন্ত্রিত ব্যাবহারিক জীবনের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। এই প্রাণান্তকর দ্বন্দ্বের ফলে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সৃষ্টি হয় দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি, সামাজিক জীবনে সৃষ্টি হয় ভীষণ কপটতা ও দুর্নীতি, আর রাষ্ট্রীয় জীবনে সৃষ্টি হয় ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড, বিপ্লব। Psycho-analysis, মানসিক ব্যাধি-চিকিৎসার গ্রন্থে ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। প্রাচীন ভারত এই দ্বন্দ্বের ভীষণ অপকার উপলব্ধি করেই মানুষের অন্তর-জীবন ও বহির্জীবনে সমতা স্থাপনের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব নাটকীয় আখ্যান-রূপে Antigone, Monna vanna প্রভৃতি গ্রন্থে উপভোগ্য হতে পারে, কিন্তু যাঁকেই জীবনে অল্প পরিমাণেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে, তিনিই বুঝেন, ইহা কিরূপ দুঃখের, কিরূপ প্রাণান্তকর ও শোকাবহ। শ্রীকৃষ্ণও অর্জ্জুনকে তাই "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" হতে উপদেশ দিচ্ছেন।

অন্তর ও বহির্জ্জীবনের এই দ্বন্দ্ব দূর করতে হলে মানুষকে অন্তরে ও বাহিরে বিশুদ্ধ হতে হয়,—জীবনে কোথাও কিছু-মাত্র কপটতা থাকলে এই দ্বন্দ্বের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। চিত্তের বিশুদ্ধি সাধন করতে প্রধান সাহায্য আদর্শ চরিত্রের লোকের সাহচর্য্য। প্রাচীন ভারতে সেই জন্য ছাত্র-জীবনে পবিত্রতার উপর এত জোর দেওয়া হত। ব্যাবহারিক জীবনে লিপ্ত পিতামাতা কিশোর বালককে পূতচরিত গুরুর সন্নিধানে ন্যস্ত করে আসতেন আর গুরুও শিষ্যকে পরম স্নেহে আপনার কাছে টেনে নিতেন। আদর্শ গুরু-চরিত্রে পবিত্রতা,

নির্লোভিতা ও তেজের সঙ্গে মাধুর্য্যের সমাবেশ অনুভব করে ছাত্রও আকৃষ্ট হয়ে পড়ত ও আপন চরিত্রের যা-কিছু নীচতা ও ক্ষুদ্রতা তা ক্রমে ভুলে যেত। নিয়ত উচ্চ চিন্তা ও পবিত্র জীবন যাপন করতে করতে ছাত্রের স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটত যে, নীচ চিন্তা বা অপবিত্র জীবন যাপন করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। মানুষের কার্য্যাবলী তার অন্তরের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র, সেই জন্য মানুষ যদি নিয়ত উচ্চ চিন্তা, নির্ম্মল ভাবনা ও পবিত্রতার সাধনা করে, তার জীবনের কার্য্যাবলীও উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, সরল, নির্ম্মল, সুন্দর হবেই।

তাই উচ্চশিক্ষার জন্য প্রথম প্রয়োজন এমন একদল আদর্শ শিক্ষক, যাঁদের জীবন নির্ম্মল ও চিন্তা উচ্চ। কেবল বুদ্ধিবৃত্তি-সার পণ্ডিতেরা বিদ্যার্থীদের জীবন ঠিকভাবে গঠিত করতে পারেন না। আর ছাত্রদের পাওয়া চাই এই সকল উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত পবিত্রস্বভাব শিক্ষকদের সাহচর্য্য। আমাদের বর্ত্তমান উচ্চশিক্ষাপ্রণালীতে এই দুইটার অভাব, এরূপ শিক্ষকও দুর্ল্লভ আর তাঁহাদের সাহচর্য্য আরও দুর্ল্লভ। আধুনিক শিক্ষকসমাজে এরূপ শিক্ষক যে একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু সাধারণ শিক্ষক অন্য প্রকৃতির লোক। সাধারণতঃ অধিকাংশ শিক্ষকই অধিক উপার্জ্জনের অন্য কোন বৃত্তির অভাবেই অধ্যাপনা-কার্য্য গ্রহণ করে থাকেন, আর অধ্যাপনা কাজটাও অর্থোপার্জ্জনের একটা পন্থা বলেই মনে করেন। বিদ্যালয়ের কাজের বাইরে কি ভাবে তাঁরা অবসর কাল যাপন করেন, তা লক্ষ্য করলেই কথাটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। অবসরকালে হয় তাঁরা ছাত্রদের গৃহশিক্ষকের কাজ করেন, না হয় যে সকল সাহায্য-পুস্তক অবলম্বন করে ছাত্রেরা পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত না করেও অনায়াসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে, সেই জাতীয় Hidden Treasure, Open Sesame, Made Easy প্রভৃতি রচনা করেন, কেহ কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যে লিপ্ত থাকেন, কেহ ছাপাখানা চালান, কেহ বইয়ের দোকান চালান, কেহ কৃষিশালা চালান, কেহ Audit Bureau চালান, কেহ তেজারতি ব্যবসায় চালান। বিদ্যালয়ে যিনি যে বিষয় অধ্যাপনা করেন, তাতে গভীর ভাবে অভিনিবেশ করতে পারেন না, তার উপর প্রাণের টান নেই, ফলে তাতে কখনও সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পারেন না, সে বিষয়ে কোন মৌলিক গবেষণাও করতে পারেন না, কেবল ছাত্রদিগকে কোনরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ করিয়েই পরিতৃপ্ত থাকেন। যাঁরা এই ছাত্র-পাশ-করা কাজে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেন, ছাত্রসমাজে তাঁদের নাম সহজেই প্রচারিত হয়ে পড়ে, আর এই সুলভ সুনামকে তাঁরা যশ মনে করে সানন্দে এই সঙ্কীর্ণ জীবনেই পরিতুষ্ট থাকেন। এই সকল অধ্যাপক যে গ্রন্থরাজি রচনা করেন, তাদের কাটতিও বাজারে পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই হয়। যখন তাঁরা সাহায্য-পুস্তক ছেড়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে আরম্ভ করেন, সেগুলি অল্প আয়াসেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাঠ্য বলে নির্দ্দিষ্ট হয়। আধুনিক অধ্যাপকদের প্রণীত বিপুল গ্রন্থরাজি অনুধাবন করতে বসলে তাঁদের মানসিক সম্পদের একটা পরিষ্কার ধারণা হয়, আর কোন উদ্দেশ্যে ও কোন প্রণালীতে এই গ্রন্থগুলি রচিত হয়ে থাকে, তাও স্পষ্ট বোঝা যায়। এই সকল গ্রন্থে বিদেশী লেখক, বিশেষতঃ ইউরোপীয় গ্রন্থকার কি বলে গিয়েছেন, তার বিবরণ বিশেষ যত্নের সহিত সঙ্কলিত দেখা যায়। এই সকল গ্রন্থ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলম্বন করে' যে ভাবে পরীক্ষায় প্রশ্ন করা হয় তার উত্তরস্বরূপ লেখা হয়। বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা অপেক্ষা মতকর্ত্তাগণের নামের তালিকাতেই এই সকল গ্রন্থ অধিক ভারাক্রান্ত, সাধারণ পাঠক, তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব বিপুল পাণ্ডিত্যে ভীত হয়ে পাঠ্যগ্রন্থ তালিকাভুক্ত করে দেন। আর একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়, কোন বিখ্যাত ইংরাজ গ্রন্থ-প্রকাশকের নামে গ্রন্থগুলি প্রকাশিত করা হয়। অধিকাংশ স্থলেই হিসাবী ইংরাজ ব্যবসাদার, মুদ্রণব্যয় বহন করা দূরে থাক, তাদের নামটা দেওয়ার পরিবর্ত্তে প্রচুর অর্থ ও গ্রন্থ-বিক্রয়ের জন্য মোটারকম মুনফা দাবী করেন। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে একটু সময়োচিত তোষামোদ করে গ্রন্থগুলি পাঠ্যতালিকাভুক্ত করে দিতে পারলে সমস্ত ব্যয় বহন করেও প্রচুর লাভ হয়। অধ্যাপকদের প্রণীত এই সকল গ্রন্থে পাণ্ডিত্য প্রকাশ আছে, ছাত্রদিকে পরীক্ষা পাশ করবার কৌশল আছে, নাই কেবল মৌলিকতা, নাই কেবল স্বাধীন চিন্তা, নাই কেবল প্রতিভার স্ফুরণ, নাই কেবল অকুণ্ঠিত সত্যানুষ্ঠান। অধ্যাপক-নামা এই সকল বুদ্ধিজীবী শ্রমিকের দল বিদ্যার্থী কুলের যে কি অমঙ্গল সাধন করেছেন তার পরিমাণ নাই। ছাত্রেরা

ইহাদিকেই আদর্শ করে নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করে; এই নিষ্ঠাহীন, আদর্শহীন, পরপ্রতিভা-অপহরণকারী অর্থলোলুপ জীবনই তাদের কাম্য হয়ে উঠে ও সমস্ত জাতির মানসিক সম্পদ্ একটা বিরাট জুয়াচুরিতে পরিণত হয়। মনটা এমনই সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে যে, একটা সুলভ ক্ষণস্থায়ী সুনাম আর বালিগঞ্জে বিলাসিতাপূর্ণ হর্ম্ম্যই জীবনে কৃতকার্য্যতার নিদর্শন বলে মনে হয়। এ কথা স্মরণেও আসে না যে, যখনই সত্যকারের জ্ঞান ও মৌলিক স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ দেশের মধ্যে আসবে, তখনই এই সকল বিদ্যাবত্তার পূতিগন্ধময় অজীর্ণোদ্গার অপরিণত চিন্তারাশি ও ইতরজনসুলভ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ কালের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। একবারও এ আশা মনে উঠে না যে, অধ্যাপনীয় বিষয়ে এমন কিছু বলতে পারা যায়, যা কালের ব্যবধান তুচ্ছ করে বিশ্ব-মানবের চিরন্তন সম্পদ্ হয়ে থাকবে, এমন বাণী ঘোষিত করা যায় যা স্বার্থ-সংঘর্ষের সহস্র কোলাহল তুচ্ছ করে শাশ্বত মানবের অন্তরের গুপ্ত দ্বারে আঘাত করবে।

মানুষ যা চায়—তাই পেয়ে থাকে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" মানুষ চোখের সামনে যে আদর্শ রক্ষা করে অগ্রসর হয়, তা সফল করবার উপযুক্ত প্রচেষ্টাই করে থাকে, আর তা সফল করার উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃজন করে নেয়। বুদ্ধিবৃত্তিসর্ব্বস্ব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে আমরা একটী ভ্রমাত্মক আদর্শ স্থাপন করেছি, আর সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলেছি। এই আদর্শ আমাদের দেশের সমস্ত ইতিহাসের, সমস্ত জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এই মারাত্মক ভ্রম আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক জীবনে, জাতীয় জীবনে যে সর্ব্বনাশ সাধন করছে, তা প্রতিদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর জীর্ণ কন্থায় আবৃত হয়ে সুখ-নিদ্রায় অচেতন থাকলে চলবে না, জেগে উঠে সবল হস্তে এই আদর্শকে চূর্ণ করে দূরে নিক্ষেপ করতে হবে, এই ক্ষমতা ও অর্থের উপাসনা, এই ধর্ম্মহীন, নীতিহীন, বুদ্ধিবৃত্তিসার শিক্ষার ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নের অবসান করতে হবে। আবার প্রাচীন আদর্শ স্থাপিত করে, ভারতের চিরন্তন সাধনা, সত্যের, জ্ঞানের সাধনা আরম্ভ করতে হবে।

আমাদের ভুললে চলবে না যে, অধ্যাপক ও বিদ্যার্থী নিয়েই বিশ্ব-বিদ্যালয়,—সুরম্য হর্ম্ম্য, বিলাসিতাপূর্ণ আসবাব, সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে নয়, গ্রন্থ, যন্ত্রপাতি, বাদ্যভাণ্ড, রঞ্জিত পতাকা, কুচকাওয়াজ নিয়েও বিশ্ব-বিদ্যালয় নয়। যেখানে গুরু শিষ্যের সুপ্ত ব্যক্তিত্বকে প্রবুদ্ধ করে তুলতে পারেন, তার হৃদয়কে আলোর দিকে, সত্যের দিকে, জ্ঞানের দিকে বিকশিত করে তুলতে পারেন, সেইখানেই শিক্ষা সফল ও সার্থক হয়। এর জন্য চাই আদর্শ-চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ ও বিদ্যার্থীর প্রতি পরম স্নেহপরায়ণ প্রকৃত জ্ঞানী অধ্যাপকমণ্ডলী,—কেবল বুদ্ধিমান্ সুচতুর, কৌশলী বিদ্যা-ব্যবসায়ীর এ কাজ নয়। তেমনি চাই জ্ঞানান্বেষী সত্যসন্ধিৎসু, নির্ম্মল-স্বভাব, শ্রদ্ধাবান্ বিদ্যার্থীর দল,—কেবল সার্টিফিকেট-লোলুপ বিদ্যাক্রয়কারী ছাত্র নয়।

কেবল বিদ্যার্জ্জনে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনেই জীবনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, এ কথা ভাল করে বোঝা উচিত। কৃতকার্য্যতার জন্য চাই চরিত্রবল, ব্যক্তিত্ব, অন্তরে বাহিরে সহজ অকপট সরলতা, গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ পুরাণপুরুষের আরাধনা। আর বুঝতে হবে, অর্থ ও ক্ষমতা অর্জ্জন করাই জীবনে কৃতকার্য্যতার পরিমাপ নয়। জীবনে কৃতকার্য্যতার পরিমাপ হয় আনন্দে, ক্ষণিক সুখে নয়, মানুষ জীবনে কত আনন্দ নিজে পেয়েছে বা অপরের জীবনকে কতখানি আনন্দময় করে তুলতে পেরেছে তা' দিয়েই বুঝতে হবে সে কি পরিমাণে কৃতকার্য্য হয়েছে। জগতের ইতিহাসে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, কেবল বুদ্ধিমান্ সুচতুর লোক জগতে কত অমঙ্গল করেছে, আপনাদের ও অপরের কত অসীম দুর্দ্দশা কতকাল ব্যেপে ঘটিয়েছে। এরূপ বিপদ্ এড়িয়ে চলাই সমীচীন। কিন্তু এই বিপদের বীজ আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার প্রণালীতে নিহিত আছে। একে অচিরে দূর না করতে পারলে ক্রমে বিষবৃক্ষ তার বিষচ্ছায়া বিস্তারিত করে, লোকচক্ষুর অন্তরালে বিষমূল প্রসারিত করে আমাদের সমস্ত জীবনকে দুঃসহ দুঃখময় করে তুলবে। উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা মাত্র ৮০ বৎসর আমাদের দেশে আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই তার বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন যুগে যে সুনির্দ্দিষ্ট চারি আশ্রমে মানুষের জীবন বিভক্ত হত, তা' ভেঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। বাণপ্রস্থ ও যতি-জীবন যাপনের কথা কারও মনে উঠে নাই, ব্রহ্মচর্য্য একটি কুসংস্কার ও স্বভাববিরোধী বলে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। ধর্ম্ম বা মোক্ষের সাধনা লোপ পেয়েছে; জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অর্থের সাধনা চলছে, আর কামের সাধনাই একমাত্র সাধনা বলে স্থির হয়ে গিয়েছে; বড়বড় পণ্ডিতেরা না কি স্থির করেছেন যে,আবাল্যমৃত্যু মানুষ সজ্ঞানে অজ্ঞানে ঐ সাধনাই করে থাকে। এত দিন আমাদের অঙ্গনারা কতকটা গৃহধর্ম্ম ও শান্তি পবিত্রতা রক্ষা করে আসছিলেন, কিন্তু আমরা আধুনিক শিক্ষার এই অপূর্ব্ব মধুময় বিষপাত্র তাঁদের অধরেও তুলে ধরেছি, আর তাঁরা আমাদের শ্মশান-নৃত্যে (danse macabre) বোধ হয় আমাদের চেয়েও উন্মত্ত অধীর হয়ে উঠেছেন। তাই প্রশ্ন করতে হয়, কোথায় চলেছ? এত দ্রুত বেগে, রুদ্ধশ্বাসে, প্রাণপণে কোথায় চলেছ? Quo Vadis?

"শিখিয়াছি স্পেশালিষ্ট সকাশে"

ফাঁকা গ্যাসে ভরা সব বেলুনে।
চাষীরে করিব খাড়া একুনে॥

লেখা আছে একরাশ পুঁথিতে।
সে-কথা কি পারি কভু ভুলিতে॥

নদীয়ার কথা

—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন আচার্য্য

জনসংখ্যা বিশ্লেষণ

গত মাসে সাধারণভাবে নদীয়ার জনসংখ্যার আলোচনা করা হইয়াছে। উহাকে সম্প্রদায়গত বিভাগ করিয়া দেখিলে বাংলার অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানেও মুসলমান সংখ্যাধিক্য বিশেষভাবেই দেখা যায়। হিন্দুর সংখ্যা হইতে মুসলমানের সংখ্যা এখানে প্রায় দ্বিগুণের কিছু কম হইবে। ঐতিহাসিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে মুসলমান আমলে বাংলার বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নানা কারণে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রাজধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইলে বহুসংখ্যক বৌদ্ধাচারী মুণ্ডিত মস্তক জন-সাধারণ সমগ্র বাঙ্গালা ব্যাপিয়া সে সময়ে নিরালম্ব নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, নবগঠিত হিন্দু সমাজে তাহারা স্থান পায় নাই। হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রবল প্রতিক্রিয়ায় ও শিথিল সমাজ-বন্ধনের সংস্কারে উক্ত ধর্ম্মভ্রষ্ট জন-সাধারণের দিকে তৎকালিক সমাজপতিরা সস্নেহ আলিঙ্গন বাড়াইয়া দিতে ত পারিলেনই না, উপরন্তু বহুবিধ সামাজিক উৎপীড়ন ও অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক স্থানে প্রমাণ আছে। উৎপীড়িত জনগন অনন্যোপায় হইয়া রাজধর্ম্মের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। ইহাই সম্ভবতঃ বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রধান কারণ। এবং বাংলার যাহা কারণ, নদীয়ার পক্ষেও অবশ্য তাহাই বলা যাইতে পারে। বাংলায় মোগলাধিকারের পূর্ব্বে, অর্থাৎ পাঠান আমলে এই নদীয়া জেলার হিন্দু জন-সাধারণের মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কথা হাণ্টার সাহেব তাঁহার গ্রন্থে এই ভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন :—

> The extistence of a large Mussalman population in the district (Nadia) is accounted for by wholesale forcible conversion at a period anterior to the Mughal Emperors during the Afgan Supremacy.
>
> —*Hunter's Statistical Account, Vol. II, Page—51*

মুসলমান সংস্পর্শে জাতিভ্রষ্ট পীরালি সমাজের উৎপত্তির কথা এই সূত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভবিষ্যতে নদীয়ার সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলন প্রসঙ্গে যথাসম্ভব ইহার আলোচনা করা যাইবে।

যাহা হউক, বিগত সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী নদীয়ায় উপস্থিত (১৯১১ খৃঃ) মুসলমান জনসংখ্যা —৯৪৪৯১৫, হিন্দুসংখ্যা ৫৭৪০৬৬ ও অন্যান্য জাতি ১০৬৭১। এইখানে
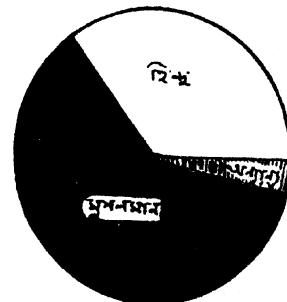
নদীয়া জেলার সম্প্রদায়গত বিভাগ।

নদীয়ার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একটি তুলনামূলক বৃত্ত প্রদত্ত হইল, ইহা হইতেই এইখানকার সম্প্রদায়গত জনসংখ্যার ধারণা সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

মুসলমান জনসংখ্যা আরও বিশদভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, নদীয়ার পাঁচটি মহকুমার ভিতরে রাণাঘাটে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সদরে সমসংখ্যক ও অপর তিনটি মহকুমায় মুসলমান প্রচুর পরিমাণে সংখ্যাধিক। সহরবাসীদের মধ্যে প্রত্যেক সহরেই হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা অধিক এবং পল্লী-গুলিতে মুসলমানগণ যে ততোধিক পরিমাণে হিন্দুসংখ্যা ছড়াইয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্য বলা বাহুল্য।

সম্প্রদায়গত জনসংখ্যা তুলনা করিতে গিয়া আরও একটি কথা এইখানে উল্লেখ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নদীয়ায় জনসংখ্যা ক্রম-ক্ষীয়মাণ। কিন্তু এই ক্ষয় কেবল-

মাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের ভিতরেই ঘটিয়াছে, মুসলমানেরা প্রায় স্বাভাবিক হারেই ক্রম-বর্দ্ধমান।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের সেন্সাসে হিন্দু সম্প্রদায়ের শতকরা সংখ্যা ছিল ৪৫·৩ ও মুসলমান ৫৪·৩। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইহা ৪১·৯ ও ৫৭ এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আরও কমিয়া ৪০·৫ ও ৫৯তে গিয়া দাঁড়ায়। এবং বর্ত্তমানে এই শতকরা হার তদপেক্ষা আরও কমিয়া হিন্দু ৩৭·৫ ও মুসলমান ৬১·৭-এ আসিয়া উপনীত হইয়াছে।

এইখানে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের হ্রাস বৃদ্ধির তুলনামূলক গ্রাফচিত্র অঙ্কিত করিয়া এই উভয় সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ গতি-প্রকৃতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিলাম। এই ভাবে অগ্রসর হইতে থাকিলে অচিরাৎ কালের মধ্যেই হিন্দু সম্প্রদায় যে মুষ্টিমেয় হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের হ্রাস-বৃদ্ধির তুলনামূলক গ্রাফ চিত্র।

গত দশ বৎসরে নদীয়ার ৫টি মহকুমায় কি পরিমাণে জনবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা দিলাম।

		১৯২১ খৃ	১৯৩১ খৃ
সদর—			
	হিন্দু	১৬২৩৬১	১৭২১৩৬
	মুসলমান	১৬৬৩৭০	১৭৭৪৭১
রাণাঘাট—			
	হিন্দু	১২২৬৬৬	৮৭৭৫০
	মুসলমান	১১৫৩৮১	৮২৫০২
কুষ্টিয়া—			
	হিন্দু	১২২৯৩৫	৩১৪৬৬০
	মুসলমান	১১৯৭২৬	৩৩৯৫৬১
মেহেরপুর—			
	হিন্দু	৯৩৪২১	১৯৩৬১৫
	মুসলমান	৯০৪৯৬	২০৯০৯৭
চুয়াডাঙ্গা—			
	হিন্দু	৮০৩৭০	১৩২৭৭৯
	মুসলমান	৭৬৩০৭	১৩৫৮৮৪

অবশ্য, হিন্দুর এই সংখ্যা-হ্রাস কেবলমাত্র নদীয়াতেই ঘটিতেছে এমন নহে। সমগ্র বাঙ্গালা ব্যাপিয়া এই সমস্যা দেখা দিয়াছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া যে কয়েকটি বিষয় আমাদের প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অতি সংক্ষেপে এইখানে তাহার উল্লেখ করিলাম।

জনসাধারণকে মোটামুটি তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে—ধনিক, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক। ইহাদের মধ্যে ধনিক সম্প্রদায় অবশ্য অতি মুষ্টিমেয় এবং নানা কারণে ইহাদের প্রজনন-হারও অত্যন্ত কম। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান অসচ্ছলতা ও আর্থিক দুর্গতির ফলে বিবাহের হার কমিয়া যাইতেছে এবং বিবাহিতের মধ্যেও অবাঞ্ছিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা বিরল নহে। বলাই বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অধিকাংশই হিন্দু। সুতরাং উক্ত মনোভাব হিন্দুর জনবৃদ্ধির বিরুদ্ধেই একমাত্র কার্য্যকরী বলা যায়। নিম্নশ্রেণী বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রকার দায়িত্ব-ভীতিসূচক মনোভাব নাই বটে, কিন্তু হিন্দুর সমাজ-বিধির বিকৃত ব্যবস্থায় তাহাদের যথাসময়ে ও যথাযোগ্য ভাবে বিবাহ হওয়াই সম্ভব হইতেছে না।

ইহাদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা কন্যার সংখ্যা কম হওয়ায় ও সামাজিক উচ্চ-নীচ গণ্ডীর ফলে অনেক পুরুষই বিবাহ করিতে পায় না, অথবা পাইলেও সাধারণতঃ অত্যধিক বয়সের পুরুষের সঙ্গে শিশুবয়স্কা কন্যার বিবাহ ঘটিয়া থাকে। ফলে সন্তান-জন্মের হার ইহাদের মধ্যে অত্যধিক কম। এমন কি অনেক শ্রেণী ইহার ফলে আজ একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। এবং পুরুষেরাও একাধিক বিবাহ করা একটু অশ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। অথচ সম-শ্রেণীর মুসলমানদিগের ভিতরে যথেচ্ছ সন্তান প্রজননের বিপক্ষে মানসিক কি সামাজিক কোনও প্রতিবন্ধকতাই নাই। যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে কয়টা কথা এইখানে উল্লেখ করিলাম মাত্র, বিশেষ ভাবে বলিতে গেলে অবশ্য আরও অনেক প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হয়, বর্ত্তমানে ইহা আমাদের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত।

তারপর হিন্দু জনসংখ্যাকেও শ্রেণীগত বিশ্লেষণ করিলে তাহার ভিতর হইতে নানা প্রকার তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে।

সাধারণ ভাবে সম্প্রদায়কে তথাকথিত উচ্চ ও অনুচ্চ, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিচার করিতে গেলে প্রথম

১। মাহিষ্য।
২। গোয়ালা।
৩। ব্রাহ্মণ।
৪। বাগ্‌দী।
৫। মুচি।
৬। নমঃশূদ্র।
৭। কায়স্থ।
৮। মালো।
৯। রাজবংশী।

শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও শেষোক্ত শ্রেণীতে মাহিষ্য, গোয়ালা, বাগ্দি, মুচি, নমঃশূদ্র, মালো, নাপিত, কামার, কুমার প্রভৃতি নদীয়া জেলায় প্রধানতম। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মাহিষ্য ও তৎপরে গোয়ালা জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ। এইখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্রেণীগত সংখ্যার একটা মোটামুটি তালিকা দিলাম। এবং সেই সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনার সুবিধার জন্য দশ বৎসর পূর্ব্বেকার সেন্সাসের সংখ্যাও উল্লেখ করা হইল।

	১৯২১ খৃঃ	১৯৩১ খৃঃ
মাহিষ্য	৯৬৩০৭	৯৯১৪৮
গোয়ালা	৪৯০০০	৫৪৪৩১
ব্রাহ্মণ	৩৯০১৪	৪৩৩২১
বাগ্দী	৩১৩৩১	৪০০৫৭
মুচি	৩১৭৩০	৩০৫২১
নমঃশূদ্র	৩১৯৯১	২০৫১২
কায়স্থ	২৯৯৪৯	২৮০৮৪
মালো	২১৪০৯	১৯৯৯৫
রাজবংশী	—	১৪৮৫১

উল্লিখিত জনসংখ্যার হিসাব দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, নদীয়ার হিন্দুদিগের মধ্যে মাহিষ্যেরাই সর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা মহকুমাতে ইহাদের প্রাধান্য অধিক ও সেখানে গড় জনসংখ্যা কুষ্টিয়ায় ১৭৪৯৪, মেহেরপুরে ৩১২১২ এবং চুয়াডাঙ্গায় ১৮৮৫২। কৃষিকার্য্যই এখন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা এবং এই সমাজ এখন মোটামুটি ভাবে উন্নতির দিকেই চলিয়াছে। এই সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

গোয়ালাদিগের সংখ্যাও এখানে কম নহে। ইহাদের জাতীয় ব্যবসায় সাধারণতঃ গোপালন ও কৃষিকর্ম্ম। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপারেও ইহাদের নাম আছে।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বৃদ্ধির হার এখানে অধিক নহে। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণের সংখ্যা খুবই কম। ইহাঁরা সাধারণতঃ সহরবাসী ও শিক্ষিত।

বাগ্দীর সংখ্যা এখানে বিশেষ কম নহে। বর্ত্তমানে ইহারা মৎসজীবী, চাষী, মজুর প্রভৃতির জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে। এই জাতির উৎপত্তির কথা বলিতে গিয়া গেট্ সাহেব বলিয়াছেন, বল্লালসেনের বঙ্গ-বিভাগ অনুযায়ী

দক্ষিণ-বঙ্গের নামকরণ ও এই জাতির নামকরণের মধ্যে সম্বন্ধ রহিয়াছে। রায় বাগড়ীর আদিম অধিবাসী বলিয়াই ইহারা অপভ্রংশে বাগ্দী হইয়াছে, অথবা বাগ্দীর দেশ বলিয়া এই দেশের নামকরণ হয় বাগড়ী। ওল্ডহাম সাহেবের মতে, এই দেশের যে সকল অসভ্য জাতি আর্য্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া চাষবাস শিখিয়া আর্য্যদিগের সঙ্গে বসবাস সুরু করিয়াছিল তাহারাই বাগ্দী। *

নমঃশূদ্রের সংখ্যাও এখানে যথেষ্ট, তবে গত দশ বৎসরের সেন্সাসে ইহাদের সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের চণ্ডাল বলিত, এখন ইহারা নমঃশূদ্র নাম গ্রহণ করিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে অদ্ভুত সামাজিক শাসন ও একতা দৃষ্ট হয়। জাতি হিসাবে ইহারা দুর্দ্ধর্ষ, সাহসী ও সঙ্ঘবদ্ধ।

নমঃশূদ্রেরা ছাড়াও মুচি, মালো প্রভৃতি সমস্ত জাতিরাই সাধারণতঃ ক্ষয়ের পথে চলিয়াছে। এই ক্ষয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য কারণ ছাড়াও আরও একটি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। এই সকল শ্রেণীর মধ্যে ক্রমশঃই আত্মসম্মান বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। তাহার ফলে পূর্ব্ব সেন্সাসে যাহারা নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা অনেকেই পরবর্ত্তী গণনায় নিজেদের নূতন নামকরণ করিয়া উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াছে দেখা যায়। সুতরাং উচ্চশ্রেণী অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর আপেক্ষিক সংখ্যা হ্রাসের এ দিক দিয়াও একটা সম্ভাবনা আছে।

* Mr. Gait remarks—"This Caste (Bagdi) gave its name to or received it from, the old division of Ballal Sen's Kingdom as Bagri or South Bengal. Mr. Oldham is of opinion that they are selection of the mal who accepted life and civilisation in the cultivated country as serfs and co-religionists of the Aryans.

Garret., B. D. Gazetteer.

ভাদ্র-বরণ

—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

ভাদর বঁধু ওগো, বরণ করি তোমা—কাতর ধরণীরে করগো করুণা,
রবির খরতাপ-শায়ক ঘাতে হায়, বসুধা-সুন্দরী হ'য়েছে অরুণা!
আদর করি' ডাকে দাদুরী তোমারে—কণ্ঠে চাতকের দারুণ পিয়াসা,
আউষ ধান্যের গোপন মর্ম্মে জান কি বঁধু হে, জাগিছে কি আশা?
নদীর দুটি কূল ভরিয়া দাও গো আকুল উচ্ছল সলিল রাশিতে,
সুরটমল্লার রাগিনী তোলো গো গহিন রজনীতে জলদ-বাঁশিতে!
তুমি যে কেতকীর জানি সে মনোচোর—তৃষিতা চাতকীর কত না দরদী,
নীপের জাগিত কি পুলক শিহরণ—ধরার পরে ও গো আসিতে না যদি।
কেকার কলরব হ'ত গো সুনীরব,—বরষা-উৎসবে বর্হ তুলিয়া
নাচিত অবিরল পুলক-চঞ্চল কেমনে শিখিদল আপনা ভুলিয়া?
তোমারি লাগি' গাঁথা র'য়েছে তড়াগে বিকচ মনোহর কুমুদ মালিকা,
করিবে আঁখিজলে তোমারে অভিষেক—বিরহ-বিয়াকুল বিধুরা বালিকা,
এস হে আন্দোলি' অশথ-শীর্ষ—শালের বনে তুলি' গভীর মর্ম্মর,
গগন-পথে এসো মেঘের রথে গো—তুলিয়া তাহে ঘোর নিনাদ ঘর্ঘর।
স্বাগত হে ভাদর, করি গো সমাদর—নিপুণ নটবর, এসো হে প্লাবনে,
উতল ছল ছল তুলুক ধারাজল রাগিনী অবিরল নিখিল ভুবনে!

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

[২৭]

'না পারি সহিতে আর, পরশ প্রাণের ভার
পাদপদ্মে লও উপহার'—

পঞ্চমী ঘরে আসিয়া দেখিল সুখেন বিছানায় বসিয়া আছে। মায়ের ঘরের কপাট তখনও খোলা, সাবধানে ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া পঞ্চমী বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বিছানায় খান কয়েক নূতন বই ছড়ান,—'রামায়ণ চিত্রে' 'শকুন্তলা চিত্রে', এই সব ছবির বই। একদিন কোথায় বেড়াইতে গিয়া এই রকম একখানা বই দেখিয়া আসিয়া পঞ্চমী সুখেনের কাছে গল্প করিয়াছিল।

একটি ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া বইগুলি সরাইয়া রাখিয়া পঞ্চমী বিছানায় বসিল। বলিল, 'সরলা এখন কেমন আছে ?'

'শরীর ভালই আছে।'

'কান্নাকাটী করে খুব ?'

'আগে খুবই করত—এখন একটু কম।'

'ছেলেটি কেমন আছে ?'

'ভালই আছে।'

'এটি কেমন হয়েছে দেখতে ?'

'খুব ফরসাই হয়েছে।'

পঞ্চমী পানের ডিবাটি সুখেনের কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, 'তুমি আরও ক'দিন সরলার কাছে থেকে তাকে শান্ত করে এলে না কেন ?'

'শান্ত কেউ কাউকে করতে পারে না, ও আপনা আপনিই ভাল হয়—মনটা আমার বিশ্রাম চাইছে, তাই চলে এলাম। আমারও শরীরটা ভাল নেই—বিকাল হলেই মাথাটা একটু ধরে—'

'আমি তোমার মাথা টিপে দিচ্ছি'—পঞ্চমী সুখেনের মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। সুখেন চোখ বুজিল।

পঞ্চমী বার বার চাহিয়া সুখেনকে দেখিতে লাগিল। চেহারাটি যেন রুক্ষ ও কঠোর দেখাইতেছে, একটা অবসন্ন শ্রান্ত ভাব যেন সুখেনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে।

কিছুক্ষণ মাথা টিপিবার পর সুখেন ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া পঞ্চমী লেপটি খুব আস্তে সুখেনের গলা পর্য্যন্ত টানিয়া দিল। নিজেও সাবধানে শয়নের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সুখেন বলিল, 'বইগুলো খুলে দেখলে না ?'

'দেখব কাল, এখন না আনলেই হত—টানাটানির সময় কেন এতগুলো টাকা খরচ করলে ? এ কোথা থেকে কিনলে ?'

'টানাটানি আর নেই। বইগুলোর কথা আমি রাঘবপুরের একজনকে বলে দিয়েছিলাম—সে দোকানের জিনিসপত্র আনতে প্রায়ই কলকাতা যায়—সেই এনে দিয়েছে।'

'টানাটানি নেই যদি তবে এবার তোমার একখানা আলোয়ান কিনবে ভাল দেখে—এ খানা বড্ড পুরাণো, রং জলে গিয়েছে।'

'আমিও ত পুরাণো পঞ্চমী, আমারও দেহ-মনের রং জলে গিয়েছে, আমাকে যদি পছন্দ করে থাক, আলোয়ানটা কি দোষ করলে ?'

পঞ্চমী হাসিয়া ফেলিল—'যাও। শীতে কষ্ট পাচ্ছ না তুমি ? এতখানি পথ ত এইটা গায়ে দিয়েই চলা-ফেরা করতে হয় ?'

'নতুন কিনবার অত টাকা হবে না। ঘর দুটো হচ্ছে, আর একটা কুয়ো দিতে হবে—ছেলেদের শীতের জামা কাপড় দু'বছর দিতে পারি নি—এবার দিতে হ'ল।'

'আমার কাছে টাকা আছে, তেইশটা টাকা হয়েছে, কাল পাব আর দুটো, তাই নিয়ে যাও, ওতে তোমার একখানা হবে না ?'

'না, তোমার সবই তো নিয়েছি, বাকী কি আছে বল ? থাকবার মধ্যে এই দুটো ভাঙ্গা ঘর, তা যদি ইচ্ছে

হয়—এ দুটো বেচে যা হয় দিয়ে দাও—ক্ষোভ কেন থাকে ?'

পঞ্চমী নিরুত্তরে মুখ একটু ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। অভিমানে ও রাগে মুখখানি ভারি ভারি—সুখেন একহাতে তাহাকে কাছে সরাইয়া আনিয়া আর এক হাতে মুখখানা নিজের দিকে ফিরাইল—'দিয়ো দিয়ো, যা খুসী দিয়ো, কাপড়, চাদর, গামছা অনেক দিয়েছ, সবাই জানে তুমি দিয়েছ—সরলা জানে হাটের কেনা। তা তুমি কাপড় বেচে বেচে টাকা জমাচ্ছ না কি ?'

পঞ্চমীর হাসিমাখা চোখ ঝলমল করিয়া উঠিল—'বুঝতে পেরেছ ? আমার মত অবসর কারো নেই, তোমার আমার ও মার জন্য রেখে বেশী কাপড়-টাপড় বিক্রী করে দিই। ছেলেদের জন্যও দেব এবার, এ কথাটা আমার মনে হয়নি—'

'অমন কাজও ক'রো না, সরলা ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সে বুঝেছে, আমি পারি, কিছু বলে না, ছেলেদের পরতে দেবে না।'

'তবে থাকগে, নাই দিলাম। দেখ ভাসুকে বড় আমার দেখতে ইচ্ছে হয়, এক কাজ—এক কাজ করবে ? একদিন আমায় দেখিয়ে দেবে ভাসুকে ? আনবে একদিন এখানে ?'

'সর্ব্বনাশ ! সরলা কি আস্ত রাখবে ছেলেকে ?'

মায়ের কথা পঞ্চমীর মনে পড়িয়া গেল। বলিল, 'দেখ একটা কথা আছে—'

'বল—'

পঞ্চমী সব কথা বলিল। শেষে বলিল, 'নিয়ে চল আমায়, বৃন্দাবন যেতে আমার একটু ইচ্ছে নেই—'

সুখেন উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া থাকিয়া পঞ্চমী আলোটা নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। সুখেনের গায়ে হাতখানি রাখিয়া বলিল, 'কি এত ভাবছ ? তোমার যদি অসুবিধে হয় তবে আমি কাঞ্চনপুর যেতে চাইনে—'

সুখেন পাশ ফিরিল। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া পঞ্চমীর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'আমার অসুবিধে ? তা তোমার যদি লাঞ্ছনা দেখি, অসুবিধে হবে বৈ কি—'

'কে লাঞ্ছনা করবে ? মার কথা ধ'র না। আর সরলা এতদিনও কি রাগ রেখেছে আমার ওপর ? দু'চার কথা বললেও আমি জবাব দেব না, তা হলেই হল—'

'দু'চার কথা ? আজই আসবার সময় যা তেড়ে উঠেছিল। আমায় খাবার দিতে এসে দেখে, আমি কাপড়-চোপড় পরছি, খাবার-টাবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল—'

'তুমি কি বলেছিলে এখানে আসবে ?'

'না—বাড়ী যাব বলেছিলাম, কিন্তু সে জানে চিলহাটী আসবই। সকালেও বলেছিল, দু'চার দিন আরও থাকতে। বিকেল বেলা বেরুতে দেখেই ধরে নিলে। ও কেমন করে যে টের পায় এখানে আসি। কতদিন ত' অন্য জায়গায়ও দু'চার দিন থাকতে হয়,—তখন কিছু বলে না, কিন্তু যে দিন এখানে আসি সেইদিনই ধরে ফেলে। অথচ কাঞ্চনপুরের কোন লোকও জানে না যে, আমি এখানে এসেছি।'

'হয় ত কথা-বার্ত্তায় ধরা পড়ে যাও, অত মনে থাকে না, গল্পে গল্পে হয় ত এমন কিছু বলে ফেল, যাতে সে বুঝে নেয় ; খুব বুদ্ধি কিন্তু—'

'বুদ্ধি খুবই, অতটা না থাকলে আমি বাঁচতাম। কিন্তু তুমি যদি যেতে চাও, আমি বারণ করব না, সব কিন্তু তোমার উপর ঠিক আগের মতনই করবেন, কি তার চেয়ে বেশীও। সরলা কি যে করবে, বুঝতে পারছি নে, যদি সত্যিই তোমার উপর অত্যাচার করে, তবে কি হবে ?'

'যতদূর পারি সয়ে থাকব—'

'যদি না পার ? তবে বৃন্দাবন চলে যাবে ?'

'মা যে থাকবেন না—আমি একা কি করে থাকব বল ?'

'আমি বুঝতে পেরেছি, আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন এগিয়ে আসছে—যদি বৃন্দাবন চলে যাও, যদি যাও, আমার সব যাবে, আমি তোমায় হারিয়ে আবার নূতন করে পেয়েছি—আমি সব ক্ষতি সব অসুবিধা সইতে পারি, যদি মাসে একবারও তোমায় দেখতে পাই, দু'টি বছর কত ক্ষতি, কত অভাব, কত কষ্ট সহ্য করলাম, গায়ে লাগে নি, তোমার কাছে এসে সব ভুলে যেতাম।

পুত্রশোক, যার বাড়া কষ্ট হতে পারে না—সেই আমার দীনুর শোক একটা মাস আমায় জীবন্ত দগ্ধ করেছে—তোমার কাছে এসে, তোমার দিকে চেয়ে আজ আমি তাও যেন ভুলে গেছি—শান্তি পেয়েছি—'

পঞ্চমী দুই হাতে সুখেনের হাত চাপিয়া ধরিল,—বলিল, 'তুমি যদি বারণ কর, আমি যাব না,—মা যান, আমি এই বাড়ীতেও থাকতে পারি—রাত্রে দিদিদের কাছে থাকব গিয়ে—'

'না, পাগল হয়েছ তুমি? মা গেলে তুমি থাকতে পার? আর মা তোমায় ফেলে যাবেন? আমি আসবো, আমার সংসারের ষোল আনা কাজ বুঝিয়ে দিয়ে তবে—আর সেই ভরসায় তুমি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি এই শূন্য পুরীতে থাকবে? সে হয় না, কোন মতেই না। যাও, তুমি মার সঙ্গে যাও—আমি বাধা দিই না, বারণ করি না, কেন করব?'

'কেন করবে না? তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছায় কেন আমায় চালাবে না? আমি কি তোমার বৌ নই? এত বছর ধরে বিয়ে হয়েছে—কখনও একটু রাগ করলে না—দুটো গাল দিলে না—কোনদিন মুখখানা একটু ভারি কর নি—এই তোমার ভালবাসা? আমি কিছু বলিনে বলে? আমি সব টের পাই জান?'

সুখেন হাসিয়া উত্তর দিল, 'জান? সত্যি? আমি জানি তোমার রাগ নেই—এই যে দিব্যি রাগ করতেও জান। আলোটা একবার জ্বালো না পঞ্চমী—রাগলে মুখখানি কেমন দেখায় দেখি—কখনো দেখি নি। অন্ধকারে বুঝতে পারছিনে।'

সুখেনের হাত ঠেলিয়া দিয়া পঞ্চমী তেমনি রুষ্টভাবে বলিল, 'আমি যাব—কাল সকালেই তোমার সঙ্গে কাঞ্চনপুর যাব—তুমি একটি কথাও বলতে পারবে না—ভোরবেলা উঠেই দাদাদের ব'লো—পাল্কী ঠিক করে দেবে—বুঝলে? ব'লো কিন্তু—না গিয়ে আমি ছাড়ব না। তুমি থাকতে আমার বৃন্দাবন যাওয়া উচিত? সেখানে সবাই জিজ্ঞাসা করবে না? তখন বলব আমার স্বামী আবার বিয়ে করেছে সেই জন্যে—না?'

'সুখেন বলল—তাই চল—এক বার চল কাঞ্চনপুর। দেখা যাক কি হয়। কিন্তু যদি কষ্ট পাও—সেখানে যে কষ্ট দূর করবার কোন সাধ্যই আমার হবে না—সব ত তোমায় বলেছি—আমি দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষ—'

'থাক্—থাক্—তোমার কিছু করতে হবে না। কোন কষ্ট আমার হবে না—আমি সরলার সঙ্গে মিল-মিশ করেই থাকতে পারব, দেখো—প্রতিজ্ঞা করছি, একটিও রাগের কথা বলব না—একা একা কি ঝগড়া করবে সে?'

'তা হলে এখন নয়—চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সরলা কাঞ্চনপুর যাচ্ছে। আর যদি এখন যাও—পাল্কীতে যেতে হবে—পথে পাল্কী দেখলে পর এ দিকের লোক ঝুঁকে পড়ে—কার পাল্কী? কোথা যাবে? সে পরিচয় দিতে দিতে বেহারারা বিরক্ত হয়ে যায়। আবার উত্তর পেলেও—'ও সেই বৌ—তা এতদিন পর?'—এ সব তোমার শুনতে হবে। একটা মাস দেরী কর—মাকে রাজী করাতে পারবে না? বর্ষায় নৌকায় যাবে। সরলার মেজ বোনের বিয়ে আষাঢ় মাসের পনেরই ঠিক হয়েছে, সেও তখন থাকবে না—সে বাড়ীতে না থাকবার সময়ই গিয়ে ওঠা ভাল। মাকে তুমি রাজী করে নিয়ো সব বলে।'

'তা রাজী হবেন—মা নিজেই বলেছেন। তবে ঠিক হল আমার যাওয়া? তা বলে আমার যেন আলাদা মহল করে দিয়ো না—সত্যবাবু নীলমণিবাবুদের মত!' হাসিতে হাসিতে পঞ্চমী বলিল, 'একা একা আমি থাকতে চাই নে—সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে চাই।'

[২৮]

'লোহিত লোচনে ছুটে বহ্নি যেন আগ্নেয় ভূধর ফাটি—'

আকাশে ঘন মেঘ জমিয়াছে—সূর্য্য একবার মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িয়া রৌদ্র নিভিয়া যায়—আবার মেঘ সরিয়া গেলে তীব্র আলোয় জল-স্থল উজ্জ্বল হইয়া উঠে। বিশাল বাহিরের ঘরের বেড়ায় বাঁধন দিতে দিতে একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

ঘরের ভিতরে সুখেন, বাহিরে বিশাল—দুই ভাই বেড়া বাঁধিতেছিল—বিশাল বলিল, 'আজ আর হাটে যাওয়া হবে না বোধ হয়—আকাশের অবস্থা ভাল নয়।'

একটা ছোট ঝুড়ি ভর্ত্তি করিয়া রাখালকে বলিলেন, পরশমণির ডিঙ্গীতে দিয়া আসিতে।

পরশমণি উঠিতেন না, কিন্তু রাখালটাই বলিল যে, 'ঠাকরুণ, ভানুর বাবা বলল, তোমাদের বাড়ীতে কে এল।' খবর পাইয়া আর বসা হইল না। হয়ত সরলার মা কি বোন আসিয়াছে, 'উঠি ঠাকুরঝি, ও বেলা আসব, এই নাও পাকা পান দুটো, মেজ-বৌ সেজ-বৌকে দিয়ো। কে এল দেখিগে, ছোট বৌটা ত' এক কাঁড়ি কাপড় কাচতে লেগেছে। তার বাপের বাড়ীর কেউ হলে নবাবের বিবিরা কি চেয়েও দেখবে?'

শ্যামল কৃষ্ণ রায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছিল, পরশমণি ডিঙ্গীতে উঠিলে শ্যামলও আসিয়া উঠিল। পরশমণি বলিলেন, 'কে এল রে, চিনতে পেরেছিস?'

'এত দূর থেকে কি চিনতে পারা যায়? গিয়েই দেখবে। একটা বাক্সও নামাতে দেখলাম মাঝিকে। আর কেউ নামল না—শুধু বউটি।'

'বাক্সো ডেক্সো নিয়ে আবার কে এল রে?' একটু চিন্তিত ভাবে পরশমণি বাড়ীতে পৌছিলেন; মণি ইস্কুলের বই-খাতা হাতে ঘাটের উপর ডিঙ্গীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে, পরশমণি বলিলেন, 'কে এসেছে রে?'

'ছোট-খুড়িমা—ছোট-খুড়িমা, চিলহাটির ছোট-খুড়িমা।' বলিতে বলিতে মণি একলাফে ডিঙ্গীতে উঠিয়া বসিল।

'চিলহাটির বৌমা? এসেছেন—বেশ করেছেন—আর কতদিন বাপের বাড়ী থাকবেন?' বলিয়া শ্যামল বাহিরের ঘরের দিকে গেল।

জলন্ত আগুনে পুড়িতে পুড়িতে পরশমণি ভিতরে ঢুকিলেন। কোন্ ঘরে কে বোঝা যায় না, এ দিকে ও দিকে চাহিতে চাহিতে সোজা ঘাটের পথে চলিলেন, তেঁতুল-তলার ঘাটের দিক্ হইতে মেজ-বৌ স্নান করিয়া কলসী-কাঁখে আসিতেছে, তাহাকে বলিলেন, 'বলি চিল-হাটির বিবি না কি এসেছে?'

'হাঁ'—বলিয়া মেজ-বৌ কলসীটা রান্না-ঘরের বারান্দায় রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে গেল।

তেঁতুল-তলায় ঘন ছায়া ভরা স্বচ্ছ জলে সরলা কাপড়-গুলি ধুইয়া ধুইয়া নিংড়াইয়া একটা ধোয়া বেতের ধামায় রাখিতেছে, সব কাপড়ই প্রায় কাচা হইয়া গিয়াছে—খান-কয়েক ছেলে-পিলেদের জামা-কাপড় বাকী ছিল, সরলা বলিল, 'বড়দি, তুমি এবার যাও, এ ক'খানা ধুয়ে আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

বড়-বৌ বলিল, 'সবগুলিই প্রায় তুই কেচেছিস, এগুলো আমিই কেচে নেব, তুই চান করে চলে যা, মার রান্নার দেরী হয়ে যাবে। নারুর সর্দ্দি করেছে, আর তুই সেই সকাল থেকে জলে রয়েছিস! কচি ছেলের মা—একটু সাবধান থাকতে হয়।'

'একটু-আধটু জলে ভিজলে কি হয়? যত সাবধান করবে ততই আরও অসুখ-বিসুখ বেশী হবে। ভগবানের নামে ছেড়ে দিয়ে রাখি। তাকে এত সাবধানে রেখে-ছিলাম কৈ রাখতে পারলাম? বছর, দেড় বছর পর মাস চার-পাঁচ করে বাপের বাড়ী গিয়ে থাকি—আবার এসেও যদি সাবধানেই থাকি, তবে তোমরা মরবে।'

'ন্যাও! এক কথা বললাম, তা দশ কথা শোনালে, আচ্ছা, সাবধান না হলি নেই—মার রান্নার বেলা হল না?'

'বেলা খুব বেশী হয়নি, মজা দেখেছ বড়-দি, মেজ-দি রাঁধতে এত বেলা করে ফেললে যে মণি দত্তবাড়ী থেকে খেয়ে ইস্কুলে গেল। আমি যাই তা হলে, নিরামিষ ডাল ডালনা মার ঘর থেকে দেব এখন, মেজ-দি শুধু মাছ রান্না করুক।'

বড়-বউ হাসিয়া বলিল, 'মণি ভয়ানক রেগে গেছে, বলে ছোট-খুড়িমা ইস্কুলের বেলা না হতে ডাকাকাকি করে, আর তুমি এতক্ষণে নেয়ে এলে, এমন বাপের আদুরে মেয়ে আমাদের গরীব ঘরে মানায় না।'

সরলা জলে নামিয়া স্নান করিতে করিতে বলিল, 'কালি-পড়া টিনটা মেজে রাখলুম না যে।'

'ও আমি মাজব এখন, তুই যা।'

পিছনদিকে পরশমণি যেন খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া তেঁতুলতলায় বসিয়া পড়িলেন।

'ও মুখপুড়ী, চোখখাগীর বেটি, বলি কার খাটুনী খেটে

মরছিস বাঁদীর মতন? ওদিকে দেখ্ গে যা,—পাটরাণী এসে খাটে বসেছে।'

দুইজনেই চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল, বড়বৌ কাপড় কাচা বন্ধ করিয়া বলিল, 'কে মা?'

সে কথায় কাণ না দিয়া পরশমণি বলিতে লাগিলেন, 'কলিকালে মানুষ এমন হাঁদা হয়, বাপের জন্মে দেখিনি। তোর ঘরে যারা সিঁদ কাটছে তাদেরই সঙ্গে দিনরাত গলায় গলায় পিরীত! গলায় গলায় পিরীত! দেখগে যা, চিলহাটির বিবি এসে রূপ ছড়িয়ে বসে রয়েছে—এ বার তোর হাতে টুকনি দিয়ে পথে বার করে দিয়ে ঘর-সংসার বুঝে নেবে—যেমন তুই হাঁদারাম তেমনি আক্কেল হোক্।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া সরলার গামছা কাচা বন্ধ হইয়া গেল। শান দেওয়া ছুরির মত তার দুই স্বচ্ছ চোখ ঝলকিয়া উঠিল,—চাপা ঠোঁট দুটি আরও দৃঢ়-বদ্ধ হইল, গামছাটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া ভিজা কাপড়ে হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া কালি-পড়া টিনটা মাজিতে আরম্ভ করিল।

ভয়ে বড় বউয়ের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, কাপড় কাচিতে ভুলিয়া গিয়া সে জলের দিকে চাহিয়া আছে।

পরশমণি সরলার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া কোন কূল-কিনারা পাইলেন না,—হতাশ হইয়া আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'কথা কি কাণে গেল না? না বিশ্বেস হল না? না হয় একবার নিজের চোখ দিয়েই দেখ।'

সরলা মুখ না তুলিয়াই কঠোর ও নীচু গলায় জবাব করিল, 'এসেছে ত' এসেছে, আমি করব কি? আগুনে ঝাঁপ দেব, না জলে ভেসে যাব?'

[২৯]

'—রাজার উদ্যানে,
ফুটেছিল যে কুসুম পড়িল নিদাঘে
মরুভূমে—'

প্রতি শিরায় তড়িৎ বহিয়া লইয়া স্নানশেষে সরলা সদ্যধৌত লাল পেড়ে সাড়িখানি পরিয়া নিজের ঘরে গেল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইয়া সিঁথিতে ও কপালে যত্ন করিয়া সিঁদুর পরিল, বাঁদিক দিয়া ঘন ও লম্বা কালো চুলগুলি পিঠের কাপড়ের উপর ছড়াইয়া দিয়া আর একবার আয়নায় মুখ দেখিল, হয়ত ভাবিল, এই পরিপাটী গৃহিণীর বেশ সপত্নী-সম্ভাষণের যোগ্য হইল কি না, কিংবা ইহা সৌভাগ্যশালিনীর স্বাভাবিক বেশ,—পরিত্যক্তা অনাদৃতার কাছে রাণীর মত গৌরবময়। কিংবা কি ভাবিল—তা সেই জানে, সরলার মনের কথা কে বুঝিবে?

মেজ-বৌয়ের ঘরের দরজার কাছ পর্য্যন্ত গিয়া হঠাৎ ঘরের মধ্যে চোখ পড়ায় সরলা সেখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘরের একদিকে একটা মাদুর পাতিয়া বসিয়া চিলহাটির ছোটবৌ একখানা বগি থালায় পান চিরিয়া চিরিয়া রাখিতেছে,—পানের বাটায় ধনের চাল ও কুচা সুপারী, খয়ের রাশি করা, বাঁদিকে ছোট একটি বালিশ শিয়রে দিয়া মেজবৌয়ের কোলের মেয়ে ঘুমাইয়া রহিয়াছে, এক একবার পাখা দিয়া তাহাকে বাতাস করিয়া ছোট-বৌ আবার হাতের কাজে মন দিতেছে।

সরলার মত টক্‌টকে চওড়া লাল পেড়ে কাপড় ইহার নয়—খয়ের পেড়ে একখানা চিকণ ডুরি দেওয়া সাদা ধপ্ ধপে কাপড় পরা—কালো রেশমের মত একরাশ চুল পিঠে ছড়াইয়া মাদুরে পড়িয়াছে। পায়ে আলতা পরা, পা দুখানা একটু মেলিয়া বসা,—ফুটন্ত পদ্মের মত মুখ—ভ্রমরের মত দুটি চোখ জাণ আসবাবে ভরা ঘর আলো করিয়া প্রতিমার মত বসিয়া আছে।

কয়েক মুহূর্ত্ত সরলার চোখে পলক পড়িল না—ফিরিতেও পারিল না, সতীনকে দেখিতে লাগিল, দিনে-দুপুরে একেবারে সতীনের মুখোমুখি—একি সত্য না স্বপ্ন!

হঠাৎ সরলার সর্ব্বাঙ্গ একটু শিহরিয়া উঠিল ভয়ে, কি লজ্জায়, কি রাগে বলা যায় না—নিমেষে ঐ নতমুখ রূপবতী মেয়েটির কাছে সে যে নিতান্ত তুচ্ছ, অতি সাধারণ, এই কথাটা মনে জাগিয়া উঠিল—মনের দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়া সহসা তীব্র আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান ফিরাইয়া পাইয়া—বিজয়নীকে পরাস্ত করিতে সরলা ঘরের ভিতরে প্রবেশোদ্যোত হইল।

ছায়া পড়িল দেখিয়া পঞ্চমী মুখ তুলিয়া চাহিয়া

সরলাকে দেখিতে পাইল, কয়েক মিনিট চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিয়া বলিল, 'তুমি সরলা, না ?'

সরলা এক পা ঘরের ভিতরে এক পা বাহিরে কপাট ধরিয়া দাঁড়াইল—তীক্ষ্ণ সুরে বলিল, 'তোমার কি মনে হয় ?'

'সরলাই মনে হয়, কানুর ঠিক তোমার মতন মুখ।' পঞ্চমী হাসিল।

'সব খবর নেওয়া হয়েছে এরই মধ্যে ? তা এতকাল পরে তুমি কি মনে করে এলে ?'

'কি মনে করে আবার আসব—থাকতে এলাম।' পঞ্চমী আবার হাসিল।

সরলার মুখ কঠিন দেখাইল—'থাকতে এলে ? আগে এলে না কেন ?'

'কি জানি কেন আসি নি। এখন মনে হল তাই এলাম।' আবার পঞ্চমী হাসিল। 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? এখানে বস এসে।'

'তোমার কাছে ?'

'দোষ কি, এস'—কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসা পঞ্চমীর অভ্যাস—হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা একটু লাল হইয়া উঠে।

'তোমার মতন বসে বসে দিন কাটানো আমার অভ্যাস নয়। তা তুমি যে এলে কার সঙ্গে এলে ?'

'দাদা আর খুড়িমার সঙ্গে, আমার বাবার খুড়তুতো ভাই—তাঁর ছেলে।'

'তাঁরা কই, দেখছিনে যে।'

'আমায় রেখে চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন কেন ? মেয়ের বাড়ী জলগ্রহণ করতে নেই দৌহিত্র না হলে ? সেই জন্যে ?'

'দৌহিত্র ত আছে, কানু, ভানু।' পঞ্চমী হাসিল।

সরলার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, 'তোমার সেই দাদা ? যার সঙ্গে সেই জন্মের মত গিয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ,—পান খাবে ? এস না ঘরে, দাঁড়িয়ে কতক্ষণ থাকবে ?'

'তোমার হাতের পান—লজ্জা করে না বলতে ?'

'লজ্জা কি ? খেয়েই ছাখো।'

'দূর হও, তুমি দূর হও, তুমি আমার সর্বনাশ করতে এসেছ—তুমি মানুষ নও—তুমি শয়তানী—তুমি রাক্ষুসী।' বলিতে বলিয়া সরলা ঝড়ের মত ছুটিয়া পলাইল।

পঞ্চমী পান সাজিতে সাজিতে একটু হাসিল, হাসিটি ভাল ফুটিল না। ভাবিল, প্রথম দর্শনেই পালাতে হল, সইতে পারব কি ?—

পান সাজা ফেলিয়া রাখিয়া পঞ্চমী কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে আবার পান সাজিতে সাজিতে মনে মনে বলিল, 'পারব না ? মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, রাখতেই হবে। আমি বড় বোকা, গাছের ডালে যে কাক সারাদিন কা-কা করে তা শুনে রাগ করি না কি ? সরলা যা করুক ওর সতীনকে করছে, আমাকে ত' নয়। সরলার যদি অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে হত, আর সেই লোকটার আর একটা বউ থাকত, তা হলে সরলা তার সঙ্গে ঝগড়া করেছে বলে আমি রাগ করতাম না কি ? এও ঠিক তাই, মার বকুনি দিনরাত দিদিরা সইছে, আমিও কত সয়েছি, তাতে কখনো রাগ হয়নি, তবে সরলার দোষ কি ?'

ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চমীর মুখের চিন্তিত ভাব কাটিয়া গেল। 'এই দেখ পানগুলো শুকিয়ে ফেললাম, চূণমাখা পান তাড়াতাড়ি সেজে না ফেললে এই দশাই হয়। যা, আর মন খারাপ করব না, এ বার সরলা যদি ধরে মারেও তা হলেও না। তাই বলে সত্যি ত আর মারবে না।' পঞ্চমী একটু হাসিল, 'আমায় থাকতেই হবে যে সব সয়ে, নইলে উনি ভয়ানক কষ্ট পাবেন। আর মার কাছে মুখ দেখাতে পারব না।'

[৩০]

'তুই দুশ্চারিণী কেন ছুঁইলি আমায় ?'

সরলা নিজের ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। সমস্ত গায়ে তাহার অগ্নি-জ্বালা। পঞ্চমীর হাসি, পঞ্চমীর কথার সুর তাহার দেহ-মনে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। এই মুহূর্তে যদি পঞ্চমীকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিতে পারে, তবে তাহার চিত্ত-জ্বালা শান্ত হয়।

'হে ভগবান্, হে ভগবান্, এ তুমি কি করলে? এত করে বার-ব্রত-উপোষ-নিয়ম করি, এই কি তার ফল? এ কি তুমি এনে দিলে? একে চব্বিশ ঘণ্টা চোখের উপর দেখে কেমন করে আমি বাঁচব? মরেও যে আমার শান্তি নেই—ঐ আমার স্বামী-পুত্র সব নেবে? ও মা সুবচনী এই করলে? আমি যে মুষ্টি-চাল বেচে বেচে মাসে মাসে তোমার পুজো করি।'

সরলার চোখের জল আগুনের মত গরম বিছানায় লুটাইতে লুটাইতে সে কাঁদিতে লাগিল—'আমার কপালে এই ছিল? ও-মুখ যে দেখবে, সে কি আর এই মুখের দিকে ফিরে চাইবে? সব গেল, সব হারালাম।'

কয়েক মিনিট সরলা নিস্তব্ধ হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পরে সহসা তীরের মত বেগে উঠিয়া বসিল।

'আমি কাঁদছি? সতীনকে দেখে ভয়ে কাঁদছি? ছি, ছি, ছি! এই আমার মন, এই আমার বড়াই?' চোখের জল মুছিতে মুছিতে সরলার মুখে আবার ভ্রুকুটী দেখা দিল; চোখের কোণ একটু কুঞ্চিত ও ঠোঁট দুখানি যেন ঝকঝকে দাঁতগুলির উপর আঁটিয়া বাঁধিয়া বসিল। বিছানা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে আয়নার কাছে গেল। 'সে কে? সে কে? সব আমার নয়? মাজেম সেখের বৌটার চেয়েও যে সে অধম—এই আমি বুঝতে পারিনে! মাজেমের বৌ নিকের বৌ হলেও তার একটা সত্যিকার দাবী রয়েছে মাজেমের ওপর—মাজেমের ঘরে—আর ও, ওর কি আছে? ওরই সঙ্গে আমি আমার তুলনা দিচ্ছি?'

দড়ি হইতে ভিজা গামছা লইয়া ভাল করিয়া চোখ মুখ মুছিয়া মাথার এলোমেলো চুলগুলি আবার আঁচড়াইয়া ঠিক করিয়া সরলা মাথায় কাপড় দিয়া দরজা খুলিল,—শান্ত, গম্ভীর ও অত্যন্ত কঠোর মুখে ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে নামিল—কোন দিকে না চাহিয়া রান্না-ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

আকাশের গতি দেখিয়া বাহির হইতে বিশাল ও সুখেনের অনেকটা দেরী হইল। মেঘ অল্পে অল্পে কাটিয়া গেল দেখিয়া প্রায় বেলা দু'টার সময় নৌকা-বোঝাই ধান লইয়া তাহারা যাত্রা করিল। তাহাদের নৌকায় পান—জলপান দেওয়া, মা সুমতির নামে মানস করিয়া পয়সা তুলিয়া রাখা, যাত্রার জন্য ধান-দূর্বা ও জল-ঘট দেওয়া—এই সব কাজে বৌদের খাইতে একেবারে বেলা পড়িয়া গেল। মেজ-বৌয়ের ঘরের জানালা দিয়া ঘাটের দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—পঞ্চমী দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, বেলি আসিয়া ডাকিল, 'খুড়িমা খেতে এস।'

পঞ্চমী ঘরের দরজা টানিয়া দিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিল—পরশমণি নিজের রান্নাঘরের সামনে বসিয়া তামাক-পোড়া দাঁতে দিতে দিতে বাঁকা চোখে চাহিয়া দেখিতেছেন, সরলা ভাত বাড়িতে বাড়িতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'ও কি, ও কি, ঘরে ঢুকো না—ঢুকো না, সাত লঙ্কা পাড়ি দিয়ে এলে—কাপড়খানা অবধি ছাড়া হল না, গেরস্ত ঘরে বিবিয়ানা পোষায় না।'

পঞ্চমী বলিল, 'আচ্ছা আমি বারান্দায়ই বসছি' বলিয়া একখানা পিঁড়ি টানিয়া লইয়া বসিল।

'পিঁড়িখানা আবার ধুতে হবে, মাটীতে বসলে কি হত?'

'আমি ধুয়ে দেব পিঁড়ি—মাটীতে বসলে কাপড় বড্ড ময়লা হয়।'

পরশমণি বলিলেন,

> 'দেখছি কত দেখব আর
> ছুঁচোর গলায় চন্দর হার।

আ মরি, ঢলানি বিবির কথা শুনে মরে যাই—মাটীতে বসলে কাপড় ময়লা হয়। যে পালং-এ বসে ছিলে—তা ছেড়ে মাটীতে বসতে আসা কেন? দুই ভাসুরে যেন দু'খানা খাট বানিয়ে দেয় আজই।'

ঘরে চারিখানা ঠাঁই হইয়াছিল—বড়-বৌ বলিল, 'আমি বারান্দায় বসিগে, তোরা ঘরে বস্', বলিয়া দুই হাতে নিজের ও পঞ্চমীর থালা লইয়া বারান্দায় আসিল। থালা নামাইয়া রাখিয়া ঘরে গিয়া হাত ধুইয়া জলের ঘটি ও গ্লাস আনিয়া খাইতে বসিল।

পঞ্চমী বলিল, 'আমি এত ভাত খেতে পারব না দিদি, নৌকায় খেয়েছি একবার।'

'তবে আমার থালায় তুলে দে চাট্টি—মেখে কুকুরটাকে দেব। ওর জন্যে কমই নিয়েছি, হাড়িতে ভাত কম পড়ল, দত্তবাড়ী দু বাটী নিয়ে গেল কি না?'

সরলার চোখ বড়-বৌয়ের অনুসরণ করিতেছিল, পিঁড়িতে বসিয়া সে চোখ পাকাইয়া সব দেখিতেছে, ভাতে হাত দেয় নাই। সরোষে বলিয়া উঠিল, 'করলে কি বড়দি? ওর ছোঁয়া খেলে? কাপড় না ছেড়ে আর ঘরে আসতে পারবে না।'

বড়-বৌ বলিল, 'আচ্ছা, মুখ ধুতে গিয়ে একেবারে দুজনায় কাপড় কেচেই আসব। গরমও যা লাগছে, সেই কোন ভোরে নেয়েছি।'

বৈকালে পাড়ার অনেকেই বেড়াইতে আসিল। গিরির সঙ্গে পঞ্চমীর অকপট সখিত্ব, দুইজনে ঢেঁকী-ঘরে বসিয়া কথা বলিতেছিল, সরলা কাপড় তুলিতে তুলিতে বলিতেছে, 'কাজ না দেখে করলে কি বলে করান যায় লোককে, ঘরে-দোরে ঝাঁট পড়ে নি, আলো-বাতি এমনি পড়ে রয়েছে,—কেউ নিশ্বেস ফেলবার সময় পায় না, কেউ পায়ের উপর পা।'

'কাল আবার আসিস ভাই', বলিয়া পঞ্চমী উঠিয়া পড়িল, ঝাঁটা লইয়া অন্যান্য ঘরগুলি ঝাঁট দিয়া সরলার ঘরের দিকে চলিল।

সরলা বলিল, 'ও ঘর নয়, ও ঘর নয়, ও ঘরের কথা আমি বলি নি, আমার ঘরে কাউকে হাত দিতে হবে না।'

সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া পঞ্চমী লণ্ঠন ও কুপি-গুলিতে তেল ভরিয়া মুছিয়া সাফ করিয়া রাখিল। ধুলা কাদা মাখা ছেলেমেয়েরা কলরব করিতে করিতে বাড়ীর ভিতরে আসিল, পঞ্চমী বলিল, 'এস তোমাদের হাত-পা ধুইয়ে কাপড় ছাড়িয়ে দিই।'

কুয়ার ধারে বালতীতে জল তুলিয়া পঞ্চমী ছেলেদের হাত পা ধোয়াইয়া দিতে লাগিল। বেলি একটা বেলার মধ্যেই পঞ্চমীর বেশ বাধ্য হইয়াছে, ছোট মেয়েটাও কোলে আসে, তবে ছেলেরা বড় দুষ্ট, এত দুরন্ত ছেলেদের সঙ্গে পারিয়া উঠা পঞ্চমীর সাধ্য নয়। শুধু ভানুকে চাহিয়া চাহিয়া দেখে। ভানু একেবারে সুখেনের প্রতিমূর্ত্তি, আর নারু,—নারু ফুটফুটে ফরসা, চেহারাটি সুখেনের। কিন্তু সে পরশমণির কোলেই থাকে, এ পর্য্যন্ত একবারও পঞ্চমী তাকে কোলে লইবার সুবিধা পায় নাই।

পরশমণির পাড়া বেড়ান আজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বাহিরের উঠানের কোণের দিকে দাঁড়াইয়া তিনি রায়-বাড়ীর ঠাকুরঝিকে উচ্চ স্বরে কি বলিতেছেন, নারুকে কোলে করিয়া বেলি আসিয়া বলিল, 'খুড়িমা একেও ধুইয়ে দাও—'

পঞ্চমী নারুকে কোলে করিয়া খানিকক্ষণ আদর করিল, তার পরে ভিজা গামছা দিয়া তাহার হাত পা মুছাইতে লাগিল।

সরলা পিছন হইতে এক ঝটকায় ছেলেকে টানিয়া লইতে লইতে বলিল, 'সর্দ্দিতে ও বাঁচে না, তুমি ওর গায়ে ভিজে গামছা দিচ্ছ কি বলে? ও রকম আদর ওরা চায় না।'

পঞ্চমীর মুখখানি একটু বিবর্ণ দেখাইল, বলিল, 'আমি জানতাম না ওর সর্দ্দি হয়েছে।'

'গা কেমন গরম হাতেও টের পাও নি? চোখ মুখ টস্‌টস করছে। ইচ্ছে করে কানা সাজলে চোখ দেবে কে?'

সরলা ছেলে লইয়া চলিয়া গেল। ভানু বলিল, 'মা ভারি ইয়ে, খুড়িমা একটু জল দাও না খাই।'

গ্লাসে করিয়া তাহাকে জল দিয়া পঞ্চমী বলিল, 'আমি তোমার খুড়িমা হইনে।'

'খুড়িমা হও না? তবে কি হও? মণিদা যে খুড়িমা বললে?'

'ওদের খুড়িমা হই, তোমাদের নয়।'

'আমাদের কি হও বল তবে?' ভানু পঞ্চমীর হাত ধরিল।

ভানুকে কোলের কাছে ধরিয়া পঞ্চমী সস্নেহে বলিল 'তোমার জ্যেঠিমাদের কাছে জিজ্ঞাসা কর।'

নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সরলা ছেলেকে জামা পরাইতে পরাইতে ডাকিয়া বলিল, 'অ ভানু, পড়তে বসবি কি না? হাট থেকে এসে পিঠের ছাল তুলে দেবে, যদি না পড়া বলতে পারিস।'

মায়ের কথা কাণে না তুলিয়াই ভানু জ্যেঠিমার উদ্দেশে ছুটিয়া গেল। বড়-বৌকে মণি বেলিরা বড়মা বলে, ভানুরাও তাই শিখিয়াছে। জ্যেঠিমা বলে মণির

মাকে, কাজেই মেজ-বৌ-এর কাছে গিয়া বলিল, 'জ্যেঠিমা' ঐ যে আমাদের বাড়ী একজন এসেছে না, মণিদার খুড়িমা হয়, ও আমার কি হয় জ্যেঠিমা, কি বলে ডাকব ?'

মেজবৌ এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিয়া বলিল, 'কি বলব বড়দি ?'

বড় বউ বলিল, 'মা বলবে।'

'মা বলতে সরলা দেবে না, ছোটমা বলবে ?'

'না, সরলার ছোট হ'লে ছোটমা বলতে পারত।'

'তবে নতুন-মা বলবে।'

কথাটা ভাল করিয়া না শুনিয়াই ভানু আবার ছুটিয়া গেল। পঞ্চমী প্রদীপ হাতে মণ্ডপ-ঘরের দিকে যাইতেছে, পিছন হইতে ধরিয়া ফেলিয়া ভানু বলিয়া উঠিল, 'নতুন-মা, নতুন-মা হও, আমি নতুন-মা বলে ডাকব।'

'এস'—বাঁ হাতে ভানুর হাত ধরিয়া পঞ্চমী মণ্ডপ-ঘরের সামনে গিয়া আলোটি ঘরের ভিতরে রাখিয়া প্রণাম করিল। সন্ধ্যার আঁধারে জলের রং ঘোর ঘোর দেখাইতেছে, চারিদিক্‌কার প্রতিবেশীদের বাড়ীগুলির সদর একেবারে শূন্য—নির্জ্জন—গ্রামশুদ্ধ হাটে গিয়াছে, আকাশে দুই একটি তারা উঠিয়াছে, পঞ্চমী একবার উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল,—একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভানুকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার পিঠে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'তাই ব'লো।'

ছেলেকে পরশমণির কাছে দিয়া সরলা কাজে গেল। রাত্রে দুই ধামা আমন ধান না ভাঙিলে নয়, পুরানো চাল একটি ঘরে নাই। সরলা রান্নার কাজে গিয়াছে—বড়-বৌ ঢেঁকিঘরে ধান, কুলা ও সের রাখিয়া আসিল, রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর এক পালটা দিয়া রাখিলে খুব ভোরে উঠিয়া কাঁড়াইয়া লইতে দেরী হয় না।

মেজ-বৌ বলিল, 'এ-গুলোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসব, পঞ্চমীকেও ডেকে আনব। তিনজনায় টপ করে হয়ে যাবে। সরলাকে বারণ ক'রো দিদি—ছেলেটার সর্দ্দি হয়েছে—ও যেন আর না আসে।'

'বারণ করলে শোনবার মেয়ে ও ? বলতে নেই, এমন শোকটা পেলে, তা একদণ্ড বসে নি, এক হাতে কাজ করে, আর এক হাতে চোখের জল মোছে।'

'সবই তো ভাল, কিন্তু...'

'হাটে যাবার সময় উনি বলে গেলেন যে, ছোট-বৌমাকে তোমার কাছে রেখো, আমি বাইরের ঘরে শোব—তা ও চৌকিতে ত ও শোবে না—মেঝেয় বিছানা করব এখন।'

'বট্‌ঠাকুর তাই বলে গেলেন ? আমি ভাবছি আমার কাছে থাকবে। আমার ত দুটা চৌকি—মেঝেতে শুতে হবে না, বেলু যেটায় শোয় সেইটেয় ও ওদের নিয়ে শোবে।'

'কি দিদি, কিসের কথা হচ্ছে ?'

'এই পঞ্চমীর শোবার কথা বলছি।'

'মা বললেন, তাঁর ঘরে থাকবে—বিছানা দিয়ে এসেছি। বড়দি একটু নাক্কে নেওগে না—মা জপ করতে বসতে পারছেন না।'

হাটের ভরসা না রাখিয়া রান্নাবাড়া শেষ হইল। আজ ফিরিতে কত রাত্রি হইবে ঠিক নাই। মেজ-বৌ নিজের ঘরে কপাট দিয়া আসিয়া বলিল, 'আর বসে না থেকে নোটে ধান দিইগে চল—কতকটা এগিয়ে থাকবে—পঞ্চমীকে ঘরে রেখে এলাম—ওরা উঠে কাঁদলে ধরবে। সরলা কই ?'

'নাক কেঁদে কেঁদে উঠছে—আনতে গেছে—'

একটা কুপি হাতে দুইজনে ঢেঁকিঘরে চলিল—ভানু পঞ্চমীকে ধরিয়া টানিয়া আনিতে আনিতে বলিতেছে, 'তুমি আমার ভাত দিয়ে যাও নতুন-মা।'

রান্নাঘরের শিকল খুলিয়া একটি পিঁড়ি পাতিয়া এক গ্লাস জল দিয়া পঞ্চমী ধোয়া বাসনের গোছা হইতে এক খানা ছোট থালা লইয়া হেঁসেলের দিকে যাইতে যাইতে হঠাৎ পরশমণির চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া উঠিল।

'বলি হেঁসেলে ঢোকালে কে ? রাঁধতে সয় বাড়তে সয় না ? অ ভানু, মা এসে পিঠে খুন্তির ছেঁকা দিক্—ঘরে ঢুকে জাত-জন্ম একেবারে খুইয়ে দিলে, এমনি ত' একটার জ্বালায় মরছি, রাত দুপুরে বসিরদ্দীর সাথে সলা-পরামিস্তি করে বেরিয়ে যাওয়া হলো ঘর থেকে, পথে দেখে গোঁসাই এনে গছিয়ে দিয়ে গেলেন। এমন শত্তুর পেটে ধরেছি,—সেই বেরিয়ে-যাওয়া বৌ নিয়ে মাথায় তুলে নাচছে—নিত্যি

হাটে রং-বেরংয়ের দেব্য এনে সোহাগ করা! এক দণ্ড না দেখলে চার দিকে উঁকি ঝুঁকি! দেখে দেখে বেহদ্দ হয়ে গেলাম,—আবার এটা এসে গোদের উপর বিষ-ফোঁড়া উঠল! কত ঢলান ঢলিয়ে বাপের বাড়ী গিয়েছিল, মুখে লাথি মেরে সুখেন বিয়ে করে ভদ্দর ঘরের মেয়ে ঘরে আনলে! এখন মা মাগী বাইজি মেয়েকে নিয়ে আর সামলাতে পারলে না—আবার ঢেলে দিয়ে গেল আমারই কপালে। ওর কি জাত আছে? না মান আছে? ওর ছোঁয়া খেয়ে একঘরে হয়ে থাক্‌গে যা।'

'ওকি শুনছ নতুন-মা, ঠাকুমার চেঁচানি? ঠাকু-মা রাতদিন অমনি চেঁচায়—তুমি ভাত বাড় না।'

'তুমি কেন ঘরের ভেতর এলে?' বলিয়া সরলা পিছন হইতে তাহার সম্মুখে আসিল।

'ভানু খেতে চাইলে।'

'তোমার ছোঁয়া খেয়ে একঘরে হয়ে থাকব আমরা?'

দুই সতীনে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছে, পঞ্চমীর মুখে নিরুপায়ের ব্যথা, রাগে ও হিংসায় সরলার দুই চোখ জ্বলিতেছে।

'আমি কি করেছি?'

'কি করেছ জান না? আবার জিজ্ঞেস হচ্ছে! যাও তুমি বাইরে যাও—ঘরের ভেতর কোনদিন এস না, জলের কলসী ছুঁয়েছ না কি?'

'হ্যাঁ,—কিন্তু মাকে আমিই রেঁধে দিতাম।'

'তোমার মা খাবেন বলে আমরাও খাব? যাও, কথা বাড়িয়ো না, আমরা সবাই সন্ধ্যা-আহ্নিক করি, বিবি সেজে আঁচল উড়িয়ে বেড়ালে চলে না।' বলিয়া জলের কলসীটা টানিয়া বারান্দায় আনিয়া কলসীর জল উঠানে ঢালিয়া ফেলিল।—শূন্য কলসীটি ঠক করিয়া উঠানে নামাইয়া দিয়া ঘরে আসিয়া পঞ্চমীর হাত হইতে থালা খানি টানিয়া লইয়া ভাত বাড়িতে বসিল।

পঞ্চমী মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে পঞ্চমী পরশমণির ঘরে শুইতে আসিল। মেঝেতে মাদুরের উপর কাঁথা ও বালিশ। নিজের বাক্সটি খুলিয়া পঞ্চমী গায়ে দিবার জন্য আর একটি কাঁথা বাহির করিয়া লইল। আলো নিভাইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুম হইল না; মাটীতে শুইবার অভ্যাস নাই, বর্ষাকালে ঘরের কোণে ইঁদুরে মাটী তোলে, ঘরের ভিতরেই ব্যাঙের বাস, রাত্রে সারা ঘরে পোকা-মাকড় খাইবার জন্য লাফাইয়া বেড়ায়, মানুষকে ভয় করে না। পঞ্চমী অস্বস্তি ও ভয়ে ঘুমাইতে পারিতেছে না,—পাঁচ ছয়খানা পুরু দেশী কম্বলের উপর কাঁথা, তার উপরে ধোয়া চাদর, সেই কঠিন কোমল উঁচু চৌকির উপরকার বিছানায় মার কাছে শুইয়া ঘুমান অভ্যাস, আবার ঘুম না আসিলে জানালা দিয়া নদী দেখিত, পথ-ঘাট, গাছ-পালা সব দেখা যায়, চৌকি হইতে জানালা নীচু। পরশমণির ঘরে জানালা দুটি কিন্তু এত ছোট ও উঁচুতে যে, যারা চৌকিতে শোয় তারাও নাগাল পায় না। ঘরের রুদ্ধ বাতাস, কেমন একটা পুরাণ অপরিচ্ছন্ন গন্ধে ভরা। এ ঘরে না আছে এমন জিনিস নাই,—মাটীর হাড়ি, কলসী, জ্বালা, চাঙারী, কুলা, সের, কাঠা সবই। কোণায় কোণায় জিনিস একে বারে ঠাসা, কুলা-ডালায় কাটা আমচুর, আচার কাসুন্দি, বড় বড় জালায় চিড়ে মুড়ির ধান ভিজান। চাল, ডাল, তেল, তরকারী, গুড়ের হাঁড়ি পর্য্যন্ত।

বিশালের ঘর চুপচাপ, নিঃশব্দ। মেজ-বৌয়ের ঘর হইতে মেয়ের কান্না ও শ্যামদের সান্ত্বনা শোনা গেল। সরলার ঘর আরও কাছে, সরলার তিক্ত-বিরক্ত গলা শোনা যাইতেছে, ছেলেদের কি সুখেনকে বলিতেছে বোঝা গেল না, পঞ্চমী সুখেনের স্বর শুনিবার জন্য অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু শুনিতে পাইল না।

[ক্রমশঃ

বিশ্বামিত্র ও মেনকা

(রবি বর্ম্মার অনুসরণে)

জনয়ামাস স মুনির্মেনকায়াং শকুন্তলাম্।

একটি সামাজিক সমস্যা

—প্রত্যক্ষদর্শী

যশোহরের কোন এক প্রসিদ্ধ গ্রামের একটি সেবা-প্রতিষ্ঠানের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। নানাবিধ জনহিতকর ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা এবং যথাসাধ্য আর্ত্তের ত্রাণ ও দুর্গতের সেবা ইহার কর্ম্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিকার হইতে পারে এই আশায় নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকেরা কোন প্রকার দুর্ঘটনা বা বিপদ্ ঘটিলেই আমাদের সংবাদ প্রদান করিতেন।

বোধ হয় ১৩৩৯ কি ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে হইবে, একদিন রাত্রিতে সংবাদ আসিল, ২০।২২ মাইল দূরবর্ত্তী একটি গ্রামে একটি দুঃসাহসিক নারী-হরণ হইয়াছে। অপহৃতা রমণীটি অতিশয় দরিদ্র ও তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীভুক্ত।

যাতায়াতের অন্য কোন প্রকার সুবিধা না থাকায় আমরা দশ বার জন কর্ম্মী বিশেষ উদ্বেগ লইয়া শেষ রাত্রিতেই পায়ে হাঁটিয়া ঘটনাস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম এবং প্রায় দ্বিপ্রহরে উদ্দিষ্ট গ্রামে উপস্থিত হইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে অতিথি হইলাম। ঘটনার বিবরণাদি জানিবার জন্য ভদ্রলোকের নিকট প্রথম প্রশ্ন করিতেই যে উত্তর পাইলাম, তাহা আমাদিগকে চমকিত করিল বটে, কিন্তু এই সকল দুর্ঘটনার কারণের দিকেও স্পষ্টভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

আমাদের মনে সারাক্ষণ এই কথা তোলপাড় করিতেছিল যে, বাংলাদেশে প্রতি বৎসর কয়েকশত নারী অপহৃত হন এবং এই দুর্ভাগিনীদের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্য্যাতন ভোগ করেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর। ইহা লইয়া কান্নাকাটি, আলোচনা-আন্দোলন অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত সুফল কিছুমাত্র পাওয়া যায় নাই এবং পাওয়া সম্ভবও নহে। কারণ, যাহারা সামান্য মাত্র আত্মরক্ষা করিতে পারে না, সম্পূর্ণ বিনা বাধায় যাহাদিগকে পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব, শুধু মাত্র কোন কঠোর আইনের সাহায্যে তাহাদিগকে কেহ রক্ষা করিতে পারে না। অথচ, সমস্যা হইতেছে যে, দেশে এত যে নারী-হরণ হইতেছে, দুষ্কৃতকারীরা কোথাও সামান্যতম বাধা প্রাপ্ত হয় না। কোন বিশেষ অঞ্চল কিংবা সমাজের নিগৃহীত লোকেরা সংখ্যাল্প হইতে পারেন, শক্তিতে তাঁহারা অত্যাচারীদের সমকক্ষ না হইতে পারেন, আক্রমণকারীদের দ্বারা তাঁহাদের পরাভূত হওয়াও অসম্ভব নহে, কিন্তু অন্যায়ের প্রতিরোধ করিবার জন্য, মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য লড়িবার এবং প্রয়োজন হইলে সে জন্য জীবন দান করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। কিন্তু কোন সমাজের মধ্যে যখন এই প্রকার লোকের অভাব ঘটে, যে-কোন প্রকার অপমান, লাঞ্ছনা এবং গ্লানি সহিয়াও কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারাকেই যখন মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বলিয়া মনে করে, তখন বুঝিতে হইবে, সেই সমাজের কোথাও না কোথাও গুরুতর ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। এই প্রকার শোচনীয় কাপুরুষতা কোন মানব-সমাজের পক্ষেই স্বাভাবিক নহে এবং ব্যাধি-গ্রস্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থার মধ্যেই এই শোচনীয় কাপুরুষতার উদ্ভব হইতে পারে।

কাজেই আমরা মনে মনে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এই ব্যাধির মূল কোথায়। তাহারই কতকটা ইঙ্গিত পাইলাম এই ভদ্রলোকের কথা হইতে। ভদ্রলোকের নিকট আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই স্থানে একটি নারী-হরণের সংবাদ পাইয়া অনেকটা দূর হইতে আমরা আসিয়াছি, তিনি সে সম্বন্ধে কতটা কি জানেন এবং আমাদিগকেই বা কতটা সাহায্য করিতে পারেন? তিনি যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, এ অঞ্চলে কোন নারী-হরণের সংবাদ তিনি অবগত নহেন। তবে কি মিথ্যা সংবাদ দিয়া কেহ আমাদিগকে প্রতারণা করিল! যাহা হউক, ব্যাপারটি আর একটু বুঝাইয়া বলিতেই ভদ্রলোক আমাদের কথা ধরিতে পারিলেন বলিয়া মনে হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ওহো, অমুক জাতের (কোনও

অনুন্নত শ্রেণীর উল্লেখ করিয়া) একটা বিধবা মেয়েকে কয়েকদিন পূর্ব্বে বদমাইসরা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে বটে, এবং আজও তার সন্ধান হয় নি সে কথাও সত্য, তবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাকে আপনারা এত বড় মনে করে এই পর্য্যন্ত ছুটে এসেছেন, এইটাই বিস্ময়ের কথা।"

ভদ্রলোক যে বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝা গেল। কারণ, এই সকল ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইতে এ পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও দেখেন নাই এবং কোন অনুন্নত শ্রেণীর মেয়ে চুরির ন্যায় নিতান্ত ক্ষুদ্র ঘটনাকে তিনি নারী-হরণের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহেন না।

এ অঞ্চল মুসলমান-প্রধান। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পার্থক্য রহিয়াছে। পাশাপাশি বাস করিয়া যাহারা সম্পূর্ণভাবে এক হইতে পারে না, তাহাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। এখানেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সেই প্রতিযোগিতার ভাব আছে। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ এবং হিন্দুরা বিচ্ছিন্ন —বৈষম্য এবং বিভেদে শক্তিহীন। 'উচ্চ'বর্ণের অর্থশালী হিন্দু দুই একজন যাঁহারা আছেন, তাঁহারা অন্যদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিহীন। ফলে যখন অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দু কোন প্রকারে অত্যাচারিত হন, তখন প্রতিকারে কতকটা সক্ষম উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এ কথা মনে করেন না যে, সে আঘাত তাঁহাদেরও গায়ে লাগিতেছে এবং তাঁহারাও একদিন আক্রমণের লক্ষ্য হইতে পারেন। এরূপ ঘটনাও পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, অনুসন্ধানে তাহাও প্রকাশ পাইল। অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা তখন কৌতুক অনুভব করা ব্যতীত আর কিছু করেন নাই।

সমাজের এক অংশের প্রতি অন্য অংশের এই মমতা-হীনতা জনসাধারণকে সম্পূর্ণভাবে শক্তিহীন এবং উচ্চ সম্প্রদায়ের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিয়াছে। সহানুভূতিহীন প্রতিযোগী সম্প্রদায়ের করুণার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিতে বাঁচিতে এই সকল স্থানের অধিবাসীদের ন্যায়ের সমর্থন করিবার, সত্য কথা বলিবার, মর্য্যাদাবোধ রক্ষা করিবার সাহস সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এইরূপ অবস্থার মধ্যে কোন বৃহৎ কল্পনা বা কোন মহৎ আদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করিতে পারে না এবং তাহার নৈতিক অধোগতিও কেহ রোধ করিতে পারে না। এ অবস্থায় জনসাধারণ যে কাপুরুষ হইয়া উঠিবে, মাতা, কন্যা ও বধূকে রক্ষা করিবার জন্য লড়িবার সাহস হারাইবে, তাহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

যদিও ইহা একটি বিশেষ স্থানের অবস্থা মাত্র, তবুও ইহাকে সমগ্র বঙ্গদেশের পল্লী অঞ্চলের অধিবাসীদের অসহায় অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখানে অধিবাসীদের দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ লক্ষ্য করা গেল, তাহারও সর্ব্বব্যাপী হইবার সম্ভাবনা আছে। পূর্ব্ব ও উত্তর-বঙ্গের সকল স্থানেরই অবস্থা সম্ভবতঃ অল্পাধিক ইহার অনুরূপ হইবে।

আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতার জন্য সঙ্ঘশক্তির সুযোগ হইতে জনসাধারণ বঞ্চিত, আর শারীরিক শক্তিতে হীন হইয়াও যে নৈতিক সাহসের বলে লোকে জীবন তুচ্ছ করিয়াও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ণিত প্রতি-কূল অবস্থার মধ্যে বাস করিবার ফলে তাহা তাহাদের সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় যে ইহারা নির্য্যাতনের পাত্র হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে! হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন এবং অনেক ক্ষেত্রেই বিধবাদের রক্ষক ও অভিভাবকহীন অবস্থা সমগ্র পরিস্থিতিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

সংঘবদ্ধ হইয়া জনসাধারণের এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্র-দায়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক অভিযান চালাইতে থাকুন, এমন পরামর্শ কেহ দান করিবেন না, তবে এ কথাও সত্য যে, জনসাধারণ যদি সংঘবদ্ধ হইতে না পারেন, আত্মরক্ষা ও মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য দৃঢ়তা অবলম্বন না করিতে পারেন, অধিকতর সাহস ও পৌরুষের অধিকারী না হইতে পারেন, তবে আত্মরক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে কোনক্রমে সম্ভব হইবে না।

আত্মরক্ষার যে উপায়ের কথা বলা হইল, তাহা যে ফলপ্রদ হইতে পারে, তাহারও প্রমাণ আমরা আলোচ্য স্থানে পাইয়াছিলাম। আমরা যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম, তখন সকলকে এতটা আতঙ্কগ্রস্ত দেখিয়াছিলাম যে,

যে-বাড়ীতে ব্যাপারটি ঘটিয়াছিল, আমাদের সহিত সেখানে যাইতেই কাহারও সাহসে কুলাইতেছিল না। ভয়, যদি অত্যাচারকারীরা মনে করে যে, অত্যাচারিতদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি আছে এবং তাহার ফলে তাহারাও ইহাদের ক্রোধভাজন হয় এবং অনুরূপ অথবা অন্য কোন প্রকার শাস্তি ভোগ করে।

কিন্তু এখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া এবং দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া আমরা যখন সকলকে বুঝাইতে সমর্থ হইলাম যে, স্থানীয় মুষ্টিমেয় অধিবাসী যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারেন, দৃঢ়তার সহিত যদি আত্মরক্ষার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতে পারেন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যদি সংযোগ ও ঐক্যস্থাপন করিতে পারেন, তবে সংখ্যাল্পতা সত্ত্বেও তাঁহাদের শক্তি আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। আমাদের উপস্থিতিতে ও উৎসাহে ইহাদের মধ্যে নূতন প্রাণ, উদ্যম ও সাহসের সঞ্চার হইল এবং অত্যাচারিতের প্রতি সমবেদনাটুকু পর্য্যন্ত জানাইবার সাহস যাহাদের দুই একদিন পূর্ব্বেও ছিল না, তাহারা এই সকল অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সভাসমিতি প্রভৃতির অনুষ্ঠান এবং প্রয়োজন হইলে বাধা দিবার জন্য দল গঠন প্রভৃতি করিতে লাগিল। বাহির হইতে বিশেষ কোন সাহায্য না পাইয়াও স্থানীয় অধিবাসীরা এইরূপে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহাতে এই সকল স্থানে কোন সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই; তবে ইহার পূর্ব্বে এই প্রকার ঘটনা যদিও এ সকল অঞ্চলে নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছিল, জনসাধারণের এই চেষ্টার দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়াছে।

আরও একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

এইখানে যশোহরে হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীর তুলনা-মূলক আলোচনা উপস্থিত করিতেছি। কেহ না মনে করেন, এই আলোচনার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বর্ত্তমান। আলোচনা পড়িলে ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যাইবে। তুলনায় যশোহরের মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুরা স্বাস্থ্যহীন এবং তাঁহাদের শারীরিক শক্তি ও সাহসও অপেক্ষাকৃত কম। যশোহর অতিশয় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত এবং বাংলার ক্ষয়িষ্ণু জেলাগুলির অন্যতম। কিন্তু দেশ বা আবহাওয়ার প্রভাব হিন্দু-মুসলমান সকলের উপরই সমান হওয়া উচিত এবং সাধারণভাবে ক্ষয়িষ্ণুতাও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমভাবেই বণ্টিত হওয়াই উচিত। অথচ, হিন্দুদের অধিকাংশকেই দেখিলাম রোগজীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, উদ্যমহীন, কোন প্রকারে অস্তিত্বের বোঝা বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। অথচ তাহাদেরই প্রতিবেশী মুসলমানেরা স্বাস্থ্যবান, কর্ম্মঠ, উদ্যমশীল এবং বর্দ্ধিষ্ণু। এ দৃশ্য হয়ত বাংলার সর্ব্বত্রই মিলিবে এবং আমরা যেখানে বাস করি, তাহার অবস্থাও হয়ত একই প্রকার হইবে। কিন্তু অভ্যাসে যাহা সহিয়া গিয়াছে, নিত্য দেখিবার ফলে যাহা আর চোখে পড়ে না, অনভ্যস্ত নূতন স্থানে আসিয়া তাহাই বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দুরা যে কম বর্দ্ধনশীল (অথবা, ক্ষয়িষ্ণু) আমাদের মনে হয়, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহাদের মধ্যে জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যের অভাব ঘটিয়াছে।

আমরা শুধু তথ্যের কথা বলিতেছি। বিশেষজ্ঞেরাই প্রকৃত কারণের সন্ধান দিতে পারিবেন। হইতে পারে, হিন্দুদের খাদ্য ইহার জন্য দায়ী, হইতে পারে, তাঁহাদের ছোট ছোট বৈবাহিক বেষ্টনীগুলির জন্য এ রূপ ঘটিয়াছে। বিধবা-বিবাহের অপ্রচলন তাঁহাদের ক্ষয়িষ্ণুতার জন্য দায়ী হইলেও, তাঁহাদের স্বাস্থ্যহীনতার কারণ হইতে পারে না।

মুসলমানদের খাদ্য হিন্দুদের অপেক্ষা আমিষ-প্রধান। অভ্যাসেও হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত অধিক অলস। হিন্দুদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন নাই বলিয়া অনেক জাতির বিবাহের গণ্ডীগুলি অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ নবশাখ প্রভৃতি শ্রেণীগুলির মাত্র দুই চারি ঘর লোক এক গ্রামে বাস করেন এবং খুব বেশী দূরে যাওয়ার অভ্যাস না থাকায় ইঁহাদের বিবাহগুলি ৫।৭টি গ্রাম, অর্থাৎ ৫০।৬০টি পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ নিকট রক্ত-সম্বন্ধের প্রভাব স্বাস্থ্যের উপর, বংশবৃদ্ধির উপর, উদ্যমশীলতার উপর, জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্যের উপর কতটা হইয়াছে, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে তাহার অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। সেন্সাস রিপোর্টের সংখ্যা-গণনা করিলেও হিন্দুদের বৃদ্ধিহীনতার মূলে যে বংশগত কোন কারণ থাকিতে পারে, তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

আদম-সুমারীর বিভাগানুসারে পশ্চিমবঙ্গে শতকরা

৮২, মধ্যবঙ্গে ৫১, উত্তরবঙ্গে ৩৫·৫ এবং পূর্ব্ববঙ্গে ২৮·৪ জন হিন্দুর বাস। ১৮৭২-১৯২১ পর্য্যন্ত ৪৯ বৎসরে জনসংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে ৫·৯ হারে, মধ্যবঙ্গে ২৭·৮ হারে, উত্তরবঙ্গে ২৫·১ হারে এবং পূর্ব্ববঙ্গে (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে) ৭২·৫ হারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯০১-১৯১১ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২·৮, মধ্যবঙ্গে ৫·১, উত্তরবঙ্গে ৮ এবং পূর্ব্ববঙ্গে ১১·৪ শতকরা হারে বাড়িয়াছে। ১৯১১-২১ -এর মধ্যে সমগ্র বাংলার জনসংখ্যা ২·৮ হারে বাড়িয়াছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এই সময় ৪·৯ হারে জনসংখ্যা হ্রাস পায়।

বাংলাদেশের জেলাগুলি দেখিলে দেখা যাইবে, মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, বরিশাল প্রভৃতি মুসলমান-প্রধান স্থানে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়িয়াছে, আর অন্যদিকে ১৯১১-২১-এর মধ্যে বাঁকুড়া জেলায় শতকরা ১০·৪ ও বীরভূম জেলায় ৯·৪ জন করিয়া লোক কমিয়াছে। বাজেট অনুসারে বাসস্থানের দিক্ দিয়া হিন্দুদের বিশেষ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থাকিতে হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের অনেকগুলি জেলায় কৃষির বিশেষ অবনতি ঘটিয়াছে এবং কর্ষিত ভূমির পরিমাণ অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। উর্ব্বরাশক্তি এত কমিয়াছে যে, উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও কম হইতেছে। তদুপরি ম্যালেরিয়া পল্লীগুলিকে ধ্বংস করিতেছে। অন্যদিকে পূর্ব্ববঙ্গ ম্যালেরিয়ামুক্ত এবং এখানে কৃষি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি বিস্ময়কর। অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ও উদ্যমশীলতার উপর ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাসের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাসস্থানের অসুবিধা ব্যতীত হিন্দুদের বংশক্ষয়ের অন্যান্য কারণও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ১৯১১-২১-এর মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি ৮·৩, কিন্তু হিন্দুদের বৃদ্ধি মাত্র ৪·৬ ; এই সময়ে উত্তরবঙ্গে সমগ্র জনসংখ্যার বৃদ্ধি ১·৯, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষয় ৩·২ ; এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ৪·৯ হারে সমগ্র জনসংখ্যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষয় হয় ৫·২ হারে।

আশা করি, আলোচিত সমস্যাগুলির প্রতি দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবে।

আকর্ষণ ও বিকর্ষণ

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

সহরের পথে দুধারেতে বাড়ী
রচে এক মোহজাল,
কোনোটী বা তার দৈত্যের মত
আয়তন সুবিশাল ;
কোনোটীতে জ্বলে বিজলীর বাতি,
চোখে লাগে ধাঁধা হেরি তার ভাতি,
রেস্ ও টেনিস্, পোলো ও সিনেমা,
ট্র্যাম্-ব্যস্ পালে পাল,—
আলোকের পোকা চলেছে ছুটিয়া
জ্বলিছে বিষ-মশাল !

দুঃখ সুখের খণ্ড কাহিনী
কোথা তার সুরু-শেষ,
কোলাহল মাঝে সব একাকার
সুরের রহে না রেশ্।
মানুষেরা সেথা অনুকূল প্রাতে
দুগ্ধ-চিনিতে চা-সেবনে মাতে,
রাখে না তাহারা কিছুরি খবর
রাখে না কিছুরি খেয়াল।
কোন পার্ব্বণে কাহারা হেথায়
ধান কুটে' করে চাল !

বঙ্কিমের করকোষ্ঠী

—শ্রীমতিলাল দাশ

জ্যোতিষবিদ্যাকে উপহাস করা অভিজাত মানুষের গৌরবের বিষয়। কিন্তু শাস্ত্রটী সত্যই উপহসনীয় নয়। বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - এক ভাগ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সত্যপ্রতিষ্ঠিত, অপর বাঞ্জনাময়। হয়ত মানুষের বুদ্ধির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ভাগও গণিত, রসায়ন প্রভৃতির ন্যায় exact science রূপে পরিণত হবে।

কেইরো একজন নামকরা সামুদ্রিক ও জ্যোতিষী। তাঁর World Predictions বলে একটা বই আছে। এই বইটি খুব সম্ভব ১৯২৭ সালে বাহির হয়। এই বইটিতে তিনি যুবরাজ এডওয়ার্ডের সম্বন্ধে নিম্নের ভবিষ্যদ্বাণী করেন—

"Rumour says that Queen Mary and in a lesser degree, King George have worried themselves seriously over this problem of the Prince who may be fond of a light flirtation with the fair sex but is determined not to 'settle down' until he feels a *grande* passion, but it is well within the range of possibility, owing to the peculiar planetary influences to which he is subjected that he will fall victim of a devastating love affair. If he does, I predict that the Prince will give up everything, even the chance of being crowned rather than lose the object of his affection.

ইতিহাস আজ সাক্ষ্য দেয়, এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে—কেইরো দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে এই কথা বলেছিলেন, এ কথা সহসা বিশ্বাস হয় না—কিন্তু সত্য, স্বপ্নের ও কল্পনার চেয়ে বিস্ময়কর। প্রেমের জন্য সিংহাসনত্যাগী রাজা এডোয়ার্ডের কথা থেকে আমরা বুঝি—জ্যোতিষ কেবল বুজরুকি নয়। মমতাবান, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কৌশলীর হাতে এই বিদ্যা অনেক গোপন খবর দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর নানা উপন্যাসে জ্যোতিষিক গণনার ও জ্যোতিষিক তত্ত্বের বর্ণনা আছে। আমরা এখানে তাঁর নিজের করকোষ্ঠী বিচার করব।

তাঁর জন্মকুণ্ডলী নীচে দিলাম।

জন্ম-লগ্ন শকাব্দ ১৭৬০।২।১২।৩৯।৩১

মৃত্যু শকাব্দ ১৮১৫।১১।২৬
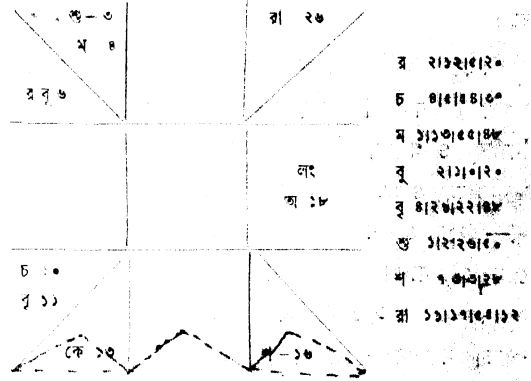
জন্ম ১২৪৪ সালের ১৩ই আষাঢ় রাত্রি ৯টা রবিবার;
মৃত্যু ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র বেলা ৩টা ২৩ রবিবার।

আষাঢ় মাসে জন্ম ফলে বঙ্কিমের প্রকৃতিতে সূচিত হয়, দ্বন্দ্বভাব। বদান্যতা ও কৃপণতা, সাহসিকতা ও ভীরুতা, স্থিতিশীলতা ও উদারনৈতিকতা প্রভৃতি দ্বৈতভাবের সমাবেশ সম্ভব। মানসিকতা অত্যন্ত প্রবল, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ইঙ্গিতজ্ঞ—কূটনীতি এবং ধীশক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভব করবার শক্তি বর্ত্তমান। অতীন্দ্রিয়কে যুক্তিতে বুঝবার চেষ্টা প্রবল।

মস্তিষ্কের শক্তি অসাধারণ, প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে লোকচিত্তজয়ী। সত্যনিষ্ঠ কিন্তু মতপরিবর্ত্তনশীল। পরিশ্রমী, বংশে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় খ্যাতি, জীবন সমস্যাপূর্ণ—বিবাহের সময় কোথায় বিবাহ হবে তা নিয়ে সমস্যা হতে পারে।

প্রতি দশ বৎসরে স্মরণীয় পরিবর্ত্তন। বক্তা, শিক্ষক, সম্পাদক বা ব্যবহারজীবীর কাজে সাফল্য ও সাধারণ রুচির উপযোগী সাহিত্য রচনায় দক্ষতা সূচিত হয়। একসঙ্গে দু'রকম কাজে অর্থ উপার্জ্জন।

দোষ অব্যবস্থিতচিত্ততা। দুই বিবাহ সম্ভব—দু'যায়গা থেকে সম্বন্ধ উপস্থিত হতে পারে এবং দু'জনের মধ্যে কাকে

বিয়ে করা উচিত তা নিয়ে গোলযোগ সম্ভব। স্বাস্থ্য খুব দৃঢ় নয়।

অল্পবিদ্যান্বিতঃ শান্তো, রূপবান্ বহুহিংসকঃ
চপলঃ সুবক্তঃ মানী দীর্ঘসূত্রী প্রিয়ংবদঃ
অতিলোভী ধনাঢ্যশ্চ আষাঢ়ে জায়তে নরঃ॥

আষাঢ় মাসের জন্মে অল্প বিদ্বান্, শান্ত, রূপবান্, হিংসক, চপল, সুবক্তা, মানী, দীর্ঘসূত্রী, প্রিয়বাদী, লোভী এবং ধনশালী হয়।

বঙ্কিমের মকর লগ্নে জন্ম, প্রকৃতি সন্দিগ্ধ ও দুঃখবাদী। সুখহীন জীবন তাই কড়ামেজাজী—অপরিচিতের সম্মুখে নির্ব্বাক্ ও গম্ভীর, কিন্তু পরিচিতের নিকট দিল-খোলা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও অধ্যবসায়ী। শত্রুতা হলে সহজে ক্ষমা করেন না—হিসাবী ও সাবধানী কিন্তু ঝোঁকের স্থলে জ্ঞানহীন—স্নেহপাত্রের সঙ্গে মিলন দীর্ঘস্থায়ী নয়, পুরাতনে প্রীতি থাকলেও নূতনের জন্য খুঁজতে হয়—ভ্রাতা ভগ্নী বেশী, তাদের সঙ্গে শত্রুতার সম্ভাবনা—বিবাহিত জীবন প্রায়ই সুখকর হয় না। স্থলপথে অনেক ভ্রমণের যোগ—পুত্রের চেয়ে কন্যার সংখ্যা বেশী, একাধিক বিবাহ করতে পারেন—প্রথমা স্ত্রীর প্রায়ই মৃত্যু হয়—উন্নতির সঙ্গে শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা বাড়ে, বন্ধুদের মধ্যে একজিকিউটিভ কর্ম্মচারী, পুলিশ বিভাগ, সামরিক বিভাগ, পোষ্ট-টেলিগ্রাফ, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগীয় ব্যক্তি, জমিদার ও ডাক্তার অনেকেই থাকেন।

লগ্নফল :—

মৃগোদয়ে চোদ্যতঃ সুতীব্রো ভীরুঃ সদা পুণ্যানিযেবকশ্চ
শ্লেষ্মানিলাভ্যাং পরিপীড়িতাঙ্গঃ সুদীর্ঘগাত্রঃ পরবঞ্চকশ্চ।

বঙ্কিমের সিংহরাশি এবং তিনি অত্যন্ত রাশভারী লোক ছিলেন। সিংহরাশির জাতক উচ্চাভিলাষী, প্রভুত্বপ্রিয় এবং কর্তৃত্বক্ষম। উদার, বদান্য এবং উচ্চপ্রকৃতি এবং প্রতিষ্ঠাপ্রিয়। চিত্র, সঙ্গীত, কাব্য, অভিনয় প্রভৃতি হইতে অর্থাগমের যোগ, সুন্দর পোষাক, আসবাব, অলঙ্কার, গন্ধ-দ্রব্যাদি ব্যবহার করতে তিনি ভালবাসেন—অর্থশালী হওয়ার সম্ভাবনা।

স্থিরমতিশ্চ পরাক্রমসাধিকো বিভুতয়াদ্ভুতকীর্ত্তিসমন্বিতঃ।
দিনকরে করিবৈরিগতে নরো নৃপরতো পরতোষকরো ভবেৎ॥

বঙ্কিমের রবিবার জন্ম। রবির জাতক ধর্ম্মজ্ঞ, তীর্থভ্রমণকারী, পুত্রযুক্ত, সহিষ্ণু, প্রিয়বাদী, অল্প দ্রব্যে ধনী ও জ্ঞানবান হয়।

বঙ্কিমের নক্ষত্র মঘা। মঘার জাতকের ফল :—

মহাভোগী মহোৎসাহী দ্বিজদেবার্চ্চনে রতঃ।
বহুপুত্রশ্চ সদা সৌখ্যং মঘায়াং জায়তে নরঃ॥

বঙ্কিমের কোষ্ঠীতে অনেকগুলি সুন্দর যোগ আছে। বুধাদিত্য যোগই প্রথম কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই যোগের ফল সম্বন্ধে জ্যোতিষ বলে যে, এমন যোগ হয় না ও হবেও না—এই জাতক চিরকাল সুখ ভোগ করে এবং গঙ্গাজলে প্রাণত্যাগ করে।

বুধ ও শুক্র লেখক, শিল্পী, কবি ও গুণীদের পরিচালক, বঙ্কিমের কোষ্ঠীতেও বুধ ও শুক্র নিজ নিজ গৃহে থাকায় বঙ্কিমকে বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী গ্রন্থকার করেছে।

বঙ্কিমের জন্মকালে শুক্র ছিলেন কৃত্তিকা নক্ষত্রে। বৃহৎ পারাশরী হোরা বলেন :—

কৃত্তিকা রেবতী স্বাতী পুষ্যাস্থানী ভৃগোসুতঃ।
করোতি ভূভুজাং নাশমপিত্যামপি সংস্থিতঃ॥

বঙ্কিমের লগ্নের তৃতীয়স্থ রাহু। তাহার ফল :—

ন না গোহন সিংহো ভুজবিক্রমেণ।
প্রয়াতীহ সিংহী সুতে তৎসমত্বম্।
তৃতীয়ে জগৎ সোদরত্বং সমেতি
প্রযাতোঽপি ভাগ্যং কুতো যত্নহেতুঃ॥

বঙ্কিম অত্যন্ত রাশভারী ছিলেন অথচ অত্যন্ত সহৃদয় ছিলেন—হস্তী ও সিংহের মত তাঁর মানসবীর্য্য এবং জগতের সকল লোকই তাঁর সোদরোপম ছিল।

বঙ্কিমের কোষ্ঠীতে বিশিষ্ট ভাগ্যযোগ পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ পারাশরী হোরা বলেন : —

ভাগ্যরাজ্যেশ্বরৌ ভাগ্যে রাজ্যে বাঙ্গোস্তরাশিগৌ
জাতৌ স্ব-স্ব গৃহে যাতৌ যোগোঽয়ং প্রবলঃ স্মৃতঃ॥
আয়ুর্ব্বিষ্টর্থলাভেশঃ যোগোঽয়ং প্রবলঃ স্মৃতঃ।
দোষযুক্তোঽপ্যয়ং রাজ্যং দত্তে সম্বন্ধিতস্ততঃ।

বঙ্কিমচন্দ্রের নবমপতি বুধ ও দশমপতি শুক্র নিজ নিজ ঘরে থাকায়, পঞ্চম ও দশমপতি শুক্রের চতুর্থ ও লাভেশ মঙ্গলের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় বিশিষ্ট সৌভাগ্যযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। শুক্র ও মঙ্গলের একত্র অধিষ্ঠান বিশেষ সম্ভ্রম সূচনা করে।

পুনশ্চ পুত্রপতি ও পিতৃপতির সম্বন্ধ হওয়ায় জাতককে রাজসম্ভ্রমশালী করেছে।

আমি জ্যোতিষী নই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ গ্রন্থের জ্যোতিষ বিষয়ক বিভিন্ন সাহায্যে সঙ্কলিত। আশা করি, বাংলাদেশের কোনও খ্যাতনামা জ্যোতিষী এই অমর সাহিত্যিকের কোষ্ঠীর বৈজ্ঞানিক আলোচনা করবেন।

বিদ্যা যেখানে অচল সেখানে সে মৃত। গতিই জীবনের চিহ্ন—আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষ কালে কালে বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। বর্ত্তমানে যাঁরা জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন তাঁরা যদি ইহাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন—তবে দেশের একটি অবজ্ঞাত ও লুপ্তপ্রায় বিদ্যার পুনরুদ্ধার হয়।

রাজধর্ম্ম-কৌস্তুভে জ্যোতিষীর যথেষ্ট সম্মানের পরিচয় পাই। রাজ্যলাভ করার পর রাজা দুইজন কর্ম্মীর সন্ধান করবেন—একজন পুরোহিত, অপর জন দৈবজ্ঞ। দৈবজ্ঞ অবজ্ঞার পাত্র নন—তাঁর কাজ ছিল পুরকল্যাণ, তার অধিকার ছিল বৃষ্টি-বিদ্যা—তাঁর আলোচ্য ছিল গ্রহ-সংস্থান।

বাংলা পঞ্জিকা সত্যের সঙ্গে মিল রাখে না—যখন পাঁজিতে লেখা চন্দ্র মিথুনে—তখন হয়ত আকাশের চন্দ্র কর্কটে, গণনার এই ভুল আমাদের মনকে পীড়িত করে না। এই ভ্রান্তি কতকাল চলবে? সকলে বলেন, বুদ্ধি, বিদ্যা বাড়ছে—কিন্তু এই শ্রেণীর বিদ্যা বৃদ্ধি কতকাল চলবে? যাঁরা জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও জ্যোতিষের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দিক্ জানেন—এমন জ্যোতিষী কি বাংলাদেশে জন্মিবে না?

আলোচনা

হৃদয়-কাশী

ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়া গিয়াছেন—"আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি, সেই এলোকেশী বিরাজ করে"। এক্ষণে বিচারের বিষয় এই যে, এই "হৃদয়-কাশী" শব্দটি কি ভাবে সমাসবদ্ধ হইয়াছে, "হৃদয় রূপ কাশী" অথবা "হৃদয়ই কাশী"; অর্থাৎ রামপ্রসাদ হৃদয়কে কাশীর সহিত উপমা দিয়াছেন কিংবা হৃদয় ও কাশী এই উভয় শব্দই একার্থক ও একই বিষয়ের প্রতিপাদক সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি হৃদয়-কাশী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সন্দেহ বিচার দ্বারাই অপনীত হয়; অতএব এক্ষেত্রে সম্যক্ বিচারেরই প্রয়োজন। এ বিষয়ের আলোচনা বা বিচার করিতে গেলেই উপনিষদাদি শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; কাজেই প্রথমে "হৃদয়" ও "কাশী" এই দুইটী শব্দ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রাদিতে কি ভাবে ও কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

প্রথমে হৃদয় শব্দটির আলোচনা করি। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, "হৃদয়" শব্দটীর প্রয়োগ বহু শাস্ত্রে আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

(ক) "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"।

(খ) "হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি"।

ইহা হইতে দেখা যায় যে, ভগবান স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, তিনি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন। বশিষ্ঠদেবও রামচন্দ্রকে ধ্যানমার্গের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছিলেন, সেই আত্মা সর্ব্বদেহেই অবস্থিত এবং তিনি প্রত্যেক দেহীর হৃৎপদ্মকোটরে বাস করেন—"স্থিতঃ সর্ব্বেষু দেহেষু," "পদ্মকোটরবাসী", "হৃদ্গুহাবাসী" ইত্যাদি। তিনি আরও বলিয়াছেন, সেই ভগবান বা পরমাত্মা—"হৃত্তেবেহানুভূয়তে"—হৃদয়েই অনুভূত হন। উপনিষদেও দেখি—

(ক) প্রাপ্যেচ্ছরীরাদুপলভেত এবং

(খ) অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।

অর্থাৎ, সেই পরমাত্মাকে এই শরীর হইতেই লাভ করিতে হইবে, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বলোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই, ধ্রুব, যোগস্থ হইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে হৃদয়েই অনুভব করিয়াছিলেন—

"হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্"।

নন্দ ও যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনাকালে উদ্ধব বলিয়াছিলেন—

"অন্তর্হৃদি স ভূতানামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি"।

মহাভারতে দেখি, সনৎসুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিয়াছেন—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মহাত্মা, ন দৃশ্যতেঽসৌ হৃদি সন্নিবিষ্টঃ"।

সাধনক্রমের উপদেশ প্রদান করিতে উপনিষৎ বলিয়াছেন—

"তাবদেব নিরোদ্ধব্যং যাবদ্ হৃদি গতং ক্ষয়ং"

অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন লয়প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া রাখিবে। এই ভাবের বহু উক্তি তন্ত্রাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

(ক) হৃদিস্থকং মনঃ কৃত্বা যাবদুন্মনতাং গতঃ।

(খ) হৃদিস্থং নিশ্চলীভূতং কুম্ভমধ্যে জলং যথা।

শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়েরই যে সমস্ত গ্রাম্যসঙ্গীত আমাদিগের দেশে প্রচলিত আছে—তাহাতেও হৃদয় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়—

(ক) "হৃদয় রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে"

(খ) "হৃৎকমলের মঞ্চে দোলে করালবদনা শ্যামা"

(গ) "হৃদ্‌বিহারী গৌর হরি"

(ঘ) "হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি"

(ঙ) "ধ্যান ধর মন হৃদয় মঠে"

এখন প্রশ্ন এই যে, দেহের কোন্‌ অংশকে শাস্ত্রাদি হৃদয় শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ বামবক্ষের নিম্নস্থ হৃৎপিণ্ডকেই হৃদয় বলিয়া জানি। কোন কোন লেখক অধ্যাত্মশাস্ত্রের এই হৃদয় শব্দকে ইংরাজীতে heart শব্দে তরজমাও করিয়াছেন দেখিতে পাই, কিন্তু শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করিলে পরিষ্কারই দেখা যায়, হৃৎপিণ্ড বা heart হৃদয় শব্দের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন—

ইয়ত্তয়া পরিচ্ছিন্নে দেহে যদ্‌বক্ষসোঽন্তরম্‌
হেয়ং তদ্‌হৃদয়ং বিদ্ধি তনাবেকতটে স্থিতম্‌।

অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে পরিচ্ছিন্ন যে অংশ বিশেষকে হৃদয় বলা হয়, তাহা হেয়, সেখানে ব্রহ্মানুভূতি হয় না, কারণ তাহা ("জড়ৌর্গোপলোপমঃ") প্রস্তরবৎ জড় পদার্থ। তন্ত্র বলেন, "হৃৎকমলং শিরশ্চৈব"। ইহা দ্বারাও বুঝিতে পারা যায়, হৃদয় বক্ষঃস্থলে নয়। অন্যত্রও দেখিতে পাই—

তালুমূলে স্থিতং পদ্মং দলৈঃ ষোড়শকৈর্যুতং
স্বরাঃ ষোড়শকাস্তত্র তদূর্দ্ধং হৃদিপঙ্কজম্‌
একং সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং চক্ষুরগ্রে সুশোভিতম্‌,
তদেব হৃদয়ং নাম সর্ব্বশাস্ত্রসুসম্মতম্‌
অন্যথা হৃদি কিঞ্চান্তি প্রোক্তং যৎ স্থূলবুদ্ধিভিঃ।

অর্থাৎ, হৃদয় তালুর ঊর্দ্ধে এবং উভয়চক্ষুর সম্মুখ ভাগে অবস্থিত, যাঁহারা অন্য কোনও স্থানকে হৃদয় বলেন তাঁহারা স্থূলবুদ্ধি।

উপরের শাস্ত্রোক্তিগুলি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহেই স্বীকার করা যায়, হৃদয় বক্ষঃস্থলের অন্তর্গত মাংসপিণ্ড নয়। উপনিষৎ আরও পরিষ্কার ভাবে হৃদয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—

পদ্মকোষপ্রতীকাশং সুষিরং চাপ্যধোমুখং
হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ॥

এখানে দেখি হৃদয় (ক) "বিশ্বস্যায়তনং মহৎ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অন্য উপনিষৎ 'বিশ্বস্যায়তনং মহৎ'-এর স্থান নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে ললাটস্থ নাসিকায়াং তু মূলতঃ
অমৃতস্থানং বিজানীয়াদ্বিশ্বস্যায়তনং মহৎ ॥"

উক্তি দুইটি বিচার করিলেই দেখা যায়, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যগত ললাটদেশই হৃদয়, উহাই—অমৃত স্থান, উহাই বিশ্বস্যায়তনং মহৎ। এই হৃদয়ের অপর অনেকগুলি নাম আছে—দ্বিদল, আজ্ঞাচক্র, বারাণসী, গুহা, গহ্বর, ত্রিবেণী, পুষ্কর, গুরুস্থান, শিবস্থান, আকাশস্থান, বৃন্দাবন, নাসাগ্র, নাদামূল ইত্যাদি।

এক্ষণে কাশী শব্দটির আলোচনা করিব। কাশী সাধারণতঃ তিনটী নামে প্রসিদ্ধ—কাশী, বারাণসী ও অবিমুক্ত। আমরা সাধারণতঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত গঙ্গাতীরবর্ত্তী তীর্থস্থানকেই কাশী বলিয়া জানি। কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্রের কাশী ঐস্থান নহে। তন্ত্রে দেখিতে পাই, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—

"কাশীলগ্নং হি যৎ কিঞ্চিৎ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ"

অর্থাৎ যাহা কিছু কাশীর সহিত সংলগ্ন হয়, তাহা তৎক্ষণাৎ কাশী হইয়া যায়। আমরা যাহাকে কাশী বলিয়া জানি, সেখানে ত' আমরা অনেকেই বহুবার গিয়াছি, কিন্তু কৈ কখনও ত' কাশী হইয়া যাই নাই। কাশীতে কত উদ্যান, অট্টালিকা, পথ, লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া আছে, কতলোক প্রতিদিন কাশী যাইতেছে ও কাশী হইতে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারা ত' কাশীত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই ভাবে চিন্তা করিলে স্বতঃই মনে প্রশ্ন উঠে, তন্ত্রোক্ত কাশী কাহাকে বলে।

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য উপনিষৎ খুঁজিলে দেখিতে পাই, মহর্ষি অত্রির প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিতঃ"—

অর্থাৎ, তুমি যে অনন্ত অব্যক্ত আত্মার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই আত্মা অবিমুক্তে অর্থাৎ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত। অত্রি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই অবিমুক্ত কোথায় অবস্থিত, উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—

"ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য যঃ সন্ধিঃ স এষ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি তদ্‌ বৈ"

অর্থাৎ উভয় ভ্রু ও নাসিকার সন্ধিস্থলই সেই অবিমুক্ত বা কাশী। উপনিষদে আরও দেখি—

"বারাণসী ভ্রুবোর্ম্মধ্যে"

যোগশাস্ত্রেও দেখিতে পাই—

"ভ্রুবোর্ম্মধ্যে শিবস্থানম্‌"।

উল্লিখিত শাস্ত্রবচনগুলি লক্ষ্য করিলেই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভ্রূযুগলমধ্যবর্ত্তী স্থানই কাশী, বারাণসী ও অবিমুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, ঐ স্থানেরই অপর নাম হৃদয়, কাজেই দেখা যায়, রামপ্রসাদও ভ্রূমধ্যকে লক্ষ্য করিয়াই "হৃদয়-কাশী" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তিনি কোনও রূপক বা উপমার সাহায্য গ্রহণ করেন নাই; তিনি তাঁহার নিজের হৃদয়কেই কাশী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উপনিষদাদি শাস্ত্রে দেখা যায়, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিতে পারিলেই মনের লয় হয় ও আত্মতত্ত্ব প্রকাশ পায়—

নিরস্তবিষয়াসঙ্গং সন্নিরুদ্ধং মনো হৃদি
যদা যাত্যুন্মনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্‌ ॥

হৃদয়ে মনের লয় হইলেই জ্ঞানের স্বরূপ বা আত্মজ্ঞানের অনুভূতি জন্মে ও মন স্বকীয় চঞ্চল মনন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তৎস্বরূপ লাভ করে, তাই তন্ত্র বলিয়াছেন—

"কাশী স্পর্শনমাত্রেণ কাশী ভবতি তৎক্ষণাৎ"।

কোন্‌ সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিলে মনকে হৃদয়ে নিরোধ করা যায়, উহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ও নহে। রামপ্রসাদ সেই আত্মর সাধন অভ্যাস করিয়াই তাঁহার "ব্রহ্মস্বরূপিণী শ্যামা মাকে" স্বহৃদয়ে দর্শন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন এবং নিজের হৃদয়কেই কাশী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, ও সেইজন্য তাঁহার মোগলসরাই-এর নিকটবর্ত্তী প্রাকৃত কাশীতে যাওয়ার প্রবৃত্তিও হয় নাই। তিনি তাই গাহিয়া গিয়াছেন—

কাশী যেতে কৈ মন সরে
যার জন্য যাব কাশী, সেই সর্ব্বনাশী সঙ্গে ফেরে ॥
লোকে বলে শিবের কাশী,
এ কাশী ত জনবাসী,
আমার হৃদয়-কাশীর মধ্যে আসি, সেই এলোকেশী বিরাজ করে ॥

স্বামী ভূমানন্দ—

"নবযুগ ঐ এল ঐ—"
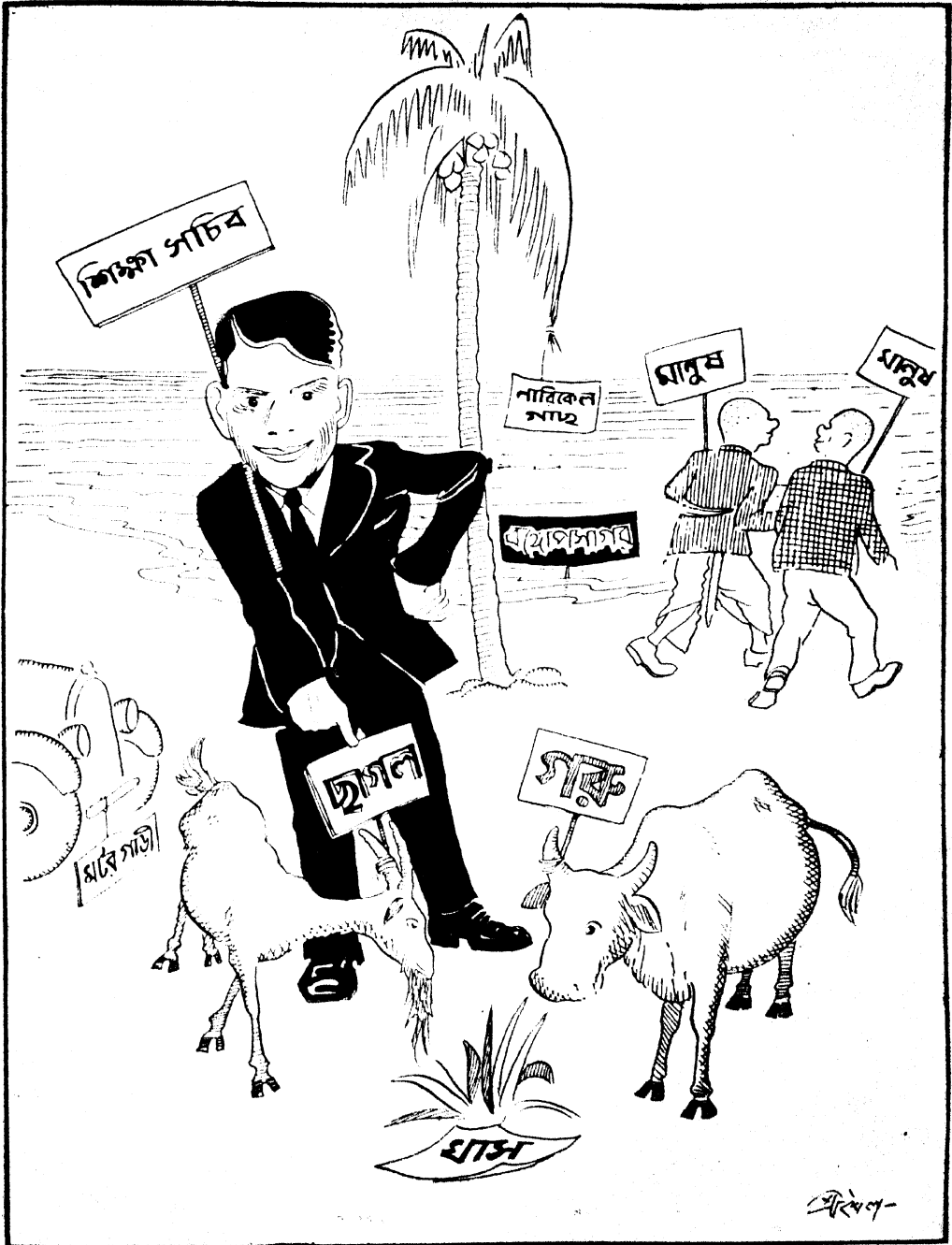
মাদ্রাজের শিক্ষা-সচিব ডাঃ পি. সুব্বারাওন গ্রামবাসিগণের নিরক্ষরতা দূর করিবার একটী অভিনব উপায়

ব্যবসায়ে জাতীয় কল্যাণ

—শ্রীমন্মথনাথ সরকার

পৃথিবীর ব্যবসায়-বাণিজ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে-দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য জাতীয় কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই দেশের ব্যবসায়ই স্থায়ী হইয়াছে এবং ঐ সকল ব্যবসায় পৃথিবীর বাজারে শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠার সহিত কারবার করিয়া আসিতেছে। আর যে সকল ব্যবসায় জাতীয় কল্যাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, সে সকল ব্যবসায়, কয়েক বৎসরের জন্য প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়া কালক্রমে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য যে ব্যবসায় সেই ব্যবসায়ের আয়ুষ্কাল প্রতিষ্ঠাতার উদ্যমের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। প্রতিষ্ঠাতার উদ্যমের অভাব ঘটিলে বা তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হইলেই ব্যবসাও বিনষ্ট হয়; কিন্তু জাতীয় কল্যাণকর ব্যবসায়ের ঐরূপ বিনাশ ঘটে না, প্রতিষ্ঠাতার উদ্যমের অভাব হইলেও বা তাঁহার মৃত্যু হইলেও অন্যান্য কর্ম্মীদের উদ্যমে ঐ ব্যবসায় বিনাশের হাত হইতে রক্ষা পায়। আমাদের দেশে বিধবা বা নাবালকের সম্পত্তির যেরূপ দশা হয়, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতার অভাব ঘটিলেও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন ভারতে আসিয়াছে, তখনও ভারতবাসীরা বড় বড় বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের মালিক। প্রাচীন ইতিহাসের ফিনিসিয়া ও বাবিলন সহরের প্রসিদ্ধির সহিত ভারতীয় পণ্যের আদান-প্রদানের বিশেষ সংস্রব ছিল। ভারতের নানাবিধ পণ্য তৎকালে ঐ পথে ইউ-রোপে যাইত এবং ইউরোপে অতি উচ্চ দরে বিক্রীত হইত। পারশ্য দেশের তাৎকালিক সমৃদ্ধির মূলেও এই ভারতীয় পণ্যের আদান-প্রদান নিহিত রহিয়াছে। আরবী ও পারশিকগণ ভারতীয় পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থো-পার্জ্জন করিত। ক্রমান্বয়ে নৌ-শিল্পের প্রসার ঘটিলে আরবীয়রা নৌকাযোগে ভারতের সহিত কারবার করিতে এবং তাহারাই ভারতীয় পণ্য তৎকালে আফ্রিকায় ও ও ভূমধ্যসাগরের তীরে পঁহুছিয়া দিত।

ভারতীয় পণ্যের প্রচলন আরবীয়দের হাতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পারশ্যের অবনতি ঘটিতে আরম্ভ হয়। আরবীয়রা নৌকাযোগে শতাধিক বৎসর যাবৎ ভারতীয় পণ্য ইউ-রোপের দ্বারে পঁহুছাইয়া দিয়াছে। পারশ্যের বণিকগণ অসুবিধা বুঝিয়া একেবারে ভারতে আসিয়া কারবার করিবার মানস করিলেন। প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে কতিপয় পারশিক বণিক বোম্বাইয়ে আসেন। তাঁহাদের বংশধরগণ এখনও বোম্বাইয়ে প্রতিষ্ঠার সহিত কারবার করিতেছেন। অবশ্য কেহ কেহ বলেন যে, পারশিকদিগের ভারতে আসিয়া বসবাস করিবার মূলে রাজনৈতিক কারণ নিহিত আছে। সে যাহা হউক, ইউরোপীয় বণিকদিগের ভারতসমুদ্রে শুভাগমন করিবার পূর্ব্বে আরবীয় নাবিকগণই যে ইউরোপের সহিত ভারতীয় পণ্যের বিনিময় ঘটাইত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

আজ আমরা ফরাসীর নকল রেশম-জাত বস্ত্র অঙ্গে চড়াইয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেছি, কিন্তু ফরাসীর এমন দিন গিয়াছে, যখন ঐ দেশের বড় ঘরের মহিলারা ঢাকাই মসলিনে অঙ্গ আবৃত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতেন। মসলিন সামান্য কার্পাস জাত বস্ত্র হইলেও ইউরোপের বাজারে এত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত যে, উহা তৎকালে বিলাসের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ধনী গৃহস্থ ব্যতীত অপর কেহ মসলিন কিনিবার অর্থ যোগাইতে পারিত না।

ভারতীয় পণ্য অত্যধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হইত বলিয়া, ইউরোপীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে ভারতে আসিবার জন্য বহু বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ডি গামা সর্ব্বপ্রথম ভারতে আগমন করেন এবং দক্ষিণ-ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত হয়েন। তৎপরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক, ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই উহা অবগত আছেন। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ইউরোপীয় বণিকগণ ভারতে

রাজ্য বিস্তার করিবার মানসে আসেন নাই—তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছিলেন অর্থোপার্জ্জন করিতে, কিন্তু ঈর্ষা-দ্বেষপূর্ণ ভারতবাসীর এমনই কৃতিত্ব যে, ইউরোপীয় বণিকগণের ইচ্ছা না থাকিলেও সমগ্র ভারত তাহাদের হাতে যাইয়া পড়িল। ওলন্দাজরা ভারত-মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে কারবার করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল, পর্ত্তুগীজরা ব্যবসায় করিয়া অহেতুক মাথা ঘামান অপেক্ষা ডাকাতি করিয়া অধিক অর্থোপার্জ্জন করিবার মানস করায় অচিরে বিতাড়িত হইল। ফরাসী সন্ধির সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং সমগ্র ভারত ধীরে ধীরে ইংরাজের হস্তে পতিত হইল। ফল অবশ্য এক পক্ষে ভাল হইল। ভারতে সুশাসন প্রবর্ত্তিত হইল, ঈর্ষা-দ্বেষিগণ আশ্বস্ত হইলেন, ঠগী-ডাকাতি প্রভৃতি বিদূরিত হইল এবং আইন ও শৃঙ্খলার বাঁধনে ভারতবাসী একটু শান্তি পাইল; কিন্তু ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ধীরে ধীরে গণেশ উল্টাইল। অবশ্য ইহাতে দোষ যে একমাত্র ভারতবাসীরই তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই—ইহা একটু নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিলেই আমার দেশবাসী বুঝিতে পারিবেন। জাতীয়তা-জ্ঞানহীন ও ঈর্ষ্যাপরায়ণ জাতির ভাগ্যে এইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে। একদিন ভারতবাসীর অনেক গুণ ছিল সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবাসীর মনোভাব 'একোদরঃ পৃথকগ্রীবঃ ভারণ্ডপক্ষী'র ন্যায়। অর্থনীতি ও জাতীয়তা ভারতবাসী অনেক দিন ভুলিয়া বসিয়াছিল এবং যখন বৈদেশিকরা ভারতে আসিতে আরম্ভ করে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে অর্থসেবী সম্প্রদায়ের সমাজে হীন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ফল যাহা, তাহা হইল।

কিন্তু এ কথা মনে রাখিতেই হইবে যে, কার্পাস-বস্ত্রের ও ঠক্‌ঠকি তাঁতের উৎপত্তি হয় এই বাঙ্গালা দেশেই। বাঙ্গালার সহিত এককালে চীনের খুব সৌহার্দ্দ্য ছিল। কথিত আছে, বাঙ্গালার কোন রাজা চীনের তৎকালীন রাজা উটিকে কার্পাসজাত একখানি সূক্ষ্ম বস্ত্র উপহার দিয়াছিলেন। রাজা উটি তাঁহার পারিষদবর্গকে ঐ বস্ত্রখানি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার রাজা তাঁহাকে এইখানি উপহার দিয়াছেন এবং উহা এক প্রকার ফুল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চীনে তৎকালে রেশমজাত বস্ত্রের খুব প্রচলন ছিল এবং এই শিল্প চীনেই যে সর্ব্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'চীনাংশুক' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, বর্ত্তমানে যন্ত্র-চালিত বস্ত্র-শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইলেও বাঙ্গালার সেই সুপ্রাচীন ঠক্‌ঠকি তাঁতের আদর্শ এবং মাকুর যাতায়াত এখনও শিল্পিগণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাঙ্গালায় কিছুকাল কারবার করিয়া দেখিল যে, বাঙ্গালার জোলা ও তাঁতির কারবার খুব লাভজনক। তারপর কি করিয়া ধীরে ধীরে ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র কি ভাবে বাঙ্গালায় এবং সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ও তাঁতিকুল পথে বসিল, তাহার ইতিহাস আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু ইহার জন্য দায়ী দেশবাসীই। বাঙ্গালার তাঁতিকুলের মধ্যে যদি জাতীয়তা-জ্ঞানের লেশমাত্র থাকিত, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টার অত সহজে বাঙ্গালার এই প্রাচীনতম শিল্পকে ধ্বংস করিতে পারিত না। কোন কোন মনীষী লেখক বলিয়া থাকেন যে, তৎকালে বাঙ্গালার বহু গঞ্জ ও বণিক-সঙ্ঘ বা trade-guild বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু ঐগুলির মধ্যে জাতীয়তার বন্ধন ছিল না, অথবা স্বদেশীয় শিল্পকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদের পক্ষে ঐকান্তিকতার অভাব ছিল। প্রবাদ আছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের উদ্যোগে না কি বড় বড় জোলা ও তাঁতিদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই প্রবাদে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রবৃত্তি হয় না। ইহা সত্য হইলেও রামা তাঁতির অঙ্গুলি কর্ত্তিত হইল দেখিয়া তাহার প্রতিবেশী শ্যামা তাঁতি যে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সঙ্ঘবদ্ধতার ও একতার অভাব যে এখনও দেশীয় বণিকমহলে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের কন্যাকে আরোগ্য করিয়া ইংরাজ চিকিৎসক পারিতোষিকের পরিবর্ত্তে ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যাধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আসরফির পরিবর্ত্তে এই অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা অকুণ্ঠিতচিত্তে মঞ্জুর করিয়াছিলেন। জাতীয় কল্যাণবোধের ইহাই হইল একটি নিদর্শন। জাতীয়

কল্যাণের মনোবৃত্তি আমাদের দেশে তখনও ছিল না, এখনও নাই। ইদানীন্তন বিলাতীর অনুকরণে যে জাতীয়তাবোধ গড়িবার চেষ্টা হইতেছে, তাহার দ্বারাও প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে বলিয়াই আমরা মনে করি।

ব্যবসায়ের একটি বড় বিষয় হইল, পণ্যমূল্য নির্দ্ধারণ। দেশবাসীর ব্যবসায়-বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই তৎকালে বাঙ্গালার তাঁত-প্রস্তুত বস্ত্রের কোন বাঁধা দর ছিল না। যে বস্ত্রের উৎপন্ন মূল্য এক টাকা, সেই বস্ত্র কাহারও নিকট দুই টাকা, কাহারও নিকট তিন টাকা, কাহারও নিকট পাঁচ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইত। এক টাকা মূল্যের বস্ত্র পাঁচ টাকায় বিক্রয় করিতে পারিলে তাঁতি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। শুধু ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত প্রতিযোগিতা নহে, এই দাও মারিবার প্রবৃত্তিও বাঙ্গালার বস্ত্র-শিল্পের পতনের অন্যতম কারণ। বিদেশী বণিকের স্কন্ধে দোষারোপ করিবার পূর্ব্বে নিজেদের ত্রুটির বিষয় প্রণিধান করা আবশ্যক।

বর্ত্তমান যুগে জাতীয়তার কিঞ্চিৎ উন্মেষ হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয় বটে, তবে তাহাতেও এখনও স্বার্থপরতা ও দ্বেষ পূরামাত্রায় বর্ত্তমান। ভারতের মধ্যে পার্শী, মাড়য়ারী ও ভাটিয়ারাই বাণিজ্য-বীর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা এক এজেন্সী ব্যবসায় ব্যতীত অপর কোন ব্যবসায় বিশেষ বুঝেন না বা যে ব্যবসায়ের দ্বারা দেশের আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয় এবং যাহাতে দেশের জাতীয় অর্থের বৃদ্ধি ঘটে, তৎপ্রতি তাঁহারা দৃষ্টিপাত করেন না; সকলেই স্ব স্ব ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্ অর্জ্জনে ব্যস্ত; দেশের জন্য স্থায়ী কল্যাণ সাধনে কাহারও চেষ্টা নাই। ইঁহারা মনে করেন যে, দেশে ধর্ম্ম-শালা স্থাপন, হাসপাতাল নির্ম্মাণ ও তীর্থসংস্কার করিলেই দেশের যথেষ্ট হিত সাধিত হইল। যাহাতে জাতীয় অর্থের বৃদ্ধি ঘটে এবং যাহাতে শোষণ বন্ধ হয় বা দেশ-বাসীর উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি মনোযোগ দিবার মত মনোভাব তাঁহাদের নাই। ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করিলে ভারত হইতে স্বর্ণ-রপ্তানীর হিড়িক্ পড়িয়া গেল, অমনি ভারতের বড় বড় বাণিজ্য-রথীরা একটা লাভ-জনক কারবার পাইয়া গেলেন মনে করিয়া পুরাদমে স্বর্ণ-রপ্তানীর কারবারে লাগিয়া গেলেন। নিজে বেশ কিছু উপার্জ্জন করিয়া লইতে পারিলেই আমাদের পরম তৃপ্তি! হায় হতভাগ্য দেশ!

আমাদের দেশে নিজে গুছাইয়া লইয়া সরিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, আমরা দেশের স্বার্থ অপেক্ষা নিজের স্বার্থের প্রতি সর্ব্বদাই সচেতন থাকি। জাতীয় কল্যাণের দিক্ দিয়া আমরা ব্যবসায়ের ভালমন্দ বিচার করি না, আমরা বিচার করি আমাদের ব্যক্তিগত ভাল মন্দের দিক্ দিয়া। এই প্রকার সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি ব্যবসায়ের প্রসার ও স্থায়িত্বের পরিপন্থী।

এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই সকল বিষয়ে কেহ কাহারও যুক্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। দেশের আবহাওয়া, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, জাতি বা ধর্ম্মবিশেষের বৈশিষ্ট্য এবং সর্ব্বোপরি কালধর্ম্ম—এই গুলিকেও বিচারের মানদণ্ডে স্থাপন করা আবশ্যক। আবার ইহাও স্বীকার্য্য যে, প্রতিপাদ্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার যাবতীয় রীতি-নীতির সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। আমার বক্তব্য বা বিষয়গুলি চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে না করিয়া উপপাদ্য বিষয়ের এক একটি অঙ্গ বলিয়া মনে করিয়া লইলেই আমি পাঠকবর্গের নিকট কৃতজ্ঞ হইব।

স্বাধীনতা ও সত্য

…কেহই ভাবিয়া দেখিতেছেন না যে, স্বাধীনতা হইলেই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভবযোগ্য নহে। স্বাধীনতা হইলেই যদি জন-সাধারণের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের কোন দেশেরই জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ আর্থিক দুর্দ্দশা দেখা যাইত না। কিন্তু, বাস্তব সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত…।

বিচিত্র জগৎ

ইটালির উপনিবেশ ইরিত্রিয়া

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ

'আসাব' লোহিত-সাগরের তীরবর্ত্তী একটি বন্দর, ইরিত্রিয়ার অন্তর্গত। পৃথিবীতে এমন অনুর্ব্বর মরুময় স্থান আর দুটি আছে কি না সন্দেহ।

সমুদ্রতীরে দেখা যাবে, কয়েকটি তালজাতীয় গাছ,

কপ্‌টিক্ চার্চ্চের ধর্ম্মযাজক।

কয়েকখানা নীচু নীচু বাড়ী, তার পশ্চাতে ধূ ধূ করছে বালুকাময় জলহীন মরুপ্রদেশ।

অনেক সময় মনে হয়, মানুষে এখানে বাস করে কি ভাবে?

অথচ লোহিত-সাগরের পশ্চিম-তীরবর্ত্তী এই ক্ষুদ্র বন্দরেই ইটালীয় উপনিবেশ ইরিত্রিয়ার প্রথম আর অন্যান্য উপনিবেশের মত স্বর্ণ-খনির সন্ধান বা অন্য জা ধন-রত্নের সন্ধান এই উপনিবেশ-স্থাপনের মূলে ছিল এর সূচনা খুব সামান্য ভাবে হয়।

বর্ত্তমানে যেখানে আসাব, ১৮৭০ সালে ইটালি রুবাটিনো ষ্টীমশিপ কোম্পানী একটা কয়লা রাখবার ডি হিসেবে নামমাত্র মূল্যে স্থানীয় অধিপতি রাহেই সুলতানের কাছ থেকে সেই জায়গাটুকু ক্রয় করেন। ত আসাব বন্দর ছিল বটে, কিন্তু খুব ছোট অবস্থায় ছিল আরব জাহাজ এসে লাগত খেজুর নিয়ে যাবার জ এখনও বন্দর হিসেবে আসাব যে বড় বন্দর, তা ন সামান্য কিছু বেড়েছে বটে, আসলে যেমন তেমনই আছে

রুবাটিনো কোম্পানী দেখল আসাব ক্রয় করে ত ঠকেছে। কয়লার ডিপো হিসেবে এটি বিশেষ কো দরকারে লাগল না। ইতিমধ্যে আশেপাশের বি জমিও কোম্পানী কিনে ফেলেছিল। ১৮৭৯ সালে এক ইটালিয় সৈন্য আসাবে নেমে বালুকাময় মরুভূমির ম ইটালির পতাকা প্রোথিত করে। বর্ত্তমানে লোহি সাগরের ৬৭০ মাইল দীর্ঘ উপকূলভাগে ইটালির পতা উড্ডীয়মান, মরুভূমির ওপারে ইথিয়োপিয়ার নাতিশীতো মালভূমিতেও।

আসাব বন্দর থেকে উত্তর-পশ্চিমে যে উপকূল বিস্ত তা যেমন মরুময়, তেমনি দুর্গম, তেমনি অস্বাস্থ্যক মাসাউয়া বন্দরের পর থেকে উচ্চ মালভূমি থাকে থা উঠে গেছে—এখানকার বায়ু শীতল এবং স্বাস্থ্যক গাছপালা প্রচুর জন্মায়। মাসাউয়া মালভূমিকে আফ্রিক অন্তঃপুরের দ্বারস্বরূপ বলা যেতে পারে।

১৮৮৫ সালে ইটালি মাসাউয়া অধিকার করে এবং ইরিত্রিয়া তখন থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করতে আরম্ভ করে। রুবাটিনো কোম্পানী জমি কিনবার কুড়ি বছরের মধ্যে ইটালির উপনিবেশ চ'চল্লিশ হাজার বর্গ-মাইল পরিমাণ স্থানে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৮৯০ সালের ১লা জানুয়ারী ইটালিয় গবর্ণমেণ্ট এই নতুন উপনিবেশের নামকরণ করেন, ইরিত্রিয়া।

আমি আসাব থেকে মাসাউয়া যাবার পথে বুঝলাম, উত্তাপ কাকে বলে। এর আগে ভারতবর্ষে সারাদিন ধরে কুমীর শিকার করে বেড়িয়েছি, থার্ম্মমিটারে ১১৭° ডিগ্রি উত্তাপ উঠেছিল আমার মনে আছে, কিন্তু সে উত্তাপও এর কাছে কিছু নয়। ছায়াতেই উত্তাপ উঠে গেল ১২০° ডিগ্রী।

ষ্টীমার থেকে নেমে হোটেল স্যাভোয়িয়া পর্য্যন্ত হেঁটে যাওয়া এক মহা কষ্টকর ব্যাপার। হোটেলের ম্যানেজার বলল, গ্রীষ্মকালে এসব জায়গায় থাকা যায় না। শীতকালেও যে খুব ভাল তা নয়, তবে সে সময় বরং টিকে থাকা যায়, কিন্তু এ সময় এ যায়গা নরকের সামিল!

অন্য সহর যতই গরম হোক, মাসাউয়াকে আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তপ্ত সহর বলতে প্রস্তুত আছি। এখনও এ সহরে পনেরো হাজার অধিবাসী আছে। ইউরোপীয়দের মধ্যে ইটালিয়ানদের সংখ্যাই বেশী। তারা এখানে সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই আছে। অনেক বড় বড় ব্যবসা এখন এদের হাতে।

গবর্ণমেণ্টের চাকুরী, শাসন বিভাগের চাকুরী, শিপিং কোম্পানীর কাজ, আমদানী রপ্তানীর কাজ, সব ইটালিয়ান-দের হাতে এবং সব নিষ্পন্ন হয় এই ভীষণ উত্তাপে।

শ্বেতকায় ইউরোপীয় এই উত্তাপ ভুলে থাকতে পারে শুধু কাজের চাপে। কোন অলস লোকের পক্ষে এ-উত্তাপ সহ্য করা অসম্ভব, সে মরে যাবে দু'দিনে, নয়তো পাগল হয়ে যাবে। হাসপাতালের দু'চারজন নার্স ছাড়া গ্রীষ্মকালে কোনো ইউরোপীয় মহিলা মাসাউয়াতে থাকেন না। সে সময় তাঁরা হামাসিনের পার্ব্বত্য ভূখণ্ডে গ্রীষ্ম যাপন করেন।

আমিও দেখলাম হোটেলের একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব। ভাবলাম, ইরিত্রিয়া দেখতেই যখন আসা—

মাসাউয়া: সমুদ্রজল শুকাইয়া যাইবার পর শ্রমিকেরা লবণ একত্র জড় করিয়া স্তূপ করিতেছে।

তখন অন্ততঃ মাসাউয়া সহরটা ঘুরে বেড়ান যাক। কিন্তু স্থানীয় ইটালিয়ান অধিবাসিগণ মাসাউয়া ঘুরবার মধ্যে কি আছে বুঝতে পারল না। এ বিষয়ে তাদের কোন উৎসাহ নেই দেখা গেল।

অবিশ্যি মাসাউয়া সহরের কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য নেই। এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় জায়গা, এই পর্য্যন্ত এর প্রয়োজনীয়তা। সুদক্ষ পুলিশ থাকাতে কোন চুরি-ডাকাতি তেমন হয় না। দেশী লোকেরা ছোট ছোট

চেয়েছিল বলেই এই যুদ্ধ বাধে। উক্ত সেনাপতির হাতে ইথিওপীয়ার অসীম দুর্দ্দশা হয়েছিল, অধিবাসিগণ নিহত ও গির্জ্জাসমূহ ভস্মীভূত হয়েছিল।

ইথিয়োপীয়ার সাহায্যের জন্য ক্রিষ্টোভাও ডা গামা এই অভিযান চালনা করেছিলেন, ইনি প্রসিদ্ধ নাবিক ভাস্কো ডা গামার চতুর্থ পুত্র। এই যুদ্ধের ফল ভাল হয় নি, ডা গামা যুদ্ধে বন্দী এবং পরে শত্রুহস্তে নিহত হন, তাঁর

বাইবেলের 'লাষ্ট সাপার' বিষয় অবলম্বনে অঙ্কিত চিত্র। ইরিত্রিয়ার কপ্‌টিক্ চার্চ্চের দেয়াল-গাত্রে এইরূপ শত শত বাইজান্টাইন ধরণের চিত্র আছে।

সৈন্যগণ সব যুদ্ধে হত হয়েছিল। কিন্তু আবিসিনীয়াকে তাঁরা রক্ষা করেছিলেন।

যারা দু'চারজন প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল, তাদের মধ্যে মিগুয়েল ডি কাষ্টানহোসো নামে জনৈক পর্টুগিজ ছিল। এই পর্টুগিজ যোদ্ধা উত্তরকালে আবিসিনীয়া অভিযানের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে। এই বিবরণ পড়লে একটা জিনিষ আমরা জানতে পারি যে, ইথিওপীয়ার গির্জ্জার ঘণ্টা পাথরের তৈরী।

আমি নিজে এতকাল পরে কাষ্টানহোসো লিখিত বিবরণের সত্যতা উপলব্ধি করলাম। আসমারার নিকটে একটি কপ্‌টিক ভজনাগার আছে, তার ঘণ্টা পাথরের, অর্থাৎ একটা কাঠের গায়ে চার পাঁচখানা বড় বড় পাথর দড়ি দিয়ে ঝোলান আছে। এই পাথরগুলোর চেহারা অনেকটা কামার-দোকানের নেয়াই-এর মত ; এক দিক সরু, অন্যদিক মোটা। আর এক টুক্‌রো পাথর দিয়ে আঘাত করলে টুং টুং করে বাজে। বেশ জোরেই বাজে। চারশো বছর পূর্ব্বে মিগুয়েল ডি কাষ্টান্‌হোসো এই পাথরের ঘণ্টা দেখে গিয়েছিলেন, আজও সেখানে পাথরের ঘণ্টাই প্রচলিত।

আসমারাতে পৌঁছে আমাকে মনে মনে আবৃত্তি করতে হয়েছে "আমি আফ্রিকায় থাকি, আমি বিষুব রেখার মাত্র ১৫ ডিগ্রি উত্তরে আসমারাতে আছি", নইলে প্রতি পদেই আমার ভুল হয়েছে যে, আমি বুঝি দক্ষিণ ইটালির কোন একটা ক্ষুদ্র সহরে আছি। সেই ইটালিয়ান রাস্তা-ঘাট, ইটালিয়ান স্থাপত্য, ইটালিয়ান লোকজন সেই ধরণের ফলের দোকান। একটা ছোট কফির দোকান দেখে মনে হল, নেপল্‌সে আমি অবিকল এই ধরনের একটা কফির দোকান দেখেছি।

তবে তফাৎ কোথায়? আমি যে আফ্রিকায় বসে আছি তা কি করে জানব? তাই বসে বসে আবৃত্তি করতাম, উপরের ওই কথাগুলি। তবে আর একটা দৃশ্যে শীঘ্রই আমার ভ্রম ঘুচল, যখন কালো রংয়ের দেশী লোক শুভ্র পোষাকে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, কি দোকানে জিনিষ কিনছে, তখন বুঝতাম যে, এ দেশ ঠিক ইটালি নয়।

তা হলেও একটা কথা বলব। আসমারা ইটালির অনুকরণ নয় ; আমার বলবার তা উদ্দেশ্য নয়। এটা ইটালিই, আফ্রিকার ইটালি। কোনো তফাৎ নেই; কেবল এক ওই কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের ছাড়া।

মাসাউয়া-র সে ভীষণ উত্তাপ না থাকাতে, আবহাওয়া এমন ঠাণ্ডা যে, দক্ষিণ-ইটালি বলে ভ্রম হয়। আসমারা সহরে ২২০০০ অধিবাসী আছে, তন্মধ্যে ৩০০০ ইউরোপীয়, এদের বেশীর ভাগই ইটালিয়ান। এই সহরে ইরিত্রিয়ার

গভর্ণর থাকেন। ইরিত্রিয়ার অধিকাংশ লোকই এই উচ্চ মালভূমি অঞ্চলে বাস করে। এর সাধারণ উচ্চতা প্রায় ৭০০০ ফুট, এখানে বাতাস ঠাণ্ডা এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

অধিবাসীরা হ্যামিটিক জাতি, একটু নিগ্রোর অংশ মেশানো। এদের ভাষা টিগ্রাই, ধর্ম্ম কপ্‌টিক খৃষ্টধর্ম্ম। ইথিওপীয়া সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাটি খাটে, অর্থাৎ তারাও কপ্‌টিক খৃষ্টান এবং তাদেরও ভাষা টিগ্রাই।

মালভূমি থেকে অবতরণ করে সুদানের দিকে গেলে দেখা যাবে, আবহাওয়া ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। আসমারার উচ্চ মালভূমিতে নানা রকম ফল ও তরি-তরকারী জন্মায়। নীচের দিকে কফি, তামাক ও শিসল উৎপন্ন হয়। আজকাল তুলার চাষ বাড়ছে।

পশ্চিম দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাবে, মানুষের রং তত কালো দেখা যাবে। সুদানের অধিকাংশ অধিবাসীই নিগ্রো মুসলমান। আফ্রিকাতে, বিশেষ করে এ অঞ্চলে, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম খুব বিস্তার-লাভ করেছে।

ইটালির ব্যবহার এদের সঙ্গে খুব ভাল। শাসকের গর্ব্ব নেই তার মধ্যে।

আমি একদিন আসমারাতে একটা ছোট ইটালিয়ান দোকানে বেড়াতে গেলাম। দোকানের ইটালিয়ান মালিক একজন কৃষ্ণকায় খরিদ্দারকে একটা পুলিন্দা বেঁধে দিয়ে বললে, 'ধন্যবাদ, আবার আসবেন।' কৃষ্ণকায় খরিদ্দারটি হ্যাট উত্তোলন করে প্রত্যভিবাদন জানিয়ে দোকান ত্যাগ করলে।

আমি সত্যই বিস্মিত হলাম। কোনও কৃষ্ণকায় জাতির দেশে ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গগণ এরূপ ব্যবহার করে না। কিন্তু এখানে শ্বেতাঙ্গ দোকানদারেরা হাসিমুখে কয়েক সেণ্ট মাত্র দামের জিনিষও নিজের হাতে সযত্নে বিক্রি করছে কৃষ্ণকায় খরিদ্দারকে।

আসমারাতে অনেক ইটালিয়ান কৃষক জমি নিয়ে চাষ-বাস করছে, শুনেছিলাম। স্থানীয় কৃষি-বিভাগে গিয়ে তাদের অনুসন্ধান করা গেল। কৃষি-বিভাগের কর্ত্তা আমাকে একটা বড় কৃষি-ক্ষেত্রে নিয়ে যাবেন বললেন। আমরা মোটর-বাসে কয়েক ঘণ্টা পথ অতিবাহিত করে
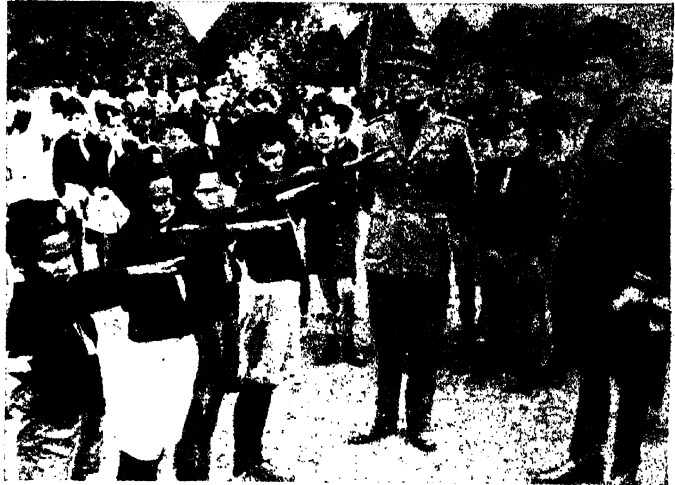
ইরিত্রিয়ার দেশীয় বালকগণ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতেছে। ফ্যাসিস্ত যুব-সংগঠন বহুসংখ্যক ইটালীয়ান ও দেশীয় বালকদের সংঘবদ্ধ করিতেছে।

একটা জায়গায় এলাম, সেখানে চারিদিকে গবর্ণমেণ্ট-পরিচালিত বড় বড় ক্ষেত্র।

আমি বললাম, 'একটা ছোট কৃষিক্ষেত্র আমায় দেখাতে পারেন?'

তিনি বললেন, 'তাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ছোট ছোট কৃষকেরা ইটালির মতই চাষ করে এখানে।' আমি তাই দেখবার জন্য জিদ ধরলাম। তখন তিনি আমাকে একটা সেই ধরণের কৃষিক্ষেত্রে নিয়ে গেলেন। কৃষকের বাড়ীটা ছোট, তিনটী ঘর, তাতেও একটা রান্নাঘর। গৃহস্বামী বৃদ্ধ কৃষক আমাদের দেখে যেন একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে মনে হল।

গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ক্যাক্‌টাসের ফল ছাড়াতে ছাড়াতে সে তার জীবনের ইতিহাস আমাদের শোনালে। ইটালীতে তার জমি-জমা বিক্রি করে স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে সে অনেক দিন আগে আফ্রিকা এসে নতুন ভাবে জীবন আরম্ভ করেছিল। গবর্ণমেণ্ট তাকে প্রথমে বিনা খাজনায় খানিকটা জমি দেয়। তারপরে যখন সে নিজের কৃতিত্ব দেখালে, তখন সেই জমিটুকু তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল।

কৃষক ক্ষেত্রের নানা স্থানে আমাদের নিয়ে নিয়ে দেখাল।

সে নিজে ও তার ছেলেরা মিলে একটা কূপ খনন করেছে। সেই কূপ থেকে ফলের বাগানে জল সেচন করা হয়। অনেক ফলের গাছ, সে নিজেই এই সব ফলের গাছ পুতেছে। কিন্তু বাড়ীতে রাঁধুনী নেই, তার স্ত্রীকে এখনও রান্নাবান্না করতে হয়। বললাম, 'এ সব থেকে কি রকম আয় হয় ?'

সে উত্তর দিলে, 'খুব বেশী আয় হয় না। কিন্তু আমাদের এখানে খরচও ত' খুব বেশী নয়।'

ফিরবার সময়ে আমি কৃষি-বিভাগের কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ইটালি থেকে বেশী লোক এসে এখানে চাষবাস করুক, গবর্ণমেণ্ট কি এইটাই চান ?'

কর্ম্মচারীটী বললে, 'ইচ্ছে হলে কি হবে, গবর্ণমেণ্ট বিনামূল্যে আর জমি দিতে পারবে না। জমি কোথায় ? এ দেশের লোকরাও ত চাষ করে। তাদের কাছ থেকে আমরা জমি ত' কেড়ে নিতে পারব না।'

ইরিত্রিয়াতে কপটিক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত পূর্ব্বেই বলেছি। এখানকার গির্জ্জার গঠনরীতি ও দেওয়ালের চিত্রগুলি দেখলে ১৬০০ বৎসর পূর্ব্বের বাইজান্টাইন যুগের গির্জ্জার প্রাচীর-চিত্রের কথা মনে এনে দেয়। আমি এ দেশের বহু গির্জ্জাতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, ঐ একই ধরণের প্রাচীর-চিত্র সর্ব্বত্রই।

কতকগুলি ছবি দেখে মনে হ'ল, সেগুলি খুব নতুন। আমার কৌতূহল দমন করা সম্ভব হল না। একজনকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললে, 'ওসব আধুনিক কালের চিত্রকরের আঁকা।' একজন চিত্রকরের বাড়ী সে আমায় নিয়ে গেল। টিনের ছাদযুক্ত তিনখানা ঘর এবং একখানা রান্নাঘর নিয়ে তার বাড়ীটা। বলা বাহুল্য, চিত্রকরটী এ দেশী লোক। চিত্রকর আমাকে তার আঁকা ছবি দেখাল। ম্যাডোনা, সেণ্ট জর্জ্জ ও ড্রাগন ইত্যাদি; তবে ড্রাগন ঠিক ড্রাগন হয় নি, একটা বড় অজগর সাপ হয়েছে। ড্রাগন কি জানোয়ার, চিত্রকর কখনও দেখে নি।

আমি বললাম, 'কোথায় আপনি ছবি আঁকতে শিখেছিলেন ?'

'আমার বাবার কাছে।'

'তিনি কোথায় শিখেছিলেন ?'

'তাঁর বাবার কাছে। তা ছাড়া এ আর এমন কঠিন কাজ কি! সমস্ত গির্জ্জাতেই ত' এই ধরণের ছবি। দেখে আঁকলেই হোল।

বহুযুগ পূর্ব্বের ছবি আঁকার প্রাচীন ধারাটা এই দেশে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে দেখে আনন্দ হল। তবে আর বেশী দিন বোধ হয় থাকবে না। ফাসিষ্ট ইটালি খুব তাড়াতাড়ি নব-সভ্যতার আমদানী করছে এ দেশে। ছোট ছোট দেশী ছাত্রগুলিকে পর্য্যন্ত প্রতিদিন সামরিক কুচকাওয়াজ করতে হয়। শনিবার ও রবিবার দেখা যাবে কৃষ্ণকায় দেশী ছাত্রদল সারবন্দী হয়ে সহরের বাইরে মাঠে ড্রিল করতে চলেছে। ফাসিষ্ট আন্দোলন এদের মধ্যেও সুরু হয়ে গিয়েছে।

(হ্যারল্ড লেকেনবার্গের বিবরণ হইতে)

পূর্ব্ব-স্মৃতি

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্দ্ধমানের গঙ্গাটিকুরী গ্রামে গত বৈশাখ মাসের শেষে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-সভা হইয়া গেল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে একজন দিক্‌পাল ছিলেন। আজ আমি তাঁহারই জীবন-কথার আলোচনা করিব।

আমি সাহিত্যিক জীবনে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম, - অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মির্জ্জাফর্স লেন স্থিত একটি বাড়ী হইতে "হিন্দু হেরাল্ড" নামক একখানি ছোট ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইত। ঐ বাড়ীর দ্বিতলের বড় ঘরখানিতে ছিল "হিন্দু হেরাল্ড" অফিস। উপরতলায় অন্যান্য ঘরগুলিতে ছিল ছাত্রদের মেস। আমি ছিলাম সেই মেসের একজন বাসাড়ে। বর্দ্ধমান সহরের মিঠপুকুর পল্লীর স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ছিলেন 'হিন্দু হেরাল্ডে'র সম্পাদক এবং স্বত্বাধিকারী। আবার তিনিই ছিলেন মেসের কর্ত্তা। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই সেই মেসে থাকিতেন। মেড়তলার সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ, রাজবাড়ীর উকিল (তখনও উকিল হন নাই) শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি। ইঁহারা এখনও জীবিত আছেন কি না জানি না। ইহা ভিন্ন অধ্যাপক শ্রীযুত সাতকড়ি অধিকারী মহাশয়ও এই মেসে কিছুদিন ছিলেন। এই মেসের বাসায় স্বর্গগত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু গিরীন্দ্রবাবুর সহিত কখন কখন দেখা করিতে আসিতেন। অফিস-ঘরেই তাঁহারা আসিয়া বসিতেন ও কথাবার্ত্তা কহিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের হাস্যের তরঙ্গ আসিয়া আমাদের কর্ণপটাহে আঘাত করিত। তাহা হইলেও আমরা মেসের যত বালক ঐ আলাপের সময় অফিস-ঘরের ত্রিসীমানা মাড়াইতাম না।

ঐ সময় কলিকাতা সহর এক তীব্র আন্দোলনে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হোমরা-চোমরা অধ্যাপক হইতে স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর বালক পর্য্যন্ত, রাজারাজড়া হইতে খোলার ঘরের ভদ্র বাসিন্দা পর্য্যন্ত, হাইকোর্টের পশারে উকিল হইতে মুদিখানার ছোট দোকানদার পর্য্যন্ত, সকলেই যেন ঐ আন্দোলনে টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছিলেন। কলিকাতায় এমন মেস ছিল না, স্নানের সময় যাহার কলতলা এই বিতর্কিণী আলোচনায় মেছোহাটার হট্টগোলকে পরাজিত না করিত, এমন পার্ক ছিল না (তখন পার্ক ছিলও অল্প) যেখানে শ্বেতকূর্চ্চ বর্ষীয়ান্ হইতে চশমাধারী যুবকগণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা না করিতেন। হাইকোর্টের বার লাইব্রেরী হইতে অশ্ববাহিত ট্রামযাত্রীদিগের মধ্যে ঐ একই বিষয়ের চর্চ্চা। শুনিয়াছিলাম, কোন কোন মেসের কলতলায় ঐ বিষয়ের বিতণ্ডা ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইয়াছিল।

আন্দোলনের বিষয় ছিল "বাল্য-বিবাহ ত্যজ্য কি গ্রাহ্য"; আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ছিলেন মিষ্টার জয়গোবিন্দ সোম নামক একজন খৃষ্টান ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন হাইকোর্টের উকিল। একে খৃষ্টান, তাহার উপর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ-শিক্ষিত। তাঁহাকে বাল্য-বিবাহের সমর্থন করিতে দেখিয়া উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় বিস্মিত এবং চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। এ দিকে তখন উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ও পণ্ডিতপ্রবর শশধর তর্কচূড়ামণি এবং কৃষ্ণানন্দ স্বামীর (শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) আন্দোলনের ফলে হিন্দুত্বের দিকে কিছু কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কতকগুলি লোক আবার মধ্যপন্থী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক ও বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক ব্যারিষ্টার মিষ্টার এন. এন. ঘোষ প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ মধ্যপন্থী দলভুক্ত ছিলেন বলা যাইতে পারে। তাঁহারা একেবারে বাল্য-বিবাহকেও সমর্থন করিতেন না, আবার পাশ্চাত্ত্য যৌবন বা যৌবনান্ত বিবাহকেও সমর্থন করিতেন না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমবাবুকেও মধ্যপন্থী বলা যাইতে পারে, তবে তিনি বাল্য-বিবাহ সম্বন্ধে কোন মত দিয়াছিলেন কি না,—তাহা

আমার স্মরণ নাই। কলিকাতা এলবার্ট হলে জয়গোবিন্দ সোম এক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন,—আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক সোম মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিবাদ তেমন জমে নাই।

ইহার পরই হয় কলিকাতা শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে এক সভা। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইয়াছিলেন সেই সভার সভাপতি। সভায় নানাস্থান হইতে বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল। চুঁচুড়া হইতে গঙ্গাচরণ সরকার এবং তস্যপুত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকার উভয়ে, বর্দ্ধমান হইতে ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি দিক্‌পালগণ সভার শোভাবৰ্দ্ধন করিয়াছিলেন। বক্তৃতাও অনেকে করিয়াছিলেন। আজ ৫১ বৎসর পরে সে কথা সব আমার স্মরণ নাই। তবে স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকারের একটি কথা আমার স্মরণ আছে। সে কথা এই :—"অনেকে বলেন, বাল্য-বিবাহজাত সন্তানরা দুর্ব্বল হয়। আমার বাল্যকালেই বিবাহ হইয়াছিল। আমার পুত্র শ্রীমান অক্ষয়চন্দ্র ঐ বসিয়া আছে। উহাকে দেখিলে কি দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়? উহার বয়স যখন এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, তখন ও এক কিলে এক একটা হাত-বাক্স ভাঙ্গিয়া ফেলিত।" ইন্দ্রনাথও সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "সমাজ-সংস্কারকরা বলেন, বাল্য-বিবাহে দম্পতি বড় অসুখী হয়। আমার বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল। আমি জানি এ বিবাহে আমি সুখী। আমার স্ত্রী বলেন যে, তিনিও এই বিবাহে সুখী। কিন্তু সংস্কারকরা বলেন আমরা অসুখী। এখন এই সুখ-দুঃখের মীমাংসা কে করে?" সভাপতি ভোটের উপর বাল্য-বিবাহের সমর্থন করেন। কাজেই এই ব্যাপার লইয়া সারা বাঙ্গালা দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কলিকাতায় বহুবাজারে 'বাল্যাশ্রম' নামে এক সভা ছিল। সেই সভায় আমি 'সমাজ-সংস্কার' কি 'বাল্য বিবাহ' বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। প্রবন্ধটি তদানীন্তন 'দৈনিক' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন গিরীন্দ্রবাবুর অনুরোধে আমি উক্ত শোভাবাজারের সভার একটি ছোট্ট রিপোর্ট ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া দেই। গিরীনবাবু সেটি সংশোধন করিয়া 'হিন্দু হেরাল্ডে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইন্দ্রবাবু ঐগুলি সমস্তই পড়িয়াছিলেন এবং এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে যখন আবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন গিরীন্দ্রবাবুর সহিত দেখা করিতে আসিয়া আমি যে ঐ মেসেই থাকি, তাহা শুনেন এবং আমার সহিত দেখা করিতে চাহেন।

আমি গিরীন্দ্র বাবুর ঘরে যাইয়া ইন্দ্রনাথের সহিত দেখা করিলাম। তিনি এই সময়ে আমাকে নিকটে বসাইয়া কতকগুলি কথা বলেন :—"তুমি লেখার চর্চ্চা রাখিও, লেখক হইতে পারিবে। মানুষ দেখিয়া অত সঙ্কোচ বোধ করিও না। লেখায় বেশী বাগাড়ম্বর করিও না। সরলভাবে ও সোজা কথায় যাহাতে মনের ভাব স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়, এমন ভাবে লিখিবে। অনেক স্থলে ভাষাপ্রয়োগের দোষে ভাবটা চাপা পড়ে। মনে ভাব জাগিলে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবে। তোমার লেখা পড়িয়া আমি ইহা বেশ বুঝিয়াছি। জোর করিয়া মনোমধ্যে কোন ভাব জাগাইতে চেষ্টা করিও না। যে ভাব স্বচ্ছন্দে আসিবে তাহাই লিখিবে। বাহবা পাইবার লোভে ভাবের ঘরে চুরি করিতে যাইও না।" ইহাই হইল আমার ইন্দ্রনাথের সহিত আলাপের প্রথম অধ্যায়।

ইহার পর ঘটনাচক্রে আমি ঐ মেস ত্যাগ করি। কিছু দিন অন্যান্য মেসে ছিলাম। তাহার পর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া নানা স্থানে মাষ্টারী করিয়া বেড়াই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে এক চাকুরী পাই। ইন্দ্রনাথ তখন আর পূর্ব্বের ন্যায় হামেসা কলিকাতায় আসেন না। কিন্তু তখনও তিনি 'বঙ্গবাসী'তে লেখেন। বঙ্গবাসীর তদানীন্তন সহ-সম্পাদক হরিমোহন বাবু বর্দ্ধমানে ইন্দ্র বাবুর নিকট হইতে লেখা আনিতে যাইতেন। হরিমোহন বাবু ছুটী লইলে একদিন যোগেন্দ্র বাবু আমাকেই বর্দ্ধমানে ইন্দ্র বাবুর লেখা আনিবার জন্য পাঠাইলেন। ইন্দ্রবাবু বঙ্গবাসীতে কেবল 'পঞ্চানন্দ' লিখিতেন না, অন্যান্য অনেক বিষয় প্রবন্ধও লিখিতেন। সে লেখার ভঙ্গীই এক স্বতন্ত্র ছিল।

যেদিন বর্দ্ধমানে যাই, সেদিন শুক্রবার। অপরাহ্ণে 'ইন্দ্রালয়ে'তে পৌছিয়া বরাবর তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে গেলাম। দেখিলাম, তথায় তিনি বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া তাঁহার হাতে যোগেন্দ্র বাবুর লিখিত পত্র দিলাম। তিনি পত্রখানি আগাগোড়া পড়িয়া আমাকে বলিলেন "তুমি নূতন নিযুক্ত হইয়াছ? বেশ বেশ! মনোযোগ দিয়া কাজ

কর। ভাল হইবে।" তাহার পর আমাকে অন্য কোথায় কি কি কাজ করিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। ইহার পর আমি সন্ধ্যা করিতে যাইলে তিনিও উঠিয়া সায়ংকৃত্য সারিতে গেলেন। আমি সন্ধ্যা করিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, এমন সময় ইন্দ্রবাবু উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক এই সময় আসিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রবাবু সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহারা কেহ কেহ চলিয়া গেলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার যেন মনে হইতেছে, তোমাকে আমি কোথাও দেখিয়াছি। তুমি কখনও বৰ্দ্ধমানে আসিয়াছিলে কি?" আমি তাঁহাকে মির্জ্জাফর্দ লেনে সেই সাক্ষাতের কথা মনে করাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি বলিলেন, "বটে! বটে! তুমি সেই শশীবাবু! তা বেশ। মনোযোগ দিয়া কাজ কর, উন্নতি হইবে।" তাহার পর তিনি বলিলেন, "বঙ্গবাসী কাগজখানি হিন্দুয়ানির সমর্থক কাগজ। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝাইয়া দিবার কাগজ। ইংরাজী সাহিত্য ও দর্শন পড়িয়া আজকালকার লোকের মনে একটা বিজাতীয় মোচড় লাগিয়াছে। আমাদিগকে সেই মোচড় ঘুচাইয়া দিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যাহা কিছু আছে তাহা সমস্তই কি আমরা সমর্থন করিব?" উত্তরে ইন্দ্রবাবু বলিলেন "হাঁ তাহাই করিব। একটুও বাদ দিব না। কারণ বর্ত্তমান সময়ে বিপরীত শিক্ষার প্লাবন এবং কালের প্রভাব আমাদের যাহা কিছু ছিল, তাহা সমস্তই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। সেই জন্য আমরা হিন্দুয়ানির সবটাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব। এখন যতদূর থাকে। কুশিক্ষার গোরে পাশ্চাত্য শিক্ষার কুহকে দিশাহারা হইয়া নির্ব্বিচারে আমাদের সমস্ত ব্যবস্থাই অনিষ্টকর, ইহা মনে করিলেই ভুল হইবে। আমাদের যাহা আছে তাহার উপর শ্রদ্ধা বুদ্ধি রাখিয়া তাহার সার্থকতা কি, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তাহা হইলে অনেক বিষয় বুঝা যাইবে। আজকাল অতি অল্প লোকেই সত্য সন্ধান করিতে জানে ও পারে। সাহেব লোক যাহা বলেন, তাহাই প্রায় সকলে বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু একান্তভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিলে অনেক বিষয় বুঝিতে পারা যায়।"

এইরূপ কিছুক্ষণ উপদেশ দানের পর আহারের জন্য আমার ডাক আসিল। আমি খাইতে গেলাম। তিনি আর কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

প্রাতে তিনি একটু বেলাতে নীচে আসিলেন। বোধ হয় সন্ধ্যাহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়াছেন। সে সময় তাঁহার সহিত অধিক কথা হইল না। আমি পরদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "লেখা কখন হইবে?" তিনি অমনই পাল্টা প্রশ্ন করিলেন যে, "তুমি বৰ্দ্ধমানের গোলাপ-বাগ দেখিয়াছ? বৰ্দ্ধমানে আসিয়া কেবল আমাকেই দেখিয়া যাইবে, গোলাপ-বাগ দেখিবে না? আজ বৈকালে গোলাপ-বাগ দেখিতে যাইও, সঙ্গে লোক দিব।" সেদিন অপরাহ্নে গোলাপ-বাগ দেখিয়া আসিলাম। কিন্তু যে কাজে আসিয়াছি, তাহার কিছুই হয় নাই দেখিয়া মনটা কিছু বিষণ্ণ হইল। তিনি আমার বিষণ্ণ ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মন এত বিষণ্ণ রহিয়াছে কেন? এখানে কি কোন কষ্ট হইতেছে?" উত্তরে আমি বলিলাম, "লেখা লইয়া যাইতে বিলম্ব হইতেছে। স্বত্বাধিকারী কি মনে করিবেন?" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সে ভয় নাই। তুমি নূতন লোক কি না, সব জান না। এখানে আসিয়া বিলম্ব হইলে যোগী কিছু বলিবে না।" তাঁহার বাসায় লোকের যত্নের ক্রটী ছিল না। সর্ব্ব বিষয়ে সুন্দর ব্যবস্থা ছিল।

ক্রমে সোমবার সমাগত। ইন্দ্রবাবুর সে দিকে আর ভ্রূক্ষেপ নাই। সময় পাইলেই আমার সহিত তিনি অনেক বিষয়ে আলাপ করিতেন। আলাপে আমার যেন ধারণা জন্মিয়াছিল যে, হিন্দু সমাজের উপর এবং হিন্দু ধর্ম্মের উপর তাঁহার বিলক্ষণ টান ছিল। তিনি বলিতেন—"আমাদের ধর্ম্ম যদি থাকে তাহা হইলে আমরা টিকিয়া থাকিতে পারিব। ধর্ম্ম ছাড়িলে—ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটাইলে আমরা একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইব। কর্ণকে যাহাতে কেহ যুদ্ধে নিহত না করিতে পারে, সেইজন্য সূর্য্যদেব কর্ণকে অক্ষয় কবচ-কুণ্ডল দিয়াছিলেন। কর্ণ যতদিন তাহা রাখিয়াছিলেন, ততদিন কেহ তাঁহাকে মারিতে পারে নাই। তিনি যখন উহা বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাহার পরই তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদিগকে এই সনাতন ধর্ম্মরূপ অক্ষয় কবচকুণ্ডল দিয়া গিয়াছেন। যতদিন আমরা উহা রাখিয়া

দিতে পারিব, ততদিন আমরা কালজয়ী হইয়া থাকিব—কেহই আমাদিগকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে না। ধর্ম্ম ছাড়িলেই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

আমি ইন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত ও লোকাচারগুলি যুক্তিদ্বারা বুঝিতে হইবে এবং লোককে বুঝাইতে হইবে, না উহা শাস্ত্রে আছে বলিয়া শ্রদ্ধাবুদ্ধি সহকারে মানিয়া লইতে হইবে? এখন কালের প্রভাবে নব্য বঙ্গ ত' শাস্ত্রে বিশ্বাস হারাইতেছে। 'শাস্ত্রে আছে বলিলে', লোক তাহা মানিয়া লইবে কি?" ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "দিনকাল যেরূপ পড়িয়াছে তাহাতে যুক্তি দিতে হইবে বই কি? কিন্তু সেই যুক্তি সুযুক্তি হওয়া চাই। আর স্বয়ং বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিয়া তবে পরকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া অন্যকে সিদ্ধি দান করা যায় না।" আমি বলিলাম যে "ইংরাজী-নবীশরা যেরূপ যুক্তি দিয়া থাকেন এবং যেরূপ যুক্তি বুঝেন, সেইরূপ যুক্তি দিতে হইবে কি?" ইন্দ্রবাবু বলিলেন, "তোমার প্রশ্নের ভাব আমি বুঝিয়াছি। ইংরাজী যুক্তির অধিকাংশই অযুক্তি বা কু-যুক্তি। যুক্তি দেখান আমারও পেশা। তবে ইংরাজী-নবীশদিগকে বুঝাইতে হইলে তাঁহারা যেরূপ যুক্তি বুঝেন—সেইরূপ যুক্তি দিতে হইবে বই কি? একটা দৃষ্টান্ত দেই। যদি কোন ব্যক্তি শ্মশানের পূতিগন্ধময় অপরিস্কৃত ভূমিতে অনেক দূর চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে শ্মশানের সেই ভূমিতে পা না দিয়া যেমন ফিরাইয়া আনা যায় না, সেইরূপ এই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার মোহময় যুগে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিরও প্রয়োজন আছে। তবে স্বয়ং সেই যুক্তি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা আবশ্যক। সদ্‌যুক্তির আর প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভেদ নাই। এখন যুক্তির ভাল-মন্দ বিচার করা আবশ্যক। সেইরূপ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে হইলে গুরুকরণ আবশ্যক। সে গুরু আবার সদ্‌গুরু হওয়া চাই। সকল বিষয়ে expert দিগের মত লইতে হয়। এই বর্দ্ধমানের সহরে অনেক এক টাকা দুই টাকার উকিল পাওয়া যায়। তাহারাও ওকালতির পরীক্ষা পাশ করিয়া ছাড়-পত্র লইয়া আসিয়াছে। তবে লোক নলিনাক্ষবাবুকে ও তারাপ্রসন্নবাবুকে মোটা টাকা দিয়া উকিল দিবার চেষ্টা করে কেন? ইহারা আইন বিষয়ে ওস্তাদ (expert) বলিয়া। ধর্ম্ম বিষয়েও তাহাই। যিনি ধর্ম্ম বিষয়ে ঠিক জানেন—সেইরূপ ওস্তাদ লোককে গুরু করা চাই। আনাড়ির নিকট যাইলে ঐ কুবুদ্ধিই পাওয়া যাইবে।"

ইন্দ্রনাথ ঘোর স্বদেশী ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দেশকে ভালবাসা অর্থে দেশের লোককে ভালবাসা। আমার বাড়ীর পাশে তোবড়া তাঁতি কর্ম্মাভাবে না খাইতে পাইয়া সপরিবারে মরিতেছে, আর আমি যদি ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে চিকণ ধুতি কিনিয়া সেই দূর দেশের লোকের অন্ন যোগাই, তাহা হইলে কি অধর্ম্ম হয় না? আমি তোবড়ার দুঃখ না বুঝিলে আর কে বুঝিবে? আমি স্বদেশ-প্রেম অর্থে আমার গ্রামবাসী, আমার জিলাবাসী, আমার দেশবাসীই (বাঙ্গালা দেশ) বুঝি। এতবড় ভারতের এত কোটী লোকের ভাবনা আমি ভাবিতে পারি না। আমার দেশপ্রেম এই বাঙ্গালার মধ্যে নিবদ্ধ। এই প্রেমটা স্বাভাবিক। একজন বাঙ্গালী মার্কিনের এক চিড়িয়াখানা দেখিতে গিয়াছিল। তথায় সে যাইয়া একটি পিঞ্জরে (ঘরে) আবদ্ধ সুন্দরবনের বাঘ দেখিতে পায়। সে কাগজে লিখিয়াছে, বাঘটা দেখিয়া সেটা তাহার দেশের জানোয়ার বলিয়া তাহার মনে সেই ভীষণ বাঘের উপরও কেমন একটা অনুরাগ আসিয়াছিল। সুতরাং ওটা স্বাভাবিক। বঙ্গদেশের লোকের দাবী বাঙ্গালীর নিকট আগে।"

ইন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে সুনজরে দেখিতেন না। তিনি বলিতেন, "উহার দ্বারা ভারত উদ্ধার হইবে না। নিরস্ত্র, নির্ব্বীর্য্য আমরা যুদ্ধ করিয়া ভারত উদ্ধার করিতে পারিব না। আবেদন-নিবেদনেও কোন ফল ফলিবে না। যাহারা প্রবল পক্ষ, তাহাদের ধর্ম্মভাব যদি খুব প্রবল না হয়, তাহা হইলে তাহারা আপনার স্বার্থই বড় করিয়া দেখিবে। বিষয় কি লোক সহজে ছাড়িতে চাহে? কলিকাতায় সেদিন দুইজন বড় বড় জমিদারের মধ্যে কয়েক হাত জমির জন্য কি মামলাটাই হইয়া গেল! লর্ড ডফরিণ কিছুদিন পূর্ব্বে লণ্ডনের বণিক্‌-সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়াছ কি?"

এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমি লেখা পাইবার জন্য বড় চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। মঙ্গলবার দিন সন্ধ্যার পর ইন্দ্রনাথ আচম্বিতে ডাকিলেন,—"শৈলেন, ও শৈলেন? আমার লেখা পেয়েছে, শীঘ্র এস।" শৈলেনবাবু দোয়াত-কলম লইয়া আসিলেন। ইন্দ্রবাবু অনর্গল বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শৈলেনবাবু (ইন্দ্রবাবুর ভাগিনেয়) তাহা দ্রুত লিখিয়া লইতে থাকিলেন। একঘণ্টার মধ্যেই লেখা হইয়া গেল। আমি তখন শুইয়া ছিলাম। পরদিন সকালে শৈলেনবাবু কপি আমার হাতে দিলেন। আমি বুধবারের দিন আহারাদি করিয়া কলিকাতায় রওনা হইলাম।

মুকুর

—শ্রীনিখিল সেন

পল্লী-উন্নয়নের কাজে বাংলার স্বায়ত্ত-শাসনের দপ্তর হইতে মফঃস্বল আসিয়াছি।

বনবিলাস গাঁয়ে আমাদের তাঁবু পড়িয়াছে। লম্বা এককালি পাহাড়ের গায়ে ঢালু একটু জমির উপর ছোট্ট এই গ্রামখানি। একদা কোন এক মেষপালক বুঝি এই পাহাড়টায় একদল ভেড়া চরাইতে আসিয়াছিল; তাহার অন্যমনস্কতার সুযোগ লইয়া এক সময় ভেড়ার সেই দলটি ধীরে ধীরে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছে ও বনবিলাস গাঁয়ের মধ্যে অবশেষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ছোট বড় এই ঝোপগুলির পাশ কাটিয়া গ্রামের একমাত্র নদীটি বহিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালেই শুধু এই পাহাড়ী নদীটি উগ্র হইয়া উঠে। পাহাড় হইতে গাছপালা ভাসাইয়া আনিয়া দুকূল ছাপাইয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলে। শীত কাল হইতে তাহার যৌবনের উচ্ছৃঙ্খলতা কিন্তু নিঃশব্দে কমিয়া আসে; হিমে কাহিল হইয়া পড়ে তখন তাহার শীর্ণ দেহ। আর গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া নীচেকার শাদা কাঁকর আর লাল মাটী দেখা যায়।

বনবিলাস গাঁয়ে তখন জলের দারুণ অভাব। এখানে পুকুর নাই। তাহার বদলে আছে কুয়া; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা নেহাৎ কম। আর সেখানকার আবহাওয়া ছোঁয়া-ছুঁয়ির গন্ধে এত ভারী যে, দুঃস্থ অনেককেই এক কলসি জলের জন্যে সকাল হইতে দুপুর কিংবা দুপুর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। জলের অভাবে তাহাদের ক্ষেত-খামারেরও প্রচুর লোকসান হইয়া থাকে। নিজেদের মধ্যেও আবার একে অপরকে নিজের জমির উপর দিয়া নালা কাটিয়া নদী হইতে জল সেঁচিয়া নিতে দিবে না। যাহার একটু ক্ষমতা আছে, সেই শুধু মাঠের মধ্যে গহিন কুয়া কাটিয়া গরু লাগাইয়া জল তুলে; আর তরমুজ, লঙ্কা, কুমড়ার ক্ষেত-খামার করিয়া থাকে।

অনেকদিন হইতে গ্রামের দীন অধিবাসীরা তাহাদের দারুণ জলকষ্টের কথা জানাইয়া কাতর আবেদন করিতেছিল। কয়েকটা টিউবওয়েল বসাইতে এখানে তাই আমি আসিয়াছি।

আজ সকালে গোটা গ্রামখানি ঘুরিয়া আসিলাম। সঙ্গে ছিল ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু, চৌকিদার আর আমার পিয়ন বলরাম খাঁ। প্রেসিডেন্ট বাবুর নিকট তাঁহাদের অভাব-অভিযোগগুলি নীরবে শুনিতেছিলাম। গ্রামের অভাব-অভিযোগগুলি সত্যই খুব গভীর আর মর্ম্মস্পর্শী। লোক-সংখ্যা এখানকার খুবই কম; তবুও তাহাদের মধ্যে দলাদলি, ঝগড়াঝাঁটি আর মামলা-মোকদ্দমার অন্ত নাই। অজ্ঞতা আর কুসংস্কার ইহাদের দেহে পুরু ময়লার মত জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে।

যে যে জায়গায় টিউবওয়েল বসিবে, বলরাম সেখানে একটা বিশেষ চিহ্ন দিয়া আসিতেছিল। আমাদের প্রেসিডেন্ট বাবু তাঁহার বাড়ীর নিকট সুবিধামত একটা জায়গা দেখাইয়া কহিলেন, 'এখানে একটি, সার।'

'এখানে?' আমি মুখ তুলিলাম, 'ওই যে, ওখানে একটা কুয়ো দেখছি না?'

এক গাল হাসিয়া তিনি আমার উত্তরটাকে হাল্কা করিয়া ফেলিলেন।

'হাঁ সার, কিন্তু ওটায় কি জল আছে ভেবেছেন? চলুন না সার, একবার দেখাইগে, নীচে পোকা-পড়া খানিকটা জল। তা নিয়ে ই তো সেদিন মাতঙ্গ ভট্ট আর পলাস বেরার কী চোটটাই না হয়ে গেল।'

এখানে একটু থামিয়া তিনি চোখ দুটি একবার আমার উপর বুলাইয়া লইলেন। আবার নামাইয়া লইয়া শুরু করিলেন, 'আমি বলি, তুই ব্যাটা বেরার জাত, তোর একটু তর সয় না? খামকা তুই দিলি কি না ভট্ট-বধূর কলসিটা ছুঁয়ে? হুঁ, বেঞ্চ-কোর্ট থেকে আমিও তাই দিলাম দু ব্যাটারই পাঁচ পাঁচ টাকা জরিমানা করে। দু ব্যাটাই সমান ধাড়ী কি না!'

মুখ তুলিয়া কিছুক্ষণ আমি স্বার্থপর এই প্রেসিডেন্ট বাবুটির দিকে চাহিয়া রহিলাম। অজ্ঞতার জমাট আবরণের মধ্যে স্থূল, বৃদ্ধ এই গেঁয়ো লোকটির প্রতি আমার কেমন এক করুণা হইল।

আমাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া প্রেসিডেন্ট বাবু খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মানুষের কোমল দুর্ব্বলতায় একটা মৃদু মোচড় দিয়া কহিলেন, 'আপনারা হলেন সার, হুজুর মানুষ। আপনাদের উপর ত' আর আমাদের মত নগণ্য লোকের কথা খাটে না। তবে হ্যাঁ, টিউবকল এখানে একটা পুতলে আরও দশজনের সুখ-সুবিধা হবে কি না, তাই বলছিলাম—হেঃ হেঃ-হেঃ।'

পান-চিবান দন্তহীন দু' পাটি মাড়ি দেখাইয়া তিনি টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আমারও একটু হাসি পাইল, বলিলাম, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

লক্ষ্য করিলাম, কৃতজ্ঞতায় তিনি তাঁহার গলার ভাঁজ-করা চাদরখানিকে দু হাতে প্যাচাইয়া প্যাচাইয়া এতটুকু করিয়া ফেলিয়াছেন।

হাঁটিতে হাঁটিতে হাটের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। এক-চালা ছোট ছোট দোকানগুলি সপ্তায় দুদিন মালপত্র ও ক্রেতা বিক্রেতায় ভরিয়া যায়। আজকেও ছিল হাটবার; কিছু কিছু দোকানপাতি এখন হইতে আসিতে সুরু করিয়াছে। সস্তায় আম-কাঁঠাল কিনিতে সহর হইতে অনেক বেপারী আসিয়া জুটিয়াছে।

মুসারি দোকানের মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আফ্রিকার গভীরতম অরণ্য হইতে একটি ভীষণ-আকৃতি গরিলাকে কে যেন আমার সামনে দাঁড় করাইয়া দিয়া গেল! কাঠের মোটা দুটি লাঠিতে ভর দিয়া ঠক-ঠক করিতে করিতে কোথা হইতে একটি লোক আমার সামনে আসিয়া থামিল। প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় সে কখন আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু শরীরের গাঁথুনী তাহার এখনও অটুট। খুব মোটা আর বেঁটে-খাটো তাহার গঠন আর বাঁ পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত তাহার নাই।

বগলের নীচে কাঠের লাঠি দুটির উপর শরীরটাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া খোঁড়াটি তাহার লোমশ কালো একখানি হাত আমার দিকে বাড়াইয়া দিল। পরিষ্কার হিন্দুস্থানীতে কহিল, 'একঠো পাই দিজিয়ে বাবু সাব!'

কালো একমুখ দাড়ি-গোঁপের মধ্যে তাহার মুখের আকৃতিখানি বড় ভয়াবহ। কোটরে বসা ছোট ছোট চোখ দুটি ক্রূর হিংস্রতায় আর কুটিলতায় জ্বল-জ্বল করিতেছে। মাথার রুক্ষ চুলগুলিও জট পাকিয়া রাস্তার ধূলি-বালিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভীষণ গলায় সে আবার কহিল, 'কুছ দিজিয়ে বাবু সাব, দু'রোজ লেড়কা ভি কুছ খায়া হায় নেই। বহুত ভুখা হায়!'

সে তাহার বিশ্রী মুখখানি তুলিয়া আমার দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিল। ব্যাগ হইতে একটা আনি বাহির করিয়া তাহার হাতে ফেলিয়া দিলাম।

খুশী হইয়া সে ডান হাত কপালে ঠেকাইয়া আমাকে সেলাম করিল। ভুরু দুটির মাঝখানে তাহার কপালের উপর গভীর একটা কাটা দাগ আমার নজরে পড়িল।

হাট ছাড়াইয়া আমরা আবার চলিতে লাগিলাম।

পিছনে একবার চাহিয়া লইয়া কামিনী চৌকিদার আমার নিকট খুব আগাইয়া আসিল ও ফিসফিস করিয়া কহিল, 'বাবু ও-বেটাকে আর পয়সা-টয়সা দেবেন না। ব্যাটা শয়তান, লোকের অনিষ্ট করতে একটুও পিছ-পা হয় না। ঘর জ্বালিয়ে দিতে বলুন, লোকের মাথা ফাটিয়ে দিতে বলুন, কিছুই তার আটকাবে না—অমনি পা-কাটা খোঁড়া হলে কি হবে!'

বিস্মিত হইয়া আমি কামিনীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। সে আবার কহিল, 'হ্যাঁ বাবু, এ তল্লাটে তা সবাই জানে। জানেন, এ সব যদি ব্যাটার কানে যায় ত' আমার মাথাটাই শালা এক রাত্রিতে দেবে ফাটিয়ে।'

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুই না চৌকিদার, থানায় গিয়ে এ সব রিপোর্ট করতে পারিস না?'

কামিনী একটু হাসিল। বলিল, 'তা কি আর ছেড়েছি বাবু? তবে শালা যে একটা ঘুঘু! মেয়াদ খেটে খেটে মানিকে এখন আর ডরায় না।'

আমার খুব কৌতুহল জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা কামিনী, বলতে পারিস ও কে?'

'ব্যাটা জাতিতে বেদে। গেল এক পৌষ মাসে পছিমী একদল সাপুড়ের সঙ্গে এখানে এসে জুটেছে। তারপর থেকেই এ হাটে মোটা এক বুড়ি মাগীকে নিয়ে ডেরা পেতে বসেছে। দূর হলেই এখন বাপু, আপদ্ চুকে।'

বৈশাখের সূর্য্য মাথার উপর অনেকখানি উঠিয়াছে। সঙ্কীর্ণ গেঁয়ো পথ। দু' পাশে সবুজ ঘাস, ভাঁটি গাছ আর মাঝে মাঝে ফণীমনসা ও কেয়াগাছের ঝোপ। লোকের অবিরাম হাঁটাহাঁটিতে মাঝখানের ঘাস মরিয়া গিয়া পথের উপর শাদা ধুলার পুরু স্তর পড়িয়াছে। প্রখর রৌদ্রে তাহা তাতিয়া উঠিয়াছে।

কামিনী আবার সুরু করিল, 'শুনুন বাবু, এই শালার কীর্ত্তি! শুনলে পর বলুন, কার না গা জ্বলে উঠে? সুবল দে তার বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরছিল। ছোট্ট বউ, কীই বা তার বুদ্ধি; হাসলেই বা একটু তোকে দেখে, তাই বলে কী তুই পিছন থেকে একটা আস্ত ঢিল ছুঁড়ে মারবি? আহা বউটি কি ভোগটাই না শেষে ভুগল। চাঁদের মত অমন মুখখানি এখন তাই হয়ে গেছে বিশ্রী!'

বিস্মিত চোখ দুটি আমি কামিনীর দিকে তুলিয়া ধরিলাম। মাথা নাড়িয়া সে কহিল, 'সত্যি বাবু নিজে খোঁড়া আর বিশ্রী দেখতে কি না, তাই সুন্দর কিছু একটা দেখলে অমনি রুখে আসে। আর গাঁয়ের ছেলে-পিলের উপরই যেন ব্যাটার যত রাগ; দেখলে অমনি লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে মারতে।'

হাট হইতে আমার তাঁবু তেমন দূরে নহে। কথা কহিতে কহিতে যখন তাঁবুতে আসিয়া পড়িলাম, দুপুরের রোদে তখন চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে।

বাহিরে ক্যাম্পখাটে শুইয়া ছিলাম। বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। দূর পাহাড় হইতে একটা দমকা হাওয়া হঠাৎ হু হু করিয়া বহিয়া গেল ফাটল-পড়া শুষ্ক মাঠের উপর দিয়া। এক মালসা আগুনের তপ্ত ঝিলিক আমার নাকে মুখে কে যেন দু' হাতে ছুড়িয়া মারিল। ক্যাম্পের পাকা ঝাউগাছটি ততক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার শোঁ শোঁ করিয়া আঁতকাইয়া উঠিল।

সকালের ডাকে দেশ হইতে চিঠি আসিয়াছে। আমার উপর সুলেখা হয় ত' এবার একটু অভিমান করিয়াছে। উচ্ছ্বাসময়ী আমার চিঠির উত্তরে লিখিয়াছে,

> ...আচ্ছা মেনে নিলাম আমি তোমাকে ভালবাসি না—একটুও বাসি না—একটুও না। কিন্তু আমি জানি তুমি ত' বাস আমাকে। তোমার কাছ থেকে যদি নিবিড় ভালবাসা শুধু আমি পেয়ে থাকি, তোমাকে কী আমি ভাল না বেসে থাকতে পারি? এ তুমি ভুল করছ কেন?

...হাতের মুঠায় চিঠিখানাকে ঘামে ভিজাইয়া তুলিয়া আমি একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। তুমুল একটা সোর-গোলে ঘুম আমার টুটিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, তাঁবু হইতে কিছু দূরে একটি অশথ গাছের গোড়ায় আসিয়া সকাল বেলাকার সেই খোঁড়াটি তাহার পরিবার ও কাচ্চা-বাচ্চা আর পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া আশ্রয় লইয়াছে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, কামিনী চৌকিদারের অনুমানে একটু ভুল রহিয়াছে। খোঁড়া-পরিবারটি সত্যই মোটা বটে, কিন্তু বুড়ী নহে। আর তাহার বাঁ হাতের একটিও আঙ্গুল নাই; সব কয়টি দুরন্ত রোগে ঝরিয়া গিয়াছে। দু' খানা পায়েও মাংস খেতলাইয়া গিয়া মাঝে মাঝে বিশ্রী ঘা হইয়াছে।

এখন ঝগড়া বাধিয়াছে খোঁড়া ও তাহার পরিবারের মধ্যে। ন্যাংটা বড় ছেলেটি তাহার মার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া ছিল। এক সময় কি মনে করিয়া খোঁড়া তাহাকে অকারন লাঠি দিয়া খোঁচাইতে সুরু করিল। ছেলেটি জাগিয়া উঠিয়া নাকি সুরে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার মাকে নালিশ করিয়াছে, 'দেখলি মা, বাপ মিছি-মিছি মোরে মারিছে!'

তাহার চোখে জল দেখিয়া তখন খোঁড়ার মহা আনন্দ! জোরে তাহার পিঠে আরও গোটা কয়েক খোঁচা মারিয়া সে তখন নাকি সুরে তাহাকে ভ্যাঙাইতে লাগিল।

'মিছি মিছি মোরে মারিছে!'

তারপর পরম কৌতুকে হাসিতে হাসিতে সে মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

দু' জনের ঝগড়া বাধিয়া গিয়াছে তারপর। খোঁড়া-

পরিবার মার-মুখো হইয়া চেঁচাইয়া উঠিল—'তু কে, খোঁড়া, হমার পোলাকে মারিবি ?'

'খবরদার, মুখ সামলে কথা ক' বাঁদীর ঝি বাঁদী ; খালি খোঁড়া-খোঁড়া করিস না, বলছি !'

'না, করিবে না ; কেন করিবে না—কেন তু মারিবি হমার পোলাকে ?'

খোঁড়া-পরিবার তাহার বিরাট বপু লইয়া এক পা আগাইয়া আসিল এবং স্বামীর প্রতি প্রচুর অকথ্য গালি পাড়িয়া চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিল, যাহার এক পয়সা কামাইবার মুরোদ নাই, কোন্ আক্কেলে এখন সে তাহার ছেলেকে মারিতেছে ?

ইহার প্রত্যুত্তরে খোঁড়া নিজের মোটা একটা লাঠিকে মাথার উপর বাগাইয়া লইল। তাহার বাঁদীর-ঝি বাঁদীটি কিন্তু ইহাতে একটুও ভীত না হইয়া নিজের লোহার বড় বাটিটাকে মাথার উপর উঠাইয়া তুলিয়া হঠাৎ সাহায্যার্থে কাতর চীৎকার করিয়া উঠিল।

ক্যাম্প হইতে দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা আশঙ্কা করিতেছিলাম। কিন্তু হাটের লোকজন ছুটিয়া আসিয়া দু'জনকে থামাইয়া দিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে আবার দেখিলাম দু'জনের মধ্যে বেশ ভাব জমিয়া উঠিয়াছে। খোঁড়া-পরিবার স্বামীর রুক্ষ মাথাটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া আঙ্গুলহীন নিজের বাঁ হাতখানি চুলের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে। আর ডান হাতে সযত্নে চুল চিরিয়া চিরিয়া মাথার উকুন ফেলিতেছে। আর চোখ বুজিয়া খোঁড়া তাহার কোলে শুইয়া রহিয়াছে।

নদী হইয়া সন্ধ্যার দিকে তাঁবুতে ফিরিতেছিলাম। সারাদিনের গুমট গরমের পর এখন একটু ঝির-ঝিরে হাওয়া দিতে সুরু করিয়াছে।

হাটের নিকট আসিয়া পড়িলাম। হাট এখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দোকান-পাতি সব উঠিয়া গিয়াছে। সেখানকার স্থায়ী দোকানদারেরা শুধু কপাটে বাঁশের ঝাঁপ লাগাইয়া হিসাব মিলাইতেছে।

হঠাৎ দেখিলাম, অন্ধকারে খোঁড়া প্রত্যেক দোকানের সামনে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া এক মনে কী যেন খুঁজিতেছে। আগাইয়া গিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, 'এই, কী খুঁজছিস ?'

সে একবার অকারণ চমকাইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল ; তারপর আমার দিকে চাহিয়া তোতলাইয়া তোতলাইয়া জবাব দিল ঃ

'—কুছ নেহি বাবুসাব।'

আমি একটু হাসিলাম ; পাশ কাটিয়া যাইতেছিলাম। পিছন হইতে সে ডাকিল। কালো লোমশ ডান হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া কহিল, 'একঠো পয়সা বাবুসাব।'

'ও বেলা তো পয়সা নিয়েছিস ; আর কি হবে ?'

ইহার উত্তরে সে যাহা বলি, তাহার মর্ম্মার্থ এই ঃ তাহার রোজগারের সমস্ত পয়সাই সেই মাগী আর তার কাচ্চা-বাচ্চাদের পিছনে উজাড় হইয়া যাইতেছে। আজকের হাটেও তেমন কিছু মিলে নাই। আমি যদি দয়া করিয়া তাহাকে একটা পয়সা দিই।

মানিব্যাগ ক্যাম্পে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। বলিলাম 'যা, এখন পয়সা নেই।'

সে ক্রূর অবিশ্বাসের হাসি হাসিল।

'—দিজিয়ে বাবুসাব, হাম পয়সা হাম।'

আমি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম—'নেই, তোকে আমি বলছি না ?'

তারপর চলিয়া আসিলাম। পিছন হইতে শুনিতে পাইলাম—সে কাহাকে বিশ্রী গালি দিতেছে। কিন্তু ফিরিয়া তাকাইতেই সে বগলের নীচে দুটি লাঠিতে ভর দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া সরিয়া পড়িল।

তারপর কিছুদিন কাজের চাপে বড় ব্যস্ত ছিলাম। গ্রামে গ্রামে ঘোরা-ফিরা করিয়া এক মুহূর্ত্তও সময় ছিল না।

বনবিলাস গাঁয়ের পাশের গ্রামেও টিউব-কল পুঁতিবার সব আয়োজন করিয়া আজ আসিতেছিলাম। রাত্রি অনেক হইয়াছে। পিছনে পাহাড়টার আগায় একফালি চাঁদ দেখা দিয়াছে। দুসারি পাহাড়ের মধ্যে ঢালু একটুকু পথ। তাহার উপর পাশের নির্জীব গাছপালাগুলি রাত্রির অস্পষ্ট ছায়া ফেলিয়াছে। আমার বুটের খুট-খুট শব্দ

ছাড়া আর কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নাই। রহিয়া রহিয়া শুধু একটা দমকা হাওয়া শণ গাছের আগাগুলিকে খস-খস করিয়া যাইতেছে।

পথের উপর হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আমাদের কিছু দূরে ঢালু পথ বহিয়া কে একজন যেন লাফাইতে লাফাইতে উপরে উঠিতেছে। বলরাম ভয় পাইয়া হাঁকিল—

—'কোন হ্যায় ?'

আশ্চর্য্য ; গাছের একটা ঝোপের মধ্যে কিন্তু ছায়াটি কোথাও অদৃশ্য হইয়া গেল ! ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না। ভাবিলাম—আমাদের চোখে হয়তো ধাঁধাঁ লাগিয়াছে। শিমূলগাছের এই ছায়াটিকে হয়তো লোক ধরিয়া ভুল করিয়াছি। আমরা আবার নামিতে লাগিলাম।

পিছনে আবার ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সেই ছায়াটিই একরূপ লাফাইতে লাফাইতে আবার উপরে উঠিতেছে।

বলরামকে ইসরায় আসিতে বলিয়া আমি তাহার পিছু লইলাম। ছায়াটি তখন পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িয়াছে। চারিদিক্ ভাল করিয়া একবার দেখিয়া লইয়া অধিকতর এক ছায়াময় সরু পথ ধরিয়া তারপর সে চলিতে লাগিল। আসিতে আসিতে এক গুহার সামনে সে থামিয়া পড়িল। গাছপালার ঝোপে গুহার মুখটা এইভাবে ঢাকিয়া পড়িয়াছে যে, দিনের বেলাতেও তাহার অস্তিত্ব কাহারও চোখে পড়ে না। গুহার মধ্যে সে ঢুকিয়া পড়িল।

আমার চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। ছায়াটি দেখিতে অনেকখানি আমাদের খোঁড়ার মত। ঠিক তাহার মত দু'লাঠিতে ভর দিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলে। কিন্তু জনহীন এই পাহাড়ে এত রাত্রিতে সে আসিবে কেন ?

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বাহিরে আসিল। কাল একটি পাঁঠাকে দড়ি ধরিয়া হেঁচড়াইয়া হেঁচড়াইয়া সে গুহা হইতে টানিয়া আনিল।

ঠাহর করিয়া দেখিলাম—এই পাঁঠটিকেই কিছুদিন হইতে কুসির মা খুঁজিয়া পাইতেছে না। গাঁয়ের শ্মশান-কালীর পায়ে এই শনিবারেও সে একজোড়া মোমবাতি আর সাতটি রক্তজবা দিয়া আসিয়াছে। মাথা কুটিয়া ইহাই কাতর বর মাগিয়াছে যে, তাহার পাঁঠাটা যাহাদের পেটে গিয়াছে, তাহাদের মড়া যেন সাতদিনের মধ্যে আনিয়া এই শ্মশানে পোড়ান হয়।

নিকটের পেয়ারা গাছটির সঙ্গে লোকটি এই সময়ে পাঁঠাটাকে কসিয়া বাঁধিল। তারপর লিকলিকে সরু একটা বেত ঝোপ হইতে টানিয়া লইয়া পাঁঠাটাকে সে শপাশপ্ মারিতে লাগিল। অসহায় ছাগ-শিশুর কাতর চীৎকার বনের নিবিড় নীরবতাকে চিরিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দিল। তবুও সে ক্ষান্ত হইল না। উল্লাসে আটখানা হইয়া হা—হা করিয়া সে হাসিতে লাগিল।

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার মুখ দিয়া আচম্কা বাহির হইয়া গেল, "এই ব্যাটা।"

থত-মত খাইয়া হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বেতটি তাহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল।

ঝোপের আড়াল হইতে আমি বাহিরে আসিলাম, আগাইয়া গিয়া গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,

—'তুই এটাকে মারছিস কেন ?'

কিছুক্ষণ সে জবাব খুঁজিয়া পাইল না। তারপর গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিল, 'না, মারিনি।'

আমি তাহাকে ধমকাইলাম—'মারিসনি তুই ?'

—'আমার কেতটুকু খেয়েছে কি না—'

আমি জোরে তাহাকে একটা বকুনি দিলাম—"মিথ্যুক, চোর কোথাকার, চল তুই, থানায় যেতে হবে।"

ধপ করিয়া সে আমার পায়ের উপর বসিয়া পড়িল। দু'পায়ে মাথা কুটিয়া সে রুদ্ধশ্বাসে কহিল, "না, বাবু না ; আমি মেরেছি।"

অসহায় শিশুর মত সে এবার ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছোট গোল গোল চোখ দুটি আমার দিকে অপলকে তুলিয়া ধরিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত সে কি যেন একটা ভাবিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'কিন্তু কেন জানেন বাবু ?'

আমি একটু চমকাইয়া উঠিলাম। খোঁড়ার মুখে এই প্রথম বাঙ্গালা কথা শুনিলাম। পরিষ্কার বাঙ্গলায় সে কহিল, 'কিন্তু কেন জানেন বাবু, জেলে ঠিক তারাও আমাকে এমনি করে মারত। হাত হু'খানি পিছমোড়া বেঁধে দশ ঘা করে পিঠে!'

স্থির দৃষ্টিতে আমি তাহার চোখের ভিতর তাকাইলাম।

—'তুই জেলে ছিলি?'

মোটা হুপাটি দাঁত দেখাইয়া সে এবার হাসিয়া ফেলিল, 'হ্যাঁ বাবু। নর্দমার ভিতর দিয়ে তারপর পালিয়ে এসেছি। শালারা আমার আর নাগাল পায় নি।'

আমার অতি শৈশবের একটা দিনের কথা আজ মনে পড়িল। এখন ভাবিয়া তাহা বড় হাসি পায়। ভিতর বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া বিকালে আমাদের বাড়ীর পুরাণ বুড়ীঝি মার চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। আর মার পায়ের কাছে আমি আয়না লইয়া খেলিতেছিলাম। খেলা ভুলিয়া হঠাৎ আমি তাকাইয়া দেখিলাম, সামনে আয়নাটির মধ্যে একটি কোমল শিশু দন্তহীন হুপাটী মাড়ি দেখিয়া মিষ্টি হাসিতেছে, আর ছোট ডান হাতখানি বাড়াইয়া কাহাকে যেন ধরিতে চাহিতেছে। এই পুতুলটি পাইবার জন্য আমি তখন মহা কান্না জুড়িয়া দিয়াছিলাম।

একখানি মুকুরের মধ্যে এতদিন শুধু খোঁড়ার ছায়াটাই দেখিয়া আসিতেছি; এইবার তাহার আকৃতির দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম।

সে অনর্গল বকিয়া চলিল, 'তারপর নাম ভাঁড়িয়ে বেদেদের সাথে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

এক সময় নিজের কাটা বাঁ পা-খানি দেখাইয়া বলিল, প্রথম যখন পুলিশ তাহাকে ধরিতে আসে, সে পিছনের ছাদ থেকে মাটীতে লাফাইয়া পড়ে। তারপর যে কি হইয়া গেল, তাহার আর মনে নাই। হাসপাতালেই তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। পা-টাকে তখন কাটিয়া ফেলা হইয়াছে।

খোঁড়ার কাহিনী শুনিলাম।

তাহার কোন্ আত্মীয় না কি তাহার নাম রাখিয়াছিল, অরূপ। বিশ্রী, কাল শিশুটির পিট-পিটে চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া তাঁহার এই নামটিই না কি প্রথম মনে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহার এই পরিকল্পনায় আর একটি জিনিষ বাদ পড়িয়াছিল। অরূপ শুধু কুশ্রী নহে, তাহার মত হতভাগা বোধ হয় আর একটিও নাই এই দুনিয়ায়। রাতদুপুরে নিশুতি পল্লীকে মুখর করিয়া শাঁখ বাজাইয়া যে-রাত্রিতে তাহার শুভ আগমন-বার্ত্তাটা চারিদিকে ঘোষণা করা হইয়াছিল, সে রাত্রি আর প্রভাত হইল না। ভোর রাতে বুক-ফাটা কান্নার একটা রোল উঠিয়া সকলকে আবার মর্ম্মাহত করিয়া দিল। অরূপ মাকে তাহার আঁতুড়-ঘরেই হারাইল।

তাহাকে বড় করিয়া তুলিবার অজুহাতে তাহার বাবা অবশ্য শীঘ্র আর একটি নূতন-মা আনিয়া ঘরে তুলিলেন, কিন্তু কেন জানি না, অরূর জ্যেঠাই-মা এত দিন পরে বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া মাতৃহীন এই মাংস-পিণ্ডটিকে নিজের বুকে তুলিয়া লইলেন এবং তাহাকে বড় করিয়া তুলিবার সকল ভার নিজের কাঁধে চাপাইলেন।

দিন গুঁড়ি মারিয়া হাঁটিয়া চলিল। অরূপও ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

কী একটা আবদার করিয়া একদিন দুপুরে সে ছুটিয়া গিয়া জ্যেঠাইমার পিঠের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। 'মা' বলিয়া দুহাতে তাঁহার মুখখানি সযত্নে ফিরাইতে গিয়া, তাহার নজরে পড়িল, অনেক বয়সের একদল অপরিচিতা মেয়েদের সাথে তাহার জ্যেঠাই-মা তখন আলাপ করিতে-ছেন আর অভ্যাগতারা সকৌতুকে অরূর দিকে চাহিয়া আছে। লাজুক অরূ যাহা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া গেল।

'—কি বাবা, বল।' জ্যেঠাই-মা সস্নেহে তাহার দিকে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। অরূ কিন্তু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

'ঐ ক্ষীরোদের বড় ছেলেটি না? ও মা, অমন বানরের মত মুখ আবার মানুষের হয় না কি?' কে এক জন ভিড় হইতে তাহার জ্যেঠাই-মাকে জিজ্ঞাসা করিল। পিছন হইতে হাসিতে হাসিতে কে আবার শুধাইল, 'মরবার আগে পরী-বৌদি কোন্ ঝোপ থেকে একে কুড়িয়ে এনেছিল?'

তাহার কাল মুখখানি আরও মলিন হইয়া তখন বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। জ্যেঠাই-মা তাহা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া কহিলেন, 'তোমরা আমার বাছার অতো খুঁত দেখলে কোথায়? সে তো আর মেয়ে নয় যে বিয়ে আটকাবে—হ'লোই বা অমনি একটু।'

অরু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। পিছন হইতে শুনিতে পাইল, তাহার জ্যেঠাই-মার কথায় হাসির একটা উচ্চ রোল উঠিয়াছে নূতন অভ্যাগতাদের মধ্যে।

তাহার আজ চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে কি তবে খুব বিশ্রী আর বানরের মত দেখতে—সে নিজেকে শুধাইল। কই, তাহার জ্যেঠাইমা ত' কখনও তাহাকে এমন বলেন না। নির্জ্জন পুকুর পাড়ের দিকে সে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া যাইতেছিল। পথে ঝুন্তুর সঙ্গে দেখা। আম কাটিবার ঘসা ঝিনুক আর কলাপাতায় করিয়া নুন-লঙ্কা লইয়া সে তাহাকে ডাকিতে আসিতেছিল। পথে দেখা হইয়া যাওয়ায় কহিল, 'চল আম খাইগে অরুদা।'

ঠাস করিয়া অরু তাহার গালে খামাকা একটা চড় বসাইয়া দিল। ভ্যাঙাইয়া কহিল, 'হুঁ, খাবে!'

তারপর হু-হু করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া পুকুর-পাড়ের দিকে সে চলিয়া গেল।

তারপর হইতে সে নিজের সম্বন্ধে জাগিয়া উঠিল! সে যে কুশ্রী এবং তাহার এই কুশ্রীতা লইয়া সকলে তাহাকে নীরব উপেক্ষা করে—ইহা বুঝিতে তাহার আর কিছু বাকি রহিল না। এমন কি, সেদিন এই ইঙ্গিতটুকু বাড়ীর রাখাল চাকরটি পর্য্যন্ত দিয়া বসিল।

ঢিল ছুঁড়িয়া বাহির পুকুরটাকে ডিঙাইবার পাল্লা চলিয়াছিল। পাড়ার সকল ছেলেরা ইহাতে মাতিয়া গিয়াছে। অরুও মহা আগ্রহ লইয়া একটা ঢিল কুড়াইয়া লইল। কিন্তু ছুঁড়িবার আগেই মতি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'রেখে দিন বাবু, সে তুমি পারবে না। মরু বাবুর যেমন কার্ত্তিক ঠাকুরের মত চিয়ারা, কজ্জীর জোরও তেমনি।'

কথাটি সত্য। তাহার মত অত্যন্ত মোটা আর ভীষণ বেঁটে-খাটো ছেলের ঢিল ছুঁড়িয়া কোন লাভ নাই। কিন্তু মতি তাহাদের চাকর, তাহার মুখে সঙ্গীদের সামনে নিজের অপটুতার ইঙ্গিতে সে মরিয়া হইয়া উঠিল। রুখিয়া বলিল, 'দেখবি পারি কি না?'

বোঁ করিয়া হাতের ঢিলটা সে মতির মাথায় মারিয়া বসিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল-চড়ে তাহাকে আধমরা করিয়া তুলিল, 'বানর কোথাকার, আর ইয়ার্কি করবার জায়গা পাসনি তুই?'

নূতন-মার নিকট শাস্তি তাহার সেদিন খুব কম হইল না। হাতের পাঁচটা আঙুল তাহার সারা পিঠে স্পষ্ট বসিয়া রহিল। গলায় জোরে একটা ধাক্কা দিয়া তিনি তাহাকে উপুড় করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। চেঁচাইয়া কহিলেন, 'এ হনুমানটার জ্বালায় চাকর-বাকর দেখছি, বাড়ীতে আর টিকতে পারবে না।'

এ সব ছোট-খাট শাস্তি সে এখন গায়ের উপর গড়াইয়া লইতে শিখিয়াছে। কেন না, এ সম্বন্ধে এখন তাহার বেশ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে—সে এ বাড়িতে কে এবং তাহার স্থান কোথায়। কিন্তু একদিন যখন তাহার একমাত্র জ্যেঠাই-মাও তাহার কুশ্রীতার একটু আভাস দিয়া তাহাকে কটু তিরস্কার করিলেন, সে দিন সে নিজেকে বড় অসহায় মনে করিল। সামনেই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আমার সত্যিকারের মা নেই বলেই তো তুমি মা, আজকে আমাকে ও-কথা বললে।'

কথাটি জ্যেঠাই-মার বুকে গিয়া খচ্ করিয়া বিঁধিল। হাসিয়া তিনি তাহাকে সস্নেহে ডাকিলেন, 'ওরে পাগল, শোন্; রাগের মুখে কি বলে ফেলেছি বলে, তুই কি আমাকে সত্যি পর ঠাওরালি?'

অরু ততক্ষণে চাল হইতে ছিপ আর মাছ রাখিবার হাঁড়িটি লইয়া পুকুরে চলিয়া গিয়াছে। সত্যই ত' সে কি আর জানিত যে, তীরটি অমনি ভাবে ফসকাইয়া গিয়া জ্যেঠাই-মার দামী গরদের কাপড়খানাকে অতখানি ফুটো করিয়া দিবে? আর কাঠ-বিড়ালীগুলি কি কম জ্বালাতন করিতে সুরু করিয়াছিল? এই ত' সেদিন, জ্যেঠাই-মা একপাটি বড়ী বেলতলায় শুখাইতে দিয়া গেলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আসিয়া দেখিলেন, সব বড়ীগুলি কাঠ-বিড়ালীতে লুট করিয়া গিয়াছে। কত কষ্ট করিয়া তাই

সে ধনুকটি তৈয়ারী করিয়াছিল। কোন রকমে একটি কাঠবিড়ালী মারিয়া গাছে টাঙাইয়া রাখিলে, ভয়ে আর কোনটা আগাইবে না। ছিলাটি শেষে ফসকাইয়া গেল!

পুকুর-ঘাটে আসিয়া বঁড়শীতে কেঁচো গাঁথিয়া অরূ জলে ছিপ ফেলিল। তারপর হাত ধুইতে মুখ নীচু করিয়া সে হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। পুকুরের শান্ত জলের উপর একটা কালো ছায়া পড়িয়াছে। উহার নাকটি ঠিক পাতিহাঁসের মত চ্যাপ্টা। গোল-গোল চোখ দুটি উঁচু ভুরুর আড়ালে ডুবিয়া গিয়াছে। চোয়ালের হাড়দুটি উহার বিশ্রীভাবে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আর মাথাটিকে কে যেন সজোরে চাপিয়া কাঁধের উপর বসাইয়া দিয়াছে।

অরূর চোখদুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সে তাহার লোমশ হাত দুখানার দিকে তাকাইল। তারপর বাঁ হাতখানি তুলিয়া চ্যাপ্টা নাকটির উপর আস্তে আস্তে বুলাইতে লাগিল।

ধপ করিয়া হঠাৎ তাহার মাথার কাছে কি যেন পড়িল। চমকাইয়া উঠিয়া সে চাহিয়া দেখিল—তাহার পুঁটিমাছের হাঁড়িটি জলের উপর আধ-কাৎ হইয়া ভাসিতেছে। আর অপু কূলে দাঁড়াইয়া ছড়া কাটিয়া বলিতেছে, 'ভালুক ভায়া, ভালুক ভায়া, মাছ ধরেছ ক'টা? জলের উপর দেখছ বুঝি চাঁদ বদনটা?'

অরূ চারিদিক্ রাগে অন্ধকার দেখিল। ছোট ভাইয়ের নিকট হইতে এই অপমান সে আর সহ্য করিতে পারিল না। এক লাফে কূলে সে উঠিয়া আসিল। ছিপটি ঘুরাইয়া অপুর মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিয়া সে তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে ছিপটি ফেলিয়া দিল।

কোথায় পলাইয়া যাইয়া আত্মরক্ষা করিবে, সে আর ভাবিবার সময়ও পাইল না। ঘাড়ে রূঢ় হাতের একটা জোর ঝাঁকুনি খাইয়া সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল—পিছনে তাহার বাবা আসিয়া কখন দাঁড়াইয়াছেন। তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, 'অপুকে তুই ও ভাবে মারলি কেন?'

'ও আমাকে ভালুক বললে কেন? আমার সব কটা মাছ ফেলে দিয়েছে।'

'আমাকে ভালুক বলবে কেন!'…… তিনি অরূকে ভেঙাইলেন। কান দুটি ধরিয়া হিড়-হিড় করিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন 'ভালুককে ভালুক বলবে না, জানোয়ার কোথাকার? যা, দূর-হ, দূর-হ আমার সামনে থেকে।'

মানুষের দুর্ব্বলতা যেখানে জমিয়া ঘনীভূত হইয়া আছে, সেখানে যদি কেহ একটা মৃদু খোঁচা দেয়, মানুষের মন তখন বড় অসহায় হইয়া কাঁদিয়া উঠে। অরূর গণ্ড বহিয়া তাই দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। আর সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার বাবা তখন অপুকে প্রবোধ মানাইতেছেন, 'দিয়েছি বাবা ওকে আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে, কেঁদো না বাবা লক্ষীটি, ও-কি আর তোমার গায়ে হাত তুলতে পারে?'

·

অরূর জীবনের উপনয়ন পর্ব্বটা শুধু এইখানে আসিয়া সমাপ্ত হইয়া গেল না। ভালবাসিতে সেও একদিন গিয়াছিল। ধূপ-ধুনা জ্বালিয়া ষোড়শোপচারে সুন্দরের পূজা সেও আনিয়াছিল! কিন্তু সুন্দর অসুন্দরের দিকে—অরূপের দিকে, মুখ ফিরাইল না!

তাহাদের বাহির-বাড়ীর ছাদে অনেকগুলি অব্যবহৃত পাল্কী জমিয়াছিল। নিস্তব্ধ দুপুরে পাড়ার ছেলে-মেয়েরা রোজ আসিয়া এক একখানা পালকীর মধ্যে নিজেদের নকল ঘর-সংসার পাতিয়া খেলা করিত। সেদিনও তাহারা 'বউ-বউ' খেলিতেছিল। মেয়েদের ভিতর গুপ্তদের বকুল ছিল সকলের চাইতে বড় আর সুন্দরী। বিপুল আগ্রহে বুক বাঁধিয়া অরূ একদিন তাহাকে ভয়ে ভয়ে জানাইল, 'চল আজকে ভাই আমি আর তুই খেলি গে। তুই হবি ভাই বউ, আমি—!

সে আর বলিতে পারিল না। বকুল কিন্তু তখন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। কাল চোখ দুটি তুলিয়া অপুর দিকে তেরচা তাকাইয়া সে কহিল, 'শুনলি ত' অপুদা, এ বানরটা কি বলে? উনি আজকে আমার বর হবেন গো!'

তারপর এক সময় তাহাকে তাড়া দিয়া কহিয়াছে, 'যা, পালা—দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আর শোন, মতিকে বলিস ত কিছু ফুল নিয়ে আসতে।'

কিন্তু আশ্চর্য্য, এ-অন্ধরও একদিন বউ আসিয়াছিল!

সকলে বলা-বলি করিল—সে এবার বউ-য়ের রূপের আড়ালে নিজের কুশ্রীতাকে ঢাকিতে পারিবে।

কিন্তু সে পারিল কি? জীবন-মন্ত্রে সে তখন সম্পূর্ণ দীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। আপনার লোমশ কালো হাতের পাশে বধূর আলতা-গুলান নরম হাতখানি তাহার চোখে প্রতিদিন খোঁচা মারিতে লাগিল। টানা ভুরুর মাঝখানে বধূর সিঁদুরের লাল টিপটি খালি তাহাকে মনে করাইয়া দিতে লাগিল, কপালের উপর তাহার বিশ্রী কাটা দাগটার কথা। বধূর পাতলা দেহ-লতার নিকট নিজের স্থূল মাংসপিণ্ডটাকে অত্যন্ত দুর্ব্বিবহ বলিয়া তাহার মনে হইল।

কলসী লইয়া বধূ একদিন পুকুরে গিয়াছিল। ফিরিতে কেন একটু দেরী হইয়া গেল। বধূর পিছু পিছু গিয়া অন্ধ রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বধূর সামনে দাঁড়াইয়া খুব গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করিল, 'অত দেরী করলে কেন?'

বিস্মিত হইয়া বধূ স্বামীর দিকে চোখদুটি তুলিয়া ধরিল। ক্রূর হিংস্রতায় অন্ধর চোখদুটি তখন জ্বল-জ্বল করিতেছে। ভুরু দুটি কুঁচকাইয়া গিয়া কপালে তাহার কুটিল খাঁজ পড়িয়াছে। সে আবার ধমকাইয়া উঠিল, 'বল, কেন দেরী করলে?'

বধূ এ বার জবাব দিল। স্থির গলায় কহিল, 'জান না, একটু গল্প-সল্প করে এলাম। আমার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে ওরা বসে আছে কি না।'

'হ্যাঁ, জানাচ্ছি!'

এতদিনের সুপ্ত পশুটি আজ তাহার ভিতর জাগিয়া উঠিল। মাচার নীচ হইতে একখানি জ্বালানি-কাঠ টানিয়া লইয়া সে বধূর মাথায় মারিয়া বসিল। বলিল, 'রূপের অত দেমাক করা ভাল না বউ, বুঝলে?'

…বলিতে বলিতে খোঁড়া এক সময় থামিয়া গেল। তাহার মুখের শেষ কথাগুলি বহিয়া গিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলাম—নীল আকাশের বুকে চাঁদ কখন ডুবিয়া গিয়াছে। সুপ্ত বনস্পতির উপর নিবিড় ছায়া নামিয়াছে। আর সেই অস্পষ্ট নিঝুম অন্ধকারে খোঁড়ার হিংস্র-কুটিল চোখদুটি জ্বল-জ্বল করিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে আমার কানের কাছে কে শুধু বিড়-বিড় করিয়া বলিতে লাগিল, 'ওরাও বাবু, আমাকে এমনি করে মারত।'

ভুলভাঙ্গা

—শ্রীসত্যনারায়ণ দাশ

এত দুঃখ, এত ব্যথা ধরণীর খেলাঘরে করে কানাকানি,
বেদনার আঁখিজলে ঝরে বুঝি প্রতি পলে মরমের বাণী ;
আধভাঙ্গা মিঠে বুলি হেথাকার কথা ভুলি' মিশে কোথা যায়,
আধ সাঁজে অবিরত ঝরে পড়ে কলি কত মুরছিত বায়।
কেহ যদি দিত বলি বেদনাতে গলাগলি করে আঁখিলোর,
করিত না কভু ভিড় খেয়া-ঘাটে ধরণীর ছোট তরী মোর।

দূরে চলে যায় যারা হেথাকার পথ তারা ক্ষণিকেতে ভোলে
রিক্ত ও বীথিকায় শন্ শন্ খর বায় যে-কথাটি তোলে ;
হাহাকার ভরা নদী বহে যায় নিরবধি বন-উপবনে,
বিটপীর সুরগীতি তারি তীরে উঠে নিতি কাকলীর সনে।
অনুতাপ দুঃখ-জ্বালা ধরণীর বুকে ঢালা যদি জানিতাম,
গৃহীদের আঙিনায় খেলাঘর কভু হায় নাহি পাতিতাম।

বীণাতার স্নায় ছিঁড়ে জ্বালা বাতি আঁখিনীরে হয় শিখাহীন,
মুছে যায় রাঙ্গা ছবি তমসায় হেথা সবি হয়ে পড়ে লীন ;
যেই পাখী গায় গান উড়ে যায় কোনখান নিমিষের মাঝে,
ভুল মোর যায় ভাঙি মনপাত ওঠে রাঙি মৌন এ সাঁজে।
এত তাপ হলাহল বেদনার আঁখি-জল কেহ বলে নাই,
জানিতাম যদি আগে ঋষিদের পুরোভাগে যেতাম যে ভাই।

আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ

আয়ুর্ব্বেদের বৈশিষ্ট্য, আয়ুর্ব্বেদসেবিগণের দায়িত্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থায় সম্যক্ ভাবে আয়ুর্ব্বেদের পুনরুদ্ধার করিবার উপায় সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা আমার প্রধান উদ্দেশ্য।

চারিদিকে যে অনুসন্ধিৎসা এবং জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এতাদৃশ সময়ে আয়ুর্ব্বেদসেবীদিগের পক্ষ হইতে এই সম্মেলনের আহ্বান হওয়ায় তাঁহারা আমার ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।*

আজকাল সমগ্র মানব-সমাজে যতগুলি চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ, হাকিমী, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বাইওকেমী এবং হাইড্রোপ্যাথীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মানুষের যাহাতে ব্যাধি-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, ব্যাধি হইলেও পুনরায় যাহাতে আরোগ্য-লাভ সম্ভব হইতে পারে, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে মানুষকে যাহাতে বিধ্বস্ত হইতে না হয়, ইহা করাই সর্ব্ববিধ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য এক হইলেও উপরোক্ত ছয়টি চিকিৎসা পদ্ধতির প্রত্যেকটিই যে উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে সমানভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে বা করে, তাহা বলা চলে না।

আমার মতে, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বাইও-কেমী, হাইড্রোপ্যাথী প্রভৃতি যে সমস্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি গত দুইশত বৎসর হইতে মানবসমাজে অল্পাধিক পরিমাণে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি চিকিৎসাবিজ্ঞান সম্বন্ধে এক একটি পরীক্ষা (experiment) মাত্র, এবং চিকিৎসা-পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উহাদের কোন পরীক্ষাই সম্যক্ ভাবে সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

উপরোক্ত আধুনিক চিকিৎসা-পদ্ধতিগুলি যদি বাস্তবিক সাফল্য লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে তাহাদের অভ্যুদয়কালে মানবসমাজে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু, বিবিধ রোগের যাতনা, পুনঃ পুনঃ একই জীবনে বিবিধ রোগের আক্রমণ দেখা যাইত না। সমগ্র মানবসমাজের এতদ্বিষয়ক বাস্তব অবস্থা কার্য্যকারণের সঙ্গতির মাপ-কাঠি লইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, গত দুইশত বৎসর হইতে মানবসমাজের মধ্যে একদিকে যেরূপ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, সেইরূপ আবার রোগের সংখ্যা ও রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতেছে।

অকালমৃত্যুর হার যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সাক্ষ্য ১৮৭১ খৃঃ হইতে ১৯৩১ খৃঃ পর্য্যন্ত প্রতি ১০ বৎসরের যে সমস্ত লোক গণনার তালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিলে পাওয়া যাইবে। ১৯৩১ খৃঃ ও ১৯২১ খৃঃ, এই দুইটি বৎসরের লোকগণনার তালিকা পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, যে-ভারতবর্ষে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর হার শতকরা অল্পাধিক ৪৪ জন মাত্র ছিল, সেই ভারতবর্ষে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসরের অনূর্দ্ধ-বয়স্ক মানুষের মৃত্যুর হার দাঁড়াইয়াছে শতকরা অল্পাধিক ৬৭ জন। শুধু যে ভারতবর্ষেই অকালমৃত্যুর হার এতাদৃশ অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, ইউরোপ এবং ইউনাইটেড ষ্টেটের মানুষের মৃত্যুর হার পরীক্ষা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সে সকল স্থানেও অকালমৃত্যুর হার ভারতবর্ষের তুলনায় তত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় নাই বটে, কিন্তু উক্ত মহাদেশ-সমূহের পূর্ব্বাপর অবস্থা বিবেচনায় উহা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং যে হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আশঙ্কাপ্রদ। এই রূপভাবে জগতের হাসপাতালের সংখ্যা ও চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা দখিলে দেখা যাইবে যে, শুধু যে অকাল-মৃত্যুর হারই মানবসমাজে সর্ব্বত্র শঙ্কাপ্রদ-পরিমাণে বৃদ্ধি

* ২৮শে শ্রাবণ হইতে ৩১শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক মহাসম্মেলনের বনৌষধি বিভাগের সভাপতির অভিভাষণ হিসাবে পঠিত।

পাইয়াছে তাহা নহে, রোগের সংখ্যা ও রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর সর্ব্বত্রই উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়া চলিতেছে। লোক-গণনার তালিকা অথবা হাসপাতালসমূহের বাৎসরিক রিপোর্ট যাঁহাদের পক্ষে পরীক্ষা করা সম্ভব হয় না, তাঁহারা যদি স্ব স্ব পরিচিত পরিবারসমূহের কে কোন্ সময় কিরূপ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া থাকেন এবং কতদিন ঐ ব্যাধি-যন্ত্রণা তাঁহারা ভোগ করেন, কাহার কোন্ সময় মৃত্যু হয়, এবংবিধবিষয়ক ঘটনাগুলি লক্ষ্য করেন, তাহা হইলেও আমার উপরোক্ত মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারিবেন।

যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, গত দুইশত বৎসর হইতে অকাল-মৃত্যুর হার, অকালবার্দ্ধক্যের হার, রোগের সংখ্যা এবং রোগীর সংখ্যার হার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন বর্ত্তমান কালের প্রচলিত চিকিৎসা-পদ্ধতিসমূহের কোনটাই প্রশংসার যোগ্য নহে, তাহা যুক্তিসঙ্গতভাবে অস্বীকার করা যায় না। অন্যদিকে, দুইশত বৎসর আগে মানবসমাজে ব্যাধি, মৃত্যু ও রোগভোগের প্রসার কিরূপ ছিল, তাহা যথাযথ ভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, যতই পশ্চাতের দিকে পিছাইয়া যাওয়া যায়, ততই মৃত্যুর হার, রোগের প্রকার এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে।

অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, রোগের প্রকার ও রোগীর সংখ্যা একদিন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম ছিল এবং পরবর্ত্তী কালে উহার প্রত্যেকটি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, এই মন্তব্য যে, বাস্তব অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা সপ্রমাণিত হইলে সর্ব্বাধিক প্রাচীনকালে মানবসমাজে যে-চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল, তাহার উৎকর্ষ এবং বর্ত্তমান কালে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচলিত আছে, তাহার আপেক্ষিক অপকর্ষ অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

আমার মতে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে মানব-সমাজ একদিন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিল এবং তখন অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, রোগের প্রকার এবং রোগীর সংখ্যা অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সময় মানবসমাজ প্রত্যেক পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, উদ্ভিদ্ ও মানুষ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ চর ও অচর জীবের এবং খনিজ পদার্থের শরীরগঠন, সৃষ্টি, স্থিতি ও মৃত্যুর কারণসমূহ আমূলভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, সেইজন্য তখন প্রত্যেক চর ও অচর জীবের শরীরবিধান এবং প্রকৃতি ও বিকৃতি সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান নির্ভুলভাবে অর্জ্জন করিবার ও ঐ ঐ বিষয়ক প্রত্যেক সত্য প্রত্যক্ষ করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাও সম্ভবপর হইয়াছিল। এই জন্যই মানুষের নানাবিধ ব্যাধির কারণ, বিভিন্ন ব্যাধিতে শরীর-গঠনের ও শরীর-বিধানের বিশেষ পরিবর্ত্তন ও ব্যাধি-প্রতিষেধের উপায়-নির্দ্ধারণও সম্ভব হইয়াছিল। কি করিলে কোন ব্যাধি যাহাতে উৎপন্ন না হয়, তাহা করা সম্ভবযোগ্য, ব্যাধি উৎপন্ন হইলে, শরীরে কোন্ অংশের সহিত কোন্‌কোন্ বস্তুর কিরূপ ভাবে মিলনে সর্ব্ববিধ ব্যাধিকে তিরোহিত করা সম্ভবযোগ্য, এবংবিধ-বিষয়ক তথ্যগুলি মানুষের পক্ষে আমূলভাবে প্রত্যক্ষ করাও সম্ভব হইয়াছিল। যাহাদিগের সাধনায় এই সকল সম্ভব হইয়াছিল, তাঁহাদিগকে তখনকার দিনে সত্যদ্রষ্টা ঋষি বলা হইত।

কি করিলে কোন ব্যাধি যাহাতে মানবসমাজে উৎপত্তি লাভ করিতে না পারে, অথবা ব্যাধি উৎপন্ন হইলে উহা কি করিয়া জীবশরীর হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা সম্ভবযোগ্য হয়, তাহা ঋষিগণ নির্ভুলরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাৎকালিক জীবসমাজ ক্রমে ক্রমে একদিকে যেরূপ ব্যাধিক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল, সেইরূপ জলবায়ুর বিশুদ্ধি এতাদৃশ পরিমাণে সংঘটিত করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল যে, ব্যাধির উৎপত্তি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

আমার উপরোক্ত কথা যে কল্পনা-বিলাসীর কল্পনা মাত্র নহে, তাহা এদিকে যেরূপ মানবসমাজের বাস্তব অবস্থা (অর্থাৎ যতই বর্ত্তমান কালের দিকে আগুয়ান হওয়া যাইবে ততই অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, রোগের প্রকার, রোগীর সংখ্যার বৃদ্ধি, আর যতই পিছাইয়া যাওয়া যাইবে, ততই উহার হ্রাস দেখা যাইবে এতাদৃশ অবস্থা) হইতে সপ্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার ঋষিগণ তাঁহাদের প্রণীত বিবিধ গ্রন্থে কোন্ কোন্ বিদ্যা কিরূপভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা যথাযথ অর্থে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এতৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়।

বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় ১২০০০ বৎসরের প্রথম ৪০০০ বৎসরব্যাপী যে সময়, তাহাকে ঋষিগণ তাঁহাদের অভ্যুদয়-কাল বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। বর্ত্তমান কাল হইতে ৮০০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত সমগ্র মানব-সমাজে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, রোগের রকম এবং রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান কাল হইতে ৮০০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত মানব-সমাজের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, রোগের রকম এবং রোগীর সংখ্যা যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা জ্যোতিষ-সম্বন্ধীয় বেদাঙ্গ, যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের সহায়তায় প্রমাণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কাল হইতে ৮০০০ বৎসর আগে পর্য্যন্ত মানব-সমাজের মধ্যে অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই কথা হইতে ইহা যেন কেহ না বোঝেন যে, ৮০০০ বৎসর আগে চিরদিনই মানবসমাজ অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য এবং ব্যাধিযন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকিতে পারিয়াছিল।

কাল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ঋষিগণ যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তন্মধ্যে আমূলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রতি ১২০০০ বৎসরের ৪০০০ বৎসর অত্যন্ত সুসময়। তখন মানবসমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান বিকৃতি-হীন উজ্জ্বল মূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং সমগ্র জনসমাজ সাধারণভাবে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইয়া থাকে। তৎপরবর্ত্তী ৪০০০ বৎসরে মানবসমাজে বিস্মৃতি ও মোহমুগ্ধতা ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া পশুবৎ হইয়া পড়ে।

জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এতৎকালীন বিস্মৃতির ফলে তৎপরবর্ত্তী ৪০০০ বৎসরের মানুষের মধ্যে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া উহার পরাকাষ্ঠা ঘটিয়া থাকে। এই সময় অভাবের তাড়নায় মানুষ আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু মোহমুগ্ধতার ফলে প্রকৃত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

এইরূপে ঠকিয়া ঠকিয়া যখন মানবসমাজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত টলটলায়মান হয়, তখন পুনরায় মানুষ স্বভাবের নিয়মে সত্যের সন্ধান পাইয়া থাকে এবং তখন পুনরায় ঋষিদিগের অভ্যুদয় ঘটে।

এইরূপে প্রতি ১২০০০ বৎসরে একবার করিয়া ৪০০০ বৎসরব্যাপী ঋষিদিগের অভ্যুদয়-কাল ও সুসময়ের উদ্ভব, একবার করিয়া ৪০০০ বৎসর ব্যাপী বিস্মৃতি ও মোহমুগ্ধতার কাল এবং সর্ব্বশেষ এইরূপ করিয়া ৪০০০ বৎসরব্যাপী দুঃসময়ের কাল দেখা দিতেছে। ঋষিগণ কালের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনকে কালচক্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং এই কালচক্রের আবর্ত্তনে মানবসমাজে সর্ব্বব্যাপী সুসময়ের পর সর্ব্বব্যাপী বিস্মৃতি ও মোহমুগ্ধতার এবং সর্ব্বব্যাপী বিস্মৃতি ও মোহমুগ্ধতার পর সর্ব্বব্যাপী চাঞ্চল্য ও দুঃসময়ের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

ঋষিগণ প্রণীত উপরোক্ত কাল-বিজ্ঞানের দিকে লক্ষ্য করিলে বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে মানব-সমাজ একদিন উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইয়াছিল এবং তখন অকালমৃত্যু, অকাল-বার্দ্ধক্য, রোগের রকম এবং রোগীর সংখ্যা সর্ব্বাধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য মানুষ একদিন সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পরিয়াছিল বলিয়াই মানবসমাজ সাধারণভাবে রোগযন্ত্রণা ও রোগের আক্রমণ হইতে সম্যক্ পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল এবং জগতের সর্ব্বত্র একই রকমের চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচলিত হইয়াছিল। মানবসমাজ সাধারণভাবে রোগ-যন্ত্রণা ও রোগের আক্রমণ হইতে সম্যক্ পরিমাণে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল বলিয়াই পরবর্ত্তীকালে মানুষের আর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের তাদৃশ চর্চ্চা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, এবং ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত নির্ভুল চিকিৎসাবিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বিস্মৃতির গর্ভে নিপতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কাল হইতে ৪০০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০০০ বৎসরকে উপরোক্ত বিস্মৃতির কাল ব লিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

এই বিস্মৃতির কালের পর পুনরায় মানবসমাজের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র রোগের যন্ত্রণা ও রোগের আক্রমণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মানুষ

বাধ্য হইয়া পুনরায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান কাল হইতে পূর্ব্ববর্ত্তী ৪০০০ বৎসর ধরিয়া এই গবেষণা চলিতেছে। প্রয়োজন পূরণের জন্য মানুষ বাধ্য হইয়া পুনরায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে বটে, কিন্তু যে সাধনানিরত হইলে সঠিক ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রে সম্পূর্ণভাবে নিপুণতা লাভ করা সম্ভব হয়, সেই সাধনার সন্ধান মানুষ এখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই। ঐ সাধনার সন্ধান মানুষ বাহির করিতে সক্ষম হয় নাই বলিয়া মিশরীয়গণ ও গ্রীকগণ, রোমানগণ ও বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের গবেষণার ফলে যে সমস্ত চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মানবসমাজকে রোগের আক্রমণ ও রোগের যন্ত্রণা হইতে অথবা অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও মুক্ত করা সম্ভব হয় নাই, পরন্তু উপরোক্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে রোগের রকম, রোগীর সংখ্যা, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

কোনও গ্রন্থে নির্ভুল ভাবে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় কি না, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণ ঐ বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় তাঁহাদের চারিটি বেদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু বেদে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রই লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বেদের মধ্যে নির্ভুল ভাবে সম্যক্ পরিমাণে পাওয়া যায়। যেরূপ মানুষের অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য বেদের মধ্যে শৃঙ্খলিত ভাবে পাওয়া যায়, সেইরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রও যে, উহার মধ্যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা বেদের ভাষা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। এইখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, বেদে যদি চিকিৎসা-শাস্ত্র এত নির্ভুল ভাবে লিপিবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে এক্ষণে উহা অধ্যয়ন করিয়াও শৃঙ্খলিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না কেন?

যথাযথ ভাবে ইহার উত্তর দিতে হইলে আমাকে বলিতে হইবে, বেদের ভাষা যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। মানুষের যত কিছু জ্ঞাতব্য আছে, তাহার প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়টি তিন ভাগে বিভক্ত। উহার কতিপয় অংশ প্রকাশিত অথবা ব্যক্ত (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য); কতিপয় অংশ স্থূল ভাবে অপ্রকাশিত অথচ সূক্ষ্ম ভাবে প্রকাশিত; এই অংশকে দার্শনিক ভাষায় অব্যক্ত (অর্থাৎ মনমাত্র গ্রাহ্য) বলা হইয়া থাকে। মানুষের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে ব্যক্ত ও অব্যক্ত অংশ ছাড়া আর একটি অংশ আছে, যাহা সম্পূর্ণ ভাবে সাধারণ মানুষের কাছে সর্ব্বদাই অপ্রকাশিত থাকে। মানুষের প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে এই তৃতীয়াংশটি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়াই প্রত্যেক বিষয়ের অব্যক্ত ও ব্যক্ত অংশের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হইতেছে। এই অংশটি সাধারণ মানুষের কাছে কখনও প্রকাশিত হয় না বটে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে কখনও সক্ষম হন না বটে, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান্, তাঁহারা শৃঙ্খলিত ভাবে এই অংশটিকে জ্ঞানগোচর করিবার জন্য যত্নশীল হইলে উহা বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। দার্শনিক ভাষায় এই অংশটিকে বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ বলা হইয়া থাকে। মানুষের যত কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহার প্রত্যেকটিই যে ব্যক্ত, অব্যক্ত এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ, এই তিনটি অংশ লইয়া সম্পূর্ণ, তাহা যে কোন বস্তু উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ করিলে পরিস্ফুট হইবে। মানুষের হস্তের কথা ধরিলে, উহার উপরিভাগের চর্ম্ম, উহার দৈর্ঘ্য ও আয়তন প্রভৃতি কতকগুলি অংশ ব্যক্ত বটে, কিন্তু কেন যে 'হস্ত' চক্ষু, কর্ণ অথবা পদ প্রভৃতির মত না হইয়া এইরূপ হইল এবং হস্তের স্পর্শশক্তি যে কোথা হইতে আসিল, তাহা সম্পূর্ণভাবে ইন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রকাশিত। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, যে যে কারণ বশতঃ হস্তের তাদৃশরূপ দৈর্ঘ্য, আয়তন এবং স্পর্শশক্তি হইয়া থাকে, তন্মধ্যে কতিপয় অংশ মনের দ্বারা অনুভব করিতে হয়, আর বাকি অংশ বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তের ব্যক্তাংশ, অব্যক্তাংশ এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা না যায়,

ততক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তখানিকে সম্পূর্ণভাবে বুঝা সম্ভব হয় না; সুতরাং হস্তখানিকে ত্রিবিধাংশে বিভক্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

ব্যক্তাংশ সম্বন্ধীয় বর্ণনার ভাষা যেরূপ ব্যক্ত হইতে পারে, অব্যক্তাংশ অথবা বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ সম্বন্ধীয় বর্ণনার ভাষা সেইরূপ ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না। বস্তুর অব্যক্ত এবং বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশ যেরূপ মন ও ও বুদ্ধির সহায়তায় অনুভব করিতে হয়,সেইরূপ উহার বর্ণনার ভাষা ও মন ও বুদ্ধি দ্বারা শিক্ষা করিবার প্রয়োজন হয়। বেদাঙ্গের সহায়তায় গবেষণা করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, বেদ যাবতীয় বস্তুর অব্যক্ত ও বুদ্ধিগ্রাহ্যাংশের কথায় পরিপূর্ণ। যখন মানুষ মন ও বুদ্ধিকে নিজ দেহাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হয়, তখন মানুষের পক্ষে সেই সকল বেদ ও বেদাঙ্গ যথাযথ অর্থে বুঝা সম্ভব হয়। একদিন ছিল, যখন মানব-সমাজে মন ও বুদ্ধিকে অনুভব করিবার মত মানুষ বিদ্যমান ছিল এবং তখন মানুষের পক্ষে বেদ ও সংহিতা সুবোধ্য ছিল। কালক্রমে মন ও বুদ্ধিকে অনুভব করিবার কৌশল যতদিন মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে, তদবধি মানুষের পক্ষে উহা যথাযথ অর্থে বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার জন্য আধুনিক কালে বেদ অধ্যয়ন করিয়াও উহার মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সম্যক্ সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য। চারিখানি বেদের মধ্যে যে, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র শৃঙ্খলিত ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি, তৎসম্বন্ধে গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বপ্রথমে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাফল্য সম্পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ক জ্ঞান অপরিহার্য্য (essential), তাহা সাধারণ বুদ্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি যে, (১) যাহাতে রোগাক্রান্ত হইলে অনায়াসে উহা হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এবং (২) যাহা করিলে রোগাক্রমণ না ঘটে, তাহা করা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্যতম দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য। এই দুইটি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে সফলকাম হইতে হইলে যে, প্রথমতঃ মানুষ কোন্ কোন্ অবয়বের দ্বারা গঠিত ও কি করিয়া ঐ অবয়বসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, দ্বিতীয়তঃ কোন্ কোন্ কার্য্যশক্তি লইয়া মানুষের সম্পূর্ণতা ও কি করিয়া ঐ কার্য্যশক্তিসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এবং তৃতীয়তঃ মানুষের অবয়বের ও কার্য্যশক্তির সহিত মানুষের অন্যান্য চর ও অচর জীবের অবয়বের ও কার্য্যশক্তির কি কি সম্বন্ধ, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

মানুষ কোন্ কোন্ অবয়বের দ্বারা গঠিত এবং কি করিয়া ঐ অবয়বসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের শরীরাভ্যন্তরে যত কিছু অবয়ব আছে, তাহা অসংখ্য নামের দ্বারা অসংখ্য সংখ্যায় বিভক্ত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু মূলতঃ ঐ অবয়বসমূহকে (১) মেদ (২) অস্থি (৩) মজ্জা (৪) বসা (৫) মাংস (৬) রক্ত এবং (৭) চর্ম্ম, এই সাত ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে এবং এই সাত ভাগের প্রত্যেক ভাগের প্রাথমিক উপাদান—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্। ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম্,এই পাঁচটি প্রাথমিক উপাদান, কোন্ কোন্ উপাদান হইতে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মূলে রহিয়াছে বায়ু, তেজ ও রস, এবং বায়ু, তেজ ও রসের সৃষ্টি হইতেছে ব্যোম্ হইতে। ছয়টি বেদাঙ্গের সহায়তায় ঋষিদিগের ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের মতে ব্যোম্ হইতে বিশুদ্ধ বায়ুর সৃষ্টি হইতেছে, বিশুদ্ধ বায়ু হইতে অপ্ নামক একটি শক্তির উদ্ভব হইতেছে। বিশুদ্ধ বায়ু ও অপ্ মিলিত হইয়া অম্বুর উদ্ভব হইতেছে। বিশুদ্ধ বায়ু, অপ্ ও অম্বু মিলিত হইয়া বহ্নির সৃষ্টি হইতেছে। বিশুদ্ধ বায়ু, অপ্, অম্বু, ও বহ্নি, এই চারিটি পদার্থের মিশ্রণ হইতে মিশ্রিত বায়ু, তেজ, ও রস অথবা মিশ্রিত বায়ু, পিত্ত এবং কফের উৎপত্তি হইতেছে এবং মিশ্রিত বায়ু, পিত্ত এবং কফ হইতে যথাক্রমে মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হইয়া মানুষের বিবিধ অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি সাধিত হইতেছে। আমরা সাধারণতঃ যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া থাকি, তাহা হইতে মনে হয় যে, অপ্, অম্বু, রস ও জল একার্থক্ এবং বহ্নি, তেজ ও অগ্নি প্রভৃতি শব্দও একার্থক। ঋষিদিগের শব্দতত্ত্বে সম্যক্‌ভাবে প্রবিষ্ট

হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ শব্দগুলি একার্থক নহে, পরন্তু প্রত্যেক শব্দটি অন্যান্য শব্দ হইতে অনেক পরিমাণে বিভিন্নার্থক। মানুষের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের মূল উপাদান যে ব্যোম্, বিশুদ্ধ বায়ু, অপ্, অগ্ন, বহ্নি, মিশ্রিত বায়ু (অথবা মরুৎ), তেজ, রস, পিত্ত, কফ, মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, ও চর্ম্ম; তন্মধ্যে ব্যোম, বিশুদ্ধ বায়ু, অপ্ এবং অগ্ন, এই চারিটি পদার্থ বুদ্ধিগ্রাহ্য, এই চারিটি পদার্থকে কখনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। মিশ্রিত বায়ু অথবা মরুৎ, তেজ, রস, পিত্ত, কফ ও মেদ, এই ছয়টি পদার্থকেও কখনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ করিতে হয় অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা; ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় কেবল মাত্র অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মকে। মানুষ কোন্ কোন্ অবয়বের দ্বারা গঠিত এবং কি করিয়া ঐ অবয়বসমূহের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আরও দেখা যাইবে যে, মানুষের অবয়বের যে উপাদান বুদ্ধিগ্রাহ্য, সেই উপাদানগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে অতীন্দ্রিয় উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথাযথভাবে জানা সম্ভব হয় না; আবার অতীন্দ্রিয় উপাদানগুলি অনুভব করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানগুলি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি যথাযথ ভাবে জানা সম্ভব হয় না। মানুষের অবয়বের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপাদানসমূহের নির্ভুল জ্ঞান অতীন্দ্রিয় উপাদানসমূহের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল; এবং অতীন্দ্রিয় উপাদানসমূহের নির্ভুল জ্ঞান বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদানসমূহের উপলব্ধি করিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল; এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিলে অনায়াসেই বুঝা যাইবে যে, মানুষের শরীর-গঠন-প্রণালী (anatomy) নির্ভুলভাবে ও সম্যক্ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে মানুষের ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি কি কি বস্তু এবং কি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের শক্তির উদ্ভব হয় এবং শরীর অভ্যন্তরে তাহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব গণ্ডী কতখানি, তাহা কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে নিপুণতা লাভ করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত নিপুণতা কি করিয়া লাভ করা সম্ভব, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলে দেখা যাইবে যে, উহার তথ্য অথর্ব্ববেদের প্রথম এগারটি অধ্যায়ে অন্যান্য কথার সহিত অতি পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, আর কি করিয়া ঐ ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি এবং তাহাদের কার্য্যকে শরীরাভ্যন্তরে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহার প্রণালী অভ্যাস করিবার উপায় সামবেদের বিভিন্ন স্থানে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরোক্ত নিপুণতা কি করিয়া লাভ করা সম্ভব, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইলে আরও দেখা যাইবে যে, উহার অভ্যাসের প্রণালী সামবেদ ও অথর্ব্ববেদে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আর কোনও দেশের গ্রন্থে সেইরূপভাবে লিপিবদ্ধ নাই। মানুষের অঙ্গের গঠন-প্রণালী নির্ভুল ভাবে সম্যক্ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি-সম্বন্ধীয় তথ্যগুলি সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিবার প্রণালীতে অভ্যস্ত হইবার প্রয়োজন আছে, তাহা পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিশারদগণ বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। তাঁহারা উহা বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া মৃতদেহে অস্ত্রোপচারের দ্বারা মানুষের শরীর-গঠন প্রণালী নির্দ্ধারণ করিবার উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। মৃতদেহে অস্ত্রোপচারের দ্বারা মানুষের শরীর-গঠন-প্রণালী কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুমান করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ উপায়ে শরীর-গঠন-প্রণালী সম্পূর্ণ পরিমাণে নির্ভুলভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যে সম্ভব নহে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই সাধারণ বুদ্ধি দ্বারাও বুঝা যাইতে পারে, কারণ মানুষের সজীবদেহ আর মৃতদেহ কখনও সর্ব্বতোভাবে একরূপ হইতে পারে না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, মানুষের শরীর গঠন-প্রণালী (anatomy) কি উপায়ে নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা বেদে লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিশারদগণ তাহা স্থির করিতে পারেন নাই।

সেইরূপ আবার মানুষ কোন্ কোন্ শক্তির সমাবেশে পরিচালিত, অর্থাৎ কি কি লইয়া মানুষের শরীর-বিধান (physiology), তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলেও

দেখা যাইবে যে, ঐ সম্বন্ধে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করিবার উপায় ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে যেরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আর কোনও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই এবং ঐ সম্বন্ধেও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা-বিশারদগণ যে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। অভিনিবেশসহকারে একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, মানুষ যে মানুষের মত চলাফেরা করে, তাহার মূল কারণ মানুষের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধগ্রহণের শক্তি। এক কথায়, মানুষের বিশিষ্ট শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-গ্রহণের শক্তি লইয়াই তাহার মনুষ্যত্ব এবং নির্ভুলভাবে মানুষের শরীর-বিধান (physiology) পরিজ্ঞাত হইতে হইলে কি করিয়া তাহার শরীরাভ্যন্তরে শব্দ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি, রূপ-শক্তি, রস-শক্তি, গন্ধ-শক্তির উদ্ভব হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার উপায় পরিজ্ঞাত হইতে হয়। জীবন্ত শরীরমধ্যে ঐ পাঁচটি শক্তি প্রত্যক্ষ কি করিয়া করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে আর কোন উপায়ে মানুষের শরীর-বিধান নির্ভুলভাবে সম্পূর্ণ রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, ইহাও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। বেদাঙ্গের সহায়তায় পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে পারিলে তন্মধ্যে যথাযথ অর্থে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় এবং তখন দেখা যাইবে যে, জীবের শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস ও গন্ধ-সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্যই অথর্ব্ববেদে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গ্রহণের তথ্য অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে সূত্রাকারে বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। রূপ, রস ও গন্ধ-সম্বন্ধীয় তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া উত্তরমীমাংসায় যথাযথ অর্থে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া মানুষের স্পর্শ-শক্তি হইতে রূপ, রস ও গন্ধ-শক্তির উদ্ভব হইতেছে এবং শব্দ-শক্তির সহিত স্পর্শ-শক্তির কি সম্বন্ধ, তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য ঐ গ্রন্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ, বৈশেষিক দর্শন, গৌতমসূত্র এবং উত্তর-মীমাংসায় জীবের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-শক্তির সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিবার প্রণালী রহিয়াছে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদের মধ্যে। জীবন্ত শরীরের মধ্যে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি মানুষের মূল পাঁচটি শক্তি কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়, ঐ মূল পাঁচটি শক্তি হইতে যে বিভিন্ন শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা কি করিয়া পরিজ্ঞাত হইতে হয়, তাহা লইয়া ঋষিদিগের এতদ্বিষয়ক কথা। এইরূপ ভাবে ঋষিগণ জীবের শরীর-বিধান (physiology) সম্বন্ধে সমস্ত কথা সম্যক্ ভাবে সম্পূর্ণ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী আর কোন গ্রন্থে ঐ সম্বন্ধীয় কোন কথা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পাওয়া যায় না। শরীর-বিধান সম্বন্ধীয় যে সমস্ত গ্রন্থ আধুনিক কালে প্রচলিত আছে, তাহার মূল রহিয়াছে Albrecht Von Haller-এর Elements of Human Physiology নামক গ্রন্থে।

ঐ গ্রন্থে শরীর-বিধান সম্বন্ধীয় যে উল্লেখ আছে, তাহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও লওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু উহা যে মূলতঃ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসের অযোগ্য, তাহা গোঁড়ামি পরিত্যাগ করিয়া বিচারশীল হইলে স্বীকার করিতে হইবে।

পাশ্চাত্ত্যগণ মানবের শরীর-বিধান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য আর একটি শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার নাম Experimental Physiology। Magendie এই শাস্ত্রের প্রধান প্রবর্ত্তক। শরীর-বিধানের কোন কোন অংশ সম্বন্ধে আমেরিকার Beumont নামক পণ্ডিত কতগুলি মৌলিক কথা প্রচার করিয়াছেন। Magendie সাহেব যে সমস্ত কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা অনুধাবন করিলেও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শরীর-বিধান শাস্ত্র যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

মানুষের শরীর-গঠন-প্রণালী (anatomy) ও শরীর-বিধান (physiology) সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যগণের মধ্যে যে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, পরন্তু ভারতীয় ঋষিগণ ঐ ঐ সম্বন্ধে যে যে বিজ্ঞান-শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যে সম্পূর্ণ ও ভ্রম-প্রমাদ-হীন, ইহা যেরূপ প্রমাণিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্র সফল করিতে হইলে যে-তৃতীয় বিদ্যার (অর্থাৎ, মানুষের অবয়ব ও কার্য্যশক্তির সহিত মনুষ্যেতর অন্যান্য চর ও অচর জীবের অবয়বের ও কার্য্যশক্তির কি কি সম্বন্ধ, তৎসমুদয় বিদ্যা) প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান

করিলেও দেখা যাইবে যে, উহাও যেরূপ শৃঙ্খলিত ভাবে ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা অন্য কোন পরবর্ত্তী গ্রন্থে অথবা আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই।

মানুষের কোন্ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অথবা কোন্ কার্য্যশক্তিতে ব্যাধি, তাহা জানিতে হইলে যেরূপ শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান শাস্ত্র সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার ঐ ব্যাধি নিরাময় করিতে হইলে, কেন ঐ ব্যাধির উৎপত্তি হইয়াছে এবং কোন্ বস্তু বা কার্য্যের সংযোগে ঐ বিকৃতিকে দূরীভূত করা সম্ভব, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের, অথবা কার্য্যশক্তির কোন্ বিকৃতির ফলে কোন্ ব্যাধির উৎপত্তি হয় এবং কোন্ বস্তু বা কার্য্যের সংযোগে ঐ বিকৃতিকে দূরীভূত করা সম্ভব, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে, মানুষের বিভিন্ন অবয়ব ও বিভিন্ন কার্য্য-শক্তির সহিত অন্যান্য চর ও অচর জীবের বিভিন্ন অবয়বের ও কার্য্যশক্তির কি কি সম্বন্ধ, তাহা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। ইহাকেই প্রচলিত ভাষায় ভৈষজ্য প্রকরণ কহে। বনৌষধি প্রকরণ এই ভৈষজ্য প্রকরণের অন্তর্গত। মানুষের বিভিন্ন অবয়ব ও বিভিন্ন কার্য্যশক্তির সহিত অন্যান্য চর ও অচর জীবের বিভিন্ন অবয়ব ও বিভিন্ন কার্য্য-শক্তির কি কি সম্বন্ধ,তাহা নির্ভুলভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে যে, একদিকে যেরূপ মানুষের শরীরগঠন ও শরীর-বিধান প্রণালী সম্যক্‌ভাবে ও সম্পূর্ণ রকমে পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার অন্যান্য চর ও অচর জীবের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান-প্রণালী সম্যক্‌ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, ইহা একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে।

কাযেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, মানুষের শরীর গঠন ও শরীর-বিধান শাস্ত্র সম্যক্‌ভাবে নির্ভুল রকমে পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে বিশ্বাসযোগ্য ভৈষজ্য প্রকরণ সম্বন্ধীয় বিদ্যার উদ্ভব হইতে পারে না।

এই যুক্তির অনুসরণ করিলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, যখন দেখা যায় যে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্যগণের মধ্যে নির্ভুল শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান বিদ্যা বিদ্যমান নাই, তখন তাহাদের ভৈষজ্য বিদ্যাও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে।

অথর্ব্ববেদের একাদশ অধ্যায় হইতে ষোড়শ অধ্যায় পর্য্যন্ত যথাযথ অর্থে অনুসরণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সমস্ত চর ও অচর জীবের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান-প্রণালী, ঐ ঐ চর ও অচর জীবের উপাদান ও কার্য্যশক্তির সহিত মানুষের বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন উপাদানের ও কার্য্যশক্তির কি কি সম্বন্ধ এবং ঐ ঐ তথ্য কি রূপে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহা অতীব শৃঙ্খলিতভাবে বিবৃত রহিয়াছে। বনৌষধি সম্বন্ধে অনুসন্ধানপ্রয়াসী হইলে, কোন্ গাছটির যে কি নাম, তাহা স্থির করিতে প্রায়শঃ আমরা প্রয়াস অনুভব করি।

ভারতের সমতল মালভূমিতে তৃণ, লতা, তরু, গুল্মের অভাব নাই। এই সকল উদ্ভিদের ভৈষজ্য গুণবৈচিত্র্যেরও শেষ নাই। তাই ঋষি বলিয়াছেন, কিঞ্চিদভেষজমস্তি।

জল, বায়ু ও মৃত্তিকার সহিত মানব-শরীরের সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ। এই ঘনিষ্ঠতার জন্যই শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, "যস্য দেশস্য যো জন্তুস্তজ্জং তস্যৌষধং হিতম্।" এই বচনের যুক্তি বুঝাইবার জন্য বাগ্‌জাল বিস্তার করিবার আবশ্যকতা নাই, ইহা সহজবুদ্ধির অধিগম্য। এই বনৌষধি ব্যবহার বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ যে সকল বিধি-ব্যবস্থার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা যেরূপ সুবিস্তৃত সেইরূপ সুচিন্তিত। উদ্ভিদের সকল অংশই ঔষধার্থে ব্যবহার হইত—"মূল-ত্বক্-সার-নির্য্যাস-নাড়-স্বরস-পল্লবাঃ, ক্ষারাঃ ক্ষীরং ফলং পুষ্পং ভস্ম তৈলানি কণ্টকাঃ। পত্রাণি শুঙ্গাঃ কন্দাশ্চ প্ররোহশ্চোদ্ভিদো গণঃ।" কিন্তু, একই উদ্ভিদের সকল অংশ সমগুণ অথবা ভেষজগুণ-সম্পন্ন নহে। "সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং" প্রভৃতি বচনে এই বিষয়ের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন অনুসারে একই উদ্ভিদে বিভিন্ন গুণের আধান ও একই গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। এই প্রাকৃতিক তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ত্বক্, মূল ও পত্রাদি আহরণ করিবার জন্য বৎসরের বিশেষ বিশেষ সময়ের নির্দ্দেশ আছে। এই সকল নির্দ্দেশ যেরূপ সুবিন্যস্ত, সুসম্বদ্ধ ও সুবিভক্ত, তাহাতে স্বতই মনে হয় যে, ইহাদের পশ্চাতে অনন্ত শক্তিশালী মহাপুরুষবৃন্দের সুগভীর চিন্তা, পরীক্ষা, গবেষণা নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু গুরুশিষ্যপরম্পরায় উপদেশ আদান-প্রদানের ব্যাঘাত হওয়ায় এবং উদ্ভিদসমূহের নাম বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে প্রচলিত থাকায় বোধসৌকর্য্যের হানি ঘটিয়াছে।

ঋষিদিগের ভৈষজ্যপ্রকরণে সোমলতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে। বাস্তবিক বেদ ও বেদাঙ্গে সোমলতার বিবরণ পাঠ করিলে বিস্ময়ান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। অধুনা-বিলুপ্ত এই অপূর্ব্ব ভেষজের গুণবর্ণনায় শুক্ল-যজুর্ব্বেদের দ্বাদশ অধ্যায় পরিপূর্ণ। আচার্য্য সুশ্রুত তাঁহার সংহিতার একোনত্রিংশ অধ্যায়ে সোমলতার ভেষজার্থ প্রয়োগের যে বিধান দিয়াছেন, তাহা যেমনই অপূর্ব্ব তেমনই বিস্ময়প্রদ। সোমপানেচ্ছু ব্যক্তির প্রথম প্রয়োজন গৃহ। এ গৃহ সাধারণ গৃহ নহে। একটি গৃহের মধ্যে আর একটি, তাহার মধ্যে আর একটি, এইরূপ ত্রিবৃত গৃহের তৃতীয় গর্ভ-কুটীরে বমনবিরেচনাদি দ্বারা পরিশুদ্ধদেহ সোমপায়ী অগ্নিষ্টোম বিধান মতে হোম এবং মঙ্গলাচরণ করিয়া সুবর্ণসূচী দ্বারা সোমলতার কন্দ বিদীর্ণ করিয়া তাহার ক্ষীর পান করিবে। তারপর সোম জীর্ণ হইলে প্রথমে বমন, তাহার পর শোণিতযুক্ত কৃমিমিশ্রিত বমন, তৃতীয় দিনে কৃমিমিশ্রিত ভেদ, চতুর্থ দিনে শোথ এবং সর্ব্বাঙ্গ হইতে কৃমি নিষ্ক্রমণ, সপ্তম দিবসে শরীর মাংসহীন হইয়া ত্বক্ ও অস্থিমাত্র অবশিষ্ট থাকে। তাহার পর হইতে শরীর নবজন্ম পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। দশরাত্রি পরে সোমপায়ীকে দ্বিতীয় গর্ভ-কুটীরে এবং তাহার দশ রাত্রি পরে তৃতীয় গর্ভ-কুটীরে বাস করিবার পর বাহিরে আসিয়া পুনরায় দশ দিনের জন্য কুটীরাভ্যন্তরে বাস করিতে হইবে।

মালবাজী কায়কল্প-চিকিৎসাধীন হওয়ায় দেশব্যাপী সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু, আমাদিগের শাস্ত্রে ছোটবড় কত প্রকার রসায়ন সেবনের বিধান রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। অথচ, ইহার প্রযোজ্য-প্রযোজকের অভাবে সকল বিদ্যাই পুস্তকস্থ হইয়া রহিয়াছে। সুশ্রুত-সংহিতায় স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে—

"ন তান্ পশ্যন্ত্যধর্ম্মিষ্ঠাঃ কৃতঘ্নাশ্চাপি মানবাঃ।
ভেষজদ্বেষিণশ্চাপি ব্রাহ্মণ-দ্বেষিণস্তথা।"

আমাদের পূর্ব্ব সম্পদ্ ফিরাইয়া পাইতে হইলে আমাদের অন্তরও করিতে হইবে পূর্ব্বতন ঋষিদিগের অনুকরণে, যথাশক্তি কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, তারপর সেই নির্ম্মল মনের একাগ্র সাধনায় লুপ্ত সম্পদের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে হইবে।

কত বনৌষধি যে কত দেশে কত ছদ্মনামে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? একটা উদাহরণ দিতেছি—শাস্ত্রে ঘোষা, দেবদালী প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া—আমি বহুদিন যাবৎ উহার অনুসন্ধানে নিরত ছিলাম। কয়েক বৎসর হইতে চলিল, একজন পণ্ডিতের নিকট আমি ঘোষাফলের সন্ধান পাই। শাস্ত্রনির্দ্দেশ মত উহা ব্যবহার করিয়া অতি অদ্ভুত ফল পাইয়াছি। এই ফলের ভৈষজ্য ব্যবহার এ অঞ্চলে সুপরিচিত নহে। ঘোষা ফলের প্রকারভেদ অনেক। আমি অনেক চেষ্টায় মাত্র দুই প্রকার ঘোষা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। শিরোবিরেচন হিসাবে, ঊর্দ্ধশ্লেষ্মা ও উন্মাদ রোগে ঘোষার ব্যবহারে আমি প্রভূত উপকার পাইয়াছি। শুধু আমি নহে, আমার নিকট লইতে, ইহার ব্যবহার পরিজ্ঞাত হইয়া অন্য কয়েকজন চিকিৎসক উক্ত প্রকার ক্ষেত্রে এই ফলের ব্যবহারে অনুরূপ উপকার দেখিতে পাইয়াছেন। আর একটা ভৈষজ্য শুঁটচাঁদা। ইহার শাস্ত্রীয় নাম সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ধারণা হয় যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই নামে ইহার ভেষজার্থে ব্যবহার প্রচলিত ছিল না। কিন্তু, উন্মাদ-রোগে ইহার ব্যবহার অতি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ, ইহা আপনারা সকলেই জানেন।

বনৌষধি সম্বন্ধে এইরূপ নানা তথ্য আলোচনার অভাবে উপেক্ষিত হইতেছে। আপনারা সকলেই কৃতবিদ্য, শাস্ত্রোক্ত কথার পিষ্টপেষণ করিয়া আপনাদের বিরক্তি উৎপাদন করিবার প্রয়োজন নাই। তবে আলোচনাক্ষেত্রের বিশালতার আভাস দিবার জন্য আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিলাম।

ঋষিগণ তাঁহাদিগের বেদাঙ্গের মধ্যে যে শব্দশাস্ত্র বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উদ্ভিদ্ হউক, অথবা খনিজ হউক, অথবা পশু-পক্ষীই হউক, দুনিয়ার যে কোন বস্তুই হউক না কেন, উহার অবয়ব, শব্দ-শক্তি, স্পর্শশক্তি, রূপশক্তি, রসশক্তি, গন্ধশক্তি পরীক্ষা করিতে পারিলে উহাকে কোন্ নামে অভিহিত করিতে হইবে, তাহা অনায়াসে স্থির করা যায়।

কোন্ বস্তুকে কোন্ নামে অভিহিত করিতে হইবে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, বর্ত্তমান রসায়নের সঙ্কেতগুলি দেখিয়া বস্তুর উপাদান নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয়। সেইরূপ যে নামে যে বস্তু অভিহিত হয়, সেই নামের মধ্যে যে যে বর্ণ নিহিত

আছে, তাহা দেখিলেই ঐ বস্তুর উপাদান নির্ভুল ভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব।

যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, শরীর-গঠন বিদ্যা, শরীর-বিধান বিদ্যা এবং বনৌষধি প্রকরণ সম্যক্ ভাবে নির্ভুল রকমে ঋষিগণ তাঁহাদের চারিটি বেদে ও সংহিতায় বিবৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যা তৎপরবর্ত্তী আর কেহ ঐরূপ শৃঙ্খলিত ভাবে বিবৃত করেন নাই, তখন ইহা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে যে, চারিখানি বেদের মধ্যে অনন্যসাধারণ চিকিৎসা-শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমার মতে ঋষিদিগের অভ্যুদয়-কালে এতাদৃশ ভাবের চিকিৎসা-শাস্ত্র ও চিকিৎসা-বিজ্ঞান উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই জগতের সর্ব্বত্র ঐ চিকিৎসা-শাস্ত্রই সর্ব্বস্তরের মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধাকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং তখন আর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্র কাহারও শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে নাই। আমার এই উক্তি যে সত্য, তাহা চিকিৎসা-শাস্ত্রের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে প্রমাণিত হইতে পারে।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে ইতিহাসের গতি কি হইয়া থাকে, তাহা কালচক্র সম্বন্ধীয় ঋষিদিগের বিজ্ঞান জানিতে পারিলে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ঋষিদিগের ঐ জ্ঞান এক্ষণে বিস্মৃতির গর্ভে লুক্কায়িত। কাযেই উহার আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই।

ইংরাজী এবং ফরাসীতে অনেকগুলি ঐ সম্বন্ধীয় ইতিহাস রচিত আছে। তন্মধ্যে গ্যারিসন সাহেব ও হাসার সাহেবের পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খৃষ্ট জন্মাইবার ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে হিপোক্রেটিসের জন্মের পূর্ব্বে যে চিকিৎসা-শাস্ত্র জগতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, তাহা মূলতঃ একই রকমের বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

আমাদের মতে, একদিন একই চিকিৎসা-শাস্ত্র জগতে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিয়াছিল এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহা নির্ভুল ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত আর কোন চিকিৎসা-শাস্ত্র স্থান পায় নাই। তাহার পরে যখন ঐ মূল নির্ভুল চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল, তখন নানাস্থানে নানারকমের চিকিৎসা-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উহার কোনটিই আর মূল চিকিৎসা-শাস্ত্রের মত নির্ভুল হয় নাই এবং নূতন যাহা যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে নানারূপ ভ্রম-প্রমাদ প্রবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রাথমিক যুগে উহার প্রত্যেকটির মধ্যে মূলতঃ ঋষিদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনেক কথাই বিদ্যমান ছিল। Hippocrates, Lucretius, Aristotle, Theophrastus, Pausanius প্রভৃতি গ্রীকগণের অথবা Celsus, Vitruvius প্রভৃতি রোমান্‌গণের চিকিৎসাপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের উপরোক্ত মন্তব্যের সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আধুনিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের বীজ রোপিত হইয়াছিল, ইহাও যে সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, তাহা আগেই দেখান হইয়াছে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রের উপরোক্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহা আমরা বলিতে বাধ্য যে, চিকিৎসা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে, অর্থাৎ মানুষ যাহাতে ব্যাধির যন্ত্রণা, উহার আক্রমণ, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে, পুনরায় যাহাতে ঋষিগণের মূল চিকিৎসা-বিজ্ঞান, অর্থাৎ চারিটি বেদ যথাযথ অর্থে উপলব্ধ হইতে পারে এবং তাহার প্রয়াস আরম্ভ হয়, তজ্জন্য প্রযত্নশীল হইতে হইবে। সত্যোদ্ঘাটন করিতে পারিলে যাহা অসত্য, তাহা আপনিই নির্ব্বাপিত হইবে। আমাদের চরক, সুশ্রুত, ভেলসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থের মূলে যে ঋষিগণের কথা রহিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ কথাগুলি আমরা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে বুঝিতে পারি কি না, তদ্বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। আমার মনে হয়, আমরা যদি ঐ সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে সক্ষম হইতাম, তাহা হইলে আমাদের চিকিৎসা দ্বারা সমস্ত ব্যাধি আরোগ্য হইতে পারিত, কিন্তু তাহা হয় কি?

আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ঋষিদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিবার দায়িত্ব আমাদিগের এবং তাহা আর কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনুকরণ দ্বারা করা সম্ভব নহে। আমাদের নিজস্ব বিজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে হইলে নিজস্ব গবেষণার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে, ইহাই আমার অভিমত।

যদি আবার কখনও অবসর এবং সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে ঐ পুনরুদ্ধার-কার্য্যে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি, তাহা আপনাদিগকে অধিকতর বিস্তৃতভাবে শুনাইবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে আজিকার মত বিদায় লইতেছি।

আবিষ্কার

—শ্রীশিবশম্ভু সরকার

নিবারণ বাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।

'বল কি! কি করা যায় তা হলে?'

স্ত্রী সুহাসিনী গম্ভীর ভাবে জবাব দিলেন, 'করা আর কি যাবে—শুভেন্দু ডাক্তারকে একবার ডাক, আসুক, দেখে যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেই…'

নিবারণ মাথার চুলগুলির মধ্যে দু'তিনবার আঙুল চালাইয়া দ্বিধার সঙ্গে বলিলেন,'হাঁ, তাই হোক…শুভেন্দুকে ডাকি তা হ'লে…'

'হাঁ, যাও শীগ্‌গির…'

নিবারণ ত্রস্তপদে বাহির হইয়া গেলেন। পরক্ষণেই আবার বিপর্য্যস্ত মূর্ত্তিতে ফিরিয়া আসিয়া সুহাসিনীকে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'টাকা আছে ত'?'

সংক্ষিপ্ত স্তব্ধতায় উত্তর আসিল, 'না।'

'তবে? শুভেন্দুকে দেবে কি? ভাল মানুষ ভদ্রলোককে ডেকে এনে কি শেষে খালি হাতে বিদায় করতে চাও! সে ভাববে কি!'

সুহাসিনী চটিয়া উঠিলেন, 'দেখ, ভাবাভাবি এখন আমার আসছে না। যার মেয়ে মর মর, সেই বাপেরও অত ভব্যতা নিয়ে মাথা ঘামান বোকামি। যাও… শুভেন্দুকে বলবে, বাধা ভিজিটের টাকা পরে দেব। যাও, শীগ্‌গির যাও'—গলাটা একটু কোমল করিয়া সুহাসিনী আবার বলিলেন, 'অত ভাবছ কেন, এখনও ত হাতে চুড়ি ক'গাছা আছে। বাঁধা দিলেই টাকা পাওয়া যাবে'খন…'

আর্দ্র স্বরে নিবারণ বলিলেন, 'মাত্র চুড়ি ক'গাছাই আছে—তাও কেড়ে নিতে বল…'

'—তুমি কি পাগল হলে না কি! মেয়েমানুষের গহনা বিপদ-আপদের জন্যই, নইলে কিসের জন্য আর সোনাদানা!'

নিবারণের তবুও 'কিন্তু'টা ঘুচিল না, 'তা জানি বৌ, কিন্তু…'

ভয়ানক গরম হইয়া সুহাসিনী বলিয়া উঠিলেন, 'যাও, তোমার এখন হল দরদ দেখানর সময়! মেয়ে ও দিকে কাতরে খুন হচ্ছে—প্রাণ যায় তার, উনি এ দিকে আগডুম বাগডুম বকতে সুরু করলেন! যাও, যাও বলছি…'

তাড়া খাইয়া তাড়াতাড়ি যাইতে উদ্যত হইয়াই নিবারণ ফিরিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'নিরঞ্জন কোথায়?'

'কলেজের সোশ্যালে গেছে।'

নিবারণ একেবারে দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন, 'সোশ্যালে গিয়েছে! বাড়ীতে বোনটা ধুঁকছে, হতচ্ছাড়া গেল কি না সোশ্যালে! পাজি হতভাগার আক্কেলটা কি শুনি?'

সুহাসিনী মহা বিরক্ত হইলেন, 'তোমার আক্কেলটাই বা কি! মেয়েটা এখন-তখন প্রসব-ব্যথায় ছটফট করছে আর তুমি বিচক্ষণ পিতা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিয়ে চলেছ! যাও, শীগ্‌গির ডাক্তারের বাড়ী যাও—পরে যত খুসী লেকচার ঝেড়ো, যাও বলছি…'

অপ্রস্তুত হইয়া নিবারণ দু'চার পা আগাইয়া গেলেন, কি মনে পড়ায় থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

'ওকি আবার দাঁড়াচ্ছ যে!'

'বলছিলাম কি, জ্ঞানদাদাকে একবার ডেকে পাঠাও। তিনি এলেই বিপদ দেখো হালকা হয়ে যাবে।'

প্রশান্তকণ্ঠে সুহাসিনী উত্তর করিলেন, 'আমি এখুনি দাদাকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তুমি আর দেরী ক'র না। শীগ্‌গির দৌড়ও…'

নিবারণ দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

ডাক্তার শুভেন্দু অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগিণীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিল। গতিক বড় সুবিধা বোধ হইল না। লতার পাণ্ডুর বেদনাক্লিষ্ট মুখের দিকে স্থিরভাবে চাহিয়া শুভেন্দু একটু তফাতে সরিয়া আসিল। তারপর বেশ গম্ভীর স্বরেই বলিল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি কাকাবাবু?'

নিবারণ সাগ্রহে কহিলেন, 'বল বাবাজী—কি জানতে চাও…'

তেমনি অবিচলিত স্বরেই শুভেন্দু বলিল, 'আমাকে এই শেষ সময়ে ডাকবার উদ্দেশ্য কি?'

নিবারণের মুখ আশঙ্কায় ও সঙ্কোচে কালো হইয়া গেল।

'জানেন, নিরঞ্জনকে আমি ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করি। আর তারি ছোট বোন লতা যে আমারি ছোট বোনের মত, এটাও কি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?'

নিবারণ হাত দুটি কচলাইতে কচলাইতে উত্তর দিলেন, 'সে কি আমার অজানা বাবা! তবে কি না তোমাকে ডেকে হয়রাণ…'

শুভেন্দু কথা কাড়িয়া লইল, 'হয়রাণটা বড়, না প্রাণটা বড়?'

মহা ফাঁপরে পড়িয়া নিবারণ বলিলেন 'তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারিনে বাবা, নইলে তোমার খুড়িমা ত…'

ভ্রু কোঁচকাইয়া শুভেন্দু উত্তর করিল, 'টাকাটাই কিছু মোক্ষ নয় কাকাবাবু! আর যাই ভাবুন, জানবেন, ডাক্তরেরাও মানুষ—তাদেরও হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে!…'

'থাকাই ত উচিত, শুভেন্দু!'

জবাবটা একেবারে তৃতীয় পক্ষীয়। নিবারণ ও শুভেন্দু উভয়েই বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, জ্ঞানদাদা—সাদা থান পরিহিত শুভ্র দেহটি হইতে শুচিতার স্নিগ্ধতা বিকীর্ণ হইতেছে!

জ্ঞানদাদা পাড়ার সকলের দাদা। সেই উদার সম্পর্কে শুভেন্দু এবং নিবারণেরও দাদা। কিন্তু সম্পর্ক যাহাই হোক আত্মীয়তার কষ্টিপাথরে ঘটনার দল তাঁকে এমন ভাবে যাচাই করিয়াছিল যে, শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় থাকে না।

বয়স চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শরীরের গঠন-ভঙ্গী এমন যে, ত্রিশের কোঠায় দেহের বার্দ্ধক্যাভিযান যেন স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। একটা অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা তাঁর চোখের মণিতে ঠিকরাইয়া বাহির হয়। মনের স্থির অচপলতা মুখের রেখায় রেখায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

এই দাদাটির প্রতি শুভেন্দুর শ্রদ্ধাটা ছিল বাস্তবিকই নিবিড়। ডাক্তারের উপর কেহ কথা কহিতে আসিলে ডাক্তারের উচিত ভ্রুকুটী করিয়া তাকে থামাইয়া দেওয়া অথবা নিজের গৌরবের ওজনে মূঢ়জনের বাচালতাকে অবজ্ঞা করা। এই দাদাটির বেলায় শুভেন্দু কিন্তু পেশার মর্য্যাদা রাখিত না। তাঁর পরামর্শ সে মন দিয়া শুনে, যুক্তি থাকিলে তন্ন-তন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করে, ধৈর্য্য দেখাইতে ত্রুটি করে না। তার একটু বিস্ময়ও লাগে। পাড়ার যত বাড়ীতে তার ডাক পড়িয়াছে, সেখানে গিয়া প্রথমেই দেখা মিলিয়াছে জ্ঞানদাদার—রোগের সব তথ্য-তল্লাস তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া একেবারে ফাইল-বাঁধা করিয়া বসিয়া আছেন। ভাবখানা যেন, পাড়ার সব বিপদের নিরিবিলি দায়িত্বই তাঁর—সকলেরই দুঃখদাহের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া রাখিবার সমস্ত অধিকারটা যেন তাঁরই করতলে। মারী-মড়কে ত' কথাই নাই—সাকার, বেকার নিরাকার—যে কোন দলের, যে কোন মানুষ একবার তাঁর দরজায় কড়া নাড়িলেই আত্মীয় হইয়া উঠে। অথচ তিনি বড় ঘরের ছেলে এবং নিষ্কর্ম্মা নন। আত্ম-অভিমানের চৌকাঠের ওপারে বসিয়া থাকিলে কারও সাধ্য ছিল না তাঁর পা পর্য্যন্ত স্পর্শ করে। নিজেকে এমন ভাবে সাধারণ করিয়া রাখায় মধ্যে যে অসাধারণতা ছিল, শুভেন্দুর মর্য্যাদালোভী পেশাকেও তাহা অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। এত বড় সামাজিক লোকটি কিন্তু সংযতবাক্, মিষ্টভাষী—সময়ে সময়ে ভারি গম্ভীর। আভিজাত্যের সঙ্গে অমায়িকতার নিভাঁজ মিশ্রণে এমন একটি নির্লিপ্ততা সৃষ্টি করিত যে, অতি বড় আপনার বলিয়া জানিয়াও অসঙ্কোচে কথা কওয়া দায় হইয়া উঠিত।

তাঁকে দেখিয়া শুভেন্দু যেন একটা সমাধান খুঁজিয়া পাইল। স্বস্তির স্বরে বলিয়া উঠিল, 'এই যে দাদা এসেছেন। যা হোক বাঁচা গেল।'

জ্ঞানদাদা উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিলেন, 'কেন? কেমন দেখলে, শুভেন্দু?'

'সুবিধে নয় বলে মনে হচ্ছে। মোট কথা এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমি নিজে হাত দিতে আর ভরসা পাচ্ছি না। এখন…'

'কাকে ডাকতে বল?'

ডাক্তার শুভেন্দুকে ইতস্ততঃ করিতে দেখা গেল। কার

নাম সে করিবে? মাত্র কয়েক মিনিট আগে অভাবের যে অভাগামূর্ত্তি অস্থিচর্ম্মে তার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিয়াছে, তারি গলায় দড়ি বাঁধিয়া কোন্ কোটীশ্বরের রথচক্রে জুড়িয়া দিতে বলিবে? শুভেন্দুর চারটি টাকা দিতে যাদের ভাঁড়ের ভবানী পর্য্যন্ত নীলামে চড়িয়া বসে, কী ভরসায় বত্রিশ-রূপিয়া, চৌষট্টি-রূপিয়ার দরজায় তাদের ধন্না দিতে বলিতে যাইবে!

জ্ঞানদাদা বোধ করি শুভেন্দুর অবস্থাটা আন্দাজ করিয়া লইলেন, 'আচ্ছা শুভেন্দু, ডাক্তার রসিকলাল চাটুজ্জেকে ডাকলে কেমন হয়?'

নিবারণের মুখ ভয়ানক কালো দেখাইল। সোৎসাহে শুভেন্দু বলিয়া উঠিল, 'ডাক্তার রসিকলাল চাটুজ্জে! তা' হলে ত সব থেকে ভালই হয়! কিন্তু ···'

'কিন্তুর ভাবনা তোমায় করতে হবে না।'

শুভেন্দুর তবুও 'কিন্তু' গেল না, 'জানেন ত তিনি চৌষট্টির কম কথাই কন না।'

জ্ঞানদাদা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'আমি কিন্তু ডাক্তার রসিকলালকে বিনা পয়সায় কথা কওয়াতে পারি। আজকে তিনি বড় মানুষ হলেও, এককালে ছিলেন নিতান্ত গরীব। এমন কি আমার বাবা ফি-টি না দিলে এ জীবনে হয়ত আর ডাক্তার রসিকলালের ম্যাট্রিকুলেশন পার হওয়াও ঘটে উঠত না। সময় নেই, অসময় নেই, যখন দরকার হয়েছে বাবা তাঁকে অকৃপণভাবে সাহায্য করেছেন। রসিকদাও তাঁকে দেবতার মত ভক্তি করতেন—সব কথাই মানতেন। সেই অম্বিকা বাঁড়ুয্যের ছেলে আমি! সুতরাং বুঝেছ বোধ হয়।'

কাহাকেও আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া জ্ঞানদাদা চিঠি লিখিতে বসিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে নিরঞ্জনকে সদর দরজায় দেখা গেল। ছেলেকে দেখামাত্র নিবারণ নিষ্করুণ কণ্ঠে সবে ধমকাইতে সুরু করিয়াছেন, জ্ঞানদাদা থাবা দিয়া ব্যাপারটা হটাইয়া দিলেন, 'আচ্ছা হবে'খন ও সব। ওরে নিরু, একবার দৌড়ে যা ত' ডাক্তার রসিকলাল চাটুজ্জের বাড়ী···আর হাঁ, এই চিঠিটা দিয়ে বলবি, এখনি আসতে হবে ··বুঝলি?'

আর কথাটি না কহিয়া নিরঞ্জন দ্রুত উৎসাহে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। আজ কলেজ-সোশ্যাল তার মাথায় উঠিয়াছিল আর একটু হইলে। কর্ত্তব্যের কড়া তাগিদের দেনা মিটান ছাড়াও যে এই জীবনে আরও কিছু থাকিতে পারে, এ কথাটা তার বাবা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ছন্দে, সঙ্গীতে, রসে, রূপে জীবন যদি দোলাই না পাইল, তবে কিসের এই কোলাহল, কেন হৃদয়ের তারুণ্য, কোথায় আনন্দের অভিব্যঞ্জনা? শুধু ঘর আর দুয়ার, আলু আর পটল, কর্ত্তব্য ও বাধ্যবাধকতা! ছিঃ ছিঃ—ইজ দিস লাইফ! পুয়োর কল্পনা। জীবনের সম্বন্ধে একটা উচ্চ আদর্শ পর্য্যন্ত নাই! রেচেড ফাদার!

'নিবারণ বাবু আমার একটা কাজ রয়েছে বাড়ীতে। একটু যেতে হবে ভাই।'

নিবারণ ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, 'সে কি হয় দাদা। ডাক্তার এখুনি এসে পড়বে। তখন উপায় কি হবে?'

জ্ঞানদাদা হাসিয়া বলিলেন, 'ভয় নেই! বড় ডাক্তার অত চট করে আসে না! দেরী হবেই। সেই ফাঁকে জপটা সেরে আসিগে···হাঁ, দেখ শুভেন্দু, তুমিও ভাই বাড়ী থেকে ঘুরে এস গে। ডাক্তার চাটার্জ্জি এলেই নিরঞ্জন খবর দেবে'খন।'

'আচ্ছা' বলিয়াই শুভেন্দু চলিয়া গেল। জ্ঞানদাদা তাড়াতাড়ি বাড়ীর পথে নামিলেন।

মস্ত বড় বাড়ী—প্রাসাদ বলিলেই চলে। ফটকে মোটা মোটা হরফে লেখা ডক্টর রসিকলাল চাটার্জ্জি, এম. ডি. ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলি অক্ষর। দরোয়ান সসম্ভ্রমে পথ দেখাইয়া দিল।

খানিকটা আসিতেই একটা হল-ঘরে নিরঞ্জন হাজির হইল। চাপড়াশী অদূরস্থ একটা চেয়ারে তাকে বসিতে ইঙ্গিত করিল।

বৃহৎ একটি গোল টেবিলের চারি পাশে পঁচিশ ত্রিশ খানা চেয়ার সাজান। অধিকাংশই ভর্ত্তি; নিরঞ্জন একটিতে সসঙ্কোচে বসিয়া পড়িল।

একটু স্থির হইয়া নিরঞ্জন চারিদিকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনেকগুলি লোক বসিয়া আছে। দেখিলেই বোঝা যায়, ডক্টর রসিকলালের এরা দর্শনার্থী। কেহ গম্ভীর, কেহ প্রশান্ত, কেহ বা ফিস্‌ফিস্ করিয়া কি সব পরামর্শ করিতেছে। দু একজন টেবিলের উপর ম্যাগাজিন-

গুলি ঘাঁটিতেছে। পাশেই মেয়েদের ওয়েটিং রুম। স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহাঁরাই আসল রোগী, সঙ্গের পুরুষেরা বিপন্ন মাত্র।

নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া দেখিল, হলের চারি দেয়ালেই কেবল সাধু-সন্ন্যাসীর ছবি ঝুলান। ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য ছোট বড়, দেশী বিদেশী মহাত্মা, সাধুদের ছবি শোভা পাইতেছে। সেখানে বিদ্যাসাগর নাই, আশু মুখার্জ্জি নাই, রকফেলার নাই, আইনষ্টাইন নাই, মহম্মদ মহসীনও নাই—কেবল আছে গৃহত্যাগী, গুহাবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের ছবির মিছিল। এত সব কাম-কাঞ্চনত্যাগীর দলে মেঝের উপর এককোণে কাঁচের আলমারির মাঝে বসা পূর্ণ-ছবি রহিয়াছে ডক্টর রসিকলাল চ্যাটার্জ্জির। কোট-প্যান্ট পরা, চোখে উজ্জ্বল দীপ্তি, ভঙ্গীতে উদ্দীপ্ততা, মুখের রেখায় রেখায় যেন আত্ম-বিশ্বাসের পৌরুষ ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। নিরঞ্জন প্রশংসা করিল চিত্রকরের তুলির কৌশলকে, হাজার বার তারিফ করিতে লাগিল এমন জীবন্ত প্রতিমা-সৃষ্টিকে। ঠোঁটের উপর হাসিটি কি মধুর, কি আন্তরিকতা ও প্রসন্নতায় ভরা! ত্যাগের অপূর্ব্ব আবহাওয়ার মধ্যে ডাক্তার যেন দৃপ্ত পৌরুষ ও অপরিসীম মহানতা লইয়া বসিয়া। সব চেয়ে মধুর হাসিটি—সহৃদয়তা ও সমবেদনার কারুণ্য যেন উপছিয়া বাহির হইতেছে। এমন হাসি যে হাসিতে পারে, তার প্রাণের পরিচয় না জানি কত মহান্, কত অপরিসীম!

সহসা এক উর্দ্দিপরা চাপরাশী হাঁকিল, 'ঢাকা, মোহিনী-পুর থেকে কে এসেছেন···আসুন।' দু'জন প্রৌঢ় ধড়মড় করিয়া উঠিলেন—অস্পষ্ট আওয়াজ মাত্র শুনা গেল। দশ মিনিট বাদে ভদ্রলোকেরা বিদায় লইলেন। আবার চাপ-রাশী হাঁক দিল, 'ভাঙ্গনঘাট, নদীয়া থেকে কে এসেছেন?' একটি বৃদ্ধ ঘরে ঢুকিলেন। পাঁচ মিনিট নির্ব্বিঘ্নে নিঃশব্দে কাটিয়া গেল। সহসা একটা কর্কশ কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, 'ষোল টাকার কম এখানে আমি নিই নে।'

কাতর স্বরে আর একটি কণ্ঠ বলিল, 'এই চারবারের বার, ডাক্তার বাবু। আগের তিনবার ত দিয়েছি, এইবারটি দয়া করে—'

একটা আওয়াজ হইল, 'চাপরাশী।'

চাপরাশী আসিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে অবিলম্বে পথ দেখিতে আদেশ দিল, নহিলে দরোয়ান ডাকিয়া যে অর্দ্ধ-চন্দ্রের ব্যবস্থা হইবে—এ আশঙ্কাটাও সুস্পষ্ট ভাবে জানাইতে তার ভুল হইল না। যাক প্রাণ, থাক মান! ভদ্রলোক পলাইতে পারিলে বাঁচেন। নিঃশব্দে টুঁ শব্দটি না করিয়া সঙ্গের মহিলাটিকে লইয়া সরিয়া পড়িলেন। নিরঞ্জন অবাক্ হইয়া গেল।

নিরঞ্জন বিংশ শতাব্দীর কলেজের ছাত্র—সংসার সমরাঙ্গনের কোন আস্বাদ আজও তীব্রতম রুক্ষতায় চোখের মণিকে ঝলসাইয়া দেয় নাই। চোখে এখনও ভাসে, আকাশভরা তারার ছায়া—কাণে এখনও আসে, পাখীর আগমনী। 'সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্ট' সম্বন্ধে তার ধারণাটা বড্ড চড়া এবং কথায় কথায় বন্ধু-বান্ধবদের সামনে সে আবৃত্তি করে, "সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই!" আজ তাহারই চোখের সামনে এক বর্ষীয়ান্ ভদ্রলোককে যখন সে নিগৃহীত হইতে দেখিল, তখন প্রথমটা সে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, পরক্ষণেই নাকের ডগায় একটা কালো ছায়া দেখিয়া আত্মসংবরণ করিয়া স্থিরভাবে বসিল। জীবনে এই প্রথম আজ সে যেন অনুভব করিল, যার পয়সা নাই, তার বুঝি সেল্‌ফ-রেস্‌পেক্টও নাই।

জটলা ক্রমশঃ কমিতে থাকে। একে একে ডাক হয়। তবু সময় ভারি হইয়া উঠে। কতক্ষণ আর চুপচাপ এমন গুম হইয়া বুকের ভিতরে উদ্বেগের জ্বালা বহিয়া বসিয়া থাকা যায়? সময় কাটাইতে নিজেকে হাল্‌কা করিতে নিরঞ্জন চারিদিকে চায়। একটা অদ্ভুত জিনিস নিরঞ্জনের চোখে ঠেকে—সকলেই বিষণ্ণ, সকলেরই মুখে আশঙ্কার কালি, কিন্তু কেউ কারও প্রতি এতটুকু মমতার স্পর্শহীন। মূঢ়ের মত সব বসিয়া আছে চোখদু'টী মেলিয়া, কখন ডাক্‌টা আসে! নিজের কথা ছাড়া আর কোন চিন্তা যেন কারও মগজে নাই। এত বড় আত্মসর্ব্বস্বতার দৃশ্য এই ঘরের দেয়ালগুলি ভরা ত্যাগের পটভূমিকায় এক শোচনীয় বৈষম্যের সৃষ্টি করিতেছিল। বৈষম্য আরও বিচিত্র হইয়া দেখা দেয়, যখন একই পরিস্থিতিতে জাগিয়া উঠে পাশা-পাশি রসিকলালের অয়েল-পেন্টিংএর কারুণ্য-ঝরা স্নিগ্ধ হাসি এবং এতগুলি লোকের জড়ো-করা উদ্বেগের কালো নিবিড় ছায়া!

অবশেষে নিরঞ্জনের ডাক পড়িল। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সে ঘরে ঢুকিল। সামনে একটী বৃহদাকারের সেক্রেটারিয়েট। তার ওপারে একখানি রিভলভিং চেয়ারে আসীন—ডক্টর রসিকলাল চ্যাটার্জ্জি। হাঁ, ইনিই স্বনামধন্য ডক্টর চ্যাটার্জ্জি। বাহিরের হলঘরের ঐ বসা অয়েল-পেন্টিং ছবিটীর সঙ্গে হুবহু মিল। সেই মুখ-চোখ, সেই দৃপ্ত ভঙ্গী, সেই আত্মবিশ্বাসের উজ্জলতা—কেবল একটী অভাব⋯যে কারুণ্যপূর্ণ স্নিগ্ধ হাসিটী ঐ ছবিখানিকে মহান্ করিয়া তুলিয়াছে, সেইটী নাই। সেই অমায়িক হাসিটীর স্থানে রহিয়াছে প্রখরতা—তপ্ত গাম্ভীর্য্য!

বেশ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ডক্টর প্রশ্ন করিলেন, 'কি চাই আপনার?'

নিঃশব্দে নিরঞ্জন জ্ঞানদাদার চিঠিখানি আগাইয়া দিল। ডক্টর রসিকলাল পাশে উপবিষ্ট অ্যাসিস্ট্যান্টকে চিঠিটা পড়িয়া শুনাইতে বলিলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট পড়িল শ্রীচরণেষু,

রসিকদা! পত্রবাহকের কাছে সবিশেষ সংবাদ পাবে। আমাদের পাড়ার আমার বিশেষ পরিচিত নিবারণবাবুর মেয়েটীর সঙ্কটজনক অবস্থা—প্রসব-বেদনায় ভয়ানক অস্থির, কয়দিন ধরে ক্রমাগত কষ্ট পাচ্ছে! বিশেষ জরুরি ব্যাপার বলে অন্য কাজ ফেলে রেখেও তাড়াতাড়ি আসবে। প্রণাম নাও। ইতি—

প্রণত
জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডক্টর ধীরভাবে চিঠিখানি শুনিলেন। মুখে তরঙ্গের একটী ভগ্নাংশও ফুটিয়া উঠিল না—একটা রেখাও হেলিল না। জলদস্বরে অ্যাসিস্ট্যান্টকে শুধাইলেন, 'আর কেউ আছে?'

লঘুস্বরে অ্যাসিস্ট্যান্ট বলিল, 'আজ্ঞে না, স্যর।' মাথাটাকে একটু সংক্ষিপ্ত ক্ষিপ্র ঝাঁকুনি দিয়া গম্ভীরস্বরে ডাক্তার নিরঞ্জনকে বলিলেন, 'চলুন।'

*

গাড়ীর হর্ণ শুনিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল। সকলের মন যেন কাণে আসিয়া ঠেকিয়া উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া ছিল। কূল হারাইয়া অকূল পাথার দেখিতে দেখিতে সহসা সকলেই চেঁচাইয়া উঠিল, 'ঐ ডাক্তা।'

ডক্টরের মুখচোখের ভাবে কিন্তু আন্তরিকতা প্রকাশ পাইল না। অন্যে পরে কা কথা, জ্ঞানদাদার সঙ্গেও তিনি কোনও কথা কহিলেন না। নিবারণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'রোগী কোথায়?'

রোগিণীকে ডকটর প্রায় পনর মিনিট ধরিয়া তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। তারপর মুখখানি আরও গম্ভীর করিয়া ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। জ্ঞানদাদা নিরঞ্জনকে তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার আনিতে ইসারা করিলেন। ডকটর রসিকলাল নিবারণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কেস খুব সিরিয়াস্। যদি আপনি পাঁচ শ' টাকা ফি দিতে পারেন, তবে কেস হাতে নিয়ে দেখতে পারি, নইলে নয়। আর জানবেন, বেশীক্ষণ এ ভাবে থাকলে রোগীর বাঁচাও একেবারে অসম্ভব হবে।'

আতঙ্কে নিবারণ গুমরিয়া উঠিলেন, 'বাবা, রক্ষে করুন আপনি। আমি নিতান্ত গরীব মানুষ।'

অবিচলিত স্বরে ডকটর জবাব দিলেন, 'দেখুন আমি দান-খয়রাত করতে বসিনি। আপনার যদি না পোষায় আমার বত্রিশ টাকা ফি-টা দিয়ে দিন, চলে যাচ্ছি। গরীব টরীব বলে মিছে দয়া উদ্রেকের চেষ্টায় আমার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করবেন না।'

জ্ঞানদাদা এতক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিলেন। প্রায় ছয় সাত বৎসরের উপর রসিকলালের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্পর্ক ছিল না। এই কয় বৎসরের অপরিচয়ের অবসরে ডাক্তার রসিকলাল যে দ্রুত উল্লম্ফনে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তার সঠিক হদিস্ জ্ঞানদাদার অগোচরে ছিল। আজ প্রথম হইতেই রসিকলালের অনাত্মীয় ব্যবহারে তিনি একটু বিমূঢ় হইয়া ছিলেন এবং মনে মনে হেতুটা খুঁজিয়া ফিরিতেছিলেন। কিন্তু কসাইয়ের রক্তাক্ত ছুরিকা হাতে রসিকলালের দয়ালেশহীন মূর্ত্তিটি যখন সংশয়ের অতীতরূপে প্রকট হইয়া পড়িল, তখন আর জ্ঞানদাদার বুঝিতে বাকি রহিল না, কেন রসিকদাদা তাঁকে চিনিতে পারেন নাই! পাছে জ্ঞানদাদা অনুরোধ করেন এবং ফি-টির গুরুত্ব বেশ কিছু কমাইতে হয়, তাই ঝানু রসিকলাল ঝানু চাল চালিতেছেন, জ্ঞানদাদাকে যেন তিনি চেনেনই না! একটা পরিচয়সূচক কথা বলিলে

পাছে জ্ঞানদাদা তারই সুযোগ লয়! টাকার মোহ এক-বার যাকে পাইয়া বসে তার নিরানব্বুইয়ের ধাক্কার টাল সামলান ভার হইয়া পড়ে। বত্রিশ টাকার মায়াটা অত বড় রসিকলাল অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। তাই ডাক দিতেই আসিয়াছেন এবং ইচ্ছাটাও জানাইতে কোন কুণ্ঠা নাই যে, পাঁচশতখানি মুদ্রা দর্শনী চাই, তা সে প্রাসাদ বা কুঁড়েঘর যেখানেই হউক। কিন্তু মানুষের নীচতাকে যিনি কোন দিন সহ্য করেন নাই তিনি আজিও তাহা করিলেন না। ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন, 'এই ঝর-ঝরে পোড়ো বাড়ির দুঃস্থ লোকগুলোর কাছে পাঁচশ টাকা চাইতে তোমার লজ্জা করছে না, রসিকদা!'

ডক্টর ঐ প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, কিন্তু কথা কহিলেন, 'দেখুন নিবারণবাবু, আমার সময় বড্ড কম। টাকার ব্যাপারটা যা করবেন তাড়াতাড়ি ঠিক করুন।'

আত্মসম্মানের মাথা খাইয়া জ্ঞানদাদা আবার বলিলেন, 'দেখ রসিকদা, আমার অনুরোধ এঁদের কেস্‌টা বিনা ফি-তে করবে।'

কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া জ্ঞানদাদা যেন হাঁফাইতে লাগিলেন।

এ বার ডক্টর উত্তর দিলেন, বেশ স্পষ্টভাবে, 'অনুরোধ করলেই যে রাখতে হবে এমন বাধ্য-বাধকতা ত' নেই।' জ্ঞানদাদা জ্বলিয়া উঠিলেন, 'তা জানি। অম্বিকা বাঁড়ুজ্জের কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না, কিন্তু হাত পেতে যখনই অনুরোধ করতে তখনই যে ভিক্ষে মিলত এটা ভুলে যেও না।'

ডক্টর মহা বিরক্ত ও মহাগরম হইয়া উঠিলেন, 'দেখ জ্ঞানদা, তোমার বাবা আমার অনেক উপকার করেছেন, এ কথা অস্বীকার করছি না। কিন্তু ডাক্তার হয়ে তোমাদের বাড়ীতে বিনা ভিজিটে যতবার গিয়েছি আর পরিবারশুদ্ধ যত ঔষধ তোমরা আমার গিলেছ, তা জড়ো করলে তোমার বাবাই রসিকলালের খাতক হয়ে দাঁড়ান।'

সশব্দে চেয়ারটা হটাইয়া দিয়া ডক্টর উঠিয়া পড়িলেন, 'দেখুন নিবারণবাবু, বাজে বকার আমার সময় নেই। বত্রিশ টাকার ফি-টা দিন, চলে যাই।'

সুহাসিনী একটু তফাতে ছিলেন, হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, 'বাবা আপনি ত' রাজা মানুষ—দয়া করুন।'

ডক্টর রুমালটা শুঁকিতে শুঁকিতে মন্তব্য করিলেন, 'রাজা আর হতে দিচ্ছেন কই! হাঁ নিবারণ বাবু, কুইক্‌—জল্‌দি ফি-টা দিন।'

নিবারণকে একেবারে অভিভূত দেখা গেল। শুভেন্দুও স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। কারও মুখে কথা নাই। আকস্মিকতা এত দ্রুত ভোল বদলাইতেছিল যে, হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকা ছাড়া যেন গতি থাকে না।

নিবারণকে ধীরে ধীরে ধাক্কা দিয়া জ্ঞানদাদা বলিলেন, 'টাকা আমিই দেব নিবারণবাবু—কোন ভয় নেই।'

নিবারণ আঁৎকাইয়া উঠিলেন, 'তা কি করে হয়!'

'হয় বলেই বলেছি। না যদিই হয় পরে তবে আস্তে আস্তে শোধ দিলেই চলবে।'

তারপর ডক্টর রসিকলালের দিকে ফিরিয়া জ্ঞানদাদা বলিলেন, 'ডক্টর চ্যাটার্জ্জি, আপনার ধাত্রী-বিদ্যার নৈপুণ্য আমরা দেখতে চাই। পাঁচশ টাকাই মিলবে—কাজে লেগে যান, কুইক্‌।'

ডক্টর রসিকলালের বিরাট ব্যক্তিত্ব হঠাৎ উল্টা কুইকের ধাক্কায় কেমন যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কোন জবাব দিবার ভরসা ছিল না। হুড়মুড় করিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। নুণ খাইলে গুণ গাহিতেই হইবে, এমনি একটা বাধ্যবাধকতার নূতনতম সূত্র যেন তাঁর মাথায় পাক খাইতেছিল।

প্রথমটা ডক্টর বেশ ধীরতার সঙ্গে কাজে হাত দিলেন। যে বিদ্যা তাঁকে ডক্টর রসিকলালের কোঠায় তুলিয়াছে, তারই কলাকৌশল আরম্ভ করিলেন। পাঁচ মিনিট এ দিক্‌ ও দিক্‌ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

অ্যানেস্‌থেটিষ্ট কাজ সুরু করিল। শুভেন্দু ডক্টর রসিকলালকে সাহায্য করিতে লাগিয়া গেল। ডক্টর ফরসেপ ধরিলেন, তাঁর দেশবিখ্যাত হাত দুটি দিয়া। কয়েক মিনিট ধস্তাধস্তি চলিল। ডক্টর ভয়ানক বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। শুভেন্দু হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, 'স্যর, এই ভাবে আর একবার দেখলে হ'ত না।' একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া রসিকলাল ঘরের বাহিরে আসিলেন।

'দেখুন নিবারণবাবু, আমরা ডাক্তার। আমাদের নীতি হচ্ছে, বড় জীবনের জন্য ছোট জীবনকে নষ্ট করে দেওয়া।

যদি প্রসূতিকে বাঁচাতে চান তবে গর্ভের শিশুকে নষ্ট করতেই হবে। এখন কোন্‌টা চান, প্রসূতি অথবা শিশু।'

নিবারণ হতভম্ব হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সকলের পক্ষেই সমস্যা; কিন্তু কথা কহিলেন জ্ঞানদাদা, 'প্রসূতি ও শিশু দুই চাই।'

ডক্টর এতটা আশা করেন নাই। ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, 'তা কি করে হবে?'

জ্ঞানদাদা দৃঢ়স্বরে জবাব করিলেন, 'হতেই হবে। দশ টাকা দিয়ে আমরা ধাই ডাকিনি। পাঁচশখানি মুদ্রা সেলামীর অঙ্গীকার করে ডক্টর রসিকলালকে নিয়ে আসা হয়েছে!'

তারপর স্বরটি আরও চড়াইয়া জ্ঞানদাদা বলিলেন, 'যান ডক্টর, কাজ করুন গে। উপযুক্ত পারিশ্রমিকের উপযুক্ত ফল চাই।'

রসিকলালের মনে হইল, দু'গালে কে যেন চড় বসাইয়া দিল। রোগী দেখিতে আসিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর মনে হইয়াছে, তিনি কৃপা করিতেছেন মাত্র। আর্ত্তত্রাণের দুরূহ বোঝা তাঁর স্কন্ধে। কিন্তু, 'তোমাকে ভূষি খাওয়াইয়াছি, অতএব কেন দুধ দিবে না'—এমনি করিয়া কেহ দাবীর ওজনটা কড়া কথায় আওড়াইতে পারে, এটা ছিল রসিকলালের স্বপ্নাতীত—বিশেষ আবার তাঁরই সামনে।

আবার চেষ্টা স্বরু করিলেন। আবার সেই ফরসেপ চলিল। এক, দুই, তিন, সাত মিনিট···রসিকলাল ঘড়ির দিকে চাহিলেন। উত্যক্ত হইয়া অস্ত্রে হাত দিতেই শুভেন্দু বলিয়া উঠিল, 'স্যর আর একটু চেষ্টা করে দেখুন। প্রথম সন্তান। আপনি একটু ধীর ভাবে অনুগ্রহ করে···'

দ্রুত কণ্ঠে রসিকলাল উচ্চারণ করিলেন, 'টাইম নেই। আর পনর মিনিট পরে আমাকে আর একটা কল্ অ্যাটেণ্ড করতে হবে। আমি আহাম্মুক নই। অপেক্ষা করার মত প্রচুর সময় আমার হাতে নেই।'

বলিতে না বলিতে সুদক্ষ হাতে ডক্টর ছেলেটি কাটিয়া বাহির করিলেন। তারপর দ্রুত নিপুণতার সহিত ষ্টীচ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক গুলি সারিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেলেন। শুভেন্দু মূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ঐ পাষণ্ডটার নৃশংসতা দেখিয়া তার চোখ দুটা হইতে আগুন ঠিকরাইতেছিল।

ডক্টর রসিকলাল বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'চেষ্টা করে দেখলাম, অসম্ভব—ইম্‌পসিবল্। ডাক্তারের যা কর্ত্তব্য তা করা হয়েছে। ফি-টা পাঠিয়ে দেবেন—গুড্ বাই।'

তাড়াতাড়ি তিনি চলিয়া গেলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব আজ এই বিধ্বস্তপ্রায় বাড়ীটার গুমোট আবহাওয়ার বিরুদ্ধে যেন সতেজে আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তাঁর তাড়াতাড়ি স্থানত্যাগ অনেকটা পরিত্রাণেরই সামিল। একটা শিশুকে যেন তিনি সত্যই হত্যা করিয়াছেন—এমনি একটা অস্বস্তি-বোধ তাঁর মগজের মধ্যে দাঁত ফুটাইতেছিল। এটা কি স্নায়ুর দুর্ব্বলতা? মূর্খে বলে 'বিবেক'!

কেহ কোন কথা বলে না। নীরবে যেন সকলেই অপেক্ষা করিতেছে, কি করণীয় কেহ বলিয়া দিক। জ্ঞানদাদা প্রয়োজনীয় বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। হত শিশুটিকে কাপড়ে জড়াইয়া শুভেন্দুকে বলিলেন, 'তুমিই এটাকে পুড়িয়ে এস ভাই।'

*

আবার সেই প্রাসাদের ফটক। শ্রান্ত উত্তপ্ত চিত্তে নিরঞ্জন ফটকের সামনে একবার আসিল, ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, হাঁ ডক্টর রসিকলাল চ্যাটার্জ্জিরই হর্ম্ম্য। ঐ ত' পিতলের হরফে নামের অক্ষরগুলি।

দরোয়ান বলিল, 'সাব কুঠিমে হ্যায়।' আগের মত সে খাতির করিল, পথ দেখাইয়া দিল। সেই হলঘরটা—নিরঞ্জন কোনদিকে চাহিল না—চাহিবার প্রবৃত্তিও ছিল না।

সটান হুড়মুড় করিয়া ঢুকিয়া পড়িল। ডাক্তার মাথাটা দু'হাতে চাপিয়া টেবিলের উপর ভর দিয়া বসিয়া ছিলেন। শব্দ পাইয়া নিরঞ্জনের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিলেন।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর চেকখানা ফেলিয়া দিয়া নিরঞ্জন শুষ্ক স্বরে বলিল, 'আপনার ফি-টা।'

ডাক্তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফিরিবার সময় হল-ঘরে পা দিতেই নিরঞ্জনের চোখে পড়িল, ডক্টর রসিকলালের সেই বসা দৃপ্ত ছবিখানা। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল মুখের হাসিটি এখনও তেমনি উজ্জ্বল- তেমনি খেলা করিতেছে। পরক্ষণেই একটা তীব্র বিরক্তিতে মুখখানা তার কোঁচকাইয়া উঠিল। রুদ্ধ দাঁতের মাঝ দিয়া উন্মত্ত ক্ষোভে মন তার গর্জ্জন করিয়া উঠিল, 'সারা জগৎকে ঠকাতে পার, কিন্তু আমার হাতে আজ ধরা পড়ে গেছ ডাক্তার! তোমার ঐ হাসির অর্থ আমি আজ আবিষ্কার করেছি! করুণা নয়, আন্তরিকতা নয়, হীন কুটিল নৃশংস আত্মপ্রসাদে ভরা ঐ হাসি! ঐ হাসির অর্থ—কত দুঃখীর রক্ত শোষণ করেছি—কত অসহায়ের আর্ত্তনাদকে আমি অগ্রাহ্য করেছি—মানুষের মুণ্ডের উপর দিয়ে হাঁকিয়েছি আমার চতুর্দ্দোলা, অথচ আমি অনড়, নির্ব্বিকার, মানুষের চোখের জলে আমার হাসি ফুটে···'

"ডেমোক্রেসির কয়টি ছেলে......?"

হারাধনের যে-কয় ছেলে হারিয়েছিল, ফিরেছে ফের
ডেমোক্রেসি টানছে তাদের আবোল-তাবোল হাজার জের ॥
ডেমোক্রেসি-ষষ্ঠিরাণীর ঘর ভরেছে সোনার চাঁদে

বর্ত্তমান বিজ্ঞানে শক্তির স্বরূপ

—শ্রীকানাইলাল মণ্ডল

গত শতাব্দীর বিজ্ঞান জড় ও শক্তি (matter and energy), বিশ্বের এই দুই আদি জিনিষকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করিয়া দেখে। গ্যালিলিওর সময়ে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের নবযুগের প্রারম্ভে শক্তিসম্বন্ধে অস্পষ্ট রকমের ধারণা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসিয়াছিল। তাপ, আলোক,তড়িৎ প্রভৃতিকে শক্তির বিভিন্ন রূপ বলিয়া জানিতে বিজ্ঞানের সময় লাগে; শক্তির বিভিন্ন-রূপ যে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নয়, নিউটনের যুগ হইতে তাহা ধরা পড়িতে থাকে। নিউটন নিজে মহাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করিয়া প্রমান করেন, যে-শক্তির দ্বারা চন্দ্র পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা পৃথিবীর উপরিভাগের পতনশীল বস্তুর উপর ক্রিয়াকারী শক্তি হইতে কোন অংশে ভিন্ন নয় এবং এক মহাকর্ষণের নিয়ম সমগ্র বিশ্বে চলিতেছে। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈজ্ঞানিক জাউল গতিশক্তি ও তাপশক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করেন। শব্দ যে বস্তু-কণিকার স্পন্দন হইতে উৎপন্ন হয় বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানা আছে; কাজেই শব্দ ও তাপ, এই দুই শক্তিকে বস্তু-কণিকার স্পন্দনের সহিত জড়িত করিয়া দেখার প্রয়োজন হয়। অর্সষ্টেড, অ্যাম্পীয়ার, ফ্যারাডে প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যুৎ ও চুম্বকশক্তি শেষ পর্যান্ত একস্থানে গিয়া মিলিয়াছে। ম্যাক্সওয়েল কিছুদিন পরে প্রমাণ করেন যে, আলোক বিশ্বব্যাপী ইথারে উৎপন্ন তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ মাত্র। সুতরাং চুম্বকশক্তি, আলোক ও তড়িৎ-শক্তি, শক্তির এই তিন রূপ যে বিশেষ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, তাহা অনুমান করা যায়। শক্তিকে একদিকে বস্তু-কণিকার গতি ও অন্যদিকে ইথারতরঙ্গের সহিত জড়িত করিয়া গত শতাব্দীর বিজ্ঞান শক্তির বিভিন্ন রূপসমূহের মধ্যে ঐক্য-স্থাপনের দিকে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল বটে, তবে বিচ্ছিন্ন বস্তু-কণিকা (discontinuous particle) এবং নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ (continuous wave), এই দুইয়ের মধ্যে কোন যোগসূত্র কল্পনা করে নাই।

বস্তু হইতে বিকীর্ণ শক্তির (radiation), বিশেষতঃ আলোকরশ্মির সাহায্যে আমরা বহির্জগতের জ্ঞান লাভ করি। এই প্রকার বিকীর্ণ রশ্মি নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গের সহিত জড়িত। দৈর্ঘ্যের বিভিন্নতা ব্যতীত বিভিন্ন রশ্মি-তরঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। রামধনুর সপ্তবর্ণের আলোকের মধ্যে লোহিতালোকের তরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। মাপ করিয়া জ'না যায় যে, এক ইঞ্চ স্থানের মধ্যে লোহিতালোকের ৩৩ হাজার তরঙ্গ থাকে। বেগুনী আলোক-তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে লোহিত আলোক-তরঙ্গের প্রায় অর্দ্ধেক, অর্থাৎ ৬৮ হাজার বেগুনী তরঙ্গ মাত্র এক ইঞ্চি স্থান অধিকার করে। নীল, হলদে

এ. কম্‌টন।
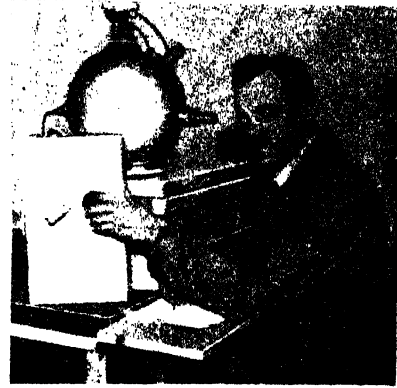
প্রভৃতি অপর পাঁচ প্রকার আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) উপরোক্ত দুই সীমার মধ্যে অবস্থিত। স্পেকট্রোস্কোপ নামক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ভিতর সূর্য্যালোক পাঠাইলে উহা ভাঙ্গিয়া গিয়া যে স্পেকট্রাম বা বর্ণছত্র সৃষ্টি হয়, তাহার একপ্রান্তে থাকে লোহিতালোক, অপর প্রান্তে বেগুনী আলোক। অপরগুলি মধ্যেকার বিশেষ বিশেষ স্থান অধিকার করে। 'ডিফ্রাক্‌শন গ্রেটিং' নামে (diffraction grating) অন্য আর এক যন্ত্রে সাদা আলোক একই ভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহার দ্বারা উৎপন্ন স্পেকট্রামে বর্ণের ক্রম একই থাকে, অর্থাৎ বর্ণছত্রে প্রতি বর্ণের অবস্থান আলোকের তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে পর পর হইয়া থাকে। বর্ণছত্রকে যদি সঙ্গীতের সপ্তকের ন্যায়

রশ্মির এক 'সপ্তক' বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যায় যে, আধুনিক বিজ্ঞান চৌষট্টি সপ্তকের রশ্মির বিষয় অবগত হইয়াছে। তবে বর্ণাদির উভয় দিকে লাল ও বেগুনী অতিক্রম করিয়া যে সকল রশ্মি বর্ত্তমান থাকে, সে গুলি দৃষ্টির অগোচর। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঐ সকল রশ্মির অস্তিত্ব জানিতে

লুই ডা ব্রগলি।

হয়। আমরা এই সকল রশ্মি দেখিতে পাই না, তাহার কারণ মানব-চক্ষুর গঠনের অসম্পূর্ণতা, রশ্মিসমূহের প্রকৃতিগত পার্থক্য নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ব্যতীত ঐ গুলির মধ্যে অন্য কোন ভেদ নাই।

লাল বর্ণের প্রান্তে দীর্ঘতর তরঙ্গের যে অদৃশ্য অতি-লোহিত (infra-red) রশ্মি থাকে, তাহাকে আলোক-রশ্মি না বলিয়া তাপ-রশ্মি বলাই সঙ্গত। কোন কঠিন দ্রব্য গরম করিলে উহা হইতে আলোক বাহির হইবার পূর্ব্বে এইরূপ রশ্মি প্রথমে নির্গত হয়। চক্ষুর উপর উহা ক্রিয়া করে না বটে, তবে ত্বকের উপর উহা ক্রিয়া করে এবং সেই জন্য এই রশ্মি মানবেন্দ্রিয়ের গোচরে আসে। সাধারণ ফটো-গ্রাফের প্লেটে উহার কোন ক্রিয়া নাই। বিশেষ ভাবে প্রস্তুত 'ইন্‌ফ্রা-রেড' প্লেটে কিন্তু উহা ক্রিয়া করে। সেই নিমিত্ত অন্ধকারে দৃষ্টিগোচর হয় না—লোহিত অপেক্ষা তিন সপ্তকের নীচের দিকের এই রূপ অদৃশ্য রশ্মি দ্বারা অন্ধকারে ফটো তোলা যায়। ফুটন্ত জল হইতে যে রশ্মি বাহির হয়, তাহার তরঙ্গ আরও দীর্ঘ এবং লোহিত অপেক্ষা প্রায় চার সপ্তক নিম্নে। বায়ু-মণ্ডলের আবছায়া ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মির ভেদ করিবার ক্ষমতা আছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে সাধারণ আলোকের দ্বারা দূরের ফটো উঠে না। কিন্তু অতি-লোহিত রশ্মির সাহায্যে, চোখে যায় না এরূপ দ্রব্যের সুন্দর ছবি তোলা যায়।

দৃশ্য আলোকের ত্রিশ সপ্তক নীচে যে রশ্মিগুলি বর্ত্তমান, তাহাদের তরঙ্গ অতি দীর্ঘ। উহারা আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা বহুলক্ষগুণ বড়। এইগুলিই পরিচিত এক রেডিও-তরঙ্গ। হলদে আলোর তরঙ্গ এক ইঞ্চির চল্লিশ হাজার ভাগের ভাগ। কিন্তু বেতার, তরঙ্গ যে দৈর্ঘ্যে ১৫০০ মিটার, ৩৪২ মিটার প্রভৃতি হয়, তাহা আমরা সকলেই জানি। প্রতি সেকেণ্ডে ৬কোটী-কোটী (৬০০০০০০০০০০০০০০০) হলদে আলোর তরঙ্গ আমাদের চক্ষুতে আসিয়া আঘাত করে। ইহা কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য সত্য। সাধারণ রকম বড় তরঙ্গের রেডিও-রশ্মির কম্পন-সংখ্যা প্রতি সেকেণ্ডে দুই লক্ষ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অর্থাৎ, এক সেকেণ্ডে উক্তরূপ দুই লক্ষ তরঙ্গ একস্থান দিয়া বহিয়া যায়। রেডিও-

ভের্ণার হাইজেনবার্গ।

তরঙ্গের প্রকৃতি যে আলোক-রশ্মি-সদৃশ তাহার এক প্রমাণ, 'ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং'-এর সমান্তরাল দাগগুলি যেমন আলোক-রশ্মিকে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিশেষ দিকে প্রতিফলিত করে, 'বীম-ষ্টেশনের' তারসমূহ বিশিষ্ট দৈর্ঘ্যের রেডিও-তরঙ্গকে সেইরূপ প্রতিফলিত করিয়া বিশেষ দিকে চালিত করে।

কঠিন বস্তুকে গরম করিয়া চলিলে রশ্মির বড় তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর তরঙ্গ সকলও উৎপন্ন হইতে থাকে। বস্তুটী যখন উত্তাপে লাল হইয়া উঠে, সেই সময় লাল আলোর তরঙ্গসমূহ উহা হইতে বাহির হইতে আরম্ভ করে। উহাকে আরও উত্তপ্ত করিলে আরও বেশী কম্পন-সংখ্যাবিশিষ্ট, অর্থাৎ, অধিকতর সূক্ষ্মতর তরঙ্গসমূহের আবির্ভাব হয়। শেষে যখন নির্গত আলোক শ্বেতবর্ণ ধারণ করে, তখন বোঝা যায় যে, আলোকতরঙ্গ বর্ণছত্রের সকল রং উৎপাদন করিবার মত যথেষ্ট সূক্ষ্ম হইয়াছে। বেগুনীর উপরদিকের আলোকসপ্তকে আছে, অতি-বেগুনী বা 'আল্ট্রা-ভায়লেট' রশ্মি। এই অদৃশ্য রশ্মি ফটোগ্রাফের প্লেটের উপর খুবই ক্রিয়াশীল। উর্দ্ধ বায়ুমণ্ডলে রেডিও-তরঙ্গ চালনক্ষম 'আয়নোস্ফিয়ার' নামে যে পরিবেশ আছে, তাহা প্রধানতঃ সূর্য্যের অতি-বেগুনী আলোক দ্বারা গঠিত হয়। এইরূপ আলোকসম্পাতে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য হইতে দীপ্তি বাহির হয় (fluorescence); ইহার অর্থ এই যে, রাসায়নিক দ্রব্যগুলি দৃশ্যালোক অপেক্ষা সূক্ষ্মতর তরঙ্গের রশ্মিকে সপ্তকের নীচের দিকে ঠেলিয়া দিয়া দৃষ্টিপথে আনে। এক্স-রশ্মি দৃশ্যালোকের দশ সপ্তক উপরে অবস্থিত এবং উহার তরঙ্গ দৃশ্য আলোক-তরঙ্গ অপেক্ষা কয়েক হাজার গুণ ছোট। এক্স-রশ্মির ভেদকারী শক্তির কথা সুবিদিত। হাল্কা দ্রব্য অপেক্ষা এই রশ্মিতে ভারী দ্রব্য ঘনতর ছায়া ফেলে বলিয়া এক্স-রশ্মির সাহায্যে দেহাভ্যন্তরের ভগ্ন হাড়ের ফটো তোলা যায়। রেডিয়াম হইতে বহির্গত 'গামা'-রশ্মি এক্স-রশ্মি অপেক্ষা দশগুণ সূক্ষ্মতর। দৃশ্যালোকের ৩২ সপ্তক উপরে আরও অধিক সূক্ষ্ম রশ্মি-তরঙ্গ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রশ্মির নাম ব্যোম রশ্মি cosmic ray)। ব্যোম-রশ্মির অংশবিশেষ বহু গজ পুরু সীসার বাধা ভেদ করিয়া যাইতে পারে। তীক্ষ্ণতম ব্যোমরশ্মির তরঙ্গ এক্স-রশ্মির তরঙ্গ অপেক্ষা লক্ষগুণ ছোট। শূন্যস্থানের মধ্যে আলোক, তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ, এক্স-রশ্মি সকলেরই বেগ সমান, সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল।

যে আলোর সাহায্যে জগতের সহিত মানুষের প্রথম পরিচয়, তাহার প্রকৃতি জানিবার চেষ্টা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। প্রাচীনযুগের বিজ্ঞানের ন্যায় অতি-আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানেরও এক প্রধান সমস্যা—নক্ষত্র, সূর্য্য এবং অন্যান্য জ্যোতি-বিশিষ্ট পদার্থ হইতে আলোক কেমন ভাবে বহিয়া চলে? প্রাচীন যুগের দার্শনিকগণ ভাবিতেন যে, চক্ষু হইতে অনুভবকারী দ্রব্য বাহির হইয়া আলোক-উৎসের সহিত সংযোগ সাধন করে। আলোকের অনুভূতি-প্রদানে আলোকের কোন প্রধান অংশ আছে বলিয়া তাঁহারা কল্পনা করিতে পারেন নাই। আরিষ্টটল বিচার-বুদ্ধির বশে প্রথম সহজ ভাবে এই প্রশ্ন করেন—চক্ষুই যদি দেখিবার কাজে যথেষ্ট হয়, তবে অন্ধকারে আমাদের দৃষ্টি চলে না কেন?

আরিষ্টটল এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, শব্দ যেমন উৎস হইতে বায়ু-পরিচালিত হইয়া কাণে পৌঁছায়, তেমনি
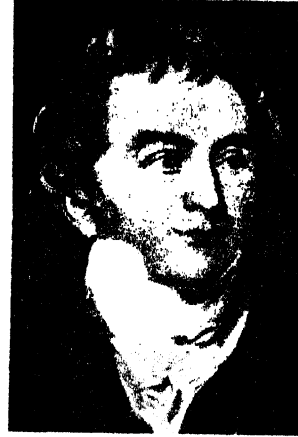
টমাস ইয়ং।

আলোকও তাহার উৎস হইতে বিশেষ দ্রব্য সাহায্যে বাহিত হইয়া চক্ষুকে স্পর্শ করে, চক্ষু হইতে কোন কিছুই বাহির হইয়া আলোকের দিকে যায় না। আরিষ্টটল আলোকের যে বাহন কল্পনা করেন, তাঁহার মতে সেই দ্রব্যের গুণ, অসীম বেগে আলোককে চালাইয়া লইয়া যাওয়া। গতিবেগ অন্তহীন বলিয়াই আলোকের পথ চলিতে কোন সময় লাগে না এবং সেই জন্যই অতিদূর বস্তু হইতে বিচ্ছুরিত আলোককে আমরা সময় ব্যবধানে দেখি না, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাই। ১৫ শত বৎসর পরে মুর-বৈজ্ঞানিক আল্‌হাজেন আলোকের একই রূপ গতির কথা বলেন। আরও

পাঁচশত বৎসর পরে দেকার্তে আলোকের বেগ সম্বন্ধে উক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াও তিনি দাবী করেন। দেকার্তের সমসাময়িক গ্যালিলিও আলোকের বেগ অনন্ত নহে বলিয়া সন্দেহ প্রকাশ করেন। তবে এক মাইল ব্যবধানের মধ্যে পরীক্ষা করিয়া আলোক চলাচলের সময় তিনি ধরিতে পারেন নাই। ঐ সময় নিরূপণ তাঁহার পক্ষে সম্ভবপরও ছিল না, কারণ এক মাইল রাস্তা চলিতে আলোকের যতটুকু সময় লাগে, তাহা পরিমাপ করিবার কোন উপায় সেই যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৬৭২ সালে রোমার, ১৭২৮ সালে ব্রাডলে, ১৮৬২ সালে ফুকো, ১৮৭৯, ১৮৮২, ১৯২১-২৬ সালে মাইকেলসন পৃথক্ পৃথক্ উপায়ে আলোকের গতি নিরূপণ করেন। বর্তমানে নিশ্চিতরূপেই জানা গিয়াছে যে, আলোকের বেগ সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইলের কাছাকাছি। হার্ৎস তড়িৎ-চৌম্বক-তরঙ্গের গতি নির্ণয় করিয়াছেন। এক্স রশ্মির বেগও নিরূপিত হইয়াছে। সকল প্রকার রশ্মির বেগকেই যে আলোকের বেগের সমান বলিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হয় যে, আলোক সরল রেখায় চলে। দ্রুতগামী বস্তুখণ্ডসকল একই ভাবে সরল রেখায় চলে দেখিয়া প্রথম যুগের বৈজ্ঞানিকেরা স্বভাবতঃ ধারণা করিয়াছিলেন যে, বন্দুক হইতে যে ভাবে গুলি বাহির হয়, জ্যোতিবিশিষ্ট বস্তু হইতে সেইরূপ কণিকা-সমষ্টির (corpuscles) প্রবাহ চলিতে থাকে। নিউটন তাঁহার কণিকানির্গমন মতবাদে (emission theory) এই ধারণাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন। আলোকের সরল গতি ছাড়া নিউটন এই মতবাদের সাহায্যে আলোকের প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (reflection and refraction) ব্যাখ্যা করেন। কণিকা-সকলের আকারের পার্থক্যের জন্য আলোকের বর্ণের বিভিন্নতা ঘটে, এই মতও তিনি প্রকাশ করেন। ডাচ্ বৈজ্ঞানিক হুইগেন্স নিউটনের মতবাদ সন্তোষজনক বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তিনি সমগ্র বিশ্বে আলোকবাহী এক সূক্ষ্ম বস্তু—ইথারের (luminiferous ether) অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আলোককে সেই ইথার-সাগরে উৎপন্ন তরঙ্গ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। তদানীন্তন পদার্থবিদ্গণ হুইগেন্সের মতবাদ গ্রহণ না করিয়া নিউটনকে সমর্থন করেন। তাহার কারণ অবশ্য সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের উপর নিউটনের অসীম প্রভাব। পরে কণিকা-নির্গমনের নিয়মে আলোকসংক্রান্ত কতকগুলি প্রাকৃতিক ক্রিয়ার বিশেষ অসুবিধা ঘটায় তরঙ্গবাদের (wave theory) পুনরাবির্ভাব হয়। টমাস ইয়ং এই মতের প্রকৃত ভিত্তি-স্থাপয়িতা। ইয়ং ও ফ্রেনেল আলোকের ক্রিয়ার ব্যাখ্যার জন্য তরঙ্গ-বিষয়ক সুসম্পূর্ণ নিয়ম গঠন করিলে উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলী উহা মানিয়া লন। কোন কোন ক্ষেত্রে আলোকের সরল গতির ব্যত্যয় পরিদৃষ্ট হওয়ায় কণিকা-প্রবাহের দ্বারা আলোকের ক্রিয়াব্যাখ্যার প্রধান বাধা আসে। বহুদিন পূর্ব্বেই লক্ষ্য করা গিয়াছিল যে, ক্ষুদ্র দুইটী আলোক-রশ্মিগুচ্ছের প্রত্যেকটী পৃথক্‌ভাবে পর্দ্দার উপরে দুইটী আলোক-চিহ্ন অঙ্কিত করে বটে, কিন্তু যদি উহাদের একটী অপরটীর উপর গিয়া পড়ে, তবে আলোক আংশিক ভাবে অন্ধকারে পরিণত হয়। স্পষ্টতঃ ইহা আলোকের ব্যাভিচার (interference)। তাহা ছাড়া আলোকের সম্মুখে কোন বৃহৎ বস্তু রাখিলে বস্তুটীর যেমন স্পষ্ট ছায়া পড়ে ক্ষুদ্রতর বস্তুতে সেরূপ ছায়া উৎপন্ন হয় না। তেমনি আবার কোন বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলোক বহিয়া গিয়া পর্দ্দার উপরে একটী আলোকময় গোল দাগ ফেলে, কিন্তু ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র হইলে উহা পর্দ্দায় আলো-ছায়ার সমকেন্দ্রীয় চক্রসমূহ (diffraction rings) সৃষ্টি করে। সূক্ষ্ম রশ্মিগুচ্ছ দ্বারা ঐ ভাবে উৎপন্ন আলো ও ছায়ার পর পর চক্র প্রদর্শিত চিত্রে দেখা যাইবে। আলোককে জলের তরঙ্গসদৃশ বলিয়া ভাবিলে তবে উক্ত ক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা হয়। জলের মধ্যে তরঙ্গসমুদয় যেমন সম্মুখের ক্ষুদ্র বাধা ঘুরিয়া অপর দিকে মিলিত হয়, অথবা সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া বহিয়া যাইবার পর মুক্ত স্থান পাইলে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, উপরোক্ত ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ঘটিতেছে। প্রভেদের মধ্যে ধরিতে হয়, এক্ষেত্রে ইথার-তরঙ্গগুলি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় বৃহৎ নয়, অতি ক্ষুদ্র—এক ইঞ্চির বহু সহস্রাংশ। তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হইলেও আলোকের পথ যে সরল হইবে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখান হয়। আলোক—কণিকাপ্রবাহ অথবা তরঙ্গপ্রবাহ, সে প্রশ্নের নিঃসন্দেহ উত্তর বৈজ্ঞানিকেরা

১৮৪৯ সালে ফুকোর পরীক্ষা হইতে প্রাপ্ত হন। নিউটনের কণিকা-নির্গমন মতবাদ অনুসারে ঘনতর মধ্যগে (denser medium) আলোকের বেগ বেশী হইবে, অপর নিয়মে ঐ-বস্তুতে আলোকের বেগ কমিয়া যাইবে। ফুকোর
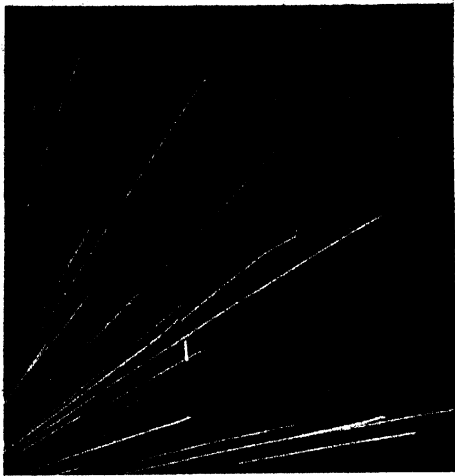
এক্স-রশ্মির প্রভাবে উৎপন্ন ইলেকট্রনের পথ।

পরীক্ষায় দেখা গেল, বায়ু অপেক্ষা জলে আলোর গতি কম।

সপ্তদশ শতাব্দী আলোককে কণিকা বৃষ্টি বলিয়া ধরিয়াছিল। পরের যুগ উহাকে তরঙ্গপ্রবাহ বলিয়া মনে করে। গত শতাব্দীর শেষে ম্যাক্সওয়েলের সময় হইতে আলোককে ইথার-তরঙ্গ মনে না করিয়া তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বলিয়াই বেশীরূপে মনে করা হইতেছে। সংক্ষেপে, গত শতাব্দীর বিজ্ঞান এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, (১) আলোক বস্তুকণার কম্পন দ্বারা উৎপন্ন ক্ষুদ্র আকারের অনুপ্রস্থ (transverse) তরঙ্গ; (২) তরঙ্গগুলির মধ্যে দৈর্ঘ্যের ভিন্নতা বর্ত্তমান; (৩) বর্ণ-বৈচিত্র্য তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে; (৪) শূন্য স্থানে সকল তরঙ্গ সমান বেগে চলে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যে ঐ বেগের বিভিন্নতা হয়।

সারা উনবিংশ শতাব্দীতে আলোককে তরঙ্গরূপে কল্পনা করিবার কোন বিরোধী প্রমাণ না পাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা উহাই তাহার একমাত্র সত্য রূপ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন এবং বস্তু-জগতের আদিতে একদিকে বস্তুর বিচ্ছিন্ন কণিকা, অপর দিকে শক্তির নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ—এই দুইটীর মাত্র অস্তিত্ব সত্য জানিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। গত শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেল যে, প্রকৃত সত্য ঐ ধারণার কাছ ঘেঁসিয়াও যায় না এবং শক্তির প্রকৃতি নির্ণয় সমস্যার সমাধান তত সহজ নয়। মাক্স প্লাঙ্কের পরীক্ষা হইতে পদার্থবিদ্যায় এই যুগান্তকারী ধারণা আসে যে, বস্তুই শুধু অবিভাজ্য বস্তুকণিকাসমূহের দ্বারা গঠিত নয়, বিকীর্ণ রশ্মিও অতি ক্ষুদ্র শক্তিকণা (quantum) সকলের সমষ্টি এবং ঐ শক্তিকণা অবিভাজ্য। উহা হইতেই আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানের 'কোয়ান্টাম্ থিয়োরী'র জন্ম। পরীক্ষাবিশেষের ফলে বৈজ্ঞানিকদের এই সিদ্ধান্তে না আসিয়া উপায় রহিল না যে, শক্তির উৎস হইতে উহার নির্গমন বিচ্ছেদহীন নহে। তাপ, আলোকাদি শক্তি বস্তুর মধ্য হইতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বাহির হইতেছে

বায়ুতে এক্স-রশ্মির গমনপথ।

বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা থাকিয়া থাকিয়া ঝলকে ঝলকে বাহির হয়। এই বিচ্ছিন্নতা (discontinuity) অবশ্য এত সূক্ষ্ম ধরণের যে, উহা নিরবচ্ছিন্নতা নহে বলিয়া ধরা শক্ত। তরঙ্গের সাহায্যে শক্তির সঞ্চরণ কেন

নিরবচ্ছিন্ন হইবে না—আইনষ্টাইন সে কথার কোন উত্তর খুঁজিয়া পান না। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইনই বিকীর্ণ শক্তির সহিত কণিকাকে স্পষ্টভাবে জড়িত করিয়া নূতনরূপে কণিকা-মতবাদ প্রকাশ করেন। উহার মূল কথা এই যে, জলধারায় যেমন জলকণাসমূহ বর্ত্তমান থাকে, গ্যাসের স্তূপে উহার পৃথক্ পৃথক্ অণু ঘুরিয়া বেড়ায়, রশ্মির মধ্যেও তেমনি শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আদি-কণা সকল মিলিয়া থাকে। এইরূপ আদি রশ্মিকণার নাম দেওয়া হয় 'ফোটন' (photon)। তরঙ্গের ধারণাও একেবারে বাদ পড়ে না। ফোটন বা রশ্মিকণা অনেক রকমের। যে রশ্মির তরঙ্গ যত দীর্ঘ, তাহার আদি-কণার শক্তি তত কম। লাল আলোক-কণা অপেক্ষা বেগুনী আলোক-কণার মধ্যে বেশী শক্তি সঞ্চিত থাকে। ব্যোম-রশ্মিতরঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; সুতরাং তাহার আদি-কণার শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। গামা-রশ্মিকণার শক্তি উহা অপেক্ষা কম, এক্স-রশ্মিকণার আরও কম। কোন একটা বিশেষ সংখ্যাকে (Planck's constant-h) রশ্মিকণার কম্পনসংখ্যা দ্বারা গুণ করিলে উহার আদি-কণার শক্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ, প্রত্যেক কণা শক্তির একগুচ্ছ, যাহা তরঙ্গের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির অনুপাতে ছোট হইয়া যায়। ইনফ্রা-রেডের দিকে এই গুচ্ছ ছোট এবং আলট্রা-ভায়োলেটের দিকে বড়।

আলোকের তড়িত-ক্রিয়া (photo-electric effect) উহার কণিকারূপের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। সাধারণ আলোক সোডিয়াম, পোটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর উপর এবং এক্স-রশ্মি গ্যাসের উপর পড়িলে উহাদের পরমাণু হইতে বিয়োগ-তড়িৎ বিশিষ্ট বস্তুর এক আদি-কণা—ইলেকট্রন্ উৎপন্ন হয়। ইহার নাম ফটো-ইলেকট্রন্। আলোকের তেজ (intensity) বেশী করিলে ঐ-ভাবে উৎপন্ন ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে বটে, কিন্তু উহার বেগ বা শক্তি বাড়ে না। কিন্তু যদি আলোকের তীক্ষ্ণতা (frequency) বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে ফটো-ইলেকট্রনের শক্তি বাড়িয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গ যত বড় হয়, তীরস্থ প্রস্তরখণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিবার শক্তিও উহার তেমনি বাড়িয়া থাকে। আলোক তরঙ্গ সদৃশ হইলে উহার তেজ বাড়াইয়া দিয়া ফটো-ইলেকট্রনের শক্তি বাড়ান যাইত। আলোক বস্তুর সংস্পর্শে আসিয়া উহাকে কণিকারূপে আঘাত করে বলিয়া উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহে পরমাণু হইতে উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের শক্তি আলোকের তীক্ষ্ণতার উপর, অর্থাৎ ফোটনের শক্তির উপর নির্ভর করে। পরমাণু হইতে ইলেকট্রন্‌কে বাহির করিতে যতটুকু শক্তি ব্যয়িত হয়, সেইটুকু ছাড়া রশ্মিকণার সমস্ত শক্তি নির্গত ইলেকট্রনে সঞ্চারিত হয়। বিপরীত পক্ষে, বৈজ্ঞানিক বোর্ পরমাণুর মধ্যে ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন্ এক কক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় 'নিউক্লিয়াসের' নিকটতর কক্ষে লাফ দিয়া পড়ে বলিয়া শক্তির নির্গমণ স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্নভাবে হয়—এই যে মত প্রকাশ করেন, রশ্মিলেখার পরীক্ষায় তাহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কম্‌টনের রশ্মিপরীক্ষার ফলও (Compton effect) কণিকার পক্ষ সমর্থন করে। পূর্ব্ব-বর্ণিত আলোকের ডিফ্র্যাকশন প্রভৃতি ক্রিয়া উহার তরঙ্গরূপের পক্ষে যে প্রমাণ দেয়—তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ শেষ পর্য্যন্ত তরঙ্গ ও কণিকার মধ্যে মিলন-সাধন করিয়া তরঙ্গ-কণিকার ('wavicle'—wave
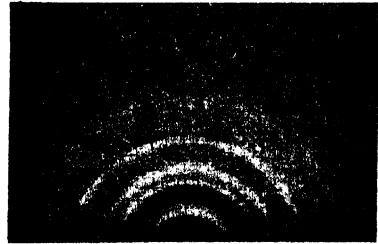
ইলেকট্রনের প্রতিফলনে উৎপন্ন ডিফ্র্যাকশন-চক্র।

particle) সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবলমাত্র আলোকই নয়, সকল প্রকার রশ্মিকেই এখন 'কণিকা-তরঙ্গ' অর্থাৎ কণিকা ও তরঙ্গের মিলিত রূপ বলিয়া কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অধ্যাপক কম্‌টনের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ইলেকট্রনের উপর এক্স-রশ্মির ক্রিয়া বিশিষ্ট কণিকাবৃষ্টির ন্যায়। লো, ব্র্যাগ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন, বস্তুদানার মধ্য দিয়া চলিবার কালে এক্স-রশ্মির প্রকৃতি তরঙ্গ-সদৃশ হইয়া থাকে। শক্তির ক্ষেত্রে যেমন একদিকে রশ্মিকে কখনও বস্তুকণার ন্যায় আবার কখনও তরঙ্গ-সদৃশ আচরণ করিতে দেখা যাইতেছে, অন্যদিকে জড়বস্তুর ক্ষেত্রে

তেমনি আবিষ্কৃত হইতেছে যে, ইলেকট্রন ও প্রোটন এই দুই আদি বস্তুকণা অবস্থাবিশেষে তরঙ্গের আকার ধারণ করে। বিকীর্ণ রশ্মির ন্যায় ইলেকট্রনও যে ডিফ্র্যাকশন চক্র সৃষ্টি করে, ছবিতে তাহা দেখা যাইবে। উইলসন 'প্রকোষ্ঠে' সঞ্চরণকারী ইলেকট্রনের ফটোগ্রাফ তুলিলে উহাকে কণিকা বলিয়া বোধ

সাধারণ আলোকে উৎপন্ন ডিফ্র্যাকশন চক্র।

হয়। কিন্তু সোনার সূক্ষ্মপাতে উহার প্রতিফলন ও প্রতিসরণের ফটোগ্রাফে উহাকে তরঙ্গরূপে দেখা যায়। তাহা হইলে কি কণিকা ও তরঙ্গের মধ্যে প্রকৃত কোন প্রভেদ নাই কিন্তু অবস্থাবিশেষে কণিকা তরঙ্গের এবং তরঙ্গ কণিকার রূপ গ্রহণ করিতে পারে? কণিকা ও তরঙ্গের একত্ব সম্বন্ধীয় এই প্রশ্ন হইতে পদার্থ-বিজ্ঞানের এক নূতন বিভাগের—wave mechanics-এর ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। যে সকল বৈজ্ঞানিক এই দিকের গবেষণায় নিযুক্ত আছেন—ফরাসী বৈজ্ঞানিক দ্য ব্রগলি, জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক শ্রোডিঙ্গার ও হাইজেনবার্গ এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁহাদের অন্যতম।

কণিকা-তরঙ্গকে একটি তরঙ্গপুঞ্জ (wave-packet) বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তরঙ্গগুলি পরস্পরের উপর ক্রিয়ায় সর্ব্বদেহে আপনাদের নাশ সাধন করিয়া একটি মাত্র স্থানে শক্তিতে বাড়িয়া যায়। তখন তরঙ্গ হইতে কণিকারূপে ইলেকট্রনের জন্ম হইল বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। অথবা অন্য পক্ষে একটি ইলেকট্রন এক তরঙ্গমণ্ডলীর সৃষ্টি করে তাহাও ভাবা যাইতে পারে। গতিশীল কণিকাকে তরঙ্গের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া উহা তরঙ্গের মধ্য দিয়া পরিচালিত হয় বলিয়া ধরিলে অনেক সমস্যার সমাধান সহজ হয়। সেকেণ্ডে এক-সেণ্টিমিটার-বেগ-বিশিষ্ট একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) হিসাব করিয়া ৭ সেণ্টিমিটার হয়। কেবলমাত্র কণিকার ভার (mass) ও গতির উপর উহার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। একটি উপমা দিলে বস্তু-তরঙ্গের মূল কথাটি মোটামুটি ধারণা করা সহজ হইবে। চলন্ত গাড়ীর চাকায় একটি সাদা দাগ থাকিলে গাড়ীর বেগ যখন বাড়িতে থাকে, ঐ শ্বেত চিহ্নটিকে একটি ঝাপ্‌সা বৃত্তের আকার ধারণ করিতে দেখা যায়। বৃত্তটির কিনারার দিকে ঝাপ্‌সাভাব বেশী হয়। আপাত-দৃষ্টিতে অদৃশ্য হইয়া গেলেও সাদা চিহ্নটি উহার মধ্যে বর্ত্তমান আছে বলিয়া জানা থাকে। ঝাপ্‌সা বৃত্তটিকে ঘূর্ণমান তরঙ্গপুঞ্জের সহিত এবং মূল দাগটিকে ইলেকট্রন কণার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রীয় প্রোটনের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান ইলেকট্রনের তরঙ্গরূপে বৈজ্ঞানিক বোরের নিরেট ইলেকট্রন ও তাহার কক্ষ (orbit) লোপ পাইয়াছে। অবশ্য তরঙ্গের অন্তর্দ্দেশে কণিকার অবস্থিতি কল্পনায় অসুবিধাও আছে। পদার্থবিদ্যার সাধারণ নিয়মে বস্তুকণার গতি ও অবস্থান একই সঙ্গে নির্ণয় করিতে না পারিবার কারণ নাই। কিন্তু দেখা যায়, ইলেকট্রনের অবস্থান সঠিক নির্ণয় করিতে গেলে উহার ভরবেগ (momentum) কিংবা ভরবেগ নির্ণয় করিতে গেলে উহার অবস্থান ঠিক ঠিক নির্ণীত হয় না (Uncertainty principle)। সকল দিক্
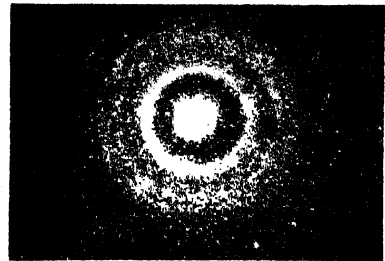
ইলেকট্রনের প্রতিসরণে উৎপন্ন ডিফ্র্যাকশন-চক্র।

দিয়া বিবেচনা করিলে শেষ পর্য্যন্ত বস্তু ও শক্তির প্রত্যেকটির দ্বৈতরূপ অস্বীকার করিবার উপায় বর্ত্তমানে দেখা যায় না। সাধারণতঃ ইহাই লক্ষ্য করা যায় যে, বস্তুর সংস্পর্শে আসিলে আলোকাদি শক্তি-কণিকার রূপ গ্রহণ করে এবং ইলেকট্রনাদি কণিকা বস্তুর মধ্য দিয়া চলিবার কালে তরঙ্গে পরিণত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত ইহাই জানা ছিল যে, জড় ও শক্তি বিশ্বের এই দুই আদি জিনিসের মধ্যে কেবল মাত্র জড়বস্তুর ভার আছে এবং এই ভার নিত্য। বস্তুর নিত্যতা অর্থে এই বোঝা যায় যে, সমগ্র বিশ্বে যে বস্তু আছে, তাহার পরিণাম বাড়ান কিংবা কমান সম্ভবপর নয়। স্যর জে. জে. টমসন প্রথম প্রমাণ করেন, তড়িতযুক্ত বস্তুকে গতিবেগ দিলে উহার ভার বাড়িয়া যায়। বেগ বাড়িতে থাকিলে ঐ ভারও ক্রমে বাড়ে। ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন সাধারণ ভাবে এই কথা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক প্রকার শক্তির ভার আছে। ঐ ভার অবশ্য অতি কম। ৫০ হাজার হাজার টনের একখানি জাহাজ ২৫ নট বেগে চলিলে উক্ত গতি-শক্তির জন্য উহার ওজন এক আউন্সের এক লক্ষ ভাগের এক ভাগ বাড়িবে। একজন লোক সমস্ত জীবনে যত শক্তি ব্যয় করে, তাহার ওজন এক আউন্সের ৮০ ভাগের ভাগ হইবে। বস্তু হইতে শক্তি নির্গত হইয়া গেলে তেমনি উহার ওজন কমিবে। একটি বাতি, অথবা একখণ্ড অঙ্গার পুড়িয়া গেলে যে-ওজনের তাপ ও আলোক বাহির হইল, সেই পরিমাণ বস্তুও মোটের উপর কমিয়া গেল। বস্তুর ন্যায় বিকীর্ণ শক্তির যে চাপ আছে, ম্যাকসওয়েল ১৮৭৩ সালে তাহা প্রমাণ করেন। শক্তির ভার থাকিলে অবশ্যই উহার চাপও থাকিবে এবং এই চাপ ভারের অনুপাতে কম হইবে। এক শতাব্দীতে যতটা সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর উপর পড়ে, তাহার চাপ এক সেকেণ্ড-ব্যাপী প্রবল বর্ষণে যতটুকু জল ধরাপৃষ্ঠে পড়িয়া থাকে, তাহার ওজনের সমান। পৃথিবীতে শক্তির ভার তুচ্ছ হইলেও সূর্য্য, নক্ষত্র প্রভৃতি আকাশের বৃহৎ বস্তুপিণ্ডসমূহে উহা তুচ্ছ নয়। সূর্য্যের কেন্দ্রদেশের তাপমাত্রা ৫।৬ কোটী ডিগ্রী। সেখানকার কণা পরিমাণ বস্তু হইতে যে শক্তি নির্গত হয়, তাহার চাপে দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রভৃতি মুহূর্ত্তে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। ঐ রূপ শক্তির হাজার মাইলের মধ্যে পড়িলে তাহার ঝাপটায় মানুষ নিমিষে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। বস্তু মাত্রে যে হিসাবে আঘাত দিতে পারে, শক্তিও সেই নিয়মে আঘাত দেয় বলিয়া বন্দুকের গুলির ধ্বংসক্রিয়া অতি তীব্র আলোকের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভবপর। সূর্য্য প্রতি মিনিটে যে কিরণ ছড়ায়, তাহার ওজন ২৪ কোটী টন।

জড় ও শক্তি যে ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট নয়, মূলে উভয়ের প্রকৃতি এক—একটীর অপরটীতে পরিবর্ত্তন হইতে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি দেখা গিয়াছে যে, যোগতড়িৎবিশিষ্ট আদি বস্তুকণা—পজিট্রন, বিয়োগতড়িৎ-বিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার সহিত মিলিত হইলে উভয়েই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের স্থানে শক্তিরূপা দুইটী আলোককণা জন্মগ্রহণ করে। অন্যদিকে 'উইলসন প্রকোষ্ঠে' পরীক্ষায় বিকীর্ণ শক্তি হইতে ইলেকট্রন-যুগলের জন্ম হইতে দে[illegible] (pair creation)। সূর্য্য-তারকার অতিতপ্ত [illegible] ও তারকামধ্যবর্ত্তী স্থানের শীতলতার মধ্যে জড়বস্তুর শক্তিতে পরিবর্ত্তন ও শক্তির জড়রূপ গ্রহণ অতি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া অনুমান করিবার কারণ আধুনিক বিজ্ঞানে মিলিতেছে। কেবলমাত্র শূন্যস্থান ও তড়িৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে এখন বিশ্বের আদি বলিয়া ধরা যায় এবং দুইটীর ভিত্তিতে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাখ্যা করা চলে।

ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান

...ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রকৃত উন্নতি কাহাকে বলে, তাহার পরিচয় ভারতবর্ষের ঘাটে মাঠে এবং ভারতীয় ঋষিগণের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। ভারতীয় ঋষিগণ ঐ উন্নতি সাধিত করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সহস্র সহস্র বৎসর পরে ভারতবর্ষ কতকগুলি দ্বিপদ পশু এবং ভাবসঙ্কর পাপাত্মার আবাসভূমি হইলেও ভারতবাসিগণকে অদ্যাবধি ইয়োরোপের মত ব্যাপক ভাবে অন্নসংস্থানের জন্য নকরবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, অথবা প্রতারণাবৃত্তি, অথবা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করিতে হয় নাই। ভারতবাসীর মধ্যে যাঁহারা ভাবসঙ্কর হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা অন্নসংস্থানের জন্য নকরবৃত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জন এখনও সর্ব্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হন নাই এবং অদূরভবিষ্যতে ঐ ভাবসঙ্কর পাপাত্মাগুলি মহাত্মা প্রভৃতি নামে চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের অধিনায়কত্ব পদদলিত করিতে পারিলে আবার ঋষির জ্ঞান সমুদ্ভাসিত হইবে এবং তখন পুনরায় ভারতবর্ষ যে সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ জ্ঞানে সমগ্র জগতের শীর্ষস্থানীয় এবং অতুলনীয়, তাহা প্রমাণিত হইবে।...

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

মহাযানের একটী প্রধান সম্প্রদায় হচ্ছে যোগাচার। এ মত পরিপুষ্টি লাভ করে চতুর্থ পঞ্চম শতকে অসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর হাতে; অসঙ্গ এ সম্প্রদায়কে যোগাচার নামে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু বসুবন্ধু নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানবাদ বা বা বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাবাদ। এ সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার বলা হয়, আর এর দার্শনিক মতবাদকে বলা হয় বিজ্ঞানবাদ। অসঙ্গ তাঁর গ্রন্থাবলীতে সাধনমার্গের কথাই বলেছেন বেশী; আর বসুবন্ধু আলোচনা করেছেন দার্শনিক মতবাদ।

যোগাচার সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় খুব সম্ভব অসঙ্গের পূর্ব্বে। অসঙ্গের দুখানি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং 'মহাযান সম্পরিগ্রহ শাস্ত্র'। প্রথম গ্রন্থখানির সংস্কৃত মূল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়খানির মূল লুপ্ত, কিন্তু চীনা অনুবাদ আছে। অসঙ্গের জীবনী সম্বন্ধে যে জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে, তা হতে বোঝা যায়, তিনি মৈত্রেয়ের দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েছিলেন। এ মৈত্রেয় অনেকের মতে মৈত্রেয় বুদ্ধ, সুতরাং সে প্রবাদ হচ্ছে অলৌকিক। কিন্তু জাপানী পণ্ডিতদের মতে এ মৈত্রেয় হচ্ছেন মৈত্রেয়নাথ নামক একজন শাস্ত্রকার। এই মৈত্রেয়ের নামে প্রচলিত অভিসময়ালঙ্কার নামক একখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ছাড়া মৈত্রেয়ের রচিত 'মহাযান উত্তরতন্ত্র' ও 'ধর্ম্মধর্ম্মতাবিভঙ্গ' নামক দুখানি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়।

মহাযান সূত্রালঙ্কার হচ্ছে কতকগুলি সূত্র ও টীকা। এই সূত্র বা কারিকাগুলিও অনেকের মতে মৈত্রেয়ের রচিত। এ সব সত্ত্বেও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, মৈত্রেয়নাথের ঐতিহাসিকতা এখনও নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় নি। সুতরাং যোগাচারের প্রথম আচার্য্য অসঙ্গ এবং দ্বিতীয় আচার্য্য হচ্ছেন বসুবন্ধু, এই কথাই আমাদের মেনে নিতে হবে। অসঙ্গ বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উভয়ের জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুরে, কিন্তু তাঁরা শাস্ত্র রচনা করেন অযোধ্যায়। বসুবন্ধুর প্রধান যোগাচার গ্রন্থ হচ্ছে বিংশক-কারিকা-প্রকরণ, ত্রিংশিকা-প্রকরণ এবং মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র। বসুবন্ধুর পরে এ সম্প্রদায়ে যে সব প্রধান আচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁদের মধ্যে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে দিঙ্‌নাগ স্থিরমতি ও ধর্ম্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মপাল ছিলেন নালন্দা মহাবিহারের একজন প্রধান পণ্ডিত; তাঁর শিষ্য শীলভদ্রের নিকট প্রসিদ্ধ চীনা পণ্ডিত হিউয়ান সাং শিক্ষালাভ করেন। হিউয়ান সাংকেও যোগাচার সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ তিনি চীনা ভাষায় 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি' নামক এক বিপুল গ্রন্থ রচনা করেন, এ গ্রন্থে ভারতীয় আচার্য্যদের মতামত ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। সে গ্রন্থ সম্প্রতি ফরাসী ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং তা আলোচনা না করলে যোগাচার দর্শনের অধ্যয়ন অসম্পূর্ণ থাকে।

যোগাচার সম্প্রদায়ের দর্শন বা বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনকে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। সেই কারণে অসঙ্গ ও বসুবন্ধু উভয়েই স্বীকার করেছেন যে, ধর্ম্মসমূহ অলীক, তাদের উৎপাদ, স্থিতি, বিনাশ প্রভৃতিও অলীক, অর্থাৎ সমস্তই হচ্ছে শূন্যগর্ভ। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাঁরা বলেছেন যে ধর্ম্মসমূহ অলীক বটে, কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানমাত্র বা চিত্তমাত্র।

> বিজ্ঞপ্তিমাত্রমেবেদমসদর্থাবভাসনাৎ।
> যদ্বৎ তৈমিরিকস্যাসৎ কেশোণ্ড্রকাদিদর্শনং॥
> ন দেশকাল-নিয়মঃ সংতানানিয়মো ন চ।
> ন চ কৃত্যক্রিয়া যুক্তা বিজ্ঞপ্তিযদি নার্থতঃ॥

অর্থাৎ, সমস্তই বিজ্ঞপ্তিমাত্র, তাদের সত্যকার অস্তিত্ব নাই। তৈমিরিক বা চক্ষুপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিদের দৃষ্ট অলীক বস্তুসমূহের মত অবভাস মাত্র। ধর্ম্ম যখন অলীক, তখন দেশ এবং কালের পরিচ্ছেদ নাই, ক্ষণ প্রবাহও নাই, কৃত্য-ক্রিয়ার সমাধান বলেও কিছু নাই, কারণ ধর্ম্মসমূহ প্রকৃত

পক্ষে বিজ্ঞানমাত্র। এই সম্পর্কে বসুবন্ধু যে বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করেছেন, তা অতি প্রাচীন। বুদ্ধ বলেছেন, 'চিত্তমাত্রং ভো জিনপুত্রা যদুত ত্রৈধাতুকমিতি' অর্থাং 'হে জিনপুত্রগণ ত্রিধাতু বা সমস্ত জগং চিত্তমাত্র'। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু ধর্ম্মসমূহের অলীকতার যে অর্থ নির্দ্ধারণ করলেন, তাতেই এই নূতন দার্শনিক মতের সৃষ্টি হল। আর এ দার্শনিক মত বৌদ্ধ সাধককে বেশী আকৃষ্ট করল, নাগার্জ্জুনের শূন্যবাদ তার আধ্যাত্মদৃষ্টির পটভূমিকা হতে যে আনন্দময় কল্পলোককে অপসারিত করেছিল, সে এক মুহূর্ত্তেই তা ফিরিয়ে পেল।

মাধ্যমিক মত হতে বিজ্ঞানবাদের এই পরিণতির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় অসঙ্গের সূত্রালঙ্কারের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সুতরাং সেই অধ্যায়ের আলোচনা করলেই এই দুই মতের সাদৃশ্য ও বিভিন্নতা স্পষ্টভাবে ধরা যাবে।

অসঙ্গের মতে পারমার্থিক সত্য হচ্ছে অদ্বয়, আর এই অদ্বয়ের লক্ষণ পাঁচটি :—

> ন সন্ন চাসন্ন তথা ন চান্যথা
> ন জায়তে ব্যেতি ন চাবহীয়তে।
> ন বর্দ্ধতে নাপি বিশুধ্যতে পুন-
> বিশুধ্যতে তৎপরমার্থলক্ষণং॥

পরমার্থ সং নয়, অসং নয় এবং অন্যরূপ কিছুও নয়। তার উংপত্তি এবং বিনাশ কিছুই নাই এবং তার ক্ষয়বৃদ্ধিও নাই। সে পরমার্থের বিশোধন হয় এ কথা বলা চলে না, কারণ প্রাকৃতিক ক্লেশ তাকে স্পর্শ করে না, এবং তার বিশোধন হয় না, এ কথাও বলা চলে না, কারণ আগন্তুক উপক্লেশের প্রভাব হতে তা মুক্ত নয়।

পরমার্থের এই যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, তা মাধ্যমিকবাদ হতে কোন হিসাবেই পৃথক নয়। এখানে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদ উভয়েই একমতাবলম্বী। এর পর প্রশ্ন হচ্ছে, আত্মদৃষ্টি কি? পঞ্চ-উপাদান ও পঞ্চ-স্কন্ধই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তরে অসঙ্গ বলেছেন—

> ন চাত্মদৃষ্টি স্বয়মাত্মলক্ষণা
> ন চাপি দুঃসংস্থিততা বিলক্ষণা।
> দ্বয়ান্ন চান্যদ্ ভ্রম এষ তদিত-
> স্ততশ্চ মোক্ষো ভ্রমমাত্র-সংক্ষয়ঃ॥

অর্থাং, আত্মদৃষ্টির পিছনে কোন আত্মা নাই। দুঃসংস্থিততা বা পঞ্চ উপাদানস্কন্ধের কোন লক্ষণ নাই। অথচ এ দুটী ব্যতীত আর কিছুই নাই। সমস্তই ভ্রম মাত্র, মোক্ষ এই ভ্রমের সংক্ষয় ব্যতীত আর কিছু নয়। জন্ম এবং শমথ, অর্থাং জন্মের নিবৃত্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই, সংসার এবং নির্ব্বাণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

অসঙ্গের এ মত নাগার্জ্জুনের উক্তির পুনরাবৃত্তি। নাগার্জ্জুনের নির্ব্বাণ ও অসংস্কৃত সংসার অভিন্ন। সুতরাং এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কোথায়, সে কথাও অসঙ্গ বলেছেন—

> অর্থান্ স বিজ্ঞায় চ জল্পমাত্রান্
> সংতিষ্ঠতে তন্নিভচিত্তমাত্রে।
> প্রত্যক্ষতামেতি চ ধর্ম্মধাতু
> স্তস্মাদ্বিযুক্তো দ্বয়লক্ষণেন॥

অর্থাং, মহাজনেরা যখন বুঝতে পারেন যে, বস্তুর সত্যকার অস্তিত্ব নাই এবং তা গল্পমাত্র, তখন তাঁরা চিত্তমাত্রে বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। এই চিত্তমাত্রতাই হচ্ছে ধর্ম্মধাতু, অর্থাং ধর্ম্মসমূহের আত্যন্তিক অবস্থা। এই ধর্ম্মধাতু প্রত্যক্ষ হলেই দ্বয়জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়।

> নাস্তীতি চিত্তাৎপরমেত্য বুদ্ধ্যা
> চিত্তস্য নাস্তিত্বমুপৈতি তস্মাৎ।
> দ্বয়স্য নাস্তিত্বমুপেত্য ধীমান্
> সংতিষ্ঠতেঽতদ্গতিধর্ম্মধাতৌ॥

অর্থাং, চিত্ত ব্যতীত সমস্তই অলীক বুঝতে পারলে এই চিত্তেরও যে অস্তিত্ব নাই, তাও বুঝতে পারা যায়। বিকল্পজ্ঞান নষ্ট হলে ধর্ম্মধাতুতে স্থিতি হয়।

অসঙ্গের দৃষ্টিভঙ্গী সাধকের। তাই তিনি পারমার্থিক সত্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলেছেন, তা শুধু দার্শনিক আলোচনা নয়, সাধকের সাধনমার্গের কথা। এই সাধনমার্গে চারটী স্তর হচ্ছে প্রধান। প্রথম স্তরে সাধক বুঝতে পারেন যে, গ্রাহ্যগ্রাহক (subject and object) চিত্তমাত্র। দ্বিতীয় স্তরে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই চিত্তমাত্রতা অদ্বয়; এ অবস্থায় সমস্ত বিকল্পজ্ঞান বিনষ্ট হয়। তৃতীয় স্তরে সাধক বুঝতে পারেন যে, এই চিত্তমাত্রতার কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ যেখানে গ্রাহ্যের (object) অস্তিত্ব নাই, সেখানে

গ্রাহক-এর (subject) অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব নয়। তা হলে পরমার্থ সত্য কি শূন্যমাত্র? তার উত্তরে অসঙ্গ বলেছেন যে, তা শূন্যমাত্র নয়, কারণ চরম অবস্থায় চিত্তমাত্রতা থাকছে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মধাতু থাকছে। এই ধর্ম্মধাতু কি তা কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয় নি, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা তার প্রতিশব্দ দিয়েছেন 'idealistic world of phenomenon'.

সুতরাং, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদে বিজ্ঞানমাত্রতাই হচ্ছে পারমার্থিক সত্য। এই বিজ্ঞান হতে কি করে ধর্ম্মসমূহের উদ্ভব হচ্ছে, তার ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে বসুবন্ধুর ত্রিংশিকাকারিকায়। বসুবন্ধু বলেছেন যে, আত্ম, ধর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই বিজ্ঞানের পরিণাম। আর এই পরিণাম তিন প্রকারের, (১) আলয়বিজ্ঞান, (২) আলম্বন, (৩) বিষয়বিজ্ঞপ্তি।

আলয়বিজ্ঞান সমস্ত ধর্ম্মের বীজস্বরূপ। সমস্ত সাংক্লেশিক ধর্ম্ম, যা হতে জগতের উৎপত্তি, তার বীজ এখানে নিহিত থাকে বলে একে আলয় বলা হয় (সর্বসাংক্লেশিকধর্ম্মবীজস্থানত্বাদ্ আলয়ঃ)। এই আলয়বিজ্ঞানের পরিণতি দু'রকমের অধ্যাত্ম (subjective) এবং বহির্ধা (objective)। অধ্যাত্মকে উপাদান-বিজ্ঞপ্তিও বলা হয়, তার কারণ সমস্ত বস্তুর গ্রহণ করবার শক্তি এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানেই নিহিত। এ ছাড়া যা কিছু সমস্তই বহির্ধা বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উপাদান বিজ্ঞানের পরিণতি তিন প্রকারের—(১) 'পরিকল্পিত-স্বভাবাভিনিবেশ-বাসনা', অর্থাৎ যে বাসনাবীজ হতে জগতের পরিকল্পিত স্বভাব উদ্ভূত হয়। (২) ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-স্থান—যা হতে রূপাদির জ্ঞান উদ্ভূত হয়, এবং (৩) নাম, অর্থাৎ যে-জ্ঞানের দ্বারা সংজ্ঞা স্থিরীকৃত হয়। এই কারণে স্পর্শ, মনস্কার, বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতনা প্রভৃতি আলয়বিজ্ঞানেরই পরিণতি। এই পাঁচটী হতেই সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। ত্রিকসংনিপাতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, বিষয় এবং বিজ্ঞানের সংঘটনে স্পর্শের উৎপত্তি। সুতরাং স্পর্শ হচ্ছে ইন্দ্রিয়বিকার মাত্র। মনস্কার হচ্ছে "চেতস আভোগ" বা বিষয়ের প্রতি চিত্তের অভিমুখী ক্রিয়া; বেদনা হচ্ছে অনুভব, আর এ অনুভব তিন প্রকারের—সুখ, দুঃখ ও অদুঃখ-অসুখ। সংজ্ঞা হচ্ছে "বিষয়নিমিত্তোদ্গ্রহণং" বা "নিরূপণং" এবং চেতনা হচ্ছে—"মনসঃ চেষ্টা"।
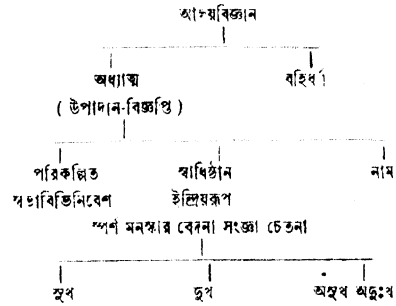
আলয়বিজ্ঞানের এই পরিণতি হতে যে ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি হচ্ছে, তাদের কোন স্থায়িত্ব নাই। বসুবন্ধু তাদের নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করেছেন (স্রোতসৌঘবৎ)। এ প্রবাহ হচ্ছে হেতুফল বা কার্য্যকারণের নিরন্তর প্রবাহ। জল-প্রবাহ হতে যেমন জলের পূর্ব্বাপর ভাগ বিচ্ছেদ করা সম্ভব নয়, এ প্রবাহেও তা সম্ভব নয়। জলপ্রবাহ যেমন পারিপার্শ্বিক মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠদ্রব্য প্রভৃতি নিয়ে প্রবাহিত হয়, আলয়বিজ্ঞানের এই প্রবাহ তেমনি স্পর্শ মনস্কার প্রভৃতি শক্তির দ্বারা পুণ্য, অপুণ্য প্রভৃতি বাসনা সংগ্রহ করে নিরন্তর ভাবে প্রবাহিত হয় এবং সংসারের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহের ব্যাবৃত্তিই হচ্ছে অর্হত্ব।

বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে আলম্বন, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। এ আলম্বের ব্যাখ্যাও বসুবন্ধুর ত্রিংশিকাকারিকায় পাওয়া যায়।

তদাশ্রিত্য প্রবর্ত্ততে।
তদালম্বং মনোনাম বিজ্ঞানং মননাত্মকম্ ॥

অর্থাৎ, আলম্বন আলয়বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে উদ্ভূত হয়। এই আলম্বন হচ্ছে মননাত্মক। সুতরাং এই আলম্বনকে মনোবিজ্ঞান বলা চলে। এই আলম্বনের পরিণতিতেই চার প্রকার ক্লেশের উৎপত্তি। এই চার প্রকার ক্লেশ হচ্ছে—আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান এবং আত্মস্নেহ।

বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি হচ্ছে—বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় হচ্ছে ষড়্বিধ—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শনীয় এবং ধর্ম্মাত্মক। এই বিষয়-বিজ্ঞপ্তির পরিণতিতেই ধর্ম্ম-

সমূহের উদ্ভব। এ ধর্ম্ম হচ্ছে সৌত্রান্তিকদের ছয় প্রকারের চৈত্তধর্ম্ম—(১) চিত্ত-মহাভূমিক—, (২) কুশল—, (৩) ক্লেশ—, (৪) অকুশল—, (৫) উপক্লেশ, (৬) অনিয়তভূমিক—।

সুতরাং বসুবন্ধুর মতে "সর্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্", অর্থাৎ সমস্তই বিজ্ঞপ্তি মাত্র। বিজ্ঞানের পরিণামেই ত্রিজগতের উদ্ভব। আর এই কারণে যে ত্রিজগৎ যে অলীক, তাতে আর সন্দেহ কি?

তাহলে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর মতে নির্ব্বাণ কি? নির্ব্বাণ হচ্ছে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় অবস্থিতি। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতায় যতক্ষণ অবস্থিতি না হয়, ততক্ষণ গ্রাহ্যগ্রাহক থাকে, ধর্ম্মসমূহেরও সৃষ্টি চলে। এই কথা সুস্পষ্ট করবার জন্য বসুবন্ধু বলেছেন—

যাবদ্বিজ্ঞপ্তিমাত্রত্বে বিজ্ঞানং নাবতিষ্ঠতি।
গ্রাহদ্বয়স্যানুশয়স্তাবন্ন বিনিবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ যতক্ষণ বিজ্ঞান চিত্তমাত্রত্বে, বা চিত্তধর্ম্মতায় অবস্থান না করে, ততক্ষণ গ্রাহদ্বয়ের ক্রিয়ার নিবৃত্তি হয় না। গ্রাহ্য এবং গ্রাহক, অর্থাৎ বিজ্ঞপ্তি এবং গ্রহণ করার ব্যাপারই হচ্ছে গ্রাহদ্বয়। গ্রাহদ্বয়ের উৎপত্তি হয় আলয়বিজ্ঞানে যে বীজ নিহিত থাকে, সেই বীজ হতে। বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা অদ্বয় লক্ষণ-বিশিষ্ট, সুতরাং যোগীর চিত্ত যখন সেই অদ্বয় চিত্তমাত্রতায় নিবিষ্ট হয়, তখনই আলয়বিজ্ঞানে নিহিত গ্রাহদ্বয়ের বীজ বিনষ্ট হয়। এ অবস্থায় যোগীর চিত্তের কি অবস্থা হয়, তা বসুবন্ধু ত্রিংশিকাকারিকার শেষ দুইটি শ্লোকে সংক্ষেপে বলেছেন—

অচিত্তোঽনুপলম্ভোঽসৌ জ্ঞানং লোকোত্তরং চ তৎ।
আশ্রয়স্য পরাবৃত্তির্ দ্বিধা দৌষ্ঠুল্যহানিতঃ ॥
এ সবানাস্রবো ধাতুরচিন্ত্যঃ কুশলো ধ্রুবঃ।
সুখো বিমুক্তিকায়োঽসৌ ধর্ম্মাখ্যোঽয়ং মহামুনেঃ ॥

অর্থাৎ, তখন লোকোত্তর জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন চিত্ত থাকে না, উপলম্ভ বা গ্রাহ্য-গ্রাহক সম্বন্ধে বিজ্ঞান থাকে না, দুই প্রকারের দৌষ্ঠুল্য বিনষ্ট হওয়ায় আশ্রয়ের পরাবৃত্তি ঘটে। সে লোক হচ্ছে অনাস্রব, অচিন্ত্য, কুশল, ধ্রুব বা অচল, সুখময় এবং বিমুক্তিবিশিষ্ট। এই অবস্থাকে বলা হয় বুদ্ধের ধর্ম্মকায়।

দৌষ্ঠুল্য দুই প্রকারের—ক্লেশাবরণীয়, এবং জ্ঞেয়াবরণীয়। দৌষ্ঠুল্য হচ্ছে আশ্রয়ের অকর্ম্মণ্যতা। বসুবন্ধু আশ্রয়ের যে অর্থ নির্দ্দেশ করেছেন, তা হতে বোঝা যায় যে, আশ্রয় হচ্ছে ধর্ম্মসমূহের বীজস্বরূপ আলয়বিজ্ঞান (সর্ব্ববীজ-কমালয়বিজ্ঞানম্)। সুতরাং আলয়বিজ্ঞান নিহিত বীজের উৎপাদনশক্তিকেই দৌষ্ঠুল্য বলা চলে। বিজ্ঞপ্তি চিত্তমাত্রতায় নিবদ্ধ হলে এই আশ্রয়ের পরাবৃত্তি ঘটে।

পরাবৃত্তি যোগাচারের একটি পারিভাষিক শব্দ। সুতরাং এই পরাবৃত্তি কি, তা বুঝতে পারলে নির্ব্বাণের অবস্থা স্পষ্ট হবে। অসঙ্গ তাঁর সূত্রালঙ্কারের নবম অধ্যায়ে এই পরাবৃত্ত অবস্থার বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, বিকল্প, মৈথুন প্রভৃতির পরাবৃত্তিতে পরম বিভুত্ব লাভ হয়। এই পরাবৃত্ত অবস্থাই হচ্ছে স্থায়ী নির্ব্বাণের অবস্থা। পরাবৃত্তির সাধারণ অর্থ হচ্ছে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করে স্বস্থানে ফিরে আসা। যোগশাস্ত্রে এ কথার স্পষ্ট প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। চিত্তের দুটী সহজ শক্তি আছে, একটী বহির্মুখী বা অনুলোম, অন্যটী অন্তর্মুখী বা প্রতিলোম। প্রতিলোম গতি অবলম্বন করে নিজের কারণ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়া যায়। সুতরাং এই প্রতিলোম গতি সম্পূর্ণ হওয়া এবং পরাবৃত্ত হওয়া একই কথা। এই গতি সম্পূর্ণ হলে সাধকের সমস্ত বৃত্তি অন্তর্মুখী হয়। এই পরাবর্ত্তনকে retroversion বা transformation বলা যায়।

Retroversion

সমুদ্রতলের জগৎ (সমুদ্রতলে বসিয়া শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত)।

ভারতের রাষ্ট্রভাষা ও বাঙ্গালার দাবী

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চৌধুরী

আধুনিক জগতের চিন্তাধারায় নব্যভারত একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। কাজেই ভারতের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে কিছুদিন হইল যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত সঙ্গত ও স্বাভাবিক বলিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের চিন্তাশীল এবং ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ভাষার দাবী উপস্থিত করিয়াছেন এবং এ-বিষয়ে যে তর্ক-বিতর্ক হইয়াছে, তাহাতে উচ্ছ্বাসও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করা হইয়াছে। প্রশ্নটি কিন্তু মোটেই উচ্ছ্বাস-সাপেক্ষ নহে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার দাবী বিচার করিতে হইবে। কিন্তু কোন আদর্শ না মানিলে, কোন আইনের অধিকার না মানিলে, কোনও বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কাজেই, প্রথমতঃ রাষ্ট্রভাষা-উপযোগী গুণাবলীর নির্ণয় দরকার। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটি ভাষা ভারতের রাষ্ট্রভাষার আসন পাইবার উপযুক্ত মনে হয়।

(১) ভারতের জাতীয় বা রাষ্ট্রভাষা ভারতীয় ভাষা হইতে হইবে।

(২) এই ভাষাভাষীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হইলে চলিবে না।

(৩) এই ভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যগঠনরীতি এরূপ সরল হইবে, যাহাতে অপেক্ষাকৃত অনায়াসে যে কেহ এই ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন।

(৪) এই ভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ ক্ষীণ হইলে চলিবে না।

(৫) এই ভাষা-ভাষীর রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে।

এই আদর্শে বিচার করিলে ভারতীয় অনার্য্যভাষা-গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ এবং আর্য্যভাষাগোষ্ঠীরও দুইটি ভিন্ন অন্য সমস্ত ভাষার পক্ষে ২,৩,৪ এবং ৫ সংখ্যক দাবী পূরণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে; সুতরাং, এই ভাষাগুলির কোনোটিই ভারতের রাষ্ট্রভাষার আসন পাইতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকে, বাংলা এবং হিন্দী।

গত কয়েক বৎসর হইল, হিন্দী-ভাষা-ভাষিগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষার দাবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্থ, বুদ্ধি, ক্ষমতা এবং উচ্ছ্বাস ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। আধুনিক যুগ "প্রপ্যাগাণ্ডা" বা প্রচারের যুগ। যে যাহার ঢোল বেশী কৌশলে উচ্চস্বরে বাজাইতে পারিবে তাহারই জিৎ। কাহাকেও ভাবিবার অবসর দেওয়া হইবে না যে, সেই স্বরে হয়ত বাদকের নিজের কর্ণপটাহই ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। ভারতের জাতীয় ভাষার দাবী সম্পর্কে হিন্দীর প্রাধান্য অনেকটা এই ধরণের প্রচার-সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। এই দাবী এবং প্রচারকার্য্য সাধারণতঃ কংগ্রেসের তরফ হইতে করা হইয়া থাকে। কতকগুলি সাময়িক কারণে কিছুদিন হইল কংগ্রেসের কার্য্যকারিতা কতক পরিমাণে হিন্দীর এলাকায় আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রাজনৈতিক বিচার-বুদ্ধিতে আধুনিক উত্তর-ভারতীয় রাষ্ট্রনায়কগণের সামর্থ্য ও কৌশল সর্ব্বথা স্বীকার্য্য, কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেক মনীষী রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে হিন্দীর দাবী সাব্যস্ত করার প্রচেষ্টায় নিরপেক্ষ বিচার-ক্ষমতার পরিচয় দিতে সক্ষম হন নাই। বাঙ্গালার আদর্শের ঔদার্য্য আধুনিক জীবনের স্বার্থহানাহানির সংঘাতের দিক দিয়া একটি বিরাট দুর্ব্বলতা। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে বাঙ্গালা ভাষার দাবী উপস্থাপিত করা বিষয়ে বাঙ্গালী চরিত্রের এই ঔদাসীন্যই কার্য্যকরী দেখিতে পাই।

উপরে নির্দ্দেশিত আদর্শানুযায়ী এই প্রশ্নের সমালোচনায় বাঙ্গালা এবং হিন্দীর দাবীর পরিমাণ নিরূপিত করার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

(১) বাঙ্গালা এবং হিন্দীর দাবী সমান।

(২) ভাষা-ভাষীর সংখ্যার দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, বাঙ্গালা ভাষা-ভাষীর সংখ্যার অনুপাতে হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা মুষ্টিমেয়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সম্পর্কে হিন্দীর প্রাধান্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা সবচেয়ে বেশী হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, এই প্রকার যুক্তিতে বাস্তব অপেক্ষা কল্পনার প্রাধান্যই অধিক। অনেকে আবার ১৯২১ সালের লোকগণনার সরকারী তালিকা দাখিল করিয়া হিন্দী-ভাষা-ভাষীর সংখ্যার গরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। অবশ্য যদি অবিসংবাদিরূপে প্রমাণিত করা যায় যে, হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যার অনুপাতে বাঙ্গালা ভাষাভাষীর সংখ্যা অতি সামান্য, তাহা হইলে রাষ্ট্রভাষার দাবী প্রসঙ্গে হিন্দীর প্রাধান্যের একটা সুযুক্তিপূর্ণ অত্যাবশ্যক উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কিন্তু গলদ গোড়ায়। যে সরিষা মন্ত্রপূত করিয়া অশরীরী প্রেতকে মানবের অমঙ্গল হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে, সেই সরিষাই প্রেতস্পৃষ্ট। ভাষাতত্ত্ববিদ্ স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন তাঁহার Linguistic Survey of India নামক গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, ১৯২১ সালের লোকগণনার হিসাবে হিন্দী-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ভুল দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ ভুলের পশ্চাতে যে ক্রিয়াশীল মনস্তত্ত্বটি ছিল, তাহাও তিনি সুসঙ্গত যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ পূর্ব্বী-হিন্দীকে পশ্চিমা-হিন্দীর একটি শাখা বলিয়া ভুল করা হইয়াছে এবং পূর্ব্বী-হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা পশ্চিমা-হিন্দীর স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বিহারী-ভাষাভাষীর সংখ্যারও বেশীর ভাগই ক্রমক্রমে পশ্চিমা-হিন্দী লাভ করিয়াছে। কাজেই এইরূপ হিসাবের তালিকায় যে পশ্চিমা-হিন্দীর পক্ষে ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক্ দিয়া ভোট বেশী দাঁড়াইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কি আছে! এ যেন একজনের 'ballot-box'-এ তাঁহার নিজের পাওনা ছাড়াও অন্য দুইজনের ভোটপত্র ভুল করিয়া দেওয়া! নিম্নে লোকগণনার হিসাব এবং গ্রীয়ার্সন সাহেবের 'Survey'র হিসাব দেওয়া গেল।

পশ্চিমা-হিন্দী,	৪১,২১০,৯১৬,	৩৮,০১৩,৯২৮
বাঙ্গালা,	৪৯,২৯৪,০৯৯,	৪১,৬০৪,১৪৩

নিছক সংখ্যার বিচার করিতে গেলেও সমগ্র পশ্চিমা-হিন্দী বাঙ্গালার নিকট ভোটে হারিয়া যায়, কিন্তু আরও একটি কৃত্রিম উপায়ে হিন্দী ভাষাভাষীর সংখ্যা বেশী দেখাইবার একটা অযৌক্তিক চেষ্টা করা হইয়া থাকে। "হিন্দী" শব্দটাকে একটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা এই নীতির অন্তর্গত। "হিন্দী" বলিতে বাস্তবিক পশ্চিমা-হিন্দীর একটি উপভাষা বুঝায়, ভাষা-বিশেষজ্ঞগণের এই মত। কিন্তু চলতি মতে বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া ভিন্ন ভারতের প্রায় সব জায়গার ভাষাই হিন্দী। এই সংজ্ঞা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। প্রকৃতপক্ষে মীরাট অঞ্চলের এবং দিল্লীর ভাষাকে হিন্দী বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত ভাষা-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে এবং স্থানীয় [illegible] দেখা যায়, বিহারী ভাষার সহিত হিন্দীর মোটেই নিকট সম্পর্ক নাই। যে হিন্দী পশ্চিমা হিন্দীর একটি উপভাষা মাত্র, সেই পশ্চিমা হিন্দী 'শৌরসেনী অপভ্রংশ' হইতে উদ্ভূত, আর বিহারী 'মাগধী অপভ্রংশ' হইতে উদ্ভূত। এই দুই অপভ্রংশের মধ্যে পার্থক্য কত বেশী, তাহা ভাষাবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। 'বিহারী'র সহিত 'বাঙ্গালা' অত্যন্ত নিকট সম্পর্কে আত্মীয়তাসম্পন্ন। কারণ বাঙ্গালারও জননী ঐ মাগধী অপভ্রংশ। বাঙ্গালা বিহারীর সহোদরা।

ভাষার দিক দিয়া এই [illegible] আজিও যে-কেহ বুঝিতে পারেন। যে কোন বিহারী অনায়াসে একজন বাঙ্গালীর ভাষা বুঝিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও একজন দিল্লীওয়ালার ভাষা বোঝা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভবই হইয়া পড়ে। এ দিক দিয়াও হিন্দী বিশেষ কিছুই দাবী করিতে পারে না। তবু যদি কেহ বলেন, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের এবং মধ্যদেশের অধিবাসী হিন্দীতে পরস্পরের সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারেন—অর্থাৎ এই সমস্ত জায়গায় যে ভাষা প্রচলিত, উহাদের মধ্যে তেমন কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, সুতরাং এই হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের অধিকসংখ্যক লোক হিন্দী বুঝিতে পারেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার তরফ হইতে বলা যাইতে পারে যে, মাগধী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলি

অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বিজ্ঞানসম্মত কারণে বাঙ্গালা ভাষার সহিত আত্মীয়তাসূত্রে জড়িত এবং একই জননীর সন্তান বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত এমন একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, যাহাতে রাজনৈতিক এবং অন্যান্য কারণে একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের সহিত তেমন কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, মগহী ও ভোজপুরিয়া, এই ছয়টি ভাষার মধ্যে মূলগত পার্থক্য এতই সামান্য যে, ইহাদের মধ্যে যে কোনও ভাষাভাষী অপর ভাষাভাষীর সহিত অনায়াসে ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। আসামী এবং উড়িয়া যে বাঙ্গালার উপভাষা মাত্র, ইহা ভাষাবিজ্ঞানে সামান্য জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বীকার করিবেন। বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে পরিভ্রমণ করিলেও একই তথ্য প্রকাশিত হইবে। আসামে কোন পৃথক বিশ্ব-বিদ্যালয় নাই। আসামী ছাত্রদের এম-এ পড়িবার জন্য বাঙ্গালায় আসিতে হয়; বি-এ এবং অন্যান্য পরীক্ষার জন্যও বহু আসামী ছাত্র বাঙ্গালায়, বিশেষতঃ, কলিকাতায় পড়িতে আসেন। ইঁহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে বাঙ্গালী ছাত্রের একটুও অসুবিধা হয় না। উচ্চারণগত সামান্য পার্থক্য লক্ষিত হয় মাত্র। আসামী লিপিও বঙ্গলিপি। কোনও সময় আসাম প্রদেশে অনার্য্য প্রভাব বেশী হওয়ায় এবং আশেপাশের পাহাড়তলীতে অনার্য্যভাষা কথিত হওয়ায় কিছু কিছু অনার্য্যশব্দ এবং অনার্য্য ভাষার ধ্বনি আসামী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই অনভিজ্ঞ লোকের আপাতদৃষ্টিতে কোনও সময় আসামী ভাষাকে বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র মনে হইতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা আসামের 'আবাহন' নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকা এবং 'পখিলা' নামক আসামের 'শিশুসাথী' পড়িলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন। পঠনক্ষম বাঙ্গালীর পক্ষে আসামের সাময়িক পত্রিকা পাঠ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। উড়িয়া সম্পর্কেও ঐ একই কথা খাটে। অনার্য্যভাষার কতকগুলি শব্দ এবং উচ্চারণ-গত দুই চারিটি বৈশিষ্ট্য বাদ দিলে উড়িয়া আর বাঙ্গালায় কোনই পার্থক্য থাকে না। বাঙ্গালাদেশে উড়িয়া ভৃত্য এবং পাচকের অভাব নাই। ইহারা অতি অল্পায়াসেই বাঙ্গালীর সহিত ভাবের আদান-প্রদান করিতে পারে। আধুনিক ভারতীয় মাগধী ভাষাসমূহের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মাত্র সেদিন আসামী ও উড়িয়া বাঙ্গালা হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। ভাষাগত এই স্বাতন্ত্র্য রাজনৈতিক কারণে কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করার চেষ্টা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেদিনও উড়িষ্যার এবং আসামের বিদ্যালয়গুলিতে বাঙ্গালা ভাষা আবশ্যক পাঠ্য-বিষয়গুলির অন্যতম ছিল। কিন্তু রাজ-নৈতিক কারণে বঙ্গদেশকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়োজনীয়তা হইতেই আসামী ভাষার স্বাতন্ত্র্য-বোধকে জাগ্রত করিবার চেষ্টার সৃষ্টি।

এই বিষয়গুলি নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বাঙ্গালা এবং বাঙ্গালা ভাষার সহোদরা উপভাষাসমূহই বেশী লোকে বুঝিতে পারে। এই সমস্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা Linguistic Survey of India-র মতে :—

বাঙ্গালা, আসামী, উড়িয়া	৮৯,৩০৪,১৪৩
মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরিয়া :	৩৭,১৮০,৭৮২
মাগধী ভাষাসমূহ :	১২৬,৭৮৪,৯২৫

সমগ্র পশ্চিমা-হিন্দী-ভাষাভাষীর সংখ্যা :—

হিন্দুস্থানী	১৬,৬৩৩,১৬৯
বাঙ্গারু	২,১৬১,৭৮৪
ব্রজভাষা	৭,৮৬৪,২৭৪
কনৌজী	৪,৪৮৩,৫০০
বুন্দেলী	৬,৮৬৯,২০১
শৌরসেনী ভাষাসমূহ	৩৮,০১৩,৯২৪

উপরের হিসাব হইতে দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতেই বাঙ্গালা ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত ভাষাভাষীর সংখ্যা হিন্দী ও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত উপভাষাভাষীর সংখ্যার অনেক বেশী। এই তুলনায় হিন্দীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় বলা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, আরও একটু তলাইয়া দেখিলে হিন্দীর পক্ষীয় কৃত্রিম যুক্তির অসারতা আরও বাহির হইয়া পড়িবে। 'হিন্দী' বলিতে কোন্ ভাষা বুঝিব? পশ্চিমা-হিন্দীর যে উপভাষাটিকে গ্রীয়ার্সন

সাহেব হিন্দুস্থানী বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, হিন্দী এবং উর্দ্দু এই হিন্দুস্থানীর উপভাষারূপে তাঁহার সঙ্কলিত গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছে। এই হিন্দী, উর্দ্দু ও হিন্দুস্থানী বলিতে পশ্চিমা-হিন্দীর কোন্ কোন্ উপভাষা বুঝায়, তাহার একটা স্পষ্ট ধারণা হওয়া আবশ্যক। গ্রীয়ার্সন সাহেবের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

> "The name Urdu can then be confined to that special variety of Hindusthani in which Persian words are of frequent occurence and which, therefore, can only be written with ease in the Persian character, and similarly Hindi can be confined to the form of Hindusthani in which Sanskrit words abound and which, therefore, is legible only when written in the Nagare character."
>
> (L. S. I. p. 167, I, 1)

> "সুতরাং হিন্দুস্থানীর যে বিশিষ্ট উপভাষায় ফার্‌সী শব্দের হামেশা ব্যবহার করা হয় এবং তাহার ফলে একমাত্র ফার্‌সী লিপিতেই যাহার প্রকাশ অতি সহজে হইতে পারে, 'উর্দ্দু' নামটি কেবল তাহারই প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। এইরূপ 'হিন্দুস্থানী'র অপর যে একটি উপভাষায় সংস্কৃত শব্দের বহু ব্যবহার হইয়া থাকে এবং সেই জন্য একমাত্র নাগরী বর্ণমালাতেই যাহা সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে সেই উপভাষার নামই 'হিন্দী' দেওয়া যাইতে পারে।"

কাজেই দেখা যাইতেছে, হিন্দী এবং উর্দ্দু হিন্দুস্থানী নামক পশ্চিমা-হিন্দীর একটি শাখার উপশাখাদ্বয়রূপে গ্রীয়ার্সন কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ হিন্দুস্থানীর একটু অন্য প্রকার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। হিন্দী এলাকার একজন পণ্ডিতের মত উল্লেখ করা যাইতে পারে।

> **"इस् अवस्था मे इस्के दो रुप हो गये, एक तो हिन्दी कहलाता रहा और दुसरा उर्दु नाम से प्रसिद्ध हुया। दोनोंके प्रचलित शब्दोंके ग्रहण करके, पर व्याकरणका संघटन हिन्दीके ही अनुसार रख कर, अंरेजोंने इस्का एक तीस्रा रुप हिन्दुस्तानी बनाया। अतएव इस् समय खड़ी वोलीके तीन रुप वर्त्तमान हैं। (१) शुद्ध हिन्दी जो हिन्दुओंकी साहित्यिक भाषा है और जिस्का प्रचार हिन्दुओं मे है। (२) उर्दु जिस्का प्रचार विशेष कर मुसलमानोंमे है और जो उनके साहित्यकी और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिन्दुओंकी घरके बाहरकी बोलचालकी भाषा है; और (३) हिन्दुस्तानी जिस्मे साधारणतः हिन्दी उर्दु दोनोंके शब्द प्रयुक्त होते हैं और जिस्का बहुतसे लोग बोलचालमे व्यवहार करते है। इस्मे अभी साहित्यकी रचना बहुत कम हुई है। इस तीस्रे रुपके मूलमे राजनीतिक कारण है।"**

এইরূপ হিন্দুস্থানীর একটি শঙ্কররূপকে ভারতের ন্যায় একটি বিরাট গৌরব-সমুজ্জ্বল জাতীয়তার বাহন করিবার ক্ষীণ প্রচেষ্টা করা হইয়া থাকে। এই দৃষ্টিতে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর (সমার্থক নহে) সংখ্যাগত লঘিষ্ঠতা অত্যন্ত করুণ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে ভাষাভাষীর সংখ্যার দিক্ দিয়া বাঙ্গালার দাবী এই তুলনায় এত বেশী যে, এ বিষয়ে এই দুইটি ভাষার মধ্যে রাষ্ট্রভাষার দাবীসম্পর্কে কোন তুলনাই চলিতে পারে না। এই কারণেই ইহাদের মধ্যে বিরোধ থাকাও অশোভন, নিঃসঙ্কোচে বাঙ্গালার আধিপত্য স্বীকার করিয়া হিন্দীর পক্ষে সরিয়া দাঁড়ানোতে তাহার গৌরব এবং সার্থকতা।

(৩) (৪) ভাষাভাষীর সংখ্যার পরেই বিচার্য্য বিষয়, রাষ্ট্রভাষার ব্যাকরণ ও বাক্যগঠনরীতির আলোচনা এবং প্রচলিত সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ। এই সম্পর্কেও বাঙ্গালার দাবীই যে সর্ব্বাগ্রগণ্য, তাহাতে কোনই সন্দেহের অবসর নাই। অতি স্বাভাবিক কারণেই রাষ্ট্রভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল হওয়া আবশ্যক, যাহাতে অল্লায়াসে যে কেহ এই ভাষা শিক্ষা করিতে পারেন। বাক্যগঠনরীতির জটিলতাও এই প্রসঙ্গে একটি অনতিক্রমণীয় বাধা বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। শুদ্ধ হিন্দীর ব্যাকরণ এবং বাক্যগঠন-ভঙ্গিমা বাঙ্গালা এবং ভারতীয় অন্যান্য ভাষাগুলির তুলনায় কত জটিল, তাহা সকলেই জানেন। ক্রিয়াপদের লিঙ্গভেদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দী ব্যাকরণের জটিলতা হিন্দীভাষা শিক্ষার পক্ষে একটি গুরুতর অন্তরায়। এ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষাগোষ্ঠীর দাবী অত্যন্ত স্পষ্ট এবং যুক্তিপুষ্ট। ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্লায়াসে বোধ হয় বঙ্গভাষাই আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালা জটিল ব্যাকরণের বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সরল হইতে সরলতর সহজ গতি লাভ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের হস্তে এই ভাষার ব্যাকরণ অনেকটা শব্দ-প্রয়োগের কৌশলেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। আধুনিক রীতিতে যে ভাষার অভিধান আছে, অথচ তথাকথিত ব্যাকরণ নাই, সেই ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী ও সরল। শুধু শব্দের প্রয়োগ-চাতুর্য্যে ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা কত অধিক এবং স্বাভাবিক হইতে পারে, তাহা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গদ্য-রীতি আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। ভাব-প্রকাশ ক্ষমতায় বাঙ্গালা পৃথিবীর যে কোন গৌরবমণ্ডিত ভাষার সহিত তুলিত হইতে পারে। এ বিষয়ে হিন্দী বা হিন্দুস্থানীর অনুরূপ সৌকর্য্য এবং সারল্য লাভ করার এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

রাষ্ট্রভাষার সাহিত্য-সম্পদ্ উজ্জ্বল এবং মহনীয় হইতে হইবে এবং রাষ্ট্রভাষার রাজনৈতিক প্রতিপত্তিও দেশের রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিশেষ পরিমাণে সামর্থ্যের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই দিক্ দিয়াও বাঙ্গালার দাবীই সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনায় ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্যের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে বঙ্গ-সাহিত্য এতই সমৃদ্ধ যে, পৃথিবীর যে কোন দেশের গৌরব-পূর্ণ আধুনিক সাহিত্যের সহিত বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনা চলিতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যের চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনেক বিদেশী বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতে পাশ্চাত্যখণ্ডের সর্ব্বত্র বঙ্গভাষা আসন লাভ করিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি।

ভারতীয় আধুনিক রাজনীতির জন্মস্থান বাঙ্গালায়। ইহা ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, সে বিচার না করিয়াও বলিতে পারা যায় যে, ভারত স্বায়ত্তশাসন-সংস্কার কথাটির সহিত যে পরিচিত হইয়াছে, তাহা একমাত্র বঙ্গ-দেশের রাজনীতিক চিন্তার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্র বাঙ্গালা হইতে অন্যত্র অপসারিত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দৃষ্টি চক্ষুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অপদৃষ্টির ন্যায়। দরিদ্র বাঙ্গালা রাজনীতিক্ষেত্রে অনাড়ম্বর ত্যাগস্বীকারে চিরকালের জন্য মহনীয় হইয়াছে। বলিষ্ঠ কল্পনায় ভারতীয় রাজনীতি-যজ্ঞে বাঙ্গালীই হোতা।

উপরে প্রদর্শিত যুক্তিপরম্পরা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, একমাত্র বঙ্গভাষাই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। নিছক কৃত্রিম যুক্তি সৃষ্টি করিয়া শুধু ঘটনাসমাবেশ ও সুযোগের সহায়তায় অন্য কোন ভাষার দাবী ন্যায়তঃ টিকিতে পারে না। তবে বাঙ্গালার পরেই হিন্দী এবং উর্দ্দুর সমান অধিকার এবং ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা সমস্যার একটা বাস্তব মীমাংসা দুইটি মূলনীতি-সাপেক্ষ।

প্রথম, প্রদেশগত রাষ্ট্রভাষা, দ্বিতীয়, কেন্দ্রীয় যুক্ত-ভারতীয় রাষ্ট্রের ভাষা-সমস্যা।

প্রথম সমস্যার মীমাংসা অবশ্য কষ্টসাধ্য নহে। বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে প্রাদেশিক ভাষা রাষ্ট্রের ভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, তবে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের সহিত যোগসূত্রে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার মারফতই কাজ চালাইতে হইবে এবং এই উপলক্ষে প্রদেশগুলিতে একটি কেন্দ্রীয় দপ্তর স্থাপিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যাই প্রধানতঃ মূল সমস্যা। আমরা বিভিন্ন আদর্শে এই মূল সমস্যার আলোচনা করিয়া উপরে দেখাই-য়াছি যে, যুক্তভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষার উপযোগী বৈশিষ্ট্য একমাত্র বঙ্গভাষারই রহিয়াছে।

কিন্তু নানা কারণে এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যে, ভারতের রাষ্ট্রভাষা একটি হইলে নানা প্রকার বিরুদ্ধ ঘটনার সৃষ্টি হইবে। হিন্দী-ভাষাভাষীর ভাবপ্রবণতা অবশ্য যুক্তির দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয়, তথাপি যাহাতে গৃহবিবাদের ফলে জাতীয় উন্নতি প্রতিহত না হয়, সেই জন্য হিন্দীর দাবী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে এবং হিন্দীর দাবী স্বীকৃত হইলে উর্দ্দুর অধিকার অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। কাজেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের তিনটি ভাষা থাকিবার প্রয়োজন, বাঙ্গালা, হিন্দী এবং উর্দ্দু। কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকেরই এই তিনটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে এবং এই তিনটি ভাষার যে কোন একটিতে রাজনৈতিক সমস্যার আলোচনা হইতে

পারিবে। বিভিন্ন দলগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ইহা অপেক্ষা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা আর হইতে পারে না।

এইরূপ নিয়ম যে সর্ব্বপ্রথম এইখানেই প্রস্তাবিত হইল এমন নহে, পৃথিবীর অন্যান্য অনেক দেশে প্রয়োজন-মত দুই বা তদধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষার কার্য্য করিয়া থাকে। আমরা ইতিহাস হইতে এরূপ কয়েকটি উদাহরণ দিয়া আমাদের প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১৮৪০ খৃঃ ক্যানাডার পালিয়ামেণ্টে একটি অ্যাক্টে নির্দ্দেশিত হয়—

"XLI. And be it enacted, that from and after the said reunion of the said two provinces (Upper and lower Canada) all business and records of the said Legislative Council and Legislative Assembly shall be in the English language only."

"অর্থাৎ, এইরূপ বিধি করা হউক যে, উক্ত দুইটি প্রদেশের (উত্তর এবং দক্ষিণ ক্যানাডা) পুনর্ম্মিলনের পর হইতে উক্ত ব্যবস্থাপক সভা এবং আইন-পরিষদের সমস্ত কাজকর্ম্ম কেবল ইংরাজীতেই চলিবে এবং ইংরাজীতেই সমস্ত নথিপত্র রাখা হইবে।"

কিন্তু যখন এই ব্যবস্থার ফলে ক্যানাডায় নানাপ্রকার গোলযোগ দেখা দিতে লাগিল, তখন ক্যানাডার রাষ্ট্র-নায়কগণ এই নির্দ্দেশের ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং ১৮৬৭ খৃঃ The British North America Act-এ নিম্নলিখিত বিধি ব্যবস্থিত হইল।

"133. Either the English or the French language may be used by any person in the debates of the Houses of the Parliament of Canada and of the Houses of the Legislature of Quebec; and both these languages shall be used in respective records and journals of these houses, and either of those languages may be used by any person or in any pleading or process in or issuing from any Court of Canada established under this act, and in or from all or any of the Courts of Quebec. The acts of the Parliament of Canada and of the Legislature of Quebec shall be printed and published in both these languages."

"অর্থাৎ ক্যানাডা পার্লিয়ামেণ্টের পরিষদে এবং কুইবেকের ব্যবস্থাপক সভায় যে কোন লোক ইংরাজী অথবা ফরাসী ভাষায় বাদানুবাদ করিতে পারিবেন, এবং ঐ সকল পরিষদের স্ব স্ব নথিপত্র ও পত্রিকাদিতে ঐ দুইটি ভাষাই ব্যবহৃত হইবে। এই আইন অনুসারে স্থাপিত ক্যানাডার যে কোন বিচারালয়ে এবং কুইবেকের এক বা সমস্ত বিচারালয়ে যে কেহ এই দুই ভাষার যে কোন একটি ব্যবহার করিতে পারিবেন। এই সমস্ত আদালতে পক্ষ সমর্থন বিষয়ে কিংবা বিচার ব্যবস্থায় অথবা আদালত কর্ত্তৃক প্রচারিত বাহিরের কোনও নির্দ্দেশে এই দুইটির যে কোন একটি ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে। ক্যানাডা পার্লিয়ামেণ্ট এবং কুইবেকের ব্যবস্থাপক সভার আইনসকল এই দুইটি ভাষাতেই মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইবে।"

১৯০৯ সালে দক্ষিণ-আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করিবার সময় পার্লিয়ামেণ্টের Actএ রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে নিম্ন-লিখিতরূপে আইন করা হয়।

"137. Both the English and the Dutch languages shall be official languages of the Union and shall be treated on a footing of equality and possess and enjoy equal freedom, rights and privileges; and all records, journals and proceedings of Parliament shall be kept in both languages, and all bills, acts and notices of general public importance or interest issued by the Govt. of the Union shall be in both languages."

অর্থাৎ ডাচ ভাষা এই য়ুনিয়নের সরকারী ভাষারূপে গণ্য হইয়া তুল্যমূল্য বিবেচিত হইবে এবং সমান স্বাধীনতা, অধিকার ও সুখ-সুবিধা ভোগ করিবে। সরকারী সমস্ত রেকর্ড, সংবাদপত্র এবং পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-বিবরণীসমূহ উভয় ভাষাতেই লিপিবদ্ধ থাকিবে, এবং সরকার হইতে প্রচারিত বিল, আক্ট ও সাধারণের জন্য নোটিসাদি সমস্তই এই দুই ভাষার মারফৎই হইবে।"

সুইজারল্যাণ্ডেও ফরাসী, জার্ম্মান এবং ইতালিয়ান রাষ্ট্রভাষার আসন পাইয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষেও বাঙ্গালা, হিন্দী এবং উর্দ্দু রাষ্ট্রভাষারূপে চলিতে পারে কি না, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিচার করিবেন।

দুঃখ-নিবারণী সমিতি

—শ্রীকালীপদ চৌধুরী—

হরিশপুর গ্রামে মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে দুই-চার জন খদ্দরধারী দেশসেবক আসিয়া কৃষকদের দুর্দ্দশা নিবারণের জন্য বক্তৃতা দিতেন এবং ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ প্রদান করিতেন। গ্রামটী কৃষকপ্রধান। কৃষকেরা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত। তাহারাও বক্তৃতা-সভায় যোগদান করিত; কিন্তু বক্তৃতা শুনিবার জন্য অথবা খদ্দর-টুপীধারী স্বদেশীবাবুদের চেহারা দেখিবার জন্য, তাহা বলা কঠিন।

এই "কৃষক-দুঃখ-নিবারণী" সমিতির সভ্যবৃন্দ আবিষ্কার করিয়াছিলেন যে, কৃষকদের দুর্দ্দশার প্রধান কারণ, ইংরাজী শিক্ষার অভাব। এই তত্ত্ব আবিষ্কার করা মাত্র কৃষকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। গ্রামের ডেঁপো ছোক্‌রারা খাতা বগলে করিয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চাঁদা-সংগ্রহের জন্য ঘুরিতে লাগিল। এইরূপে বহু চেষ্টায় সমিতি হরিশপুর গ্রামে একটি মাইনর স্কুল স্থাপিত করিলেন।

সহর হইতে তিন জন পাশকরা মাষ্টার আনা হইল। ছেলেদের মাহিনা ধরা হইল—আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত এবং ঠিক হইল, ছেলেদের মাহিয়ানা হইতেই মাষ্টারদের বেতন দিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

গ্রামের পশ্চিমাঞ্চলে একটি বিস্তৃত মাঠের এক প্রান্তে কলা গাছের আড়ালে যে কুটিরখানি দেখা যায়, সেটির মালিক বৃদ্ধ পরাণ হালদার। পরাণ হালদারের সংসারে তিনটী প্রাণী,—নিজে, হালদার-গিন্নী ও সাবালক পুত্র হরিচরণ। এ-পাড়ায় পরাণের অবস্থাই একটু স্বচ্ছল। কারণ, অন্যান্য সমস্ত কৃষকের কম-বেশী দেনা আছে, পরাণের তাহা নাই। পিতা-পুত্র দিন-রাত খাটিয়া যাহা রোজগার হয়, জমীদারের খাজনা দিয়া তাহা দ্বারাই তাহারা কোনমতে গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, কখনও ঋণ করিবার নামও করে না। দেশ নিরিবিলি বাসভবন, স্ত্রীপুত্র লইয়া পরাণ অনাড়ম্বর সহজ শান্ত জীবন যাপন করে। স্বভাব অত্যন্ত নিরীহ বলিয়া পরাণকে গ্রামের সকলে বেশ ভালই বাসে।

গ্রামে স্কুল বসিল। বৃদ্ধ পরাণ হালদারের সতের বৎসর বয়স্ক পুত্র হরিচরণ পিতার হস্তে লাঙ্গল তুলিয়া দিয়া, বর্ণবোধ ও ফার্ষ্ট বুক হস্তে বিদ্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করিল। গ্রামের জমীদার রামু দত্ত পরাণকে উৎসাহ দিয়া বলিলেন, 'বেশ, বেশ, এই তো চাই—ছেলেটী মানুষ হোক!'

জমীদারের উৎসাহ পাইয়া চাষ-বাসের অসুবিধা হইলেও হরিচরণের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া পরাণের বুকও উৎসাহে ভরিয়া উঠিল।

হরিচরণের বয়স একটু বেশী, এই জন্য সে ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া, বৎসরের পর বৎসর এক শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। প্রথমে বর্ণবোধ ও ফার্ষ্টবুক ছাড়িয়া বাল্যশিক্ষা ও স্পেলিং-বুক, তার পর-বৎসর নীতিশিক্ষা ও চাইল্ডস্ রিডিং, ইতি-কথা ইত্যাদি পড়িতে আরম্ভ করিল। পরাণ ছেলের বিদ্যাশিক্ষার খরচ নির্ব্বিবাদে জুটাইয়া চলিতে লাগিল। হালদার-গিন্নী ছেলের মুখে দুর্ব্বোধ্য বিদেশী ভাষা শুনিয়া গর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিলেন, ছেলে নিশ্চয়ই জজ কিংবা ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে!

ক্রমে হরিচরণের গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইল। অতঃপর তাহার পড়া লইয়া একটু মুস্কিল বাধিল।

ধরিতে গেলে জমীদার রামু দত্তকে একরকম অত্যাচারীই বলিতে হয়। কিন্তু গ্রামে স্কুল হইবার সঙ্গে সঙ্গে—কি কারণে বলা কঠিন, তাঁহার মধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিল যে, অত্যাচারের বহর তিনি কমাইয়া দিলেন। ছেলের পড়ার নাম করিয়া যে-ই তাঁর কাছে অর্থের জন্য হাত পাতিত, তিনি কাহাকেও ফিরাইতেন না।

একদিন বিকালে জমীদারের লোক আসিয়া জানাইল, 'পরাণ, বাবু ডেকেছেন।'

পরাণ প্রথমে শিহরিয়া উঠিল। জমীদারের ডাক তো ভাল নয়! কোন দোষ করিয়াছে না কি? তবে জমীদার তাহাকে কেন ডাকিল? নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে পরাণ ছেলেকে সঙ্গে করিয়া কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

জমীদার রামু দত্ত কাছারীতে তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া ছিলেন; একপাশে স্কুলের মাষ্টার সতুবাবু ও অন্য পাশে "কৃষক-দুঃখ-নিবারণী" সমিতির সভ্যবৃন্দ আসর জমাইয়া বসিয়াছেন। পরাণ দ্বারের পাশে বলির ছাগের মত গিয়া দাঁড়াইল। পিছনে হরিচরণ।

মাষ্টার সতুবাবু পরাণকে দেখিয়া বলিলেন, 'এস হে এস, ভেতরে এস।'

পরাণ এ-রকম আহ্বান প্রত্যাশা করে নাই। সে একটু সাহস পাইয়া দ্বারের চৌকাঠ পার হইয়া মাটিতেই বসিয়া পড়িল।

তখন জমীদার রামু দত্ত বলিলেন, 'কিরে পরাণ, ছেলে তো তোর গাঁয়ের স্কুলের সব বিদ্যে শিখে ফেলেছে! তাকে তো এবার সহরে পাঠাতে হবে?' বলিয়া তিনি সতু মাষ্টারের মুখের দিকে চাহিলেন।

সতুমাষ্টার সায় দিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে হাঁ, নিশ্চয়।'

কথাটার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া না বুঝিয়াই পরাণ উত্তর দিল, 'তা হুজুর, সে আপনাদের মর্জ্জি। আমি আর কি বলব।'

জমীদার বলিলেন, 'সে তো আগেই জানি যে, তোর আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু ছেলে পড়াবার খরচও তো কিছু আছে,—তা থাক্, সেজন্য আটকাবে না, মাসে পনেরটা টাকা—তা' তুই সবটা না পারিস্ আমার কাছে আসিস, সে দেখা যাবে।—কি বল মাষ্টার?'

মাষ্টার পুনর্ব্বার সায় দিলেন।

"কৃষক-দুঃখ-নিবারণী" সভার সভ্যবৃন্দ এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। এবার নেতা ভানুবাবু কহিলেন, 'ছেলের পড়ার খরচ দিতে পারবে না কেন? ওর অবস্থা এ গাঁয়ে সবার চেয়ে ভাল। তারপর হরিচরণ যদি সহরে যায় তবে তার খোরাকির ধানটা তো বাঁচবে? সেটা বিক্রী করলেই তো টাকা আসবে।'

পরাণ এবার কহিল, 'বাবুরা, আমার অবস্থা যে কী তা আপনারা কেমন করে জানবেন? ধারধোর করি না বটে বাবু, উপোস করে থাকলেও ধারধোর করতে আমার ভয় করে, কিন্তু আমার অবস্থা একদম ভাল নয় বাবু। আপনারা মা-বাপ—'

সতুমাষ্টার একটু কাশিয়া কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি, ও সব কথা বাদ দে। হরিচরণ আমাদের স্কুলের প্রথম পাশকরা ছেলে, ওকে ভাল করে লেখাপড়া শেখাতেই হবে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখন, ভাবিস না।'

পরাণ কাতরকণ্ঠে সতুমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু বাবু আমি বুড়ো বয়সে একা ক্ষেত-খামার কি করে দেখব?'

সতুমাষ্টার হঠাৎ এ কথার জবাব দিতে পারিল না। রামু দত্ত ও কথাটার কোন উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া কথাটা চাপা দিবার জন্য বলিয়া উঠিলেন, 'হ্যাঁরে হরিচরণ! তোর কি মত, বল তো শুনি? সহরে যাবি, না লাঙ্গল ধরে এখানে চাষবাস করবি?'

এবার সকলের দৃষ্টি যাহাকে লইয়া এত বচসা তাহার উপর গিয়া পড়িল। জমীদারের প্রশ্নের উত্তরে হরিচরণ একবার পিতার মুখের দিকে চাহিল—তারপর মাথা নীচু করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না। স্পষ্ট বোঝা গেল, পড়িবার ইচ্ছা তাহার আছে, কিন্তু এই বয়সে পিতার ঘাড়ে ক্ষেত খামারের সমস্ত ভার চাপাইয়া দিয়া সহরে যাইবার কথাটাও তাহার ভাল লাগিতেছে না।

জমীদার সতুমাষ্টারের দিকে চাহিয়া কহিলেন, 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং, ধরে নেওয়া যেতে পারে, এঁ্যা?'

সতুমাষ্টার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, 'হবেই তো, লেখাপড়ার নেশায় একবার ধরলে আর কি, মানুষ ছাড়াতে পারে।'

তারপর পরাণকে অনেক রকম করিয়া বুঝান হইল, আশ্বাস দেওয়া হইল। কিছুদিন তাহাকে কষ্ট করিয়া চালাইতে হইবে বটে, কিন্তু ছেলে লেখাপড়া শিখিয়া একবার মানুষ হইতে পারিলে তখন কি আর পরাণের কোন অভাব থাকিবে, রাজার হালে দিন কাটিবে। শেষ পর্য্যন্ত পরাণ রাজী হইয়া বাড়ী ফিরিল। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে এই কথাটাই কেবল খচ খচ করিয়া বিঁধিতে লাগিল যে, তাহার একমাত্র পুত্র বিদেশে চলিয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি? মুখ ফুটিয়া না বলিলেও ছেলের পড়িবার ইচ্ছা আছে, সকলে মিলিয়া এমন করিয়া তাহাকে ধরিয়াছেন। তা'ছাড়া উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাটাও তো ভাবিতে হইবে।

বাড়ীর দাওয়ায় হালদার-গিন্নী বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া-ছিল, পিতা-পুত্রকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া নিকটে গেল। জিজ্ঞাসু নেত্রে পরাণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হালদার-গিন্নী নথ নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো কি হল?'

পরাণ কোন উত্তর না দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া আসিয়া ছেলেকে তামাক সাজিতে বলিল। ছেলে তামাক সাজিতে গেল। পরাণ ধীরে ধীরে স্ত্রীকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিল। হালদার-গিন্নী ছেলের বিদেশে যাওয়ার কথায় প্রথমে শিহরিয়া উঠিল। তারপরে যখন শুনিল—ছেলেরও মত আছে, তখন কহিল—'তা আসে আসুক। বাছা আমার মানুষ হোক্। দেখবে তোমার দুঃখ ঘুচবে।'

পরাণ একটু শ্লেষের সঙ্গে কহিল—'দুঃখ তো ঘুচবে, কিন্তু মাসে মাসে পনের টাকা কোথা থেকে দেব, ভেবে দেখেছ।'

গিন্নী যে সে কথা না ভাবিয়াছে তা নয়। আরও ভাবিয়াছে, পরাণের নিজের কথা—বৃদ্ধ বয়সে লাঙ্গল হাতে ক্ষেতে যাওয়ার কথা। কিন্তু সে কি করিবে? মা তো? ছেলের বিদ্যা-শিক্ষার ইচ্ছায় বাধা দিতে, তার যে মন চায় না। ওই একটি মাত্র সন্তান—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া এত বড়টি হইয়াছে। ছেলে হইবে না হইবে না করিয়া কত গোপন মানত, দেবপূজার ব্যবস্থা ও মাদুলি-কবচ ধারণের ফলে হরিচরণকে সে কোলে পাইয়াছিল। আজও হালদার-গিন্নীর আঁতুড়-ঘরের কথা মনে পড়ে। পরাণ মাঠের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং কি ব্যাকুলতার সঙ্গেই গদার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'হাঁ গো গদার মা, কি হল, ছেলে, না মেয়ে?' সেই ব্যাকুলতা ও আনন্দভরা প্রশ্ন আজও হালদার-গিন্নীর মনকে নাড়া দেয়।

সেই ছেলের পড়াশোনা করিয়া জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট হইবার সাধে কি হালদার-গিন্নী বাদ সাধিতে পারে!

এ দিকে পরাণ ভাবিতে থাকে, দুই চার মাস হয়ত সে সহরের খরচ চালাইতে পারিবে। তার পর দেনা করিতেই হইবে। তাহাও রামু দত্তের নিকট হাত পাতা ছাড়া উপায় নাই! রামু দত্তকে পরাণ ভাল ভাবেই চেনে। টাকা ধার দিতে লোকটা আপত্তি করে না, কিন্তু আদায় করে বড় নির্ম্মম ভাবে! ও-পাড়ার গোবরা মিস্ত্রী কয়েকটা টাকা ধার করিয়া শোধ দিতে পারে নাই বলিয়া রামু দত্ত গত বৎসর গোবরার ভিটে-মাটী নীলাম করিয়া লইয়াছিল। দশটা টাকা দেনার জন্য রামু ব্যাপারীকে কি প্রহারটাই না সহ্য করিতে হইয়াছে! সে দৃশ্যটা পরাণের এখনও মনে পড়ে।

হালদার-গিন্নী স্বামীর চিন্তিত মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'অত ভেবো না। উপায় একটা হবেই। খাবে এস।'

[২]

নানা বাধা-বিপত্তি এড়াইয়া হরিচরণের সহরে যাইবার দিন ঠিক হইল। পূর্ব্বদিন পরাণ আর মাঠে গেল না। খোরাকীর ধান হইতে এক শলী ধান মাথায় করিয়া জমীদারের কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গোমস্তা অক্ষয়বাবু এক শলী ধানের পরিবর্ত্তে সাত টাকার বেশী দিতে রাজী হইলেন না; পরাণ অগত্যা টাকা সাতটী লইয়া বাড়ী আসিল। গিন্নীকে টাকা সাতটী দিয়া কহিল—"এর বেশী দিলে না!"

গিন্নী কোন কথা বলিল না।

পরাণ আবার কহিল, "আর যা ধান আছে, তাতে দু'জনের সম্বৎসরকাল খাওয়া হবে না। আরও তো এক শলী ধানের দরকার, কোথা থেকে পাব?"

গিন্নী কহিল, "কোথায় পাবে, তা আমি কি করে বলব?"

তারপর গিন্নী অনেক ভাবিয়া শেষে নিজের অতি সাধের নথটা নাক হইতে খুলিয়া দিল। কত দিন কত বিপদা-পদের ঝড় এই দরিদ্র পরিবারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সব উপেক্ষা করিয়া গিন্নীর নাকের নথটা ঠিক স্থানেই এত দিন ছিল। এইবার পুত্রের শিক্ষার খরচের জন্য গিন্নী সেটী খুলিয়া দিল। নথটী খুলিবার সময় হালদার-গিন্নীর চোখ ফাটিয়া জল আসিল। তাদের উভয়ের দাম্পত্য-জীবনের সহিত সহস্র স্মৃতি জড়িত তাহার কত সাধের নথটী! শুধু পুত্রের শিক্ষার জন্যই আজ পুত্রের মুখ চাহিয়া গিন্নী সেটী খুলিয়া স্বামীর হস্তে দিল।

পরাণ মাথা নীচু করিয়া কম্পিত হস্তে নথটী গ্রহণ করিল। নিরাভরণা স্ত্রীর মুখের দিকে একবারের বেশী চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। একবার চাহিয়াই মনে হইল, এতদিনের নথটীর অভাবে গিন্নীর মুখের চেহারাই যেন

বদলাইয়া গিয়াছে। পরাণ নথটাকে কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া পুনরায় কাছারীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার রামু দত্ত স্বয়ং কাছারিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নথটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া পরাণকে সাতটী টাকা দিয়া কহিলেন যে, এটি আনিবার দরকার ছিল না। একটা সই করিয়া দিলেই পরাণ এ-ক'টা টাকা পাইত।

পরাণ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ফিরিয়া আসিল। সে দিন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত হালদার-দম্পতি নানারূপ সুখ-দুঃখের আলোচনায় ঘুমাইতে পারিল না। ছেলে মানুষ হইবে, টাকা রোজগার করিবে—দুঃখ ঘুচিবে! তারপর হালদার-গিন্নীর চিরদিনের সাধ—পরীর মত ফুটফুটে পুত্র-বধূ ঘরে আনা, সে সাধটাও মিটিবে। তারপর আরও কত কি হইবে! আলোচনা করিতে করিতে ধান ও নথ বিক্রয়ের দুঃখও যেন উভয়ের মিলাইয়া আসিল। গিন্নী ঘুমাইয়া পড়িলে পরাণ একা জাগিয়া থাকিয়া ভাবিতে লাগিল, সহর! না জানি কেমন অদ্ভুত জায়গা! কত গাড়ী-ঘোড়া! বায়স্কোপ-থিয়েটার!

পরদিন হরিচরণ ছিটের হাফ-শার্টটি গায়ে দিয়া, পিতৃদত্ত টাকা কয়টী কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া মাতাপিতাকে প্রণাম করিয়া নৌকায় উঠিল। ষ্টেশন অনেক দূর, নৌকায় যাইতে হইবে। পরাণ ষ্টেশন পর্য্যন্ত সঙ্গে যাইবে। নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হালদার-গিন্নী চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বারংবার মনে করাইয়া দিল, গিয়াই যেন হরি পত্র দেয়। গ্রামের অনেকেই ঘাটে উপস্থিত ছিল। গদার মা হালদার-গিন্নীর হাত ধরিয়া বলিল, 'ছি, মা! কাঁদে না, ওর অমঙ্গল হবে। ছেলে তোর হাকিম হয়ে আসতে যাচ্ছে, ওর জন্যে কাঁদতে আছে!'

[৩]

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরিচরণ এখন মাঝে মাঝে টাকার দরকার জানাইয়া পত্র দেয়। পরাণ বহুকষ্টে টাকা যোগাড় করিয়া পাঠায়। জমীদার রামু দত্তর নিকট অনেক টাকা ধার হইয়াছে। আজ কাল আর ধারও কেহ দিতে চায় না। জমীদারের খাজনা বাকী পড়িয়াছে। "কৃষক-দুঃখ-নিবারণী সমিতি"র সভ্যবৃন্দের নিকট সাহায্য চাহিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে—নিজের দেহও তাহার দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর খাটিতেও পারে না।

আজ হরিচরণের পত্র আসিয়াছে, সে একটা পরীক্ষায় পাশ করিয়াছে, কিন্তু গরমের ছুটিতে না আসিয়া একেবারে পূজার ছুটিতে দেশে আসিবে। খবর শুনিয়া হালদার-গিন্নী বারোয়ারী শীতলাতলায় পাঁচ পয়সার বাতাসা-ভোগ দিল। কি পরীক্ষা গিন্নী জানে না, তবু ছেলে পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, ইহাতেই সে খুসী। পূজা পর্য্যন্ত ছেলেকে দেখিতে পাইবে না ভাবিয়া বুকের ভিতর কেমন করিতে লাগিল। বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিল, ছেলে যেন তার সুখে থাকে, ভাল থাকে। আরও এক মাস চলিয়া গেল। জ্যৈষ্ঠের গরমে গাছের পাতাগুলি লাল হইয়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে। চারিদিকে খাঁ খাঁ করিতেছে রোদ! পরাণ ভোরে মাঠে চলিয়া যায়, অনেক বেলাতে ফিরিয়া আসে। গিন্নী দাওয়ায় বসিয়া ধূ ধূ মাঠের দিকে চাহিয়া হাই তোলে। অনেক বেলায় পরাণ বাড়ী ফিরে, চারটি অন্ন মুখে দিয়া আবার মাঠের দিকে ছুটিয়া যায়। হালদার-গিন্নী অলস নিষ্কর্ম্মা দুপুর কাটাইবার জন্য গদার মায়ের বাড়ীতে চলিয়া যায়, নানা রকম সুখ-দুঃখের গল্প করে।

হরিচরণের আবার একটি পত্র আসে,—এ মাসে টাকা কিছু বেশী চাই, কারণ পুস্তক কিনিতে হইবে।

গিন্নী পরাণকে জিজ্ঞাসা করে, 'কি লিখেছে গো? পড় না শুনি? ভাল আছে তো?'

পরাণ সংক্ষেপে "হ্যাঁ" বলিয়া আবার রামু দত্তর কাছে ধর্ণা দেয়।

রামু দত্ত জিজ্ঞাসা করেন, 'টাকা ত' নিচ্ছিস, শোধ দিবি কবে?'

পরাণ আশ্বাস দিয়া বলে, 'এই ধানটা হলেই কর্ত্তার সব দেনা শোধ দিয়ে দেব।' কথাটা বলিয়া সে মনের মধ্যে জ্বালা অনুভব করে। সামান্য কয়েক বিঘা জমিতে সে ধান দিয়াছে, তাহাতে খাজনার হার হয় কি না সন্দেহ,—একা মানুষ বেশী জমিতে ধান দিতে পারে নাই। অনেক জমি পড়িয়া আছে। তা ছাড়া ধান মাত্র শীষ তুলিয়া সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, এখনও কিছু ভরসা করা চলে না। যদি একবার

জলে ডুবিয়া যায়, তবে সব আশাই নির্ম্মূল হইবে! তবু আশা করা ছাড়া আর উপায় কি? যা হোক একটা উপায় হইয়াই যাইবে।

আষাঢ় মাস—অঝোর বৃষ্টিধারায় রাস্তাঘাট ডুবিয়া গিয়াছে। মাঠ-ঘাট সব জলে একাকার হইয়া বাড়ীর দাওয়া পর্য্যন্ত কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা অর্দ্ধাহারে, অনাহারে মাঠের শস্যের প্রতি তাকাইয়া পেটে কাপড় বাঁধিয়া দিন কাটায়। জিনিষপত্র দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। নৌকায় নৌকায় লোক চলাচল করে। হালদার-গিন্নী দাওয়ায় বসিয়া কূল-ছাপানো জলের উপর বাতাসে আন্দোলিত ধানের শীষ দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করে। পরাণ পুত্রের পত্রের আশঙ্কায় সশঙ্কিত হইয়া থাকে।

আষাঢ় শেষ হইয়া ভাদ্র আসিল। জল কমিয়া আসিয়াছে, আশু ধান পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কৃষকদের দুঃখের রাত্রি ভোর হইবার সময় উপস্থিত হইয়া আসিয়াছে। বাড়ী বাড়ী শেফালী ও স্থলপদ্মের গন্ধে ভরপুর করিয়া মা আনন্দময়ী তাঁর আগমনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। দু'একটা উঁচু জমির ধান এখন হইতেই কাটা আরম্ভ হইয়াছে। পরাণের জমির জল এখনও কমে নাই, ধান পাকিয়া আসিয়াছে। পরাণ আকাশের দিকে তাকাইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে,—হে ভগবান আর বৃষ্টি যেন না হয়। হালদার-গিন্নী পুত্রের বাড়ীতে ফিরিবার কল্পনা লইয়া মগ্ন হইয়া থাকে।

আশ্বিনের প্রথমেই হরিচরণের পত্র আসিল, সে পূজার ছুটিতে বাড়ী আসিতে পারিবে না। টাকা চাই,—অন্ততঃ পচিশটা টাকা তাহাকে দিতেই হইবে। ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইবে, জুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, ভাল জামা নাই, বন্ধুদের কাছে তাহার মুখ দেখান দায়! টাকা যেন যত শীঘ্র সম্ভব পাঠান হয়।

অতি কষ্টে অনেকক্ষণের চেষ্টায় ছেলের পত্রখানা পড়িয়া পরাণ ধপ করিয়া মাটীতেই বসিয়া পড়িল, তাহার মাথার মধ্যে যেন হঠাৎ ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল। টাকা! টাকা! জমীদার জানাইয়াছেন, পূজার আগে তাঁর টাকা শোধ দিতেই হইবে, নহিলে তিনি ছাড়িবেন না। কারণ, তার বাড়ীতে পূজা আছে, অনেক খরচ। কিছুক্ষণ পরে পরাণ পত্র হস্তে ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে খেয়াল ছিল না, গিন্নীর ডাকে চমক্ ভাঙ্গিল। ঝম্ ঝম্ বৃষ্টিতে পথ-ঘাট ডুবিয়া গিয়াছে, মাঠের ধানগুলি দেখা যায় না। পাকা ধানগুলি বৃষ্টির ভারে ঝরিয়া গিয়াছে! চারিদিকে কৃষকেরা ছুটাছুটি করিতেছে কি করিয়া ধানগুলি রক্ষা করা যায়। অনেকে নৌকা করিয়া ক্ষেতে যাইয়া যাহা পারিল বাঁচাইতে লাগিল, কেহ কেহ নিরুপায় হইয়া কেবল কপালে করাঘাত করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হালদার-গিন্নী থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এ কি সর্ব্বনাশ! পরাণ নিঃস্পন্দ-নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দেবতা মুখের গ্রাস এ ভাবে কাড়িয়া লইবেন তাহা যে সে ভাবিতেও পারে নাই। সে নড়িবার চেষ্টাও করিল না। শুধু তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল এক ছত্র লেখা 'পচিশ টাকা চাই-ই—পশ্চিমে বেড়াতে যাব।' চেষ্টা করিলে হয়ত সে কতকটা ধান বাঁচাইতে পারিত, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ এমন ভাবে অবশ হইয়া আসিয়াছে যে, পরাণের চেষ্টা করিবারও ক্ষমতা ছিল না।

হালদার-গিন্নী স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া ডাক দিল, 'কি দেখছ গো? যাও, ছুটে যাও!'

পরাণ কোন সাড়াশব্দ না দিয়া ঘাটে যাইয়া নৌকায় উঠিল। গিন্নী দুর্গা-নাম স্মরণ করিতে লাগিল। পরাণ কতক কতক ধান কাটিল বটে, কিন্তু তখন অর্দ্ধেকের বেশী ধান ঝরিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইয়া আসিল; পরাণ নৌকা বোঝাই দিয়া ভিজা খড়সমেত কিছু ধান আনিয়া দাওয়ায় ঢালিল। মাঠ জলে ভরা, নীচে যে ধান ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহা পাইবার কোন আশা নাই। গিন্নী চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বৃষ্টি এক সময় থামিল বটে, কিন্তু সমস্ত কৃষককে সপরিবারে যমপুরীর অৰ্দ্ধপথ পৰ্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া থামিল।

সংবাদ পাইয়া জমীদারের গোমস্তা অক্ষয় আসিয়া দেখা দিয়া জানাইল, খাজনা ও দেনা বাবদে জমীদারের যাহা পাওনা হইয়াছে, পূজার আগে সব আদায় করা চাই, এ রূপ হুকুম সে পাইয়াছে।

পরাণের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া অক্ষয় পুনরায় জমীদারের হুকুম জানাইল। পরাণ কোন উত্তর করিল না—শুধু অঙ্গুলি দিয়া সিক্ত খড়-সমেত ধানগুলিকে দেখাইয়া দিল।

অক্ষয়ও বাক্যব্যয় না করিয়া পাইকদের হুকুম দিল, 'ধান নৌকায় তোল!'

ধান জমীদারের নৌকায় তোলা হইল। পরাণ কোন আপত্তি করিল না, হালদার-গিন্নীও কোন আপত্তি করিল না। অক্ষয় জানাইল যে, ঐ ধানে এক সনের খাজনাও হয় কি না সন্দেহ; সুতরাং পরাণ যেন বাকী টাকার যোগাড় রাখে। পরাণ তখনও মাথা নাড়িয়া স্বীকার পাইল। অক্ষয় নৌকা ছাড়িয়া দিল।

এতক্ষণে হালদার-গিন্নীর হুঁস হইল। সে পরাণের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'কি করলে! সব ধান দিয়ে দিলে?'

পরাণের চেখে জল, মুখে জ্বালাভরা হাসি—'কি হবে? ছেলেই তো চাকরী করে খাওয়াবে!' অভিমানে পরাণের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল।

গিন্নী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ লুকাইল।

ক্রমে পূজা নিকটে আসিল। জমীদারের নালিশে পরাণের ভিটা নীলাম হইয়া গেল। পাইক, বরকন্দাজ আসিয়া অস্থাবর যাহা কিছু ছিল, সব লইয়া গেল। কয়েকটা দিন বাড়ীতে থাকিবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে। শূন্য ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পরাণ মাথায় হাত দিয়া এ বার কি করিবে ভাবিতে লাগিল।

কয়েকদিন পরে ক্রুদ্ধ হরিচরণের পত্র আসিল। পত্রের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, পরাণ যখন টাকাই দিল না, তখন তাহাদের সাথে হরিচরণেরও কোন সংস্রব থাকিল না। সে তাহাদের কেহ নয়, পরাণ যেন এই কথাটা মনে রাখে।

পরাণ ধীরে ধীরে বানান করিয়া করিয়া ছেলের পত্র খানা পড়িতেছিল, কাল রাত হইতে গিন্নীর জ্বর হইয়াছে—ভেদ-বমি আরম্ভ হইয়াছে। অনেকক্ষণ ছেলের চিঠি হাতে করিয়া পরাণ স্তব্ধ হইয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরে ঢুকিল। হালদার-গিন্নী জ্বরে বেহুঁস; কি ভাবিয়া তার বুকের ওপর চিঠিখানা ছুঁড়িয়া দিয়া পরাণ বাহিরে চলিয়া আসিল।

পুস্তক-পরিচয়

নীরাজন (কবিতা-পুস্তক)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। চক্রবর্ত্তী সাহিত্য-ভবন, বজবজ হইতে প্রকাশিত। প্রাপ্তি-স্থান সাহিত্য-ভবন প্রেস, ২৭নং ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা। ডিমাই ৮ পেজী, ৮০ পৃষ্ঠা। পাইকায় ছাপা। ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ, সুন্দর বাঁধাই।

দেশে লক্ষ্মীর মুখে-চোখে বিরক্তির ভাব অনেকদিন ফুটিয়াছে। সেই বিরক্তির ভ্রুকুটী ছোঁয়াচ হিসাবে সরস্বতীকেও আক্রমণ করিয়াছে। নিছক সৌন্দর্য্যের পূজারী যে কবি, তিনিও তাহার হাত হইতে রক্ষা পান নাই, তাঁহারও একদিন অনুশোচনা হইয়াছিল:—

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্ম্মে রত
তুই শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মত
সারাদিন বাজাইলি বাঁশী।

কাব্যে এই ভাবের স্থান কোথায়, কাব্যের আদর্শ হইতে এই ভাবকে বিচ্যুতি বলা যায় কি না, ইহা সুদীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, সুনিপুণ কুম্ভকারের হস্তে যেরূপ পাঁক পর্য্যন্ত সুন্দর মৃন্ময় পাত্রে বিকশিত হইয়া উঠে, সত্যকার কবিও অনুরূপ ভাবে যে-কোন বিষয়-বস্তুকে সৌন্দর্য্যান্বিত করিয়া তুলেন। 'নীরাজন' ইহার নিদর্শন। অপূর্ব্বকৃষ্ণ 'বঙ্গশ্রী'র পাঠকের নিকট সুপরিচিত। বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের কবিমণ্ডলীর মধ্যে তিনি অজ্ঞ আর অপরিচিত আগন্তুক নহেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার

'মধুচ্ছন্দা' প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক পত্রিকার তিনি নিয়মিত লেখক গোষ্ঠির অন্তর্গত। কিন্তু তথাপি 'নীরাজন' পাঠে মনে হয়, বাংলা সাহিত্যে এ যেন ঠিক অশ্রুতপূর্ব না হইলেও নূতন সুর। 'বঙ্গশ্রী'তেই ইহার অনেক কবিতা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে যাহা পাঠ করা যায়, বিভিন্ন কবিতার সমাবেশে তাহার অর্থ আরও সুস্পষ্ট হয়।

৪৫টি কবিতায় নীরাজন সম্পূর্ণ। তাহার মধ্যে অধিকাংশ কবিতাই লক্ষ্মী-বিরহে সংস্মৃতীর গুঞ্জন। 'নীরাজন'-এর মূল সুর হইতেছে—

> মায়ের পরাণে অতীতের স্মৃতি জ্বলে
> পরণের শাড়ী ছিঁড়ে গেছে বহুদিন ॥

কিন্তু অপূর্বকৃষ্ণের কবি-চিত্ত তাঁহাকে কেবল ইহারই মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ রাখিতে পারে নাই। পৃথিবীর আদি-কবিকে যে সুর ভুলাইয়াছিল, তাঁহাকেও যে সেই সুর ভুলাইয়াছে, ইহারও পরিচয় এ পুস্তকে পাওয়া যায়। পুস্তকে এই উত্থান-পতনের তরঙ্গ অত্যন্ত লক্ষণীয়। প্রথম দশটি কবিতার যে-সুর দুঃখোদ্বেল, বিদ্রোহমূলক, তাহার পর পাঁচটি কবিতায় সে-সুর নব-বর্ষার শ্যামশ্রীর ন্যায় স্নিগ্ধ। প্রথম দশটিতে শুনিতে পাই :—

> কুরুক্ষেত্র শ্মশানেতে গান্ধারীর আর্ত্ত হাহাকার
> যুগে যুগে উঠিতেছে। বীর্যহীন কাঁদে পার্থ তব
> ধরিতে পারে না এবে জোহুর্ম্মর গাণ্ডীব সে তার।

কিন্তু তাহার পরের পাঁচটির সুর :—

> দূরে দেখা যায় পোড়োভিটেগুলি সবুজ লতায় ঢাকা
> যেখানে আজিও জোছনা বিছায় স্বপন-রজত পাখা।

এই তরঙ্গ ভঙ্গের দোলা পাঠককে আবিষ্ট করে।

এই মুহূর্ত্তে পাঠ করিলাম :

> হরিণ-লোচনা! কাজল তোমার চোখে
> স্নিগ্ধ চপল ছিল চাহনির গতি ॥

পর মুহূর্ত্তেই :—

> যূপ-কাষ্ঠেতে যৌন সাধকে বলি দিতে আমি চাই।

নিম্ন সপ্তকের ষড়্‌জ হইতে একেবারে উচ্চ-সপ্তকের নিষাদ! ইহার ফলে কবিকে মধ্যে মধ্যে বিপরীত কথাও বলিতে হইয়াছে—'যক্ষবধূর বিরহ-মথিত দারবধাস'কে উপেক্ষা করিয়া 'মন্দাক্রান্তা ছন্দে নব সঙ্গীত'-গায়কের জন্য অশ্রুপাত করিতে হইয়াছে।

বোধ করি, তরুণ কবিচিত্তের এই বৈপরীত্য স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মতে, এই বৈপরীত্য কাব্যধর্ম্মের বিরোধী। কবিকে নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে হইবে, সুন্দরের ধ্যান কখনও সত্য, কিংবা কল্যাণের বিরোধী হইতে পারে না। বিলাসমাত্রেই কল্যাণবিরোধী, সুতরাং কাব্য-চর্চ্চায় বিলাস চলিতে পারে না। যদি দেখা যায়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিও এই বিলাসের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে তিনি কাব্যধর্ম্ম হইতে পতিত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অপূর্ব্বকৃষ্ণের মধ্যে আমরা কবিধর্ম্মের পরিচয় পাইয়াছি, সুতরাং তাঁহার বিলাস আমাদিগকে পীড়িত করিয়াছে। তাঁহার সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি বলিয়া তাঁহার তপস্যার পথের অন্তরায়ের উল্লেখ করিলাম। আশা করি, তিনি ক্ষুণ্ণ হইবেন না।

দৈনন্দিন রোগের জল-চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। শ্রীগুরু লাইব্রেরী—২০৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ টাকা। পুরু এ্যান্টিক কাগজে ছাপা। ৩০০ শত পৃষ্ঠা। বিষয় সূচী :— রোগ ও তাহার চিকিৎসা, জ্বর রোগ, শ্রবণযন্ত্রের রোগ, পরিপাকযন্ত্রের রোগ, ক্ষত রোগ, মূত্রযন্ত্রের রোগ, বাত রোগ, বেদনা রোগ, উপসর্গ রোগ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে কুলরঞ্জন বাবুর 'বৈজ্ঞানিক জল-চিকিৎসা'র সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছি এবং তাঁহার কতিপয় প্রবন্ধও বঙ্গশ্রীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছি। ইহা নিশ্চয়ই সত্য যে, বর্ত্তমান কালে যে-সকল চিকিৎসাবিধি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোনটিই কার্য্যকরী নহে। মনুষ্যদেহের মধ্যে কি আছে এবং কি নাই, তাহা এই সকল চিকিৎসাবিধির সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শিশি-বোতলে করিয়া কয়েকটি বিভিন্ন রসায়নের মিশ্রিত সংযোগ মনুষ্যদেহে পূরিয়া ব্যাধি সারাইবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়াইবে তাহা এই চিকিৎসা-বিধি হইতে বলা সুকঠিন। জল-চিকিৎসার বিপক্ষে এমন অভিযোগ আনা যায় না। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, তিনি স্বহস্তে অনেক রোগীর রোগ উপশম করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যাধির বর্ণনা তাঁহার এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পুস্তকে সম্ভব হয় নাই। অনেক চিকিৎসকও তাঁহার পরামর্শানুযায়ী কাজ করিয়া সুফল পাইয়াছেন বলিয়া গ্রন্থকার জানাইয়াছেন। জল-চিকিৎসার প্রণালী সরল ও সহজ। যে-কোন গৃহস্থ-বাটীতে ইহার সাহায্যে চিকিৎসার কার্য্য চলিতে পারে বলিয়া আমরা পুস্তকপাঠে বুঝিয়াছি। যে-সকল ছোটখাট ব্যাধিতে আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকল সময় বিপর্য্যস্ত হইয়া থাকেন, এই পুস্তকে তাহার সকলগুলির চিকিৎসা-বিধিই লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এই পুস্তকের বহুল প্রচার হইবে বলিয়া আশা করা যায়। গ্রন্থের ভাষা ভাল।

সংবাদ ও মন্তব্য

স্বাধীনতার সরল অর্থ

> গত ১৩ই জুলাই চাঁপদানীতে চটকল শ্রমিক সম্মেলনে মিসেস সরোজিনী নাইডু বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—কংগ্রেস গত ৫০ বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। স্বাধীনতার সর্ব্বাপেক্ষা সরল অর্থ সকলের জন্য খাদ্য। খাদ্য ব্যতীত স্বাধীনতা হইতে পারে না।

খাদ্য ব্যতীত যদি স্বাধীনতা না হইতে পারে, এবং ইহা যদি মিসেস নাইডুর মনের কথা হয়, তাহা হইলে গত ৫০ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস খাদ্যের চেষ্টা না করিয়া স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়া ভুল করিয়াছে, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবেই। কিন্তু ইহা তিনি স্বীকার করিবেন কি?

আমাদের মতে, পৃথিবীতে আজ কোনও জাতিরই যথেষ্ট খাদ্য নাই এবং ক্রমশঃই উহা কমিয়া আসিতেছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা নামে যে 'স্বর্ণনির্ম্মিত প্রস্তরপাত্র' বর্ত্তমান যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহাতে স্বাধীনতা কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা, দুইটির একটিও মিলে না। আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়াসেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্ম, ইহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন, কিন্তু যেন 'নাকের বদলে নরুন' মিলিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ আর্থিক স্বাধীনতাও মিলে নাই, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নামে যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের সেই সনাতন অষ্টরম্ভা! আমরা মনে করি, আর্থিক পরাধীনতা ঘুচিলেই রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ঘুচিবে। ভারতে যে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা বিদ্যমান, তাহা দূর করিবার জন্য আর্থিক স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, ইহাও আমাদের অভিমত। এই আর্থিক স্বাধীনতা কিরূপে লাভ করা যায়, তাহার জন্য অনুসন্ধান-প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, ইংলণ্ড ও ভারতের মিলন ব্যতীত ইহা সম্ভব হইতে পারে না। এই মিলিত চেষ্টায় ইংলণ্ড ও ভারত দুই দেশেরই আর্থিক স্বাধীনতা মিলিতে পারে। ভারতীয় কংগ্রেস যদি ইংলণ্ডকে আর্থিক স্বাধীনতার পথ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে রাষ্ট্রীয়ভাবে ভারতকে পরাধীন থাকিতে হইবে না। কি ভাবে ভারতীয় কংগ্রেস উভয় দেশের আর্থিক স্বাধীনতার জন্য সচেষ্ট হইতে পারে, তাহার আলোচনা আমরা করিয়াছি।

সুভাষচন্দ্রের 'স্বাধীনতা'

> ঐ একই সভায় বক্তৃতা দিয়া সুভাষচন্দ্র বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা সকলের জন্মগত অধিকার এবং স্বাধীনতা না পাইলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে বিশেষ করিয়া দরিদ্র ব্যক্তিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত।

আমরা ঠিক অনুমান করিতে পারিতেছি না, সুভাষচন্দ্র এই ভাবে স্বমত জানাইয়া মিসেস নাইডুর বক্তব্যের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন কি না এবং মিসেস্ নাইডুর তাহাতে সমর্থন ছিল কি না। একই সভায় দুইজনে একযোগে দুই প্রকার কথা বলিয়া হাততালি পাইয়াছেন এবং হয় তো বা মাল্যও লাভ করিয়াছেন—অথচ দুই জনের কথা পরস্পর-বিরোধী। এমন না হইলে আর সভা এবং সভার বক্তৃতা!

আমাদের মতে, সৈনিক যখন খাদ্যাভাবে বুভুক্ষু, তখন তাহার খাদ্যের বন্দোবস্ত না করিয়া ক্ষুধা-প্রপীড়িত সৈনিক লইয়া যুদ্ধে আগুয়ান হওয়া আর শূন্যের উপর দুর্গ-নির্ম্মাণ একই কথা। সুভাষ বাবু বলিয়াছেন, দরিদ্র ব্যক্তিদেরই স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেওয়া উচিত। এ কথা যিনি জীবনে কোনদিন দারিদ্র্য কি, তাহা বুঝিতে পারেন নাই, তাহারই মুখে সাজে। পেটের জ্বালা কি বস্তু, তাহা সুভাষচন্দ্র যদি একদিনের জন্যও বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে এ কথা তিনি বলিতে পারিতেন বলিয়া আমরা মনে করি না। আমরা তাঁহাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, দেশের জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অনশনে অর্দ্ধাশনে অস্বাস্থ্যে তাহারা যেরূপ প্রপীড়িত হইতেছে, তাহাতে কয়দিন আর তাহাদের লইয়া সখের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলিবে? সুভাষ বাবুর স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর

হইয়া হউক, আর না হইয়া হউক, তাহাদের অধিকাংশেরই জীবন রক্ষা আর কতদিন সম্ভব হইবে, এই প্রশ্ন যদি সুভাষ চন্দ্রের মনে জাগে, তবে তিনি বুঝিতে পারিবেন, বস্তুতঃ 'স্বাধীনতা না হইলে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব নহে' একথা বলার কোন তাৎপর্য্যই নাই। সুভাষচন্দ্র কি জনসাধারণকে আপীলে খালাস করিবার সান্ত্বনা দিয়া ফাঁসি-কাঠে দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে বলেন?

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

> ২০শে জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে সংবর্দ্ধনা ও মানপত্রের উত্তরে স্যর আকবর হায়দারী বলিয়াছিলেন—ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় এবং আশায় ভারত আজ সমুজ্জ্বল। প্রাচ্য দেশসুলভ বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের সাহায্যে বোধ হয় যে কোন জিনিসই অর্জ্জন করা যায়। অদূরভবিষ্যতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির সমবায়ে ভারত প্রাচ্যের এমন একটি বিশিষ্ট দেশ হইয়া উঠিবে যে, ইহা অন্য দেশের সমকক্ষ ত' হইবেই, বরং অনেক ক্ষেত্রে অন্য দেশের অনুসরণীয় হইয়া উঠিবে।

স্যর আকবর হায়দারী কেন যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় এবং আশায় ভারতকে সমুজ্জ্বল ভাবিয়াছেন, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। কেন না, চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে সর্ব্বত্রই একদিকে যেমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত জনসাধারণের চিত্র দৃষ্টিতে পড়ে, তেমনই সেই দুর্দ্দশা দূর করিবার কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থার অভাবও সর্ব্বত্রই প্রকট। পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার মুখে যে-ভরসার কথা উঠিয়াছে, তাহারও অর্থ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট নহে। ইহা অবশ্য সত্য যে, গত-পূর্ব্ব শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যের কয়েকটি দেশে জ্ঞানচর্চ্চার একটা উন্মেষ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু, গত শতাব্দীর শেষ দিক্ হইতেই ইহার দিক্‌ভ্রান্তি ঘটিয়াছে এবং তাহারই ফলে বর্ত্তমানে পৃথিবীব্যাপী দুর্দ্দশার মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। স্যর আকবর হায়দারী 'প্রাচ্যদেশ সুলভ বিশ্বাস' যাহাকে বলিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা চরিত্রবল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতিরেকে চরিত্রবলের সৃষ্টি হইতে পারে না, সুতরাং এই চরিত্রবলের মূলে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। বর্ত্তমানে ইংরাজী-শিক্ষিত জনসাধারণের ধারণা এই যে, ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানে ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে। প্রাচীন জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রকৃত সন্ধান পাইলে দেখা যাইবে, ঐ বিদ্যার প্রত্যেকটি গ্রন্থে ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপায় নিহিত আছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে আমরা ইহার আলোচনা করিয়াছি। পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অসারতাও সে সকল প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

মোটরগাড়ী শিল্পের প্রয়োজনীয়তা

> গত ১১ই জুলাই তারিখে মাদ্রাজ মোটর চালক সঙ্ঘের প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে মাদ্রাজে শ্রমশিল্প-সচিব মিঃ ভি. ভি. গিরি বলিয়াছেন যে, মোটরগাড়ীশিল্প একটি প্রধান শিল্প এবং এই শিল্প-সংস্থানার্থ সকল কংগ্রেসী প্রদেশের শিল্প-সচিবরা মতামত আদান প্রদান করিতেছেন। সম্ভবতঃ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীও এই সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের একটি বৈঠক বসাইবেন। তিনি বলেন যে, যেরূপ বিদেশী গাড়ী ৩৫০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়, ভারতে নির্ম্মিত হইলে সেইরূপ গাড়ীর দাম পড়িবে ১৫০০ টাকা।

কংগ্রেস যে ভারতীয় জনসাধারণের প্রতিষ্ঠান, এই সংবাদ হইতে তেমন কোন তথ্য সংগ্রহ করা দুষ্কর। কেন না, মোটরগাড়ীতে জনসাধারণের প্রয়োজন নাই। জনসাধারণের প্রয়োজন মোটা ভাত ও কাপড়। ৩৫০০৲ টাকা মূল্যের মোটর গাড়ী ১৫০০৲ টাকায় পাওয়া গেলেও জনসাধারণের মোটা ভাত ও কাপড়ের কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে করা যায় না। আমাদের মতে, কংগ্রেসের এই কার্য্যপ্রস্তাব মোটেই সুচিন্তিত নহে, ইহা কেবল লোক দেখাইয়া বাজার মাৎ করার চেষ্টা মাত্র। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্ত্তমানে এদিক্ দিয়া কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া মনে হয় না। যে-দেশে শতকরা ৮০টি লোকের পেটের ভাত ও পরণের কাপড়ের অভাব, সে-দেশের কংগ্রেস যদি সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া মোটরগাড়ীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের দুঃখ এই যে, কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ মুখে যে-কথা প্রচার করেন, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করেন না। উপরন্তু কার্য্যতঃ যাহা করেন, তাহাতে তাঁহাদের মুখের কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নের সংবাদ দ্রষ্টব্য।

চাষীদের অবস্থা

> গত ২৩শে জুলাই ঝাঁসীতে বিভাগীয় গ্রাম উন্নয়ন সম্মেলনের উদ্বোধনের সময় যুক্ত-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী মিঃ গোবিন্দবল্লভ পন্থ

বলিয়াছেন—গ্রামের অধিকাংশ কৃষক অস্থিচর্ম্মসার অবস্থায় জীর্ণ বস্ত্রে দিন কাটায়। সরকারী রাজস্বের ৮০ ভাগ ইহারা যোগায়, অধিকন্তু সহরবাসীদের আয়ও অনেকাংশে ইহারা যোগাইয়া থাকে। এই হিসাবে গবর্ণমেণ্ট উহাদের নিকট ঋণী, সুতরাং রাজস্বের কতকাংশ গ্রাম উন্নয়নের জন্য উহাদের প্রত্যর্পণ করা ন্যায়সঙ্গত।

মিঃ গোবিন্দবল্লভ পন্থের ন্যায় সকল কংগ্রেসী মন্ত্রী এবং অপরাপর এইরূপ নেতৃবৃন্দ মৌখিক চাষীদের অবস্থা লইয়া সর্ব্বদা পীড়িত এবং চাষীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করিবার জন্য সকল কংগ্রেসী প্রদেশেই কিছু কিছু আইন জারী করা হইয়াছে কিংবা হইবে বলিয়া শুনা যাইতেছে, যদিও দেখা যাইবে, এই সকল আইনই জমিদার ও প্রজার মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল সৃষ্টি করা ব্যতীত চাষীদের অবস্থা উন্নয়নের ধার দিয়াও যাইতেছে না। কি করিলে চাষীদের অবস্থা ভাল হইতে পারে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের তাহা জানা নাই বলিয়াই এইরূপ হইতেছে। যদি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সত্যই উপলব্ধি করিতেন, চাষীদের অবস্থা ভাল না হইলে দেশের অবস্থার উন্নতি হইবে না, তাহা হইলে তদুদ্দেশ্যে কি করা সঙ্গত, সর্ব্বাগ্রে তাহাই নির্দ্ধারণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্যে ব্রতী হইতেন। আমরা এই জন্যই ক্রমাগত বলিতেছি, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি থাকিলে, তাঁহাদের দ্বারা এইরূপ শিব গড়িতে বানর গড়া সম্ভব হইত না। অথচ, মুখে মুখে তাঁহারা সর্ব্বত্রই প্রচার করিতেছেন, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-পদ্ধতি ব্যতীত কিছুই হইবে না। নিম্নের সংবাদ দ্রষ্টব্য।

কি প্রয়োজন

৩০শে জুলাই মিঃ সুভাষচন্দ্র বসু হাওড়া টাউন হলে এক ছাত্র সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়া বলিয়াছেন—ভারতের জন্য তিনটি বিষয় বিশেষ প্রয়োজনীয়, সরল এবং সাধারণবোধ্য নীতি অবলম্বন, জনসাধারণের সংগঠন ও একতা এবং উপযুক্ত নেতা।

ইহাই যদি সুভাষচন্দ্রের মনের কথা হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বীকার করা উচিত যে, যে-পদ তিনি বর্ত্তমানে অধিকার করিয়াছেন, তাহার যোগ্যতা তাঁহার নাই, কেন না জনসাধারণের সংগঠন ও একতার জন্য এ পর্য্যন্ত তিনি যে-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতে অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইয়াছে, তদুপরি কোন সরল ও সহজবোধ্য নীতি তিনি এ পর্য্যন্ত সাধারণ্যে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং নেতৃত্বের যোগ্যতা তাঁহার নাই। ভগবান্ তাঁহাকে ইহা বুঝিবার সুমতি দান করুন।

সর্দ্দিকাশির বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা

সর্দ্দি কাশি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটি অসাধারণ অসুখ। সহস্র সহস্র লোক প্রতিনিয়ত এই রোগে ভুগিতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই রোগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য নানা প্রকার পন্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য দেশের মনীষীবৃন্দ সর্ব্বদাই সচেষ্ট আছেন, যাহাতে এই রোগে একবার দেখা দিলে ইহার প্রসার সহজে বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইতে না পারে। কিন্তু আমাদের দেশে এ বিষয়ে কাহাকেও বড় একটা সচেষ্ট দেখা যায় না। রোগের প্রথমাবস্থা হইতেই সচেষ্ট হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। অন্যথা ইহাকে সামান্য অসুখ মনে করিয়া বৃদ্ধি পাইতে দিলে পরিণামে নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটীস, এমন কি ভীষণ যক্ষ্মারোগে পর্য্যন্ত হইতে পারে।

সর্দ্দি কাশি বাস্তবিক পক্ষে নিজে কোনও রোগ নহে; ইহারা রোগের লক্ষণবিশেষ। অধিকাংশ স্থলে ফুসফুস এবং বায়ুনালীর অসুস্থতা বশতঃ ইহারা দেখা দিয়া থাকে। মাথাধরা, হাঁচি, নাসিকা হইতে প্রচুর পরিমাণে গরম জল নিঃসরণ, শরীরতাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি মস্তকে সর্দ্দি জমিবার প্রবল লক্ষণ। শীতকালে ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে অথবা বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজিবার ফলে সর্দ্দি হইয়া থাকে। ঋতু-পরিবর্ত্তনের সময়েই সাধারণতঃ সর্দ্দি কাশির প্রসার দেখিতে পাওয়া যায়। অত্যধিক গরমের পর হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগাইলে অথবা গ্রীষ্মকালে বেশীক্ষণ অসাবধানভাবে পাখার নীচে বসিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলেও ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হইতে দেখা যায়।

ব্রঙ্কাইটীস আক্রমণের প্রারম্ভে ঠাণ্ডাভাব অনুভূত হয় এবং তৎসঙ্গে অল্প অল্প জ্বর ও মাথাধরা দেখা যায়। রোগী শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে কষ্ট অনুভব করে এবং বহুল পরিমাণে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া থাকে। রোগী বক্ষস্থলে, পাঁজরার নীচেও এক প্রকার বেদনা অনুভব করিয়া থাকে।

সুতরাং সকলেরই উচিত সর্দ্দি কাশিকে উপেক্ষা না করিয়া ঠিক সময় হইতে তাহার সুচিকিৎসার বিধান করা। নতুবা পরিণামে আর্থিক এবং শারীরিক ক্ষতি হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা। সর্দ্দি, কাশি, যক্ষ্মা প্রভৃতির চিকিৎসার জন্য সুইজারল্যাণ্ড বিখ্যাত। সুবিখ্যাত রচি কোম্পানী ৭০ বৎসর পূর্ব্বে 'সিরোলিন রচি' আবিষ্কার করিয়া একদিকে যেমন সর্দ্দি, কাশি, ব্রঙ্কাইটীস প্রভৃতি রোগ শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য করিতেছেন, অপর দিকে তেমন সুস্থ শরীরে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় ইহা সেবন করিলে কাহাকেও সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত হইতে হয় না। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে সর্দ্দি কাশির সংক্রামকতার আশু প্রতিকার করিতে সিরোলিন রচি অদ্বিতীয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই ঔষধ নিয়মিত ভাবে সেবন করাইলে আমাদের দেশে সর্দ্দি কাশির সংক্রামকতা বহুল পরিমাণে হ্রাস হইবে এবং দেশের স্বাস্থ্য সম্পদ উন্নতি বিধান হইবে।

—জনৈক চিকিৎসক

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

আশ্বিন—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

ইচ্ছাময়ী দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য ও ধ্যান

পৌরোহিত্য

৺দশভূজার পূজার দিন সমাগত। আজ আমি বুদ্ধিজীবী আত্ম-তত্ত্বের সাধক নহি। যখন আমি তোমার কৃপায় বুদ্ধিজীবী ও আত্ম-তত্ত্বের সাধক, তখন আর আমি তোমার কথা ব্যক্ত করিতে সক্ষম নহি। আমি তখন তোমার ভাবে বিভোর। তখন, আমার শব্দ-শক্তি, স্পর্শ-শক্তি, রূপ-দর্শন-শক্তি, রস-গ্রহণ-শক্তি ও গন্ধ-গ্রহণ-শক্তি যে তোমা হইতেই উদ্ভূত, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। আমার বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, তাহার প্রত্যেকটীর উদ্ভব যে তোমার সৃজন-শক্তির বিকাশ, তাহার প্রত্যেকটীর রক্ষা যে তোমার স্থিতি-শক্তির সিঞ্চন এবং বিশ্ব-দুনিয়ার সহিত আমার যাহা কিছু সংস্রব, তাহা যে তোমার লয়-শক্তির কর্ম্ম, তাহা উপলব্ধি করিতে আমি প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। তখন আমার শব্দ-শক্তি থাকিয়াও তোমার সৃষ্টির কোন ব্যক্ত প্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হয় না। তখন তুমি আমার কাছে অব্যক্ত। তুমি যখন আমাকে আত্ম-তত্ত্ব সাধন করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি প্রদান কর, তখন তোমার পূজার কোন দিন ও অদিন আমার কাছে থাকে না।

আমি ঐ পূজা আজ চাহি না। আমি আজ চাই সেই পূজা, যে পূজায় তোমার সৃষ্টির কথঞ্চিৎ প্রয়োজনে আমি লাগিতে পারি। আমি আজ স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টায় নিজেকে লইয়া নিজে ব্যস্ত থাকিতে চাহি না। চাওয়া ছাড়িয়া দিয়া সংযুক্ত প্রকরণে তোমার ও আমার ভাবে ব্যস্ত থাকায় আজ আমার তৃপ্তি নাই। তোমা ছাড়া আমি যে কেহ নহি, তাহা আমি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারিলেও, তোমার দেওয়া আমার অস্তিত্ব আজ জাগ্রত হইয়াছে। তোমাকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়া আর কিছু আমার আকাঙ্ক্ষণীয় নাই, তাহা তুমিই আমাকে বুঝাইয়াছ। আর আজ আবার

তুমিই আমার মধ্যে উপদেষ্টৃত্বের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছ। যে উপদেষ্টৃত্ব তোমার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের সহায়ক ছাড়া কখনও বিরোধী হয় না, সেই উপদেষ্টৃত্ব আজ তোমার শক্তিতে আমার মধ্যে জাগ্রত হউক। গ্রহ ও উপগ্রহগণ আজ যে সংস্থানে সংস্থিত, তাহার দিকে তাকাইলে আমার যেন মনে হয়, আজিকার দিনে প্রযত্নশীল হইলে, যাঁহারা ঘোর তমসাবৃত, তাঁহাদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পর্য্যন্ত তোমার খেলা জাগাইয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। গ্রহ ও উপগ্রহগণের সংস্থান-সম্বন্ধীয় আমার এই যে জ্ঞান, ইহাও তোমা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। আমার ভ্রান্তি যাহাতে বিলুপ্ত হয়, তুমি প্রতিনিয়ত তাহার সহায়তা করিতেছ। আমার কাম ও ক্রোধাদির তাড়নায় আমি সর্ব্বদা ভ্রান্তি-প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছি। সংযুক্ত প্রকরণে তোমার ও আমার ভাবে আমি যখন ব্যস্ত থাকি, আমার ব্যক্তিত্ব যখন বিলুপ্ত হইয়া ব্রহ্মরূপস্বরূপ তোমার সহিত মিলিত হয়, তখন প্রায়শঃ আমার ভ্রান্তি থাকে না। তখন ভ্রান্তি থাকিলেও আমি কাহারও বিপথগামিতার সহায়ক হই না। তোমারই কারণে আজ আমি যখন উপদেষ্টৃত্বের ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়াছি, তখন আজিকার দিনে আমার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও যাহাতে ভ্রান্ত হইয়া আমি কাহারও বিপথগামিতার অন্যতম কারণ না হই, তাহার সহায়তার বিধান তুমি করিয়া দাও। যাহা রাজসিক ও তামসিক নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকের সহিত মিলিত হইয়া উপলব্ধি করা চলে না, তাহার জন্য আজ আমি প্রযত্নশীল নহি। সত্ত্বাবস্থার জন্য সন্ন্যাস ও রাজসিক অবস্থার জন্য ত্যাগ আজ আমি চাহি না।

আমার ঐ সহোদর ও সহোদরাগণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত অভাবের তাড়নায় উচ্ছিন্নমুখা থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার দেওয়া জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যে আমি সন্তুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছি না। জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার যে পন্থা আমার ঐ সহোদর ও সহোদরাগণের অবোধ্য ও সাধ্যাতীত, সেই পন্থায় আজ আমি বিভোর হইতে চাহি না। আজ আমার মধ্যে এমন একটী পন্থার নির্দ্দেশ জাগ্রত কর, যে-পন্থা সকলের বোধ্য ও সাধ্য এবং যে পন্থায় প্রত্যেকে স্ব স্ব অভাবের তাড়না হইতে মুক্ত হইতে পারে। যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে একজনেরও সাধ্যাতীত, সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য আজ আমার আরাধ্য নহে। আজ আমি চাই সেই জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য, যাহা আমার ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের প্রত্যেকের পক্ষে লাভ করা সুসাধ্য। তুমি আমাকে সন্ন্যাস ও ত্যাগের প্রবৃত্তি দিয়াছ, আমাকে অসীম জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের রাস্তা দেখাইয়াছ এবং তাহার মনোহারিত্ব উপলব্ধি করিবার শক্তি দিয়াছ, কিন্তু তাহা তো আমার ভ্রাতা-ভগ্নিগণের প্রত্যেকের সাধ্যায়ত্ত নহে! কাজেই আজ আমি তাহা তোমার নিকট চাহি না। যে অনন্ত কথা তুমি আমার মধ্যে রক্ষা করিয়াছ এবং প্রতিনিয়ত জাগ্রত করিয়া তুলিতেছ, যে ভাষায় সেই অনন্ত কথা আমার ঐ ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের প্রাণে জাগিয়া উঠিতে পারে, সেইরূপ ভাষা আজ আমার প্রাণে জাগ্রত কর। মা, আমার মধ্যে যত কিছু দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং রাগ ও দ্বেষের প্রমত্ততা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আজ দূরীভূত হউক। তুমি যে আমাদের সর্ব্বসাধারণের মাতা এবং তোমার সৃষ্ট প্রত্যেক মানুষটী যে এক মাতার সন্তান, সেই ভাবে আজ আমি যেন প্রবুদ্ধ হই এবং ঐ ভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া আমি যেন রাগ, দ্বেষ, হিংসা, অভিমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া সকলকেই প্রকৃত ভ্রাতা ও ভগ্নীর মত প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন করিতে পারি। আমার এই আকাঙ্ক্ষারূপী রাজসিকতার মধ্যেও যেন তোমার ঐ সাত্ত্বিকতা অটুটভাবে মিলিত থাকে।

উপরোক্ত প্রার্থনাসমূহ কায়মনো-বাক্যে করিতে হইলে যে শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন তাহা পাঠকদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই শিক্ষা ও সাধনা সর্ব্বতোভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে ইচ্ছাময়ী দুর্গাপূজার পৌরোহিত্য করিবার অধিকারী হওয়া যায়। উহা অর্জ্জন না করিয়া পৌরোহিত্য করিতে বসিলে প্রকৃতপক্ষে কোন পূজা সাধিত হয় না এবং পূজার উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। অধুনা কাহাকেও পৌরোহিত্যের অধিকারী বলিয়া মনে করা যায় না। যাঁহারা পৌরোহিত্যের

অনধিকারী, তাঁহাদিগের দ্বারা পূজা সাধিত হইতেছে বলিয়াই মার পূজা পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে এবং উহা কোন সুফলপ্রদ হইতেছে না। তাহার জন্ম দায়ী ৺পূজার প্রণেতা ঋষিগণ নহেন। পরন্তু, আমাদের মধ্যে তাঁহারা, যাঁহারা যথোপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা লাভ না করিয়াও ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইহার ফলে একদিকে ঐ পূজারীগণ যেরূপ বংশ ও শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছেন, সেইরূপ আবার উহার প্রয়োজনীয়তার প্রতি জন-সাধারণের শ্রদ্ধা নষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং তাঁহারাও হতশ্রী হইয়া পড়িতেছেন।

ইচ্ছাময়ী দুর্গাপূজার ধ্যান

যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সাধনাবলে শব্দের সহিত ব্রহ্মের কি সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারা ৺দুর্গা বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা সাধারণতঃ তিনটি মূর্ত্তিতে ৺দুর্গার ধ্যান করিয়া থাকেন। ঐ তিনটি মূর্ত্তির একটির নাম **সিংহবাহিনী মূর্ত্তি** দ্বিতীয়টির নাম **মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি** এবং তৃতীয়টির নাম **চণ্ডিকা মূর্ত্তি।** মানুষ তাহার মূলপ্রকৃতি হইতে যাহা পায়, তাহাতেই যদি সম্পূর্ণ থাকিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা ও ইচ্ছাধিক্য এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইত না। এই অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে মানুষের শরীরবিধান কোন মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করিতে পারে না, কারণ তখন মানুষের শরীর ও শরীরের শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরীরের কোন কার্য্য থাকিতে পারে না, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকিতে পারে না, মন ও মনের শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মনের কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধি ও বুদ্ধির শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধির কোন কার্য্যের প্রয়োজন হয় না। এই অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে, মানুষের শরীরবিধানে থাকে মাত্র আত্মার কার্য্য। তাহা অতীব সূক্ষ্ম। কাযেই উহার কোন মূর্ত্তি হয় না।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি বুঝিতে হইলে শরীর, শরীর-শক্তি, শরীর-কার্য্য, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়-শক্তি, ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, মন, মনঃ-শক্তি, মনের কার্য্য, বুদ্ধি, বুদ্ধি-শক্তি, বুদ্ধির-কার্য্য, আত্মা, আত্মার শক্তি এবং আত্মার কার্য্য, এই কয়টির সংজ্ঞা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে হয়। এই সংজ্ঞাগুলি কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা মূলতঃ একমাত্র অথর্ব্ববেদ ও ব্রহ্মসূত্রে সম্যক্ ভাবে বুঝান হইয়াছে। উহা অথর্ব্ব-বেদ ও ব্রহ্ম-সূত্রে সম্যক্ ভাবে বুঝান হইয়াছে বটে, কিন্তু শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে উহাদের প্রণেতা ঋষিগণের কথা যথাযথ ভাবে বুঝা সম্ভব নহে। অথর্ব্ব-বেদ ও ব্রহ্মসূত্রের প্রচলিত কোন ভাষ্য হইতে উহা সম্যক্ ভাবে বুঝা সম্ভব নহে। পরন্তু, উহাদের কোন প্রচলিত ভাষ্য হইতে উপরোক্ত কথা কয়টির সংজ্ঞা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিলে বিপথগামী হইতে হয়। বাংলা ভাষার সাহায্যে আমাদিগের পক্ষেও উহা উপলব্ধি করিবার পন্থা বুঝান সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহারা ভাগ্যবশে ঋষিদিগের উপরোক্ত কথা কয়টির সংজ্ঞা যথাযথভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে আমাদিগের সন্দর্ভের এই অংশ পাঠ না করাই সঙ্গত। আমাদের পরামর্শ—তাঁহারা কেবলমাত্র ধ্যানাংশটি পাঠ করুন।

মূলপ্রকৃতি হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই যদি মানুষ সম্পূর্ণ থাকিতে পারিত, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছা ও ইচ্ছাধিক্য এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইত না বটে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীর-বিধানও প্রকাশের যোগ্য কোন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিত না বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ মূলপ্রকৃতি হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতেই মানুষ সম্পূর্ণ থাকিতে পারে না, কারণ বিকাশই প্রকৃতির অন্যতম ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উদ্ভব হইবামাত্র ইন্দ্রিয়ের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং প্রথমতঃ ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির পর্য্যন্ত উদ্ভব হয়।

মূলতঃ ব্রহ্ম ও শিবের বিদ্যমানতা বশতঃ মূলপ্রকৃতি হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উৎপত্তি হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীরবিধানের কার্য্য যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, অথবা ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উৎপত্তি হওয়া সত্ত্বেও সাধন দ্বারা ঐ ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির প্রবৃত্তি সংযত করিতে পারিলে

শরীর-বিধানের কার্য্য যে মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ী দুর্গার সিংহ-বাহিনী মূর্ত্তি।

মূলতঃ ব্রহ্ম ও শিবের বিদ্যমানতা বশতঃ মূলপ্রকৃতি হইতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয়, অথচ ঐ ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টি তীব্রতা লাভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শরীর-বিধানের কার্য্যগুলি যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে,অথবা ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হইলেও সাধনা দ্বারা উহা দমিত করিতে পারিলে শরীর-বিধানের কার্য্যগুলি যে মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ী দুর্গার মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি।

মূলতঃ ব্রহ্ম ও শিবের বিদ্যমানতা বশতঃ মূলপ্রকৃতি হইতে ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইলে শরীর-বিধানের কার্য্যগুলি যে রূপ পরিগ্রহ করে, অথবা সাধনার দ্বারা ঐ ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা দমিত হইলে শরীর-বিধানের কার্য্যগুলি যে মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তাহাই ইচ্ছাময়ী দুর্গার চণ্ডিকা মূর্ত্তি।

যাঁহারা অথর্ব্ববেদে ও ব্রহ্মসূত্রে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া কি প্রকারে পিতার শুক্র, মাতার আর্ত্তব ও বায়ুর অংশবিশেষের মিলনে ভ্রূণের উদ্ভব হয়, ঐ ভ্রূণ কি করিয়া মাতৃগর্ভে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, কোন্ উপায়ে ক্রমে ক্রমে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং তাহার পর কি করিয়া উহার মধ্যে প্রতিনিয়ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাবের উদ্ভব হয়, এই চারিটি তথ্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির উদ্ভব পর্য্যন্ত, অথবা ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব পর্য্যন্ত, অথবা ইচ্ছাধিক্যের ও অসন্তুষ্টির তীব্রতার উদ্ভব পর্য্যন্ত শরীর-বিধানের কার্য্যগুলি কখন কোন্ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, অথবা কোন্ মূর্ত্তিতে পরিণত হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি, ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টি এবং ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা দমিত ও সংযত করিয়া যখন কেবলমাত্র মূলপ্রকৃতিজাত অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তখন শরীর-বিধানে যে কার্য্যগুলি বিদ্যমান থাকে, সেই কার্য্যগুলি যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ সাধনায় উপনীত হইয়াছেন, একমাত্র সেই সাধকগণের শরীরে সম্ভবযোগ্য। এই অবস্থায় শরীর-বিধানের কার্য্যগুলির যে মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহাও কেবলমাত্র ঐ উচ্চতম সাধকগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই হিসাবে সিংহবাহিনী মূর্ত্তির যথাযথভাবে পূজা করা অথবা ঐ পূজা উপলব্ধি করা একমাত্র ঐ সর্ব্বোচ্চ সাধকগণের সাধ্য এবং উহা সাধারণ মানুষগণের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে। ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টি এবং ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা দমিত করিয়া যখন কেবলমাত্র ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তখন শরীর-বিধানে যে কার্য্যগুলি বিদ্যমান থাকে, সেই কার্য্যগুলি যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের মধ্যম সাধনায় উপনীত হইয়াছেন, কেবলমাত্র সেই মধ্যম সাধকগণের শরীরে সম্ভবযোগ্য। এই অবস্থায় শরীর-বিধানের কার্য্যগুলির যে মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, তাহাও কেবলমাত্র ঐ মধ্যম সাধকগণের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই হিসাবে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তির যথাযথ ভাবে পূজা করা অথবা ঐ পূজা উপলব্ধি করা একমাত্র ঐ মধ্যম সাধকগণের সাধ্য।

ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা দমিত করিয়া যখন ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির সূচনার অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়, তখন শরীর-বিধানে যে কার্য্যগুলি বজায় থাকে, সেই কার্য্যগুলি যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের নিম্নতম সাধক, তাঁহাদের শরীরে পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শরীর-বিধানের এই কার্য্যগুলি নিম্নতম সাধকগণ পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। এই হিসাবে চণ্ডিকা মূর্ত্তির পূজা ও তাঁহার উপলব্ধির কার্য্যে নিম্নতম সাধকগণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইতে পারেন।

সর্ব্বসাধারণের শিক্ষা ও সাধনার জন্য ঋষিগণ একমাত্র চণ্ডিকা মূর্ত্তির পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই জন্য ঐ চণ্ডিকা মূর্ত্তিরই পূজা সাধারণতঃ এই সময়ে সাধিত হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে, এই সময়ে যে মূর্ত্তির পূজা হয়, তাহা মহিষ-মর্দ্দিনীর মূর্ত্তি এবং মূলমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। যাঁহারা ইহা মনে করেন, তাঁহারা পুরাণের ভাষা বুঝিতে পারেন না। প্রকৃত পক্ষে মূলমূর্ত্তি অন্তর্হিত হয় নাই। সিংহবাহিনী ও মহিষ-মর্দ্দিনীর মূর্ত্তি সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী নহে বলিয়া ব্যাপকভাবে উহার পূজার

ব্যবস্থা যাহাতে না হয়, তাহা ঋষিগণেরই পরামর্শ। চণ্ডিকা মূর্ত্তি উপলব্ধি করিতে হইলে সৃষ্টি-তত্ত্বের কয়েকটি কথা সর্ব্বাগ্রে জানিবার প্রয়োজন হয়। ঐ কথা কয়েকটি আমরা সংক্ষেপতঃ বর্ণনা করিব।

সৃষ্টির মূল "ব্রহ্ম" অথবা ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নির মিলিত অবস্থা। ব্রহ্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্যোম, বায়ু, অম্বু ও বহ্নি মিলিত হইয়া সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং ঐ বিদ্যমানতা কবে হইতে এবং কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং কোথায় ও কবে তাহার শেষ, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই ব্রহ্ম নিয়ত তিনটি অবস্থায় বিদ্যমান থাকেন। একটি তাঁহার নিষ্ক্রিয় অবস্থা, দ্বিতীয়টি তাঁহার কার্য্যশীলতার অবস্থা এবং তৃতীয়টি তাঁহার কার্য্যবৃদ্ধির অবস্থা। ব্রহ্মের এই তিনটি অবস্থাই অব্যক্ত, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, পরন্তু বুদ্ধিগ্রাহ্য। "ব্রহ্ম" যখন কার্য্যশীল অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় "বিষ্ণু" বলা হইয়া থাকে এবং তিনি যখন কার্য্যবৃদ্ধির অবস্থায় উপনীত হন, তখন তাঁহাকে "মহেশ্বর" অথবা "শিব" বলা হয়। ব্রহ্ম যখন "শিবত্ব" প্রাপ্ত হন, তখন মূলপ্রকৃতির উদ্ভব হয়। মূলপ্রকৃতি অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং ইহা সর্ব্ববিধ গুণের আকর। ইনি সর্ব্ববিধ গুণের আকর বলিয়া গুণ-ভেদানুসারে ইহাঁকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিবিধ নামে আখ্যাত করা হইয়া থকে। মূল প্রকৃতিও ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা বিরাজিত। মূলপ্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে। গুণের আকর মূলপ্রকৃতি সর্ব্বত্র বিরাজিত আছেন বলিয়াই প্রতি-নিয়ত তাঁহার এবং সর্ব্ববিধ স্ত্রী ও পুরুষের বীজের মিলনে অঙ্কুর অথবা ভ্রূণের উৎপত্তি হইতেছে। মনুষ্যজাতির স্ত্রী ও পুরুষের শুক্র ও আর্ত্তবের এবং গুণের আকর মূলপ্রকৃতির মিলনে যে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়, তাহা প্রথমতঃ অব্যক্ত ভাবে অতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় বিদ্যমান থাকে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ঐ ভ্রূণ হইতে ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ মানুষের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। বেদের সৃষ্টিতত্ত্বে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়কে দক্ষিণ ও বাম-ক্রমে দশধা বিভক্ত করা হইয়াছে।

পুরুষগণের প্রথমতঃ বামভাগের এবং স্ত্রীগণের প্রথমতঃ দক্ষিণভাগের ইন্দ্রিয়গুলির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি হইবার পর ভ্রূণ ব্যক্ত, অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যাবস্থায় উপনীত হয়। তখন ক্রমে ক্রমে অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধশক্তি এবং মন ও বুদ্ধির উন্মেষ হইয়া থাকে। অস্থি প্রভৃতির উন্মেষ হইবার পর "ইচ্ছা"র উদ্ভব হয়। "ইচ্ছা"র উন্মেষ হইলে প্রথমতঃ মানুষ প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভের কামনায় প্রবৃত্ত থাকে এবং যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে। ক্রমে ক্রমে ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি হয় এবং তখন প্রকৃত জ্ঞান ও প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের কামনায় মানুষ সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে না। তখন নানাবিধ রূপ ও আধিপত্যের কামনায় প্রমত্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে যখন নানাবিধ রূপ ও আধিপত্যের কামনায় প্রমত্ত হয়, তখন ইচ্ছার আধিক্যের ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং মানুষ আসুরিকতার আবাসস্থল হইয়া ধ্বংসমুখী হয়। এই অবস্থায়ও প্রতি-নিয়ত মূলপ্রকৃতির স্বচ্ছ ও শুভ্র কার্য্য-শক্তিগুলি মানুষকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মূলপ্রকৃতিকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ সাধনা অথবা পূজা-নিরত হইলে মূলপ্রকৃতির কার্য্য-শক্তিগুলি সবলতা লাভ করিতে পারে এবং তখন আসুরিকতা বিনষ্ট হইয়া ইচ্ছার আধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা তিরোহিত হইতে পারে।

সৃষ্টিতত্ত্বের উপরোক্ত কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে চণ্ডিকা মূর্ত্তি উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য হয়। দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম ও তাঁহার তিনটি অবস্থার প্রতিকৃতি। মূল দেবীমূর্ত্তি মূলপ্রকৃতির প্রতীক। তাঁহার দশটি বাহু, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বাম ও দক্ষিণক্রমে দশটি বিভাগ। সরস্বতীমূর্ত্তি প্রকৃত জ্ঞানের প্রতিকৃতি। লক্ষ্মীমূর্ত্তি প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের প্রতিকৃতি। কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি সর্ব্ববিধ সৌন্দর্য্য ও রূপের প্রতিকৃতি। গণেশমূর্ত্তি সর্ব্ববিধ আধিপত্য-প্রবৃত্তির প্রতিকৃতি। অসুরমূর্ত্তি আসুরিকতার প্রতিকৃতি। সিংহমূর্ত্তি মূল-প্রকৃতির কার্য্য-শক্তির প্রতিকৃতি।

যে অস্ত্রের দ্বারা 'মা' অসুরকে প্রত্যক্ষভাবে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্রের নাম তীক্ষ্ণবাণ। সেই অস্ত্র দক্ষিণভাগস্থ ঊর্দ্ধ হইতে চতুর্থ বাহুতে রক্ষিত হয়।

আসুরিকতা অথবা ইচ্ছাধিক্য ও অসন্তুষ্টির তীব্রতা তিরোহিত করিবার প্রত্যক্ষ উপায় কি তাহার নির্দ্দেশ ইহা হইতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভাগস্থ ঊর্দ্ধ হইতে চতুর্থ বাহু জিহ্বার দক্ষিণ ভাগের প্রতিকৃতি আর তীক্ষ্ণবাণ তীব্র রসের প্রতিকৃতি। যাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সাধনায় অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, জিহ্বার সমগ্রভাগ সম্যক্ ভাবে অনুভব করা অত্যন্ত প্রযত্ন-সাধ্য, নানাবিধ মন্ত্র ব্যবহারের সহিত ঐ প্রযত্নে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিলেও শরীরের দক্ষিণ-ভাগের সহিত বামভাগের যে কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করা এবং শরীরমধ্যস্থ পাঁচটি বায়ুর কার্য্য প্রত্যক্ষ করা সহজসাধ্য হয় না। তখনও কামাদির তীব্রতা প্রায় সমানভাবেই বিদ্যমান থাকে। কিন্তু, ভারতীয় ঋষির এমনই আশ্চর্য্য আবিষ্কার যে, বেদোক্ত দুর্গামন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিলেই জিহ্বার দক্ষিণভাগের কুটিলতা নষ্ট হইয়া যায় ও তাহা হইতে ঝির ঝির করিয়া রস নির্গত হইতে থাকে। তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কভাগ, হৃদয়ভাগ এবং পাদভাগের পরস্পরের সংযোগ প্রত্যক্ষীভূত হইয়া পাঁচটি বায়ুর প্রত্যেকটির সমতা সাধিত হয় ও সমস্ত ইন্দ্রিয়ের শক্তি বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও উহা সংযত হইয়া পড়ে। এইরূপে জিহ্বার দক্ষিণভাগের কার্য্যের সহায়তায় আসুরিকতা দমিত হয়।

দুর্গা-প্রতিমা সম্বন্ধে আমরা যাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম, তাহা হয়ত অনেকের চক্ষে রূপক-ব্যাখা বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে উহা কোন রূপক-ব্যাখ্যা নহে। শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, বাহু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, অসুর, সিংহ এবং বাণ প্রভৃতি শব্দের যথাযথ অর্থ কি, তাহা নির্ভুলভাবে বুঝিতে পারা যায়। তখন দেখা যাইবে যে, আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণভাবে উপরোক্ত পদগুলির অর্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট।

একাধিক তন্ত্র ও একাধিক পুরাণে এবং চারিটি বেদে দুর্গাপূজা-সম্বন্ধীয় কথাগুলি সম্যক্ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপরোক্ত ব্যাখ্যা যে সম্যক্ ভাবে সঙ্গত, তাহা ঐ পন্থাগুলিতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে বুঝা যাইবে।

কালিকাপুরাণে ৺দুর্গার যে ধ্যান আছে এবং যে ধ্যান বাঙ্গালার অনেক স্থানেই ৺দুর্গাপূজায় ব্যবহৃত হয় তাহা যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেও আমাদের কথার যুক্তিযুক্ততা অনুধাবন করা যাইবে। দুর্গাপ্রতিমা কাহার প্রতিকৃতি, তাহার সন্ধান পাইলে কালিকাপুরাণের ঐ ধ্যান প্রত্যক্ষ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে প্রথমতঃ দুর্গার প্রতিমা সম্বন্ধে ধারণা করিবার জন্য প্রযত্নশীল হইতে অনুরোধ করিতেছি। আজ আমাদের প্রবন্ধের কলেবর অনেকখানি বৃদ্ধি পাইল। আবার সময় হইলে ধ্যানের ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

যে সমস্ত পত্রিকা প্রতি বৎসর দুর্গা সম্বন্ধে অন্ধকারময় উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আমরা তাহাদিগের সম্পাদকগণকে ঐ কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করি। ঐরূপ করা আগুন লইয়া খেলা করিবার অনুরূপ। তমসাবৃত মানুষগুলি যাহাতে তমসা হইতে মুক্ত হইয়া স্ব স্ব জীবনকে প্রকৃত মনুষ্যোপম করিয়া তুলিতে পারে, তাহার প্রথম সোপান ৺দুর্গার পূজা। তৎসম্বন্ধে মিথ্যা কথা কওয়া, অথবা উহা বিতরণ করা অপেক্ষা চুপ করিয়া থাকাই সঙ্গত।

ইয়োরোপের মহাসমর

পুনরায় ইয়োরোপে মহাসমর আসন্ন হইয়াছে বলিয়া অনেকের মনে গত কয়েকদিন হইতে একটা প্রচণ্ড আশঙ্কা জাগ্রত হইয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে যাহা যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে ঐ আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়া মনে করা যায় না। কলিকাতা হইতে ইংরাজী ও বাংলায় যে কয়খানি দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, তাহাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভেও ঐ মর্ম্মের কথা দেখা যাইতেছে। ভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মধ্যেও

অনেকের মনেই কয়েক বৎসর হইতে অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় একটি আন্তর্জ্জাতিক মহাসমরের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহার আভাস তাঁহাদিগের একাধিক বক্তৃতায় পাওয়া গিয়াছে। এই নেতৃবর্গ আশা করেন যে, ইয়োরোপে কোন আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হইলে ভারতবাসিগণের পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। কাজেই ইহাঁরা পরোক্ষভাবে মহাসমরের কামনা করিয়া থাকেন।

আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য দুইটি। প্রথমতঃ, ইয়োরোপে কোন আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর আসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় কি না, দ্বিতীয়তঃ, ইয়োরোপে কোন আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হইলে ভারতবাসিগণের স্বাধীনতা লাভ করিবার সম্ভাবনা অধিকতর দ্রুত হইবে কি না, আমরা তাহার আলোচনা করিব।

ইয়োরোপে কোন আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর আসন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় কি না, তাহা আমূলভাবে বিচার করিতে হইলে, মহাসমর-প্রবৃত্তি মূলপ্রকৃতিজাত অথবা মানুষের কোন কর্ম্মের ফল এবং আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর কেন ঘটে, সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

মহাসমর-প্রবৃত্তি মূলপ্রকৃতিজাত অথবা মানুষের কোন কর্ম্মের ফল, তাহার বিচার করিতে হইলে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের মনে কোন্ অবস্থায় এবং কেন দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি উদ্ভব হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ঐ পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি অল্লাধিক পরিমাণে প্রায় প্রত্যেক মানুষটী স্ব স্ব হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। কোন্ অবস্থায় এবং কেন এই দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগ্রত হয়, তৎসম্বন্ধে আত্মপরীক্ষা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ঐ প্রবৃত্তি কাহারও পছন্দসহি নহে। অতর্কিতভাবে ঐ প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। মানুষ স্বকীয় প্রকৃতিবশে উহাতে প্রবৃত্ত হয় না এবং উহাতে প্রবৃত্ত হইলেই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। যদি স্বকীয় মূলপ্রকৃতি বশতঃ কাহারও দ্বন্দ্ব এবং কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইত, তাহা হইলে উহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অত সহজে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইতে পারিত না, কারণ মূলপ্রকৃতি-বশতঃ যে যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, সেই সেই কর্ম্মের ফলে কেহ কখনও ক্লান্ত হয় না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, সকল মানুষেরই সাধারণ কাম্য প্রধানতঃ ছয়টি, যথা :—অর্থের প্রাচুর্য্য, (২) স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য, (৩) শান্তি, (৪) সন্তুষ্টি, (৫) দীর্ঘ যৌবন, এবং (৬) দীর্ঘ জীবন। এই প্রধান ছয়টি কাম্য যতদিন পর্য্যন্ত সন্তুষ্টির অনুরূপ পরিমাণে কাহারও করতলগত থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইবার অবকাশ হয় না এবং ঐ ছয়টি কাম্যের কোনটীর অপ্রাচুর্য্য অথবা অভাব ঘটিলেই প্রথমতঃ নিজের মনে এবং দ্বিতীয়তঃ অপরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলহের সূচনা হইয়া থাকে। যাঁহারা নিজেদের সঙ্গে খেলা করিয়া আত্ম-তত্ত্বের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা আরও দেখিতে পাইবেন যে, প্রকৃতি প্রত্যেক মানুষটিকে এবং তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক অণু ও পরমাণুটিকে পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতির সৃষ্টির সূচনা হয় পরমাণু ও অণু হইতে। পরমাণু ও অণু সর্ব্বতোভাবে সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু পরমাণু ও অণুর কোন কাম অথবা ক্রোধ অথবা লোভ অথবা মোহ অথবা মাৎসর্য্য বিদ্যমান থাকে না। পরামাণু ও অণুর পক্ষে অর্থ, অথবা স্বাস্থ্য, অথবা শান্তি, অথবা যৌবন, অথবা জীবন সম্বন্ধীয় কোন কথাই প্রযুজ্য নহে। কারণ ঐ সম্বন্ধীয় কোনটিরই প্রাচুর্য্য অথবা অপ্রাচুর্য্য পরমাণু অথবা অণুর মধ্যে নিহিত থাকে না। অথচ পরমাণু ও অণুর সমন্বয়ে যখন জীবের উদ্ভব হয়, তখন ঐ জীবের মধ্যে অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ছয়টি কাম্যের প্রত্যেকটিরই প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্য ঘটিয়া থাকে।

অণু ও পরমাণু-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তথ্য উপলব্ধি করিতে পারিলে, অণু ও পরমাণুই যে প্রত্যেক জীবের অন্যতম মূল উপাদান, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে এবং অর্থ প্রভৃতি ছয়টি কাম্যের অপ্রাচুর্য্য অথবা অভাববশতঃই যে দ্বন্দ্ব ও কলহের উদ্ভব হয়, তাহা স্বীকার করিয়া লইলে, ইহাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয় যে, যাহার সমন্বয়ে

জীবের উৎপত্তি, তাহার মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি বিগুমান নাই। কাজেই, দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি যে মানুষের মূলপ্রকৃতিজাত নহে, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া যাইতে পারে।

এক্ষণে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি যদি মানুষের মূলপ্রকৃতিজাত না হয়, তাহা হইলে মানুষের হৃদয়ে উহার উদ্ভব হয় কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে দিতে হইলে, অণু ও পরমাণুর সমন্বয়ে কি প্রকারে মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্ভব হইয়া থাকে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে তাহার আলোচনা করিতে হইবে। প্রধানতঃ, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির কার্য্য লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব, ইহা বলাই বাহুল্য। শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্য্য মানুষের পক্ষে ভালও হইয়া থাকে এবং মন্দও হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্য্য লইয়া যখন মানুষের মনুষ্যত্ব, তখন মানুষের মনুষ্যত্বের উদ্ভব হয় কি প্রকারে, তাহা বলিতে গেলে যে প্রকারে শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির কার্য্যের উদ্ভব হয়, তাহার আলোচনা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অণু ও পরমাণু বিচ্ছিন্নাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উহার কোনটীর মধ্যে কোনরূপ ভাব (অর্থাৎ—অর্থ প্রভৃতির কামনা) বিগুমান থাকে না বটে, কিন্তু দুইটি পরমাণুর মিলন ঘটিলেই পরস্পরের ঘর্ষণবশতঃ বহ্নি ও ক্রমে ক্রমে তাহা হইতে তেজের এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে অম্বু ও তাহা হইতে ক্রমে ক্রমে রসের উৎপত্তি হয়। এই রস ও তেজ মিলিত হইয়া যে যে বস্তু জিহ্বার উপাদান, সেই সেই বস্তুর উৎপত্তি সংঘটিত করে। যাহা লইয়া জিহ্বার জিহ্বাত্ব, তাহার মূল উপাদান যে একমাত্র রস ও তেজ, তাহা জিহ্বাকে অনুভব করিতে শিক্ষা করিতে পারিলে অনায়াসেই প্রতীয়মান হইবে।

জিহ্বার উপাদানের উৎপত্তি হইবার পর তাহার সহিত পুনরায় রস ও তেজের মিলন হয় এবং এই মিলন হইতে চক্ষুর উপাদানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে রস ও তেজের মিশ্রণে ক্রমে ক্রমে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্যশক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার পর একটীর পর একটী করিয়া অস্থি, মজ্জা, রস, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম, মন ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত দশটী ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের প্রত্যেকের কার্য্য-শক্তির উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষকে পার্থিব মানুষ বলিয়া অভিহিত করা চলে না এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ছয়টী বস্তুর প্রয়োজন অথবা কামনার উৎপত্তি হয় না। মানুষের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি হওয়া মাত্র ইচ্ছার উদ্ভব হয়। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, **মানুষের ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি হয় তাহার অণু পরমাণু অথবা মূলপ্রকৃতি হইতে এবং ইচ্ছা তাহার মূলপ্রকৃতি-জাত নহে। পরন্তু, উহা পার্থিব মনুষ্য-জাত।** অণু ও পরমাণু হইতে দশটী ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তির উৎপত্তি পর্য্যন্ত মানুষের যে অবস্থা বিগুমান থাকে, সেই অবস্থাকে সংস্কৃত ভাষায় ঋষিগণ সাত্ত্বিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। "ইচ্ছা"র উদ্ভব হইবামাত্র মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই অবস্থাকে ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষায় "রাজসিক" অবস্থা নামে আখ্যাত করিয়াছেন। "ইচ্ছা"র উদ্ভব হইবা মাত্র মানুষের হৃদয়ে অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাম্য-বস্তুর আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত অণু ও পরমাণুজাত রস ও তেজবশতঃ "ইচ্ছা"র আধিক্যের উৎপত্তি না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান কাম্য-বস্তুর আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু ঐ ঐ কাম্য-বস্তুর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই মানুষ সন্তুষ্টি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যখন অণু ও পরমাণুজাত রস ও তেজবশতঃ "ইচ্ছা"র আধিক্যের উৎপত্তি হয়, তখন তৎসঙ্গে সঙ্গে একই কারণে অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির প্রয়োজনও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তখন আর ঐ সমস্ত কাম্য-বস্তুর যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই মানুষ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না এবং ক্রমে ক্রমে উহার অপ্রাচুর্য্য অনুভূত হইতে থাকে ও অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয়। "অপ্রাচুর্য্যে"র এবংবিধ অনুভূতি এবং অসন্তুষ্টির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হৃদয়ে দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। "ইচ্ছা"র উদ্ভব হইতে

আরম্ভ করিয়া উহার আধিক্য না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষ রাজসিক অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। "ইচ্ছা"র আধিক্য হওয়া মাত্র মানুষ যে অবস্থায় উপনীত হয়, সেই অবস্থাকে ঋষিগণ সংস্কৃত ভাষায় মানুষের তামসিক অবস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যদিও দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি মানুষের মূলপ্রকৃতি নহে, তথাপি **অসংযত রস ও তেজ-বশতঃ পার্থিব মানুষের ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি হইয়া অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।**

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহাও বুঝা যাইবে যে, মানুষের সত্ত্বাবস্থা (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়শক্তির মূল উৎস) তাহার মূলপ্রকৃতিজাত। রাজসিক অবস্থা তাহার বিকৃতিজাত এবং তামসিক অবস্থা তাহার বিকার-জনিত। এই তামসিক অবস্থায় মানুষের অসন্তুষ্টির এবং দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে এবং ইহাই মানুষের মনুষ্যত্বের মন্দাবস্থা। রাজসিক অবস্থা যদিও মূলতঃ মানুষের বিকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি এই অবস্থাকে তাহার মন্দাবস্থা বলা চলে না, কারণ এই অবস্থাতে তাহার ইচ্ছার উদ্ভব হয় বটে, কিন্তু সে যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। রাজসিক ও তামসিক অবস্থা যদিও মানুষের মূলপ্রকৃতিজাত নহে, তথাপি এই দুই অবস্থাকে মানুষ সর্ব্বতোভাবে নিগ্রহ করিতে পারে না, কারণ মূলপ্রকৃতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে পরবর্ত্তী এই দুই অবস্থার উৎপত্তি হয় না বটে, কিন্তু মূল-প্রকৃতি হইতে সাত্ত্বিক অবস্থা, অথবা স্ব-ভাবের উৎপত্তি হইয়া এবং ঐ সাত্ত্বিক অবস্থা, অথবা স্বভাব হইতে ক্রমে ক্রমে পরবর্ত্তী দুইটি অবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক অবস্থা, অথবা স্ব-ভাব হইতে রাজসিক ও তামসিক অবস্থার উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ দুইটি অবস্থাকে সর্ব্বতো-ভাবে নিগ্রহ করা, অর্থাৎ বাদ দিয়া চলা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে বটে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটিকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সাধ্যায়ত্ত।

মানুষ যাহাতে মনুষ্যত্বের মন্দাবস্থায় নিপতিত না হয়, তাহা করিতে হইলে তামসিক অবস্থার প্রবৃত্তিগুলি যাহাতে সংযত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রযত্নশীল হওয়া বিধেয়। এই প্রযত্নে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে মানুষ অসন্তুষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে এবং তখন অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কাম্যবস্তুর প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হইয়া যায় ও অনায়াসেই দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি দমিত হইতে পারে।

কোন্ কোন্ উপায়ে তামসিক অবস্থার প্রবৃত্তিগুলি সংযত করা সম্ভব, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে, কেন স্ব-ভাব অথবা, সাত্ত্বিক অবস্থাবশতঃ তামসিক অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহা আর একবার স্মরণ করিতে হইবে।

আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, অসংযত রস ও তেজ-বশতঃ পার্থিব মানুষের ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি হইয়া অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

উপরোক্ত সত্য হইতে ইহা বুঝিতে হয় যে, যাহাতে দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তির উৎপত্তি না হয়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে যাহাতে অসন্তুষ্টির উৎপত্তি না হয়, তাহা করিবার প্রয়োজন হয়। যাহাতে অসন্তুষ্টির উৎপত্তি না হয়, তাহা করিতে হইলে যাহাতে ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা করিতে হয় এবং যাহাতে ইচ্ছার আধিক্যের উৎপত্তি না হয়, তাহা করিতে হইলে যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

কাযেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের তামসিক অবস্থার উৎপত্তি না হয়, তাহা করিতে হইলে যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। রস ও তেজ অসংযত হইলেই মানুষের তামসিক অবস্থার, অথবা দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হয়, তাহা করিবার উপায় কি।

এই সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে রস ও তেজ অসংযত না হয়, তাহা করিবার উপায় প্রধানতঃ দুইটি। সকল মানুষের স্বভাবজাত ক্ষমতা

সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। মানুষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। কতকগুলি মানুষ স্বভাববশেই বুদ্ধিপ্রবণ হইয়া থাকেন, আর কতকগুলি মানুষ শারীরিক শ্রমপ্রবণ হন। যাঁহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধিপ্রবণ, তাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সাধনার দ্বারা স্বকীয় শরীরস্থ রস ও তেজকে অনায়াসে সংযত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। আর যাঁহারা বুদ্ধিপ্রবণ নহেন, পরন্তু শারীরিক শ্রমপ্রবণ, তাঁহারা আত্ম-তত্ত্বের সাধনায় কখনও নিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। তাঁহাদের শরীরস্থ রস ও তেজ যাহাতে অসংযত না হয়, তাহা করিতে হইলে তাঁহাদিগের খাদ্য, চাল-চলন ও শিক্ষা সম্বন্ধে কতকগুলি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিবার প্রয়োজন হয় এবং তাঁহাদের প্রয়োজনীয় অর্থ, স্বাস্থ্য, সন্তুষ্টি ও শান্তি সম্বন্ধে যাহাতে কোনরূপ অভাবে নিপতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিগণের লক্ষ্য রাখিতে হয়। এইরূপ ভাবে বুদ্ধিজীবিগণ যাহাতে নিয়মিত ভাবে আত্ম-তত্ত্বের সাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং শ্রমজীবিগণ যাহাতে তাঁহাদিগের খাদ্য, চাল-চলন ও শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি পালন করেন ও তাহা না করিলে যাহাতে তাঁহারা দণ্ড-প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাদিগের প্রয়োজনীয় অর্থ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অভাব যাহাতে না ঘটে, তদ্বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রপতিগণের লক্ষ্য থাকিলে কখনও কোন শ্রেণীর মানুষের ইচ্ছার আধিক্য অথবা অসন্তুষ্টি অথবা দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না। অন্যথা দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

যাহা ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে সত্য, তাহা প্রায়শঃ সঙ্ঘগত অথবা সমাজ ও রাষ্ট্রগত মানুষের পক্ষেও সত্য হইয়া থাকে।

কাযেই বলিতে হয় যে, কোন জাতি অথবা সমাজ অথবা রাষ্ট্রের সমর-প্রবৃত্তি তাহার মূলপ্রকৃতিজাত নহে। যে মানুষগুলি লইয়া জাতি, সমাজ, অথবা রাষ্ট্র সংগঠিত হয়, সেই মানুষগুলির আত্ম-তত্ত্বের সাধনায় অথবা খাদ্য, চাল-চলন ও শিক্ষা-বিষয়ক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় যখন কোনরূপ অনিয়ম প্রবিষ্ট হয় এবং তাহাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টির অপ্রাচুর্য্য ঘটে, তখন ঐ জাতি, সমাজ অথবা রাষ্ট্রের মধ্যে সমর-প্রবৃত্তির উদ্ভব হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। নতুবা কখনও কোন জাতি, সমাজ অথবা রাষ্ট্রের সমর-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইতে পারে না। উপরোক্ত অনিয়ম ও অপ্রাচুর্য্যের তারতম্যানুসারে সমর-প্রবৃত্তির মাত্রারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যখন ঐ অনিয়ম ও অপ্রাচুর্য্য অত্যধিক মাত্রায় ঘটিতে থাকে, তখন সমর-প্রবৃত্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হয়। ঐ অনিয়ম ও অপ্রাচুর্য্যের মাত্রা অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও যখন মানুষ কোন রকমের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতে আরম্ভ করে, তখনও সমর সংঘটিত করিবার প্রবৃত্তি সমান ভাবে বজায় থাকে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ সমরের শক্তি হ্রাস পাইয়া যায় এবং তাহার ফলে আন্তর্জ্জাতিক মহা-সমর অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অবস্থায় অন্তর্ব্বিদ্রোহের দ্বারা মানুষের সমর-প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি সাধিত হয়।

উপরোক্ত সত্যগুলি উপলব্ধি করিয়া ইয়োরোপের অবস্থা পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইয়োরোপে অন্নাধিক দুই সহস্র বৎসর আগে এমন একদিন ছিল, যখন ইয়োপীয়গণ প্রায়শঃ দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত ছিলেন। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী এই দুই শ্রেণীর মানুষই বিদ্যমান ছিলেন। তখন তাঁহাদিগের বুদ্ধিজীবিগণ নিয়মিত ভাবে আত্ম-তত্ত্বের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তখনও জগতে হিন্দুধর্ম্ম, অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম, অথবা খৃষ্টধর্ম্ম, অথবা মুসলমান-ধর্ম্মের উদ্ভব হয় নাই। ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই তখনও "মানবধর্ম্ম" বলিয়া একটি মাত্র ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এখনকার বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বাইবেল তখনও প্রচলিত হয় নাই। এক বাইবেলের কথা লইয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব তখনও শুনা যায় নাই। সর্ব্বত্রই তখন একমাত্র হিব্রু ভাষায় লিখিত "বাইবেল" প্রচলিত ছিল এবং সকলেই ঐ বাইবেলকে এক অর্থে গ্রহণ করিতে পারিতেন। যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হইতে পারে, তাদৃশ খাদ্যাখাদ্য, চাল-চলন ও শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিধি তখনও শ্রমজীবিগণের মধ্যে কঠোর ভাবে প্রচলিত ছিল। কেহ উহার ব্যভিচার সাধন

করিলে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতেন। এখনকার মত যথেচ্ছ ভাবে পান-ভোজন, যৌন ব্যবহার ও উচ্ছৃঙ্খলতা-মূলক শিক্ষা তখনকার ইয়োরোপীয়গণের অসাধ্য ছিল। প্রকৃত অর্থ ও স্বাস্থ্যের অভাব তখন প্রায়শঃ কোন ইয়োরোপীয়কে ভোগ করিতে হইত না। পাউণ্ড, শিলিং পেন্সের সংখ্যা তখন ইয়োরোপীয়গণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে কম ছিল বটে, কিন্তু পেটের দায়ে প্রায়শঃ কাহাকেও দেশ ছাড়িয়া সারাজীবন আত্মীয়-স্বজনবিহীন বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না। সমস্ত প্রয়োজনীয় কৃষি ও কুটীর-শিল্প ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে প্রচলিত ছিল এবং ইয়োরোপীয়গণ দেশে বসিয়াই স্ব স্ব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। সমর-প্রবৃত্তি একরূপ সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদিগের অপরিজ্ঞাত ছিল। আমাদিগের এই ইতিহাসের সাক্ষ্য এখনও বাইবেল হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। যে ইতিহাসে ইহার বিরোধী কথা প্রচলিত হইয়াছে, তাহার কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

কালক্রমে দুই সহস্র বৎসর হইতে ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবিগণ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া গিয়াছেন এবং আত্ম-তত্ত্বের প্রকৃত সাধনা ও প্রকৃত বাইবেল আলোচনা তাঁহাদিগের মধ্যে একরূপ অপরিজ্ঞাত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে শরীরস্থ রস ও তেজ অসংযত না হইতে পারে, তাদৃশ খাদ্যাখাদ্য, চালচলন ও শিক্ষার ব্যবস্থা ও বিধি ক্রমে ক্রমে শ্রমজীবিগণের মধ্যে শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে ইয়োরোপীয়গণের রস ও তেজ অসংযত হইয়া পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মৃদুমাত্রায় অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়া দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। এই সময় তাঁহারা ক্রুসেড নামক সমরে প্রমত্ত হইয়া পড়েন। এই ক্রুসেড নামক সমরকে মহাসমর বলিয়া আখ্যাত করা যায় না। এই সময়েও অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব তাঁহাদিগের মধ্যে তাদৃশ পরিমাণে দেখা যায় নাই। তখনও ইয়োরোপের কৃষি ও কুটীর-শিল্প প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ব্যবহার্য্য প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিত। তখনও ইয়োরোপীয়গণ আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া নিজেদের দেশে বসবাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। তখনও তাঁহাদিগকে অন্ন-সংস্থানের জন্য আত্মীয়স্বজনবিহীন বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না।

অল্পাধিক এক সহস্র বৎসর হইতে ইয়োরোপীয়গণের অর্থাভাব দেখা দিয়াছে। এই সময় হইতে স্বদেশে বসবাস করিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে অন্ন-সংস্থান করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময় হইতে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

একে আত্ম-তত্ত্বের সাধনপরায়ণ বুদ্ধিজীবীর অভাব, তাহার উপর আবার অর্থাভাব, অন্নাভাব, খাদ্যাখাদ্য, চালচলনের বিচার এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব তাঁহাদিগকে এই সময় হইতে সম্পূর্ণভাবে অন্ধ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা এই সময় হইতেই ভীষণ ভাবে দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তিতে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারই ফলে তাঁহাদিগের মধ্যে গত দ্বাদশ শতাব্দী হইতে মহাসমরের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাই তাঁহাদের শতবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের সূচনার সৃষ্টি করিয়াছে। এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি লইয়া তাঁহারা এসিয়া, আমেরিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া খণ্ডে উপনীত হইতে পারিয়াছেন এবং সাময়িক ভাবে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অন্নসংস্থানের কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের মনে হইয়াছে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির সাফল্যে জীবন-যাত্রা-সংস্থানের সাফল্য সংঘটিত হইতে পারে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া গত সপ্তদশ শতাব্দী হইতে তাঁহাদের খাদ্য, চালচলন ও শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব গ্রহণ করিয়াছে। এই চালচলন ও শিক্ষা তাঁহাদিগের রস ও তেজকে সম্পূর্ণ অসংযত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তির উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই বিপরীত পরিবর্ত্তনের ফলে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে রুশ ও তুর্কীর যুদ্ধ, ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার যুদ্ধ, ইংরাজ ও বুয়ারের যুদ্ধ, রুশ ও জাপানের যুদ্ধ এবং ইয়োরোপের মহাসমর অভূতপূর্ব্ব ভাবে সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। এখনও তাঁহাদের সমর-প্রবৃত্তি সমধিক পরিমাণে প্রজ্জলিত

রহিয়াছে এবং যাহাতে ঐ সমর-ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্য ইয়োরোপের প্রত্যেক দেশে অধিকতর পরিমাণে আয়োজন চলিতেছে।

ইয়োরোপের এই অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে পুনরায় একটি মহাসমর যে আসন্ন হইয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যে মহাযুদ্ধগুলি হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইয়োরোপের কোন জাতিই স্ব স্ব জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কোন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই এবং যুদ্ধের সময় প্রকৃত পক্ষে যাঁহারা জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন অথবা অঙ্গহীন হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন, তাঁহাদিগের আত্মীয়-বান্ধবগণের অন্ন-সংস্থানের ক্লেশ অধিকতর মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সেনানী হইবার উপযোগী, তাঁহারা পুনরায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে সম্পূর্ণভাবে নারাজ হইয়া পড়িয়াছেন। এইরূপ ভাবে ইয়োরোপীয় প্রত্যেক জাতির মধ্যে সমর-প্রবৃত্তির ও সমরায়োজনের বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা কার্য্যতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন এবং কোন **অন্তর্জ্জাতিক মহাসমর অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।** আমাদের এই কথা যে যুক্তিযুক্ত ও সত্য, তাহা অদূর-ভবিষ্যতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইবে। যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করেন, তাঁহারা রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্রে যতই খ্যাতিসম্পন্ন হউন না কেন, প্রকৃত পক্ষে বালকের ন্যায় অজ্ঞান।

বর্ত্তমান অবস্থায় আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে বটে, কিন্তু বিপরীত খাদ্য,চাল-চলন ও শিক্ষা-বশতঃ ইয়োরোপীয়গণের দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে সমর-প্রবৃত্তি সমানভাবেই বিদ্যমান থাকিবে। ইহার ফলে ইয়োরোপের সর্ব্বত্র অন্তর্ব্বিদ্রোহ ও খাদ্যাভাবের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং মনুষ্যচর্ম্মাবৃত হইয়াও তাঁহাদের পশুর ন্যায় হিংস্র, খল ও কপট হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

ইয়োরোপে কোন আন্তর্জ্জাতিক মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হইলে ভারতবাসিগণের স্বাধীনতা লাভ করিবার সম্ভাবনা অধিকতর দ্রুত হইবে কি না, তাহার উত্তর দিতে হইলে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তির দ্বারা কখনও কোন কাম্যবস্তু সন্তুষ্টির অনুরূপ পরিমাণে লাভ করা সম্ভব হয় না।

ইয়োরোপীয়গণ যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন ও তাঁহাদিগের পশুপ্রবৃত্তি যেরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রভুত্ব সর্ব্বত্রই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই সময়ে ভারতীয়গণ সুপথে পরিচালিত হইলে,তাঁহাদিগের পক্ষে শুধু স্বাধীনতা কেন, সারাজগতের উপর নৈতিক প্রভুত্ব অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরগণ ভারতীয়গণকে যে রাস্তায় পরিচালিত করিতেছেন এবং ভারতীয় যুবকবৃন্দ যেরূপ ভাবে না বুঝিয়া তাণ্ডব-নৃত্যে মত্ত হইয়াছেন, তাহাতে ভারতীয়গণও উত্তরোত্তর অধিকতর দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রবৃত্তিযুক্ত হইয়া ইউরোপীয়গণের মত হিংস্র, কপট ও খল হইয়া পড়িতেছেন। গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের এই পরিচালনা অপ্রতিহত থাকিলে ভারতীয়গণের স্বাধীনতা লাভ করা তো দূরের কথা, ভারতবর্ষেও ইয়োরোপের মত অন্তর্ব্বিদ্রোহ ও অন্নাভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং সোনার ভারত কিছু দিনের জন্য ঘূর্ণাই তাণ্ডব-নৃত্যের আবাসস্থল হইয়া পড়িবে।

উপসংহারে, আমরা আমাদিগের যুবকবৃন্দকে যে শিক্ষা ও চালচলনে দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে সংযত করা যায়, সেই শিক্ষা ও চালচলনের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি এবং ঐকান্তিক মনে যাহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরাজ, ফরাসী ও ভারতবাসী-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষের ঐক্য সাধিত হইতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইবার বাঞ্ছা জানাইতেছি। গান্ধীজী, জওহরলালজী, সুভাষচন্দ্র ও তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণের বর্ত্তমান কর্ম্মপন্থা ভারতবর্ষের অত্যধিক অনিষ্টপ্রদ। তাঁহারা মুখে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে কোন কোন কথা কহিয়া থাকেন বটে এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পরিকল্পনাও তাঁহারা আলোচনা করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাদিগকে পাশ্চাত্ত্যগণের অপেক্ষাও অধিকতর পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন বলিয়া বলিতে বাধ্য হইতে হয়।

হিন্দু-মুসলমানের অমিলনের জন্ত আমরা সাধারণতঃ ইংরাজগণকে দায়ী করিয়া থাকি বটে, কিন্তু দূরদর্শিতার সহিত চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও তাঁহাদিগের সহকর্ম্মিগণের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যটি সর্ব্ববিধ অমিলনের বৃদ্ধি সাধন করিতেছে এবং কোনরূপ মিলনের আশা সুদূরপরাহত করিয়া তুলিতেছে।

জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের যে সমুজ্জল ভবিষ্যৎ উদ্ভাসিত হইয়াছে, তাহা কার্য্যতঃ লাভ করিতে হইলে গান্ধীজী যাহাতে তাঁহার কপটতাপূর্ণ কার্য্যসূত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া প্রকৃত ভারতীয় সাধনা-নিরত হন এবং সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ যাহাতে নেতৃত্বের আসন হইতে অপসারিত হইয়া সামান্য সৈনিকের মত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন, ভারতীয় যুবকবৃন্দকে তজ্জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে। সুভাষচন্দ্র যেরূপ দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তি সম্পন্ন, তাহা কু-শিক্ষিত যুবকোচিত বটে, কিন্তু উহা ভারতীয় নেতৃত্বের উপযুক্ত নহে, পরন্তু ভারতবাসীর কলঙ্কস্বরূপ। গান্ধীজীর আশ্রয়ে তাঁহার বিপথগামিতা যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ভারতীয় যুবকগণকে সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তৎসদৃশ কেহ যাহাতে অবাধে নেতৃত্ব করিতে না পারেন, তাহার জন্ত কার্য্য-তৎপর হইতে হইবে। দ্বন্দ্ব ও কলহ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া নেতৃত্ব করিতে গেলে ঐ নেতৃত্ব অচিরে খসিয়া পড়ে, ইহার দৃষ্টান্ত প্রস্তুত হইলে কু-প্রবৃত্তিসম্পন্ন আর কেহ কখনও নেতৃত্বের চেষ্টা করিতে সাহসী হইবেন না এবং তখন রাগ ও দ্বেষ-বিযুক্ত নেতার উদ্ভব হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইবে। ভবিষ্যৎ দৃষ্টিসম্পন্ন সু-প্রবৃত্তিযুক্ত নেতার দ্বারা পরিচালিত হইলে ভারতবর্ষের সমুজ্জল ভবিষ্যৎ কাহারও পক্ষে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা সম্ভব হইবে না এবং তখন আর যুবকবৃন্দকে অথবা শ্রমিকবৃন্দকে অন্নাভাবে, অথবা স্বাস্থ্যাভাবে, অথবা বেকার অবস্থায় হাহাকার করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটা ভাবিবার কথা

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র

ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী যে রাস্তায় চলিয়াছে, তাহাতে তাহাদিগের উন্নতি হইতেছে অথবা অবনতি হইতেছে, তৎসম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, অতীত কালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার চিত্র সর্ব্ব-প্রথমে উদ্ঘাটন করিতে হইবে। কত সহস্র বৎসর লইয়া যে ভারতবর্ষের অতীত, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না বটে, কিন্তু যে সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থ এখানে প্রণীত হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে ইহার অতীত যে বহু সহস্র বৎসর ব্যাপী, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ বিদ্যমান থাকে না।

ভারতবর্ষের যে প্রাচীন গ্রন্থসমূহ এখনও বিদ্যমান আছে তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার কতকগুলি ঋষি ও মুনি প্রণীত, কতকগুলি "দেব" প্রণীত, কতকগুলি "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত, কতকগুলি "ভট্ট" প্রণীত, কতকগুলি "আর্য্য" প্রণীত, কতকগুলি "দীক্ষিত" প্রণীত, কতকগুলি "সুরী" প্রণীত, কতক-গুলি "স্বামী" প্রণীত, কতকগুলি "ভট্টাচার্য্য" প্রণীত, আর কতকগুলি অবধূত, তর্করত্ন, সাংখ্যরত্ন, তর্কাচার্য্য, সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত। এই গ্রন্থগুলির ভাষা, রচনা-পদ্ধতি ও বক্তব্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি ঋষি ও মুনি প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ প্রথম শ্রেণীর; যেগুলি "দেব," "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর; যেগুলি "ভট্ট," "আচার্য্য," "দীক্ষিত" ও "সুরী" প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর; আর যেগুলি "স্বামী"

"ভট্টাচার্য্য," "অবধূত", তর্করত্ন, সাংখ্যরত্ন, তর্কাচার্য্য, সাংখ্য-তীর্থ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিবিশিষ্ট মানুষের প্রণীত, তাহা সাধারণতঃ চতুর্থ শ্রেণীর। এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চিন্তা করিয়া অধ্যয়ন করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, বেদ, মীমাংসা, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, চিকিৎসা, অলঙ্কার, ছন্দঃ, গণিত, অর্থনীতি, রাজনীতি, বাণিজ্য-নীতি, কৃষি-নীতি, শিল্প, গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালী, যান-বাহন নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্পাধিক আলোচনা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যেই উপরোক্ত ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়ের আলোচনা অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ আলোচনার ভাষা, রচনা-পদ্ধতি ও ভঙ্গী চারি শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে প্রায়শঃ সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ পৃথক্।

ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকখানির ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, সেইরূপ বক্তব্য বিষয়ও সম্পূর্ণ মৌলিক। উহার কোনখানিতেই কোনরূপ মন্তব্য প্রচারের প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকখানিতেই কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধীয় সত্যোদ্‌ঘাটনের প্রযত্ন এবং কি করিলে ঐ সত্যসমূহ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে, তাহার নির্দ্দেশ দেখা যাইবে। এই গ্রন্থগুলির রচনা-পদ্ধতি ও বক্তব্য বিষয় এত সুস্পষ্ট যে, ঋষি ও মুনিদিগের ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে ইঁহাদের প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ জীবনের ৮।১০ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ ভাবে পড়িয়া উঠা সম্ভব হয় এবং তৎসাহায্যে কি করিয়া মানুষ অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অসন্তুষ্টি, অশান্তি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে পারে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ ভাবে লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়। ঋষি ও মুনিগণ প্রণীত গ্রন্থসমূহের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহাদের কোন গ্রন্থই কেবল মাত্র কোন ব্যক্তি, জীব অথবা দেশবিশেষের উন্নতি কি করিয়া হইতে পারে, তাহার আলোচনায় সীমাবদ্ধ নহে। পরন্তু, প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক মানুষের ও প্রত্যেক জীবের অর্থাভাব, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু কি করিলে বিদূরিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক কোন না কোন আলোচনা তাঁহাদিগের প্রত্যেক গ্রন্থখানিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থসমূহ তলাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যায় যে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মত-পার্থক্য বিদ্যমান নাই, পরন্তু উহারা সর্ব্বতোভাবে এক-মতাবলম্বী।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন খানিরই আলোচ্য বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে মৌলিক নহে এবং উহার কোনখানিই কোন না কোন মন্তব্য প্রচারের প্রচেষ্টার দোষ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত নহে। ইঁহাদের প্রণীত প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানিই ঋষি ও মুনিদিগের প্রণীত গ্রন্থ-সমূহের বিষয়কে ভিত্তি করিয়া লিখিত। ঋষি ও মুনিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থসমূহে সত্যোদ্‌ঘাটন ও সত্য প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য যে সমস্ত ক্রিয়া-বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্রিয়া-বিধির কোন বিবৃতি "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" প্রণীত কোন গ্রন্থে প্রায়শঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়, তাহা প্রায়শঃ ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য ঋষিদিগের সিদ্ধান্তের বিরোধী না হইলেও উহা এত অসম্পূর্ণ ও শৃঙ্খলাবর্জ্জিত যে, উহার কোনখানি হইতেই মনুষ্যের বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় কোন কার্য্যপদ্ধতিই প্রয়োগানুযায়ী ভাবে পাওয়া যায় না এবং তাহার ফলে কি করিয়া মানুষ অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবনের অভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা ঐ সমস্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করিয়াও শিক্ষা করা সম্ভব হয় না।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলির লিখিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতি ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও রচনাপদ্ধতির ন্যায় প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলামূলক না হইলেও অপর দুই শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রাঞ্জল ও শৃঙ্খলামূলক। এই গ্রন্থগুলির অপর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায়শঃ কোন মত-পার্থক্য দেখা যায় না।

তৃতীয় শ্রেণীর যে গ্রন্থগুলি ভট্ট, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিত উপাধিধারী পণ্ডিতগণের দ্বারা লিখিত, তাহাদেরও আলোচ্য বিষয়ে কোন মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয় না। এই গ্রন্থগুলিও ঋষি ও মুনিগণের আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়শঃ মূলতঃ উঁহাদের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যা স্বরূপ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও ভট্ট, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিতগণ ঋষিগণের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি ইঁহারা কেহই প্রায়শঃ মূলগ্রন্থগুলির কথা পরিষ্কার ও অভ্রান্তভাবে বিবৃত করিতে সক্ষম হন নাই। অধিকন্তু, ইঁহারা ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকল্পে যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ঋষিগণের মতবাদের বিরোধী। ইঁহাদিগের বিবৃত মতবাদসমূহের পরস্পরের মধ্যে প্রায়শঃ কোন সামঞ্জস্য অথবা ঐক্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থগুলির ভাষা ও রচনাপদ্ধতির দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহা একদিকে যেরূপ অপ্রাঞ্জল ও দুরূহ, অন্যদিকে আবার ইহার মধ্যে অধিকাংশ গ্রন্থেই কোন শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয় না। ইঁহাদের মতবাদ ও কার্য্যপদ্ধতিসমূহের মধ্যে প্রায়শঃ কোন যুক্তি-যুক্ততা অথবা প্রয়োগ-যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয় না।

বাস্তব জীবনের সাধারণ সমস্যাসমূহ কি করিয়া দূর করিতে হয়, তাহার কোন কথা এই গ্রন্থগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু তথাপি ইহাদের কথার মধ্যে যে বিচারপটুতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে, প্রণেতাগণকে তর্ক-পটু পণ্ডিত বলিতে বাধ্য হইতে হয়।

যে গ্রন্থগুলি স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধূত, তর্করত্ন, সাংখ্য-রত্ন, তর্কাচার্য্য, সাংখ্যতীর্থ প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারী মানুষের দ্বারা লিখিত, সেই গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের মধ্যে প্রায়শঃ গ্রন্থকারগণের পাণ্ডিত্য প্রকাশের প্রচেষ্টার চিহ্ন বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থকারগণ যে বস্তুতঃ অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট দাম্ভিক মানুষ, তাহার নিদর্শনও ঐ গ্রন্থগুলির প্রায় ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থগুলির বক্তব্য বিষয়ও ঋষি-মুনিগণের বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ। অথচ, যে যুক্তি-জাল ও প্রয়োগ-যোগ্য কর্ম্ম-পদ্ধতির নির্দ্দেশ ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থসমূহের বৈশিষ্ট্য, সেই যুক্তি-জাল ও প্রয়োগযোগ্য কর্ম্ম-পদ্ধতির নিদর্শন এই গ্রন্থগুলির কুত্রাপিঃ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পরন্তু, ইহার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানি পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) কথায় পরিপূর্ণ। এই শ্রেণীর প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থখানিতে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা উপস্থাপিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় প্রত্যেক আলোচনাটিতেই অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সংক্ষেপতঃ, এই পুস্তকগুলিতে কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্য-বিন্যাসের চাতুর্য্য বিদ্যমান আছে, অথচ ইহার কোনখানি হইতে কোন বিষয় সম্বন্ধে কোনরূপ সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহাদের ভাষা এবং রচনা-পদ্ধতি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলামূলক। পরস্পরকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া স্বকীয় পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি ইহাদের প্রণেতাগণের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

উপরোক্ত চারি শ্রেণীর গ্রন্থের তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বলিতে হয় যে, মানুষ কি করিয়া প্রকৃত 'মনুষ্য'-নামের যোগ্য হইয়া ব্যক্তিগতভাবে সর্ব্ববিধ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে সুখের আস্পদ হইতে পারে এবং কোন্ বিধিতে সমাজ সংগঠিত হইলে, প্রত্যেক মানুষটী অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া একমাত্র স্বকীয় ব্যক্তিগত কর্ম্মকেই স্ব স্ব সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী করিতে বাধ্য হইতে পারে, তাহার আলোচনা ঋষি ও মুনিগণের প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থখানিকে সমালঙ্কৃত করিয়াছে।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে গ্রন্থসমূহ লিখিয়াছেন এবং যাহাকে আমরা এই সন্দর্ভে দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানিতেও ঋষি এবং মুনিগণের আলোচ্য বিষয়-সমূহই সমাবিষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু রচনা-পদ্ধতির দুষ্টতা ও সাধনার অভাব বশতঃ এই শ্রেণীর কোন গ্রন্থ হইতেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কোন সুস্পষ্ট বিধি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

ভট্ট, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিতগণের প্রণীত যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহাকে আমরা

তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকখানির আলোচ্য বিষয়েও ঋষি এবং মুনিগণের আলোচ্য বিষয়ের সহিত অনুরূপতা রহিয়াছে। ইহাদের রচনা-পদ্ধতি দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির রচনা-পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর দুষ্ট এবং ইহাদের মধ্যে প্রণেতাগণের সাধনার অভাবও অধিকতর মাত্রায় পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির কোন কোন খানির মধ্যে মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার কথঞ্চিৎ অস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থগুলির কোনখানি হইতেই ঐ অস্পষ্ট নির্দ্দেশও পাওয়া যায় না। পরন্তু, এই গ্রন্থগুলির মধ্যে কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী কথার ঝঙ্কার বিদ্যমান থাকায় মানুষ উহা পাঠ করিয়া অভিমানগ্রস্ত হইতে বাধ্য হইয়া পড়ে।

স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধূত, তর্করত্ন প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারিগণের লিখিত গ্রন্থগুলির আলোচ্য বিষয়ও ঋষি এবং মুনিগণের গ্রন্থসমূহের আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ। এই গ্রন্থগুলির সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে ঋষিগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হওয়ায় মানুষের ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত সাধনার নির্দ্দেশ পাওয়া তো দূরের কথা, এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ আগে এবং কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ পরে লিখিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ইহাদের মধ্যে ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইয়াছিল।

"দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারিগণের গ্রন্থ ঋষি ও মুনিগণের গ্রন্থের পরবর্ত্তী।

ভট্ট, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিতগণের গ্রন্থ, "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারিগণেরও পরবর্ত্তী।

স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধূত, তর্করত্ন প্রভৃতি আধুনিক উপাধিধারিগণ যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এই চারিশ্রেণীর গ্রন্থ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলে ইহা বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে, ভারতবর্ষে এমন একদিন ছিল, যখন ভারতবাসিগণের মধ্যে উচ্চতম চিন্তা ও উচ্চ সাধনা বিদ্যমান ছিল। এই চিন্তা ও সাধনার ফলে একদিন ভারতবাসী সমগ্র মানবসমাজকে সর্ব্ববিধ ব্যক্তিগত ও সঙ্ঘগত দুঃখ হইতে মুক্তির পন্থা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই সময়ে মানুষের মধ্যে শ্রমজীবী (শূদ্র) ও বুদ্ধিজীবী (আর্য্য) বলিয়া এবং বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে শ্রেণী-বিভাগ ছিল বটে, কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মগত কোন শ্রেণী-বিভাগ বিদ্যমান ছিল না। তখন সমগ্র মানবসমাজে "মানবধর্ম্ম" নামক একটিমাত্র ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। এই সময়ে মানুষের মধ্যে উপরোক্ত ভাবের শ্রেণী-বিভাগ বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু কোন শ্রেণীর মানুষই স্বশ্রেণীকে অপর শ্রেণীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন না। শ্রমজীবিগণ নিজদিগের শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বুদ্ধিজীবিগণের নায়কত্ব স্বীকার করিতেন বটে এবং বুদ্ধিজীবিগণও ঐ উদ্দেশ্যে শ্রমজীবিগণকে উপদেশের দ্বারা পরিচালনা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা কখনও তজ্জন্য নিজদিগকে শ্রমজীবিগণের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন না, অথবা তাঁহাদিগের প্রতি কোন ঘৃণা পোষণ করিতেন না। শৃঙ্খলিত জীবন-যাত্রা ও শিক্ষা-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিবার জন্য বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী, অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নামক শ্রেণী-বিভাগ মানবসমাজের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ দলাদলি অথবা কলহের প্রবৃত্তি প্রায়শঃ দেখা যাইত না। যাঁহাদিগকে সমাজের নায়ক বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত, তাঁহারা প্রায়শঃ নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ-সাধনার কার্য্যে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে রাগ ও দ্বেষ বিযুক্ত হইয়া, সর্ব্ববিধ জিদ্ ও উত্তেজনার কার্য্য হইতে নিজদিগকে দূরে রক্ষা করিতেন।

মানবসমাজের প্রত্যেক মানুষটীর পক্ষে কি করিয়া অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত হইয়া অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টির প্রাচুর্য্য এবং দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন উপভোগ

করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিবার উপযোগী সাধনায় এক শ্রেণীর লোক সর্ব্বদা নিমগ্ন থাকিতেন। এই শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীস্থ মানুষগুলি সমাজের নায়ক বলিয়া মানিয়া লইতেন। শিক্ষা ও সাধনায় ইঁহারা অপর তিন শ্রেণীর মানুষের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং অপর তিন শ্রেণীর মানুষ ইঁহাদিগকে প্রভুর ন্যায় মান্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজদিগকে কখনও অপর তিন শ্রেণীর প্রভু বলিয়া অভিমান পোষণ করিতেন না।

ইঁহাদের শিক্ষা ও সাধনার ফলে মানবসমাজের হিতার্থে যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইত, সেই সূত্র ও সঙ্কেতগুলি যাহাতে অপর তিন শ্রেণীর লোক শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করিতে পারে এবং করে, তাহার দায়িত্ব ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলির উপর। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলিকে অপর দুই শ্রেণীর মানুষ প্রভুর মত মান্য করিতেন বটে, কিন্তু ইঁহারা নিজদিগকে কখনও অপর দুই শ্রেণীর মানুষকে কোনরূপে হীনতর বলিয়া মনোভাব পোষণ করিতেন না।

মানবসমাজের হিতার্থে, প্রথম শ্রেণীর মানুষগুলির দ্বারা যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইত তাহা যাহাতে শ্রমজীবিগণ শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, তাহার দায়িত্বভার তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকিত। শ্রমজীবিগণ ইঁহাদেগের কথা গুরুর নির্দ্দেশের মত পালন করিয়া চলিতেন বটে, কিন্তু ইঁহারা কখনও শ্রমজীবিগণকে কোনরূপ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন না।

মানবসমাজের অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন ও দীর্ঘজীবন রক্ষা করিবার জন্য যে সমস্ত সূত্র ও সঙ্কেত প্রথম শ্রেণীর মানবের দ্বারা আবিষ্কৃত হইত এবং তাহার মধ্যে যে কার্য্যগুলি শারীরিক শ্রমসাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই কার্য্যগুলি সম্পাদনের ভার শ্রমজীবিগণের স্কন্ধে অর্পিত হইত। তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা ও নির্দ্দেশানুযায়ী উহা পালন করিতেন। এই শ্রমজীবিগণ কখনও নিজদিগকে প্রথম অথবা দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীর সমকক্ষ বলিয়া মনে করিতেন না বটে, এবং সর্ব্বদাই অবনত মস্তকে তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ মান্য করিয়া চলিতেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কখনও নিজদিগকে অপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন না এবং অপদার্থের মত নফরগিরিতে মত্ত হইয়া জীবন যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতেন না।

ঋষি ও মুনিদিগের অভ্যুদয়-কালে মানবসমাজের হিত-সাধনার্থে এতাদৃশ সূত্র ও সঙ্কেত আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই চারিশ্রেণীর মানুষের কোন শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বতোভাবের সখ্যভাব পরিলক্ষিত হইতে পারিত।

প্রত্যেক নদীটি যাহাতে বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকে, তজ্জন্য উহার গতি সর্ব্বতোভাবে অপ্রতিহত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইত। ইহার জন্য প্রায়শঃ স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইত, কারণ স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা গৃহীত হইলে নদীর গতি প্রতিহত করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। স্থল-পথের রাস্তার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইলে আপাতদৃষ্টিতে গমনাগমনের অসুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তখন যাতায়াতের কোনরূপ অসুবিধা ঘটিতে পারিত না, কারণ, সুগভীর নদী ও খালের সাহায্যে সর্ব্ব-জগদ্ব্যাপী জল-পথে রাস্তার ব্যবস্থা সাধন করা হইত এবং দ্রুতগামী জল-যান কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কৌশল তখনকার মানবসমাজ শিক্ষা করিতে পারিত। দেশের প্রত্যেক নদীটিতে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার দিকে তখন লক্ষ্য করা হইত বলিয়া দেশের প্রত্যেক খালটিও বারমাস জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং তাহার ফলে একদিকে যেরূপ দেশের জমীর সর্ব্বত্র সরসতা রক্ষা করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার দেশের হাওয়াও অশুদ্ধি হইতে মুক্ত হইয়া অধিকতর স্নিগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারিত। তখন, দেশের জমীর সরসতা, হাওয়ার শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব হইত বলিয়া শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাঁচমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া সমগ্র সমাজের সারাবৎসরের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিতে পারিত এবং দেশের জলবায়ু প্রায়শঃ অস্বাস্থ্যকর হইতে পারিত না। এইরূপে সমগ্র সমাজের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদনের

কার্য্য সম্পাদিত হইত। কাঁচামাল হইতে কুটীর-শিল্পের সাহায্যে যাহাতে অনায়াসে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসমূহের (finished products) উৎপাদনের প্রাচুর্য্য রক্ষিত হয়, তাহার দিকেও যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করা হইত। যাহারা বৎসরের মধ্যে পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া সারাবৎসরের উপযোগী কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারিত, তাহারাই বাকী সাতমাস কুটীর-শিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। কুটীর-শিল্প-কার্য্য যন্ত্র-শিল্প-কার্য্যের তুলনায় এক দিকে যেরূপ স্বাস্থ্যকর, সেইরূপ আবার কুটীর-শিল্প-জাত দ্রব্যও যন্ত্র-শিল্প-জাত দ্রব্যের তুলনায় মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অধিকতর হিতকারী। তখনকার দিনে শ্রমজীবিগণ পাঁচমাস পরিশ্রম করিয়া সারাবৎসরের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারিত বলিয়াই তাহারা যে-সমস্ত কুটীর-শিল্প-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত, সেই সমস্ত কুটীর-শিল্প-কার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া জয়ী হওয়া কোন যন্ত্র-শিল্পের পক্ষে সম্ভবযোগ্য হইত না। ইহার ফলে আপনা হইতেই অস্বাস্থ্যকর যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা মানবসমাজের মধ্যে তখনকার দিনে স্থান পায় নাই।

দেশের প্রত্যেক নদী ও খাল যাহাতে সারাবৎসর জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখার ফলে ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে অনায়াসে যেরূপ প্রচুর পরিমাণের কাঁচামাল ও ব্যবহারোপযোগী শিল্প-জাত দ্রব্যের উৎপাদন করা সম্ভব হইত, সেইরূপ আবার উহা যাহাতে প্রত্যেক মানুষটী প্রয়োজনীয় পরিমাণে পাইতে পারে এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রমশীলতা ও সততার তারতম্যানুসারে উহার পাওয়ার তারতম্য যাহাতে ঘটে, তজ্জন্য তখনকার দিনে দ্রব্য-মূল্যের মধ্যে যাহাতে সমতা (parity) রক্ষিত হয়, তদ্বিষয়েও লক্ষ্য রাখা হইত। সমাজের মধ্যে কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইলে এক শ্রেণীর মানুষের পক্ষে কোন পরিশ্রম না করিয়া, প্রকৃত বিদ্যা ও বুদ্ধি অর্জ্জন না করিয়া, সততা রক্ষা না করিয়া ঐ কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় এবং তখন অল্পবুদ্ধি শ্রমজীবিগণকে উহার সাহায্যে উচ্চতর মূল্যের অজুহাতে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্যে তাহাদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় ভাগ হইতে বঞ্চিত করিয়া পরোক্ষ ভাবে উহা কাড়িয়া লওয়া সম্ভব হয়।

এইরূপে সমাজের মধ্যে অসমান বিতরণ, অসততা ও শ্রমহীনতার সাফল্য ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত কৃত্রিম মুদ্রার পরিকল্পনাও বহুল ব্যবহার হইতে মানুষ যাহাতে দূরে থাকে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হইত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, কাগজ ও ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার ব্যবহার না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ের প্রসার সাধন করা সম্ভব হয় না—কিন্তু তখনকার দিনে উহা পরিত্যাগ করিয়া কড়ি প্রভৃতি স্বাভাবিক দ্রব্যের সাহায্যে দ্রব্য-বিনিময়ের যে ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল, সেই ব্যবস্থার ফলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা বিষয়েও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

নদীর ও খালের গভীরতা, কুটীর-শিল্পের প্রসার এবং দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার, প্রধানতঃ এই তিনটি সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হয় এবং আর্থিক প্রাচুর্য্য উপভোগ করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

মানুষের অস্বাস্থ্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার জন্য তখনকার দিনে তিনটি পন্থা পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রথমতঃ, নদী ও খালে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সর্ব্বত্র বায়ু ও জল যাহাতে শুদ্ধ ও স্নিগ্ধ থাকে এবং রোগের বীজাণুমুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, শব্দকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয়, তাহার পন্থা আবিষ্কার করিয়া সাধকগণ যাহাতে নিজ শরীর মধ্যে শরীর-গঠন-প্রণালী (anatomy), শরীর-বিধান-প্রণালী (physiology) ও বিবিধ দ্রব-সংযোগের ফলাফল (materia medica) প্রত্যক্ষ ভাবে অবগত হইতে পারেন, তাহার পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছিল এবং ইহার ফলে ক্রমশঃ অভ্রান্ত চিকিৎসা বিদ্যা ও চিকিৎসা শাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের, এমন কি প্রত্যেক শ্রমজীবীটি পর্য্যন্ত যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রণালী ও বিবিধ খাদ্যাখাদ্যের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে, এবংবিধ শিক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইয়াছিল।

এইরূপে বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা, চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের আবিষ্কার এবং স্বাস্থ্য-বিষয়ক শিক্ষার বিস্তার—প্রধানতঃ এই তিনটী সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনে মানবসমাজের প্রত্যেকে যাহাতে স্বাস্থ্যাভাব হইতে মুক্ত হয় এবং স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য উপভোগ করে, তাহার ব্যবস্থা সম্ভাবিত হইয়াছিল।

মানুষের যাবতীয় অশান্তি ও অসন্তুষ্টি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। একশ্রেণীর নাম দৈহিক এবং অপর শ্রেণীর নাম মানসিক। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ কারণে মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হয়, তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার কারণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর। প্রথমতঃ, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সর্ব্ববিধ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নায়কগণের সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠনে ব্যক্তি ও শ্রেণীবিশেষের উপর পক্ষপাতিত্বের অথবা অবিচারের জন্য সময় সময় অশান্তি ও অসন্তুষ্টি ভোগ করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, স্বকীয় অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য মানুষের প্রায়শঃ অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উদ্ভব হইয়া থাকে। ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে এই অশান্তি ও অসন্তুষ্টির উপরোক্ত তিন শ্রেণীর কারণ দূর করিবার জন্য সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর পন্থা অবলম্বিত হইত। প্রথমতঃ, যাহাতে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব সমাজ হইতে সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয় এবং উহার প্রাচুর্য্য প্রত্যেকে উপভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিয়া মানুষের দৈহিক অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রধান কারণগুলি অপসারণ করা হইত। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে কেবলমাত্র সাধক, চরিত্রবান্, অভিমানশূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব পাইতে পারেন এবং যাঁহারা অসাধু, চরিত্রহীন, অভিমানী এবং স্বার্থপর, তাঁহারা যাহাতে উহা না পাইতে পারেন এবং দণ্ডভোগ করেন, যাহাতে প্রত্যেক মানুষ প্রয়োজনোপযোগী প্রাচুর্য্যলাভ করিতে পারে এবং বিদ্যাবুদ্ধি, সততা ও শ্রমশীলতার তারতম্যানুসারে ঐ প্রাচুর্য্যের তারতম্য সংঘটিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিয়া দৈহিক অশান্তির ও অসন্তুষ্টির দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণগুলি অপসারণ করিবার ব্যবস্থা সাধিত হইত।

মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির তৃতীয় কারণ যে অব্যবস্থিতচিত্ততা, তাহার উদ্ভব হয় কেন, তদ্বিষয়ক সন্ধানে প্রয়াসী হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ চারিটী। যথা—রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব এবং কলহ-প্রবৃত্তি। এই চারিটী কারণ দূর করিবার একমাত্র উপায় মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও সাধনা। ঋষিগণ মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য আবিষ্কার করিয়া তদ্বিষয়ক শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়া মানুষের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির তৃতীয় শ্রেণীর কারণগুলি দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এইরূপে, অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবের অপসারণ, সুবিচার, দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা-সাধন এবং মনস্তত্ত্বের শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন—প্রধানতঃ এই তিনটী সঙ্কেতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তখনকার দিনের মানবসমাজ হইতে যাহাতে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি দূরীভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর কারণ সাধারণতঃ চারিটী। অর্থাভাব উহার প্রধান কারণ, স্বাস্থ্যাভাব উহার দ্বিতীয় কারণ, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি উহার তৃতীয় ও চতুর্থ কারণ। এই চারিটী কারণ যাহাতে প্রবিষ্ট না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে প্রায়শঃ আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। তখনকার দিনে, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যাহাতে মানবসমাজে প্রবেশলাভ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্কতার আশ্রয় লওয়া হইয়াছিল বলিয়াই মানুষ প্রায়শঃ অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিত।

অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যাহাতে প্রবেশলাভ না করিতে পারে, তদ্বিষয়ে গোড়া হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই অকালবার্দ্ধক্যের হাত এড়ান যায় বটে, কিন্তু যিনি একবার অকাল-বার্দ্ধক্যের দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কেবলমাত্র ঐ চারিটী কারণ দূর করিতে পারিলেই উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয় না। অর্থাভাব প্রভৃতি যাহাতে না থাকে তাহা তো করিতেই হইবে, অধিকন্তু মনস্তত্ত্ব পারজ্ঞাত হইয়া শরীরের মধ্যে বার্দ্ধক্য কেন প্রবেশ করিতে

পারে, তদ্বিষয়ক সত্যগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া সাধনা-নিরত হইতে হইবে।

এইরূপে, ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে মানব-সমাজের প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইয়াছিল।

ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থসমূহে উপরোক্ত বিষয়ক তথ্যগুলি এবং তাহা অভ্যাস করিবার নির্দ্দেশগুলি যে সুস্পষ্ট, পরবর্ত্তী কোন শ্রেণীর গ্রন্থেই যে উহা আর তাদৃশভাবে বর্ণিত হয় নাই, ইহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ "দেব", "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অধ্যবসায় সহকারে অধ্যয়ন করিতে পারিলে ইহা মনে হইবে যে, ঋষি ও মুনিগণের অভ্যুদয়-কালে মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং যাহা মানবসমাজ আনন্দের সহিত পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তখনও বিদ্যমান ছিল এবং তখনকার মানুষ উহা আনন্দের সহিত পালন করিতেন। এই সময়েও মানবসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে অর্থাভাব অথবা স্বাস্থ্যাভাব অথবা অশান্তি অথবা অসন্তুষ্টি অথবা অকালবার্দ্ধক্য অথবা অকালমৃত্যু প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ইহা ছাড়া আরও প্রতীয়মান হইবে যে, অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে মানবসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়েও প্রতিপালিত হইত বটে, কিন্তু যে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা তাঁহারা ঐ সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই শিক্ষা ও সাধনা মানুষ তখনই আংশিক পরিমাণে বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার ফলে অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে যে-সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন্‌টার যে কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধীয় সম্যক্ জ্ঞান মানুষ তখনই হারাইয়া ফেলিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ ভট্ট, আচার্য্য, সুরী ও দীক্ষিত উপাধিধারী মানুষগুলি যে সমস্ত গ্রন্থ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ কতকগুলি ব্যবস্থা তখনও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং তাহার ফলে মনুষ্য-সমাজের অনেকেই তখনও অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব হইতে মুক্ত ছিল। অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার ঐ ব্যবস্থাগুলি তখনও আংশিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু উহার শিক্ষা ও সাধনা প্রায়শঃ তখনই বিলুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে তখনই মানুষের মধ্যে কথঞ্চিৎ পরিমাণে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অশান্তি ও অসন্তুষ্টি, অথবা অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করিবার জন্য ঋষিগণের কালে যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সমাজ-মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা এই ভট্ট ও আচার্য্য প্রভৃতিগণের সময়ে সম্পূর্ণভাবে বিকৃততা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং উহার ফলে অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু এই সময় হইতেই মানব-সমাজকে আচ্ছন্ন করিয়া আসিতেছে।

চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ আধুনিক কালের গ্রন্থসমূহ হইতে ইহা দেখা যাইবে যে, মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব দূর করিবার জন্য ঋষি ও মুনিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যস্থ অর্থাভাব দূর করিবার ব্যবস্থাগুলি এই চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থকাল পর্য্যন্ত আংশিকভাবে বিদ্যমান ছিল এবং এই সময় পর্য্যন্তও মনুষ্য-সমাজ অর্থাভাবে এতাদৃশ পরিমাণে বিধ্বস্ত হয় নাই। অবশ্য এ কথাও বলিতে হইবে যে, তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ শ্রেণীর গ্রন্থকারসমূহ, অর্থাৎ ভট, আচার্য্য সুরী, দীক্ষিত, স্বামী, ভট্টাচার্য্য, অবধূত, তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষগুলি ঋষিগণের কোন কথাই যথাযথ ভাবে বুঝিতে সক্ষম হন নাই বলিয়া সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য ঋষিগণ যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা বিনষ্ট করিবার সহায়তা করিয়াছেন।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের কোন্ শ্রেণীটী কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, প্রথম শ্রেণীর, অর্থাৎ ঋষি ও মুনিগণ প্রণীত গ্রন্থগুলি যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে বলা অত্যন্ত দুরূহ। বেদাঙ্গ ও বেদের মধ্যে জ্যোতিষশাস্ত্র ও কালচক্র সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ "দেব" "রাজ" ও "সিংহ" উপাধিধারী মানুষগুলির লিখিত গ্রন্থগুলি যে অন্ততঃপক্ষে ছয় হাজার বৎসর আগে, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর, অর্থাৎ ভট্ট, আচার্য্য, সুরী, দীক্ষিত, স্বামী, অবধৃত, মিশ্র, তর্করত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী মানুষগুলির গ্রন্থ যে গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে, ইহা সহজেই স্পষ্টভাবে অনুমান করা যায়।

এই চারি শ্রেণীর গ্রন্থের উপরোক্ত প্রণয়ন-কাল হইতে ইহা বলিতে হয় যে, ভারতবর্ষের মানুষ একদিন অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুর হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে যে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সেই দিন যে কত সহস্র বৎসর আগে হইতে বিদ্যমান ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা কথঞ্চিৎ পরিমাণে ছয় হাজার বৎসর আগেও এই দেশের সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উহা বিকৃততা প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। গত তিন হাজার বৎসর হইতে ঐ বিকৃততা প্রায়শঃ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ইহার ফলে মানুষের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দূর করিবার জন্য ভারতবর্ষে একদিন যে সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রায়শঃ গত তিন হাজার বৎসরের মধ্যে উত্তরোত্তর বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তৎসঙ্গে অর্থাভাবাদি ভারতবাসিগণকে উত্তরোত্তর অধিকতর পরিমাণে বিধ্বস্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই তিন হাজার বৎসরের শেষ ভাগে ভারতবাসিগণের অর্থাভাবাদি যাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা লাভ করিয়াছে, উহার প্রথমভাগে উহা তাদৃশ পরিমাণে তীব্রতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ভারতবর্ষের যে গ্রন্থগুলির সাহায্যে ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গে জগতের অন্যান্য দেশের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিতে পারিলে জগতের ও জগদ্বাসীর অতীত চিত্রও সম্যক্‌ভাবে উদ্‌ঘাটিত করা সম্ভব হয়। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকে যেরূপ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকেও চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি যেরূপ সংস্কৃত ভাষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন হিব্রু ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে সেইরূপ বাইবেল এবং প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কোরাণ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

ঋষি ও মুনিপ্রণীত গ্রন্থগুলি হইতে যেরূপ মানব সমাজকে অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবাদি হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, সেইরূপ বাইবেল ও কোরাণ হইতেও ঐ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার নির্দ্দেশ উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষা যেরূপ ভারতবর্ষের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননী, সেইরূপ হিব্রু ও আরবী ভাষা জগতের অন্যান্য সমস্ত ভাষার জননী।

ভট্ট, অচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পরবর্ত্তী কালের গ্রন্থগুলিকে আপাতদৃষ্টিতে যেরূপ বিবিধ সত্যোদ্‌ঘাটক বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং মানুষ তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকে, অথচ পরোক্ষভাবে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহই ভারতবাসিগণের বর্ত্তমান হীনাবস্থার অন্যতম প্রধান কারণ, সেইরূপ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিকেও আপাতদৃষ্টিতে বিবিধ সত্যোদ্‌ঘাটক বলিয়া প্রতীয়মান হয় বটে এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অনুচরগণ উহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারসমূহই পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান পতিতাবস্থার অন্যতম মূল কারণ।

সমাজমধ্যে কোন্ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা প্রবর্ত্তিত হইলে প্রত্যেক মানুষটি অর্থাভাব প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা যেমন ভারতবাসী ঋষি ও মুনিগণ সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন—সেইরূপ অন্যান্য দেশের মানুষগুলির মধ্যেও উপরোক্ত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অন্যান্য দেশের প্রাচীনতম গ্রন্থ, অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেল এবং আরবী ভাষায় লিখিত কোরাণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে পারিলে সহজেই প্রতীয়মান হয়।

সংস্কৃত, হিব্রু এবং আরবী ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বেদ, বাইবেল এবং কোরাণের মধ্যে যেরূপ সত্যোদ্ঘাটনের সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইরূপ ভট্ট, আচার্য্য প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের লিখিত বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থগুলির ও গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যেও সত্য-অপলাপের সমতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

মোটের উপর, যাহা ভারতের অতীত চিত্র, তাহাই জগতের অতীত চিত্র, ইহা উপরোক্ত চারি শ্রেণীর প্রাচীন গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হইতে পারে।

প্রাচীন গ্রন্থসমূহই যে অতীত ইতিহাস প্রণয়নের একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ, তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং উহা পারেন নাই বলিয়াই তাঁহারা বিবিধ প্রস্তরখণ্ড ও প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ প্রভৃতিকে ইতিহাস প্রণয়নের অন্যতম উপকরণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইহা তাঁহাদের বহুদর্শিতার অভাবের পরিচায়ক। কোন কালের প্রকৃত ইতিহাস পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বিবিধ স্তরের মানুষের চিন্তাস্রোত ও কার্য্যস্রোত পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। উচ্চতম চিন্তাশীল মানুষগুলির চিন্তাস্রোত অথবা কর্ম্মস্রোত কখনও কোন প্রস্তরখণ্ড অথবা অট্টালিকায় লিপিবদ্ধ হয় না। এই কারণে উহা হইতে যে প্রাচীন ইতিহাস প্রণীত হয়, তাহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অন্যদিকে চিন্তাশীল মানুষগুলি উহাদিগের প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থেই কোন না কোন ভঙ্গীতে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষের চিন্তা ও কর্ম্মস্রোতের কথা লিখিয়া থাকেন।

যখন সমাজের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়, তখন স্বতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব হইতে থাকে এবং যে-সমস্ত চিত্র কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক, সেই সমস্ত চিত্র ঐ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অঙ্কিত করেন না। আর যখন সমাজের অবনতির অবস্থা চলিতে থাকে, তখন চিন্তাশীলতার বিলুপ্তি ঘটিতে আরম্ভ করে এবং যাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন, তাঁহারাও চিন্তাশীল বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকেন। এই উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন গ্রন্থকারগণ যাহা অঙ্কিত করেন তাহা তথাকথিত আর্টের নামে প্রায়শঃ কাম-ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে এবং পরোক্ষভাবে মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এইরূপভাবে যে কোন সাহিত্যিক গ্রন্থ দেখিয়া সমাজের সমসাময়িক অবস্থা অতি অনায়াসে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা সম্ভবযোগ্য হয়।

ঋষি ও মুনি প্রণীত কোন গ্রন্থে কোনরূপ কুৎসিত ভাবোদ্দীপক কোন কথা পাওয়া যায় না, অথচ গান্ধীজী অথবা রবীন্দ্রনাথ যাহা কিছু লিখিয়াছেন অথবা লিখিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেক ছত্রে ছত্রে রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, কলহ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যোদ্দীপক কথা পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে, ঋষি ও মুনিগণের সমসাময়িক অবস্থা যে উন্নতিমুখী ছিল এবং গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অবস্থা অবনতির দিকে প্রধাবিত, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এই অবনতির অবস্থায় যাঁহারা বাস্তবিক পক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতা ও চরিত্রহীনতার সহায়ক, তাঁহারাও চিন্তাশীল সমাজ-নায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন।

কাযেই প্রাচীন গ্রন্থসমূহকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া যে সমস্ত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত উদ্ধার করা হয়, তাহা প্রায়শঃ অবিশ্বাসযোগ্য নহে। এই হিসাবে আমাদের উপরোক্ত অতীত চিত্র উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র

যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা বিদ্যমান থাকিলে সমাজের প্রত্যেক মানুষটির পক্ষে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য এবং অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা যে সমগ্র জগতের মানব-সমাজের মধ্যে ছয় হাজার বৎসর আগে প্রবর্ত্তিত ছিল এবং গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উহা যে উত্তরোত্তর বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সন্দর্ভে দেখাইয়াছি। মানুষের অর্থাভাবাদির অপনয়নকারী ঐ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা গত ছয় হাজার বৎসর হইতে উত্তরোত্তর বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে বটে, কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও কোন বিপরীত ব্যবস্থা অথবা শিক্ষা অথবা সাধনা জগতের কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই এবং তখনও প্রাচীনতম ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার চিহ্নবিশেষ সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইতে পারে নাই। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। অর্থাভাবাদি দূর করিয়া মানুষের আর্থিক প্রাচুর্য্য, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক শান্তি, সন্তুষ্টি, দীর্ঘযৌবন এবং দীর্ঘজীবন রক্ষা করিতে হইলে যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন, অল্পাধিক গত দুইশত বৎসর হইতে মানুষ ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনা গ্রহণ করিয়াছে।

মানুষকে প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে হইলে, যে যে স্বাভাবিক কার্য্যশক্তি লইয়া কোন মানুষ জন্মগ্রহণ করে, সেই সেই কার্য্যে সে যাহাতে নিপুণতা লাভ করে এবং পরবর্ত্তী জীবনে ঐ ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহের দায়িত্ব যাহাতে তাহার স্কন্ধে ন্যস্ত হয়, তাদৃশ শিক্ষা ও সাধনার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

স্বভাবতঃ মানুষ শ্রমজীবী (শূদ্র) ও বুদ্ধিজীবী (আর্য্য) নামক দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় সমস্ত বালকের চাল-চলন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কোন কোন বালক স্বভাবতঃ যেরূপ শারীরিক শ্রমপটু হইয়া থাকে, শত চেষ্টা করিয়াও তাহাকে তাদৃশ বুদ্ধি-শ্রম-পটু করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। আবার কোন কোন বালক স্বভাবতঃ অত্যন্ত বুদ্ধি-শ্রম-পটু হইয়া থাকে। যাহারা স্বভাবতঃ বুদ্ধি-শ্রম-পটু, তাহাদিগের পিছনে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াও তাহাদিগকে দৈহিক শ্রম-পটু করিয়া গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় না। স্বভাবের এই বিষয় অনুসরণ করিয়া শিক্ষা ও কার্য্যক্ষেত্রে একদিন মানুষকে শ্রমজীবী ও বুদ্ধিজীবী নামে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে শারীরিক শ্রমের ও বুদ্ধির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। যাহারা শারীরিক শ্রমের কার্য্যে শিক্ষা পাইত, তাহাদিগকে কখনও বুদ্ধির কার্য্যের দায়িত্বভার দেওয়া হইত না, আবার যাহারা বুদ্ধির কার্য্যে শিক্ষা পাইত, তাহাদিগকে কখনও কায়িক শ্রমের কার্য্যের দায়িত্বভার দেওয়া হইত না। স্বাভাবিক কর্ম্মশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মানবসমাজের এই শ্রেণী-বিভাগ যে গত বার হাজার বৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং দুইশত বৎসর আগেও যে ইহা কথঞ্চিৎ বিকৃতভাবে দেখা যাইত, তাহা সহযেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। এখন আর মানুষের উপর দায়িত্বভার অর্পণে ঐ স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগের কথা স্মরণ করা হয় না, পরন্তু শিক্ষার নামে কতকগুলি চরিত্রহীন, উচ্ছৃঙ্খল মানুষের দেওয়া ২।১ খানি সার্টিফিকেট পাইলেই মানুষ সর্ব্ববিধ দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ফলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে গিয়া পড়িতেছে এবং বাহবা দিবার উপযোগী উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের মধ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

প্রত্যেক মানুষটী যাহাতে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হয়, তাহা করিতে হইলে তিনটি সঙ্কেত আশ্রয় করা সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয় ; যথা :—(১) নদী ও খালে সারাবৎসর জল রক্ষা করিবার উপযোগী গভীরতা, (২) কুটীর-শিল্পের প্রসার, (৩) দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে কড়ি প্রভৃতি কোন স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার। এই তিনটি সঙ্কেত যে অর্থাভাব দূর করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

নদী ও খালসমূহে যাহাতে সারাবৎসর জল থাকে, তাহা করিবার জন্য প্রথমতঃ বর্ষাকালে যাহাতে নিয়মিত

বৃষ্টি হয়, দ্বিতীয়তঃ পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তিস্থলে যাহাতে স্রোতের বিঘ্নকর কিছু উৎপন্ন না হয়, তৃতীয়তঃ পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশ লাভ করিবার পর নদীর স্রোত যাহাতে নদীর গভীরতা উৎপাদনে কোনরূপ বাধা না পায়, চতুর্থতঃ নদীর উৎপত্তি-স্থল হইতে সাগর-সঙ্গম পর্য্যন্ত নদীর স্রোতের যাহাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্তি না ঘটে এবং উহা কোন স্থলে শুষ্ক হইয়া না যায়, তাহা করা একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে।

বর্ষাকালে যাহাতে নিয়মিত বৃষ্টি হয়, তাহা করিতে হইলে, যাহাতে ভূমিখণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে এবং ঐ রস বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া মেঘের গঠন সাধিত করে এবং মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানান্তরিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভূমিখণ্ডে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে রস থাকে, তাহা করিতে হইলে ভূমির গভীরতম প্রদেশ হইতে যাহাতে রসোৎপাদক খনিজ পদার্থসমূহ স্থানান্তরিত না হয় এবং ঐ গভীরতম প্রদেশের জল যাহাতে উত্তোলিত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজনীয়। স্মরণাতীত কাল হইতে যে, ভারতবর্ষে এতদ্বিষয়ে নজর রাখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য বেদ ও সংহিতায় লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা মানুষ অনেকদিন হইতেই ভুলিয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ দুইশত বৎসর আগেও উহার কোন বৈপরীত্য সাধন করে নাই, কারণ তখনও অত্যধিক পরিমাণে খনিজ পদার্থগুলি উত্তোলিত হয় নাই এবং টিউবওয়েলের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় নাই। আর এক্ষণে মাইনিং-এর ও টিউবওয়েলের পরিকল্পনার প্রসার সাধন করিয়া বৈজ্ঞানিকতার ছড়াছড়ি করা হইতেছে বলিয়া মানুষ মনে করিতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি বৃদ্ধি এবং জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস সাধন করা হইতেছে। এক কথায়, মানুষ প্রধানতঃ যাহার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তাহারই উচ্ছেদ সাধন করিতেছে।

মেঘ যাহাতে বর্ষণের আগে স্থানান্তরিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইতে হইলে ব্যোমযানের ব্যবহার একান্তভাবে বর্জ্জনীয়। সাধারণতঃ মানুষ মনে করিয়া থাকে যে, ব্যোমযান আধুনিক বিজ্ঞানের একটা নূতন আবিষ্কার। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা সত্য নহে। শিল্প সম্বন্ধে ঋষিদিগের যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহা হইতে আমাদের এই কথার সাক্ষ্য পওয়া যাইবে। "শব্দ-স্ফোট" উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "ব্যোম-যান" এই শব্দটার মধ্যেই বায়ুর সহায়তায় কি করিয়া ব্যোম-যান প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার সূত্র ও সঙ্কেত লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। স্মরণাতীত কালে ভারতীয়গণ ব্যোম-যান প্রস্তুত করিতে জানিতেন, অথচ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি যাহাতে না হয়, তজ্জন্য উহার ব্যবহার বর্জ্জন করিয়াছিলেন। অল্পাধিক দুইশত বৎসর আগেও উহার ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা মানুষের অন্তঃকরণে স্থান পায় নাই। অধুনা উহা ব্যবহার সখের কার্য্যে পরিণত হইয়াছে এবং ক্রমশঃই প্রসার লাভ করিতেছে। ফলে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির সহায়তা সাধিত হইতেছে।

পাহাড়ের উপর নদীর উৎপত্তি স্থলে যাহাতে স্রোতের বিঘ্নকর কিছু উৎপন্ন না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, পাহাড়ের উপর যাহাতে কোন বৃহৎ সহর ও রাস্তা নির্ম্মিত না হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। বেদ ও স্মৃতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্মরণাতীত কাল হইতে ঋষি ও মুনিদিগের এতদ্বিষয়ে সতর্কতা বিদ্যমান ছিল এবং দুই শত বৎসর আগেও মানবসমাজ কার্য্যতঃ এতাদৃশ সর্ব্বনাশক পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে নাই। আর অধুনা শৈলাবাসই মানুষের অন্যতম সখের কার্য্য এবং শৈল রাস্তা আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম গর্ব্বের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিস্তৃত শৈলাবাস (hill-town ও) বিস্তৃত শৈল রাস্তা (hill road) বর্জ্জন করিবার পরিকল্পনা অধুনা অসভ্যতার নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে প্রবেশলাভ করিবার পর নদীর স্রোত যাহাতে নদীর গভীরতা উৎপাদনে কোনরূপ বাধা না পায়, তাহা করিতে হইলে নদীর মধ্যে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড (boulders) নিক্ষেপ করা, বিস্তৃতভাবে জলপথ নির্ম্মাণ করা এবং বিস্তৃত সেতু নির্ম্মাণ করার পরিকল্পনা একান্তভাবে বর্জ্জনীয়। এতদ্বিষয়েও স্মরণাতীত

কাল হইতে ভারতীয় ঋষিগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ, বিবিধ সংহিতা ও ঋষি-প্রণীত শিল্প-গ্রন্থে ঐ সতর্কতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। দুইশত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ এতাদৃশ কর্ম্মের পরিকল্পনা মানব-হৃদয়ে স্থান পায় নাই। কিন্তু আধুনিক এঞ্জিনিয়ারগণ ঐ তিনটী পরিকল্পনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন। ফলে, নদীসমূহ আর তাহাদের গভীরতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইতেছে না এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বন্যা ও জল-প্লাবনের মাত্রা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে।

এরূপভাবে একদিন যে-সমস্ত কার্য্যের সহায়তায় নদী-সমূহে বার মাস গভীরভাবে জল রক্ষা করিবার ব্যবস্থা সম্পাদিত হইত, এক্ষণে তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক নদীর শুষ্কতা সাধন করিতেছেন এবং মানুষের সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে।

কুটীর-শিল্পের প্রসার সাধন করিতে হইলে একদিকে যাহাতে শ্রমজীবিগণ বৎসরের মধ্যে পাচমাস মাত্র পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদন করিতে পারে এবং অন্যদিকে যাহাতে যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা বর্জ্জিত হয়, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। এই ব্যবস্থার দিকেও ভারতীয় ঋষিগণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছিল। বেদ, সংহিতা এবং ঋষিপ্রণীত শিল্প-গ্রন্থে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। যন্ত্র-শিল্প আধুনিক আবিষ্কার বলিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের ধারণা। ইহাও সত্য নহে। শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, 'যন্ত্র' এই শব্দটির মধ্যেই কি করিয়া বায়ুর সহায়তায় যন্ত্রের পরিচালন ও নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার সূত্র ও সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। যাঁহারা বেদ ও বর্ত্তমান যন্ত্র-সম্বন্ধীয় এঞ্জিনিয়ারীং (mechanical, hydraulic and automobile engineering etc.) অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, বেদে বায়ু, জল ও তেজ সম্বন্ধে কথা ও অঙ্ক-শাস্ত্র যত আমূলভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহার তুলনায় ঐ সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান এঞ্জিনিয়ারীং-এর কথা অতীব অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যকর। এই সমস্ত কথা মানুষ অনেকদিন হইতে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ উহার কোন বিপরীত আচরণ করে নাই, কারণ তখনও জমীর উর্ব্বরা-শক্তির হানিকর কার্য্যে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই এবং তখনও কোন বিস্তৃত যন্ত্র-শিল্পের পরিকল্পনা মানুষ গ্রহণ করে নাই। আর অধুনা, আধুনিক বৈজ্ঞানিকের প্রায় প্রত্যেক কার্য্য জমীর উর্ব্বরতার হ্রাস সাধন করিতেছে এবং শ্রমজীবীর পক্ষে পাঁচমাস তো দূরের কথা, সারাবৎসর পরিশ্রম করিয়াও প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল তৈয়ারী করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যন্ত্র-শিল্পের প্রসার সাধন করা প্রায় প্রত্যেকের আরাধ্য কর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে।

সমাজমধ্যে যাহাতে কোন দ্রব্যের অসমান বিতরণ না হয়, প্রত্যেকে যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে আবশ্যকীয় বস্তুসমূহ পাইতে পারেন, যোগ্যতানুসারে যাহাতে আবশ্যক বস্তুসমূহের বিতরণের তারতম্য ঘটে, এই তিনটি ব্যবস্থা যে সমাজের অর্থাভাব-জনিত অসন্তুষ্টি নিবারণের অন্যতম প্রধান পন্থা এবং ঐ তিনটি ব্যবস্থা সম্পাদিত করিতে হইলে যে দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্যে কড়ি প্রভৃতি কোন না কোন স্বভাবজাত দ্রব্যকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য যে ধাতু ও কাগজে নির্ম্মিত মুদ্রার বিকৃত ব্যবহার সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এতৎসম্বন্ধেও ঋষিগণ সতর্ক ছিলেন। তাহার পরিচয়ও বেদ এবং সংহিতায় পাওয়া যাইবে। ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং যুক্তিযুক্ততাও মানবসমাজ অনেক দিন হইতে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু কার্য্যতঃ দুইশত বৎসর আগেও ইহার বিপরীত আচরণ করে নাই। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, দুইশত বৎসর আগেও কড়ি প্রভৃতি স্বভাবজাত বস্তুর সহায়তায় জগতের বহু দেশে দ্রব্যের বিনিময়-কার্য্য সম্পাদিত হইত এবং তখনও ধাতু এবং কাগজনির্ম্মিত মুদ্রার এতাদৃশ বিস্তৃত প্রচলন কোন দেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আর অধুনা, জগতের প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট ধাতু এবং কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রার উৎপাদনে অত্যধিক তৎপর হইয়াছেন। ১৯১১ সালে সারাজগতে কত পরিমাণের ধাতু ও কাগজ-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচলিত ছিল আর ১৯৩১ সালেই বা ঐ পরিমাণ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে

দেখা যাইবে যে, প্রায় সহস্রগুণ পরিমাণে উহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, অসমান বিতরণজনিত অসন্তুষ্টি সর্ব্বত্র বৃদ্ধি পাইতেছে এবং হৃদয়বিদারক ভাবে কতকগুলি চরিত্রহীন ধনীর সন্তান কোনরূপ ধনবৃদ্ধির সহায় না করিয়া ব্যভিচারিণী সেক্রেটারীর অঙ্ক পরিশোভিত করিয়া সমাজের মধ্যে নায়কত্ব করিতে পারিতেছে আর ধর্ম্ম-জ্ঞান-যুক্ত চরিত্রবান্ শ্রমজীবীর সন্তান প্রতিনিয়ত রৌদ্র ও বৃষ্টিতে পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বদা সমাজের খাদ্য ও ব্যবহার্য্য সরবরাহ করিয়াও নিজেরা অন্নহীন হইয়া অবজ্ঞেয় অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে।

এইরূপে যে অর্থাভাব একদিন মানব সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই অর্থাভাবের হাহাকার জগতের প্রায় প্রত্যেক গৃহে স্থান পাইয়াছে এবং তথাপি যে যে ব্যবস্থায় উহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে এবং ঐ বৈপরীত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই মানুষগুলিই কোথায়ও বা সুনিপুণ বৈজ্ঞানিক, কোথায়ও বা সুনিপুণ অর্থ-নৈতিক আর কোথায়ও সুনিপুণ শাসক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।

স্বাস্থ্যবিষয়ক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াও ঠিক একই কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যাইবে।

সর্ব্বসাধারণের শারীরিক স্বাস্থ্য যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিতে হইলে তিনটি ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। প্রথমতঃ, বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা রক্ষা, দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈষজ্য বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কার এবং তৃতীয়তঃ স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষার বিস্তার। এই তিনটি কার্য্যের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত তিনটি ব্যবস্থার আবশুক হইয়া থাকে। আমরা ইহা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র উদ্ঘাটন-কালে দেখাইয়াছি।

বায়ুর শুদ্ধতা ও স্নিগ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে জল ও স্থল, এই উভয়েরই শুদ্ধতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কারণ, জল ও স্থল শুদ্ধ না থাকিলে উহা হইতে দুষ্ট বাষ্প উদ্গত হইতে থাকে এবং তদ্দ্বারা বায়ুর অশুদ্ধি সংঘটিত হয়। জলের শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে উহার মধ্যে যাহাতে কোনরূপ দুষ্ট দ্রব্য নিপতিত না হইতে পারে এবং সর্ব্বত্র (অর্থাৎ নদী খাল, পুষ্করিণীতে পর্য্যন্ত) যাহাতে স্রোত রক্ষিত হইতে পারে, প্রধানতঃ তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। স্থলের শুদ্ধতা রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ, স্থলের প্রত্যেক স্তরে যাহাতে বায়ু গমনাগমন করিতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, উহার সর্ব্ব-নিম্ন স্তর পর্য্যন্ত প্রত্যেক অণু ও পরমাণু যাহাতে প্রয়োজনানুরূপ রসসিঞ্চিত থাকে, তৃতীয়তঃ, উহার আবরণে যাহাতে কোনরূপ বিষাক্ত দ্রব্য নিহিত না থাকে, চতুর্থতঃ, উহার উপরে যে-সমস্ত চর ও অচর জীব অবস্থিত থাকে অথবা বিচরণ করে, তাহাদের প্রশ্বাসে ও চালচলনে যাহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য নির্গত না হয়, প্রধানতঃ তাহার দিকে লক্ষ্য করিতে হয়। জল ও স্থলের শুদ্ধতা রক্ষা করিবার জন্য এই সমস্ত বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা যে স্মরণাতীত কালে ঋষিগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং তদ্বিষয়ে তাঁহারা যে সতর্ক ছিলেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রণীত ব্যবস্থাশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করিতে পারিলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা ও বিজ্ঞান বহুদিন হইতেই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও কার্য্যতঃ মানবসমাজ উহার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। গত দুইশত বৎসরের মধ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ রেলপথ নির্ম্মাণের অজুহাতে নানা স্থানে রাস্তা ও সেতু নির্ম্মাণ করায় এবং বৈজ্ঞানিক জলসেচ প্রণালীর (irrigation) অজুহাতে বাঁধ ও অগভীর খালের প্রবর্ত্তন করায়, জলস্রোত অপ্রতিহত রাখা তো দূরের কথা, উহা যাহাতে প্রতিহত হয়, তাহার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

ইহা ছাড়া বৈজ্ঞানিক মল-নির্গমন-প্রণালী (sewerage) নির্ম্মাণের অজুহাতে ভূগর্ভস্থ নর্দ্দমার দ্বারা প্রবাহিত মল খাল ও নদীর মধ্যে নিষ্কাশিত করিবার ব্যবস্থা সাধন করিয়া জলের শুদ্ধতা রক্ষা করা তো দূরের কথা, জলের অশুদ্ধি সম্পাদন করিতেছেন। এইরূপ ভাবে আধুনিক কালে যেরূপ জলের অশুদ্ধতা সম্পাদিত হইতেছে, সেইরূপ আবার স্থলভাগও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা দূষিত হইয়া পড়িতেছে। প্রতিনিয়ত রেলগাড়ীর চাপ পড়ায়

মৃত্তিকাভাগ এত অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে যে, এখন আর উহার প্রত্যেক স্তরের অণু ও পরমাণুর মধ্যে বায়ুর চলাচল সুসাধ্য থাকিতে পারিতেছে না। নদীগুলি ক্রমশঃ অগভীর ও দুর্ব্বল স্রোতোযুক্ত অথবা স্রোতোহীন হইয়া পড়ায় সর্ব্ব-নিম্নস্তর পর্য্যন্ত রসের প্রবেশ দুর্গম হইয়া পড়িতেছে। মোটরগাড়ীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাগুলি নানারূপ বিষাক্ত দ্রব্য-নির্ম্মিত আবরণের দ্বারা আবৃত হওয়ায় প্রতিনিয়ত উহা হইতে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইতেছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার না থাকায় চর জীবগণের পাকস্থলী হইতে অনবরত বিষাক্ত বাষ্প প্রশ্বাসের সহিত নির্গত হইতেছে। কৃত্রিম সার ব্যবহারের প্রসার সাধিত হওয়ায় উহা উদ্ভিদের প্রশ্বাসকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে এবং ঐ বিষাক্ত প্রশ্বাস বায়ুর সহিত মিলিত হইতেছে। ইহা ছাড়া রেলগাড়ী ও যন্ত্র-শিল্পের বহুল প্রচলনে তাহা হইতে যে কয়লার ধূমা নির্গত হইতেছে, উহাও বিষাক্ত এবং উহাও বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। এইরূপ ভাবে একদিকে যেরূপ জল ও স্থল হইতে বিষাক্ত বাষ্প উদ্গত হইয়া বায়ুকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে, সেইরূপ আবার মানুষের কার্য্যের ফলেও উহা বিষাক্ত হইতেছে।

মানুষের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান এবং ভৈষজ্য বিজ্ঞান যথাযথ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার একমাত্র উপায় শব্দকে কি করিয়া স্পর্শ করিতে হয় তাহার কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া এই কৌশল ঋষিগণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া তখনকার দিনে বিশ্বাস-যোগ্য চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের উদ্ভব হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। ঐ চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্র মানুষ বহুদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং তাহার জন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রের অব্যর্থতাও অনেক দিন হইতে নষ্ট হইয়াছে ইহা সত্য-কিন্তু দুইশত বৎসর আগেও চিকিৎসার নামে মানুষ এমন কিছু করে নাই, যদ্দারা মানুষের প্রাণনাশ অথবা অকর্ম্মণ্যতা ঘটিতে পারে। বর্ত্তমানে শবদেহ দেখিয়া সজীব দেহের শরীর-গঠন ও শরীর-বিধান অনুমান করা হইয়া থাকে এবং মনুষ্যেতর প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া মানুষের ভৈজষ্য-বিজ্ঞান স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। ইহার ফলে এক্ষণে, ব্যাধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে চিকিৎসা-বিদ্যা ও চিকিৎসা-শাস্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বতোভাবে আনুমানিক হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈষজ্য-বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইবার আশা সুদূরপরাহত হইয়া পড়িতেছে।

প্রত্যক্ষীভূত শরীর-গঠন, শরীর-বিধান ও ভৈজষ্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কার সুদূরপরাহত হওয়ায়, কোন্ খাদ্য ও চালচলন কোন্ অবস্থার কোন্ মানুষের পক্ষে উপকারক অথবা অপকারক, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে একে তো সর্ব্বসাধারণকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রকৃত শিক্ষা প্রদান করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে, তাহার উপর আবার তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে যে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা তাহাদের স্বাস্থ্যসাধক না হইয়া স্বাস্থ্য-বিনাশক হইতেছে।

এইরূপে যে স্বাস্থ্যাভাব একদিন মানব-সমাজের অপরিজ্ঞাত ছিল, সেই স্বাস্থ্যাভাবে প্রায় প্রত্যেক মানুষটি হাবুডুবু খাইতেছে এবং তথাপি যে যে ব্যবস্থায় উহা নিবারিত হইতে পারে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া মানুষ সম্পূর্ণ-ভাবে উহার বিপরীত আচরণ করিতেছে এবং ঐ বৈপরীত্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

সন্তুষ্টি ও শান্তি বিষয়ে মানুষ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলেও হতাশ্বাস হইতে হয়।

মানুষের মনে শান্তি ও সন্তুষ্টি থাকিলে, মানুষ প্রতি-নিয়ত এত অধিক পরিবর্ত্তন-প্রয়াসী হইত না এবং প্রতি-নিয়ত নূতন নূতন মতবাদ ও নূতন নূতন দলের উদ্ভব হইতে পারিত না। মানুষের মনে বর্ত্তমান সময়ে যে শান্তি ও সন্তুষ্টি নাই, তৎসম্বন্ধে মনুষ্যসমাজের উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে যেরূপ কৃতনিশ্চয় হওয়া যায়, সেইরূপ আবার ব্যক্তিগত ভাবে আত্মপরীক্ষা করিলেও উহা বুঝিতে পারা যায়।

মানুষের শান্তি ও সন্তুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে প্রথমতঃ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যাহাতে অপসারিত করিতে পারা যায়, দ্বিতীয়তঃ সুবিচার, দণ্ড ও ধন-বিতরণের শৃঙ্খলা যাহাতে সাধিত করা যায়, এবং তৃতীয়তঃ মনস্তত্ত্বের

প্রয়োগযোগ্য শিক্ষা ও সাধনা যাহাতে প্রবর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আবশ্যক। এই তিনটি ব্যবস্থা সাধিত করিবার জন্য কি কি প্রয়োজন, তাহা যে ভারতীয় ঋষিগণ একদিন সম্যক্‌ভাবে স্থির করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহা যে মনুষ্যসমাজে একদিন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থ হইতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হইতে পারে। ঐ ঐ ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান মানুষ অনেকদিন হইতেই বিস্মৃত হইয়াছে তাহা সত্য এবং ঐ ঐ ব্যবস্থা অবহেলার চক্ষে অনেকদিন হইতে দেখিয়া আসিতেছে তাহাও সত্য, কিন্তু কিছুদিন আগেও উহার বিপরীত ভাবের কোন আচরণে মানুষ হস্তক্ষেপ করে নাই।

অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব যাহাতে জনসাধারণের মধ্য হইতে অপসারিত হয়, তাহার জন্য কি কি করা কর্ত্তব্য, উহার জন্য যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য তাহা ভুলিয়া গিয়াও মানুষ যে অনেকদিন পর্য্যন্ত কোন বিপরীত আচরণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করে নাই এবং অধুনা ঐ বিপরীত আচরণ যে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

সুবিচার ও দণ্ড যথাযথভাবে সাধন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, যাহাতে কেবলমাত্র সাধক, চরিত্রবান, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত, দ্বন্দ্ব ও কলহ প্রবৃত্তিবিহীন, অভিমান-শূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মিগণ সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব পাইতে পারেন, এবং যাঁহারা সাধনাহীন, চরিত্রহীন, রাগ-দ্বেষ-যুক্ত, দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রমত্ত, অভিমানী ও স্বার্থ-পরায়ণ মানুষ, তাঁহারা যাহাতে উহা না পাইতে পারেন এবং দণ্ডভোগ করেন, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ইহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি। সমাজের প্রত্যেকের শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধান করিবার জন্য যে উপরোক্তভাবে সুবিচার ও দণ্ড-বিধান করিবার একান্ত প্রয়োজন, তাহাও ভারতীয় ঋষিগণ স্মরণাতীতকালে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন এবং উহার ব্যবস্থাও সমাজমধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুবিচার ও দণ্ডের বিধান কোন্ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যায়-প্রমত্ততা সঙ্কুচিত হইতে পারে, এবং একমাত্র ন্যায়পরায়ণ বিচারকের উদ্ভব হইতে পারে, তাহার তথ্যও মানুষ অনেকদিন হইতে ভুলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন আগেও যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সাধনাহীন অথবা চরিত্রহীন, অথবা রাগ-দ্বেষ-যুক্ত, অথবা দ্বন্দ্ব-কলহ-প্রমত্ত, অথবা অভিমানী, অথবা স্বার্থ-পরায়ণ হইতেন, তাঁহারা কি সমাজের, অথবা কি রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় হইয়া দায়িত্ব গ্রহণ করিবার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিতেন না। যাঁহারা ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণী হইতেন, তাঁহারা যতই গুণসম্পন্ন হউন না কেন, তাঁহাদের পক্ষে সমাজের অথবা রাষ্ট্রের শীর্ষস্থান লাভ করা তো দূরের কথা, পরিত্যক্ত ও পরিত্যক্তা হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের অন্তরালে দিন যাপন করিতে হইত। ৩০।৪০ বৎসর আগে যাঁহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যে সাধক, চরিত্রবান্, রাগ-দ্বেষ-বিমুক্ত, দ্বন্দ্ব ও কলহপ্রবৃত্তিহীন, অভিমানশূন্য ও নিঃস্বার্থ কর্ম্মী ছিলেন, ইহা বলা চলে না বটে, কিন্তু যাঁহারা উহার বিপরীত আচরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে লুক্কায়িতভাবে তাহা করিতে হইয়াছে।

আর আজকাল যাঁহারা সমাজের ও রাষ্ট্রের নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে সাধনা-বিহীনতা, চরিত্রহীনতা, রাগ-দ্বেষ-যুক্ততা, দ্বন্দ্ব কলহ-প্রমত্ততা, অভিমানগ্রস্ততা, স্বার্থ-পরায়ণতা, অসত্যবাদিতা নাই, প্রায়শঃ এমন একজনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীগণ অনায়াসে ও অসঙ্কোচে সমাজের ও রাষ্ট্রের বুকের উপর দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব করিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদিগকে দেখিয়া মনে হয়, যেন প্রকাশ্যভাবে বিপরীত চালচলনই আধুনিক নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণ (qualification) হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইরূপভাবে মানুষের শান্তি ও সন্তুষ্টি বিদূরিত হইয়া অশান্তি ও অসন্তুষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি যে যে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সাধনায় দূরীভূত হইতে পারে, তাহা গ্রহণ না করিয়া অধুনা মানুষগুলি যেরূপ বিপরীতভাবে চলিতেছে, সেইরূপ বিপরীতভাবে চলিতে থাকিলে অদূর, ভবিষ্যতে ভারতীয় মনুষ্যসমাজ কোন্ অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহার চিত্র উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিব।

উপরোক্ত চিত্র অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় মনুষ্যসমাজকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নামে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। কিছুদিন আগেও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বস্তু ছিলেন ভারতীয় নারী। ঐ ভারতীয় নারীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতীয় শিক্ষিত পরিবার ও ভারতীয় শিক্ষিত সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই নারীকে আশ্রয় করিয়া কিছুদিন আগেও ভারতীয় পুরুষগণ শ্রমক্লিষ্ট ও অশান্তিদগ্ধ জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে আমরা যে ভাবে চলিতেছি এবং আমাদিগের নারীগণকে চালাইতেছি, তাহাতে ইহাঁরাই প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত পরিবারের সর্ব্বাপেক্ষা অশান্তি ও ক্লেশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবেন। ভারতীয় শিক্ষিত পরিবার বলিতে যাহা বুঝা যাইত তাহা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে এবং আমাদিগকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে দিন যাপন করিতে হইবে। ভারতীয় শিক্ষিত পরিবারস্থ নারীগণের যে সতীত্বের খ্যাতি একদিন সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহা উপকথার মত হইয়া দাঁড়াইবে। মাতৃস্বরূপ, যে নারীগণ একদিন নিতান্ত ঘৃণ্যকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, যাঁহারা নিজদিগের চরিত্রবলে চরিত্রহীন পতি-পুত্রকে চরিত্রবান্ করিয়া তুলিতে পারিতেন, সেই নারীগণ প্রায়শঃ চরিত্রহীনা হইয়া সমাজের স্কন্ধে ভারস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবেন।

যাঁহারা বংশপরম্পরায় কোন দিন নফরগিরী করেন নাই, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও অতিথিপরায়ণতা যাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি চালচালনে ফুটিয়া বাহির হইত, তাঁহারা পেটের দায়ে কর্ম্ম ও অকর্ম্মের মধ্যে কোন পার্থক্য বজায় রাখিবেন না।

যাঁহারা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও পরের কাছে যাচ্ঞা করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন, তাঁহারা যাচ্ঞায় কোন সঙ্কোচ বোধ করা তো দূরের কথা, পেটের দায়ে পরের গলায় ছুরী মারিতেও কুণ্ঠা বোধ করিবেন না।

যাঁহারা পরের কাছে দায়গ্রস্ত হইতে অথবা উপকার গ্রহণ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করিতেন, তাঁহারা প্রতারণার দ্বারা পরস্বাপহরণ করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না।

প্রায় প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষটি এক একটি দাস হইয়া পড়িবেন।

স্ত্রী, ভগ্নী ও কন্যার ব্যভিচার, পুত্র ও ভ্রাতার প্রতারণা, অনাহার ও ব্যাধিক্লেশ নীরবে সহ্য করিতে হইবে এবং সময় সময় যাঁহারা অনুগৃহীত ও আশ্রিত, তাহাদের হস্তে প্রহার খাইতে হইবে।

বিধির বিধানানুসারে ভারতীয় মানুষগণকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ইংরেজ ও ভারতীয়গণের মিলনে যে কংগ্রেস মিলনমণ্ডপরূপে রচিত হইয়াছিল, সেই কংগ্রেস একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব-কলহের আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইবে।

যাঁহারা আজ কংগ্রেসের নেতারূপে বিভিন্ন প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট রচনা করিতেছেন, ইহাঁদের অনেককেই অপঘাত মৃত্যু সদৃশ জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। পরস্পরের মধ্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অধিকাংশ পরিমাণে তিরোহিত হইয়া যাইবে।

পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত আমাদের এই চিত্রের কথায় হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। আমরা তাঁহাদিগকে আগত ৫।৬ বৎসর অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদিগের শিক্ষিত সমাজ অতীব মহাপাপী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদিগের পাপের ফল তাঁহাদিগকে ভুগিতে হইবে। ইহার অন্যথা কখনও হইতে পারে না।

যাহারা অশিক্ষিত তাহারা নিরীহ এবং তাহারা প্রায়শঃ শিক্ষিতগণের মত অত মহাপাপী নহে। যে অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণকে লইয়া আমাদিগের সোস্যালিষ্ট্ নেতৃবৃন্দ তথাকথিত শ্রমজীবীর আন্দোলন চালাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি না। তাঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে এক সম্প্রদায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহারাই আমাদিগের ৩৬ কোটীর ২৮ কোটী। তাহারা অনেক সহ্য করিয়াছে। তিন বেলার স্থলে এক বেলা খাইয়াই তাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নীরব রহিয়াছে। কিন্তু এখন আর ঐ একবেলাও তাহাদিগের আহার জুটিতেছে না। কাযেই আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। আমাদিগের নেতৃবৃন্দের মৃত্যুবাণ তাহাদিগের বক্ষে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

ক্ষুধার তাড়নায় তাহারা অদূর-ভবিষ্যতে ধেই ধেই করিয়া নাচিয়া উঠিবে। যে বন্যা ও জলপ্লাবন এক্ষণে ভীষণাকারে দেখা দিতেছে, তাহা প্রতি বৎসর ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে থাকিবে। কিছু দেনা অথবা কিছু খয়রাৎ প্রদান করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না। তাহারা উহা সহ্য করিতে পারিবে না। নিরীহ ঐ বেচারীগণ ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ। তথাকথিত শিক্ষিত মহাপাপী নীচ স্বার্থপরায়ণ মোড়লগণের দণ্ড উহাদের হাতে সম্পাদিত হইবে। তখন শিহরিয়া উঠিলেও রক্ষা পাওয়া যাইবে না। উহাদের হাতে নৃশংস ভাবে প্রাণাধিক পুত্রের দণ্ড ও প্রাণাধিকা কন্যার নির্য্যাতন দাঁড়াইয়া নীরবে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই চিত্র অতীব ভীষণ। এই চিত্র যাহাতে সত্য না হয় তজ্জন্য আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতেছি। তাই আমরা এখনও বলি, সাধু, এখনও সাবধান হও। এখনও পাশ্চাত্ত্য দলাদলির পলিটিক্স্ বাদ দিয়া, এখনও পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া মোড়লী করিবার প্রবৃত্তি বিসর্জ্জন দিয়া দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি অতিক্রম করিয়া মানুষের মত মানুষ কি করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে, সর্ব্বাগ্রে তাহার গবেষণায় প্রবৃত্ত হও।

বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা আগামী বারে লিখিব।

গান্ধীজীর নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ এবং অহিংসা-প্রবৃত্তি

কয়েকদিন আগে গান্ধীজী "হরিজন" পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার মূল বক্তব্যের মর্ম্ম এই যে, "স্বার্থপর হইলে দেশের কোন হিতকর কার্য্য করা যায় না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ যে-সকল প্রদেশে মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিয়াছেন, সেই সকল প্রদেশে, যাহা প্রকৃত-পক্ষে দেশের হিতকর কার্য্য তাহা করিতে হইলে, ঐ মন্ত্রিমণ্ডলকে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থপর হইতে হইবে।"

সম্প্রতি দিল্লীতে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার যে অধিবেশন হইতেছে, তাহার ২৩শে সেপ্টেম্বরের অধিবেশনে গান্ধীজী যে বক্তৃতা দিয়াছেন, সেই বক্তৃতার অন্যতম কথা এই যে, "রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিবার যুদ্ধে অহিংসা ও সত্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা সত্ত্বেও কেন যে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ দেশের শাসন ও স্বাধীনতা রক্ষার কার্য্যে ঐ অহিংসা ও সত্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারেন না, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। রাষ্ট্রীয়ই হউক আর যাহাই হউক, মানুষের সর্ব্ববিধ ব্যাধির আরোগ্য-সাধনের সর্ব্বোচ্চ ঔষধ অহিংসা ও সত্য" ইত্যাদি

(He could not conceive of the Congress believing in the efficacy of truth and non-violence only in its *fight* to win political freedom and not in governing the country and retaining the freedom so won. So far as he was concerned, he is reported to have made it clear, that truth and non-violance were the sovereign remedy for all ills of mankind, political or otherwise.)

প্রকৃত নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ এবং অহিংসা-প্রবৃত্তির সাধনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে যে মানুষের পক্ষে সর্ব্ববিধ জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সন্তুষ্টি ও তৃপ্তির উচ্চতম শিখরে আরোহণ করা যায়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু উহার কোনটির সাধনাতেই তমসাচ্ছন্ন সাধারণ লোকের পক্ষে সিদ্ধি লাভ করা সম্ভব নহে, ইহা ভারতীয় ঋষিগণের অভিমত। আমরা ঐ মতের অনুরাগী।

গান্ধীজীর জীবনের কার্য্যগুলি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি প্রতিনিয়ত নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ ও অহিংসা প্রবৃত্তির উৎকর্ষের কথা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেই উহার সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ-বিশিষ্ট, অর্থাৎ নিঃস্বার্থপর, সত্যানুরাগী ও অহিংস হওয়া তো দূরের কথা, গান্ধীজী নিজেই ঘোর স্বার্থপর, কপট, মিথ্যাবাদী এবং হিংস্র। সত্তর বৎসরে উপনীত হইয়াও তিনি ঐ কদর্য্য প্রবৃত্তিসমূহ হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও মুক্ত হইতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে শিক্ষার নামে কুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং

তাঁহাদিগের অধিকাংশই গান্ধীজীর মত নীচ, স্বার্থপর, কপট ও মিথ্যাবাদী এবং হিংস্র বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি দল গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং দলপতিত্ব করিতে পারিতেছেন। ভারতের কংগ্রেস ভগবানের দান এবং পুণ্যময় প্রতিষ্ঠান তাহা সত্য, কিন্তু উহা কু-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরবর্গের দ্বারা কলুষিত হওয়ায় এবংবিধ পুণ্যময় কংগ্রেস হইতে দরিদ্র ভারতবাসিগণের কোন উপকার না হইয়া ঘোর অপকার সাধিত হইতেছে এবং প্রতি ঘরে ঘরে দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অশান্তির হাহাকারও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের এই কথাগুলি কঠোর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা অতীব সত্য। সাধারণ মানুষ, গান্ধীজী ও যাঁহাদিগকে লইয়া তিনি দলপতিত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের গুণপনা বুঝিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায়, দলাদলি ও রক্তা-রক্তির ফলে অথবা এক কথায় গুঁতার চোটে উহা ৭।৮ বৎসরের মধ্যে বুঝিতে বাধ্য হইবে।

সাধারণ লোকের চক্ষে গান্ধীজীর নিঃস্বার্থপরতার সর্ব্বাপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত, বিবিধ আন্দোলনোপলক্ষে একাধিকবার কারাবাস। যদি তিনি কোন লাভবান্ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিতেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মতিলালের মত তাহা পরিত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলন উপলক্ষে অথবা কংগ্রেসের কার্য্যব্যপদেশে ক্লেশজনক কারাবাস স্বীকার করিতেন অথবা কংগ্রেসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে তাহা তাঁহার স্বার্থ-পরিত্যাগের দৃষ্টান্ত হইত, এতদ্বিষয় সন্দেহ করা যায় না। কিন্তু তিনি তাঁহার জীবনে কোনদিন কোন ব্যবসায়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের উপার্জ্জনে সক্ষম হন নাই এবং এমন কথাও নিশ্চয়তার সহিত বলা চলে না যে, কোন ব্যবসায়ে তিনি স্থায়ীভাবে লাগিয়া থাকিলে অধিকতর নাম, যশঃ এবং অর্থোপার্জ্জন করিতে কৃতকার্য্য হইতেন। তিনি যেরূপ মেজাজী, তাহাতে বরং বিপরীত কথাই মনে করিতে হয়। কোন ব্যবসায়ে যাঁহার কোন স্বার্থের প্রতিষ্ঠা হয় নাই এবং উহার সম্ভাবনাও কম ছিল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, সেই ব্যবসা ত্যাগ করাকে কোন স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত বলিয়া কোন ক্রমেই মনে করা চলে না।

কারাগারে সাধারণতঃ যে ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, তাহাও কোন দিন তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, কারণ প্রায় প্রত্যেক বারই তিনি কারাগৃহে বিশেষ রকমের বিশিষ্ট সম্মানার্হ বন্দীর সমাদর লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার বাণীতে প্রমত্ত হইয়া যে সমস্ত উজ্জ্বল যুবক তাহাদিগের ভবিষ্যৎ বিসর্জ্জিত করিয়াছে, তাহারা কারাবাসে যে ক্লেশ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছে, কারাগৃহের বিশেষ সমাদর লইতে অস্বীকার করিয়া গান্ধীজী যদি ঐ যুবকগণের মত কারাক্লেশ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও তাঁহার স্বার্থত্যাগের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহাও তিনি তাঁহার জীবনে কোন দিন করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। পরন্তু যখন সহস্র সহস্র যুবক তাঁহারই উত্তেজনায় দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া লৌহ কবাটের অন্তরালে জটিল ব্যাধির আশ্রয়স্থল হইতেছিল, তখন প্রায়োপবাসের ভীতি প্রদর্শন করিয়া কেবল মাত্র নিজের মুক্তির জন্য গান্ধীজী তৎপর হইয়াছিলেন এবং উহা সাধন করিয়াছিলেন, এবংবিধ দৃষ্টান্তও তাঁহার কারাগার-জীবনের ইতিহাসে পাওয়া যায়। যাঁহাদিগকে তিনি নিজেই উত্তেজিত করিয়া কারাগার গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মুক্তির অথবা ভবিষ্যতের কোন পন্থার কথা না ভাবিয়া কেবলমাত্র নিজের মুক্তির পন্থা অবলম্বন করা কি স্বার্থপরতার পরিচায়ক নহে? আজ তিনি বিরুদ্ধবাদী নরীম্যান ও খারেকে জব্দ করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে কতকগুলি ভুয়া পরিকল্পনা দাখিল করিয়া কি করিয়া নিজের দলের প্রাধান্য বজায় রাখিবেন, মন্ত্রী ও কংগ্রেসের দলপতির স্রষ্টা হইবেন ও জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিবেন, তাহা লইয়া ব্যস্ত, অথচ অসহায় জন-সাধারণের দুঃখ-কষ্ট ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাও কি নীচ স্বার্থ-পরতার অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে? যদি তাঁহার পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কিছু মাত্রও চিন্তার খাদ্য থাকিত, তাহা হইলে উহা সাফল্য লাভ করিতে না পারিলেও তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে অন্য চক্ষে দেখা যাইত, কিন্তু ঐ পরিকল্পনাগুলিতে যে কোন চিন্তার খাদ্য নাই, পরন্তু উহার প্রত্যেকটি যে লোকচক্ষে ধূলি প্রদান করিবার চেষ্টামাত্র, তাহা আমরা একাধিকবার এই বঙ্গশ্রীতে দেখাইয়াছি।

তাঁহার কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার উজ্জ্বল প্রমাণ নরীম্যান ও খারের সহিত তাঁহার ব্যবহারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা ছাড়া যাঁহারা তাঁহার সহিত প্রত্যক্ষ চিঠি-পত্র ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে আমাদিগের ব্যক্তিগত চিঠি হইতে এতৎসম্বন্ধে প্রমাণিত করিতে পারিব। 'দশ মণ তেলও পুড়িবে না এবং রাধাও নাচিবে না', ইহা জানিয়া 'তোমরা অমুক অমুক করিলে আমি তোমাদিগকে একবৎসরের মধ্যে স্বরাজ আনিয়া দিব', এবংবিধ বাণী প্রদান করা কি ঘোর কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার সাক্ষ্য নহে? "কংগ্রেসের আমি চারি আনার সভ্যও নহি", ইহা মুখে বলা আর কার্য্যতঃ কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভার প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনটিতে যোগদান করিয়া প্রত্যক্ষ ও

পরোক্ষভাবে উহার প্রত্যেক কার্য্যের নায়কত্ব করা কি ঐ কপটতা ও মিথ্যাবাদিতার অন্যতম দৃষ্টান্ত নহে ?

কপটতা ও মিথ্যা কথার দ্বারা তিনি তাঁহার হিংস্র প্রবৃত্তি লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে এবং প্রায়শঃ তাহাতে কৃতকার্য্যও হন বটে, কিন্তু খারে ও নরীম্যানকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তিনি যেরূপ ভাবে প্রকারান্তরে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংবাদ হইতে মনে করা যায়, তাহাতে কোন ক্রমেই তাঁহাকে হিংস্র না বলিয়া পারা যায় না। যদি দেখা যাইত যে, তাঁহার বিরুদ্ধবাদিগণের মধ্যে এক জনও কংগ্রেসের কার্য্যকরী সভ্য হইতেন, অথবা কোনরূপ দলপতিত্ব করিতে সক্ষম হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যে অহিংস হইবার চেষ্টা আছে তাহা বলা যাইত বটে, কিন্তু তাহা কার্য্যতঃ কোথায়ও দেখা যায় না।

গান্ধীজী স্বয়ং যে স্বার্থপরতা, মিথ্যা, কপটতা এবং হিংস্র প্রবৃত্তি হইতে মুক্ত নহেন, তাহার প্রমাণিত হইলে তাঁহার এতাদৃশ নিঃস্বার্থ-পরতা, সত্যানুরাগ ও অহিংসার বাণীগুলিও যুক্তিসঙ্গতভাবে মিথ্যা ও কপটতার অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে পরিগণিত হয় না কি ?

বাস্তবিক পক্ষে, গান্ধীজীর খ্যাতি আপাতদৃষ্টিতে যতই বৃদ্ধি পাক না কেন, তাঁহার প্রায় প্রত্যেক কার্য্যটি যে হীন চরিত্রের পরিচায়ক, তাহা মানুষ অদূরভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে। তিনি ও তাঁহার অনুচরবৃন্দই যে ভারতীয় জন-সাধারণের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার অন্যতম বিদ্যমান কারণ, তাহা মানুষ এখন না বুঝিতে পারিলেও ৫।৭ বৎসরের মধ্যে বুঝিতে পারিবে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

মানুষের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক অবস্থা কাহাকে বলে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জলপাত্রের নীচে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিয়া যেরূপ পাত্র ও জলের শীতলতা সাধন করা কখনও সম্ভব হয় না, সেইরূপ কোন রকম fighting আর নিঃস্বার্থ-পরতা, সত্যানুরাগ এবং অহিংসা এক সঙ্গে চলিতে পারে না। যাঁহারা গান্ধীজী-কৃত গীতার ব্যাখ্যা অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, উপরোক্ত সাধারণ সত্যটুকু বুঝিবার মত মস্তিষ্ক লাভ করিবার সৌভাগ্য গান্ধীজীর হয় নাই। গান্ধীজী উহা বুঝিতে পারুন আর নাই পারুন, উহা বাস্তব সত্য। নিঃস্বার্থপর, সত্যানুরাগী এবং অহিংস হইতে হইলে সর্ব্ব রকমের fighting-এর প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে; আর কোনরকমের fighting জাগ্রত রাখিতে হইলে নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ এবং অহিংসা প্রবৃত্তি বিসর্জ্জিত করিতে হইবে।

এতাদৃশ ভাবে fighting-এর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্বার্থ-পরতা, সত্যানুরাগ ও অহিংসার কথা কহিলে, বক্তা হয় অতীব নির্ব্বোধ, নতুবা অতীব হীন-চরিত্রের, অথচ বড় কথা কহিয়া বড়ত্বের খ্যাতিলাভ করিবার জন্য প্রযত্নশীল, ইহা বুঝিতে হয়।

ভারতবাসিগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়া, দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি, এবং নফরগিরী হইতে মুক্ত হইতে হইলে, প্রকৃত নিঃস্বার্থপর, সত্যানুরাগী এবং অহিংস নেতার উদ্ভব যাহাতে হয় তাহা করিতে হইবে, ইহা খুবই সত্য, কিন্তু গান্ধীজীর নেতৃত্বে উহা কখনও সম্ভব হইবে না। পাশ্চাত্ত্যের যে-স্বাধীনতার ফলে তাহার প্রত্যেক দেশের মানুষগুলির শতকরা ৯৫ জনকে জীবিকার জন্য চাকুরীরূপী পরাধীনতা অথবা নফরগিরীর উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে, আমরা সেই স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি না। ইহারই জন্য আমরা গান্ধীজীর স্বাধীনতার আন্দোলন ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকি। দেশের মধ্যে নিঃস্বার্থপরতা, সত্যানুরাগ ও প্রকৃত অহিংসার মন্ত্র চালাইতে হইলে গান্ধীজীর স্বাধীনতা অথবা স্বরাজের আন্দোলন যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যক্ত হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরাজ জাতি ভারতীয়গণের প্রতি অকৃত্রিমভাবে সখ্য-ভাব পোষণ করুন আর নাই করুন, ভারতীয় জনসাধারণ যাহাতে ইংরাজ, পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের প্রতি অকৃত্রিম সখ্যভাব পোষণ করেন, কংগ্রেস হইতে তাহার চেষ্টা আরম্ভ হইলেই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতা অদূরভবিষ্যতে করতলগত হইবে এবং সমগ্র মানবসমাজ দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি এবং নফরগিরী হইতে মুক্ত হইবে। মনে রাখিতে হইবে, সদুদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও প্রকৃত সখ্যের ভাব নষ্ট হয় না। মত্তাবস্থায় মাতাল যেরূপ নিজের প্রকৃত হিত কোন্ উপায়ে হইতে পারে তাহা বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কোনরূপ আন্দোলনে মত্ত হইলে আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি বুঝা যাইবে না। গান্ধীজীর তথাকথিত স্বাধীনতার আন্দোলনে দেশের জনসাধারণ ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষে মত্ত রহিয়াছে বলিয়াই আমাদিগের অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলি তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না।

আমরা এখনও সকলকে স্থিরমস্তিষ্ক রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছি।

নির্ঝরিণী —আলোক চিত্র

সেকালের দুর্গোৎসব

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

দুর্গোৎসব বাঙ্গালার জাতীয় উৎসব। এই উৎসবের আনন্দ বাঙ্গালীর মর্ম্মে মর্ম্মে কিরূপ প্রবেশ করিত, তাহা যাঁহারা সে কালের দুর্গোৎসব না দেখিয়াছেন, তাঁহারা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার পল্লীগ্রামে এবং গণ্ডগ্রামে যেরূপ ভাবে এই পূজা এবং উৎসব সম্পন্ন হইত, তাহা আমি দেখিয়াছি। সে কথা আমার বেশ মনে আছে। উহা যেন আমার মনের মধ্যে গাঁথিয়া রহিয়াছে। সে স্মৃতি বড়ই সুখের—বড়ই আনন্দের। এখনও এই নিরানন্দময় জীবনে তাহার কথা মনে করিয়া আনন্দ পাই। এখন সে ব্যাপারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

আমার বাসস্থান এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামে এক ঘর বড় জমিদার ছিলেন। তাঁহাদের বাড়ীতে পূজার খুব ধূমধাম হইত। প্রতিপদে কল্পারম্ভ হইত। ইহা ভিন্ন ঐ গ্রামে কতকগুলি ধনী এবং স্বচ্ছল অবস্থাসম্পন্ন ভদ্রলোকের বাস ছিল। আমি এক বৎসর এই গ্রামে বাইশ খানা পূজা দেখিয়াছি। তে হি নো দিবসা গতাঃ। এখন গ্রামে নাম মাত্র দুইখানি কি তিনখানি পূজা হয়। "নীরব রবাব বীণা মুরজ-মুরলী রে।"

তখন পূজা আরম্ভ হইবার পনর দিন কিংবা বিশ দিন পূর্ব্বে গ্রামময় পূজার সাড়া পড়িয়া যাইত। তখন বাঙ্গালী চাকুরী করিতে বা ওকালতি করিতে বিদেশে যাইত বটে, কিন্তু অনেকে পরিবার লইয়া বিদেশে যাইত না। যাঁহারা উকিল অথবা হাকিম, তাঁহারাই সপরিবারে কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। যাঁহারা কেরাণীগিরি বা শিক্ষকতা করিতেন, তাঁহারা প্রায় কর্ম্মস্থলে পরিবার লইয়া যাইতেন না। যদি বিশেষ প্রয়োজনে লইয়া যাইতেন, তাহা হইলেও অল্পদিন রাখিয়া তাহাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। তখন একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা একটু একটু ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারে এমন ভাবে ভাঙ্গে নাই। তখনও উহার অনেকটা অবশেষ ছিল। যাঁহারা পরিবার লইয়া বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারা প্রায় ভাদ্র মাসের পূর্ব্বেই পরিবারদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দিতেন। কারণ অনেকের বাড়ীতেই পূজা হইত। আবার কেহ কেহ ভাদ্র মাস অতিবাহিত করিয়া আশ্বিনের প্রথমেই পরিবারদিগকে বাড়ী পাঠাইতেন। কেহ কেহ মহালয়ার সময়েই সপরিবারে বাড়ী আসিতেন। ফলে পূজার সময় সকলেই গ্রামে আসিয়া এই আনন্দে যোগদান করিতেন। তখন গ্রামে ম্যালেরিয়া প্রায় ছিল না। গ্রামে যাইতে কেহ ভয় পাইত না।

প্রতিমায় যখন মাটি দেওয়া হইত, তখন হইতে ছেলেদের মনে পরম আনন্দ। পাঠশালা হইতে কোন গতিকে পাঠ শেষ করিয়াই আমরা পূজা-বাড়ী প্রতিমা-গঠন দেখিতে যাইতাম। ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনুভূতিও আমাদের থাকিত না। বাড়ী হইতে বার বার ডাকাডাকির পর কোন গতিকে দুইটি অন্ন মুখে দিয়া আবার পূজা-বাড়ী আসিতাম এবং সন্ধ্যা হইলে মায়ের কাছে বসিয়া দুর্গা-ঠাকুরের কথা শুনিতাম। অসুরটা বড় দুষ্ট ছিল বলিয়া মা-দুর্গা তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছেন, এই কথা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। পূজার আনন্দের জন্য মন বড় ব্যাকুল হইয়া উঠিত। যখন ঠাকুরের গায়ে রং, গর্জ্জন তেল, মুখ বসান এবং চক্ষুদান হইত, তখন আমাদের ছেলের দলের আনন্দ দেখে কে? জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ছেলেরা এই মহানন্দে যোগ দিত। যখন প্রতিমার সাজসজ্জা হইত, তখন ছেলের দল পূজা-বাড়ীতেই বসিয়া থাকিত।

মহালয়া হইতে তৃতীয়া, চতুর্থী পর্য্যন্ত গ্রামের প্রবাসী লোকদিগের বাড়ী ফিরিবার সময়। কচিৎ কেহ পঞ্চমী, ষষ্ঠীর দিন বাড়ী আসিত। যাহারা একক বিদেশে থাকিত, তাহাদের বাড়ী ফিরিতে কিছু বিলম্ব ঘটিত। কারণ, অনেকের আফিস বা স্কুল বন্ধ হইত চতুর্থী-পঞ্চমীর দিন। এই সময় গ্রামের লোক 'অমুক কবে বাড়ী আসছে?' প্রভৃতি

প্রশ্ন প্রায়ই করিত। তৃতীয়া-চতুর্থী হইতে নূতন কাপড় কেনার ধূম পড়িয়া যাইত। তখন এত প্রকার লতাপাতা-যুক্ত কাপড়ের পাড় ছিল না। সিমলা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, বাগেরহাট প্রভৃতি স্থানের তাঁতীরা অতি সুন্দর সুন্দর কাপড় বুনিত। অনেক কাপড়ে ব্লু দেওয়া বা নীল-বড়ির ছোপ দেওয়া হইত। তদ্ভিন্ন ধোয়া কাপড়ও যথেষ্ট আসিত। মহামায়ার আগমন উপলক্ষে যাহার যেরূপ সাধ্য, সে সেইরূপ নূতন কাপড় দিয়া পরিজনবর্গকে সাজাইত। এমন কি মুসলমানরা পর্য্যন্ত নূতন কাপড় পরিত। ঢাকাই কাপড়ের পাড়ের বাহার এবং কাপড়ে নানারূপ ফুল কাটা থাকিত। সম্পন্ন ব্যক্তিরা ঐ কাপড় কিনিতেন। তখন কাপড়ের সঙ্গে উড়ানী (চাদর) ব্যবহার করা হইত। জামার রেওয়াজ কম ছিল। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জামা পরিতেন। মেয়েদের কাপড়ের এত বাহুল্য ছিল না। তবে তখন মেয়েরা গহনা অধিক পরিতেন। বার ভরি, পনর ভরির বাউটি, হস্ত ভরিয়া এক একটী চৌদানী, পনর ভরির হার অনেক ললনার অঙ্গ-শোভা বৰ্দ্ধন করিত।

ষষ্ঠীর দিন হইতে পূজা আরম্ভ। মায়েরা তাঁহাদের ছেলেগুলিকে নূতন কাপড় পরাইয়া দিয়া ঠাকুর দেখিতে পাঠাইয়া দিতেন। ছেলে-মেয়ের দল মহানন্দে দল বাঁধিয়া প্রত্যেক পূজা-বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইত। তখন ছেলেদের আর ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বোধ থাকিত না। এই দিন কে কোন্ বাড়ীতে ভোগ রাঁধিবে তাহা ঠিক করা হইত। রন্ধন-কার্য্যে বিশেষ কুশলা এবং নিষ্ঠাবতী ভিন্ন কাহাকেও দেবতার ভোগ রাঁধিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইত না। আর গ্রামের সাধারণ ব্রাহ্মণ মহিলারা নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণের জন্য রন্ধন করিতে আমন্ত্রিত হইতেন। তখন রাঁধুনী বামুনের রেওয়াজ হয় নাই। গৃহস্থের মেয়েরাই রন্ধন করিতেন। সাধারণ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের জন্য রাঁধিয়া যাঁহার খ্যাতি হইত, তিনিই ভোগ রাঁধিবার অধিকার পাইতেন। যে গ্রামে অধিক পূজা হইত, সে গ্রামে ভোগ রাঁধিবার জন্য লোক পাওয়া কখনও কখনও একটু কঠিন হইত। কারণ অনেকে ভোগ রাঁধিতে সম্মত হইতেন না। কেহ কেহ কোন কোন বার ভিন্ন স্থান হইতে আত্মীয়া স্ত্রীলোক আনিয়া ভোগ-রন্ধন-কার্য্য সমাপন করিতেন। অসম্মতির আসল কারণ, তিন দিন ব্রাহ্মণ-ভোজনের কাল পর্য্যন্ত অনাহারে এবং কঠোর শুদ্ধাচারে থাকিয়া ভোগ রাঁধিতে হইত। শরীর অসুস্থ থাকিলে কেহ ভোগ রাঁধিতে সম্মত হইতেন না।

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। জাতিধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে যে কেহ প্রতিমা এবং পূজা দেখিতে আসিত, তাহাকেই ভুরি পরিমাণে খাদ্য দেওয়া হইত। তখন হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর লোক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিত। মুসলমানরা হিন্দুদের ন্যায় নূতন কাপড় পরিতেন। আমাদের দেশে প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক আগন্তুককে খুব বড় সরার এক সরা চিঁড়া, মুড়কী এবং চারিটি করিয়া রসকরা (নারিকেল ও চিনির সন্দেশ) দেওয়া হইত। ঐ চারিটি রসকরার ওজন প্রায় তিন পোয়া হইত। ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আধ-সরা চিঁড়া, মুড়কী এবং দুইটা করিয়া রসকরা দেওয়া হইত। ইহা ধনী লোকের বাড়ীর ব্যবস্থা। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম অঞ্চলে দেখিয়াছি, হুড়ূম ভাজা, মুড়ি এবং পক্কান্ন দেওয়া হইত। পক্কান্ন ছোলার ডাউলের বেশম তেলে বা ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিয়া প্রস্তুত করা হইত। উহা দেখিতে অনেকটা উড়িয়ার দোকানের কটকটের মত, কিন্তু খাইতে উহা অপেক্ষা অনেক সুস্বাদু। কোন কোন অঞ্চলে মুড়ি মুড়কি ও রসকরা দেওয়া হইত। গরীব লোকরা তত দিতে পারিত না। তথাপি সকলে দুইটি করিয়া নারিকেলের নাড়ু এবং কিঞ্চিৎ মুড়ি মুড়কি পাইত। ফলে পূজা দেখিতে আসিয়া কেহ রিক্ত হস্তে ফিরিত না। বড় বড় পূজা-বাড়ীতে বেলা নয়টা দশটার সময় হিন্দু মুসলমানে প্রায় চারি পাঁচ শত দর্শক উপস্থিত হইত। ইহারা প্রায় সকলেই স্ত্রীলোক এবং বালক। দুগ্ধপোষ্য শিশুটি পর্য্যন্ত জলখাবারের দান পাইত। গরীবের পূজা-বাড়ীতে ঐরূপ দর্শকের ভীড় হইত না।

সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সাধারণতঃ পূজা, চণ্ডীপাঠ প্রভৃতি চলিত। পুরোহিত মহাশয়দিগের আর অবকাশ থাকিত না। দশটার পর গ্রামের পুরুষ এবং মেয়েরা মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিতেন। এক-

দিকে পুরুষ আর একদিকে নারীদিগের আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। উভয় দিকেই প্রচুর চন্দন এবং পুষ্পবিল্বপত্র-সমেত পাত্র থাকিত। নরনারী সংখ্যায়ও কম হইত না। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলে একজন পুরুষের হস্তে আর এক-জন মেয়েদের হস্তে সচন্দন পুষ্প ও বিল্বপত্র প্রদান করিলে পুরোহিত মহাশয় স্পষ্ট এবং সুললিত স্বরে এই স্তব পাঠ করাইতেন :—

ওঁ দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াম্।
সর্ব্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাম্॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাম্॥
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্॥
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বলোকভয়াপহাম্।
ব্রহ্মেশ বিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা শিবাম্। ইত্যাদি।

পুরোহিত মহাশয় যখন সুললিত স্বরে এই মন্ত্র পাঠ করাইতেন, তখন সমস্ত নরনারী এক তানে তাঁহারই সুর-লয়ের অনুকরণ করিয়া সেই মন্ত্র বিশেষ ভক্তিসহকারে উচ্চারণ করিয়া যাইতেন। তখন সেই উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগে মান, লজ্জা, ভয় যেন কিছুই থাকিত না। সকলের নয়ন হইতে ভক্তির অশ্রু বিগলিত হইত। পুরোহিত হইতে ছোট ছোট বালক-বালিকার পর্য্যন্ত কণ্ঠস্বর কম্পিত হইয়া সেই উচ্চারিত শব্দগুলিতে যেন এক অপূর্ব্ব মাধুরী ঢালিয়া দিত। যাহাদিগকে চণ্ডীমণ্ডপে উঠিতে দেওয়া হইত না, তাহারাও যুক্তকরে বাহিরে দাঁড়াইয়া সেই উচ্চারিত কোমল মন্ত্র-মূর্চ্ছনায় এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িত যে, তাহাদের নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহারা মন্ত্র উচ্চারণ করিত না বটে, কিন্তু সেই মন্ত্রোচ্চারণের ভক্তির তরঙ্গ যেন উচ্ছল গঙ্গা-বারির ন্যায় মণ্ডপের সীমা ছাড়াইয়া ঐ সকল মৌন ভক্তের হৃদয়ে সরসতার সঞ্চার করিয়া দিত। তাহাদের নয়নাসারই তাহার সাক্ষ্য দিত। ঢাকী-ঢুলি প্রভৃতি বাদ্য-করগণ করযোড়ে সে ধ্বনি শুনিত আর প্রতিবার প্রতি-মার দিকে তাকাইয়া ললাট ভূমিতে স্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম করিত। তাহার পর পুরোহিত মহাশয় বর-প্রার্থনা মন্ত্র পড়াইতেন।

ওঁ মহিষঘ্নি মহামায়ে চামুণ্ডে মুণ্ডমালিনি
আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি নমোঽস্তুতে॥
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো রক্ষোভ্যঃ পরমেশ্বরি!
ভয়েভ্যো মানুষেভ্যশ্চ দেবেভ্যো রক্ষ মাং সদা॥
ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
উমে ব্রহ্মাণি গৌমারি বিশ্বরূপে প্রসীদ মে। ইত্যাদি।

এই মন্ত্র পড়িয়া মূল-মন্ত্র স্মরণ করিয়া দেবীর চরণে সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্র-দূর্ব্বাদি অঞ্জলি দিতে হইত। কোন কোন পূজা-বাড়ীর পুরোহিত যাঁহারা দীক্ষিত তাঁহাদিগকে এক সঙ্গে এবং যাঁহাদের দীক্ষা হয় নাই তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে এক সঙ্গে অঞ্জলি প্রদান করিতে বলিতেন। কর্ম্ম-বাড়ীর কর্ত্তা ও গৃহিণী দীক্ষিতদিগের সহিত এক সঙ্গেই পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। কারণ, তাঁহারা সে পর্য্যন্ত অদীক্ষিত থাকিতেন না। যাঁহারা পরে আসিতেন, তাঁহাদিগকেও পরে অঞ্জলি দেওয়ান হইত। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পর বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিত। ঐ সময়ে বলিদান এবং পরে ভোগ দেওয়া হইত। বলিদান শশা, কলা, চাল কুমড়া, আখ প্রভৃতি দিবার পর ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হইত। সপ্তমী-পূজার দিন বলির বাহুল্য হইত না। কোন কোন বাড়ীতে পশুবলি একেবারেই দেওয়া হইত না। কোন কোন বাড়ীতে সপ্তমী-পূজায় পশুবলি দেওয়া হইত না। আবার অনেক বাড়ীতে কেবল মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজায় একটি মাত্র ছাগ বলি এবং নবমী পূজায় দুই তিনটি ছাগ বলি দেওয়া হইত।

বলিদান এবং ভোগ হইবার পরই ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজন। তখন ভোজনের উৎপাত ছিল না। উত্তম গব্য ঘৃত ও দুগ্ধ যথেষ্ট পাওয়া যাইত। তবে পূজার সময় উহার মূল্য বৃদ্ধি হইত। তখন ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বা অম্ল-রোগের নাম পর্য্যন্ত অনেকে শুনে নাই। সামান্য গৃহস্থের বাড়ীতেও পঁচিশ ত্রিশ রকম ব্যঞ্জন, মৎস্য, পায়স ও মিষ্টান্ন পর্য্যাপ্ত থাকিত। এক একজন ব্রাহ্মণ (অথচ সকলে নহেন) পর্য্যাপ্ত আহারের পরও দুই সের সন্দেশ এবং এক সের দধি খাইতেন। মুণকে রঘু তখনও মরেন নাই। এক একজন মাছ খাইতেন এক সের, দেড় সের। পরমান্ন-ভোজনের সে হুস্-হাস্ শব্দ আর শুনা যায় না। উহাও লোক ভূরি পরিমাণে খাইত। তখন অনেক দরিদ্রের কুটীরেও মা আসিতেন। প্রায় সকল

গ্রামেই দুই একজন ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়াও মায়ের পূজা করিতেন। টসপুরের এক গরিব ব্রাহ্মণের বাড়ী আমি খাইতে গিয়া দেখিয়াছি, তথায় ব্যঞ্জনাদি অতি সুস্বাদু ও অমৃততুল্য হইয়াছে। প্রত্যেক বারই এইরূপ হইত। তিনি অধিক লোক নিমন্ত্রণ করিতেন না। কিন্তু নিতান্ত ভক্তিভরে পূজা করিতেন এবং অত্যন্ত ভক্তির সহিত সকলকে খাওয়াইতেন। তাঁহার বাড়ী আয়োজনও কম হইত না। তিনি যথেষ্ট আয়োজন করিতেন অন্য জাতি-কেও এবং কাঙ্গালীদিগকেও তিনি খুব শ্রদ্ধাসহকারে ভোজন করাইতেন। তাঁহার বাড়ী লোক তরিতরকারী অযাচিতভাবে দিয়া যাইত। লোকের বিশ্বাস ছিল, মা ঐ বাড়ী নিশ্চয়ই আসেন। তবে তাঁহার বাড়ী মুণকে রঘুর আমদানী হইত না বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার নিমন্ত্রিতের সংখ্যা ৭০-৮০টির অধিক হইত না। বহু স্থানে পূজা হেতু সকলে তাঁহার বাড়ী খাইতে আসিতেন না। সকল বাড়ীতে, যায় জমিদার-বাড়ীতে পর্য্যন্ত, গৃহস্বামী এবং গৃহকর্ত্রী ব্রাহ্মণ-ভোজন শেষ হওয়া অবধি নিরম্বু উপবাসী থাকিতেন। ইহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। কেহ কেহ বাইরের লোকের খাওয়া শেষ হওয়া অবধি অভুক্ত থাকিতেন। কেহ যেন অভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়, সে দিকে সকলে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

সন্ধ্যার পরই আরত্রিক করা হইত। এখনও হয়, তবে তখন এই ধূপ-দানের কিছু বিশেষত্ব ছিল। ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুলের গন্ধে চণ্ডীমণ্ডপ আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। বাদ্যকরেরা বিশেষ ঘটা করিয়া নাচিয়া নাচিয়া বাদ্য বাজাইত। ধূনা-ধূপের ধূমে প্রতিমা আর স্পষ্ট লক্ষিত হইত না। পল্লীর নর-নারীরা পূজা দেখিতে আসিয়া দেবীর দুইদিকে গলবস্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেন। পুরোহিত আরত্রিক করিতেন। ভক্তগণ 'মা মা' শব্দে গগন-পবন মুখরিত করিতেন। আরত্রিকের সময় কোন কোন স্থলে নৃত্যও হইত। প্রায় দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা আরত্রিক কার্য্য চলিত। আরত্রিকের পর সমবেত ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলাদিগকে কর্ম্ম-কর্ত্তা ও গৃহিণী বৈকালি দিতেন। মেয়েরা প্রায় উহা আঁচলে বাঁধিয়া বাড়ী লইয়া আসিতেন। পুরুষরা কেহ বসিয়া খাইতেন, কেহ বাড়ী লইয়া আসিতেন। ইহা light refreshment (জলযোগ)। তবে তখন এখনকার মত কচুরী, সিঙ্গাড়া, নিমকি বড় ছিল না। গজা, বঁদে, রসকরা আর কাটা ফল প্রভৃতিই ছিল। পূজার কয়দিন সাধারণ পূজা এইরূপেই নির্ব্বাহিত হইত।

মহাষ্টমীর দিন অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। মহাষ্টমী যেমন সাধনার এবং পূজার দিক্ দিয়া বিশিষ্ট ছিল, সেইরূপ উহা বীরাষ্টমী বলিয়া ঐ দিন বীরভাবের অনেক কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। ঐ দিন বলিদানকালে কোন কোন বাড়ীতে মহিষ বলি হইত। অতি প্রকাণ্ড খড়্গ দিয়া কর্ম্মকার এক কোপে মহিষের মুণ্ডচ্ছেদ করিত। সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত বলির দিকে চাহিয়া থাকিত। কারণ, বলি বাধিলে বিষম অমঙ্গলের শঙ্কা জন্মে। গৃহিণী সেই জন্য দুর্গা-প্রতিমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন, কর্ত্তা গলায় বস্ত্র দিয়া মাকে আহ্বান করিতেন। ঢাকী-ঢুলি সকলে নাচিয়া নাচিয়া বাদ্য বাজাইত। পুরোহিত নিষ্পন্দ দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া ইষ্টমন্ত্র জপিতে থাকিতেন। কর্ম্মকার প্রতিমার দিকে চাহিয়া যেমন সেই বৃহৎ খড়্গ তুলিতেন অমনই চতুর্দ্দিক হইতে 'জয় মা দুর্গে' শব্দ উঠিত। যেমন মহিষমুণ্ড দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িত, অমনই 'জয় মা' শব্দে দশদিক্ পূর্ণ হইত, কর্ত্তা-গৃহিণী প্রতিমার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেন। পুরোহিত মহিষের রক্ত দেবীকে নিবেদন করিয়া দিতেন। অমনই প্রাঙ্গণস্থিত বহু সবল-কায় লোক সেই মহিষের রক্ত গায়ে মাখিয়া তাণ্ডবনৃত্য জুড়িয়া দিত। হাতাহাতি, কোস্তাকুস্তি প্রভৃতি আরম্ভ হইত। এক এক জন পাঁচ ছয় হাত লম্বা লাঠি এমন ভাবে ঘুরাইত যে, লাঠি দেখিতে পাওয়া যাইত না। কেহ কেহ সেই লাঠিতে ভর দিয়া এরূপ লম্ফ দিত যে উঁচু এক-তলার ছাদের উপর যাইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইত। কেহ কেহ মাটির দিকে মুখ করিয়া 'রা রা রা রা' শব্দে এমন চীৎকার করিত যে, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত সেই শব্দ শুনা যাইত। অনেকে দাঁত দিয়া ঝুনা নারিকেল ছুলিয়া দুই হাতের তালুর চাপে তাহা ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ করিত। কেহ কেহ দুইখানি ঝামা এক হাতের মধ্যে লইয়া তাহা পরস্পর ঘসিয়া একেবারে ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ফেলিত। অনেক ভদ্র-সন্তান ব্রাহ্মণ প্রভৃতিও ইহা করিতে

পারিতেন। নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রায়-বেঁশেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রায়বাঁশ দুই হাতে দুইখানা লইয়া এমন বেগে ঘুরাইত যে, সে বাঁশ আর দেখা যাইত না। ইহা ভিন্ন কোন কোন অঞ্চলে মাটিতে ছোট চৌবাচ্চা করিয়া যুবকেরা মল্লক্রীড়া করিত। এইরূপ নানা বীরত্ব-সূচক ক্রীড়া-কৌশল এইদিনে প্রদর্শিত হইত। আমি স্বয়ং যাহা দেখিয়াছি তাহার কথাই লিখিলাম। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় অনেক ব্রাহ্মণ ভোজনের পর আড়াই সের তিন সের সন্দেশ এবং একখানা দধি খাইয়া ফেলিতেন। মহাষ্টমীর দিন অনেকে মাকে বুকের রক্ত দান করিতেন। অনেকে এই দিন উপবাসও করিতেন।

নবমী পূজার দিন কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং-এর ব্যাপার। নবমী পূজার দিন গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে সমস্ত কুশদহ সমাজের ব্রাহ্মণ ভোজন করান হইত। প্রায় চারি পাঁচ হাজার ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে বসিয়া ভোজন করিতেন। অত বড় বহির্ব্বাটির ভিতরে, উপরে, নীচের উঠানে এবং বাটির বাহিরে ঘেরা স্থানে ব্রাহ্মণ বসিতেন। কত প্রকার খাদ্যের আয়োজন যে করা হইত, তাহার ইয়ত্তা হয় না। কত লোক যে পরিদর্শন করিতেন, তাহা ঠিক করা যাইত না। জমিদার বাবুরা এবং তাহাদের আত্মীয়রা সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া কোথাও কোন ত্রুটি হইতেছে কি না দেখিয়া বেড়াইতেন। সে ব্রাহ্মণ-ভোজনের দৃশ্য না দেখিলে তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল কার্য্য যেন ঘড়ির কাঁটার ন্যায় নিয়মিত ভাবে সম্পন্ন হইত। সে দিন আর বাঙ্গালায় ফিরিবে না। সুবর্ণপুরের জমিদার স্বর্গীয় মহানন্দ রায়ের বাড়ীতে অনেক ব্রাহ্মণ যাইতেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে এত ব্রাহ্মণ হইত না।

একবার নদীয়া জেলার বিল্বগ্রাম অঞ্চলে অজন্মা হইয়াছিল। বহুলোক পর্য্যাপ্ত খাইতে পাইতেছিল না। সেই সময় পূজা উপস্থিত হয়। উক্ত গ্রামে আমার ভগিনী-পতির বাড়ীতে পূজা হইত। তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, ঢেঁটরা দিয়া কাঙ্গালী আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে নবমীর দিন খাওয়াইবেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে ঐ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কারণ তাহা হইলে এত লোক হইবে যে সামলান যাইবে না। শেষে উহা করাই সাব্যস্ত হয়। অনেকে আন্দাজ করেন যে ১৫ মণ চাউল এবং ৫ মণ দাইল সিদ্ধ করিলেই হইবে। তবে মাছ তত পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় নাই। যাহা হউক, তাহাই করা হইল। নবমীর দিন ভোর বেলা বাইন কাটিয়া বড় বড় ডেকচি চাপাইয়া অন্ন পাক হইতে থাকিল। দাইল তরকারী অন্য লোক রন্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এতগুলি চাউলের অন্ন রাঁধিয়াছিলেন আমার রাধিকা দাদার স্ত্রী একা। তিনি বেড়ি দিয়া সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ডেকচি ধরিয়া ঝুড়ির উপর ভাত ঢালিয়া দিতে থাকিলেন। ফেন পড়িয়া গেলে দুইজন যুবক তাহা যথাস্থানে লইয়া যাইতে থাকিল। শেষে দেখা গেল যে, ঐ চাউলে কুলাইবে না। তখন তিনি আরও প্রায় দুই মণ অন্ন পাক করিয়াছিলেন। তিনি এখন লোকান্তরে। কিন্তু বাঙ্গালায় এখন সেরূপ মহিলা আর জন্মিবে কি? সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া তিনি রন্ধন করিয়াছিলেন। আমি কিছুক্ষণ ভোগের ঘরে কাজ করিয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার হাতে জল দেওয়া, কাঠ আনিয়া দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়াছিলাম। সেদিন কত লোক খাইয়াছিল তাহা গণনা করা হয় নাই। আমি সমাগত দরিদ্রদিগকে পরিবেশন করিয়াছিলাম। আজ আমি এই উপলক্ষে সেই স্বর্গীয়া মহিলার উদ্দেশে শত শত প্রণাম করিতেছি। রাধিকা দাদার স্ত্রীর নয় দশ বৎসরে বিবাহ হইয়াছিল। কাঙ্গালী-ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একবিন্দু জলও স্পর্শ করেন নাই। বিল্বগ্রামে বহু পূজা হইত। এখন কি হয় জানি না। তবে অন্যান্য পূজা-বাড়ীর লোকও কাঙ্গালী-ভোজনে পরিবেশন করিতে আসিয়াছিলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে ও অন্যান্য ধনী বাড়ীতে বহু কাঙ্গালী ভোজন করান হইত।

দশমীর দিন বিজয়া। সে দিন সকলের মন বিষণ্ণ। কয়েক দিন পরে বাড়ীতেই ভোজনের ব্যবস্থা। বিসর্জ্জনের সময় শান্তিজল ও যাত্রার পুষ্প লইবার জন্য পূজা-বাড়ী যাওয়াই এই দিনের কাজ। বৈকালে জলাশয়ে প্রতিমা বিসর্জ্জন। উহা ছিল এক বিরাট ব্যাপার। আমাদের বাল্যকালে যমুনা নদীতে প্রায় দুই শত ছোট-বড় নৌকা আসিত। তন্মধ্যে সাঁড়া পোলের পানসী ছিল সরু ও

লম্বা। এক একখানি পান্‌সীতে একজন করিয়া মাঝি আর ছয়জন আটজন করিয়া দাঁড়ী থাকিত। ইহারা বাজি রাখিয়া তীরবেগে নৌকা ছুটাইত। নৌকা যেন জল কাটিয়া তীর বেগে ছুটিত। যাহারা বাজী জিতিত তাহারা আরোহীদিগের নিকট হইতে পুরস্কার পাইত।

বেলা তিনটার সময় বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়া উঠিত। আমাদের গ্রামে দুই ঘর জমিদার বাড়ীতে পূজা হইত। উভয় জমিদারই ব্রাহ্মণ, উভয়েই নৈকষ্য কুলীন। ছোট জমিদারও বড় জমিদার বাটীর দৌহিত্র সন্তান। প্রতিমা-বরণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া বাড়ীর বাহিরে আনা হইত এবং তথা হইতে প্রতিমা বাদ্য-ভাণ্ড সহকারে নদীবক্ষে নৌকায় লইয়া যাওয়া হইত। চারিখানি পান্‌সী নৌকা এক সঙ্গে বাঁশ দিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর সেই বৃহৎ প্রতিমা কৌশলে রক্ষিত হইত। এমন কৌশলে রক্ষিত হইত যে, দুইখানি দুইখানি নৌকা বাঁধন কাটিয়া সরাইয়া লইলেই প্রতিমা ধীরে ধীরে জলে পড়িবে। বাজন্দারগণ ভিন্ন নৌকায় থাকিত। নৌকায় প্রতিমা রক্ষা করিবার পর সেই নৌকা যমুনা নদীর ঘাটে ঘাটে লইয়া দেখান হইত। ঘাটে সহস্র সহস্র নারী প্রতিমা দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা নূতন বস্ত্র এবং অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া আসিতেন। দূর গ্রাম হইতেও অনেক নারী গো-যান করিয়া বিসর্জ্জন দেখিতে আসিতেন। পুরুষরা কেহ কেহ নৌকায় করিয়া নিরঞ্জন দেখিতে যাইতেন, অনেকেই নদীতীরস্থ রাজপথে বেড়াইয়া প্রতিমা দেখিতেন। সকল প্রতিমাই নৌকায় লইয়া যাইয়া বিসর্জ্জন করা হইত। প্রথমে সাঁড়া পোলের পার্শ্বে খুব প্রতিযোগিতা চলিত। মাঝে মাঝে দুই একটা পান্‌সী ডুবিয়া যাইত, কিন্তু কখনও কেহ ডুবিয়া মরিয়াছে শুনি নাই। ঘাটে যখন এক একখানি প্রতিমা আসিত, তখনই শত শত নারী-কণ্ঠে 'মা মা' ধ্বনি উঠিত। "মাগো সম্বৎসর স্বামী পুত্রদিগকে বাঁচাইয়া রাখিও, আবার যেন আগামী বৎসর এমনই আনন্দে তোমায় দেখিতে পাই।" প্রতিমা ঘাটে ঘাটে যাইয়া ভিড়িতে বিলম্ব হইত। তাহার পর সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম গগনে রক্তিম বর্ণ ধরিয়া অস্তে যাইতে বসিতেন, সেই সময় বড় জমিদার মহাশয়দিগের প্রতিমা পূর্ব্ববাহিনী যমুনায় দুর্গাদহ নামক অগাধ জলপূর্ণ দহে আসিয়া সাতপাক ঘুরিতে আরম্ভ করিত। কৃষ্ণনগর হইতে আমদানী করা সুদক্ষ কারিকর-নির্ম্মিত এই দুর্গামূর্ত্তির মুখমণ্ডল অতি সুন্দর হইত। প্রতিমা হইত অতি প্রকাণ্ড। সেই সময় যমুনার নীল জল লোহিত সূর্য্যকিরণে লোহিতাভ হইয়া উঠিত। 'তামগ্নি-বর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু দৃষ্টাম্' দুর্গা-প্রতিমার মুখমণ্ডলে সূর্য্যের লোহিত কিরণ প্রতিবিম্বিত হইত বলিয়া মনে হইত, মা যেন চৈতন্যরূপিণী হইয়া সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। দর্শকদিগের মনের বিষাদ সেই প্রতিমায় প্রতিফলিত হইত বলিয়া মনে হইত, মা যেন কাঁদিতেছেন। দুই একবার প্রতিমা কাঁপিয়া উঠিত। নিম্নের বাঁশগুলি সরাইয়া লইবার জন্য। কিন্তু লোক সেদিকে দৃষ্টি দিত না। মনে করিত, মা যেন মাথা নাড়িয়া সকলকে বিদায় দিতেছেন। দেখিতে দেখিতে সেই অতিকায় প্রতিমা সলিল-গর্ভে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হইত। তখনই সহস্র কণ্ঠে 'মা মা' ধ্বনি উঠিত। লোক যমুনার জল শান্তিজল মনে করিয়া মাথায় ছিটা দিত। নারীরা বলিতেন, "মাগো সম্বৎসর পরে আবার সকলের হাসিমুখ দেখিতে আসিও।" তাহার পর ছোট জমিদার বাড়ীর প্রতিমাও বিসর্জ্জিত হইত। এ প্রতিমাও কৃষ্ণনগরের কারিকর দ্বারা নির্ম্মিত। এই প্রতিমাও ঐ দুর্গাদহে বিসর্জ্জন করা হইত। সূর্য্য-দেবও সঙ্গে সঙ্গে দিক্‌চক্রবালে অস্তমিত হইতেন। তাহার পর অন্য প্রতিমাগুলি যথাস্থানে নীত হইয়া বিসর্জ্জিত হইত। বিসর্জ্জনের পরে সানাইয়ে করুণ বেহাগ রাগিণীতে বিজয়া-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বাদ্যকর কর্ম্মকর্ত্তাদিগের বাড়ীতে উপস্থিত হইত।

পূজার পর প্রণামের ও আলিঙ্গনের পালা। শত্রু-মিত্রনির্ব্বিশেষে সকলে সকলের সহিত আলিঙ্গনে বদ্ধ হইতেন। গুরুজন আশীর্ব্বাদভাজন ব্যক্তিদিগকে আশী-র্ব্বাদ করিতেন। প্রণাম ও আলিঙ্গনে জাতি-বিচার প্রায় করা হইত না। লোক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া গুরুজনকে প্রণাম করিতে যাইত। সকলেই আগন্তুকদিগকে মিষ্ট মুখ করাইতেন। এই সময়ে জগতের নশ্বর ভাব লোকের

মনে ফুটিয়া উঠিত। লোকে সহজেই পার্থিব শত্রুতার কথা ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া যাইত।

সেকালে, অর্থাৎ অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জিনিষপত্র এত দুর্ম্মূল্য ছিল না, অনেক প্রয়োজনীয় জিনিষ স্বচ্ছন্দে পাওয়া যাইত। সুতরাং সেই জন্য লোক একজনের স্থলে দশজনকে অন্ন দিতে ভয় পাইত না। বরং লোককে অন্ন দিতে প্রায় সকলেই আনন্দ বোধ করিত। ইহা ভিন্ন তখনকার পূজায় লোকের ঐকান্তিকতা ছিল, ধর্ম্ম-বিশ্বাস দৃঢ় ছিল। এখন তাহা নাই। গুরু-পুরোহিতদিগকে লোক অধিক ভক্তি করিত। বাড়ীর নিরেট বোকা ছেলেটি পৌরোহিত্য বা গুরুতা করিত না। ইহা ভিন্ন তখন সকলেরই নিজ জন্ম-গ্রামের এবং গ্রামস্থ লোকের উপর একটা আন্তরিক টান ছিল। কাজেই লোক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা করিত। গ্রামের শ্রী ছিল। খাঁটি জিনিষ পাওয়া যাইত। লোকের ধর্ম্মভয় ছিল। খাদ্য-দ্রব্যে কেহ ভেজাল দিত না। তখন লোক হৃদয়বান্ ছিল, কিছু কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ত ছিল। তখন 'Fact and Faith' প্রভৃতির ন্যায় পুস্তক পড়িয়া লোক পণ্ডিত সাজিত না। এখন সে দিন গিয়াছে, বুঝি বা আর ফিরিয়া আসিবে না। কালী-পূজা পর্য্যন্ত পল্লীগ্রাম এইরূপ উৎসবময় থাকিত। তখন লোকের কষ্ট-সহিষ্ণুতা এবং কর্ম্মশক্তি ছিল অসাধারণ।

বিশ্বযজ্ঞে

—শ্রীকালিদাস রায়

বিশ্ব ভরিয়া লক্ষ শিখায় যে মহাযজ্ঞ জ্বলে
মহামানবের জীবন গলিয়া হবি-ধারা তায় গলে।
লক্ষ তৃষিত রসনা মেলিয়া লেহিছে বৈশ্বানর,
বিশ্বনরের সঞ্চিত যত সম্বল পরিকর।
আহুত তাহায় রূপ যৌবন ধন জন সংসার,
বিজয়-ধ্বজা রথ রাজা-প্রজা সমারোহ সম্ভার।

যত হাহাকার মন্ত্রে ডুবায় ঋত্বিক মহাকাল,
হোম-ধূমে তার রঞ্জিত আঁখি কুঞ্চিত তার ভাল।
জাতি-প্রেমের যূপে যূপে বহে জীব-শোণিতের স্রোত,
ভরি' পারাবার ইন্ধনভার বহিছে হাজার পোত।
সাম্য মৈত্রী সোম বল্লীর মুষলে পীড়ন চলে,
মোদন মদির পানীয়ের তরে স্বার্থের উদূখলে।

এ মহাযজ্ঞ দেবতাগণেরে করিতে তুষ্টি দান,
মানবের নাই হেথায় স্বস্তি শরণ পরিত্রাণ।
মানবের তরে শুধু আছ তুমি জননী সরস্বতী,
তোমার চরণ ছাড়া নাই তার অন্য শরণাগতি।
তোমার বীণার সাতটি সুরের মাধুরী সারাৎসারা,
চিরদিন এই জ্বালাময় প্রাণে ঢালিতেছে বসুধারা।

অভিভাবক

—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

ব্যারিষ্টার এস.কে. ড্যাট ক্লাব হইতে একটু রাত করিয়াই ফিরিলেন। মোটর হইতে নামিয়া বেয়ারাকে প্রশ্ন করিলেন, "সে সম্বন্ধী এসেছিল আজও,—সেই ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্টটা ?"

ক্লাবের ফেরৎ স্বরটা একটু জড়িত এবং মেজাজটা একটু চড়া পর্দ্দায় বাঁধা থাকে; আর ঠিক সে 'সম্বন্ধী' কথাটাই ব্যবহার করিলেন তাহা নয়। যেটা ব্যবহার করিলেন সামাজিক ভাষায় তাহার মানে হয়, সম্বন্ধী। আমরাও এই কথাটাই চালাইব।

বেয়ারা বলিল, "আজ্ঞে না, সে আজ আর আসে নি।"

সিধা হইয়া সামান্ত দুলিতে দুলিতে বলিলেন, "সো মাচ্ দি বেটার ফর হিম্। এবার এলে জিজ্ঞেস করবি তার নিজের লাইফ ইনসিওর করা আছে কি না।"...

"যে আজ্ঞে হুজুর।"

"কেন? হোয়াই?"

বেয়ারা উত্তর দিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। ড্যাট সাহেব তাহার বুকের কাছে তর্জ্জনীটা লইয়া গিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "যেহেতু তাহার অভ্যর্থনার জন্য কল্য হইতে আমার ব্লডহাউণ্ড লীয়নকে খুলিয়া রাখা হইবে।...বলে দিবি।"—বলিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

২

বারান্দার একপাশে মক্কেলদের বসিবার ঘর। পর্দ্দা সরাইয়া ভিতরে উঁকি মারিয়া বেয়ারা বলিল, "ও হবে না বাবু, শুনলেন তো? ক্রমেই বেশি রকম খাপ্পা হয়ে উঠছেন, কোন্ দিন খেয়ালের মাথায় কি একটা করে বসবেন...এমনি তো সাহেব খুব ভাল, তবে..."

"তাই দেখছি"—বলিয়া একটি ছোকরা বিষণ্ণভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। পর্দ্দার ফাঁকে বাহিরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "চলে গেছেন ওপরে, না?"

বারান্দায় আসিয়া পকেট হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া বেয়ারার হাতে দিয়া নামিয়া গেল। বেয়ারা সিকিটা বিদ্যুতের আলোয় ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নামিয়া তাড়াতাড়ি ছোকরাটির কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কালও আসবেন না কি বাবু? আরে খাপ্পা হয়ে তো আর খুন জখম করবে না...অত ভয় করলে কি কাজ চলে?"

ছোকরা একটু দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া বলিল—"ঠিক বলতে পারছি না বাপু, তবে সম্ভবতঃ নয়। যদি আসিই তো তুমি তোমার চার-আনি থেকে বঞ্চিত হবে না।" বলিয়া একটু হাসিল।

বোস ব্রাদার-ইন-ল ফ্যামিলী ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। আজ চার দিন হইতে যাওয়া আসা করিতেছে, কিন্তু সুবিধা হয় নাই। প্রথম দিন সামান্ত মিনিট দশেক ধরিয়া একটু কথা কহিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে নিজেদের প্রস্‌পেক্টাস্‌টা বুঝাইতেই কুলায় নাই। ইহার পর আদৌ বীমা করিবার যৌক্তিকতা দেখান আছে, তাহার পর অন্যান্ত দেশী বিদেশী তাবৎ বীমা কোম্পানীর প্রবঞ্চনা এবং অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ উপস্থিত করা আছে; তাহার পর যদি মন ভেজে।

অবশ্য দেশী এবং বিদেশী কোম্পানীগুলা যে প্রবঞ্চক এবং অন্তঃসারশূন্য এটা বুঝাইতে বেগ পাইতে হইবে না। যতদূর খবর পাওয়া গেছে এবং পরিচয়েও যেটুকু বোঝা গেছে এ-সম্বন্ধে ড্যাট্ সাহেবের তাহার সঙ্গে মতান্তর নাই। কিন্তু ও সবের মধ্যে বোস ব্রাদার-ইন-ল ফ্যামিলী যে একমাত্র ব্যতিক্রম, এ ধারণাটা অমন সুরক্ষিত মনোদুর্গে কোন ফাটল-টাটল দিয়া সঁাদ করাইয়া দেওয়া চলিবে কি না, সেই হইয়াছে সমস্যা।

কোন আশা নাই; বড় বড় জাঁদরেল রকম এজেন্টরা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। সেখানে কি এই আই-এ ফেল কোঁচা-লটকান ছোকরা-এজেন্ট অনাথ সরকারের কাজ?

তবে লোভ ছাড়া দুষ্কর। লোকটা শ্বশুরের একমাত্র কন্যার সঙ্গে অগাধ টাকা ঘরে তুলিয়াছে। আর ইনসিওরেন্স ভাষায় যাকে বলে একেবারে 'ভার্জিন সয়েল'—না রেস্, না শেয়ার-মার্কেট, না ইনসিওরেন্স—কোনটাই ফালের একটু আঁচড় পর্য্যন্ত দিতে পারে নাই।

তাই এই কঠোর তপস্যা চলিতেছে; ধ্রুব কিংবা প্রহ্লাদের তপস্যার চেয়ে কোন অংশে খাটো নয়।…তবে, কোন আশা নাই।

আর আজকের ব্যাপারে উৎসাহও ভাঙ্গিয়া গেছে। অন্তরালে রাজা-বাদশাকেও সবার 'সম্বন্ধী' হইতে হয়। এ একেবারে গালাগালটা স্বকর্ণে শুনিতে হইল! এর পরে আর এ-বাড়ীতে পা দেওয়া চলে না।

মনটা সত্যই বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে, আত্মধিক্কারে। সমস্ত দিন নানান জায়গায় হাজির দিয়া দিয়া পায়ের সুতা ছিঁড়িয়া যাইতেছে। আসল কাজের জমার ঘরে একেবারে শূন্য। চাকরির সমস্ত দ্বার বন্ধ, ও দিকে বাড়ীতে বৃদ্ধ পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। ভরসা এই দালালিটুকু, এইটুকুকে সারাদিন নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া দু'ফোঁটা রস গড়াইয়া আসে হাতে।…চোখে জল আসিয়া পড়ে। অবশেষে গালাগালটা পর্য্যন্ত অদৃষ্টে ছিল!

গলাটা শুকাইয়া আসিতেছে—গলার রসই যেন চোখে ঠেলিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা—তিনটি ঘণ্টা আজ একাসনে গিয়াছে! অনাথ সরকার গিয়া একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইল। বলিল—"দু'পয়সার দু'টি ডবল খিলি—বেশ ভাল করে সেজে দে দিকিন।"

৩

পানওয়ালার অবস্থা ভাল, দুইটী সহকারী। নিজে অন্য একটি ছোকরার সহিত কি লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিতেছিল, হুকুম করিল—"খুব ঠিকসে বনা দে বাবুকো।"

তাহার পর হাসিয়া অনাথ সরকারের দিকে চাহিয়া বলিল, —"বাবু, একে জিজ্ঞেস করেন তো আমার কে হোয়।" অনাথ বোধ হয় প্রশ্নেরই উদ্দেশ্যে ছেলেটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিল।

ছেলেটি একটু লজ্জিতভাবে ছদ্ম ক্রোধের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"ও পাগলা আছে বাবু, শুনবেন না ওর কথা।"

"আচ্ছা, শপথ করকে বোলো।"

যে ছোকরা পান সাজিতেছিল, মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিল,—"ওর বহিনকে সোমবারী রাউত সাদী করেছে বাবু।"

ছেলেটা তাহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া বলিল,— "হামারা বহিন হি নেহি হ্যায়, হোগাভি নেহি,—বাপ মা দুনো চৌপট!" বলিয়া ও দিক্ দিয়া নিজের নিশ্চিন্ততায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর অনাথকে সাক্ষী মানিয়া বলিল,—"আপনিই বিচার করেন বাবু,—গাঁয়ের লেড়কী সাদী করলেই যদি সব হোত তো সোমবারী ভইয়ার গাঁয়ে যারা সাদী করেচে সবাইতো সম্বন্ধে ওর…"

সোমবারী হাসিয়া তাহার মুখটা চাপিয়া ধরিল এবং উহারই মধ্যে খানিকটা বলপ্রয়োগ করিয়া বলিল,—"মানো গে কি নেহি?"

ছেলেটা বেকায়দায় পড়িয়া একটু ছটফট করিল, ছাড়াইতে না পারিয়া আবদ্ধ স্বরে কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, মান লিয়া।"

সোমবারী ও তাহার দুই সহকারী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ছেলেটা একটু অপ্রতিভ ভাবে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আচ্ছা বেশ, তবে খাতির করো,—"

সোমবারী কৃত্রিম আগ্রহের সহিত বলিল,—"হাঁ—হাঁ— জরুর!…খাতির করব না বাবু? বোড়ো কুটুম আছে!"

ছেলেটা ডান হাতটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"লে আও —এক প্যাকেট্ গোল্ড ফেলেক…ঠিক কি না বাবু? বড় কুটুমের বড় খাতির হবে না?"

সোমবারী নিজের পরাজয়ে হঠাৎ একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কিন্তু অনাথ দাঁড়াইয়া থাকিবার জন্যই হোক্ বা যে জন্যই হোক্, সেটা সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"হাঁ, হাঁ, আলবৎ, আরে সোমবারী রাউত ফকির নেহি হ্যায়—তুম মান তো লিয়া আখির?…(তুই শেষ পর্য্যন্ত মেনে ত নিলি)?"

একটা গোল্ড ফ্লেক্ সিগারেটের বাক্স বাড়াইয়া ধরিল। "বড় কুটুম" সেটা বাঁ হাতে লইয়া ফরমাইস করিল,—"দো

খিল্লি বনারসী পান—বাদলরামকা জরদা ডাল দেনা,—এক বোতল আইস-নিম্‌লেট্‌—বড়া বোতল…"

ছেলেটার পান সাজা হইয়াছিল, অনাথের দিকে বাড়াইয়া বলিল, "লেন বাবু।"

অনাথ সোমবারী রাউতের সখের বড় কুটুনের দিকে অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া কি একটা গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল, শুনিতে পাইল না। ছেলেটা আবার বলিতে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—"হো গিয়া ?"

তাহার পর খিলি ছুইটা লইয়া দাম চুকাইয়া আবার কি চিন্তা করিতে করিতে মন্থর গতিতে বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

৪

তাহার পর দিন অনাথ আবার ড্যাট সাহেবের বাড়ী গেল। মালী মরশুমী ফুলের গাছ নিড়াইতেছিল। উঠিয়া আসিয়া একটা সেলাম করিয়া বলিল,—"সাহেব তো কোর্টে গেছেন।"

সেটা জানিয়াই আসা, তবুও অনাথ একটু নৈরাশ্যের ভাণ করিয়া বলিল,—"সত্যি! তবে তো কাজ হল না।… আচ্ছা মেম সাহেব আছেন ?"

জানা গেল মেম আছেন। তাহার পর বাগানের প্রশংসা করিতেই আরও জানা গেল একটু আরাম করিয়া শীঘ্রই নামিবেন—বাগানের ভারি সখ, সমস্ত দুপুরটা তাঁহার এই-খানেই কাটে।

অনাথ বলিল, "হ্যাঁ, শুনেছি বটে. বাগান আর কুকুরের বড় সখ; সমস্ত দুপুর লীয়নটাকে সঙ্গে করে বাগানে ঘুরে ঘুরে বেড়ান।"

টের পাওয়া গেল—না, কুকুরের সখ তো দূরের কথা, একেবারে দুচক্ষে দেখিতে পারেন না, আর সাহেবের অবর্ত্তমানে লীয়নকে কি খুলিবার জো আছে ? তাহা হইলে তো একটা মহামারী কাণ্ড হইয়া পড়িবে। লীয়ন বাড়ীর পেছনে কেনেলে বাঁধা আছে।

তাহা হইলে লীয়নকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নিয়োজিত করা হয় নাই। অনাথ নিশ্চিন্ত হইয়া বারান্দায় গিয়া বসিল। ছোট বারান্দার মাঝখানে একটি গোলটেবিলের চারিধারে কতকগুলি কৌচ। সিঁড়ি, বারান্দার কিনারা—নানা রকম গাছের টবে ভর্ত্তি। উপর হইতে তারের ছোট ছোট ঝুড়িতে কয়েক রকম অর্কিড টাঙ্গান। বারান্দাটি দক্ষিণমুখো, একদিক দিয়া গাছের জাফরি ভেদ করিয়া নূতন শীতের সূর্য্যের কয়েকটি রশ্মি আসিয়া শরীরের খানিকটা উত্তপ্ত করিতেছে। লাগিতেছে বেশ মিষ্ট।

অনাথ দাঁতে আঙ্গুল খুঁটিতে খুঁটিতে চিন্তা করিতেছিল। আজ একটা নূতন পথে পা বাড়াইতে হইবে। সাফল্যের সংশয়ে বুকের মধ্যে ঢিপঢিপানিটা এক একবার বড় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তবুও একবার চেষ্টা করিতে হইবে। একটু সাহস। সে সাহসে কি আনিয়া দেয় বলা শক্ত। যদি আনেই অবজ্ঞা, যদি আনেই অপমান তো তাহাই অদৃষ্টের দান বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। জীবনটা তো এই—পদে পদে অদৃষ্টকে যাচাই করিয়া চলা,—দেখা, তাহার অদৃশ্য করে বরাভয়, কি অভিশাপ…

হঠাৎ সিঁড়ির মাথায় হালকা চপ্পলের ঘা পড়িল যেন। অনাথ উৎকর্ণ হইয়া উঠিল, বুকের স্পন্দন অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল।…শব্দটি দ্বিতীয় ধাপে নামিল, অলস, মন্থর পাদুকার আর একটি কোমল—আঘাত নয়, স্পর্শই বলা ঠিক। তাহার পর পদক্ষেপ একটু দ্রুত হইয়া উঠিল। অনাথ কৌচটা ঠেলিয়া সিধা হইয়া দাঁড়াইল এবং সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির বাঁকে একটি নারীমূর্ত্তির আবির্ভাব হইল।

"কি দরকার আপনার ?…মিষ্টার দত্ত তো এখন…"

অনাথের অবস্থাটি বর্ণনাতীত। একটু দুর্ব্বলতা, এক লহমার একটু দ্বিধা। সঙ্গে সঙ্গেই সেটা কাটাইয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া গেল এবং মুখটা যতটা সম্ভব সিধা করিয়া তুলিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, দত্তজা মশাইয়ের সঙ্গে আমার দরকার নেই তো, আমি এসেছিলাম…"

বরাভয় কি অভিশাপ—বোঝা যায় না। চোখে শুধু একটা উগ্র বিস্ময় লাগিয়া আছে।

"কিছু চাই কি আপনার ?—চাঁদা টাঁদা…"

"আজ্ঞে না, আপনার কাছে অত হালকা প্রার্থনা নিয়ে আসব কেন ?"

সেই রকমের স্ত্রীলোক, যাঁদের এ ধরণের কথা অনায়াসেই বলা চলে। দীর্ঘাঙ্গী, তন্বী, সমস্ত অবয়বে একটি শান্তশ্রী,

একটি প্রসন্নতা পরিব্যাপ্ত। মুখে এখন কৌতূহলের সঙ্গে একটা সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেটি অন্তরের সহজ আনন্দ-রূপটি ঢাকিতে পারে নাই। অনাথের চোখে এটা ধরা পড়িতে বিলম্ব হইল না, কেন না এ ব্যবসায়ে নবাগত হইলেও দৃষ্টিতে কোথায় অনুরাগ কোথায় বিরাগ লুকান আছে, সেটা আবিষ্কার করিয়া ফেলায় সে দক্ষ হইয়া উঠিতেছে।

মহিলাটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর হইবে, অর্থাৎ সেই বয়স যে সময় সংসারের খানিকটা অভিজ্ঞতা লাভ করায় স্বভাবের মধ্যে বেশ একটু গাম্ভীর্য্য আসিয়া পড়ে, অথচ এমন একটা পরিপক্কতা আসিয়া পড়ে না, যাহাতে কেহ দুইটা মিষ্ট কথা বলিলে, কি একটু তোষামোদ করিলেই কূট উদ্দেশ্যের সংশয়ে মনটা সতর্ক হইয়া পড়ে।

ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন,—"গুরুতর প্রার্থনা পূরণ করবার আমার সাধ্যি কী আছে? তবু বলুন, শোনবারও তো একটা কৌতূহল হয়।"

সব চেয়ে তফাতের কৌচটিতে বসিলেন।

অনাথও একটু হাসিল, বলিল,—"আমি যা প্রার্থনা করতে এসেছি তা আগেই অপর হাত থেকে পেয়ে গেছি অযাচিত ভাবে। কিন্তু সে-পাওয়ার মধ্যে একটু খুঁৎ থেকে গেছে। দানপত্র হাতে এসেছে দাতার সাক্ষর সমেত, কিন্তু তাঁর একলার স্বাক্ষরে দাবী-দাওয়া সাব্যস্ত হবে না, আপনারও দস্তখৎ চাই; তাই আপনার কাছে আসা।'

রমণী কতকটা বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন। একটু যেন অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,—"বুঝতে পারছি না আপনার কথা ঠিকমত, কে দানপত্র দিয়েছে? দানপত্র··· আপনি একটু স্পষ্ট করে বলুন।"

অনাথ মনে মনে বক্তব্যটা যেন একটু গুছাইয়া লইল, তাহার পর বলিতে লাগিল।—"আমি হচ্ছি বোস ব্রাদার-ইন-ল ফ্যামিলী ইনসিওরেন্সের এজেন্ট।···চোদ্দ বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করি, এখন সতের। বুঝতে পারছেন, অদৃষ্টের বিশেষ তাগাদা না থাকলে সতেরটা ক্যানভাসিং করবার বয়স নয়। তবুও বছর দেড়েক কোন রকমে ঠেকিয়ে রেখেছিলাম তাগাদা। আই-এ-টা আরম্ভ করলাম, গেলামও এগিয়ে অনেকটা, কিন্তু ঠিক যে সময় পরীক্ষা দেওয়ার যোগাড়যন্ত্র করছি, সেই সময় তাগাদা এত জরুরী হয়ে উঠল যে, আর ঠেকান গেল না। চাকরির বাজার ঘুরলাম, জোড়া দু'এক জুতো নিঃশেষের পর আর উৎসাহ রইল না; আগে গেলেই ভাল হত, কিন্তু লোকসানের কপাল কি না, মাস চারেক চোরা উৎসাহটা রইল সঙ্গে। তারপর এই অধম-তারণ ইনসিওরেন্স।

"ও দিককার ইতিহাস এই। আপাততঃ এই অবলম্বন করে মাস তিনেক এই সহরে কাটল। দেখছি, আরও দুর্গম পথ। জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে এত কোম্পানী গড়ে উঠেছে, আর তাদের চরেরা গেরস্তদের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত এমন ভর্ত্তি করে ফেলেছে যে, লোকেরা কি করে সে কল্যাণ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে কোন রকমে জীবনটাকে কাটিয়ে দেবে সেই ভেবে ক্ষেপে উঠেছে।···আপনি হাসছেন? কিন্তু ব্যাপারটা এই-ই, একটুও অতিরঞ্জিত নয়। বুঝিও সব, কিন্তু পেট বোঝে না একটুও।···অবশ্য ফল বিশেষ কিছু হচ্ছে না—সেখানে গীতার বাণী সান্ত্বনা দিচ্ছেন—"মা ফলেষু কদাচন···

"কাহিনীটা বেড়ে যাচ্ছে, আপনি বোধ হয় বিরক্ত হচ্ছেন?

"···হচ্ছেন না? সে আপনার দয়া।···যা হক, যে ফল আকাঙ্ক্ষা করে এত কাণ্ড, তা না পেলেও ভগবান আমায় অন্য দিক্ দিয়ে এক অপূর্ব্ব পুরস্কার দিয়েছেন। সেই সম্পর্কেই আমার আসা। আমি এ বাড়ীতেও বার-চারেক এসেছি, বোধ হয় আপনার নজরেও পড়ে থাকব। ফলে দত্ত সাহেবকে এতটা সন্তুষ্ট করে ফেলিছি যে, কাল ঘরের ভেতর পর্দ্দার আড়াল থেকে স্বকর্ণে শুনলাম, তিনি নিজের মুখে আমার সঙ্গে পৃথিবীর মধ্যে মধুরতম সম্বন্ধ পাতিয়ে প্রীতি-সম্ভাষণ করে ফেললেন।"

রমণী কৌতূহলে, বিস্ময়ে, আশঙ্কায় মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনাথ একরকম করুণ অথচ হালকা রহস্যের হাসি হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেয়ারাকে জিজ্ঞেস করলেন,—'সে সম্বন্ধী আজও খোঁজ করতে এসেছিল না কি?'—ঠিক সম্বন্ধী বলেন নি, কথাটার মানে হয় সম্বন্ধী···"

রমণী ঘৃণায় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ছি, ছি, এই কথা বললেন উনি আপনাকে! কি করে পারলেন বলতে!···আমি ওঁর হয়ে···"

অনাথ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু এতে 'ছি-ছি'রই বা কি আছে বলুন না ?"

"সে কি ! উনি এমন একটা গালাগাল দিলেন, আর···"

"দেখুন, আমায় কথাটা প্রথমে ঐ ভাবেই আঘাত করেছিল বটে, কিন্তু পরে একটু অদ্ভুত ভাবেই এর আর একটা দিকে আমার নজর পড়ে। সেটা···থাক, সে আর আপনাকে বলব না···

"মোটকথা আমি আমার পারিবারিক সম্বন্ধের রাজপথ আর অলি-গলি সর্ব্বত্র মনে মনে খুঁজে দেখলাম, কিন্তু কোন খানেই একটিও ভগ্নীর সন্ধান পেলাম না। তখন নিশ্চিন্ত হলাম, যাক্, ভগবান আমায় বঞ্চিত করে গালাগাল থেকে বাঁচিয়েছেন।"

অনাথ হাসিয়া একটু থামিল। তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। তাহাতেই আবার সচকিত হইয়া সে একটু ম্রিয়মাণ হইয়া বলিল, "কিন্তু মনের গতি বড় কুটিল তা জানেনই, যে অভাব আমায় নিশ্চিন্ত করলে সেই অভাবই একটু পরে আমার মনটা বড় বিষণ্ণ করে তুলল, অর্থাৎ যে-বোন থাকলে আজ পরোক্ষভাবে অপমানিত হত তার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। আমরা চারটি ভাই, একটি বোনের অভাব সকলেই বড় অনুভব করি। বাবা, মা বলেন ভগবানের দয়া, না হলে এর ওপর আবার তার বিয়ের দুর্ভাবনা ছিল, কিন্তু এ দয়ার বেদনা যে তাঁদের কত গভীর তা আর আমাদের বুঝতে বাকী থাকে না। যদি বলি কাল সমস্ত রাত এই না-থাকা বোনের চিন্তায় কেটেছে আপনি নিশ্চয় বিশ্বাস করবেন না।"

মিসেস দত্ত হঠাৎ বিষণ্ণ আর অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, অনাথ চুপ করিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "করব বিশ্বাস। দেখুন আমারও ভাই নেই···আর সব চেয়ে কষ্ট হয়, লোকে যখন কানাঘুষা করে, ভাই থাকলে আর বাপের এতবড় সম্পত্তিটা আমি পেতাম না।···মানুষ মানুষের বেদনা কত কম বোঝে দেখুন।"

অশ্রু ঠেলিয়া আসিবার ভয়ে মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ গেল, তাহার পর হঠাৎ যেন মন হইতে এই আতুর ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া অনাথ বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু বিধাতার বঞ্চনা নিয়ে দুঃখ করেই বা কি হবে ? আমার মাথায় একটা মতলব এল, দুষ্টবুদ্ধিও বলতে পারেন, ভাবলাম, চাই কি, এ থেকে একটা মহালাভও হয়ে যেতে পারে।"

মিসেস্ দত্ত একটু বিস্মিত হইয়া অনাথের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর একটি ক্ষীণ স্মিত হাস্যের সহিত প্রশ্ন করিলেন,—"লাভ !—গালাগাল থেকে কি লাভ হবে ?"

"দিদি লাভ।"

মিসেস দত্ত আরও একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ আঁচলটা মুখে দিয়া খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কৌতুকদীপ্ত চক্ষে অনাথের পানে চাহিয়া বলিলেন—"কিন্তু তাতে যে গালাগালটা আরও পাকা করে নেওয়া হল !"

অনাথ হাসিয়া বলিল,—"আপনি ভুল বলছেন দিদি, গালাগালটা যে আর একবারে রইলই না। মা কখন কখন আমায় বাদশার-জামাই বলে গালাগাল দেন, কিন্তু সত্যিই যদি বাদশার মেয়ে ঘরে আনতে পারা যেত···"

মিসেস দত্ত আবার হাসিয়া বলিলেন,—"আপনিও ভুল করছেন, ও গালাগালটা দেন আসলে আমার ভাজকে···কিন্তু আপনি বসুন, তখন থেকে দাঁড়িয়েই রয়েছেন যে···"

অনাথ বসিতে বসিতে বলিল,—"আমি এই আদেশটুকুর জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করছিলাম, কেন না এর মানে হয়—দিদি আমায় ভাই বলে তুলে নিলেন।"···আমায় কিন্তু 'আপনি' বলে আর লজ্জা দেবেন না।"

দিন কয়েক পরের কথা। তিথিটা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

এর মধ্যে অনাথ কয়েকবার আসিয়াছে এবং অকৃত্রিম প্রীতি আর শ্রদ্ধার বিনিময়ে একটি স্নেহাতুর চিত্তের নিবিড়তর পরিচয় লইয়া গিয়াছে। অনাথ বলে,—"দিদি, শাপেও-বর সত্যিই হয়। জামাইবাবুকে ধন্যবাদ না দিতে পারা পর্য্যন্ত মনটা হাল্কা হবে না।"

অবশ্য, জামাই-বাবুর সঙ্গে এখনও দেখা হয় নাই। কারণ অনাথ আসে দুপুরটিতে, তাঁহার অবর্ত্তমানে—ইচ্ছা করিয়াই।

ভাই-বোনের মধ্যে স্থির হইয়াছে, দেখাটা করিতে হইবে একেবারে অকস্মাৎ, আর নিতান্তই এক অপ্রত্যাশিত, অচিন্তনীয় অবস্থার মধ্যে।···হাওয়া যদি অনুকূল বোধ হয় তো

অনাথ আর একবার অদৃষ্ট পরীক্ষা‍ও করিবে বলিয়া মনে মনে আঁচিয়া আছে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। ড্যাট্ সাহেব আশ্চর্য্য হইতেছেন—বাড়ীতে আজ যেন কিছু বাড়তি আয়োজন হইতেছে। এই দিনটির সম্বন্ধে সাধারণতঃ মিসেস্ ড্যাটের একটি নিগূঢ় বেদনা আছে। এ বারে ভাবটা বেশ প্রসন্ন, রহস্য-মুখর। ড্যাট্ সাহেব তাই আশ্চর্য্য হইয়াছেন; দু'একবার প্রশ্ন করিয়া কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পান নাই।

দুইজনে বারান্দায় বসিয়া আছেন, এমন সময় একটি সতের আঠার বৎসরের প্রিয়দর্শন যুবক ফটক খুলিয়া কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করিল; একটু অনিশ্চিত চিত্তে থমকাইয়া দাঁড়াইল, তাহার পর দৃষ্টি নত করিয়া অবিচলিত পদে বাগান পার হইয়া, বারান্দায় উঠিয়া ড্যাট্ সাহেব এবং পরে মিসেস্ ড্যাটের পা স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। মিসেস্ ড্যাট মাথায় হাত দিয়া আশিস্-অভ্যর্থনা করিলেন,—"এস ভাই, দীর্ঘজীবী হও।"

তাহার পর মিষ্টার ড্যাটের বিস্ময়-বিমূঢ় ভাব দেখিয়া হাসি চাপিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ড্যাট সাহেব ছেলেটিকে দেখিয়াছেন কবার এর আগে—খুব স্নেহের চোখেও নয়। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ভাই! এ ছোকরা···মানে, ইনি ভাই হলেন কবে তোমার? ···কই, তোমার যে ভাই আছে···কি রকম ভাই হন ইনি, কৈ আমি তো আজ পর্য্যন্ত কিছু জানি না···বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?···"

মিসেস্ দত্তের চাপা হাসিতে মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছিল। ফিরিতে পারিলেন না; আঁচলে মুখ চাপিয়া, কষ্টে হাসি রোধ করিয়া বলিলেন,—"না, কিছু জানতে না!—না জানতে তো সেদিন ঠাট্টা করে ওকে—মানে অনাথকে, ওই কথা বলে ডাকলে কি করে?" আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"কি কথা!"

"কেন?—'সম্বন্ধী' —যে কথাটার মানে হয় সম্বন্ধী।"

ড্যাট সাহেব প্রথমটা আরও বিমূঢ় হইয়া গেলেন। তাহার পর স্ত্রীর হাসিতে, অনাথের সলজ্জ এবং বোধ হয় একটু চটুল হাসির ভাবে তাঁহার কাছে ব্যাপারটা যেন কিছু কিছু পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল।

"ও!—বোধ হয় বুঝেছি"—বলিয়া আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন। অনাথ বাধা দিয়া বলিল—"দিদির ভাই-ফোঁটা নেওয়ার আগে আমার একটা কাজ সেরে নিতে হবে জামাইবাবু;—আগে সেবা তারপরে আশীর্ব্বাদ কি না—দীর্ঘ-জীবন পাকা করে আপনাদের দুজনের অমূল্য জীবন দু'টি বীমা করে রাখতে চাই···আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই এতে···আর, হলামই বা ছোট ভাই–দিদির বাপের বাড়ীর দিক্ থেকে আমিই এখন একমাত্র অভিভাবক—সে হিসেবে দিদির আর সেই সঙ্গে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার একটা কঠিন দায়িত্ব আছে তো?···"

ব্যথিত

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

প্রেমের পীযূষ পাত্রে আজি মিশিয়াছে
তীব্র সুরা লবণাক্ত নয়ন আসার।
জীবনেতে হতাশার জ্বালা শুধু আছে—
দুর্ভোগের আকর্ষণ তিক্ত হাহাকার।
মাটির নেশায় আজ আপনা হারাই,
স্বর্গীয় ও প্রেম ভাল লাগে না ক' তাই॥

গতানুদর্শন

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

আমার এক তরুণ বন্ধু মাঝে মাঝে আসেন আমার কাছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজরীতি, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের সংবাদ, সমালোচনা শুনি তাঁর মুখে। অথর্ব্ব বিচার-বুদ্ধির ফোগলা দাঁতে যথাসাধ্য চর্ব্বণ করতে চেষ্টা করি এই আধুনিক সাড়ে-বত্রিশ ভাজা। আমি শ্রোতা, তিনি বক্তা, সুতরাং আমাদের এ দেনা-পাওনা চলে নির্ব্বিবাদে। তাঁর হৃদয়ভার হয় লঘু, আমার শূন্য ঝুলিও ভরে ওঠে বিচিত্র তণ্ডুলকণায়।

আজ সন্ধ্যা বেলা কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বললেন, "তিন পুরুষের তরুণ সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপনার কারবার। রাতারাতি ত বুড়ো হন নি, একদিন আমাদের দলেই ছিলেন। শিঙ্ ভেঙ্গে বাছুরের দলে ভিড়ে পড়বার দুর্নাম আপনার আছে এবং নিজেও বলেন, বার্দ্ধক্যটা আপনার মুখোস। বাঙ্গালার তরুণ মিছিলের প্রগতি সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি, শুনতে ইচ্ছা হয়।"

না-ছোড়বান্দা ছেলে মাটির তল থেকে নবকিশলয়োদ্ভিন্ন আমের আঁঠিটাকে ঝুঁটি ধরে টেনে তোলে। শুধু তাই নয়, সেটাকে ঘসে ঘসে তার ফাটলটাকে করে ক্ষৌরমসৃণ। তারপর দেয় সজোরে ফুঁ, আমের আঁটি বেজে ওঠে।

তাঁর নির্ব্বন্ধে পড়ে হঠাৎ কথা দিয়ে ফেললুম, দু-একটা কথা কালি-কলমে বলতে চেষ্টা করব। আমরা সেকেলে লোক, কথা দিলে কথাটা রাখবার উদ্বেগ মনে জাগে, সুতরাং কথা রাখবার জন্যেই কথা বলতে হল।

শুনেছিলাম একটা কথা—সত্যি মিথ্যে জানি না—গুলিখোর না কি পুজোর নবমীর দিন বৎসরান্তে একবার গঙ্গাস্নান করে। ঘাটে বসে 'জলে নামব কি নামব না' এই স্বগতোক্তিতে অনেকক্ষণ ধরে হ্যামলেটের রিহার্স্যাল দেয়—'To be or not to be।' এই বিতর্কের কোন সমাধান না করতে পেরে, অবশেষে কাঁধের গামছাখানা ফেলে দেয় জলে, সেই মজ্জমান গলবস্ত্রটিকে উদ্ধার করতে গিয়ে তার বছরকি অবগাহন নিষ্পন্ন হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখছি, একটা মৌখিক সত্য রক্ষা করবার জন্যে দুটো বাজে কথা বলতে হল। আমার তরুণ শ্রোতা রাগ করতে পারবেন না, কারণ এ কথাগুলো তাঁর আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফল।

একদিন ছিলুম ইস্কুল মাষ্টার। অনেক ছেলের নাড়ী টিপে টিপে আঙ্গুলে কড়া পড়ে গেছে। সেই আঙ্গুলে এখন নস্যি টিপি। হয়ত তাম্রকূট-পরাগের সঙ্গে আঙ্গুলের ডগায় তাদের তারুণ্য-বেপথুর কিঞ্চিৎ স্পন্দন আমার মগজে গিয়ে ভোঁ ভোঁ করে। তাদের মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বড় একটা নেই। তবু এক একটা গলার আওয়াজ আর পাঁচটা কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে জেগে ওঠে। মানুষের মনটা বাদ্যয়। ইন্দ্রিয়ের তারে তারে যে মৌন ঝঙ্কারটি অন্তরে বাজে, সেটা আত্মপ্রকাশ করতে চায় ভাষায়। ভূমিষ্ঠ হবার প্রচেষ্টায় কথাগুলো হয় শব্দ-ভ্রূণ। আমার নবীন বন্ধুর প্রশ্নে সেই কথার নীহারপুঞ্জ ঘনিয়ে উঠতে চায় বাণীর মৌখর্য্যে। কিন্তু কি বলি, কোন্ কথা দিয়ে আরম্ভ করি?

গঙ্গোত্তরী থেকে যাত্রারম্ভ করে যদি গঙ্গার তীর ধরে বরাবর অগ্রসর হওয়া যায়, তবে তার ধারাপথটি কেমন করে প্রস্থ ও গভীরতা লাভ করল পরিস্থিতির পট-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে তার একটা আভাস পাওয়া যায়। তরুণ বাঙ্গালার যে রুদ্ধ প্রবাহ পল্লীতে পল্লীতে বন্দী হয়ে আছে, তার সন্ধান কোন দিনই রাখি নি, আজও জানি না। আমরা সহুরে জীব। আমাদের মানসিক মোল্লার দৌড় নাগরিক মসজিদ পর্য্যন্ত। যা কিছু অভিজ্ঞতা, সেটুকু পেয়েছি সহরের স্কুল-কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে, ইঁটের পাঁজার খোপে খোপে, রাজপথের গোলক-ধাঁধায়। আর যা, সব পরোক্ষ, বই পড়ে, লোকের মুখে শুনে।

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ পঞ্চাশ বৎসর আগে স্কুল-কলেজে পড়ত এখনকার মত। প্রাচীর সংস্কার ও বিধি-

নিষেধের আচার-বন্ধনগুলি মোটামুটি অক্ষুণ্ণ ছিল ঘরে ঘরে। ইতিমধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও আদর্শ এ দেশে এসে শিকড় গেড়ে বসেছে এবং প্রাচীন সমাজের বুকে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে ফাটল। সাহিত্যে তখন ছিল বঙ্কিম-যুগের অস্তরাগ, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আন্দোলন তখন থিতিয়ে পড়েছে। রামমোহন-প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে বেপরোয়া সত্যনিষ্ঠ বিবেকপন্থী কেশবচন্দ্র, বিজয় গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির দ্বারা প্রাচীন সমাজের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত চলেছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অভ্যুদয়। তারপর এল রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রণোদিত রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের জাগরণ। আনি বেসান্টের থিয়-সফিকাল সোসাইটির ঢেউও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নাড়া দিয়েছিল। চিন্তা ও ভাবলোকের অভিনবত্বের প্রবর্ত্তক রবীন্দ্রনাথকে তরুণ বাঙ্গালা পেল এই সময়ে। অনতি-বিলম্বে এল স্বদেশী যুগ, বাঙ্গালা দেশ লাভ করল শ্রীঅরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনকে। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের প্লাবন বন্যাপ্রবণ তরুণ বাঙ্গালাকে দিল অস্বীকারের পরাক্রম ও উত্তেজনার মধ্যে কর্ম্মদীক্ষা। এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, অসূর্য্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণীরা বহুদিনের অবরোধ প্রথাকে অকুতোভয়ে অতিক্রম করে অন্দর থেকে কতকটা বাহিরে এসেছেন। বাঙ্গালার সামাজিক জীবনে এটা একটা যুগান্তর।

পঞ্চাশ বছর আগে যাঁরা ছিলেন কিশোর বা যুবক আজ তাঁরা বৃদ্ধ। আমি সেই দলের একজন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের নানা ভাব ও চিন্তার পুঞ্জমেঘে ভরা ছিল আমাদের আকাশ, তার উপর পড়েছিল নবরবির অরুণরাগ আমাদের পূর্ব্বাশায়। আমাদের আশার অন্ত ছিল না। সেটা ছিল রোমান্টিক যুগ, অর্থাৎ যখন তুরীয় লোকের স্বপ্নটা বাস্তব জীবনের চেয়ে অধিকতর সত্য মনে হয়। গণৎকার যখন হাত দেখে বলে, অদৃষ্টে আছে রাজ্যলাভ, তখন সহজ-বিশ্বাসী মন দৈবজ্ঞের কথায় আস্থা রেখে স্বয়ম্বরা রাজলক্ষ্মীর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উদ্গ্রীব হয়। আমরা অনেকেই আপন আপন করকোষ্ঠিতে ভবিষ্যতের চিত্রপট দেখি। আমাদের মধ্যে ক্বচিৎ এমন লোকও পাওয়া যায়, যার পুরুষাকার দৈবজ্ঞ ঠাকুরের গণনাকে সফল করে। আরকিমিডিস বলতেন, "যদি একটা বিন্দু-পরিমিত অচল কেন্দ্রভূমি পাওয়া যায়, আর সেই সঙ্গে জোটে একটা মজবুত হুড়কো, তা হলে ওই প্রতিষ্ঠা-বিন্দুর উপর ভর রেখে লাঠার চাড়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে ঠেলে তুলতে পারি।" মানুষের জীবনে এই অটল ভিত্তি হচ্ছে সত্য। হোক বিন্দু-পরিমাণ কিন্তু তার উপর নির্ভর রেখে সে বিশ্বজয়ী হতে পারে। চিরন্তন সত্য কি, সে তাত্ত্বিক বিচারে এখানে প্রয়োজন নেই। সব দেশে সব সময়েই মানুষের মনে বদ্ধমূল সংস্কার কিছু কিছু থাকে। সেই সংস্কারের বনেদের উপর সমাজ-সংস্কার গড়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনযাত্রা মোটমুটি নির্ব্বিঘ্নেই চলে। কোন একটি ধারার প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে চাই তার জন্য একটি পয়ঃপ্রণালী। আমাদের দেহে যে রক্ত-চলাচল হচ্ছে, আমাদের শিরা-উপশিরা তার অলিগলি। এই ধমনীগুলি যদি ফাটে তবে সর্ব্বাঙ্গের অন্তস্তলে হয় রক্ত-প্লাবন। প্রাচীন আচারমার্গ কালধর্ম্মে যখন অচল হয়ে আসে তখন সময়োপযোগী নতুন রাস্তা যদি প্রস্তুত না হয় সামাজিক ক্ষেত্রে, তবে বিপ্লবের ঢলে জলমগ্ন হবার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। আমাদের সামাজিক পূর্ত্ত-বিভাগে নব্য ইঞ্জিনিয়ারের অভাব ছিল। নবযুগ তাই তরুণদের কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশের সহজ পথ পায় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সময় রাস্তার এপারে ওপারে নোটের দামে ঘটেছিল মূল্যবিভ্রাট, নিরিখ বেঁধে দেবার কর্ত্তৃপক্ষের অভাবে। কর্ত্তৃপক্ষ সেখানে বে-এক্তার, যেখানে তাঁদের অভিসন্ধির বিশুদ্ধতার সঙ্গে জনমতের সমর্থন নেই। তাস খেলতে বসে কোন্‌টা রঙ তাই নিয়ে যদি মতদ্বৈধ থাকে, তবে প্রত্যেকবার তুরুপ করবার সময় বাধে মল্ল-যুদ্ধ। এক ফোঁটার গোলাম যেখানে বিশ ফোঁটা হয়ে টেক্কা তুরুপ করে বসে, সেইখানে উভয় পক্ষে বেধে যায় হাতাহাতি। স্বদেশী বিদেশী নানা মতবাদের বৈপরীত্যে একটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠছে। তার প্রধান কারণ বোধ হয়, কোন একটা বিশেষ 'আইডিয়া' বা আদর্শকে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরবার যে চরিত্রবল তার অভাব ছিল আমাদের জীবনে।

ভাব, চিন্তা ও আদর্শের সমতা যে পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের মধ্যে ঐক্যলাভ করে সে আনুকুল্য পঞ্চাশ বছর আগে আমরা পাই নি। স্বাধীনতার প্রতি অন্ধ আকর্ষণ, বন্ধনবেদনার অসহনীয়তা এসেছিল কিন্তু সেই সঙ্গে তিতিক্ষা ও দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করতে পারে নি। নিজের কর্ম্মফলে যে দুর্গতি মানুষ আপনার জীবনে টেনে আনে, তার জন্যে যখন সে অভিসম্পাত করে সমাগত আপদ্‌কে তখন তার আত্মাপরাধের স্মৃতি হয় বিলুপ্ত। এই স্মৃতিভ্রংশই বিনষ্টির অগ্রদূত। পুরুষানুক্রমে খাল কেটে কুমীর গ্রামের ঘাটে ডেকে আনা গেল, দল বেঁধে খালের কিনারায় দাঁড়িয়ে তাকে গালাগালি দিলে তার করাল গ্রাসের সঙ্গে পরিচয় হবার সম্ভাবনাই বেশী। রাজনৈতিক আন্দোলনের হিড়িকে পড়ে পরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বিদ্বেষ-বুদ্ধিকেই উদগ্র করা হচ্ছে। অপরপক্ষের দোষ যতই থাকুক, আত্মাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ও পিতৃঋণ শুধবার দুষ্কর ব্রত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের তরুণরা যে পরিমাণে গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছে, সেই পরিমাণে ঘর সামলাবার আগে প্রতিপক্ষের সঙ্গে অসম যুদ্ধে আত্মশক্তির অপব্যয় করেছে বেশী। পিঁজরের বাঘকে একটা তানপুরো দিয়ে ধ্রুপদী চালে হুঙ্কারে গলা সাধবার জন্য বসিয়ে দিলে তার মুক্তির সম্ভাবনা নিকটতর হয় না। তার চোয়ালে, দাঁতে, থাবার নখে গরাদে-কাটা তীক্ষ্ণতা ও শক্তি-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলে হয়ত একদিন গিয়ে বনের বাঘ বনে গিয়ে হাঁফ ছাড়তে পারে। এই শক্তি-সাধনা পূর্ব্বতন যুগে তেমন হয়নি। সত্যের বীজকে প্রতিদিনের "অভ্যাসযোগে"র দ্বারা উদ্ভিন্ন করতে হয় জীবনে। অপ্রমত্ত অনুশীলনের যে সাধনা তাতে আমরা দীক্ষিত হইনি। সুর ও তাল নিয়ে সঙ্গীত। এদের অভাবে সুর হয় অসুর, তাল হয় বেতাল। সংযমের অভাবে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র হয়েছে অসুর আর বেতালের মল্লভূমি।

হিষ্টিরিয়া রোগটা মেয়েদের পক্ষেই লজ্জাকর। পুরুষের হিষ্টিরিয়া ন্যক্কারজনক। এ দৃশ্যটা আমাদের দেশেই সুলভ। আমরা কীর্ত্তনে সহজেই 'দশা' পাই। সে ভাবাবেগের প্রেরণা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগাই এ কথা যিনি ভাবেন, তাঁকে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের কথায় বলি—'কাজের বেলা যদি করি if you think, you are an awful goose'। আমাদের ইচ্ছাশক্তিটা স্নায়ুতে এসে থামে পেশীতে পৌঁছয় না।

গত তিন পুরুষ ধরে আমরা পল্লীর মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ত্যাগ করেছি, তেমনি আমাদের অন্তরের ও বাহিরের শূন্যতা ভরে তুলেছি পশ্চিমের বিলাস-বাহুল্যের পুঞ্জভারে। তৃণশ্যামল মাটি পুড়িয়ে গড়ে তুলেছি কোঠাবাড়ী, পঞ্চভূতকে লাগিয়েছি পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যায়। এই জল-গ্যাস-বিদ্যুৎকে যদি নিজেদের যন্ত্রশক্তিতে বাঁধতে পারতাম তা হলে তত ক্ষতি ছিল না। আমরা পড়েছি তাদের যাঁতাকলে। আমাদের প্রাণপণ শক্তিতে যেটুকু সম্বল পিচকারিতে টেনে তুলি, সেটুকু দমকলের জলের মত নিঃশেষে উজাড় করে দিই সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে। নিজেরা সৃষ্টি করতে পারি না যে-সব বিলাসের পণ্যভার সেগুলি সংগ্রহ করতে চেষ্টা করি বুকের রক্ত জল করে। এমনি করে তিন পুরুষে হয়ে এসেছি ফতুর। একমাত্র উপজীবিকা যেখানে শুধু চাকরী এবং দৈহিক পরিশ্রমের অক্ষমতা ও অপ্রবৃত্তি, সেখানে কৃতবিদ্য তরুণ সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা কিরূপ হয়ে দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়।

রোমান্টিক যুগের আকাশকুসুম আজ হয়েছে সর্ষের ফুল। আশাপ্রবণ মনে জেগেছে, সিনিসিজম বা সব-ঝুট্টা-বাদ। মাঝে মাঝে দেখি, দু একটি তরুণ যাদের দেখে কবির সেই গানটি মনে পড়ে—

> "রাখিও বল জীবনে, রাখিও চির আশা
> শোভন এই ভুবনে রাখিও ভালবাসা।"

দেশে নবযুগ আসবে এই প্রহ্লাদ-মার্কা ছেলেদের দিয়ে যারা জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, অমৎসর, সত্য-নিষ্ঠ, কর্ম্মপ্রাণ। গত যুগ ও বর্ত্তমান যুগের ব্যবধানে খাতটি ভরে মাঝে মাঝে নামে নানা আন্দোলনের বন্যা। নদীর উপর দিয়ে সাঁকো বাঁধতে হলে জলের তল থেকে পাথরের থাম গেঁথে তুলতে হয়। বড় বড় লোহার চোঙা জলের মধ্যে পুতে তার ভিতরকার জল ছেঁচে, সেই লোহার বেড়ের ভিতর নামে স্তম্ভ-নির্ম্মাতা, আস্তে আস্তে গেঁথে তোলে সেতুর ভিত্তিমূল। উত্তেজনার হাত থেকে

রক্ষা করতে না পারলে সব চেষ্টা স্রোতের মুখে ভেসে যাবে।

জাতীয় নবজীবনের উদ্যোগপর্ব্ব রইল এই অল্পসংখ্যক অপ্রমত্ত গুপ্তসাধকদের হাতে। এই তরুণদের কর্ম্মসঙ্গিনী হবেন যাঁরা, তাঁদের প্রেমে আসবে বাংলার neo-romantic যুগ। ঔপন্যাসিক Ibanez এক জায়গায় বলেছেন "An automobile and a necklace are the modern woman's uniform", অর্থাৎ একটি মোটরকার ও রত্নহার আধুনিকার বিজয় সজ্জা। ভদ্রসমাজের উচ্চতম স্তর থেকে নিম্নতম তল পর্য্যন্ত যে বাহুল্যের ঠাট বাঁধা হয়ে যাচ্ছে, তাতে এই নারী-প্রগতির দিনে এরূপ প্রলয়ঙ্করী চামুণ্ডামূর্ত্তির আবির্ভাব অসম্ভব নয়। তবে আস্থা আছে, চিররক্ষণশীলা মাতৃপ্রকৃতি বঙ্গনারীর অন্তস্তলে লুপ্ত হয় নি, নবযুগের কার্ত্তিকেয় ভূমিষ্ঠ হবে শিবাণীর ক্রোড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্ল গৃহলক্ষ্মী হবেন বাংলার ঘরে ঘরে।

আলো ও আঁধার

—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী

দীপ্ত সমুজ্জ্বল ওই দিব্য হর্ম্মতলে
আনন্দের সুখ-স্রোত যেথা ভাসি চলে,
চঞ্চল করিয়া তোলে নিস্তব্ধ নিশীথ
পানোন্মত্ত উল্লাসের উচ্ছল সঙ্গীত।
পরিপূর্ণ যৌবনের শিরায় শিরায়,
ফাল্গুনের উতরোল মলয় বিলায়

অতন্দ্র আবেগে করে বিভোল পরাণ
নাহি নাহি, অমৃতের নাহি অবসান।
বিলাসের আবেষ্টনে ভরিয়া কায়ায়
মোহমুগ্ধ দৃষ্টি ফেলি প্রতিটি ধূলায়,
ঊষর মরুর মাঝে স্বর্গ আনে ডাকি
আলোক মায়ার বুকে আপনারে রাখি।

এস বন্ধু, আর এক কোণে এস চলে,
অন্ধকার গুমরিছে যেথা পলে পলে,
ওই শোন, বেদনার অস্ফুট নিশাস
শতাব্দীর কঙ্কালের কামনা তিয়াস,
ভরি তোলে বাস্তবের গগন পবন,
রিক্ত করি অভিশপ্ত হৃদয়-স্পন্দন!

দুরান্তের মরীচিকা তার পাত্রখানি
উগ্র হলাহলে দিল সম্মুখেতে আনি,
বিষাক্ত করিয়া তুলি অন্তর বাহির
কলঙ্কের চিহ্ন আঁকি বক্ষে সুগভীর।
এই সব যুগান্তের মৌন মূক প্রাণ
শুনেছে কি আলোকের আকুল-আহ্বান!

পাষাণের মর্ম্মতলে কত ব্যাকুলতা
বনানীর শিরে শিরে অনন্ত বারতা!
জগতের রূপ-সুধা তাদের কোথায়
তিল তিল করি যারা পুড়িছে চিতায়।
মর ধরণীর মোহে মুগ্ধ আমি কবি
আঁকি গেনু চিরন্তন এই সত্য ছবি।

চীনদেশে প্রাচীন সভ্যতা ও লোক-শিল্প

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

খৃষ্টের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মুষ্টিমেয় চীন জাতি হোয়াং-হো বা পীতনদীর উভয় তীরে বাস করতে আরম্ভ করে। পীতনদীর উভয় তীর অত্যন্ত উর্ব্বর বলেই চীনারা অতি প্রাচীন কাল হতেই কৃষিকার্য্য সুরু করে।

চীনা সভ্যতা যে অতি প্রাচীন তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার মতই এ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। সিন্ধু নদের তীর হতে আর্য্যেরা যেমন ক্রমশঃ ভারতের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আদান-প্রদান সুরু করেন ও তাদের আর্য্যসভ্যতায় দীক্ষিত করেন, প্রাচীন চীন জাতিও অনেকটা সেই ভাবে সমস্ত চীন দেশে তাদের সভ্যতা বিস্তার করেছিল।

এই জাতি আর্য্যদের মতই তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তাদের আশ্চর্য্য উদ্ভাবনী-শক্তি ছিল বলেই নিজেদের সভ্যতাকে উন্নত করতে তাদের বেশীদিন লাগে নি। সমস্ত দক্ষিণ চীনে তখন নানা বর্ব্বর জাতির বাস। উত্তর-চীনে মঙ্গোলীয়দের বাস। এই সব জাতির ভিতর চীনারা ক্রমশঃ তাদের আধিপত্য বিস্তার করল এবং তাদের নিজে-দের সভ্যতায় দীক্ষিত করল। খৃঃ পূর্ব্ব পঞ্চম শতকের পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত চীনদেশে চীনা সভ্যতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সাহিত্য, শিল্প এবং ধর্ম্ম হচ্ছে সভ্যতার উৎকর্ষের প্রধান প্রমাণ। এ সব বিষয়ে চীনা সভ্যতার অবদান অন্য কোন সভ্যতার চাইতে কোন অংশে কম নয়। চীনা সাহিত্য বিপুল। এ সাহিত্যের প্রথম সূত্রপাত হয় খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় হাজার বছর পূর্ব্বে। তার পর বহুদিন ধরে সে সাহিত্যের উন্নতি চলেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, কথা, ইতিহাস, অভিধান প্রভৃতি এই সাহিত্যকে একটা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত করেছে।

চীনদেশে তিনটি ধর্ম্ম প্রবল ছিল—কনফুসীয়, 'তাও' এবং বৌদ্ধধর্ম্ম। কনফুসীয় সাহিত্যই চীনাদের প্রধান শাস্ত্র-গ্রন্থ। কনফুসীয়স চীনাদের একজন মহাপুরুষ। তাঁর প্রকৃত নাম হচ্ছে "কোং ফু-ৎস" অর্থাৎ "দার্শনিক কোং"। ইউরোপীয় ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে এ নাম কন-ফুসীয়স (Confucius) আকার ধারণ করেছে। কনফুসীয়স প্রায় বুদ্ধের সমসাময়িক। তাঁর জন্মকাল খৃঃ পূঃ ৫৫১ এবং মৃত্যুকাল খৃঃ পূঃ ৪৭৯। তিনি শান্-টুং অঞ্চলে জন্ম-গ্রহণ করেন। প্রথমে কিছুদিন রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থেকে দেশের অত্যন্ত দুরবস্থা দেখে ব্যথিত হন। দেশে অরাজকতা, রাজার আধিপত্য তখন নাম মাত্র, সামাজিক

চিঠির খামের উপর—
"তোমার এইরূপ সুন্দর খোকা হোক্।"

জীবনেও তখন অবনতির যুগ। দেশের অবস্থা ভাল করে বুঝবার জন্য তিনি দেশভ্রমণে বেরুলেন। বহুদিন ধরে পর্য্যটন করে তিনি বুঝতে পারলেন যে, দেশ এবং জাতিকে উন্নত করতে হলে দেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করা প্রয়োজন এবং যে ধর্ম্মকে অবলম্বন করে চীন জাতি উন্নত হয়েছিল, সে ধর্ম্ম পুনরায় প্রচার করা আবশ্যক। এই প্রচার-কার্য্যের উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন চীনা সাহিত্যের কয়েকখানি লুপ্ত রত্ন উদ্ধার করে প্রকাশ করলেন।

তিনি পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই গ্রন্থগুলি সমস্ত চীন জাতির শাস্ত্র-গ্রন্থ। গ্রন্থগুলি হচ্ছে—(১) "সু-চিং"—প্রাচীন ইতিহাস বা পুরাণ। চীন জাতির প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রথম রাজা থেকে আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের 'চৌ'-রাজবংশ পর্য্যন্ত চীনাজাতির কীর্ত্তিকলাপ এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। (২) "শিং-চিং"—কাব্যগ্রন্থ। বহু প্রাচীন কালের অনেক কবিতা এ গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে। এ গ্রন্থে প্রায় ৩০৫টী কবিতা আছে। ভারতীয় বৈদিক মন্ত্রের মত এগুলি প্রথমে মুখে মুখে চলত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের

"তোমার পাঁচটি ছেলে পরীক্ষায় পাশ হোক্।"

সময় গান করা হত। কনফুসীয়স সেগুলিকে সংগ্রহ করে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। কনফুসীয়স নিজে এই দুখানি গ্রন্থই প্রকাশ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যেরা বাকী তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। (৩) "ই-চিং—এ গ্রন্থে দার্শনিক মত স্থাপনের প্রথম চেষ্টা দেখা যায়। (৪) "লি-চি"—ধর্ম্মশাস্ত্র। (৫) "ৎসুয়েন-ৎসু"—বসন্ত ও শরৎকালের ইতিবৃত্ত। এ গ্রন্থখানি কনফুসীয়সের নিজের রচিত। তিনি যে প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন, এ গ্রন্থে সেই প্রদেশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এ পাঁচখানি প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন না করলে কেহই পণ্ডিত বলে বিবেচিত হন না। এ গ্রন্থগুলির উপর বহু টীকা-টিপ্পনী রচিত হয়েছে। এই কনফুসীয় শাস্ত্রে পারদর্শী না হলে কেহই সেকালে রাজকীয় পদে নিযুক্ত হতেন না। রামায়ণ মহাভারত না পড়লে যেরূপ প্রকৃত হিন্দু হওয়া যায় না, কনফুসীয় শাস্ত্র না পড়লে তেমনি প্রকৃত চীনা হওয়া যায় না।

কনফুসীয়স কোন ধর্ম্মমত বা দর্শন প্রচার করেন নি। নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের শাস্ত্র-সম্মত কর্ত্তব্যগুলিই তিনি প্রত্যেক স্বদেশবাসীকে প্রতিপালন করতে বলেছেন। রাষ্ট্র হচ্ছে তাঁর মতে একটি বৃহৎ পরিবার এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের সমষ্টিতে এই বিরাট পরিবার গঠিত হয়েছে। সাধারণ পরিবারে পুত্রকে পিতৃভক্ত হতে হবে এবং অন্যান্য পূজনীয়দিগের যথাযোগ্য সম্মান এবং প্রতিবেশীকে যত্ন করতে হবে। রাষ্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষে হচ্ছেন সম্রাট্ নিজে। তিনি হচ্ছেন এই বৃহৎ পরিবারের পিতৃস্থানীয়। তিনি নিজে হচ্ছেন দেবপুত্র, অর্থাৎ দেবতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত। সেই রাষ্ট্রীয় পরিবারের শীর্ষস্থানীয় পিতা প্রত্যেক পুত্র বা প্রজার সম্মানার্হ। কনফুসীয়সের সমস্ত ধর্ম্মমতই এই জাতীয়। রাষ্ট্র ও সমাজকে এক সূত্রে না বাঁধতে পারলে জাতির উন্নতি সম্ভবপর নয়, এ কথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই সেই দুটিকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই তিনি সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করেছিলেন। তিনি যে এ বিষয়ে আশাতীতভাবে কৃতকার্য্য হয়েছিলেন, সমস্ত চীনা ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

প্রাচীন চীনা শাস্ত্রের দ্বিতীয় শাখা হচ্ছে "তাও" (Tao) শাস্ত্র। 'তাও' ধর্ম্মের প্রচারক একজন মহাপুরুষ লাওৎসু (Lao-tseu)। তিনি কনফুসীয়সের কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী এবং একটি নূতন দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তক। ইনি

দীর্ঘায়ুর প্রতীক : কচ্ছপ ও সারস

একখানি ছোট গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম 'তাও তে চিং'। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থকে অবলম্বন করে প্রায় দেড় হাজার টীকা-টিপ্পনী লেখা হয়েছে। লাও ৎসু কনফুসীয়সের মত সমাজ এবং রাষ্ট্র-সংস্কারক ছিলেন না। তাই তাঁর ধর্ম্মমত সার্ব্বজনীন নয়, সাম্প্রদায়িক। কোন দিনই তা সমস্ত চীনা

জাতির চিত্ত আকৃষ্ট করতে পারে নাই! 'তাও' কথার অর্থ হচ্ছে 'পথ' এবং 'তে' কথার অর্থ 'গুণ' বা 'পুণ্য'। 'তাও তে চিং' গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বা সাধনমার্গের কথা বলা হয়েছে। লাও ৎসু যে সাধনমার্গের কথা বলেছেন তা ভারতীয় যোগমার্গের অনুরূপ। সেই কারণে অনেকে অনুমান করেন যে, ভারতীয় ধর্ম্মের প্রভাবেই 'তাও' ধর্ম্মমত গড়ে উঠেছিল। এ কথা এখনও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কারণ অত প্রাচীনকালে ভারতের সহিত চীনদেশের যে কোন সম্বন্ধ ছিল, এ কথা এখনও প্রমাণিত হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মও এক সময়ে চীনদেশে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকেই চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সুরু হয়। এই প্রচারকার্য্য প্রায় হাজার বছর ধরে চলেছিল। চীনাজাতির জীবনে বৌদ্ধধর্ম্মের বহু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এক সময়ে চীনদেশের সম্রাটেরাও এ ধর্ম্মে দীক্ষালাভ করেছিলেন। চীনদেশে যে সব বৌদ্ধ সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, সেগুলি এখনও সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয় নাই। ভারতীয়দের শিক্ষার গুণেই চীনারা স্থাপত্য, সুকুমার শিল্প, ভাস্কর্য্য, শব্দ-শাস্ত্র, গণিত-শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে যে উন্নতি সাধন করেছিল, তা বর্ত্তমান চীনা জীবনেও পরিলক্ষিত হয়।

কনফুসীয় ধর্ম্ম চীনা জীবনকে চিরদিন নিয়ন্ত্রিত করছে। 'তাও' ধর্ম্ম হতে চীনারা আধ্যাত্মিক সাধনার উপায় পেয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম তাদের মনকে সরস করেছে। এই ত্রিধারা নিয়েই চীনা সভ্যতা গঠিত। কিন্তু এ সভ্যতাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, লোকাচারের পেছনে রয়েছে একটা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধারা। চীনাদের দৈনন্দিন জীবন যে অনেক পরিমাণে সেই ধারা অনুসরণ করে তাতে সন্দেহ নাই। লোক-সাহিত্য, লোক-শিল্প প্রভৃতির মধ্যেও সেই ধারার খোঁজ পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের মত চীনদেশে এমন কতকগুলি লোকাচার আছে, যাকে সাধারণতঃ 'কুসংস্কার' বলা হয়। কুসংস্কারই হোক, আর সুসংস্কারই হোক, সেগুলি চীন-দেশের যে লোক-শিল্পের সৃষ্টি করেছে, তা আমাদের মনকে আনন্দরসে সিক্ত করে। সুখ-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, দীর্ঘজীবন প্রভৃতির কামনা প্রত্যেক দেশেই মানুষের অন্তরে প্রবল। সেই কামনা ফলবতী করবার জন্য কবচ ধারণ করা, প্রতীক পূজা করা, গৃহের ব্যবহার্য্য আসবাব-পত্রে মাঙ্গলিক-চিহ্ন অঙ্কিত করবার রীতিও নানাভাবে প্রচলিত আছে। বৌদ্ধদের মধ্যে আটটী মাঙ্গলিক-চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, এই অষ্টমঙ্গলা হচ্ছে—শ্রী-বৎস, পদ্ম, ধ্বজ, কলস, চামর, ছত্র, মৎস্য এবং শংখ। এর মধ্যে অনেক-গুলি চিহ্ন হিন্দুদের মধ্যেও মঙ্গলাচরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

মানুষের প্রধান কামনাই হচ্ছে সুখ। চীনারা লোক-শিল্পে এ কামনা নানাভাবে প্রকাশ করে। সে কামনা প্রকাশ করবার সব চাইতে সহজ উপায় হচ্ছে গৃহে ব্যবহার্য্য চীনামাটির বাসন বা সূচীকার্য্যের উপর আনন্দ
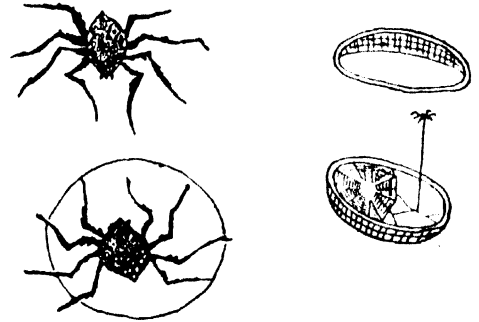
সুখের প্রতীক: মাকড়সা ও মাকড়সার জাল।

বা সুখদ্যোতক চীনা অক্ষর অঙ্কন করা। চীনা অক্ষরগুলি চিত্রবিশেষ, সুতরাং তা ভালভাবে অঙ্কিত করতে হলে যথেষ্ট সৌন্দর্য্যজ্ঞান আবশ্যক। চীনাদের পৌরাণিক প্রবাদে ড্রাগন জাতীয় যে অদ্ভুত জন্তুর পরিকল্পনা করা হয়েছে, সে জন্তু হচ্ছে পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান এবং পূর্ণতম জীব। চীনাদের একটি পৌরাণিক পাখী হচ্ছে ফিনিক্স। সংস্কৃতে এ পাখীর নাম দেওয়া হয়েছে জীবঞ্জী-বক। এ পাখী অমর। চীনারা কবচ এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য বস্তুতে এই 'ড্রাগন' এবং 'ফিনিক্সে'র চিত্র অঙ্কিত করে, কারণ তাদের মতে এ দুটি জীব হচ্ছে পার্থিব সুখের মূল। চীনাদের মতে সুখের অন্যান্য প্রতীক হচ্ছে ছুঁচো, কুমড়া, মাকড়সা প্রভৃতি। সুতরাং ব্যবহার্য্য

আট জন অমর মহাপুরুষ।
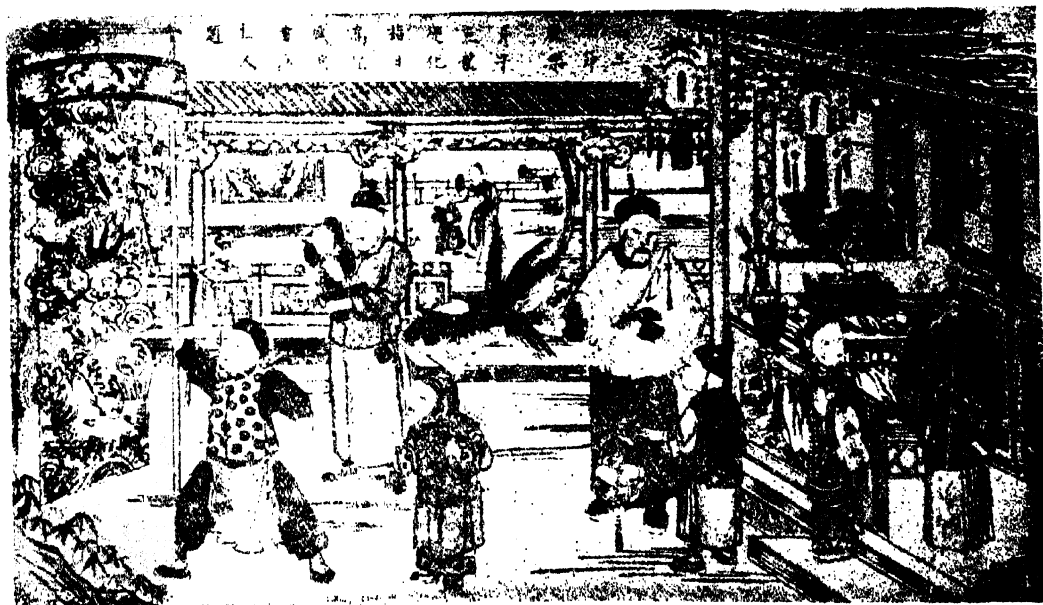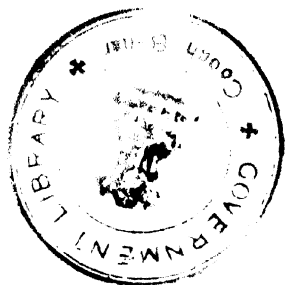
দ্রব্যের ওপর এসব চিত্রও অঙ্কন করা হয়। দুটি মাকড়সা সুখ এবং দীর্ঘায়ুর প্রতীক।

দীর্ঘায়ুর অন্যান্য প্রতীকও আছে। দীর্ঘজীবন লাভ করবার জন্য যে দেবতাকে পূজা করা হয়, তাঁর মূর্ত্তি বিভিন্ন দ্রব্যে নির্ম্মিত হয় এবং প্রতি ঘরেই রাখা হয়। সে মূর্ত্তি একটি চিরানন্দময় বৃদ্ধের মূর্ত্তি, তাঁর পরিহিত বস্ত্রে দীর্ঘায়ু দ্যোতক চীনা-অক্ষর লিখিত। সে মূর্ত্তি যে কোন্ শিল্পী প্রথম রচনা করেছিল তা জানা যায় না, কিন্তু সে শিল্পী যে শীর্ষস্থানীয় ছিল তাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘজীবনের আর দুটি প্রতীক্ হচ্ছে কচ্ছপ এবং সারস। চীনারা বিশ্বাস করত যে, কচ্ছপ তিন হাজার বৎসর এবং সারস হাজার বৎসর বাঁচতে পারে। এই কারণে কাউকে আশীর্ব্বাদ করতে হলেই তারা বলত "তোমার কচ্ছপ এবং সারসের মত দীর্ঘায়ু হোক।" সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য অনেক আসবাবপত্রে কচ্ছপ ও সারসের চিত্রও এই কারণেই অঙ্কিত হয়ে থাকে।

দীর্ঘজীবনের আর একটি প্রতীক হচ্ছে 'পীচ' ফল। এ ফল চীনদেশে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ ফল। এর রঙ লাল এবং স্বাদ অতি মধুর। তা ছাড়া চীনারা এক সময়ে বিশ্বাস করত যে, তাদের দেশের পশ্চিম প্রান্তে যে পর্ব্বতমালা আছে, সেখানে এক মাতৃদেবী বাস করেন, আর তাঁর বাগানে যে পীচ ফল পাওয়া যায় তা অমরত্ব দান করে।

বহুসংখ্যক সন্তান-সন্ততিলাভের কামনা হচ্ছে চীনাদের একটি প্রধান কামনা। সেই কারণে এখনও অনেক চিঠির খামের ওপর একটি ছোট ছেলের চিত্র দেখা যায় এবং তার পাশে লেখা থাকে "তোমার সন্তানভাগ্য হোক!" চিঠির ওপরে এরূপ শুভকামনা আজকাল আমাদের অশোভন মনে হলেও বৃদ্ধেরা নববিবাহিতকে এ আশীর্ব্বাদ করে থাকেন।

চীনারা লেবুকে এই কামনার একটি প্রতীক মনে করে, তার কারণ লেবুর অসংখ্য বীজ থাকে। পাঁচটি ছেলে ও দুটি মেয়ে হলে সব চাইতে সুখের ব্যাপার হয়, সেই কারণে আয়না এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য জিনিষে পাঁচটি ছেলের চিত্র অঙ্কিত করা হয়। সে চিত্র যে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক তাতে সন্দেহ নাই।

অনেক ব্যবহার্য্য দ্রব্যে মাছের ছবি দেখা যায়। মাছটি জল থেকে লাফিয়ে উঠে একটি দরজা পার হচ্ছে, আর সে দরজা হচ্ছে ড্রাগনের। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হবার জন্য আশীর্ব্বাদ হিসাবে এ চিত্র ব্যবহৃত হয়। ত্রিপদবিশিষ্ট ব্যাঙের চিত্র ঐ একই প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বৎসরের প্রথম দিনে শুভকামনা করবার জন্যও মাছের চিত্র মাঙ্গলিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বহুসংখ্যক প্রজাপতির চিত্রও দীর্ঘায়ুর প্রতীক হিসাবে গৃহীত হয়।

চীনাদের প্রাচীন সাহিত্যে আটজন মহাপুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মহাপুরুষেরা নিজেদের সাধনার দ্বারা অমরত্ব লাভ করেছিলেন। সেই কারণে দীর্ঘায়ু, সুখ-সম্পদ্ প্রভৃতি কামনার সঙ্গে যে সব মাঙ্গলিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সে সঙ্গে এই মহাপুরুষদের চিত্রও অঙ্কিত হয়। এই মহাপুরুষরা হচ্ছেন—(১) লি থিয়ে কোয়াই—ভিক্ষুকবেশে, হাতে লাউয়ের ভিক্ষাপাত্র; (২) হান্ সিয়াংৎসে—হাতে বাঁশী; (৩) চোং লি খিউয়ান—হাতে পাখা; (৪) লান্ৎসাইহো—হাতে ফুলের ডালি; (৫) লু তোং পিন—হাতে পাখা ও তলোয়ার; (৬) চাংকুও হাতে অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র; (৭) ৎসাও কুও খিউ এবং (৮) হোসিয়েন কুও, হাতে লম্বা চুবড়ি। এই সব মহাপুরুষদের কিংবদন্তী লোকচিত্তে বিপুল প্রভাব বিস্তার করছে এবং সেই কারণে তাঁদের চিত্র মাঙ্গলিক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

জনসভা

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার তখন বয়স নয় বছর। গ্রামের উচ্চ-প্রাইমারী স্কুলে পড়ি এবং বয়সের তুলনায় একটু বেশী পরিপক্ক। বিনু একদিন ক্লাশে একখানা বই আনিল, ওপরে সোনালিস্কুল হাতে একটি মেয়ের ছবি (ত্রিশ বছর আগেকার কথা বলিতেছি মনে রাখিবেন), রাঙা কাগজের মলাট, বেশী মোটা নয়, আবার নিতান্ত চটি-বইও নয়।

আমি সেই বয়সেই দু'একখানা সুগন্ধি তেলের বিজ্ঞাপনের নভেল পড়িয়া ফেলিয়াছি, পূর্ব্বেই বলি নাই যে বয়সের তুলনায় আমি একটু বেশী পাকিয়াছিলাম? সে জন্য বিনু আমাকে ক্লাশের মধ্যে সমজদার ঠাওরাইয়া বইখানি আমার নাকের কাছে উঁচাইয়া সগর্ব্বে বলিল, "এই ছাখ, আমার দাদা এই বই লিখেছেন, দেখেছিস?"

বলিলাম, "দেখি কি বই?" মলাটের ওপরে লেখা আছে 'প্রেমের তুফান'।

হাতে লইয়া দেখিলাম, লেখকের নাম, শ্রীভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। দিনাজপুর, পীরপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, দাম আট আনা।

"তোর দাদার লেখা বই, কি রকম দাদা?"

বিনু সগর্ব্বে বলিল, "আমার বড়মামার ছেলে, আমার মামাতো ভাই।"

এই সময়ে নিতাই মাষ্টার মহাশয় ক্লাশে ঢোকাতে আমাদের কথা বন্ধ হইয়া গেল। নিতাই মাষ্টার আপন মনে থাকিতেন, মাঝে মাঝে কি এক ধরণের অসংলগ্ন কথা বলিতেন আর আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া হাসিতাম, জোরে হাসিবার উপায় ছিল না তাঁর ক্লাশে।

অমনি তিনি বলিয়া বসিবেন, "এই তিনকড়ি, এদিকে এস, হাসছ কেন? ছানা চার আনা সের, কেরোসিন-তেল ছ'পয়সা বোতল—"

এই সব মারাত্মক ধরণের মজার কথা শুনিয়াও আমাদের গম্ভীর হইয়া বসিয়া থাকিতে হইবে, হাসিয়া ফেলিলেই মার খাইয়া মরিতে হইবে।

বর্ত্তমানে নিতাই মাষ্টার ক্লাশে ঢুকিয়াই বলিলেন, "ও খানা কি বই নিয়ে টানাটানি হচ্ছে সব? তিনটের গাড়ী কাল এসেছিল তিনটে পঁচিশ মিনিটের সময়, পঁচিশ মিনিট লেট—অমুক বিস্কুট পয়সায় দশখানা—"

আমরা হাসি অতি কষ্টে চাপিয়া মেজের দিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

নিতাই মাষ্টার বইখানা হাতে লইয়া বলিলেন, "কার বই?"

বিনু সগর্ব্বে বলিল, "আমার বই, স্যর। আমার দাদা লিখেছেন, আমাদের একখানা দিয়েছেন—"

নিতাই মাষ্টার বইখানা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "হুঁ, থাক্, একটু পড়ে দেখব।"

পরের দিন বইখানা ফেরৎ দিবার সময় মন্তব্য করিলেন, "লেখে ভাল, বেশ বই। ছোকরা এর পর উন্নতি করবে।"

বিনু বাধা দিয়া বলিল, "ছোকরা নন স্যর তিনি, আপনাদের বয়সী হবেন—"

নিতাই মাষ্টার ধমক দিয়া বলিলেন, "বেশী কথা কইবে না, চুপ করে বসে থাকবে। আবার কথার ওপর কথা! পুরাণো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারে, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজো হয়।"

পুরাণো তেঁতুলে অম্বলের ব্যথা সারুক আর নাই সারুক, নিতাই মাষ্টারের সার্টিফিকেট্ শুনিয়া বিনুর দাদার বইখানা পড়িবার অত্যন্ত কৌতূহল হইল। বিনুর নিকট যথেষ্ট সাধ্য-সাধনা করিয়া সেখানা আদায় করিলাম। বাড়ীতে বাবা ও বড়দা'র চক্ষু এড়াইয়া বইখানাকে শেষ করিয়া বিনুর এই অদেখা দাদাটির প্রতি মনে মনে ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া গেলাম। একটি মেয়েকে কি করিয়া দুষ্ট লোক ধরিয়া লইয়া গেল, নানা কষ্ট দিল, অবশেষে মেয়েটি কি ভাবে জলে ডুবিয়া মরিল, তাহারই অতি মর্ম্মন্তুদ বিবরণ। পড়িলে চোখে জল রাখা যায় না।

কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে, একদিন বিনু বলিল, "জানিস্ পাঁচু, আমার সেই দাদা, যিনি লেখক, তিনি এসেছেন কাল আমাদের বাড়ী।"

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম।

"কখন এসেছেন? এখনও আছেন?"

"কাল রাতের ট্রেনে এসেছেন, দু'তিন দিন আছেন এখন।"

"সত্যি? মাইরি বল্—"

"মা-ইরি, চল বরং, আয় আমাদের বাড়ী—"

আমার ন'দশ বৎসর বয়সে ছাপার বই কিছু কিছু পড়িয়াছি বটে, কিন্তু যাহারা বই লেখে, তাহারা কিরূপ জীব কখনো দেখি নাই। একজন জীবন্ত গ্রন্থকারকে স্বচক্ষে দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না; বিনুর সহিত তাহার বাড়ী গেলাম।

বিনুদের ভেতর-বাড়ীতে একজন একহারা কে বসিয়া বিনুর মার সঙ্গে গল্প করিতেছিল, বিনু দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, "উনিই।" আমি কাছে যাইতে ভরসা পাইলাম না। সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া দূর হইতে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। লোকটি একহারা, শ্যামবর্ণ, অল্প দাড়ি আছে, বয়স নিতাই মাষ্টারের চেয়ে বড় হইবে তো ছোট নয়, খুব গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়াও মনে হইল। লোকটি সম্প্রতি কাশী হইতে আসিতেছে, বিনুর মায়ের কাছে সবিস্তারে সেই ভ্রমণ-কাহিনীই বলিতেছিল। প্রত্যেক কথা আমি গিলিতে লাগিলাম ও হাত পা নাড়ার প্রতি ভঙ্গীটি কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

লেখকরা তাহা হইলে এই রকম দেখিতে!

সেই দিনই গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল, বিনুর বাবা মুখুজ্যেদের চণ্ডীমণ্ডপে গল্প করিয়াছেন, তাঁহার বড় শালার ছেলে বেড়াইতে আসিয়াছে, মস্ত একজন লেখক, তার লেখার খুব আদর। ফলে গ্রামের লোক দলে দলে দেখা করিতে চলিল। বিনুর মা মেয়ে-মহলে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, 'প্রেমের তুফান'-এর লেখক তাহাদের বাড়ী আসিয়াছেন। উক্ত বইখানি ইতিমধ্যে পুরুষেরা যত পড়ুক আর না পড়ুক, গ্রামের মেয়ে-মহলে হাতে হাতে ঘুরিয়াছে খুব, অনেক মেয়ে পড়িয়া ফেলিয়াছে, বিনুর মা ভ্রাতুষ্পুত্রগর্ব্বে স্ফীত হইয়া নিজে যাচিয়াও অনেককে পড়াইয়াছেন, সুতরাং মেয়ে-মহলও ভাঙ্গিয়া আসিল এক-জন জলজ্যান্ত লেখককে দেখিবার জন্য। বিনুদের বাড়ী দিনরাত লোকের ভিড়; একদল যায়, আর একদল আসে। অজ পাড়াগাঁ, এমন একজন মানুষের, যার বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, দেখা পাওয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতই দুর্লভ।

ক'দিন কি খাতির এবং সম্মানটাই দেখিলাম বিনুর দাদার! এর বাড়ী নিমন্ত্রণ, ওর বাড়ী নিমন্ত্রণ, বিনুর মা সগর্ব্বে মেয়ে-মহলে গল্প করেন, "বাছা এসে ক'দিন বাড়ীর ভাত মুখে দিলে? নেমন্তন্ন খেতে খেতেই ওর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে—"

ভাবিলাম—সত্য, সার্থক জীবন বটে বিনুর দাদার! লেখক হওয়ার সম্মান আছে।

ভূষণ দাদার সহিত এই ভাবে আমার প্রথম দেখা।

অত অল্প বয়সে অবশ্য ভূষণ দাদার নিকটে ঘেঁসিবার পাত্তা পাই নাই—কিন্তু বছর দুই পরে তিনি যখন আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন, তখন তাঁহার সহিত মিশিবার অধিকার পাইলাম—যদিও এমন কিছু ঘনিষ্ঠভাবে নয়। তিনি যে মাদৃশ বালকের সঙ্গে কথা কহিলেন, ইহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়া বাড়ী গিয়া উত্তেজনায় রাত্রে ঘুমাইতে পারিলাম না।

সে কথাও অতি সাধারণ ও সামান্য।

দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া ভূষণ দাদা বলিয়াছিলেন, "তোমার নাম কি হে? তুমি বুঝি বিনুর সঙ্গে পড়?"

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমজড়িত কণ্ঠে উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তোমার?"

"শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।"

"বেশ।"

কথা শেষ হইয়া গেল। দুরু দুরু বক্ষে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। প্রথম দিনের পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। পরদিন আরও ভাল করিয়া আলাপ হইল।

নদীর ধারে বিনু, আমি আরও দু'একটি ছেলে তঁার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম। ভূষণ দাদা

বলিলেন, "বল তো বিনু, 'এ দম্ভোলি বৃত্রাসুর শিরচ্ছিন্ন যাচ্ছে' দম্ভোলি মানে কি ? পারলে না ? কে পারে ?"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি বয়সের তুলনায় পাকা ছিলাম। তাড়াতাড়ি উত্তর করিলাম, "আমি জানি, বলব ?···বজ্র।"

"বেশ বেশ, কি নাম তোমার ?"

কালই নাম বলিয়াছি ; এ দীনজনের নাম তিনি মনে রাখিয়াছেন, এ আশা করাও আমার মত অর্ব্বাচীন বালকের পক্ষে ধৃষ্টতা। সুতরাং আবার নাম বলিলাম।

"বেশ বাংলা জান তো ! বই-টই পড় না কি ?"

এ সুবর্ণ সুযোগ ছাড়িলাম না ; বলিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার বই সব পড়েছি।"

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, ইতিমধ্যে ভূষণ দাদার আরও দুইখানি উপন্যাস ও একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল—বিনুদের বাড়ী সেগুলি আসিয়াছিল ; বিনুর নিকট হইতে আমি সবগুলিই পড়িয়াছিলাম।

ভূষণ দাদা বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "বল কি ? সব বই পড়েছ ? নাম কর তো ?"

"প্রেমের তুফান, রেণুর বিয়ে, কমলকুমারী আর দেওয়ালী।"

"বাঃ বাঃ এ যে বেশ ছেলে দেখছি ! কি নাম বললে ?"

বিনীতভাবে পুনরায় নিজের নাম নিবেদন করিলাম।

"বেশ ছেলে ! ছাখ তো বিনু, তোর চেয়ে কত বেশী জানে !"

গর্ব্বে আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। একজন লেখক আমার প্রশংসা করিয়াছেন ! তারপর ভূষণ দাদা (বিনুর সুবাদে আমিও তাঁহাকে তখন 'দাদা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি) নবীন সেন এবং হেমচন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন, সাহিত্য, কবিতা এবং তাঁহার নিজের রচনা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন ; তার কতক বুঝিলাম, কতক বুঝিলাম না—এগারো বছরের ছেলের পক্ষে সব বোঝা সম্ভবও ছিল না।

বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। আমি হাই-স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। একদিন ভূষণ দাদা সম্বন্ধে আমি এক বিষম ধাক্কা পাইলাম আমাদের স্কুলের বাংলা মাষ্টারের নিকট হইতে। কি উপলক্ষে মনে নাই, মাষ্টার মশায় আমাদের ক্লাসের ছেলেদের জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাংলা দেশের আরও দু'একজন বড় লেখকের নাম কর ত। কে পারে ?"

একজন বলিল, "নবীনচন্দ্র", একজন বলিল, "সুরেন ভট্‌চাজ" (তখনকার কালে মস্ত নাম), একজন বলিল, "রজনী সেন", (তখন সবে উঠিতেছেন)—আমি একটু বেশী জানিবার বাহবা লইবার জন্য বলিলাম—"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।"

মাষ্টার মশায় বলিলেন, "কে ?"

"ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। আমি পড়েছি তাঁর সব বই, আমার সঙ্গে আলাপ আছে।"

"সে আবার কে ?"

আমি মাষ্টার মশায়ের অজ্ঞতা দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

"কেন, ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খুব বড় লেখক—প্রেমের তুফান, কমলকুমারী, দেওয়ালী, রেণুর বিয়ে—এই সব বইয়ের—"

মাষ্টার মশায় হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, ক্লাসের ছেলেদের বেশীর ভাগই না বুঝিয়া সে হাসিতে যোগ দিল। উহাদের সম্মিলিত হাসির শব্দে ক্লাসরুম ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

আমার কাণ গরম হইয়া উঠিল, রীতিমত অপদস্থ বিবেচনা করিলাম নিজেকে। কেন ? ভূষণ দাদা বড় লেখক নন ? বা রে !

মাষ্টার মশায় বলিলেন, "তোমাদের গাঁয়ের আত্মীয় বলে আর তোমার সঙ্গে আলাপ আছে বলেই তিনি বড় লেখক হবেন তার মানে আছে ? কে তাঁর নাম জানে ? ও রকম আর ব'লো না।"

ভূষণ দাদার সাহিত্যিক যশ ও খ্যাতি সম্বন্ধে আমি এ পর্য্যন্ত কেবল একতরফা বর্ণনাই শুনিয়া আসিয়াছি বিনুর মায়ের মুখে, বিনুর মুখে, বিনুর বাবার মুখে, ভূষণ দাদার নিজের মুখে। তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, সরল বালক মনে। এই প্রথম আমার তাহার উপরে সন্দেহের ছায়াপাত হইল।

এতদিন গাঁয়ে থাকিয়া কেবল সুগন্ধি তেলের

বিজ্ঞাপনের নভেলই পড়িয়াছি--ক্রমে স্কুল লাইব্রেরী হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের ও আরও অন্যান্য বড় লেখকের বই লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলাম, বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দ বুঝিবার একটা ক্ষমতাও জন্মিল—ফলে বছর চারপাঁচ স্কুলে পড়িবার পরে আমার মনের উপরে ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর প্রভাব যে অত্যন্ত ফিকে হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার।

আমি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি, সে বার শ্রাবণ মাসে বিনুর ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে ভূষণ দাদা আবার আমাদের গ্রামে আসিলেন। তখন আমার চোখে তিনি আর ছেলেবেলার সে বড় লেখক ভূষণচন্দ্র নন, বিনুর ভূষণ দাদা, সুতরাং আমারও ভূষণ দাদা। তখন বেশ সমানে সমানে কথাবার্ত্তা বলিলাম, দাদারও আর সে মুরুব্বিয়ানা চাল নাই, থাকিবার কথাও নয়, তিনিও সমানে সমানেই মিশিলেন।

একখানা বই দেখিলাম, বিবাহ-বাটির কুটুম্ব সাক্ষাৎদের হাতে ঘুরিতেছে, কবিতার বই, নাম, 'প্রতিমা বিসর্জ্জন'! দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া ভূষণ দাদা কবিতা লিখিয়া বই ছাপাইয়াছেন বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বিনুও তো আর বাল্যের সেই বিনু নাই। সে বলিল— "মজার কথা শোন্, আগের বৌ-দিদি ষোল বছর ঘর করে ছেলেপুলের মা হয়ে মরে গেল, বেচারী, তার বেলা শোকের কবিতা বেরুলো না, দ্বিতীয় পক্ষের বৌদি—দু'তিন বছর ঘর করে ডব্‌কা বয়সেই মারা গেল কি না—দাদার তাই শোকটা বড্ড লেগেছে—একেবারে প্র—তি—মা— বি—স—র্জ্জ—ন!"

ভূষণ দাদা আমাকেও একখানা বই দিয়াছিলেন, দু'তিন দিন পরে আমায় বলিলেন—"প্রতিমা-বিসর্জ্জন কেমন পড়লে হে?"

অতি সাধারণ ধরণের কবিতা বলিয়া মনে হইলেও বলিলাম, "বেশ চমৎকার।"

ভূষণ দাদা উৎসাহের সহিত বলিলেন, "বাংলাদেশে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম'-এর পরে আমার মনে হয়, এ ধরণের বই আর বেরোয় নি। নিজের মুখে নিজের কথা বলছি বলে কিছু মনে ক'রো না—তবে তোমাদের ছোট দেখেছি, তোমাদের কাছে বলতে দোষ নাই।"

ভূষণ দাদার দাড়ি চুলে বেশ পাক ধরিয়াছে, তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলি, সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া গেলাম। যদিও 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর প্রতি আমার যে খুব শ্রদ্ধা ছিল তাহা নয়, তবুও ভূষণ দাদার কথা শুনিয়া তাঁহার সমালোচনা-শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইলাম।

ভূষণ দাদার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়, অনেকদিন হইতেই জানি। তিনি ক্যাম্বেল স্কুল হইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া দিনাজপুরের এক সুদূর পল্লীগ্রামের জমিদারের দাতব্য-চিকিৎসালয়ে চাকুরী করিতেন, স্বাধীন ব্যবসা কোনদিন করেন নাই।

এবার শুনিলাম ভূষণ দাদার সে চাকুরীটাও যায় যায়। বিনুই এ সংবাদ দিল।

ভূষণ দাদা আসার পরদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও হে, তোমরা তো কলকাতায় ছাত্রমহলে ঘোর, পাঁচটা কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হয়, ছাত্রমহলে আমার বই সম্বন্ধে কি মতামত কিছু শুনেছ?" শুনিয়া হঠাৎ বড় বিব্রত হইয়া পড়িলাম, আম্‌তা আম্‌তা সুরে বলিলাম, "আজ্ঞে হাঁ—তা মত বেশ ভালই—"

বলেন কি ভূষণ দাদা! বিব্রত ভাবটা কাটিয়া গিয়া এবার আমার হাসি পাইল। কলকাতায় ছাত্রমহলে ভূষণ চাটুয্যের নামই কেউ জানে না, তার বই পড়া, আর সে সম্বন্ধে মতামত!

ভূষণ দাদা উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "কি, কি, কি— রকম বলে? আমার কোন্ বইটার কথা শুনেছ, পাষাণপুরী না দেওয়ালী?"

অকূলে কূল পাইলাম। ভূষণ দাদার বইয়ের নাম কি আমার একটাও মনে ছিল ছাই! বলিলাম, "হ্যাঁ, ওই পাষাণপুরীর কথাই যেন শুনেছি।"

ভূষণ দাদা আর আমায় ছাড়িতে চান না। কি শুনিয়াছি, কোথায় শুনিয়াছি, কাহার কাছে শুনিয়াছি? পাষাণপুরী তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তবুও তো তিনি পাবলিশার পান নাই, সব বই-ই নিজে ছাপাইয়াছেন, দিনাজপুরের অজ পাড়াগাঁয় বসিয়া বই

বিক্রী ও বিজ্ঞাপনের কোনো সুবিধা করিতে পারেন নাই।

বিনু আমায় আড়ালে বলিল, "এই অবস্থা, পঞ্চাশটা টাকা মাইনে পান ডাক্তারী করে, সংসারই চলে না, তা থেকে খরচ করেন ওই সব বাজে বই ছাপতে। ভূষণ দাদার চিরকালটা এক রকম গেল। বাতিক যে কত রকমের থাকে।"

ইহার পর আরও ছ'সাত বছর কাটিয়া গেল।

আমি পাশ করিয়া বাহির হইয়া নানারকম কাজকর্ম্ম করি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু লিখিও।

ভূষণ দাদার প্রভাব আমার জীবন হইতে সম্পূর্ণ যায় নাই, মনের তলে কোথায় চাপা ছিল, লেখক হওয়া একটা মস্ত বড় কিছু বুঝি। সেই যে আমাদের গ্রামে বাল্যকালে সেবার ভূষণ দাদাকে সম্মান পাইতে দেখিয়াছিলাম, সেই হইতেই বোধ হয় লেখক হওয়ার সাধ মনে বাসা বাঁধিয়া থাকিবে, কে জানে?

আমার লেখক-জীবন যখন পাঁচ ছ' বছরের পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে, দু চারখানা ভাল মাসিক পত্রিকায় লেখা প্রায়শঃ বাহির হয়, কিছু কিছু আয়ও হইতেছে, সে সময় কি একটা ছুটিতে দেশে গেলাম। বিনুদের বাড়ীতে গিয়া দেখি, ভূষণ দাদা অসুস্থ অবস্থায় সেখানে সপরিবারে কিছুদিন হইতে আছেন। আমায় বলিলেন, "পাঁচু, শুনলাম, আজকাল লিখছ টিখছ? কোন্ কোন্ কাগজে লেখা বেরিয়েছে?"

কাগজগুলির কয়েকখানি আমার সঙ্গেই ছিল, ইতি-মধ্যে গ্রামের অনেকেই সেগুলি দেখিয়াছে। ভূষণ দাদাকেও দেখাইলাম—দেখাইয়া বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করিলাম।

ভূষণ দাদা কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "এই সব কাগজে লিখছ? বেশ বেশ। এ সব তো বেশ নাম-করা পত্রিকা। একটু ধরাধরি করতে হয় না? তুমি কাকে ধরেছিলে? একটু ধরাধরি না করলে আজকাল কিছুই হয় না। গুণের আদর কি আর আছে? এই দেখ না কেন, আমি পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে নিজেকে পুশ্ করতে পারলাম না। আমার 'নারদ'-কাব্য পড় নি? দু'বছর ধরে খেটে লিখেছি, প্রাণ দিয়ে লিখেছি। কিন্তু হলে হবে কি, অই ধরাধরির অভাবে বইখানা নাম করতে পারছে না।"

বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভূষণ দাদার মুখে তাঁহার 'নারদ'-কাব্যের অনেক ব্যাখ্যা শুনিলাম। অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইলেও তাহার মধ্যে নিজস্ব জিনিস কি একটা ঢুকা-ইয়া দিয়াছেন ভূষণ দাদা, অমন দার্শনিকতা আধুনিক কোন বাংলা গ্রন্থে নাই, এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিতে পারেন।

বলিলাম, "বইখানা ছেপেছে কারা?"

"আমিই ছেপেছি। লোকের দোরে দোরে বেড়িয়ে ছাপানর জন্যে খোসামোদ করা ও সব আমার দ্বারা হবে না।"

মনে হইল ভূষণ দাদা আমারই প্রতি যেন বক্রকটাক্ষ করিতেছেন এই সব উক্তি দ্বারা। যাহা হউক কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

বছরখানেক পরে আমি আমার কর্ম্মস্থলে একটা বুক-পোষ্ট পাইলাম। খুলিয়া দেখি, ভূষণদাদা সেই 'নারদ'-কাব্যখানি আমায় পাঠাইয়াছেন; সঙ্গে একখানা বড় চিঠি। 'নারদ'-কাব্যখানির উচ্চ প্রশংসা করিয়া বহুলোক ইতিমধ্যে চিঠি লিখিয়াছেন—চিঠিগুলি তিনি পুস্তিকাকারে ছাপিয়া ঐ সঙ্গে আমায় পাঠাইয়াছেন। আমি কলিকাতায় কোন নাম-করা কাগজে বইখানির ভাল ও বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করিয়া দিই, এই ভূষণ দাদার অনুরোধ।

ছাপান প্রশংসাপত্রগুলি পড়িয়া আমার খুব ভক্তি হইল না। একজন মফঃস্বলের কোন সহরের প্রধান ডাক্তার লিখিয়াছেন, কবি নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যের পরে আর একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য আবার বাংলা সাহিত্যে বাহির হইল বহুকাল পরে। আর একজন কোথাকার প্রধান উকীল লিখিতেছেন, কে বলে বাংলা ভাষার দুর্দ্দিন? বাংলা সাহিত্যের দুর্দ্দিন? বাংলা কবিতার দুর্দ্দিন? যে দেশে আজও 'নারদ'-কাব্যের মত কাব্য রচিত হয়ে থাকে (মনে ভাবিলাম, ভদ্রলোক কি বাংলা কবিতার কিছুই পড়েন নাই?) সে দেশে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মন দিয়া 'নারদ'-কাব্য পড়িলাম। নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-'এর ব্যর্থ অনুকরণ। লম্বা লম্বা বক্তৃতা মাঝে মাঝে—তাহার মধ্যে 'ভূমা', 'প্রপঞ্চ', 'ক্ষর' ও 'অক্ষর', 'শাশ্বত' 'অব্যয়' প্রভৃতি শব্দের ভীষণ ভিড়—ইহাকে 'নারদ'-কাব্য না বলিয়া গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতের পদ্যে ব্যাখ্যা বলিলেও চলিত।

আমি চিঠির উত্তরে লিখিলাম, 'নারদ' বেশ লাগিয়াছে, তবে কলিকাতায় কোন নামকরা মাসিক পত্রিকায় ইহার বিস্তৃত সমালোচনা বাহির করা আমার সাধ্যায়ত্ত নয়। সে চিঠির উত্তরে ভূষণ দাদা আমায় আরও দুই তিনখানি পত্র লিখিলেন—যদি বইখানি আমার ভাল লাগিয়া থাকে, তবে সে কথা ছাপাইয়া প্রকাশ করিবার সৎসাহস থাকা আবশ্যক ইত্যাদি। সে সব চিঠির উত্তর দিলাম না।

ইহার বছরখানেক পরে আমি আমার বিদেশের কর্ম্মস্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়াছি। শ্রাবণ মাস, তেমনি বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে। দিনে রাতে বৃষ্টির বিরাম নাই। এ বেলা একটু ধরিয়াছে বলিয়াই বাহির হইয়াছি। গোলদীঘির কাছাকাছি আসিয়া একখানা হ্যাণ্ডবিল হাতে পড়িল। হ্যাণ্ডবিলখানা ফেলিয়া দেওয়ার পূর্ব্বে অন্যমনস্কভাবে সেখানার উপর একটু চোখ বুলাইয়া লইতে গিয়া দস্তুরমত বিস্মিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। উহাতে লেখা আছে—

'নারদ'-কাব্যের খ্যাতনামা কবি
বঙ্গভারতীর কৃতী সন্তান
শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে (বড় বড় অক্ষরে)
সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণের
জনসভা (আধইঞ্চি লম্বা অক্ষরে)
স্থান—ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হল, সময়—সন্ধ্যা ৬৷৷০টা।

সভাপতিত্ব করিবেন একজন খ্যাতনামা নামজাদা প্রবীণ সাহিত্যিক।

ব্যাপার কি? চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিলাম না—ভূষণ দাদাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসিগণ (কি ভয়ানক ব্যাপার!) জনসভা আহ্বান করিয়াছে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট হলে অতবড় নামজাদা সাহিত্যিকের সভাপতিত্বে! কই, 'নারদ'-কাব্যের এতাদৃশ জনপ্রিয়তা তো পূর্ব্বে মোটেই শুনি নাই? যাহা হউক, হইলে খুব ভাল কথা, কিন্তু কলিকাতাবাসিগণ কি ক্ষেপিয়া গেল হঠাৎ?

হ্যাণ্ডবিলের তারিখ লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা সভা। সাড়ে ছ'টার বেশী দেরী নাই, যদি লোকের খুব ভিড় হয়, পৌণে ছ'টায় ইন্‌ষ্টিট্যুটে গিয়া ঢুকিলাম। তখনও কেহ আসে নাই—অতবড় হল একেবারে খালি। এক পাশে গিয়া বসিলাম। ছ'টা বাজিল, জনপ্রাণীরও দেখা নাই—এই সময় আবার জোরে বৃষ্টি নামিল, সওয়া ছ'টা—কেহই নাই, সাড়ে ছ'টার দু'এক মিনিট পূর্ব্বে দেখি ভূষণ দাদা অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে একতাড়া কাগজ বগলে হলে প্রবেশ করিতেছেন, পিছনে চার পাঁচটি ভদ্রলোক—তাঁহাদের কাহাকেও চিনি না। তখন সভার সাফল্য সম্বন্ধে আমার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, এ অবস্থায় ভূষণ দাদার সহিত দেখা করিলে তিনি অপ্রতিভ হইতে পারেন—সুতরাং হলের বাহিরে গা ঢাকা দিয়া রহিলাম।

পৌণে সাতটা—জনপ্রাণী না, সভাপতিও অনুপস্থিত। সাতটা, তথৈবচ। এমন জনশূন্য জনসভা যদি কখনও দেখিয়াছি! ভূষণ দাদার অবস্থা দেখিয়া বড় কষ্ট হইল। তিনি ও তাঁহার সঙ্গের ভদ্রলোক কয়জন কেবল ঘর-বাহির করিতেছেন, নিজেদের মধ্যেই উত্তেজিতভাবে কি পরামর্শ করিতেছেন—আবার একবার করিয়া ইন্‌ষ্টিট্যুট-এর গেটের কাছে যাইতেছেন। সওয়া সাতটা—কাকস্য পরিবেদনা। সাড়ে সাতটা—পূর্ব্ববৎ অবস্থা। কলিকাতাবাসিগণের জনসভায় কলিকাতাবাসিগণই আসিতে ভুলিয়া গেলেন কেমন করিয়া?

পৌণে আটটার সময় ভূষণ দাদা সঙ্গীদের লইয়া বাহির হইয়া গেলেন—অল্পক্ষণ পরে আমিও হল পরিত্যাগ করিলাম।

পরদিন বিনুর মেসোমশায় তারিণীবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চেনেন খুব ভালই—বিনুর সঙ্গে কতবার সিমলা ষ্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে গিয়াছি। কুশল প্রশ্নাদির পরে তিনি বলিলেন, "ভূষণ যে এখানে এসেছে হে, আমার বাসাতেই আজ আট দশ দিন আছে। কি একখানা বই

নিয়ে খুব ঘোরাঘুরি করছে, ওর মাথা আর মুণ্ডু ! এদিকে এই অবস্থা, সতের-আঠার বছরের মেয়ে একটা, পনের বছরের মেয়ে একটা গলায়—পার করবে কোথা থেকে তার সংস্থান নেই—আবার কাল দেখি নিজের পয়সায় এক গাদা কি মিটিং না ফিটিং-এর হ্যাণ্ডবিল ছেপে এনেছে ; আর বল কেন, একেবারে মাথা খারাপ !"

বলিলাম, "হ্যাঁ—হ্যাঁ, দেখছিলুম বটে একখানা হ্যাণ্ডবিলে—জনসভা না—কি—"

"জনসভা না ওর মুণ্ডু ! ও নিজেই তো পরশু দুপুরে বসে বসে ওখানা লিখলে ! আমার বাড়ীতে দুজন বেকার ভাই-পো আছে, তাদের নিয়ে কোথায় সব ঘুরছে ক'দিন দেখতে পাই—সাড়ে সতের টাকা প্রেসের বিল কাল দিলে দেখলাম আমার সামনে—এদিকে শুনি, বাড়ীতে নিতান্ত দুরবস্থা,··অতবড় সব আইবুড়ো মেয়ে গলায়, এক পয়সার সংস্থানই নেই—তার বিয়ে !"

মাঘ মাসের শেষে আমি কার্য্যোপলক্ষে জলপাইগুড়ি যাইতেছি ; পার্ব্বতীপুর ষ্টেশনে দেখি, ভূষণ দাদা একটি ব্যাগ হাতে প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আরে পাঁচু যে ! ভাল তো ? সেই পশ্চিমেই আজকাল চাকুরী কর তো ? কোথায় যাচ্ছ এদিকে ?"

"আজ্ঞে একটু জলপাইগুড়িতে। আপনি কোথায় ?"

"আমি একটু যাচ্ছি কলকাতায়। হ্যাঁ, তোমাকে বলি—শোন নি বোধ হয়, আমার 'নারদ'-কাব্যের খুব আদর হয়েছে। এর মধ্যে কলকাতায় ইন্‌ষ্টিটিউট হলে প্রকাণ্ড সভা হয়ে গেল তাই নিয়ে। অমুক বাবু সভাপতি ছিলেন। খুব উৎসাহ দেখলাম লোকজনের মধ্যে, খুব ভিড়—দেখবে এই দেখ।" বলিয়াই ভূষণ দাদা ব্যাগ খুলিয়া জনসভার ছাপানো হ্যাণ্ডবিল একখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "পড়ে দেখ।"

আসন রয়েছে পড়ি'

—শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার

পোলেনপুরের ছোট বুক বেয়ে
চলে গেছে ইছামতী,
গাঁওয়ালী ঘরের বধূর মতন
সরল সহজ গতি।

দুই পাশে ঘন কাশের বসতি,
কূলেতে কল্‌মী লতা
বাতাসে ও ঢেউয়ে ঢাকিতে পারে না
প্রাণের চঞ্চলতা।

পা'ড়ির উপরে বাবলার বন,
এরি উত্তর বাঁকে
বুড়ো বটগাছ যেথা আজো খাড়া
রাখিয়াছে আপনাকে ;

তাহারি তলায় বহু পুরাতন
আধ-ভাঙ্গা মন্দির,
চারপাশে তার কাঁটাবন আর
যত আ-গাছার ভিড়।

এরি মাঝখানে শ্মশান-কালীর
আসন রয়েছে পড়ি
সেই অতীতের ভক্তি-মুখর
কথাগুলি বুকে করি।

এখানে মানুষ কত উৎসবে
কাটায়েছে সারা রাতি,
দীপান্বিতায় কত শত শত
জ্বলেছে ঘিয়ের বাতি।

বন্ধ্যা রমণী কেঁদেছে এখানে
ছাড়ি ঘর-বাড়ী দেশ,
হাসি মুখে এসে কত না জননী
মানত করেছে শেষ।

আজ হেথা আর জ্বলে না প্রদীপ
গৌরব নিভিয়াছে,
মানুষের রচা দেবতাকে এই
মানুষেই মারিয়াছে।

তাই মাথা নেড়ে বুড়ো বটগাছ
কেঁদে মরে অবিরত,
বিহানের রোদ ঝরে পড়ে শুধু
সহানুভূতির মত।

আকাশ-কুসুম
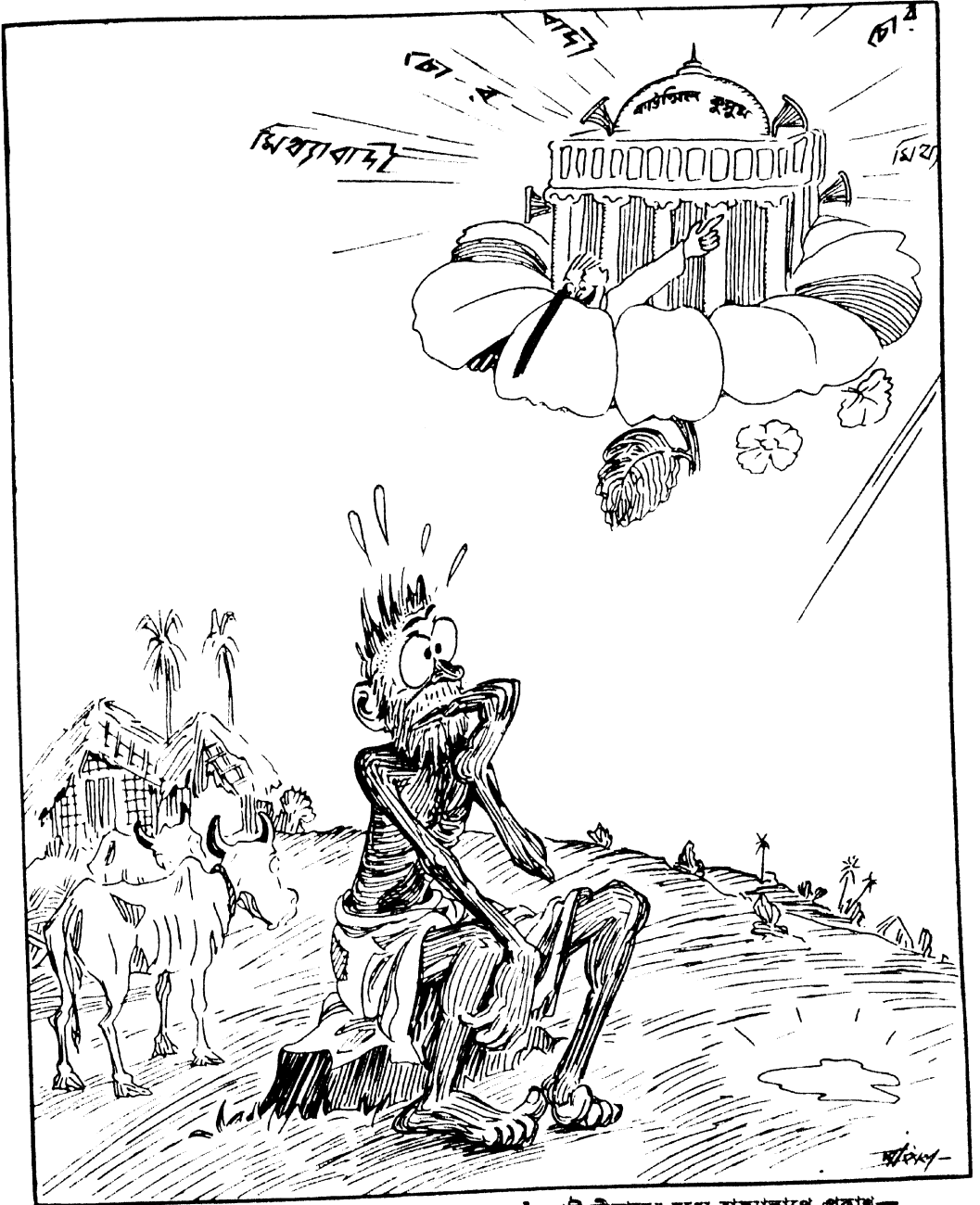
বাঙ্গালা অ্যাসেমব্লিতে প্রধান মন্ত্রী ও কংগ্রেসদলের ডেপুটি লীডারের মধ্যে বাক্যালাপে প্রকাশ—
মিঃ টি. সি. গোস্বামী......প্রধান মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলিতেছেন।......মিঃ ফজলুল হক......আপনারা চোর।

ধরে টান্‌তে আরম্ভ করলেন। সিভ্যালরীর তাতে বেশ অসুবিধে হতে লাগল, সে চটে গেল। শেষে দাঁড়াল এই যে, দু'জনকে হাতাহাতি করতে হল। ওদিকে বৃষ্টি অনেক আগে কখন যে থেমে গেছে তা কারুরই খেয়াল ছিল না। সিভ্যালরী চটে ভদ্রলোকের নাকে বেশ এক ঘুষি লাগাল। ক্ষত নাক নিয়ে ভদ্রলোক কোনমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

মহিলাটি তখন উত্তেজিত হয়ে সিভালরীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। তারপর কথা-কাটাকাটির মুখে জানা গেল যে, সেই ভদ্রলোকটি না কি মহিলাটির স্বামী—কিছুদিন হল মতান্তর প্রবল হওয়ায় দু'জনে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন।

সিভ্যালরী ঘরে ফিরল। পথে তার মনে হল এবং দুঃখও হল, মহিলাটিকে মিলনী-সঙ্ঘের কার্ড না দেওয়াতে। যাক্, ভাবতে ভাবতে সে একেবারে কাদামাখা বুট নিয়ে সোজা ঘরে ঢুকে টেবিলে কাগজের বাণ্ডিলটা রেখে বিছানায় বসে পড়ল।

সিভ্যালরীর স্ত্রী লুনা সেন। আধুনিকা বলে তার অভিমান ছিল। খেয়ালী স্বামীর পিছনে দৌড়বার সখ বা সহিষ্ণুতা তার কোনটাই ছিল না। অবশ্য প্রেমের ফলেই তাদের বিয়ে হয়, কিন্তু বিয়ের ফলে তাদের প্রেম পদার্থ উড়ে গিয়েছিল।

সিভ্যালরী যখন জুতো জামা খোলায় ব্যস্ত, হঠাৎ তাকিয়ে দেখে লুনা রাগের সঙ্কেত মত আয়নার সামনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। সে বললে, এক কাপ চা আন ত। লুনা সেই ভাবেই বললে, কাছে ত ফোন রয়েছে। যার চা-তেষ্টা পায় তাকেই ফোন করে আনাতে হয় এই নিয়ম। সিভ্যালরী বলে উঠল, ও ভুলে গেছলুম, ধন্যবাদ, কিন্তু কাল ঐ আয়নাটা একজন নিয়ে যাবে। আমি তাকে বিক্রী করেছি।

লুনা বিরক্তিময় সুরে বললে, সেই একঘেয়ে বিক্রীর কথা একজন আর শুনতে চায় না। তাছাড়া আমি এই শেষবার শুনিয়ে রাখছি এটা আমার বাবার উপহার দেওয়া জিনিষ, এ বিক্রী করা—

—আহা হা, এটা কি শুধু টাকারই জন্যে?

—তবে কি?

—বলছি—

সিভ্যালরী ফোনের কাছে গিয়ে চাকরকে ফোন করলে, হ্যালো শঙ্কু, এক কাপ চা। লুনার কাছে সরে গিয়ে বললে, শুধু টাকার জন্য নয় লুনা, তোমার মান-ভঞ্জনের হয়ত অনেকটা সুরাহা হবে। তোমার ঘা'টা শুকিয়েছে? দেখি আজ ভাল করে ড্রেসিং করে দেব, চট করে শুকিয়ে যাবে।

লুনা বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার খেয়াল নিয়ে তুমিই থাক, আমার অন্য কাজ আছে।

সিভ্যালরী আহত হলেও অনুনয়ের সুরে বললে, হাঁ শোন, একটা দরকারী কথা আছে, গোটা কয়েক টাকার প্রয়োজন, নইলে এক্সপেরিমেণ্ট আর এগুচ্ছে না। লুনা বললে, আবার সেই এক্স-পে-রিমেণ্ট? টাকা আমার নেই! বলেই ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল।

সিভ্যালরী অন্যদিকে চেয়ে ছিল, বললে, এবারে কি আর তোমায় নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করব ছাই, এবারে ঠিক করেছি শঙ্কুটাকে দিয়ে—

বলতে বলতেই প্রভুভক্ত চাকর শঙ্কু চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। কাল আঙ্গরার মত মূর্ত্তি, জাতে আধা-উড়িয়া। টেবিলে চা রেখে দাঁড়াল।

সিভ্যালরী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, এই যে ব্যাটা এসেছে। ওরে শোন্ তোকে একটা ইন্সিওর করতে হবে।

শঙ্কু হাঁ করে বললে, কিসে মারা গেল বাবু? সিভ্যালরী বললে, কেউ মরে নি রে ব্যাটা, মরে নি। তুই যদি মরিস তা হলে কিছু টাকাকড়ি পাবে তোর বাড়ীর লোক, বুঝলি?

শঙ্কু বিজ্ঞের মত বললে, না বাবু টাকাকড়ি কাকেও দিবনি, তা আপনার কি আর পর কি। আমার তের গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দিল ঐ নীলকণ্ঠটা। সিভ্যালরী বিরক্ত হয়ে বলল, আচ্ছা আচ্ছা যা তুই কাজ করগে যা।

মনে মনে সিভ্যালরী আওড়াতে লাগল, রং ফর্সা করার স্কীমটা যদি সাকসেসফুল হয়, সারা ভারতের চেহারা ফিরে যাবে। আর লুনা আজ যাকে আমার পাগলামি বলছে তাকেই দুনিয়ার লোক পূজো করবে।

মিলনীসঙ্ঘ নামে একটি সমিতি। একটি নাতিপ্রশস্ত কক্ষ। সেই কক্ষের দরজার পাশে একটি ছোট কাঠের বোর্ড ঝুলছিল, সেটীতে ব্লু-টাইপে লেখা ছিল 'মিলনী-সঙ্ঘ'। ঘরটি ঈষৎ প্রশস্ত হলেও ভিতরে যথেষ্ট স্থানাভাব। কয়েকটী টেবল চেয়ার, একটা আধভাঙ্গা টাইপরাইটার,

কয়েকটি কালির বোতল, ব্লটিংপ্যাড ইত্যাদি রকমের বিবিধ জিনিষপত্র ঘরটির আসবাব ও সরঞ্জাম। দেওয়ালে দেশবন্ধু, তিলক প্রভৃতি জনকয়েক মহাত্মাদের ছবি। একটা উঁচু র‍্যাকের উপর একটা তেকোণা কাঠের টুকরো, খুব সম্ভব সেটা প্লানচেটেরই মার্জ্জিত সংস্করণ।

ঘরের মধ্যে লোক আসে বহুরকম, গলার স্বর অসংখ্য রকম আর বচসা বাদবিতণ্ডার তো অন্ত নেই। আস্তে কথার চেয়ে উচ্চগলার মাত্রাই বেশী আর পরামর্শের চেয়ে তর্কের উগ্রতাই অধিক।

ট্রীমের ডালা খুলতেই শঙ্কু বাপ্‌লো বলে চেঁচিয়ে উঠল।

সিভ্যালরী ছিল এই সঙ্ঘের একজন বিশিষ্ট সদস্য। তার নেশা ছিল রিসার্চ্চের পথে, সে ভাবত এই রিসার্চ্চ করতে করতে এমন 'আবিষ্কার সে করবে, যা দিয়ে মন্ত্রশক্তির মত দেশকে স্বাধীন করা চলবে। যে কোন জাতির কাছ থেকে যে কোন সময়ে ভারতকে ছিনিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত হবে না। মন্ত্রের মতই তার রিসার্চ্চের ফল মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিপ্লব আনতে পারবে, শান্তি আনতে পারবে।' এই জন্যই সে 'মিলনী সঙ্ঘে'র কোন প্রোগ্রাম ফলো করত না। সে আপনাকে বিশ্বাস করত সব চেয়ে বেশী, তাই আপন খেয়াল মত ভারতকে স্বাধীন করতে সে ব্যস্ত থাকত ল্যাবরেটরীতে।

প্রথমে তার বিশ্বাস ছিল মানুষকে হিংস্র করে তুলতে হবে, তবেই তারা যুদ্ধে দুর্দ্দমনীয় হয়ে উঠবে। তাই নিয়ে সে অনেক এক্সপেরিমেণ্ট করেছে। বাঘ, সাপ, ওরাং-ওটাং হায়েনা, বুনো শূয়ার, এদের রক্ত নিয়ে অনেক দিন কালচার করেছিল। তাদের red-corpuscle-এর সঙ্গে মানুষের red-corpuscle-এর প্রভেদ কোন্ খানে এবং একটাকে আর একটায় পরিণত করা সম্ভব কি না, এই নিয়ে অনেক গবেষণায় সে নিজেই এমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে, শেষে লুনা পর্য্যন্ত তাকে এড়িয়ে চলত। শেষে একদিন লুনার যুক্তিতর্কে তাকে পরাজিত হতে হল। শান্তকে হিংস্র করা যদি বা
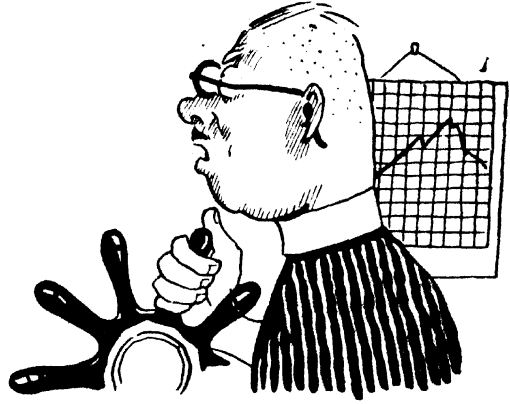
সম্ভব হয়, তার পরে হিংস্রকে আবার শান্ত করা সম্ভব কি না? এও যে একটা ভাববার কথা তা তার মনেই হয় নি। যাক্ শেষ পর্য্যন্ত তেরটী হেলে-সাপের প্রাণান্ত করে সে এই স্কিমটী ছাড়ল।

মিলনী-সঙ্ঘের জরুরী অধিবেশনে স্থির হল যে, স্বাধীনতা আনতে হলে দেশে একতা আনা বিশেষ দরকার, যেহেতু কোন দেশ একতাবদ্ধ না হয়ে কখনও স্বাধীন হয়নি। সকলেই ভাবতে থাকে, কি করে ফুস্‌মন্তরে সকলকে এক করা যায়। সিভ্যালরী বাড়ী ফিরল দারুণ দুর্ভাবনা নিয়ে। তারপর তার মাথায় এক যুক্তি খেলল। জগতের মধ্যে white nation কেউ পরাধীন নয় আর তারা সকলেই একতাবদ্ধ। সুতরাং যদি কোনক্রমে আমাদের skinটাকে white করা যায়—তা হলে ত' সব জাত আমাদের সম্ভ্রমের

চোখেই দেখবে। আরে ছোঃ, এ মতলব তার মাথায় এতদিন আসে নি ? রং কটা করার কল্পনায় সিভ্যালরী বহু এক্সপেরিমেণ্ট করল। Colourless করার যত রকম process ছিল সিভ্যালরী সংগ্রহ করতে লাগল। কষ্টিক থেকে আরম্ভ করে ফরাসী দেশের খুব দামী টয়লেট সাবান কিনে আনল।

সেক্রেটারী একটু থেমে বললেন – কতকগুলো বিল।

কোনটা চূর্ণ, কোনটা solution জলে বা spirit-এ, কোনটা paste, কোনটা crystal – test-tube, jar ভর্ত্তি হয়ে থাকত chlorinated water আর এই মালমশলায়। লুনার হাত নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট হবার পর প্রভুভক্ত ভৃত্য শঙ্কুকে নিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা হল। ষ্টীম-এর ঘরে অনেক করে বুঝিয়ে তাকে পাঠান হল। দরজা বন্ধ করে ষ্টীম-এর valve খুলতেই শঙ্কু 'বাপ্‌লো' বলে আতঙ্কে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে, হার্টফেল করতে পারে এই ভয়ে তাকে বার করা হল। Caustic-এর bath tub, dehydrating powder, bleaching powder, কোন কাজেই লাগল না। শঙ্কু কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এল। সর্ব্বাঙ্গে বিষম জ্বালা। বাইরে এসেই সে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। শঙ্কুকে মেডিক্যাল কলেজ-এ পাঠিয়ে সিভ্যালরী এ পথ ত্যাগ করলে।

'মিলনী-সঙ্ঘে'র সেদিন এক জরুরী সভা বসেছিল। সেক্রেটারী টি. কে. আঢ্য গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসে আছেন। ছয় সাতজন মেম্বার সাব-মেম্বার নীরবে আছে। সিভ্যালরী একটা সিগারেট টানতে টানতে কি ভাবছিল।

সেক্রেটারী বলে উঠলেন—আপনার failureএর জন্যে দায়ী আপনি, অথচ টাকা জোগাচ্ছি আমরা। এ-রকম অভিনয় কতদিন চলতে পারে মিঃ সেন ?

সিভ্যালরী বললে—দেখুন আমি আগেই তো বলেছিলাম যে এগুলো আমার idea, I mean experiment, এগুলোর guarantee দেওয়া যেতে পারে না।

সেক্রেটারী একটু থেমে বললেন, এই দেখুন কতকগুলো বিল এখনও unpaid থেকে গেছে। Steam Chamber Co.র দু'শ বাইশ টাকা, Galvanising-এর সাতাশ টাকা বার আনা, আরো খুচরো chemical প্রভৃতির মোট প্রায় দেড়'শ টাকা।

অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি বলে উঠল, শুধু তাই নয় স্যর— শঙ্কুর মা যে case করে তার claim প্রায় ছ'শ টাকা হবে। মাসে মাসে তাকে ২॥ টাকা ২০ বৎসর দিতে হবে, যতদিন শঙ্কুর অজাত পুত্র উপার্জ্জনক্ষম না হয়।

সেক্রেটারী—তা হলে তো আরও ভাল, এইটে আবার add করতে হবে। সঙ্ঘের টাকা এ ভাবে misuse করা তো—

সিভ্যালরী—আচ্ছা মিষ্টার আঢ্ডি, আমি আর একটা chance নিতে চাই। এবারের schemeটা যে successful হবে সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

টঙ্কারবাবু বাধা দিয়ে বললেন, না, আর না, আপনার hobbyর পিছনে আর টাকা invest করা চলে না। এত দিনেও আপনি practical suggestion একটা দিতে পারলেন না।

সিভ্যালরী—Idea গুলো কিছু ভুল হয় নি মিষ্টার আঢ্ডি, এক্সপেরিমেণ্টে একটু ভুল হয়েছিল মাত্র। ধরুন শঙ্কুর জায়গায় টঙ্কুকে নিলে হয়ত আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যেত। Heat capacity সবার তো সমান নয়।

টঙ্কারবাবু একটি আধা-বয়েসী ভদ্রলোক। তিনি জিজ্ঞাসা করে ফেললেন, এবারের schemeটা তোমার শোনাই যাক্! বলো হে সেন, মিঃ আঢ্ডি একটু শুনুন ত।

সিভ্যালরী আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলতে আরম্ভ করল, ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, দেশে unity আনার দরকার, এই তো কথা। আমার এবারের schemeটা যার

ওপর based, সেটা হচ্ছে সুরের ক্ষমতা। তানসেনের কথা আপনারা সকলেই জানেন। গ্রীসের Orpheus-এর কাহিনীও এই সঙ্গীতের অদ্ভুত ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়।

টঙ্কার বাবু একটি আধা-বয়েসী ভদ্রলোক।

এই সুর দিয়েই পাথর নড়ত, সমুদ্র শুকিয়ে যেত, আগুন জ্বলত, ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি সুরু হত। এত বড় একটা source of energy-র খবর এ পর্যান্ত কেউ পায় নি। এত-দিন ধরে এটা তাই হয়ে আছে বৈঠকখানার আসবাব আর আমোদ প্রমোদের উপকরণ। এর মধ্যের এত বড় প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা মুক্তি পেলে পৃথিবীতে যে বিপ্লব আনতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। টঙ্কারবাবু সমজদারের মত ঘাড় নেড়ে গেলেন, তা সত্য, তা সত্য।

সিভ্যালরী আবার পুরোদমে বলে চলল, এই সুরকে করায়ত্ত করতে পারলে অসাধ্য সাধন করাও সম্ভব হবে। এখন কথা হচ্ছে, কি করে করা যায়? এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি। সংক্ষেপে আমি তাই বলব। কিন্তু পূর্ব্বেই এটা বলে রাখছি যে, এই এক্সপেরিমেণ্ট করতে অনেক কিছু দরকার হবে। একবার successful হলে আর কিছুই লাগবে না। ধরুন প্রথমতঃ নানা রকম সঙ্গীতের যন্ত্র চাই। সেই সব যন্ত্রে নানা রকম সুর বাজাতে হবে, বেহাগ, খাম্বাজ, পিলু, বাগেশ্রী। দেখতে হবে কোনটায় বেশী লোকের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। Heart-এর সাড়া মাপার যন্ত্রটা আমি আপনাদের দেখিয়েছি।

—অসম্ভব অসম্ভব! মিঃ সেন—টঙ্কারবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন। এসব আপনার পাগলামি। সুরে মানুষের প্রাণের সাড়া পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে তাদের unite করা চলবে না।

সিভ্যালরী উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল—আলবৎ চলবে। সেইটেই কি করে সম্ভব হয়, আমায় বলতে দিন। এই সব appealing সুরগুলোকে মিলিয়ে একটা নতুন সুরে blend করতে হবে। একটা বিরাট broadcasting station করতে হবে, যেখান থেকে দিন-রাত ধরে সেই সুর লোকের কানে পৌছে দেওয়া হবে। প্রথম কিছুদিন এর reaction পাওয়া যাবে না, তারপর দেখবেন 'ইউনিমিটারে' কি response! শেষে এমন হবে যে দেশের সব লোককে একসঙ্গে ঘুমভাঙ্গান, ঘুমপাড়ান, ওঠান, বসান, খাওয়ান সব করা চলবে। শুধু broadcasting station-টা যা control করা।

টঙ্কারবাবু বলে উঠলেন, এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে আপনার কি চাই?
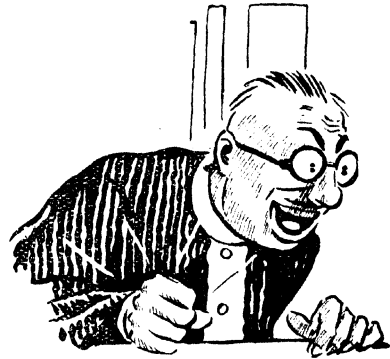
সিভ্যালরী উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

—কিছু না—কেবল দশ জন গাইয়ে, দশ জন বাজিয়ে আর এক হাজার লোক, যার ৮০% হবে চাষী। এই চাষী নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করতে করতে পরে সব রকম লোককেই unison-এ আনা যাবে।

মিষ্টার আড্ডি বলে উঠলেন, সবই শুনলুম, কিন্তু মনে রাখবেন এবারও যদি আমরা finance করি তা হলে সেটা হবে শেষ chance.

টঙ্কারবাবু—নিশ্চয়ই, তাছাড়া আমাদের Reserve Bank-এ অ্যাকাউন্ট শেষ হয়ে এল বলে।
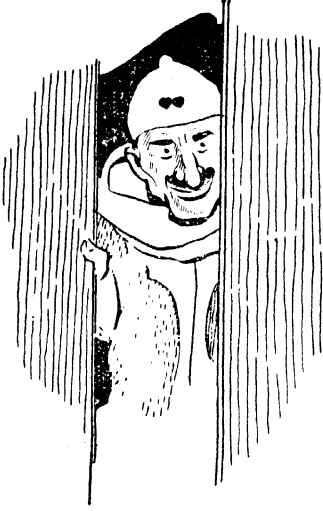
—কি হে সেন, হল ?

সিভ্যালরী বললে, না এর জন্যে বেশী কিছু আমি চাই না। আর আমার খুব ভরসা আছে এবার অব্যর্থ successful হওয়া যাবে—

এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে শর্ব্বরীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।—কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে, বলে সকলেই তারস্বরে চীৎকার করে উঠল।

শর্ব্বরীবাবু একটু খর্ব্বাকৃতি, শরীরের মধ্য-প্রদেশ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। দেশে ঐক্য-আনয়নে তাঁর অসীম আগ্রহ। আর একটী জিনিষে তাঁর বেশী hobby, সেটী হচ্ছে প্ল্যান-চেট্‌।

সকলে ভাবল, এবার তাঁর প্ল্যান-চেটে নিশ্চয়ই কোন বিস্ময়কর ও অদ্ভুত message আছে।

শত কণ্ঠের ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে শর্ব্বরীবাবু শুধু বললেন, তোমরা একবার এ ঘরে এসে দেখে যাও। আরে, এবারে দেশ স্বাধীন করা ঠেকায় কে। সিভ্যালরী, যদি কলম্বাস হতে চাও, যদি আর্কিমিডিস্‌ হতে চাও, যদি নিউটন—

কি ব্যাপার হে—আগে বল।

—প্ল্যানচেটে এক বিচিত্র খবর পাওয়া গেছে, আমার ইচ্ছে কচ্ছে এখনি এটা ব্রডকাষ্ট করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়িয়ে দিই।

সিভ্যালরী ব্যগ্র ভাবে বললে, কি খবরটাই শুনি—তার পর ব্যবস্থা হবে।

শর্ব্বরীবাবু অধীর হয়ে দরজায় খিল দিয়ে যা বললেন, তার মর্ম্মটা হচ্ছে এই যে, প্ল্যানচেটে আজ এক মহাত্মার soulকে পাওয়া গিয়েছিল—তিনি না কি দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। আরও তিনি ছিলেন ডাক্তার—বিজ্ঞান দিয়ে দেশের কাজ করাও তাঁর এক উৎকট নেশা ছিল। যাক্‌ এখন কথাটা হচ্ছে, সেই প্রেতাত্মা এক মস্ত যুক্তি দিয়েছেন, দেশে ঐক্য আনতে হলে প্রেমের বীজ ছড়াতে হবে। মানুষে মানুষে প্রেম দিয়ে বাঁধতে হবে। এই প্রেমের বীজ culture করে তৈরী করতে হবে।

সিভ্যালরী উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল—the grand idea !

শর্ব্বরীবাবু বাধা দিয়ে বললেন, শুধু তাই নয়, এই প্রেমের বীজ কোথায় কি ভাবে পাওয়া যাবে তাও তিনি বাৎলে দিয়েছেন। কাল সকালে এক মস্ত দেশ-প্রেমিক মারা যাবেন, তাঁর মস্তিষ্ক থেকে serum নিয়ে culture করতে হবে—তার-পর সেই serum inject কর সারা ভারতের নরনারীকে।

সিভ্যালরী লাফিয়ে উঠল—Eureka !

টঙ্কারবাবু—এ আর সিভ্যালরী সেনের scheme নয়, কুকুরের ল্যাজ সোজা করতে গিয়ে ল্যাজ যেমন তেমনি রইল, আর মাঝ থেকে ব্যাঙ্কের টাকাগুলো গাঁট গচ্ছা গেল !

আড্ডি বললেন, নাও হে সেন, এইবার যদি তোমার দ্বারা কিছু হয়, হতভাগা দেশ নিয়ে ভেবে ভেবেই গেলুম, লোকগুলোর কি যে হয়েছে একটু মিলে মিশে কাজ কর, তা নয় ঝগড়াঝাঁটি গণ্ডগোল, দলাদলি, স্ত্রী মারে স্বামীকে, স্বামী মারে ছেলেকে, ভাই ভাইকে, মাসী পিসীকে—আরে ম'ল—যাক্‌ আর ভাবতে পারা যায় না বাবা, শেষে মিলনী-সঙ্ঘও একটা মারামারির আখড়া হয়ে দাঁড়াবে।

সিভ্যালরী—আপনি ভাববেন না স্যর, এইবার সাফল্য আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, এই ideaটা আমার

কাজে করতে দিন—জানেন তো, দৈব না হলে কোন কাজ হয় না ; এবারে দৈব প্রেতাত্মারূপে আমাদের সহায়।

আড্ডি (চিন্তান্বিত মুখে)—আচ্ছা, তাই হোক আজ রাত্রে তুমি কিছু টাকা নিয়ে যেও—আর শর্ব্বরীর কাছে থেকে addressটা নিয়ে যেও, কোথা সেই দেশ-প্রেমিক মরছেন তার খোঁজটা আগে করতে হবে ত।

টঙ্কারবাবু—সেন, এইবার তুমি একটা নাম করে নেবে হে, দেখ serumটা তৈরী হলে আমার শালাকে ভাই একটা injection দিও তো। বউএর সঙ্গে রোজই তার একটা না একটা অনর্থ হয়ই—বড় উপকার হবে হে।

আড্ডি—তুমি ব্যস্ত হয়ো না টঙ্কার, তোমার মত দরকার দেশের অনেকেরই আছে, আমারও আছে।

থাক্ আজকের মত সভা ভঙ্গ হোক। সেন তুমি যাও—মনে রেখ তোমার ওপর দেশের ভাগ্য নির্ভর করেছে।

পরদিন প্রত্যূষে সিভ্যালরী তার

কোরাস বাহিনী :
"বড় ভালবাসা লেগেছে প্রাণে......'
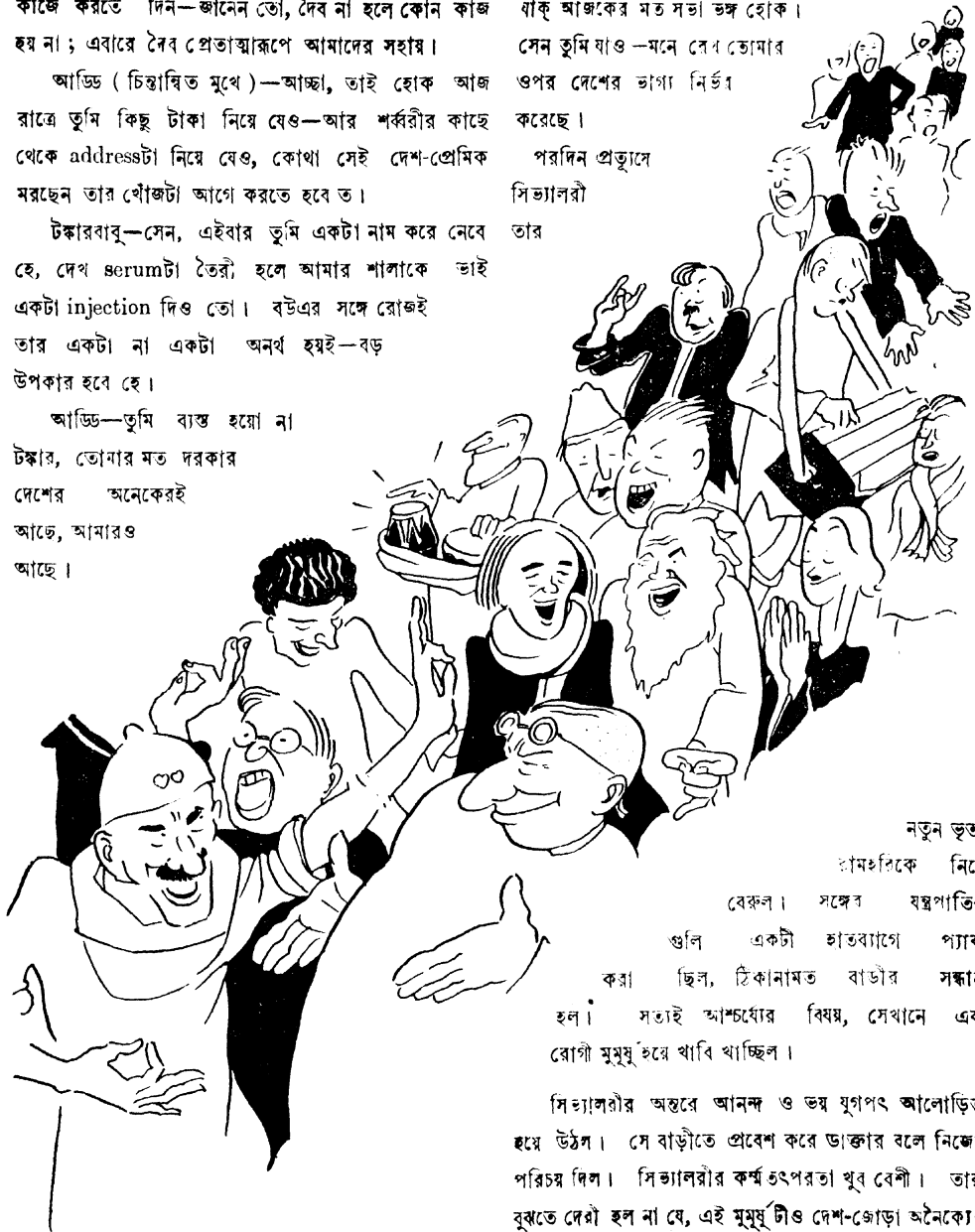
নতুন ভৃত্য রামহরিকে নিয়ে বেরুল। সঙ্গের যন্ত্রপাতি-গুলি একটা হাতব্যাগে প্যাক করা ছিল, ঠিকানামত বাড়ীর সন্ধান হল। সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয়, সেখানে এক রোগী মুমূর্ষু হয়ে খাবি খাচ্ছিল।

সিভ্যালরীর অন্তরে আনন্দ ও ভয় যুগপৎ আলোড়িত হয়ে উঠল। সে বাড়ীতে প্রবেশ করে ডাক্তার বলে নিজের পরিচয় দিল। সিভ্যালরীর কর্ম্মতৎপরতা খুব বেশী। তার বুঝতে দেরী হল না যে, এই মুমূর্ষুটীও দেশ-জোড়া অনৈক্যের হাত থেকে নিস্তার পায় নি। শেষ শয্যারও কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না। সিভ্যালরী কিছুক্ষণের মধ্যেই তার

লেখাও অসমাপ্ত রয়েছে। লুনা স্ত্রীলোক, বৈজ্ঞানিক গবেষণার তত্ত্ব সে বোঝে না। আবিষ্কারের গর্ব্ব ও উল্লাস সে উপলব্ধি করতে পারে না। হায় নারী! যাক্ খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। পাকস্থলী তো বুঝবে না যে, তার মালিক কত বড় বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে আত্মাহুতি দিচ্ছে! রেনার্ড প্যালিসির জীবনী সে পড়েছে, এনামেল আবিষ্কারের মূলে তার কি

এক দৃষ্টে চেয়ে রইল তার পানে।

অদম্য উৎসাহ, কি অক্লান্ত পরিশ্রম—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, এমন কি সমস্ত সংসার তার বিরুদ্ধে, আর সে তার অমানুষিক সাধনা নিয়ে আর একদিকে। শেষে জয়লক্ষ্মী তাকেই বরণ করলে। হায় বাঙ্গালী, তোমার জীবনে এর স্পর্শ কি একদিনও আসবে না?

ক্ষেমিয়া বসে আছে—আহার-ক্রিয়াটা শেষ করে লুনাকে চিঠি লিখে ক্ষেমিয়াকে বিদায় করতে হবে। সে চিঠির কাগজ নিয়ে লিখতে বসল।

লুনা,

কখন ফিরব জানি না। কাজ এখনও শেষ হতে অনেক দেরী। এবারের মত তোমার পাঠান খাবার খেলুম, কিন্তু যদি সাকসেসফুল না হই তা হলে অনশন-ব্রত নেব। ইতি—

সিভ্যালরী।

হ্যাঁ এইবার লুনা একটু তার কাজের গুরুত্ব বুঝবে। যদি না বোঝে তা হলে কিসেরই বা সম্বন্ধ ওর সঙ্গে। ক্ষেমিয়ার হাতে চিঠি দিয়ে সিভ্যালরী আবার কাজে মন দিলে। অসংখ্য অ্যাম্পুল তৈরী হয়ে গেল। পরে বড় স্কেল-এ করলেই চলবে। আপাততঃ এক্সপেরিমেণ্ট-এর জন্যে আড়াই শ' ইঞ্জেক্সন যথেষ্ট হবে। সে সমস্ত সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে একটা টেবিলে সাজিয়ে রাখল।

কিন্তু প্রথমেই তার এক সমস্যা উপস্থিত হল, যে বিশেষ group-এর ওপর serumএর ফলাফল দেখতে হবে, সেই বিশেষ group কাদের করা যায়। প্যাড থেকে একখানা কাগজ ছিঁড়ে সে একটা লিষ্ট তৈরী করতে লাগল।

ঠক্ ঠক্ করে বাইরে দরজা নাড়ার শব্দ। সিভ্যালরী গিয়ে দরজা খুলল। সম্মুখেই টঙ্কারবাবু ও মিঃ আড্ডি।

মিঃ আড্ডি—তিনঘণ্টা বহুক্ষণ হয়ে গেছে সেন। সিভ্যালরী উৎফুল্ল হয়ে বলল—And everything is ready, Sir.

টঙ্কারবাবু—Million thanks তোমায় সেন। তুমি world-history-তে একটা record করলে! কিন্তু আমাদের এই trade secret-টুকু কাউকেও জানতে দেওয়া হবে না। কি বলেন মিষ্টার আড্ডি?

মিঃ আড্ডি—নিশ্চয়ই না। এর ওপরই তো আমরা বেঁচে থাকব, জাত বেঁচে থাকবে। আমার ইচ্ছে হয় যদি প্রত্যেক injectionএর দাম দশটাকাও করা যায় - তা হলেও it will not be too much

টঙ্কারবাবু—আর ভেবে দেখুন আমরা পাব ৩৫ কোটী ইণ্টু দশ টাকা! ওঃ আমি faint হব।

সিভ্যালরী—আপনারা কিন্তু ভুলে যাচ্ছেন economic দিকটা, দশ টাকা দাম করলে চাষা হরিজন প্রভৃতি কেউই নিতে পারবে না—তারা ভাববে ওটা একটা luxury, তার চেয়ে একটা nominal fee করা যাক, চার আনা করে।

টঙ্কারবাবু—Right you are, সেন, maximum sale on minimum profit। তোমার ব্যবসায়-বুদ্ধিও আছে হে।

সিভ্যালরী—কিন্তু, first thing is, on whom to experiment?

মিঃ আড্ডি—এ আর ভাবনা কি সেন। আমরা, মানে 'মিলনী-সঙ্ঘে'র কর্ম্মীবৃন্দই ঐ হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে পড়ি—কি বল টঙ্কার?

টঙ্কার—নিশ্চয়ই, আমরা যে দেশ জাগাব, আমাদের দেশপ্রেমের stock বেশী না থাকলে চলবে কি করে? তা ছাড়া আমার সম্প্রতি বেরীবেরী হয়ে দেশপ্রেম যেন একটু শিথিল হয়ে এসেছে—এই সময় একটা অথবা দুটো injection—

এমন সময় হৈ চৈ করতে করতে শর্ব্বরীবাবু ও আরও দু'চার জন সদস্য এসে উপস্থিত। তখন সকলে সিভ্যালরীর টেবিলের পাশে ঘিরে দাঁড়াল।

একবার 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করে সকলেই দক্ষিণ বাহুতে এক একটি injection নিল। সিভ্যালরী নিজেকেও একটা inject করল।

জয় প্ল্যানচেটের জয়, জয় সিভ্যালরীর জয়! সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে—কোথাও কিছু পরিবর্ত্তন হচ্ছে কি না।

সন্ধ্যা হল, চাকর এসে ঘরের সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর সিভ্যালরী প্রথম কথা বললে—আজ সঙ্ঘের সমস্ত কাজ স্থগিত থাকা উচিত। আমাকে আজ এখানে থাকতে হবে—আপনারা আসুন, কাল আবার দশটায় দেখা হবে। হ্যাঁ, যদি পারেন খানিকটা করে ছাগ-দুগ্ধ খাবেন—serumএর actionটা ভাল হবে।

সেন তার ল্যাবরেটরীর খাটিয়ায় আশ্রয় নিল।

এদিকে মিলনী-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ রাস্তায় নেমেই এক কোরাস গান ধরল। আড্ডি, টঙ্কার আর শর্ব্বরীর গলাই জোর শোনা গেল—

বড় ভালবাসা লেগেছে প্রাণে

সেরামের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

পথে লোক দেখে আর অবাক হয়ে যায়। মান্যগণ্য ব্যক্তি বলেই যাদের জানত তারা এ-রকম করে প্রোসেশন করে গান করছে! ছেলেরা হাততালি দিতে লাগল—কেউ বা ঢিল ছুঁড়ল। তারা সেরামের খবর পায়নি। হৈ চৈ শুনে মোধো বাগ্দির ঠানদি ব্যাপারটা দেখতে এসেছে—সে রাস্তার মাঝখানেই প্রায় দাঁড়িয়েছিল।···কোরাস-বাহিনী তার সামনে গিয়ে থামল। গান পুরো দমে চলছে। বাগ্দিনী থতমত খেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বলতিছ কি, ভিক্ষে চাও?

টঙ্কার হঠাৎ দল ছেড়ে বৃদ্ধার সামনে oriental dance-এর pose দিয়ে সুর করে বললে—

'চাঁদনী রাতে সাজাব তোমায়
ফুলরাণী করে—'

বাগ্দিনী ঠিক বুঝতে না পেরে রেগে কাঁই হয়ে গেল। এমন সময় আড্ডি ভুঁড়ি দুলিয়ে দুলিয়ে তাকে হাত নেড়ে বলতে এল—

'বিরহিণী—বঁধু আমার
বাঁধে নাকো চুল।'

—তবে র‍্যা মিনসেরা, মরবার জায়গা পাও নি—নিয়ে আয় ত মোধো, মুড়ো খ্যাংরাটা······

টঙ্কার এক লাফে ছুট, আর সকলেই তার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে দেরী করল না। কেবল মোটা লোক আড্ডি—'ব্যথা, ব্যথা, ব্যথা' করতে করতে এক মুড়িউলীর দোকানে গিয়ে বসে পড়ল।

এদিকে সিভ্যালরীর ঘরের বাইরে ক্ষেমিয়া খাবার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকক্ষণ পরে সিভ্যালরী দরজা খুলল—তার মাথা বোঁ করে উঠল—একদৃষ্টে চেয়ে রইল ক্ষেমিয়ার পানে। ক্ষেমিয়া বললে—খাবারটা লিয়ে লিন। সিভ্যালরীর চোখের পলক পড়ে না—ক্ষেমিয়ার মধ্যে সে কি দেখতে লাগল! প্রৌঢ়া গয়লানী ছাড়া সে কিছু নয়, কিন্তু সিভ্যালরীর চোখে সে আজ অপরূপ। তার মধ্যে সে দেখছে সেই চিরন্তন নারীকে, যে যুগে যুগে মানুষকে আকর্ষণ করেছে প্রেমের পথে, romance-এর পথে। সে যেন আজ রোমিয়ো-জুলিয়েট-এর প্রেমে মন্ত্রমুগ্ধ—সে যেন চণ্ডীদাস, রামীর রূপতরঙ্গে পাল ছেঁড়া তরণীর মত হাবুডুবু খাচ্ছে। ক্ষেমিয়া আজ ক্ষেমিয়া নয়—অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে ভরা মূর্ত্তিমতী যৌবনশ্রী।

ক্ষেমিয়া বলল—আমায় চটপট করে বিদায় কর বাবু—আমায় বিচালি কুঁচোতে হবে—

সিভ্যালরী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, না ক্ষেমিয়া, তুমি যেও না—আমার অন্তর-লোকের প্রতিমা হয়ে তুমি থাক। ক্ষেমিয়া খাবার রেখে সরে দাঁড়াল—অমনি সিভ্যালরী

মত্ত প্রেমিকের মত ছুটল তার পিছু পিছু—টেবিল থেকে টেষ্ট-টিউব অ্যাম্পুল আরও কাঁচের বহু সরঞ্জাম পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হল। সে ক্ষেমিয়ার হাত ধরে ফেলল—

—ছোড় দিন বাবু, ঐসা বাতমে আমার সরম লাগে।—

—তুমি আমায় ফেলে চলে যেও না। চল আমিও যাব, নিভৃতে নীরবে—লোকালয়ের পারে—অভিসারের পথে। যেথায় জ্যোৎস্না আছে—ফুলের সৌরভ—damn laboratory, bloody serum জাহান্নমে যাক্।

ক্ষেমি হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

এমন সময় দলে দলে লোক হৈ চৈ করতে করতে ল্যাবরেটরি-ঘরে এসে ঢুকল।

বিজ্ঞাপনের ফলে যে জনতা জমেছিল, তারা উন্মত্ত হয়ে ঘরে ঢুকে ল্যাবরেটরি লণ্ড ভণ্ড করতে লাগল, সকলেই সেরাম চায়। সকলেই শিশি হাতড়ায়।

ক্ষেমিয়ার দুধের কারবার সেদিনের মত বন্ধ হল।

*

পরদিন "দৈনিক পত্রিকা" খুলে দেখা গেল, বড় বড় হরফে লেখা—অদ্ভুত প্লানচেটের বাণী! বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সিভ্যালরী সেন ও মিলনী-সঙ্ঘের সদস্যগণ প্রেমাক্রান্ত! আরও খবর এই যে, যে রোগীর রক্ত নিয়ে সেরাম তৈরী হয়েছিল সে যেমন দেশ-প্রেমিক ছিল—তেমনই ছিল নারী-প্রেমিক। তার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই সিভ্যালরী সেন তার সেরাম নিয়েছিলেন।

মিলনী-সঙ্ঘের আর বৈঠক হয়নি, কারণ প্রত্যেক সদস্যেরই বাড়ী ছাড়ার প্রবৃত্তি বা ফুরসৎ কোনটাই হয়নি। তাই মিলনী-সঙ্ঘের কপাটের বুকে সেদিন থেকে এক বিরাট তালা ঝুলছে।

কিসের তোমার গর্ব্ব এত

—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী

কিসের তোমার গর্ব্ব এত
বলতে আমায় পারো?
কি সুখ তুমি পাও চিতে
গরীবকে যে মারো?

অর্থ তোমার বড় এত!
জড় কর অর্থ যত!
নিজে জড় হও যে মনে
কর্ব্বে ঘৃণা আরো?

বুঝে দেখ মনে মনে
জেতো কিংবা হারো!

ভোগ-বিলাসে ভরাডুবি
হবে যখন বুঝবে খুবি;
চোবন খেয়ে মরবে প্রাণে;
গর্ব্ব আজি ছাড়ো;

সবার মাঝে দাও বিলায়ে
তরো এবং তারো।

নরওয়ে
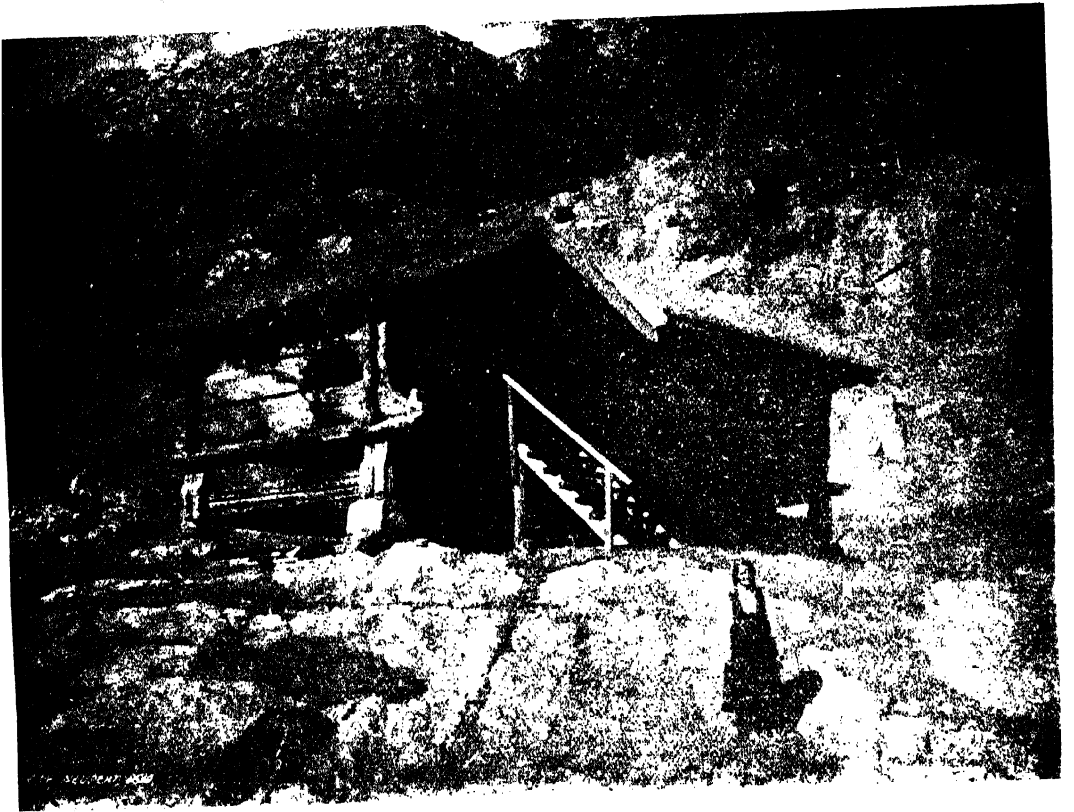
পাইন গাছের তক্তায় নির্ম্মিত নরওয়ের নিজস্ব সনাতন পদ্ধতির গোলাবাড়ী।

নরওয়ের জাতীয় পোষাকে কৃষক-পরিবার।

নরওয়ের একটি হ্রদ : বার্গেন রেলপথ ইহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

নরওয়ের প্রসিদ্ধ রেল-ষ্টেশন ভস্: এই স্থান হইতে নরওয়ের সুপ্রসিদ্ধ ফিয়র্ডসমূহের (পাহাড়-বেষ্টিত সমুদ্রের খাড়ি) রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্ব্ব নরওয়ের হেডাল উপত্যকা অঞ্চলে একটি কাম্প।
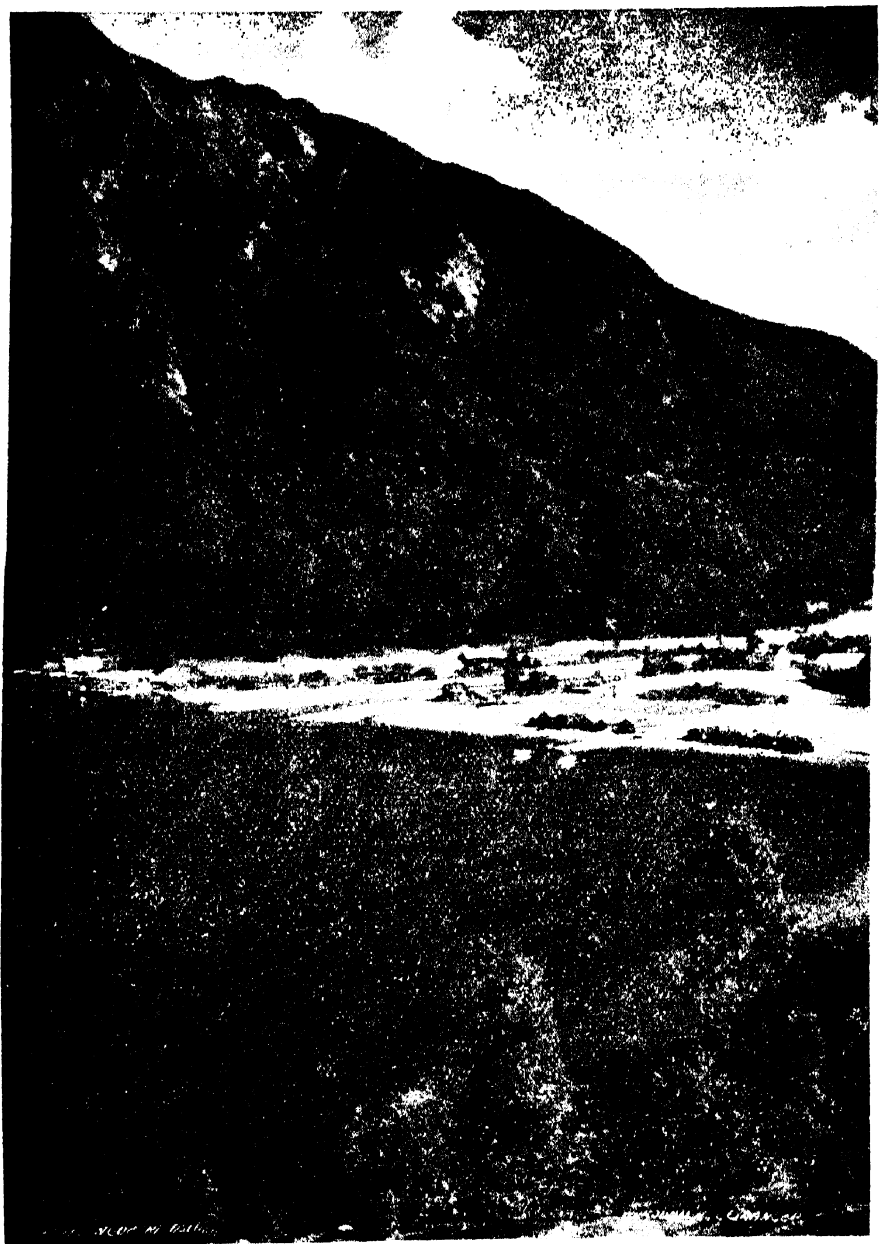
পশ্চিম নরওয়ের সুপ্রসিদ্ধ নাইরংগার ফিয়র্ড।
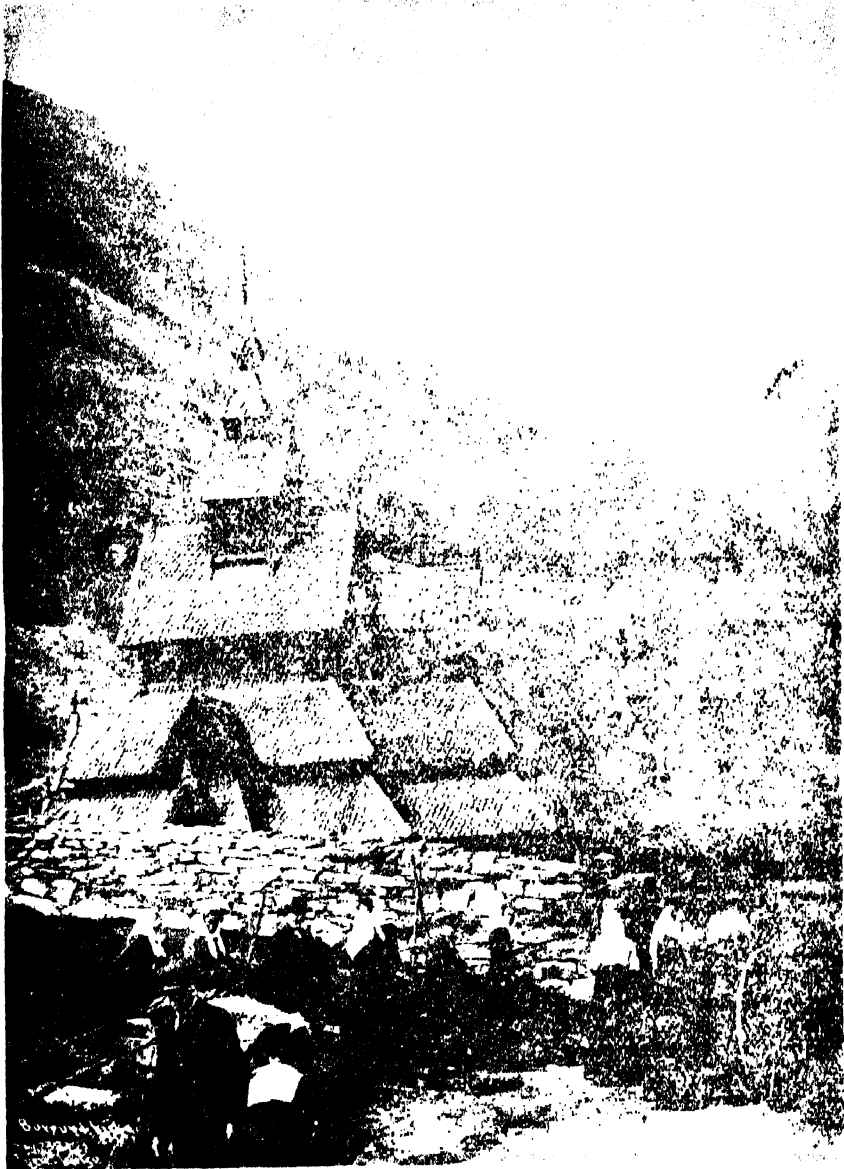
নরওয়ের একটি প্রাচীন গির্জ্জা (নির্ম্মাণ-কাল প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দ) : বঙ্গদেশের প্যাগোডার নির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত ইহার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

নরওয়ের কৃষি ও বন-সম্পদ্

—শ্রীএস. গিলসেথ

দক্ষিণ হইতে উত্তরে নরওয়ের বিস্তৃতি ৫৮°, উত্তর-অক্ষরেখা হইতে ৭১° উত্তর-অক্ষরেখা পর্য্যন্ত ১৮°, ইহার ফলে নরওয়ের বিভিন্ন অংশের জমি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হয়। উত্তরে প্রধানতঃ ঘাস, দক্ষিণে গম ও কাঁচাসব্জি এবং মাঝামাঝি স্থানে সাধারণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদন করা হইয়া থাকে। হিমমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী হওয়া সত্ত্বেও ৭০° অক্ষাংশ পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানে যবের চাষ এবং আরও উত্তরে আলুর চাষ সম্ভব।*

নরওয়ের প্রাকৃতিক অবস্থা মোটামুটি ভাবে কৃষির অনুকূল হওয়ায় নরওয়েতে কৃষির গুরুত্ব যথেষ্ট। বর্ত্তমানে কৃষিই নরওয়ের অধিকাংশ লোকের জীবিকা। পূর্ব্বে নরওয়ের শিল্প-বাণিজ্যের যুগে প্রধানতঃ শিল্প-বাণিজ্যই গবর্ণমেন্টের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেই সময়ে গবর্ণমেন্ট কৃষি কার্য্যের দিকে মোটেই নজর দেন নাই। মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে দেশের লোকের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এই সম্পর্কে অনেক সংস্কার সাধিত হয়। ইহার পরে, বিশেষ করিয়া গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে নরওয়ের কৃষির যে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই সংস্কারগুলির ভিত্তিতেই সম্ভব হইয়াছে। যে সকল দেশে সর্ব্বপ্রথম বাধ্যতামূলক ভাবে শিক্ষা প্রবর্ত্তন হয়, নরওয়ে তাহার অন্যতম; বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত জনসাধারণের হাইস্কুল ও কৃষিবিষয়ক হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

নরওয়ের কৃষির বৈশিষ্ট্য এই যে, দেশের অধিকাংশ পরিমাণ জমী ছোট ছোট ফার্ম্মে বিভক্ত এবং ইহার ফলে চাষ-বাসের কাজ চাষীদের হাতেই রহিয়া গিয়াছে। আধুনিক কালে গ্রামের অনেক লোক শহরমুখো হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর আগে সমগ্র-লোক সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গ্রামে বাস করিত। বর্ত্তমানে শহর ও গ্রামের অধিবাসীদের সংখ্যা প্রায় সমান দাঁড়াইয়াছে। চাষীরা কিন্তু এই শহুরে নেশা হইতে অনেকাংশে মুক্ত, গ্রামের সহিতই তাহাদের জীবন এখনও জড়িত রহিয়াছে। পূর্ব্বে চাষবাস হইতে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন চলিত, কিন্তু আয়কর ফসল তৈয়ারী করায় এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে বিক্রয়-ব্যবস্থার সুবিধা হওয়ায় ছোট ছোট ফার্ম্মের মালিকদের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে।

নরওয়ের মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ২১ লক্ষ একর। ইহা ছাড়া স্বাভাবিক ঘাস-জমির পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ একর। নরওয়েতে বছরে প্রায় ৫॥ লক্ষ টন শস্য—প্রধানতঃ যব ও ওট, উৎপন্ন হয় এবং আরও ৪॥ লক্ষ টন বিদেশ হইতে আমদানী হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নরওয়ের ফার্ম্মগুলি ছোট। প্রায় ২,৬৫,০০০টি রেজিষ্টারী করা ফার্ম্মের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ টি ফার্ম্মের জমির পরিমাণ ২৫ একরের কম; ২৫০ একরের বেশী জমি আছে এরূপ ফার্ম্ম সমগ্র নরওয়েতে ৩০টির অধিক কি না সন্দেহ। অধিকাংশ ফার্ম্মের সঙ্গে আবাদী জমি ছাড়া অল্প-বিস্তর বন এবং চারণভূমি আছে।

দেশের বহু স্থানে পার্ব্বত্য অঞ্চলে বিস্তৃত চারণভূমি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সকল চারণভূমি ফার্ম্ম হইতে অনেক দূরে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে কয়েক মাস এই চারণভূমিতে গবাদি পশু রাখা হয় এবং এই সকল "সেটার" (নরওয়েজিয়ান seter) হইতেই দুগ্ধ দোহন ও দুগ্ধ চালান হইয়া থাকে।

সমগ্র নরওয়েতে পশু-পালনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। গো-পালন সকল ফার্ম্মের কাজের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। নরওয়েতে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ঘোড়া পাওয়া যায়, পূর্ব্বী এবং পশ্চিমা। পশ্চিমা ঘোড়া আকারে ছোট, অন্যটি মাঝারি আকারের।

গরুর শ্রেণীর মধ্যে রেডপল, টেলেমার্ক এবং কাল ও ধূসর পশ্চিমা'র নাম করা যাইতে পারে। নরওয়ের সকল শ্রেণীর গরুই দুগ্ধ দেয়, আকার হিসাবে দুগ্ধের পরিমাণ

* লেখক নরওয়েজিয়ান। বঙ্গশ্রীর জন্য বিশেষভাবে ইংরাজীতে লিখিত প্রবন্ধ হইতে ইহা শ্রীযুক্ত সুধাংশুপ্রকাশ চৌধুরী কর্ত্তৃক অনুদিত হইয়াছে বঃ সঃ।

ভালই বলিতে হইবে। নরওয়ের মেষপাল অধিকাংশ বৃটেন হইতে আমদানী করা চেভিয়ো (cheviot) শ্রেণীর, কিছু পরিমাণ দেশী মেষও পালিত হয়। নরওয়েতে ছাগপালনও মন্দ হয় না এবং ছাগ প্রায় সবই দেশীয়। নরওয়ের ছাগ আকারে ছোট হইলেও ভাল দুধ দেয়। নরওয়ের পশুপালের স্বাস্থ্য খুবই ভাল; পায়ের ও মুখের রোগ একেবারেই নাই এবং গো-যক্ষ্মা অত্যন্ত বিরল।

নরওয়ের গৃহপালিত পশুর সংখ্যা আনুমানিক এই প্রকার: ঘোড়া ১,৭০,০০০; গবাদি ১৩,০০,০০০; মেষ ১৭,০০,০০০; ছাগ ৩,৪০,০০০ এবং হাঁস-মুরগী ৩৩,০০,০০০।

বর্ত্তমানে সমবায় প্রথার বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যৌথভাবে মাখনের কারখানা, পনিরের কারখানা, কসাইখানা, ডিম ও কাঠ বিক্রয় করিবার জন্য যৌথ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া গ্রাম্য অঞ্চলে সার, পশু-খাদ্য, চাষ-বাসের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয় করিবার জন্য বহু যৌথ ক্রয়-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের ২৬,২০ গুলি শাখা আছে এবং ইহার সদস্যসংখ্যা ১,১০,০০০।

অনাবাদী জায়গায় নূতন ফার্ম্ম স্থাপনের জন্য সরকার 'সেটলমেণ্ট সোসাইটী'দের দান বা ঋণ দিয়া কৃষি-বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকেন। এই সকল সোসাইটী অনাবাদী জমি কিনিয়া পথ-ঘাঠ এবং জল-নিকাশের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। সমস্ত জমিটি তাহার পর ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এই সকল খণ্ডের আয়তন সাধারণতঃ ৫ একরের কাছাকাছি হইয়া থাকে। যে সকল চাষী এই ভাবে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করে, সরকার হইতে তাহাদের অর্থ সাহায্য করা হয় বা ঋণ দেওয়া হয়।

নরওয়ের কৃষি-উন্নয়নের কাজ প্রধানতঃ সরকারী কৃষি-বিভাগের উপর ন্যস্ত। ইহা ছাড়া অনেকগুলি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করিতেছে। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে 'নরওয়ে মঙ্গল সমিতি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—এই সমিতির বহু শাখা আছে। সরকারী কৃষি-বিভাগ কৃষি-উপদেষ্টা, কৃষি-গবেষণা ও পরীক্ষণ-কেন্দ্রের সাহায্যে কৃষির উন্নতি-বিধানের চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রাথমিক ও উচ্চ কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিখান হইয়া থাকে। উচ্চ কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র অসলোর নিকটে আস নামক স্থানের সরকারী কৃষি-কলেজ।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে শস্য আমদানী সরকারের একচেটিয়া অধিকার হইয়াছে। দেশের শস্য উৎপাদন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, সরকার তাহার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন।

নরওয়ের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অংশের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থান বনভূমি। উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৩ হাজার ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত বনভূমির বিস্তৃতি। ট্রণ্ডহাইম্স ফিয়র্ডের চতুর্দ্দিকে নর্ডেনফিয়েলস্কে জেলায়ও বহু বনভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার বিস্তৃতি সমুদ্রপৃষ্ঠের ১৮০০ ফুটের উচ্চে বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে তীব্র সামুদ্রিক বাতাসের জন্য সমুদ্রতীরে বনভূমির বিশেষ বিস্তৃতি হইতে পারে নাই। পাহাড়ের আড়ালে যাহা কিছু সামান্য জঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ চওড়া পাতাওয়ালা গাছের। ফার-জাতীয় গাছের জঙ্গল পশ্চিম-নরওয়েতে বিরল, কয়েকটি ফিয়র্ডের গোড়ায় কয়েকটি ছোট ছোট জঙ্গল পাওয়া যায়।

নরওয়ের অর্থকরী বনভূমির আয়তন প্রায় ১কোটী ৯০লক্ষ একর। ইহার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ ফারজাতীয় গাছের বন এবং বাকী ৩০ ভাগ চওড়া পাতাওয়ালা গাছের বন। এই জাতীয় বনভূমি অধিকাংশই ৬৬° উত্তর-অক্ষাংশের উত্তরে। সমগ্র দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অর্থকরী বনভূমি।

বনভূমির শতকরা ৪৫ ভাগ আয়তন ফার[১] গাছ, ২৫ ভাগ পাইন গাছ এবং বাকি ৩০ ভাগ চওড়া পাতাওয়ালা গাছ। চওড়া পাতাওয়ালা গাছের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান পাগড়ী বার্চ্চ[২], উত্তরের পার্ব্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর অন্য গাছের মধ্যে নিম্নভূমির বার্চ্চ[৩], ওক[৪], বীচ[৫] ও অ্যাস-পেনের[৬] উল্লেখ করা যাইতে পারে। নরওয়ের বনভূমিতে কাঠের পরিমাণ ১১৩০ কোটী ঘনফুট এবং প্রতি বৎসর

১। Picea excelsa ২। Betula odorata ৩। Betula verruccosa ৪। Quereus pedunculata ও sessilli flora ৫। Fagus sylvatica ৬। Populus tremulus.

২৫ কোটী ঘনফুট নূতন কাঠ জন্মায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে।

বনভূমির অধিকাংশ, শতকরা প্রায় ৬৫ ভাগ, চাষীদের ফার্ম্মের সহিত সংলগ্ন এবং তাহাদের সম্পত্তি। ১৫ ভাগ বনভূমি কাঠের ব্যবসায়ীদের অধিকারে এবং বাকি অংশ সাধারণের সম্পত্তি।

জলপথের সুবিধা থাকায় বন হইতে জলে ভাসাইয়া কাঠের গুঁড়ি চালান দিবার বিশেষ সুবিধা আছে। সেপ্টেম্বর হইতে এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত গাছ কাটা এবং চালানের কাজ হইয়া থাকে। জলে ভাসাইবার আগে ক্রেতা প্রত্যেক গুঁড়িতে নিজের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দিয়া দেন এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইলে চিহ্ন দেখিয়া গুঁড়ি বাছাই করা হয়। গড়পড়তা হিসাবে প্রতি বৎসর প্রায় ২কোটী ৪০ লক্ষ গুঁড়ি নরওয়ের নদীপথে বাহিত হয়। ইহার পরিমাণ হইবে ১৭ কোটী ৫০ লক্ষ ঘনফুট। নরওয়ে হইতে যে পরিমাণ পণ্য বিদেশে রপ্তানী হয়, কাষ্ঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্য তাহার শতকরা ৩৫ ভাগ। ১৯৩০ সালে নরওয়ে প্রায় ২০ কোটী ৯লক্ষ ক্রোণার মূল্যের কাঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্য রপ্তানী করে।

বনবিভাগের উন্নতির জন্য সরকার নানা ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সম্পর্কিত বিদ্যা শিখাইবার জন্য অনেকগুলি সরকারী শিক্ষালয় আছে এবং উচ্চতর শিক্ষা সরকারী কৃষি-কলেজে দেওয়া হইয়া থাকে।

বসুন্ধরা

—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা

হে মোর শ্যামলদ্যুতি তৃণগুল্মবিটপীশোভনা,
নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বাঁধা জন্মাবধি আমরা দুজনা।
মোর দেহকণা
এ বক্ষের নির্বান্দী পবনে
পত্রে পত্রে শুষি লও শ্যামল চুম্বনে।
তোমার প্রাণদা শ্বাসবায়ু
পলে পলে বক্ষে মোর ঢালে পরমায়ু।
পবনে পবনে তাই নিত্য অভিসার
প্রাণে প্রাণে তোমার আমার।
হে রূপসী নীলাম্বরে আলোকের ঊর্ম্মিদলে ভাসি'
দরশের সিকতায় নিত্য মোরে দেখা দাও আসি
আত্মপরকাশি'।

রূপে রূপে কত মূর্ত্তি ধর,
সহস্র প্রপাতে মোর শূন্য বক্ষ ভর
কিরণের অমৃত নির্ঝরে,
আলোক-মালিকা লয়ে প্রহরে প্রহরে
এস তুমি সঙ্গোপনে মরম-নিভৃতে
সে মালিকা মোর গলে দিতে।
আমার শ্রবণে তুমি সুরে সুরে এস অভিসারে,
গোপন সুড়ঙ্গপথ মুখরিয়া নূপুর ঝঙ্কারে
মরম মাঝারে
পশ' ধীরে খুলিয়া মঞ্জীর
সুরঘন বাণীময় স্তম্ভিত তিমির
তোমারে টানিয়া লয় বুকে,
অধরে অধর রাখি রহ মৌন মুখে।

পরশনে ঢাল' তুমি রন্ধ্রে রন্ধ্রে হরষণধারা,
পরাণে উথলে তাই দেহ ভেদি অমৃত ফোয়ারা,
ফোটে কোটি তারা
মরমের গহন সুনীলে
রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে মোর, তুমি পরশিলে;
দামিনী নাগিনী খেলা করে
ঝলমলি মোর শিরা স্নায়ু পেশী পরে।
দীপ্ত ফণা ধরে যেন পুলক কৃশাণু
অঙ্গে অঙ্গে প্রতি পরমাণু।
ইন্দ্রিয়ের ঐকতান নিঃশবদে থামি যায় যবে,
তোমার আনন্দঘন মধুরিমা লভি অনুভবে।
আমারে নীরবে
কর তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান,
সর্ব্ব উন্মাদনাহরা প্রশান্তি নির্ব্বাণ।
এ গাগরি কানায় কানায়
ভরিয়া হরিয়া লও তৃষ্ণা বেদনায়।
প্রাণের গহন শূন্য পূর্ণ করি' রও,
সুদূর, অন্তিকতম হও।

ভারতে কয়লা-সমস্যা

—শ্রীনির্ম্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

বর্ত্তমান যুগে সভ্যজগতে পাথুরে কয়লা যে বিবিধ শিল্প ও কারখানায় নানা প্রকারে ব্যবহৃত হইতেছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। পাথুরে কয়লা যে অতীত যুগে (পৃথিবীতে মানবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বে) নানা প্রকার উদ্ভিদ্‌রাশির ধ্বংসাবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আজ বৈজ্ঞানিক-গণের নিকট সুপরিচিত। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা পরীক্ষা করিলে উদ্ভিদের কিছু না কিছু চিহ্ন প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। অধিকাংশ স্থলেই পাথুরে কয়লার মধ্যে অনেকগুলি নিষ্প্রভ ও উজ্জ্বল স্তরের বিন্যাস সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এই সকল স্তরের সম্বন্ধে লেখক বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিগত শিউড়ী অধিবেশনে কিছু আলোচনা করিয়াছেন।

যখন পাথুরে কয়লায় বায়ুর সংমিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করা যায়, তখন উহা প্রজ্বলিত হইয়া তাপ উৎপাদন করে। এই তাপের সাহায্যেই কল-কারখানায় নানা প্রকার যন্ত্রাদি পরিচালিত হইয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনও আবদ্ধ পাত্রে বায়ু-সংযোগ ব্যতিরেকে কয়লাকে (৪৫০°—১০০০° সেন্টিগ্রেড) উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে কয়লা-বিশেষে উহা হইতে বিভিন্ন পরিমাণ ধূম নির্গত হয়। ধূম নির্গমনের পর দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাত্রের মধ্যে কোন কোন কয়লা কঠিন পিণ্ডে বা কোকে পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই আমরা পোড়া কয়লা বা কোক কয়লা বলিয়া থাকি এবং এই শ্রেণীর কাঁচা কয়লাকে coking coal বা কোক-উৎপাদনকারী কয়লা বলা হয়। ৪০০°-৬০০° সেন্টিগ্রেড প্রস্তুত হইলে আমরা তাহাকে সাধারণতঃ পোড়া কয়লা বা soft coke বলি এবং ইহাই গৃহস্থের রন্ধনচুল্লীতে ব্যবহারোপযোগী। ৯০০°-১০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে প্রস্তুত কোক কয়লা বিশিষ্ট গুণাবলীর জন্যই ধাতু নিষ্কাষণে একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। ইহাকে আমরা hard coke বা metallurgical coke বা কঠিন কোক বলি। এই কোক কয়লার পরিবর্ত্তে ধাতু-নিষ্কাষণ চুল্লীতে পাথুরে কয়লা বা অন্য পদার্থের ব্যবহার আজ পর্য্যন্ত বিশেষ সুফল প্রদান করে নাই। কাঠ কয়লার দ্বারা ধাতু নিষ্কাষণ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেও ধাতু নিষ্কাষণের বর্ত্তমান বিশাল চুল্লীতে (blast furnace) ইহার প্রচলনে অনেক বাধা-বিপত্তি আছে।*

ভারতবর্ষের ভূতত্ত্বের ইতিহাস আলোচনা করিয়া আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছেন, অতীত যুগে (gondwana যুগে) জল ও স্থলভাগের সমাবেশ বর্ত্তমান অবস্থান হইতে বিভিন্ন ছিল। বর্ত্তমানে যেখানে হিমালয় পর্ব্বত দণ্ডায়মান, সে-স্থানে বহু প্রাচীন যুগে যে টেথিস্ (Tethys) নামক একটি বিশাল সমুদ্র ছিল, সাধারণের নিকট তাহা অদ্ভুত মনে হইলেও ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য যে জীব-যুগের পর হইতে স্থলভাগেই বিদ্যমান আছে এবং কখনও সমুদ্রজলে প্লাবিত হয় নাই, তাহাও তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন। ঐ যুগের গণ্ডোয়ানা মহাদেশের উদ্ভিদ্‌রাজি হইতে যে কয়লার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আজ আমরা ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি, রামগড়, বোকারো, জয়ন্তি, রাজমহাল প্রভৃতি বহু স্থানের ভূগর্ভে দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে ঝরিয়া, গিরিডি ও রাণীগঞ্জের কতকাংশের কয়লা উচ্চ-শ্রেণীর এবং ইহা হইতে উৎকৃষ্ট hard coke প্রস্তুত হয়। ঝরিয়া ১৪নং, ১৫নং ও ১৭নং স্তরের কয়লা হইতে যে উত্তম শ্রেণীর কোক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। রাণীগঞ্জ ক্ষেত্রে বহু পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর কয়লা পাওয়া গেলেও, কেবলমাত্র সাঁক্তোর, লাইকডি, বেগুনিয়া, ডিসেরগড় প্রভৃতি স্তরের কয়লা হইতেই ভাল কোক প্রস্তুত হইতে পারে।

সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের আকরের ভূগর্ভস্থ কোক-উৎপাদনকারী কয়লার পরিমাণ দেওয়া হইল :—

---

* মহীশূর রাজ্যে ভদ্রাবতী লৌহ কারখানার চুল্লীতে কাঠ কয়লার প্রচলন আছে।

"তুমি যে সুরের আগুন
জ্বালিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে আগুন ছড়িয়ে গেল
সবখানে, সবখানে, সবখানে…"

শ্রেণী—	আকরের ও স্তরের নাম	পরিমাণ (টন)
১ম " সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহচুল্লীর উপযুক্ত—	গিরিডি, নিম্নকরহারবাড়ী স্তর……	৯০ লক্ষ
২য় " উৎকৃষ্ট কোক—	ঝরিয়া—১৩নং ১৪নং ১৫নং ১৪এ নং ১৭নং স্তর ··	৭৩ কোটী ৩০ লক্ষ
২য় " " "	গিরিডি নিম্নকরহারবাড়ী স্তর…	৩ কোটী
২য় " " "	রাণীগঞ্জ, ভিক্টোরিয়া, লাইকডি ও রামনগর স্তর…	৫ কোটী
৩য় " সন্তোষজনক কোক	ঝরিয়া ১০নং ১১নং ১২নং ১৬নং ১৮নং স্তর ···	৮০ কোটী
৩য় " " "	রাণীগঞ্জ. ডিসেরগড় স্তর	৪ কোটী ৮০ লক্ষ
৩য় " " "	রাণীগঞ্জ, সাঁক্তোর স্তর	৩ কোটি ৬০ লক্ষ
৩য় " " "	রাণীগঞ্জ, বেগুনিয়া স্তর	২ কোটী ৫০ লক্ষ
৩য় " "	বোকারো, কারগালি স্তর	৩৬ কোটী ৫০ লক্ষ
৩য় " " "	জয়ন্তি	
৪র্থ " উত্তম কোক প্রস্তুত হইতে পারে কিন্তু লৌহচুল্লীতে ব্যবহৃত হইতে পারে না—	আসাম···	৬০ কোটী

আধুনিক জীব-যুগে ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বহু কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বিকানীর, বেলুচিস্থান, জাম্মু (কাশ্মীর), ডানডট (পাঞ্জাব) ও উত্তর-পূর্ব্ব আসামে মাকুম্ প্রভৃতি স্থানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশেও ঐ যুগের কয়লা নানাস্থানে পাওয়া যায়। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যে মাকুম্ ও কালাকট (জাম্মু, কাশ্মীর) খনির কয়লা হইতে উৎকৃষ্ট কোক্ উৎপন্ন হইতে পারে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের কয়লার রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিডি প্রভৃতি স্থানসমূহের মধ্যে গিরিডির কয়লা উৎকৃষ্ট কোক্ প্রস্তুতের উপযোগী। কিন্তু এই সকল কয়লার মধ্যে ভস্মের ও ফস্ফরাস্-(phosphorus)-এর পরিমাণ অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কোক্ কয়লার গুণাবলীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তথাকার কঠিন কোকে ভস্মের পরিমাণ অনেক কম। প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের কয়লার ভস্মের ভাগ কিছু কমান গেলেও যে বিশেষ সুফল লাভ হইবে, তাহা মনে হয় না। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা বিশেষভাবে পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভস্মের পরিমাণের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আসামের কয়লা ভারতের সকল স্থানের কয়লার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারে। কিন্তু উহার মধ্যে গন্ধকের ভাগ শতকরা ৩।৪ হওয়াতে ইহা লৌহ বা অন্য কোন ধাতু নিষ্কাসণের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে না। প্রক্ষালন-যন্ত্রের সাহায্যে আসামের কয়লার গন্ধকের ভাগ কিছু পরিমাণ কমান গেলেও উহা হইতে প্রথম শ্রেণীর কোক্ উৎপন্ন হওয়া কঠিন। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বহুস্থানে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লা অধিক পরিমাণে থাকিলেও ধাতু-নিষ্কাষনের উপযোগী উচ্চশ্রেণীর কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা অতি অল্প পরিমাণেই বর্ত্তমান।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ অনেক দিনের গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, ভারতের ভূগর্ভে সর্ব্বসমেত দুই শত কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা ও দুইশত পঞ্চাশ কোটী টন উচ্চশ্রেণীর কোক্-অনুৎপাদনকারী কয়লা এবং নূ্যনপক্ষে ১৫০ কোটী টন নিম্নশ্রেণীর কয়লা মজুত আছে।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক্ কয়লার দ্বারাই বিভিন্ন চুল্লীতে ধাতু-নিষ্কাষণ প্রক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় বলিয়া ইহার ব্যবহার আধুনিক সভ্যজগতে সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। এবং এই কোক্-কয়লা সম্পদের উপর দেশের ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ভারতে লৌহ-প্রস্তর যথেষ্ট পরিমাণে (প্রায় ৬০০ কোটী টন) বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই খনিজ প্রস্তর হইতে লৌহ-ধাতু নিষ্কাষণের জন্য যে উপযুক্ত পরিমাণ কোক কয়লার অভাব, সে সম্বন্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তালিকায় প্রদত্ত কোক-উৎপাদনকারী কয়লার সম্পদ্ অত্যন্ত অল্প এবং ইহা ভারতের লৌহ-প্রস্তর সম্পদের পরিমাণের তুলনায় অতি তুচ্ছ। বর্ত্তমানকালে যে উপায়ে খননকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহাতে খনি হইতে মাত্র অর্দ্ধেকাংশ কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব। এবং কয়লার বর্ত্তমান ব্যবহার-প্রণালী আলোচনা করিলে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোক-উৎপাদনকারী কয়লা অতিমাত্রায় অপব্যয় করা হইতেছে। নানা প্রকার বয়লারে ও কল-কারখানায়

এই শ্রেণীর কয়লার সমধিক প্রচলন কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বৎসরে গড়ে ২২০ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে ১৩০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদনকারী কয়লা ও ৯০ লক্ষ টন কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা উৎপন্ন হয়। ২০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদনকারী কয়লা বৎসরে কেবল ধাতু-নিষ্কাষণে ব্যবহৃত হয় এবং ১১০ লক্ষ টন অপরাপর কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রচলন অনুসারে কোক-উৎপাদনকারী কয়লার পরমায়ু মাত্র ৬০।৭০ বৎসর ধার্য্য করিতে পারা যায়। এই কোক-উৎপাদনকারী কয়লার অপব্যবহার বন্ধ হইলে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অন্য প্রকার উচ্চ শ্রেণীর কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লার প্রচলন হইলে ভারতের কোক-কয়লা-সম্পদের পরমায়ু কিছু মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া শতাধিক বৎসর হইতে পারে এবং যদি কয়লা-খনন-প্রণালী বিশেষ পরিশোধিত হয়, তবে কোক কয়লা-সম্পদ্ যে আরও অধিক দিন কার্য্যকরী হইতে পারিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমানে খনন-প্রণালীতে বালুকা-পূরণ প্রথা (sand stowing) যদি শীঘ্রই বিধিবদ্ধ হয়, তবে কয়লা যে অনেক অধিক পরিমাণে খনি হইতে উত্তোলন করা যাইবে, সে বিষয়ে খনি-বিশেষজ্ঞগণ একমত হইয়াছেন। এই বালুকা পূরণ-প্রথা আজও সর্ব্বতোভাবে প্রচলিত হয় নাই বলিয়া ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিড়ি প্রভৃতি খনিগুলিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইতেছে। খনন-প্রণালী কতকাংশে পরিমার্জ্জিত হইলে খনি-দুর্ঘটনার লাঘব হইবে এবং কয়লাও অনেক অধিক পরিমাণে পাওয়া যাইবে। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যথাযথ ব্যবহারের প্রচলন হইলে ভারতের কোক-কয়লার সমস্যার এক প্রকার সমাধান হইতে পারে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার গঠিত Rees কমিটী কয়লা-খনন-কার্য্যে বালুকাপূরণ-প্রথা প্রচলনের ব্যবস্থা অনুমোদন করা সত্ত্বেও ভারত সরকার এতাবৎ কাল ঐ প্রথা প্রচলনের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের সময়মত চেষ্টা ফলবতী হইলে আজ দেশের কয়লা-সম্পদের এতাদৃশ অবস্থা হইত না। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয় স্যর লুই ফারমর (Sir Lewis Fermor) একটি প্রবন্ধে ভারতের কয়লা-সম্পদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া সরকারের, তথা দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে এ-সমস্যার সমাধানকল্পে কোনও নীতির পরিকল্পনা ও প্রচলনের চেষ্টা করিয়া যান নাই। স্যর লুই প্রভৃতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী যত্নবান্ হইলে এ সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারিত। বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় কয়লার যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে আজিও আমরা বিশেষ কিছু জানি না। এ বিষয়ে ভারত সরকার-পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষাগারে গবেষণা-কার্য্য অবিলম্বে সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। এই প্রকার গবেষণার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার বিশেষ ব্যবহার-বিধি প্রচারিত হইলে দেশের কয়লা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি ও উপকার হইতে পারে। এই বিষয়ে সরকারের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত। গত বৎসর (১৯৩৭) Burrows কমিটী একটি বিরাট গবেষণাগারের পরিকল্পনা করিয়াছেন, ঐ পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে বহুল অর্থের প্রয়োজন হইবে। এ প্রসঙ্গে ও বালুকাপূরণ-প্রথা প্রয়োগ-কল্পে কয়লার উপর কিছু শুল্কের ব্যবস্থাও করিয়াছেন। শুল্ক ধার্য্য না করিয়াও গবেষণা-কার্য্য সুচারু রূপেই চলিতে পারে এবং বালুকাপূরণের জন্য যেরূপ শুল্কের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাও অধিক মাত্রায় ধার্য্য হইয়াছে। এক আনা শুল্ক ধার্য্য করিয়া কার্য্যের সূচনা করা উচিত, কারণ, প্রথমতঃ সমস্ত উৎপন্ন কয়লার উপরই শুল্ক ধার্য্য হইবে ও দ্বিতীয়তঃ, কয়লা-খনন-কার্য্যের প্রথমাবস্থায় বালুকাপূরণের আবশ্যক হয় না। কার্য্য আরম্ভ হইলে ভবিষ্যতে বিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী শুল্কের হার পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারিবে।

যদি অর্থাভাবে বা শুল্ক-ধার্য্য ব্যতিরেকে ভারত সরকারের অধীনে নূতন গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠান বিলম্বিত হয়, তবে দেশের কয়লা-শিল্পের ক্ষতি হইতে পারে। যতদিন পৃথক্ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের, যথা—ভূতত্ত্ব-বিভাগ, ধানবাদ খনি-বিদ্যালয়, আলিপুর গবেষণাগার, কানপুর গবেষণাগার ও বিভিন্ন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গবেষণাগার প্রভৃতি স্থানে কয়লার উপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা অচিরে আরম্ভ করা বিধেয়। এ বিষয়ে আর কালক্ষেপ করা কোন মতেই সমীচীন হইবে না। এরূপ গবেষণার ফলাফল প্রচারিত হইলে ভারতের

কয়লা-শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইবে এবং কয়লা-সম্পদের সুব্যবহারের ফলে উহার পরমায়ুও বৃদ্ধি পাইবে।

কয়লার ব্যবহার-প্রথায় যে কিরূপ অপব্যয় হইতেছে, সে সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত না দিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। রেলওয়ে বোর্ড ভারতের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কোক-উৎপাদনকারী কয়লা বাষ্পীয় শকটে বহু পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাষ্পীয় শকটে উচ্চশ্রেণীর কোক-অনুৎপাদনকারী কয়লা বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা চূর্ণীকৃত অবস্থায় ব্যবহার প্রচলিত হইলে যে সুফল লাভ হইতে পারে, অন্যান্য দেশে তাহা সুপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ব্যবহারের ফলে ভারতের কোক-উৎপাদনকারী কয়লা-সম্পদের যথাযথ সংরক্ষণ হইতে পারিবে ও কোক-শিল্পের, তথা জাতীয় ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল হইতে পারে। রেলওয়ে বোর্ড-এর এরূপ উচ্চশ্রেণীর কয়লা-সম্পদের অপব্যবহার কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে এবং ইহা অবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে ব্যবস্থা-পরিষদের সভ্যগণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

অপরাপর কার্য্য-প্রণালীর দ্বারাও যে দেশের কয়লা-সম্পদের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, তাহা নিম্নে দুই-একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিতে পারা যাইবে।

ভারত সরকারের Coal-grading Board-এর কার্য্য-প্রণালীর ফলে খনন-কার্য্যের যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে যে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন খনিতে অগ্ন্যুৎপাতের ও খনি-দুর্ঘটনার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এখন প্রায় সর্ব্ববাদীসম্মত। সুতরাং ভারত সরকারের এই বিভাগের কার্য্য-প্রণালী অচিরে সংশোধিত না হইলে, ভারতের কয়লা-সম্পদের সংরক্ষণ-সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইবে সন্দেহ নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার-গঠিত কোল কমিটী পোড়া কয়লার সমধিক প্রচলন ও প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতিকল্পে পোড়া কয়লার (soft coke) উপর টনপ্রতি ৴৹ আনা হিসাবে শুল্কের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। এযাবৎকাল ঐ শুল্ক সমভাবেই গ্রহণ করা হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে পোড়া কয়লার প্রচারকার্য্য হইতেছে বটে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত পোড়া কয়লা প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতিকল্পে কোনও বিশেষ চেষ্টাই সরকার করেন নাই। গৃহস্থেরা সুপরিমার্জ্জিত উপায়ে প্রস্তুত উন্নত শ্রেণীর পোড়া কয়লা পাইবার আশায় দশ বার বৎসর যাবৎ এই শুল্ক বহন করিয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহার প্রস্তুত-প্রণালীর উন্নতিসাধনে কোনও বিশেষ চেষ্টা বা তাহার ফলাফল আজও কেহই জানিতে পারে নাই। যদি কমিটীর রিপোর্ট অনুযায়ী কার্য্য করাই না হয়, তবে শুল্ক ধার্য্য করার কোনও আবশ্যকতা ছিল বলিয়া মনে হয় না। এরূপ শুল্ক অচিরেই বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে সরকারের আইন-প্রণেতৃগণের দৃষ্টি পড়িলে দেশের কয়লা-সম্পদের ও কোক-শিল্পের কল্যাণ সাধিত হইবে।

দুর্গা-স্তোত্র

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি সর্ব্বশক্তিদায়িনি মাতঃ শিবপ্রিয়ে! তোমার শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের যুবকগণ তোমার মন্দিরে আসীন, প্রার্থনা করিতেছি, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানব শরীরে অবতীর্ণ হইয়া জন্মে জন্মে তোমারই কার্য্যে ব্রতী আমরা শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও।

মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহিনি, ত্রিশূলধারিণী, বর্ম্ম-আবৃত-সুন্দর-শরীরে মাতঃ জয়দায়িনি! তোমার প্রতীক্ষায় ভারত রহিয়াছে, তোমার সেই মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি দেখিতে উৎসুক। শুন মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও।

মাতঃ দুর্গে! বলদায়িনি, প্রেমদায়িনি, জ্ঞানদায়িনি, শক্তিস্বরূপিণী, ভীমে, সৌম্য-রৌদ্ররূপিণি! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রেরিত যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ প্রাণে মনে শক্তি, উদ্যম, দাও, মাতঃ, হৃদয়ে বুদ্ধিতে দেবের চরিত্র, দেবের জ্ঞান।... "ধর্ম্ম"—(কার্ত্তিক : ১৩১৬)

এ পূজার অভিনয়ে

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চিত্ত যেথা মৃতপ্রায় ভারতের মহাসিন্ধু পারে,
আজি সেথা অর্ঘ্য উপচারে
পূজিতে তোমারে দেবি! অশ্রু ঝরে নয়নে আমার
তুমি কেন এসেছ আবার।
অসীম শর্ব্বরী মাঝে যেথা কাঁদে মোর জন্মভূমি
অব্যক্ত দুঃখের পথে, বুভুক্ষায় পড়িয়াছে ঘুমি'
আমার দেশের লক্ষ্মী অন্ধকারে যেথায় জননি!
সেথায় ক্ষণিক হর্ষ মেঘাম্বরে ক্ষণপ্রভা গণি,
আজিকার শারদ প্রভাত
আমার অন্তরে কোন দিল না ক' আনন্দ-সংবাদ।

সরসীর শতদলে অরুণের আলোক-চুম্বন,
বিহঙ্গের অস্ফুট কূজন,
শরতের তরুরাগ, আরক্তিম উষার প্রাচীর,
শ্যামশষ্পে উচ্ছল শিশির,
কাননের কুসুমিকা, নির্ঝরের ছন্দো-মাধুরিমা,
নদীর তরঙ্গ নৃত্য জানি কত কবি-চিত্তসীমা
করিয়াছে অধিকার; তব পুণ্য বোধন-সঙ্গীত
আনিতেছে তাহাদের আনন্দের তরল ইঙ্গিত,
মোর চিত্ত করিয়া হরণ
আজিকার কোন গান করে নাই মোরে আকর্ষণ।

আমি ভাবি অসহায় মূক পশু হারাবে পরাণ
দেবালয়ে হবে বলিদান,
ভিক্ষুকের প্রতি রোষ, শ্রমিকের প্রতি নির্য্যাতন,
প্রতীহারী আরক্তলোচন,
এ দৃশ্য হেরিতে মাতা! চাহি না ক', তাই দুঃখে কহি
ফিরে যাও স্বর্গলোকে, আর্ত্তনাদ আর কত সহি
বোধন-সঙ্গীতে তব! কেন এস? কেন পূজা আসে?
পূজায় আনন্দ কোথা? পর্ণপুটে তপ্ত অশ্রু ভাসে।
ফিরে যাও আপনার ঘরে,
রাজার দুহিতা তুমি কি এনেছ ভিখারীর তরে?

বর্ষে বর্ষে কেন এস ভারতের ভগ্ন দেবালয়ে?
এ পূজার তুচ্ছ অভিনয়ে
বিক্ষোভ জাগিছে মোর, শক্তিপূজা করি শক্তিহীন
জন্মভূমি রহে রাত্রিদিন
অবজ্ঞার প্রান্তপথে, যেথা শুনি ভীষণ চীৎকার
যূপের ভৈরবী করে, অট্টহাস্য উঠে বিধাতার।
দূরান্তর হতে আসি কত লোক পদাঘাত করি'
সর্ব্বস্ব হরিয়া যার রেখে গেছে ক্ষুদ্র কাণাকড়ি
মোরা তার অভাগ্য সন্তান,
কি দিয়া তোমারে পূজি! আমাদের কোথা আছে স্থান?

শক্তি তব আছে শুনি, আমি ভাবি, সম্পূর্ণ অলীক
নারী হতে নহেক অধিক
প্রত্যক্ষ বাস্তবে তুমি, তাই যদি সত্য নাহি হবে
এ ভারতে কভু কি সম্ভবে
নিরন্তর যারা তব স্তোত্রপূজা মন্ত্র পাঠ করে
তাহাদের নাহি স্থান? শ্মশানের কালরাত্রি পরে
শেষের স্বাক্ষর দেয়! আর যারা মিথ্যামায়া মোহ
ছিন্ন করি' চূর্ণ করি' দেবালয় করেছে বিদ্রোহ,
নিত্য ভাঙ্গে তোমারি প্রতিমা,
তাহাদের জয়রথচক্রে কাঁপে সংসারের সীমা!

তোমার পূজার দিনে পট্টবস্ত্র কোথা পাব আমি?
মোর দুঃখ জানে অন্তর্যামী।
তুমি রাজ-রাজেশ্বরী ঐশ্বর্য্যের অন্তঃপুরে রহ,
নাহি কিছু আমার সংগ্রহ।
স্থাপন করিতে আমি পারিব না সিংহাসন নব,
ভিক্ষামুষ্টি নিয়ে মোর কোন কাজে লাগিবে না তব,
মাঝে শুধু অশান্তির উদ্দীপনা দিলে পরিবারে,
নববস্ত্র চাহে সবে, কোথা পাব! তাই অশ্রু ধীরে
ভাসে মোর দীর্ণ বক্ষখানি,
কে বুঝিবে মোর ব্যথা! স্বার্থপর এই বিশ্ব জানি।

পূজার বাজার

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৩১

'ধূলা-ধূসরিত কেশ
ভস্মে ঢাকা যৌবনের অপরূপ ডালা।'
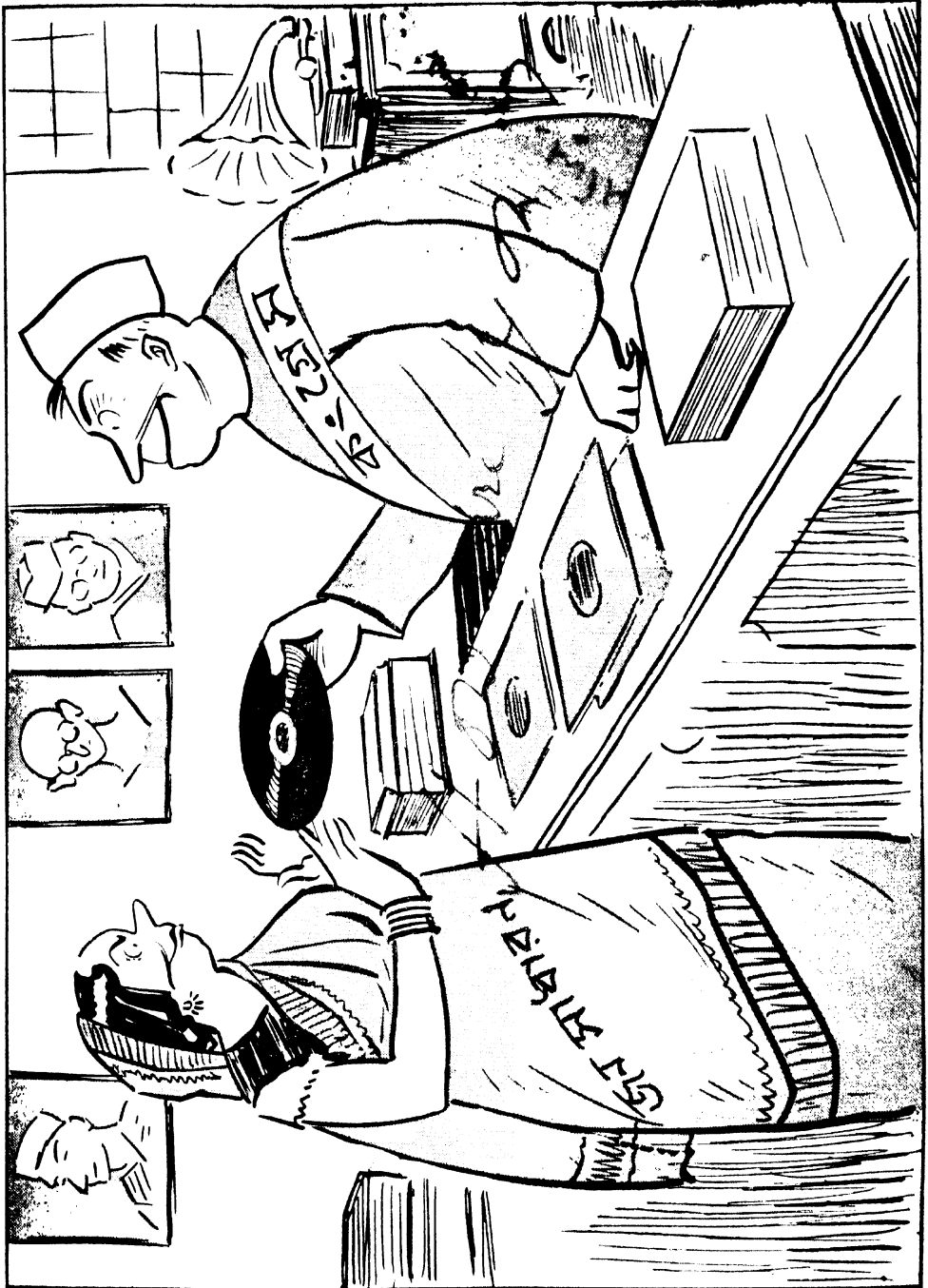
কানুর জ্বর, সরলা ছেলে লইয়া আছে, বড়-বৌ আসিয়া বলিল, 'গিরির শাশুড়ী দশ সের চাল চাইছেন।'

সরলা বলিল, 'আমি উঠতে পারছিনে, দশ সের চাল দিলে আমাদের ঘরে বাড়তি আর কিছু থাকবে না। তা দিয়ে দাও, আর সুয়োরাণীকে বল, এই বেলা চাল করে রাখতে, ও বেলা রাঁধবার সময় যেন পাওয়া যায়।'

বড়-বৌ বলিল, 'নিরু কুটনো কুটছে, এখন আমাদের কারু অবসর নেই, দুপুর বেলা তিন জনায়—'

'দেখ দিদি, ঐ জন্যে আমার রাগ ধরে, আধ মণ ধান ভানতে কজন লাগে? শরীরখানা দেখেছ? অমন শুয়ে বসে শ্বশুরঘর আমরা করতে পারলাম না।'

বড়-বৌ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, 'বসে থাকে না বড়, গোয়াল-গোবর ঝাঁট-পাট থেকে ধান-কলাই যত কিছু, যদ্দূর পারে।'

'আচ্ছা বড়দি, তুমি এই কথা বললে? ঝাড়া হাত পা লোকের এই কাজ, না কি? আমি এই কুচো কাচা নিয়ে সব কাজ একা করিনে কি? তোমরা কর না? আর উনি করেছেন, অমনি সবার চোখ পড়ল।'

বড়-বৌ কথা ঘুরাইবার জন্য বলিল, 'কানুর জ্বরটা ছেড়েছে?'

'ছাড়েনি, দ্যাখ দিদি, ও যদি এখানে থাকে, সংসারে অমঙ্গল ঘটবে। কিন্তু আমি বলছি, ওর শেষ ভাল নয়। যা করে ও ছেলেদের দিকে চেয়ে থাকে, মনে হয় রক্ত শুষে খাচ্ছে। সৎমা ত'?'

বড়-বৌ বলিল, 'দেখ সরলা, জ্ঞান-বুদ্ধি তোর আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, সহ্য-গুণ তোর যা এমন কারও দেখিনে। দিনের পর দিন উপোস করে কখন তোর মুখ কালো দেখিনি, কোন কষ্ট কষ্ট বলে মানিসনে, তুই যদি ওকে একটু দয়া না করিস, তবে ও দাঁড়ায় কোথা?'

সরলা কানুকে বাতাস দিতে দিতে একটু ভাবিল, বলিল, 'দিদি তুমি যা বলছ, বুঝি। কিন্তু ওর দয়ায় দরকার কি? ও সেখানে ত'বেশ ছিল, কেন মরতে এল বল?'

'তুই বুঝেও অবুঝ হচ্ছিস। স্বামী, জা, ভাসুর সব থাকতে বাপের বাড়ী থাকাটা কি ভাল? মা ঐ রূপের ডালি নিয়ে একা কি করে থাকে?'

'ও সব মানুষের আবার ভয়। কত রং, কত ঢং জানে ওরা।'

'ছি, ও সব বলতে নেই, ওকে বললে নিজেদের গায়েই লাগবে, ও বড়—'

'ও বড় লক্ষ্মী ওর মত এমনটি আর নেই।'—এই কথাটা বলিতে গিয়া বড়-বৌ রসনা সংযত করিয়া ফেলিল। কিন্তু যেটুকু বলিয়াছে, সরলা আন্দাজে বাকীটুকু বুঝিয়া লইল। মুখ অন্ধকার হইয়া গেল, ভ্রুকুটী করিয়া বলিল, 'দিদি যাই বল, যত মন্দ বল আমায়, ওকে আমি দেখতে পারব না কিছুতেই, ওকে দেখলে আমার বুকে আগুন জ্বলে, মনে হয় ও-ই সব আমি কেউ নই। দিদি, তুমি কানুর কাছে বস একটু, চালটা আমিই দিয়ে আসি। বসে বসে যেন বাত ধরে গেল।'

উঠিয়া সরলা আয়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, নিজের মুখের ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিল—এমন যে খারাপ হয়েছে চেহারা, ভ্রু চোখ নাক সবই তেমনি আছে। হঠাৎ যেন আয়নার মধ্যে আর একখানা ছবি ফুটিয়া উঠিল। শত অনাদর, শত অযত্নেও সে মুখটা যেন অম্লান, তৈলহীন রুক্ষ চুলে আরও যেন সুন্দর দেখায়। মনের মধ্যে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, এমন একখানা সুন্দর মুখ সরলা আর দেখে নাই। শুধু রং, চেহারা বলে নয়,

সে মুখে কি একটা স্বপ্ন-মাখান লাবণ্য আছে, যা মানুষের মুখে দেখা যায় না।

মাথার চুলগুলি ঠিক করিতে করিতে সরলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'আচ্ছা দিদি, আমি দেখতে কি খুব খারাপ হয়ে গেছি? বিয়ের পর সবাই ত' বলত, চেহারা খুব ভাল, তেমনটি কি নেই?'

বড়-বৌ হাসিয়া বলিল, 'তোর মাথায় পোকা ঢুকেছে, দিন রাত ঐ সব ভাবিস বুঝি? পঞ্চমী যতই রূপসী হোক, নিষ্ফলা, স্বামীর কাছে কোন মূল্য নেই। তুই সুখেনের ছেলের মা, তোর কাছে কি পঞ্চমী? কেন মন খারাপ করিস? চেহারা তোর ঠিক তেমনই রয়েছে, মনেও হয় না যে, ছেলে-পিলে হয়েছে।'

'না দিদি, তুমি বোঝ না। ছেলেপিলে হলেই বৌয়ের আদর কমে যায়, যতটা ভালবাসা বৌয়ের উপর থাকে, সেইটাই ছেলেদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। শেষ স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই নিজেদের কাজ একদম ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে থাকে। নিজেরা যে কতখানি ফাঁকিতে পড়ে, সেটা ভেবে দেখবারও অবসর হয় না। মনে ভাবে খুব সংসার করছি, কিন্তু সে সংসার যে শুধু কল-কব্জার মত চলছে, তাও বোঝে না। এই দেখ না, মেজ-বট্‌ঠাকুরকে সবাই বলে, মেজদির খানসামা। কিন্তু মেজ-বট্‌ঠাকুর মেজদির খোঁজ-খবর কতটুকু করেন? দিন-রাত ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্যস্ত। কোথাও থেকে এলেন, মণির জ্বর কেমন, বেলির পেটের অসুখ সেরেছে কি না, খেয়েছে কি? এই সব খবর আগে। আর বট্‌ঠাকুরকে দেখ, বাড়ীতে পা দিয়ে আগে তোমার খোঁজ। এদিকে না দেখলেন তো রান্নাঘরে গিয়ে একবারটি দেখে আসবেন। তোমার যদি দুটো ছেলেমেয়ে থাকত, তা হলে কি এমনটা হত?'

বড়-বৌয়ের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। বলিল, 'আগে এমন ছিলেন না।'

'সে মানুষের শত্রুতায়, এখনকার কথা ধর। তোমার বয়সও কম নয়, বিয়েও আজ হয় নি। আমি ঘরে এসে অবধি তোমাদের এই ভাবই দেখছি, যেন নতুন বিয়ে হয়েছে। আর আমাদের দেখ, সারাদিন কাজের কথা ছাড়া আর কোন রকম কথা হয়?'

'হ্যাঁ রে পাগল হলি না কি? এ বয়সে আবার অন্য কথা কি?'

'তুমি বুঝেও বুঝছ না। বট্‌ঠাকুর তোমার সঙ্গে শুধু কাজের কথাই কন? যখনই দেখি চোখে-চোখে মিললেই তোমরা হাসছ, কত আদর, কত কি,—আমার বলা অন্যায়, গুরুজন। কিন্তু সত্যি বলছি কি না, বল? আমাদের ও সব আছে?'

পিছন-বাড়ীতে দত্ত-গিন্নীর গলা শোনা গেল, সরলা ঘর হইতে বাহির হইয়া দত্ত-গিন্নীকে চাল মাপিয়া দিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া পঞ্চমীকে দেখিতে পাইল না। দু-পা আগাইয়া গিয়া দেখে ঢেঁকিঘরের পিছনে কাঁঠালতলায় পঞ্চমী ঝাঁটা হাতে শ্রান্ত ভাবে গাছে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঠিক সামনে সুখেন দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে। পঞ্চমীর মুখে ঈষৎ হাসি, শ্রান্ত ভাব, মলিন কাপড়, রুক্ষ, অগোছাল চুল, তবু কি সুন্দর! একটা কথা সরলার কাণে আসিল— 'এত বেলা হয়েছে এখন কি স্নান করবে না? খুব সুখে আছ, না?'

সরলা তীব্র চাপা গলায় বলিল, 'সুয়োরাণীকে নিজেই চান করাও না। দাসী আমি এতখানি বেলা নাই নি, রোগা ছেলেটাকে নিয়ে ঘরের কোণে পড়ে রয়েছি, তা একবার মুখের কথাটি বলেছ কি? রাখ সুয়োরাণী, তুমি ঝাঁটা রাখ, নেয়ে সিঁদুর পরে খাটে বসে থাক গিয়ে।'

পাশ কাটাইয়া সুখেন নীরবে চলিয়া গেল। পঞ্চমী বলিল, 'আর সব হয়েছে ঢেঁকিঘরটা ঝাঁট দিলেই হয়।'

পঞ্চমীর হাত হইতে ঝাঁটাটা টানিয়া লইয়া সরলা পরিষ্কার উঠানটা আর একবার ঝাঁট দিতে সুরু করিল। পঞ্চমী নিরুপায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি একটা কলসী লইয়া ঘাটের দিকে গেল।

মেজ-বৌ ছেলেমেয়ের জামা-কাপড় কাচিতেছে। ও-ঘাটে গিয়া দুই জা স্নানে নামিল। পঞ্চমী বলিল, 'যাও মেজদি, আমি এগুলো কেচে নেব।'

গিরি সাঁতার দিয়া এ ঘাটে আসিয়াছে। বলিল, 'মেজদি পঞ্চুর মাথার এমন দশা? তোমাদের নিজেদের চুল দিব্যি চকচকে।'

মেজ-বৌ বলিল, 'আমি কি করব? সরলা তেলের বোতল নিজের ঘরে রাখে। সেইখান থেকে আমাদের একটু একটু দেয়। আমাদের কি ইচ্ছে হয় তেল মাথায় দিতে? ও অমন ডালি মাথাটা নিয়ে থাকে। সে দিন উনি বললেন, ছোট বৌমাকে সবাই মিলে তোমরা কষ্ট দিচ্ছ।'

পঞ্চমী বলিল, 'দিদি এতে আমার কষ্ট নেই। মা কখনও তেল মাখেন না—তাতে কি হয়েছে? আমার এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।'

অভ্যাস অনেক কিছুরই হইতেছিল; নিজের বাক্সের সাবান, তেল, আলতা, ফিতা, কাঁটা সব বিলাইয়া দিয়াছে, এখন পঞ্চমী চুল বাঁধে না, মাথায় চিরুণী দেওয়ারও সময় নাই। সরলা তাহাকে রান্নাঘরে ঢুকিতে দেয় না বটে, কিন্তু এত বড় বাড়ীটার ও এতগুলি লোকের কাজ কম নয়—সে সবই পঞ্চমীর হাতে পড়িয়াছে। সরলার বুদ্ধি অসাধারণ তীক্ষ্ণ—নিত্য নূতন নূতন সৌখীন কাজে বড়-বৌ মেজ-বৌকে আটকাইয়া রাখে—বাধ্য হইয়াই পঞ্চমীকে সব করিতে হয়।

তবু পঞ্চমী ফাঁক পাইলেই একবার বাঁশ-ঝাড়ের তলায় আসিয়া বসে। আজকাল বর্ষার দিনে স্কুল মেজ-বৌয়ের ঘরেই বসে, বড়-বৌও বাঁশতলায় বড় আসিবার সময় পায় না, বিশাল যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, তার কাছেই থাকে—বিশাল কাজে বাহির হইলে বৌদেরও সংসারের কাজের সময় হয়। একা পঞ্চমী আনমনে কখনও কাঁঠাল-তলায় দাঁড়াইয়া জলের খেলা দেখে—কখনও বাঁশ-ঝাড়ের নীচে বসিয়া বসিয়া নিত্য-পরিচিত পাখীগুলির জীবন-যাত্রার খুঁটি-নাটি পর্য্যন্তও মন দিয়া দেখে—আবার এক-বার মেজ-বৌয়ের কাছে বসিয়া মেয়েদের পড়ায়। সমস্ত বাড়ীটির মধ্যে একটি উদাসিনী আপন মনে ঘুরিয়া ফিরে, কোথায়ও এতটুকু জায়গা পায় না।

৩২

'আশ্রয়বিহীন চারুলতার মতন'—

পরশমণি আজকাল চোখে দেখেন কম। দৃষ্টিশক্তিটা দিন দিন যেন কমিয়া আসিতেছে, দিনে বড় অসুবিধা হয় না—রাত্রে একেবারেই মানুষ চিনিতে পারেন না। চিকিৎসা চলিতেছে সাধ্যমত। বিশাল ডাক্তার-কবিরাজ দেখাইল, সকলেই বলিল, বয়সের জন্য এ রূপ হইয়াছে। পরশমণি সে কথা মানিলেন না, পাড়ায় তাঁর চেয়ে বয়সে বড় অনেকেই—কারও এমন হইল না,—হতভাগা ডাক্তার-কবিরাজ আরও টাকা চায়, এ সব তারই ফন্দী।

জলের সময়। সন্ধ্যা হইলে পরশমণি আর কোথায়ও যাইতে পারেন না—বাড়ীতেই থাকিতে হয়। কখনও দেখিয়া, কখনও না দেখিয়া গালাগালি দেওয়াই তাঁর অভ্যাস, সেটা আজকাল আরও বাড়িয়া গেল।

রান্না-ঘরে ভাত বাড়িয়া বড়-বৌ অপেক্ষা করিতেছে, সরলা স্নানের পরে প্রসাধন সারিয়া এখনও বাহির হয় নাই। বারান্দার এক কোণে জলের ঘটি লইয়া ছোট একটি পিঁড়ি পাতিয়া পঞ্চমী বসিয়া আছে।

মেজ-বৌ বলিল, 'দিদি, পঞ্চমীর থালাটা দাও না? রাত্রে খায় নি, বেলা কত হয়েছে দেখ দেখি—'

পঞ্চমী বলিল, 'না, সরলা আসুক।'

সরলা সকলের থালায় খাদ্য-বস্তুর পরিমাণ দেখিয়া ঠিক করিয়া দেয় প্রতিদিন। পঞ্চমীর থালায় সব দিনই সবই কম কম থাকে—সেই যে প্রথম দিন বলিয়াছিল—'খেতে পারব না, অল্প দাও—নৌকায় খেয়েছি···' তার প্রথম কথা দুটি সরলা মনে ধরিয়া রাখিয়াছে। কোন কিছু অপচয়ে বড় ভয়, উহাতে বাড়ীতে অলক্ষ্মী লাগে।

ধীরে সুস্থে সরলা দেখা দিল—আপাদমস্তক চকচকে ঝকঝকে মাজা-ঘসা! বর্ণের ঔজ্জ্বল্য দিন দিন বাড়িতেছে। বাঁ-হাতে গামছাটি বারান্দায় বেড়ার গায় গুঁজিয়া ঘরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিল।

সরলার থালা তাহাকে দিয়া বড়-বৌ মেজ-বৌ নিজ নিজ ভাতের থালা লইয়া বারান্দায় পঞ্চমীর কাছে আসিয়া বসিল।

সরলা বলিল, 'তোমরা বারান্দায় গেলে যে?'

মেজ-বৌ বলিল, 'ঘরে বড্ড গরম—'

'এতদিন গরম লাগল না, আজ লাগল যে হঠাৎ? তা আমায়ও বারান্দায় দিলে না যে?

'আয় না, এসে বোস্।'

সরলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনজনকে দেখিয়া লইল। কি একটা পরামর্শ তার অগোচরে হইয়া গিয়াছে নিশ্চয়। আচ্ছা।—ভাতের থালা ও পিঁড়ি তুলিয়া সরলা বারান্দায় আসিয়া বসিল।

রাত্রে পঞ্চমীর খাওয়া বড় হয় না। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহ সন্ধ্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। সন্ধ্যার পরে কাজও থাকে না। অন্ধকার ঘরের মেঝেয় বিছানা পাতিয়া বিশ্রামলাভের আশায় শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়ে। ঘুমও বড় গাঢ়, দু'এক ডাকে ভাঙ্গে না। আগে আগে বড়-বৌ, কি মেজ-বৌ নিঃশব্দে আসিয়া পঞ্চমীর চোখে জল দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইয়া উঠাইয়া লইয়া যাইত। ডাকাডাকি করিলে পরশমণি গালাগালি দিয়া ভূত ছাড়াইতেন। এখন চোখে কম দেখেন—অতএব সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনি ঘরে কপাট দিয়া শুইয়া পড়েন। কাজেই পঞ্চমীর রাত্রের খাওয়াটা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে।

মেজ-বৌ বলিল, 'ডালনাটা কি বিচ্ছিরি রেঁধেছ বড়দি, মুখে দেওয়া যাচ্ছে না যে—নে, পঞ্চমী খেয়ে ফেল এটুকু।'

সরলার চোখ এ দিকে ফিরিল 'কি বললে মেজদি? ডালনাটা বিচ্ছিরি হয়েছে? সব চেয়ে ডালনাটাই ভাল হয়েছে কি না—'

অসমাপ্ত কথার অর্থ বিশেষ প্রাঞ্জল, বুঝিতে কষ্ট হয় না।

বড়-বৌ ধীরে ধীরে বলিল, 'রান্নায় আমরা পাকা নই, একদিন ভাল হল ত' দশ দিন মন্দ হবে। শুনেছি রায়-বাড়ীর মেজ-খুড়িমার শাশুড়ীর হাতের রান্না ছিল অমৃত, কোন ভাল জিনিষ তিনি রাঁধতেন না, যা পাঁচজনে তুচ্ছ করে, তাই তিনি রাঁধতেন, পোলাও মাংস ফেলে লোকে তাই খেত।'

সরলা বিরক্তির সুরে বলিল, 'তোমার রান্না আবার কবে খারাপ হয়?'

এ দিকে পঞ্চমীকে গল্পে পাইয়া বসিয়াছে। উৎসুক হইয়া বড়-বৌয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'কি তুচ্ছ জিনিষ রাঁধতেন বড়দি?'

'এই ধর, বোশেখ জষ্ঠি মাসে যে সব ডোবা খালের জল শুকিয়ে যায়, সেখানকার মাছ কেউ খেতে চায় না, কেমন একটা কাদা-কাদা গন্ধ ছাড়ে, কি পচা মাছ, যা লোকে ফেলে দেয়, বুড়ো লাউ, সীম, পুরোনো কলাইয়ের ডাল, যাই হোক না কেন, তাঁর হাতে পড়লেই বদলে যেত। নেমন্তন্নে মাছ, মাংস, ডালনা, কালিয়া রাঁধত সবাই, আর সব্বাই মিলে তাঁকে ধরত এই সব অখাদ্য রাঁধতে। একবার হয়েছে কি, দত্ত-বাড়ীর মেয়ের বিয়ে, বর্ষাকাল, তরী-তরকারীর বড্ড দাম, হাট থেকে যা কেনা হয়েছে, তা ছাড়া গাঁয়ে একটি বেগুন অবধি পাবার যো নেই। রান্না-বাড়ি হয়ে গেলে অনেকগুলো মাছের কাঁটা বেঁচে গেল, রেখে দিলে পচে যায়—আর এমন একটি কাঁচা তর-কারী ঘরে নেই, যা দিয়ে সেই কাঁটা রাঁধতে পারা যায়।'

মেজ-বৌ পঞ্চমীকে একটা ঠেলা দিয়ে বলিল, 'হাঁ করে গল্প শুনছিস, মাছ নিয়ে গেল বেরালে, বুড়ো মেয়ের এত গল্প শোনবার সখ? এখন ছাই খাও—'

পঞ্চমী অসহিষ্ণু হইয়া বলিল, 'মরুক গে যাক, তুমি বল তারপর কি হল?'

'তারপরে কি হল? দত্ত-বাড়ীর পেঁপেগাছ ছিল অনেকগুলো। জলে গোটাকতক গাছ পড়ে গিয়েছিল, তার থেকে পেঁপেগুলো পেড়ে ঘরে রেখেছিল, ডাসা নয় কি না, পাকলে না, শুকিয়ে গিয়েছে—দিন পনের আগের পাড়া। সেই পেঁপে সুতোর মত মিহি সরু করে নিজেই কুটে নিলেন, তার মত কুটনো কুটতেও কেউ জানত না। সেই পেঁপে আর মাছের কাঁটার ঘণ্ট করলেন, ঘি গরম মশলা আর আদা-বাটা দিয়ে—।'

মেজ-বৌ বলিল, 'সেইবার মণি হল না বড়দি? সে কি আজকার কথা? এখনও সে স্বাদ কেউ ভোলে নি, পেঁপে দেখলেই মনে পড়ে। কতজনে কত রকম করে রেঁধেছে, সে রকমটি আর হল না।'

'রায়-বাড়ীর সেজ-কাকা অনেকটা মায়ের হাত পেয়েছেন। সেজ-খুড়িমাকে উঠিয়ে দিয়ে নিজেই রাঁধতে বসে যান।'

পঞ্চমী আগ্রহ-ভরা কাল চোখ দুটি মেলিয়া রূপকথার মত গল্প শুনিতেছে, মেজ-বৌ বড়-বৌও বলিয়া যাইতেছে। সরলা থালায় জল ঢালিয়া উঠিয়া পড়িল।

বলিল, 'কি রঙ্গই জুড়ে দিয়েছ তোমরা, দেখে গা জ্বলে যায়। আহ্লাদে খুকী খেতে ভুলে গেছেন, ভাত মেখে খাইয়ে দাও না, সেটা বাকী থাকে কেন? উঠবে না না-কি তোমরা আজ? রাত্তিরের চাল ঘরে নেই, সেটা বুঝি ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি এই যে যাই', পঞ্চমী জলের গ্লাস মুখে তুলিল, বড়-বৌ নিজের থালাটি পঞ্চমীর দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, 'তুই খেয়ে ফেল, আমি আর পারছিনে, যা গরম।'

সরলা একদণ্ড দাঁড়াইয়া বলিল, 'কিছুই যে খাওনি—অৰ্দ্ধেকের বেশীই সব পড়ে রইল—এত তোমাদের অখিদে? বেশ',—বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া উচ্ছিষ্ট থালা তুলিয়া লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল।

পঞ্চমী বলিল, 'রোজ রোজ কেন এ রকম দাও দিদি? সরলা যে রেগে গেল!'

'রাগুক গে—তুই তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। এই আজ দুপুর, আর সেই কাল দুপুর, এর মধ্যে আর জল-টুকুও নয় তো? বেঁচে থাকবি কি করে?'

পঞ্চমী হাসিয়া বলিল, 'মিথ্যে কথা - জল আমি অনেক বার খাই।'

মেজ-বৌ বলিল, 'তোরও দোষ আছে, সন্ধ্যে হতেই শুয়ে পড়িস কেন? রান্না-ঘরের বারান্দায় বসে থাকলে হয় না?'

'ভাল লাগে না মেজদি, কাজ ছাড়া বসে থাকলে ঘুম পায়। দিনে অত বুঝিনে, কিন্তু রাত্তির হলেই হাত পা যেন ভেঙ্গে আসে। কিছুতে বসে থাকতে পারিনে, তা আমার কোন কষ্ট হয় না, এক ঘুমে ভোর হয়ে যায়।

'শরীর যে কত দুর্ব্বল হয়ে পড়ে রাত্তিরে না খেলে, তাও তুমি বুঝতে পার না? ধন্যি মেয়ে, কি চেহারা নিয়ে এসেছিলি, কি হয়ে গেছিস!'

'আমি বেশ আছি দিদি, তোমরা আর আমায় এমন করে দিয়ো না, সরলা ভয়ানক রেগে যায়, কি দরকার ওকে রাগিয়ে?'

রাত্রে পরশমণি চোখে না দেখিলেও সতর্ক ও সজাগ থাকেন। পঞ্চমীকে যে মেজ-বৌ ও বড়-বৌ নিজ নিজ ঘরে শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহার উদ্দেশ্যটা পরশমণি বেশ বুঝিয়াছিলেন। রাত্রে বারবার উঠিয়া ঘরের মেঝেয় হাতড়াইয়া পঞ্চমীকে অনুভব করিয়া লইতে হয়, সুখেনের চোখ সতত এই রূপসীকে খুঁজিয়া বেড়ায়, সেটা পরশমণি বুঝিয়াছেন। কাজেই এত সাবধানতা।

পরদিন দুপুর বেলা। যথারীতি পঞ্চমী বারান্দায় পিঁড়ি পাতিয়া সকলের ঠাঁই করিয়া নিজে একদিকে বসিয়াছে। সরলা সকাল সকাল আসিয়া ভাত বাড়িতে বসিল। আজ প্রসাধনের মাত্রাটা একটু কম। প্রত্যেক পিঁড়ির সামনে সজ্জিত অন্নের থালা ধরিয়া দিয়া নিজের থালাটি লইয়া পঞ্চমীর একেবারে পাশে ডান দিকের পিঁড়িটাতে আসিয়া বসিল। যেখানে রোজ বড়-বৌ বসে।

বড়-বৌ মেজ-বৌয়ের চোখে চোখে মিলিল। সরলা দেখিয়াও দেখিল না।

বড়-বৌ একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, 'আজ এত কম কম দেখছি যে সব? যেন ভানু কানুর মতন বেড়ে-ছিস্, এতে কি হবে?'

সরলা একটু গম্ভীর ভাবে বলিল, 'খুব হবে, আজ মাস খানেক ধরেই দেখছি, তুমি, মেজদি অৰ্দ্ধেক খেয়েই উঠে পড়, তারপর সেগুলো যায় ঘাটের জলে। অনর্থক নষ্ট করে লাভ কি? ঠিক যা রোজ খাও, তাই বেড়ে দিয়েছি। সংসারের যা অবস্থা হচ্ছে দিন দিন, ফেলা-ছড়া করবার দিন আর নেই, তোমার ছেলে-পিলে নেই, টানও নেই সংসারে। মেজদির বাপের বাড়ীর সম্পত্তি পাবে, তারও বড় ভাবনা নেই। আমার তো তা নয়? এখানকার ধুলোমাটীই সম্বল। আমাকে বুঝে-সুঝে চলতে হবে না?'

ইহার উপর আর কথা নাই। সেই দিন হইতে পাক-শালার সমস্ত ভার সরলার হাতে গেল। নিজের হাতে সব কাজ না করিলেও সর্ব্বদা চোখ রাখিত। ফলে জেলের কয়েদীর মত নিত্য-নিয়মিত বরাদ্দ-ভাগের উপর পঞ্চমীর উপরি-পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল।

৩৩

'টলিলে টলিতে পারে পৃথিবী গগন
টলিবে না সত্যভামা-পণ,—'

বাঁশ-ঝাড়ের নীচে ছায়ায় মাদুর পাতিয়া পঞ্চমী বসিয়া আছে, রুক্ষ চুল বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া শুকাইতেছে। আকাশে অল্প অল্প সাদা মেঘ ইতস্ততঃ ভাসমান, সেই জন্য বাতাসটিও স্নিগ্ধ।

পঞ্চমী একাকিনী। মেজ-বৌ নিজের ঘরের বারান্দায় মেয়েদের পড়াইতে বসিয়াছে। বিশাল বিশ্রামে শয়ান—বড়-বৌ তার কাছে। সরলাও ছেলেদের লইয়া শুইয়াছে। পরশমণি পাড়ায়। মেয়েদের পড়ার সুর ছাড়া সমস্ত বাড়ীতে আর কোন সাড়া-শব্দ নাই।

তেঁতুল-তলার ঘাট শূন্য। ঘাটের তক্তাগুলি শুকাইয়া রহিয়াছে, অনেকক্ষণ জল পড়ে নাই। জলের স্রোতে টান ধরিয়াছে, এবার ভাঁটা পড়িবে। এখন কূলে কূলে জল ভরা, কিন্তু আর সে উদ্দাম চপলতা নাই। যেন যাত্রা-পথের অপেক্ষায় স্থির হইয়া আছে।

রাত্রে এক এক দিন শীত পড়ে, যেদিন বেশী বর্ষা নামে। পঞ্চমীর কাঁথাগুলি পরশমণি নিজ বিছানায় পাতিয়া লইয়াছেন, খান দুই কানু-ভানুদের দিয়াছেন। রাত্রে গায় দিবার জন্য পঞ্চমী একখানা কাঁথা দিন পনের হইল জুড়িয়াছে। বড়-বৌ ও মেজ-বৌ নিজেদের অর্দ্ধছিন্ন কাপড়গুলি দিয়াছিল, পঞ্চমীর নিজেরও খান দুই আছে। প্রতি রাত্রে মনে হয়, খুব তাড়াতাড়ি সেলাই সারিয়া ফেলিবে। কিন্তু দুপুর বেলা আর স্ঁচ চালাইতে ইচ্ছা করে না।

বাঁশ-ঝাড়ের লঘু চিকণ পাতাগুলি খসিয়া খসিয়া নিঃশব্দে পঞ্চমীর গায়ে মাথায় পড়িতেছে। একদিন এখানে বড়-বৌয়ের একাধিপত্য ছিল, আজ পঞ্চমী সেখানে অধিষ্ঠিতা। এই বাঁশ-ঝাড় তেঁতুল কাঠালতলার ছায়া-শীতল স্থানটি বড় শান্তিপ্রদ, সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ইহারা ব্যথিত, মৌন সাক্ষী। কুকুরটা অদূরে চুপ করিয়া শুইয়া পাখীগুলির খেলা দেখিতেছে, কোন দিনও একটা পাখীকে সে তাড়া করে না। পাখীরাও নির্ভয়-অসঙ্কোচে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বিচরণ-রত। নানাবিধ বিচিত্র কল-কাকলীতে গাছের তলা মুখর, শুধু কাঁঠাল গাছের ঘন চিকণ পাতার আড়ালে ডালে বসিয়া ঘুঘু অলস মধুর করুণ ও উদাস সুরে ক্রমাগত ডাকিতেছে, 'ঠাকুর গোপাল, ওঠ—ওঠ—ওঠ।'

পাখীগুলির মধ্যে হলদে পাখীরাই সব চেয়ে সুন্দর, যেমন উজ্জ্বল-হল্‌দে গায়ের রং, তেমনি কালো চোখের টান, মাথায় কালো চুলের বাহার। গর্ব্বিত ও চঞ্চল চাল-চলন, রূপের গরবে মাটীতে পা পড়ে না, এমনি ভাব। শালিকেরা একটু লজ্জিত ও কুণ্ঠিত, শালিকেরা রূপে হলদে পাখীর কাছে দাঁড়াইতে পারে না, এটুকু যেন বোঝে। চড়াই পাখারা এ সব বিষয় একটুও ভ্রুক্ষেপ করে না, তারা অতি মাত্রায় ব্যস্ত ও চঞ্চল। চড়াইয়ের একটা ছানা, বোধ হয় সবে উড়িতে শিখিতেছে—বার বার পঞ্চমীর পায়ের উপর আসিয়া বসিতেছে। দেখিতে টুনটুনি পাখীর মত ছোট, পঞ্চমী কয়েকবার দেখিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া পাখীটিকে ধরিল, পাখীটা একটুও ভয় পাইল না, পঞ্চমীর হাতের মধ্যে নির্ভয়ে ছোট ছোট চঞ্চল চোখদুটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পঞ্চমীকে দেখিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে পঞ্চমীর মনে বড় মায়া হইল, কত ক্ষুদ্র, কত অসহায় প্রাণী, এর উপায় ভগবানই করিয়া দিয়াছেন, কার উপায় তিনি না করেন ? কেউ বোঝে, কেউ বুঝিতে চায় না। তা বলিয়া পঞ্চমী অবোধ নয়, সে মনে জানে, ভগবান তাহাকে কতখানি দিয়াছেন।

চড়াই পাখীরাও ছানাটিকে ধৃত দেখিয়া ভ্রুক্ষেপ করিল না, পঞ্চমীর কাঁথার সাজিতে কৌটা-ভরা ক্ষুদ সর্ব্বদা সঞ্চিত থাকে, বার বার সেগুলি ছড়াইয়া দেয়। সমস্ত পাখীরা তাহা খুঁটিয়া খাইতেছে। পঞ্চমী হাতের মুঠাটি একটু খুলিল, ছানাটি ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া মুঠার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পঞ্চমীর হাতের শাঁখাটির উপর বসিল, বসিয়া বসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া ঘুরাইয়া এ দিক্ ও দিক্ দেখিতে লাগিল।

'হ্যা রে, এই তোর কাঁথা সেলাই হচ্ছে ?' বড়-বৌ মাদুরের কিনারায় বসিয়া কাঁথাটা সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চমী বলিল, 'আমার ভাল লাগে না দিদি সেলাই করতে, অন্যের জন্যে হলে পারি, নিজের জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা হয় না। আর কেউ সেলাই করে দেয় ত' বেশ হয়।'

বড়-বৌ বলিল, 'সুঁচ কটায় সুতো পরিয়ে দে, আমার একখানাও বাড়তি কাঁথা নেই আর, একখানা জুড়ব ভাবছি, তোর এটা সেরে ফেলি, তারপর জুড়ব। এক-খানা মোটা পুরানো চাদর বের করলাম বাক্স থেকে এখন, তলায় পাতা ছিল অনেক কাল ধরে। সেইটে আজ রাত্তিরে গায়ে দিস নিয়ে।'

'দিদি, পাখীটা যাচ্ছে না কেন? ওর মা-বোনেরাও তো গরজ করছে না মোটে?'

'কে ওদের ক্ষতি করবে না করবে ওরা বেশ বোঝে, কি সুন্দর পাখী-টুকুন—'

পঞ্চমী দু'একটা ক্ষুদের কণা ডান হাতে ধরিয়া ছানাটিকে খাওয়াইতে গেল, ছানাটি অমনি ফুড়ুৎ করিয়া উড়িয়া নিজেদের দলের মধ্যে গিয়া মিশিল। পঞ্চমী হাসিয়া হাতের ক্ষুদগুলি সেই দিকে ছড়াইয়া দিল। একটা চড়াই টুকটুক্ করিয়া কয়েকটি কণিকা খুঁটিয়া তুলিয়া ছানাটিকে খাওয়াইয়া দিল।

'ওঃ—এই জন্যে? ছানাটুকুন এখনও নিজে নিজে খেতে শেখেনি? মা খাইয়ে দেয়? তাই আমার হাতে খেলে না?'

বাতাসে বাঁশ-বন দুলিতেছে, সমস্ত বাড়ীর শান্তিটুকু আহরণ করিয়া আনিয়া এই জায়গাটিতে যেন জমা করা হইয়াছে। বসিলে আর উঠিতে ইচ্ছা হয় না। ঘর-করণার কাজ মনেও থাকে না। সাজান তেঁতুলপত্র-রাশি বাতাসে দুলিলে আরও সুন্দর দেখায়। কাঁঠাল গাছের কৃষ্ণাভ সবুজ মসৃণ পাতাগুলিও অল্প অল্প কাঁপিতেছে। সূর্য্যের প্রখরতা নাই, তেঁতুলের এক বহু উচ্চ শাখায় বসিয়া বসিয়া লেজ-ঝোলা পাখী গুরু গম্ভীর ও গভীর আর্ত্তনাদের সুরে নির্জ্জন তরুপুঞ্জ সচকিত করিয়া ডাকিয়া উঠিল, 'দুখ—দুখ—দুখ।'

বড়-বৌয়ের মাথার চুল খুলিয়া দিতে দিতে পঞ্চমী 'দিদি পাখীটার সত্যিই দুঃখ, না?'

'দুঃখ বই কি? নইলে কোন্ কালে কি হয়ে গেছে, আজও কেঁদে কেঁদে বেড়ায়?'

'সতীনের ছেলেকে পিঠে করে আর নিজের ছেলেকে বুকে করে সাঁতার দিতে গিয়েছিল, না? ভেবেছিল, সতীন-পোকে কাকে চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে—আর নিজেরটি বুকের মধ্যে ভাল থাকবে।'

'মন্দ কাজের ফলও মন্দ। দুটোকেই পিঠে নিলে হত। এখন ছেলে হারিয়ে যুগ যুগ ধরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে।'

'সতীন না হয় মন্দ—ছেলে কি দোষ করলে—আমি কানু-ভানুদের এতটুকু ক্ষতি করতে পারি না কিছুতেই।'

'তুই না পারিস তোর একটা থাকলে সরলা পারত বোধ হয়—'

'নাঃ—না দিদি, কি যে বল। ছেলেদের কিছু বলত না। দেখ দিদি, ওর নারুকে আমায় দিয়ে দিক না একেবারে, আমাকেই মা বলে জানবে—ওকে পেলে আমি চিলহাটি গিয়ে থাকি—মা যানগে বৃন্দাবন। আমার যা কিছু ওকেই দেব—বলে দেখবে দিদি? ও আমার কাছে থাকতে পেলে আর কিছু চায় না।'

'ভাল কথা বলেছিস—বলতে গিয়ে আমি শুদ্ধ ঝাঁটা না খাই ত' ভাল। তোকে দেবে ছেলে? মরে গেলে সইবে, কিন্তু তোকে দেবে না।'

'এইটা আমি কিছুতে বুঝতে পারিনে, আমি যত্ন করব—ভালবাসব—তা ও বিশ্বাস করে না না কি?'

মাথার উপর দিয়া পাখীটা ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল। বহু দূর দূর হইতেও তাহার বিলীনপ্রায় সুর শুনিতে পাওয়া যাইতেছে—'দুখ দুখ—দুখ।'

বড়-বৌ বলিল, 'সরলাকে অমনি একদিন কেঁদে কেঁদে বেড়াতে হবে।'

পঞ্চমী হাসিয়া বলিল, 'সেই ওর উচিত। বাবা—বাবা! এমন মেয়ে জন্মে দেখিনি! আমি ভগবানের কাছে মনে মনে বলি কি দিদি, জান? যে, সরলার সঙ্গে কোন জন্মেই যেন আমার আর দেখা না হয়, ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করে না।'

বড়-বৌ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে তোকে। এমন পাষাণী আর নেই। একটা কথা শুনবি?' সেলাই রাখিয়া বড়-বৌ পঞ্চমীর দিকে চাহিল।

'কি কথা দিদি? তোমার চুল শুকিয়ে গেছে দেখ বাতাসে, ভিজে চুল বেঁধে রেখেছিলে কেন?'

সে কথায় কাণ না দিয়া বড়-বৌ বলিল, 'তুই চিলহাটি যা—এখানে থাকলে মরে যাবি।'

'চিলহাটি যাব? কেন?'

'চেহারা যা হয়েছে তোর,—যা এসেছিলি, তার অর্দ্ধেকও নেই। তিন মাস হল এসেছিস, এর মধ্যে তিন দিনও রাত্তিরে খেয়েছিস কি না ঠিক নেই। দুপুর বেলা আধ-পেটা আর উদয়াস্ত এই খাটুনি—আচ্ছা, রাত্রে তোর শীত করে কেন? জ্বর-টর হয় না কি?'

'কি জানি, গা-হাত-পা এত ব্যথা করে যে, শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়—তখন ভারি শীত লাগে।'

'ভিজে মেঝেয় শুয়ে বাতে ধরল বুঝি। এখানে থাকলে তুই বাঁচবিনে।'

'তবু আমার যেতে ইচ্ছে করে না দিদি—আমি বেশ রয়েছি।'

চুপ করিয়া বড়-বৌ পঞ্চমীকে দেখিতে লাগিল।

পঞ্চমী বলিল, 'কি দেখছ দিদি?'

'দেখছি,—ভাবছি কি পাপ তুই করেছিলি যে, তোকে এমন সাজা পেতে হচ্ছে, এমন সোনার লক্ষ্মী ঘর করতে পেলে না।'

'কি পাপ? আর জন্মে কি করেছি না করেছি কে জানে, হয় ত সরলাকে কষ্ট দিয়েছি ঠিক এই রকম'—পঞ্চমী হাসিতে লাগিল।

'জানিনে কি করেছিস, চোখ মুখ তোর বসে গেছে একেবারে—দেখলে চেনা যায় না—চোখের ওপর নিত্যি নিত্যি আর পারিনে এ দুর্গতি দেখতে।'

'কি দুর্গতি? আমার মা ত একবেলা খান।'

'তিনি কি তোর মতন এই রকম মেহনৎ করেন সারাদিন? আমাদের যে সব কাজ আগে ছিল না—নিত্যি নতুন সব হচ্ছে।'

'কাজে আমার তেমন কষ্ট হয় না দিদি, অভ্যাস হয়ে গেছে। এখন কিন্তু ঢেঁকিতে উঠতে আর ইচ্ছে হয় না, সত্যি বলছি—ভোর রাত্তিরে কুড়ি কাঠা ধান ভেনে পা দুটো যা হয়েছে—কতবার বললাম যে, দুপুরে অর্দ্ধেক করে দেব—সরলা কিছুতে শুনলে না—ভারি নিষ্ঠুর ও, পা দুটোয় যা ব্যথা হয়েছে—দেখ না, পায়ের পাতা ফুলে গিয়েছে কেমন।'

পা দুখানা ছড়াইয়া ছোট্ট আমের চারা গাছটিতে হেলান দিয়া পঞ্চমী একটা পান বাটা হইতে তুলিয়া মুখে দিল।

পঞ্চমীর সুন্দর-গঠন ছোট পা দুটি যথার্থ ফুলিয়া উঠিয়াছে—আঙ্গুলগুলি টসটসে দেখাইতেছে। বড়-বৌ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তুই চিলহাটি ফিরে যা বোন—সত্যি এখানে থাকলে মরেই যাবি।'

'মরব না ভয় নেই, চিলহাটি কোন্ মুখে যাব দিদি? মা কি বলবেন? গিয়ে বলব কি যে, কেউ আমায় রাখলে না? বড় ঠাকুরদের, তোমাদের শুদ্ধ নিন্দা হবে না?'

'আমাদের নিন্দে? আমাদের মুখে চুণ-কালি দেওয়া উচিত। সরলা যেমন এ বাড়ীতে, আমরাও তেমনি, কই এত যে অত্যাচার করছে তোর ওপর, একটুও প্রতিকার করতে পারিনে, একটি কথা অবধি বলবার সাহস নেই! কতবার ভাবি বলব, কিন্তু কিছুতেই পারিনে।'

'ঐ দেখ তোমরাই পার না, আমি পারব কি করে?' পঞ্চমী হাসিতে লাগিল।

'তুই যা, মার সঙ্গে বৃন্দাবন গেলে ক্ষতি কি? স্বামীর জন্যে? স্বামী তোকে বাঁচাতে পারছে না একটু—তার জন্যে জীবনপাত করে এখানে তোর পড়ে না থাকাই ভাল। আমি একদিন সইতে না পেরে পালিয়েই গিয়েছিলাম। কি সহ্যগুণ ভগবান তোকে দিয়েছেন, দেখে আমাদের সয় না। তুই যা—তুই যা পঞ্চমী মার কাছে গিয়ে বাঁচগে যা', বলিতে বলিতে বড়-বৌর দুই চোখের জল টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

—'ভাল রে ভাল, কাল মেজ-দি, আজ তুমি! ও কি বড়দি—না ছি—কেঁদ না—চোখ মুছে ফেল—এই নাও, পান নাও। আমার কাঁথাটা সেরে ফেল দিকি তাড়াতাড়ি,

আজ রাত্তিরে আমার চাল নিও। আমি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে থাকব এখন। ডাল চাল বাছা, একটা যা হোক কাজ দিও, তবে সেদিনের মতন সরলা কুলো-শুদ্ধ টেনে না নেয়। বড়ঠাকুর খেতে আসেন, কোথায় বসি, কোথায় দাঁড়াই? আচ্ছা আজ থেকে মেজ-দির ঘরে থাকব সে সময় টুকু।'

পিছন হইতে মেজ-বৌ আসিয়া বড়-বৌয়ের কাণে কাণে বলিল, 'ছোট ঠাকুরপো পঞ্চমীকে খুঁজছিল, আমি এখানে আসতে বলেছি—আসছে। তুমি যাও, মেয়েদের পড়া দেখগে একটু—আমিও খুকীর দুধ নিয়ে আসছি।'

কাঁথার ঝুড়ি ফেলিয়া দুইজনে উঠিয়া পড়িয়া প্রস্থান করিল।

কিছুক্ষণ পরে সরলা দিবা-নিদ্রা ছাড়িয়া উঠিয়া ঘর হইতে বাহির হইল, দিনে ঘুমাইবার যো নাই তার—চমকিয়া চমকিয়া উঠে। রাত্রে পরশমণির তত্ত্বাবধানে পঞ্চমীকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমায়। কানু মায়ের বিশ্বস্ত চর। সরলা বারান্দায় বাহির হইতে না হইতেই কোথা হইতে কানু আসিয়া চুপি চুপি মাকে কি বলিল।

ও ঘর হইতে মেজ-বৌ তাহা দেখিতে পাইয়া বড়-বৌকে দেখাইল। পঞ্চমীর কাছ হইতে আসিয়া তারা সরলার দিকে নজর রাখিয়াছে।

সরলা দুটি ভ্রূ একবার সঙ্কুচিত করিল। কপালের উপরকার ও কাণের দু'পাশের চুলগুলি হাত দিয়া গুছাইয়া কাপড়ের আঁচলটি ঠিক করিতে করিতে পিছন-বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

বড়-বৌ জল খাইবার ছলে উঠিয়া পিছনের জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দেখিল, সরলা অতি নিঃশব্দে রান্না-ঘরের ভিতর ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

ইসারায় মেজ-বৌকে কাছে ডাকিয়া বড়-বৌ তাহাকে ব্যাপারটা বলিল।

মেজ-বৌ উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, 'আজ মরবে ওরা, একটু আধটু দু'একটা কথা শুনতে পায়, তাই রক্ষা রাখে না, যাও না বড়দি, একটু জোরে কথা কইতে কইতে যাও।'

'আমি পারব না নিরু, বড্ড ভয় করে আমার, তুই যা, শীগগির যা।'

মেজ-বৌ ঘর হইতে বাহির হইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে উঁচু গলায় বলিতে লাগিল, 'ও সরলা, ও সরলা, উঠেছিস না কি? ছোট খোকা হামা-গুড়ি দিয়ে উঠোনে নামছে, ওমা রান্নাঘরের শিকল নামানো কেন? ঘরে কুকুর গেল না কি? যাঃ—'

সুখেন রান্নাঘরের পিছন দিক্‌কার পথে নিজেদের শয়ন-ঘরের পিছনে আসিয়া সেই দিক্ দিয়াই বাহিরে চলিয়া গেল। জলের গেলাস হাতে সরলা রান্না-ঘরের ভেজানো দুয়ার খুলিয়া বাহির হইল—সমস্ত মুখ লাল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে, মনের উত্তেজনা কিছুতেই দমন করিতে পারে না, এমনি ভাব।

সরলা রান্না-ঘরের পিছনের দিকে চলিয়া গেল দেখিয়া মেজ-বৌও চলিল।

পঞ্চমী বসিয়া কাঁথা সেলাই করিতেছে, ঠিক সামনে দাঁড়াইয়া সরলা মৃদু ও অত্যন্ত কঠিন স্বরে প্রশ্ন করিল, 'ঘরে একটি ডাল নেই ও-বেলা বলেছি না? তৈরি হয়েছে ডাল?'

পঞ্চমী মুখ তুলিয়া সরলার দিকে চাহিয়া একটু কুণ্ঠিত ভাবে উত্তর দিল, 'আজ পায়ে বড্ড ব্যথা হয়েছে, আজ আর পারব না, কাল খুব ভোরে উঠেই কলাই ভাঙ্গতে বসব।'

'এ বেলা রান্না হবে কি?'

মেজ-বৌ পিছন হইতে বলিল, 'মার ঘরে মাষ-কলাইয়ের ডাল আছে সের দুই, ওতেই হবে এ বেলা।'

'এই বর্ষা-বাদলের দিনে রাত্তিরে মাষকলাইয়ের ডাল?—না হলে বাত ধরবে কিসে? দেখ, তোমায় একটা কথা বলছি, এটা গেরস্ত-বাড়ী—নবাবী করবার জায়গা নয়। নবাবী করতে হয়, চিলহাটি যাও—সারাদিন শুয়ে-বসে থাকলেও কেউ বলবে না।'

পঞ্চমী মুখ নীচু করিয়া সেলাই করিতে লাগিল।

সরলা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ় হইয়া বলিল, 'শোন তিন মাস হয় এসেছ—আমার প্রাণ তুমি ওষ্ঠাগত করে তুলেছ—তোমার এখানে থাকা চলবে না, তুমি চিলহাটি যাও।'

'আমি কি করেছি তোমার?'

'কি করেছ জিজ্ঞাসা করছ? কি কর নি- তাই বল! আমার সুখ-শান্তি সব কেড়ে নিয়েছ—স্বামী আমার নয়, ছেলে আমার নয়—সংসার আমার শূন্য হয়ে গেছে,—তোমার জন্যে রাত্রেও আমার ঘুম নেই—তুমি আর কিছু-দিন থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।'

পঞ্চমী ধীরে ধীরে বলিল, 'সবই তোমার আছে সরলা, মিছে তুমি রাগ করছ।'

'না—না—না। তোমায় চোখের ওপর রেখে রেখে আর আমি থাকতে পারছিনে,—তুমি যাও—তুমি যাও—তুমি সর্ব্বনাশ করতে এসেছ আমার'—বলিতে বলিতে সরলা কেমন পাগলের মত হইয়া উঠিল, মাথার এলো-মেলো চুল—অসংযত বসন, দুই চোখ আগুনের মত জ্বলিতেছে, দেখিয়া পঞ্চমী ভয় পাইয়া চোখ নামাইয়া ফেলিল।

মেজ-বৌ সামনে আসিয়া সরলার হাত ধরিয়া বলিল, 'শান্ত হ', অমন করছিস কেন? চেঁচাসনে, লোকে শুনলে বলবে কি?'

'বলুক গে, যার যা খুসী! তোমার কি? তুমি কি বুঝবে?' হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরলা পঞ্চমীর আরও কাছে আসিয়া বলিল, 'যাবে না? যাবে না? তুমি আমি দু'জনার এ বাড়ীতে ঠাঁই হবে না—হবে না। তুমি আমার সব কেড়ে কেড়ে নেবে? আমি তাই চুপ করে বসে দেখব? রাক্ষসী, সর্ব্বনাশী, শয়তানী—কি স্বামী আমার ছিল—কি করেছিস তাকে? দূর হতে হবে—তোকে দূর হতে হবে।'

পঞ্চমী প্রায় রুদ্ধ স্বরে বলিয়া ফেলিল, 'যাব, তাই যাব, ফিরেই যাব!'

'যাব নয়—যাও, আর আগুন জ্বেলে থাকতে দেব না; তোমায় বিদায় না করে আমি জল গ্রহণ করব না, হয় তুমি মর, নয় আমি মরি।'

পঞ্চমী মুখ তুলিয়া সরলার দিকে চাহিল—ম্লান, পাণ্ডুর মুখ—ব্যথা-বিবর্ণ, দুই চোখ জলে ভাসিতেছে, ঠোঁট দুখানি কাঁপিতেছে—সেই কম্পিত ওষ্ঠাধরের মধ্য হইতে অস্পষ্ট, করুণ, ক্ষীণ স্বর বাহির হইল, 'সরলা, কেন তুমি আমায় এমন করে দুর্ব্বাক্য বললে? আমারও স্বামী।'

'তোমারও স্বামী? তাই বটে! স্বামী পায়ে ঠেলে দিয়েছে—আবার সোহাগ জানাতে লজ্জা করে না? গলায় দড়ি দিতে পার নি? দখল নিতে এসেছ?'

'না, আমি দখল নিতে আসি নি—এখানে থাকতে এসেছিলাম শুধু—আমি মাকে চিঠি দিচ্ছি—এসে নিয়ে যাবে, তুমি আর কিছু বল না—তোমার এক একটা কথা আমার বুকে ছুরির মত বিঁধে বসছে—এমন করে কেউ আমায় কখনও বলে নি।'

সরলা তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'মাকে চিঠি দেবে? উত্তর আসবে, আর তুমি ততদিন আমার মাথা চিবোবে বসে বসে? অত সোহাগে কাজ নেই—তোমার যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করব। সতীনের সঙ্গে ভাগাভাগি করতে এসেছিলে? সরলাকে তেমনই বোকা পেয়েছ? তোমার মতন ঢংদার মেয়ে মানুষ সরলা ঢের দেখেছে।' বলিয়া সরলা সেখান হইতে সরিয়া গিয়া ঘাটে নামিল। জলে মুখ হাত ধুইয়া মাথার কাপড় ঠিক করিয়া দিয়া আঁচলে মুখ মুছিল, তারপর রণ-বিজয়ীর মত দৃপ্ত ভঙ্গীতে দু'হাতে মাথার চুল জড়াইতে জড়াইতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। আর কোন দিকে চাহিল না।

পঞ্চমী ছিন্ন লতার মত মেজ-বৌয়ের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল, রুদ্ধ রোদনের স্বরে বলিল, 'মেজ-দি নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করলাম, চলে যেতে স্বীকার করে ফেললাম।'

মেজ-বৌ তাহাকে মেয়ের মত কোলে টানিয়া লইল। সস্নেহে বলিল, 'ভাল হল, এখান থেকে গেলেই তোর মঙ্গল। মার বাছা—মার কোলে থাকবি, এখানে থাকলে বাঁচবি নে। স্বামী? কিসের স্বামী তোর? সরলার স্বামী—ও তোর কেউ নয়—শুধু দুঃখ-যন্ত্রণা দেবার ওস্তাদ, ওর জন্যে তুই এমন নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিসনে।"

'ও কথা ব'লো না—ও কথা ব'লো না দিদি, আর যে দেখতে পাব না, আমায় তোমরাও রাখতে পারলে না? এ বাড়ী কি সরলার? তোমরা কেউ নও?'

'আমরা যে কেউ নই, তা কি আজ টের পেলি বোন? বড়-দির দশা ভুলে গেছিস? আমারও কপালে কি আছে কে জানে?' [ক্রমশঃ

কিরণচ্ছত্র

—শ্রীনীলরতন কর

কিরণচ্ছত্র বিষয়ে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণা প্রায় আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বেকার কথা। সে হিসাবে প্রসঙ্গটি পুরাতন, কিন্তু আজও তার মূল্য কমে নি। অতি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বমূলক পরীক্ষাকার্য্যের ভিত্তি এরই উপর ন্যস্ত রয়েছে। বিভিন্ন কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে এখনও বস্তু এবং শক্তির প্রকৃতি ও সমাবেশ সম্পর্কে বহু বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে।

১৬৬৬ অব্দে সার আইজাক্ নিউটন্ একটি ত্রিপৃষ্ঠ কাচ নিয়ে আলোকরশ্মি পরীক্ষা করতে ব্রতী হন। অন্ধকার ঘরে, বন্ধ জানালার মাঝে সরু ছিদ্র দিয়ে যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করছিল, তাকে তিনি কাচটির ভিতর দিয়ে পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্‌বর্ত্তী দেওয়ালের গায়ে শাদা পর্দ্দার উপর রামধনুর সাতটি রঙ্—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলদে, নারাঙি ও লাল পর পর সজ্জিত হয়ে পড়ে। কাচটির পুরোভাগে আলোকের রঙ্ শাদা, পশ্চাদ্‌ভাগে সাতরঙা। রঙগুলির পরস্পরের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা টানা না গেলেও সাতটি রঙকে বেশ ভালভাবে চেনা যায়। ত্রিপৃষ্ঠ কাচের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সূর্য্যের মিশ্র আলোর বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কোণে তির্য্যগ্‌বর্ত্তিত হয়ে যায়। লাল অংশটি সবচেয়ে কম বাঁকে, আর বেগুনী অংশটি সবচেয়ে বেশী বাঁকে। বিশ্লিষ্ট রশ্মির সামনে আর একটি ত্রিপৃষ্ঠ কাচকে প্রথমটির বিপরীত ভাবে স্থাপন করলে সূর্য্যালোকের পূর্বেকার শুভ্র মিশ্র আলোর সংশ্লেষিত রূপ ফিরে আসে। বিশ্লিষ্ট বর্ণ-সপ্তকের যে কোনও একটিকে আরও বিশ্লেষণ করা সম্ভব কি না, দেখবার জন্য নিউটন্ তাদের এক একটিকে পুনরায় ত্রিপৃষ্ঠ কাচের ভিতর দিয়ে পাঠান। এরূপ করার ফলে পূর্ব্বেকার রঙ্ বদলায় নি, কেবল পূর্বেকার রঙীন আলোই একটু বেশী ছড়িয়ে পড়েছিল। এ-থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন, প্রথম কাচটিই আলোককে সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট করে ফেলে। সঙ্গীতের মিশ্রসুরে যেমন সুরসপ্তক মিশে থাকে, শুভ্র কিরণের মধ্যে সেইরূপ বর্ণ-সপ্তকের অবস্থিতি।

নিউটন্ সূর্য্যালোককে বৃত্তাকার ছিদ্রের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে তার কিরণচ্ছত্র দেখেছিলেন। তাঁর দৃষ্ট কিরণচ্ছত্রে প্রকৃতপক্ষে বহুসংখ্যক কিরণচ্ছত্র একে অপরের গায়ে আংশিকভাবে মিশে ছিল। এই জন্য কিরণচ্ছত্রের একটি বিশেষত্ব তাঁর লক্ষ্যে পড়ে নাই।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উইলিয়ম্ হ্বুলষ্টান্ খুব সরু একটি ফাটলের ভিতর দিয়ে আলো পাঠিয়ে নিউটনের অপেক্ষা স্পষ্ট কিরণচ্ছত্র উৎপন্ন করেন। সেই কিরণচ্ছত্রের মধ্যে তিনি বহুসংখ্যক কৃষ্ণরেখা লক্ষ্য করেন। কিন্তু রেখাগুলির তাৎপর্য্য বিষয়ে তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নি। হ্বুলষ্টানের পরীক্ষা হতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে ১৮১৫ অব্দে ব্যাভেরিয়াবাসী জার্ম্মান আলোকবিদ্ ফ্রাউন্‌-হোফের সৌরকিরণচ্ছত্রে কালো রেখাসমূহ ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি খালি চোখে ত্রিপৃষ্ঠ কাচ দিয়ে না দেখে তার সঙ্গে একটা দূরবীণ লাগিয়ে সরু ফাটল থেকে চব্বিশ ফুট দূর হতে লক্ষ্য করেন। তাতে তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈজ্ঞানিকদের অপেক্ষা অনেক স্পষ্টভাবে কিরণ-চ্ছত্রের রেখাবলী দেখতে পান। ১৮১৪ অব্দে তিনি এই রেখাবলীর বিবরণ ও চিত্র-সমন্বিত এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি চিত্রটিতে মাত্র ৩৫৪টি রেখার অবস্থান নির্দ্দেশ করলেও সৌরকিরণচ্ছত্রে ৫৭৪টি রেখা গণনা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এই রেখাগুলি বিভিন্ন প্রকার তীব্রতা ও বেধ-বিশিষ্ট। কোন কোনও রেখাকে খালি চোখে সুতাতন্তুর মত সূক্ষ্ম, আবার কোনটিকে বা তার বহু গুণ চওড়া দেখায়। ফ্রাউন্‌হোফের পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সৌরকিরণচ্ছত্রে এই রেখাগুলি সর্ব্বদা একই স্থান অধিকার করে থাকে। সূর্য্যালোক, চন্দ্র অথবা গ্রহদের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে এলেও রেখাদের আসন সরে

যায় না। কিন্তু অপর তারকাদের আলো পরীক্ষা করে তিনি সৌরকিরণচ্ছত্র অপেক্ষা পৃথক্ রকমের কিরণচ্ছত্র লক্ষ্য করেন। তার মধ্যে রেখাবলীর সংখ্যা, সন্নিবেশ-রীতি ও স্থিতি-স্থান সকলই ভিন্ন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ-ফলে ফ্রাউন্‌হোফের যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

ফ্রাউন্‌হোফের কিরণচ্ছত্রের যে চিত্র এঁকেছিলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট রেখাসমূহ বা রেখাপুঞ্জদের তিনি এ. বি. সি. ডি. ই. এফ্. জি. এবং এচ. অক্ষর দ্বারা সূচিত করেন। তাঁর উল্লিখিত রেখাগুলি এখনও এই অক্ষরসমূহ দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়। কারণ এরা কিরণচ্ছত্র-মধ্যে রেখাদের আসন-নির্ণয়ের সঙ্কেত হিসাবে কয়েকটি স্থির বিন্দুরূপে কাজ করে। অবশ্য নিখুঁত কাজের জন্য যে-কোনও রেখাকে তদনুসারী রশ্মির তরঙ্গান্তর দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে।

ফ্রাউন্‌হোফের অনুমান করেন যে, যে প্রদীপ্ত গ্যাসের আবরণ সূর্য্যকে ঘিরে আছে তার ভিতর দিয়ে আলো আসবার সময় কোন কোনও রশ্মি শোষিত হওয়াতে কিরণচ্ছত্র-মধ্যে সেই রশ্মির স্থানে কাল রেখার সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর খুব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি করতে পারেন নি।

১৮২২ অব্দে ব্রুষ্টার আলো বিষয়ে পরীক্ষার নিমিত্ত লবণাক্ত পলিতাযুক্ত সুরাসার-দীপের ব্যবহার প্রচলিত করেন। দীপটির সুবিধা এই যে, তা থেকে একরঙা আলো পাওয়া যায়। আগুনে নুন দিলে যে শিখা ওঠে, সেটি হলদে রঙের কিরণ ছড়ায়। এ তথ্যটি ব্রুষ্টারের পূর্ব্ব হতেই জানা ছিল। সোডিয়ম্-ঘটিত লবণ আগুনে দিলে যেমন হলদে আলো বের হয়, কোন কোনও রাসায়নিক বস্তুও সেইরূপ অপরবিধ রঙীন আলো উৎপন্ন করে। তাদের কিরণচ্ছত্র কিরূপ হয় তা জানবার জন্য স্যর জন হার্শেল, ক্লোরাইড অব ষ্ট্রন্‌সিয়ম্, ক্লোরাইড অব কপার, নাইট্রেট অব কপার, বোরিক্ অ্যাসিড, ক্লোরাইড অব পটাশিয়ম্ প্রভৃতি দ্রব্যকে আগুনে দিয়ে তার শিখা ত্রিপৃষ্ঠ কাচ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ফটোগ্রাফি বিদ্যার উৎকর্ষ-সাধকগণের অন্যতম বৈজ্ঞানিক ফক্‌স ট্যালবট প্রদীপ্ত রাসায়নিক বস্তুর কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হন যে, খুব সামান্য মাত্রায় বস্তু নিয়ে তার আলোক বিশ্লেষণ দ্বারা অতি সহজে তন্মধ্যস্থ রাসায়নিক উপাদান নির্ণয় করা যায়। কোন কোনও মৌলিকের অস্তিত্ব অতি সামান্য মাত্রায় থাকলেও কিরণ-চ্ছত্র পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। অতি কম মাত্রায় থাকলে অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা তাকে নিরূপণ করা অসাধ্য। ৩০০০০০০ মিলিগ্রাম মাত্র সোডি-য়ম্‌ও কিরণচ্ছত্র-মধ্যে তার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে।

স্যর্ ডেভিড ব্রুষ্টার ১৮৩২ অব্দে নাইট্রাস্ অ্যাসিডের বাদামী রঙের বাষ্প নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে, সেটি সৌর কিরণচ্ছত্রকে অদ্ভুতভাবে প্রভাবান্বিত করে। সূর্য্যের আলো হতে কিরণচ্ছত্র উৎপাদনের পূর্ব্বে তাকে যদি নাই-ট্রাস্ অ্যাসিডের বাষ্পপূর্ণ কাচ-পাত্রের ভিতর দিয়ে পাঠান যায়, তবে কিরণচ্ছত্রের উপর বহুসংখ্যক কালো ডোরা দেখা যায়। সেই ডোরাগুলি ফ্রাউনহোফের-এর রেখাবলী হতে পৃথক্। ব্রুষ্টার বলেন যে, গ্যাসটি কিরণের অংশবিশেষ শোষণ করাতেই এই ব্যাপার ঘটে। তাঁর পরবর্ত্তীকালে ডব্লু. এচ. মিলার এবং অধ্যাপক ড্যানি-য়েল্ সৌরকর ব্যতীত অপরাপর আলোককে উৎস হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের বিভিন্ন গ্যাসের ভিতর দিয়ে পাঠিয়ে বহুবিধ শোষক ডোরা প্রত্যক্ষ করেন।

তাঁরা দেখান যে, ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের প্রভাবে উৎপন্ন শোষক ডোরাগুলি পৃথক্ পৃথক্ ধরণের। দুইটি গ্যাস যদি এক প্রকার রঙের হয়, তা হলেও তাদের শোষক ডোরা বিভিন্ন ধরণের হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রোমিন্ বাষ্প ও নাইট্রাস অ্যাসিডের বাষ্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এরা উভয়েই দেখতে বাদামী রঙের, কিন্তু উভয়ে পৃথক্ প্রকার শোষক ডোরা উৎপন্ন করে।

সুইডেনের আঙষ্ট্রম, জার্ম্মানীর কির্খহোফ্ এবং ইংলণ্ডের হিগিন্‌স্ কিরণচ্ছত্র-বিষয়ক গবেষণার বিশেষ সমৃদ্ধি সাধন করেন। কির্খহোফই সর্ব্বপ্রথম ফ্রাউন্-হোফেরের-এর কালো রেখার স্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

কোনও তাপোজ্জ্বল বস্তু হতে নিঃসৃত শাদা আলোয় যে কিরণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাতে কোনও কালো রেখা

থাকে না; তা হতে সাত-রঙা কিরণচ্ছত্র অবিচ্ছিন্ন আকারে দেখা যায়। তাপোজ্জ্বল চূণের টুকরা কিংবা বিজলী দীপের তাপোজ্জ্বল সূক্ষ্ম 'তার' অথবা সাধারণ গ্যাস বা মোমবাতির উজ্জ্বল শিখাস্থিত কার্ব্বন কণাগুলি অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র প্রদান করে। কিন্তু কোনও দ্যুতিমান্ গ্যাস বা বাষ্পের কিরণচ্ছত্র এ-হতে ভিন্ন প্রকার। তাতে রঙীন আলোর চওড়া অবলেপ দেখা যায় না, কেবল অন্ধকারের মাঝে মাঝে কতকগুলি উজ্জ্বল আলোর রেখা দৃষ্ট হয়।

সুরাগার-প্রদীপের পলিতার উপর নুনের গুঁড়ো থাকলে যে হলদে রঙের শিখা ওঠে, তাকে কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রে পর্য্যবেক্ষণ করলে কখনই বেগুনী, নীল, আসমানী, নারাঙি অথবা লাল আলো পাওয়া যায় না; কেবল দুইটি হলদে রেখা পরস্পর অতি-সন্নিহিত ভাবে অবস্থান করে। সোডিয়ম বাষ্পের পরমাণুগুলো চঞ্চল হয়ে এরূপ স্পন্দন উৎপন্ন করে যে, সেটি ইথর-সমুদ্রে কেবল একটা নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গান্তরের ঢেউ তোলে; এই কারণে সোডিয়ম-ঘটিত লবণের শিখা হতে কোনও অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র পাওয়া যায় না। কির্খহোফ ১৮৬০ অব্দে লবণাক্ত সুরাসার-দীপের পিছন থেকে অত্যুত্তপ্ত চূণখণ্ড নিঃসৃত শাদা আলো পাঠিয়ে কিরণচ্ছত্র যন্ত্রের ত্রিপৃষ্ঠ কাচ সাহায্যে লক্ষ্য করেন। তিনি সাত-রঙা আলোর অবলেপের মধ্যে পূর্ব্ব-দৃষ্ট সোডিয়মের উজ্জ্বল রেখা দুইটির স্থানে দুইটি কালো দাগ দেখতে পান। ফ্রাউনহোফের এই রেখা-দ্বয়ের নাম দিয়েছিলেন 'ডি'-লাইন।

দহমান সোডিয়ম, ভাস্বর চূণের চেয়ে ঢের কম উষ্ণতা-বিশিষ্ট, এই কারণে অপেক্ষাকৃত শীতল সোডিয়মের বাষ্পগুলো চূণনিঃসৃত আলো হতে তার নিজের বিশিষ্ট কিরণচ্ছত্রটির অনুসারী আলোক-তরঙ্গকে শুষে নেয়।

বিদ্যুতপ্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত একটি প্লাটিনামের তার নিঃসৃত আলো ত্রিপৃষ্ঠ কাচের ভিতর দিয়ে পাঠালে কম তাপমাত্রায় কেবল লাল প্রান্তটা প্রকাশ পায়, তারপর তাপমাত্রা যদি ক্রমশঃ বাড়ান যায়, তবে সেই সঙ্গে সঙ্গে বেগুনীর অভিমুখের রঙগুলো প্রকাশিত হতে সুরু করে। শেষে যখন একেবারে জল-জলে সাদা আলো বের হয়, তখন সর্ব্বাঙ্গীন অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্রটি পাওয়া যায়। কিন্তু যদি দীপ্তি-হীন বুনসেন্-শিখার একটি প্লাটিনাম্ তারের উপর সোডিয়ম্, পটাশিয়ম্, ষ্ট্রনসিয়ম্ প্রভৃতির লবণকে সামান্য মাত্রায় রেখে যথাক্রমে তার হলদে, বেগুনী ও লাল আলো ত্রিপৃষ্ঠ কাচ দ্বারা পরীক্ষা করা যায়, তবে অবিচ্ছিন্ন কিরণচ্ছত্র পাওয়া যায় না; পাওয়া যায় কতকগুলি উজ্জ্বল রেখা। এই রেখাগুলি তত্তৎ মৌলিকসমূহের বিশেষত্বজ্ঞাপক ও নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গান্তরের আলো দ্বারা উৎপন্ন। এই প্রকার কিরণচ্ছত্রকে রেখা-কিরণচ্ছত্র (line spectrum) বলা হয়। কিরণচ্ছত্র-মধ্যে মৌলিক-সমূহের প্রত্যেকের রেখার আসন পৃথক্, একে অপরের স্থান অধিকার করে না। কিরণচ্ছত্র-যন্ত্র এই কারণে মহাকাশে অবস্থিত জ্যোতিষ্ক-রাজির রাসায়নিক পরীক্ষার পথ উন্মুক্ত করেছে। সুদূরবর্ত্তী তারকা-প্রেরিত আলোক-রশ্মি হতে তার আভ্যন্তরীণ দ্যুতিমান বস্তুসমূহের রাসায়নিক উপাদান এতটা নিশ্চয়তার সহিত নির্ণয় করা যায় যে, বীক্ষণাগারে সেই তারকার খানিকটা টুকরা নিয়ে পরীক্ষা করা সম্ভব হলে তার চেয়ে নিখুঁত বিশ্লেষণ হত কি না সন্দেহ।

কিরণচ্ছত্র-যন্ত্র সাহায্যে সূর্য্য ও তারকাদের সম্পর্কে বহু তথ্য জানা যায়। সূর্য্যের পরিমণ্ডলে হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ যে লেলিহান শিখারাজি বিরাজ করছে; জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্যগ্রহণের সময় তা পরীক্ষা করেছেন। এই কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে তাঁরা সূর্য্যে হাইড্রোজেন গ্যাসের সন্ধান পান। গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিকগণের পরীক্ষায় সৌর-কিরণচ্ছত্রে এক অদ্ভুত হলদে রেখা ধরা পড়ে, তাকে প্রথমে তাঁরা সোডিয়মের নির্দ্দেশক বলে ভুল করেছিলেন। ১৮৬৮ অব্দে স্যর নরম্যান্ লক্‌ইআর্ সূর্য্যের বিভিন্ন স্থানের কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করে নিম্নলিখিত তালিকাটি প্রকাশ করেন :—

সূর্য্যের কিরীটিকা (corona)—এক অজ্ঞাত মৌলিক বস্তু (?), অল্পতাপোজ্জ্বল (sub-incandescent) হাইড্রোজেন।

সূর্য্যের বর্ণমণ্ডল (chromosphere)—তাপোজ্জ্বল হাইড্রোজেন, এক অজ্ঞাত মৌলিক বস্তু—প্রস্তাবিত নাম "হিলিয়ম্", ক্যাল্‌সিয়ম্, ম্যাগ্‌নেসিয়ম্।

সূর্য্যের কলঙ্ক-প্রদেশ (Region of solar spots) সোডিয়ম, টাইটেনিয়ম, ক্রোমিয়ম্, অ্যালুমিনিয়াম্।

তেজোমণ্ডল (photosphere) ও বর্ণমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী স্তর (The Reversing Layer)—লোহা, ম্যাঙ্গানিজ্, কোবল্ট্, নিকেল, তামা, দস্তা, পটাসিয়ম্, ষ্ট্রনসিয়ম্, বেরিয়ম্, ক্যাড্মিয়ম্, সিসা।

সে সময়ে পৃথিবীতে হিলিয়মের অস্তিত্ব জানা ছিল না; কিন্তু লক্ইয়ার কিরণচ্ছত্রের মধ্যে এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব হলদে রেখা দেখে তাকে নূতন মৌলিক বস্তুর সূচক বলে নির্দ্দেশ করেন এবং কেবল সূর্য্যে অবস্থান বলে তার নাম দেন হিলিয়াম্। তাঁর সাতাশ বৎসর পরে স্যর উইলিয়াম্ র‍্যামজে, ক্লিভেনাইট্ ও ইউরেনাইট্ আকরে হিলিয়ামের সন্ধান পেয়ে পৃথিবীতেও এই গ্যাসের অস্তিত্ব আছে প্রমাণ করেন। এক্ষণে সূর্য্যের মধ্যে চল্লিশটিরও অধিকসংখ্যক মৌলিকের অস্তিত্ব আছে বলে জানা গেছে।

১৮৬০ অব্দে বুনসেন্ ও কির্খহোফ্ কর্ত্তৃক কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রের উন্নতিসাধনের অনতিকাল পরে হিলিয়ম্ ব্যতীত আরও পাঁচটি নূতন মৌলিক আবিষ্কৃত হয়। তাদের নাম যথাক্রমে রুবিডিয়ম্, সিজিয়ম্, থ্যালিয়ম্, ইন্ডিয়ম ও গ্যালিয়ম্।

বুনসেন্ ও কির্খহোফ্ মনে করতেন, কোনও মৌলিকের কিরণচ্ছত্র সর্ব্বদাই একরূপ, প্রত্যেক রেখাটির তরঙ্গান্তর অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু ১৮৫৬ অব্দে প্লুকার ও হিটর্ফ দেখেন যে, বায়ুনিষ্কাশিত কাচ-নলে নাইট্রোজেন, দুইটি ভিন্ন প্রকার কিরণচ্ছত্র উৎপন্ন করে; একটি রেখা-কিরণচ্ছত্র, অপরটি ডোরা-কিরণচ্ছত্র (band spectrum) উভয় কিরণচ্ছত্রই যুগপৎ উৎপন্ন হতে পারে। অন্যান্য বস্তু নিয়েও এইভাবে পরীক্ষা করে এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা গেছে। ফস্ফরাস্ গ্যাসীয় অবস্থায় আটটী পৃথক্ রকম কিরণচ্ছত্র উৎপন্ন করে। গ্যাসের চাপের তারতম্যহেতু কিরণচ্ছত্রের রেখাবলী চওড়া হতে পারে, এমন কি তার আসনও একটু আধটু সরে যেতে পারে। কাজেই আজ-কাল কিরণচ্ছত্রের রেখাবলীর আসন একেবারে অটল, অপরিবর্ত্তনীয় বলে গণ্য করা হয় না। লোহার কিরণচ্ছত্র এর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সৌর-কিরণচ্ছত্রে লোহার অস্তিত্ব-নির্দ্দেশক যে রেখা পাওয়া যায়, আর বৈদ্যুতিক আর্ক (arc)-এ লোহা যে কিরণচ্ছত্র রেখা উৎপন্ন করে, তাদের উভয়ের অবস্থানে একটু তফাৎ হয়। আবার সামান্য সামান্য মাত্রায় অপর গ্যাসের মিশ্রণ কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট গ্যাসের আপেক্ষিক তীব্রতায় (অবস্থানে নয়) পার্থক্য ঘটাতে পারে।

যৌগিক বস্তুসমূহের কিরণচ্ছত্র মৌলিকের কিরণচ্ছত্র অপেক্ষা ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়; স্পষ্ট রেখার পরিবর্ত্তে সেখানে কালো ডোরা দেখা যায়। ডোরার এক দিক্ খুব স্পষ্ট থাকে, অপর দিক্ ক্রমশঃ ফিকে হয়ে মিলিয়ে যায়। যে সকল নিখুঁত কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রে রেখাগুলিকে দূরে দূরে অবস্থিত দেখা যায়, তার সাহায্যে ডোরাকৃতি কিরণচ্ছত্র পরীক্ষা করলে প্রত্যেক ডোরাটি বহুসংখ্যক সূক্ষ্ম রেখার সারি বলে ধরা পড়ে। ডোরার উজ্জল দিকটার রেখাগুলি খুব ঘেঁসা-ঘেঁসা করে থাকে, আর ঝাপ্সা দিকটায় ক্রমশঃ ফাঁক হয়ে যায়।

সৌর-কিরণচ্ছত্রে এ পর্য্যন্ত প্রায় চৌদ্দহাজার কালো রেখার মানচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। সেই রেখাসমূহের অন্ততঃপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ দ্বারা শোষিত হওয়ায় উৎপন্ন। সৌর-কিরণচ্ছত্রে কোন কোনও রেখা অতিশয় মৃদু, সে জন্য তাদের চিনে নেওয়া কষ্টসাধ্য।

কিরণচ্ছত্র-যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্ত্তী সূর্য্যতারকাদির কেবল মৌলিক উপাদান বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া যায় এমন নয়। এতদ্দ্বারা আমরা নির্ণয় করতে পারি, কোন্ তারা প্রাচীন, কোন্টি বা নবীন; আবার এরই সাহায্যে জানা যায়, কোন্ তারা দূরে সরে যাচ্ছে, কোন্ তারাটি সন্নিহিত হচ্ছে। এই যন্ত্র সাহায্যে জ্যোতিষ্কদের সেকেণ্ডে এক মাইলের পাঁচভাগের একভাগ বেগ পর্য্যন্ত নির্ভুলতার সহিত হিসাব করা যায়।

সূর্য্যের গতিহেতু কিরণচ্ছত্রের রেখাবলীর স্থান পরিবর্ত্তিত হয়; তা থেকে সূর্য্য নিজ অক্ষদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করতে কতটা সময় নেয় জানা যায়। সৌর-কলঙ্কের স্থান পরিবর্ত্তনের হার থেকে সূর্য্যের পাক খাওয়ার যে হিসাব পাওয়া যায়, তার সঙ্গে এই হিসাবের মিল পাওয়া গেছে।

কিরণচ্ছত্রের কালোরেখাগুলির স্থিতিস্থান পরিবর্ত্তন থেকে কোন্ রেখাগুলি সূর্য্যের পরিমণ্ডল হতে সৃষ্ট এবং কোন্ রেখাগুলি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল দ্বারা উৎপন্ন, তা আমরা পৃথক্ করতে পারি। সূর্য্যপৃষ্ঠে যে প্রবল বাত্যাসমূহ সংঘটিত হয়, কিরণচ্ছত্রের কালো রেখা থেকে তা বলে দেওয়া যায়; কারণ সে সময়ে এই রেখাগুলি বিকৃত আকার ধারণ করে। সূর্য্যের পক্ষে যে কথা বলা হল, অপরাপর তারকাদের সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। তাদের কিরণচ্ছত্রের ধরণ অনুসারে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। কারণ যে সকল তারার আলোতে একই ধরণের কিরণচ্ছত্র পাওয়া যায়, তাদের সকলের তাপমাত্রা প্রায় এক রকমের। আবার পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা এটাও দেখা গেছে যে, একই ধরণের কিরণচ্ছত্র-উৎপাদনকারী তারকাদের বস্তুত্বে খুব বেশী কিছু প্রভেদ হয় না। কিন্তু একই কিরণচ্ছত্র-বিশিষ্ট তারাদের মধ্যে দীপনক্ষমতায় (candle power) বিরাট কম বেশী হতে পারে; একটার তুলনায় অপরটি হয়ত লক্ষকোটীগুণ বেশী দীপ্তি দান করছে।

কোনও তারার আলো যখন তার পরিমণ্ডলবর্ত্তী গ্যাসের উত্তেজিত পরমাণুদের অতিক্রম করে, তখন তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ তরঙ্গান্তরের আলোকরশ্মি শোষিত হয়। কোন্ তরঙ্গান্তরের আলো শুষে যাবে, তা নির্ভর করে তারকার পরিমণ্ডলস্থ মৌলিকের উপর। এই কারণে আমরা তারকার পরিমণ্ডলস্থ সর্ব্ববিধ মৌলিকের রৈখিক নক্সা দেখতে পাই। তারকার তাপমাত্রা কম থাকলে নিরাসক্ত পরমাণুর (neutral atom) রেখা পাওয়া যায়, অর্থাৎ পরমাণুরা তখন সহজ অবস্থায় (normal state) থাকে। কিন্তু তাপমাত্রা বেশী হলে পরমাণু হতে এক বা একাধিক ইলেক্‌ট্রন্ ছিটকে বেরিয়ে যায়, তখন তারা বিদ্যুৎযুক্ত থাকে। নিরাসক্ত পরমাণু অপেক্ষা বিদ্যুৎ-যুক্ত পরমাণুদের কিরণচ্ছত্ররেখা ভিন্ন ধরণের। যে সকল তারকার তাপমাত্রা খুব কম নয়, আবার খুব বেশীও নয়, তাদের আলোতে এই দুই ধরণেরই কিরণচ্ছত্ররেখার সাক্ষাৎ মেলে। অর্থাৎ, তাদের মধ্যে সহজ পরমাণু ও বিদ্যুতযুক্ত পরমাণু উভয়ই বর্ত্তমান থাকে। যে সকল তারার তাপমাত্রা কম, তাদের নিরাসক্ত পরমাণুর রেখাগুলি এবং যাদের তাপমাত্রা বেশী, তাদের বিদ্যুৎযুক্ত পরমাণুর রেখাগুলি স্পষ্টতর হয়।

এ পর্য্যন্ত দৃশ্য আলোকের কিরণচ্ছত্র আলোচিত হল; কিন্তু লাল হতে বেগুনী পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন রঙীন আলো-সমূহ কিরণচ্ছত্র মধ্যে বর্ত্তমান, কিরণচ্ছত্রটির প্রদেশ সেই রঙীন অবলেপের দুই পারে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। লালের পরেই অদৃশ্য অংশে ইন্‌ফ্রারেড্ বা লাল উজানী আলোর স্থান; তাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু রৌদ্রে ঘুরে সর্দ্দিগর্ম্মি লাগলে তার প্রতাপ টের পাওয়া যায়। কিরণচ্ছত্রের ঐ স্থানে কালো বাল্‌ব-যুক্ত থার্ম্মোমিটার্ ধরলে এর তেজ ধরা পড়ে। কারণ লাল উজানী আলো দৃশ্য আলো অপেক্ষা অধিক উত্তাপ প্রদানক্ষম। আবার বেগুনীর পাশেও কিরণচ্ছত্রের অদৃশ্য অংশে অদৃশ্য তেজ আছে; তার নাম আল্‌ট্রা-ভায়লেট্ রশ্মি বা বেগুনী পারের আলো। অপুষ্টাঙ্গ, রিকেটগ্রস্ত ও ক্ষয়রোগীদের চিকিৎসায় আজকাল এই রশ্মির প্রয়োগ যে ভাবে প্রসার লাভ করছে, তাতে এর গুণের কথা প্রায় সকলের জানা হয়ে গেছে। ফটোগ্রাফির ফলকে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বেগুনী পারের আলোতে পড়লে কুইনীন্-ঘটিত লবণ এবং আরও কয়েকটি বস্তু হতে এক প্রকার নীলাভ ঝল্‌মলে জ্যোতি (fluorescence) নির্গত হয়।

বেগুনী পারের আলো এবং লাল উজানী আলো আবিষ্কারের পর থেকে দৃশ্য বর্ণসপ্তকের সঙ্গে অদৃশ্য আলোর প্রদেশের যোগাযোগ জানা হয়েছে। সৌরকরের যে অংশ আমাদের উষ্ণতার অনুভূতি জন্মায়, তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেটি দৃশ্য আলোর সহিত অভিন্ন স্বভাবের। এই তাপ-রশ্মির স্থান লাল উজানীর পাশে। রঙীন আলো ও বেরঙা আলো, উভয়েরই নির্দ্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক তরঙ্গান্তর আছে। লাল উজানীর তরঙ্গান্তর লালের চেয়ে দীর্ঘতর, আর বেগুনী পারের আলো বেগুনীর চেয়ে হ্রস্বতর। দৃশ্য কিরণের তরঙ্গান্তর গড়ে প্রায় ৫×১০^{-৫} সেন্টিমিটার বা এক ইঞ্চের ষাট হাজার ভাগের প্রায় একভাগ। এতটা সূক্ষ্মতার ধারণা করা কষ্টসাধ্য। খুব ফিন্‌ফিনে পাতলা টিস্যু-কাগজকে যদি একশত সূক্ষ্ম

কাগজ উপর্য্যপরি সাজিয়ে তৈরী কল্পনা করা যায়, তা হলে সেই সূক্ষ্ম কাগজের বেধের সহিত দৃশ্য আলোর তরঙ্গান্তরের তুলনা হতে পারে! কোন কোনও অদৃশ্য তেজ এর চেয়ে ঢের সূক্ষ্ম তরঙ্গান্তরের। কাজেই এদের মাপতে গেলে সাধারণ ইঞ্চির মাপকাঠি নিতান্ত স্থূল হয়ে যায়, এ জন্য একটি নূতন মানদণ্ড বৈজ্ঞানিকগণ পরিকল্পনা করেছেন। তার এক একটি দাগ হচ্ছে ১০$^{-১০}$ মিটার, অর্থাৎ এক মিটারের একশত কোটী ভাগের এক ভাগ, অথবা একফুটের প্রায় তিন শত কোটী ভাগের এক ভাগ। তেজের তরঙ্গান্তর মাপার এই মানদণ্ডের এককের নাম অ্যাঙষ্ট্রোম্। একস্ রশ্মি এবং রেডিয়ম-নিঃসৃত তেজ গামা-রশ্মির তরঙ্গান্তর তাপতরঙ্গের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম, আবার বেতার তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ এর বহুগুণ বড়। এই সকল তেজকে যে আমরা চোখে দেখতে পাই না, সেটা আমাদের চোখের গঠনের দোষে, অথবা সম্পূর্ণ অনুভবক্ষমতার অভাবে। বাস্তবিক পক্ষে দৃশ্য আলো এবং তেজের সঙ্গে অদৃশ্য আলো এবং তেজের প্রকৃতিগত কোনও পার্থক্য নেই।

পরিদৃশ্যমান আলোক সঙ্গীতের ভাষায় বলতে গেলে মাত্র একটি সপ্তকের মধ্যে পর্য্যবসিত। দীর্ঘতম দৃশ্য আলো, যেটা আমাদের লালরঙের প্রতীতি জন্মাচ্ছে, তার তরঙ্গান্তর সঙ্কীর্ণতম দৃশ্য আলোর বেগুনীর তরঙ্গান্তরের দ্বিগুণ। দৃশ্য আলোর চেয়ে দীর্ঘতর তরঙ্গান্তরে যেটুকু আমাদের অনুভূতির মধ্যে, সেটি তাপতরঙ্গ। তারপরে দুইপারের ছোটবড় তরঙ্গগুলো সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতিতে ধরা দেয় না; নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের আচরণ ও ক্রিয়াবলী লক্ষ্য করা যায়।

শরতের রূপ

—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায়

বর্ষার প্লাবনে আজ দিকে দিকে ভরে হাহাকার
কুঁড়ে ঘর ডুবিয়াছে জলে,
সর্ব্বহারা জীবনের সান্ত্বনার ভাষা কোথা আর
শান্তি যার ডুবিল অতলে।

দু-মুঠা অন্নের লাগি চেয়ে থাকা অন্য মুখ পানে
বাঁচিবার এই প্রয়োজন,
সুতীব্র দৈন্যের গ্লানি ক্ষণে ক্ষণে লজ্জা ডেকে আনে
মৃত্যু-পথে বাঁচা কি ভীষণ!

"অন্ন দাও বস্ত্র দাও—ছিল সব ভেসেছে বন্যায়"
কানে বেঁধে তীব্র হাহা-স্বর,
ব্যাধির কবলমাঝে যন্ত্রণার করাল ছায়ায়
আর্ত্তজন ভাবে—"অতঃপর?"

শরতের আগমনী—তাহাদের ভগ্ন মনোবীণ
আনন্দের কোথা অবকাশ?
মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে প্রাণ যেন নীলিম মলিন
ব্যথাতুর বিপুল আকাশ।

আনি-মানি জানি না ঃ পরের ছেলে মানি না

'...গোড়ার কথা এই যিনি পক্ষে না থাকিবেন, ধরিতে হইবে তিনি বিপক্ষে আছেন...'—সুভাষচন্দ্র

পাড়াগাঁয়ের মেয়ে

—শ্রীবিজনবালা দেবী

"ঠাকুর-ঝি ডাকছ ভাই? মার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি—বৃষ্টির ছাঁটে ঘরের অর্দ্ধেক অবধি ভিজে গেছে, নীচে ছিলাম জানতে পারি নি।

"এখনও ঘুমোওনি কেন? অসুখ শরীরে রাত জাগা ভাল নয়। খুকীকে মার কাছে রেখে এলাম, নইলে তোমায় বড্ড বিরক্ত করে। আলো নিবিয়ে দি, আঃ কম্বলটা আমায় কি ভাল বাসে, সারা দিন পর কি আরাম দিলে?

"কি বললে? ঘুমোবে না? আমার বাপের বাড়ীর গল্প শুনবে? শোনবার জানবার অনেক বিষয়ই আছে—বিশেষ করে তোমাদের।

"বালিশটা নাও, শুধু হাতে মাথা রেখে শুয়ো না। হ্যাঁ—একটা মাটীর প্রদীপ জ্বেলে ও ঘরে রেখেছি, তাই আলো দিচ্ছে। বাসগৃহ একেবারে অন্ধকার করতে নেই।

"ঐ আবার কি জোরে বৃষ্টি নামল! সেই কাল বিকাল থেকে সুরু হয়েছে, এখন পর্য্যন্ত সমানে চলছে। আবার হয় ত কাল ভোরে উঠে দেখব—পরিষ্কার রোদ উঠেছে, মেঘের লেশ মাত্র নেই।

"আমাদের রাজপুরে এমনি বৃষ্টির পরে সূর্য্যোদয় কি সুন্দর দেখাত। জলে ভিজে গাছ-পালার উপর রোদ পড়ত যেন শ্যামবর্ণের রাজা সোনার উষ্ণীষ পরেছেন। বেশী বৃষ্টির পর রোদ উঠলে আকাশের রং খুব গভীর নীল, রোদ খুব উজ্জ্বল আর ছায়া খুব নিবিড় দেখাত। এখানে সে সব কখন দেখতে পাই নি।

"চৈত্র মাস থেকে ঝড় আরম্ভ হ'ত। প্রতিদিন বিকাল বেলা গাঢ় কাল মেঘে আকাশ ছেয়ে চার দিক্ আঁধার করে ভীষণ বেগে ঝড় উঠে আসত, সে কি ভীষণ ঝড়! তেমন ঝড় এ দেশে হয় না। নদীবহুল দেশের ঝড়-বৃষ্টির রূপই আলাদা। বড় বড় গাছ একেবারে মাটীতে লুটিয়ে পড়ত—কোনটা সমূলে উপড়ে যেত, কোনটার ডাল ভেঙ্গে পড়ত, কোনটা আছড়া-আছড়ি করত, কোনটা বা অন্য গাছের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিত। নিরাশ্রয়া লতা মাটীতে গড়াগড়ি দিত। পাখীরা বাসা শুদ্ধ পড়ে যেত। চারিদিকে যেন প্রলয়ের যুদ্ধ! মেঘগর্জ্জনে কানে তালা ধরে যায়—আর কি বিদ্যুতের চমকানি! সারা আকাশে যেন সোনার নাগিণীরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। আকাশের দিকে চাইতে চোখে ধাঁধা লেগে যায়। ভাঙ্গা গাছের ডাল উড়ে এসে ঘরের চালের উপর পড়ে—টিনের চাল মড় মড় শব্দে কেঁপে উঠত, প্রবল ঝড়ের বেগে ঘর মট্মট্ শব্দ করত। মেঘ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে উড়ে সারা আকাশময় ছেয়ে যায়—তারই ফাঁকে একটু পরিষ্কার দেখায়, আবার তেমনি নিবিড় অন্ধকার!

"প্রায় ঘণ্টা দুই এই রকম ঝড়-বাতাসের পরে চটপট শব্দে বৃষ্টি নামতে সুরু হল—নদীর জল যেন ফুলে ফুলে ওঠে, সমস্ত গ্রামের বৃষ্টির জল কল কল শব্দে নীচু রাস্তা বেয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। বিকাল বেলাতেই সকলের রান্না সারা হয়ে যায়। ঝড়ের সময় বাবা-কাকারা সব বাইরের ঘরে থাকতেন, তত ঝড়েও কাকাদের তাস-পাশা খেলা বন্ধ হয় নি। মা-কাকীমারা আমাদের নিয়ে বসতেন, পিসী-মা মালা জপ করতেন। আর ঝি খুকীকে ঘুম পাড়াত। সবাই কিছু না কিছু করত, কেবল আমি জানলা খুলে দাঁড়িয়ে দেখতাম। আকাশ, পৃথিবী, গাছপালা, বাড়ীঘর সব যেন ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এই মেঘ সরে গেল, আবার জোরে বৃষ্টি নেমে এল। আমার কাপড়, মাথা, চুল, সব বৃষ্টির ছাটে ভিজে গেছে—তবু সরি নি। সেই এতটুকু বয়স থেকে পল্লীর প্রতি দৃশ্যটিকে আমি এমনই ভালবাসি।

"রাত আটটা-নটা পর্য্যন্ত এমনি ঝড়-বৃষ্টি হয়ে তার পর ধীরে ধীরে কমে আসত, মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ-চমকও কমে যেত, শুধু বৃষ্টি, আর কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টির বেগ কমে এলে ছাতা মাথায় দিয়ে সকলের আগে মা রান্নাঘরে যেতেন; তার পর একে একে বাবা-কাকারা অন্য লোকজন সব গিয়ে খেতে বসে যেতেন। সেই সময় ঝি মাথায় খান দুতিন গামছা দিয়ে এক হাতে লণ্ঠন আর এক হাতে ঝুড়ি নিয়ে সমস্ত

ঝরা আম কুড়িয়ে এনে ঘরের মেঝেয় ঢেলে রেখে আবার আনতে যেত।

"মা যখন খাওয়া শেষ করে কাকীমা-দিদিদের নিয়ে আসতেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছেই, আমরা জেগে থাকতাম পিসী-মার গল্প শুনব বলে। পিসী-মার কাছেই আমরা সব খুড়তুত, জেঠতুত ভাই-বোনেরা থাকতাম। পিসী-মার ঘরটা ছিল সব চেয়ে বড়। বাড়ীর মধ্যে সেইটেকে 'বড় ঘর' বলা হত। পাড়ার মেয়েরা বেড়াতে এসে সেই ঘরে বসত। ভাল ভাল খাবার জিনিস যত কিছু সব সেই ঘরে। দিনে রাতে বাবা-কাকারা এসে সেই ঘরে বসতেন। পানের আড্ডাও সেই ঘরে। পাড়াগাঁয়ে ঠাকুর-মা পিসী-মার ঘর সব বাড়ীতেই এই রকম।

"রাত্রিতে মা-কাকীমারা সেই ঘরে পানের বাটার কাছে বসে পিসী-মার সঙ্গে দিনের সমস্ত বিষয়ের গল্প করতেন। আমরা বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, 'মা এখনও যায় না কেন।' সেই সময় ঝি আমের ঝুড়ি বার করে গুণতে বসত, অত বৃষ্টির মধ্যে আম কুড়ানর জন্যে মা তাকে বকতেন। আমরা বিছানা ছেড়ে উঠে কাঁচা আম নিয়ে কাড়াকাড়ি, টানাটানি—এ বড়টা নিলে, ওরটা ছোট, ঝগড়া-কান্না—কেউ সুপারী-কাটা যাঁতি দিয়ে আম কাটতে বসে গেল। মা গণ্ডগোল মোটেই ভালবাসতেন না, উঠে যেতেন। পিসী-মা সবাইকে শান্ত করে দরজা বন্ধ করে আমাদের নিয়ে শুয়ে পড়তেন।

"তার পর গল্প শোনবার পালা—তখন ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কত রকম গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। রাত্রেও সেই সব স্বপ্নে দেখেছি। কত রাজপুত্র-রাজকন্যার আশ্চর্য্য কাহিনী, কত রাক্ষস-খোক্কসের অদ্ভুত কাণ্ড, আম-কাড়াকাড়ি, ঝগড়াঝাটি, সবই কেমন এলোমেলো ভাবে সারা রাত্রি স্বপ্নে দেখতাম।

"ভোর বেলা চোখ চেয়ে দেখি—আকাশে মেঘের লেশ নেই। সকালের সোনালী রোদ বিছানায় পড়েছে—অবাক্ হয়ে বার বার চোখ মুছে দেখতাম। রাত্রিতে দেখা স্বপ্নের সঙ্গে হঠাৎ এই পরিষ্কার দিন যেন কি রকম খাপছাড়া বোধ হত। শেষে উঠে বাইরে এলে তবে ঘুমের ঘোর ভাঙ্গত।

"তার পর বর্ষা। ঝড়ের রুদ্রমূর্ত্তি কোথায় মিলিয়ে যায়, দিন-রাত অবিরাম বৃষ্টি, খানা-ডোবা, নদী-পুকুর সব জলে ভরে ওঠে, দুপুর বেলা বৃষ্টিটা একটু কম থাকে, আবার সন্ধ্যার আগেই জোরে নেমে আসে। একবার বর্ষা খুব বেশী হয়েছিল। দেখতে দেখতে ঘাট-মাঠ, পথ, শস্যের ক্ষেত সব ডুবিয়ে দিয়ে নদীর জল গ্রামে উঠে এল। হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে আর কিছু বুঝতে পারি নে। কাল দেখেছি ফুল-বাগান জলে ডোবে-ডোবে, আর আজই আমাদের বাড়ীর উঠানে হাঁটু-জল হয়েছে।

"তখন বাড়ীতে অনেক লোক কাজ করছে,—কাঠ, তক্তা, বাঁশ দিয়ে উঁচু মাচার মত বেঁধে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যাতায়াতের পথ তৈরী হচ্ছে। বাবা বারান্দায় বসে দেখছেন। কাজে সবাই ব্যস্ত, আমার কথার কেউ উত্তর দেয় না। শেষে পিসী-মা বললেন, 'রাত্রিতে বানের জলে গ্রাম ভেসে গেছে—এই রকম কয়েক দিন থাকবে, তাই এই সব পুল হচ্ছে।' শুনে আমার এমনি আনন্দ হল; বাবাকে বললাম, 'বাবা, আমি উঠোনে সাঁতার দেব।' বাবা বললেন, 'দাও গে।' আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

"তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। সাঁতার সত্যিই জানতাম না। মাটী ধরে ধরে সাঁতার দিয়ে পিছন-বাড়ীতে রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাজির। মা দেখে রেগে উঠলেন। আমি বললাম, 'মা, আর পুকুর-ঘাটে নাইতে যেতে হবে না, বাড়ীর ওপর যতক্ষণ ইচ্ছে নাইব, পুকুর থেকে দেরী করে এলে তুমি যা বকতে!' মা বললেন, 'হাঁ, ওই পচা জলে ডুব দিয়ে জ্বর হক আর কি;—খবরদার, মাথা ভিজিয়ো না'। মাথায় তখন জল ঝরছে—কে মার কথা শোনে! সাঁতার দিয়ে আবার ফিরে এলাম।

"কয়েক দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হল। এই সব জল-বৃষ্টির ঝঞ্ঝাটে আষাঢ় মাস পড়ে অবধি কারও বাড়ী বেড়াতে যাওয়া হয় নি। সে দিন রাত্রে মা, পিসী-মা, কাকীমারা ও-পাড়ায় বেড়াতে যাবেন ঠিক করলেন। বাড়ীর সামনে চার পাঁচখানা ছোট বড় নৌকা সর্ব্বদা বাঁধা থাকত, তারই একখানাতে তাঁরা গিয়ে উঠলেন। আমি ও দিদি সঙ্গে গেলাম। নৌকা ছেড়ে দিলে। পাড়াগাঁয়ে এ রকম নিয়ম আছে—দিনে কাজের ঝঞ্ঝাটে কেউ বড় বেরুতে পারে না - রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ী

বেড়ানো সুবিধে। পাড়াগাঁয়ে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া খুব সকালেই হয়। তারপর পুরুষেরা কেউ তাস-পাশা নিয়ে বসেন; কেউ বেড়াতে যান। মেয়েরাও কেউ বেড়াতে যায় —কেউ কড়ি খেলতে বসে।

"আমাদের নৌকা ধীরে ধীরে চলতে লাগল। মেঘশূন্য নীল আকাশে লক্ষ তারা ঝক ঝক করে জ্বলছে। চারিদিক্ জলে জলময়—যেন নিথর সমুদ্র। বড় বড় গাছপালা স্থির দাঁড়িয়ে আছে, গ্রামখানি যেন জলে ভাসছে।

"একটু পরেই চন্দ্রোদয় হল। এমনটি আর কখনও দেখেছ কি, ঠাকুরঝি? প্রথমে পুব দিক্‌টা উজ্জ্বল হয়ে উঠল—তার পরে চাঁদের একাংশ দেখা দিল। তখন সেই শান্তিময় নীরব পল্লীটির উপর থেকে যেন একটা স্নিগ্ধ ছায়ার মত অস্পষ্ট যবনিকা সরে গেল; এক দিকে জলের উপর সেই জ্যোছনা এসে পড়ল,—গাছপালা, বাড়ী-ঘর সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্য দিক্‌টা ছায়াময় আঁধারে ঢাকা রইল।

"আকাশের তারা নিষ্প্রভ হয়ে গেল। আরও একটু পরে চারিদিক্ জ্যোৎস্নায় ভেসে গেল। জলের বুকে চাঁদের ছায়া পড়ল, একটি ছায়া শত খণ্ড হয়ে তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য-লীলায় মেতে উঠল। আজ যেমন করে বুঝতে পারছি—সেই কত দিন আগের দেখা জিনিষ চিরনূতন হয়ে চোখের সামনে জেগে আছে—সেই ছোটবেলায় এমনি করে সব বুঝতে না পারলেও আমার চোখে সবই অপূর্ব্ব, আনন্দময় লাগত।

"সে দিন আর কারও বাড়ী যাওয়া হল না। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জলের উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। শেফালী আর কামিনী ফুলের গন্ধে তখন সারা বাড়ী আমোদিত, ঠিক যেন স্বপ্নপুরী। যেন কোন যাদুকরের মায়ার রাজ্য!

"ধীরে ধীরে ক্রমশঃ বানের জল সরে যেত, ভাদ্রের কাঠ-ফাটা রোদে চারিদিক্ ঝাঁ ঝাঁ করত, আবার দু' একদিন মেঘ করে বৃষ্টিও হত। সকালবেলা বেশ পরিষ্কার উজ্জ্বল দিন—দুপুর না হতেই মেঘ করে এল—তার পরই ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি—সবাই তখন বিশ্রাম সুখে শুয়ে আছে, ছেলেরা নৌকা করে স্কুলে গেছে—ঠিক যেন সময় বুঝেই প্রবল বেগে বৃষ্টি নেমে আসত।

"আমি উঠানের পেয়ারা গাছে উঠে বসে জলের ধারায় ভিজতে ভিজতে মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গান ধরতাম। সব চেয়ে জলে ভিজতে আমারই আনন্দ ছিল বেশী। দিদি বলত, আমি আর জন্মে চাতক ছিলাম। অত জলে ভিজেও একটি দিনের জন্যে আমার কোন অসুখ করে নি।

"সহরটা হচ্ছে মায়াবিনী। এর আগাগোড়াই কৃত্রিম যত্ন করে সাজান। যত্নে তৈরী বাগান-পুকুর—বড়লোকদের বড় বড় বাড়ী—আর বড় বড় রাস্তা—রাস্তায় আলো—দুই দিকে সাজানো দোকান—এই সব কি দেখবার জিনিস? না, এতে সত্যি সত্যি মন ভোলে? দেখবার জিনিস অবশ্য ঢের আছে—যে কিছুদিন ধরে দেখলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু পল্লীর বাস উঠিয়ে দিয়ে কি সুখে যে লোক এখানে বাড়ী-ঘর করে—আমি কখনও তা পারতাম না। আর এর সৌন্দর্য্য কোথায় ভাই? ঐ সব গলির দিকে চেয়ে দেখ দেখি, বড়লোক, বড় বাড়ী ক'টা? শতকরা পঁচানব্বুই জনেরও বেশী যে লোক ঐ গলিতে গলিতে বাস করে, তারা না পায় আলো—না পায় হাওয়া—না দেখে রোদ—না দেখে জ্যোছনা। তবু তারাও সহরের নেশায় পড়ে দেশের বাস তুলে দিয়েছে। দেশে ছোট-বড় নেই—সব সমান। বেশ, চাকরীর জন্যে অনেককে কলকাতায় থাকতে হয়—তাঁরা থাকুন—না বোন্, স্ত্রী-ছেলেপিলে দেশের বাড়ীতে রাখুন—কিংবা স্ত্রীকে নিয়ে সহরে থাকুন—আর সব দেশে থাক্, তা হলে উভয় পক্ষেরই সুবিধে হয়। দেশে কিছু কিনতে হয় না—যেখানে সেখানে দু-একটা বীজ ছড়ালেই তরকারী, আর এখানে পুঁইডাঁটা, কাঁচালঙ্কাটা পর্য্যন্ত কিনতে হয়।

"কি বলছ? রাজপুরে বাগান ছিল কি না? ছিল ভাই, সব বাড়ীতেই ছিল, এখনও আছে। রাজপুর খুবই পল্লী। পোষ্ট-অফিস পর্য্যন্ত ছিল না; এখন বাবার চেষ্টায় হয়েছে। রাজপুরের পাশের গ্রামটা বেশ বড় ছিল, সেখানে রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে হাট বসে, আর রোজ সকাল বেলা বাজার বসে। রাজপুর থেকে এক মাইল দূর—দৌলতপুর নাম। রাজপুরে মিত্রবংশই প্রধান। সমস্ত গ্রাম আমাদের মিত্র-দেরই; সব জ্ঞাতি-গোষ্ঠী। কেবল দু'ঘর ছুতোর, একঘর নাপিত, একঘর মালী আর ভিন্ন পদবীর দু'চার ঘর কায়স্থ ছিল। এখন আরও দু'চার ঘর ব্রাহ্মণ এসে বাড়ী করেছে।

কারণ রাজপুরের স্বাস্থ্য খুব ভাল। সেবার তোমার দাদা অত বড় অসুখটা থেকে উঠে একমাস থেকে কেমন শরীর করে নিয়ে এলেন। তুমি ত মোটে রাজী হও নি। বাবা বার বার লেখাতে বাবা বললেন যেতে, তাই যাওয়া হল। নদীর জল খুব মিষ্টি, ঐ নদীর হাওয়াতেই রাজপুরের স্বাস্থ্য অত ভাল।

"আমাদের বাড়ী কেমন শুনবে? হ্যাঁ ভাই, দালান নয়—রাজপুরে একটিও পাকা বাড়ী নেই, শুনে খুব আশ্চর্য্য হচ্ছ, নয়? মিত্র-বংশ প্রধান, স্বচ্ছল অবস্থা হলেও সকলেরই মাটীর ঘর। কিন্তু সেই একখানা মাটীর ঘরে যা খরচ পড়ে, সহরে তাতে পাকা বাড়ী হয়ে যায়। তার মানে নদী প্রধান দেশে ইট আনতে হয় দুরদেশ থেকে, তাতে ভয়ানক খরচ পড়ে, মিস্ত্রী, কুলী অন্যান্য জিনিসপত্র মাল-মসলা সব নিতে হয় বহু দুর থেকে। কাজেই খরচে পেরে ওঠা যায় না। পাজা পুড়িয়ে ইট করে নিয়ে বাড়ী করলে খরচ কম পড়ে, কিন্তু পাঁজা সকলকে পোড়াতে নেই, এই সব বিধি-নিষেধ পাড়াগাঁয় খুব মেনে চলে। অনেক সময় দেখা যায়, কেউ না মেনে জোর করে ইট পোড়ালে, কিন্তু বাড়ী আর তার ভোগে হল না—একটা না একটা বিপদ্ হয়ে তারা বিধ্বস্ত হয়ে যায়; ইটের পাঁজার ওপর গাছপালা জন্মে তাকে মাটির ঢিবি করে ফেলে।

"তোমরা ভাব মাটীর ঘরে লোক থাকে কি করে? কিন্তু তারা তা মনে করে না। এই দেখ পাড়াগাঁয়ের অনেকেই চাকরীর জন্য নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে—প্রায় সবাই বিদেশে দোতলা, তেতলা একতলা, বাড়ী করে ফেলে। কিন্তু সম্বৎসরে দেশের সেই মাটীর বাড়ীটিতে যাবার জন্যে তাদের প্রাণ পড়ে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকদের দেশের ওপর যে কি ভীষণ টান—তা তোমরা ধারণাই করতে পারবে না। পূজার সময় কত দূর দেশ থেকে ছোট ছোট ছেলে-পিলে নিয়ে কি ব্যাকুল আগ্রহে তারা দেশের দিকে ছুটে চলে, তা দয়া করে একবার শিয়ালদহ ষ্টেশনে গিয়ে দাঁড়ালেই কতকটা বুঝতে পার। তাও কতটুকু দেখবে? কতক আসে উত্তর থেকে, তারা সান্তাহার-ঈশ্বরদী দিয়ে চলে যায়। পশ্চিমে যারা থাকে তারা নৈহাটী-ব্যাণ্ডেল দিয়ে যায়। কলকাতা থেকে যারা যায়, তাদের ভিড়ই তোমরা দেখতে পাবে। ছুটীর দিন সন্ধ্যা থেকে অষ্টমী, নবমী পর্য্যন্ত কি দারুণ ভিড়,—মোটে বার দিন ছুটী যাদের, হয় তো কোন কারণে যেতে পারছে না, তারাও নবমীর দিন অন্ততঃ রওনা হবেই। বিজয়া-দশমী, লক্ষ্মীপূর্ণিমা তো বাড়ীতে দেখবে। যদি কোন কারণে কেউ না যেতে পারে—তার সারাবছর মনোক্লেশের অবধি থাকে না। আবার পরের বছর গেলে তবে সেটা দূর হয়। এমন টান, জন্মভূমির ওপর এমন মায়া তোমাদের আছে? তোমাদের মধ্যে যে সামান্য মাইনে পায় সেও ছুটি হলেই দার্জ্জিলিং, সিমলা, মুসুরী যাবার জন্য টাইম-টেবল দেখে। আর পূর্ব্ববঙ্গের বড় বড় বিখ্যাত লোকেরাও দেশের দিকে ছোটেন। সেই তাঁদের দার্জ্জিলিং, সেই তাঁদের আগ্রা, লক্ষ্ণৌ। তাঁদের সমস্ত আনন্দের খনি পল্লীমায়ের স্নিগ্ধ কোলে। তবে যে বললে, তোমরা এ দেশে থাক—ছুটি-ছাটায় বাড়ী যাও, আমাদের বাড়ী এখানে, তা কোথা যাব। সে কথা মানি, কিন্তু এ দিকের বহুলোক ঢাকা, ময়মনসিং, বরিশাল, ফরিদপুর চাকরী করে, তারা কই ছুটি-ছাটাতে আমাদের মত দেশের দিকে ছুটে আসে না। স্ত্রীটি ছেলে-পিলেটি নিয়ে সেখান থেকেই চলল, হয় পশ্চিমে, না হয় উত্তর বা দক্ষিণে। আমাদের দেশে দল বেঁধে তীর্থ করতে যায়। একা একা কেউ কখন যাবে না। মা, বাপ, ভাই, বোন, আত্মীয়-কুটুম্ব সব একত্র দল বেঁধে মনের আনন্দে তীর্থ ভ্রমণ করে। এ দেশে দুচার দিনের ছুটি হচ্ছে, অমনি হয় নিজে একা, নয় স্ত্রীকে নিয়ে ছোট্ট বিছানা বেঁধে চলল। দু' একদিন করে থেকে চলে এল। আবার বন্ধ হল, আবার অন্য এক জায়গায় গেল। আমাদের দেশে তা নয়। অল্পবয়সী ঝি-বৌ, ছেলে-পিলে একেবারে বাদ। তবে কচি বয়সে বিধবা হলে তাদের নিয়ে যায়। অনেকদিন ধরে পরামর্শ করে তীর্থের খরচ, জিনিসপত্র সব সাধ্যমত সবাই গুছিয়ে রাখে। খুব সংক্ষেপে দিন কাটিয়ে পয়সা জমায়। তার পর একদিন শুভদিন দেখে প্রকাণ্ড দল বেঁধে কুড়ি-পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ জন এক সঙ্গে যাত্রা করে। প্রত্যেক তীর্থে কয়েক দিন করে থেকে সব দেখে শুনে করণীয় ক্রিয়াকর্ম্ম সব সমাধা করে তবে ফিরে আসে। ওরই মধ্যে যার সঙ্গতি কম, অন্য পাঁচজনে তাকে সাহায্য করে। আর যেখানে যেখানে যাবে, সে সব জায়গার চিহ্নস্বরূপ নানা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে আসে।

দেশে ফিরে সবাইকে কিছু না কিছু দেবেই। পল্লীতে পাঁচ জন পাঁচ জনের—তোমার বাড়ীতে রান্না হয় নি, আমার বাড়ী-থেকে খেয়ে ছেলেরা স্কুলে গেল। আমার পাঁচ জন অতিথি কুটুম এল, তোমার বাড়ী থেকে সব নিয়ে এসে কাজ চালিয়ে দিলাম। আর এ দিকে ভাই ভাই পর্য্যন্ত মুখ দেখা-দেখি থাকে না।

"গল্প করেই যে রাত্রি কাটিয়ে দিলাম ভাই, তুমি ঘুমোও, রাত জেগে অসুখ বেশী করে বসবে। কি, ঘুম আসছে না? শুনতে ভাল লাগছে? একবার রাজপুর গিয়ে দেখে আসবে সব নিজ চক্ষে, সত্যি? আমারও ঘুম আসছে না। কেবলই রাজপুরের ছবি চোখে ভেসে উঠছে। সেই আমাদের বাড়ী, মাটীর ঘর, কত বড় বড় ঘর এক একখানা। উপরে টীনের চাল, কত উঁচু, কত দূর থেকে ঘরের চাল দেখা যায়। ঘরের বেড়া ছেঁচা-বাঁশের তৈরী, মাটী দিয়ে লেপা, চূণ ফেরানো, সাদা ধপ ধপে। দেড় হাত অন্তর সবুজ রংয়ের জানালা বসান। প্রত্যেক ঘরে চার পাঁচটি করে দরজা। বাইরের বৈঠকখানা প্রকাণ্ড, সামনে পিছনে চওড়া বারান্দা, মাঝে একটা বড় ঘর, দু'পাশে ছোট মাঝারি চারটে ঘর। অনেকটা বাংলোর ধরণে তৈরী। মাঝের ঘরটায় বৈঠক হত। আশপাশের গুলি সুবিধামত ব্যবহার হয়। বাইরের ঘরখানি পূর্ব্ব-দ্বারী, তার সামনে হাত দশেক জমিতে ফুলের বাগান, তার পরে জমি ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নীচের সমতল ভূমিতে গিয়ে মিশেছে, ওপর থেকে ফুলের বাগানও ঢালু হয়ে থাকে থাকে নেমে গিয়েছে। অজস্র দেশী ফুলে আলো-করা সে-বাগানের যে কি শোভা, তা কি বলব, নীচে থেকে মনে হত ফুলের পাহাড়! ফুল-বাগানের মধ্য দিয়ে আমাদের বাড়ী থেকে পথটি নেমে খানিক দূর গিয়ে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। যতদূর দৃষ্টি চলে, দিগন্ত-বিস্তৃত সবুজ ক্ষেত। পূর্ব্ব দিকে আমাদের বাড়ীর সামনে আর কারও বাড়ী ছিল না। সবুজ শস্য-ক্ষেতের পরে বড় রাস্তা, তার ও পারে আবার ক্ষেত। বহুদূরে ভিন্নগ্রামের ঘন সবুজ গাছ-পালা আর মধ্যে মধ্যে একখানা টিনের চাল দেখা যায়। সেগুলি সেই গ্রামের সম্পত্তিশালী লোকদের বাড়ী। তাদের একটা ঝোঁক আছে খুব উঁচু করে ঘর তোলবার। এই জেদাজেদির ফলে অনেক সময় ঘর এত উঁচু হয় যে ঝড়ে পড়ে যায়। আমাদের ঘর অবশ্য তত উঁচু ছিল না।

"সব শুদ্ধ ক'খানা ঘর ছিল? অনেক গুলি ছিল, তিনটে প্রকাণ্ড উঠান। চারিদিকেই তার বড় বড় ঘর। বাইরের উঠানের পূর্ব্ব দিকে বৈঠকখানা, দক্ষিণদিকে দু'খানা মাঝারি ঘর—উত্তর-দ্বারী। উত্তর দিকে মণ্ডপ-ঘর দক্ষিণ-দ্বারী। পশ্চিম দিকে খুব বড় একখানা ঘর, পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে চারটে দরজা। আবার ভিতর-বাড়ীর উঠানেও পূর্ব্বদ্বারী, উত্তর-দ্বারী, দক্ষিণদ্বারী ঘর। এ সবই শোবার ঘর। সব ঘরের দুদিকে চওড়া বারান্দা। পিছন-বাড়ী মানে রান্না-বাড়ীর উঠানের উত্তর দিকে দক্ষিণমুখো দু'খানা পাশাপাশি ঘর রান্না আর খাবার জন্য। দক্ষিণ দিকে লম্বা একটানা ঘরের তিনটে ভাগ, একটা ঢেঁকি-ঘর, একটায় কাঠ ঘুঁটে থাকে, অন্যটায় চিড়ে মুড়ি খই ভাজা, নানা রকম কাজ-কর্ম্ম হয়। পশ্চিম দিকে দুটো ঘর, একটায় পিসী-মার রান্না হয়, অন্যটা ভাঁড়ার। বাইরে মণ্ডপ-ঘরের পাশে একটা ইঁদারা। পিছন-বাড়ীতে দুই রান্না-ঘরের সামনে দুটি পাতকুয়ো। মণ্ডপ-ঘরের পিছন দিকে একটু দূরে সারি সারি ধানের গোলা আর গোয়াল ঘর। সব ঘরের পিছনেই দুটি একটি করে আম-কাঁঠাল গাছ। বাড়ীর চার দিকেই সারি দিয়ে নারকেল সুপারীর গাছ। গোয়াল-ঘরের সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে উঁচু বাঁশের বেড়ের উপর বড় বড় মাটির গামলা বসান, সব রকম খাবার একটায় ঢেলে কখনও গাইকে বাবা খেতে দিতেন না। কোনটায় পরিষ্কার জল, কোনটায় খোল-ভূষি, কোনটায় ফেন, ভাত-তরকারীর খোসা, এই রকম বন্দোবস্ত। আমগাছের ছায়ায় সে-জায়গাটা এমন ছায়া-স্নিগ্ধ আর পরিষ্কার কি বলব। বাবা রোজ গাইদের খাওয়া দেখতেন। মা-কাকীমারা এক বার করে সেখানে ঘুরে আসবেনই। পিসীমার সঙ্গে আমরা সর্ব্বক্ষণ সেখানে আছি। এ রকম জীবনের সঙ্গে তোমাদের একেবারে পরিচয় নেই। কাজেই আমার কথা বুঝতে পারবে না ঠিক রকম। গাইগুলো আমাদের কতই না প্রিয় ছিল। আমরা সব ভাই-বোনে একটা একটা করে গাই আর বাছুর নিয়ে ছিলাম। কল্যাণী, লক্ষ্মী, ছায়া, বুধী, মঙ্গলী, লালী, চাঁদনী, সুখী, নীলি—এই সব তাদের

নাম। শনি রবিবারে দুটি বাছুর হয়ে ছিল বলে আমার ছোট ভাইটি তাদের নাম রেখেছিল শনিবালা আর রবিবালা।

"কি সুন্দর মোটা-সোটা দেখতে তারা, আর কি শান্ত। আমরা তাদের গায়ে গায়ে বেড়াতাম, কিছু বলত না—কেবল চেয়ে চেয়ে দেখত। মা বলতেন, 'এরাই আমার লক্ষ্মী।' নূতন গাই কেনা হলে বাড়ীর গিন্নী তাকে অভ্যর্থনা করে নেন। পাদ্য-অর্ঘ্য যাকে বলে, চার পা ধুইয়ে মুছিয়ে শিঙে সিন্দূর, মাথায় ধান দুর্ব্বা, মুখে বাতাসা দিয়ে বরণ করে নিতে হত, এখনও এ নিয়ম আছে। খুব দুরন্ত গাই হলে দূর থেকে কোন রকমে এ নিয়মগুলো পালন করা হত। এমন প্রথা যে দেশে, গো-ধনকে যারা সাক্ষাৎ মাতৃরূপিণী মনে করে, তাদের কি কোন অভাব থাকতে পারে? না, সত্যি করে তারা কখনও নিরন্ন হয়?

"আমার পিসী-মার কথা বলিনি, না? পিসী-মার খুব ছেলে বয়সে বিয়ে হয়েছিল। অতিরিক্ত সাহেবী করে পিসেমশায় দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখনকার দিনের সাহেবী। পিসী-মার কোলে তিন চারিটি ছেলে মেয়ে, পিসেমশায় তাঁকে ফেলে চললেন বিলাত বেড়াতে। বিলাত থেকে ফিরে মারা গেলেন। বাবা সব দেনা শোধ করে দিয়ে পিসী-মাকে নিয়ে এলেন। পিসী-মা ছেলে মেয়েদের মার হাতে দিয়ে সংসারের ভার তুলে নিলেন। পিসী-মা সব চেয়ে ভালবাসেন বাবাকে। আর সবাই তাঁর কাছে সমান।

"তুমি যখন এত করে রাজপুরের কথা শুনতে চাইছ, তবে বলতে আমার পরম আনন্দ—এমন আনন্দ কিছুতে পাইনে। রাজপুরের বাড়ীর কাজের রকম বলি শোন—ভোর না হতে 'মালেনী' এলো, ছড়া ঝাঁট সেরে দিয়ে গেল। পিসী-মা তো রাত থাকতে উঠে জপে বসেছেন। তার পর একে একে সব উঠল। বড়দের খাবার ঠাঁই হল বারান্দায়—ছেলে মেয়েদের পাতা পড়ল পরিষ্কার লেপা উঠানে। পিসী-মা ছেলে মেয়েদের দিলেন, মা কাকী-মারা বড়দের দিলেন। ছেলে মেয়েদের হাঙ্গামা পিসী-মা ভিন্ন কেউ মেটাতে পারে না। তার পর কৃষাণ, রাখাল, বাড়ীর দাস-দাসীরা বসল, পিসী-মা তাদের দিলেন। এসব মিটলে কুটনোর পালা। পিসী-মা, মা, দুজনে কুটনো কুটে দেন, তার পর স্নান করে কাকী-মারা রান্নাঘরে গেলেন। মা পিসী-মার ঘরে নিরামিষ রান্নায় গেলেন। আগে ছেলেদের খাওয়া হয়, তার পরে অতিথি-অভ্যাগত-আশ্রিত, যখন যারা থাকে সকলকে নিয়ে বাবা বসেন। তাঁদের পরে আবার কৃষাণদের পালা, কার কি লাগবে না লাগবে, কে কি পায় নি, সব পিসী-মা দেখেন। সেই যে ভোরে মটকা পরে জপ করেছেন, সেখানা পরাই আছে, নিজে পরিবেশনও করছেন। সবার খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে বৌ-মেয়েরা বসে, তাদেরও তিনিই দেখে শুনে দেবেন। তার পর যান স্নান করতে। স্নান-পূজা সেরে তিনি খেতে বসলে মা খেতে বসেন। দুপুর বেলায় পিসী-মার ঘরেই সবার আড্ডা হয়। বিকালের রান্না সন্ধ্যার আগেই হয়, ছোট ছেলে মেয়েরা আগে খায়। আটটা না বাজতে সব মিটে যায়। এ ছাড়া গোয়াল-বাড়ীতে গিয়ে দেখ, বাবা বসে পিসী-মার সঙ্গে গল্প করছেন, আবার দেখ পিসী-মা ফুল-বাগানে, এই পাশের বাড়ীতে গলা শোনা যাচ্ছে, কার অসুখ হয়েছে দেখতে গেছেন। এসে বার্লি রেঁধে নিয়ে গেলেন। গরুটার ব্যামো হয়েছে, বাছুরকে চোঙায় করে দুধ খাওয়াচ্ছেন, বাগানে গরু ঢুকছে, সেখানে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন। এক কথায় সর্ব্বঘটে অবতার্ণ—আর পিসী-মার গলা কি, অত বড় বাড়ী, যেখান থেকে কথা বলবেন শুনতে পাওয়া যাবে। পিসী-মাই যেন বাড়ীর প্রাণ, যেখানে তিনি নেই, সেখানকার কিছু ভাল লাগে না। ছেলেপিলেরা পড়ছে না, সেখানে গিয়ে হাজির, বৌদের কারও জ্বর হয়েছে বার্লি খাবে না, পিসী-মা দুটো পলতার বড়া ভেজে দুটো চালভাজা তেল-নুন মেখে চললেন বৌয়ের কাছে। বৌ পলতার বড়া আর চালভাজার লোভে বার্লিটুকু আগে খেয়ে ফেলে। বাড়ীতে যারই অসুখ হক না কেন, যে দিন পথ্য করবার দিন, সে দিন সকালে উঠে দেখ দুটি লাউডগা, দুখানা বেতের আগা ভাতে দিয়ে পুরাণো চালের ভাত হয়ে গেছে—কই মাছের ঝোল ফুটছে। এমন স্নেহ-মমতা, যত্ন, এমন বিচার-বিবেচনা কোথাও দেখিনি। আমাদের রাখাল, কৃষাণরা অসুখবিসুখ হলেও বাড়ী যেতে চাইবে না। পিসী-মার মতন কে করবে? তাঁর কাছে ছোট বড় নেই, দাস-দাসীদের জন্য যে ব্যবস্থা দাদা-কাকাদের জন্যেও সেই ব্যবস্থা। দই, দুধ, মিষ্টি, মাছ, ফল, সব চুল-চেরা ভাগ। বরং কোন দিন কিছু কম পড়লে

পিসী-মা দাদা-কাকাদের কি আমাদের না দিয়ে রাখাল কৃষাণ-দের দেন। বলেন 'ওরাই মূল, ক্ষেতখামার, গরু, বাছুর, পুকুর, বাগান সব ওদেরই হাতের, ওরা মেহনৎ করে এনে দেয় বলে আমরা খেতে পাই। ওদের বঞ্চনা করলে ধর্ম্মে সইবে না।'

"না, ঘুমোই নি। কিন্তু তুমি কি ঘুমোবে না? ঐ শোন বাইরের ঘড়িতে দুটো বাজল। এবার ঘুমোও—ঘুমোও। কাল তখন শুনো রাজপুরের গল্প। অসুখ নিয়ে রাত জেগ না আর।

"অসুখ কিছু নয়? একটুখানি সর্দ্দিজ্বর মাত্র? বিকালে অত চেঁচাচ্ছিলে কেন? আমি মাথা টিপে দিলাম তবে ঘুমিয়ে পড়লে, তিন বার এসে দেখে গেছি, তুমি যখন ঘুম ভেঙ্গে ডাকলে আমায়—আমি তখন বাবার কাছে, তোমার খাবার পাঠিয়ে দিয়ে, সব কাজ-কর্ম্ম সেরে মার ঘরে যেতে যেতে তোমার ডাক শুনলাম।

"সেই জন্যে ঘুম আসছে না? এবার আমার ঘুম পাচ্ছে একটু। ঘুমোতে দেবে না? কি শুনবে বল?

"বৃষ্টি থেমে গেছে। এখানে বর্ষা আর শীতটাই যা একটু পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোন্ ঋতু কোথা দিয়ে এসে চলে যায়, বুঝতেও পারি নে। দেশে শরতের উজ্জ্বল রোদ, নীল আকাশ, বসন্তের স্নিগ্ধ দক্ষিণে বাতাস অযাচিত সম্পদ্। ঝড় কখনও দেখেছ? কাল-বৈশাখী কাকে বলে জান? আকাশে একটু মেঘ করে বাতাস দিয়ে দু চারটে গাছের মাথা যদি হেলে পড়ে, অমনই দোর-জানলা বন্ধ করে দাও—এই তো বিংশ শতাব্দীর বীরাঙ্গনা! কোন দিক্ দিয়েই তোমাদের বাল্য-জীবনের সঙ্গে আমাদের মিল ছিল না। তোমরা যেন পিঞ্জরের পাখীটি, নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়ে বসে আদর ভোগ কর, আর আমরা বনের পাখী। এখন বড় হয়েছি—তুলনায় বিচার করেও অনেক দেখেছি, কিন্তু যে সহজ স্বচ্ছন্দ স্বাধীন-তার সুখের স্বাদ আমরা পেয়েছি, তোমরা তা পাও নি বলে আমার বিশ্বাস। তোমাদের পদে পদে মান মর্য্যাদার হানির ভয়, আমাদের ছিল ছোট বড় সব সমান।

"আবার অনেক জিনিসপত্র দেখলে প্রাচুর্য্যের মধ্যে বাস করলে মনও প্রশস্ত হয়। আমাদের বাড়ীর সামনে-পিছনে শস্য-ক্ষেত দিগন্তবিস্তৃত। কখনও সরষে ফুলের উজ্জ্বল হলদে রং ক্ষেত আলো করে রাখে, কখনও কচি কোমল সবুজ ধানের শীষ বাতাসে মাথা দুলিয়ে নাচে, কখনও নিবিড় পাটের বন ঘন সবুজ রং নিয়ে রাজত্ব করে। এমন দৃশ্য-পরিবর্ত্তন কোথায় আছে? এই সহর—নমস্কার করি এর পায়। ভোরে উঠে যে মাঠে বাগানে ছুটত—প্রথম সূর্য্যোদয় দেখবার লোভে, সেই আমি ভোরে স্নান করে পূজার ঘরে দরজা দিয়ে বসি। যে দিকে চাই চোখ যেন ফিরে ফিরে আসে, তাই মনে হয়, আর বাইরের দিকে চাইব না। নির্জ্জন স্নিগ্ধ শান্তিপ্রয়াসী মন প্রবোধ মানে না। দু'চোখ ভরে পল্লী মায়ের নিত্য-নূতন সৌন্দর্য্য দেখতে যে অভ্যস্ত, সে কিসে তৃপ্ত হবে বল? তোমার ছেলে বলে 'ধান গাছে তক্তা হয়।' পল্লী-মায়ের কোলে যে অন্ততঃ কিছু দিনও বাস করে নি, তার জীবন অসম্পূর্ণ। দেশকে সে চেনে না, দেশকে সে ভাল বাসতে জানে না, দেশে থেকে সে বিদেশী। সহর দেশ নয়, দেশ পাড়াগাঁয়ে। সেই জন্যে তোমরা নিজের দেশের সব কিছুই হেলার চক্ষে দেখতে শিখেছ, পাড়াগাঁয়ের নামে নাক সিঁটকাও। দেশের কুকুর পথে পথে অনাহারে ঘোরে, এক মুষ্টি ভাত দাও না, দূর দূর করে তাড়াও, বিদেশের কুকুরকে আদর করে মোটরে নিয়ে বেড়াও, সুখাদ্য দিয়ে পালন কর। আচ্ছা, ওরা ওদের দেশের লোকের কাছেই বেশ আদর পায়, তোমাদেরটা না পেলেও চলে। কিন্তু দেশী কুকুরকে তোমরাও যদি অবহেলা কর, তবে তারা বাঁচবে কি করে? শুধু কুকুর নয়, দেশের কোন পশু-পক্ষীই তোমাদের ভাল লাগে না, সব বিদেশের চাই।

"আমাদের রাজপুরের বাড়ীতে কুকুর ছিল চার পাঁচটা। ভুলি, বাঘা, কালু, ছিল সর্দ্দার। নাম ধরে ডাকলে ছুটে আসত, বাবা তাদের পাতের ভাত খেতে দিতেন না, আলাদা ভাত মেখে তাদের খাওয়ান হ'ত। এখন তাদের নাতির নাতিরা তিন চারটে আছে। ভুলির বাচ্চার বংশ এরা। রাত্রে বাড়ীতে ওঠে কার সাধ্য! বাঘের মত বাড়ী আগলে থাকে। বিলিতী কুকুরের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। বিড়ালগুলো যেমনি মোটা তেমনি তেজী। একটা ইঁদুর বাড়ীতে হবার যো নেই। টিয়ে ময়না এখনও আছে, ভোর না হতে দেব-দেবীর নাম, স্তব-পাঠ আরম্ভ করে, পিসী-মার কাছে সব শেখে। আর কবুতর, সে অমন দু'শো হবে, ভাঁড়ার-ঘরের পাশে উঁচু কাঠের খুঁটীর উপর টিন আর তক্তা

দিয়ে তাদের জন্যে দোতলা অসংখ্য ঘর করে দেওয়া আছে, সেইখানে তারা বংশাবলীক্রমে রয়েছে। এমন নির্ভীক, গায়ে মাথায় এসে বসে। কোন জিনিস রোদে দিলে পাঁচ মিনিটে শেষ করে ফেলে, এ জন্য লাঠি হাতে এক জনকে বসে থাকতে হয়। এ সব বাড়ীর অবশ্য-প্রতিপাল্য পোষ্যের মধ্যে ধরা হয়। বাড়ীর আনন্দ এরাই।

"আর এক দল হাঁস ছিল, এখন আরও বেশী হয়েছে, কাকাদের রাজহাঁসের খুব সখ। রাজহাঁস দশ বারটা আছে, পাতিহাঁস গোটা ত্রিশেক। বাড়ীর পিছনে উত্তর দিকে হু'টো ডোবা আছে, সেখানে তারা চরে।

"এই নাও, আবার কি জোরে বৃষ্টি হচ্ছে দেখ, কাপড়-চোপড় আর শুকোবে না দেখছি, ঠাণ্ডায় বাবার হাতের ব্যথাটা একটু বেড়েছে, কাল সকালেই কবিরাজ মশাইকে ডাকতে হবে, যে ঔষধটা দিয়েছেন তাতে কিচ্ছু হচ্ছে না।

"ঐ কেমন সংকীর্ত্তনের গান শোনা যাচ্ছে, আজ পূর্ণিমা, সমস্ত রাত সংকীর্ত্তন হবে, ওঁরা পরম বৈষ্ণব। মাসে দশদিন সংকীর্ত্তন হয় ওঁদের বাড়ীতে। এবার ভাঙ্গবে তাই এত জোর হচ্ছে।

"হ্যাঁ ভাই, আমাদের দেশে সংকীর্ত্তন একটা জিনিস। বৃষ্টি-বাদলের দিনে বড় একটা হয় না। কিন্তু পরিষ্কার জ্যোছনা রাতে কোথাও না কোথাও সংকীর্ত্তন হবেই। সব গাঁয়ে গাঁয়ে সংকীর্ত্তনের দল আছে, প্রায়ই নিমন্ত্রণে তারা ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের ছেলেরাও তাদের মধ্যে আছে। বিদেশে কলেজে পড়ে, ছুটীতে দেশে গিয়ে সংকীর্ত্তনে লেগে যায়। তার পরে চাকরী নিয়ে মন অন্য রকম হয়ে যায়—তখন কেবল দেখে শোনে, তবে আনন্দটা ভোগ করে।

"সুন্দর জ্যোছনা উঠলে তোমরা এ দিক ও দিক বেড়াতে যেতে চাও, পাড়াগাঁয়ে সেদিন লোকে হরিল্লুটের আয়োজন করে। সে-দিন সকাল সকাল কাজ-কর্ম্ম সারা হয়। উঠানের মাঝখানে সংকীর্ত্তনের জন্য বিছানা হয়, চার দিকে ভদ্র-ইতর সকলের ফরাস পড়ে। চারিদিকের ঘরের বারান্দায় মেয়েদের বসবার জায়গা হয়, তবে চিক বা পরদা থাকে না।

"খোল-করতালের বাজনা, প্রাণঢালা মুক্ত সুরের গান, আর উন্মত্তের মত নৃত্য দেখলে সত্যিই প্রাণে একটা অপূর্ব্ব ভাব আসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেজে রাত্রি গভীর হয়ে আসে—চাঁদ যেন অস্তগমন ভুলে গিয়ে স্থির হয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকে। কোন দিন কথকতা হয়, কোন দিন রাম-মঙ্গল গান, কোন দিন পুতুল-নাচ, তা ছাড়া যাত্রা, সখের থিয়েটারও হয়। তবে পল্লীবাসীর সব আনন্দ আমোদ ধর্ম্মসংক্রান্ত। আর যাঁরা এই সব গান বাড়ীতে দেন, যত্ন করে তাঁরা এদের খাওয়ান। নগদ টাকার প্রত্যাশা বড় কেউ করে না। তুমি আদর করে নিয়ে গেলে—খাইয়ে দাইয়ে যা-কিছু দিলে তাতেই সন্তুষ্ট। এমন সুন্দর মিষ্টি গান আর রাজপুর ছেড়ে শুনিনে ভাই—কানে যেন লেগে আছে। আমি গেলে বাবা প্রায় প্রত্যেক দিনই বাড়ীতে গানের আয়োজন করেন। গান ভেঙ্গে গেলে ছেলেপিলে, ছোট বড় সব প্রসাদ নিয়ে উচ্চ কলরবে নির্জ্জন পথ মুখরিত করে বাড়ী ফেরে।

"দেশে ফকির-বৈষ্ণবকে সবাই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে। 'হরে কৃষ্ণ রাধে' বলে ভিখারী-বৈষ্ণব এসে দাঁড়াল কি কেউ কখনও তার সাত পুরুষের খবর জিজ্ঞেস করে—ভিক্ষা করা উচিত কি অনুচিত সে বিষয়ে লম্বা বক্তৃতা দিয়ে শেষে—'আমাদের বাড়ী অসুখ', 'আজ বেস্পতিবার—ভিক্ষে দিতে নেই' বলে শুধু-হাতে বিদেয় করে না। হিন্দু ভিখারীই হোক বা মুসলমান ফকিরই হোক—এসে দাঁড়াবামাত্র ছেলে, মেয়ে, বৌ, ঝি, গিন্নী যেই সামনে থাক, অমনি ভিক্ষে দিয়ে দেবে। বাগানের তরকারী, গাছের ফলেও তাদের দাবী আছে। চাইতে হয় না—আপনিই যার যা সাধ্য হয় দেয়। 'মহোৎসব' বলে যে মস্ত ব্যাপারটা—সে শুধু ভিখারী-বৈষ্ণব নিয়েই। বাড়ীর কর্ত্তা সে দিন গলবস্ত্র হয়ে থাকেন। দলে দলে ভিখারী-বৈষ্ণব আসছে, অমনি অভ্যর্থনা করে বসাচ্ছেন। বিশিষ্ট ভক্ত বৈষ্ণবরা পূজা-পাঠ আরম্ভ করেন, এক দল রান্নাবাড়ার দিকে থাকেন। এ দিকে সংকীর্ত্তন হতে থাকে। দুপুর বেলা মহাপ্রভুর ভোগ হয়, তার পরে সমস্ত অতিথি ভিখারী-নিমন্ত্রিত ভদ্র, ইতর, বৈষ্ণব সব একত্রে বৈঠক করে প্রসাদ গ্রহণ করা হয়। আবার মহোৎসবের এমনি মাহাত্ম্য যে, ভোজের পর যা-কিছু বাঁচে, সব পরের দিন সকলের বাড়ী কিছু কিছু পাঠান হয়—'বাসি প্রসাদ' বলে ভক্তি করে সবাই তা গ্রহণ করে। কিছু ফেলা যায় না।

"সংকীর্ত্তনের একটা গল্প বলছি শোন। রাজপুরে নদীর ধারে দু'জন বুড়ী ছিল। তাদের ভারি হরিল্লুট দেবার সখ—

প্রতি পূর্ণিমার রাত্রিতে সংকীর্ত্তন করিয়ে হরিলুট দেবেই। মাটীর ছোট্ট ছোট্ট চারখানি ঘর—উঠানের ঠিক মাঝখানে তুলসী-ঝাড়, শোবার ঘরের কাছে একটি ছোট আমগাছ। দু'চারটে নারকেল-সুপারী-লিচুগাছও ছিল। পূর্ণিমার রাত্রে আমরা পিসী-মার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেতাম। সংকীর্ত্তনের জন্য উঠোনটি সন্ধ্যাবেলা আরও যত্ন করে লেপা হয়েছে, গোয়াল-ঘরটির পাশে কপালে সাদা চাঁদওয়ালা কালো গাইটি বাছুর সামনে করে বসে আছে। ধীরে ধীরে বাতাস বইছে, গাছের পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠানটিকে ছায়াচিত্রের মত দেখাচ্ছে। বারান্দায় বাতাসার ডালা, জলভরা ঘটি-কলসী রেখে বুড়ী উঠোনের এক পাশে বসে মালা জপ করত, তার ননদ সবাইকে আদর করে বসাত। এ-বাড়ী ও বাড়ী থেকে সত-রঞ্চি মাদুর নিয়ে রাখত—তাই পেতে দিত।

"একদিন এমনি সংকীর্ত্তন হয়ে গেছে, প্রসাদ নিয়ে সবাই বিদায় হয়েছে। বুড়া আমগাছে হেলান দিয়ে বসে মালা জপ করছে; নদীর জল নিস্তরঙ্গ—জ্যোৎস্নায় বুকে শত হীরা জ্বলছে। ছায়াময় গাছের তলাটির স্নিগ্ধ নির্জ্জন শান্তিতে বুড়ীর তন্দ্রার ভাব এল। একটু পরে ধপ্ করে একটা আম পড়ল বাতাসে—বুড়ী চমকে চোখ চেয়ে দেখে দুটি ছোট ছেলে নির্জ্জন উঠানটিতে বেড়াচ্ছে। একবার ভাবলে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে—ওরা কে? আবার ভাবলে, পাড়ারই কোন ছেলে বাতাসা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"সেই সময় বেড়াতে বেড়াতে ছেলে দুটি সামনের দিকে ফিরল। তাদের দিকে চেয়ে বুড়ীর ঘুমের নেশা ছুটে গেল। কোন দিন দেখে নি—তবু যেন চেনা। মাথার চুল চূড়ার মত করে বাঁধা, গলায় ফুলের মালা। মুখে চন্দন আঁকা—চোখ ত নয় যেন পদ্মের পাঁপড়ী। একজন ফর্সা আর একজন শ্যামবর্ণ। বুড়ী সব ভুলে চেয়ে রইল—পায়ের নূপুরের ধ্বনি তার কানে বাজতে লাগল। এদের সে চেনে—ভাল করেই চেনে। এদের দুভায়ের কাঁচে বাঁধান ছবিখানিই তো সে রোজ পূজা করে।

"বুড়ী খুব বুদ্ধিমতী ছিল, আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে একেবারে ছেলেদের সামনে দাঁড়াল। বললে, 'কে তোমরা? কাদের ছেলে গো?'

"ছেলে দুটি থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখলে, একবার নিজেদের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। ফর্সা ছেলেটি বললে, 'আমরা রোজই আসতে চাই—গণ্ডগোলের জন্য পারি নে। আজ কেউ নেই, তাই তোমার এই সুন্দর জায়গাটিতে একটু বেড়াচ্ছি। তা তুমি কারুকে কিছু বল না, আমরা এখনই চলে যাব।'

"বুড়ী ব্যস্ত ব্যাকুল ভাবে বললে, 'না-না, তোমাদের যতক্ষণ ইচ্ছে থাক—কেউ এখন আসবে না।' বলে ঘরে ঢুকে লুঠের বাতাসা নিয়ে এল। বললে, 'তোমরা ত বাতাসা পাও নি, এই নাও।'

"ছেলে দুটি বুড়ীর মুখের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইল। শেষে হাত পেতে বললে, 'দাও।'

"বুড়ী তাদের কচি রাঙ্গা টুকটুকে হাতের অঞ্জলি দুটিতে বাতাসা দিয়ে জল আনতে গেল। এসে দেখে কেউ নেই, তার শূন্য উঠান শূন্য—গাছের পাতা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ছে। বাতাস হা-হা শব্দে যেন কেঁদে কেঁদে ফিরছে।

"বুড়ী সেইখানে আছাড় খেয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। এমন করে পেয়ে হারানোর চেয়ে না পাওয়াও যে ছিল ভাল।

"বুড়ীর ননদ মাদুর সতরঞ্চি দিতে গেছল। এসে বুড়ীকে দেখে কিছু বুঝতে পারে না—অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করলে, বুড়ী কোন উত্তর দিলে না। শেষে সে বুড়ীর কাছেই আঁচল পেতে শুয়ে পড়ল।

"চন্দ্রালোক নিষ্প্রভ হয়ে এল। পূর্ব্বাকাশ ধীরে ধীরে রাঙ্গা হয়ে উঠল। কেঁদে কেঁদে বুড়ী ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে দেখে, ভোর হয়ে এসেছে, নানান সুরে পাখীরা ডাকতে আরম্ভ করেছে। বুড়ী বিগত ঘটনাটিকে স্বপ্ন বলে ভেবে নিশ্চিন্ত মনে উঠবে, এমনি সময়ে দেখে তার কাছেই মাটিতে গোটা দুই ফুল, নূপুরের একটি কলি, আর একখানা বাতাসা পড়ে আছে। এ এক রকম ফুল, পাড়াগাঁয়ে বড় দেখতে পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বোতাম-ফুল বলে। একটি ফুল সাদা, একটি লাল। তবে সবই সত্যি, বুড়ীর ক্ষুদ্র কুটিরে সত্যিই তোমরা নেমে এসেছিলে, চলতে ফিরতে নূপুর থেকে কি একটি কলি খুলে পড়েছিল, না তোমরা যে এসেছিলে, নিশ্চয় করবার জন্য এই তার চিহ্ন রেখে গেছ?

"সকালের আলোর সঙ্গে সঙ্গে এই কাহিনী মুখে মুখে সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। বুড়ী সেই চিহ্ন কয়টি নিয়ে

বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে মাকে দেখে তাঁরই কাছে মনের ব্যথা জানাতে লাগল। মা স্নান-পূজা সেরে রান্না-ঘরে যাচ্ছিলেন, বুড়ী এসে দাঁড়াল, সে মাকে বড় ভাল বাসত। মা তাকে বসতে দিয়ে নিজেও তার কাছে বসলেন। বুড়ী মাকে সব কথা বললে, আমরা কাছেই খেলা করছিলাম, তার কথায় মন দিই নি, বুড়ীর কান্না শুনে কাছে এলাম। •বুড়ী:সেই ফুল, বাতাসা, কলি মাকে দেখাচ্ছে, মার চোখের জল টপ টপ করতে পড়তে লাগল। মা বুড়ীর পায়ের ধূলা মাথায় তুলে নিলেন।

"অনেকেই অবিশ্বাস করেছিল। কেউ কেউ হাতে হাতে প্রমাণও দেখিয়ে দিলে। ছেলে মেয়ের প্রায় সকলেরই পায়ে তোড়া পালং-পাতা মল আছে, তারই কলি খুলে পড়েছে। সোনার রং হল কি করে? ও একটা আধটা তামারও হয়ে থাকে। আর ঐ রকম ফুল স্কুলের বাগানেই আছে, ছেলে পিলে কেউ এনেছিল। বড় বড় লোকের বাড়ী রয়েছে গাঁয়ে, ঠাকুর-বাড়ীতে পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় মণ মণ সন্দেশের লুট হচ্ছে, খোল-করতালের বাজনায় কান পাতা যায় না। সে সব আঙ্গিনা ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণ কি না আসতে গেলেন ঐ পাড়াবেড়ানী পাগলা বুড়ীর বাতাসা খেতে! যত সব গাঁজাখুরী গল্প!

"কিন্তু মেয়েরা এ কথায় বিশ্বাস করে নি। অনেকেই পূর্ণিমা রাতে ধুম ধাম করে হরিল্লুট দিত। তুলসীতলাতে থালায় সন্দেশ বাতাসা সাজিয়ে গ্লাসে ঘটিতে জল দিয়ে দূরে বসে অপেক্ষা করত, মাঝে মাঝে আশা করে চোখ চেয়ে দেখত, কখন বা ভাই দুটি এসে বাতাসা নিয়ে পালাবে।

"কিন্তু কারও কামনা আর কোন দিন পূর্ণ হয় নি। কোন্ সুযোগে কখন কি হয় কে বলতে পারে? কিছু দিন পরে বুড়ী বৃন্দাবন চলে গেল। তার ননদ বোনের কাছে গাঁয়ে রইল, সে বুড়ীর সঙ্গে গেল না।

"কি বলছ? আমি? আমি বিশ্বাস করি কি না? কেন করব না, বিজ্ঞানের আলোক এ মনে ঢোকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে ফিরে গেছে।

"এবার সত্যিই রাজপুর যাবে? প্রতিজ্ঞা করে বলছ? না, প্রতিজ্ঞার দরকার নেই, সামান্য কথায় প্রতিজ্ঞা কি শপথ করা ভাল নয়। রাজপুর যাওয়া এমন কিছু অসাধ্য-সাধন নয়। রাত্রে শিয়ালদহে ট্রেনে উঠবে, ভোর হতে হতে গোয়ালন্দ পৌছবে; ট্রেন থেকে নেমে দেখবে সারি সারি ষ্টীমার জলে ভাসছে। বেলা একটা দু'টোর সময় আমাদের ষ্টেশনে নামবে, আগে বলা থাকলে বাড়ী থেকে নৌকা আসে, নৌকায় রান্না-বাড়া করে রাখে। তা না হলে ঘাটেই সারি সারি অসংখ্য নৌকা রয়েছে। পূজার সময় প্রায়ই চারিদিক জলে ডুবে থাকে। নৌকায় উঠে ষ্টেশন ছেড়ে একটু তফাতে নির্জ্জন দেখে নৌকা বাঁধবে। ঘাট, বড় বড় গাছের সারি, সবুজ আমন ধানের শীষ জলের ওপর মাথা তুলে হেলছে, দুলছে—সেখানে স্নান কর, কাপড় কাচ—ষ্টেশনে তরী-তরকারী মাছ, দুধ, মিষ্টি সব পাওয়া যায়, রীতিমত বাজার বসে। দোকানও আছে। হোটেল রয়েছে, ইচ্ছামত ফরমাস কর, তারা রেঁধে নৌকায় দিয়ে যাবে। জালে সর্ব্বক্ষণ মাছ ধরা হচ্ছে। আর যদি নৌকায় রান্না করে খেতে চাও, তবে জলখাবার জিনিষ-পত্র আর যা যা দরকার সব কিনে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দাও, ধীরে ধীরে নৌকা চলতে লাগল, এ দিকে ধীরে সুস্থে রান্না হল, দু'পাশে বাড়ী ঘর—বৌ-মেয়েরা তোমাদের দেখবে। নৌকা লাগিয়ে কারও বাড়ী থেকে কলার পাত কেটে নাও। নৌকার মাঝিদের উনান, কাঠ সব গোছান থাকে। মাঝিরা নোংরা নয়, তবু যদি তাদের বাসনে প্রবৃত্তি না হয়, তবে ষ্টেশনেই মাটীর হাঁড়ি কিনে নিয়ে যেতে হয়। খাওয়া সেরে বিছানা করে স্বচ্ছন্দে ঘুমোও, গল্প কর, তাস খেল। ভিতরে মেয়েরা থাকে, বাইরে পুরুষরা বসে। বড় নৌকায় দশ বারো জন স্বচ্ছন্দে শুয়ে ঘুমিয়ে যেতে পারে।

"নৌকার ভিতর দিকে জানলা আছে, তবে আমি বাইরেই বসি। দু'দিকের দৃশ্য দেখতে দেখতে যাই।

"সন্ধ্যার আগে নৌকায় চুল-বাঁধা কাপড়-কাচা হয়। সেই সময়টা ঘাটে নৌকা লাগাতে হয়। কোন আঘাটায়, কি ক্ষেতের ধারে নৌকা লাগাতে নেই, কুমীরের ভয় আছে। বসতির কাছে, লোকজনের কাছে জেনে তবে নৌকা লাগাতে হয়। মাঝিরা সবই জানে। তার পর চা খাও, খেয়ে বাইরের বিছানায় বসে সূর্য্যাস্ত দেখ। আমাদের বাড়ীর বজরা আগে আগে আমাকে নিতে ষ্টেশনে আসত। কিন্তু সে আমার ভাল লাগে না, সেই বসবার ঘর, খাবার ঘর

শোবার ঘর, বাথরুম, টেবিল, চেয়ার, আলনা-খাটে সাজান। মনে হয় যেন ঘরের ভিতর রয়েছি। নৌকার মত এমন আনন্দ তাতে নেই। জানলায় বসে দেখতে হয় খাঁচার পাখীর মত। আমি নৌকায় বরাবর যাই আসি, এখন বাবা বড় নৌকাখানা পাঠান, না হয়, ষ্টেশন থেকে ভাড়া করে নিয়ে যাই।

"সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে আসে। পশ্চিম-দিকের সিঁদুরে রং জলের বুকে রং খেলে বেড়ায়, শিশু ডুবছে উঠছে, পাখীরা সব বাসায় চলল। দু'পাশের বাড়ী থেকে শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে, মেয়েরা বৌয়েরা এ ঘর ও-ঘর করে বেড়াচ্ছে, ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বলে উঠল। বেলা চারটে না বাজতেই নৌকা পদ্মা ছেড়ে শাখানদীতে পড়ে, তোমার কোন ভয় নেই, পদ্মা ছাড়াতে বেশীক্ষণ লাগে না। তার পরে নদী, এ নদীর বিস্তার গ্রীষ্ম কালে খুব কম, তবে বর্ষায় সবই জলে জলময়। কিন্তু গাছের সারি, আর বাড়ী-ঘর দেখেই নদীর সীমা বুঝতে পারবে। হাট-বাজার করে লোক ফিরছে, ছেলেদের গণ্ডগোল, মাঝিদের গান এমন সুন্দর শোনায় সেই জলের ওপর! দু'পাশের বাড়ীগুলোর এত কাছে দিয়ে নৌকা যায় যে, তাদের কথা-বার্ত্তাও শুনতে পাওয়া যায়। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখে, বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে, তোমার মন চাইবে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে। কেউ কেউ ঘাটে জল নিতে এসেছে, কেউ কাপড় কাচছে, হাসি-গল্পে ঘাট মাথায় করেছে। আবার এ-নৌকা ও-নৌকা থেকে আলাপ চলছে, যেমন 'কনে যাইবা', 'আইজ হাটে মাছ তরকারী কিবা কিনলা' 'অমুক বাবু আইজ আইবার পারে নাই নাউ ফিরে আইছো,' 'অমুকের বাড়ীতে বড় ধুম পূজার, বিদেশ থেইকে সব আইছে', এই সব মাঝিরা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করতে করতে দাঁড় বেয়ে চলে। তোমার মনে হবে জলের দেশে এসেছ, এই মন, এই অনুভূতি এ সব তখন থাকবে না। মন এমন স্নিগ্ধ আনন্দ-রসে ডুবে যাবে ভাই!

"একটু একটু করে সন্ধ্যার রাঙ্গা আলো ডুবে গিয়ে যখন কাল ছায়া নেমে আসে, তখনই জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে। সেই সময় নদী ছেড়ে নৌকা গ্রামে ঢুকবে। তখন কেবল মাঠে মাঠে যাওয়া, ধান গাছের শীষ দেখতে পাওয়া যায়। মাঠ-পথে খাল-ডোবা দিয়ে ঝোপ-ঝাড়ের পাশ দিয়ে নৌকা চলল। বেত-বন, বাঁশ-বন ঘেঁসে নৌকা চলে, দৌলতপুর ছেড়ে রাজপুরে যেতেই সামনে পিছনে আশে পাশে পরিচিত লোকের কুশল-প্রশ্ন, কথা-বার্ত্তা আরম্ভ হল। নৌকা দাঁড় করেও কথা-বার্ত্তা চলে। এ-বাড়ী, ও-বাড়ী থেকে প্রশ্ন—'নৌকা কার? কোথায় যাবে?' উত্তর পেলে অমনি আশীর্ব্বাদ, কুশল-প্রশ্ন, কত স্নেহ, কত আগ্রহ! 'কাল গিয়ে দেখে আসব—আহা কতদিন পর এলি'—গিন্নীরা বয়ো-জ্যেষ্ঠারা এই রকম বলবেন। অনেক সময় এই সব আলাপ-প্রশ্ন করতে করতে দেরী হয়ে যায়।

"রাজপুর গ্রামটা খুব বড়। মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে কতক্ষণে বাড়ী পৌছব। বাড়ীতে সবাই জেগে থাকেন, অপেক্ষা করেন, কেন না পূজার বন্ধের পর দাদা-কাকারা, দিদিরা-বোন-ঝিরা সব আসেন—প্রায় প্রত্যেক দিনই একজন না একজন আসছেন। খবরও কখনও জানা থাকে, কখন থাকে না। রাত্রি দশটার আগে কেউ খেতে যান না। যারা আসবে তাদের নিয়ে বসবেন।

"বাড়ীটা আমাদের খুব বড় তা বলেছি, বাড়ীটা পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা। নৌকা রাজপুরে ঢুকতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়ি কতক্ষণে বাড়ী দেখব। পূর্ব্ব দিকে যাতায়াতের পথ। কিন্তু একে বেঁকে ঘুরে ফিরে নৌকা আসতে রাত্রি হয়ে যায়। জ্যোৎস্না উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আশ-পাশের বাড়ীর সাড়া-শব্দ ক্রমে নিস্তব্ধ হয়ে যায়, আবার কোন কোন বাড়ীতে আলো জ্বলে, কথা-বার্ত্তা শুনতে পাওয়া যায়—তারা বিদেশাগতের প্রতীক্ষা করছে। ঘাটের উপর গিন্নীরা মেয়েরা বসে দেখে, নৌকা তাদের ঘাটে ভেড়ে কি না।

"খানিকদূর গিয়ে নৌকা পুবমুখে চলে, আবার ঘুরে দক্ষিণ মুখো হয়। বাঁদিকে দিগন্তবিস্তৃত অগাধ জলরাশি নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মত দেখায়, ডানদিকে লোকজনের বাড়ী-ঘর। ধীরে ধীরে নৌকা চলে, একটি একটি করে বাড়ী ছাড়িয়ে চলে। ডান দিকে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। স্নিগ্ধ শীতল বাতাস। মনে ব্যাকুল প্রতীক্ষা, মুখে ভাষা নেই।

"এইবার নৌকা ছোট্ট একটা বাঁক ঘুরল, এইবার তুমি সেই ছবির মত বাড়ীটি দেখতে পাবে। নৌকা ধীর, মন্থর

...ত—মনের আবেগ বোঝে না। চক্রবর্ত্তী ঠাকুরদের বৈঠকখানায় তাস-খেলার আড্ডা বসছে, ওঁরা রাত একটা অবধি তাস খেলেন রোজ। চক্রবর্ত্তীদের বাড়ী ছাড়িয়ে নৌকা একটু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ বেঁকে চলতে থাকে—এইবার ভাই সামনের দিকে চেয়ে দেখবে, তোমার পাড়াগেঁয়ে বৌদির বাপের বাড়ী, পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতিমণ্ডিত সুখ-দুঃখের লীলা-ক্ষেত্রটি। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা ঘরটির জানালা-দরজা খোলা, ভিতরের আলো দেখা যাচ্ছে, জ্যোৎস্নাধৌত করোগেট টিনের চাল উজ্জ্বল ঝক্ ঝক্ করছে। সামনের ফুল-বাগানের নীচের দিকটা জলের তলে, উপরের গুলি আকাশের দিকে ঊর্দ্ধমুখ। সবুজ পাতা, হলদে, লাল, সাদা, গোলাপী ফুলের বর্ণের বিভিন্নতা আর একটু এগোলেই চোখে পড়ে। নারিকেল, সুপারী গাছের দীর্ঘ পত্রগুলি বাতাসে দুল্ছে, গোয়াল-বাড়ীতে সাদা কালো, লাল গাইগুলি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে অলসভাবে রোমন্থন করছে, তাদের দূর থেকে ছবির মত দেখায়। ফুল-বাগানের সামনে বাইরের ঘাটের ধারে ধারে এ দিক্ ও দিক্ করে নৌকাগুলো বাঁধা রয়েছে, মণ্ডপ-ঘরের পিছনে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি জলে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে, রাত্রি গভীর, পল্লী প্রায় সুপ্তিমগ্ন, বাড়ীর সামনে স্থির জলরাশিতে নৌকার দাঁড়ের আঘাতের মৃদু মৃদু তরঙ্গ উঠল। গাছ-পালার ছায়ায় স্নিগ্ধ, জ্যোৎস্নার উজ্জ্বল, নীরব নিস্তব্ধ ছায়াচিত্রের মত বাড়ীটি, সেই আমার শৈশব-কৈশোরের সুখের খেলা-ঘর, মধ্য-বয়সের স্বপ্নমন্দির—আমার তীর্থ, আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার আশা, আমার জন্মভূমি।"

আমরা মানুষ

—শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

আমরা দেবত্বলোভী স্বার্থপর স্বল্পায়ু মানব,
এক পা-ও চলিনাকো উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন ছাড়া,
অমায়িক মিষ্ট হাস্যে ছদ্মবেশী আমরা দানব,
নিঃস্বার্থ কর্ম্মের ক্ষেত্রে আমাদের নাহি পাবে সাড়া,
অশেষ সঞ্চয়-লুব্ধ আমাদের মন।

আমরা মৃত্তিকা-কীট সুখান্বেষী বুদ্ধিবৃত্তি লয়ে—
সদম্ভে ঘোষণা করি মানবতা বিচিত্র ভাষায়,
সত্য মিথ্যা দুটি খড়্গ ঊর্দ্ধে তুলি' ছুটি দিগ্বিজয়ে,
অন্ধকারে জ্বলে আঁখি নিত্য নব লাভের আশায়।
প্রতিষ্ঠা-কাঙ্গাল হয়ে রহি সারাক্ষণ।

আমাদের চারিদিকে সুবিধা সুযোগ ফাঁদ পাতা,
রাখিয়াছি বহুযত্নে সভ্যতার নানা রূপান্তরে,
আমরা হাঁটিতে জানি, কাটিতেও জানি লক্ষ মাথা,
মানুষে ঠকায়ে খাই মূল্যহীন ধর্ম্মের মন্তরে।
কর্ত্তৃত্বের দাম্ভিকতা মোদের জীবন।

এ বিরাট পৃথিবীতে যত পশু, যত জীব আছে,
তাহাদের তুলনায় আভিজাত্য মোদের প্রবল,
মোদের বীরত্ব শুধু, দুর্ব্বল ও নারীদের কাছে,
রক্তপাত করি আর সাথে সাথে ফেলি অশ্রুজল।
আত্মারে অমর বলি ভুলিতে মরণ।

আমরা মানুষ এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব,
প্রেমিক, লম্পট, ধূর্ত্ত, দয়ালু, দেবতা, ভয়ঙ্কর,
অন্নের অভাব যদি নাহি থাকে মোরা সাজি শিব,
পরধন লোভে মত্ত তবু বলি জীবন নশ্বর।
তৃপ্তিহীন অসন্তুষ্ট মোরা আজীবন।

আমরা কবিতা লিখি খেয়ালের নেশায় মাতিয়া
আমূর্খ-পণ্ডিত মাঝে 'বাহবা'র তীব্র প্রত্যাশায়,
সুখ্যাতি ও অখ্যাতির ভিক্ষাঝুলি যতনে পাতিয়া,
আত্ম-প্রতিষ্ঠার লাগি অহোরাত্র করি হায় হায়!
মরার পরেও চাই অমর জীবন।

জগন্নাথদেবের মন্দির (পুরী)।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

কণারকের মন্দির।

কণারকের পুরাতন সহরের চিহ্ন।
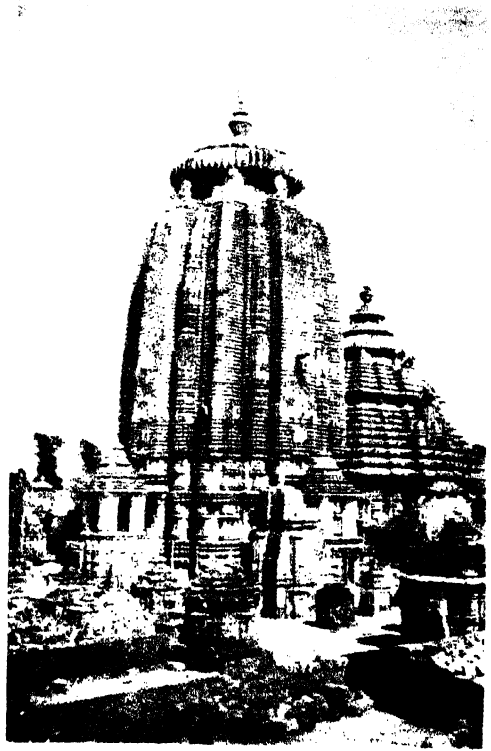
উড়িষ্যার সভ্যতার ধারা

—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

উড়িষ্যা প্রদেশটী প্রকৃতির লীলানিকেতন, একদিকে পর্ব্বতমালা সুশোভিত অরণ্যানীর শ্যামল শোভা, অন্যদিকে পার্ব্বত্য নদী সকলের সমাবেশ, নিম্নে বঙ্গোপসাগরের বিশাল বারিধি-রাশির নীলাম্বুরেখা। বাহিরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতিদেবী যেন সচেষ্ট, পশ্চিমদিকে বিন্ধ্যাচলের পর্ব্বত-মালা দ্বারা সুরক্ষিত, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে চিল্কা হ্রদ ও মান্দ্রাজ প্রদেশের পূর্ব্বঘাটের পর্ব্বতমালা, উত্তরে সুবর্ণরেখা নদী ও বঙ্গোপসাগর।

বিভিন্ন কালের বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ইহার সভ্যতার স্তর বিকশিত। অতি প্রাচীন সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় যেরূপ অক্ষুণ্ণভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যত্র সেরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না। সাহিত্যে, সামাজিক রীতি-নীতিতে, শিল্প-কলায় ও পুরাতত্ত্বে সেই বিভিন্ন সভ্যতার চিহ্ন আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। উড়িষ্যার নিজস্ব সভ্যতা বিদেশীয় সভ্যতার ভারে কোনদিনও আক্রান্ত হয় নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও এই দেশ হিন্দু রাজার অধীনে ছিল। মোগল, পাঠান, মারাঠা ও ইংরাজ শাসনে উড়িষ্যার বিশেষত্ব কোন দিন লোপ পায় নাই। ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, উড়িষ্যার সমাজতত্ত্ব, ধর্ম্ম, রাজবংশের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব উদ্ধার ও অনুশীলন করা একান্ত আবশ্যক।

উড়িষ্যার প্রাচীন সভ্যতার স্তরকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনটি প্রধান জাতীয় ধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে :—

প্রথম—অনার্য্যধারা।
দ্বিতীয়—দ্রাবিড় ধারা।
তৃতীয়—আর্য্য ধারা।

প্রথম : অনার্য্য ধারা

কোল, সাঁওতাল, কন্ধ, গণ্ড, জুয়াং, পাতুয়া, শবর, শঅর, পান, ভুঁইয়া, চিড়িয়ামা, গোথা, শিউলা, তিয়র, পাটরা, বাউরি, কণ্ডরা, ডোম, মুচি, হাড়ী, তঁঅলা, ঘুশুড়িয়া, ওড়চাষা, কেওট, মাল্লা প্রভৃতি।

অনার্য্যধারার পাথর, তাম্র, লৌহযুগের প্রত্নতত্ত্বের সামগ্রী নিম্নলিখিত স্থানে পাওয়া গিয়াছে :—

(১) তালচর—হরিচন্দ্রপুরের নিকট।

(২) আঙ্গুল—কালীয়াকোটা গ্রামে।

(৩) সম্বলপুর—বুড়াশ পল্লীর নিকট খুদার বুগা গ্রামে।

(৪) ময়ূরভঞ্জ—বঙ্গী দীপসী পর্ব্বতের নিকট, বৈতরণী নদীর পার্শ্বে খিচিং-এ, বুড়বলাং নদীর ধারে বৈদ্যপুর গ্রামে, গুলপা নদীর ধারে বগড়াপীড় গ্রামে।

(৫) বালেশ্বর—তামাজুড়ী গ্রামে।

(৬) ঢেঙ্কানল, কেঁউঝর, দশপাল্লা, বৌধ, খন্তাপাড়া, নয়াগড়, হিন্দোল, পাড়লাহা প্রভৃতি স্থানে বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি পাওয়া যায়।

জুয়াং ও পাতুয়া জাতির স্ত্রীলোকেরা আজিও স্থান বিশেষে বৃক্ষপত্র সেলাই করিয়া পরিধান করিয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, সভ্যতার কত নিম্নস্তর নিজ বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া গড়জাত মহলে আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।

দ্বিতীয় : দ্রাবিড় ধারা

মহানদী, পুরী, চিল্কা হ্রদ, গঞ্জাম প্রদেশ হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত সমুদ্রতটস্থ বিভিন্ন বন্দরের (কলিঙ্গ) অর্ণবপোত অভিযান এবং ভারত ও প্রশান্তসাগরের দ্বীপ-পুঞ্জের সভ্যতা-বিস্তার—আর্য্যসভ্যতার পূর্ব্বে। উক্ত স্থান-সমূহে আর্য্যসভ্যতার পূর্ব্বে ও পরে দ্রাবিড় সভ্যতার সংস্পর্শের নানাবিধ বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি পাওয়া যায়।

কোণার্ক হইতে পাঁচ হাজার নৌকা নবগ্রহ পূজা করিয়া বিজয়া দশমীর দিন সমুদ্র যাত্রা করিতেছে এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিন মহাসমারোহে স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছে—তাহার বর্ণনা পুরাতন উড়িয়া পুঁথিতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই প্রদেশটী ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা একদিন সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। চিল্কা হ্রদের মধ্যে "দয়া" নদী আসিয়া পড়িয়াছে এবং পুরাতন "প্রাচী" নদী "দয়া" নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। দয়া নদী ও প্রাচী নদীর দুই কূলে পুরাতন নগরীর অস্তিত্ব ও গুহাদি দৃষ্টিগোচর হয়। চিল্কা হ্রদটী প্রাচীন কালে সমৃদ্ধিশালী পোতাশ্রয় বা বন্দর ছিল—তাহা পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লাক্ষাদ্বীপ, মালদ্বীপ, সকোট্রা হইতে অর্ণবপোত আসিয়া এই হ্রদে নঙ্গর করিত। দ্রাবিড় জাতীয়েরা স্থল-পথে ও জলপথে বহির্ভারতের অনেক স্থলে উপনীত হইয়া অনেক রাজ্য অধিকার করিয়াছিল;

খৃষ্টপূর্ব্ব নয়শত বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রু কলিঙ্গ বা ত্রিকলিঙ্গের অধিবাসীরা পেগু, তেনাসেরিম, আরাকান প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিল। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের প্রাচীন দ্রাবিড় অধিবাসীরা যে আনাম অধিকার করিয়া খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিল, তাহা কর্ণেল জেরিণির গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

সেই কালে ত্রিকলিঙ্গ—উৎকল(কটক), কোঙ্গদা(পুরী), কলিঙ্গ(গঞ্জাম) - প্রদেশটি প্রবল প্রতাপান্বিত এবং সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

উড়িষ্যার সাহিত্যে, শিল্পে, মূর্ত্তিতে, মন্দিরাদি গঠনে, পূজা-পদ্ধতি ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে দ্রাবিড় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। জৈনরাজ খারবেলের উদয়গিরি পর্ব্বতের হস্তী-গুম্ফার খোদিত লিপিমালা, ভুবনেশ্বরের সর্ব্বপুরাতন শিব মন্দির, পরশুরামেশ্বর গঞ্জামের সুড়লিঙ্গের মন্দির প্রভৃতি দ্রাবিড় সভ্যতার সুস্পষ্ট চিহ্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

চোলরাজা রাজরাজ, গঙ্গাবংশীয় চোড়ঙ্গদেব ও দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ রায় প্রভৃতি দ্রাবিড় রাজ-শাসনই প্রথমে উড়িষ্যার পল্লী-সমাজে প্রধান, সরবরাহকার, পাইক, নায়েক, খণ্ডায়েৎ ও হিসাবনবিশীকরণের প্রচলন করে। জমীর খাজনার বন্দোবস্ত আদায়ের নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করে। পূর্ত্ত-কার্য্য সম্পাদনে সকলের দায়িত্ব, গোচারণ ভূমিতে সর্ব্বসাধারণের অধিকার, পঞ্চায়েৎ শাসন, গ্রাম্য সমাজ কর্ত্তৃক শিল্পী ও মজুর নিয়োগ—সবই দ্রাবিড় সভ্যতার দান।

তৃতীয়ঃ আর্য্যধারা

(১) **বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ**—ঋক্‌বেদে, মহাভারতের আদিপর্ব্বে, শান্তিপর্ব্বে, বনপর্ব্বে, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতিতে কলিঙ্গ ও তাহার রাজাদের বর্ণনা উল্লেখ রহিয়াছে।* রামায়ণেও উৎকল এবং কলিঙ্গের কথা বর্ণিত রহিয়াছে। আজ পর্য্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভ খনন করিয়া সেই যুগের নিদর্শনাদি কিছু পাওয়া যায় নাই।

(২) **প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম**—(১) ভুবনেশ্বরের নিকট খণ্ডগিরি ও উদয়গিরির পর্ব্বত-গাত্রের খোদিত গুহাসমূহ ও তাহার খোদিত লিপি ও মূর্ত্তি প্রভৃতি। আদি বোধিবৃক্ষের উপাসনা ও জৈন তীর্থঙ্করদিগের মূর্ত্তিপূজার প্রবর্ত্তন দেখা যায়।

(২) ধৌলী পর্ব্বতে সম্রাট অশোকের একাদশ অনুশাসন লিপি।

(৩) ভুবনেশ্বরের নিকট—তোসালীর (ভাস্করেশ্বর, বড়-গড় ও শিশুপালগড়ের মধ্যে) ভূগর্ভস্থ নিদর্শনাদি।

(৪) গঞ্জামে সম্রাট্ অশোকের জোগড়ের অনুশাসন-লিপি।

(৫) কাকটপুরে প্রাচীনদীতীরস্থ রাজা খারবেলের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ।

(৩) **মধ্যযুগের বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের চিহ্নাদি** -(ক) যাজপুর ও নিকটস্থ গ্রামগুলিতে প্রচুর বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি।

(খ) কটক জেলার মধ্যে ললিতগিরি, উদয়গিরি, রতন-গিরি ও অশিয়া পর্ব্বতের বিশালকায় বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রভৃতি এবং স্তূপ, গুহা ও খোদিত লিপিসমূহ। উপরোক্তস্থানে তন্ত্রোক্ত মহাযানী বৌদ্ধদিগের আধিপত্য ছিল।

(গ) পুরী জেলায় প্রাচী নদীর তটভূমিস্থ উপাদান ও চাঁদকার জঙ্গলে বৌদ্ধমূর্ত্তি।

---

* ঋক্‌বেদ (মণ্ডল (১)—১৪৭)।
মহাভারত আদিপর্ব্ব—১০৪ অধ্যায়।
ঐ শান্তিপর্ব্ব—৪ অধ্যায়।
ঐ বনপর্ব্ব—১ অধ্যায়।
ব্রহ্মপুরাণ—ত্রয়োদশ অধ্যায়, ২৯, ৩০, ৩১ শ্লোক।

(ঘ) ময়ূরভঞ্জ, ঢেঙ্কানল, বৌধ ও বালেশ্বর জেলায় বিক্ষিপ্ত নিদর্শনাদি ও বৌদ্ধস্তূপ প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়। গড়জাত মহলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে বৌদ্ধমূর্ত্তি ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু ধর্ম্মের বিকাশ

ষষ্ঠ শতাব্দীতে উড়িষ্যার কেশরী বংশের অভ্যুত্থান হয়। কেশরী বংশের রাজগণ ১১৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উড়িষ্যাদেশে রাজত্ব করেন। প্রথম হইতে এই বংশের রাজগণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিল। কেশরী বংশের প্রথম শৈব রাজা যযাতি কেশরী কর্ত্তৃক যাজপুর বা যজ্ঞপুর সহর প্রতিষ্ঠিত হয়—যাহা এককালে উড়িষ্যার ধর্ম্ম ও বিদ্যাচর্চ্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল ও তন্ত্রধর্ম্মের প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কান্যকুব্জ হইতে আনীত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা ব্রাহ্মণধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব উড়িষ্যার চতুর্দ্দিকে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। ঐ শাসনী ব্রাহ্মণগণ রাজানুগ্রহে উড়িষ্যার হিন্দু-সমাজকে নিয়ন্ত্রিত ও বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

১১৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশের রাজত্বকাল। উড়িষ্যার এই বংশের শাসনে উৎকলীয় সভ্যতা চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। ১৪৭৯ হইতে ১৫০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজা পুরুষোত্তমদেব ও ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা প্রতাপরুদ্রদেব রাজত্ব করিয়াছিলেন। গঙ্গা হইতে গোদাবরী পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এই বিশাল রাজ্যের সর্ব্বত্রই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

হিন্দুদিগের পঞ্চ-উপাসনার পঞ্চ-ক্ষেত্রের বিকাশ

(ক) **মহাবিনায়ক ক্ষেত্র**ঃ—ধানমণ্ডল (বি-এন-আর) ষ্টেশন হইতে দুই মাইল উত্তরে দর্পণগড় পর্ব্বতের উপর নির্ঝর-বিধৌত মহাবিনায়কের মন্দিরাদি ও পূজার ব্যবস্থা **—গণপতি উপাসনা।**

(খ) **অর্কক্ষেত্র**ঃ—কোণার্কের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত ভগ্নমন্দিরে সূর্য্য ও নবগ্রহ পূজার ব্যবস্থা—**সূর্য্যো-পাসনা।**

(গ) **শঙ্খক্ষেত্র**ঃ পুরুষোত্তমধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের দারুমূর্ত্তির পূজা ও ভোগরাগাদি—**বিষ্ণু-উপাসনা।** এখানে তন্ত্র, স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব যুগের প্রভাব দেখা যায়। বিশেষতঃ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও চৈতন্যদেবের ধর্ম্মপ্রভাব ত্রিবেণী সঙ্গমের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়াছে।

পদ্মক্ষেত্রঃ—ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মূর্ত্তির (স্বয়ম্ভু লিঙ্গ) মনোহর মন্দিরাদি তাঁহার পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা **—শিবোপাসনা।**

(ঙ) **বিরজা ক্ষেত্র**ঃ—তন্ত্রোক্ত মহাপীঠে মহিষ-মর্দ্দিনী বিরজাদেবীর মূর্ত্তি, দেবীর নাভিকুণ্ডে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা—বৈতরণীর নদী ও সপ্তমাতৃকা ইত্যাদি—**শক্তি-উপাসনা।**

মহানদার অপর পার্শ্বে কটকের পূর্ব্বদিকে চৌদুয়ার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, কটক সহরের বারবাটী দুর্গ, ময়ূরভঞ্জে খিচিং-এর ভগ্ন মন্দির ও উড়িষ্যার সর্ব্বত্রই বহু মন্দিরাদি হিন্দুদিগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

পাঠান, মোগল, মহারাষ্ট্র ও বাঙ্গালী সভ্যতার নিদর্শনাদি সাহিত্যে, শিল্পে ও সামাজিক রীতিনীতিতে দৃষ্টিগোচর হয় এবং তৎকালীন ঐতিহাসিক উপাদানাদি আজিও অতীত যুগের সাক্ষ্য স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

উড়িষ্যার বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব, মগ-প্রবর্ত্তিত সূর্য্যপূজা, মহাযান বৌদ্ধ-তান্ত্রিক মারিচীর পূজা, সুব্রহ্মণ্যের পূজা, তান্ত্রিক মহিষমর্দ্দিনীর পূজা, নরসিংহের পূজা, শঙ্করাচার্য্যের শৈব-ধর্ম্মের ও রামানুজ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব—এ প্রদেশের সঙ্গে মুলতান, চীন, তিব্বত, দাক্ষিণাত্য, আসাম ও বঙ্গদেশের সহিত প্রাণের যোগের পরিচয় পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ধর্ম্ম-ইতিহাস লিখিত হইলে ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা অনেকটা পরিস্ফুট হইবে, কারণ ভারতের সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের চিহ্ন এই খানেই পুঞ্জীভূত রহিয়াছে।

১৫১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উড়িষ্যায় আগমন করিয়া পরবর্ত্তী আঠার বৎসর কাল পুরীর সাগরতীরে অতি-বাহিত করেন। একজন মহাপুরুষের আদর্শে ও তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে সমগ্র জাতীয় জীবন কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত এই সময়ের ইতিহাসে দেখা যায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবেই উৎকল-বাসীর জীবন-সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। সুখে দুঃখে, জীবনে মরণে

উৎকল বাসীরা শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর একান্ত শরণাপন্ন হইয়া থাকেন—উৎকলের গ্রাম্য জীবনে দেখা যায় যে, সমগ্র উৎকলবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর বিশাল পরিবাররূপে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য মহাত্মা জগন্নাথ দাস বিরচিত "উড়িয়া ভাগবত" আজিও উড়িষ্যার গৃহে গৃহে দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি "ভাগবত-ঘর" আছে। এই ঘরটি সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামবাসিগণ এই গৃহে মিলিত হইয়া ভাগবত পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন এবং কীর্ত্তনাদি করেন। জগন্নাথ দাস প্রভৃতি সাধুগণের চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম উড়িষ্যায় আপামরসাধারণের ধর্ম্ম হইয়াছিল।

ধর্ম্মের নীচেই বাঙ্গালীদের শ্রেষ্ঠদান সাহিত্য—উৎকল সাহিত্যে বঙ্গসাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত ভাবে দেখা যায় এবং তাহার ছায়ায় ইহা পরিপুষ্ট। বর্ত্তমান উৎকল সাহিত্যে উৎকলবাসী বাঙ্গালী কবি রাধানাথ রায় কাব্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রীগৌরীশঙ্কর রায় উৎকল ভাষার কত যে উপকার করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করা সুকঠিন। তিনিই প্রথমে "উৎকলদীপিকা" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রচলন করেন। তাঁহার ভ্রাতা রায় বাহাদুর রামশঙ্কর রায় উড়িষ্যার সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার—তিনি বহু নাটক রচনা করিয়াছেন।

উড়িষ্যার শিল্প, চিত্র ও স্থাপত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার সভ্যতা, তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য, উৎকর্ষতা ও মাধুর্য্য লইয়া বিকশিত হইয়াছে। উড়িষ্যার শিল্পীদের ধ্যান-পরায়ণ কঠোর সাধক বলিলে অত্যুক্তি হয় না—কারণ তাঁহাদের শিল্পে সৌন্দর্য্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের রেখাপাতের মধ্যে ধ্যানযোগীর অন্তর-সৌরভটুকু ধরিয়া দেয়। অন্যদিকে এই গৌরবময় জাতির সহিষ্ণুতার ও তিতিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দেয় তাহার বিশালকায় স্থাপত্যের ছন্দ ও লালিত্য।

উড়িষ্যা প্রদেশটি বিভিন্ন সভ্যতার একটি যাদুঘর বা শিল্প-সাধনার রঙ্গমঞ্চ—যেখানে দর্শক তাহারই স্থলে জলে, পর্ব্বতে কন্দরে, গ্রামে জঙ্গলে বিচিত্র লীলার অভিনবত্ব দর্শন করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যায়। এখানে সভ্যতার প্রত্যেক স্তরের জাজ্বল্যমান নিদর্শনাদি রহিয়াছে। অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে উড়িষ্যার কর্ম্মভূমি বিশাল ও বিচিত্র। মানব-সভ্যতার ইতিহাসের বহুতর মূক সাক্ষ্য ইহার ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে। কৃতবিদ্য ঐতিহাসিকের সচেষ্ট অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে উড়িষ্যার ভূগর্ভস্তর হইতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে খনন-কার্য্য-দ্বারা মানব-সভ্যতার অজ্ঞাত রহস্যাবৃত দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে।

দূর্ব্বা

—শ্রীহলধর মুখোপাধ্যায়

সবুজ সরল বন্ধু ওগো, তুই সবার চরণতলে,
মরণকোলে পড়ছ লুটি' নীরব রাখি অটুট বলে।
গর্ব্ব নাহি, দর্প নাহি, বিদ্রোহীরে করছ সখা,—
পায়ের তলে লুপ্ত করি' আপন শ্যামল অচল রেখা!

বন্ধু, তুমি সমাজ-দেহের আসনতলে শুভ্র তারা,
তোমার হাসি, বিরাট বাঁশী, নাইক বাঁধন নাইক কারা।
অচিন বাঁধন ছিন্ন হবে বুকে যেদিন জ্বলবে আলো,—
বিরাট সখা, ত্যাগের রাজা, তোমার প্রদীপ বক্ষে জ্বালো!

বিরাট মহান বিশাল যে সুর রাখেন তোমায় আপন শিরে,
বন্ধু, তুমি তুচ্ছ নহ, আছ ধরার অর্ঘ্য ঘিরে!

ভারতের নূতন যুগ

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতনে স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতার একাংশ :—···কবিগুরু ও মহাত্মাজীর প্রভাবেই ভারতের নূতন যুগ অধিকাংশে প্রভাবিত হইয়াছে দেখা যায়। ··

এপিঠ ও ওপিঠ

—শ্রীঅমলা দেবী

স্থান—পশ্চিম-বঙ্গের কোন একটি সহরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ এ. বোস, অর্থাৎ অনুপম বোস আই. সি. এস.-এর বাংলো—নাতিবিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটি নাতিবৃহৎ একতল গৃহ। কাল—রাত্রি তিনটা। একটি কক্ষের উপরে পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সের একজন যুবক নিদ্রিত। ইনিই মিঃ এ. বোস। ইনি অত্যন্ত পীড়িত; আজ তিন সপ্তাহ ধরিয়া ইঁহার টাইফয়েড্ চলিতেছে। পালঙ্কের পাশেই একটি ইজি-চেয়ারে সাতাশ আটাশ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে শুইয়া আছে। এটী একজন নার্স, নাম মণিকা দাস। মিঃ বোসের শুশ্রূষার জন্য ইহাকে কলিকাতা হইতে আমদানী করা হইয়াছে। খান কয়েক চেয়ার, একটি টেবিল ও গোটা দুই টিপয় ছাড়া কক্ষটীতে আসবাবপত্রের বিশেষ বাহুল্য নাই। টেবিলের উপর রোগীর আহার, ঔষধ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সজ্জিত, একটি টিপয়ের উপর একটি কাঁচের কুঁজা—একটু দূরে আর একটি টিপয়ের উপর সবুজ রঙের ঘেরাটোপ দেওয়া একটি আলো, তাহারই মৃদু আলোকে কক্ষটীকে একটী আবেগহীন স্বপ্নাচ্ছন্নতা দান করিয়াছে।

"মা" বলিয়া রোগী পাশ ফিরিয়া শুইতেই মণিকা তড়াক্ করিয়া উঠিয়া আসিয়া, রোগীর পাশে বসিয়া কহিল, "মিঃ বোস, কোন কষ্ট হচ্ছে?"

মিঃ বোস ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন, "হচ্ছে, মিস্ দাস।"

"আজ তো বেশ ঘুমিয়েছিলেন, মিঃ বোস। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছেন—"

"ঘুমিয়েছি কিন্তু অনেকক্ষণ নয়, একটুখানি, জেগে দেখলুম আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। অনেক রাত্রির জাগরণের পর একটুখানি বিশ্রাম—নষ্ট করে দিতে ইচ্ছে হল না, প্রাণপণে চুপ করে তাই পড়ে আছি···কটা বেজেছে মিস দাস?"

মণিকা তাহার হাত-ঘড়ি দেখিয়া কহিল, "তিনটে বাজতে যাচ্ছে—"

"আজও তা হলে এলেন না। আপনি চিঠি লিখে ছিলেন ত' মিস দাস?"

"হ্যাঁ মিষ্টার বোস। আপনি যে দিন বলেছিলেন, সেই দিনই লিখেছি।"

"হয় ত আসবেন না—আমি ত' ভাল ব্যবহার করি নি—"

"ঠিক আসবেন, মিঃ বোস। ছেলে বদ্লাতে পারে, কিন্তু মা কি বদ্লায়?"

"বদ্লায় না—না মিস দাস? ঠিক তাই। একবার আমরা—আমি, মীরা, আমার শ্বশুর, শাশুড়ী, আরও জনকয়েক—আমাদের গাঁয়ের ষ্টেশন দিয়ে যাচ্ছিলুম; মা কি করে খবর পেয়ে আমার এক মামাতো ভাইকে নিয়ে দেখা করতে এসেছিলেন। আমার ভাই আমাকে ডাকল, আমি তার সঙ্গে মেয়েদের ওয়েটিং-রুমে গিয়ে দেখি, মা দাঁড়িয়ে আছেন, প্রণাম করতে যেতেই বুকে জড়িয়ে ধরে ঝর্‌ঝর্ করে কেঁদে ফেললেন, বললেন, 'একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছিস্? একটুও মনে পড়ে না আমাকে?' মিষ্টার বোসের কণ্ঠস্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "জানালাটা একটু ভাল করে খুলে দিন না, মিস্ দাস।"

মিস দাস জানালাটা খুলিয়া দিয়া আসিয়া পাশে বসিয়া কহিল, "আরও একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, মিঃ বোস।"

"ঘুম আমার আসবে না, মিঃ দাস!"

"আসবে, মিঃ বোস। চোখ বুজে চুপটি করে থাকুন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

মণিকা অনুপমের লম্বা, রুক্ষ চুলগুলিতে আঙুল ঢুকাইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণের জন্য দুইজনেই নিঃশব্দ। কিছুক্ষণ পরে মিঃ বোস কহিলেন, "মা ঠিক এমনি করে হাত বুলিয়ে দিতেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী যেতাম, দুপুর বেলায় সব কাজ সেরে মা আমার ঘরে আসতেন, আমার পাশে বসে

আমার চুলে তাঁর নরম আঙ্গুলগুলি দিয়ে বিলি কাটতেন, মার কোলে মাথা দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম……মনে হয়, কতদিনের কথা—যেন আর এক যুগের—এক জন্মের কথা—"

মণিকা বলিল, "আর কথা বলবেন না, মিঃ বোস্। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।"

অনুপম কহিলেন, "ঘুমোতে পারছি না, মিস দাস। ঘুম আজ আমার কিছুতেই আসবে না।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার এত বড় অসুখের খবর পেরেও মা এলেন না—অথচ যখন স্কুলে পড়তাম তখন একবার রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে মা আট দশ মাইল হেঁটে আমাকে দেখবার জন্যে ছুটে গিয়েছিলেন; স্কুল থেকে ডাকিয়ে আমাকে একেবার দেখে তখনই এতখানি রাস্তা হেঁটে আবার বাড়ী ফিরে গিয়েছিলেন।… মিস দাস, আপনার মাকে আপনি খুব ভালবাসেন, না?"

"মাকে কে না ভালবাসে, মিঃ বোস?"

"আপনার মাও আপনাকে খুব ভালবাসেন?"

"হ্যাঁ মিঃ বোস। আমি ছাড়া আমার মা-এর আর তো কেউ নেই—"

"আমার মা-এরও তাই—মিস দাস। আমাকে কোলে নিয়ে বিধবা হন; মামাদের আশ্রয়ে থেকে কত দুঃখে যে আমাকে মানুষ করেন, তা আমি এখন বুঝতে পারি—" দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া, "লোকে বলে, মানুষ আমি হয়েছি, মিস দাস। কিন্তু মার দুঃখ এখনও ঘোচেনি—কি কষ্টের জীবন! ভোর হতে রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত রান্নাঘরে কাটে, একাদশীর দিনও ছুটী নেই, তবু মামীমাদের মন পান্ না—"

"একটা কথা বল্‌ব, মিঃ বোস? কিছু মনে করবেন না?"

"বলুন।"

"আপনি তো ইচ্ছে করলেই মায়ের দুঃখ ঘোচাতে পারেন।"

"ইচ্ছে করলেই সব জিনিষ করতে পারা যায় না, মিস দাস। বৃন্তচ্যুত ফলকে বৃন্ত কি ডেকে ফেরাতে পারে, না, ফলই ইচ্ছে করলে ফিরে যেতে পারে?"

অনুপম চক্ষু মুদিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। মিস দাস কিছুক্ষণ পরে উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ মিঃ বোস ডাক দিলেন, "মিস দাস।"

মণিকা উঠিয়া বসিল। মিঃ বোস কহিলেন, "মনে হল, একটা গাড়ী আমাদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াল—দেখুন না?"

মণিকা জানালার কাছে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, "হ্যাঁ তাইতো! একটা ঘোড়ার গাড়ী বলে মনে হচ্ছে—"

অনুপম দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিলেন, "সত্যি! তা হলে নিশ্চয় মা এসেছেন—" মিনতি করিয়া কহিলেন, "একটি বার গিয়ে দেখুন না—মিস দাস।" মিস দাস চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল। তাহার পশ্চাতে একজন বিধবা মহিলা কুণ্ঠিত চরণে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়স চল্লিশ পার হইয়া গেছে; মুখখানি কৃশ ও ম্লান; দুই চোখে উদ্বেগাকুল দৃষ্টি। তাঁহার পরিধানে থান কাপড়, গায়ে একটা মোটা চাদর, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন।

অনুপম দুই হাতে ভর দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেই মিস দাস তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া কহিল, "উঠবেন না, মিঃ বোস। মা ত' আপনার এসে গেছেন—" বিধবার দিকে তাকাইয়া কহিল, "আপনি এখানে বসুন—" মিস দাস বাহিরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে বেলা আটটার সময়ে মিসেস্ বোস, অর্থাৎ শ্রীমতী মীরা বোস শয়ন-কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার বয়স কুড়ির বেশী নয়; লম্বা ছিপছিপে গঠন; গায়ের রং দুধ-আলতা-গোলা না হইলেও ফর্সা বলা চলে; অবিশ্রান্ত ঘষা-মাজার ফলে গাত্রচর্ম্ম সুচিক্কণ; পটল-চেরা চোখ নহে বলিয়া দিবারাত্র চশমা ব্যবহার করেন।

অদূরে বারান্দায় ডেক-চেয়ারে মিস দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মিসেস বোস আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "আপনি এখানে! মিঃ বোস কেমন আছেন?" মিস

দাস সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভালই আছেন, মিসেস বোস।"

"কাল রাত্রে কেমন ছিলেন ?"

"টেম্পারেচার আর বাড়েনি, তবে ভারি ছট্‌ফট্ করেছিলেন। ঘুমুতে পারেন নি। ভোর বেলায় মা এসে পৌঁছলেন ; তারপর থেকে বেশ ঘুমুচ্ছেন—"

বিস্মিতকণ্ঠে মিসেস বোস কহিলেন, "মা! কার মা ?"

"মিঃ বোসের—"

"সত্যি না কি! কি মুস্কিল!" দারুণ বিরক্তিতে মিসেস বোসের মুখখানি আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিতে লাগিলেন, "পাড়াগাঁ-এর লোকের কি কাণ্ড দেখুন, কোন খবর দেওয়া নেই, দুম্ করে এসে পড়লেন। পাড়াগেঁয়ে বিধবা—কোথায় রাখি কি বা খাওয়াই—বাড়ীতে বামুন নেই, ঝি নেই, যারা আছে তাদের জল উনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করবেন না—তার ওপর নানান হাঙ্গাম্, ভারী ফ্যাঁসাদে পড়লুম আমি"—বলিয়া রোগীর কক্ষের দিকে চলিয়া গেলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া মিসেস বোস ললাটের কুঞ্চন-রেখাগুলিকে যথাসাধ্য মসৃণ করিয়া তুলিলেন এবং শয্যাপার্শ্বে গিয়া মাকে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কহিলেন, "আপনি কখন এলেন ?" মা অনুপমের মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে পাখা করিতেছিলেন, অনুপমের একটি হাত তাঁহার কোলে পরম নির্ভরতার সহিত পড়িয়া ছিল।

মা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, "ভোরে এলাম, মা। তুমি বেশ ভাল আছ ?"

"আমার আবার ভাল থাকাথাকি কি ? দেখছেন তো কি বিপদ্। হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলেন, একা মানুষ কি করে যে রাত-দিন কেটেছে, তা আমিই জানি। তারপর বাবা খবর পেয়ে একজন নার্স নিয়ে এলেন। আপনি কেমন করে খবর পেলেন ?"

"ছেলের অসুখ মা-এর কি খবর পেতে হয় মা। মন আপনি জানতে পারে —"

"তা ত' পারেই।" একটু মুচকি হাসিয়া, "আর দিন কয়েক পরে এলেই কিন্তু একেবারে সুস্থ শরীরে দেখতে পেতেন।" তারপর গম্ভীর হইয়া মিসেস বোস কহিলেন, "সারারাত জেগে এসেছেন, বিশ্রাম করুন গে, এখন পাখা করবার দরকার হবে না।" মা তেমনি পাখা করিতে লাগিলেন।

মিসেস্ বোস মিষ্টার বোসের মাথার কাছে গিয়া কপালে হাত দিয়া, উত্তাপ বোধ করিয়া কহিলেন, "জ্বর খুব কম মনে হচ্ছে।" মাকে কহিলেন, "আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন, আমি বিছানাটা একটু ঠিক করে দি।" মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মিসেস্ বোস বিছানার চাদরের প্রান্তদ্বয় একটু টানিয়া সমান করিলেন এবং হাত বুলাইয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া দিতে গিয়াই দেখিলেন, বালিশের নীচে শালপাতায় মোড়া কি একটা রহিয়াছে। টানিয়া বাহির করিয়া মাকে দেখাইয়া কহিলেন, "এটা কি ?"

মা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, "নারায়ণের পূজার ফুল, মা। অনুর জন্যে এনেছি। তা'ছাড়া আমাদের মা চণ্ডীর কাছে অনুর নামে পূজো দিয়ে মাদুলী নিয়ে এসেছি। ঐ যে, অনুর হাতে রয়েছে —" মিসেস্ বোস দেখিলেন—অনুপমের দক্ষিণ বাহুতে একটি কালো সূতায় একটি তামার মাদুলী বাঁধা রহিয়াছে। মিসেস্ বোস গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্নোমেত্ত, প্রসাদ, আনেন নি ?"

"এনেছি বৈকি মা! অনুকে খাইয়ে দিয়েছি—" মিসেস বোস চম্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "কি বললেন ? খাইয়ে দিয়েছেন! জানেন, আপনার ছেলের টাইফয়েড হয়েছে ? আজ কুড়ি দিন তাঁকে শুধু জল খাইয়ে রাখা হয়েছে ? আর আপনি কতকটা পচা জল আর নোংরা মিষ্টি তাঁকে খাইয়ে দিয়েছেন !"

মা অত্যন্ত কাঁচু-মাচু হইয়া কহিলেন, "না মা একটু-খানি—"

মিস দাস কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার দিকে তাকাইয়া মিসেস বোস কহিলেন, "কি বলছেন, শুনুন। একটুখানি! একটা ছুঁচের মুখে লক্ষ লক্ষ জীবাণু থাকে।" মা-এর দিকে তাকাইয়া কহিলেন,

"যাক্‌গে, আপনি ও সব বুঝবেন না। যা করেছেন ভালই করেছেন, এর পর আপনি আপনার ছেলে নিয়ে থাকুন, যা ইচ্ছে হয় খাওয়ান, আরও কতকগুলো মাদুলী কবচ এনে সর্ব্বাঙ্গে বেঁধে দিন। আমি চললুম, এ সবের মধ্যে আমি নেই—" বলিয়া মুখ কালো করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। মিস দাস মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ?"

মা অত্যন্ত অপ্রতিভ কণ্ঠে কহিলেন, "কি জানি মা! আমি বুঝতে পারি নি, এতে এত ক্ষতি হবে। আমাদের বাড়ীতে নারায়ণ আছেন, তাঁরই একটুখানি স্নান-জল মাথায় দিয়েছি, একটুখানি প্রসাদ মুখে দিয়েছি। আমাদের বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ হলে আমরা তাইই দিই। এত ডাক্তার দেখাবার পয়সা তো নেই, মা। তা' ওতেই আমাদের সব সেরে ওঠে। হ্যাঁ মা! সত্যিই কি এতে ক্ষতি হবে ?"

মিস্ দাস কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মিসেস বোসকে আবার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া থামিয়া গেল। মিসেস বোস কাছে আসিয়া মাকে কহিলেন, "দেখুন, আমি আপনাকে একটা কথা বলি। আপনাদের খবর দেবার আমার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেমন করেই হোক, খবর পেয়ে যখন এসেছেন, তখন উপায় নেই। কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলবেন না যে, এটা আপনার বাপের বাড়ী নয় যে, কবচ-মাদুলী আর জড়ি-বড়ি এখানে চলবে। এটা একটা হাকিমের বাড়ী; এখানে যারা আসে যায়, তারা আপনার পাড়াগাঁ-এর চাষা-ভুষো নয়, ভদ্রলোক, তাদের সামনে কবচ-মাদুলী পরিয়ে ওঁকে বের করতে আমি পারব না, তাতে আপনি যা-ই মনে করুন।···আর দেখুন, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, ততদিন আমার রুচিমত ওঁকে চলতে হবে—আমি মরবার পর আপনারা যা' ইচ্ছে করবেন, আমি দেখতে আসব না।" বলিয়া গট্‌গট্ করিয়া আসিয়া অনুপমের বাহু হইতে মাদুলীটা একটানে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া মেজের উপর ছুড়িয়া দিলেন এবং তার পর পাতার মোড়কটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আপনি তুলে রাখুন, এ সব এখানে চলবে না।" মিস দাসকে কহিলেন, "এঁর সঙ্গে গল্প করলেই চলবে না, মিস দাস। সাহেবকে উঠিয়ে মুখ ধোয়াবার, ওষুধ খাওয়াবার ব্যবস্থা করুন, ডাক্তার সাহেবের আসতে দেরী নেই—" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মা প্রস্তরমূর্ত্তির মত জানালার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন। তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া, মেজের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া, মাদুলী ও ফুলের মোড়কটী কুড়াইয়া মাথায় ঠেকাইলেন এবং সেগুলিকে চাদরের খুঁটে বাঁধিয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিস্ দাসকে কহিলেন, "মা! আমি তাহলে যাই।"

মিস্ দাস আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "সে কী? কোথায় যাবেন ?"

"বাড়ী ফিরে যাই মা! আমার তো দেখা হল—"

"আপনি কি পাগল হয়েছেন, মা! একটু বিশ্রাম পর্য্যন্ত করেন নি—"

মা একটু হাসিয়া কহিলেন, "বিশ্রাম! এখনও সময় হয় নি—মা।" তার পরই গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "মা! আমাকে বেরিয়ে যাবার রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দাও—"

যাইতে উদ্যত হইয়াই মা আবার ফিরিয়া অনুপমের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অনুপমের ঘুমন্ত, শীর্ণ মুখের দিকে তাকাইতেই প্রবল ক্রন্দনোচ্ছ্বাস তাঁহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু দুই ঠোঁট দৃঢ়ভাবে চাপিয়া তিনি তাহা রোধ করিলেন। তার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া, একবার নত হইয়া অনুপমের ললাট স্পর্শ করিয়া বোধ করি তাহার মঙ্গল প্রার্থনা করিলেন। তার পর মিস দাসের কাছে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "মা! আমি যাচ্ছি—অনু সেরে উঠলে, তাকে নিজের হাতে আমাকে একখানি চিঠি লিখতে ব'লো—"

বলিয়া আর কোন দিকে না তাকাইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

*

দশ বৎসর পরে। মিঃ এ. বোস এখন কোন এক জেলার জজ সাহেব। অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যবহারের জন্য তাঁহার অধীন কর্ম্মচারীরা সকলেই তাহার প্রশংসা করে। কিন্তু সামাজিকতার দিক্ দিয়া তিনি সহরের

সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কারণ 'মেলামেশা' সম্বন্ধে মিসেস বোসের আইন-কানুন অত্যন্ত কড়া। জন কয়েক সিভিলিয়ান এবং দুই চারিজন বিলাতী ঢংওয়ালা উকীল,ডাক্তার ছাড়া কাহারও তাঁহার ড্রয়িং রুমের চৌকাঠ পার হইবার সাধ্য নাই। মিসেস বোসের মত এই যে, হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণেরা যেমন অতি সন্তর্পণে আপনাদের সামাজিক মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিতেছে, ঠিক তেমনি-ভাবে দেশী সিভিলিয়ানদেরও চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রচনা করিয়া নিজেদের পদমর্য্যাদাকে সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে হইবে। যে হস্ত শাসন-রজ্জু ধারণ করিতেছে, যাহাকে-তাহাকে চা-সিগারেট পরিবেশন করিবার দুর্ম্মতি সেই হস্তের যেন কোনদিন না হয়। তাই, মিঃ বোসের আত্মীয়-স্বজনকে কোনদিনই তিনি আমল দেন নাই। অবশ্য মিঃ বোসের মা যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিন সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল ভগবান্ তাঁহাকে নিশ্চিন্ত করিয়াছেন।

ফাল্গুন মাস। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। টেনিস খেলা শেষ করিয়া মিঃ বোস ও মিসেস বোস বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লনে বসিয়া গল্প করিতেছেন। ঝিরঝির করিয়া বাতাস বহিতেছে, নির্ম্মল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ডালে বসিয়া কোকিল ডাকিতেছে এবং মিসেস বোসের প্রিয় এসেন্সের সুরভি সকলের নাসিকা-রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করিতেছে। এ অবস্থায় ভাবাকুলতা অনিবার্য্য। কাজেই গল্পস্রোত ক্রমে মন্থর হইয়া আসিতে লাগিল এবং অবিবাহিত তরুণ আই-সি-এস মিঃ নন্দী ইজি চেয়ারে লম্বা হইয়া শুইয়া গুন গুন করিয়া একটী বিলাতী গানের সুর ভাঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু শেষে সুবিধা করিতে না পারিয়া মিসেস বোসকে কহিলেন, "মিসেস বোস। একটা গান করুন—"

মিসেস বোস পার্শ্ববর্ত্তী ডাক্তার সাহেব (ইংরাজ আই-এম-এস নহেন, দেশী ডিগ্রী-ওয়ালা সরকারী বাঙ্গালী ডাক্তার, বিলাত না যাইয়াও পুরোপুরি সাহেব) মিঃ বনার্জ্জীর সহিত মৃদুকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন। মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, মিঃ নন্দী। আজ আমার গলার অবস্থা ভাল নয়।"

মিঃ নন্দী উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "কি হয়েছে মিসেস বোস ?"

মিসেস বোস মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "সাংঘাতিক কিছুই হয় নি, একটুখানি ধরেছে ; কাল রাত্রে ঘুমুতে পারিনি।" মিঃ নন্দীর মুখে নিদারুণ উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল। মিসেস বোস বলিতে লাগিলেন, "বেবি কাল সারা রাত্রি কেঁদেছে, আয়া সামলাতে পারে নি, আমাকে সারা রাত্রি জাগতে হয়েছে।" বেবি বোস-দম্পতীর একমাত্র পুত্র, বয়স চার অথবা পাঁচ।

অতএব এই সংবাদে মিঃ বোস ছাড়া সকলকেই উদ্বিগ্ন হইতে হইল। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কি হয়েছে বেবির ?"

ডাক্তার সাহেব উত্তর দিলেন, "কিছুই হয়নি, টীকে দেওয়া হয়েছিল, বোধ হয় তারই reaction-এ একটুখানি জ্বর হয়েছে।"

টীকে ? সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে পড়িয়া গেল, সহরে বসন্তের মহামারী চলিতেছে, গৃহে গৃহে রোগীর ক্রন্দন। ফলন্ত গাছের ডাল ধরিয়া নাড়া দিলে যেমন কাঁচা, পাকা ফল নির্ব্বিচারে ঝরিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি মৃত্যু যেন নির্ম্মমভাবে নাড়া দিয়া এই সহরের লোকগুলাকে নির্ব্বিচারে জীবন-বৃক্ষ হইতে ঝরাইয়া দিতেছে। ফাল্গুন-জ্যোৎস্না যে মায়াজাল সৃষ্টি করিতেছিল, তাহা খান্ খান্ হইয়া ছিঁড়িয়া গেল। সকলে চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং 'বেশী রাত্রিজাগা ঠিক নয়' বলিয়া একে একে উঠিয়া গেলেন। কেবল ডাক্তার সাহেবকে মিসেস্ বোস ধরিয়া রাখিলেন।

ডাক্তার সাহেব বেবিকে দেখিয়া কহিলেন, "জ্বর একটু রয়েছে, কাল সকালে নিশ্চয়ই রেমিশান হবে, চিন্তার কোন কারণ নাই।"

কিন্তু তাহার পরদিনও জ্বর ছাড়িল না, বরং বাড়িতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব দেখিয়া কহিলেন, "টাইফয়েড যদি না হয়, তো বসন্ত বেরুতে পারে।" মিষ্টার বোস শুষ্ক মুখে কহিলেন, "টীকে দেওয়া হয়েছে, তবু —" ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "টীকে দেওয়াতেও বিশেষ সুবিধে হচ্ছে

বলে মনে হচ্ছে না; দুবার টীকে দেবার পরেও বসন্ত হয়েছে বলে রিপোর্ট পেয়েছি—"

মিসেস বোস মুখ কালী করিয়া কহিলেন, "পাব্লিক্-এর কথা ছেড়ে দিন; যে-সে যেমন তেমন করে ফুঁড়ে দেয়; কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তো তা নয়, মিঃ ব্যানার্জ্জী। আপনি নিজে সমস্ত রকম 'প্রিকশন' নিয়ে টীকে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যদি রোগ হয়, তবে আপনাদের সায়েন্স অত্যন্ত বাজে বলতে হবে—"

যে সায়েন্সের জোরে মিঃ ব্যানার্জ্জি ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ছেলে হইয়া সাহেব বনিয়াছেন, মোটর চড়িতেছেন, মুরগী খাইয়া পিতৃপুরুষকে চরিতার্থ করিতেছেন, সেই সায়েন্সের নিন্দা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তিনি মৃদু হাস্য করিলেন; কহিলেন, "সায়েন্সের দোষ কি, মিসেস বোস! টীকে দিলেই বসন্ত হবে না, এ কথা সায়েন্স কোন দিনই বলে না। শরীরে রোগের বিষ ঢুকে যাবার পর টীকে দিলে বসন্ত বেরুবে, তবে তা মারাত্মক হবে না—"

"অর্থাৎ, আপনি বলতে চান যে, বেবির শরীরে টীকে দেবার পূর্ব্বেই বিষ ঢুকেছিল?"

"তা ছাড়া আর কি হতে পারে? অবশ্য যদি বসন্ত হয়—"

"কিন্তু ঢুকবে কি করে? আমরা সতর্কতার ত্রুটি করি নি—"

"তা নিশ্চয়ই করেন নি। কিন্তু আপনার বাড়ীতে আপনারা ছাড়া আরও অনেকে থাকে—আয়া, খানসামা, চাকর, মেথর, তারা নিশ্চয়ই খুব সতর্ক নয়, সহরের মধ্যেও তারা যাওয়া-আসা করে। কিন্তু···আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন, মিসেস বোস! বেবির যে বসন্ত হবেই তা' কে বলছে? দু'চার দিনের মধ্যে জ্বর রেমিশান্‌ও হয়ে যেতে পারে—"

মিসেস বোস চুপ করিয়া রহিলেন, খুব সান্ত্বনা পাইলেন বলিয়া মনে হইল না। মিষ্টার বোস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিলেন। শান্ত, অবিচলিত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি তা' হলে বলতে চান্ যে বেবির বসন্ত হলেও তা' মারাত্মক হবে না?"

ডাক্তার গম্ভীরভাবে কহিলেন, "অন্ততঃ আমার তাই বিশ্বাস—"

মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইয়া মিসেস বোস তাচ্ছিল্যের সহিত হাসিয়া কহিলেন, "ওঁর বিশ্বাস! উনি নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না—"

ডাক্তার সাহেব জবাব দিলেন না।

মিষ্টার বোস কহিলেন, "হোমিওপ্যাথিতে কিছু সুবিধে হতে পারে কি?"

ডাক্তার সাহেব জবাব দিলেন, "হোমিওপ্যাথির খবর জানিনে, মিষ্টার বোস। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, শরীরে এ রোগের বিষ একবার ঢুকলে এর আত্মপ্রকাশে বাধা দেবার ক্ষমতা কোন 'প্যাথি'রই নেই—"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আমি ও-বেলায় আবার আসব, আপনারা তাড়াতাড়ি কিছু করবেন না। বসন্ত না হতেও পারে, আর হলেও ভয় নেই, আমি আবার বলছি।"

মিসেস বোস দুই ঠোঁট চাপিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। মিষ্টার বোস ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে বাহির হইয়া গেলেন।

মিঃ বোস ফিরিয়া আসিলে মিসেস বোস কহিলেন, "তোমার ডাক্তার সাহেব কি বললেন?"

বোস সাহেব কাঠগড়ার আসামীর মত জবাব দিলেন, "বললেন, ভয় নেই—"

তীক্ষ্ণস্বরে মিসেস বোস কহিলেন, "তুমি এর পর নিশ্চিন্ত হয়ে কোর্টে যাবে তো?"

মিঃ বোস মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "কোর্টে তো যেতেই হবে—"

মিসেস বোস বোঁ করিয়া অর্দ্ধপাক ঘুরিয়া গিয়া কহিলেন, "কোর্টে যেও, আমি কিন্তু বেবিকে নিয়ে দুপুরের গাড়ীতে ক'লকাতায় চলে যাব—"

মিঃ বোস মরিয়া হইয়া কহিলেন, "তুমি পাগল হয়েছ না কি?"

পুনরায় উল্টাদিকে অর্দ্ধপাক ঘুরিয়া মিসেস বোস দুই চোখে বিদ্যুৎ হানিয়া কহিলেন, "পাগল! কি আমাকে করতে হবে শুনি? বেবির যদি এখানে বসন্ত হয়, দেখবে

কে? তুমি, না, ঐ ডাক্তার? তুমি নিশ্চিন্ত মনে কোর্টে গিয়ে হাকিমী করবে, আর ডাক্তার দুবেলা এসে চা আর সিগারেট ধ্বংস করবে আর বিষ্ণের বহর দেখাবে। তারপর যদি কিছু হয়, ও ওর ডাক্তারী শাস্ত্র খুলে দেখিয়ে দেবে যে ঠিকই হয়েছে—" কিছুক্ষণ মিঃ বোসের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া শ্লেষের সহিত কহিলেন, "দাঁড়িয়ে থাকলে কেন, কোর্টের দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—"

মিঃ বোস সভয়ে কহিলেন, "গিয়েই চলে আসবার চেষ্টা করব…আর দেখ, ক'ল্কাতা গিয়ে কাজ নেই, সেখানেও তো সবাই বিব্রত হয়ে পড়বেন—"

মিসেস বোস তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "তোমাকে তার জন্যে মাথা ঘামাতে হবে না—" বলিয়া বেবির ঘরে চলিয়া গেলেন।

মিষ্টার বোস কোর্টে যাইবার কিছুক্ষণ পরে খানসামা জমীরুদ্দিন মিসেস বোসের শয়নকক্ষের দরজায় আসিয়া গলা ঝাড়িল। মিসেস বোস বেবির কাছে বসিয়া ছিলেন। কহিলেন, "কে?"

"হুজুর আমি—" বলিয়া জমীর পর্দ্দাটা ফাঁক করিয়া দাড়ি-সমেত মুখটি বাড়াইয়া দিল। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পণে কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল। কহিল, "হুজুর! খোকা সাহেব কেমন আছেন?"

গম্ভীরভাবে মিসেস বোস কহিলেন, "ভাল নেই, জমীর।"

জমীর কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া বার দুই কাসিয়া কহিল, "আমার একটা আর্জ্জি আছে, হুজুর।"

মিসেস বোস সতর্ক হইলেন; সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কি?"

জমীর কহিল, "হুজুর, আমাদের পাড়ায় একজন রোজা আছে। হিন্দু হলে কি হবে, হুজুর। ভারী ওস্তাদ্; শেতলা বিবির খুব পেয়ারের লোক, শুধু ফুঁ দিয়ে হুজুর রোগ উড়িয়ে দেয়—"

"তোমরা শেতলা-টেতলা বিশ্বেস কর না কি, জমীর।"

জমীর দাড়ি চুলকাইয়া কহিল, "বড় জাঁহাবাজ দেবতা কি না, হুজুর! গোঁসা হলেই একেবারে সাবাড় করে দেয়—"

মিসেস বোস কহিলেন, "তুমি বলছ ঐ রোজাকে ডাকতে? ও ভাল করে দিতে পারবে?"

জমীর প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আলবৎ পারবে, হুজুর। আপনি একবার পরীক্ষা করে দেখুন—"

মিসেস বোস চিন্তিতভাবে বসিয়া রহিলেন।

জমীর বলিতে লাগিল, "আমাদের পাড়ায় তো হুজুর আমরা ডাগ্‌দার-টাগ্‌দার ঢুকতে দিই নে, ঐ রোজাই সব চিকিচ্ছে কচ্ছে। সহরে এত লোক তো মারা যাচ্ছে হুজুর, কিন্তু আমাদের পাড়ায় একটিও টাল্ খায় নি—"

মিসেস বোস নীরব।

জমীর বলিতে লাগিল, "আমাদের আবু মিঞাকে তো আপনি জানেন, হুজুর। আপনার এখানে দিনকয়েক বাবুর্চ্চি ছিল; ওর ছেলের ভারী জ্বর হল, সেদিন একবারে বেহুঁস। সবাই বলতে লাগল, শেতলার ভর হবে। রোজাকে ডাকা হল, ও এসে মন্তর পড়ে ঝেড়ে দিল, হুজুর, আপনি বিশ্বাস করবেন না—একঘণ্টা যেতে না যেতেই সেই ছেলে চাঙ্গা হয়ে উঠে নাস্তা করতে বসল—"

মিসেস বোস কহিলেন, "তুমি তাকে এখনই আনতে পারবে?"

জমীর প্রবল উৎসাহের সহিত কহিল, "হুজুর, এখনই এনে হাজির করে দেব—"

মিসেস বোস কহিলেন, "খুব সাবধানে আনতে হবে, কেও যেন জানতে না পারে—"

"ও সব আমাকে বলতে হবে না, হুজুর। কাকপক্ষী, জানতে পারবে না—।" বিদেশী ও বিজাতীয় কাল্‌চারের যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান মিসেস বোস ও জমীরুদ্দীনকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন এক মুহূর্ত্তে উড়িয়া গেল। জমীর পরম আত্মীয়তার সহিত কহিল, "ভারী জবর ওস্তাদ, হুজুর। শেতলার সঙ্গে দিন মোলাকাৎ, বাৎচিৎ হয়; দেখবেন, ও এক মিনিটে খোকা সাহেবকে চাঙ্গা করে দেবে—"

জমীর মিথ্যা কথা বলে নাই। আধ ঘণ্টার মধ্যে সে রোজাকে ডাকিয়া আনিয়া হাজির করিল। লোকটার

বয়স ত্রিশের বেশী নয়, কিন্তু দিবারাত্র নেশা করিয়া দেহটীকে এমনি অস্থিচর্ম্মসার করিয়া তুলিয়াছে যে, চল্লিশ হইতে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোন অঙ্কে তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিলে বেমানান্ হইবে না। মাথায় লম্বা চুল ও মুখে লম্বা দাড়ি, দাড়ি ও চুলে মোম দিয়া জটা তৈয়ারী করিয়াছে। খাড়া লম্বা নাক, কড়া লোমওয়ালা মোটা ভ্রূ দুইটা নাকের ঊর্দ্ধপ্রান্তে মিলিয়া গিয়াছে। অক্ষি-কোটরের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান চোখ দুইটা গঞ্জিকাধূম প্রভাবে রক্তবর্ণ। রেখা-বহুল ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক আঁকা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও বাহুতে রুদ্রাক্ষের তাগা। পরিধানে গেরুয়া রং-এর কাপড়, অত্যন্ত মলিন। ডান হাতে একটী লাল সালু ঢাকা ছোট চৌকীতে একটী পিত্তল-মূর্ত্তি, বোধ করি, মা শেতলার, কিন্তু সিন্দূরলেপনের ফলে কিছু বুঝিবার উপায় নাই। বাম হাতে একটা ত্রিশূল, তাহাও সিন্দূর-চর্চ্চিত। জমীর তাহাকে আনিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইতে বলিল। অন্য বাড়ী হইলে ওস্তাদজী এতক্ষণ হাঁক্‌ডাক্ পাড়িয়া মা-শেতলার আগমন-বার্ত্তা দিগ্‌বিদিকে প্রচারিত করিত। কিন্তু জমীর তাহাকে নিষেধ করিয়াছিল, কাজেই তাহাকে নীরব থাকিতে হইল।

জমীর ঘরের ভিতর গিয়া খবর দিতেই রোজাকে ভিতরে লইয়া যাইতে হুকুম হইল। তাহাকে দেখিয়াই মিসেস বোসের আজন্ম-লালিত সংস্কার ও শিক্ষা ঘৃণায় আকুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কিন্তু দায়ে পড়িয়া মিসেস বোস এই লোকটাকে সহ্য করিয়া লইলেন। শুধু জমীরকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেও দেখে নি তো ?"

জমীর মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, "না, হুজুর। ঘোড়ার গাড়ীতে বন্ধ করে নিয়ে এসেছি—"

রোগীর মাথার কাছে দাঁড়াইয়া রোজা কট্‌মট্ করিয়া একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ রোগীর দিকে তাকাইয়া রহিল। জমীর অভিজ্ঞের মত কহিল, "চোখের তেজেই রোগ অর্দ্ধেক সেরে যাবে, হুজুর। তার পর যখন ঝাড়ন চলবে, তখন বেয়াদপ্ রোগ—"

রোজা বাধা দিয়া কহিল, "গিন্নী মা, একটা আসন আনতে বলুন—"

গিন্নী মা! সম্বোধন শুনিয়া মিসেস বোসের সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করিয়া উঠিল। কিন্তু বাড়ীতে ছুঁচা আমদানী করিলে, তাহার গন্ধ সহিতেই হইবে। তিনি গম্ভীর বদনে জমীরের দিকে তাকাইলেন—জমীর অপরাধীর মত মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল।

রোজা জমীরের দিকে তাকাইয়া কহিল, "একটা আসন চাই যে, মা বসবেন কোথায় ?"

কিন্তু হাকিমের বাড়ীতে আসন কোথায় থাকিবে ? এ কি মাষ্টার অথবা কেরাণীর বাড়ী যে, ঘরশুদ্ধ সকলে আসন পাতিয়া নিত্য ডাল-ভাত গিলিতে বসে ? অতএব উপায় ? জমীর রোজার দিকে তাকাইয়া কহিল, "চেয়ার হলে হবে না ?"

রোজা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, চেয়ারে চলিবে।

মিসেস বোস কহিলেন, "সিন্দূর লেগে চেয়ারের কুশন্ হয় তো নষ্ট হয়ে যাবে, তার চেয়ে এক কাজ কর না, জমীর। একটা ছোট টেবিল আনো—" রোজার দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "তাতে দোষ হবে না তো ?"

রোজা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—দোষ হইবে না।

জমীর টানাটানি করিয়া একটা টেবিল আনিয়া হাজির করিল। মা-শেতলাকে তাহার উপর রাখিয়া রোজা কহিল, "মাটী কৈ ? আমি ত্রিশূল গাড়ব কি করে ?"

মিসেস বোস সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে জমীরের দিকে তাকাইলেন। জমীর কহিল, "হুজুর! তিরশূলটা মাটিতে পুঁততে হবে—"

ভ্রূ কুঁচকাইয়া মিসেস বোস কহিলেন, "কেন ?"

জমীর মাথা চুল্‌কাইয়া রোজার দিকে তাকাইল।

রোজা গম্ভীর ভাবে কহিল, "মা-শেতলার আদেশ—"

মিসেস বোস কহিলেন, "মাটী ত নেই, সিমেণ্টের পাকা মেজে, তা'ছাড়া গভর্ণমেণ্টের বাড়ী, খোঁড়াখুঁড়ি চলবে না।"

জমীর কহিল, "হুজুর, এক কাজ করলে হয় না ? একটা ফুলগাছের টব এনে দেব ?"

মিসেস বোস বিরসমুখে কহিলেন, "আমি কি জানি ? জিজ্ঞাসা কর ওঁকে, তাতে হবে কি না—"

জমীর রোজাকে বুঝাইয়া বলিলে সে রাজী হইল। জমীর একটা বড় ফুলগাছ সমেত টব আনিয়া মা শেতলার টেবিলের পাশে নামাইল। রোজা বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ত্রিশূল পুতিয়া দিল। তার পর মিসেস বোসের দিকে তাকাইয়া কহিল, "মা-শেতলার কাছে মুঠি ধরুন তা'হলে—" মিসেস বোস জমীরের দিকে তাকাইলেন। জমীর রোজাকে কহিল, "বুঝিয়ে বলে দাও না—"

রোজা কহিল, "খোকা বাবুর—"

জমীর ভুল শুধরাইয়া দিয়া কহিল, "সাহেব!" ঘাবড়াইয়া গিয়া রোজা কহিল, "সাহেব! কৈ?" জমীর চড়া গলায় কহিল, "খোকা বাবু, না, খোকা-সাহেব—।" রোজা বলিতে লাগিল, "ওঃ! আচ্ছা! খোকা-সাহেবের নামে আজ মা-শেতলার কাছে পূজো দিতে হবে। আপনি, যা আপনার ইচ্ছা,—মুঠোর মধ্যে নিয়ে, মা-শেতলার কাছে খোকা বাবুর, না—না—সাহেবের মঙ্গল-কামনা করুন—"

মিসেস বোস অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

জমীর রোজাকে কহিল, "আরে! 'গিন্নী-মা' বলছ কেন? এতবার করে বলে দিলাম, মেম-সাহেব বলতে হবে; না হলে গোঁসা করে ভাগিয়ে দেবে এখনই—।" রোজা ঘাড় নাড়িল।

জমীর কহিল, "হয় তো মোটা কিছু ধরে দেবে এখনই, আমার কিন্তু আধা-আধি—"

রোজা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "পাগল! মা-শেতলার টাকা—"

জমীর দাঁত মুখ খিঁচাইয়া কহিল, "রেখে দাও তোমার শেতলা। না দিলে ভাল হবে না বলে দিলাম, রাস্তাতেই—"

মিসেস বোস কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কাজেই জমীর জমাট বাঁধিয়া গেল। মিসেস বোস কাছে আসিতেই রোজা কহিল, "মা-শেতলার সামনে দাঁড়িয়ে খোকা-সাহেবকে ভাল করে দিতে বলুন।" মিসেস বোস মা-শেতলার সম্মুখে দাঁড়াইতেই রোজা কহিল, "হুজুর! পায়ের চটী জুতাটা—"

জমীর কহিল, "আরে! থাক্ না—"

রোজা তাড়াতাড়ি কহিল, "আচ্ছা আচ্ছা, থাক্।"

মিসেস বোস স্যাণ্ডাল খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর মা-শেতলার সামনে একখানি পাঁচ-টাকার নোট রাখিয়া কহিলেন, "মনে মনে বললে হবে তো?" রোজা পুলকিত কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ হুজুর।" জমীর রোজার দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

প্রণামী-নিবেদন পর্ব্ব শেষ হইলে ঝাড়ন-পর্ব্ব সুরু হইল। বেবির বিছানার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া ডান হাতে একটা তুলসীগাছের ডাল হইয়া ওস্তাদজী সেইটে বেবির আপাদমস্তক সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিড়্‌বিড়্‌ করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিল। জমীর ও মিসেস বোস নির্ব্বাক্‌ভাবে দেখিতে লাগিলেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে রোজা ঝাড়ন বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "আর কিছু ভয় নেই গিন্নী-মা।" জমীর কটমট করিয়া তাকাইতেই কহিল, "না—না— মেম-সাহেব! আপনাকে কিন্তু একটু পালন করতে হবে—"

মিসেস বোস কোন জবাব দিলেন না।

রোজা বলিতে লাগিল, "মাছ খাবেন না—"

জমীর কহিল, "মুরগী?"

প্রশ্নটা কঠিন। মাছ বন্ধ হইলে মুরগী বন্ধ হওয়া উচিত কি না, ঠিক করিতে না পারিয়া রোজা কহিল, "তা চলতে পারে; আর পান খাবেন না।"

জমীর জবাব দিল, "পান তো হুজুর খানই না।"

রোজা কহিল, "তা হলে তো খুব ভাল। আর একটা কথা—খোকা সাহেব ভাল হয়ে গেলে, মা-শেতলার আর একদিন ভাল করে পূজো দিতে হবে, গিন্—না—মেম-সাহেব।"

মিসেস বোস নিরুত্তর রহিলেন। জমীর কহিল, "আরে সে জন্যে তোমার ভাবতি হবে না—"

যাইবার সময় রোজা মিসেস বোসকে কহিল, "হুজুর আমি আর একদিন এসে খোকা সাহেবকে দেখে যাব। আপনার কোন চিন্তা নেই। উনি মা-শেতলার দয়ায় ঠিক ভাল হয়ে যাবেন।" জমীরকে কহিল "তুমি থাক না জমীর! আমি একলা-ই যাচ্ছি—" বলিয়া প্রস্থান করিল।

জমীর পলায়মান রোজার দিকে তাকাইয়া ভ্রূকুটি করিল এবং মিসেস বোসের পানে তাকাইয়া বিনয়-বিগলিত কণ্ঠে কহিল, "হুজুর, আমাকে ঘণ্টা খানেকের জন্যে ছুটি দিতে হবে। বাড়ীতে—"

মিসেস বোস কহিলেন, "আচ্ছা, যাও···আর দেখ, বেশ সাবধানে দরজা বন্ধ করে ওকে নিয়ে যেও, কেউ যেন জানতে না পারে।"

প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া জমীর কহিল, "কিছু চিন্তা নাই হুজুর।" বলিয়া দ্রুতপদে রোজার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

সেই দিন রাত্রেই জ্বর ছাড়িয়া গেল। ইহার পর মা-শীতলার মাহাত্ম্য ও মন্ত্রের মহিমা কোন্ পাষণ্ড অস্বীকার করিবে? কাজেই সকালে জমীর যখন খোকা-সাহেবের জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, একগাল হাসিয়া কহিল, "হুজুর বলেছিলাম যে?···ভারী জবরদস্ত্ দেবতা হুজুর! হিন্দুর সেরা দেবতা।" তখন মিসেস বোসকে সায় দিতে হইল।

বেলা আটটার সময়ে ডাক্তার সাহেব আসিয়া রোগীর অবস্থা দেখিয়া পুলকিত চিত্তে কহিলেন, "বলেছিলাম, জ্বর রেমিশন্ হয়ে যাবে। আপনারা মিছেমিছি ভয় করছিলেন।"

মিসেস বোসের ওষ্ঠে শ্লেষাক্ত হাসি ফুটিয়া উঠিয়াই আবার নিবিয়া গেল। মিষ্টার বোস নির্ব্বিকার রহিলেন।

ডাক্তার সাহেব মিঃ বোসের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'মিসেস্ বোস কাল আমাদের সায়েন্সের নিন্দে করছিলেন, কিন্তু এরপর আশা করি, তা আর করবেন না।" বলিয়া মিসেস বোসের দিকে তাকাইলেন। মিসেস বোস কিছু উত্তর না দিয়া অন্য কক্ষে চলিয়া গেলেন।

চারদিন পরে। রবিবার। বেলা আটটার সময়ে ডাক্তার সাহেব জজ সাহেবের কুঠিতে আসিয়া দেখিলেন, তিনি ও তাঁহার পত্নী দুইজনে বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাঁহাদের পোষাক অভাবনীয়-রূপে অভিনব। মিঃ বোসের পরিধানে গরদের শাড়ী-পাড় ধুতি ও চাদর ও মিসেস বোসের পরিধানে, গরদের চকচকে লালপাড় শাড়ী। উভয়েই সদ্যোস্নাত ও নগ্নপদ। সন্ধ্যার সময় হইলেও বা তিনি ভাবিতে পারতেন যে, মিঃ বোস ও মিসেস বোস 'পূজারী ও পূজারিণী'র কৌতুক-সজ্জায় সাহেবী-মহলে বলনাচে চলিয়াছেন। কিন্তু এই সকাল বেলায় এই পোষাকে বাহিরে যাওয়া! ইহাদের দুই জনেরই এক সঙ্গে মাথা খারাপ হইয়াছে না কি! তিনি বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন, "ব্যাপার কি? চললেন কোথায়?" মিষ্টার বোস লজ্জিত মুখে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। মিসেস বোস কঠিন হইয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "মা-শেতলার পূজো দিতে চলেছি—"

ডাক্তার দুইচোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন, "মা-শেতলার পূজো? হেতু?"

মিসেস বোস নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "বেবি সেরে উঠেছে বলে—"

"আপনাদের বিচার তো বেশ! আমি বেবিকে সারিয়ে তুললাম, আর মা-শেতলা পাবেন পূজো? পূজো দিতে হলে তো আমাকে দেওয়া উচিত—" মিসেস বোস দুই ভ্রূ কুচকাইয়া কহিলেন, "আপনার ধারণা, আপনিই বেবিকে সারিয়ে তুলেছেন?"

ডাক্তার সাহেব জোর দিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই—" মিসেস বোস মাথা নাড়িয়া, দুই চোখ ছোট করিয়া, ধারাল কণ্ঠে কহিলেন, "আপনি—না।" ডাক্তার স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "তবে?"

উন্মুক্ত জানালার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তর্জ্জনী বাড়াইয়া মিসেস বোস কহিলেন, "যে সারিয়েছে, সে ঐ।"

ডাক্তার বিহ্বল-নয়নে দেখিলেন, দুইজন মোটা পৈতা-ওয়ালা ব্রাহ্মণ দুইটা বড় থালায় পূজার প্রচুর আয়োজন বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং মিসেস বোসের তর্জ্জনী-উদ্দিষ্ট লোকটা একটি সুপুষ্ট ছাগ-শিশুকে দড়ি ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

মিসেস বোস বলিতে লাগিলেন, "আপনি তো হয় টাইফয়েড নয় বসন্ত হবে বলে সরে পড়লেন। তারপর

ওকে ডাকা হল। ও এসে (ঝাড় ও ফুঁকের কথাটা মিসেস বোস চাপিয়া গেলেন) চিকিৎসা করে সারিয়ে দিলে।"

ডাক্তার সাহেব মিষ্টার বোসের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, "শুনছেন সার, আমি এতদিন ধরে চিকিৎসা করলুম তাতে কিছু হল না, আর ঐ লোকটা একঘণ্টা চিকিৎসা করেই ভাল করে দিয়ে গেল। একেই বলে হাতযশ!"

মিসেস বোস স্বামীর দিকে একবার কটাক্ষ করিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, "তা বললে কি হবে? আপনি তো definite আশা কিছু দিতে পারেন নি। ও এসে বললে, ভাল হয়ে যাবেই!"

ডাক্তার আর প্রতিবাদ না করিয়া কহিলেন, "বেশ চিকিৎসা না হয় ওই ভাল করেছে, তাহলে ওকেই বকশিস দিন, মা-শেতলাকে পূজো দিচ্ছেন কেন?"

"ও যে মা-শেতলার পূজারী, মা-শেতলার নাম নিয়েই তো ভাল করেছে।"

ডাক্তার সাহেব করুণ-কণ্ঠে কহিলেন, "আপনারাও এ-সব বিশ্বেস করেন?"

মিসেস বোস ঝাঁঝাল-কণ্ঠে কহিলেন, "কেন? আমরা কি হিন্দু নই?"

ডাক্তার সাহেব চুপ করিয়া গেলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "তোমাদিগকে দেখিয়াই আমরা সাহেব সাজিয়াছি। এখন তোমরা যদি ভোল ফিরাইয়া হঠাৎ গোঁড়া সাজিয়া বস, তো আমরা দাঁড়াইব কোথায়? দিন দুই পূর্ব্বে ডাক্তার সাহেবের গৃহিণী লুকাইয়া শীতলার পূজা পাঠাইয়াছিলেন জানিতে পারিয়া ডাক্তার সাহেব তাঁহার সহিত ঝগড়া করিয়াছেন; আজই তাহা মিটাইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন।

মিসেস বোস কহিলেন, "এবার আমাদের যেতে হবে। আপনি একটুখানি বসুন মিঃ ব্যানার্জ্জী। আমরা এখনই ফিরে আসছি। আপনি ততক্ষণ রেডিওটা চালিয়ে দিয়ে বিলেতী প্রোগ্রাম শুনুন," একটু হাসিয়া কহিলেন, "জমীর বাড়ীতে থাকবে, আপনারও পূজোর কোন ত্রুটী হবে না।"

ডাক্তারকে হাসিয়া বলিতে হইল, "ধন্যবাদ মিসেস বোস।"

মিঃ বোস ও মিসেস বোস চলিয়া গেলেন। জমীর রোজার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার সাহেবকে সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর, চা, না, কোকো?"

ডাক্তার কহিলেন, "কিছু দরকার নেই রে, জমীর। আজ আমি উঠি। তবে প্রসাদী পাঁঠাটার কিছু যদি ফিরে আসে তো একটা ঠ্যাং আমার ওখানে পৌঁছে দিস্।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

সহরের আদি ও অকৃত্রিম মা শীতলার (কারণ মড়কের সময়ে ফ্যালাও কারবারের লোভে প্রায় ডজন খানেক নূতন মা শীতলার আবির্ভাব ঘটিয়াছে) মন্দিরে সেদিন ভিড়ের অন্ত ছিল না। জজ সাহেব মা-শীতলার পূজা দিতে আসিয়াছেন, এ দৃশ্য দেখিবার সৌভাগ্য কাহারও ভাগ্যে সহজে ঘটে কি?

যথারীতি পূজা ও বলিদান হইয়া গেল। মা-শীতলা নধর ছাগ-শিশুর কবোষ্ণ শোণিতসহযোগে প্রচুর পূজোপকরণ ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। মন্দির-প্রাঙ্গনে রক্তাক্ত বলি-কাষ্ঠ ও মুণ্ডহীন ছাগ-দেহকে ঘিরিয়া ভক্তের দল নাচিতে লাগিল এবং ঢেকোর দল প্রাণপণে ঢাক পিটাইতে লাগিল। অদূরে দাঁড়াইয়া মিঃ বোস ও মিসেস বোস অবলীলাক্রমে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

স্বর্গ হইতে অনুপমের মা ইহা দেখিয়া বোধ করি মুচ্‌কি হাসিলেন।

সিংভূমের রত্নসম্ভার

—শ্রীকাননগোপাল বাগ্‌চী

সিংভূম জেলার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি না। নানা দিক্‌ দিয়ে এর প্রভাব আমরা অনুভব করি। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া অনেককেই এ দেশে বসবাসের জন্য আকৃষ্ট করেছে। সিংভূমের সম্বন্ধে ভ্রমণ-বৃত্তান্তেরও অভাব নেই।

প্রত্যেক দেশেই আজকাল পরনির্ভরতার হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতির দিকে যত্ন নেওয়ার একটা সাড়া পড়ে গেছে, কিন্তু আমাদের সে চেষ্টা কৈ? ক্ষুদ্র এক সিংভূম থেকেই দেখছি, কত প্রয়োজনীয় রত্ন এই ভারতবর্ষে রয়েছে—যার যথার্থ ব্যবহার করতে পারলে আমাদের অনেক দুঃখ ঘোচে। এ-জন্যই সিংভূম-ভ্রমণের সময় যদিও অন্যান্য অনেক বিষয় আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু আজ আমি বলব প্রধানতঃ এর রত্ন-সম্পদের কথা। অনেক ভূতাত্ত্বিকই এ দেশে এসেছেন এবং এখানে কাজের জন্য রয়েও গেছেন, কিন্তু কেউ এর পরিচয় সর্ব্বসাধারণে প্রকাশ করেন নি—এক "জিয়লজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়া" ছাড়া। কিন্তু সে বিবরণ ক'জনই বা পড়েন?

আমাদের স্বভাব "দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই", কিন্তু প্রতিবেশীর খোঁজ কেউই রাখিনে। আমরা পৃথিবী ভ্রমণ করি, আমেরিকায় পাড়ি দিই এবং তাদের সম্বন্ধে রাশি রাশি বই লিখি, এ দিকে নিজের দেশ বা আশেপাশের কিছুই জানিনে। নিজের কথাতেই তার প্রমাণ দিই। ভূতত্ত্ব শেখার জন্য শিক্ষা-ভ্রমণে হিমালয় গেছি, খাসিয়া পাহাড়ও ঘুরে এসেছি, এমন কি মধ্যপ্রদেশও বাদ পড়েনি, অথচ যে সমৃদ্ধ অঞ্চল তার রত্নসম্ভার নিয়ে আমাদেরই সামনে অপেক্ষা করছে, তার প্রতি মনোযোগ দিই নি। সুতরাং এই ভুল শোধরাবার একটা সুযোগ যখন উপস্থিত হল, আগ্রহভরেই তা গ্রহণ করলাম। প্রয়োজনমত হাতুড়ি, পাথর বইবার হ্যাভারস্যাক্, ক্যামেরা ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে বড়দিনের ছুটি হতেই রাতারাতি বেরিয়ে পড়লাম। ক'লকাতার শীতে যারা অভ্যস্ত, বাইরের সঙ্গে পরিচয় নেই, তাঁদের প্রথমেই বলে রাখি, সিংভূম অঞ্চলের ঠাণ্ডা বেশ একটু প্রখর।

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করে ভোরের দিকে একটু রাত থাকতেই ঘাটশীলা এসে পৌছুলাম। ভোরের বাতাস এবং পাহাড়ে শীতের প্রথম সম্ভাষণ বিশেষ সুখপ্রদ মনে হ'ল না। ডাক-বাংলোয় এসে আশ্রয় নেওয়া গেল। সকাল হতেই হাতুড়ি, ম্যাপ, ব্যাগ ও যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সোজা নদীর দিকে। পূবদিকে সবে সূর্য্য উঠছে, লাল কাঁকরের রাস্তায় লোকের সমাগম তখনও বিশেষ হয়নি—আর চারিদিকে সবুজ মাঠ দেখতে বেশ তৃপ্তিকর। খানিকটা হেঁটেই এসে পড়লাম সুবর্ণরেখার তীরে। সুবর্ণরেখা নদীটি "দলমা শ্রেণী" নামে এক পাহাড়ের গা ঘেঁসে একে বেঁকে চলে গেছে। বইয়েতেই পড়েছিলাম যে, বহুকাল পূর্ব্বে সিংভূম জেলায় বিরাট এক আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের ফলে গলিত পাথর মাটির ওপরে এসে জমাট বেঁধে দলমা নামে প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের সৃষ্টি করেছে। আজ দলমা শ্রেণীর সামনে দাঁড়িয়ে যখন কল্পনা করতে চেষ্টা করলাম যে, এ এক বিরাট আগ্নেয়োচ্ছ্বাসের নিদর্শন, গা শিউরে উঠল। বাস্তবিকই চোখে না দেখলে কি ধারণা করতে পারতাম এর গুরুত্ব!

দলমার কাছে এগিয়ে যেতেই হাত উস্‌খুস্‌ করে উঠল হাতুড়ির সদ্ব্যবহার করতে। গোটাকতক পাথরের নমুনা ভেঙ্গে নিলাম ল্যাবরেটরীতে গিয়ে দেখব, কি জাতীয় পাথর পৃথিবীর ভেতর থেকে এসেছে এবং তারা যে আগ্নেয়, তার প্রমাণ। এর পর নদী ধরে বরাবর প্রায় দশ মাইল চললাম। নদীটি বয়ে গেছে "মাইকাশিষ্টে"র (mica schist) ওপর দিয়ে এবং 'শিষ্টে'র ভেতর অনেক আগ্নেয় উদ্ভেদ খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। এগুলি দেখতে পাথরের দেয়ালের মত লাগে। এরা সব দলমা
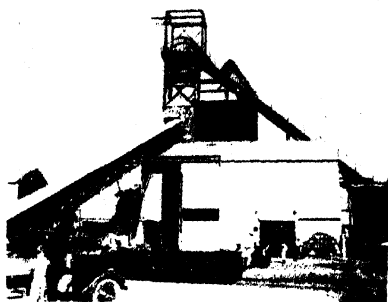
মোসাবনি : ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের কারখানা।

নোয়ামুণ্ডি : স্তরীভূত লৌহ-আকর।

সিংভূমের পথে বিশ্রাম।
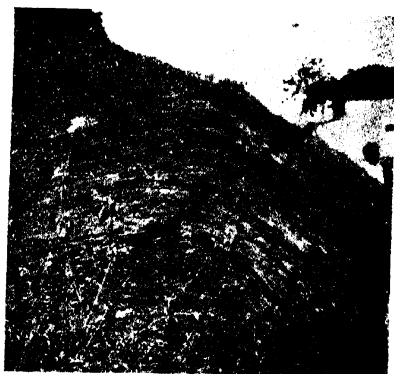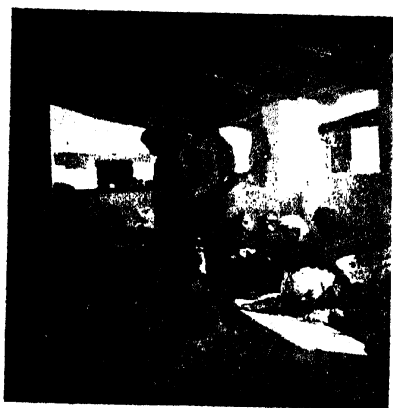
হাজারিবাগ অভ্রখনি : অভ্রের পাতগুলি বিভিন্ন আয়তনে কাটা হইতেছে।

হাজারিবাগ অভ্রখনি : অভ্রের পাত কাটিয়া ভিন্ন ভিন্ন পর্দায় ভাগ করা হইতেছে।

সেরাইকেলা : উড়িয়া স্যাকরার দোকান।

সেরাইকেলা : জগন্নাথ মন্দিরের অভ্যন্তর।

সেরাইকেলা : হো অধিবাসী।

বিজ্ঞান সভায় নিমন্ত্রিত ভূতত্ত্ববিদ্ :
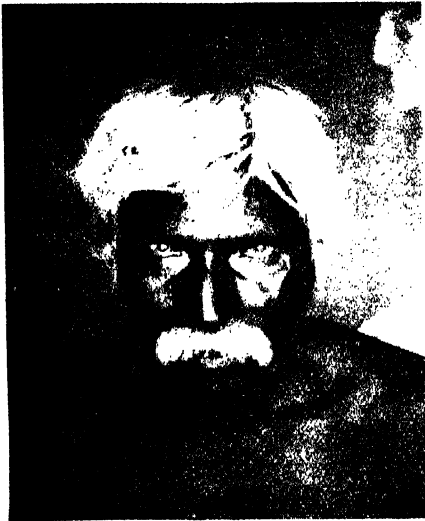
টমাস (লণ্ডন) ডুটয়েট (দক্ষিণ আফ্রিকা) রীডস্ (লিভারপুল)।

শ্রেণীর সমসাময়িক এবং একই শক্তি থেকে উদ্ভূত। এই অগ্ন্যুৎপাতের উত্তাপের ফলে যে তাপ ও সঞ্চাপ এই অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করেছিল, তার নিদর্শন আলোড়িত পাথরের ভেতর প্রচুর পাওয়া যায়। 'শিষ্টে'র ভেতর "গারনেট" নামে এক প্রকার খনিজ* (mineral) দেখা যায়, তাও এরই নিদর্শন।

পাথরের নমুনা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাত আর হাতুড়ি যখন ক্লান্ত এবং অত্যধিক ভারে পিঠ ও থলি উভয়েই প্রায় বিদ্রোহ করে আর কি, ঘড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখি, বেলা তখন পাঁচটা। মাইল দশেক পথ তখন ফিরতে হবে—সুতরাং বাংলোর দিকে পা বাড়ালাম। বাংলোয় এসে দিনের কার্য্য-তালিকা ঠিক করলাম। ম্যাপ খুলে দেখি, কেনাইট খাদ দেখতে হলে মাইল আট পথ হেঁটে তবে সেখানে পৌছব। সুতরাং সকালে উঠে প্রথমে তাম্র-সঞ্চয় দেখাই ঠিক করলাম। এর জন্য অবশ্য বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি।

পরদিন সাতটার সময় ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের তাম্র-খনি দেখতে মোসাবনি এলাম। এখান হতে তামার আকর (ore) মৌভাণ্ডারে পাঠান হয়। পাথরের সঙ্গে কোন ধাতু যদি এরূপ পরিমাণে মিশ্রিত থাকে, যা হতে নিষ্কাশন করে লাভবান হওয়া যায়—তা হলে তাকে সেই ধাতুর আকর (ore) বলা হয়। মোসাবনি গ্রানাইট ও সোডা-গ্রানাইট নামে পাথর দিয়ে গঠিত। খনির বেষ্টনীর ভেতর প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়ল, স্তূপাকার তাম্রমল। এগুলি বহু প্রাচীন। আদিম অধিবাসীরা উচ্চাঙ্গের যন্ত্রপাতির সাহায্য ব্যতিরেকে তামা গালিয়ে যে জিনিষপত্র প্রস্তুত করত, তা এ থেকেই বোঝা যায়। তারা আকরকে টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে কাঠকয়লার আগুনে গালাত।

ভেতরে কি ভাবে তামা অবস্থান করে ও তার খনন-প্রণালী দেখবার জন্যে প্রধান সুড়ঙ্গ দিয়ে টবে চড়ে নীচে নেমে গেলাম। প্রধান সুড়ঙ্গ প্রায় ১৯০০ শত ফুট গভীর। এখানে যে আকর পাওয়া যায়, তা প্রধানতঃ গন্ধকযুক্ত। এর সঙ্গে কোয়ার্টজ বিশেষ নেই, তবে তাম্র-আকর ভিন্ন অন্যান্য খনিজও সংমিশ্রিত থাকে। এতে কাজের অসুবিধা আরও বেড়ে যায়। তাম্র-আকরের ভেতর ক্যালকোপাইরাইট-ই অধিক। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে তামা, গন্ধক ও লোহার সংমিশ্রণকে (স্বাভাবিক উপায়ে) ক্যালকোপাইরাইট বলা হয়।

এই ক্যালকোপাইরাইট এবং অন্যান্য খনিজ পাথরের ফাটলের ভিতর শিরার মত লম্বা রেখায় অবস্থান করে। এই সব তাম্রশিরা সর্ব্বত্র সমান আয়তন নয়—কোথাও বেশ প্রশস্ত, আবার অনতিদূরেই সরু হয়ে শেষে হয়ত অদৃশ্য হয়ে গেছে। এর কারণ, যে তরল পদার্থ পৃথিবীর অভ্যন্তর হতে তাম্র-খনিজ দ্রব-অবস্থায় বয়ে এনে এগুলি সঞ্চিত করেছে, পাথরের ফাটলের পরিমাপ অনুযায়ী তারও সঞ্চয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। এইসব শিরা অনুসরণ করে খননের কাজ চালাতে হয়। মাটির ওপরে আকরের যে পরিমাণ থাকে, ভেতরে প্রায়ই তার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়—এ জন্যই কোন একটি ধাতু-সঞ্চয়ের পরিমাণের আন্দাজ করা এত কঠিন।

এখানে খননের সব কাজ ভ্রমর দিয়েই হয়। ভ্রমর চালানোর জন্য উচ্চ-চাপযুক্ত বাতাস ব্যবহার করা হয়। যে সব পাথর বেশী শক্ত, সেগুলি পূর্ব্বে বারুদ দিয়ে ধ্বসিয়ে নেওয়া হয়। আকর কাটা হলে প্রধান সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে আনা হয়। বড় বড় টুক্‌রাগুলি যাঁতা দিয়ে ছোট করে এগুলো 'রোপওয়ে'তে মৌভাণ্ডারে পাঠান হয়,—তামা গালানর জন্য। মোসাবনি হতে সাত মাইল দূর পর্য্যন্ত একটা দড়ি অনবরত ঘুরে চলেছে। এর ওপর স্থানে স্থানে টব্ বসিয়ে দেওয়া হয় এবং দড়ির আবর্ত্তনের সঙ্গে টবগুলিও পরিক্রমণ করতে থাকে।

মৌভাণ্ডারে আকর থেকে তামা গালিয়ে বার করা হয়। প্রথমে আকরকে গুঁড়িয়ে তার সঙ্গে চুণ, দেবদারু কাঠের তেল ও 'জ্যানথেট' মিশিয়ে মন্থন করা হয়। গন্ধক-যুক্ত আকর অপেক্ষাকৃত হালকা বলে, সেগুলো ফেনার সঙ্গে ভেসে ওঠে; অথচ কোয়ার্টজ্ ও অন্যান্য আবর্জ্জনা নীচে পড়ে যায়। ফেনাটা উঠিয়ে নিয়ে আবর্জ্জনা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এই আবর্জ্জনার সঙ্গে অল্প পরিমাণ সোনাও

---

* দুই বা অধিক উপাদান (elements) রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অবস্থান করলে তাকে খনিজ (mineral) বলা হয় এবং বিভিন্ন মিনারেলের সমষ্টি হতেই পাথরের উৎপত্তি।

থাকে, কিন্তু এ উদ্ধারের কোন চেষ্টা হয় নি। ফেনার সঙ্গে যে আকরের গুঁড়া তুলে নেওয়া হয়, তা গালিয়ে যে ধাতু পাওয়া যায়, তাতে প্রচুর খাদ থাকায় তাকে আবার শোধন করা হয়। পরিষ্কার তামার সঙ্গে কিছু দস্তা মিশিয়ে পিতল হয় এবং তা থেকে এখানেই পাতও প্রস্তুত হয়।

কারখানা দেখার পর বিকালে বেরোলাম কেনাইট্ দেখতে। মাইল আষ্টেক হাঁটার পর, কিছুদূর নদী অনুসরণ করে কেনাইট্-পাথর দেখলাম। কেনাইট্, অ্যালুমিনিয়ম অক্সাইড্ ও সিলিকার সংমিশ্রণে প্রস্তুত হয়। এতে করে চুল্লীর ভেতর আবরণ—লাইনিং—দেওয়া হয়। কেনাইটের প্রধান গুণ—অত্যধিক উত্তাপেও চুল্লীর কোন ক্ষতি হতে দেয় না।

ঘাটশীলার কায শেষ করে এলাম নায়ামুণ্ডিতে। নায়ামুণ্ডি আজ পৃথিবীর ভেতর একটা স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছে—তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, বিলাসামোদী ব্যক্তিদের বিহার-স্থান হিসাবে নয়—এমন কি, এর আবহাওয়াও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। এর বিশেষত্ব হল, অপরিমেয় লৌহ-সঞ্চয়।

মনে পড়ে, ছেলেবেলায় রূপকথাতেই শুনেছিলাম যে, জঙ্গলে তাল তাল সোনা, পাহাড় পাহাড় রূপা আর কলসী কলসী মাণিক পড়ে থাকে—নিয়ে এলেই হল। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখলাম যে, সত্য সত্যই আমাদেরই দেশে পাহাড় পাহাড় লোহা পড়ে রয়েছে। একটু হিসেব করে খরচ করলেই অনেক উন্নতি করা যেতে পারে। এ-অঞ্চলের মাটী, লোকের ঘর-বাড়ী, পথ-ঘাট সমস্তই লোহার পাথর দিয়ে তৈরী। প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে এখানকার অধিবাসীদের শরীর পর্য্যন্ত লোহার মত কাল ও বলিষ্ঠ।

এখানকার লৌহ-আকর প্রধানতঃ অক্সিজেনযুক্ত—যাকে হিমেটাইট্ বলা হয়। এগুলি স্তরবদ্ধভাবে এক নির্দ্দিষ্ট গতি ও নতি অনুসরণ করে বিন্যস্ত থাকে। অধিকাংশ পাহাড়ই হিমেটাইট্ দিয়ে গড়া। বারুদ দিয়ে পাহাড়ের গা ধ্বসিয়ে বড় বড় খণ্ড ভেঙ্গে নেওয়া হয়। সন্ধ্যের সময় দিনের কায শেষ হলে বিষাদময় অবিচ্ছিন্ন নীরবতা ভেদ করে পর পর ১৫০।২০০ ডিনামাইট বিস্ফোরণের শব্দে বনানীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত কেঁপে ওঠে। বারুদ দিয়ে ফাটানর পর সাবল, গাঁইতি ইত্যাদি দিয়ে আকরগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা করা হয়—টাটানগরে লোহা গালানর জন্য। সিংভূমের এ অঞ্চলে এত অধিক পরিমাণ লোহার সঞ্চয় আছে যে, তা গালানর মত প্রচুর কয়লা এ দেশে আছে কি না ভাববার বিষয়। ট্রলী করে ও পায়ে হেঁটে মাইল পঞ্চাশেক ঘুরে এই সঞ্চয় দেখতে হয়েছিল। শীকারের অভিপ্রায়ে একটা পাহাড়ের ওপর উঠে দেখি, লাঠি জাতীয় কোন জিনিস দিয়ে আঘাত করলেই বা জোরে পা ফেললেই ঢং ঢং করে ধাতুর ওপর ঘা দেওয়ার মত শব্দ হচ্ছে। এর কারণ, পাহাড়ের মাথার ঠিক নীচেই কতকটা অংশ ফাঁপা। পাহাড়ের সবটাই হিমেটাইট্ দিয়ে গড়া—মজার ব্যাপার নয় কি?

দু'দিন দু'রাত এখানে কাটিয়ে যাত্রা করলাম কেঁউঝরের অন্তর্গত জোডার উদ্দেশ্যে। ভোরের বেলায় ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাসের এই ভ্রমণটা বেশ উপভোগ্য হয়েছিল। পথে 'মুর্গা' নামে একটা জায়গায় ছোট্ট এক জলপ্রপাত দেখলাম। পাশেই এক পুরাতন শিবমন্দিরের ভেতর হতে পূজার মন্ত্র আবহাওয়ার ভেতর একটা পবিত্র ভাব এনে দিয়েছিল। স্তরযুক্ত হিমেটাইট পাথরের ওপর হতে প্রায় ৪০ ফুট নীচে একটা পাহাড়ে নদী লাফিয়ে পড়ে এই জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে।

জোডার প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, ম্যাঙ্গানিজ খাদ। এও টাটা কোম্পানীর সম্পত্তি। লোহার সঙ্গে ম্যাঙ্গানিজ মিশিয়ে ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়। রুশ দেশ ভিন্ন, ভারতবর্ষের মত এত বিচিত্র শ্রেণীর বহুল পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ-সঞ্চয় পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। ম্যাঙ্গানিজের প্রধান উৎপন্ন-ক্ষেত্র হল মধ্যপ্রদেশ। সিংভূমের সঞ্চয় তার তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। যাই হোক্, এখানকার আকরে ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ বেশ সন্তোষজনক; ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৯৭।৯৮ ভাগ পর্য্যন্ত ওঠে। ম্যাঙ্গানিজ খননের জন্য কোন সুড়ঙ্গের প্রয়োজন হয় না। মাটীর ওপরের দিকেই থাকে বলে খাদ কেটেই বের করা হয়। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় খাদ ২০০।২৫০ ফুটের বেশী গভীর হবে না। এ সঞ্চয়গুলি ক্ষুদ্রায়তন বলে কোন নির্দ্দিষ্ট গতি বা নতি নেই।

ঘন জঙ্গলের জন্য ও উচ্চতার কিছু আধিক্যবশতঃ জোডাতে এসে শীতের প্রভাব কিছু বেশী হল। মাত্র একরাত্রে এখানে ক্যাম্প করেছিলাম—ভোরে উঠে দেখি, তাঁবুর ছাদে ও নীচের ঘাসে এক পর্দা শিশির জমে বরফ হয়ে রয়েছে। অনুসন্ধানে জানলাম, সে-রাত্রে এখানে সর্ব্ব-নিম্ন উত্তাপ গেছে ৩৪°—অর্থাৎ ঐ দিনের দার্জ্জিলিঙের সর্ব্বনিম্ন উত্তাপ হতে ৪° কম। কল্পনাও করি নি, ছোটনাগপুরের মত কোন জায়গায় বরফ দেখার সৌভাগ্য হবে।

জোডা হতে বড়জামদায় আরও কয়েকটি ম্যাঙ্গানিজ খাদ দেখে বড়বিলে এলাম। এখানে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে ম্যাঙ্গানিজকে বিভিন্ন আয়তনে গুঁড়িয়ে বিক্রীর জন্য তৈরী হয়। ইচ্ছা ছিল এখান হতে গোয়ায় লৌহ-সঞ্চয় দেখতে যাওয়ার, কিন্তু পরদিন ভারতীয় বিজ্ঞান-সভার পঞ্চবিংশ অধিবেশনের সভ্যগণের সহিত মিলিত হয়ে হাজারিবাগ ভ্রমণের সুযোগ উপেক্ষা করার মত সংযম না থাকায় সেটা হয়ে ওঠে নি।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি বহু ভারতীয় ও অনেক অনেক বৈদেশিক বৈজ্ঞানিক অভ্রখনি দেখতে হাজারিবাগ আসেন। আমিও এসে উপস্থিত হলাম, এঁদের সঙ্গে যোগদান করতে। এখানে অনেক বিশিষ্ট সভ্যবৃন্দের সঙ্গে মেশবার সুযোগ হয়েছিল। এঁদের অধিকাংশের ব্যবহার ও অমায়িকতা স্মরণ করিয়ে দেয়, অন্ততঃ জ্ঞানের জগতে দেশ, জাতি বা বর্ণের কোন বৈষম্য নেই। অনেকের ভেতরই নূতন জিনিষ দেখবার এবং শিখবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখলাম। এঁদের উৎসাহ ও আলোচনা আমাদের অনেক প্রেরণা দিয়েছে।

যাওয়ার সময় পথে নানাস্থানে নেমে এই অঞ্চলের পাথরের উপাদান-সমষ্টি, গঠন ও আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করে অবশেষে অভ্রখনিতে এসে পৌছান গেল। "দৈব দুর্ঘটনায় দেহত্যাগ করলে ক্ষতিপূরণের দাবী করতে আসব না," এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে সুড়ঙ্গ ধরে নীচে নেমে যাওয়া হল। মোমবাতি হাতে অন্ধকার, স্বল্প-পরিসর খাড়া-সিঁড়ি দিয়ে ৫০০ ফুট নীচে নামার নূতন এক অভিজ্ঞতা হল। টুপী না থাকলে মাথাটা ফুটিফাটা হয়ে যেত।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, পাঁজ পাঁজ অভ্র পাথর থেকে কেটে বার করে খাড়া একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে ওপরে আনা হচ্ছে। এখান থেকে এগুলো কোডারমা পাঠান হয়, বিভিন্ন পাতে বিশ্লিষ্ট করার জন্য। বিকেলে কোডারমা এসে অভ্র কাটা ও বিশ্লিষ্ট করা দেখা হল।

হাজারিবাগ হ'তে আবার সিংভূমে ফিরলাম। এবার এসে পৌছলাম, সেরাইকেল্লা ষ্টেটে (উড়িষ্যা)। জামসেদপুর ছাড়িয়ে খড়কাই নদী অতিক্রম করলেই সেরাইকেল্লার সীমানায় পৌছান যায়। এখানকার অ্যাসবেষ্টস-সঞ্চয় ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ষ্টেটের ভেতর বহু স্থানেই এই সঞ্চয়গুলি বিক্ষিপ্ত আছে। ক্ষুদ্রায়তন বলে এদেরও নির্দ্দিষ্ট গতি বা নতি নেই। অতিক্ষারীয় পাথরের ওপর গ্রানাইটজাত দ্রব পদার্থের প্রভাবেই বোধ হয় এগুলির উৎপত্তি হয়েছে। অ্যাসবেষ্টসের অংশগুলি পাথরের ফাটলে আড়াআড়ি ও খাড়াভাবে বিন্যস্ত থাকে। অংশগুলি গঠনের সময় যে চাপ উৎপন্ন হয়েছিল, তাতেই পাথরে ফাট ধরেছে বলে মনে হয়। এখানে সবই ট্রেমোলাইট অ্যাসবেষ্টস্।

মজুররা পাথর কেটে অংশগুলি বের করে। অল্পতেই গুঁড়িয়ে যায় বলে এগুলি বয়নের কাজে লাগান যায় না। তবে দড়ি ইত্যাদি তৈরী হয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভঙ্গুর ভাব কমান যায় কি না, তা প্রণিধানযোগ্য।

অ্যাসবেষ্টস্ আগুনের তাপে কিছুমাত্র বিকৃত হয় না এবং এর ভেতর দিয়ে উত্তাপও সহজে চালিত হয় না। সে জন্য অ্যাসবেষ্টসের পোষাক পরে আগুনের কাজ করা হয়।

অংশুর দৈর্ঘ্য অনুসারে এখানকার এসবেষ্টস্ তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত—(১) দীর্ঘ অংশুযুক্ত (২) খর্ব্ব অংশুযুক্ত (৩) গুঁড়া।

এ ছাড়াও সিংভূমে অন্যান্য বহু খনিজ পদার্থ আছে—যেমন ক্রোমাইট, গ্যালেনা, সোপষ্টোন, আপেটাইট্ প্রভৃতি। কিন্তু সময়াভাবে এ সব দেখে উঠতে পারি নি।

এই ক্ষুদ্র বিবরণী থেকে বোঝা যাবে, এক সিংভূম জেলাতেই কত বিভিন্ন রত্ন-সম্ভার রয়েছে। এ হ'তে সমগ্র ভারতের রত্ন-সঞ্চয়ের অনুমান করা সহজ। পরের উপর নির্ভর না করে এ সকলের যথাযথ ব্যবহার শিখলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি-সাধন সম্ভব।

ঢাকার কাহিনী

—শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

প্রাগ্‌মুখ

বিংশ শতাব্দীর মানব-সভ্যতাস্রোত আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত রচিয়া চলিয়াছে। যদি-ই বা কোনও দিন এই স্রোতোবেগ উদ্দাম ও সাবলীল গতিবিশিষ্ট ছিল, আজ সেই যুগ পুরাতন জীর্ণ ইতিহাস; বাঁকে বাঁকে কুটিলতার অন্তরালে সেই উদ্দামতা ও সাবলীল গতিভঙ্গী আত্ম-গোপন করিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সীমারেখায়, বিশ্বাসের যুগের অবসানে, বিংশশতাব্দী এক সন্দেহ এবং প্রশ্নের যুগ। ব্যাপকভাবে সন্দেহ ও প্রশ্ন করা বিংশ শতাব্দীর মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কোনও বাঁধা-ধরা নিয়ম-নীতির অনুশাসনে "শুষ্ক রুটিনপথ-পরিচারণ" কল্পনা আজ মানুষের মনকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে,—অন্ততঃ ইহাই তাহার দাবী। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাহার চরম লক্ষ্য, মানুষের প্রতি মানুষের প্রাত্যহিক আচরণ, সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান সমাজ-সংস্থান—মনুষ্য সম্পর্কিত যাবতীয় সংস্থাপন-সম্ভার আজ মানুষের ব্যাপক প্রশ্ন-শর বর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিতেছে। কারণ, অন্ধভাবে চলা এবং অন্ধ-অনুকরণ, এই যুগের মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির স্বচ্ছন্দ বিকাশের পরিপন্থী বলিয়া পরিচিত। সন্দেহ করিয়া, প্রশ্ন করিয়া, যাচাই করিয়া বস্তুপুঞ্জকে গ্রহণ করিবার প্রণালী প্রথমতঃ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির মুক্তি সাধন করে; দ্বিতীয়তঃ ইহা চিন্তারাজ্যে ব্যক্তিগত বুদ্ধির স্বাতন্ত্র্য রক্ষক।

বর্ত্তমান যুগের প্রশ্নকুটিল এই পৃথিবীতে মানুষের জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত যে ক্রমেই প্রচণ্ড হইয়া উঠিতেছে, তাহা জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্বসম্ভূত। মনীষিগণের কেহ কেহ অবশ্য এই ক্রমবর্দ্ধমান দ্বন্দ্বের জন্য বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকেই দায়ী করেন এবং তাঁহাদের মতবাদবিশ্লেষণে, বর্ত্তমানে জাতিসমূহের পরস্পরের শক্তি-বৈষম্যও যে এই দ্বন্দ্বে প্রভূত শক্তিসঞ্চার করিতেছে, এই সত্যই প্রকট হইয়া ওঠে। প্রতিযোগীদের মধ্যে যেখানে সর্ব্বক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের সমকক্ষ, যেখানে গর্জ্জন ও আস্ফালনই বেশী, বর্ষণ অথবা রক্তপাত সেখানে খুব সুলভ নহে। কিন্তু যেখানে শক্তি-বৈষম্যও নানা স্তরে সজ্জিত, সেখানে, শক্তিমানের শক্তির অপব্যবহার স্বাভাবিক। বস্তুতঃ, বর্ত্তমানে পৃথিবীর ঘটনা-পরম্পরা এই উপসংহারের দিকেই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছে। কাজেই এই সংঘর্ষকণ্টকিত আবেষ্টনী হইতে মানুষের মুক্তির পথ—জাতি-সমূহের শক্তির (শক্তি শব্দ এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—কৃষ্টিমূলক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি, ধনোৎপাদন শক্তি ইত্যাদি) সাম্যাবস্থার দিকে। সেই দিনে,—জাতিসমূহের, তথা নিখিল মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির দিনে, পৃথিবীতে অনেক সমস্যা, অনেক দ্বন্দ্বেরই অবসান হইবে, এ কথাই মনীষিগণ ঘোষণা করিতেছেন।

তাই আজ জাগরণের দিন আসিয়াছে। বিশ্ব-মানবতার পরম কল্যাণের জন্যও প্রত্যেকটি পশ্চাৎপদ জাতির উন্নতির পথে অভিযানের পুণ্যক্ষণ উপস্থিত। এই অভিযানের প্রধান পাথেয়—জাতির গূঢ় আত্ম-সমৃদ্ধির বিকাশ, যে প্রচেষ্টা জাতিকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলে। যেখানে জাতীয় আত্মসমৃদ্ধির পরিপূর্ণতা সেখানেই জাতির প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য। এবং এই আত্মচেতনার বিকাশের পথে প্রধান অবলম্বন, জাতির প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধান। জাতির শিক্ষা, দীক্ষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যে যে যুগে যে যে স্থানে জাতিকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া তত্তৎ স্থান সন্ধান-পূর্ব্বক আত্ম-পরিচয়ের প্রচেষ্টাই কি উন্নতির পথে প্রথম সোপান নহে?

পরন্তু, তাহাকেই আমরা জাতীয় দুর্দ্দিন বলি, যে দিনে সভ্যতান্তরে একদা উন্নীত কোনও জাতি কালের প্রতিঘাতে আত্মসম্বিৎ হারাইয়া আপনাকেই চিনিয়া লইতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। সুতরাং, নিঃসন্দেহে, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর আজ দুর্দ্দিন। কিন্তু মুক্তির পথস্বরূপ বাঙ্গালার একখানি প্রকৃত ইতিহাস কই? যে বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সর্ব্বদিক প্রসারী কৃষ্টি বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, সেই দেশের, সেই জাতির গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী-সম্বলিত একখানি পরিপূর্ণ ইতিহাস আজিও রচিত হইল না কেন? জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন—বাঙ্গালার একখানা ইতিহাস নাই। আজ তাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকী মহাসমারোহে সম্পন্ন করিতে বসিয়া বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজ, চিন্তানায়ক ও জ্ঞানবীরগণ উচ্চতর এক সপ্তকে সুর চড়াইয়া সেই লোকান্তরিত আত্মার খেদোক্তিরই প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতেছেন, বাঙ্গালার একখানা ইতিহাস নাই। কিন্তু এই 'নাই'কে 'চাই' বলিয়া দাবী করিবার মত মানসিক শক্তি কি জাতি আজও আয়ত্ত করিতে পারিল না?

অবশ্য ইতিহাস-চর্চ্চা যে বাঙ্গালায় নাই এমন নহে। তবে সে স্রোত অত্যন্ত ক্ষীণ, বাঙ্গালীর আত্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর অজ্ঞানতারূপ স্তূপীকৃত গ্লানি বহন করিয়া লইয়া যাইবার মত শক্তি সে স্রোতের নাই। তদুপরি বাঙ্গালার জ্ঞানবৃদ্ধ ঐতিহাসিকগণ (যদিও তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়) মাতৃভাষাকে অবহেলা করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানলব্ধ ফল, তাঁহাদের প্রতিভার অবদান, বিদেশী ভাষার সাহায্যে রূপায়িত করেন, দেশী খাদ্য-সম্ভার বিদেশী বিজাতীয় চমকপ্রদ আসবাবে ও আড়ম্বরে সজ্জিত করিয়া বাঙ্গালীর মানসিক ক্ষুন্নিবৃত্তির অভিনব ব্যবস্থা করেন। বাঙ্গালীর উপায় কি? সারস-নিমন্ত্রিত শৃগালের মতই হতবাক্ হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, জঠরজ্বালার দাহনে নীরবে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কিন্তু এক্ষণে আমরা কি চাই? খুব স্পষ্ট করিয়া এ কথা ঘোষণা করিবার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে, সহরগুলিতে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, বাঙ্গালীর যে ইতিহাস বিক্ষিপ্তাকারে পড়িয়া আছে, তাহারই

সন্ধান করিতে হইবে। বাঙ্গালীর মর্ম্মস্থানের সন্ধান না পাইলে তাহার লুপ্ত আত্মসম্বিৎকে পুনরায় সঞ্জীবিত করিবে কোন্ উপায়ে? বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্ট সভ্যতা ছিল, বিশিষ্ট কৃষ্টি ছিল, আজ তাহার ইতিহাস উদ্ধার করিয়া বিশ্ব-সভায় বাঙ্গালী জাতি আপনার দাবী উপস্থিত করিবে না কেন?

বলা বাহুল্য, প্রাচীন ঐতিহাসিক ভিত্তি-ভূমির উপরে অবস্থানপূর্ব্বক বর্ত্তমান ঢাকা জেলার পরিচয় দিবার ক্ষুদ্রপ্রয়াস পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

ইতিহাসের যে সকল বিভিন্ন দিক্ অথবা ধারা একত্র সম্মিলিত হইয়া বর্ত্তমান ঢাকা জেলার ঐতিহাসিক পটভূমির সৃষ্টি করিয়াছে, তন্মধ্যে রাজনৈতিক দিক্‌ই সর্ব্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য; যেহেতু ঢাকার প্রাচীন ইতিহাসের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে রাজনৈতিক দিক্‌ই অধিকতর সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। কেবলমাত্র ঢাকা কেন, গোটা ভারতবর্ষের উল্লেখও এ ক্ষেত্রে অযৌক্তিক হইবে না। কারণ, আজ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয় ইতিহাসের নামে যাহা কিছু রচিত হইয়াছে, তাহাতে যে প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছিল, উহা একটু অনন্যসাধারণ। এই প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য, ভারতের রাজবংশ, প্রজাপুঞ্জ নহে। যুগে যুগে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে সকল সম্রাট্ অথবা তাঁহাদের বংশাবলী রাজকীয় ক্ষমতা লইয়া পরস্পর বিভিন্নছন্দে অক্ষক্রীড়া করিয়াছেন, আজও একমাত্র তাঁহারাই তাঁহাদের জীবনের বিভিন্ন কাহিনী লইয়া ভারতের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ সর্ব্বক্ষণের জন্য অধিকার করিয়া আছেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদেরই উপরে পুনঃপুনঃ আলোক-সম্পাত করার দরুণ প্রজাপুঞ্জকে দীর্ঘকাল বিস্মৃতি ও অবজ্ঞার আড়ালে আত্ম-গোপন করিতে হইয়াছে। হর্ষবর্দ্ধনের যাগ-যজ্ঞ অথবা আকবরের শিল্প-প্রীতির কাহিনী অপেক্ষা সম্রাটদ্বয়ের আমলে ভারতবর্ষ কোন্ স্তরের সামাজিক, অর্থ-নৈতিক এবং কৃষ্টিমূলক জীবন যাপন করিত, সে কাহিনী নিশ্চয়ই, অন্ততঃ উক্ত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে, অধিক গুরুত্ব-বিশিষ্ট নহে। অবশ্য ইহার যে কোনও চিরাচরিত কারণ ছিল না, তাহা নহে। রাজবংশ-সংশ্লিষ্ট ঘটনা-পরম্পরার সহিত সম-সাময়িক সমাজের অথবা জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব-সমূহকে তুল্যাসনে স্থান দিয়া পশ্চাদ্বংশীয়দের জন্য উহাদিগকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লিপিবদ্ধ করিবার প্রণালী অবশ্য প্রাচীন যুগে আবিষ্কৃত হয় নাই।[১] তখনকার দিনে সমাজ-সংস্থান সম্বন্ধে মানুষ যে ভাবে চিন্তা করিত, তাহাতে উক্ত প্রণালীর অভাব বোধ করিবার বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না। তারপরে কালের পরিবর্ত্তনে মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্ত্তন আসিল, কিন্তু এই আলোড়নে যখন অনাকাঙ্ক্ষিত প্রণালীটি সহসা আবিষ্কৃত হইল, তখন ইহার যথার্থ মূল্য নিরূপিত হইল না। বর্ত্তমানে অবশ্য ইহার প্রয়োজন সভ্য-জগৎ উপলব্ধি করিয়াছে। কাজেই আমাদের দেশের ইতিহাসের ভিতর দিয়া সামাজিক তথ্যসমূহ সন্ধানপূর্ব্বক যখন বিভিন্ন যুগের সমাজ সংস্থানকে পরীক্ষা করিতে বসি, তখন মুষ্টিমেয় বিদেশীয় পরিব্রাজকদের খণ্ডবিবরণ, অপ্রচুর শিলালিপি ও তাম্রপত্রস্থ অনুশাসনরূপ ক্ষীণ অবলম্বনের উপরই নির্ভর করিতে হয়। বিস্মিত হওয়া নিরর্থক। যতই পুরাতনের দিকে, পিছনের দিকে ফিরিয়া যাইতে চাহি, অবলম্বনও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। তবুও একটু আশার কথা—দেশের ও জাতির ইতিহাসের অন্যান্য দিক্ অপেক্ষা রাজনৈতিক দিক্ স্পষ্টতররূপে জানিবার উপায় আছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন যুগে ইতিহাস রচনার প্রয়াসের মধ্যে রাজনৈতিক দিক্‌ই শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমানে অনন্যোপায় হইয়া রাজনৈতিক দিকের সাহায্যেই ঢাকার ঐতিহাসিক পটভূমির পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

ঢাকা জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসকে চারিভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানগণের প্রথম বঙ্গ-প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়, মুসলমানের বঙ্গবিজয় হইতে মুঘলযুগের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত; তৃতীয়, মুঘলযুগ; সর্ব্বশেষ বৃটিশ আমল। রাষ্ট্র-নৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতির ও ঘটনাবৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া এই চারিভাগের মধ্যে মুঘলযুগই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুরুষপরম্পরাগত কিংবদন্তী এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করিয়া ঢাকার ইতিহাসের আরম্ভ। কিংবদন্তী এই, উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য খৃষ্টের জন্মের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে ঢাকা জেলার[২] দক্ষিণে রাজত্ব করিতেন এবং তৎকালীন রাজধানী তাঁহার নামানুসারেই বিক্রমপুর নামে আখ্যাত হয়। পরবর্ত্তী রাজবংশ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূঞা। রাজাদের স্থাপিত এবং প্রকাশ, বঙ্গের পালরাজগণ উঁহাদের বংশধর। মাধবপুরের যশোপাল, সাভারের হরিশ্চন্দ্র এবং ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ার শিশুপাল[৩]—ভূঞা।

১। জুল্যান্ হাক্সলে বলেন, ক্লাসিকাল যুগে গ্রীকদের ইতিহাসও সমসাময়িক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ মাত্র; সামাজিক মূল্যবান্ তত্ত্বসমূহ আবিষ্কার পূর্ব্বক উহাদিগকে চিরস্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ রাখিবার কোন প্রণালী উক্তযুগের গ্রীকদের ছিল না।

২। "অতি পূর্ব্বকালে ঢাকা জেলার উত্তরভাগ কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। বল্লালসেনের রাজত্বসময় এই ভূখণ্ড "বঙ্গ" নামে অভিহিত হয়। মোগল শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে টোডরমল্ল বাঙ্গালার রাজস্ব ও ভূমির বন্দোবস্ত করেন। টোডরমল্লের বন্দোবস্ত-কাগজে ঢাকা জেলার দক্ষিণভাগ ও পূর্ব্বভাগ 'সরকার সোণার গাঁও' এবং উত্তরভাগ 'সরকার বাজুহার' অন্তর্গত ছিল। ইংরেজ শাসন প্রবর্ত্তিত হইলে সরকার সোনার গাঁও ও সরকার বাজুহা "ঢাকা নেয়াবতের" অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ক্রমে জেলা স্থাপিত হইলে তাহা "ঢাকা জেলা" নামে অভিহিত হইয়াছে।" – কেদার মজুমদার: ঢাকার বিবরণ, ১৩১৬, পৃঃ ২।

৩। শ্রীযতীন রায় বলেন, শিশুপাল ভাওয়ালের উত্তরপশ্চিমে দীঘলিরছিট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক এতদঞ্চল শাসন করিতেন। ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা।

বংশের এই নৃপতিত্রয় উক্ত রাজবংশকে সমধিক প্রসিদ্ধ করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় অন্যতম রাজবংশ১ আদিশূরকর্তৃক স্থাপিত হয়। আইন-ই-আকবরীতে আদিশূর পাল-রাজাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পরন্তু, জনশ্রুতি তাঁহাদিগকে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করে। বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ ভাগ আদিশূরের অধিকারে ছিল এবং পালরাজগণ উহার উত্তরে রাজত্ব করিতেন। আদিশূরের প্রধান কীর্ত্তি, কান্যকুব্জ হইতে আনীত পাঁচজন কুলীন ব্রাহ্মণের সহায়তায় নিজরাজ্যান্তর্গত ব্রাহ্মণ সমাজের সংশোধন ও স্তরবিন্যাসসাধন। তাঁহার রাজত্ব সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু জানা যায় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহারাজ বল্লালসেনের বংশাবলী সম্বন্ধে আইন-ই-আকবরী এবং জনশ্রুতি ঠিক একমত নয়। শেষোক্তমতে বল্লালই আদিশূরের পরে বিক্রমপুরের রাজা এবং তিনি বঙ্গের এতদংশ মুসলমান কর্তৃক বিজিত না হওয়া পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মণ ঘটকগণ অবশ্য এই সম্বন্ধে অন্যপ্রকার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন২; এবং বল্লালের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের পরিচয়ের সুযোগ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের কাহিনীকে উপেক্ষা করা যায় না। তাঁহারা বলেন, মুসলমান কর্ত্তৃক গৌড় অধিকারের সময় বল্লালের একজন বংশধর সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং এই সময়ে বিক্রমপুরের শাসন-কর্তৃত্ব বল্লালপুত্র দনুজমাধবের৩ হস্তে ন্যস্ত ছিল।

আদিশূরের রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানী রামপালে যে সুবৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহাতে সেনবংশীয় নৃপতিগণের আমলে বিক্রমপুরের অভ্যুদয়ের গৌরবময় কাহিনীই ঘোষিত হয়। কাহারও কাহারও ধারণা, রামপাল সমতটেরই নামান্তর এবং বক্তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড় অধিকারের পর শেষ হিন্দু নৃপতি (যাঁহার নাম লক্ষ্মণসেন বলা হয়) পৈত্রিক প্রাচীন রাজধানী রামপালে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন৪। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমানগণ বঙ্গের অনেকাংশ জয় করিয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রকৃত বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের কোনও কোনও স্থান তাহার পরেও অনেকদিন পর্য্যন্ত অনধিকৃত ছিল এবং বল্লালসেনের বংশধরগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্য্যন্ত সেখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন৫। পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ সমতটকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ বাঙ্‌লা জয়৬ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের জেলাসমূহের শাসনভার কাজিদের হস্তে অর্পণ করেন। এই সম্পর্কে বিক্রমপুরের কাজি-শাসনকর্ত্তা পীর আদমের নাম উল্লেখযোগ্য; ধর্ম্মমূলক গোঁড়ামি এবং অত্যাচারের জন্যে উনি প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কাজি-যুগের অবসানে রাজ-প্রতিনিধিগণ নিযুক্ত হইয়া এতদঞ্চল শাসন করিতে আসেন; সুলতান উদ্দীন তুঘ্রিল সর্ব্বপ্রথম রাজ-প্রতিনিধি। ত্রিপুরাভিমুখে তাঁহার সফল সামরিক অভিযান তাঁহার শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে৭ সুলতান আলাউদ্দিন খীলজি বাঙ্‌লাকে লক্ষ্মণাবতী ও সোনার গাঁ এই দুই অংশে ভাগ করিয়া বাহাদুর শাহ্ অথবা খাঁকে শেষোক্ত অংশের শাসনকর্ত্তা করিয়া প্রেরণ করেন। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাহাদুর খাঁ স্বপদে বহাল ছিলেন। এই সময়ে তাঁহার শাসনকার্য্য পরিচালনার অক্ষমতার কথা তদানীন্তন দিল্লীশ্বর মুহম্মদ বীন্ তুঘলকের কর্ণগোচর হইলে সম্রাট্ স্বয়ং রাজ্যের পূর্ব্বাংশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া বাহাদুর খাঁকে অপসারিত করেন। বঙ্গদেশ দুইভাগের স্থলে, লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁ ও সোনার গাঁ এই তিনভাগে বিভক্ত হয় এবং তাতার বৈরাম খাঁ শেষোক্ত অংশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন।

১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বৈরামের মৃত্যু হইলে তদীয় বর্ম্মবাহক ফকীর উদ্দীন সুলতান সেকেন্দর৮ উপাধিধারণপূর্ব্বক আপনাকে সোণার গাঁর স্বাধীন শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ছিল না, বৎসর তিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা আলি মোবারকের হস্তে নিহত হইলেন। সুলতান সেকেন্দরের পরে ইলিয়স খাঁজে সুলতান সামসুদ্দীন, তদীয় পুত্র সুলতান সেকেন্দর শাহ ক্রমে এই জেলা স্বাধীনভাবে শাসন করিয়াছিলেন। সুলতান সামসুদ্দীনের সময়ে, ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে, বাঙ্‌লার বিভিন্ন খণ্ডপ্রদেশ সোণার গাঁর অধীনে একীভূত হইলে সোণার গাঁর শাসনকর্ত্তাদের ক্ষমতা ও প্রভুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। হিন্দু রাজগণের সময়ে যেমন দেশের গৌরব ও সমৃদ্ধি রামপালে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও সেইরূপ পাঠানগণের আমলে, সোণার গাঁ সমগ্র বঙ্গের শীর্ষে অবস্থানপূর্ব্বক গৌরবের ভাস্বর-দীপ্তি বিকিরণ করিতেছিল।

১। এই রাজবংশ সেনরাজবংশ নামে বিখ্যাত।

২। James Taylor : Topography and Statistics of Dacca, 1840, p. 66.

৩। *Ibid*, p. 66.

৪। শ্রীযতীন রায় : ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, উপক্রমণিকা।

৫। W. W. Hunter : Statistical Account of Dacca District, p. 119.

৬। উক্ত তারিখ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ দেখা যায়। Imperial Gazetteer, Volume XI-এ ১২০৪ এর পরিবর্ত্তে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে। উপরন্তু—"Marco Polo mentions that in the year 1272 A. D. while he was residing at the court of the great Khan of Tartary, the kingdom of Bengala was taken by that chief".—See Taylor : Topography, p. 67, footnote.

৭। এই ঘটনা ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয় বলিয়া Taylor সাহেব লিখিয়াছেন, See his Topography, p. 67. Imperial Gazetteer এ অবশ্য ১২৯৬ খৃষ্টাব্দেই আছে।

৮। Hunter সাহেব, সম্ভবতঃ Blochmann-এর রিপোর্ট-এর উপরে নির্ভর করিয়া বলেন, ফকীর-উদ্দিন, মোবারক শাহ উপাধিধারণপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। See Hunter; Statistical Account of Dacca District. p. 119.

সুলতান সামসুদ্দীন ও তাঁহার বংশধরগণ জেলার উত্তরাংশে একডালার দুর্গে বাস করিতেন। দিল্লীর সম্রাট্ ফিরোজ শাহ কর্ত্তৃক দুইবার এই দুর্গ অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সুলতান সেকেন্দর শাহের পরাক্রমের বলে সম্রাট্ তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। সুলতান সেকেন্দর শাহের পুত্র আজম শাহই আপনাকে সোণার গাঁর স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করিয়া কবি হাফেজকে নিজ সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে সোণার গাঁ ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্ত্তী জেলাসমূহ বিদ্রোহমূলক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। আজম শাহের পরে সোণার গাঁ, তথা বঙ্গের সিংহাসন ত্রিপুরা, আসাম এবং আরাকানের রাজগণের পদানত হয়। প্রায় ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে সুলতান সামসুদ্দীনের বংশধর প্রথম মামুদ শাহ তাঁহার অধীনে সমগ্র বঙ্গকে একীভূত করিয়া বঙ্গের লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার করেন[১]। তাঁহার বংশ প্রায় ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে পূর্ব্বাংশের জেলাসমূহ মুয়াজ্জমাবাদ নামে আখ্যাত হইত। মুয়াজ্জমাবাদ মেঘনা হইতে শ্রীহট্টের লাউড় নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। মুয়াজ্জমাবাদের দক্ষিণে ও পশ্চিমে ঢাকা, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জালালাবাদ ও ফতিয়াবাদ নামে পরিচিত হইত। আজাম শাহের বংশের পরে হুসেন শাহ বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিকগণের মতে তিনিই বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন। একডালা দুর্গ হইতে সামরিক অভিযান প্রেরণ পূর্ব্বক কামরূপের রাজধানী অধিকার করিয়া তিনি স্বকীয় অনন্য-সাধারণ শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করেন। হুসেন শাহই স্বাধীন বঙ্গের সর্ব্বশেষ মুসলমান নৃপতি।

১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে শেরসাহের রাজত্বকাল আরম্ভ হয়। তিনি যে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কথিত আছে, সোনার গাঁ তাহার পূর্ব্বাংশের শেষ প্রান্ত। শেরসাহের পরে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে ঢাকা সংলগ্ন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূখণ্ড ছোট ছোট খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়; যথা, ত্রিপুরা, শ্রীপুরের পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ, আরাকান রাজ্যের অধীন চট্টগ্রাম এবং সন্দীপ, ইত্যাদি। এই সময়ে আকবর কর্ত্তৃক মধ্যবঙ্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া আফগানগণ উড়িষ্যা এবং ঢাকা জেলার সীমান্তে আশ্রয় লয় এবং ধামরাই-এর নিকটবর্ত্তী গণকপাড়া ও গৌরীপাড়ায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকে। উহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে ইসলাম খাঁ বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া আসেন। আফগানেরা সম্পূর্ণরূপে শায়েস্তা হইলে পর তিনি ঢাকায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তদানীন্তন মুঘল সম্রাটের নামে ইহাকে জাহাঙ্গীরনগর আখ্যা দেন এবং বঙ্গের সৌভাগ্য ও গৌরবলক্ষ্মীকে সোণার গাঁ হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করিয়া লইয়া আসেন। মুঘল যুগে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করিয়া যে সকল শাসনকর্ত্তা বাঙ্লার রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, ক্রমানুসারে তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল[২]:—

তারিখ	বাঙ্লার শাসনকর্ত্তা	মুঘলসম্রাট্	ইংলণ্ডের সম্রাট্
১৬০৮	শেখ ইসলাম খাঁ	জাহাঙ্গীর	প্রথম জেম্‌স্
১৬১৩	কাসিম খাঁ	"	"
১৬১৮	ইব্রাহিম খাঁ	"	"
১৬২২	শাহজাহান	"	"
১৬২৫	খানেজাদ খাঁ	"	প্রথম চার্লস
১৬২৬	মুক্রাম খাঁ	"	"
১৬২৭	ফিদাই খাঁ	"	"
১৬২৮	কাসিম খাঁ জোবানি	শাহজাহান	"
১৬৩২	আজিম খাঁ	"	"
১৬৩৭	ইসলাম খাঁ মুসেদি	"	"
১৬৩৯	সুলতান সুজা*	"	"
১৬৬০	মীর জুমলা	ঔরংজেব	দ্বিতীয় চার্লস
১৬৬৪	শায়েস্তা খাঁ	"	"
১৬৭৭	ফিদাই খাঁ	"	"
১৬৭৮	সুলতান মহম্মদ আজিম	"	"
১৬৮০	শায়েস্তা খাঁ	"	"
১৬৮৯	দ্বিতীয় ইব্রাহিম খাঁ	"	তৃতীয় উইলিয়াম
১৬৯৭	আজিম উষান্	"	"
১৭০৪	মুর্শিদ কুলী	"	রাণী এ্যান্

শুধু আফগানদিগকে নহে, মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুগণকেও বিতাড়িত করিয়া ইস্‌লাম খাঁ বাঙলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম খাঁর মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা কাসিম খাঁ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। কাসিম খাঁর সময়ে আরাকানরাজ বঙ্গদেশস্থ পর্ত্তুগীজদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন এবং নিম্নবঙ্গের প্রদেশগুলিতে যথেচ্ছ অত্যাচার ও লুণ্ঠতরাজ করিতে থাকেন। ইহাতে কাসিম খাঁর দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাকে সরাইয়া তৎস্থানে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইব্রাহিম খাঁকে বাঙ্লায় পাঠাইলেন। এই সময়ে সম্রাট্‌পুত্র শাহজাহান পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। এক বিরাট যুদ্ধে ইব্রাহিম খাঁ নিহত হইলে শাহজাহান ঢাকা অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহজাহান পাটনায় সম্রাট্‌বাহিনী কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পর জাহাঙ্গীর মহব্বত খাঁকে বাঙ্লায় সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। খানেজাদ খাঁ তাঁহার প্রতিনিধি হইলেন। ইহার পরে আজিম খাঁর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা নাই। আজিম খাঁর সময়েই, সম্রাট্ শাহজাহানের নিকট হইতে এক ফরমান পাইয়া ইংরেজেরা বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করেন এবং এতদুপলক্ষে বালেশ্বরের নিকটে তাঁহাদের প্রথম বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করেন।

১। *Ibid.*

২। P. C. Gupta, Some Reminiscences of Old Dacca, p. 2.

* কর্তৃত্ব পাইবার অব্যবহিত পরেই সুলতান সুজা রাজধানী ঢাকা হইতে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন।

পরবর্ত্তী সুবাদার কাশিম খাঁ জোবানি ঢাকাতে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং সৈন্য ও নৌ-সম্ভার বৃদ্ধি করেন। সুলতান সুজা অতি বিচক্ষণ সুবাদার ছিলেন। রাজস্ববৃদ্ধি করিয়া এবং শাসনকার্য্যের প্রত্যেক বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তিনি ইংরেজদিগকে অনেক বাণিজ্যিক সুবিধা ও সুযোগ প্রদান করেন। তাঁহার সময়ে রাজধানী ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া রাজমহলে নীত হইয়াছিল। সুলতান সুজার পরে মীর জুমলা নবাব হইয়া আসিয়া পুনরায় ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন। ঐতিহাসিকগণ মীর জুমলার আমলকেই ঢাকার ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় অধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মগ এবং অন্যান্য সীমান্ত-জাতিদের আক্রমণ প্রতিরোধার্থে তিনি যে বৃহৎ বৃহৎ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, হাজিগঞ্জে এবং ইদ্রাকপুরে এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। আসাম অভিমুখে অভিযানের শেষাংশে মীর জুমলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃত্ব পাইবার অব্যবহিত পরেই চট্টগ্রাম অধিকার করিয়া উহাকে ইসলামাবাদ আখ্যা দেন। তাঁহার সময়ে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বহুল পরিমাণে বিদ্যমান ছিল এবং স্থাপত্যশিল্প সবিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। "শায়েস্তাখানি" ঢং-এর অনেক প্রাচীন দালান অদ্যাবধি ঢাকা সহরে দেখিতে পাওয়া যায়। মুর্শিদকুলী খাঁ মুঘলগণের অধীন শেষ সুবাদার। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ঢাকা মুঘল-রাজ-প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে একজন নায়েবের দ্বারা শাসিত হইতে থাকে।

এই সময় হইতে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানীর অধিকার লাভ করিয়াছিল) ঢাকা এবং সংলগ্ন জেলাসমূহের ইতিহাসে কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। নায়েবগণ মুর্শিদাবাদে থাকিয়া শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতেন ; বিশৃঙ্খলার সুযোগ পাইয়া কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গকে শোষণ করিয়া অর্থসঞ্চয়ের দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। দেশের সুখ ও সৌভাগ্য নায়েবের ব্যক্তিগত চরিত্রের উপরে নির্ভর করিত। রাজবল্লভ ও তদীয় পুত্র কৃষ্ণদাস এইরূপেই প্রভূত অর্থসঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌল্লার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইলে পর দেশীয়গণ ঢাকার শাসন-কর্ত্তৃত্ব ইংরেজের হাতে তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়েন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করিলে ঢাকার শাসনভার দুইটি বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হইত। হুজুরী বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন প্রাদেশিক দেওয়ান। তিনি মুর্শিদাবাদে থাকিতেন এবং একজন ডেপুটির সহায়তায় কার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম এই বিভাগের অধীন ছিল।

দেওয়ানী ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নিজামত বিভাগের উপরে। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে হুজুরী ও নিজামত এই উভয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইয়া একজন রাজস্ব-সচিব নিযুক্ত হয়েন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-সচিব উপাধি কলেক্টরে পরিণত হয় এবং উক্ত বৎসরই দেওয়ানের পদ মহম্মদ রেজা খাঁর স্থলে স্বয়ং কোম্পানী গ্রহণ করায় কলেক্টরের অধীনে একটি দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক কৌন্সিল স্থাপিত হইলে রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী আদালতে বিচার করিবার জন্য সাহেবগণ নিযুক্ত হইতে থাকে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কৌন্সিল উঠিয়া গেলে ডে সাহেব প্রথম কলেক্টর ও ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়েন এবং ডানকান্‌সন্ সাহেবকে প্রথম বিচারপতিরূপে লইয়া একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়।

১৭৭৮ এবং ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজগণ ক্রমে ক্রমে ফরাসী ও ওলন্দাজগণের কুঠিসমূহ দখল করেন। এই সময় হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ঢাকার বাণিজ্যের (প্রধানতঃ মুসলিম) দ্রুত অবনতি হইতে থাকে এবং ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে ইংরেজদের কমার্শিয়াল রেসিডেন্সী একেবারেই উঠিয়া যায়।

ইহার পরে, ইংরেজদের আমলে, ঢাকার ইতিহাসে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আছে, তাহা সিপাহী-বিদ্রোহ। ঢাকাস্থিত লালবাগ দুর্গের সিপাহীগণ বিদ্রোহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু উহারা সহজেই দমিত হয়। চট্টগ্রাম, মৈমনসিংহ ইত্যাদি পূর্ব্বাংশের জেলাসমূহের সিপাহীদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ঢাকাতেই বিশ্বাসী সৈন্য জমায়েত করিতে থাকেন। দুই একটি ছোটখাট খণ্ডযুদ্ধ ভিন্ন ঢাকাতে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় আর কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

১৯০৫ সন পর্য্যন্ত ঢাকা জেলা বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের অধীনে ছিল। উক্ত সনে ১৬ই অক্টোবর বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া "পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম" প্রদেশ গঠিত হয় এবং ঢাকা জেলাকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেন্টের শাসনাধীন করা হয়। পরে বঙ্গভঙ্গ রহিত হইলে ঢাকা জেলা পুনরায় বাঙ্গলা গবর্ণমেন্টের অধীন হইয়াছে।

রাজনৈতিক দিক্ দিয়া ঢাকার ঐতিহাসিক পটভূমি পর্য্যবেক্ষণ করা গেল। প্রাগৈতহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান ইংরেজ আমল পর্য্যন্ত ঢাকা জেলাই সমগ্র বঙ্গের হৃদ্‌পিণ্ডস্বরূপ ছিল। যুগে যুগে রাজনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতের বৈচিত্র্যের মধ্যে এই কথাই প্রতীয়মান হয় যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও বাঙ্গালার ভাগ্য ঢাকা জেলার ভাগ্যের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত থাকিয়া ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে ; ঢাকার স্বাস্থ্যের উপরেই সমগ্র বঙ্গরাজ্যের স্বাস্থ্য নির্ভর করিয়াছে। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঢাকা জেলা, রাজ্যের শীর্ষদেশে অবস্থান করিয়া এবং তাহার সুপ্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টি লইয়া যে ভাবে জনমনের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং এইরূপে এক বিরাট ঐতিহ্য গঠন করিবার সহায়তা করিয়াছে ক্রমে ক্রমে যথাযথভাবে তাহারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী আলোচিত হইবে। বাঙ্গালার জাতীয়তা গঠনেও এই ঢাকা জেলা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কতখানি সাহায্য করিয়াছে, এই জেলার বিভিন্ন দিকের পরিচয় প্রদান করিলেই সে রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে।

বন্যা ও ব্রডকাষ্ট [শিল্পী—শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

সুদেতেন জার্ম্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়া
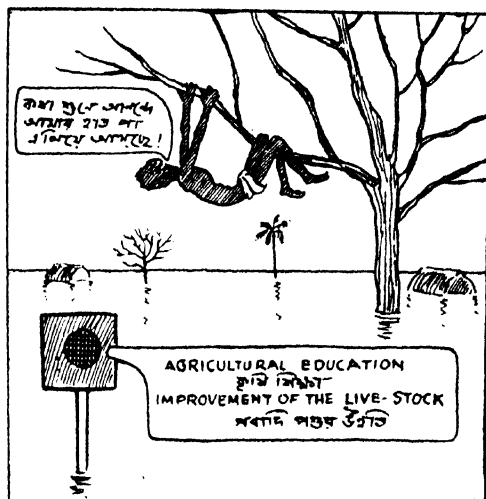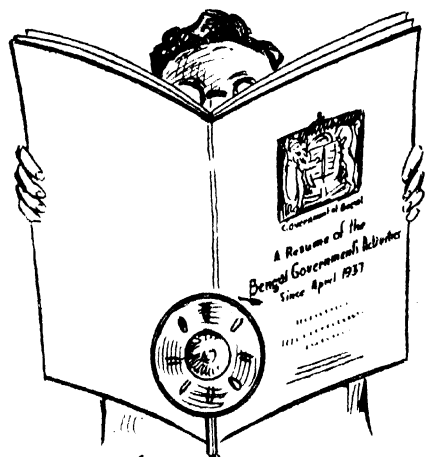
—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

চেকোশ্লোভাকিয়া মধ্য-ইউরোপের একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র ইউরোপে, শুধু ইউ-রোপে কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এক জটিল সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। এই সমস্যার গুরুত্ব কতখানি, সম্প্রতিকার দুইটি ঘটনায় তাহা বেশ জানা গিয়াছে। প্রান্তিক প্রাচীতে জাপান ও সোভিয়েট রুশিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ মাত্র সাত দিন চলিয়াই থামিয়া যায়। আবার পশ্চিম-ইউরোপে, ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মান সীমান্তে বহু-আলোচিত রাইনল্যাণ্ড অঞ্চল এবং চেক-জার্ম্মান সীমানা হিটলার সুরক্ষিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সীমানা সুরক্ষিত করা মানে, সামরিক প্রয়োজনের জন্য দুর্গ, ঘাঁটি, রাস্তা-ঘাট প্রভৃতি যেখানে যত কিছু আবশ্যক সবই আগে হইতে নির্ম্মাণ করিয়া লওয়া। এই ব্যাপার লইয়া ইউরোপে আজ হৈ-চৈ-এর অন্ত নাই। বহু সহস্র মাইল ব্যবধানে জগতের দুই প্রান্তে যে দুইটি ব্যাপার ঘটিয়া গেল—একটি অবশ্য এখনও চলিতেছে, তাহা কিন্তু পরস্পর-বিরোধী উদ্দেশ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। জার্ম্মানী ও রুশিয়ার লক্ষ্য এক —চোকোশ্লোভাকিয়া। জার্ম্মানী চোকোশ্লোভাকিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে চায়, সোভিয়েট রুশিয়া তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়িতে প্রস্তুত। ইহাদের এই বিভিন্নমুখী উদ্দেশ্যে ইন্ধন জোগাইতেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতেন জার্ম্মানরা। আজকাল এই দলের কথা বড়ই শোনা যাইতেছে। চেক সরকার ইহাদের তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ প্রকারের চেষ্টা করিতেছেন। ইংরেজ লর্ড রান্সিমান বে-সরকারী ভাবে উভয়কে পরামর্শ দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, সুদেতেন জার্ম্মান ও চেক সরকারের মধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসা না হইলে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা তো বিপন্ন হইবেই, উপরন্তু জগতে আর একটি মহাসমর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। এই সুদেতেন জার্ম্মান কাহারা? সকলেই আজ ইহাদের কুলজী সম্বন্ধে খোঁজ করিতেছে।

হিটলার অনেক দিন যাবৎ আট কোটী জার্ম্মানের একটি সম্মিলিত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখিতেছেন। ইদানীং এই স্বপ্ন যেরূপ তৎপরতার সহিত তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে সর্ব্বত্রই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। সুদেতেন জার্ম্মানরা জার্ম্মান জাতিরই অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহারা কখনও খাস জার্ম্মানীর অধীনে থাকে নাই। আজ তাহারা জার্ম্মানীর সঙ্গে মিলিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। কেন এবং কিরূপে ইহা সম্ভব হইল, তাহা সম্যক্ বুঝিতে হইলে অতীতের দিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।

চেকোশ্লোভাকিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র, বয়স কুড়ি বৎসর এখনও পূর্ণ হয় নাই। বোহিমিয়া এখন ইহার একটি প্রদেশ মাত্র। কিন্তু বোহিমিয়াকেই এই নূতন রাষ্ট্রের পূর্ব্বজ বলিয়া গণ্য করা যায়। বোহিমিয়া চেক জাতির অতি গৌরবের বস্তু। তাহার সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও ধর্ম্ম এখানেই গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা আড়াই শত বৎসর যাবৎ অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর অধীন ছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে বহুকাল বোহিমিয়া স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। চেক জাতিই ছিল স্বাধীনতার বাহন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে এখানে ডক্টর জন হাস নামে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তিনি বিখ্যাত ধর্ম্ম-সংস্কারক জন উইক্লিফের সমসাময়িক ও মার্টিন লুথারের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি ছিলেন জাতিতে চেক। তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল অফুরন্ত। তিনি অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। কিন্তু ধর্ম্ম-সংস্কারে ও ধর্ম্মালোচনায় যুক্তির প্রবর্ত্তনে তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। তখন ইহা ছিল একটা মস্ত বড় অপরাধ। জার্ম্মান রাজের আদেশে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়। চেক জাতির প্রাণে আজও ইহার স্মৃতি কাঁটার মত বিঁধে, তাহারা এখনও তাঁহার স্মৃতি পূজা করে। এখন হয় ত আশ্চর্য্য ঠেকিবে, কিন্তু এক সময় মুসোলিনীও ডক্টর হাসের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহার একখানা জীবনী লিখিয়াছিলেন।

বোহিমিয়ার এই চেকদের সঙ্গে জার্ম্মানরা বহুশত বৎসর যাবৎ পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে। বোহিমিয়া

যখন স্বাধীন ছিল, তখন চেকদের গৌরবে ইহারা স্বতঃই ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। পরে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর অধীন হইলে জার্ম্মানদের নানা রকম সুখ-সুবিধা হইতে থাকে। অষ্ট্রীয়ান-রাও জার্ম্মান, কাজেই তাহাদের অধীন থাকিতে সুদেতেন জার্ম্মান দলের পূর্ব্বপুরুষদের এতটুকুও আটকায় নাই। চেক জাতি কিন্তু বরাবর আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছে। এজন্য কখন কখন বিদ্রোহও করিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয় নাই। তবে উভয় জাতির জনসাধারণ বরাবর প্রতিবেশী হিসাবেই বসবাস করিয়াছে, একের দুঃখে অন্যে দুঃখ এবং একের সুখে অন্যে সুখ অনুভব করিয়াছে। পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদানও হইয়াছে বিস্তর। জার্ম্মান লেখকগণ চেক জাতির বীরত্ব-কাহিনী ভাষায় প্রকাশ করিতেও কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু কালের গতি কে রোধিবে?

মধ্যযুগের সামন্ত-তন্ত্র গত শতাব্দীর মাঝখানেই তাসের ঘরের মত কোথায় মিলাইয়া গেল। এক একটি জাতি নিজের বৈশিষ্ট্য লইয়া এক একটি রাষ্ট্র গড়িয়া লইল। এই সময় হইতেই হইল জাতীয়তাবাদের সুরু। যাহারা এই যুগ-ধর্ম্মের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে না পারিল, তাহাদের ভিতর দেখা দিল তীব্র অসন্তোষ, বিদ্বেষ, হিংসা। হাপ্‌সবুর্গ রাজবংশের অধীনে থাকিতে বোহিমিয়ার জার্ম্মানদের কোন আপত্তির কারণ ছিল না। কিন্তু চেক জাতির পক্ষে স্থির থাকা অসম্ভব, যুগধর্ম্ম তাহাদের ভিতরও যে আলোড়ন আনিয়া দিয়াছে। তাহারা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অর্থ যাহারা সরকারের পক্ষপাতী তাহাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন। চেকগণ শ্লাভ জাতির একটি শাখা। নিখিল-শ্লাভ কংগ্রেসে তাহারা যোগদান করিল। তাহাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সকলেরই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, রাজনৈতিক সুবিধাও আদায় করিতে হইবে, ইহাই হইল অতঃপর চেক জাতির দাবী। ১৮৪৮ সাল হইতে ১৯১৮ সাল, এই দীর্ঘ সত্তর বৎসর পর্য্যন্ত চেকদের এই আন্দোলন চলে। প্রতিবেশী জার্ম্মানদের বিপক্ষতা ও বিরোধিতা তাহাদের উদ্দেশ্যে বাদ সাধিয়াছিল। কাজেই এককালের স্বাধীন ও শক্তিমান চেক জাতি এই রাজ-অনুগত জার্ম্মানদের উপর যে বিরূপ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশঃ চেক-জার্ম্মান বিরোধে পরিণত হইল। অষ্ট্রিয়া সরকার চেকদের খুশী করিবার জন্য পার্লামেণ্টারী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন এবং অন্যান্য শ্রেণীর সঙ্গে তাহাদেরও প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষমতা দেন। ১৮৬৭ সালে এই ব্যবস্থা কার্য্যকরী হয়। কিন্তু চেকেরা ১৮৭৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা 'বয়কট' বা বর্জ্জন করিয়াছিল। জার্ম্মানগণ কিন্তু সরকারের সঙ্গে বরাবর সহযোগিতা করিয়াই চলিয়াছে এবং সামরিক ও পররাষ্ট্র-নীতিতে তাহাদের সাহায্য করিয়াছে। ১৮৭৯ সাল হইতে চেকগণ পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে থাকে। বহুদিন পরাধীন থাকিলেও এই সময় হইতেই তাহাদের বৈশিষ্ট্য আত্ম-প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইতে থাকে। ১৮৮২ সালে প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে চেক ভাষা ও সাহিত্য একটি গৌরবময় আসন লাভ করে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর হইতেই জার্ম্মান ও চেকদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে কত ভ্রান্ত, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিলাম। এই বিরোধ বহু-শতাব্দী পুষ্ট। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাই এই বিরোধকে পাকাইয়া তুলিয়াছে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের কারণ জিয়াইয়া রাখিয়াছে। বিগত মহাসমরে এই বিরোধ আরও বাড়িয়া চলিয়াছিল। জার্ম্মানরা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীকে আঁকড়াইয়া থাকিতে চায়। তাহারা ধন-জন দিয়া সরকারকে সাহায্য করে। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পায়। আর চেকেরা? আইনের আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক চেকদের সরকারের তরফে স্বজাতীয় শ্লাভগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লাগান হইয়াছিল বটে, কিন্তু জাতির স্বাতন্ত্র্যকামী নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশে চেকগণ শেষে বিপক্ষ দলেই যোগ দিয়াছিল। পাঠক মাসারিকের নাম নিশ্চয়ই শুনিয়াছেন। বৃদ্ধ মাসারিক এবং যুবক বেনেশ ও ষ্টেফানিক এই ত্রয়ী মিলিয়া এই সব অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধে খাস জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পতন হইল। তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বোহিমিয়ার জার্ম্মানদের অদৃষ্টের চাকাও উল্টাইয়া যায়। মিত্র-শক্তিবর্গের শুভাশিস্‌ লইয়া চেকোশ্লোভাকিয়া রাষ্ট্র

অতঃপর গড়িয়া উঠিল। বোহিমিয়া, মোরাভিয়া-সাইলেসিয়া শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া এই চারিটি অঞ্চল লইয়া ইহা গঠিত হয়। ১৯২০ সালে পার্লামেণ্টিয় প্রথায় শাসন-কার্য্য আরম্ভ হইল। চেকোশ্লোভাকিয়া একটি পুরাপুরি 'রিপাবলিক' বা সাধারণতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। টমাস গেরিস মাসারিক ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইলেন।

জার্ম্মানরা কিন্তু মহাসমরে চেকদের আচরণ ভুলিতে পারে নাই। এখন তাহাদের ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া কি বিশ্বাসঘাতক (?) চেকদের সঙ্গে একযোগে কার্য্য করিবে? চেক-রাষ্ট্র গঠনের সময় যে সব আলোচনা হয়, তাহা তাহারা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করে। ১৯২০ সালের প্রেসিডেণ্ট-নির্ব্বাচনেও তাহারা যোগ দেয় নাই, শাসন-ব্যাপারে কোনরূপ সহযোগিতাই তাহারা করিতে চাহিল না। কিন্তু তাহাদের এই সঙ্কল্প বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ধীরে ধীরে তাহাদের মধ্যে নানা দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। একজন বিশেষজ্ঞ এই দলগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন: activist বা সহযোগপন্থী এবং negativist বা অসহযোগ-পন্থী। ১৯২৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে সহযোগপন্থীরা যোগদান করে এবং পর বৎসর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়, তাহাতে ইহাদের মধ্য হইতে দুইজনকে মন্ত্রিপদে গ্রহণ করা হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় চেক, শ্লোভাক, জার্ম্মান, মেগিয়ার, রুথেন, পোল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বাস। সেখানকার গঠনতন্ত্রে বিভিন্ন জাতির লোকসংখ্যার অনুপাতে পার্লামেণ্টে সদস্য-নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা আছে। জার্ম্মানদের ভাগে পড়িয়াছে পঁচাত্তরটি। গঠন-তন্ত্রের আরও দুই একটি বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা ভাল। কেন্দ্রে যেমন 'ডায়েট' বা পার্লামেণ্ট, প্রত্যেক প্রদেশেও তেমনি একটি করিয়া ব্যবস্থাপক-সভা আছে, প্রতি জেলাতে এক একটি কাউন্সিল আছে। ইহাদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার-মনোনীত। স্থানীয় ব্যাপার-গুলি এই সব কাউন্সিলই নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। গঠন-তন্ত্রে আর একটি বিষয় বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লিখিত আছে। তাহা হইল সেখানকার 'মাইনরিটি' বা সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতিগুলি সম্বন্ধে ব্যবস্থা। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি-সমূহের নাম আগে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার মধ্যে প্রধান হইল জার্ম্মান জাতি। সুতরাং সংখ্যালঘিষ্ঠদের সম্বন্ধে যে-সব ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে জার্ম্মানরাই উপকৃত হইয়াছে বেশী। এক জন বিশেষজ্ঞ বলিয়াছেন, ইটালি, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লাভিয়ায় যে সব জার্ম্মান আছে, তাহাদের অপেক্ষা এখানকার জার্ম্মানরা কোন প্রকারেই নিকৃষ্ট ব্যবহার পায় না। চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্ম্মানরা কি কি সুবিধা ভোগ করিতেছে একবার দেখুন। পার্লামেণ্টে সদস্য-প্রেরণের ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি। মিউনিসিপ্যালিটিগুলিতে তাহারা সংখ্যানুপাতে সদস্য প্রেরণ করিতেছে। তাহাদের শিক্ষার জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। জার্ম্মান জাতির নিজস্ব একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং বহুশত নিম্ন, মধ্য ও উচ্চশ্রেণীর স্কুল, কলেজ, সঙ্গীত ও ললিত-কলা বিদ্যালয়, কেজো (technical) ও ব্যবসা-বাণিজ্য শিক্ষার জন্য শিক্ষায়তন প্রভৃতি রহিয়াছে, আর ইহার অধিকাংশেরই ব্যয় বহন করে চেক সরকার। মোট জন-সংখ্যার অনুপাতে জার্ম্মানদের সংখ্যা ২২·৫ জন, কিন্তু তাহাদের পড়ুয়া ছেলে-মেয়েদের অনুপাত বর্ত্তমানে শতকরা ২৭·৬ জন। জার্ম্মানদের সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকার হইতে সাহায্য পাইয়া থাকে। তাহারা নিজস্ব দৈনিক পত্রিকাদিও নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে পরিচালন করিতেছে। জার্ম্মান ভাষা ছিল আগে রাজভাষা। চেক এখন রাষ্ট্রভাষা হইয়াছে, তথাপি জার্ম্মান-অধ্যুষিত অঞ্চলে সরকারী বিভাগ-গুলিতে, মিউনিসিপালিটিতে, আইন-আদালতে জার্ম্মানভাষা ব্যবহারের বিধি আছে। এত সব সুবিধা পাইয়া, একদল জার্ম্মান কয়েক বৎসরের মধ্যে চেক সরকারের সহযোগিতায় অগ্রসর হইয়াছিল।

বিগত ১৯২৬ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত খাস জার্ম্মানীতে নাৎসী দলের আবির্ভাব পর্য্যন্ত চেক ও জার্ম্মানদের ভিতরে বিশেষ কোন দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ ঘটে নাই। চেক-রাষ্ট্র আয়তনে ছোট। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যে অনেক বড় বড় রাষ্ট্রকেও সে হার মানায়। আপনারা কলিকাতার অলিতে গলিতে, এমন কি সুদুর মফঃস্বলের ছোট ছোট সহরেও বাটা কোম্পানীর জুতার দোকান দেখিতে পাইবেন। বাটা হইলেন চেকোশ্লোভাকিয়ার একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁহার ব্যবসা এখন জগৎজোড়া। এইরূপ বহু নামজাদা ব্যবসায়ী সেখানে আছেন। যে দেশের বহির্ব্বাণিজ্য এত সুবিস্তৃত, সে দেশ

যে অহর্নিশ কলকারখানার গুঞ্জনে মুখরিত হইবে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। এ-সব কলকারখানা আবার জার্ম্মান-অধ্যুষিত বোহিমিয়া অঞ্চলেই সব চেয়ে বেশী। জার্ম্মানরা এখানে জনমজুরী খাটিয়া ও অন্যান্য চাকরি আদি করিয়া বেশ দু'পয়সা আয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া পাইল। কিন্তু কয়েক বৎসর আগেও তাহারা যে রাজার জাত ছিল, তাহারা তাহা এবং তাহার আনুষঙ্গিক ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিতে পারে নাই।

ইহার পর এমন দুইটি ঘটনা ঘটিল, যাহা চেক-জার্ম্মান সম্পর্কের একেবারে মোড় ফিরাইয়া দিল। ইহা দ্বারা পূর্ব্বস্মৃতি জাগিবার অবকাশ পাইল, বিরোধ পুনরায় পাকাইয়া উঠিবার উপক্রম হইল। ইহার কোনটিরই উপর হাত কি চেক, কি জার্ম্মান কাহারও ছিল না। গত ১৯৩১ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত হইলে সর্ব্বত্রই শিল্প-বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইয়া আসিল। চেকোশ্লোভাকিয়ারও ঐ একই দশা। ইহার দুই বৎসরের মধ্যেই জার্ম্মানীতে নাৎসী বা হিটলারপন্থী দল প্রাধান্য পাইল, হিটলারের নেতৃত্বে শাসনভার গ্রহণ করিয়া নাৎসীরা খাস জার্ম্মানী হইতে মন্দা বিদূরিত করিবার যে আয়োজন করে, তাহা দ্বারাও চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯২৯ সালে চেক ও জার্ম্মানীর ভিতর আমদানী-রপ্তানীর যে পরিমাণ ছিল, ১৯৩৩ সালে তাহা প্রায় এক-চতুর্থাংশে গিয়া দাঁড়ায়। জার্ম্মানী প্রতিবেশী বলিয়া সেইখানে চেকের মালপত্র বেশী কাটতি হইত। কাজেই আমদানী-রপ্তানী এতটা হ্রাস পাওয়ায় বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া গেল। ইহার ফলে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বোহিমিয়া অঞ্চলের জার্ম্মানরা ক্ষতিগ্রস্ত হইল সব চেয়ে বেশী। চেক সরকার তাহাদের বিশেষ কিছু সাহায্য করিতে পারিলেন না।

এদিকে যখন জার্ম্মানদের দুরবস্থা এইরূপ, অন্যদিকে তখন জার্ম্মানীতে বেকার-সমস্যার আশ্চর্য্যরকমের মীমাংসা হইতে চলিল। সেথানে বেকার-সংখ্যা খুবই হ্রাস পাইল। তার উপর জার্ম্মানীতে যে আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার ঢেউ বোহিমিয়ায় পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। মহাসমরের ফলে জার্ম্মানজাতি বিচ্ছিন্ন হইয়া দুরবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতেছিল। জার্ম্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়ে তাহাদের প্রাণে নববলের সঞ্চার হইল। জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত হইবার কল্পনা পর্য্যন্ত যাহাদের মনে কখনও উদিত হয় নাই, তাহারাও হিটলারকে অভিনন্দন জানাইল। হিটলারের লক্ষ্যই সমগ্র জার্ম্মানজাতির ঐক্য-সাধন, আর সম্ভব হইলে তাহাদের এক রাষ্ট্রভুক্ত করা। চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্ম্মানদের ভিতর অসহযোগী এক দল বরাবরই ছিল। এখন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা জার্ম্মান জনসাধারণের মধ্যে হিটলারের আদর্শ প্রচার করিতে লাগিল। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে অষ্ট্রিয়ায় নাৎসীদের চেষ্টা ব্যাহত হইলে সরকার সেথানে তাহাদের বে-আইনী ঘোষণা করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার হিটলারপন্থীরা এই দৃষ্টান্তে হুসিয়ার হইয়া গেল ও তাহারা দল ভাঙ্গিয়া দিল। তলে তলে কিন্তু তাহাদের প্রচারকার্য্য ভাল মতই চলিতে থাকে। তাহারা "হোম ফ্রণ্ট" নামে আর একটী দল গঠন করে এবং কনরাড হেনলাইন ইহার নেতা হন। হেনলাইন জার্ম্মান-জিক ইউনিয়নের পরিচালক। কাজেই যুবকগণ তাঁহার একান্ত অনুগত। ১৯৩৫ সালের সাধারণ নির্ব্বাচনে হেনলাইনের দল—তখন ইহার নাম হইয়াছে সুদেতেন জার্ম্মান—মোট পঁচাত্তরটি জার্ম্মান সদস্যপদের মধ্যে চুয়াল্লিশটিই লাভ করিল। ইহারা ভোট পাইল সাড়ে চার লক্ষ, অর্থাৎ জার্ম্মান ভোট-দাতাদের শতকরা বাষট্টি জন ইহাদের পক্ষে ভোট দিল। পার্লামেণ্টে (সদস্যসংখ্যা তিন শত) ইহারা দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইল। হেনলাইন কিন্তু সদস্য-পদ প্রার্থী হইলেন না, বাহিরে থাকিয়া দলকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। চেক সরকার এতকাল সহযোগী (activists) জার্ম্মানদের মত অনুযায়ী কার্য্য করিতেন, এখন বুঝিতে পারিলেন অসহযোগীদের (negativists) সঙ্গে আপোষ-রফার সময় দ্রুত ঘনাইয়া আসিতেছে।

বর্ত্তমানে সুদেতেন জার্ম্মান নামে পরিচিত পূর্ব্বের সেই অসহযোগী দল সরকারের সঙ্গে এবারেও, এত সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াও, সহযোগিতা করিতে রাজী হইল না। আগেকার সহযোগীদের ভিতর হইতেই মন্ত্রিসভার সদস্য লওয়া হইল। জার্ম্মানদের অভিযোগের কারণগুলি দূর করিতে চেক-সরকার অধিকতর মনঃসংযোগ করিলেন। তাহাদের একটি অভিযোগ, শাসনকার্য্যে জার্ম্মানদের অধিকার স্থাপন। চেক-রাষ্ট্রের সঙ্গে জার্ম্মান জন-সাধারণ বহু বৎসর যাবৎ অসহযোগিতা

করিয়াছে, সরকারের অধীনে চাকুরি স্বীকার করে নাই, শাসন ব্যাপারেও যোগদান করে নাই। কাজেই অন্যান্য জাতির মধ্য হইতে লোকজন সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল। যেহেতু এখন তাহারা সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিযুক্ত হইবার সুযোগ চাহিতেছে, সেহেতু প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মিলান হোজা এই বিষয়ে ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বৎসর সময় চাহিয়াছিলেন। একজন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, যে-সব অঞ্চলে জার্ম্মানরা সংখ্যায় অধিক, সে-সব অঞ্চলের মিউনিসিপ্যালিটী, আইন-আদালত এবং সরকারী অন্যান্য বিভাগগুলিতে জার্ম্মান কর্ম্মচারীরা এই সংখ্যাধিক্য লাভ করিয়াছে।

কনরাড হেনলাইনের নাম আপনারা শুনিয়াছেন। সুদেতেন জার্ম্মান দলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা। হিটলারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইলেও তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও চেক্‌-সরকারের আধিপত্য অস্বীকার করেন নাই। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভিতরে থাকিয়াই জার্ম্মানদের অবস্থার উন্নতি করিবার তিনি প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার মত বদলাইয়াছে। গত মার্চ্চ মাসে হিটলার কর্তৃক বিনা রক্তপাতে অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার পর হইতে হেনলাইনের দল যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মান মন্ত্রীরা একে একে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। এখন একমাত্র জার্ম্মান সমাজতান্ত্রিক দল ছাড়া অন্য সকলেই চেক্‌ সরকারের বিরুদ্ধে মিলিত হইয়াছে। জার্ম্মান-প্রধান অঞ্চলে সম্প্রতি যে মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে এই সরকার-বিরোধী দলই আশাতীত রূপ জয়লাভ করিয়াছে, জার্ম্মান সমাজতন্ত্রীরা অতি সামান্য ভোটই পাইয়াছেন। হেনলাইন কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় সুদেতেন জার্ম্মানদের দাবীর একটি ফিরিস্তি পেশ করেন। ইহার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার সার্ব্বভৌমতা ক্ষুণ্ণ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। হেনলাইনের প্রধান দাবী— চেক রাষ্ট্রকে ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়ার সংস্রব বর্জ্জন করিয়া জার্ম্মানীর সঙ্গে একযোগে চলিতে হইবে। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, জার্ম্মানীর অভিসন্ধি জানিয়া তাহা ব্যাহত করিবার জন্য ফ্রান্স ও সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে চেক-রাষ্ট্র তিন বৎসর পূর্ব্বে পরস্পর সাহায্যমূলক সন্ধিতে আবদ্ধ হয়। এ সময় ইহা বর্জ্জন করিলে প্রবল জার্ম্মান-রাষ্ট্রের কবলেই যে গিয়া পড়িতে হইবে এ-বিষয়ে দ্বিমত নাই। আবার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও যাহাতে হিটলার হস্তক্ষেপ করিতে পরেন, তাহার সূত্রও ঐ দাবীর মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। হেনলাইনের অন্যতম দাবী—জার্ম্মান-প্রধান অঞ্চলকে একটি সম্পূর্ণ আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে। তাহা হইলেই, জাত-ভাইদের হাতে রাখিয়া হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার পরিচালনা করিতে পারিবেন। ইদানীং শুনা যাইতেছে, হেনলাইন তাঁহার সুর কতকটা নামাইয়াছেন। সুদেতেন জার্ম্মানরা একনায়কত্বে বিশ্বাসী, চেকরা গণতন্ত্রে আস্থাবান্। কিন্তু যেখানে উভয়ের আদর্শের এতটা আকাশ-পাতাল প্রভেদ, সেখানে মীমাংসা কিরূপে সম্ভব?

চেক-সরকার এই জটিল সমস্যার মীমাংসায় সম্প্রতি বিশেষভাবেই অবহিত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ডক্টর এডোয়ার্ড বেনেশ ও প্রধান মন্ত্রী ডক্টর মিলান হোড্‌জা ঘোষণা করিয়াছেন যে, চেক-রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহারা জার্ম্মান-প্রমুখ সংখ্যালঘিষ্ঠদের দাবীপূরণে সর্ব্বদাই উৎসুক। চেক ও জার্ম্মানদের মধ্যে ব্যবহারে কোনরূপ বৈষম্য থাকিবে না। রাষ্ট্রের সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধাই জার্ম্মানরা পাইবে। ইদানীং জানা গিয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার দেশ-রক্ষা, অর্থ-সংস্থান ও পররাষ্ট্র-নীতিতে নিজ কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবেন স্থির করিয়াছেন। ইহার ফলে, বোহিমিয়ার সুদেতেন জার্ম্মানরাও স্থানীয় ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিবে। প্রদেশগুলিতে যে-সব 'ডায়েট' বা ব্যবস্থাপক-সভা থাকিবে, তাহারাই আভ্যন্তরীণ শাসন-কার্য্য পরিচালনা করিবে।

চেক সরকারের এই প্রস্তাব সুদেতেন জার্ম্মানরা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছে। তবে তাহারা আরও আলাপ-আলোচনা চালাইতে সম্মত। ওদিকে বিলাতের লর্ড রান্সিমান বে-সরকারীভাবে উভয় পক্ষকে মাসাধিক কাল পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহার প্রাহা গমন লইয়া নানা জনে নানা কথা বলিয়াছিল। লর্ড রান্সিমানের মধ্যস্থতায়ও যদি কোনরূপ আপোষ-মীমাংসা না হয় তাহা হইলে ব্যাপার কিরূপ দাঁড়াইবে? সোভিয়েট রুশিয়ার জাপানের সঙ্গে হঠাৎ আপোষ এবং হিটলার কর্তৃক রাইনল্যাণ্ড ও চেক-সীমান্ত সংরক্ষণের নবীন উদ্যম, এ-উভয়ই একটা ভাবী বিপদের সূচনা করিতেছে। শেষে কি, সার্ভদের মত সুদেতেন জার্ম্মানরাও একটা মহাসমরের কারণ হইবে?

কেস নম্বর...

—শ্রীসুমন্ত্র মহলানবীশ

পড়াশোনায় রাঘব বরাবরই ভাল। বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে ফিরে এল যখন, তখন বন্ধু-বান্ধবেরা বললে, "বিলেত গিয়েও বিগ্‌ড়ে যায় নি, এমন ছেলের উন্নতি অনিবার্য্য।" সিগারেট খাওয়া ছাড়া আর একটি কেবল দোষ ছিল তার। সেটি হচ্ছে মনস্তত্ত্ব বা মনো-বিশ্লেষণ অর্থাৎ সাইকো-এনালিসিস্‌। ভাল ডাক্তার হতে হলে নিদেন সাধারণ সাইকোলজি ভাল করে পড়া চাই, রোগের সঙ্গে যোগ যে কেবল শরীরেরই নয়, তা সে ছাত্রাবস্থাতেই জোর গলায় প্রচার করত।

কৃতী ছেলের আইবুড়ো থাকাটা কিছু না। আত্মীয়-স্বজন রাঘবকে এ কথা জানাতে ক্রটি করলেন না। রাঘবের কিন্তু এ বিষয়ে কোন উৎসাহ নেই। সে বলে, বিবাহটা প্রধানতঃ মনের ওপরই নির্ভর করে। যদি 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'ও হয়, তবু আগে চাই পুত্রের ইচ্ছা। তার তদ্রূপ কোন কামনার উদ্রেক হয় নি। আত্মীয়-স্বজন হতাশ। বন্ধু-বান্ধবও খানিকটা নিরাশ হল। বিমল রায় ব্যাক্‌টিরিওলজিষ্ট, প্রেমটাকেও সে একটা ব্যাধি বলেই মনে করে। সে বলে, কালে বিজ্ঞানের উন্নতি হলে মন-টাও আসবে তার এলাকার ভেতরে এবং মানসিক ব্যাধিরও বীজাণু আবিষ্কৃত হবে। তখন প্রেমগ্রস্ত লোককে অটো-ভ্যাক্‌সিন দিয়ে আরোগ্যও করা যাবে এবং অপ্রেমিককেও ইন্‌জেক্‌সন দিয়ে তার ভেতর প্রেম-রোগের সৃষ্টি করা যাবে। যাই হোক, মনের যখন কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয় নি, তখন শরীরে প্রেমোদ্দীপন করলেও খানিকটা হয় ত ফল পাওয়া যেতে পারে।

রাঘবের কাছে প্রস্তাবটা কোন রকমে পাড়া হল। সে বললে, "প্রেসিডিওরটা একেবারেই ভুল। বাইওলজীতে বলে যে, জীবনের আদিতে মন বলে কিছু ছিল না। ক্রম-অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনের যে-রকম উন্নতি দেখা যায়, তাতে এটা খুবই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বিশাল মনো-রাজ্যের এখনও অনেক তথ্যই অনাবিষ্কৃত আছে। কোন জিনিষের উৎপত্তি হয় মনে এবং শরীরের যে পরি-বর্ত্তন সেটা তারই প্রভাবে—তার অভিব্যক্তি আর কি। মন সম্বন্ধে বিমল কতটুকুই বা বোঝে?" শেষোক্ত কথাটার পর বিমল বিরক্ত হয়ে গেল। রাঘবের বিবাহের ব্যাপারটা তখনকার মত চাপা পড়ল বটে, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের দাবী বন্ধুদের চেয়ে অনেক বেশী, তারা অত সহজে ভুলল না।

মিটিং-এর পর মিটিং বসল। ঠিক হল যে, ওর বন্ধুবর্গকে আবার ডাকা হক। কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল হবে বলে মনে হল না। বাড়ীর ভেতর শচীন সব চেয়ে জ্যাঠা, সে বললে, "ব্যাপারটা যে-রকম সূক্ষ্ম, তাতে এ্যালোপ্যাথী ডাক্তারের ক্ষমতা নয়। বলেন-দাকে খবর দেওয়া যাক।" বলেন বাঁড়ুজ্যে রাঘবেরই সতীর্থ, সে হোমিওপ্যাথী প্র্যাক্‌টিস্‌ করে। M. B., H. M. D. (U. S. A.)। শুধু ভাল হোমিওপ্যাথ বলে নয়, ইন্টেলিজেন্ট বলে বলেনের বরাবরই একটা খ্যাতি ছিল এবং ডাক্তারী ছাড়াও নানা বিষয়ে বন্ধুরা তার পরামর্শ নিয়ে থাকে। বলেনকে জানান স্থির হল।

যথাসময়ে বলেনের আগমন হল। আত্মীয়গণ বললেন, "বাবা বলেন, এ বিপদ্‌ থেকে আমাদের উদ্ধার করে দাও।" বলেন বললে, "আচ্ছা, ভেবে একটা উপায় বার করা যাবে। কিন্তু রাঘবের বিয়ে দিতে হলে একজন পাত্রী তো আবশ্যক, সেটা আগে ঠিক করুন, তার পর আমি সব ঠিক করে দেব।"

বাংলা দেশে পাত্রীর অভাব কখনও হয় নি। আত্মীয়-গণ বললেন, "সে জন্য ভেব না, পাত্রী ঢের পাওয়া যাবে।" বলেন বললে, "দেখুন পাত্রী পাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু রাঘব বিলেত-ফেরৎ, তা ছাড়া সাহিত্যানুরাগী, একটু কাল্‌চারড্‌ মেয়ে না হলে কি চলে! একটি ভাল পাত্রী দেখে আমাকে খবর দেবেন।"

আবার মিটিং। এবার পাত্রী-নির্ব্বাচন নিয়ে। অনেক খ্যাত-অখ্যাত কুলীন বংশের নাম উঠল। শচীন

কর্ণেল চৌধুরীর মেয়ে উৎপলার উল্লেখ করাতে আর সব কটা নামই প্রায় চাপা পড়ে গেল। উৎপলা মেয়ে খাসা। বি. এ. পাশ, দেখতে শুনতেও মন্দ না—স্মার্ট। কর্ণেল চৌধুরী রাঘবের পিতৃবন্ধু, তাঁরও অমত হবে না বলেই বোধ হয়। সকলেই একমত হল—উৎপলার সঙ্গেই রাঘবের সম্বন্ধ করা যাবে। শচীন বললে, "আর সকলের তো মত হল, কিন্তু আসল লোকের মনের ভাব তো কিছু জানা গেল না।" গুরুজনেরা ধমকে উঠলেন, "সব-তাতে ডেঁপোমো করিস নে। রাঘবকে রাজী করবার ভার তো বলেন নিয়েইছে।" ডেঁপো কিন্তু দমল না, বললে, "রাঘবদার কথা কে বলছে। মেয়ের যদি মত না হয় তবে রাঘবদার রাজী হওয়াতে কি যায় আসে।" এটা চিন্তার বিষয় বটে। মেয়ে শুধু চৌধুরী সাহেবের একমাত্র ও অতিপ্রিয় কন্যা তা নয়, বি. এ. পাশ করেছে—আজকালকার মেয়েদের মতামতটা নেহাৎ উপেক্ষার বিষয় নয়। সকলেই একটু হতাশ হয়ে পড়ল। এমন পাত্রী হাতছাড়া করতেও মন সরে না। শচীন বললে, "দুজনের সঙ্গে দুজনের দেখা করিয়ে দেওয়া যাক, তারপরে কার কি মনোভাব যদি আঁচ করতে পারা যায় তো ভাল। শেষ পর্য্যন্ত না হয় বলেন-দাকে আর একটা কল দেওয়া যাবে।" অগত্যা এই প্রস্তাবে সবাই রাজী হল। কর্ণেল চৌধুরী অবসর নিয়ে রাঁচীতেই থাকেন। রোগা লম্বা, দাড়ি-গোঁপ-কামান—শরীরে বাহুল্য কোথাও নেই। বয়স যদিও ষাটের কাছাকাছি তবু বেশ শক্ত আছেন। এখনও মাঝে মাঝে শীকারে যান। বয়সকালে নামজাদা শীকারী ছিলেন। শরীরের মত মনটাও সতেজ আছে। পুরুলিয়া রোডের উপর বাড়ী, সঙ্গের বাগানটিও সযত্ন-রক্ষিত।

পূজায় রাঘবের আত্মীয়গণ রাঁচী যাওয়াই স্থির করলেন। রাঘবকে এ কথা জানান হল। সে বললে, "হাজারীবাগে নিজেদের বাড়ী থাকতে মিথ্যে খরচ করে রাঁচী যাওয়া কেন?" বাড়ীর লোক বললে, "রাঁচীতে দেখবার বস্তু অনেক, মোরাবাদী পাহাড়, হুড্রু ফল্‌স্ ইত্যাদি।" "বেশ তো। সে তো হাজারীবাগ থেকে যে কোন দিন মোটরে করে গিয়ে দেখে আসা যায়। তার জন্যে খামকা বাড়ী-ভাড়া করে এক মাস ধরে থাকবার কি দরকার?" গুরুজনরা বললেন, "তোমার বাপু আমাদের সব কথাতেই আপত্তি, কেন, রাঁচী গেলে এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে? তা ছাড়া, জায়গাটার স্বাস্থ্যও খুব ভাল।" "হাজারীবাগের স্বাস্থ্যও কিছু খারাপ নয়।" গুরুজনরা অধৈর্য্য হয়ে বললেন, "রাঁচী অনেক স্বাস্থ্যকর জায়গা—নইলে ওখানে যক্ষ্মারোগীর হাসপাতাল খুলবে কেন?" শচীন বললে, "তা ছাড়া ওখানে মনেরও স্বাস্থ্য থাকে ভাল, তা না হলে পাগলা-গারদই বা থাকবে কেন?" গুরুজনের হাত কাণ পর্য্যন্ত পৌছবার আগেই শচীন সরে পড়ল। রাঁচী যাওয়াই স্থির হল। কর্ণেল চৌধুরী নিজেদের বাড়ীর কাছেই এক বাড়ী ঠিক করে দিলেন। সহরের প্রান্তে সার্কুলার রোডের ওপর বাড়ী। সব যখন ঠিক-ঠাক, রাঘব বললে, "আমার যেতে কিছুদিন দেরী হবে, হাতে কয়েকটা কেস্ আছে, এদের একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পারব না।"

এই নিয়ে বাড়ীর লোকে গোলমাল করলে। ভাবলে, যদি শেষ পর্য্যন্ত না যায়, তবে তো সমস্তই পণ্ড হবে। শচীন বললে, "আচ্ছা, আমি থেকে যাই, পরে রাঘবদার সঙ্গে যাব।" শচীনের ওপরেই রাঘবকে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া সাব্যস্ত হল। বাড়ীর সবাই চলে যাবার পর রাঘব একদিন শচীনকে জিজ্ঞেস্ করলে, "হ্যাঁ রে, এবার সকলের হঠাৎ রাঁচী যাবার এত সখ হল কেন?" "কি জানি, বোধ হয় নতুন জায়গা বলে।" "আরে নতুন জায়গা তো আরও ঢের ছিল—দার্জ্জিলিং, সিম্‌লে, মশুরি।" "একটু চুপচাপ জায়গায় যেতে চান, রাঁচীটা দেখাও হয় নি; তা ছাড়া, সস্তাও বটে।" "চুপচাপই যদি চান, তবে হাজারীবাগ কি দোষ করল? সেখানে তো সস্তাও বেশী হত—নিজে-দের বাড়ী পড়ে রয়েছে। ভাড়া তো আর লাগে না।—নাঃ, ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না, কেমন গোলমেলে লাগছে।"

নির্দ্দিষ্ট দিনে শচীন বললে, "রাঘবদা, আজ সন্ধ্যার গাড়ীতেই যাওয়া যাক।" রাঘব দ্বিরুক্তি করল না। যথা-সময়ে রাঁচী পৌছন গেল। শচীনের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও রাঘবের মনে একটা খটকা রয়ে গেল। ষ্টেশন থেকে

কয়েক মাইল মোটরে যেতে হবে। রাঘবকে আনতে বাড়ীর লোক একজন এসেছিলেন। মোটরের চেহারা এবং সোফারের উর্দ্দি দেখে ট্যাক্সি বলে মনে হয় না। রাঘব জিজ্ঞেস্ করলে, "এটা কার গাড়ী ?" বাড়ীর লোক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "এটা কর্ণেল চৌধুরীর গাড়ী—আমাদের বাড়ীর কাছেই তাঁর বাড়ী। জান তো তোমার বাবার কি রকম বন্ধু ছিলেন ?" রাঘব মাথা নাড়ল। বাড়ী পৌছে কুশলাদির পর সবাই বললে, তাড়াতাড়ি স্নান করে নিতে—খাবার তৈরী। স্নানের পর রাঘব যথারীতি খাটো কাপড়ের ওপর ওয়েষ্টকোট পরে হাজির হল। সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললে, "এ কি রকম বেশ, আর, কামাস নি কেন ?" রাঘব তার চেহারা সম্বন্ধে নানা কথা শুনে শুনে অভ্যস্ত, কাজেই কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বারান্দায় পাইচারী করতে লাগল। বাড়ীর লোকের উৎকণ্ঠা বেড়েই চলল। একগুঁয়ে লোককে চটিয়ে দেওয়াও সুবিধার নয়। ডেঁপোকে তলব করা হল। শচীন ব্যাপার শুনে বললে, "তা শেভ্ করলেও যে বিশেষ তফাৎ হবে তা মনে হয় না।" রাঘবের গোঁপজঙ্গল-সম্বলিত মুখ যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা কথাটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারলেন না। তবু ভব্যতার খাতিরে ওটা করা ভাল। তা ছাড়া পরিচ্ছদ। শচীন বললে, "রাঘবদা, তুমি এ কি করছ ? বিলেত ঘুরে এসেও ম্যানার্স শেখ নি ?" "তার মানে ?" "মানে, তুমি এই বেশে খেতে যাবে ?" রাঘব কিছুক্ষণ অবাক্ হয়ে রইল, তার পর বললে, "দেখ্ শচী, মেলা জ্যাঠামি করিস নি। চিরকাল এই বেশে খেয়ে এসেছি—আজকে হঠাৎ কি হল ?" "চিরকাল তো আর তুমি কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ী খেতে যাও নি।" "কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ী!" "হ্যাঁ, আজ সকালে সকলকে ওখানে খেতে বলেছেন যে।" "কই, তা তো জানি না", বলে রাঘব কর্ত্তিত-ধান্যক্ষেত্রবৎ চিবুকে হাত বুলুতে লাগল। রাঘব যে নিমন্ত্রণের কথা জানেই না, এ কথা বাড়ীর লোকের গোচর করা হল। তাঁরা শুনে গালে হাত দিয়ে বললেন, "ওমা, অমুক তোকে বলে নি ?" পরস্পর পরস্পরের ওপর দোষারোপ করলেন। শচীন বললে, "দোষ যারই হোক, নেমন্তন্ন যখন করেছে, তখন উপযুক্ত বেশভুষা করে যাওয়াই উচিত।" অগত্যা রাঘবকে বেশ-পরিবর্ত্তন করতেই হল। যথাসময়ে কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ী যাওয়া হল। কর্ণেল সাহেব বহু কাল পরে রাঘবকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "কত দিন পরে দেখা, তুমি তো বেশী চেঞ্জ কর নি, খালি গোঁপজোড়া নতুন দেখছি।"

উৎপলা ঘরে ঢুকল। চৌধুরী সাহেব তাকে বললেন, "পলি, রাঘবকে চিনতে পারছিস ?" রাঘব একটু দাঁত বার করল, কিন্তু গোঁপের আড়ালে দেখা গেল না। উৎপলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলিল, "ওমা রাঘবদা কি রকম বদ্‌লে গেছেন—আর ওরকম বিশ্রী গোঁপ রেখেছেন কেন ?" বলে হেসে উঠল। উৎপলাকে রাঘব শেষ দেখেছিল প্রায় বছর দশেক আগে। বালিকা আর তরুণীতে যে একটু প্রভেদ আছে তা স্বীকার করতে হল। খাবার সময় উৎপলা পরিবেশন করল। রাঘব ছাড়া আর সকলেই পরিতৃপ্তির সহিত ভুরি-ভোজন করলেন। বাড়ী ফিরে সবাই রাঘবকে শুনিয়ে শুনিয়ে উৎপলার প্রশংসা সুরু করলেন। এমন কি শচীনও বলল, "আঃ মাংসের কালিয়াটা যা রেঁধেছিল আর আলু-বোখরার চাটনী। কি বল রাঘবদা ?" রাঘব কথাটা অস্বীকার করতে পারল না। "ও দুটোই শুনলাম চৌধুরী সাহেবের মেয়ে নিজে রেঁধেছিলেন। আমি বলি বাবা এই হচ্ছে আইডিয়াল মেয়ে। এ দিকে পড়াশোনা আছে—কালর্চাড। আবার ঘরের কাজেও ওস্তাদ। আজকাল এ রকম মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না।" ডেঁপোর উচ্ছ্বাসোক্তিতে রাঘব একটু অবাক হল। একদিন সকলে মিলে হুড্রু ফল্‌স যাওয়া হল। অন্যরা ট্যাক্সিতে এবং চৌধুরী সাহেবের মোটরে রাঘব আর পিতাপুত্রী। পথে উৎপলা রাঘবকে ঝরণার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করাতে লাগল। ক্রমে আলোচনা মানবের সৌন্দর্য্যলিপ্সা ও তার কারণ এই নিয়ে তর্কে গিয়ে ঠেক্‌ল। রাঘব ভাবলে, এতদিন যে মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে এইবার তার পরিচয় দেওয়া যাক্, বললে, "ফ্রয়েডের মতে এ সব কামনার মূল হচ্ছে·····" কথা শেষ হবার আগেই উৎপলা বলে উঠল, "ফ্রয়েডের থিওরী নিয়ে ওই খানেই তো ওঁর শিষ্যদের সঙ্গে বিবাদ। আমার মনে হয় এ

বিষয়ে ইয়াং-এর মতামতই বেশী গ্রাহ্য।" রাঘব এতটা আশা করে নি, কাজেই আলোচনা ওখানেই স্থগিত রইল। যাই হোক, রাঘবের ভাগ্য সেদিন একেবারেই অপ্রসন্ন ছিল না। রোগ, তার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা সুরু হল। রাঘব এমন সুযোগ ছাড়লে না। রোগের উৎপত্তি যে অনেক সময়েই মন থেকে এবং এই কথাটা জানা নেই বলেই যে চিকিৎসকগণ অধিকাংশ কেসে ভুল চিকিৎসা করেন এবং অনর্থক নানাপ্রকার ওষুধ প্রয়োগ করে থাকেন, তা সে দৃঢ়ভাবে বলে গেল। এই তো আসবার আগে তাঁর নিজেরই একটা কেস। রোগ বিশেষ কিছুই না, ডিস্‌পেপসিয়া, কিন্তু কিছুতেই সারে না। কত ডাক্তার কতরকম ওষুধ দিলেন, শেষে রোগী হতাশ হয়ে রাঘবকে ডাকলে। রাঘব কেবল আহারের একটা তালিকা দিয়ে তখুনি চেঞ্জে যেতে বলে দিল। কারণ অন্যেরা যা বুঝতে পারে নি, সেটা হচ্ছে এই যে, রোগীর ব্যারামটা আসলে মনের দুদিন খোলা জায়গায় থাকলে এবং নিয়মিত বেড়ালে মন প্রফুল্ল হবার সঙ্গে সঙ্গেই অসুখ সেরে যাবে। সেরে গিয়েছিল কি না সেটা জানা গেল না, কারণ ততক্ষণে তারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছেছে। গাড়ী থেকে নেমে সবাই হাঁটা-পথে চলতে সুরু করলেন। চলতে চলতে নানা গল্প-গুজব হচ্ছিল। রাঘবের পায়ের তলায় একটা নুড়ি পড়াতে হঠাৎ সে বে-সামাল হয়ে গেল। পড়ল না বটে, কিন্তু পড়া বাঁচাতে গিয়ে এমন অদ্ভুত ভাবে হাত পা ছুঁড়ল যে, অন্যরা এবং বিশেষ করে উৎপলা না হেসে থাকতে পারল না। রাঘব মুখটা আরও গম্ভীর করে সাবধানে হাঁটতে লাগল। প্রায় আধঘন্টা পরে ফল-এ উপস্থিত হওয়া গেল। সঙ্গে চায়ের আয়োজন ছিল। টিফিন-বাক্স থেকে খাবার নামল। ঝরণার দৃশ্যটি বাস্তবিকই সুন্দর, উৎপলা খানিকক্ষণ মুগ্ধ চোখে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। রাঘব পাশ থেকে বলে উঠল "জন্তুর সঙ্গে মানুষের তফাৎ তো এইখানেই, মানুষের জীবন ধারণ করবার পক্ষে খাদ্যই যথেষ্ট নয়-কথাটা পুরোণ, কিন্তু অতি সত্য।" উৎপলা বললে, "কিন্তু খাদ্যও তো দরকার।" "হ্যাঁ, শরীর যখন একটা আছে, তখন খাদ্যটা না হলে চলে না। তবু দেখুন, এমন সুন্দর জায়গায় এসে খাবার কথা মনে থাকে না-অবশ্য এটা একান্তই আমার মনের কথা। এই দেখুন না, আমার বাড়ীর লোকে এখানে এসে কি খাওয়া হবে আগে থাকতে তাই নিয়েই ব্যস্ত, চায়ের কেট্‌লী, চিনি, দুধ ইত্যাদির কথা ভাবতে ভাবতে আর কিছুতে মনই দিতে পারলেন না। এমন জায়গায় এসেও যদি খালি কি খাব তাই ভাবতে হয় তা হলে আসার কি প্রয়োজন?" বলে রাঘব উদাস দৃষ্টিতে প্রপাতের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় শচীন এসে জানাল যে, কোন আত্মীয়ের ভুলে ষ্টোভটি না কি ফেলে আসা হয়েছে। মুহূর্ত্তে রাঘবের মুখ ম্লান হয়ে গেল। "বলিস্ কি? আসবার সময় বিশেষ করে বলে দিয়েছিলাম যে ষ্টোভটা যেন ভুল না হয়, নিজে তেল-টেল ভরে পর্য্যন্ত দিলাম। যাক, আর কি করা যাবে, চা বিনা খাবারও খেতে ইচ্ছে করে না।" ভুলে যাবার মূল কারণ সম্বন্ধে ফ্রয়েড কি বলেন, সে বিষয়ে রাঘবের বক্তব্য শেষ হবার আগেই উৎপলা শচীনের সাহায্যে দুখানা পাথর দিয়ে দিব্যি উনুন তৈরী করে ফেললে, তার পর ডাল-পাতা দিয়ে আগুন জ্বালতেও দেরী হল না। আগুন ধরাবার পর রাঘবের মনে পড়ল যে, নিজের পকেটে দেশলাই ছিল। কেট্‌লী বসান হল। যাঁর ভুলে ষ্টোভটা আনা হয় নি তিনি রাঘবকে বললেন, "কি কাজের মেয়ে!" রাঘব উত্তর দিলে, "দায় পড়লে সবাই কাজের হয়। ষ্টোভটা আনলে আর ওঁকে অনর্থক কষ্ট দিতে হত না।" যথাকালে চা-পানের পালা শেষ হল। অস্ত-সূর্য্যের আভায় পশ্চিম আকাশ রক্তিম হয়ে উঠেছে, সেই আলো প্রপাতের উপর পড়াতে জলের মধ্যে বিচিত্র মায়াজাল সৃজন করছে।

এমন সময়ে অ-কবির মনেও গান জাগে। সবাই বললে উৎপলাকে গাইতে হবে। উৎপলা কিছুমাত্র ন্যাকামি না করে বললে "আচ্ছা।" তার পর রাঘবকে জিজ্ঞেস করল "কি গাইব?" রাঘবের মনেও সূর্য্যাস্তের রঙীন আভা পড়েছে, তাই তার মুখভাব অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অজানা লোকে দেখলে বল্‌ত, বোধ হয় পরিপাক-যন্ত্রের কোন গোল-যোগ ঘটেছে! সে বললে "একটা বাংলা গান শোনান।"

উৎপলা গাইতে লাগল "পথে যেতে দিনের শেষে, দেখা তোমার সে কোন্ বেশে···।" গলাটি বেশ মিষ্টি, সবাই তন্ময় হয়ে শুনতে লাগল। রাঘবের ভাবাবেশে চোখ বুজে এল। শচীন কুগ্রহের মত রাঘবের কাছে কাছেই ছিল, রাঘবের চোখ বন্ধ দেখে বলে উঠল "দাদা ঘুমোলে না কি?" গান গেল থেমে। সবাই জিজ্ঞেস করল, "কি হল, মাঝখানে গান বন্ধ করবার কি কারণ?" রাঘব শচীনের দিকে কটমট্ করে চেয়ে রইল। পেড়াপিড়িতে উৎপলা বললে, "বেশ, আর একটা গাইছি।" বলে আর একটা গান সুরু করে দিল। রাঘব বলবে, "না না, যেটা গাইছিলেন সেইটাই শেষ করুন না।" উৎপলা রাঘবের দিকে চোখ তুলে বললে, "ওটা আর গাইব না, ফের যদি আবার আপনার ঘুম পায়?" রাঘবের মুখে কথাটি নেই- নতুন গান সুরু হল। গান শেষ হতেই সবাই পাততাড়ি গুটিয়ে ফিরে চলল। পথে উৎপলা শচীনের সঙ্গে জাতি-ভেদ নিয়ে তর্ক করতে করতে চলল। শচীন বলছিল যে, জাতির বৈশিষ্ট্যই যখন রইল না, তখন জাতিভেদের আর প্রয়োজন নেই। "এই দেখুন না, যদি পুরাকালের ব্রহ্মণ্য তেজ থাকত, তা হলে আমি কি আর এতক্ষণ বেঁচে থাকতাম? রাঘবদার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম।"

দু' তিন দিন পরে রাঘব কলকাতা ফিরে যেতে চাইল। ডাক্তারের বেশী দিন সহর ছেড়ে থাকা ভাল নয়, তাতে প্র্যাক্‌টিসের ক্ষতি হয়। আত্মীয়েরা বললেন, "আর ক'টা দিন থেকে যেতে পারিস না?" রাঘব বললে, "অসম্ভব, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।" শচীনকে জিজ্ঞেস করাতে সে রাঘবের সঙ্গে ফিরবার বিশেষ উৎসাহ দেখালে না, অগত্যা রাঘব একাই চলে গেল। সে যাবার পর আবার মিটিং বসল। এখন কি করা যায়? প্রবীণেরা বললেন, "একবার কর্ণেল চৌধুরীর কাছে কথাটা পেড়ে দেখা হোক।" শচীন জিজ্ঞেস করল, "কি কথা পাড়া হবে?" প্রবীণেরা বললেন, "কেন রাঘবের বিয়ের কথা; আমরা রাঘবের সঙ্গে উৎপলার বিবাহ প্রস্তাব করে পাঠাব।" শচীন বললে, "রাঘবদার মত না জেনে অগ্রসর হওয়া কি ঠিক?" তাকে সব কথায় জ্যাঠামি করতে বারণ করে দিয়ে রেজলিউসন পাশ করা হল। যথা সময়ে কর্ণেল চৌধুরীর কাছে প্রস্তাব পৌঁছল। তাঁর যে কোন আপত্তি নেই তা তখুনি জানালেন, কেবল মেয়ের যদি মত হয়। দুদিন পরে মেয়ের মত জেনে পাঠাতে প্রতিশ্রুত হলেন। রাঘবের কাছে এই মর্ম্মে চিঠি গেল যে, কর্ণেল চৌধুরীর মত পাওয়া গেছে। এমন মেয়ে আর পাওয়া যাবে না, সে যেন আর অনর্থক একটা গোলমাল না বাধায়। এক দিনের ব্যবহারে তাঁরা স্পষ্টই বুঝেছেন যে উৎপলার রাঘবের প্রতি কি রকম অনুরাগ ইত্যাদি। চিঠির শেষ দিকটা রাঘবের ভাল লাগল। উৎপলার কেন, যে-কোন মেয়েরই তার প্রতি অনুরাগ আছে শুনলে সে খুসী হত। উত্তরে লিখলে যে, তার মতামত না নিয়ে বিবাহের প্রস্তাব করাটা অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে। আজকালকার দিনে মেয়েদেরও একটা মতামত হয়েছে বটে, কিন্তু তা বলে ছেলের মতটা উপেক্ষার নয়। তার সম্মতি না নিয়েই যে ওঁরা এই কাজ করেছেন, এ কথা যেন চৌধুরী সাহেবকে জানান হয়। তবে কর্ণেল চৌধুরী বাবার বাল্যবন্ধু, তাঁর মনে কষ্ট দেওয়াও তার ইচ্ছে নয়, কাজেই সে কথাটা বিবেচনা করে দেখবে এবং যথা সময়ে জানাবে। যেদিন চিঠিটা ডাকে দিল তার পরদিনই রাঁচী থেকে আর একটা চিঠি পেল। তাতে লেখা আছে যে, উৎপলার মত এখনও পাওয়া যায় নি, কাজেই রাঘব যেন বিবাহের আশায় এখনি উৎফুল্ল না হয়। এ চিঠির আর কোন উত্তর দিল না। একজন সামান্য মেয়ে তাকে উপেক্ষা করবে, শেষে এও সহ্য করতে হল! ছুটির শেষে রাঘবের আত্মীয়রা ফিরে এলেন। শচীন একদিন কথায় কথায় উৎপলার প্রশংসা করতে লাগল। রাঘব বললে, "যা যা, ওর কথা ঢের শোনা গেছে, 'স্ববিশ'।" "না উৎপলাদি মোটেই দেমাকে না। তা ছাড়া তুমি আর বলো না, সেদিন যা অভদ্র ব্যবহার করেছিলে তার সঙ্গে।" "আমি আবার অভদ্র ব্যবহার করলাম কখন?" "বা রে, সেই হুড্রু ফল্‌স দেখতে দিয়ে, ওঁকে গান ফরমাস করে ঘুমোতে লাগলে।" "আমি মোটেই ঘুমোই নি।" "পষ্ট দেখলাম চোখ বন্ধ।" "চোখ বন্ধ হলেই যেন ঘুমোতে হবে। আমি তো চুপ করে শুনছিলাম, তুই হতভাগাই তো খামকা চেঁচিয়ে উঠে সব মাটি করলি—ইষ্টুপিড।"

"এখন আমাকে গাল দিলে কি হবে। বেশ তো তখন নিজেই বললে না কেন সব? উৎপলাদি বেচারা অভিমান করে রইল। আমার বিশ্বাস সেদিনের ঘটনার জন্যেই ওঁর তোমার ওপর রাগ। তা না হলে তো তোমাকে ওঁর ভালই লাগত, আমার কাছে প্রশংসাও তো করেছিলেন।" "ওর প্রশংসা শোনবার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছে না আর কি? কি বলছিল শুনি?" "বলছিলেন 'তোমার রাঘবদা যদি ওরকম বিশ্রী, খ্যাংরা গোঁপ না রাখতেন তবে তাঁকে সুপুরুষ বলা চলত'।" "আহা কি বা ভাষার ছিরি। বেশ করব গোঁপ রাখব, একশো বার রাখব।" "বেশ তো রাখ না গোঁপ, এতে চটবার কি আছে? তোমার গোঁপ তো আর কেউ চুরি করতে যাচ্ছে না। তবে আমারও কিন্তু মনে হয় যে, তুমি যদি সামনে ছোট, পেছনে বড় করে চুল না ছাঁট এবং গোঁপটা কামিয়ে ফেল, তবে চেহারাটা কিছু ভদ্র হয়।"

ব্যাপারটা এতদূর এসে আটকে রইল বলে সকলেই একটু মনক্ষুণ্ণ, তা ছাড়া এর জন্যে কিছু খরচও তো করতে হয়েছে। শচীনের কথা অনুসারে বলেনকে আবার ডাকা হল। সে বললে, রাঘবকে বাগে আনা তত শক্ত হবে না, কিন্তু উৎপলা সম্বন্ধে অত চট করে কিছু বলতে পারবে না। গুরুজনরা বললেন, "বাবা বলেন, এ কাজটুকু তোমায় করে দিতেই হবে। যদি দরকার মনে কর, না হয় একবার রাঁচী হয়ে এস, টাকাকড়ি যা লাগে আমরা দেব।" বলেন রাঘবকে গিয়ে বললে, "হ্যাঁরে রাঘব, শুনলাম না কি কে এক কর্ণেল চৌধুরীর মেয়ে তোর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে অথচ তুই না কি তার কিছু করছিস না?" "কোথা থেকে তুমি এ সব বাজে কথা শোন বল দেখি?" "যেখান থেকেই শুনি না কেন, বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিস কেন?" "বাজে কথা ছাড়া আবার কি?" "বাজে কথা! তুই কি বলতে চাস, সে মেয়ে তোকে ভালবাসে না?" "এমন কথা তো সে আমায় কোনদিন বলে নি।" "দেখ রাঘব, তুই হয় ইচ্ছে করে ন্যাকা-সাজছিস, নয় তোর সাইকলজি পড়াই বৃথা হয়েছে। মনের ভাব কি এক কথা দিয়েই প্রকাশ করে না কি? বিশেষতঃ মেয়েরা! হতে পারে তুই ওকে ভালবাসিস না, তা বলে ও তোকে ভালবাসে এ কথা ঢাকবার কি প্রয়োজন, আমি তো আর কিছু ঢাক বাজাচ্ছি না। তুই কি বলতে চাস, ওর কোন কথায়, কোন আচরণে কখনও তোর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায় নি?" রাঘব জীবনে অল্প মেয়েকেই চেনে, কিন্তু সাইকলজির বই থেকে ওর মনে যে ১১৩টা কেস টোকা আছে, তার ৩, ১৭, ৩৯ আর ৯৯নং কেসের সঙ্গে উৎপলার আচরণের যে একটু আধটু মিল নেই তা বলা যায় না এবং উল্লিখিত প্রত্যেকটিতেই মেয়েটি প্রেমে পড়েছিল। কাজেই মনোবিজ্ঞান অনুসারে উৎপলা তাকে ভালবাসে। রাঘব আমতা আমতা করে বলল, "তা যদিই বা তার মনে কিছু থাকে তাই বলে আমারও যে—" বলেন বাধা দিয়ে উঠল "আহা, সে কথা তো আমি বলছিই, তোর দিক্ দিয়ে কিছুই না থাকতে পারে, তবে মেয়েটির কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছিস কেন? অবশ্য আগেকার দিন হলে বলতাম, মেয়ের মন নিয়ে যখন খেলা করেছ তখন তাকে বিয়ে করা উচিত। যদি বিয়েই না করবে তবে কেন শুধু শুধু অত ঘনিষ্ঠতা করা? যাক্ তোমরা আধুনিকরা তো তা মান না, দুপক্ষেই যদি প্রেম না হল তবে আর কি—মেয়েটার কষ্ট আর কি।" রাঘব বললে "বলেন, তুই সমস্তটা না জেনে আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছিস, আমার সঙ্গে বিয়েতে মেয়ের মত নেই।" "দেখ্ রাঘব, তুই সাইকলজির বইগুলো পুড়িয়ে ফেল্, এত পড়েও বুদ্ধি হল না? অভিমান বলে একটা জিনিষ আছে, যেটার ভালবাসার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ। মেয়েটি শুনলাম যথেষ্ট লেখাপড়া-জানা—তার তো একটা আত্ম-সম্মান জ্ঞান আছে—যা তোর নেই। সে দেখলে যে তুই কোন প্রতিদান দিচ্ছিস না এবং প্রস্তাব করেছেন তোর বাড়ীর লোক ওর বাবার কাছে। অভিভাবকের মারফৎ 'কোর্টসিপ' করা আজকালকার রেওয়াজ নয়। ও কেন শুধু শুধু নিজেকে খেলো করতে যাবে? কাজেই ওর অমত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। অবশ্য তুই যদি নিজে 'প্রপোজ' করতিস্ এবং ও 'রিফিউজ' করত তা হলে অন্য কথা ছিল। এ সব বিষয়ে তোর যেরকম অ্যাডভান্সড্ আইডিয়া তবু যে একথাগুলি আবার বুঝিয়ে বলতে হবে

তা ভাবিনি।" রাঘব বললে "হুঁ।" মনে মনে বললে "cf. কেস্ নং, ৪৩, ৫৯, ১০৭।"

রাঘবের আত্মীয়দের ব্যবস্থানুযায়ী বলেন রাঁচীতে কর্ণেল চৌধুরীর বাড়ীতেই উঠল। দুদিনেই কর্ণেল চৌধুরীর সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিল। একদিন কথায় কথায় রাঘবের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। "রাঘব যদি আর একটু স্মার্ট হত তবে বড় ভাল হত হে। এদিকে এত ভাল ডাক্তার, কিন্তু ওর কতকগুলো জিনিষ এমন অদ্ভুত যে লোকে অনেক সময়ে ওর গুণগুলো দেখতেই পায় না।" ক্রমশঃ উৎপলার সঙ্গে রাঘবের বিয়ের কথাও বলে ফেললেন।

"উৎপলার তো ওকে এমনিতে অপছন্দ নয়, তবে ও বলে যে, রাঘব চেহারা ও বেশভূষা সম্বন্ধে আর একটু সচেতন না হলে তাকে নিয়ে ঘর করা যাবে না। নিজেই মেয়েকে লেখাপড়া শেখালাম; ওর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতেও ইচ্ছা করে না; অথচ রাঘব ছেলে ভাল, আমাদের অনেকদিনের জানা; ছেলেবেলায় উৎপলার খুব ভাব ছিল রাঘবের সঙ্গে। ও বলে, রাঘবদা বড় হয়ে কেমন যেন লক্ষীছাড়ার মত হয়ে গেছেন।" বলেন বললে, "তা দেখুন, অবিবাহিত লোকদের একটু লক্ষীছাড়া ভাব থাকেই। আমার তো মনে হয়, বিয়ে হলে বেশভূষার পারিপাট্যও সঙ্গে সঙ্গে আসবে।" "আমারও তাই বিশ্বাস, তবে কি জান?" বলে চৌধুরী সাহেব একটু হাসলেন, "আমি নিজেই মেয়ের মন বোঝবার চেষ্টা করেছিলাম। মা-মরা মেয়ে, আমিই ওকে হাতে করে মানুষ করেছি, কাজেই আমার সঙ্গেও অনেকটা অসঙ্কোচে গল্প করে। রাঘবের গোঁপ সম্বন্ধেই ওর সবচেয়ে আপত্তি দেখছি। মনে করেছিলাম রাঘবকে এ কথা পরিষ্কার করে জানাব, ওর আত্মীয়দের সে কথা বলেও ছিলাম। ওঁরা বললেন বড় একগুঁয়ে ছেলে, চটে মটে যাবে, এখন বলে কাজ নেই। আমার কিন্তু বিশ্বাস যে, রাঘব যদি ক্লীন সেভ্ করে আসে তা হলে অনেক কাজ এগোয়" বলে স্মিতমুখে বলেনের দিকে চাইলেন।

বিকালে সুকন্যা কর্ণেল চৌধুরী ও বলেন মোরাবাদী বেড়াতে গেলেন। উৎপলার সঙ্গে নানা আলোচনায় বলেন দেখলে যে, সাইকলজির প্রতি উৎপলারও অনুরাগ যথেষ্ট। বলেন ভাবলে, এই সাইকলজিকেই যদি কাজে খাটান যায়, হয়ত কিছু সুবিধা হতে পারে। অনেকক্ষণ হাঁটবার পর বলেন চৌধুরী সাহেবকে বললে, "আপনার ক্লান্তি বোধ হচ্ছে না তো?" "না, এমন আর কি বেশী হেঁটেছি? শীকারে গেলে তো আরও বেশী পরিশ্রম করি।" "আপনি কি এখনও শীকারে যান?" "মাঝে মাঝে, তবে আগের মত অত ঘুরতে পারি না, তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ি।" উৎপলা বললে, "বাবা শীকারের লোভ কিছুতে ছাড়তে পারেন না—একবার যদি খবর পেলেন কোথাও বাঘ বেরিয়েছে, অমনি যাবার জন্যে অস্থির—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বোধ হয় শীকারের স্বপ্ন দেখেন।" কর্ণেল সাহেব বললেন "নাঃ, আজকাল আর সে উৎসাহ নেই। কাছাকাছি কোথাও খবর পেলে যাই—এখন বেশীর ভাগই স্বপ্ন দেখি।" বলে হাসতে লাগলেন। উৎপলা বললে "জানেন বলেন বাবু, সেবার বাবার যখন খুব অসুখ করে, তখন প্রলাপের ঘোরে শীকারের কথাই বলতে লাগলেন, থেকে থেকে 'ওই যে বাঘ' 'বন্দুক দাও' এই সব বলে চেঁচাতেন।" বলেনের মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। মুখে কেবল বলল, "বটে!" বাড়ীর পথে কর্ণেল সাহেবকে বলল, "আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে, নিরিবিলিতে বলতে চাই।"

বাড়ী ফিরে সমস্তটা শুনে চৌধুরী সাহেব খুব হাসলেন, বললেন, "তুমি উকীল হলে না কেন হে? "ছেলেবেলায় মেডিক্যাল কলেজে অভিনয় করে প্রাইজ পেয়েছিলাম, সে বহুকাল আগের কথা, তোমার দেওয়া পার্ট এখন আর প্রাইজ পাবার মত করতে পারব কি না কে জানে।" বলেন বললে, "সে বিচার আমরা করব। আপাততঃ তা হলে আপনার এতে কোন আপত্তি নেই মনে করতে পারি তো?" "স্বচ্ছন্দে।"

তার পরদিন বলেন কলকাতায় ফিরল। রাঘবের বাড়ীর লোকের সঙ্গে যথাকালে দেখাও করল। প্ল্যান শুনে শচীন বললে, "বাস্তবিক বলেন-দা, হোমিওপ্যাথী পড়েই বোধহয় তোমার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম।" বলেন বললে, "দেখ আমি অনেক কষ্টে সব ঠিক-ঠাক করে এসেছি, এবার

তোকে কিন্তু কাজ করতে হবে।" "বেশ তুমি বলে দিও কি কি করতে হবে।"

ক্রীস্‌মাসের ছুটীর আর দেরী বিশেষ নেই। একদিন শচীন জানাল সে রাঁচী যাচ্ছে। রাঘব বললে "বেশ, আমি যদি হাজারীবাগ যাই তবে তুইও এসে তুদিন থাকতে পারবি।"

শচীন রাঁচী যাবার ক'দিন পরে হঠাৎ একদিন বাড়ীর লোকে রাঘবকে জানালেন যে, কর্ণেল চৌধুরীর বড় অসুখের খবর এসেছে, এজন্য তাঁরা চিন্তিত আছেন। বেচারা উৎপলা একলাটি রয়েছে, যা হোক শচীন থাকাতে কিছু সাহায্য হবে। শচীনের ওপর হঠাৎ অকারণে রাঘবের অত্যন্ত রাগ হল, থাকতে না পেরে বলে ফেললে, "শচীন কি করবে —ও কি ডাক্তার না কি? হতভাগা জানে খালি আড্ডা দিতে আর ফুর্ত্তি করতে—ইরেস্‌পন্সিবল।" "তবে কি তুই একবার যাবি না কি, ওখানে ভাল ডাক্তার-টাক্তারও তো নেই! কি যে হবে জানি না—একা মেয়েটা।" "আমি এখন চট করে এদিকের সব কাজ ফেলে যাই কি করে, তা ছাড়া ওঁরা কি যেতে বলেছেন?" "ওঁরা আর কি যেতে বলবেন, কেই বা বলবে, চৌধুরী সাহেব তো শয্যাগত—ভুল বকছেন। একা উৎপলা, সে বেচারার কি আর মাথার ঠিক আছে—কোন্ দিক্ সামলাবে। শচীনকে একটা চিঠি লিখে দেখি।" "শচীনটা ত একটা খবর দিতে পারত - ইডিয়টটার যদি একটু কমন্ সেন্স থাকে।" তুদিন পরে ইডিয়টের চিঠি এল রাঘবকেই লিখেছে। "চৌধুরী সাহেবের অসুখটা সত্যই বেশী - দশ দিন আগে, কাছেই একটা জঙ্গলে শীকারে যান—পাহাড়ে যায়গা, হঠাৎ কেমন করে পা হড়কে, গড়াতে গড়াতে একেবারে অনেকটা নীচে গিয়ে পড়েন। মাথায় চোট লেগেছে। কেটে বিশেষ যায় নি, কিন্তু বেশ শক্ লেগেছে বোধহয়। কারণ, তার পরদিন থেকে মাঝে মাঝে ভুল বকছেন। আমরা রাঁচীর ডাক্তার রমেন বাবুকে ডেকেছিলাম। তিনি কাছে আসবামাত্র রোগী অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেন। 'রাম সিং জল্‌দি বন্দুক দেও, দেখো এক জানোয়ার আতা'—বলে চ্যাচাতে লাগলেন। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে পালালেন। বলেছেন, খুব 'রেষ্ট' দরকার। তবু একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল, শরীরের ভেতর কিছু বিগড়ে গেছে কি না, কিন্তু তার উপায় নেই। কেবল আমাকে আর উৎপলাদিকে কাছে যেতে দেন। উৎপলাদি বড় ভাবছেন। বলছিলেন খুব চেনা কোন ডাক্তার যদি পাওয়া যেত তা হলে হয়ত চৌধুরী সাহেবের কাছে যেতে পারত। তাড়াতাড়ি পরীক্ষা না করলে শেষে হয়ত 'টু লেট' হয়ে যাবে। আমি উৎপলাদির কাছে তোমার নাম করেছিলাম, তিনি বললেন 'ওঁকে পেলে তো খুবই ভাল হয়, কিন্তু উনি কি আর এতদূরে আসবেন ওখানকার কাজ ফেলে?' বড়ই ভাবনায় দিন কাটছে।" রাঘব ভাবলে, দেমাকে মেয়েটা নিজে তো একবার আসতে বলতে পারত? পরক্ষণেই মনে হল, আসতেই ত একরকম বলেছে—মেয়েরা সব সময়ে মনের কথা সোজা ভাষায় বলে না। খুঁজলে ১০৩নং কেসের সঙ্গে কিছু সাদৃশ্য যে বার করা যায় না, এমন নয়। তা ছাড়া নতুন যে বইটা পড়ছে তার appendix-এ তো এই ধরণেরই একটা ব্যাপারের উল্লেখ আছে। সেখানে মেয়েটি নিজের ভালবাসার কথাটি কেমন ঘুরিয়ে প্রকাশ করেছিল। নায়ককে বলেছিল "আমার ভালবাসা টেডি কুকুরটাও তোমার চেয়ে ভাল বোঝে।" ঠিক, রাঘব স্পষ্টই বুঝল, উৎপলা তাকে ডাকছে। একবার ভাবল, বলেনকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু পাছে সে ঠাট্টা করে তাই আর বলা হল না। ইতিমধ্যে বলেনের কাছেও এক চিঠি এসেছে। শচীন লিখছে "এ পর্য্যন্ত ত সব ঠিক ঠিক হচ্ছে। চৌধুরী সাহেবকে নিশ্চয়ই প্রাইজ দেওয়া উচিত। উৎপলাদি পর্য্যন্ত কিছু বুঝতে পারছে না। এখন রাঘব-দা এসে পড়লেই হয়। পরে যা যা হয় জানাব।"

একদিন সকাল বেলা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি দেখে শচীন বেরিয়ে এল। ট্যাক্সি থেকে নামল রাঘব—ব্যাত্যাহত কাকপক্ষীর মত চেহারা। শচীন তাড়াতাড়ি ধূলি-ধূসর স্যুটকেসটা তুলে নিল। ততক্ষণে উৎপলাও বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছে—চিন্তাপূর্ণ মুখ। রাঘব উঠে

এসেই কোন সম্ভাষণ না করে বলল, "এখন কেমন আছেন ?" ওর মূর্ত্তি দেখেই উৎপলার অত্যন্ত হাসি এল—মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, "অনেকটা ভাল মনে হচ্ছে—রাত্রে ঘুম বেশ হচ্ছে।" "কোন্ ঘরে আছেন ?" বলেই রাঘব উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই ভেতরে চলল। উৎপলা বললে, "এখনও ওঠেন নি বোধহয়। আপনি ততক্ষণ মুখহাত ধুয়ে একটু বিশ্রাম করে নিন, তারপর না হয় দেখবেন।" শচীন তাকে আর একটা ঘরে নিয়ে গেল।

রাঘব বললে, "ব্যাপারটা কি বল তো শচীন ?" শচীন বলল, "তোমাকে তো সব লিখেইছিলাম। এখন মুস্কিল হচ্ছে এই যে, ওঁকে একবার ভাল করে পরীক্ষা করা দরকার। ভেতরে হাড়-টাড় কিছু ভেঙ্গেছে কি না। অথচ ওঁর কাছে যাবার সাধ্য নেই কারোর।" "প্রথমে কে দেখেছিল ? পড়ে যাবার পর কি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ?" "না উনি নিজেই উঠেছিলেন। বাড়ী এসে বললেন, 'সমস্ত গায়ে ভয়ানক ব্যথা আর মাথার মধ্যে কি-রকম করছে।' ঘাসের ওপর পড়েন, কাটাকুটি কিছু হয় নি, তবে মাথায় খুব চোট লেগেছিল নিশ্চয়।" "তখুনি কাউকে দেখান উচিত ছিল।" "আমরা তো বলেছিলাম। উনি নিজেই বললেন, দেখবার দরকার নেই। খুব ক্লান্ত লাগছিল বলে সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে ওঁর চাকর দৌড়ে এসে উৎপলাদিকে বললে, সাহেব কি রকম করছেন। আমরা গিয়ে দেখি, তিনি লাঠিটিকে বন্দুকের মত করে ধরে মুখ দিয়ে 'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দ করছেন। আমাদের দেখেই বললেন, 'কোন্ দিকে পালাল দেখতে পেলে ?' জিজ্ঞেস করলাম, 'কি পালাল ?' তাতে বললেন, 'ওই যে জন্তুটা এখুনি এইদিকে পালাল।' ওঁকে উৎপলাদি বুঝিয়ে টুঝিয়ে শুইয়ে দিলেন, আমি তখনি ডাক্তার ডাকতে গেলাম। তারপরে তো জানই, ডাক্তারের সাধ্য কি যে রোগীর কাছে আসে। ভাগ্যিস উৎপলাদিকে চিনতে পারলেন। আমাকেও চিনতে পারেন, কাছে আসতে দেন, কিন্তু আর কাউকে না, এমন কি চাকর-গুলিকেও না। কাউকে দেখলেই ওঁর কেমন এক রকম হয়, তাই যাকে তাকে চট্ করে ঘরে নিয়ে যাওয়াও নিরাপদ নয়। এখন তোমাকে যদি চিনতে পারেন তো ভাল, তা না হলেই সব পণ্ডশ্রম।" "দেখি কি করা যায়। মরবিড সাইকলজি আমার কিছু জানা আছে। উনি শীকারে গিয়ে চোট পান। মাথায় এখনও সেই ইম্প্রেশনগুলি রয়েছে। প্রাণীমাত্রেই জন্তু বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। আমার বোধ হয় খুব রেষ্ট নিলেই অনেকটা সারবে। তাছাড়া দু'একটা ওষুধ না হয় দেওয়া যাবে।" এমন সময়ে চাকর এসে খবর দিলে, দিদিমণি ডাকছেন চা প্রস্তুত। রাঘব তাড়াতাড়ি চলল খাবার ঘরের দিকে—পেছনে শচীন। চা খেতে খেতে উৎপলা বাবার অসুখের কথা বলল। রাঘব খানিকক্ষণ গোঁফ ফাঁপিয়ে চুপ করে রইল—শচীন ইসারায় বললে 'ভাবছে।' চা-পানান্তে ঠিক হল রোগীকে দেখতে যাওয়া হবে। উৎপলা আগে ভেতরে গেল, তারপর পর্দ্দা উঠিয়ে ইসারা করতেই, রাঘব ও শচীন ঢুকল। রাঘব সোজা ওঁর খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল—ওকে দেখেই কর্ণেল চৌধুরীর নিমীলিত-প্রায় চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর ওর দিকে কটমট করে তাকাতে তাকাতে উঠে বসে বিছানায় কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। উৎপলার ইসারায় শচীন রাঘবের হাত ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল। একটু পরেই উৎপলা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বেরিয়ে এসে বললে, "কি হবে ? বাবা তো আপনাকে চিনতে পারছেন না।" রাঘব বললে, "আস্তে আস্তে পারবেন। আমি যদি তখন নিজের পরিচয় দিতাম তা হলে হয়ত বুঝতে পারতেন। অনেক সময় চোখে দেখে না চিনলেও কাণে শুনে চিনতে পারে। শচেটা খামকা আমাকে টেনে নিয়ে এল।" "হ্যাঁ, খামকা টেনে নিয়ে এল—দু'এক ঘা না খেলে বুঝবে না" বলে শচীন মুখ বিকৃত করলে। ভিতর থেকে "উৎপলা" "উৎপলা" ডাক শুনে উৎপলা তাড়াতাড়ি রোগীর ঘরে ঢুকল। "দাঁড়াও দেখি আবার কি হল" বলে শচীনও পেছন পেছন গেল। রাঘব উৎকণ্ঠিত হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল, শচীন বেরুলে জিজ্ঞেস করল, "কি হল রে ?" "যা ভয় করে-ছিলাম তাই।" "কি ব্যাপার কি, ঘরে কি দেখলি ?" "দেখলাম উনি খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, উৎপলা-দিকে

বলছেন, 'কি একটা ভয়ানক জন্তু তার বাঘের মত গোঁফ অথচ বনমানুষের মত দেখতে'। মারবার জন্যে বন্দুক খুঁজছিলেন—এখন বুঝলে তো কেন টেনে আনতে গিয়েছিলাম ?" "থাম থাম, বন্দুক কি ওঁর বিছানায় থাকে না কি ?" "তা যখন গোলমাল করেন তখন রাখতে হয় বই কি—এমনিতে তো ঘরের কোণে সর্ব্বদাই থাকে।" "গুলি ভরা তো থাকে না ?" "না, তা থাকে না বটে, তবে দুচারটে খালি কার্ট্রিজ হাতের কাছে রেখে দেওয়া হয়—নেহাৎ যখন গোলমাল করেন তখন ওই গুলো বন্দুকে পুরে দেওয়া হয়।"

সেদিন বিকেলে আবার রাঘব রোগীর কাছে যেতে চাইল, কিন্তু উৎপলা বলল, "আজ থাক। সারাদিনই একটু উত্তেজিত ছিলেন। কালকে আবার চেষ্টা করবেন।" রাঘব বললে, "ব্যাধিটাও সমস্তই মানসিক বোধ হচ্ছে—হঠাৎ মাথায় লাগাতে বোধ হয় এ-রকম হয়েছে। বেশী সিরিয়স মনে হয় তো কোন স্পেশালিষ্টকে একবার কন্সাল্ট করা যাবে।" "সিরিয়স কি না, বুঝব কি করে ? তাই তো চাচ্ছিলাম আপনি একবার ভাল করে দেখেন। আমার ভয় করে, ভেতরে কিছু ভেঙ্গে-টেঙ্গে গেছে হয়ত। মাঝে দু'দিন বেশ ছিলেন, কথাবার্ত্তাও সহজ হয়ে আসছিল; মনে করছি, হয়ত রেষ্ট নিলেই আস্তে আস্তে সেরে যাবে। হাসপাতালের ডাক্তারও তাই বলেছিলেন—নার্ভাস শক্ কি না। আজকে আবার আপনাকে দেখে ক্ষেপে গেলেন। কি যে হবে।" বলতে বলতে উৎপলার মুখ কাঁদ-কাঁদ হয়ে এল। রাঘব আর স্থির থাকতে পারল না, "কিছু ব্যস্ত হবেন না। এ-রকম অনেক হয়, সেরে যায়। আমি কাল সকালে আবার দেখব চিনতে পারেন কি না।" "যা-ও বা একটু সারবার আশা ছিল তাও গেল।" বলে শচীন উৎপলার দিকে চাইল। রাঘব শচীনের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, "তার মানে ?"

"মানে এই যে, তোমাকে দেখেই উনি অত উত্তেজিত হচ্ছেন, আর উত্তেজিত হচ্ছেন বলেই অসুখ সারছে না।" রাঘব শচীনের কথায় কর্ণপাত করে নি এই রকম ভাব করে উৎপলাকে বললে, "দেখুন, এক কাজ করা যাক, কাল সকালে উঠে বরং আপনি ওঁকে বলুন যে, আমার কলকাতা থেকে আসবার কথা ছিল, তাই এসেছি এবং ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছি। তাতে হয়ত চিনতে পারবেন।" শচীন আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "তার চেয়ে যদি তুমি গোঁফটা কামিয়ে ভদ্র হয়ে যাও, তাতে হয়ত তোমাকে মানুষ বলে মনে করতে পারেন।" "সব সময়ে ডেঁপোমি করিস না" বলে রাঘব উঠে চলে গেল। উৎপলা বললে, "কেন ওঁকে চটাচ্ছ, শেষে যদি রেগে-মেগে চলে যান তখন মুস্কিল হবে। উনি একবার বাবাকে পরীক্ষা করলে নিশ্চিন্ত হই।"

"রাঘব-দা যে ভাল ডাক্তার তা অস্বীকার করি না। কিন্তু ও এমন বেশে ঘুরে বেড়ায় যে, লোকে ভরসা করে ডাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, ও যদি ভাল করে সেভ করে যেত তা হলে আপনার বাবা চিনতে পারতেন। এখন তো উনি আগের চেয়ে ভাল আছেন, লোক-টোক চিনতেও পারেন। একে ঘরের জানলা-টানলা বন্ধ, তার ওপর অন্ধকারে ওই জঙ্গল-ভরা মুখ দেখলে সহজ লোকেই জন্তু মনে করতে পারে।" উৎপলা না হেসে পারল না। "সত্যি ভাই, তোমার রাঘব-দা এদিকে চমৎকার লোক কিন্তু ইচ্ছে করে চেহারাটাকে বিশ্রী করেন কেন জানি না।" শচীন মনে মনে ভাবলে 'এইবার সুশ্রী করাচ্ছি দেখ না।'

রাত্রে খাবার সময় রাঘব উৎপলাকে বললে, "কালকে আপনার বাবাকে বলে রাখতে ভুলবেন না। আজ রাত্রেই বলে রাখতে পারেন যে, কাল আমার পৌঁছবার কথা।" খাবার পর রাঘব বারাণ্ডায় বসে সিগারেট খেতে খেতে ভাবতে লাগল। উৎপলাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাতেই হবে। বেচারা যে রকম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। একবার মনে হল, জীবনে তো কত আপদ্-বিপদ্ আসে, তার থেকে উৎপলাকে চিরকাল রক্ষা করবার ভার নিতেও হয়ত তার আপত্তি হবে না। কর্ণেল চৌধুরীর যদি সত্যিই একটা কিছু হয়, তবে বেচারীর কি হবে ? ভাবতে ভাবতে রাঘবের মন আর্দ্র হয়ে উঠল—চুরুটটাও নিবে গেল কখন টের পেল না। নাঃ, যদি দরকার হয় সে রাঁচীতে আরও কিছুদিন থেকে যাবে। কলকাতার প্র্যাকটিস্ যায় যাক।

"বাবা এই ঠাণ্ডায় চাতালে বসে কবিত্ব করা হচ্ছে।" বলে শচীন এসে উপস্থিত। "সবার তো ওরকম পল্কা শরীর নয় যে নাকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকেছে কি অমনি হাঁচি! যা, নাকে তুলো গুঁজে থাক গিয়ে।" "তোমার নাকের সামনে যা জঙ্গল তাতে অবশ্য হাওয়া ফাওয়া পট করে ঢুকতে পারে না। আচ্ছা রাঘব-দা তুমি তো পরশু সকালে পৌঁছেছ, এর মধ্যে তো একদিনও সেভ করতে দেখলাম না। নিজের বাড়ীতে যেমন ইচ্ছে থাক গিয়ে। কিন্তু ভদ্রলোকের বাড়ী বসে এ রকম অত্যাচার কেন?" "তোর সব তাতেই জ্যাঠামি। যে তাড়াতাড়ি চলে এলাম, ক্ষুরটা ফেলে এসেছি। দুদিনের জন্যে দরকারই বা কি?" "দরকার যে কি, তা যদি বুঝতে তবে আর ভাবনা ছিল কি। কষ্ট তো আর তোমার নয়, অন্যদের।" "তার মানে কি?" "মানে তোমার দিকে তাকান যায় না, কষ্ট হয়।" "থাক! ঢের হয়েছে।" "ওই তো, সত্যি কথা বল্লে চটে যাও।" "না চট্‌বে না। সব জিনিষেরই সময় আছে। সব সময়ে ফাজলামী ভাল লাগে না। তোকে যে এরা 'টলারেট' করে কি করে, জানি না।" "তা তোমাকে যদি সহ্য করতে পারে, আমাকে না পারবার কোন কারণ নেই। চৌধুরী সাহেব তো আমাকে জন্তু ভেবে মারতে আসেন নি।" চৌধুরী সাহেবের ভুলটা সেরে দেবার আগেই শচীন অন্তর্দ্ধান হল।

পরদিন সকালে শীতটা একটু বেশী লাগছিল বলে রাঘব ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে নিল। চা খাবার পর শচীন জিজ্ঞেস করল, চৌধুরী সাহেবকে দেখতে যাবে কি না। "হ্যাঁ যাব বই কি" বলে রাঘব চুরুটটা ফেলে দিল। "আরে দাঁড়াও আগেই লাফাচ্ছ কেন। এই বেশে যাবে না কি?" "তা নয় ত কি—একি রাজদরবারে যাচ্ছি না কি?" "যেতে চাও যাও, তবে একে তিন চার দিন দাড়ি কামাওনি তার ওপর ওভারকোট, তা ছাড়া গা দিয়ে কড়া চুরুটের গন্ধ বেরোচ্ছে, কিছু হলে আমি জানি না।" তখুনিই হয়ত একটা কিছু হয়ে যেত, তবে বাইরে উৎপলার গলা শুনে রাঘব নিরস্ত হল। সবাই মিলে রোগীর ঘরের দিকে চলল। আগে উৎপলা, পরে রাঘব এবং পেছনে শচীন। তিন জনেই ঘরে ঢুকল। চৌধুরী সাহেব শুয়ে ছিলেন। উৎপলা ডাকলে, "বাবা?" তিনি যেন চমকে উঠলেন, বললেন, "অ্যাঁ, কি হয়েছে?" উৎপলা আস্তে আস্তে বললে, "রাঘব-দা এসেছেন, এই যে এই দিকে।" চৌধুরী সাহেব রাঘবের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ভাবে জোরে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, "ওটা কি?" শচীন একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল, "রাঘব-দা আপনাকে দেখতে এসেছেন।" "আমাকে খেতে এসেছে, ওটা কি?" শচীন গলা উঠিয়ে বলল, "রাঘব-দা!" চৌধুরী সাহেব বললেন "বোয়াল?" উৎপলাকে দেখে যদিও কষ্ট হচ্ছিল, তবু শচীনের ভয়ানক হাসি এল। অতি কষ্টে সংবরণ করে বলল, "রাঘব…দা।" চৌধুরী সাহেব ততক্ষণে উঠে বসেছেন এবং একদৃষ্টে রাঘবের দিকে তাকিয়ে আছেন। রাঘব একটু হাসবার চেষ্টা করলে। রোগী চীৎকার করে উঠলেন "বাঘ না, বাঘ না, ভাল্লুক—রামসিং—এই রামসিং, আমার রাইফল কই।" শচীন সমস্ত রুমালটা মুখের ভিতর গুঁজে রাঘবকে একটা টান মেরে বাইরে পালাল। উৎপলা করুণ কণ্ঠে বললে "আপনি একটু বাইরে যান রাঘব-দা। বাবা বড্ড উত্তেজিত হচ্ছেন।" রাঘব বেরিয়ে সোজা নিজের ঘরে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল। শচীন কখন এসে ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি। "বাঃ বেশ দেখাচ্ছে। এখানে শীগ্‌গির একটা যাত্রা হবে শুনছি। রামায়ণ, জাম্বুবানের পার্টটা এখুনি তোমায় দেবে।" বলে নিজে হনুমানের মত এক লাফে বেরিয়ে গেল। খাবার সময় রাঘব উৎপলাকে বললে, "আজ আপনার বাবা একটু বেশী উত্তেজিত হয়ে গেলেন।"

উৎপলা বিষণ্ণ মুখে উত্তর দিলে "কি যে হবে জানি না, আমার এমন ভয় করে।" "ভয় কি, আমি তো রয়েছি, দরকার হয় আরও কিছুদিন থেকে যাব।" "সেইটেই ত ভয়" বলে শচীন নিবিষ্ট মনে খেতে লাগল। রাঘব ভাবলে ছোঁড়ার কাণ দুটো আচ্ছা করে মলে দিতে পারলে গায়ের জ্বালা কিছু মেটে। আপাততঃ নিরুপায় হয়ে অন্ন-ধ্বংস করতে লাগল। "মাঝে কিন্তু একটু ভাল হয়েছিলেন, চাকর-বাকরদের চিনতে পারতেন। এমন কি বাইরের

লোকদের দেখলেও বিশেষ গোলমাল করতেন না। আপনার কথা আমি যখন বললাম তখন কিন্তু বুঝলেন বলেই মনে হল।" "অনেক সময় অবশ্য এ রকম হয় যে, কোন লোকের কথা মনে আছে কিন্তু তার চেহারাটা মনে নেই।" শচীন বলে উঠল, "আরে চেহারাটা দেখতে পেলেন কোথায়। দেখলেন তো খানিকটা অন্ধকার, তাতে ঝোপ-জঙ্গল আর তার ভেতর একজোড়া চোখ—কাজেই ওঁকে এর জন্যে দোষ দেওয়া যায় না।" রাঘবের হঠাৎ বিষম লাগল।

পরদিন রাঘব বিমর্ষ মুখে ভাবতে লাগল, কি উপায়ে চৌধুরী সাহেবের কাছে ঘেঁসা যায়। শচীন তাকে ওই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করল, "ট্রেণের সময় ভাবছ না কি?" "কেন, ট্রেণের সময় ভাবতে যাব কেন?" "থেকেও যখন কিছু করবেই না, তখন যাওয়াই ভাল।" "কিছু করব না মানে? দেখছিস এ রকম অদ্ভুত রোগী, কাছে যাবারই যো নেই, তা দেখব কি? তবু তো চেষ্টার কসুর করি নি।" "একে তো কিছু করবে না তার ওপর আবার মিথ্যে কথা কেন?" "দেখ শচে, তুই বড় বাড়িয়ে তুলেছিস। যখন-তখন যা-তা বলা একটা বদ অভ্যাস হয়ে গেছে।" রাঘব চেয়ার থেকে উঠে ঘন ঘন পাইচারী করতে লাগল। শচীন বলল, "ওই তো সত্যি কথা বলতে নেই। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায়ই এ কথা বলেছিলেন, 'কাণাকে কাণা বলবে না, খোঁড়াকে খোঁড়া বলবে না'।" রাঘবের রাগ চড়ে গেল। "তুমি কি বলতে চাও যে, আমি কলকাতায় প্র্যাকটিস ছেড়ে এখানে খেলা করতে এসেছি? দিনের পর দিন এখানে থাকতে ক্ষতি হচ্ছে না? এসে অবধি রোগীর কাছে যাবার চেষ্টা করছি—আর কি করতে পারি এর চেয়ে শুনি?" "অবশ্য বাইরের লোকে শুনলে বলবে যে, আর কিছু করবার ছিল না, তবে তারা তো আর ভেতরের খবর জানে না।" "কে জানে শুনি?" "এই ধর উৎপলাদি জানেন, আমিও তো কিছু কিছু জানি।" "উৎপলা কি বলতে চায় যে, আমি যথেষ্ট চেষ্টা করি নি?" শচীন অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললে "যদি সে কথা তাঁর মনে এসেও থাকে তবু সে কথা মুখ ফুটে বলবার মত মেয়ে তিনি নন। তবে মনে হয় যে, তাঁর মনে একটু খুঁত রয়ে গেল। তুমি যদি গোঁয়ার্ত্তুমি না করে চেহারাটাকে একটু ভদ্র করে যেতে, তবে আমরা অন্ততঃ এইটুকু বুঝতাম যে, চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। যাক্ এ সব কথা তোমায় বলা বৃথা। ভাববে, তোমায় অপমান করা হচ্ছে। তোমার যত সব অদ্ভুত আইডিয়া। উৎপলা-দি তোমার কথা শুনে মনে করেছিলেন তুমি যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। যাক্, সে কথা বলে কেবল কথা বাড়ান ছাড়া লাভ নেই।" রাঘব চুপ করে বসে রইল। সে দিন সারা দিনই সে বিশেষ কথা-টথা বলল না। উৎপলা শচীনকে জিজ্ঞেস করলে, "উনি হঠাৎ রেগে-টেগে গেছেন না কি?" "তা তো জানি না, তবে রাগবার কোন কারণ দেখি না।" রাত্রে খাবার সময় উৎপলা বললে, "আপনার শরীর কি খারাপ লাগছে, সারাদিন এত চুপচাপ রয়েছেন? কথা-বার্ত্তা বললেন না।" "না শরীর ভালই আছে, একটু অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আচ্ছা দেখুন, কাল সকালে একবার আমাকে বেরোতে হবে। সকালে চা-টা আমার ঘরেই পাঠিয়ে দেবেন। তারপর দুপুরে ফিরব। খাবার আগে একবার আপনার বাবাকে দেখতে চাই। আপনি তাঁকে সেদিনের মত জানিয়ে রাখবেন যে, আমি কলকাতা থেকে ওঁকে দেখতে আসছি।" উৎপলা ঘাড় নাড়লে—কথামত সবই সে করতে প্রস্তুত।

পরদিন কথামত রাঘব একটু সকাল-সকাল উঠে চা খেয়েই বেরিয়ে গেল। শচীন জিজ্ঞেস করলে, "তোমার কি ফিরতে দেরী হবে?" খাবার সময় ফিরবে, বলে রাঘব চলে গেল। শচীন যথাসময়ে স্নান করে ফিরে এসে দেখে রাঘব ঘরে বসে কাগজ পড়ছে। কাগজের আড়ালে মুখ দেখা যাচ্ছে না। শরীরের বাকী অংশটুকুর আচ্ছাদনের দিকে দৃষ্টিপাত করে শচীন চমকে উঠল। ধুতিটি অত্যধিক পরিষ্কার, আর সাদা সিল্কের একটা পাঞ্জাবী। "রাঘব-দা!" কাগজের আড়াল থেকে গম্ভীর কণ্ঠে থেকে উত্তর এল "কি?" "এই ইয়ে, তুমি ফিরেছ?" "না, ওটা তোর মনের ভুল—মোরাবাদীর পাহাড়ে ওপর বসে আছি।" শচীন অবাক্ হয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল। পাশ থেকে

রাঘবের ছায়া পড়েছে আরশীতে। শচীন চমকে উঠে ফিরে চাইল। হাত থেকে চিরুণীটা গেল পড়ে। কোন রকমে তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁ করে চেয়ে রইল। শব্দ পেয়ে রাঘব কাগজ নামিয়ে সেদিকে তাকাতেই শচীন একটু ঘাবড়ে গেল। রাঘব বললে, "উজবুকের মত দেখছিস কি?" শচীন নির্ব্বাক্। অনেকক্ষণ পরে মাটির দিকে চেয়ে বললে, "যদি আগে থাকতে একটু সাবধান করে দিতে। ভাল চিরুণীটা ভেঙ্গে গেল।" বলে ভাঙ্গা টুকরো দুটো সযত্নে তুলে রাখল। রাঘবকে দেখে সে এত অবাক্ হয়েছিল যে, হাসবার কথাও ভুলে গেল। বাস্তবিক দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকলে রাঘবকে সুপুরুষ বলা যায় নিশ্চয়ই।

সব চেয়ে অবাক্ হল উৎপলা। শচীন ফিস-ফিস করে বললে, "আচ্ছা উৎপলা-দি, রাঘব-দার চেহারাটি বাস্তবিকই ভাল, না?" উৎপলা আস্তে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ।" বাড়ীর সকলেই, এমন কি চাকরগুলো অবধি এমন করতে লাগল যে, রাঘবের একটু অপ্রস্তুত লাগতে লাগল। সেটাকে কাটাবার জন্যে বললে, "দেখি এবার চৌধুরী সাহেব চিনতে পারেন কি না।" আবার চেষ্টা করা হল। এবারে রোগী অল্পক্ষণ চেয়েই চিনতে পারলেন। স্মিতমুখে বললেন "এই যে রাঘব। বিলেত থেকে কবে ফিরলে?" "সে প্রায় দুবছর হবে।" "বটে! তা আমরা তো কোন খবর পাই নি। চেহারা কিছুই বদলায় নি। শরীর ভাল তো?" "আজ্ঞে হ্যাঁ, বেশ ভালই আছি। আমি একবার আপনাকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলাম। শীকারে গিয়ে আপনি পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছেন শুনলাম, তাই।"

"হ্যাঁ, তা পড়ে বেশী চোট পাইনি। মাথায় লেগেছিল। কিছুদিন বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে বোধ হয়। এখনও এক এক সময় মাথা কেমন করে, চট্ করে কাউকে চিনতে পারি না।" রাঘব পরীক্ষা করে জানাল যে, ভয়ের কোন কারণ নেই। উৎপলা কৃতজ্ঞ চোখে চেয়ে জানালে, "আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছি কিছু মনে করবেন না। আপনি অভয় দেওয়াতে যে কতটা নিশ্চিন্ত হয়েছি তা বলতে পারি না।" "আর কি, আমার কাজ তো ফুরিয়েছে, এবার ফেরবার আয়োজন করি।" "যেতে কি হবেই?" উৎপলা রাঘবের চোখের দিকে তাকাল। রাঘবের ৫৯নং কেসের কথা মনে এল, সে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেল। শচীন টাইম-টেবলের পাতা উল্টোতে উল্টোতে বললে, "তা হলে ট্যাক্সিই বলা যাক।" "ট্যাক্সি কি হবে?" "চৌধুরী সাহেবের গাড়ীটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই বলছিলাম, তোমাকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে ট্যাক্সি আনতেই বলে দিই।" "আমি এখন কিছুদিন থাকব মনে কর্‌ছি, কর্ণেল চৌধুরী একেবারে সেরে উঠিলে ফিরব।" "এই না তোমার কলকাতায় কাজের ক্ষতি হচ্ছে? থাকতে চাও থাক। শেষকালে বাপু আমাদের ওপর দোষ দিও না। এই তো শুনলাম, তুমি নিজেই বলেছ যে আর কোন ভয় নেই। রোগী তো প্রায় সেরে উঠেছেন।" "ভয়ের কারণ নেই বলেই মনে হচ্ছে, কিন্তু মাথাটা এখনও খুব পরিষ্কার হয়নি। দেখলি না আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কবে বিলেত থেকে ফিরেছি? গত পূজোয় যে দেখা হয়েছে সেটা মনে নেই। আমার বিলেত যাবার চেহারাটাই মনে আছে, ফেরবার পরেরটা মনে নেই।" "মনে না থাকাই ভাল।" বলে শচীন টাইম-টেবলের আড়ালে মুখ লুকোলে। বিকেলে রাঘব বললে, "দেখ শচীন, বাজারের দিকে গেলে আমার জন্যে একটা সস্তা দেখে ক্ষুর কিনে আনিস দেখি। রোগীর খাতিরে এখন বোধ হয় রোজই কামাতে হবে।" "কার খাতিরে?" "রোগীর"—বলে রাঘব মুখটা অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর করলে। শচীন বাজারের দিকে কেবল যে ক্ষুর কিনতেই গেল তা নয়। পথে পোষ্ট অফিস থেকে বলেনকে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলে। টেলিগ্রামটার প্রাঞ্জল বাংলা তাৎপর্য্য হচ্ছে, 'টোপ গিলেছে।'

কৃষি-গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞানের স্থান

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

প্রাচীনকাল হইতে রাজ্যশাসন সম্পর্কে তথ্য ও সংখ্যা সংগ্রহ করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মিশর, ব্যাবিলন ও রোমক রাজ্যে লোকগণনা, রাজ্যের বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যের হিসাব প্রস্তুত করার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই অর্থে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও যে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন-কার্য্যে সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১১ হইতে ৩০০ অব্দের মধ্যে কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্র" গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, এই সময়েও ভারতবর্ষে সংখ্যাবিজ্ঞানের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল। অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ আছে, কি প্রথায় কর-নির্দ্ধারণ, সৈন্য-সংগ্রহ, শস্যাদি উৎপাদন, শ্রমিক-সমস্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়-অনুযায়ী সমগ্র গ্রাম-গুলিকে বিভক্ত করা যায়, গ্রাম্য হিসাব-রক্ষক দ্বারা কি ভাবে ভূমির তারতম্য (যথা, উর্ব্বর, অনুর্ব্বর, গোচারণ ক্ষেত্র, অরণ্য ইত্যাদি) অনুসারে গ্রামের সীমা সাব্যস্ত করা হয়, অথবা উপজীবিকা অনুযায়ী গ্রামবাসীদের সংখ্যা সম্বন্ধে কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা করা যায়। প্রাচীন ভারতে সংস্কৃত সভ্যতার যুগে শাসনকার্য্যে যে এইরূপ সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহার ছিল তাহার আরও প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। পরবর্ত্তী সময়ে মুসলমান রাজত্বে ভারতবর্ষে রাজ্যশাসন সম্পর্কিত সংখ্যা-বিজ্ঞানের প্রচলন ছিল। মোগল সম্রাট্ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে তদীয় মন্ত্রী আবুল ফজল "আই-নই-আকবরী" গ্রন্থ (১৫৯৬-৯৭ খৃঃ) রচনা করেন। তাহাতে জন-সংখ্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য, দেশের আর্থিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য পাওয়া যায়। ইউরোপে খৃষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন-সম্পর্কিত সংখ্যা-বিজ্ঞানের ব্যবহার প্রধানতঃ অর্থশাস্ত্র-বিষয়ক তথ্য-সংগ্রহ ও প্রকাশের অতিরিক্ত প্রসার লাভ করে নাই। ইংরাজ-রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হইতে স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিভাগ

সংখ্যা-বিজ্ঞান প্রথমে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল, পরবর্ত্তীকালে কি তত্ত্বের অংশে, কি ব্যবহারিক অংশে সে রূপের বহু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সংখ্যা-বিজ্ঞান দুইটি বিশিষ্ট পর্য্যায়ে পরিবর্দ্ধিত। প্রথম পর্য্যায়ে পূর্ব্বের রূপ কিছু বজায় আছে, দ্বিতীয় পর্য্যায় সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিতেছে। প্রথম পর্য্যায় কোন বিশেষ বিষয়ের কেবল বিবরণে পর্য্যবসিত, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের লক্ষ্য, কোন বিশেষ বিষয়ের তথ্য বিশ্লেষণ ও বিচার। বিবরণী-পর্য্যায়ে সমগ্র বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সমষ্টি ও গড় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভই যথেষ্ট। বিশ্লেষণ পর্য্যায়ে সমষ্টি বা গড় সম্বন্ধে জ্ঞান যথেষ্ট নয়। গড় ও অন্যান্য পরিমাপ হইতে তারতম্য বিভিন্ন নমুনায় কি প্রকার লক্ষ্য করা যায় ও নমুনা হইতে সমগ্র বিষয় সম্বন্ধে কি আলোক পাওয়া যায়, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে তাহাই আলোচ্য।

রাজ্যশাসন সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমগ্রের সমস্যা এবং রাজ্যের অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিভিন্ন ও বিশিষ্ট বিভাগ সমগ্রের বিষয়। এই কারণে সভ্যতার সকল স্তরেই সংখ্যাবিজ্ঞানের যে পর্য্যায়ে সমগ্রের বিষয় আলোচিত হয়, সে পর্য্যায়ের প্রয়োজন ও ব্যবহার রহিয়া যাইবে, বিলুপ্ত হইবে না। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রয়োজনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, কারণ দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা লাভ করিবার স্পৃহা সর্ব্বদাই বৃদ্ধি পাইতেছে, পরীক্ষার পরিসর যত স্বল্প হইবে, বিশ্লেষণ তত তীব্র হইবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে যে উচ্চাঙ্গের গণিতের প্রয়োগ প্রয়োজন, তাহাতে উচ্চাঙ্গের জ্যোতির্ব্বিদ্যার বা পদার্থ-বিদ্যার মত এই শাস্ত্রের ব্যবহারও সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না।

কৃষি-সংক্রান্ত বিবরণী

সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিবরণী-পর্য্যায় যথেষ্ট প্রসার লাভ করিয়াছে আরও এই কারণে যে, পূর্ব্বে যে সকল বিষয় উপে-ক্ষিত হইয়াছিল, জীবন-সংগ্রামের কঠোরতা-বৃদ্ধির সহিত সে সকল বিষয় উত্তরকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং

সেই সকল বিষয়ের দিকে সমগ্র ও ব্যাপকভাবে দৃষ্টিপাত করা সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিবরণী-পর্য্যায়ের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন মত প্রকাশ করেন যে, কৃষি বিষয়ক সংখ্যা-বিবরণের সংগ্রহ-পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষিবিষয়ক সংখ্যা-বিবরণের ধারাবাহিক সঙ্কলন আরম্ভ হয়। বর্ত্তমানে সরকারী দপ্তর হইতে কৃষি-সংক্রান্ত যে সকল বিবরণী প্রকাশিত হয়, তাহা চারিটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা :—(১) শস্য ও শস্য উৎপাদন, (২) গোধন ও হাল লাঙ্গল, (৩) কৃষিজীবীর সংখ্যা (৪) ধন-সম্পদের তথ্য। কয়েকটি বিশিষ্ট বিবরণীর উল্লেখ করা যায়, যথা :—

১। 'এগ্রিকালচারাল্ ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব্ ইণ্ডিয়া' (বাৎসরিক), এই বিবরণী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডে বৃটিশ ভারত ও দ্বিতীয় খণ্ডে দেশীয় রাজ্যগুলির সম্বন্ধে কৃষিবিষয়ক সংখ্যা-বিবরণী প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন তালিকাতে যে পরিমাণ ভূমিতে চাষ হয়, সমগ্র ভূমির কিরূপ অংশ চাষের উপযুক্ত ইত্যাদি, সেচ-ব্যবস্থা, কিরূপ শস্যের চাষ, গোধন, খাজনার হার ও শস্যের মূল্য সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রদেশের ও প্রত্যেক জেলার সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

২। 'এষ্টিমেট্স্ অব্ এরিয়া অ্যাণ্ড ইল্ড অব্ প্রিন্সিপ্যাল ক্রপস্ অব্ ইণ্ডিয়া' (বাৎসরিক), এই বিবরণীতে বিভিন্ন প্রকার শস্যের উৎপাদন ও ভূমির পরিমাণ সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

৩। 'ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল ষ্টেট্মেণ্টস্ রিলেটিং টু দি কো-অপারেটিভ মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া' (বাৎসরিক), এই বিবরণীতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সমবায় সমিতির (কৃষি সমবায় সমিতি সম্বন্ধেও) প্রসার সম্বন্ধে সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

৪,৫,৬। 'ইণ্ডিয়ান টি ষ্ট্যাটিস্টিক্স' (বাৎসরিক)
'ইণ্ডিয়ান কফি ষ্ট্যাটিস্টিক্স' (,,)
'ইণ্ডিয়ান রবার ষ্ট্যাটিস্টিক্স' (,,)

এই সকল বিবরণীতে ভারতবর্ষের চা, কফি, রবার উৎপাদন সংক্রান্ত সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

৭। 'র-কটন্ ট্রেড্ ষ্ট্যাটিস্টিক্স' (মাসিক)

এই বিবরণীতে কাঁচাতুলার বাণিজ্য সম্পর্কে সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

৮। 'অ্যাকাউণ্টস্ রিলেটিং টু দি সী-বোর্ণ ট্রেড অ্যাণ্ড ন্যাভিগেসন্ অব্ বৃটীশ ইণ্ডিয়া' (মাসিক)

দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ এই বিবরণীতে সঙ্কলিত থাকে।

৯। 'অ্যাকাউণ্টস্ রিলেটিং টু দি ইন্ল্যাণ্ড (রেল্ অ্যাণ্ড রিভার-বোর্ণ) ট্রেড্ অব্ ইণ্ডিয়া' (মাসিক)

রেল ও ষ্টীমারযোগে ভারতবর্ষের অন্তর্ব্বাণিজ্যের সংবাদ এই বিবরণীতে সঙ্কলিত থাকে।

১০। 'ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড জার্ণাল' (সাপ্তাহিক)

এই বিবরণীতে ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদ সঙ্কলিত থাকে।

১১। 'রিভিউ অব্ সুগার ইণ্ডাষ্ট্রি অব ইণ্ডিয়া'

এই বিবরণীতে ইক্ষু-চাষ-সম্পর্কিত সংবাদও সঙ্কলিত আছে।

১২। 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল অ্যাবষ্ট্রাক্ট ফর ব্রিটীশ ইণ্ডিয়া' (বাৎসরিক)

এই বিবরণীতে বিভিন্ন সংবাদের সার সঙ্কলিত থাকে, ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত প্রত্যেক মরসুমে প্রায় ১১টি প্রধান শস্যের উৎপাদন সম্বন্ধে সাময়িক পূর্ব্বাভাস প্রকাশিত হয়। 'ইণ্ডিয়ান্ ট্রেড জার্ণাল্' পত্রিকায় পূর্ব্বাভাস সম্বন্ধে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

গোধন, হাল-লাঙ্গল ও গো-যান সম্বন্ধে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গণনা করা হয় ও 'এগ্রিকালচারাল্ ষ্ট্যাটিস্টিক্স অব ইণ্ডিয়া' বিবরণীতে প্রকাশিত হয়।

তথ্য-সঙ্কলন

এই সকল বিবরণীতে যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়, তাহার সঙ্কলন-কার্য্য জটিল। বিস্তৃত ভূভাগের তথ্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হওয়া সম্ভবপর নয়। প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে একই পদ্ধতিতে তথ্য সংগৃহীত হয়। রাজস্ব-বিভাগ দ্বারা সংগ্রহ-কার্য্য সমাধা করা সম্ভব হয়। পাট-চাষ সম্পর্কে তথ্য অধিকাংশ স্থলে সংগৃহীত হয় গ্রাম্য পঞ্চায়েতের সাহায্যে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের পাট-চাষ সম্পর্কে তথ্য

সংগৃহীত হয় বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগ দ্বারা। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ যে সংখ্যা সংগ্রহ করেন তাহা মহকুমার ও জেলা কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর কৃষি-বিভাগে পৌঁছায়। কৃষি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে এখন বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। শস্য-উৎপাদন ও কৃষি সম্পর্কে অন্যান্য তথ্যসংগ্রহের জন্য পৃথক্ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব। কি পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইল, এই সংবাদ নির্ভুল পাইতে হইলে তিনটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়, যথা :—

(১) কত পরিমাণ জমিতে আবাদ করা হইল।

(২) বিঘা-প্রতি ফসল কি পরিমাণ।

(৩) জল-বৃষ্টি বা সার ইত্যাদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিরূপ।

বিঘা-প্রতি ফসলের পরিমাণ যতটা নির্ভুল হইবে, উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ গণনা ও অবশেষে সমগ্র সংবাদ ততটা নির্ভুল হইবে। এই জন্য ফসল নির্দ্ধারণ যাহাতে নির্ভুল ও যথাথ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়, কেবল গণনাকারীর চাক্ষুষ অনুমানের উপর নির্ভর করা যায় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিরূপণ করা ও পরিমাপ নির্দ্ধারণ করা আরও কঠিন।

এইভাবে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সংখ্যা-বিবরণী হইতে সমগ্র বিষয়ের সম্পূর্ণ নির্ভুল ও সঠিক তথ্য না জানিলেও যথেষ্ট সঠিক আভাস পাওয়া সম্ভব। এবং এই সকল কারণে সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নমুনা বিশ্লেষণ ও বিচার দ্বারা সমগ্রের আভাস পাইবার প্রচেষ্টার উপকারিতা ও তাৎপর্য্য রহিয়াছে। আর এরূপ বিশ্লেষণ ও বিচার নানারূপ গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের আওতায় অল্প পরিসরের গণ্ডীতেও হওয়া সম্ভব। নমুনা হইতে সমগ্রের আভাস লাভ করিবার প্রচেষ্টাকে তুলনা করা যায় পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ করিবার প্রচেষ্টার সহিত। কিন্তু নমুনা বিশ্লেষণের পদ্ধতিতেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়।

বঙ্গদেশের কৃষিসম্পর্কে তথ্যাবলী

বঙ্গদেশের কৃষিবিষয়ক যে সকল তথ্য সঙ্কলিত পাওয়া যায় তাহার কিছু উদ্ধৃত করা হইল। যথা :—

(ক) কৃষিজীবী সম্বন্ধে

১৯৩১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী গ্রাম্য অঞ্চলে সমগ্র বঙ্গদেশের লোক-সংখ্যা (পুরুষ ও স্ত্রী, ছিল ৫,০১,১৪,০০২ (পাঁচ কোটি এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার দুই), তন্মধ্যে কৃষি-কার্য্যের নানা বিভাগে যাহারা নিযুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্যা এইরূপ :—

তালিকা ১

[সাধারণ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোক-সংখ্যা..........৯৯,১৫,৬৪২

(১)	যে সকল ভূস্বামী নিজে চাষ করে না এবং খাজনা পাইয়া থাকে...	৭,৮৩,৭৫৫
(২)	জমিদারীর ম্যানেজার ও এজেণ্ট......	১,৩৯৫
(৩)	তহসিলদার ও আমলা......	৫১,৩০৩
(৪)	চাষী ভূস্বামী......	৫৩,১৭,৯৭৩
(৫)	ভূমির চাষী প্রজা......	৮,৭৩,০৯৪
(৬)	চাষী শ্রমিক......	২৮,৭৭,৮০৪
(৭)	অন্যান্য চাষী......	১৩,৩১৮
	সমষ্টি :—	৯৯,১৫,৬৪২

ফুল-ফলাদি ও বিশেষ চাষ, যথা চা, কফি, রবার ইত্যাদিতে নিযুক্ত— ২,৯৯,০০৫

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, সাধারণ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চমাংশ এবং এই পঞ্চমাংশের প্রায় অর্দ্ধেক চাষী ভূমির মালিক।

সাধারণ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ও চাষী ভূস্বামীর সংখ্যার কিরূপ অংশের কৃষিই মূল উপজীবিকা ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে :—

তালিকা ২

	পুরুষ	নারী
১। সাধারণ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যা......		৯৯,১৫,৬৪২
যাহাদের কৃষিই মূল উপজীবিকা......	৮৩,৯৩,৮৭৭	৭,৪৯,৪৯০
যাহারা অন্যের পোষ্য......	২,৩০,৭৩৩	৪,৬৪৩৫
কৃষি ব্যতীত অন্য উপজীবিকার উপর যাহারা নির্ভর করে......	৬,৫৫,২৪২	২৯,৯৩১
২। চাষী ভূস্বামীর সংখ্যা......		৫৩,১৭,৯৭৩
তন্মধ্যে, যাহাদের কৃষি মূল উপজীবিকা......	৪৮,৬৬,৯২৪	২,১৬,৮৩০
যাহারা অন্যের পোষ্য......		
কৃষি ব্যতীত অন্য উপজীবিকার উপর যাহারা নির্ভর করে......	২,২৩,৫৬৫	১০,৬৫৪

(খ) বঙ্গদেশের ভূমির শ্রেণীবিভাগ

বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশের ভূমি বিভাগ কিরূপ ছিল তাহা তালিকায় দেখান হইল :—

তালিকা ৩ (সহস্র একরের* সংখ্যা)

	কর্ষিত ভূমির পরিমাণ	অনুর্ব্বর পতিত ভূমির পরিমাণ	উর্ব্বর অথচ কর্ষিত পতিত ভূমির পরিমাণ	যে পরিমাণ ভূমি কর্ষিত হয় না	বন জঙ্গল	মোট জমির পরিমাণ
১৯৩৫-৩৬	২২৬১৪	৫৬৭০	৬৬৫৮	৯৭৯৪	৪৪৫৮	৪৯২৫৫
৩৪-৩৫	২৩৩১৭	৫৪২৪	৬৬২৬	৯২২৯	৪৬১৭	৪৯২৫৫
৩৩-৩৪	২৪০০২	৪৯৫০	৬৪০৩	৯২৬৩	৪৬০৭	৪৯২৫৫
৩২-৩৩	২৩৩৪৯	৫৪১৪	৬৪০৯	৯৪৫৬	৪৬২৭	৪৯২৫৫
৩১-৩২	২৩৫৬৮	৫৩০০	৫৯১৬	৯১৫৩	৪৬৩০	৪৮৫৬৭
৩০-৩১	২৩০৬০	৫৫৭৪	৫৯৭২	৯৫৮৭	৪৫৯৪	৪৯১৮৭
২৯-৩০	২৩৩৭০	৫৩৮৭	৬০১৮	৯৮৪১	৪৫৭১	৪৯১৮৭
২৮-২৯	২৩৮২৭	৪৭৯৪	৫৯১৩	১০০৭৩	৪৫৮০	৪৯১৮৭
২৭-২৮	২১৯০১	৫০২৩	৬৪৩৭	১০২৪২	৪৫৮৪	৪৯১৮৭
১৯২৬-২৭	২৩৫৮৮	৫০৭৫	৫৮০৮	১০২৬৯	৪৫৮৩	৪৯১২৩

* ১ একর=প্রায় ৩ বিঘা।

(গ) সেচ ব্যবস্থা

বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ভূমিতে জলসেচের বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে :—

তালিকা ৪ (সহস্র একরের সংখ্যা)

	মোট যে পরিমাণ ভূমিতে জল সেচ হইয়াছিল	যে পরিমাণ ভূমিতে সরকারী খাল দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা ছিল	যে পরিমাণ ভূমিতে বে-সরকারী খাল দ্বারা জল সেচের ব্যবস্থা ছিল	যে পরিমাণ ভূমি পুষ্করিণীর জল দ্বারা সিক্ত হইত	যে পরিমাণ ভূমি কূপের জল দ্বারা সিক্ত হইত	অন্যান্য উপায়ে যে পরিমাণে ভূমি জলসিক্ত হইত
১৯৩৫-৩৬	১৫৯৪	২০৫	২০৫	৭০৯	৩০	৪১৫
৩৪-৩৫	১৬৯৯	১২৬	২০৮	৮৮৮	৩৭	৪৪১
৩৩-৩৪	১৬১১	৮৬	২০২	৯৬৩	৩০	৪১০
৩২-৩৩	১৬৭২	৫৫	২০৪	৯৭২	৩৪	৪০৭
৩১-৩২	১৬০২	৬৩	২০৭	৯০০	৩৪	৩৯৮
৩০-৩১	১৫৩৫	৭৭	২০৪	১১১৫	৩২	৩০৭
২৯-৩০	১৪০৯	৫০	১৭৭	৮৬৯	৩৮	২৭৫
২৮-২৯	১৪৩৫	৯২	১৯১	৮১২	১২	৩২৮
২৭-২৮	১৩৬৬	১০১	১৯২	৬৮৩	৩২	৩৫৮
১৯২৬-২৭	১৩১৮	১০১	২৩১	৪২৫	৮৮	৪৭৩

(ঘ) বিভিন্ন প্রকার আবাদী ভূমির শ্রেণীবিভাগ

বঙ্গদেশে যে পরিমাণ জমিতে কয়েকটি মূল শ্রেণীবিভাগে শস্যের চাষ হইয়াছে তাহার তালিকা :—

তালিকা ৫ (সহস্র একরের সংখ্যা)

	খাদ্য শস্য	তৈল-বীজ	ইক্ষু	আঁশময় শস্য	ভেষজ ও মাদক শস্য	ফল-মূলাদি	মোট আবাদী ভূমির পরিমাণ
১৯৩৫-৩৬	২২৬৭০	১০১৬	৩২৫	১৭৭০	৫১০	৭৬৭	২৭৬৯৫
৩৪-৩৫	২২৩৮২	১০৫১	২৭৬	২২৬১	৫১১	৭৯২	২৭৯২১
৩৩-৩৪	২৩১৮০	১০১৯	২৫৬	২২৪৩	৪৯০	৭৬৭	২৮৫৬৭
৩২-৩৩	২৩২৭৭	১০৪৬	২৩৩	১৭৩৮	৪৮৩	৭৬০	২৮১৭৪
৩১-৩২	২৩৭০৯	১১০২	২৩৩	১৭১৯	৪৯৬	৭৭২	২৮৬৭৫
৩০-৩১	২২০৯০	১০৮৬	১৯৯	৩১৫৩	৪৮৭	৭৪৯	২৮৩৯৯
২৯-৩০	২১৬৮২	১০২৫	১৯৮	৩০৩৬	৪৯৫	৭০১	২৭৮৩৩
২৮-২৯	২২৮৩৩	১০৩৮	১৯৬	২৭৯৫	৪৮৯	৭০৫	২৮৭০৩
২৭-২৮	১৯৯২৫	১০৫০	২০৯	৩০৫৮	৪৭৬	৬৮৩	২৬০৬১
১৯২৬-২৭	২১০৭৬	১০৯১	২০১	৩২৫৭	৪৮৮	৬৯৮	২৭৪৬৯

[ভারতে মোট অবাদী ভূমির যে অংশে বিভিন্ন শস্যের চাষ হয় তাহার তুলনা (১৯৩৫-৩৬) ।
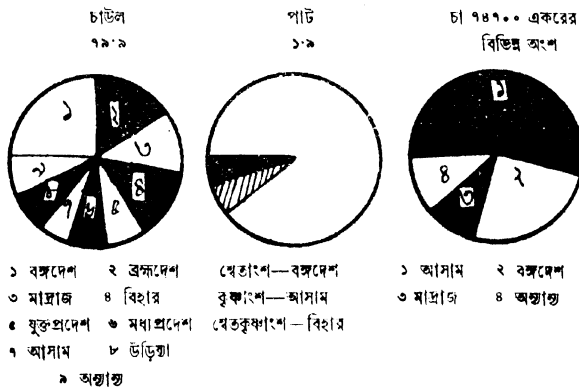
(ঙ) বিভিন্ন শস্যের আবাদী ভূমির পরিমাণের বিস্তৃত বিবরণ :—

বঙ্গদেশে যে পরিমাণ জমিতে কয়েকটি বিশিষ্ট শস্যের চাষ হইয়াছে তাহার তালিকা :—

তালিকা ৬ (সহস্র একরের সংখ্যা)

	ধান্য	গম	বার্লি	দাইল	চা	তুলা	পাট	তামাক
১৯৩৫-৩৬	২১০৯২	১২৭	৯০	১৮৩	২০০	৫৭·৯	১৬৭০	৩০৭
৩৪-৩৫	২০৭৪০	১৫৫	৯১	২০৭	২০০	৫৮·০	২১৬০	৩০৮
৩৩-৩৪	২১৬৭৩	১৪৫	৮৫	১৭৫	১৯৯	৫৮·০	২১৪২	২৮৫
৩২-৩৩	২২৭৭১	১৪৩	৮৫	১৭৭	১৯৮	৫৮·৫	১৬১১	২৮১
৩১-৩২	২২১২৯	১৪৫	৮৭	১৮০	১০৯	৫৮·৫	১৫৯৭	২৯৩
৩০-৩১	২০৫৮২	১৪৩	৮৬	১৫২	২০০	৫৮·১	৩০২৮	২৮৩
২৯-৩০	২০২২৭	১২৬	৮৪	১৫৩	১৯৫	৫৮·৮	২৯১৪	২৯৫
২৮-২৯	২১৪০৪	১২৩	৮২	১৪৩	১৯৩	৫৯·০	২৬৬৭	২৯১
২৭-২৮	১৮৬৮২	১০৭	৬৭	৯২	—*	৫৮·৪	২৯২৯	২৯০
২৬-২৭	১৯৭১৪	১২৯	৭৫	১২৬	—*	৫৯·৩	৩১২৪	২৯৫

* তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই ।

(চ) কৃষিদ্রব্যের পণ্য মূল্য ঃ—

বঙ্গদেশে কয়েকটি বিশিষ্ট শস্যের মূল্যের যেরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার তালিকা ঃ—

তালিকা ৭ (মণ-প্রতি)

	ধান্য	গম	বার্লি	দাইল	আখের গুড়	তুলা	পাট	তিসি	রাই	তামাক
১৯৩৫-৩৬	৩৷৷০	৩৲	২৵০	৩৲	৩৷৷/০	১৫৲	৪৸/০	৪৲	৪৸/০	৮৲
৩৪-৩৫	৩৷০	৩৲	২৲	২৷৷৶০	৪৲	১৪৷৷০	৩৷৷০	৩৸০	৪৷৵০	৭৲
৩৩-৩৪	৩৲	৩৲	২৲	২৷৷৵০	৩৸৶০	১১৷০	৩৷৷০	৩৷৷৵০	৪৷/০	৮৲
৩২-৩৩	২৷৷৵০	৩৵০	২৲	২৷৷৶০	৩৷৷৶০	১৪৷৷০	৩৷৷০	৩৸৶০	৪৷০	৮৸৵০
৩১-৩২	৩৷/০	৩৷৷০	২৷৷৵০	৩৲	৪৸৶০	১০৲	৪৷০	৪৷৷০	৪৷৷৵০	৮৲
৩০-৩১	৪/০	৪৲	৩৷০	৩৲	৫৷৵০	২২৷৷০	৩৷৷/০	৫৷০	৫৷০	১০৲
২৯-৩০	৬৲	৫৸৵০	৪৲	৫৲	৭৸৶০	৩২৲	৮৲	৭৲	৮৷/০	১৫৲
২৮-২৯	৬৷৷৵০	৬৲	৩৷৷/০	৫৷৷০	৮৷৷/০	৩৩৲	৯৲	৮৲	৮৸০	২০৲
২৭-২৮	৭৷৷০	৬৵০	৩৷৷৶০	৫৸০	৮৸৵০	৩৯৸০	৮৷০	৭৷৷০	৯৲	১৭৷০
২৬-২৭	৭৶০	৬৷০	৩৷৷৵০	৫৲	৯৵০	৪০৲	৮৷০	৭৸/০	৯৲	১৪৷৷০

(ছ) উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ ঃ—

বঙ্গদেশে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যাইবে ঃ—

তালিকা ৮

	ধান্য (সহস্র টন)	গম (সহস্র টন)	বার্লি (সহস্র টন)	আখের গুড় (লক্ষ টন)	তুলা (সহস্র গাঁট*)	পাট (সহস্র গাঁট)	তামাক (সহস্র টন)	চা (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৩৬-৩৭	১০৬৬৮	৪৬	৩১	৬৫৪	২৩	৬৯·৮	১৪৪	৯৯৪
৩৫-৩৬	৭২০৮	৩৩	২৬	৫৬০	২১	৭৯·৪	১২৯	৯৬৩
৩৪-৩৫	৮২৭৩	৫১	৩০	৪৯২	২১	৬৪·৯	১৪৪	৯৮৪
৩৩-৩৪	৮৬৮০	৪১	২৪	৪৫৭	২১	৭৬·৮	১২৩	৯৬৬
৩২-৩৩	৯৩৬৪	৪১	২৭	৪৫৪	২১	৭০·৫	১৩৯	১০৮৯
৩১-৩২	৯৪৯৩	৩৪	২৭	২৭৩	১৫	৬১·৭	১২২	৮৮৫
৩০-৩২	৯২০৬	৩৪	২৮	২৪৮	১৭	৪৯·৮	১২০	৯৭০
২৯-৩০	৮২০২	৩৩	২৭	২২০	১৮	৯৮·৮	১২৪	১১০০
২৮-২৯	৯৬৮৪	৩২	২৬	২১৬	১৫	৯১·৮	১২২	৯৫০
২৭-২৮	৬৪৯৩	২২	১৮	২৩৬	১৭	৮৫·১	১২০	৯৭০

* ১ গাঁট = ৪০০ পাউণ্ড, ১ পাউণ্ড = প্রায় অর্দ্ধ সের, ১ টন = ২৭ মণ ৯ সের।

(জ) বঙ্গদেশের বিভিন্ন ফসলের গড়ে একর প্রতি উৎপাদন ও অন্যান্য সকল প্রদেশের গড়ে একর প্রতি উৎপাদনের সহিত তুলনামূলক তালিকা নিম্নে দেখান হইল।

তালিকা ৯ (একর প্রতি পাউণ্ডের সংখ্যা)

	ধান্য		গম		ইক্ষু		তুলা		পাট		চা	
	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ	বঙ্গদেশ	সকল প্রদেশ
১৯৩৬-৩৭	১০২৭	৮০৯	৬৯২	৭০৮	৪১২৭	৩৩৪৭	১৫৯	১১১	১২৯১	১২০৬	৪৯০	৪৮৮
৩৫-৩৪	৭৬৫	৭০৫	৫৮২	৬৭৭	৩৮৬০	৩২৭৯	১৪৫	৯৭	১৪৩১	১৩৩৩	৪৭৭	৪৮৭
৩৪-৩৩	৮৯৪	৮২৯	৭৩৭	৬৭৮	৩৯৯৩	৩২৯৯	১৪৫	৮৮	১৩৬৬	১৩২৫	৪৮৮	৪৯৯
৩৩-৩২	৮৯৭	৮৪০	৬৩৩	৬১১	২৯৮৩	৩৩০৪	১৪৫	৯৩	১৩২৩	১২৭৫	৪৮৪	৪৮৩
৩২-৩৩	৯৬৩	৮৫০	৬৪২	৬৮৪	৪৩৬৫	৩১৩৬	১৪২	৯০	১৩১৬	১২৭৫	৫৪৭	৫৫৩
৩১-৩২	৯৬১	৮৮৩	৫২৫	৬৪৮	২৬২৫	২৯৭৭	১০৩	৬৭	১৩৫৪	১২৪৮	৪৪৬	৫০৪
৩০-৩১	১০০২	৮৮২	৫৩৩	৬৯৩	২৭৯২	২৫৬০	১১৭	৯৫	১২৪৮	১১৯৭	৪৮৭	৫০১
২৯-৩০	৯০৮	৮৭০	৫৮৭	৮১২	২৪৮৯	২৪৩১	১২২	৯১	১৩০৬	১২৮৭	৫৬৪	৫৬৪
২৮-২৯	১০১৪	৮৭০	৫৮৩	৬৫৬	২৪৬৯	২৩৩২	১০২	৯২	১২৩১	১২১৪	৪৯০	৫২৯
২৭-২৮	৭৭৯	৮০৯	৪৬১	৫৮০	২৫২৯	২৪০৬	১১৫	৯৫	১২৭৭	১২৬৫	৫১১	৫২৩

(ঝ) বঙ্গদেশের বিভিন্ন শস্যের একর প্রতি স্বাভাবিক ফলন

তালিকা ১০

ধান্য…	(পৌষ)	১১১১	পাউণ্ড
গম……		৮১৬	”
ইক্ষু……		৪৬৪৩	”
তুলা……		১৫৫	”
পাট……		১৪৬৫	”
তিসি……		৬০৭	”
রাই……		৬২৪	”

(ঞ) বঙ্গদেশের বারিপাত—স্বাভাবিক মাপ ৭৪'১ ইঞ্চি

তালিকা ১১

সাল	ইঞ্চি	সাল	ইঞ্চি
১৯৩৬	৭৫'৮	১৯৩১	৭৪'৮
৩৫	৬০'৫	৩০	৬৯'৭
৩৪	৬৭'৮	২৯	৭৪'৮
৩৩	৮১'৬	২৮	৭৯'৮
৩২	৭১'০	২৭	৬৫'০

(ট) গোধন, লাঙ্গল ও গোযান (সহস্রের সংখ্যা)

প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর গোধন ইত্যাদির সংখ্যা গণনা করা হয়—গত দুই গণনার ফলাফল কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

তালিকা ১২

	ষাঁড়	বলদ	গাভী	বাছুর	মহিষ	মহিষ-গাভী	মহিষ-বাছুর	ছাগল ভেড়া	ঘোড়া	ঘোড়ী	বাচ্চা	লাঙ্গল	গাড়ী
১৯২৪-২৫	১১৯৫	৮৪৫৯	৮৩৮২	৬৩৭২	৬৮৪	২৭১	১২৭	৬৭১৮	৮২	৩৫	৮	৪৬৮৯	৮৫৫
১৯২৯-৩০	১১৫৬	৮৩৮৯	৮২৫১	৬৪০৩	৬৮৯	২৭৬	১২৩	৬০৪৯	৭০	৩৪	৯	৪৫৯২	৮৬০

(ঠ) সমবায় আন্দোলন

১৯৩৫-৩৬ সালে বঙ্গদেশে কৃষি-বিভাগে সমবায় আন্দোলন কিরূপ চলিয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নের তালিকা হইতে দেখা যায় :—

১। মোট প্রাথমিক কৃষি-সমিতির সংখ্যা		২১,১১২
(অ) দাদন সমিতি	১৯৭৯০	
(আ) ক্রয়-বিক্রয় সমিতি	৭৩	
(ই) শস্য-উৎপাদন সমিতি	৯৫৭	
(ঈ) উৎপাদন ও পণ্য-বিক্রয় সমিতি	২৪৬	
(উ) অন্যান্য প্রকার সমিতি	৪৬	
২। সভ্য সংখ্যা		৫,০৬,৬১০
৩। মোট সংগৃহীত মূলধন		৬১,৩১,১০৪৲
৪। কার্য্যকরী মূলধন		৬,১৫,২১,৩৫২৲
মজুত তহবীল		১,৮২,৩৮,৯৩৯৲
অন্যান্য তহবীল		২,৭০,১৮৬৲
লাভ		১০,৩৪,৪৭৬৲
৫। লভ্যাংশ যে হারে দেওয়া হইয়াছে…		৯।৵০ শতকরা
৬। সাধারণতঃ যে সুদে কারবার হয় :—ঋণ গ্রহণে		১০৸৶০ শতকরা
ঋণ দাদনে		১৫॥৵০ শতকরা

তথ্যাবলীর তাৎপর্য্য

তালিকাগুলিতে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে বিভিন্ন প্রকার অর্থ ও তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন সম্ভব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতকগুলি সংখ্যা উদ্ধার করা ব্যতীত তাহাদের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য্য উদ্ঘাটন করা হইল না, কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখান হইল, কত বিভিন্ন বিষয়ে সংখ্যা-বিজ্ঞানের বিবরণী-পর্য্যায় কার্য্যকরী। এমন অনেক বিষয় সাব্যস্ত করা যায়, যে সকল বিষয়ের বিবরণী কৃষি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে নূতন পথ নির্দ্দেশ করিতে পারে।

নমুনা বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র

প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যা-বিজ্ঞানের দ্বিতীয় পর্য্যায় (অর্থাৎ যে পর্য্যায়ে নমুনা-বিশ্লেষণ হইতে সমষ্টির জ্ঞান লাভ করা যায়,) কৃষি-ব্যবস্থার নানা বিভাগে প্রযুক্ত হইতেছে ও নূতন নূতন পথ সর্ব্বদা নির্দ্দেশ করিতেছে। ফসলবৃদ্ধির উপায় এখন সংখ্যা-বিজ্ঞানের কল্যাণে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ফসলবৃদ্ধির উপায় কয়েকটি বিশিষ্ট বিভাগে গবেষণা দ্বারা নির্দ্ধারণ করা যায়। যথা :—

(১) জমি ও সার,
(২) কৃষি-বিষয়ক আবহতত্ত্ব,
(৩) শস্য-প্রজনন,
(৪) শস্যের দেহতত্ত্ব,
(৫) শস্যের রোগ ও প্রতিকার,
(৬) কীটতত্ত্ব ইত্যাদি।

এই বিভাগগুলির প্রত্যেকটিতে ভূমির নমুনা, গঠন ও ও নমুনার গুণাগুণ বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়া গবেষণা করা হয়, এবং এরূপ গবেষণায় সংখ্যাবিজ্ঞান ব্যতীত এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। কৃষকদের সম্বন্ধেও এই প্রণালী দ্বারা গবেষণা করা চলে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বিভিন্ন স্থানের ভূমির বহু নমুনা লইয়া সংখ্যাবিজ্ঞান সাহায্যে বিচার করিয়া ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের যে সকল ভূমিতে ধান্যের চাষ হয়, সে সকল ভূমি রৌদ্র-বৃষ্টির তারতম্যে একই রূপ সাড়া দেয়। সংখ্যাবিজ্ঞান সাহায্যে ভূমির নমুনা লইয়া বিচার করা যায় শস্যের বৃদ্ধি ও ফলনের উপর শীতাতপের প্রভাব কিরূপ, অথবা বিভিন্ন জাতের শস্যের সংমিশ্রণে যে সঙ্কর জাতীয় বীজের জন্ম হয়, তাহার গুণাগুণ কিরূপ, অথবা বিভিন্ন শস্যের দেহপুষ্টির জন্য কি পরিমাণ জল বা সার খাদ্য প্রয়োজন, অথবা বিভিন্ন শস্যের রোগ ও তাহার প্রতিকার কি, অথবা কোন্ কীট বা পতঙ্গ অনিষ্টকারী বা উপকারী এবং অনিষ্টের বা উপকারের মাত্রা কিরূপ, অথবা কোন্ তিথিতে শস্যরোপণের ফল কিরূপ তাহার বিচারও সংখ্যা-বিজ্ঞানের আওতায় পড়ে।

আবার, কৃষিপণ্যবিক্রয়-সমস্যাতেও সংখ্যাবিজ্ঞানের প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয়। ক্রেতা অনুসন্ধান ও পশ্চাদ্ধাবন প্রভৃতি বিষয় যুদ্ধবিদ্যার সমকক্ষ। ক্রেতার রীতিনীতি, গতিবিধি, ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সুচারু বিক্রয়-পদ্ধতির অপরিহার্য্য বিষয়, কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ক্রেতাদের সমষ্টি হইতে নমুনা সংগ্রহ করিয়া সংখ্যাবিজ্ঞান সাহায্যে নমুনার ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিয়া সমগ্র ক্রেতাগোষ্ঠীর ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

অন্য আর এক দিকে সংখ্যা-বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। সংখ্যা-বিজ্ঞানের সে দিকও কৃষি-বাণিজ্যে কম প্রয়োজনীয় নয়। সংখ্যাবিজ্ঞানের সে দিক 'ব্যবসা-চক্র' নামে সাধারণতঃ পরিচিত। পণ্যের মূল্য বহু কারণের ঘাত-প্রতিঘাতের একটি ফল বিশেষ, কিন্তু পণ্য-মূল্যের পরিবর্ত্তন হইলেও কিছু কাল পর পর পূর্ব্বের মূল্য দেখা দেয়—বহু সংখ্যাবিদের মতে একই পণ্য-মূল্যের পুনরাবির্ভাব হয় চক্রবৎ পদ্ধতিতে এবং সম্বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মূল্যের তারতম্য প্রায় একই রূপ ঘটে; এ পরিবর্ত্তনকে ঋতুব্যাপী হ্রাস-বৃদ্ধি আখ্যা দেওয়া যায়। যেমন, বঙ্গদেশে পাটের মূল্য সর্ব্বোচ্চ হয় প্রায় প্রতি বৎসরই সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে ও সর্ব্বনিম্ন হয় মে-জুন মাসে। চাউলের মূল্য সর্ব্বনিম্ন হয় গ্রীষ্মের শেষ মাসে ও সর্ব্বোচ্চ হয় শীতের মাঝামাঝি।

কলিকাতার পাটের দর বিশ্লেষণ সম্বন্ধে নিম্নে তিনটি চিত্র দেওয়া হইল:—

'ক' চিত্র:- কলিকাতায় প্রতি মণ পাটের প্রকৃত দর।
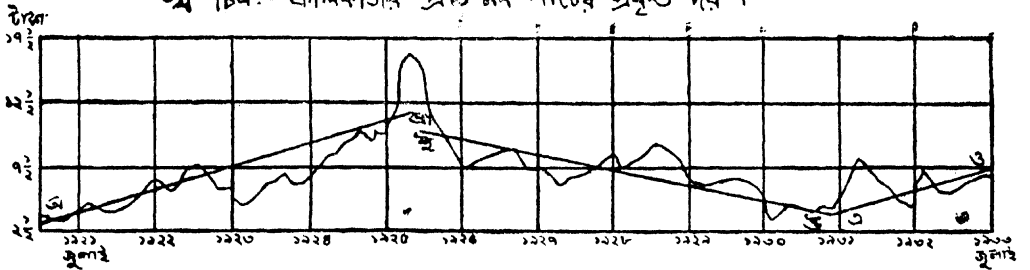
'গ' চিত্র:- কলিকাতার পাটের দরের ঋতুব্যাপী হ্রাসবৃদ্ধি।

'ঘ' চিত্র :- কলিকাতার পাটের দরের হ্রাস বৃদ্ধির চক্র।
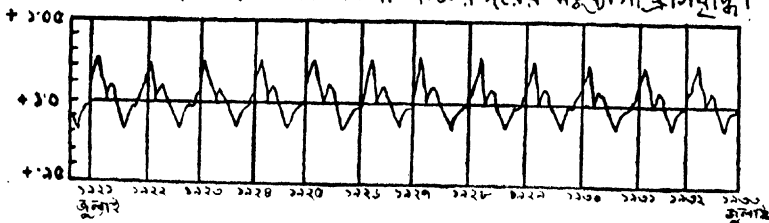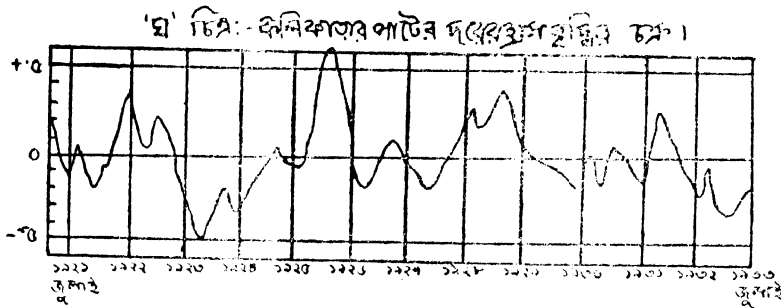
অতি-আধুনিক গবেষকেরা এই চক্রাৎ পদ্ধতির সহিত গতির ও শক্তির সম্বন্ধ দেখিতেছেন। জ্যোতির্বিদ্যা ও পদার্থবিদ্যাতে গতি ও শক্তির অনুশীলন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করিয়া যেরূপ জড় ও জ্যোতিষ্কের অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক পূর্ব্বাভাস দেওয়া সম্ভব, চক্রসংখ্যাবিদ্‌রাও আশা করেন, তেমনই পণ্য মূল্য ও অন্যান্য যে সকল বিষয় কালের গতির সহিত পরিবর্ত্তনশীল, তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা কার্য্যকরী ও প্রকৃতভাবে সম্ভব হইবে। যে-শক্তি পণ্যমূল্যের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া কৃষি হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-সমাজের আর্থিক জগতে ভাঙ্গন-গড়ন করিয়া চলিয়াছে, তাহার সন্ধান পাইলে তাহাকে সংযত করিবার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়ত কিছু সম্ভব হইবে। সে-শক্তির রূপ চক্র-সংখ্যাবিদেরা এখনও কল্পনা বা সাব্যস্ত করিতে পারেন নাই।

কৃষিসংক্রান্ত সূচক-সংখ্যা

সংখ্যা-বিজ্ঞানে অনেকগুলি ঘটনার চুম্বক-সংবাদ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং এইরূপ সংখ্যাগুলি একটি সর্ব্বসাধারণ সংবাদ সূচনা করে। এরূপ সংখ্যার নামই সূচক-সংখ্যা। ভারতবর্ষে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কিরূপ কর্ম্মকুশল হইয়াছে তাহার সংবাদ সংপ্রতি সূচক-সংখ্যা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। কৃষি-কার্য্যের কর্ম্মকুশলতা সম্বন্ধে সূচক-সংখ্যা সাহায্যে সংবাদ প্রকাশ করিবার প্রথাও হয়ত অল্পদিনের মধ্যে প্রচলিত হইবে।

পারম্পর্য্য পরিমাপ

এমন অনেক বিষয় আছে, যাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত নিগূঢ় সূত্রে আবদ্ধ। একটির পরিবর্ত্তনে অপরটির পরিবর্ত্তন হয়। সংখ্যা-বিজ্ঞানে বহু বিষয়ের পরস্পরের সম্বন্ধের মাত্রার পরিমাপ করিবার পদ্ধতি উদ্ভূত হইয়াছে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া কৃষি বিষয়েও অনেক পরস্পর সম্বন্ধের মাত্রা পরিমাপ করা যায়। কৃষককে ত্যাগ করিয়া কৃষি সম্ভব নয়। কৃষকের সমস্যা ও কৃষির সমস্যা উভয় সমস্যাতেই সংখ্যা-বিজ্ঞানের এই পদ্ধতি প্রযুজ্য। যেমন অনাবৃষ্টির সহিত কৃষি-ঋণের সম্বন্ধের মাত্রা কিরূপ, অথবা নিয়ন্ত্রিত চাষের সহিত পাটের মূল্যের সম্বন্ধের পরিমাপ কিরূপ ইত্যাদি।

কৃষি সম্পর্কে সংখ্যা-বিবরণী ও গবেষণার ফলাফল বাঙ্গলা ভাষায় কৃষকদিগের মধ্যে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করা ও কৃষি সম্বন্ধে সংখ্যা-বিজ্ঞানের চর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষাগার গবেষণা ও শিক্ষা বিস্তার

১৯৩৪-৩৫-এ বঙ্গদেশে যে যে স্থানে কৃষি সম্বন্ধে পরীক্ষাগার ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল :—

পিপীলিকার বিচিত্র কাহিনী

—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কীট-পতঙ্গের মধ্যে সাধারণতঃ পিপীলিকার সঙ্গেই মানুষের পরিচয় বেশী। মানুষের সঙ্গে যেন ইহাদের অতি নিকট সম্বন্ধ বিদ্যমান। সম্বন্ধ অবশ্য মধুর নহে। যেখানেই মানুষের বাস, সেখানেই কোন না কোন জাতীয় পিপীলিকা নানা প্রকারে উপদ্রব করিয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তোলে। কিন্তু নানা ভাবে অপকার করিলেও তাহারা জীবিত বা মৃত অন্যান্য অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের দেহ উদরসাৎ করিয়া মানুষের উপকারও কম করে না।

পিপীলিকারা সামাজিক জীব, কখনও একক ভাবে ইহাদিগকে জীবন যাপন করিতে দেখা যায় না। ইহারা যেমন পরিশ্রমী তেমনই সঞ্চয়ী। দৈনন্দিন কার্য্য সম্পাদনে ইহাদের অপূর্ব্ব নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখিলে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকার মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী ছাড়া বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট আরও কয়েক রকম পিপীলিকা দেখা যায়। যেমন ছোট ও বড়, কর্ম্মী ও সৈনিক প্রভৃতি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুং পিপীলিকার ডানা থাকে। তাহারা কেবলমাত্র বংশবৃদ্ধি ব্যতীত সংসারের আর কোন কাজই করে না। কর্ম্মীরা বাসা-নির্ম্মাণ, আহার-সংগ্রহ ও সন্তান-পালন প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করিয়া থাকে। সৈনিকেরা শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে। যাহাদের মধ্যে সৈনিক জাতীয় পিপীলিকা নাই, তাহাদের কর্ম্মীরাই লড়াইয়ের কাজ করিয়া থাকে। কর্ম্মী পিপীলিকারাই সংখ্যায় বেশী। আর সচরাচর আমরা পিপীলিকার কর্ম্মীদিগকেই দেখিতে পাই। কর্ম্মীদের দেখিয়াই পিপীলিকার জাতি নির্ণীত হয়।

পিপীলিকার দেহ মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত। যথা মাথা, বুক ও পেট। বুকের সঙ্গে তিন জোড়া করিয়া পা থাকে। প্রত্যেক পিপীলিকারই মাথার উপরে এক জোড়া শুঁড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের চক্ষু সরল গঠনের নহে। প্রত্যেকটি চোখ কতকগুলি ক্ষুদ্র চোখের সমষ্টি মাত্র। ইহারা নিরামিষ ও আমিষ উভয় প্রকার খাদ্যই গ্রহণ করিয়া থাকে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র বাংলাদেশেই কত যে বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা আছে, তাহার সঠিক হিসাব দেওয়া দুষ্কর। সচরাচর আমাদের দেশে যে সব বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কয়েকটির জীবন-যাত্রা-প্রণালী সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে আম, জাম, পাকুড় প্রভৃতি বড় বড় গাছের উপর লাল রঙের এক জাতীয় পিপীলিকাকে কতগুকলি পাতা একত্রে জুড়িয়া বেশ বড় রকমের গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে দেখা যায়। ইহাদিগকে 'নালসো' বা লাল-পিঁপড়ে বলে। ইহারা অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির, পশু-পাখী হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ পর্য্যন্ত সকলেই ইহাদের বিষাক্ত দংশনের ভয়ে নিকটে যাইতে সাহসী হয় না। কেহ ইহাদের বাসার নিকটে গেলেই ইহারা উত্তেজিত ভাবে দলে দলে বাহিরে আসিয়া বাসার উপরে জমায়েৎ হইতে থাকে এবং মুখ হাঁ করিয়া শরীরের পশ্চাদ্ভাগ উঁচুতে তুলিয়া শত্রুর নাগাল পাইবার আশায় অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। শত্রু প্রবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, কাহাকেও আক্রমণ করিতে ছাড়ে না। কামড় দিয়া আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে একরকম বিষাক্ত রস বাহির করিতে থাকে। টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও কামড় ছাড়ে না। যদি শত্রুকে নাগালের মধ্যে না পায়, তবে পশ্চাদ্দেশ উঁচু করিয়া বিষাক্ত রস পিচকিরির মত ছুঁড়িয়া মারিতে থাকে। একখণ্ড কাঠি বা ঐরূপ অন্য কিছু সামনে ধরিলেও তৎক্ষণাৎ নির্ব্বিচারে তাহা কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই অবস্থায় সেই কাঠিটি তাহার মুখ হইতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে। জীবন যাউক তাও স্বীকার, তবু কাঠি ছাড়িবে না। আশঙ্কার আর কোন

কারণ না থাকিলে অবশ্য অনেকক্ষণ পরে কাঠিটি ফেলিয়া দেয়। জীবন্ত ফড়িং বা অন্য কোন কীটপতঙ্গকে কোন রূপে একবার ধরিতে পারিলে আর রক্ষা নাই; একটু নড়াচড়ার সাড়া পাইলেই অন্যান্য সকলে দলে দলে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে এবং যতক্ষণ নির্জীব না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে কামড়াইয়া টানা দিয়া রাখে। শীকার বিশেষ প্রবল হইলে কখনও কখনও ঝাপটা-ঝাপটি করিয়া উড়িয়া যায়; কিন্তু উড়িয়া গিয়াও তাহার নিস্তার নাই। লেজে, ডানায় বা শুঁড়ে দুই চারিটি 'নাল্‌সো' কামড় দিয়া আটকাইয়া থাকিয়া যায়। দংশনের জ্বালার অস্থির হইয়া ছুটাছুটি করিতে করিতে হয়রান হইয়া কোন স্থানে একবার বসিলেই হইল। সেই বিশ্রাম-স্থলে পা আটকাইয়া পুনরায় তাহাকে প্রাণপণে বাঁধিতে চেষ্টা করে। বার বার এইরূপ চেষ্টার ফলে শীকার অবশেষে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় ইহারা দলছাড়া হইয়া পড়িলেও পুনরায় কোন নূতন স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, অথবা অন্য কোন একটা দলের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাহাদের দলভুক্ত হইয়া যায়।

লাল-পিঁপড়েদের বাসা-নির্ম্মাণের কৌশল অতি অদ্ভুত। প্রথমতঃ বাসাটী ক্রমশঃ বড় করিতে করিতেও যখন সংখ্যা-বৃদ্ধি হেতু স্থান-সঙ্কুলান হয় না, তখন কয়েকটি 'নাল্‌সো' একসঙ্গে উপযুক্ত নূতন স্থানের সন্ধানে বহির্গত হয়, স্থান নির্ব্বাচন করিয়া ফিরিয়া আসিলে কতকগুলি কর্ম্মী পিপীলিকাকে সেস্থলে পাঠাইয়া দেয়, অবশ্য অনুসন্ধান-কারীরাও তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কর্ম্মীরা সেখানে গিয়া অনেকক্ষণ আনাগোনা করিয়া পাতাগুলিকে বিশেষ ভাবে দেখিয়া লয় এবং পরস্পর-সন্নিহিত দুইটি পাতা নির্ব্বাচন করিয়া একটির ধারের দিকে কামড়াইয়া ধরে ও অপরটিকে পায়ের নখ দিয়া টানিয়া রাখে। তখন তার পাশে আর একটি নাল্‌সো আসিয়া এক পাতায় পা রাখিয়া অপর পাতাটিকে কামড়াইয়া আর একটুকু কাছে টানিয়া ধরিয়া রাখে। এইরূপে পাশাপাশিভাবে পাঁচ সাতটা পিপীলিকা পাতা দুইটিকে যথাসম্ভব একত্র করিয়া টানিয়া রাখিবার পর বাসা হইতে অপর কর্ম্মী পিপীলিকারা শ্বেতবর্ণের ছোট ছোট বাচ্চা মুখে করিয়া সেস্থলে উপস্থিত হয়। পিপীলিকা, মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের বাচ্চারা মাকড়সার ন্যায় ইচ্ছামত মুখ হইতে সূতা বাহির করিতে পারে। কিন্তু নাল্‌সো, কাঠজিঁয়া প্রভৃতি কয়েক জাতীয় পিপীলিকার বাচ্চা ছাড়া অন্য সাধারণ পিপীলিকার বাচ্চারা এইরূপ সূতা বাহির করিতে পারে না। নাল্‌সো পিঁপড়ের বাচ্চারা পুত্তলী অবস্থায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে মুখের কাছে সুড়সুড়ি দিলেই সূতা বাহির করিতে থাকে। কর্ম্মীরা বাচ্চা মুখে করিয়া টানা দেওয়া পিঁপড়েদের উপর দিয়া আনাগোনা করিয়া বাচ্চাদের মুখ একবার এ পাতার ধারে আবার ও পাতার ধারে ঠেকাইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুঁড় দিয়া তাহাদের মুখের কাছে সুড়সুড়ি দেওয়ার ফলে সূতা বাহির করিয়া পাতা দুইটিকে একসঙ্গে যুড়িয়া দেয়। এই সূতাগুলি এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে নজরেই পড়ে না। কিন্তু অনেকবার করিয়া বুনিবার ফলে ক্রমশঃ এই সূত্রজাল পাতলা কাগজের মত হইয়া থাকে। এইরূপে প্রায় একদিনের মধ্যেই পাঁচ সাতটি পাতা একত্রে জুড়িয়া একটি গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া ফেলে। বাহিরে যাতায়াত করিবার জন্য বোঁটার কাছে বেশ বড় একটি ছিদ্র রাখে। বাসানির্ম্মাণ শেষ হইতে না হইতেই পূর্ব্ব বাসা হইতে একদল পিপীলিকা কয়েকটি বাচ্চা, দুই চারিটি স্ত্রী ও পুরুষকে লইয়া আসিয়া নূতন বাসায় বসবাস করিতে আরম্ভ করে। বাচ্চা না হইলে ইহাদের বাসা নির্ম্মাণ চলে না।

এক জাতীয় শ্বেতবর্ণের গাছ-উকুনের গায়ের রস অতি উপাদেয় বোধে ইহারা চুষিয়া খাইয়া থাকে। এই পোকা-গুলিকে নাল্‌সোরা অতি যত্নসহকারে প্রতিপালন করিয়া থাকে। বাচ্চা ও শ্বেতবর্ণের গাছ-উকুনই ইহাদের প্রধান সম্পত্তি। এই গুলিকে তাহারা অতি সতর্কতার সহিত পাহারা দিয়া থাকে, কারণ, ভিন্ন দলের পিপীলিকারা কোন রকমে সুবিধা করিতে পারিলেই এই সম্পত্তি ছিনাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। এই উপলক্ষে সময়ে সময়ে দুইদলে লড়াই বাঁধিয়া যায়; সে অতি ভীষণ ব্যাপার। প্রথমতঃ দুই দলের দুই জন করিয়া দ্বৈরথ যুদ্ধ চলে। বিজেতা পরাজিতকে টুকরা টুকরা

করিয়া কাটিয়া ফেলে। কিন্তু বিজেতাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেও সে মরণকামড় ছাড়ে না। যুদ্ধ অবসানে দেখা যায়, অনেক বিজয়ী যোদ্ধার পায়ে বা শুঁড়ে মরণকামড় দিয়া পরাজিত পিপীলিকার মাথাটি ঝুলিয়া রহিয়াছে। যত দিন তাহারা বাঁচিবে ততদিন এইভাবে দেহের সঙ্গে শত্রুর মুণ্ড বহন করিয়াই চলাফেরা করিতে হইবে। দ্বৈরথ যুদ্ধ করিতে করিতে ইহারা যেন ক্রোধে দিশেহারা হইয়া ওঠে, তখন সুরু হইয়া যায় সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যুর যুদ্ধের মত একটা বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড। দুইদল তখন আর এলোমেলো ভাবে ছুটোছুটী করে না—উভয় দলের মধ্যে তখন বেশ ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধস্থলের উভয় পার্শ্বে যোদ্ধারা দলে দলে সমবেত হইয়া জটলা করিতে থাকে, আর কতকগুলি পিপীলিকা উত্তেজিত ভাবে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঠুকিয়া একপ্রকার অস্ফুট শব্দ করিতে থাকে। এই অবস্থায় একদলের কোন যোদ্ধা যদি কোন গতিকে অপর দলের কাহাকেও ধরিতে পারে, তবে তৎক্ষণাৎ হিড়হিড় করিয়া তাহাকে নিজের দলের মধ্যে টানিয়া আনে এবং সকলে সমবেতভাবে তাহাকে আক্রমণ করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে অথবা তাহার প্রত্যেকটি পা ও শুঁড় এক একজনে কামড়াইয়া খুব জোর করিয়া টানিয়া রাখে। এ-অবস্থায় বন্দী পিপীলিকাটি একটুও নড়াচড়া করিতে পারে না। যুদ্ধাবসানে বন্দীদের অনেককেই দলভুক্ত করিয়া লয় অথবা কোন-কোনটিকে মারিয়া ফেলে।

নদী পার হইবার সময় বানরদের যেরূপ শিকল গাঁথিবার গল্প শুনা যায়, বাসা বাঁধিবার সময় নিম্নস্থিত কোন লতাপাতাকে টানিয়া একত্র করিবার জন্য 'নাল্‌সো'রাও সেইরূপ মোটা শিকল গাঁথিয়া থাকে। উপরের ডালে অনেক কর্ম্মী পিপীলিকা স্তূপাকারে একত্রিত হইতে হইতে ক্রমশঃ লম্বা শিকলের মত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। এইরূপ পিঁপড়ের শিকল সময়ে সময়ে এক ফুটের বেশী লম্বা হইয়া থাকে। নীচের ডাল বা পাতা নাগাল পাইবামাত্রই উপর দিক হইতে পিঁপড়েরা একটি একটি করিয়া সরিয়া গিয়া শিকলের দৈর্ঘ্য কমাইতে থাকে। পাতাগুলি এইরূপে খুব কাছে আসিয়া পড়িলে বাচ্চার সাহায্যে সূতা বুনিয়া বাসার সঙ্গে জুড়িয়া দেয়।

হল্‌দে রঙের ক্ষুদে-পিঁপড়েরা লাল-পিঁপড়েদের ভয়ানক শত্রু। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এই দুর্দ্ধর্ষ লাল-পিঁপড়েরা একমাত্র ক্ষুদে-পিঁপড়েদের ছাড়া আর কাহাকেও ভয় করে না। যে-সব গাছপালার মধ্যে ক্ষুদে-পিঁপড়েরা বিচরণ করে, তাহার ত্রিসীমানায়ও 'নালসো' পিঁপড়ের আনাগোনা বা বাসা দেখিতে পাওয়া যায় না।

'নাল্‌সো'দের গন্ধ পাইলেই হল্‌দে রঙের ক্ষুদে পিপীলিকাগুলি দলে দলে আসিয়া তাহাদিগকে বেপরোয়া ভাবে আক্রমণ করে। এই ক্ষুদেদের দেখিলেই 'নালসো'রা যেন ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু সহজে পলায়ন করা ইহাদের স্বভাব নহে, কাজেই প্রথম আক্রমণের সময় হয়তো দশ পনরটা ক্ষুদে পিপীলিকাকে কামড়াইয়া মারিয়া ফেলে—কিন্তু ক্ষুদেরা যেমনই দলে ভারী, তেমনই উৎসাহও অদম্য। এক এক দলে হয়তো লক্ষাধিক পিপীলিকা বাস করে। দুই একটার সহিত মারামারি আরম্ভ হইতে না হইতেই শত শত ক্ষুদে আসিয়া 'নাল্‌সো'কে ঘিরিয়া ফেলে। তাহাদের সমবেত দংশনের বিষের জ্বালায় 'নাল্‌সো' পশ্চাদ্দেশ ঊর্দ্ধে তুলিয়া উল্টাদিকে বাঁকিয়া সঙ্গে সঙ্গেই দেহত্যাগ করে। ক্ষুদেরা প্রায় চার পাঁচঘণ্টার মধ্যেই বড় রকমের একটা বাসার যাবতীয় পিঁপড়েকে হত্যা করিয়া তাহাদের মৃতদেহ ও ডিম লইয়া প্রস্থান করে।

'নাল্‌সো'রা উই পোকা খাইতে খুবই ভালবাসে। উইএর সন্ধানে ইহারা সময়ে সময়ে গাছ হইতে মাটীতে নামিয়া আসে। কিন্তু উই পোকারা দুর্ভেদ্য সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে চলাফেরা করে। ইহারা উইএর লাইনের ধারে আসিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে কোথাও একটু নরম স্থান পাইলে শক্ত দাঁতের সাহায্যে সে স্থলে খানিকটা অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া একপাশে চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। উইএর সুড়ঙ্গ কোথাও একটু ভাঙ্গিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহারা সেস্থান মেরামত করিয়া দেয়। যখন উই পোকারা ভগ্নস্থান মেরামত করিতে আসে তখনই 'নালসো' চক্ষের নিমেষে এক একটি উইকে কামড়াইয়া ধরিয়া একেবারে বাসায় লইয়া যায়। কলিকাতা রয়েল

বোটানিক্যাল গার্ডেনে আমি এরূপ দৃশ্য অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ধৈর্য্যধারণ করিয়া অপেক্ষা করিলেই অন্যান্য অনেকস্থলেই (অবশ্য যেখানে উই পোকা ও 'নালসো' যথেষ্ট পরিমাণ আছে) এরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে।

ইহাদের মধ্যে দুই রকমের কর্ম্মী পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ কর্ম্মীরাই হয়—আকারে বড়, আর কতকগুলি হয় ক্ষুদ্রকায়। ইহাদের মধ্যে সৈনিক বলিয়া আলাদা কোনরকম পিপীলিকা নাই। কর্ম্মীরাই সৈনিকের কাজ করিয়া থাকে। ফাল্গুন চৈত্র মাসে স্ত্রী-পুরুষেরা দলে দলে আকাশে উড়িতে থাকে। সেই সময়ে যৌন-মিলন ঘটে। এই মিলনের পর স্ত্রী পিপীলিকাদের ডানা খসিয়া যায়। কোনক্রমে যদি পূর্ব্ব বাসায় ফিরিয়া আসিতে পারে, তবে সেখানেই ডিম্ব প্রসব করে, নচেৎ অন্য যে কোন স্থলে ডিম পাড়িয়া তাহাদের তত্ত্বাবধান করে। সেখান হইতে ক্রমশঃ নূতন বাসার পত্তন হয়।

আমাদের দেশীয় বনে জঙ্গলে ছোট ছোট গাছপালার উপর গাঢ় খয়েরী রঙের এক জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা দেখিতে কতকটা 'নাল্‌সো' পিঁপড়েরই মত; কিন্তু কতকটা বেঁটে এবং শরীরের পশ্চাদ্ভাগ গোলাকার। ইহাদিগকে মেটে-নাল্‌সো বলে। ইহারা আশশ্যাওড়া, লেবু, ভাঁট প্রভৃতি ছোট ছোট গাছের পাতা যুড়িয়া বাসা নির্ম্মাণ করে। কতকটা নাল্‌সোদের মতই পাতার দুই প্রান্তভাগ একত্র করিয়া বাচ্চার সাহায্যে সুতা বুনিয়া আটকাইয়া দেয়। কিন্তু যোড়া মুখে খালি সূতা গাঁথিয়াই ক্ষান্ত হয় না—যোড়া মুখের আগা-গোড়া ভিজা মাটী বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘাসের কণিকা দ্বারা মুড়িয়া দেয় এবং মাত্র একটী পিপীলিকা বাহির হইতে পারে এরূপ সরু সরু কয়েকটী ছিদ্র রাখে। ইহারা সংখ্যায় খুবই কম। এক একটি বাসার মধ্যে একশ বা দেড়শোর বেশী পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা ডিম পাড়িয়া এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রাখে—অন্যান্য পিপীলিকাদের মত মুখে করিয়া ঘোরা ফেরা করে না। এই পিঁপড়েগুলি অনেকটা নিরীহ প্রকৃতির। প্রায়ই বাসার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং প্রয়োজন না হইলে সহজে কাহাকেও আক্রমণ করে না। কিন্তু বাসার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিলে অথবা শত্রুর আগমন আশঙ্কা করিলে, কয়েকটি মাত্র ডিম ও বাচ্চার পাহারায় থাকিয়া বাকী সকলেই বাসার উপর আসিয়া জমায়েৎ হয় এবং শরীরের পশ্চাদ্দেশ বাসার উপর ঠুকিয়া খট্ খট্ আওয়াজ করিতে থাকে। বেশ দূর হইতেই এই অদ্ভুত আওয়াজ শ্রুতিগোচর হয়। শত্রুকে সামনে দেখিতে পাইলে আওয়াজ বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ যেন আসন-পিঁড়ি করিয়া বসিয়া যায়। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! মানুষ যেমন খাড়া ভাবে বসে, দেখিতে কতকটা সেইরূপ, শরীরের পশ্চাদ্ভাগ ঘুরাইয়া সম্মুখের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয় এবং মাথা পর্য্যন্ত বাকী অংশ খাড়া করিয়া রাখে—মনে হয় যেন, একটা পুঁটুলী কোলে করিয়া বসিয়া আছে। উগ্র প্রকৃতির না হইলেও ইহাদিগকে এ অবস্থায় দেখিলে সকলেরই মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়। কয়েক বছর পূর্ব্বে ধাপার মাঠে এই জাতীয় পিপীলিকা সর্ব্ব প্রথম আমার নজরে পড়ে। জঙ্গলের মধ্যে কীট-পতঙ্গ ধরিতে ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ পাশ দিয়া একটা সাপ ছুটিয়া গিয়া নালার মধ্যে পড়িল। বোধ হয় জঙ্গলের মধ্যে নড়া চড়া করার ফলেই সাপটা ভয়ে ছুটিয়া পালাইয়াছিল। আমিও ভয় পাইয়া সরিয়া যাইতেই টাল সামলাইতে না পাড়িয়া একটা ভাঁটের ঝোপের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেলাম। একটা ভাঁট গাছের পাতা মুড়িয়া এই জাতীয় মেটে-নাল্‌সোরা বাসা বাঁধিয়াছিল। পাতাগুলির আন্দোলনের ফলে পিঁপড়েরা শত্রুর আগমন আশঙ্কা করিয়া সকলেই বাসার উপরে জমায়েৎ হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার অদ্ভুত খট্ খট্ আওয়াজ করিতেছিল। উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই সে শব্দ আমার কাণে গেল। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না, কিসের এমন অদ্ভুত শব্দ, হঠাৎ বাসাটার উপর নজর পড়তেই দেখি—অদ্ভুত দৃশ্য। পিঁপড়েরা যে এমন ভাবে পুঁটুলী কোলে করিয়া খাড়া হইয়া বসে—এরূপ ব্যাপার তো আর কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই। এর পরে ইহাদের সম্বন্ধে আরও অনেক বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুবিধা হইয়াছিল।

অনেকদিন আগের কথা। একদিন পূজা করিতে

বসিয়াছি। পূজার আয়োজন অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল বলিয়া নৈবেদ্যের চাল ও অন্যান্য উপকরণ শুকাইয়া গিয়াছিল। নজরে পড়িল, দুইটী বিভিন্ন গর্ত্ত হইতে কাল ক্ষুদে-পিঁপড়ের দুটী সার চলিয়াছে। অসংখ্য কাল কাল পিঁপড়েরা দুই তিনটীতে একত্র হইয়া এক একটি চাঁউলের কণিকা উঁচু করিয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। অজস্র খাদ্যসামগ্রী পাইয়া তাদের যে কি আনন্দ, কি উৎসাহ দেখা যাইতেছিল, চক্ষে না দেখিলে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মনে তখন একটা কুবুদ্ধির উদয় হইল। একজনকে একটা লম্বা চুল আনিতে বলিলাম। প্রায় হাত খানেক লম্বা একটা চুলের দুই প্রান্ত প্রদীপের তেলে ডুবাইয়া, পিঁপড়েদের লাইন দুইটা যেখানে খুব কাছাকাছি হইয়াছে, সেখানে চুলগাছির দুই প্রান্ত দুইটা লাইনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দেখিতে লাগিলাম—কি ব্যাপার ঘটে। পিঁপড়েরা প্রথমে গ্রাহ্যই করিল না; তাহারা চাউল, চিনি লইয়াই ব্যস্ত। প্রায় দশ পনর মিনিট এই ভাবে অতিবাহিত হইবার পর দেখি—একটা লাইনের গুটি কয়েক পিঁপড়ে চুলটাকে কামড়াইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু চুলের প্রান্তভাগের তেল মাটিতে লাগিয়া যেন কতকটা আঠার মত অবস্থা হইয়াছে। কিছুতেই তাহারা চুলটাকে সরাইতে পারিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকটা পিঁপড়ে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল এবং চুলের প্রান্তভাগ কামড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতে লাগিল। এইরূপ টানাটানির ফলে চুলের অপর প্রান্ত যখন লাইন হইতে একটু একটু করিয়া সরিতেছিল, তখন অপর দলের পিঁপড়েরাও জীবন্ত একটা কিছু মনে করিয়াই হউক বা হাতের কাছে পতিত একটা খাদ্যবস্তু অপসারিত হইতেছে দেখিয়াই হউক, চুলের সেই প্রান্ত কামড়াইয়া ধরিল। অপর দলের অনেকগুলি পিঁপড়ে একসঙ্গে টানিতেছিল, কিন্তু এদের মাত্র দুই চারিটি ছাড়া আর কেহ তখনও মনোযোগ দেয় নাই। কাজেই পূর্ব্বের দল চুলটাকে খানিকটা দূরে লইয়া যাইতেই অপর দলের আরও কতকগুলি পিঁপড়ে আসিয়া যোগ দিল। তখন চলিল সমানে সমানে "টাগ-অব-ওয়ার"। একবার এ-দল খানিকটা টানিয়া লইয়া যায়, আবার অপর দল তাহাদের অপেক্ষা বেশী লইয়া আসে। এরূপ টানাটানি প্রায় সাত মিনিট যাবৎ চলিতেছিল। কোন দলের পিঁপড়েরাই বুঝিতে পারে নাই যে, ব্যাপারটা কি। তাহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিল, কেঁচো বা ওই জাতীয় কোন লম্বা শীকার লইয়া যাইবার সময় কোন কিছুতে আটকাইয়া গেলে যে অবস্থা হয়, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে, কাজেই তাহারা প্রাণপণে টানিতেছিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া অবশেষে একদলের কতকগুলি পিপীলিকা লাইন ছাড়িয়া অনুসন্ধানে বাহির হইল—চুলটা কোথায় আটকাইয়াছে। কিছুক্ষণ খানিকদূর পর্য্যন্ত ঘোরাফেরা করিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাহারা আবার লাইনের মধ্যে ফিরিয়া আসিল। এদিকে অপর দলের পিপীলিকারা অসুবিধা দেখিয়া চুলটিকে ঘুরাইয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় লাইন ছাড়িয়া সামনের দিকে চুলের প্রান্তভাগ কামড়াইয়া ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে প্রথম দল হইতে আবার কয়েকটি পিপীলিকা লাইন ছাড়িয়া অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছে। উভয় দলের মধ্যস্থলে হঠাৎ দুই দলে দেখা হইয়া গেল। দেখা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ লড়াই বাধিয়া গেল। একে অন্যকে কামড়াইয়া ধরিয়া কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলের মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কেহ কাহাকেও ছাড়ে না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত লাইনের মধ্যে যুদ্ধের বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল। তখন লাইন ছাড়িয়া এলোমেলোভাবে এখানে সেখানে পরস্পর কামড়াকামড়ি চলিতে লাগিল। সে একটা ভীষণ অরাজক কাণ্ড। এতক্ষণ সুশৃঙ্খলার সহিত নিরিবিলি লাইন চলিতেছিল—মুহূর্ত্তেই সব বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। পিঁপড়েগুলি ঘরময় ছড়াইয়া পড়িল, কিন্তু এই অবস্থা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। কিছুক্ষণ বাদেই মধ্যস্থলে খানিকটা স্থান ব্যতীত আর সবদিকেই লাইন ঠিক হইয়া গেল। এবার দেখা গেল, উভয় পক্ষেই সারি বাঁধিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছে। এই সৈন্যদের চেহারা অদ্ভুত। আকারে এক-একটা চার-পাঁচটা ডেয়ো-পিঁপড়ের মত। ইহারা আসিয়াই যাহাকে পাইল, তাহাকে কামড়াইয়া ছিন্ন-ভিন্ন

করিয়া ফেলিতে লাগিল। দশ পনের মিনিটের মধ্যে উভয় পক্ষের প্রায় দুইশতাধিক পিপীলিকা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন দিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দেখিলাম, একদল যেন ভয়ানক ভয় পাইয়া গিয়াছে। তাহারা কতকগুলি মৃতদেহ মুখে করিয়া গর্ত্তের দিকেই ছুটিয়া যাইতেছে। গর্ত্ত হইতে অবশ্য তখনও কেহ কেহ বাহির হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই কম। বোঝা গেল, তাহারাই যুদ্ধে হারিয়াছে। আরও প্রায় মিনিট দশেক সময়ের মধ্যে পরাজিত দল একে-একে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়া গেল। চুলটা এতক্ষণ এক স্থানে এলোমেলোভাবে পড়িয়া ছিল। বিজেতৃদলের লাইনে এবার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পিঁপড়েকে আনাগোনা করিতে দেখিলাম। এই দলের প্রায় শতাধিক পিপীলিকা চুলটাকে শূন্যে তুলিয়া গর্ত্তের দিকে লইয়া চলিল। কি যে উল্লাস তাহাদের! চলন-ভঙ্গী হইতে ইহা পরিষ্কার বোঝা যাইতেছিল। আরও দেখিলাম, লাইনের মধ্যে মাঝে-মাঝে দুই একটা সৈনিক পিপীলিকা চলিয়া বেড়াইতেছে, আর তাহাদের প্রত্যেকের পিঠের উপর চার-পাঁচটা কর্ম্মী পিপীলিকা একসঙ্গে সওয়ার হইয়া যেন হাতীতে চড়িবার সখ মিটাইতেছে।

এদেশীয় লালরঙের ক্ষুদে-পিপীলিকাদের বুদ্ধিবৃত্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। ইহাদিগকে ঘরে-বাহিরে, মাঠে-ঘাটে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের দংশন অত্যন্ত যন্ত্রাণদায়ক এবং ইহারা গৃহস্থের খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া যথেষ্ট উপদ্রব করিয়া থাকে। যদি কোন খাদ্যদ্রব্য জলের মধ্যে রাখিয়া উপরে ঢাকা দিয়া দেওয়া হয়, তবে ইহারা ঢাকনা বাহিয়া উপরে ওঠে ও সেখান হইতে ঝুপ ঝুপ করিয়া নীচে পড়িয়া সমস্ত জিনিষ খাইয়া উজাড় করিয়া দেয়।

আঠার শিশির মধ্যে একবার কোন গতিতে একটা আরশুলা ঢুকিয়া মরিয়া পড়িয়া ছিল। আঠাসমেত আরশুলাটাকে আঙ্গিনার পাশে ফেলিয়া দিয়াছিলাম। ঘণ্টখানেক বাদেই দেখি, অসংখ্য লাল ক্ষুদে-পিঁপড়ে আরশুলাটার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তরল আঠা ডিঙ্গাইয়া মৃতদেহের কাছে যাইতে পারিতেছে না। তখন বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি নাই। প্রায় পনর-বিশ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, পিঁপড়েরা আরশুলার দেহ উদরসাৎ করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে। আঙ্গিনার চতুর্দ্দিকে খুব সূক্ষ্ম কাঁকর বিছানো ছিল। তাহারা মুখে করিয়া এক একটি করিয়া কাঁকর আনিয়া আঠার উপর দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করিতেছে। প্রায় বার তের মিনিটের মধ্যেই দিব্য একটা কাঁকরের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়া গেল। তখন দলে দলে পিঁপড়েরা সেই কাঁকরের উপর দিয়া হাঁটিয়া গিয়া আরশুলার দেহ কুরিয়া কুরিয়া খাইতে লাগিল। খুব জোর বৃষ্টি হইলে মাঠে-ঘাটে এমন কি উঠান-আঙ্গিনায়ও প্রচুর পরিমাণে জল জমিয়া যায়। তখন মাটীর নীচে গর্ত্তের মধ্যে যে সকল পোকা-মাকড় বাস করে, তাহাদের আর দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। অনেকেই এইরূপ দৈবদুর্ব্বিপাকে প্রাণ হারাইয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লাল ক্ষুদে পিপীলিকা-রাও গর্ত্তে বাস করে। এইভাবে জল জমিলে তাহারা আশ্চর্য্য উপায়ে প্রাণ রক্ষা করিয়া থাকে। শতশত পিপীলিকা একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া ডেলা পাকাইয়া যায়, আর তাহার ফলে জলে ডুবিয়া যায় না। জলের উপরে ডেলার মত হইয়া ভাসিতে থাকে। জলের আলোড়নে বড় বড় ডেলাগুলি ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট ডেলায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। জল নামিয়া গেলেই সকলে ঘোরাঘুরি করিয়া ক্রমে ক্রমে একসঙ্গে মিলিত হয় এবং নূতন বাসার পত্তন করে।

সময়ে সময়ে ক্ষুদে-পিঁপড়েরা বড় বড় কাল ডেয়ো-পিঁপড়ের সঙ্গেও লড়াই জুড়িয়া দেয়। ডেয়োরা ইহাদিগকে খুবই ভয় করিয়া চলে। পারতপক্ষে ইহাদের কাছে ঘেঁসে না। সময় সময় দেখিতে পাওয়া যায়, কাল মোটা ডেয়োরা ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে আনমনে হঠাৎ কোন ক্ষুদে-পিঁপড়ের লাইনের মধ্যে আসিয়া পড়িলেই তাহারা দলবদ্ধভাবে তাহাকে আক্রমণ করে। শুঁড় ও পায়ে যে যেখানে পারে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে। তখন ডেয়োও তাহার সাঁড়াশীর মত দাঁত দিয়া একসঙ্গে দুই চারটাকে ধরিয়া ধরিয়া কাটিয়া ফেলিতে থাকে, কিন্তু দংশনের যন্ত্রণায়

অস্থির হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই রণে ভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। প্রায়ই দেখা যায়, দুই একটা ডেয়োর পায়ে ক্ষুদে-পিঁপড়ের মৃতদেহ কামড় দিয়া ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ডেয়ো পিঁপড়েরা রস খাইবার জন্য দুই জাতীয় পোকা পুষিয়া থাকে। এক জাতীয় পোকা খুব সাদা ও আঁশের মত গাছের গায়ে লাগিয়া থাকে। আর এক জাতীয় পোকা দেখিতে কাল ও মাথার কাছে তিনটি করিয়া শিং থাকে। যে সকল গাছে এই পোকা জন্মে, সে সকল গাছে ক্ষুদে-পিঁপড়েরাও আনাগোনা করিয়া থাকে। আর ডেয়োরা তো সেই পোকাগুলির কাছে কাছেই থাকে। কাজেই মাঝে মাঝে এ সব স্থলে উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়।

সুড়সুড়ে পিঁপড়ে নামে এক রকম ছোট ছোট কাল রঙের পিপীলিকাকে আমাদের দেশে যেখানে সেখানে অনবরত ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটী করিতে দেখা যায়। ইহারা কাহাকেও কামড়ায় না, কিন্তু মিষ্টি দ্রব্যাদি খাইয়া যথেষ্ট উৎপাত করিয়া থাকে। ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি বা সহানুভূতির অন্ততঃ একটী ঘটনা যাহা দেখিয়াছি, অন্যান্য পিপীলিকাদের মধ্যে সেরূপ ঘটনা নজরে পড়ে নাই। মেজের উপর খানিকটা জল পড়িয়া ছিল। আশে পাশে কতগুলি সুড়সুড়ে পিঁপড়ে ব্যস্ত ভাবে ছুটাছুটি করিয়া বোধ হয় খাদ্যান্বেষণ করিতেছিল। হঠাৎ অসাবধানে কেমন করিয়া যেন একটা পিঁপড়ে জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। প্রায় মিনিট দুই তিন প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কিছুতেই সে জল হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেছিল না—জলের ধারে আটকাইয়া গিয়াছিল। আর একটা পিঁপড়ে সে স্থান দিয়া ছুটিয়া যাইবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাড়াইল এবং শুঁড় দিয়া দুই চারবার পরীক্ষা করিয়া জলমগ্ন পিপীলিকাটীকে পায়ে কামড়াইয়া জল হইতে টানিয়া খানিকটা দুরে রাখিয়া দিয়া আপন কাজে চলিয়া গেল। জলমগ্ন পিপীলিকাটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্জীব ভাবে পড়িয়া থাকিয়া অবশেষে শুঁড় ও হাত পা চাটিতে চাটিতে চাঙ্গা হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশেষে ছুটিয়া পালাইল।

একদিন সকাল বেলায় মেঝেতে বসিয়া পড়িতেছি। প্রায় চার পাঁচ হাত তফাতে দেখিলাম—একদল সুড়সুড়ে পিঁপড়ে খুব ত্রস্তভাবে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে, প্রায় প্রত্যেকের মুখেই এক একটি সাদা ডিম বা বাচ্চা। বুঝিতে পারিলাম, তাহারা ডিম ও বাচ্চাগুলিকে স্থানান্তরিত করিতেছে। ব্যস্ততার কারণ এই যে, কয়েক জাতীয় পিপীলিকা ইহাদের ভয়ানক শত্রু। তাহারা ইহাদের ডিমের সন্ধান পাইলে তৎক্ষণাৎ লড়াই বাধাইয়া ডিম ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করে। অনেকক্ষণ ধরিয়া বোধ হয়, তাহারা এই ভাবে ডিম ও বাচ্চাগুলিকে অন্য বাসায় লইয়া যাইতেছিল। আমি যখন ইহাদিগকে দেখিতে পাইলাম, তাহার প্রায় মিনিট দশেক পরে হঠাৎ দেখি, দেয়ালের কোন একটা গর্ত্ত হইতে একটা 'কড়িয়া জাঙ্গাল' বাহির হইয়া মেঝের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। অতি উগ্র প্রকৃতির কাল রঙের এক জাতীয় বিষাক্ত পিপীলিকার সারকে 'কড়িয়া জাঙ্গাল' বলে। পিপড়েগুলি খুব ছোটও নয়, আবার খুব বড়ও নয়, মাঝামাঝি আকৃতির। একদলে ৫০।৬০ টার বেশী পিঁপড়ে দেখা যায় না। একটার পিছনে আর একটা, এইরূপ সার বাঁধিয়া ঠিক সাপের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে। ইহাদিগকে কদাচিৎ বাহিরে দেখা যায়। ইহারা পিঁপড়েদের মধ্যে লুণ্ঠনকারী ডাকাতের দলের মত। চলিবার মুখে যে কীট-পতঙ্গ পড়ে, তাহাকেই ইহারা সাবাড় করিয়া দিয়া যায়। যাহা হউক, 'কড়িয়া জাঙ্গাল'টি চলিতে চলিতে বোধ হয় কোন রকমে সুড়সুড়ে পিঁপড়েদের ডিমের গন্ধ পাইয়াছিল। সুড়সুড়ে পিঁপড়েদের লাইনের দিকে অগ্রসর হইয়া প্রায় হাতখানেক ব্যবধান থাকিতেই ইহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া তাহাদিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিল। তাহারা এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের অতর্কিত আক্রমণে এমনই ভীতবিহ্বল এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, সে দৃশ্য দেখিলে প্রত্যেকেরই মনে সহানুভূতির উদ্রেক হইত। আমার মনে সহানুভূতির উদ্রেক হইলেও অবস্থাটা শেষ পর্য্যন্ত কি দাঁড়ায় ইহা দেখিবার কৌতূহল প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছিল। কাজেই সুড়সুড়েদের সাহায্যার্থ কিছুই না করিয়া চুপ করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দুই তিন মিনিটের মধ্যেই দেখিলাম—শত শত সুড়সুড়ে

পিপীলিকা ধনুকের মত বক্র হইয়া মরিয়া রহিয়াছে। বাকীগুলা ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় যে লুকাইয়াছে, তার সন্ধান করিতে পারিলাম না। 'কড়িয়া জাঙ্গালে'র প্রত্যেকটি পিপীলিকার মুখে দুই বা ততোধিক ডিম রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। তাহাদের কতকগুলি তখনও পলাতকদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। প্রায় আট দশ মিনিট পরে আততায়ীরা আসিয়া একসঙ্গে মিলিত হইল এবং পূর্ব্বের মত সারবন্দী ভাবে যেন 'মার্চ্চ' করিয়া এক দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। তখনও সুড়সুড়েদের দেখা নাই। ভাবিলাম ইহার গর্ত্তে গিয়া লুকাইয়াছে। কাছেই একখানা খাতা পড়িয়া ছিল। খাতাখানা তুলিতেই দেখি, অদ্ভুত কাণ্ড। সকলগুলি সুড়সুড়ে পিঁপড়ে তাহাদের ডিম ও বাচ্চা লইয়া খাতাখানার তলায় লুকাইয়া রহিয়াছে। ডিমগুলি মধ্যস্থলে স্তূপাকার করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে পিঁপড়েরা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। খাতাখানা তুলিয়া আনা সত্ত্বেও ভয়ে একটি পিপীলিকাও সেখান হইতে নড়িতে চাহিতেছিল না। একটু নাড়াচাড়া দিতেই ডিম মুখে করিয়া তাহারা অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিল।

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় বিষ-পিঁপড়ে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের দেহের রং ধূসর বা ফিকে কাল। তাহাতে ব্রোঞ্জের মত আভা আছে। আকারে ইহারা লাল-পিঁপড়ে অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড় হইয়া থাকে। ইহাদের শরীরের পশ্চাদ্ভাগে মৌমাছির মত হুল আছে। এই হুল ফুটাইয়া ইহারা শত্রুকে ঘায়েল করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী কর্ম্মী ছাড়া অন্য কোন রকমের পিপীলিকা নাই। এক এক দলে প্রায়ই ৮০।৯০টির বেশী পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্যান্য পিঁপড়ের মত ইহারা সার বাঁধিয়া চলা ফেরা করে না। প্রত্যেকে একা একা আহারসংগ্রহে বহির্গত হয়। ইহাদিগকে কাঠজিয়া বলে। উটপাখীরা শত্রু কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া যেমন বালির ভিতর মাথা গুজিয়া চুপ করিয়া থাকে, কাঠ-জিয়ারা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কতকটা সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। তাড়া পাইলেই নিমেষের মধ্যে ছুটিয়া কোন কিছু একটা আবরণের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। হয় ত বা মাথাটিই মাত্র প্রবেশ করাইয়া দিল, শরীরের বাকী অংশ বাহিরেই রহিয়া গেল। তাহার ধারণা, সে যেমন কিছুই দেখিতে পাইতেছে না, শত্রুরাও সেরূপ তাহাকে দেখিতে পাইবে না। আবরণটি আস্তে আস্তে সরাইয়া লইলেও ঠিক তাহার পূর্ব্বের ধারণানুযায়ী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ইহাদের বাচ্চারা মুখ হইতে সূতা বাহির করিয়া নিজের শরীরের চতুর্দ্দিকে একটা আবরণ তৈয়ারী করে, তাহার ভিতর তাহারা পুত্তলীতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশেষে কর্ম্মীরা গুটি কাটিয়া পরিণত বাচ্চাকে বাহির হইতে সাহায্য করে।

আমাদের দেশে, জিঁয়া, কাঠ-পিঁপড়ে, বামাইঝালী উঁইরাজ প্রভৃতি সাধারণের পরিচিত আরও যে কত রকমের পিপীলিকা আছে তার ইয়ত্তা নাই। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তাহাদের বিষয় আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

১। লাল-পিঁপড়ের স্বাভাবিক বাসা। ২। ডেয়ো-পিঁপড়ে। ৩। কাঠ-পিঁপড়ের ঘর। ৪। (ডাহিনে) লাল-পিঁপড়ে শত্রুর হস্ত হইতে বাচ্চা ও ডিম-রক্ষার

৺কপালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

—শ্রীসতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত ৮ই চৈত্র (ইংরাজী ২২শে মার্চ্চ) ভবানীপুরে ৯৭ বৎসর বয়সে কপালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের দেহান্ত হইয়াছে। বাংলার ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে হুগলী জেলার বলাগড় গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৬৭ খৃঃ অব্দে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তখনকার দিনে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিস্তার পাঞ্জাব প্রদেশ পর্য্যন্ত ছিল। তিনি ও স্বর্গীয় রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম এম. এ.। বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা ঈশানী দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। এম. এ., বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে ওকালতী ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী রাজা স্যর দিনকর রাও এর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্য্য গ্রহণ করেন। পরে তিনি এই চাকুরী ছাড়িয়া বাংলা দেশে আসিয়া মুন্সেফী চাকুরী গ্রহণ করেন।
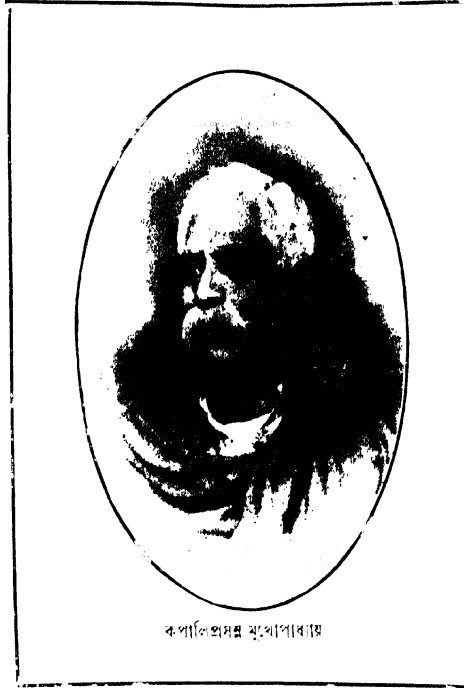
কপালিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনে তাঁহার পার্থিব ঐশ্বর্য্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্যও ছিল না। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া মানসিক উৎকর্ষ সাধনই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। সুদীর্ঘ অবসরপ্রাপ্ত জীবনে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রালোচনা এই ছিল কর্ম্ম। ক্রিশ্চিয়ান মিশনারী সোসাইটির গীতার বিরুদ্ধালোচনার উত্তরস্বরূপ তিনি ১৯০০ সালে Young men's Gita নামে এক গীতার ইংরাজী অনুবাদ করেন ও ভূমিকায় ঐ আলোচনার সম্যক্ উত্তর দেন। কাশীপ্রবাস কালে তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচনা হইত। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা ও হৃদয়ের ঔদার্য্যে অনেকেই বিস্মিত হইতেন।

বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার উপযুক্ত তিন পুত্র, ৬ই কন্যা এবং সহধর্ম্মিণীর মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার মত সুদীর্ঘ, উন্নতদেহ, কান্তিবিশিষ্ট পুরুষ আজকাল কদাচিৎ চোখে পড়ে। তাঁহার চরিত্র ছিল অনুপম। জীবনের মূল মন্ত্র তাঁহার ছিল 'ভূমৈব সুখম্'। তিনি ছিলেন বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণদের সাধক। স্নিগ্ধ হাস্য প্রকাশ ছিল সদাই তাঁহার মুখে। সর্ব্বদিকে, সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বাবস্থায় কল্যাণ ও মঙ্গল, এই ছিল তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। তিনি পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু অভিমানী ছিলেন না, জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তার্কিক ছিলেন না, মনে-প্রাণে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু অন্ধ সঙ্কীর্ণতা তাঁহার কিছুই ছিল না। মন তাঁহার বিচরণ করিত ক্ষুদ্র সাংসারিক ঝঞ্ঝা, রোগ, শোক, দুঃখের বহু উপরে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-কন্যা এবং সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুতেও তিনি অবিচলিত ছিলেন।

শতাব্দী পূর্ণ হওয়ার তিন বৎসর পূর্ব্বে এই অপূর্ব্ব সুন্দর জীবনের অবসান ঘটিল, যে জীবন ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উচ্চ-শিক্ষার অদ্ভুত সমন্বয় এবং যাহা বহু অন্বেষণেও বোধ হয় আর মিলিবে না।

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

কার্ত্তিক—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৪র্থ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা এবং তাহা রক্ষা ও লাভ করিবার উপায়

জুডেটেন প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ানগণ জার্ম্মানগণের সহিত যে সন্ধি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা লইয়া সারা জগৎময় একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিলে এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত সংবাদ সংগ্রহ করা যাইবে। আসন্ন যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় কেহ কেহ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া শান্তিবোধ করিতেছেন এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের মধ্যস্থতায় উহা সংঘটিত হওয়ায় তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। কেহ বা, জুডেটেন প্রদেশের বিনিময়ে ঐ সন্ধি সংস্থাপিত হওয়ায় অত্যাচারীর অত্যাচার-প্রবৃত্তির ইন্ধন যোগান হইয়াছে এবং ইংলণ্ড চুক্তিভঙ্গ করিয়াছেন ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে নিন্দা করিতেছেন।

জার্ম্মানী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সন্ধিব্যাপারে মিঃ নেভিল চেম্বারলেন যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা প্রশংসার যোগ্য অথবা নিন্দনীয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

একটি প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি স্থাপন করায় মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের কার্য্য প্রশংসনীয় হইয়াছে অথবা নিন্দনীয় হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইলে, বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য যে যে উপায় অবলম্বিত হয়, অথবা প্রস্তাবিত হয়, তাহা প্রশংসনীয় কি না, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বাগ্রে কৃতনিশ্চয় হইতে হইবে।

এই খানে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান যুগে যাহাকে স্বাধীনতা বলা হইয়া থাকে, তাহা প্রধানতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা। মানুষ খাইতে পাক্ আর নাই পাক্, খাদ্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহের জন্য মানুষের নফরগিরী করিতে হউক আর নাই হউক, দেশের গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিচালিত হইলেই ঐ দেশকে বর্ত্তমান ধুরন্ধরগণ স্বাধীন বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহাঁরা

মুখে বলেন বটে যে, স্বাধীন হইতে হইলে যেরূপ দেশের গভর্ণমেণ্ট দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন, সেইরূপ আবার গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যেকটি দেশীয় লোকের হিতার্থে হওয়া আবশ্যক, কিন্তু কার্য্যতঃ আজকাল এমন একটি গভর্ণমেণ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহার কার্য্য পরোক্ষ ভাবেই হউক অথবা প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, জনসাধারণের অহিত সাধন করিতেছে না। ইহারই জন্য জগতের প্রত্যেক দেশে গভর্ণমেণ্টের বিরোধী দলের লোকের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদিগের মতে এতাদৃশ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করা চলে না। আমরা যে অবস্থাটিকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া মনে করি, সেই অবস্থায় ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক মানুষের স্বাবলম্বনে কাহারও কোনরূপ বেতনভোগী চাকুরী অথবা নকরগিরি (অর্থাৎ জজীয়তী হউক আর মেথরগিরি হউক) না করিয়া আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের প্রাচুর্য্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। যে স্বাধীনতায় জাতিগত ভাবে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের জন্য অপর দেশের রপ্তানীর উপর নির্ভরশীল হইতে হয় এবং ব্যক্তিগত ভাবে কখনও বা জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ম্যানেজার প্রভৃতি নাম লইয়া আর কখনও বা কেরাণী, কুলি ও বেয়ারা প্রভৃতি নাম লইয়া মাসিক অথবা সাপ্তাহিক বেতনের উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা উপরিতন কর্ম্মচারীর আদেশের আশঙ্কে আতঙ্কিত থাকিতে হয়, সেই স্বাধীনতা আমরা অলীক বলিয়া মনে করি। দেশের গভর্ণমেণ্ট যেই পরিচালিত করুক না কেন, দেশের লোকের শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে নিজের দেশে উৎপন্ন হইলে ও নিজের দেশে শিক্ষা লাভ করিয়া কাহারও আদেশের প্রত্যাশী না হইয়া সম্পূর্ণ স্বাবলম্বনে উপার্জ্জন করিতে পারিলেই মানুষ প্রকৃতভাবে স্বাধীন হয়, ইহাই আমাদিগের মত। অবশ্য এ কথা প্রাকৃতিক সত্য যে, যে-দেশ এতাদৃশ ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিতে অথবা রক্ষা করিতে সক্ষম হয়, সেই দেশের গভর্ণমেণ্টও প্রায়শঃ দেশীয় লোকের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে।

মানবজাতির প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এক্ষণে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে মানুষ স্বাধীনতা বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকে, মানব-সমাজ চিরদিন তাহাকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া মনে করিত না। পরন্তু, আমরা যে অবস্থাটীকে প্রকৃত স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করিতেছি, উহাই একদিন সমগ্র মানব-সমাজের আরাধ্য হইয়াছিল।

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও দেখা যাইবে যে, যেদিন হইতে প্রকৃত স্বাধীনতার স্থলে একমাত্র রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, স্বাধীনতা বলিয়া স্থান পাইয়াছে, সেই দিন হইতে পাশবিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র শস্ত্রের উৎকর্ষের উপর মানুষের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সময় হইতে মানুষের মনে হইয়াছে যে, শরীরের ও অস্ত্র শস্ত্রের বলে বলীয়ান্ হইতে না পারিলে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষা করা অথবা লাভ করা সম্ভব হয় না; এবং তদবধি উহাই স্বাধীনতা রক্ষা করিবার প্রধান উপায় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপে, শারীরিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ-সাধন স্বাধীনতা রক্ষা ও লাভ করিবার প্রধান উপায় বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার দ্বারা মানুষ কার্য্যতঃ কোনরূপে লাভবান্ হইতে পারে নাই। ঐ উৎকর্ষের দ্বারা জগতের শক্তিসমূহের মধ্যে একটা প্রধান শক্তি বলিয়া পরিগণিত হওয়া যায় বটে এবং তাহাতে একটা কাল্পনিক মর্য্যাদাও অনুভব করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু মানুষের অনাহারের ও অস্বাভাবের কষ্ট, অস্বাস্থ্য, অশান্তি এবং অকালমৃত্যু বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার কারণ, শারীরিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষের অনিবার্য্য পরিণতি হয় যুদ্ধে এবং তাহাতে বিজিত পক্ষেরও যেরূপ লোকক্ষয় ও অর্থনাশ হইয়া থাকে, বিজয়ী পক্ষেরও তদপেক্ষা কোনক্রমে অল্পতর অনিষ্ট সহ্য করিতে হয় না। গত এক শতাব্দীর মধ্যে মানব-সমাজে যে সমস্ত মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার ফলাফল বিচার করিলে আমাদিগের উপরোক্ত উক্তির সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে। কাজেই, স্বাধীনতা রক্ষার অথবা লাভ করার এই যে প্রধান উপায়, তাহাকে কোনক্রমেই প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না।

শারীরিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষসাধনের দ্বারা যে প্রকৃত পক্ষে লাভবান্ হওয়া যায় না, তাহা সত্য হইলেও সমগ্র মানব-সমাজ এখনও উহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারই জন্য এখনও ঐ পন্থাকেই মানুষ বীরত্বের প্রধান পন্থা বলিয়া সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকে। এই পন্থা যে সম্পূর্ণ নিষ্ফল এবং সর্ব্বতোভাবে অনিষ্টপ্রদ, তাহা মানুষ সম্যক্ ভাবে বুঝিতে না পারিলেও, প্রকৃতিবশে এক শ্রেণীর মানুষ বাস্তব যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা অথবা লাভ করার প্রতি পরোক্ষভাবে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িয়াছে, ইহারই ফলে শান্তি-বৈঠক প্রভৃতির অভিনয় চলিতেছে এবং মানুষের মধ্যে বুদ্ধি উঠিয়াছে যে, অস্ত্র শস্ত্রের বলে বলীয়ান্ হওয়ার প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু তাহা যুদ্ধের জন্য নহে, সবল যাহাতে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার না করিতে পারে এবং সবল যাহাতে সর্ব্বদা জব্দ থাকে, তজ্জন্য কতকগুলি জাতির ঐ অস্ত্র শস্ত্রে উৎকর্ষ সাধন করা এবং প্রয়োজন হইলে অত্যাচারী সবল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রয়োজনীয়, ইহা এই সম্প্রদায়ের অভিমত। ইংলণ্ডের চার্চ্চিল প্রভৃতি এই মতের অনুবর্ত্তী।

আমাদের মতে এই পন্থাও যুক্তিসঙ্গত নহে। শারীরিক বল ও আগ্নেয় অস্ত্র-শস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া অল্পবুদ্ধি হিংস্র জন্তুগণকে অথবা তদনুরূপ বর্ব্বর মানুষগুলিকে আতঙ্কিত করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু যাঁহারা সমানভাবে এই বলের উৎকর্ষ সাধন করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদিগকে আতঙ্কিত করা সম্ভব হয় না, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। উহার দ্বারা যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা সবল তাঁহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করা সম্ভব হয় না। সবলকে ভীতি প্রদর্শন করিতে গেলে তাহার ফলে দুইপক্ষের ঠোকাঠুকী অথবা যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

কাযেই স্বাধীনতা লাভ করিবার [দ্বিত]ীয় পন্থাও প্রথম পন্থার মতই নিন্দনীয়।

তৃতীয় আর একটি পন্থা "হরিজন" মারফৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পন্থাটী মহামান্য গান্ধীজীর মস্তিষ্কপ্রসূত। এই পন্থাটীর নাম "অহিংস যুদ্ধ" (non-violent warfare)। এই পন্থানুসারে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে আঘাত করিবে ও হত্যা করিবে, আর অন্য পক্ষ কোনরূপ প্রতিঘাত করিতে পারিবে না, অথচ আত্মসমর্পণও করিতে পারিবে না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতি মানুষের চর্ম্মের সহিত তাহার মস্তিষ্ক, ললাট, দন্ত, হস্ত এবং পদের এমনই সম্বন্ধ রচনা করিয়াছেন যে, চর্ম্মের কোন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মস্তিষ্ক, অথবা ললাট অথবা দন্ত, অথবা হস্ত, অথবা পদ বাধা প্রদান করিতে ও প্রতিঘাত করিতে প্রবৃত্ত হয়। মস্তিষ্ক, ললাট, দন্ত, হস্ত ও পদ দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ করিতে না পারিলে অথবা অস্বাভাবিক ভাবে উহা নিষ্ক্রিয় করিতে না পারিলে কাহারও পক্ষে চড়টী খাইয়া পাটকেলটী মারিবার প্রবৃত্তি হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া সম্ভব হয় না। কাযেই উপরোক্ত অহিংস-যুদ্ধের পরিকল্পনা কতকটা সোনার পাথরের বাটী, অথবা শীতল আগুনের মত অলীক। অভিমানের মত্ততায় এতাদৃশ খেয়াল মানুষের মস্তিষ্কে ও জিহ্বায় স্থান পাইতে পারে বটে এবং অস্বাভাবিক জীবন-যাপনের ফলে ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাহারও পক্ষে নিজেকে এইরূপ অস্বাভাবিক রকমের নিষ্ক্রিয় করিয়া তুলিতে পারা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু একটা জাতির অধিকাংশ লোকের পক্ষে এইরূপ অস্বাভাবিক ভাবাপন্ন হওয়া কখনও সম্ভব হইতে পারে না। যদি তর্কের খাতিরে উহার সম্ভব যোগ্যতা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেও এই পন্থার দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই হউক আর প্রকৃত স্বাধীনতাই হউক, উহার কোনটী কথঞ্চিৎ পরিমাণেও লাভ করা সম্ভব হয় না।

এক পক্ষ আর এক পক্ষকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, প্রতিপক্ষ যদি নিশ্চল হইয়া তাহা সহ্য করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যার সহায়তা করা হয় বটে এবং অত্যাচারী পক্ষ যাহাতে প্রতিপক্ষকে কচুকাটা করিতে পারে, তাহারও সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় বটে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার, অথবা রক্ষা করিবার রাস্তায় এক পদও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় না। তাহা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে মানুষ আত্মহত্যা করিয়াই জীবনের আকাঙ্ক্ষিত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিত।

আমাদের মতে, এতাদৃশ অহিংস যুদ্ধ কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে এবং জাতিগতভাবে কার্য্যতঃ উহার কোন চিহ্ন কখনও দেখা যাইবে না, কারণ মনুষ্য-শরীরের স্বভাবানুসারে উহা কখনও সম্ভবযোগ্য হয় না।

কাযেই, স্বাধীনতা রক্ষা, অথবা লাভ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত পন্থা প্রচলিত রহিয়াছে, অথবা তজ্জন্য যে সমস্ত নূতন পন্থার পরিকল্পনা চলিতেছে, তাহার কোনটিকেই সর্ব্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না।

অথচ, এমন কথাও বলা চলে না যে, অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। মানুষের ত্বকের সহিত তাহার মস্তিষ্ক, ললাট, দন্ত, হস্ত এবং পদের কি সম্বন্ধ, তাহার আলোচনা করিতে পারিলে যখন দেখা যায় যে, শরীরের কোন অংশ আঘাত প্রাপ্ত হইলে মানুষ কি করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, অথবা আঘাতকারীকে কিরূপভাবে প্রতিনিবৃত্ত করিবে, তাহার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি ভগবান্ বিধান করিয়াছেন, তখন কাহারও কোন অনিষ্ট না করিয়া অত্যাচারীর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় মানুষকে ভগবান্ প্রদান করেন নাই, ইহা মনে করা চলে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, স্বাধীনতা রক্ষা, অথবা লাভ করিবার জন্য বর্ত্তমান যুগে যে সমস্ত পন্থা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার কোনটিই যদি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে কোন্ উপায়ে কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট সাধন না করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা, অথবা লাভ করা সম্ভব-যোগ্য হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার, অথবা স্বাধীনতা রক্ষা করিবার, অথবা উহা লাভ করিবার উপায় দুইটি। একটির নাম শিক্ষা এবং অপরটির নাম আত্মসমর্পণ।

অত্যাচার ও স্বাধীনতা-অপহরণ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাকৃতিক সত্য বিদ্যমান আছে। ঐ প্রাকৃতিক সত্যগুলি শিক্ষার দ্বারা অত্যাচারীকে অত্যাচার হইতে, অথবা স্বাধীনতা-অপহরণকারীকে তাহার কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার পন্থা।

অত্যাচারের দ্বারা কখনও কখনও সাময়িকভাবে কাহারও কাহারও শরীরের উপর প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কাহারও মনের উপর কোনরূপ প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। সাময়িকভাবে শরীরের উপর যে প্রভুত্ব লাভ করা সম্ভব হয়, অত্যাচারের দ্বারা তাহা কখনও স্থায়ী করা সম্ভব হয় না—এবংবিধ সত্যসমূহই অত্যাচারের ফলাফল সম্বন্ধে প্রাকৃতিক সত্য।

অত্যাচারিগণ যাহাতে ঐ সত্যসমূহ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারেন, তদনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে অত্যাচারের প্রবৃত্তিসমূহ সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হয়। এতাদৃশ শিক্ষার দ্বারা অত্যাচারের প্রবৃত্তি সমূলে উৎপাটন করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ শিক্ষার ব্যবস্থা সকল সময়ে সকলের দ্বারা সম্ভবযোগ্য নহে। কারণ, মহামানুষ ব্যতীত আর কেহ উহার বিধান করিতে সক্ষম হন না এবং মহামানুষ সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষেত্রে আবির্ভূত হন না।

অত্যাচারীকে তাহার অত্যাচার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার দ্বিতীয় পন্থা আত্মসমর্পণ। সাধারণতঃ প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয়সমূহের বিবিধ আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুলাভের আশায় অত্যাচারিগণ তাঁহাদিগের অত্যাচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া যাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করা হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে মনুষ্যোচিত একতাবন্ধন নষ্ট না হইলে কাহারও পক্ষে অত্যাচার করা সম্ভব হয় না।

যে প্রভুত্ব ও ধনাদি আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তুসমূহের লাভের আশায় অত্যাচারের কার্য্য আরম্ভ হয়, অত্যাচারিগণ যদি সেই প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া বিনা বাধায় তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব অত্যাচারিগণের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আর অত্যাচারের কোন কারণ বিদ্যমান থাকে না এবং তখন অত্যাচারী ও অত্যাচারিত-গণের মধ্যে অনায়াসেই সন্ধি স্থাপিত হইয়া যায়। যথা-সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া দিয়া যদি জনসাধারণ তাঁহাদিগের প্রভুগণের

প্রয়োজনীয়, কেবলমাত্র তাহার যাজ্ঞা করেন, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, অত্যাচারী প্রভুগণ কখনও জনসাধারণের ঐ যাজ্ঞা পূরণ করিতে সক্ষম হইবেন না, কারণ অত্যাচারের ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির প্রবৃত্তির ফলে তাঁহাদিগের মস্তিষ্কের সামর্থ্য অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যে ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রত্যেকের অত্যাবশ্যক দ্রব্যসমূহের সংস্থান হইতে পারে, তাহা উদ্ভাবনা-শক্তির দ্বারা স্থির করা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় প্রভুগণ জনসাধারণের নিতান্ত আবশ্যক দ্রব্যের যাজ্ঞা পূরণ করিতে সক্ষম হন না বটে, কিন্তু নানা কৌশলে জনসাধারণকে প্রতারিত করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার ফলে, জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় একতা স্থাপিত হয়, কারণ জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রভুগণের নিকট যে দাবী উত্থাপিত হয়, তাহা উঁহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়। এইরূপভাবে জনসাধারণের মধ্যে পুনরায় অকৃত্রিম একতা স্থাপিত হইলে তাহারা অত্যন্ত শক্তিমান্ হইয়া পড়ে এবং তখন আর কোন প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয়-বিলাসী মানুষের পক্ষে জনসাধারণের উপর ঐ প্রভুত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এমন কি, তাঁহাদিগের উহার সাহস পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়; এবং ক্রমে ক্রমে অভিমান-শূন্য প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয়-সমূহের ভোগে ত্যাগশীল নেতাসমূহের উদ্ভব হইতে থাকে এবং তখন অনায়াসে জনসাধারণের পক্ষে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হয়। ইহারই নাম আত্মসমর্পণের দ্বারা প্রকৃত স্বাধীনতালাভ। এই পন্থায়, যাঁহারা প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির লোভ-বিলাসী, তাঁহাদিগকে পদে পদে মানসিক অসুবিধা সহ্য করিতে হয় বটে, কিন্তু কোন পক্ষেরই কোনরূপ দৈহিক ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং কোন পক্ষেরই কোন জীবননাশও ঘটে না।

প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আত্ম-সমর্পণের দ্বারা উপরোক্তভাবে স্বাধীনতা লাভ করিবার যে পন্থা বিবৃত হইল, তাহা কাল্পনিক নহে। মানুষ বর্ত্তমান কালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, তাহা অভিনব নহে। প্রত্যেক বার-হয়। জীবনরক্ষার জন্য যাহা যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির অভাব জনসাধারণের প্রায় প্রত্যেকের মধ্যে দেখা দেয় এবং তাহারা প্রথমতঃ অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ঐ অভাব নীরবে সহ্য করিতে আরম্ভ করে বটে, কিন্তু ক্রমশঃ উহার মাত্রার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রভুত্ব গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ প্রভুত্বলোভী ও ইন্দ্রিয়-বিলাসী হইয়া থাকেন এবং ঐ লোভ ও বিলাসের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধিহীন হইয়া পড়েন এবং জনসাধারণের অভাব পূরণ করিতে অক্ষম হন। ইহার ফলে প্রথম প্রথম দুই পক্ষের সংঘর্ষ উপস্থিত এবং হত্যা ও প্রবঞ্চনা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। এই সংঘর্ষে কোন পক্ষেরই কোন লাভ হয় না এবং তখন জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে আত্ম-সমর্পণের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় ও সমগ্র জনসাধারণ মিলিত হইয়া প্রভুত্বলোভী ও ইন্দ্রিয়-বিলাসী প্রভুগণের বাসনা চূর্ণ করিয়া ফেলে। ইহার পর সত্যবাদী, প্রভুত্ব ও ইন্দ্রিয়-বিলাসত্যাগী, প্রকৃত সমবেদনাযুক্ত নেতৃগণের উদ্ভব হয় এবং তখন মানুষের মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা দেখা যায়।

দুই পক্ষের সংঘর্ষে যে-কোন পক্ষেরই কোন সুফল লাভ করা সম্ভব হয় না এবং আত্ম-সমর্পণের দ্বারা যে প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিলে চেকোশ্লোভাকিয়া ও জার্ম্মানীর সংঘর্ষ-ব্যাপারে মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের কার্য্যকে কোনরূপেই নিন্দনীয় বলিয়া মনে করা যায় না। অবশ্য, এই সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপার পূর্ব্বাপর চিন্তা করিলে, মিঃ নেভিল চেম্বারলেন যে আমূল বুঝিয়া-সুঝিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহা বলা চলে না। আমাদের মতে, মানবসমাজের পূর্ব্বাপর অবস্থা ও কর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে যে বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা সমগ্র ইংরাজ জাতির মধ্যে অথবা ইংরাজী শিক্ষাভিমানিগণের মধ্যে একজনেরও নাই। কেবলমাত্র সময়ের প্রকৃতির তাড়নায় ইংরাজ জাতি ও তাঁহাদিগের প্রধান প্রতিনিধি গত বিশ বৎসর হইতে এতাদৃশভাবে পরিচালিত হইতে

মানবজাতি বারংবার আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতেছে। এই হিসাবে মিঃ গান্ধীই হউন আর মিঃ চার্চ্চিলই হউন, যাঁহারা মিঃ নেভিল চেম্বারলেনকে নিন্দা করিতেছেন, তাঁহারা অর্থনীতি ও রাষ্ট্র-নীতি-ক্ষেত্রে বালকের মত অবোধ।

উপসংহারে আমরা পাঠকবর্গকে এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি অতিরিক্ত কথা শুনাইতে চাই। আমাদিগের কথাগুলি কাহারও কাহারও কাছে অত্যন্ত তিক্ত হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, কিন্তু তিক্ত হইলেও কর্ত্তব্যের খাতিরে উহা আমরা পাঠকবর্গকে না শুনাইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

বর্ত্তমান সময়ের মূল প্রকৃতির তাড়নায় ইংরাজ জাতি ও তাঁহাদিগের প্রধান প্রতিনিধি গত বিশ বৎসর হইতে অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণুতা লইয়া পরিচালিত হইতে বাধ্য হইতেছেন বটে এবং তাঁহাদিগের কৃত কার্য্যের ফলে সমগ্র মানব-সমাজ বারংবার আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইতেছে বটে এবং হয়ত ভবিষ্যতে আরও কয়েকবার এতাদৃশ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে বটে, কিন্তু একেলা ইংরাজজাতি কখনও সমগ্র মানবসমাজে জনসাধারণকে তাঁহাদিগের আসন্ন অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব ও সন্তুষ্টির অভাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইংরাজজাতি একদিন অত্যন্ত প্রভুত্ব-প্রয়াসী ও ইন্দ্রিয়ের লালসা-বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে এবং এখনও তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ লালসা সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু সময়ের তাড়নায় খাস ইংরাজের মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া অব্যক্ত-ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। মিঃ নেভিল চেম্বারলেনের বর্ত্তমান কার্য্য উহারই অভিব্যক্তি। ইংরাজ জাতির উপরোক্ত প্রতিক্রিয়া যতই তীব্রতার সহিত আরম্ভ হউক না কেন, যে পরিকল্পনার দ্বারা মানব-সমাজের প্রত্যেককে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে মুক্ত করা সম্ভব, সেই পরিকল্পনা কখনও ইংরাজের মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ ঐ পরিকল্পনা আবিষ্কার করিতে হইলে যে শ্রেণীর খাদ্য ও ব্যবহারের দ্বারা দৈনিক জীবন যাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা ইংলণ্ডের মৃত্তিকার জন্য যে বিশেষ উপাদানে চাটিম-কদলীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, ঠিক ঠিক সেই উপাদানে কাঁচা-কদলীর উৎপত্তি হয় না।

মৃত্তিকার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কোন্ কোন্ কারণে ঘটিয়া থাকে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান বিজ্ঞান সমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ পরিকল্পনা একমাত্র ভারতবর্ষ হইতে উদ্ভূত হওয়া সম্ভব। গত এক শত বৎসরে ভারতবর্ষে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ হইতে যাহাতে ঐ কল্পনার উদ্ভব হয় এবং যাহাতে ইংরাজ-সহায়তায় উহা কার্য্যপ্রসূ হয়, তজ্জন্য প্রকৃতিদেবী প্রতি-নিয়ত প্রযত্নশীলা রহিয়াছেন। অথচ ঐ পরিকল্পনা যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে উদ্ভূত এবং কার্য্যপ্রসূ হইতে পারিতেছে না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কারণ তদানীন্তন নেতৃবর্গের বিপথগামিতা। এই এক শত বৎসরের মধ্যে শিক্ষা-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি, সাহিত্য-নীতি, দর্শন-নীতি, ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতি এবং সংবাদ পরিবেশন নীতি প্রভৃতি বিষয়ে যে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে।

মূল প্রকৃতির এতাদৃশ সহায়তা সত্ত্বেও এখনও যে ঐ পরিকল্পনার সর্ব্বাঙ্গীন আবিষ্কার সম্ভবযোগ্য হইতেছে না, এবং ঘরে ঘরে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব যে ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহারও কারণ ভারতবর্ষের শিক্ষা-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি, সাহিত্য-নীতি, দর্শন-নীতি, ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতি এবং সংবাদ-পরিবেশন-নীতির নেতৃত্ব যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদিগের অনাচার, বিপথগামিতা ও মূর্খতা।

অনেকে মনে করেন যে, ভারতবর্ষের উপরোক্ত নীতি-গুলির সমস্তই মূলতঃ ইংরাজের দ্বারা পরিচালিত হই-তেছে; কিন্তু তাহা সত্য নহে। পরোক্ষভাবে মূলতঃ ইংরাজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা ঐ নীতিসমূহ সংগঠিত হইতেছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহার কোনটিরই সংগঠন অথবা পরিচালনা ইংরাজের দ্বারা হইতেছে না। যে

তাহাতে আমূলভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর ইংরাজের প্রভুত্ব বিনষ্ট না হয়, তজ্জন্য ভারতবর্ষে ভেদনীতির প্রবর্ত্তন ইংরাজ জাতি করিয়াছেন বটে এবং ঐ ভেদ-নীতি যাহাতে সর্ব্বদা কার্য্যপ্রবৃত্ত থাকে, তজ্জন্য রস-সিঞ্চনেও ইংরাজ জাতি প্রতিনিয়ত প্রযত্নশীল আছেন বটে, কিন্তু রাজকার্য্য-পরিচালনা-বিষয়ক শিক্ষা-নীতি, অথবা রাষ্ট্র-নীতি, অথবা সাহিত্য-নীতি, অথবা দর্শন নীতি, অথবা ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতি, অথবা সংবাদ-পরিবেশন-নীতির দায়িত্ব অনেক দিন হইতেই ভারতবাসিগণের হস্তে তুলিয়া দিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে উহা সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসিগণের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষা নীতির যিনি প্রধান সংগঠক, তিনি এক্ষণে মৃত। মৃত ব্যক্তির নিন্দনীয় কার্য্য সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত আলোচনা করা সাধারণতঃ আমাদিগের নীতি-বিরুদ্ধ।

বাঙ্গালার ঐ নীতির প্রধান পরিপোষক কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ বাবু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী যে মানুষকে মানুষ না গড়িয়া অমানুষ করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমরা আমাদের পাঠকবর্গকে অনেকবার দেখাইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্য গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা প্রকৃত শিক্ষার ক্ষেত্র নহে এবং কর্ত্তৃপক্ষ শিক্ষার প্রতি যথাযথভাবে অভিনিবিষ্ট না হইয়া উহার প্রতি কার্য্যের দ্বারা কি করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধিকতর অর্থাগম হয় এবং কি করিয়া চাটুকারীর পোষণ-বৃত্তি চরিতার্থ হয়, তদ্বিষয়ে অধিকতর মনোযোগী।

আমাদিগের রাষ্ট্রনীতির বর্ত্তমান প্রধান সংগঠক মিঃ গান্ধী। রাষ্ট্রনীতির প্রধান দায়িত্ব জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীভূত করা। বিস্তৃতভাবে রাষ্ট্রীয় কার্য্য পরিচালনা করিবার জন্য আর যাহা কিছু করা হয়, তাহার সমস্তই জনসাধারণের ঐ তিনটির অভাব দূর করিবার জন্য। তাহা না করিয়া আর যাহাই করা হউক না কেন, তাহাকে জনসাধারণের হিতোদ্দেশ্যে (for the people) গভর্ণমেণ্ট পরিচালনা বলা চলে না। উপরোক্ত রাষ্ট্রীয় নীতির যিনি প্রধান সংগঠক হইবেন, তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রভুত্ব-লোভহীন এবং ইন্দ্রিয়ের লালসা-সংযম-পরায়ণ হইয়া তাঁহার প্রধান প্রধান দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হয়। গান্ধীজীর কার্য্য ও উক্তি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া জনসাধারণের প্রত্যেককে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞান ও বুদ্ধি নাই। আমাদের কথা যাঁহারা অবিবেচনামূলক বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহাদিগকে আমরা সজীব গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করিতে অনুরোধ করি। তখন আমাদিগের মন্তব্য সম্বন্ধে তাঁহারা নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারিবেন এবং গান্ধীজী যে ঐ ঐ বিষয়ে কতখানি প্রতারণা-পরিপূর্ণ, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। রাষ্ট্রনীতি-সংগঠনের দায়িত্ব নির্ব্বাহ করিতে হইলে যে জ্ঞান ও বুদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয়, গান্ধীজী যে শুধু তাহাই বিবর্জ্জিত তাহা নহে, যে যে গুণ থাকিলে হিতকারী রাষ্ট্র-নীতির সংগঠক হওয়া যায়, গান্ধীজীর তাহার একটিও আছে বলিয়া মনে করা যায় না। আমরা আগেই দেখাইয়াছি যে, জনসাধারণের হিতকারী রাষ্ট্রনীতির সংগঠক হইতে হইলে প্রভুত্ব লালসা ও ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির বাসনা সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন করিতে হয়। গান্ধীজী যে তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণেও করিতে সক্ষম হন নাই, তাহা তাঁহার কার্য্য ও উক্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে। তিনি যে ঘোরতর প্রভুত্ব-লালসাযুক্ত, তাহা কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক প্রস্তাবটী, সাধারণ সভার সভাপতির প্রত্যেক অভিভাষণটী লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে। কংগ্রেসের কার্য্য-করী সভার উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবসমূহের খসড়া, অথবা বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণ যে প্রায়শঃ গান্ধীজী মঞ্জুর করিয়া থাকেন এবং তিনি মঞ্জুর না করিলে যে উহা প্রায়শঃ পরিগৃহীত হয় না, উহা সর্ব্বজনবিদিত। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, গান্ধীজী প্রভুত্ব-প্রয়াসী না হইলে এইরূপ হইতে পারিত না এবং প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে উল্লেখযোগ্য

প্রস্তাবসমূহ ও অভিভাষণ প্রদান করিতে সমর্থ হইতেন। গান্ধীজী যে ঘোরতর প্রভুত্ব-প্রয়াসী, তাহা মিঃ নারীমান ও মিঃ খারের সহিত তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছে। সঙ্গীতপ্রিয়তা, নারী ও যুবতী-প্রিয়তা, বিশেষ বিশেষ খাদ্যপ্রিয়তা, বিশেষ বিশেষ ব্যবহারপ্রিয়তা তাঁহার ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির লালসার অন্যতম নিদর্শন। যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযমবিষয়ে প্রযত্নশীল, তাঁহাদিগের কাছে কিছুই প্রিয় অথবা অপ্রিয় থাকে না, কোন বস্তু অথবা ব্যক্তির প্রতি তাঁহাদিগের কোন অনুরাগ অথবা বিদ্বেষ থাকিতে পারে না, ইহা এই সম্বন্ধীয় প্রথম ও প্রধান কথা। গান্ধীজীর আবাসস্থল নামে আশ্রম হইলেও উহা যে প্রায় সর্ব্বদা নারী ও যুবতী-গণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে, এবং কোন কোন নারী ও যুবতী যে তাঁহার প্রিয় এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে তাঁহার অপ্রিয়, তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে। পুরুষ ও যুবকগণের মধ্যে যে ঐরূপ তাঁহার কেহ কেহ প্রিয় ও কেহ কেহ অপ্রিয়, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত।

বাঙ্গালার সাহিত্যনীতি-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান নেতা রবীন্দ্রনাথ। বাঙ্গালার উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকে তাহা স্বীকার না করিলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে উহা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্যনীতির প্রধান দায়িত্ব সৎ-সাহিত্যের রচনা। ইহার অর্থ, যাহাতে বক্তব্য দ্ব্যর্থযুক্ত না হইয়া একার্থযুক্ত ও পরিস্ফুট হয় এবং মানুষ যাহাতে কাম, ক্রোধ ও লোভাদিতে উন্মত্ত না হয়, তাদৃশ ভাবে রচনা করা। কোন রচনা উপরোক্ত ভাবের না হইয়া বিরুদ্ধভাবোদ্দীপক হইলে তাহা মনুষ্য সমাজের অপকারী হইয়া থাকে। কাজেই উহা মনুষ্য-সমাজের বর্জ্জনীয় এবং উহার রচয়িতা দণ্ডার্হ হওয়া প্রয়োজনীয়। এবংবিধ সৎ-সাহিত্য রচনা করিতে হইলে রচয়িতাকে নিভৃতে থাকিয়া রাগ-দ্বেষবিমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে হয় এবং অত্যন্ত পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনাসমূহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটী সৎ-সাহিত্য রচনার মূল সূত্রের বিরোধী এবং তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন রাগ-দ্বেষবিযুক্ত, অথবা অপবিত্রতাহীন বলিয়া আখ্যাত করা যায় না।

ভারতবর্ষের দর্শন-নীতি-ক্ষেত্রের বর্ত্তমান প্রধান অভিনেতা যে কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা বড় দুষ্কর। আমাদের মতে, দর্শনের জন্মস্থান ভারতবর্ষে এখন আর একটিও প্রকৃত দার্শনিক নাই এবং দর্শনের নীতিও নাই। দার্শনিকের নামে দৈনিক সংবাদপত্রে যাঁহাদের গবগবানি ও কচকচানি শুনা যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে স্যর রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

দর্শন-নীতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান দায়িত্ব তিনটি। মনুষ্য প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্ত জীব ও বস্তু দেখা যায়, তাহার মধ্যে এত জটিলতা ও বিভিন্নতা কোথা হইতে এবং কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহার সন্ধান অভ্রান্তভাবে প্রদান করা দর্শন-নীতির প্রথম দায়িত্ব। ঐ ব্যক্ত জীব ও বস্তুর জন্ম ও ব্যক্তের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহার সন্ধান অভ্রান্তভাবে প্রদান করা ঐ নীতির দ্বিতীয় দায়িত্ব। যাহা হইতে ঐ ব্যক্ত ও জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার কার্য্য ও বিকাশ কিরূপে সংঘটিত হয়, তাহার সন্ধান অভ্রান্তভাবে প্রদান করা ঐ নীতির তৃতীয় দায়িত্ব। প্রকৃত ভাবে জনসাধারণের হিত সাধন করিতে হইলে সঠিক দর্শন-নীতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। সঠিক দর্শন-নীতি পরিজ্ঞাত হইতে না পারিলে, শিক্ষা-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি, সাহিত্য-নীতি, ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতি এবং সংবাদ-পরিবেশন-নীতি যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব হয় না। দর্শন-নীতির দ্বারা জীব ও বস্তুর উৎপত্তি ও জটিলতা, অথবা বিকৃতি কিরূপ ভাবে সংঘটিত হয়, তাহা সঠিক ও অভ্রান্ত ভাবে জানা সম্ভব হয়। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, জীব ও বস্তুর উৎপত্তি ও জটিলতা অথবা বিকৃতি কিরূপ ভাবে সংঘটিত হয়, তাহা অভ্রান্তভাবে পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে, কোন্ কোন্ উপায়ে জীবের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব দূরীভূত হইতে পারে, তাহা কখনও সঠিক ভাবে স্থির করা সম্ভবযোগ্য হয় না। এই দর্শন-নীতির উপরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভ্রমহীনতা ও সম্পূর্ণতা নির্ভরশীল। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-গণ এই প্রাথমিক সত্যটুকু পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে

পারেন নাই এবং তাঁহারা যে রাস্তায় চলিয়া আসিতেছেন, তাহাতে উহা কখনও পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। কাযেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনকে যেরূপ প্রকৃত ভাবের দর্শন ও বিজ্ঞান বলা চলে না, সেইরূপ আবার যাঁহারা ঐ দর্শনে বিজ্ঞানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা যতই প্রখ্যাতনামা হউন না কেন, প্রকৃত দর্শন-নীতির আলোচনা-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কোন নাম উল্লেখ-যোগ্য হইতে পারে না। ইহারই জন্য আমরা তাঁহাদিগের কাহারও নাম উল্লেখ করি নাই।

স্যর রাধাকৃষ্ণন্ ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কার্য্য ও রচনা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের কুত্রাপি প্রকৃত দর্শন-নীতির কোন কথা পাওয়া যায় না।

প্রকৃত দার্শনিক হইতে হইলে যে যে গুণ ও কার্য্য-শক্তি অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও উপরোক্ত দুইটি মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। পরন্তু তাহার বিপরীত গুণ ও কার্য্যশক্তিই উহাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়।

প্রকৃত দার্শনিক হইতে হইলে তিনটি গুণ সর্ব্বাগ্রে অর্জ্জন করিতে হয়। প্রথমতঃ যশঃ ও নামের লিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রচারের প্রচেষ্টা হইতে বিরতি, দ্বিতীয়তঃ নিভৃতে প্রাকৃতিক সত্য প্রত্যক্ষ করিবার প্রযত্ন, তৃতীয়তঃ যে অব্যক্ত সত্য প্রত্যক্ষযোগ্য না হয়, তাহা যাহাতে বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণের বিপথ-গামিতার সহায়ক না হয়, তদ্বিষয়ক সজাগতা,—এই তিনটি গুণ প্রকৃত দার্শনিকের অপরিহার্য্য।

রাধাকৃষ্ণন্ ও সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের ঐ তিনটি গুণ থাকা ত' দূরের কথা, তাঁহারা ঠিক উহার বিপরীত ভাবে চলাফেরা করিয়া থাকেন। আত্মপ্রচার প্রায়শঃ তাঁহাদের দৈনিক কার্য্য। প্রাকৃতিক সত্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে নিভৃত বাস একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাতে অভ্যস্ত হওয়া ত' দূরের কথা, সর্ব্বত্র স্বকীয় জয়ঢাক বাজাইয়া ঘোরা-ফেরা করা তাঁহারা অত্যন্ত গৌরবের কার্য্য মনে করিয়া থাকেন। যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহা যাহাতে প্রচারিত হইয়া জনসাধারণের বিপথগামিতার সহায়ক না হইতে পারে, তদ্বিষয়ক সজাগতা অবলম্বন করা ত' দূরের কথা, তাঁহারা নিজেরাই যাহা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে।

ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতিক্ষেত্রেও ভারতবর্ষে কোন উল্লেখ-যোগ্য মানুষের নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জ্জী মহাশয় এই বিষয় লইয়া কতকগুলি কথা-বার্ত্তা কহিয়া থাকেন বটে, কিন্তু আমাদিগের মতে তাঁহার বিদ্যা কলঙ্কময় এবং ব্যক্তিগতভাবে তিনি এইবিষয়ক অধ্যাপনার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতির প্রধান দায়িত্ব দুইটি। একটি, শব্দ-লক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া, আর একটি শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হওয়া। শব্দ-লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে কোন্ পদটি অথবা বাক্যটি প্রকৃতিসঙ্গত, আর কোন্টি প্রকৃতিবিরুদ্ধ, অথবা অভিমানাত্মক, অথবা ম্লেচ্ছ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, যে কোন ভাষার শব্দই হউক না কেন, কোন্ শব্দের কি অর্থ, তাহা আমূলভাবে জানিতে পারা যায়।

ভাষা পরিজ্ঞান-নীতির সহায়তায় ব্যক্তিগতভাবে কোন্ মানুষের পক্ষে কোন্ শিক্ষা-নীতি, অথবা কোন্ রাষ্ট্র-নীতি প্রভৃতি প্রয়োগযোগ্য এবং কোন্ ভাষায় কাহাকে বিভিন্ন নীতিবিষয়ে শিক্ষাদান করা সম্ভব, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। কাযেই জনসাধারণকে তাহাদিগের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে মুক্ত করিতে হইলে ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতিই বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পাশ্চাত্য "ফাইলোলজী" নামে যে "ভাষা-পরিজ্ঞান-বিদ্যা" প্রচলিত আছে, তাহা অদ্যাবধি এতৎসম্বন্ধে উপরোক্ত প্রাথমিক সত্যগুলি পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য ভাষা-পরিজ্ঞান-বিদ্যা উহা পরিজ্ঞাত হউক আর নাই হউক, ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা ঐ বিদ্যার প্রাথমিক সত্যগুলি পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে না পারিয়া নিজদিগকে ঐ বিষয়ে কৃত-

বিজ্ঞ বলিয়া মনে করেন এবং উহার গরিমা জাহির করিতে সঙ্কোচ ও কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক যে অসার বস্তুতে পরিপূর্ণ এবং তাঁহারা যে ভারতবর্ষের কলঙ্ক-স্বরূপ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহারই জন্য আমরা ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জ্জীকে অত্যন্ত বুদ্ধিহীন এবং নিন্দনীয় বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ইহা ছাড়া তাঁহাকে বিদ্যা-বিষয়ে প্রতারকও বলিতে হইবে। যাঁহারা শব্দবিষয়ে সাধনা করিয়া ঋষি-প্রণীত বেদাঙ্গের ব্যাকরণ, শিক্ষা এবং নিরুক্তের প্রথম সোপানেও উপনীত হইতে পারেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, সংস্কৃত ভাষাসম্বন্ধীয় প্রথম কথাই শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তির পরিজ্ঞান। এই শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত না হইতে পারিলে বুঝিতে হইবে যে, সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে কোন বিদ্যাই আদৌ শিক্ষা করা হয় নাই। সংস্কৃত ভাষা সম্বন্ধে এই প্রাথমিক কথাগুলি না জানিয়া তৎসম্বন্ধে কথা কওয়া এতৎসম্বন্ধে প্রতারণার পরিচয়। ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জ্জী যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সংস্কৃত জানেন বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা বিদ্যমান আছে, অথচ তিনি যে শব্দ-লক্ষণ অথবা শব্দ-বৃত্তি জানেন, তাহার কোন পরিচয় কুত্রাপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যিনি বিদ্যাবিষয়ে প্রতারক, তাঁহাকে অধ্যাপনার দায়িত্ব প্রদান করিলে যে, ছাত্রগণও প্রতারক হইয়া উঠে, ইহা বলাই বাহুল্য।

ভাষা-পরিজ্ঞান নীতির সংগঠক হিসাবে তাঁহার ব্যক্তি-গত চরিত্রও নিন্দনীয়। ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতির সাধক হইতে হইলে খাদ্য ও আচার সম্বন্ধে অত্যন্ত সংযমী এবং বিশ্লেষণপটু হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। ডক্টর সুনীতি চ্যাটার্জ্জীর চলাফেরা লক্ষ্য করিলে তিনি যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত পথগামী, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

বাঙ্গালা সংবাদ-পরিবেশন-নীতিক্ষেত্রের প্রধান প্রযোজক "ষ্টেটস্‌ম্যান", "অমৃতবাজার" এবং "আনন্দবাজার" পত্রিকা।

সংবাদ-পরিবেশন-নীতির প্রধান দায়িত্ব দুইটি। প্রথমতঃ, সাধারণ পাঠকগণ যাহাতে প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সংবাদটির অব্যক্ত অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করিতে পারেন, তাহার সহায়তা করা সংবাদ পরিবেশন-নীতির প্রথম দায়িত্ব। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে বিভিন্নবিষয়ক নেতৃবর্গের মধ্যের দ্বন্দ্ব ও কলহ অবসান প্রাপ্ত হয়, তাহার সহায়তা করা ঐ নীতির দ্বিতীয় দায়িত্ব।

বাঙ্গালার তিনটি প্রধান সংবাদপত্রে দিনের পর দিন কি প্রচারিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি দায়িত্ব নির্ব্বাহ করা ত' দূরের কথা, উহারা ঠিক বিপরীত আচরণ করিতেছেন এবং পাঠকবর্গ বিপথে পরিচালিত হইতেছেন।

কোন্ সংবাদ হইতে মানুষের অবস্থা সম্বন্ধে কি বুঝিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ইঁহারা প্রায়শঃ নির্ব্বাক্ থাকেন। কখনও কখনও এই সম্বন্ধে ইঁহারা যাহা প্রচার করেন, তাহা প্রায়শঃ ভ্রমাত্মক। পরবর্ত্তী ঘটনা হইতে তাহার সাক্ষ্য সহজেই সংগৃহীত হইতে পারে।

দ্বিতীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে লক্ষ্য করিলে বলিতে হয় যে, দ্বন্দ্ব-কলহের অবসানের সহায়তা করা তো দূরের কথা, ইহাদের লেখায় প্রায়শঃ প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব-কলহ অধিকতর মাত্রায় তীব্রতা প্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতবাসীকে তাহাদিগের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, প্রথমতঃ শিক্ষা-নীতি, রাষ্ট্র-নীতি, সাহিত্য-নীতি, দর্শন-নীতি, ভাষা-পরিজ্ঞান-নীতি এবং সংবাদ পরিবেশন-নীতি-ক্ষেত্রে যাঁহারা অধিনায়কত্ব করিতেছেন, তাঁহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইবে এবং আত্ম-সমর্পণের দ্বারা তাঁহারা যাহাতে ঐ বিপরীত নীতিসমূহ আর অধিক দিন চালাইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য

গত সংখ্যায় "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি ভাবিবার কথা" শীর্ষক সন্দর্ভে আমরা ভারতবর্ষের ও ভারতবাসীর অতীত চিত্র, বর্ত্তমান চিত্র এবং ভবিষ্যৎ চিত্র দেখাইয়াছি। পাঠকগণকে ঐ তিনটি চিত্র আর একবার অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিবার জন্ম আমরা অনুরোধ করিতেছি, কারণ কোন্ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য, তাহা যথাযথভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে অবস্থাটি পূর্ব্বাপর ভাবে সঠিক রকমে পরিজ্ঞাত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়।

ঐ তিনটি চিত্র যথাযথভাবে মানস নেত্রে জাগ্রত করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক মানুষটি ভারতীয় ঋষিগণের উপদেশগুলি প্রায়শঃ সম্যক্ ভাবে বুঝিতে পারিতেন এবং সশ্রদ্ধভাবে উহা বর্ণে বর্ণে পালন করিতেন। তখন ভারতবাসিগণের মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা বিদ্যমান ছিল না এবং তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিলেন। যখন মানুষ সর্ব্ববিষয়ের সত্যগুলি সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে, তখনই এইরূপ সর্ব্বতোভাবের ঐক্যবন্ধন সম্ভবযোগ্য হয়। সত্য ভুলিয়া গিয়া মানুষ যখন অসত্যকে সত্য বলিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে, অথবা প্রমাণিত করিতে চাহে, তখন মানুষের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে।

ভারতীয় ঋষিগণের মূলগ্রন্থগুলি এখনও যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ক সমস্ত সত্য আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন। সমগ্র জগতের প্রত্যেক শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি কিরূপভাবে হয় এবং ভ্রূণ, অথবা বীজরূপে উৎপত্তির পর প্রত্যেক জীবের গঠনে ও কাযকর্ম্মে জটিলতা কিরূপভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তাহা যেরূপ তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার যে মূল কারণ বশতঃ জীবের উৎপত্তি এবং জীবের শরীর-গঠনে ও কাযকর্ম্মে জটিলতা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই মূল কারণের উদ্ভব, বৃদ্ধি ও সৃষ্টিশক্তির উন্মেষ কি করিয়া হয়, তাহাও তাঁহারা স্থির করিতে পারিয়াছিলেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপরোক্ত দুইটি দিক্‌কে তাঁহারা যথাক্রমে "ঈশ্বররূপ", অথবা "ব্রহ্মরূপ" এবং "মানুষরূপ", অথবা "জগদ্রূপ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ, অথবা দুইটি মীমাংসা, অথবা চারিটি দর্শন যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরোক্ত দুইটি দিক্ সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। যাঁহারা ঐ বেদ অথবা মীমাংসা, অথবা দর্শনে প্রবিষ্ট হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা মহাভারতান্তর্গত "গীতা"র বিশ্বরূপ-দর্শনাধ্যায় উপলব্ধি করিতে পারিলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে উপরোক্ত ভাবের দুইটি দিক্ আছে এবং দুইটি দিকই যে ঋষিগণ সম্যক্‌ভাবে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার আভাস পাইবেন। এইরূপ ভাবে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য তাঁহারা আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই সমাজ-পরিচালনার জন্য যে-সমস্ত বিধি ও নিষেধ সংহিতাকারে তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেকটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে পালন করা এবং তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা অনায়াসসাধ্য হইয়াছিল। তাঁহাদিগের কোন বিধি অথবা নিষেধ আংশিকভাবেও বিপরীত-ফলপ্রদ হইতে পারে নাই। সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় সমস্ত সত্য আমূলভাবে পরিজ্ঞাত না হইয়া কোন বিধি-নিষেধ অথবা আইন প্রণয়ন করিলে মানুষের পক্ষে উহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা সম্ভবযোগ্য হয় না এবং উহা সময় সময় ঈপ্সিত ফল প্রদান করিলেও সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সুফল প্রদান করে না। কি করিয়া সমাজের প্রত্যেক মানুষ আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন ব্যবস্থা সাধন না করিয়া মানুষকে চুরি ও প্রবঞ্চনা হইতে বিরত থাকিবার

উপদেশ প্রদান করিলে, কথঞ্চিৎ পরিমাণে সুফল লাভ করা সম্ভব হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে চুরি ও প্রবঞ্চনার দায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয় না। ঋষিদিগের প্রত্যেক বিধি ও নিষেধটি প্রত্যেক মানুষের পক্ষে সশ্রদ্ধভাবে পালন করা এবং তদ্দ্বারা সুফল লাভ করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছিল বলিয়াই তৎকালে মানুষের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্য সংঘটিত হইতে পারিয়াছিল।

ভারতীয় ঋষিগণের সংগঠনানুসারে সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সত্যোপলব্ধি করা, বিধি ও নিষেধ স্থির করা অথবা আইন-প্রণয়ন করা, শিক্ষার প্রণালী ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করা এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য অর্জ্জন করিবার প্রণালী ও ব্যবহার-পরিকল্পনা স্থির করার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণের।

ব্রাহ্মণগণ যে সমস্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতেন, তৎসম্বন্ধে শ্রমজীবিগণ যাহাতে শিক্ষিত হন এবং উহা পালন করিতে যাহাতে তাঁহাদের কোন ক্লেশ অথবা অসুবিধা না হয়, তদনুরূপ কার্য্য করিবার দায়িত্ব ছিল বৈশ্যগণের।

উপরোক্ত বিধি ও নিষেধ এবং ব্যবস্থা পাকা করিতে যাঁহারা তাচ্ছিল্য করিতেন, অথবা তাচ্ছিল্য করিবার সহায়তা করিতেন, তাঁহারা যাহাতে দণ্ড প্রাপ্ত হন, তাহার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়গণের।

যে সমস্ত ব্যবস্থায়, অথবা প্রণালীতে সমাজের প্রত্যেকের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব ছিল শূদ্র অথবা শ্রমজীবি-গণের।

যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় ত আমাদিগের উপরোক্ত কথায় আপত্তি উত্থাপিত করিবেন। কিন্তু, শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি, পরোক্ষ-বৃত্তি এবং অতিপরোক্ষ-বৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া বাক্যের অর্থগ্রহণ করিবার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, আমরা মনু-সংহিতার কথাই বলিতেছি এবং যাঁহারা ঐ বিষয় অপর কোন অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা উহার মর্ম্ম যথাযথ ভাবে উদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই।

এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি শ্রেণীর মানুষ উপরোক্ত চারি শ্রেণীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিতেন এবং তখন প্রত্যেক মানুষটী প্রয়োজনানুরূপ অর্থ, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টি উপার্জ্জন করিতে পারিত।

তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি শ্রেণীর মানুষকে বিষয়বিশেষে পরস্পরের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত বটে, কিন্তু কোন শ্রেণীর মানুষই অপর কোন শ্রেণীর মানুষকে নীচ বলিয়া অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। বৈজ্ঞানিক সত্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মণ আবিষ্কর্ত্তা ও প্রণেতা ছিলেন বলিয়া অন্যান্য শ্রেণীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ পরিবারকেও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য শূদ্রের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হইত। ব্রাহ্মণ যেমন অপর তিন শ্রেণীর প্রয়োজনীয় ছিলেন, সেইরূপ অপর তিন শ্রেণীও ব্রাহ্মণের প্রয়োজনীয় ছিলেন।

ঋষিগণের সংগঠনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেও দেখা যাইবে যে, তখনকার দিনে বংশপরম্পরায় কেহ ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য, অথবা শূদ্র হইতে পারিত না।

ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে, ব্রাহ্মণ হওয়া যাইত, অথবা ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ক্ষত্রিয় হওয়া যাইত, অথবা বৈশ্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই বৈশ্য হওয়া যাইত, অথবা শূদ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিলেই শূদ্র হইতে বাধ্য হইতে হইত, তাহা নহে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, অথবা শূদ্র হইতে হইলে প্রত্যেক শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-ক্ষমতা ও গুণ অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। উহা অর্জ্জন করিতে না পারিলে, অথবা উহা অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা না থাকিলে, ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানকে ক্ষত্রিয়, অথবা বৈশ্য, অথবা শূদ্রের দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। আবার শূদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য-শক্তি ও গুণ অর্জ্জন

করিতে পারিলে অথবা উহা অর্জ্জন করিবার সম্ভাবনা দেখা গেলে, শূদ্রের সন্তান ব্রাহ্মণের দারিত্বভার গ্রহণ করিতে পারিত।

আর্থিক অভাব দূর করিবার জন্য তখন প্রধানতঃ পাঁচটি উপায় পরিগৃহীত হইত। ঐ পাঁচটি উপায়ের নাম—(১) কৃষি, (২) শিল্প, (৩) বাণিজ্য, (৪) চাকুরী, এবং (৫) প্রতিগ্রহ।

জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে এবং কৃষক যাহাতে কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান্ হইয়া দৈনন্দিন জীবনে কোনরূপ আর্থিক ক্লেশ ভোগ না করে, তাহা ছিল কৃষি-ব্যবসায়ের প্রধান দায়িত্ব। কি কি করিলে জমির উৎপাদিকাশক্তি অটুট থাকিতে পারে, তাহার বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিবার দায়িত্ব ছিল ব্রাহ্মণগণের। জমির উৎপাদিকাশক্তির অটুটতা রক্ষাবিষয়ে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ আবিষ্কার করিতেন, তদনুসারে যাহাতে কার্য্য হয় এবং তাহা পরিদর্শন করিবার এবং ঐ সমস্ত কার্য্যের মধ্যে যাহা যাহা দৈহিক শ্রম-সাধ্য তাহা শ্রমজীবিগণকে শিখাইবার ও তদনুসারে কার্য্য করাইবার দায়িত্ব ছিল বৈশ্যগণের। ব্রাহ্মণগণের আবিষ্কৃত কৃষি-বিষয়ক বিজ্ঞান ও নির্দ্দেশ যাঁহারা প্রতিপালন না করেন, তাঁহারা যাহাতে দণ্ডপ্রাপ্ত হন, তাহার দায়িত্ব ছিল ক্ষত্রিয়গণের। কায়িক শ্রমসাধ্য যে যে কার্য্য কৃষিবিষয়ে করিবার প্রয়োজন হয়, তাহার দায়িত্ব ছিল শূদ্র অথবা শ্রমজীবিগণের। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি শ্রেণীর মানুষ মিলিত হইয়া, কৃষক যাহাতে কৃষিকার্য্যের দ্বারা লাভবান্ হইয়া দৈনন্দিন জীবনে কোনরূপ আর্থিক ক্লেশ ভোগ না করে, তাহার ব্যবস্থা সম্পাদন করিতেন। কৃষকগণকেও শূদ্রই বলা হইত। জমীদার ও জোতদারগণ বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। যাঁহারা আজকাল ভদ্র কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বৈশ্য শ্রেণীর অন্তর্গত এবং প্রধানতঃ জমিদার ও জোতদার। কৃষি-ব্যবসায়ী সমগ্র শূদ্র ও বৈশ্যগণ একমাত্র কৃষিকার্য্যের দ্বারাই দৈনন্দিন আর্থিক প্রয়োজন সাধন করিয়া বার মাসে তের পার্ব্বণে যোগদান করিতে পারিতেন।

জমির উৎপাদিকাশক্তি যাহাতে অটুট থাকে, তৎসম্বন্ধীয় তাৎকালিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিগণের মতানুসারে উহার একমাত্র উপায় নদী ও খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে বারমাস বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, মনুসংহিতার কথানুসারে বৈশ্যগণের প্রধান কার্য্য তিনটি, যথা, (১) কৃষি, (২) পশুরক্ষা, (৩) বাণিজ্য। আজকালকার সংস্কৃত-পাঠকগণ প্রায়শঃ মনে করেন যে, 'পশুরক্ষা' এই শব্দটির অর্থ পশুকে রক্ষা করা। কিন্তু, তাহা ঠিক নহে। শব্দের অতি-পরোক্ষ-বৃত্তি (অর্থাৎ মর্ম্মার্থানুসারে) 'পশু' শব্দের অর্থ জন্তু হয় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ-বৃত্তি (অর্থাৎ অক্ষরগত অর্থানুসারে) 'পশু' শব্দের অর্থ 'জন্তু' হয় না। শব্দ-স্ফোট পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি অনুসারে উহার অর্থ হয় 'মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতার ব্যবস্থা'। বাক্য, অথবা পদের অর্থ স্থির করিতে হইলে কোথায় শব্দের প্রত্যক্ষ-বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইবে, আর কোথায়ই বা উহার পরোক্ষ-বৃত্তি, অথবা অতি-পরোক্ষ বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইবে, তাহারও নির্দ্দেশ ঋষিগণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বেদাঙ্গান্তর্গত 'নিরুক্তে'র উপোদ্ঘাতাধ্যায়ের সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ঐ নির্দ্দেশ সঠিক ও সবিস্তৃত ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বেদাঙ্গান্তর্গত 'নিরুক্তে'র উপোদ্ঘাতাধ্যায়ের সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অতীব উচ্চ-সাধনাসাধ্য। শব্দের ব্রহ্মত্ব কোথায় তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে ঐ সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবযোগ্য নহে। পরবর্ত্তী ভট্ট ও আচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণের অনেকেই ঐ সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া এবং শব্দের ব্রহ্মত্ব কোথায়, তাহা উপলব্ধি না করিয়া ঋষিপ্রণীত নিরুক্তের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং হৃদয়-বিদারক

ভাবে মানুষের বিপথ-গামিতার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ঐ উচ্চ সাধনায় পরাঙ্মুখ, তাঁহাদিগের পক্ষে নিরুক্তের উপরোক্ত সূত্রগুলি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা অসাধ্য হইলেও,নন্দিকেশ্বরের লিঙ্গধারণ-চন্দ্রিকায় প্রবিষ্ট হইতে পারিলে কোন্ পদে ও বাক্যে শব্দের প্রত্যক্ষবৃত্তি গ্রহণ করিয়া পদ ও বাক্যের অর্থোদ্ধার করিতে হইবে, তাহা সংক্ষেপতঃ মোটামুটি-ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। 'জ্যোতিলিঙ্গানুসন্ধানরূপ অন্তর্লিঙ্গধারণপ্রতিপাদনং' আর 'ঈষ্টলিঙ্গরূপ বাহ্যলিঙ্গ-ধারণপ্রতিপাদনং', এই দুইটি সূত্রে ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। ঐ দুইটি সূত্র বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মনুসংহিতায় যে প্রসঙ্গে 'পশু-রক্ষা' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে শব্দের 'পরোক্ষ-বৃত্তি' অথবা 'অতি-পরোক্ষ-বৃত্তি' গ্রহণ করিলে বাক্যার্থ নিয়ম-বিরুদ্ধভাবে গৃহীত হয় এবং উহা দুষ্ট হইয়া পড়ে। ঐ প্রসঙ্গের অর্থ গ্রহণ করিবার একমাত্র উপায় শব্দের প্রত্যক্ষ বৃত্তি গ্রহণ করা। শব্দের এই বৃত্তিত্রয় এবং তাহার কোন্‌টি কোথায় প্রযোজ্য,তাহা না জানার ফলে শুধু যে মনুসংহিতার ঐ স্থানটিই দুষ্টার্থে ব্যাখ্যাত হইতেছে, তাহা নহে, সমগ্র মনুসংহিতাটি এবং ঋষি-প্রণীত প্রত্যেক গ্রন্থখানি বিরুদ্ধার্থে প্রচারিত হইতেছে এবং মানুষ উহা পড়িয়াও ঋষি-প্রণীত বিজ্ঞান ও ব্যবস্থা যথাযথভাবে জানিতে পারিতেছে না। পরন্তু, সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথাকে ঋষির কথা বলিয়া মনে করিতেছে। এই বিপদ্ হইতে মানব-সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে বর্ত্তমান সংস্কৃতাধ্যাপকগণ তাঁহাদের অধ্যাপনা এবং প্রচার হইতে অনতিবিলম্বে প্রতিনিবৃত্ত হন এবং তাঁহারা যাহাতে সম্মানিত পদ হইতে বিতাড়িত হন, তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়।

মনুসংহিতা যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে যেরূপ দেখা যায় যে, মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতার ব্যবস্থা রক্ষা করিবার দায়িত্ব বৈশ্যগণের, সেইরূপ আবার কোন্ উপায়ে মৃত্তিকার জ্যোতি ও সরসতা ব্যবস্থিত হইতে পারে, তাহার বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে হইলে অথর্ব্ব-বেদ পড়িবার প্রয়োজন হয়। এই বিজ্ঞান বাইবেল এবং কোরাণেও লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। ঋষি-প্রণীত এই বিজ্ঞান পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি অটুট রাখিবার একমাত্র উপায়—নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা ছাড়া এতদ্বিষয়ে আর যে-সমস্ত পরিকল্পনা মানুষের মনে উদিত হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটি বিচার করিয়া ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, উহার কোনটি হইতেই সর্ব্বাঙ্গীন সুফলোদয় হওয়া সম্ভব নহে। ঋষিগণের এই বিচারগুলি অনুধাবন করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে ইয়োরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং ক্যানাডা প্রভৃতি দেশে জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে উপায় গৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি স্বভাব-বিরুদ্ধ এবং উহার ফলে জমি হইতে ঐ ঐ দেশে যে-সমস্ত ফসল উৎপন্ন হয়, তাহার প্রত্যেকটি মানুষের আহার ও ব্যবহার কার্য্যে অস্বাস্থ্য-কর। সাদা ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বর্ত্তমান বিজ্ঞানানুসারে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে, তাহার ফলে যে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তাহা আহার অথবা ব্যবহার করিলে মানুষ আস্তে আস্তে বিষক্রিয়া-সংযুক্ত হইয়া পড়ে। প্রধানতঃ ইহারই জন্য সর্ব্বদেশে সারা মানব-সমাজের মধ্যে ক্ষয়-রোগ এতাদৃশ পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস মৃত্তিকার সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে পারিলে শুধু যে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং কৃষি-ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব দূরীভূত হয়, তাহা নহে। উহার দ্বারা দেশের জল ও বায়ু অধিকতর স্নিগ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং সর্ব্বসাধারণের স্বাস্থ্যও অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করে। এইরূপে, ঐ একই কার্য্যের দ্বারা সমাজের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত করিবার সহায়তা ঘটে।

জমির উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে যে শুধু কৃষি-ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্র জনসাধারণের অর্থাভাব দূর হয়, তাহা নহে, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মানুষের ব্যবসাও অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য হয়।

আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ প্রায়শঃ কেন লোকসানগ্রস্ত হইয়া থাকেন, তাহার অনুসন্ধান করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা সহজেই বুঝা যাইবে। ঐ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে,আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের লোকসান-গ্রস্ততার প্রধান কারণ দুইটি—যথা, (১) ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির অভাব, এবং (২) সর্ব্বত্র শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী। ক্রেতাগণের ক্রয়শক্তির অভাববশতঃ বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, সেইরূপ আবার চাহিদার অল্পতা বশতঃ বিক্রয়-মূল্যের হারও শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ উত্তরোত্তর কমাইতে বাধ্য হইতেছেন। অন্যদিকে, সর্ব্বত্র শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী উত্থাপিত হওয়ায়, দ্রব্য-উৎপাদনের খরচার হার বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপে, একদিকে খরচের হারের বৃদ্ধি, অন্যদিকে বিক্রয়-মূল্যের হারের অল্পতা বশতঃ শিল্প ও বাণিজ্যে লাভের হার ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

ক্রেতাগণের ক্রয়-শক্তির অভাব কেন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের মোট লোকসংখ্যার শতকরা প্রায় নব্বই জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভরশীল। জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইলে, কৃষকগণের পক্ষে অল্পায়াসে প্রচুর শস্যোৎপাদন করা সম্ভব হয় এবং তখন তাহাদিগের উপার্জ্জন বৃদ্ধি পায় ও দারিদ্র্য অনেকাংশে ঘুচিয়া যায়। অন্যদিকে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইলে, কৃষি-কার্য্য অপেক্ষাকৃত অধিকতর আয়াস ও খরচাসাধ্য হইয়া পড়ে এবং তখন অত্যধিক পরিশ্রম করিয়াও প্রচুর পরিমাণে শস্যোৎপাদন করা অসম্ভব হয়। সুতরাং কৃষিজীবিগণের উপার্জ্জন কমিতে আরম্ভ করে এবং তাহাদিগের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বর্ত্তমান সময়ে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে বলিয়াই ভারতবাসী কৃষিজীবিগণের অর্থাভাবও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে এবং তাহাদের ক্রয়-শক্তিও উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতেছে।

শ্রমজীবিগণের অসন্তুষ্টি ও তাহাদের মজুরী-বৃদ্ধির দাবী কেন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রধান কারণ দুইটি, যথা—(১) তাহাদের অসুস্থতার বৃদ্ধি, এবং (২) অসুস্থতার চিকিৎসা এবং আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের মূল্যের হারের বৃদ্ধি বশতঃ খরচার বৃদ্ধি। অসুস্থতার বৃদ্ধির জন্য তাহারা নিজের ও পরিবারের শরীর লইয়া প্রায়শঃ অসন্তুষ্ট থাকে। তাহার পর আবার ঐ অসুস্থতার জন্য প্রয়োজনানুরূপ শ্রম করিতে অক্ষম হয় এবং ইহার ফলে উপার্জ্জনের হার কমিয়া যায়। ইহা ছাড়া অসুস্থতার চিকিৎসা, আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অপেক্ষাকৃত অধিকতর মূল্য বশতঃ তাহাদের খরচার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বাধ্য হইয়া অধিকতর হারে মজুরীর দাবী উত্থাপন করে। তাহাদের অসুস্থতার বৃদ্ধি কেন হইতেছে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, দেশমধ্যস্থিত নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে বার মাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা থাকিলে জল-বায়ু স্নিগ্ধ হয় এবং প্রাকৃতিক কারণেই রোগের বীজাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহাতে জনসাধারণের অস্বাস্থ্যের সম্ভাবনা কমিয়া যায়। তাহার পর আবার যদি জীবিকার্জ্জনের এমন ব্যবস্থা থাকে যে, উন্মুক্ত বায়ুতে অনায়াসসাধ্য কার্য্য করিয়া শ্রমজীবিগণের পক্ষে উহা অর্জ্জন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রায়শঃ অসুস্থ হইতে হয় না। অন্যদিকে নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়গুলি বছরের অধিকাংশ সময়ে শুষ্ক থাকিলে, দেশের জল-বায়ু অধিকতর উত্তপ্ত হইয়া পড়ে এবং উহা সর্ব্বত্রই রোগের বীজাণুপরিপূর্ণ হয়। তাহার পর আবার যদি জীবিকার্জ্জনের জন্য তাহাদিগকে অনবরত বদ্ধ স্থানে

অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রুগ্নতা অনিবার্য্য হয়।

প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের অভ্যুদয়-কালে ভারতবর্ষের প্রত্যেক নদী ও খাল বার মাস জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা কৃষিকার্য্য করিত, তাহারাই জমির অত্যধিক উর্ব্বরাশক্তি বশতঃ পাঁচ মাসের পরিশ্রমে অনায়াসে বার মাসের খোরাক সংগ্রহ করিতে পারিত বলিয়া, বাকী সাত মাস নানাবিধ কুটীর-শিল্পে মনোযোগী হইতে পারিত। কুটীর-শিল্পে কখনও বদ্ধ স্থানে বাস করিয়া অত্যধিক শ্রমসাধ্য কার্য্য করিবার প্রয়োজন হয় না। এইরূপে, তখনকার দিনে শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্যে কাহারও প্রায়শঃ অসুস্থ হইতে হইত না।

আর অধুনা, একে ত' নদী ও খাল প্রভৃতি জলাশয়-সমূহ বৎসরের অধিকাংশ সময়ই শুষ্ক থাকে, তাহার পর আবার যন্ত্র-শিল্পের সংগঠনানুসারে শ্রমজীবিগণকে দিন-ভাগের অধিকাংশ সময়ই বদ্ধ স্থানে অবস্থান করিতে হয় এবং প্রতিনিয়ত যন্ত্রসমূহের কর্কশ ধ্বনির মধ্যে অতীব কষ্ট-সাধ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিতে হয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, নদী ও খাল প্রভৃতির শুষ্কতাবশতঃ এক দিকে দেশের জল-হাওয়া রোগের বীজাণু-পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং অন্য দিকে জমির অনুর্ব্বরতা বশতঃ কৃষিকার্য্য কষ্ট-সাধ্য ও লোকসান-জনক হওয়ায় মানুষকে বাধ্য হইয়া কুটীর-শিল্প পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্র-শিল্প গ্রহণ করিতে হইতেছে ও তাহাদের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের মূল্য কেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-কার্য্য অনায়াস-সাধ্য হইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্যের হ্রাস হওয়া অনিবার্য্য হয়। অন্য দিকে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অত্যধিক শ্রম-সাধ্য হইলে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইতে থাকিলে আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস প্রকৃতভাবে অনুসন্ধান করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, ঋষিদিগের অভ্যুদয়-কাল হইতে ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অনায়াসসাধ্য ছিল এবং তখন উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও এখনকার তুলনায় বহুগুণে বেশী ছিল। ফলে কয়েকশত বৎসর আগেও নামমাত্র মূল্যে প্রত্যেক দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয় সাধিত হইত। আর অধুনা কৃষি, কুটীরশিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য অত্যধিক শ্রমসাধ্য হইয়াছে এবং প্রত্যেক মানুষের উৎপন্ন দ্রব্যের হারও কমিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষি, কুটীরশিল্প ও বাণিজ্যের কার্য্য যে অত্যধিক শ্রমসাধ্য হইয়াছে, তাহার কারণ যে জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির হ্রাস তাহাও আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

সুতরাং যুক্তি অনুসরণ করিলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, জমির উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ী মানুষের ব্যবসাও অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য হয়।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যে যে কথা বলা হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, নদী, খাল প্রভৃতি জলাশয়ে যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বারমাস জল থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলেই, জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং তখন যেরূপ কৃষি আয়াসসাধ্য হয় সেইরূপ কুটীরশিল্প এবং বাণিজ্যও অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া দেশের জল-বায়ু স্নিগ্ধ হয় ও বাতাস হইতে রোগের বীজাণুর বিলুপ্তি ঘটে। এইরূপে নদী, খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত বার মাস জল থাকে, একমাত্র তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে, একদিকে যেরূপ জনসাধারণের অস্বাস্থ্য প্রায়শঃ বিদূরিত হইতে পারে, সেইরূপ আবার

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণের আর্থিক প্রাচুর্য্য সম্পূর্ণভাবে সংঘটিত হইতে পারে।

ভারতীয় ঋষিগণ ঐ উপায়টি সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ মিলিত হইয়া যাহাতে উহা পালন করে, তাহার ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে উহা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং ইহা যাহাতে পালন করা হয়, তাহার ব্যবস্থা যে তাঁহারা সংগঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদিগের প্রণীত অথর্ব্ববেদ ও মনুসংহিতা।

প্রধানতঃ এই উপায়টি আবিষ্কার করিবার জন্যই সম্পূর্ণ জীবতত্ত্ব (অর্থাৎ মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতি জীবের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কোথা হইতে ও কিরূপ ভাবে হয়, তাহার তত্ত্ব) আমূলভাবে জানিবার প্রয়োজন হয়। তাহাতে ভারতীয় ঋষিগণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইহার প্রমাণ তাঁহাদিগের বেদান্ত, বেদ, মীমাংসা ও দর্শন।

ভারতীয় ঋষিগণের মতানুসারে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ছাড়া জীবিকার্জ্জনের আর দুইটি উপায়—চাকুরী এবং প্রতিগ্রহ।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জায়গায় যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত করিতে পারিলে দেশের প্রত্যেকের রুগ্নতার কারণ বিদূরিত হয় বটে এবং তদ্দ্বারা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অনায়াসসাধ্যতা সম্পাদিত হইয়া ঐ ঐ ব্যবসায়ী বৈশ্য ও শূদ্রগণের আর্থিক প্রাচুর্য্যও সম্ভাবিত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ তিনটি ব্যবসায় শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শ্রম-শক্তি-ক্ষম, তাহাদিগের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ঐ তিনটি ব্যবসায়ের কোনটি অবলম্বন করিলে তাহাদিগের মধ্যে অর্থলোলুপতার উদ্ভব হইতে পারে এবং কর্ত্তব্যবিমুখতা স্থান পাইতে পারে। এই আশঙ্কায়, শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প শ্রম-শক্তি-ক্ষম, তাহাদিগের জন্য চাকুরী ব্যবসায় এবং ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের জন্য প্রতিগ্রহের সংগঠন সাধিত হইয়াছিল।

তৎকালে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, এই তিনটি ব্যবসায় প্রকৃতভাবে স্বাধীন কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে ঐ ঐ ব্যবসায়িগণকে ব্রাহ্মণ-প্রণীত অনেক বিধি ও নিষেধ পালন করিতে হইত বটে, কিন্তু কোন ব্যবসায়েই কোনরূপ শুল্ক অথবা কর প্রদান করিতে হইত না এবং কাহারও লাভালাভের জন্য বাজারের দরের উপর নির্ভরশীল হইতে হইত না। চাকুরী সর্ব্বাপেক্ষা নিন্দনীয় কার্য্য ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে চাকুরীয়া শূদ্রগণকে কাহারও অবজ্ঞা করা নিয়মবিরুদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু উহাঁরা প্রত্যেকেই অপর কাহারও না কাহারও আদেশ পালন করিয়া পরাধীন জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইতেন।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ যখন তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-নির্ব্বাহের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে কাহারও জীবন-রক্ষাকার্য্যে উপকার সাধন করিতে সক্ষম হইতেন, তখন উপকৃত স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য যাহা প্রদান করিত, তাহা গ্রহণ করিবার কার্য্যের নাম ছিল প্রতিগ্রহ। কোনরূপ বিলাস-ভোগের কামনা-যুক্ত হইলে কাহারও পক্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মান লাভ করা সম্ভব হইত না, কারণ তাহা হইলে উভয়েরই দায়িত্ব নির্ব্বাহ করা অসাধ্য হওয়া উচিত। বিলাসভোগের কামনা বর্জ্জন করিতে হইত বলিয়া, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরিবারের জীবিকানির্ব্বাহের জন্য খুব অল্প বস্তুরই প্রয়োজন হইত। প্রতিগ্রহের নিয়মানুসারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ খুব অল্প বস্তুই গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাহাও যাহার তাহার নিকট হইতে গ্রহণ করা অসাধ্য ছিল, কারণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জীবন-রক্ষাকার্য্যে উপকৃত হইতেন, একমাত্র তাঁহাদিগেরই দান উহাঁরা গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে জীবনরক্ষা-কার্য্যে উপকৃত হইতেন, তাঁহারা কখনও অসাধু হইতে পারিতেন না। এই যে যৎসামান্য গ্রহণ, তাহাও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়গণ কেহ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া না দিলে যাচ্ঞা করিয়া লইতে পারিতেন না। অবশ্য, উপকৃত হইলে যাহাতে উপ-

কারীকে দান করিবার প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহার শিক্ষা তৎকালে প্রত্যেককে দেওয়া হইত।

কোন উপকার হউক আর নাই হউক, ডাক্তারগণ ও আইনব্যবসায়ী প্রভৃতিগণকে অধুনা যেরূপ তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট ফি প্রদান করিতে হয় এবং তাহা না করিলে উহা যেরূপ ডাক্তার ও আইনব্যবসায়িগণ আদায় করিয়া লইতে পারেন, তখনকার দিনে তাহা অসম্ভব ছিল। চিকিৎসায়, অথবা আইন-ব্যবহারের কার্য্যে কোন উপকার না পাইলে কাহারও কিছু দিতে হইত না এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া কিছু না দিলে তাহা আদায় করা সম্ভব হইত না।

এইরূপে চারি শ্রেণীর মানুষ মিলিত হইয়া কৃষি প্রভৃতি পাঁচটি ব্যবসায়ের কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলে, সমাজের প্রত্যেকের পক্ষে অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে এবং স্বাস্থ্যাভাব হইতে আংশিকরূপে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয়। অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে এবং স্বাস্থ্যাভাব হইতে আংশিকরূপে মুক্ত হইতে পারিলে অশান্তির ও অসন্তুষ্টির মাত্রাও অনেকাংশে কমিয়া যায়। অর্থাভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলেও সমাজের মধ্যে অসচ্চরিত্রতাজনিত স্বাস্থ্যাভাব এবং অশান্তি ও অসন্তুষ্টির কারণ বিদ্যমান থাকে। উহা সম্যক্‌ভাবে দূর করিতে হইলে প্রয়োজন হয় আত্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় শিক্ষা, কারণ স্বকীয় কর্ম্ম-শক্তি ও গুণের বিকাশ কিরূপে হয়, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে বিবিধ চরিত্রের উদ্ভব হয় কি করিয়া, তাহা জানা সম্ভব হয় না এবং অসচ্চরিত্রতা হইতে মুক্তি লাভ করাও সাধ্যায়ত্ত হয় না।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি হইতে সম্যক্‌ভাবে অব্যাহতি পাইয়া সুখে কাল-যাপন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হইলে একদিকে যেরূপ চারি শ্রেণীর মানুষের মিলিত হইয়া কৃষি প্রভৃতি পাঁচটি অর্থাগমের কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইতে হয়, সেইরূপ আবার আত্ম-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষারও প্রয়োজন হয়।

ঋষি-প্রণীত গ্রন্থগুলির মূলভাগ যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঋষিগণের অভ্যুদয়কালে উহার প্রত্যেক ব্যবস্থাটি যাহাতে প্রতিপালিত হয়, তদনুরূপ সংগঠন সাধিত হইয়াছিল এবং তখনকার দিনে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষটি সর্ব্বতোভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

ঐ ব্যবস্থাগুলি যে শুধু ভারতবর্ষেই প্রতিপালিত হইত এবং শুধু ভারতবাসিগণের প্রত্যেকেই যে সর্ব্বতোভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা নহে। ঋষিগণের গ্রন্থগুলির মূলভাগে যথাযথ ভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কি করিয়া জগতের প্রত্যেক দেশে ঐ ব্যবস্থাগুলি প্রচারিত হইতে পারে, তাহার চিন্তাও তৎকালে মানবহৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল এবং ইহার ফলে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও হিব্রু ভাষার বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ঐ দুইটি ভাষার সাহায্যে তখনকার দিনে জগতের প্রত্যেক দেশে ঋষি-প্রণীত প্রত্যেক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে স্থান পাইয়াছিল এবং সমগ্র মানব-সমাজের প্রত্যেকে সর্ব্বতোভাবের সুখে কাল-যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

যে ব্যবস্থাগুলির সাহায্যে একদিন সমগ্র মানব-সমাজ এতাদৃশভাবে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি এবং অসন্তুষ্টির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল, সেই ব্যবস্থাগুলি কেন নষ্ট হইল এবং কেনই বা প্রত্যেক মানুষটি আবার অর্থাভাবে, অথবা স্বাস্থ্যাভাবে, অথবা অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাও আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর অতীত এবং বর্ত্তমান চিত্রে" দেখাইয়াছি। উহার পুনরুল্লেখ করিব না।

কি করিলে পুনরায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যেকের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা করা আমাদিগের এই সন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

আজকালকার ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা না হইলে ভারতবাসীর অর্থাভাব প্রভৃতি কিছুই দূর করা সম্ভব নহে, সেইরূপ বলা আমাদিগের মতে, কোনরূপ প্রকৃত কাযের কথা না বলার অনুরূপ। যখন নয় মণ তেল পুড়ান সহজসাধ্য নহে, তখন নয় মণ তেল না পুড়িলে রাধা নাচিবে না, এতাদৃশ উক্তির সমর্থন করা বর্ত্তমান নেতৃত্বের পক্ষে শোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কাহারও অবস্থার কোনরূপ উন্নতি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধিত হইবে না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় যাহা যাহা করা ভারতবাসিগণের আয়ত্তাধীন এবং সহজসাধ্য, তাহার মধ্যে কি কি করিলে ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি সম্যক্ পরিমাণে বিদূরিত হইবে, তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। আমাদিগের মতে, ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সেই পন্থায় অন্যান্য দেশের মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতিও সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে। ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি বিদূরিত না হইলে অন্য কোন দেশের আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি কোন সমস্যাই সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না, কারণ ভারতবাসিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশবাসীর মত ভারতবাসিগণের চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তত অধিক পরিমাণে মজ্জাগত হয় নাই। ইহা ছাড়া, অন্যান্য দেশের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা যেরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার উন্নতিসাধন করা যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা এখনও তত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহার উন্নতিসাধন করাও তত অধিক কষ্টসাধ্য নহে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে, ভারতবাসিগণের তুলনায় অন্যান্য দেশবাসিগণ অধিকতর উন্নতিলাভ করিয়াছেন তাহা সত্য, কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধ্বংস-সাধন করিবার যত সহায়ক, তাহার শতাংশের একাংশ প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে সক্ষম নহে। প্রকৃত শব্দ-বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে বর্ত্তমান বিজ্ঞানকে কোন ক্রমেই বিজ্ঞান বলা চলে না। পরন্তু উহাকে কু-জ্ঞান বলিতে হয়। সেইরূপ আবার বর্ত্তমান সভ্যতাকেও সভ্যতা বলা চলে না; পরন্তু অসভ্যতা অথবা পশুত্ব বলিতে হয়, কারণ উহার দ্বারা পশু-প্রবৃত্তির বৃদ্ধি সাধিত হইয়া থাকে।

কি করিলে পুনরায় ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে, তাহার সন্ধানে কৃতকার্য্য হইলে দেখা যাইবে যে, উহার উপায় একটির বেশী আর একটি নাই এবং আর একটি হইতে পারে না।

কোন্ কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা উহা সম্পাদন করা সম্ভব, তাহার আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, সমাজের প্রত্যেক মানুষ যাহাতে অর্থাভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে, তাহার উপায়, চারি শ্রেণীর মানুষের চারিরকমের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মিলিতভাবে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা এবং উহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধন করিতে হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখান হইয়াছে যে, সমাজের প্রত্যেকে যাহাতে স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির হাত হইতে অব্যাহতি পায়, তাহা করিতে হইলে একদিকে যেরূপ উপরোক্ত প্রথম ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়, সেইরূপ আবার প্রত্যেকে যাহাতে সাধ্যানুরূপ আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃত ভাবে চরিত্রবান্ হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

কাযেই বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের প্রত্যেকে যাহাতে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির হাত হইতে সর্ব্বতোভাবে অব্যাহতি পায়, তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়—ভারতবাসিগণের মিলন, দ্বিতীয় প্রয়োজন—ভারতবর্ষের চারিশ্রেণীর লোক যাহাতে চারিরকমের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা, তৃতীয় প্রয়োজন—ভারতবর্ষের নদী ও খাল প্রভৃতি

যাঁহারা ঋষিগণের ভূতত্ত্ব ও জল-সেচনতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্ত্যগণের আধুনিক ভূতত্ত্ব (Geology) ও জলসেচন তত্ত্ব (Irrigation Engineering) সমানভাবে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, পাশ্চত্ত্যগণের আধুনিক ভূতত্ত্ব ও জলসেচন তত্ত্ব ঐ নামের কলঙ্ক। উহাতে কোন প্রকৃত তত্ত্ব লিপিবদ্ধ নাই, পরন্তু উহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়পরায়ণ গভীর দৃষ্টিবিহীন মানুষের একদেশদর্শী পরীক্ষার অজ্ঞানতাময় কথায় পরিপূর্ণ। বালু নিছক অথবা কর্দ্দমাক্ত, তাহা কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিতে হয়, তাহার তথ্য পর্য্যন্ত ঐ ঐ বিষয়ক আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে, আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্ ও জলসেচন-তত্ত্ববিদ্ অনেক অদ্ভুত কার্য্য সমাধান করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যটীতে মানুষের উপকার অপেক্ষা অধিকতর মাত্রায় অপকারই সাধিত হইতেছে। আমাদিগের এই কথার সত্যতা একাধিকযুক্তির দ্বারা বঙ্গশ্রীর পাঠকগণকে দেখাইয়াছি। এক্ষণে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহারা যতই অদ্ভুতকর্ম্মা হউন না কেন, নদীর সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত খনন করা আধুনিক বৈজ্ঞানিকের সর্ব্ববিধ যন্ত্রের ক্ষমতাতিরিক্ত, কারণ কোন মৃত্তিকার বালুকাভাগ যখন অর্দ্ধাতিরিক্ত হয়, তখন উহা অভেদ্য হইয়া থাকে এবং উহা খনন করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত থাকে না। এতাদৃশ অভেদ্য বালুরাশি মৃত্তিকার মধ্যে বিদ্যমান আছে বলিয়াই মৃত্তিকার জলরক্ষণের ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার জন্যই মৃত্তিকা হইতে প্রস্তরের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই বিষয়ক সমস্ত কথা বিবৃত করা এই সন্দর্ভে সম্ভবযোগ্য নহে।

নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত নদী খনন করা একমাত্র প্রকৃতির সাধ্যায়ত্ত। পর্ব্বত হইতে উদ্ভব হইয়া স্রোতস্বিনী যখন সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন উহার বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিলে বায়ুর সাহায্যে ঐ স্রোত ঘূর্ণীয়মান হইয়া থাকে এবং ঘূর্ণয়নের সাহায্যে আধুনিক স্ক্রুর মত উহা নিম্নগামী হয় এবং মৃত্তিকাস্থিত কর্দ্দমকে জলে পরিণত করিয়া উহার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এইরূপে বায়ুর সাহায্যে ঘূর্ণয়নের দ্বারা জলের অভেদ্য নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত স্রোতস্বিনী উপনীত হইয়া থাকে এবং নদী ঐ স্তর পর্য্যন্ত গভীর হয়। এই তথ্য বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের অপরিজ্ঞাত বটে, কিন্তু ঘূর্ণয়নের এই প্রাকৃতিক সত্য বিদ্যমান আছে বলিয়াই ক্যাপষ্টানের (capstan) সাহায্যে ঘূর্ণয়নের দ্বারা স্ক্রুপাইলসমূহ (screw piles) নদীর গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত অনুবিদ্ধ করা (driving) সম্ভব হইতেছে এবং মৃত্তিকার বালুভাগ কর্দ্দমভাগ অপেক্ষা অধিক হইলে যন্ত্রের অভেদ্য হইয়া পড়ে এই সত্যের বিদ্যমানতা বশতঃ ঐ স্ক্রুপাইলগুলি গভীরতরদেশে অনুবিদ্ধ করা সম্ভব হয় না।

দেশের প্রত্যেক নদীটী উপরোক্তভাবে সুগভীর হইলে প্রত্যেক খাল প্রভৃতি অপরাপর জলাশয়গুলিও স্বভাববশতঃই যথোপযুক্ত পরিমাণে সুগভীর হইয়া থাকে।

স্রোতস্বিনী যখন সমতল ভূমিতে অবতীর্ণ হয়, তখন উহার বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিলে উহার স্রোত যেমন বায়ুর সাহায্যে ঘূর্ণীয়মান হইতে থাকে এবং উহা যেরূপ নিছক বালুকাস্তর পর্য্যন্ত উপনীত হইতে সক্ষম হয়, সেইরূপ আবার উহার বেগ ও গতি বাধাপ্রাপ্ত হইলে ঐ ঘূর্ণয়নও অসম্ভব হয় এবং তখন ঐ নদীও অগভীর হইয়া পড়ে।

দেশের কোন নদী অগভীর হইলে খাল ও অন্যান্য জলাশয়গুলিও অগভীর হইয়া থাকে।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সর্ব্বত্র স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি যাহাতে সর্ব্বরকমের বাধা হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

এই ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে প্রবর্ত্তন করা সম্ভবযোগ্য কি না, তাহার বিচার করিতে বসিলে বর্ত্তমান সময়ে

কোন্ কোন্ কারণে স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি বাধা-প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

কোন্ কোন্ কারণে স্রোতস্বিনীর বেগ ও গতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার সন্ধান প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহার সর্ব্বপ্রধান কারণ চারিটি, যথা, (১) রেল-রাস্তা, (২) মোটরগাড়ীর রাস্তা, (৩) পুলসমূহ, এবং (৪) আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ।

এই চারিটি কারণে যে, স্রোতস্বিনীসমূহের স্বাভাবিক গতি ও বেগ প্রতিনিয়ত বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহা একটু চক্ষু মেলিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে। আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ বাণিজ্যের সহায়তার জন্য নদীর তীরে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। তাহার যে কোনটীর অবস্থান পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহার নদীর তীরস্থিত অংশ প্রায়শঃ প্রাচীন নদীর বক্ষে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার ফলে নদী যথেষ্ট পরিমাণে বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, নদীর স্বাভাবিক গতি ও বেগকে কোনরূপে বাধা প্রদান না করিয়া আধুনিক রেল-রাস্তা, অথবা মোটরগাড়ীর রাস্তা, অথবা পুলসমূহ অথবা বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ প্রয়োজন সাধনানুরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করা সম্ভব নহে।

কাযেই ইহা বলিতে হইবে যে, স্রোতস্বিনীর স্বাভাবিক বেগ যাহাতে কোনরূপে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তাহা করিতে হইলে, রেল-রাস্তা, মোটরগাড়ীর রাস্তা, পুলসমূহ এবং আধুনিক বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে এবং উহার মধ্যে যাহা যাহা এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেকটি যাহাতে অপসারিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মানুষ এক্ষণে যে সমস্ত অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রত্যেক রেল-রাস্তা, মোটর গাড়ীর রাস্তা, পুল এবং বাণিজ্যপ্রধান সহরের উচ্ছেদ সংঘটিত হইলে, কাহারও কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে কি না, তাহাও এই সঙ্গে বিচার করিতে হইবে।

কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য লাভ করা তাঁহাদিগের অপর ঐ [illegible] দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তিবিহীন রেল-রাস্তা প্রভৃতির মালিক, [illegible] লাভ করে সংস্রবে থাকিয়া চাকুরী ও ব্যবসা করিয়া লাভবান্ হইয়া থাকেন, আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদিগের কিছু আর্থিক অনিষ্ট ঘটিবে বটে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণের কোনই অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না। কারণ যখন দেখা যাইতেছে যে, রেল-রাস্তা প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন করিলে নদীসমূহের স্বাভাবিক বেগ ও গতি অপ্রতিহত থাকিতে পারে, তখন রেল ও মোটরের স্থানে অনায়াসেই সমান ভাবে জলযানসমূহের গমনাগমন সাধিত হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা মানুষের গমনা-গমনের এবং পণ্যবহনের প্রয়োজনও সম্পন্ন হইতে পারে।

রেল-রাস্তা, মোটর গাড়ীর রাস্তা প্রভৃতির উচ্ছেদ সাধন করা কোনরূপ অতিরিক্ত খরচ, অথবা পরিশ্রম-সাধ্য কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই ভাবনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, উহা আদৌ-অতিরিক্ত খরচ অথবা পরিশ্রমসাধ্য নহে, কারণ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ উহাদের রক্ষায় যত্নপরবশ না হইলে, স্রোতস্বিনীসমূহ তাহাদের স্বাভাবিক বেগ ও গতির অপ্রতিহততাবশতঃ অনায়াসেই উহার প্রত্যেকটীকে সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভাসাইয়া লইতে সক্ষম হয়।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা অসাধ্য নহে এবং উহাতে কেবলমাত্র সামান্য কয়েকজন মালিক, ব্যবসায় ও চাকুরীয়া ছাড়া আর কাহারও কোনরূপ অসুবিধা ও ক্ষতিগ্রস্ততার আশঙ্কা নাই।

স্রোতস্বিনীসমূহের স্বাভাবিক বেগ ও গতি যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, তজ্জন্য রেল-রাস্তা, মোটর-রাস্তা, পুলসমূহ, এবং বাণিজ্যপ্রধান সহরসমূহ যাহাতে আর বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে এবং ঐ রেল-রাস্তা প্রভৃতি যাহা যাহা বিদ্যমান আছে, তাহা রক্ষা করিবার

৬৮৮ ... যাহাতে না করা হয়, তাহার ... করিলে, নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক ...শয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এই কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাই হইবে প্রথম সমস্যা। ইহা ছাড়া কোনরূপে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলে যাঁহারা ঐ কার্য্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, অর্থাৎ রেল রাস্তা প্রভৃতির মালিকগণ, তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ যে উহাতে স্বভাবতঃ বাধা-প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তাহাই বা অতিক্রম করা যাইবে কিরূপে, ইহা হইবে ঐ কার্য্যের দ্বিতীয় সমস্যা।

এই কার্য্য অসাধ্য না হইলেও উহা যে অতীব কষ্টসাধ্য, তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। ইহা যতই কষ্টসাধ্য হউক না কেন, এই কার্য্যে মানুষের একদিন না একদিন প্রবৃত্ত হইতেই হইবে, কারণ অন্য কোন উপায়ে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব এবং শান্তির অভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নহে।

দেশের কোন্ শ্রেণীর মানুষের দ্বারা এই কার্য্য সম্ভবযোগ্য হইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাহারা ইহার দ্বারা আশু লাভবান্ হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহা গ্রহণ করা সম্ভব।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইবেন যাঁহারা বর্ত্তমানে বিবিধ সম্পদের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ। কারণ, আজকাল যাঁহারা বিবিধ সম্পদের মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়া, তাঁহারা স্বভাবতঃ দেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্। দেশের জন-সাধারণ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, ইঁহারাই পরিশেষে জন-সাধারণের পরিচালক হইতে পারিবেন এবং তখন ইঁহাদিগকে কখনও লাভ-লোকসানের কথা, অথবা নফরগিরীর চিন্তাজ্বরে ব্যাকুল হইয়া অকালে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া জীবনসুখে বঞ্চিত হইতে হইবে না। ইঁহারা পরিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভবান্ হইবেন বটে কিন্তু আশু ইঁহাদের কোন লাভ হইবে না, পরন্তু ইঁহাদের প্রত্যেককে কার্য্যের প্রারম্ভে অল্পাধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। ইঁহারা অধুনা জীবনব্যাপী যে যে অশান্তি ও অস্বাস্থ্য ভোগ করিয়া থাকেন তলাইয়া চিন্তা করিলে তাহার তুলনায় ঐ অসুবিধা নগণ্য। তথাপি ইঁহাদের ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা খুবই অল্প, কারণ ইঁহারা প্রায়শঃ সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনে মত্ত এবং যে দূরদর্শিতা থাকিলে কোন কার্য্যের পূর্ব্বাপর আমূলভাবে চিন্তা করা সম্ভব, কু-শিক্ষার প্রভাবে ইঁহাদিগের সেই দূরদর্শিতা প্রায়শঃ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অথচ যাহারা জীবন-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা লাভে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কাহারও নেতৃত্ব না হইলে সর্ব্বসাধারণের হিতকর কোন কার্য্যে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় না। আমাদের মনে হয়, যাঁহারা এই কার্য্যে আশু লাভবান্ হইবেন, তাঁহারা ইহাতে আন্তরিকতার সহিত সদ্ভাবে প্রবৃত্ত হইলে, স্বভাবের নিয়ম-বশে উহাঁদের কাহারও না কাহারও নেতৃত্ব পাওয়া যাইবে।

কাহারা এই কার্য্যের দ্বারা আশু লাভবান্ হইবেন, তাহার কথা চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা কৃষক, জমীদারী ও জোৎদারী প্রভৃতি কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও শিক্ষিত বেকার, তাঁহাদিগের ইহাতে কোনরূপের ক্ষতিগ্রস্ততার আশঙ্কা নাই। পরন্তু নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বারমাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, অনতিবিলম্বে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং কৃষি-কার্য্যে ও কুটীর-শিল্পে অনায়াসে লাভবান্ হওয়া সম্ভব হইবে। তখন কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী ও কুটীর-শিল্পিগণের অর্থাভাব ঘুচিয়া যাইবে এবং শিক্ষিত বেকারগণও কৃষি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়া তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার মোচন সাধন করিতে পারিবেন।

কাযেই ইহা বলিতে হয় যে, এই কার্য্যের প্রথম

প্রবৃত্তি দেশের কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও শিক্ষিত বেকারগণের দ্বারা সম্ভব।

কিরূপভাবে এই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। সর্ব্বসাধারণের কোন হিতকর কার্য্য কিরূপভাবে আরম্ভ করিতে হইবে, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কাহারও সহিত কোনরূপে দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রবৃত্ত হইলে কোন সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভব নহে। যাঁহারা ধূর্ত্ত, অথবা শঠ, অথবা অজ্ঞ, তাঁহারা যাহাতে তাঁহাদের ধূর্ত্ততা, শঠতা এবং অজ্ঞতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহার উপায় আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের সহিত যাহাতে কোনরূপ দ্বন্দ্ব অথবা কলহে প্রবৃত্ত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। কংগ্রেসের সাহায্য ব্যতীত এতাদৃশ কার্য্য সম্ভবযোগ্য নহে বটে, কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নেতৃত্ব বজায় থাকিলে ঐ কংগ্রেসের দ্বারা যাহা প্রকৃতপক্ষে সাধারণের হিতকর কার্য্য, তাহা সম্পাদন করা কখনও সম্ভব হইবে না। আমরা এই কথা কেন বারংবার বলিয়া আসিতেছি, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হইলে, আমাদিগের পাঠকবর্গকে আর একবার স্মরণ করিতে হইবে যে, কাহারও সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রবৃত্ত হইলে, কোন সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যে কোনরূপ সাফল্য লাভ করা কখনও সম্ভব হয় না। এই সত্যটিকে তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগত জীবনের সহিত মিলাইয়া সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সত্যটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, দ্বন্দ্ব ও কলহের দ্বারা কেহ কখনও কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সাফল্য লাভ করিতে পারে না বটে, কিন্তু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গের মূল কার্য্য সর্ব্বসাধারণকে দ্বন্দ্ব ও কলহে প্রমত্ত করিয়া তোলা। ইংরাজকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা তাঁহারা কংগ্রেসের মূলমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার পর আবার বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া কাউন্সিলে সংখ্যাধিক্য লাভ করা তাঁহাদিগের অপর মন্ত্র লইয়া দাঁড়াইয়াছে। দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তিবিহীন কিছুই ইহাঁদের কথায় অথবা কার্য্যে প্রচার লাভ করে না। কেন ইহাঁরা এইরূপ হইয়াছেন, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ হীন প্রবৃত্তির সর্ব্বপ্রধান কারণ পাশ্চাত্য কুশিক্ষা। ইহাঁরা মুখে স্বদেশীয়তার কথা বলেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাঁদের প্রত্যেক কার্য্য হীন পাশ্চাত্যের পরিচায়ক। গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া যাহারা নেতৃত্বের সম্মুখভাগে সমাসীন রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের একজনকেও ধূর্ত্ততা, শঠতা এবং অজ্ঞতা হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট, আর কেহ কেহ কংগ্রেসের কার্য্যের দ্বারা নিজ নিজ জীবিকার্জ্জনের কার্য্যে ব্যাপৃত। গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রকে পর্য্যন্ত এতাদৃশ কোন না কোন দোষ হইতে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও মুক্ত বলিয়া মনে করা চলে না।

কাযেই কি করিয়া ইহাঁদিগের সহিত কোনরূপ দ্বন্দ্ব-কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া জাতীয় কংগ্রেসকে ইহাঁদিগের অবৈধ নেতৃত্ব হইতে মুক্ত করা যায়, তাহাই হইবে উপরোক্ত কার্য্যবিধির প্রথম আলোচ্য।

ইহাঁদিগের প্রতিনিধিবর্গ যখন ইহাঁদিগের জন্য কোন না কোনরূপ ভোটসংগ্রহের কার্য্যে কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও বেকার যুবকগণের সম্মুখীন হন, তখন, কি করিয়া ভারতবর্ষের পরাধীন অবস্থাতেও ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহার পরিকল্পনা তাঁহাদিগের নিকটে যাচ্ঞা করিলে, ইহাঁদিগের অবৈধ নেতৃত্বের অবসান ঘটিতে পারে।

ভোটের জন্য যাঁহারা ইহাঁদিগের প্রতিনিধিত্ব করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ পাইলে, অথবা এই নেতৃবর্গের স্বয়ং কেহ জনসাধারণের সম্মুখীন হইলে, কৃষক, কৃষি-ব্যবসায়ী, কুটীর-শিল্পী ও বেকার যুবকগণকে সসম্ভ্রমে বলিতে হইবে যে,

"হে মহাশয়, ভোট আমরা কংগ্রেসের প্রতিনিধিকে দিব, কিন্তু যাঁহাকে আমরা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচন করিতে চাহি, তাঁহার নিকট হইতে, কি করিয়া আমাদিগের এই পরাধীন অবস্থাতেও অর্থাভাব এবং স্বাস্থ্যাভাব বিদূরিত হইতে পারে তাহার প্রয়োগযোগ্য পরিকল্পনা আমরা যাচ্ঞা করিতেছি। স্বাধীন না হইলে আমাদিগের ঐ অভাব দূর হইবে না, ইহা আর আমরা শুনিতে পারিতেছি না। কবে নয় মণ তেল পুড়িবে আর রাধা নাচিবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিবার ধৈর্য্য আর আমাদিগের নাই। পেটের দায়ে আমরা আর অহিংস থাকিতে পারিতেছি না। আমাদের আর ঐ অহিংসার বাণী শুনিবার ধীরতা নাই। শিক্ষা লাভ করিবার মত মস্তিষ্ক আমাদিগের নাই। উহা আমরা চাহি না। আমরা চাই সসম্ভ্রমে পেটের ভাত। গভর্ণমেণ্টের ঋণ ও খয়রাতকে আমরা অসম্ভ্রমের চিহ্ন বলিয়া মনে করি। যাহাতে উহা আর না লইয়া চলিতে পারি, তাহার উপায় আমরা চাই। হাসপাতাল আমাদিগের অনেক হইয়াছে; ডাক্তারও আমরা অনেক পাইয়াছি। আমাদিগের অসুস্থতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে আমাদিগের আর এতাদৃশ ভাবে অসুস্থ না হইতে হয়, তাহা আমরা এক্ষণে চাহি।"

উপরোক্ত যাচ্ঞা যাহাতে পরিপূর্ণ করা হয়, কৃষক প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাবে তদ্বিষয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলে, বর্ত্তমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আর কেহ কেহ হয়ত ঐ যাচ্ঞার পূরণ কি করিয়া হইতে পারে, তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হইবেন। যদি ইহাঁদিগের কেহই এই কার্য্যে ব্যাপৃত নাও হন, তাহা হইলেও দেখা যাইবে যে, স্বভাবের নিয়মানুসারে জনসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুলাভের আন্তরিক যাচ্ঞা পূরণ করিবার জন্য, যাঁহারা অজ্ঞাত তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই উপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোক অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপে, জাতীয় কংগ্রেস পরিচালনার জন্য যাঁহারা অনুপযুক্ত, তাঁহাদিগকে অপসারিত করিয়া, প্রকৃত গুণসম্পন্ন নেতৃবর্গের উদ্ভব সম্পাদন করা সম্ভবযোগ্য হইবে। পাঠকবর্গকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আমাদিগের মত নহে। ইহা ভারতের এতাদৃশ অবস্থার ভারতীয় ঋষির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সূচী। যাঁহারা এই কার্য্যসূত্রের বিরোধী, তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের মত দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়, ধূর্ত্ত, শঠ, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণ নেতৃবর্গের প্রাধান্য যতদিন পর্য্যন্ত বিদূরিত না হয়, অথবা যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাঁহাদিগের দ্বন্দ্বকলহ-প্রিয়তা, ধূর্ত্ততা, শঠতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণতা পরিহার করিতে বাধ্য না হন, ততদিন পর্য্যন্ত কংগ্রেস কখনও জাতীয়তার রূপ ধারণ করিতে পারিবে না এবং ততদিন পর্য্যন্ত কোন ক্রমেই ভারতবাসী জনসাধারণ তাহাদিগের বুভুক্ষু অবস্থা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না। অদূর-ভবিষ্যৎ আমাদিগের এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

এইরূপে যথোপযুক্ত গুণসম্পন্ন লোকের দ্বারা কংগ্রেস অধিকৃত হইলে, কার্য্যসূত্রে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হইবে বটে, কিন্তু তখনও রেল-রাস্তা, মোটরগাড়ীর রাস্তা, পুলসমূহ ও বাণিজ্য-প্রধান সহরসমূহের অপসারণ করিয়া স্রোতস্বিনীসমূহের গতি ও বেগ যাহাতে অপ্রতিহত থাকে, তাহা করা সহজসাধ্য হইবে না, কারণ তখনও সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উহাতে বাধা প্রদান করিবেন সম্পদের মালিকসমূহ, তৎসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ। ইহাঁদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করা অধিকতর ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। ইহাঁরা যেরূপ ক্ষমতাপন্ন, তাহাতে অতীব সতর্কতার সহিত পরিচালিত না হইলে, যাহাঁরা সম্পদের মালিক, অথবা ব্যবসায়ী, অথবা চাকুরীয়া নহেন, তাঁহাদিগের পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণ হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান থাকিবে। এইরূপ অবস্থার উদ্ভব যাহাতে না হয়, তজ্জন্য কংগ্রেসকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহারা মানুষ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ভারতবাসী। এই সময়ে যাঁহারা কংগ্রেসের প্রকৃত নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা নাম ও যশের অবস্থার অন্তরালে থাকিয়া প্রভুত্বের কার্য্য ও ভাব হইতে বিরত

থাকিতে হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি উচ্চপদ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, অথবা হিন্দু হউক, যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা দলপতি, তাঁহারা যাহাতে মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদ পাইতে পারেন, তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। কাহাকেও 'বাবা'র মত সম্মান করিলে সে কখনও 'শালা' বলিয়া অত্যাচার করিতে পারে না। স্বভাবের এই নিয়ম অনুসারে যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহারা তখন আন্তরিকতার সহিত না হইলেও কার্য্যতঃ কংগ্রেসের পক্ষ সমর্থন করিতে বাধ্য হইবেন। এইরূপে তখন হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে দেশের অধিকাংশ মানুষেরই কংগ্রেসের পতাকাতলে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে। তখন একদিকে রেলরাস্তা প্রভৃতি অপসারণের ফলে যে সমস্ত মালিক, ব্যবসায়ী ও চাকুরীয়াগণ আপাতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের যাহাতে বন্দোবস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে, অন্যদিকে ব্রিটিশার-গণকে করজোড়ে বলিতে হইবে যে,

"হে মহাশয়গণ, আপনারা আমাদিগের প্রভু, আমরা স্বাধীনতার জন্য উদ্‌গ্রীব নহি। আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব আপনাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আপনাদিগের আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত আছি। আমরা চাই শুধু পেটের ভাত ও রুটী, পরণের ধুতি ও চাদর, শয়নের কুটীর। আমরা অনশনে, অর্দ্ধাশনে, নগ্নাবস্থায়, অর্দ্ধ-নগ্নাবস্থায় ধৈর্য্যহারা হইয়াছি। আমরা কমিশন ও কমিটী চাই না। আমরা চাই পেটের ভাত এবং আপনাদের আদেশ। আমাদের যে জমিতে তিনশত বৎসর আগেও বিশ মণ ফসল হইত, সেই জমিতে এক্ষণে ৩।০ মণ ফসল হইতেছে। অনশন ও অর্দ্ধাশন-বশতঃ আমরা আর ধৈর্য্য রাখিতে পারিতেছি না। অনশন ও অর্দ্ধাশন হইতে আমরা যাহাতে অনতিবিলম্বে মুক্ত হইতে পারি, হয় আপনারা নিজেরা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিন, নতুবা আমরা যে ব্যবস্থা সাধন করিতে চাই, সেই ব্যবস্থা আপনারা সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করুন।"

সমস্ত প্রদেশের মন্ত্রিগণের সহযোগে, নাম ও যশের অনভিলাষী সঙ্কীর্ণ স্বার্থত্যাগী কংগ্রেসের নেতৃবর্গের দ্বারা এতাদৃশ যাজ্ঞা উত্থাপিত হইলে বৃটিশারগণের পক্ষে ইহার পূরণ করিয়া না থাকা অসাধ্য হইয়া পড়িবে। এতাদৃশ যাজ্ঞা উত্থাপিত হইলে দেশের জন-সাধারণের এতদ্বিষয়ে স্বতঃই ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। তখন 'মিলিত হও, মিলিত হও' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে না এবং বৃটিশার-গণকে সর্ব্বতোভাবে প্রভু বলিয়া মানিয়া লইলে স্বভাবের নিয়মানুসারে তাঁহাদিগের পক্ষে কোন কৌশলে এই মিলনের বিরুদ্ধে বাধা উপস্থিত করিয়া সাফল্য লাভ করিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। কোন মানুষ যাহাকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া সজ্ঞানে আত্মত্যাগ করে এবং কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী খাদ্যের ও ব্যবহার্য্যের প্রার্থী হয়, তখন তাহাকে বিমুখ করা পশুজনোচিত হয়। বৃটিশারগণ একে ত' এত অধিক পশুভাবাপন্ন নহেন, তাহার পর আবার তাঁহারা পশুভাবাপন্ন হইলেও, ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ভারতবাসীর পক্ষে কয়েকটী পশুকে শাসন করা ক্লেশসাধ্য ব্যাপার হইতে পারে না।

তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত অবস্থার উদ্ভব হইলে ভারতবাসীর প্রকৃত রাষ্ট্রীয় স্বাধী-নতা করতলগত হইবে এবং তখন নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে তাহার ব্যবস্থা সাধন করা অনায়াসসাধ্য হইবে।

নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা সাধিত হইলে, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি সাধন করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দুনির্ব্বি-শেষে সকল জনসাধারণের অর্থাভাব দূর করা যে সহজ-সাধ্য, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। জনসাধা-

রণের অর্থাভাব দূর করিতে পারিলে, শিক্ষা ও শৃঙ্খলা সংস্থাপনের দ্বারা অস্বাস্থ্য ও অশান্তি দূর করা অনায়াস-সাধ্য হইবে। এই সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। যথাসময়ে আমরা আবার উহার আলোচনা করিব।

পাঠকদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য দেশের নদী ও খাল প্রভৃতি প্রত্যেক জলাশয়ে যাহাতে বার মাস সর্ব্বনিম্ন বালুকাস্তর পর্য্যন্ত জল থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা। উহা করা অনায়াস-সাধ্য না হইলেও অসাধ্য নহে।

এই কার্য্যের দ্বারা যে শুধু ভারতবাসিগণ উপকৃত হইবেন, তাহা নহে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের প্রত্যেকের অর্থাভাব যাহাতে বিদূরিত হইতে পারে, তাহা করিতে পারিলে মানব-সমাজের প্রত্যেকের অর্থাভাব দূর করা সম্ভব হইবে।

ভারতবাসী নেতৃবর্গকে যদিও কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য সর্ব্বাগ্রে আগুয়ান হইতে হইবে, তথাপি মনে মনে কি করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের হিত সাধিত হইতে পারে, তাহার চিন্তা সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। তাঁহাদিগকে আরও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবাসীই হউক, আর বিদেশীই হউক, যে কার্য্যে এক জনেরও মূলতঃ অনিষ্ট হইতে পারে, সেই কার্য্যে কোন ভারতবাসীর কোনরূপ প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে না। গান্ধীজী ও তাঁহার অনুসরণ-কারিগণ এই মৌলিক সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারেন না বলিয়াই তাঁহাদিগের নেতৃত্বের ফলে আমাদিগকে এত বিব্রত হইতে হইতেছে।

সেই কি ভারত তুমি

শ্রীহরিপদ দত্ত

সেই কি ভারত তুমি করিয়া ধারণ
শুভ্র তুষারের তুঙ্গ কিরীটি উজ্জ্বল
তুঙ্গতর শিরে তব, বক্ষেতে শ্যামল
অফুরন্ত অন্নভার করিয়া বহন
অন্নপূর্ণা বলি' খ্যাতি লভিলে জগতে—
আজিও র'য়েছি মোরা সেই কি ভারতে ?

নিশ্বাস-প্রশ্বাস-শুদ্ধ মলয় সমীরে
বহিত তপন তব, নদ-নদী কুল
বহিত অপ্রতিবদ্ধ সিঞ্চি' দুই কূল,
ভাসাইয়া আবর্জ্জনারাশি সিন্ধুনীরে,
স্বাস্থ্যপূর্ণ জীবকুল, ক্ষেত্রে শস্যভরা—
সেই কি ভারতে আছি আজিও আমরা ?

সুনিবিড় কেশদাম-অন্তরালে তব
সামগানে করি' কেহ মুখরিত দিশি
করিত বসতি কত শত যোগী ঋষি,
উদ্ঘাটিন জ্ঞানের দুয়ার করি' নব
জ্ঞানধারে নিত্য ধরা করিত প্লাবিত—
সেই কি ভারতে মোরা আজি অবস্থিত ?

অনশনে, অর্দ্ধাশনে সন্তান তোমার
খাইয়া অখাদ্য খর্ব্ব করিছে জীবন,
নগ্ন কেহ, কেহ করে কটীতে বন্ধন
বস্ত্রের বিদ্রূপ শুধু—লুপ্ত এইবার
"অন্নদা" নামের খ্যাতি হ'ল কি জগতে ?
তা'নয়, তথাপি মোরা নহি সে ভারতে।

বদ্ধ নদ-নদী তব লৌহের শৃঙ্খলে
বিক্ষুব্ধ-অন্তর এবে—করে উদ্গীরণ
জলরাশি ক্ষিতি'পরে সৃজিয়া প্লাবন ;
শ্বাস তব করিছে বমন পলে পলে
ব্যাধির গরল কত ; জর্জ্জরিত তা'তে
অহোরহ, আজিও কি মোরা সে ভারতে ?

স্তব্ধ সে সঙ্গীত পুণ্যপ্রবাহ যাহার
পশিয়া শ্রবণ-পথে দিত মর্ম্মে ঢালি'
ঐশ প্রেম, রুদ্ধ শুদ্ধজ্ঞানের প্রণালী—
বিকট আরাব এবে, অবাধ প্রচার
অসত্যের কিংবা অর্দ্ধসত্যের নিয়ত
বল দেখি মাতা তুমি সেই কি ভারত ?

বঙ্গ-রমণী

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৩৪

'আমার লাগিয়া কাঁদিও না সখি!'

হাটের দিন। বৈকাল বেলা, পাড়া একেবারে নিস্তব্ধ বলিলেই হয়। ছেলে বুড়ো, রাখাল, কৃষাণ সব নৌকা ভরিয়া হাটে গিয়াছে। বাড়ীতে গৃহিণী ও বৌয়েরা সকাল-সকাল কাজ-কর্ম্ম সারিয়া ফেলিতে তৎপর, এর পরে হাটের সওদা বুঝিয়া লইতে ও হাট-প্রত্যাগত শ্রান্তদিগের পরিচর্য্যার সময় থাকিবে না। কাজেই এঘাটে ওঘাটে দাঁড়াইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা আজ নাই, বেড়ান ত' নাই-ই। কাজের অবসরে বাহির-বাড়ীতে একবার করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া যে নিত্যকার অভ্যাস—তাও আজ বন্ধ।

ছই দেওয়া ছোট একখানা নৌকা আসিয়া ঘাটে লাগিল, বাড়ীর ভিতর হইতে পঞ্চমী, বড়বৌ ও মেজবৌ বাহির হইয়া আসিল। ঘাটের উপর বসিয়া পরশমণি, তাঁহার কাছে সরলা দাঁড়াইয়া।

তিন জনেই নৌকায় উঠিল। একটু পরে মণি কাপড়-চোপড় পরিয়া উৎফুল্লভাবে আসিয়া লাফ দিয়াই নৌকায় উঠিল—ছোট নৌকা তার পদভরে দুলিতে লাগিল, পরশমণি সহাস্যে বলিলেন, আস্তে রে, আস্তে, নৌকো ডুবোবি না কি?

আর আস্তে, মণি মস্তবড় প্রমোশন পাইয়াছে, এত বড় একটা গুরু দায়িত্বভার তাহাকে দেওয়া এই প্রথম। ছোট খুড়িমাকে বাপের বাড়ী পৌছিয়া দিতে হবে। ছোট খুড়িমা নিজেই তার হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন। পদ-মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়া মাঝি গৌরবে স্ফীত, আদেশের স্বরে বলিল, মা, বড়-মা, তোমরা নেমে যাও, আর দেরী করলে চিলহাটি পৌছুতে রাত হয়ে যাবে, কাল আমার স্কুল আছে না? তোমরা কিছু বোঝ না, নামো, শীগগির নামো।

দুই জায়ে বাহির হইল, আনতমুখে ঘাটে নামিয়া দাঁড়াইল, নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা সরিয়া সরিয়া দূরে যাইতে লাগিল তবু পঞ্চমীকে দেখা যাইতেছে, ছইয়ের সামনে বসিয়া অপলক চক্ষে এই দিকে চাহিয়া আছে।

সরলা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, বড়বৌ মেজবৌ অন্দরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু নৌকা একেবারে অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত সরলা একভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

পর দিন বেলা গোটাদশেক হইবে, বিশাল বাহির আঙ্গিনায় বসিয়া স্তূপাকার নারিকেলগুলি হইতে একটা একটা করিয়া খোলা ছাড়াইয়া চাঁচিয়া পরিষ্কার করিতেছে, ছেলে মেয়েরা জ্যেঠার চারিদিক্ ঘিরিয়া বসিয়াছে। শ্যামল তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটী বিশালের হাতে দিয়া আর একখানা দা লইয়া নারিকেল ছাড়াইতে বসিল।

'শ্যামল, নৌকো আসে কার? শ্যামল ফিরিয়া বলিল, 'কি জানি, বলতে পারিনে।'

নৌকা ঘাটে না লাগিতেই মণি লাফাইয়া নামিল। বিস্মিত হইয়া বিশাল বলিল, 'তুই গেছলি কোথায়?'

'ছোট খুড়িমাকে রেখে এলাম।'

'কাকে?'

'চিলহাটির খুড়িমাকে চিলহাটিতে রেখে এলাম।'

'বলিস কি?'

'হ্যাঁ, আমার ইস্কুলের বেলা হয়েছে, যাই।'

'শোন্, শোন্, কি বললি?'

'যা বললাম তাই, আর দেরী করতে পারিনে।' জ্যেঠার আদুরে ছেলে মণি তিন লাফে বাড়ীর ভিতরে প্রস্থান করিল।

বিশালের প্রসন্ন চেহারায় যেন ঝড় উঠিল, হতবুদ্ধি শ্যামলের দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, 'আমরা বেঁচে আছি না কি? চল্ দেখি—'

পরশমণি তরকারী কুটিতে বসিয়াছেন, বিশাল ডাকিল, 'মা, চিলহাটীর ছোট বউ চলে গেছে?'

মা বলিলেন, 'হ্যাঁ কাল বৈকালে।'

'তা বুঝলাম কিন্তু কেন গেল? আর আমাদের জানাগুনি কেন? কে পাঠালে তাকে?'

মা ছেলেদের দিকে চাহিলেন, এক ছেলে নির্ব্বাক হইয়া আছে, আর এক ছেলে সরোষে গম্ভীর মূর্ত্তি ধরিয়া প্রশ্ন করিতেছে, যা কোন দিন পরশমণি দেখেন নাই। তবু তিনি দমিলেন না, দিব্য সহজ ভাবে বলিলেন, 'পাঠাবে আবার কে? নিজেই গেল, মণিকে বললে, মণি নিয়ে গেল। গিয়েছে ভাল হয়েছে, দু সতীন একত্তর বাস করতে পারে?'

'সে কথা বলিনি, বলছি যে আমাদের আসা পর্য্যন্ত সবুর সইল না? একবার আমাদের জানানও হল না কেন? রাত্রে কেউ বললে না কেন এ কথা?'

'নিশুতি রাতে খেটেখুটে এলি, কে এমন জবর খবর সাত তাড়াতাড়ি দিতে যাবে? বড়-বিবি মেজ বিবি ত' নিজেরাই নৌকায় তুলে দিয়ে এল ঘটা করে। তা তোদের বলেছে, কি না বলছে, আমি কি জানি? আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই, সারা রাত্তিরই তো ফুসফাস শুনতে পাই, চোখে দেখিনে বলে কি কানেও শুনি নে? বিবিরা কেন বলেনি তা তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর গে যা, আমার ওপর কেন রে বাপু?'

'কি বড়-বৌ—মেজ-বৌ, তা হলে বড়-বৌকে আজই এ বাড়ী ছাড়তে হচ্ছে।'

শ্যামল লুপ্ত বাক্‌শক্তি সহসা ফিরিয়া পাইয়া দাদার সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, 'আমিও মেজ-বৌকে এক্ষুণি রওনা করে দিচ্ছি বাপের বাড়ী।'

হঠাৎ অর্দ্ধাবগুণ্ঠনা সরলা রান্না-ঘর হইতে চৌকাঠের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখ ঘরের দিকেই ফিরানো, ভাল দেখা যায় না। ধীর ও নীচু সুরে শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'মা বলুন না কেন সত্যি কথা বলুন, পাঠিয়েছি আমি, আমি ছাড়া কে পাঠাবে তাকে? আর কার গরজ আছে? আমিও এ বাড়ীতে ভেসে আসিনি; সতীন নিয়ে ঘর করতে নাই যদি পারি কার কি বলবার আছে? এ নিয়ে যদি আর একটা কথাও আমার শুনতে হয় মা, সত্যি বলছি ছেলে-দের হাত ধরে ঐ ঘাটে গিয়ে জন্মের মত ডুব দেব।'

কথাগুলির সুর নীচু হইলেও অতি তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট, দুই ভাই একেবারে নত শির ও নীরবে ফিরিয়া আসিয়া যে যার শয়নঘরে প্রবেশ করিল। যে কথাটা বিশাল জোর করিয়া বলিতে গিয়াছিল যে, ছোট বৌমাকে আমি এখনই ফিরিয়ে আনতে যাব—সে কথাটি মনেই রহিয়া গেল, মুখে উচ্চারণ করিবারও সাধ্য হইল না।

সমস্ত দিনটা যে কি ভাবে কাটিয়া গেল, তাহা সরলা ও পরশমণি ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারিবে না। দুপুর বেলা শ্যামল অনেক আগেই স্কুলে যায়, পরে সুখেন ও বিশাল খাইতে বসে। সুখেনকে ছাড়িয়া বিশাল কোনও দিনই খাইতে আসে না, কোথাও গেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া অপেক্ষায় থাকে। রাত্রে একেবারে বাঁধানিয়মে তিনজনে একত্র বসে। কিন্তু আজ কে যে কোথা দিয়া আসিয়া এক কোণে চোরের মত বসিয়া খাইয়া উঠিল, বাড়ীতে থাকিয়াও পরশমণি তাহা টের পাইলেন না। যেন কি একটা ভয়ানক দুষ্কার্য্য হইয়া গিয়াছে, সেই কারণে নিজেদের মধ্যেও পরস্পরের মুখ দেখা-ইতে লজ্জা হইতেছে, গতিবিধি চোরের মতই ভীতি-কুণ্ঠাজড়িত, শুধু সরলা সুদক্ষ নাবিকের মত আকস্মিক ঝড়ে বিপর্য্যস্ত সংসারটির কর্ণ দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহিয়াছে! সুখেনকে সারা দিনে অবশ্য দু তিনবার দেখা গিয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। বাড়ী নিস্তব্ধ, শিশুকণ্ঠ ভিন্ন অন্য সাড়াশব্দ নাই। বাহিরের ঘরের দরজা শিকল বন্ধ, প্রতি-বেশীরা আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

রাত্রি হইল। ঘরে ঘরে আলো জ্বলিল, আলোও যেন ম্লান, ভয়চকিত। সকলের আগে আসিয়া শ্যামল আসিয়া খাইয়া গেল। বিশাল অসুস্থ হইয়াছে বলিয়া উঠিল না। সরলা কাজ-কর্ম্ম সারিয়া সুখেনের খাবার নিজের ঘরে লইয়া গেল।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মেজ-বৌয়ের ঘরে আলো জ্বলিল। দরজা বন্ধ, জানালা দিয়া দেখা গেল, মেজ-বৌ ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া কি সব কাজ করিতেছে—শ্যামলও বিছানায় বসিয়া আছে। বিশালের ঘর অন্ধকার ও নিঃশব্দ। অভ্যাস মত পরশমণি একবার দুই ঘরের কোণায় কোণায় সতর্কভাবে ঘুরিয়া দেখিয়া আসিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ভোর বেলা, ঠিক ভোর নয়, ঘণ্টাখানেক রাত্রি আছে—শ্যামলের ডাকে বিশালের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া দরজা খুলিয়া বিশাল বাহির হইয়া বলিল—'কি রে?'

'দাদা আমি এদের নিয়ে দোগাছি যাচ্ছি একবার'—বলিয়া

শ্যামল বিশালকে প্রণাম করিল—মেজ-বৌ পিছন হইতে আসিয়া দূর হইতে বিশালকে প্রণাম করিল। বিশাল বলিল, 'মণিও যাচ্ছে না কি ?'

'না তার স্কুল কামাই করাব না—তবে আসি।'

দুইজনে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া ও নির্জ্জনতার মধ্য দিয়া নৌকায় গিয়া উঠিল, ছেলে-মেয়েদের উঠাইয়া আগেই নৌকায় রাখিয়া আসিয়াছে।

মেজ-বৌ তো পালাইয়া বাঁচিল। বড়-বৌ সেই বহুদিন আগেকার মত অতি ভোরে শয্যা ত্যাগ করিল। শ্যামলরা যাইবার পর বিশাল আর শোয় নাই, বিছানায় বসিয়া ধূমপান করিতেছে। একবার বলিল, 'শ্যামলরা যে যাবে তুমি জানতে কি ?'

'হ্যাঁ নিরু রাত্তিরেই আমাকে বলেছিল।'

কথার শব্দ নিজেদের কাণে আসিয়া বাজে, মন এতই নির্জ্জনতার প্রয়াসী। কঠোর সংসার, নিজের পাওনা বুঝিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে, নিস্তার কোথায় ?

সকাল বেলায় সরলা সব জানিতে পারিল। বড়-বৌকে বলিল, দিদি এর মানে কি ? মেজ-দি না বলে কয়ে এমন করে চলে গেল কেন ? এত টান ? তা তাকে নিয়ে ঘর করলেই হ'ত ? আর কি ফিরতে হবে না এখানে ? বাপের বাড়ীতে চিরকাল কুলোয় না—ও যে যতই গল্প করুক—'

বড়-বৌ নীরবে উঠান ঝাঁট দিতেছে,—পঞ্চমী আসার পরে এ সব কাজ আর করিতে হয় নাই। অনভ্যস্ত হাতে ঝাঁটা ঠিক আগের মত চলে না।

সরলা বক্র কটাক্ষে বড়-বৌয়ের নত মুখ দেখিয়া লইয়া বলিল, 'আচ্ছা দিদি, সে ক'দিনই বা ঘর করেছিল—তাই তার ওপর তোমাদের এত মায়া ? আর আমি এত বছর সুখে-দুঃখে, মিলে-মিশে তোমাদের সঙ্গে এক হয়ে রয়েছি—কৈ আমার ওপর তো তোমাদের এতটা নয় ? এক মা ভিন্ন এ সংসারে দেখছি সব সমান—'

বড়-বৌ কোন কথাই বলিল না—কথা বলিবার মত মনের অবস্থা নয়, ঝাঁট দিতে দিতে রান্নাবাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

রুদ্ধ আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে ঘরের পৈঠায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সরলা চুলের বেণী খুলিতে লাগিল। শত্রু দূর হইয়াছে বটে—কিন্তু তার প্রভাব যায় কই ? শুক্লা পঞ্চমীর ক্ষীণ আলো যে দিবা দ্বি-প্রহরের প্রখর রোদকেও ছাড়াইয়া উঠিতে চায়।

চুল খুলিতে খুলিতে ফিতাটা বেণীর সঙ্গে গিরো বাঁধিয়া আটকাইয়া গেল, ধৈর্য্য ধরিয়া গিরো খুলিবার সময় সরলার নাই—একটানে নূতন ফিতাটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। ব্যর্থ প্রসাধন ! ব্যর্থ এই বেণী গাঁথা,—কাল সন্ধ্যায় সরলা কত না আশা মনে গাঁথিয়া চুল বাঁধিয়াছে—গা ধুইয়া তাঁতের মিহি কালাপাড় শাড়ীটি পরিয়া সুখেনের অপেক্ষায় জাগিয়া বসিয়া পান সাজিতেছিল, গহনাগুলি বৈকালেই রিঠার জলে ধুইয়া চক্‌চকে করিয়াছিল। কিন্তু সব নিষ্ফল, কত রাত্রে সুখেন আসিয়াছে, সে জানেই না—ছেলের কান্না থামাইতে বিছানায় আসিয়া শুইয়া ছিল, কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোখ চাহিয়া দেখে, সুখেন বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। সামনা সামনি পড়িলেও না হয় দু' একটা কথা চলে—কিন্তু পঞ্চমী যাওয়ার পরে সুখেনের সঙ্গে বলিতে গেলে সরলার দেখাই হয় নাই। এর চেয়ে পঞ্চমী এখানে থাকিতেই ছিল ভাল। তা বলিয়া সরলা সেই অবস্থাটা আর ফিরিয়া চায় না। ক'দিন কথা না বলিয়া পারিবে ? সরলা কানু ভানুর মা নয় ? যে কানু ভানু সুখেনের প্রাণ ! কৈ এত সোহাগের সুয়োরাণী ত' এ পর্য্যন্ত একটা মেয়েও দিতে পারিল না স্বামীকে,—এমন চাঁদের মত ছেলে দূরে থাক।

৩৫

'কথায় কথায় অভিশাপ !'

অনেক রাত্রে বড়-বৌ ঘরে আসিল। পরশমণিকে হাতে ধরিয়া বিছানায় রাখিয়া আসিতে হয়—বড়-বৌকে তিনি ছোঁন না এখনও—কিন্তু বারান্দায় বসিয়া ঘুমে ঢুলিয়া পড়িতেছিলেন—সরলা সকাল সকাল ঘরে গিয়াছে আর বাহির হয় নাই। অগত্যা বড়-বৌ তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া ঘরে লইয়া গেল—ঘুমের ঘোরে পরশমণি টের পাইলেন না যে কে, শুধু বলিলেন, 'দরজাটা টেনে দিয়ো ভাল করে—'

বড়-বৌ মনে ভাবিল, এ রকম একা থাকা ভাল নয়—বিশালের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কিন্তু ঘরে আসিতে আসিতে ভুলিয়া গেল, সমস্ত বাড়ীটা শূন্য—মেজ-বৌয়ের ঘর শিকল বন্ধ—তালা দেওয়া। তার ছেলে-মেয়েরা বাড়ীটাকে খালি করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তবে সমস্ত অভাব ডুবিয়া গিয়াছে এক লক্ষ্মীর তিরোধানের মহা শূন্যতায়। সেই ম্লান মধুর ছায়াটি আজ বাড়ীর কোথাও নাই—কোন দিক হইতেই মৃদু পদে আসিয়া মধুর স্বরে 'দিদি' বলিয়া ডাকিয়া উঠিবে না,—

বিশাল বড়-বৌকে লক্ষ্য করিতেছিল, নিত্যকার পানের ডিবাটি টুলের উপর রাখিয়া বিছানার এক কোণে বড়-বৌ চুপ করিয়া বসিয়া আছে—চোখ দুটি খোলা জানালার দিকে।

বিশাল ধীরে ধীরে বড়-বৌয়ের হাতখানা চাপিয়া ধরিল, বলিল, 'বড় কষ্ট হচ্ছে স্বর্ণ? যাবে কোথাও?'

বিশালের দিকে না চাহিয়াই বড়-বৌ বলিল, 'কোথা যাব?'

'যেখানে হোক্—অন্ততঃ এখান থেকে দুটো দিনের জন্যেও চলে যাই। নবদ্বীপ যাবে? সেখান থেকে আসবার সময় আত্মীয় কুটুম্ব যাঁদের বাড়ী পথে পড়বে—দেখা-শুনো করে আসব.—'

'তাই চল, যাবার সময় গুরুদেবকে দর্শন করে যাওয়া যায় না?'

'তা যায়—কালই গোছগাছ করে নাও।'

'কাল? মেজ-বৌ নেই, একা সরলা, কাজকর্ম্ম—'

অসহিষ্ণু হইয়া বিশাল বলিয়া উঠিল, 'চুলোয় যাক কাজ-কর্ম্ম! চল আমরা চলে যাই।'

'তাই চল'—বলিতে বলিতে বড়-বৌয়ের চোখ দুটি জলে ভাসিয়া গেল।

এমন একটা মুখরোচক ও অপূর্ব্ব কথা এক বেলার মধ্যে পাড়ায় ছড়াইয়া পড়িল। সকালে বিশাল রায়-বাড়ীর বৈঠকখানায় কথাটা বলিয়াছিল। তাহার ঘণ্টা দুই পরে দত্ত-গিন্নী পাল-গিন্নীকে ঘাটে বলিতেছিলেন, 'শুনেছ মামী? বিশু বড় বৌকে নিয়ে হাওয়া খেতে চলল।'

পাল-গিন্নী কলসী মাজিতে মাজিতে বলিলেন, 'আহা তা যায় যাক, দুদিন জিরিয়ে আসুক—জন্মে অবধি বৌটা আরামের মুখ দেখলে না।'

'না মামী আজকাল তা নয়, বিশু এখন বৌ-সর্ব্বস্ব, না হবে কেন, অমন লক্ষ্মী বৌ কটা আছে? হাঁা, আর ঐ ছোটটা বাঁশতলায় বসে থাকত মামী—যেন সেই অশোক বনে সীতা, আহা কি করে বিদায় করলে তাকে, বাছা চক্ষের জলে ভেসে নৌকায় উঠল, কিছুতে যাবে না, জা দের, সতীনের কাছে কত মিনতি, শাশুড়ীর পায়ে পড়ে কত কাঁদলে, তবু কারো মন ভিজিল না। গিরি তখন ও বাড়ী, সেদিন কিছু আর মুখে তুললে না কেঁদে কাটালে।'

'যেতে দাও, পাপের ফল ভুগতেই হবে একদিন। সতীন কি এতই হেলা ফেলার? আগে আগে সতীন নিয়ে সবাই প্রায় ঘর করত, আজকাল না হয় এক-বৌ সার হয়েছে। কি শক্ত মেয়ে সরলা!'

দত্ত গিন্নী যেমন সহৃদয়া, তেমনই রসিকা। বলিলেন, 'তা এটা কিন্তু নতুন মামী, যাই বল! এক-বৌ নিয়ে কেউ কখন বাড়ী থেকে বেরোই নি, বিশু নতুন পথ দেখালে সায়েব বিবিদের মতন।'

সুখেনের কাণে নানাভাবে কথাটা বার বার উঠিল। অবশিষ্ট পাটগুলি বেচিয়া ফেলিতে সে আজ বাহির হইবে ঠিক করিয়া সকাল সকাল স্নান করিতে আসিয়াছে, বিশালের ঘরের মধ্যে কানু ভানুরা হৈচৈ বাধাইয়াছে—বিশাল একটা মাঝারি গোছের বিছানা বাঁধিতেছে দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত সুখেন উঠানে থমকিয়া দাঁড়াইল, তার পরে আগাইয়া আসিয়া বিশালের ঘরের পৈঠায় এক পা তুলিয়া দিয়া বলিল, 'দাদা!'

বিশাল ঘরের ভিতর হইতেই জবাব দিল, 'কেন?'

এ প্রত্যুত্তর সম্পূর্ণ নূতন। সুখেনের ডাক শুনিলে বিশাল সাগ্রহে বলিয়া উঠে, 'কেন রে?' হাতে কাজ থাকিলে বলে, 'আয় এখানে', আর কাজ না থাকিলে নিজেই উঠিয়া আসে। আজ এ দুয়ের একটাও করিল না।

সুখেনের অন্ধকার মুখ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিল। রুক্ষ মুখের চেহারা দ্বিগুণ রুক্ষ ভাব ধরিল। আর এক পা উঠিয়া বলিল, 'তুমি কি করছ?'

'বিছানা বাঁধছি।'

'ওঃ যা শুনলাম তবে সবই সত্যি? আমি বিশ্বাস করিনি কারো কথা—সত্যি বড়বৌকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যাচ্ছ?'

বিশাল কথা কহিল না।

স্বাধীনতার শান্তিজল

"সর্ব্ব দুঃখ কষ্ট সর্ব্ব ব্যাধির কারণ—
নির্ম্মূল হইয়া করে রোগ নিবারণ।"

বিশাল মাকে প্রণাম করিল, ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, 'এস।'

'সে কি রে? কোথা যাস? মুখে জলটুকু পড়েনি যে? পাগল হলি না কি?'

বড়-বৌ বাহির হইয়া আসিল, শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া মৃদু স্বরে বিশালকে বলিল, 'সরলাকে একবার বলে আসি।'

সে ক্ষীণ স্বর বিশালের প্রবল কণ্ঠের মধ্যে ডুবিয়া গেল, 'যাও নৌকায় ওঠগে, কোথাও যেতে হবে না বলতে।'

বড়-বৌকে সঙ্গে লইয়া বিশাল বহির্ব্বাটিতে আসিল এবং কোন দিকে না চাহিয়া নৌকায় উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

পরশমণিও পিছনে পিছনে আসিয়াছেন। নৌকা তখন খানিক দূর চলিয়া গিয়াছে—সরলা ব্যস্ত ভাবে আসিয়া বলিল, 'এ কি মা, এমনি করে ওঁরা চলে গেলেন? আমায় কেন ডাকলে না? কি কাণ্ড হল! এই ভর-দুপুরে না খেয়ে? বটঠাকুর যে স্নানও করেন নি?'

'ও আমার কপাল—যে ডাইনীর হাতে পড়েছে বিশু। দূর হোক অমন ছেলে—ছাইকপালী আমার কাছ থেকে একেবারে ছিনিয়ে নিয়েছে ওকে—হে ভগবান্, হে ভগবান্ এ-দপ্পের শোধ তুমি দিও, পোড়াকপালী যেন পথে পথে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়—'বলিতে বলিতে কপালে করাঘাত করিয়া পরশমণি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। আর সরলা নৌকার দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

৩৬

'আমি মূর্খ—সর্ব্বনাশ করেছি আমার—'

এক গাদা কাপড়-চোপড় কিনিয়া সুখেন দাম মিটাইয়া দিতেছে, পিছন হইতে কে তাহার কাঁধে হাত দিল—ফিরিয়া দেখে বিমান, পঞ্চমীর জ্ঞাতি-ভাই।

'হয়েছে? এখন এস দেখি হাটের দিন সেই সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করি—একটা দিনও তোমার টিকিটি দেখতে পাইনি—আজ ধরেছি।'

দুই জনে হাটের লোকজন ও গোলমালের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসিল। বিমান বলিল, 'আর কিছু কিনবে কি? না সব হয়ে গেছে?'

'না কিছুই হয়নি, আমি এই সবে আসছি, এখনও ঢের জিনিস কিনতে বাকী।'

'আচ্ছা তবে কিনে নেবে চল, কিন্তু আজ একবার যেতেই হবে—পঞ্চুর বড় অসুখ।'

'অসুখ? কি অসুখ?'

'জ্বর, তোমাদের ওখান থেকে এসেই শরীরটা ভাল যাচ্ছে না—হাটের দিন দরকার না থাকলেও তারই তাগাদায় এসেছি, কিন্তু ব্যাপার কি বল দেখি বাড়ীর কি কিছুই দরকার হয়নি এত দিন?'

'একে-ওকে দিয়ে হাট করিয়েছি এতদিন—আজ কাউকে পেলাম না—জিনিসপত্রও কিনতে হবে অনেকগুলো, তাই নিজেই এলাম। কি করে আসি? এ পথে পা বাড়াতে আমার মুখ নেই বিমান, তোমাদের কারো সঙ্গে আমার দেখা হয় এ আমি চাইনে বলেই আসিনি।'

'থাক্ থাক্, ও-সব পঞ্চুর কাছে গিয়ে ব'লো, আমি শুধু তোমায় পৌঁছে দিয়েই খালাস। বেলা নেই আর, চল কি কিনবে কিনে নাও।'

'না আর কিছু কিনব না আজ চল, তুমি কিছু কিনবে কি?'

'না, আমার শুধু তোমায় খুঁজতে আসা।'

'আচ্ছা দাঁড়াও', বলিয়া সুখেন কাপড়ের পুঁটলীটা এক দোকানে রাখিয়া আসিয়া বিমানের সঙ্গে চিলহাটির পথ ধরিল।

আলো-ছায়াময় সংসারের রহস্য অতি বিচিত্র! চাঁদের জ্যোছনায় বসিয়া দিনের প্রখর রোদের চিন্তাও বিরক্তিজনক বোধ হয়, আবার সূর্য্যালোকের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নায় মায়া মধুরতা কোথায় মিলাইয়া যায়, তখন দিবসের তীব্র দীপ্তিই মনে হয় জাগ্রত সত্য। সরলা সুখেনকে আজ জোর করিয়া হাটে পাঠাইয়াছে। কারও কাপড় নাই, কানুর শ্লেট ও পাটীগণিত চাই, ভানুর ইয়ার্লি একজামিন্ হইয়া গিয়াছে—ক্লাসে উঠিয়া এ পর্য্যন্ত সহপাঠীদের বই দিয়াই চালাইতেছে, নূতন বই আজও কেনা হয় নাই, নারুর জন্য এক কৌটা লিলি বিস্কুট লাগিবে, আর এক কৌটা বার্লী ও সূঁচি তৈরী করিবার চুয়া। নূতন যে কাঁথাখানি সরলা জুড়িয়াছে—সেখানা একখানা দেখিবার জিনিস হইবে—কত রকম ছবি,

লতা, ফুল, পাতা আঁকা ; নানা রংয়ের সুতা চাই, আপাততঃ লাল ও সবুজ রংয়ের সুতাই বেশী দরকারী—সরলা নমুনা সুখেনের পকেটে দিয়া দিয়াছে।

রুমালে বাঁধা টাকা-পয়সা পকেটেই রহিল। সুখেনের মন একেবারে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে ঘুরিয়া গিয়াছে।

শীতের বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে চিলহাটি পৌছিল। বর্ষার বিপুল বিস্তারময়ী নদী এখন শুষ্ক শীর্ণকায়া। খেয়া নৌকায় নদী পার হইয়া বিমান বলিল, 'চল আমাদের বাড়ী, আমি একবার খবর দিয়ে আসি।'

'তাই চল'। সহসা মুখোমুখী দাঁড়াইবার সাহস সুখেনের নাই, বিশেষ করিয়া শাশুড়ীর। আগে জানিতে পারিলে তিনি যে সুখেনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁসিবেন না,সে কথা সুখেন ভাল রকমই জানে।

নিজেদের বৈঠকখানায় সুখেনকে রাখিয়া বিমান চলিয়া গেল এবং মিনিট দশ পনের পরে আসিয়া বলিল, 'এস'।

সেই বাড়ী, সেই ঘর। ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কপাট ভেজান, বিমান বলিল, 'যাও, ঘরে যাও।'

চোরের মত সুখেন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিল, বিছানায় শুইয়া পঞ্চমী দরজার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সুখেনকে দেখিয়া সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া বলিল, 'এস আমার কাছে ব'স—'

ধীরে ধীরে সুখেন আসিয়া দাঁড়াইল। 'এইখানে আমার কাছে ব'স' বলিয়া পঞ্চমী সুখেনের হাত ধরিয়া বসাইল।

'কি ঠাণ্ডা তোমার হাত! পা তুলে ভাল করে ব'স; এতখানি পথ এই ঠাণ্ডায় হেঁটে এলে, হাত-পা হিম হয়ে গেছে, আগুনের মালসাটার ওপর পা দুটি ধর না, এখুনি গরম হয়ে যাবে। বড্ড শীত পড়েছে বলে মা সন্ধ্যা হতেই ঘরে আগুন রাখেন।'

'না আমার তেমন শীত লাগে নি', বলিয়া সুখেন বালিশে ঝুঁকিয়া হাতের উপর ভর দিয়া পঞ্চমীর কপালের চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, 'কতদিন হল অসুখ করেছে? একখানা চিঠি দাওনি কেন?'

'চিঠি দেব কেন? তুমি একদিনও এলে না কেন? আমার রাগ হয় না বুঝি? পাঁচ ছ'মাস এমনি করে থাকে?'

রাগের কোন আভাস পঞ্চমীর মুখে নাই, প্রফুল্ল মুখ, চঞ্চল কালো চোখ, শুধু মুখের গোলাপী আভাটি রোগে পূরণ করিয়া লইয়াছে।

'আমি কি আসবার মুখ রেখেছি? তুমি কেন আমায় দেখতে চাও? এত লাঞ্ছনায়ও তোমার আক্কেল হয় না? এই তোমার উপযুক্ত, পঞ্চমী, তোমার মতন মানুষের এ লাঞ্ছনা অপমানও যথেষ্ট নয়—'

বলিতে বলিতে সুখেনের চোখের কয়েক ফোটা জল ঝরিয়া পঞ্চমীর চোখে মুখে পড়িল। সে অশ্রু আগুনের মত উষ্ণ। নিজের কাপড়ের আঁচলে সুখেনের চোখ মুছাইয়া দিয়া পঞ্চমী মৃদু মধুর স্বরে বলিল, 'লাঞ্ছনা আবার কি? বড়দি কত সয়েছেন জান না? দত্তদের বড়-বৌ কি না সয়েছে? আমার বেশী কি এমন? তবে সতীনকে কোথায় কে ভালবাসে বল? তুমি অমন ধারা কর না, আমি যদি কষ্ট না পাই তোমার কি? কষ্ট আমার শুধু তোমাকে দেখতে পাইনে বলে।'

সুখেন মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না।

৩৭

'নাথ! নাহি চাহি রাজ্য ধন'

শীতের রাত্রি, চারিটা বাজিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাহিরে ঘোর অন্ধকার, পূর্ব্বদিক এখনও স্বচ্ছ হয় নাই। দুই জনে জাগিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে, সে কথার আগাগোড়া কিছু নাই, কোন শৃঙ্খলা নাই, কথার উৎস স্বতঃই উৎসারিত।

পঞ্চমী বলিতেছে, 'আচ্ছা, ছোড়দার কাছে শুনে তুমি কি ভেবেছিলে আমার খুব অসুখ?'

সুখেন উত্তর দিল, 'না, ভাবব কেন? অসুখ খুব নয় বুঝি?'

'না একটুও না, মাঝে মাঝে জ্বর হয় আর কিছু না। তবে এ অসুখটা আমার কত ভালর জন্যে তা জান?'

'না, কি ভাল বল দেখি?'

'ভাল এই যে, আমি একেবারে সেরে না ওঠা পর্য্যন্ত মা বৃন্দাবনে যেতে পারছেন না'—পঞ্চমী হাসিতে লাগিল।

সুখেন মনে মনে ভাবিতেছিল, রাত্রিটা আর ভোর না হয় এমন কোন মন্ত্র থাকিত! এই সুখের স্বপ্ন-জগৎ হইতে

timed''* টেকচাঁদের বিদ্রোহ যদিও 'his own work suffers from the exclusion but the movement was well-timed', টেকচাঁদ তাঁহার ভাষাকে সাহিত্যিক রূপ দিতে পারিলেন না, ইহা সত্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষার সহিত যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিয়া তুলিলেন তাহা সময়োপযোগী হইয়া উঠিল। বিদ্যাসাগরের ভাষা ক্রমে 'বিদ্যাসাগরী ভাষা' হইয়া উঠিতেছিল; ইহার পারিপাট্য ও সংস্কার সাধন করিয়া ইহার মধ্যে নববেগ সঞ্চার করিবার জন্য অর্থাৎ ইহাকে আরও প্রাঞ্জল ও সর্ব্বচারী করিয়া তুলিবার জন্য ইহার সহিত কতটুকু মিশ্রণ ও বর্জ্জনের প্রয়োজন তাহার সময় হইয়া আসিয়াছিল এবং এই মিশ্রণ ও বর্জ্জনের জন্য বিদ্যাসাগর-বিরুদ্ধ একটা ভাষা-স্রোতের প্রয়োজন ছিল। সেই প্রয়োজন সাধিত হইল টেকচাঁদের আবির্ভাবে। সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের ভাষার বহু দোষ সত্ত্বেও ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, টেকচাঁদের ভাষা তাঁহার সজাগ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষারূপকে স্বীকার করিয়া লইয়াও টেকচাঁদের ভাষাকে সাদরে গদ্যভঙ্গীর মধ্যে বরণ করিয়া লইয়াছেন, ইহার কারণ কি? বঙ্কিম বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলিতেছেন, "ইহাঁদের ভাষা (বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার) সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং পরেও কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজনবোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার ভাষা ইহাতে ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইতেন না, কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।"† বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অগ্রাহ্য করেন নাই, অপিচ ইহার মনোহারিতায় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি ভাষার একটু বৈচিত্র্য চাহিয়াছিলেন, অথবা ভাষাকে এক সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যে রাখিতে চাহেন নাই—ভাষাকে আর একটু নমনীয় (flexible) করিবার মানস করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ভাষাকে "সর্ব্বজন-বোধগম্য" করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই জন্যই টেকচাঁদের ভাষার গ্রাম্যতা ও তরলতাকে বিশেষ নিন্দনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। টেকচাঁদের মানসভঙ্গীর সহিত, অর্থাৎ টেকচাঁদ যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চায় মন দেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি ছিল। বঙ্কিম টেকচাঁদের মতই অতি সহজ ও সরল ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতি ছিলেন।‡ প্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার—পরে সময় মত সাহিত্যিক ভাষার মধ্য দিয়া সাহিত্য প্রচার করিলেই চলিবে, টেকচাঁদ ও বঙ্কিম উভয়েরই এইরূপ কামনা অন্তর্নিহিত ছিল।

বিদ্যাসাগর সহজ সরল ভাষায় সর্ব্বসাধারণের জন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচলন চাহিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তাঁহার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি কিছুতেই ভাষার ক্লাসিক্যাল গঠন ও সৌষ্ঠব নষ্ট করিতে স্বীকৃত ছিলেন না। ভাষার ক্লাসিক্যাল গঠন ও সৌষ্ঠবের মধ্যে যতটুকু ভালো ভদ্রভাবে চলিতে পারে, তাহার বেশী স্বাধীনতা দিতে তিনি স্বীকৃত ছিলেন না। বিদ্যাসাগর ভাষা সম্বন্ধে যতটুকু স্বাধীনতা স্বীকার করিতেন, তাহা যেন ইংরেজ লিবারাল দলের ডিমোক্রাসির মত, ডিমোক্রাসি আছে কিন্তু ইংরেজ অভিজাতের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিয়া ডিমোক্রাসি পংক্তি ভোজনের দাবী পায় নাই, আর টেকচাঁদের ডিমোক্রাসি যেন রাশিয়ার গণতন্ত্র, ইতর-ভদ্র মিশিয়া গিয়াছে। অথচ অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মত এত অতিসম্ভ্রান্ত ভাষা

* এই সমালোচনাটি কাহার বলিতে পারি না। ইহা যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত '[illegible]'র দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন হইতে পাইয়াছি। 'বঙ্গবাসী' সংস্করণেও এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইয়াছে।

† আলালের ঘরের দুলালের বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত ভূমিকা। দ্বিতীয় সংস্করণ।

‡ "যাহাতে এই পত্র সর্ব্বজনপাঠ্য হয়, তাহা আমাদিগের বিশেষ উদ্দেশ্য।" বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা—১২৭৯ বৈশাখ।

শিল্পী কি করিয়া টেকচাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন! ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিম কম আভিজাত্যবাদী ছিলেন না।

ইহার কারণ বোধ হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র আলালের ভঙ্গী ও বিষয়বস্তু, form ও matter-এর মধ্যে একটা নূতনত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কারণ, আলালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যে মৌলিক কিছু রচিত হইয়া উঠে নাই। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় উভয়েই হয় সংস্কৃত ও হিন্দী, না হয় ইংরেজী হইতে বিষয়-বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন—হয় অনুবাদ করিয়াছেন, না হয় ছায়ানুসরণ করিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবিক সাহিত্য-পিপাসা যে মিটিতে ছিল না, ইহা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় প্যারীচাঁদের মধ্যে মৌলিক একটু প্রেরণার আভাস পাইয়া আশ্বস্ত হইয়া থাকিবেন। তাই তিনি লিখিয়াছেন

"দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনি গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন, এবং তিনিই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক গ্রন্থে উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য সংস্কৃত ও ইংরেজীর কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্য লইয়া সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল।'

বঙ্কিমের এই উক্তির মধ্যে বিচার ও তথ্যের কিঞ্চিৎ ফাঁক রহিয়াছে। বলা আবশ্যক যে, বঙ্কিমের এই উক্তি আংশিক সত্য। বঙ্কিমের সময় বাঙ্গালা উপন্যাসের সূত্রপাত সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুসন্ধান হয় নাই, সেইজন্যই বঙ্কিম টেকচাঁদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আলালের ঘরের দুলালের মধ্যে বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাসের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছে ধরিয়া লইলেও আলাল হইতে বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাসের ইতিহাস আরম্ভ করা সঙ্গত হইবে না। আলাল প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। উহার বহুপূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্যে বিদ্রূপ বা শ্লেষাত্মক সামাজিক চিত্রাঙ্কনের একটা ধারা চলিয়া আসিতেছে। এই সকল সামাজিক চিত্র যে উপন্যাসের রূপ, form প্রাপ্ত হয় নাই তাহা বলাই বাহুল্য—উহাদের সবগুলিই নক্সার ছাঁচে ঢালা শ্লেষ মাত্র। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এই নৈতিক উপদেশ ও বিদ্রূপাত্মক রচনার সূত্র অবলম্বন করিয়াই আলালের ঘরের দুলালের বিষয় বস্তু দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আলাল বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উপন্যাস হইলেও উহার আবির্ভাব আকস্মিক নয়। যে পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি ও সাহিত্যিক প্রেরণা এতদিন পর্য্যন্ত সামাজিক ব্যঙ্গ-চিত্রে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল, বিদেশী দৃষ্টান্তে সেই শক্তি এবং অনুভূতি আলালের ঘরের দুলালে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

প্যারীচাঁদ মিত্র সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর ঘরের কথা লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ইহা সত্য বটে, কিন্তু ঘরের যে উপাদান লইয়া তিনি তাহাকে রূপ, form দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের আবিষ্কার নয়। তাঁহার পূর্ব্বেই বাঙ্গালা দেশের সাময়িক সাহিত্যে এ বিষয়ে অবতারণা হইয়া গিয়াছে। এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে আলাল বাঙ্গালা সাহিত্যে যেমন একটি নূতন genre এর প্রথম প্রকাশ, অন্যদিকে একটি পুরাতন সাহিত্যিক ধারারই পরিণতি মাত্র, শুধু তাহাই নয়, পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যের সহিত আলালের যোগসূত্র আরও নিবিড়।*

তাহা হইলে আমরা কি ধরিয়া লইব যে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না? যে বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য, তাঁহার সম্বন্ধে এ কথা কি করিয়া নির্ব্বিবাদে বলা চলে? আসলে বঙ্কিমচন্দ্র সেই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত পরিচিত ছিলেন—এবং ভাল করিয়াই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ও কিছু পূর্ব্বে পত্রিকার মধ্যে যে ব্যঙ্গকৌতুক ও বিদ্রূপাত্মক রচনা প্রকাশিত হইত, সেইগুলির উপর

* বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাসের উপক্রমণিকা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনীরোদচন্দ্র চৌধুরী—বঙ্গশ্রী, শ্রাবণ ১৩৪০।

তৎকালীন ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতই তিনিও বিরূপ ছিলেন।

ইহা সত্য যে, নব্য সংস্কৃতিবশে সেই যুগের বাঙ্গালী এই সব নক্সা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখেন নাই। বিশেষ করিয়া সেইগুলি নিতান্তই রক্ষণশীলতার পৃষ্ঠপোষক ছিল এবং নব্য বাঙ্গালা তখন এক নূতন আলোকে নূতন পথে চলিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের মত বাঙ্গালীর মধ্যে যেরূপ স্বজাতিপ্রিয়তা লক্ষ্য করি, তাহাতে মনে হয় যে, এই সব রস-রসিকতাকে তিনি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন। কারণ, সেই সব রসিকতার মধ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন, সহজ সরল বাঙ্গালীয়ানাপূর্ণ রসের অভাব ছিল না। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমের চরিত্রের মধ্যে যে ইংরেজসুলভ নীতিবাদ ছিল, তাহাতে তাঁহাকে এই রসিকতার প্রতি বিমুখ করিয়া রাখিয়াছিল। খাঁটি বাঙ্গালী রসিকতার মধ্যেও যদি তাৎকালীন অশ্লীলতা থাকিত, বঙ্কিম তাহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনায় আমরা তাঁহার এই মনোবৃত্তির পরিচয় পাইয়াছি। এই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিম টেকচাঁদকে বাঙ্গালা সামাজিক ব্যঙ্গ-রচনার আদিগুরু বলিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অধিকন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের মত টেকচাঁদের মধ্যেও যে বাস্তবতা, realism ছিল, তাহা বঙ্কিমকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবমার্গের ও আদর্শমার্গের যে লোকে বিচরণ করিতেন, তাহার মধ্যে যদি টেকচাঁদ ও ঈশ্বর গুপ্তের বাস্তবতা, realism-এর আদর্শ না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্য প্রেরণা নিছক অবাস্তব স্বপ্নভূমিতে পরিণত হইয়া ব্যর্থ হইয়া যাইত, নিতান্ত কাঁচামাটির মত নরম, থলথলে হইয়া উঠিত।

কাব্যের মধ্যে যেটুকু, বাস্তবতা, realism ও life, জীবনের স্পর্শ নিতান্ত প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই জীবন ও বাস্তবতা, realism ঈশ্বরগুপ্ত ও টেকচাঁদের মধ্যে পাইয়াছিলেন। টেকচাঁদ ও ঈশ্বরগুপ্তের বাস্তবতা, realism এর সাধনা বঙ্কিমের মধ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

সমস্ত ব্যঙ্গ-রচনা, satire এর মূলে যে মনোবৃত্তি থাকে, টেকচাঁদের মধ্যেও তাহাই ছিল। অর্থাৎ, সামাজিক সংস্কারের মনোবৃত্তি শুধু আলালের ঘরের দুলালে নহে, টেকচাঁদ তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের মধ্য দিয়াই নীতি প্রচার ও সমাজ সংস্কার করিতে চাহিয়াছেন এবং এই নীতি প্রচার ও সংস্কারের মধ্যে তাঁহার কোন art বা আর্ট ছিল না। ব্যঙ্গ রচনা satireকে আর্ট হিসাবে ব্যবহার করিবার যে একটা সাহিত্যিক রীতি বা form আছে, তাহা টেকচাঁদের আয়ত্ত ছিল না। তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা, satire সেই জন্য কোথায়ও সজ্ঞানভাবে তীক্ষ্ণ ও urbanity-র স্পর্শ লাভ করিতে পারে নাই। যেখানে তাঁহার ব্যঙ্গ অকস্মাৎ তীক্ষ্ণ ও urbanity-র স্পর্শলাভ করিয়াছে—যেমন ঠকচাচার সৃষ্টিতে, সেখানে টেকচাঁদ সজ্ঞান ভাবে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার অজ্ঞাতেই ঠকচাচা অকস্মাৎ স্বপ্নস্থানের মধ্যেই শিল্পীর অবজ্ঞাত চেতনার ভিতর দিয়াই জীবন্ত ও সৃষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ব্যঙ্গ রচনা, satireকে আর্ট হিসাবে ব্যবহার করিয়া টেকচাঁদের পূর্ব্বে মাত্র এক জন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—তিনি ঈশ্বর গুপ্ত; আর টেক-চাঁদের পরে যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি শুধু ব্যঙ্গ-রচনা, satire-এর আর্টেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তাহা নয়, তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা, satire বহু স্থানেই, সাহিত্যিক পরিভাষায় যাহাকে 'হিউম্যর' বলে, সেই পর্য্যায় দিয়া অপূর্ব্ব ভাবে এক নূতন রসের দ্বার খুলিয়া ধরিয়াছে—যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'।

টেকচাঁদের মধ্যে একটি অপূর্ব dramatic instinct ছিল, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন কি না, সন্দেহ আছে। শৃঙ্খলাবিহীন বিচিত্র চিত্র তাঁহার চোখের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইয়াছে এবং সেই চিত্রগুলিকে তিনি নিতান্ত শিশুর মতই নির্ব্বিবাদে দেখিয়া কৌতুক অনুভব করিয়াছেন। রস-সৃষ্টির জন্য সেই বিশৃঙ্খল চিত্রজগৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার, কোন চিত্রকে ভাল করিয়া এবং কোন চিত্রকে একেবারে অবজ্ঞা করিবার জন্য যে দৃষ্টির প্রয়োজন, সে জন্য তাঁহার খেয়ালই ছিল না। চোখের সম্মুখে বিচিত্র চিত্রশালা দেখিয়া তিনি এতই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, স্থানে স্থানে গল্প বলিবার জন্য যে অনিবার্য্য সূত্রটিকে সম্বল করিয়া তিনি সেই চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছেন তাহা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন।

ইহা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে নাটকীয় বিচ্ছিন্নতা, objectivity লইয়া একটু বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবনকে দেখিবার জন্য তাঁহার যে প্রবণতা লক্ষ্য করি, তাহা সেই যুগে বাস্তবিকই বিরল।

"বৈদ্যবাটির বাজারের পশ্চিমে কয়েকঘর নাপিত বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে একজন বৃষ্টির জন্য আপন
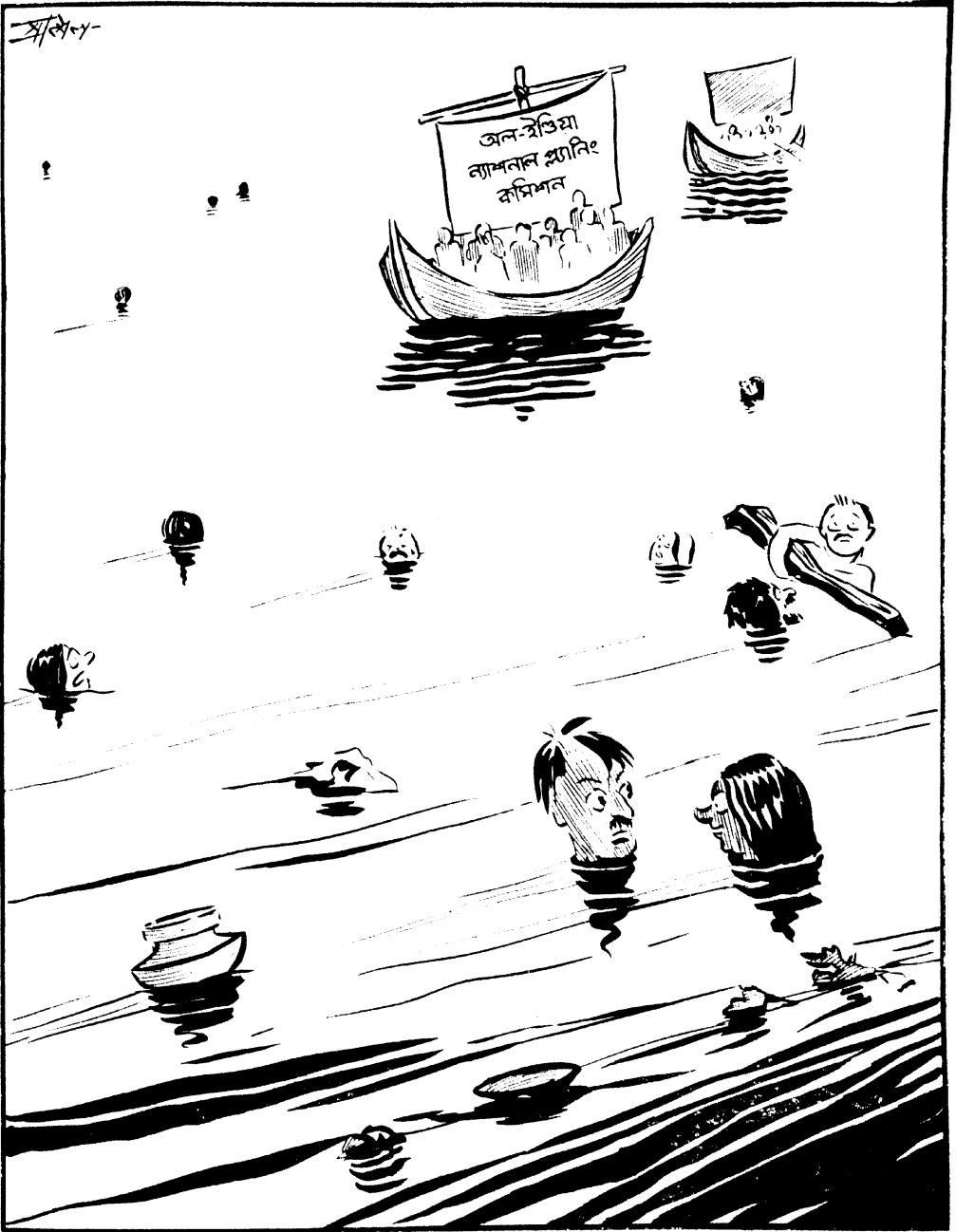
—এই বানের জলে ঐ ক্ষুদে নৌকা ভাসিয়ে ওরা করবে কি ?

—বোধ হয় আমাদের ফটো তুলবে !

দাওয়াতে বসিয়া আছে। একবার আকাশের দিকে দেখিতেছে ও এক একবার গুণগুণ করিতেছে, তাহার স্ত্রী কোলের ছেলেটি আনিয়া বলিল, "ঘরকন্নার কম্মে কিছু থা পাইনে—হেদে! ছেলেটাকে একবার কাঁকে কর, এদিকে বাসন মাজা হয় নি, ওদিকে ঘর নিকন হয় নি, তারপর রাঁদাবাড়া আছে, আমি একলা মেয়েমানুষ এসব কি করে করব, আমি কোন দিকে যাব? আমার কি চাট্টে হাত চাট্টে পা?' নাপিত অমনি ক্ষুর ভাঁড় বগলদাবায় করিয়া বলিল," এখন ছেলে কোলে করিবার সময় নয়. কাল বাবুরাম বাবুর বিয়ে, আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।" নাপতানী চমকিয়া উঠিয়া বলিল, "ওমা আমি কোজ্জাব? বুড়ো ঢোপা আবার বে করবে! আহা অমন গিন্নী, অমন সতীলক্ষ্মী, তার গলায় আবার একটা সতিন গেঁতে দিবে, মরণ আর কি? পুরুষজাত সব করতে পারে।"

এইরূপ নাটকীয় objectivity তাঁহার পর আর একটি লেখকের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম। টেকচাঁদের ধারার সহিত ইহাঁর অপূর্ব্ব সহধর্ম্মিতা রহিয়াছে এবং এ প্রসঙ্গে ইহাঁর আলোচনা না করিলে চলিবে না।

আলাল ও হুতোম উভয়ই শ্লেষ ও ব্যঙ্গ রচনা। এই শ্লেষ ও ব্যঙ্গ রচনা একটা বিশিষ্ট form-এর মধ্য দিয়া আলালে creative হইয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যায়, কিন্তু শক্তির অভাবে তাহা ব্যর্থ হইয়াছে। হুতোমে creative কিছু করিবার কোন ভাব নাই। হুতোমের মধ্যে যথাযথ চিত্র সংগ্রহ করিবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। এ যেন তৎকালীন প্রচলিত জীবনের ফটোগ্রাফি। এ ফটোগ্রাফি সর্ব্বত্রই অতি আশ্চর্য্যভাবে নিখুঁৎ হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও কোন ঘটনা বা ব্যক্তির উপর বেশী বা কম আলো বা ছায়াপাত হয় নাই। যেখানে যেমনটি ছিল তেমনই উঠিয়াছে। সাহিত্য ও আর্ট সমালোচনায় আধুনিক ভাষায় realist বলিতে যে শ্রেণীর শিল্পীকে আমরা বুঝি, হুতোমের মধ্যে তাহারই প্রকৃষ্ট ও যথার্থ পরিচয় রহিয়াছে।

আলাল ও হুতোম উভয়েই বাঙ্গালা কথাভাষার যে রূপ রহিয়াছে, তাহার মধ্যে হুতোমের ভাষাই প্রকৃতরূপে অবিকৃত কথ্য রূপ। তৎকালীন কলিকাতায় নব্য বাণিজ্যছায়ায় বহু দেশাগত বহুভাষী মিশ্রিত যে এক অভিনব কথ্য-ভাষার জন্ম হইয়াছিল, হুতোমে তাহারই পরিচয় রহিয়াছে। হুতোমের মধ্যে তৎকালীন কলিকাতার ভাষার সামাজিক রূপের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গী পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দিয়াছে। বঙ্কিম হুতোম ও টেকচাঁদের ভাষারূপের সমালোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন "টেকচাঁদী ভাষা হুতোমী ভাষার এক পৈঠা উপরে" কথাটা তিনি যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তৎকালে যথার্থ বলিয়া মনে হইলেও আজ ইহাকে ঠিক উল্টা করিয়া বলা চলে—অর্থাৎ অন্যদিক্ দিয়া হুতোমি ভাষা টেকচাঁদী ভাষা হইতে এক পৈঠা উপরে। টেকচাঁদ মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যিক রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ প্রকট হইয়াছে, কিন্তু হুতোমের মধ্যে এই দোষ নাই, হুতোম সর্ব্বত্রই একভাবায় সুসমঞ্জসভাবে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত চলিতে পারিয়াছেন।

অনেকে বঙ্কিমচন্দ্রের হুতোম-বিদ্বেষের কারণ বুঝিতে পারেন নাই। বঙ্কিম নিজেই বলিয়াছেন—"হুতোমি ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পবিত্রতাশূন্য। হুতোমি ভাষায় কখনও গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। যিনি হুতোমপেঁচা লিখিয়াছেন, তাঁহার রুচি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না।" হুতোমের মধ্য দিয়া তৎকালীন নব্য বাঙ্গালার যে মনের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা বঙ্কিম সহ্য করিতে পারেন নাই। হুতোমের মধ্যে শুধু অশ্লীলতাই ছিল না, অধিকন্তু তাহার মধ্যে ব্রাহ্মসুলভ যে সংস্কারের প্রচেষ্টা ছিল—যে প্রচেষ্টার মধ্যে হিন্দুর সকল কিছুকেই সংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া প্রকাশ করিবার প্রবণতা দেখা যায়, বঙ্কিম তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমও হিন্দুর গোঁড়ামীর উপর আঘাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা হিন্দুর সংস্কারের প্রতিষ্ঠা-ভূমির উপর দাঁড়াইয়াই, কিন্তু হুতোম সেই হিন্দু সংস্কারের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হইতে দূরে দাঁড়াইয়া হিন্দুকে আঘাত করাতে তিনি হুতোমকে সহ্য করিতে পারেন নাই এবং সেইজন্য হুতোমের উপর বিরূপ ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' হুতোম হইতে রুচি-বিরুদ্ধ হইলেও বঙ্কিম তাহাকে স্বীকার করিতে পারিয়াছিলেন বোধ এই আশায় যে, তাহা হিন্দুত্বের ভিত্তিমূলে আঘাত করিবার চেষ্টা করে নাই, অথবা তাহার মধ্যে হিন্দু সমাজ হইতে দূরে সরিয়া ব্রাহ্মসুলভ সংস্কারের প্রচেষ্টা নাই।*

* এখানে একথা উল্লেখ না করিলেও পারিতাম। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন তাঁহার "বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য" পুস্তকে বঙ্কিমের এই সমালোচনার মানসিকতাকে না বুঝিতে পারিয়া এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এখানে এ বিষয়ে উল্লেখ আবশ্যক যে, এ বিষয়টি সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

দেওধানি

—স্বামী ভূমানন্দ

আসাম প্রদেশে কামাখ্যা হিন্দুর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা ৫২ মহাপীঠের একটি শ্রেষ্ঠ পীঠ, এখানে প্রতি বৎসরই কয়েকটি পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হয়। পাহাড়ের উপরে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের নিকটে প্রত্যেক পর্ব্বেই বড় মেলা বসে, অনেক যাত্রী এই উপলক্ষে বহু দূরদেশ হইতে কামাখ্যায় আসে। উৎসবগুলির মধ্যে দুইটি প্রসিদ্ধ, একটি "অম্বুবাচী", অপরটি "দেওধানি"। অম্বুবাচী বাঙ্গালীর পর্ব্ব; এই পর্ব্বোপলক্ষে কামাখ্যায় বহু বাঙ্গালী যাত্রীর সমাগম হয়, অধিকাংশই স্ত্রীলোক। "দেওধানি" স্থানীয় পর্ব্ব; আসামের লোকেরাই এই পর্ব্বে যোগদান করে। এই উৎসব উপলক্ষে আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোকের সমাবেশ হয়। উৎসবটি অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং উৎসব সময়ে অনেক রকম অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশে যেমন চড়ক পূজার কয়েক দিন পূর্ব্বে, শূদ্র-শ্রেণীর কতকগুলি লোক সাময়িক সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া ব্রত পালন করে ও চড়ক পূজার পর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, কামাখ্যাতেও সেইরূপ, শূদ্রদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই "দেওধানি" ব্রত পালন করে। শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে "দেওধানি" পর্ব্ব আরম্ভ হয় ও ভাদ্র মাসের ২রা পর্য্যন্ত পর্ব্ব ও আনুষঙ্গিক উৎসব চলিতে থাকে। ২রা তারিখে রাত্রি-শেষে পর্ব্ব শেষ হয় ও ব্রতচারিগণ ব্রত উদ্যাপন করিয়া ৩রা ভাদ্র স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে। অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে ব্রতচারীরা বিকট চীৎকার অর্থাৎ ধ্বনি করে বলিয়াই এই উৎসবের নাম "দেওধানি"। "দেওধানি" শব্দটি "দেবধ্বনি" শব্দেরই অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। যাহারা এই ব্রত পালন করে, তাহাদিগকেও "দেওধানি" বলা হয়।

যে কেহ ইচ্ছা করিলেই এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারে না। যাহারা "দেওধানি" হইবে, তাহাদিগের ভিতরে, উৎসবের কিছুকাল পূর্ব্বেই কতকগুলি লক্ষণ স্বতঃই প্রকাশ পায়। উৎসবের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে ভাবী দেওধানির অনেক রকম অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে থাকে। এই সকল স্বপ্নের মধ্যে সর্প-স্বপ্নই অধিক ও এই জাতীয় স্বপ্নকে স্বপ্ন-দ্রষ্টারা শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ দেবী [illegible] স্বপ্নে দেখে; কেহ বা মহামায়াকে, কেহ বা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মনসা দেবী, কুমারীরূপে স্বপ্নে দর্শন করে। কেহ দেখে একটি প্রকাণ্ড সুদর্শন অজগর সর্প আসিয়া তাহাকে একটি গোপনীয় স্থান দেখাইয়া দিতেছে এবং বলিয়া দিতেছে, সেখানে লুক্কায়িত ধন আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, স্বপ্নদৃষ্ট আদেশমত হইয়া সেই স্থানে গিয়া সত্য সত্যই সিকি-মোহর প্রভৃতি পাইয়াছে। কামাখ্যায় এখনও এমন লোক বর্ত্তমান রহিয়াছে, যে স্বপ্নে সর্পের ইঙ্গিতে অর্থলাভ করিয়া দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া বেশ সচ্ছল অবস্থায় বাস করিতেছে।

স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্বপ্ন দর্শন করিয়াই বুঝিতে পারে, তাহাকে আগামী পর্ব্বে "দেওধানি" হইতে হইবে, ও তজ্জন্য সে ব্রত ধারণ করে ও সেই সময় হইতেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সংযত ভাবে অবস্থান করে। দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে; কোনওরূপ আমিষ ভক্ষণ করে না; রাত্রে কেবল মাত্র দুগ্ধ ও ফলাদি ভক্ষণ করে। ব্রতকালে কেহ ক্ষৌরকার্য্য করে না এবং নিজ নিজ চাকরী, পেশা, বা ব্যবসার জন্য কোনও কর্ম্মই করে না; এমন কি, দৈনন্দিন সাংসারিক কার্য্যও উপেক্ষা করে। প্রত্যেক ব্রতচারী, ব্রতকালে স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার মন্দিরে গিয়া প্রতিদিনই তাঁহার পূজা করে, কেহ কেহ বা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, সেই মন্দিরেই বাস করে। এই ভাবে নিয়ম পালন করিয়া তাহারা সংযত ভাবে প্রায় একমাস কাটায়। স্বপ্ন-দর্শনের

পর যদি কেহ ব্রত-রক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছাচার ও অনাচার করে, এবং ব্রত-নিয়মের বিপরীত আচরণ করে, তাহা হইলে তাহার রক্ত-বমি হয়, কেহ কেহ বা কঠিন রোগ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত ব্যাপার কামাখ্যার অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

দেওধানিরা এই ভাবে ব্রত ধারণ করিয়া প্রায় মাসাবধি অবস্থান করিতে থাকে; ক্রমে শ্রাবণ সংক্রান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দিবসে পূর্ব্বাহ্ণে কামাখ্যা দেবীর নাট-মন্দিরের সংলগ্ন পঞ্চরত্ন-বেদীর উপরে, মনসা দেবীর উদ্দেশে ঘট স্থাপন হয়। ঘটের চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকা-নির্ম্মিত নানাবিধ নাগফণা সাজাইয়া দেওয়া হয় ও নির্দ্দিষ্ট পূজারী-ব্রাহ্মণ ঐ ঘটে ষোড়শোপচারে মনসা দেবীর পূজা করেন। পূজান্তে কামাখ্যা দেবীর মালা-করেরা ঐ ঘটের সম্মুখে বসিয়া পদ্মপুরাণ পাঠ করে। অপরাহ্নে দেওধানিদিগের আদেশ অনুসারে, স্থানীয় শূদ্র স্ত্রীলোকেরা মহাদেব বা ভৈরবীর মন্দিরে গিয়া কালী কীর্ত্তন করে; দেওধানিরা পূর্ব্ব হইতেই সেখানে উপস্থিত থাকে। এই সময় চতুর্দ্দিক হইতে বহু নাগারা, করতাল বাজিতে থাকে ও দেওধানিরা সেই শব্দে উন্মত্ত হইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে সকলে এক সঙ্গে বিকট চীৎকার করে। কীর্ত্তন শেষ হইলে প্রসাদ বণ্টন হয়; স্ত্রীলোকেরা প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যায় এবং দেওধানিরাও ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তন স্থান পরিত্যাগ করিয়া নাট-মন্দিরে ঘটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে কিছুক্ষণ নৃত্য করিয়া তাহারা নিজ নিজ মন্দিরে চলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় যথা নিয়মে ঘটে মনসা দেবীর আরতি প্রভৃতি হয়।

পরদিন, অর্থাৎ ১লা ভাদ্র, পূর্ব্বাহ্ণে পূজারী আসিয়া ঘটে মনসা দেবীর পূজা করিয়া ভোগাদি নিবেদন করে। পরে কামাখ্যা দেবীর ভোগাদি শেষ হইলে, বেলা প্রায় ১টার পর হইতে বহু ঢোল, নাগারা, করতাল, সানাই প্রভৃতি বাজিতে থাকে। দেওধানিরা ও বাজনার শব্দ শুনিয়া নিজ নিজ স্থান হইতে বাহির হইয়া পড়ে ও প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়, যেন একটি কুমারী পথ প্রদর্শন করিয়া তাহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছে। প্রত্যেক দেওধানি নাচিতে নাচিতে ঐ কুমারীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে থাকে ও নিজ নিজ দেবতার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে বাজনার তালে তালে কিছুক্ষণ নাচিয়া, পরে ঐ কুমারীর ইঙ্গিতে তাহার পিছনে পিছনে নাচিতে নাচিতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে ও ক্রমে সকলে নাট-মন্দিরে আসিয়া সমবেত হয়। এই সময় তাহাদিগের ভাব-ভঙ্গী, চাল-চলন ও উদাস লক্ষ্যবিহীন শূন্য দৃষ্টি দেখিলে মনে হয়, যেন তাহারা যে সমস্ত কার্য্য করিতেছে, তাহাতে তাহাদিগের কোনও

নৃত্যপরায়ণ দেওধানি

রূপ স্বাধীনতা নাই; ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাহারা যেন যন্ত্র-চালিত হইতেছে মাত্র। এই অবস্থায় দেওধানিরা নাট-মন্দিরের বাহিরে সকলে একত্রিত হইয়া কিছুক্ষণ নৃত্য করে; পরে সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মন্দিরে চলিয়া যায়। সেখানে গিয়া প্রত্যেক দেওধানি পীঠের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে এবং সেই স্থানেই প্রায় এক ঘণ্টা পড়িয়া থাকে ও মধ্যে মধ্যে বিকট চীৎকার করে। কাহারও এই সময় বিশিষ্ট ভাবাবেশও হয়।

এই অবস্থায় দেওধানিদিগকে অনেকে নানাবিধ

প্রশ্ন করেও তাহারা সঙ্গে সঙ্গে তাহার উত্তর দেয়। কোনও কোনও দেওধানি, প্রশ্নের পূর্ব্বেই, প্রশ্নকারী কি প্রশ্ন করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহা বলিয়া দেয় ও সেই প্রশ্নের উত্তরও দেয়। অধিকাংশ স্থলেই দেখা গিয়াছে, উত্তরগুলি ভবিষ্যতে সত্যে পরিণত হইয়াছে। এই সময় প্রশ্নকারীরা, দেওধানিদিগের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইলে, আগামী বর্ষে এই পর্ব্বে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কাপড়, ছাগ, পারাবত, সিন্দুর, মিষ্টান্ন, ফলমূলাদি উপহার দিবে বলিয়া মানত করে। কাহারও গ্রহবৈগুণ্য থাকিলে, সে গ্রহের যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার পূজা দিবার জন্য, দেওধানি প্রশ্নকর্ত্তাকে আদেশ করে। এই ভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা কাটিয়া যায়। পরে দেওধানিরা মন্দির হইতে বাহির হইয়া আসিয়া মন্দিরের নিকটেই একস্থানে বিশ্রাম করে। কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডারা আসিয়া এই সময় দেওধানিদিগকে রক্তবস্ত্র, সিন্দুর, ফুল মালা প্রভৃতি দ্বারা ভৈরব বেশে সাজাইয়া দেয়। পূর্ব্ব বৎসর মানত করিয়া যাহারা দেওধানির ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ ফল পাইয়াছে, তাহারাও নিজ নিজ মানসিক দ্রব্যাদি লইয়া এই সময় দেওধানিদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও উপস্থিত জনমণ্ডলীর সমক্ষে গত বৎসরের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা জানাইয়া, দেওধানিদিগকে ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি প্রদান করে। এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইলে দেওধানিরা ছাগাদি স্কন্ধে করিয়া ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একত্র করিয়া লইয়া নাচিতে নাচিতে নাট-মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময় চতুর্দ্দিকে ঘোর রবে ৩০।৪০টি ঢোল, ১২।১৪ জোড়া নাগারা, অনেকগুলি সানাই ও করতাল বাজিতে থাকে। উপস্থিত দর্শকগণের কোলাহল ও উৎসাহসূচক বাক্যও সেই ঘোর রবে মিশিয়া গিয়া "স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ"। ঊর্দ্ধে মেঘমালা, চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতশ্রেণী ও নিম্নে ব্রহ্মপুত্র নদ সেই শব্দে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। মনে হয় যেন প্রকৃতি দেবীও দেওধানি উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন।

দেওধানিরা এই তুমুল শব্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে ও নিজ নিজ হস্তে খড়্গ, তরবারি, ঢাল, বেত প্রভৃতি লইয়া অমানুষিক চীৎকার করিয়া উদ্দাম ভাবে নৃত্য করিতে থাকে। এই সময় কখনও কখনও একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। কামাখ্যা দেবীর মহিষ বলিদানের যে বিরাট তীক্ষ্ণধার খড়্গ আছে, তাহা দুইজন দেওধানি দুই প্রান্ত ধরিয়া ভূমি হইতে প্রায় দুই হাত ঊর্দ্ধে ধরিয়া রাখে; ধারাল দিকটা উপরের দিকে থাকে। কোনও দেওধানি সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গের উপর উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই তীক্ষ্ণধার খড়্গের উপর নৃত্য করিলেও, সে সময় নৃত্যকারী দেওধানি পড়িয়া যায় না এবং তাহার পদতল অল্পমাত্রও ক্ষত হয় না। এই ব্যাপার বহু লোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। পূর্ব্বে প্রতি বৎসরই এই খড়্গনৃত্য হইত; এখনও কোনও কোনও বৎসর হয়। সকল দেওধানিই এই দুষ্কর কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না। নৃত্য করিতে করিতে যাহারা ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়ে, তাহাদিগের মধ্যে কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই হঠাৎ লাফ দিয়া খড়্গের উপর উঠে ও কোনও প্রকার আশ্রয় না লইয়াই খড়্গের উপর নৃত্য করিতে থাকে। স্থানান্তরে কোনও কোনও দেওধানি ভূমিতে নৃত্য করিতে থাকে এবং খড়্গ, তরবারি, বা অন্য অস্ত্রদ্বারা সজোরে বক্ষে আঘাত করিতে থাকে, অথচ বক্ষোস্থল কাটিয়া যায় না এবং বিন্দুমাত্রও রক্তপাত হয় না। এই নৃত্য দর্শন করিবার জন্য বহুলোক সমবেত হয় ও তাহাদিগের সমক্ষেই খড়্গ-নৃত্য প্রভৃতি চলিতে থাকে।

এই নৃত্য সময়েও দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ দেওধানিদিগকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্ন শুনিয়াই উত্তরদাতা দেওধানি নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া উত্তর দিবার জন্য নাটমন্দিরের ভিতরে চলিয়া যায় ও প্রতিষ্ঠিত ঘটের সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বিকট চীৎকার করে এবং পরক্ষণেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। যতবার প্রশ্ন করা হয়, ততবারই বিকট চীৎকার করিয়া দেওধানিরা উত্তর দেয়। প্রশ্নকারীরা এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় মানত করে। ইহার পরেই দেওধানিরা নাটমন্দির হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন পূর্ব্ববৎসরের প্রশ্নকর্ত্তারা তাহাদিগের মানসিক দ্রব্যাদি উহাদিগকে প্রদান করে। মানসিক ছাগ, পারাবত, ফল প্রভৃতি গ্রহণ করার পরই দেওধানিরা পুনরায় নৃত্যস্থানে ফিরিয়া আসে ও গৃহীত দ্রব্যাদি একস্থানে রক্ষা

করিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে থাকে। নৃত্যকালেও দর্শক-দিগের মধ্যে অনেকে ভক্তিবশতঃ জল, ফল-মূল, দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওধানিদিগকে উপহার দেয়। এই সমস্ত উপহৃত দ্রব্যও পূর্ব্বপ্রাপ্ত মানসিক দ্রব্যাদির সহিত একত্রে সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়।

এই ভাবে অপরাহ্ন প্রায় ছয়টা পর্য্যন্ত নৃত্য চলিতে থাকে। পরে দেওধানিরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া সকলে একসঙ্গে একস্থানে বসিয়া বিশ্রাম করে ও সেই সময় পূর্ব্বসঞ্চিত ফল, মূল, দুগ্ধ প্রভৃতি আহার করিতে থাকে। ছাগ ও পারাবতগুলি ইতিমধ্যে কামাখ্যাদেবীর সমক্ষে বলি দেওয়া হয় ও যে দেওধানির যে ছাগ ও পারাবত, তাহার হস্তে সেই ছাগ ও পারাবতের ছিন্ন মুণ্ড দেওয়া হয়। দেওধানিরা ঐ কাটামুণ্ডের রক্ত চুষিয়া পান করে। পরে ছাগ ও পারাবতের অপরাংশের কাঁচা মাংস টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া একটি মাটির হাঁড়ির ভিতরে রাখে ও তাহার সহিত চিনি ও কলা মিশাইয়া উত্তমরূপে মাখিয়া সকলকে বণ্টন করিয়া লইয়া আহার করে। আহারান্তে পুনরায় নৃত্য আরম্ভ হয়। প্রদোষে কামাখ্যাদেবীর ও মনসাদেবীর যথাবিহিত আরতি প্রভৃতি হইয়া যায়। রাত্রি প্রায় আটটার সময় কামাখ্যাদেবীর নিজ তহবিলের খরচে দেওধানিদিগের জন্য ছাগ বলি দেওয়া হয় ও তাহার কাঁচা মাংসও পূর্ব্ববৎ চিনি ও কলার সহিত মাখিয়া দেওধানিদিগকে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের বাহিরে বসাইয়া খাইতে দেওয়া হয়। আহারান্তে প্রত্যেক দেওধানিকে এক একখানি বস্ত্র, ফুলের মালা ও সিন্দুর উপহার দেওয়া হয়। আহারান্তে দেওধানিরা পুনরায় পূর্ব্ববৎ নাচিতে আরম্ভ করে ও প্রায় সমস্ত রাত্রিই তাহাদিগের নাচ চলিতে থাকে। নৃত্য শেষ হইলে প্রত্যেক দেওধানি পৃথক্‌ভাবে ঘটের নিকট গমন করে ও মনসা দেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া তিন চার বার বিকট চীৎকার করিয়া হঠাৎ লাফাইয়া উঠে ও তৎক্ষণাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যায়। দেওধানিকে ঐ সময় ধরিবার জন্য তাহার নিকট লোক পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে; দেওধানি লাফাইয়া উঠিলেই তাহারা উহাকে ধরিয়া ফেলে, মাটিতে পড়িতে দেয় না ও তাহাকে নাটমন্দিরের বাহিরে আসিয়া কিছুক্ষণ কাঁধের উপর রাখিয়া পাখা দিয়া বাতাস দিতে থাকে ও মধ্যে মধ্যে চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্‌টা দেয়। ক্রমে সংজ্ঞালাভ হইলে তাহাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া দেওয়া হয়। দেওধানিরা তখন সৌভাগ্য-কুণ্ডে গিয়া স্নান করে ও নিজ নিজ দেবতার মন্দিরে চলিয়া যায়। পরে কেহ হবিষ্যান্ন করে, কেহ বা উপবাসী থাকে।

পরদিন, অর্থাৎ ২রা ভাদ্র, পূর্ব্ব দুই দিবসের অনুরূপ পূজা, আরতি, ভোগ, পদ্মপুরাণ পাঠ ও নৃত্যাদি চলিতে থাকে এবং রাত্রের নৃত্য শেষ হইতে প্রায় প্রভাত হইয়া যায়। দেওধানিরা তখন সৌভাগ্য-কুণ্ডে স্নান করিয়া স্ব স্ব স্থানে চলিয়া যায়। এই সময় কামাখ্যা পাহাড়ের পাণ্ডা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য যাবতীয় অধিবাসী, যাত্রীসকল ও দর্শকবৃন্দ, সকলেই নাটমন্দিরে ঘটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় ও পূজারী ব্রাহ্মণ পঞ্চরত্ন বেদী হইতে ঘটটি ও অন্যান্য লোকে নাগফণাগুলি ও ও পূজাবশিষ্ট পুষ্পপত্রাদি উঠাইয়া লইয়া যায় ও সৌভাগ্য-কুণ্ডে বিসর্জ্জন দেয়। বিসর্জ্জনান্তে উপস্থিত জনগণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। সকলেই ভক্তিপূর্ব্বক প্রসাদ গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করে। ঘট বিসর্জ্জন হইলেই দেওধানিদিগের ব্রত শেষ হয় ও তাহারা নিজ নিজ বাটীতে গিয়া সাধারণভাবে আহারাদি করে। কেহ ইহার পরও মাসাধিক সংযত ভাবেই থাকে ও সাংসারিক কোনও কাজ-কর্ম্ম করে না।

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

বিদ্যাসাগর বাঙ্গালী ছিলেন না—বিদেশ-গত বন্ধুকে তিনি মনে রাখিতেন; সমবেদনা তাঁর মৌখিক ও লজ্জা তাঁর কেবল চাক্ষুষ ছিল না; কথা বলিয়া তা রক্ষা করিতেন; দানের প্রয়োজন বুঝিলে ঋণ করিয়া টাকা দিতেন, সুখের দিনের বন্ধুর বিপদ দেখিলে কাজের ছুতায় সরিয়া পড়িতেন না; গাছে তুলিয়া দিয়া মই টান দিবার অভ্যাস তাঁর ছিল না; এক কথায় তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না।

মধুসূদনের চিঠি পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় ঋণ করিয়া টাকা পাঠাইলেন; তিনি ইচ্ছা করিলে অতি সহজে পত্তনীদারের কাছে পাওনা টাকা আদায় করিবার ছুতায় বিলম্ব করিতে পারিতেন এবং যখন সে টাকা ফ্রান্সে গিয়া পৌঁছিত, অন্য প্রয়োজনে না হোক, মধুসূদনের অন্ত্যেষ্টি সৎকারে তার সার্থকতা হইত! বিদ্যাসাগরের ঋণ-করা টাকা তাঁর হাতে পৌঁছিয়া তাঁদের আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিল।

মধুসূদনের জীবন-ধনুকের দুই কোটি: এক কোটিতে সাহিত্য, অন্য কোটিতে অর্থ; তাঁর ধনুর্ভঙ্গ-পণ ছিল এক সঙ্গে, এক জীবনে, তিনি এই দুই কোটিতে গুণ পরাইবেন; এমন প্রতিজ্ঞা করে অনেকেই, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে কয়জন! মধুসূদনও পারেন নাই।

সাহিত্য-কোটিতে গুণ পরানো হইয়াছিল, মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন প্রকৃতপক্ষে শেষ হইয়া গিয়াছে। এবারে অর্থের কোটিতে গুণ পরাইবার পালা। তাঁর দানবীয় শক্তি ধনুকখানাকে নত করিয়া ধরিল—বিশাল ধনুক আর্তনাদ করিয়া উঠিল এবং অবশেষে বলের প্রবলতায় সে ধনুক ভাঙ্গিয়া পড়িল—এই তো মধুসূদনের জীবনের ট্র্যাজেডি!

কিন্তু কবি নিজে জানিতেন না যে, তাঁর কাব্য-জীবন সমাপ্ত, তিনি তখনও বিরাটতর কাব্য লিখিবার উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু যে শনি মানুষের সুখ-দুঃখে ছক-কাটা বিচিত্র শতরঞ্চের উপর দ্যূত ক্রীড়ায় মগ্ন, তার ওষ্ঠাধরের স্মিত ব্যঙ্গ কে দেখিতে পায় বল!

মধুসূদন বিদ্যাসাগরকে লিখিতেছেন:—উদ্বেগের মধ্যে আছি তবু ফরাসী ভাষা প্রায় আয়ত্ত করিয়া আনিয়াছি। ফরাসী ভাষায় বেশ কথা-বার্তা বলিতে পারি, লিখিতে পারি আরও ভাল। ইটালীয় ভাষা শিখিতে সুরু করিয়াছি এবং ফিরিবার পূর্ব্বে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ ভাষা না পারিলেও, জার্মান নিশ্চয় শিখিয়া লইব।

আবার:—

তুমি কল্পনাই করিতে পারিবে না ইটালীয় ভাষায় কত চমৎকার কাব্য আছে! টাসোকে ইউরোপের কালিদাস বলা চলে।

আমি সত্যেন্দ্রকে [ঠাকুর] সেদিন ইটালীয় ভাষায় একখানা চিঠি লিখিয়াছিলাম—সে তার উত্তর দিয়াছিল ইংরাজিতে। কেন বুঝিতে পারিলাম না। গত বছর সে তো খানিকটা ইটালীয় শিখিয়াছিল!

এ সব চিঠি কি আসন্ন অনাহার-পীড়িত ব্যক্তির! নিন্দুকে বলিতে পারে—বিদ্যাসাগরকে খুসী করিয়া বিপদের দিনে টাকা আদায় করিবার জন্য—সন্দিগ্ধ পিতার কাছে অপবাদ রটিয়াছে যার নামে এমন পুত্রের ভাল-ছেলের ভাণ! দেশে মধুসূদনের নিন্দুকের অভাব ছিল না—তারা কল্পনার ব্যোমজীবী পরগাছায় অতিরঞ্জনের ফুল ফুটাইয়া তাঁকে ফরাসী দেশের কারাগারে প্রেরণ করিয়াছিল।

কিন্তু আসল কথা অন্য রকম। মধুসূদন মনে মনে তখন ধনুকের দুই কোটিতে গুণ পরাইতেছিলেন—তাই একদিকে কাব্যের উপাদান সঞ্চয় বিদেশী ভাষা হইতে, আর একদিকে কবিজনোচিত জীবন যাপনের জন্য অর্থ-উপার্জ্জনের চেষ্টা ব্যারিষ্টারি ব্যবসায় শিখিয়া লইয়া।

এ সময়ে তিনি দু'খানি বাংলা কাব্য লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাব্যের এই অর্দ্ধপথে ছেদ, অর্থাভাবে বা মনোকষ্টে নয়, কৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পরে গাণ্ডীবীর আর গাণ্ডীব উত্তোলন করিবার সামর্থ্য ছিল না; কাব্য-

কোটিতে গুণ পরাইবার সাধ্য কি যে কবি আবার নূতন কাব্য লেখেন !

দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরে কবি আরম্ভ করিতেছেন :—

কেমনে রথীন্দ্র পার্থ- পরাভবি রণে
লক্ষ রণ সিংহ শূরে পাঞ্চাল নগরে
লভিলা দ্রুপদবালা কৃষ্ণা মহাধনে,
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধি দেববরে,
গাইব সে মহাগীত !

সুভদ্রা-হরণ কাব্যের প্রারম্ভে আছে :—

কেমনে ফাল্গুনীশূর স্বগুণে লভিলা
পরাভবি যদুবৃন্দে চারু চন্দ্রাননা
ভদ্রায়, নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীন কবি বঙ্গবাসী জনে।

দুই কাব্যেরই মূল কথা এক, প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পার্থের জয় ও অভীষ্ট লাভ। ইহা কি নায়কেলের জীবনের প্রতিচ্ছবি নয় ? তিনিও ত' বিদেশে প্রতিকূলতার চরমে অভীষ্টলাভের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁর লক্ষ্য যে লক্ষ্মী, তিনি দ্রৌপদী ও সুভদ্রার চেয়ে অনেক বেশি চঞ্চলা ; জীবনে যে লীলা সংগ্রাম ভাবে তাঁর জীবনে চলিতেছিল, কাব্যে তা অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

এই সময়ে ভার্সেই নগরের রাজকীয় উদ্যানে প্রায়ই তিনি বেড়াইতে যাইতেন। এই ঐতিহাসিক স্থানে কবির মনে কি ভাবের উদয় হইত, জানা যায় না। কিন্তু আর একটি ঐতিহাসিক দৃশ্যে তাঁর মনের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন প্যারিসের পথে তৃতীয় নেপোলিয়ান ও সম্রাজ্ঞীকে দেখিয়া তিনি ফরাসী ভাষায় 'সম্রাট জীবতু' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলেন ; সম্রাট্ দম্পতী আনন্দে প্রত্যভিবাদন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দান্তের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ইউরোপের কবিরা কবিতা লিখিয়া ইটালীতে পাঠাইতেছিলেন, মধুসূদনও একটি বাংলা সনেট ও স্বকৃত ফরাসী ও ইটালীয় অনুবাদ পাঠাইয়াছিলেন। ইটালীরাজ ভিক্টর ইমানুয়েল এই কবিতা পাইয়া মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন :—

It will be a ring which will connect the orient with the occident.

আপনার কবিতা রাখীবন্ধনে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যকে যুক্ত করিবে।

মধুসূদনও জানিতেন না, ইটালীরাজও জানিতেন না, যাঁর কবিতা সত্যই প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্যকে সংযুক্ত করিবে সে অতি দূরে, পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে কোন শিশুশয্যায় সেদিন নিদ্রিত।

মধুসূদনের জীবনীকার লিখিতেছেন, তিনি ইউরোপে থাকিবার সময়ে ভিক্টর হুগো ও টেনিসনের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদনের মত ইতিহাস-বোধ বাঙ্গালী কোন লেখকের ছিল না ; চতুর্দ্দশ লুই-এর উত্থান ; নেপোলিয়ানের বংশধর, দান্তের কবিস্মৃতি, ভিক্টর হুগো ও টেনিসনের সঙ্গ, ইতিহাসের কোন বিস্মৃত বীথিকার মধ্যে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিত কে বলিবে। জীবনের এক কোটিতে ইতিহাসের ক্লান্তিপাত আর এক কোটিতে অসহায় ভীত দারিদ্র্য—

"এই চিঠি লিখিবার ডাকটিকিট জিনিষ বন্ধক দিয়া কিনিতে হইয়াছে।"

মানুষের জীবনে মহত্ত্ব ও তুচ্ছতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

মনোমোহন ঘোষ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করিলে বিদ্যাসাগরকে দুঃখ করিয়া মধুসূদন লিখিতেছেন—

"বেচারা মনু আবার ফেল করিয়াছে।............আমার বিশ্বাস মনুকে এখন ব্যারিষ্টারী পড়িতে হইবে, কিন্তু সমস্যা এই যে, সে পরীক্ষাতেও পাশ হইবার শক্তি তার আছে কি ? ইংরেজ জুরির সমক্ষে বহুঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা করিবার মত ইংরাজি জ্ঞান তার আছে কি ?"

অদৃষ্টের এও আর একটা দারুণ উপহাস ! যে মনুর ইংরাজি জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ, যে মনুর পাশ করিবার সামর্থ্য সম্বন্ধে দ্বিধা, একদিন জীবনের শেষ দিনে, আত্মপ্রত্যয়ী মধুসূদনকে এই 'বেচারা মনু'র হাতেই নিজের অনাথ শিশু দুটিকে তুলিয়া দিয়া বিদায় হইতে হইয়াছিল।

১৮৬৫-র শেষ ভাগে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রেরিত অর্থে মধুসূদনের স্বচ্ছলতা ঘটিল ; তিনি ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন।

ইংলণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকেরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ; মধুসূদনের পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া লণ্ডন ইউনি-

-ভার্সিটি কলেজের বাঙ্গলা অধ্যাপকের পদ দিতে চাহিলেন—পদটি অবৈতনিক। বলা বাহুল্য এই অবৈতনিক পদ তিনি গ্রহণ করেন নাই।

১৮৬৬ সালের ১৭ই নভেম্বর মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

আর্থিক অস্বচ্ছলতা তাঁর দূর হয় নাই, বিদ্যাসাগরের অনুগ্রহে কোন রকমে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলিতেছিল মাত্র। বিদ্যাসাগরকে লিখিত একখানি চিঠিতে আছে—

"আমার স্ত্রীকে প্রায়ই বলিয়া থাকি, কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে তোমার বাড়ীতে আমাদিগকে থাকিবার জন্য একখানি ঘর ও জীবন ধারণের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে ভাত দিবে!"

গৌরদাস বসাককে মধুসূদন লিখিতেছেন :—

"আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাষা; প্রতিভাবানের হাতে পড়িলে এর উজ্জ্বলতা বাড়িবে। আমাদের শৈশবের শিক্ষার ত্রুটির গতিকে এ ভাষা শিখি নাই। বাংলার মধ্যে মহাভাষার উপাদান আছে। আমার সাধ হয় যে, মাতৃ-ভাষার চর্চ্চায় জীবন নিয়োগ করি—কিন্তু সাহিত্যিকের জীবন যাপন করিতে হইলে যে পরিমাণ টাকা দরকার, আমার তাহা নাই। আমাদের দেশে টাকা না হইলে সম্মান নাই। যদি টাকা থাকে তুমি বড় মানুষ; নতুবা তোমাকে কেহ গ্রাহ্য করে না। আমরা নিতান্ত অধঃপতিত জাতি। আমাদের দেশের বড়লোকেরা কে? চোরবাগানের ও বড়বাজারের নামগোত্রহীনের দল।"

এখানে দেখি, কবির জীবনের দুই কোটির মধ্যে দ্বন্দ্ব! সাহিত্য ও অর্থ; ইহজীবন আর অমরতা; আরাম ও খ্যাতি। যে ভাবে চিঠিখানা লিখিত তা'তে যেন অর্থের জয়েরই আভাস! বোঝা যায়, কবির জীবন যবনিকার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

অবশেষে ইয়োরোপ হইতে বিদায়ের দিন আসিল। বিদ্যাসাগরের নিষেধ না মানিয়া তিনি পত্নী ও পুত্রকন্যাকে ফরাসীদেশে রাখিয়া ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী মার্সেইয়ে জাহাজে চড়িলেন। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েরা সাশ্রুনয়নে বন্দরে দাঁড়াইয়া রহিল—মধুসূদন ইউরোপের ভূমি ত্যাগ করিলেন।

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথমে মধুসূদন কলি-কাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন

ব্যারিষ্টারী জীবন

কলিকাতায় ফিরিয়া মাইকেল স্পেনসেস্ হোটেলে উঠিলেন; মধুসূদন ফিরিয়াছে শুনিয়া বিদ্যাসাগর কয়েকজন বন্ধুকে লইয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। বিদ্যাসাগরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই মাইকেল ছুটিয়া গিয়া তাঁকে ধরিলেন এবং তিনি বাধা দিবার আগেই তাঁকে জড়াইয়া ধরিয়া নৃত্যের তালে তালে সবেগে পাক খাইতে লাগিলেন। নাচের বেগে মাইকেলের দ্বিধাবিভক্ত দাড়ি ও বিদ্যাসাগরের উড়ুনী বাতাসে সঞ্চালিত হইতে লাগিল, মাইকেলের বুট খট্‌খট্‌ ও বিদ্যাসাগরের চটি চট্‌চট্‌ করিতে লাগিল; স্থূলাকার মাইকেল ও ক্ষুদ্রাকার বিদ্যাসাগর গ্রহনাথ উপগ্রহের মত ঘরময় বন্‌ বন্‌ করিয়া পাক খাইতে লাগিলেন।

বিদ্যাসাগর যতই বলেন, 'আঃ লাগে যে!' মধুসূদন ততই ঘন ঘন চুম্বন করেন; বিদেশে বিপদের সময় যে ব্যক্তির কৃপায় রক্ষা পাইয়াছিলেন—তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া কি মধুসূদনের স্বস্তি আছে—নিরুপায় বিদ্যাসাগর কৃতজ্ঞতার ঘূর্ণীপাকে আবর্ত্তিত হইতে লাগিলেন—আতঙ্কিত বন্ধুরা নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করিয়া কৃতজ্ঞতার ঘূর্ণীবাত্যা দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উভয়ে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন, অনেকক্ষণ জিরাইয়া লইয়া বিদ্যাসাগর বলিলেন—

'মধু, তোমার জন্যে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছি, সেখানে চল। এ হোটেলে বাস করা ব্যয়-বহুল।'

মাইকেল বলিলেন—'মাই ডিয়ার ভিড!' (বিদ্যাসাগর শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন), 'সেজন্য তুমি ভাবিও না, আমি এখানে বেশ আছি।' বিদ্যাসাগর বুঝিলেন মধুসূদন এ হোটেল ছাড়িয়া দেশী পাড়ায় যাইবেন না, কাজেই বৃথা অনুরোধ।

তিনি উঠিয়া পড়িলেন, মধুসূদনও উঠিয়া পড়িলেন এবং বিদায়ের পূর্ব্বে বাংলার অদৃষ্ট-আকাশের যুগল জ্যোতিষ্কের সেই গ্রহনৃত্য আরম্ভ হইল। কোন রকমে মধুসূদনের হাত ছাড়াইয়া বিদ্যাসাগর বাহির হইয়া পড়িলেন।

বন্ধুরা মধুসূদনকে কোথায় উঠিয়াছ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন—বামুনপাড়ায় আছি ; তারা না বুঝিলে ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন ; গাঁয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পাড়া বামুনপাড়া ; সহরের মধ্যে সাহেবপাড়া শ্রেষ্ঠ, কাজেই তা বামুনপাড়া।

মধুসূদন ইউরোপের অনটনের স্মৃতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; ভুলিয়া গিয়াছিলেন চিঠির সেই কয়েক ছত্র, যাতে তিনি থাকিবার জন্য একখানি ঘর, খাইবার জন্য প্রচুর ভাত ছাড়া আর কিছু চান না লিখিয়াছিলেন ; মধুসূদনের শিশু-মনের উপর দুঃখের অশ্রু হাঁসের পাখার জলের মত গড়াইয়া পড়িয়া যাইত।

তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর জন্য আর চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগরের চিন্তা দূর হইবে কেন? পরের জন্য কাষ্ঠাহরণ করা যার স্বভাব, সে বিনা অনুরোধেও করিবে ; পরের জন্য যার চিন্তা করা স্বভাব—সে চিন্তা না করিয়া পারে কই!

অতএব মধুসূদন আগামী আড়াই বছরের জন্য স্পেন-সেস্ হোটেলে রহিয়া গেলেন আর বিদ্যাসাগর যুগপৎ পুরাতন ঋণের সুদ ও নূতন ঋণের অবসনের জন্য আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

কাব্যলক্ষ্মী

—শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

স্বপ্নের মত মনে পড়ে আজ—কবে, সেই কত দিন,
দূর বিস্তৃত প্রান্তরপথে চলিতেছিলাম একা,—
পথের যেন সে শেষ নাই—দিবা-আলো হয়ে আসে ক্ষীণ
আবছা সন্ধ্যা-আঁধারে তাহার পাইয়াছিলাম দেখা!

নীড়ে ফেরা পাখী ক্লান্ত কণ্ঠে গাহিয়া চলেছে গান,
দুপাশে ধানের সবুজ সুষমা কোন্ মায়ালোকে মেশে,
সেই দিক হতে শুনিয়াছিলাম অশ্রুত আহ্বান
কুলু কুলু করে ক্ষেত-হতে-ক্ষেতে জল যাওয়া সেই দেশে!

পথের দুপারে নিশিন্দা গাছ নীল ফুল মেলে রয়,
তাদের জড়ায়ে কত বনলতা ফুটায় গন্ধফুল,
লজ্জাবতীর আঁখি মুদে গেছে—বনচাঁপা কথা কয়,
বলে বুঝি—আঁখি খোল গো মানিনী ;—হয়তো শোনার ভুল!

অপরাহ্ণের বৃষ্টিতে ভেজা নীরব শান্ত পথ
সেই পথে মোর দেখা হয়েছিল সেই দিন সন্ধ্যায়
কবিতাদেবীর সাথে—জোনাকীরা টেনেছিল তাঁর রথ
ঝিঁঝিঁ পোকা সব যোগ দিয়েছিল সেই শোভাযাত্রায়।

সেই পথ বেয়ে এসেছি বন্ধু তোমাদের এ সহরে,
কবিতাদেবীর সাথে দেখা আর হয়নি তাহার পরে!

সহরের মায়া-কাজল আমার নয়নে লাগিয়া আছে,
হেথা হতে পাই কবিতাদেবীর প্রীতির নিমন্ত্রণ
কবিতার সাথে দেখা হয় সেথা—সেথা কি কবিরা বাঁচে?
বিরহ যে ভাই কবিতার প্রাণ, কবির শ্রেষ্ঠ ধন!

কবিতাদেবীরে ছাড়িয়া এসেছি—হেথা রচি তাঁর স্তব
বহুদিন অন্তর যাই তাঁর চরণ দেখার আশে,—
বিরহ এবং মিলন, আমার দুই যে মহোৎসব,—
পল্লীর কথা ভাল করে পারি ফুটাতে সহরবাসে!

সেথায় আমার কবিতালক্ষ্মী গাহিয়া চলেছে গান,
হেথায় সে গীতি-মাধুর্য্য ফুটে, আমার লেখনীমুখে,
সেথায় কবিতা—হেথায় যে কবি—প্রাণে মিশে আছে প্রাণ
আমার কাব্যদেবী সে তাহাই চেয়ে দেখে কৌতুকে।

সহরের পথে জ্বলিছে আলোক—প্রাসাদের চূড়ে চূড়ে
শত সহস্র সুন্দরী বধূ প্রেমের কথাই কয়,
জ্যোৎস্না হেথায় ভীতা হয়ে আসে আকাশের দূরে দূরে
দুয়েকটি তারা জেগে থাকে—তবু জানি নিঃসংশয়

কবিতাদেবীর বিরহে কবিরা হেথা হয় আরো কবি,
দিবস-রজনী জাগায়ে রাখে সে মানসমোহন ছবি!

ভারতের শিল্প-সংস্থান

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিগত ন্যূনাধিক দুই শতাব্দীর মধ্যে প্রতীচ্যে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত বা পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে ও কার্য্যক্ষেত্রে সেইগুলি প্রযুক্ত হইয়া বিভিন্ন শিল্পবিষয়ে নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের এতাদৃশ ব্যবহার মানবের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলজনক কি না তাহা সুধীজনবিবেচ্য। তবে দেখা যায় যে, দূরদেশ হইতে সংগৃহীত কাঁচামাল (raw materials) হইতে প্রতীচ্যের সুবৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিবিধ প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া দেশ-বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। আধুনিক জীবনযাত্রার উপকরণ, দেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও তাহার বাণিজ্যই প্রতীচ্যকে বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ধনশালী করিয়াছে বলিয়া মনে করা যায়।

সম্প্রতি এদেশের শিল্পোন্নতি ও নব নব শিল্পস্থাপন সম্বন্ধে কেহ কেহ সচেতন হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, শিল্পবিষয়ে এতাদৃশ উন্নত প্রতীচ্যেও বিবিধ অশান্তি বিদ্যমান রহিয়াছে এবং ঐ সকল দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর সকলের ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদন ও বাসস্থানের অভাব পরিপূর্ণ হয় নাই। তথাপি অনেকে মনে করেন, পাশ্চাত্ত্য শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞান দেশের ও দশের পক্ষে অপরিহার্য্য ও একান্ত মঙ্গলজনক। ভারতীয় শিল্পবাণিজ্য ও ভারতীয় শিল্প-সংস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে ঐ সকলের অধুনাতম পাশ্চাত্ত্য অবস্থায় উপনীত হইবার কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় ধনী, শ্রমিক ও কৃষকের কি অবস্থা দাঁড়াইবে, তাহা বিবেচনা-সাপেক্ষ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সে-বিচার না করিয়া আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে ভারতের সম্ভাবনা কি বিপুল, তাহারই আভাস দিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভারতের বিবিধ শিল্প-সংস্থানকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—উদ্ভিজ্জ ও কৃষিজাত, প্রাণীজ ও খনিজ। এই সকলই প্রচুর পরিমাণে এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়া থাকে ও বিদেশ হইতে বহুবিধ নিষ্প্রয়োজনীয় ও আপাতদৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত হইয়া এ দেশে আমদানী হইয়া থাকে। বর্ত্তমান অবস্থায় এ দেশের মাত্র মুষ্টিমেয় ধনী ও ব্যবসায়ী এই সকল শিল্প-সংস্থান রপ্তানী ও বিদেশী পণ্যের আমদানীতে লাভবান্ হন। কিন্তু কিরূপে এই সকল শিল্প-সংস্থান দেশবাসীর সর্ব্বসাধারণের পক্ষে মঙ্গল ও লাভজনকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। যে সকল উল্লেখযোগ্য কাঁচামাল এদেশ হইতে বিশ্বের সুদূর প্রান্তে প্রেরিত হইয়া থাকে, সে-গুলির বিষয় ইতিপূর্ব্বে এই পত্রিকায় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এতৎসহ প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে এদেশের প্রধান প্রধান কাঁচামালগুলি কোন্ কোন্ অঞ্চলে পাওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইল।

গত বৎসর প্রায় ৫॥০ কোটি টাকা মূল্যের বিবিধ ধাতু ও খনিজ দ্রব্য এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতে ধাতু ও ধাতব দ্রব্য অপরিচিত ছিল না, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। লৌহ, তাম্র, পারদ, রাঙ্গ ও দস্তা প্রভৃতি ধাতু এদেশে সেদিনও ব্যবহৃত হইত ও প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইত। এই সকল ধাতু হইতে প্রস্তুত লবণাদিও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইত। দাক্ষিণাত্যে প্রস্তুত ইস্পাত বহু মূল্যে বিক্রীত হইত। এক্ষণেও লৌহ ও তাম নিষ্কাষণ-শিল্প এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও এই উভয় ধাতু হইতে বিবিধ মিশ্রধাতু প্রস্তুত হইতেছে।

এতদ্সহ প্রদত্ত তালিকা (এপ্রিল, ১৯৩৭—ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮) হইতে দেখা যাইবে, এই প্রবন্ধে আলোচিত কয়েকটি দ্রব্যের কিরূপ রপ্তানী বা আমদানী হইয়াছে :—

রপ্তানী

	পরিমাণ	মূল্য
ধাতু ও ধাতুর আকর	১৭,১১,৬২৯ টন্	৫,৫০,৩০,৭৯১ টাকা
স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রাদি		১৭,০৮,৫৬,৮৮৪ "
লৌহের আকর	৫,৮১,৬৯০ "	২,৩৪,৮৪,১৫৫ "
লৌহ ও ইস্পাত	৭১,৩৪২ "	৪২,৭৪,৬৭৭ "

এখন এদেশ হইতেই লৌহ রপ্তানী হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে প্রায় ৩ কোটী টাকা মূল্যের লৌহ, ইস্পাত ও লৌহের আকর রপ্তানী হইয়াছে। টাটা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার পর কুলটী, আসনসোল ও মহীশূরে কয়েকটী লৌহের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

আকর হইতে লৌহ নিষ্কাশন করা অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। প্রথমে, অপদ্রব্যগুলিকে যথাসম্ভব মুক্ত করিয়া আকরের টুকরাগুলিকে উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়। উহার সহিত কোক্ (কয়লা) ও চুণের পাথর (lime-stone) বা ডলোমাইট্ (dolomite) নামক পাথর মিশ্রিত করিয়া চুল্লামধ্যে উত্তপ্ত করা হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে অপদ্রব্যগুলি চুণের পাথরের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। উত্তপ্ত তরল লৌহ চুল্লার তলদেশে জমিয়া থাকে ও তাহার উপরিভাগে অপদ্রব্যের স্তরটী ভাসিতে থাকে। চুল্লী-গাত্রের ছিদ্রপথে এই দুইটী স্তর বাহিরে আনা হয়। বালুকাময় ছাঁচে তরল লৌহ ঢালা হয়। এইরূপে প্রস্তুত লৌহই 'ঢালা লোহা' (cast iron)। ইহাতে ঢালাই-এর কাজ ভাল হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা অতিশয় ভঙ্গপ্রবণ। ইহাতে অঙ্গার, বালুকা প্রভৃতি যাবতীয় অপদ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। এই সকল অপদ্রব্য মুক্ত করিলে বিশুদ্ধ লৌহ (wrought iron) প্রস্তুত হয়। ইহার গুণাবলী সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহাকে উত্তপ্ত করিয়া যে ভাবে ইচ্ছা গঠন করা যায়। 'ঢালা লোহার' প্রধান অপদ্রব্য অঙ্গার। ইহার পরিমাণের তারতম্য অনুসারে প্রস্তুত লৌহের গুণাবলীরও বিশেষ তারতম্য ঘটে। বিশুদ্ধ লৌহ প্রায় অঙ্গারমুক্ত। কিন্তু স্বল্প পরিমাণ অঙ্গারযুক্ত হইলে ইস্পাত প্রস্তুত হয়। ইস্পাতের প্রতি ১০০ ভাগে প্রায় ১-২ ভাগ অঙ্গার থাকে। এই অল্প পরিমাণ অঙ্গারের ফলে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহার গুণাবলী বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। ইস্পাত তাপ ও ঘাতরোধক। ইহাকে পান ও ধার দেওয়া যায়। যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও অন্যান্য বিশেষ ব্যবহারের জন্য 'বিশেষ-ইস্পাত' (special steel) প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেখা গিয়াছে, ইস্পাতে অল্প পরিমাণ অন্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া যে মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়, তাহা বিশেষ গুণবিশিষ্ট। বিশেষ গঠনের বৈদ্যুতিক চুল্লীর মধ্যে উত্তপ্ত ও তরল ইস্পাতের সহিত নিকেল, ক্রোমিয়াম্, টাংস্টেন্ প্রভৃতি ধাতু অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া নিকেল্-ইস্পাত, ক্রোমিয়াম-ইস্পাত ও টাংস্টেন-ইস্পাত প্রস্তুত হয়। এদেশে দুই তিনটী প্রতিষ্ঠানে এইরূপ ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তাম্র : পিত্তল, কাঁসা, ব্রোঞ্জ

নেপাল, ভুটান ও টাটা-প্রতিষ্ঠানের সন্নিহিত অঞ্চলে তাম্রের আকর পাওয়া যায়। ঘাটশীলায় আধুনিক প্রণালীতে তাম্র-নিষ্কাশন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আকরগুলি সংগ্রহ করিয়া উহাকে বিশেষভাবে পরিষ্কৃত করা হয়। পরিষ্কৃত আকরকে কয়লা-চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বিশেষ চুল্লীতে বহুক্ষণ ধরিয়া উত্তপ্ত করিলে তাম্র সংগৃহীত হয়। তাম্র হইতে বহুপ্রকার মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হয়। দস্তা মিশাইলে পিত্তল, টিন্ মিশাইলে ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হয়। এই দ্বিতীয় ধাতুগুলির পরিমাণ অনুসারে প্রস্তুত মিশ্র ধাতুগুলির গুণাবলীর তারতম্য ঘটে। বেশী দস্তা থাকিলে পিত্তলের বর্ণ শ্বেতাভ ধারণ করে। বিগত বর্ষে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যের পিত্তল ও ব্রোঞ্জ আমদানী হইয়াছে এবং প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের তাম্র রপ্তানী হইয়াছে।

বহুবিধ প্রয়োজনে তাম্র ব্যবহৃত হয়। তামার তারের সাহায্যে বিদ্যুত-প্রবাহ সহজেই সঞ্চালিত হইতে পারে বলিয়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে প্রচুর পরিমাণ তামার তার ও পাত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মুদ্রা প্রস্তুত করিতে তামা বা তামাযুক্ত মিশ্রধাতু ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ-প্রলেপ (electroplating), ব্লক তৈয়ারী প্রভৃতি বিষয়েও তামার প্রয়োজন হয়। তাম্রঘটিত লবণ হইতে ঔষধ, বীজাণুনাশক দ্রব্যাদি ও রং প্রস্তুত হয়। তাম্রযুক্ত মিশ্র ধাতুর মধ্যে পিত্তল, কাঁসা, জার্ম্মান সিল্ভার ও ব্রোঞ্জই প্রধান। পিত্তল হইতে সাধারণ ব্যবহার্য্য বাসন-পত্র, নল, চাদর ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। জার্ম্মান সিল্ভার দামে সস্তা ও ইহাকে সুন্দর রূপে পালিশ করা যায়। রৌদ্র ও জল বায়ুতে ব্রোঞ্জের সহজে কোন পরিবর্ত্তন হয় না।

ম্যাঙ্গানীজ

এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ম্যাঙ্গানীজ নামক ধাতুর আকর পাওয়া যায়। মধ্য-ভারতের ম্যাঙ্গানীজ আকর বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মহীশূর প্রদেশেও এই আকর পাওয়া যায়। বিগত বর্ষে প্রায় ১ কোটী টাকা মূল্যের আকর রপ্তানী হইয়াছে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহাতে বহু প্রকার অপদ্রব্য মিশ্রিত থাকে। তন্মধ্যে বালুকা, লৌহ, প্রস্তর প্রভৃতিই প্রধান। বিভিন্ন ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রণালীতে ঐ সকল অপদ্রব্য মুক্ত করা হয়। সুপরিষ্কৃত ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড হইতে টর্চ্চ-লাইটের ব্যাটারী প্রস্তুত হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যাটারী ভারতে আমদানী হইয়াছে। দেশীয় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও বিদেশীয় উৎসাহে স্থাপিত কয়েকটি কারখানা এই বিষয়ে যথেষ্ট অগ্রণী হইয়াছেন। পরিষ্কৃত ম্যাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড হইতে পটাশিয়ম পার-ম্যাঙ্গানেট নামক বীজাণুনাশক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এই লবণটীও এদেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ক্রোমাইট

বেলুচিস্তান, বিহার, উড়িষ্যা ও মহীশূর অঞ্চল ক্রোমাইট নামক খনিজের জন্য প্রসিদ্ধ। এই খনিজ হইতে ক্রোমিয়াম্ নামক ধাতুটি পাওয়া যায়। ক্রোমাইট হইতে এক প্রকার ইষ্টক প্রস্তুত করা হয়। তীব্র তাপসহনশীল চুল্লী নির্ম্মাণের জন্য এই ইষ্টক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিবিধ মিশ্রধাতু প্রস্তুত করিতে ও তড়িৎ প্রলেপের জন্য ক্রোমিয়াম্ ধাতু ব্যবহৃত হয়। বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে ও ব্যবহারে ক্রোমিয়ামের আবরণ নিকেল্ অপেক্ষা ভাল। ক্রোমিয়াম্-যুক্ত ইস্পাত খুব মজবুত হয় ও উহাতে সহজে মরিচা ধরে না।

অভ্র

বিহার প্রদেশ অভ্রের জন্য বিখ্যাত। এই প্রদেশের অন্তর্গত হাজারিবাগ ও গয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রায় ৬০।৭০ মাইল দীর্ঘ ও ১২ মাইল প্রস্থ ব্যাপিয়া অভ্রের স্তর বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজের নেলোর ও সালেম অঞ্চলে, রাজপুতানা ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যেও অভ্র পাওয়া যায়।

তাপ ও বৈদ্যুৎ প্রবাহ রোধ করিতে অভ্র বিশেষ কার্য্যকরী। সে কারণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিতে অভ্র ব্যবহৃত হয়। বিগত বর্ষে প্রায় ১॥০ কোটী টাকা মূল্যের অভ্র রপ্তানী হইয়াছে। অভ্রের পাত বা অভ্র চূর্ণ হইতে তাপ-নিবারক ও তাপরোধক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। উত্তপ্ত চুল্লীর ভিতরের অবস্থা দেখিবার নিমিত্ত চুল্লীগাত্র ছিদ্র করিয়া উহাতে অভ্রখণ্ড লাগাইয়া দেওয়া হয়।

বক্সাইট : রং, এলুমিনিয়াম, ফটকিরি

বক্সাইট (bauxite) এক প্রকার কঠিন প্রস্তর বিশেষ। ইহা হইতেই এলুমিনিয়াম্ ধাতু নিষ্কাশিত হয়। মধ্যপ্রদেশ, হাজারিবাগ, জব্বলপুর, কোল্হাপুর, গঞ্জাম ও ভিজাগাপত্তম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বক্সাইট পাওয়া যায়।

বিগত বর্ষে প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা মূল্যের এলুমিনিয়াম এ দেশে আনীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এলুমিনিয়াম হইতে প্রস্তুত লবণাদিও এ দেশে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে প্রায় ২৮ সহস্র টাকা মূল্যের ফটকিরি আমদানী হইয়াছে।

বক্সাইট হইতে এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে উহাকে সম্পূর্ণরূপে অপদ্রব্য মুক্ত করিতে হয়। তীব্র সোডার দ্রবণের সহিত বক্সাইট চূর্ণকে ফুটাইলে এলুমিনিয়াম প্রধান অংশ দ্রবীভূত হইয়া যায়; অবশিষ্ট থাকিয়া যায় অপদ্রব্যগুলি। দ্রবণটিকে ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide) নামক গ্যাস-প্রবাহ চালিত করিলে এলুমিনিয়ামের অংশ প্রক্ষেপ হয়। ঐ প্রক্ষেপকে উত্তপ্ত করিয়া জলমুক্ত করা হয় ও বিশেষ ভাবে প্রস্তুত বৈদ্যুতিক চুল্লীতে উত্তপ্ত করিলে এলুমিনিয়াম ধাতু মুক্ত হইয়া যায়।

এলুমিনিয়াম ধাতু লঘু অথচ মজবুত। তাপ ও বিদ্যুৎ প্রবাহ সহজেই সঞ্চালন করিতে পারে। ইহার দাম অল্প ও ইহা হইতে বিশেষ ব্যবহারোপযোগী বহু প্রকারের মিশ্র ধাতু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এলুমিনিয়ামের তার, পাত ও চূর্ণ বিভিন্ন প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়

থাকে। পাত হইতে বাসনপত্র, মোটর, রেলগাড়ী ও বিমানপোতের অংশবিশেষ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি, খেলনা, কৌটা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। খুব পাতলা পাত দিয়া সিগারেট, সাবান ও লজেঞ্জস প্রভৃতি আবৃত করা হয়। এলুমিনিয়াম চূর্ণ হইতে রং ও বিস্ফোরক প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ জলিবার সময় তীব্র তাপ উৎপন্ন হয়; সেইজন্য ইস্পাত প্রভৃতি জুড়িবার জন্য (welding) এই চূর্ণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এলুমিনিয়াম হইতে ডুরালুমিন্, আল্প্যাক্স্, ম্যাগনেলিয়াম্ প্রভৃতি দৃঢ় মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয়। এইগুলি মোটরগাড়ী ও বিমানপোত প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। খনিজ বক্সাইটকে অপদ্রব্য মুক্ত করিয়া নানা প্রকার ব্যবহারে আনা যাইতে পারে। ইহার সাহায্যে খনিজ তৈলকে (কেরোসিন প্রভৃতি) বর্ণ ও গন্ধকবিহীন করা হয়। সাধারণতঃ খনিজ তৈলের বর্ণ গাঢ় হয় ও উহাতে গন্ধকময় অপদ্রব্য বর্ত্তমান থাকে। এই উভয় দোষই তৈলের পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। একটি নলের ভিতর পরিষ্কৃত বক্সাইটের টুকরা দিয়া পূর্ণ করিয়া উহার মধ্য দিয়া তৈলটি প্রবাহিত হইতে দিলে উহা অনেকাংশে পরিষ্কৃত হইয়া যায়। জব্বলপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বক্সাইটে টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (titanium dioxide) নামক এক প্রকার ধাতব অপদ্রব্য থাকিতে দেখা যায়। এই জাতীয় বক্সাইটের সূক্ষ্মচূর্ণকে তিসি তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে কাষ্ঠ ও ধাতুপাত্রের উপযোগী দীর্ঘকালস্থায়ী রং প্রস্তুত হয়। লৌহ-ঘটিত অপদ্রব্য বর্ত্তমান থাকায় এই রং ঈষৎ পীতাভ বা লোহিতাভ হয়, কিন্তু লৌহমুক্ত করিলে রংটি বেশ সাদা হয়।

মাদ্রাজ অঞ্চল হইতে সংগৃহীত বক্সাইটের চূর্ণকে সালফিউরিক এসিডের সহিত পাক করিলে এলুমিনিয়াম অংশ দ্রবীভূত হইয়া যায়। দ্রবণটি পৃথক্ করিয়া লইয়া উহার সহিত পটাশিয়াম লবণের দ্রবণ মিশ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে ঘনীভূত করিলে ফটকিরির দানা প্রস্তুত হয়। ঔষধে, পানীয় জল পরিষ্কার করিতে ও রঞ্জন শিল্পে প্রচুর পরিমাণে ফটকিরি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চীনাবাদাম বা মাঠকড়াই

—শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র

হাতা-আস্তিন গুটায়ে জামার
ছেলেগুলো পথে করে লড়াই,
'চীনাবাদাম তো ভারতের নয়'—
এই নিয়ে গোল, যত বড়াই।
'চীন থেকে আসে তাই দাম বেশী'··
'আলব্যৎ এতে বেড়ে ওঠে পেশী',···
'এক পয়সায় দেছে কত ক'টি',···
'আয় খাবি, সতু-নীলু-ঝড়াই!

বোকা বালকেরা শিখেছিস্ স্কুল,
চীনাবাদামের কাহিনী শোন্,—
চীনাম্যানগুলো খায় বেশী ক'রে
তাই হলো ঐ নামকরণ।
বাঙলার মাঠে দুখীদের তরে
চাষ হয় ওর প্রায় প্রতি ঘরে,
মাটীর নীচেতে জনম বলিয়া
ডাক-নাম ওর মাঠকড়াই।

অস্ত্র-চিকিৎসা ও শারীর-রসায়ন

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী

কিছুদিন যাবৎ অস্ত্র-চিকিৎসার সাফল্য ও প্রসার দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, কালক্রমে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধির চিকিৎসাই ঐ উপায়ে সম্ভব হইবে। এই সঙ্গে কি প্রকারে ব্যাধি নিরোধ করা যাইতে পারে, সে চিন্তাও মানব-মনে উদিত হইয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বহুসংখ্যক হাসপাতাল আছে, সুতরাং অনেক রোগী অস্ত্র চিকিৎসার সুযোগ পায়, কিন্তু আমাদিগের দেশে ধনী ব্যতীত অন্যের পক্ষে ইহা দুরূহ ব্যাপার। কারণ, হাসপাতালের সংখ্যা এতই অল্প যে, দরিদ্র জনসাধারণের অনেকেই স্থান পায় না। নিজের গৃহে চিকিৎসক আনিয়া অস্ত্রোপচার করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, সুতরাং মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণ ঐরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে না। ঔষধপ্রয়োগে ব্যাধি নিরাময় ও নিরোধ করিতে পারিলেই মানব-জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

শৈশবের বহু রোগ, যথা,—রিকেট্‌স্ (rickets) প্রভৃতি উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে আক্রমণ করে। শিশুর পক্ষে স্তন্যদুগ্ধের ন্যায় পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই। শিশুর অধিকাংশ রোগই উপযুক্ত পরিমাণে স্তন্যদুগ্ধের অভাবে প্রভাব বিস্তার করে ও পরে ঐ সমস্ত শিশু বয়োপ্রাপ্ত হইয়াও সম্পূর্ণ সুস্থ ও বলবান্ হইতে পারে না। এই সমস্ত দুর্ব্বল ও রোগজীর্ণ ব্যক্তির সন্তান-সন্ততিগণও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয় ও এইরূপেই দেশব্যাপী স্বাস্থ্যহীন ও দুর্ব্বল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিজ্ঞাপনের প্রভাবে কৃত্রিম খাদ্য দিও বহুল প্রচার হইয়াছে ও শিশুদিগকে খাওয়ান হইতেছে, কিন্তু এখন তাহার কুফল সম্বন্ধে বহু চিকিৎসকই একমত। কৃত্রিম খাদ্য শিশুদিগের উপর প্রয়োগ করা বিষ প্রয়োগেরই অনুরূপ। স্তন্যদুগ্ধ ও সমস্ত ফলের রস খাওয়াইলে শিশুর স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা খুবই কম।

এখনও পর্য্যন্ত কতকগুলি রোগ, যথা—অপাঙ্গ-প্রদাহ (appendicitis) প্রভৃতির অস্ত্র চিকিৎসা ব্যতীত উপায়ান্তর দেখা যায় না, কিন্তু এতৎসম্বন্ধে ইহাও গবেষণার বিষয় যে, এই রোগের উৎপত্তির কারণ কি? বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন যে, খাদ্যের জন্যই এই রোগ জন্মায়। অনুচিত খাদ্যাদি আহার করিলে কতকগুলি জীবাণু উৎপন্ন হইয়া এই রোগের সৃষ্টি করে। কিরূপ খাদ্য আহারের জন্য এই ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ইহা নির্ণয় করিতে পারিলেই এই রোগের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হইবে। অনেক চিকিৎসকের বিশ্বাস যে, অপাঙ্গ (appendix) মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক ও উহা একটি পুরাতন অঙ্গের অবশেষ মাত্র। বহু অস্ত্র চিকিৎসক বলেন যে, শৈশবাবস্থাতেই ইহা অস্ত্রোপচার দ্বারা বাহির করিয়া লওয়া উচিত, কারণ তাহা হইলে অপাঙ্গ-প্রদাহ রোগ হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। তুলনা-মূলক শরীর-সংস্থান-বিজ্ঞান (comparative anatomy) পাঠে জানা যায় যে, বানর অপেক্ষা নিম্নস্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণীদিগের অপাঙ্গ নাই। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, বানরের পক্ষে এই অঙ্গের প্রয়োজনও আছে। স্বাভাবিক বন্য অবস্থায় বানরের অপাঙ্গ-প্রদাহ রোগ হয় না, কিন্তু গৃহপালিত বানরকে মনুষ্যের খাদ্য আহার করিতে দিলে কখনও কখনও উহাদিগকে ঐ রোগাক্রান্ত হইতে দেখা যায়। মানবদেহেও অপাঙ্গের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শরীরের স্থানে স্থানে যে কোষগুলি রক্তের শ্বেতকণিকা উৎপাদন করে, অপাঙ্গের ভিতরেও সেইরূপ কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয় যে, সম্ভবতঃ অপাঙ্গের ভিতরেও শ্বেত-কণিকা উৎপন্ন হয়।

কর্কট রোগের (cancer) চিকিৎসাও একমাত্র অস্ত্রোপচার দ্বারাই সম্ভব, ইহাই চিকিৎসকগণ মনে করেন। আজকাল রঞ্জনরশ্মি সাহায্যে কর্কট রোগের চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু কোন রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা উহার চিকিৎসা এখনও পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। এই রোগ সম্বন্ধে পৃথিবীর নানাদেশে প্রচুর গবেষণা ও পরীক্ষা চলিতেছে। কর্কট রোগাক্রান্ত স্থানের কোষগুলি অস্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পাকস্থলীতে

এই রোগ বেশী হয়, কিন্তু ক্ষুদ্র অন্ত্রে (small intestine) এই রোগ হইতে দেখা যায় না। পাকস্থলীর অম্লরস এই রোগ বৃদ্ধির সহায়ক ও ক্ষুদ্র অন্ত্রের ক্ষার রসে এই রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। এই পরীক্ষা হইতে মনে হয় যে, কালক্রমে এই রোগের ঔষধ আবিষ্কার হওয়া খুবই সম্ভব। প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ ও শারীর-রসায়নবিদ্‌গণ (biochemists) এ বিষয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা ও গবেষণা আরম্ভ করিয়াছেন, সুতরাং আশা করা যায় যে, কালক্রমে তাঁহাদের গবেষণা সফল হইবে ও মানবজাতির অশেষ কল্যাণসাধনে সক্ষম হইবে।

প্রাণী-কোষের ভিতরে জীবপঙ্ক (protoplasm) থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, জীবপঙ্কের কিয়দংশ চতুর্দ্দিকের জীবপঙ্ক অপেক্ষা সামান্য পৃথক্ প্রকৃতির ও গোলাকার। উহাকে কেন্দ্রক (nucleus) বলা হয়। কেন্দ্রকের ভিতরে সূক্ষ্মসূত্রের ন্যায় পদার্থ আছে। ঐগুলিকে ক্রোমোসোম (chromosome) বলে। রঞ্জক পদার্থ প্রয়োগ করিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রসাহায্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যা গণনা করা যায়। একই শ্রেণীর জীবের ক্রোমোসোম সংখ্যা একই হইবে। কোষতত্ত্ববিদ্‌গণ (cytologists) দেখিয়াছেন যে, কর্কট রোগাক্রান্ত কোষগুলিতে ক্রোমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার অৰ্দ্ধেক মাত্র। এডিনবরার ডাক্তার জন বেয়ার্ড (Dr. John Beard) এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করিয়া একটি চিকিৎসা প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মতানুসারে ও গবেষণার ফলে এই দুরারোগ্য ব্যাধিও ঔষধ প্রয়োগেই আরোগ্য করা সম্ভব হইবে, সুতরাং অস্ত্র চিকিৎসার আর এ ক্ষেত্রে কোন আবশ্যক হইবে না। এই সকল দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, জীবতত্ত্ববিদ্ ও শারীর-রসায়নবিদ্‌গণের সম্মিলিত গবেষণা ও চেষ্টার ফলে সকল রোগই অস্ত্র-চিকিৎসা ব্যতিরেকেই আরোগ্য করা যাইবে।

জীবাণুতত্ত্ববিদগণ রোগজীবাণু ও ঐ জীবাণুগুলির বাহক কীটগুলি আবিষ্কার করিয়া রোগ উৎপত্তি ও প্রসারের হেতু নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এক্ষণে শারীর রসায়নবিদ্‌গণ তাঁহাদিগের সহিত সম্মিলিতভাবে গবেষণার ফলে অনেকগুলি রোগ চিকিৎসা ও রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। আমেরিকার কতিপয় কোষতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত জীবদেহ হইতে মূত্রাশয়, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, যকৃৎ ইত্যাদির অংশ অস্ত্রোপচার দ্বারা নিষ্কাশন করিয়া যথাযথ উত্তাপ ও উপযুক্ত পরিপোষক রাসায়নিক দ্রবণে রাখিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ঐগুলিকে জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই সকল পরীক্ষার ফলে তাঁহারা কিরূপ অবস্থায় রাখিলে ঐগুলি বর্দ্ধিত হইতে পারে ও কিরূপ অবস্থা ঐগুলির বৃদ্ধির প্রতিকূল তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। ক্রমশঃ এই সকল পরীক্ষা দ্বারা কিরূপ রাসায়নিক পদার্থ জীবদেহে প্রয়োগ করিলে সুস্থ অবস্থায় থাকা সম্ভব ও কোন্ রাসায়নিক পদার্থ রোগজীবাণু নাশ করিবে, তাহাও জ্ঞাত হওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়। রোগ-প্রতিষেধক পদার্থ আবিষ্কার ও প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজনও কমিয়া যাইবে ও একমাত্র দৈবঘটনাপ্রসূত রোগ, যথা, হঠাৎ আঘাত প্রাপ্ত হওয়া অস্থিভঙ্গ প্রভৃতি ব্যাপারে অস্ত্রচিকিৎসার প্রয়োজন হইবে।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা গিয়াছে যে, অনেক রোগই জীবদেহে প্রকাশ পায় ও বিনা চিকিৎসাতেই আরোগ্য হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া মনে হয়, জীবদেহের ভিতরেই এমন পদার্থ আছে, যাহার ব্যাধি আরোগ্য করিবার ক্ষমতা আছে। অতি-আধুনিক চিকিৎসক ও শারীর-রসায়নবিদ্‌গণ মানবদেহের কতকগুলি গ্রন্থিরসের উপকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ গুলি অনেক সময় রোগ নিরাময় করে ও দেহের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড গ্রন্থিরস (thyreid extract) প্রয়োগ করিয়া কতকগুলি মানসিক ও শারীরিক ব্যাধি আরোগ্য হইয়াছে। অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলি (adrenal glands) হইতে অ্যাড্রিনালিন (adrenalin) নামক একটি বিশেষ উপকারী পদার্থ পাওয়া গিয়াছে ও ঔষধার্থে প্রয়োগ করা হইতেছে। মজ্জার (bone-marrow) উপকারিতা সম্বন্ধেও চিকিৎসকগণ একমত। থাইমাস গ্রন্থি-(thymus gland)-রসও বহু রোগে প্রয়োগ করা হইতেছে। পিটুইটারী গ্রন্থি-(pituitary gland)-রস উন্মাদ রোগ ও অন্যান্য কারণেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থি যৌবনে বর্দ্ধিত হইলে মনুষ্য অত্যন্ত দীর্ঘাবয়ব বিশিষ্ট হয়, সুতরাং উচ্চতা বৃদ্ধি করিবার জন্যও এই গ্রন্থিরস ব্যবহার করা যাইতে পারে। এই সকল গ্রন্থিরস

ব্যতীত অন্যান্য পদার্থ, যথা, মস্তিষ্ক, মূত্রাশয়, যকৃৎ, প্রজনন কোষ প্রভৃতির নির্য্যাস প্রয়োগ করিয়াও ঐগুলির ক্রিয়া সম্বন্ধে পর্য্যবেক্ষণ ও গবেষণা চলিতেছে, কিন্তু এখনও আশানুরূপ ফলপ্রাপ্তি ঘটে নাই। এই অকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণই এই যে, শারীর-রসায়ন সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও অধিক অগ্রসর হয় নাই। থাইরয়েড গ্রন্থির নির্য্যাস সর্ব্বত্রই ফলপ্রদ হইয়াছে। প্যানক্রিয়াস (pancreas) গ্রন্থি অতি আধুনিক আবিষ্কার। দেখা গিয়াছে যে, পরিপাক ক্রিয়ার উপরে ইহার যথেষ্ট প্রভাব আছে এবং শরীরের উপকারার্থে শর্করা কাজে লাগাইবার জন্য ইহা অপরিহার্য্য। প্যানক্রিয়াসের কিয়দংশের নাম ল্যাঙ্গারহানসের দ্বীপ (Islands of Langerhans)। প্যানক্রিয়াসের এই অংশ ব্যাধিযুক্ত হইলে রক্তের অভ্যন্তরস্থ শর্করা শরীরপুষ্টির কাজে লাগান সম্ভব হয় না ও রোগী বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হয়। অল্পদিন পূর্ব্বে টরণ্টো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর এফ. জি, ব্যান্টিং (Dr. F. G. Banting) প্যানক্রিয়াস-নিঃসৃত রসের যে-পদার্থটি শর্করা কাজে লাগাইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন ও ইহাকে ইনসুলিন (Insulin) আখ্যা দিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বহুমূত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্তপ্রবাহে ইনসুলিন ইনজেকসন করিয়া প্রবিষ্ট করাইলে রোগ নিরাময় হয়, কিন্তু ইনজেকসন বন্ধ করিলেই পুনরায় রোগ দেখা দেয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী দীর্ঘকাল ধরিয়া ইনসুলিন ইনজেকসন ও পথ্যাদি বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া বহুমূত্র রোগাক্রান্ত রোগীকে বহুদিন যাবৎ সুস্থ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন ও তাঁহারা আশা করেন যে, দীর্ঘকাল ইনসুলিন্ ইনজেকসন করিলে ল্যাঙ্গারহানসের দ্বীপের কোষগুলি পুনরায় ক্রিয়াশীল হইতে পারে।

রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ আবিষ্কার করিবার জন্য এ যুগের পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এ বিষয়ে গবেষণার পথ-প্রদর্শক স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) এবং লর্ড লিষ্টার (Lord Lister) ও রবার্ট কখ্ (Robert Koch)—তাঁহার উপযুক্ত কৃতী ছাত্রদ্বয়। লর্ড লিষ্টার তাঁহার গুরুর আবিষ্কার কার্য্যকরী করিয়াছিলেন। রবার্ট কখ্ অনেকগুলি রোগ-জীবাণুর আবিষ্কর্ত্তা। যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগে অধ্যাপক এলি মেচনিকাফ (Elie Metchnikoff) এবং অধ্যাপক পাউল এরলিশ (Paul Ehrlich) যদিও কোন রোগ-জীবাণু আবিষ্কার করেন নাই, তথাপি তাঁহাদের গবেষণা চিকিৎসাশাস্ত্রে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। রোগ-জীবাণু কিরূপে রোগ উৎপাদন করে; একই জীবাণু দ্বারা কাহারও দেহে পীড়া জন্মায় ও কাহারও দেহে কোন রোগের লক্ষণ দেখা যায় না এবং রোগ-জীবাণুর সহিত মনুষ্য দেহাভ্যন্তরে কি প্রকার সংগ্রাম চলিতেছে, এই সকল বিষয়ে তাঁহারা গবেষণা করেন। এই সকল বিষয় অত্যন্ত জটিল। একটি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীর হইতে রোগজীবাণু লইয়া কয়েকজনের দেহে প্রবিষ্ট করাইয়া দেখা গিয়াছে যে, কেহ রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, কেহ অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কিছুদিন থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিল ও কাহারও শরীরে রোগের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। ইহা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, এরূপ পার্থক্য কেন ঘটিল। এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অধ্যাপক এলি মেচ্‌নিকফ বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখার সৃষ্টি করিলেন ও ইহাকে স্বাভাবিক রোগ প্রতিকার বিজ্ঞান (science of immunity) বলা যাইতে পারে।

বহুকাল পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছিল যে, শ্বেত রক্তকণিকা ধমনীর আবরণের ভিতর দিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ধমনাগাত্রে কোন প্রকার ছিদ্র হয় না। কিছুদিন পরে কখ্ শ্বেত রক্তকণিকা পরীক্ষা করিতে করিতে কতকগুলির ভিতর রোগ-জীবাণু দেখিতে পান। তখনও পর্য্যন্ত শ্বেত রক্তকণিকার কোন বিশেষ ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় নাই। মেচনিকফ্ এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, শ্বেত রক্তকণিকা শরীরের যে অংশে পাকযন্ত্রাদি আছে, তথায় উৎপন্ন হয়, সুতরাং আশা করা যায় যে, ঐ কণিকাগুলির পরিপাক-ক্ষমতা আছে। জল-মক্ষিকা (water flea), কুম্ভীর প্রভৃতি লইয়া পরীক্ষা করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, শ্বেত রক্তকণিকাগুলির জীবাণু ভক্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিগণ তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পরীক্ষা দ্বারা সকল যুক্তিই খণ্ডন করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্বেত রক্তকণিকা পরিপাক-ক্রিয়াশীল কতকগুলি রস প্রস্তুত করে ও ঐগুলি ব্যবহার করে। তাঁহারা এই রসগুলি পৃথক্ করিতেও সমর্থ হইয়াছেন। ইহাই যে জীবদেহের রোগ-প্রতিরোধক ক্রিয়া অনেকাংশে সম্পন্ন করে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আধুনিক চিকিৎসকগণ রক্তের শ্বেতকণিকা অণুবীক্ষণ সাহায্যে গণনা করিয়া কোন ব্যক্তির রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারেন। বহু প্রকার রোগক্রান্ত ব্যক্তির শ্বেত রক্তকণিকা গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কখনও সুস্থ ব্যক্তির তুলনায় অধিকসংখ্যক ও কখনও অল্পসংখ্যক থাকে। অধিকসংখ্যক শ্বেত রক্তকণিকা দেখিলে বুঝিতে হইবে যে, রোগ-জীবাণু নাশ করিবার জন্যই শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। নিউমোনিয়া রোগে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অল্প দেখিলে রোগীর জীবন সম্বন্ধে কোনরূপ আশাই করা যায় না। রোগ-জীবাণু ও শ্বেতকণিকার সংগ্রামের ফলে যদি শ্বেতকণিকা পরাভূত হয়, তবে আক্রান্ত স্থানে পুঁযের উৎপত্তি হয়। এইগুলি শ্বেত রক্তকণিকার ক্রিয়ার অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত।

এই মতবাদের উপর সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা এখনও সম্ভব হয় নাই। ডিপ্থিরিয়া (diphtheria) রোগাক্রান্ত শিশু ও অশ্বের রক্তে ডিপ্থিরিয়া অ্যান্টিটক্সিন্ (diphtheria antitoxin) পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে চিন্তা করিলে মনে হয় যে, শ্বেতরক্তকণিকা-বৃদ্ধি ইহার উৎপত্তির কারণ হওয়া সম্ভব নহে, কারণ গলার যে সমস্ত কোষ ডিপ্থিরিয়া রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছে, সেই কোষগুলি হইতেই অ্যান্টিটক্সিন্ প্রস্তুত হইয়া রক্তে যাইয়া থাকিতে পারে। রক্তের রসভাগ (blood serum) কতকগুলি রোগজীবাণু ধ্বংস করিতে পারে। খরগোসের রক্তের রসভাগ এ্যান্থ্রাক্স (anthrax) জীবাণু নাশ করিতে পারে, ইহা বহুকাল পূর্ব্বেই জানা গিয়াছে। মেচ্নিকফের মতবাদ অনুসারে ইহার এই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, রক্তের রসভাগের যে পদার্থ জীবাণুধ্বংসকারী, উহা শ্বেতকণিকারই সৃষ্টি ও তথা হইতেই উহা রক্তের রসভাগে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

রোগ-জীবাণু আক্রমণ করিলেই কেহ কেহ অসুস্থ হন না দেখিয়া মনে হয়, জীবদেহের রোগ প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। এই রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা দুইটি কারণ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, শরীরের শ্বেত-রক্তকণিকাগুলি জীবাণু ধ্বংস করে ও দ্বিতীয় কারণ এই হইতে পারে যে, শরীরে কোন প্রকার জীবাণুধ্বংসকারী পদার্থ আছে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। এখন ইহা একটি বিশেষ গবেষণার বিষয় হইয়াছে। সকল মনুষ্যদেহই একটি কোষ হইতে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে, কিন্তু পরে রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণ রসায়নে এই রোগ-প্রতিরোধক পদার্থগুলি সম্বন্ধে কোন তথ্যই পাওয়া যায় না বা ঐ প্রকার কোন পদার্থ রাসায়নিকগণ প্রস্তুত করিতেও সমর্থ হন নাই। লামার্ক বা ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদ দ্বারাও রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার এই তারতম্যের কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

অধ্যাপক পাউল এরলিশের মতে দুইটি পদার্থ রক্তে থাকিবার জন্য স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতার উৎপত্তি হইয়াছে। প্রথম পদার্থটির ক্রিয়ায় জীবাণুগুলি নিস্তেজ ও ধ্বংসপ্রবণ হয় এবং দ্বিতীয়টি জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। ইংরাজ জীবাণুতত্ত্ববিদ্ স্যর আম্‌রথ্ রাইট (Sir Almroth Wright) রক্তের রসভাগে একজাতীয় পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ইহাকে অপসোনিন্ (opsonin) আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে এই অপসোনিন্‌গুলিই রোগজীবাণু নাশের প্রধান উপাদান। এ বিষয়ে বহু গবেষণাই চলিতেছে ও অনেকগুলি রোগ, যথা ডিপথেরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি রোগের অ্যান্টিটক্সিন্ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শারীর-রসায়নের জ্ঞান এখনও প্রায় শৈশবাবস্থাতেই আছে; সুতরাং আশা করা যায় যে, এ বিষয়ের জ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে অনেক রোগেরই প্রতিষেধক ও চিকিৎসা আবিষ্কৃত হইবে ও ক্রমশঃ অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

কেনিয়ার কথা

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

ডার্ক কন্টিনেন্ট বা অন্ধকার মহাদেশ আখ্যায় অভিহিত আফ্রিকার বক্ষে ভ্রমণ করিবার বিশেষ বাসনা বহুদিন হইতে বিদ্যমান ছিল। বাল্যকালে বাল-সুলভ কল্পনার সাহায্যে আফ্রিকার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার বিচিত্র চিত্র চিত্তপটে অঙ্কিত করিতাম। অবশেষে যেদিন চিররহস্যময় ও চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই আফ্রিকার উপকূলে

ফোর্ট যেসাস—মোম্বাসা (এই দুর্গ পর্তুগীজদের দ্বারা নির্ম্মিত হয়)।

ভ্রমণ করিবার সুযোগ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রাপ্ত হইলাম, সেদিন অন্তরে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আনন্দ স্বতঃই সঞ্চারিত হইল।

বোম্বাই হইতে কেনিয়া উপনিবেশের বন্দর মোম্বাসায় পৌঁছিতে প্রায় দশ দিন লাগিল। মোম্বাসা নগরী ডিম্বাকৃতি একটি দ্বীপের পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। নগরের নিম্নবর্ত্তী সমুদ্র তেমন গভীর নহে বলিয়া নগরের নিকটস্থ উপকূল বর্ত্তমানে বন্দর রূপে ব্যবহৃত হয় না। আধুনিক বন্দর দ্বীপের পশ্চিমে বিরাজিত। পশ্চিমের সমুদ্রাংশ সুগভীর বলিয়াই ঐ দিক বন্দর হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে। এই বন্দর কিলিণ্ডিনি আখ্যায় অভিহিত।

এই স্থানে মোম্বাসার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিলে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহা পর্তুগীজদের দ্বারা অধিকৃত এবং ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে পর্তুগীজ "পূর্ব্ব আফ্রিকার" রাজধানী রূপে গণ্য হয় বলিয়া আমরা জানিতে পারি। স্থানটিকে সুরক্ষিত করিবার জন্য পর্তুগীজগণ "ফোর্ট যেসাস্" নামক একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। আরবদের সহিত বিবাদে বহুবার এই দুর্গ তাঁহাদের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আরবদের হস্তগত হইয়াছিল। অবশেষে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দিনত্রয়ব্যাপী অবরোধের পর এই সুদৃঢ় দুর্গের উপর আরবের স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক আরবগণ অবশিষ্ট পর্তুগীজগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। দুইদিন পরে সাহায্য করিবার জন্য গোয়া হইতে যখন সৈন্য আসে, তখন আর দুর্গ রক্ষার কোন উপায় ছিল না। ঐ সুদৃশ্য ও সুদৃঢ় দুর্গ এখন কারাগার রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

আমরা গ্রীষ্মকালে গিয়াছিলাম। অতি রুক্ষ উত্তাপের জন্য মোম্বাসা তখন ভ্রমণকারীর পক্ষে বিশেষ উপভোগ্য ছিল না। কেনিয়া-উগাণ্ডা রেল-পথ মোম্বাসা নগর হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রেল-পথ কিলিণ্ডিনি বন্দর অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ অনেক উচ্চে উঠিয়াছে। নায়রোবি অতিক্রম করিবার পর এই পথ ক্রমশঃ নামিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত রিফ্ট উপত্যকার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই উপত্যকা পার হইয়া ইহা আবার ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে এবং

ইকুয়েটর, অর্থাৎ বিষুবরেখা রেল-ষ্টেশন অতিক্রম করিবার কালে ৯ হাজার ১ শত ৩০ ফুট উচ্চে আরোহণ করিয়াছে। বৃটিশ-অধিকৃত অন্য কোন রেলপথ এত উচ্চে উঠে নাই।

আমরা মোম্বাসা হইতে যাত্রা করিয়া নানা প্রকার বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। আফ্রিকা-সুলভ নানা রকম অদ্ভুত প্রাণী এই পথে দেখা যায়। আমরা গ্যাজেল, হার্টিবীষ্ট আখ্যায় অভিহিত এন্টিলোপ জাতীয় মৃগগণকে বিচরণ করিতে দেখিলাম। রেল-রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ভূ-খণ্ডে দণ্ডায়মান কয়েকটি জিরাফ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আলিপুরের পশুশালায় এই দীর্ঘ-স্কন্ধ বিচিত্র জীবকে আমরা দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সেই দেখার সহিত এই দেখার কি বিপুল পার্থক্য। এখানে ইহারা মাতৃরূপা প্রকৃতির ক্রোড়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে, আর সেখানে তাহারা কৃত্রিম আব-হাওয়া বা আবেষ্টনের মধ্যে মানুষের তীব্র দৃষ্টির সম্মুখে বন্দীশালায় বাস করিতেছে।

স্বস্থানে স্বাভাবিক আবেষ্টনীর মধ্যে জিরাফ।

জিরাফ সকল সময়ে দেখা যায় না বলিয়া সকলেই বিশেষ উদ্‌গ্রীব বা ব্যগ্র ভাবে সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিল। জিরাফদিগকে দেখিলে তাহারা যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিচিত্রাকৃতি প্রাণীদের অবশেষ সে বিষয়ে সংশয় থাকে না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই ধরণের আরও অনেক দীর্ঘ-স্কন্ধ জীব বিদ্যমান ছিল, যাহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে না পারিয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন কারণে আফ্রিকার বিজন বা নিভৃত বক্ষে ইহারা রহিয়া গিয়াছে।

আমরা শুনিতে পাইলাম, সময়ে সময়ে ট্রেন হইতে পশুরাজ সিংহকেও দেখা যায়। যে সময়ে জলাভাব ঘটে, সাধারণতঃ সেই সময়েই প্রচণ্ড পিপাসার দ্বারা পীড়িত হইয়া দুই একটি সিংহ রেলপথের পার্শ্বে আসিয়া পড়ে। অবশ্য কচিৎ এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মোম্বাসা হইতে বাহির হইয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে আমরা নায়রোবি নগরে উপনীত হইলাম। নায়রোবি কেনিয়ার রাজধানী। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫ হাজার ৪ শত ৫২ ফুট উচ্চে অবস্থিত। নায়রোবি রাজধানী হইলেও কেনিয়া উপনিবেশের মধ্যে মোম্বাসাই বৃহত্তম নগর।

নায়রোবিকে নিতান্ত নূতন নগর বলিলে ভুল বলা হয় না। এখানকার অধিকাংশ বাড়ীই কংক্রীটের গাথনি এবং করোগেটের শীটের ছাউনি-বিশিষ্ট। সুতরাং প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে এরূপ গৃহ এখানে নাই বলিলেও চলে। এখানে গাছপালা বড় বেশী দেখা যায় না। শুধু একদিক্ বন-বহুল বটে। পার্ব্বত্যপ্রদেশ বলিয়া জমিগুলি উচ্চ-নীচ। আবহাওয়া বিশেষ পরিষ্কার বলিয়া বহু দূরবর্ত্তী দৃশ্যও দৃষ্টিপথে পতিত হয়। নায়রোবি হইতে মাউণ্ট কেনিয়া ও কিলিমাঞ্জারো দুইই দেখা যায়। অথচ মাউণ্ট কেনিয়া হইতে কিলিমাঞ্জারোর দূরত্ব দুই শত মাইলের কম নহে। মাউণ্ট কেনিয়া নায়রোবি হইতে উত্তরে এবং কিলিমাঞ্জারো

দক্ষিণে অবস্থিত। আমরা নায়রোবির নিকটস্থ নগং নামক স্থানের উচ্চতম প্রদেশে দাঁড়াইয়া দূরে দণ্ডায়মান এই দুইটি পর্ব্বত যখন দর্শন করিলাম, তখন আমাদের মনে যে অপূর্ব্ব ভাব সঞ্চারিত হইল, তাহাকে ভাষাতীত ছাড়া অন্য কিছু বলা চলে না। উভয় পর্ব্বতের তুষারশুভ্র সমুচ্চ-শীর্ষ সান্ধ্যসূর্য্যের রমণীয় রক্ত-রাগে রঞ্জিত হইয়া বর্ণনাতীত দৃশ্য পরিগ্রহ করিয়াছিল।

এই দুই দিব্য দৃশ্যের মধ্যস্থলে নায়রোবি নগর দাঁড়াইয়া, সুতরাং নগর হইতে উভয় পর্ব্বতই প্রায় এক শত মাইল দূরে দণ্ডায়মান। কেনিয়া পর্ব্বত প্রায় ১৭ হাজার ফুট উচ্চ। ইহাকে ইকুয়েটর, বা বিষুবরেখার উপর অবস্থিত বলিলেও ভুল বলা হয় না। কিলিমাঞ্জারোর উচ্চতা ১৯ হাজার ৩ শত ফুট। ইহা বিষুবরেখা হইতে তিন ডিগ্রি দক্ষিণে বিরাজিত। শুনিলাম, যুগপৎ উভয় পর্ব্বতকে দেখিবার সৌভাগ্য সকল সময়ে ঘটে না। কখনও কেনিয়াকে, কখনও বা কিলিমাঞ্জারোকে জলদ-জালে জড়িত হওয়ার জন্য দেখা যায় না। জিজ্ঞাসার দ্বারা জানিলাম, অধিকাংশ সময়ে মেঘমালায় মণ্ডিত থাকে বলিয়া কিলিমাঞ্জারো অপেক্ষা মাউন্ট কেনিয়াকেই কম দেখা যায়।

ট্রেন হইতে জিরাফ প্রভৃতি জন্তুদিগকে দেখিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই বলিয়া আমরা আফ্রিকার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য এই সকল জীবকে দেখিবার জন্য নায়রোবির নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে মোটরযোগে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমরা প্রথমে নায়রোবি হইতে বিশ মাইল দূরে প্রসারিত প্রসিদ্ধ রিফ্‌ট উপত্যকায় গমন করি। রিফ্‌ট উপত্যকাকে পৃথিবীর বক্ষতলে বিস্তৃত প্রকাণ্ড "ফিশ্চর" বা ফাটল বলা চলে। ইহা (আফ্রিকার) বেইরা নামক স্থানের নিকটে আরম্ভ হইয়া নায়াসা হ্রদ পর্য্যন্ত প্রসারিত। নায়াসা হ্রদ হইতে ইহার একটি শাখা পশ্চিমে অগ্রসর হইয়াছে। টাঙ্গায়ানিকা, কিভু, এলবার্ট এডওয়ার্ড এবং এলবার্ট এই চারিটি হ্রদ এই শাখার অন্তর্গত। নায়াসা হ্রদ হইতে এই সুবিখ্যাত উপত্যকার আর একটি শাখা উত্তরে আগাইয়া গিয়াছে। এই শাখা রুডলফ হ্রদ এবং আবিসিনিয়ার অন্তর্গত হ্রদাবলীর ভিতর দিয়া লোহিত সাগর অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি। ভূতত্ত্ববেত্তা পণ্ডিতগণের মতে পশ্চিম-এশিয়ার অন্তর্গত "ডেড্-সি" ও জর্দ্দন উপত্যকা এই শাখারই অংশবিশেষ। এই সুপ্রসিদ্ধ উপত্যকা নায়রোবির নিকটে বিশেষ নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক প্রশস্ত আকারে প্রসারিত রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বে সুদৃশ্য শৈলশ্রেণী প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া; ইহাদের উচ্চতা এক হাজার ফুট হইতে দেড় হাজার ফুট পর্য্যন্ত। আমরা উপত্যকার পূর্ব্বপার্শ্বস্থ পাহাড়গুলির পাদদেশে উপনীত হইলাম। বৃক্ষের মধ্যে এখানে এক প্রকার কণ্টকবৃক্ষই বেশী। উপত্যকার স্থানে স্থানে কার্পাসের জমি আছে। আমরা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর কিছু দূরে কয়েকটি জিরাফকে দণ্ডায়মান দেখিলাম। জিরাফগুলির সংখ্যা পাঁচটি হইবে। আমরা উপত্যকার নিম্নতর প্রদেশে অবতরণপূর্ব্বক আরও কিছুদূর আগাইয়া যাইবার পর চাহিয়া দেখিলাম জিরাফদের দল বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহারা সংখ্যায় বারটি হইয়া পড়িয়াছে। মনোযোগ সহকারে দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম, একটি ছাড়া আর সকলেই জিরাফী। জিরাফীদের অপেক্ষা জিরাফটি আকারে বৃহত্তর। জিরাফটির সুদীর্ঘ স্কন্ধ কৃষ্ণকায় কেশরের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। দেখিয়া বুঝা গেল, জিরাফটির শাসন দলের সকলকে সসম্ভ্রমে মানিয়া চলিতে হইতেছে। কেহ পিছাইয়া পড়িয়া থাকিলে জিরাফের ইঙ্গিতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ আগাইয়া আসিতে হইতেছে। সহসা একটি জেব্রাও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

আমরা আর একদিন নায়রোবির পশ্চিমে কেদং উপত্যকার দিকে বেড়াইতে গেলাম। পথটি সহসা প্রায় দেড় হাজার ফুট নীচে নামিয়া বিশেষ বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য প্রকাশিত করিয়া তুলিয়াছে। এই পথে দাঁড়াইয়া আমরা রিফ্‌ট উপত্যকার অপূর্ব্ব দৃশ্য সম্যকরূপে উপভোগ করিলাম। দুইটি আগ্নেয়গিরির অবশেষ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। দক্ষিণে দণ্ডায়মান পাহাড়টির নাম শিশয়া, উত্তরস্থ ভূতপূর্ব্ব আগ্নেয়গিরিটি লঙ্গানট আখ্যায় অভিহিত।

সৌভাগ্যক্রমে আমরা এমন কয়েকজন য়ুরোপীয় ভ্রম-

কারীর সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, যাঁহারা আফ্রিকাসুলভ বিচিত্র পশুসমূহ দর্শনের জন্য নৈশ অভিযানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাদিগকে সঙ্গে লইতে সাগ্রহে স্বীকৃত হইলে আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। নৈশ ভ্রমণের এরূপ সুযোগ অতি অল্পই মিলিয়া থাকে। আফ্রিকার বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য স্বরূপ অদ্ভুতাকৃতি পশুপক্ষীসমূহ যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, সেই জন্য এই সকল প্রাণিপূর্ণ কতিপয় স্থানকে সুরক্ষিত রাখিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ চেষ্টা অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমরা মোটর-যোগে রাত্রিতে সেইরূপ একটি স্থানে গমন করিলাম। অধিকাংশ বন্য পশুই অত্যুজ্জ্বল আলোক দেখিলে মন্ত্র-মুগ্ধের মত স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে বলিয়া এই সকল নৈশভ্রমণ বিশেষ উপভোগ্য এবং পরীক্ষা বা পর্য্যবেক্ষণের দিক দিয়াও কার্য্যকরী।

আমাদের গাড়ীখানি যতই সেই সুরক্ষিত জঙ্গলের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, গাড়ীর সুতীব্র আলোকের সাহায্যে বনচারী প্রাণীদের অস্তিত্ব আমরা ততই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলাম। অবশেষে যখন গাড়ীখানি জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন প্রথমেই একদল জেব্রা এবং পরে কতিপয় গ্যাজেল ও 'ওয়াল্ড বীষ্ট' আখ্যায় অভিহিত মৃগজাতীয় বড় বড় পশুর পাল আমাদের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। উজ্জ্বল আলোকের বিমোহিনী শক্তিতে সর্ব্বাধিক আকৃষ্ট হইল একটি ক্ষুদ্রকায় প্রাণী। এই অদ্ভুত প্রাণীর পুরোভাগ খরগোসের মত এবং পশ্চাৎ ভাগ ক্যাঙ্গারুদের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন। ইহাদের দীর্ঘাকার পুচ্ছের প্রান্ত-প্রদেশ লোমাবৃত। এই ক্ষুদ্রকায় প্রাণীগুলি যখন লাফাইতে লাফাইতে বন বক্ষ হইতে বাহির হইয়া সুতীব্র রশ্মির মোহিনী শক্তি বলে আলোকাধারের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, তখন সেই দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিতে অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহারা গাড়ীর নিকটে আসিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত উহার দিকে চকিত চক্ষুতে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্কা-চঞ্চল পাদক্ষেপে পলায়ন করিতেছিল।

নায়রোবির সংগ্রহাগারের বৈশিষ্ট্য সহজেই চিত্ত আকৃষ্ট করে। এই সংগ্রহাগারটিতে প্রধানতঃ কেনিয়াসুলভ পশু-পক্ষী, বিশেষতঃ নানাপ্রকার পক্ষীই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এত প্রকারের পক্ষী অন্য কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত কেনিয়াকে প্রাকৃতিক পশুশালা ও চিড়িয়াখানা বলিয়া অভিহিত করিলে ঠিকই বলা হয়। এত রকমের পশু-পাখী আর কোন দেশেই দেখা যায় না। এষ্টার জীব-সম্পর্কীয় সৃষ্টি-বৈচিত্র্য দেখিয়া যাহারা অবাক হইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে এই দেশ বিশেষ উপযোগী। পশুপতি সিংহ,

পরিত্যক্ত পুরাতন বন্দর মোম্বাসা।
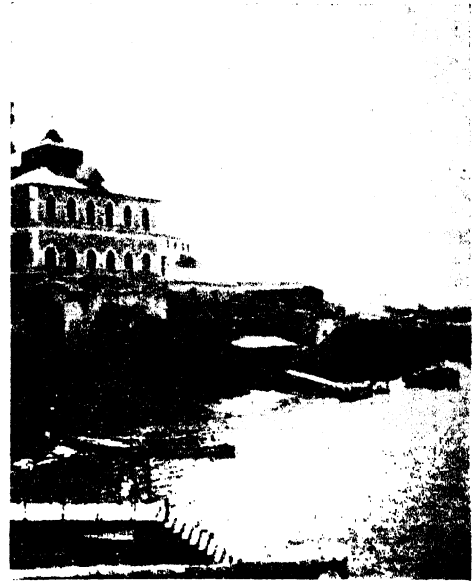
বিচিত্রাকৃতি জিরাফ, জেব্রা প্রভৃতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় দর্শন করিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিবার জন্য য়ুরোপীয় ও আমেরিকান ভ্রমণকারিগণ দলে দলে কেনিয়ায় আসিয়া থাকেন। যেমন হিন্দুর নিকট গয়া-কাশী, মুসলমানের নিকট মক্কা-মদিনা এবং খৃষ্টানের নিকট জেরুজালেম-নাজারেথ, তেমনই শিকারানুরাগী ব্যক্তিবর্গের পক্ষে কেনিয়া। বিশেষ যাহারা সিংহ শিকার করিবার সাহস ও উচ্চাশা পোষণ করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে অন্য কোন দেশ এত উপযোগী হইতে পারে না।

পশুরাজ সিংহকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন অবস্থায় স্বভাবের বক্ষে দর্শন করা একপ্রকার সৌভাগ্য সন্দেহ নাই। পূর্ণ পরিণত দেহ ও কেশর-ভূষিত সিংহকে সুন্দরতম প্রাণি-গণের অন্যতম বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। সেই সিংহ যখন প্রকৃতির ক্রোড়ে "নিজ নিকেতনে" সগর্ব্বে ও সহর্ষে দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে মনে হয়, 'পশুরাজ' উপাধি অতিরঞ্জন বা কবি-কল্পনা নহে। সিংহ যখন তাহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক দশ দিক্ কম্পিত করিয়া গর্জ্জন করে, তখন গভীর সম্ভ্রমের সহিত গভীর ভীতির সঞ্চার স্বাভাবিক। সেই মেঘ-গম্ভীর শব্দে সমস্ত প্রকৃতি যেন ভীত ও স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

সিংহ দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া কত দূর দেশ হইতে দলে দলে দর্শক আসিয়া থাকে, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, আমরা এই দেশে এমন লোকও কয়েক জন দেখিলাম, যাঁহারা কখনও সিংহ প্রত্যক্ষ করে নাই। আমরা যখন গিয়াছিলাম তাহার কিছুকাল পূর্ব্বে নায়রোবি নগরের অভ্যন্তরে একটি সিংহ প্রবেশ করিয়াছিল।

সিংহ মার্জ্জার-জাতীয় জীব। কেশরভূষিত সিংহের ল্যাটিন নাম, ফেলিস লিয়ো। স্থানীয় অধিবাসীরা ইহাকে 'সিম্বা' আখ্যায় অভিহিত করে। সিংহ শব্দের সহিত এই শব্দের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেনিয়ায় দুই প্রকার সিংহ দেখা যায়। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বড় বেশী নয়। পার্থক্য শুধু কেশর লইয়া। এক শ্রেণীর সিংহ প্রান্তরে বাস করে। এই প্রান্তরচারী সিংহেরাই কেশরভূষিত। অন্য শ্রেণীর সিংহগণ কেশরশূন্য এবং তাহারা ঝোপের মধ্যে বাস করে বলিয়া জানা যায়। ইহাও সত্য যে, কেশরভূষিত সিংহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভাগ্যক্রমে আমরা উভয় প্রকার সিংহই দেখিতে পাইয়াছিলাম।

কেনিয়াবাসী সিংহদের প্রধান খাদ্য জেব্রা। জেব্রার মাংস সিংহগণের বিশেষ প্রিয়। এন্টিলোপ জাতীয় প্রত্যেক প্রাণীকেই ইহারা অসাধারণ শারীরিক শক্তি বলে সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারে, শুধু অরিক্স নামক মৃগ-দিগকে পারে না। এ বিষয়ে অরিক্সের শৃঙ্গ ইহাদিগের রক্ষাস্ত্রের কার্য্য করে।

কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, মোটামুটি এক একটি সিংহ সপ্তাহে দুইবার মাত্র অপর প্রাণীকে হত্যা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করে। কাহারও কাহারও মতে সিংহ সমগ্র বৎসরে অন্ততঃপক্ষে তিন শতবার খাদ্য সংগ্রহের জন্য হত্যাকার্য্যের অনুষ্ঠান করে। সিংহ কখনও একা, কখনও যুগ্মভাবে, কখনও বা সদলে শিকারে বাহির হয়। আজ-কাল সিংহেরা সাধারণতঃ রাত্রিকালে শিকারে বাহির হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ রেলপথ প্রভৃতি প্রসারিত হইবার ফলে এবং য়ুরোপীয় দর্শক ও শিকারীদের প্রাদুর্ভাবের পর হইতে ইহারা দিনের বেলায় বাহির হওয়াকে নিরাপদ মনে করে না।

সাধারণতঃ শিকার করিবার সময় সিংহ গভীর স্বরে গর্জ্জন করে। সেই ভৈরব রবে অপর প্রাণিগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। সৃষ্টিতে একপ হৃৎকম্পকর শঙ্কা-সঞ্চারক শব্দ অতি অল্পই আছে। এই শব্দ ক্রমশঃ নিম্ন গ্রাম হইতে উচ্চগ্রামে উত্থিত হয় না, উচ্চ হইতে নিম্নে নামিয়া আসে। অতি উচ্চ হইতে আরম্ভ হইয়া এই শব্দ ক্রমশঃ নিম্নতর গ্রামে নামিতে নামিতে অবশেষে দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়। এই বজ্রবৎ গর্জ্জন শেষ হইবার অব্যবহিত পরে কয়েকবার গোঙানি শব্দ হয়। এই গোঙানি ক্রমশঃ মৃদু অথচ গভীর হইয়া পড়িয়া সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। বায়ুপ্রবাহ অনুকূল হইলে সিংহ গর্জ্জন দুই তিন মাইল দূর হইতে শোনা যায়।

এক য়ুরোপীয় দম্পতি কেনিয়ায় শিকার করিতে গিয়াছিলেন। সিংহ শিকার করিতে যাওয়া অল্প সাহসের কার্য্য নহে। নায়রোবি নগরে এই দম্পতির সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মহিলাটির মুখে সিংহ-শিকার সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার যে কাহিনী শুনিয়া-ছিলাম, তাহাই নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মহিলাটি কহিলেন, আমার স্বামী ও আমি উভয়ে সিংহের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন একটি মৃতা মহিষীকে তানা নদীর উপত্যকায় পতিত দেখিলাম। মৃত মহিষের চারিদিকে সিংহের পদাঙ্ক অঙ্কিত দেখিয়া আশা জন্মিল, মৃতদেহ ভক্ষণের জন্য যে কোন সময়ে সিংহটি অবশ্যই ফিরিয়া আসিবে। তখন অপরাহ্ণ তিনটার

বেশী হইবে না। মৃত মহিষের মাংস পচিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আমাদের জানা ছিল, সিংহের পচা মাংসে অরুচি দেখা যায় না। সিংহগণ পচা এবং টাটকা উভয় মাংসই সমান আগ্রহের সহিত আহার করিয়া থাকে। অনেকেই হয় তো জানেন, ব্যাঘ্রগণ বাসি বা পচা মাংস আদৌ পছন্দ করে না। ব্যাঘ্রের সহিত সিংহের আর একটি পার্থক্য—ব্যাঘ্র অপরের দ্বারা নিহত প্রাণীর মাংস খাইতে ভালবাসে না, কিন্তু সিংহ সেইরূপ মাংস প্রীতি-সহকারে গ্রহণ করে।

আমরা সিংহের প্রতীক্ষায় সেই মৃত মহিষীর সন্নিকটে সমগ্র রাত্রি যাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া তদনুযায়ী বন্দোবস্ত করিলাম। প্রায় ছয় মাইল দূরে আমাদের বস্ত্রাবাস নির্মিত ছিল। আমরা কেজন আফ্রিকাবাসী অনুচরকে তুইখানি কম্বল, একটি কেট্‌লি, একখানি কড়াই এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য কয়েকটি জিনিষ আনিবার জন্য বস্ত্রাবাসে পাঠাইয়া দিলাম। আমাদের আদেশে অপর অনুচরগণ কণ্টকাকীর্ণ ঝোপের বক্ষে একটি "বোমা" প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত হইল। কণ্টকবৃক্ষগুলিকে কাটিয়া-ছাঁটিয়া ও বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া যে কুটিরাকার আশ্রয় রচনা করা হয়, তাহাই বোমা নামে অভিহিত। ঐ কণ্টকবৃক্ষ-বিরচিত কুটীরের ভিতর আমাদিগকে সমস্ত রাত্রি বাস করিতে হইবে। সূর্য্যাস্তের সহিত সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিবামাত্র আমরা হামাগুড়ি দিয়া সেই কণ্টক-কুটীরে, সেই বিচিত্র শিবিরে প্রবেশ করিলাম।

আমি ও আমার স্বামী ছাড়া তুই জন সোমালী বন্দুক-বাহকও সেই বোমা-বক্ষে আশ্রয় লইল। আমরা সকল সরঞ্জাম হাতের কাছে প্রস্তুত রাখিয়া এবং বন্দুকে গুলি ভরিয়া ব্যবস্থা করিলাম, পালাক্রমে প্রত্যেকে তুই ঘণ্টা করিয়া প্রহরীর কার্য্য করিবে। আদেশ দেওয়া হইল, দিনের আলো প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন একটিও বাক্য উচ্চারণ না করে।

চারিদিকে চন্দ্রহারা নিবিড় অন্ধকার রাত্রি। সিংহ আসিলেও সেই অন্ধকারের মধ্যে তাহাকে আমরা দেখিতে পাইব না। যদি সে ভোরের দিকে আসে, তবেই আমরা তাহাকে দেখিতে পাইব এবং আমাদের পক্ষে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছোড়া সম্ভব হইবে। ছয় ঘণ্টা কাল সেই সঙ্কীর্ণ বোমার বক্ষে সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া থাকা কতখানি কষ্টকর, তাহা অপরে বুঝিবে না। তবুও ছয় ঘণ্টা চলিয়া গেল। মাটি এত কঠিন যে, শুইতে চেষ্টা করিতে কষ্ট হয়। আফ্রিকা-সুলভ নানারকম পোকা কামড়াইতে লাগিল। পচা মাংসের উৎকট দুর্গন্ধ বহিয়া আনিয়া বাতাস অনুবিধাকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে-ছিল। এ কথা আমাদের সহিষ্ণুতার সীমাকে অতিক্রম

কিলিণ্ডিনি বন্দর—মোম্বাসা।
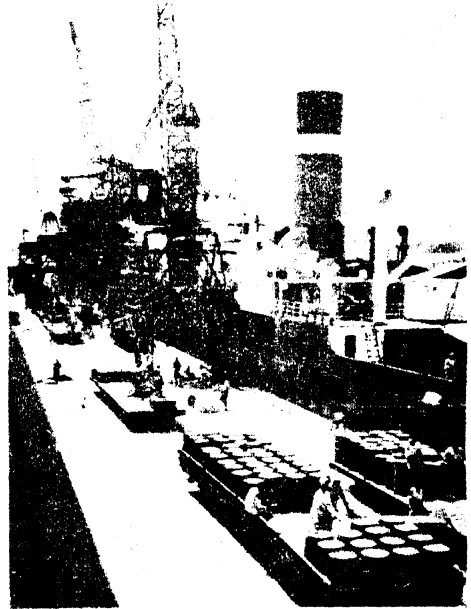
করিয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। যখন বাতাস অন্য দিকে বহার জন্য পচা মাংসের গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল না, তখন পাশে উপবিষ্ট সোমালীদ্বয়ের দেহের দুর্গন্ধ অস্বস্তি জন্মাইতেছিল।

নিশীথ রাত্রিতে গর্জ্জন ও গোঙানি শোনা গেল। সেই শব্দে আমাদের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমরা সঙ্কুচিত হইয়া অতি কষ্টে শুইয়া ছিলাম, সেই শব্দে উঠিয়া বসিয়া এবং প্রত্যেক বন্দুকটিকে ধরিবার ভঙ্গীতে

তুলিয়া ধরিয়া স্পন্দিত বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কোন্ দিক হইতে শব্দ আসিতেছিল, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছিল না বলিয়া প্রত্যেক বন্দুককে বিভিন্ন দিকে তুলিয়া ধরা হইল। মধ্যে মধ্যে গর্জ্জন শোনা যাইতেছিল এবং প্রত্যেক বারই মনে হইতেছিল, উহা নিকটতর হইতেছে। কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে দিক্ নির্ণয় সম্ভব হইতেছিল না। হিংসার প্রতিমূর্ত্তি ভীষণতম সিংহ ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান রূপে কণ্টকাকীর্ণ একটি ঝোপের পাতলা পর্দ্দা ছাড়া আর কিছুই নাই, এই সত্য আমাদের সমস্ত শরীরে শঙ্কাজনিত শিহরণ বার বার জাগাইতে লাগিল। গৃহের নিরাপদ ক্রোড়ে বসিয়া দূর হইতে সিংহের গর্জ্জন শোনা আর নিশীথ রাত্রিতে মুক্ত প্রকৃতির বক্ষে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ভিতর বসিয়া অতি নিকটে অবস্থিত সিংহের গর্জ্জন শুনিতে পাওয়া,—দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সন্দেহ নাই।

অবশেষে মনে হইল, সিংহ খুবই নিকটে আসিয়াছে। শব্দ শুনিয়া বোধ হইল, ত্রিশ গজের মধ্যেই সে অবস্থান করিতেছে। পরে পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছিল, আমাদের অনুমান ঠিক। সন্নিকটস্থ সিংহের সেই গর্জ্জন ও গোঙানি কি ভয়ঙ্কর, তাহা না শুনিলে উপলব্ধি করা কঠিন। সেই শব্দের আঘাতে ভূমিতল স্পন্দিত হইতেছিল।

এই স্থানে বলা আবশ্যক, আমরা সে রাত্রিতে এবং পরবর্ত্তী রাত্রিতেও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। তৃতীয় রাত্রিতে সিংহটিকে মারিতে আমরা সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সময় পর্য্যন্ত মৃত মহিষের মাংস এতদূর পচিয়া গিয়াছিল যে, সেই দুর্গন্ধ সম্পূর্ণ দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছিল।

আফ্রিকায় সিংহ-শিকার আদৌ সহজ ব্যাপার নহে। পায়ে হাঁটিয়া শিকার করা ভিন্ন অন্য কোন উপায় দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় পোষা হাতী নাই বলিলেই হয়, সুতরাং হাতীতে চড়িয়া শিকারের সুবিধা নাই। তাহার উপর যে অঞ্চলে সিংহ বাস করে, সে সকল স্থান বৃক্ষ-বর্জ্জিত, শুধু কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আগাছা বা ঝোপ মাত্র আছে। সুতরাং লুকাইয়া থাকিবার সুবিধাও কম।

আফ্রিকাবাসী সিংহ বিশেষ কোন নিয়মের বশীভূত নহে—খেয়াল অনুসারে চলে বলিলে ভুল বলা হয় না। পালিত পশু চুরি করিতে ইহারা অতিশয় দক্ষ। কেনিয়ার কৃষককুলকে এই জন্য সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। কেনিয়াবাসী কৃষক বোমা প্রস্তুত করিয়া রাত্রিতে সেই বোমার ভিতর সমস্ত পশুপালকে পুরিয়া উহার মুখ বন্ধ করিয়া দিয়া পাহারা দিয়া থাকে। সিংহের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। একবার একটি সিংহ পূর্ণ-বয়স্ক একটি প্রকাণ্ড ষণ্ডকে ১২ ফুট উচ্চ বেড়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

উক্ত মহিলাটি সিংহ সম্বন্ধীয় আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আমরা তখন আলিমন্দি নদীর তীরে বস্ত্রাবাস বিছাইয়া বাস করিতেছিলাম। রাত্রিকাল। আমরা তাঁবুর ভিতর মশারি টাঙ্গাইয়া শুইয়া ছিলাম। শেষ রাত্রিতে হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া আমি মশারির ভিতর হইতেই একটি সিংহকে বস্ত্রাবাসের সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। শুধু ভয় পাইয়াছিলাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। সত্য কথা বলিতে, আমি ভয়ে অভিভূত হইয়াছিলাম। আমি বিছানার উপর আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া রাইফেলটিকে অঙ্গুলির দ্বারা চাপিয়া ধরিলাম। আমরা প্রত্যেকে এক একটি পৃথক রাইফেল লইয়া শয়ন করিতাম। সামান্য শব্দেও বিপদ ঘটিতে পারে বলিয়া স্বামীকে জাগ্রত করিতে সাহসী হইলাম না। অন্য দিকে রাইফেল ছোড়ার সাহসও হইল না। আমি শুধু দ্রুত স্পন্দিত বক্ষে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। বোধ হয় দশ মিনিট এইরূপ ভাবে ছিলাম। অবশেষে সিংহটি ছায়া-মূর্ত্তির মত নিঃশব্দে বাম দিকে সরিয়া অদৃশ্য হইল।

সিংহের এই অদৃশ্য হওয়া আমার ভয়কে হ্রাস করা দূরের কথা, বাড়াইয়া তুলিল। এতক্ষণ সিংহের অবস্থান সম্বন্ধে আমার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল, এইবার সে কোথায় লুকাইল তাহা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যাহা হউক এইবার আমি আমার স্বামীকে জাগাইয়া ব্যাপারটি বলিলাম। স্বামী বলিলেন, বোধ হয়, হায়েনা হইবে। এই সময়ে সহসা আমাদের আফ্রিকান অনুচর উদ্বিগ্ন

ভাবে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, দুই শত গজ দূরবর্ত্তী ঝোপ হইতে কোন সিংহ একটি বাছুরকে লইয়া পলাইয়াছে। বোঝা গেল, আমি যে সিংহটিকে বন্ধাবাসের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, সেই সিংহটিই বাছুরটিকে লইয়া গিয়াছে। পরে জানা গেল, সেটি সিংহ নহে সিংহিনী।

ভোরে পথ চিনিবার উপযুক্ত আলোক দেখা দিবামাত্র আমার স্বামী সিংহীর সন্ধানে বাহির হইলেন। তাঁহাকে বেগবতী আলিমিন্দি নদী অতিক্রম করিয়া পরপারে যাইতে হইল। নদীটি ৫০ গজ চওড়া এবং উহাতে জানু পর্য্যন্ত জল। নদীর ওপারে তিন ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের পর একটি ঘন ঝোপের ভিতর তাহাকে দেখা গেল। সে বাছুরটিকে নামাইয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। আমার স্বামীর গুলিতে সেই ঝোপের বক্ষেই তাহার জীবনের সমাপ্তি ঘটিল।

মুরশিদাবাদ

—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অয়ি পুণ্য জন্মভূমি নমো নমঃ মুরশিদাবাদ,
মুগ্ধ কবি সন্তানের স্নেহভরা আলিঙ্গন বাঁধ।
কাশীমবাজার-বক্ষে জননী গো ধরাইলি স্তন,
সে অমৃতদুগ্ধপানে ধন্য হল এ নরজীবন।
আম্রকুঞ্জ তলে তোর উদিল এ জীবন প্রভাত
মা বলে' উঠিনু কাঁদি' ভক্তিভরে করি প্রণিপাত।

জনম লভিল হায় যে দেশেতে নবাব সিরাজ,
রেখে গেল মীর্জাফর যে মাটিতে কলঙ্কিত লাজ।
যাহার বাঙালী সৈন্য হাসিমুখে যুদ্ধে দিল প্রাণ,
মোহনলালের সঙ্গে অস্তমিত জীবনের গান।
রাণী ভবানীর কীর্ত্তি ভাঙ্গা সে মন্দিরে অবশেষ,
হে মহামহিমময়ি, ধন্য তবু কাঙ্গালিনী বেশ।

গগনে পবনে বনে নদীতীরে প্রান্তরে প্রান্তরে,
পুণ্য অবদানগাথা কীর্ত্তিমধু ঝরি ঝরি পড়ে।
বাঙ্গালার পাণিপথ গিরিয়ার পুণ্য রণাঙ্গন,
হেথায় সে অমরের আত্মদানে রহিল অঙ্কন।

উত্তরেতে পদ্মা তোরি বেদনার বহ্নি' উর্ম্মিদলে,
হাহাকার আর্ত্তনাদে ফেণপুঞ্জ উগারিয়া চলে।

শুভ্র-বালু-সৈকতের রৌদ্রদগ্ধ তপ্ত বুক দিয়া,
গগনের সব স্বপ্ন বক্ষে তোর পড়ে লুটাইয়া।
সেই স্বপ্নে তরী বেয়ে গাও বন্ধু দুলে' দুলে' চল,
দূরে ওই ধান্যক্ষেত্রে কার বাঁশী ডাকিছে উতল।
আর দূরে ঐ দেখ বাঙালীর গর্ব্ব দেখা যায়,
যোগীন্দ্র-প্রাসাদ-চূড়া বারবার ডাকে আয় আয়।
আনন্দের শেষ সাক্ষী লালগোলা-দানতীর্থতলে,
সাহিত্যের আজ সৌধ-স্বপ্নদীপ দপ্ দপি জ্বলে।
পার্শ্বে ভগবানগোলা কাঁদে লজ্জাকলঙ্কিত শিরে,
অতিথি নবাবকণ্ঠ কাঁদে আজো বুক চিরে চিরে।
ওরে ওরে তুই সেই প্রভুহত্যা-কলঙ্কিত দেশ,
কভু মুছিবে না হায় ঘুচিবে না এই তীব্র ক্লেশ।
চিরদিন চিরদিন জেগে রবে এ করুণ গান,
তাই আজি বুকে তোর কেঁদে পান্থ করে পদদান।

মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলের পুনঃ-সংস্কার

—শ্রীহরিদাস মিত্র

(ক্ষয়িষ্ণু) আলোচ্য অঞ্চলের প্রাকৃতিক সংস্থান

শ্রীদেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণাদিতে উক্ত এবং (শ্রীদুর্গা—) পূজা-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত—'ভৈরব-সিন্ধু-শোণাদ্যাঃ যে নদাঃ ভুবি সংস্থিতাঃ।' স্নান-মন্ত্রে, 'ভৈরব' প্রথমেই পঠিত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য, 'ভৈরবের' সে ভীম-কান্ত রূপ এক্ষণে উপলব্ধ না হইলেও, উপবঙ্গের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির কেন্দ্রসকল ভারতের এই অদ্বিতীয়-নামা নদের এবং উহার শাখা-প্রশাখার কূলে গড়িয়া উঠিয়াছিল।*

এক সময়ে, ভৈরব-নদ মধ্য-বঙ্গের মধ্য বা মেরুদণ্ড-স্বরূপে অবস্থিত ছিল। ভৈরব-নদ মধ্যে, পশ্চিমে যমুনা, পূর্ব্বে মধুমতী, দক্ষিণে ভদ্র—এই বিশাল ভূখণ্ডের আকার, হল বা লাঙ্গলের ন্যায়। মধ্য-বঙ্গের বিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চল, প্রধানতঃ এই সীমা-মধ্যে আবদ্ধ।

অধিকতর স্পষ্টরূপে সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে—(দক্ষিণ-) পূর্ব্ব হইতে ক্রমশঃ পশ্চিম পর্য্যন্ত আসিয়া—মধুমতী ও ভৈরবসঙ্গমে স্থিত কচুয়া ; কচুয়া হইতে মৃত বিষখালি-নদী অনুসরণ করিয়া রামপাল থানা ; রামপাল হইতে পসর-নদী অনুসরণ পূর্ব্বক চালনা ; চালনা হইতে চুনকুড়ী বাহিয়া দাকুপী থানা ; দাকুপীর সন্নিহিত ভদ্র-নদ ধরিয়া উত্তরে খ্যাঙ্গরাইল-নদী সীমা। তথা হইতে, কপোতাক্ষী-তীরে সুপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ কপিলমুনি তীর্থ, বাড়ুলি-কাটিপাড়া গ্রাম, প্রসিদ্ধ মসজিদকুড় এবং আমাদি। তথা হইতে, প্রতাপনগর ও গড়কমলপুর এবং বেদকাশী দিয়া, যমুনা-তীরে (শ্রীযশোহরেশ্বরীপুর, বা, সংক্ষেপে) ঈশ্বরীপুর।

ঈশ্বরীপুর হইতে ধূমঘাট, নূরনগর, কাটুনিয়া, গড়-মুকুন্দপুর, ডামরাইল, বসন্তপুর হইয়া, কালীগঞ্জ (যমুনা-তীরে) হিঙ্গুল (হিঙ্গল, হেঙ্গেল-) গঞ্জ (কালিন্দী-তীরে)। তৎপরে, যুক্ত যমুনা-ইচ্ছামতী-তীরে, দেবহাটা, (টাকী) শ্রীপুর, (বসুরহাট, বাদুড়িয়া), টিবি।

"টিবির মোহনায় যমুনা ও ইচ্ছামতী মিশিয়াছে এবং ধূমঘাটের নিম্নে বিযুক্ত হইয়াছে। পথে টিবি হইতে বসন্তপুর পর্য্যন্ত নদীর নাম ইচ্ছামতী, বসন্তপুর হইতে ধূমঘাট পর্য্যন্ত সেই একই ধারার নাম যমুনা। 'যমুনেচ্ছা প্রসঙ্গমে' ধূমঘাট দুর্গ স্থাপিত হয়। সেখানে যমুনা শাখা পশ্চিম মুখে এবং ইচ্ছামতী পূর্ব্ব মুখে গিয়া উভয়ে পরে দক্ষিণবাহিনী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।"

টিবি বা টিপির মোহানা চারঘাটের নিকট। তথা হইতে যমুনা অনুসরণ করিয়া, গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, গাইঘাটা থানা, জলেশ্বর, চৌবাড়িয়া, বিরুই, হরিণঘাট থানা।

গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী, প্রয়াগ হইতে সপ্তগ্রামের নিকট পর্য্যন্ত, যুক্ত প্রবাহে আসিয়া মুক্ত ত্রিবেণীতে ত্রিধারায় - (দক্ষিণে) সরস্বতী, (বামে) যমুনা ও (মধ্যে) ভাগীরথী—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

"এই ত্রিবেণী হইতে যমুনা কিছু দূর পর্য্যন্ত চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া, এবং তৎপরে চব্বিশ পরগণা ও যশোহরের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। যমুনা যেখানে ভাগীরথী হইতে প্রথম উঠিয়াছে, তথাকার সেই দুরবস্থ প্রাচীন খাত সাধারণের নিকট বাঘের খাল বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।"

বস্তুতঃ যমুনা, কাঁচড়াপাড়া (কাঞ্চন-পল্লী)-র নিকট, ভাগীরথী হইতে বাহির হইয়াছিল। এক্ষণে সে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

কাঁচড়াপাড়া পর্য্যন্ত আসিয়া, এক্ষণে মধ্যবঙ্গের (বিধ্বস্ত) ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের পশ্চিমোত্তর সীমা ধরিতে হইবে। কাঁচড়াপাড়া হইতে ভাগীরথী ধরিয়া, সুখসাগর ও চাকদহ (প্রাচীন চক্রদহ তীর্থ)। ভাগীরথী হইতে বরাবর চূর্ণী নদী বাহিয়া, রাণাঘাট ও আড়ংঘাটা ষ্টেশন, হাঁসখালি,

* প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন ও বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শিবনিবাস এবং কৃষ্ণগঞ্জ। মাজদিয়া ষ্টেশনের নিকট, কৃষ্ণগঞ্জে আসিয়া মাথাভাঙ্গা-নদী, চূর্ণী ও ইচ্ছামতী—এই দুই শাখায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ইচ্ছামতী, দক্ষিণে ও চূর্ণী, পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণগঞ্জে পূর্ত্তবিভাগের শুল্ক আদায় হয় এবং তজ্জন্য একটি কেন্দ্র আছে। ইচ্ছামতীর উপরে নোণাগঞ্জ, বনগ্রাম মহকুমা, ছবরিয়া, চান্দুড়িয়া, মলঙ্গপাড়া স্বরূপনগর প্রভৃতি অবস্থিত।

পূর্ত্তবিভাগ কর্ত্তৃক বাণপুর ও দর্শনা রেলষ্টেশন-দ্বয় মধ্যে, ৭২-৭৩ মাইলে 'বিজয়-কাট' কর্ত্তিত হইয়াছে। এই 'বিজয়-কাট'-দ্বারা মাথাভাঙ্গা এবং ভৈরব-নদের পুনঃ সংযোগ সংস্থাপিত হইয়াছে।

"মালদহের মধ্য দিয়া আসিয়া প্রকৃতকীর্ত্তি মহানন্দ যেখানে পদ্মায় পড়িয়াছে, তাহারই অপর পারে যেন সেই নদই ভৈরব নাম ধারণ পূর্ব্বক বাহির হইয়াছে। অনেক দূর আসিয়া ইহা পদ্মার অন্য একটি দক্ষিণ-বাহিনী শাখা জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। যুক্তপ্রবাহ হইতে মুক্ত হইয়া ভৈরব পুনরায় মেহেরপুরের পশ্চিম দিয়া বর্ত্তমান জয়রামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিমে পদ্মার আর একটি শাখা মাথাভাঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। বর্ত্তমান দর্শনা রেলওয়ে ষ্টেশনের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে একটি প্রকাণ্ড বৃত্তাকার বাঁকে এই যুক্ত প্রবাহ ঘুরিয়াছিল। ঐ বাঁকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ হইতে ভৈরব মাথাভাঙ্গা হইতে বিচ্যুত হইয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়াছে।"

মেহেরপুর মহকুমা, উথলি, জীবননগর নদীয়া জেলায় ভৈরব তীরে। উথলিতে, পরমহংস নিগমানন্দজীর শিক্ষা-কেন্দ্র আছে।

মহেশপুরের সন্নিহিত ভৈরব-নদ হইতে, বেত্রবতী (বেতনা বা বেণ) নামে শাখা বাহির হইয়া বাগদা, নাভরণ ষ্টেশন (যাদবপুর), উলসী, বাঘ আঁচড়া, বাগুড়ি শঙ্করপুর, কলারোয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া খুলনার সীমায় প্রবেশ করিয়াছে এবং 'বুধহাটার' গাঙ্গ, খোলপেটুয়া প্রভৃতি নামে, বিস্তার লাভ করিয়া, কপোতাক্ষীর সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। যাদবপুরের নিম্ন হইতে বেত্রবতী বহতা আছে।

ভৈরব-নদ—

"ক্রমে কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে আসিয়া পরে দক্ষিণমুখী হইয়াছে। ৫।৭ মাইল আসিয়া চৌগাছার উত্তরে তাহিরপুর নামক স্থানে ভৈরব দক্ষিণ দিকে কপোতাক্ষ শাখা ত্যাগ করিয়া নিজে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে উভয় নদী অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। যশোহর-খুলনায় আর্য্য সভ্যতা এই দুই নদীপথে প্রবাহিত হইয়া উভয়ের কূলে কূলে সমৃদ্ধ ও জ্ঞানালোক-দীপ্ত পল্লীর সৃষ্টি করিয়াছে।"

ভৈরব ক্রমান্বয়ে বামে দক্ষিণে তাহেরপুর, চূড়ামণকাঠী, বারবাজার, মুড়লী, কস্‌বা (বর্ত্তমান যশোহর), বকচর, রাজার হাট, রামনগর, বাশুয়াড়ি, রাধানগর, জঙ্গল বাঁধাল, বসুন্দিয়া, মহাকাল, আফরা, শেখহাটি (জগন্নাথপুর), (থালি নগর) নওয়াপাড়া, বিভাগদিহি, বাবুটিয়া, রাজঘাট, দক্ষিণ ডিহি, পয়গ্রাম, কস্‌বা, ফুলতলা, ভুগিল হাট, শুভরাড়া, ধূলগ্রাম, দামোদর, মুক্তিশ্বরী, সিদ্ধিপাশা, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, সেনহাটি, খালিসপুর, বেলফুলিয়া, খুলনা, থালাইপুর, মানসা ফকির হাট, মূলঘর, যাত্রাপুর, পাণিঘাট, বাগেরহাট (খলিফাতাবাদ), মঘিয়া, তালেশ্বর, কচুয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান রাখিয়া বলেশ্বরে মিশিয়াছে। এইরূপ বহুসংখ্যক ভদ্রপল্লীর অবস্থান, গঙ্গা ভিন্ন অন্য নদীতীরে বঙ্গদেশে নাই।

কপোতাক্ষী, তাহিরপুরের নিকটে ভৈরব হইতে উঠিয়াছে। কপোতের অক্ষির ন্যায় স্বচ্ছ, নির্ম্মল ও নীলাভ জল বলিয়া, বোধ হয় কপোতাক্ষী এই নাম দেওয়া সার্থক হইয়াছে। কোন কোন মতে, কপোতাক্ষ বা কবদক, রামনগরের নিকট চূর্ণী নদী হইতে বাহির হইয়াছে এবং কোটচাঁদপুর পর্য্যন্ত ভৈরবের অংশ, কপোতাক্ষ নামে পরিচিত হইত। বস্তুতঃ ইহা ভৈরবের শাখা মাত্র। কপোতাক্ষের তীরে, গুয়াতলি, চৌগাছা, গঙ্গানন্দপুর, অমৃতবাজার, বোধখানা, ঝিকরগাছা (ঝিঙ্গের গাছা), লাউজানি (ব্রাহ্মণ নগর), ত্রিমোহিনী, মির্জ্জানগর, সাগরদাঁড়ি, কুমিরা, তালা-মাগুরা, কপিলমুনি, রাড়ুলি-কাটিপাড়া, চাঁদখালি, বড়দল, থামাদি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান।

কপোতাক্ষী হইতে হরিহর ও ভদ্র নামক আর দুইটি শাখা পূর্ব্ব-দক্ষিণবাহী ছিল। হরিহর ঝিকরগাছার কিঞ্চিৎ উত্তরে কপোতাক্ষ হইতে নির্গত হইয়াছিল। এক সময়ে ইহার কূলে লাউজানি, মণিরামপুর, কেশবপুর, বিদ্যানন্দকাটি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান শোভা পাইত। হরিহর আলতাপোলের কিছু ভাটিতে ভদ্র-নদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

"ভদ্রের সহিত কপোতাক্ষের সঙ্গমস্থানে ত্রিমোহিনী ও মির্জ্জানগরে মোগল ফৌজদারের রাজধানী ছিল, সেখান হইতে ভদ্র কেশবপুর ঘুরিয়া গৌরীঘোণা, ভরতভায়না প্রভৃতি স্থানের শোভা-বর্দ্ধন করিয়া এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু সামাজিক কায়স্থ ব্রাহ্মণের বসতি করাইয়াছিল। আজ ভদ্র ডুমুরিয়া পর্য্যন্ত প্রদেশকে কাণা করিয়া নিজে এক প্রকার মজিয়া গিয়াছে। কিন্তু ডুমুরিয়া ছাড়িয়া ভদ্র সুন্দরবনের নদী।"

চুকনগর, শোভনা, ডুমরিয়া, সাহস প্রভৃতি গ্রাম এই নদীর তীরে অবস্থিত।

মুক্তীশ্বরী-নদী, বুকভরা, বাওড় এবং এড়ুল বিল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এরেণ্ডা, দুর্গাপুর, পুলের ঘাট, চাঁচড়া, রাজধানী, সতীঘাটা-কামালপুর, চাকুরিয়া-প্রতাপকাটি প্রভৃতির নিম্ন দিয়া, শেষে ট্যাকা-নদী নামে নেহালপুর, ধালিঘা-পাচাকড়ি প্রভৃতির ধার দিয়া, মুক্তীশ্বরী নদী কপালিয়ার নিকট ভবদহের খালে পড়িয়া—ভদ্র-নদের সহিত মিশিয়াছে। একদা এই সুন্দর কেদারবাহিনী মুক্তীশ্বরী-নদী বহু অঞ্চলকে শস্য-শ্যামলা করিয়া প্রবাহিতা হইত। এক্ষণে এই নদীটির ধ্বংসের সহিত, বহু অঞ্চল বদ্ধ জলায় পরিণত হইয়াছে। খুলনা হইতে যশোহর পর্য্যন্ত—বিল ডাকাতিয়া, বিল বোকড় প্রভৃতির শাখা-প্রশাখা সহ, প্রকাণ্ড এক অঞ্চল জল-গণ্ড রোগে আক্রান্ত। খুলনা, দৌলতপুর, ফুলতলা, নওয়াপাড়া, ডুমুরিয়া, কেশবপুর, মণিরামপুর, যশোহর, কোটচাঁদপুর প্রভৃতি সমগ্র কয়েকটা থানা এই অঞ্চলমধ্যে পড়িয়াছে।

নব-গঙ্গা যেখানে মাথাভাঙ্গা হইতে জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহারই ১০ মাইলের মধ্যে, জয়রামপুর রেল-ষ্টেশনের উত্তরে মহেশ্বরা নামক এক শাখা বাহির হয়। মহেশ্বরী-নদীর নিম্নাংশ, চিত্রা-নদী নামে যশোহর-খুলনা মধ্যে প্রবাহিত। বোধ হয়, কন্যারাশিস্থ উজ্জ্বল চিত্রা-নক্ষত্র হইতে, এই স্বচ্ছ ও নির্ম্মলতোয়া নদী, চিত্রা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে।

"রেনেল সাহেবের মতে এই নদী নবগঙ্গা নদীর শাখা। নবগঙ্গার উৎপত্তি স্থান হইতে দেড় ক্রোশ দূরবর্ত্তী দামুড়হুদা নামক স্থানে এই নদী, নবগঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণপূর্ব্ব বাহিনী হইয়া এক শাখা উত্তরাদিকে ফটকি নাম ধারণ করিয়া বেগবতী (বেড়্) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।"

"ঘোড়াখালি নামক একটি খনিত খাল নদীর নিম্নে নবগঙ্গাকে নড়াইলের উত্তরস্থিত চিত্রা ও ফটকির সম্মিলিত প্রবাহের সহিত মিশাইয়া [illegible]য়াছে।"

চিত্রা, ঘোড়াখালি পর্য্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া তথা হইতে গুলপুর পর্য্যন্ত দক্ষিণবাহিনী, এবং গুলপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ববাহিনী হইয়া চাঁচড়ি মধ্য দিয়া, গাজির-হাটের নিকট দিয়া বহিয়া পরিশেষে আঠার-বাঁকীর সহিত ছাগলাদহে মিলিত হইয়াছে।

পুনরায় চিত্রা নামে এক নদী, আঠার-বাঁকীর অপর পারে নাগরকাঁদি হইতে, বাগেরহাট মহকুমার মধ্য দিয়া মধুমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মধুমতী ও চিত্রাসঙ্গমে চিতলমারি প্রকাণ্ড গঞ্জ, এক্ষণে উহা ক্ষয়িষ্ণু। বিশেষজ্ঞগণের মতে, এই দ্বিতীয় চিত্রা, প্রথম চিত্রারই বিস্তৃতি এবং ইহাই সম্ভব।

মূল চিত্রা-নদীর তীরে খরগোদা, কালীগঞ্জ, খাজুরা, সীমাখালি, নারিকেল বাড়িয়া, সালিখা, বুনাগাতি, ঘোড়াখালি, নড়াইল মহকুমা, কুরিগ্রাম, হাটবাড়িয়া, ব্রাহ্মণডাঙ্গা, গোবরা, বড়গাতি, গুলপুর, চাঁচড়ি, গাজিরহাট প্রভৃতি গ্রাম অবস্থিত।

চুয়াডাঙ্গা রেল-ষ্টেশনের উত্তরে, ৮৪-৮৫ মাইল মধ্যে, 'গজনভি-কাট'। এই 'গজনভি-কাট' দ্বারা মাথাভাঙ্গার সহিত নবগঙ্গা-নদীর পুনরায় সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। ঝিনাইদহ ও মাগুরা মহকুমাদ্বয়, হরিশঙ্করপুর, আঠারখাদা, আলুকদিয়া, বিনোদপুর, সত্রাজিৎপুর, নহাটা, বাটাযোড়, নলদী, কুমারগঞ্জ, রায়গ্রাম, কলাগাছা, লক্ষ্মীপাশা, লোহাগড়া, কালনা প্রভৃতি গ্রাম এই নবগঙ্গা তীরে অবস্থিত। লোহাগড়া হইতে নবগঙ্গা সোজা কালনার নিকট মধুমতীতে মিশিয়াছিল, কিন্তু সে অংশ এক্ষণে মজিয়া গিয়াছে। কারণ বাণকাণা নামক একটী শাখা এই স্থান হইতে নবগঙ্গার জল লইয়া কালিয়ার পার্শ্বব[illegible] [illegible]-গঙ্গায় মিশাইতেছে এবং কালীগঙ্গা গা[illegible] নিকট আতাই-নদীতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। আতাই গিয়া খুলনার নিকট ভৈরবে পড়িয়াছে। মাগুরা হইতে ৩।৪ মাস কাল এবং বিনোদপুর হইতে লোহাগড়া পর্য্যন্ত বারমাস সমভাবে নবগঙ্গায় নৌকা চলে।

আলমডাঙ্গা রেল-ষ্টেশনের প্রায় পাঁচ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, পাঙ্গাসী বা কুমার-নদ, মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে। পাঙ্গাসী-নদীর নিম্নাংশ কুমার নামে খ্যাত।

"মাগুরা নগরের উত্তরাংশে মুচিখালি নামক একটি খালের দ্বারা নবগঙ্গার সহিত কুমারের মিলন হইয়াছিল। কুমার এই সংযোগের ফলে নবগঙ্গাকে পুনর্জীবিত করিয়াছে। কুমার পূর্ব্বমুখে গৌরীতে মিশিয়া গিয়াছে এবং অপর পার হইতে বাহির হইয়া চন্দনা নামক পদ্মার অন্য শাখার সহিত ইহার সংযোগ হইয়াছে। কুমার পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়া ফরিদপুর জেলায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।"

প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্ট হয়, চন্দনা-নদী কুমার-নদতীরস্থ মধুখালি বন্দরের নিম্নে কুমারের সহিত সংমিলিত হইয়াছে। এই কুমারই মধুখালি হইতে কানাইপুরাভিমুখে, ভাঙ্গা ও মাদারীপুরের নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

"গোরাই নদী হইতে কালীগঙ্গা নাম্নী একটি নদী বহির্গত হইয়া কুমার নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। কালীগঙ্গার প্রবাহ এই নদীতে পড়িত, সুতরাং পূর্ব্বে কিছুকাল বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়েও এই নদী খরস্রোতে প্রবাহিত হইত। কুমারের স্রোত তখন নবগঙ্গা নদীতে আসিত।"

এইবার মধ্যবঙ্গের (বিধ্বস্ত) ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের পূর্ব্বোত্তর ও পূর্ব্ব সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

গাঙ্গেয় উপদ্বীপ বা উপবঙ্গকে, গৌরী মধুমতী দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে। যশোহর-খুলনার মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল নদী। এই নদীর পূর্ব্বাংশে, বঙ্গ এবং পশ্চিমভাগে, মধ্যবঙ্গের অবস্থিতি।

"একই নদী পদ্মা হইতে নির্গত হইয়া নদীয়া, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা বাখরগঞ্জ জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। কুষ্টিয়া হইতে কামারখালির কিছু ভাটি পর্য্যন্ত গড়ুই, তথা হইতে চিতলমারি পর্য্যন্ত মধুমতী ও তথা হইতে বলেশ্বর নাম ধারণ করিয়া হরিণঘাটা আখ্যায় সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। গৌরীকে সাধারণতঃ গোরাই, গড়াই বা গড়ুই বলে।"

"কুষ্টিয়ার সন্নিকটে গৌরী, গোরাই বা গড়ুই নদী পদ্মা হইতে বাহির হইয়া নদীয়া জেলা দিয়া যশোহরে প্রবেশ করিয়া কুমার নদের সহিত মিশে এবং পরে কুমারের শাখা বারাসিয়া দিয়া দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত হয়। কিন্তু কালে গৌরীর জলপ্রবাহ এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যে, বারাসিয়া হইতে এলেংখালি নামে একটা পৃথক্ শাখা বাহির হইয়া যায়। পূর্ব্বে বারাসিয়ার নিম্নে মধুমতী নাম ছিল, এখন এই এলেংখালিও বিস্তার লাভ করিয়া মধুমতীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।"

যশোহরের পূর্ব্ব সীমায় হানু নদী—ইহা গড়ুই নদের একটি শাখা। ভাটবাড়িয়ার সমীপবর্ত্তী গড়ুই নদ হইতে বাহির হইয়া পুনরায় নিচিন্দপুরের নিকটবর্ত্তী গড়ুই নদের সহিত মিশিয়াছে। ভাটবাড়িয়ার মোহানা বন্ধ হইয়াছে। নারকোল একটা প্রসিদ্ধ বন্দর।

নবগঙ্গা-তীরে—আলমডাঙ্গার পরে, শৈলকুপা। শৈলকুপা বন্দরে মোগল-রাজত্ব সময়ে, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের শুল্ক আদায় হইত। রামনগর, মধুমতী তীরে—(ফরিদপুর জেলায়) কামারখালি প্রধান গঞ্জ। (যশোহর জেলায়) ভূষণা ও মহম্মদপুরে, অন্যতম বীর রাজা সীতারাম রায়ের কীর্ত্তি-সকল অবস্থিত।

বারাসিয়া-তীরে—বোয়ালমারি এক প্রধান গঞ্জ কাশিয়ানি, ভাটিয়াপাড়া, অন্যতম প্রধান গঞ্জ। অধুনা নদী শুষ্কপ্রায়।

মধুমতী-তীরে—ইছনা। বড়দিয়া, প্রধান গঞ্জ এবং ইহা হইতে হালিফাক্স খাল, হালিফাক্স ক্যানাল দ্বারা মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার যোগ সাধিত হইয়াছে। মাদারিপুর বিলপথে—গোপালগঞ্জ, সেনদিয়াঘাট। কোটালিপাড়া, প্রধান পণ্ডিত সমাজ, একটু দূরে ঘাঘর নদী তীরে অবস্থিত।

মাণিকদহের সন্নিকটে আসিয়া মধুমতী আঠারবাঁকি শাখা প্রসারিত করিয়াছে, এবং সেখান হইতে ইহা খুলনা জেলার পূর্ব্ব সীমা ধরিয়াছে। মোল্লাহাটি থানার চিতলমারি, চিত্রা ও মধুমতীর সঙ্গমে প্রধান গঞ্জ ছিল, এক্ষণে ক্ষয়িষ্ণু। মধুমতীর বিস্তার ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে, নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া (চিতলমারির নিকট) বলেশ্বর হইয়াছে। কচুয়ার সন্নিকটে ভৈরব এই বলেশ্বরে মিশিয়াছে। কচুয়া পর্য্যন্ত, মধ্য-বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু অঞ্চলের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা শেষ হইল।

মধ্য-বঙ্গ বিশেষ রূপে নদী-মাতৃক। স্বভাবতঃই ইহার উত্থান-পতন এবং সংস্কৃতির ইতিহাসে এই সকল নদ-নদীর স্থান প্রধান। অনেক তথ্য, কিংবদন্তী, কাহিনী এই সকলের সহিত জড়িত আছে। এই সকল নামের অনেকগুলি অপূর্ব্ব কবি-কল্পনার নিদর্শন এবং নিরুপম রসের আকর।

পক্ষান্তরে পুণ্য যশোর-ভূমিতে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছিল। আজিও তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সকল বর্ত্তমান আছে।

সেই মহীয়সী যশোর-ভূ-লক্ষ্মীকে, কোটি নমস্কার।

দোটানা

"এ পথ গেছে কোন্ খানে ভাই,
কে জানে, তা কে জানে।"

শূন্যস্থান

—শ্রীজগৎ দাশ

পঙ্কিল আবর্ত্ত।

সব রস শুকিয়ে নীরস হয়ে গেছে জীবন। বেকার জীবনের ব্যর্থতার ওপর নেমে এসেছে কাল পর্দ্দা—জঞ্জালের মত প্রতি পদে পথ ব্যর্থতা। সামনে সামনে চলা মুছে গেছে, এঁকে বেঁকে চলতে হয়। হয়তো খানিকটা অসত্যের পথে; পঙ্কিল প্রবাহে ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে।

ফাঁকির মরসুম।

মন নিত্য নূতন ফাঁকির ফরমাস জুগিয়ে আসছে। নিস্তার কি আছে তাতেই?

জীবনটা নদী। বহুদূর বয়ে এসেছে, বহুদূরে বহুদিন বয়ে বয়ে চলবে এ কুল্-কুল্ কল্-কল্ করে। কত আঁকে কত বাঁকে এ ঘুরপাক খাবে। কত তীর ভাঙবে, অপর পারে জমে উঠবে কত চর। বালু আর আবর্জ্জনায় এর স্রোতের গতি হবে মন্থর।

শীতের রাত্রি ফিকে হয়ে এসেছে; ঘুম গেছে ফ্যাকাসে হয়ে। আধঘণ্টা ধরে জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছিলুম। ভারি সুন্দর এক স্বপ্ন। ইচ্ছে করে তাড়াইনি, স্বপ্ন ভাঙবার ইচ্ছে হয় নি, খেয়াল হয় নি, মনে আমার ক্ষমতা ছিল না এমনি রং-বোনান স্বপ্ন।

স্বপ্ন মিথ্যে, কল্পনা—কুয়াসার মত মিথ্যে। আমি কি তা জানি না? জেনেও ভাণ করতে হয়—না বোঝার ভাণ, সব বুঝে ফেললে, কিছুই বোঝবার বাকি না থাকলে পৃথিবীতে থাকা চলে না। পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক হতে গেলে চলে না—অন্ততঃ আমার চলে না।

শীতের প্রকাণ্ড রাত্রি।

মানুষ ঘুমোবে কত? বিশেষতঃ যাদের মাথা ঠিক রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোবার মত পেটে ভাত আর হাতে পয়সা নেই। চারিদিকের ভদ্রপল্লী গুলো অভদ্র হয়ে গুটিয়ে আসতে আসতে, এখানে এসে বস্তীতে ঠেকেছে।

চারিদিকে টাইটুই শোনা যাচ্ছে। সবাই জেগেছে আর কি। যদি কাণ সজাগ করে শোনা যায়, এই ফিকে-হয়ে-আসা রাত্রিতে, এদের জীবন-নাটিকার দৈনিক মহল্লায়, হয়তো আমরা এই অসভ্য মানব-সমাজের অনেক বৈচিত্র্যের সন্ধান পাব। কিন্তু সেটা হয়তো এক টুকরো কল্পনা। যাকে আমরা বলতে পারি বৈচিত্র্য, যাকে আমরা অনায়াসে কবিতার বিষয়-বস্তু করতে পারি—ওদের কাছে সেটা বৈচিত্র্য নয়, বেদনা নয়—কিছুই নয়। ভাবেই না; আমলই দেয় না ওরা এ সবকে।

এখানে থাকি। এই বস্তীতে ওদের সঙ্গে গা-ঘেঁসা-ঘেঁসি করে, এদের চিনতাম না কোনদিন। জানতাম না এদের জীবনের খুঁটিনাটি, এদের কথা কাটাকাটি থেকে ছিলাম বহুদূরে। অনেকবার মনে হয়েছে এই এক পাল বোবা মানবকদের নিয়ে গল্প লিখব। এদের জীবনে রং ফলিয়ে সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়াব। মূর্খ অহঙ্কার আমাদের, ভণ্ডিতার ভাণ চলে আসছে আদিম যুগ থেকে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—আমাদেরকে ক্ষমা করবেন বলেই না তাঁর অস্তিত্বে আমরা আস্থা রাখি।

পাশের ঘরে বুড়ো ঠাকুর পরম পরিতৃপ্তিতে তামাক টানছে। হুঁকোর গুড় গুড় শব্দ শুনে কে বলবে এর জীবন দারিদ্র্যের শতছিদ্রে নাজেহাল। এই বুড়োকে সেদিন কালীবাড়ীতে যাত্রী পাকড়াও করতে দেখলুম।

"আসেন বাবু; আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। চান-টান সব সেরে এসেছেন?" ভদ্রলোক জোরে পা চালাচ্ছেন বোঝা গেল। "মায়ের কাছে একটা ডালা তো দেবেনই, যার কাছ থেকেই হোক—সামান্য পাঁচটা পয়সা।" ভদ্রলোক কি জবাব দিলেন শোনা গেল না। হ্যাংলা কুকুরের মত আর কতদূর যাওয়া যায়? বুড়ো ফিরে এল।

পিছনের ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে কথা হচ্ছে। স্ত্রীর গলা শোনা যায়, "আগে দোকানে বিক্রি হত, আজকাল হয় না

কেন? নবাবী চালে যেতে যেতে তো সেই নটা বাজবে, খদ্দেরের দোষ কি? তারা তোমাদের দোকানে এসে ধন্না দেবে না কি?"

"এমনিই তো চিরদিন যাই, তা ছাড়া এটা ওটা সেরে—"

"এটা ওটা তোমায় কে সারতে বলে শুনি?" স্ত্রী মুখিয়ে উঠে। "অত বড় মেয়ে রয়েছে কি করতে? ব'সে ব'সে ভাত গিলতে তো আটকায় না।"

এমনি এদের আলাপ-আলোচনা। এই কি সাহিত্য? এই নিয়ে গল্প লিখবে তুমি? এদের দৈনন্দিন অনেক কথাই আমি জানি, এই বৌটীর দুটি মেয়ে আর তিনটি ছেলের পর সেদিন আর একটি ছেলে হয়েছে। ওরা ভেবে নেয়, এ ভগবানের দান। ওদের হাত আছে কিছু? ওদের দুটো জিনিষ আমার কাছে এখনও অপরিষ্কার। বৌটী দুপুরে কিছু রাঁধে না—অন্ততঃ আমার চোখে পড়ে নি, ওর ছেলে-মেয়েদের দেখেছি মুড়ি চিবোতে। রাত্রে খুব রাত করে রাঁধে। স্বামী কিসের দোকান করে জানি না। কালীঘাট থেকে পায়ে হেঁটে ধর্ম্মতলা যায় প্রতিদিন। অনেকদিন দেখেছি তো, খালি গায়ে ধর্ম্মতলায় ঘোরাফেরা করতে।

•

রাত দিনের দিকে সরে আসছে। পাতলা পর্দ্দার ঝিলিমিলির ভেতর দিয়ে আলোর আত্মপ্রকাশের আর দেরী নেই। শীতের সকাল, যা' তা' করে নটা বেজে যাবে। মেজমামার চিঠিটা পকেটে ফেলে অনুকূল বাবুর বাড়ী যেতে হবে। রাত্রে ভাবা খুব আরাম। মামা লিখেছেন, "অনুকূল বাবু আমার বাল্যবন্ধু। একটা বিলাতী কোম্পানীর অংশীদার—খুব অমায়িক মানুষ।" এর পরও মামা লিখেছেন—তাঁদের বন্ধুত্বে ফাটল ছিল না। একটা ব্যবস্থা তিনি করবেন, এ চোখ বুজে আশা করা যায়। ঐ যে পাঁয়ের বাড়ীর ঠাকুরের ঘরের ওপারের ঘরে যে লোকটী থাকে, কি নাম?—হরিচরণ। কালই রাস্তায় দেখে ডেকে গিয়ে ওর কথা বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও হরি আমাকে আর তাকে এখন মোটেই অসমান ভাবে না।

সত্যি, বেকার-জীবনের লজ্জার সঙ্গে দৈন্যের খোলস গা থেকে খুলে ফেলে না দিতে পারলে, নিজের কাছেও পরিত্রাণ নেই যেন। কাল সাবান মাখাতে গিয়ে টুইলের শার্টটা কাঁধের কাছে টাল্ সামলাতে পারে নি—ফেঁসে গেছে খানিকটা। তাতে আর কি হয়েছে, চাকুরীর সুপারিশ নিয়ে যাচ্ছি, অনুকূল বাবু এটা নির্ভেজাল বুঝতে পারবেন—দেহের কাঠামে এটা ইচ্ছাকৃত দৈন্যের পোঁচ।

মেজমামার ছোটবেলার বন্ধু অনুকূল বাবু একটা ব্যবস্থা করবেন বৈ কি?

তারপর মুক্তি। এই স্যাঁতসেঁতে, নোংরা জীবন থেকে মুক্তি। নির্মুক্ত জীবনের নূতন স্বাদ পাব। মাতাল আনন্দে দৈহিক রেখাগুলো উচ্চারিত হয়ে উঠবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভাবনার বালাই নেই, শুধু এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অতি নির্লিপ্ত প্রশান্তি।

বৈঠকখানার দরজা ভেজান ছিল—কড়ানাড়ায় ফাঁক হয়ে গেল। অনুকূল বাবু অপরিচিত চোখে চাইলেন, মামার চিঠিটা টেবিলের ওপর প্রসারিত করে দিয়ে পায়ের ধুলো নিলুম।

"ও", অনুকূল বাবু হাঁক তুললেন। "থাক কোথায়? তোমাকে হয়তো খুব ছোটবেলা দেখে থাকব, তাই চেনা মুস্কিল।" চেয়ারের বুকে পিঠ ঠেকিয়ে তিনি প্রসারিত হলেন খানিকটা। অনুকূল বাবুর মন্তব্যে উত্তর দেবার কিছু নেই; কাচুমাচু করতে লাগলুম, তিনি ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের তেলো ঘষতে লাগলেন। বললুম, "কালীঘাটে থাকি।"

"চাকরী-বাকরীর যা বাজার", তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন। "আমাদের ছেলেরা বড্ড বেশী চাকরী-ঘেঁষা", তিনি আরম্ভ করলেন এমনি করে—আর শেষ করলেন পাশের স্তূপীকৃত খাতার অরণ্য থেকে নানান সই একখানা খাতা সামনে টেনে নিয়ে। বেকার-সমস্যা নিয়ে আচার্য্য রায়ের আর আলবার্ট হলের সবগুলি সভা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকায় অনুকূল বাবুর কথা নতুন ঠেকল না বিশেষ। জড়সড় হয়ে বললুম, "কিন্তু টাকা?"

ভদ্রলোক বেশ মাংসল পেটের ওপর হাত বুলিয়ে সজোরে হেসে উঠলেন, "ঐ তো দোষ, একটা না একটা

কৈফিয়ৎ তোমাদের আছেই।" পেন্সিলটা খাতার উপর উপুড় করে ঠুকলেন বার কয়েক, যেমন মুখে আগুন দেবার আগে সিগারেট ঠোকে মানুষের হাতের তেলোর ওপর, "আটকায় না হে, ইচ্ছে থাকলে আটকায় না। দেখেছ বড় বাজারে মাড়োয়ারীদের বড় বড় বাড়ী আর জুড়ি, কটা টাকা নিয়ে আসে ওরা জান, একটা লোটা আর একটা কম্বল, বুঝলে ?" অনুকূল বাবু ঈষৎ হাসলেন।

তা' ছাড়া অনুকূল বাবুর নিজের ভুঁড়িও একটি উদাহরণ বিশেষ। আমি লক্ষ্য করলুম। শরীরকে ফাঁকি দিয়ে পেটের ওপর মাংস জমে নি। চেহারা অনুকূল বাবুর নাদুসনুদুস। ভুঁড়ির ওপর পড়েছে গভীর কয়েকটা বাঁকা রেখা। তবু বিধাতার অপসৃষ্টি অনুকূল বাবুর চোখের চার ধারটা। চোখের চার ধারে অসমান মাংসের পুঁটলি। আর এই মাংসস্তূপের মাঝখানে আটকে আছে স্বচ্ছ দুটো চোখ; সঙ্কুচিত হয়ে ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে যেন।

ঘরখানা বেশ পরিপাটী ক'রে সাজান, অযথা বস্তুর পীড়নে কোলাহল ওঠে নি, এর কোন কোণ থেকেই। আমি উঠছি না দেখে অনুকূল বাবু অস্বস্তি বোধ করছেন। তিনি সন্দিগ্ধতর হয়ে আমার মুখের উপর চাইলেন। অনুকূল বাবুর চোখ ছোট, কিন্তু চাউনি সুতীব্র। আমার মুখের সূক্ষ্মতম স্নায়ুটী পর্য্যন্ত তাঁর চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। অনুকূল বাবু উসখুস্ করছেন, বুঝলুম আমার উঠা উচিত। কিন্তু অনুকূল বাবু আমার নাগালের বাইরে নয়। একটি চাকরী তাঁর একটি কথার অপেক্ষা রাখে, তাই অঙ্কুরকে অত সহজে টক্ ভাবতে মুস্কিলে পড়লুম। "দয়া করে আপনি যদি একটু" বললুম।

"সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আমার নিজেরই গরজ আছে।" প্রচেষ্টার ব্যঞ্জনা হাত-পা নেড়ে তিনি স্ফুটতর ক'রে তুললেন। "কিছু একটা সুবিধা হলেই তোমায় খবর দেব। ঠিকানাটা"—ড্রয়ার খুলে একখণ্ড সাদা কাগজ এগিয়ে দিলেন। ঠিকানা রেখে উঠে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই, আমি উঠে পড়তে তিনিও উঠলেন। ঘরের একটা প্রত্যন্ত প্রদেশে স'রে গিয়ে বললেন, "বাড়ীর সব ভাল তো ?" উত্তর না দিয়ে চৌকাঠ ডিঙিয়ে এলুম।

মিউজিয়ামের সামনে মাঠ ঘেঁসে একটা গাছতলায় বসে তার কথা এ পর্য্যন্ত শুনলুম। অমল যা' বলল, তা' বুঝলুম, যা' বলল না, তাও বুঝলুম। অনুকূল বাবুর আর অমলের বাড়ী এক গ্রামে। এক সঙ্গে পড়েছি একদিন অমল আর আমি। অমলদের সংসারের সঙ্গে অনুকূল বাবুকে জড়িয়ে যে ইতিহাস আছে, তা' আমি জানি। অন্ততঃ একদিনের জন্য অমলকে অতিথি ক'রে রাখা অনুকূল বাবুর অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল।

অনুকূল বাবু রূপোর চামচে মুখে নিয়ে সংসারে আসেন নি। অনেক কষ্ট ক'রে তাঁকে লেখাপড়া শিখতে হয়েছে, আর সেই কষ্ট করবার হদিশ পেয়েছিলেন তিনি অমলের দাদামশাই ব্রজবল্লভ বাবুর বদান্যতায়। অনুকূল বাবু কপালে-মানুষ সন্দেহ নেই; তা' না হ'লে লেখাপড়া অনেকেই শেখে, কষ্ট বহুলোকেই করে, কিন্তু এমনি দু'হাত ভ'রে টাকা আনতে পারে ক'জন ?

শীতের কুয়াশা ফুরিয়ে গেছে কোন্ সকালে। আকাশ চিরে সোনালী রোদ ছড়িয়ে পড়েছে কলকাতার ইটকাঠময় জনবহুলতার ওপর। সকালে খাওয়া হয় নি। খিদেয় পেটে চিড় ধরার উপক্রম। পকেটে পয়সা না থাকার ভিড়। হেঁটে যেতে হবে প্রায় দু'মাইল। বিলীয়মান সুধার'শ্মর দিকে একবার তাকিয়ে, অমলকে ডাকলুম "চল", অমল উঠল।

আপনারা হয়ত বলছেন—'বাঃ রেঃ! আরম্ভ করছ কি ? গল্প বল।' বাধ্য হ'য়ে আমায় জিজ্ঞেস ক'রতে হয়, কি গল্প শুনবেন ? প্রেমের ? প্রেমের গল্প ভোঁতা, জীবনের জীর্ণ আবহাওয়ায় প্রেম পচে গেছে, তার আবার গল্প !

তবু। তবু আপনারা পয়সা দিয়ে এ গল্প কিনবেন। সময়কে জাঁকাল রকমে খরচ করবার জন্য ভাল রকম উপাদান তো খুঁজবেনই। এ আর খুব বেশী অন্যায় আব্দার কি ?

ছোটবেলায় ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে বসেছি। প্রথমেই ঠাকুরমা জেনে নিয়েছেন, আমাদের চাহিদা কি ? পরীর গল্প ? না, রাজার ছেলে আর নাপিতের ছেলের গল্প ? অথবা ডালিম-কুমারীর ? সবাই একবাক্যে বলেছি, 'ডালিম-কুমারীর গল্প বল ঠাকুরমা।'

ঠাকুরমা গল্প বলেছেন। আমরা বলেছি,—'তারপর ?'

তারপর ঠাকুরমা এটার খানিকটা বাদ দিয়ে, ওটার খানিকটা, সেটার খানিকটা নিয়ে তাঁর গল্প এগিয়ে নিয়ে গেছেন। আমরা কোন প্রতিবাদ করিনি। শুধু মাঝে মাঝে বলেছি, তারপর কি হল ঠাকুরমা ? সোনার কাঠি দিয়ে জীবন-দেওয়া রাজকন্যা রাজকুমারকে ভালবাসতো ?

ঠাকুরমা বলেছেন—"বাসলই তো।" বাসবেই তো—এ যে গল্প। আমাদের মনের মত ক'রে একে গড়ে নিয়েছি যে। কাল্পনিক হোক, অসংখ্য অসঙ্গতি থাক গল্পে—ঘুমিয়ে পড়তে অসুবিধা তো আমাদের হয় নি।

আপনাদের চাহিদা কি—তাও জানি। বলি শুনুন।

অমলকে দেখে অনুকূল বাবু আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন—আ রে ! অমল যে, কত ছোটবেলা তোমায় দেখেছি, তবু ভুল ক'রনি নিশ্চয়ই।

অমল অনুকূলবাবুকে প্রণাম করে।

—থাক্, থাক্, বেঁচে থাক। বীণা, বীণা, দেখে যা কে এসেছে। অনুকূল বাবুর মেয়ে বীণা দরজায় টাঙানো পর্দা দু'হাতে ফাঁক ক'রে ঘরে ঢোকে।

অনুকূল বাবু অমলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনুকূলবাবুর বাসায়ই অমল থেকে যায়। তিনি ওর চাকরীর চেষ্টায় থাকেন। হাজার হোক তারই ছোট বেলার আশ্রয়দাতার নাতি তো।

তারপর সোজা। গল্পের প্লট তো তৈরী।

আসলে অনুকূলবাবু ওসব কিছুই করেন নি। অমল যে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিল ; সেটা তার বের না হওয়া পর্যন্ত খোলাই ছিল। তাই ও সব লিখি কি করে বলুন। তা সৃষ্টি করবার হাতও আমার পঙ্গু, অমলের কথাগুলি আমি গুছিয়ে বলবার ভার নিয়েছি মাত্র।

অমলের সঙ্গে কলকাতায় এই আমার প্রথম দেখা। জানতুম অমল কলকাতায় চাকরীর চেষ্টা করছে। অমলকে পেয়ে খুব খুশী হওয়া গেল ; অনুকূলবাবুর ওপর মনটা আরও বিষিয়ে গেল এই যা।

আমি থাকি ভবানীপুরে। অমলকে আমার বাসায় নিয়ে চললুম।

কিছুদিন আগেও একটা মেয়েকে পড়িয়ে কটা টাকা পেতুম, সেটা হারিয়েছি নানা কারণে—প্রায় যে কোন কারণে বলা যায়। দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে বিনা বেতনে সদাগরি অফিসে নবিশি করছি।

এই অসংখ্য লোকের শোভাযাত্রা...এর ভেতর সুখী ক'জন ? শীর্ণ মুখের উঠন্ত হাড় আর চোখের কালীতে কি মনে হয় ? জীবনের সবটুকু বৈচিত্র্য তাদের নিবে গেছে, কি আশায় এই চলিষ্ণু জনস্রোতের গতি অব্যাহত, অটুট রয়েছে ? ফুটপাথে তাই ফিরিওয়ালাদের ভীড়ই বেশী। নানাশ্রেণীর ফিরিওয়ালা ফিরছে এদিকে সেদিকে, পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে, পেটে না খেয়ে ; দু'পয়সা ওরা পকেটে ফেলতে ব্যস্ত।

পরবর্তী সমস্যা ভিক্ষুকের। দারিদ্র্যের রাজপথে যাদের বাস, ফুটপাথের ভিক্ষুক তাদের হ'তেই হবে কোনোদিন না কোনোদিন

হাসি পায়—জীবনের গ্রন্থিশিথিল, অগোছালো ভাবনার কথা মনে ক'রে। কত কথা আমরা ভাবি, কত অসম্ভব কল্পনা আমাদের মাথায় আসে। অবাক্ লাগে অনেক সময়। মাঝে মাঝে মনে হয়, অনেক মোড় এঁকে বেঁকে এইবার বুঝি সোজা পথ পাওয়া গেল। পথ ভুল হবে না আর কিছুতেই। রাতের অন্ধকারে যেটা জলের মত সোজা মনে হয়,—দিনের আলোতে ফুটে ওঠে সেটা পাথরের মত কঠিন হ'য়ে।

হাঁটতে হবে আরও অনেক পথ।

বৈজ্ঞানিক যুগে বাস করছি আমরা। পাশ দিয়ে ট্রাম, বাস্, ট্যাক্সি, রিক্সা কত যে যান-বাহন চলেছে, তার ঠিক আছে কিছু ? শুধু একবার হাত উঠিয়ে যদি বলি "রোকো", যানবাহন তো দূরের কথা, পৃথিবীর ঘূর্ণন থেমে যেতে পারে প্রায়। সমস্ত বৈজ্ঞানিক কলকব্জা পোষা কুকুরের মত আমার পায়ের কাছে গুড়ি সুড়ি মারবার জন্য আমার একটী ক্ষীণতম ইঙ্গিতের অপেক্ষা করে। আসলে পকেটে যে আমার সে জোর নেই। তাই হাঁটতে হবে আমার দু'মাইল।

মনে মনে মানুষের বড়ত্বকে ঘৃণা করি। তাই ব'লে দারিদ্র্যের অভিশাপও ঠিকমত মেনে নিতে পারি না। আমি বড়লোক হ'তে চাই না। কিন্তু আমার ভেতর আমি সুখী

হ'তে পারব না কেন? আমার প্রত্যাঙ্গিক স্ফুরণ ব্যাহত হ'লে মন খচ্‌খচ্‌ করবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

কিন্তু দৈন্যটাই যে জোর ক'রে আমাদের ঘাড়ে চেপে আছে তা নয়, আমরা মেনে নিয়েছি দৈন্যকে। আমরা পাকে পাকে জড়িয়ে গেছি আষ্টেপৃষ্ঠে।

অনেকবার লটারীর টিকিট কিনে বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখেছি,—সুখী হ'তে পারিনি ঠিকমত। যখনই ভেবেছি, কাল সকালে আমি মুক্ত, দৈন্যের সবটুক্‌ নোংরামি আমার গা' থেকে খসে পড়েছে, কাল থেকে আরম্ভ আমার জীবনের ফুলশয্যা, তৃপ্তি পাইনি, মায়া পড়ে গেছে এই একটানা দারিদ্র্যের ওপর। ইচ্ছে করলেই যেন আর আমার মুক্তি নেই; বহু বলক্ষয় করবার যেন দরকার আছে এই নোংরা জীবনকে টেনে হিঁচড়ে ফেলে দিতে, অনুকূলবাবুর গায়ে ঐ যে গণ্ডারের চামড়া আর তার তলায় সজাগ হ'য়ে আছে যে পশু-মন—এতক্ষণে এর যেন একটা মানে খুঁজে পাওয়া গেছে।

বিকেলে দু'জন বেড়াতে বেরিয়েছি, হালদারপাড়া রোড দিয়ে চলেছি কালীঘাটের পথে। আমাদের আগে আগে চলেছেন সাজগোজকরা কেতাদুরস্ত ভদ্রলোক, আর তাঁর সঙ্গে প্রায় মিশে চলেছেন ভদ্রপত্নী পোষাকের বিজ্ঞাপন দিয়ে। দু'ধারে অগুণতি নরকঙ্কাল। এরা হালদারপাড়া রোডের দু'পাশে সারবাঁধা ভিক্ষুকের দল। ভারী মলিন এদের ঘর-সংসার।

দু' এক যায়গায় মাটীর হাঁড়ীতে ভাত ফুটছে। একটা পচাগলা বুড়ো তার পায়ের ফাটলে ন্যাকড়া ভরছে। মা মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে মাথার উকুন বের করছে। মা কালো কুচ্‌কুচে একখানা দীর্ঘ যষ্টি, মেয়ে ছোটখাটো একরাশ ময়লার স্তূপ।

শিশুদের চারপাশ-ঘেরা মশারির মত পাতার ঘরে এদের বাস।

দিনের আলো চুপ্‌সে আসছে ক্রমে রাতের কালো চুলের ভেতর। অনেকেই লম্বা হ'য়ে শুয়ে আছে। কেউ ছেঁড়া পাতায় ভাত ঢেলে খাওয়া আরম্ভ করেছে।

একটা কঙ্কাল উঠে এল।

"মা, একটা পয়সা।" ভদ্রপত্নীর কাছে হাত জোড় করলে সে। একাঙ্গীর কপালের চামড়া কুঁচকে গেল।

"হ'বে না অন্য যায়গা দেখ্‌।" ভদ্রলোক হাতের লাঠি দিয়ে ওকে অন্যপথের ইঙ্গিত দিলেন।

"ওদের জ্বালায় আর পথ চলবার উপায় নেই," ভদ্রমহিলা পিছিয়ে পড়েছিলেন, সামলিয়ে নিতে হল তাঁকে জোর দু'পা এগিয়ে গিয়ে।

অমল বলল, "দেখলে তো।"

"নতুন আর কি এমন?" বললুম, "সংসারের রংচটা চেহারাই তো এই। যদি ওরা দাক্ষিণ্যে গ'লে গিয়ে সিকি, আধলি একটা কিছু দিয়েই ফেলতো, তা' হ'লে এই কঙ্কাল আর মানুষে যে তফাৎ, সেটা কি এত চকচকে হ'য়ে চোখে পড়তো? দু'পক্ষই ভিজে অনেকখানি একাকার হ'য়ে আসতো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মনের ওপর গাঁথুনী দেবার তাঁর কারিগরি আছে। আচম্‌কা ফাটল ধরবার উপায় নেই। এই অগুণতি ভিক্ষুকদলের এইটেই সান্ত্বনা। ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার উপাদান ফুরিয়ে যাচ্ছে না। এদের ভিক্ষুকত্ব মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তার দীনতা অসহ্য।"

অমল উত্তর দিল না, আমি চুপ করলুম।

রাস্তায় ভিড় জমেছে—প্রায় কালীবাড়ীর কাছে, একটা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাকে কি বলেছে। সাদা-পোষাকধারী পুলিশের নিষেধ পর্য্যন্ত শোনেনি। ওকে থানায় যেতে হবে, ও যাবে না, পুলিশটী নাছোড়। খুব টানাটানি করছে; একবার দু'জনই গড়িয়ে গেল রাস্তায়।

"বাবুর হাতে পায়ে ধর্‌। ওনার সঙ্গে জোরে পারবি না কি?" কে একজন বললে।

"বজ্জাতের ধাড়ী মশাই! কেন? উনি নিষেধ করলেন, শোনা হল না!" আর একজনের গলা শোনা গেল।

এততেও হল না, পুলিশটী ওকে টানতে টানতে থানায় নিয়ে গেল।

"দেখলেন মশাই জুলুম, কি না কি একটা কথা বলেছে—" একজন বললে।

কেওড়াতলা।

শ্মশান ঘিরে নেমে এসেছে একটা প্রশান্তি, আবছা

অন্ধকারের সঙ্গে। একটা মানুষের সবটুকু পুড়ে প্রায় ছাই হ'য়ে এসেছে, কয়েকজন লোক চুপ ক'রে ব'সে আছে, একজন গুণগুণ ক'রে গান গাইছে। আশ্চর্য্য! হয়তো কোন একটী নিটোল সংসারের সুখশান্তি সব কিছু ছাই হ'য়ে যাচ্ছে ঐ মানুষটার সঙ্গে। আর ওর মনে গান এল!

বাংলার বহু কৃতী সন্তান সমাধি লাভ ক'রেছেন, এই কেওড়াতলায়। তাঁদের স্মৃতিকে শক্তিবান্ করা হয়েছে। দেশবন্ধুর সমাধি-মন্দিরটী তার মধ্যে সবচেয়ে জোরালো ও শক্ত।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পাশাপাশি এক সাধু বাস করেন। ভাঙ্গা হাঁড়ীতে এইমাত্র খিচুড়ি রেঁধে নামিয়েছেন। অনেকেই ভিড় ক'রে দেখছে ব্যাপারটা।

জটাধারী এক বুড়ীকে ভাঙ্গা খাপরায় খানিকটা ঢেলে দিয়ে সাধু বললেন, "খা।"

একখানা কলার পাতা কুড়িয়ে এনে এক পাগল ব'সে আছে খানিকদূরে।

"আয় পাতা নিয়ে আয় এ দিকে"—বুড়ী ডাকলে পাগলটাকে। একজন ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। বুড়ী বললে, "অভুক্তকে না দিয়ে আমি খাই না।"

"ওকে আমি দিচ্ছি, ওগুলি তুই খা।" সাধু আরও খানিকটা খিচুড়ি বুড়ীর খাপরায় ঢেলে দিয়ে তার ক্ষতিপূরণ করলেন।

মাথার ওপর গাছের ডালে অনেকগুলো কাক কাঃ কাঃ ক'রছে।

উপরের দিক চেয়ে সাধু বললেন "তোদের আর সবুর সইছে না।" ঘরের পিছনে গিয়ে অনেকগুলি খিচুড়ি সাধু ছড়িয়ে দিয়ে এলেন।

পৃথিবীতে চোখ ধাঁধিয়ে দেবার জন্য বৈচিত্র্যের কমতি নেই।

এই সাধু আর এই বুড়ী, প্রাণরস এদের শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। তবুও স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা' সুখদুঃখের একটা ক্ষীণ রেখা এখনও একেবারে লেপে পুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়নি।

সংসার পাতবার নীরব কল্পনা এদের মনে আসে বৈ কি মাঝে মাঝে। অন্ততঃ যখন এরা ক্লান্তিতে ঢ'লে পড়ে এই গাছতলায়—নিজেদের ওপর স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব যখন এরা হারায়, অনুর্ব্বর মাঠ যখন থাকে·········উঠে আসে না ওদের বদ্ধ চিন্তাগুলো মনের ওপর তলায় কিল্‌বিল্ ক'রে?

ঠিক হল ভবানীপুরে বাসা থেকে খেয়ে, কালীঘাটে অমলের বাসায় এক সঙ্গে রাত কাটানো যাবে। বিদ্যায়তনে বন্ধুত্ব আমাদের খানিকটা নিবিড় গোছের ছিল। অনেক দিন পর দেখা হওয়ায় দু'জনেই প্রায় ভরপুর হয়ে উঠেছিলুম।

রাত ন'টায় অমলের বাসা পাওয়া গেল। শুয়ে পড়ে দু'জনেই আজে-বাজে কথা বলে যাচ্ছি। মন যখন ভারাক্রান্ত, কথা খুব বেশী, বাঁধন না মানলেই বা ক্ষতি কি? চারিদিকটা কেমন থম্‌থম্ করছে। এত সকালে তো এমন হবার কথা নয়! নিশীথ রাত্রিতে ঘরের ঘড়িতে টিং টিং শব্দের মত আমাদের কথা টিং টিং করে বাজছে যেন। হরিচরণের ঘরে বার কয়েক মানুষের নড়া-চড়ার শব্দ পেলুম। পিছনের ঘরে ছেলেমেয়েরা বুঝি আজ সকাল সকালই ঘুমিয়ে পড়েছে। বামন ঠাকুর আস্তে স্ত্রীকে কি যেন বলছে—প্রায় সাইলেন্ট-এর মত।

এই জীবন, মিথ্যেকে মিথ্যে ব'লে ভাববার দুর্ভাবনা এদের নেই।

অমল বললে, "কি করা যায় বল্ তো? ঘুরে ঘুরে আর পারি না। তা' ছাড়া হাতে একটাও পয়সা নেই—দু'মাসের ঘর-ভাড়া বাকী পড়েছে।"

"ঘাবড়াস কেন? চেষ্টা কর, শীগিগরই কিছু একটা হয়ে যাবে বৈ কি।" মুখে বললুম বটে, গলায় যে একটুও জোর নেই, সেটা আমি নিজেও ধরতে পারলুম।

শূন্যতায় ভরে গেছে সব। মানুষের দৈন্য, অস্বাস্থ্য; মানুষের অতৃপ্তি আর অশিক্ষা, এ ছাড়া সুস্থ সবল এক টুকরো স্থানও আর অবশিষ্ট নেই এ পৃথিবীতে।

অমলের শিথিল কথার ভারে মন কয়েকটা মুহূর্ত্তের জন্য নুয়ে পড়ল। মনে পড়ল পূর্ব্বকালে অমলকে প্রজ্জ্বলিত হাতের সিগারেটের ধূমের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে বলেছিলুম, "সিগারেট যদি না-ই খাস, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে কেনা কেন?" উত্তরে অমল কি বলেছিল, পরিষ্কার মনে আছে।

"অপব্যয়ের ভিতরই তো পরিপূর্ণ উপভোগ। সুদ কষে পয়সা খরচ করে আনন্দ কোথায়? তা' ছাড়া এতে আমি ভারী আরাম পাই। বলতে কি উড্ডীয়মান নীল আঁকা-বাঁকা ধোঁয়া দেখবার জন্যই আমি সিগারেট খাই।"

সে সব স্বর্ণযুগ ইতিহাস হয়ে গেছে। আজ অমলের পকেটে চানাচুর খাবার একটা পয়সা নেই।

"চল, দেশে গিয়ে একটা ছোটখাটো ব্যবসা করি," অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অমল বললে।

বললুম "ভেবে দেখি।"

মন সায় দিল না। একটা অফিসে নবিশি করছি। ট্যুশনির জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছি। ঝোপের ভেতর সত্যি হয় তো দুটো পাখী আছে, কিন্তু অতটা আশা করা যায় না। শেষ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে দিনের দিকে এগিয়ে আসছে। মায়ের বাড়ীর ঠাকুরের তামাকী হুঁকোর গুড় গুড় আর ওপাশের ঘরে শোওয়া হরির ঘড় ঘড় নাক ডাকান মিশে এক অদ্ভুত শব্দ কাণে আসছে।

পিছনের ঘরে ব্রাহ্মণীর সদ্যোজাত শিশুটি বুঝি শেষ-নিশ্বাস ছাড়ল। ছেলেমেয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী এক সঙ্গে কেঁদে উঠল।

অমল বলল, "আহা, সেদিনও বেচারীর জন্য ওদের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না।"

"কোন বড়লোককে দিয়ে দেওয়া যায় না ওকে? এখানে থাকলে হয় তো না খেতে পেয়েই মরে যাবে।" ব্রাহ্মণী বলেছিল। "তুমি ভেব না, যিনি জীব দিয়েছেন তিনিই আহারের ব্যবস্থা করবেন।" ব্রাহ্মণ বলেছিল।

তিনি ব্যবস্থা না করতে পেরেই কি ওকে ফিরিয়ে নিলেন না তাঁর ব্যবস্থার উপর মানুষের কারসাজী এ?

প্রার্থনা

—শ্রীঅনিলময় বন্দ্যোপাধ্যায়

এই পৃথিবীর প্রান্তে
কিংবা এরই অপ্রকাশ্য অন্তরের গূঢ় অন্তঃপুরে
হয়তো এখনো আছে ঠাঁই,
সভ্যতা বলিষ্ঠ বাহু
উদ্ধত আলোর ছায়া যেথা মেলে নাই!
সেথায় পালাবে তুমি অহরহ উচ্চারিছ এই যে প্রার্থনা
—নির্জন নদীর তীরে বাসা বেঁধে থাকিবার আশা
ভেবেছ কি পাবে অভ্যর্থনা?
ভেবেছ সুন্দর হবে জীবন তোমার?
চপলতা-বিরহিত অসংখ্য নিঃস্তব্ধ প্রাণে—
ব্যর্থ হবে তব অভিসার!
সূর্য্যের উত্তপ্ত স্পর্শে উত্যক্ত হইতে মোরা—
বহুদিন ভালবাসিয়াছি।
আমরা বেসেছি ভাল কোলাহল,
—কর্ম্মের কল্লোল!
সমুদ্র-গম্ভীর-স্বর রক্ত-উৎস-মূলে লুপ্ত কোন যুগে
নিয়েছে আশ্রয়—
—সে কথা জানি না!

কিন্তু জানি—আমরা পারি না এই কর্ম্ম-ব্যস্ত পৃথিবীর
আকর্ষণ ছিঁড়ে চলে যেতে
অরণ্যের রক্ত নয় আমাদের তরে কোন দিন
শান্ত-স্নিগ্ধ স্বপ্নে মোরা করিব না প্রবঞ্চিত কখনো মোদের,
স্বপ্নের সঙ্কল্প হবে
ভীষণ দুর্জ্জয় ভয়ঙ্কর অচিন্ত্য আকৃতি।
আমরা যাব না কোন নির্জ্জন নদীর তীরে অরণ্য-ছায়ায়
ব্যস্ত-স্তব্ধ পৃথিবীর অলস প্রশ্রয়ে।
আমরা প্রার্থনা করি—তুমিও প্রার্থনা কর—
আমাদের পৃথিবীর লাগি:
—তুমি গো পবিত্র হও হে পৃথিবী—ধরিত্রী মোদের—
যত্নে যত্নে, কর্ম্মে কর্ম্মে ক্লান্তির প্রগল্ভ প্রসাধনে
আমরা সুন্দর হই—ক্লান্ত হই—গ্লানি-জর্জ্জরিত হই—
যতটুকু বাঁচি।
তুমি হও পবিত্র কেবল!—
অরণ্য নিস্তব্ধ নীড়ে তোমাকে ছাড়িয়া যাওয়া নহেক সম্ভব।
আমরা চঞ্চল।

খেতুরীর মহামহোৎসব ও শ্রীনরোত্তম দাস

—শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চৌধুরী

রাজশাহীর অন্তর্গত খেতুর গ্রামের প্রকৃত পরিচয় আমাদের স্মৃতির সমুদ্রে ক্ষীণ বুদ্বুদের মত মিলাইয়া গিয়াছে। বৎসরান্তে একটি অস্বাস্থ্যকর মেলা আজ আর ইহাকে ইতিহাসের পাতায় উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পারে না। দুর্গন্ধময় শৈবালাবৃত পচা জলপূর্ণ ডোবা ও অধিবাসিবর্জ্জিত ধূসর-ভূমি এবং হিংস্র-পশু-সঙ্কুলিত বন-জঙ্গল বক্ষে ধারণ করিয়া খেতুরীভূমি আমাদের নিজের প্রতি উদাসীনতারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। একদিন যেখানকার ধূলি বৈষ্ণবকুল-শিরোমণিগণের পাদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল, একদিন যেস্থানের আকাশ-বাতাস তাঁহাদের মুখনিঃসৃত পুণ্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল, পরম ভাগবতগণ পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হইয়া একদিন যেখানে সরল ভগবৎ-প্রেমের দৃষ্টান্ত ছড়াইয়া-ছিলেন, পতিতপাবন শ্রীনরোত্তমদাস যেখানে এক দিন মহামহোৎসবে পতিতের জয়গান গাহিয়াছিলেন, আজ বৎসরান্তে সেখানে তাহার কোন স্মৃতিই ভাসিয়া আসে না। এই স্থানের প্রসিদ্ধির কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে নানারকমের মুখরোচক গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ বলে, এখানকার মেলায় উৎকৃষ্ট খাগড়াই বাসন বেশ সস্তা দরে পাওয়া যায়। কেহ বলে, এখানে কৃষ্ণনগরের ভাস্করের হাতে গড়া সুন্দর সুন্দর ডানাওয়ালা পরী বা ঐ রকম পুতুল প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, কেহ বলে, এখানে বহরমপুরের পুরু কম্বল বিক্রয় হয়।

বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে খেতুরীর উক্ত পরিচয়ের কথা শুনিয়া আমাদের কথা চিন্তা করিতে গেলে, আমরা যে অধঃপতিত, আমাদের নিজস্ব গৌরব সংরক্ষণ করিতে আমরা যে অক্ষম, এই সত্যই আকাশ-বাতাস ব্যাপিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে থাকে।

রাজশাহী সহরের অনতিপশ্চিমে খেতুর গ্রাম অবস্থিত। এইস্থানে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত, এই ছয়টি বিগ্রহ ও তাঁহাদের মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে "কায়স্থ-কেশরী" নরোত্তম দত্ত একটি মহা-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। 'ভক্তিরত্নাকর,' 'নরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থে এই উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। কাজেই এখানে সে বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। আন্দাজ ১৫০৪ শকে এই উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে সন্তোষ দত্ত এই উৎসব করেন—

"সন্তোষ দত্ত খেতুরীতে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে যে মহাসমারোহজনক উৎসব করেন, তাহাতে তাৎ-কালিক সমস্ত বৈষ্ণবমণ্ডলী আহূত হন" (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়)।

আমরা প্রবীণ দীনেশ বাবুর উক্ত মত নির্ভুল বলিয়া দ্বিধাবিহীন চিত্তে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ, প্রামাণিক বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নরোত্তম দত্তই ঐ উৎসবের অনুষ্ঠাতা। সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র। উত্তরকালে তিনি নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ-ভাজন হন। কাজেই নরোত্তমের প্রত্যেক কার্য্যেই তিনি সহায়তা করিতেন। খেতুরীতে নরোত্তম দত্ত যে উৎসব করেন, সে উৎসবেও সন্তোষ দত্ত নরোত্তমের সহায়করূপে ছিলেন, এই মাত্র। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইহাতে এ সত্য প্রমাণিত হয় না যে, সন্তোষ দত্তই এই উৎসবের অনুষ্ঠাতা। যে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই মহাসমারোহজনক ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই বিগ্রহও নরোত্তম দত্তই উদ্ধার করেন।

বিপ্রের বচন শুনি আচার্য্য সন্তোষে।
শ্রীনরোত্তমের শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসে॥
বিপ্র কহে নীলাচল হইতে আসিয়া।
খণ্ডিলা পাষণ্ড মত ভক্তি প্রকাশিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ পঞ্চ কৈল প্রিয়াসহ।
প্রাপ্ত হৈল প্রিয়া সহ শ্রীগৌর বিগ্রহ॥
গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে, ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম॥
ধান্য সর্ষপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে।
তথা সর্পভয়ে কেহ না যাইতে পারে॥
না জানি শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে।
রজনী প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে॥
... ...
গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌর সুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা হৈলা সর্ব্ব নয়ন গোচর॥
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসা ঘরে।
প্রিয়া সহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌর সুন্দরে॥
... ...
শ্রী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তোষ দত্ত।
সর্ব্ব কার্য্য সাধে তেঁহো পরম মহত্ব॥
করিলা নির্ম্মাণ শ্রীমন্দির সিংহাসন।
মহামহোৎসবের করিলা আয়োজন॥
... ...
শ্রীআচার্য্য নরোত্তম করাবলম্বিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিভৃতে বসাইয়া॥
মহাশয় কহে মহা মধুর বচনে।
সকল মঙ্গল এবে হৈল দর্শনে॥
প্রভু আজ্ঞা কৈল গোড়ে করিতে গমন।
শ্রীবিগ্রহ বৈভব সেবা শ্রীসঙ্কীর্ত্তন॥
তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল আর।
হৈল শ্রীমন্দির আদি সকল সম্ভার॥
শ্রীফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহগণে।
মনে এই আপুনি বসাব সিংহাসনে॥ [ভক্তিরত্নাকর]

এখানে 'আপুনি' শব্দ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। 'ভক্তি-রত্নাকর'-গ্রন্থের উপরি-উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, খেতুরীর মহামহোৎসবের অনুষ্ঠাতা নরোত্তম দত্ত। তারপর নিমন্ত্রণ-পত্র 'প্রস্তুত' কার্য্যে ও উৎসবের অন্যান্য ব্যবস্থায় নরোত্তমের যে পরিশ্রমের কার্য্য-কুশলতার ও কর্ত্তৃত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়া দেয় যে, কর্ম্মকর্ত্তার গুরু দায়িত্বভার নরোত্তমই গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রবন্ধের কলেবর অত্যন্ত বাড়াইয়া ফেলিবার ভয়ে সেই সমস্ত বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। "নরোত্তমবিলাস" ও "প্রেমবিলাস" নামক গ্রন্থে এবং "ভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থের দশম ও একাদশ তরঙ্গে এই সমস্ত বিবরণ বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কথিত সন্তোষ ও নরোত্তম দত্ত, যিনি ঐ সময় হইতে 'নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়' নামে, কখনও বা কেবল 'ঠাকুর মহাশয়' নামে অভিহিত হন, তাঁহারা শ্রীপাট খেতুর দেবালয়ের সেবাপূজা যাহাতে চিরকাল সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদুপযুক্ত দেবোত্তর ও জোতসম্পত্তি গৌরাঙ্গদেবের দেবোত্তররূপে দান করিয়া গিয়াছেন। তদবধি দৈনিক সাড়ে বাইশ সের চাউলের অন্নভোগের ব্যবস্থা করা হয়।

নরোত্তমের তিরোভাবের পর মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার জ্ঞাতির মধ্যে একজন সেবাইতের উপর অর্পণ করা হইত। নরোত্তমের সেবাইত-বংশের শেষ সেবাইত রাধাসুন্দরী দেবীকে বিশেষ কারণবশতঃ বরখাস্ত করিয়া জনসাধারণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যবংশীয় বালুচর-নিবাসী সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তীর পিতা গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তীকে সেবাইত নিযুক্ত করে। এই গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রথম হিন্দুসাধারণের অভিমত অনুসারে গৌরাঙ্গদেবের সেবাইত নিযুক্ত হন। তারপর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে তদানীন্তন খেতুর-নিবাসী সচ্চিদানন্দের মন্ত্র-শিষ্য ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাখাল-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমান অংশে সেবাইত-স্বত্বে স্বত্ববান হইয়া বিগ্রহের সেবা পূজার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা অপারগ হইলে তাঁহাদের স্বত্ব হিন্দুসাধারণকে প্রত্যর্পণ করিবেন তাঁহাদের সঙ্গে এইরূপ চুক্তি হয়। তারপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পূর্ণ দুই বৎসর পরে ১৩১৭ সালের ১৩ই আশ্বিন তারিখে তাঁহার স্বত্ব হিন্দুসাধারণকে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার স্বত্ব প্রত্যর্পণ করেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী কালিদাসী দেবী ও নাবালক পুত্র বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় পুঁঠিয়ার চারি-আনির রাজা শ্রীযুক্ত নরেশনারায়ণকে তাঁহাদের সেবাইত-স্বত্ব অর্পণ করেন। ইহার পর কিছু কাল দুই পক্ষে দলাদলি চলে। অবশেষে ১৩২৯ সালে রাজশাহী সবজজ আদালতের নির্দ্ধারণ অনুসারে রাজসাহীর

খ্যাতনামা উকিল পরলোকগত মুকুন্দনাথ ঘোষ মহাশয় রিসিভার নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে প্রায় বারজন দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি লইয়া খেতুর সেবা-পূজা ট্রাষ্ট গঠিত হইয়াছে এবং এই ট্রাষ্টিগণই খেতুরের সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকেন।

ট্রাষ্টিগণের আমলে খেতুরীর অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ভগ্ন মন্দির পুনরায় নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, ভোগের ভাণ্ডারের জন্য একটি বৃহৎ দালান ও তৎসংলগ্ন প্রাঙ্গন প্রস্তুত হইয়াছে। প্রত্যেক দেবমূর্ত্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে।

বিগত ১৩৩৬ সনের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিন ভগ্ন শ্রীমূর্ত্তিসমূহের পরিবর্ত্তে নূতন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ নির্ম্মাণের ব্যয় ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দিয়াছিলেন।

এই সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে। ১৭ই পৌষ (১৩৩৬) সন্ধ্যার পর কোনও দুর্বৃত্ত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি ও দেবী-মূর্ত্তিদ্বয় অপহরণ করে। নানারূপ চেষ্টা ও সন্ধানেও তাহা না পাওয়া গেলে ট্রাষ্টিগন পুনরায় সুবর্ণমণ্ডিত অষ্টধাতু-নির্ম্মিত দ্বিভুজ মুরলীধর মূর্ত্তি ১৬ই আষাঢ় শুক্রবার রথ-যাত্রার দিবস প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মুরলীধর গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত করান।

নরোত্তম দত্ত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত মহামহোৎসবে নিত্যানন্দ প্রভুর বনিতা জাহ্নবী দেবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বহস্তে ভোগের রন্ধন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরভদ্র মাতার সহিত শ্রীপাট খেতুরে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর হাতের 'খুন্তি'খানি তাঁহাদের তথায় গমনের চিহ্নস্বরূপ শ্রীপাটে 'ঠাকুর মহা-শয়কে' দান করেন। সেই খুন্তিখানি প্রত্যেক সেবাইত-কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইত। তৎপর উক্ত ঐতিহাসিক 'খুন্তি'খানি চুরি যায়। পরে কার্য্যাধ্যক্ষ ট্রাষ্টি অনুকূল চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া ঐ 'খুন্তি'খানির উদ্ধারসাধন করেন। উহা এক্ষণে শ্রীপাট খেতুরীতে অতিশয় যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে।

নরোত্তম দত্তের মহামহোৎসবের ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব সাহিত্যে, তথা মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিন্তিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ। ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। ইহারা ছায়ার ন্যায় আমাদের দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইলেও সেই ক্ষণিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া আমরা তাঁহাদের উত্তরীয় বস্ত্রে ১৫০৪ শকাব্দ (১৫৮৩ খৃঃ) অঙ্কিত করিয়া দিয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে। নরোত্তমের কাব্যজীবনের গৌরবও বৈষ্ণব, তথা বঙ্গসাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। তিনি 'নাম-সংকীর্ত্তন', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' ও 'পাষণ্ডদলন' রচনা করিয়াছেন। যে সমস্ত পদকর্ত্তাগণ তাঁহাদের ভাবমধুর পদাবলীতে বৈষ্ণব-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নরোত্তমের নাম তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পদাবলীর ছন্দঃকুশলতা এবং ভাব-মাধুর্য্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। স্বয়ং গৌরাঙ্গদেব নদীর তীরে দাঁড়াইয়া 'নরোত্তম' 'নরোত্তম' 'নরোত্তম' বলিয়া তিনবার ডাক দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শ্রীগৌরাঙ্গ মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা নরোত্তম যেমন তাঁহার সমস্ত জীবন পাত করিয়া করিয়াছেন এমন দৃষ্টান্ত অতি সহজে পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত পদাবলীতে তাই ভক্তি-রসের এত প্রাবল্য। নীচে তাঁহার একটি পদ উদ্ধৃত করা হইল :—

গৌরাঙ্গের সহচর শ্রীনিবাস গদাধর
নরহরি মুকুন্দ মুরারি।
শ্রীরূপ দামোদর, হরিদাস, বক্রেশ্বর
এসব প্রেমের অধিকারী॥
করিলা যে সব লীলা শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহা মুঞি না পায় দেখিতে।
তখন না হৈল জন্ম না বুঝিনু সেই মর্ম্ম
এহ শেল রহি গেল চিতে॥
প্রভু সনাতন, রূপ রঘুনাথ ভট্ট যুগ
ভূগর্ভ, শ্রীজীব, লোকনাথ।
এ সকল প্রভু মেলি কৈলা কি মধুর কেলি,
বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথে।
সভে হৈলা অদর্শন শূন্য ভেল ত্রিভুবন,
আন্ধল হৈল এনা আঁখি॥
কাহারে কহিব দুঃখ, না দেখাব ছার মুখ
আছি যেন মরা পশুপাখী।
আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিনু যাঁহার পাশ
কথা শুনি, জুড়াইত প্রাণ।
তেঁহ মোরে ছাড়ি গেল রামচন্দ্র না আইল
দুঃখে জিউ করে আনচান্॥
যে মোর মনের ব্যথা কাহারে কহিব কথা
এছার জীবনে নাহি আশ।
অন্নজল বিষ খাই মরিয়া নাহিক যাই
ধিক্ ধিক্ নরোত্তম দাস॥

জীবন-চিত্র

—শ্রীবিজনবালা দেবী

চৈত্রোৎসব

বিশ্বকর্ম্মার শ্বশুর দেখিলেন, জামাই ছুটিটা বুঝি বাড়ীতেই কাটায়, তবে আর দেখা-সাক্ষাতের আশা কই?—অতএব চিঠির উপর চিঠি। দুই মাস দেখা না হইলে উভয় পক্ষই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন—বিশ্বকর্ম্মার নিয়ম বছরে অন্ততঃ আটবার শ্বশুরালয় দর্শন, বাড়ী আসিবার আগে তিন চারি দিন কাটাইয়া আসিয়াছেন—আবার কর্ত্তার বিবাহের আগে সাক্ষী দিতে গিয়া দিন তিনেক থাকিয়া আসিয়াছেন—এই মাসখানেক যান নাই।

বাড়ীতেও সকলে ছাড়িবে কেন? মেজ-বৌ বলিলেন, 'অত শ্বশুর-বাড়ী যাওয়া কি? লোকে নিন্দে করবে না?'

'আচ্ছা—পরমহংসী ঠাকরুণ আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না।'

মেজ-বৌ 'আমি' 'আমার' বলেন না—বলেন—মেজ-বৌয়ের ঘর, কি মেজ-বৌয়ের কাপড়। নিজেকে মেজ-বৌ বলিয়া উল্লেখ করেন, সেই জন্য বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে পরমহংসী বলেন।

'উপদেশ দিতে হয় অবুঝ হলে—শ্বশুর-বাড়ীর দিকেই চাকরী করা হয়—চালাকি বুঝিনে? আপনার ভাই বোন সবাই বলছেন আমের সময়টা থেকে যেতে—আমার কি? আপনি গেলেই আমরা বাঁচি. ওরা বলছেন বলে বলতে এলাম।'

'ওরে কে আছিস—মেজ-বৌয়ের ঘটিটার মধ্যে একটা কই মাছ জিইয়ে রাখত।'

মেজ-বৌ ছুটিয়া গেলেন ঘটি সামলাইতে, তাঁহার ঘটটার উপর বিশ্বকর্ম্মার নজর আছে,—অত পূজার্চ্চনা তিনি দেখিতে পারেন না, তাঁহার জ্বালায় কাহারও তিলক কাটিবার যো নাই, বোষ্টমী বলিয়া ঠাট্টা করেন।

তখনকার মত দেওর-বৌদির বাগ্‌-যুদ্ধ থামিলেও বিশ্বকর্ম্মা ঠিক করিলেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্বশুর-বাড়ী যাইবেন, তারপর কর্ম্মস্থান।

*

দেশে চৈত্রোৎসবের ধুম পড়িয়াছে। চৈত্র পূজায় হরেক রকম সং বাহির হয়—সারা বছরের কেচ্ছা-কাহিনী লইয়া চৈত্রোৎসবের গান। কোন্ বউ মাথায় কাপড় দেয় না, কে দাঁত বাহির করিয়া হাসে—বড় গলায় কথা কয়,—এই সব সকলের অজ্ঞাতে ছড়া বাঁধা হইয়া যায়। ব্যাপারটা হাস্য-রস-প্রধান হইলেও যথেষ্ট নীতি-শিক্ষামূলক।

সুধার দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। বিশ্বকর্ম্মা বহুদিন সং দেখেন নাই—সুরুচিরও এই প্রথম। এবার এই বাড়ীতেই আসর বসিল—দর্শকে বাড়ী ভরিয়া গেল।

আগে আসিল কয়েকজন ভিখারিণী—

> আমরা কলকাতার বুড়ি—
> পথে পথে ঘুরি—
> দুঃখের কথা কব কি—
> খাবার চাইলে পয়সা চায়!—

গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ।

ইহার পরে তিন বেদে-বেদেনী। বেদেনী অল্পবয়স, খুব চঞ্চল, হাসি-খুসী—রূপার গহনা, নীলাম্বরী কাপড় পরিয়া বেশ সাজিয়াছে—বেদেটিও অল্পবয়স সৌখীন জামা-কাপড়ের উপর একটা ওয়েষ্ট-কোট পরা—মাথায় বাঁকা টুপি। বেদেনী বৃদ্ধ স্বামী ত্যাগ করিয়া ইহাকে বিবাহ করিয়াছে—সেই বৃদ্ধও ইহাদের সঙ্গেই আছে—তাহার সাদা পোষাক, লম্বা সাদা দাড়ি—মাথায় প্রকাণ্ড সাদা পাগড়ী।

আগে আগে বেদেনী, পর পর দুই বেদে ঝুমুর ঝুমুর বাজনার সঙ্গে নাচ গান আরম্ভ করিয়া দিল—

> —নিজের ধর্ম্ম ছেড়া দিয়া এস্যাছি বেদের দলে—
> বিয়া নিকা সব চলে—

আমরা খোদার নামে নমাজ পড়ি সহালে আর বিহালে'

(পশ্চিম মুখে দাঁড়ান)

এমন ধর্ম্ম ভাই—আর তো কোথাও নাই—

আবার সূর্য্যি পেরনাম করি যে ভাই—নিত্যি ভোর কালে—

বর্ত্তমানকালের গুরু সমস্যা—হিন্দু সমাজের উপর তীক্ষ্ণ সমালোচনা এবং উদার মতবাদকে তীব্র বিদ্রূপ। যেহেতু বেদেনী নবীন স্বামী গ্রহণ করিলেও বৃদ্ধকে আশ্রয়ে রাখিয়াছে আবার বৃদ্ধও বেশ আছে—সপতির উপর বিদ্বেষ নাই। (সতীনকে সপত্নী বলে—স্ত্রীর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীকে কি বলে ঠিক জানি না; 'সপতি'র চেয়ে সহজ বাংলা খুঁজিয়া পাইলাম না।)

বেদের দলের পরে কাবুলীওয়ালার মত ঝল-মলে পোষাক পরা এক ফেরিওয়ালার প্রবেশ। বিরাট পাগড়ী,—রংয়ে চুলে দাড়িতে বিকটদর্শন চেহারা, হঠাৎ ভয় পাইয়া ছেলেপিলেরা কাঁদিয়া উঠিল।

তাহারা থামিলে ফেরিওয়ালা প্রকাণ্ড ঝুলিটা পাশে রাখিয়া গুরু-গম্ভীর মুখে জমকাইয়া বসিল, ও শান্ত ধীর স্বরে গান ধরিল—

'জয় রাম জয় রাম জয় রাম'—

থলির ভিতরে হাত ঢুকাইয়া একটু উচ্চস্বরে—

চল চলাচল নেত্য করি—

ঘর নাই তার বার করি'—

বলিয়াই একটা কল্কি টানিয়া বাহির করিয়া বিকট বজ্রনাদে হুঙ্কার :

—বারালো!—(অর্থাৎ বাহির হইল।)

সে গর্জ্জনে আবালবৃদ্ধবনিতা চমকিয়া উঠিয়াছে।—

—'বারালো!—কল্কি-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী'—

(খুব মিহি ও ঠানা স্বরে)—

তামুক খাওয়া ঠেলুয়া

জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম—

রামের যে ছোট ভাই সে তো বড় রঙ্গিলা

জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম—।

আবার গম্ভীর দ্রুত ও চঞ্চল স্বরে—

—'চল্ চলাচল নেত্য করি—

ঘর নাই তার বার করি'

(বজ্রনাদে গর্জ্জন) 'বারালো,—

ঝুলি হইতে একটা খুন্তি টানিয়া বাহির করিয়া—

—'বারালো! খুন্তি-নারায়ণ চক্রবর্ত্তী—'

'ওরে বউ-ঠেঙ্গানি ঠেলুয়া—

জয় রাম—জয় রাম জয় রাম—।

বিপুল হাসি ও কাসির শব্দে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। শাশুড়ীর দল কিছু অসন্তুষ্ট—'সং দিলেই হল, আমরা কবে খুন্তি দিয়ে বউ ঠেঙ্গিয়েছি।—সব বানান, আর কাজ নেই ছোঁড়াদের শুধু পরের কুচ্ছা করা!'—

ওদিকে ফেরিওয়ালার ঝুলি হইতে দেশলাই, ছুরি, ঘটি, চাবি ইত্যাদি কত জিনিষই যে এক একটা ইতিহাস লইয়া বাহির হইতেছে তাহার অন্ত নাই।

মেট্রো ও রূপবাণীর শো দেখা চক্ষুও এই সহজ ও সরল অভিনয়ের যথার্থ স্বরূপটি দেখিয়া যে তৃপ্তি ও আনন্দ পায়—সে কিছু মাত্র কম নয়।

সমস্ত চৈত্র মাস ধরিয়া নিত্য নূতন সং বাহির হয় চড়ক সংক্রান্তিতে সমাপ্তি তবে আরও কিছু দিন জের চলে।

বৈশাখী ঝড়

তারপরেই কাল-বৈশাখী লইয়া বৈশাখের আবির্ভাব।

ছাত্রাবস্থা হইতে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের ঝড়ের রূপ বিশ্বকর্ম্মা ভুলিয়া গিয়াছেন।

প্রথম কয়েকদিন বিকালের দিকে ঝড় ওঠে, খুব প্রলয় নয়—তবু বিশ্বকর্ম্মা ভয় পান।

তার পরের দিন—

রাত্রি প্রায় দেড়টা-দুইটা—ভীষণ ঝড়ের শব্দে বিশ্বকর্ম্মার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সরোষে বলিলেন, 'ঝড়ে বাড়ী ঘর উড়িয়ে নিচ্ছে তবু ঘুম!—কুম্ভকর্ণকে বলে, ওদিক থাক।'

সুরুচিও সরোষে কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসিলেন—কিন্তু ঝড়ের শব্দে আর ঝগড়া করা চলিল না—সত্রাসে বলিলেন, 'কি হবে?'

'—আঃ অত কিনারে কেন? বিছানার মাঝখানে ব'স—ঝড়ের সময় কিনারে যেতে নেই—পুঁথির বিদ্যা কাজে লাগে না।'

চারিদিকে কর্ণ-বধির-করা গর্জ্জন—গাছ-পালার ডাল সশব্দে ঘরের উপরে আছড়াইয়া পড়িতেছে, এক একবার

সবেগে খাট কাঁপিয়া ওঠে ভূমিকম্পের মত—সভয়ে দুইজন বিছানা ছাড়িয়া নামিলেন—বিশ্বকর্ম্মা বাহিরের দিকের দুয়ার খুলিয়া দেখেন—সব নিস্তব্ধ কেহই জাগে নাই, ঝড়ের গতিও সেদিকে কম, পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে ঝড় উঠিয়াছে,বাড়ীর ভিতরের দিকে প্রকোপটা বেশী।

ভিতরের দিককার দুয়ার খুলিয়া দেখিলেন—জানালার ফাঁক দিয়া ঘরে ঘরে আলো দেখা যায়; সকলে জাগিয়াছে, এবং মেজ-বৌ তাঁহার ঘরের দরজা খুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, বিশ্বকর্ম্মাকে দেখিয়া প্রাণপণে চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'ভয় হচ্ছে? আসব?'

কথা বাতাসে উড়িয়া যায়—তবু বোঝা গেল। বীরপুরুষকে আশ্বাস দিতে আসিবে এক অবলা? মুহূর্ত্তে পৌরুষ জাগিয়া উঠিল—বিশ্বকর্ম্মা হাত নাড়িয়া উত্তর দিলেন, 'না—যান ঘরের ভিতর। দোর বন্ধ করুন।'

তির্য্যক্ গতিতে বৃষ্টি-ধারা তীরের মত আসিয়া গায়ে বেঁধে—দুয়ার খুলিয়া রাখা অসম্ভব। বিশ্বকর্ম্মা দুয়ার বন্ধ করিয়া বিছানায় বসিলেন।

পূর্ব্ব-বঙ্গের ঝড়ের রূপ বড় ভয়ঙ্কর—সাক্ষাৎ প্রলয় দর্শন। নিমেষে নিমেষে দ্বিগুণ বেগে গর্জিয়া ওঠে,—শেষে মনে হইল, সমস্ত বাড়ী শুদ্ধ উপড়াইয়া উড়াইয়া লইয়া গেল বুঝি।

দুইজনই বাক্যহারা—কে কাহাকে সাহস দেয়? আলোটার শিখা বাড়াইতে বাড়াইতে চিমনীটা চিড়িক্ শব্দে ফাটিয়া গেল। আর একবার খাট দুলিয়া উঠিতেই আবার দুইজন বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া চেয়ারে গিয়া বসিলেন।

প্রায় আধঘণ্টা পরে ঝড় একটু কমিল কি না দেখিতে বিশ্বকর্ম্মা পুনরায় উঠিয়া দুয়ার খুলিলেন, অমনি সেই উন্মাদ ঝোড়ো বাতাস তাঁহাকে যেন ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিল এবং অজস্র শিলাবৃষ্টি ও গাছের ছেঁড়া পাতা বন্যার মত ঘরের ভিতর ঢুকিতে লাগিল—

তৎক্ষণাৎ দুয়ার বন্ধ করিলেও বিশ্বকর্ম্মা ভিজিয়া গিয়াছেন, আলনার কাছে গেলেন কাপড় ছাড়িতে। এ দিকে ঘরের সমস্ত মেঝে শিলে-জলে-পাতায় ভরিয়া গিয়াছে দেখিবামাত্র সুরুচি উঠিয়া শিল কুড়াইয়া খাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

বক্র কটাক্ষে বিশ্বকর্ম্মা চাহিয়া দেখিলেন—'ধন্য ধন্য স্ত্রীলোকের জিভ! এ হেন সময়েও শিল খাবার সাধ?'

'তুমি খাবে?' কয়েকটা শিল কুড়াইয়া ধুইয়া সুরুচি বিশ্বকর্ম্মাকে দিলেন।

বিশ্বকর্ম্মা দু'একটা খাইয়া আর সব মেঝেয় ফেলিয়া দিলেন, বলিলেন, 'আজ কি উপোস করেছ না কি? এই ঠাণ্ডায় শিল খেয়ো না, অসুখ করবে।'

সুরুচি ঝড়ের ভয় ভুলিয়া নির্ব্বিবাদে শিল কুড়াইয়া গ্রাস ভরিতেছেন ও দু'একটা করিয়া মুখে ফেলিতেছেন।

বিকট শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সুরুচি ছুটিয়া বিছানায় গিয়া উঠিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'কেমন? কুড়োও শিল।'

ভীম বেগে ঝড় বহিতে লাগিল, বীর ও বীরজায়া সশঙ্ক মনে নিশি জাগিয়া বসিয়া আছেন।

এক সময় বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'দুত্তোরি দেশ। মানুষ থাকে এখানে? কালই রওনা হব।'

'আজ রাত্রি কাটলে ত?'

'কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।'

ভোরের দিকে ঝড় কমিল।

একটা নিয়ম আছে, একদিন এই রকম প্রবল ঝড় হইলে দিন তিনেক বেশ ভালই কাটে। তৃতীয় দিন না আসিতে ঝড়ের ভয়ে বিশ্বকর্ম্মা দেশত্যাগী হইলেন।

ঘটকালী

শ্বশুরবাড়ী উত্তর-বঙ্গে, পদ্মা-যমুনার দেশ নয়।

শ্বশুর দেবরাজ ইন্দ্র—তাঁহাকে ঘিরিয়া চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, সভাটি স্বর্গ-সভারই মত।

সুরুচিরা পাঁচ বোন, তিন ভাই। বিশ্বকর্ম্মা বলেন, 'পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক নাশনম্,'—

সুরুচির দিদি সরযূ বলেন, 'তবে আপনার স্বর্গ বাস ঠেকায় কে?'

'উঁহু, আপনাদের যে নিয়মনিষ্ঠা, পূজো-আচ্চার ঘটা, আমার মত ম্লেচ্ছের জন্য কি জায়গা থাকবে? এক এক বোনের তিন চারটে ঘরের কমে হয় না, বসবার, শোবার, পূজোর, দিনের বিছানা, রাত্রের বিছানা, এত সব কুলিয়ে স্বর্গে আর কি কুলবে?'

দিদি বলেন, 'সতীর পুণ্যে স্বামীর স্বর্গ—'

'নাঃ, কলিকালের সতীরা স্বামীর জন্যে মোটেই ব্যস্ত নন, তবে আমার ভাবনা নেই, আপনারা দল বেঁধে যখন স্বর্গারোহণ করবেন, আপনাদের লেজ ধরে ঝুলতে ঝুলতে যাব।'

এ হেন দেব-সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল, প্রফুল্লের বিবাহ। ঘটক মহারাজ ঠিক আছেন।

প্রফুল্ল আদরের ছেলে, আজকালকার ছেলে, বিবাহ-বিতৃষ্ণ, শুনিবামাত্র পুরীতে চলিয়া গেল। তা যাক, পাত্রের কি দরকার? আগে পাত্রী ঠিক হক।

বছর দুই আগে হইতেই বাংলা হইতে বেহার পর্য্যন্ত প্রফুল্লের পাত্রীর খোঁজ-তল্লাস চলিতেছিল, পছন্দ আর হয় না।

এমন সময় খবর পাওয়া গেল, মাইল পাঁচেক দূরের ষ্টেশন পাঁচবিবিতে একটি বড় সুন্দরী মেয়ে আছে, বহরের বোসেদের পুত্রীর পৌত্রী, কাজলার জমাদারের দৌহিত্রী, কাঁচা পালিয়ার গুহ-বিশ্বাসের পুত্রী।

দ্বিজেন এক বন্ধুকে লইয়া ভাবী বৌদিকে দেখিতে গেল এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না, ভাল নয়।'

অন্যত্র খোঁজ চলিল।

আবার একজনের মুখে খবর পাওয়া গেল, মেয়েটি সত্যই ভাল।

বিশ্বকর্ম্মা ফণীকে পাঠাইলেন, ফণী আসিয়া বলিল, 'খুব সুন্দরী।'

তাহাতেও প্রত্যয় হইল না। এবার নীহার, তবে বৈকাল পাঁচটার আগে আর ট্রেন নাই, এত দেরী বিশ্বকর্ম্মার সহিবে কেন? শ্বশুর বলিলেন, 'ব্যস্ত কি? বিকালে যাবে।'

বিশ্বকর্ম্মা মানিলেন না, দ্বিজেন একটা ছোট্ট ও শান্ত ঘোড়া যোগাড় করিয়া আনিল, নীহার অশ্বারোহণে যাত্রা করিল।

ফিরিল পাঁচটার আগে, জীবনে ঘোড়ায় চড়ে নাই, গায়ের ব্যথায় ইতিমধ্যেই জ্বর আসিয়াছে, কিন্তু নিস্তার নাই। এক কথা বার বার করিয়া বুঝাইতে অনেক সময় লাগিল যে, যথার্থই মেয়ে অনিন্দ্য। তারপরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'পাঁচ মাইল দূর থেকে পাঁচবিবির মেয়ে আসছে পঞ্চকন্যার ঘরে, একেবারে রাহুস্পর্শ লাগবে!'

তাপসী বলিলেন, 'না অমৃতযোগ।'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'পঞ্চকন্যা নয়—পঞ্চরত্ন।'

বিশ্বকর্ম্মা ও সুরুচির পিতা এবার কন্যা দেখিতে গেলেন। লক্ষ্মীর মত মেয়েটি আসিয়া উভয়কে প্রণাম করিয়া ভয়ে লজ্জায় কাঁপিতে লাগিল, একটু বেশী রকম লজ্জাবতী,—সুরুচির পিতা গভীর স্নেহে হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন, বলিলেন, 'ভয় কি মা?'

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'কিছু ভয় নেই তোমার—চোখ তুলে চেয়ে দেখ—ইনি তোমার শ্বশুর।'

বিবাহ ঠিক করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া দুইজন ফিরিলেন। পাকা আশীর্ব্বাদ নয়। সেটা হইবে বিবাহের দিন সকালে।

তখন 'সাজ রে সাজ রে সৈন্যগণ'—ফণী, দ্বিজেন কলিকাতা সওদা করিতে গেল—দিকে দিকে বার্ত্তা প্রেরণ করা হইল—নিমন্ত্রণ-চিঠি, উপহার ছাপা আরম্ভ হইল এবং প্রফুল্লের কাছে চলিল টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম।

পাড়ার প্রায় ঘরেই বিবাহযোগ্য পাত্র আছে, মেয়েটীর উপর অনেকেরই লক্ষ্য ছিল, সুতরাং শত্রুপক্ষের গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে নিত্য-নূতন আশঙ্কা-জনক সংবাদ পাইয়া পাইয়া কন্যা-পক্ষ ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিল এবং খবর পাঠাইল, 'এখন মেয়ের বিবাহ দিতে ইচ্ছা নাই, আর্থিক অনটন ও মেয়ের মায়ের অসুখ।'

আর কেহ হইলে ইহার উপরে আর উচ্চবাচ্য করিতেন না, কিন্তু সুরুচির পিতার অত্যন্ত জেদী স্বভাব—তথা বিশ্বকর্ম্মা—সোনায় সোহাগা! যে মেয়েকে তাঁহারা বধূ বলিয়া আদর করিয়া আসিয়াছেন—সেই মেয়ে ফাঁকি দিয়া অপরে লইবে? বিশেষ করিয়া সুরুচির পিতার মনে ভাবী বধূটীর ছবি স্থায়ী রেখাপাত করিয়া ফেলিয়াছে।

যথারীতি গুপ্তচর মুখে বিশ্বকর্ম্মা সকল বার্ত্তা পান। ওদিকে শত্রুদল জয়-সম্ভাবনায় উৎসাহী—এদিকে বিশ্বকর্ম্মা অদ্ভুত রণ-নৈপুণ্য দেখাইলেন, কোথায় লাগে জার্ম্মান কাইজার! অভিযান চলিল, সোজা কন্যার বাড়ীর অভিমুখে, আশ-পাশের পৃষ্ঠযুদ্ধে নয়। বিপক্ষের প্রধানকে ধরিয়া ফেলা হইল এবং কন্যার বাড়ীতে তাহাকে উপস্থিত করিয়া দুই পক্ষের মতামত লওয়া হইল, বিশ্বকর্ম্মার প্রিয় বিশ্বাসী

এক সেনাপতির দ্বারা সকল কার্য্য উদ্ধার হইল। নিজেরা তো কন্যার বাড়ী যাইতে পারেন না—অসম্মান হয়।

প্রতারিত কন্যাপক্ষ এবার আসিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিল, নাম-ধাম জানাইয়া দিল, ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিটমাট করিয়া লইল, দুঃখিত, লাঞ্ছিত ও অনুতপ্ত ভাবে।

চক্রান্ত ফাঁস হইয়া যাওয়ায় বিপক্ষের অপমানে আর এক মাত্রা বাড়াইয়া বিশ্বকর্ম্মা দুইবেলা তাহাদের ডাকিয়া আনান, অত্যন্ত বন্ধু ভাবে বিবাহের লিষ্ট তৈয়ারী ও আয়োজনের পরামর্শ করিতে। যাহাকে বলে মিছরীর ছুরি!

প্রফুল্লকে ফিরিতে হইল, সেও কঞ্চীর মত বাঁকা হইয়া থাকে—বিশ্বকর্ম্মার পাল্লায় পড়িলে কতক্ষণ? প্রফুল্ল অনেক কাজই করে—শিকার করে, চরকা কাটে, চমৎকার প্রবন্ধ লেখে চোখা চোখা জোরাল ভাষায়, লেখা-পড়ায় তীক্ষ্ণ মেধাবী, এত সব পারে, আর বিবাহ করিতে পারিবে না? কিন্তু সে খদ্দর পরে, সেই বেশেই বিবাহ করিবে, সৌখীন বেশ ধরিবে না।

সাতদিন আগে হইতেই বিপুল উৎসব—সমস্ত আত্মীয় স্বজন আসিয়াছে, ভিতরে বাহিরে তিলধারণের জায়গা নাই।

রাত্রি থাকিতে বাজনা বাজিতেছে, একদণ্ড বিরাম নাই। সুরুচির দিদি বলেন, 'কাণ তালা ধরে গেল, বিয়ের আগেই যে সব কালা হয়ে গেলাম, একটু থামুক না।'

বিশ্বকর্ম্মা বলেন, 'কর্ত্তার ইচ্ছা তা নয়, তাঁর ছেলের বিয়ের বাজনা বাজবে না? বেটারা পয়সা নেবে না? অষ্ট প্রহর বাজাবে।'

'বেশ—পয়সা যখন নেবে তখন প্রাণপণে বাজাক—মেয়েদের কাণ থাক্ আর যাক।'

বেলা নটার ট্রেণে বরযাত্রীরা যাইবে; সারারাত্রি কেহ বিছানার মুখ দেখিল না, ভোরবেলা পাতা পড়িল, বিশ্বকর্ম্মার ত্বরায় কাহারও খাওয়া হইল না, পাতে হাতে মাত্র। প্রফুল্লকে বর-বেশে সাজাইতে ধ্বস্তাধ্বস্তি লাগিয়া গেল। সে সজ্জা সমাপন করিয়া পাল্কীতে বসিবে, তাহার উপবাস।

বিরাট প্রোশেসান সাজিয়া দাঁড়াইয়াছে—জামাই শ্বশুর দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন, হাতী, ঘোড়া, গাড়ী, পাল্কী, পদাতিক শুদ্ধ শতাধিক বরযাত্রী আগে পিছে বাদ্যভাণ্ডসহ রওনা করিয়া দিয়া, শেষে দুইজন গাড়ীতে উঠিলেন। অত্যন্ত আড়ম্বর করিয়া বিপক্ষদলকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে বরযাত্রী যাইতে, কিন্তু তাহারা কেহই গেল না।

মেয়েরা বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন মন্থর গতিতে শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বাজনাটা একটু কম হইলে (দূরত্ব হেতু) সুরুচির দিদি বলিলেন, 'কি মানুষ! উল্লাসে একেবারে নাওয়া-খাওয়া বন্ধ!'

তাপসী বলিলেন, 'নাওয়া নয় দিদি—রাত থাকতে একখানা চন্দন সাবান ক্ষয় হয়েছে জামাই বাবুর—আর এক শিশি হাজলীন্।'

বর বধূ লইয়া যাত্রা করিবার সময় বধূ লীলাবতী ভীষণ কান্না জুড়িয়াছিল, বাড়ীশুদ্ধ তেমনি হাসির—তেমন সাষ্ট রগুন্দ লুকাইতে লাগিয়া গেলেন, তবু থামে না। শেষে বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, 'আর কেঁদ না লীলা, আর কেঁদ না—একে শ্রাবণ মাস, এখনো বর্ষা নামেনি তাই বলে—তুমিই কি বর্ষা নামাতে চাও? তোমার কি বল, মজা করে গহনা পরে পরে শুয়ে থাকবে, আর কাঁদবে—কষ্ট যে আমাদের! যে কান্না কেঁদেছ এখান থেকে আমাদের ষ্টেশন পর্য্যন্ত তোমার চোখের জলের বন্যা পৌঁছে গেছে, ট্রেন ভেসেই চলবে দেখো, অতএব দোহাই তোমার থাম।'

গাড়ীশুদ্ধ হাসিল, লীলার বাবা-মা চোখের জল মুছিতে মুছিতে হাসিলেন, ঘোমটার মধ্যে লীলাও হাসিয়া ফেলিল।

শত্রুপতির হাত হইতে কাশীরাজকন্যা হরণ করিয়া বিজয়ী ভীষ্মের মত বিশ্বকর্ম্মা সগর্ব্বে বধূ লইয়া ফিরিলেন। প্রতিপক্ষের বাড়ীর কাছাকাছি হইতেই বাজনার জোর দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

বলা বাহুল্য প্রফুল্লকে ঢাকাই মসলিন ধুতি ও চাদর, উৎকৃষ্ট জামা জুতা এবং নানা আভরণ পরাইয়া বিবাহ করিতে হইয়াছিল। বাড়ীতে গিয়াই সে সব সে দ্বিজেনকে দিয়া আবার খদ্দর-ধারী হইল।

চার মাস শ্বশুরবাড়ী কাটাইয়া ছুটি ফুরাইলে বিশ্বকর্ম্মা আরও উত্তরে বদলী হইলেন। এক বৎসর না ঘুরিতেই বরাবর মেদিনীপুর।

চিত্রশিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

শ্রীহিতেন্দ্রকুমার নাগ

বাস্তব চিত্রশিল্পী ডাচ্ মনীষি রেম্‌ব্রাণ্টের (১৬০৬-১৬৬৯) দান অপূর্ব্ব। আজ তিনশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তবু রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি প্রাণবন্ত এবং আলোছায়ার কুশলী সমন্বয়ে যেন কালের মত জীবন্ত সম্পদ্। অথচ পাশ্চাত্যদেশে সাধারণ

আ্যাডমিরাল ট্রম্প। —শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

কলারসিকগণ রেম্‌ব্রাণ্টের মূল্যবান ছবিগুলির এবং তাঁহার প্রতিভার কদর করেন এই স্বর্গগত চিত্রশিল্পীর মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পরে। মাত্র শত বৎসরেরও কম রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি চতুর্দ্দিকে প্রচার লাভ করে। অবশ্য ইতিমধ্যেই তাঁহার নাম বর্ত্তমানে যশস্বী শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পীদের সমপংক্তিতে। শিল্পীর জীবদ্দশায় তাঁর জন্মভূমি হল্যাণ্ডের বাহিরে খ্যাতি বিশেষ ছড়ায় নাই। মৃত্যুর পর ক্রমশঃ ইউরোপের আর্ট-গ্যালারিতে গ্যালারিতে মাইকেল এঞ্জেলো, বতিচেলি, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, র‍্যাফায়েল, বার্ন জোন্‌স্ প্রভৃতি মনীষীদের এবং তাঁর সমসাময়িক চিত্রশিল্পী স্যর ভ্যান ডাইকের ছবির পাশে পাশে স্থান পায়। এখন মোটামুটি ভাবে স্বীকার করা হয় যে, এই রূপ নিখুঁত প্রতিমূর্ত্তি-আঁকিয়ে দু' একজন ছাড়া আর জন্মায় নাই।

রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি প্রসার লাভ করিবার পর তাঁহার জীবনী জানিবার জন্য সাধারণের ঔৎসুক্য জাগিল। বিশেষ কোন ইতিহাস তাঁহার ছিল না। কয়েকজন অনুসন্ধান করিয়া হল্যাণ্ড হইতে তাঁহার যে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন, নীচে তাহা সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

একটি বৃদ্ধা নারীর প্রতিকৃতি। —শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

রেম্‌ব্রাণ্টের পুরা নাম (Rembrandt Harmensz Van Ryn) রেম্‌ব্রাণ্ট হারমেনস্ ফান্ রিন। পিতা ছিলেন সামান্য কলওয়ালা। ১৬০৬সালে ১৫ই জুলাই

দক্ষিণ হল্যাণ্ডের লিডেন সহরে শিশু রেম্‌ব্রাণ্টের জন্ম।—ইহা সেই সপ্তদশ শতাব্দীর কাহিনী, যখন ইংলণ্ডে সেক্সপিয়র যশের সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে আরূঢ়। বাপ কল-

হেন্‌ড্রিকিয়ে ষ্টোফেল্‌স্‌।　　—শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

ওয়ালা (miller) আর মা এক সামান্য রুটিওয়ালার মেয়ে। দুজনেই কখনও আর্টের ধার ধারেন নাই। কিন্তু হীরক জ্যোতির মত ইঁহাদের ঘরেই রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি আঁকার প্রতিভার আশৈশব অভ্যুদয়। সাধারণের মতই অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রেম্‌ব্রাণ্ট স্কুলে যাইতেন, পড়াশুনাও করিতেন। কিন্তু অন্তরের মণিকোঠায় তাঁহার ছবি আঁকার নেশা উঁকি মারিল। প্রথম নিতান্তই খেয়ালে, তাহার পর সেই খেয়াল সাধনায় রূপান্তরিত হইল।

প্রতিমূর্ত্তিকে তুলির টানে রূপ দিবার অদম্য স্পৃহা শিক্ষানবীশ রেম্‌ব্রাণ্টের মনে জাগিয়া উঠিল। লিডেনের ল্যাটিন স্কুল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে রেম্‌ব্রাণ্ট তাঁহার এক শিল্পী বন্ধুর (আইজাক্‌ সোয়ানেনবার্গ) ষ্টুডিওতে ছবি আঁকা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল লেখাপড়া শিখিয়া রেম্‌ব্রাণ্ট অর্থোপার্জ্জন করুক, কিন্তু শিল্পী হইবার তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া তিনি হাল ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমশঃ লোকের প্রতিমূর্ত্তিকে তুলির আঁচড়ে ফুটাইয়া তুলা যেন রেম্‌ব্রাণ্টের বাই হইয়া পড়িল। মা, বাবা, ভাই, বোন, নিজে এবং পরে স্ত্রী, বান্ধবী প্রভৃতি সংসারের সকলের ছবি রেম্‌ব্রাণ্ট আঁকিতেন। বৃদ্ধ মাতাকে যে কতবার বসাইয়া তাঁহার মুখাবয়বকে ক্যানভাসের উপর রূপ দিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। হেগ্‌ গ্যালারির বিডিয়াস ৫০০শতখানি রেম্‌ব্রাণ্টের ছবি সংগ্রহ করিয়া বই বাহির করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায়, রেম্‌ব্রাণ্ট নিজের ছবি বোধ করি ৫০।৬০খানা আঁকিয়াছিলেন। বেশী ও কম নয়। ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় একা না হয় সাস্‌কিয়ার সঙ্গে তিনি নিজের বহু ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন।

সোয়ানেনবার্গের ষ্টুডিওতে বৎসর তিনেক শিক্ষা লাভ করিয়া রেম্‌ব্রাণ্ট আমষ্টারডামে (হল্যাণ্ডের প্রধান সহর) আসেন, খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী পীটার লষ্টম্যানের শিষ্যত্ব গ্রহণের লোভে। কিন্তু মাত্র ছয়মাসকাল তাঁহার নিকট শিক্ষা

শিল্পীর নিজের প্রতিকৃতি।　　—শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

লাভ করিয়া রেম্‌ব্রাণ্ট ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, কারণ লাষ্টম্যান যতই নাম করা শিল্পী হউন না কেন, তিনি তখনকার দিনের রোমীয় স্কুলের কৃত্রিম ষ্টাইলে ছবি আঁকিতেন। এই ষ্টাইল

ভবিষ্যৎ অন্যতম শ্রেষ্ঠ-শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্টের মনে ধরিল না। তিনি নিজের মত করিয়া নিজের চোখে আমষ্টারডামের সমস্ত ইটালীয় ছবিগুলির 'ষ্টাডি' করলেন। তথাপি তাঁহার মনের ক্ষুধা মিটিল না। আমষ্টারডাম হইতে রেম্‌ব্রাণ্ট গেলেন রোমে। রোমে আসিয়া ইটালীয় চিত্রশিল্পের ধারাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া দেশে ফিরিয়া রেম্‌ব্রাণ্ট নিজস্ব মৌলিক ধারায় (যদিও ভিত্তিতে ছিল ইতালীয় বাস্তব পদ্ধতি) ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিলেন। মাইকেল এঞ্জেলোর মত আলোকছায়ার কৃত্রিম রূপসম্পাৎ রেম্‌ব্রাণ্ট বড় পছন্দ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার অয়েল-পেণ্টিং পোর্ট্রেটগুলি আলোকছায়ার অপূর্ব্ব সমাবেশে সুন্দর হইয়া উঠিল।

লিডেনে তিনি প্রথম প্রথম যে সমস্ত চিত্র আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সেণ্ট্ জেরামের এবং কারারুদ্ধ সেণ্টপলের ছবি বিশেষভাবে নাম করা। ভাব, রচনা (composition) আলোর সামঞ্জস্য এবং প্রাণবত্ত, সবদিক্ হইতেই এই ছবিগুলি উল্লেখযোগ্য।

ক্যাসেল্ আর্ট-গ্যালারিতে রেমব্রাণ্ট কতকগুলি ছবি পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে বৃদ্ধ নরনারীর কতকগুলি মুখাবয়ব রেমব্রাণ্টের তুলির আঁচড়ে অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠে। ইহার প্রত্যেকটী তৈলচিত্র এক একটী বিশিষ্ট মুখের ভাব প্রকাশ করে। কি সুন্দর ষ্টাডি এক একটী। তুলির চাপ কোথাও কি একটু অস্বাভাবিকতা রাখিয়াছে! বৃদ্ধের প্রতিমূর্ত্তির রুক্ষতা ও কাঠিন্য এমন বাস্তব ভাবে রূপ পাইয়াছে যে, অতি বড় সমালোচকও তাঁহার দোষ ধরিতে পারেন না। অঙ্কন-কৌশল এবং আলোকছায়ার সমন্বয় অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল বলিয়া লিডেন হইতে ক্রমশঃ রেম্‌ব্রাণ্টের সুনাম নেদারল্যাণ্ডের (Holland) রাজধানী আমষ্টারডামে

অস্ত্রধারী পুরুষ। —শিল্পী রেম্‌ব্রাণ্ট

বিস্তৃত হইল। শীঘ্রই মহানগরীর শিক্ষিত কলারসিক-মহলে রেম্‌ব্রাণ্টের মনীষা পুরাদস্তুর ভাবে আদর লাভ করিল। এই নবীন যুবক চিত্রশিল্পীকে হল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিয়া সকলে মানিয়া লইলেন। ইহা ১৬৩১ সনের কথা। পঞ্চবিংশতিবর্ষীয় যুবক রেম্‌ব্রাণ্ট জীবিকার্জ্জনের জন্য এবং

তাঁহার শিল্পের খ্যাতি পাইবার জন্য আমষ্টারডামে চলিয়া আসিয়া সেখানে স্থায়ী বাসস্থান পাতিলেন। মনুষ্যদেহকে কাটাকাটি (dissection) করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা লাভ করা কিছুকাল পূর্ব্বেও ইউরোপে কেহই বরদাস্ত করিত না। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রথম মেডিকেল কলেজে মৃতদেহকে লইয়া সার্জ্জারী শিক্ষায় সরকার এবং লোকমত অনুমতি দেন। তখনকার দিনে মরা মানুষকে লইয়া অ্যানাটমি শিক্ষা যেমন অদ্ভুত তেমনই নূতন। এই জিনিষকে বিষয়বস্তু করিয়া আমষ্টারডামে রেমব্রাণ্ট প্রথম ছবি আঁকিলেন, দেহবিধান শিক্ষা (Anatomy Lesson)। সিটি করপোরেশনে এই তাঁহার প্রথম ছবি। ইহার পর অস্ত্রচিকিৎসকদের লইয়া আরও অনেকগুলি তৈলচিত্র রেমব্রাণ্ট আঁকিলেন এবং ইহাতেই রেমব্রাণ্টের যশ বিস্তৃতভাবে প্রসার লাভ করিল।

এই সময়ে রেমব্রাণ্ট প্রাচীন ফ্রিজিয় বংশের একটী সুন্দরী মেয়ের রূপে মুগ্ধ হন এবং তৈলরঙে ক্যানভাসের উপর তাঁহাকে সুন্দর সুন্দর সাজে রূপ দিতে থাকেন। এই মেয়েটীর নাম সাজ্‌কিয়া (Saskia)। ১৬৩৪ সালে রেমব্রাণ্ট ইহাঁকেই বিবাহ করেন। সাজ্‌কিয়ার অনেকগুলি ছবি শিল্পী আঁকিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে আন্দাজ কুড়িখানির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইউরোপ বা আমেরিকার ছবির গ্যালারিগুলিতে। বিবাহের পূর্ব্ব বৎসরে ভবিষ্যৎ স্ত্রীর একটী অতুলনীয় ছবি তিনি আঁকেন, সেটী আছে ক্যাসেল গ্যালারিতে। সাজ্‌কিয়া রেমব্রাণ্টের উপযুক্তা স্ত্রী ছিলেন। স্বামীর চিত্রাত্মপ্রেরণাকে তিনি কোন দিন প্রতিহত করেন নাই। সংসারের কাজকর্ম্ম করা, সন্তান-ধারণ করা, তাহাদের মানুষ করা এবং তাহার উপর শিল্পী স্বামীর মডেল হইয়া তাঁহাকে সাহায্য করা—কি না করিয়াছিলেন এই রমণী। কিন্তু শিল্পীর অতি দুর্ভাগ্য যে সাজ্‌কিয়া বিবাহের আট বৎসর পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের চারিটী সন্তান হয়। কিন্তু পুত্র টাইটাস্ ছাড়া সকলেই শিশুকালেই নষ্ট হইয়া। শিল্পী-দম্পতির বিবাহিত জীবনে বড়ই কষ্ট দেয়।

রেমব্রাণ্ট টাইটাসের কতকগুলি ছবি আঁকিয়াছিলেন। টাইটাস্‌কে মানুষ করিবার জন্য পরিচারিকা হ্রোফেলস্ হেন্‌ড্রিয়েকাকে রেমব্রাণ্ট বাড়ীতে লইয়া আসেন। মডেল হিসাবে হ্রোফেলসের দেহগঠন ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট ছিল, কাজেকাজেই শিল্পীর মনের ক্ষুধা এবং তুলির খোরাক এই মেয়েটী নূতন করিয়া মিটায়। হেন্‌ড্রিয়েকার অনেক ছবি রেমব্রাণ্ট আঁকিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সাজ্‌কিয়ার শূন্য আসনে হ্রোফেলস্‌কে রেমব্রাণ্ট অধিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করেন নাই। এইজন্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার কলঙ্ক রটে এবং প্রবীণ বয়সে তিনি দুর্নাম কেনেন। যদিও রেমব্রাণ্টের সে সময়কার আঁকা ছবি, সমানভাবে, বরঞ্চ বেশী ত কম নয়, উল্লেখযোগ্য বলিয়া বর্ত্তমানে বিবৃত হইতেছে।

আমষ্টারডামের যে পল্লীতে রেমব্রাণ্ট বাস করিতেন, সেখানে ইহুদীদের মস্ত আড্ডা ছিল। এই আড্ডায় তিনি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতেন। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার ছবিতে ওল্ড টেষ্টামেণ্ট এবং ইহুদীদের প্রভাব দেখা যায়। যীশুখৃষ্টের অতি মূর্ত্ত কতকগুলি ছবি তিনি আঁকেন। ইহাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, সেটী বৃদ্ধবয়সে (১৬৬১ সালে) আঁকেন। তা ছাড়া সেণ্ট বারথেলমো, স্যাক্রিফাইস অব এব্রাহাম (Sacrifice of Abraham,) মিনার্ভা, কিউপিড, ডায়েনা প্রভৃতি গ্রীক দেব-দেবী, (Adoration of the Shepherds, Holy Family) প্রভৃতি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক ছবি তিনি আঁকেন। একটীর ছবি এই সঙ্গে দিলাম। ইনি গ্রীক্ দেবী য়ুনো (Juno)। এটী রেমব্রাণ্টের প্রাচীন বয়সের সুদক্ষ হস্তের পরিচয়। দেবীমূর্ত্তির পরিকল্পনার দিক্ হইতে চিত্রটী অতুলনীয়। তবু বহুদিন ছবিটী অযত্নে অন্তরালে পড়িয়াছিল। সেদিন মাত্র জানা গিয়াছে ইহা ডচ্ মনীষি রেমব্রাণ্টের আঁকা। ছবিটী কলোন-এ ছিল। নিতান্ত অবহেলায় কালো হওয়াতে সাধারণের বিশ্বাস ছিল এটী রেমব্রাণ্টের সমসাময়িক কোন শিল্পীর আঁকা। কিন্তু হলাণ্ডে লইয়া এটী ভাল করিয়া সংস্কার করিবার পর দেখা গেল যে, ইহা শিল্পী শ্রেষ্ঠ রেমব্রাণ্টের আঁকা। রেমব্রাণ্টের ছবিগুলির বেশীরভাগেরই এরকম অবস্থা, কারণ বৃদ্ধবয়সে আর্থিক অনটনে তিনি যখন দেউলিয়া হন, তখন তাঁহার ছবিগুলি দেনদারদের ক্রোকে এইরূপ ভাবে অবহেলার অনাচারে চারিদিকে ছিটকাইয়া যায়। য়ুনো (Juno) ছবিটী নিলামে বিক্রী হইয়াছিল মাত্র ১০০ মার্কে। আজ ইহার দাম ১০ লক্ষ মার্ক।

প্রবীণ বয়সে রেমব্রাণ্ট যে সমস্ত ছবি আঁকেন, তাহার মধ্যে সিমিয় ইন দি টেম্প্‌ল, উম্যান টেকেন ইন অ্যাডাল্টি, এবং ডিসাইপল অ্যাট এম্মানস্ (Simeon in the Temple, Woman Taken in Adultery, Disciple at Emmans) প্রভৃতি নাম-করা ছবি।

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কন একচেটে হইলেও রেমব্রাণ্ট কয়েকখানি দৃশ্য-চিত্রও (landscape) আঁকেন। তাহার মধ্যে উইণ্টার ল্যাণ্ডসকেপ (Winter Landscape) এবং উইণ্ডমিল (Windmill) এই দুটী উল্লেখযোগ্য। শেষের ছবিখানি অনেক টাকা খরচা করিয়া আমেরিকা নিজের দেশে লইয়া রাখিয়াছে। এচিংয়েও রেমব্রাণ্টের পাকা হাত ছিল।

উলট পুরাণ

—শ্রীঅমলা দেবী

কাল সকাল সাতটা। স্থান একটি অপরিসর কক্ষ। কক্ষটির এক পার্শ্বে একটি ছোট আলমারী আইনের বড় বড় কেতাবে ভর্তি। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি নাতিবৃহৎ টেবিল, অয়েল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। টেবিলের এক পার্শ্বে একটি ঘূর্ণমান পুস্তকাধার; সেটিও আইনের কেতাবে ঠাসা হইয়া আছে। টেবিলের উপরে এক ধারে সদা-হাস্যময়ী মেমসাহেবের ছবিওয়ালা একটি ক্যালেণ্ডার; আর এক ধারে দোয়াতদানিতে দোয়াত ও কলম; মধ্যস্থলে একটি লেটার-প্যাড্। কক্ষের অন্যপার্শ্বে, টেবিল হইতে অনতিদূরে একটি ইজি-চেয়ার। কক্ষটীর দুইটি দরজা, একটি বাহির ও অন্যটি অন্দরের সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছে। দুইটি দরজাতেই নীল রং-এর পর্দ্দা ঝুলিতেছে।

ভিতরের দরজার পর্দ্দা ঠেলিয়া একজন যুবক কক্ষে প্রবেশ করিল এবং বাহিরের দরজার দিকে মুখ করিয়া চেয়ারে বসিল। যুবকের বয়স পঁচিশ কি ছাব্বিশ বৎসর। নাম অমলকুমার। চেহারা সাধারণ বাঙ্গালী যুবকের মত চলনসই। বৎসর দুই ওকালতী পাশ করিয়া আদালতে আনাগোনা করিতেছে। বাড়ীখানি পৈতৃক, তা'ছাড়া দেশে কিঞ্চিৎ জমীদারী আছে। সেই জন্য এখনও চাকরীর জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় নাই।

প্যাডের নীচ হইতে একটি দু-আনা দামের এক্সার-সাইজ খাতা বাহির করিয়া যুবক 'ভ-টা-দা' এই অক্ষর তিনটি লিখিতে লাগিল। 'ভ-টা-দা'—'ভগবান টাকা দাও' বাক্যটির সংক্ষিপ্তাকার মাত্র। যুবক পূর্ব্বে বৎসর খানেক 'মা-লক্ষ্মী'-র নাম লিখিয়াছিল। ফলে, বৎসরান্তে একটি কন্যা-রত্ন লাভ করে। কাজেই উহা বন্ধ করিয়া দিয়া স্পষ্ট ভাবে আর্জ্জি পেশ করিবার জন্য 'ভগবান টাকা দাও' বাক্যটি লিখিতে আরম্ভ করে এবং লিখিতে লিখিতে হয়রাণ হইয়া শেষে উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া শুদ্ধ 'ভ-টা-দা' লিখিতেছে।

যাই হোক, যুবক এক মনে লিখিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ বাহিরে জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়া, চট্ করিয়া খাতাটা প্যাডের নীচে সরাইয়া ফেলিয়া, বুক-সেল্ফ্ হইতে একটা মোটা বই টানিয়া লইয়া, তাহা খুলিয়া গভীর ভাবে পাঠ-মগ্ন হইল। একজন চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর বয়সের যুবক কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকের রং ফর্সা, আকৃতি দীর্ঘ, দেহ সুগঠিত ও মুখশ্রী সুন্দর। বোধ করি, সহজ অবস্থায়, ইহার মুখে একটি বুদ্ধি ও কৌতুকের দীপ্তি বিরাজ করে। কিন্তু সম্প্রতি সেখানে রাত্রি-জাগরণজনিত গ্লানি ও রুক্ষতা বিরাজ করিতেছে।

যুবক কক্ষে প্রবেশ করিলে, অমল মুখ না তুলিয়াই কহিল, 'বসুন'। যুবক তাহা লক্ষ্য না করিয়া একেবারে সটান্ গিয়া ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িল এবং একহাত মাথার উপর আড়াআড়ি রাখিয়া সজোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল।

অমল মুখ তুলিয়া বিস্ময়ের সহিত কহিল, 'আ রে! শান্ত যে! তুই এত সকালে? আমি ভেবেছিলুম—'

যুবকের নাম, সুশান্ত। অমলের বাল্যবন্ধু। শৈশবে তাহারা এক সঙ্গে পড়াশুনা করিয়াছে এবং যৌবনে একসঙ্গে এম. এ. এবং ল' পাশ করিয়া একই আদালতে প্র্যাকটিস্ করিতেছে।

সুশান্ত জবাব দিল না। অমল কহিল, 'কি রে, তোর হল কি? এমন করে শুয়ে পড়লি যে! রাত্রে থিয়েটারে গিয়েছিলি না কি?'

সুশান্ত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, থিয়েটারে যায় নাই।

'তবে দের বরযাত্রে গিয়েছিলি বুঝি?'

সুশান্ত পুনরায় 'না' সূচক ঘাড় নাড়িল।

'তাও যাস্নি! তবে এমন চেহারার জৌলুস্ খোলালি কি করে রে—এ্যা?'

সুশান্ত উঠিয়া বসিয়া কহিল, 'কাল সব শেষ হয়ে গেছে—'

অমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'কি শেষ হয়ে গেছে রে? তোদের বাড়ীতে কারও অসুখ ছিল শুনিনি তো—'

সুশান্ত ক্লান্ত দুই চক্ষু মেলিয়া এক দৃষ্টিতে অমলের পানে তাকাইয়া রহিল।

অমল কহিল, 'কি রে! চুপ করে রইলি যে? বল না কি হয়েছে।'

সুশান্ত ধীরে ধীরে কহিল, 'আভা কাল সাফ্ জবাব দিয়েছে।'

নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল, 'ওঃ, তাই বল! যা' ভাবিয়ে দিয়েছিলি।'

দুই ভ্রু কুঁচকাইয়া সুশান্ত কহিল, 'তার মানে, এতে কিছুই ভাববার নেই, না?'

অমল অপ্রতিভতার হাসি হাসিয়া কহিল, 'না, তা' বলছি না; ভাববার আছে বৈ কি! তবে তত সিরিয়াস—'

সুশান্ত বাধা দিয়া কহিল, 'সিরিয়াস নয়! তোর বুদ্ধি না থাকলেও হৃদয় আছে জানতুম; এখন দেখছি, তাও তোর নেই। মরে যাওয়াটাই সিরিয়াস আর বেঁচে থেকে তিল তিল করে মরাটা কিছুই নয়?'

অমল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সুশান্ত কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, 'হাসছিস? জানিস্ আভা কাল কি বলেছে? বলেছে, আমি পাগল, আমার রাঁচি যাওয়া উচিত—'

অমল কহিল, 'কথাটা মন্দ নয় তা'হলেও আভা ও কথা বলেছে, আমি বিশ্বাস করি না—'

অমলের কণ্ঠস্বর ও মুখভঙ্গী অনুকরণ করিয়া সুশান্ত কহিল, 'বিশ্বাস করিস্ না! এই দেখ,' বলিয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া মেজের উপর ছুঁড়িয়া দিল। অমল কাগজটা কুড়াইয়া লইয়া, পড়িয়া, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'শুধু শুধু এ সব কথা লেখবার মেয়ে আভা নয়। আমি তো তাকে এতটুকু হতে জানি। তুই নিশ্চয় তাকে বিরক্ত করেছিস!'

প্রতিবাদ করিয়া সুশান্ত কহিল, 'বিরক্ত করেছি! সত্যি বলছি, না—বিশ্বাস না হয় তো বৌদিকে ডাক, পায়ে হাত দিয়ে বলছি—'

'থাক আর বৌদিকে টানাটানি করে লাভ নেই; ঠিক করে বল দেখি কি ব্যাপার?'

বার কয়েক ঢোক গিলিয়া সুশান্ত কহিল, 'কাল দুপুরে ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম; আভা ছিল কলেজে আর বুড়ো ওপরে। ভৃত্য রামচরণ তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বুড়োর গড়-গড়ায় তামাকু সেবন করছিলেন, আমাকে দেখেই নল ফেলে দিয়ে গভীর নিদ্রামগ্ন হলেন। আমি ডাকলুম, সাড়া নেই। গায়ে বার কয়েক ধাক্কা দিতেই মিট্‌মিট্ করে তাকালেন; তারপর উঠে বসে, বার কয়েক হাই তুলে ও গা মুড়ে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বাবু এমন অসময়ে?' আমি বললুম, 'তোমাদের পাড়ায় এসেছিলুম, রামচরণ! ভারী তেষ্টা পেয়েছে, একগ্লাস জল আন দিকি?' বেটাকে জল আন্‌তে পাঠিয়ে, আভার পড়বার ঘরে গিয়ে, ওর লজিকের বই-এর মধ্যে একটা চিঠি গুঁজে দিয়ে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলুম। তারপর রামচরণ জল নিয়ে এল। জল খেয়ে ভাল ছেলের মত সরে পড়লুম।'

অমল জিজ্ঞাসা করিল, 'চিঠিতে কি লিখেছিলি?'

'কি আর এমন! লিখেছিলুম, আভা আমি তোমায় ভালবাসি।'

'তারপর?'

'তারপর সন্ধ্যের সময় আবার যাই ওদের ওখানে। রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত ছিলুম। বুড়োকে দোতালার সিঁড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি, তখন আভা গট্‌গট্ করে এসে এই চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে তেমনি ভাবেই চলে গেল। চিঠি পেয়েই আমার হৃদয় ট্যাঙ্গো-নাচ সুরু করে দিলে। ট্যাঙ্গো-নাচ দেখেছিস?'—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া—'কচু দেখেছিস। শোন্, চিঠিটা তাড়া-তাড়ি পকেটে পুরে বাড়ী ফিরে এসে দেখি, যাকে পারি-জাতের মালা বলে বুকে তুলেছিলুম, সে মালা নয়, খাঁটী গোখরো সাপ্; আমার বুকের ওপর ছোবল্ মেরে পাক্কা আউন্স্ দুই বিষ ঢেলে সমস্ত বুকখানা আমার জ্বালিয়ে দিলে। কোথায় গেল খাওয়া, কোথায় গেল ঘুম! সমস্ত রাত্রি ছট্‌ফট্ করে তোর কাছে আসছি।'

অমল গম্ভীর মুখে কহিল, 'তুই যে একটি আস্ত গাধা তা' আমি আগে জানতুম না।'

দুই চোখ কপালে তুলিয়া সুশান্ত কহিল, 'কেন?'

অমল বলিতে লাগিল, 'আলাপ নেই পরিচয় নেই, ধাঁ করে কোন ভদ্রলোকের মেয়ের কাছে 'ভালবাসি' বলে আবদার করলেই, সে বুঝি 'এস, এস, বঁধু এস! আধ আঁচরে বস—' বলে আদর করে বসাবে? বুড়োকে বলে তোকে যে ঠ্যাঙ্গানোর ব্যবস্থা করে নি, এই তোর ভাগ্যি।'

বুড়ো আভার পিতা, দামোদর বাবু; অবসর প্রাপ্ত সাব-জজ; গান-বাজনায় অত্যধিক ঝোঁক।

সুশান্ত কহিল, 'আলাপ নেই আবার কি! তোর বাড়ীতে তুই তো সেদিন আলাপ করিয়ে দিলি।'

'আরে! সে তো আধঘণ্টার আলাপ। সে রকম আলাপ তো তার দু'শ লোকের সঙ্গে আছে। তাই বলে, সবাই যদি সেই আলাপের জোরে 'ভালবাসি' বলে চ্যাঁচামেচি করতে থাকে, তা'হলে তো ভারী বিপদ্ দেখছি!'

ধমক দিয়া সুশান্ত কহিল—'বক্তিমে থামা বলছি! কে বললে আধ ঘণ্টার আলাপ! তারপর যে দুটি মাস ধরে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যে বেলায় তাদের বাড়ী গেছি, তা' তুই জানিস্? দুটি মাস ধরে বুড়োর কর্ণভেদী কালোয়াতী গান শুনেছি; বেতালা গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছি। বলে আলাপ নেই!'—একটু দম লইয়া—'শুনেছিস্ একদিনও বুড়োর গান? খুব তো মাসতুতো বোন বলে দরদ দেখান হচ্ছে—যেও একদিন মেসোমশাই-এর গান শুনতে! angina pectoris হয়ে যাবে, বাবা! ছ'মাস এখানে এসেছে, আশে পাশের একটা বাড়ীতেও ভাড়াটে নেই—'

অমল হাসিয়া কহিল- 'তা' বেশ করেছিস্। কিন্তু আভার সঙ্গে একদিনও কথাবার্ত্তা হয়েছিল?' মুখ কাঁচুমাচু করিয়া সুশান্ত কহিল—'তা' অবশ্য হয় নি। তবে দেখেছি, আমি যখন গান গাই পর্দ্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে আমার গান শোনে।'

'আরে, ও-বাড়ীর রামচরনও তো তোর গান শোনে।'

'শুনুক—একদিন এক সঙ্গে চা খেয়েছিলুম। ও ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা! উনি কি চায়ে বেশী চিনি খান?'

'বললেই বা।'

'চুপ! রাত্রে ওদের বাড়ী থেকে চলে আসবার সময়ে পিছন ফিরে দেখেছি, অনেক দিন দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে আছে।'

'তোর চেহারা দেখবার জন্যে নয়।'

'নেই বা হল! তারপর, দিন কয়েক ওর প্রফেসার পড়াতে আসে নি, তো বুড়ো একদিন বললে, সুশান্ত বাবুর কাছে যা দেখিয়ে নেবার, নাও না, মা! তাতে মুখ চোখ লাল করে ও বললে, না বাবা! দরকার হবে না।'

'সব লক্ষণই তো খারাপ দেখছি।'

'তুই একটি কোলা ব্যাং! তুই এসব বুঝবি না। আমি আজকাল বৈষ্ণব সাহিত্য পড়ছি চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি; এগুলি সব পূর্ব্বরাগের লক্ষণ। কিন্তু মুস্কিল করেছে, ঐ প্রফেসার।'

'কেন? ওর দোষ কি?'

মুখ বিশ্রী করিয়া সুশান্ত কহিল, 'দোষ আর কি! আমার চেয়ে দেখতে ভাল, লেখা-পড়ায় ভাল। বেশ জুটিয়ে দিয়েছ, বাবা! বন্ধু যে বন্ধুর এমন সর্ব্বনাশ করে, তা' কখনও শুনি নি। কেন বাবা! আমি কি আই-এ ক্লাশের লজিক পড়াতে পারতুম না? আমাকে গছিয়ে দিলেই পারতে।'

একটু হাসিয়া অমল কহিল, 'প্রফেসারের বোধ হয় বিয়ে হয়ে গেছে।'

ঘাড় নাড়িয়া সুশান্ত কহিল, 'না, আমি খবর নিয়েছি।'

অমল কহিল, 'আভা যে ওকে ভালবাসে তার প্রমাণ কি?'

'তা জানব কি করে রে মুখ্খু! পরদার আড়ালে বসে পড়ায়, প্রমাণ যদি কিছু থাকে তো ওরা নিজেরাই জানে'—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া—'আমি অবশ্যি একটা প্রতিষেধক প্রয়োগ করেছি।'

সুশান্ত দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল। তাহার পর মনে মনে কহিল, তা তুমি পারবে—বাবা! যা জাঁহাবাজ মেয়ে! এখন দয়া করে আমার স্কন্ধে ভর না কর !

তারপর আরাম-কেদারায় শুইয়া পড়িয়া মুদ্রিত চক্ষে বোধ করি অসমাপ্ত প্রবন্ধের বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতেই অচিরে গভীর নিদ্রামগ্ন হইল।

ঘুম ভাঙ্গিতেই সুশান্ত দেখিল, সামনের দেওয়ালে বড় ঘড়িতে সাড়ে ছটা বাজিয়া গিয়াছে।

'উঃ, সাড়ে ছটা'—বলিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুঁজার জলে যেমন তেমন করিয়া মুখ চোখ ধুইয়া জামা গায় দিয়া ঘর হইতে বাহির হইল। মনে মনে বলিতে লাগিল, 'মনের এই নিদারুণ অবস্থায় এমন ঘুম! আমার দ্বারা কিছু হবে না।'

দোতলায় নামিয়া সুশান্ত পা টিপিয়া টিপিয়া একতলায় যাইবার উপক্রম করিতেই দূর হইতে বৌদির কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, 'ঠাকুর পো! না খেয়ে বেরিও না, এদিকে এস।'

নিরুপায় হইয়া সুশান্ত অত্যন্ত বিশ্রী মুখ করিয়া রান্নাঘরের বারান্দায় উপস্থিত হইল। ভিতর হইতে বৌদিদি কহিল, 'ঐ আসনটায় বস।'

একটা থালায় করিয়া লুচি, তরকারী, মিষ্টি ইত্যাদি আনিয়া আসনের সামনে রাখিয়া বৌদিদি কহিলেন, 'খাও।'

সুশান্ত মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'এখন খেতে পারব না—বৌদি!'

বৌদিদি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'তার মানে?'

'মানে—এখন খেতে বসলে দেরী হয়ে যাবে। আমাদের ক্লাবে আমার সেই প্রবন্ধটা পড়তে হবে কি না, অনেক লোক অপেক্ষা করে থাকবে।'

'থাকুক। একটু অপেক্ষা করলে সৃষ্টি রসাতলে যাবে না, তুমি খাও।'

বাধ্য হইয়া সুশান্তকে খাইতে বসিতে হইল। বৌদিদি বলিতে লাগিলেন, 'সকালে কি যে খেয়েছ ভগবান্ জানেন। দুপুর বেলায় খান কয়েক কচুরী খেতে না খেতেই পেট ভরে গেছে বলে উঠে পালালে, আবার এখন না খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে। কি ব্যাপার বল দেখি?'

গোগ্রাসে গিলিতে গিলিতে সুশান্ত কোনমতে বলিল, 'মনটা বড় চঞ্চল কি না! বড় শক্ত প্রবন্ধ; ওরই কথা ভাবতে ভাবতে।'

'প্রবন্ধ শক্ত হোক, কিন্তু সত্যি বলছি ঠাকুর পো! তোমার ভাবগতিক দেখে ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার দাদাও সেদিন দুঃখ করছিলেন—শান্তু কিছু করছে না।'

'কেন বৌদিদি! আমি তো খুব পড়াশুনা কচ্ছি! অমলের ওখানে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত পড়ি।'

'অমলের ওখানে কেন? বাড়ীতে কি বই নেই?'

'থাকবে না কেন? তবে দুজনে একসঙ্গে পড়লে পড়াটা ভাল হয় কি না।'

'পড় ভাল কথা, অমলও ছেলে ভাল, কিন্তু ওঁর মত লোকের কাছে বসে হাতে কলমে কাজ শেখাও তো উচিত! বাইরের কত লোক কত জিনিষ শিখে যাচ্ছে, কত বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছে, আর তুমি ঘরের ছেলে হয়ে—'

'বইগুলো একবার ভাল করে পড়ে নিয়ে ওঁর কাছে বসব ঠিক করেছি।'

একটা চাকর পাশ দিয়া যাইতেছিল। বৌদিদি তাহাকে বলিল—'ওরে এই! ড্রাইভার বাবুকে বলগে যা, মাসীমাকে আনতে যেতে।'

সুশান্ত বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, 'সুনন্দা কোথায় গেছে?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ী। মেয়েটির বাবা রাঁচিতে আমাদের পাশের বাড়ীতে ছিলেন। আমার বাবার সঙ্গে না কি ওঁর আলাপ হয়েছিল।' বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

তাঁহার পিতা অক্ষয় বাবু সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। বৎসর কয়েক হইল অবসর লইয়া রাঁচিতে নিজ বাড়ীতে বাস করিতেছিলেন। মাস কয়েক আগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

'সব না খেয়ে যেও না, ঠাকুরপো! আমি আসছি'—বলিয়া বৌদিদি রান্নাঘরের ভিতরে গেলেন।

খাইতে খাইতে সুশান্ত ভাবিতে লাগিল, সুনন্দা তাহা হইলে দুপুরের কোন কথা বৌদিদিকে বলে নাই। মেয়েটা খাণ্ডারী হইলেও নেহাৎ খারাপ লোক নয়, দেখা যাইতেছে।

সমস্ত রাস্তা প্রায় ছুটিয়া সুশান্ত দামোদর বাবুর বৈঠকখানায় হাজির হইল। দামোদর বাবু মুদ্রিত চক্ষে তানপুরা সহযোগে সুর ভাঁজিতেছিলেন। সুশান্তর জুতার শব্দে সুর-বিস্তার বন্ধ রাখিয়া চোখ খুলিয়া কহিলেন, 'কে? সুশান্ত বাবু! হাঁপাচ্ছ কেন হে? কুকুরে তাড়া করেছিল না কি?'

সুশান্ত রুমাল দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল, 'আজ্ঞে না, এমনি একটু ছুটছিলাম। শরীর ম্যাজ ম্যাজ করছে কি না।'

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে দামোদর বাবু কহিলেন, 'ম্যাজ ম্যাজ করছে? তা'হলে একটু আদার রস দিয়ে গরম গরম চা খাও না। শরীরটাও ভাল হবে, গলাটাও পরিষ্কার হবে। বলিয়া হাঁকিলেন, 'রামচরণ!'

রামচরণ আসিলে কহিলেন, 'দিদিমণিকে এক কাপ চা আদার রস দিয়া তৈরী করতে বলগে, সুশান্ত বাবুর জন্যে—'

দামোদর বাবু বিপত্নীক। দুইটি পুত্র সরকারী চাকুরে। তাহারা বিদেশে থাকে। একমাত্র কন্যা আভাই সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

একটা ঘরে বসিয়া আভা ও সুনন্দা গল্প করিতেছিল।

রামচরণ আসিয়া খবর দিল, 'বাবু এক কাপ চা পাঠাতে বলছেন, আদার রস দিয়ে, সন্থ বাবুর জন্যে—'

আভা বিস্মিতকণ্ঠে কহিল, 'সন্থ বাবু আবার কে?'

রামচরণ কহিল, 'ঐ যে বাবু দিন আসে, বাবুর সঙ্গে গান বাজনা করে।'

দুই বন্ধুর চোখে চোখে ইসারা হইয়া গেল। আভা কহিল, 'হুঁ আচ্ছা! তৈরী কচ্ছি, তুমি এখনি এসে নিয়ে যেও।' রামচরণ চলিয়া গেল।

সুনন্দা কহিল, 'উনিই তোমাকে প্রণয় নিবেদন করেছেন বুঝি?'

আভা কহিল, 'প্রণয় নিবেদন নয়, প্রণয়াঘাত। পাশের ঘরেই পড়ি। আজ ছ'মাস ধরে নিত্য নূতন প্রেমের গান শোনাচ্ছেন। আমার ধাতটা একটু কড়া, তাই, নইলে অন্য কেউ হলে রসাধিক্য ঘটত।'

সুনন্দা কহিল, 'ভদ্রলোক কি করেন?'

'কি করে জানব, ভাই। অমলদাদার বন্ধু-বোধ হয় উকীল, কাজকম্ম কিছু নেই বোধ হয়, নইলে ঘণ্টা তিনেক ধরে নিত্যি কেউ পরের বাড়ীতে আড্ডা দিতে পারে? আমার অবশ্য আপত্তি করবার কিছু নেই। বাবার গান গাইলে শরীর ভাল থাকে। ও ভদ্রলোক না জুটলে, হয়ত পয়সা খরচ করে লোক জোটাতে হত।'

সুনন্দা মৃদু হাসিয়া কহিল, 'ভদ্রলোকের যখন এত অধ্যবসায়, তখন ওকেই বিয়ে করলে পার—'

আভা ভুরু কুচকাইয়া কহিল, 'বল কি সুনন্দা! একজন বেকারকে বিয়ে করব? গান শুনে পেট ভরবে না কি?'

সুনন্দা কহিল, 'মন ত' ভরবে?'

আভা হাসিয়া কহিল, 'মনের কারবার ভরা পেটেই ভাল জমে ভাই! রবীন্দ্রনাথ বড় জমিদার বলেই বড় কবি, বিক্রমাদিত্যের কাছ হতে মোটা মাসোহারা না পেলে কালিদাসের কাব্যরস এত দানিয়ে উঠত না।'

এমন সময় রামচরণ আসিয়া হাজির হইল।

[ক্রমশঃ

বঙ্গালদেশ ও বাঙ্গাল

—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশ বাঙ্গালা বা বাংলা নামে পরিচিত। কিন্তু এই নাম খুব প্রাচীন নহে। পণ্ডিতগণ বলেন যে, মুসলমানগণই তাঁহাদের অধিকৃত এই দেশকে 'বঙ্গাল' নাম প্রদান করেন। এই 'বঙ্গাল' নামই 'বাঙ্গালা' এবং Bengal নামের মূল। মুসলমানদিগের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতেই ভারতের পূর্ব্বদিকে বঙ্গাল নামে একটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ এই বঙ্গাল দেশের নামানুসারেই তাঁহাদের বিজিত এই বিস্তৃত দেশের নামকরণ করিয়াছেন।

পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই বঙ্গাল দেশের অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ বর্ত্তমান। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গ ও বঙ্গাল একই দেশ। আবার কেহ বলেন, বাখরগঞ্জ জেলার চন্দ্রদ্বীপই এই প্রাচীন বঙ্গাল দেশ। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বঙ্গাল দেশের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গ ও বঙ্গাল

বঙ্গ নামটি অতীব প্রাচীন। ঐতরেয় আরণ্যকে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌধায়ন তৎপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে বঙ্গদেশে গমনের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিভিন্ন পুরাণ, প্রাচীন কাব্য এবং প্রাচীন লিপি ইত্যাদিতে বঙ্গদেশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] কিন্তু বঙ্গাল দেশের উল্লেখ সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে আমরা পাই নাই।[২] প্রকৃত পক্ষে বঙ্গাল দেশের উল্লেখ বেশীর ভাগ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর খোদিত লিপিতেই পাওয়া যায়। যদি বঙ্গ ও বঙ্গাল একই দেশ হইত, তাহা হইলে বঙ্গাল নামের আরও প্রাচীন উল্লেখ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। যে মুসলমানগণ এই দেশের নাম বঙ্গাল দিয়াছেন, তাঁহারাও জানিতেন যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশ নহে। ব্লকম্যান[৩] লিখিয়াছেন যে, বখতিয়ার খিল্‌জী সমস্ত Bengal অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা মনে করা নিতান্তই ভ্রমাত্মক হইবে। তিনি মিথিলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ, বরেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ এবং বগড়ীর উত্তর-পশ্চিমাংশ মাত্র করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বিজিত ভূভাগ ইহার রাজধানী লক্ষ্ণৌতী-র নামানুসারে লক্ষ্ণৌতী প্রদেশ বলিয়া কথিত হইত। তবকাত্‌-ই-নাশিরীতে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্ণৌতী প্রদেশ গঙ্গা দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বাংশের নাম বরেন্দ্র, দেবকোট ইহার অন্তর্গত। পশ্চিমাংশের নাম রাল বা রাঢ়, 'লক্ষ্ণৌর' ইহার অন্তর্গত। তবকত্‌ কার মিনহাজ, আরও বলেন যে, তাঁহার সময়ে (১২৬০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গ (দিয়ার-ই বঙ্গ) ও লক্ষ্ণৌতী দুইটি পৃথক্ প্রদেশ ছিল। বঙ্গে তখনও নদীয়ার রাজা লখমনিয়ার বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তুঘলক্ সার রাজ্যকালেই (১৩২৩ খৃষ্টাব্দ) প্রথম সাতগাঁও ও সোণারগাঁওতে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের উল্লেখ পাওয়া যায়। লক্ষ্ণৌতী, সাতগাঁও ও সোণারগাঁও, এই যুক্ত-প্রদেশই প্রথম 'বঙ্গাল' নামে অভিহিত হইতে দেখা যায়। ইহার পূর্ব্বে মুসলমান ইতিহাসে 'বঙ্গাল' নাম দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন যে এই যুক্ত-প্রদেশের নাম বঙ্গাল হইল, তাহার কোন কারণ জানা যায় না। যাহা হউক, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশ নহে। বঙ্গদেশ মুসলমান-প্রদত্ত বঙ্গাল নামক দেশের একটি অংশ মাত্র। পরবর্ত্তী কালে মুঘলদিগের সময়ে সমগ্র বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা বঙ্গাল নাম প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ রাজত্বকালেও এই নামই চলিতে থাকে। অতি অল্প দিন হইল বিহার ও উড়িষ্যা Bengal হইতে পৃথক্ হইয়াছে।

আইন-ই-আকবরি-প্রণেতা আবুল ফজল এই দেশের বঙ্গাল নামের একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার মতে বঙ্গ ও বঙ্গাল একই দেশ। তিনি বলেন, প্রাচীনকালে এই দেশের রাজগণ 'আল্' (আলি, বাঁধ) নির্ম্মাণ করাইয়া দেশকে জল-প্লাবন হইতে রক্ষা করিতেন। এই জন্য 'বঙ্গ' এবং 'আল' এই উভয় শব্দের যোগে দেশের নাম 'বঙ্গাল' হইয়াছে। এই প্রথা বর্ত্তমান সময়েও লবণজলপূর্ণ সমুদ্র এবং নদীর তীরস্থ খুলনা ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ ভূভাগে প্রচলিত আছে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য, নোণাজল হইতে কৃষি রক্ষা করা। বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশেই এই ব্যবস্থা নাই। কারণ, সর্ব্বত্র ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হয় না। দেশের অত্যল্প অংশের একটি প্রথার জন্য সমস্ত দেশের নামকরণ হওয়া সম্ভবপর নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে অনেক প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গাল নামের উল্লেখ পাইতাম। বস্তুতঃ, আবুল ফজল ভিন্ন অন্য কেহই এরূপ ব্যাখ্যা দেন নাই। সুতরাং ইহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। আমরা পরে যে প্রমাণ দিতেছি, তাহা দ্বারাও ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হইবে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী কলচুরী-রাজ বিজ্জল দেবের অবলুর লিপি এবং ডাকার্ণব গ্রন্থ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি পৃথক্ দেশ।[৫] আমরা ইহা ভিন্ন আরও কয়েকখানি প্রাচীন লিপি[৬] ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে[৭] বঙ্গ ও বাঙ্গালের একসঙ্গে উল্লেখ পাইয়াছি। লিপিগুলি সমস্তই কর্ণাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত। ইহাদের তারিখ দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে। গ্রন্থগুলির মধ্যে সোমদেব সুরি রচিত যশস্তিলক ৮৮১ শকাব্দ বা ৯৫৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহার সকলগুলিতেই বঙ্গ ও বঙ্গালের পাশাপাশি উল্লেখ রহিয়াছে। ডক্টর রায় চৌধুরী প্রদত্ত মাত্র দুইটি প্রমাণকে কেহ কেহ উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন বোধ হয় এতগুলি প্রমাণ কেহ অবিশ্বাসযোগ্য মনে করিবেন না।

চন্দ্রদ্বীপ ও বঙ্গাল

ডক্টর রায় চৌধুরী বলেন যে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান বরিশাল ও তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড, যাহা পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ নামে অভিহিত হইত—তাহাই বঙ্গাল দেশ। এখন দেখা যাউক্ তিনি কোন্ প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন:—

একাদশ শতাব্দীর রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয় লিপিতে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্গাল দেশের অধিপতি বলা হইয়াছে। আনুমানিক দশম শতাব্দীর শেষ বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল তাম্রশাসনে তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি এবং 'হরিকেল-রাজ-ককুদ-ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়মাধারঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই চন্দ্রদ্বীপই এই শাসনে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের স্বরাজ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা বঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ইৎসিং এবং রাজশেখরের কর্পূর-মঞ্জরীতে প্রদত্ত হরিকেলের অবস্থানের সহিত লক্ষ্মণ সেন দেবের (?) তাম্রশাসন ও যশোধরের টীকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় যে, বিক্রমপুর ও লৌহিত্যের পূর্ব্বতীরস্থিত ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ (?) শতাব্দী পর্য্যন্ত 'বঙ্গ' বা 'হরিকেল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সাগর-তীরবর্ত্তী 'সাগরানূপ' যে বঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তাহার প্রমাণ মহাভারত ও বৃহৎ সংহিতায় পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর পর্টুগিজ মানচিত্রে এবং গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে অবস্থিত সাগর-তীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে Bengala নামক একটি নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই নগরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশই সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশ। 'চন্দ্রদ্বীপ' ও 'বঙ্গাল' এই উভয় দেশই বঙ্গ-বহির্ভূত সাগরানূপে অবস্থিত এবং চন্দ্রোপাধিক নৃপতি-শাসিত। ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং চন্দ্রবংশের সহিত সংযোগ বিচার করিলে এই দুই দেশ যে অভিন্ন, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরীর উপরোক্ত যুক্তিগুলি কতদূর বিচারসহ। তিনি রামপাল-লিপির প্রমাণে বঙ্গাল বা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যকে চন্দ্রদিগের স্বরাজ্য বলিয়াছেন। অধ্যাপক রায় চৌধুরীর এই উক্তিদ্বারা মনে হইতেছে, তিনি যেন বলিতে চাহেন যে, চন্দ্রদ্বীপই চন্দ্রদিগের আদিম রাজ্য। হরিকেল বা বঙ্গ পরে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল এবং চন্দ্রবংশের নামানুসারেই তাঁহাদের আদিম রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, শ্রীচন্দ্রের তাম্র-শাসনে কি লিখিত আছে এবং তাহাদ্বারা উপরোক্ত অনুমান সমর্থিত হয় কি না। উক্ত লিপির পঞ্চম শ্লোকে লিখিত আছে:—

"পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়কুলঃ কৌলীন-ভীমাশয়স্ত্রৈলোক্যো
বিদিতো দিশামতিথিভিস্ত্রৈলোক্যচন্দ্রো গুণৈঃ॥
আধারো হরিকেল-রাজ ককুদ-ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং যশ্চন্দ্রো
পপদে বভূব নৃপতির্দ্বীপে দিলীপোপমঃ॥

আমাদের মনে হয়, উপরোক্ত শ্লোকের বর্ণনার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বলিতে হয় যে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র, যিনি হরিকেল বা বঙ্গের রাজ-ককুদ-ছত্রস্মিত-শ্রীর আধার, তিনি চন্দ্রদ্বীপেরও রাজা হইয়াছিলেন। এই ব্যাখ্যানুসারে হরিকেল ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পৈত্রিক রাজ্য ছিল। পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। চন্দ্রদিগের আদিমরাজ্য ছিল রোহিতাগিরি।৮ ইহা সত্য বটে যে, প্রাচীন লিপিতে চন্দ্রদ্বীপের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ এই তাম্র-শাসনেই পাওয়া যায়। ভবভূতির উত্তররামচরিতে (৮ম শতাব্দী) দেখা যায় যে, রাজর্ষি জনক সীতার নির্ব্বাসনে দুঃখিত হইয়া কিছুকাল চন্দ্রদ্বীপ তপোবনে তপস্যা করিয়াছিলেন।৯ আবার নেপাল হইতে সংগৃহীত এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে রক্ষিত অষ্টসহস্র প্রজ্ঞা-পারমিতার পুঁথিতে চন্দ্রদ্বীপের ভগবতী তারাদেবীর যে চিত্র আছে, তাহার পরিচয়ে চন্দ্রদ্বীপ 'আরিযস্থান' অর্থাৎ আর্যস্থান বা তপোবন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।১০ কেম্ব্রিজ পুঁথির নকলের তারিখ ১০১৫ খৃষ্টাব্দ।

চন্দ্রবংশের নামানুসারে যে চন্দ্রদ্বীপ নাম হইয়াছে, এরূপ প্রসঙ্গ আজ পর্য্যন্ত কোথাও পাওয়া যায় নাই। অপরন্তু তারা নাথের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে পঞ্চম শতাব্দীর চন্দ্রগোমির নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে—স্বীকার করিতে হয়।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সময়ে বঙ্গ ও চন্দ্রদ্বীপ দুইটি পৃথক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর বিশ্বরূপ সেন দেবের সাহিত্য-পরিষদ্-তাম্রশাসনে দেখা যায় যে, চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গের একটি বিভাগরূপে পরিণত হইয়াছে। এই তাম্রলেখে বঙ্গকে অন্ততঃ চারিটি ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, যথা—নাব্য, মধুক্ষীরক, বিক্রমপুর এবং চন্দ্রদ্বীপ।১১ বর্ত্তমানে বরিশালের উত্তর ভাগে চর সরিকেল নামে একটি স্থান আছে।

অধ্যাপক রায় চৌধুরী বঙ্গ ও বঙ্গালের অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া কামসূত্রের টীকাকার দ্বাদশ শতাব্দীর যশোধরের মত গ্রহণ করিয়াছেন। যশোধর বলেন:—"বঙ্গা লৌহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ।" অর্থাৎ বঙ্গ লৌহিত্যের পূর্ব্বে। এই মতের সমর্থক কোন প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর কেশব সেন এবং বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় প্রমাণ করিতেছে যে, বঙ্গ, লৌহিত্য নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং এবং ইহা ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর কেশব সেনের ইদিলপুর তাম্রশাসনে আছে:—"বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে তালপড়া পাটক।" প্রিন্সেপ সাহেব 'তালপড়া পাটক' স্থানে "লতাট ঘোড়া ঘাটক" পাঠ করিয়াছেন এবং তাহাই প্রকৃত পাঠ। এই লতা এবং ঘোড়াঘাট মৌজা লৌহিত্যের পশ্চিমস্থিত বরিশাল জেলার ইদিলপুর পরগণায় বর্ত্তমান। বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয়েও বঙ্গের উল্লেখ আছে এবং তাহাতে উল্লিখিত স্থানগুলিও লৌহিত্যের পশ্চিম তীরে ঢাকা, ফরিদপুর এবং বরিশাল জেলায় অবস্থিত।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দেশগুলির অবস্থান সম্বন্ধে যশোধরের উক্তি যে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার আর একটি প্রমাণ দিতেছি। যশোধর লিখিয়াছেন:—"অঙ্গা

মহানন্থাঃ পূর্ব্বেণ।" অর্থাৎ অঙ্গ মহানদীর পূর্ব্বে। এই মহানদী যে উড়িষ্যার সুপরিচিত মহানদী হইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য। উত্তর বঙ্গে মহানদী বা মহানন্দা নামে একটি নদী আছে। মালদহ সহর ইহার তীরে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে গৌড়-বরেন্দ্র এবং পশ্চিমে পূর্ণিয়া জেলা। যশোধরের 'পূর্ব্বেণ' স্থলে যদি 'পশ্চিমেন' পাঠ করা যায়, তাহা হইলে সব দিক্ ঠিক হয়। বঙ্গ যে কোন সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত ছিল, এরূপ প্রবাদেরও অভাব।

শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন প্রমাণ করিতেছে যে, শ্রীচন্দ্র ও তাঁহার পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। শ্রীচন্দ্রের রাজ্যকাল দশম শতাব্দীর শেষভাগে বা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। শেষোক্ত কালের তিরুমলয় লিপি হইতে জানা যায় যে, গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গাল দেশের রাজা ছিলেন। উভয়েই চন্দ্রোপাধিক বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা আমাদের জানা নাই। সুতরাং উভয়ের রাজ্যই বঙ্গাল দেশে ছিল বলা চলে কি? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রের শাসিত চন্দ্রদ্বীপকেও বঙ্গাল বলা চলে না। চট্টগ্রামের সন্নিকটস্থ Bengala নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থিত রাজ্য সাগরানূপে অবস্থিত। চন্দ্রদ্বীপও সাগরানূপে স্থিত। উভয়েই সাগরানূপে, সুতরাং উভয়েই এক দেশ বলা ঠিক হইবে কি? পূর্ব্বোক্ত রাজ্যকে বঙ্গাল বলিয়া ধরিয়া লইলেও চন্দ্রদ্বীপকেও বঙ্গাল বলা কঠিন হইবে, কারণ, ঐ রাজ্যের বিস্তৃতি বরিশাল জেলার চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। এই উভয় প্রদেশের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র (মেঘনা) নদ প্রবাহিত। ইহা এইরূপ অনুমানের একটি বিষম অন্তরায়।

পক্ষান্তরে চন্দ্রদ্বীপ যে বঙ্গাল দেশ নহে, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্গজ-কায়স্থদিগের কুলজী গ্রন্থে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গজ-কায়স্থগণের শীর্ষস্থানীয় সমাজ চন্দ্রদ্বীপ, যথায় কুলীনগণ বাস করেন। চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সীমা :—পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে ইচ্ছামতী, পশ্চিমে মধুমতী এবং দক্ষিণে সমুদ্র।১৩

ইহাই মোটামুটি ভাবে বঙ্গেরও সীমা বলা যাইতে পারে। বঙ্গাল দেশকে পাণ্ডব বর্জ্জিত ম্লেচ্ছাচার সমন্বিত এবং কুলাচারহীন বলা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, বঙ্গালদিগের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিলে বঙ্গদিগকে জাতিভ্রষ্ট হইতে হইবে।১৪ পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ বলিতে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরকেই বুঝায়। ভীম পূর্ব্বদেশ জয় করিতে আসিয়া লৌহিত্য পর্য্যন্ত গিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমরা ১৩৩১ সনের অগ্রহায়ণ মাসের 'পঞ্চপুষ্পে' করিয়াছি। সুতরাং এখানে আর বেশী কিছু বলা হইল না।

ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীরস্থ কয়েকটি স্থানের নামের সঙ্গে 'বঙ্গাল' নাম সংযুক্ত, যথা :—রঙ্গপুরের বঙ্গালভূম, ময়মনসিংহের বাঙ্গালপাড়া এবং বিশ্বরূপ সেনের সাহিত্য-পরিষৎ তাম্রশাসনোক্ত বাঙ্গাল বড়া (বরিশাল জেলার বর্ত্তমান বাঙ্গ.বোড়া পরগণা)।১৫ ইহা দ্বারা ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম তীর পর্য্যন্তও যে বঙ্গালদেশ বিস্তৃত ছিল, তাহা প্রমাণিত হয় না। বরং ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, এইগুলি বঙ্গাল দেশের বাহিরে বঙ্গালদিগের উপনিবেশ। কালীঘাটে যে স্থানে পূর্ব্ববঙ্গীয়গণ বাস করে, তাহাকে বাঙ্গালপাড়া বলিত। ইহা দ্বারা কালীঘাটকে বঙ্গাল দেশের অন্তর্গত বলা চলে না।

বঙ্গালদেশের প্রকৃত অবস্থান

উপরে দেখা গেল যে, বঙ্গালদেশ ও বঙ্গ বা চন্দ্রদ্বীপ এক নহে। বঙ্গাল ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্রের অব্যবহিত পূর্ব্ব তীরে ত্রিপুরা জেলা অবস্থিত। ঐ জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহকুমার অন্তর্গত বাঘাউড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐ দেশ প্রথম মহীপাল দেবের তৃতীয় বর্ষ, অর্থাৎ দশম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত সমতট নামে পরিচিত ছিল।১৬

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, বঙ্গাল দেশের উল্লেখ দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে, এমন কি সপ্তম শতাব্দীতেও পাওয়া যায়। সুতরাং ত্রিপুরা জেলা প্রাচীন বঙ্গালদেশের অন্তর্গত ছিল না।

বঙ্গালদেশের প্রাচীন অবস্থান ত্রিপুরারও পূর্ব্বে কিংবা উত্তরে খুঁজিতে হইবে। ত্রিপুরার দক্ষিণে সমুদ্র। ইহার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলা। এই চট্টগ্রামই কি বঙ্গালদেশ? চট্টগ্রামের নিকটে Bengala নামে একটি নগর ছিল ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এবং শ্রীযুত রায় চৌধুরী যে এই Bengala নগরীর চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্যকে বঙ্গাল বলিয়া অনুমান করেন, তাহাও বলিয়াছি। এখন আমরা দেখিতে চেষ্টা করিব, এই অনুমানের সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

অমর কোষের লিঙ্গাদি-বর্গে কেবল স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার, এরূপ বিয়াল্লিশটি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অমর ইহাদের কোন অর্থ নির্দ্দেশ করেন নাই। পরবর্ত্তী টীকাকারগণ তাঁহাদের সময়ে ইহাদের যেরূপ ব্যবহার দেখিয়াছেন, তদনুরূপ অর্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে তিনটি শব্দ, 'তোরা (শুঁটকি মাছ), লট্‌ৱা (মৎস্য বিশেষ) এবং সিধ্মলা (শুঁটকি মাছ)' আমাদের বিবেচ্য।১৭ লট্‌ৱা চট্টগ্রামে খুব পাওয়া যায়। ইহা চট্টগ্রামবাসীদিগের খুব প্রিয় খাদ্য। তথায় ইহার সম্বন্ধে একটি প্রবচন প্রচলিত আছে। 'থানার মধ্যে পইট্যা, মাছের মধ্যে লইট্যা।' অর্থাৎ থানার মধ্যে পটীয়া থানা এবং মাছের মধ্যে লট্‌ৱা মাছ উৎকৃষ্ট। পটীয়া থানায় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাস। সিধ্মলা বা 'হিদল্ হুটকী' অর্থাৎ পুঠিমাছের শুঁটকি। চট্টগ্রাম এবং আরাকান প্রদেশে এই তিনটির খুব প্রচলন। চট্টগ্রামে শুঁটকি মাছ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হয় এবং অন্যদেশে প্রেরিত হয়।

অমর-কোষের প্রাচীন বাঙ্গালী টীকাকার সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটী ১১৬০ খৃষ্টাব্দে রচিত তাঁহার 'টীকাসর্ব্বস্বে' এ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন :— "সিধ্মলা সিধ্ম ইতি খ্যাত; যত্র বঙ্গাল বচ্চারাণাং প্রীতিঃ। কিলাসীতি চ।" ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, সর্ব্বানন্দের সময় সিধ্মলা বা শুঁটকি মাছ বঙ্গাল ও বচ্চারগণের প্রিয় খাদ্য ছিল। (১৮) বাঙ্গালদিগের সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গীয়গণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন—'বাঙ্গাল পুঁটিমাছের কাঙ্গাল।' এই প্রবচনের মূলেও বঙ্গালদিগের সিধ্মলা-প্রীতি অনুমান করা যাইতে পারে।

এই সকল কথা পর্য্যালোচন করিলে চট্টগ্রাম এবং আরাকান প্রদেশকেই প্রাচীন বঙ্গালদেশ বলিয়া মনে হয় না কি? এই আরাকান প্রদেশ যে এক সময়ে চন্দ্ররাজগণ দ্বারা শাসিত হইত, তাহা আরাকানে প্রাপ্ত চন্দ্রদিগের মুদ্রা ও খোদিতলিপি দ্বারা প্রমাণিত হয়।

আমাদের সন্দেহ হয়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের চট্টগাঞি (বর্ত্তমান চট্টোপাধ্যায়-দিগের গাঞি) ও এই চট্টগ্রাম একই স্থান। আশ্চর্য্যের বিষয়, চট্টোপাধ্যায়-দিগের অন্যতম প্রথম কুলীনের নাম বাঙ্গাল।১৯ এ কথায় অনেকেই আপত্তি করিবেন। তাঁহারা বলিবেন যে, রাঢ়ীদিগের চট্টগ্রাম রাঢ়েই, ইহা রাঢ়ের বাহিরে হইতে পারে না। গাঁইয়ের এরূপ অবস্থান সব সময় ঠিক নহে। বারেন্দ্রকুলজীতে দেখা যায়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় নরসিংহ শ্রীহট্টের লাউড় গ্রাম হইতে আসিয়া বারেন্দ্রদিগের লাউড়িয়াল বা নাড়িয়াল গাঁই সৃষ্টি করিয়াছেন।২০ অদ্বৈত প্রভু এই নরসিংহের বংশধর। আবার বাৎস গোত্রে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র এই উভয়ের মধ্যেই ঘোষ গাঞি দেখিতে পাওয়া যায়।২১ রাঢ়ীদিগের ঘোষগণ এখন ঘোষাল নামে পরিচিত। এই ঘোষগ্রাম কোথায়? রাঢ়ে না বারেন্দ্রে? ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন? উভয়েই যখন বাৎস গোত্রীয়, তখন ইহারা এক বংশীয় এবং একস্থান হইতে গিয়া থাকিবে এবং পূর্ব্ব বাসস্থানের নামানুসারে নূতন বাসস্থানের নামকরণ হইয়া থাকিবে। এরূপ আরও অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

Bengala নগরী সম্ভবতঃ বঙ্গাল দেশের রাজধানী ছিল। ইহার নামানুসারেই ইহার চতুঃপার্শ্বস্থ রাজ্য এবং তদধিবাসিগণ বঙ্গাল নামে পরিচিত হইয়া থাকিবেন।

ত্রিপুরা জেলা সমতটের অন্তর্গত হইলেও দশম শতাব্দীর পরে আর এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এই সময়ে এই স্থান বঙ্গাল দেশের রাজা চন্দ্রগণের রাজ্যভুক্ত হইয়া বঙ্গাল নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহার সমতট নাম লোপ পাইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীর রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয় লিপিতে আমরা গোবিন্দ চন্দ্রকে বঙ্গাল দেশের রাজারূপে দেখিতে পাই। অনেকের মতে, এই গোবিন্দচন্দ্র এবং 'ময়নামতীর গান' এবং 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের' গোপীচাঁদ, একই ব্যক্তি। গোপীচাঁদ ত্রিপুরা জেলার মেহারকুল পাটিকারার রাজা ছিলেন। এই প্রমাণেও ত্রিপুরা জেলা বঙ্গাল দেশের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। আবার পাঞ্জাবী প্রবাদ অনুসারেও গোপীচাঁদের বাড়ী ছিল গৌড়-বঙ্গাল দেশে।২২ নেপালে প্রাপ্ত 'গোপীচাঁদ নাটকে' দেখা যায়, বঙ্গকুমার কর্ত্তৃক গোপীচাঁদের রাজ্য আক্রান্ত হইয়াছিল।২৩ ইহা দ্বারাও জানা যাইতেছে যে, গোপীচাঁদের রাজ্য বঙ্গদেশ নহে। এই সব কারণে মনে হয়, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর হইতে আরাকান পর্য্যন্ত সমস্ত দেশই একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গাল নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপ চন্দ্রবংশের অধিকৃত হইয়াও কিন্তু বঙ্গাল নাম প্রাপ্ত হয় নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ চন্দ্রবংশের দুইটি বিভিন্ন শাখা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর ও পশ্চিমতীরে রাজত্ব করিত। নেপালে প্রাপ্ত গোপীচাঁদের নাটকও তাহাই প্রমাণ করিতেছে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে নানা স্থানে বাঙ্গাল শব্দের যে ব্যবহার দেখা যায়, তাহার কিছু ইঙ্গিত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

বাঙ্গালবড়া

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশ্বরূপ সেন দেবের সাহিত্যপরিষৎ তাম্র-শাসনে 'বঙ্গালবড়া' নামে একটি স্থানের উল্লেখ পাই। ইহার বর্ত্তমান নাম বাঙ্গ্‌রোড়া। বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে দেখিতে পাই, বিজয়গুপ্তের বাড়ী বাঙ্গ্‌রোড়া তক্‌সিমের ফুল্লশ্রী গ্রামে ছিল। বিজয়গুপ্ত গৌড়েশ্বর সৈয়দ হুসেন সাহার সমসাময়িক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক। এই বঙ্গালবড়া বা বড়-বঙ্গাল নাম হইতে মনে হয়, উহার নিকটে 'ছোট বঙ্গাল' নামেও একটি স্থান ছিল।

ডক্টর ফ্রাঙ্কের (Francke) Antiquities of Indian Tibet (Pt. II. Index. p. 28) নামক পুস্তকে পাঞ্জাবের কুলুজেলায় বঙ্গালবড়ায় ও ছোট বঙ্গাল নামক দুইটি স্থানের উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, লাহুলের (Lahul) পালবংশীয় জায়গীরদারগণ বলেন যে, ৮০০ বৎসর অতীত হইল রাণা নীলচাঁদ নামক এক ব্যক্তি বঙ্গালের কোলঙ্গ (Kelong) নামক স্থান হইতে আসিয়া লাহুলে বাস স্থাপন করেন। ঠিক ঐ সময়ে পালবংশীয় ঠাকুর রতন পাল বঙ্গালের গোন্ধ (Gondh) নামক স্থান হইতে ঐ স্থানে আগমন করিয়া তিনানে (Tinan) বাস স্থাপন করেন এবং নিজ পূর্ব্বনিবাসের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোন্দলা (Gondla) রাখেন। ইহার বংশধর ঠাকুর হীরাচাঁদ বর্ত্তমান সময়ে গোন্দলার জায়গীরদার। (ঐ, ২০২ পৃষ্ঠা)।

জানি না এই বঙ্গালবড়ার সহিত তাম্র-শাসনোক্ত বঙ্গালবড়ার কোন সম্পর্ক আছে কি না। যে সময় দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা মনে হয়, এই উপনিবেশ একাদশ শতাব্দীতে, অর্থাৎ পালরাজগণের অধঃপতনের সময় ঘটিয়াছিল। বঙ্গদেশ হইতে হিমালয় প্রদেশে এইরূপ অভিযান লক্ষ্মণ সেনের পতনের পরও দেখিতে পাওয়া যায়।

E. Atkinson তাঁহার Notes on the History of the Himalaya of the N. W. Province (Ch. III. p. 50 & IV. p. 20) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আলমোরা নগরস্থ যোগেশ্বর মন্দিরে মাধব সেনের তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। আবার বলেশ্বর মন্দিরে ভট্টনারায়ণ বংশীয় বঙ্গজব্রাহ্মণ রুদ্রশর্ম্মাকে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন আছে। ইহার তারিখ ১১৪৫ (১২২৩ খৃষ্টাব্দ)।২৪

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে দেখা যায়, রাঢ়ীয় বন্দ্যঘটী গাঞির অন্যতম প্রথম কুলীন ঈশান বন্দ্যোর এক পুত্রের নাম রুদ্র। এই মাধবসেন সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেনের পুত্র। পাবনা জেলার মাধাইনগর, যে স্থান হইতে লক্ষ্মণ সেনের মূলাভিষেক সময়ে প্রদত্ত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ এই মাধবসেনের রাজধানী ছিল।

বাঙ্গাল পাশ ও স্বল্প বাঙ্গাল পাশ

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"বন্দ্যবঙ্গে বামপার্শ্বে বাঙ্গালার আলী।
অধস্তনে কুল হল বাঙ্গালপাশ মেলী।"২৫

ইহার দ্বারা মনে হয় যে, বন্দ্যোদিগের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্গদেশের 'বাঙ্গাল পার্শ্বে' বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা উপরোক্ত সাহিত্য-পরিষৎ তাম্রশাসনে দেখিতে পাই যে, আবল্লিক পণ্ডিত হলায়ুধ, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ঘাঘরকাট্টি পাটকস্থ মহেশ্বর রাজপণ্ডিতের 'সর্বাস্তুভূ' ক্রয় করিয়াছিলেন। এই ঘাঘর-কাট্টি সম্ভবতঃ বরিশাল জেলার গৌরনদী থানার ঘাঘর নদীর তীরে অবস্থিত এবং ফরিদপুর তাম্রশাসনসমূহের প্রাপ্তিস্থান কোটালিপাড়ার নিকটস্থ ঘুঘরাহাটি একই স্থান। এই রাজপণ্ডিত মহেশ্বর এবং বন্দ্যোঘটীর প্রথম কুলীনদিগের অন্যতম মহেশ্বর বন্দ্যো অভিন্ন বলিয়াই মনে করি।

ধ্রুবানন্দ মিশ্র এই মহেশ্বর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —

"মহেশ্বরো মহাবিজ্ঞঃ শুচোচট্ট-সুতাপতিঃ
রাজ্ঞো লক্ষ্মণসেনস্য সভায়াং তিলকঃ কৃতঃ ॥ ৮ ॥"

এই মহেশ্বরের পুত্র মহাদেবও লক্ষ্মণসেন কর্তৃক 'প্রপূজিত' হইয়াছিলেন।২৬ ইহার পুত্র দুর্ব্বলী বন্দ্যো। দুর্ব্বলীর পাঁচপুত্র—অনন্ত, হরি, সঙ্কেত, নারায়ণ ও ভাস্কর। ইহাদের প্রথম চারিজনের সন্তানগণকে যথাক্রমে গয়ঘর, সাগরদিয়া, বাঙ্গালপাশ ও স্বল্পবাঙ্গালপাশ গ্রামের নামে পরিচিত দেখিতে পাই।২৭ তাহাতে মনে হয়, ইহারা ঐ সকল গ্রামে বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়ঘর ফরিদপুর জেলার দক্ষিণস্থ মাদারীপুর মহকুমায় অবস্থিত। সাগরদিয়া সম্ভবতঃ বরিশাল সহরের নিকটস্থ সাগরদিয়া গ্রাম। বাঙ্গালপাশ ও স্বল্প বা ছোট বাঙ্গালপাশ সম্ভবতঃ যথাক্রমে উপরোক্ত বাঙ্গালবড়া এবং ছোট বাঙ্গালের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম। ইহার কোনটি মহেশ্বর বন্দ্যোর ঘাঘর কাটী বা ঘুঘরাহাটী হইতে খুব বেশী দূরে নহে। বাঙ্গালপাশ-গ্রামী সঙ্কেতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রত্নাকর বাঙ্গালপাশ মেলের প্রকৃতি বা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালপাশ মেলের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে—"হইল বাঙ্গালামেল মগদোষ হেতু।"২৮ এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে আরাকানের মগ ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকর্ত্তৃক ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছিল। অনেকস্থান জনশূন্য হইয়াছে এবং অনেকে মগদোষ হেতু সমাজে অচল হইয়া রহিয়াছে। এখনও মঘী কায়স্থ, মঘী নাপিত প্রভৃতি দেখা যায়। বর্ত্তমান বাঙ্গরোড়া (প্রাচীন বাঙ্গালবড়া) পরগণায় অবস্থিত গৈলা গ্রামে (বরিশাল জেলা) এখনও বঙ্গপাশ পদবীক রাঢ়ী ব্রাহ্মণের বাস আছে।

বঙ্গাল রাগ, বঙ্গালী রাগিণী ও 'বঙ্গালী' সাধনা—মতবিশেষে সাধারণতঃ কুড়িটি রাগ প্রধান বা আদিম। তন্মধ্যে বঙ্গাল অন্যতম। ভরত ও হনুমন্ত মতে রাগ ছয়টি, তন্মধ্যে ভৈরব অন্যতম। বঙ্গালী রাগিণী এই ভৈরবের ভার্য্যা। বঙ্গালী ওড়ব, মতান্তরে সম্পূর্ণ। কল্লিনাথ লিখিয়াছেন :—

'বাঙ্গালী ঔড়বা জ্ঞেয়া গ্রহাংশন্যাসষড়্জভাক্।
রিধহীনা চ বিজ্ঞেয়া মূর্চ্ছণা প্রথমা মতা।
পূর্ণা বা মন্দ্রয়োপেতা কল্লিনাথেন ভাষিতা' ॥

সঙ্গীত নারায়ণের মতে বঙ্গাল রাগ করুণ ও হাস্য রসে গেয়।২৯ এই রাগটি বাঙ্গাল দেশের নামানুসারে হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ৺মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রকাশিত বৌদ্ধ সহজিয়া-মতের গানগুলির মধ্যে ভুসুকুপাদ রচিত 'সহজমহাতরু' ইত্যাদি গানটি বঙ্গাল রাগে গেয়।৩০ শাস্ত্রীর মতে এই ভুসুকু একাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী। ইনি স্বরচিত গানে নিজকে বাঙ্গালী বলিয়াছেন :—

['আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
[নিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী।' ৩১]

শাস্ত্রী বলেন 'সহজ মতে তিনটি পথ আছে : অবধূতী, চণ্ডালী, ডোম্বী বা বঙ্গালী।'৩২

আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন লিপিতে সহজিয়া মতের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া যায়, এই বাঙ্গাল দেশে ত্রিপুরা জেলার ময়নামতী পাহাড়ের নিকট প্রাপ্ত হরিকেলদেব-রণবঙ্কমল্লের তাম্রশাসনে। ইহার তারিখ শকাব্দা ১১৪১=১২১৯ খৃষ্টাব্দ।৩৩

বঙ্গাল বিদ্রোহ

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালগণ বিদ্রোহী হইয়া সোমপুর (বর্ত্তমান পাহাড়পুর, রাজসাহী) এবং নালন্দার কতিপয় বৌদ্ধ বিহার অগ্নিসাৎ করিয়া মগধে প্রবেশ করে। প্রথম মহীপালের মাতুল চাণক এই বিদ্রোহ দমন করেন। ৩৪

বাঙ্গাল মাঝি

প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথিতে বাঙ্গাল মাঝিগণকে লইয়া কৌতুক করা হইয়াছে। বাঙ্গালগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই নৌচালনা বিদ্যায় পটু। আজ পর্য্যন্ত নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলের লোকই অধিকাংশ ষ্টীমার ও সমুদ্রগামী জাহাজে সারেং, লস্কর ইত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে।

বাঙ্গাল

বঙ্গাল দেশের অধিবাসিগণই প্রকৃত বঙ্গাল বা বাঙ্গাল পদবাচ্য। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গাল শব্দের বহুল প্রচার থাকিলেও এতৎসম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নাই। কলিকাতাবাসিগণ যশোহর-খুলনা জেলার লোকদিগকেও বাঙ্গাল বলিয়া থাকেন। আবার যশোহর খুলনার অধিবাসিগণ বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণকে বাঙ্গাল বলেন। পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরবাসী-গণকে বাঙ্গাল মনে করেন। ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মোটামুটি ভাবে চব্বিশ পরগণা ভিন্ন গঙ্গার পূর্ব্বতীরবাসিগণই বাঙ্গাল নামে অভিহিত হয়। উপরে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে চট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চলই প্রকৃত বঙ্গাল দেশ এবং ঐ স্থানের অধিবাসীরাই প্রকৃত বাঙ্গাল। বাঙ্গাল কথাটির মধ্যে একটি অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমান। বল্লাল সেনের সমসাময়িক সর্ব্বানন্দ বন্দ্যোঘটীর উক্তি হইতেও ইহা প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কারণ কি?

বাঙ্গাল শৌর্য্যে বীর্য্যে এবং শিক্ষা দীক্ষায় হীন তাহা ত' মনে হইল না। বঙ্গজ-কায়স্থদিগের কুলজীগ্রন্থে বঙ্গাল দেশকে পাণ্ডব বর্জ্জিত, ম্লেচ্ছাচার

সমন্বিত এবং কুলাচারহীন বলা হইয়াছে। পাণ্ডবগণ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীরে পদার্পণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা মনে হয়, ঐ দেশ মহাভারতের সময়ে বৈদিক সভ্যতার বাহিরে ছিল। বৌদ্ধাচারকেই সম্ভবতঃ ম্লেচ্ছাচার বলা হইয়াছে। সেনদিগের সময়ে বঙ্গে হিন্দু আচার-ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গাল দেশে সম্ভবতঃ তৎকালেও বৌদ্ধাচার প্রচলিত ছিল। বল্লাল প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্যের প্রবর্ত্তন না হওয়াই বোধ হয় ইহারা কুলাচারহীন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। বাঙ্গালদিগের কথা ভাষাও পশ্চিম বঙ্গবাসীদিগের একটি ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

পাদটীকা

১। B. C. Law—*Ancient Indian Tribes*, Vol. II, ১—৮ পৃষ্ঠা।

২। H. P. Sastri—*Nepal Catalogue*, pp. LXXVIII—XXXI.

৩। *J. A. S. B.*—1873, ২১১-২১২ পৃষ্ঠা।

৪। আইন-ই-আকবরি, ২—১২০ পৃষ্ঠা।

৫। *Studies in Indian Antiquities*, ১৮৪—১৯২ পৃষ্ঠা।

৬। *Epigraphia Carnatica*, Vol. IX., Bangalore 96 (C. 1402 A. D.) এবং ঐ vol. V., Channavayapatna 179. (1190 A. D.)

৭। Sastri—Des. Cat. of Sans. Mss, Vol. VI, No. 470, ৩২১ পৃষ্ঠা; and Vol.VI., p. CCTXXXVI এবং Peterson's 2nd Report pp. 33 and 39.

৮। "চন্দ্রানামিহ রোহিতাগিরি ভুজাম্বচ্শে" Beng. Ins. Vol. III, ৪ পৃষ্ঠা)। কেহ কেহ এই রোহিতাগিরি ও সাহাবাদ জেলার রোটাসগড়কে এক বলেন। শ্রীযুত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে এই রোহিতা-গিরি, বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলার লালমাই পাহাড়।

৯। উত্তররামচরিতম, ৪র্থ অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য। I. H Vol. VII., ৩০৮ পৃষ্ঠা।

১০। *Catalogue of the Miniatures and Inscriptions of Ms. Add. 1643*, Cambridge. (Fol. 85, Vol. I)

১১। *Beng. Ins.* vol. III., ১৪১-১৪৭ পৃষ্ঠা।

১২। ঐ, ১২১ পৃষ্ঠা। *J. A. S. B*, Vol. VII., ৪৩-৪৬ পৃষ্ঠা।

১৩। পূর্ব্বস্মিন্ ব্রহ্মপুত্রশ্চ ইচ্ছামতী তথোত্তরে। মধুমতী পশ্চিমেচ সমুদ্র দক্ষিণে তথা। এতন্মধ্যেষু কায়স্থাঃ কার্য্যাচ্চ প্রবরাঃ স্মৃতাঃ। অন্যস্থান-স্থিতা যে চ ইতরাস্তে প্রকীর্ত্তিতা।

১৪। পাণ্ডবৈর্ব্বর্জ্জিতস্থানং ম্লেচ্ছাচারসমন্বিতং। নাস্তিভেদকুলাচার-সুসংস্থানেষু কদাচন। তৎস্থানবাসিনঃ সর্ব্বে বঙ্গালাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ। তস্মাত্তে চ কুলাচারাৎ বল্লালেন বহিষ্কৃতা। বঙ্গালেন সমং কর্ম্মং কুর্য্যাশ্চ বঙ্গজা যদা। জাতিভ্রষ্টা ভবেয়ুশ্চ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥

১৫। *I. H. Q.* Vol. IV., ৬৩৮ পৃষ্ঠা।

১৬। *E. I.* Vol. XVII., ৩৫৫ পৃষ্ঠা।

এই সময়ের পরে লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসনে 'সমতটীয় নদ' ভিন্ন অন্য কোথায়ও সমতটের উল্লেখ পাইয়াছি মনে পড়ে না। সম্ভবতঃ ইহার পরেই বঙ্গালদেশ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

১৮। সম্ভবতঃ 'কচ্চর' শব্দ লিপিপ্রমাদে 'বচ্চর' হইয়াছে। এই 'কচ্চর' বর্ত্তমান কাছাড়ের প্রাচীন নাম। 'ক'-এর আকড়ি লোপ পাইলেই 'ব'-এ পরিণত হয়। সুতরাং এইরূপ ভুল অসম্ভব নহে। তথায় শুঁটকি মাছের প্রচলন আছে, কিংবা ছিল কি না জানি না।

১৯। "বঙ্গরূপঃ সুতো নামাপারবিন্দো হলায়ুধঃ। বাঙ্গালশ্চ ততঃ খ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥" আদিত্যকান্তেব ... শ্রীযাকণ্ঠকঃ খ্যাতঃ শ্রীল হিরণ্যকঃ সুমতিকঃ কণ্ঠাজ বাঙ্গালকঃ (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ, ১২৫ এবং ১৩৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা)।

২০। ঐ, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বিবরণ, ২১৫-২১৯ পৃষ্ঠা।

২১। রবির্মিইন্দ্রা সুরভিশ্চ যোগঃ কবিঃ পৃথিব্যাঃ বলু শিঙ্গলাঃ (রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণের ১১৮ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় ধৃত হরি মিশ্রের বচন)— "ঘোষ গ্রামে তথাদীবং, বোথুড়া কালীছড় মৌলিকা তথ্যৈবেচীড়, নানস্বর সুথৈবচ। শিবহট্টা বৈশালীচ, চতুর্ব্বিংশতি বিখ্যাতা, বাৎস্য গোত্র সমুদ্ভবা" (কুল শাস্ত্র দীপিকা, ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠা, রায় বাহাদুর যদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত)।

২২। *Proceeding of the Sixth Oriental Conference*, ২৬৭ পৃষ্ঠা।

২৩। ঐ, ২৭৩ পৃষ্ঠা।

২৪। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, ৩১৭ পৃষ্ঠা।

২৫। পরেশ নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত, ২৯০ পৃষ্ঠা।

২৬। মহাবংশ বা মিশ্রগ্রন্থ, ২য় সমীকরণ।

২৭। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ; ১৬১-৬২ পৃষ্ঠা।

২৮। ঐ, ১২৪ পৃষ্ঠা।

২৯। ডক্টর রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, ১ম ভাগ ১১৮ পৃষ্ঠা। ৩য় ভাগ, ৪৩৪ এবং ৪৪২ পৃষ্ঠা।

৩০। বৌদ্ধগান ও দোহা, ৬৬ পৃষ্ঠা।

৩১। ঐ মুখবন্ধ, ২৩ পৃষ্ঠা।

৩২। ঐ, ঐ, ১২পৃষ্ঠা। ভুসুক পাদের ৪৯ সংখ্যক গানে 'অদ অ বঙ্গাল'-এর ব্যাখ্যায় টীকাকার 'অদ্বয় বঙ্গাল' লিখিয়াছেন (৭৩ পৃষ্ঠা)।

৩৩। *I. H. Q.* Vol. IX., ২৮৬ পৃষ্ঠা।

৩৪। *Indian Culture*, Vol. I., ২৯১-২ পৃষ্ঠা।

টু-লেট

—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তারকনাথ ছিল নিতান্ত ভাল মানুষটী। আর না হইয়াই বা করে কি, গিন্নীর আয়ের উপরেই সংসার চলিত। নিজের এক পয়সা আয়ের উপায় কিছু ছিল না, কাজেই গতিকে পড়িয়া ভাল মানুষটী সাজা ছাড়া আর উপায় ছিল না।

আজ সাত বৎসর হইল তারকনাথের চাকরী-বাকরী কিছুই নাই। পোর্টক্যানিং কোম্পানীতে পঁচিশ টাকা মাইনের একটি চাকুরী ছিল, তাও বছর আষ্টেক হইতে না হইতে সেবারের রিডাক্‌সানের হাঁচকা টানে ছুটিয়া গিয়াছে বেচারার চাক্‌রী সেই হইতে আর হাজার চেষ্টা করিয়াও জুটাইতে পারে নাই তারকনাথ।

গিন্নীর আয় অর্থে আর অন্য কিছু নয়—এই বাড়ীখানি গিন্নীর পৈত্রিক সম্পত্তি। গিন্নী ছিলেন তাঁহার পিতামাতার সবে-ধন নীলমণি রতনমণি, কাজেই তাঁহাদের অবর্ত্তমানে এখন গিন্নীই হইয়াছেন মালিকা—ভোগদখলকারিণী।

বাড়ীখানি ছোট্ট একতালা। চারিটি মাত্র কুঠরী, একটি কল, একটি পায়খানা; ইহার ভিতর দুইটি ছিল গিন্নীর ব্যবহারের জন্য, আর দুইটি কুঠরী ভাড়া দিতেন। ঐ ভাড়ার আয়ই ছিল চলার একমাত্র সম্বল।

আবার এই ভাড়াটীয়া যেমন তেমন যে সে ভাড়াটীয়া হইলে চলিবে না। অমনি গিন্নীর মত সন্তানহীনা শুদ্ধ দুটি স্বামী স্ত্রীতেই বাস করে, পাচটা হাঁংড়া প্যাংড়া ছেলে পুলে থাকিলে চলিবে না, এমন ভাড়াটীয়া হওয়া চাই।

তারপর যে ভাড়াটীয়া থাকিবে, সে ভাড়াটীয়া বাবুটীর হওয়া চাই গবর্ণমেণ্ট চাকুরে, ঠিক্ যেন মাসের পয়লা তারিখে ভাড়াটী হাতে আসে, আর তিনি হইবেন নিতান্ত ভাল মানুষ—যেমন তারকনাথ, আর ভাড়াটীয়া গিন্নীর হওয়া চাই শুদ্ধাচারিণী। হো হো করিয়া উচ্চ হাসি থাকিবে না, হাঁচা পাঁচা থাকিবে না আর সহৃশীলা। এমন ভাড়াটীয়া না হইলে সে ভাড়াটীয়াকে গিন্নী বাড়ী ঢুকিতে দিতে রাজী নন।

শুধু ইহাই হইলে গিন্নীর বাড়ীর তিনি উপযুক্ত ভাড়াটীয়া হইলেন না। গিন্নী ছিলেন কিছু মুখরা ও ছুঁচিবাইগ্রস্তা। সামান্য একটু খুটীনাটী ত্রুটীতেই একেবারে অগ্নিশর্ম্মা, বকর বকর করিতেই থাকেন, অতি সহজে বা দুইটা কথায় তাহা মিটিয়া যায় না।

তারপর ভাড়াটীয়ারা যদি কোনও প্রকারে অশুচি অবস্থায় কল-চৌবাচ্চা ছোঁয়, কি বাসি কাপড়ে তাঁহার ঘর বারাণ্ডায় আসে, অথবা হঠাৎ তাঁহার দখলের কোনও কিছু ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে ত' আর রক্ষা থাকিবে না, ভাড়াটীয়ার চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত অন্ত হইবে।

সর্ব্বদা ঘর দ্বার রাখিতে হইবে পরিষ্কার ফিট্‌ফাট। সকাল সন্ধ্যা ছিটাইতে হইবে সর্ব্বত্র গঙ্গাজল। তারপর যিনি ভাড়াটীয়া থাকিবেন, তাঁহার যেন কোনও আত্মীয়-কুটুম্ব কেহ না থাকে, যখন তখন আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া খোস গল্প, হাসি-হল্লা এ সব কিছু এখানে চলিবে না।

ভাড়াটীয়া সম্বন্ধে এই সমস্ত নিয়ম-কানুন তিনি অনেক হিসাব করিয়াই করিয়াছেন। একে ত' তিনি সত্যই ছুঁচিবাই-গ্রস্তা ও খিট্‌খিটে মেজাজের, (ইহা তাঁহার পিতৃকুলগত)। তাহার উপর গিন্নী থাকিবেন বাড়ীর সামনের অংশে আর পিছনের অংশে থাকিবে ভাড়াটীয়া। যখন তখন লোকজন আসিয়া কড়া নাড়িলেই সামনের কাছে গিন্নীই থাকেন, তাঁহাকেই উঠিয়া দরজা খুলিতে হয়, খবরদারী করিতে হয়। এঝঞ্চাট তিনি মোটেই পোহাইতে চান না। আবার তাহার উপর ভাড়াটীয়ার অংশে যাইবার রাস্তা গিন্নীর রান্নাঘরের গা দিয়া। যে কোন জাত শুচি কি অশুচি তাহার ঠিক নাই, সকালে রান্নাঘর ছুঁইয়া যাইবে, এই বা কেমন করিয়া সহ্য করিবেন?'

তাহার পর ঘরের ভাড়া। দুখানা ছোট ছোট ঘরের মাসিক ভাড়া দশ দুগুণে কুড়ি টাকা, আর রান্নাঘরের বাবদ পাঁচ টাকা, তাই পঁচিশ টাকা। তারপর এই বাড়ীখানার বাৎসরিক কর্পোরেশন ট্যাক্স ও মেথরের মাহিয়ানা হিসাব করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ নিজের দিকে রাখিয়া বাকী অর্দ্ধাংশ মাসিক

ভাড়ার সহিত হিসাব করিয়া ভাড়াটীয়াকে দিতে হইবে। অর্থাৎ ভাড়াটীয়ার মাসিক ভাড়া ছাব্বিশ টাকা, এগার আনা, তিন পয়সা।

যদিও কালে-ভদ্রে গিন্নীর সব বিষয়ে মনোমত না হউক, ঐ রকম স্বামী-স্ত্রী ভাড়াটীয়া জুটিত, কিন্তু গিন্নীর এই সব আইন-কানুন মানিয়া চলিয়া ভাড়াটীয়ার টিকিয়া থাকা অসম্ভব হইত। কেহই তেরাত্তির বাস করিতে পারিত না, দুইদিনেই তল্পী তল্পা লইয়া সরিয়া পড়িত।

তারকনাথের এ সব সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার অধিকার ছিল না, কারণ গিন্নীর পৈত্রিক সম্পত্তি তারকনাথের পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, কাজেই গিন্নীরই একচেটিয়া ক্ষমতা। বিশেষতঃ গিন্নী নাবালিকা নন, সম্পূর্ণ সাবালিকা। যা কিছু আয়-ব্যয় সবই গিন্নীর হাতে। তারকনাথ খালি ভাড়াটীয়া সংগ্রহ করিয়া গিন্নীর কাছে আনিয়া দিয়া খালাস। তারপর যা কিছু কথাবার্ত্তা, ভাড়াটীয়াকে কসিয়া, মাজিয়া, বাজাইয়া লওয়া সে সবই গিন্নী করিবেন।

কিন্তু এই ভাড়াটীয়া সংগ্রহ করিয়া না আনিতে পারিলে তারকনাথের লাঞ্ছনা তিরস্কারের অন্ত থাকিত না।

গিন্নীর এই সব আইন-কানুনের ঠেলায় বছরের ভিতর প্রায় ন' মাসই বাড়ী খালি পড়িয়া থাকিত আর তার জন্য বেচারা তারকনাথ তিরস্কার খাইয়া মরিত। সে-ই উপযুক্ত ভাড়াটীয়া সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে না বলিয়াই না কি বাড়ীখানি পড়িয়া থাকে!
অথচ বেচারা ভাড়াটীয়াদের সাথে কোনও কথা বলে না, খালি গিন্নীকে ভাড়াটীয়া আনিয়া দিতেই থাকে।

বেচারা তারকনাথ গিন্নীর এই অযথা তিরস্কারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য গিন্নীর আড়ালে ভাড়াটীয়া আসিলে তাহার সঙ্গে অনেক কিছু সম্বন্ধ পাতাইয়া লয়, অনেক কিছু তোয়াজ খাতির করে, অনেক উপদেশ দেয়, যাহাতে সে শীঘ্র উঠিয়া না যায়। তাহা হইলে গিন্নীর আর কি, বিপদ্ বাড়িবে তাহারই। কিন্তু তাহাতেও তারকনাথের উদ্ধার নাই। তেমন করিতে গিয়া দু-দুবার গিন্নীর কাণে সে কথা প্রবেশ করায় তারকনাথ বেশ ঘা খাইয়াছে, কাজেই আর এখন সে দিকেও যাইবার উপায় নাই।

তারকনাথের বয়স যদিও পঞ্চাশের ভিতর, এখনও বৃদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, দুশ্চিন্তায় আর রোগে তারকনাথকে করিয়া ফেলিয়াছে অতি বৃদ্ধেরই মত।

কোনও ভাড়াটীয়া আসিলে সে যে বয়সেরই হউক না কেন, তারকনাথের চেয়ে সে বড়ই হোক আর ছোটই হোক, সবাইকে সে করিয়া লইত তাহার বড়। প্রথমেই তারকনাথের সঙ্গে ভাড়াটীয়ার আলাপ হইত—'দেখুন, আপনি নিশ্চয়ই বয়সে আমার বড় হবেন, তা বেশ হয়েছে, আপনার মত একটি প্রবীণ লোকই ভাড়াটে চাই। তা হলে দেখছি আমার স্ত্রী আপনার স্ত্রীর ছোট ভগ্নীর মত। তাঁর এমন কতকগুলি রসিকতা আছে যা সাধারণ লোক শুনলে মনে করেন, 'আমার গিন্নী বুঝি ভারী ঝগড়াটে, মুখরা। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা নয়, ওঁর অমনিই স্বভাব। সেই জন্যেই বলছি, ওসবগুলো আপনার স্ত্রীর ছোট ভগ্নীর রসিকতা বলেই মনে করবেন ঝগড়া বলে মনে করবেন না।'

ভাড়াটীয়া ভদ্রলোক হাসিয়া বলেন, 'তা হ'লে ত আপনি আমার ভায়রা হলেন দেখছি।'

তারকনাথ হো হো করিয়া একগাল হাসিয়া বলে, 'তা যা মনে করেন, তা যা মনে করেন। তা ত বলতে পারেন অথবা ওর নাম কি, ওটা উল্টে আমাকে আপনার স্ত্রীর ভ্রাতা বলেও মনে করতে পারেন, যা হয় একটা মনে করতে পারেন, ও ওটাও যা, এটাও তাই—ও সব একই কথা, তা বেশ, তা বেশ, এই ত চাই আমি। এমনি হলেই আমার গিন্নী ভারি খুসী হবেন, তা এমনি যেন চিরদিনই মনে করেন, আমার গিন্নীর একটু উগ্রভাব দেখলে অন্য কিছু মনে করবেন না, ওটা মনে করবেন ও-ও আপনার স্ত্রীর ভগ্নীরই হোক, অথবা আপনার স্ত্রীর ভ্রাতৃবধুরই হোক, ঐ রকম একটা কিছু মনে করবেন। ওসবই রসিকতা।'

ভদ্রলোক হাসিয়া বলেন, 'তা হলে আপনার স্ত্রীকে ঠিক কি বলে ডাকব? দুটোই ত আর একসঙ্গে ডাকা চলবে না। একটা ধরে ত' ডাকতে হবে?'

তারকনাথ আবার একগাল হাসি হাসিয়া বলে, 'তা ঠিক, তা ঠিক, দুটোর কোন্‌টা বলে ডাকবেন, সে কথা ঠিক বটে, দুটো ত' আর একসঙ্গে ডাকা চলে না। আচ্ছা গিন্নীকেই ডাকি, তাঁর কাছেই জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কোন্‌টা বলে

ডাকলে খুসী হন। ওগো! ও গিন্নী গো! একবার এদিকে এস ত' গো বাবা! এই এই···তোমায় উনি ডাকছেন। হাঁ দেখুন, আর একটা কথা, আমাদের মধ্যে যে সম্বন্ধই ধরুন না কেন, উনি অর্থাৎ আমার গিন্নী একটু ছুঁচিবাইগ্রস্ত আছে, তার জন্যে মনে কিছু করবেন না। এটা অবশ্য আমাদের বাঙ্গালী ঘরে, বিশেষতঃ, হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে থাকাই উচিত। বিশেষ দরকার। দেখবেন উনিই তু'দিনে আপনার ওনাকে শিখিয়ে নেবে সব, তার জন্যে হয় ত আমার উনি আপনার ওনাকে একটু আধটু তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে পারেন, তার জন্য যেন আপনার উনি মনে কিছু না করেন।'

এমন সময় গিন্নী মাজার হাত দিয়া বিরক্তিপূর্ণ মুখভঙ্গী করিয়া মাথার অর্দ্ধেকাংশে একটু ঘোমটার মত দিয়া দরজার পাশে আসিয়া দাঁড়ান, চাপা জলদগম্ভীর স্বরে দরজার আড়াল হইতে বলেন, 'অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন গা? কি হয়েছে?'

তারকনাথ একগাল হাসিয়া বলে, 'ষাঁড় নয় গিন্নী, ষাঁড় নয়, আমি।' তারপর আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া আবার একগাল হাসিয়া বলে—'এই দেখলেন ত' আপনার ওঁর রসিকতা, এই রকমই দিনরাত চলবে আর কি, তার জন্য মনে কিছু করবেন না।'

ভদ্রলোক একবার আড়চোখে দরজার দিকে তাকাইয়া লইয়া নীরবে রসিকতা উপলব্ধি করিতে লাগিলেন।

তারপর তারকনাথ গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া বলে, 'তা দেখ গিন্নী! বাবা···এই তোমার উনি বলছেন, তোমাকে কি বলে ···বলে ডাকবেন?'

গিন্নী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'ডাকবেন আবার কি বলে, উনি আমার সাত পুরুষের কুটুম না গুরুঠাকুর যে, আমাকে তাই বলে ডাকবেন। ভাড়া দেবেন থাকবেন, ব্যস্ চুকে গেল লেঠা, এর ভিতর আবার ডাকাডাকির কি আছে?'

তারকনাথ আবার একগাল হাসিয়া ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলে, 'শুনলেন আপনার ওনার রসিকতা? উনি ঐ রকমই—উনি ঐ রকমই—ওঁর রসিকতাও ঐ রকম।

তারপর গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া তারকনাথ বলিল, 'তা যাও যাও গিন্নী, সে যা হয় হবে, সে যা হয় করে নিও তুমি, মানিয়ে নিতে পারলেই হল, আমার আর কি—আমাকে আড়ালে অন্য সময় যা হয় ব'লো, এখন থাক।'

গিন্নী আড়াল হইতে তারকনাথের উপর দাঁত মুখ খিঁচাইয়া হাত-পা নাড়িয়া চাপাকণ্ঠে বলিলেন, 'তোমার যদি কেউ হয় তুমি তাই বলে ডেকো, আমার অত কুটুম্বিতার দরকার নেই', বলিয়া ফর্ ফর্ করিয়া স-শব্দে চলিয়া গেলেন।

গিন্নীর এ চাপা আওয়াজ ভীষণ সমুদ্রগর্জ্জনের ন্যায় ভদ্রলোকের কর্ণে প্রবেশ করিল। ভদ্রলোক বাড়ীওয়ালা গিন্নীর রসিকতা শুনিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিলেন, আর টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। এই যদি গিন্নীর রসিকতা হয়, তাহা হইলে না জানি রাগ কেমন জিনিষ?

ইহাও গিন্নীর রসিকতার মধ্যে—তারকনাথ ভদ্রলোককে তাহা বুঝাইবার জন্য আবার খানিকটা হো হো করিয়া হাসিল।

২

পাঁচ মাসের মধ্যে একটি ভাড়াটীয়াও আসিতেছে না, ঘরখানি পড়িয়াই আছে। ইহার জন্য সহরের সারা অলিগলি, পার্কের গেট, বাড়ীর দেওয়াল, গ্যাস-পোষ্টের গায় "টু-লেট" লটকাইতে বাকী নাই। বড় বড় অক্ষরে সর্ব্বত্র লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে,—নিষ্ঠাবান ছোট্ট ভদ্রপরিবারের বাসোপযোগী এমন সুরম্য স্থান অতীব বিরল, ভাড়াটীয়া পরম আত্মীয়ের মতই ব্যবহার পাইবেন, সর্ব্ববিষয়ে বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে, ভাড়া যৎসামান্য।

কিন্তু ইহাতেও তারকনাথের নিস্তার নাই। গিন্নী সর্ব্বদাই তারকনাথকে অকর্ম্মণ্য, কোনও যোগ্যতা নাই, খালি বসিয়া বসিয়া খাইবে ইত্যাদি সুমধুর সম্ভাষণ করেন, আর তাহার সহিত তারকনাথের স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণকেও উপযুক্ত প্রণামী মধুর ঝাঁপতাল রাগিণীতে শিব-নৃত্যসহ শুনাইতে ছাড়েন না।

কিন্তু তারকনাথ কি করিবে? বেচারাকে সমস্ত দিন সহরের রাস্তায় রাস্তায় ভাড়াটীয়ার সন্ধানে ছুটাছুটি করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সেই একই কথা শুনাইতে হয়—'পেলুম না', আর গিন্নীও সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়ার ফলও বেশ ষোড়শোপচারে দিয়া দেন। সহ্য করা ছাড়া তারকনাথের উপায় নাই।

৩

সে দিন সকালে উঠিয়া তারকনাথের বড় পেট ব্যথা করিতেছিল। তাই সে দিন আর ভাড়াটীয়ার চেষ্টায় যাইবে না মনস্থ করিয়াছে। কিন্তু সে কথা গিন্নীকে বলিবার উপায় নাই, তাহা হইলে গিন্নী আর রক্ষা রাখিবে না। কাজেই তারকনাথ গিন্নীকে আর কোনও কথা না বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া খান কয়েক বাড়ী বাদে একটা বাড়ীর বারান্দায় চুপটী করিয়া বসিয়া ভাবিল, এ বেলাটা এখানে কাটাইয়া যাইবে, গিন্নীকে গিয়া বলিবে, ভাড়াটীয়া খুজিতে গিয়াছিলাম। কিন্তু তারকনাথের এমন দুর্ভাগ্য যে, অন্য দিন গিন্নী স্নান করিয়া ফিরিয়া আসেন ঐ পাশের গলিটা দিয়া, কোনও দিনও এ পথ মাড়ান না, আর আজ হঠাৎ এই রাস্তা দিয়াই ফিরিয়াছেন। তারকনাথ গিন্নীর চোখে পড়িতেই সম্মুখে বিষধর সর্প কি ব্যাঘ্র পড়িলে মানুষ যেমন আঁৎকাইয়া উঠে, তারকনাথ তেমনি আঁৎকাইয়া উঠিয়া আর কোনও দিকে পালাইবার উপায় না দেখিয়া সেই খানে বারাণ্ডার উপরই চিৎ হইয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভাবিল, বোধ হয়, গিন্নী দূর হইতে ঠিক চিনিতে পারে নাই, শুইয়া পড়িলে আর এ দিকে লক্ষ্য করিবে না, চলিয়া যাইবে। কিন্তু আজ তারকনাথের বরাতে নিতান্তই কিছু আছে, কেমন করিয়া তাহার খণ্ডন হইবে ?

গিন্নী তারকনাথকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে আসিয়া খানিক ক্ষণ মাজায় হাত দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, 'হাঁ গো! তুমি ঘুমিয়ে না জেগে ?'

তারকনাথের নড়ন-চড়ন কি সাড়া-শব্দ কিছুই নাই, তেমনি চোখ বুজিয়া কাঠ হইয়াই পড়িয়া রহিল।

গিন্নী না-ছোড়, আরও গলা চড়াইয়া দিয়া বলিলেন, 'তুমি জেগে না ঘুমিয়ে ?'

তারকনাথ দেখিল, এবার আর গিন্নীর কথায় জবাব না দিলে হইবে না, শেষটা হয় ত গিন্নীর চেঁচামেচিতে লোক-জন জড় হইয়া পড়িলে আরও মুস্কিলে পড়িতে হইবে। ভয়ে ভয়ে করুণ স্বরে চোখ বুজিয়াই তারকনাথ বলিল, 'ঐ জাগা-ঘুমোনোর মাঝখানে পড়ে আছি বাবা! ঠিক ঘুমও না, ঠিক জাগাও না।'

'কেন এখানে পড়ে আছ কেন ? কি হয়েছে তোমার ? উঠে বাড়ী চলে এস।'

তারকনাথ দেখিল, গিন্নী অনেকটা ভদ্রতা করিয়াছে, এখানে আর বিশেষ কিছু গণ্ডগোল করিল না। তবে তার মনের ভয় ঘুচিল না। বাড়ী লইয়া গিয়া ঘরে পুরিয়া যা ঝাল ঝাড়িবে, তখন টিকিতে পারিলে হয়।

উঠানে পা দিয়াই গিন্নী নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, 'এই বুঝি তোমার ভাড়াটীয়া খোঁজা ? এমনি করে রোজই এসে বুঝি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বল ?'

তারকনাথ পেটে হাত দিয়া চাপিয়া উঠানে বসিয়া পড়িয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'না গিন্নী! আমি তোমার সাথে কখনও মিথ্যা বলি না গিন্নী! আজ বড্ড পেটে ব্যথা ধরেছিল, তাই ওখানে গিয়ে বসে একটু জিরুচ্ছি-লাম বাবা!'

গিন্নী আজ আর ভাড়াটীয়ার কথা লইয়া বিশেষ কিছু বাড়াবাড়ি করিল না, তারকনাথকে অন্য দিক্ দিয়া ধরিল। 'বলি হাঁ গা! তুমি কি পাগল না কি ? যখন তখন যেখানে সেখানে বাবা বলে ডাক কেন ? ঘরের ভেতর যা বল তা বল রাস্তা-ঘাটেও তাই ?'

'ভুল হয়েছে গিন্নী, ভুল হয়েছে, আর বলব না। তবে জান কি গিন্নী ওটা আমার কথার মাত্রা···গিন্নী, মাত্রা।'

'এত যদি মাত্রা দিয়ে কথা বলবার সাধ তবে আমায় বিয়ে করেছিলে কেন ? আর খবরদার অমন বল না বলছি।'

'তা বলতে পারি না গিন্নী! ও মাত্রাটা ছাড়তে পারব বলে মনে হচ্ছে না। ওর জন্যে তুমি কোন ক্রটী নিও না।'

'তা মাত্রা দাও আর যাই কর, ঘরের ভিতর কেউ দেখতে শুনতে আসে না। কিন্তু বাইরে কথা বলতে গেলে ও মাত্রাটা বাদ দিয়ে ব'ল।'

'কেমন করে বুঝব গিন্নী তুমি ও রাস্তা দিয়ে আসবে, কখনও ত ও-রাস্তা মাড়াও না।'

'তাই বুঝি ঐ খানেই বসে ভাড়াটীয়া খোঁজা হচ্ছিল ?'

'তা—তা—গিন্নী পেট-ব্যথায় মরে যাচ্ছিলাম।'

গিন্নী তারকনাথের এ গুরুতর অপরাধ আজ হঠাৎ কি ভাবিয়া ক্ষমা করিয়া লইয়া বলিলেন, 'কিন্তু মনে থাকে যেন আর কখনও এমন ক'র না। আমার ভাড়াটে চাই।'

'না বাবা! আর হবে না, এই আমি খেয়েই ভাড়াটের চেষ্টায় বেরুচ্ছি।'

৪

মাস পাঁচেক ঘোরার পর এবার তারকনাথ একটি মনোমত ভাড়াটীয়া পাইল। ভদ্রলোকটি বোবা, কথা বলিতে পারেন না, পূর্ব্বে গবর্ণমেন্টের চাকুরী করিতেন, এক্ষণে পেন্সন্ পাইতেছেন। চাকুরী ছাড়ার কিছুদিন পর শক্ত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া বোবা হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার গিন্নীটি বদ্ধ কালা, কানের কাছে ঢাক পিটাইলেও শুনিতে পান না। ছেলে-পুলে কিছু নাই।

এমন একটি সুন্দর ভাড়াটীয়া পাইয়া তারকনাথের আনন্দের সীমা রহিল না। ভাবিল, যেমন গিন্নী, তাহার উপযুক্ত ভাড়াটীয়াই মিলিয়াছে, এ ভাড়াটে আর উঠিবে না, গিন্নী যাই করুক না কেন, ইহারা সে সব রসিকতা বেশ হজম করিতে পারিবে।

আনন্দে তারকনাথ ভাড়াটীয়াকে লইয়া গিন্নীর নিকট হাজির করিল। গিন্নীর সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করিয়া ভদ্রলোক স-স্ত্রীক আসিয়া গৃহ প্রবেশ করিলেন। তারকনাথ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

গিন্নীর বাড়ী ভাড়াটীয়া থাকার নিয়ম—পূর্ব্বে এক মাসের ভাড়া জমা রাখিয়া তবে তিনি ঘরে ঢুকিবেন, নচেৎ নহে। এ ভাড়াটীয়ার বেলায়ও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

যদিও বার মাসের ভিতর ছয় সাত মাস গিন্নীর ঘর খালি পড়িয়া থাকিত, ভাড়াটীয়া হইত না, তাহা হইলেও গিন্নীর বিশেষ লোকসান হইত না, ভাড়াটীয়া আসিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেই গিন্নী তাঁহার ঝাঁপতাল-নৃত্য দেখাইয়া রসিকতা আরম্ভ করিতেন, সেই ঠেলায় ভাড়াটীয়া তেরাত্রির পার হইবার পূর্ব্বেই তল্পি-তল্পা লইয়া পালাইত, তখন আর ডিপজিটের টাকার মায়া করিত না। কাজেই গিন্নী দুদিনে এক মাসের ভাড়াই পাইয়া যাইতেন।

ভাড়াটীয়া ভদ্রলোকটি বোবা ও গিন্নী কালা হইলে কি হয়, গিন্নীর মত অত শুদ্ধাচারী নয়। কর্ত্তার খাওয়া-সম্বন্ধে বাছ-বিচার কিছু ছিল না, আর তাঁহার গিন্নী ছিলেন তাঁহারই ছায়া। তিন দিন বাদে একদিন কর্ত্তার মাংসের জুস চাই। এটা যে শুধু তাঁহার না খাইলে হইত না এমন নহে, তাঁহার দুর্ব্বলতার জন্য ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপশান, কাজেই না খাইয়া তাঁহার উপায় ছিল না। অন্ততঃ তিনি তাহাই বলিতেন। তাই বলিয়া গিন্নী এ সব রান্নাঘরে হাঁড়ীতে তুলিতেন না। একটি তোলা-উনান ছিল, তাহাতে বারাণ্ডার এক ধারে পৃথক্ করিয়া রান্না করিয়া দিতেন।

সেদিন বাড়ীওয়ালা গিন্নী গিয়াছেন সকালে উঠিয়া গঙ্গা-স্নানে। স্নান আহ্নিক সারিয়া তাঁহার ঘরে ফিরিতে অনেকটা বেলা হইল। এদিকে ভাড়াটীয়া-গিন্নী বারাণ্ডায় তোলা-উনুনে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন কর্ত্তার জন্য মাংসের জুস। বাসন-কোসন সারা উঠানে ছড়ান রহিয়াছে। বারাণ্ডাটি এত ছোট যে, বাড়ীওয়ালা গিন্নীর রান্না-ঘরের দরজার সামনে ভাড়াটীয়া-গিন্নীর জুস্ রান্না ছাড়া আর উপায় ছিল না, এমন সময় বাড়ীওয়ালা গিন্নী উঠানে পা দিয়াই দেখিলেন, সারা উঠান-ভরা বাসন-কোসন এবং তাঁহারই দরজার সামনে মাংস সিদ্ধ হইতেছে—টেম্পার তাঁহার চরমে উঠিল।

তারকনাথ ইতিপূর্ব্বে ভাড়াটীয়া-গিন্নীর ঐ সব কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া চুপি চুপি বাড়ী হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল। বুঝিয়াছিল, আজ আর গিন্নী বাড়ী আসিয়া রক্ষা রাখিবে না। ভাড়াটীয়ার চৌদ্দপুরুষ অস্ত হইবে, আর তাহার শুধু চৌদ্দ পুরুষ অস্ত করিয়াই গিন্নী ঠাণ্ডা হইবে না, এই ভাড়াটীয়াকে আনার জন্য হয়ত তাহাকেও ঐ ভাড়াটীয়াদের সঙ্গে বিদায় করিবে। তাহার চেয়ে আগে হইতে সরিয়া পড়িলে তবু কতকটা সামনা-সামনি ঝাপটা হইতে রেহাই পাওয়া যাইবে।

বাড়ীওয়ালা গিন্নী স্বর সপ্তমে তুলিয়া ভাড়াটীয়া-গিন্নীর প্রতি ঝাঁটা হস্তে ধাবিত হইয়া বলিলেন, 'এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যা বলছি, ম্লেচ্ছ, অজাত, ছোটলোক!'

ঝাঁটা হাতে বাড়ীওয়ালা-গিন্নীকে বাহির হইতে দেখিয়া ভাড়াটীয়া-গিন্নী মনে করিলেন, উঠান পরিষ্কারের জন্য ঝাঁটা লইয়া আসিয়াছে। ভাড়াটীয়া-গিন্নী বাধা দিয়া বলিলেন, 'ও সব তোমায় করতে হবে না দিদি! ওসব মেথর এসে নিয়ে যাবে।'

বাড়ীওয়ালা গিন্নী আরও উত্তেজিত হইয়া ঝাঁটা ঘুরাইয়া বলিলেন, 'মর, আমি তোমার এঁটো পরিষ্কার করতে যাচ্ছি বুঝি, এত কপালও হয়েছে আমার! ছোট মুখে বড় কথা, এত বড় স্পর্দ্ধা, বেরোও বলছি এখনই আমার বাড়ী থেকে।'

ভাড়াটীয়া-গিন্নীর কাণে কিছুই প্রবেশ করিল না। তিনি বাড়ীওয়ালা-গিন্নীর মুখভঙ্গীতে এই বুঝিয়া লইলেন যে, বোধ হয়, বাহিরে বারাণ্ডায় রাঁধিতে নিষেধ করিতেছে, ঘরে লইয়া গিয়া রাঁধিতে বলিতেছে, তাহাই বুঝিয়া ভাড়াটীয়া-গিন্নী উনান-সহ জম্‌ বাড়ীওয়ালা-গিন্নীর রান্না-ঘরে লইয়া গেলেন ও হাসিয়া বলিলেন, 'তাই বল দিদি! আমি কিছু কাণে কম শুনি কি না।'

'ওরে আমার কি হল রে, জাত-জন্ম সব গেল রে, অজাত ভাড়াটে এসে আমার কি সর্ব্বনাশ করলে রে,—আমার রান্নাঘরে মাংস সিদ্ধ করছে রে, ইত্যাদি' বলিয়া বাড়ীওয়ালা-গিন্নী চিৎকার আরম্ভ করিলেন।

বাড়ীওয়ালা-গিন্নীর চীৎকারে পাড়ার লোকজন জড় হইয়া গেল। সকলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি, কি, কি হয়েছে গা?'

বাড়ীওয়ালা-গিন্নী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া নিজ মাথা-কপাল ভাঙ্গিয়া, মাথার চুল ছিঁড়িয়া বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ দেখ তোমরা। ভাড়াটে এসে আমার রান্নাঘরে মাংস সিদ্ধ করছে। তোমরা সকলে মিলে এক্ষুণি ভাড়াটে দূর করে দাও।'

সকলে মিলিয়া অতিকষ্টে ভাড়াটীয়া-গিন্নীকে বুঝাইল, 'এখানে ও সব চলবে না, বাড়ীওয়ালা-গিন্নী নিষেধ করছে।'

ভাড়াটীয়া গিন্নী বলিল, 'তা কেমন করে হবে, আমার কর্ত্তার এ যে ওষুধ, ডাক্তার খেতে বলেছে।'

এ কথার উত্তরে পাড়ার লোক কি বলিবে? যে যাহার মত সরিয়া পড়িল।

তারকনাথ এতক্ষণ আশে পাশে থাকিয়া ব্যাপার লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার সাহস হয় নাই যে, এ সময়ে গিন্নীর সমক্ষে হাজির হয়। সে যখন বাড়ীর সামনে আসিল, তখন বেলা দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। তারকনাথ দেখিল, সেই সকালের ভিজা কাপড়েই গিন্নী উগ্রমূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে। ঠেলাগাড়ী-ভর্ত্তি ভাড়াটীয়ার জিনিষ-পত্র বাঁধা-ছাঁদা, আর ভাড়াটীয়া কর্ত্তা-গিন্নী একটি রিক্‌শায় উঠিতেছেন।

তারকনাথ দেখিয়া হাঁপ ছাড়িয়া মনে মনে বলিল, 'যাক্‌, তবু তেরাত্তির কাটিয়াছে। এত দীর্ঘ দিন কোন ভাড়া-টীয়াই আজও পর্য্যন্ত টিকে নাই।

তারকনাথ আবার টু-লেট্‌-এর সাইন-বোর্ড ঘরে লট্‌-কাইয়া দিল। কাল হইতে আবার রীতিমত ভাড়াটীয়ার খোঁজে বাহির হইতে হইবে।

যে-শতাব্দী সম্মুখে তোমার

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অভিশপ্ত নিখিলের ছন্দোহীন জীবনের রুদ্ধ আর্ত্তনাদ
কর্ণে আসে রাত্রি-দিন, সর্ব্বহারা হয়েছে উন্মাদ,—
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরি' সভ্যতার সুতীক্ষ্ণ শাসনে
আমার প্রাণের কাব্য বন্দিনী জানকী সম কাঁদিতেছে অশোকের বনে—
আজি তার নাহি কোন স্থান,
সবলের কশাঘাত সহিতেছে নিরানন্দে, দুর্ব্বিষহ দুঃখ অপমান।
তাই মনে অভিলাষ ধ্বংস করে যাব এই বিংশ শতাব্দীর
দানবীয় সভ্যতারে
প্রলয়ের দীপক ঝঙ্কারে
গাহিবে শক্তির গান গীতচ্ছন্দা সর্ব্ব বাধা টুটি'
এ দিনের অবসানে,
সে গানে হিমাদ্রি খসি' লুটাইবে ধরিত্রীর ধূলি তলে
সর্ব্বনাশী রুদ্র অভিযানে।
সেই তো আনন্দ মোর—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অহঙ্কারী
আমার চরণে তার ঢেলে দিবে তপ্ত অশ্রুবারি।

ক্ষুদ্র বলি উপহাস করিয়াছে যারা মোর পিতৃ-পিতামহে,
আমার সত্ত্বারে কভু দিল নাক ঠাঁই,
বক্ষে মোর প্রতিদিন যারা বজ্র দিতেছে বেদনা,
মর্ম্মে মর্ম্মে তীব্র ব্যথা পাই,
আমার কাব্যেরে যারা, আমার ধর্ম্মেরে যারা,
আমার সত্যেরে যারা অসুন্দর কহে,
তাহাদের পথ বাহি চলিয়াছে মোর গ্রহ-উপগ্রহ তারা,
তৃতীয় পাণ্ডব সম চিত্ত মোর ক্লৈব্যভরা নহে।

সহস্র বৎসর পরে যে-শতাব্দী সম্মুখে তোমার
আনিতেছে বিভীষিকা স্বার্থ-প্রয়োজনে
দুর্নিবার মিথ্যার ভাষণে
প্রাণের পরম সত্য দিল বিসর্জ্জন,
সে আজ বপন
করিছে কণ্টক-বীজ তোমারি অলক্ষ্যে।
আগামী যুদ্ধের বক্ষে
সে কণ্টক-মহীরুহ জাগাইবে তীব্র হাহাকার।

ক্ষোভে তাই দাবাগ্নির মত ওঠে মোর চিত্ত জ্বলি'
অশেষ দুর্গতি লভি
ভবিষ্যের অন্ধকার ছবি
আমি হেরি অন্তরে আমার,
যুগ-সভ্যতার অভিবন্দনার ছিন্ন করি ঘৃণ্য পুষ্পহার
বাজাইয়া বেদনার বীণ
আনিব সুদিন।
ক্ষণজীবী মানবের গর্কোদ্ধত আস্ফালন
চূর্ণ হবে মোর পদাঘাতে,
দস্যুর লুণ্ঠিত ধনে যে-প্রাসাদ হয়েছে রচনা
ধ্বংস হবে মোর বক্র আঁখিপাতে।
শাশ্বত কালের স্রষ্টা আমি কবি নিখিলের লাগি
আত্মদান করি মোরে বিষ-বাষ্প মুখে,
নাহি মৃত্যু মোর, মধুপেরা ব্যর্থ হয়ে যায় ফিরে দুখে।

জাপানী কবিতা

—শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ

কয়েকটি জাপানী কবিতার অনুবাদ করিতেছি। বলা বাহুল্য যে, ইহারা ইংরাজী অনুবাদ হইতে গৃহীত হইয়াছে। অনুবাদের অনুবাদ হইলেও এই কবিতাগুলিতে জাপানী কবিতার স্বল্পাক্ষরতা ও ভাবমাধুর্য্য বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কবিতাগুলি প্রাচীন, জাপানী ভাষায় ইহাদের tanka (তঙ্কা ?) বলা হয়। খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দী বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে এই জাতীয় কবিতা জাপানে লিখিত হইয়া আসিতেছে। জাপানী চারুশিল্পে যে আড়ম্বর-বিরলতার পরিচয় আছে, কাব্যক্ষেত্রেও তাহা লক্ষণীয়। যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের জন্য উল্লেখ প্রয়োজন, তঙ্কায় ৩১টি করিয়া অক্ষর বা syllable থাকে। পাঁচটি পংক্তিতে ইহারা সমাপ্ত। অক্ষরের সংখ্যা প্রতি পংক্তিতে যথাক্রমে ৫, ৭, ৫, ৭, ৭। ইংরাজী কাব্য-সাহিত্যের epigram বা বাংলার কণিকা জাতীয় কবিতার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আছে, তবে জাপানী তঙ্কার বিশেষত্ব এই, যে লঘু বা তুচ্ছভাব হইতে অতি গম্ভীর ভাবও এই সমস্ত কবিতায় সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তঙ্কাজাতীয় কবিতাকে প্রাচীন জাপানী কাব্যের বাহন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চেরিপুষ্পের ন্যায় জাপান-বাসীদের জীবনে ইহারা যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়াইয়া আছে। জাপানী পুরুষ এবং মহিলা কবি মিলিয়া এই সকল তঙ্কা রচনা করিয়াছেন।

ক্ষুদ্রাবয়ব হইলেও এই কবিতাসমূহের কাব্য-সম্পদ্ উপেক্ষার নহে; ক্ষুদ্র পুষ্পনিহিত মধুর সৌরভের মত ইহাদের ভাব হৃদয়-মন মাতাইয়া তুলে। নিম্নে ইংরাজী ও বাংলা অনুবাদ সহ একটী মূল জাপানী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"Idete inaba
Nushi naki Tado to
Narinatomo
Nokiba no ume To
Hara wo wasarana".

'When I am gone away
Masterless my dwelling
Though it become,
Oh, plum-tree by the eaves
Forget not thou the spring'.

আমি যখন দূরে চলিয়া যাইবে,
গৃহ আমার প্রভুহীন হইব,
তখন হে গৃহচূড়াস্থ লগ্ন প্লাম (বদরী ?) বৃক্ষ
তুমি যেন বসন্তকে ভুলিও না।

জাপানী কবিতাটি পড়িবার সময়ে প্রথম পংক্তির idete শব্দের i অক্ষরটি বাদ দিতে হইবে।

কয়েকটি প্রেমের কবিতা লিপিবদ্ধ করা গেল। প্রেম-ভাবসুলভ সকল প্রকার সুকুমার এবং সূক্ষ্ম অনুভূতিতে এই কবিতাগুলি পরিপূর্ণ। সুরভি-মধুর শুভ্র-কোমল বকুল পুষ্পের মতই ইহারা লোভনীয়। জাপানীরা যে কেবল যুদ্ধ করেন না, তাঁহারা যে প্রেম করিয়াও থাকেন এবং অত্যন্ত নিবিড়ভাবে, ইহাদের মধ্যে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় আছে।

প্রেম, কে তোমারে দিল হেন
অপরূপ নাম
মৃত্যু আর ভালবাসা
নহে কি সমান ?

একাধারে বিষামৃতময় প্রেমের অপরূপত্ব স্পষ্টাক্ষরে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। নীচের কবিতাটিতে উপমার চমকটি লক্ষ্য করিতে হয়,

যে ক্ষণমুহূর্ত্ত তরে বিদ্যুৎ চমক্‌ভরে
ঝলি' উঠে শরতের শ্যামশস্পবন,
তোমারে কি ভুলি প্রিয়, ক্ষীণায়ু সে-ক্ষণ ?

বাঁচিতে না পারি কাল জানি মনে মনে—
আলোক থাকিতে তাই আজিকে গোপনে,
দু'ফোঁটা চোখের জল করিব মোচন
তারি তরে, চলে গেছে যে প্রিয়-স্বজন।

কে দিল নৈরাশ্যে ভরি সারা দেহ মন!
প্রদোষ আঁধারে যবে
বসে আছি তারি তরে এল না যে জন,
সে কি কভু হতে পারে
শীতের তীক্ষ্ণতা ভরা দুরন্ত পবন?

বসন্তের আগমনে যেমন তুষাররাশি
নিঃশেষে গলিয়া যায়,
তেমনি হৃদয় তব মিলুক আমাতে আসি
সারাটি পরাণ চায়।

কেমন ক'রে যাবে একা
এ শরতে গিরিসীমানায়?
কঠিন যাহা এতখানি
ছিনু যবে মোরা দু'জনায়।

পদাঙ্গুলে ভর করি'
একান্ত গোপনে সখি,
চাহিনু তোমার পানে,
নিদ্রিত কুসুম বুকে
নীরব চন্দ্রমা যথা
স্নিগ্ধ কর দিঠি হানে।

কবিতাটিতে যেন চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল পুষ্প-সৌরভ বিকীর্ণ হইতেছে। সৌন্দর্য্যের স্নিগ্ধতায় মন ভরিয়া উঠে।

নীরবে ঘুমায়েছিনু ভাবিয়া তোমারে
হেরিনু তোমারে তাই স্বপন মাঝারে।
স্বপ্নে শুধু কাটে যদি জীবন আমার
মন কভু চাহিবে না জাগরণ আর।

কত না যতন করি স্বপনে মিলিব বলি,
নিদহীন আঁখিতারা নিশীথিনী যায় চলি।

গোধুলি ঘনায়ে আসে; মুক্ত মম গৃহদ্বারে
কাটে বেলা শান্ত-প্রতীক্ষায়,
কোন্ সে প্রিয়ের লাগি? যে জন কহেছে মোরে
দেখা দিবে স্বপন-সীমায়।

প্রেমিক হৃদয়ের বিরহ-ব্যাকুলতা এবং মিলন-উৎকণ্ঠার ছবিটি বড় মধুর ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে।

রচিব প্রণয়-স্বপ্ন মোরা গৃহ-কোণে?
নিশীথ বেলায় যবে চন্দ্রমা পড়িছে ঝরি'
'ইনামী' প্রান্তর পরে মুস্তাতৃণ বনে?

সৌন্দর্য্যের অবাধ এবং অজস্র প্রকাশের মধ্যে যে প্রেমের স্থিতি এবং প্রেমিক হৃদয় যে প্রকৃতির দূরপ্রসারী সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রেমাস্পদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, কবিও তাহা এই কবিতায় বলিতে চাহিয়াছেন। গোপন প্রেমের কথা দুইটি কবিতায় চমৎকার বলা হইয়াছে :—

গুপ্ত গিরিরন্ধ্র মাঝে, পুষ্পসম নিত্য রাজে
বিকশিত মোর প্রেম,
প্রাচুর্য্য রসেতে ভরা আঁখিতে পড়ে না ধরা
অজানিত মোর প্রেম।

নীরবে ঝরে গো যাহা বহিঃপ্রকাশহীন
হৃদয়-কুসুম তাহা কুটিয়া গোপন লীন।

উপরের কবিতাসমূহে রোমান্টিকতার অপরূপ পরিচয় রহিয়াছে। প্রেমিক হৃদয়ের সৌন্দর্য্য-সকরুণ, অশ্রু-সজল, স্বপ্নমধুর যে ছবিটি ফুটিয়াছে, তাহা সত্য সত্যই অনির্ব্বচনীয় কাব্য-রস সৃষ্টি করিয়াছে। প্রেমাস্পদকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া প্রেমিক জনের এই বিরহ-মিলন-ব্যাকুলতা সকল দেশের মানব-মনকে স্পর্শ করে এবং যে রসোদ্রেক করে, তাহা মনকে বিমল আনন্দে ভরিয়া দেয়। মাত্র কয়েকটি কবিতা এখানে উল্লিখিত হইল, বলা বাহুল্য যে, জাপানী সাহিত্যে এরূপ অজস্র কবিতা আছে।

একটি কবিতায় আনন্দমুখ্য নশ্বর জীবনের কথা বলা হইয়াছে :—

ঝিল্লী, তোমার পুলক গানে
কেমন করে বলবে বল,
ত্বরায় তোমার চপল জীবন
মরণ মাঝে টলমল!

অপর একটি কবিতায় দেখা যায়, বাস্তবতা ও স্বপ্ন কবির কাছে এক হইয়া গেছে; স্বপ্নমুগ্ধ কবি তাই বলিতেছেন :—

বাস্তবতা সত্য নহে,—এ কথা সবে জানি,
স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন হবে, কেমন করে মানি?

একটি শোক-কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। কবিতাটির রচয়িতা Yumagami no Ollura। প্রায় ১১ শত বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। কবির শিশুপুত্র মারা গিয়াছে; অসহায় দুর্ব্বল শিশু, অজানিত, পিচ্ছি

লতা-দুর্গম মৃত্যু-পুর-পথে কেমন করিয়া চলিবে! তাই কবি মৃত্যু পুর-দ্বার-রক্ষীকে মিনতি জানাইতেছেন :—

অজানিত মৃত্যুপুর
গহ্বর অতল,
কেমনে চলিবে শিশু
তরুণ দুর্ব্বল?
মৃত্যুপুর-দ্বাররক্ষী,
মিনতি আমার—
স্নেহভরে নিয়ো তারে'
দিব পুরস্কার।

পুত্রবিয়োগ-কাতর পিতৃহৃদয়ের মর্ম্মান্তিক শোক-বিহ্বলতা কবিতাটির মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এরূপ কবিতা সত্যই দুর্লভ। ১৯ শত বৎসর পূর্ব্বে সার্দ্দিসের কবি Diodorus Zonas অনুরূপ একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি :—

"Do thou, who rowest the boat of the dead in the water of the reedy lake, for Hades, Stretch out thy hand, dark Charon, to the son of Kingras, as he mounts the ladder by the gangway and receive him. For his sandals will cause the lad to slip and he fears to set his feet naked on the sand of the shore."

শরবনপূর্ণ হ্রদে নরকাভিমুখী শব-সরণীর চালক হে কৃষ্ণ চারণ, কিংরাদের তনয়কে পার্শ্বস্থ সোপান আরোহণ কালে তুমি হাত দুইখানি বাড়াইয়া অভ্যর্থনা কর; কেননা সমুদ্রতীরের বালুকায় নগ্ন-পদস্পর্শ করিতে সে ভয় পায়, অথচ উপানতের জন্য বালকটির পা পিছলাইয়া যাইবে।

কিন্তু ইহা কাল্পনিক, কারণ Son of Kingras, Adonais ব্যতীত অপর কেহ নহেন। ইহার সহিত প্রথম কবিতাটির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু প্রথমটির মধ্যে যে শোক-বিহ্বলতা একান্ত ভাবে সত্য, দ্বিতীয়টিতে তাহা কল্পনা মাত্র।

এতদ্ভিন্ন জাপানী সাহিত্যে Naga-uta, Henka প্রভৃতি জাতীয় নানা ছোট বড় কবিতা আছে। বারান্তরে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নেতা, না অভিনেতা

—শ্রীমোহিনী চৌধুরী

বল এ কি তব ভণ্ডামি নয়, এর মূলে কোন সত্য প্রেরণা আছে?
তোমার মৌনী ধ্যান-দৃষ্টিতে সত্যশিবের নির্দ্দেশ মিলিয়াছে?
ত্যাগ ও সেবার ধর্ম্ম নিয়াছ নহে কি কেবল মিথ্যা মন্ত্র-মোহে;
স্বার্থ-প্রতিমা কর নাই পূজা পরোপকারের সীমাহীন সমারোহে?
তোমার কর্ম্মে মুক্তি পেয়েছে তোমার মনের সহজ চিন্তাধারা,
নিষ্ঠা তোমার শুভ আদর্শ, সত্য কি তব জীবনের ধ্রুবতারা?
অকপটে তুমি নর-নারায়ণে দিয়াছ তোমার প্রাণের অর্ঘ্য আনি?
বল, তুমি কোন্ মহাদেবতার লভিয়াছ চির পুণ্য আশীর্ব্বাণী।

বল, বল তুমি নিষ্পাপ কি না, বল, বল তুমি নহ বিশ্বাসঘাতী;
কল্যাণ-ব্রত লও নাই তুমি বিশ্বপ্রেমের ক্ষণিক নেশায় মাতি'।
সুবিধা-বাদীর হীন চাতুর্য্যে সত্য কি তব আছে সুতীব্র ঘৃণা?
বল তুমি তব স্বরূপখানিরে ঢাকিয়াছ কোন ছদ্ম-বসনে কি না।
তুমি তো দুষ্ট প্রতারক নও, সত্য কি তুমি নির্ম্মল সাধুচেতা?
দুর্ভাগাদের সমব্যথী তুমি, তুমি যথার্থ নেতা, নও অভিনেতা?
খ্যাতির লালসা নাই তব মনে, তুমি কি নীরবে পরহিত করি চল?
তুমি কি প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবক, সে কথা আজিকে স্পষ্টকণ্ঠে বল।

বাঙ্গালায় বর্গী

—নিখিলনাথ রায়

নবাব বাঁকিপুর হইতে শিবির তুলিয়া, জৈনুদ্দীন, সৈয়দ আহম্মদ, আতাউল্লা খাঁ এবং সিরাজউদ্দৌলাকে সঙ্গে লইয়া নহবতপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাঁকিপুর হইতে যাত্রাকালে পথি-মধ্যে যদিও একজন মহারাষ্ট্রীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, তথাপি দূর হইতে তাহাদের কোলাহলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা অগ্রসর হইয়া নবাব সৈন্যের খাদ্য দ্রব্যাদির উপর পতিত হয় ও কিয়দংশ লুণ্ঠন করিয়া নিমেষমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। পরদিন পার্শ্বস্থ সৈন্যগণকে কামান-বন্দুক দ্বারা সুরক্ষিত এবং প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীকে সম্মান প্রদানে উৎসাহিত করিয়া নবাব বিপক্ষদলনে যাত্রা করিলেন। সম্মুখস্থ সৈন্যগণের পরিচালনের ভার মীরজাফর খাঁ ও সমসের খাঁর উপর অর্পিত হয়। তাঁহাদের দক্ষিণ পার্শ্বে আতাউল্লা খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ এবং বাম পার্শ্বে জৈনুদ্দীন এবং আমেদ খাঁ অবস্থিতি করিতেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খাঁ, সাজাহান ইয়ার এবং ওমার খাঁ পার্শ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। রহিম খাঁ নবাবের পতাকাবাহী হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া পতাকারক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। নবাব নিজে, ফকীরউল্লা বেগ প্রভৃতি কতিপয় উপযুক্ত কর্ম্মচারী কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া মধ্যভাগে অবস্থিতি করিয়া সেই বিরাট অক্ষৌহিণী সহ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখীন হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু প্রথমতঃ বিপক্ষ-গণের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। পর দিবস প্রাতঃকালে বহুদূরে, গোলাপতনের সীমা অতিক্রম করিয়া কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য কতকগুলি অরক্ষিত গ্রামলুণ্ঠনে প্রমত্ত হইয়াছে দৃষ্ট হইলে, নবাব অগ্রসর হইয়া রাণী-সরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রঘুজী তথায় শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, নবাব সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইবেন। নবাবের সম্মুখভাগের সৈন্যাধ্যক্ষ মীরজাফর খাঁ ও সমসের খাঁ সহসা রঘুজীকে আক্রমণ করায় তিনি চমকিত হইয়া উঠেন। কিন্তু সেই দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীর কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অশ্বারোহণে বিপক্ষ সৈন্য মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার শরীর-রক্ষকগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিল এবং অন্যান্য সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া নবাবসৈন্যদিগের আক্রমণে বাধা দিতে লাগিল। মীরজাফর খাঁর সহিত তাহাদের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এইরূপ কথিত আছে, সমসের খাঁ যদি ঔদাসীন্য বা বিশ্বাসঘাতকতাচরণ না করিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ রঘুজীর রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিত। যাহা হউক, মীরজাফর খাঁ ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন শুনিয়া, নবাব নিজে তাঁহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা একে একে প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ করিল। অন্য দিকে আবদুল আলি খাঁ, গোলাম হোসেন প্রভৃতির স্বল্পসংখ্যক সৈন্যের সহিত কয়েক সহস্র মহারাষ্ট্রীয়ের যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল। যুদ্ধ ঘোরতর হইয়া উঠিলে, মেহেদী নেসার খাঁ, সৈয়দ আহম্মদের পতাকাবাহী হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, কতিপয় সৈন্যের সহিত আবদুল আলির সাহায্যের জন্য উপনীত হইলেন। উভয় পক্ষের বহুসংখ্যক সৈন্য রক্তাক্ত কলেবরে ভূতলে শায়িত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে রজনী উপস্থিত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতে লাগিল। নবাব গাঢ় নৈশ অন্ধকারে আর বিপক্ষগণের অনুসরণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া, সেই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করিলেন, কেবল তাঁহারই জন্য একটিমাত্র তাম্বু উত্তোলিত হইয়া-ছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ বৃক্ষতলে রজনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ সেই

যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইল। রজনীর অন্ধকারে কেহই ইতস্ততঃ গমনে সাহসী হইল না। তাহাদের খাদ্য-দ্রব্যাদি কোথায় রহিল, কেহই তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় নাই। আবদুল আলি খাঁ, গোলাম হোসেন খাঁ, আল্লা ইয়ার খাঁ এবং অন্যান্য কতিপয় কর্ম্মচারী নবাবের শিবির-রক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে নিকটস্থ প্রান্তরে তাঁহাদিগের খাদ্যদ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব সৈন্যদিগকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। প্রতিদিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সামান্য রূপ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। নবাব তাহাদিগকে যুদ্ধে নিরুৎসাহ দেখিয়াও প্রতিদিন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া কোন রূপ ফল না পাওয়ায় অত্যন্ত ক্লান্তি অনুভব করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিজে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকিয়া আপনার কর্ম্মচারিগণকে ভার প্রদান করিলেন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে লাগিল। এই সময়ে দুই জন আফগান কর্ম্মচারীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হয়। তাহারা সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁ।

আফগানদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় নবাব অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়াকাশ বিষাদমেঘে আবৃত হইয়া উঠিল। নবাব-বেগম নবাবের এরূপ অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিতা হইলেন। নবাব-বেগম অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিবেচনাশালিনী ছিলেন। তিনি সময় সময় নবাবকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং প্রয়োজন বোধ হইলে নিজে সাধ্যানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে যত্নবতী হইতেন। বেগম নবাবকে বিষণ্ন দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, নবাব এই উত্তর প্রদান করেন যে, আমার লোকদিগের মধ্যে বিরুদ্ধভাব দেখিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। নবাব-বেগম, নবাবকে এইরূপ দেখিয়া নিজে মজাফর আলি খাঁ বাহাদুর ও ফকীর আলিখাঁ নামক দুই ব্যক্তিকে দূতস্বরূপে রঘুজীর নিকট প্রেরণ করিলেন। যাহাতে উভয় পক্ষের মধ্যে আপাততঃ শান্তি স্থাপিত হয়, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা প্রথমে মীর হাবীবের নিকট উপস্থিত হইলে, মীর হাবীব তাঁহাদিগকে লইয়া রঘুজীর নিকট গমন করেন। এই সময়ে রঘুজী পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া মনে মনে শান্তির ইচ্ছা করিতেছিলেন। তিনি সে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উপক্রম করিলে, মীর হাবীব তাঁহাকে বাধা প্রদান করিলেন। মীর হাবীব আলিবর্দ্দীর অত্যন্ত শত্রু ছিলেন এবং তৎকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে তাঁহার অত্যন্ত প্রাধান্য থাকায়, রঘুজী তাঁহার উপদেশে স্বীকৃত হইয়া নবাব পক্ষের প্রস্তাব প্রত্যাখান করিলেন। মীর হাবীবের পরামর্শে তিনি মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তৎকালে দুর্ব্বল-প্রকৃতি নওয়াজিস মহম্মদ তথায় অবস্থান করায়, তাঁহারা অনায়াসে রাজধানী অধিকার করিতে পারিবেন, এইরূপ মনে করিয়াছিলেন। নবাব-সৈন্যগণও তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহাদিগের যাত্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামাদি হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্তির উপায় ছিল না। কারণ, মহারাষ্ট্রীয়েরা সেই সমস্ত স্থান ধ্বংস করিতে করিতে গমন করিতেছিল। বিশেষতঃ শোণ নদ অত্যন্ত পরিপূর্ণ থাকায় তাহা অতিক্রম করাও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। নবাব শোণের তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। মেটা যশোবন্ত নগর ও মীর গোলাম আশ্রফ নামক জৈনুদ্দীনের দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। যৎকালে নবাব-সৈন্য মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ করার জন্য আজিমাবাদ হইতে গমন করেন, তৎকালে তাঁহারা কোন কারণে আজিমাবাদে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক্ষণে সাহসে ভর করিয়া তাঁহারা নবাব-সৈন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে চতুর্দ্দিকে মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহিগণ কৃতান্তদূতের ন্যায় লুণ্ঠনব্যাপারে প্রবৃত্ত ছিল। তাঁহারা উভয়ে কতিপয় সাহসী সৈন্যের সহিত অগ্রসর হইলে, সেই কৃতান্তানুচরগণ প্রবলবেগে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা তাঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, তাঁহাদিগের এক প্রকার নগ্ন অবস্থায় পরিত্যাগ করে। যদিও তাঁহারা আপন আপন বীরত্ব ও সাহস প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র ফললাভ করিতে পারেন নাই। মেটা যশোবন্তের নাসিকাটি

তরবারির আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়। যাহা হউক এইরূপ ঘোরতর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও তাঁহারা অবশেষে নবাব-সৈন্যের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছিলেন। নবাব বহু কষ্টে আজিমাবাদে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ বাঙ্গলার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে জ্ঞাত হইয়া তিনি অবিলম্বে তাহাদিগের অনুসরণ করার জন্য ভাগলপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং চম্পানগরের নিকটস্থ নদীতীরে বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া শিবিরসন্নিবেশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রঘুজী পাঁচ ছয় সহস্র অশ্বারোহী সৈন্যসহ সহসা নবাবসৈন্যের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ তাহাতে অনুমাত্র ভীত না হইয়া পাঁচ ছয় শত সাহসী ও শিক্ষিত সৈন্যসহ রঘুজীকে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্যগণ পশ্চাতে অবস্থান করিতে লাগিল। দোস্ত মহম্মদ খাঁ নামক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অনেক বার মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। নবাব এক্ষণে তাঁহাকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। দোস্ত মহম্মদ নিরতিশয় উদ্যম-সহকারে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া কয়েক জনকে আহত, কয়েক জনকে নিহত ও কয়েক জনকে বন্দী করিয়া নবাবের নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রঘুজী জয়লাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ অনেক দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল। রঘুজী নবাব সৈন্যের সহিত আর যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভাগলপুর পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণ পার্শ্বের পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ পদদলিত করিয়া, মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলে, নবাব নওয়াজিস মহম্মদ খাঁকে সতর্ক হওয়ার জন্য পত্র লিখিলেন। পরে নিজে সসৈন্যে দ্রুতবেগে তাহাদের অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাত হইলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজধানীর নিকটস্থ ঝাঁপাইদহ ও জাফর খাঁর উদ্যান নামক গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া কাটোয়ার দিকে গমন করিয়াছে। নবাব দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া রাজধানীর নিকট আমানিগঞ্জে আপনার শিবির সন্নিবেশ করিলেন। পরে তথা হইতে কাটোয়ার নিকটস্থ রাণীসরাই নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিলেন। রঘুজী তাঁহার সে আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া, বাঙ্গলার পশ্চিম পার্শ্বস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করিলেন। নবাব তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এইরূপে পরাজিত হইয়া স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। কেবল মীর হাবীবের অধীন দুই তিন সহস্র মাত্র মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য ও ছয় সাত সহস্র আফগান সৈন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে ভীষণ শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া নবাব কিছুদিনের জন্য শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ক্রমান্বয়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নবাব নিজেও অবিশ্রান্ত যুদ্ধযাত্রায় এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, কিছুদিন বিশ্রাম না করিলে, তিনি কিছুতেই পূর্ব্বোদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। সেই জন্য তিনি কিছুদিন বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে তিনি সিরাজুদ্দৌলা ও এক্রামউদ্দৌলা ভ্রাতৃদ্বয়ের বিবাহব্যাপার সংসাধিত করিতে সংকল্প করেন। তৎকালে কতিপয় অবাধ্য জমীদারদিগকে দমন করার প্রয়োজনও হইয়াছিল। নবাব রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রেই উত্যক্ত প্রজাগণকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিলেন এবং আপনার সৈন্যদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন। প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারিগণও যথাসাধ্য সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ বিগত যুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শিতা প্রদর্শন করায়, নবাব তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। এক্ষণে তাঁহাকে ও মীর কাসেম খাঁকে সম্মানে ভূষিত করিলেন। তাঁহারা দুই জনই আপন আপন বীরত্বে ও কার্য্যদক্ষতায় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তৎকালে চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের প্রশংসা বিস্তৃত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বিহার প্রদেশস্থ রাণীসরাই নামক স্থানে রঘুজীর সহিত যুদ্ধকালে আফগান সেনাপতি সমসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রঘুজীর উপকার সংসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে সর্দ্দার খাঁরও বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশিত

হয়। নবাব তাঁহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া তিনি তাঁহাদিগের প্রতি আন্তরিক বীতশ্রদ্ধ হন।

কতিপয় কারণে নবাব তাঁহাদের বিশ্বাসঘাতকতা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা এই, যৎকালে রঘুজী মুর্শিদাবাদের চতুর্দ্দিকে এবং বীরভূম প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে বর্ষার অবসান হওয়ায়, নবাবসৈন্যের খাদ্যদ্রব্যাদি পরিপূর্ণ নৌকাসকল একেবারে মুর্শিদাবাদে না আসিয়া ভগবানগোলায় অপেক্ষা করিতেছিল। তথা হইতে স্থলপথে এই সমস্ত দ্রব্য আনীত হইবে এইরূপ স্থির ছিল। চতুর্দ্দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ অবস্থান করায় নবাব সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁর উপর দ্রব্যাদি আনয়নের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাদের অবহেলায় অনেক বার সেই সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠিত হয়। নবাব অবশেষে সৈয়দ আহম্মদ খাঁকে প্রেরণ করেন। তিনি সতর্কতাসহকারে তৎসমুদায় আনয়ন করেন। নবাব উক্ত আফগান কর্ম্মচারিদ্বয়ের এইরূপ আচরণ দেখিয়া তাহাদের প্রতি সন্দিহান হইয়া আপনার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে বলেন। ক্রমে উহাদিগের সমস্ত বৃত্তান্ত নবাবের কর্ণগোচর হয়। তিনি চর-প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, আতাউল্লা খাঁকে মহারাষ্ট্রীয়েরা আজিমাবাদের শাসনকর্তৃত্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছে এবং আজিমাবাদ অধিকারের জন্য সমসের খাঁ ও সর্দ্দার খাঁকে এক এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিপতি করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। যদি আজিমাবাদ অধিকৃত হয়, তাহা হইলে, উহাদিগকে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা ও দ্বারভাঙ্গা প্রদেশের জমীদারী প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া পত্রাদি প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু ইহাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, উক্ত আফগানদ্বয় আপনাদিগের রাজ্যলাভের পিপাসায় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের নিকট আবেদন প্রেরণ করিয়াছে। ফলতঃ যেরূপে হউক, মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত উহাদিগের সংযোগে সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। উহারা আপনা হইতেই কার্য্য পরিত্যাগ করুক অথবা উহাদিগের প্রতি সন্দেহ করিয়াই হউক, ১৭৪৬ খৃঃ অব্দে তাহাদিগকে নবাব-সৈন্য মধ্য হইতে দূরীভূত করিবার আজ্ঞা প্রদত্ত হয়। এইরূপে সেই বিশ্বাসঘাতক আফগানদ্বয়কে পদচ্যুত করিয়া নবাব নিজ সৈন্যমধ্যে শান্তি স্থাপন করিলেন।

হিমালয়

—শরিফুল ইসলাম

হে পাষাণ!
হে বিরাট হিমের আগার,
গর্বোন্নত শির তুলি মহাশূন্য প'রে,
আজো কার তরে—
ধ্যানমগ্ন ঋষি সম রহিয়াছ বসি,
নীরব নিশ্চলতায় হ'য়ে কণ্ঠ-হারা,
নয়নের ধারা—
নদীর আকারে ওগো কেন ব'য়ে যায়?
কার লাগি হায়!
মনের আগুনে শুধু জ্বলি দিবা নিশি,
হইয়াছে মসী,
বাহির ভিতর তব,—নিরেট পাষাণ!
তবু কি হ'ল না হায় ধ্যান অবসান?
হে বিরহি!
কেন রহি রহি,
এই কথা জাগে আজ শুধু মোর মনে,
কেন ক্ষণে ক্ষণে,
কোন্ সে আদিম যুগে মধুর লগনে,
কাহারে দেখেছ তুমি শারদ-গগনে,
যাহার প্রেমের লাগি কত বর্ষ ধরি,
নীরবে কাঁদিছ তুমি গুমরি গুমরি।
হে মৌনী পাষাণ!
হবে অবসান?
তোমার বুকের এ' বিরহের তাপ?
যাহার লাগিয়া তুমি
লইয়াছ চুমি,
তুহিন্-শীতল শত পাষাণের চাপ,
হে পাষাণ!
হে মহান্!
হেরি তোমা হয়ে সংজ্ঞাহীন
ভাবি নিশিদিন,
কোথা হতে এলে তুমি,
অসীম আকাশ চুমি
হিমের আশয়
ওগো হিমালয়।

অহিংসা ও তাহার লীলা
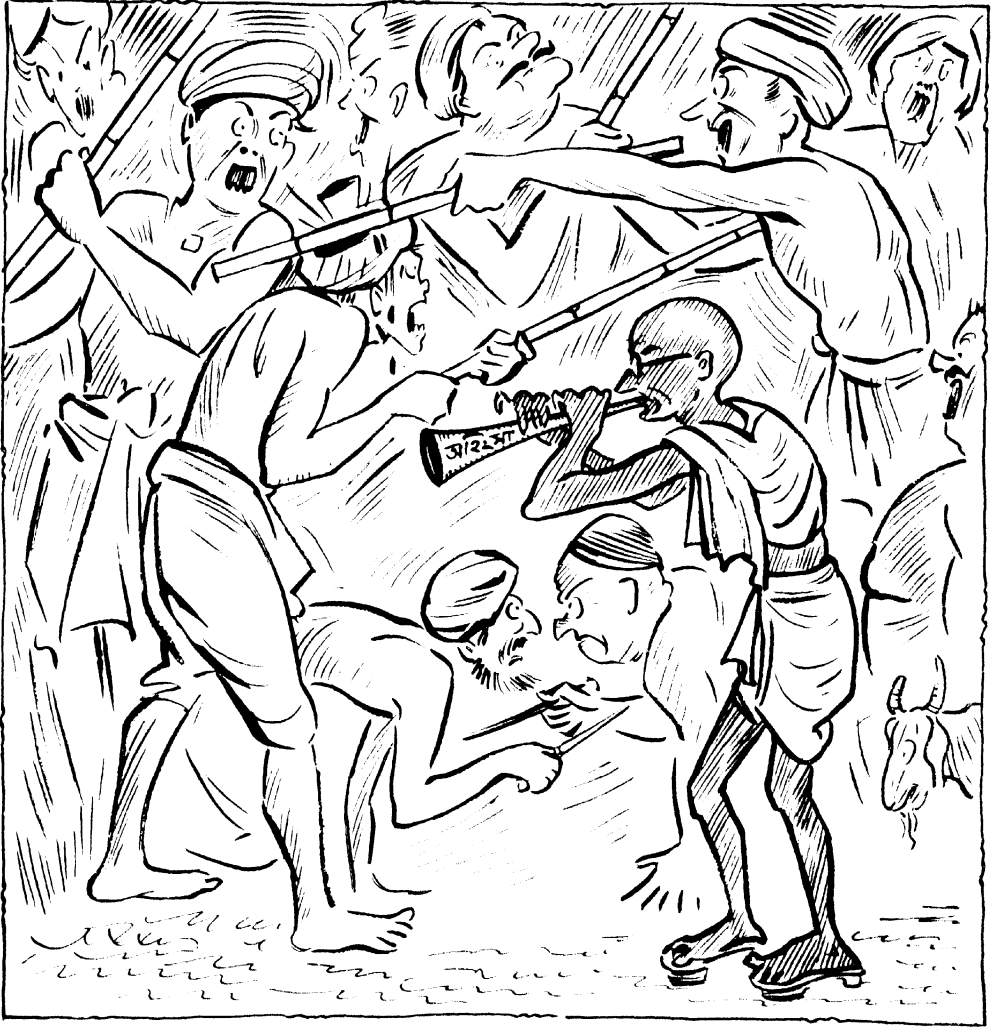
—এ কি তোমার লীলা না বাঁশীর খেলা

বুঝতে নারি গুণধাম···

রসেলীর 'লরেটনী'তে খদ্দর-প্রিয় কুমারদের বাহবা দান—এ হেন মণি-কাঞ্চন সংযোগে জাতীয়তা গজাবে না ত' গজাবে কিসে। অগণিত কুমার ঝাঁপ এ যজ্ঞে দেবে না! অলক্ষ্যে নয় লক্ষ্য মধ্যে, সুরূপিণীদের সুর-ঝঙ্কারে জাতীয়তা জননে জীবনীশক্তি নবরূপে প্রবাহিত হয়ে সারা দেশে নব-চেতনা জাগিয়ে তুলবে না!

দেশের এমনিনব-জাগরণের দিনে একদিন গণপতির বাড়ীতে হুলস্থূল কাণ্ড—রসেলীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিন গেল তার কোনও সন্ধান নেই।

দিন দিন করি পক্ষ চলি গেল…

কোথায় রসেলী! কোথায় রসেলী! আর কোথাই বা—থাক্ গে সে কথা।

পক্ষান্তে সংবাদপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত সবাই দেখলে, রসেলীর জ্বালাময়ী বক্তৃতা, "ভারতনারী-চেতনা"। বক্তৃতার মর্ম্ম—"ছিন্ন ভিন্ন কর সমাজ, দূর কর দেশের আচার ব্যবহার, ফিরে চেও না, তার দিকে—যাকে বলে ওরা ধর্ম্ম। স্বাধীন মনোবৃত্তি বলে এগোও সামনে, কর প্রাণ যা চায় তাই, বোঝ তোমার 'ইনার ভইস'ই তা ক'রতে বলছে তোমাকে—তার চেয়ে বড়—ধর্ম্ম না সমাজ? আমার কথাই বলি, এক পক্ষ আজ আমি গৃহত্যাগিনী। কারো মতামতের অপেক্ষা না করে ছুটে বেরিয়ে আমি পড়েছি বুকে দাবানল জ্বলে উঠতে। এমনি হ'তে হবে ঘরে ঘরে, তবেই ভারতের নারীচেতনা উদ্বুদ্ধ হবে।"

বক্তৃতা দেওয়া পার্ব্বত্য প্রদেশ আলমোরাতে। সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত—যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্রী।

রসেলী ব্যাপারে গণপতি একটা সমস্যার হাত থেকে বাঁচল। সুযোগ পেতেই বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে পুত্রীর কথা উল্লেখ করে গর্ব্ব প্রকাশই গণপতি করলে। গোল বাধল কিন্তু রসেলীর মাকে নিয়ে। খবর যখন পৌছল রসেলী আসছে, সাহেবকে তিনি জানিয়ে দিলেন—'কারও বাধার সৃষ্টি করতে আমি চাই নি, আমি চললুম, কাশীবাসিনী হ'ব—দেখি যদি শান্তি পাই।' গণপতির শত অনুরোধেও আটক তিনি রইলেন না।

জানিও সাহেবকে জানালে—'সাব্ হামারা ভি ছুট্টি।'

আলোচনা

গৌড়লেখমালা

কিছুদিন যাবৎ 'গৌড়লেখমালা' চতুষ্পাঠীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি অদ্যাপি ইহার একটা বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন না। পরীক্ষার পাঠ্য-গ্রন্থে কোনরূপ ভুল থাকা বাঞ্ছনীয় নহে। আজ আমি ঐ গ্রন্থের দুইটি ভ্রম প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমার কথাগুলি বিবেচনা করিবেন।

১। লেখমালাধৃত 'গরুড়স্তম্ভলিপি'র ঊনবিংশশ্লোকটি এইরূপ লিখিত আছে—

"কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুর্য্যং পশ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা তস্য।"

ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—[পাত্রাপাত্র-বিচার] কুশল গুণবান্ বিজিগীষু শ্রীনারায়ণপাল যখন তাহাকে মাননীয় মনে করিতেন—ইত্যাদি।

আমাদের মতে মূলের পাঠ—"কুশলো গুণান্ বিবেক্তুং"—এইরূপ হইবে—এবং অর্থ হইবে—গুণসমূহ বিবেচনা করিতে সমর্থ (দক্ষ) শ্রীনারায়ণ পাল নৃপতি যাহাকে বহুমান করিতেন—ইত্যাদি।

কারণ—লেখমালাধৃত-পাঠে আর্য্যার ছন্দোভঙ্গ (প্রথম পাদে ত্রয়োদশ মাত্রা) ঘটিয়াছে, অথচ অর্থসঙ্গতি হয় না বলিয়া পাত্রাপাত্রবিচার কথাটি উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইয়াছে। "কুশলো গুণান্ বিবেক্তুং"—বলিলে ছন্দোভঙ্গ হয় না এবং "বিবেক্তুং" ক্রিয়াটির কর্ম্মপদও উহ্য করিতে হয় না।

গ্রন্থমধ্যে গরুড়স্তম্ভলিপির যে ফটো আছে, তাহাতেও "কুশলো গুণান্ বিবেক্তুং" লিখিত আছে বলিয়াই আমার বোধ হইল।

২। অষ্টাদশ শ্লোক—

"জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ॥"

লিপির প্রথম শ্লোকটীর (বিষ্ণুঃ শাণ্ডিল্যবংশেঽভূৎ ইত্যাদি) ব্যাখ্যা উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় পাদটীকায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, "এই বংশোদ্ভব গুরবমিশ্র [অষ্টাদশ শ্লোকে] 'জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ' বলিয়া উল্লিখিত থাকায় এই বংশ রাঢ়ী-বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ সমাজের সুপরিচিত শাণ্ডিল্য বংশ হইতে পৃথক্ বলিয়াই বোধ হয়।"

সম্পাদক মহাশয়ের এই মন্তব্যের কোন তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারি নাই; কারণ—আমাদের মতে—জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ—বিশেষণটি রামের (উপমানীভূত পরশুরামের), উহা গুরব মিশ্রের নহে। যদি বা পদটিকে শ্লিষ্ট মনে করিয়া মিশ্রের পক্ষেও ব্যাখ্যা করিতে হয়, তবে জমন্ অগ্নিঃ যস্মিন্ কুলে—তস্মাদ্ উৎপন্নঃ—এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। তাহাতে কুলের সাগ্নিকত্ব-প্রতীতি হইবে। গুরবমিশ্র জমদগ্নির সন্তান এমন কথা বুঝাইবে না। গুরবমিশ্রের আট পুরুষের নাম গরুড়স্তম্ভলিপিতেই আছে। তাঁহাদের কাহারও নাম জমদগ্নি নহে। সাতপুরুষের নাম কীর্ত্তন করিয়া জমদগ্নির কুল হইতে উৎপন্ন বলিবার কোনই সার্থকতা হয় না। জমদগ্নির বংশে জাত এই কথা বলা উদ্দিষ্ট হইলে বীজিপুরুষের নামের পূর্ব্বেই তাহা বলা হইত। সুতরাং গুরবমিশ্র যে-শাণ্ডিল্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশই রাঢ়ী-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-সমাজের শাণ্ডিল্য বংশ হওয়া অসম্ভব নহে। ইতি—

শ্রীমাহেন্দ্র চন্দ্র কাব্যতীর্থ-সাংখ্যার্ণব

বিচিত্র জগৎ

মেক্সিকোর গভীর অরণ্যে মায়া সভ্যতার কীর্ত্তি-স্তম্ভ।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩০ সালে ফিলাডেলফিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় গোয়াতেমালা, দক্ষিণ মেক্সিকো, ইউকাতান, ব্রিটিশ হন্দুরাস প্রভৃতি স্থানের মায়া সভ্যতার কীর্ত্তি খনন করিয়া বাহির করিতে কৃত-সঙ্কল্প হয়। পাইড্রাস নেগ্রাস নামক স্থানে বৃহৎ কীর্ত্তি-

মায়া রাজধানীতে এইরূপ পাঁচটি টেবল পাওয়া গিয়াছে।

কলাপ আবিষ্কৃত হইবে এই ভরসায় ঐ স্থানে সর্ব্ব-প্রথম কাজ সুরু হইয়াছিল।

মায়া সভ্যতার আমলের বহু নগরীর চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে এবং নব নব নগরী প্রতিবৎসরই বাহির হইতেছে।

কিন্তু এই সব নগরী ঘন জঙ্গলের মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া আছে এবং যে সব স্থানে ঐগুলি অবস্থিত—সাধারণ রেল ও ষ্টীমারের পথ হইতে সেগুলি বহু দূরে। পাইড্রাস নেগ্রাস সম্বন্ধে কিন্তু একথা খাটে না। এই স্থানটী উযুমাসিণ্টা নামক একটী বড় নদীর নিকটে এবং ঐ নদী দিয়া সব সময় নৌকা বা ষ্টীমার যাতায়াত করে। ত্রিশ মাইল লম্বা একটী পথ তৈয়ারী করিলেই পাইড্রাস নেগ্রাসের সহিত বহির্জগতের সংযোগ অতি সহজেই সাধিত হইতে পারে।

কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সর্ব্বোত্তম ভাস্কর্য্যের নমুনা পাইড্রাস নেগ্রাসের ভগ্ন প্রস্তর প্রাচীর ও স্তম্ভসমূহে পাওয়া যায়। এরূপ আর কোনও মায়া নগরীতে পাওয়া যায় নাই বলিয়াই পাইড্রাস নেগ্রাস পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণের তীর্থস্থানস্বরূপ।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এই স্থানটী আবিষ্কৃত হইয়াছে আজ নয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে টিওবার্ট ম্যালের নামক জনৈক ভ্রমণকারী ইহার সন্ধান পান এবং তাঁহার উদ্যোগে ও পরিশ্রমেই সভ্য জগতে এই স্থানটীর কথা সকলে অবগত হয়।

মায়া সভ্যতায় মানুষদের একটী অভ্যাস এই ছিল যে, বাড়ী-ঘর, মন্দির বা স্তম্ভ পুরাতন হইয়া গেলেই তাহারা পুরাতন কীর্ত্তির উপর নূতন কীর্ত্তি গড়িয়া তুলিত। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাতে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে—স্তম্ভগুলির বয়সের পারম্পর্য্য বুঝিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হয় না।

পাইড্রাস নেগ্রাস এই হিসাবে একটী প্রাচীনতম মায়া নগরী।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বাদ দিলেও মায়া সমাধিগুলি হইতেও বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়। বহু স্থানে এরূপ সমাধি-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। অস্থিসকল অনেকস্থলেই অখণ্ড অবস্থায় থাকায় প্রাচীন মায়াজাতীয় মানুষদের শারীরিক গঠন বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। শুধু অস্থি নয়, মৃতের সহিত প্রোথিত অনেক পদার্থই অভগ্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

মায়া-সভ্যতার রাজ-সিংহাসন।

এই সমাধিগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। সাধারণ লোকের সমাধি, রাজা ও পুরোহিতদের সমাধি, ধনী ব্যক্তির সমাধি ইত্যাদি। বড়লোকের সমাধি-অভ্যন্তরে মৃতের কঙ্কালের সহিত একস্থানে দুইটী বালক বা বালিকার কঙ্কাল এবং কড়ি ও জেড্ প্রস্তরের অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, কোথাও এতটুকু সোণার জিনিষ পাওয়া যায় নাই—ইহাতে প্রমাণ হয় যে, তৎকালে এই ধাতু অনাবিষ্কৃত ছিল।

জনৈক ভূপর্য্যটনকারী, জে. অ্যালডেন ম্যাসেনের বর্ণনা হইতে উদ্ধৃত হইল :—

পিয়েড্রাস নেগ্রাসে আমি সাতবার যাই। একবার আমি এরোপ্লেনে এই পথ উত্তীর্ণ হই। কিন্তু এরোপ্লেন হইতে নিম্নের মায়াস্তূপ দেখা যায় না। এত ঘন জঙ্গল। শুধু বড় বড় গাছপালার মাথা।

এরোপ্লেন ছাড়াও এখানে আসা যায়—তাহাতে দুই সপ্তাহ লাগে। দুই দিন নদীপথে, দুই দিন বনের পথে চলিবার কষ্টই বেশী। খননকারীর দল মার্চ্চ মাসে কাজ আরম্ভ করিয়া জুন মাস পর্য্যন্ত ওখানে থাকিতে পারে, জুন মাসের শেষে বৃষ্টি নামিলে বনের মধ্যে থাকা দুঃসহ হইয়া ওঠে, তাহা ছাড়া খনন কার্য্য তখন বন্ধ রাখিতে হয়।

আলভারো ওব্রিগণ মেক্সিকোর একটী বন্দর। এখান হইতে কলা চালান হয়। আমরা এখানে উসুমাসিণ্টা নদীর একখানা ষ্টিমারে উঠিলাম। প্রথমে নদীর দুধারে শুধু দিগন্তবিস্তৃত সমতল ভূমি—মাঝে মাঝে বড় বড় জলা।

নদী ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে। কিছুদূর আসিয়া গ্রিজাল্ভা নদী ও উসুমাসিণ্টা নদীর সংযোগ-স্থলে পৌঁছান গেল। আলভারো ওব্রিগণ বন্দর হইতে এই স্থান খুব বেশী দূর নয়।

নদীর দুই পারে নিবিড় অরণ্য।

কত ধরণের পাখী গাছের ডালে ডালে—হিরণ ও
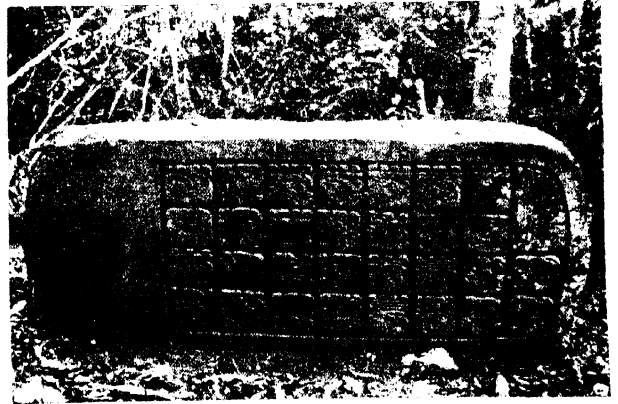
সমাধি ফলক : ইহাতে কেবল তারিখ খোদিত আছে।

সাদা ইগ্রেট্ পাখীই বেশীর ভাগ দেখা গেল। এমিলিয়ানো জাপাটা নামে একটী গ্রামে ষ্টিমার আসিয়া নঙ্গর ফেলিল। এই গ্রামের নাম পূর্ব্বে ছিল মন্টিক্রিষ্টো, বর্ত্তমানে জনৈক প্রসিদ্ধ বিদ্রোহী নেতার নামে স্থানটীর নব নামকরণ হইয়াছে।

শ্যালেম্‌ক নামক স্থানে মায়া সভ্যতার যে প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষ আছে তাহা এমিলিয়ানো জাপাটা হইতে খুব বেশী দূরে নহে।

উসুমাসিণ্টা নদীর এমন একস্থানে আমাদের ষ্টিমার আসিয়া পৌঁছিল, যেখান হইতে সামনের দিকে আর কোনও নৌকা বা ষ্টিমার চলে না। এখান হইতে জঙ্গলের পথে যাত্রা সুরু হইল।

ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া একপ্রকারের সুঁড়ি পথ আছে—

প্রস্তর-নির্ম্মিত মুখোস।

চিকুল গাছের আঠা সংগ্রহকারী অশিক্ষিত মেক্সিকান্ ইণ্ডিয়ানরা এই পথ দিয়া যাতায়াত করে। জঙ্গলের ভিতর এই পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে।

এই অশিক্ষিত আঠাসংগ্রহকারিগণ কর্ত্তৃক বহু প্রাচীন মায়া কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মেক্সিকোর গভীর অরণ্যের মধ্যে ইহারা ছাড়া আর কে যাইবে ?

যাহাদের জঙ্গলের পথে ভ্রমণ অভ্যাস নাই—তাহারা বড় কষ্ট ভোগ করে এই পথ উত্তীর্ণ হইবার সময়ে। মশার উপদ্রব তত নাই, কিন্তু গাছপালার গায়ে একপ্রকার উকুণ জাতীয় ছোট ছোট পোকা আছে, তাহারা ভ্রমণকারীর জীবন দুর্ব্বিসহ করিয়া তোলে।

বনে পথ হারাইবার ভয় অত্যন্ত বেশী বলিয়া সবাই এক সঙ্গে থাকিতে চায়। বনের মধ্যে কোনো শব্দ পাওয়া যায় না—অনেকের ভুল ধারণা আছে, এসব জঙ্গলে সাধারণতঃ পক্ষী-কূজন বা অন্যান্য বন্যপশুর ডাক শুনিতে পাওয়া যায়—কিন্তু আসলে তাহা নয়। বন যেমন নিস্তব্ধ, তেমনি একঘেয়ে।

এক সময়ে, বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মায়া কৃষকেরা এখানে চাষবাস করিত। পূর্ব্বে যেখানে তাদের শস্যক্ষেত্র ছিল, এখন সেখানে গভীর অরণ্য, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ।

একদিনের পথ ব্যবধানে মাঝে মাঝে ল্যাকানড্‌ন ইণ্ডিয়ানদের বসতি চোখে পড়ে। গোয়াতেমালার ঘন অরণ্যে ইহারা ছাড়া অন্য কোনও জাতি নাই।

দুই দিন অতিবাহিত করিবার পরে আমরা পাইড্রাস্ নেগ্রাস্ পৌঁছিলাম।

তাঁবু ফেলিবার উপযুক্ত স্থানই বটে! অধিকাংশ মায়া-কীর্ত্তিই গভীর অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত, সে সব অরণ্যে জল পাওয়া যায় না। পাইড্রাস নেগ্রাসে কিন্তু জলকষ্ট নাই। আমাদের তাঁবুর নীচেই উসুমাসিণ্টার গৈরিক প্রবাহ ভীম গর্জ্জনে বহিয়া চলিয়াছে।

এই জঙ্গলের মধ্যে তালপাতার বড় বড় ঘর বাঁধা হইল। বাঁশের কিংবা নলখাগড়ার বেড়া। খাট প্রথম অবস্থায় আসে নাই, পরে আনা হইয়াছিল। কারণ মেঝের উপর শুইলে বিষাক্ত সর্পের দংশনে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

তাঁবুর কাছে কোনও বৃক্ষাদি রাখিতে নাই। ছায়ার জন্য একটী গাছ রাখাও বিপজ্জনক, কারণ কাছাকাছি জন্মায় বলিয়া গাছের শিকড় মাটীর মধ্যে গভীর ভাবে প্রবেশ করে না, এ-অঞ্চলের ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। অনেক সময় অনভিজ্ঞতার ফলে বৃক্ষপতনে তাঁবু ও জিনিসপত্র নষ্ট হইয়াছে।

এক ধরণের বানরের চীৎকার সর্ব্বক্ষণ শুনিতে পাওয়া যাইত। মাঝে মাঝে সবুজ রংএর বন-টীয়ার ঝাঁক কিচমিচ করিত—দীর্ঘচঞ্চু টুকান্ তাঁবুর সকলের কৌতুক উৎপাদন

করিয়া উযুমাসিণ্টা নদীর তীরে কাদার উপর বিচরণ করিত।

এই সব উষ্ণমণ্ডলের অরণ্যানী মরুভূমিবিশেষ। এই অর্থে দেশীয় ভাষায় এই অঞ্চলকে 'নির্জ্জনভূমি' আখ্যা দেয়। বৃক্ষ-লতাহীন বলিয়া নয়, জনহীন বলিয়া। বনের মধ্যেকার তাবু যেন মরুভূমির মধ্যস্থ মরুদ্বীপ।

অনভিজ্ঞ লোকে এইরূপ বনে পদে পদে বিপদে পড়িতে পারে।

যাহার দিক্ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান নাই বনের মধ্যে কিছুদূর গিয়াই সে পথ হারাইবে, ইহা একরূপ নিশ্চয়। বেজকো ডি এগুয়া নামে একপ্রকার বন্য-লতা কাটিলে প্রায় এক পাইট রূপেয় পানীয় জল পাওয়া যায়, যাহারা জানে না, এ লতা চেনে না, বনের মধ্যে পথ হারাইলে তাহাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিখ্যাত ভ্রমণকারী ও দেশ-আবিষ্কারক ষ্টেফানসনের একটা উক্তি বড় মূল্যবান্। তিনি বলিতেন, ভ্রমণকারী বা আবিষ্কারক বিপদে পরিলেই বুঝিতে হইবে কোথায় তাহার সতর্কতা বা তোড়জোড়ের অভাব ছিল। বুদ্ধিমান্ ভ্রমণকারী কখনও গুরুতর বিপদে পড়ে না।

অনেক সময়ে তাঁবুতে উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য রাখিলেই যে বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহা নয়।

একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ দেই।

এই অঞ্চলের অরণ্যে চিচেম্ নামে এক জাতীয় বৃক্ষ আছে। তাহার রস ও আঠা চোখে লাগিলে মানুষ তখনই অন্ধ হইয়া যায়। এই বৃক্ষ হইতে আঠা সর্ব্বদাই নিঃসৃত হইতেছে। এ অবস্থায় দেশীয় লোকের মুখে এ কথা শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁবুর কাছাকাছি সমস্ত চিচেম্ গাছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

টিনবন্দী খাবার ভিন্ন ঘন অরণ্যের মধ্যে আর কোন খাদ্য পাওয়া যায় না। অবশ্য বনের মধ্যে অনেকরকম পাখী ও নদীতে মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমাদের সময় না থাকায় শিকারের ব্যবস্থা আমরা করিতে পারি নাই।

পাইড্রাস নেগ্রাসের সমস্ত কীর্ত্তিগুলিতে মায়া যুগের সন তারিখ দেওয়া আছে।

মোটামুটি তিনশত বৎসর ধরিয়া এগুলি তৈয়ারী হইয়াছিল—২৫০ হইতে ৮১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাহার কত পূর্ব্বকাল হইতে এই সহরে লোকের বাস ছিল, বুঝিবার কোন উপায় নাই। তবে এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে যে, ৮১০ খৃষ্টাব্দের পরে কোন অজ্ঞাত কারণে এই নগরী পরিত্যক্ত হয়।

তাহার পর বাড়ী, মন্দির, পিরামিডগুলি ভাঙ্গিয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং বাড়ীঘরের উপর বড় বড় বন্য বৃক্ষ জন্মায় ও শিকড় চালাইয়া গাঁথুনি শিথিল করিয়া দেয়। কালে ঐ সব স্থানে বড় বড় ফাটল ধরিয়া বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহারপর হাজার বছর কাটিয়া গিয়াছে।
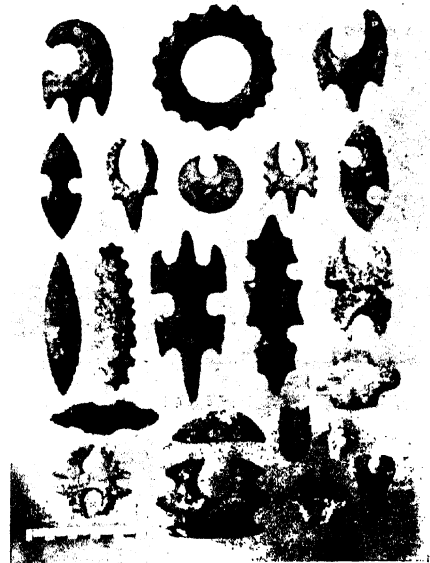
প্রস্তর, হাড়, কড়ি প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত এই সকল জিনিষগুলি মায়া জাতীয়েরা মন্দিরের মেঝের নীচে পুঁতিয়া রাখিত।

এখন পিরামিড ও বাড়ীঘরের উপর এমন জঙ্গল গজাইয়াছে যে, সেগুলির উঁচু উঁচু ঢিবি দেখিলে গণ্ডশৈল হইতে তাহাদের পৃথক্‌ভাবে চিনিয়া লইবার উপায় নাই। আমরা যখন প্রথম দেখিলাম, তখন প্রাচীন যুগের মায়া নগরীর বাহিরের আকৃতি অবিকল কতকগুলি বনাবৃত ছোট খাট পাহাড়ের মত।

এই নগর কাহাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, বর্ত্তমানে

তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই নগরীর নাম কি ছিল, তাহাও কেহ জানে না।

পিয়াড্রেস্ নেগ্রাসে প্রাপ্ত প্রস্তরে খোদিত চিত্র।

তবে এখানকার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য উত্তর ইউকাটান প্রদেশের মায়া স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যগুলির অনুরূপ, যদিও এগুলি উহাদের তুলনায় অনেক প্রাচীন।

দক্ষিণ অঞ্চলের বহু মায়া কীর্ত্তি ও নগরীকে এজন্য প্রাচীন মায়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। এই প্রাচীন মায়া সাম্রাজ্যের কোন ঐতিহাসিক বিবরণ এখনও পর্য্যন্ত আমাদের জানা নাই।

প্রাচীন আমেরিকার মায়া সভ্যতা যে অতি সুপ্রাচীন, তাহা মনে করিবার যথার্থ কারণ আছে। অনেকের ধারণা প্রাচীন মহাদেশ হইতে সভ্য লোক এখানে আসিয়া এই সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেন না।

তাঁহাদের মতে মায়া সভ্যতা প্রাচীন আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদিগের নিজেদের মধ্যেই গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাহির হইতে ইহার কিছুই আসে নাই।

আমরা খনন করিতে করিতে একটী বড় পিরামিড্ বাহির করিয়াছিলাম, এই পিরামিড্ ও তাহার পাশের মন্দিরটীতে আমরা যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য নিদর্শন পাইয়াছি, তাহাতে প্রাক্-কলম্বস আমেরিকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কলাকুশলতার নমুনারূপে সেগুলি গ্রহণ করিতে আমরা দ্বিধা বোধ করিব না।

টিউবার্ট ম্যালের ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছইখণ্ড বড় বড় খোদাইকরা প্রস্তরখণ্ড লইয়া গিয়া হার্ভার্ডের পিবডি মিউজিয়মে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

এক খণ্ড চওড়া পাথরের উপরে প্রাচীন যুগের একটি দৃশ্য খোদিত আছে।

এই প্রস্তরখানি দৈর্ঘ্যে চার ফুট, চওড়ায় দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি হয়। ওজনে প্রায় ৬ মণ। চিকাগোতে ১৯৩৩ সালে শতাব্দীর প্রগতি প্রদর্শনীতে মায়া সভ্যতার কীর্ত্তিকলাপ যে অংশে রক্ষিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এই পাথরখানাও ছিল।

আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের সাধারণতঃ কোন স্থান দেওয়া হয় না, বড় বড় শিল্প-সমালোচনার পুস্তকে কিন্তু এই পাথরখানিতে খোদাই বাক্যটির সঙ্গে প্রাচীন যুগের যে কোন

পিয়াড্রেস নেগ্রাসে প্রাপ্ত প্রস্তর-লিপি—ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তারিখ খোদিত আছে।

দেশের যে কোন বিশিষ্ট শিল্পধারার তুলনা অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

পাথরখানিতে যে দৃশ্যটি খোদিত আছে, তাহা প্রাচীন মায়াযুগের কোন একটি বিশেষ উৎসব বা পূজাপার্ব্বনের দৃশ্য বলিয়াই মনে হয়।

মাঝখানে একটি প্রস্তর সিংহাসন। তাহাতে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—রাজা বা পুরোহিত—বসিয়া। এই মূর্ত্তির পিছনে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি জাগুয়ারের চামড়ার পোষাক দেখা যাইতেছে। তার পিছনে সিংহাসনের পাথরের ঠেস্। সিংহাসনের দুখানি পায়া দেখা যায়, নীচের দিকে ঝালর ঝুলিতেছে তাহাও বেশ সুস্পষ্ট ফুটিয়াছে।

এই সিংহাসনোপবিষ্ট মূর্ত্তির পিছনে তিনটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি। সম্মুখে সাতটি ভূমিতে উপবিষ্ট মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি দেখিলে গ্রীক আর্টের কথা মনে হয়। ভূমিতে উপবিষ্ট মূর্ত্তিগুলির আঙ্গুল ও পোষাকগুলি পর্য্যন্ত কি সুন্দর সুস্পষ্ট ভাবে খোদাই করা।

প্রাচীন মায়াযুগের প্রস্তর পঞ্জিকা অনুসারে এই খোদাই করা প্রস্তরের সময় ১৭ই মার্চ্চ, ৭৬১ খৃষ্টাব্দে অথবা ৫০১ খৃষ্টাব্দে। দুই রকম সন হওয়ার কারণ এই যে, প্রস্তর-পঞ্জিকা অনুবাদ করিবার দুইটি প্রণালী প্রচলিত আছে। একটি প্রণালী অবলম্বন করিলে যাহা দাঁড়াইবে ৭৬১, অন্য ধারা অবলম্বন করিলে তাহাই গিয়া দাঁড়াইবে ৫০১।

এই পিরামিডের পিছনে একটি ছোট পাহাড় আছে। পাহাড়ের গায়ে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির খোদাই করা প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় পুরাতন একটি বাড়ীর উপরে নূতন যুগের বাড়ী বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

সর্ব্বত্রই একটা ব্যাপারের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরী পরিত্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অধিকাংশ স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য কে বা কাহারা ইচ্ছা করিয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আজ এত শতাব্দী পরে বুঝিবার কোন উপায় নাই যে নগরী কেন হঠাৎ পরিত্যক্ত হইয়াছিল বা কলার নিদর্শনগুলি ইচ্ছা করিয়া ধ্বংস করিয়াছিল কাহারা। অনুমান হয় শত্রু বা বিদ্রোহিগণ ঐরূপ করিয়া থাকিবে। রাজ্যের শত্রু পদে পদে।

একস্থানে একটি প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া যায়—তাহার ওজন ছয় টন। এটি দুই সমান ভাগে ভাঙ্গা অবস্থায় ছিল। উচ্চতায় স্তম্ভটি পনের ফুট তিন ইঞ্চি। স্তম্ভে একটি দেবমূর্ত্তি খোদিত। মাথায় মুকুট, বাঁ হাতে থলি—দেবতা থলি হইতে শস্যের বীজ মুঠি মুঠি লইয়া ধরিত্রী দেবীর মাথার উপরে বপণ করিতেছেন।

প্রাচীন পঞ্জিকা অনুসারে এই স্তম্ভটি ৭৪৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন স্থাপিত হইয়াছিল। অন্য প্রণালী অনুসারে গণনা করিলে উহা ৬৮৬ খৃষ্টাব্দে দাঁড়ায়।

গান্ধীজীর স্বাদেশিকতা

...ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র দলাদলি আরম্ভ হইয়া জাতীয়তা গঠনের অথবা ঐক্যসম্পাদনের কার্য্যে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাধিক বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভকাল হইতে গান্ধীজীর হস্তে। গান্ধীজীর প্রতি অবজ্ঞার উৎপাদক আমাদিগের এ উক্তিটি যে অনেকেরই মুখরোচক হইবে না, তাহা আমরা জানি, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, পঞ্চাশ বৎসর আগে ভারতবর্ষে বহু সহস্র বৎসরের পরে জাতীয়তা গঠনের অথবা ঐক্যসাধনের যে কার্য্য প্রাকৃতিক নিয়মবশে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই কার্য্য বিধ্বস্ত হইয়াছে তথাকথিত লোকপ্রিয় মিঃ এম, কে, গান্ধীর দ্বারা, কারণ, উহা বাস্তব সত্য এবং এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্তরের মানুষের দুরবস্থা আমাদের কোন্ অপকার্য্যের ফলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা যথাযথ ভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হইবে না এবং তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রতিকারের উপায় আবিষ্কৃত হইবে না। মিঃ এম, কে, গান্ধী আজকাল সাধারণতঃ মহাত্মা নামে প্রচারিত। তাঁহাকে মহাত্মা না বলিয়া পাশ্চাত্ত্য ধরণে মিঃ বলিয়া আখ্যাত করায় অনেকে হয়ত বিরক্ত হইবেন, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে মানুষ জানিতে পারিবে যে মিঃ গান্ধীকে পাশ্চাত্ত্য ধরণে আখ্যাত না করিলে সত্যের অপলাপ করা হয় ; কারণ, খাঁটি ভারতীয় ভাবধারা এবং চালচলন যে কি বস্তু, তাহা গান্ধীজীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা, চিন্তার ধারা, চালচলন ও আচার-ব্যবহার প্রায়শঃ পাশ্চাত্ত্য ধরণের সহিত ভেজালপ্রাপ্ত।...

ফ্যাসিজম্

—শ্রীঅমিতাভ সেন

মহাযুদ্ধের পর যখন পৃথিবীব্যাপী আর্থিক অশান্তি দেখা দিয়েছিল, তখন সঙ্গে সঙ্গে তার ফলে কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণীও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রতার ফলে তাদের মধ্যে বেশ একটা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়ে উঠেছিল।

তাদের আন্দোলনকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে ফেলবার উদ্দেশ্যে ফ্যাসিজম্ নামে এক নতুন 'ইজম্' দুনিয়াতে আমদানী করা হ'ল। সেটা যে ঠিক কি জিনিষ, তা খুব স্পষ্ট বুঝে ওঠা যায় না, কারণ কেউই, এমন কি ফ্যাসিজ্‌মের খোদ কর্ত্তারাও তার কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করে দেন নি। তবে এটুকু বেশ বোঝা যায়, যে সোস্যালিজমের সঙ্গে তার আদা-কাঁচকলায় সম্পর্ক।

সে যাই হোক, এটা বেশ বোঝা যায় যে, ফ্যাসিষ্ট শাসন-কর্ত্তাদের হাতে শ্রমিক-কৃষকেরা সম্পূর্ণ রাষ্ট্রের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রের—অর্থাৎ ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরের বিরুদ্ধে একচুল এগোবার ক্ষমতাও তাদের নেই। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে ফ্যাসিষ্ট দেশগুলি থেকে নির্ম্মূল করা হয়েছে।

কিন্তু ইদানীং এর একটা নতুন দিক্ প্রকাশিত হয়ে উঠছে। দেখা যাচ্ছে, যে ফ্যাসিষ্ট ডিক্টেটরেরা তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য দেশের মধ্যবিত্তদের উপরও যথেষ্ট অত্যাচার করা সুরু করেছেন।

দুটো কারণে এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।

প্রথমতঃ, ফ্যাসিষ্ট নেতারা যতই ক্ষমতাশালী হউন না কেন, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে ইচ্ছামত চালিত করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রবাহ তার স্বকীয় নিয়ম—অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিয়ম, মেনেই চলবে। সে হচ্ছে যেন সমুদ্র, কোন কেনিউটের হুকুম তামিল করতে সে বাধ্য নয়।······জগতের অর্থনৈতিক ভিত্তি পুঁজিপতিদের স্বার্থান্ধ ব্যবস্থাদির ফলেই টলে পড়েছে। তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করেও, উপরন্তু পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি বিধান করা, এ দুটো জিনিষ সম্ভব নয়। অথচ ফ্যাসিজম্ তাই করতে চায়। ফলে ফ্যাসিষ্ট দেশ-সমূহে এমন সমস্ত বিধান নিত্যই জারি করতে হচ্ছে, যা অর্থনৈতিক নিয়মের সম্পূর্ণ বিরোধী। এবং সে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত করার ফলে বড় বড় পুঁজিপতিদের স্বার্থের ক্ষতি হচ্ছে না বটে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট দরের বণিকেরা যথেষ্টই ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে। (এখানে বলে রাখি, যে ফ্যাসিজ্‌ম্ কখনই এমন কিছু করবে না, যার ফলে business magnate অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠীদের স্বার্থে আঘাত দিতে পারে; কারণ ফ্যাসিষ্ট নেতারা এই সমস্ত বণিক সম্রাটদের-অর্থ দ্বারাই পুষ্ট এবং এঁদের পরামর্শেই চালিত।)

দ্বিতীয়তঃ, ফ্যাসিষ্ট নেতারা মিলিটারিজ্‌মের পাল্লায় পড়ে দেশের সমস্ত ধন-সম্পত্তি হস্তগত করে নিয়েছেন বললেই হয়। এ করতে তাঁরা বাধ্য। কারণ, তাঁদের যুদ্ধের অথবা যুদ্ধসজ্জার খরচ এত সাংঘাতিক রকম বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আইনসঙ্গত উপায়ে তার জোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব।

ফ্যাসিষ্ট নেতারা মিলিটারিষ্ট হয়ে যাচ্ছেন কেন? তারও যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। কেন না তাঁদের ক্ষমতা বজায় রাখবার জন্য সর্ব্বদাই দেশের জনসাধারণকে ভয় দেখান দরকার যে, দেশ অতি বিপদাপন্ন, তাকে বাঁচাতে একমাত্র ফ্যাসিজ্‌মই পারবে। এবং সেটাকে প্রত্যক্ষভাবে দেশের লোকের চক্ষুর সামনে ধরে দেওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, অবিরত যুদ্ধসজ্জার বন্দোবস্ত করা, যাতে লোকে মনে করতে পারে, যে যাক্, ফ্যাসিজ্‌ম্ আছে বলেই আমরা এত সমস্ত অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে পারছি।

কাজেই ফ্যাসিষ্ট এবং প্রায় ফ্যাসিষ্ট দেশগুলিতে এমন সমস্ত ফতোয়া জারি হয়ে চলেছে, যেগুলো শুধু শ্রমিকদের নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকরী হয়ে উঠছে।

এই ত সেদিন জাপানের প্রধান মন্ত্রী বললেন যে, সম্প্রতি জাপানের সরকার ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না, অথবা কলকারখানাগুলিকে যুদ্ধের প্রয়োজনানুসারে রসদ প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার করবেন না। দয়া তাঁদের, সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন এ আশ্বাসবাণী দেওয়ার ফলে এটাও কি সঙ্গে সঙ্গে প্রতীয়মান হয় না যে, যদি প্রয়োজন হয়, তবে জাপানের গবর্ণমেণ্ট যথেচ্ছাচারী নীতি অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করবেন না? এখনও সে রকম প্রয়োজন হয় নি, সেটা ঠিক। কিন্তু জাপানের অবস্থা যদি একটু খারাপ হয়ে পড়ে, যদি চীন-জাপান যুদ্ধে চীন অপ্রত্যাশিত রকমের দৃঢ়তা দেখাতে পারে, অথবা অন্যান্য জাতির যুদ্ধে যোগদানের ফলে জাপানের অবস্থা একটু সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায় তবে যে,জাপান সরকার দেশের সমস্ত ধন জন যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবেন না, ব্যক্তি-স্বাধীনতার ধারও ধারবেন না, এ বিষয়ে কিছু সন্দেহ আছে কি? বর্ত্তমান আশ্বাসবাণীতে সেই দুর্দ্দিনেরই একটা ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা আলোচনা করে দেখলে বেশ বোঝা যায় যে, ফ্যাসিষ্টরা কি ভাবে দেশের সমস্ত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ক্রমশঃ হস্তগত করে নেবার চেষ্টা করে থাকে। এখানে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান বিধিব্যবস্থাদি সম্বন্ধে একটু সবিস্তারে আলোচনা করব।

জার্ম্মানীতে এখন ব্যবসা বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যে উপায়ে জার্ম্মান সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যকে কার্য্যতঃ হস্তগত করে নিয়েছে, সে উপায়টি হচ্ছে আর কিছুই না—অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বা Economic Planning -দাদা বাংলায় যার মানে হচ্ছে, দেশের অর্থনীতিকে আইন-কানুনের সাহায্যে এমনভাবে চালান যাতে দেশের নেতাদের কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি নানারকমই হতে পারে, যেমন যুক্তরাজ্যে সেটা হচ্ছে, প্রধানতঃ বেকার সমস্যার সমাধান, বা রুশিয়াতে হচ্ছে সমগ্র অর্থনৈতিক ভিত্তিকেই দৃঢ় করে তোলা, ইত্যাদি। জার্ম্মানীতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যান্য ফ্যাসিষ্ট দেশের মতই, জার্ম্মানীতে নাৎসী শাসন বজায় রাখা এবং আগামী অবশ্যম্ভাবী মহাযুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা। এই দুই লক্ষ্য চালিত হয়ে জার্ম্মানীর অর্থনীতি কি রকম কৃত্রিম পথে যাচ্ছে, তা G. D. H. Cole-এর লেখা পেলিকান সিরিজে প্রকাশিত "Practical Economics" খানা পড়লে বেশ বোঝা যায়। তবে কোল-এর বইখানা যখন লেখা হয়েছিল, তখন অবস্থা যা ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক সঙ্গীন হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ "অর্থনৈতিক পরিকল্পনা" এই কিছুদিনের মধ্যেই অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে।

নবতম পত্রিকা, খবরের কাগজ, প্রভৃতি থেকে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে মোটামুটী বর্ণনা একটা সেদিন সংগ্রহ করলাম। তার থেকে কতকগুলি তথ্য এখানে দিচ্ছি।

(১) জার্ম্মানীতে কোন জিনিষ আমদানী বা রপ্তানী করতে হইলে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি বা"devise"-এর দরকার। আর এই "ডেফিজে" দেওয়া না দেওয়া সরকারের ইচ্ছাধীন —তা নিয়ে কোন প্রশ্ন চলবে না। (অবশ্য সরকারের ইচ্ছাধীন মানে হিটলারের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা গোয়রিং-এর ইচ্ছাধান।)

(২) যুদ্ধসজ্জার জন্য যে সমস্ত জিনিষের দরকার হয়, সেগুলো রপ্তানী করতে দেওয়া হয় না। একেবারেই না। লোহা, নিকেল, কয়লা, রবার, খনিজ তেল প্রভৃতি এই তালিকার মধ্যে পড়ে। আবার যে সব পণ্যদ্রব্য যুদ্ধে ব্যবহৃত হবার সম্ভাবনা নেই, সেগুলো আমদানী করার ডেভিজে সহজে দেওয়া হয় না। উদ্দেশ্য—যাতে জাতীয় ধন যুদ্ধে অনাবশ্যক এমন জিনিষ কেনাতে "অপব্যয়িত" না হয়।

(৩) যে সমস্ত রসদ মজুত রয়েছে, সে সব যাতে বেশী খরচ হয়ে না যায়, তাও দেখা দরকার। কাজেই জার্ম্মান সরকার ব্যবস্থা করেছেন যে, কোন্ কারখানায় কি পণ্য উৎপন্ন করা হবে, কি কাঁচা মাল ব্যবহৃত হবে, এবং কি কি পরিমাণে, সে সমস্তই গবর্ণমেণ্ট ঠিক করে দেবেন।

(৪) প্রত্যেক পণ্যদ্রব্যের মূল্যের হার সরকারই ঠিক করে দেন। প্রত্যেক জিনিসের জন্যই একজন করে "Price Commissar" বা "মূল্য-নির্দ্ধারণকারী কর্ম্মচারী"

নিযুক্ত করা হয়েছে—তাদের নির্দ্ধারিত মূল্যেই পণ্যদ্রব্য-সমূহ বেচা-কেনা করতে হবে।

(৫) জার্ম্মানী থেকে স্বর্ণ বা স্বর্ণমুদ্রা বাইরে পাঠাতে দেওয়া হয় না—আমদানী পণ্যদ্রব্যের মূল্যস্বরূপেও না। ফলে জার্ম্মান-ব্যবসায়ীরা barter বা বিনিময়ের সাহায্যে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। যেমন, সাউথ আমেরিকাতে জার্ম্মান চাষ-আবাদের যন্ত্রপাতি পাঠান হল, পরিবর্ত্তে ব্রাজিলের কফি বা আর্জ্জেণ্টাইনের মাংস নেওয়া হল। মুদ্রা উদ্ভাবনের আগে মানুষ যেভাবে পণ্যবিনিময় করত, হিট্‌লারের অধীনে বিংশ শতাব্দীর জার্ম্মানী আজ তাই করছে।

(৬) কোন নতুন ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের পত্তন করতে হলেও আগে সরকারের অনুমতি চাই। অনেক ধরণের ব্যবসায়—যেমন মনোহারী দোকান—আর নতুন খুলতে দেওয়াই হয় না।

(৭) কৃষিকার্য্যের অবস্থাও তথৈবচ। সরকারের Reichsnaehrstrand বিভাগটি থেকেই ঠিক করে দেওয়া হয়, কোন্ কৃষক কিসের চাষ করবে এবং সে সব কৃষিজাত দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হবে।.........(রাইশ্‌নাহর-শ্‌ট্রাণ্ট অর্থ হচ্ছে Nutrition Estate বা "পুষ্টিরাষ্ট্র।" এসব বীভৎস নাম দেবার সার্থকতা কি? ডিপার্টমেণ্ট অভ এগ্রিকাল্‌চার বা "কৃষি-বিভাগ" নাম দিলেও ত, চল্‌ত? এ রকম উৎকট নামের সার্থকতা হচ্ছে এই যে, লোকে সহজে এর মানে বুঝে উঠ্‌তে পারে না, এবং আন্দাজ করে উঠতে পারে না যে, তাদের শোষণ করবার জন্যই এসব জিনিষের সৃষ্টি।

কাজেই এটা বুঝতে বেশী দেরী হয় না যে, হিটলারের জার্ম্মানীতে শুধু যে শ্রমিকদের ব্যক্তিস্বাধীনতাই হরণ করা হয়েছে তা নয়, সমগ্র জাতিই প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিষ্ট নেতাদের দাসে পরিণত হয়েছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরাও বাদ যায় নি। শুধু Thyssen, Roechling, Von Bohlen প্রভৃতি বণিক্‌সম্রাটেরা, যাঁরা নাৎসি party fund-এ প্রচুর অর্থ ঢাল্‌ছেন, এবং Goering, von Krosigk প্রভৃতি মিলিটারিষ্টদের সাহায্যে হিট্‌লারকে চালাচ্ছেন, তাঁরা পুরাপুরি নিজেদেরই স্বার্থ বজায় রেখে চলেছেন।

হিতোপদেশে আছে, "উপায়ংশ্চিন্তয়ন্ প্রাজ্ঞঃ অপায়মপি চিন্তয়েৎ।" এই শাস্ত্রবাণী না মানার ফল জার্ম্মানীর মধ্যবিত্ত শ্রেণী আজ হাড়ে হাড়ে বুঝছে। জার্ম্মানীর মধ্যবিত্তেরা মনে করেছিল, সোশ্যালিজমের অগ্রগতির ফলে তাদের সর্ব্বনাশ হবে। কাজেই তারা একজোটে হিটলার-এর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। কিন্তু এখন তারা ফাঁকে পড়েছে। বণিক-সম্রাটদের স্বার্থের খাতিরে তাদেরও এখন কার্য্যতঃ ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে।

কেন কম হল?

এ রকম হওয়াটা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। প্রগতি-পন্থী ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ অনেকদিন থেকেই এই ধরণের একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে আসছিলেন। তাঁহা বলেছিলেন, শ্রমিক-কৃষকদের শোষণের মাত্রা যতদূর উঠতে পারে উঠেছে, এইবার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শোষণ সুরু হবে।

প্রথম যখন ক্যাপিটালিষ্ট নীতির গোড়াপত্তন হয়েছিল, তখন পুঁজিপতিরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত ভাল অর্থাগমের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে না কি তারা স্বার্থের প্রলোভনে শ্রমিক-কৃষকদের পক্ষ ছেড়ে তাঁদের পক্ষেই যোগদান করে। এইভাবে মধ্যবিত্তদের হাত করে নিয়ে তাঁরা প্রোলেটারিয়েটদের দলিত করলেন। কিন্তু এখন এমন নিদারুণ ব্যবসায়-সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে যে, শুধু তাতেই শানাচ্ছে না। এবার মধ্যবিত্তদের শোষিত হবার পালা।

অনেকদিন আগে, যখনও ম্যাকডোনাল্ডের দল পার্লা-মেণ্টে জয়লাভ করে মন্ত্রীত্ব থেকে আরম্ভ করে সাব-এসিষ্টাণ্ট প্রোবেশনারী একটিং আণ্ডার-সেক্রেটারী পর্য্যন্ত নানারকম ছোট-বড় সরকারী পদ লাভ করতে পারেন নি, তখন ব্রিটিশ লেবার পার্টির অনেকে অনেক সময় স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলতে সঙ্কুচিত হতেন না। সে সময়কার একটা লেখায় J. H. Thomas লিখেছিলেন:—

"We must remember that the middle class man of to-day is entirely different from what he was a generation or two ago...

"To-day you have a much larger membership of this class, this class between the millstones of the capitalist and the organised manual labourer. This class has no trade union, no organisation, is invariably the victim of labour disputes. Between the capitalist and the trade union he is crushed...."

হিটলার এর বর্ত্তমান অর্থনীতি এই তথ্যকেই আমাদের চোখের সামনে পরিস্ফুট করে তুলছে।

পুনশ্চ—প্রবন্ধটি শেষ হয়ে গেলে পরে দেখলাম, বম্বার একটি ফার্ম্ম বাম্বা চেম্বার অব কমার্সের কাছে জানিয়েছে, ইটালী থেকে তারা পাওনা টাকা আদায় করতে পারছে না। খোঁজ করে জানা গেল, ইটলীর Exchange সম্বন্ধে কতকগুলো বিধিনিষেধের ফলে এ অবস্থা হয়েছে।...

পথ চলার বিপদ্

—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

সহরের পথ-ঘাটে চলা বিপজ্জনক—এমন কথা যে কোন বিজ্ঞব্যক্তি বহুবার উচ্চারণ করেন কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য নয়। দিনের সকল সময়েই সকল পথ-ঘাট সমান বিপজ্জনক থাকে না, কোন কোন পথে কোন কোন সময়ে চলা-ফেরা সাবধানে করা প্রয়োজন হয়। পথ-ঘাটে এত সাবধান হওয়া প্রয়োজন, কারণ কি জানি কখন গাড়ী ঘোড়া চাপা পড়িতে হয়। গাড়ী ঘোড়ার মধ্যে গাড়ীর জন্যই ভয় আবার বেশী; সেকালে হয়ত গাড়ীর ভয়ের অপেক্ষা ঘোড়ার তলায় পড়িবার ভাবনা ছিল বেশী—সেকালে ঘোড়াই ছিল দ্রুতগামী জন্তু; এখন অমন কত ঘোড়ার বেগে এক একখানা কলের গাড়ী দানবের মত সহরের পথে, ছুটাছুটি কেন, একেবারে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ঘুরিতেছে। পথে প্রাণের আশঙ্কা এখন বাড়িয়াছে বেশী। কিন্তু কেবল যে গাড়ীতে কলের শক্তি বসাইবার জন্য প্রাণের ভয় বাড়িয়াছে তাহা নয়। গাড়ীর সংখ্যাও বাড়িয়াছে অনেক; অথচ সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও বিপদের আশঙ্কাবৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়। গাড়ীর কলের শক্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির মিলিত প্রচেষ্টাতেই কেবল বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় নাই। তবে বিপদ বৃদ্ধির কারণ কি? এক কথায় বলিতে গেলে, সহরের পথে বিপদ্ বৃদ্ধির কারণ, চলা-ফেরার সুব্যবস্থার অভাব। চলা-ফেরার ব্যবস্থা নির্ভর করে অনেকগুলি কারণের উপর—সেগুলি কি, ও কি ভাবে ব্যবস্থা করিলে পথ-চলার বিপদ্ হ্রাস পাইতে পারে, ক্রমশঃ সে বিষয় আলোচনা করিব।
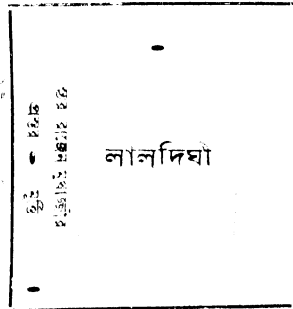
সাধারণতঃ বর্ত্তমান কালের উন্নতিশীল নগরে চলা-ফেরার সুব্যবস্থা করার প্রশ্ন সর্ব্বত্রই জটিল। পক্ষান্তরে পতনোন্মুখ নগরে এ প্রশ্নের জটিলতা ক্রমশঃ লোপ পাওয়াই

স্বাভাবিক। আবার যে কোন নগরের আজ যে স্থান উন্নতিশীল, বহু বৎসর পরে হয়ত সে স্থানের মাধুর্য্য আর সেরূপ থাকিবে না ; তেমনি বহু বৎসর পূর্ব্বে যে স্থানের কোন মূল্য ছিল না কালক্রমে সেইস্থান হয়ত কর্ম্মমুখর হইল। কালের পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে এক এক স্থানের এক একরূপ শ্রী দেখা যায়। যখন যেখানে মধু পায় মক্ষিকা তখন সেখানে যায়—মানুষের প্রকৃতিতেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। নগরের যখন যেখানে আকর্ষণের বস্তু থাকে লোকের ভীড় তখন সেদিকে ধাবিত হয়, কিন্তু আকর্ষণের বস্তু গড়িয়া উঠে ধীরে ধীরে—বহুপূর্ব্ব হইতে তাহার সম্যক্ আভাষ পাওয়া সম্ভব নয়। নগর গঠন হয় একভাবে—কিন্তু বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাহার নিজের খেয়াল মত। নগর গঠন যত সুকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হউক না কেন নাগরিকদের ভবিষ্যৎ গতিবিধি কোন্ পথ ধরিয়া দিবারাত্র চলিবে তাহার সঠিক কল্পনা করা ও তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখা সম্ভব নয় বলিয়া যুগে যুগে পথ চলা সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রশ্ন জটিল হইতে জটিলতর ভাবে দেখা দিবে এবং তাহার ব্যবস্থাও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নরূপ হইবে।

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও শিল্পচর্চ্চার অবিরত পরিবর্ত্তন—এই দুইটী কারণ সমগ্র জগতের বড় বড় সহরের অবয়ব দিন দিন পরিবর্ত্তিত করিতেছে। এমন কোন বড় সহর পৃথিবীতে নাই যেখানে লোকজনের বাস দিন দিন না বাড়িতেছে, এমন কোন বড় সহর পৃথিবীতে নাই যেখানে ক্রমশঃ কলকারখানা বৃদ্ধি না পাইতেছে, এমন কোন বড় সহর পৃথিবীতে নাই যেখানে দিনের পর দিন শস্য-শ্যামল প্রান্তর তাহার অধিকৃত স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে সরিয়া না যাইতেছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও হয়ত যেখানে শাক শব্জীর বাগান ছিল আজ সেখানে নূতন পথঘাট, বাড়ীঘর, বিজলী বাতির, টেলিফোন লাইনের বড় বড় থাম দোকান-পাট, স্কুল-পাঠশালা, ছেলেমেয়ে, পুরুষ-নারী, গাড়ী-ঘোড়া, কুকুর-বিড়াল সকলে মিলিয়া একটা যেন 'মেলা' বসাইয়াছে। কিন্তু এ ভাবে নগরের অবয়ব বৃদ্ধি হইলেও নগরপত্তনের প্রারম্ভে যে সকল স্থান লইয়া নগরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল সে স্থানগুলির প্রতিপত্তি বরং উত্তর কালে বৃদ্ধিই পাইয়াছে। অধিকাংশ নাগরিকদের লক্ষ্য ও গন্তব্য এখনও সেই পুরাতন কেন্দ্রস্থলগুলিই। পথগুলি বহু পূর্ব্বে যেভাবে রচিত হইয়াছে সামান্য পরিবর্ত্তন ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে সেগুলি পরিবর্ত্তন করা প্রায় অসম্ভব। লোকের চাপ, যান-বাহনের চাপ ও দ্রুতগতি, পথের কলেবর পরিবর্ত্তনের অসুবিধা এ সবগুলি মিলিয়া এমন জটিলতা সৃষ্টি করে যে, মানুষের তখন তাহার বুদ্ধিকে কষাঘাত করিয়া কিছু সুযুক্তি আদায় না করিলে প্রাণ বাঁচান দায়। পঙ্গপালের মত কাতারে কাতারে জন-সেনা যেন যুদ্ধযাত্রীর মত দিনের পর দিন ভীড় করিয়া সকাল বেলা কার্য্যস্থলে যায় আবার দিনশেষে তেমনি ভীড় করিয়া তাহার সুখের (?) নীড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। গৃহে ফিরিয়া আবার ভীড় করিয়া অবসর বিনোদন করিয়া ক্লান্তি দূর করিতে আমোদ-প্রমোদের যায়গায় যাওয়ার জন্য পথের সাহায্য গ্রহণ করে, আর পথও যেন সদা সর্ব্বদা সকলের পথ চাহিয়া পড়িয়া আছে, যত লোক যায় পথের যেন তৃপ্তি নাই, আরও চাই আরও চাই বলিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিবার জন্য দিন দিন ব্যাকুল হইতেছে। পথের এ দুরন্ত ক্ষুধায় যাহাদের ইন্ধন যোগাইতে হয় তাহারা ভীড় করিয়া নিজেদের বিপদ নিজেরা আনিতেছে। বিপদের সম্ভাবনা কমাইবার একমাত্র কৌশল ভীড় নিয়ন্ত্রণ করা। ভীড় হয় কেন সেই কারণের সন্ধান করা আর তাহার প্রতিকার বিধান করা হইল ভীড় নিয়ন্ত্রণের মূল সূত্র। কিন্তু এই সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হইবার পথেও বাধার অন্ত নাই।

পথের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য পথের মাঝে মাঝে স্তম্ভ, ফোয়ারা, মনুষ্যমূর্ত্তি ইত্যাদি স্থাপিত করার প্রথা কোন সময়ে প্রচলিত ছিল ; কিন্তু এগুলি বিগত শতাব্দীর অলস মুহূর্ত্তে রচিত হইলেও কালের আবর্ত্তনে এখন তাহাদের অস্তিত্বের মর্য্যাদা হারাইয়াছে। এরূপ আড়ম্বর উত্তরকালে কেবল যে বাহুল্যে পরিণত হইয়াছে তাহা নহে এগুলি পথের মাঝে থাকার জন্য এ সকল স্থানের পাশ দিয়া যে সকল যান বাহন বা লোকজনের যাতায়াত তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় এ সকল স্থান এখন পথের

বাধায় পরিণত হইয়াছে। একসঙ্গে অনেককে এরূপ বাধার সম্মুখীন হওয়ায় অযথা ভীড় সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। ভীড় কমাইবার প্রথম উপায় তাই পথের অনাবশ্যক বাধা অপসারণ করা। পথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য অতীতের রচিত উক্ত-আড়ম্বরগুলিই যে পথের বাধা সৃষ্টি করে তাহা নয়। ফিরিওয়ালা ও দোকানপাট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন বিরক্তিকর অবস্থায় উপনীত হয় যে তাহারও একপ্রকার পথের বাধায় পরিণত হয়। তাহারা প্রকৃত পথের বাধায় পরিণত হইলেই, বড় রাস্তা হইতে সরাইয়া দিয়া আশে পাশের গলিতে স্থান দেখাইয়া দিতে পারিলে বড় রাস্তায় ভীড় কমান যায়। যে পথ দিয়া সচরাচর দ্রুতগামী যানবাহনের গতিবিধি অপরিহার্য্য, সে পথে কোন প্রকার মন্থর-গতিসম্পন্ন যানবাহনের চলাচল বাধা বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যখন এই সকল পথে দ্রুতগতির যানবাহনের চলাফেরা করিবার সময়, অন্ততঃ পক্ষে সেই সময় সে পথে মৃদুগতির যানবাহন যাহাতে না চলে, তাহার ব্যবস্থা করিলে ভীড় কমান সম্ভব হয়।

পথে বাধা সৃষ্টি হয় আরও এক সময় যখন পথ হয় জীর্ণ। কত যাত্রীর ভার আর একা একটি পথ বহন করিতে পারে? পথের অবসাদ নাই, ক্লান্তি নাই, আছে তার প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা, আর আছে তার ক্ষয়। আঘাতের পর আঘাত পাইয়াও বেচারী আলিঙ্গন করিতে দ্বিধা করে নাই, সঙ্কোচ করে নাই, ত্রুটী করে নাই। যতই লাঞ্ছিত, পদদলিত হইয়াছে প্রতিদানে ততই আরও সে যাত্রীর দল আহ্বান করিয়াছে। প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহার দেহ হইয়া পড়ে শিথিল। বিরাম সে মুখ ফুটিয়া চায়ও না, পায়ও না, যাত্রীদেরও যে আর পথ নাই, এই পথ অবলম্বন করিয়াই যে তাহাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে হয়! লক্ষ্যের দিকে তাদের দৃষ্টি, পথের দিকে নয়। কিন্তু, চিরকাল কি একভাবে যায়? এমন দিনও আসে যখন লাঞ্ছিত, অপমানিত, উপেক্ষিতের মূক নিবেদন ঠিক স্থানে পৌঁছায়, এমন দিনও আসে যখন গর্ব্বিত, গর্জ্জিত, উদ্ধতের দম্ভ খর্ব্ব হয় তখন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঐ লাঞ্ছিত অপমানিত, হেয়কে অবনতশিরে সম্ভ্রম দেখাইতে হয়। অবশেষে পথের যখন সংস্কার আরম্ভ হয় তখন যাত্রীরা সাধারণতঃ ধীরে চলে। পথের সংস্কারের জন্য যে বাধার ও ভীড়ের উৎপত্তি তাহার প্রতিবিধানের উপায় অন্য পথকে পুরাতন পথের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা। এ জন্য বড় বড় সহরে একই গন্তব্যে পৌঁছাইবার জন্য পাশাপাশি কয়েকটি পথ নিম্মাণ করা হয়। মাঝে মাঝে কোন পথ অবরোধ করিয়া সংস্কার করাইলেও পথিকদের ভীড় সহ্য করিতে হয় না।

বড় হাট বাজারের নিকটের রাস্তাতেও বহু লোক যানবাহন একত্রিত হওয়ায় ভীড় জমে। যে সকল বাজারে ক্রেতার ভীড় বেশী সেখানে আসে পাশে রাস্তার পরিসর বৃদ্ধি করিয়া, যানবাহনের বিলম্ব করিবার সময় নিয়ন্ত্রণ করিয়া, নূতন পথঘাট সৃষ্টি করিয়া ভীড় কমাইবার উপায় আছে।

অনেক পথের পাশে দোকানের সামনে গাড়ী রাখিয়া জিনিষ কেনা সুবিধাজনক, অথচ এরূপ অপেক্ষমান যান বাহন কম ভীড় সৃষ্টি করে না এরূপ স্থলে ভীড় নিয়ন্ত্রণের উপায় যানবাহনের অপেক্ষা করিবার সময় নিয়ন্ত্রণ করা—পথের ধারে যান বাহনের অপেক্ষার প্রথার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করিলে কেবল নাগরিক স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করাই হয় না বরং ইহাতে ব্যবসায়ের অন্তরায় সৃষ্টি করা হয় ও তাহার প্রতিক্রিয়া হয় সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার উপর। সমাজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিবার জন্য সমাজের মান খোয়াইতে পারা যায় না। ভীড় নিয়ন্ত্রণের সকল প্রকার ব্যবস্থাতেই দৃষ্টি রাখিতে হয়, সমাজের আর্থিক দিকে কোন্ ব্যবস্থায় কি প্রকার ফল ফলিবে। এমন কি ভীড় নিয়ন্ত্রণ করিয়া নগরের বিভিন্ন অংশে আর্থিক বণ্টনের ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যে পথ দিয়া লোকজন চলাচল করে, সে পথের ধারে পথচারীর প্রয়োজন মত সামগ্রীর ক্রয় বিক্রয় হয়, যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি হওয়া স্বাভাবিক, সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি রাখিবার স্থানের চাহিদা বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী অর্থাৎ পথচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে পথের ধারের স্থানগুলির মূল্য বৃদ্ধি হওয়াও তেমনি স্বাভাবিক—ক্রমশঃ পথচারীদের নিকট হইতে অর্থ বঞ্চিত হয় আর সঞ্চিত হয় অপরের নিকট, যদি নগরের

কোন অংশে অর্থ বন্টনের প্রয়োজন হয় সেই অংশে ভীড় ঠেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা চলে; তেমনি কোন অংশ হইতে অর্থ কমাইবার প্রয়োজন হইলে সেই অংশ হইতে ভীড় কমাইবার ব্যবস্থাও করা চলে। অর্থের সন্ধানিরা নগরের কোন্ অংশে কখন কিরূপ ভীড়ের স্রোত বহিবে তাহার সন্ধান রাখেন। ভীড় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারটি যাদুমন্ত্রের মত কার্য্যকরী; সুশ্রীকে বিশ্রী, বিশ্রীকে সুশ্রী করিয়া তুলিতে পারে।

পথে নামিলেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছান যায় না—পথ-প্রদর্শকের নির্দ্দেশ চাই পদে পদে। বিপথে গিয়া বিপদে না পড়িতে হয়, সকল যাত্রীরই এ ভাবনা থাকে। লাল, নীল, হলুদ, শাদা—কত রং বেরংএর আলো পথ দেখাইয়া চলে। যে যাত্রী কোন রংএর কি তাৎপর্য্য বোঝে না তার বিপদ্ হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তবে অনেক যাত্রীই বোঝে—তাদের দেখাদেখি, তাদের চলার ভঙ্গীর সাথে সাথে পা ফেলিয়া চলিলে, অমঙ্গল না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে যান বাহন ও পথিকের ভীড় বেশী হয় সকালে ও সন্ধ্যায়। যান-বাহনের ও পথিকের চলার পথ যাহাতে সুগম হয় এই সকল স্থানে তাহার ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যায়। লালদিঘির উত্তর-পূর্ব্ব কোণে লালবাজার-বৌবাজার পথটি অপ্রশস্ত অথচ যান-বাহনের যাতায়াত এই পথে যথেষ্ট, তেমনি অপ্রশস্ত পথ কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। লালবাজার বৌবাজার ষ্ট্রীটে মোটর গাড়ী চলাচল ও ট্রাম গাড়ী যাতায়াত যেমন বেশী, পথচারী পথিকের সংখ্যাও তেমনি বেশী, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট-হেয়ার ষ্ট্রীটের মোড়ে পথচারী পথিক ও মোটর গাড়ীর চলাচল বেলা ১০টা হইতে ১০॥টা ও বিকাল ৪॥ টা হইতে ৫॥০টা পর্য্যন্ত ভয়াবহ। কারেন্সী আপিসের পাশ দিয়া লালবাজার-বৌবাজার ষ্ট্রীটের সমান্তরাল করিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে একটি রাস্তা প্রশস্ত করিয়া সেণ্ট্রাল এভিনিউ পার হইয়া ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত পৌঁছানতে, বৌবাজারের ভীড় কমিতে পারে; এই পথে ভবিষ্যতে ট্রামও চলিতে পারে; তখন এই রাস্তার দোকান পাট যেগুলি এখন ক্রেতার অভাবে তেমন উন্নতিশীল নহে সেগুলি ভাল কারবার করিবে আশা করা যায়। কিন্তু কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট ও হেয়ার ষ্ট্রীটের মোড়ে হয়ত পথচারী যাত্রীর যাতায়াতের জন্য কালক্রমে রাস্তার উপর দিয়া সেতু নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইতে পারে, এখন পথের বিলম্ব এই পথে যথেষ্ট ভোগ করিতে হয়, সেতু নির্ম্মাণের আরও প্রয়োজন এই জন্য হইবে এখানে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটকে প্রশস্ত করিবার উপায় এরূপ প্রচুর ব্যয়-সাধ্য যে, অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনের একমাত্র অল্প ব্যয়-সাধ্য উপায় সেতু নির্ম্মাণ। লালদিঘীর আশে পাশের পথগুলির নক্সা (ক) চিত্রে দেখান হইল। পদচারী পথিকের পক্ষে অনেক সময় পাদপথ অবলম্বন করিয়া চলাও মুস্কিল, বিশেষতঃ ক্লাইভ ষ্ট্রীটের পশ্চিম পাশের পাদপথে যেন বাজার বসিয়া থাকে, এত ফিরিওয়ালার ভীড়। কিন্তু এ সমস্ত ফেরিওয়ালারাই বা যায় কোথায়? এই রকম প্রশ্ন অনেক অনেক পথেই রহিয়াছে যেমন বড়বাজার, হ্যারিসন রোড, শিয়ালদহের নিকট বৌবাজার ষ্ট্রীট, মাণিকতলার মোড়, চৌরঙ্গীর কাছে ধর্ম্মতলার মোড়, শ্যামবাজারের কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইত্যাদি।

পথের বাধা-বিপত্তি অপসারণ, পথকে সুগম ও মঙ্গলময় করিতে পারে কে? পথের মালিক যিনি তিনি অভিপ্রায় করিলে যাত্রীদের ভাবনা থাকে না। যাত্রীরা কি কেবল তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী সর্ব্বদাই চলিবে? তারাও চায় কিছু স্বাধীনতা, তারাও কখন কখন তাদের খেয়াল মত ঘুরিতে চায় নই কি? তাই, পথের মালিক আর পথিক দুজনে না একত্রিত হইলে নিরাপদ হয় না।

নগর-শাসনের ভার যাঁদের উপর তাঁদেরই পথের মালিক বলা চলে। নগর-শাসনের বিভিন্ন ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত থাকে, কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ত কাজ নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা করা, কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ত কাজ নগরের অবয়বের সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যের উন্নতি বিধান করা, কোন প্রতিষ্ঠানের হয়ত কাজ পথিককে পথ প্রদর্শন করা, শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এই সকল প্রতিষ্ঠানের একযোগে পরামর্শ, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও প্রতিপালন করা যেমন প্রয়োজন তেমনি এদের কর্ত্তব্য পালনে সহায়তা করা, পদচারী ও যানচারী উভয়বিধ পথিকের ও তেমনি প্রয়োজন। আর প্রয়োজন প্রত্যেক পথিকের অন্য পথিকের সুখ সুবিধা বিচার করা ও একে অপরের উদ্দেশ্যকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা। এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে একটি বিষয় অপরটির সহিত যোগসূত্রে গাথা আছে যে, একটির অভাব বা শুষ্কতা ঘটিলে সমস্ত আয়োজন বিসদৃশ ও অকল্যাণকর হইয়া পড়ে।

পথ চলার বিপদ্ কাটাইতে হইলে তাই সর্ব্বদা স্মরণ ও মনন থাকা চাই যে, পথের মালিকের সাথে আর সকল যাত্রীদের সাথে আমার যোগাযোগ রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য।

সংবাদ ও মন্তব্য

বিজয়ার নমস্কার

৬ই অক্টোবর (১৯শে আশ্বিন) তারিখের সম্পাদকীয় সন্দর্ভে পাঠকবর্গকে বিজয়ার নমস্কার জানাইয়া অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছেন :—বিজয়ার আধ্যাত্মিক দিক্‌টা সকলেই বিস্মৃত-প্রায় হইয়া গিয়াছে, এখন কেবল সামাজিক দিক্‌টাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু বিজয়ার আধ্যাত্মিক (?) দিক্‌টা কি, সম্পাদক মহাশয়ের আলোচনায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। বস্তুতঃ 'আধ্যাত্মিক' বলিতে সম্পাদক মহাশয় কি বুঝিয়াছেন, আমরা তাহাও অনুসরণ করিতে পারিলাম না। জগতের চরাচর জীবের কার্য্যক্রম পরীক্ষা করিলে, দেখা যায়, প্রত্যেক ব্যক্ত কার্য্যশক্তির মূলে একটি অব্যক্ত কার্য্যশক্তি বিদ্যমান। আমাদের মতে, ঐ অব্যক্ত কার্য্যশক্তি হইতে ব্যক্ত কার্য্যশক্তি কি করিয়া উৎপন্ন হইতেছে, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ না হয়, ততক্ষণ জগৎ ও তাহার চরাচর জীব সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। আধুনিক ভাষাসমূহে, যাহা কিছু দৃশ্য জগতের অন্তরালে—তাহাকেই 'আধ্যাত্মিক' বলিয়া আখ্যাত করা হয় এবং অনেক সময়েই তাহাকে 'অপাংক্তেয়' পর্য্যায়ে ফেলা হয়। বস্তুতঃ এই জন্যই আধুনিক জগতে কোন বিষয়ের জ্ঞান-বিজ্ঞানই নির্ভরযোগ্য হয় নাই এবং তাহারই ফলে, জন-সাধারণের মধ্যে চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে।

বিজয়ার উৎসব যাঁহারা পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের মধ্যে সম্পর্ক কি, তাহা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই জ্ঞান যাহাতে তাঁহাদের নিজস্ব উপলব্ধির মধ্যেই পর্য্যবসিত হইয়া না থাকে, তাহারই জন্য জগোৎসব অনুষ্ঠান। অব্যক্ত হইতে কি করিয়া প্রকাশমান বস্তুর প্রকাশ সংঘটিত হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়াকেই 'বিজয়া' বলা হইয়াছে। পুরোহিতের নিকট এই জ্ঞান লাভ করিয়াই স্মরণাতীত কালে জন-সাধারণ কৃতার্থ হইতেন। সেই কৃতার্থতার বোধই বন্ধু-বান্ধবের নিকট 'নমস্কার' রূপে প্রকাশ পাইত।

সেই হিসাবে, বিজয়ার নমস্কার জানাইবার অধিকার বর্ত্তমান জগতে কয় জনের আছে ? তথাপি, আমরা আমাদের পাঠকবৃন্দকে বিজয়ার নমস্কার জানাইতেছি। আমাদের এই নমস্কার যেন তাঁহাদিগকে সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণের 'নমস্কার' প্রকরণ সম্বন্ধে উৎসুক করে।

ভারতের ইতিহাস

৮ই অক্টোবর তারিখে এলাহাবাদে নিখিল ভারত ইতিহাস কংগ্রেসের সভাপতি ডক্টর ডি. আর. ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন, ভারতীয় ঐতিহাসিক সুসম্পূর্ণ ভাবে ভারতের ইতিহাস কেন প্রণয়ন করিবেন না, তাহার সঙ্গত কোন কারণ নাই।

এই সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, প্রাচীন গ্রন্থসমূহই অতীত ইতিহাস প্রণয়নের এক মাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের অধিকাংশই মনে করেন, মাটি খুঁড়িয়া ইঁটের কিংবা পাথরের টুকরা জোড়া দিয়া মনোমত কাহিনী রচনা করিলেই তাহা ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমাদের মতে, কোন যুগের প্রকৃত ইতিহাস প্রণয়নার্থ সেই যুগের বিবিধ স্তরের মনুষ্যের চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রম পরীক্ষা করিতে হয়। কোন যুগের উচ্চতম চিন্তাধারা প্রস্তরখণ্ডে অঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রস্তরখণ্ডের সন্নিবেশ হইতে উদ্ধৃত কিংবা অনুমিত ইতিহাসকে প্রকৃত ইতিহাস বলা চলে না। বরং দেখা যায়, চিন্তাশীল মনস্বিগণের লিখিত গ্রন্থেই কোন না কোন রূপে সমাজের প্রত্যেক স্তরের মনুষ্যের চিন্তাধারা ও কার্য্যক্রমের ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমরা মনে করি, প্রাচীন ভারতেতিহাস রচনা করিতে হইলে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের প্রকৃতি বিচার করিয়া, তাহাদিগকে যুগ-বিভাগানুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তদনুসারে ঐ গ্রন্থসমূহের বক্তব্য উদ্ধার করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কোন্ বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক এই কার্য্যের সামর্থ্য অর্জ্জন করিয়াছেন ?

নদী-বিজ্ঞান

পুণার খদকোয়াসালা সেণ্ট্রাল হাইড্রো-ডাইনামিক রিসার্চ্চ ষ্টেশনের যে কার্য্যাবলী ৮ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, নদী সম্বন্ধীয় নানাবিধ গবেষণায় ঐ রিসার্চ্চ ষ্টেশন হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

এই গবেষণার প্রকৃতি বিচারে দেখা যায়, নদীবক্ষে বাঁধ ও সেতু বজায় রাখা বিষয়েই ইহার সমধিক উৎসাহ। কিন্তু জনসাধারণের কল্যাণের দিক্ হইতে বাঁধ ও সেতুর প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষা আপজ্জনকতা অধিক। এই জন্য আমাদের মতে, নদীস্রোত সম্বন্ধে প্রাকৃতিক বিধি কি এবং তাহা অব্যাহত থাকিলে জনসাধারণ কি ভাবে উপকৃত হয়, নদী-সম্বন্ধীয় প্রাথমিক গবেষণা ইহাই হওয়া উচিত। একদিন ভারতবর্ষের সমস্তগুলি নদী ও খাল সারা বৎসর জলে থৈ থৈ করিত এবং তাহারই ফলে জনসাধারণের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব মিটিয়াছিল। আমাদের মতে, সেই পুরাতন ব্যবস্থা ও সংগঠনের পুনরুদ্ধার না হইলে ভারতবাসী জনসাধারণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দূরীভূত হইতে পারে না। ইহার জন্য কি প্রয়োজন, তাহার বিস্তৃত আলোচনা বর্ত্তমান সংখ্যার সম্পাদকীয় স্তম্ভে করা হইয়াছে।

নাগরিক কর্ত্তব্য

১৭ই অক্টোবর তারিখে মহীশূরে এক মানপত্রের উত্তরে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ শরৎচন্দ্র বসু বলিয়াছেন:—কোন সহরের সমৃদ্ধি কেবল ভাল পথঘাট অথবা অট্টালিকা দ্বারা বিচার করা যায় না। সহরের দুঃস্থ ব্যক্তিদের অবস্থার কতখানি উন্নতি হইয়াছে, তাহা হইতেই প্রকৃত বিচার সম্ভব। পৌরসভা কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত ইত্যাদি।

অর্থাৎ, যে-ব্যবস্থায় ও শিক্ষায় বর্ত্তমান সভ্যতা ও তাহার পরিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যবস্থা ও শিক্ষার সমগ্রাংশই বজায় রাখিতে হইবে, তথাপি দুঃস্থ ব্যক্তিদের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে! ইহাকেই আমরা বলি 'ডুড ও টামাক' এক সঙ্গে খাইবার স্পৃহা। শরৎচন্দ্র যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তনকে পৌরসভার পক্ষে অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই শিক্ষার শেষ সোপান অতিক্রম করিলেও সামান্য পেটের ভাত জুটাইবার সামর্থ্য হয় না—ইহা কি বাস্তব সত্য নহে? কিংবা, ইহাও কি বাস্তব সত্য নহে যে, পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যেখানে যত ভাল ভাল পথ ও অট্টালিকা তৈয়ারী হইয়াছে, সেই খানে তত অধিক লোকের হাহাকার পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে? এই বাস্তব সত্য প্রত্যক্ষ দেখিয়াও ভারতীয় নেতাদের কাণ্ডজ্ঞানের উদয় হইল না, তবু ইহারই জন্য হা-হুতাশ করিতে হইবে!

নারীর কর্ত্তব্য

২২শে অক্টোবর বাঙ্গালোরের মহিলা সেবক সমাজ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত স্বদেশী-প্রদর্শনী উদ্বোধনকালে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিসেস্ সুব্বারায়ন বলিয়াছেন: পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিভেদকারী প্রভাব সত্ত্বেও ভারতীয় নারীরাই ভারতের সমাজ ও কৃষ্টি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। নারীদের আচরণ এরূপ হওয়া উচিত যে, গৃহই জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে।

কিন্তু ভারতীয় নারীর যে-অংশ পাশ্চাত্ত্যের এই শিক্ষার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা এই কৃষ্টি ও সমাজরক্ষার কার্য্য ইতিমধ্যে যেরূপ 'পৌরুষে'র সহিত অবলম্বিত হইয়াছে, তাহাতে কি আশঙ্কা হয় না যে, ভারতীয় কৃষ্টি ও সমাজের জীর্ণ সৌধখানি সম্পূর্ণ পতনোন্মুখ? মিসেস্ সুব্বারায়ন বলিয়াছেন বটে যে, নারীদের আচরণ এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে গৃহই দেশাত্মবোধের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু চারিদিকে যেরূপ মহিলাসঙ্ঘের প্রসার দেখা যাইতেছে এবং অ্যাসেম্বলি ও কাউন্সিলে নারীরা যে-ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহাতে গৃহই রক্ষা পাইতেছে না, তা আবার দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা!

আশ্রমের আদর্শ

৩রা অক্টোবর তারিখে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি-বিতরণ সম্মেলনে মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—বিশ্ব-বিদ্যালয় সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র পাড়ায় একটি আশ্রম করুক। হাসপাতাল, ছাত্রাবাস, বক্তৃতার হল, লাইব্রেরী, পাঠাগার, ছোট-খাট সিনেমা ইত্যাদির ব্যবস্থা এখানে হইতে পারে।

অর্থাৎ, দরিদ্র পাড়ার এই আশ্রমে যাবতীয় ব্যাপারই থাকিবে—তালিকায় কেবল রেস্তরাঁ, অর্কেষ্ট্রা ও ড্যান্সিং হলের কথা বাদ পড়িয়াছে—তবু ইহাকে 'আশ্রম' বলিতে হইবে। মিঃ এণ্ড্রুজকে বিদেশী নিরীহ ভদ্রব্যক্তি পাইয়া বর্ত্তমান ভারতের আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতারা তাঁহার মাথায় আশ্রম সম্বন্ধে এমনই আজগুবী ধারণা ঢুকাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে, একাধারে 'হার্ভার্ড' ও 'হোলিউডে'র সংমিশ্রণ হইলেও, তাহাকে আশ্রম আখ্যা দিলেই সমস্তটাই দারিদ্র্যাবসানে আশ্চর্য্যভাবে কার্য্যকরী হইতে পারে। আমরা মিঃ এণ্ড্রুজকে দোষ দিব না। এত দীর্ঘ কাল তিনি শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করিয়াছেন যে, তাহাতে তাঁহার সহজাত কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইলে দোষ দিবার উপায় কই? কেবল মনে হয় কি লজ্জা!

"লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি প্রাণিনাং প্রাণদায়িনী"

অগ্রহায়ণ—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৫ম সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

নেতৃত্বের নমুনা

কিছুদিন আগে মহীশূরের ছাত্র-সম্মেলনে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারীষ্টার মিঃ শরচ্চন্দ্র বসু সভাপতিরূপে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় প্রধানতঃ নয়টি বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

ঐ বিষয় নয়টির নাম—

(১) নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কি কি?

(২) যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়?

(৩) বর্ত্তমান যুবকগণের দোষ কি কি?

(৪) বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রের অসুবিধা কি কি? (Difficulties of Practical Politics)

(৫) অপরিহার্য্য একতা যে ভারতবর্ষে আছে তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় কি কি? (Realisation of the essential unity of India)

(৬) ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি কি? (Removal of the appaling poverty of the masses of India)

(৭) ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বরাজ লাভ করিবার সমস্যা সমাধান করিবার উপায় কি কি? (Problem of securing complete independence for India)

(৮) ঐ সমস্যা সমাধানে ভারতীয় যুবকগণকে কি কি করিতে হইবে? (What contributions can the youth of India bring to solutions)

(৯) ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের স্বভাব কি কি? (Character of Indian National Congress)

মিঃ বসু তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতায় যে নয়টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি আমাদিগের মতে শুধু যুবকগণের জন্য কেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ভারতবাসীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই শ্রেণীর চিন্তাশীল বিষয়-সমাবেশ প্রায়শঃ আজকালকার বক্তাগণের বক্তৃতায় দেখা যায় না। এই হিসাবে মিঃ বসুকে চিন্তার বিধানজ্ঞ বলা যাইতে পারে এবং তিনি প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু, যে ভাবে তিনি উপরোক্ত বিষয়গুলির বিচার করিয়াছেন তাহা বিশ্লেষণ করিলে তাঁহাকে বালকের মত অজ্ঞ, বিপথগামী যুবকের মত উচ্ছৃঙ্খল, সাধনাহীন বৃদ্ধের মত চিন্তা-শক্তিহীন না বলিয়া পারা যায় না। অবশ্য, ভ্রমাত্মকতার প্রমাণ যে কেবল মিঃ বসুর বক্তৃতাতেই অনন্যসাধারণরূপে দেখা যায় তাহা নহে। গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের যে কোন নেতা জনসম্মেলনে যাহা কিছু বলেন, তাহার যে কোনটি বিশ্লেষণ করিলে উপরোক্ত ভ্রমাত্মকতার নিদর্শন পাওয়া যাইবে। ইহারই জন্য তাঁহাদিগের তথাকথিত অভূত-পূর্ব্ব সাফল্য সত্ত্বেও, শিক্ষিত যুবকগণের বেকার অবস্থা, মধ্য-শ্রেণীর দারিদ্র্য, শিল্পক্ষেত্রের শ্রমজীবিগণের হাহাকার, কৃষকগণের অনাহার, সমস্ত সম্প্রদায়ের অস্বাস্থ্য ও চরিত্রহীনতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এক কথায়, অস্ত্রোপচার ঠিকই হইতেছে বটে, কিন্তু রোগীরা মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। আমাদিগের নেতারা প্রায়শঃ উচ্ছৃঙ্খল এবং চিন্তা-বিষয়ে অলস। তাঁহারা কতকগুলি উত্তেজক কথার আরোপ করিয়া শ্রোতাদের উত্তেজনা বৃদ্ধি করিবার জন্যই প্রায়শঃ ব্যস্ত থাকেন, অথচ কি করিলে যে সর্ব্বসাধারণের বিবিধ সমস্যার সমাধান হইতে পারে, স্বাধীন ভাবে তাহার কোন চিন্তা করেন না। এইরূপে তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপকার অপেক্ষা অধিকতর অপকারই করিতেছেন। তাঁহারা কি বলেন তাহা প্রায়শঃ নিজেরাই বুঝিতে পারেন না। দেশের ও দেশবাসীর অবস্থা এবং কর্ত্তব্য বুঝিতে হইলে যে ধীরতা ও বিশ্লেষণ-নিপুণতার একান্ত প্রয়োজন, তাহা প্রায়শঃ তাঁহাদিগের একজনের মধ্যেও দেখা যায় না। ইহাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আত্মানুরাগজাত পরিতৃপ্তিতে (egotistical complacence) পরিপূর্ণ। সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইলে, তাহাদিগের অবস্থা, খেদ ও চিন্তা যে-ধৈর্য্যসহকারে পরীক্ষা করিতে হয়, সেই ধৈর্য্য প্রায়শঃ ইহাঁদিগের একজনের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয় না। ইহাঁরা স্বকীয় নৈপুণ্যেই বিভোর থাকেন বলিয়া এতাদৃশ রকমের বিচারহীন, উচ্ছৃঙ্খল, চিন্তা-বিষয়ে অলস, উত্তেজনাপ্রিয় ও অধৈর্য্য হইয়া থাকেন।

সাধারণতঃ ভারতীয় নেতাদের মধ্যে নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় যে যে গুণের অভাবের কথা বলা হইল, মিঃ বসুর মধ্যেও যে ঐ ঐ গুণের অভাব একান্ত ভাবে বিদ্যমান আছে, তাহা তাঁহার এই বক্তৃতা হইতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। তাহার জন্যই আমরা এই সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। মিঃ বসুকে হীন প্রতিপন্ন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। মিঃ বসুর শ্রেণীর আধুনিক নেতৃবর্গ আমাদিগের জনসাধারণকে ও যুবকগণকে কিরূপ ভাবে বিপথগামী করিতেছেন, তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের চক্ষু ফোটান আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। ঐ উদ্দেশ্যে, মিঃ বসু যে নয়টি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তিনি কি কি বলিয়াছেন এবং তাঁহার বক্তব্যের ভ্রমাত্মকতা কোথায়, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কি কি?

নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কি কি তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিয়া আধুনিক ইটালীতে কোন্ কোন্ বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তত্রত্য নেতা হওয়া যায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে মিঃ বসু তাঁহার যুবক শ্রোতৃবর্গকে শুনাইয়াছেন। অথচ, আমাদিগের ভারতবর্ষে নেতা হইতে হইলে কোন দিন কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার ব্যবস্থা ছিল কি না এবং থাকিলে কোন্ কোন্ বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে হইত, তদ্বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই।

একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, যুবকদিগকে কোন বিষয়ে কাহারও উৎকর্ষ আছে বলিয়া দেখান হইলে তাহার উপর পরোক্ষভাবে তাহাদিগের অনুরক্তি আনান হয়। ইটালীতে নেতৃত্বের পরীক্ষা হইয়া থাকে, অথচ আমাদিগের দেশে এই পরীক্ষা হয় না বা হইত না, ইহা যুবকগণ যদি প্রকারান্তরে

জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের পক্ষে এতদ্বিষয়ে ইটালীর সুবন্দোবস্তের ক্ষমতা সম্বন্ধে আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। ইহাতে পরোক্ষভাবে নিজের দেশের প্রতি ঘৃণা এবং অপরের গুণপনার প্রতি আকৃষ্টতা আনয়ন করা হয়। ইহাতে ভালমন্দ বিচারের জ্ঞানহীন যুবকগণের মন আংশিকভাবে অপরের দ্বারা যাহাতে বিজিত হইতে পারে, তাহার সহায়তা করা হইয়া থাকে, অথবা প্রকারান্তরে ইংরাজীতে যাহাকে intellectual conquest বলা হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য করা হয়।

সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে, নেতৃত্বের অত্যাবশ্যকীয় গুণ কি কি, তাহার আলোচনাকালে ইটালীতে নেতৃত্বপরীক্ষার কি কি ব্যবস্থা আছে, তাহার উল্লেখ করায় এবং ভারতবর্ষে কোনদিন কোন ব্যবস্থা ছিল কি না, তাহার উল্লেখ না করায়, মিঃ বসু যদিও পূর্ণ স্বাধীনতার বুলি অহরহ আওড়াইয়া থাকেন, তথাপি প্রকারান্তরে ভারতীয় যুবকগণের intellectual conquest-এর সহায়তা করিয়াছেন।

অবশ্য একথা বলিতেই হইবে যে, যে বিষয়ের সুব্যবস্থা আমাদিগের দেশে নাই, অথবা কোনদিন ছিল না, সেই বিষয়ের সুব্যবস্থার নিদর্শন যদ্যপি আর কোন দেশে আছে বা ছিল বলিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে তাহার অনুকরণ আমাদিগকে করিতেই হইবে। ঐ সুব্যবস্থার অনুকরণ করিতে গিয়া যদি কাহারও কোনরূপ বিজয়ের সহায়তা করিতে হয়, তাহাও আমাদিগকে উপেক্ষা করিতে হইবে।

অতএব, ভারতীয় যুবকগণের intellectual conquestএর সহায়তা করিবার জন্য মিঃ বসুর উপর আমরা যে দোষারোপ করিতেছি, তাহা সম্পূর্ণ ভাবে সঠিক কি না, তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে হইলে, প্রথমতঃ নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য ইটালীতে যে যে ব্যবস্থা আছে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে কোনদিন ঐ-বিষয়ক কোন সুব্যবস্থা ছিল কি না, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

নেতৃত্বের পরীক্ষার জন্য ইটালীতে যে যে ব্যবস্থা আছে এবং যাহার কথা মিঃ বসু তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহা স্থির করিতে হইলে কোন দেশের নেতার অবশ্যকর্ত্তব্য কি কি এবং ঐ কর্ত্তব্য-ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইলে কোন্ কোন্ গুণপনা একান্ত প্রয়োজনীয়, এবং ঐ গুণপনা কেহ অর্জ্জন করিয়াছেন কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার উপায় কি কি, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে।

নেতার অবশ্যকর্ত্তব্য কি কি, তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের সর্ব্বসাধারণ সাধারণ ভাবে কি কি চায়, তাহার নির্ণয় করিতে হইবে, কারণ দেশের সর্ব্বসাধারণের একান্ত প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার জন্যই নেতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের চলতি কথানুসারে ("ভাত-কাপড় দেবার নাম নাই কিলাইবার গুরুমহাশয়"), যাঁহারা ভাত-কাপড় দিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তাঁহারা সাধারণের অবজ্ঞাভাজন হইয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণ সাধারণ ভাবে কি চায়, তাহার আলোচনা আমরা অনেকবার করিয়াছি। তাহাতে আমরা দেখাইয়াছি যে, সসম্মে উপার্জ্জিত অর্থের স্বচ্ছলতা, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি, ইহা প্রত্যেক মানুষেরই প্রয়োজনীয়, এবং তাহা পাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রত্যেকেই করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে, যথা বড়মানুষের বড়মানষী, মাতালের মাতলামী ইত্যাদি। প্রত্যেক মানুষই যে সসম্মে উপার্জ্জিত অর্থের স্বচ্ছলতা, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তি ও সন্তুষ্টি চাহিয়া থাকেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে, খুবই আশা করি, কোন মতপার্থক্য ঘটিবে না। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, সর্ব্বসাধারণ সাধারণ ভাবে স্বাধীনতা পাইবার আকাঙ্ক্ষাও করিয়া থাকে। আমাদের মতে তাহা সত্য নহে। যাহারা অশিক্ষিত জনসাধারণ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে যে, যাহাতে কাহারও তাঁবেদারী না করিয়া তাহাদিগের প্রয়োজনীয় অর্থের স্বাচ্ছল্য ঘটে, সেইরূপ ভাবের স্বাধীন উপার্জ্জনের আর্থিক স্বচ্ছলতা তাহারা চাহে

বটে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতার জন্য তাহারা উদ্‌গ্রীব নহে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা দেশের প্রত্যেকের পক্ষে উপার্জ্জন করা কখনও সম্ভব হয় না, কারণ রাষ্ট্রীয় ভাবে দেশ স্বাধীন হইলেও যাঁহারা দেশের শাসনভার পাইয়া থাকেন, প্রধানতঃ তাঁহাদিগকেই স্বাধীন বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে এবং দেশের অন্যান্য সকলকে তাঁহাদিগের তাঁবেদারী করিতে হয়। উপরোক্ত বিচার হইতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, একে ত' জনসাধারণ প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অথবা পরাধীনতা সম্বন্ধে উদাসীন, তাহার পর আবার তাহাদিগের পেটের ডাল-ভাতের, শরীরের স্বাস্থ্যের, মনের শান্তির ও সন্তুষ্টির ব্যবস্থা সাধিত না হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা তাহাদিগের কোন প্রয়োজনেই আসে না।

কাজেই, যাহাতে সর্ব্বসাধারণের সসম্ভ্রমে আর্থিক স্বচ্ছলতা উপার্জ্জন করা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করা এবং মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা করাই নেতার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য।

কোন্ কোন্ গুণপনা অর্জ্জন করিতে পারিলে নেতার পক্ষে সর্ব্বসাধারণের জন্য সসম্ভ্রমে উপর্জ্জিত স্বচ্ছলতা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, তাহা স্থির করিতে হইলে কোন্ কোন্-বিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতা অর্জ্জন করিতে পারিলে ঐ ঐ ব্যবস্থা করিতে পারা যায়, তাহার বিবেচনা করিতে হইবে।

কোন্ কোন্-বিষয়ক জ্ঞান ও কার্য্য-কুশলতা অর্জ্জন করিতে পারিলে দেশের মধ্যে ঐ ঐ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়, তাহার বিবেচনা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সর্ব্বসাধারণ যাহাতে সসম্ভ্রমে উপার্জ্জন করিয়া আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতাবিষয়ক বিজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা এবং কুটীর-শিল্প ও অন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক বিজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয়। কারণ, স্বাধীন ভাবের লাভজনক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা সাধিত না হইলে জনসাধারণের পক্ষে স্বাধীন-ভাবে সসম্ভ্রমে উপার্জ্জন করা কখনও সম্ভব হয় না এবং জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি, কুটীর-শিল্প ও অন্তর্ব্বাণিজ্য রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে কখনও স্বাধীনভাবের লাভজনক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি যাহাতে সর্ব্বসাধারণে উপভোগ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রয়োজন হয় জীব ও জলহাওয়া-তত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞান ও কার্য্যকুশলতা, কারণ অস্বাস্থ্য, মনের অশান্তি ও অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ জল-হাওয়ায় রোগের বীজাণু এবং মানুষের অসচ্চরিত্র-জনিত চালচলন এবং উপরোক্ত তত্ত্ববিষয়ক বিজ্ঞান কয়টি না জানিতে পারিলে ও উহার কার্য্যকুশলতা লাভ করিতে না পারিলে জলহাওয়া হইতে রোগের বীজাণু ও মানুষের অসচ্চরিত্রতা কখনও দূর করা সম্ভব হয় না। যে যে ব্যবস্থায় সর্ব্বসাধারণের সসম্ভ্রমে উপার্জ্জিত অর্থের স্বচ্ছলতা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি লাভ করা সম্ভব হইতে পারে, তাহা দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে প্রয়োজন হয় মান, অপমান, দ্বন্দ্ব ও কলহের বিজ্ঞান ও তাহা পরিত্যাগ করিবার অভ্যাস, কারণ মান ও অপমানের কোন্দল এবং দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকিলে কাহারও পক্ষে কোন ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কখনও প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় না।

উপরোক্ত কথাগুলি হইতে ইহা বলা যাইতে পারে যে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণ সসম্ভ্রমে উপার্জ্জিত অর্থের স্বচ্ছলতা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি উপভোগ করিতে পারে, তাহা করিতে হইলে, প্রথমতঃ জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরতা-বিষয়ক, দ্বিতীয়তঃ কুটীর-শিল্প-বিষয়ক, তৃতীয়তঃ অন্তর্ব্বাণিজ্য-বিষয়ক, চতুর্থতঃ জীবতত্ত্ব-বিষয়ক, পঞ্চমতঃ জলহাওয়াতত্ত্ব-বিষয়ক, ষষ্ঠতঃ মান ও অপমানবিষয়ক, সপ্তমতঃ দ্বন্দ্ব ও কলহবিষয়ক বিজ্ঞান ও তাহার অভ্যাস অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

কোন্ কোন্ গুণপনা অর্জ্জন করিতে পারিলে উপরোক্ত সাতটী বিষয়ের বিজ্ঞান ও তাহার অভ্যাস

আয়ত্তাধীন করা সম্ভব হয় তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন—স্বকীয় মন ও বুদ্ধির সহিত সর্ব্বতোভাবের পরিচয় এবং স্বকীয় মন ও বুদ্ধির সহিত সর্ব্বতোভাবের পরিচয় করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন—স্বকীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করা।

মানুষ, মাংসপেশীর, অথবা দৌড়ঝাঁপের, অথবা অস্ত্র-শস্ত্রব্যবহারের, অথবা কথাবার্ত্তা কহিবার, অথবা চিঠি-পত্র লিখিবার নৈপুণ্যে যতই সিদ্ধিলাভ করুক না কেন, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিতে সক্ষম না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনও কোন লোকহিতকর বিজ্ঞানে অথবা অভ্যাসে সাফল্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত লোকহিতকর বিজ্ঞানে অথবা অভ্যাসে সাফল্য-লাভ না করা যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব-সাধারণের সমগ্রমে অর্জ্জিত অর্থের স্বচ্ছলতা, শরীরের পূর্ণ স্বাস্থ্য, মনের শান্তি ও সন্তুষ্টি বিধান করা কোনক্রমেই সম্ভব হয় না, ইহা স্বভাবের নিয়ম। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, যখন দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্যগণ তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত না করিয়াও বিবিধ বিজ্ঞানে অত সাফল্য-লাভ করিতে পারিয়াছেন, তখন স্বভাবের নিয়ম যে উহার বিপরীত, তাহা বলা কোন সুবিবেচনা-সঙ্গত নহে। তাহার উত্তরে আমরা বলিব যে, পাশ্চাত্ত্যগণের বিজ্ঞান নামতঃ বিজ্ঞান বটে, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে উহা কু-জ্ঞান এবং উহা কুত্রাপি লোকহিতকর হইতে পারে নাই। উহা লোকহিতকর হইতে পারে নাই বলিয়াই উহার প্রসারসত্ত্বেও পাশ্চাত্ত্যজগতে এতাদৃশ হাহাকার, অশান্তি, অসন্তুষ্টি এবং অস্বাস্থ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

কাযেই, ইহা বলা যাইতে পারে যে, কোন মানুষ কোন দেশের অথবা কোন সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের উপযুক্ত গুণপনা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন কি না, তাহার যথাযথ পরীক্ষা করিতে হইলে, তিনি অন্ততঃপক্ষে তাঁহার স্বকীয় ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্ব্বতোভাবে সংযত করিতে পারিয়াছেন কি না, সর্ব্বাগ্রে তাহার পরীক্ষা করিতে হয়।

ইন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বতোভাবে সংযত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা না করিয়া আর কোন পরীক্ষার দ্বারা নেতৃত্বের যোগ্যতা স্থির করিলে একটী সুন্দর তামাসা সাধিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা যোগ্য ব্যক্তিকে নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করা হইল কি না, তাহার পরীক্ষা করা হয় না এবং এতাদৃশ ব্যক্তির দ্বারা জনসাধারণের অবশ্য-প্রয়োজন সাধনের সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে কৃত-নিশ্চয়ও হওয়া যায় না।

নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহা উপরোক্তভাবে স্থির করিয়া লইলে, ইটালীতে ঐ বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য যে যে ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং যাহার কথা মিঃ বসু তাঁহার বক্তৃতার প্রথমভাগেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত অথবা অসঙ্গত, তৎসম্বন্ধে সহজেই স্থির করা সম্ভব হয়।

ইটালীতে নেতৃত্বের যোগ্যতা বিচার করিবার জন্য যে তিনটি বিষয় পরীক্ষা করা হয়, বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, তাহার প্রত্যেকটী শরীরের নৈপুণ্য-বিষয়ক এবং যাহাকে ইন্দ্রিয়-সংযম বলে, উল্লেখযোগ্য ভাবে তদ্বিষয়ে কোনক্রমে অগ্রসর না হইয়াও ঐ পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করা সম্ভব হইতে পারে এবং উহার কোনটিতে ইন্দ্রিয়সংযমের অভ্যাস অর্জ্জিত হইয়াছে কি না, তাহার কোন পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয় না। কাযেই, ঐ পরীক্ষাকে কোনক্রমেই নেতৃত্বের যোগ্যতা-পরীক্ষায় সঙ্গত বলিয়া মনে করা চলে না। বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক ইটালীতে মুসোলিনী প্রভৃতি যে সমস্ত নেতার উদ্ভব হইয়াছে, তাঁহারা মিঃ বসুর শ্রেণীর লোকের চমক-প্রদ অনেক কিছু করিতে পারিয়াছেন এবং পারিবেন বলিয়া মনে করা গেলেও যাইতে পারে বটে এবং তাঁহাদের দ্বারা ইটালীর সম্প্রদায়বিশেষের মুগ্ধকর কিছু সাধিত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু ইটালীর সর্ব্বসাধারণের সমগ্রমে অর্জ্জিত আর্থিক স্বচ্ছলতা, অথবা পূর্ণ স্বাস্থ্য, অথবা শান্তি ও সন্তুষ্টি কখনও বিহিত হইবে না। পরন্তু, উহার

প্রত্যেকটীর অভাব যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে ও পাইবে, তাহার প্রমাণ কাহারও কাহারও কাছে এখনও সুস্পষ্ট না হইলেও অদূরভবিষ্যতে তাহা সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইবে।

ভারতবর্ষে কখনও নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার কোনরূপ বিধান ছিল কি না, তাহার সন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, ভারতীয় ঋষিদিগের অভ্যুদয়-কালে ভারতীয় জনসাধারণের নেতৃত্ব যাঁহাদিগকে দেওয়া হইত, তাঁহাদিগের নাম ছিল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং যে কেহ বংশানুক্রমে অথবা ইচ্ছা করিলেই ঐ তিন বর্ণের সম্মান লাভ করিতে পারিতেন না। উহার জন্য বিশেষ বিশেষ কর্ম্মক্ষমতা ও গুণবত্তা অর্জ্জন করিতে হইত এবং তাহার পরীক্ষা সাধিত হইত ইন্দ্রিয়-সংযমের পরীক্ষায়। যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়-সংযম করিবার সক্ষমতার কোন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইতেন, তিনি বংশ হিসাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য হইলেও তাঁহাকে ঐ গৌরব হইতে অপসারিত করা হইত। ঋষিদিগের অভ্যুদয়-কালে ভারতবর্ষে নেতৃত্বের যোগ্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য যে এতাদৃশ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিচয় ঋষি-প্রণীত সংহিতার এবং বেদের মূলভাগে যথাযথ অর্থে প্রবেশ করিতে পারিলে এখনও পাওয়া যাইবে।

আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, নেতৃত্বের যোগ্যতা যথাযথভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে যে যে পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা একদিন ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল আর ঐ বিষয়ে আধুনিক ইটালীতে যে পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উহার প্রহসন-মাত্র।

এতদবস্থায় নেতৃত্বের আবশ্যকীয় গুণ অথবা পরীক্ষা কি, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিতে বসিয়া ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত উল্লেখ না করায় এবং ইটালীর দৃষ্টান্ত যুবকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করায়, মিঃ বসু যে প্রকারান্তরে intellectual conquest-এর সহায়তা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবের যুক্তিক্রমেই বলা যাইতে পারে।

যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়?

যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়, তাহার আলোচনা করিতে বসিয়া মিঃ বসু যে যে কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার দুইটি কথা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

প্রথম—'যৌবনই যে জীবনের কার্য্যপ্রবৃত্তি সাধনের শক্তি প্রদান করে, যে শক্তি বয়সের অভিজ্ঞতার সজ্জায় সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে সজ্জিত হইয়া সমাজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলসাধনে সক্ষম হয়, সেই শক্তি যে যৌবনেরই দান, তাহা আমি কোনক্রমেই ভুলিতে পারি না'।(But for all that I cannot forget that it is youth, which supplies the motive power of life : that it is youth which furnishes the energy which the experience of age at its best can only harness to the highest good of society.)

দ্বিতীয়—'আদর্শবাদ (অর্থাৎ চরমোৎকর্ষের অনুসন্ধানবত্তা), সাহস এবং আদর্শবাদকে (অর্থাৎ চরমোৎকর্ষের অনুসন্ধানবত্তাকে) কার্য্যে পরিণত করিবার দুর্দ্দমনীয় জিদ্, এই তিনটি বস্তুর জন্য আমি যৌবনকে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি।' (I respect and love it (youth) for three things : its idealism, its courage and its unconquerable urge towards finding an outlet for idealism in action.)

তাঁহার উপরোক্ত দুইটী কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, যে কার্য্য-প্রবৃত্তি ও শক্তি মনুষ্যজীবনের বৈশিষ্ট্য, তাহা যৌবনের দান এবং তাহারই জন্য যৌবন ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বস্তু। মিঃ বসুর এই কথা দুইটী চলতি ধারণার অনুরূপ বটে, কিন্তু মানুষের জীবনকে তলাইয়া বিশ্লেষণ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ ধারণা প্রকৃতপক্ষে সত্য নহে। যৌবন সাধারণতঃ মানুষ ভালবাসিয়া থাকে বটে এবং দীর্ঘ-যৌবনও আকাঙ্ক্ষার বস্তু বটে, কিন্তু যৌবনকে ভালবাসিয়া তাহা উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ

ও দিশাহারা হইয়া যায় এবং অচিরে যৌবন নষ্ট হইয়া বার্দ্ধক্যের উদয় হয়। যৌবন যাহাতে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে, তাহা করিতে হইলে যৌবনকে ভালবাসা, অথবা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া কেবলমাত্র যৌবনের কর্ত্তব্যে মনোযোগী হইতে হয়। নিভৃতে একমাত্র সু-শিক্ষা ও সু-সাধনাই যৌবনের প্রথম কর্ত্তব্য। গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যৌবনকে নানারূপ বৃক্ষ ও লতাপাতাশোভিত বিপৎসঙ্কুল অরণ্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। উহা অতীব মনোরম বটে, কিন্তু অসতর্ক হইয়া উহা উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে বিপদাকীর্ণ হইতে হয়। অথচ, সতর্কতার সহিত কর্ত্তব্যপালন করিলে, অথবা চলাফেরা করিতে পারিলে অনায়াসেই যৌবনকালে নানা রত্ন আহরণ করা সম্ভব-যোগ্য হয়। কাজেই যৌবনকে নিছক ভালবাসা ও শ্রদ্ধার বস্তু বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত ভাবে কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। পরন্তু, উহাকে ভয় করিবার বস্তু বলিয়াই মনে করিতে হয়। যে যৌবন এত আকাঙ্ক্ষার বস্তু, তাহাকে ভাল না বাসিয়া অথবা উপভোগ না করিয়া ভয় করিতে হয় কেন, তাহার তথ্য অনুসন্ধান করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, যৌবন-নামক মানুষের বিকাশটি তাহার পক্ষে বড়ই প্রয়োজনীয়। কিন্তু, ঐ বিকাশ যখন স্বভাবতঃ মানুষের অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য আরম্ভ করে, তখন ঐ অস্থি প্রভৃতির নানারকম উৎকট দাবীদাওয়ার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং তখন সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের স্বাভাবিক দাবীদাওয়া মিটাইবার কার্য্যে উদ্যোগী থাকিলে অচিরে যৌবনের শক্তি বিনষ্ট হইয়া যায় ও বার্দ্ধক্যের সম্মুখীন হইতে হয়। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার প্রধান লক্ষ্য উপরোক্ত অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির স্বাভাবিক দাবী সংযত করা। যৌবনের উপরোক্ত স্বাভাবিক গতি সংযত করিবার জন্য যে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার প্রয়োজন, তাহা হইতে বিরত থাকিয়া শিক্ষা ও সাধনা-বিষয়ে উদাসীন থাকিলে, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির স্বাভাবিক দাবী-দাওয়া উৎকটতা প্রাপ্ত হয় এবং তখন স্বভাবক্রমেই মানুষ জরাগ্রস্ততার সম্মুখীন হইয়া বিনষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ অশিক্ষিত শ্রমজীবিগণের জীবন। যৌবনের স্বাভাবিক গতি সংযত করিবার জন্য যে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার প্রয়োজন, তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া কোন শিক্ষা ও কোন সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে যেরূপ অশিক্ষিতগণ স্বভাব-বশে বার্দ্ধক্যের সম্মুখীন হইয়া জরাগ্রস্ত ও অপটু হইয়া পড়েন, সেইরূপ যাঁহারা শিক্ষা ও সাধনার নামে কু-শিক্ষা ও কু-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারা ততোধিক পরিমাণে বিপন্ন হইয়া পড়েন, কারণ তাঁহাদের অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের স্বাভাবিক দাবীদাওয়া আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহাদের আরও অকালে বার্দ্ধক্যের অপটুতা ও রুগ্নতা উপস্থিত হয়। ইহার উদাহরণ বর্ত্তমান শিক্ষিত মানুষের জীবন। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, বর্ত্তমান শিক্ষিতগণ যত অল্প বয়সে বার্দ্ধক্যের অপটুতা ও রুগ্নতা প্রাপ্ত হন, অশিক্ষিতগণের প্রায়শঃ তত অল্প বয়সে বার্দ্ধক্য ও তাহার অপটুতা উপস্থিত হয় না। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার ফল যে কি হয়, তাহার বাস্তব উদাহরণ আজকাল বড়ই দুর্লভ; কারণ সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা যে কি বস্তু, তাহা মানুষ প্রায়শঃ ভুলিয়া গিয়াছে এবং সু-শিক্ষিত ও সু-সাধনা-নিরত মানুষ প্রায়শঃ নয়ন-গোচর হয় না। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার বলে কি যে হইতে পারে, তাহা যুক্তির দ্বারা অনুমান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কালবশে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য বটে, কিন্তু সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার দ্বারা বার্দ্ধক্যের অপটুতা ও রুগ্নতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত করা সম্ভব। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনানিরত মানুষের পক্ষে মৃত্যুর হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু তাঁহারা শত বর্ষাধিক দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হন এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের যৌবনের শক্তি অটুট থাকিয়া যায় এবং শেষ দিন পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যের অপটুতা ও রুগ্নতা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না।

কাযেই বলিতে হইবে যে, যৌবন-নামক মানুষের বিকাশের অবস্থাটি প্রয়োজন-বোধে তাহার আকাঙ্ক্ষার যোগ্য বটে, কারণ তখন উপরোক্ত সু-শিক্ষা ও সু-সাধনা সম্ভবযোগ্য হয়, কিন্তু উহা ভালবাসার অথবা উপভোগ করিবার বস্তু নহে, কারন উহাকে ভালবাসিতে অথবা উপভোগ করিতে আরম্ভ করিলে, কোন ক্ষেত্রে বা মোহমুগ্ধতাবশতঃ অশিক্ষা, আর কোন ক্ষেত্রে বা দম্ভবশতঃ কুশিক্ষার উদয় হয়।

মিঃ বসুর প্রথম কথাটী হইতে বুঝিতে হয় যে, মনুষ্যজীবনের যাহা কিছু ভাল, স্বভাবতঃ তাহার বীজ রোপিত হয় যৌবনে। এই কথাটী অতীব ভ্রমাত্মক। মানুষের জীবনে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য নামক যে তিনটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ বিদ্যমান আছে, তাহার বাস্তব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, চেষ্টা করিলে শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা যৌবনে কোন কোন বিষয়ের সুবীজ রোপণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ কোন সুবীজ যৌবনে রোপিত হয় না।

মনুষ্য-জীবনের যাহা কিছু ভাল, স্বভাবতঃ তাহার সুবীজ রোপিত হয় বাল্যে এবং যাহা কিছু মন্দ, তাহার কুবীজ রোপিত হয় যৌবনে। মনে রাখিতে হইবে যে, এ কথাটি সম্প্রদায়বিশেষের অভিমত (opinion) নহে। চক্ষু থাকিলে এবং তাহা মেলিয়া দেখিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে পারিলে, দেখা যাইবে যে, উহা মনুষ্যজীবনের বাস্তব অবস্থা। ভাল অবস্থার বীজ যখন স্বভাবতঃ রোপিত হয়, তাহার পরবর্ত্তী কালে চেষ্টা না করিলেও স্বভাবতই ভাল অবস্থার উৎপত্তি হয়, আর মন্দ অবস্থার কুবীজ যখন রোপিত হয়, তাহার পরবর্ত্তী কালে স্বভাবতই মন্দাবস্থার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা সাদা কথা ও বাস্তব সত্য। জরাধর্ম্মী বার্দ্ধক্য কখনও কাহারও আকাঙ্ক্ষণীয় নহে। উহা জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা মন্দাবস্থা এবং উহার পরিণতি হয় মৃত্যুতে। যৌবনে যদি স্বভাবতঃ কোন সুবীজ রোপিত হইত, তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় স্বভাবতঃই বার্দ্ধক্যের উদ্ভব হইত না। যৌবন-কাল আকাঙ্ক্ষণীয় বটে, কারণ তখন ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ হয়, মন অভিব্যক্তি লাভ করে এবং বুদ্ধির উন্মেষ হয়, কিন্তু সুশিক্ষা না পাইলে উপরোক্ত স্ফুরণের ফলে মানুষ স্বভাবতঃ যৌবনে যে সমস্ত কার্য্য করে, তাহার স্বাভাবিক ফল কখনও শুভপ্রদ হয় না। ইহারই জন্য যৌবনের পর স্বভাবতঃ বার্দ্ধক্যের উদয় হয়। স্বাভাবিক ভাবে যৌবনে যে সমস্ত শক্তির স্ফুরণ ঘটে, সেই সমস্ত শক্তির সুবীজ বাল্যে নিহিত থাকে এবং বাল্যে মানুষের সমস্ত প্রয়োজনীয় শক্তির সুবীজ স্বভাবতঃ রোপিত হয় বলিয়াই বাল্যের পর স্বভাবতঃ যৌবনের উদ্ভব হইয়া থাকে। সুশিক্ষার ও সুসাধনার পরিমার্জ্জন না পাইলে যৌবনের শক্তি স্বভাবতঃ মানুষের ও মনুষ্য-সমাজের ঘোরতর অপকারই সাধন করিয়া থাকে।

ইহারই জন্য, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার অভাবের ফলে, আজকালকার যুবকগণ তথাকথিত শিক্ষালাভ করিয়াও প্রায়শঃ পরের মাথায় কাঁঠাল না ভাঙ্গিয়া, রামের ধন যদুকে দিবার কৌশলে অভ্যস্ত না হইয়া অথবা কোন না কোন রকমের নফরগিরি না করিয়া মূল প্রকৃতি হইতে কিরূপে প্রচুর ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিয়া, কাহারও সহিত যুদ্ধ ও কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া, জীবন যাপন করিবার নৈপুণ্য লাভ করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিতে পারে না।

মিঃ বসুর দ্বিতীয় উক্তির অন্য কথা—আদর্শবাদ, সাহস ও আদর্শবাদকে কার্য্যে পরিণত করিবার জিদ্ যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাও সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে।

সু-শিক্ষা ও কঠোর সাধনার দ্বারা চেষ্টা করিলে কখনও কখনও যৌবনেও প্রকৃষ্ট আদর্শ অনুসন্ধান করিবার এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় বটে, কিন্তু সু-শিক্ষা ও কঠোর সাধনা না থাকিলে স্বভাবতঃ যৌবনে যে সমস্ত আদর্শের কথা উত্থিত হয়, তাহা প্রায়শঃ ইন্দ্রিয়ের ভোগ ও যথেচ্ছাচারমূলক এবং তাহা প্রায়শঃ নিন্দনীয়। পরন্তু, প্রকৃষ্ট আদর্শের বীজ মানব-হৃদয়ে বপন করা বাল্যে ও কৈশোরে যত সহজসাধ্য, যৌবনে তাহা বপন করা

তত সহজসাধ্য কখনও হয় না। যৌবনে শক্তির উন্মেষ স্বভাবতঃই হইয়া থাকে বটে এবং সু-শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা তখন সাহসও রক্ষা করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু সু-শিক্ষা ও সাধনার দ্বারা চেষ্টা না করিলে যে-সাহসের স্বভাবতঃ বাল্যে ও কৈশোরে উদ্ভব হয়, সেই সাহস যৌবনে বজায় রাখা কখনও সম্ভব হয় না।

কেন এইরূপ হয়, তাহার কথা চিন্তা করিতে বসিলে মানবজীবনের মূল কোন্ বস্তুতে, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে হয়। মানবজীবনের মূল কোথায়, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, জগতে যত কিছু অভিব্যক্ত বস্তু (manifested articles) রহিয়াছে, তাহার মধ্যে মানুষের সর্ব্বপ্রথম মূল রহিয়াছে বায়ুর মধ্যে এবং তৎপরবর্ত্তী মূল রহিয়াছে রস ও তেজের মধ্যে। বায়ু না থাকিলে মানুষের জন্ম হওয়া অথবা জীবনধারণ করা সম্ভব হইত না। মানুষের শরীরে রস ও তেজ না থাকিলে মানুষের চলা-ফেরা করা সম্ভব হইত না। শক্তিসম্পন্ন চলা-ফেরার জন্য এই রস ও তেজের পরিমিত মাত্রা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ রস ও তেজের মাত্রা কম হইলে মানুষ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং উহার মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইলে মানুষ নানাবিধ রকমে অসুস্থ, অধীর, এমন কি ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। যৌবনে ইন্দ্রিয়শক্তি ও মনঃশক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়া স্বভাবতঃই রস ও তেজের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার দ্বারা রস ও তেজের ঐ স্বাভাবিক বৃদ্ধি সংযত করিতে না পারিলে, যুবকের পক্ষে অস্বাস্থ্য, অধৈর্য্য এবং ক্ষিপ্ততা স্বাভাবিক।

কাযেই বলিতে হইবে যে, যে তিনটি গুণে যৌবনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা বলিয়া মিঃ বসু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই তিনটি গুণের জন্য উহার কোন প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা নাই। উহার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায়।

এই কথা হইতে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার কথা না বলিয়া যুবকগণকে যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ইঙ্গিত করা তাহাদিগকে কু-পরামর্শ দিবার, অথবা চলতি কথায় 'বকাইয়া' দিবার অনুরূপ। আমাদিগকে কি বুঝিতে হইবে যে, আজ-কাল নেতা ও ভাল ব্যারীষ্টার হইতে হইলে কখনও কখনও 'বকাটে' হইবার প্রয়োজন আছে?

বর্ত্তমান যুবকগণের দোষ কি কি?

যৌবনের স্বাভাবিক দোষ কোথায়, তাহা বলিতে বসিয়া মিঃ বসু বলিয়াছেন—"যৌবনের আদর্শবাদের (অর্থাৎ, চরমোৎকর্ষের অনুসন্ধানবত্তার) কথা বলিবার কালে, vision (অর্থাৎ দূরদৃষ্টি) থাকা এবং visionary (অর্থাৎ, উৎকট কল্পনাশ্রয়ী) হওয়া, এই দুইটি কথার প্রভেদ আমি স্মরণ করিয়া থাকি এবং আমার মতে এই পার্থক্য অপরিহার্য্য। (In speaking of the idealism of youth, I make a distinction between having vision and being a visionary, and to my mind the distinction is fundamental)। দূরদর্শিতা চিত্তবিক্ষেপের ও অপ্রাসঙ্গিকতার হাত হইতে এড়াইয়া সারবস্তু আয়ত্তাধীন করিবার সামর্থ্য প্রদান করে, আর কল্পনাপ্রিয়তা বাস্তবতা-বিরুদ্ধ আদর্শের সৃষ্টি করিয়া নিষ্ফল জীবনের সূচনা করিয়া দেয়। (Vision enables us to rise above the distractions and irrelavancies of immediate circumstances and keep our hold on essentials; while a visionary, by divorcing his ideals from reality, has foredoomed himself to a barren career)। যৌবনের এই আদর্শগুলি এতাদৃশ কল্পনামূলক হইয়া থাকে যে, কার্য্যকরী জগতের সহিত তাহাদের কোন সংস্রব থাকে না এবং তাহারা এত দৌর্ব্বল্য আনয়ন করে যে, প্রতিক্রিয় শক্তিগুলির সম্মুখীন হইবার সাহস লুপ্ত হইয়া যায়। এই কল্পনা-প্রিয়তা মানবজীবনের কোন উন্নতি সাধন করিতে পারে না। (Ideals so utopian that they have no moorings in the work-a-day world or so feeble that they dare not take up the challenge of reactionary forces, are of no value in the onward march of humanity)।"

এক কথায়, বাস্তবতা পরিত্যাগ করিয়া কল্পনাশ্রয়ী হওয়া মিঃ বসুর মতে যৌবনের প্রধান দোষ। ইহা ছাড়া এতৎসম্বন্ধে তিনি আর যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝিতে হয় যে, কল্পনাপ্রিয়তা ছাড়িয়া দিয়া মারামারি কাটা-কাটি করিতে প্রবৃত্ত হইলেই যৌবন সার্থক হইয়া থাকে।

যৌবনের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় দর্শনে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার পরিমার্জ্জন সাধিত না হইলে, কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা, তাহা যুবকগণের পক্ষে স্বভাবতঃ স্থিররূপে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হয় না বটে, কিন্তু কু-শিক্ষা না পাইলে তাহারা স্বভাবতঃ কখনও কল্পনাশ্রয়ী হয় না। ইহার প্রমাণ - শ্রমজীবিগণের মধ্যে যাহারা যুবক, তাহাদিগের স্বভাব। বাস্তবতঃ শ্রমজীবী যুবকগণের মধ্যে কদাচিৎ কল্পনাপ্রিয়তা দেখা যাইবে। শ্রমজীবী যুবক ও শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে মূলতঃ প্রভেদ যে তথাকথিত শিক্ষা লইয়া, তাহা বলাই বাহুল্য। যখন দেখা যায় যে, শ্রমজীবী যুবকগণের মধ্যে কল্পনা-প্রিয়তা নাই আর ঐ কল্পনা-প্রিয়তা তথাকথিত শিক্ষিত যুবকগণের মজ্জাগত হইয়া তাহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবন মরুভূমি করিয়া তুলিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, কল্পনাপ্রিয়তা যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, পরন্তু শিক্ষিত যুবকগণ আজকাল যে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, উহা সেই শিক্ষারই ফল। কাযেই শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে আজকাল যে কল্পনাপ্রিয়তা দেখা যায়, তাহার জন্য দায়ী যৌবনের স্বভাব, অথবা যুবকগণ নিজেরা নহে। উহার জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবে দায়ী করিতে হয় বর্ত্তমান শিক্ষাকে। যুবকগণের মধ্যে উহার প্রতিনিবৃত্তি সাধন করিতে হইলে যুবকগণকে বলিয়া কোন লাভ হইতে পারে না। পরন্তু, প্রয়োজন হয় আধুনিক শিক্ষার পরিবর্ত্তন সাধন।

অথচ মিঃ বসু আধুনিক শিক্ষাবিধানের কোন পরিবর্ত্তন সাধনের কথা না বলিয়া সরাসরি যুবকগণকেই উহা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। অন্ধকার ঘরে যাহাতে আলো প্রজ্বলিত হয়, তাহার কোন আয়োজন না করিয়া "অন্ধকার দূর কর, অন্ধকার দূর কর", এতাদৃশভাবে কেবলমাত্র চীৎকার করিলে যেরূপ কোন সুফলোদয় হয় না, সেইরূপ আধুনিক শিক্ষার পরিবর্ত্তন সাধন করিবার আয়োজন না করিয়া যুবকগণকে কল্পনা-প্রিয়তা পরিত্যাগ করিবার কোন উপদেশেই কোন সুফলোদয় হইতে পারে না।

কাযেই মিঃ বসুর বক্তৃতার এই অংশকেও সমীচীন বলা চলে না।

বাস্তব রাজনীতি ক্ষেত্রের অসুবিধা কি কি?

(Difficulties of Practical Politics)

যাঁহারা কার্য্যতঃ রাজনীতি ক্ষেত্রের কর্ম্মী, তাঁহাদিগের অসুবিধা কোথায়, তাহার বর্ণনা করিতে বসিয়া মিঃ বসু বলিতেছেন যে—"রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রত্যেক পদে পদে আপোষের কথায়, গোপনের কার্য্যে, ঔচিত্যের মতলবে, কার্য্যপন্থার অসুবিধায় পরিব্যাপ্ত। (Beset at every turn with compromises and reservations, motives of expediency and difficulties of ways and means)।"

বর্ত্তমান রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে মিঃ বসুর কথিত উপরোক্ত বিশৃঙ্খলাগুলি বিদ্যমান আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে রাজনীতি ও শাসননীতি সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য, সেই রাজনীতির ও শাসননীতির বাস্তবক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব, কলহ ও দলাদলিরই বা কেন প্রয়োজন হয়, আর তাহার আপোষেরই বা প্রশ্ন কেন উঠে, যাহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য, তাহার প্রত্যেক কথাটি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ না করিয়া তাহার প্রত্যেক পদে পদে সর্ব্বসাধারণকে এত অবিশ্বাস করিতে হয় কেন এবং এত গোপন ও লুকোচুরির খেলা খেলিবারই বা প্রয়োজন উপস্থিত হয় কেন, তাহার কর্ম্মসূত্রে লইয়াই বা এত অহরহ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয় কেন, তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে বসিলে, বর্ত্তমান রাজনীতি ও শাসননীতি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য

কি না এবং উহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেকের মঙ্গল সাধন করা সম্ভবযোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ উপস্থিত হয়। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, যাহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য এবং যে কর্ম্মসূত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করা সম্ভবযোগ্য, তাহাতে কখনও পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, কলহ বা দলাদলির কথা উত্থিত হইতে পারে না এবং তাহার কোন কথা লইয়াই প্রতি পদে পদে আপোষের (compromise-এর) প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যাহা সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেকের মঙ্গলের জন্য, তাহার কোন কথাই কাহারও নিকট গোপন রাখিবার প্রয়োজন হয় না। কাযেই তাহাতে কোন লুকোচুরি খেলার-(reservation-এর)ও আবশ্যকতা হয় না। যে কর্ম্মসূত্রের দ্বারা সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেকের হিত সাধন করা সম্ভব হয়, সেই কর্ম্মসূত্রের কোন অবস্থাতেই কোন রূপ অসুবিধার (difficulties of ways and means-এর) কথা উঠিতে পারে না, কারণ সর্ব্বসাধারণের প্রত্যেকেরই তাহাতে স্বার্থ থাকে এবং যাহাতে মানুষের স্বার্থ থাকে, তাহা মানুষ স্বভাবের প্ররোচনাতেই বুঝিতে পারে।

কাযেই বলিতে হইবে যে, আধুনিক যে রাজনীতি ও শাসননীতির কথা মিঃ বসু তাঁহার বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা মুখে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য (অর্থাৎ for the people) হইলেও কার্য্যতঃ উহা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম নহে এবং উহা আদৌ বাস্তব (অর্থাৎ practical) নহে। পরন্তু উহা সর্ব্বৈব কল্পনাশ্রয়ীর (অর্থাৎ visionary) কল্পনা। আধুনিক রাজনৈতিক দর্শনগুলি (political philosophy) যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক-প্রসূত, তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থগুলি চিন্তা করিয়া পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক গ্রন্থখানি কতকগুলি পরস্পর-বিরোধী (অর্থাৎ self-contradictory) এবং অস্বাভাবিক কল্পনায় (unnatural schemes-এ) পরিপূর্ণ। যাঁহারা মিঃ বসুর মত পাশ্চাত্যভাবে বেশভূষা ও চালচলন ধারণ করিয়া সাহেবীয়ানায় গৌরবান্বিত অনুভব করেন এবং আত্ম-পরীক্ষার সামর্থ্য হারাইয়া নিজদিগের বুদ্ধি ও অবস্থাতে পরিতৃপ্ত (অর্থাৎ egotistically complacent), তাঁহারা পাশ্চাত্ত্য political philosophy-র দোষ কোথায় এবং আমাদের উপরোক্ত কথার সত্যতা কোথায়, তাহা বুঝিতে সক্ষম না হইলেও হইতে পারেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য রাজনীতি ও শাসননীতি যে অবাস্তব এবং উহা দ্বারা সম্প্রদায়বিশেষের মঙ্গল সাধিত হইলেও উহা যে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গল সাধন করিতে অক্ষম, তাহা বাস্তব সত্য। যদি তাহাই না হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপে এবং মার্কিণে প্রত্যেক স্তরের লোকের মধ্যে এত হাহাকার উঠিতে পারিত না।

কোন্ সূত্রের উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সঙ্গত, কোন্ সূত্রের উপর রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা সহজেই সর্ব্বসাধারণের পালনযোগ্য হইয়া বাস্তবরূপ ধারণ করিতে পারে, মানুষ যাহাতে অসত্য ও দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া মানুষের মত হয়, তাহা করিতে হইলে রাজনীতি-ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ কর্ম্মসূত্র সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় এবং গ্রহণীয়, তাহর সম্পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে অথর্ব্ববেদের মধ্যে। বাইবেলে এবং কোরাণেও ঐ আলোচনা বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ কর্ম্মসূত্র সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় ও বর্জ্জনীয়, তৎসম্বন্ধে বেদে যে সমস্ত আলোচনা রহিয়াছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যাহাতে সর্ব্বসাধারণ কাহারও নফরগিরি না করিয়া অনায়াসে স্বাধীনভাবে ও সসম্ভ্রমে আর্থিক প্রাচুর্য্য লাভ করিতে পারে, শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে এবং ধর্ম্ম-চর্চ্চার অবসর পায়, তাহাই রাজনীতি-ক্ষেত্রের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব। রাজনীতি-ক্ষেত্রের দ্বিতীয় দায়িত্ব, যাহাতে যুবকগণ অশিক্ষা অথবা কু-শিক্ষার ফলে ইন্দ্রিয়ভোগে প্রমত্ত না হইয়া অনায়াসে সু-শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং চরিত্র গঠন করিয়া সত্যপরায়ণ, অকপট এবং দ্বন্দ্বকলহপ্রবৃত্তি-বিহীন হয়, তাহার ব্যবস্থা। মনে রাখিতে হইবে যে, এই দুইটি ব্যবস্থাই এমনভাবে করিতে হয়, যাহাতে

উহা সর্ব্বসাধারণের এবং যুবকগণের অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। যে ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা কাহারও পক্ষে অসাধ্য অথবা কষ্ট-সাধ্য, তাহা কখনও সঙ্গত নহে, ইহা বেদের অভিমত।

বাস্তবিক পক্ষে, যে রাজনীতি ও শাসননীতি বাস্তব এবং যাহার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মানুষের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব, সেই রাজনীতিতে কখনও কোন অসুবিধা থাকিতে পারে না এবং তাহাতে প্রবেশ করিয়া কোন মানুষেরই প্রকারান্তরেও অসত্য ও কপটতা (অর্থাৎ diplomacy) গ্রহণ করিয়া পশুর মত হইতে বাধ্য হইতে হয় না।

এই সাদা কথাগুলি পর্য্যন্ত যাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে যুবকদিগের গুরুমহাশয়গিরি করিতে যাওয়া, অথবা তাঁহাদিগকে উহা করিতে দেওয়া সমাজের মঙ্গলজনক কি না, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

অপরিহার্য্য একতা যে ভারতবর্ষে আছে তাহা উপলব্ধি করিবার উপায় কি কি ?

(Realisation of the essential unity of India)

এই প্রসঙ্গে মিঃ বসু যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রায়শঃ পরস্পর-বিরোধী (self-contradictory) এবং তাঁহার চিন্তায় যে কোন বুদ্ধিমানোচিত শৃঙ্খলা নাই, তাহার পরিচায়ক। তাঁহার কথার উপরোক্ত ভ্রমাত্মকতাগুলি বাদ দিয়া তিনি কি বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিলে, সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হয় যে, তাঁহার মতে, জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই অপরিহার্য্য ভাবে অথবা স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ এবং উহার মধ্যে যে অনৈক্য দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ তিনটি, যথা—(১) আয়তন হিসাবে উহার বিস্তৃতি (area), (২) অতীত কালে উহার বিভিন্ন প্রদেশে যাতায়াতের অসুবিধা (difficulties of communications in the past), (৩) ইংরাজের কূটনীতিমূলক কার্য্যসমূহ এবং কেবলমাত্র ইংরাজের কূটনীতিমূলক কার্য্যের ফলে ভারতবাসিগণের মধ্যে বর্ত্তমানে ঐ অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে। তাঁহার মতে, ভারতবাসিগণের ঐ অনৈক্য দূর করিয়া পুনরায় ঐক্যস্থাপন করিতে হইলে, প্রথমতঃ, শিল্পের প্রসার সাধন করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজের কূটনীতিমূলক প্রত্যেক কার্য্যটীতে বাধা দিতে হইবে এবং বিশেষতঃ ইংরাজগণ সংস্কৃত আইনানুসারে যে নিয়মক্রমে মিলিত সর্ব্বভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট (Central Government on all-India Federation) স্থাপন করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা যাহাতে সাফল্য লাভ না করে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

আমাদিগের মতে, মিঃ বসুর উপরোক্ত মতবাদের একটি কথাও বুদ্ধিমানোচিত চিন্তা-প্রসূত নহে। পরন্তু উহার প্রত্যেক কথাটি বিপথগামী যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল কপ্চানীতে যে অমানুষোচিত প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করেন, তাহার জ্ঞাপক। জগতের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষই যে অপরিহার্য্য ভাবে, অথবা স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহা সত্য নহে এবং কেবলমাত্র ইংরাজের কূটনীতিমূলক কার্য্যের ফলেই যে ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐ অনৈক্য বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাও সত্য নহে।

দেশের মানুষগুলির প্রত্যেকে যাহাতে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায় অভ্যস্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা দেশের মধ্যে প্রবর্ত্তিত না হইলে দেশের মানুষ কখনও স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয় না, অথচ শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতের প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক মানুষ ও প্রত্যেক চরাচর জীবের মূল প্রকৃতিতে ঐক্যবন্ধনের বীজ রোপিত থাকে, ইহা দার্শনিক সত্য। ইহারই জন্য (অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে ঐক্যবন্ধনের বীজ রোপিত থাকে বলিয়া) প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক মানুষ ও চরাচর জীবের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে অনেক রকমের সমতা (similarity) সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, আর সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায় অভ্যস্ত না হইলে স্বভাবতঃ কোন জাতির মধ্যে ঐক্যবন্ধন সম্ভবযোগ্য হয় না বলিয়া প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে অনেক রকম অসমতার (individuality-র) অথবা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হইয়া

থাকে। আমাদিগের উপরোক্ত কথা কয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে "মূল প্রকৃতি" কাহাকে বলে, "স্বভাব"ই বা কাহাকে বলে এবং দুইএর মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয়। কাহার নাম "মূল প্রকৃতি" ও কাহার নাম "স্বভাব", তাহার আমূল সন্ধান অথর্ব্ববেদ ও সাংখ্য-দর্শনে পাওয়া যাইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ঋষি-প্রণীত ঐ দুইখানি গ্রন্থই ভাষ্যকার ও বৃত্তিকারগণের অনাচার ও চিন্তাহীনতার ফলে কুজ্ঝটিকা-পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত উহার ভাষা বুঝিবার কৌশল মানুষ পুনরায় বিদিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত "প্রকৃতি" ও "স্বভাবে"র মধ্যে পার্থক্য কোথায়, তাহার মর্ম্ম যথাযথ ভাবে উদ্ঘাটন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে না। সুক্ষ্মতম বাস্তব উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত এই দার্শনিক সত্যগুলি সাধারণ পাঠকগণের রুচি-সম্মত নহে। ইহারই জন্য এতৎসম্বন্ধীয় বিস্তৃত কথা হইতে আমরা আপাততঃ বিরত থাকিলাম।

সংক্ষেপতঃ মানুষের "মূল প্রকৃতি" ও "স্বভাব" কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে, একটা অব্যক্ত (unmanifested) অবস্থা হইতে মনুষ্যের ব্যক্তি (manifestation) ঘটিয়া থাকে। মানুষ যখন পিতা ও মাতার মিলনে ভ্রূণরূপে জন্ম পরিগ্রহ করে, তখন ঐ ভ্রূণ প্রথমতঃ অব্যক্ত (unmanifested) অবস্থায় মাতৃগর্ভে বিদ্যমান থাকে। তাহার পর নানা রকম প্রকরণের মধ্যে অতিক্রম করিয়া তাহার মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের উদ্ভব হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই ব্যক্ত অবস্থার নানারূপ বিকাশ ঘটিতে থাকে। উপরোক্ত অব্যক্ত (unmanifested) অবস্থার প্রকরণবিশেষকে ঋষিগন সংস্কৃতভাষায় "মূল প্রকৃতি" বলিয়া নামকরণ করিয়াছেন, আর মেদ, অস্থি প্রভৃতি লইয়া ব্যক্ত হইবামাত্র যে অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহার নামকরণ করিয়াছেন "স্বভাব"।

ভারতবর্ষ যে স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহা দেখাইতে গিয়া মিঃ বসু তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "I know India is geographically, economically and therefore strategically one", অর্থাৎ ভৌগোলিক অবস্থানে, অর্থব্যবহারঘটিত অবস্থানে এবং সৈন্য-সমাবেশের কৌশলমূলক অবস্থানে আমি ভারতবর্ষকে এক বলিয়াই জানি। ভারতবর্ষের এই একতা যে সম্পূর্ণ, তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি বলিতেছেন যে, "No amount of ingenuity will ever be able to parcel out India into units, which can exist as self-contained economic entities or can be defended separately," অর্থাৎ যে সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড অন্য কোনও খণ্ডের উপর নির্ভর না করিয়া অর্থনীতির হিসাবে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে পারে, অথবা পৃথক্‌ভাবে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষিত হইতে পারে, অতি বড় বুদ্ধির দ্বারাও ভারতবর্ষকে তাদৃশ পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে বিভক্ত করা সম্ভব নহে। মিঃ বসুর এই কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, ভারতবর্ষের গ্রামগুলির পক্ষে, অথবা থানাগুলির পক্ষে, অথবা মহকুমাগুলির পক্ষে, অথবা জেলাগুলির পক্ষে কখনও পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাবলম্বনে জীবন রক্ষা করা সম্ভব নহে। মিঃ বসু এতাদৃশ উক্তি তারস্বরে ঘোষিত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই বটে, পরন্তু ঐ কথা কহিয়া নিজেকে একটা সারপদার্থে পরিপূর্ণ মাথাওয়ালার গৌরবে গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পঞ্চাশ বৎসর আগেও ভারতবর্ষের গ্রামগুলির অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, তখনও প্রায় প্রত্যেক গ্রামটি অর্থনীতির হিসাবে প্রায়শঃ স্বাবলম্বী ছিল। তখনও ষ্টীমার, রেল ও মোটর-রাস্তা এত বিস্তৃতি লাভ করে নাই এবং তখনও প্রত্যেক গ্রামে যাতায়াতের জন্য ষ্টীমার, রেল ও মোটর-রাস্তার সুবিধা হয় নাই। তখনও প্রত্যেক গ্রামে স্ব স্ব কার্য্যপরায়ণ কৃষক, তাঁতী, জোলা, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, ঘরামী, বণিক, ধোবা, নাপিত, গ্রাম্য বৈদ্য, গ্রাম্য শিক্ষক এবং গ্রাম্য পুরোহিত বিদ্যমান ছিল। তখনও প্রায় প্রত্যেকেই বছরের পাঁচ মাস মাত্র পরিশ্রম

করিয়া সারা বৎসরের খোরাকের উপযোগী ধান্য, গম, তিল, ডাল, সরিষা প্রভৃতি উৎপাদন করিতে পারিত এবং যে গ্রামে যে ফসল পাওয়া যাইত, তাহা খাইয়াই সন্তুষ্টিলাভ করিতে পারিত ও প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে স্বাস্থ্য বজায় রাখিত। তখনও মিঃ বসুর শ্রেণীর লোকের উদ্ভব হয় নাই এবং তখনও বৈজ্ঞানিক খাদ্য-রূপে চা, বিস্কুট, চপ, কাটলেট প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া খাদ্যের নামে বিষ ব্যবহারে অকালে রক্তের চাপ, বিবিধ রকমের আমাশয়, বেরিবেরি, ক্ষয় (T. B.), দুর্ব্বল দৃষ্টি প্রভৃতি রোগে জীর্ণ হইতে গ্রামবাসিগণ শিক্ষা করে নাই। তখনও বছরের বাকী সাত মাস কৃষকগণ প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে তাঁতী, জোলা, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, কাঁসারী, ঘরামী প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া নামমাত্র মূল্যে গ্রামের ব্যবহারোপযোগী ধুতি, চাদর, শয্যাদ্রব্য ও তৈজসপত্র প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করিত এবং গ্রামবাসিগণকে প্রায়শঃ অন্য কোন গ্রামের প্রতি উহার কোনটার জন্য মুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই। তখনও শিক্ষার জন্য অথবা চিকিৎসার জন্য কোন সহর অথবা ইউরোপ পরিভ্রমণ করিতে হয় নাই।

তখনও হাসপাতালের ও ষ্টেথস্কোপওয়ালা ডাক্তার নামক মানুষের 'যমে'র সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় নাই এবং মানুষের অকাল-মৃত্যুর হারও অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল। গ্রামে রোগের মাত্রাও যেমন অপেক্ষাকৃত অনেক কম ছিল, সেইরূপ গ্রাম্য বৈদ্যগণই উহার উপশম করিবার পন্থা বিদিত ছিলেন এবং তাঁহাদিগের চিকিৎসাতেই গ্রামবাসিগণ প্রায়শঃ সন্তুষ্ট থাকিতেন ও সম্পূর্ণ ভাবে আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেন। এক্ষণে যেরূপ একবার ডাক্তারের হাতে পড়িলে চিরজীবন কোন না কোন অসুস্থতা অথবা ঔষধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা প্রায়শঃ সম্ভব হয় না, তখন সেইরূপ ছিল না। মানুষ একবার কোন রোগে অসুস্থ হইলেও অথবা কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলেও ভবিষ্যৎ জীবনে আর কোন রোগে না ভুগিয়া অথবা আর কোন ঔষধ ব্যবহার না করিয়া দিন যাপন করিতে পারিত।

এখন যেরূপ শিক্ষিতের নামে কতকগুলি মিথ্যা-বাদী, সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরায়ণ, ব্যভিচারী, বাক্‌সর্ব্বস্ব মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে, তখনও তাহা হয় নাই। তখনও মিথ্যাপ্রিয়তা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-পরায়ণতা, ব্যভিচার-প্রবৃত্তি ও কার্য্যহীন বাক্য-প্রিয়তা এত ব্যাপক হইতে পারে নাই। তখনও সত্যপ্রিয়তা, পরার্থ-পরায়ণতা, যৌন-শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ও নীরব কর্ম্ম-প্রাণতা গ্রামবাসিগণের মধ্যে প্রায়শঃ দেখা যাইত। যে শিক্ষার দ্বারা এতাদৃশ উন্নতি সম্ভব-যোগ্য হয়, তাহার বিধান গ্রাম্য শিক্ষকগণ ও গ্রাম্য পুরোহিতগণই গ্রামে গ্রামে সাধিত করিতেন।

উপরোক্তভাবের যে স্বাবলম্বনের অবস্থা ভারতের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে পঞ্চাশ বৎসর আগেও অধিকাংশ পরিমাণে দেখা যাইত, তাহা যে একদিন সম্পূর্ণভাবে ভারতের প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে বিদ্যমান ছিল, তাহা প্রকৃত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইতে জানিলে সহজেই অনুমান করা যাইবে।

শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতের যে কোন দেশই ধরা যাউক না কেন, তাহার অতীত ইতিহাস কার্য্য-কারণের সঙ্গতির সহিত মিলাইয়া পর্য্যালোচনা করিবার পদ্ধতি বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নিম্নতম খণ্ডটি ও প্রত্যেক মানুষটি (units) অর্থনীতির হিসাবে একদিন সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী ছিল।

কাযেই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে মিলিত না হইলে তাহার বিভিন্ন খণ্ডগুলি যে পরস্পরের উপর নির্ভর না করিয়া অর্থনীতির হিসাবে সম্পূর্ণভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারে না, মিঃ বসুর এতাদৃশ উক্তি তিনি যে কল্পনাপ্রিয় (visionary) ও বালকের মত অজ্ঞ, তাহার পরিচায়ক।

ভারতবর্ষ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইলে তাহার কোন খণ্ডকেই পৃথক্‌ভাবে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে—এই কথাটিও ঐতিহাসিক সত্য নহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এমন কি মুসলমানগণের রাজত্বকালেও পৃথক্ পৃথক

ভাবে এক একটি সহরকে তাহার বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইত।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ বসু যে যুক্তির (argument-এর) অবতারণা করিয়াছেন, সেই যুক্তি কোন সত্য অবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে এবং তাঁহার পক্ষে ইহা শোভনীয় নহে, কারণ তিনি ব্যারীষ্টার এবং কোন ব্যারীষ্টারের পক্ষে সত্য ঘটনার (facts) উপর যুক্তি না দেখাইয়া মনগড়া অসত্য ঘটনার উপর কোন যুক্তি দেখান ঐ ব্যবসা হিসাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে। আমাদের মনে হয়, মিঃ বসুর যদি আত্ম-বিশ্লেষণ ও সত্য-প্রিয়তার প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার বিশেষভাবে লজ্জিত হওয়া সঙ্গত।

ইহা ছাড়া আরও বলিতে হইবে যে, ভারতবর্ষ যে স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহা তিনি প্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা কোন সঙ্গত যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারেন নাই। কাজেই "ভারতবর্ষ স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ নহে," ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ শুধু ভারতবর্ষে কেন, প্রত্যেক দেশের মূল প্রকৃতিতে ঐক্য-বন্ধনের বীজ নিহিত থাকে এবং সুশিক্ষা ও সু-সাধনার ব্যবস্থা না থাকিলে কোন দেশই স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয় না, তাহা আমরা আগেই বলিয়াছি।

ভারতবর্ষ যে স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ এবং উহার ঐক্যবন্ধন যে স্মরণাতীত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য মিঃ বসু আরও বলিয়াছেন যে, "The desire for unity is not a new yearning in India, nor the process of unification a recent growth. The one came into being and the other began long before the times for which we have epigraphic records. Both are symbolized in the great "Aswamedha" sacrifices enjoined in the Vedas." মিঃ বসুর উপরোক্ত কথার মর্ম্মার্থ এই যে, "স্মরণাতীত কাল হইতে যে ভারতবর্ষ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতি।"

স্মরণাতীত কালে যে ভারতবর্ষ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল, তাহা আমাদিগের মতেও সত্য। কিন্তু একদিন ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল এবং এখনও তাহার বিভিন্ন প্রদেশের অবস্থানে ও চালচলনে সমতা বিদ্যমান আছে, ইহা দেখিয়া ভারতবর্ষ অপরিহার্য্যভাবে (essentially) অথবা স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ, তাহা বলা চলে না। ভারতবর্ষ যদি অপরিহার্য্যভাবে অথবা স্বভাবতঃ ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইত, অথবা কোন দেশকে যদি তাহার স্বভাব ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ রাখিতে পারিত তাহা হইলে আজও ভারতবাসিগণের মধ্যে এবং জগতের প্রত্যেক দেশে সর্ব্বতোভাবে ঐক্যবন্ধন বিদ্যমান থাকিত এবং কেহ চেষ্টা করিয়াও উহাদিগের অনৈক্যের অথবা দলাদলির সৃষ্টি করিতে পারিত না।

ভারতবর্ষের ও জগতের প্রাচীন ইতিহাস যথাযথভাবে উদ্ঘাটন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, স্মরণাতীত কালে যে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার দ্বারা যৌবনের স্বাভাবিক ধ্বংসকারী দাবীদাওয়া সংযত করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হওয়া যায়—সেই সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার ব্যবস্থা ভারতবর্ষে ও জগতের সর্ব্বত্র বিদ্যমান ছিল এবং তখন ভারতবর্ষ ও জগতের সমস্ত দেশই সর্ব্বতোভাবের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ ছিল। পরবর্ত্তীকালে বর্ত্তমান ইতিহাসের আদিম যুগে ঐ সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল এবং শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে প্রায়শঃ ঔদাসীন্যের উদ্ভব ঘটিয়াছিল। এই সময়ে মানুষের ঐক্যবন্ধন শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান ইতিহাসের মধ্য যুগ হইতে শিক্ষা ও সাধনার নামে কতকগুলি বিপরীত শিক্ষা ও সাধনা স্থান পাইয়াছে এবং তখন হইতে শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতের সর্ব্বত্রই অনৈক্য, দলাদলি, দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি সুরু হইয়াছে। অধুনা ঐ বিপরীত শিক্ষা ও সাধনা সর্ব্বত্রই বিস্তৃতি লাভ করিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনৈক্য, দলাদলি, দ্বন্দ্ব কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর ভীষণ হইতে ভীষণতর রূপ ধারণ করিতেছে।

যে তিনটী কারণকে ভারতবাসিগণের অনৈক্যের হেতু বলিয়া মিঃ বসু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও সু-চিন্তাপ্রসূত নহে। ভারতবর্ষের আয়তন অথবা যাতায়াতের অসুবিধা যদি ভারতবাসিগণের অনৈক্যের কোন কারণ হইত, তাহা হইলে "অশ্বমেধ যজ্ঞে"র যুগে মিঃ বসুর কথিত ঐক্যের চিহ্ন দেখা যাইত না। কারণ তখনও ভারতবর্ষের আয়তন ও যাতায়াতের তথাকথিত অসুবিধা সমান ভাবেই বিদ্যমান ছিল। ইংরাজের কূটনীতিমূলক কার্য্য ভারতবাসিগণের অনৈক্য-বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে, তাহা আংশিক ভাবে সত্য, কিন্তু ভারতবাসিগণের মধ্যে অনৈক্যের প্রবৃত্তি না থাকিলে কাহারও কোনরূপ কার্য্য উহাদিগের অনৈক্য বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইত না—ইহা দার্শনিক সত্য। কাযেই, ইংরাজের কূটনীতিমূলক কোন কার্য্যকেও ভারতবাসিগণের অনৈক্যের মূল হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা চলে না।

আগেই দেখান হইয়াছে যে, প্রত্যেক দেশের মানুষের ঐক্যবন্ধনের শ্লথতার মূল কারণ হয় শিক্ষা ও সাধনা বিষয়ে ঔদাসীন্য এবং অনৈক্য-বৃদ্ধির মূল কারণ হয় কু-শিক্ষা ও কু-সাধনার উদ্ভব ও বিস্তৃতি।

এখনও উপভোগ, প্রভুত্ব ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রবৃত্তির বৃদ্ধিমূলক আধুনিক বিপরীত শিক্ষা ও সাধনার বিস্তৃতি অপহৃত করিয়া যাহাতে সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার উদ্ভব ও বিস্তৃতি ঘটে, তাহার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলে অনায়াসেই জগতের প্রত্যেক মানুষটী যে মানুষ, তাহা বাস্তবতঃ উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে এবং তখন "মানব-ধর্ম্ম" জাজ্জ্বল্যমান হইয়া শুধু ভারতবাসী কেন, সমস্ত মনুষ্যজাতি এক সূত্রে সর্ব্বতোভাবের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হইতে পারে।

অনৈক্য দূর করিয়া যাহাতে ভারতবাসিগণের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হয়, তাহার যে দুইটী পন্থার মিঃ বসু তাঁহার যুবক শ্রোতৃবৃন্দকে নির্দ্দেশ দিয়াছেন তাহাও অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

বর্ত্তমান শিল্পের বিস্তৃতি-সাধনের দ্বারা কখনও ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে, পরন্তু উহাতে অনৈক্যের বৃদ্ধি পায়। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে আধুনিক শিল্পের *বিস্তৃতি অবধি এত দ্বন্দ্ব-কলহ ও যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইত না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে* যে এত দ্বেষ-হিংসা এবং দ্বন্দ্ব-কলহ, তাহার কারণ কি কি, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইবে যে, উহার অন্যতম কারণ তথাকথিত আধুনিক শিল্প বিস্তারের চেষ্টা। আধুনিক শিল্প-বিস্তৃতির সাধারণ স্বভাব কি, তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, প্রধানতঃ রামের বাজার (market) শ্যাম কি করিয়া লইবে, তাহার চেষ্টা লইয়া আধুনিক শিল্পের বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে।

যে ট্রেনখানিতে মাত্র পঞ্চাশ জন মানুষের বসিবার স্থান বিদ্যমান আছে, তাহাতে একশত জন যাত্রীর টিকিট বিক্রয় করিলে যেরূপ হুড়াহুড়ি ও মারামারি অনিবার্য্য হয় এবং ঐ হুড়াহুড়ি ও মারামারি নিবারণ করিতে হইলে যেরূপ ট্রেনখানিতে যাহাতে একশত জনের বসিবার স্থান হয়, তদনুরূপ উহার বৃদ্ধি সাধন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, সেইরূপ বর্ত্তমান যুগের শিল্পের বিস্তৃতি ঘটিতে থাকিলে উহার ফলে মানুষের অনৈক্য বৃদ্ধি হওয়া অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে এবং উহার নিবারণ সাধন করিতে হইলে মাটী হইতে যাহাতে আরও অধিক পরিমাণে ও অনায়াসে কাঁচামাল পাওয়া যায়, সর্ব্বাগ্রে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ধনের বৃদ্ধি ও অনায়াস উৎপত্তি সাধন করিবার চেষ্টা না করিয়া রামের ধন শ্যাম কি করিয়া কাড়িয়া লইবে, তাহার চেষ্টা আইনব্যবসায়িগণের পক্ষে সুশোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা মনুষ্য-সমাজের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না এবং সাধিত হইবে না।

ইংরাজগণের কূটনীতিমূলক কোন কার্য্যে বাধা প্রদান করিলেও ভারতবাসিগণের ঐক্যবন্ধনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তাহাতেও অনৈক্যই বৃদ্ধি পাইবে। ইহার প্রমাণ স্বদেশী যুগ হইতে ভারতবর্ষের গত ৩২ বৎসরের ইতিহাস। এই সময়ে ভারতবাসিগণের পক্ষ হইতে ইংরাজগণের প্রতি-কার্য্যে যে বাধা দেওয়া হইতেছে এবং ভারতবাসিগণের দলাদলিও যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ঐতিহাসিক সত্য। ইংরাজগণের কূটনীতিমূলক কোন কার্য্যে বাধা প্রদান

করিলে যদি ভারতবাসিগণের ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হওয়া সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ভারতবাসিগণের দলাদলি এই সময়ে এত বৃদ্ধি পাইত না। কংগ্রেসের এই বাধা দেওয়ার নীতির ফলে কংগ্রেসের মধ্যে পর্য্যন্ত ভীষণতম দলাদলির সূচনা যে দেখা যাইতেছে, তাহা মিঃ বসুর মত যে সমস্ত ব্যারীষ্টার অসত্যকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না, তাঁহারা অস্বীকার করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহারা সত্যপ্রিয় ও সত্যোদ্ঘাটন করিতে সক্ষম, তাঁহারা কখনও অস্বীকার করিতে পারেন না। ইংরাজগণের স্বভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাঁরা ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে আদৌ খারাপ নহেন এবং ইহাঁদিগের যত কিছু দোষ, তাহা তাঁহাদিগের বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত শিক্ষাবশতঃ। যদি কিছু বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদিগের ঐ বিপরীত বিজ্ঞান ও ঐ বিপরীত শিক্ষা। তাঁহাদিগের যে কূটনীতি, তাহাও ঐ বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত শিক্ষাবশতঃ। কাযেই, মানুষ হিসাবে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের কূটনীতিমূলক কার্য্যের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের কূটনীতিমূলক কার্য্য যে, কি ভারতবাসী ও কি ব্রিটেনবাসী, কাহারও পক্ষে আদৌ মঙ্গলপ্রদ নহে এবং মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন্ পরিকল্পনায় ভারতবাসী ও ব্রিটেনবাসী প্রত্যেকের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান সাধিত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

Federal government লইয়া ইংরাজগণের সহিত কংগ্রেস যে কলহে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন করিতেছেন, সেই কলহের দ্বারা তথাকথিত democratic government-এর সৃষ্টি হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু আধুনিক democratic government কখনও সর্ব্বসাধারণের অন্ন-সমস্যার সমাধান করিতে সক্ষম হইতে পারে না এবং হয় না, কারণ উহার ফলে সর্ব্বদা গভর্ণমেন্টকে no confidence-এর motion বাঁচাইবার জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হয় এবং সুচিন্তিত কার্য্য-পরিকল্পনা আবিষ্কার করিবার জন্য যে অবসর ও মানসিক বিশ্রামের প্রয়োজন তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

আধুনিক democratic government-এর দ্বারা যদি সর্ব্বসাধারণের কোন মঙ্গল সাধন করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে জগতের যে যে দেশে democratic government সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই সেই দেশের জনসাধারণের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শান্তি ও সন্তুষ্টির অভাব-বিষয়ক সমস্যা-সমূহ কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সমাধান করা সম্ভবযোগ্য হইত। কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা যথাযথভাবে পর্য্যালোচনা করিবার পদ্ধতি কি, তাহা বিদিত হইয়া তদনুসারে বর্ত্তমান democratic stateগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটির জনসাধারণের কোন অবস্থার কোনরূপ উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, প্রত্যেক সমস্যাটি উত্তরোত্তর অধিকতর জটিলতা প্রাপ্ত হইতেছে। সু-শিক্ষা ও সু-সাধনার যখন বিলুপ্তি ঘটে এবং তাহার স্থানে যখন কু-শিক্ষা ও কু-সাধনা বিস্তৃতি লাভ করে, তখন স্বভাবের বশেই এতাদৃশ democratic government-এর প্রবৃত্তির উদ্ভব হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ democratic গভর্ণমেন্টের পরিকল্পনা মানুষের কু-শিক্ষা ও কু-সাধনার ফল।

যখন জনসাধারণ প্রায়শঃ শিক্ষা বিষয়ে উদাসীন থাকে এবং শিক্ষিতগণ শিক্ষার নামে কু-শিক্ষা গ্রহণ করেন, তখন এতাদৃশ democracy কখনও সুফলপ্রদ হয় না। কারণ কু-শিক্ষিতগণ যেরূপ কোন্ রাস্তায় পরিচালিত হইলে জনসাধারণের অর্থসমস্যা প্রভৃতির সমাধান হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সেইরূপ আবার কাহার দ্বারা ঐ সমস্যাসমূহের সমাধান করা সম্ভব, তাহাও অশিক্ষিতগণ স্থির করিয়া যথাযথভাবে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে সক্ষম হয় না। যখন শিক্ষিতগণ প্রকৃত সু-শিক্ষা ও সু-সাধনায় সমলঙ্কৃত হন এবং অশিক্ষিতগণ ঐ সু-শিক্ষার ও সু-সাধনার সুফল পাইতে আরম্ভ করেন, কেবলমাত্র তখনই প্রকৃত লোকহিতকর democratic government স্থাপন করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। তাহার

আগে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কোন নেতৃবর্গের, অথবা রাজন্য-বর্গের উপর গবর্ণমেণ্ট পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এতদবস্থায় দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃবর্গের অভাব যদি কোন দেশে ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে উহার পূরণ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কোন্ উপায়ে তাহার পূরণ করা সম্ভব, তাহা আমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত "বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক সন্দর্ভে আলোলচনা করিয়াছি। ঐ সন্দর্ভ পাঠকবর্গকে আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

ভারতবর্ষের নূতন আইনের federal government এর পরিকল্পনায় কেন বাধা দিতে হইবে, তাহার যুক্তি প্রদর্শন করিতে বসিয়া মিঃ বসু দেখাইয়াছেন যে, ঐ পরিকল্পনা গৃহীত হইলে ভারতবর্ষের perfect democratic governmentএর সম্ভাবনা কমিয়া যাইবে। তাহাতে ভারতবাসী জনসাধারণের যে কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলেন নাই। যাঁহারা এত গণতন্ত্র-প্রিয় (democrat), তাঁহারা কেন যে জন-সাধারণের পক্ষে democracy-র দোষগুণ কি, তাহা দেখান না, তাহা ভাবিতে বসিলে উহা আমাদিগের আশ্চর্য্যের বিষয় হইয়া পড়ে। আমাদের মনে হয়, ইঁহারা মুখে democrat হইলেও কার্য্যতঃ জনসাধারণের কোন কথাই ভাবেন না বলিয়া এতাদৃশভাবে নির্ব্বাক্ থাকিতে পারেন।

এই কথা সত্য হইলে বলা যাইতে পারে যে, যদিও মিঃ বসুর শ্রেণীর লোক দেশের নেতাগিরি করিয়া থাকেন, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে ইহাঁদিগকে জনানুরাগী (অথবা patriot) পর্য্যন্ত বলা চলে না।

মিঃ বসু তাঁহার democracy-র কথায় M. Sorel-এর French revolution প্রসঙ্গের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই কথাগুলি যেরূপভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিলে ইউরোপের যে অবস্থায় French revolution-এর উদ্ভব হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে এবং ইউরোপের ইতিহাস সম্বন্ধে মিঃ বসুর বদহজমের পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রয়োজন হইলে আমাদিগের মন্তব্য যে ঠিক, তাহা ভবিষ্যতে প্রতিপন্ন করিব। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আমরা উহা হইতে আপাততঃ বিরত থাকিলাম।

কূটনীতির ফলে ইংরাজগণ কোন কূটনীতির কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও তাঁহাদিগকে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমা করিয়া ঐ কার্য্য যে সর্ব্বসাধারণের কাহারও মঙ্গলদায়ক নহে, তাহা প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে। এই চেষ্টা নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনাই অধিক তাহা সত্য, কিন্তু উহার ফলে ইংরাজগণ তাঁহাদিগের কার্য্য হইতে বিরত না হইলেও জনসাধারণ স্বভাববশে বর্ত্তমান নীতি-সমূহের কূট অভিসন্ধির স্বরূপ এবং কু-বিজ্ঞান ও কু-শিক্ষা যে মানুষের কত অনিষ্ট করিতে পারে, তাহা বুঝিতে সক্ষম হইবে। ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজের সহিত ঝগড়ার প্রবৃত্তি পরিত্যক্ত হইলে, ঐক্যবন্ধনের কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হইবে।

ঐক্যবন্ধনের কার্য্যে কিরূপভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহার বিশদ আলোচনাও আমরা গত মাসে প্রকাশিত "বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক সন্দর্ভে করিয়াছি। কাযেই এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কি কি

(Removal of the appaling poverty of the masses of India)

এই প্রসঙ্গে মিঃ বসু যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কথা কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :—

(১) "Poverty has existed in all ages and in all climes but nowhere in the modern world do I think is its burden more crushing or incidence more wide-spread than in our country."

ইহার মর্ম্মার্থ—দারিদ্র্য সর্ব্বযুগে এবং সর্ব্বদেশে বিদ্যমান আছে এবং ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে উহা ভারতবর্ষে যেরূপ তীব্র ও ব্যাপক, সেইরূপ জগতের আর কোথায়ও নহে।

(২) "Mr. Seebohm Rowntree has ·· fixed the minimum level of family income needed to supply the bare necessities of civilized healthy existence of British families at 53s. and 41s. a week in the town and country respectively for a family of man, wife and three children. ···41s. a week works out to something like Rs. 110 a month in Indian money. It is permissible to enquire how many middle class families in India command this income."

ইহার মর্ম্মার্থ—ব্রিটেনে গ্রাম্য-জীবন যাপন করিতে মাসিক যে খরচের প্রয়োজন হয়, তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষের কৃষকদিগের দৈনন্দিন খরচের জন্য প্রত্যেক মাসে অন্ততঃপক্ষে ১১০৲ টাকার প্রয়োজন হয়। ইহা কৃষকগণের তো দূরের কথা, মধ্যবিত্তগণের পর্য্যন্ত নাই।

(৩) "If in spite of this penury there is not a peasants' upheaval in India, it is owing, I believe, partly to the fatalism and the naturally unagressive temper of the Indian masses and partly perhaps to the observed historical fact that revolts start not where the suffering is most unrelieved but where its yoke sits tightest."

ইহার মর্ম্মার্থ—এতাদৃশ দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষে যে কৃষকগণের বিদ্রোহ এ যাবৎ ঘটে নাই, তাহার কারণ সম্ভবতঃ তিনটী, যথা: (১) উহাদিগের অদৃষ্টবাদিতা, (২) স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা, আর (৩) যেখানে ক্লেশের উপশমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাচ্ছিল্য দেখান হয়, সেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত না হইয়া যেখানে উহার তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, সেইখানেই বিদ্রোহ দেখা যায়—এতাদৃশ ঐতিহাসিক সত্য।

(৪) "There is an influential and imposing body of thought which holds the emphatic view that poverty will never be eliminated from human society without the elimination also of capitalism and the classes."

ইহার মর্ম্মার্থ—একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে ধনতান্ত্রিকতা ও শ্রেণীবিভাগের উচ্ছেদসাধন না করিতে পারিলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করা কখনও সম্ভব হইবে না।

(৫) "India at any rate will be spared the painful spectacle of seeing her sons face one another in serried ranks of organized and implacable hatred."

ইহার মর্ম্মার্থ—শ্রেণীবিভাগ নষ্ট করিবার জন্য ভারতবাসিগণ দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি দুর্দ্দমনীয় অবজ্ঞা দেখাইতেছে, এতাদৃশ দৃশ্য ভারতবর্ষে দেখা যাইবে বলিয়া কখনও মনে করা যায় না।

(৬) "At all events, there is good deal that we can do before class conflict comes to India, on the assumption that it is inevitable."

ইহার মর্ম্মার্থ—বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহাই ঘটুক না কেন, উহা যে অনিবার্য, তাহা মনে করিয়া ভারতবর্ষে শ্রেণী-সংঘর্ষ আরম্ভ হইবার আগে আমরা অনেক কিছু করিতে পারি।

(৭) "We shall not be betraying the interest of the masses if we decide for the present to work within the framework of the existing social order to develop industry and improve agriculture."

ইহার মর্ম্মার্থ—এক্ষণে সমাজে যে শৃঙ্খলা বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা বজায় রাখিয়াও আমরা যদি শিল্প ও কৃষির উন্নতি করিতে মনোযোগী হই, তাহা হইলে জন-সাধারণের স্বার্থ নষ্ট করা হইবে না।

ভারতীয় জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র্য নিবারণের উপায় সম্বন্ধে মিঃ বসু যে যে কথা তাঁহার বক্তৃতায়

বলিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকটী অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মতে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য নিবারণের প্রধান উপায়, শিল্প ও কৃষির উন্নতি। শিল্প ও কৃষির উন্নতি সাধন করিতে চেষ্টা করিলে শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় জনসাধারণের দারিদ্র্যের উপশম হইতে পারে বলিয়া তিনি নির্দ্দেশ দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন্ উপায়ে যে শিল্প ও কৃষির উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে তিনি বিশেষ কিছুই বলেন নাই। এই সম্বন্ধে কেবল একটি মাত্র কথা বলিয়াছেন যে, "India's potential resources for supporting her people have not yet been tapped and worked to a tithe of their capacity," অর্থাৎ ভারতবাসিগণের ভরণ-পোষণের জন্য যে সমস্ত সম্ভাব্য উপায় বিদ্যমান আছে, তাহার দশাংশের এক অংশও এখনও পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ ব্যবহৃত হয় নাই।

মিঃ বসুর এই কথার বিস্তৃত অর্থ যে কি, তাহা আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারি না এবং তিনিও তাঁহার শ্রোতৃবর্গকে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। মোটের উপর সাধারণতঃ যাঁহারা এতাদৃশভাবে ভারতবর্ষের "potential resources"এর কথা ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়শঃ শিল্পবিস্তার ও অনাবাদী জমীর আবাদের কথা বলিয়া থাকেন। কাযেই, মিঃ বসুও তাহাই বলিয়াছেন বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব।

মিঃ বসুর মতে, শিল্পের বিস্তার ও অনাবাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধি করিতে পারিলে ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্র্যের উপশম হইতে পারে বটে, কিন্তু উহা কখনও সর্ব্বতোভাবে তিরোহিত হইতে পারে না, কারণ তাঁহার বক্তৃতার এই অংশের প্রথমেই তিনি বলিয়াছেন যে, দারিদ্র্য সর্ব্বযুগে এবং সর্ব্বদেশে বিদ্যমান আছে ও ছিল, (pverty has existed in all ages and in all climes)।

দারিদ্র্যের লক্ষণ কি, অর্থাৎ কি হইলে মানুষকে দরিদ্র বলিতে হইবে, প্রকারান্তরে তাহা স্থির করিবার জন্য তিনি মিঃ Seebohm Rowntreeর মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, সভ্য মানুষের মত জীবন যাপন করিতে হইলে, ভারতবর্ষের গ্রাম্য কৃষকদিগের অন্ততপক্ষে মাসিক ১১০৲ টাকার প্রয়োজন হয়। এই একশত দশ টাকা যিনি প্রতি মাসে আয় করিতে অক্ষম, তাঁহাকেই দরিদ্র বলিতে হইবে।

মিঃ বসুর মতে ভারতবাসিগণ বর্ত্তমানে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র এবং এতাদৃশ দারিদ্র্যের অনিবার্য্য পরিণতি তাহাদিগের বিদ্রোহ। তথাপি ভারতীয় কৃষকগণ যে এতাবৎ বিদ্রোহী হয় নাই, তাহার কারণ, তাঁহার মতে তিনটি, যথা (১) অদৃষ্টবাদীতা, (২) শান্তিপ্রিয়তা, (৩) এতদ্বিষয়ক ঐতিহাসিক সত্য।

কার্ল মার্কস প্রভৃতির মতে সমাজ হইতে দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিবার উপায় দুইটি, যথা (১) ধনতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ, এবং (২) বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উচ্ছেদ। মিঃ বসু এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করেন না। ঐ মতবাদের ভ্রান্তি কোথায় তাহা আংশিকভাবে দেখাইয়া তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, ঐ মতবাদ ভ্রান্তই হউক আর অভ্রান্তই হউক, তাঁহার মতে অদূর-ভবিষ্যতে বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের উচ্ছেদ কল্পে ভারতবর্ষে কোন তীব্র শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষণ দেখা যায় না। ইহা ছাড়া আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে শ্রেণীসংগ্রামের লক্ষণ দেখা যাউক, আর নাই যাউক, বর্ত্তমান শ্রেণীবিভাগের শৃঙ্খলা নষ্ট না করিয়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অনেক কিছু করা সম্ভব এবং শিল্প-বিস্তার ও কৃষির উন্নতিতে হস্তক্ষেপ করিলে ঐ দারিদ্র্য নিবারিত হইতে পারে।

মিঃ বসুর বক্তৃতার এই অংশেও কোন ভাবুকতার ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। জনসাধারণের দারিদ্র্য কাহাকে বলে, কি করিলে জনসাধারণের দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে দূরদর্শিতা ও ঐকান্তিক চিন্তার কোন পরিচয় তাঁহার বক্তৃতায় পাওয়া যায় না বটে, তথাপি আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভাবকগণের মূল মতবাদের সহিত আংশিক ভাবে পরিচিত। আজকাল ভারতবর্ষে যাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদের নেতা, তাঁহাদিগের

লেখা ও বক্তৃতা পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের কেহই প্রায়শঃ ঐ বাদের মূল উদ্ভাবকগণের মতবাদ ও যুক্তির সহিত আংশিকভাবে পর্য্যন্ত পরিচিত নহেন। হইতে পারে, তাঁহারা ঐ গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের লেখা ও বক্তৃতা পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহারা যে উহা তাড়াতাড়ি পড়িয়াছেন এবং উহার এক বাক্যও হজম করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই প্রতিভাত হয়। এই হিসাবে মিঃ বসু আমাদিগের প্রশংসার যোগ্য। মিঃ বসু ঐ সমাজতন্ত্রবাদের মূলভাগের সহিত আংশিক-ভাবে পরিচিত বটে, কিন্তু যেরূপ ভাবে অধ্যয়ন করিলে উহার কোন যুক্তিতর্কের ভ্রমাত্মকতা ও ভ্রমহীনতা উপলব্ধি করিয়া ঐ মতবাদ যুক্তিসঙ্গত ভাবে গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়, তাহা স্থির করিতে পারা যায়, তিনি সেই ভাবে যে উহা পাঠ করেন নাই, ইহা আমাদিগের পরবর্ত্তী বিশ্লেষণ হইতে সহজেই বুঝা যাইবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, যিনি যে বিষয়ে সম্যক্ চিন্তা করিবার অবসর পান নাই, অথবা কোন বিষয়ের চিন্তা করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার পক্ষে ঐ বিষয়ক কোন মতবাদ অপরিপক্ক বুদ্ধির যুবকগণের সম্মুখে প্রচার করা সঙ্গত নহে, কারণ, তদ্দ্বারা যুবকগণের বিপথগামিতার সহায়তা হইতে পারে। এই নিয়ম যখন সাধারণ মানুষের কেহ পালন না করেন, তখন তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে অনধিকার-চর্চ্চা-নিরত অথবা 'জ্যেঠা' বলা হইয়া থাকে। এতাদৃশ কার্য্যে নিরত সাধারণ মানুষকে যদিও 'জ্যেঠা' বলা হইয়া থাকে, তথাপি মিঃ বসুকে তাদৃশ কোন বিশেষণে বিভূষিত করা নিরাপদ নহে, কারণ তিনি দিগ্বিজয়ী গান্ধিজীর সেবক মিঃ সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতা, আনন্দবাজার পত্রিকার দলের পরিপোষক, রামের ধন শ্যামকে দিবার কৌশলজ্ঞ সুবিখ্যাত ব্যারীষ্টার এবং মিথ্যা ইতিহাস ও ঘটনার উপর গলাবাজী করিয়া ছল-জবাব করিতে সঙ্কোচহীন।

দারিদ্র্যের লক্ষণ কি, তৎসম্বন্ধে মিঃ বসু প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে, যাঁহার মাসিক আয় একশত দশ টাকার কম, তিনি দরিদ্র, যেহেতু ব্রিটিশ অর্থনৈতিক মিঃ Seebohm Rowntree বলিয়াছেন যে, ভদ্রভাবে গ্রাম্যজীবন যাপন করিতে হইলে মাসিক ১১০৲ টাকার প্রয়োজন। মিঃ বসুর এই কথা হইতে বুঝিতে হয় যে, মাসিক আয়ের পরিমাণ যে টাকা, তাহাই দারিদ্র্য ও ধনবত্তার পরিমাপক। ইহার জন্য মিঃ বসুকে চলতি হিসাবে কোনরূপ নিন্দা করা চলে না, কারণ আমাদিগের শিক্ষিত সমাজের পাশ্চাত্ত্য মহাগুরুগণ একমাত্র টাকা, আনা, পয়সা অথবা পাউণ্ড, শিলিং, পেন্সের দ্বারাই দারিদ্র্য ও ধনবত্তার লক্ষণ ও পরিমাণ স্থির করিবার নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে, এই নিয়ম ভ্রমহীন নহে। যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, মানুষ মাসিক পাঁচ ছয় হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াও দিন-যাপনে ঋণগ্রস্ত হইতে বাধ্য হয় এবং সন্তান-সন্ততিকে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, আবার মাসিক কেবলমাত্র ১৫৲।১৬৲ টাকা রোজগার করিয়াও দেনা-গ্রস্ত হওয়া তো দূরের কথা, হাজার হাজার টাকার মহাজনী কারবার গড়িয়া তুলিতে এবং সন্তান-সন্ততিকে "বনা" করিয়া রাখিতে সক্ষম হয়, তখন মাসিক আয়ের টাকার পরিমাণই যে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার একমাত্র পরিমাপক, তাহা বলা চলে না। যখন পরিষ্কার দেখা যায় যে, মাসিক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াও ব্যাঙ্কের ঋণের সুদ যথাসময়ে পরিশোধ করিতে অক্ষম হয়, বিপথগামী পুত্রকন্যার বিলা-সিতা ও ব্যভিচারে জর্জ্জরিত হয়, যথাসর্ব্বস্ব প্রদান করিয়াও রোগের যন্ত্রণা হইতে অথবা বিরুদ্ধবাদী নিন্দুকের নিন্দা-যাতনা হইতে অথবা শত্রুর আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব হয়, অথচ সামান্য মাত্র আয় করিয়াও সুখে ও শান্তিতে স্বচ্ছন্দতার সহিত কালযাপন করা সহজসাধ্য হয়, তখন দ্রব্যমূল্যের হারানুসারে একমাত্র মাসিক আয়ের টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণই যে ধনী ও দরিদ্রের লক্ষণ, তাহা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে কোন ক্রমেই স্বীকার করা চলে না।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, যদি টাকা, আনা, পয়সা, দারিদ্র্য ও ধনবত্তার পরিমাপক না হয়, তাহা হইলে কি করিয়া মানুষ দরিদ্র অথবা ধনী, তাহা স্থির করা সম্ভব

হইতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে মানুষ কি হইলে নিজেকে স্বভাবতঃ দরিদ্র অথবা সম্পন্ন, অর্থাৎ ধনী মনে করিয়া থাকে, অথবা মনে করিতে পারে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

মানুষ কি হইলে নিজেকে দরিদ্র অথবা সম্পন্ন (অর্থাৎ ধনী) স্বভাবতঃ মনে করিয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, সকল মানুষ একই অবস্থায় নিজেকে ধনী অথবা দরিদ্র মনে করে না। এতদ্বিষয়ে মানুষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা বাসের জন্য সুবৃহৎ অট্টালিকা; চলাফেরা করিবার জন্য মোটর-গাড়ী, ষ্টীম্-লঞ্চ অথবা এরোপ্লেন; খাইবার জন্য চপ্, কাটলেট, পোলাও, কারী, কোর্ম্মা; বিশ্রাম যাপনের জন্য থিয়েটার, বায়স্কোপ অথবা রেডিও, গ্রামোফোন; প্রভুত্বের জন্য দাস, দাসী ও কর্ম্মচারী ও অন্যান্য সকলের বিদূষকতা; চিকিৎসার জন্য নানা রকম বৈজ্ঞানিক ডাক্তার ও ঔষধ; শান্তির জন্য নানা রকম সভা, বক্তৃতা, চুটকী গল্প, প্রেমের উপন্যাস ও কবিতা এবং পরিধেয়ের জন্য নানা রকমের মিহি সিল্ক, উল ও সূতার ধুতি প্রভৃতি চাহিয়া থাকেন এবং তাহা সংগ্রহ করিবার মত টাকা, আনা, পয়সা না থাকিলেই নিজদিগকে দরিদ্র মনে করিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর মানুষ আছেন, যাঁহারা ঐ সমস্তের বাড়াবাড়ি কিছু চাহেন না এবং খাইবার জন্য ভাত-ডাল প্রভৃতি, পরিধেয়ের জন্য মোটা ধুতি ও শাড়ী, স্বাস্থ্যের জন্য কোন না কোন রকমের একখানি কুটীর ও সাধারণ শয্যা, সন্তুষ্টির জন্য স্বাবলম্বন ও পুত্রকন্যার সচ্চরিত্র ও শান্তির জন্য ধর্ম্মচর্চ্চার অবসর প্রভৃতি পাইলেই তৃপ্তি অনুভব করেন এবং তাহাতেই নিজদিগকে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আধুনিক জগতের উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর লোকের স্বভাব লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উহাঁরা সর্ব্বদা টাকা, আনা, পয়সার হিসাব লইয়াই ব্যস্ত এবং টাকা, আনা, পয়সার জন্য ইহাঁরা স্ত্রী-কন্যার শরীর প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। ঐ টাকা, আনা, পয়সার জন্য ইহাঁরা নফরগিরি পর্য্যন্ত করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না এবং বেতনভোগী জজীয়তি, ম্যাজিষ্ট্রেটগিরি ও মন্ত্রিত্ব প্রভৃতি যে নফরগিরি, তাহা বিস্মৃত হইয়া উহার জন্যই মারামারি করিতে থাকেন।

ইহাঁদের স্বভাব লক্ষ্য করিলে আরও দেখা যাইবে যে, ইহাঁদের অর্জ্জিত টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণ অনেকের তুলনায় অনেক বেশী বটে, কিন্তু ইহাঁদের ভাগ্যে তথাপি আর্থিক অস্বচ্ছলতা সর্ব্বদাই থাকিয়া যায় এবং ইহাঁদের মানসিক দাবীদাওয়া কিছুতেই সম্পূর্ণভাবে মেটান সম্ভব হয় না। ইহাঁদের নিজদিগের সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্যও সর্ব্বদা খারাপ থাকিয়া যায় এবং শান্তি ও সন্তুষ্টি ইহাঁদের ভাগ্যে কদাচিৎ জুটিয়া থাকে। চলতি হিসাবে ইহাঁদিগকে কখন কখন ধনী বলাও হইয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোন না কোন রকমের মানসিক ও শারীরিক অভাব ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে। ইহাঁরা নিজদিগকে কখনও সর্ব্বতোভাবে ধনী বলিয়া ভাবিতে পারেন না। পরন্তু, সর্ব্বদাই কোন না কোন বস্তুর অভাববশতঃ নিজদিগকে দরিদ্র বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। আধুনিক সংস্কৃত ও ইংরাজী প্রভৃতি শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষগুলি প্রায়শঃ এই শ্রেণীর উদাহরণ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষগুলির স্বভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাঁরা সময় সময় বাধ্য হইয়া চাকুরী অথবা নফরগিরি স্বীকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু স্বভাবতঃ উহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। অর্জ্জিত টাকা-পয়সার পরিমাণ যাহাই হউক না কেন, কাহারও দাস্য স্বীকার না করিয়া খাইবার জন্য সাধারণ ডাল-ভাত, পরিধানের জন্য মোটা ধুতি, শাড়ী ও চাদর, ব্যবহারের জন্য সাধারণ তৈজস, স্বাস্থ্যের জন্য সাধারণ কুটীর, সন্তুষ্টির জন্য সন্তান-সন্ততিগণের সচ্চরিত্র এবং শান্তির জন্য দ্বন্দ্ব-কলহহীনতা ও ধর্ম্মচর্চ্চার অবসর পাইলেই ইহাঁরা তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং দারিদ্র্যের তাড়না হইতে মুক্ত বলিয়া অনুভব করেন। বর্ত্তমান শিক্ষা ও সভ্যতার মহিমায় এই শ্রেণীর লোক এখন আর প্রায়শঃ দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক বৎসর আগেও এই শ্রেণীর লোকই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিলেন এবং তখন

কৃষক ও কুটীরশিল্পী শ্রমজীবিগণকে এই শ্রেণীর উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করা সম্ভব হইত।

এই দুই শ্রেণীর স্বভাব হইতে দেখা যাইবে যে, প্রথম শ্রেণীর লোকের টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে উপার্জ্জনের মাত্রা অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও বস্তুতঃ পক্ষে ইঁহারা কখনও দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হন না এবং হইতে পারেন না। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণে উপার্জ্জনের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হইলেও এবং অবস্থাবিশেষে টাকা, আনা, পয়সা একেবারে না থাকিলেও তাঁহারা দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারেন। টাকা, আনা, পয়সা কম হইলেও এবং টাকা, আনা, পয়সা না থাকিলেও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু উপরোক্ত কথাগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, এমন কয়েকটি বস্তু আছে, যাহা প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে না থাকিলে তাঁহারাও দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত কয়েকটি বস্তুর (অর্থাৎ খাদ্যের জন্য সাধারণ ডাল-ভাত, পরিধেয়ের জন্য মোটা ধুতি, চাদর, ব্যবহারের জন্য সাধারণ তৈজস প্রভৃতি, স্বাস্থ্যের জন্য সাধারণ কুটীর ও শয্যা, সন্তুষ্টির জন্য স্বাবলম্বন ও পুত্রকন্যার সচ্চরিত্র ও শান্তির জন্য ধর্ম্ম-চর্চ্চার অবসর) অর্জ্জনের পরিমাণানুসারে তাঁহারা দরিদ্র ও ধনী হইয়া থাকেন। এই কয়েকটি বস্তুর প্রত্যেকটী আবার একমাত্র ধান প্রচুর পরিমাণে পাইলেই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, টাকা, আনা, পয়সার দ্বারা কোন না কোন অভাব অথবা দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে, পরন্তু একমাত্র ধানের প্রাচুর্য্যের দ্বারাই ঐ দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হওয়া সম্ভব এবং অর্জ্জিত ধানের পরিমাণের তারতম্যানুসারে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার তারতম্য নির্ণীত হইতে পারে, তখন যুক্তিসঙ্গত ভাবে টাকা, আনা, পয়সাকে কোনক্রমেই দারিদ্র্য ও ধনবত্তার মাপকাঠী বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু ধান্যকেই উহার মাপকাঠী বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। অথর্ব্ববেদে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত যুক্তির বলেই ভারতীয় ঋষি একদিন "লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপাসি" এই মহাবাক্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদিগের পাঠকবর্গের অনেকেই হয়ত আমাদিগের উপরোক্ত নূতন কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু একমাত্র অর্জ্জিত ধান্যের পরিমাণই যে ধনবত্তা ও দারিদ্র্যের পরিমাপক, তাহা মোটেই নূতন কথা নহে, পরন্তু উহা অতীব পুরাতন কথা। যে মানুষ আকাঙ্ক্ষানুরূপ খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারে না, তাহার কোটি কোটি টাকা, আনা, পয়সা থাকিলেও তাহাকে কোনক্রমেই দারিদ্র্য হইতে মুক্ত অথবা ধনী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না, ইহা সম্ভবতঃ আমাদিগের পাঠকবর্গের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। আমাদিগের সাধারণ ধারণা যে, টাকা, আনা, পয়সা থাকিলেই খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে সর্ব্বদাই সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমাদিগের পাঠকবর্গের সকলেই সম্ভবতঃ পরিজ্ঞাত আছেন যে, জার্ম্মানীতে হিটলারের রাজত্বে এখন আর মানুষ ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে ডিম, মাখন প্রভৃতি ক্রয় করিতে সমর্থ নহে। কোন কোন খাদ্য-দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট মাত্রার অধিক পরিমাণে ক্রয় করিলে জার্ম্মানীর বর্ত্তমান আইনানুসারে আইন-বিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। হিটলারী গভর্নমেণ্ট মুখে যাহাই বলুন না কেন, জার্ম্মানীতে খাদ্য-দ্রব্য প্রয়োজনাপেক্ষা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে বলিয়াই গভর্নমেণ্টকে বাধ্য হইয়া উপরোক্ত আইন প্রণয়ন করিতে হইয়াছে, অথচ জার্ম্মানীর টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণের কোন অভাব নাই। কাজেই ইহা বলা যাইতে পারে যে, টাকা, আনা, পয়সা থাকিলেই যে সর্ব্বদা ইচ্ছানু-রূপ পরিমাণে খাদ্য ও ব্যবহার্য্য বস্তুসমূহ ক্রয় করা যাইতে পারে, তাহা সত্য নহে।

শুধু জার্ম্মানীতে কেন, এখনও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার অভিমানিগণ সতর্ক না হইলে, আগামী ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ড, ইটালী এবং এমন কি, সোনার ভারতবর্ষেও এমন অবস্থার উদ্ভব

হওয়া সম্ভব যে, যাঁহারা মিঃ শরচ্চন্দ্রের মত একমাত্র টাকা, আনা, পয়সা গণনার কার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই টাকা, আনা, পয়সা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছানুরূপ পরিমাণে খাদ্য-বস্তু সংগ্রহ করা অসম্ভব হইবে, অথচ কৃষিজীবিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহাদিগের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে উহা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবে। অ্যাডাম্ স্মিথ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্শ্যাল পর্য্যন্ত ইংরাজী অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যাঁহারা নিজদিগকে অর্থনৈতিক পণ্ডিত-বোধে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জির মত আবোল-তাবোল বকিয়া থাকেন এবং যুবকগণকে বিপথগামী করিয়া থাকেন, তাঁহারা আমাদিগের উপরোক্ত কথা হৃদয়ঙ্গম না করিলেও করিতে পারেন বটে, কিন্তু টাকা, আনা, পয়সা যে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার প্রকৃত মাপকাঠী নহে এবং উহার প্রকৃত মাপকাঠী যে প্রধানতঃ ধান্যের পরিমাণ, তাহা বুঝিতে না পারিলে এবং সতর্ক হইয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে সোনার ভারতে মিঃ শরচ্চন্দ্র ও ডাঃ রাধাকুমুদ শ্রেণীর মানুষের অনেকেরই অদূরভবিষ্যতে টাকা, আনা, পয়সা থাকা সত্ত্বেও খাদ্যাভাব অল্পাধিক পরিমাণে অনুভব করিতে হইবে। আমাদিগের এই কথা যেন কখনও সত্য না হয়, তজ্জন্য আমরা সর্ব্ব-নিয়ন্তার নিকট প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতেছি বটে, কিন্তু আমাদিগের মনে হয় যে, আমাদিগের নেতাগণ যে অতীব বিপথগামী, তাহা জনসাধারণ শৃঙ্খলার সহিত না বুঝিতে পারিলে কার্য্য-কারণের স্বাভাবিক সঙ্গতি অনুসারে উহা সত্য হইয়া দাঁড়াইবে।

অর্জ্জিত টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার মাপকাঠী নহে বটে এবং প্রধানতঃ ধান্যই স্বাভাবিক মাপকাঠী বটে, কিন্তু খাদ্য ও পরিধেয় প্রভৃতির জন্য বিভিন্ন বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধার্থ মুদ্রার প্রয়োজন হয়। যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে কোনরূপ অসমতা (want of parity) প্রবিষ্ট না হইতে পারে, তাহাই মুদ্রা নির্দ্ধারণের অপরিহার্য্য মূল সূত্র (fundamental principle) হওয়া সঙ্গত। যে মুদ্রার ব্যবহারে কোন সক্ষমতা অর্জ্জন না করিয়া, সমাজের কোন উপকার না করিয়া, ঘোড়দৌড় ও লটারী প্রভৃতির দ্বারা বহুমুদ্রা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়, এবং যে মুদ্রার ব্যবহারে অবস্থাবিশেষে একজন মানুষের একদিনের পরিশ্রমজাত দ্রব্য ১০০৲ একশত টাকায়, আর অবস্থান্তরে সেই শ্রেণীর আর একজন মানুষের একদিনের পরিশ্রমজাত দ্রব্য ১৲ টাকায় বিক্রয় হয়, সেই মুদ্রা কখনও সর্ব্ব-সাধারণের শান্তি ও সন্তুষ্টি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, ইহারই জন্য প্রাচীন কালে কাগজনির্ম্মিত কোন মুদ্রার ব্যবহার তো হইতই না, পরন্তু ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার বহুল ব্যবহারও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জিত হইয়াছিল। ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আরও জানা যাইবে যে, যে-দিন হইতে আধুনিক কাগজ ও ধাতু-মুদ্রার বহুল ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে সমগ্র মানব-সংখ্যার তুলনায় অতি অল্পসংখ্যক মানুষের একটি সম্প্রদায়ের পক্ষে ঐ কাগজ ও ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করা সম্ভবযোগ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষেই আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের অভাব ও মুদ্রার অসম বিতরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। অ্যাডাম স্মিথ হইতে মার্শ্যাল পর্য্যন্ত যে-সমস্ত গ্রন্থকার অর্থনৈতিক ধুরন্ধর বলিয়া পাশ্চাত্যজগতে প্রাসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে কোন গ্রন্থ প্রকৃত ভাবুকের মত অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানিতে কোন না কোন অদূরদর্শী কৌশলজ্ঞতার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু উহার এক-খানিতেও যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকার সাধিত হইতে পারে, এতাদৃশ প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নাই। ইয়োরোপীয়-গণের ভাগ্যাকাশ যে বর্ত্তমানে নিবিড় কুজ্ঝটিকা-পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ঐ পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক ধুরন্ধরগণ। তাঁহাদিগের রচিত প্রত্যেক নিয়ম ও কার্য্যটি স্বভাবের বিধানানুসারেই অদূর-ভবিষ্যতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্বভাবের বিধানানুসারেই উহাঁদিগের প্রত্যেক কার্য্যটি ও নিয়মটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে মানুষের সু-শিক্ষা ও সু-সাধনাজাত প্রযত্ন মিশ্রিত না হইলে, উপরোক্ত ধ্বংসের পূর্ব্বে রক্তগঙ্গা প্রবাহের আশঙ্কা আছে। অন্যপক্ষে স্বভাবের কার্য্যের

সহিত মানুষের সুশিক্ষা ও সুসাধনাজাত প্রযত্ন মিশ্রিত হইলে, উহা ধীরতার সহিত করা সম্ভব হইবে এবং তখন রক্তগঙ্গা প্রবাহের আশঙ্কা তিরোহিত হইবে।

এই সমস্ত কথা না বুঝিয়া এবং উহা চিন্তা না করিয়া, একমাত্র টাকা, আনা, পয়সাই যে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার মাপকাঠী, তাহা অপরিপক্ক বুদ্ধির যুবকগণকে শুনাইলে এবং টাকা, আনা, পয়সার অর্জ্জনানুসারে মানুষের ধনবত্তা ও দারিদ্র্য নির্ণয়ের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে, আমাদিগের মতে একদিকে যেরূপ তাহাদিগকে জ্ঞান বিষয়ে বিপথগামী করা হয়, অন্যদিকে আবার প্রকারান্তরে তাহাদিগের মনকে কু-জ্ঞানী মানুষের বশ্যতাপন্ন করিয়া intellectual conquest এর সহায়তা করা হয়। কাযেই, পাঠকগণ বুঝিয়া রাখুন যে, মিঃ বসু কোন্ শ্রেণীর স্বাধীনতাকামী। যাঁহাদিগের এত গলদ এবং কার্য্য-কারণের সঙ্গতি বোঝা বিষয়ে যাঁহারা এত মূর্খ, তাঁহারা যে নেতাগিরি করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না কেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদিগের মনে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে যে, ইহাঁরা কি নেতাগিরি করিবার উপযুক্ত মানুষ ?

"দারিদ্র্য সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে বিদ্যমান আছে এবং ছিল" (Poverty has existed in all ages and in all climes)—মিঃ বসুর এই কথাও প্রকৃত ইতিহাস এবং প্রকৃত দর্শনসঙ্গত নহে। টাকা, আনা, পয়সাই যে দারিদ্র্যের ও ধনবত্তার মাপকাঠী, তাহা মনে করিলে সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশেই দারিদ্র্য বিদ্যমান আছে এবং ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়, কারণ টাকা, আনা, পয়সার দ্বারা কখনও মানুষের কোন অভাব সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভব যে নহে, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি। অন্য পক্ষে দারিদ্র্য ও ধনবত্তার মাপকাঠী প্রধানতঃ ধান্যের পরিমাণ এবং আহারের জন্য ডাল-ভাত, পরিধেয়ের জন্য সাধারণ মোটা ধুতি, শাড়ী ও চাদর, ব্যবহারের জন্য সাধারণ তৈজস, স্বাস্থ্যের জন্য সাধারণ কুটীর ও শয্যা, সন্তুষ্টির জন্য দ্বন্দ্বকলহহীনতা ও সন্তান-সন্ততির সচ্চরিত্র ও শান্তির জন্য ধর্ম্মচর্চ্চার অবসর প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে লাভ করিতে পারিলে মানুষের সর্ব্ববিধ অভাব দূরীকৃত হইতে পারে, ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলে জগতের সর্ব্বত্র মানুষ যে একদিন সর্ব্ববিধ দারিদ্র্য হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত ছিল, তাহা বাস্তব ইতিহাসের সহায়তায় অনায়াসেই অনুমান করা যায়। প্রত্যেক জীবের "মূল প্রকৃতি" ও "স্বভাব" কোন্ নিয়মে পরিচালিত, তাহা দর্শন করিয়া এবং মানুষের "স্বভাব" যখন "মূল প্রকৃতি"র ব্যাভিচারী হয়, তখন বস্তুতঃ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থার উৎপত্তি হয় তাহা যখন উপরোক্ত দর্শনের সহিত মিলাইয়া লিখিত হয়, তখন উহাকে "বাস্তব ইতিহাস" বলিতে হয়। আধুনিক ইতিহাসের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উপরোক্ত বাস্তব ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি অনেক দিন হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কারণ এখন আর মানুষ প্রত্যেক জীবের "মূল প্রকৃতি" ও "স্বভাব" যে কোন্ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত, তাহা পরিজ্ঞাত নহে এবং ঐ নিয়ম দর্শন করিবার পদ্ধতি যে কি, তাহাও মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে।

আমাদিগের বিদ্যায় যতটুকু কুলায়, তদনুসারে বলিতে হয় যে, উপরোক্ত বাস্তব ইতিহাসের উদাহরণ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে দেখা যায়। এই অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রত্যেকখানিই যে এক একখানি প্রকৃত ইতিহাস, তাহা নহে। কি করিয়া মানুষের বিভিন্ন অবস্থা আমূলভাবে পর্য্যালোচনা করিতে হয়, প্রধানতঃ তাহার কথাতেই ঐ মহাপুরাণের সতের-খানি পরিপূর্ণ। মানুষের বিভিন্ন অবস্থা দেখিয়া কি করিয়া তাহার অতীত ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয় অবস্থা নির্দ্ধারিত করিতে হয়, তাহার উদাহরণ ঐ আঠার-খানি মহাপুরাণের মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেই লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া আমাদিগের মনে হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের মধ্যেও এই শ্রেণীর কথা অতি গূঢ়ভাবে লিপিবদ্ধ আছে বটে, কিন্তু কোন বেদের ভাষা কোন দ্বন্দ্বকলহপ্রিয় ও রাগদ্বেষনিরত মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব নহে বলিয়া পুনরায় মহাপুরাণে সাধারণের বোধগম্য করিয়া বিস্তৃত ভাবে উহা লিখিত হইয়াছে। মহাপুরাণগুলি আমূল-ভাবে অধ্যয়ন করিতে পারিলে মানুষের যে কোন যুগের ইতিহাস কার্য্যকারণের সঙ্গতির সহিত মিলাইয়া নির্ণয়

করা সম্ভব হয়। মহাপুরাণগুলি সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করিয়াও যে অনেক দিন হইতে আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ ইতিহাস নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, তাহার প্রধান কারণ, ঋষিদিগের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে হইলে শব্দলক্ষণ ও শব্দবৃত্তি আমূলভাবে উপলব্ধি করিবার প্রয়োজন হয় এবং ঐ শব্দলক্ষণ ও শব্দবৃত্তি উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি অনেক সহস্র বৎসর হইতে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়াছেন। ইহারই জন্য ঐ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের অনেকেই ঋষি-প্রণীত পুরাণগুলিকে পোকামাকড়ের আজগুবি অথবা কতকগুলি অস্বাভাবিক নাম ও গল্পে পরিপূর্ণ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ঋষিগণের ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের এই অজ্ঞতাবশতঃ, আজকাল বাংলা ও ইংরাজী প্রভৃতি অন্যান্য ভাষায় মহাপুরাণসমূহের যে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহার একখানিতেও কোন মহাপুরাণের কোন কথাই প্রকৃতভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় না।

শুধু যে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত মহাপুরাণ-গুলিতেই মানুষের যে কোন যুগের প্রাচীন ইতিহাস অটুটভাবে নির্ণয় করিবার সঙ্কেত লিপিবদ্ধ আছে, তাহা নহে, প্রাচীন হিব্রু ও প্রাচীন আরবী ভাষায় লিখিত কোন না কোন গ্রন্থেও উহা লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আমাদের মনে হয়, প্রাচীন হিব্রুর ও প্রাচীন আরবী ভাষার ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ কোন না কোন স্থানে লুক্কায়িত রহিয়াছে এবং প্রাচীন ঐ দুইটি ভাষার অজ্ঞতাবশতঃ উহা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না।

মহাপুরাণগুলি যথাযথ অর্থে পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বার হাজার বৎসরব্যাপী প্রত্যেক যুগের আদিম তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া জগতের সর্ব্বসাধারণ সর্ব্বতোভাবে দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হয় এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বত্রই মানুষের মধ্যে আবার দারিদ্র্য দেখা দেয় ও উহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চরমে উপস্থিত হয়। কেন এইরূপ হয়, তাহা বুঝিতে হইলে সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রের সহিত পৃথিবীর কি সম্বন্ধ, তাহা আমূলভাবে পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। সূর্য্য ও চন্দ্রের অবস্থানভেদে যে পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধি ও কার্য্য-শক্তির তারতম্য ঘটে, তাহা সকাল বেলা, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও রাত্রিকালে মানুষের শরীরের অবস্থা স্বতঃই কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা লক্ষ্য করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে। এই সমস্ত কথা অতীব দুরূহ এবং বিস্তৃত। তাহা এই সন্দর্ভে আলোচনা করা সম্ভবযোগ্য নহে।

মহাপুরাণগুলি বিশ্বাস করিতে না পারিলেও, মানুষ যে অতীতকালে একদিন সর্ব্বতোভাবে অভাব হইতে মুক্ত ছিল, তাহা মানুষের স্মরণযোগ্য অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা হইতেও অনুমান করা সম্ভব। কি ভারতবর্ষ, কি ইয়োরোপ, কি আমেরিকা, যে কোন দেশের যে কোন পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থা, পঞ্চাশ বৎসর আগেকার অবস্থা এবং একশত বৎসর আগেকার অবস্থার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক পরিবারেই অর্জ্জিত টাকা, আনা, পয়সার পরিমাণ বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে বটে, কিন্তু খাদ্য, পরিধেয়, ব্যবহার্য্য, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টির মানসিক অভাব প্রত্যেক পরিবারেই বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে প্রাচুর্য্য থাকিলে নিজেদের অভাব মিটাইয়া বিস্তৃতভাবে আতিথেয়তা, আত্মীয়-স্বজন-পরায়ণতা নির্ব্বাহ করা সম্ভব, সেই প্রাচুর্য্য পঞ্চাশ বৎসর আগেও যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, এখন আর তাহা নাই, ঐ প্রাচুর্য্য আবার একশত বৎসর আগে যে পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, পঞ্চাশ বৎসর আগে সেই পরিমাণে ছিল না—এই কথা যে সত্য, তাহা প্রায় প্রত্যেক পরিবারের স্মরণযোগ্য ইতিহাস হইতে প্রতিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ ভাবে অতীতের দিকে পশ্চদ্বর্ত্তী হইয়া প্রাচুর্য্যের পরিমাণ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল বলিয়া পরিলক্ষিত হইলে আজকালকার গণিত অনুসারেও বলিতে হয় যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম কালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাচুর্য্য বিদ্যমান ছিল।

কাযেই বলিতে হয় যে, "দারিদ্র্য সর্ব্বযুগে ও সর্ব্বদেশে বিদ্যমান আছে এবং ছিল", এতাদৃশ মতবাদ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। পরন্তু, ইহা "মূল প্রকৃতি" ও "স্বভাবে"র নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সম্বন্ধে যেরূপ অজ্ঞতার পরিচায়ক, সেইরূপ

আবার প্রকৃত বুদ্ধিমানোচিত ভূয়োদর্শনের অক্ষমতার পরিচায়ক। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই মতবাদ ইয়োরোপীয়গণের নিকট ধার করা এবং তদনুসারে তাঁহার মনোভাব অন্যায়ভাবে পাশ্চাত্ত্য-গণের দ্বারা বিজিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তথাপি মিঃ (শ্রীযুক্ত অথবা বাবু নহে) শরচ্চন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বাধীনতাবাদী জেনারেল (general) অথবা 'ত্রাতা'!

"বর্ত্তমান যুগে দারিদ্র্য ভারতবর্ষে যেরূপ তীব্র ও ব্যাপক, সেইরূপ জগতের আর কোথাও নহে" (No where in the modern world do I think is its burden more crushing or incidence more widespread than in our country.)—মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই মতবাদও অপরিপক্ক বুদ্ধির যুবকের মতবাদের ন্যায় অসত্য। টাকা অথবা পয়সার পরিমাণানুসারে হিসাব করিলে ভারতবাসিগণকে অনেকের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয় তাহা সত্য, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এখনও ভারতবাসিগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। ভারতবাসিগণ তাঁহাদিগের পূর্ব্বাবস্থার তুলনায় অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া প্রায়শঃ অন্নহীন ও বস্ত্রহীন হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই দারিদ্র্যের আশু প্রতীকার না হইলে শুধু ভারতবর্ষে কেন, জগতের সর্ব্বত্র জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব বিদ্রোহ অনিবার্য্য তাহাও সত্য বটে, কিন্তু এখনও ভারতবাসিগণ ইয়োরোপের কোন জাতির তুলনায় অধিকতর দরিদ্র নহেন। ভারতবাসিগণ যদি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইতেন, তাহা হইলে ভারতবাসী জনসাধারণের দলে দলে আহার্য্যসংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির দ্বারস্থ হইতে হইত, কারণ, আহার্য্যের জন্য দরিদ্রের পক্ষে ধনীর দ্বারস্থ হওয়া স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যায় যে, ন্যূনপক্ষে গত এক সহস্র বৎসর হইতে জগতের অন্যান্য জাতিগণই অর্থোপার্জ্জনের জন্য ভারতবর্ষের দ্বারস্থ হইতেছেন এবং এখনও তাঁহারা প্রায়শঃ নিজেদের দেশে থাকিয়া সর্ব্বসাধারণের নিয়োগ ও আহার্য্য সংস্থান করিতে পারিতেছেন না, অথচ ভারতবাসিগণ এখনও অন্ন-সংস্থানের জন্য ভারতবর্ষের বাহিরে কাহারও দুয়ারে যাইতে বাধ্য হয় নাই। ইহা ছাড়া কোন্ দেশে কত খাদ্য-শস্যের উৎপত্তি হয়, তাহার হিসাব সংগ্রহ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, এখনও ভারতবর্ষের সমগ্র ভারতবাসীর মাথাপিছু যত খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়, তত জগতের আর কোন দেশে প্রায়শঃ উৎপন্ন হয় না। মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা খাদ্য-শস্যের কথা বলিতেছি এবং অন্যান্য কোন শস্যের কথা বলিতেছি না। প্রকৃত পক্ষে জগতের প্রত্যেক দেশই অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহার জন্য জগতের সর্ব্বত্রই অভূতপূর্ব্ব রকমের হাহাকার উঠিয়াছে। ভারতবর্ষও তাহার পূর্ব্বাবস্থা ও প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থা অন্যান্য প্রত্যেক দেশের তুলনায় অপেক্ষাকৃত যে ভাল, তাহা তাহার খাদ্য-শস্যের উৎপত্তির হার ও জনসাধারণের প্রবৃত্তি দেখিলে যুক্তিসঙ্গত ভাবে অস্বীকার করা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাবে গান্ধিজীপ্রমুখ নেতৃবর্গের পরিচালনায় ভারতবর্ষ যে রাস্তায় চলিয়াছে, তাহার আশু প্রতীকার না হইলে, অদূরভবিষ্যতে ভারতবাসিগণকেও অন্যান্য জাতির মত আত্মীয়স্বজন ছাড়িয়া দলে দলে খাদ্যের জন্য ভারতের বাহিরে অন্যান্য জাতির দ্বারস্থ হইতে হইবে তাহা সত্য, কিন্তু এখনও ভারতবাসিগণ আর কোন জাতির তুলনায় অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়ে নাই। জনসাধারণ যে দিন গান্ধিজী, জওহরলালজী, সুভাষচন্দ্র ও কংগ্রেসের অন্যান্য high command শ্রেণীর কুশিক্ষিত, বিপথগামী নেতৃবর্গকে শাসিত ও সংযত করিয়া কংগ্রেসকে দ্বন্দ্ব-কলহহীন ও সর্ব্বসাধারণের মিলন-ক্ষেত্র করিয়া তুলিতে পারিবে, তাহার দশ বৎসরের মধ্যে দেখা যাইবে যে, ভারতবাসিগণ পুনরায় মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেকে প্রত্যেক বস্তুর প্রাচুর্য্য অনুভব করিতেছে এবং তাহার বিশ বৎসরের মধ্যে দেখা যাইবে যে, ভারতবর্ষ পুনরায় জগতের প্রত্যেক জাতির দ্বারা নৈতিক গুরুরূপে পরিগৃহীত হইতেছে। তখন ভারতবর্ষ যে শুধু ভারতবাসিগণকেই খাওয়াইতে পারিবে এবং খাওয়াইবার প্রবৃত্তি-সম্পন্ন হইবে তাহা নহে, সর্ব্ব জগতের

মধ্যে সে আবার তাহার "মানব-ধর্ম্ম" প্রচারিত করিয়া প্রত্যেক জাতির প্রত্যেকের আহার্য্য, ব্যবহার্য্য, স্বাস্থ্য, শান্তি ও সন্তুষ্টির বিধান করিবে এবং তাহার কামান, বন্দুক ও ছলচাতুর্য্য না থাকিলেও প্রত্যেক জাতি স্বতঃপরতঃ হইয়া তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, ইহা লেখকের অলীক কল্পনা ও পাগলামী। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রতিপন্ন করিবে যে, ইহা আদৌ লেখকের কল্পনা নহে। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বর্ত্তমান অভাবের তাড়নায় অব্যক্ত ভাবে যে মনোভাবের উদ্ভব হইয়াছে এবং ভারতের জমির মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলে বুঝা যাইবে যে, দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়, কুশিক্ষিত, বিপথগামী, গান্ধিজীপ্রমুখ নেতৃবর্গের বিপথ-পরিচালনার কাল আর অধিক দিন বিদ্যমান নাই এবং তখন আমাদিগের প্রত্যেক কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করা সম্ভব হইবে।

স্বকীয় দরিদ্রাবস্থাতেও অন্তর্নিহিত অনেক শক্তি বিদ্যমান থাকে। তাহা উপলব্ধি না করিয়া নিজেকে অযথা দরিদ্র মনে করিলে এবং অপরকে অযথা ধনী মনে করিলে, দ্বন্দ্ব-কলহের প্রবৃত্তি উদ্ভাসিত হয় এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস নষ্ট হইয়া পরের বিদ্যাবুদ্ধির উপর আকৃষ্টতার সূচনা ঘটে। ইহাও intellectual conquest-এর অন্যতম বিধান, ইহা ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বভাবোচিত নহে। মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই কথা শুনিলে আমাদিগের মনে হয় যে, যাঁহারা বংশানুক্রমে পরের দাস্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা যতই শিক্ষিত ও স্বাধীনতা-সংগ্রামে যতই স্বাধীনতাবাদী সেনাপতি হউন না কেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এতাদৃশভাবে পরাশ্রয়ী ও পরের অবস্থায় বিমুগ্ধ হওয়া খুব অস্বাভাবিক নহে। মিঃ শরচ্চন্দ্রের মত দাস্যভাবাপন্ন মানুষগুলি আমাদিগের যুবকদিগের সম্মুখে এতাদৃশ অসত্য কথা কহিয়া intellectual conquest-এর সহায়তা আর না করেন, ইহাই তাঁহাদের কাছে আমাদিগের অন্যতম মিনতি।

এ বিষয়ে শরচ্চন্দ্রের তৃতীয় কথা—"ভারতবাসিগণের এতাদৃশ দারিদ্র্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষে যে কৃষকগণের বিদ্রোহ এতাবৎ ঘটে নাই, তাহার কারণ তিনটি—(১) উহাদিগের অদৃষ্টবাদিতা, (২) স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা, (৩) যেখানে ক্লেশের উপশমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাচ্ছিল্য দেখান হয় সেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত না হইয়া যেখানে উহার তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, সেইখানেই বিদ্রোহ দেখা যায়—এগুলি ঐতিহাসিক সত্য।

আমাদিগের মতে মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই তৃতীয় কথাটীও যুক্তিসঙ্গত নহে। কৃষকগণের অদৃষ্টবাদিতা এবং স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তাই যদি তাহাদের বিদ্রোহ না করিবার কারণ হয়, তাহা হইলে কুত্রাপি কখনও কৃষকগণের বিদ্রোহ ঘটিতে পারে না। কারণ, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, জগতের সর্ব্বত্রই কৃষকগণ প্রায়শঃ অদৃষ্টবাদী ও স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয় এবং যাহারা স্বভাবতঃ অদৃষ্টবাদী ও শান্তিপ্রিয়, তাহাদিগের অদৃষ্টবাদিতা ও শান্তিপ্রিয়তা অন্য কোন কারণ উপস্থিত না হইলে বিলুপ্ত হইতে পারে না। চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, যে কারণে মানুষ অদৃষ্টবাদী ও শান্তিপ্রিয় হইয়া থাকে এবং যে কারণের অভাব হইলে মানুষের শান্তিপ্রিয়তা ও অদৃষ্টবাদিতা নষ্ট হইয়া অস্থিরতা ও বিদ্রোহের ভাব উপস্থিত হইতে পারে, সেই কারণকেই বিদ্রোহের মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

যেখানে ক্লেশের উপশমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তাচ্ছিল্য দেখান হয়, সেইখানে বিদ্রোহ উপস্থিত না হইয়া যেখানে উহার তীব্রতা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু, সেইখানেই বিদ্রোহ দেখা যায়, ইহাও ঐতিহাসিক সত্য নহে। পরন্তু, যেখানে অন্নাভাবে জঠর-জ্বালা তীব্রতর রূপ ধারণ করে, সেইখানেই বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, আর যেখানে বিদ্রোহ উপস্থিত হয় না, সেইখানে অন্নাভাবে জঠর-জ্বালা তীব্রতম রূপ ধারণ করে নাই, ইহা বুঝিতে হইবে।

অন্নাভাববশতঃ ক্ষুধার জ্বালা যখন মানুষের পেটে তীব্রতম রূপ পরিগ্রহ করে, তখন কোন মানুষই সুস্থির থাকিতে পারে না। তখন মানুষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম সন্তানের মাংস পর্য্যন্ত আহার করিতে উদ্যত হয়, ইহা বাস্তব সত্য। দুর্ভিক্ষের সময় এতাদৃশ উদাহরণ বিরল থাকে না। কাযেই ভারতবর্ষের কৃষকগণের মধ্যে যে

এখনও পর্য্যন্ত বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই, তাহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের কৃষকগণের মধ্যে অন্নাভাবের সর্ব্বাধিক তীব্র যাতনা এতাবৎ দেখা দেয় নাই। জগতের যেখানে যেখানে জনসাধারণের মধ্যে এতাদৃশ বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, সেই সেইখানে টাকা, আনা, পয়সার প্রাচুর্য্য দেখা গেলেও বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঐ স্থানে প্রকৃত দারিদ্র্য তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছিলাম যে, মিঃ শরচ্চন্দ্র বসুর শ্রেণীর লোকের মতে, ভারতবর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া বিবেচিত হইলেও, বাস্তবিক পক্ষে জগতের অন্য কোন দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এখনও অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া পড়ে নাই। পরন্তু, যে যে দেশে জনসাধারণের বিদ্রোহ অথবা অস্থিরতা দেখা যাইতেছে, সেই সেই দেশ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

স্বভাবের নিয়মানুসারে মানুষের অস্থিরতা অথবা বিদ্রোহের কারণ প্রধানতঃ দুইটী :—

(১) খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব, (২) অসচ্চরিত্রতা (অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য) বশতঃ দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়তা এবং রাগ ও দ্বেষ। প্রধানতঃ এই দুইটী কারণ বশতঃ যে মানুষের অস্থিরতা অথবা বিদ্রোহের প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা যে কোন মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অথবা যে কোন জাতির সঙ্ঘগত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে পরিলক্ষিত হইবে।

স্বভাবের নিয়মানুসারে মানুষ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—(১) বুদ্ধিজীবী, এবং (২) শ্রমজীবী। মানুষকে পরীক্ষা করিতে জানিলে মানুষের এই স্বাভাবিক শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধেও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায়।

মানুষের অস্থিরতা অথবা বিদ্রোহের যে দুইটী স্বাভাবিক কারণ আছে, তাহার যে কোনটী বুদ্ধিজীবিগণকে ব্যাপকভাবে অস্থির করিয়া অথবা বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু অসচ্চরিত্রতা প্রায়শঃ শ্রমজীবিগণকে ব্যাপকভাবে অস্থির করিয়া অথবা ব্যাপকভাবে বিদ্রোহী করিয়া তুলিতে পারে না—ইহাও স্বভাবের নিয়ম। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্যগণ গত দুই সহস্র বৎসরের যে ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, এতাবৎ জগতে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, তাহার কারণ প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত ও অথবা বুদ্ধিজীবিগণ। কোন কোন যুদ্ধে শ্রমজীবিগণ খণ্ড খণ্ড ভাবে যোগদান করিয়াছে বলিয়া পরিচয় পাওয়া গেলেও যাইতে পারে বটে, কিন্তু কোন যুদ্ধেই উহারা ব্যাপকভাবে যোগদান করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইবে না। অথচ কয়েক বৎসর হইতে জগতের সর্ব্বত্রই শ্রমজীবিগণের মধ্যে অস্থিরতা এবং বিদ্রোহোন্মুখতা দেখা যাইতেছে।

ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, আধুনিক মধ্যবিত্ত অথবা বুদ্ধিজীবিগণের মধ্যে অর্থ ও খাদ্যাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও অসচ্চরিত্রতা অনেক দিন হইতেই প্রাবল্য লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুদিন আগেও শ্রমজীবিগণের মধ্যে কুত্রাপি খাদ্যাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব তীব্রতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রত্যেক দেশের বাস্তব অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলেই উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

শ্রমজীবিগণের আর একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাহারা সর্ব্বত্রই স্বভাবতঃ অত্যধিক সহনশীল হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে যাঁহারা স্বকীয় দেহাভ্যন্তরে বুদ্ধিকে প্রত্যক্ষ করিয়া বুদ্ধিজীবী হইয়া থাকেন, তাঁহারা স্বভাবতঃ শ্রমজীবিগণের অপেক্ষাও অধিকতর সহনশীল এবং ধীর হইয়াও থাকেন বটে, কিন্তু তথাকথিত কুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবিগণ সহজেই অধৈর্য্য ও দ্বন্দ্ব-কলহ প্রিয় হইয়া থাকেন। শ্রমজীবিগণ খাদ্যের অভাব আরম্ভ হইলেও প্রথম প্রথম ঐ অভাবকে সহ্য করিতে আরম্ভ করে। তখন তাহারা তিন বেলার স্থানে দুই বেলা খাইয়া এবং দুইবেলা না মিলিলে একবেলা খাইয়াও তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু ঐ এক বেলার খাদ্যও যখন আর তাহাদিগের সংগ্রহ করা অসম্ভব হয়, তখন আর তাহারা ধৈর্য্য রাখিতে পারে না এবং স্বভাবের বশে অস্থির হইয়া বিদ্রোহোন্মুখ হয়।

শুধু ভারতবর্ষে নহে, বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বত্র অন্নাভাব এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ঐ অভাব শ্রমজীবিগণের ধৈর্য্যের মাত্রা ছড়াইয়া উঠিয়াছে। চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিতে জানিলে ইহার সত্যতা অনায়াসেই প্রতিভাত হইবে। ভুয়া political independence-এর আন্দোলন

চালাইলে এই অভাব কুত্রাপি তিরোহিত হইবে না। ভারতীয় শ্রমিক-নেতৃবৃন্দ যে বিদ্রোহের জন্য প্রযত্নশীল হইয়াছেন, তাহার জন্য চেষ্টা না করিলেও আপনা হইতেই অভূতপূর্ব্ব রকমে শ্রমিকগণের ঐ বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিবে এবং সর্ব্বাগ্রে ঐ নেতৃবৃন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে। ঐ বিদ্রোহে কাহারও কোন সুফল ফলিবে না। উহাতে চলিতে থাকিবে কেবল মাত্র তাণ্ডবনৃত্য এবং জগদ্ব্যাপী হাহাকার।

বিদ্রোহে ও তাণ্ডবনৃত্যে কোন বিষয়ের বৃদ্ধি হয় না। হয় কেবলমাত্র ক্ষয়। এখনও ভারতবাসী নেতৃবর্গ সাবধান হইলে উহা সর্ব্বতোভাবে নিবারিত হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য কোন দেশের নেতৃবর্গের জাগরণে এই সর্ব্বব্যাপী তাণ্ডবনৃত্যের তাদৃশ প্রতিবিধান করা সম্ভব নহে। কারণ, ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় এখনও যে শক্তি আছে, সেই শক্তি আর কোন দেশের মৃত্তিকায় নাই। একমাত্র মৃত্তিকার শক্তিই মানুষের স্বাস্থ্যকর খাদ্য-শস্য ও কাঁচামাল প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

ইহারই জন্য মিঃ শরচ্চন্দ্রের শ্রেণীর লোককে আমরা ভুয়া পাণ্ডিত্যের প্রতিধ্বনি হইতে নিবৃত্ত হইতে করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি।

মিঃ শরচ্চন্দ্রের এই বিষয়ক চতুর্থ কথা—

"একশ্রেণীর চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে ধনতান্ত্রিকতা ও শ্রেণীবিভাগের উচ্ছেদ সাধন না করিতে পারিলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করা কখনও সম্ভব হইবে না।"

যাঁহাদিগের এই অভিমত, তাঁহাদিগের সহিত মিঃ শরচ্চন্দ্র একমতাবলম্বী নহেন। তিনি তাঁহাদিগের মতবাদ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তৎপরে তাঁহার পঞ্চম কথায় উপনীত হইয়াছেন। এই পঞ্চম কথায় তিনি বলিয়াছেন যে—

"বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগ নষ্ট করিবার জন্য ভারতবাসিগণ দলে দলে মিলিত হইয়া পরস্পরের প্রতি দুর্দ্দমনীয় অবজ্ঞা দেখাইতেছে, এতাদৃশ দৃশ্য ভারতবর্ষে দেখা যাইবে বলিয়া কখনও মনে করা যায় না।"

যদিও তিনি মনে করেন যে, উপরোক্ত শ্রেণীসংঘর্ষ ভারতবর্ষে হওয়ার সম্ভাবনা কম, তথাপি উহা কখনও হইবে কি না, তাহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারেন নাই।

ইহার পরই তিনি তাঁহার ষষ্ঠ কথায় উপনীত হইয়া বলিয়াছেন যে—

"বর্ত্তমান সমাজের মধ্যে যে শ্রেণীবিভাগ রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহাই ঘটুক না কেন, উহা যে অনিবার্য্য, তাহা মনে করিয়া ভারতবর্ষে শ্রেণীসংঘর্ষ আরম্ভ হইবার আগে আমরা অনেক কিছু করিতে পারি।"

মিঃ বসু তাঁহার পঞ্চম কথায় যে মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ সমাজতান্ত্রিক মিঃ কার্ল মার্কস্ ও তাঁহার চেলা-চামুণ্ডার। আমরা ঐ মতের পরিপোষণ করি না। মিঃ কার্ল মার্কসের মতে দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূর করিতে হইলে ধনতান্ত্রিকতা ও বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগ সর্ব্বতোভাবে দূর করিয়া সমাজের সকলকে এক শ্রেণীতে পরিণত করিতে হইবে। আমরা ঐ মতবাদ সমর্থন করি না বটে, কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগ সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিলেও যে দারিদ্র্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইতে পারে, মিঃ বসুর এই মতবাদও পরিপোষণ করি না। আমাদিগের মতে বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে কোনরূপ বিব্রত না করিয়া, অথবা উহাকে উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র্য দূর করিবার কর্ম্মসূত্রে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে বটে এবং আপাততঃ তাহাই করা পরামর্শসঙ্গত বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন না করিতে পারিলে জনসাধারণের দারিদ্র্য কখনও সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে বলিয়া, সকলকেই সামাজিক ভাবে এক শ্রেণীর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা বলা চলে না এবং তাহা করা সম্ভবও নহে। কারণ, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, স্বভাবতই মানুষ একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন মানুষ পঠন-পাঠন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যে স্বভাববশেই যেরূপ সুনিপুণ

হইয়া থাকেন, শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। আবার কোন মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে স্বভাববশেই যেরূপ সুনিপুণ হইয়া থাকেন, শত চেষ্টা করিলেও পঠন-পাঠন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। স্বভাবের এই নিয়মের বিরোধিতা করিবার আয়োজন করিয়া সকলকে একশ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করা কখনও সুফলপ্রদ হইতে পারে না। ইহা ছাড়া সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য সমাজের মধ্যে কোন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইলে কি কি একান্ত প্রয়োজনীয়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার জন্য প্রথমতঃ, কোন্ কোন্ ব্যবস্থায় উহা হইতে পারে, তাহা গবেষণা করিয়া যাহাতে বাহির করা হয়; দ্বিতীয়তঃ, ঐ ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে ও শিখিতে পারে; তৃতীয়তঃ, ঐ ব্যবস্থাসমূহ যাহারা পালন না করে তাহারা যাহাতে দণ্ড প্রাপ্ত হয়; চতুর্থতঃ, ঐ ব্যবস্থাসমূহ যাহাতে শারীরিক শ্রমের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা হয়; এই চারি শ্রেণীর কার্য্যের প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই চারি শ্রেণীর কার্য্য একই শ্রেণীর মানুষের দ্বারা সুসম্পন্ন করা সম্ভবযোগ্য নহে। উহার জন্য চারিটী বিভিন্ন শ্রেণীর গুণবত্তার প্রয়োজন হইয়া থাকে। মানুষকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষও স্বভাবতঃ উপরোক্ত চার শ্রেণীর কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য চারি শ্রেণীর গুণসম্পন্ন হইয়া চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কাযেই দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য যাহাতে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হয়, তাহা করিতে হইলে মনুষ্য-সমাজে মানুষকে তাহাদের স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম্ম-ক্ষমতানুসারে চারিটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার প্রয়োজন আছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সমাজে বংশানুক্রমে যে শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া আপাততঃ দারিদ্র্য দূর করিবার কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ শ্রেণীবিভাগ স্বাভাবিক গুণ ও কর্ম্ম-ক্ষমতা অনুসারে সম্পাদিত হয় না বলিয়া পরিশেষে উহার পরিবর্ত্তন সাধন একান্ত প্রয়োজনীয় হইবে।

ধন-তান্ত্রিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য সমাজ-তান্ত্রিকগণ যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সমাজ মধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়। প্রকৃত ধন কাহাকে বলে এবং কি হইলে বস্তুতঃ পক্ষে মানুষকে ধনী বলা যাইতে পারে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান জগতে যাঁহাদিগকে ধনী বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায়শঃ প্রকৃতপক্ষে ধনী নহেন। চল্‌তি হিসাবেও ইহাঁদিগকে প্রায়শঃ ধনী বলা চলে না, কারণ যাঁহারা ক্রোড় ক্রোড় টাকা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদের প্রায়শঃ ততোধিক পরিমাণের দেনা থাকে। যাঁহাদের বা দেনা অপেক্ষা পাওনা অধিক, তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত টাকা থাকে প্রায়শঃ কোন না কোন রকমের কাগজে। যখন শস্যোৎপত্তির হ্রাসের জন্য অন্নাভাব আসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ঐ কাগজ কার্য্যতঃ যে কোন কাযে লাগে না, তাহা জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই প্রতিভাত হইবে। এইরূপ ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এখন মানবসমাজ হইতে ধনী শ্রেণীর মানুষ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ধনী এখন আর প্রায়শঃ নাই বটে, কিন্তু ধনীর চাল, অর্থাৎ ধনবত্তার আস্ফালন অনেকের মধ্যে যে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদিগের মতে ঐ আস্ফালন নির্ম্মূল করিবার জন্য কোন প্রযত্ন অথবা বিবাদের প্রয়োজন হইবে না। কৃষক ও শ্রমজীবিগণের অন্নাভাবের তাড়নায় উহা অদূর-ভবিষ্যতে আপনা হইতেই শুষ্ক হইয়া যাইবে।

"ভারতবর্ষে সামাজিক শ্রেণীসংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা নাই", মিঃ বসুর এতাদৃশ উক্তিও সামাজিক অবস্থা বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয়। শিল্পক্ষেত্রে মজুরদিগের ধনিকদিগের বিরুদ্ধে, কৃষকগণের জমীদারদিগের বিরুদ্ধে, দেনাদারগণের মহাজনদিগের বিরুদ্ধে, তপশীলভুক্ত জাতিগুলির তথাকথিত উচ্চজাতিগুলির বিরুদ্ধে, কায়স্থ ও বৈদ্যগণের ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব যে পরিমাণে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে ভারতবর্ষে সামাজিক কোন শ্রেণীসংঘর্ষ বিদ্যমান নাই, অথবা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা কোনক্রমেই বলা চলে না। এত বড় মিথ্যা

কথা কোন দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন মানুষের পক্ষে যুবকগণকে শুনান কোনক্রমে উচিত কি না, তাহা আমরা পাঠকবর্গকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। কোন্ অবস্থার পর কোন্ অবস্থা সম্ভাবনীয়, তাহা কি করিয়া নির্ণয় করিতে হয়, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলে দেখা যাইবে যে, গান্ধিজীপ্রমুখ নেতৃবর্গ অদূরভবিষ্যতে তাঁহাদিগের কু-কার্য্য-তৎপরতা হইতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত না হইলে অথবা প্রতিনিবৃত্ত হইতে বাধ্য না হইলে, ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব্ব রকমের শ্রেণীসংঘর্ষ হইবার আশঙ্কা আছে। সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য যাহাতে কার্য্যতঃ নিবারিত হয়, তাহার প্রকৃত কর্ম্মসূত্রে হস্তক্ষেপ করিলে ঐ আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে। নতুবা ঐ সংঘর্ষে মিঃ বসুর শ্রেণীর অনেককেই অনেক কিছু বিসর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদিগের কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা অদূরভবিষ্যৎ প্রতিপন্ন করিবে।

মিঃ বসুর সপ্তম কথা—শিল্পের বিস্তৃতি সাধন করিয়া এবং অনাবাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধি করিয়া কৃষকগণের দারিদ্র্য দূর করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কৃষি-বিজ্ঞান, শিল্প-বিজ্ঞান ও অর্থনীতি-বিজ্ঞান বিষয়ে মিঃ বসু যে আজকালকার একটি কলেজের ছাত্র হইতে অধিকতর অভিজ্ঞ নহেন,তাহার সাক্ষ্য তাঁহার এই কথাটি হইতে পাওয়া যাইবে। শিল্পের বিস্তৃতি সাধন করিয়া অথবা অনাবাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধি করিয়া যদি সর্ব্বসাধারণের প্রকৃত দারিদ্র্য কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস করা সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে গত ত্রিশ বৎসরের কার্য্যে ভারতবাসী সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। কারণ ত্রিশ বৎসরের শিল্প ও কৃষি-বিবরণী পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, এই কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে শিল্পের বিস্তৃতি যেরূপ অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে,সেইরূপ অনাবাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধিও অনেক পরিমাণে ঘটিয়াছে। এই দুই উপায়ে যদি সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য হ্রাস করা কোন ক্রমে সম্ভবযোগ্য হইত, তাহা হইলে ইউরোপে ও অ্যামেরিকা প্রভৃতি কোন দেশেই জনসাধারণের মধ্যে দারিদ্র্যের হাহা-কার এত বৃদ্ধি পাইত না। যাঁহারা মানুষের অবস্থা সঠিক ভাবে পরীক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, রুশিয়ায় ঐ দুই উপায়ের দ্বারা দারিদ্র্য নিবারিত হইয়াছে, কিন্তু রুশিয়ার জনসাধারণের অবস্থা যে কিঞ্চিন্মাত্র পরি-মাণেও উন্নত হইয়াছে বলিয়া মনে করা চলে না, তাহা আমরা অনেকবার আমাদিগের পাঠকবর্গকে দেখাই-য়াছি। ঐ দুই উপায়ের দ্বারা যদি রুশিয়ায় দারিদ্র্যের হ্রাস করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে, তাহা অন্যান্য দেশেও অসফল থাকিত না, কারণ সকলেই রুশিয়াকে অনুকরণ করিত। শিল্পের প্রসার ও অনাবাদী জমীর আবাদ বৃদ্ধি করিলে দারিদ্র্যের হ্রাস হয়, তাহা পাশ্চাত্ত্যগণের কেতাবে লেখা আছে বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় না। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যখন হ্রাস পাইতে থাকে, তখন উহাতে বড় জোর সম্প্রদায়বিশেষের টাকা, আনা, পয়সার, পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইতে পারে বটে,কিন্তু সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য দূর হওয়া তো দূরের কথা,কোন সম্প্রদায়েরই প্রকৃত দারিদ্র্য কিঞ্চিন্মাত্র পরিমাণেও হ্রাস পাইতে পারে না—ইহা বাস্তব সত্য। যখন জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে, তখন দেশের কৃষি ও শিল্প ষ্টেটের দ্বারা পরিগৃহীত হইলে ষ্টেটের পক্ষে অধিকতর পরিমাণে টাকা, আনা, পয়সা নাড়া-চাড়া করা সম্ভব হয় বটে এবং লাভের মধ্যে যে-কৃষকগণ সাধারণতঃ স্বাবলম্বনে কৃষির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বেতন-ভোগী নফর করিয়া তোলা হয় বটে, কিন্তু কাহারও প্রকৃত দারিদ্র্যের লাঘব করা সম্ভব হয় না। পরন্তু ষ্টেটকে অধিকতর পরিমাণে কাগজের মুদ্রা প্রচার করিতে বাধ্য হইয়া স্বকীয় ঋণগ্রস্ততার ভার বৃদ্ধি করিতে হয়। ইহা ছাড়া, এখনও যন্ত্র-শিল্পের বিস্তার সাধন করিলে এবং জগতে এক্ষণে যে অনাবাদী জমী আছে,তাহার আবাদ বৃদ্ধি করিলে সারা জগৎ অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়া মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। আমাদিগের এই কথাগুলি যে যুক্তি-সঙ্গত, তাহা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। আমরা এখানে আর ঐ প্রমাণ উপস্থিত করিয়া এই সন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে উহা আমরা আমাদিগের পাঠকবর্গকে অনেক-বার শুনাইয়াছি। এতদ্বিষয়ে কাহারও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হইলে আমরা আবার তাহা শুনাইব।

সর্ব্বসাধারণের দারিদ্র্য যাহাতে হ্রাস পায়, তাহা করিতে হইলে শিল্প ও কৃষির উন্নতিতে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে তাহা সত্য, কিন্তু তাহা যন্ত্র-শিল্পের বিস্তারের দ্বারা অথবা অনাবাদী জমীর আবাদ-বৃদ্ধির দ্বারা কোনক্রমে সম্পাদিত করা সম্ভব হইবে না। উহার জন্য সর্ব্বাগ্রে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা না করিয়া কোন কৃত্রিম অথবা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে জনসাধারণের দারিদ্র্য বিদূরিত হইবে না। জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধিতে কৃতকার্য্য হইলে, যন্ত্র-শিল্পের স্থানে যাহাতে কুটীর শিল্প উন্নতি ও বিস্তৃতি লাভ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে এবং তখন উহা স্বতঃই সহজসাধ্য হইবে।

কোন্ উপায়ে জমীর স্বাভাবিক উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহা আমরা আমাদের গত সংখ্যায় "বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক সন্দর্ভে বিস্তৃত ভাবে লিখিয়াছি। উহা আমরা পাঠকদিগকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভ্রমের দৃষ্টান্ত

আসাম প্রদেশের বর্ত্তমান প্রধান-মন্ত্রী মিঃ বড়দলুই জমির রাজস্বহার কমাইবার জন্য প্রাদেশিক কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবের প্রথম কথা, কৃষকদিগের বর্ত্তমান রাজস্বহারের শতকরা ৫০, অর্থাৎ অর্দ্ধেক কমাইয়া দিতে হইবে। এত অধিক পরিমাণে রাজস্বহার কমাইবার ফলে রাজকোষে যে ঘাটতি পড়িবে, তাহা পূরণ করিবার জন্য রাজস্ব-তহশীলদারগণের মধ্যে যাঁহাদের আয় দুই সহস্র টাকার অধিক, তাঁহাদিগের উপর এবং যাঁহারা চা-বাগানের কার্য্যের পরিচালনা দ্বারা লাভবান্ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিতে হইবে, ইহা তাঁহার প্রস্তাবের দ্বিতীয় কথা।

আমাদের মতে, ইংরাজ ও ভারতীয়, মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু-নির্ব্বিশেষে সকলে মিলিত হইয়া দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি সংযত করিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্য্যে যাহাতে যোগদান করিতে পারে এবং যাহাতে যোগদান করে, তাহা না করিতে পারিলে, ভারতবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে কাহারও কি অর্থসমস্যা কি স্বাস্থ্য-সমস্যা, অথবা কি অশান্তি ও অসন্তুষ্টি-সমস্যা, ইহার কোনটিরই বিন্দুমাত্র সমাধান করা আদৌ সম্ভবযোগ্য হইবে না। আমাদের কথা যে ঠিক, তাহার প্রমাণ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং ভারতবাসিগণের আধুনিক অবস্থা।

প্রকৃতির কার্য্যের ফলে ইংরাজ ও ভারতীয়, মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু মিলিত হইয়া কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন আত্মত্যাগ করিয়া মিলনই ছিল কার্য্যতঃ কংগ্রেসের অন্যতম মূল মন্ত্র। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাবধি কোনদিনই আদর্শকে সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া স্থির করিতে পারে নাই বটে এবং কার্য্যসূত্রও আমূলভাবে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার ভিত্তি-স্থাপনের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত এমন কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য সংঘটিত হয় নাই, যাহার ফলে সর্ব্বসাধারণের মিলনের সূত্র পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইতে পারিত। তখনকার জনসাধারণের সর্ব্ববিধ অবস্থাও সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্টির অনুরূপ না হইলেও, বর্ত্তমান অবস্থার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক ভাল ছিল। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের সেই আদিম কালে তাহার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতাগণ দেশের মধ্যে যে মিলনের প্রবৃত্তি (spirit) অনুবর্ত্তিত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই ফলে ভারতীয় কংগ্রেস আংশিক পরিমাণে জগতের শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে স্বায়ত্তশাসন লাভ করিতে সক্ষম

হইয়াছে। ভুলিলে চলিবে না যে, ঐ ভিত্তি-প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে যেমন হিন্দুও ছিলেন, সেইরূপ মুসলমান এবং খৃষ্টানও ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে যেমন ভারতবাসী ছিলেন, সেইরূপ আবার ইংরাজও ছিলেন। কিন্তু হায়, আজ ভারতীয় কংগ্রেসের এই দশা কেন? কেন আজ তাহার মধ্যে এত দলাদলি, দ্বন্দ্ব ও কলহ? আজও গান্ধীজী হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের জন্য মুসলমানগণকে ব্ল্যাঙ্ক-চেক প্রদান করিতে সম্মত হন, আজও তিনি হিন্দুর উন্নত ও অনুন্নত জাতির মধ্যে মিলন রক্ষা করিবার জন্য নিজের বুকের রক্ত পরিত্যাগ করিবার স্বীকারোক্তি প্রচার করিয়া থাকেন, তথাপি কংগ্রেসের মধ্যে এত অধিক দলাদলি পাকাইয়া উঠে কেন?

মিলনের মন্ত্র লইয়া যে কংগ্রেসের ভিত্তি, সেই কংগ্রেসে এত অধিক দলাদলি উত্তরোত্তর পাকিয়া উঠিতেছে কেন, তাহার বিচার করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ যদিও মুখে মিলনের বার্ত্তা প্রচার করিয়া থাকেন, তথাপি কার্য্যতঃ তাঁহারা যাহা করেন, তাহাতে কখনও মিলন সম্ভব হইতে পারে না। তাঁহাদিগের মুখে মিলনের বার্ত্তা থাকিলেও তাঁহাদের কার্য্য এতাদৃশ অবিবেচনামূলক যে, উহার ফলে সর্ব্বতোভাবের মিলন হওয়া তো দূরের কথা, অমিলন অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে। কথায় কাহারও সহিত মতপার্থক্য অথবা অমিলন হইলে তত কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না বটে, কিন্তু যে কার্য্যে একজনেরও সহিত কলহ হইতে পারে, অথবা একজনেরও ক্ষতি হইতে পারে, সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দলাদলির সূচনা ও বৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়, ইহা স্বভাবের নিয়ম।

যে কার্য্যে একজনেরও সহিত কলহ হইতে পারে, অথবা একজনেরও ক্ষতি হইতে পারে, সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে দলাদলির সূচনা ও বৃদ্ধি অনিবার্য্য হয়, তাহা আধুনিক বিকৃতমস্তিষ্ক ও তরলমতি যুবকগণের পক্ষে বুঝিয়া উঠা অসাধ্য হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রৌঢ়গণের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব জীবনের ঘটনাগুলি কি করিয়া অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা উহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। দলাদলির সূচনা ও বৃদ্ধির উপরোক্ত স্বাভাবিক নিয়মানুসারে, জাতীয় মিলন-মণ্ডপস্বরূপ কংগ্রেসের কার্য্যসূত্রে যাহাতে ভারতের কাহারও কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে, অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে, তাদৃশ কোনরূপ কার্য্য পরিগৃহীত হওয়া অবিধেয়। কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ স্বভাবের উপরোক্ত নিয়মটি আদৌ পালন করিতেছেন না বলিয়াই, ভারতীয় কংগ্রেসে দলাদলি এত বৃদ্ধি পাইতেছে এবং কংগ্রেসও অবজ্ঞেয় অবস্থা হইতে অধিকতর অবজ্ঞেয় অবস্থায় উপনীত হইতেছে। কংগ্রেস যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে উত্তরোত্তর হীন হইতে হীনতর অবস্থায় উপনীত হইতেছে, তাহা তাহার প্রতিনিধিবর্গের ভোটযুদ্ধে জয়ের পরিমাণ দেখিলে আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধি করা যায় না বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, ভোট যুদ্ধের ঐ জয় দীপশিখা নির্ব্বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদীপ্তির অনুরূপ।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, তথাকথিত অশিক্ষিত জনসাধারণ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পার্থক্য কার্য্যতঃ বুঝিতে পারে না, কারণ দেশ স্বাধীন হইলেও তাহারা প্রত্যেকে পরাধীনই থাকিয়া যাইবে। তাহারা প্রত্যেকেই চায় পেটের ভাত, পরণের ধুতি, বাসের কুটীর আর শরীরের স্বাস্থ্য এবং একমাত্র তাহাই তাহারা চলতি হিসাবে বুঝিতে পারে। ইংরাজ যখন প্রথমে এ দেশে রাজা হইয়াছিলেন, তখন ঐ পেটের ভাত, পরণের ধুতি, বাসের কুটীর আর ঐ শরীরের স্বাস্থ্য তাহারা অপেক্ষাকৃত অধিকতর পরিমাণে পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাই তাহারা ইংরাজের রাজত্বকে প্রথম প্রথম মানিয়া লইয়াছিল এবং 'মহারাণী'র রাজত্বে অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইংরাজগণ তাহাদিগের ঐ যৎসামান্যের আকাঙ্ক্ষাও সর্ব্বতোভাবে পূরণ করিতে পারেন নাই এবং তাহাদিগের পেটের ভাত প্রভৃতিতে প্রত্যেকের ঘরে অভাব দেখা দিয়াছে ও ঐ অভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই এখন আর তাহারা ইংরাজের উপর সন্তুষ্ট নহে। তাহারা এখন একটা 'নূতন কিছু' চাহে। যাহা কিছু

ইংরাজের বিরোধী, তাহাকেই ঐ 'নূতন কিছু' বলিয়া তাহারা মানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে। কংগ্রেসকে তাহারা ঐ 'নূতন কিছু' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এ দিকে কংগ্রেসও আংশিক ভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। পেটের ভাতের, অথবা পরণের ধুতির, অথবা বাসের কুটীরের, অথবা শরীরের স্বাস্থ্যের জন্য জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন দাবী উত্থাপিত হইলে এক্ষণে ইংরাজের পক্ষে কংগ্রেসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অথচ কি করিয়া যে জনসাধারণের ঐ পেটের ভাত প্রভৃতির দাবী মিটান সম্ভব হইতে পারে, তাহা গান্ধীজী হইতে আরম্ভ করিয়া কংগ্রেসের কোন নেতাই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। ঐ উদ্দেশ্যে ইহাঁরা কখনও বা রুশিয়ার দৃষ্টান্ত, কখনও বা মার্কিনের দৃষ্টান্ত, কখনও বা জার্ম্মানীর দৃষ্টান্ত, আর কখনও বা ইতালীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু একবারও তাকাইয়া দেখেন না যে, যদি রুশিয়া, অথবা মার্কিন, অথবা জার্ম্মানী, অথবা ইতালী প্রভৃতি কোন দেশে জনসাধারণের উপরোক্ত দাবী মিটাইবার মন্ত্র আবিষ্কৃত হইত, তাহা হইলে জগতের জনসাধারণের মধ্যে কুত্রাপি অর্থাভাবের হাহাকার উঠিতে পারিত না, কারণ সকলেই ঐ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পারিত। গান্ধীজী প্রভৃতি এই নেতৃবর্গের মস্তিষ্ক যদি কোন সারবান্ পদার্থে পরিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে ইহাঁরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেন যে, যে-মন্ত্রে জনসাধারণের পেটের ভাত প্রভৃতির দাবী সর্ব্বতোভাবে মিটান সম্ভব, সেই মন্ত্র আধুনিক জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। উহা সাধনার দ্বারা পুনরায় আবিষ্কার করিতে হইবে। এই মন্ত্র কংগ্রেসের কোন নেতাই শিক্ষা ত' করিতে পারেনই নাই, পরন্তু উহা যে কোন জাতির নকল না করিয়া সাধনার দ্বারা আবিষ্কার করিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত ইহাঁরা বুঝিতে পারেন নাই। কাযেই যদিও কংগ্রেস আংশিক ভাবে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিয়াছে, তথাপি তাহার পক্ষে জনসাধারণের পেটের ভাত প্রভৃতির দাবী পূরণ করা সম্ভব হইবে না। ইহার ফলে, যদিও জনসাধারণ তাহাদের দাবী মিটাইবার আশায় কংগ্রেসের প্রতি আংশিক ভাবে অনুরক্তি দেখাইতেছে এবং কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণ সাময়িকভাবে ভোটযুদ্ধে প্রায়শঃ জয়ী হইতেছেন, তথাপি অদূরভবিষ্যতে কংগ্রেসের কার্য্যপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হইলে ইহাকে ধূলিসাৎ করিবার জন্য ঐ জনসাধারণই পুনরায় বদ্ধপরিকর হইবে। অব্যক্ত অবস্থা কি করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, তাহা জানা থাকিলে, উহার চিহ্নও এখনই দেখা যাইবে। ইহারই জন্য আমরা বলিতেছে যে, ভোটযুদ্ধে কংগ্রেস-প্রতিনিধিগণের জয় আপাততঃ দেখা গেলেও উহা দীপ-শিখা নির্ব্বাণের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রদীপ্তির অনুরূপ এবং কংগ্রেস হীনতম অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদিগের এই কথা এখনও কাহারও কাহার কাছে হাস্যোদ্দীপক হইলেও হইতে পারে, কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য। অদূরভবিষ্যৎ ইহার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবে।

কোন্ মন্ত্রে জনসাধারণের প্রত্যেকের পেটের ভাতের দাবী প্রভৃতি মিটান সম্ভব তাহা আবিষ্কার করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ঐ মন্ত্রও কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ইংরাজ ও ভারতীয়, মুসলমান, খৃষ্টান ও হিন্দু নির্ব্বিশেষে সকলের মিলন একান্ত প্রয়োজনীয়।

কাযেই দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেসকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষ বুদ্ধিমানই হউক আর বুদ্ধিহীনই হউক, কর্ম্মতৎপরই হউক আর অলসই হউক, চরিত্রবানই হউক আর চরিত্রহীনই হউক, হিংসই হউক আর অহিংসই হউক, ছাগলের দুগ্ধই গ্রহণ করুক আর গরুর দুগ্ধই গ্রহণ করুক, সহযোগীই হউক আর অসহযোগীই হউক, যুবতীর স্কন্ধে ভর করিয়া উপাসনাক্ষেত্রে প্রবেশোন্মুখই হউক, আর যুবতীর নিকট হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াসীই হউক, চরকার ভক্তই হউক আর অভক্তই হউক, গান্ধীজীর সেবকই হউক আর বিদ্বেষীই হউক, হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় পরুক আর কোট প্যান্টুলান পরুক, বিলাতেরই হউক আর ভারতবর্ষেরই হউক, নিজের নামের পাশে মিষ্টারই লিখুক আর শ্রীযুক্তই

লিখুক, ডাঃ খারেই হউক, আর মিঃ বল্লভভাই প্যাটেলই হউক, সকলে যাহাতে কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারে তদনুরূপ কার্য্যসূত্র কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইলে যে-কার্য্যে একজনেরও ক্ষতি হইতে পারে, অথবা একজনেরও সহিত কলহ হইতে পারে, সেই কার্য্য হইতে কংগ্রেসকে বিরত থাকিতে হইবে। কোন্ কার্য্যসূত্রের দ্বারা কংগ্রেসের পক্ষে একজনেরও ক্ষতি এবং একজনেরও সহিত কলহ হইতে বিরত থাকা সম্ভব, তাহার আলোচনা আমরা বর্ত্তমান মাসের 'মাসিক বঙ্গশ্রী'তে প্রকাশিত "বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবাসিগণের কর্ত্তব্য" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে করিয়াছি। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিব না। দেশের জনসাধারণের সাধারণ দাবী যাহাতে মিটান সম্ভব, তাহা করিতে হইলে যাঁহারা এই কার্য্যসূত্র আবিষ্কার করিতে অক্ষম, তাঁহারা যাহাতে নেতৃত্বের আসন হইতে অপসারিত হন, তাহা দেশবাসীকে করিতে হইবে। কংগ্রেসের বর্ত্তমান অক্ষম নেতৃবর্গের সহিত কোনরূপ কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া তাঁহাদিগকে কান্ উপায়ে তাঁহাদিগের নেতৃত্ব হইতে অপসারিত করা সম্ভব, তাহাও আমরা উপরোক্ত মাসিক বঙ্গশ্রীর সন্দর্ভে দেখাইয়াছি। আমাদিগের ঐ সন্দর্ভ পাঠ করিলে দেখা যাইবে যে, কাহারও ক্ষতি না করিয়া অথবা কাহারও সহিত কলহে প্রবৃত্ত না হইয়া ভারতীয় কংগ্রেসকে পরিচালনা করা এবং তাহার উদ্দেশ্য সফল করা অসম্ভব ত' নহেই, পরন্তু সম্পূর্ণ সম্ভব। উপরন্তু, উহাই ভারতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সফল করিবার একমাত্র উপায়।

কংগ্রেসের পক্ষে দেশীয় জনসাধারণের সর্ব্বতোভাবের মিলন যে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং উহা যে সম্পূর্ণ সম্ভব তাহা বুঝিতে পারিলে মিঃ বড়দলুই-এর প্রস্তাব যে কংগ্রেসের পক্ষে কতদূর অসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

অবস্থাবিশেষে, কৃষকদিগের রাজস্ব-হার শুধু আংশিকভাবে কমান কেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে উঠাইয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যে-ব্যবস্থায় কৃষকদিগের রাজস্ব-হার কমাইতে হইলে রাজস্ব-তহশীলদারগণের, অথবা চা-বাগানের মালিকগণের উপর অতিরিক্ত কর স্থাপিত করিতে হয়, সেই ব্যবস্থা কোন ক্রমেই জাতীয় কংগ্রেসের মূলসূত্রের কার্য্য-পন্থা হইতে পারে না, কারণ—কৃষকগণও যেরূপ জাতির একটি অংশ, সেইরূপ রাজস্ব-তহশীলদারগণ ও চা বাগানের মালিকগণও জাতির এক একটি অংশ। জমীর উর্ব্বরা-শক্তি যেরূপ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে এবং প্রতি বৎসরের বন্যায় ফসলের ক্ষতির পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, কৃষকের রাজস্ব-হার অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া দিলে আসামের কৃষকগণ আপাতসন্তুষ্ট হইবে বটে এবং আপাতভাবে ঐ কংগ্রেসের নেতৃবর্গ তাহাদের ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন বটে, কিন্তু অদূরভবিষ্যতে আবার উহার বিপরীত অবস্থার উদ্ভব হইবে। জমীর উর্ব্বরাশক্তি যেরূপ উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে এবং বন্যা প্রভৃতিতে ফসলের ক্ষতি যেরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে এখনকার অর্দ্ধেক রাজস্বও অদূর ভবিষ্যতে পুনরায় অত্যধিক বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তখন আবার কৃষকগণের মধ্যে অধিকতর অসন্তুষ্টি দেখা দিবে। কাযেই যাহাতে জমীর উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস প্রাপ্ত এবং বন্যা প্রভৃতিতে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহা না করিতে পারিলে স্থায়ীভাবে কৃষকগণের সন্তুষ্টি বিধান করা কোন ক্রমেই সম্ভবযোগ্য হইবে না। যে পরিবর্ত্তনে কৃষকগণের স্থায়ী ভাবে সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, অথচ জাতির অন্যান্য অংশের অসন্তুষ্টি অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিবর্ত্তন কোন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ নহে।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃবর্গ গঠনের নামে যে সমস্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি এতাদৃশ। উহার কোনটীতেই কাহারও স্থায়ী ভাবের কোনরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না, অথচ জাতির কোন না কোন অংশের সমূহ ক্ষতি সাধিত হইতেছে। কাহারও কোন উপকার হইতেছে না, অথচ লাভের মধ্যে হইতেছে দলাদলি ও বিদ্বেষের বৃদ্ধি। ছাগ-দুগ্ধের এতাদৃশ মহিমা মানুষ এখনও কি বুঝিবে না?

এঙ্কোর

"এস ভারতোদ্ধারিণী রুশিয়া
রক্ত-পতাকাধৃত ভক্ত-বিমোহিনী অভক্ত ভারতীয়ে রুষিয়া…"
(বামপন্থীদল) অ্যাঁকোর অ্যাঁকোর ..

ত্রোকাদেরো

—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

[১]

প্যারিস সহর যে ইউরোপের শিল্পামোদীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীঠস্থান তা সকলেই জানেন। বহু শতাব্দী ধরে ফরাসী জাতি স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা ও কারুশিল্পে ইউরোপের নানা জাতিকে প্রেরণা জুগিয়েছে। শিল্পসৃষ্টির ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার জন্য এবং নানা যুগের রচিত প্রাসাদ, মূর্ত্তি, চিত্র প্রভৃতি ফরাসী জাতি প্যারিস সহরে সুরক্ষিত করে রেখেছে। সেই কারণে প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনী যতবার হয় অন্য সহরে তা হয় না।

প্যারিসে আন্তর্জ্জাতিক শিল্পপ্রদর্শনীর স্থানও সুনির্দ্দিষ্ট। সামরিক শিক্ষায়তন (Ecole Militaire) এর সামনে সেন নদীর তীর পর্য্যন্ত যে বিস্তীর্ণ মাঠ আছে, যার নাম শাঁ দ' মার্স (Champs de Mars), প্রতিবার প্রদর্শনীগুলি সেই মাঠেই হয়ে থাকে। এই মাঠেই সেন নদীর নিকটে বর্ত্তমান জগতের সপ্তাশ্চর্য্য বস্তুর একটি "তুর ইফেল" বা Eiffel Tower; ইফেল টাওয়ারের সম্মুখেই সেন নদীর ওপর যে সেতু আছে সে সেতুর নাম "পঁ দ' ইয়েনা" (Pont d'Iena) নেপোলিয়ন জেনা বা ইয়েনায় যে যুদ্ধ জয় করেন সেই যুদ্ধের স্মৃতিই এই সেতু বহন করছে।

ত্রোকাদেরোর পুরাতন প্রাসাদ

ইয়েনার সেতু পার হলেই সামনে একটি টিলা, স্তরে স্তরে বিন্যস্ত বাগান ও ফোয়ারা অতিক্রম করে উপরে উঠলে যে অদ্ভুত ধরণের একটা বিশাল প্রাসাদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল তার নাম ছিল Palais du Trocadero বা ত্রোকাদেরো প্রাসাদ। এই বাড়ীটি প্যারিস সহরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান। এর মধ্যে ছিল একটি হল-ঘর, সেখানে প্রায় ৬,০০০ লোক বসতে পারত, আর পাশের বাড়ীগুলিতে প্যারিসের কয়েকটি প্রধান মিউজিয়ম অবস্থিত ছিল—যা না দেখলে ফরাসী দেশের শিল্পসম্পদের অনেক জিনিষই বিদেশীর পক্ষে অজ্ঞাত থাকত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল—(১) Musée de sculpture comparee অর্থাৎ তুলনামূলক ভাস্কর্য্যের মিউজিয়ম। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নানা যুগের ফরাসী দেশীয় ভাস্কর্য্য সুসজ্জিত ছিল, যা হতে সহজেই ফরাসী ভাস্কর্য্যের ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যেত। (২) Musée Combodgien et Indo-chinois কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীনের প্রত্নতাত্ত্বিক মিউজিয়ম। ফরাসীদের এই উপনিবেশগুলিতে প্রাচীন যুগের যে হিন্দু শিল্পসম্পদ
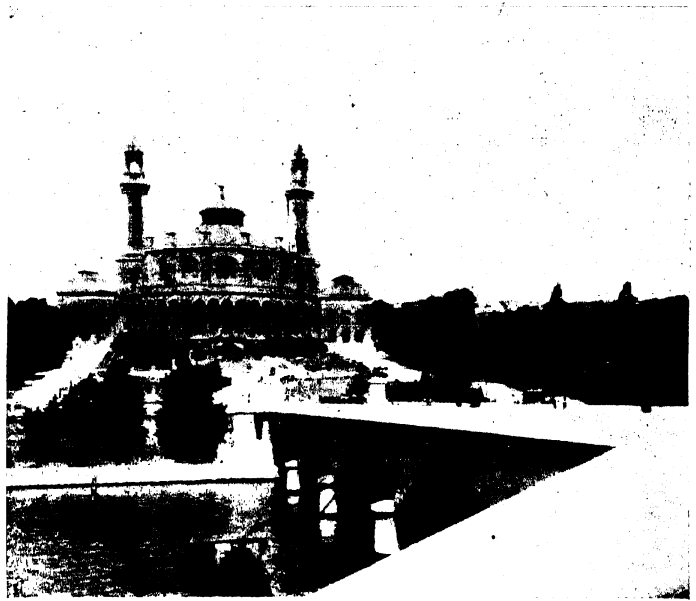
উদ্ধার করা হয়েছে, এই মিউজিয়মে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। (৩) Ethnographical বা নৃতত্ত্বের মিউজিয়ম। আফ্রিকার নানাদেশের, ও ওসিয়ানির নানা দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের বিশদ পরিচয় এই মিউজিয়মের সংগ্রহ হতে পাওয়া যেত।

ত্রোকাদেরো প্রাসাদ তার প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহের জন্য ফরাসী ও বৈদেশিক পর্যাটকদের আকৃষ্ট করেছিল বটে, কিন্তু সে প্রাসাদ হয়ে উঠেছিল ফরাসী জাতির চক্ষুশূল, কারণ সে প্রাসাদ ছিল অত্যন্ত কদাকার, অথচ তা প্যারিসের সর্ব্বোচ্চ টিলার উপর একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করবার প্রচেষ্টা হতেই গড়ে উঠেছিল। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে যে আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী হয় সেই সময়ে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়েছিল। যে শিল্পীরা এর পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে দাভিউ (Davioud) এবং বুর্দে (Bourdais), এঁরা শিল্পী হিসাবে সে কালে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এ প্রাসাদ ছিল স্পেনীয় রীতিতে নির্ম্মিত, মধ্যভাগে অর্দ্ধগোলাকার, দুই পাশে দুটি মিনারেট, প্রত্যেকটি ২৩০ ফুট উঁচু। আর সেন নদীর ধার হতে উপর পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরে তৈরী করা হয়েছিল একটি সুন্দর বাগান, ফোয়ারা, আর তার মাঝে মাঝে ফরাসী ভাস্করদের রচিত নানা মর্ম্মর মূর্ত্তি। প্রাসাদটি শেষ পর্য্যন্ত দেখতে হয়েছিল অত্যন্ত অশোভন ও কুৎসিৎ।
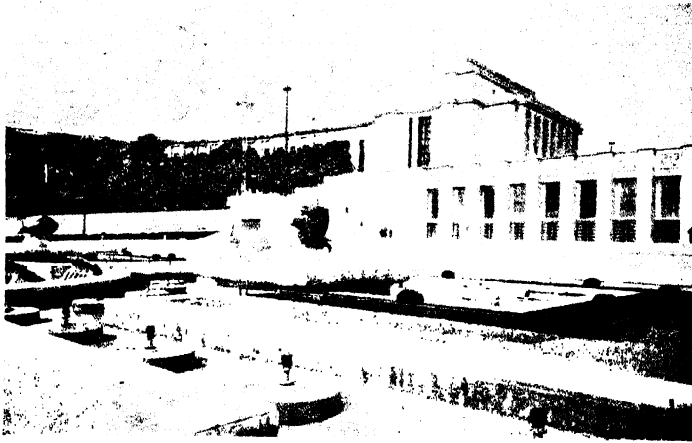
শাইও প্রাসাদ—সম্মুখে বাগান ও ফোয়ারা আংশিক দেখা যাইতেছে

যে টিলার উপর ত্রোকাদেরো নির্ম্মিত হয়েছিল সে টিলা ঐতিহাসিক। টিলাটি ও পারিপার্শ্বিক স্থানের প্রাচীন নাম ছিল শাইও (Chaillot)। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ হতে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত 'শাইও' ছিল ফরাসী দেশের রাজবংশের আত্মীয়দের সম্পত্তি, এবং তাঁদের ব্যবহারের জন্য সেখানে নানা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হয়েছিল।

নেপোলিয়ন সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হবার পর এই টিলা ও নিকটবর্ত্তী স্থানের উপরে তাঁর শিশু-পুত্র, King of Rome-এর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণের পরিকল্পনা করেন। এই প্রাসাদের নক্সা পুরাণো কাগজ-পত্র হতে বার করা হয়েছে এবং সে নক্সা দেখলে স্বীকার না করে পারা যায় না যে, সে প্রাসাদ নির্ম্মিত হলে প্যারিস শহরের এ দিকটার সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যেত। প্রাসাদ নির্ম্মাণের কাজ আরম্ভ হবার কিছু পরেই নেপোলিয়নের রুশযুদ্ধ বা Moscow expedition। তাঁর জীবনের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর যে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় কেটেছিল, তাতে আর এই প্রাসাদ নির্ম্মাণের কার্য্য চালান সম্ভব হয় নি। ১৮২৩ সালে ফরাসী সৈন্য স্পেনে ত্রোকাদেরো নামক স্থানে যে জয়লাভ করে, সেই স্মৃতি রক্ষার জন্য এই স্থানটির প্রথম 'ত্রোকাদেরো' নাম দেওয়া হয়।

এর পর বহুকাল ধরে ত্রোকাদেরো নিয়ে নানা জল্পনা চলে। প্রথমে এখানে নেপোলিয়নের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করবার কথা হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সৈন্যের জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করবার কথা হয়, অবশেষে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রদর্শনী উপলক্ষে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'কিং অব রোম'-এর জন্য পরিকল্পিত প্রাসাদের নক্সা
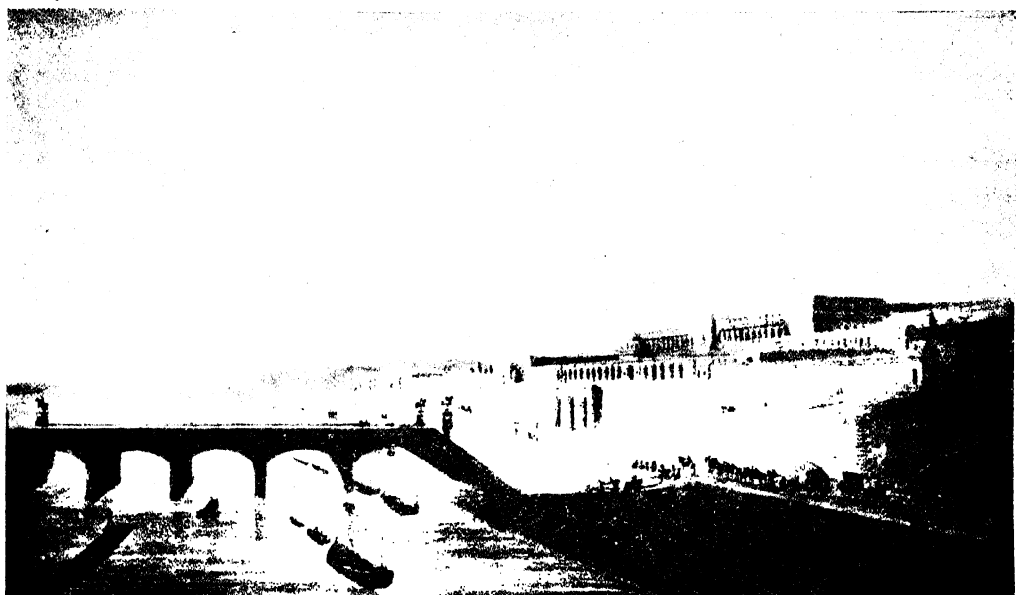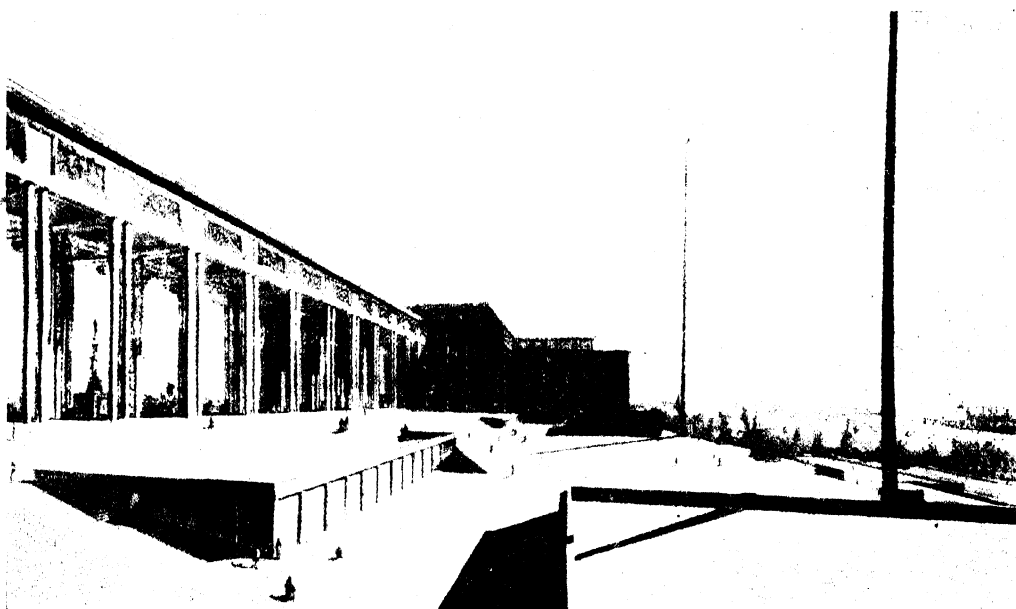
নব-নির্ম্মিত ত্রোকাদেরোর বিরাট উন্মুক্ত চাতাল ও স্তম্ভ

১৮৬৫ সালে কাজ আরম্ভ করা হয়। টিলার মাটি অনেক কেটে নিয়ে Champ de Marsএর মাঠ উঁচু করা হয় ও ত্রোকাদেরোর কদাকার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা হয়।

(২)

ত্রোকাদেরোর এ প্রাসাদ ফরাসী জাতিকে খুসী করতে পারে নি, এবং তাকে ধূলিসাৎ করে নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণের কথা অনেকবার উঠেছে। ফরাসী জাতির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যজ্ঞান অবশেষে বলবৎ হয়েছে এবং প্রাচীন ত্রোকাদেরো প্রাসাদ ধূলিসাৎ করে সম্প্রতি নূতন যে শাইও প্রাসাদ (Palais de Chaillot) নির্ম্মিত হয়েছে তা যে আধুনিক ফরাসী মনকে বহু পরিমাণে খুসী করেছে তাতে সন্দেহ নাই।

গত বৎসর (১৯৩৭) প্যারিসে যে আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-প্রদর্শনী খোলা হয়, সেই উপলক্ষে এই নূতন 'শাইও প্রাসাদ' নির্ম্মিত হয়েছে। ১৯৩২ সালে এই নূতন প্রসাদ নির্ম্মাণের জন্য শিল্পীদের প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতা হতেই নূতন প্রাসাদের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই নূতন প্রাসাদ classical style বা প্রাচীন ইউরোপীয় রীতিতে নির্ম্মিত হয়েছে। কোন স্পেনীয় বা প্রাচ্য প্রভাব গ্রহণ করা হয় নাই।

এই নূতন প্রাসাদের হল ঘর আধুনিক থিয়েটারের মত করেই নির্ম্মিত হয়েছে, প্রায় ৪,০০০ লোকের বসবার স্থান আছে। আর এর চারি পাশের কারুকার্য্যে আধুনিক ইউরোপীয় রুচির বহির্ভূত কিছু নাই। এই থিয়েটার ব্যতীত প্রাচীন ত্রোকাদেরোর মিউজিয়মগুলির স্থানও নূতন প্রাসাদের দুই পাশে করা হয়েছে। মিউজিয়মগুলির নাম কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে—

(১) Musée Monuments Francais—অর্থাৎ Museum of French Monuments.

(২) Musée de L'Homme অর্থাৎ Ethnographical Museum.

(৩) Musée des Arts et Traditions populaires, লোকশিল্প ও লোকাচারের মিউজিয়ম।

(৪) Musée de marine অর্থাৎ Marine museum

প্রাচীন নৃতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যে সংগ্রহ, তাকে দুভাগ করেই Museum of man এবং লোকাচার ও লোকশিল্পের মিউজিয়ম পরিকল্পনা করা হয়েছে। কাম্বোডিয়া ও ইন্দোচীনের প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহ স্থানান্তরিত করা হবে এবং নূতন প্রাসাদে উপরোক্ত চারিটি সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন সংগ্রহ থাকবে না।

ফরাসী জাতি অন্যান্য জাতির মত প্রগতিশীল নয়, অর্থাৎ তারা সহজে কোন প্রাচীন প্রতিষ্ঠান নষ্ট করে না। তাই প্যারিসে অনেক অপরিষ্কার ও অন্ধকারাচ্ছন্ন অনেক গলি রয়েছে, আর সেই গলির মধ্যে হয় ত এমন দু'একটি বাড়ীর সন্ধান পাওয়া যাবে, যা প্রায় জাতীয় অনুষ্ঠানের মত লোকপ্রিয়, তার কারণ তার সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বা ফরাসী সাহিত্য ও শিল্পের ইতিহাসের এমন একটা ঘটনা জড়িত রয়েছে, যার স্মৃতি এখনও ফরাসী জাতি ভোলে নি। সেই কারণেই তারা সে সব প্রতিষ্ঠানকে নষ্ট করে নি। এই রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও যে সে জাতি প্রাচীন ত্রোকাদেরোকে ধূলিসাৎ করে নূতন "শাইও প্রাসাদ" নির্ম্মাণ করেছে, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের সৌন্দর্য্যনিষ্ঠা, পারিস সহরের সর্ব্বোচ্চ টিলার উপরে ত্রোকাদেরোর মত একটি অসুন্দর প্রতিষ্ঠানকে খাড়া করে রাখবার জন্য তাদের মন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল। বহির্জগতের চোখে পারিসের যে সব চাইতে আশ্চর্য্য বস্তু 'ইফেল টাওয়ার' তাও সে জাতির চক্ষুশূল। সুতরাং এর পর সেই প্রায় ৮০০ ফুট উঁচু টাওয়ারকেও যদি তারা কোন দিন কক্ষচ্যুত করে তা হলে আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছুই থাকবে না।

লুই পাস্তুর

পিতৃমাতৃ পরিচয়, জন্মকথা, বাল্যজীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা

—শ্রীনীলরতন কর

ফ্রান্স এবং সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সংযোগস্থলে যেখান দিয়ে আল্‌পস্ গিরিমালার অংশ, জুরা পর্ব্বতশ্রেণী শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে চলে গেছে, তারই সন্নিকটে ফরাসীদেশের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী জুরা প্রদেশ অবস্থিত। এই জুরা অঞ্চলে দোল্ নামে একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সেখানে এক চর্ম্মকার-পরিবার বাস করতেন। তাঁরা বিশেষ অবস্থাপন্ন ছিলেন না। গৃহের কর্ত্তা জঁ। জোসেফ পাস্তার সংস্কৃত চামড়া বিক্রয় করে জীবিকার্জ্জন করতেন। পাস্তার বংশের অতি প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষেরা কৃষিজীবী ছিলেন। কিন্তু জঁ। জোফেস-এর প্রপিতামহ পূর্ব্বের ব্যবসা পরিত্যাগ করে চর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। সেই সময় হতে তাঁদের বংশ-পরম্পরা চামড়ার কাজকে জীবিকার্জ্জনের উপায়রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

জঁ। জোসেফ পাস্তার অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হন। শৈশবে কিছুকাল পিতামহীর নিকট লালিত পালিত হবার পর তাঁর পিসী তাঁকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। যত্নের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েও তিনি খুব উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। কারণ সেকালে সামান্য লেখাপড়া জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল ; উপরন্তু জঁ। জোসেফকে চর্ম্মকারের বৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল। নাপোলেঁয়র রাজত্বকালে তিনি তৃতীয় সৈন্যদলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পেনিন্‌সুলার যুদ্ধে যাত্রা করেন এবং সামরিক বিভাগে কার্য্যনিপুণতা হেতু অল্প দিনের মধ্যেই সার্জ্জেন্ট-মেজরের পদে উন্নীত হন। যোদ্ধার কাজে পারদর্শিতার জন্য তিনি Legion d'honneur দ্বারা সম্মানিত হয়েছিলেন। কিন্তু সৈনিকের কাজে অধিক দিন তাঁর স্পৃহা ছিল না। তিনি তিন বৎসর কার্য্য করার পর সৈনিক বিভাগ পরিত্যাগ করেন এবং বেজ্ঁাস নামক স্থানে পৈতৃক ব্যবসায়ে মন দেন। এর অনতিকাল পরে জঁান এতিয়েনেত্ রোকী নামে এক কুমারীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়।

জোসেফ পাস্তার অত্যন্ত মিতভাষী ও শান্তপ্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর মন সর্ব্বদা যেন চিন্তারাজ্যে নিমগ্ন থাকত। জঁান এতিয়েনেত্ ছিলেন অত্যন্ত কর্ম্মশীলা। তাঁর অন্তর ছিল কল্পনা দিয়ে ভরা, উৎসাহে পরি-পূর্ণ। তাঁদের উভয়ের স্বভাবে এই বৈচিত্র্য পরস্পরের চিত্তে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করে তুলেছিল এবং একের মধ্যে যেটির অভাব সেটি অপরের গুণে পূরণ হয়ে গিয়েছিল।

এই তরুণ দম্পতি দোল্ সহরে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে স্থায়ী ভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁদের প্রথম সন্তান অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়। তারপর তাঁদের একটি কন্যা জন্মে। কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার চারি বৎসর পরে ১৮২২ অব্দের ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার রাত্রি দুইটার সময় তাঁদেরই সামান্য কুটীরে লুই পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। পরে তাঁদের আরও দুইটি কন্যা সন্তান হয়েছিল।

জঁ। জোসেফ-এর শ্বশ্রূ বৃদ্ধ বয়সে নিজের সম্পত্তি স্বীয় পুত্রকন্যাদ্বয়কে বণ্টন করে দেন। সেই বিষয়সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত জোসেফকে দোল্ পরিত্যাগ করতে হয়। আর্ব্বোয়া সহরের নিকটে একটি ভাল চামড়ার কারখানা ভাড়া পাওয়াতে জঁ। জোসেফ সপরিবারে সেই-খানে গমন করেন।

আর্ব্বোয়া কলেজ-সংশ্লিষ্ট 'একোল প্রাইমারী'তে লুই পাস্তারের প্রথম শিক্ষারম্ভ হয়। তিনি বিদ্যালয় হতে অল্পায়াসেই অনেক পারিতোষিক লাভ করেছিলেন। কিন্তু বাল্যজীবনে তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা বিকাশের কোন পরিচয়-যোগ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি যখন আর্ব্বোয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন, সে সময়েও তাঁর স্থান সাধারণ ভাল ছেলের পর্য্যায়ের অধিক ছিল না।

পুত্রের প্রাথমিক বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্যের নিমিত্ত জঁ। জোসেফ যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তিনি লুইকে নূতন নূতন বই কিনে দিতেন। নূতন পুস্তক ক্রয়ে লুই পাস্তারের

অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তিনি স্বীয় হস্তে পুস্তকসমূহের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নাম লিপিবদ্ধ করে গৌরব বোধ করতেন। ছুটির দিনে তিনি সহপাঠীদের সহিত স্বচ্ছন্দচিত্তে ঘুরে বেড়াতেন; কখনও বা সাথীদের সঙ্গে নদীতে গিয়ে জাল ফেলে, মাছ ধরে সময় কাটাতেন। পুত্রের সহপাঠী বন্ধুদের জন্য জোসেফ পাস্তুরের গৃহদ্বার সর্ব্বদাই অবারিত থাকত। তারা লুই-এর সঙ্গে চর্ম্ম-সংস্কার-গৃহের প্রাঙ্গণে খেলা করত। জোসেফ পাস্তুর নিরহঙ্কার প্রকৃতির লোক ছিলেন। অবসর-প্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ হলেও তাঁর আচার-ব্যবহারে, চালচলনে কিছুমাত্র গর্ব্বের ভাব প্রকাশ পেত না। তিনি কিন্তু সকলের সঙ্গে সহজে বন্ধুত্ব করতেন না। রবিবার দিনে তিনি যখন আর্ব্বোয়া হতে বেজাঁস'র অভিমুখে একাকী বেড়াতে যেতেন, তখন তাঁর মনে ভবিষ্যতের নানাবিধ চিন্তা উদয় হত। তাঁর বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন অধ্যয়ননিরত পুত্রটির পঞ্চদশ বৎসর বয়স হওয়া সত্ত্বেও চিত্রাঙ্কন ব্যতীত অপর কোন বিদ্যার প্রতি অনুরক্তি লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়াতে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হতেন। আর্ব্বোয়াবাসিগণ তাঁর পুত্রের চিত্রাঙ্কন শিল্পের প্রশংসা করলেও তা শুনে তিনি বিশেষ তৃপ্তি লাভ করতেন না। তথাপি লুই-এর প্রথম প্যাষ্টেলে আঁকা ছবি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। লুই পাস্তুর অত্যন্ত ঐকান্তিকতা সহকারে তাঁর মাতার একটি প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন। সেই চিত্রটি প্রাগ্-র‍্যাফেলীয় কলারীতি অনুসারে অঙ্কিত হয়েছিল।

আর্ব্বোয়া কলেজের প্রধান শিক্ষক রোমানে মহাশয় লুই পাস্তুরের জীবনধারার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে লুই-এর সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পান। পাস্তুর অত্যন্ত মনোযোগ এবং সতর্কতা সহকারে কাজ করতেন, সেজন্য তাঁকে কাজে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতাহীন বলে বোধ হত। তিনি কোন বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে স্থির-নিশ্চয় না হলে সে সম্বন্ধে জোরের সঙ্গে মতামত প্রকাশে বিরত থাকতেন। কিন্তু তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ও সাবধানতাপূর্ণ অভিমতের সহিত প্রখর কল্পনাশক্তি বিদ্যমান ছিল।

ছাত্রেরা যখন কলেজের মাঠে খেলা করত, তখন রোমানে মহাশয়, লুই পাস্তুরের পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অন্যান্য অন্ত-র্নিহিত গুণাবলীকে উদ্দীপিত করতেন। শিক্ষক মহাশয়ের উৎসাহ বাক্য পাস্তুরের মনে উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলত; 'একোল নর্ম্মাল' হতে শিক্ষিত হয়ে ভবিষ্যৎ জীবনকে গৌরবমণ্ডিত করবার সম্ভাবনার কথা শুনতে শুনতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। রোমানে মহা-শয়ের অনুপ্রেরণাতেই লুই পাস্তুর উচ্চশিক্ষা লাভে অভিলাষী হন। কিন্তু জাঁ জোসেফ তাঁর অল্পবয়স্ক পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার্থে সুদূর পারী সহরে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি ভাবতেন যে, তাঁর পুত্রের পক্ষে পারী সহরের 'একোল নর্ম্মালে' যাওয়া অনাবশ্যক, তৎপরিবর্ত্তে লুই যদি নিকটবর্ত্তী বেজাঁস' কলেজে অধ্যয়ন করে আর্ব্বোয়া কলেজের অধ্যাপক হতে পারে, তা' হলেই যথেষ্ট। অধিকন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থাও লুই পাস্তুরকে পারীতে পাঠানর পক্ষে অনুকূল ছিল না। কিন্তু সেখানকার এক কর্ম্মচারী পাস্তুরকে উচ্চ-শিক্ষিত করাতে অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন। জাঁ জোসেফ তাঁরই আগ্রহাতিশয্যে লুইকে পারীতে যেতে অনুমতি দেন।

২

ছাত্র-জীবন

গৃহের সুখময় স্নেহাঞ্চল পরিত্যাগ করে যখন লুই পাস্তুর সর্ব্বপ্রথম পারী নগরীতে উপনীত হন, তাঁর বয়ঃক্রম তখন ষোল বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। জ্ঞানার্জ্জনে প্রবল স্পৃহা থাকা সত্ত্বেও গৃহত্যাগজনিত দুঃখ তাঁকে এতদূর বিচলিত করেছিল যে, চিত্তের তৎকালীন বিমর্ষভাব দূর করা তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। সাধারণ দুর্ব্বলচিত্ত ছেলেদের মত বাক্‌প্রগল্‌ভতার সাহায্যে অন্তরের বিষণ্ণতা অপসারিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কারণ তিনি ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহরের সমস্ত কোলাহল যখন নীরব হয়ে যেত, সাথীরা যে যার ঘরে নিদ্রামগ্ন থাকত, কেউ তাঁর দুঃখের স্রোতে বাধা দিতে পারত না, তখন তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেগে বাড়ীর কথা ভাবতেন, তাঁর মন বিষাদে ভরে উঠত। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা 'লিসে-সাঁ-লুই'-এর ক্লাশে যেত। কিন্তু পাস্তুরের গভীর শিক্ষানুরাগকে ছাপিয়ে উঠেছিল, বাড়ী হতে দূরে যাওয়ার হতাশা। শিক্ষক মহাশয় তাঁকে সান্ত্বনা ও আনন্দ দেবার জন্য বৃথাই চেষ্টা করতেন। পুত্রের এই

অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে, জাঁ জোসেফ আর বিলম্ব করলেন না; লুই পারীতে যাবার একমাস পরেই তিনি তাঁকে বাড়ী নিয়ে গেলেন।

পাস্তার আর্বোয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করে দিন কতক খুব আনন্দে উল্লাসে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু যখন তাঁকে পুনরায় অধ্যয়নের নিমিত্ত আর্বোয়া কলেজে ঢুকতে হল, তিনি কি তখন বাড়ীর মায়াত্যাগে অসামর্থ্যের কথা স্মরণ করে অন্তরে অনুতাপ বোধ করেন নাই? জীবনের উচ্চাভিলাষ ক্ষুদ্র সহরের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকাতে তাঁর মনে কি নৈরাশ্য জাগে নাই? এ সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট কিছু জানা যায় না, কিন্তু তাঁর সে সময়কার দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে অব্যবস্থিত ভাব হতে তাঁর মনের অসন্তোষপূর্ণ অবস্থা অনুমান করা যায়।

তৎকালে চিত্রাঙ্কনের প্রতি তাঁর আসক্তি যেন গভীর সুপ্তি হতে চেতনা লাভ করে প্রগাঢ় উদ্যমশীলতা লাভ করেছিল। যে অঙ্কনের সরঞ্জামসমূহ আঠারো মাসকাল অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলি নিয়ে তিনি চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর অঙ্কন-নৈপুণ্য অল্পদিনের মধ্যে তাঁর শিল্প-শিক্ষককেও অতিক্রম করল। দেখতে দেখতে তাঁর ছবির গ্যালারি বন্ধুদের প্রতিকৃতিতে ভরে গেল। আদালতের কর্ম্মচারী, গীর্জ্জার পাদ্রী, বৃদ্ধা ভিক্ষুণী, রুগ্ন শিশু ও বালকবালিকাদিগের নানা মূর্ত্তি তাঁর চিত্রশালার শোভা বর্দ্ধন করতে লাগল। যে কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিকৃতি করাতে ইচ্ছুক হতেন, তাঁর চিত্রই তিনি সাগ্রহে অঙ্কিত করতেন।

যিনি পরবর্ত্তীকালে খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন, তাঁর বাল্যজীবনে চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ ও চিত্রাঙ্কনে দক্ষতা আপাতদৃষ্টিতে আশ্চর্য্যজনক মনে হয় বটে, কিন্তু বৈজ্ঞানিকের মধ্যে শিল্প-প্রতিভার উন্মেষ খুব বিস্ময়কর নয়। একাধারে শিল্প-প্রতিভা ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা কোন কোন মনীষির জীবনে পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট হতে দেখা গেছে। প্রকৃত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিকের অনুপ্রেরণায় বোধ হয় মূলগত কোন পার্থক্য নেই। অথবা একই ব্যক্তির জীবনে একাধিক বিষয়ে প্রতিভার উন্মেষ হওয়া বিচিত্র নয়।

১৮৩৯ অব্দের শেষে লুই পাস্তার বিদ্যালয় হতে এত পারিতোষিক পেয়েছিলেন যে, সেগুলি একাকী বাড়ী নিয়ে যেতে তাঁকে রীতিমত বিব্রত হতে হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের প্রশংসাবাদ এবং রোমানে মহাশয়ের পরামর্শ তাঁর মনে 'একোল নর্ম্মালে' অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করেছিল।

রাজা প্রথম নাপোলেঁ তরুণ অধ্যাপকদিগকে শিক্ষিত করণোদ্দেশে ecole normale superieur-এর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধারণ শিক্ষা ও ললিতকলা বিভাগের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান পরিচালিত। আঠারো বৎসরের অধিক এবং একুশ বৎসরের অল্পবয়স্ক ছাত্রেরা সেখানে প্রবেশপ্রার্থী হতে পারেন। তাঁদের একটি লিখিত ও একটি মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয় এবং যে বিষয়ে পড়তে ইচ্ছা, তদনুসারে পূর্ব্বে সাহিত্য অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে 'বাশেলিয়ে' উপাধি লাভ করতে হয়। তদ্ব্যতীত তাঁদের দশ বৎসরের জন্য সাধারণ শিক্ষা-বিভাগের অধীনে কাজ করবার চুক্তি করতে হয়। 'একোল নর্ম্মালে'র অধ্যাপকগণ 'মেত্র দে কঁফেরাঁস্' পদবী প্রাপ্ত হন। পাস্তুরের সময়ে ফরাসী 'লিসে'র ক্লাশসমূহ নীচের দিক্ হতে আরম্ভ করে এইভাবে শ্রেণীবদ্ধ ছিল :—

অষ্টম শ্রেণী
সপ্তম শ্রেণী
ষষ্ঠ শ্রেণী—ফরাসী ব্যাকরণের প্রারম্ভ
পঞ্চম শ্রেণী—লাতিনের প্রারম্ভ
চতুর্থ শ্রেণী—গ্রীকের প্রারম্ভ
তৃতীয় শ্রেণী—
দ্বিতীয় শ্রেণী—
প্রাথমিক গণিত, ছন্দঃ শাস্ত্র
উচ্চতর গণিত, দর্শন শাস্ত্র।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র, যিনি 'বাকালোরেয়া এস্ সিয়ঁাস' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে ইচ্ছুক, তাঁকে প্রাথমিক গণিতের ক্লাশে যোগদান করতে হত এবং যিনি সাহিত্য অথবা আইন বিষয়ে উপাধিলাভে অভিলাষী, তাঁকে ছন্দঃ ও দর্শন শাস্ত্রের ক্লাশে যোগ দিতে হত। কিন্তু আর্বোয়া কলেজে দর্শনের ক্লাশ ছিল না, অথচ তখন পাস্তুরের পক্ষে পারীতে ফিরে যাওয়া সুদূরপরাহত। সে কারণে তিনি এইরূপ মনস্থ করলেন

যে, আগে বেজ়াঁস কলেজে প্রথম উপাধি 'বাকালোরেয়া' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার পর 'একোল নর্ম্মালে'র জন্য প্রস্তুত হবেন। ফরাসী 'ফাকুলতে'র প্রথম উপাধির নাম 'বাকালোরেয়া'; এই উপাধি ইংরেজী বিশ্ববিদ্যালয়ের bachelor ডিগ্রী অপেক্ষা নিম্নস্তরের। 'বাকালোরেয়া' উপাধি দ্বিবিধ —প্রথম,—'বাকালোরেয়া এস্ লেতর', দ্বিতীয়,—'বাকালোরেয়া এস্ সিয়ঁাস'। এই উপাধি লাভের জন্য লুই পাস্তুরকে বেজ়াঁসঁতে যেতে দিতে জঁা জোসেফ আপত্তি করেন নাই। কারণ আর্ব্বোয়া হতে বেজ়াঁস'র দূরত্ব ছিল মাত্র পঁচিশ মাইল; উপরন্তু তিনি চর্ম্মাদি বিক্রয়ের জন্য প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। বেজ়াঁস কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দোনা অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে ছাত্রগণ অত্যন্ত উৎসাহিত হত। তিনি তাদের দেখে মনে মনে গৌরব অনুভব করতেন। লুই পাস্তুর বেজ়াঁসঁতে গিয়ে এঁরই নিকটে অধ্যয়নের সুযোগ পেলেন। দোনার ক্লাশে যোগদান করে পাস্তুর অত্যন্ত তৃপ্তি বোধ করতেন, কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষকের কাছে তেমন উৎসাহ পেতেন না। তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সময়ে বিজ্ঞানের শিক্ষককে বিভ্রাটে পড়তে হত।

বেজ়াঁস কলেজের সকলেই লুই-এর চিত্রাঙ্কন শিল্পের পরিচয় পেয়েছিলেন। পাস্তুরের অঙ্কিত তাঁর জনৈক বন্ধুর প্রতিকৃতি সেই কলেজে প্রদর্শিত হওয়াতে সেখানে তাঁর সুনাম প্রসারলাভ করেছিল।

তিনি ১৮৪০ অব্দের ২৯শে আগষ্ট তারিখে 'বাশেলিয়ে এস্ লেতর' উপাধিতে ভূষিত হন। পরীক্ষকত্রয় তাঁকে গ্রীকের প্লুতার্ক, ভার্জিলের লাতিন্ কবিতা, অলঙ্কার শাস্ত্র, চিকিৎসা বিদ্যা. ইতিহাস, ভূগোল ও দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং ফরাসী রচনা ও প্রাথমিক বিজ্ঞানে অত্যন্ত পারদর্শী ব'লে অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রথম উপাধি পরীক্ষাদানের পূর্ব্ব হতেই পাস্তুরের মনে 'একোল নর্ম্মালে' অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল। ১৮৪০-এর জানুয়ারীতে তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনীকে লিখিত নিম্নোক্ত পত্রে সেই আগ্রহের আভাস পাওয়া যায়।—

"স্নেহের বোন,

তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে। কখনও কাজে অলস হোয়ো না। একবার কাজ করা অভ্যাস হয়ে গেলে তখন দেখবে যে, কাজ ছেড়ে থাকাই অসম্ভব। কর্ম্মশক্তিরই উপর পৃথিবীর সব কিছু নির্ভর করছে। তোমাকে উপদেশ দেওয়া বাহুল্য। আশা করি, ঠিক ভাবে নিজের পড়াশুনা করছ। আমি কবে 'একোল নর্ম্মালে' যেতে পারব সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় আছি।"

পাস্তুর এই পত্রে কয়েকটি সহজ সরল বাক্যে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন, সেটি একান্তরূপে তাঁর স্বীয় জীবনে অনুভূত চিন্তার প্রকাশ। সকলের প্রতি তাঁর স্নেহ, মমতা, ভালবাসা যেরূপ গভীর ছিল, কর্ম্মের প্রতিও তাঁর আসক্তি ছিল সেইরূপ তীব্র। তিনি ছাত্রজীবনে কর্ম্মের অনুপ্রেরণাবশে কেবল নিজেরই উৎকর্ষ সাধনে তন্ময় ছিলেন না, অন্যান্য বিষয়েও তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি বাড়ীর অবস্থা ও ভগিনীদের শিক্ষাপ্রসঙ্গে চিন্তা করতেন, তদ্বিষয়ে উন্নতিবিধান উদ্দেশে খবরাখবর নিতেন। ভগিনীর পুস্তকপাঠে আগ্রহ এবং বিদ্যাশিক্ষায় উন্নতির সংবাদ পেয়ে তিনি এই পত্র লেখেন—

"প্রিয় ভগিনী,

ইচ্ছারই উপর সমস্ত নির্ভর করছে, কারণ কর্ম্ম ইচ্ছাকেই অনুসরণ করে এবং মানুষের কর্ম্ম-প্রচেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয় না। ইচ্ছা, কর্ম্ম ও কৃতকার্য্যতা, এই তিনটি মানুষের জীবনকে সার্থক করে তোলে। ইচ্ছা কৃতকার্য্যতা-লাভের প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করে; কর্ম্ম সেই দুয়ার অতিক্রম করে কৃতকার্য্যতার কিরীটে বরণীয় হয়। তুমি যদি দৃঢ়রূপে সঙ্কল্প করে থাক, তা'হলে জানবে যে, তোমার কার্য্য আরম্ভ হয়ে গেছে। এখন তোমাকে কেবল সম্মুখের পথে অগ্রসর হতে হবে। তার পর কর্ম্মের ফল একদিন আপনিই আসবে।...

বোনটি আমার, তুমি কথাগুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা ক'রো। আমি তোমার অন্তরে এই ভাব গেঁথে দিতে চাই। এইটিই তোমার পরিচালক-স্বরূপ হোক।

ইতি—১লা ডিসেম্বর ১৮৪০।"

তিনি যে পত্রাদি লিখতেন, যে পুস্তকসমূহ ভালবাসতেন এবং যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন, তা' হতেই তাঁর জীবনধারার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। সে সময়ে বেজ়াঁসঁতে একজন

চিন্তাশীল প্রবীণ লেখক ছিলেন। পাস্ত্যর তাঁর রচিত গ্রন্থ অধ্যয়নের নিমিত্ত প্রায়ই সেই লেখকের নিকট হতে সেই সব পুস্তক চেয়ে নিয়ে যেতেন। তিনি সেই পুস্তক পাঠে এত আনন্দিত হতেন যে, পিতামাতাকে সে বিষয়ে না জানিয়ে থাকতে পারতেন না। চিন্তাশীল লেখকদের অভিমত পড়ে তাঁর মনে হত যে, পুস্তকপাঠের পূর্ব্বেই তিনি সেইভাবে চিন্তা করেছেন। নিজের ভাবধারার সঙ্গে লেখকদের মতের সাদৃশ্য দেখে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হতেন।

বেজাঁসঁ কলেজের প্রধান অধ্যাপক লুই পাস্ত্যরের বিশিষ্ট গুণাবলী দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কলেজের পরীক্ষায় পাস্ত্যর বেশী রকম কৃতিত্ব প্রদর্শন না করা সত্ত্বেও তাঁকে তিনি অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত করতে মনস্থ করেন। সে সময়ে কলেজের ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়ায় এবং কলেজ-পরিচালন-প্রণালীর কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটায় একজন অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয়েছিল। লুই পাস্ত্যর ১৮৪১ অব্দের প্রথম হতে বাৎসরিক তিনশত ফ্রাঁ বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হন। তাঁর নিকট এই তিনশত সংখ্যক মুদ্রা আশাতিরিক্ত মনে হয়েছিল। তিনি সানন্দচিত্তে তাঁর পিতাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করে লিখেছিলেন—

"...এই মাসের শেষে আমার বেতন পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি এর যোগ্য নই।"

"নিজের জন্য একটা আলাদা ঘর পাওয়াতে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। এখন আমি যথেষ্ট সময় পাই, কারণ আমাকে ছেলেদের অসংখ্য তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যে বন্দী থাকতে হয় না। নিজের কাজে আমি ইতিমধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন বুঝতে পারছি। আমার সমস্ত বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। কারণ আমি তাদের সরিয়ে দিতে সময় পাই। বস্তুতঃ এখন আমার আশা হয় যে, আমি এইভাবে কাজ করলে, 'একোলে'র শ্রেষ্ঠ পর্য্যায়েতেই গৃহীত হব। কিন্তু সেজন্য আমার অতিরিক্ত পরিশ্রম হচ্ছে ভাববেন না। প্রয়োজন অনুসারে আমি বিশ্রাম, ক্রীড়া ও চিত্তবিনোদন করে থাকি।"

পাস্ত্যর কেবলমাত্র কলেজের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নিবিষ্ট থাকতেন না, সাধারণ চিন্তাধারার প্রসারতার জন্য সাহিত্য-প্রসঙ্গে আলোচনা তাঁর জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। বেজাঁসঁ কলেজে শার্লশাপুই নামে দর্শনশাস্ত্রের এক ছাত্র ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পাস্ত্যরের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব জন্মে। তাঁদের উভয়ের মধ্যে সাহিত্যালোচনা ও চিন্তার আদান-প্রদানে একটা সমালোচনার ক্ষেত্র গড়ে উঠেছিল। কোন কোন বিজ্ঞানের ছাত্রের সাহিত্যের প্রতি, তথা সাহিত্যের ছাত্রের বিজ্ঞানের প্রতি যে অবজ্ঞার ভাব সাধারণতঃ দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে সেরূপ ছিল না। পাস্ত্যর কখনও বিজ্ঞান বিষয়ে বোঝাতেন, শার্লশাপুই উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনতেন, আবার কখনও বা শাপুই দার্শনিক তত্ত্ব ও সাহিত্যের কথা বিবৃত করতেন, পাস্ত্যর আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। সেই সকল বিষয়ে তাঁদের নানাবিধ প্রশ্ন এবং সমালোচনা চলত।

পাস্ত্যরের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সহজবোধ্য করে বলবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। কারও অনভিজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে তাঁর মুখে বিদ্রূপাত্মক হাসির রেখা ফুটে উঠত না। তাঁর সামান্য দুই চারিটি কথাতেই শ্রোতার মন আকৃষ্ট হত। তিনি সর্ব্বদা ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বক্তব্য বিষয়কে সরস করে তুলতেন। এই প্রকার আলোচনায় তাঁদের দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গাঢ়তর হচ্ছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে শাপুই 'একোল নর্ম্মালে'র জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হবার উদ্দেশে পারীতে চলে গেলেন। পাস্ত্যরের সেখানে যেতে আগ্রহ থাকলেও, তাঁর পিতা পূর্ব্বেকার ঘটনা স্মরণ করে অনুমতি দিলেন না। কাজেই তিনি বেজাঁসঁতে থেকেই 'একোল নর্ম্মালে'র জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন।

১৮৪২ অব্দের ১৩ই আগষ্ট তাঁর 'বাকালোরেয়া এস্ সিঁয়াস্' পরীক্ষা হয়। এই পরীক্ষার ফল তাঁর 'বাকালোরেয়া এস্ লেতর' পরীক্ষা অপেক্ষাও খারাপ হয়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নাই। বাইশে আগষ্ট তিনি 'একোল নর্ম্মালে' পরীক্ষা দেবার অনুমতি-পত্র পান। সেই পরীক্ষায় 'একোল নর্ম্মালে' প্রবেশার্থী বাইশ জনের মধ্যে তাঁর স্থান হয়েছিল চৌদ্দজনের পরবর্ত্তী। এই প্রকার নিম্ন স্থান অধিকার করায় তিনি সে বৎসরে 'একোল নর্ম্মালে' প্রবেশের ইচ্ছা ত্যাগ করে পর বৎসরে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে উচ্চতর স্থানলাভে মনস্থ করেন।

৩

বিদ্যাশিক্ষার্থে প্যারীতে ; জে. বি. ডুমার প্রভাব ; গবেষণার সঙ্কল্প ; জাতীয় আন্দোলনে যোগদান

বেজাঁস কলেজ অপেক্ষা প্যারীর 'লিসে-সাঁ-লুই'-এর শিক্ষাপদ্ধতি উৎকৃষ্ট ছিল। এই নিমিত্ত পাস্তার সে স্থান পরিত্যাগ করে ১৮৪২ অব্দের অক্‌টোবর মাসে প্যারীতে গমন করেন। তাঁর 'বাকালোরেয়া এস্ সিয়াঁস' পরীক্ষা শেষ হবার আগে শার্লশাপুই প্যারীতে চলে যাওয়াতে তিনি বেজাঁসঁতে থাকতে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন; তজ্জন্যও তাঁর 'লিসে-সাঁ-লুই'-এ অধ্যয়নের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়েছিল। চার বৎসর পূর্ব্বে তিনি যখন প্যারীতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর চিত্ত বালসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ ছিল। কিন্তু এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাঁর মনের দৃঢ়তা ও দায়িত্বজ্ঞান বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং অধ্যাপনায় বিশেষ অধিকার জন্মেছিল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে ছয়টা হতে সাতটা পর্য্যন্ত ছাত্রদিগকে গণিত শিক্ষা দিতেন। এই জন্য তাঁকে পড়ার দক্ষিণাস্বরূপ সেখানকার পূর্ণবেতনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক দিতে হত না। কিছুদিনের মধ্যে তিনি কার্য্যকুশলতার প্রভাবে সেখানে থাকা ও পড়ার ব্যয়ভার হতে মুক্তি পেলেন। এই সময়ে তিনি তাঁর বন্ধুদের লিখলেন—

"অধিক পরিশ্রমে আমার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটছে সন্দেহ করে উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই। আমাকে সাধারণতঃ ৫।৪৫এর পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করতে হয় না।

"বৃহস্পতিবার নিকটস্থ গ্রন্থাগারে শাপুই-এর সঙ্গে পড়াশুনা করি। রবিবার দিন দুজনে একসঙ্গে বেড়াই, গল্পগুজব করি এবং সামান্য একটু আধটু কাজ করি। আমি এখানে সাহিত্য বিষয়েও আলোচনা করছি। এখন আর তোমরা আমার মধ্যে পূর্ব্বেকার মত গৃহত্যাগজনিত চিত্তচাঞ্চল্য দেখতে পাবে না।"

সেখানে থাকতে পাস্তার শুধু ক্লাশের পড়ায় যোগদান করতেন না, মাঝে মাঝে জে. বি. ডুমার বক্তৃতা শুনতে 'সর্বনে' যেতেন। 'সর্বন্' প্যারীর 'ফ্যাকালটি অব্ থিওলজি' ও তার বিদ্যায়তনের নাম। তার 'সর্বন্' নামকরণ এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতার নামানুসারে করা হয়েছিল। ১৮০৮ অব্দে সর্বন্ প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর সেটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম্ম-বিভাগের পর্য্যালোচন-কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা দিতে সর্বপ্রথমে নিযুক্ত হয়েছিলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গেলুসাক্। তাঁর পরে প্রতিভাবান্ বাগ্মী ও রসায়নবিদ্ জে. বি. ডুমা সেখানকার অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হন। ডুমার বক্তৃতা শুনতে বহু ছাত্র সর্বনে সমবেত হত। পাস্তার তাঁর বাক্যাবলী শুনবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বক্তৃতামঞ্চের নিকটে অপেক্ষা করতেন। ডুমার কথা পাস্তারের মনে উৎসাহের সঞ্চার করত। এ সম্বন্ধে তিনি ১৮৪২-এর ৯ই ডিসেম্বর একটি পত্রে লিখেছিলেন—

"আমি প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্ ডুমার বক্তৃতা শুনতে সর্বনে যাই। তাঁর কথা শুনবার জন্য এত জনসমাগম হয় যে, না দেখলে কল্পনা করা যায় না। বৃহৎ গৃহটির অভ্যন্তর লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান থাকে না। আমাদের ভাল জায়গা দখল করবার জন্য আধঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকতে হয়। সব সময়েই প্রায় ছয়সাত শত লোকে ঘরটি পূর্ণ থাকে।" ডুমার অনুপ্রেরণাময় বাণী পাস্তারকে তাঁর শিষ্যত্ব পদে অভিষিক্ত করেছিল।

পাস্তার ১৮৪৩ অব্দের পাঠ্যবৎসরের অবসানে 'লিসে সাঁ লুই' হতে পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম পুরস্কার ও অপর দুই বিষয়ে বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হন। ফ্রান্সের সমস্ত কলেজ হতে নির্ব্বাচিত ছাত্রদের প্রতি বৎসরে 'কঁকুরজেনেরাল্' নামে একটি পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় পাস্তার পদার্থবিজ্ঞানে বিশিষ্টতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। 'একোল্ নর্ম্যালে' প্রবেশের সময় তাঁর নাম তিনজন ছাত্রের পরেই উল্লিখিত হয়েছিল।

সেখানে অধ্যয়নকালে পাস্তারের যেদিন অৰ্দ্ধদিবস অবকাশ থাকত, সেদিন তিনি 'লিসে-সাঁ-লুই'-এর ছাত্রদিগকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। সেজন্য তিনি কোন পারিশ্রমিক নিতেন না। তিনি তাঁর শিক্ষকমহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নিমিত্ত এই কার্য্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ব্যাপারটি তুচ্ছ, কিন্তু সামান্য দৃষ্টান্ত হতেও মানুষের উদারচিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর

মহানুভবতা ও ভালবাসা অপরিচিতের প্রতিও অকুণ্ঠিত ছিল।

পাস্তুর তাঁর অবসর-কাল 'একোল্ নর্ম্মালের' গ্রন্থাগারে অতিবাহিত করতেন। তৎকালে তাঁর প্রকৃতি ছিল গম্ভীর, শান্ত ও লাজুক ধরণের। কিন্তু সেই চিন্তাশীল প্রকৃতির মধ্যেই উৎসাহের ফল্গুধারা প্রবাহিত হত। তাঁকে অনুপ্রেরণা দিত মহৎ ব্যক্তিদের জীবন, শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের কার্য্যাবলী, উদার স্বদেশপ্রেমিকদের আদর্শ। আগ্রহের সঙ্গে ঔৎসুক্য, উৎসাহের সঙ্গে তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি তাঁর চরিত্রে একাধারে বিরাজ করত। যখন তিনি কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন, অথবা বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বক্তৃতা শুনে ফিরতেন কিংবা পঠিত বিষয় লিপিবদ্ধ করতেন, সে সময়ে তাঁর মনে তীব্র অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হত। ছুটির দিনে সর্বনের বীক্ষণাগারে অতিবাহন অথবা বিজ্ঞান বিষয়ে পর্যালোচনা তাঁর নিকট অবসর-যাপনের শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে পরিগণিত হত।

একদা তিনি একোল্ নর্ম্মালের গ্রন্থাগারে বসে 'আকাদেমী দে সিয়ঁাসের' ১৮৪৪ অব্দের বিবরণী-পত্রিকা পড়ছিলেন, তার মধ্যে একস্থানে টার্টারিক্ আসিড্ সম্পর্কীয় কয়েকটি সমস্যাপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ দেখতে পেলেন। ফ্রান্স এবং জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা সেই সমস্যার রহস্য ভেদ করতে পারছিলেন না। কথাগুলি তাঁকে চিন্তাবিষ্ট করল। তিনি পত্রিকাটি মনোযোগ সহকারে পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করতে লাগলেন। সমস্যাটি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হলে তিনি তদ্বিষয়ে অনুসন্ধানে সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু কলেজের licence এবং aggregation পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তিনি সেই গবেষণায় পুরাপুরি মনোযোগ দিতে পারলেন না। তখন তিনি মনস্থ করলেন যে, 'দক্ত্যর এস্ সিয়ঁাস' পরীক্ষা শেষ করে তবে সে বিষয়ে একাগ্র মনে কাজ করবেন।

পাস্তুর সর্বদা সাধারণ ছাত্রদিগের দ্বিগুণ কাজ করতে চেষ্টা করতেন। কি উপায়ে কলেজের পরীক্ষাটি শেষ করা যায়, সেই চিন্তাই তাঁকে ব্যাকুল করে তুলছিল। কিন্তু অপরাপর কর্ত্তব্যের প্রতিও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

আর্ব্বোয়া কলেজের প্রধান অধ্যাপক তাঁর নিকট হতে যে সকল কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চিঠি-পত্র পেতেন, তাই থেকে পাস্তারের এই সময়কার কর্ম্মময় জীবনধারার আভাস পাওয়া যায়। পাস্তুর অবকাশকালে বাড়ী গেলে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুরোধে আর্ব্বোয়া কলেজের ছাত্রদিগকে বিজ্ঞান ও পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, তাদের সঙ্গে সর্বনের বক্তৃতাসমূহের পর্যালোচনা করতেন। সেখানকার কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকাদি নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ করা প্রভৃতি কার্য্যের ভার তাঁরই উপর ন্যস্ত হত। সে সময়ে তাঁকে আরও একটি বিশেষ কাজে মন দিতে হয়েছিল। তাঁর পিতা বাল্যকালে অধিক বিদ্যাশিক্ষা করতে পারেন নাই। সেজন্য জোসেফ পাস্তুর নিজের জ্ঞানের অল্পতা সম্বন্ধে উল্লেখ করে অত্যন্ত দুঃখ করতেন। লুই পিতার সেই জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহার পরিপূরণে প্রবৃত্ত হন।

জাঁ জোসেফের নিকট লুই-এর প্রদত্ত পাঠ সর্ব্বদা সহজবোধ্য হত না। তিনি অনেক রাত্র অবধি ব্যাকরণের সূত্র অধ্যয়ন করে, গণিতের সমস্যা সমাধান করে লিপিবদ্ধ উত্তরাদি পারীতে পুত্রের কাছে পাঠাতেন। তাঁর সে সময়ে পিতার নিকটে থাকা সম্ভবপর ছিল না। তাই তিনি চিঠি-পত্রের সাহায্যেই পিতার বিদ্যাশিক্ষায় সহায়তা করছিলেন। কিন্তু তিনি পিতাকে পাঠ্য বিষয়ে এমনভাবে উল্লেখ করতেন, যাতে মনে হত, যেন তিনি পিতার সাহায্যে স্বীয় ভগিনীর বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্য করার নিমিত্তই সে সকল কথা লিখেছেন। সেই পত্রসমূহে পিতার প্রতি লুই পাস্তারের শ্রদ্ধাশীল ভাব ও বিনয়-নম্র চরিত্রের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

পাস্তুর 'একোল নর্ম্মালে'র ক্লাসে যোগদান করে অধ্যাপক মহাশয়ের বক্তৃতাসমূহ উদ্গ্রীব হয়ে শুনতেন, কিন্তু সকল সময় শুধু বক্তৃতা শুনেই সন্তুষ্ট হতেন না, বক্তৃতায় যে সকল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা শুনতেন, সে বিষয়ে বীক্ষণাগারে গিয়ে পরীক্ষা করতেন। একদা অধ্যাপক মহাশয় ফস্‌ফরাসের প্রস্তুত-প্রণালী বিষয়ে বক্তৃতা দিলে তিনি তখনই বাজারে গিয়ে কতকগুলি হাড়ের টুকরো কিনে সেই অস্থি ভস্ম করে সালফিউরিক্ আসিডের সাহায্যে ষাট গ্রাম্ ফস্‌ফরাস্ নিষ্কাশিত করেছিলেন। এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিকসুলভ আনন্দ পেয়েছিলেন।

সহপাঠীরা তাঁকে ঈষৎ বিদ্রূপচ্ছলে 'ল্যাবরেটরীর স্তম্ভ' বলে

অভিহিত করত। কারণ তিনি বেশী সময় পরীক্ষার পড়া অপেক্ষা বীক্ষণাগারের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন। সেই জন্য পরীক্ষাতে তাঁর স্থান খুব উচ্চ হয় নাই। তিনি licence পরীক্ষায় সপ্তম হন এবং agregation পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষার বিচারকগণ তাঁকে উত্তম অধ্যাপক হবার যোগ্য বলে মন্তব্য করেন।

'একোল নর্ম্মালে'র শিক্ষক এবং 'আঁস্তিত্যু দ ফ্রাঁসের' সভ্য বালার্ মহাশয় পাস্তারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা পোষণ করতেন। ইনিই ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থের আবিষ্কারক রূপে বৈজ্ঞানিক মহলে সুপরিচিত। বালার্ মহাশয়, পাস্তারকে তাঁর বীক্ষণাগারের কাজ গ্রহণ করবার নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছুক ছিলেন। তাই শিক্ষামন্ত্রী পাস্তারকে তুর্নোলিসের অধ্যাপনা-কার্য্যে নিয়োগের প্রস্তাব করলে, তিনি সেই প্রস্তাবে দৃঢ়রূপে বাধা দেন। অধ্যাপনা-কার্য্য অপেক্ষা বীক্ষণাগারের কাজেই পাস্তারের অধিকতর স্পৃহা ছিল। বালার মহাশয়ের চেষ্টায় তাঁর সেই অভিলাষে আনুকূল্য ঘটায় তিনি বালারের বীক্ষণাগারে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন ও সেখানকার কিউরেটর পদে নিযুক্ত হন।

১৮৩৮ অব্দের শেষ ভাগে আর এক ব্যক্তি বালারের বীক্ষণাগারে যোগদান করেন। তাঁর নাম ওগুস্ত্ লোরঁ। ওগুস্ত্ লোরঁ পূর্ব্ব হতেই বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি 'থিওরী অব সাবস্টিট্যুসান্' নামক জে. বি. ডুমার সিদ্ধান্তটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সিদ্ধান্তটির মূলকথা এই যে, ক্লোরিন্ জাতীয় বস্তুর এমন একটি বিশিষ্ট ক্ষমতা আছে, যাতে সেটি কোন কোন যৌগিক বস্তুর প্রত্যেক হাইড্রোজেন পরমাণুকে একে একে অপসারিত করে তার স্থান অধিকার করতে পারে। মৌলিক গবেষণা ও নব নব সিদ্ধান্ত পাস্তারের নিকট খুবই চিত্তাকর্ষক বোধ হত। কিন্তু তিনি কোন বিষয়েই তাড়াতাড়ি মন্তব্য করে নূতন প্রমাদ স্থষ্টির সহায়তা করতেন না।

শ্রীযুক্ত লোরঁ কতকগুলি সিদ্ধান্ত অবলম্বনে বালারের বীক্ষণাগারে পরীক্ষাকার্য্য আরম্ভ করেন। সেই কার্য্যে সহকারিতার জন্য তিনি পাস্তারের সাহায্যপ্রার্থী হন। পাস্তার তাঁর এই অনুরোধে সানন্দে সম্মতি দেন। লোরঁর ন্যায় বিচক্ষণ রসায়নবিদের অধীনে কাজ করে তিনি নিজেকে অত্যন্ত উপকৃত মনে করেছিলেন। লোরঁর গবেষণাকার্য্য পাস্তারকে টার্টারিক্ অ্যাসিডের সমস্যা সমাধানে আংশিক ভাবে সাহায্য করেছিল। তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যলিপির মধ্যে সে সম্বন্ধে এইরূপ উল্লিখিত আছে—

"একদিন লোরঁ মহাশয় টাংষ্টেট্ অব-সোডার কতকগুলি স্ফটিক নিয়ে অপর এক রসায়নবিদের কার্য্যের সত্যতা নিরূপণ করছিলেন। আমি নিকটেই উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখালেন যে, সেই লবণটি আপাতদৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বোধ হলেও তার মধ্যে তিনটি বিভিন্ন আকৃতির স্ফটিক বিদ্যমান আছে। শ্রীযুক্ত দলাফস্ আমাদের খনিজ তত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে আমি স্ফটিকতত্ত্বের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়েছিলাম। সে কারণে আমি কোণমাপক-যন্ত্র (goniometer) ব্যবহারে অভ্যস্ত হই, এবং বিভিন্ন প্রকার টার্টারেট্ লবণ ও টার্টারিক অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করি। আমার এই কাজে প্রবৃত্ত হবার আর একটি হেতু ছিল। দ লা প্রেহ্বোস্তে মহাশয় এই সময় স্ফটিকতত্ত্ব বিষয়ে যে সকল কার্য্য-বিবরণী প্রকাশ করছিলেন, আমি তার সত্যতা নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম।"

পাস্তারের লোরঁর সহিত একত্র কাজ করার সুযোগ অধিক দিন ছিল না। ডুমার সহকারীরূপে নিযুক্ত হয়ে লোরঁ সর্বনে চলে যান।

তার কিছুকাল পরে পাস্তার পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন-তত্ত্ব বিষয়ে দুইটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন—

প্রথমটি—আর্সেনিয়াস্ অ্যাসিডের 'সম্পূরণ ক্ষমতা' (saturation capacity) সম্বন্ধে গবেষণা; আর্সেনাইট্ অব পটাশ, সোডা ও অ্যামোনিয়া বিষয়ে পর্য্যালোচনা।

দ্বিতীয়টি—তরল পদার্থের 'আবর্ত্তিত মেরুবর্ত্তন' (rotatory polarization)-এর সহিত তার অন্যান্য গুণাবলীর সম্বন্ধ বিষয়ে পরীক্ষা।

তাঁর মাতাপিতার নামে উৎসর্গীকৃত এই নিবন্ধ দুইটি ১৮৪৭ অব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে প্রকাশিত হয়। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে তাঁকে তাঁর পিতা লিখেছিলেন—

'তোমার নিবন্ধ দুটি বিচার করার মত ক্ষমতা না থাকলেও এই লেখা আমাদের তৃপ্তি বিধান করেছে। তুমি

যে ডক্টর উপাধি পাবে তাই আমরা আশা করতে পারি নাই। তোমার agregation পরীক্ষার ফল আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে।'

কিন্তু লুই-এর আদর্শ ছিল ভিন্নরূপ। কোনপ্রকার উপাধি লাভ করা তাঁর লক্ষ্য ছিল না। অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসাই সর্ব্বদা তাঁকে অগ্রগতির পথে চলতে অনুপ্রাণিত করত। তিনি ১৮৪৮এর ২০শে মার্চ্চ 'আকাদেমী দে সিয়াঁস্'-এ 'ডাইমরফিজম' সম্বন্ধে এক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েন।

কোন কোন রাসায়নিক বস্তু দুই বা ততোধিক স্ফটিকাকারে দানা বাঁধে। এই দুই বা ততোধিক পৃথক্ আকারে স্ফটিকীভূত হওয়ার লক্ষণকে 'ডাইমরফিজম্' বা 'পলিমরফিজম্' বলে।

পাস্তুর দলাফস্ মহাশয়ের সহযোগে ডাইমরফাস্ বস্তু-সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন।

পাস্তুর যখন এইভাবে বীক্ষণাগারের কাজ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, সেই সময়ে তাঁর জীবনের কর্ম্মধারা বিজ্ঞান-চর্চ্চা হতে একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হয়। তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পেয়ে বীক্ষণাগারের কিউরেটর পদে নিযুক্ত থাকলেও, বীক্ষণাগারের বর্হিভূত ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না। দেশের রাজনৈতিক অন্দোলন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

পাস্তুর বাল্যকাল হতে উদার মৈত্রীভাবের সমর্থক ছিলেন। ১৮৪৮ অব্দে যখন কবি-ঐতিহাসিক লামার্তীনের বাণী ফরাসী দেশে রাষ্ট্র-বিদ্রোহ সংঘটিত করে, তিনি তখন বীক্ষণাগার পরিত্যাগ করে সেই আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলভুক্ত হয়ে এই মর্ম্মে বাড়ীতে একটি পত্র লেখেন—

'আমি অর্লেআঁ রেলওয়ে হতে এই পত্র লিখছি। এক্ষণে আমাকে 'গার্দে নাসিওনাল্' বা জাতীয় শান্তিরক্ষকরূপে কাজ করতে হচ্ছে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আমি 'ফেব্রুয়ারী দিবসে' পারীতে থাকতে পেরেছি এবং এখনও সেখানে থাকতে পারছি। আমাকে সেস্থান পরিত্যাগ করে যেতে হলে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হব। আমার সামনে এক মহৎ উদার বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে।...প্রয়োজন হলে আমি দেশের গণ-তন্ত্রের উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করব।'

সে সময়ে ফরাসীদেশে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের আন্দোলন পুরামাত্রায় চলছিল। একদিন পাস্তুর পথ অতিক্রম করে যাবার সময় একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বেদীর সম্মুখে বিরাট জন-সমাগম দেখতে পেলেন। তার উপরে লেখা ছিল 'ওটেল্ দ লা পাত্রি'। দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে আর্থিক সাহায্য দানের নিমিত্ত সেখানে জনমণ্ডলী সমবেত হয়েছিল। তাই দেখে পাস্তুর তখনই তাঁর সঞ্চিত অর্থ তদুদ্দেশে দান করলেন।

১৮৪৮এর ২৮শে এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁর পিতার নিকট হতে এই পত্র পেলেন—

"তোমার পত্র হতে অবগত হলাম যে, তুমি তোমার সঞ্চিত একশত পঞ্চাশ ফ্রাঁ দেশের জন্য দান করেছ। সেই অর্থ তুমি যে অফিসে জমা দিয়েছ তার রসিদখানিতে নিশ্চয় সেখানকার নাম ঠিকানা এবং তারিখ লেখা আছে। তুমি তার উল্লেখ করে 'ল নাসিওনাল্' বা 'লা রিফর্ম' পত্রিকায় এই কথা প্রকাশিত কর যে, ফরাসী সাম্রাজ্যের জনৈক বৃদ্ধ সৈনিকের পুত্র, একোল্ নর্ম্মালের লুই পাস্তুর দেশের উদ্দেশে ১৫০ ফ্রাঁ দান করেছে।

"...তুমি তোমার বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রের নিকট হতে পোলাণ্ড দেশীয় নির্ব্বাসিত ব্যক্তিদের* জন্য অর্থ সংগ্রহ কর। তাঁরা আমাদেরই নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করেছেন।"

ফ্রান্সের জাতীয় আন্দোলনের পর পাস্তুর স্ফটিকতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণায় পুনঃপ্রবৃত্ত হন এবং নিজের মতে অনুসন্ধানের ফলে টার্টারিক অ্যাসিড সম্বন্ধে একটি অভিনব তথ্য আবিষ্কার করেন। (ক্রমশঃ)

* পোলাণ্ড অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাশিয়া, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার করতলগত হয়। ১৮১৫ অব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের আজ্ঞানুসারে জার আলেকজাণ্ডার পোলাণ্ডের অংশবিশেষকে রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল পৃথক্ রাজ্যরূপে গড়ে তোলেন। কিন্তু রাশিয়া পোলাণ্ডকে স্বায়ত্তশাসন দেবার অঙ্গীকার পুরাপুরি রক্ষা করে নাই। উপরন্তু দেশের অতীত স্বাধীনতার গৌরবস্মৃতি স্বদেশপ্রিয় পোল্‌দিগকে জারের অধীনতা পাশ ছিন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ১৮৩০ অব্দের ফরাসী বিপ্লবে উৎসাহিত হয়ে পোলগণ স্বাধীন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনে প্রয়াসী হন। কিন্তু জার-সৈন্যের নিষ্পেষণে পোল স্বদেশপ্রেমিকগণ ১৮৩১ অব্দের অন্তে ভয়ানক দুর্দ্দশা ভোগ করেন। জারের আদেশে বহু ব্যক্তি নির্দ্দয়ভাবে নিহত হন, অনেকে সাইবেরিয়ার মরুভূমে নির্ব্বাসিত হন, শতসহস্র ব্যক্তি দেশত্যাগ করে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও পশ্চিম ইয়োরোপে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ১৮৩০ অব্দে যে সকল স্বাধীনতা-প্রয়াসী রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হয়েছিল, তন্মধ্যে কোন দেশই পোলাণ্ডের ন্যায় লাঞ্ছনা ভোগ করে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় নাই। পোলদিগের বিপ্লব প্রচেষ্টা, বেলজিয়ন এবং ফ্রান্সের বিদ্রোহকে সফল করে তুলেছে, এইটুকুই পোলাণ্ডবাসীদের একমাত্র সান্ত্বনা ও তৃপ্তি দিয়েছিল।

বঙ্গ-রমণী

— শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৩৮

নিদারুণ কীট পশিয়া মরমে
শুকাল কমলদলে—'

'বড় মা—ও বড় মা, গেলে কোথা? তুমি বললে দেবে—সেই কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি—ছুঁয়ে দোবো তোমার দুধের কড়া?'

'সে বুঝি পূজোয় বসেছে—তোর মাকে বল না?'

'নাঃ—মা সত্তের কথা শুনিয়ে দেবে এখুনি, বড় মাটা ভারি দুষ্ট হচ্ছে দিন দিন।'

'মেজ বউ' নাম ঘুচিয়া রায়-বাড়ীর মেজ বৌয়ের নাম এখন বড় মা হইয়াছে। স্বামী থাকিতে আজীবন বিদেশে থাকিয়া আসিয়াছেন; এখন স্বামীর সংসার শত বাহু মেলিয়া তাঁহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়াছে। সেজ বউ সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব মেজ বউকে নিঃশেষে সঁপিয়া দিয়াছেন। পিসীমা তাঁহার গৃহিণীপনা ছাড়িয়াছেন—অনেকটাই। সেজ বউ মেয়েদের বলিয়া দিয়াছেন, 'মেজ জ্যেঠিমাকে তোরা বড় মা বলে ডাকবি।' তারা তাই ডাকে। মায়ের কাছে কোন কিছুর জন্যে গেলেই তিনি বলেন, 'আমি জানিনে, তোর বড় মার কাছে যা।' কৃষ্ণ রায় দণ্ডে দণ্ডে বৈষয়িক কাজের পরামর্শ চাহিতে আসেন, বলেন, 'মেজ বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি কি বলেন।' সেজ রায় হাট-বাজারে যাইবার সময় মেজ বৌয়ের কাছে জানিতে চাহেন, কি লাগিবে না লাগিবে। শোক-শয্যা হইতে সকলে মিলিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দিয়াছে। যিনি একদিন অন্তঃপুরের সঙ্কোচকুণ্ঠিতা বধূ ছিলেন, তিনি আজ মাতৃস্থানীয়া সর্ব্বময়ী কর্ত্রী।

দিনের সঙ্গে সঙ্গে সকলই সহিয়া যায়। কালের মত চিকিৎসক কে আছে? বৎসর ঘুরিয়া আসিল প্রায়। এখন মেজ বৌয়ের অনেকটাই সহিয়া গিয়াছে। রাত্রি থাকিতে উঠিয়া নিজের জপ-সন্ধ্যা সারিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের বাঁধনে ধরা দেন। স্বভাবে সহজ, সরল, অকুণ্ঠিত কর্ত্রীভাব দেখা দিয়াছে। পিসীমার অসুখ-বিসুখ হইলে মেজ বউ নিরামিষ রান্নাঘরের দিকে ঘেঁষিতে চান না। অনেক বেলা হয়—সেজ বৌয়ের একটা চোখ এদিকে ত' আছেই। জিজ্ঞাসা করেন 'ও দিদি নাইবেন না বেলা হল কত?'

'হোক গে—আজ আর রাঁধছিনে—ঠাকুর-কন্যা যেদিন পথ্য করবেন সেইদিন রাঁধব।'

সেজ বৌয়ের মেজ মেয়ে স্বধা বলিল, 'ও মা, তদ্দিন তুমি উপোষ করবে?'

সেজ বউ বলিলেন, 'তাই ভেবে রেখেছ মেজদি? আমি মনে করেছি যে, আজ এদের খাইয়ে দাইয়ে নেয়ে এসে তোমার কাছে এক সঙ্গে বসে খাব। রোজ রোজ নিজের হাতের রান্না আর ভাল লাগে না। সেই সেদিনের মত শাকের ঘণ্ট রাঁধবে ভেবেছিলাম। তা তোমার যদি উপোষ হয়—আমারও আজ না হয় উপোষই হোক।'

সেজ বউ-এর কথাটা সব সত্য নয়। প্রতিদিনই নিরামিষ ঘরের ব্যঞ্জনাদি না হইলে এ ঘরের লোকদের তৃপ্তি হয় না। রান্না শেষ করিয়াই সেজ বউ-এর জন্য একখানা রেকাবে সব জিনিস সাজাইয়া রাখা মেজ বউ-এর অভ্যাস।

নিশ্চিন্ত মনে পূজার বাসনগুলি মাজিয়া ঘসিয়া রাখিয়া মেজ বৌ স্নানে যাইবেন ভাবিয়া রাখিয়াছেন। পূজার বাসন আজ কিছু বেশী বাহির হইয়াছে, বেশীক্ষণ ধরিয়া আজ পূজা করিবেন; ফুলও সকাল বেলা ঝুড়িখানেক নিজের হাতে তোলা হইয়াছে। এমন অবসর রোজ হয় না।

গম্ভীর অপ্রসন্ন মুখে বাসনগুলি একখানা বড় ধোয়া পিঁড়ির উপর রাখিয়া স্নান করিতে যাইবার পরিবর্ত্তে একটা শাক তুলিবার সাজি হাতে বাগানের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, 'তা আমি জানি, তোমাদের যন্ত্রণায় আমার আবার পূজো, আমার আবার সন্ধ্যা, কত জন্ম জন্ম পাপ করেছিলাম, তাই তোমাদের মত শত্তুরদের হাতে পড়েছি; এখন দয়া

করে দেখো, তোমার গুণের ছেলে যেন এসে আমার বাসন-পত্তরগুলো নোংরা করে না দেয়।'

দারুণ ক্রোধ না হইলে মেজ বউ সেজ বউকে 'তুমি' বলে না।

বৈকালে রোদ পড়িয়া গিয়াছে—আষাঢ়ের লম্বা দিন। এখনও অনেক বেলা আছে, মেজ বউ নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া দীপ-সলিতা পাকাইতেছেন। সামনা সামনি সেজ বউ-এর ঘর, সেই ঘরের চৌকাঠের সামনে বসিয়া সেজ বউ চুলের জট ছাড়াইতেছেন, পাশে একখানা রঙীন বেতের ডালায় চিরুণী, সিন্দূরকৌটা আর একদিকে তেলের বোতল। স্নানের সময় মেজ বউ সেজ বউয়ের মাথায় সাবান দিয়া ঘসিয়া দিয়াছেন—তাই এ আয়োজন, নহিলে চুল বাঁধা সেজ বউয়ের বড় ঘটিয়া উঠে না। আর কোন কাজে কোন আলস্য সেজ বউয়ের নাই, শুধু এই কাজটি ছাড়া।

সন্তোষ আসিয়া একদফা মায়ের গামছা, তেলের বোতল লইয়া টানাটানি করিয়া খানিকটা তেল ফেলিয়া দিয়া সিন্দূর ঢালিয়া শেষে মার খাইয়া পিসীমার কাছে নালিশ করিতে গিয়াছে। সে এখনও কথা বলিতে পারে না ভাল করিয়া, তবে তাহার ইসারা ইঙ্গিতে পিসীমা সব বুঝিয়া লন—সে অবোধ্য ভাষা আর কাহারও বুঝিবার সাধ্য হয় না।

কমল পাঠ সাঙ্গ করিয়া বিশ্বাস-বাড়ী হইতে আসিয়া এতক্ষণ গাছতলায় আম কুড়াইতে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ কি মনে হইতে 'বড় মা' বলিয়া ডাক দিয়া বাড়ীর ভিতরে আসিয়াই চোখ পড়িল, মায়ের প্রসাধনের দিকে, যাহা বলিতে আসিয়াছিল, সব ভুলিয়া এক ছুটে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইল এবং মার পিটের উপর ঝুঁকিয়া একবার এ-কাঁধ একবার ও-কাঁধের পাশ দিয়া আয়নায় নিজের মুখ দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মা চুল বাঁধিতেছে—এ ব্যাপার তাদের কাছে যেমন নূতন—তেমনি মার বড় আয়নাও হাতে পায় না বলিয়া নিজের মুখ ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগও হয় না—কাজেই সুবিধাটুকু পূরাপুরিই গ্রহণ করা চাই।

একে দারুণ গ্রীষ্ম, ঘরের মধ্যে যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে চায়—তায় অনভ্যস্ত হাতের চিরুণীতে রাশি রাশি চুল ছিঁড়িতেছে, কিন্তু জট ছাড়া দূরে থাক, আরও যেন জট বাধিয়া চলিয়াছে—সেজ বউয়ের মেজাজ অত্যন্ত উত্তপ্ত, তার উপর ছেলে মেয়ের উৎপাত। বার কয়েক ঠেলিয়া সরাইয়া... দু'চারিটা চড়চাপড়ও দিয়াছেন, কমল শুনিবে কেন? সে বেণীশুদ্ধ মাথাটি হেলাইয়া দুলাইয়া নিজের মুখ দেখিতেই ব্যস্ত।

মার পিঠের উপর দিয়াই হাত বাড়াইয়া সিন্দূরের কৌটা তুলিয়া লইতে গিয়া কমল হঠাৎ পড়িতে পড়িতে মায়ের পিঠ ধরিয়া সামলাইয়া লইল, কিন্তু সেজ বউ এই অতর্কিত ধাক্কায় পড়িয়া গেলেন। তাঁর ডান দিকে কপাটের আড়ালে এক-খানা ছোট্ট কুড়ুল ছিল, হাত বাড়াইয়া সেইটা টানিয়া লইয়া সক্রোধে তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'দাঁড়া পোড়ামুখী, তোকে আজ দুখানা করে কেটে ফেলছি।'

'ওরে বড় মা, মেরে ফেললে রে', চীৎকার করিতে করিতে কমল উৰ্দ্ধশ্বাসে মেজ বউয়ের দিকে ছুটিল, পিছনে পিছনে মা। মাঝ-পথে মেজ বউ উঠানের মাঝখানে কমলকে ধরিয়া ফেলিলেন, কমল তাঁহার পিছনে লুকাইল। সেজ বউ এক হাতে কুড়ুল আর এক হাতে কমলকে ধরিবার চেষ্টায় সক্রোধে মেজ বউয়ের হাত এড়াইয়া কমলের দিকে হাত বাড়াইল। 'ওগো বড় মা গো' বলিয়া কমল ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল।

'নে নে হয়েছে ছাড়।'

'না মেজদি, না বড্ড বাড় বেড়েছে ওর, সারাদিন থাকবে বাইরে বাইরে, একটা কথা বললে শোনে না, তুমিই নষ্ট করলে ওকে, আজ আমি ওকে কাটবই।'

'কাটিবে? আস্পর্দ্ধা কম নয়। বুড়ো ধাড়ি সিঁথিপাটি করতে বসেছেন। মেয়েটা গেছে বলে বড্ড অপরাধ হয়েছে? মর মর, মরবিনে?' বলিয়া মেজ বউ সেজ বউয়ের পিঠে সজোরে এক কিল বসাইয়া দিলেন।

হাতের কুড়ুল ফেলিয়া দিয়া সেজ বউ হাসিয়া বলি-লেন, 'দিদি মারলে কি বলে?'

হঠাৎ কিল দিয়া ফেলিয়া মেজ বউও হাসিয়া ফেলিলেন, তখনই আবার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, 'এমন অলক্ষণে কথা তোর মুখ দিয়ে বার করিস কি বলে? কত দুঃখের ধন ছেলে পিলে, তাই কুড়ুল দিয়ে কাটবি? অমন বড়াই করিসনে?'

সেজ বউ নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া চুল বাঁধিবার সরঞ্জাম তুলিয়া ফেলিল। মেজ বউ বলিল, 'ও কি রে চুল বাঁধবি নে?'

...., ও আমার সয় না।'

'একবার আঁচড়ে একটু সিঁদুর দে,—আমার মাথা খাস্, কথা শোন্। এমনি সেজ ঠাকুরপোর শরীর ভাল যাচ্ছে না।'

'তুমি যদি বেঁধে দাও তা হলে কথা শুনি।'

'আয় দিচ্ছি।'

পিসীমা সন্তোষের হাত ধরিয়া একবার আসিয়া দেখিলেন, চুল বাঁধাই চলিতেছে, দেখিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আবার আসিয়া দেখেন, দুই জায়ে দোক্তাপাতা পোড়ার গুঁড়ার কৌটা হইতে হাতে খানিক খানিক ঢালিয়া মুখোমুখি বসিয়া ধীরে-সুস্থে দাঁতে দিতে দিতে কথাবার্ত্তায় একেবারে মগ্ন। এদিকে বেলা ডুবু-ডুবু, ছেলেটা মা' মরার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এ দেখিলে কার প্রাণে সয়? গেরস্ত ঘরের বউরা যদি দিন রাত না মানিয়া গল্পে এমন অজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে সে বাড়ীর লক্ষ্মী থাকে না কি?

উত্তর দিকের পথ দিয়া সুখেনকে আসিতে দেখিয়া পিসীমা উদ্যত কথা সংবরণ করিয়া ফেলিলেন এবং ছেলেটার একটা গতি করিবার জন্য নিজেই এক হাতে গামছা ও অন্য হাতে সন্তোষকে ধরিয়া ঘাটের দিকে গেলেন।

মেজ-বউ মাথায় আজকাল বড় একটা কাপড় দেন না, সেজ-বউ তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় দিলেন। কৃষ্ণ রায় অন্দরে আসিবার সময় বিশেষ রকম সাড়া-শব্দ করিয়াই আসেন, সুতরাং ভ্রাতৃবধূরা পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইতে পারেন।

দাঁড় করান পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া মেজ-বউ বলিলেন, 'বোস্ বোস্, এমন চেহারা হয়েছে কেন রে? একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছিস যে?'

সেজ-বউ বলিলেন, 'আর জল যা বাড়ছে দিন দিন, এক পা বেরুবার যো নেই, যেন খাঁচার পাখী হয়েছি। এবারকার জল অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত থাকবে দেখো দিদি, কদিন দেখিনি সুখেন, কোথাও গিয়েছিলে না কি?'

বারান্দার কোণে মাটীতেই সুখেন বসিয়া পড়িল, রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে উপর দিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—'সব শেষ করে এলাম খুড়ীমা।'

দুইজনে একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, 'কিসের শেষ? আঁ্যা?'

'চিলহাটির ছোট বউ খুড়িমা, বিদায় দিয়ে এলাম জন্মের মত।'

অনেক সময় দারুণ দুঃসংবাদও মনে হয় যেন সাধারণ; মনের মধ্যে খবরটা ধারণার শক্তির অতীত বলিয়াই এরূপ হয়, তার পরে কথাবার্ত্তার মধ্যেই মনটা যে কতখানি উদাস ও শূন্য হইয়া যায়, তাহা কথার ফাঁকে ফাঁকেই ধরা পড়ে; আবার এক একবার মনে হয় যে, স্বপ্ন দেখিতেছি যেন।

'কি হয়েছিল সুখেন—কি হয়েছিল?' সেজ-বউ প্রশ্ন করিলেন।

'এখান থেকেই জ্বর হত রোজই—সেটা আর ছাড়ল না একটা বছর।'

'কবে?'

'আজ শনিবার—বার দিন হ'ল।'

'তুই ছিলি সেখানে?'

'আমি ভানুদের আনতে গিয়েছিলাম মামাবাড়ী থেকে, পথে খবর পেয়ে গেলাম, তার দু'দিন পরে,—'

'বেঁচেছে—সতী-লক্ষ্মী স্বর্গে গেছে, তোর হাত এড়িয়েছে, হতভাগা! লক্ষ্মীছাড়া! তোর হাতে সে টিকবে কেন? এবার বুঝবি, বুঝবি তিলে, তিলে বেঁচে থাকতে ত' বুঝিস নি—' বলিতে বলিতে মেজ-বউয়ের চোখের জল পড়িতে লাগিল।

'কাঁদছ খুড়ীমা? কাঁদ, আমার চোখে জল নেই—নিজের হাতে শেষ কাজ সেরে এলাম, এক ফোঁটা চোখের জল ফেলি নি। বলে গেছে কি জান খুড়ীমা? আবার যেন পরজন্মে আমাকেই পায়। সেই আশীর্ব্বাদ চেয়ে নিলে, সেই কামনা নিয়ে সে গেল, সেই কামনাই আমাকেও করতে বলে গেল।'

শুষ্কচক্ষু, উদাস-মূর্ত্তি, শ্রীহীন কঠিন চেহারা সুখেন খুঁটিতে ঠেস দিয়া পা ঝুলাইয়া বসিয়া আকাশের নব-সাজন্ত মেঘগুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

সেজরায়ের নিজস্ব প্রিয় হুঁকাটি এক হাতে, অপর হাতে কল্কিটা সন্তোষ বীর-দর্পে বারান্দায় উঠিতে লাগিল। এবার বড়-মাকে আচ্ছা করিয়া পিটিবে।

সেজ বউ তাড়াতাড়ি হুঁকা-কল্কিটি কাড়িয়া লইয়া সন্তোষকে লইয়া রান্নাঘরের দিকে দুধ আনিতে গেলেন। সুখেন ফিরিয়া চাহিয়া বলিল—'খুড়ীমা দায় উদ্ধার করে দিতে হবে, আমার হাতে কিছুই নেই।'

'কত লাগবে?'

'কত লাগবে সেটা এখনও ফন্দ ধরিনি, পরে নেবো, আজ গোটা কুড়ি টাকা দাও। কাল হাট, কতক কতক কালকার হাটে কিনব।'

'কি রকম করে করবি ?'

'কি রকম আর, জীবনে কোন কিছুই নেয়নি, এক অপমান লাঞ্ছনা ছাড়া। এই শেষ, আর কোন দিনও কিছু তার জন্যে আমায় করতে হবে না। ভানুকে বড় ভালবাসত তারই হাত দিয়ে কাজটুকু করাব। মেজদা ভানুদের আনতে গেছে, ভানুর হাতের জলটুকু পেলে সে তৃপ্ত হবে। ওকে নিজের ছেলে বলে ভাবত।' সুখেনের স্বর কাঁপিতে লাগিল।

মেজ-বউ উঠিয়া গিয়া দু'খানা নোট আনিয়া দিলেন। অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার নোট দু'খানা ও একবার মেজ-বউয়ের দিকে চোখ ফিরাইয়া সুখেন উঠিয়া যন্ত্র-চালিত প্রাণহীন পুতুলের মত টাকাটা বাঁ-হাতের মুঠিতে চাপিয়া ধরিয়া সন্ধ্যার আঁধারের মধ্যে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ও বেড়ার বাঁকের আড়ালে আড়ালে তাহার চলমান আকৃতি একটা ম্লান ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। মেজ-বউ খুঁটিতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া অপলক চক্ষে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৩৯

'নহি আমি প্রিয়তমে নির্দ্দয় হৃদয়।'

পরশমণির হাত ধরিয়া বেলি ঘাটে নামিয়াছে। পরশমণি এখন একেবারে দৃষ্টিহীনা।

ও-দিক্‌কার ঘাটে জলের শব্দ শুনিয়া পরশমণি বলিলেন, 'ও কে—রে ?'

বেলি বলিল, 'মেজ-ঠান্‌দি।'

'অ—মেজ-বউ—মেজ-বউ, বলি একবারও কি আসতে নেই।'

'সময় পাইনে দিদি, কমলির জ্বর হয়েছে, তার বাপও দাঁতের ব্যথায় বিছানায় পড়ে। রোজ মনে করি, একবার যাব, কিন্তু হয়ে ওঠে না।'

'আর ভাই চোখে তো তোদের মুখ দেখতে পাব না, দুটো কথা কওয়া আর শোনা, এই হয়েছে সার। কতবার বলি একবার নিয়ে চল, তা পোড়ার-মুখোরা কেউ ... শোনে ? সেই পরশু একবার দত্তবাড়ী গিয়েছিলাম, আর বেরুতে পাইনে ; কে নিয়ে যাবে ?'

'তা দিদি আসুন না, এ-বেলাটা থাকবেন, ও-বেলা আমরা দিয়ে আসব।'

পরশমণি কথাটায় খুব খুসী হইলেন—মুখে হাসি ফুটিল। মেজ বউ সাঁতার দিয়া গিয়া পরশমণির হাত ধরিয়া জলে নামাইলেন। বেলিকে বলিলেন, 'তুই যা, বল গে আমি এঁকে নিয়ে গেলাম।'

পরশমণির পাশে পাশে সাঁতার দিয়া আসিয়া নিজেদের ঘাটে উঠিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া দিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া আপনি স্নান করিয়া মেজবউ বাড়ীতে ফিরিলেন। নিজের কাপড় একখানা পরশমণিকে পরিতে দিয়া হাত ধরিয়া নিরামিষ রান্না-ঘরে তাঁহাকে লইয়া গেলেন। পিঁড়ি পাতিয়া বসাইয়া সরবৎ তৈরি করিয়া দিলেন। পিসীমার কাজের ফাঁকে ফাঁকে দুই রান্নাঘরেই একবার করিয়া উঁকি দিয়া দেখিয়া যাওয়া অভ্যাস এবং প্রত্যেক বারই হাতে দুইটা বেগুণ, দুইটা লাউডগা, একটা কাঁচা কুমড়া কি দুমুঠো শাক, এই রকম একটা না একটা জিনিষ থাকেই এবং দরকার বুঝিয়া মেজ-বউ কি সেজ-বউকে দিয়া যান। পরশমণিকে দেখিয়া আর রান্নাঘরের দিকে গেলেন না, চৌকাঠের এধারে হাত বাড়াইয়া একমুঠা কুমড়া ফুল, একটা কচি লাউ ও কয়েক খণ্ড বেতের আগা রাখিয়া বলিলেন, 'কুমড়া ফুলগুলো ডাল বাঁটা দিয়ে ভেজে সন্তোষের জন্যে রেখে দিয়ো, ও আর কাউকে দিয়ো না। চাল সরষে দিয়ে ভেজো না যেন, সেদিন ভেজেছিলে, তা বাছা ঝালের চোটে মুখেও দিতে পারলে না, তোমাদের কি আক্কেল পছন্দ কিছু আছে ? তিল বাঁটা দিয়ে লাউ-ঘণ্টো রাঁধো। আজ কি বার ? ও সোমবার, তবে দোষ নেই, বেতের আগায় আলু-পটল কুচিয়ে দিয়ে সুক্তো ছেঁচকী করো। আর কি রাঁধতে নিয়েছ ? একটু দেখে শুনে ভাল করে রেঁধো, বৌয়ের যেন খাবার কষ্ট না হয়।'

পরশমণি বলিলেন, 'আমার আবার কষ্ট, ঠাকুরঝি কি যে বল ? বড়-বৌটা ফিরে চেয়েও দেখে না—মেজটাও তাই,

৬৮ পয়লা দেয় দুটো সেদ্ধ করে, তাই বেঁচে আছি, বেলা তিনটে বেজে যায়, তবু এক একদিন মুখে জল দিই নে।'

'তা বউ তুমি এখানেই থাক না কেন? এ বাড়ী কি তোমার নয়? সারাদিন থাকলে, বৈকালে গেলে। দেখি ও ঘরে কি হচ্ছে, সন্তোষের বাপ আজ দু'দিন খাওয়া বন্ধ করেছে। মেজ-বউকে বললাম, চালে-ডালে বেশী করে ঘি দিয়ে পাতলা করে রেঁধে দিতে, তা কই, লক্ষণ কিছু দেখছিনে, গেরস্তর রান্নাই রাঁধছেন, আর কি কোন হুঁস আছে? যে দিক না দেখব—'

পিসীমা চলিয়া গেলেন। পরশমণি বলিলেন, 'এই দেখ তোরা, তোরাও ভাল ভাল ঘরের মেয়ে—কেমন সংসার করছিস, কেমন কাজকর্ম্ম বলব কি—বিশুর দিন কয়েক একটু জ্বর মতন হয়েছে, বড় বিবি ঘর ছেড়ে নড়েন না, দিন-রাত মুখের ওপর পড়ে রয়েছেন। আবার কাল চিলহাটির বিবির ছেরাদ্দ। ঘেন্না ধরিয়ে দিলে ভাই, ঘেন্না ধরিয়ে দিলে। আবাগীর না ছিল জাত না ছিল মান, তারই জন্যে এত ঘটা! আমার পেটে সব কালসাপ ধরেছি বোন। যেমন বড়-বউটা তেমনি চিলহাটিরটা, বজ্জাতের ধাড়ি।'

মেজ-বউ বলিলেন, 'থাক্ দিদি ভাগ্যিমানী, স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে স্বর্গে গেছে; তার কথা আর কেন?'

'বলিনে, ভাল-মন্দ কিছু বলিনে, তোদের কাছেই যা দুটো সুখ-দুঃখের কথা কই বোন—এখন ত চোখে দেখিনে, বিবিরা কি যে সব ধিঙ্গি নাচ নাচছেন দিন-রাত, সব টের পাই।

পরদিন বিশ্বাস-বাড়ীতে এ বাড়ীর সকলকেই যাইতে হইল, এ-পাড়া ও-পাড়ার অনেকে আসিয়াছেন। মেজ-বউ সেজ-বউকে লইয়া বাঁশ বাগানের দিকের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া নামিয়া বাড়ীর ভিতর গেলেন। মধ্য উঠানে শ্রাদ্ধায়োজন হইয়াছে। সব বাড়ীতেই তিনটি করিয়া আঙ্গিনা থাকে, কারো ছোট, কারো বা বড়। মণ্ডপ ও বাহিরের ঘরের দিকে যে আঙ্গিনা, তাকে বলে বার-বাড়ী। ভিতরে শয়ন-ঘর ঘেরা আঙ্গিনাটি, মাঝ-দুয়ার বা আগ-দুয়ার। আর পিছন দিকে রান্নাঘর, ঢেঁকিঘর প্রভৃতি ঘেরা যে উঠান, তাহাকে বলে পিছন-বাড়ী বা পাছ-দুয়ার। পাছ দুয়ারটি বৌঝিদের স্বরাজ্য। শুধু দুয়ার বলিলে ঘরের দরজাকে বোঝায়, আর আগ-দুয়ার পাছ-দুয়ার বলিলে উঠান।

সুখেন যথাশক্তি আয়োজন করিয়াছে। সরলা তপ্ত বালি-খোলায় ধানের মত সারা বাড়ী ছিটকাইয়া বেড়াইতেছে। ভানু মুণ্ডিত মস্তকে অত্যন্ত শান্ত স্থির ভাবে নূতন মার শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছিল, একটু চঞ্চলতা নাই, কোন দিকে চাহে না। সুখেন কাছে বসিয়া, ঈষৎ নত মুখ, শ্যামল কাছে দাঁড়াইয়া, বিশাল নিজ ঘরের দরজার কাছে মাথা হেলাইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

মেজ-বউ চোখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, 'ভাগ্যি দেখ, ছেলের হাতের জলপিণ্ড পেলে।'

শ্যামলের ঘরের কোণের দিকে দুইজন দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। পিছন হইতে সরলা আসিয়া বলিল, 'রোদে দাঁড়িয়ে কেন খুড়ীমা। ও আর কি দেখবে, এস ঘরে বসবে এস, এ বাড়ীর সব ছিষ্টিছাড়া। আমার কচি ছেলে, এই বেলা মুখে জলটুকু অবধি না; ছেলে—ছেলে! না বিইয়ে কানাই-এর মা! কিসের ছেলে? সৎমা আঁবার মা; তা কে শুনবে আমার কথা। চিলহাটি থেকে এসে অবধি কারও সঙ্গে কথাই নেই শুনছি। আমি এসে অবধি একটা কথা যদি নিজে থেকে আমার সঙ্গে বলে থাকে—দিব্যি করে বলছি খুড়ীমা, আমি কি মেরে ফেলেছি ওঁর সাধের বৌকে?'

সেজ-বউ চুপে চুপে বলিলেন, 'চল মেজদি বাড়ী যাই, কি আর দেখব।'

'না বসবে এস খুড়ীমা, ঘরে এস দুঃখের কথা বলি, কার কাছে বলব আর।'

'সময় নেই মা, মেজদি এখন চান অবধি করে নি। ঠাকুরকন্তার খেতে বেলা উল্টে যাবে, এখন যাই।'

মেজ-বউয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া সেজ-বউ নিজেদের ডিঙ্গীতে গিয়া উঠিলেন। দত্ত-গিন্নীও ইহাঁদের সঙ্গে গেলেন, বলিলেন, 'একবার দেখে শুনে এখুনি আসছি।' দত্ত গিন্নী ভোর না হইতে আসিয়া ক্রিয়া-বাড়ীর ভার লইয়াছেন। পরে অনেকেই আসিয়াছেন কিন্তু দত্ত-গিন্নীর মতন দেখা-শোনা কাজকর্ম্ম করা কাহার সাধ্য নয়।

দত্ত-গিন্নীকে তাঁহাদের ঘাটে নামাইয়া দিয়া সেজ-বউয়েরা নিজেদের ঘাটে নামিলেন। মেজ-বউ ঘাটের ধাপে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষের জল অজস্রধারে ঝরিয়া ঝরিয়া জলে পড়িয়া মিশিতে লাগিল। এত যে চিত্ত-দাহকারী ব্যথার অশ্রু, 'জলেরি তরঙ্গ জলে হল লয়'—চিহ্ন কই? এ জগতে কোথাও কি তার চিহ্ন রহিল?

৪০

'চেয়ে আছে বিষাদিনী পতিমুখ পানে।'

শরৎশেষের বৈকাল। বাঁশ-বাগানের ছায়ায় পাখীদের নিত্যকার মেলা বসিয়াছে। বর্ষাবারিধৌত গাছপালা তেমনি সতেজ ও উজ্জ্বল সবুজ। কাঁঠাল গাছের চিক্কণ গাঢ় সবুজ পত্রগুচ্ছের মধ্যে এক একটা জবাফুলের মত লাল কিশলয় দেখা যায়। দু'একটা পাকা পাতা বৈকালের অনুজ্জ্বল রোদে ঠিক সোণার রং ধরিয়াছে। বাঁশ-ঝাড়ের ওপাশে কচু গাছ, দণ্ডকলস ফুলের গাছ, কাঁটানটের ঝাড় বন্যার জলের টানের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ শোভা লইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। কচি কচুর পাতায় ঈষৎ পীত আভা, বড় বড় পরিণত কচুপাতায় ঘন সবুজ বর্ণ। মাঝে মাঝে তারার মত দ্রোণ ফুলগুলি। একটা বন্য ফুলগাছের গায়ে উচ্ছে গাছ লতাইয়া উঠিয়াছে। হলুদ রংয়ের দু'একটা ফুল সবে ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁশ ঝাড়ের ফাঁক দিয়া দত্ত-বাড়ীর সীমানায় বাবলা, তেঁতুল ও আম গাছের সারি দেখা যায়। বর্ষার উজ্জ্বল ও কোমল সবুজ বর্ণটি এখনও গাছের পাতায় লতায়, ঝোপে ঝাড়ে জঙ্গলে। প্রকৃতি নিত্যপরিবর্ত্তনশীলা, কাল যেখানে অগাধ জলরাশিতে তরঙ্গ উঠিতে দেখিয়াছ, আজ দেখ সেখানে ঝোপ-ঝাড়, লতা-পাতা, ফুলের বাহার!

রান্নাঘরের পিছনের জায়গাটি একদিন বড়-বউয়ের জুড়াইবার স্থান ছিল। তার পরে এক দুঃখিনী সেখানে ঠাঁই করিয়া লইয়াছিল, আজ কাল কেহই বড় এদিকে আসে না, তবুও জায়গাটি অনেক পরিচ্ছন্ন আছে। চার পাশের সবুজ জঙ্গলের মধ্যে একখণ্ড তৃণহীন ভূমি যেন নীল যমুনার মাঝখানে একটি চড়া। সেই চড়াটিতে রং-বেরঙের পাখীর দল নামিয়াছে। হলদে পাখীর গায়ের হলদে রং আরো উজ্জ্বল, কালো চুল ও পিঠের উপরে আঁচলার কালো কল্কা দুটি আরো কালো দেখায়। কিন্তু হলদে পাখীকে তুচ্ছ করিয়াই রূপশালিকের দল সগর্ব্বে ঘুরিতেছে। রূপশালিকের মতন অমন নানারঙের সমাবেশ গৌরব তো হলদে পাখীর নাই; ঝোড়-শালিকের বাহার আরো বেশী। সোনালী ঠোঁট, মাথার উঁচু ঝোঁপা, চোখের কোণ সিন্দুরে রেখা টানা, গাঙশালিকের চক্‌চকে ডোরা একটু কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়—ইহারি মধ্যে মৌশালিকরা সাদাসিধা গৃহস্থবধূদের মত সহজ সরলভাবে খাদ্যান্বেষণে রত। চড়াইগুলি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়িয়া কচুর পাতায় গিয়া বসে, তখনি আবার ডালে মুহূর্ত্তের মধ্যে নামিয়া মাটিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল, ক্ষুদে ক্ষুদে টুনটুনিরা চঞ্চলতায় সেরা, দ্রোণফুলের গাছের ডালে বসিয়া এমন করিয়া মুখটি বাড়াইয়া আছে—সরু লম্বা পাতাগুলিতে গা-ঢাকা, যেন কত ভালমানুষ, ভীরু চাহনি, নিমেষের মধ্যে তুড়ুক করিয়া উড়িয়া গিয়া একটা ছোট কচুপাতায় বসিয়া দোল খাইতে লাগিল।

দুপুর বেলা একটু গুমোট, গরম ভাব হয়। বেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ছাড়িয়াছে, নিঃশব্দ মৃদু চরণে বড় বউ আসিয়া আতা গাছতলায় বসিল, মাথায় অগোছাল এক রাশ রুক্ষ চুল আঁট করিয়া জড়াইয়া বাঁধা, দু একটা চুলের গুচ্ছ কপাল ও চোখে উড়িয়া পড়িতেছে। একটা উদাস অন্যমনস্ক ভাব। পাড়ার অনেক কর্ত্তা-গৃহিণীরা বিশালকে দেখিতে আসিয়াছেন। মোহিনী মাসখানেক হইল এইখানেই আছে, সে বিশালের কাছে বসিয়া রহিয়াছে। লোকে ঘর ভরিয়া যাওয়ায় ঘোমটা টানিয়া বড় বউ বাহির হইয়া আসিল।

তুলসী-তেঁতুলের ঘন জঙ্গলের মধ্য হইতে একটা মৃদু মিষ্ট গন্ধ আসিতেছে। বেলা শেষের রোদ গাছ-পালার মাথায় সোনা ঢালিয়া দিয়াছে। পাখীদের কত বিচিত্র সুরের ঝঙ্কার, বাবলা গাছটার মধ্যে বসিয়া পাখীটা ক্রমেই সুর উচ্চে তুলিতেছে···চোখ গেল—চোখ গেল—চোখ গেল। বেলা ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের জোর একটু বাড়িল, সমস্ত বাবলা, বাঁশবন, আম, কাঁঠাল, তেঁতুল ও সুপারী-নারিকেল গাছের মাথা দুলিতেছে, সেই বাতাস লাগিয়া নীচে ছোট সবুজ ঝোপ-জঙ্গলও মৃদু তরঙ্গময়।

বাঁশ-ঝাড়ের নীচের পথে হিমু দেখা দিল। হিমু কমলার দিদি, সেজ বউয়ের মেজ মেয়ে। হিমুর হাতে বড় একটা বাটী কলাপাতায় ঢাকা, বলিল, 'বড় বউদি, গুরু মা কই ?'

হিমুরা মেজ বউয়ের স্কুলে পড়িয়াছে। এখন বিবাহের পরে শ্বশুরবাড়ীই বেশীর ভাগ থাকে। কিন্তু গুরুমাকে ভোলে নাই ; হিমুই একদিন স্কুলে সেরা ছাত্রী ছিল। বিশালের অসুখে মেজ বউয়ের স্কুল এখন বন্ধ।

বড় বউ কথা বলিতে না বলিতে হিমু রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। পাড়ার গিন্নীরা দু'একজন রোগীর কাছ হইতে উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিয়াছেন, রান্নাঘরের সামনের উঠানে পিঁড়ি পাতিয়া পান ও দোক্তাপাতার গুঁড়া দিয়া মেজ বউ ও সরলা তাঁদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। হিমুকে দেখিয়া দাসেদের বাড়ীর বড় বউ বলিলেন, 'ও কি রে ?'

হিমু রান্নাঘরের ভিতরে বাটীটা রাখিয়া আসিয়া বলিল, 'মা মাছ পাঠিয়ে দিলে, আমাদের মস্ত বড় একটা মাছ এসেছে, অত কে খাবে ? তার পরে মেজবউয়ের কাণে কাণে গোটা দুই কথা বলিয়া হিমু চলিয়া গেল।

কথা কয়টি প্রায় সকলের কাণেই গেল এবং নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কেহ 'আহা', কেহ 'হে গুরু', কেহ 'পরমেশ্বর' ইত্যাদি খেদসূচক উক্তি করিল।

বড়-বউয়ের কাণে কথা-বার্ত্তার অনেকটাই আসিতেছে, যদিও বিশালের অসুখে স্বাভাবিক চিন্তা ছাড়া অতিরিক্ত কিছু তার মনে হয় নাই। তবু বিশাল শয্যাশায়ী, এ দুঃখ কম নয়। নবদ্বীপ যাইবার আগে দুই ভাইয়ে কলহ হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে ফিরিয়া আর বিশাল আগের মত সংসারে মিশিল না। প্রকাশ্যে বিবাদ বা পৃথক্ কিছুই হয় নাই, কিন্তু অন্তরের যথেষ্ট পরিবর্ত্তনই হইয়াছে। সুখেনের সঙ্গে বিশালের কথা খুব কমই হয়, নেহাৎ যেটুকু না বলিলে নয়। একসঙ্গে বসিয়া খাওয়া কোন দিন হয় না, রান্না-বাড়ীর দিকে একজনের সাড়া পাইলে আর একজন নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়ে। কেবল শ্যামলের কোন বালাই নাই, সে চিরদিন একরকম।

সূর্য্য অদৃশ্যপ্রায়। সোনালী আলো ডুবিয়া আবীর ঢালা সন্ধ্যার ছায়া নামিল। দু'একটা করিয়া পাখী উড়িয়া উড়িয়া ডালে আপন আপন নীড়ে গিয়া বসিতেছে—তেঁতুল গাছের মধ্যে হঠাৎ আর্ত্ত গভীর স্বরে কাণাচোখো পাখীটা ডাক ছাড়িয়া উঠিল—দুখ্—দুখ্—দুখ্।

বড়-বউ চমকিয়া উঠিল—ডাকিতে ডাকিতে পাখীটা উড়িয়া মাথার উপর দিয়া বাড়ী ছাড়াইয়া দূর-দূরান্তরের দিকে যাইতে যাইতে করুণ গভীর সুরে চিরস্থায়ী ব্যথা দিগ্‌দিগন্ত ছড়াইয়া দিতে লাগিল—দুখ্—দুখ্—দুখ্।

দত্ত-গিন্নী বলিতেছেন, 'দেখ্ মেজ-বউ বড়-জা'য়ের পাতে মাছ-টাছ বেশী করে দিস্ বাছা, বরাতে কি আছে কে জানে।'

মেজ-বউয়ের সভীত সুর শোনা গেল, 'কেন, কেন মাসীমা ? দিদির মতন মানুষের কি—'

'ও মা, সে কিছু বলা যায় কি ? ভগবান্ কার কপালে কি লিখেছেন। রায়দের মেজ-বউ অমন লক্ষ্মীর মতন চালচলন, কপালে সিঁথীয় টকটকে সিঁদূর, লালপেড়ে সাড়ি পরা—যখনই দেখ যেন এই মাত্র সিঁদূর পরেছে, মুখে পানটি, আর মেজকর্ত্তার নামে মরণ-বাঁচন, কোন্‌খানটায় তার কু-লক্ষণ ছিল বল দেখি ?'

পূব-পাড়ার শশী রায়ের মাসী—'তা বলেছ সত্যি, কমলির মার দেখ, চুল আঁচড়ান নেই, সিঁদূর নেই, বলে, 'সিঁদূর পরলে সিঁথে বড্ড চুলকোয়'—নোয় এনে অমনি একটু ছুঁইয়ে রাখে—রাঙ্গ পেড়ে কাপড় দু'চক্ষে দেখতে পারে না। ও-বছর পূজোর কি সুন্দর লালপাড় কাপড় দিলে—তা একদিন পরলে না, মেয়েকে দিয়ে দিলে। ঐ কালপাড় কাপড় বার মাস পরছে, তাও আবার চওড়া হলে পরবে না, তা বলতে নেই, সেজরায়—'

সন্ধ্যার ছায়ায় বড়-বউ বসিয়া আছে, সব কথাই তার কাণে আসিতেছে, কিন্তু মনোযোগ নাই বলিয়াই কথার ভাবটা মনে স্পর্শ করিল না।

আকাশে তারা ফুটিয়াছে দুই তিনটা। পাখীরা চলিয়া গিয়াছে, চড়ুই পাখীর মতন নাম-না-জানা একটু লম্বা ধরণের পাখী নিত্যই সকলের শেষে যায়, গায়ের রংটি ধূসর, পিঠে বুকে ও চোখের চার দিকে কালো কালো রেখা টানা। সুপারীর ছোট ছোট চারার লম্বা সবুজ পাতায় উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। এবার তাহারাও চলিয়া গেল। সোনালী সিঁদূরে আভা সম্পূর্ণ মিলাইয়া গিয়া শ্যাম ছায়া নিবিড় হইয়া নামিল। সুখেনের ঘর হইতে শঙ্খধ্বনি উঠিল। ধ্বনি মৃদু ও সন্তর্পণে। বিশালের অসুখের জন্য বাড়ীতে সব সময় একটা সতর্কভাব। আজ বৃহস্পতিবার, নিয়মিত লক্ষ্মীপূজার দিন, সরলা বিশালের মাঙ্গলিক কামনায় বিশেষ করিয়া পূজার আয়োজন করিয়াছে এবং স্নানশুদ্ধ হইয়া নিজেই পূজায় বসিয়াছে। [ক্রমশঃ

বিচিত্র জগৎ

সুয়েজ খাল

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহারা থেকে ধূলো ও উত্তাপ বহন করে উড়ছে মরুর ঝড়। সমুদ্রের ঢেউও হয়ে উঠেছে উত্তাল। বন্দর থেকে কিছু দূরে একটী যুগোশ্লাভ ষ্টীমার দাঁড়িয়ে। তার পাইলট বার-সমুদ্র থেকে তাকে খালের মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করছিল।

সুয়েজ-খালের ভূমধ্য-সাগরের মুখে দলে দলে কুলী জাহাজে কয়লা বোঝাই করিতেছে।

সামনেই সুয়েজ খাল। পোর্ট সৈয়দ থেকে পোর্ট তেউফিক্ পর্য্যন্ত দীর্ঘ খালটি সব সময়ে ঐ অঞ্চলের শ্রমিকদের গৌরবের বস্তু।

ব্রিটিশদের গৌরবের বস্তু বিশেষ করে। কারণ সুয়েজ খাল তাঁদের নিজস্ব বস্তু।

ফ্রেডরিক গ্রীনউড লর্ড বেকনস্‌ফিল্ডকে ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিজের বাড়ীতে। সেখানে তিনি লর্ড বেকনস্-ফিল্ডকে বললেন, 'খেদিভ ইসমাইলের সুয়েজ খালের শেয়ার-গুলো বিক্রী হবে, ইংলণ্ডের কিনে রাখলে ভাল হয়।'

তার প্রায় ছ' বছর আগে সুয়েজ খাল খুলেছে।

সম্রাজ্ঞী ইউজিনীকে নিয়ে পতাকা উড়িয়ে ফরাসী জাহাজ 'লেগল' এবং আরও আটষট্টিখানা জাহাজের দীর্ঘ শোভাযাত্রা সুয়েজখালের উদ্বোধন করেছিল। মধ্যে আরাবি পাশার বিদ্রোহের সময় চারদিন খালে যাতায়াত বন্ধ ছিল, নতুবা

...থেকে আজ পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল দিয়ে সমান ভাবেই জাহাজের যাতায়াত চলেছে।

তখন বেতারের যুগ নয়। কিন্তু ডিজরেলি সুয়েজ খাল সম্বন্ধে খবর শীঘ্রই সংগ্রহ করে ফেললেন। ১৮৭৫ সালের ২৩শে নভেম্বর খেদিভ ইসমাইলের ১,৭৬,৬০২ খানা শেয়ার তাঁর কাছে বিক্রয়ার্থ এল। ২৫শে নভেম্বর কায়রোতে শেয়ার কেনার কনট্রাক্ট সই হল। ২৬শে নভেম্বর শেয়ার-গুলো ব্রিটিশ কনসুলেট আফিসের হাতে এল; তখন 'পেলমেল গেজেটে' খবরটা প্রকাশিত হল, তার পূর্ব্বে এর বাষ্পও কেউ জানতে পারে নি।

যাতায়াত করছে, জগতের ব্যস্ততাপূর্ণ বৃহত্তর কর্ম্মজীবন সুয়েজখালের পথে প্রতিদিন তার চিহ্ন রেখে চলেছে।

মালবাহী জাহাজ ত' আছেই। তা ছাড়া আছে ভ্রমণ-কারীর দল, নিত্য নূতন দেশ দেখতে উৎসুক ধনীর দল।

সুয়েজখালের লাভের দিক্ এরাই যোগায়। ড্রেজার বোটগুলো দিন রাত বালি কেটে পথ পরিষ্কার করে রাখছে এদেরই জন্য।

ভ্রমণকারীদের মত জাহাজও সূর্য্যের আলো খুঁজে বেড়ায়। উত্তর আটলান্টিকের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কে যখন বরফ জমতে সুরু হয়, জাহাজের মাস্তুলে ও দড়াদড়িতে বরফ জমে যায়, তখন অনেক জাহাজ সুয়েজ-খালের পথে প্রাচ্যদেশের সূর্য্যা-লোকিত সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি দেয়।
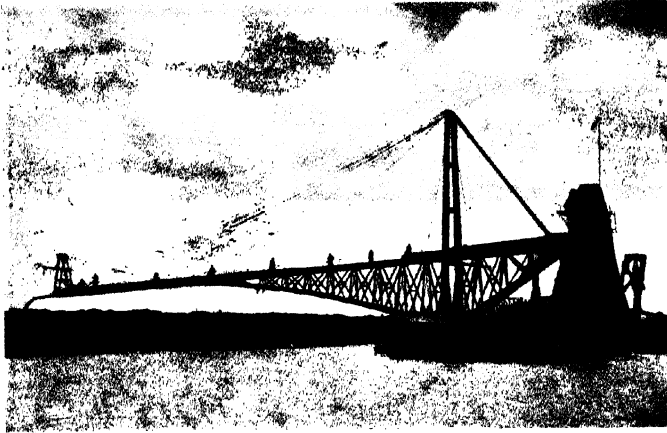
সুয়েজ খাল গভীর ও পরিষ্কার রাখিবার জন্য কয়েক প্রকারের 'ড্রেজ' ব্যবহৃত হয়। উপরের যন্ত্রটি খালের বালি ও মাটি তুলিয়া খালের ধারে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করে।

১৮৮৮ সালের সুয়েজ খাল সম্বন্ধে সর্ত্তসমূহের মধ্যে আছে, "এই খাল বাণিজ্য-জাহাজ বা যুদ্ধ-জাহাজের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত রাখিতে হইবে, তা সে জাহাজ যে জাতিরই হউক।" জিব্রাল্টার ও মাসাউয়ার মধ্যে জাহাজগুলি একই পথ ধরে যায়, কিন্তু তার পরে জাহাজের দল নিজের নিজের পথ ধরে, কেউ বা আফ্রিকার উপকূল ধরে যায় মোম্বাসা পর্য্যন্ত, অথবা মোম্বাসা, ডারবান কিংবা কেপটাউন পর্য্যন্ত। কেউ যায় বিষুবরেখা পার হয়ে সিডনি বা মেলবোর্ণে, পারস্য উপসাগর পার হয়ে কেউ যায় বুশীর বা বসোরা, অথবা বোম্বাই বন্দরে নোঙ্গর করে কিংবা হুগলী নদীতে ঢোকে, উসাং বন্দরে সাংহাই বন্দরের মালের জন্য অপেক্ষা করে।

সুয়েজ খাল একটা বালির খাল, লক্-বিহীন। দুটি সমুদ্র ও তিনটি হ্রদের সংযোগ সাধন করেছে। একদিকে কলকারখানাপূর্ণ ইউরোপ, অন্যদিকে প্রাচ্য দেশের কাঁচা-মালের পণ্যের মধ্যে সুয়েজ খাল একটি সংযোগ-সেতু।

সুয়েজখাল এক হিসাবে জাতের বাণিজ্যের মাপকযন্ত্র। কয়লা যাচ্ছে ইউরোপ থেকে এসিয়ার দিকে। নানা দেশ থেকে শস্যবোঝাই জাহাজ ইউরোপে ঢুকছে। ব্রহ্মদেশ থেকে পশম আসছে। নতুন তৈরী জাহাজ এসিয়ার দিকে যাচ্ছে। কয়লার বদলে তেলের এঞ্জিন নতুন জাহাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সৈন্যদল যুদ্ধজাহাজে বা সৈন্যবাহী জাহাজে

এই যে দীর্ঘ, চওড়া ডকওয়ালা, চারিধারে ঢাকা-ঢোকা জাহাজ, এটি আবাদান থেকে আগত নতুন ধরণের তৈলবাহী জাহাজ। আর একটি জাহাজের ওপরের ডেক থেকে সুসজ্জিত নরনারীর দল জাহাজের পাশের ক্ষুদ্র নৌকোয় আরব ফিরিওয়ালার কাছে দড়ি ও ঝুড়ির সাহায্যে

খেলো জিনিস কিনছে, এটা হচ্ছে মার্কিণ টুরিষ্টদের জাহাজ—যারা সারা পৃথিবী ঘুরে দ্রষ্টব্য স্থান দেখে বেড়ায়, নেপল্‌সের উপসাগর, টুটেন-খামেনের সমাধি, ভারতবর্ষের স্নানের ঘাট, হংকংয়ের সিঁড়ির মত রাস্তা, জাপানে গেইশাদের নৃত্য ইত্যাদি।

সুয়েজ খালের বন্দর পোর্ট সৈয়দে এ রকম দৃশ্য নিত্যই দেখা যায়।

সুয়েজের নিকটেই একটি প্রাচীন খালের চিহ্ন আজও বর্ত্তমান। এই খালটি ১৩০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ইজিপ্টের ফ্যারাও প্রথম আরম্ভ করেন এবং ফ্যারাও রামেশিস্ তাঁর রাজত্বকালের বহু প্রকার গুরুতর যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য কাজের মধ্যেও নীল নদীকে লোহিত সমুদ্রে যুক্ত করার এই কার্য্যটি চালিয়েছিলেন।

ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রাজা ও শাসনকর্ত্তা খাল কাটবার চেষ্টা করেছেন, কেউ কেউ কেটেছেন—যেমন রোমান সম্রাট ট্রাজান ও খলিফা ওমরের সময়ে পারস্য-সম্রাট দরায়ুসের তৈরী প্রাচীন খালের পুনঃ সংস্কার করা হয়, নবম শতকের শেষে আরবদের দেশে খাদ্য-শস্যের রপ্তানী বন্ধ করার অভিপ্রায়ে আল্ মনসুর সে খাল বুজিয়ে ফেলেন।

ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের মতে এই প্রাচীন খালটি স্যামিটিকসের পুত্র নেকো কর্ত্তৃক প্রথম কর্ত্তিত হয়। সম্রাট দরায়ুস খালটি আরও বড় করেন এবং নেকোর সময়ে আরব্ধ কার্য্য তাঁর সময়ে শেষ হয়।

হেরোডোটাসের মতে এই খালের দৈর্ঘ্য ছিল এত বড় যে, এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে পৌছতে চারদিন লেগে যেত। দুখানা সেকালের বজরাশ্রেণীর নৌকো দাঁড় বেয়ে পাশাপাশি যেতে পারত, এত চওড়া ছিল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ২২০০ বছর ধরে নানা দেশের লোক খাল তৈরী করেছে, ব্যবহার করেছে, তারপর অসংস্কৃত অবস্থায় ফেলে রেখেছে, নয় ত বুজিয়ে ফেলেছে, এই চলছে।

ডি লেসেপ্‌স্-এর খাল-কাটার প্রস্তাবে প্রথমে ইংরেজদের মত ছিল না। তাদের প্রস্তাব ছিল যে, খালের বদলে রেলওয়ে করে দিলেই ভূমধ্য-সাগরে থেকে লোহিত সাগরে যাওয়ার কাজ সহজ হবে।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, রেলওয়ে দ্বারা বর্ত্তমান খালের কাজ করতে গেলে প্রতি ঘণ্টায় দশখানা ট্রেন দিন
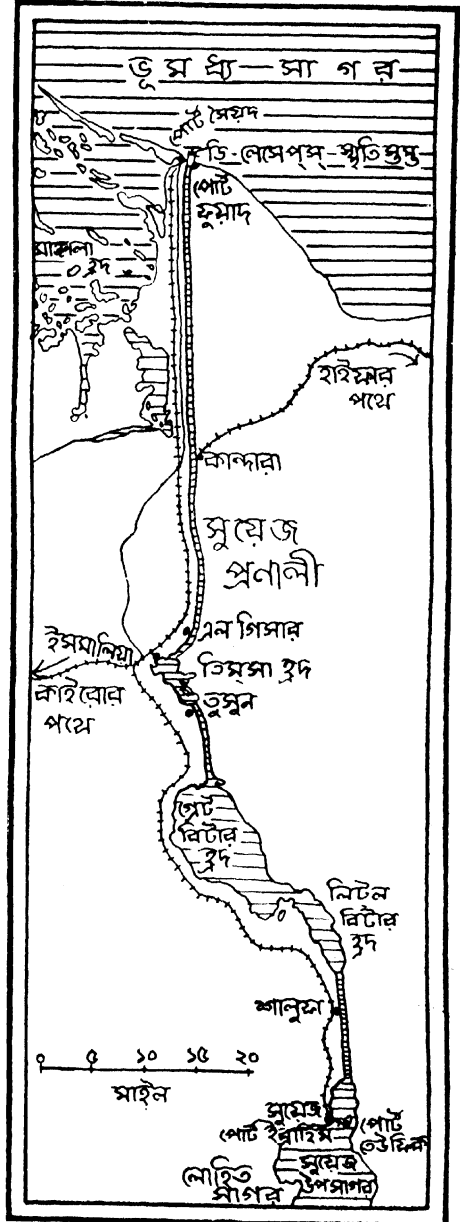
সুয়েজ খাল।

সমান ভাবে চালান দরকার হত। সে এক অসম্ভব ব্যাপার। খাল যদি বন্ধ করে দেওয়া হয়, ভারতবর্ষ ইংলণ্ড থেকে আরও ৫০০০ মাইল দূরে গিয়ে পড়বে।

নেপোলিয়ান যখন ইংরাজদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ কেড়ে নেবার মতলব করেন, তখন তিনি সুয়েজ খাল খননের সামরিক উপকারিতা বুঝে এই অঞ্চল জরীপ করবার জন্য লোক নিযুক্ত করেন।

নেপোলিয়ানের নিযুক্ত প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ল্যাপেয়র রিপোর্ট পাঠালেন, লোহিত সাগরের সাধারণ উচ্চতা ভূমধ্যসাগরের অপেক্ষা ৩৩ ফুট উঁচু, অতএব খাল খনন সম্ভব নয়,
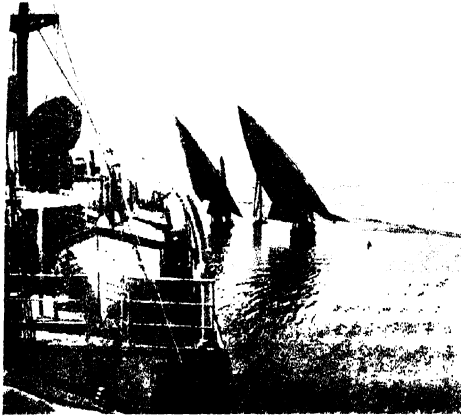
সুয়েজ খালে ছোট ছোট পালবাহী স্থানীয় নৌকা যাতায়াত করে।

সম্ভব হলেও বহু অর্থব্যয়-সাপেক্ষ। নেপোলিয়ান এতেই পিছিয়ে গেলেন।

ডি লেসেপ্‌স্ কিন্তু দমবার পাত্র নন। তবুও খাল-কাটার প্রস্তাবে কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো যায় নি—তাঁরা দেখলেন, খালের দুই মুখের উচ্চতার পার্থক্য এত বেশী যে, সে হিসেবে দেখলে প্রণালীকে জল-প্রপাতের মত মনে হবে।

অবশেষে ডি-লেসেপ্‌স্ ভাইসরয় মহম্মদ সৈয়দ পাশার নিকট আবেদন পাঠালেন। সৈয়দ পাশা বলে পাঠালেন, "খাল কাটার প্রস্তাবে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। আমি আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

এ ব্যাপারটা ঘটল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। দু' সপ্তাহের মধ্যে ডি-লেসেপ্‌স্ মিশর গবর্ণমেন্টের অনুমতি পেয়ে গেলেন। কিন্তু ডি-লেসেপ্‌স্ যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটি ঘট্‌ল না। লোকে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাল না। এমন সময়ও উপস্থিত হল, যখন অর্থাভাবে খাল কাটার কাজ বন্ধ রাখতে হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা গেল।

খাল যখন প্রথম কাটা হয়েছিল, তখনও সমুদ্রে ষ্টীম-পরিচালিত জাহাজ একাধিপত্য স্থাপন করতে পারেনি—ক্রমে যখন পাল-তোলা জাহাজ কোন-ঠাসা হয়ে গেল ষ্টীম-চালিত জাহাজের দ্বারা, তখনই প্রকৃত পক্ষে সুয়েজ খালের উন্নতির দিন সুরু হল।

ডি-লেসেপ্‌সকে যে ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল, তা শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, তখন আধুনিক যুগের উন্নত ধরণের যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হয় নি—আফ্রিকার প্রখর সূর্য্যতাপে শুধু গাঁতি, কোদাল ও ঝুড়ির সাহায্যে ৭৫ মাইল লম্বা খাল খনন করবার কষ্ট যে কি, তা সহজেই অনুমিত হবে।

মিশরের ভাইসরয় প্রথমে ২৫,০০০ কুলী খনন-কার্য্যের জন্যে যোগাড় করে পাঠিয়ে দেন; খাল কাটার জন্যে এরা খোরাকী এবং মজুরী পাবে এই ঠিক হয়। কিন্তু তিনি ফার্ম্মান্ জারি করবার পূর্ব্বেই তুরস্কের সুলতান এ প্রণালীতে কুলী সংগ্রহ বন্ধ করে দিলেন।

আধুনিক যুগের ভ্রমণকারীরা জাহাজের ডেক্ থেকে পোর্ট সৈয়দের দিকে চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন যে, পোর্ট সৈয়দে মিষ্ট জলের খাল ইস্মেলিয়ার দিক থেকে এসেছে। এই মিষ্ট জলের খাল কেটে আনা হয়েছে নীলনদ থেকে, ইস্মেলিয়ায় এসে এটা ইংরেজি T অক্ষরের আকারে সুয়েজ ও পোর্ট সৈয়দের দিকে চলে গিয়েছে।

ইস্মেলিয়া থেকে অনেক দূর পর্য্যন্ত এই মিষ্ট জলের খাল একটা প্রাচীন খাত বেয়ে অগ্রসর হয়েছে, এই খাত টুটেনখামেনের সময় থেকে মরুভূমির মধ্যে বর্ত্তমান আছে।

মরুভূমির মধ্যে জল সরবরাহ করে কৃষিকার্য্যের সুবিধা করার জন্যে প্রাচীন যুগে এই খাল কর্ত্তিত হয়েছিল। বাইবেলে বর্ণিত জোসেফ্ ও তাঁর পরিবারবর্গ এখানে বাস করেন।

প্রথম থেকে ডি-লেসেপ্‌স্‌-এর নজর ছিল শ্রমিকদের দিকে। ১৮৫৬ সাল থেকে ডি-লেসেপ্‌স্‌-এর যত্নে ও চেষ্টায় তাদের লভ্যাংশ পাবার ব্যবস্থা হয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানীর চাকুরীতে যারা ঢোকে, তাদের নানারকম সুবিধে আছে। কোম্পানী কখনও তাদের ডিস্‌মিস্‌ করে না। ঢুকবার সময় প্রত্যেককে একটা পরীক্ষা দিয়ে তবে ঢুকতে হয়। অনেক পাইলটকে দু'বছর শিক্ষানবিশী করতে হয়।

শ্রমিকদের সুবিধার জন্য পোর্ট ফুয়াদ নামে নতুন সহর তৈরী হয়েছে পোর্ট সৈয়দের পূর্ব্বতীরে মরুভূমির মধ্যে। সেখানে শ্রমিকদের জন্যে বাড়ী ও বাগান ইত্যাদি কোম্পানী তৈরী করে দিয়েছেন, যদিও শ্রমিকরা সেখানে থাকা অপেক্ষা পোর্ট সৈয়দে থাকতে বেশী ভালবাসে, কারণ, সেখানে থিয়েটার আছে, সিনেমা আছে।

সুয়েজ খাল কোম্পানী যদিও মিশরীয় আইন অনুসারে মিশরেই চুক্তিবদ্ধ, তবুও কোম্পানীর অফিস্‌ প্যারীতে অবস্থিত। প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারী ফরাসী, বত্রিশজন ডিরেক্টরের মধ্যে একুশ জন ফরাসী।

সাধারণ কর্ম্মচারীদের মধ্যে নানাজাতীয় লোক আছে—ক্যানাল ষ্টেশনের কর্ত্তা একজন কর্সিকান। মিষ্টজলের খাল পরিচালনা কোম্পানী অন্যলোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছে, কেবল ষ্টেশনে ষ্টেশনে জল ফিল্‌টার করবার ভার আছে কোম্পানীর ওপর।

কোম্পানীর প্রধান কাজ হচ্ছে খাল জাহাজ চলাচলের জন্যে খোলা রাখা—যাতে দু'ধারের মরুভূমির বালি উড়ে পড়ে খাল বুজিয়ে না দেয়, সে জন্যে ড্রেজার বোটগুলি সর্ব্বদা খাটান। খালের ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের ওপর এ সমস্ত কাজের ভার আছে।

ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টের এঞ্জিনিয়ারেরা প্যারীর পলিটিক্‌নিক্‌ স্কুলে সুশিক্ষিত। পোর্ট সৈয়দে এই ডিপার্টমেণ্টের বড় কারখানা আছে, সেখানে খাল-সংক্রান্ত সকল প্রকার যন্ত্র মেরামত হয়, ড্রেজার বোটের দাঁত-ওয়ালা কোদাল যখন ভোঁতা হয়ে যায়, তখন সেগুলোতে শান দেওয়া এই ডিপর্টমেণ্টের একটি বিশেষ কাজ। ট্রাফিক্‌ ডিপার্টমেণ্টের কাজ এর চেয়ে অনেক সহজ। জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করা ও পাইলট যোগান এদের কাজ। এই ডিপার্টমেণ্টের লোক সাধারণতঃ ফরাসী নৌ-বিভাগ থেকে সংগ্রহ করা হয়।

ব্রিটিশ পোষ্ট অফিস্‌ প্রথমে বছর দুই সুয়েজ খাল দিয়ে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করতে রাজি হয় নি। তাদের ধারণা ছিল, এতে অনেক সময় নষ্ট হবে। কিন্তু এখন দেখা গিয়েছে, পূর্ব্বের অনুমান সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, পোর্টসৈয়দ ও পোর্ট-তেউফিকের মধ্যে জাহাজ খুব দ্রুত চলাচল করতে পারে।
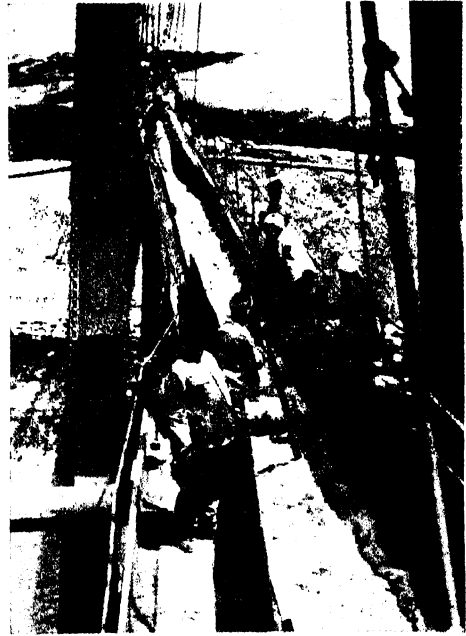
মরুভূমির বালি ক্রমাগত সুয়েজ খালে উড়িয়া আসিয়া পড়ে—ক্রমাগত বালি তুলিয়া খাল যাতায়াতের উপযোগী রাখিতে হয়। ড্রেজারের এই অংশ শুষিয়া-তোলা বালি জলস্রোতের সাহায্যে তীরে নিক্ষেপ করে।

কোম্পানীর মোটরবোট আড়াই ঘণ্টার মধ্যে এই দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে।

সুয়েজখাল পার হবার সময়ে সাধারণতঃ দুজন পাইলট প্রত্যেক জাহাজ চালনা করে। একজন অর্দ্ধেক পথ নিয়ে যায়, আর একজন বাকী অর্দ্ধেকটুকু নিয়ে যায়। তবে এরা নিজেরা জাহাজ চালায় না। কাপ্তেনকে পরামর্শ দেয় মাত্র।

ক্যানালের ধারে বর্ত্তমানে যে সব টাউন আছে, তাদের মধ্যে সুয়েজ বহুদিন থেকে বর্ত্তমান।

সুয়েজ আগে ছিল একটি ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কার আরব গ্রাম। এখন তেমনি অপরিষ্কার ও কুশ্রী একটি আরব টাউন।
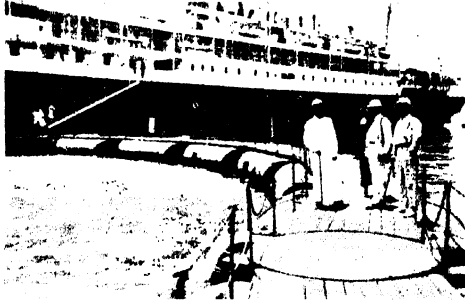
নৌকায় নামা-উঠার পরিবর্ত্তে এখন এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সুয়েজ সহরে আজকালকার ধরণের দু'একটা বাড়ী ভাড়ার জন্যে তৈরী হচ্ছে। মিষ্টজলের খালের কল্যাণে ঘোর মরুভূমি হলেও এখানে ফুল, ফল, শাকসব্জি উৎপন্ন হয়।

সুয়েজ দিগন্তপ্রসারী মরুভূমির মধ্যে। কিছুদূরে লোহিত সাগরের বক্রাকৃতি তীরভূমি, পিছনে আফ্রিকার উষর পর্ব্বতমালা, মাঝে কতকগুলো তেলের ট্যাঙ্ক এবং কিছুদূরে পোর্ট ইব্রাহিমের কারখানার লম্বা লম্বা চিমনি।

আর একটি ছোট টাউন হচ্ছে পোর্ট তেউফিক্। ক্ষুদ্র সহর, সুয়েজ খালে ঢুকবার মুখেই অবস্থিত। খালের ধারে অ্যাভিনিউ হেলেন বলে একটি রাস্তা, এই একমাত্র বড় রাস্তা গোটা সহরের মধ্যে। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, এগুলি ছায়ার জন্যে রোপণ করা হয়েছিল এই মরুভূমির দেশে।

জলের ধারে ধারে বেঞ্চি পাতা, দু'একজন আয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে বার হয়েছে। পোর্ট তেউফিক আসলে বন্দর নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাইলট না আসে, ইউরোপগামী জাহাজগুলো এখানে ততক্ষণ অপেক্ষা করে।

পোর্ট ইব্রাহিমও একটা ক্ষুদ্র টাউন। এখানে তেল চোলাই করবার কয়েকটি কারখানা আছে। জাহাজের তেল এখান থেকে সরবরাহ করা হয়। পোর্ট ইব্রাহিমের অধিবাসী অধিকাংশ এই তেল-চোলাই কারখানার শ্রমিক ও কর্ম্মচারী।

সুয়েজ টাউনের পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বে মক্কাযাত্রীদের একটি তাঁবু ফেলবার স্থান ছিল। তাদের মধ্যে ইজিপ্ট, সিরিয়া, তুরস্ক, নানা দেশের লোক থাকতেন। আজকাল সে স্থান শূন্য পড়ে থাকে, মাঝে মাঝে হয় ত এক আধজন অশ্বারোহী বেদুইনকে দেখা যায়।

সুয়েজ খালের পথে দুটি লবণাক্ত হ্রদ পড়ে—লেক-বিটার বা তিক্তহ্রদ ও তমসাহ্রদ,—তিক্তহ্রদ দুটি, বড় ও ছোট। তমসাহ্রদের তীরে ইসমেলিয়া নামে ক্ষুদ্র টাউন। এই টাউনে বালুর ঝড় বড় বেশী, উভয়দিকের মরুভূমি সর্ব্বদাই চাইছে সহরকে বালুস্তূপের মধ্যে পুঁতে ফেলতে। অধিবাসীরা প্রাণপণে চেষ্টা করছে মরুভূমিকে দূরে রাখতে। মানুষ ও মরুভূমির মধ্যে এখানে সর্ব্বদাই একটা যুদ্ধ চলেছে।

ইসমেলিয়া সহরের উদ্যানগুলি সারা সুয়েজ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ। বাগানের মধ্যে সর্ব্বত্রই বোগেনভিলিয়া গাছ বেশী দেখা যাবে। মিশরের শাসনকর্ত্তা ইস্মাইল পাশা এখানে একটা প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন দু'লক্ষ ডলার ব্যয়ে। সুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত হবার পরে তিনি এখানে একটি বৃহৎ ভোজ-উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। সে প্রাসাদের বর্ত্তমানে কোন চিহ্ন নেই।

পোর্টসৈয়দে মোটরবোটের জন্য পেট্রোল সরবরাহ করিবার ব্যবস্থা আছে।

বিশ্ব-সৃষ্টি

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

মানব-সভ্যতা হ'তে যে-ভদ্রতা বর্ব্বরতা আনে,
দেয় ব্যথা স্বার্থের সংঘাতে শত দুর্ব্বলের প্রাণে
ব্যাপিয়া সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি করে তীব্র অন্ধকার,
মানব-রুধিরে মন্ত্র'পাঠ করে মৃত্যু বন্দনার
যন্ত্র-দানবের সনে পৈশাচিক পুষ্প উপচারে
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

মিথ্যার ভাষণে তার ধরণীতে হয় ধর্ম্ম লোপ,
স্বেচ্ছাচারে জাগে নিত্য মানবের মৃত্যু অশ ক্ষোভ,
বিপ্লবের সূর্য্য নিয়া ভাগ্যাকাশে রক্ত উষা জাগে
নটরাজ করে নৃত্য; অন্নপূর্ণা দ্বারে ভিক্ষা মাগে,
অভয় মঙ্গলশঙ্খ নাহি বাজে যুগের মন্দিরে
সভ্যতার ধ্বংস হোক্ হে শতাব্দী কালসিন্ধু-নীরে।

শব্দের সমষ্টি ভিন্ন নহে কিছু নিখিল জীবন,
সে শব্দ কদর্থ করি' অকল্যাণ আনি' অনুক্ষণ
যে সভ্যতা দিলনা ক' মহত্ত্বের কোন পরিচয়
ক্ষুদ্র আমিত্বের লাগি, যে সভ্যতা পাপের সঞ্চয়
করিতেছে উগ্রতম অসত্যের ক্রুদ্ধ অহঙ্কারে
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

সত্যের শ্রীক্ষেত্রে হেরি রথযাত্রা চলেছে মিথ্যার,
ভণ্ডের মৃদঙ্গ বাজে, সংকীর্ত্তন করি' নীচতার
আত্মপ্রচারকদল চলিতেছে পঙ্গপাল সম,
কু-উদ্দেশ্য প্রতিচিত্তে অপবিত্র রহে ঘৃণ্যতম।
দ্ব্যর্থশব্দ নিয়ে তারা করিতেছে সংসারে চাতুরী,
যাহারা বোঝে না কিছু তাহাদের বক্ষে হানে ছুরি।

দৃষ্টি-বিভ্রমের পথে যুক্ত আছে শতেক যুবতী
তাদের মিটাতে ক্ষুধা,নিত্য যারা সমাজের ক্ষতি
করিতেছে নেতারূপে, রাগ দ্বেষ নহেক বর্জ্জিত,
দর্শন-বিজ্ঞান নীতি যারা আজি করেছে বিকৃত,
বিশ্বের কলঙ্ক তারা, তবু হায়! নির্ব্বোধ মানব-
সম্প্রদায় করিতেছে তাহাদের জয় শঙ্খরব।

সাম্যের সঙ্গীত যারা গাহিতেছে এ সভ্য জগতে
তাহারা বপন করে অসমতা জীব-যাত্রা-পথে
দ্বন্দ্বের সৃজন করে সমরের ডাকে হুতাশনে
ঢাকিয়া মারণ-অস্ত্র ভদ্রতার ছদ্ম আবরণে।
শান্তির লাগিয়া যারা সম্মেলন করিতেছে নিতি
তাহাদের কণ্ঠে ওঠে বারম্বার সংগ্রামের গীতি।

আজিকার মৃত্তিকার নাহি রস, নাহি গন্ধ ফুলে,
বহেনা ক' সমীরণ শান্তি-স্নিগ্ধ পল্লী-কুঞ্জে দুলে;
নদীর প্রবাহধারা চিরসুপ্ত শুষ্ক মরুভূমে,
শস্য নাহি, শষ্প নাহি, পৃথ্বী কাঁদে উগ্র চিতাধূমে।
যাহাদের মূর্খতার কূটচক্রে এই চিত্র রাজি
রয়েছে সম্মুখে মম, তাহাদের ধ্বংস করো আজি।
ধ্বংস করো সভ্যতার গর্ব্বোদ্ধত হিমাদ্রি-শিখর,

আগ্নেয়গিরির সম তুমি জাগো বিশ্বের ভিতর,
তোমার গৈরিক-স্রাবে ভস্ম হোক পাপের ফসল,
আত্ম-সমর্পণহীন ধ্বংস হোক, নীরব নিশ্চল
হোক যারা কোন দিন চিত্ত স্থির করেনি ভুলিয়া,
মিথ্যার কালিমা মাখি ঘুরিয়াছে সংহতি গঠিয়া।

সভ্য জগতের চেয়ে বন্যদ্বীপ অসুন্দর নহে,
আদিম মানব সেথা সারল্যের প্রীতিপুণ্যে রহে
শ্যামল কুটির মাঝে শান্তিময় মুক্তির বাতাসে;
সভ্য জগতের দূরে শিশুসম আরণ্যক হাসে।
বন্দীর শৃঙ্খল সেথা বাজে নাক লৌহ কারা গেহে,
সবলের নিষ্পেষণে নাহি রক্ত ঝরে নরদেহে।
দানবীয় চরমতা সভ্যতার হেরিয়াছি এবে
আর কেন হে শতাব্দী! ধ্বংসরূপী ওঠ বিশ্বরোপে
ধ্বংসের পশ্চাতে রহে সনাতন সৃষ্টির নির্ঝর,
আবার হাসিবে বিশ্ব নন্দনের সম নিরন্তর।

যে সভ্যতা-ভদ্রতায় ক্ষিপ্ত-পৃথ্বী অস্ত্রের ঝঙ্কারে,
হে মোর শতাব্দী আজি ধ্বংস করো—ধ্বংস করো তারে।

উলট-পুরাণ

—শ্রীঅমলা দেবী

এদিকে রামচরণ যাওয়া অবধি সুশান্ত দরজার দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিল। আভার নিজহস্তের চা পরিবেশন কদাচিৎ তাহার ভাগ্যে ঘটিলেও, আজ তাহার মন বলিতেছিল, আভা আজ নিজে চা লইয়া আসিবে। কাল সে কাঁটা বিঁধিয়াছে, করুণাময়ী আজ কোমল হস্তে সে কাঁটা নিশ্চয়ই তুলিয়া লইবে।

হঠাৎ পদশব্দ শুনিয়া সুশান্তর বুকের রক্ত 'ছলাৎ' করিয়া উঠিল। পিছনে চাহিয়া দেখিল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সমাকীর্ণ মুখ লইয়া রামচরণ চা লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিতেছে। সুশান্তর রক্তের চাপ কয়েক ইঞ্চি কমিয়া আসিল; মনে হইল, মাথার এবং বুকের ভিতরটা খালি হইয়া যাইতেছে।

একঢোক গরম চা গিলিয়া সুশান্ত সম্বিৎ লাভ করিল। রামচরণ তখন চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তামাকের কড়া-ঘন-গন্ধ, ঘরের বাতাস তাহার আগমনের সাক্ষ্য দিতেছে।

দামোদর বাবু কহিলেন, 'সুশান্ত বাবুর একটা গান হোক্।'

*   *   *   *

পরদার ওপারে দাঁড়াইয়া আভা ও সুনন্দা। পর্দার ফাঁক দিয়া দেখাইয়া আভা কহিল, 'উনিই আমাদের প্রেমোন্মাদ বাবু।'

সুনন্দা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'ইনি যে আমাদের সুশান্ত বাবু!'

আভা কহিল, 'ওঁকে তুমি চেন?'

'খুব চিনি! উনি আমার দিদির দেওর।'

অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া আভা কহিল, 'তাই না কি?'

সুনন্দা প্রশ্ন করিল, 'উনি দিন আসেন?'

'হ্যাঁ, প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত গানবাজনা করেন।' সুনন্দা কহিল, 'ভাই এখানে ভারী গরম। চল ও ঘরে গিয়ে বসিগে', বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুনন্দাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া আভা কহিল, 'ভাই সুনন্দা! সুশান্ত বাবুর সম্বন্ধে অনেক যা'তা' তোমার কাছে বলেছি, কিছু মনে কর না।' সুনন্দা নীরস কণ্ঠে কহিল, 'মনে করবার কিছু তো নেই, ভাই!' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমাকে যদি কোন পুরুষমানুষ এ রকম করে অপমান করত তা'হলে (একটু উত্তেজিত হইয়া) আমি কোনদিন তাকে বাড়ী ঢুকতে দিতুম না। ছিঃ লেখাপড়া শিখে, ভদ্রলোকের ছেলে এত নীচ হয়, তা আমি জানতুম না। অথচ জামাইবাবু কত ভদ্র! কত পবিত্র তাঁর মন! মেয়েদের উপর কত তাঁর শ্রদ্ধা।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আমার বড় দিদিই এর জন্যে দায়ী।'

বিস্মিত কণ্ঠে আভা কহিল, 'কেন ভাই?'

'কোন দিন নিজে শাসন করেন নি, কাউকে শাসন করতে দেন নি।'

আভা কহিল, 'কেন, ওঁর বাপ, মা?'

'ওঁর বাবা মা তো নেই! আমার দিদিই এক রকম ওঁকে মানুষ করেন।'

'তোমার দিদি বুঝি ওকে খুব স্নেহ করেন?'

'মা বোধ হয় নিজের ছেলেকে এতখানি স্নেহ করে না। কিন্তু স্নেহের সঙ্গে শাসনও ত দরকার।'

'তোমার জামাইবাবু শাসন করেন না?'

'জামাইবাবু নিজের কাজ নিয়েই এত ব্যস্ত যে, সংসারের কিছু লক্ষ্য করবার সময় পান না। আর পেলেও বড়দিদি ওঁর দোষ ঢেকে রাখেন। এই দেখ না দিন রাত্তির করে ঘরে ঢুকছেন, আমি কতদিন দিদিকে বলেছি, ওঁকে নিষেধ করতে, করেন নি; জামাইবাবুকে বলতে বলেছি, তাও বলেন নি। অথচ যত অপদার্থ তুমি ওঁকে মনে করেছ, তা' উনি নন। এম. এ.-তে ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাশ পেয়েছেন, ল'-এতেও ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট, ওঁর পক্ষে কিছু বিচিত্র নয়।'

সুনন্দার উত্তেজনার কারণ নির্ণয় করিতে আভার দেরী

হইল না। মুচকি হাসিয়া কহিল, 'তুমিই তো সুশান্ত বাবুর ভার নিলে পার ভাই।'

সুনন্দা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'আমি কে ভাই, আমি কেন নিতে যাব।'

হাসিয়া আভা কহিল, 'কেন? তুমি ওর আত্মীয়, হয় ত দুদিন পরেই—'

'বাজে কথা ব'লো না, আভা।' কথাটা উল্টাইয়া দিয়া সুনন্দা কহিল, 'ড্রাইভার তো এখনও এল না ভাই! রাত আটটা বেজে গেল। প্রণব বাবু হয়ত এসে বসে আছেন।'

প্রণব বাবু কলেজের ফিলজফির প্রফেসার। ঠিক এমনি সময়ে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। সুনন্দা কহিল, 'এই যে এসেছে, ভাই। ভদ্রলোক অনেকদিন বাঁচবে··· কাকাবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া উচিত, কিন্তু যে রকম ব্যস্ত হয়ে আছেন।'

আভা কহিল, 'চল না দেখা করিয়ে দিচ্ছি।'

সুনন্দা যাইতে উদ্যত হইলে আভা কহিল, 'ভাই একটু দাঁড়াও, (ড্রয়ার হইতে একটি চিঠি বাহির করিয়া) তোমার চিঠি নিয়ে যাও'। সুনন্দা বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কার চিঠি ভাই?'

আভা মুচকি হাসিয়া কহিল, 'তোমার বরের। ঠিকানা ভুল হয়ে আমার কাছে পৌঁছেছিল।' সুনন্দার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল, সে কৃত্রিম কোপের সহিত কহিল— 'আভা দুষ্টুমি হচ্ছে!' কিন্তু চিঠিখানি ব্লাউজের মধ্যে ঢুকাইয়া রাখিল।

সুশান্তর গানের মাত্রা চৌদুন হইতে আট দুনে উঠিয়াছে এবং দামোদরবাবুর বাজনা গানের সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছে। তাঁহার দুই চক্ষু মুদ্রিত, মস্তক দোদুল্যমান, মুখে হাস্যকর ভঙ্গী।

আভা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, 'বাবা!' বাদক ও গায়ক কাহারও কানে সে ডাক পৌঁছিল না। আভা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা!'

দামোদর বাবুর দুই চক্ষু উন্মীলিত হইল, বাজনা বন্ধ হইয়া গেল, মুখের ভাব স্বাভাবিক হইয়া আসিল। তিনি স্থির-মস্তিষ্ক হইয়া কহিলেন, 'কি মা?'

গান বন্ধ করিয়া, ঘাড় ফিরাইয়া আভাকে দেখিতে গিয়া তাহার পাশে সুনন্দাকে দেখিয়া সুশান্তর দুই চোখ কপালে উঠিল এবং ঘাড় ফিরাইতে ভুলিয়া গিয়া সে তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আভা বক্রদৃষ্টিতে তাহাকে একবার দেখিয়া লইয়া দামোদর বাবুকে কহিল, 'সুনন্দা যাচ্ছে।'

দামোদর বাবু কহিলেন, 'যাচ্ছ মা? বেশ। আবার একদিন এস।'

সুনন্দা সুশান্তর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া দামোদর বাবুকে কহিল, 'আমি যাচ্ছি কাকা বাবু।' বলিয়া নমস্কার করিয়া কহিল, 'আভাকে নিয়ে আমাদের ওখানে একদিন যাবেন, দিদি বলে দিয়েছেন।'

দামোদর বাবু কহিলেন, 'নিশ্চয় যাব মা। নিশ্চয় যাব।'

আভা ও সুনন্দা চলিয়া গেল। সুশান্ত নির্বোধের মত তাকাইয়া রহিল।

বলা বাহুল্য, ইহার পর আর গান জমিল না। কিছুক্ষণ পরে সুশান্ত বিদায় লইল।

রাস্তায় নামিয়া দুশ্চিন্তায় ও আশঙ্কায় সুশান্তর কপোল বারংবার ঘর্মাক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সুনন্দা আভার সহিত দেখা করিয়াছে ও তাহার সম্বন্ধে সকল কথা শুনিয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণ রান্নাঘরে একান্তে বসিয়া একে একে সমস্ত কথা বৌদিদির কর্ণগোচর করিতেছে। কাজেই ইহার পর বাড়ী যাইবার কোন প্রয়োজন আছে কি? বৌদিদির সামনে আসামী হইয়া দাঁড়াইয়া সুনন্দার মুচকি হাসির খোরাক যোগানর চেয়ে মোটর চাপা পড়িয়া মরা ভাল। কিন্তু রাস্তায় মোটর ছিল না। কিছুক্ষণ পরে একটা আসিল বটে, সুশান্তর খুব কাছ দিয়া গেলও, কিন্তু সুশান্ত লাফ দিয়া সরিয়া পড়ায় মরা হইল না। কিন্তু এদিকে তাহাদের বাড়ী প্রতি পদক্ষেপে নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অতএব উপায়? সহসা সুশান্তর মস্তিষ্কের মধ্যে বিজলী খেলিয়া গেল। আরে ছিঃ। নিছক মিথ্যার মাল-মসলা দিয়া যাহাকে একদিন বড় বড় সেসনের মামলা গাঁথিতে হইবে, সে এই সামান্য ব্যাপারটাকে সামলাইতে পারিবে না? সে বৌদিদিকে বলিবে, 'তাহাদের ক্লাবের সান্ধ্য বৈঠকে দামোদর বাবু যোগ দিয়াছিলেন। তাহার প্রবন্ধ শুনিয়া

চমৎকৃত হইয়া তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া যান। সেখানে তাঁহার অনুরোধে তাহাকে দু'চারখানা গান গাহিতে হয়।' ইহা ছাড়া অন্য কোন কথা উঠিলে সে সাফ অস্বীকার করিবে।

প্রশান্ত বাবু অফিস-ঘরে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার দরজার সামনে দিয়া সুশান্তকে ঘরে ঢুকিতে হইবে। সুশান্ত বার কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই প্রশান্ত বাবু মুখ তুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া ডাক্ দিলেন, 'শানু।'

সুশান্ত, 'আজ্ঞে, যাই' বলিয়া সুবোধ বালকের মত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইল। প্রশান্ত বাবু কহিলেন, সেই sessions caseটা বোধ হয় তোকেই চালাতে হবে। কাল সকাল থেকে আমার কাছে বসে তৈরী করতে আরম্ভ কর'—বলিয়া আবার নিজের কাজ করিতে লাগিলেন। সুশান্ত কহিল, 'আজ্ঞে-হাঁ।,' তার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল।

দোতলায় উঠিয়াই সুশান্ত দেখিল, বারান্দায় আসন পাতিয়া বসিয়া বৌদিদি ও সুনন্দা মৃদুকণ্ঠে আলাপ করিতেছে। দেখিয়া তাহার বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। তাহার পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া, তাহাকে দেখিতে পাইয়া বৌদিদি কহিলেন, 'ঠাকুরপো, এদিকে এস।'

সুশান্ত কাছে আসিয়া সুনন্দার মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সেখানে কালবৈশাখী ঘনাইয়া উঠিতেছে। মুখের ভাব যথাসাধ্য সহজ করিয়া সুশান্ত কহিল, 'কি বৌদিদি?' তার পরই কহিল, 'ভারী তেষ্টা পেয়েছে,' বৌদিদি সুনন্দাকে কহিলেন, 'এক গেলাস জল আন্ত রে।'

সুনন্দার পরিত্যক্ত আসনে সুশান্ত বসিয়া পড়িল। বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমাদের সভা হয়ে গেল?'

'হাঁা বৌদিদি।'

'প্রবন্ধ শুনে সবাই খুব খুসী হয়েছে তো?'

'ওঃ খুব! এক ভদ্রলোক তো আমাকে ছাড়তে চাইলেন না—সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়ে ছাড়লেন।'

'তাই না কি!'

এমন সময়ে সুনন্দা জল লইয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বৌদিদি কহিলেন, 'শুন্‌ছিস্ সুনি! ঠাকুরপোর প্রবন্ধ শুনে খুসী হয়ে এক ভদ্রলোক ওকে বাড়ী ধরে নিয়ে গিয়ে চা খাইয়েছেন।'

সুনন্দা সুশান্তর হাতে জলের গেলাসটা দিয়া শ্লেষের সহিত কহিল, 'তাই না কি, সুশান্ত বাবু! আমাকে প্রবন্ধটা দেবেন তো একবার; বুঝতে না পারি পড়ে দেখব।'

সুশান্ত সুনন্দার মুখের দিকে না তাকাইয়া জল খাইতে খাইতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহাকে প্রবন্ধটা পড়িতে দিবে।

সুশান্ত কহিল, 'জামা-কাপড় ছেড়ে গা-হাত ধুয়ে আমি আসছি বৌদি! তুমি ততক্ষণ খাবার ঠিক কর, খিদে পেয়েছে।'

খাবার কথা বলিলে বৌদির সন্তোষের সীমা থাকিত না, সুশান্ত তাহা জানে।

বৌদিদি কহিলেন, 'আচ্ছা, এস ভাই—চল সুনন্দা।'

তেতলায় উঠিয়া সুশান্ত অনেকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা তাহা হইলে বৌদিকে এখনও কিছু বলে নাই। হয়তো না বলিতেও পারে। দুপুরের কথাও সে চাপিয়া গিয়াছে। আভাও তো তাহার চিঠির কথা দামোদর বাবুকে জানায় নাই। লেখা-পড়া শিখিয়া মেয়েগুলোর আর কিছু না হোক, কিঞ্চিৎ common sense-এর উদয় হইয়াছে বলিতে হইবে।

রাত্রে খাওয়ার সময়ে সুনন্দাকে দেখা গেল না। খাওয়ার পরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া সুশান্ত দেখিল, টেবিলের উপর পেপার-ওয়েট চাপা দেওয়া একটা চিঠি। চিঠিটা খুলিয়া দেখিয়াই তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল, এ তাহারই চিঠি, আভাকে লেখা—'আভা! আমি তোমাকে ভালবাসি—' লেখকের নাম হিসাবে সে শুধু 'সু' লিখিয়াছিল, কিন্তু তাহার স্থানে পরিষ্কার মেয়েলী হাতে লেখা রহিয়াছে—'প্রেমোন্মত্ত সুধেন।' শুধু ইহাই নহে, চিঠির এক পার্শ্বে চমৎকার ছোট পেন্সিলে আঁকা একটি ছবি—একটি হনুমান যুক্ত-পদ ও যুক্ত-কর হইয়া খাড়া দণ্ডায়মান; তাহার সু-দীর্ঘ লেজটি বাঁকিয়া উঠিয়া তাহার নিজের গলদেশে বহু পাকে জড়ান; তাহার মাথা এক পাশে কিঞ্চিৎ হেলান; চক্ষে কটাক্ষ, বদনমণ্ডলে গদগদ ভাব; জিহ্বা কিঞ্চিৎ বাহির হইয়াছে ও দুই কষ দিয়া লালা ঝরিতেছে; মুখের সম্মুখে কিছু দূরে, কণ্টকময়

ফল (চিত্রকর খুব সম্ভব আনারস আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছে।) ও মাথার পশ্চাতে এক গুচ্ছ কদলী। সকলের চেয়ে মর্ম্মান্তিক ব্যাপার এই যে, হনুমানের মুখের সহিত সুশান্তর মুখের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। চিঠির নীচে সুনন্দার হাতের লেখা, 'কাল বড়দিদিকে ও জামাই বাবুকে সব বল্‌ব, অবশ্য যদি এর মধ্যে মত পরিবর্ত্তন না হয়।'

ছবি দেখিয়া ও সুনন্দার বক্তব্য পাঠ করিয়া সুশান্তর মাথা গরম হইয়া উঠিল। বিড় বিড় করিয়া কহিল, 'বল্‌গে যা! বয়ে গেল। ছিনে জোঁক, স্পাই কোথাকার!' খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—'আভা মেয়েটাতো আচ্ছা প্যান্‌পেনে দেখছি! কি এমন লিখেছি! —"ভালবাসি"—সে তো আজকালকার দিনে ছেলেরা হরদম্ মেয়েদের লিখছে, বলছে। তাতে কাউকে তো এমন তুফান তুল্‌তে দেখিনি। আর এমন যদি ঠুনকো মন, তো হাই-হিল্ জুতো পরে, বেণী দুলিয়ে কলেজে না যেয়ে বোর্‌খা এঁটে ঘরের কোণে বসে থাকলেই পারে'। ঘন ঘন পায়চারী করিতে করিতে কহিল—'যেমন আমি লিখেছি, তেমন আমাকে তো পাগল বলেছে। আমি তাতে কিছু মনে করছি, না তাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছি', কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, 'হনুমান! আমি হনুমান!' হাত নাড়িয়া কহিল—'এই হনুমান জুটলে হয়, হবে কোন্ হোঁদল-কুৎকুতের সঙ্গে বিয়ে মজাটা বুঝবে তখন!'—তার পর সুনন্দার উদ্দেশে কহিল—'ধন্যি মেয়ে বাবা! গ্রেহাউণ্ডের চেয়ে সাংঘাতিক! খুঁজে খুঁজে বের করেছে!......বলে দেব। দিগে যা। আমি লিখেছি তার প্রমাণ কি?' চিঠিখানা কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া 'প্রমাণ তো এই, দিলাম তার নিকুচি করে। সাফ্ মিথ্যে বলে দেব, ও নিজেই হিংসুটে, মিথ্যাবাদী বনে যাবে।'

কিন্তু ক্রমে মাথা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে সুশান্ত বুঝিতে পারিল, এরূপ আস্ফালনে কোন ফল হইবে না। সুনন্দা যদি সত্যি বলিয়া দেয় ও সাক্ষ্য হিসাবে আভাকে আনিয়া হাজির করে, অবস্থাটা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার চেয়ে মিটমাট করাই ভাল। সুনন্দা লিখিয়াছে—যদি এর মধ্যে মত পরিবর্ত্তন না হয়—অর্থাৎ চেষ্টা করিলে মত পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে। জানালায় ঝুঁকিয়া দেখিল, দোতলায় বড়দার ঘরে আলো তখনও নিবে নাই, অতএব ইজি-চেয়ারে শুইয়া পড়িয়া সুশান্ত একটা সিগারেট ধরাইল।

সিগারেটের ধূম সুশান্তর নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মস্তিষ্ককে আবিষ্ট করিল। ফলে তাহার চিন্তাধারা একটি সম্পূর্ণ অভিনব খাতে বহিতে সুরু করিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'সুনন্দা তাহাকে চায় এবং সে যে রকম দস্যি মেয়ে, তাহাকে না পাইয়া সে ছাড়িবে না। কিন্তু সুনন্দা কি তাহারও চাওয়ার যোগ্য নয়? আভার চেয়ে কোন্ বিষয়ে সে কম? রূপ? আজ তো দুজনকেই একসঙ্গে দেখিলাম, রূপে আভা সুনন্দার পাশে দাঁড়াইতে পারে না। বুদ্ধি? ইহার চেয়ে বেশী বুদ্ধি মেয়ে মানুষের থাকিলে পুরুষদের সদল বলে সন্ন্যাস লওয়াই ভাল। কর্ম্মিষ্ঠতা? সে এ বাড়ীতে আসা অবধি বৌদিদি সংসারের অর্দ্ধেক ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়াছেন। সে অবলীলাক্রমে সে ভার বহন করিতেছে, এবং বড়দাদা হইতে আরম্ভ করিয়া দীনু মালী পর্য্যন্ত সকলকে বশীভূত করিয়াছে। শুধু তাহারই উপর সে সন্তুষ্ট নয়। ইহার কারণ শুধু jealousy—আমি আত্ম-সমর্পণ করিলেই খড়্গধারিণী মালাধারিণী হইয়া উঠিবে—কিন্তু—'

সুনন্দা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাছে আসিয়া চেয়ার টানিয়া বসিতেই সুশান্ত ত্রস্ত হইয়া কহিল,'ওঃ সুনন্দা, তুমি এসেছ। আমি তোমার কাছে যাচ্ছিলুম।'

সুনন্দা পাথরের মত কঠিন মুখ করিয়া নীরস কণ্ঠে কহিল, 'কেন?'

'মানে, আমার একটা কথা ছিল—মানে'?

'বলুন, আমি তো নিজেই এসেছি।'

সুশান্ত কহিল, 'হ্যাঁ, তা'তো আসতেই হবে, মানে আমারই যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু—'

সুনন্দা কহিল, 'দেখুন সুশান্ত বাবু, আবোল তাবোল বকে লাভ নেই। আপনার যা বলবার স্পষ্ট করে বলুন। আপনার বক্তব্য শোনবার জন্যেই আমার আসা।'

ক্ষণকাল পূর্ব্বে সুশান্তর মনের মধ্যে যে মোহজালের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বাষ্প হইয়া উবিয়া গেল। সে ভাবিল, 'বাবা! এর কাছে আত্ম-সমর্পণ করার চেয়ে হাড়কাঠে মাথা গলান ঢের সহজ।'

সুশান্ত কহিল,'দেখ, যা' হয়েছে, ও নিয়ে বেশী গোলমাল করে লাভ নেই।'

সুনন্দা গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, 'কি করলে লাভ হবে বলুন ?'

'মানে চুপচাপ করে যাওয়াই ভাল, আর কি।'

সুনন্দা স্থির-দৃষ্টি সুশান্তর মুখের উপরে ন্যস্ত করিয়া কহিল, 'আমরা চুপচাপ করে থাকি, আর আপনি অবাধে ভদ্রলোকের মেয়েদের ওপর উপদ্রব করতে থাকুন, এই আপনি চান তো ?'

সুশান্ত প্রতিবাদ করিয়া কহিল, 'পাগল! তা' আবার কেউ চাইতে পারে! আমি বলছি—'

'কি বলছেন ?'

'আমি আর কখনও এমন করব না।'

সুনন্দা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'আপনার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

সুশান্ত কহিল, 'যা' করলে বিশ্বাস হবে বল, তাই করতে প্রস্তুত।'

সুনন্দার দুই চক্ষে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। কহিল, 'সত্যি ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ! তা' হলে কাল থেকে আমার রুটিন মত আপনাকে চলতে হবে।'

হতাশ কণ্ঠে সুশান্ত কহিল, 'চলব কিন্তু রুটিনটা কি রকম হবে জানতে পারি কি ?'

'নিশ্চয়! সকালে আপনি কোথাও বেরুবেন না। জামাই বাবুর কাছে বসে কাজ করতে হবে।'

উৎসাহের সহিত সুশান্ত কহিল, 'তা' তো করবই, দাদার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

'বেশ! বিকেলে ক্লাবে যেতে পাবেন না।'

'না খেললে যদি আমার শরীর খারাপ হয় ?'

'খেলতে কে বারণ করছে ? বাড়ীতে খেলবেন। টেনিস্ কোর্ট ত রয়েছে।'

সুশান্ত সখ করিয়া বাড়ীতে টেনিস কোর্ট তৈয়ারী করাইয়াছিল। উহা যে তাহার এমন শত্রুতা করিবে সে কখনও ভাবে নাই। ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল, 'কার সঙ্গে খেলব ?'

'আমার সঙ্গে ?'

দুই চোখ কপালে তুলিয়া সুশান্ত কহিল, 'তোমার সঙ্গে ? তুমি তো র‍্যাকেট ধরতেই জান না।'

হাসি চাপিয়া সুনন্দা কহিল, 'শিখিয়ে নেবেন।'

'ওঃ', বলিয়া সুশান্ত চুপ করিল।

'তারপর সন্ধ্যের পর আমাকে গান শেখাবেন।'

'তোমার প্রফেসর যে সন্ধ্যেবেলায় আসে।'

'সকালে আসতে বলব। আভা বলেছে, ও সন্ধ্যেবেলায় পড়বে। আপনি রাজী ?'

সুশান্ত চুপ করিয়া রহিল।

সুনন্দা কহিল, 'রাজী না হলে বাধ্য হয়ে জামাই বাবুকে সব জানাতে হবে।'

বিশ্রী মুখ করিয়া সুশান্ত কহিল, 'রাজী।'

সুনন্দা কহিল, 'বেশ। আমি তবে উঠি। শুভরাত্রি! সারারাত্রি ধরে আভার স্বপ্ন দেখুন।'

সুনন্দা বাহির হইয়া গেল। দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া সুশান্ত কহিল, 'স্বপ্ন দেখুন! ঘুম আজ আর হবে কি না!'

৪

সুনন্দা যাইবার দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যার সময় অমল সস্ত্রীক আভাদের বাড়ীতে আসিল। অমলের স্ত্রী মিভা সটান বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। অমল বসিবার ঘরে গিয়া চৌকীর উপরে বসিল। দামোদর বাবু মুদ্রিত চক্ষে তানপুরা সহযোগে গান গাহিতেছিলেন।

অমল ডাক দিল, 'মেসোমশাই!'

দামোদর বাবু চক্ষু খুলিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন, 'আরে! অমু যে! এতদিন আসিস নি কেন ?'

অমল চৌকীর উপরে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া কহিল, 'একটু কাজে ব্যস্ত ছিলাম, মেসোমশাই।'

'বেশ! বেশ! প্রাক্‌টিসের একটু সুবিধে হচ্ছে তা'হলে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু আধটু হচ্ছে বৈ কি! তবে আমার বন্ধু সুশান্তর মত নয়। ওই হচ্ছে জুনিয়রদের মধ্যে best man।'

দামোদর বাবু বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, 'সুশান্তটি কে ?'

অমল কহিল, 'আমাদের সুশান্ত, মেসোমশাই! যে আপনার এখানে দিন আসে।'

দামোদর বাবু বলিলেন, 'দিন আসে নয়, আসত; দিন দুই বন্ধ করেছে। তা' ওর প্রাক্‌টিস সকলের চেয়ে ভাল বলছিস?'

অমল 'হাঁ'-সূচক ঘাড় নাড়িল।

দামোদর বাবু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিলেন, 'ওর যে কোন কাজকর্ম্ম আছে বলে তো আমার বিশ্বাস হয় না। আমার এখানেই তো রাত্রি নটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেয়, তা' ছাড়া শুনেছি, সমস্ত দিনটা হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়ায়; সে দিন রামচরণ বলছিল যে, ও বেলা দুটোর সময় আমার এখানে এসেছিল।'

'তা' আসতে পারে; হয় তো এ দিকে কোন কাজ ছিল। কিন্তু সত্যি মেসোমশাই! ও আমাদের বারে জুনিয়রদের মধ্যে বেশ shine করেছে।'

দামোদর বাবু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, 'Shine করেছে, না কচু করেছে। আমি বত্রিশ বছর ধরে উকীল চরিয়ে ঘুণ হয়ে গেলাম, আমি বুঝিনে কোন্ উকীলের প্রাক্‌টিস আছে, কার নেই। এই যে, তুই এতদিনের মধ্যে একদিনও আসতে পারিসনি এতে আমি খুসীই হয়েছি। বুঝতে পাচ্ছি, তোর প্রাক্‌টিসের কিছু উন্নতি হচ্ছে।' কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, 'অবশ্য বলছি না—সুশান্ত বাবুর কোন গুণ নেই, প্রাক্‌টিস না থাকলেও চমৎকার গলা আছে।'

'ও ল'এ ফার্ষ্ট হয়েছিল, মেসোমশাই।'

'হোক, তাতে কিছু হয় না। ভাল পাশ করলেই ভাল উকিল হওয়া যায় না, খুব পরিশ্রম করতে হয়, পড়াশুনা করতে হয়।'

'ও করে, মেসোমশাই। সেদিন একটা সেসন কেস-এ আসামীকে খালাস করেছে।'

'হাঁ—হাঁ—সে কেসে ওকে না দাঁড় করিয়ে একটা বৃষ-কাষ্ঠকে দাঁড় করিয়ে দিলেও আসামী খালাস হত।'

অমল দামোদর বাবুকে কাবু করিবার অন্য উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

দামোদর বাবু বলিতে লাগিলেন, 'কাজের লোক দেখলেই বোঝা যায়। এই দেখ্ না, ঐ যে ছেলেটি, আমাদের আভাকে পড়ায়—কি নাম ওর? হাঁ, প্রণব বাবু, কেমন ছেলেটি বল দেখি? যেমন দেখতে, তেমনি গুণ? ফিলসফিতে ফার্ষ্ট ক্লাস এম. এ।'

অমল কহিল, 'সুধাংশু ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস এম এ—'

দামোদর বাবু বাধা দিয়া কহিলেন, 'না—না, ফিল-সফিতে। আমি জিজ্ঞেসা করেছি। শীঘ্র না কি 'ডক্টর' হবে। কিন্তু কত বিনয়ী বল দেখি? দিন দুবার করে আমাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে—একবার আসার সময়, একবার যাওয়ার সময় (দামোদর বাবুর প্রণাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতা আছে)—কত সাদাসিধে! দেখে বোঝবার জো নেই যে, ঐ ছেলের মাথায় বার্গস, সোপেনহয়ার গজগজ করছে।'

'কেন, সুশান্তও তো খুব বিনয়ী।'

'হতে পারে। তবে মাথা নোওয়াতে একদিনও দেখি নি। তা ছাড়া দায়িত্ব-জ্ঞানও নেই। আজ দুদিন আসে নি। আমি রাত আটটা পর্য্যন্ত হা-পিত্যেশ করে বসে থাকি। একটা খবর দেওয়া উচিত ছিল।'

'নিশ্চয় ছিল! তবে ও বড় ব্যস্ত আছে। একটা সেসন কেস চালাচ্ছে। কেসটা প্রশান্ত বাবুর হাতে ছিল। তা উনি সাবজজের কোর্টে একটা বড় দেওয়ানী মামলায় ব্যস্ত আছেন বলে কেসটা ওরই ঘাড়ে চাপিয়েছেন।'

'প্রশান্ত বাবু তো এখানকার বড় উকীল।'

'আজ্ঞে হাঁ—দেওয়ানী, ফৌজদারী এই দুই-এতেই—মাসে হাজার তিনেক টাকা আয়। উনি তো আমাদের সুশান্তর নিজের বড়দাদা।'

'তাই না কি! আমি তো জানতুম না।'

'আজ্ঞে হাঁ। প্রশান্ত বাবুর নিজের ছেলে-পিলে নেই কি না! সুশান্তকে অত্যন্ত স্নেহ করেন।'

দামোদর বাবু হাসিয়া কহিলেন, 'তুই এত সুশান্তর হয়ে ওকালতী কাচ্ছিস কেন বল্ দেখি? তোর কি কিছু মতলব আছে?'

'আজ্ঞে হাঁ...সুশান্তর সঙ্গে আভার বিয়ে দিলে হয় না?'

দামোদর বাবু চিন্তিত মুখে বলিলেন, 'আভার বিয়ে এবার দিতে হবে। আমি ঐ প্রণব ছেলেটির কথা ভাবছিলুম। তোকে একদিন ডেকে বলবও ভেবেছিলুম। ঐ ছেলেটি আমার বেশ পছন্দ হয়।...তা' তুই যখন সুশান্তর কথা বল-

ছিস—প্রশান্ত বাবুর ভাই—প্রশান্ত বাবুর ছেলেপিলে নেই—মাসে তিন হাজার টাকার প্রাক্‌টিস্‌'—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া 'সুশান্ত এমন কিছু মন্দ ছেলে নয়, একটু চঞ্চল স্বভাব, বিয়ে হলেই ও সেরে যাবে; তা' দেখ, তুই চেষ্টা করে দেখতে পারিস। আমার অমত নেই, তবে অবশ্য আভার মতামতটা একবার জানতে হবে। বড় হয়েছে, লেখা-পড়া শিখেছে।'

অমল পুলকিত কণ্ঠে কহিল, 'সে আমি জানব এখন—তারপর কিছুক্ষণ অন্যান্য বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া কহিল, 'যাই, একবার আভার সঙ্গে দেখা করে আসি' বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

এদিকে অমলের স্ত্রী নিভাননী আভার সহিত আলাপ জমাইয়া তাহার মনের কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতে-ছিল। নানা কথার পর নিভা কহিল, 'ঠাকুরঝি, তোর এবার বে করা উচিত।'

আভা হাসিয়া জবাব দিল, 'উচিত তো বৌদি! কিন্তু বর জুটছে কই?'

'কেন? বর তো দিন এখানে আনাগোনা করছে?'

ভুরু কুঁচকাইয়া আভা কহিল, 'দিন আনাগোনা করছে? কে বৌদি?'

হাসিয়া আভা কহিল, 'কেন, আমাদের সুশান্ত বাবু। তোর হৃদয়-দ্বারে ঘন ঘন আঘাত করছেন—শুনতে পাচ্ছি।'

'ও! তাই বল। সুশান্ত বাবু! হাঁ, আঘাত করছেন বটে—তবে হৃদয়-দ্বারে নয়, আর একটুখানি ওপরে—কাণের পর্দায়। আমার বুকের মধ্যে যে কুমারী মাল্য-চন্দন নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, সে সাড়া দেয় নি।'

'তার মানে, সুশান্ত বাবুকে তোর পছন্দ হয় নি।'

'না বৌদি! তা তিনি যতই হাঁকাহাঁকি করুন আর ঢাক-ঢোল বাজান।'

'বলিস কি ভাই! সুশান্ত বাবুর মত ছেলে, এমন চমৎ-কার চেহারা, এত গুণ!'

'সুশান্ত বাবুর নাম করতে তোমার জিবে যে জল ঝরছে, বৌদি!'

নিভা সকোপে কহিল, 'দূর মুখপুড়ী! আমার জিবে কেন জল ঝরবে? আমি তোর জন্যে ভাবছি। কচি সবুজ ঘাস সাম্‌নে দেখেও যদি আমাদের মঙ্গলী গাই একবার শুঁকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তো আমরা তার জন্যে ডাক্তারের ব্যবস্থা করি।'

'কিন্তু মঙ্গলী যদি পরের বাগানের চারাগাছে মুখ দিতে চায় তো কি কর বৌদি?'

এমন সময়ে অমল কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া আভা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'অমুদা কখন এলে?'

'কেন ঘণ্টাখানেক আগে, তোর বৌদির সঙ্গে।'

'আমাদের বাড়ীতে নয়, সহরে কখন ফিরলে।'

'বা রে! কোথায় আবার গিছলুম? সহরেই তো বরাবর আছি।'

মুচ্‌কি হাসিয়া আভা কহিল, 'আমরা ভেবেছিলুম, কোথাও গিয়েছ। নইলে এক সহরে রয়েছ, অথচ একদিন পাশ মাড়াও নি।'

নিভা কহিল, 'তোমার বোনের অভিমান হয়েছে গো! পায়ে ধরে অভিমান ভাঙ্গাও, পার তো সেই গানটা গেয়ো—'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' মাল্যচন্দন বকশিশ মিলে যেতে পারে।'

কোপের সহিত আভা কহিল, 'বৌদি! দুষ্টুমি হচ্ছে। বলে দেব সুশান্ত বাবুর কথা?'

নিভা বলিল, 'বল না, হ্যাঁ গা, সুশান্ত বাবুর সঙ্গে আভার চমৎকার মানায় না?'

অমল কহিল, 'মানাবেই তো! সুশান্ত is the man for you, আভা। আর কারও সঙ্গে তোর বিয়ে হবে, এ আমি ভাবতে পর্যান্ত পারিনে। মেসোমশাই-এর মত আছে, শুধু তোর মত হলেই হয়।'

আভা ব্যস্ত হইয়া কহিল, 'তুমি এ সম্বন্ধে কোন কথা বাবাকে বলেছ না কি?'

অমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হাঁ বলেছিই তো! ওঁর মত তো সকলের আগে নেওয়া দরকার।'

আভা কহিল, 'তুমি জান, সুশান্ত বাবুর সঙ্গে একটি মেয়ের বে'র ঠিক হয়ে গেছে?'

অমল অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া কহিল, 'দূর পাগলী। তা' হলে আমি জানতুম না?'

আভা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, 'হাঁ হয়েছে। আমি সে মেয়েকে দেখেছি, বাবাও দেখেছেন, আর তুমি যদি সুশান্ত বাবুদের

বাড়ীতে যাও তো, তুমিও তাকে দেখতে পাবে। সে ওদের বাড়ীতে এখন রয়েছে। তাকে দেখলে বুঝতে পারবে, তার পায়ের কাছে বসবার যোগ্যতা তোমাদের আভার নেই। সুশান্ত বাবু জন্ত বিশেষ বলে, ঘরের মুক্তার হারকে তুচ্ছ করে বাইরে কাচের পিছনে ছুটোছুটি করেছেন।'

অমল গম্ভীর হইয়া কহিল, 'তা'তো আমি জানতুম না ভাই। শানুটা'—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—'মেসোমশাই-এর কাছে কথাটা পেড়ে বড় অন্যায় হয়ে গেছে, আর একদিন এসে ওটা সেরে নিতে হবে—আর তোকে যদি কিছু বলেন তো তুই সব বুঝিয়ে বলিস্।'

৫

সুশান্তের অন্তরীত জীবনের সপ্তম দিবসের প্রভাত। সুশান্ত তাহার শয়নকক্ষে জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। হেমন্তের স্নিগ্ধ প্রভাত। ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়, লোহার রেলিং-এ, রাস্তার ধারে ইলেক্‌ট্রিকের তারে শিশিরবিন্দুগুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। দূরে নারিকেল গাছের মাথায়, উঁচু বাড়ীগুলার চিলে-ছাদের উপরে প্রভাতের কচি রৌদ্র পড়িয়াছে। গাছের ডালে বসিয়া শালিক পাখীর দল অকারণ কলরব করিতেছে, তাল গাছের মাথার উপরে একটা চিল উড়িবার আগে ডানা ঝাপ্‌টাইতেছে।

এই পাখীগুলার প্রতি সুশান্তর হিংসা হইতে লাগিল। ইহারা এই সুন্দর, শুভ্র প্রভাতটি ইচ্ছামত উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহাকে এখনই সুনন্দার হেপাজতে চা ও খাবার খাইয়া বড়দার সঙ্গে ফৌজদারী আইন-কেতাবের কণ্টকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

সুনন্দা চা ও খাবার লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। পদশব্দে মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া সুশান্ত মুগ্ধ হইয়া গেল—যেন শিশিরে ধোয়া একটি পূর্ণবিকশিত শ্বেত কমল। পিঞ্জর ভাল না লাগিলেও, পিঞ্জরের মালিকটিকে তাহার মন্দ লাগিতেছে না।

সুশান্তকে খাইতে দিয়া সুনন্দা কহিল, 'প্রণব বাবু কদিন পড়াতে আসেন নি, কলেজও যান নি। তাঁর বোধ হয় অসুখ হয়েছে। বড়দিদি বলছেন, তাঁর একবার খবর নিতে।'

তড়াক্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুশান্ত কহিল, 'এখনই যাচ্ছি।'

'এখনই যেতে হবে না। খেয়ে যাবেন। আমিও যাব।'

সুশান্ত বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'তোমার যাবার কি দরকার? পড়াশুনা করতে হবে না?'

'সে হবে এখন, যাবার সময়ে আমাকে ডাক দেবেন', বলিয়া সুনন্দা চলিয়া গেল।

সুশান্তর যাইবার উৎসাহ নিবিয়া গেল। নাঃ সুনন্দা তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুক্তি দিবে না।

*

সুশান্ত মোটর চালাইতেছে, সুনন্দা পিছনে বসিয়া আছে। যে রাস্তা দিয়া প্রণব বাবুর বাড়ী যাওয়া যায়, সে দিকে না গিয়া গাড়ী উল্টা দিকে ঘুরাইতেই সুনন্দা বলিল, 'ও কি! কোথায় যাচ্ছেন?' সুশান্ত গম্ভীর ভাবে কহিল, 'অনেকদিন বেরোই নি, একটু বেড়িয়ে আসিগে।'

সুনন্দা কহিল, 'দেরী হয়ে যাবে যে।'

সুশান্ত গাড়ীর স্পীড একটু বাড়াইয়া দিয়া কহিল, 'হোক গে।' গাড়ী সহরের বাহিরে আসিতেই সুশান্ত স্পীড আরও বাড়াইয়া দিল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পাকা, চওড়া রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া দূর গ্রামের দিকে চলিয়া গিয়াছে। সেই রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল। রাস্তার দুইধারে ধানের ক্ষেত, তৃণময় প্রান্তর, কলমীদলে ঢাকা পুকুর, ঝুরি-নামান বটগাছ, ছোট ছোট গ্রাম, ছায়াচিত্রের ছবির মত দ্রুতবেগে পার হইয়া যাইতে লাগিল। সুনন্দা কহিল, 'এত জোরে চালাবেন না সুশান্ত বাবু!' সুশান্ত গাড়ী থামাইয়া কহিল, 'কেন, ভয় করছে? আমার পাশে এস।' সুনন্দা নামিয়া আসিয়া সুশান্তর পাশে বসিল।

আবার গাড়ী তেমনি বেগে ছুটিতে লাগিল। গতিমাপক যন্ত্রের কাঁটাটি পঞ্চাশের অঙ্কে আসিয়া কাঁপিতে লাগিল। হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে লাগিয়া সুনন্দার শীত-শীত করিতে লাগিল। সে আরও একটু সুশান্তর দিকে ঘেঁসিয়া বসিল।'

সুশান্তর শান্ত, দৃঢ় মুখের পানে তাকাইয়া সুনন্দার মনে

হইল, সে যেন সুশান্তকে অজে নূতন করিয়া দেখিল। শক্তিমান, গতিপিপাসু, উচ্ছৃঙ্খল; আবার, শিশুর মত সরল ও আত্ম-কল্যাণে উদাসীন। উত্তপ্ত বাষ্পের মত এ আপনাকে বিস্ফারিত ও বিকীর্ণ করিতে চায়। গৃহের প্রতি ইহার বিন্দুমাত্র মমতা নাই; দূর দুরান্তরের পিপাসা ইহাকে বৈরাগী করিয়াছে। অথচ ইহাকে নারী-হৃদয়ের স্নেহ ও ভালবাসার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সংযত ও সংহত করিতে পারিলে এ হয় ত ঘর বাঁধিবে; ইহার সবল হস্ত দুর্বল নারীর সকল কামনা ও আশাকে সফল করিয়া তুলিবে।

সুনন্দা সুশান্তর আরও কাছে সরিয়া বসিল। সুশান্ত কহিল, 'সুনন্দা এখনও ভয় করছে?'

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'না।' তারপর অর্দ্ধোন্মীলিত নয়নে বিপরীতগামী বিস্তীর্ণ প্রান্তর ও সহগামী ধূম্রল দিগন্ত রেখার পানে চাহিয়া রহিল।

এদিকে সুনন্দার একটিমাত্র কথা, 'না', সুশান্তর মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সারা মনকে ফেনাইয়া তুলিতে লাগিল। আভা তাহাকে চায় নাই বটে, কিন্তু যে রূপসী তরুণী তাহার বক্ষের অতি সন্নিকটে বসিয়া আছে, যাহার কোমল উষ্ণ স্পর্শ তাহার বক্ষ-রক্তকে উত্তপ্ত করিতেছে, যাহার চূর্ণ অলক বাতাসে চড়িয়া তাহার গালে আসিয়া লাগিতেছে, ইহার পৃথিবীর মধ্যে শুধু তাহারই উপর এই নিঃশঙ্ক নির্ভরতা, তাহার মর্ম্ম-কোষ মধুতে ভরিয়া দিতে লাগিল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

বন্ধনহারা

—শ্রীলীলাময় দে

বন্ধনহারা বেদনার কবি গাহি বেদনার গান
রিক্ত পরাণে চলেছে একাকী খুঁজিতেছে ভগবান।
সংসাক্ষা এই সংসারে তার স্বপ্ন গিয়াছে টুটি
বনকান্তার মরুপথ বেয়ে তাই সে চলেছে ছুটি,
সম্মুখে চলে অনন্ত পথে পশ্চাতে নাহি চায়
মায়ার বাঁধন পিছনে ডাকিছে আয় ওরে ফিরে আয়।
আপন ভুলিয়া পাগল রে তুই দিসনে আগল খুলে,
দেবতাই নর নরেতে দেবতা যাসনে সে কথা ভুলে।

মানুষের মাঝে 'মানুষ' রয়েছে নারীতে রয়েছে দেবী
চিত্ত তোমার ভরে লও আজি তাদের বেদনা সেবি।
গাহি বনান্তে বেদনার গান বিশ্ব-মানব তরে
পথের প্রান্তে দেবতারে স্মরি চিত্ত ওঠে কি ভরে?

দেবতা যে তোর ঘরে ঘরে আজ ফেলিছে অশ্রুজল
মুছাতে নারিলে তাদের অশ্রু লভিবি না কোন ফল।
বেদনার কবি ব্যথায় তোমার নিত্য নীলিমা হ'তে
ধরণীর বুকে অশ্রু গড়ায় কোন্ অজানার পথে।
প্রকৃতির বুকে শিহরণ জাগে থনে থনে ওঠে দুলে
সব ভুলে আজ সজল আঁখিতে বসে আছে এলো চুলে।

স্রষ্টার এই বিশ্বসৃষ্টি এ যে তার মায়াখেলা
খেয়ালী তাহার সৃষ্টিরে ল'য়ে করিতেছে হেলা ফেলা।
স্বপ্নেতে রচা সাধনার ফল মুক্তি লভিছে সবে
প্রথম আলোক স্বর্গের শিশু যখনি দেখিছে ভবে
কোন্ বেদনায় নাহি জানি হায় তখনি সে কেঁদে ওঠে
অজ্ঞাতে তার বিশ্বের ব্যথা আঁখিতে বুঝি বা ফোটে।

ক্রন্দন মাঝে ভগবান কাঁদে দুঃখে দেবতা রাজে
বেদনার কবি আপনারে বাঁধ সেই বেদনার মাঝে।

ডেমোক্রেসী ও কংগ্রেস

—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আজকাল ডেমোক্রেসী নামক শাসনপদ্ধতির নামে অধিকাংশ শিক্ষিত লোক যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া পড়েন। এই শব্দটি পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আমদানী। এই প্রকার শাসন-পদ্ধতিও সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য ধরণের। আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকালে স্থানে স্থানে গণশাসন প্রচলিত ছিল। রাজা যুধিষ্ঠির যখন ভীষ্মের নিকট রাজনীতি সম্বন্ধে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন, তখন শরশয্যাশায়ী কুরু-পিতামহ যুধিষ্ঠিরকে গণশাসনের কথাও বলিয়াছিলেন। সে গণশাসনের সহিত পাশ্চাত্ত্য দেশ হইতে আমদানী করা এই ডেমোক্রেসীর কতটা মিল এবং কতটা অমিল, এই প্রবন্ধে আমি তাহার আলোচনা করিব না। কারণ উহাতে আমার বক্তব্য বিষয়টা বিশেষ ভারাক্রান্ত হইবে। তবে আমার বিশ্বাস, সংজ্ঞা হিসাবে ডেমোক্রেসী (democracy) শব্দের অর্থ কি, উহাতে কি বুঝায়, সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের লোকের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নাই। সংজ্ঞা হিসাবে ডেমোক্রেসীর অর্থ দেশের লোকের নিজস্ব শাসন (of the people), দেশের লোক কর্তৃক পরিচালিত শাসন (by the people) এবং দেশশুদ্ধ লোকের হিতার্থ পরিকল্পিত শাসন (for the people)। দেশের লোকের শাসন অর্থে কি বুঝায়? দেশের লোক স্বাধীনভাবে যে শাসনপদ্ধতির পরিকল্পনা করিয়াছে, যাহা অন্য দেশের লোক বাহির হইতে বিজাতীয় সংস্কৃতি ও মানসভাব লইয়া পরিকল্পিত করে নাই, যাহা শাসিত প্রজা-সাধারণই স্বীয় মানসী শক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়াছেন, সেই শাসনপদ্ধতিকে বুঝায়। অর্থাৎ যে শাসনপদ্ধতিকে প্রত্যেক লোক বলিতে পারে, এই শাসনপদ্ধতি আমারই বা আমাদেরই। দ্বিতীয়তঃ, যে শাসনপদ্ধতি দেশের লোক কর্তৃক পরিচালিত, তাহাকেই ডেমোক্রেসী বলে। অর্থাৎ বাহির হইতে লোক আসিয়া যে শাসনযন্ত্র পরি॰ালিত করেন না, দেশের লোকই তাহার পরিচালনা করেন। আমলার মধ্যে দুই চারিজন বিদেশী থাকিলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু দেশের লোকের বুদ্ধির এবং নীতির দ্বারা ঐ শাসনযন্ত্র পরিচালিত হওয়া চাই। তাহা না হইলে ঐ শাসনযন্ত্র ডেমোক্রেসী বলিয়া গণ্য হইবে না। তৃতীয়তঃ, যে শাসনপদ্ধতি দেশের লোকের, অর্থাৎ সমস্ত জনসাধারণের হিতসাধনের জন্য পরিচালিত হইয়া থাকে, তাহাই হইল ডেমোক্রেসী। এই তিনটি লক্ষণের সমবায় হইলেই ডেমোক্রেসী সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হয়। এখন জিজ্ঞাস্য, এই ধরণীতলে মানবসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ পর্য্যন্ত কস্মিন্ কালে এবং কোন দেশে এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ লক্ষণযুক্ত শাসনপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে কি না? আমার বিশ্বাস তাহা হয় নাই। সাধারণ লোক বুঝে যে, তাহারা শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে অসমর্থ। সামান্য বারোয়ারী কার্য্যের পরিচালনা করিতেই যখন অনেকে আপনাদের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়া দায়িত্ব এড়াইতে চাহেন, তখন এতগুলি গুরু দায়িত্ব লইয়া শাসনযন্ত্র পরিচালিত করিবার সামর্থ্য কয়জনের থাকিতে পারে? উহা অধিক লোকের থাকে না। আমাদের দেশের লোকের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কোন দেশের লোকের অধিকাংশের সে সামর্থ্য থাকে না। ব্যক্তিভেদে সামর্থ্যেরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। কোন দেশের সমস্ত লোকই আমি দেশ শাসন করিব, এরূপ বাসনাও মনে স্থান দেয় না। প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বিশিষ্ট বিলাতী রাজনীতিক বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ "নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফ্‌টার" নামক মাসিক পত্রে এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন আমি পাদটীকায় তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম*। এ দেশের কোন কোন ব্যক্তি গ্রেট বৃটেন এবং মার্কিন ঘুরিয়া আসিয়া বলেন যে, সে

* People, as a rule, are incapable of ruling and aware of their own capacity. What is more, they never show the slightest desire to rule. It is true there have been occasions, as for example, the French Revolution and the Bolshevik upheaval in Russia, when the galls of misrule have chafed so virulently that the body politic has erupted, but the eruption occurred not primarily because the moujiks wished themselves to rule but because they could no longer bear to be mis-ruled. C. H. Bonner.

সকল দেশের সকলেই রাজনৈতিক ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামায় বা রাজনীতি বুঝে, তাহাও ঠিক নহে। বিশেষজ্ঞগণের এরূপ উক্তি আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

ঠিক উল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী গণতন্ত্র পৃথিবীর কুত্রাপি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। সেই হেতু কোন কোন রাজনৈতিক লেখক এই সংজ্ঞার কিছু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যে-ক্ষেত্রে শাসন-পদ্ধতি দেশের সর্ব্বসাধারণের সক্রিয় সম্মতির (active consent) উপর নির্ভর করে, তাহাই "ডেমোক্রেসী"। 'সক্রিয় সম্মতি' বলিতে কি বুঝায়? সিজুইক (Sidgwick) ইহার অর্থ করিয়াছেন যে, দেশের লোক ইহা বুঝেন এবং জানেন যে, তাঁহারা বহুজনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে আইন অনুসারে সেই শাসন-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার সাধন করিতে পারেন, তাঁহাদের সেই সম্মতিই সক্রিয় বা সার্থক সম্মতি। এখন বিবেচ্য, এই শেষোক্ত শাসন-পদ্ধতি কোথায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে? যে দেশ পরাধীন এবং যে দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষালাভে বঞ্চিত, সে দেশে ইহা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, কোন পরাধীন দেশের শাসন-ব্যবস্থা দুষ্ট হইলেও শাসক জাতির সম্মতি ব্যতীত তাহার পরিবর্ত্তন অথবা পরিবর্জ্জন শাসকদিগের সম্মতি ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না। পরাধীন দেশে বিজেতারাই তাঁহাদের মনের মত করিয়া শাসন-ব্যবস্থা রচনা করেন। উহার বাহ্য আকার কতকটা গণতন্ত্রের মত হইলেও অনেক সময় উহা নকল গণতন্ত্র। উহাতে গণতন্ত্রের দোষ সমস্তই অধিক থাকে, গুণ প্রায় কিছুই থাকে না। অধিকন্তু পরাধীন দেশে দেশের লোক স্বাধীনভাবে শাসনতন্ত্র পরিচালিত করিতে পারে না, উহা বিদেশী ব্যক্তিবৃন্দের দ্বারাই চালিত হইয়া থাকে। সেই বিদেশী ব্যক্তিবৃন্দকে স্বাধীনভাবে পরিচালিত করিবার অধিকারও বিজিত জাতির থাকে না। অতএব পরাধীন দেশে rule by the people প্রতিষ্ঠিত হয় না, সাধারণের সক্রিয় সম্মতিও থাকে না। এই হিসাবে পরাধীন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলেও বুঝা যায় যে, পরাধীন দেশের জনসাধারণ কখনই মনে করিতে পারে না যে. তাহারা ইচ্ছা করিলেই শাসনযন্ত্রের, অথবা শাসনপদ্ধতির পরিচালনার ব্যবস্থার কোন পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা রাখে। যদি তাহারা তাহা করিতে পারে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের সে দেশ পরাধীন নহে। তাঁহারা পূর্ণ মাত্রায় স্বাধীন। জাতি যদি পরাধীন হয়, আর বিজেতা জাতি যদি সেই বিজিত জাতির পরাধীনতা ঘুচাইতে না চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পরিকল্পিত শাসনযন্ত্রে তাঁহাদের নিজ ক্ষমতা পরিচালনার সুবিধা করিয়া রাখিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরাধীন দেশের শাসন-পদ্ধতিতে প্রজাদিগের সক্রিয় সম্মতি থাকিতেই পারে না। সম্মতি হইলে উহা সহনশীল বা নির্ব্বিরোধ সম্মতি হইবেই হইবে। যেখানে শাসনযন্ত্রের প্রধান পরিচালকের হস্তে আইনমতে স্বৈর ক্ষমতা পরিচালনের অধিকার প্রদত্ত, যে স্থানে শাসক ইচ্ছা করিলে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের সিদ্ধান্ত অনায়াসে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারেন, সেখানে স্বাধীনতা ও গণশাসন, এই দুইটি জিনিষেরই অত্যন্ত অভাব। যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা, সেখানে প্রজাসাধারণের সম্মতি সতেজ বা সক্রিয় থাকিতে পারে না। পরাধীন রাজ্যের শাসন জনসাধারণের হিতার্থে পরিচালিত হইতে পারে। ইতিহাসে দেখা যায়, তাহা অনেক সময় হইয়াছেও। কিন্তু সে ক্ষেত্রে প্রজার যে সম্মতি, তাহা সক্রিয় (active) নহে, সম্পূর্ণ অবিরোধী (passive) হইয়াই থাকে। ইহা মানুষের স্বভাব। কারণ তথায় সক্রিয় সম্মতি স্ফূর্ত্তি পাইবার পরিস্থিতি নাই।

স্বাধীন দেশেও এ পর্য্যন্ত কোথাও খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফ্রান্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু তথায় খাঁটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা কয়েকবার নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে তথায় কয়েকবার ক্ষমতাশালী ব্যক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন তথায় যে দর্শনধারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা প্রকৃত পক্ষে গণতন্ত্র নহে, তাহা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক পরিচালিত শাসনতন্ত্র (intellectual aristocracy)। তথাকার জনসাধারণ এখন ঐ সকল সুশিক্ষিত ও উচ্চমনা জনগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছেন। জওহরলালজী রুশিয়ার শাসন-পদ্ধতিকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যে, তথায় এখন পূর্ণমাত্রায় সামরিক শাসন চলিতেছে। তথায় সঙ্কুচিত এবং সন্ত্রস্ত লোকমত এখন আত্মপ্রকাশই করিতে পারিতেছে না।

মার্কিনে ধনাধিপদিগের মতই লোকমত চালিত করিতেছে। সুতরাং প্রকৃত demos (জনসাধারণ) কুত্রাপি শাসন-তরণী চালাইতেছে না। অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে যে, প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে প্রকৃত ডেমোক্রেসী ছিল। কিন্তু সে ধারণা ভুল ইহা বিশেষজ্ঞগণ অনুসন্ধান করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। † যে ডেমোক্রেসী কস্মিন্ কালে ঠিক খাঁটিভাবে কোথাও প্রবর্ত্তিত করা হয় নাই, ভারতবর্ষীয় কংগ্রেস সেই গণতন্ত্রের প্রতি এতই আকৃষ্ট যে, তাঁহারা নামমাত্র গণতন্ত্রের সেবক, রুশিয়ায় নামে লালায়িত এবং ফ্রান্স, মার্কিন প্রভৃতি দেশের শাসনপদ্ধতির বিশেষ অনুরাগী। কিন্তু ঐ সকল দেশের শাসনপ্রণালী যে প্রচ্ছন্ন oligarchy বা aristocracy, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। তাঁহাদের শিক্ষাগুরুরা যখন একটা ধুয়ার দ্বারা চালিত হন, তখন তাঁহারা যে তাহা না হইয়া পারেন না, ইহা বলাই বাহুল্য।

যে দেশে প্রকৃত ডেমোক্রেসী প্রবর্ত্তিত, সে দেশে কখন কোন ব্যক্তির প্রাধান্য থাকিতে পারে না। ডেমোক্রেসী মানুষে মানুষে প্রভেদ করে না। ডেমোক্রেসীর আর একটা লক্ষণ এই যে, 'any one self-supporting and law-abiding citizen is, on the average, as well qualified as another for the work of Government', অর্থাৎ শাসন-কার্য্যে গড়ে প্রত্যেক স্বাবলম্বী এবং রাষ্ট্রীয় বিধি-পালক ব্যক্তিই ঐরূপ অন্য ব্যক্তির সমকক্ষ। শাসনকার্য্য পরিচালনকার্য্যে স্বাবলম্বী ও আইন-পালক ব্যক্তিদিগের মধ্যে উনিশ বিশ নাই, সবাই সমান। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান প্রভৃতিতে গুরুত্ব আরোপ করা ঠিক নহে। যদি তাহা করা হয়, তাহা হইলে সেটা হইবে হয় oligarchy, না হয় aristocracy। এই হিসাব ভাল কি মন্দ, সে বিচার আমি এ প্রবন্ধে করিব না। কিন্তু কংগ্রেস এই ধরণের ডেমোক্রেসীর দ্বারা চালিত হইতেছে কি না, তাহাই এ ক্ষেত্রে বিচার্য্য বিষয়। আমরা দেখিতেছি যে, গান্ধী-শাসিত কংগ্রেস প্রকৃত গণতন্ত্রের কোন নিয়মই মানিয়া চলিতেছেন না। যাঁহারা গান্ধীর নামে মন্ত্রমুগ্ধ জীবের ন্যায় নিজ জ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া কেবল 'যো-হুকুম' বলিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই যে গণতন্ত্র বুঝিবার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য। গণতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষের মতকে অবজ্ঞাত করে না, আবার অতিরিক্ত সম্মানও প্রদর্শন করে না। প্রকৃত গণতন্ত্রে দলাদলির স্থান অতি অল্প। যিনি প্রকৃত গণতন্ত্রবাদী হইবেন, তিনি প্রতিপক্ষের মতপ্রকাশে বাধা দিবেন না, তিনি উহা খণ্ডন করিবারই প্রয়াস পাইবেন। ডেমোক্রেসী অবশ্য অধিকাংশ লোকের (majority-র) মত বা ভোট অনুসারে চালিত হয়। কারণ ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে যে, অধিকাংশের মতই সত্য হয়। এই ধারণা ভ্রান্ত, ইহা বহুবার সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। স্যর আইজাক নিউটন যখন বর্ণচ্ছত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, গ্যালিলিও যখন সূর্য্যমণ্ডলকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, হার্ভি যখন রক্ত-সঞ্চালন তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন অধিকাংশের মতই ঐ নূতন আবিষ্কারের প্রতিকূল ছিল। সেই অধিকাংশের মতই যে ভ্রান্ত ছিল, অন্ততঃ নব-মতপ্রচারকদিগের অপেক্ষা অধিক পশ্চাদ্বর্ত্তী ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেইজন্য যাঁহারা সত্যসন্ধ, তাঁহারা প্রতিকূল মতকে অবাধে প্রকাশ হইতে দেন, উহাতে বাধা দেন না। অথচ যে ক্ষেত্রে মতভেদ অপরিহার্য্য, অথচ অবিলম্বে কার্য্য করিতে হইবে, সে ক্ষেত্রে অধিকাংশের মত অনুসারে চালিত হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই,—কিন্তু তাই বলিয়া প্রতিকূল মতকে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করা সাধুত্বের পরিচায়ক নহে। উহাতে সত্যপ্রচারে বাধা দেওয়া হয় এবং আপনাদের উৎকট অহমিকা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে অনধিকারীর হাতে পড়িয়া প্রকৃত ডেমোক্রেসীর অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে। দলাদলি করিয়া শাসনকার্য্যের পরিচালনা, অধিকাংশ কর্ত্তৃক অল্পাংশের পীড়ন ও দমন, উহার সেই বিকৃতির অভিব্যক্তি। দলাদলি যদি ন্যায্য পথে এবং সত্যসন্ধানের জন্য পরিচালিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সুফল হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া উহা যদি ছলে, বলে এবং কৌশলে ভিন্ন মতকে দমন করিবার একটা প্রতিষ্ঠানে

† If we examine any of the so-called democracies—Athens, Rome under the Republic—we find the same thing, an inner ring of the more powerful men, an aristocracy of wealth or brains, imposing its will upon the masses.

পরিণত হয়, তাহা হইলে উহা ঘোর অসাধুত্বের পরিচায়ক হইয়া থাকে। য়ুরোপে উহা আছে বলিয়াই যে উহা ভাল, ইহা কোন মতে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। যাহা সত্যসন্ধানের বাধক, তাহা পাপ।

দেখা যাইতেছে যে, কংগ্রেস, অন্ততঃ গান্ধীজী-পরিচালিত কংগ্রেস গণতন্ত্রের কোন নিয়মের দ্বারাই চালিত হইতেছেন না। তাঁহারা সকল নিয়মই লঙ্ঘন করিয়া চলেন। গণতন্ত্রে ডিক্‌টেটারের বা নিরঙ্কুশ ক্ষমতাবান্ নিয়ন্তার স্থান নাই। কিন্তু কংগ্রেসে তাহা আছে। সেই নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বয়ং 'মহাত্মা গান্ধী'। "ইনি নাচেন ভাল পাক দেন এলো।" ইনি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কংগ্রেসের আর চারি আনার সদস্যও নাই। অথচ কংগ্রেসের এমন কোন কাজ নাই, যাহা ইঁহার পরামর্শমতে চালিত না হয়। ইনি যখন কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন যে, অনেক লোক তাঁহার কথার উপর কথা কহিতে পারে না, সেজন্য তিনি কংগ্রেস হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ডিক্‌টেটর হইতে চাহেন না। কিন্তু তাহার পর হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি ভিতরে থাকিয়া কংগ্রেসের সকল ব্যাপারেই সেই ডিক্‌টেটরগিরিই করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কংগ্রেসে কোন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই, এবং কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই। তাঁহারই 'হরিজন' পত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জনৈক চীনা পরিব্রাজকের সহিত আলাপপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, *"আমি রাজনীতি বুঝি না, আমি রাজনীতি হইতে চিরদিনের জন্য সরিয়া দাঁড়াইয়াছি ; আর উহাতে যাইব না।"* কিন্তু কাজে তাঁহার বিপরীত আচরণ দেখা যায়। তিনি এ পর্য্যন্ত যত কার্য্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আসলে সমস্তই বর্জ্জিত হইয়াছে। আইন-অমান্য আন্দোলন যখন নিষ্ফল হইয়াছে বলিয়া তিনি উহা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন, তখন তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মীদিগের ত্রুটিতে সেই অমোঘ উপায়টি নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে। অহিংস অসহযোগ আন্দোলন কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ বর্জ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ্যে এখনও স্বীকার করা হইতেছে না। কিন্তু যখন তাঁহারা সরকারী শাসনযন্ত্রকে মানিয়া লইয়া তাহা চালাইতে সম্মত হইয়াছেন, উহার নিয়ম-কানুন সমস্তই মানিয়া লইয়াছেন, তখন অসহযোগিতা রহিল কোন্ খানে? কিন্তু তথাপি তাঁহারা অসহযোগ আন্দোলন যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, এমন কথা মুখে স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিতেছেন না। কেন? ভুল স্বীকার করিলে কি 'মহাত্মা'র মাহাত্ম্য নষ্ট হয়? কংগ্রেস বলেন যে, তাঁহারা ডেমোক্রেসী ভিন্ন অন্য শাসনতন্ত্র ভাল বলিয়া স্বীকার করেন না,—কিন্তু তাঁহারা যে শাসনতন্ত্রের যোয়াল ঘাড়ে করিয়া লইয়া তাহা চালাইতেছেন, তাহা কি খাঁটি ডেমোক্রেসী? কখনই না। উহা ডেমোক্রেসীর গিল্‌টি করা একটা কৃত্রিম জিনিষ। উহা এক প্রকার স্বল্পজনচালিত শাসনপদ্ধতি (oligarchy)। কংগ্রেস মুখে গণতন্ত্রের যতই বড়াই করুন, উহার ভিতরে আসলে স্বৈরতন্ত্র বা ফাসিজ্‌ম্ বিরাজমান। সত্য কথা অবাধে বলিতে হইলে বলিতে হয়, শ্রীযুত মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী মুসোলিনী বা হিট্‌লারের ন্যায়ই একজন স্বৈরশাসক। ইহাঁরই ইঙ্গিতে জওহরলাল দুইবার উপর্য্যুপরি কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন এবং সমস্ত চিরাচরিত বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় প্রদেশেই কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। কংগ্রেস যখন শাসনসংস্কার আইনের একাংশ মানিয়া লইয়াছেন, তখন তাঁহাদের উহার অপর অংশ ফেডারেশনও মানিয়া লইতেই হইবে।

ফেডারেশন প্রতিষ্ঠাই যে শাসনসংস্কারের উদ্দেশ্য, তাহা জয়েণ্ট কমিটীর রিপোর্টেই স্বীকৃত হইয়াছে। কংগ্রেস যখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন মানিয়া লইয়াছেন, তখন ফেডারেশন মানিয়া লওয়াও অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। কারণ এই ভাবে নিছক প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন লইলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে ; প্রতিষ্ঠার দিন হইতে কংগ্রেস ভারতে যে একতা-প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রতিকূলতা করা হইবে। এ সম্বন্ধে জয়েণ্ট কমিটী তাঁহাদের রিপোর্টে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা সুপ্রকাশ। যে ভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে অনৈক্য ঘটিবার সম্ভাবনাই অধিক।* এরূপ অবস্থায় ভারতে

* We have spoken of unity as perhaps the greatest gift which British rule has conferred on India; but in

মায়ের দরদ

৭ই নভেম্বর তারিখে বোম্বাই সহরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মঘটে যোগদানকারী

সেই একতা স্থাপনের পথে কণ্টক পড়িবে। ইহার মধ্যেই বিহারে ও বাঙ্গালায় বেশ বিবাদ বাধিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যখন প্রাদেশিক শাসনপদ্ধতি কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন, তখনই তাঁহারা বিষম ভুল করিয়াছেন। এখন ফেডারেশন গ্রহণ করিলেও বিপদ্, বর্জ্জন করিলেও বিপদ্। যদি গোড়ায় কংগ্রেস বলিতেন যে, ফেডারেশন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন না করিলে তাঁহারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনও মানিয়া লইতে পারেন না, তাহা হইলেই তাঁহারা প্রকৃত রাজনীতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতেন। তাঁহারা ফেডারেশনের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহার দোষও বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহাতে আপত্তিও করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ কালটা আইনের যোয়ালে ঘাড় দিয়াই ইতঃনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ করিয়া বসিয়াছেন। ইহাতে 'মহাত্মা'-পরিচালিত কংগ্রেসের বুদ্ধিহীনতাই সূচিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি এই সংস্কৃত শাসন-পদ্ধতি বর্জ্জন করিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। এই শাসন-পদ্ধতি ঠিক গণতন্ত্রসম্মত নহে।

transferring so many of the powers of the Government to the Provinces and in encouraging them to develop a vigourous and independent political life of their own, we have been running the inevitable risk of weakening or destroying that unity.

Joint Committee's Report—page 14, lines 27 to 32.

দুঃখ

—শ্রীআশুতোষ সান্যাল

হে দুঃখ, আমারে তুমি দেখাইলে সত্যের মূরতি
নগ্ন সুকঠোর! মোর জীবনের পারাবার মথি'
আনিলে আমার লাগি, বেদনার তপ্ত হলাহল
জ্বালাময়! তুমি দিলে মোরে শুধু উষ্ণ অশ্রুজল—
নৈরাশ্যের হাহাকার—দীর্ঘশ্বাস—করুণ ক্রন্দন
মর্ম্মভেদী! হে নিঠুর, দিবা-রাতি বীণার মতন
এ-বুকের তন্ত্রীগুলি নিপীড়িয়া রাগিণী উদাস
বাজাইছ বসি। সদা খল খল তব অট্টহাস
সঞ্চারিয়া বিভীষিকা ধ্বনিতেছে মর্ম্মমাঝে মোর।
তুমি মোর আঁখি হ'তে মুছিয়াছ স্বপ্নাঞ্জন ঘোর
চিরতরে; প্রকৃতিরে নাহি আর লাগে মোর চোখে
অপূর্ব্ব রূপসী সম অন্তরের রহস্য-আলোকে
সমুজ্জ্বল; আর কভু জ্যোৎস্না-সিত বসন্তের রাতি
করে না আমারে ওগো গগনের চাঁদিনীর সাথী।
পুষ্পগন্ধে নাহি হই উতরোল পাগল বিহ্বল;
ফাল্গুন করে না মোরে আর নর্ম্মনটন চঞ্চল
উন্মাদ আকুল! যূথী-পরিমলবাহী সমীরণ
মেঘম্লান বরষায় ব্যাকুলিয়া নাহি তোলে মন।
তুমি রূঢ় বাস্তবের তীক্ষ্ণ-জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়
নাশিয়াছ মোহ ঘোর—ফুটায়েছ আঁখিযুগ হায়,
চিরতরে! এসংসারে অহর্নিশ অদৃষ্টের সাথে
দিয়েছ শকতি মোরে প্রাণপণ আপনার হাতে
করিতে সংগ্রাম। ওগো জীবনের চির সাথী মোর,
অবিশ্রাম তব স্পর্শ নিষ্করুণ কুলিশ-কঠোর
উচ্চকিয়া আকুলিয়া তোলে যেন আমার হৃদয়!
স্বর্ণসম বহ্নিতাপে এ জীবন কর হে নির্দ্দয়,
নিখাদ নির্ম্মল। আজি চিরতরে নিবে যাক্ যত
নিত্য নব বাসনার লেলিহান শিখা অবিরত।

দাও আত্ম-সমাহিত সাধকের শুদ্ধ শান্তি মোরে,
মিথ্যা সুখ—মায়ামৃগ---নিশিদিন ঘুরাইছে ওরে!

বঙ্গের মুসলমান বৈষ্ণব-কবি

—শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে বঙ্গদেশ বহু মুসলমান শাসনকর্ত্তা শাসন করিয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য তাঁহাদের সহৃদয়তা এবং আন্তরিক চেষ্টা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। ঐ সকল মুসলমান সম্রাটের প্রবর্ত্তনায় বঙ্গসাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রী ও অসীম উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্ররোচনায় উৎসাহিত হইয়া অনাদৃতা বঙ্গভাষার প্রতি বাঙ্গালী কবির দৃষ্টি পড়িল—বাঙ্গালী হিন্দু কবিগণ মুসলমান সম্রাট্গণের আদেশে মহাভারত অনুবাদ করিলেন, ভাগবত অনুবাদ করিলেন। মুসলমান কবি আলওয়াল মাগনঠাকুরের আদেশে (ইনি মুসলমান ছিলেন) হিন্দী পদ্মাবৎ কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদ করিলেন। এইরূপে দীনা বঙ্গভাষাকে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে দেখিয়া অন্যান্য কবিগণ আশান্বিত হইয়া সেই সকল উৎসাহদাতা মুসলমান সম্রাট্গণের কত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে—অর্থাৎ এই বিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিলমোহরে যদি 'শ্রী' এবং 'পদ্ম' একসঙ্গে থাকে, তাহা হইলে কোন কোন মুসলমান তাহাতে আপত্তি করেন। উহা না কি হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু মুসলমানগণের এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব চিরদিন ছিল না। এই বঙ্গদেশে এমন এক দিন ছিল, যখন হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই সম্প্রদায় পরম প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আনন্দের স্রোতে দিন কাটাইয়া দিত। উভয় সম্প্রদায়ের পূজা-পার্ব্বণে অথবা উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই সমান আনন্দ উপভোগ করিত। দোল-দুর্গোৎসবের সময়ে মুসলমানগণ হিন্দুদের উৎসবের আনন্দে যোগ দিত—আবার হিন্দুরা মহরমের সময়ে মুসলমানদের মত লাঠি খেলিয়া এবং আমোদ করিয়া দিন কাটাইত। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কি গভীর হৃদ্যতাই না সেকালে ছিল! এ সম্বন্ধে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। "মুসলমানগণ ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি যে-স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দু-প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মস্‌জিদের পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাট্গণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস-নিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িয়াছিল।"[১]

বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান উৎসাহবর্দ্ধক ছিলেন সম্রাট্ হুসেন সাহ (১৪৯৪-১৫২৫)। তাঁহার প্রশংসা বহু কাব্যেই আছে। বিজয়গুপ্ত তাঁহার 'মনসামঙ্গল' কাব্যের রচনাকাল নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—

"সনাতন হুসেন সাহ, নৃপতি তিলক।"

পদাবলী সাহিত্যেও এই হুসেন সাহের নাম খুব সম্মান ও সম্ভ্রমের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীযুত হুসন, জগত ভূষণ, সোহ এরস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর, ভোগ পুরন্দর, ভণে যশরাজ খান॥"

মাধবাচার্য্যের 'চণ্ডীমঙ্গলে' খুব সম্ভ্রমের সহিত কবি একাব্বর মহারাজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥"

পরাগল খাঁ নামে হুসেন সাহের এক সেনাপতির আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর উপাধিধারী শ্রীকর নন্দী নামক কবি মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহাতেও এইরূপ জানিতে পারা যায়।

"নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তাহানক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, চতুর্থ সং, পৃঃ ১১২।

এই পরাগল খানের পুত্র ছুটি খাঁও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইঁহারই আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্ব অনুবাদ করেন। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে।

"নশরত শাহ নাম অতি মহারাজা।
পুত্রসম রক্ষা করে সকল পরজা॥
নৃপতি হুসেন সাহ তনয় সুমতি।
সামদান ভেদ দণ্ডে পালে বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুরা উপরে করিল সন্নিধান।"

এই সকল গুণগান হইতে ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, রাজকার্য্য-অবসানে মুসলমান সম্রাট্‌গণ পাত্র-মিত্র পরিবেষ্টিত হইয়া সাহিত্যচর্চ্চা করিতে ভালবাসিতেন এবং হিন্দুশাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ শুনিবার জন্যও তাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল।

মুসলমান শাসকদের দৃষ্টান্তে হিন্দু নৃপতিগণও বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য বাঙ্গালী কবিদিগের সম্মান ও সমাদর করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে মুসলমান শাসকদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণাই বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির কারণ হইয়াছিল।

শুধু যে মুসলমান শাসকদের উৎসাহে মধ্যযুগের বঙ্গ-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল তাহা নহে। ঐ যুগে বহু মুসলমান কবি বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য বাঙ্গালায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সে দান অবহেলা করিবার নহে। এই সকল মুসলমান কবিগণের অধিকাংশই আবার বৈষ্ণবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ছিলেন—তাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই সকল কবিতা ভাষার ঐশ্বর্য্যে, ভাবের গভীরতায় এবং ছন্দের মাধুর্য্যে আজিও ঝলমল করিতেছে। সেই সকল পদাবলীর সরসতা আমাদিগকে মুগ্ধ করে।

প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের কিয়দংশ মঙ্গলকাব্য, কিয়দংশ অনুবাদ কাব্য, কিয়দংশ চরিতাখ্যান। এই তিন শ্রেণীর কাব্যসাহিত্যের মধ্য দিয়া বিশেষ কোনরূপ মৌলিক কবিত্বরস উৎসারিত হয় নাই এবং কেবলমাত্র অনুবাদকাব্য, চরিতাখ্যান অথবা মঙ্গলকাব্যের রচনা ও তাহার পরিবর্ত্তন ও পরিমার্জ্জনেই যদি বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্য আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে ইহার পরবর্ত্তী উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কখনই সম্ভব হইত না।

বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত জাগরণ হইয়াছিল বৈষ্ণব কবিতায়। ভাষা-সৌষ্ঠবে, ভাব-গভীরতায় এবং ছন্দোমাধুর্য্যে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের একমাত্র গৌরবস্থল বৈষ্ণব পদাবলী। ইহারই মধ্য দিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়ের ভাবধারা মুক্তিলাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাঙ্গালা দেশের আবেগময়, স্নেহ-প্রেমার্দ্র চিত্তবৃত্তি এই বৈষ্ণব কবিতার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশের সার্থকতা লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালীর চিত্ত সরসসুন্দর এবং ভাবপ্রবণ হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে শাক্ত কবিদেরও শ্যামা-সঙ্গীতের আবির্ভাব হইয়াছে। এবং অবশেষে ইহারই প্রভাবের সহিত ইউরোপীয়—বিশেষ করিয়া ইংরেজি গীতি-কবিতার প্রভাব মিলিত হইয়া আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ কবিগণ এই বৈষ্ণব কবিতারই গীত-মাধুর্য্য ও পদলালিত্যকে লালন করিয়া নূতন যুগের উপযোগী নূতনতর কাব্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন।

যে-যুগে বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মত বঙ্গের কাব্যকানন পুষ্পিত করিয়া তুলিয়াছিল, উহা হইতেছে বঙ্গ-সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। উহা শ্রীচৈতন্য-দেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকাল। এই যুগে বহু মুসলমান পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভাষার সরলতায়, কল্পনার অভিনবত্বে এবং ভাব-গভীরতায় সেই সকল মুসলমান কবিগণের পদাবলীর সহিত জ্ঞানদাস, নরোত্তমদাস, ঘনশ্যামদাস, বলরামদাস, লোচনদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাজন-গণের পদাবলীর তুলনা হইতে পারে। সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের মত সেই সকল পদাবলীর গঠনের পারিপাট্য এবং ভাবের সৌরভ।

কিন্তু কি অদ্ভুত প্রেরণার ফলে মুসলমান কবিগণ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও তাঁহার প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যক।

বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীচৈতন্যদেবই তাহার প্রবর্ত্তক। তবে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেও আমাদের দেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম ছিল। জয়দেব, বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি শ্রীচৈতন্যদেবের বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা যে বৈষ্ণব মতবাদের নিদর্শন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পদাবলী যদিও বাঙ্গালা কাব্যের অশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিল, তথাপি পদাবলীর প্রসার ও সমাদর শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরেই বেশী হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী কবিগণের দ্বারাই বৈষ্ণব কবিতার অফুরন্ত ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া হরিনাম ও কৃষ্ণভক্তি প্রচারকেই তাঁহার জীবনের ব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
রাত্রি দিনে প্রেমে নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ॥
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া।
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া॥" ১

সঙ্কীর্ত্তন করিয়া এবং রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী শুনিয়া তিনি পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে আছে যে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এবং জয়দেবের গীত তাঁহাকে গান করিয়া শোনানো হইত।

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত॥" ২

অন্যত্র—"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ।" ৩

কোন্ কোন্ পদ আস্বাদন করিয়া তিনি মুগ্ধ হইতেন, তাহাও চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতির—

"কি কহব রে সখি! আনন্দ ওর।
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

এই পদটি শুনিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। এবং নিম্নোদ্ধৃত চণ্ডীদাসের পদটি শুনিয়া শ্রীরাধিকার মত ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত।

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে।
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ।
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ॥
এই পদ গায় মুকুন্দ সুমধুর স্বরে।
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে॥" ১

এইভাবে চৈতন্যদেবের অনুরাগ ও আগ্রহের ফলে বিদ্যাপতি ও বড়ু চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাক্‌চৈতন্যযুগের পদকর্ত্তাদের পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে খুবই সমাদৃত হইয়াছিল। তাহার পর তিনি যখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন সেই সম্প্রদায়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী ভাবের ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতি ও প্রচার হইতে লাগিল।

"শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান।
আজন্ম আজ্ঞাকারী তিঁহো সেবক প্রধান।" ২

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এই বঙ্গদেশে প্রেমের বন্যা বহিয়াছিল। তাঁহার সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাব এমনই অসীম ছিল যে, উহা শ্রবণ করিয়া মুসলমানগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া বুদ্ধিমন্ত খান তাঁহার সেবক হইয়াছিলেন—

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতেও আছে—

"বুদ্ধিমন্ত খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন।
তাহার আনন্দ অতি অকথ্য কথন॥" ৩

নীলাচলে রথযাত্রার সময়ে যখন চৈতন্যদেবের ভক্তগোষ্ঠী গমন করিয়াছিলেন, তখনও—

"চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয়।
আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা যাঁহার বিষয়॥" ৪

যে হুসেন সাহ্ বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান উৎসাহবর্দ্ধক হইয়াছিলেন, অনেকে মনে করেন, তিনিও চৈতন্যদেবের অলৌকিক প্রভাব ভিন্ন ঐরূপ মহান্ ও উদার হইতে পারিতেন না।

১। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১৩শ পরিচ্ছেদ
২। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৩শ পরিচ্ছেদ
৩। ,, ,, ১০ম পরিচ্ছেদ

১। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ
২। ,, আদি ১০ম ,,
৩। চৈতন্যভাগবত, আদি ১০ম পরিচ্ছেদ
৪। চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৯ম পরিচ্ছেদ

"যে হুসেন সাহা সর্ব্ব উড়িষ্যার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল বিশেষে ॥
হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র।"১

চৈতন্যদেবের পার্ষদ এবং শিষ্য গদাধর দাসের কীর্ত্তন শ্রবণে মুসলমান কাজী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—

"শ্রীগদাধর দাস শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজীগণের মুখে যে বোলাইল হরি ॥"২

সর্ব্বসাধারণের মনের উপরে চৈতন্যদেবের যেমন অসীম প্রভাব ছিল, তেমনই তাঁহার প্রভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারই আবির্ভাব বৈষ্ণব কবিদের ছন্দঃ, গীত, সুর ও ভাবধারা উৎসারিত করিয়া দিয়া বঙ্গদেশকে মধুর আনন্দে পরিপ্লাবিত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবে পদাবলী সাহিত্যের এই বিকাশ দেখিয়া একটি রূপকের কথা মনে হয়। বসন্তাগমের ঠিক পূর্ব্বে কোকিল ডাকে একটি ছুইটি। কিন্তু বসন্তাগমে যখন সমস্ত কুঞ্জকানন ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন সমস্ত আকাশ-বাতাস কোকিলের কুহুরবে মুখর হইয়া উঠে। বসন্তের আগমনে কোকিলের মনে যেমন অসীম আনন্দের সঞ্চার হয়, চৈতন্য-দেবের আবির্ভাবে তেমনই কবিগণের অন্তরে এক অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত বহিয়াছিল এবং উহা তাঁহাদের গীতলহরীকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল। সেই মধুর আনন্দের স্রোতে মুসলমান কবিগণ পর্য্যন্ত অবগাহন করিয়া বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন।

রাধার বর্ণনা অথবা তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের জন্য বৈষ্ণব কবিগণের আদর্শই ছিলেন চৈতন্যদেব। কি হিন্দু, কি মুসলমান কবি, সকলেই রাধাভাবের মূর্ত্তিকে তাঁহাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গিয়াছেন। ইহাতে কোনরূপ কল্পনার প্রয়োজন তাঁহাদের হয় নাই। চৈতন্যদেব নিজেই প্রেমমূর্ত্তি। তাঁহার প্রেমের আগ্রহে ও আর্ত্তিতে, বিরহে ও মিলনে বৈষ্ণব-সাধনার প্রণালীগুলি মূর্ত্তি পাইয়াছিল। রাধা-ভাবে আবিষ্ট চৈতন্যদেবের প্রেমের আকৃতি দেখিয়া মুসলমান পদকর্ত্তাগণ এমনই অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারাও রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমুদ্র-তরঙ্গ দেখিবামাত্র চৈতন্যদেব তাহাকে যমুনা বলিয়া ভুল করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হইয়াছে, এইরূপ ধারণায় এমন আনন্দ তাঁহার হইত যে, তাহাতে তাঁহার দেহ কদম্বের মত কণ্টকিত হইয়া উঠিত। নদী দেখিবামাত্র উহা যমুনা বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইত—

"যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
তাঁহা নাচে গায় প্রেমাবেশে পড়ে কান্দি ॥"১

পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধিকার যে প্রেমাবেশ, তাহা চৈতন্যদেবের প্রেমাবেশেরই অনুরূপ। ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়া চৈতন্যদেবের সুমধুর ভাবাবেশের চিত্র চৈতন্য-চরিতামৃতে অঙ্কিত হইয়াছে।

"ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভুমিতে পড়িলা ॥"২

ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা মনে করাইয়া দিয়াছে, মেঘের নীলিমা দেখিয়াও সময়ে সময়ে তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের কথা মনে পড়িয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরাধিকারও এইরূপ ভাবাবেশ দেখা যায়। চণ্ডীদাসের একটি বিখ্যাত পদে আছে—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।
এক দিঠ করি ময়ূর-ময়ূরী-
কণ্ঠ করে নিরিখনে।"

গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে যে, শ্রীরাধিকা মেঘ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের জন্য ব্যাকুলা হইয়াছেন এবং তমাল তরুর নীলিমা দেখিয়া নির্জ্জনে তাহাকেই আলিঙ্গন করেন—

'জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর
... ...
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল।"

শ্রীচৈতন্যদেবও—

"তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥"

—গোবিন্দদাসের কড়চা

১। চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ
২। চৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১০ম পরিচ্ছেদ

১। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ
২। চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যদেব কৃষ্ণ-নাম শুনিবামাত্র বক্তার পদে বিক্রীত হইতেন—ভাবাবেগে বাক্যহীন হইয়া যাইতেন। পদাবলী-সাহিত্যে রাধিকার অবস্থাও অনেক সময়ে এইরূপই হইয়াছে—

"যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়॥
সোনার পুতলী যেন মাটিতে লোটায়॥"

—চণ্ডীদাস

সুতরাং পর-চৈতন্যযুগের পদাবলীর রাধাকে শ্রীচৈতন্য ভিন্ন আর কি বলিব। কৃষ্ণপ্রেম তাঁহার জীবনের ব্রত হওয়ার পর হইতে চৈতন্যদেব সেই পরম-আনন্দময়ের চিন্তাতেই মুগ্ধ ও আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দে তিনি বাহ্য-জগৎ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িতেন। সেখলাল নামক একজন মুসলমান বৈষ্ণব কবি শ্রীরাধিকার মুখ দিয়া চৈতন্যদেবেরই সেই বিহ্বল অবস্থাই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

"শয়নে স্বপনে, ঘরেতে পিরীতি,
করিনু শ্যামের সনে।
সেই হইতে মোর চিত বেয়াকুল
কিছুই না লয় মনে।"

—সেখলাল॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব না হইলে বৈষ্ণবেরা হয়ত আরাধিকা-শিরোমণি শ্রীরাধিকার প্রণয় মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। তিনিই শ্রীরাধিকার প্রণয়-মহিমা জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই জীবনের ঘটনাসমূহ পর-চৈতন্যযুগের পদকর্ত্তাদের মনে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বিষয় গভীর ভাবে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিল। সেই অসীম প্রভাব হইতে মুসলমান কবিগণ পর্য্যন্ত মুক্ত হইতে পারেন নাই।

কোন কোন মুসলমান পদকর্ত্তা অবশ্য ব্রজ-লীলার কাব্যোচিত মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনে হয়, অধিকাংশ মুসলমান পদকর্ত্তা প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্ব-সমাজে নিন্দার আশঙ্কা থাকিলেও বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অনুপ্রেরণায় স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সেই কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। আকবর সাহা, নশীর মামুদ, ফকির হবিব, ফতন প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের পদাবলীর ভণিতার ভিতর দিয়া তাঁহাদের কৃষ্ণভক্তি স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সকল মুসলমান পদকর্ত্তাদের পদসমূহে যে রকম উপলব্ধির গভীরতা আছে, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুপ্রেরণা ভিন্ন সম্ভব নহে। যেমন—

"আগম নিগম বেদ সার,
লীলা যে করত গোঠ বিহার,
নশীর মামুদ করত আশ,
চরণে শরণ দানরি॥"

কবি এখানে স্পষ্টভাবে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণ মাগিয়াছেন, কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন নাই।

ফকির হবিব নামক একজন মুসলমান পদকর্ত্তা বলিতেছেন—

"ফকির হবিব বলে, কানুরে দেখিনু ভালে,
যেন শশী পূর্ণ উদয়।
হেন মন করে হিয়া, কানুরে সমুখে থুইয়া,
নিরবধি দেখহু' সদায়॥"

একেবারে বৈষ্ণবভাবাপন্ন না হইলে প্রাণের আকুতি এই ভাবে ব্যক্ত হইতে পারে না।

কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা ত' শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান, যেন সেই পরম-পুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়াই গাহিয়াছেন—

"সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে নাগর রসিয়া।
আন ভুলায়ল মুরলী শুনাইয়া॥"

ইঁহারই—

"শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি॥"

এই পদটির শেষাংশে আছে—

"সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে, কানুর চরণে,
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিল তুয়া পায়ে,
জীবন মরণ ভরি॥"

এই গীতটিতে পদকর্ত্তা নিজে শ্রীরাধার সুরের সহিত সুর মিলাইয়া তাঁহার হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদছায়ার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন। অন্যান্য বহু মুসলমান পদকর্ত্তাও রাধার বেনামী তাঁহাদের নিজেদের মিলন-ব্যাকুলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। ফতন নামক এক পদকর্ত্তা গাহিয়াছেন—

"সহিতে না পারি আর, কৃপা করি কর তার,
জনম অবধি দুখ পাইনু।
অধম ফতনের সাধ, ক্ষেম প্রভু অপরাধ,
রাঙ্গা পায় শরণ লৈনু।"

শ্রীকৃষ্ণের শরণ প্রার্থনা করিতে ইনিও কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

মুসলমান পদকর্ত্তাদের মধ্যে চাঁদ কাজির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে এবং তাঁহার পদে উচ্চ শ্রেণীর কবিত্বও বর্ত্তমান। যেন শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনি তাঁহার অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে এবং তিনি বংশীধারীর সহিত মিলনের আকুলতাবশতঃ গাহিয়াছেন—

"চাঁদ কাজি বলে—বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি, না দেখিলে হরি॥"

এই সকল মুসলমান পদকর্ত্তার হৃদয়ের নিভৃত কোণে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি যেন অলক্ষ্য হইতে ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই অপূর্ব্ব বংশীধ্বনিই মুসলমান পদকর্ত্তাদের মুগ্ধ কবিচিত্তে কবিত্বরস উৎসারিত করিয়া দিয়াছিল এবং সমস্ত পদাবলীর ভিতরেই এই সকল পদকর্ত্তাদের বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যে মুসলমান কবির সংখ্যা অল্প নহে। কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল—যেমন, অলিরাজা, আকবর সাহা, কবীর, গরিব খাঁ, চাঁদ কাজি, নশীর মামুদ, ফকির হবিব, ফতন, সেখ ভিখন, সেখ জালাল, সেখলাল, সৈয়দ মর্ত্তুজা ইত্যাদি। কবি হিসাবে ইঁহাদের অনেকেই শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য। শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যে এমন একটি কোমল মধুর উজ্জ্বলতা থাকে, যাহা আমাদিগের প্রাণে ও মনে এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা আনিয়া দেয়। এই কোমলতা এবং মাধুর্য্য, যাহাকে রাস্কিন্ infinite tenderness বলিয়াছেন, জুবেয়ার যাহাকে বলিয়াছেন delicacy এবং সেক্সপীয়র যাহাকে fine frenzy বলিয়াছেন, তাহার সন্ধান এই সকল মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী আস্বাদন করিলেও পাওয়া যায়।

কবির পরিচয় তাঁহাদিগের কাব্যে। কাব্য বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়াই আমরা তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্তের অনুসন্ধান করি। কিন্তু উল্লিখিত মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের অনেকেরই জীবন তমসাবৃত। কারণ কবিগণ নিজেরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন এবং কোনও জীবনীলেখক তাঁহাদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। ইঁহাদের জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার যেটুকু পরিচয় আমরা পাই, তাহা তাঁহাদের কাব্যেই বর্ত্তমান আছে। কাব্য হইতেই তাঁহাদের ভাবপ্রবণতা ও অন্তর্জ্জীবনের ধারণা করিয়া লওয়া যায়।

আলওয়াল :—

বঙ্গসাহিত্যে যে কয়জন মুসলমান কবি পদ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কবি আলওয়াল একটি শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া আছেন। ইহাঁর রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ বর্ণনাচাতুর্য্যে ও সরস শব্দ-যোজনার মাধুর্য্যে খুবই সুন্দর।

ইনি ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণার জালালপুর নামক স্থানের অধিপতি সমশের কুতুবের মুসলমান সচিবের পুত্র ছিলেন। যৌবনে ইনি ইহাঁর পিতার সহিত জলপথে যাইতেছিলেন। সেই সময় ইহাঁরা পোর্ত্তুগীজ-জলদস্যু হার্মাদদের দ্বারা আক্রান্ত হন। সেই আক্রমণে কবির পিতা প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু কবি কোনরূপে রক্ষা পাইয়া রোসাঙ্গের (আরাকানের) রাজার প্রধান অমাত্য মাগন ঠাকুরের শরণাপন্ন হন। সঙ্গীত ও অপরাপর সুকুমার শাস্ত্রের প্রতি মাগন ঠাকুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আলওয়ালের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া মাগন ঠাকুর আলওয়ালকে প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি মালিক মহম্মদ জয়সী প্রণীত 'পদ্মাবৎ' কাব্যের অনুবাদ করিতে বলেন। ইনি যখন পদ্মাবৎ কাব্য রচনা শেষ করেন, তখন ইনি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পরে তিনি আবার তাঁহার আশ্রয়দাতা এবং সাহিত্য-প্রচেষ্টায় উৎসাহদাতা মাগন ঠাকুরের আদেশ 'সয়ফল মূলুক' ও 'বদিউজ্জামল' নামক ফার্সী কাব্যের অনুবাদে রত হন। কিন্তু অনুবাদ শেষ না হইতে হইতে শা সুজা আরাকান আক্রমণ করেন এবং আলওয়াল বন্দী হন। পরে কারামুক্ত হইয়া এই দীন কবি সৈয়দ মুসা নামক একজন সদয় ব্যক্তির নিকট আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার ভগ্ন বীণায় পুনরায় তার সংযোজনা করিয়া অসমাপ্ত কাব্য দুইটি শেষ করেন। ইহা ভিন্ন তিনি 'লোর চন্দ্রানী' ও 'সতী ময়না'[১] নামক দুইখানি

১। পুস্তক দুইখানির প্রথমাংশ দৌলত কাজির রচিত।

কাব্যের শেষাংশ রচনা করেন, এবং পরে সৈয়দ মহম্মদ খাঁ নামক এক ব্যক্তির আদেশে ফার্সী কবি নিজামী গঞ্জনবীর প্রসিদ্ধ কাব্য 'হস্ত পায়কার' বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন। উক্ত কাব্য কয়খানি আলওয়ালের মৌলিক সৃষ্টি নহে। সবগুলিই হয় হিন্দী না হয় ফার্সী কাব্যের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদ হইলেও প্রত্যেকখানি কাব্যের অনেক স্থলেই চমৎকার কবিত্ব ও নূতন সৃষ্টি আছে। আলওয়ালের সমস্ত কাব্যের মধ্যে তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্যখানিই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাতে কবির পাণ্ডিত্য, গভীর সংস্কৃত-জ্ঞান, সরস শব্দ-যোজনা হইতে ঋতুবর্ণনা প্রভৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রচনায় কলসীকক্ষা রমণীর জল ভরিয়া আনার বর্ণনা, বয়ঃসন্ধি বর্ণনা প্রভৃতি অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

ইনি মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের ও কাশীরাম দাসের পরবর্ত্তী কবি। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অনুমান করেন যে, ১৬১৮সালের কাছাকাছি কোনও সালে ইহাঁর জন্ম হইয়াছিল। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শা সুজার মৃত্যু হয়। সুতরাং তাহার পূর্বে কবি আলওয়াল যে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহ।

কবি আলওয়াল যে বয়ঃসন্ধি বর্ণনায় একজন রসজ্ঞ বৈষ্ণব কবি ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার 'পদ্মাবৎ' কাব্য হইতে পাওয়া যায়।

"আড় আঁখি বক্রদৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু আসি সঞ্চরয়॥
চোর রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে উপজয়।
বিরহ বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়।
অনঙ্গ-সঞ্চার অঙ্গে রঙ্গ ভঙ্গ সঙ্গে॥
আমোদিত পদ্মগন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।
সুন্দরী কামিনী কামবিমোহে।
খঞ্জন-গঞ্জন নয়নে চাহে।
মদনধনু ভুরুবিভঙ্গে।
অপাঙ্গ ইঙ্গিত বাণ তরঙ্গে॥"

আলওয়ালের এই বয়ঃসন্ধি বর্ণনা বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বহু স্থানেই বিদ্যাপতির বর্ণনার চমৎকারিত্ব আলওয়ালের বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আলওয়ালের—

"চলিল কামিনী গজেন্দ্র গামিনী
খঞ্জনগমন শোভিতা॥"

বিদ্যাপতির—

"গেলি কামিনী গজহু গামিনী
বিহসি পালটি নেহারি।"

এই বর্ণনার কথা মনে করাইয়া দেয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বিদ্যাপতির পদাবলীর মাধুর্য্যে তিনি মুগ্ধ হইয়া প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। আলওয়ালের উপর জয়-দেবেরও প্রভাব ছিল। অনেক স্থানেই তাঁহার কবিতার কথার বাঁধুনি জয়দেবের মত। বিদ্যাপতির বর্ণনা-চাতুর্য্য ও জয়দেবের সরস শব্দযোজনার সৌকর্য্য মিলিয়া আলওয়াল কবির কবিতাকে সরসসুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

আলওয়ালের নিম্নলিখিত রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদটি সমধিক প্রসিদ্ধ—

"ননদিনী রসবিনোদিনী
ও তোর কুবোল সহিতাম নারি॥ ধ্রু॥
ঘরের ঘরণী জগত মোহিনী
প্রত্যুষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ
কিসে বিলম্ব করিলি।"

রাধা অভিসারে গিয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছেন, তাঁহার ননদিনী কুটিলার তিরস্কার রাধিকার অসহ্য বোধ হইতেছে। কুটিলা তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেছে—হে সুন্দরী তুমি প্রত্যুষে যমুনায় গিয়াছিলে; এখন দিবাবসান হইয়াছে, রাত্রির অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। এত বিলম্ব তোমার কি জন্য হইল? কুটিলার প্রশ্নের উত্তরে রাধিকা বলিতেছেন—

"প্রত্যুষ বেহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম॥
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে
করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে
দিন অবশেষ ভেল॥
সীঁথের সিন্দুর নয়নের কাজল
সব ভাসি গেল জলে।
হের দেখ মোর অঙ্গ জরজর
দারুণি পদ্মের নালে॥"

এইভাবে রাধিকা তাঁহার নিজের অঙ্গের অভিসার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিয়া গোপন করিতেছেন। এই উক্তির পশ্চাতে রাধিকার যে মূর্তিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপূর্ব্ব। দুর্গম পথে অভিসার-যাত্রা করিয়া এবং প্রত্যাবর্তন করিয়া রাধা মলিন হইয়াছেন—তিনি তাঁহার করের কঙ্কণ হারাইয়াছেন এবং তাঁহার সিন্দূরের রেখা ও নয়নের কাজল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহা গোপন করিয়া তিনি যে ভাবে অভিসার-লক্ষণ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে তাঁহার করুণকোমল রূপটি চমৎকারভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই পদটির শেষে কবি বলিতেছেন—

আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে
জগৎ-মোহিনী বামা॥"

কবি আলওয়াল যে মাগন ঠাকুরের আজ্ঞায় এই পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই ভণিতা হইতে পাওয়া যায়।

আলওয়ালের পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের মত যে উপলব্ধির গভীরতা এবং বর্ণনাকৌশল আছে, তাহা পাঠকদিগকে মুগ্ধ করে।

আকবর সাহ :—

ইঁহার একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। এক-কালে যেমন কানু ছাড়া আর গীত ছিল না, পরে তেমনি গৌর-চন্দ্রের চরিত-বর্ণনা ছাড়া আর গীত কল্পনা করা যাইত না। বৈষ্ণব পদাবলীগুলি গান করিয়া শোনানো হইত। সেই কৃষ্ণ-লীলা গাহিবার পূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া শ্রোতাদের মন ভক্তিতে প্রেমে অভিষিক্ত করিয়া লওয়া হইত। নিম্নোদ্ধৃত আকবর সাহের রচিত পদটিতে গৌরাঙ্গলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের আনন্দে বিভোর চৈতন্যদেবের রূপটির মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কবি গাহিয়াছেন—

"জিউ জিউ মেরে মন চোর গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥ ধ্রু॥
খোল করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া।
পদ দুই চারি চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥
ঐছন পহুকে যাহু বলিহারি।
সাহ আকবর তেরে প্রেম-ভিখারী॥"

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন রূপ মহাযজ্ঞ দর্শনে মুসলমানগণ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। আকবর সাহও সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা চাক্ষুষ দর্শন করিয়া এই পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। একজন বিখ্যাত লেখক এই পদটি সম্বন্ধে বলিয়াছেন "এ রতন বাজে-মারকা নহে, প্রাচীন এবং হীরার ধারে প্রস্তুত।"[১] ভগবৎপ্রেমে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গৌরাঙ্গের নৃত্যের বর্ণনা লোচনদাস, বাসু ঘোষ প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের পদেও পাওয়া যায়। গরিব খাঁ নামক একজন মুসলমান পদকর্ত্তারও একটি গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া গিয়াছে। চৈতন্যদেবের ভুবনভুলানো গৌর-বরণ দেখিয়া কবি মুগ্ধ হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সেই গৌরবর্ণ কোথা হইতে পাইয়াছেন তাহা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, রাই-কানু দুইজনের রূপের সারাংশ লইয়া হয়ত গৌরাঙ্গের অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্য সৃষ্ট হইয়াছে। কোন্ রূপ-পাথারে ডুবিয়া চৈতন্যদেব গৌর হইয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য গরিব খাঁর অসীম কৌতূহল হইয়াছে। রূপমুগ্ধ কবি গাহিয়াছেন—

"শরমে শরম পলায়ে গেল।
রাই কানু দুটি তনু যামন দুধে জলে মালায়ে গেল॥
চাঁদের কোলে চকোরী না সুধায় ডুবা্যা অবশ হল।
সে সুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনমভর ডুবা্যা রহিল॥
গরিব ভাই দেখার লাগি মনের দুখে মন গুমরি' পাগল হ'ল॥
সে রসের পাথার পেল না কোথায়, শ্যামে আচোট ভুঁয়ে পড়িয়ে মল॥
জানি কার রূপপাথারে ডুবা্যা চাঁদ গৌর হয়েছে।
যামন করে বাসুত ভাল স্যা ওর মনমত আছিল।
ও মন আছিল স্যা রূপের কাছে।
গরিব কয় ধরম্ বলে ডুবা্যা প্যালে না, তাই থাপি নদেয় এয়েছে॥"

কবীর :—

ইনি হিন্দী সাহিত্যের সাধক-কবি নহেন। ইহাঁর ভাষাই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইহাঁর একটি পদে বসন্তোৎসব উপলক্ষে হোলী-খেলার চমৎকার বর্ণনা আছে। ব্রজ-যুবতীরা চুয়া-চন্দন ও গোলাপের সুগন্ধমিশ্রিত আবীর লইয়া শ্যামের অঙ্গে দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণও ফাগ লইয়া ঘুরিতেছেন—কখনও বা শ্রীরাধিকাকে সেই ফাগের রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিতেছেন। আবার বর্ষণ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার

১। শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়

জন্য বারে বারে তিনি অবগুণ্ঠনদ্বারা তাঁহার মুখ ঢাকিতেছেন। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাঁহার মুখ-চন্দ্র বার বার লুকাইতে দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন মেঘের আড়ালে চাঁদ গিয়া আত্মগোপন করিতেছে।

"বরজ কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।
চুয়া চন্দন, আবীর গোলাব,
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে॥ ধ্রু॥
ফাগু হাতে করি, ফিরত শ্রীহরি,
ফিরি ফিরি বোলত রাই।
ঘুমট উঠায়েঁ বয়ান ছাপায়ত,
বেরি বেরি যৈসে মেঘসে চাঁদ লুকাই॥
ললিতা একা সখী, ফাগু হাতে করি,
দেয়ত কানু নয়ান।
বৃকভানু কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি,
মারাত শ্যাম বয়ান।
আওর এক সখী, জীউ জীউ করি,
কাঁহা লাগাও আবীর।
কমরি ফাগু লেই, কান নয়ান বেরি বেরি দেয়ত,
হাঁ হাঁ করত কবীর॥"

ইহার সহিত বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের এই কবিতাটি তুলনীয়—

"মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে।
ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে।
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরি অঙ্গে।
মুখ মোড়ল ধনি করি কত ভঙ্গে॥
ফাগুরঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেড়িয়া।
শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥ ইত্যাদি

কবীরের পদটিতেও জ্ঞানদাসের এই পদটির মত বর্ণনার চমৎকারিত্ব আছে।

নশীর মামুদ :—

ইহাঁর একটিমাত্র পদ বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "পদ-কল্পতরুতে" পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁর জীবনের কোন বৃত্তান্তই পাওয়া যায় না। তবে ইনি হয়ত পশ্চিমবঙ্গবাসী ছিলেন। কারণ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে যে সমস্ত পদ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নশীর মামুদের কোনও পদ দৃষ্ট হয় না।

ইহার যে পদটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি গোষ্ঠবিহারের পদ। পদটির রচনা অতি সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম মুরলী ধ্বনি করিয়া ধেনুগুলির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সঙ্গীগণও তাঁহাদের সঙ্গে আছেন। যমুনা-তীরে ধবলী শ্যামলী প্রভৃতি গাভীদিগকে আহ্বান করিয়া কানু যাইতেছেন এবং খেলা করিতেছেন। তাঁহার কিশোর বয়স এবং মুখে নীল-নব-জলধরের কান্তি। সুন্দর গুঞ্জা-হার তাঁহার কণ্ঠে এবং তাঁহার মুখে মদন দীপ্তি পাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের এই গোষ্ঠলীলা আগম নিগম বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের সার।

"ধেনু সঙ্গে গোঠে রঙ্গে
খেলত রাম সুন্দর শ্যাম
পাঁচনি কাঁচনি বেত্র বেণু
মুরলি আলাপি গানরি।
প্রিয় দাম শ্রীদাম সুদাম মেলি
তরণি তনয়া তীরে কেলি
ধবলি শাঙলি আওরি আওরি
ফুকরি চলত কানরি॥
বয়স কিশোর মোহন ভাঁতি
বদন ইন্দু জলদ কাঁতি
চারু চন্দ্রি গুঞ্জা হার
বদনে মদন ভাণরি।
আগম নিগম বেদ সার
লীলা যে করত গোঠবিহার
নশীর মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দানরি॥"

ভণিতার অর্দ্ধ কলিটি পদকর্ত্তার কৃষ্ণভক্তির পরিচায়ক। এই পদটির ছন্দোঝঙ্কার এবং অপূর্ব্ব শব্দচিত্র, রচনার কৌশল লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ফকির হবিব নামক মুসলমান পদকর্ত্তার একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহাতে কবি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিয়াছেন। পদটি সুন্দর, কিন্তু তাঁহার বর্ণনায় বিশেষ কোনও অভিনবত্ব না থাকায় উহা আর উদ্ধৃত করা হইল না।

সেখলাল :—

ইনি চমৎকার ভাবে অনুরক্তা শ্রীরাধার বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনোৎসুক হইয়া বিরহের যে অনুভূতি, তাহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"শুন লো স্বজনি কিছুই না জানি
কি বুধি করিব আমি।
তারিতে নারিব দৈবে মরিব,
নিশ্চয় জানিহ তুমি॥
শয়নে-স্বপনে, শ্যাম বঁধুর সনে
সুখে গিয়াছিনু নিদ।
... ...
পাঁজর কাটি শ্যাম বঁধুরে কেবা,
দিয়া নিল সিঁদ।
তোমারে কহিনু সখি, পিরীতির এই রীতি,
সদাই পরবশ দে।
সেখলালে কয়, যে জন তাহার হয়,
সে বিনে জানিবে কে॥"

ফত্তন নামক এক পদকর্ত্তার একটি পদেও অনুরক্তা রাধার বিরহিণী-রূপটি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। রাধিকার সেই ব্যাকুলতা যেন আমাদের চোখের সাম্‌নে ভাসিয়া উঠে। রাধিকা বলিতেছেন—

"আরে মোর একি পরমাদ হইল।
ছটফট করে হিয়া কহ না বঁধুরে যাইয়া
কি দিয়া কিবা গুণ কৈল॥
জীতে মোর নাহি সাধ, মিছামিছি পরিবাদ
মিছা পাকে ঠেকিয়া রৈনু।
এমন করম মোর, কলঙ্কের নাহি ওর,
সহিতে না পারি আর কৃপা করি কর তার,
জনম অবধি দুখ পাইনু॥" ইত্যাদি

সেখ ভিখন :—

ইঁহার একটি "খণ্ডিতার" পদ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ অন্য নায়িকা ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান। ইহাতে অভিমানিনী রাধা যে উক্তি করিতেছেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার দুঃখপূর্ণ সরল হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"সবাই বলে রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন ঠাঁই॥ ধ্রু॥
কেমন বানালে চূড়া, শ্রবণে দুলিতেছে,
মেলিতে নার দুটি আঁখি।
হব না মথুরাগতি, কি কব চূড়ার ভাতি,
শ্যাম-অঙ্গে লাগিয়াছে সাথি।
কুঙ্কুম কস্তুরী আর, সুগন্ধি তাম্বুল,
থুইয়াছিনু শিয়র উপর।
হা হরি হা হরি করি, জাগিয়া পোহানু নিশি
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥
সেখ ভিখনে ভণে, বড় দুঃখ রাইয়ের মনে,
পাশরিলে পুরব পিরীতি।
আমার করম দোষে তুমি থাক অন্য পাশে,
হউক মেনে রাধার মিরিতি॥"

সৈয়দ মর্ত্তুজা—

ইঁহার একটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু এই কবির কোনও পরিচয় আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। কবি হিসাবে ইনি যে একটি শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইঁহার শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা, মান, ভাবসম্মিলন প্রভৃতি-সম্বন্ধীয় পদগুলি অতি মনোহর। ইনি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা করিতেছেন—

"ভুবনমোহন রূপ অতি মনোহর।
ঝলমল করে রূপ দেখিতে সুন্দর॥
তরুমূলে করে কেলি ত্রিভঙ্গ হইয়া।
কত কত নাগরী রহে চাঁদ-মুখ চাইয়া॥
জিনি শশী দিবাকর জিনিয়া উজর।
আন মোহিত হইল ব্রজ রমণী সকল॥
কপালে তিলক চাঁদ জিনি তারাগণে।
চিকুর জিনিয়া ছটা পড়িছে গগনে।" ইত্যাদি

এই কবি অল্প কথায় 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব' শ্রীরাধিকার রূপের যে আভাষ দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব—

"একে তোমার গোরা গা, না সহে ফুলের ঘা,
বায়ু হেলিছে সব অঙ্গ।"

সৈয়দ মর্ত্তুজার নিম্নোদ্ধৃত আত্মনিবেদনের পদটি খুব প্রসিদ্ধ এবং ইহা "পদকল্পতরু"তে স্থান পাইয়াছে।—

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন্ শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাশরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদনে,
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান্
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণকানু
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥" ইত্যাদি

বৈষ্ণব পদাবলী কতকগুলি রস অবলম্বন করিয়া রচিত। যেমন পূর্ব্বরাগ, মান, বিরহ, ভাবসম্মিলন ইত্যাদি। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও ঐ বিভিন্ন রস অবলম্বন করিয়া পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। কোনও এক প্রকার রস অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের কবিতা গড়িয়া উঠে নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ। সকল পদকর্ত্তাই হয় শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা অথবা লীলাপ্রসঙ্গ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের আশ্চর্য্য কৃতিত্ব এইখানে যে, ইংরেজ কবি কীট্‌সের মত তাঁহারা অতি সহজেই শব্দ ও উপমার সাহায্যে একটি সৌন্দর্য্য-চিত্র জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও এই প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। বর্ণনীয় বিষয় সঙ্কীর্ণ হইলেও তাঁহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব।

পদাবলী সাহিত্যের বহু পদে শ্রীকৃষ্ণের মনোমুগ্ধকর বংশীধ্বনির আহ্বানের সুর বাজিয়াছে। সেই মর্ম্মভেদী বংশীধ্বনি শুনিলে রাধার আর ঘরে থাকাই দায়—তিনি চঞ্চলা হইয়া উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণের পায়ে নিজেকে বিলাইয়া দিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া উঠেন। সেই বাঁশীর সুরের এমনই আকর্ষণী শক্তি। বৈষ্ণব কবিগণ বাঁশীর সুরে রাধার আকুলতা ব্যক্ত করিয়া রূপকভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভক্তের আকূতি প্রকাশ করিয়াছেন। বহু বৈষ্ণব পদে সেই বিশ্বনিয়ন্তা আনন্দময় পুরুষের বাঁশীর সুরটি ধ্বনিত হইতেছে। সেই পরমপুরুষ—আনন্দময়ের সুর যাহার কাণে পৌঁছায় সে কোনরূপ সীমার বাঁধনে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বিখ্যাত পদে—

"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কুলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।
কে না বাঁশী বাএ সে না কোন্ জনা।
দাসী হঞাঁ তার পায়ে মিশিবোঁ আপনা।।" ইত্যাদি

এই বাঁশীর সুরের কথাই আছে। চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য বহু পদকর্ত্তার পদে এই বাঁশী সুরে রাধার চঞ্চলতা ব্যক্ত হইয়াছে।

মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্থলে সেই পরমপুরুষের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীরাধিকার মুগ্ধ ও ব্যাকুল অবস্থাটিকে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। চট্টগ্রামের ফেণী নদীর তীরবাসী 'অলিরাজা' নামক এক কবি গাহিয়াছেন—

"বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগপ্রাণ ॥ ধ্রু ॥
শুনি মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব-মুনি
ত্রিভুবন হএ জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণ বংশী স্বর ॥
জাতি ধর্ম কুল নীতি ছাড়ি বন্ধু-সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে জন্তু আদি প্রাণী হরে
বংশীমূলে জগতের হিত।
যে শুনে তোমার বংশী সে পায় দেবের অংশ
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়
গৃহবাস কিবা সাধ বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে অলিরাজা কয়।"

ইহা অপেক্ষা 'চাঁদ কাজি' নামক কবির নিম্নোক্ত পদে রাধার ব্যাকুলতা আরও তীব্র এবং তাঁহার লজ্জাশীলা মূর্ত্তি বড়ই মধুর। গুরুজনের নিকটে রাধা যখন উপবিষ্টা তখন অকস্মাৎ বাঁশীর রব তাঁহার কাণে পশিয়াছে—ইহাতে তিনি লজ্জায় বিব্রত। কিন্তু সে বংশীধ্বনি কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাঁহাকে এমনই ব্যাকুল করিয়াছে যে, তাঁহার অবরুদ্ধ আত্মা সীমার বাঁধ ভাঙ্গিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য নিবিড় আনন্দে উল্লসিতা হইয়া উঠিয়াছে।

বাঁশী বাজান জান না।
অসময় বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না।
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে।
তুমি নাম ধইরা বাজাও বাঁশী, আর আমি মইরি লাজে ॥
ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি ॥
যে ঝাড়ের বাঁশের বাঁশী, সে ঝাড়ের লাগি পাঁও।
জড়ে-মুলে উপাড়িয়া যমুনায় ভাসাওঁ ॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমু না জীমু না আমি, না দেখিলে হরি ॥"

এই শ্রেণীর বৈষ্ণব কবিতাগুলি অধ্যাত্ম রাজ্যের—এগুলি অতীন্দ্রিয় ভাবের দ্যোতক। ক্রমাগত সীমার বন্ধন অতি-

ক্রম করিয়া অসীমের সহিত মিলিত হইবার ব্যাকুল প্রার্থনায় পরিপূর্ণ এই কবিতাগুলি। এখানে বৈষ্ণবদের সাধনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা আসিয়া পড়ে। বৈষ্ণব পদাবলীতে এক স্বর্গীয় উপাদান আছে। "উহা মানবীয় প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে যেন সহসা সুর চড়াইয়া কি এক অজ্ঞাত সুন্দর রাগিণী ধরিয়াছে, তাহা ভক্ত ও সাধকের কর্ণে পৌঁছিতে সমর্থ হইয়াছে।" ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-প্রদর্শনের জন্য রাধার রূপক কেন অবলম্বন করা হইল সে সম্বন্ধে কার্ডিনাল নিউম্যানের মতটি উল্লেখযোগ্য।

"If thy soul wants to attain the higher spiritual blessedness, it must become a woman, Yes, however manly thou mayst be among men".

অর্থাৎ "যদি তোমার আত্মা উচ্চ ধর্ম্মরাজ্যের পবিত্রতায় প্রবেশ করিতে অভিলাষী হয় তবে তাহাকে রমণীবেশে যাইতে হইবে। মনুষ্য-সমাজে তোমার যতই পুরুষকারের গর্ব্ব থাকুক না কেন, এস্থলে আত্মার রমণী সাজা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।" পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অন্যত্রও পাওয়া যায়—

"Make myself thy bride. I will rejoice in nothing till I am in thy arms."

—হে প্রভু আমাকে তোমার বধূ-রূপে বরণ কর, আমি তোমার আলিঙ্গন লাভ করিতে না পারা পর্য্যন্ত কিছুমাত্র সন্তোষ লাভ করিব না।[১]

বৈষ্ণব সাধকদের এই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি মুসলমান বৈষ্ণব কবিদেরও হইয়াছিল। কবি যেখানে বলিতেছেন—

"ওপার হইতে বাজাও বাঁশী, এপার হইতে শুনি।
অভাগিয়া নারী হাম হে সাঁতার নাহি জানি॥"

ঐ বাঁশীর রাগিণী ইহজগতের নহে। ঐ রাগিণী এমন এক জগৎ হইতে আহ্বান আনিয়া দিয়াছে যেখানে এই রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া প্রবেশ লাভ করা যায় না। সেই পরমানন্দময় বংশীবাদকের সহিত দেহের মিলন হইবে না। কিন্তু, বাঁশীর সুর রাধার কাণে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহার সহিত সেই পরমানন্দময়ের মনের মিলন বা ভাব-সম্মিলন হইয়া গিয়াছে।

আধ্যাত্মিকতার কথা ছাড়িয়া দিলেও এই শ্রেণীর পদের আর একটি দিক্ আছে, তাহা কবিত্বের দিক্। এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে প্রবহমান নদীর সহিত তুলনা দেওয়া চলে। নদী কলকল করিয়া বহিয়া চলে। তাহার দুই পার্শ্বে তৃণ-পুষ্প, ফল-ফুল-পরিবৃত নয়নমুগ্ধকর সুন্দর বনরাজি, নগর, গ্রাম থাকে, কিন্তু যখন সে সাগরের বুকে লীন হইয়া যায় তখন উহা অসীম এবং অনন্ত-বিস্তৃত হইয়া পড়ে, উহার আর কোনও সীমা নির্দ্দেশ করা চলে না। বৈষ্ণব কবিতাও সেইরূপ। জাগতিক নরনারীর প্রেমগীতি গাহিতে গাহিতে বৈষ্ণব কবিতা এমন এক স্তরে গিয়া পৌঁছায় যেখানে ঐহিক প্রেমের উন্মত্ত কাকলি থামিয়া যায়, ভগবৎপ্রেমের লীলা-বর্ণনায় কবি মুখর হইয়া উঠেন। মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণও সেই ভগবৎপ্রেমের লীলাবর্ণনায় যেরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা অনবদ্য। যে বিশিষ্টতার জন্য বৈষ্ণব কবিতার সৌন্দর্য্য, তাহা এই সকল মুসলমান কবিগণের পদেও বর্ত্তমান। তাঁহাদের কবিতাও নানাবিধ পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া চলিয়া থাকে, কিন্তু শেষকালে উহা খরস্রোতা নদীর ন্যায় আমাদিগকে অসীমের সন্ধান দিয়া অসীমের বুকে লইয়া গিয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

পরচৈতন্যযুগে বহু পদ রচনা হইয়াছিল। বিভিন্ন কবির পদাবলী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকার জন্য কাব্যরসিক ও ভক্তদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত। সেইজন্য পর পর অনেকগুলি বৈষ্ণব কবিদের পদসঙ্কলন হইয়াছিল।

বৈষ্ণবদাস-সঙ্কলিত (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ) 'পদ-কল্পতরু'তে সৈয়দ মর্ত্তুজা, নশীর মামুদের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, বৈষ্ণব সমাজে মুসলমান কবিগণের পদাবলী খুবই সমাদৃত হইয়াছিল।

বঙ্গদেশের গীতিকবিতাই উৎকৃষ্ট কবিতা। বঙ্গসাহিত্যে এখনও গীতিকবিতার যুগ চলিতেছে। এই যুগের আদি কবি চণ্ডীদাস। এই যুগের কাব্যের উপজীব্য বিষয় প্রেম। ইহার শ্রেষ্ঠ পূজারী প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁহারই প্রেরণায় এই বঙ্গদেশে বহু কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। প্রেমের মন্দিরে সেই সকল কবি যে সুবর্ণ-প্রদীপ জ্বালিয়া গিয়াছেন আজিও তাহার সেই শান্ত-স্নিগ্ধ কিরণে বঙ্গবাসীর হৃদয় উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বল এবং মধুর রসের ধারায় বঙ্গ-সাহিত্য পবিত্র এবং স্নিগ্ধ। আধুনিক যুগের প্রারম্ভে অবশ্য মাইকেল মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ভেরী-নিনাদ শুনাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার কাব্যের সমস্ত উৎকৃষ্ট অংশেই গীতি-কবিতার মধুর বেণুবীণানিক্বণ ধ্বনিত হইয়াছে। মধ্যযুগের হিন্দু এবং মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণ মিলিয়া এই গীতিকবিতার মৃদু উপাদানটিকে লালন করিয়াছিলেন। মধ্যযুগের মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের কাব্যবীণায় যে মধুর ধ্বনি ঝঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহার অনুরণন আজও বাঙ্গালী পাঠকবর্গকে মুগ্ধ করিতেছে। তাঁহারা বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের সৌষ্ঠব-সাধন করিবার জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেজন্য বঙ্গসাহিত্য চিরদিন তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে, সন্দেহ নাই।

১। St. Juan.

রেশম শিল্পের অবতারণা ও মুর্শিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি

—শ্রীকিরণেন্দু বাগচী

সূচনা

পূর্ব্বে বাংলা দেশের অনেক লোকই রেশম-শিল্প অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। এমন কি, বহু পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বের (১৯০৩ সালের) গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে দেখা যায়, এই মুর্শিদাবাদ জেলায় ঐ সময় ৪১,৬১৫ জন ব্যক্তি "পলু" অর্থাৎ রেশমগুটীর চাষে ব্যাপৃত ছিল এবং ইহার রেশম-শিল্পই একদিন সমগ্র জগতের সমক্ষে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। কিন্তু, বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে, এখানকার অধিকাংশ রেশম-শিল্পাবলম্বী তনন্যোপায় হইয়া ক্রমে ক্রমে রেশম কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতেছে।

এইরূপ হইবার কারণ কি?—কারণগুলি, রেশমের কিঞ্চিৎ পরিচয়ের পর সাধ্যানুযায়ী একে একে দর্শাইবার চেষ্টা করিব।

রেশমের আদি জন্মস্থান

রেশমের আদি জন্মস্থান যে কোথায়, এ যাবৎ তাহার কোন সঠিক নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে রেশম চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ভারতীয়েরা নাকি রেশম চিনিত না। চীন দেশে রেশমের নাম 'চীয়াং সুক' বা 'চীন্ সুক' (সংস্কৃত চীনাংশুক?)। তথাকার ঐতিহাসিকেরা বলেন—চীন সম্রাট্ যেপহিতের পত্নী সম্রাজ্ঞী সি-সিং-চি (Sising-chin) চীন দেশের সাং টাং প্রদেশে ২৬০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে পৃথিবীর ভিতর সর্ব্বপ্রথম গুটী হইতে রেশমসূত্র কাটিবার প্রণালী আবিষ্কার করেন; অতঃপর রেশমসূত্র সমগ্র জগতে পরিচয় লাভ করে।

অপর পক্ষে বৈদিক গ্রন্থের উল্লেখ হইতে বুঝিতে পারা যায়, বৈদিক যুগে হিন্দু মাত্রেরই রেশম-বস্ত্র ব্যতিরেকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম কোন শুভ কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারিত না এবং ইহাও বোধ হয় সত্য যে, ঐ যুগে ভারতবর্ষের সহিত চীন দেশের বিন্দু মাত্র পরিচয় ছিল না। কাজেই রেশম যে কোন্ দেশে সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল, সে কথা সঠিক বলা যায় না। জনৈক ফরাসী পণ্ডিতের মতেও রেশম ভারতের জিনিষ।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—রেশম কোরিয়া, জাপান ও ইহার জন্মস্থান ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। আবার কেহ বা বলেন—৩০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবাসীরা স্বর্গরাজ্য হইতে রেশম-শিল্প-জ্ঞান লাভ করে। এ-কথাটিও সত্য নহে। খৃষ্ট জন্মের বহু পূর্ব্বেই ভারতীয়েরা রেশম-শিল্প-জ্ঞান অর্জ্জন করে এবং ভারতে সর্ব্বপ্রথম গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থ অধিবাসীরাই রেশমের ব্যবহার শিখে।

যাহা হউক, এখন পর্য্যন্ত রেশমের উৎপত্তি-স্থান সম্বন্ধে একটিও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যায় নাই। তবে বহু প্রাচীনকাল হইতেই বঙ্গপ্রদেশের—মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম, রাজসাহী, মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলাতে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ভিতর প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্থানগুলিও বহু দিন যাবৎ রেশমশিল্পে নিয়োজিত আছে।

(ক) পলুর চাষ—থানা:—বড়ঞা, বুরওয়ান, গোয়াস, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি।

(খ) রেশম বয়ন—থানা:—সুজাগঞ্জ, দৌলতাবাজার, ভগবান গোলা, গোয়াস, মানুলাবাজার, আসানপুর এবং মৃজাপুর (প্রধান) প্রভৃতি।

এই মৃজাপুর (জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন) বাংলা দেশের ভিতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট রেশমসূত্র এবং বস্ত্র নির্ম্মাণকারক। এ হেন ক্ষুদ্র একটি পল্লীতে পূর্ব্বে ৭০০ ঘর তাঁতীর বাস ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে রেশমশিল্পের অবস্থা খারাপ হইয়া যাওয়ায় কমিয়া ২০০ ঘরে দাঁড়াইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমায় পূর্ব্বে রেশমের কোন পরিচয় ছিল না। তথাকার সূতিকার্য্য বিনাশপ্রাপ্ত হইলে মুর্শিদাবদের নবাব নাজিমের জনৈক হিন্দু কর্ম্মচারী আমডাঙ্গা-নিবাসী রাধিকানন্দ রায় কালনা মহকুমায় রেশমশিল্প প্রচার করেন।

এই পর্য্যায়ে আমরা আর একটি বিষয় জানিয়া রাখিতে পারি যে, মালবারী রেশম (তুঁতপত্রভূক্ কীট হইতে যাহা উৎপন্ন হয়) সমগ্র পৃথিবীর ভিতর ৪২ ডিগ্রী এবং ২০ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশে (latitude) জন্মিতে পারে। এই অক্ষাংশ মধ্যে নিম্নলিখিত দেশগুলি অবস্থিত—স্পেন, ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমানা, ইটালী, হাঙ্গারী, যুগোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রীস, এসিয়ামাইনর, কোকেসাস, সাইপ্রাস, সাইবিরিয়া, পারস্য, ভারতবর্ষ, কোচিন চায়না, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ-আমেরিকা।

রেশমের পরিচয়

'পলু' পোকা নামক একজাতীয় কীট হইতে রেশমসূত্র উৎপন্ন হয়, যাহাকে আমরা সাধারণতঃ বাংলা ভাষায় "গুটী পোকা" ও ইংরাজীতে silk cocoon বলিয়া থাকি। এই পোকা দেখিতে ক্ষুদ্রকায় গোবোরে পোকার ন্যায়। কীটরা তাহাদের লালার সহিত একপ্রকার রস নির্গত করিয়া থাকে, সেই রস ইহাদিগের অন্ত্র হইতে বহির্গত হইয়া বাহিরে আসিবামাত্র তন্ত্রীর আকার প্রাপ্ত হয় এবং উহা রেশমকীট আপনাদের দেহের উপর জড়াইতে আরম্ভ করে। এই আচ্ছাদনটির বৃদ্ধির সহিত পোকাটী দুই দিনের ভিতরই নিজনির্ম্মিত কারাকক্ষে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যখন গুটী পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহাতে রৌদ্র কিংবা উষ্ণ জলের ভাপ দিয়া ভিতরকার পোকাটীকে মারিয়া ফেলা হয়। পোকাটী সময়মত বিনষ্ট না করিলে উক্ত গুটী হইতে উৎকৃষ্ট রেশম পাওয়া যায় না।

গুটী হইতে সূতা উঠাইবার সময় গুটীটিকে গরম জলে সিদ্ধ করিয়া চরকা (ঘাই) কিংবা কলের (ruling machine) সাহায্যে উহা হইতে সূতা বাহির করা হয়। এদেশে একটি কাটনি ঘাইয়ের সাহায্যে গড়ে প্রতিদিন মাত্র তিন ছটাক সূতা কাটিয়া থাকে, কিন্তু জাপানে একটি কাটনি মেয়ে দিনে দেড় পাউণ্ড ওজনের সূতা কাটিতে পারে। বাংলা দেশের একটী গুটীতে ৩৫০ হইতে ৪৫০ গজ পর্যন্ত সূতা পাওয়া যায়, কিন্তু শীতপ্রধান দেশের গুটী হইতে অধিক সূতা পাওয়া যায়। চীন, জাপান এবং ইউরোপে প্রতি গুটীতে ৮০০ হইতে ৯০০ গজ সূতা বাহির হয়। ভারতে কাশ্মীর প্রদেশের গুটী বেশ বড় হয় এবং সেই প্রদেশের একটি গুটী হইতে ৭৫০ গজ পর্য্যন্ত সূতা পাওয়া যায়। এই রেশম সূতা দশ বারটিকে একত্রে পাকাইয়া উহার টানার সাহায্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় যে বস্ত্র বয়ন করা হয়, তাহাকে "পাকোয়ান" গরদ বলে। জঙ্গীপুর মহকুমার মীর্জাপুর গ্রামেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পাকোয়ান গরদ তৈয়ারী হইয়া থাকে। বস্ত্র বুনিবার পূর্ব্বে মীর্জাপুরের তাঁতীরা সর্ব্বাগ্রে রেশম সূতা খাড়ী বা bleach করিয়া লয়।

রেশমের শ্রেণী-বিভাগ :—রেশমগুটী হয় চার শ্রেণীর—গরদ, তসর, এণ্ডী ও মুগা। ঐ সকল হইতে আবার ছয় প্রকার বিভিন্ন জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। উল্লিখিত রেশম ভিন্ন আরও দুই প্রকারের রেশমসূতা পাওয়া যায়। ইহাদিগকে যথাক্রমে "মটকা" ও "কেটে" বলা হয়। এই মটকা ও কেটে কিরূপে হয়? গরদ ও তসরের গুটী যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন যদি পূর্ব্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ার দ্বারা পোকাটিকে মারিয়া ফেলা না হয়, তাহা হইলে অল্পকাল পরেই ঐ গুটীর মুখ কাটিয়া পোকাটি প্রজাপতির আকার প্রাপ্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। গরদকীট বংশানুক্রমে গৃহপালিত বলিয়া ইহাদিগের উড়িবার শক্তি হ্রাস হইয়াছে, এই প্রজাপতিই রেশম-বীজ উৎপাদন করিয়া থাকে। মুখকাটা গুটী হইতে নিখুঁত গুটীর ন্যায় উৎকৃষ্ট রেশম সূতা প্রস্তুত হয় না। মুখ কাটা গুটী হইতে সচরাচর টাকুর সাহায্যে সূতা বাহির করা হয়। গরদের ঐ প্রকার গুটী হইতে যে সূতা হয়, তাহাকে "মটকা" এবং তসরের ঐ প্রকার গুটী হইতে যে সূতা পাওয়া যায়, তাহাকে "কেটে" বলে। মটকার অপভ্রংশ মু-কাটা অর্থাৎ মুখ কাটা। কেটে নামটিরও ঐ কাটা শব্দ হইতে প্রচার হইয়াছে।

শীতপ্রধান দেশের গুটী সাধারণতঃ দুগ্ধফেণনিভ শুভ্র হয়। ইহা ছাড়া হরিদ্রাবর্ণের রেশমগুটী হইতে হরিদ্রা-রঙের সূতা প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ভারতের অধিকাংশ রেশমই উক্তপ্রকারের।

১। গরদ :—(মালবারী রেশম) বাঙ্গালাদেশে প্রধানতঃ তিন জাতের রেশমবীজ হইতে রেশমের চাষ হইয়া থাকে।

(ক) নিস্তারী (bombyx creesi), (খ) ছোট পলু বা দেশী পলু (bombyx fortunatus), (গ) বড় পলু (bombyx textor).

(ক) নিস্তারী—বৎসরের সকল ঋতুতেই এই বীজের দ্বারা রেশমগুটী উৎপন্ন করা যাইতে পারে (multivoltine species)। নিস্তারী কীটের দেহ একপ্রকার ডোরা যুক্ত হয়। বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন, মাঘ এবং চৈত্র মাসে ইহার ফসল উৎপন্ন হইতে পারে। তবে চৈত্রের শেষ হইতে আশ্বিনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা যে ফসল হয়, তাহাই অধিক ফলপ্রদ। বঙ্গ দেশেই একমাত্র নিস্তারী ফসলের চাষ হইতে দেখা যায়।

(খ) ছোট পলু—(multivoltine species)। এই পলুর চাষ হয় বঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে। যদ্যপি বৎসরের সকল ঋতুতেই ছোট পলুর ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, তথাপি আশ্বিনের শেষ হইতে চৈত্রারম্ভ পর্যান্ত এই বীজের দ্বারা যে গুটী হয়, তাহাই অধিক স্বাস্থ্যবান্ হইয়া থাকে।

ডিম্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া গুটী তৈয়ার হওয়া পর্যান্ত "নিস্তারী" এবং "ছোট পলু"র গ্রীষ্মকালে ২০ হইতে ২২ দিন এবং শীতকালে ৩২ হইতে ৪০ দিন সময় লাগে। নিস্তারী ও ছোট পলু ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণের হইয়া থাকে। এতদঞ্চলে সাধারণতঃ চৈত্র হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত নিস্তারী এবং কার্ত্তিক হইতে ফাল্গুন পর্যান্ত ছোট পলুর চাষ হইয়া থাকে।

(গ) বড় পলু—ইহা বর্ষজাত (univoltine species)। এই ফসল বৎসরে মাত্র একবার উৎপন্ন হয়। শীত ঋতু ভিন্ন বড় পলুর চাষ হয় না। বঙ্গের কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূম জেলায় এই রেশম উৎপন্ন হয়। এই গুটী শুভ্রবর্ণের হইয়া থাকে। এদেশের তাঁতীরা ইহাকে "ধলি" রেশম বলে।

বম্বিক্সমোরি এবং চীনা পলু (bombyx sincusis) নামক ভারতবর্ষে আরও দুই জাতীয় রেশমকীট পালিত হইয়া থাকে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে উহার কোন চাষ নাই। বম্বিক্সমোরি ভারতে একমাত্র কাশ্মীর রাজ্যে এবং চীনা পলু বঙ্গে কেবলমাত্র তমলুক মহকুমায় পালিত হইয়া থাকে।

গত দেড় বৎসর যাবৎ "নিস্তিদ" ও "নিসমো" নামক আরও দুই প্রকার বর্ম্মাদেশের বীজদ্বারা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলায় উৎকৃষ্ট রেশম উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। ইহার দ্বারা মুর্শিদাবাদ জেলা যে কত দূর উপকৃত হইবে জানি না। এখন পর্য্যন্ত এই বীজের গুণাগুণ সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে শুনা যায়, মুর্শিদাবাদ জেলায় ইহারা কিঞ্চিৎ কাজ করিতে পারিয়াছে। তবে গত ৩০শে মে'র অমৃতবাজার পত্রিকায় দেখিলাম, মালদহ জেলার নিস্তিদ এবং নিসমো বীজ বিন্দুমাত্রও ফলদান করিতে সক্ষম হয় নাই। উক্ত বীজের ফসলও বৎসরের সকল ঋতুতেই উৎপন্ন হইতে পারে এবং নিস্তারীর নিয়মানুযায়ীই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বড় পলু ডিম্বাবস্থায় থাকে দশমাস কাল, অন্য পলু ঐ অবস্থায় থাকে মাত্র ৮ হইতে ১৬ দিন। ভারতের আসাম প্রদেশে প্রধানতঃ এই পলুর চাষ হইয়া থাকে।

একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীটের (পাকা পলুর) সূতা কাটিতে ৪ হইতে ৭ দিন সময় লাগে।

২। তসর (antherca paphia) :—ভারতের নানা স্থানে তসরগুটীর চাষ হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক পরিমাণ উৎপন্ন হয় গঙ্গা, গোদাবরী ও নর্ম্মদানদীর তটভূমিতে—মাইসুর পর্ব্বতে ও উড়িষ্যা প্রদেশে—বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মৃজাপুর জেলা এবং যুক্তপ্রদেশে তসর, ব্যবসার একটি প্রধান সম্ভার। মুর্শিদাবাদ জেলাতে তসরকীট পালিত হয় না। এই কীট কুল, সাল ও য়্যাস বৃক্ষের পত্র খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং সেই গাছের ডালেতেই গুটী বাঁধে। ডিম হইতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার প্রায় ৮ সপ্তাহকাল পরে এই কীট গুটী বাঁধিতে আরম্ভ করে। বৎসরে প্রধানতঃ তিনবার—জুন, অক্টোবর ও জানুয়ারী মাসে এই ফসল উৎপন্ন হয়।

তসরগুটীকে একবার মাত্র জলে ভাপাইয়া উহাকে জল হইতে তুলিয়া কাঠের ষ্টাণ্ডের উপর রাখিয়া হাতে পাকাইয়া উহা হইতে সূতা বাহির করা হয়। এই গুটী অধিকক্ষণ জলে ভিজিলে উত্তম সূতা পাওয়া যায় না। সকল প্রকার রেশমবস্ত্র অপেক্ষা তসর বস্ত্রই অধিক টেঁকসহি হয়। সাঁওতাল পরগণায় সাধারণতঃ এক কাহন তসরগুটীতে ৩০

হইতে ৫০ তোলা সুতা বাহির হয়। ১৯৩৩ সালের টেরিফ রিপোর্টে পাওয়া যায়, মধ্যপ্রদেশে ঐ বৎসর ২০০০/০ মণ তসর উৎপন্ন হইয়াছিল এবং তাহার মূল্য ১৪০০০০৲ টাকা।

এ সকল দেশে প্রায়শঃ সুতা কাটিবার কাজ স্ত্রীলোক কাটনির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে।

৩। মুগা (anthera assama):—এই রেশম প্রধানতঃ আসামেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে আসামের সংলগ্ন বঙ্গ এবং বর্ম্মা দেশের কোন কোন স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে ইহার চাষ হইয়া থাকে। "মুগা" চাষের প্রণালী অতি অদ্ভুত। এই রেশমকীট লোকালয়ে ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমগুলি কীটের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে উহাদিগকে লইয়া জঙ্গলের ভিতর সাম (sum) অথবা সোয়ালু (sualu) প্রভৃতি গাছের উপর দেওয়া হয়। তথায় পোকাগুলি উক্ত গাছের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। পোকাগুলির অরণ্যবাসের সময় উহাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন হয়, যাহাতে বাদুড় বা পক্ষীতে পোকাগুলি ধ্বংস না করে। পরে পোকার গুটী বাঁধা শেষ হইলে গুটীগুলিকে গাছ হইতে নামাইয়া আনা হয়। বৎসরে দুইবার মাত্র (bivoltine species) এই গুটির চাষ হয়।

১/০ একমণ মুগা রেশমের আনুমানিক মূল্য ৮০০৲ টাকা। উপস্থিত এক হাজার মুগা গুটির দাম ২৷৷০ টাকা। আসামে ধনী ব্যক্তিরা সচরাচর মুগাবস্ত্রই অধিক ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৪। এণ্ডী (attacus ricine):—আসাম প্রদেশেই বেশীর ভাগ এই রেশমের চাষ হইয়া থাকে। বঙ্গেরও কোন কোন স্থানে ইহার চাষ হইতে দেখা যায়। এই রেশমকীট এরণ্ডপত্রভুক্। ইহারা গৃহপালিত। বৎসরে চারিবার এই পোকা হইতে রেশম গুটী পাওয়া যায়। মুগাগুটির আঁশ অত্যন্ত নরম। এই গুটীর গা হইতে আঁশ উঠাইয়া পাঁজ নির্ম্মাণ করতঃ চরকার সাহায্যে সুতা তৈয়ারী করা হয়। অতি সহজেই এই গুটী হইতে আঁশ ছাড়িয়া যায়। গুটীর মধ্যস্থ পোকাটিকে ধ্বংসের প্রয়োজন হয় না। এই রেশমের ১/০ এক মণের মূল্য আনুমানিক মাত্র ১৬০৲ টাকা।

আবহাওয়া

মালবারী রেশম-কীট পালন করিবার স্থানের নিম্নলিখিত রূপ আবহাওয়ার প্রয়োজন। (ক) পোকা থাকিবার স্থানের উত্তাপ দিবারাত্র সমপরিমাণ হওয়া দরকার। (খ) ঘরটির ভিতর প্রচুর পরিমাণে বাতাস খেলিবে। (গ) জায়গাটিতে বিন্দুমাত্র সেঁতা ভাব থাকিবে না। (ঘ) ঘরটির ভিতর প্রচুর পরিমাণে সূর্য্যালোক প্রবেশের সুবিধা থাকিবে। (ঙ) এই স্থানের উত্তাপ ৭০° হইতে ৮০° ফ্ হইলে অতি উত্তম ফলদায়ক হয়। বঙ্গে আশ্বিন হইতে চৈত্রমাস উৎকৃষ্ট রেশম উৎপন্ন হইবার সময়। এই সময় বাংলা দেশের রেশমনার্সারী গৃহের উত্তাপ ১০০° পর্য্যন্ত উত্থিত হয় এবং কমিয়া ৫৮°তে দাঁড়ায়।

রেশমকীট প্রতিপালন

গুটীর মুখ কাটিয়া পোকা বাহিরে আসিবার সময় প্রজাপতির আকার প্রাপ্ত হয়। বংশানুক্রমে গৃহপালিত বলিয়া দুইখানি পক্ষ থাকা সত্ত্বেও ইহাদের উড়িবার শক্তি হ্রাস পাইয়াছে। গুটী হইতে প্রাপ্ত পুরুষ এবং স্ত্রীজাতীয় প্রজাপতি দুইটি লইয়া একত্রে মিলিত করিয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা রাখিবার পর পুরুষটিকে স্ত্রীটির নিকট হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। পরে ঐ স্ত্রী-জাতীয় পোকাটিকে একখানি পরিষ্কার কাগজ কিংবা বস্ত্রের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই স্থানে পোকাটি ডিম্ব প্রসব করে। একটি রেশমকীট ডিম পাড়িতে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা সময় লয় এবং ইহা সাধারণতঃ ৩০০ আন্দাজ ডিম্ব প্রসব করিতে পারে। ডিম প্রসবের পর পোকাটি কোন আহার গ্রহণ করে না। ফলে অতি অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডিম্ব প্রথমাবস্থায় কিঞ্চিত হরিদ্রাবর্ণ প্রাপ্ত হয়। ডিম হইতে কীটের অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পোকাটির ঐ রং বদলাইয়া ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত হয়। এই ডিম অত্যন্ত হালকা। একত্রে ৪০০০০ হাজারের ওজন মাত্র এক আউন্স।

আহার দিবার ব্যবস্থা

বিশেষ কক্ষে মালবারী রেশম-কীট পালন করা হয়। প্রতি ঘরে বাঁশের খুটি পুঁতিয়া তাহার উপর বড় বড় বাঁশের ডালা দিয়া মঞ্চাকারে একত্রে চার পাঁচটি করিয়া থাক তৈয়ারী

করা হয়। প্রতিটি ডালার ভিতর কিঞ্চিৎ ব্যবধান থাকে। ডিমসহ কাগজ অথবা বস্ত্রটিকে একখানি শূন্য ডালার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। ডিম কীটের আকার প্রাপ্ত হইলে পালবারী রেশমকীটের খাদ্য "তুঁত"পাতাকে অতি মিহি করিয়া কাটিয়া, অর্থাৎ মোচা কুটবার ন্যায় কুচি করিয়া সেই পাতার কুচি সম ভাবে পোকাগুলির উপর ছড়াইয়া দেওয়া হয়। আহার পাইয়া পোকাগুলি একেবারে পাতার সহিত মিশিয়া যায়, তখন পাতার সহিত মিশ্রিত ঐ পোকাগুলিকে অপর ডালাতে অতি সন্তর্পণে ঝাড়িয়া স্থানান্তরিত করা হয়। ঝাড়িবার সময় ডিমের খোসাগুলি পৃথক্ হইয়া যায়। অপর ডালায় স্থানান্তরিত করিবার পর চার হইতে প্রায় আট দিন, দৈনিক চারিবার করিয়া ছয় ঘণ্টা অন্তর পোকার আহার বদলাইয়া দিতে হয়। এই চার হইতে আট দিনের ভিতর রেশমকীট এক কিংবা দুইদিনের জন্য আহার বন্ধ করে। এই অনাহারী অবস্থায় ইহারা একবার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার পর পোকার গা বেশ উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। ক্ষুদ্র কীট হইতে গুটী কাটিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার ভিতর পোকারা চারিবার খোলস ছাড়ে। খোলস ছাড়িবার পর ইহারা কিঞ্চিৎ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। রেশমকীটের এই প্রকার খোলস ছাড়াকে "কলপ" বলা হয়। প্রথম খোলস ছাড়িবার পর তিন হইতে পাঁচ দিনের ব্যবধানে উপর্য্যুপরি তিন দফায় পোকাগুলি সম্পূর্ণ খোলস ছাড়িয়া থাকে। শেষবারের খোলস পরিত্যাগের পর ছয় হইতে দশদিন কীটগুলি উদর পরিতৃপ্ত করিয়া আহার করে। এই আহারের পর ইহাদের দেহ একপ্রকার রক্তিম আভাযুক্ত হয়। রেশমকীটের এই অবস্থাকে "পলুপাকা" বলে। এই অবস্থার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহারা আর কোন মতেই আহার গ্রহণ করে না। একটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীটের অবয়ব ডিম অপেক্ষা ৯০০০ হাজার গুণ বড় হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবার সময়ের মধ্যে প্রায়ই কীটগুলির ডালা বদল করিয়া দিতে হয়। পূর্ণতাপ্রাপ্ত কীট যখন সুতা কাটিবার জন্য মুখ নাড়িতে থাকে, তখন উহাকে একটি খোপযুক্ত ডালায় স্থানান্তরিত করিতে হয়। এই খোপনির্ম্মিত ডালার নাম "চন্দ্রকী"। সুতা কাটা শেষ হইবার পর গুটীটিকে দুই তিনদিন চন্দ্রকীর ভিতর রাখিয়া পরে উহা হইতে গুটীটিকে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। এই গুটীকে দুই উপায়ে ব্যবহার করা যাইতে পারে—(ক) বীছন, (খ) রেশমসূতার জন্য। প্রথমোক্ত গুটীকে এরূপভাবে প্রকোষ্ঠমধ্যে রাখিবার প্রয়োজন হয়, যাহাতে গুটীর মধ্যস্থ পোকার শরীরে অধিক গরম বা ঠাণ্ডা না লাগে। দ্বিতীয় ব্যবস্থায়—রেশমগুটীতে রৌদ্র কিংবা উষ্ণ জলের তাপ দিয়া ভিতরকার পোকাটিকে মারিয়া গুটীকে সূতার জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়।

গুটীপোকার ব্যাধি

গুটীপোকাকে প্রধানতঃ চারিপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়:—(১) পেব্রিণ, (২) মাস্কার্ডিন, (৩) গ্রাসিরী, (৪) ক্যাসিরী।

(১) পেব্রিণ বা কটা—রেশমকীট পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবার দুই একদিনের পূর্ব্বে উহার মস্তকের রং কটা হইয়া যায়। রোগ হইবার পর ক্রমে ক্রমে পোকাটির দেহ গুটাইয়া যায়। অচিরে উহা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পলুর এই ব্যাধি সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। মাতা হইতে সন্তানে রোগটি সংক্রামিত হইতে দেখা যায়।

(২) মাস্কার্ডিন—একপ্রকার ছাতা ধরা রোগে পলুটি আক্রান্ত হয়। ক্রমে রোগাক্রান্ত পোকার দেহ হইতে চূণের ন্যায় একপ্রকার সাদা গুঁড়া বাহির হইয়া উহার দেহ একেবারে ছাইয়া ফেলে। খোলস ছাড়িবার পর রেশমকীট যখন আহার বন্ধ করে, তখন মাস্কার্ডিন ব্যাধি পোকাটিকে আক্রমণ করিবার সুযোগ পায়। এই রোগাক্রান্ত পোকার দেহের চতুর্দ্দিক হইতে অসংখ্য ছত্রের ন্যায় শিকড় বাহির হইয়া পলুকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ছত্রের চূণের ন্যায় গুঁড়াটিই অত্যন্ত বিষাক্ত। কোনপ্রকারে ঐ গুঁড়া অন্য কোন পোকার দেহ স্পর্শ করিলে সেটিও ঐ ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ধ্বংস পায়। এই রোগে আক্রান্ত হইবার পর পাঁচ হইতে দশ দিনের ভিতর পোকাটি মারা যায়। ইহাও পলুর একটি মারাত্মক ব্যাধি।

(৩) গ্রাসিরী বা রসা—ইহা মাস্কার্ডিনের ন্যায় সংক্রামক নহে। অধিক গরম পড়িলে বা পোকাগুলিতে আলো-বাতাস না লাগিলে অথবা পোকাকে আহার দিবার বে-বন্দোবস্ত হইলে, অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় কড়া পাতা খাওয়াইয়া

পরে অধিক রসাল পাতা খাইতে দিলে, পোকা খোলস ছাড়িবার পূর্ব্বেই রসা বা গ্রাসিরী রোগে কদাপি আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অনেক সময় পেব্রিন রোগের বীজ পলুর ভিতর গুহ্যভাবে থাকিয়া রসা রোগের সৃষ্টি করে।

ফ্ল্যাসিরী—রেশমকীটের উদারময় হইতে এই রোগের সৃষ্টি হয়। ফ্ল্যাসিরী রোগাক্রান্ত পলুর বুকের উপর কাল শিরার ন্যায় রেখা দৃষ্ট হয়। নানা রকমে এই রোগ হইতে পারে। (ক) ডিমে ছাতা ধরা, (খ) পোকাকে অধিক পাতা খাওয়ান, (গ) নূতন গাছের পাতা খাওয়ান, (ঘ) কড়া পাতা খাওয়ান, (ঙ) পলুর থাকিবার স্থানে আলো বাতাস না যাওয়া, (চ) পলুর ঘরে অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা প্রবেশ করা।

শোনা যায়, পূর্ব্বে পলুর কোন ব্যাধি ছিল না। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্যে সর্ব্বপ্রথম পলুর রোগ দেখা দেয়। ক্রমে সকল দেশেই পলুর ব্যাধি সংক্রামিত হয়। অতঃপর ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী পণ্ডিত "লুই পাস্তুর" নানা গবেষণার দ্বারা ঐ রোগ নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণ করেন।

পলুর শত্রু

এক প্রকার বড় জাতের মাছি পলুর প্রধান শত্রু। ইহারা সুযোগ পাইলেই রেশমপোকাকে বিনষ্ট করে। এই কারণেই পলু পালনের ঘরের জানালা দরজা প্রভৃতিতে উত্তমরূপে জাল লাগাইবার প্রয়োজন। যাহাতে উক্ত গৃহাভ্যন্তরে কোন প্রকারে মাছি প্রবেশ করিবার সুযোগ না পায়।

তুঁতগাছের চাষ

শীত ঋতুর শেষ ভাগে তুঁতচাষের জমীতে একবার চাষ দিয়া রাখিতে হয়। বর্ষারম্ভে এই জমীতে বার দুই তিন লাঙ্গল দিয়া জমীতে সার পচাইতে হয় এবং বর্ষাশেষে পুনরায় জমীতে লাঙ্গল এবং মই দিয়া জমী ঠিক করিয়া তুঁতগাছের ডাল ৭।৮ ইঞ্চি লম্বা করিয়া কাটিয়া (cuttings) ডালের মাথা উপর দিকে রাখিয়া ডালটিকে জমীতে শক্ত করিয়া বসাইয়া দিতে হয়। ঐ ডালের মাথা যেন ফাটা না হয়। ডালের চোখ (buds) হইতেই গাছে শাখা বাহির হয়। তিন চার ফুট ব্যবধান রাখিয়া cuttingsগুলি জমীতে লাগাইতে হয়। তুঁত চাষের জমীতে যেন কোন প্রকারে জল দাঁড়াইতে না পারে। জমী হইতে জলনিকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিতে হয়। তিন চার মাসের মধ্যেই গাছ প্রায় দেড়ফুট লম্বা হইয়া পড়ে। সেই সময় গাছের নূতন পাতাগুলি ছাঁটিয়া দিয়া জমী খুঁড়িয়া দিতে হয়। নূতন গাছের প্রথম পাতা খাইতে দিলে পলুর ফ্ল্যাসিরী রোগ হইতে পারে। ছাঁটিয়া দিবার পর মাস দুয়েকের মধ্যেই গাছ আরও দেড় ফুট দুইফুট বাড়িয়া যায় এবং উহাতে ঘন হইয়া পাতা বাহির হয়। গাছের এই অবস্থার পর হইতে পলু পোষা আরম্ভ করা যাইতে পারে। একটি গাছ হইতে বৎসরে চার পাঁচ বার পাতা পাওয়া যায় এবং উক্ত গাছ ১০।১২ বৎসর ক্রমান্বয়ে পাতা সরবরাহ করিতে পারে। বর্ষাকালে তুঁতের জমী অন্ততঃ দুইবার নিড়াইয়া দেওয়া দরকার। হেমন্ত এবং বসন্ত ঋতুতে অল্প অল্প করিয়া জমী খুঁড়িয়া দিয়া কিয়ৎ পরিমাণ সার দিতে হয়। পৌষমাসে একবার উত্তমরূপে জমী খুঁড়িয়া দেওয়া দরকার। আশ্বিন মাসে পাতা উঠানর পর জমীতে একবার লাঙ্গল এবং মই দেওয়া প্রয়োজন। তুঁত জমীতে কোনপ্রকার ঘাস বা আগাছা জন্মিতে পারে না। পাঁকমাটি, বিষ্ঠা, খড় ও চূণ একত্রে পচা, পচা গোবর এবং পলুর গুটি হইতে সূতা লওয়ার পর গুটীর মধ্যস্থিত কীট, তুঁত জমীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সার। জাপানে পলু-পালকেরা পলুর দেহাবশেষ পচাইয়া তুঁতজমীর জন্য উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ পচা গাছ, গোবর ও পুকুরের পাঁকমাটি তুঁতজমীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শেষোক্ত তিনটি তুঁতজমীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার। পাঁকমাটি তিন চার বৎসর অন্তর জমীতে দিতে পারিলে উত্তম। এদেশে এক বিঘা জমী চাষ করিয়া গাছ বসাইতে প্রায় ২০ টাকা খরচ হয় এবং প্রতি বৎসর জমীর সার প্রভৃতি মূল্য সমেত ৩০।৩৫ টাকা খরচ করিলে সাধারণতঃ একশত মণ পাতা পাওয়া যায়। পলু চাষের তারতম্যে তুঁত পাতার মূল্য মণ-পিছু ১ টাকা হইতে ৪ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। তুঁতগাছ দুই জাতের হয়—(১) কাজলী বা বড় তুঁত। (২) ফেটি বা ছোট তুঁত। বড় তুঁতের গাছের উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত সমানভাবে পাতা বাহির হয় এবং ছোট তুঁত গাছের মাথার উপর ঝোপড়া হইয়া পাতা বাহির হয়। পূর্ব্বোক্ত গাছের পাতা কিঞ্চিৎ মোটা এবং কর্কশ হয়। তবে

জমীর উর্ব্বরতায় পাতার ভাল মন্দ বোঝা যায়। ছোট পলুর আহারের জন্য ফেটি তুঁতের পাতা এবং বড় পলুর আহারের জন্য কাজলী তুঁতের পাতাই উৎকৃষ্ট খাদ্যরূপে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নিস্তারীকে দুইরকম পাতাই খাওয়ান যাইতে পারে। তুঁতগাছের বীজ লাগাইয়া ঐ বীজের চারা দ্বারা কলম করিয়া যদি গাছ বহাল করা যায়, তাহা হইলে উত্তম ফলদায়ক হয়। মুর্শিদাবাদ তথা বঙ্গের চাষীরা, যাহারা অল্প-বিস্তর রেশম চাষ করিয়া থাকে, তাহারা অনেক ধানী জমীর আলে অথবা রাস্তার পার্শ্বে তুঁতগাছ লাগাইয়া পলুর জন্য উহা হইতে পাতা সংগ্রহ করে। অধুনা বাংলা সরকার এদেশে গবর্ণমেণ্ট সেরিকালচার নার্শারী হইতে কাটনী(রেশমচাষী)দিগকে কিছু কিছু তুঁতগাছের চারা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ দেশে এক একর জমীতে ৬০।৬৫ টাকা খরচ করিলে বৎসরে প্রায় ৩০০৴০ মণ পাতা পাওয়া যায়। ঐ পাতা হইতে পলুর চাষ করিয়া সাধারণতঃ ৪০০ কাহন অর্থাৎ ৮।১০ মণ গুটী পাওয়া যাইতে পারে। এদেশের জমীতে যে পাতা উৎপন্ন হয়, তাহার উৎপাদন খরচা প্রতিমণে প্রায় ।৵০ আনা পড়ে।

রেশম শিল্পে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি

১৮৭২ সাল হইতে বাংলার রেশমের বিশেষ করিয়া অবনতি সুরু হয়। এই কারণে ১৮৮৬ সালে স্যার টমাস ওয়ার্ডেল বাংলা দেশে আসিবার অব্যবহিত পরেই রেশম-শিল্পের অবনতির কারণ নির্ণয়ের জন্য তাঁহার সভাপতিত্বে বাংলা দেশে একটি বিশেষ সভা (conference) আহূত হয় এবং সেই সভা মিঃ উড্ ম্যাসন ও শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর রেশমের রোগ নির্ণয় এবং তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা ন্যস্ত করেন। ১৮৮৮ খৃঃ নিত্যগোপাল বাবুকে সরকার হইতে রেশমের রোগ নির্ণয় এবং উন্নত প্রণালীতে রেশম চাষ শিক্ষা করিবার জন্য ফ্রান্স এবং ইটালী দেশে পাঠান হয়। নিত্য বাবু ফিরিয়া আসিয়া বাংলা দেশে কয়েকটি রেশম নার্শারী প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই নার্শারী হইতে চাষীদিগকে রোগশূন্য রেশমবীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। নার্শারীগুলির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বাংলা সরকার ১৮৯৬ সালে বাৎসরিক ৩০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করেন এবং ক্রমান্বয়ে তাহা বাড়াইয়া দেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেও সমগ্র বঙ্গদেশে ১২টি গভর্ণমেণ্ট-নার্শারী ছিল। রেশমের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকায়, বসনীর সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়, বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট রেশম-নার্শারী ক্রমে কমাইয়া দিতেছেন। এখন সমগ্র বঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ), পিয়াসবাড়ী (মালদহ), মীরগঞ্জ (রাজসাহী), বগুড়া, কণ্ঠে (বীরভূম) ও কারসিয়াং, এই সাতটি স্থানে নার্শারী পরিচালিত হইতেছে। কারসিয়াং নার্শারীতে কেবল মাত্র বড় পলুর চাষ হয়। উপরি উক্ত নার্শারীগুলির ভিতর বহরমপুর সেণ্ট্রাল নার্শারীই প্রধান। বহরমপুর নার্শারীতে একটি সেরিকাল্চার ক্লাস আছে। ইহাতে চারিটি এবং পিয়াসবাড়ী সেরিকাল্চার স্কুলে আটটি বসনীর ছেলেকে মাসিক ১০৲ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিয়া রেশম চাষ শিক্ষা দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর হইল রেশম-শিল্প শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বহরমপুরে "রেশম-বয়ন-রঞ্জন-বিদ্যালয়" নাম দিয়া একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এখানে বিনা বেতনে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অধিকন্তু দশটি ছাত্রকে মাসিক ১০৲ হিসাবে, পনেরোটিকে ৬৲ হিসাবে এবং আরও পনেরোটিকে ৪৲ হিসাবে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা আছে। শুনা যাইতেছে, বহরমপুরের রেশমস্কুলটি শীঘ্রই কলেজে পরিণত হইবে। অনেকে আশা করেন, গভর্ণমেণ্টের এই সু-প্রতিষ্ঠানে বিচক্ষণ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে আমাদের এই বেকার দেশের অনেক যুবকই লাভবান্ হইবেন এবং ঐ সকলের দ্বারা এদেশের এই মৃতপ্রায় শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য

কুটীর-শিল্পের অবনতি

......নদী ও খাল প্রভৃতির শুষ্কতাবশতঃ একদিকে দেশের জল-হাওয়া রোগের বীজাণু-পরিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং অন্যদিকে জমীর অনুর্ব্বরতা-বশতঃ কৃষিকার্য্য কষ্টসাধ্য ও লোকসানজনক হওয়ায় মানুষকে বাধ্য হইয়া কুটীর-শিল্প পরিত্যাগ করিয়া যন্ত্র-শিল্প গ্রহণ করিতে হইতেছে ও তাহাদের অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

মালদহের গম্ভীরা গান

—শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

গত ১৩৪৪ সালের পৌষ সংখ্যার 'বিচিত্রা'য়, আমি মালদহের গম্ভীরা গান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছিলাম—এবং সেই প্রবন্ধে মালদহী গম্ভীরা গানের নমুনা স্বরূপ কয়েকটি গানও তুলিয়া দিয়াছিলাম। গানগুলির ভাষা পরিমার্জ্জিত নয় অবশ্য—কিন্তু অশিক্ষিত মেঠো চাষী কবিগণের রচনার মধ্যে বর্ত্তমান সমাজের প্রকৃত চিত্র ও ভাব মাধুর্য্যের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এক কালে মালদহ জিলা —বা অতীত গৌড় নগরী বাংলা দেশের গৌরবের স্থান ছিল। তখনকার যুগে সভ্যতার কেন্দ্রস্থান ছিল ঐ মালদহ বা গৌড় নগরী। সেই সময়ে, গৌড়বাসী সর্ব্বদিক্ দিয়া উন্নত ও সুসভ্য ছিল। রাজনীতি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য—প্রভৃতির দিক হইতে, গৌড় দেশ (মালদহ) বাংলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছিল। সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্য্য হিসাবে, গৌড় নগরীর নাম, সকলের মুখে মুখে কীর্ত্তিত হইত। তদানীন্তন বাংলার রাজধানী সুসভ্য গৌড় নগরীর বিপুল জনতা, সুপ্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য পাদপছায়া, সুবৃহৎ হর্ম্ম্যরাজী, সুসজ্জিত বিপণী আজ মহাকালের প্রচণ্ড গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আজ সেখানে শুধু জঙ্গল এবং ভগ্নাবশেষ হর্ম্ম্যরাজী অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই মালদহে—সেই অতীত গৌড়ে কত সুকুমার শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ, বৌদ্ধদিগের বিহার, চৈত্য, মঠ, স্তূপ, সংঘারাম এবং হিন্দুদিগের বিরাট বিচিত্র মন্দিরসমূহ তদানীন্তন গৌড় নগরীর শোভা বর্দ্ধন করিত, তাহার পরিচয় আজও আমরা বর্ত্তমান ধ্বংসপ্রাপ্ত হর্ম্ম্যরাজী হইতে পাইতেছি। সুপ্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীযুত ষ্টেলা ক্রামরীশ গৌড়ীয় শিল্পের নিদর্শন দেখিয়া উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া উচ্চ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া, অনেক খ্যাতনামা শিল্প-সমালোচক, এই গৌড়ীয় শিল্পের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ প্রণীত "শিল্প-পরিচয়" পুস্তকের মধ্যে গৌড়ীয় শিল্প সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারি।

এই গৌড় নগরীতে, রমাই পণ্ডিত প্রভৃতি বাংলা কাব্যসাহিত্যের ভিত্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। মধ্য যুগে এই গৌড় নগরী, জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচারের একটী প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। ইহা ছাড়া চিত্র, কাব্য, ভাস্কর্য্য, লোক-সাহিত্য প্রভৃতি কত অমূল্য ভাব-সম্পদ্ ও সুকুমার শিল্প গড়িয়া উঠিয়া গৌড়বাসীকে শিক্ষার ও কৃষ্টির কেন্দ্র করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার প্রমাণ কিছু অতীতের তিমিরাবৃত গর্ভে এবং কিছু বর্ত্তমান ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

সুকুমার শিল্প, ভাস্কর্য্য ও কাব্য-সাহিত্যের দিক্ দিয়া, যেমন গৌড় উন্নত ছিল, তেমনি বীরত্বের দিক্ হইতে, গৌড় নগরী কোনরূপেই নিন্দনীয় ছিল না। গোপাল দেব, ধর্ম্মপাল দেব প্রভৃতির বীরত্বের কাহিনীর সহিত যাঁহারা পরিচিত, তাঁহারা বোধ হয় জানেন যে, লক্ষণ সেনের সপ্তদশ অশ্বারোহীর নিকট পরাজয়-কাহিনী, একটা কাল্পনিক গল্প মাত্র। যাহারা গৌড়বাসীর অতীত বীরত্বের কাহিনী জানিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র আচার্য্য মহাশয়ের "বাঙ্গালীর বাহুবল" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বলি।

মালদহের গম্ভীরা গান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অতীত গৌড়ের গৌরবের বিষয় সামান্য আলোচনা বোধ হয় অ-প্রাসঙ্গিক হইল না। বাংলা গীতি-কবিতার দেশ। এ দেশের জল-বায়ু, গাছ-পালা এ দেশের মানুষের চিত্তকে সুকোমল করিয়া রাখিয়াছে। এই সুজলা, সুফলা, চির-সুশ্যামল মাতৃরূপ, যেমন পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনই এইরূপ অপূর্ব্ব গীতি-কবিতা আর কোথাও সৃষ্টি হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। এই সব গীতি-কবিতাগুলি, অশিক্ষিত চাষী, ধোপা, নাপিত প্রভৃতির ঘর হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং উহা তাহাদের মুখে মুখে ফিরিত ও তাহারাই নিভৃত পল্লী অঞ্চলে গাহিত। ভদ্রলোক ও শিক্ষিত সম্প্রদায় ঐগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না। কিন্তু আজ কাল যেন দেশের আবহাওয়া অনেক পরিমাণে

ফিরিয়াছে। আমরা আজ বাউল, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, কীর্ত্তন, ঝুমুর প্রভৃতিকে আদর করিতে শিখিয়াছি। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অনার্সের পাঠ্য-তালিকায় ঐরূপ গীতি-কবিতার বই স্থান পাইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন এক স্থানে বলিয়াছেন,—"বোধ হয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না, বঙ্গদেশে এমন পল্লী নাই, যাহাতে প্রাচীন কালে দু'একজন পল্লী-কবির আবির্ভাব হয় নাই। বঙ্গদেশের প্রত্যেক স্থানে, সেই স্থানের ভাষা লইয়া কাব্য রচিত হইয়াছিল। কোন প্রদেশই একেবারে প্রতিভাশূন্য মরু ছিল না; আরণ্য কুসুম ও গ্রাম্য-কবিতা সর্ব্বত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায়।" কথাটি বাস্তবিক পক্ষে অতি সত্য। নদীয়া জেলার লালন ফকিরের ভজন গান—দেহ-তত্ত্বের গান 'মারেফাত' গান অনেকেই শুনিয়াছেন—এবং এইগুলি অতি চমৎকার। রঙ্গপুর জেলার বিরা-গান—পাবনা, ফরিদপুর, রাজসাহী জেলায় জাগ গান, ভাসান গান ও ময়মনসিংহ, নোয়াখালি, ঢাকা প্রভৃতি দেশে বাউল, শারী গান, ঘাটু গান প্রভৃতি আমরা অনেকে শুনিয়া থাকিব। এইগুলি প্রত্যেকটি এক একটি অমূল্য হীরা মাণিক্যের ন্যায়। স্যর জর্জ্জ গ্রীয়ারসনের চেষ্টায় ময়নামতীর গান, দেশ বিদেশে আদৃত হইয়াছে। এ ছাড়া বাংলা দেশের ডাক-খনার বচন, নানারূপ ছড়া, ব্রত এবং প্রবাদ-বাক্য কোনটিই ফেলিবার বস্তু নয়।

মালদহের গম্ভীরা গান, ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই অঞ্চলের গান, বর্দ্ধমান জেলায় রাঢ় অঞ্চলের গাজন গানের অনুরূপ। চৈত্র মাসে চৈত্র সংক্রান্তিতে, গাজন উৎসবের সময় এই গম্ভীরা গান সুরু হয়। গম্ভীরা উৎসবটি তিন ভাগে বিভক্ত—ছোট তামাসা, বড় তামাসা ও বোল-বাহি বা বোলাই। ছোট তামাসার দিনে বিশেষরূপ কোন উৎসব হয় না। মাত্র সেইদিন মহাদেবের পূজা হয়, লোকে নানারূপ মানত করে, এবং অনেকে মহাদেবের নিকট সন্ন্যাসী হয়। বড় তামাসার দিন, দিবা দ্বিপ্রহরে, সন্ন্যাসীরা শোভাযাত্রা বাহির করে। ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে, সন্ন্যাসীরা কপালে, পিঠে বাণ ফুঁড়িয়া ও ত্রিশূলাগ্রে ধূপ-দানিতে ধুপ দিয়া, নাচিতে নাচিতে এক পূজাস্থান হইতে অন্য পূজাস্থানে যায়। সন্ধ্যার পর, প্রত্যেক পাড়ায় মহা-দেবের সম্মুখস্থ গম্ভীরা স্থানে, মুখা নৃত্য বা মুখোস নৃত্য সুরু হয়। ভূতমুখা, পরীমুখা, কার্ত্তিকমুখা, শিবদুর্গা-মুখা প্রভৃতি নৃত্য সারারাত ধরিয়া হইয়া থাকে। এই ভাবে বড় তামাসার উৎসব শেষ হয়। ইহার পরদিন বোলবাহি বা বোলাই সুরু হয়। এই "বোলবাহির" দিন, গম্ভীরা গান ও নানারূপ পালাকারে গান ও নৃত্য সুরু হয়। গানের আসরটি খুব সুন্দরভাবে লতা-পাতা দ্বারা সাজান হয়। চারিদিকের বাঁশের খুঁটিতে নানা দেবদেবী ও মহাপুরুষদের ছবি, অনেক সুদৃশ্য খাঁচায় নানা জাতীয় পাখী টাঙ্গান হয়। সমস্ত রাত ধরিয়া প্রত্যেক পাড়ায় গম্ভীরা গান ও নৃত্য চলিতে থাকে। প্রথমে শিব-বন্দনা সুরু হয়, পরে সহরের সাময়িক ঘটনা লইয়া ও দেশের বর্ত্তমান অবস্থার ও দুরবস্থার বিষয় ও চাষী-মজুরগণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা লইয়া গান ও নৃত্য চলিতে থাকে।

এই সব গান ও পালা এবং নৃত্যের কল্পনা সমস্তই নিরক্ষর চাষী কৃষকরা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই সব গম্ভীরা গানের রাগ-রাগিণী বা সুর, কোন সঠিক রাগ রাগিণীর ভিতর ফেলা যায় না—সেইজন্য, ইহা গম্ভীরা সুর নামে প্রচলিত হইয়াছে। গম্ভীরা গানের সুর যেমন বিচিত্র ও বিশেষত্বময়, তেমনি ইহার ভাষা ও নৃত্যাদি, এবং অঙ্গভঙ্গী বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব-মণ্ডিত। যাঁহারা গম্ভীরা গান ও নৃত্য একবার দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজে ইহার স্মৃতিকে মনের আকাশ হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে পারিবেন না। প্রত্যেক গায়ক ও নট নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী নৃত্য-ভঙ্গিমা ও সুর সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই নৃত্যে ও সঙ্গীতে কোনরূপ বেতালা ছন্দ, বেতালা সুর বা তাল নাই।

সঠিক তাল লয় সহ সঙ্গীত ও নৃত্য হইয়া থাকে। নৃত্যের ও সঙ্গীতের সহিত তবলা, হারমোনিয়ম এবং তারের যন্ত্র বাজান হয়। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ভবেশচন্দ্র চৌধুরী ও তারাপদ লাহিড়ী রেকর্ডে গম্ভীরার গান দিয়াছেন, এ ছাড়া রেডিওতেও গম্ভীরার গান হইয়াছিল, কলিকাতাবাসীরা হয়তো শুনিয়া থাকেন। এই গম্ভীরা গানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, এই কথা বলিতে পারা যায় যে, এই সব নৃত্য ও সঙ্গীতে যে অপূর্ব্ব রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহা বর্ত্তমান অভিনয়, সঙ্গীত বা সাহিত্যেরও নিম্নে নয়।

কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, চাপের ক্রিয়া প্রধানতঃ পাত্রটির উপরিতন স্তরেই নিবদ্ধ থাকে, সুতরাং পাত্রের স্থূলতার মাত্রা বৃদ্ধি করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ব্রিজম্যান কাশীর কৌটার মত একটি পাত্রের মধ্যে পর পর কয়েকটি পাত্র সন্নিবেশ করেন। সর্ব্বাপেক্ষা ভিতরের পাত্রের ভিতরে চাপ সর্ব্বাধিক, উহার বাহিরের এবং দ্বিতীয় পাত্রের ভিতরের চাপ উহা অপেক্ষা কিছু অল্প—এইভাবে যন্ত্রসজ্জা করা হয়। অধিকন্তু চাপ দিবার যন্ত্রের পিসটনটি যথেষ্ট চাপসহ হওয়া প্রয়োজন; পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, বিশেষ সুদৃঢ় ইস্পাতও উপযুক্তরূপে চাপসহ নহে। ইহার জন্য ইস্পাত অপেক্ষা দুইগুণ দৃঢ়তর 'কার্ব্বলয়' নামে একপ্রকার দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। কার্ব্বলয় সংপ্রতি উদ্ভাবিত হইয়াছে।

পরীক্ষার কোন বিশদ বিবরণ না দিয়া এক্ষণে পরীক্ষার ফল আলোচনা করা যাউক। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই বৈজ্ঞানিকেরা জানেন যে, কোন একটি বিশেষ দ্রব্য বিশুদ্ধ অবস্থায় একটি নির্দ্দিষ্ট উত্তাপে গলে, যেমন বরফ গলিয়া জল হয় ৩২ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপে। সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিনের ভ্রাতা জেমস টম্‌সন গণিতমূলক যুক্তি হইতে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, যে-সকল দ্রব্য কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হইলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় তাহাদের গলনোত্তাপ চাপ প্রয়োগে বৃদ্ধি পাইবে। এই শ্রেণীর দ্রব্যই অধিক, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আছে, যেগুলির আয়তন গলিবার সময় কমিয়া যায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর দ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বরফ—বরফ যে জলে ভাসে ইহাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। বিস্‌মাথ ও গ্যালিয়াম নামে দুইটি ধাতুর গুণও বরফের অনুরূপ। জেম্‌স টম্‌সনের সিদ্ধান্ত যে সত্য, লর্ড কেলভিন (তিনি অবশ্য তখন লর্ড উপাধি পান নাই, তখন তাঁহার নাম ছিল উইলিয়াম টম্‌সন) তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করেন। লর্ড কেলভিনের পরীক্ষার সময়ে অধিক চাপ প্রয়োগ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না, সুতরাং তাঁহার পরীক্ষায় উত্তাপের যে তারতম্য বটে তাহার পরিমাণ অতি অল্প হওয়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী থার্ম্মো-মিটার ব্যবহার করিতে হয়। দুই টুকরা বরফ লইয়া যদি খুব জোরে চাপিয়া ধরা যায় এবং তাহার পর ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, বরফের টুকরা দুইটি জুড়িয়া গিয়াছে। ইহার কারণ বোধ হয় এখন সকলে বুঝিতে পারিবেন। বরফের টুকরা দুইটিতে চাপ দিলে যে যে স্থানে টুকরা দুইটি স্পর্শ করিয়া থাকে, সেই সেই স্থানে চাপ পড়ায় গলনোত্তাপ হ্রাস পায়, অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি অপেক্ষা কম হইয়া যায়, কিন্তু বরফের উত্তাপ শূন্য ডিগ্রি, সুতরাং ঐ বিশেষ স্থানগুলি গলিয়া যায় এবং পুনরায় ছাড়িয়া দিলেই চাপ অপসারিত হওয়ায় জল বরফে পরিণত হয় ও বরফের টুকরা দুইটি জুড়িয়া যায়। বরফের এই ধর্ম্মের সহায়তা লইয়াই কলিকাতার ফিরি-ওয়ালারা গ্রীষ্মকালে 'পাংখা বরফ' তৈয়ারী করিয়া ছেলে ভুলাইয়া দুপয়সা রোজগার করিতে পারে।

এই সকল প্রাচীন পরীক্ষায় অধিক চাপ প্রয়োগ করা সম্ভব না হওয়ায় উত্তাপের বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যাইত না, কিন্তু বর্ত্তমান পরীক্ষাপ্রণালীর উন্নতি একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। সাধারণ চাপে পারদ শূন্য ডিগ্রির ৪০ ডিগ্রি নিম্নে (সেন্টিগ্রেড, অতঃপর সকল উত্তাপই সেন্টিগ্রেড ডিগ্রিতে দেওয়া হইয়াছে) কঠিন আকার ধারণ করে। ব্রিজম্যানের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে, ৫,২০,০০০ পাউণ্ড চাপে ১০০ ডিগ্রি উত্তাপে পারদ জমিয়া কঠিন আকার ধারণ করে।

জল সম্পর্কে পরীক্ষা করিয়া যে সকল ফল পাওয়া যায় তাহার আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সাধারণ বায়ুচাপে শূন্য ডিগ্রিতে জল জমিয়া বরফ হয় এবং চাপ বৃদ্ধি করিলে এই উত্তাপ কমিয়া যায়। এখন প্রশ্ন হইতেছে এই, ক্রমশঃ চাপ বৃদ্ধি করিলে উত্তাপ বরাবর কমিয়া যাইবে অথবা অন্য কোন ঘটনা ঘটিবে? এই সম্পর্কে প্রথম পরীক্ষা করেন টামান। তিনি দেখেন যে, ৩৩,০০০ পাউণ্ড পর্যান্ত চাপ বৃদ্ধি করিলে জেম্‌স টম্‌সনের হিসাবমত গলনোত্তাপ কমিতে থাকে, এই চাপে গলনোত্তাপের অঙ্ক: -১২ ডিগ্রি (অর্থাৎ শূন্য ডিগ্রি বা সাধারণ চাপে বরফ গলিবার উত্তাপ অপেক্ষা ১২ ডিগ্রি কম)। বরফ ও লবণ মিশাইয়া আইসক্রীম বানাইবার কলে সাধারণত এই প্রকার উত্তাপ পাওয়া যায়। টামান দেখিলেন যে, ৩৩,০০০ পাউণ্ড অপেক্ষা

চাপ বৃদ্ধি করিলে বরফের আয়তন হঠাৎ শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া যায় এবং বরফে দানার আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ ধারণ করে। এক কথায় সাধারণ বরফ ও এই বরফ মূলতঃ একই রাসায়নিক পদার্থ হওয়া সত্ত্বেও ইহাদের অনুগুলির সংস্থান বিভিন্ন। এক্স-রে দিয়া পরীক্ষা করিয়া ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। এই বরফের আয়তন কমার ফলে ইহা সাধারণ জল অপেক্ষা অধিক ভারী হইয়া পড়ে সুতরাং জেমস টমসনের যুক্তি প্রয়োগ করিলে দেখা যাইবে যে এখন চাপ বৃদ্ধি করিলে গলনোত্তাপ হ্রাস না পাইয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, এত সরলভাবে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করা যায় না। ৫২,৫০০ পাউণ্ড চাপ প্রয়োগ করিয়া ব্রিজম্যান দেখিলেন যে, এই চাপে পুনরায় হঠাৎ আয়তন কমিয়া যায় এবং আরও চাপ দিলে গলনোত্তাপ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। এ পর্যন্ত চাপ প্রয়োগে সাতটি বিভিন্ন প্রকারের বরফ পাওয়া গিয়াছে। ৬,০০,০০০ পাউণ্ড চাপে যে বরফ পাওয়া যায় তাহার গলনোত্তাপ ১৯০ ডিগ্রি। এখানে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সাধারণ চাপে জল ফুটিয়া বাষ্প হয় ১০০ ডিগ্রি উত্তাপে।

জলের আচরণ হইতে অনুমান করা যায় যে, একই শ্রেণীভুক্ত দ্রব্য বিস্‌মাথ ও গ্যালিয়ামের আচরণও অনুরূপ হইবে। প্রথমে এই সম্পর্কে পরীক্ষায় বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ব্রিজম্যান সংপ্রতি দেখিয়াছেন যে, ৩,৭৫,০০০ পাউণ্ড চাপে বিসমাথের এবং ১,৯৫,০০০ পাউণ্ড চাপে গ্যালিয়ামের অনুরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে, অর্থাৎ ইহার অধিক চাপ প্রয়োগ করিলে গলনোত্তাপ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পায়। ব্রিজম্যানের পরীক্ষা হইতে মনে হয় যে, অল্প চাপে বরফের এবং আরও কয়েকটি দ্রব্যের যে আচরণ দেখা যায়, তাহা নিতান্তই আকস্মিক।

ব্রিজম্যান শতাধিক দ্রব্য লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, বহু দ্রব্যেই এই ধরণের রূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। অনেক দ্রব্যের মাত্র দুইটি রূপ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। একাধিক রূপবিশিষ্ট বহু দ্রব্যের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত দ্রব্য পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কর্পূরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক রূপ দেখা গিয়াছে ; ইহার সংখ্যা যে ৯টি তাহা নিশ্চিত, তবে ঠিক সংখ্যা সম্ভবতঃ ১১টি।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পরীক্ষার আলোচনা করা হইল তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, চাপ অপসারিত করিলেই দ্রব্যগুলি পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে, কিন্তু একটি দ্রব্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা গিয়াছে। ফস্‌ফরাস একটি সুপরিচিত দ্রব্য না হইলেও, নিতান্ত অপরিচিত নহে। সাধারণ অবস্থাতেই ইহার কয়েকটি বিভিন্ন রূপ রাসায়নিকদের জানা আছে। ইহাদের মধ্যে শ্বেত ও লোহিত ফস্‌ফরাস সর্ব্বাপেক্ষা পরিচিত। শ্বেত ফস্‌ফরাস বাতাসে রাখিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে। লোহিত ফসফরাস এরূপ সক্রিয় নহে ; দিয়াশলাই তৈয়ারী করিবার জন্য ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেত ফস্‌ফরাসের উপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করিলে উহা কৃষ্ণবর্ণের একটি নূতন ধরণের দ্রব্যে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ স্থায়ী পরিবর্ত্তন, অর্থাৎ চাপ অপসারণ করিলে ইহা পুনরায় শ্বেত ফস্‌ফরাসে রূপান্তরিত হয় না। ইহার আকৃতি অনেকটা গ্র্যাফাইট বা কৃষ্ণসীসকের মত। সাধারণতঃ ফস্‌ফরাস বিদ্যুতের পরিচালক নহে কিন্তু এই কৃষ্ণ ফসফরাস বিদ্যুতের পরিচালক। ডক্টর জ্যাকবস নামে অপর একজন বৈজ্ঞানিক ইহা ব্যতীত অপর এক প্রকার ফস্‌ফরাসের সন্ধান পাইয়াছেন। ফস্‌ফরাসের স্থায়ী পরিবর্ত্তনে বৈজ্ঞানিকরা অনেক প্রকার জল্পনা করিতেছেন। কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে, এই ভাবে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগে সম্পূর্ণ নূতন ধর্ম্মসম্পন্ন বহু দ্রব্য সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে।

রূপান্তর ব্যতীত প্রচণ্ড চাপে কি পরিমাণ আয়তন পরিবর্ত্তন হয় তাহার বিবরণও কৌতূহলোদ্দীপক। এক কালে লোকের ধারণা ছিল যে, তরল পদার্থে চাপ প্রয়োগ করিলে তাহা আয়তনে সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু বর্ত্তমানে সকলেই জানেন যে, এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা চাপ দিলে সঙ্কুচিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, সাধারণ অবস্থায় জলের যে আয়তন থাকে, ৭,৫০,০০০ পাউণ্ডে চাপে তাহার আয়তন পূর্ব্বের তুলনায় শতকরা ৪০ ভাগ কমিয়া যায়।

আয়তনহ্রাস ও রূপপরিবর্ত্তন ব্যতীত প্রচণ্ড চাপের ফলে আরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে কেবলমাত্র একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। যে

সকল দ্রব্য সাধারণ অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিচালন করিতে পারে না, প্রচণ্ড চাপের ফলে তাহাদের অধিকাংশই বিদ্যুৎ-পরিচালনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়।

জমির সরসতা নির্ণয়

জমির উপরকার মাটি যাহাতে নষ্ট না হয় সে দিকে বৈজ্ঞানিকদের সংপ্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। বৃষ্টিতে ধুইয়া গিয়া প্রচুর পরিমাণে মাটি প্রতি বৎসর নষ্ট হয়, ইহা ছাড়া বাতাসও মাটির যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া থাকে। জমির সরসতার উপর তাহার উর্ব্বরাশক্তি নির্ভর করে এবং যে সকল স্থানে সেচের ব্যবস্থা নাই, সেই সকল স্থানে একমাত্র বৃষ্টির জলই জমির সরসতা সম্পাদন করে। যে পরিমাণ বৃষ্টি জমিতে পড়ে তাহার কিয়দংশ মাটি ভেদ করিয়া নিম্নস্তরে চলিয়া যায় এবং কিছু বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যায়। বাকি অংশ জমির সরসতা রক্ষার সহায়তা করে। এই সকল বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য মার্কিন সরকার ওহায়োর কশকটন নামক স্থানে ৮,০০০ একর জমিতে পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার জন্য বোধ হয় কোটিখানেক টাকা ব্যয় করা হইতেছে। এক কথায়, পরীক্ষার উদ্দেশ্য বৃষ্টিপাতের পর বৃষ্টির জল কি হয়। কেবলমাত্র জমির সরসতা ও সারমাটি রক্ষা ব্যতীত বন্যার সহিতও এই প্রশ্নের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এই পরীক্ষা প্রণয়নকারীরা আশা করিতেছেন যে, ১৫।২০ বৎসর ধরিয়া তথ্য সংগ্রহ করিলে ব্যবহারযোগ্য কোন পরিকল্পনা গঠন করা সম্ভব হইবে।

পরীক্ষার প্রণালী এইরূপ: আন্দাজ ১১ ফুট লম্বা, ৭ ফুট চওড়া ও ১১ ফুট গভীর এক টুকরা জমি সংলগ্ন জমি হইতে পৃথক্ করা হয় এবং ইহা যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে সেজন্য ইহার চারি ধার কংক্রিট দিয়া বেষ্টন করা হয় এবং সমগ্র জমির চাঙ্গড়টি বিশেষভাবে নির্ম্মিত দাঁড়িপাল্লার এক ধারে বসান হয়। ওজন করিবার ব্যবস্থা সমস্তই জমির নীচে থাকিবে, উপর হইতে বিশেষ কিছুই বুঝা যাইবে না। এই

উপরে: প্রজ্জ্বলিত লুমিলিন ল্যাম্প, ইহার আলোক প্রায় তাপহীন।
বামে: লুমিলিন ল্যাম্পের নলের মধ্যে প্রস্ফুরক দ্রব্যের দ্রবণ ঢালা হইতেছে। [পরপৃষ্ঠা

প্রকার এক টুকরা জমির ওজন হইবে আন্দাজ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু দাঁড়িপাল্লায় সমগ্র ওজন ধরা না পড়িয়া কেবলমাত্র ওজনের তারতম্য ধরা পড়িবে; প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর কত ওজন হইল, তাহা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়া যাইবে। পাঁচ হাজার পাউণ্ড ওজনের তারতম্য যন্ত্রে ধরা পড়িবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিলে যন্ত্রের কার্য্যপদ্ধতি বুঝা যাইবে। মনে করা যাক যে, বৃষ্টির সময় এইরূপ একখণ্ড জমিতে ৫০ পাউণ্ড বৃষ্টির জল পড়িল। জমির উপর হইতে যে পরিমাণ জল গড়াইয়া যাইবে, তাহা বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্রে ধরিয়া নির্ণয় করা হইবে। মনে করা যাক, হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ইহার পরিমাণ ৫ পাউণ্ড। যে পরিমাণ জল জমি ভেদ

করিয়া নীচে চলিয়া যায় তাহাও পরিমাপ করা হইবে, মনে করা যাক ইহার পরিমাণ ২০ পাউণ্ড। বৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে জমির ওজনে যদি ২০ পাউণ্ড তফাৎ হয় তাহা হইলে দেখা যায় যে, ৫ পাউণ্ডের হিসাব পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা হইল যে, পাঁচ পাউণ্ড জল বাষ্পীভূত হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র সাহায্যে বৃষ্টির পরিমাণ ও বাষ্পীভূত জলের পরিমাণ সকল সময়ের জন্য পাওয়া যাইবে। ঘাস-জমি, কাঁকরযুক্ত জমি, চষা জমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার জমিতে এই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মাটি কি পরিমাণ বৃষ্টির জল শোষণ করে তাহা নির্ণয় করিবার পরীক্ষাপ্রণালী।

বৈজ্ঞানিকরা আশা করিতেছেন, ইহার সাহায্যে কৃষির উন্নতি, মৃত্তিকা-ক্ষয় রোধ করিবার পন্থা এবং বন্যা নিবারণের উপায় আবিষ্কৃত করা সম্ভব হইবে।

শীতল আলোকের সন্ধান

সাধারণতঃ আলোক উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তাপও উৎপন্ন হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকরা বহুদিন হইতেই তাপহীন আলোক সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সভ্য জগতে বিজলী বাতির বহুল প্রসার বর্ত্তমানে হইয়াছে। বিজলী-বাতিতেও প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। বিজ্ঞাপনের জন্য রাস্তাঘাটে যে সকল নানা প্রকার রঙীন 'নিয়ন-সাইন' দেখা যায়, তাহাও বৈদ্যুতিক বাতি হইলেও ইহার কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন। সংপ্রতি একটি বিখ্যাত মার্কিন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাতা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ নূতন ধরণের বাতি তৈয়ারী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহাতে তাপ প্রায় উৎপন্ন হয় না বলিলেও চলে, অধিকন্তু বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যয় সাধারণ বিজলী বাতির তুলনায় অনেক কম। এক প্রকার দ্রব্য আছে, যাহার উপর অদৃশ্য আলট্রা-ভায়লেট রশ্মি পড়িলে দ্রব্যগুলি ঐ অদৃশ্য আলোক শোষণ করিয়া লয় এবং দৃশ্য আলোকরূপে পুনরায় তাহা বিকীর্ণ করে। এই জাতীয় দ্রব্যকে প্রস্ফুরক দ্রব্য বলা হয়। নূতন বাতির নাম দেওয়া হইয়াছে 'লুমিনিন ল্যাম্প'। মোটামুটি হিসাবে ইহার গঠন নিয়ন-সাইনের মত। একটি কাচের নলের মধ্যে সামান্য আর্গন গ্যাস ও পারদ থাকে এবং প্রস্ফুরক দ্রব্যের একটি প্রলেপ থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রিয়ায় নলের মধ্যে প্রথমে আলট্রা-ভায়লেট রশ্মির উদ্ভব হয় এবং প্রস্ফুরক দ্রব্য থাকাতে আলো দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার প্রস্ফুরক দ্রব্য সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোক সৃষ্টি করা যায়। ইহার মধ্যে একটির বর্ণ প্রায় সূর্য্যালোকের মত।

লিগ্‌নিনের ব্যবহার

সেলুলয়েড ও সেলোফেন বর্ত্তমানে অত্যন্ত সুপরিচিত দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেলুলয়েডের ব্যবহার এত ব্যাপক যে, তাহার কোন উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই। সেলোফেনও প্রকৃতপক্ষে সেলুলয়েড, একমাত্র তফাৎ এই যে, উহা কাগজের মত পাতলা এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্ণহীন। সিগারেটের প্যাকেট ও বহু প্রসাধন দ্রব্যের প্যাকেট আজকাল এই সেলোফেন দিয়া মোড়া হইতেছে। সেলুলয়েড,

সেলোফেন ও কৃত্রিম রেশমের প্রধান উপাদান সেলুলোজ।* উদ্ভিদদেহের কোষের প্রধান উপাদান এই সেলুলোজ। উদ্ভিদদেহের কোষগুলিকে সংলগ্ন করিয়া রাখে লিগ্‌নিন নামে একটি বস্তু, সেলুলোজ হইতে এই লিগ্‌নিন পৃথক্ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অধিকন্তু এ পর্যন্ত লিগ্‌নিনকে কোন কাজে নিয়োগ করা সম্ভব হয় নাই। শতাধিক বৎসর পরীক্ষার পরও লিগ্‌নিনের রাসায়নিক স্বরূপ নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমানে প্রতিবৎসর বহু কোটি টন লিগ্‌নিন, সেলুলয়েড ও কৃত্রিম রেশম প্রভৃতির কারখানা হইতে নষ্ট হইয়া যায়।

সংপ্রতি মার্কিন সরকারী বনবিভাগের গবেষণাগার হইতে লিগ্‌নিন ব্যবহার করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। লিগ্‌নিন হইতে একপ্রকার প্লাস্‌টিক তৈয়ারী করা হইয়াছে। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'জাইলাইট'। এইরূপ প্লাস্‌টিক তৈয়ারী করিতে পাউণ্ড প্রতি ছয় পয়সার অধিক খরচ পড়ে না বলিয়া শুনা গিয়াছে। বর্ত্তমানে প্লাস্টিক নানা কাজে ব্যবহার করা হইতেছে এবং বহু ক্ষেত্রে কাঠ, ধাতু, কাচ, চামড়া প্রভৃতির পরিবর্ত্তে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ প্লাস্‌টিকের দাম অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় সকল ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা সম্ভব হয় না, কিন্তু জাইলাইটের দাম অনেক কম হওয়ায় অনেক শস্তায় ইহার দ্বারা কাঠের কাজ চালান যাইবে। জাইলাইটের একমাত্র অসুবিধা, অন্য জাতীয় প্লাস্‌টিকের মত ইহাতে রঙ্ ধরান চলে না বা স্বচ্ছ অবস্থায় তৈয়ারী করা যায় না। ইহার আকার অনেকটা ইবনাইটের মত, বর্ণ ঘোর কাল। কাঠের মতই সহজে ইহার উপর যন্ত্র চালান যায় এবং ইহা খুব ভালভাবে পালিশ করা যায়। অধিকন্তু, বিদ্যুতের অপরিচালক হওয়ায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার কাজেও জাইলাইট ব্যবহার করা চলিতে পারে।

বর্ত্তমানে ইহা কাঠের গুঁড়া হইতে তৈয়ারী হইতেছে। একটি প্রকাণ্ড লোহার পাত্রের ভিতর মৃদু অ্যাসিড ও কাঠের গুঁড়া দিয়া পাত্রটি বন্ধ করিয়া দিয়া উত্তাপ দেওয়া হয়। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে কাঠের গুঁড়ার কিছু অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া শর্করাতে রূপান্তরিত হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া শেষ হইলে পাত্রটি খুলিয়া ফেলিলে কাল সিরাপ এবং একটি গুঁড়ার মিশ্রণ পাওয়া যায় সিরাপটি ফেলিয়া দিয়া গুঁড়াগুলি ছাঁচের মধ্যে ঢালা হয় এবং হাইড্রলিক প্রেস দিয়া প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হয়। চাপ দিবার পর ছাঁচের আকারে কঠিন জাইলাইট পাওয়া যায়। বিভিন্ন আকারের ছাঁচ ব্যবহার করিয়া সরাসরি নানা প্রকার দ্রব্য তৈয়ারী করা যায়। ছাঁচের মধ্যে কোন ধাতুর চূর্ণ মিশাইয়া দিলে ধাতব চূর্ণগুলির জন্য বিভিন্ন ভাবে জাইলাইট ব্যবহার করা যায়। জাইলাইটে যে কোন রঙ্ বা এনামেল লাগান চলে। জাইলাইটের প্রধান গুণগুলির মধ্যে বিদ্যুতের অপরিচালকত্ব, জলরোধকতা এবং অ্যাসিডের কোন ক্রিয়া না হওয়ার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

পথনির্ম্মাণে মাৎগুড়ের ব্যবহার

সংপ্রতি কানপুরে শুগার টেক্নোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের যে সম্মেলন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইম্পিরিয়াল ইনস্‌টিটিউট অব শুগার টেক্নোলজির বায়োকেমিষ্ট ডক্টর এচ. ডি. সেন জানান যে, চিনির কারখানা হইতে ভারতে বাৎসরিক প্রায় ৪ লক্ষ টন মাৎগুড় উৎপন্ন হয়। এই মাৎগুড় কি ভাবে কাজে লাগান যায়, তাহা বর্ত্তমানে একটি বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ডক্টর সেন রাস্তা নির্ম্মাণের কাজে মাৎগুড় ব্যবহার করিবার একটি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। মাৎগুড়, আলকাৎরা, অ্যাশফাল্ট ও অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে মাৎগুড় রজন জাতীয় বস্তুকে রূপান্তরিত হয়। এই বস্তুটি জলে দ্রবণীয় নহে, তরল অবস্থায় রাস্তার উপরে লাগান যাইতে পারে। রাস্তায় লাগাইবার পর উহা কঠিন আকার ধারণ করে। এইভাবে যে পথ নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা কোন অংশেই আলকাৎরা লাগান পথ অপেক্ষা খারাপ নহে। ডক্টর সেন হিসাব কষিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'টার ম্যাকাডাম' ও সিমেণ্ট-কংক্রিট দিয়া পথ তৈয়ারী করিতে প্রতি বর্গগজে যথাক্রমে ৮৵০ ও ৩।৵০ খরচ পড়ে, কিন্তু তাঁহার পদ্ধতিতে

* সেলুলোজ সম্পর্কে "বঙ্গশ্রী" পত্রিকায় বিশদ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত 'সেলুলোজ' প্রবন্ধ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫) ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ লিখিত 'ভারতের শিল্প-সংস্থান' প্রবন্ধ (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫) দ্রষ্টব্য।

পথ নির্ম্মাণের ব্যয় প্রতি বর্গগজে মাত্র ॥৵০ পড়ে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, ভারতে যে পরিমাণ মাৎগুড় প্রতি বৎসর অকেজো থাকিয়া যায়, তাহা হইতে অনায়াসে ৬৮৮০ মাইল প্রথম শ্রেণীর পথ তৈয়ারী করা যাইতে পারে।

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল-পুরস্কার

ষ্টকহলম হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, এই বৎসর ইতালীয় বৈজ্ঞানিক ডক্টর এনরিকো ফের্মিকে পদার্থবিজ্ঞানের জন্য নোবেল-পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। নিউট্রন-সংঘাতে নূতন নূতন তেজোবিকিরক পদার্থ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। নিউট্রন সম্পর্কে ডক্টর ফের্মি ব্যাপকভাবে গবেষণা করিয়াছেন।

ডায়াবিটিস রোগে তামা

সংপ্রতি জনৈক জার্ম্মান চিকিৎসক ডক্টর আর. শ্রেৎস আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ডায়াবিটিস রোগীরা সামান্য পরিমাণে তাম্রঘটিত ঔষধ সেবন করিলে যথেচ্ছ আহার করিতে পারেন। সাধারণতঃ ডায়াবিটিস রোগীদের শ্বেতসার বা শর্করাজাতীয় জিনিষ খাইতে দেওয়া হয় না, কিন্তু ডক্টর শ্রেৎস পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, তাম্রঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে অপরিমিত শর্করা ও শ্বেতসার আহার করিলেও রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না। রক্তে শর্করার পরিমাণ কম রাখিবার জন্য ডায়াবিটিস রোগীদের ইনসুলিন প্রয়োগ করা হয়, তামা প্রয়োগ করিলে ইনসুলিনের পরিমাণ অনেক কমাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। রোগ বিশেষ কঠিন না হইলে কেবলমাত্র তাম্রঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করিলেই চলে, ইনসুলিনের প্রয়োজন হয় না।

তামায় রঙ্ ধরান

অলঙ্করণের জন্য যাঁহারা তামার উপর রঙ্ ধরাইতে চান তাঁহাদের জন্য দুইটি প্রক্রিয়া এখানে বর্ণিত হইল। তামা কিছুদিন ফেলিয়া রাখিলে কলঙ্ক ধরিয়া যায়, ইহাতে সে অসুবিধা দূর হইবে। প্রথমতঃ, যাহাতে রঙ্ ধরাইতে হইবে তাহা খুব পরিষ্কার থাকা দরকার। ১৫ ভাগ জলে একভাগ সালফ্যুরিক অ্যাসিড মিশাইয়া সেই দ্রবণে তামার জিনিষ অল্প সময় ডুবাইলে তাহা পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পাঁচ সের জলে এক আউন্স পোটাসিয়াম সালফাইড গুলিয়া সেই দ্রবণে পরিষ্কৃত তামার জিনিষ ডুবাইলে সময়ের তারতম্য হিসাবে সোনালী আভাযুক্ত বাদামী হইতে প্রায় ঘোর কাল রঙ্ ধরান যায়। কোন রঙের জন্য কতখানি সময় লাগে তাহা একটি পরিষ্কৃত তামার টুকরা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। বাজারে 'অক্সিডাইজ্‌ড্' বলিয়া যে সকল জিনিষ বিক্রয় হয় তাহাতে এইভাবেই রঙ্ ধরান হয়। তামা ছাড়া পিতলের উপরও এইভাবে রঙ্ ধরান যাইতে পারে। আর একটি উপায়ে তামায় সুন্দর লালাভ বেগুনী রঙ্ ধরান যাইতে পারে। বিশ আউন্স জলে আধ ড্রাম নাইট্রিক অ্যাসিড ও এক আউন্স হাইপো (রাসায়নিক নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট, ফটো 'ফিক্স' করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এক পাউণ্ডের দাম ৩।৪ আনার বেশী হইবে না) গুলিয়া একটি দ্রবণ তৈয়ারী করিতে হইবে (উত্তাপ ১২০ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইলেই ভাল হয়) এবং দ্রবণটি সামান্য গরম করিতে হইবে। পরিষ্কৃত তামার দ্রব্য এই দ্রবণে আধ মিনিট হইতে এক মিনিট ডুবাইতে হইবে।

কন্যাদায়ের প্রতীকার

—শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

পাঁকাল মাছ পাঁকের ভিতর থাকে, অথচ গায়ে তাহার পাঁকের চিহ্নও দেখা যায় না। এই উপমা পরশুরামের সম্বন্ধেও খাটে। কত রকমের কত কারবার আটাশ বছর বয়সের এই হিসাবী যুবকটির একার বুদ্ধিতে ও স্বোপার্জ্জিত অর্থে কলের মত চলিয়াছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে কোথাও সে ধরা-ছোঁয়া দেয় নাই। টালা হইতে টালিগঞ্জ পর্য্যন্ত কত স্থানে কত নামে তাহার কত কর্ম্মশালাই চলিয়াছে, কত কর্ম্মী কর্ম্মসূত্রে ঐসকল প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত; কিন্তু পরশুরামের এমনই ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা যে, মহাজনটোলার হেড আফিসে দোতালার একখানা নিভৃত ঘরে বসিয়া কর্ম্ম-ধারার যে নির্দ্দেশ সে প্রত্যহ দিয়া থাকে, তাহার এক চুলও এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। খেরো বাঁধানো এক-খানা সরু-মোটা খাতা এবং নিজের কেশ-বহুল তরুণ মাথাটির উপর নির্ভর করিয়াই সে নিশ্চিন্ত। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া যখনই যে কর্ম্মচারী কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই পরশুরাম যেন সর্ব্বজ্ঞের মত তাহাকে চেতাইয়া দিয়াছে—সাবধান! অপরাধী কর্ম্মচারী প্রভুকে সচেতন দেখিয়া অবাক-বিস্ময়ে ভাবিত—তাহার মালিক কি দৈবজ্ঞ?

পরশুরামের বিভিন্ন কারবারে কাঁচা পয়সার ছড়াছড়ি; কেনা-বেচা যাহারা করে, চুরি করিলে সহজে ধরিবার উপায় নাই। পরশুরাম তাহা বুঝিত এবং বুঝিয়া এপথ বন্ধ করিতে যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহা অদ্ভুত। চুরির দায়ে তাহার কোন কর্ম্মচারী ধরা পড়িলে, পরশুরাম তাহাকে পুলিসে দিত না; তাহার খাস-কামরায় অপরাধীকে আনাইয়া হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইত, সেই সঙ্গে এই মর্ম্মে এক একরার-পত্রও গৃহীত হইত যে, দেনার টাকা শোধ না করা পর্য্যন্ত সে পরশুরামের অফিসে কাজ করিবে এবং নির্দ্দিষ্ট বেতনের অর্দ্ধাংশ মাসে মাসে দেনায় উসুল দিবে।

যে কর্ম্মচারী ধরা পড়িত, তাহার সম্বৎসরের বেতনের টাকাটা ধরিয়া হ্যাণ্ডনোট লেখা হইত এবং তাহা উসুল করিয়া লইতে কোনরূপ ব্যতিক্রম কখনও দেখা যাইত না। কাজ ছাড়িয়া পলাইলেও তাহার নিষ্কৃতি ছিল না, আইনের সাহায্য লইয়া পুনরায় তাহাকে কর্ম্মশালার ঘানিতে জুড়িয়া দেওয়া হইত। অবশ্য, কল্পিত দেনার টাকাটা পরশুরাম নিজে লইত না, বাহিরের বা আফিসের যাহারা এই চুরি ধরাইয়া দিত, ইহা ছিল তাহাদের প্রাপ্য।

কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনের ব্যবস্থাও তাহার অদ্ভুত। সাধারণতঃ যাহারা দাগী, ছল-চাতুরী বা চুরি করিয়া জেল খাটিয়াছে, অন্য কোনও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যাহাদের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ হইয়া আছে, পরশুরাম বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের ভিতর হইতেই তাহার কর্ম্মশালার জন্য কর্ম্মী নির্ব্বাচন করিত। নির্ব্বাচিতদের সে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিত,—দাগী জেনেও তোমাদের কাজ দিচ্ছি কেন জান? ভবিষ্যতে আমার সঙ্গে দাগাবাজী করতে ভয় পাবে —তাই। আগেকার দাগ যাতে মুছে যায়, সেই ভাবে কাজ কর; আর যদি দাগের ওপর দাগ কাটবার চেষ্টা কর, বাঁচবার পথটুকুও বন্ধ করে দেব, জেনে রাখো।'

সুতরাং পরশুরামের সহিত দাগাবাজী করিলে, পরশুরাম আদালতে ইহাদের পুরান দাগগুলিও স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারিত যে, প্রতারণাই ইহাদের ব্যবসায়।

পরশুরাম নিজে বরাবরই অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রায় একান্ত অভ্যস্ত। সাধারণতঃ একখানা অতি সাধারণ ধুতি ও এক-খানা গাত্রাবরণে তাহার লজ্জা-নিবারণ হইত। সে অতি গরীবের ঘরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার বাবা আট-হাতির উপর কাপড় কখনো পরেন নাই, কোনওরূপ পিরানে অঙ্গ তাহার আবৃত হয় নাই। পিতার দৈন্যদশা পরশুরাম বিস্মৃত হইতে পারে নাই। আজ যদি তাহার বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন, পরশুরাম হয় ত তাঁহাকে সাজাইয়া দেখাইয়া দিত—কেমন করিয়া জামাকাপড়ের সদ্ব্যবহার করিতে

হয়, কিন্তু সে সুযোগ ত সে পায় নাই, শৈশবেই সে পিতাকে হারাইয়াছে এবং তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন তাহার মা—অতি দুঃখ, কষ্ট ও দৈহিক পরিশ্রম সহ্য করিয়া। সে তাহা ভুলে নাই, ভুলিতে পারে না। যে সামান্য অর্থ মা তাহাকে দিয়াছিলেন, তাহাকে মূলধন করিয়াই আজ সে একাই সহরের কতিপয় সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানের মালিক। আর্থিক প্রতিষ্ঠা তাহার প্রচুর, সুদূর প্রতীচ্যের সহিত তাহার ব্যবসায়ের যোগসূত্র রচিত হইয়াছে। সহরবাসীকে চমকিত করিয়া বড়মানুষীর পরিচয় দিতে যাহা যাহা প্রয়োজন, মনে করিলেই সেগুলি সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে, কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার অনাসক্তি সকলকেই অবাক্ করিয়া দিয়াছে। কেহ প্রশ্ন করিলে সে অসঙ্কোচে বলে, "ছেলেবেলায় ভগবানের নামে শপথ করে সঙ্কল্প করেছিলুম, টাকা রোজগার করব; টাকা আমাকে চালাবে না—আমি চালাব তাকে। সে মুখ ভগবান্ আমার রেখেছেন।"

যদি কেহ প্রশ্ন করিত,—"বেশ ত, টাকা যখন রোজগার করছেন, খরচ করে সেটা সার্থক করুন।"

পরশুরাম তখন নরম হইয়া উত্তর দিত,—"টাকা বাড়াতে যতটুকু দরকার, সে খরচ আমি করছিই। পরের জন্যেও টাকা ঢালতে কসুর ত করি নি কোন দিন—অবশ্য যেখানে ওটা দরকার বুঝেছি। তবে নিজের জন্যে খরচ করি না কেন,—তার কারণ কি শুনবে? ভাল জামা কাপড়, ভাল ভাল খাবার, রাজপুরীর মত বাড়ী, তার সাজ-সজ্জা, খাট-পালঙ্ক—এ সবের কথা উঠলেই আমার চোখের ওপর জেগে ওঠে আমার গরীব বাবার কথা, তাঁর এলো গা, খালি পা, আট হাতি আধময়লা কাপড়পরা মূর্ত্তি; অমনি পেছিয়ে যাই, ঠাস্ করে নিজের গালে চড় মেরে জানিয়ে দিই—আমি গরীবের ছেলে, গরীবের হালেই আমাকে থাকতে হবে। আমার মা মোট ব'য়ে আমাকে মানুষ করেছেন, আমীরী করা কি আমার সাজে?"

অথচ, পরশুরামের আফিসে যাহারা মাস মাহিনায় কাজ করে কিংবা যাহারা গাড়ী-জুড়ি চড়িয়া তাহার নিকট টাকা ধার করিতে আসে, তাহাদের চেহারার পারিপাট্য বা বেশ-ভূষার প্রাচুর্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহাদের তুলনায় পরশুরামের পরিচ্ছদগত দৈন্য অন্যের মনে কৌতূহল উদ্রিক্ত করিলেও পরশুরাম এ সম্বন্ধে বে-পরোয়া। বরং পোষাক পরিচ্ছদে যে লোক ফিটফাট, কাজে খুব চটপটে, কোন প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা জবাব দিতে পটু, নিষিদ্ধ রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে বা নূতন রকমের কিছু করিতে যাহার ভয়-ডর নাই, পরশুরাম তাহাকেই বেশী পছন্দ করে।

ছোট হইতে ক্রমশঃ বড় হওয়ায় এবং আশৈশব দারিদ্র্যের সহিত পরিচিত থাকায়, টাকাকেই পরশুরাম বড় করিয়া দেখিয়াছিল এবং ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল যে, এই বস্তুটিকে কায়েমীভাবে তাঁবে রাখিয়া তাহার উপর বসিতে পারিলে, প্রকারান্তরে অনেক গণ্যমান্য লোকের মাথার উপরে বসাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইবে। এই উদ্দেশ্যেই আদা-জল খাইয়া এমন জোরে সে টাকার সাধনা সুরু করিয়াছিল যে, অবাধ্য টাকা তাহার একান্ত বাধ্য না হইয়া পারে নাই। তাই সময় সময় ইহার প্রসঙ্গ উঠিলেই পরশুরামের মনটা খচ্ করিয়া উঠিত ও উচ্চারণটা একটু বেঁকাইয়া কহিত "ট্যাকা?"

কিন্তু এই টাকাই তাহাকে মানুষ চিনিবার শক্তি দিয়াছিল, অভাবগ্রস্তের দুঃখ কষ্টের হেতু নির্ণয় করিতে শিখাইয়াছিল। টাকা খেলাইবার ব্যাপারেই পরশুরাম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, তাহার তেজারতির বিভাগটি ফাঁপাইয়া তুলিয়াছে তাহারাই, যাহারা চিরাচরিত সংস্কার রক্ষা করিতে কন্যার বিবাহ দিয়া সর্ব্বহারা হইতে কুণ্ঠিত নহে। প্রয়োজন না থাকিলেও, পরশুরাম এরূপ ক্ষেত্রে কত অবান্তর কথাই শুনিত। ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া অনুচিত জানিয়াও সে কত প্রকার যুক্তি দেখাইত; অবস্থা বুঝিয়া অনেক সময় বাধাও দিত—যাহাতে মেয়ে পার করিতে তাহারা ঋণের রজ্জু নিজের গলায় বাঁধিয়া বিব্রত না হয়?

সেদিন চাঁপাতলায় চারু বোস বসতবাড়ীর দলিল-দস্তাবেজ লইয়া পরশুরামের খাস-কামরায় দেখা করিলেন ও দীর্ঘ ভনিতার পর জানাইলেন,—কন্যাদায়, চাই পাঁচ হাজার টাকা। পরশুরাম সমস্ত শুনিয়া প্রশ্ন করিল,—"আপনার বাড়ীর দাম বলছেন সাত হাজার, চাচ্ছেন পাঁচ হাজার; মাসে উপায় করেন আশী টাকা; ধার শুধবেন কিসে?"

কন্যাদায়গ্রস্ত বোসজা উত্তর দিলেন,—"এর পর খরচ

কমাব, মাইনেও কিছু বাড়বার আশা আছে; সুদ আপনার ত ঠিক দিয়ে যাব তারপর যা আছে অদৃষ্টে।"

পরশুরাম কহিল,—"অদৃষ্টে যা আছে, আমিই বলে দিচ্ছি শুনুন;—সুদ দিতে পারবেন না। বে' দিতে ও টাকাটা সমস্তই খরচ করবেন, এর জেরও ত চলবে; তত্ত্বতাবাস, মেয়ে-জামাই আনা-নেওয়া; সব দিক্ দিয়েই বড়মানুষী না করে পার পাবেন না, খুঁৎ হতে কিছুতেই দেবেন না, পাছে কেউ খোঁটা দেয়। তারপর, পরের মেয়েটিও বেড়ে উঠবে, নিজের বয়সও গড়াতে থাকবে। তখন বাড়ীও আড়ী দেবে—ভাড়া বাড়ীতে উঠতে হবে।"

দায়গ্রস্ত হইলেও চারুবাবু আশী টাকা মাহিনার চাকরী করেন ও নিজের বাড়ীতে থাকেন, সুতরাং বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন,—"ভগবানের যদি সেই ইচ্ছাই হয়, তাই হবে।"

পরশুরাম কহিল,—"এর মধ্যে ভগবানের ইচ্ছা বলে কিছু নেই, তিনি ত আমাদের মনে। মানুষ করে যখন গড়েছেন, ভাল মন্দ বোঝবার শক্তিও দিয়েছেন! কিন্তু আপনারা ত বুঝে কাজ করতে চান না। যা চলে আসছে বরাবর, তাই চালাতে হবে, তা সে ভালোই হোক আর খারাপই হোক। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে, পয়সা নেই, তাতে কি? ধার করে, ভিক্ষে করে, ঘর বাড়ী খুইয়ে তাকে পার করা চাই-ই,—এটা হচ্ছে আপনাদের সংস্কার! কেন, এখানে ভগবানের ওপর ভরসা রাখতে পারেন না—জোর করে বলতে পারেন না—ও সব বেচা-কেনার ভেতর যাব না, যা আছে তাতেই মেয়ে পার করব?"

উত্তর আসিল অসহিষ্ণুভাবে,—"তা হয় না পরশুরাম বাবু!" পরশুরাম কহিল,—"হয়। কিন্তু এর জন্যে গোড়া থেকে তৈরী হতে হয়, মেয়েকেও তৈরী করতে হয়। আপনার মনে যদি এ রকম জোর থাকে যে, মেয়েকে আপনি ঠিক মত তৈরী করতে পেরেছেন, মেয়ে একটা সংসারের হাল ধরতে পারবে, সে মেয়েকে পার করতে ভিটে-মাটী বাঁধা দিতে হবে কেন? আমি ত ভেবে পাই না, ছেলে কিছু করুক আর না করুক, তার বিয়ে যখন হওয়া চাই-ই, তখন মেয়েই বা অত সস্তা হবে কেন?"

চারুবাবু কহিলেন,—"আপনার এ যুক্তি আমাদের সমাজে তুললে, সবাই হাসবে।"

পরশুরাম গম্ভীর হইয়া কহিল,—"নিজেদের গলদ অপরে আঙুল তুলে দেখালেই অনেকে অমন হাসে। যাদের পুঁজি নেই অথচ সাধ আছে, তারা যখন মেয়ে পার করবার জন্য আমার কাছে এসে ঋণের দড়ি গলায় বাঁধে, আমিও তখন হাসি। ভাবি, এ দায় যখন সবারই ঘরে, তখন এর একটা ব্যবস্থা করতে কেউ এগোয় না,—যে যার কোলে ঝোল টেনেই চলেছে!"

বোসজা মনে মনে ভাবিতেছিলেন, কি বিপদ? কি কথা তিনি তুলিলেন, আর তাহা গড়াইয়া কোথায় আসিয়া পড়িল! বাড়ী বাঁধা রাখিয়া টাকা লইবেন, তাহাতে অত কথা-কাটাকাটি, সমাজ-সংস্কার ও তাহার চর্চ্চার কি প্রয়োজন বাপু?—অথচ মনের ভাবটুকু প্রকাশ করিবার মত সাহসও এই শ্রেণীর খাতকদের থাকে না। কেন না, পরশুরামের মত মহাজন লাখের ভিতরেও একটা মিলে কি না সন্দেহ। যদি একবার সে মুখটি ফুটিয়া কহিল,—'আচ্ছা, টাকা আমি দেব', ইহার নড়চড় কিছুতেই হইবে না। বিশেষতঃ কন্যার বিবাহ, পুত্রের উপনয়ন এবং পিতৃমাতৃদায় উপলক্ষ করিয়া যাহারা এই অদ্ভুত মহাজনটির খাস-কামরায় মুখখানি ম্লান করিয়া তুলিত, একমুখ হাসি লইয়াই তাহারা বাহির হইয়া আসিত। বোসজা অগত্যা কথাটার মোড় ফিরাইবার অভিপ্রায়ে আগ্রহ সহকারেই সহসা প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে আমার কথাটা?"

পরশুরাম হাসিমুখে কহিল,—"আপনার কথাটারই জের তো চলেছে বোসমশাই! দেখেন নি বুঝি, কলমী-দলের একটা ডাঁটা ধরে টান দিলে, সারা পুকুরভরা কলমীবন নড়ে ওঠে; এ-ও ঠিক তাই। কিন্তু তা'বলে, আসল কথাটা আমি ভুলি নি, টাকা আপনি পাবেন।"

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চারু বোস কহিলেন,—"ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

পরশুরাম হাত দু'খানি যুক্ত করিয়া কহিল,—"ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনা করি, বোসমশাই—বাঙ্গালা থেকে এই দায়টা তিনি তুলে দিন, না হয় মেয়ের নাম মুছে দিন।"

তিন দিনের মধ্যেই লেন-দেন হইয়া গেল। পরশুরামের কথার কোন নড়-চড় হয় নাই। চারু বোস ইহার পূর্ব্বে

আরও কয়েক স্থানে কন্যাদায় জানাইয়া বসতবাড়ী রেহান রাখিয়া টাকা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কেহই অত টাকা দিতে সম্মত হয় নাই। তদ্ভিন্ন যে পরিমাণ টাকা দিতে তাঁহারা স্বীকৃত ছিলেন, তাহাতে কন্যাদায় হইতে চারুবাবুর অব্যাহতি যেরূপ সম্ভবপর ছিল না, ঋণপরিশোধের সর্ত্তগুলিও তাঁহার পক্ষে তেমনই প্রীতিপ্রদ হয় নাই। পক্ষান্তরে পরশুরাম শুধু বাড়ীর দলিলখানি দেখিয়াই এককথায় তাঁহাকে প্রার্থিত পাঁচ হাজার টাকাই প্রদান করিবে বলিল, বাড়ীখানা পর্য্যন্ত দেখিল না। প্রথমটা অনেকেই উপহাস করিয়াছিল; চারু বোসকে বলিয়াছিল, "তোমাকে খেলাচ্ছে; টাকা ওখানে পাবে না; অন্য জায়গায়ও চেষ্টা দেখ।"

কিন্তু তিন দিন পরেই যখন বন্ধকী দলিল রেজিষ্টারী করিয়া দিয়া পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চারু বাবু হাসিমুখে বাড়ী ফিরিলেন, তথাকথিত সমালোচকরা অবাক্ হইয়া গেল। মনে মনে সকলেই বলিল,—"সত্যই তো, লোকটা দেখছি অদ্ভুত!"

অতঃপর ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন চলিল। বিবাহের কয়েকদিন পূর্ব্বে চারুবাবু পরশুরামের খাস-কামরায় আসিয়া সাদর নিমন্ত্রণ জানাইলেন, সুরঞ্জিত দামী কাগজে ছাপান একখানা পত্রও পরশুরামের হাতে দিলেন; কহিলেন,—"এটা হচ্ছে স্মারক, পাছে ভুলে যান; আপনার যাওয়া চাই-ই।"

পরশুরাম কহিল,—"এই গুলোই আপনাদের বাড়াবাড়ি বোস-মশাই! আমি এ-সব পছন্দ করি না।"

চারুবাবু স্তব্ধ; লোকটা বলে কি! এত লোককে নিমন্ত্রণ তিনি করিলেন, প্রত্যেকেই হাসিমুখে সম্মতি জানাইলেন, বিবাহ রাত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধন্য করিবেন; আর এই লোকটা—বয়সে যে তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠ পুত্রের সমবয়স্ক বলিলেও চলে; জাতি ও বর্ণের দিক্ দিয়াও যে ব্যক্তি অনুন্নত, শুধু মহাজন হইবার সুযোগ পাইয়া সে তাঁহার সাদর আহ্বানের এইরূপ রূঢ় উত্তর দিতে সাহস করে! ক্ষণকাল তিনি চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন,—"তাহলে আপনাকে নেমন্তন্ন করতে আসাটা আমার অন্যায় হয়েছে বলুন?"

পরশুরাম অবিচলিতকণ্ঠে কহিল,—"অন্যায় হয় নি, বাড়াবাড়ি হয়েছে। আপনিই বলুন, যদি লেন-দেন আপনার সঙ্গে আমার না হ'ত, আমাকে নেমন্তন্ন করতেন? আমি আপনাকে টাকা ধার দিয়েছি, তাই বলে আমাকে সেখানে ডাকবার কি দরকার বলুন ত? এখন আপনি মেয়ের বিয়ের মোহে এমনই মেতে উঠেছেন যে, ভবিষ্যতের দিকে নজর দেবারও ফুরসৎ পাচ্ছেন না। আমি কিন্তু আপনার কাণ্ড দেখে স্তম্ভিত হয়েছি বোস-মশাই! আপনার কন্যাদায়, এ দায় মেটাতে বাড়ী বাঁধা দিয়েছেন, অথচ বড়লোকদের মত ঘটা করে চিঠি ছাপিয়েছেন। সব দিক্ দিয়েই যে এই রকম বাহুল্য হয়েছে, তার ভুল নেই। যাই হোক, আমি খোঁচা দিলাম বলে মাপ করবেন; আমি আপনার নেমন্তন্ন মাথায় করেই নিলাম।"

বোস মহাশয়ের মনের বিক্ষোভ কাটিয়া গেল, ওষ্ঠপ্রান্তে হাসিও দেখা দিল; কহিলেন,—"তা'হলে যাবেন, যেন ভুলবেন না।"

ঘণ্টাখানেক পরে আর এক ব্যক্তি পরশুরামের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দিব্য হৃষ্ট-পুষ্ট চেহারা, চোখে চশমা, পোষাক-পরিচ্ছদের বাহার দেখিয়া মনে হয়, লোকটি পদস্থ। বয়স পঞ্চাশের উপর। নাম অবিনাশ সরকার। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কোনও জার্ম্মান সওদাগরী আফিসের বড় বাবু। পরশুরাম ইহাঁদের আফিসে কোনও কোনও পণ্য সরবরাহ করে, সেইসূত্রে সরকার মহাশয়ের সহিত তাহার বিশেষ প্রীতি ও ঘনিষ্ঠতা।

অবিনাশ সরকারকে দেখিয়াই পরশুরাম হাসিমুখে কহিল,—"আসুন! এমন অসময়ে যে?"

অবিনাশ সরকার কহিলেন,—"শোনেন নি বুঝি, ছেলের বিয়ে যে; যেতে হবে।"

পরশুরাম মুখে কৌতুহল প্রকাশ করিয়া কহিল,—"বটে! কোথায় কবে হচ্ছে?"

অবিনাশ বাবু একখানা ছাপা চিঠি বাহির করিয়া পরশুরামের হাতে দিলেন এবং মুখে বলিলেন,—"ওতেই সব খবর পাবেন। মোট কথা বিয়ের দিন সন্ধ্যের পর গাড়ী পাঠাবো, বরযাত্রায় যোগ দেওয়া চাই। রবিবারে বৌ ভাত,

দিনের বেলাতেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছি, সকাল সকাল যেতে হবে।"

পরশুরাম তক্ষণ নিবিষ্টমনে ছাপানো চিঠিখানা দেখিতেছিল। অতি সাধারণ রঙ্গীন কাগজে সাধারণভাবে ছাপা চিঠি। আগের চিঠিখানার তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট। সহসা চিঠির মধ্যে আগেকার চিঠিখানার মালিকের নামটি পরশুরামের নজরে পড়িবামাত্রই সে সচকিত হইয়া উঠিল এবং তাহার স্বভাবসিদ্ধ তিতিক্ষায় মনোভাব দমন করিয়া এক নিঃশ্বাসে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল।

ইতিমধ্যে অবিনাশবাবুর বক্তব্যও শেষ হইয়াছিল। তিনি কহিলেন,—"তা'হলে উঠি।"

পরশুরাম কহিল, "বসুন, দুটো কথা কই। শুধু যাবার কথাই তো বললেন, পাবার কথাটা তো চেপেই গেলেন, অথচ এটিই আপনাদের বিয়ের বড় কথা; আদায়টা কি রকম হবে বলুন, শুনি।"

এক মুখ হাসিয়া অবিনাশ সরকার কহিলেন, "তো মন্দ কি! বেয়াই আমার লোক খুব ভাল, আর বেশ শাঁসাল। আমি সাড়ে তিন হাজার টাকার ফর্দ্দ দিয়েছি, তাতেই রাজী হয়েছে, লোকটার মেজাজ সব দিক্ দিয়েই উঁচু।"

পরশুরাম কহিল, "কিসে বুঝলেন?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "ব্যবহারে আর পাকা দেখার দিন খাইদাইয়ের ব্যাপারে। শুনলে অবাক্ হয়ে যাবেন, একান্ন রকম 'মেনু' করেছিল, তার আবার ছাপান লিষ্ট।"

পরশুরাম কহিল, "বেশ! শুনে সুখী হলাম।"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "বিয়ের দিন বেয়াইর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব, দেখবেন, কেমন খাসা মানুষ।"

পরশুরাম হাসিয়া কহিল, "ভাল।"

অবিনাশ বাবু পুনরায় যাইবার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

৫

শুভবিবাহের দিন পরশুরাম চারু বাবুর বাড়ীতে তাঁহার কন্যার জন্য যে উপহার পাঠাইলেন, তাহার প্রাচুর্য্য ও বৈশিষ্ট্য সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল। মূল্যবান বেনারসী শাড়ী, কারুকার্য্য-খচিত দুইগাছি স্বর্ণকঙ্কণ, বিবিধ প্রসাধন সামগ্রী এবং প্রচুর দধি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি।

এই সকল উপঢৌকনের সহিত পরশুরামের এইরূপ একখানি পত্র ছিল—

মাননীয় মহাশয়,

কথায় কথায় একদিন আপনি বলিয়াছিলেন যে, আপনার বড় ছেলেটি বাঁচিয়া থাকিলে আমার বয়স আজ পাইতেন। সেই হিসাবে আপনার ছেলেরই স্থলাভিষিক্ত হইয়া আমার স্নেহের বোনটির জন্য যে উপহার পাঠাইতেছি, দয়া করিয়া গ্রহণ করিলে ধন্য হইব।

প্রণত—পরশুরাম।

সায়াহ্নের প্রীতিভোজে যদিও পরশুরাম স্বয়ং যোগ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার প্রতিষ্ঠানের দুইজন কর্ম্মচারী তাহারই প্রতিনিধি স্বরূপ বিবাহোৎসবে যোগ দিয়াছিল। তাহাদের হাতে পরশুরাম তাঁহার নিজস্ব বিপণীর সম্ভার নবদম্পতীর উদ্দেশে পাঠাইয়াছিল, বিবাহ বাসরে সকলেরই মুখে সেগুলির কি প্রশংসা!

পাকস্পর্শের পূর্ব্ব দিন অপরাহ্ণে অবিনাশ সরকার পুনরায় খাসকামরায় গিয়া দেখা দিলেন। পরশুরাম সে সময় তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া কি লিখিতেছিল।

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "বেশ পরশুরাম বাবু, খুব গেলেন ত?"

পরশুরাম কহিল, "কেন, অমিয় আর অতুলকে তো পাঠিয়েছিলুম, আপনার গাড়ী ফিরে গেছে এ কথা বলতে পারবেন না।"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "কিন্তু আমরা ভেবেছিলুম, আপনি নিশ্চয়ই যাবেন।"

পরশুরাম কহিল, "যাবার ইচ্ছাটা ছিল, কিন্তু ঘটে ওঠে নি। যাক্, বিয়ে কেমন হল? আপনার পাওনা গণ্ডা ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন ত?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "হাঁা, তা এক রকম পেয়েছি, ওদিক্কার দিয়েছে মন্দ নয়। আমি যেমন যেমন চেয়েছিলুম, সে সব বরং আরো উচিয়েই দিয়েছে, কিন্তু গোল বেধেছে ফুল-শয্যা নিয়ে।"

পরশুরাম প্রশ্ন করিল, "গোল বাধবার কারণ?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "ফুল শয্যার কথাটা আগে হয় নি; কিন্তু নাই বা হল, ওটাও ত একটা পাওনা, খাট-বিছানা

রূপোর বাসনকোসণ, তরি-তরকারি, ঘি-ময়দা, দই-মিষ্টি, মাছ অনেক কিছুই দিতে হয়। ওঁরা বলছেন, সাড়ে তিন হাজারের ভেতরেই ফুলশয্যে ধরা হয়েছিল, শুধু নেম-কর্ম্ম রাখতে ওঁরা মেয়ে-জামায়ের কাপড়, ফুল-চন্দন আর কিছু মিষ্টি পাঠাবেন। আমি বলেছি, তা হবে না—সব গুছিয়ে তত্ত্ব পাঠাতে না পারো—নগদ তিনশোটি টাকা ধরে দিয়ো, এর কমে হবে না।"

পরশুরাম বক্তার মুখের দিকে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "শেষটা কি দাঁড়াল?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "দাঁড়াবে আর কি, দিতে হবে। দেবার আগে সবাই চেষ্টা করে যাতে দিতে না হয়। জানেন ত, বিয়ে ফুরোলেই ছাদনায় লাথি, বিয়ের দেওয়া থোয়ায় মোটেই কথা কয়নি, যত গোল বাধিয়েছে মশাই—এই ফুল-শয্যার বেলায়। এখন বলে কি না, 'পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কোমর বেঁধেছিলুম, সব ফুরিয়েছে। ধারের ওপর আবার ধার করতে হবে।"

পরশুরাম যেন আকাশ হইতে পড়িল, দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিল, "বলেন কি! ধার করে অত বড় ব্যাপারটা শেষ করে ফেলেছেন! আর সে কথা শুনেও আপনি আবার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলেন?"

পরশুরামের কথাটা বোধ হয় অবিনাশ সরকারের বুকে বাজিল, বিকৃত কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "কি রকম!"

সহজ কণ্ঠেই পরশুরাম কহিল, "ধার করা টাকায় সে ভদ্রলোক অত বড় বোঝা মাথায় চাপিয়েছেন জেনেও সেটা নামাতে না নামাতে সেই বোঝাটার ওপরেই আবার তিনশো টাকার একটা আঁটি শাকের মতই চাপিয়ে দিলেন? এই কথাই আমি বলছিলুম!'

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "ক্ষেপেছেন আপনি! ওটা হচ্ছে মেয়ের বাপেদের রেহাই পাবার আর দোহাই দেবার একটা ফন্দী। বরের বাবা বেশী পীড়াপীড়ি করলেই অমনি দেনার কথা তুলবে। যেন যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে দায় থেকে উদ্ধার হচ্ছেন! ছেলের পক্ষ থেকে দাবী করাটাই হচ্ছে মস্ত অপরাধ!"

পরশুরাম নিবিষ্ট মনেই কথাগুলি শুনিল, তাহার পর আস্তে আস্তে কহিল, "আপনার বোধ হয় মেয়ে নেই সরকার মশাই?"

অবিনাশ বাবু কহিলেন, "এদিক দিয়ে আমি ভারি ভাগ্যবান্; ভগবান আমাকে রেহাই দিয়েছেন। যাক্, কাল হচ্ছে বৌভাত, দিনে দিনেই সারবার ইচ্ছা; কখন যাচ্ছেন বলুন?"

পরশুরাম কহিল, "আমার যাওয়া হবে না সরকার মশাই, মাপ করবেন।"

অবিনাশ বাবু ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "কেন বলুন ত?"

পরশুরাম একটু নীরব থাকিয়া, পরক্ষণেই কহিল, "যেহেতু, গেলেই আপনি খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবেন, কিন্তু আপনার বাড়ীতে আমার খাবার উপায় নেই; আপনার উপরোধ উপেক্ষা করে না খেয়েই ফিরতে হবে—তাই।"

বিস্ময়াভিভূত হইয়া অবিনাশ বাবু কহিলেন, "এ কথার মানে?"

পরশুরাম কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়াই তাহার স্বভাবসিদ্ধ স্পষ্ট কথায় মানেটা বুঝাইয়া দিল; কহিল, "আপনার শাঁসালো বেয়াইর মাথার শাসটুকু বিয়ের রাতেই সব শুষে নিয়েছেন, পড়ে আছে খোসাটা, সেটাও নিংড়ে রস বার করে বৌভাতের ভোজের ব্যবস্থা করেছেন ত! কিন্তু ওটা আমার ধাতে সহ্য হবে না সরকার মশাই।"

সরকার মশাই এবার অসহিষ্ণু হইয়াই কহিলেন, 'দেখুন, পরশুরাম বাবু, যত বড় কারবারী আর যত পয়সার মালিক আপনি হোন না কেন, কিন্তু বয়সের দিক্ দিয়ে এখনও আপনি ছেলেমানুষ। আমার যে ছেলের বিয়ে হয়ে গেল, তার চেয়ে কতই বা বড় হবেন! সেই ভেবে আমার সঙ্গে আপনার কথা বলা উচিত, আমি আপনার ঠাট্টার পাত্র ত নই, হতে পারে দু'পয়সা আপনার কাছে পাই, কিন্তু—"

কথাটা এই খানেই হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেল। অবিনাশ সরকারের চিত্তটি তখন সত্যই অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

পরশুরামও সঙ্গে সঙ্গে স্নিগ্ধ স্বরে কহিল, "ঠাট্টা আমি আপনাকে করিনি সরকার মশাই; পিতৃতুল্য ব্যক্তি ভেবেই আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। আপনার কাজকেও যে শ্রদ্ধা

করতে হবে, তার কোন মানে নেই। সাধুরা বলেন, পাপকে ঘৃণা করবে, কিন্তু পাপীকে নয়। আপনার বেয়াই ছাঁপোষা মানুষ, ধারকরা পাঁচটি হাজার টাকা বিয়ের রাতেই উজোড় করে ঢেলে দিয়েছেন জেনেও, আপনি ফের সেই নিরীহ আর নির্ব্বোধ মানুষটাকে তিনশো টাকার দায়ে ফেলেছেন। কথাটা শুনেই আমার সমস্ত মনটা বিষিয়ে উঠেছে, তাই কথাটা একটু কড়া করেই বলে ফেলিছি।"

মুখে বিরক্তি ও রোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া অবিনাশ সরকার কহিলেন, "এ আপনার সত্যই অনধিকারচর্চ্চা পরশুরাম বাবু; কে আপনাকে বলেছে যে, আমার বেয়াই ধার করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে?"

পরশুরাম মৃদুস্বরে উত্তর দিল, "আপনিই ত বলেছেন।"

দৃঢ়স্বরে অবিনাশ সরকার কহিলেন, "আমি যা বলেছি, সেটা কথার কথা, তার কি দাম আছে? শোনা কথাটা আপনাকে শুনিয়েই তখনই বলি নি—ও-সব বাজে কথা, দায় এড়াবার ফন্দী,—তবে? ঐ কথাটার ওপর জোর দিয়ে এত বড় কথাটা বলা কি আপনার উচিত হয়েছে?"

পরশুরাম ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "আমি মিছে কথা কিংবা বাজে কথার ওপর জোর দিয়ে নিজের মনের কথা কখনও বলি না, সরকার মশাই। কথাটা সত্যি। যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে আপনার বেয়াই মশাই—আপনার প্রচণ্ড খাঁইটা মিটিয়েছেন।"

অবিনাশ সরকার এবার তর্জ্জনের ভঙ্গীতে কহিলেন, "জানেন, আমার বেয়াই আপনার নামে এই কথার জন্য ডিফামেশন স্যুট আনতে পারেন? আপনি তাঁকে চেনেন না, জানেন না, অথচ এত বড় কথা—উঃ—কি সাহস আপনার! প্রমাণ করতে পারবেন?"

পরশুরামের মুখে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। চারু বোসের সম্পাদিত দলিল সেইদিনই রেজিষ্টারী অফিস হইতে ফেরৎ আনা হইয়াছিল এবং তখনও পর্য্যন্ত আয়রণ চেষ্টে উঠে নাই, পরশুরামের টেবিলের উপরেই ছিল। আস্তে আস্তে দলিলখানি ফাইল হইতে বাহির করিয়া পরশুরাম অবিনাশ বাবুর দিকে বাড়াইয়া কহিল—"দয়া করে পড়ুন।"

অবিনাশ বাবু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দলিলখানার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষু দুইটি ক্রমশঃই বিস্ফারিত হইতেছিল।

পরশুরাম এই সুযোগে কহিল, "আমার একটা প্রতিজ্ঞা আছে সরকার মশাই, যেখানেই জানতে পারি, বিয়ের টাকা এমনি করে উসুল করে ছেলের বাবা ঘটা করে বৌভাতের ভোজ দিচ্ছে, কিছুতেই আমি সেখানে নেমন্তন্ন নিই না। আমার মনে হয়, সেই ভোজে খাওয়াটাও ঠিক নয়। তাই গোড়াতেই বলেছিলাম, "আমি যাব না।"

দলিলখানি পরশুরামের হাতে ফেরত দিয়া গাঢ়স্বরে অবিনাশ সরকার কহিলেন, "গোড়াতে আমারই ভুল হয়েছিল, আমি সত্যই এ সব কিছুই জানতাম না, জানলে কখন এতটা নিষ্ঠুর হতুম না।"

পরশুরাম কহিল, "এখন ত জানলেন। আর যা জেনেছেন, তাঁকে না জানিয়েও এর পরের পাওনাগুলির সম্বন্ধেও আপনি সদয় হতে পারেন।"

অবিনাশ সরকার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "দেখুন পরশুরাম বাবু, একটা ক্ষণে আর একটা কথায় জগতের অনেক কিছুই ওলট পালট হয়ে যায়। এটা একটা কর্ম্মস্থান, লক্ষ্মীর আসন; আমি এইখানে বসে প্রতিজ্ঞা করছি, ঐ তিনশো টাকা আমি নেব না; আর—এর পর তত্ত্বতালাসের জন্য কোন চাপ আমি চারুবাবুকে দেব না, তিনি যেন আর কিছু খরচপত্তর না করেন, সেই টাকা যেন দেনায় দেন। আপনি আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন।"

পরশুরাম কহিল, "এইবার আপনার পায়ের ধুলো নেব সরকার মশাই—এই ভুল ভাঙ্গাটাই হচ্ছে কন্যাদায়ের প্রতীকার।"

জলধি-বেষ্টিত জাপান

—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

জাপানের সম্রাট বা "মিকাডো" তাঁহার প্রকাণ্ড প্রাসাদের বক্ষে এমনভাবে বাস করেন যে, একটা সম্ভ্রমভরা রহস্যের আবরণ তাঁহার চারিদিকে গড়িয়া উঠা কঠিন হয় নাই। বিদেশীর সহিত সম্রাটের সাক্ষাৎ খুব কমই হইয়া থাকে। তবে সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত বিদেশীয় অভ্যাগতবর্গের জন্য তাঁহার বিস্তৃত উদ্যানাবলীর দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে।

জাপানী মহিলাদের চায়ের বৈঠক

শিরো বা রাজকীয় পল্লীর মধ্যে বা নিকটে সরকারী কার্য্যালয়সমূহ, বিদেশীয় লিগেশান গৃহগুলি এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের সৌধাবলী বিরাজিত রহিয়াছে।

টোকিওর সৌধসমূহের মধ্যে রাশিয়ান গীর্জ্জা-গৃহটি এবং রাজকীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় ভবনটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বিদ্যামন্দিরটিতে ৫ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইহাকে জাপানী শিক্ষাগারসমূহের কেন্দ্র বলা চলে। জাপানের কাষ্ঠনির্ম্মিত পার্লামেণ্ট বা জাতীয় পরিষদ ভবনটির আকৃতি তেমন চিত্তাকর্ষক নহে। ইহা অপেক্ষা টোকিওর রেল-ষ্টেশনটির দৃশ্য অধিকতর সুন্দর ও মনোহর। বর্ত্তমানে বিশ্রামাবাস, অভিনয়-ভবন, যাদুঘর, গ্রন্থাগার প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার কোন নিদর্শনেরই এখানে অভাব নাই। তিনখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রও টোকিও হইতে বাহির হইয়া থাকে। এই তিনখানির একখানি সম্পূর্ণরূপে জাপানীদিগের দ্বারা সম্পাদিত ও পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রতীচ্য প্রণালীর অনুকরণে জাপ জাতীর জীবন-যাপন-পদ্ধতির মধ্যে যে পরিবর্ত্তন-প্রবাহ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার দ্বারা ঐশ্বর্য্য বা সমৃদ্ধির যতই বৃদ্ধি সাধিত হউক, সৌন্দর্য্যের হানি ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে শান্ত ও সরল সৌন্দর্য্য আমরা জাপ-জাতির জীবনে পূর্ব্বে দেখিতে পাইতাম পাশ্চাত্য সভ্যতানুবর্ত্তী ঐশ্বর্য্য-লালসা ও সাম্রাজ্য পিপাসা তাহাকে ক্রমশঃ বিনষ্ট করিয়া ফেলিতেছে।

সুবিশাল টোকিও সহর শুধু সৌধ-শালিনী নহে, এই মহানগর মন্দির-মালিনীও বটে। প্রায় তিন হাজার মন্দির এই নগরে বিদ্যমান। ইহাদের অধিকাংশই বৌদ্ধ-মন্দির। টোকিওর আসাকুসা পল্লী-বক্ষে বিরাজিত মন্দিরটিকে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত বলিয়া আমাদের মনে হয়। এই মন্দিরের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ, তীর-চালনা প্রকোষ্ঠ, চা-পান করিবার স্থান প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়া শুধু ধর্ম্মানুরাগী নয়, শত শত কৌতুককামী নরনারীকে ইহার দিকে আকৃষ্ট করিতেছে। ইহা ছাড়া এই দেবালয়ের পার্শ্বে বহু পণ্যশালা বা দোকানও বিদ্যমান। নানা আকর্ষণের জন্য এখানে সকল সময়েই জনতা দৃষ্ট হয়। যেমন রেঙ্গুনের পক্ষে শোয়ে-ডাগন

প্যাগোডা তেমনই টোকিওর পক্ষে আসাকুসা পল্লীবক্ষে বিরাজিত এই মহান মন্দির।

এই মন্দিরের বিচিত্র দর্শনীয় দৃশ্যসমূহের মধ্যে ফুজি-ইয়ামা পর্ব্বতের একটি অদ্ভুত অনুকৃতি অন্যতম। এই অতি বিচিত্র বস্তুটি ১ শত ১০ ফিট উচ্চ। হাজার হাজার অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তি অবকাশ বিনোদনের জন্য জাপানের পবিত্রতম পর্ব্বত ফুজি-ইয়ামার এই ক্ষুদ্র সংস্করণ বা অনুকরণটির উপর আরোহণ করিয়া থাকে।

টোকিওর বক্ষে অবস্থিত লাল-আলোক-মণ্ডিত একটি পল্লীতে পণ্যনারীরা বাস করে। এখন ভাবান্তর সঞ্চারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এক সময় জাপানে বেশ্যাবৃত্তি আদৌ কলঙ্ককর বা গৌরবহর ব্যাপার বলিয়া বিবেচিত হইত না। বিদেশীয় পর্য্যটকের পক্ষে টোকিওর এই পল্লীটি একটি বিচিত্র দর্শনীয় সে বিষয় বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

টোকিওর উপকণ্ঠসমূহের মধ্যে "শিবা" বিশেষ সুন্দর। মনোমদ মহান মন্দির-মালায় মণ্ডিত বলিয়া ইহা অধিকতর সুন্দর। এখানকার দেব-মন্দির ও সমাধি-মন্দির দুই-ই দর্শন-যোগ্য। এই সমাধি-গৃহগুলি ভূতপূর্ব্ব শোগানদিগের। পূর্ব্বে জাপানে শোগান আখ্যায় অভিহিত শাসনকর্ত্তাদিগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই সংবাদ অনেকেই অবগত। নগরের উত্তরে বিরাজিত উয়েনো নামক স্থানেও শোগান-সমাধি-মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাষ্ট্র-বিপ্লবের সময় এই সকল সমাধি-মন্দিরের উপর বহু অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা অবগত হই। খাস সহরের চারিদিকে সুদৃশ্য উপকণ্ঠাবলী এবং উপকণ্ঠগুলি অতিক্রম করিলে পুষ্পপুঞ্জপূর্ণ নয়ন-রঞ্জন কমনীয় কুঞ্জ-কাননরাজি দর্শকের দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করে। ইহার পর শস্য-শ্যাম ক্ষেত্র-রাজির পার্শ্বে প্রসারিত পল্লী-পথ দৃষ্টি-পথে পতিত হয়।
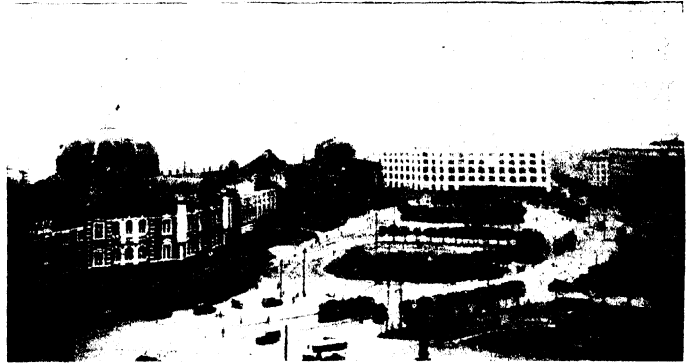
যে নদীর উপর টোকিও দাঁড়াইয়াছে তাহার নাম সুমিদা। বুকে বালুকারাশি সঞ্চিত হওয়ার জন্য কোন বন্দর ইহার তীরে গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য জল-যান গুলিকে টোকিও হইতে কয়েক মাইল দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়। এই অবস্থা দূর করিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা চলিতেছে। বর্ত্তমানে ইয়াকোহামা নামক উপসাগরতীরবর্ত্তী নগরটি টোকিওর বন্দরের কার্য্য সাধন করিতেছে। টোকিও হইতে বিশ মাইল দূরে উপসাগরের দিকে ইহা অবস্থিত। বন্দর হইতে রাজধানী পর্য্যন্ত রেল-রাস্তা রহিয়াছে। পূর্ব্বে ইয়াকোহামা একটি ক্ষুদ্র ধীবর-পল্লী মাত্র ছিল। জাপানের বাণিজ্য-বিষয়ক উন্নতির স্রোত অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইবার সহিত সেই ক্ষুদ্র পল্লী চারি লক্ষ লোকের আবাস-স্থলী বিশাল বন্দরে পরিণতি পাইয়াছে। জাপানাগত বিদেশী বণিকগণ প্রধানতঃ এই বন্দরেই বাস করিয়া থাকে। ইয়োরোপ ও আমেরিকা হইতে বহির্গত ভ্রমণকারিগণকে বহন করিয়া বহু ষ্টীম-বোট এই বন্দরে আগমন করে। বহু বিদেশীয়ের বাস-স্থলী এই নগরকে দেখিলে জাপানী সহর বলিয়া সহসা মনে করা যায় না। যে প্রধান পল্লীটিতে বিদেশীয়গণ বাস করে, তাহার সম্মুখেই সুনীল সমুদ্র রুদ্র রবে গর্জ্জন-গীতি গাহিয়া উচ্চ বীচি-বাহু বিস্তার করিয়া তাণ্ডব তালে নিরন্তর নৃত্য করিতেছে। এই স্থানেই বিদেশীয় বণিকদিগের কার্য্যালয়, গুদাম-ঘর, ক্লাব, হোটেল প্রভৃতি সমস্তই অবস্থিত। বিদেশীয় ব্যক্তিবর্গের বাস-গৃহগুলি "ব্লাফ" আখ্যায় অভিহিত একটি মুক্তবায়ুপ্রবাহযুক্ত উচ্চ স্থানে বিদ্যমান।

টোকিওর রেলষ্টেশন

ইয়াকোহামার চীনা-পল্লীর অধিবাসীরা পরস্পর-সংলগ্ন আবর্জ্জনা-মলিন গৃহসমূহে বাস করে। জাপানী-পল্লীটি বহুবিধ বিচিত্র বস্তুর বিপণিতে পূর্ণ বলিয়া বিশেষ চিত্তাকর্ষক। জাপজাতীর কলা-কৌশলের পরিচায়ক অনেক জিনিষ এই সকল দোকানে দেখা যায়। এই সহসা-সম্ভূত সহর পার্শ্ববর্ত্তী প্রাচীন বন্দর কানাগাওয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। প্রথমে কানাগাওয়াই সন্ধি-বন্দর ছিল, পরে বিদেশীয় বণিকদিগের চেষ্টায় ইয়াকোহামা গড়িয়া উঠিয়াছে বলিলে ভুল বলা হয় না।

ইয়াকোহামার দক্ষিণে ও অদূরে জাপানের অন্যতম প্রাচীন রাজধানী মন্দির-মালা-মণ্ডিত মূর্ত্তি কমনীয়কান্তি কামাকুরা দণ্ডায়মান। কামাকুরার বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ বিশ্ব-ব্যাপী খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। শক্তিশালী শিল্পী এই সমাধি-মগ্ন মহান মূর্ত্তির মহিমামণ্ডিত মুখ-মণ্ডলে বাসনা-জনিত বিক্ষোভের অতীত অনন্ত শান্তিভরা ভাব বা ভঙ্গী পরিস্ফুট করিয়া অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমরা যে প্রশান্ত-সুন্দর ভাস্কর ভাব ধ্যান-মগ্ন বুদ্ধ-মূর্ত্তির মধ্যে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করি, সুদক্ষ ভাস্কর ঠিক তাহাই এই মহান মূর্ত্তির মুখে প্রকটিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই গভীর-সম্ভ্রম-সঞ্চারক বিস্ময়কর বিশাল-গম্ভীর বিগ্রহ দাইবুৎসু আখ্যায় বিখ্যাত। ইহাকে জাপানী ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি বলা চলে। এই মূর্ত্তি দেখিলে ভারতের নিমীলিত-নেত্র সমাধি-সমুদ্র-মগ্ন-সাধক-সমূহের কথাই মনে পড়ে। এই বুদ্ধ-বিগ্রহ জৈন তীর্থঙ্করগণের ধ্যান-মগ্ন মূর্ত্তিও মনে জাগাইয়া দেয়। এই মহান মূর্ত্তির সৌম্য সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত মুখ-মণ্ডলই ৮ ফিট ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহা হইতে এই মূর্ত্তির বিপুলতা পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী বাসনা-বিক্ষোভ-বিন্দু-বিরহিত বিবেক বৈরাগ্যের বিরাট বিগ্রহ—সর্ব্ব জীবে অপার প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি দিব্যভাবোদ্ভাসিত এই দাইবুৎসুকে দর্শন করিয়াছে—এই প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তির পবিত্র পাদ-পীঠে বার বার প্রণত হইয়াছে, তাহারা যে ভাবে দুর্দ্দমনীয় সাম্রাজ্য-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া চীনের বক্ষে নৃশংস ধ্বংস-লীলা অনুষ্ঠিত করিতেছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় এই দর্শন ও পূজা বিফল হইয়াছে। এই বুদ্ধ-বিগ্রহ ব্রোঞ্জধাতুর প্রস্তুত।

কানাকুরার অদূরে এনোশিমা নামক সুদৃশ্য উপদ্বীপ। জোয়ারের জল এই উপদ্বীপকে দ্বীপে পরিণত করিলে দর্শকের দৃষ্টি-পথে চিত্তচমৎকারী বিচিত্র দৃশ্য প্রকাশিত হয়। সমুদ্র-তীরের উপদ্বীপাকার অংশটির আবহাওয়া বিশেষ উপভোগ্য ও স্বাস্থ্যকর। ইহাকে জাপানের 'রিভিয়েরা' বলে।

দক্ষিণ-উপকূলের উপর প্রসারিত রেল-পথের সহায়তায় এই স্থান হইতে মিয়ানোশিতা নামক প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্য-নিবাসে পৌছান যায়। আগ্নেয়গিরি ফুজি-ইয়ামার পার্শ্ব হইতে প্রবাহিত গন্ধক-যুক্ত গরম জলে স্নান করিলে বহুবিধ ব্যাধি হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, চারিদিকে নৈসর্গিক নির্ঝরাবলম্বনে নির্ম্মিত আরও কতকগুলি স্নান-স্থান দেখা যায়। হাকোন প্রভৃতি শৈলাবাস এই প্রদেশে অবস্থিত। এই প্রদেশের প্রধান দ্রষ্টব্য ফুজি-ইয়ামা।

টাকিত্রয় উত্তর-পশ্চিমে আগ্নেয়গিরি আসামা ইয়ামা অবস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে অবস্থিত পর্ব্বতপুঞ্জের অংশবিশেষ। ৮ হাজার ফিট উর্দ্ধ এই আগ্নেয়গিরি এখনও অগ্নি উদ্গীরণে সক্ষম। সাধারণতঃ কারু-ইজাওয়া নামক স্বাস্থ্যপ্রদ শৈলাবাসের দিক্ হইতে এই পর্ব্বতে আরোহণ করা হয়। বহু মিশনরী এই শৈলাবাসে বাস করেন।

বিদেশীয় পর্য্যটকদিগকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে পবিত্র পর্ব্বত নিক্কো। নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য রূপ ঐশ্বর্য্যে নিক্কোকে নিরুপম বলা চলে। বৃক্ষ-শ্যাম শৈলমালা, কল-নাদী নদ-নদী, ঝঙ্কারকারী নির্ঝর-নিচয়, গর্জ্জন-গীতি-রত প্রপাত, মনোমদ হ্রদ, ব্যাধি-বিনাশক উষ্ণ উৎস প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়া নিক্কোকে অতিশয় চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে। বর্ণ বৈচিত্র্য-বিমণ্ডিত পুষ্প-পুঞ্জ এবং পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পপুঞ্জের মতই প্রীতিপ্রদ প্রজাপতির দল প্রকৃতির বুকে অবিরাম বিরাজিত। টোকিও হইতে একটি রেল-পথ দ্বীপের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া প্রসারিত। বর্ত্তমানে এই রেলপথের একটি শাখা নিক্কোর দিকে আসিয়াছে। পূর্ব্বে ত্রিশ মাইল পথ রিক্‌শার সাহায্যে অতিক্রম করিতে হইত। দুই পার্শ্বে দিব্যদর্শন দীর্ঘদেহ দেবদারুদলের দ্বারা বিভূষিত

কামাকুরার বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ

বলিয়া এই পথটি অতি মনোহর। টোকিও হইতে নিক্কো পর্য্যন্ত প্রসারিত এই পথটি পৃথিবীর বৃক্ষবীথিবেষ্টিত সুন্দরতম পথসমূহের অন্যতম। এই পবিত্র পার্ব্বত্য-পল্লীতে পৌঁছিলে মনে হয়, এই তরুচ্ছায়া-শীতল প্রীতিকর পথেই এই পুণ্য-স্থানে আসিবার উপযুক্ত বটে। কেহ কেহ নিক্কোর দিকে প্রসারিত এই পথটিকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া মনে করেন।

দুইটি সুন্দর সেতু অতিক্রম করিয়া নিক্কোতে উপনীত হইতে হয়। লাল লাক্ষার সেতুটি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। বন্যার বেগে ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ইহাকে পুনরায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই সেতুর উপর দিয়া শুধু সম্রাট্ যাওয়া-আসা করেন। সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য আর একটি সবুজ সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। গ্রানিট-গঠিত প্রকাণ্ড খিলানের দ্বারা উভয় সেতুই মণ্ডিত। এই সকল খিলান শিণ্টো-মতবাদ-সম্পর্কীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য কমনীয়-কান্তি ক্রিপটোমেরিয়া কুঞ্জরাজির ভিতর দিয়া একটি তুঙ্গ পথ ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। বহু সম্ভ্রম-সঞ্চারক গম্ভীর সমাধি-মন্দির এই পথে পাওয়া যায়। এই সমাধি-সমূহের মধ্যে আয়েয়াসুর সমাধিকেই প্রধান বলা চলে। আয়েয়াসুই জাপানে শোগান পদের প্রতিষ্ঠাতা। এই সমাধির পরেই ইঁহার পৌত্র আয়েমিৎসুর সমাধি উল্লেখযোগ্য।

একটি মহান্ খিলানের নিম্ন দিয়া আয়েয়াসুর সমাধি মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সুদৃশ্য সোপানাবলী এবং বৃক্ষ-বীথি-ছায়া-শীতল অঙ্গন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উঠিতে হয়। অসংখ্য শৈবাল-শ্যাম স্মৃতি-চিহ্ন দৃষ্টি পথে পতিত হয়। বহু শিল্প-সৌন্দর্য্যভূষিত বুরুজ, তোরণ, চন্দ্রাতপ ও স্তম্ভশ্রেণী নীরবে বিরাজিত রহিয়া মনের উপর এক প্রকার অপূর্ব্ব মায়াজাল বিস্তার করে। এই সকল প্রাচীন কীর্ত্তির গাত্রে উৎকীর্ণ কমনীয় কারুকার্য্য জাপ-জাতির কলা-কৌশলের কথা প্রকাশিত করে। বিশেষ লাক্ষার বক্ষে কারুকার্য্য করার দক্ষতায় ইহাদিগের সহিত সমকক্ষতা অন্য কোন জাতি করিতে পারে কি না জানি না। খাস সমাধিটি অধিকতর ঊর্দ্ধে শৈবাল-সবুজ সোপানশ্রেণীর পরে দণ্ডায়মান। ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত সমাধিগৃহটি সাদা-সিধা ধরণের। এই সমাধি-মন্দির ক্রৌঞ্চ ও কূর্ম্ম-মূর্ত্তিদ্বারা মণ্ডিত। জাপজাতির নিকট ইহারা জীবনের প্রতীক বলিয়া সম্মানিত।
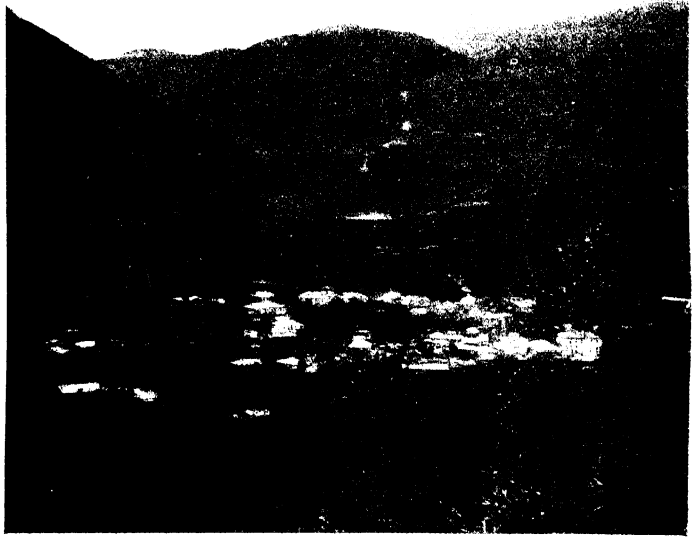
সিয়ানোসিতা—স্বাস্থ্যান্বেষীরা হং-কোন উষ্ণ স্নানের জন্য এই শৈলাবাসে আগমন করে।

এই সমাধির অনতিদূরে আয়েমিৎসুর সমাধি-মন্দির। দুইটি বিপুল মূর্ত্তি এই মন্দিরের রক্ষকরূপে রচিত রহিয়াছে। সমাধি-মন্দিরের অভ্যন্তরেও ঝঞ্ঝা ও বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের বিরাট ও বিকট বিগ্রহাবলী স্থাপিত রহিয়াছে। মনে হয় যেন কোন মায়াপুরীতে আসিয়াছি। এই সকল সমাধি মন্দির জাপানী শিল্পের যাদুঘর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভ্রমণকারীর মনের উপর এই সকল শিল্প-সৌন্দর্য্য যেরূপ ঐন্দ্রজালিক প্রভাব প্রসারিত করে,

তাহাতে যাদুঘর শব্দটি বিশেষ উপযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কাঠের উপর কারুকার্য্য করিতেও জাপানীরা অতিশয় দক্ষ। কালো ও লাল লাক্ষার দ্বারা যে ললিতকলার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহা অতিশয় চমৎকার। সোণালি দ্বার-গুলি খুলিবার সময় সামান্য শব্দও শোনা যায় না। হলের তলে যে সুকোমল আস্তরণ বিস্তৃত আছে, তাহার উপর বিচরণ-কালে পদ-শব্দ আদৌ শ্রুত হয় না। এই সকল কমনীয় কক্ষের বক্ষে রমণীয় রবি-রশ্মি প্রবেশপূর্ব্বক স্বর্ণবর্ণ-রঞ্জিত ও শিল্প-সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নানাপ্রকার চমৎকার পদার্থের উপর পতিত হইয়া যে বিচিত্র চিত্র রচনা করে, তাহাতে স্বতঃই মনে হয়, বাস্তব জগৎ হইতে সহসা কোন অবাস্তব স্বপ্নপুরীতে পদার্পণ করিয়াছি। উৎকীর্ণ চিত্রগুলির মধ্যে পুষ্প ও পক্ষীর চিত্রই অধিক লক্ষিত হয়। অভ্যন্তরস্থ স্বর্ণ-নির্ম্মিত মন্দিরবক্ষে ছয় ফিট উচ্চ কয়েকটি স্বর্ণ-পদ্ম বিদ্যমান। পদ্মের গায়ে স্বর্ণ-সূত্রের দ্বারা অপূর্ব্ব কারুকার্য্য করা হইয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘণ্টা এবং নানা রকম বিচিত্র মূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে রক্ষিত রহিয়াছে। সোণালি জরির কাজকরা পোষাক পরা শিণ্টো পুরোহিতদল কালো লাক্ষার টুপি মাথায় দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

শুধু কৃত্রিম কলাকৌশল বা কারুকার্য্যের জন্য নয়, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের জন্যও এই স্থান দর্শনের যোগ্য। এই সকল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকীর্ত্তির চতুর্দ্দিকে পার্ব্বত্য প্রবাহিণীর দল প্রচণ্ড প্রপাতের সৃষ্টি করিয়া কল-গর্জ্জনে দিক্ মুখরিত করিতে করিতে বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চঞ্চল জল-দলের কল-কল-মন্দ্র মন্দিরের বন্দনা-গানের ছন্দের সহিত মিশিয়া মুগ্ধ দর্শকের অন্তরে হর্ষরাশি বর্ষণ করে বলিলে আদৌ অত্যুক্তি হয় না। প্রপাতপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর যেটি, তাহার নাম কেগন। কোন কোন ভাববিহ্বল ভক্ত ভাবাবেশে কেগনের বেগবান্ বারি-রাশির বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি। এই সকল ভাবুকের জীবন নিম্নবর্ত্তী ফুটন্ত ও ফেনিল সলিলরাশির আবেগময় আলিঙ্গনে মুহূর্ত্তের মধ্যে মরণের কোলে বিলীন হইয়াছে।

নিক্কোর পশ্চাদ্বর্ত্তী পবিত্র পর্ব্বত নান্তাইজান ৮ হাজার ১শত ফিট উচ্চ। শিণ্টোবাদী ভক্তগণ এই পর্ব্বতে আরোহণ করাও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই পরম পবিত্র পর্ব্বতে পদার্পণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বিচিত্র বিধানের দ্বারা বুঝা যায়, জাপ-জাতি নারী সম্বন্ধে তেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করে না, অন্ততঃ করিত না। অবশ্য ক্রমশঃ এই ভাব হ্রাস পাইতেছে।

জাপানী দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ হণ্ডোর উত্তরাংশের প্রধান নগর সেন্দাই। এখানে প্রায় ১লক্ষ লোক বাস করে। এই নগরের বন্দর শ্লোগামা হইতে জাপানের অন্যতম বিচিত্র দর্শনীয় পাইন-দ্বীপপুঞ্জে পৌছান যায়। প্রায় ৮শত ক্ষুদ্র দ্বীপ এই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত।

প্রধান দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপূর্ণ অংশ দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী ভূখণ্ড। টোকাইডো নামক প্রাচীন প্রসিদ্ধ ও প্রধান পথ এই অংশে বিদ্যমান। এই পথ প্রাচীন রাজধানী কিয়োটোর সহিত আধুনিক রাজধানী টোকিয়োকে সংযুক্ত করিতেছে। বর্ত্তমানে যে রেলপথ উভয় নগরকে যুক্ত করিতেছে, তাহাও টোকাইডো আখ্যাতেই অভিহিত হইয়া থাকে। উভয় নগরের ব্যবধান প্রায় ৩ শত মাইল। এই তিন শত মাইলের মধ্যে বহু বৃহৎ ও বিখ্যাত নগর বিদ্যমান। এই নগরগুলির মধ্যে যেটি বৃহত্তম, তাহার নাম নাগোয়া। ওয়ারি উপসাগরের শীর্ষদেশের সন্নিকটে নাগোয়া নগর দণ্ডায়মান। এই নগর জাপানের অন্যতম বিখ্যাত বাণিজ্য-কেন্দ্র। ইহার অধিবাসিসংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। জলপ্রণালী বালুকারাশির দ্বারা বুজিয়া যাওয়ার জন্য ইহার দ্বারা বন্দরের কার্য্য সাধিত হইতে পারে না।

রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পূর্ব্বে কিয়োটোই ছিল মিকাডোর রাজধানী। বর্ত্তমানে ইহার নূতন নামকরণ হইয়াছে। সেই নাম সাইকিয়ো। পিকিংএর সহিত ক্যাণ্টনের যে সম্বন্ধ, মস্কোর সহিত পেট্রোগ্রাদের যে সম্পর্ক, কিয়োটোর সহিত টোকিয়োর ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ। কিয়োটো খাঁটি জাপানী সহর। বর্ত্তমান টোকিও প্রায়ই প্রতীচ্য প্রণালীতে প্রস্তুত—প্রতীচ্য পন্থায় পরিচালিত। যাঁহারা অতীতের প্রতি অনু-রাগী, প্রাচীনের প্রতি প্রীতিসম্পন্ন, তাঁহারা কিয়োটোকে দর্শন করুন। আর যাঁহারা বর্ত্তমান জাপানকে দেখিতে চান, তাঁহারা টোকিয়োকে দেখুন। জাপানের শান্ত-সুন্দর অতীত কিয়োটোর সুন্দর গম্ভীর বক্ষে প্রতিবিম্বিত, আর জাপানের

বাসনা-বিচঞ্চল বর্ত্তমান টোকিয়োর বুকে প্রতিফলিত। কিয়োটোর কণ্ঠে অতীতের শান্তসুন্দর স্বপ্ন-সঙ্গীত, টোকিয়োর মুখে নব-জাগ্রত জাপানের বজ্রবৎ গর্জ্জন-গান।

রাজধানী উঠিয়া যাওয়াতে কিয়োটোর অধিবাসিসংখ্যা বিশেষ হ্রাস পাইলেও জাপানের জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য এখনও এই স্থানেই অধিকতর পরিস্ফুট। এখনও ইহা জাপানের শিল্প-সাধনার কেন্দ্রস্থলী। বর্ত্তমানে ইহার লোকসংখ্যা অর্দ্ধলক্ষের অধিক হইবে না। জরী, পোর্সিলেন ও ব্রোঞ্জের কাজের জন্য ইহা এখনও বিখ্যাত। জাপানীগৃহের শোভা-সম্পাদক অন্যান্য পণ্যের জন্যও ইহা প্রসিদ্ধ। টোকিয়োর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এখানে আর একটি শিক্ষাসম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। এই সহরের সুদৃশ্য সৌধাবলী দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বটে, কিন্তু ইহার একান্ত চিত্তাকর্ষক ও বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য—অগণিত শান্ত-গম্ভীর সুন্দর মন্দির। এখানে এমন একটি মহান্ মন্দির আছে, যাহাতে সর্ব্বসমেত ৩৩ হাজার ৩ শত ৩৩টি বিগ্রহ বিদ্যমান। এই নগরে এমন দুইটি নব-নির্ম্মিত মন্দির দৃষ্ট হয়, যাহারা সমগ্র জাপানের মধ্যে বৃহত্তম ও মহত্তম বলিয়া বিবেচিত। এই দুইটির একটি সরকারী ব্যয়ে বিরচিত শিণ্টো-মন্দির, অপরটি জন-সাধারণের অর্থ ও শ্রমের দ্বারা নির্ম্মিত বৌদ্ধ-উপাসনাগৃহ। যেখানে সম্রাট্ অবস্থান করিতেন, সেই প্রাচীন প্রাসাদ এখন ধ্বংসোন্মুখ। দেখিলে মনে হয়, টোকিয়ো কিয়োটোর জীবনী-শক্তিকে ক্রমশঃ শোষণ করিতেছে। কিয়োটোর অভিনয়-ভবনে-ভরা পথটিতে জীবনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায়, জাপ-জাতি অভিনয়ের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী।

উৎসবের সময় তোমহ-মন্দির—কিয়োটো

কিয়োটো হইতে কয়েক মাইল দূরে বিওয়া হ্রদ। ইহাই জাপানের বৃহত্তম হ্রদ বলিয়া গণ্য। কিয়োটো হইতে কামেইয়ামার প্রপাতপুঞ্জ ও অঙ্কিত চিত্রবৎ চিত্তাকর্ষক প্রাচীন নগর 'নারা' যাওয়া যায়। এই 'নারা' নগরের একটি মহান্ মন্দিরে ৫০ ফিট উচ্চ একটি বিরাট বুদ্ধ-বিগ্রহ বিদ্যমান। এই মন্দিরের দক্ষিণে সৌরদেবতা ইসের মন্দির। জাপানী দেব-দেবীদের মধ্যে এই দেবতাই (দেবী) সর্ব্বাধিক পূজা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রাচীনের প্রবল পক্ষপাতী হইলেও কিয়োটো সম্পূর্ণরূপে আধুনিকতাবর্জ্জিত নহে। আধুনিক ধরণের বৈদ্যুতিক আলোকমালায় উদ্ভাসিত ও বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় মণ্ডিত বিশ্রামাবাসসমূহও এই নগরে দৃষ্ট হয়।

কিয়োটো হইতে ৩৩ মাইল দূরে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) সমুদ্রতীরে ওসাকা। কিয়োটো হইতে ইয়োডো-নদীর উপর দিয়া অথবা রেল-পথের সহায়তায় তথায় যাওয়া যায়। আকারের দিক্ দিয়া সমগ্র জাপ-সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহাকে দ্বিতীয় নগর বলা চলে। ইহার লোক-সংখ্যা ৭ লক্ষ ৫০ হাজারের কম নহে। ইহা জাপানের বাণিজ্য-কেন্দ্রও বটে। বিশেষতঃ কার্পাস-সম্পর্কীয় বাণিজ্যের ইহাই প্রধান স্থান। সুতরাং ইহাকে জাপানের 'ম্যাঞ্চেষ্টার' বলা যাইতে পারে। কর্ম্ম-ব্যস্ত কার্পাস-কারখানায় পূর্ণ এই জনবহুল নগরকে জাপানের 'চিকাগো'ও বলা চলে। ইহার কোলাহল-কম্পিত বিশাল বক্ষকে বিদীর্ণ করিয়া বহু জল-প্রণালী বহিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহাকে ভীনিস নগরের সঙ্গেও তুলনা করা হয়। জাপানের টাঁকশাল এই স্থানেই অবস্থিত।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রচণ্ড অগ্নি-কাণ্ডে এখানকার

বহু সৌধ-মন্দির ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছিল। এই দারুণ দুর্ঘটনায় ১১ হাজার গৃহ ধ্বংস পাইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রধানতঃ কাষ্ঠ ও কাগজাদির দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া জাপানী-গৃহের পুনর্নির্ম্মাণ তেমন কঠিন ব্যাপার নয়।

কোবে-হিয়োগো এই সম্মিলিত নগরদ্বয়কে জাপানের লিভারপুল বলা চলে। লোক-সংখ্যা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার। জাপানী যুদ্ধ-জাহাজগুলি কোবেতেই রক্ষিত থাকে। বহু বিদেশীয় এখানে বাস করে। পশ্চিমে অগ্রসর হইলে জাপানের অন্যতম বন্দর হিরোসিমায় পৌছান যায়। লোক-সংখ্যা ১ লক্ষ ৭০ হাজার। হিরোসিমার সম্মুখস্থ সমুদ্রের প্রশান্ত মূর্ত্তি অতিশয় প্রীতিকর। তীরে কানন-কুন্তলা শৈলমালা এবং বক্ষে বৃক্ষশ্যাম দ্বীপপুঞ্জ দণ্ডায়মান রহিয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট এই সমুদ্রাংশকে এক প্রকার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দ্বীপমালার মধ্যে একটি দ্বীপ জাপানীদিগের নিকট পরম পবিত্র বলিয়া বিবেচিত। এই দ্বীপের পবিত্র মৃত্তিকাকে হল-চালনের দ্বারা পীড়িত করা অন্যায় বলিয়া গণ্য হয়। এখানকার মন্দিরাবলী দর্শন করিয়া ধন্য হইবার জন্য শত শত যাত্রী নিত্য আসিয়া থাকে। মিয়াশিমা বা ইৎসকুশিমা দ্বীপ আর একটি দর্শনীয়। নামের অর্থ আলোক-দ্বীপ। ইহা জাপানের "সান-কেই" বা সুন্দরতম দৃশ্যত্রয়ের অন্যতম। অপর দুইটি দৃশ্যের একটি আমা-নো-হাসিদেৎ, অর্থাৎ স্বর্গ-সেতু। তৃতীয়টি হণ্ডোর উত্তর-উপকূলস্থ ক্ষুদ্র বন্দর মিয়াৎসুর নিকটবর্ত্তী পাইন-পাদপ-পুঞ্জপূর্ণ একটি পরমপ্রীতিপ্রদ উপদ্বীপ।
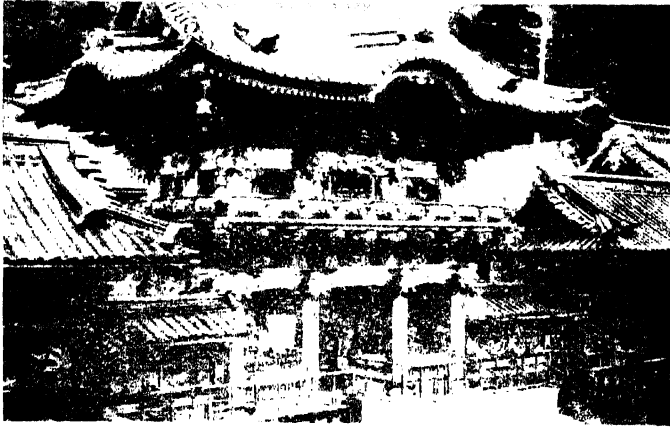
ইয়োমিমন-তোরণ—কিয়োটো

মিয়াশিমা দ্বীপটি ক্ষুদ্র হইলেও পর্ব্বতপুঞ্জ এবং দেবদারু-কুঞ্জসমূহে পূর্ণ বলিয়া বিশেষ মনোমুগ্ধকর। সমুদ্র-সৈকতে দণ্ডায়মান মহান্ মন্দির ইহার প্রধান দর্শনীয়। এই মন্দিরটি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের সৃষ্টি। দীর্ঘ দণ্ডদলের উপর দণ্ডায়মান এই মন্দিরকে সহসা দেখিলে সমুদ্র সলিলে ভাসমান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দ্বীপ হইতে কিছুদূরে সমুদ্রবক্ষে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড খিলান বিস্ময়কর দৃশ্য প্রকাশিত করিয়াছে। জাপানের প্রসিদ্ধ প্রাচীন শিল্পীদের সৃষ্ট বিচিত্র চিত্রসমূহে মণ্ডিত হইয়া মন্দিরের প্রকোষ্ঠগুলি বিশেষ মনোজ্ঞ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট সমুদ্র সঙ্কীর্ণতর আকার ধারণ করিয়া বৃহত্তম হণ্ডোকে প্রধান দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ক্ষুদ্রতম শিকোকু হইতে পৃথক্ করিতেছে। পর্ব্বত-বন্ধুর শিকোকুর আয়তন প্রায় ৭ হাজার বর্গমাইল। এই দ্বীপের বৃহত্তম নগর তোকুসিমা। ইহা পূর্ব্বোপকূলে অবস্থিত। দক্ষিণে দণ্ডায়মান 'কোচি' নামক নগর কাগজ-কলের জন্য বিখ্যাত। 'কোম্পিরা' একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। 'ডোগো' একটি স্বাস্থ্য-নিবাস। উষ্ণ সলিলপূর্ণ স্নানস্থানগুলিই এখানকার প্রধান আকর্ষণ। সমগ্র শিকোকুর লোকসংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ।

সিকোকুর পশ্চিমে কিউসিউ। উভয়ের মধ্যে 'বুঙ্গো' প্রণালী প্রবাহিত। কিউসিউর আকার সিকোকুর দ্বিগুণ। কিউসিউ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ সেতুর আকারে কোরিয়ার দিকে প্রসারিত। এই সকল দ্বীপ জলধিবেষ্টিত জাপানকে মাতৃরূপা এশিয়ার বিশাল শরীরের সহিত সংযুক্ত করিতেছে বলিলে ঠিকই বলা হয়। এই দ্বীপের নগরগুলির মধ্যে 'নাগাসাকি' সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। জাপানী বন্দরসমূহের

মধ্যে ইহারই দ্বার ইউরোপীয়দিগের পক্ষে সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত। নাগাসাকির পশ্চাতে নাট্য-মঞ্চের পট-ভূমিকার ন্যায় মন্দির-মালরা-মণ্ডিত পর্ব্বত-পুঞ্জ দণ্ডায়মান। স্বাস্থ্যকর জল-বাতাসের জন্য এই নগরে বহু বিদেশীয় বাস করিয়া থাকে। লোক-সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। এই দ্বীপের অন্যান্য নগরের মধ্যে উত্তরস্থ ফেকুওকা, মধ্যস্থলে অবস্থিত কুমামোতো এবং দক্ষিণে দণ্ডায়মান কাগোসিমা উল্লেখযোগ্য। কাগোসিমা একটি সুন্দর বন্দর, কিন্তু ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের যুদ্ধ-জাহাজের দ্বারা ইহার বিশেষ অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছিল।

কিউসিউর আগ্নেয়-গিরিগুলি বিশেষ প্রচণ্ড প্রকৃতির। এই আগ্নেয় পর্ব্বতপুঞ্জের অন্যতম আসো-সানের শিখরকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া মনে করা হয়। ইহার চতুর্দ্দিকের পরিমাপ প্রায় ৭০ মাইল। তবে উচ্চতা ৫ হাজার ফিটের অধিক নহে। যখন প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত অল্প প্রচণ্ড থাকে, তখন এই গিরি-গাত্রে আরোহণ চলিতে পারে। যেমন বেগবান্ ফেণ-প্রপাতের বুকে ভাব-বিহ্বল ভক্তগণ ঝম্পপ্রদান করে, তেমনই এই গম্ভীর গিরির অগ্নি-গর্ভ গহ্বরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হতাশ-প্রেমিকের দল বা জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ যুবকগণ জীবনের উপর মরণের যবনিকা নিক্ষেপ করে বলিয়া আমরা জানিতে পারি।

উত্তরে ইয়েজো দ্বীপ। সিকোকু ও কিউসিউকে সম্মিলিত করিলে যাহা হয়, ইয়েজো তদপেক্ষাও বৃহত্তর। কিন্তু অতি বৃহৎ হইলেও ইহার লোক-সংখ্যা খুবই কম। ইহার পর্ব্বতাবৃত ও গভীর গহনাচ্ছন্ন বক্ষে কয়েক লক্ষ লোক বিক্ষিপ্ত ভাবে বাস করিয়া থাকে। এই দ্বীপের আকার অনেকটা আইভি-লতার পাতার মত। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি মৎস্যে পরিপূর্ণ। আবহাওয়ার তীব্রতা সত্ত্বেও আপেল ও আঙ্গুর প্রভৃতি বহু সুরসাল ফল এখানে জন্মায়। এখানে পাথর-কয়লা এবং কাষ্ঠ দুইই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পশ্চিম উপকূল হইতে কয়লা-খনিপূর্ণ প্রদেশ পর্য্যন্ত রেল-পথ প্রসারিত। এই প্রদেশের রাজধানীর নাম সাপপোরো। এই নগরটিকে আমেরিকান প্রণালীতে পরিচালিত বলা চলে। আমেরিকার অনুকরণে সাপ্পোরোতে কৃষি-বিষয়ক কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ইহা জাপানের কৃষি-বিষয়ক গবেষণার কেন্দ্রস্বরূপ। বর্ত্তমানে ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। এই দ্বীপের দক্ষিণস্থ বন্দর হাকোদেটই বৃহত্তম নগর। পর্ব্বত-নিম্নে দণ্ডায়মান এই নগরটিকে দেখিলে জিব্রাল্টারের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে।

শীতের সময় এই দ্বীপের আবহাওয়া অতিশয় তীব্র হইয়া পড়ে। তখন সমুদ্র-তীরবর্ত্তী অংশগুলি কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয়। যেমন রুশের পক্ষে সাইবেরিয়া, অনেকটা জাপানের পক্ষে তেমনই ইয়েজো। এখানকার আদিম অধিবাসী আইনাস জাতির সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও লোমশ শরীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এই বন্য-ভাবাপন্ন জাতিকে দেখিলে অদ্ভুত বলিয়া বলিয়া মনে হয়। আইনাস-নারীরা উল্কির দ্বারা কৃত্রিম গুম্ফ রচনা করিয়া বিচিত্র মূর্ত্তি ধারণ করে। অতি অসভ্য হইলেও এই জাতি সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে। সুতীব্র সুরা পান করিতে ইহারা বিশেষ ভাল বাসে। দণ্ড প্রোথিত করিয়া তাহাকেই ইহারা দেবতারূপে পূজা করে, মদ্য নিবেদন করে। আইনাস-পল্লীবক্ষে পিঞ্জরাবদ্ধ এক একটি ভল্লুক দেখা যায়। এই ভল্লুকগুলিও পূজিত হয়। পূর্ব্বে আইনাসদের সহিত আর একপ্রকার আদিম অসভ্য জাতি বাস করিত। ইহারা খর্ব্বাকৃতি এবং গহ্বর-বাসী ছিল বলিয়া জানা যায়। এই জাতি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। আইনাস জাতিও ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাদিগের সংখ্যা ১০ হাজার হইতে ১৫ হাজার পর্য্যন্ত। কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জের বক্ষেও আইনাসদিগকে অবস্থান করিতে দেখা যায়।

বিনা মূল্যে

...কোনও দেশের যদি প্রচুর কৃষিযোগ্য জমী থাকে, এবং সেই দেশের ফসলের পরিমাণ যদি এত বেশী হয় যে, তদ্দ্বারা সে দেশের খাদ্য ও অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থা সুনির্ব্বাহিত হইয়াও কিঞ্চিৎ উদ্বৃত্ত থাকে এবং যদি সেই উদ্বৃত্ত কাঁচা-মালকে শিল্পে রূপান্তরিত করিবার জ্ঞান সেই দেশের অধিবাসিগণের থাকে, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত কাঁচা-মাল দ্বারা প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্য বিনামূল্যে বিক্রীত হইলেও দেশীয় অধিবাসিগণের আহার্য্য ও ব্যবহার্য্যের কোনও অভাব হয় না।

সংস্কার

—শ্রীশিবনাথ ভট্টাচার্য্য

মিঃ এন. চাটার্জ্জি একেবারে আনকোরা আই. সি. এস. এখনও বছর পার হয় নাই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চাকরীতে বহাল হইয়াছেন।

সেটেলমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষে আজ প্রাতে সদর হইতে এখানে আসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্থানীয় ডাক্-বাংলোয় সপরিবারে ক্যাম্প করিয়াছেন। জায়গাটা একেবারে অজ পাড়াগাঁ। এখানে তাঁকে পাঁচ সাত দিন থাকিতে হইবে বোধ হয়।

বাংলোর বারান্দায় বসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর সহিত বাক্যালাপে মগ্ন। কাল—রাত্রি, দূরে নীলাকাশের নির্জ্জন পটভূমিকায় দেবীপক্ষের চাঁদ মৃদু গতিতে হাল্কা মেঘে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। রাত্রে ডিনারের পর দু'জনে পাশাপাশি বসিয়া খানিকক্ষণ গল্প করা তাঁহাদের নিত্যকারের অভ্যাস।

কথায় কথায় মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন "এই সব মাঠ ঘাট বনবাদাড়ই হ'ল বাংলাদেশের প্রাণ"।

মিঃ চাটার্জ্জি তাঁর মুখের পাইপটা হইতে ইঞ্জিনের মত একরাশ ধোঁয়া উড়াইয়া মুরুব্বিয়ানা সুরে বলিলেন, "হ্যাঁ অন্ততঃ চলন্ত ট্রেনে বসে তাই ভাবা উচিত।"

হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "না ঠাট্টা নয়, দেখ দেখি, চারদিকে কেমন একটা সহজ স্বচ্ছন্দতা, আকাশে কি চমৎকার জ্যোৎস্না, আমার কিন্তু ভারি ভাল লাগছে।" এই বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি এক সুকুমার ভঙ্গীতে গ্রীবা বাঁকাইয়া স্বামীর দিকে তাকাইলেন।

মিঃ চাটার্জ্জি নিজের চেয়ারখানাকে স্ত্রীর আরও নিকটে লইয়া তাঁর স্কন্ধের উপর একখানি হাত রাখিয়া বলিলেন, "আমারও লাগছে মন্দ নয়, তবে তার চেয়েও কি ভাল লাগছে জান রাণী?"

মিসেস চাটার্জ্জির পুরা নাম ইলারাণী। তাঁর অপরাপর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ইলা বলিয়া ডাকেন। কেবল মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীকে আদর করিয়া ডাকেন "রাণী"। মিসেস চাটার্জ্জি যেন স্বামীর বক্তব্যের ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তোমার ও ত' গতানুগতিক ভাল লাগা, ওর মধ্যে আর জানাজানির কি আছে?"

"না, আজ বিশেষ ভাল লাগছে এই জ্যোৎস্নার আলোর জন্য। আজ তুমি কাছে বসে একটির পর একটি গান গাইবে, আর আমি মুখোমুখি হ'য়ে তা শুনব।" এই বলিয়া মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর কাঁধের উপর হাত রাখিলেন।

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন "কিন্তু তা যে হবার উপায় নেই; অর্গ্যান না হলে আমি মোটেই গাইতে পারি না। তার চেয়ে চল নদীর ধারে খানিকটা হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে আসা যাক, কেমন?"

বিস্মিত সুরে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন "নদী? নদী কোথায়, ও ত একটা শুক্‌নো খাল।" মিসেস চাটার্জ্জি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আজ্ঞে না, খাল নয়—সরস্বতী নদী। ছেলেবেলায় দিদিমার মুখে গল্প শুনেছি, এই সরস্বতীর বুকের উপর দিয়েই বেহুলা দেবী মরা স্বামী লখিন্দরকে কোলে করে ভেসে বেড়িয়েছিলেন।"

বেড়াইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "বেশ, বেশ। তুমি ত' দেখছি এ সব জান, একেবারে মেম সাহেব নও।'

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "জানব না? আমার বাবা সিভিলিয়ান বলে তামাসা করছ তো? কিন্তু জেনো, সিভিলিয়নের মেয়ে হলেও ছেলেবেলায় কিছুদিন আমার পাড়াগাঁয়ে বাস করবার সুযোগ ঘটেছিল। মা মারা যাবার পর বাবা আমায় কিছুদিন এই রকম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে আমার মামার বাড়ীতে রেখে এসেছিলেন, সেখানে রোজ রাত্রে দিদিমার কোলের কাছে শুয়ে এই সমস্ত গল্প শুনতুম।" বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি একটু থামিয়া আবার বলিলেন, "তা ছাড়া বাংলাদেশের হিন্দু মেয়ে মাত্রেই এই সব পৌরাণিক কাহিনী কিছু না কিছু নিশ্চয়ই

জানে। তবে যাঁরা একটু বেশী এরিষ্টোকেট, তাঁরা এই সব কাহিনী সত্যি বলে স্বীকার করতে ভয় পান।"

পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভয়, কিসের ভয়?"

"কেন তাঁদের আভিজাত্যের ভয়, পাছে সমসামাজিক লোকেরা তাঁদের কুসংস্কারাপন্ন মনে করেন!"

মিসেস্ চাটার্জ্জি একটু হাসিলেন। স্বামীকে খোঁচা দিবার জন্য তিনি কথাটা বলেন নাই—এ ভাবে স্বামীকে তিনি কখনও খোঁচা দেন না। মিঃ চাটার্জ্জির কথাটা ভাল লাগিল না। বলিলেন "কুসংস্কার নয় তো কি? ও সব বিশ্বাস করা কুসংস্কার নয়?" এ কথার জবাব দিলে তর্ক বাধিবে, মিসেস্ চাটার্জ্জি বলিলেন, "বেড়াতে যাবে বললে না? চল যাই।"

বিকালের দিকটায় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। নদীতীরে বনঝাড়ের ভিতর হইতে কেমন একটা সোঁদালী গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। চলিতে চলিতে স্ত্রীর বাহুতে মৃদু একটা নাড়া দিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "চল এবার ফেরা যাক।"

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "চল।" তাঁর আরও একটু বেড়াইবার ইচ্ছা হয়ত ছিল, কিন্তু সামান্য কারণে তিনি স্বামীর বিরুদ্ধবাদী হন না কখনও।

এসেন্স-সুবাসিত রুমালখানা লইয়া মুখের কাছে নাড়াচাড়া করিতে করিতে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "একটা গন্ধ পাচ্ছ?"

পাশের বনঝোপগুলির দিকে তাকাইয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "হাঁ পাচ্ছি, ছেলেবেলায় বর্ষাকালের দিনে ঠিক এমনিতর একটা গন্ধ পেতুম আমাদের বাড়ীর পেছনের বাঁশ-বাগানটা থেকে। গন্ধটা ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।"

মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর নাসিকার অগ্রভাগ ধরিয়া ঈষৎ নাড়া দিয়া বলিলেন "তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল, অবশ্য বাংলা দেশের মেয়েরা সাধারণতঃ তাই হয়ে থাকে।"

হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "তাই যদি হয় সেটা আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বলতে হবে।"

মিঃ চাটার্জ্জি মনস্তত্ত্বের বড় একটা খোঁজ-খবর রাখেন না। ভিজে মাটী অথবা বনঝাড়ের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে কেমন করিয়া যে মানুষের পশ্চাতের জীবনের কতকগুলি অনাবশ্যক কাহিনী মনে আসে, তাহা তিনি ভাবিয়াই পান না।

চলিতে চলিতে মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "কলেজে পড়বার সময় এমনি জ্যোৎস্না রাতে কি করতুম জান?"

হাসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন "জানলার ধারে বসে আকাশের দিকে চেয়ে পদ্য লিখতে নিশ্চয়ই।"

মিসেস চাটার্জ্জি কোন কথা না বলিয়া মুখ টিপিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন।

মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "আর আমি কি করতুম জান? জ্যোৎস্নাই হোক আর অন্ধকারই হোক, সন্ধ্যে থেকে রাত এগারটা পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে বসে শুধু জিওমেট্রির থিওরেম্ আর প্রবলেম্ সল্‌ভ করে যেতুম।"

মিসেস চাটার্জ্জি অনর্থক ছেলে-মানুষের মত খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

*

পরদিন সকাল বেলায় মিসেস চাটার্জ্জি ধোপাকে কাপড় দিবার সময় স্বামীর কোটের পকেট হইতে একখানা খামের চিঠি আবিষ্কার করিলেন। খামের উপর বাংলায় ঠিকানা লেখা। ষ্টাম্পের উপর তার শ্বশুরবাড়ীর দেশের পোষ্ট অফিসের নামমোহর-করা ছাপটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে।

পড়া চিঠি, খামটা খোলাই ছিল। মিসেস চাটার্জ্জি পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিতা হইলেও বাংলাদেশের অন্যান্য সাধারণ মেয়েদেরই মত শ্বশুর-বাড়ীর সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী। চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলেন, দেশ হইতে শ্বশুর মহাশয় তাঁর একমাত্র পুত্র মিঃ চাটার্জ্জিকে লিখিতেছেন,

"বাবা নরেন,

অনেক দিন হল তোমাদের কোন খবর পাই নি। আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় বধূমাতা ও তুমি ভালই আছ। আমার শরীরটা মোটেই ভাল নয়। তার ওপর আজ ৬মাস থেকে বাতের বেদনায় বড় কষ্ট পাচ্ছি। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, সেই বিলাত থেকে যেদিন আস, সেই দিন ষ্টেশনে অল্পক্ষণের জন্য তোমায়

দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। আমার ঘরের লক্ষ্মী বধূমাতা যে কেমন হয়েছে, তা জানি না। তোমাদের বড় দেখতে ইচ্ছা করে, তোমার ত' গাড়ী রয়েছে, বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী এস না একদিন। তোমার মাতাঠাকুরাণী আজ বেঁচে থাকলে তুমি কি এমনি করে না দেখা দিয়ে থাকতে পারতে? তোমাদের দুজনার নামে সংকল্প করে বাবা কালীরায়ের কাছে কাল পূজো দিয়েছি। আর এক কথা, তোমার বোধ হয় মনে আছে, তোমার মাতাঠাকুরাণীর বরাবর ইচ্ছা ছিল কালীরায় ঠাকুরের একটু মন্দির করে দেবার জন্য। ইচ্ছা আছে, মরার আগে মন্দিরটা তৈরী করে দিয়ে যাব। ইট আমার ঘরেই আছে। ইট ছাড়া আরও একশ টাকা খরচ। তুমি পাঠাবে কিছু? আমার অবস্থা ত' জান? কুড়িটি টাকা পেনসন্ যা ভরসা। বধূমাতা ও তুমি আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—আশীর্ব্বাদক

তোমার পিতা।

বলা আবশ্যক, মিঃ চাটার্জ্জি স্কলারশিপের টাকায় বিলাত গিয়াছিলেন। সেই কারণে গরীব পিতার উপর তাঁর বিশেষ কোন কর্ত্তব্য নাই মনে করেন। পিতা সামান্য পেনসন্ পান, তাতেই কোন রকম করিয়া পরের বাড়ী খোরাকী দিয়া খাইয়া তাঁর দিন চলিয়া যায়।

মিসেস চাটার্জ্জি চিঠিখানি আর একবার পড়িলেন। "ঘরের লক্ষ্মী বধূমাতা?" কই, এমন কথা বলিয়া কেউ ত তাঁকে সম্ভাষণ করে না! বিবাহের সময় মিঃ চাটার্জ্জি পিতাকে আনাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। সামান্য একখানা চিঠি লিখিয়া নিজের বিবাহের কথা জানাইয়া পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন।

মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য মিঃ চাটার্জ্জি পিতাকে টাকা পাঠান নাই নিশ্চয়ই; পাঠাইলে তিনি অবশ্যই জানিতে পারিতেন।

সেদিন দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প করিতে করিতে কথায় কথায় মিসেস চাটার্জ্জি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাড়ীতে টাকা পাঠান হ'য়েছিল?" মিঃ চাটার্জ্জি চিঠিখানার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন, বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, "টাকা, কিসের টাকা?"

"মন্দির তৈরীর জন্য।"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ", তার পর একটু থামিয়া আবার বলিলেন "আর তুমিও যেমন, ও অজ্ পাড়াগাঁয়ে মন্দির তৈরী করে কি হবে? তার চেয়ে বরং ঐ টাকা কোন হাঁসপাতালে অথবা স্কুলে দিলে একটা নাম থাকবে।"

ঐ প্রসঙ্গ স্থগত রাখিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বাড়ী ত' এখান থেকে বেশী দূর নয়, চল না একদিন বেড়িয়ে আসা যাক!"

পাইপটা মুখ হইতে নামাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "ভারী বিশ্রী রাস্তা, গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে।"

মিসেস চাটার্জ্জি কোন কথা বলিলেন না। সোফায় উপবিষ্ট হইয়া নত মুখে মাফলার বুনিতে লাগিলেন।

*

দিন পাঁচ সাত পরে তাঁরা সদরে ফিরিয়া আসিলেন। গায়ের কোটটা খুলিতে খুলিতে মিঃ চাটার্জ্জি একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।"

ঈষৎ হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "তোমার সব উল্টো, অমন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে তুমি উঠলে হাঁপিয়ে, আর সহরের এই ঘিঞ্জির মধ্যে এসে তুমি কি না হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে।"

তাচ্ছিল্যের স্বরে মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "আরে দূর, দিনরাত কেবল কতকগুলো অসভ্য বর্ব্বর লোকের সঙ্গে কারবার করা।"

স্বামীর পরিত্যক্ত কোটটা 'হ্যাঙারে' টাঙাইয়া দিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "কিন্তু সে কারবারে আমরাই ত' লাভ করি বেশী।"

এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, ডাক্তার সাহেব আসিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধু, অভ্যর্থনা করিবার জন্য তাঁহারা উভয়েই ড্রইংরুম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পরদিন দুপুর বেলায় মিঃ চাটার্জ্জি কাছারী চলিয়া গেলে মিসেস চাটার্জ্জি শ্বশুরের নামে একশত টাকা মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইলেন। কুপনে লিখিয়া দিলেন,

"শ্রীচরণেষু,

বাবা, আপনার চিঠি পেয়েছি, আপনার শারীরিক অবস্থা শুনে আমরা বিশেষ চিন্তিত। বেশীদিন আর

আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারব না। আপনাকে এই দুঃখিনী মেয়ের কাছে থাকতেই হবে। সামনের পুজোর ছুটীতে আমরা আপনার শ্রীচরণ দর্শনে যাচ্ছি। মন্দির-নির্ম্মাণের জন্য একশ টাকা পাঠালাম। আরও দরকার হলে আপনার মেয়েকে আদেশ করলেই পাঠিয়ে দেবে। আমরা ভাল আছি।

ইতি—

প্রণতা—আপনার বধূমাতা।"

কুপনের ঐ টুকু স্থানের মধ্যে এতগুলি কথা তাঁকে খুব হিসাব করিয়া লিখিতে হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তিন দিন পরে উক্ত মনিঅর্ডারের রসিদ ফিরিয়া আসিল। তার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে একখানা চিঠিতে মনের আবেগে বৃদ্ধ শ্বশুর পুত্র-বধূকে আনাড়ীর মত অনেক কথাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন "মা তোমার চিঠি পেয়ে চোখের জল চেপে রাখিতে পারি নি" ইত্যাদি আরও অনেক কথা। পুত্রের নিকট হইতে টাকা প্রাপ্তির আশা হয়ত তিনি করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর বিদুষী পুত্রবধূ যে এতটা হীনতা স্বীকার করিয়া একেবারে তাঁর শ্রীচরণদর্শনপ্রার্থী হইবে, ইহা তিনি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই এবং তাঁর এই অতি-আধুনিকা পুত্র-বধূটির সম্বন্ধে বরাবরই তিনি অন্যরূপ কল্পনা করিয়া আসিয়াছেন।

কুপনখানা লইয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাড়ী বাড়ী গিয়া যাচিয়া সকলকে দেখাইয়া আসিলেন। ছেলে-ছোকরাদের ডাকিয়া বলিলেন, "আমার বৌমা শাশুড়ীর নামে বাবা কালীরায়ের মন্দির করে দেবেন, তোমরা সব যোগাড়যন্ত্র কর।"

*

মিঃ চাটার্জ্জির স্পেয়ার-রুমটা প্রায় সব সময়েই খালি পড়িয়া থাকিত। কালে-ভদ্রে তাঁদের কোন বন্ধুবান্ধব আসিলে সেটা ব্যবহৃত হইত। সেদিন দুপুর বেলায় লাঞ্চ খাইতে আসিয়া তিনি দেখিলেন ঘরটার আগাগোড়া সংস্কার হইতেছে। উপদেষ্টার মত মিসেস স্বয়ং ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া।

মিঃ চাটার্জ্জি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন দিকে না চাহিয়াই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেউ আসছেন না কি?"

"হাঁ, বাবা আসছেন।'

রিটায়ার করিবার পর মিসেস চাটার্জ্জির পিতা দার্জ্জিলিঙে বাড়ী কিনিয়া তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া সেইখানে ভদ্রাসন গাড়িয়াছিলেন। বাড়ীঘর ছাড়িয়া তিনি কোথাও যান না বড় একটা। মিঃ চাটার্জ্জি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা আসবেন?"

অবাক্ হচ্ছ বুঝি?"

"না না তা বলছি না, তবে তিনি আসেন না কি না কখনও তাই বলছি।"

হঠাৎ তাঁর চোখ পড়িল, দেয়ালের গায়ে। মিঃ চাটার্জ্জি সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিলাতী ছবিগুলির পরিবর্ত্তে দেয়ালের গায়ে কতকগুলি দেব-দেবী, পরমহংস ও বিবেকানন্দের ছবি টাঙানো হইয়াছে। ফস করিয়া তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল "সর্ব্বনাশ, এ সব কি?"

শান্ত সংযত কণ্ঠে মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বাবা দেব-দেবীর ছবি খুব ভালবাসেন কি না, তাই।"

"সে কি, তিনিই না তোমার মায়ের মৃত্যুর পর মেম বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলেন?"

"ওসব কতকগুলো দুষ্টু লোকের মিথ্যা রটনা।"

খোলা জানালা দিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বাহিরের দিকে তাকাইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। মিসেস চাটার্জ্জি তাঁর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, "তোমার কোন অসুবিধে হবে না ত?"

"অসুবিধে, অসুবিধে হবে কেন? না—না।"

"ঠিক ত?"

"হাঁ ঠিক।"

অতঃপর তাঁরা দুজনে লাঞ্চ খাইবার জন্য ডাইনিং রুম অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

*

দিন কয়েক পরে একদিন দুপুর বেলায় মিসেস চাটার্জ্জি তাঁর পিয়ানোটির সম্মুখে বসিয়া একটি ইংরাজী সুর বাজাইতে-ছিলেন, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া জানাইল, একটা লোক সাহেবের দর্শনপ্রার্থী হইয়া বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।

মুখ তুলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বোল. দেও সাব আভি নেহি হ্যায়।"

"উ ত বোলা হ্যায় হুজুর, ফিন কোঠিকা অন্দরমে ঘুসনে মাংতা।"

"বোল দেও চার বাজনেসে আনে কো আস্তে।" এই বলিয়া তিনি পুনরায় পিয়ানোয় মনসংযোগ করিলেন।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পিয়ানোর চাবিগুলো নাড়াচাড়া করিবার পর মিসেস চাটার্জ্জি একটু বিশ্রাম করিতে গেলেন। বেলা তখন প্রায় তিনটা, ঘুম হইতে উঠিয়া তিনি অভ্যাসমত বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এদিক্ ওদিক্ হইতে তাকাইতে তাকাইতে হঠাৎ তাঁর নজর পড়িল ওধারে গেটের সামনে অশ্বত্থ গাছটার ছায়ায় বসিয়া কে একটা লোক তাঁদের কোয়ার্টারের দিকে নির্নিমেষ চাহিয়া আছে। লোকটার বয়স বার্দ্ধক্যের সীমায় পৌছিয়াছে, চুলগুলি সব ধব ধবে সাদা, গায়ে একটা চায়না কোট।

লোকটার বয়সমলিন মুখখানার পানে চাহিয়া অকারণে মিসেস চাটার্জ্জির মনে কেমন একটা অদ্ভুত মমত্ববোধের সৃষ্টি হইল। বেয়ারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দুপুর বেলায় সাহেবকে যে খুঁজিতে আসিয়াছিল সে এই লোকটা কি না? লোকটার দিকে একবার তাকাইয়া বেয়ারা বলিল, "জী হাঁ, দেখিয়ে আভিতক্ বৈঠ হায়।"

মিসেস চাটার্জ্জি লোকটাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বেয়ারাকে আদেশ করিলেন।

লোকটি নিকটে আসিলে তার দিকে চাহিয়াই মিসেস চাটার্জ্জির কেমন করিয়া যেন মনে হইল, ইনি নিশ্চয়ই তাঁর শ্বশুর, মুখের আদল অনেকটা ঠিক তাঁর স্বামীর মত, বিশেষ করিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জির চোখ দুটির সহিত এই লোকটির চোখের চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে।

লোকটি তাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বাড়ীতে কি নরেন থাকে?" মিসেস চাটার্জ্জীর আর কোন সন্দেহ রহিল না, "হাঁ বলিয়া একটুখানি হাসিয়া লোকটির পায়ের ধূলো লইয়া প্রণাম করিলেন।

বৃদ্ধ অস্ফুট স্বরে কি একটা আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়া অবাক্ বিস্ময়ে মিসেস চ্যাটার্জ্জির পানে চাহিয়া রহিলেন। সলজ্জ ভাবে মিসেস চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "ও মেয়েকে বুঝি এখনও চিনতে পারছেন না বাবা?"

আড়ষ্ট কণ্ঠে বৃদ্ধ শুধাইলেন "কে মা তু···আপনি?"

"আপনার মেয়ে বাবা। এতদিনে বুঝি মেয়েকে মনে পড়ল?'

হৃদয়াবেগ রোধ করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ খপ করিয়া মিসেস চাটার্জ্জির একখানা হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন। মিসেস চ্যাটার্জ্জির চক্ষুও শুষ্ক রহিল না। কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন "কাঁদবেন না বাবা, আপনার মেয়ের যে অকল্যাণ হবে।"

"ঠিক বলেছ মা, কাঁদব না" এই বলিয়া বৃদ্ধ জামার হাতায় চক্ষু মুছিলেন।

মিসেস চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "খবর দেন নি কেন বাবা? আপনার মেয়ে ঠিক ষ্টেশনে গিয়ে হাজির থাকত।" বৃদ্ধ বলিলেন, 'কি করে খবর দেব মা, তোমার চিঠি পেয়ে অবধি তোমাদের দেখবার জন্যে প্রাণটা বড় ছট্‌ফট্ কর-ছিল, কাল রাতে হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই দিলে ট্রেনখানা ছেড়ে, পরের ট্রেন আবার সেই দশটায়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ একটা হাই তুলিলেন।

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "আপনার নাওয়া খাওয়া হয় নি?"

প্রসন্ন হাসিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "গাড়ীর কাপড়ে আমি ত' কিছু খাই না মা।"

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মিসেস চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "আসুন বাবা, আপনার জন্যে সব গুছিয়ে রেখেছি।"

মিসেস চাটার্জ্জির ইচ্ছা ছিল, পূজার ছুটীতে তাঁরা দুজনে দেশে গিয়া শ্বশুরকে লইয়া আসিবেন, কিন্তু তাঁহাদের আনিতে যাওয়ার আগেই যে বৃদ্ধ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এখানে আসিয়া হাজির হইবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। যেরূপ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তাঁরা বসবাস করেন, তার পাশে এই সদাচারী ব্রাহ্মণকে খাপ খাওয়ান হয়ত তাঁদের সমসামাজিক লোকের চোখে একটু দৃষ্টিকটু হইবে, কিন্তু সমাজ অপেক্ষা এই স্নেহশীল বৃদ্ধটি কি তাঁর স্বামীর বেশী আপনার নয়? একটা মিথ্যা আভিজাত্যের দম্ভ দিয়া তিনি কি তাঁর আশৈশব মধুর সম্পর্কটীকে অস্বীকার করিয়া একটা পাতান সম্বন্ধসূত্রে গ্রন্থি গাঁথিতে চান?

পুত্রবধূর সহিত বৃদ্ধ তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া ঘরটার চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বাঃ ছবিগুলি ত বেশ।"

বাজার হইতে ছানা ও ফল আনাইয়া মিসেস চাটার্জ্জি শ্বশুরকে জল খাওয়াইলেন। তার পর ভাঁড়ার-ঘরের জিনিসপত্রগুলি-খাবার ঘরে সরাইয়া একটা বাল্‌তিতে উনুন পাতিতে বসিলেন। এমন সময় গাড়ীবারান্দার নীচে মিঃ চাটার্জ্জির মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মিঃ চাটার্জ্জি বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীকে ভাঁড়ার-ঘরের পাশে বসিয়া স্বহস্তে উনুন পাতিতে দেখিয়া বিস্মিতের মত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরে ও কি হচ্ছে ?"

মিসেস চাটার্জ্জি স্বামীকে হাত নাড়িয়া থামিতে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "বাবা এসেছেন যে।"

স্ত্রীলোকের মন সাধারণতই রহস্যপ্রবণ। মিঃ চাটার্জ্জি স্ত্রীর এই উনুন পাতার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাবা এসেছেন ত" উনুন পাতছ কেন ?"

মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "বাবা কি তোমার ঐ বকাউল্লা খানসামার হাতের রান্না খাবেন না কি ?" এই বলিয়া মিসেস চাটার্জ্জি একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, আমরা অনার্য্য হতে পারি, কিন্তু উনি ত আর অনার্য্য নন্।"

স্ত্রীর ভাবভঙ্গী ভাল বুঝিতে না পারিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "অনার্য্য মানে ?"

"অনার্য্য মানে যে সমস্ত তথাকথিত আর্য্য সামাজিক আচার-বিচার না মেনে বাহাদুরী দেখিয়ে বেড়ায়।"

ওদিক্‌কার দরজার দিকে নজর পড়ায় মিঃ চাটার্জ্জি সবিস্ময়ে দেখিলেন দুয়ারের পর্দ্দা ধরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার পিতা। বহুকাল পরে মিঃ চাটার্জ্জির কণ্ঠ দিয়া আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়িল, "বাবা !"

ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ পুত্রকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "তোকে ছেড়ে কি করে যে আমি আছি বাবা।" মিঃ চাটার্জ্জি পিতার শীর্ণ বুকখানির উপর মুখ রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সিগারেটটা তাঁর হাত হইতে কখন মেজের উপর খসিয়া পড়িয়াছিল।

পূজার আর দিন আষ্টেক মাত্র বিলম্ব ছিল। পুত্র ও পুত্রবধূ ইহার মধ্যে কিছুতেই আর বৃদ্ধকে ছাড়িয়া দিলেন না। স্থির হইল, ষষ্ঠির দিন তাঁহারা সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করিবেন।

যাত্রার দিন মিসেস চাটার্জ্জির বেশভূষার পারিপাট্যে একটু বৈচিত্র্য দেখা গেল। স্নানের পর মাথার চুল গুলি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পাশ দিয়া পিঠের উপর এলাইয়া দিয়াছেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে ছোট্ট একটি সিঁদুরের টীপ, পরণে একখানি সুপবিত্র তসরের শাড়ী শুভ্র, দুখানি পাদুকাবিহীন চরণপ্রান্তে অলক্তরেখা, সর্ব্বাঙ্গে মহিমা-ময়ী লক্ষ্মীপ্রতিমার মত নারীর পবিত্র শ্রী। তাঁহার দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।" মিঃ চাটার্জ্জি যখন পোষাক বদলাইয়া ড্রেসিং রুম হইতে বাহির হইয়া আসিলেন তখন, তাঁহাকে দেখিয়া মিসেস চাটার্জ্জি আশ্চর্য্য না হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

ট্রাউজারের পরিবর্ত্তে পরণে একখানি আধ ইঞ্চি চওড়া কালপেড়ে মিহি ধুতি, গায়ে ঢিলে-হাতা আদ্দির পাঞ্জাবী, গলায় উড়ুনী জড়ান—নিখুঁত বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

রহস্য করিয়া মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "আজ যে বড় ধুতি পরেছ ?"

"দেশে যাচ্ছি যে।"

"সেখানে গিয়ে কিন্তু শাক-চচ্চড়ী ভাত খেতে হবে।"

"ও আমার অভ্যাস আছে, আজন্ম ঐ খেয়েই মানুষ।" বলিয়া হাসিয়া মিঃ চাটার্জ্জি মোটরে উঠিয়া পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

বহুদিন পরে দেশমাতৃকার নিরুদ্দিষ্ট সন্তান দেশের শুষ্ক মাটীতে আবার ফিরিয়া আসিলেন।

মোটর হইতে নামিয়াই মিসেস চাটার্জ্জি বলিলেন, "গাড়ীটার কিছু খারাপ হয়নি ত ?"

মুখ ফিরাইয়া সোফার উত্তর দিল, "জী নেহি, রাস্তা একদম ঠিক হ্যায়।"

মিঃ চাটার্জ্জির পিতা ততক্ষণে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন। মুখ টিপিয়া হাসিয়া মিসেস চাটার্জ্জি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বলেছিলে, রাস্তাটা নাকি ভারি বিশ্রী, গাড়ী খারাপ হয়ে যাবে ?"

অন্যমনস্ক ভাবে মিঃ চাটার্জ্জি উত্তর দিলেন, "তারপর হয় ত সংস্কার হয়েছে।"

"কার, রাস্তার না তোমার ?"

"হয় ত দুয়েরই।"

"কিন্তু সংস্কার করলে কারা ?"

"যাদের দরকার বেশী।"

মিসেস চাটার্জ্জি আরও কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে-ছিলেন, এমন সময় বাড়ীর ভিতর হইতে একটি মেয়ে, প্রায় মিসেস চাটার্জ্জিরই সমবয়সী, ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল, "এস এস বৌদি, কে আর বরণ করবে বল ? জেঠাইমা ত আর নেই।" এই বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ উলুধ্বনি করিয়া উঠিল।

মেয়েটি মিঃ চাটার্জ্জির দূরসম্পর্কের খুল্লতাত-ভগ্নী।

শ্যামানন্দ বিলাস

—শ্রীরামশশী কর্ম্মকার

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর যে কতিপয় মহাজন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন রাখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্রীশ্যামানন্দ বৈষ্ণব সমাজে সমধিক শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি চক্রবর্ত্তী এবং বর্ত্তমানে The History of the Medieaval Period of Baishnab Literature গ্রন্থে এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইঁহাদের জীবন বৃত্তান্তের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আরও অনেক গ্রন্থে ইঁহাদের বিবরণ পাওয়া যায়। এই তিন মহাজনের মধ্যে শ্রীমৎ শ্যামানন্দের জীবনচরিত সমধিক বৈচিত্র্যময় বলিয়া বোধ হয়। আলোচ্য 'শ্যামানন্দ বিলাস' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছি। মাননীয় সেন মহাশয় তদীয় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' গ্রন্থের ৩৪০ ও ৬২৩ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণদাস রচিত 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' নামক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতাও কৃষ্ণদাস। জানি না 'প্রকাশ' ও 'বিলাস' একই গ্রন্থ কি না। আলোচ্য গ্রন্থের শেষ দিকে লেখক সংক্ষেপে আত্মচরিত দিয়া বলিয়াছেন—(পুথী ২২ ক পৃষ্ঠা)

> 'শ্রীশ্যামানন্দ গোসাঞির কৃপা আজ্ঞা হৈতে।
> এই গ্রন্থ রচনা করি গাইল সভাতে ॥

লেখক বলিতেছেন, কোন সাধু-মুখে রসামৃত সিন্ধুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার বৈরাগ্য জন্মে, বৃন্দাবন দর্শনের জন্য চিত্তে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হয়; কিন্তু সংসারের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইতে পারি না; মনে ভাবি বৃথা জন্ম গেল। এমন একদিন—

> শ্যামানন্দ পাদপদ্ম বিশ্বাসে চিন্তিলা।
> ভাবনা করিএ রাত্রে সঙরণ করিলা ॥

নিদ্রাঘোরে স্বপ্নে দেখিলাম, বৃন্দাবন গিয়া শ্যামানন্দ সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি সব কথা তাঁহাকে বলিলাম। তখন—

> কৃষ্ণদাস নাম বলি প্রভু মোরে দিলা।

প্রভু বলিলেন, ঘরে ফিরে যাও, স্ত্রী ছাড়িয়া ধর্ম্ম হইবে না। আমার আজ্ঞা পালন কর, রাধাকুণ্ডের চরণ পাইবে। যাও;—

> কৃষ্ণভক্তি মোর গুণ গায় অনুক্ষণে।
> আমার মঙ্গল কিছু করহ রচনে ॥ (পুথী পৃঃ ২১ ক)

আমি বলিলাম, আপনার গুণ-গরিমা কিছু জানি না, কি বর্ণিব? প্রভু বলিলেন—

> মোরে ধ্যান করিলে সব মনে স্ফূর্ত্তি হবে।

আমি পুনশ্চ নিবেদন করিলাম, আমার মত মূর্খের বই সাধুজনে স্বীকার করিবেন কেন? তখন প্রভু বলিলেন—

> আমার শ্রীনয়নানন্দ অধিকারি স্থানে।
> দেখাইবে এই গ্রন্থ বিনয় বচনে ॥
> তেঁহো শুনি এই বাক্য আনন্দ হইবা।
> মোর প্রেমে এই গ্রন্থ স্থাপন করিবা ॥
> তেঁহো যে স্থাপিলে সর্ব্বে করিব স্বীকার।

গ্রন্থকার এই স্বপ্নাদেশ তিন দিনের মধ্যে পালন করেন নাই। তৃতীয় দিন রাত্রে প্রভু শ্যামানন্দ পুনশ্চ স্বপ্নে দর্শন দিয়া গ্রন্থ রচনার আদেশ বলবত্তর করেন। তার পরই গ্রন্থারম্ভ হয়।

উপরে শ্রীনয়নানন্দ অধিকারীর নামোল্লেখ পাইলাম। ইনি কে? বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ২৭৯ পৃষ্ঠায় নয়নানন্দ দাস নামে জনৈক পদকর্ত্তার উল্লেখ আছে। উক্ত গ্রন্থের ২০২ পৃষ্ঠায় আর একজন নয়নানন্দের নাম পাইতেছি। তিনি বিখ্যাত গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র, বাণীনাথের পুত্র। গদাধর-ভ্রাতুষ্পুত্রের উৎকল বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু 'অধিকারী' উপাধি লইয়া গোলযোগ হইতেছে; গদাধর মাধব মিশ্রের পুত্র। সুতরাং গ্রন্থোক্ত নয়নানন্দ অধিকারীর স্বরূপ নির্ণীত হইল না। গ্রন্থকার গ্রন্থের আদিতে বলিয়াছেন—

> শ্রীরাধা মনোহর ঠাকুর আমারি।
> তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি ॥ (১ পৃষ্ঠা)

এই ব্যক্তিই বা কে? রাধা মানোহর? 'রাধা মোহন' নাম লিপিকর প্রমাদ বশতঃ 'রাধা মনোহর' হইলে আমরা শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্রকে গ্রন্থকারের গুরুরূপে পাইতেছি।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ ও শ্রীনিবাসের সমসাময়িক না হইলেও গ্রন্থকারের সময় শ্যামানন্দ অন্ততঃ বৃদ্ধাবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থানুসারে জীব গোস্বামীর তিরোভাবের পরও শ্যামানন্দ বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। দীনেশ বাবু বলিয়াছেন, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ মধ্যে শ্যামানন্দ প্রভৃতি তিন জন প্রাদুর্ভূত হন। অতএব অনুমান করা যায়-কৃষ্ণদাস খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থে শ্যামানন্দের 'শ্যামানন্দ' নাম প্রাপ্তির অলৌকিক বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। সে বৃত্তান্ত সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও বড় মধুর—বৈষ্ণব রসিকের নিকট। ঐ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সমাজে চলিত 'শ্যামানন্দী' নামক তিলকের ইতিহাস জানিতে পারা যাইতেছে।

শ্যামানন্দের মাতৃদত্ত নাম 'দুঃখী'। বৈরাগ্যোদয়ের পর অম্বিকাগ্রামে দীক্ষা-গুরু প্রদত্ত নাম 'কৃষ্ণদাস'। তদনন্তর দুঃখী কৃষ্ণদাস নামে তাঁহার

পরিচয় হয়। ক্রমে বৃন্দাবনে আসিয়া 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' গোপীভাবে ভাবুক হইয়া নিজকে 'দুঃখিনী কৃষ্ণদাস' বলিয়া পরিচিত করেন। দুঃখিনী কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে আসিয়া কল্পকুঞ্জে ঝাড়ুদারের কাজে রত থাকিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস দর্শন করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার অপূর্ব ভাবাবেশ দেখিয়া তদানীন্তন বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীজীব নিজ আশ্রমে আশ্রয় দেন। জীবাশ্রমে বাস করিয়া এবং প্রেম-ধর্ম্মের শিক্ষা পাইয়া শ্যামানন্দ পরমানন্দে স্বেচ্ছা-স্বীকৃত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যান।

একদিন অতি প্রত্যুষে কুঞ্জে আসিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাস বৃক্ষমূলে এক অপূর্ব কনকময় নূপুর দেখিতে পান। নূপুরের দর্শন ও স্পর্শনে তাঁহার অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবোদয় হয়। এমন সময় এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী আসিয়া শ্যামানন্দের নিকট স্বীয় বধূর হারাণ নূপুরের কথা জিজ্ঞাসা করেন। দুঃখী কৃষ্ণদাস বলেন—

'শ্রীরাধার নপুর হয় নিশ্চয় জানিল।
নূপুর পরশে মোর প্রেম উপজিল॥
মনুষ্যের বস্তু ছুঁইলে প্রেম নাহি হয়।'

তখন ব্রাহ্মণী নিরুপায় হইয়া অন্তরালে কৃষ্ণদাসের নিকট স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। শুদ্ধ-কাঞ্চনপুঞ্জাভা কোটীন্দুললিতা নবীনা ললিতা সখীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দুঃখী কৃষ্ণদাস মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে ললিতার পাদস্পর্শ করিয়া পদধূলি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। ললিতা দেবী দুঃখী কৃষ্ণদাসের প্রতি কৃপা করিয়া সিদ্ধমন্ত্র দান করিলেন। কৃষ্ণদাস অতঃপর শ্রীরাধার নূপুরটি ললিতার হস্তে অর্পণ করিলে, ললিতা দেবী কৃষ্ণদাসের ললাটে নূপুর স্থাপন করিলেন। কি আশ্চর্য্য!

ললাটে নপুর সঙ্গে তিলক হইল।
নপুরের চুড়া লাগি বিন্দু মাঝে হইল॥

ললিতা দেবী তাহা দেখিয়া বলিলেন, তোমার ললাটে শ্রীরাধার নূপুরের চিহ্ন দেখিয়া শ্যামের বড় আনন্দ হইবে, অতএব তোমার নাম 'শ্যামানন্দ' হইল। কিন্তু দেখ, আজিকার ঘটনা এক শ্রীজীব ভিন্ন কাহাকেও বলিবে না। বলিলে তৎক্ষণাৎ তোমার প্রাণত্যাগ হইবে।

জীব গোস্বামী সমস্ত শুনিয়া সাদরে শ্যামানন্দকে কোলে লইলেন এবং বলিলেন, আজ হইতে ঐ তিলকের নাম হইবে 'শ্যামানন্দী'। বৃন্দাবনে প্রকাশ হইল দুঃখী কৃষ্ণদাস স্বপ্নে গোসাঞীর কৃপা লাভ করিয়াছেন।

চারি দিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহই স্বপ্নকথা বিশ্বাস করিল না। লোকে বুঝিল, শ্রীজীব মহাপণ্ডিত হইয়াও অন্যের শিষ্য দুঃখীকে নিজের করিয়া লইলেন। কেহ শ্রীজীবের নিকট প্রকাশ্যে তর্ক করিতে আসিল না, ভাবিল, কি জানি যদি কোন বিধান থাকে। ক্রমে জানা যাইবে। এইরূপে ব্রজবাসীদের মধ্যে মতিস্থৈর্য্য সম্পাদিত হইল। কিন্তু ঐ সংবাদ যে দিন গৌড়ে আসিয়া শ্রীহৃদয়ানন্দের নিকট পৌঁছিল, হৃদয়ানন্দ ক্রোধে অধীর হইলেন, শ্রীজীবকে অপদস্থ করিবার দৃঢ় সংকল্প করিয়া গৌড়ের তাবৎ বৈষ্ণব মহান্ত সমভিব্যাহারে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আজ বৃন্দাবনে রাসস্থলীতে এক বিরাট সভার সমাবেশ হইয়াছে। গৌড়ের যাবতীয় বৈষ্ণব মহান্ত তথায় উপস্থিত; বৃন্দাবনের তাবৎ মহান্ত সমবেত। তৎকালীন বৈষ্ণব-পণ্ডিতকুলতিলক, বৈষ্ণব সমাজের নেতৃস্থানীয় শ্রীজীবের কর্ম্মবিশেষের বিচার হইবে। বিচারপ্রার্থী কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী অম্বিকা-গ্রামনিবাসী শ্রীহৃদয়ানন্দ গোস্বামী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে (পৃঃ ৩৪০) ইহাঁকে হৃদয়চন্দ্র বলা হইয়াছে। এই হৃদয়ানন্দ নিশ্চয়ই প্রসিদ্ধ গৌরাঙ্গ অনুচর, গৌরাঙ্গবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত গৌরী দাসের আত্মীয় বটেন; শ্রীজীব হৃদয়ানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জানাইবার অবসরে শ্রীগৌরীদাস ঠাকুরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পুঁথী পৃঃ ৮ (খ))। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে, দুঃখী উড়িষ্যা হইতে অম্বিকা নগরে পণ্ডিত গৌরী দাসের বাড়ী গিয়াছিলেন এবং গৌরীদাসের চৈতন্যবিগ্রহ পূজা দেখিয়াছিলেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২৯০)। বর্ত্তমান গ্রন্থেও শ্যামানন্দ বলিয়াছেন 'শ্রীবিজয়ানন্দ প্রভু(র) ভিত্যানামাভাস' (পুঁথী পৃঃ ১৩ক) অর্থাৎ আমি হৃদয়ানন্দের দীন শিষ্য। পুনশ্চ স্থানান্তরে (পুঁথী পৃঃ ১৮খ) শ্যামানন্দ বলিয়াছেন—

পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা কর্য্যাছেন সর্ব্বথা॥
গোসাঞি স্বরূপ হয়্যা দরশন দিলা।
শ্রীগৌউরি দাস পণ্ডিত ঠাকুর কৃপা কৈলা॥'

বর্ত্তমান গ্রন্থে আছে সখাভাব ত্যাগ করিয়া গোপীভাবাশ্রয় করার জন্য শ্যামানন্দ হৃদয়ানন্দ কর্ত্তৃক বেত্রাহত হন। 'মুরলী বিলাসে' মঙ্গলাচরণে উক্ত আছে—

জয় জয় গৌরীদাসাদি সখ্য ভক্তগণ।

অতএব প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, হৃদয়ানন্দ হয় গৌরীদাসের পুত্র অথবা পুত্রস্থানীয় বংশজ।

ইতিপূর্ব্বেই শ্রীজীব বিনীত ভাবে অপরাধ অস্বীকার করিয়া হৃদয়ানন্দের নিকট পত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে বিশ্বাস হয় নাই। সভায় বৃন্দাবন ও ব্রজবাসের সমস্ত মহান্ত সমবেত হইয়াছেন। হৃদয়ানন্দ দুঃখী কৃষ্ণদাসকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি মদ্দত্ত 'হরিমন্দিরা' তিলক ত্যাগ করিয়াছ কেন? স্বপ্নের কথা অবিশ্বাস্য। তোমার স্বপ্ন মুছিয়া দিব। শ্যামানন্দ মহা চিন্তাগ্রস্ত হইয়া সভামধ্যে ধ্যানস্থ হইয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল। সকলে তাহার আকস্মিক ব্যাধিতে মৃত্যু ভাবিয়া দুঃখিত হইল। শ্রীজীব শ্যামানন্দের কলেবর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলে সংকীর্ত্তন করুন। সকলে হরিনাম সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ইহার পর কবি একটি অপূর্ব্বতর দৃশ্যের বর্ণনা করিয়া প্রত্যেক বৈষ্ণব ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের প্লাবন সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্যামানন্দ ললিতার প্রদত্ত মন্ত্র জপ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। তাঁহার আত্মা রাগময় নিত্য-দেহ ধারণ করিয়া নিত্য বৃন্দাবনে শ্রীরাধার মন্দিরদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতিহারী সখী তাঁহাকে ললিতার সমীপে লইয়া গেল। তৎকালে ললিতা শ্রীরাধাকে তাম্বুল যোগাইতেছিলেন; শ্রীরূপমঞ্জরীসখীচামর-ব্যজনে এবং চম্পকলতিকা পাদসংবাহনে রত ছিলেন। মন্দিরমধ্যে ললিতা ও শ্রীরূপমঞ্জরীকে দেখিয়া শ্যামানন্দ একে একে উভয়কে প্রণাম করিলেন। শ্যামানন্দ সাধনমার্গে শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগত। শ্রীরূপমঞ্জরী শ্যামানন্দকে শ্রীরাধার চরণতলে রাখিয়া তাঁহাকে শ্যামানন্দের প্রতি কৃপাবলোকন করিতে অনুরোধ করিলেন। ললিতাও শ্যামানন্দের প্রতি কৃপা করিতে রাইকে বলিলেন।

ললিতা কহেন কৃপা কর ঠাকুরাণি।
তোমার চরণে দাসী হয় আমি ইহা জানি॥ (পুথী পৃঃ ১৬ ক)

গোপী অনুগা না হইলে রাধার কৃপা লাভ ঘটে না, তাহা দেখাইতে কবি ভুলেন নাই। শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগা দাসী কনকমঞ্জরী নামে শ্যামানন্দ রাধাকৃষ্ণের উপাসক। যাহাই হউক, শ্রীরূপমঞ্জরীর ও ললিতার কৃপায় শ্রীরাধার রাতুল চরণের স্পর্শে শ্যামানন্দের সিদ্ধিলাভ হইল। শ্যামানন্দের উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া করুণাময়ী শ্রীমতী, সুবলকে উপদেশ দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। শ্যামানন্দও সকলের চরণে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

এখানে শ্রীজীবের নির্দ্দেশ মত সংকীর্ত্তন চলিতেছে। সকলের দৃষ্টি বস্ত্রাবৃত দেহের উপর নিবদ্ধ। হঠাৎ দেহ নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। শ্যামানন্দ গুরু শ্রীহৃদয়ানন্দের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে উঠিয়া বসিলেন। তখন গুরু হৃদয়ানন্দ জল লইয়া শ্যামানন্দের তিলক ও নাম মুছিয়া দিলেন। এ কি! তৎক্ষণাৎ তিলক ও নাম উজ্জ্বলতর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। চারি দিকে জয় ধ্বনি উত্থিত হইল। ক্রমে শ্রীহৃদয়ানন্দ বুঝিতে পারিলেন, শ্যামানন্দ যে সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছে, সে পথের উপযুক্ত গুরু শ্রীজীব। তিনি শ্যামানন্দকে শ্রীজীবের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্যামানন্দ জীবসন্নিধানে পরমানন্দে অবস্থান করিতেছেন। কিছু কাল গত হইলে শ্রীজীব শ্যামানন্দের প্রতি এক আদেশ করিলেন।

> শ্রীজীব করিল আজ্ঞা যাহ উড়্‌দেশেতে।
> সে দেশ পতিত সব উদ্ধার করিতে॥' (পুঁথী পৃঃ ২৪ক)

শ্রীজীবের আদেশে শ্যামানন্দ উৎকল গেলেন এবং উৎকলবাসীকে উদ্ধার করিলেন। কিন্তু শ্যামানন্দের সঙ্গে নরোত্তম ও শ্রীনিবাস আচার্য্য বৈষ্ণব গ্রন্থরাশি লইয়া যে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এ গ্রন্থে সে বিষয়ের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না।

যাহাই হউক, শ্রীজীবের আদেশে শ্যামানন্দ গোসাঞি উৎকলে গমন করিয়া যে প্রেমভক্তির বন্যা বহাইয়াছিলেন, তাহাতে কত অধম পতিতের কথা দূরে থাক, রাজা অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিকানন্দও ভাসিয়া গিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে রসিকানন্দ সুপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান গ্রন্থে রসিকানন্দের নাম উল্লেখ ভিন্ন কোন কথা পাই না। বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে ৩১০ পৃষ্ঠায় শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দও মুরারি বলিয়া উক্ত আছে; পুনরায় ৩৪৮ পৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে অচ্যুতানন্দের পুত্র রসিক মুরারি শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য। গ্রন্থান্তরে উক্ত আছে শ্যামানন্দের অদ্ভুত প্রভাবে অদ্বৈতবাদী দামোদর এবং মুসলমান দস্যু শের খাঁর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় উক্ত আছে শ্যামানন্দ শেষ জীবন উৎকলে নৃসিংহপুর গ্রামে কাটান। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের ২৪ (খ) পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতেছে—

> পুনর্ব্বার ব্রজে গোসাঞি করিল গমন।
> শ্রীজীবের সঙ্গেতে রহিল অনুক্ষণ॥
> … … …
> শ্রীজীব গোসাঞি যবে বৃন্দাবন পাইলা।
> তাহার বিরহে গোসাঞি ব্রজধাম আইলা॥'

ইহার পর শ্যামানন্দ কি করিয়াছিলেন, কত কাল জীবিত ছিলেন, এ গ্রন্থে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিতে গিয়া এই গ্রন্থখানি পাইয়াছি। তাহারই সারাংশ পণ্ডিতকুলের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

হিমালয়

—শ্রীহরিপদ দত্ত

তুলিয়া রজত-শুভ্র মস্তক গগনে
রহিয়াছ হিমাচল স্থির যোগাসনে।
প্রত্যূষে সহস্র করে তরুণ তপন
পরায় সে তুঙ্গ শিরে কাঞ্চন ভূষণ।
দিবার যৌবনে হেরি খরতর জ্যোতি
করে দীপ্তিময় তব বিরাট মূরতি।
নিশানাথ-অভ্যুদয়ে কনক আভায়
সুরঞ্জিত হয় পুনঃ সে বিশাল কায়।
আরোহিতে পবিত্র সে মস্তকে তোমার
করিল প্রয়াস কত লোক কতবার,
কিন্তু নহে মানবের চরণ-পরশে
কলঙ্কিত অদ্যাপি সে শির ভাগ্যবশে।
বাহ্যজ্ঞানহীন ধ্যানে নিমগ্ন স্রষ্টার,
অপ্রীতি অথবা প্রীতি নাহিক তোমার।

ভারত-উত্তর দ্বার যত্নে আগুলিয়া
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে রয়েছ বসিয়া—
উত্তর হইতে কোন অরাতি কখন
না করিল সাহস করিতে আক্রমণ।
তথাপি শৃঙ্খলাহীন ভারত সন্তান,
অসমর্থ ত্যজিবারে ক্ষুদ্র স্বার্থজ্ঞান,
বিচ্ছিন্ন শতধা আত্মকলহের ফলে,
না রোধে প্রকৃতিরুদ্ধ চৌদিক কৌশলে।
ব্যাপিয়া শতাব্দী কত পরিয়া শৃঙ্খল,
হেরিয়া নিয়ত কত দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল,
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত নহিল তাহার,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ নাহি করে পরিহার।
হয়ে ধ্যানমুক্ত, ত্যজি নির্ব্বিকার ভাব,
কর হে সংস্কার, গিরি, ভারত-স্বভাব।

সংঘর্ষ

— শ্রীরমাপতি দাস

পাঠশালায় গোলমাল হট্টগোল নিয়মিত ভাবে রোজই হয়; আজ যেন একটু বেশী। বৃদ্ধ পণ্ডিতম'শায়ের শরীর বড় ভাল নয়, তাই ছেলেদের পড়িতে বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ছেলেরা সুযোগটুকু পুরোমাত্রায় উপভোগ করিতেছে। ঘর-ময় ছুটো-ছুটি, চীৎকার, মারামারি, ঠেলাঠেলি, হাততালি ইত্যাদি চলিতেছে। পণ্ডিতম'শায় মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন, 'আঃ, অত গোল করিস্ কেন? ব'স্ চুপ্ ক'রে।'—কে কার কথা শোনে! দু'টী ছেলে তাঁর মাথার পাকা চুল তুলিতেছিল, আরও দু'তিনজন পিঠে সুড়সুড়ি দিতেছিল, তিনি চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন। বাধ্যতামূলকভাবে দাঁড়াইয়া চোখের সামনে সাথীদের মনের আনন্দে ছুটোছুটি করিতে দেখা ছেলেদের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড শাস্তি। যাহারা চুল তুলিতেছিল বা পিঠে সুড়সুড়ি দিতেছিল, বহুক্ষণ হইতে তাহাদের মন সঙ্গীদের সাথেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, ঘোর সংযমের প্রভাবে শরীরটাকে কোন প্রকারে ধরিয়া রাখিয়াছিল মাত্র। অল্প-কিছুক্ষণ পর কিন্তু যাহারা চুল তুলিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দৌড় দিল, তার পর আর একজন—শেষে আর কেহই রহিল না। পণ্ডিতমহাশয় তেমনই বসিয়া রহিলেন, ঘরময় চরম ছুটাছুটি চলিতে লাগিল। মাঝে একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'তোরা বড় গোলমাল করছিস্,—থাম দেখাচ্ছি।' কিন্তু তার পরেই আবার চুপ। যাদের এ কথা বলা হইল, তাহারা বিশেষ জানিত, এ ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, কাজেই কথাটা গ্রাহ্য করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না।

কিছুক্ষণ ছুটাছুটি করিবার পর একটী ছয় সাত বছরের বালক পণ্ডিতম'শায়ের কাছে আসিয়া কাণে কাণে বলিল, 'দাদু, ও দাদু, আমি চুল তুলে দেব?' পণ্ডিতম'শায় চোখ খুলিয়া চাহিলেন, আদর করিয়া কোলে বসাইলেন, 'না দাদু, আর চুল তুলতে হ'বে না, চুপ ক'রে ব'সো, আর ছুটোছুটী ক'রো না।' বালক তেমনই বসিয়া রহিল, পণ্ডিতম'শায় তেমনই চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া তার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। আর একটা ছেলে কোথা হইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া একরকম জোর করিয়াই পণ্ডিতম'শায়ের কোলে বসিয়া পড়িল। যে কোলে ব'সিয়াছিল, সে তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিল, পারিল না; যে নবাগত তার গায়ে জোর বেশী, সেই বরং যে আগে হইতে নিজের ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতেছিল, তাহাকেই ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল। প্রথম বালক চীৎকার করিয়া উঠিল, 'দাদু, আমাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে।' পণ্ডিতমশায় চাহিয়া, বলিলেন, 'না, ফেলবে না।' পরে যে আসিয়াছিল তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি বন্ধু, খবর কি?' সে হাসিতে হাসিতে তাঁহার ঠোঁট টিপিয়া ধরিল তার ছোট্ট দুটী আঙ্গুল দিয়া। পণ্ডিতম'শায়ও হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'আচ্ছা, দু'জনেই ব'সো, ঝগড়া ক'রো না।' আবার পূর্ববৎ চোখ বন্ধ করিয়া দু'জনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। ঝগড়া মিটিয়া গেল, অতি শান্ত বালকের মত দু'জনে দুই কোলে বসিয়া রহিল। ইত্যবসরে আর একজন পিছন দিক হইতে তাঁর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁধে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; পণ্ডিতম'শায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন 'কে রে?' সে ছুট দিল, একটু পরে আবার ফিরিয়া আসিয়া পূর্ববৎ জড়াইয়া ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'দাদু, অনেক তামাক এনেছি, কৈ খেলে না?' পণ্ডিতমশায় হাসি-মুখে বলিলেন, আজ শরীরটা ভাল লাগছে না ভাই, থাক পরে খাবো।' বালক গলা ধরিয়া তেমনি ঝুলিতে থাকিল।

গ্রাম্য পণ্ডিতম'শায় বলিতে আমরা চিরকাল বুঝি বেত্রহস্ত, রক্তচক্ষু, দুষ্টদমন শিষ্টত্রাসন এক গুরু-গম্ভীর মূর্ত্তি, যাঁর সামনে শিশুর চাঁদমুখটি নিমিষের মধ্যে অমাবস্যার অন্ধকারে ভরিয়া উঠে। গ্রাম্য পাঠশালা ব'লিতেই আমাদের সাধারণতঃ মনে আসে নির্ম্মম বেত্রের আস্ফালন আর

অসহায় শিশুদের করুণ চীৎকার। আমাদের বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইয়াছে। বেত্রের আস্ফালন ত নাই-ই, কথার আস্ফালনও বড় কম। বহুকাল পণ্ডিতি করার জন্ত এই গ্রামের যুবক ও প্রৌঢ় অনেকেই তাঁর ছাত্র, কাজেই বর্ত্তমান শিশু-সম্প্রদায় প্রায় সকলেই তাঁর নাতি-স্থানীয়। তাদের লইয়া তিনি ঠাকুরদা'র মত হাসি-ঠাট্টা করেন, তাদের আব্দার শুনেন, তাদের অনেক জ্বালাতন সহ্য করেন, শত অপরাধ করিলেও এদের মারিতে তাঁর হাত উঠে না। ছেলেরাও কোন প্রকারে বাড়ী হইতে পাঠশালায় পালাইয়া চলিয়া আসিতে পারিলে বাঁচে, তাহারা ভাবিয়া পায় না, গোটা দিনমানটাই পাঠশালা হয় না কেন। বাড়ী হইতে অনেক সময় অনেকের মা বা বাবা ছেলের নামে নালিশ করিয়া পাঠান, যে নালিশ জানাইতে আসে, তাহার সামনে বৃদ্ধ খুব বিক্রম দেখান, কিন্তু তার পরেই একেবারে চাপিয়া যান; অধিকন্তু সে হয় ত দুষ্টামির জন্ত সে দিন বাড়ী গিয়া মার খাইবে, এই ভাবিয়া একটু বেশী আদর দিয়াই বিদায় করেন। ছেলেগুলি তাই একেবারে তাঁর মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে, গ্রাহ্যই করিতে চায় না।

এমন দিন অবশ্য চিরকাল ছিল না। নাতিদের পিতৃ-পুরুষ এখনও মাঝে মাঝে পণ্ডিতম'শায়ের বেতের গল্প করে, সে কি ভীষণ প্রহার! তখন যারা ছাত্র ছিল, তারা না কি পাঠশালায় আসিবার সময় প্রায়ই মার আঁচল ধরিয়া কান্না আরম্ভ করিত, অনেকে পাঠশালা আসিবার নাম করিয়া হয় গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিত, না হয় পুকুর-পাড়ে বনের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত। শেষে পণ্ডিতম'শায়ের দূত খবর দিলে বাড়ী হইতে লোক পলাতককে খুঁজিয়া বাহির করিয়া পাঠশালায় রাখিয়া যাইত, সত্য যেন যমের মুখে। পণ্ডিত-ম'শায়েরও কোন লঘুগুরু জ্ঞান ছিল না, গ্রামের জমিদার বোসেদের বাড়ীর ছেলের পিঠে যে বেত পড়িত, বাগ্দী-পাড়ার বা মুচিপাড়ার ছেলেদের পিঠেও ঠিক সেই বেত তেমনি ভাবেই পড়িত। তদানীন্তন জাতি-প্রপীড়িত সমাজের মধ্যে পণ্ডিতম'শায় ছিলেন ঘোর সাম্যবাদী এবং সে সাম্যবাদ প্রচার করিতেন তাঁর বেত্রদণ্ডের ভিতর দিয়া।

সেই পণ্ডিতম'শায় আজ এই পণ্ডিতম'শায়। কালের স্রোতে তাঁর পণ্ডিতগিরির অনেক কিছুই ভাসিয়া গিয়াছে, আছে দাদামশায়গিরি, যার অধিকারে পণ্ডিতগিরির দাবী এখনও চলিতেছে। বয়স হইয়াছে, তিনি নিজেও বুঝিতেন বার্দ্ধক্যের শিথিলতা তাঁকে বেশ গ্রাস করিতে চলিয়াছে, কিন্তু নিজের কাছেও তা স্বীকার চাহিতেন না, অপরের কাছে ত নয়ই। কেহ তাঁর কাছে বয়সের কথা তুলিলে বলিতেন, 'আমার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করবার ক্ষমতা বাড়ছে বই কমছে না, এখন আমি আগের চেয়ে বেশী খাটতে পারি', কথাটা কেউ বিশ্বাস করিত না, তিনি নিজেও বুঝিতেন বিশ্বাস করিতেছে না, কিন্তু বলিতে ছাড়িতেন না। নিজেকেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন তিনি এখন সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মঠ। ঘড়ির কাঁটা উল্টা দিকে চালাইলে সময় চিরকাল যেমন সামনের দিকে চলে তেমনই চলিতে থাকে; বার্দ্ধক্যের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত বৃদ্ধ এ কথাটাকে কিন্তু আমল দিতেই চাহিতেন না। সকলেই জানিত, পাঠশালায় পড়াশুনা বিশেষ কিছু হয় না, তবুও মুখে কেহ কিছু বলিত না। তিনি বহুদিন হইতে যে সম্মান পাইয়া আসিতেছেন, আজ বৃদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া সে দাবী আরও বেশী হইয়াছে, সেটা অগ্রাহ্য করিতে কেহ সাহস করিত না। ফলে পাঠশালায় যাওয়া-আসা করিত কতকগুলি নাতির দল, যারা পড়শুনার ধার যতটা ধারুক বা না ধারুক, বেশ শিখিয়াছিল আব্দার করিতে, অভিমান করিতে, দাড়ি-বেশী পণ্ডিতম'শায়কে নিজেদের সঙ্গী মনে করিয়া তাঁকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে। বাড়ীতে ভাল খাবার হইলে তারা মার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া পণ্ডিতম'শায়ের জন্ত একটা বড় ভাগ আদায় করিয়া আনিত, বাড়ীতে কোন নূতন জিনিষ আসিলে তারা জোর করিয়া তাহা হইতে পণ্ডিতম'শায়ের অংশ ছিনাইয়া আনিত। পণ্ডিত অবশ্য সে সব তাদের মধ্যেই ভাগ করিয়া দিতেন; কিন্তু তবুও তাদের আনা চাই।

এমন করিয়াই দিন কাটিতেছিল। সেদিন পণ্ডিত-ম'শায় বসিয়া আছেন, তাঁর কোলে দুজন উপবিষ্ট, তিনি সস্নেহে তাদের মাথায় হাত বুলাইতেছেন, আর একজন তাঁর কাঁধে দুই হাত দিয়া পিঠের দিকে ঝুলিতেছে; অন্যান্য ছেলেরা মনের আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছে আর গোলমাল করিতেছে। দৃশ্যটি প্রকৃতই উপভোগ্য। একটি শিশু আর একজনকে চিমটি কাটিয়া পালাইয়া গেল, সে তার পিছু পিছু ছুটিল,

আর এক জন কোথা হইতে আসিয়া তার চুল টানিয়া দিল, সে এবার তার পিছু পিছু ছুটিতে আরম্ভ করিল, যে পালাইতেছে তার মাথার সঙ্গে একটা বাঁশের খুঁটির ধাক্কা লাগিল, সে একটু দাঁড়াইল, তারপর আততায়ীকে কাছে দেখিয়া আবার দৌড় দিল ; ওধারে একদল ছেলে একটা কাগজের বল করিয়া ফুটবল খেলিতেছিল, বলটা যে পালাইতেছিল তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল, সে অমনি বলটা পা দিয়া মারিতে মারিতে দলের সঙ্গে খেলায় মাতিয়া গেল ; আততায়ী এবার আসিয়া তাহার চুল টানিয়া পলাইয়া গেল, সে কিন্তু খেলায় মত্ত, ক্ষেপ করিল না। চারিদিকে কেবল ছুটাছুটি, চীৎকার, মারামারি, যেন আকাশের কতকগুলি তারা খসিয়া পড়িয়া একটা ঘরের মধ্যে নিজের স্বভাবসিদ্ধ চাঞ্চল্যের জন্য কেবল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিংবা বাক্সে বন্ধ একপাল প্রজাপতি বাক্সের মধ্যেই উড়িয়া বেড়াইতেছে।

হঠাৎ সব চুপ। গানের সোমের মুখে হঠাৎ তবলা ফাটিয়া গেলে যেমন সকলেই কিছুক্ষণ বেকুব হইয়া বসিয়া থাকে কতকটা সেইরূপ ভাব। ছেলে দুইটি কোল হইতে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, বাকী যে যেখানে ছিল সেইখানেই নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পণ্ডিত ম'শায় চোখ খুলিলেন ; দেখেন নবীন সামনে দাঁড়াইয়া। 'আরে নবীন ভায়া যে, এস এস, কি মনে করে ?' বৃদ্ধ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নবীন তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখে বিরক্তিভাব, চোখে পূর্ণ বিদ্রোহের লক্ষণ, অভ্যর্থনার কোনই উত্তর দিল না। বৃদ্ধ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবীন তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, 'কাজটা ভাল হচ্ছে না, বুঝতে পেরেছেন ?' 'কি ভাল হচ্ছে না, ভাই' ? 'এই পড়াশুনার নামে ছেলেদের মাথা খাওয়া।' এমন কথা বৃদ্ধ কখনও শুনেন নাই, শুনিতে হইবে এ ধারণাও করিতে পারেন নাই। ঘরের চালের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, দুই এক ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িল। নবীন যেমন হঠাৎ আসিয়াছিল, তেমনি হঠাৎ চলিয়া গেল।

নবীন সম্প্রতি বি. এ. পরীক্ষা দিয়া গ্রামে আসিয়াছে। কলিকাতায় বহু পল্লী-রক্ষিণী সভার বক্তৃতা সে শুনিয়াছিল এবং এবার ঠিক করিয়া আসিয়াছিল যে, গ্রামের কাজে লাগিবে। আসিয়াই সে প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক গ্রামের সংস্কার করিতেই হইবে। অনেক বেকার যুবক বাড়ীতে বসিয়া আলস্যে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা প্রভৃতি করিয়া কাল কাটাইতেছিল, সে তাহাদিগকে বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত করিয়াছে, তাহারা এখন তার কর্ম্মের সাথী। এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের হাওয়া বদলাইয়া গিয়াছে, বালকদের মধ্যে আসিয়াছে একটু জীবনের আস্বাদ, যুবকদের মধ্যে কর্ম্মের প্রেরণা। ছেলেদের জন্য খেলাধুলার আয়োজন হইয়াছে যুবকেরাও তাহাতে যোগ দেয়, পুকুরপাড়ে বা বিশালাক্ষীর মন্দিরের সামনে বটগাছের নীচে বাঁধান জায়গাটায় বসিয়া নানাবিধ মুখ-রোচক আলোচনা করাটা এখন অন্যায় মনে করে, সে সময়টুকু কোন কাজে কাটাইবার জন্য তাহারা ব্যগ্র। বৃদ্ধেরাও লক্ষ্য করিতেছেন, হাওয়া বদলাইতেছে ; কিন্তু সম্ভবতঃ বার্দ্ধক্যের কিছু স্থিতিশীলতার জন্যই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে আগ্রহ দেখাইতেছেন না, অথচ প্রকাশ্যভাবে গতিরোধও করিতে চাহিতেছেন না। এক বৃদ্ধের সহিত অপর বৃদ্ধের দেখা হইলে ইহা লইয়া অবশ্য বক্রোক্তি হয় যথেষ্ট, কিন্তু স্পষ্ট উক্তি কখনও শোনা যায় নাই। কাজেই বৃদ্ধদের এ গা-ঢাকা দেওয়ার ভিতর দিয়া একধার দিয়া ইহাই প্রমাণিত হইয়াছিল যে, যুবকেরা শুধু কথায় নয়, কাজে কর্ম্মী হইয়াছে।

মিত্তিরদের বৈঠকখানায় রোজ বৈকালে বৃদ্ধদের বৈঠক বসে ; বৃদ্ধ মিত্তির ম'শায় এ বৈঠকে নিয়মিত ভাবে পান ও তামাক সরবরাহ করিয়া থাকেন ; কাজেই অনেকে একবার আসিয়া অন্ততঃ তামাকটা খাইয়া যায়। সেদিন বোসজা মশায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে সকাল বেলাতেই আসিয়া হাঁকিলেন, "বলি, মিত্তির ভায়া আছ না কি ?"

"এস দাদা, এস—বলি পাত্তাই নাই, ব্যাপারটা কি ?"

"ছিলাম না, ভায়া—কাল এসেছি, ভাবলাম একবার ভায়াকে দেখেই আসি, তা আছ ত ?" "না থেকে আর যাই কোথায় দাদা, আছি ; তবে গেলেই বাঁচি।"

"আরে এখুনি কি ? রামচন্দ্র"—কোণে লাঠিটা রাখিয়া একটু মেকী স্নেহের সুরে এবারে বলিলেন, "কৈ গো, বসতে ত বললে না, বুড়ো হয়েছি বলে কি বসতেই বারণ !"

মিত্তির ম'শায়ও ঠিক তেমনি শ্লেষের সুরে বলিলেন, "তা ত বটেই, বুড়ো যখন হয়েছ তখন কি আর বসবার অধিকার আছে? নিজেই নিজের ঠাঁই দেখতে হবে। তবে বুড়োর বাড়ী যখন এসেছে তখন আর কোন্ লজ্জায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলি, বসে পড়, যা থাকে কপালে দেখা যাবে।" দু'জনেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

চাকর তামাক দিয়া গেল। বোসজা ম'শায় হুঁকায় এক লম্বা টান দিয়া কুণ্ডলাকার ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, 'নাও একটা টান দাও, এর পর ত আর জুটবে না—হুঁকো টানলেই হয় টিকি কাটা যাবে, না হয়······"

মিত্তির ম'শায় হুঁকোটা লইতে লইতে কথাটা ছিনাইয়া লইয়া বলিলেন, 'আরে ভাবনা কিসের, দাদা, তখন না হয় চুলে কলপ লাগিয়ে, পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে, কাঁচি মার্কা সিগারেট টানব, কি বল? "উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন।"

হুঁকোটা দেওয়ালের কোণে রাখিতে রাখিতে মিত্তির ম'শায় যাহাতে অপর কেহ না শুনিতে পারে এমন ভাবে চাপা গলায় বোসজা মহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু যাই বল, ভাই, ছোঁড়াটার ক্ষমতা আছে; ও এসে গ্রামটার মধ্যে একটা নূতন হাওয়া এনেছে, এটা ত একেবারে অস্বীকার করা যায় না, ওর দোষ হল লম্বা লম্বা কথা, ঐ কথাগুলো যদি··· ··"

"তুমি ক্ষেপেছে ভায়া, ও সব হুজুক, হুজুক,—আমি বলছি, দেখে নিও, দুটো দিন থাম, দেখতে পাবে।"

"তা বটে; মরুক গে, যা হয় হোক" মিত্তির মশায় চাপিয়া গেলেন। বোসজা ম'শায় কিন্তু ছাড়িলেন না। "দেখছ না, ছেলেগুলোর মাথা একেবারে খেলে, বুড়োদের আর গ্রাহ্যই নাই। আগে যারা সামনে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে কথা কইতে সাহস করত না, এখন তারা শেয়াল কুকুর বলে গ্রাহ্যই করে না। ও যদি গ্রামে আর কিছু দিন থাকে, বুড়োদের বাস করাই কঠিন হবে দেখছি।'

হঠাৎ চাটুয্যে ম'শায় ত্রস্তভাবে আসিয়া ডাকিলেন, 'মিত্তির ভায়া আছ না কি?" মিত্তির ম'শায় ও বোসজা ম'শায় উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "এস দাদা, এস, ব্যাপার কি?"

"আর ভায়া, দেশটায় আর বাস করা গেল না।"

"তা ত অনেক আগেই জানি; নূতন আবার কি হলো?"

"আমার মাথা আর তোমাদের মুণ্ডু! দেখেছ ছোঁড়াটার আক্কেলটা?"

"আক্কেল ত অনেক দিনই দেখছি, নূতন করে দেখবার মত কি হল?"

"ওহে ভায়া, হাসির কথা নয়; আজ চন্দর ভায়ার পাঠশালে গিয়ে কি করেছে জান?"

একটা অপ্রত্যাশিত অঘটন ঘটার সংবাদ শুনিলে মানুষের যেরূপ ভাব হয় বোসজা ম'শায় ও মিত্তির ম'শায়েরও তাহ হইল; তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই অনুমান করিয়াছিলেন সংস্কারকদের হাতে বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয়ের এবার উদ্ধার নাই, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যই ঘটিল দেখিয়া উভয়েই চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কি কি হয়েছে?"

"ছোঁড়া আজ তাঁর পাঠশালায় গিয়ে বলে যে, চন্দর ভায়া না কি ছেলেগুলোর মাথা খাচ্ছে, তার দ্বারা আর এসব কাজ হবে না, তাকে পথ দেখে নিতে হবে, যদি না নেয় তবে না কি শাসিয়েছে······"

বোসজা ম'শায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "কি? এতদূর স্পর্দ্ধা! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! নচ্ছার, পাজি, বদমায়েস্, থাম্ দেখাচ্ছি! তোমরাই ওর স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিয়েছ, তা না হলে ওর সাধ্য কি যে··বামন হয়ে চাঁদে হাত—বেল্লিক কোথাকার—আমি—আমি যদি বোস্ বংশের হই···আর কথা বাহির হইল না, উত্তেজনার বশে বোস্‌জা ম'শায় প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিলেন।

ক্রমে আরও কয়েক জন বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ব্যাপার শুনিয়া সকলেই স্তব্ধ! চিরমুখর বৈঠক আজ পরিণত হইল, বোবার বৈঠকে।

যাহাকে লইয়া এত আস্ফালন হঠাৎ সেই-ই কয়েক জন সঙ্গী লইয়া সকলের সামনে হাজির হইল। সকলেই ঘৃণায় ভ্রূ সঙ্কুচিত করিয়া উঠিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। নবীন বলিতে লাগিল, "আজ সন্ধ্যে বেলায় দয়া করে সকলে পাঠশালায় যাবেন, খুব জরুরী প্রয়োজন, আপনারা না গেলে কিছু হওয়া সম্ভব হবে না। গ্রামের উন্নতিকল্পে··"

বোস্‌জা ম'শায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। "বলি হাঁ হে ছোকরা, এত বেল্লিকপনা শিখলে কোত্থেকে?

সেদিনকার ছেলে, কতকগুলো লম্বা লম্বা কথা শিখে ল্যাজ গজিয়ে গিয়েছে না কি?"

নবীনের সহচরদের মুখ লাল হইয়া উঠিল, নবীন কিন্তু হাসি মুখে বলিল, 'আপনারা পূজনীয়, অন্যায় হলে তিরস্কার নিশ্চয় করতে পারেন' তা দয়া করে যাবেন, যা হয় সেখানেই ঠিক হবে।'

"তোমার মাথা হবে। কে তোমাদের ঠিক করার কর্ত্তা করেছে হে বাপু?'

"সে ভার ত আপনাদের উপরেই ছিল; আপনারা নেন নি দেখে আমাদের নিতে হয়েছে।"

'খুব হয়েছে; কথায় বলে না, মার চেয়ে আপনি, তারে কয় ডাইনী।'

অনুচরদের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল, "দেখুন, হয় নিজেরা করুন, না হয় আমাদের পথ ছেড়ে দিন; নিজেরা কিছু না করে শুধু বৃদ্ধত্বের দাবী নিয়ে আমাদের গাল দিলে কিছু হবে না।"

আর একজন গলাটা একটু মোলায়েম করিয়া বলিল, "নবীনে ও প্রাচীনে দ্বন্দ্ব চিরকালই চলছে। পথ আটকে রাখা আপনাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে, আটকে আপনারা কখনও রাখতে পারেন নি: সক্রোটিসকে বিষ খাইয়েছেন, যিশুখৃষ্টকে ক্রসে ঝুলিয়েছেন, গ্যালিলিওকে জেলে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সত্যকে চাপা দিতে পারেন নি। আমাদের গালাগালি দিতে পারেন, পথ রুখতে পারেন, কিন্তু বন্ধ করতে পারবেন না। যা সত্য তাই থাকে। ব্যক্তিগত মঙ্গল অমঙ্গলের সেখানে কোন দাম নাই। শরীরের মঙ্গলের জন্য অঙ্গ বিশেষ, এক কালে যতই উপকার করে থাকুক না কেন, আজ যদি বিকৃত হয়, এমন বিকৃত যে সারবার সম্ভাবনা আর নাই, তবে তাকে প্রয়োজন হলে কেটে বাদ দিতে হবে। শাস্ত্রেরও আদেশ—

ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে, গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে, আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥"

নমস্কার করিয়া মৃদু হাসিয়া সকলেই চলিয়া গেল। বৃদ্ধের দল হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যার পর পাঠশালায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। মিত্তির ম'শায়ের বৈঠকখানার সভাবৃন্দ অবশ্য কেহ আসেন নাই। নবীন বক্তৃতা দিতেছে:—

"আপনারা কেউ ভুল বুঝবেন না; ব্যক্তিগত ভাবে আমি কিছু বলছি না, চাই গ্রামের মঙ্গল, চাই সর্ব্বসাধারণের উন্নতি। গ্রামই দেশের প্রাণ:—এরা বাঁচলে দেশ বাঁচবে, এরা যদি মরে দেশের অস্তিত্বও সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাবে, কাজেই এই গ্রামগুলির উপরই নির্ভর করছে আমাদের ভবিষ্যৎ, বাঙ্গলা, তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ। এদের সংস্কার যদি না হয়, যুগাতীতকাল থেকে এদের উপর যে আবর্জ্জনা পড়েছে তা যদি পরিষ্কার করা না হয় তবে শীঘ্রই আমরা চারিদিকে দেখব, মানুষের আবাসস্থলের নামে অস্থিকঙ্কাল-পূর্ণ শ্মশানের কদর্য্য বিভৎসতা, যার মধ্যে শোনা যাবে শৃগালের হুয়া হুয়া ধ্বনি, দেখা যাবে পিশাচের আর নরমুণ্ডবিলাসী দৈত্যদানবের তাণ্ডব-নৃত্য (বক্তৃতা আরম্ভ করিলেই এই কথাগুলি সে অনিবার্য্যভাবেই বলিয়া থাকে)। ঐ যে সামনে পুকুরটী দেখছেন একবার মনে করুন, এটা পূর্ব্বে কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে; এখন এর কর্দ্দমাক্ত জল মানুষ কেন, পশু-পক্ষীরও অব্যবহার্য্য, এর ভিতরটা পঙ্কে পরিপূর্ণ, বাহিরটাও তাই হয়েছে। সেই পঙ্কিলতার জঘন্য বিকাশ, তার মধ্যে সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে অস্বাস্থ্যের, অসংস্কৃতির, অসুন্দরের, এটা তাই আজ একটা উৎকট জঘন্যতার বিরাট নিদর্শন; অথচ আপনারা আপনাদের কল্পনার চোখের সামনে একবার বসান দেখি সেই ভূতপূর্ব্ব মহিমান্বিত গৌরবময় অবস্থা। কি দেখতে পান? কোথায় নন্দনের প্রাণভুলানো, মন মাতানো অপরূপ সৌন্দর্য্য, আর কোথায় নরকের নক্কারজনক পূতিগন্ধময় কদর্য্যতা! কোথায় বসন্তের শ্যামলিমা-শোভিত কুসুম-বিভূষিত উপবনের সুস্নিগ্ধ হাসি, আর কোথায় হাহাকারময় শুষ্ক মরুভূমির হীনতাব্যঞ্জক রিক্ততার আত্মনিবেদন? কোথায় ভ্রমরগুঞ্জিত শতদল বেষ্টিত মনোহর মানস সরোবর, আর কোথায় নিদাঘবক্ষ শোষিত-সর্ব্বস্ব পঙ্কের বিশুষ্ক অভিব্যক্তি! যখনই এ কথা মনে হয়, তখনই প্রাণ কেঁদে উঠে, মনে হয়...... যাক্, সে সব কথা বলে আর আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করতে চাই না, ঐ একটা সামান্য পুকুরের ভিতর দিয়ে বাহির হচ্ছে গ্রামগুলির স্বরূপ। চাই পঙ্কোদ্ধার! ঐ দেখুন পল্লীজননী আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে; অঙ্গ

তাঁর ধূলিমলিন, পরিধানে জীর্ণ বসন, দেহ শত ব্যাধির আশ্রয়স্থল হ'য়ে রক্তহীন, শক্তিহীন, চলচ্ছক্তিহীন,—দীনা-হীনা মা আজ কাতর কণ্ঠে আমাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছেন, কে এমন হতভাগ্য আছে যে সন্তান হ'য়ে তাঁর প্রার্থনা শুনেও শুনবে না, কে এমন অপদার্থ আছে যে তাঁকে দুয়ার হ'তে তাড়িয়ে দেবে তাচ্ছিল্যের ভরে······(আবেগে গলা ধরিয়া গেল ; একটু সামলাইয়া লইয়া) আমায় সকলে মাপ করবেন—আমাদের কায়মনোবাক্যে এ গ্রামের উদ্ধার চাইতেই হবে, অনেক বাধা আসবে, কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চল্‌বে না, শিখতে হ'বে সত্যকে সত্য বলতে, অন্যায়কে অন্যায় বলে ঘোষণা করতে ; যার যা প্রাপ্য তাই তাকে দিতে হবে, প্রকৃতকে গোপন রেখে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেল্‌লে চল্‌বে না। আপনারা হয় ত অনুমান ক'রে থাকবেন কিসের জন্য আজ এখানে আপনাদের আহ্বান করা হয়েছে,—অনুমতি পেলে সে সম্বন্ধে আমার নিবেদন আপনাদের কাছে জানাতে পারি······"

অনেকেই বলিয়া উঠিল, 'বলুন, বলুন,'

নবীনকে দেখিয়া মনে হইল সে বড়ই বিব্রত ; সামলাইয়া লইয়া সে ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে আরম্ভ করিল। প্রথমে আবার সে সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল যে, কর্ত্তব্য অতি কঠোর এবং তার জন্য এমন দৃঢ় হওয়ার দরকার যেন অন্য কোন সম্বন্ধ সেখানে স্থান না পায়। তারপর ক্রমশঃ বৃদ্ধ পণ্ডিত ম'শায় ও পাঠশালার কথা তুলিল এবং সকলকে জানাইল যে পণ্ডিত ম'শায়ের বিশ্রাম লইবার সময় হইয়াছে ; তাহারা সকলে মিলিয়া নূতন স্কুল করিবে যাহা সে অঞ্চলের মধ্যে হইবে আদর্শস্থানীয় ; এতে বাধা দিলে চলিবে না। সে শুধু চায় জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি, ইত্যাদি। কেহ কোন প্রতিবাদ জানাইল না ; সভা ভঙ্গ হইলে প্রত্যেকেই চুপি চুপি নিজের বাড়ী গিয়া বাঁচিল।

যুবকের দল গ্রামে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। যে যা দেয় তাই লয়, বড়লোক দেয় টাকা, দীন-দরিদ্র দু'মুঠো চাল, তারা তাই হাসি মুখে লয়। খাটুনির শেষ নাই, সকালে খোল করতাল লইয়া ভিক্ষার গান গাহিয়া বাহির হয়, ফিরে সন্ধ্যা বেলায়। তাদের এই কর্ম্মপ্রাণতায় সকলেই মুগ্ধ হইল, দান করিবার একটা নেশাও যেন সকলকে পাইয়া বসিল।

পাড়ায় হরে বাগ্‌দী আসিয়া জানাইল, 'বাবু আমি গরীব বলে কি আমার কাছে কিছু নিতে নেই !'

নবীন হাসিয়া বলিল, 'সে কি কথা হরি ! এতো তোমাদেরই কাজ, আজই তোমার ওখানে যেতাম।'

হরি কৃতার্থ হইয়া বলিল, 'বাবু, আমি টাকা পয়সা দিতে পারব না, তবে একটা তালগাছ আছে, যদি দয়া করে নেন দিতে পারি।'

হরি তাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, 'এই ত চাই, ভাই ! ঐ একটা তালগাছের দাম আমাদের কাছে কত জান ? হাজার টাকা।'

তারপর দিন এক বুড়ি দুইটি শশা লইয়া উপস্থিত হইল, বলিল, 'বাবারা সেদিন তোমরা গিয়েছিলে, কিছু দিতে পারি নি ; দুটো শশা হয়েছিল গাছে, এনেছি, নেবে বাবারা ?'

নবীন আনন্দের সহিত বৃদ্ধার দান লইল। সেইদিন হাটের মধ্যে সেই শশা দুইটি লইয়া সে সকলের সম্মুখে লম্বা বক্তৃতা করিল ; সমস্ত ইতিহাস বলিয়া এ দানের মধ্যে যে বিরাট অন্তঃকরণের আভাস যায়, তাহা শ্রোতৃবৃন্দকে অনুভব করিতে অনুরোধ করিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা প্রভৃতি আবৃত্তি করিয়া দেখাইল, এ দান সামান্য হইতে পারে, কিন্তু ইহা অমূল্য ; নিবেদন জানাইল মহাপ্রাণ যাঁরা তাঁদের কাছে, অর্থ-বিনিময়ে এই বহুমূল্য দান কিনিয়া লইতে। দু'টাকায় শশাদু'টি বিক্রয় হইল ; কিনিলেন আমাদের মিত্তির ম'শায়।

তারপর সকলে লাগিল বাড়ী তৈয়ার করিতে। নিজেরাই কাজ করে, স্বেচ্ছায় যে আসে তাকে সঙ্গে লয়, প্রয়োজন মত অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করে। অল্প দিনের মধ্যেই জীর্ণ পাঠশালার স্থানে দেখা গেল, একটা পরিষ্কার সুন্দর ঘর, নূতন দেওয়াল, নূতন ছাউনি, নূতন বাগান, এমনি কি ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করা একজন নূতন শিক্ষক। পুরাতন পণ্ডিত ম'শায় চলিয়া গিয়াছেন, যুবকেরা চাঁদা তুলিয়া মাসে ৫৲ টাকা করিয়া তাঁহাকে দিবে।

পণ্ডিত ম'শায় চলিয়া গিয়াছেন, কোন আপত্তি জানান নাই, ঘুণাক্ষরে কাহাকেও কিছু বলেন নাই। অনেকে যুবকদের উপর দোষ চাপাইয়া তাঁহাকে সমবেদনা জানাইতে

আসিয়াছিল; বাহিরে পণ্ডিত মশায়ের কোনরূপ বেদনার সন্ধান না পাইয়া একপ্রকার বিস্মিত হইয়াই চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর কিন্তু বাড়ীর বাহির হইতে কেউ তাঁকে বড় একটা দেখে নাই। বাড়ীর সংলগ্ন একটি ছোট বাগান ছিল, সেইখানে কাজ করিতেন, আর বাদ-বাকী সময় চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। তাঁর পরিচর্য্যার ভার ছিল তাঁর বিধবা কন্যার উপর, সে ছাড়া আপন বলিবার তাঁর আর কেউ ছিল না। সে বেচারী বাবার এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে ভীত ও ততোধিক বিচলিত হইয়াছিল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলে নাই, বরং প্রায়ই সুবিধা পাইলে বাবাকে জানাইবার চেষ্টা করিত যে, এই বয়সে এ অবসর তাঁর পক্ষে খুব ভাল হইয়াছে। বৃদ্ধ তার দিকে চাহিয়া রহিতেন, কিছু বলিতেন না, কখন কখন এক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইত, কন্যা খুঁজিয়া পাইত না, এরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আগুনে গ্রামটা পুড়িয়া যায় না কেন?

প্রত্যহ দুপুরে আহারের পর বৃদ্ধ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করেন, যদিও ঘুমের পরিবর্ত্তে খানিক বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করেন মাত্র। সে দিন কিছুক্ষণ এই ভাবে পড়িয়া থাকিয়া হুঁকাটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন, পাঠশালা হইতে বিদায় লওয়ার পর এই তাঁর প্রথম বাড়ীর বাহির হওয়া। পাঠশালা তখনও চলিতেছিল; আগেকার ব্যবস্থা সব বদলাইয়া গিয়াছে, চেয়ার আসিয়াছে, বেঞ্চ আসিয়াছে, টেবিল আসিয়াছে, ছেলেরা বেঞ্চের উপর সোজা হইয়া বসিয়া আছে, টুঁ শব্দটি নাই, মাষ্টার মশায়ের গম্ভীর মুখ, ছেলেদের ততোধিক, যেন খুনী আসামীর দায়রার বিচার হইতেছে। ছেলেদের আর সে আনন্দের চাঞ্চল্য নাই, শৃঙ্খলার কঠোর বন্ধন স্কুলটাকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। নবীন এখন স্কুলের সম্পাদক, স্কুলটার তত্ত্বাবধান করা হইয়াছে এখন তার দুপুরের কাজ।

বৃদ্ধ অদূরে বটগাছটার নীচে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, চোখের সামনে ভাসিতে লাগিল, তাঁর সময়ের পাঠশালার ভূতপূর্ব্ব অবস্থা আর বর্ত্তমানের এই শৃঙ্খলতা; নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা হইল এবং বৃদ্ধের মনটী ভরিয়া উঠিল আত্মগ্লানিতে। এরা ত মিথ্যা বলে না। যোগ্যতা ওদের প্রকৃতই আছে, উচিত হইয়াছে ওদের ও ভার নিজেদের উপর নেওয়া। তিনি কেন মিছামিছি বার্দ্ধক্যের অকর্ম্মণ্যত্ব লইয়া এতদিন ও স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন? আগে হইতে ওদের উপর সব ছাড়িয়া দিলে জিনিষটা আরও সুশোভন হইত।... বাস্তবিকই বৃদ্ধেরা অকর্ম্মণ্য, তাদের অস্তিত্বের কোন দাম নাই, তাদের থাকিবার অধিকার নাই। দুর্ব্বল শিশু বল প্রকাশ করে কাঁদিয়া, দুর্ব্বল বৃদ্ধ জোর করিয়া স্থান অধিকার করিয়া থাকে ভূতপূর্ব্ব সামর্থ্যের দোহাই দিয়া। প্রকৃতই অন্যায়! বৃদ্ধ দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিসের জন্য লুপ্ত অস্তিত্বের চর্ব্বিত চর্ব্বন করিতে করিতে টিকিয়া থাকা?—কিসের জন্য একদিন যা ছিল তাই লইয়া বর্ত্তমানের রিক্ততা প্রমাণ করা?—একটা কিছু করিবেন ঠিক করিলেন, কিন্তু কি তা জানা নাই!—উত্তেজনার বশে কয়েক পা অগ্রসর হইলেন। পিছন হইতে মৃদু কণ্ঠে কে ডাকিল 'দাদু, দাদু, আমি এসেছি' বৃদ্ধ শিহরিয়া উঠিলেন, মুখ দিয়া বাহির হইল শুধু ছোট একটি 'হুঁ'। পাঠশালা ছাড়িবার পর প্রথম এই 'দাদু' সম্বোধন শোনা, বুক দুর দুর করতে লাগিল, শরীরের প্রতি লোমকূপ সজাগ হইয়া উঠিল, বৃদ্ধ বিভোর হইয়া পড়িলেন, যেন অনন্ত সুখ ঘনীভূত হইয়া জমাট্ বাঁধিয়া গেল বৃদ্ধের হৃদ্‌পিণ্ডটুকুর মধ্যে!—যে চাঞ্চল্য চোরের মত আসিয়াছিল তাহা যেন চোরের মতই পালাইয়া গেল, অন্ততঃ সেই ক্ষণের জন্য পালাইল। বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিলেন, আর দাদুটি চির-অভ্যস্তভাবে পিঠের উপর ঝুলিতে থাকিল! সময় কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, স্কুল-ঘর, শিক্ষক ছাত্র সব যেন কোথায় বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় যেন এক আবর্ত্তের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছেন; শূন্যে সব একাকার হইয়া গিয়াছে! কতক্ষণ যে এইরূপে কাটিল বৃদ্ধের খেয়াল নাই! যখন চোখ খুলিলেন, দেখেন দাদুটী নাই, তিনি একাই বসিয়া আছেন।...হঠাৎ কাণে আসিল, শপাশপ্ বেতের শব্দ আর সেই সঙ্গে দারুণ চীৎকার, 'আর যাবো না, আর যাবো না, ওরে বাবা, ওরে মা—...' দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া বৃদ্ধ ছুটিয়া চলিলেন, পাগলের মত পাঠশালার ভিতর ঢুকিয়া বেত কাড়িয়া লইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ছেলেটার লাগছে যে, এ হতেই পারে না—কিছুতেই হতে দেবো না!' সব ছেলেরা 'দাদু' 'দাদু' করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নবীন অন্য ঘর হইতে আসিয়া রুদ্রমূর্ত্তিতে কিছুক্ষণ বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর অতি কঠোরভাবে বলিল, 'আপনি চলে যান এখান থেকে; স্কুলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কারও কিছু বলবার নাই—চলে যান'। বৃদ্ধের জ্ঞান হইল, 'তা—তা—হাঁ—কি বলে—ছেলেটার লাগছে যে...কিন্তু...' সম্মুখে কঠোরমূর্ত্তি নবীন তখনও দাঁড়াইয়া,—থামিয়া গেলেন, পরক্ষণেই একবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—তৎক্ষণাৎ আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া স্থির ধীরভাবে চোখের জল পর্য্যন্ত মুছিবার অবসর নিজেকে না দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। একবার একটু থামিয়া বলিলেন, 'হুঁকোটা এনেছিলাম কি? তাই তো।'

সন্ধ্যা বেলায় বৃদ্ধের অসুস্থতার সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। খুব জ্বর, অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছেন, কোন সাড়া শব্দ নাই। বৃদ্ধেরা সকলেই আসিয়া জুটিয়াছেন ও মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া আছেন। গ্রামের শ্রীচরণ

কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছেন। করিবার কিছুই নাই, রোগীকে ঔষধ খাওয়ান অসম্ভব। ক্রমে গ্রামের অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—কেহ বাড়ীর বাহিরে, কেহ বৈঠকখানায়, কেহ ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন, কিংবা দাঁড়াইয়াই থাকিলেন। সকলেই কিছু বলিবার জন্য যেন গুমরিয়া মরিতেছেন, কিন্তু বলিতেছেন না বা বলিতে পারিতেছেন না। স্নেহাস্পদের সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়জনের যে অবস্থা হয় আজ যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহাদেরও হইয়াছে তাই!···নবীন গ্রামের এম. বি. পাশ করা ডাক্তার ও কয়েকজন সঙ্গী লইয়া প্রবেশ করিল, তার হাতে আইসব্যাগ, বরফ, ইত্যাদি। ঘরে ঢুকিয়া সে একবার চারিদিক্ তাকাইয়া লইল এবং তারপর সঙ্গীদের বলিল, 'অভিভূত হলে চলবে না; মনে রাখতে হবে গীতার সেই কথা, 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'

শুশ্রূষার যথোচিত ব্যবস্থা হইল, ডাক্তার দুই একটা ইনজেকসন করিয়া পাশে একটা চেয়ার লইয়া বসিলেন। সকলে তেমনি নির্ব্বাক্ অবস্থায় বসিয়া সব দেখিতে লাগিলেন; এঁদের শুশ্রূষার মধ্যে যেমন নূতনত্ব তেমনি পারিপাট্য।

···বরফ ফুরাইয়া যাওয়ায় আইসব্যাগ লইয়া যারা মাথায় বরফ দিতেছিল তাহারা গিয়াছে পাশের ঘরে, পায়ের দিকে যে দুইজন ছিল তাহারা কি কাজে গিয়াছে বৈঠকখানার দিকে, ডাক্তার বসিয়া আছেন, কয়েকজন যুবক ঘরের মেঝের উপর বসিয়া আছে, বৃদ্ধেরা যে যেখানে ছিলেন সেখানেই আছেন—হঠাৎ পণ্ডিত ম'শায় বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। দু'টি চোখ হইতে যেন আগুন বাহির হইতেছে। সজোরে শূন্যে হস্ত সঞ্চালন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ছেলেটার লাগছে যে—এ আমি কিছুতেই হতে দেব না—কিছুতেই না—না—না · হাঃ · হাঃ···যাচ্ছে—যাচ্ছে—হাঃ—হাঃ··" তারপর সব নিস্তব্ধ। যুবকেরা ছুটিয়া আসিল—মিত্তির মশায় হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, 'খবরদার হাত দিস না,—ওর সৎকার আমরা বুড়োরাই করব।'—স্তম্ভিত যুবকবৃন্দ যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

পুস্তক-পরিচয়

সাহসীর জয়যাত্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত, প্রকাশক এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, ১২ নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। দাম একটাকা।

ছেলেদের উপযোগী করিয়া লেখা। আলোচ্য পুস্তকে আটটি চরিত-কথা সন্নিবেশিত আছে। আটজনই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উল্লেখযোগ্য এবং সর্ব্বজনবিদিত। শিশু-সাহিত্যে এরূপ ধরণের পুস্তক সাধারণতঃ সুলভ নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আজগুবি গল্প এবং উপন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার এরূপ একখানি পুস্তক লিখিয়া শিশু-সাহিত্য-জগতের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পুস্তকের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান পৃথিবীর রাজনৈতিক আবহাওয়ার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, সেগুলি অবান্তর হয় নাই। গ্রন্থকার সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসাবে ইতিপূর্ব্বে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। ছেলে-মেয়েদের উপযোগী তাঁহার প্রথম পুস্তক সাহসীর জয়যাত্রাতেও তাঁহার সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকিবে। গ্রন্থকারের লিখন-শৈলী প্রশংসনীয়। পুস্তকখানি আমাদের ভালই লাগিয়াছে। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ত্রিবর্ণরঞ্জিত প্রচ্ছদপট, উত্তম ছাপা ও কাগজ চিত্তাকর্ষক।

—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সর্পদংশন ও বিষচিকিৎসা—(ভারতীয় সর্পশ্রেণী ও বিষতত্ত্ব সম্বলিত)। ডাঃ শ্রীক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীমতী অমিয়বালা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা। ৫৯ নং চড়কডাঙ্গা রোড, বেলেঘাটা, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

বর্ত্তমানে সর্পদংশন চিকিৎসার পুস্তক, বাঙ্গালা দেশে খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহা পাওয়া যায়, তাহাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। গ্রন্থকার অনেক যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে যেরূপ সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রন্থটী লিখিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থখানিকে একটি বিশিষ্ট চিকিৎসা পুস্তক বলা চলে। ভারতীয় সর্পশ্রেণীর বিবরণ, সুন্দর চিত্রাবলী, বিষতত্ত্ব, নরদেহ ও অন্যান্য প্রাণীর উপর বিভিন্ন সর্পবিষের ক্রিয়াদি, দেশপ্রচলিত ওঝা, টোটকা ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক-ভাবে নানা প্রকার চিকিৎসা প্রণালী, প্রাথমিক সাহায্য প্রদান, ও রোগীবিবরণ প্রভৃতি এরূপ সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সকল দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে পুস্তকখানি যে সকলেরই পক্ষে খুব কাজাকরী হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পুস্তকখানির ভাষা খুব প্রাঞ্জল। সাধারণ পল্লীবাসী গৃহস্থ, ভ্রমণকারী, চিকিৎসক প্রভৃতিদিগের পক্ষে পুস্তকখানি খুব উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয়। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাজিয়া

—শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

বাঙলা দেশের কথাই বলিতেছি—তবে দেড়শ বৎসর আগের কথা।

ফরিদপুর জেলার সোনাপুর গ্রাম, তখন কিন্তু ফরিদপুর জেলা ছিল না—যশোহরের মধ্যেই ছিল এ-সব। চন্দনা নদী, তারই বা কি প্রতাপ—মাত্র একশ' বৎসর আগেও ইহারই বুকের উপর দিয়া চৈত্র মাসেও বড় বড় সদাগরী নৌকা দুই তিনখানা পাল টাঙ্গাইয়া দিয়া অবাধে ছুটিয়া চলিত। আজ মানুষের পায়ে হাঁটিয়া পারাপার করে।

গ্রামটি একেবারে চন্দনার ধারে। তখনকার দিনে সারা গ্রামখানা লোকে গিসগিস্ করিত।

বুড়োরা বলেন, "গাঁয়ে কি কুটোটি ফেলবার জায়গা ছিল? লোকেরও অর্থ-সামর্থ্যের তুলনা ছিল না।" প্রবাদ আছে,—সে কোন্ কালের কথা, সন-তারিখ অবশ্য ঠিক করিয়া কেহই বলিতে পারে না, এই গ্রামের নাম ছিল ছাইপুর। কোন্ এক বাদ্‌শা না নবাব না কি, এই পথ দিয়া কোথায় যাইতে-ছিলেন—পথের মধ্যে এখানে তাঁবু ফেলেন। গ্রামের সমৃদ্ধি দেখিয়া তিনি অবাক হন। তিনিই ইহার নাম বদলাইয়া ছাইপুরের পরিবর্ত্তে সোনাপুর রাখেন। সে কত কালের কথা, সে কথা বলা বড় মুস্কিল। বৎসরের পর পর বৎসর জমা হইয়া, সে সব কাহিনীর সমাধি রচনা করিয়া দিয়াছে। আর মানুষের মুখের দুই একটা শোনা কথাতে কি ইতিহাস লেখা চলে?

দেড়শ বৎসর আগের কথাই বলি। তখনও সোনাপুর সোনাপুরই ছিল—গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোপ, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, যুগী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকে ভরা। ব্রাহ্মণের প্রভুত্বই সকলের উপরে—জমিদার ব্রাহ্মণ, মারামারি লাঠা-লাঠিতেও ব্রাহ্মণ—সকল ভাল-মন্দেই ব্রাহ্মণ। কাজিয়া, খুন-জখম তো ছিল সেকালের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কেন এমন ছিল বলিতেছি। দুই ঘর জমিদার—মৈত্র আর বাগচি। গ্রামের সব লোক এই দুই ঘরকে কেন্দ্র করিয়া বাস করিত। হয় বাগচির দলে—আর না হয় মৈত্রের দলে—দুই দলের যে কোন এক দলে বাধ্য হইয়া সকলকে যোগ দিতেই হইত। লোকে বলিত, বাগচির ছিল মাটির জোর আর মৈত্রের ছিল লাঠির জোর। এক এক বাড়ীতে একশ করিয়া লাঠিয়াল বাঁধা থাকিত, এর পর কাজিয়া, দাঙ্গা হইলে আরও নূতন লাঠিয়াল রাখা হইত।

তখনকার লোকের খোলা প্রাণ ছিল। হাসি, তামাসা, নাচ, গান, কবি, পাঁচালী, এই সব লইয়া একেবারে মাতিয়া থাকিত। দোষও যে না ছিল এমন নয়। মদ খাওয়া আর আনুষঙ্গিক অন্যান্য জিনিষের প্রশ্রয় দেওয়া ছিল। সোনাপুরেও দুইটি মদের ভাঁটি ছিল। সারা রাত ধরিয়া গ্রামের অনেক বড় বড় ব্যক্তিরাই আনা-গোনা করিত সেখানে। এখানকার কবির দলের নাম ছিল এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। এখনও এ অঞ্চলের চাষা-ভূষার দল সোনাপুরের কোন পথিক দেখিলে জিজ্ঞাসা করে, "কোন্ সোনাপুরে বাড়ী মোশায়?"

সোণাপুরের ভুলীর দল,
গল্প করে হলাহল
—জাংলাতে কদু,
—আচ্ছা উত্তর দিয়ে গেল
মহিম চাঁদ বসু।

—সেই সোনাপুর?

মহিম ছিল তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা—আর উলী ছিল দলওয়ালী। এ সব দলের আবার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গ্রামের জমিদারগণ। যাক্ এ সব কথা।

জমিদার ভবতারণ মৈত্রের শ্রাদ্ধ বড় ঘটা করিয়া শেষ হইয়া গেল। শ্রাদ্ধের গোলমাল থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার মৈত্র বাড়ীর দেউড়ীতে ঢাল-সড়কি প্রভৃতি তৈরীর ধুম পড়িয়া গেল। নিত্য নূতন নূতন লাঠিয়াল আসিয়া কাজিয়া করিবার বায়না লইতে লাগিল।

নবীন বাগচির সঙ্গে একটা আম-কাঁঠালের বাগানের স্বত্ব লইয়া গোলযোগ। জমিদার ভবতারণ মৈত্র বাঁচিয়া থাকিতেই

গোল-যোগের সূত্রপাত; কিন্তু ভবতারনের ভয়ে বাগচিরা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ভবতারণের মৃত্যুর পাঁচ সাত দিন পরেই বাগচিদের লাঠিয়াল আসিয়া বাগানের সমস্ত আম-কাঁঠাল পাড়িয়া লইয়া গিয়াছে—আর বাগানের চারি পাশে পাহারা বসাইয়াছে। তাই এত তোড়-জোড়।

ওদিকে বাগচিরাও নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া নাই—সেখানেও পূর্ণোদ্যমে উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে। গ্রামের লোকে তো ভয়ে প্রাণ হাতে করিয়া আছে না জানি কখন কার কি হয়!

কাজিয়ার আর বেশী দেরী নাই,—রাতটুকু শেষ হইলেই মৈত্রদের লাঠিয়ালেরা গিয়া বাগান অধিকার করিবে ঠিক হইয়াছে। ভবতারণ মৈত্রের শ্যালক শ্যামাশঙ্করই এ দলের নায়ক। শেষরাত্রে উঠিয়াই তিনি সমস্ত যোগাড়যন্ত্র করিতেছেন। সমস্ত লাঠিয়ালেরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া বৈঠকখানার সম্মুখের প্রাঙ্গণে লাঠি ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। লাঠির ঠকাঠক্ শব্দে কানে তালা লাগিবার সম্ভাবনা।

কিন্তু এত যে উদ্যোগ আয়োজন, তবু বাড়ীর যিনি মালিক, যিনি জমিদার, তাঁহার খোঁজ নাই। দোতলার একটি কক্ষে নবীন জমিদার বিলাসবিহারী এক মনে কী চিন্তা করিতেছে। পাতলা ছিপ্‌ছিপে সুন্দর চেহারা—বয়স কুড়ি বাইশ, ইনিই জমিদার ভবতারণ মৈত্রের একমাত্র পুত্র।

ভবতারণ মৈত্র পুত্রকে বড় ভাল চক্ষে দেখিতেন না, কারণ এ বংশে এমন অপদার্থ পুত্র না কি আর জন্মে নাই। এ বংশের ছেলেরা ছোট বেলা হইতেই লাঠি ধরিতে শিখে, ঘোড়ায় চড়িতে শিখে, লড়াই-কাজিয়ার নাম শুনিলে তাহাদের প্রাণ নাচিয়া উঠে। কিন্তু বিলাসবিহারী একেবারে অন্য ছাঁচে গড়া। সে লড়াই-কাজিয়ার ধার দিয়াও যায় না, এমন কি দুর্গোৎসবের সময় মহিষ আর পাঁঠাবলিটা পর্য্যন্ত দেখিতে পারে না। পাশের গ্রাম মাজবাড়ীর এক বৈষ্ণব গুরুর নাম তখন দেশপ্রসিদ্ধ। তিনি তখনকার দিনে বৈষ্ণবদের শীর্ষস্থানীয়।

ভবতারণ যখন শুনিলেন যে, ছেলে বিলাসবিহারী গোপনে গোপনে সেই আখড়ায় যায়, আর শ্রীচৈতন্যের লীলা-কীর্ত্তন শুনিয়া কাঁদিয়া একাকার করে, তখন তিনি স্থির করিলেন, এ ছেলের দ্বারা আর জমিদারী রক্ষা সম্ভবপর নহে। তাই মৃত্যুর পূর্ব্বে উপযুক্ত লোককে আনিয়া ছেলের অভিভাবক করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—বিলাসবিহারীর মাতুল শ্যামাশঙ্কর।

বিলাসবিহারী এক মনে এই সবই ভাবিতেছিল। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে কি কাণ্ডই না আরম্ভ হইবে, মাত্র দুচার ঝুড়ি আমের জন্য কয়টি খুন হইবে কে জানে? কিন্তু ভাবিয়া কোন ফল নাই। সে জমিদার বটে, কিন্তু শ্যামশঙ্করের হাতের পুতুল মাত্র। তাহার কোন কথারই কোন মূল্য নাই। দুই একদিন সে প্রতিবাদ করিয়াও ছিল, "কাজ কি বিবাদ বিসম্বাদে? কতটুকুই বা বাগান তারই জন্যে"—কিন্তু কথা শেষ করিতে পারে নাই—শ্যামাশঙ্কর ধমক দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়াছে—"কতটুকু বাগান! তাই অমনি ওদের ছেড়ে দিতে হবে বুঝি? তোমার কাজ নয় বাপু জমিদারী করা—কৌপীন নিয়ে বৈরাগী হলেই ভাল মানায়!"

বিলাসের মুখে আর কথা জুয়ায় নাই—মুখ কাঁচু-মাচু করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

ওদিকে উদ্যোগ-পর্ব্ব যেমন ঘটা করিয়া আরম্ভ হইল, শেষ পর্ব্বে কিন্তু তাহার কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না। বাগান কাড়িয়া লওয়া তো দূরের কথা, বাগচিদের লাঠির কাছে মৈত্রদের লাঠিয়ালেরা দাঁড়াইতেই পারে নাই, শেষে কাজিয়ায় পিঠ দিয়া পলাইয়া বাঁচিয়াছে! বাগচি বাড়ীর বৈঠকখানা যখন গান-বাজনায় সরগরম হইয়া উঠিয়াছে, এ বাড়ীতে শ্যামাশঙ্কর তখন নিজের লাঠিয়ালদের গাল পাড়িতেছে আর মনে মনে গর্জ্জাইতেছে।

২

বিজয়া-দশমীর দিন চন্দনার বুকের উপর পাল্লা করিয়া নৌকা বাইচ্ হয়। গ্রামে প্রায় দেড়শ ঘর জেলের বাস। তাহাদের মধ্যেও দুই দল, বাগচির প্রজারা বাগচির দলে, মৈত্রের প্রজারা মৈত্রের দলে। কিন্তু সে বারের নৌকা বাইচের আড়ম্বর হইল একটু অন্য প্রকারের। নৌকায় বৈঠা লইয়া মাঝিরাও উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাল-সড়কি লাঠি লইয়া লাঠিয়ালেরাও উঠিল। এই উপলক্ষে দক্ষিণের নমশূদ্র সর্দ্দারেরা আসিয়া কোন না কোন দলে যোগ দিতে লাগিল।

বিজয়া-দশমীর দিন চন্দনার কূলে কূলে আড়ং বসে। কোথায়ও পুরুষদের ভিড়, কোথায়ও মেয়েদের ভিড়। সেবার মেয়েদের ঘাট একেবারে শূন্য পড়িয়া রহিল, পুরুষদের ঘাটেও ভিড় খুবই কম। সকলে ভয়ে অস্থির, কি হয়, কি হয়! দুই পক্ষই যখন প্রতিমা নৌকায় উঠাইয়া, পিছনে পিছনে বড় বড় বাইচের নৌকায় একেবারে ঢাল-সড়কি লইয়া প্রস্তুত, এমন সময় দূরে নাকাড়া পেটার শব্দ শুনা গেল। সংবাদ আসিল, সিপাহী বরকন্দাজ লইয়া দারোগা আসিতেছে—দাঙ্গা থামাইতে। সুতরাং আর আস্ফালন চলিল না। দুই পক্ষই ঢাল সড়কি নৌকার পাটাতনের তলে লুকাইয়া সারি-গান সুরু করিয়া দিল। একটু পূর্ব্বেই যেখানে ঢাল-সড়কির রক্তারক্তি কাণ্ড চলিবার উপক্রম হইয়াছিল, এখন সেখানে রাধাকৃষ্ণের মান-অভিমানের পালা চলিতে লাগিল। গণ্ডগোল আর কিছুই হইল না বটে, কিন্তু প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময় দুই পক্ষের নৌকার ঠেলা-ঠেলিতে দুর্ভাগ্যক্রমে শ্যামা-শঙ্কর নিজে যে নৌকায় ছিলেন, সেই নৌকাই গেল একেবারে কাৎ হইয়া ডুবিয়া। আরও দুর্ভাগ্য, বাগচিদের নৌকার মাল্লারাই উঠাইল তাঁহাকে জল হইতে টানিয়া। অন্যান্য লোক সব কোন প্রকারে সাঁতার কাটিয়া কূল পাইল।

শ্যামাশঙ্কর যখন তীরে আসিয়া লাগিলেন—তখন দেখা গেল, পিছন হইতে কে যেন তাঁহার গলায় জুতার মালা পরাইয়া দিয়াছে। ও পক্ষের লোক তখনই হৈ চৈ করিয়া আসিয়া শ্যামাশঙ্করকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু দারোগা উপস্থিত থাকায় ব্যাপারটি আর বেশীদূর গড়াইল না। কেবল শ্যামাশঙ্করই মরমে মরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

এই সব কাণ্ড যখন চন্দনার ঘাটে চলিতেছিল, তখন বিলাস-বিহারী নিজের বৈঠকখানায় বসিয়া একবার তাকাইতে-ছিল শূন্য মণ্ডপের দিকে, একবার তাকাইতেছিল চন্দনার ঘাটের দিকে। বুক তাহার দুরু দুরু করিতেছিল, এখনই হয়তো কি দুঃসংবাদ আসিবে। এক এক পক্ষে হয়তো কয়টা করিয়া খুন-জখম হইয়া গিয়াছে।

৩

মাস খানেক পরের কথা। রাত্রি আর বেশী নাই, জ্যোৎস্না ডুবু-ডুবু হইয়াছে, আধখানি চাঁদ পশ্চিম আকাশে একেবারে কাৎ হইয়া পড়িয়াছে। নবীন বাগচি একটি বিশেষ স্থান হইতে প্রায়ই এত রাত্রে বাড়ী ফিরেন। আজও ফিরিতেছিলেন, সঙ্গে জন দুই পাইক। সোনাপুরের হাট হইতে বাগচি-বাড়ী আধ মাইলের কম নয়। রাস্তার দুই ধারে লোকের বসতি, কোথায়ও কোথায়ও বাঁশ-ঝাড়, আম-কাঁঠালের বাগান। এই পথ দিয়াই আধ-আলো আধ-অন্ধকারে নবীন বাগচি টলিতে টলিতে পা ফেলিতেছিলেন। যুগীপাড়ার শেষে যেখানে রাস্তাটার বাঁক, সেখানে একটু জঙ্গলের মত, দুই ধারের অগাছায় রাস্তা অন্ধকার। সেই-খানটায় আসিতেই কাহার লাঠির আঘাতে নিধু পেয়াদা ঘুরিয়া রাস্তার এক পাশে গিয়া পড়িল। ব্যাপার দেখিয়া অন্য সঙ্গী বন-জঙ্গল ভাঙ্গিয়া দিল দৌড়।

তার পরের ব্যাপারগুলা পরের দিন সকালে প্রকাশ পাইল। সারা গ্রামময় হৈ চৈ পড়িয়া গেল—নবীন বাগচিকে রাত্রে কাহারা খুন করিয়া গিয়াছে, লাস পাওয়া যাইতেছে না। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর দিন দুই বাদে, চন্দনার মধ্যে মৃতদেহ পাওয়া গেল—আত্মীয়-স্বজন গিয়া কোন মতে সৎকার করিয়া আসিল। কোথাকার ব্যাপার যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইল, গ্রামের কাহারও আর তাহা বুঝিবার বাকী রহিল না। কিন্তু মুখ ফুটিয়া শ্যামাশঙ্করের ভয়ে কেহই কিছু বলিতে পারিল না।

শ্যামাশঙ্করের নৃশংসতা, নবীন বাগচির মৃত্যু এবং বাগচি-বাড়ীর মেয়েদের বুকভাঙ্গা কান্না যেন বিলাসবিহারীকে আরও সংসারে বীতস্পৃহ করিয়া দিল।

মৈত্রবাড়ীর বুড়া তারিণীচরণ ছিল, বিলাসবিহারীর একাধারে মাতা বল, বন্ধু বল, চাকর বল—সব। মায়ের মৃত্যু হইলে সেই ছোটবেলা হইতে বিলাসকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। বিলাস তারিণীদাদা ছাড়া জানিত না। এক মুহূর্ত্ত তাহাকে ছাড়া থাকিতে পারিত না। সে দিন তারিণী চুপি চুপি আসিয়া খবর দিল, "বিলাস দাদা—শুনেছ ব্যাপার? কি হ'লো বল তো?" বিলাস উদ্বিগ্নমুখে তাহার দিকে তাকাইল।

তারিণী বলিল, "আমি আড়াল থেকে শুনে এলাম, তোমার মামা দক্ষিণপাড়ার সদ্দারদের সঙ্গে পরামর্শ করছে, নবীন বাগচির বংশের আর কাউকে না কি রাখবে না। আহা,

কচি কচি সব দুধের বাচ্ছা, ওদের দেখবার যে আর কেউ নাই !"

—"তুমি নিজ কানে শুনে এসেছ তারিণী দাদা ?"

—"হাঁ নিজের কানে না শুনে কি ভাই তোমার কাছে বলি ! কেন করতে চায় জান ? নবীন বাগচির ছেলে অভাবে ও পক্ষের বিষয়ের মালিকও যে তুমি। বাগচিরা আর মৈত্রেরা তো ছাড়া নয় ! ওদের নিকট-আত্মীয় যদি কেউ থাকে তো তোমরাই। তোমরা তো ভাই এ সব জেনেও জান না—বিবাদ-বিসম্বাদে এখন মুখ-দেখাদেখি নাই !"

বিলাসবিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা তারিণী দাদা, জমিদারী দেখা শুনার ভার আমি নিজ হাতে নেব ?—কি বল তারিণী দাদা, পারব না ?"

—"কেন পারবি না ভাই—তুই কি জমিদারের ছেলে নস্ !"

বিলাসবিহারী উত্তর শুনিয়া সামান্য হাসিল, তারপর বলিল, "হুঁ, কিন্তু জমিদাররা কি মানুষ ?"

সে দিন দপ্তর-খানায় বসিয়া শ্যামাশঙ্কর একা একা কি কাগজপত্র দেখিতেছিল। বিলাসবিহারী নিকটে আসিয়া বলিল, "মামা, একটা কথা !"

কাগজের দিকে মুখ রাখিয়াই শ্যামাশঙ্কর উত্তর করিলেন, —"বল।"

বিলাস উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিল, উত্তেজিত হইয়াই জবাব দিল, "কথাটা অত সোজা নয়—ভাল করে শুনুন।"

শ্যামাশঙ্কর বিস্মিতভাবে মুখ তুলিলেন। বিলাসবিহারী বলিল, "জমিদারী সাত দিনের মধ্যে আমি নিজে বুঝে নেব, এখন থেকে সব আমি নিজে দেখা-শুনা করব, আপনি বিশ্রাম করুন।"

শ্যামাশঙ্কর সহসা হয় তো বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না যে, বিলাসবিহারী নিজে এই কথা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে !

শ্যামাশঙ্কর উত্তর দিলেন, "তার পর ?"

—"তার পর আর কি?

—ভাল। কিন্তু জমিদারী কিসের উপরে খাড়া আছে জান ? লাঠির উপরে ; লাঠি যার মাটি তার। যাও নিজের কাজে যাও, বিরক্ত কর না।"

বলিয়া শ্যামাশঙ্কর নিজেই গৃহত্যাগ করিয়া গেলেন।

বিলাসবিহারী অভিমানে ফুলিতে লাগিল, কিন্তু বুঝিল, মামা মিথ্যা বলে নাই। দক্ষিণপাড়ার সর্দ্দাররা সব শ্যামাশঙ্করের হাতের মধ্যে। তাহাদের প্রধান ব্যবসাই শ্যামাশঙ্করের হুকুমে গ্রামে যে একটু অবস্থাপন্ন, তাহার উপরেই অত্যাচার করিয়া অর্থ আদায় করা।

যাহা আদায় হইত, তাহা শ্যামাশঙ্কর আর সর্দ্দারেরা ভাগাভাগি করিয়া লইত। চন্দনা দিয়া কোন মহাজনী নৌকা যাইতে হইলেই ইহাদের হাতে পড়িতে হইত। যাহারা স্বেচ্ছায় ইহাদের নজর না দিত, তাহাদের জিনিষপত্র ইহারা লুটিয়া লইত। নবীন বাগচি জীবিত থাকিতে তবু ইহাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, কিন্তু এখন আর ইহাদের উপরে কথা বলে কে !

বিলাসবিহারী সকলই জানিত।

৪

বিলাসবিহারীর ঘরে বসিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে তারিণী যেন কি করিতেছিল। বিলাস ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল—

—"সোনাপুর ছেড়ে যেতে পারবে তারিণীদা ? দু'এক দিনের জন্য নয়—একেবারে জন্মের মত ?"

—"কেন কি হয়েছে বিলাস ?"

—"নূতন করে কিছুই হয় নি তারিণীদা। মামা বিষয় আমার হাতে দেবে না, তার কথায় দক্ষিণপাড়ার লাঠিয়ালেরা উঠে বসে, জোর তো তারই। কথা না শুনলে কবে হয় তো আমারই নবীন বাগচির দশা হয় দেখ !"

—"ছিঃ, কি যে বলিস বিলাস ! তোর যদি এ-ই ইচ্ছে হয়, তবে চল যাই যেখানে তোর ইচ্ছে।"

বাহিরের অন্ধকারে যেন কাহার পদশব্দ শুনা গেল।

বিলাস ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাইরে কে ?"

—"আমি সারদা।"

সারদা বাগচি-বাড়ীর ঝি।

—"কাকে খুঁজছ ?"

—"আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল বাবু !"

—"আমার সঙ্গে কথা ! এস ঘরে এস।"

তারিণীকে দেখিয়া সারদা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ভাব বুঝিয়া বিলাস বলিল, "আমার সব কথাই তারিণীদা জানে—বল কি বলবে ?"

—ও বাড়ীর মা আপনাকে একবার দেখা করতে বলছেন, "খুব গোপনে যাবেন, আজ রাত্রে।" কেউ যেন না জানে।

—"কেন সারদা ?"

—"কি জানি বাবু !"

—বিলাস ভাবিয়া উত্তর দিল, "আচ্ছা যাও কিছুক্ষণ পরে যাব।"

সারদা চলিয়া গেল। বিলাস ও তারিণী কেহই কম বিস্মিত হয় নাই। নবীন বাগচির স্ত্রী ডাকিয়াছেন বিলাসকে গোপনে !

তারিণী বলিলেন, "যাবি বিলাস ?"

—"হাঁ, তাইতো বলে দিলাম।"

- "কিন্তু বাগচি-বাড়ী যাবি তুই একলা রাত করে ?"

—"আমার সঙ্গে তো কারু শত্রুতা নাই তারিণীদা !"

রাত্রি এক প্রহর হইয়া গিয়াছে। বিলাস কম্পিত পদে অপরাধীর মত, বাগচি-বাড়ীর অন্দরে গিয়া ঢুকিল।

শৈশবের কত পরিচিত স্থান ! ঐ-পাশের আম-গাছটা তখন ছোট্ট ছিল—তাহারই নীচে সে আর নবীন-বাগচির বড় মেয়ে—তাহার লীলাদিদি সারা দুপুর সন্ধ্যা কত খেলাই না করিয়াছে ! তারপর হঠাৎ একদিন কি হইল, এ বাড়ীর দরজা একেবারে চিরদিনের মত তাহার জন্য বন্ধ হইয়া গেল। সে আজ কত দিনের কথা !

ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বিলাস ডাকিল, "কাকীমা !"

নবীন বাগচির স্ত্রী ভিতর হইতে বলিলেন, "আয় বাবা !"

বিলাস ঘরে আসিয়া বসিল। ভিতরে নবীন বাগচির স্ত্রী তাঁহার নাবালক ছেলে দুটী লইয়া বোধ হয় বিলাসের অপেক্ষাতেই বসিয়া ছিলেন। বিলাস ঘরে ঢুকিলে তাহাদিগকে বিলাসের পায়ের তলায় বসাইয়া দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আমার হারু আর নারুকে তোর হাতেই দিলাম বিলাস- দেখিস বাবা ওদের যেন কোন অনিষ্ট না হয় ! এত বয়েও তোর মামার আশ মিটল না—এখন নাকি আমার বাছাদের গায়ে হাত দেবে।"

বলিয়া তিনি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আত্ম সংবরণ করিয়া বলিলেন,—

—"আমার এক মুহূর্ত্ত আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না বিলাস, একবার যদি ওদের দাদা মশায়ের কাছে গোবিন্দপুরে ওদের নিয়ে ফেলতে পারতাম !"

বিলাস কোন ক্রমে অশ্রু সংবরণ করিয়া ছিল, বলিল,

—"তাই করুন না ককিমা, কিছুদিনের জন্য গোবিন্দপুরেই যান।"

—কিন্তু পথে যদি কোন বিপদ হয়। সম্পদের দিনে যারা ছিল সহায়—তারা যে এখন সব তোর মামার সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

বিলাস ভাবিয়া বলিল, "আপনি ভাববেন না কাকীমা—যদি আমার উপরে নির্ভর করতে পারেন, তবে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কাল শেষরাত্রে চন্দনার ঘাটে নৌকা ঠিক থাকবে, রাত্রে গিয়েই নৌকায় উঠতে হবে। রাজী আছেন কি না বলুন ?"

—"রাজী না হয়ে আর উপায় কি বিলাস ? যার চারি দিকে এমন শত্রু সে আর কি করবে !"

—"তা হলে যাই কাকীমা। আমিও কাল সোনাপুর জন্মের মতই ছেড়ে যাব। বিষয়-আশায় সব মামাকেই দিয়ে চললাম – ও সব আমার সহ্য হবে না।"

বিলাস বাহির হইয়া গেল। নবীন বাগচির স্ত্রী বসিয়া 'আকাশ পাতাল' পাতাল ভাবিতে লাগিলেন।

পরের দিন শেষ রাত্রে একখানা নৌকা সোনাপুরের দুই জমিদার বংশের কয়েকটি ভাগ্যহীন ও ভাগ্যহীনাকে বক্ষে লইয়া চন্দনা বাহিয়া ভাটাইয়া চলিল।

নৌকার ছই ধরিয়া দাঁড়াইয়া বিলাসবিহারী একদৃষ্টে নিজের জন্ম-মাটীর দিকে তাকাইয়া ছিল—তাহার চোখ দিয়া অশ্রুর ধারা নামিতেছিল। নিজের বাপ-পিতামহের জমিদারী হইতে আজ এমনি করিয়া চোরের মত তাহাকে আত্মগোপন করিতে হইল।

তারিণী ডাকিল, "আয় দাদা, ভিতরে এসে বোস্।"

—"তুমি বোস—আমি বেশ আছি।"

ভাটির টানে নৌকা ততক্ষণ দক্ষিণ বাড়ীর ঘাট ছাড়াইয়া গিয়াছে; এমন সময় দেখা গেল, একখানা বাইচের নৌকা তীর বেগে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

মাঝিরা ভয়ে জড়সড় হইয়া গেল। ভিতর হইতে একটা চাপা ভয়ার্ত্ত ক্রন্দন উঠিল। বিলাসের বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না, শ্যামাশঙ্করই তাহাদের অনুসরণ করিতেছে।

ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, "কাঁদবেন না কাকীমা, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব আপনার কোন ভয় নাই।"

তারিণীকে বলিল, "তারিণীদাদা সড়কি কই ?"

তারিণী এক গাছা সড়কি বিলাসের দিকে আগাইয়া দিল, অন্য গাছা নিজের হাতে লইল। বিলাস এক হাত দিয়া চোখের জল মুছিল, অন্য হাতে সড়কি ধরিয়া সোজা হইয়া নৌকার উপরে দাঁড়াইল। যাহারা অনুসরণ করিতেছিল—তাহারা কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

ডাকিয়া বলিল, "কার নৌকা—থামাও নৌকা !"

বিলাস চিনিতে পারিল, কাজেম সর্দ্দারের স্বর।

বিলাস ডাকিয়া বলিল, "আমার নৌকা কাজেম—আমি তোমাদের ছোট বাবু।"

—"ছোটবাবু!- ছেলাম! এতো রাত্তিরি আপনি ?"

হঠাৎ শ্যামাশঙ্করের গম্ভীর স্বর ভাসিয়া আসিল—

—"নৌকা ঘেরাও কর কাজেম! বিলাস ও নৌকা থেকে নেমে এস।"

—"কি জন্যে মামাবাবু ?"

—"নবীন বাগচির ছেলে-মেয়েদের পালাতে দেব না।"

—"কেন, কি করবেন ?"

– "সে আমি জানি।"

—সে হবে না—আমি নৌকা থেকে নামব না, তাদের, গায়ে হাত দিতেও দেব না।

—"বটে! মাঝি দুটোকে সাবাড় কর কাজেম !"

বিলাস বলিল, "কাজেম, আমার বাপের অনেক নুন, নেমক খেয়েছিস—আজ আমি তোকে আমার সেই বাপের দোহাই দিয়ে বলছি, ফিরে যা। এমন দুঃসময়ে আমার অনিষ্ট করিসনে—ভগবান তোর ভাল করবেন।"

কাজেম ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া শ্যামাশঙ্কর নিজেই এক গাছা সড়কি ছুড়িয়া মারিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সড়কি জলের মধ্যে থপ্ করিয়া তলাইয়া গেল।

মাঝি দুইজন প্রাণভয়ে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার দিল।

—"তারিণীদা, তুমি হাল ধর। আপনি ফিরে যান মামাবাবু!"

—এই যাচ্ছি, বলিয়া শ্যামাশঙ্কর পুনরায় আর একগাছি সড়কি ছুড়িয়া মারিল, সড়কি তারিণীর কান ঘেঁসিয়া জলে গিয়া পড়িল।

আর এক গাছা আসিয়া পড়িল বিলাসের আধ হাত দূরে ছইয়ের উপর।

বিলাসের সমস্ত শরীর কাঁপিয়া উঠিল, এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপর হাতের সড়কি প্রাণপণে ছুড়িয়া মারিল শ্যামাশঙ্করের দিকে ;—হঠাৎ একটি বিকট চীৎকার ও একটা গুরু জিনিষ নদীর জলে পতনের শব্দ হইল।

কাজেম সর্দ্দার বলিয়া উঠিল, "কি করলেন ছোটবাবু, মামাবাবুকে খুন করলেন !"

কিন্তু ছোটবাবু ততক্ষণ নৌকার উপরে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে !

তারিণী হাল ঘুরাইয়া সোজা করিয়া স্রোতের মুখে নৌকা ধরিল, নৌকা আগাইয়া যাইতে লাগিল আর কেহ বাধা দিল না।

পরের দিন রাষ্ট্র হইয়া গেল—নদীর বুকে কাজিয়া করিয়া মামা-ভাগিনেয় দুই জনেই খুন হইয়া গিয়াছে। জ্ঞাতিগণের ভাগ্য ভাল জমিদারী ভাল করিয়া বাঁটিয়া লইতে তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেল।

*

বছর দশ বার পরের কথা—দিন কয়েক ধরিয়া এক বৈরাগী মাজবাড়ীর আখড়ায় আসিয়া নাচিয়া গাহিয়া আখড়ার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া বিদায় লইল। তখন হরিগুরু দেহ রক্ষা করিয়াছেন। লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিলেন, এ আর কেহ নহে জমিদার ভবতারণ মৈত্রের ছেলে বিলাসবিহারী।

"ত্বমীস্বং ধান্যরূপাসি প্রাণনা প্রাণদায়িনী"

পৌষ—১৩৪৫

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড—৬ষ্ঠ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

—শ্রীসচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুয়ানী

১৩৪৩ সালের মাসিক বঙ্গশ্রীর বৈশাখ-সংখ্যায় আমরা 'মহাকালের প্রভাব, তাণ্ডবনৃত্য এবং পণ্ডিত জওহরলালের লক্ষ্ণৌ অভিভাষণ'-শীর্ষক সন্দর্ভটী প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ঐ সন্দর্ভের একাংশে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত ছিল :—

"শ্যামার যে চিত্র বর্ত্তমান কালের হিন্দুগণ ঈশ্বর-বোধে পূজা করিয়া থাকেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ব-পরিব্যাপ্ত কালপ্রভাবে মানুষের কি অবস্থা হয়, তাহার চিত্র। কিন্তু, ঐ চিত্রসমূহ কিরূপে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে মানুষ বিস্মৃত হইয়াছে। ফলে কেহ বলিতেছেন যে, ঐ চিত্র এবং তাহার পূজা অসভ্যতার পরিচায়ক এবং কেহ বলিতে-ছেন, উহা সভ্যতার আদিম অবস্থার পরিচায়ক এবং কেহ কেহ উহা যে কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া উহার পূজায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন। যদি কখনও মানুষ আবার শ্যামার চিত্রকে যথাযথভাবে অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, ঐ একটি চিত্রের সাহায্যে কাল (time) এবং স্থান (space) কাহাকে বলে এবং তাহার প্রভাব কি কি, তাহা এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমগ্র মূলসূত্র বুদ্ধিযোগ্য করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া উহাতে গতিশীল কার্য্যগুলির (dynamical action) নক্‌সা কি করিয়া করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় রহিয়াছে। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারগণ গতিশীল কার্য্যগুলির নক্‌সা কি করিয়া অঙ্কিত করিতে হয়, তাহা অদ্যাবধি পরিজ্ঞাত হইতে পারেন নাই।"

এই অংশটি কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া 'সাপ্তাহিক বঙ্গশ্রী'র প্রচ্ছদপটের একাংশে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার সম্বন্ধে

'হিন্দু' নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকার ২৬শে কার্ত্তিক সংখ্যার "সাময়িক প্রসঙ্গে" নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে।

"শ্যামা—কালী—আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মময়ী; তিনি কি এবং কি নহেন ইহা নিরূপণ করা সাধনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সাধ্য নহে ইহাই আমরা জানি। তিনি ইহা এবং উহা নহেন এইরূপ বলিবার অধিকার আমাদের জন্মে নাই। আমরা কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র লইয়া তাঁহার পূজা করি, নাম জপ করি, গুণকীর্ত্তন করি এবং মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করি আমাদের পূজা-অর্চ্চনায় তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিন ও সিদ্ধি দান করুন! আমরা কি ভুল করিতেছি? রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি সাধকগণ কি ভুল করিয়াই মরিয়াছেন? তন্ত্রশাস্ত্র কি মিথ্যা, না তান্ত্রিক সাধকগণ কেহই তন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা শ্যামাসাধনা সম্পর্কে তাঁহাদের শিষ্যদিগকে কেবল প্রতারণা করিয়াই গিয়াছেন? এখন হইতে কি কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া উঁহার পূজায় নিযুক্ত থাকা মূঢ়তা হইবে? এবং উঁহার পূজা ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত হইবে? আমরা অস্বীকার করি না যে, কোনও মানুষ ঐ একটি চিত্রের সাহায্যে কাল এবং স্থান কাহাকে বলে এবং তাহার প্রভাব কি কি, তাহা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের সমগ্র মূলসূত্র বুদ্ধিযোগ্য করা হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরবোধে শ্যামার পূজা অর্চ্চনা বৃথা ইহা স্বীকার করিব কেন? ভক্তের নিকট তিনি কল্পতরু নহেন, তিনি ব্রহ্মময়ী নহেন, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী নহেন তাহা মানিব কেন? যিনি শ্যামাকে অন্যরূপ বুঝেন বুঝুন, কিন্তু তান্ত্রিক সাধকেরা "উঁহা যে কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই" এরূপ উক্তি করা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অন্যায় এবং ধৃষ্টতা হইবে। এরূপ উক্তির পরিণামও অত্যন্ত শোচনীয়! একেই হিন্দুর পক্ষে প্রতিমাপূজাই এক মহাসমস্যার কথা। তাহাতে দেবী প্রতিমার এরূপ ব্যাখ্যা হইলে, হিন্দুর পূজা-অর্চ্চনাই অসম্ভব হইবে। আমরা এরূপ উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি।"

আমাদের লেখার যে অংশটি "হিন্দু"র সাময়িক প্রসঙ্গের লেখক ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে যে, উহাতে আদৌ ধৃষ্টতার পরিচয় নাই, পরন্তু উহার সর্ব্বত্র প্রকৃত হিন্দুয়ানী, অর্থাৎ ভারতীয় ঋষিপ্রণীত ধর্ম্মের উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ও ঐ ধর্ম্ম বিকৃত হইবার জন্য মর্ম্মান্তিক বেদনার পরিচয় রহিয়াছে। উপরোক্ত লেখকের উদ্ধৃত লেখা হইতে আমাদিগের মনে হইয়াছে যে, তিনি ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মের ক-খ সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং ঘোরতর অহিন্দু ও দাম্ভিক। ইহা ছাড়া, যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল বাঙ্গালা ভাষা বুঝিতে হইলে যে ভাষাজ্ঞানের প্রয়োজন, সেই ভাষাজ্ঞান পর্য্যন্ত তাঁহার নাই।

আমাদিগের উপরোক্ত মন্তব্য যে সত্য, তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ, লেখকের উদ্ধৃত লেখাটির প্রত্যেক অংশ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উদ্ধৃত কথাগুলির প্রকৃত অর্থ অথবা বক্তব্য যে কি, তাহা বুঝিতে হইবে। চলতি হিসাবে, "হিন্দু" কাগজের মন্তব্য আমরা উপেক্ষা করিলেও করিতে পারিতাম, কিন্তু আমাদের 'বঙ্গশ্রী'র কাছে কেহই উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ "হিন্দু"র সম্পাদক যে শ্রেণীর মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার নিজস্ব নহে। কতকগুলি মানুষ আছেন, যাঁহারা বস্তুতঃপক্ষে ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মের ক-খ জানেন না এবং যাঁহারা পবিত্র তন্ত্রের নামে প্রচ্ছন্ন ভাবে বস্তুতঃ পক্ষে মাতলামী ও শিশ্নের উপভোগবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের দোহাই দিয়া প্রকারান্তরে হিন্দুয়ানীর নামে নানারকমের অহিন্দুয়ানী প্রচার করিয়া আসিতেছেন। এই মানুষগুলি মুখে হিন্দুয়ানীর কথা বলিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ইহাঁদিগের কার্য্যগুলি ভারতীয় ঋষির মূল শাস্ত্রের কথার সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহাঁদের প্রায় প্রত্যেক কার্য্যই ভারতীয় ঋষিপ্রণীত অনুশাসনের সর্ব্বতোভাবে বিরোধী। এমন কি, খাঁটী মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের

কার্য্যে ও চালচলনে ভারতীয় ঋষির মূল অনুশাসনের যতটুকু সমতা পাওয়া যায়, তাহাও ইহাঁদিগের মধ্যে প্রায়শঃ বিরল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাঁরাই প্রকৃত পক্ষে সোনার ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার মূল কারণ। "হিন্দু" কাগজের লেখকের কথায় এই উপরোক্ত সম্প্রদায়ের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। ইহাঁদের কথা সমালোচনা করিলে হিন্দুয়ানীর নামে যাঁহারা প্রকৃত পক্ষে অহিন্দুয়ানী চালাইতেছেন, তাঁহাদিগের কার্য্যের দোষ কোথায় তদ্বিষয়ে সর্ব্বসাধারণের চক্ষু ফোটাইবার সুযোগ হয়। "হিন্দু" কাগজের মন্তব্য সাধারণ ভাবে উপেক্ষণীয় হইলেও উহাকে উপেক্ষা না করিয়া উহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার ইহাই অন্যতম কারণ।

লেখকের প্রথম কথা—

"শ্যামা—কালী—আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মময়ী, তিনি কি এবং কি নহেন, ইহা নিরূপণ করা সাধনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সাধ্য নহে ইহাই আমরা জানি। তিনি ইহা, এবং উহা নহেন এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের জন্মে নাই।"

লেখকের এই কথাটী বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে তিনটী মতবাদ আছে—যথা (১) শ্যামা—কালী—আদ্যাশক্তি, ব্রহ্মময়ী। (২) তিনি কি এবং কি নহেন ইহা নিরূপণ করা সাধন-হীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের সাধ্য নহে, (৩) তিনি ইহা, এবং উহা নহেন এরূপ বলিবার অধিকার আমাদের জন্মে নাই। পাঠকগণ একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন যে, এই লেখার সম্পাদকটী কি বলিতেছেন, তাহা তিনি নিজেই জানেন না। উপরোক্ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতবাদটী যদি সত্য হয়, অর্থাৎ শ্যামা যে কি, তাহা নিরূপণ করা যদি লেখকের মত মানুষের অসাধ্য হয় অথবা অধিকার-বহির্ভূত হয়, তাহা হইলে শ্যামা যে কালী অথবা আদ্যাশক্তি অথবা ব্রহ্মময়ী, তাহা তাঁহার পক্ষে বলা কোন ক্রমেই শোভনীয় হইতে পারে না। এক নিঃশ্বাসেই তিনি দুইটী পরস্পর-বিরুদ্ধ কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। শ্যামা যে কি, তাহা জানা যে তাঁহার মত লোকের পক্ষে অসম্ভব অথবা অনধিকারচর্চ্চা, তাহা যদি তাঁহার সর্ব্বান্তঃকরণের উক্তি হইত, তাহা হইলে শ্যামা যে কালী অথবা আদ্যাশক্তি অথবা ব্রহ্মময়ী তাহা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় নাই। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, হয় লেখকটী অত্যন্ত কপট, নতুবা তিনি যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেন, তাহার অনেকগুলির অর্থই তিনি জানেন না। পাঠকগণ বোধহয় স্বীকার করিবেন যে, এত কাঁচা লেখকের পক্ষে কোন দায়িত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোন ক্রমেই শোভনীয় নহে। ইহাঁদের সম্পাদকতার কার্য্যে খুব সম্ভব লজ্জাও লজ্জিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সংস্কৃতজ্ঞগণের অবস্থা দেখিলে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ পরস্পরবিরোধী মতবাদ প্রচারের পাণ্ডিত্যই প্রায়শঃ তাঁহাদিগের হিন্দুয়ানীর এক নম্বরের নমুনা।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, যদিও লেখকটী শ্যামাকে, কালী—আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্মময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তথাপি তিনি "কালী" অথবা "আদ্যাশক্তি" অথবা "ব্রহ্মময়ী", এই তিনটী শব্দের অর্থ যে কি কি, তাহা জানেন না বলিয়া দেবীর নামগুলির অর্থ স্থির করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে এবং উহা সাধারণের অধিকার-বহির্ভূত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা "হিন্দু"র সম্পাদকের মত হিন্দুর দেব-দেবীর নামের অর্থ না বুঝিয়াও এই দেবদেবীসমূহের উপলব্ধি না করিয়াও হিন্দুয়ানীর গোড়ামী করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের পক্ষে কোন দেব অথবা দেবী যে কি, অথবা কি নয়, তাহা স্থির করা সাধ্যাতিরিক্ত হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় ঋষির ধর্ম্মের প্রকৃত উপাসক এবং ঋষিগণের প্রতি প্রকৃতভাবে শ্রদ্ধাশীল, তাঁহাদিগের পক্ষে উহা কষ্টসাধ্য হইলেও আদৌ সাধ্যাতিরিক্ত নহে। ঋষি-প্রণীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে কোন গ্রন্থের মূল ভাগে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেব-দেবীর নামের অর্থ কি এবং উহার প্রত্যেকটী মোটামুটিভাবে উপলব্ধি করিবার উপায় কি, তাহা বিদিত না হইতে পারিলে মানুষ কখনও

ব্রাহ্মণ্যের প্রথম স্তরেও উপনীত হইতে পারে না এবং কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য হয় না। আমাদিগের এই কথাটি যে সত্য, তাহা প্রয়োজন হইলে অনেক প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত করিতে পারিব। আজকাল প্রত্যেক দেব, দেবীর নামের অর্থ ও তাহার প্রত্যেকটীর উপলব্ধি করা তো দূরের কথা, দেব-দেবী কি যে বস্তু, তাহা পর্য্যন্ত অবগত না হইয়া কেবলমাত্র বংশানুক্রমে যজ্ঞ-সূত্র ধারণ করিতে পারিলেই মানুষ ব্রাহ্মণ-পদ-বাচ্য হইতে পারে এবং ঐ শ্রেণীর তথাকথিত ব্রাহ্মণ "হিন্দু" সম্পাদকের "ডিপো"তে অনেকগুলি আছেন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা দেব-দেবী কি বস্তু, উহার প্রত্যেকটীর নামের অর্থ কি, এবং উহার প্রত্যেকটীকে উপলব্ধি কি করিয়া করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত নহেন, তাঁহাদিগকে "ব্রাহ্মণ" বলিয়া আখ্যাত করা কোন ভারতীয় ঋষির অনুমোদিত নহে। পরন্তু যাহারা দেব ও দেবী সম্বন্ধে উপরোক্ত তিনটী বিষয় পরিজ্ঞাত না হইয়াও ব্রাহ্মণ্যের অভিমান পোষণ করেন, তাঁহারা যাহাতে সমাজের মধ্যে চণ্ডালের ন্যায় ঘৃণিত হন, তাহা করাই ঋষিগণের নির্দ্দেশ। অত্রি-সংহিতাখানি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে উপরোক্ত নির্দ্দেশের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ভারতীয় ঋষির এই নির্দ্দেশ মানিয়া চলিলে দেখা যাইবে যে, যাঁহারা আজকাল কেবলমাত্র যজ্ঞসূত্র ধারণের জন্য ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব পোষণ করেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগকে লইয়া "হিন্দু"-সম্পাদকের হিন্দুয়ানী, তাঁহাদিগকে প্রায়শঃ ভারতীয় ঋষির উপদেশানুসারে "চণ্ডাল" বলিয়া মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

দেব-দেবী কি বস্তু, উহার প্রত্যেকটীর নামের অর্থ কি, এবং উহার প্রত্যেকটীকে কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা না জানিতে পারিলে যাহাতে কেহ "ব্রাহ্মণ" বলিয়া আখ্যাত না হয়, তাহা করা যেরূপ ঋষিগণের নির্দ্দেশ; সেইরূপ আবার মানুষ যাহাতে ব্রাহ্মণোচিত ভাবে চেষ্টা করিলেই দেব-দেবীসম্বন্ধীয় উপরোক্ত তিনটী বিষয় সম্যক্ ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারে এবং উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার তথ্যও ঋষিগণ তাঁহাদিগের প্রণীত দুইটী মীমাংসা, বেদাঙ্গ, বিবিধ তন্ত্র ও বেদের মধ্যে বিস্তৃতভাবে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। "হিন্দু"র সম্পাদক তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়াও হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামী করিতে পারেন বটে এবং যাঁহারা ঋষির শাস্ত্রানুসারে "চণ্ডাল" তাঁহাদিগকে তিনি "ব্রাহ্মণ" বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন বটে, কিন্তু যাঁহাদের প্রাণে ঋষিদিগের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, তাঁহারা এতাদৃশ মানুষকে (অর্থাৎ যাঁহারা দেব-দেবীসম্বন্ধীয় উপরোক্ত তিনটি তথ্য অবগত নহেন, তাঁহাদিগকে) "চণ্ডাল" ও যাঁহারা তাঁহাদিগের সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে 'চণ্ডাল-সেবী' না বলিয়া পারেন না।

দেব-দেবী যে কি বস্তু, তাহা জানিতে হইলে ঋষিগণের সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত নাম ব্যবহৃত হয় তাহার অর্থ কি করিয়া যথাযথভাবে উদ্ধার করিতে হয় তাহা পরিজ্ঞাত হইবার প্রয়োজন হয়। সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত নাম ব্যবহৃত হয়, তাহার অর্থ কি করিয়া যথাযথ ভাবে উদ্ধার করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি উপলব্ধি করিবার আবশ্যক হইয়া থাকে।

শব্দ-লক্ষণ সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য ঋষিগণ তাঁহাদিগের বেদাঙ্গের মধ্যে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের প্রণয়ন করিয়াছেন এবং শব্দ-বৃত্তি সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য নিরুক্ত-নামক বেদাঙ্গ প্রণীত হইয়াছে। শব্দ-বৃত্তি ও শব্দ-লক্ষণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উপরোক্ত দুইখানি বেদাঙ্গ প্রণীত হইয়াছে বটে, কিন্তু কোন্‌টী যে কি বস্তু, তাহা প্রথমতঃ কথঞ্চিৎ পরিমাণে অনুমান করিতে না পারিলে অথবা অনুমান করিবার পদ্ধতি না জানিলে, কোন বস্তুই সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। শব্দ-বৃত্তি ও শব্দ-লক্ষণ যথাযথভাবে অনুমান করিবার জন্য তাঁহারা যথাক্রমে পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা নামক দুইখানি মীমাংসার গ্রন্থ রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা সম্যক্ ভাবে ও সঙ্গত অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে, যথাযথভাবে

নিরুক্ত ও পাণিনির সূত্র-পাঠ অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় এবং তখন শব্দ-বৃত্তি ও শব্দ-লক্ষণ উপলব্ধি করা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। শব্দ-বৃত্তি ও শব্দ-লক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিলে দেব-দেবী যে কি বস্তু, এবং প্রত্যেক দেবদেবীর নামের অর্থ যে কি, তাহা উপলব্ধি করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। ইহা আমাদিগের মতবাদ নহে। ইহা বাস্তব এবং ঋষিদিগের কথা। শব্দের অন্তর কি করিয়া জানিতে হয়, তৎসম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে যে মন্ত্রগুলি আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলে আমা-দিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা প্রতীয়মান হইবে।

শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি উপলব্ধি করিতে পারিলে দেবদেবী যে কি বস্তু ও তাহার প্রত্যেক নামটার অর্থ যে কি, তাহা কি করিয়া উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাহা আমরা এক্ষণে দেখাইব। যাঁহারা নিজদিগকে "ব্রাহ্মণ" করিয়া পরিচয় দিতে চাহেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এই কথা কয়েকটী জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

মানুষের শিশুরূপে জন্মাবধি যে নিয়মে যথাক্রমে আধ-আধ ভাবে প্রথমতঃ খণ্ডিত শব্দ, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণশব্দ, তৃতীয়তঃ খণ্ডিত পদ, চতুর্থতঃ পূর্ণ পদ, পঞ্চমতঃ খণ্ডিত বাক্য, ষষ্ঠতঃ পূর্ণ বাক্য, সপ্তমতঃ নানারূপ বিশেষণ-সম্বলিত বাক্য অভিব্যক্তি লাভ করে, সেই নিয়মের নাম শব্দ-লক্ষণ। শব্দ-লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে মনে কোন্ ভাবের উদয় হইলে কিরূপ বাক্য, অথবা পদ প্রকাশ হওয়া স্বাভাবিক অথবা স্বভাব-বিরুদ্ধ, তাহা বুঝিতে পারা সম্ভব হয়। বিভিন্ন জীব কেন বিভিন্ন শব্দের দ্বারা স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিয়া থাকে, কোন কোন জীব কেন শব্দের দ্বারা নিজ মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে এবং কেহ কেহ কেনই বা উহা পারে না; ইংরাজ, জার্ম্মান, ভারতীয় প্রভৃতি বিভিন্ন মানুষ একই মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্য কেন বিভিন্ন ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে, এবংবিধ তথ্যগুলি বুঝিতে পারা যায়।

যে মনোভাব বশতঃ কোন শব্দ, অথবা পদ অথবা বাক্যের উদ্ভব হয়, সেই মনোভাবের নাম শব্দ-বৃত্তি। কোন্ মনোভাব বশতঃ স্বভাবতঃ কোন্ শব্দ, অথবা পদ, অথবা বাক্যের উদ্ভব হইয়া থাকে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়ার নাম শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হওয়া। শব্দ-লক্ষণ উপলব্ধি করিয়া শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে বিভিন্ন মনুষ্য, বিভিন্ন পশু ও বিভিন্ন পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত চর-জীবের স্বাভাবিক ভাষা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

শব্দ-লক্ষণ উপলব্ধি করিবার প্রযত্নে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের শরীরের মধ্যে প্রতিনিয়ত কতকগুলি কর্ম্ম ও জ্ঞানের কার্য্য চলিতেছে। উপরোক্ত কর্ম্মগুলির ফলে মানুষের অভ্যন্তরে প্রতিনিয়ত তাহার মেদ, অস্থি, মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত, চর্ম্ম ও দশটী ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও হ্রাস সাধিত হইতেছে এবং জ্ঞানের কার্য্যসমূহের ফলে তাহার শরীরের অভ্যন্তরে উপরোক্ত মেদাদি অংশসমূহ যে বিদ্যমান আছে এবং উহার প্রত্যেকটীর সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও হ্রাস যে সম্পাদিত হইতেছে, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হইতেছে। মানুষের অভ্যন্তরে যতকিছু কার্য্য প্রতিনিয়ত হইতেছে, তাহার প্রত্যেকটী ঐ জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। শব্দ-লক্ষণ উপলব্ধি করিবার প্রযত্নে অগ্রসর হইলে আরও দেখা যাইবে যে, মানুষের অভ্যন্তরস্থ ঐ কর্ম্মসমূহ বিশেষ বিশেষ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত এবং কর্ম্ম-স্রোত, অর্থাৎ কার্য্য-কারণের সঙ্গতি আছে বলিয়াই তাহার জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং কর্ম্মস্রোত বিদ্যমান না থাকিলে কোন জ্ঞানের উৎপত্তি হইত না। কাযেই কর্ম্ম-স্রোত, অথবা কার্য্য-কারণের সঙ্গতি মানুষের আদি এবং জ্ঞান তাহার পরবর্ত্তী। মানুষের এই কর্ম্মস্রোতের শৃঙ্খলা কোথায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে প্রথমে একটী কারণ বিদ্যমান থাকে এবং ঐ কারণটী হইতে পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তের মধ্যে একটী কার্য্যের উদ্ভব হইতেছে এবং ঐ কার্য্যটী উদ্ভব হইবামাত্রই উহা কারণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া এক বা একাধিক কার্য্যের উৎপত্তি সাধিত করিতেছে। এইরূপে যেটী কার্য্য, সেইটীই পুনরায় কারণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া মানুষের বিবিধ কার্য্য সাধিত হইতেছে। মানুষের

কর্ম্মস্রোতের শৃঙ্খলা কোথায়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে আরও দেখা যাইবে যে, মানুষের যতকিছু কর্ম্ম আছে, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। তাহার কতকগুলি কর্ম্ম সম্পূর্ণ ব্যক্ত, কতকগুলি অর্দ্ধব্যক্ত, আর কতকগুলি মোটেই ব্যক্ত নহে। প্রত্যেক মানুষের কর্ম্মগুলি যেরূপ তিন ভাগে বিভক্ত, তাহার জ্ঞানও সেইরূপ তিন ভাগে বিভক্ত। কোন জ্ঞান সম্পূর্ণ প্রস্ফুট, কোন জ্ঞান অর্দ্ধ-প্রস্ফুট, আর কোন জ্ঞান মোটেই প্রস্ফুট নহে। এই কর্ম্ম ও জ্ঞানের মিশ্রণে মানুষের 'অবস্থা'র উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞান যেরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রত্যেক মানুষের অবস্থাসমূহ সেইরূপ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। মানুষের কতকগুলি 'অবস্থা' সম্পূর্ণ ব্যক্ত, কতকগুলি অর্দ্ধব্যক্ত, আর কতকগুলি মোটেই ব্যক্ত নহে। তাহার কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা'-সমূহের যাহা যাহা সম্পূর্ণ ব্যক্ত, তাহা তাহাই তাহার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা যাহা অর্দ্ধব্যক্ত, তাহা তাহা তাহার অতীন্দ্রিয় অথবা মনোগ্রাহ্য, যাহা যাহা মোটেই ব্যক্ত নহে তাহা তাহা তাহার বুদ্ধিগ্রাহ্য। মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা', এই তিনটার মূল তাহার কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান মিলিত হইয়া বিভিন্ন 'অবস্থা'র উৎপত্তি হয়। কর্ম্ম ও জ্ঞানের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন 'অবস্থা'র উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও মনে রাখিতে হইবে যে, যে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা' সম্পূর্ণ ব্যক্ত, সেই সেই কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা'র উৎপত্তি হয় অর্দ্ধব্যক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা' হইতে, আর যে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা' অর্দ্ধব্যক্ত, তাহার প্রত্যেকটার উৎপত্তি হয় বুদ্ধিগ্রাহ্য কর্ম্ম, জ্ঞান ও 'অবস্থা' হইতে।

আমরা এতাবৎ যে যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও অবস্থার কথা বলিলাম, তাহার প্রত্যেকটা মানুষের অভ্যন্তরে সম্পাদিত হইতেছে এবং এই তিনটার আরম্ভ হয় তাহার 'আদি কর্ম্ম' হইতে।

কি করিয়া মানুষের অভ্যন্তরস্থ 'আদি কর্ম্ম' প্রথম উৎপত্তি লাভ করিতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার মূলে রহিয়াছে দুনিয়ার সর্ব্বপরিব্যাপ্ত কয়েকটা বস্তুর মিলিত অবস্থা। দুনিয়ার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত কয়েকটী বস্তুর উপরের মিলিত অবস্থা চরাচর প্রত্যেক জীবের অভ্যন্তরের সহিত প্রতিনিয়ত মিলিত রহিয়াছে এবং উহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধিগ্রাহ্য 'আদি কর্ম্মে'র সহিত মিলিত থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত তাহার 'আদি কর্ম্মে'র প্রবৃত্তি উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার বিকাশ আরম্ভ হয়।

আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির এই বিকাশ প্রথমতঃ কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে এবং পরিশেষে উহা ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় উপনীত হয়।

কি করিয়া মানুষের অভ্যন্তরস্থ আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উপরে দুনিয়ার সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত কয়েকটা বস্তুর যে মিলিত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে তেজ ও রসের বীজ বিদ্যমান থাকে এবং সাক্ষাৎ ভাবে ঐ তেজ ও রসের বীজ যখন মানুষের আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তির সহিত মিলিত হয়, তখনই আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং ক্রমে ক্রমে উহার বিকাশ আরম্ভ হয়। আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তির বিকাশও প্রথমতঃ কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য থাকে এবং পরিশেষে উহা ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় উপনীত হয়।

কি করিয়া মানুষের অভ্যন্তরস্থ "আদি অবস্থা"র উৎপত্তি হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, উহার উৎপত্তি হইতেছে আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তির সংমিশ্রণে এবং উহা উৎপন্ন হইবার পর ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়া থাকে। প্রথমে যখন উপরোক্ত "আদি অবস্থা"র বিকাশ ঘটে, তখন উহাও কেবলমাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য অবস্থায় থাকে এবং পরিশেষে ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় উপনীত হয়।

এইখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, আমরা উপরে মানুষের "আদি কর্ম্ম","আদি জ্ঞান", "আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি" "আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তি" এবং "আদি অবস্থা" সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিলাম, তাহা উহাদের প্রত্যেকের উৎপত্তি-বিষয়ক। মানুষের আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কিরূপভাবে প্রতিনিয়ত রক্ষিত ও বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কোন

কথাই এই সন্দর্ভে বলা হইল না। কারণ, দেব-দেবী যে কি বস্তু, তাহার সাধারণ ধারণা সংগ্রহ করা,মানুষের আদি কর্ম্ম প্রভৃতি উপরোক্ত বিষয়সমূহের রক্ষা ও বিনাশ কিরূপে হইতেছে, তাহা সম্যক্ ভাবে না জানিলেও সম্ভবযোগ্য হইতে পারে। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, দেব-দেবী যে কি বস্তু এবং তাহার প্রত্যেকটীর নামের অর্থ কি, তাহা সম্যক্ ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে মানুষের আদি কর্ম্ম, আদি জ্ঞান, আদি কর্ম্ম-প্রবৃত্তি, আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তি, আদি-অবস্থা, ইহার প্রত্যেকটীর উৎপত্তি, রক্ষা, বিনাশ-সম্বন্ধীয় প্রত্যেক কথাটী জানিতে ও উপলব্ধি করিতে হয়। তাহা এই সন্দর্ভে সম্ভবযোগ্য নহে। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা উহা সম্যক্ ভাবে জানিতে ও উপলব্ধি করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বমীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা ও বেদাঙ্গের সাহায্যে শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি উপলব্ধি করিয়া যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন পরিজ্ঞাত হইতে হইবে। এক্ষণে ন্যায়াদি দর্শন অধ্যয়ন করিয়াও যে উপরোক্ত বিষয়সমূহ নির্ভুলভাবে জানা সম্ভব হয় না, তাহার কারণ, এখন আর কেহই ঐ দর্শনসমূহ অধ্যয়ন করিবার আগে শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি জানিবার ও উপলব্ধি করিবার নৈপুণ্য অর্জ্জন করেন না।

শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি উপলব্ধি করিবার সক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া, "দেব"এই পদটীর অন্তর পরীক্ষা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে যে প্রকরণ বশতঃ মানুষের, অথবা শুধু মানুষের কেন, চরাচর প্রত্যেক জীবের, আদি কর্ম্ম হইতে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে উৎপত্তি ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া থাকে, সেই সেই প্রকরণের প্রত্যেকটীর নাম এক একটি "দেব"। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, "দেব" অসংখ্য।

"দেবী" এই পদটীর অন্তর পরীক্ষা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে যে প্রকরণ বশতঃ মানুষের, অথবা চরাচর প্রত্যেক জীবের আদি জ্ঞান-প্রবৃত্তির উৎপত্তি বুদ্ধিগ্রাহ্যভাবে উন্মেষিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা প্রাপ্ত হয়, সেই সেই প্রকরণের প্রত্যেকটীর নাম এক একটী "দেবী"। "দেবী"র এই সংজ্ঞা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বিবিধ দেবীও অসংখ্য হইয়া থাকেন।

দেব ও দেবী ছাড়া এই সম্বন্ধে ঋষিগণ আর একটী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার নাম "দেবতা।" "দেব" ও "দেবী" যেরূপ যথাক্রমে কোনও না কোন কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিষয়ক প্রকরণ-প্রকাশক, সেইরূপ "দেবতা" শব্দটী কোন না কোন 'অবস্থা'-বিষয়ক প্রকরণ-প্রকাশক।

দেব, দেবী, দেবতার সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্ব্বে একবার আমাদের মাসিক 'বঙ্গশ্রী'র ১৩৪৪ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত "বিজয়ার নমস্কার"-শীর্ষক সন্দর্ভে আলোচনা করিয়াছিলাম। ঐ আলোচনায় এই তিনটী সংজ্ঞা এত বিস্তৃত ভাবে লেখা হয় নাই বটে, কিন্তু এই সঙ্গে উহা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে বর্ত্তমান লেখা বুঝিবার সহায়তা হইতে পারে।

পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা, বেদাঙ্গ, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনের সাহায্যে দেব, দেবী ও দেবতা এবং উহার প্রত্যেক নামটীর সংজ্ঞা যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু কোন দেব অথবা দেবীকে সর্ব্বতোভাবে জানা অথবা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। তাহার জন্য প্রয়োজন হয় তন্ত্রের ও তন্ত্রোক্ত দেব-দেবীর পূজার। তন্ত্রোক্ত প্রত্যেক দেব-দেবীর পূজায় প্রধানতঃ চারিটী অংশ বিদ্যমান থাকে। পূজার ঐ চারিটি প্রধান অংশের নাম—(১) ধ্যান, (২) জপ, (৩) স্তব, (৪) কবচ। শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিয়া শব্দার্থ কি হইতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, "ধ্যান" শব্দের অর্থ "শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন প্রকরণের বিকাশ কোন্ কোন্ লক্ষণে সম্পাদিত হইতেছে, সেই সেই লক্ষণ উপলব্ধি করিবার কার্য্য" ; "জপ" শব্দের অর্থ "শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন প্রকরণ যে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হইতে পারে, সেই শব্দকে স্পর্শ করিবার কার্য্য" ; "স্তব" শব্দের অর্থ "শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন

প্রকরণকে তাহার আদি হইতে বিকাশ পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিবার কার্য্য"; "কবচ" শব্দের অর্থ "শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন প্রকরণ যথাযথভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে তাহার ফলে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশে যে পরিবর্ত্তন ঘটে তাহা উপলব্ধি করিবার কার্য্য"; "পূজা" শব্দের অর্থ "শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন প্রকরণকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিবার কার্য্য।"

পূর্ব্ব-মীমাংসা, উত্তর-মীমাংসা ও বেদাঙ্গের সাহায্যে শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ধ্যান, জপ, স্তব, কবচ ও পূজা, এই পাঁচটী শব্দের যে যে অর্থ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার কোনটীই আমাদের স্বকপোলকল্পিত নহে, পরন্তু উহার প্রত্যেকটী ঋষির শাস্ত্রানুগ।

যে কোন দেবতার ধ্যান, বীজমন্ত্র, স্তব ও কবচে যে সমস্ত মন্ত্র, সূত্র অথবা কারিকা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তির নিয়মানুসারে অর্থোদ্ধার করিতে পারিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা প্রতীয়মান হইবে।

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক দেব ও দেবী শরীরাভ্যন্তরস্থ কর্ম্ম ও জ্ঞান-বিষয়ক কোন না কোন প্রকরণ এবং পূজার সাহায্যে কি করিয়া তাহা সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে উহার ধ্যান, জপ, স্তব ও কবচের সাহায্যে শরীরের ঐ প্রকরণটীকে সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করাও সম্ভব হয়।

কাযেই, ইহা বলা যাইতে পারে যে, অমুক দেব অথবা দেবী অথবা দেবতা অমুক অথবা অমুক নয়, ইহা বলা যাহাতে মানুষের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহার জন্য ঋষিগণ দেব-দেবীর পূজার ব্যবস্থা সাধন করিয়াছেন এবং যথার্থ ভাবে যাঁহারা ঐ পূজা করিতে সক্ষম হন, তাঁহাদের পক্ষে, অমুক দেব অথবা দেবী অমুক অথবা অমুক নহেন, ইহা বলা সম্পূর্ণ ভাবে সাধ্যায়ত্ত। ইহা ছাড়া আরও বলা যাইতে পারে যে, দেব-দেবীর পূজা যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কার্য্য এবং যাঁহারা কোন দেব-দেবীর পূজা করিয়াও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না এবং উহা যে কি এবং কি নয়, তাহা বলিতে সক্ষম নহেন, অথচ ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব করিয়া থাকেন, তাঁহারা যজ্ঞসূত্র ধারণ করিলেও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহেন, পরন্তু ঋষির নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা চণ্ডালের মত ঘৃণার্হ। যাঁহারা এতাদৃশ ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ অনুরক্তি দেখাইয়া থাকেন অথবা তাঁহাদিগের নির্দ্দেশ পালন করেন, তাঁহাদিগকেও ঋষিদিগের নির্দ্দেশানুসারে চণ্ডালসেবী বলিয়া আখ্যাত করিতে হইবে।

"হিন্দু"র সম্পাদককে মনে রাখিতে হইবে যে, দেব-দেবীর পূজা যখন কোন সমাজমধ্যে উপরোক্ত যথাযথভাবে সম্পাদিত হয়, তখন ঐ সমাজের মধ্যে কাহারও কোনরূপ অর্থাভাব, অথবা স্বাস্থ্যাভাব, অথবা অশান্তি, অথবা অসন্তুষ্টির উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ দেব-দেবীর পূজা যথাযথভাবে নিষ্পন্ন হইলে মানুষের কর্ম্ম ও জ্ঞান কিরূপভাবে উৎপন্ন হয়, তাহার আদি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়া থাকে এবং তখন কোন্ ব্যবস্থার দ্বারা মানুষ অ-কর্ম্ম, কু-কর্ম্ম, অ-জ্ঞান ও কু-জ্ঞান হইতে সর্ব্বতোভাবে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পারে, তাহা যথাযথভাবে স্থির করা সম্ভব হয়। একদিন মনুষ্যসমাজে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিলেন এবং তাঁহারা উহা পারিতেন বলিয়াই সকলেই তাঁহাদিগকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করিত। এক্ষণে প্রকৃত ব্রাহ্মণ নাই বলিয়াই মনুষ্যসমাজের সর্ব্বত্র অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি ও অসন্তুষ্টির হাহাকার উঠিয়াছে। তথাপি যাঁহারা নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান পোষণ করেন এবং তাহার গোঁড়ামী দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই ধিক্কারযোগ্য।

কর্ম্ম অথবা সু-কর্ম্ম, অ-কর্ম্ম অথবা কর্ম্মে উপেক্ষা, বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম, এই তিনটীর পার্থক্য কোথায়, তাহা যথাযথভাবে বিদিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কর্ম্ম অথবা সু-কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে হিতকারী, অ-কর্ম্ম অথবা কর্ম্মে অবজ্ঞা মানুষকে অহিতের পথে লইয়া যায় বটে, কিন্তু বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম যেরূপ দ্রুতগতিতে মানুষের অহিত সাধন করে, অ-কর্ম্ম অথবা কর্ম্মে

উপেক্ষা তাহা করে না। বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দ্রুতগতিতে অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে।

আজকালকার তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ দেব-দেবী ও দেবতা কি, তাহা না বুঝিয়া পূজা, ধ্যান, জপ, স্তব ও কবচ কি করিয়া করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত না হইয়া, পূজার নামে যাহা করিয়া থাকেন, তাহা বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম। যথাযথভাবে দেব-দেবীর পূজা করা সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় এবং তাহা যতদিন পর্য্যন্ত কোন না কোন মানুষের শিক্ষা করা সম্ভব না হয়, ততদিন মনুষ্য-সমাজকে আজকালকার মত অর্থাভাবে, স্বাস্থ্যাভাবে, অশান্তিতে এবং অসন্তুষ্টিতে হাবুডুবু খাইতে হইবে,তাহা খুবই সত্য, কিন্তু আজকালকার ব্রাহ্মণগণ না বুঝিয়া পূজার নামে যে সমস্ত বি-কর্ম্ম অথবা কু-কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহা করা অপেক্ষা উহা না করাই ভাল। ব্রাহ্মণগণ কোন্ অবস্থা হইতে কোন্ অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার যুক্তিযুক্ততা প্রতিপন্ন হইবে।

ঋষি-প্রণীত মূল গ্রন্থগুলি যথাযথ অর্থে পড়িতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একদিন দারিদ্র্য, অ-স্বাস্থ্য, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু ব্রাহ্মণ মাত্রেরই অপরিজ্ঞাত ছিল। ব্রাহ্মণগণ কখনও উদরান্নের জন্য কাহারও নিকট কোনও রূপ যাচ্ঞা অথবা বেতনভোগী নফর-গিরি করিতেন না। তাঁহাদের কার্য্যে অন্যান্য বর্ণের মানুষের অর্থ, স্বাস্থ্য, সন্তুষ্টি ও শান্তি সম্বন্ধে এত উপকার সাধিত হইত যে, সকলেই স্বতঃপরতঃ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নানাবিধ দ্রব্য ও রত্ন উপহার দিতে সর্ব্বদা উদ্যত থাকিত। অথচ, কোনরূপ যাচ্ঞা করা তো দূরের কথা, কেহ যাচিয়া দিতে আসিলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কোন দ্রব্য ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিতেন না।

আর, আজ ঐ তর্কতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ, তর্করত্ন, তর্কভূষণ, তর্কাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের প্রতি তাকাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে, উঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই হয় ভৃতকাধ্যাপক নতুবা বেতনভোগী নফর। কোন না কোন রূপের প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা উঁহাদের দৈনন্দিন কার্য্য। সমাজের প্রায় কেহই কায়মনোবাক্যে স্বতঃপরতঃ হইয়া উঁহাদিগকে কিছুই দিতে চাহে না, অথচ উঁহারা কাহার নিকট হইতে কি সংগ্রহ করিবেন, তাহার কার্য্যে ও পরিকল্পনায় সর্ব্বদা ব্যস্ত। সমাজের অন্যান্য বর্ণের অর্থ ও স্বাস্থ্যাদি বিষয়ের কোনরূপ উপকার করা তো দূরের কথা, নিজেরাই নিজদিগের ও সন্তান-সন্ততির অর্থ ও স্বাস্থ্য-বিষয়ে অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত।

গুরুতা ও পৌরোহিত্য করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করেন না, ইঁহাদের মধ্যে এমন একজনও প্রায়শঃ দেখা যাইবে না, অথচ উহা যে ঋষির অনুমোদিত,তাহা ভাষা বুঝিতে পারিলে কোন ঋষিপ্রণীত সমগ্র শাস্ত্রের মূল ভাগের একটী কথা হইতেও প্রমাণিত করা সম্ভব হইবে না। পরন্তু, প্রকৃত ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন পূজা, অথবা কোন বৈদিক কার্য্যে দক্ষিণা গ্রহণ করা যে ঋষির নির্দ্দেশ-বিরুদ্ধ, তাহা ঋষিপ্রণীত একাধিক শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হইতে পারে। দক্ষিণা করা পূজার অঙ্গস্বরূপ বটে, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা তখনই গ্রহণ করা কোন ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রানুমোদিত নহে।

স্বকীয় পূর্ব্বাবস্থার তুলনায় ব্রাহ্মণগণ যতদূর পতিত হইয়াছেন, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এখনও ততদূর পতিত হন নাই। বৈশ্য ও শূদ্রগণ প্রায়শঃ স্ব-স্ব-বৃত্তি ছাড়িয়া দিয়া বেতনভোগী নফর হইতে বাধ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখনও তাঁহারা নফরগিরির ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের তুলনায় প্রায়শঃ অপেক্ষাকৃত উচ্চপদস্থ হইতে পারিয়া থাকেন। নফরগিরির ক্ষেত্রেও যদি ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকে অপরের তুলনায় উচ্চতর পদস্থ হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের যে পতন হইয়াছে, তাহা স্বীকার্য্য হইলেও অপরের তুলনায় অধিকতর পতন হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইত না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না। ভিক্ষার ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণগণ যেরূপ অন্যান্য বর্ণের নিকট ভিখারী হইয়া থাকেন, অন্যান্যবর্ণের মানুষগুলি তাহা হয় না। কাযেই তাঁহারা

যে অন্যান্য বর্ণের তুলনায়ও অধিকতর পতিত হইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ইহার একমাত্র কারণ, প্রত্যেক বর্ণের মানুষই কু কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তন্মধ্যে কু-কর্ম্ম-নিরতের সংখ্যা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যত অধিক, অন্যান্য বর্ণের মধ্যে তত অধিক নহে। ঋষির সংগঠিত ব্রাহ্মণ্যের দায়িত্ব কি, তাহা জানিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, অন্যান্য বর্ণ যে কু-কর্ম্মনিরত হইয়াছেন, তাহার জন্যও ব্রাহ্মণগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দায়ী।

অনেকে হয়ত বলিবেন যে, পেটের দায়ে এতাদৃশ চালচলনে বাধ্য হইতে হয়। আমরা তাহার উত্তরে বলিব, যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আর ব্রাহ্মণ্যের অভিমান ও গোঁড়ামী পোষণ করা হয় কেন?

কোন্ উপায়ে মনুষ্যসমাজকে আবার তাহার সর্ব্বব্যাপক দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশান্তি ও অসন্তুষ্টি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চিন্তা করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, এই ব্রাহ্মণগণই মনুষ্যসমাজকে সর্ব্বনাশের পথে লইয়া গিয়াছেন বটে এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা তথাপি ব্রাহ্মণ্যের অভিমান পোষণ করেন এবং পূজার নামে কতকগুলি কুকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা চণ্ডালের মত অবজ্ঞেয়, তাহাও যুক্তিযুক্ত বটে, কিন্তু মনুষ্য-সমাজকে তাহার সর্ব্বব্যাপক দারিদ্র্য প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে হইলে পুনরায় ব্রাহ্মণেরই প্রয়োজন হইবে। অধিকন্ত, যে পরিকল্পনার দ্বারা উহা সম্পাদন করা সম্ভব-যোগ্য, তাহা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের মস্তিষ্ক হইতে প্রদত্ত হওয়া সম্ভব নহে, কারণ এই পতিত ব্রাহ্মণগণের শিরায় শিরায় ঋষিগণের খাঁটি রক্তের যতটুকু নিকটসম্বন্ধযুক্ত অংশ প্রবাহিত হইতেছে, তাহা আর কোন বর্ণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে না এবং তাঁহাদিগের মস্তিষ্ক যত সূক্ষ্মাবস্থা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, আর কাহারও মস্তিষ্কে সেই সক্ষমতা দেখা যায় না। কাযেই, চণ্ডালোপম পতিত ব্রাহ্মণগুলি যে ঋষির সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি রক্তযুক্ত সন্তান এবং তাঁহারা যে তাঁহাদিগের দায়িত্ব ভুলিয়া গিয়া চণ্ডালোপম হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহা সত্ত্বেও অযথা গর্ব্বানুভব করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা যাহাতে বুঝিতে বাধ্য হন, তাদৃশ আচরণ করাই বর্ত্তমান সমাজের প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। এখন না বুঝিতে পারিলেও ভবিষ্যতে দেখা যাইবে যে, এতাদৃশ আচরণই উহাঁদের প্রতি প্রকৃত বন্ধুত্বের পরিচায়ক। যাঁহারা ইহার অন্যথা আচরণ করিয়া উহাঁদের প্রতি অযথা শ্রদ্ধা দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে উহাঁদের বন্ধু নহেন, পরন্তু শত্রু। বন্ধু যখন উচ্ছিন্ন হইতে থাকে তখন তাহার উপভোগের বস্তুগুলি যোগান অথবা তাহার মো-সাহেবী করা বন্ধুর কার্য্য নহে। এতাদৃশ আচরণ শত্রুর কার্য্য। পরন্তু, সে যে উচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা দেখাইয়া দেওয়া এবং তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করাই বন্ধুর কর্ত্তব্য। আমাদিগের এই কথা কয়টি বুঝিবার মত মস্তিষ্ক "হিন্দু"-সম্পাদকের আছে কি?

"হিন্দু"র সাময়িক প্রসঙ্গের লেখকের প্রথম কথাটীর দ্বিতীয় মতবাদটি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহার মতে সাধনহীন ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের পক্ষে দেবদেবী যে কি এবং কি নহেন, তাহা স্থির করা সম্ভব নহে। "সাধনা" বলিতে ঐ লেখক যে কি বুঝিয়া থাকেন তাহা আমরা জানি না। তবে, ঋষির শাস্ত্রানুসারে সাধনা প্রধানতঃ তিন প্রকার। এক প্রকারের নাম বৈদিক সাধনা, আর এক প্রকারের নাম তান্ত্রিক সাধনা, আর অন্য প্রকারের নাম শব্দ-সাধনা। শব্দ-সাধনা কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কার্য্য। তন্ত্র-সাধনা মধ্য-যৌবনের কার্য্য। বৈদিক-সাধনা শেষ যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার কার্য্য। শব্দ-সাধনায় ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইবার সামর্থ্যের উৎপত্তি হয়। তান্ত্রিক সাধনায় আত্ম-তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধিযোগ্য হয় এবং তদ্দ্বারা যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার সামর্থ্যের উৎপত্তি হয়। বৈদিক সাধনায় ঈশ্বর ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় এবং তদ্দ্বারা অকালমৃত্যু দূরীভূত হয়। ঋষিদিগের কথানুসারে প্রথম সাধনাটী বিবাহ-জীবনে করাও সম্ভবযোগ্য বটে, কিন্তু

অবিবাহিত জীবনে উহা করা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সাধনাটী একমাত্র বিবাহিত জীবনে এবং কোন নদীর নিকটবর্ত্তী উন্মুক্ত প্রাঙ্গন-যুক্ত গৃহে করা সম্ভব। অবিবাহিত জীবনে অথবা পর্ব্বতের উপর উহা যথাযথভাবে করা কখনও সম্ভবযোগ্য নহে। কাযেই, ঋষিদিগের মত-বাদ যে মূল্যযুক্ত, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে বুঝিতে হয় যে, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট সাধনা একমাত্র উপার্জ্জন-নিরত সংসারীর পক্ষেই সাধ্য। উহা আর কাহারও দ্বারা সাধ্য নহে। অবশ্য, সংসারী হইয়াও যাহাতে রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত সন্ন্যাসীর মত চলা-ফেরা করা যায়, তাদৃশ-ভাবে নিজেকে গঠন করিতে না পারিলে কোন সাধনাই সম্ভবযোগ্য নহে। যাঁহারা বিবাহ না করিয়া উলঙ্গ অথবা অর্দ্ধোলঙ্গাবস্থায় চলা-ফেরা করেন, উহাঁদিগের পক্ষে কখনও রাগ-দ্বেষ-বিযুক্ত প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া সম্ভব নহে এবং তাঁহারা ভণ্ড হইয়া থাকেন—এতাদৃশ কথা ঋষিগণ একাধিক স্থানে প্রকাশ করিয়াছেন।

তথাপি সাধনানিরত হওয়া যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে, এতাদৃশ কথা ঐ লেখকটি কেন বলিলেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের মনে হয়, তিনি কোন ঋষির গ্রন্থের মলভাগ পড়াশুনা করেন নাই। পরন্তু, কোন কু-পণ্ডিতের কথাতেই তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে? বর্ত্তমান কালের হিন্দুয়ানীর গোড়ামী এইরূপে উৎপত্তি লাভ করিয়া হিন্দু সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

লেখকটির দ্বিতীয় কথা—

"আমরা কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র লইয়া তাঁহার পূজা করি, নাম জপ করি, গুণকীর্ত্তন করি এবং মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করি আমাদের পূজা অর্চ্চনায় তিনি তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে দর্শন দিন ও সিদ্ধি দান করুন! আমরা কি ভুল করিতেছি? রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি সাধকগণ কি ভুল করিয়াই মরিয়াছেন? তন্ত্রশাস্ত্র কি মিথ্যা, না তান্ত্রিকসাধকগণ কেহই তন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাঁহারা শ্যামাসাধনা সম্পর্কে তাঁহাদের শিষ্যদিগকে কেবল প্রতারণা করিয়াই গিয়াছেন? এখন হইতে কি কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া উহার পূজায় নিযুক্ত থাকা মূঢ়তা হইবে? এবং উহার পূজা ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে?"

আমরা লিখিয়াছিলাম যে, "কেহ কেহ উহা (শ্যামা) যে কি, তাহা না বুঝিতে পারিয়া কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া উহার পূজায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন।" আমাদিগের উপরোক্ত বাক্যানুসারে আমাদের মতে কোশাকুশী, ফুল, বিল্বপত্র প্রভৃতি লইয়া পূজা করা নিন্দনীয়, অথবা শ্যামা যে কি, তাহা না বুঝিয়া কোশাকুশী প্রভৃতি লইয়া পূজা করা নিন্দনীয়, তাহা পাঠকগণ বিচার করুন। ইহার পর যদি আমরা বলি যে, এই সম্পাদকটির যুক্তিপূর্ণ চিন্তাশীল বাঙ্গালা ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য নাই, তাহা হইলে কি আমাদিগের পক্ষে অসঙ্গত হইবে?

শ্যামা যে কি, তাহা না বুঝিয়া তাঁহার পূজা করা কেন যে আমাদের মতে অসঙ্গত তাহা আমরা প্রথম কথার সমালোচনাতেই দেখাইয়াছি। কাযেই, এখানে আর তাহার পুনরুল্লেখ করিব না।

রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, কমলাকান্ত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি সম্মানযোগ্য মানুষগুলি যে তন্ত্র-সাধনা বুঝিবার প্রয়াসী ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই। তাঁহারা এক্ষণে কাল-গ্রাসে পতিত। কোন মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সাধারণতঃ আমাদিগের নীতিবিরুদ্ধ। কাযেই, আমরা উহা হইতে বিরত থাকিতে পছন্দ করি। কিন্তু, তথাপি লেখকটী যখন ঐ সম্মানযোগ্য মানুষ কয়টির সাধনার কথা উত্থাপিত করিয়াছেন, তখন দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হয় যে, ফল দেখিয়া বৃক্ষের স্বরূপ বিচার করিতে হইলে, তান্ত্রিক-সাধনা যে কি, তাহা উহাঁদের প্রত্যেকেই বুঝিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা স্বীকার করিয়া লইলেও, উহাঁরা যে তন্ত্রের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই, তাহা না বলিয়া পারা যায় না, কারণ তন্ত্রের অর্থ যথা-

যথভাবে বুঝিতে পারিলে, তান্ত্রিক সাধনা এমন ভাবেই ঋষিগণ রচিত করিয়াছেন যে, উহাতে কখনও অসিদ্ধ থাকা যায় না এবং তান্ত্রিক সাধনায় কোন মানুষ সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী মনুষ্যসমাজের বহু সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দুঃসহভাবে কোন ঐহিক দুঃখ থাকিতে পারে না। ইহার উদাহরণ ভারতীয় ঋষিগণের তান্ত্রিক সাধনা। ঋষিগণের শাস্ত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নয় হাজার বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী মানুষ এবং এই নয় হাজার বৎসরের মধ্যে কোন ঋষি জন্ম পরিগ্রহ না করিলেও গত তিন হাজার বৎসরের আগেও মনুষ্য-সমাজে কোনরূপ দুঃসহ ঐহিক দুঃখ-যাতনার সাক্ষ্য পাওয়া যাইবে না।

শব্দলক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তি উপলব্ধি করিয়া শব্দের অন্তর কি করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, এখনও ঋষি-প্রণীত তন্ত্রশাস্ত্রে প্রবেশ লাভ করা সম্ভব হয় এবং আমাদিগের কথা যে ঠিক, তাহা তখন বুঝিতে পারা যায়।

ঋষিগণের পরে যাঁহারা তন্ত্র সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে কোন গ্রন্থ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উঁহাদের প্রত্যেক খানিতে ঋষিগণের মূলগ্রন্থ যথাযথভাবে না বুঝিবার অল্পাধিক পরিচয় রহিয়াছে এবং তাহার জন্যই চেষ্টা করিয়াও উহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রাতঃ-স্মরণীয়, তাঁহারা পর্য্যন্ত মনুষ্য-সমাজকে অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টির হাত হইতে রক্ষা পাইবার কোন উপায় দেখাইতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান মনুষ্যসমাজ একদিন সর্ব্বতোভাবে অর্থাভাবাদির হাত হইতে রক্ষা পাইলেও অধুনা প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোনরূপ বাস্তব দুঃখে হাবুডুবু খাইতেছে।

দেব-দেবীর পূজা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু যে জাতীয় পূজা আজকাল হইতেছে, তাহা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই যে ভাল এবং কেন যে এতাদৃশ পূজা না হওয়াই ভাল, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

লেখকটীর তৃতীয় কথা –

"আমরা অস্বীকার করি না যে, কোনও মানুষ ঐ একটি চিত্রের সাহায্যে কাল এবং স্থান কাহাকে বলে এবং তাহার প্রভাব কি কি, তাহা এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সমগ্র মূলসূত্রে বুদ্ধিযোগ্য করা হইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরবোধে শ্যামার পূজা অর্চ্চনা বৃথা ইহা স্বীকার করিব কেন?"

শ্যামাকে ঈশ্বরবোধে পূজা করা সঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিতে হইলে শ্যামা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরবাচক কি না, তাহা আগে স্থির করিতে হয়। শ্যামা সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরবাচক কি না, তাহা স্থির করিতে বসিলে দেখা যাইবে যে, শ্যামা ঈশ্বরের আদ্যাশক্তি বটে এবং তিনি ব্রহ্মময়ীও বটে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বর-বাচক নহেন। রামকে রামের বাবার নামে ডাকিলে যেরূপ কোন উত্তর পাওয়া যায় না, পরন্তু উত্তর পাইতে হইলে রামকে কেবল-মাত্র রাম বলিয়াই ডাকিতে হয়, সেইরূপ শ্যামাকে ঈশ্বর বলিয়া ডাকিলে কোন ফলোদয় হওয়া সম্ভব-যোগ্য নহে, পরন্তু শ্যামার বিবিধ লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহার যথাযথ নামে ডাকিলে প্রত্যুত্তর পাওয়া সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। "হিন্দু"র সম্পাদক উপরোক্ত কথাটী বুঝুন আর না-ই বুঝুন—ইহাই বাস্তব সত্য। গোড়া হিন্দু-সমাজ এই কথাটী ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই মানুষের এত দুর্দ্দশা। একজনও যদি শ্যামাকে যথাযথভাবে ডাকিতে জানিতেন, তাহা হইলে মানুষ এত দুঃখ পাইতে পারিত না।

দুঃখের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আজ এই কথাটী কেহ বুঝুন আর না-ই বুঝুন, একদিন ইহা বুঝিতে হইবে এবং তখন হিন্দু, মুসলমান এবং খৃষ্টান বলিয়া এত দ্বেষ-হিংসা থাকিতে পারিবে না এবং প্রতিমা-পূজার সর্ব্ববিধ সমস্যাও সর্ব্বতোভাবে তিরো-হিত হইবে।

রাস্তাকে যাঁহারা নিজেরাই মল-পরিপূর্ণ করিয়া কলুষিত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের চোখ-রাঙ্গানীতে কেহ ভয় করিবে না, ইহা স্বভাবের নিয়ম।

সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের নমুনা ও আধুনিক হিন্দুয়ানা (২)

গত ২৪শে অগ্রহায়ণ শনিবারের "সাপ্তাহিক হিন্দু" নামক পত্রিকায় "কোথায় মস্তিষ্ক" এবং "বঙ্গশ্রী সম্পাদকের বাঙ্গালা ভাষাজ্ঞানের ও আধুনিক হিন্দুয়ানীর নমুনা"-শীর্ষক দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। "কোথায় মস্তিষ্ক"-শীর্ষক প্রবন্ধটীর লেখক "শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়।"

ইহা ছাড়া ৩রা অগ্রহায়ণ শনিবারের "বঙ্গবাসী" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় "পুঁইমাচা দর্শন" শীর্ষক একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত তিনটী সন্দর্ভই ১৩৪৩ সনের বৈশাখ মাসের মাসিক "বঙ্গশ্রী"তে প্রকাশিত "শ্যামা"-বিষয়ক কয়েকটী কথার প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর হিসাবে লিখিত। "বঙ্গশ্রী"র মূল কথা যাহা ছিল, তাহার মর্ম্ম "শ্যামার চিত্র বুঝিতে পারিলে উহার মধ্যে 'কাল' ও 'স্থানে'র সংজ্ঞা ও তাহাদিগের প্রভাব এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি বুঝিবার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া গতিশীল কার্য্যগুলির নক্সা কি করিয়া করিতে হয় তাহার জ্ঞানের পরিচয়ও ঐ চিত্রে আছে।"

মূলতঃ আমাদিগের উপরোক্ত কয়েকটী কথার প্রতিবাদে "হিন্দু" পত্রিকায় প্রথমতঃ কয়েকটী কথা লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর আমরা "হিন্দু" পত্রিকার কথাগুলির আমাদের ১লা অগ্রহায়ণের সংখ্যায় জবাব দিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকায় আবার উহার ১০ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় জবাব দেওয়া হইয়াছিল। আমরা পুনরায় আমাদের ১৫ই অগ্রহায়ণের সংখ্যায় উহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিলাম। তাহারই পাল্টা জবাবে "কোথায় মস্তিষ্ক ?" এবং অপর সন্দর্ভটী লেখা হইয়াছে।

"বঙ্গবাসী" পত্রিকার "পুঁইমাচা দর্শন" শীর্ষক সন্দর্ভের কোন জবাব আমরা এতাবৎ দিই নাই।

আমাদিগের বর্ত্তমান সন্দর্ভের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুইটী—প্রথমতঃ "হিন্দু" ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকার উপরোক্ত লেখা দুইটী সমালোচনা করা, দ্বিতীয়তঃ শ্যামার চিত্রে যে 'কাল' ও 'স্থানে'র সংজ্ঞা ও তাহাদিগের প্রভাব এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল সূত্রগুলির নির্দ্দেশ ও গতিশীল কার্য্যগুলির নক্সা করিবার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা আংশিকভাবে দেখান। শ্যামার চিত্রে কি পাওয়া যায় অথবা কি পাওয়া যায় না তাহা দেখাইতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হইবে। অতখানি লেখা এখানে সম্ভবযোগ্য নহে। সন্দর্ভান্তরে তাহা বিস্তৃতভাবে পাঠকবর্গকে শুনাইবার অভিপ্রায় আমাদিগের আছে।

"হিন্দু" ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকার যে তিনটী সন্দর্ভ আমরা সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত "কোথায় মস্তিষ্ক" শীর্ষক সন্দর্ভটী সর্ব্বাগ্রে মনোযোগের যোগ্য।

ঐ প্রবন্ধের মুখ্য প্রতিপাদ্য, "বঙ্গশ্রী"র সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকের মস্তিষ্ক অসুস্থ নহে, পরন্তু উহা একেবারেই নাই। ইহার কারণ, ঐ লেখকের লেখনীতে এই সম্বন্ধে যাহা যাহা বাহির হইয়াছে তাহার অন্যতম মর্ম্ম—"শ্যামা কি অথবা কি নয় তাহা প্রযত্নশীল হইলে সাধারণ মানুষের দ্বারা পর্য্যন্ত নির্ণীত হইতে পারে।"

শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গীতা, মহিম্নস্তব এবং চণ্ডীর কয়েকটী শ্লোক ও শ্লোকের অংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, শ্যামাকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও দেবগণ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে বিদিত হইতে পারেন নাই এবং তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে বিদিত হওয়া সম্ভবযোগ্য নহে বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন।

ঐ কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এতদবস্থায় যে মানুষটী শ্যামা কি এবং কি নয় তাহা সর্ব্বতোভাবে নির্ণয়যোগ্য বলিয়া মনে করিয়াছে, তাহার মস্তিষ্ক নাই, ইহা সঠিক ভাবে বুঝিতে হইবে।

গীতা, মহিম্নস্তব এবং চণ্ডীর যে কয়েকটা শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—তাহা আমরা নিম্নে লিখিতেছি :—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবং অজং বিভুং॥

গীতা, ১০ম অঃ, ১২ শ্লোক

সর্ব্বং এতৎ ঋতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্ দেবা ন দানবাঃ॥

গীতা, ১০ম অঃ, ১৪ শ্লোক

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন! ভূতেশ! দেবদেব! জগৎপতে॥

গীতা, ১০ম অঃ, ১৫ শ্লোক

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া॥

গীতা, ১০ম অঃ, ৪০ শ্লোক

মহিম্ নঃ পারং তে পরং অবিৎ উষো যৎ ঈ-অসৎ ঋশী।
স্তুতির্ ব্রহ্মাং ঈনাং অপি তৎ অবসং ন আস্ তু অয়ি গিরঃ॥

মহিম্নস্তব, ১ম শ্লোক

(বেদাঙ্গের শিক্ষা ও ছন্দানুগ পদচ্ছেদ যুক্ত)

যস্যাঃ প্রভাবম্ অতুলং ভগবান্ অন্ অন্তো।
ব্রহ্মা হরশ্চ ন হি-উ অক্তং অলং বলঞ্চ॥

(বেদাঙ্গের শিক্ষা ও ছন্দানুগ পদচ্ছেদ যুক্ত)

চণ্ডী, ৪র্থ অধ্যায়, ৪র্থ শ্লোক)

উপরোক্ত ছয়টী শ্লোকে যেখানে যেখানে আমাদের চিহ্নিত অনুস্বার বিসর্গ আছে, প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সেই খানে সেই খানে বিভক্ত্যন্ত পদ এবং যেখানে যেখানে আমাদিগের চিহ্নিত 'দন্ত্য ন' আছে, সেই সেই খানে 'না' অর্থ ধরা হইয়া থাকে। যেখানে যেখানে অনুস্বার ও বিসর্গ আছে, সেই সেই খানে বিভক্ত্যন্ত পদ এবং যেখানে যেখানে 'ন' আছে, সেই সেই খানে 'ন' এর অর্থ না ধরিয়া ঐ শ্লোক কয়েকটীর যে যে অর্থ হয়, তদনুসারে সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে জানা যে দেবতাদিগের পর্য্যন্ত অসাধ্য তাহা কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না এবং আমরা যে সর্ব্বতোভাবে মস্তিষ্কহীন বর্ব্বর তাহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

ইহার পরে আমরা দেখাইব যে, উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীতে যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়বাচক পদ ও বাক্যে যে 'অনুস্বার' ও 'বিসর্গ' ব্যবহৃত হয় তাহা কোন বিভক্তি-বাচক নহে এবং 'দন্ত্য-ন' এর অর্থ 'না' নহে। এতাদৃশ বিষয়ক বাক্যে যখন 'অনুস্বার' ব্যবহৃত হয় তখন 'পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কর্ম্মের অনুসরণ' বুঝিতে হয় এবং যখন 'বিসর্গ' ব্যবহৃত হয় তখন 'কোন কর্ম্ম হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত বস্তুকে' বুঝিতে হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় কোন বাক্যে যখন 'ন' ব্যবহৃত হয় তখন 'ন'-এর অর্থ 'না' হইয়া থাকে বটে, কিন্তু মন, অথবা বুদ্ধি অথবা আত্মাগ্রাহ্য কোন বিষয়-সম্বন্ধীয় বাক্যে 'ন'-এর অর্থ 'না' হয় না। তখন 'ন'-এর অর্থ হয় 'ব্রহ্মরূপের উন্মেষ' অথবা 'রাজসিকতার উন্মেষ' অথবা 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকারের বিকাশ' অথবা 'শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধের বিকাশ'। 'অনুস্বার', 'বিসর্গ' এবং 'ন'-এর অর্থ-সম্বন্ধীয় আমাদিগের উপরোক্ত কথা কয়েকটির যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণ কি আছে তাহাও আমরা ইহার পরে উপস্থিত করিব।

ঋষির শব্দ-শাস্ত্রানুসারে ঐ শ্লোক কয়েকটীর অর্থ প্রচলিত অর্থের বিরোধী হইলেও এবং তদনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রমাত্মকতা প্রতিপন্ন হইলেও, তাঁহার কথাগুলি মনোযোগের যোগ্য। কারণ, উহার মধ্যে শাস্ত্র-প্রমাণ দেখাইবার প্রযত্ন রহিয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক না কেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে যে অর্থে ঐ শ্লোক কয়েকটী গ্রহণ করিয়াছেন, তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, সেই সেই অর্থই ঠিক, তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, ঋষিদিগের মতে "সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানা ও তাঁহার কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা মানুষের ত' দূরের কথা, এমন কি দেবতাদিগের পর্য্যন্ত অসাধ্য।" এই কথা ঠিক হইলে বুঝিতে হয় যে, "সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানা এবং উপলব্ধি করা মানুষের অসাধ্য", মুখ্যতঃ এই কথাটী বলিবার জন্যই বিস্তৃতভাবে ঋষিগণ তাঁহাদিগের গ্রন্থ-

রাশি রচনা করিয়াছেন। যাঁহারা ঐ গ্রন্থরাশির সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন যে, উহা কত বিস্তৃত। ঋষিপ্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা, নিরুক্ত, উত্তর-মীমাংসা, অষ্টাধ্যায়ী সূত্র-পাঠ, বৈশেষিক-সূত্র, গৌতম-সূত্র, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, ছন্দ, জ্যোতিষ, কল্প, আগম-শাস্ত্র, চারিটী বেদ, মন্বাদি বিংশ সংহিতা যে কত বিস্তৃত-বিষয়ক, তাহা আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণের প্রত্যেকেই সম্ভবতঃ পরিজ্ঞাত আছেন। ঋষি-প্রণীত ঐ গ্রন্থগুলির সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, একমাত্র শুক্ল-যজুর্ব্বেদের মধ্যে যে-কথাগুলি আছে, তাহার শতাংশের একাংশের কথা আধুনিক পাশ্চাত্য পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, নৃ-তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, অর্থ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান, আইন-প্রণয়ন-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানাদিতে নাই।

যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, "সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানা ও উপলব্ধি করা মানুষের অসাধ্য", মুখ্যতঃ এই কথাটী বলিবার জন্যই ঋষিগণ তাঁহাদিগের এত বিস্তৃত শাস্ত্র ও গ্রন্থরাশি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা হইলে সাধারণ বুদ্ধিতেও বুঝিতে হয় যে, ঐ গ্রন্থরাশির প্রণেতা ঋষিগণ বড়ই 'বাচাল', 'আত্ম-বিজ্ঞাপন-প্রিয়', 'নিষ্প্রয়োজনীয় কথা-প্রমত্ত', 'আলস্যের উৎসাহদাতা' এবং 'দ্বন্দ্বকলহনিরত'। যাহা এক কথায় বলা যাইত তাহা বলিতে তাঁহারা এত সময়ক্ষেপ করিয়াছেন এবং এত কালী, কলম ও কাগজের ব্যবহার করিয়াছেন। যাহা তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে জানিতে পারেন নাই তাহা লইয়া মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার কৌশল রচনা করিয়াছেন, কারণ যাহা সর্ব্বতোভাবে জানা নাই, তৎসম্বন্ধীয় কথাগুলি সত্যও হইতে পারে অসত্যও হইতে পারে। এক কথায়, যাঁহারা সত্যদর্শী বলিয়া সহস্র সহস্র বৎসর হইতে চলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগের সত্যদর্শিতা সন্দেহজনক।

যে মতবাদ পোষণ করিলে ঋষিগণের সত্যদর্শিতা সন্দেহজনক হইতে পারে, সেই মতবাদ পোষণ করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করুন এবং তাঁহার বংশের শ্রী-বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হউন, তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু, আমরা এতাদৃশ মতবাদ পোষণ করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদিগের বিশ্বাস, যে মতবাদে ঋষিদিগের সম্যক্‌ সত্যদর্শিতার প্রতি বিন্দুমাত্রও অশ্রদ্ধার চিহ্ন থাকে, সেই মতবাদে নির্ব্বংশ হইয়া শ্রী-ভ্রষ্ট হইতে হয়। কত যুগ-যুগান্তর হইতে ঋষিদিগের বংশ এখনও চলিয়া আসিতেছে, ঋষির রক্ত যাঁহাদিগের শিরায় প্রবাহিত, তাঁহারা এখনও কত তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন, অথচ যাঁহারা প্রকারান্তরে ঋষিদিগের সম্যক্‌ সত্যদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দেহোৎপাদক কথা প্রচার করিয়াছেন, সেই ভাষ্যকারগণ প্রায় সকলেই নির্ব্বংশ হইয়া অকাল বার্দ্ধক্য ও অকাল-মৃত্যুর কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন—এই কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত হইলে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রেণীর মানুষ হইতে যাহাতে আমরা জন্মজন্মান্তরে দূরে থাকিতে পারি, তাঁহারা যদি কোন শ্রেণীর 'ব্রাহ্মণ' হন, তাহা হইলে আমরা যাহাতে 'চণ্ডাল' শ্রেণীর হইতে পারি, তাহাই আমাদিগের প্রার্থনীয় হয়।

ঋষিদিগের সাধারণ কার্য্যগুলি দেখিলেও তাঁহারা যে সম্যক্‌ভাবে সত্যদর্শী ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। তাঁহাদিগের সম্যক্‌ সত্যদর্শিতার প্রমাণ এখনও প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সম্যক্‌ভাবে না হইলেও আংশিকভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। সেদিন পর্য্যন্তও প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে ঋষির সন্তানগণ গুরুতা, পৌরোহিত্য ও অধ্যাপনা করিয়া, বৈদ্যের সন্তানগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া, কায়স্থের সন্তানগণ জোৎদারী ও তালুকদারী করিয়া, কৃষকের সন্তানগণ কৃষিকার্য্য করিয়া, তাঁতীর সন্তানগণ বস্ত্র বয়ন করিয়া, কুম্ভকারের সন্তানগণ হাঁড়ী-কলসীর ব্যবসা করিয়া, কর্ম্মকারের সন্তানগণ কর্ম্মকারী করিয়া, চর্ম্মকারের সন্তানগণ চর্ম্মকারী করিয়া, তিলি, সাহা প্রভৃতি বৈশ্যগণ কেনা-বেচা করিয়া, কাহারও মুখাপেক্ষী না হইয়া, কাহারও নফরগিরী না করিয়া স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে পারিত। মৃত্যুশয্যায় নিপতিত হইলে, সন্তান-সন্ততিগণ কি করিয়া কোন্‌ ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে তাহা ভাবিয়া

প্রায় কাহারও চিন্তাকুল হইতে হইত না। যে অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যুতে এখন মানুষ এত অধিক পরিমাণে সন্তপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, কয়েক শত বৎসর আগেও তাহার চিহ্ন ভারতীয় গ্রামে এত অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। যে দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়তা গ্রাম্যগণকে এত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিয়াছে, সেই দ্বন্দ্ব-কলহপ্রিয়তা একদিন কোন গ্রামে বিদ্যমান ছিল না, পরন্তু সমপ্রাণতা বিদ্যমান ছিল, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। যে একতা এখন প্রায়শঃ অদৃশ্য হইয়াছে, সেই একতা যে একদিন সর্ব্বতোভাবে বিরাজিত ছিল তাহা গ্রাম্য-গণের পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ী ও জীবন-যাপন-প্রণালী দেখিলে এখনও অনুমান করা যায়। এখনও ছেলে হইলে অন্নপ্রাশন, পিতামাতার মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধ, পুত্র-কন্যা বয়স্থ হইলে বিবাহ, 'গ্রহণ' ও 'যোগ' হইলে স্নান, পূজার সময় পূজার আনন্দের প্রবৃত্তি প্রায় সকল গ্রাম্যগণের মধ্যেই দেখা যায়। গ্রামের এই রচনা-কৌশল মূলতঃ কাহাদের মস্তিষ্কপ্রসূত, তাহার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, উহা ভাষ্যকার অথবা আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত অথবা আধুনিক বৈজ্ঞানিক, ইহাঁদের কাহারও মস্তিষ্কপ্রসূত নহে। ভাষ্যকার, আধুনিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ উপরোক্ত প্রত্যেক রচনাটী লইয়া বিভিন্ন মতবাদ উত্থাপিত করিয়াছেন এবং পরস্পরের মধ্যে দলাদলির সৃজন করিয়াছেন। ঋষি-প্রণীত সংহিতাগুলি যথাযথ অর্থে অধ্যয়ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, গ্রামের ঐ রচনার মূলসূত্র সংহিতার মধ্যেই সর্ব্বতো-ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে এবং উহার প্রত্যেকটী ঋষির মস্তিষ্কপ্রসূত। পরবর্ত্তী ভাষ্যকারগণ ঋষির ভাষা বুঝিবার পদ্ধতি বিস্মৃত হইয়া একই কথা স্বকপোল-কল্পনায় বিভিন্ন অর্থে প্রচার করিয়াছেন এবং গ্রাম্য-গণের দলাদলির সৃষ্টি হইয়াছে। সংসার-যাত্রায় দ্বন্দ্ব ও কলহের প্রবৃত্তি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করা যে ঋষির শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বপ্রথম বিধান, তাহা পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভুলিয়া গিয়া ভাষ্যকার-গণের সৃজিত দলাদলি উত্তরোত্তর আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন এবং যাঁহাদের শিরায় শিরায় ঋষির রক্ত প্রবাহিত, তাঁহারাই ঋষির রচনার ধ্বংসের সর্ব্বপ্রথম সোপান প্রস্তুত করিয়াছেন।

যে কৃষি-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, বাণিজ্য-বিদ্যা ও চিকিৎসা-বিদ্যা ও চরিত্র-গঠন-বিদ্যায় গ্রাম্যগণের পক্ষে উপরোক্ত ভাবের অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব ও শান্তির অভাব হইতে মুক্ত হওয়া সম্ভব হইয়াছিল, তাহাই বা কাহাদের মস্তিষ্ক-প্রসূত, তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেও দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেক কথাটীও অথর্ব্ববেদের মধ্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ঋষি ছাড়া আর কেহ যে ঐ বিদ্যা আবিষ্কার করিতে পারিয়াছিলেন তাহার কোন প্রমাণ কুত্রাপি দেখা যাইবে না। ঋষির ভাষা যথা-যথ ভাবে বুঝিবার পদ্ধতির বিস্মৃতির ফলে পরবর্ত্তী বিভিন্ন ভাষ্যকারগণ উহাও স্বকপোলকল্পিত অর্থে প্রচার করিয়া বিভিন্ন মত-বাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহার ইন্ধন যোগাইয়া মনুষ্য-সমাজের সর্ব্বনাশের প্রথম সোপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কাল-প্রভাব ইহার মূলে যে আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ কাল-প্রভাবের ফলে ঋষির সন্তানগণই সর্ব্বাগ্রে বিকৃত হইয়াছেন এবং তাঁহারাই মানব-সমাজের বর্ত্ত-মান সর্ব্বনাশের সর্ব্বপ্রথম কারণ। তাঁহারা ঐরূপ না হইলে হয়ত মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে কাহারও পক্ষে এতাদৃশ চিন্তাকুলতার কারণ দেখা যাইত না।

গ্রামের উপরোক্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলে তাহার প্রণয়নকারী ঋষিগণ যে সর্ব্বতোভাবে সত্যদ্রষ্টা ছিলেন তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। আমাদিগের বিশ্বাস, গ্রামের ঐ অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে যে চক্ষুর প্রয়োজন, দাম্ভিকতা, মূর্খতা ও আত্মম্ভরিতার ফলে ঋষির সন্তানগণের সেই চক্ষু সর্ব্বতোভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা কি বলেন ও কোন্ মতবাদ প্রচার করেন তাহা তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারেন না।

"সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানা ও উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভবযোগ্য নহে"—এতাদৃশ কথা ঋষিগণ

যে বলেন নাই, পরন্তু কি করিয়া মানুষ সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে ও উপলব্ধি করিতে পারে তাহার তথ্য প্রচার করিবার জন্যই যে, তাঁহারা তন্ত্র ও বেদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা ঐ তন্ত্র ও বেদ সম্যক্‌ভাবে বুঝিতে পারিলে সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট হইবে।

কি করিয়া সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে ও উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধে ঋষিগণ যে সমস্ত কথা তাঁহাদিগের তন্ত্রে ও বেদে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান কথাগুলি আমরা পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিব। এই কথাগুলি জানিতে পারিলে সর্ব্বনিয়ন্তাকে যে সর্ব্বতোভাবে জানা সম্ভব, তাহা পাঠকবর্গ অনুমান করিতে পারিবেন।

সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্ব-নিয়ন্তা যে কি বস্তু তাহা সর্ব্বাগ্রে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হয়।

যাহা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, মনের দ্বারা ভাবিতে পারা যায় এবং বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যায়, যিনি তাহার নিয়ন্তা ও স্রষ্টা তিনিই যে সর্ব্ব-নিয়ন্তা, ইহা সহজেই বুঝা যাইবে।

এক্ষণে সর্ব্বপ্রথমে স্থির করিতে হইবে যে, মানুষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কি কি দেখিতে পায়। মানুষ যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে পায়, তাহা শ্রেণীবদ্ধ করিলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি চর জীব, কতকগুলি অচর জীব, খানিকটা স্থল, খানিকটা জল, খানিকটা বায়ু, খানিকটা আলোক ও খানিকটা অন্ধকার প্রতিনিয়ত তাহার চক্ষে নিপতিত হইতেছে। যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটীর মধ্যে মূলতঃ আকার, রস, তেজ, বায়ু ও আকাশ (intermolecular space), আলোক ও অন্ধকার এবং কতকগুলি দিক্‌, কাল বিদ্যমান আছে।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যে উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ, উন্মেষ-বৃদ্ধি, বিকাশ-প্রবৃত্তি, বিকাশ, রক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিদ্যমান আছে।

অগ্রসর হইলে আরও দেখা যাইবে যে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে আকার, রস, তেজ, বায়ু, আকাশ, আলোক, অন্ধকার, দিক্‌, কাল, উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ, উন্মেষ-বৃদ্ধি, বিকাশ-প্রবৃত্তি, বিকাশ, রক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু তাহা ছাড়া স্থল, চর ও অচর জীবগণের মধ্যে আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে।

স্থল, চর ও অচর জীবগণের মধ্যে একটা অনুভব-শক্তি বিদ্যমান আছে। ঐ অনুভব-শক্তি জল ও বায়ুর মধ্যে নাই। চর-জীবগণের মধ্যে ঐ অনুভব-শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া বুদ্ধির বিদ্যমানতা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া চর-জীবগণের মধ্যে—মন, দশটী ইন্দ্রিয়, শব্দবিকাশ, স্ত্রী-পুরুষ ভাবোদ্দীপক লিঙ্গ ও কাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার কোনটী অচর জীবগণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না।

চর ও অচর জীব, স্থল, জল এবং বায়ুর মধ্যে যাহা যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, তৎসমুদায়কে আরও শ্রেণীবদ্ধ করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহা যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা পরিলক্ষিত হয়, তাহা প্রধানতঃ (১) কর্ম্ম, (২) কর্ম্ম-শক্তি, (৩) অনু, (৪) অনু-শক্তি, (৫) দিক্‌, (৬) কাল, (৭) অনুভূতি, (৮) বুদ্ধি ও ভাব, (৯) মন ও মনন-শক্তি, (১০) ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়-শক্তি, (১১) শব্দ ও শব্দ-শক্তি, (১২) লিঙ্গ ও লিঙ্গ-শক্তি, (১৩) কাম ও কাম-শক্তি, (১৪) আলোক, (১৫) অন্ধকার, (১৬) উন্মেষ, (১৭) বৃদ্ধি, (১৮) ক্ষয়।

কাযেই বলিতে হইবে যে, যিনি অথবা যাঁহারা এই আঠারটী বিষয়ের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা তিনি অথবা তাঁহারা সর্ব্ব-নিয়ন্তা।

আমাদিগের ঋষিগণ দেখাইয়াছেন যে, এই আঠারটীর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা মূলতঃ একটী। কাযেই, সর্ব্ব-নিয়ন্তা মাত্র একটী।

আপাত-দৃষ্টিতে যাহা আঠারটী অথবা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া অসংখ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা মূলতঃ দুইটী। একটীর নাম কর্ম্ম-শক্তি, আর একটীর নাম ভাব-শক্তি অথবা বুদ্ধি-শক্তি। এই কর্ম্ম-শক্তিকে ঋষিগণ ভূত-শক্তি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, কারণ কর্ম্ম শক্তির দ্বারাই ক্রমে ক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, রস ও আকার-

নামক পঞ্চমহাভূতের ও তাহাদিগের শক্তির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। ভূত হইতে ভূত-শক্তির এবং ভাব হইতে ভাব-শক্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কাযেই, জীবের ভূত ও ভাব কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে এবং উপলব্ধি করিতে পারিলেই সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে জানা ও উপলব্ধি করা হয়। ইহারই জন্য ঋষিগণের ভাষায় সর্ব্ব-নিয়ন্তার অপর নাম—"ভূত-ভাব-ন"।

এই ভূত ও ভাব যে মূলতঃ কোথা হইতে আসিতেছে এবং যেখান হইতে উহা মূলতঃ আসিতেছে, সেইখান কি করিয়া উপলব্ধি করিতে হয় তাহার কথা আমরা এক্ষণে পাঠকবর্গকে শুনাইব।

কোন্ স্থান হইতে "ভূত ও ভাবে"র মূল উৎপত্তি হইতেছে, তাহা বুঝিতে হইলে এই বিশ্ব-দুনিয়ায় কত রকম স্থান আছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে জানিতে হইবে।

সামবেদে ঋষিগণ প্রথমেই দেখাইয়াছেন যে, যাহা কিছু মানুষ চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায় তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম "অখণ্ড-মণ্ডল" এবং অপর ভাগের নাম "খণ্ড-মণ্ডল"। চন্দ্র পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা "খণ্ড-মণ্ডলে"র অন্তর্গত। চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাকাশ পর্য্যন্ত যাহা কিছু দেখা যায় তাহা "অখণ্ড-মণ্ডলে"র অন্তর্গত।

যাহার মধ্যে অণু আছে তাহাই খণ্ডিত এবং তাহাই "খণ্ড-মণ্ডলে"র অন্তর্গত। যাহার মধ্যে অণু নাই তাহাই "অখণ্ডিত" এবং তাহাই "অখণ্ড-মণ্ডলে"র অন্তর্গত।

খণ্ড-মণ্ডল ও অখণ্ড-মণ্ডলের ধারণা করিতে হইলে 'অণু' কি বস্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। পাশ্চাত্ত্য পদার্থ-বিদ্যা ও রসায়নে যাহাকে atom অথবা electron বলা হইতেছে, তাহা ঠিক ঠিক সংস্কৃত ভাষার 'অণু' নহে। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের atom অথবা electron যে কি বস্তু, তাহা সঠিক ভাবে ধারণা করা যায় না। Atom অথবা electron সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলি এখনও পর্য্যন্ত মোটেই স্পষ্ট হয় নাই। পরন্তু এখনও পর্য্যন্ত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণের atom ও electron কাল্পনিক রহিয়া গিয়াছে।

অণুর অন্তরে ও বাহিরে আকাশ (inter-molecular space), বায়ু, তেজ ও রস (কতকটা water-vapour-এর মত) অপরিহার্য্য। 'অণু' স্বতঃই বৃদ্ধি এবং ক্ষয়-শীল। ইহা কেবলমাত্র জল ও স্থলে থাকিতে পারে। যে বায়ু-মণ্ডলে রস (অর্থাৎ vapour) নাই সেই বায়ু-মণ্ডলে 'অণু' থাকিতে পারে না। মনুষ্য-নির্ম্মিত কোন কৃত্রিম জিনিষের মধ্যে 'অণু' থাকিতে পারে না। কারণ, কৃত্রিম জিনিষ যতই খণ্ডিত করা হউক, তাহার সূক্ষ্মতম খণ্ডের বাহিরে আকাশ (inter-molecular space), বায়ু, তেজ ও রস, (water vapour) থাকে বটে, কিন্তু উহার অন্তরে ঐ চারিটী পদার্থের কোনটাই থাকে না। কৃত্রিম জিনিষ পোড়াইয়া তাহার কৃত্রিমতা দগ্ধ না করা পর্য্যন্ত 'অণু'র দেখা পাওয়া যায় না। কৃত্রিম জিনিষ পোড়াইলে পর তাহার বাষ্পের মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা কৃত্রিম জিনিষের অন্তরস্থিত কোন পদার্থ নহে, পরন্তু বহিঃস্থিত পদার্থ। ইহা ছাড়া কৃত্রিম জিনিসের কোন খণ্ডই কখনও স্বতঃই বৃদ্ধি এবং ক্ষয়শীল হয় না। উহা যে কখন কখন বৃদ্ধি এবং ক্ষয় পাইয়া থাকে, তাহার কারণ উহার অন্তরে বিদ্যমান থাকে না, পরন্তু ঐ কারণ উহার বাহিরে বিদ্যমান থাকে। ইহারই জন্য উহাকে স্বতঃই বৃদ্ধি এবং ক্ষয়-শীল বলা যায় না।

পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের নির্ম্মিত কৃত্রিম পদার্থের মধ্যে 'অণু'র সন্ধান করিতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত 'অণু'কে সর্ব্বতোভাবে বুঝা তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 'অণু'কে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে কৃত্রিম পদার্থ ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করিতে ও তাঁহাকে বিশ্লেষণ করিতে হইবে। Test tube ছাড়িয়া দিয়া স্বকীয় অন্তর বিশ্লেষণ করিবার প্রবৃত্তি ও অভিনিবেশ জাগ্রত না হইলে প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করা ও বিশ্লেষণ করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। যতদিন test tube, microscope ও telescope প্রভৃতি লইয়া বিজ্ঞান আবিষ্কার করিবার মুগ্ধতা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত বিজ্ঞান কুজ্ঝটিকাময় হইয়া থাকিবে

এবং উহা নানা রকমে মোহমুগ্ধ মানুষগুলির বিস্ময় উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে বটে, কিন্তু তৎ-সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাব প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

বিশ্ব-দুনিয়ায় যতক্ষণ পর্য্যন্ত রসের উন্মেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 'অণু'র উন্মেষ হয় না এবং ততক্ষণ পর্য্যন্ত খণ্ড-মণ্ডলেরও বিকাশ হয় না। বিশ্ব-দুনিয়া সর্ব্বসমেত কতখানি তাহা ধারণা করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার অধিকাংশ ভাগেই রস উন্মেষিত নহে। রস উন্মেষিত হইবার আগে রস-বীজের উন্মেষ হয়। বিশ্ব-দুনিয়ার যে প্রদেশে রস-বীজের উন্মেষ হয়, সেই প্রদেশে 'অণু' বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। সেই প্রদেশ অখণ্ড-মণ্ডলের অংশান্তর্গত। রস-বীজ, পৃথক্ ভাবে উন্মেষ প্রাপ্ত হইবার আগে বিশ্ব-দুনিয়ার এমন প্রদেশ আছে, যেখানে রস-বীজ পর্য্যন্ত পৃথক্ ভাবে পাওয়া যায় না। সেইখানে আকাশ-বীজ, বায়ু-বীজ ও রস-বীজ সর্ব্বতোভাবে মিলিত থাকে। আমরা সেই প্রদেশের কথা বলিতে বসিয়াছি। সেই প্রদেশে ভূত-ভাব-নের অথবা সর্ব্বনিয়ন্তার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

যাহা অখণ্ড তাহা "খণ্ড মণ্ডলে"ও থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যাহা "খণ্ড" তাহা কখনও "অখণ্ড-মণ্ডলে" থাকিতে পারে না।

খণ্ড-মণ্ডলের উপাদান পাঁচটী—আকাশ, বায়ু, তেজ, রস ও আকার। ইহার মধ্যে আকাশ, বায়ু ও তেজ এই তিনটী অখণ্ড। এই তিনটীর মধ্যে কোন অণু বিদ্যমান নাই। অণু বিদ্যমান আছে কেবলমাত্র রস ও আকারের মধ্যে। খণ্ড মণ্ডলের আকাশ, বায়ু ও তেজের মধ্যে বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ যে অণু দেখিতে পান, তাহা বাস্তবিকপক্ষে আকাশ, বায়ু ও তেজের অণু নহে। পরন্তু উহা 'রসে'র অণু। কারণ, খণ্ড-মণ্ডলের আকাশ, বায়ু ও তেজ সর্ব্বদাই রস-মিশ্রিত থাকে।

অখণ্ড-মণ্ডলের উপাদান তিনটী—যথা, ব্যোম (আকাশ-বীজ), বায়ু-বীজ ও তেজ-বীজ।

খণ্ড-মণ্ডলে জীব আছে, কিন্তু অখণ্ড-মণ্ডলে জীব নাই, কারণ জীবের অপরিহার্য্য উপকরণ রস। তাহা অখণ্ড-মণ্ডলে বিদ্যমান নাই।

খণ্ডমণ্ডলে জীব যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু, অখণ্ডমণ্ডলে রাগ-দ্বেষবিশিষ্ট সাধারণ জীবের যাতায়াত সম্ভব নহে।

অখণ্ড-মণ্ডলে সাধারণ জীব ও রস যাতায়াত করিতে পারে না বটে, কিন্তু উহার মধ্যে মানুষের দৃষ্টি পরিচালিত হওয়া সম্ভব, কারণ উহার মধ্যেও আকাশ-বীজ, বায়ু-বীজ ও তেজ-বীজ বিদ্যমান আছে।

"খণ্ড-মণ্ডলে"র মধ্যে তিনটি "লোক" আছে। একটীর নাম ভূলোক, দ্বিতীয়টীর নাম "ভুব"র্লোক এবং তৃতীয়টীর নাম "স্ব"র্লোক।

আমাদের বর্ত্তমান ভূগোলের বিদ্যানুসারে যাহাকে ভূমণ্ডল বলিয়া থাকি, তাহা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম জল এবং অপর ভাগের নাম স্থল। কতখানি জল এবং কতখানি স্থল তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান বিদ্যার দ্বারা সম্যক্ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নহে, কারণ ভূমণ্ডলের উত্তরে ও দক্ষিণে যে আর্টিক ও আন্টার্টিক নামক প্রদেশ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহা যে কদ্দুর বিস্তৃত তাহা বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ এখনও পর্য্যন্ত বিদিত নহেন। ভূমণ্ডলের রূপ যে কি, তাহাও তাঁহারা সম্যক্ভাবে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, কারণ উপরোক্ত দুইটী প্রদেশ যখন এখনও তাঁহাদিগের অজানা, তখন ঐ প্রদেশের সম্পূর্ণ অবস্থান জানিতে পারিলে ভূ-মণ্ডলের রূপ যে কি দাঁড়াইবে, তাহা ঐ দুইটী প্রদেশ সর্ব্বতোভাবে না জানা পর্য্যন্ত স্থির করা সম্ভব নহে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, পৃথিবীর রূপ 'কমলালেবুর মত' বলিয়া আমাদিগের যে ধারণা আছে, তাহা অনুমান মাত্র এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে। পৃথিবীর রূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা কমলালেবুর মত নহে। পরন্তু, উহা মানুষের শরীরস্থ সর্ব্ব[illegible]-ব্যাপী অস্থি-ভাগের রূপের মত। ভূ-মণ্ডলের রূপের বর্ণনা আছে সাম্-বেদে এবং উহা কি করিয়া লেখনীর দ্বারা অঙ্কিত করিতে হয়, তাহার সঙ্কেত দেখান হইয়াছে, "কাশ্যপ-শিল্পে"। ভূ-মণ্ডলের রূপ অনুমান না করিয়া,

কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয় তাহাও ঋষিগণ দেখাইয়াছেন। ঐ সঙ্কেত লিপিবদ্ধ হইয়াছে শুক্ল-যজুর্ব্বেদে। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে যেরূপ ভাবে শ্যামা-পূজার পদ্ধতি বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে অভ্যস্ত হইতে পারিলে এবং তাহার পর শুক্ল-যজুর্ব্বেদের অভ্যাসে অভ্যস্ত হইলে ভূ-মণ্ডলের রূপ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। মানুষের অস্থি-ভাগের রূপই ভূ-মণ্ডলের রূপ, ইহা বুঝিতে পারিলে উহার কতখানি স্থল, আর কতখানি মহাসমুদ্র, ইহা বুঝা অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য হয়। ভূ-লোক, ভুব-র্লোক এবং স্ব-র্লোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব (thickness) নির্ণয় করিবার কি সঙ্কেত তাহা এই প্রসঙ্গের শেষাংশে বর্ণনা করিব। এখানে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, ভূ-মণ্ডলের স্থলভাগের নাম সংস্কৃত ভাষায় "ভূ-লোক", এবং জল ও স্থল-মিশ্রিত ভাগের নাম "ভুব-র্লোক"। এক দিকে ভুব-র্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া চন্দ্রের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত, অন্য দুই দিকে "মহ-র্লোক" পর্য্যন্ত যে অংশ তাহার নাম সংস্কৃত ভাষায় "স্ব-র্লোক"।

চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাকাশ পর্য্যন্ত যে অংশ সারা ভূ-লোক, ভুব-র্লোক ও স্ব-র্লোক ঘিরিয়া বসিয়া আছে, তাহার নাম মহ-র্লোক।

যাহা ঘন-ঘটাচ্ছন্ন নীলাকাশ তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম জন-লোক, দ্বিতীয় ভাগের নাম তপ-লোক এবং তৃতীয় ভাগের নাম সত্য-লোক।

জন-লোক ভূ, ভুব, স্ব, এবং মহ, এই চারিটী লোককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে :

তপ-লোক ভূ, ভুব, স্ব, মহ এবং জন এই পাঁচটী লোককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।

সত্যলোক ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন এবং তপ এই ছয়টী লোককে ঘিরিয়া বসিয়া আছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, ভূ, ভুব ও স্ব এই তিনটী লোক খণ্ড-মণ্ডলের অন্তর্গত এবং মহ, জন, তপ ও সত্য-লোক অখণ্ড-মণ্ডলের অন্তর্গত।

খণ্ড-মণ্ডল না বুঝিতে পারিলে এবং তাহাকে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে অখণ্ড-মণ্ডলকে বুঝা ও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। অখণ্ড-মণ্ডলকে বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে 'ভূত ভাবন' ব্রহ্মকে অথবা সর্ব্ব নিয়ন্তাকে জানা ও প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না। "ব্রহ্ম"কে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে আচারবান্ ব্রাহ্মণসন্তানগণকে ঋষির শাস্ত্রানুসারে নিয়মিত গুণাধারানুযায়ী দ্বিজ ও মুনি বলিয়া আখ্যাত করা গেলেও যাইতে পারে বটে, কিন্তু দেব-শর্ম্মা বলিয়া আখ্যাত করা চলে না। ব্রাহ্মণ-সন্তানগণের মধ্যে যাঁহারা খণ্ড-মণ্ডল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে দোষাধারানুযায়ী, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদক, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল বলিয়া আখ্যাত করিতে হয়, ইহা ঋষিগণের অনুশাসন।

ব্রাহ্মণের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ হইতে হইলে খণ্ড-মণ্ডলকে বুঝা ও প্রত্যক্ষ করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজনীয় বলিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে সর্ব্ব-প্রথমে গায়ত্রীরূপে ভূ, ভুব ও স্ব-এর আরাধনা করিতে হয়। গায়ত্রীরূপে ভূ, ভুব ও স্ব-এর আরাধনা করিয়াও যাঁহারা খণ্ড-মণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের গায়ত্রীর আরাধনা বৃথা এবং তাঁহাদিগকে দ্বিজ, মুনি ও দেব-নামক তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কোন শ্রেণীর মধ্যেই পরিগণিত করা যায় না। উচ্চশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ হইতে হইলে খণ্ড-মণ্ডলকে প্রত্যক্ষ করা যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহার প্রমাণ গুরুর নমস্কার ('অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ')। অখণ্ড-মণ্ডলের জ্ঞান অতীব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইলে, তাহার জ্ঞান যিনি প্রদান করেন তাঁহাকে গুরু বলিয়া নমস্কার করিবার যুক্তি নষ্ট হইয়া যায়। ভূ-লোক, ভুব-র্লোক ও স্ব-র্লোক লইয়া যে খণ্ডমণ্ডল তাহার দ্রব্য-মূলক উপাদান, কর্ম্ম ও গুণ সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে সামবেদে। কাযেই, যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে চাহেন তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সর্ব্বাগ্রে সাম-বেদ পরিজ্ঞাত হইতে ও অভ্যাস করিতে হয়। সাম-বেদ পরিজ্ঞাত না হইলে ও অভ্যাস না করিলে গায়ত্রীরূপী ভূ, ভুব ও স্ব-কে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয় না।

মনে রাখিতে হইবে যে, ভূ, ভুব ও স্ব-র্লোক অথবা খণ্ড মণ্ডল চন্দ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চন্দ্র হইতে অখণ্ড-মণ্ডলের আরম্ভ হইয়াছে।

অখণ্ড-মণ্ডল প্রকৃত পক্ষে মহ, জন, তপ, সত্য, এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেও মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ মানুষ চক্ষে দেখিতে পায়। ইহার নাম মহর্লোক। ইহা চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাকাশ পর্যান্ত বিস্তৃত। ইহার বর্ণ অনুজ্জ্বল রক্তাভ শ্বেত। সংস্কৃত ভাষায় অনুজ্জ্বল রক্তাভ শ্বেত বর্ণকে 'শুক্ল বর্ণ' বলা হইয়া থাকে। মহর্লোকের উপাদান, কর্ম্ম ও গুণ সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে শুক্ল যজুর্ব্বেদে। অখণ্ড-মণ্ডলের শুক্লাংশ পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বেদের এই অংশে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই ইহার নামকরণ হইয়াছে 'শুক্ল যজুর্ব্বেদ'।

অখণ্ড-মণ্ডলের এই শুক্লাংশে প্রবিষ্ট হইয়া উহা প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে কৃষ্ণাংশে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভব হয় না। ইহারই জন্য সামবেদ অধ্যয়ন করিতে না পারিলে শুক্ল-যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না এবং শুক্ল-যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে না পারিলে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করা সম্ভব হয় না। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন না করিতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ড পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় না।

শুক্ল-যজুর্ব্বেদ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এবং উহাতে অভ্যস্ত হইলে সূর্য্য ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইতেছে কি করিয়া, উহাদের প্রত্যেকটী কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, সূর্য্য ও চন্দ্র এক একটী অথচ তারা অসংখ্য সংখ্যায় প্রতিভাত হয় কেন, দিবা-রাত্রি হয় কেন, গ্রহণ হয় কেন, অক্ষশাদের মূল কোথায়, অণুর উৎপত্তি হয় কি করিয়া, সংখ্যার উৎপত্তি হয় কি করিয়া, পলে পলে চন্দ্রের বিকাশ ও ক্ষয় হয় কেন, মহাসমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হয় কেন, তাপ ও আলোর উৎপত্তি হয় কেন, ছায়ার উৎপত্তি হয় কেন, অন্ধকার ও শীতের উৎপত্তি হয় কেন, ছয় ঋতুর উৎপত্তি হয় কেন, জীবের জন্ম, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু হয় কেন, বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় কেন, বজ্রের উৎপত্তি হয় কেন, কোন কোন যুগে তেজ-শক্তি মানুষ ব্যবহার করিয়া রেল-গাড়ী, মোটর-গাড়ী, বেতার-বার্ত্তা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারে কেন, আর কোন কোন যুগে উহা সম্ভব হয় না কেন, তেজ-শক্তি এবম্বিধরূপে ব্যবহার করা মানুষের হিতজনক অথবা অহিতজনক, জমির প্রাকৃতিক উর্ব্বরতা ও মানুষের প্রাকৃতিক বুদ্ধির ক্ষয় ও বৃদ্ধি কেন হয়, এবম্বিধ সত্যগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া এবং প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়।

অখণ্ড-মণ্ডলের যে অংশ নীলাকাশ পর্যান্ত বিস্তৃত, সেই অংশ শুক্ল যজুর্ব্বেদের সহায়তায় পরিজ্ঞাত হইয়া ও প্রত্যক্ষ করিয়া উহার কৃষ্ণাংশে প্রবিষ্ট হইতে হয়। আকাশের যে অংশ সাদা চোখের অভেদ্য এবং নীল বলিয়া প্রতিভাত হয় তাহা বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বতোভাবে নীল নহে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহা নীলাভ কাল বর্ণের। সংস্কৃত ভাষায় নীলাভ কালবর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইয়া থাকে। সাদা চোখে উহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উহাকে দেখিবার প্রণালী অবগত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহা আদৌ কৃষ্ণবর্ণ নহে। কৃষ্ণবর্ণের একটি অতি পাতলা পরদা উপরিভাগে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে উহা তপ্তাভ শ্বেতবর্ণের। "রাধিকা"র ধ্যান হইতে যথাযথ ভাবে তাঁহার বর্ণ কল্পনা করিতে পারিলে নীলাকাশের বর্ণ ধারণা করা যায়।

মনে রাখিতে হইবে যে, অখণ্ড-মণ্ডলের এই অংশটী জনলোক, তপোলোক এবং সত্যলোক-নামক তিনটি ভাগে বিভক্ত, অথচ উহার মধ্যে কোন খণ্ড নাই। বুঝিবার জন্য উহা তিনটী ভাগে বিভক্ত করা হয় বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে তিনটি ভাগের উপাদান ও কর্ম্ম পরস্পরের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। জন, তপ ও সত্য-লোকের উপাদান সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে এবং উহার কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঋক্ বেদে। ঋক্ বেদে যে শুধু জন, তপ ও সত্যলোকের কর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে তাহা নহে, জন, তপ ও সত্যলোকের কর্ম্মের সহিত মহ, স্ব, ভুব ও ভূলোকের কর্ম্ম কিরূপ ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাহাও পরিজ্ঞাত হইবার ও প্রত্যক্ষ করিবার পদ্ধতি ঋগ্বেদে দেখান হইয়াছে। অখণ্ড-মণ্ডলের

কৃষ্ণাংশের উপাদানের আলোচনা কৃষ্ণযজুর্বেদে করা হইয়াছে বলিয়াই উহার নামকরণ করা হইয়াছে "কৃষ্ণ-যজুর্বেদ।"

ভূলোক প্রভৃতি সপ্তলোকের ও সাম্ প্রভৃতি তিনটী বেদের নামকরণ কেন ঐরূপে করা হইয়াছে, একটীকে অপর কোন নামে অভিহিত না করিয়া ঠিক ঠিক স্বীয় নামে অভিহিত করিতে হয় কেন, তাহা পর্যান্ত তিনটী বেদে দেখান হইয়াছে।

এইরূপ ভাবে সাম্, যজু ও ঋক্ পরিজ্ঞাত হইয়া এবং তাহাদের মন্ত্রে অভ্যস্ত হইয়া ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত্যলোকের উপাদান, কর্ম্ম ও গুণ পরিজ্ঞাত হইতে ও প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে কি কি দেখা যায় তাহা বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষার চারিটী কথার অর্থের সহিত পরিচিত হইতে হয়। ঐ চারিটী কথার একটীর নাম "ঈক্ষণ", দ্বিতীয়টীর নাম "নিরীক্ষণ", তৃতীয়টীর নাম "অনুভব", চতুর্থটীর নাম "দর্শন।"

মানুষ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে দেখা-শুনা প্রভৃতি কার্য্য করে, সেই কার্য্যের নাম "দর্শন"।

মনের দ্বারা যে দেখা-শুনা করা হয় সেই দেখা-শুনার নাম "অনুভব"। ইহা মনন-শক্তির কার্য্য।

বুদ্ধির দ্বারা যে দেখা-শুনা করা হয়, সেই দেখা-শুনার নাম "নিরীক্ষণ"। ইহা বোধ-শক্তির কার্য্য।

আত্মার দ্বারা যে দেখা-শুনা করা হয়, সেই দেখা-শুনার নাম "ঈক্ষণ"। আত্মা যে কি বস্তু তাহা বুঝা অপেক্ষাকৃত দুরূহ।

"নিরীক্ষণে"র কার্য্যে একটু অগ্রসর হইলে "আত্মা" যে কি বস্তু তাহা বুঝা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। এই সন্দর্ভেই কোন্ কার্য্যের নাম "আত্মা" তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

জন, তপ ও সত্যলোকের কার্য্য কেবলমাত্র আত্মার সাহায্যে ঈক্ষিত হইতে পারে। উহা নিরীক্ষণ করা অথবা অনুভব করা অথবা দর্শন করা সম্ভব নহে। উহা একমাত্র বেদের সহায়তায় সম্ভব। আত্মা সমস্ত লোকের কার্য্যই ঈক্ষণ করিতে সক্ষম। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে সপ্তলোকের সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যই ঈক্ষণ করা সম্ভব হয়।

মহ-র্লোকের কার্য্য আত্মা ছাড়া বুদ্ধির দ্বারাও নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয়। জন, তপ ও সত্য ছাড়া আর চারিটী লোকের কার্য্য বুদ্ধি নিরীক্ষণ করিতে সক্ষম। এইখানে মনে রাখিতে হইবে যে, মহ-র্লোকেও সত্য, তপ ও জনলোকের কার্য্য বিদ্যমান আছে এবং তাহা বুদ্ধির দ্বারা নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না।

স্ব-র্লোকের কার্য্য আত্মা ও বুদ্ধি ছাড়া মনের দ্বারাও অনুভব করা সম্ভব হয়। ভূ ও ভুব-র্লোকের কার্য্যও মনের দ্বারা অনুভব করা সম্ভব। স্ব-র্লোকের কোন কার্য্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করা সম্ভব হয় না। স্ব-র্লোকের কার্য্য বেদ ছাড়া আগমের সহায়তায় পরিজ্ঞাত হওয়া ও উপলব্ধি করা সম্ভব। স্ব-র্লোকেও সত্য, তপ, জন ও মহর্লোকের কার্য্য বিদ্যমান আছে। ঐ কার্য্যগুলি যথাক্রমে আত্মা ও বুদ্ধির সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইতে এবং উপলব্ধি করিতে হয়।

ভূলোক ও ভুব-র্লোকের কার্য্য আত্মা, বুদ্ধি ও মন ছাড়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও দর্শন করা সম্ভব। ভূ-লোক, ভুব-র্লোক, এবং তত্রত্য চরাচর জীবের কার্য্য ছাড়া ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আর কিছুই দর্শন করা যায় না। ভূ-লোক ভুব-র্লোক এবং তত্রত্য চরাচর জীবের কার্য্য আগম ও বেদ ছাড়া দর্শনের দ্বারাই পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। ভূ-লোক ও ভুব-র্লোকে সত্য, তপ, জন, মহ এবং স্বর্লোকের কার্য্য বিদ্যমান আছে। ঐ কার্য্যগুলি যথাক্রমে আত্মা, বুদ্ধি ও মনের সাহায্যে পরিজ্ঞাত হইতে এবং উপলব্ধি করিতে হয়।

খণ্ড-মণ্ডল ও অখণ্ড-মণ্ডল সম্বন্ধে এত কথা কেন বলা হইতেছে তাহা স্মরণ রাখিতে হইবে। সর্ব্ব-নিয়ন্তা অথবা "ভূত-ভাব-ন" যে মানুষের প্রত্যক্ষযোগ্য তাহা দেখান আমাদিগের সন্দর্ভের এই অংশের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বিশ্ব-দুনিয়ার কোন্ প্রদেশে তিনি আছেন তাহার সন্ধান সর্ব্বপ্রথমে করিতে হয় এবং ঐ সন্ধান করিতে হইলে বিশ্ব-দুনিয়া সর্ব্বসমেত কত অংশে প্রধানতঃ বিভক্ত তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়।

এই সম্বন্ধে উপরে যে কথাগুলি বলা হইয়াছে, তাহা চালাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, বিশ্ব-তুনিয়া প্রধানতঃ তুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগের নাম খণ্ড-মণ্ডল এবং অপর ভাগের নাম অখণ্ড-মণ্ডল। খণ্ড-মণ্ডল আবার ভূ-লোক, ভুব-র্লোক, ও স্ব-র্লোক এই তিন ভাগে বিভক্ত। অখণ্ড-মণ্ডল, মহ, জন, তপ ও সত্য, এই চারিটী লোকে বিভক্ত।

ঋষিগণের এই বিভাগগুলি কাল্পনিক নহে। কারণ ভূ-লোক, ভুব-র্লোক, স্ব-র্লোক ও মহ-র্লোক মানুষের চক্ষুর সম্মুখেই বিদ্যমান আছে। জন-লোক, তপ-লোক ও সত্য-লোক নীলাকাশের পশ্চাতে রহিয়াছে। নীলাকাশের পশ্চাতে যাহা রহিয়াছে তাহা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু বিশ্ব-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া অমাবস্যা ও পূর্ণিমার নীলাকাশ কি কি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, তাহা দেখিতে জানিলে জন-লোক, তপ-লোক ও সত্য লোক যে বিদ্যমান আছে এবং উহাও যে কাল্পনিক নহে, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইতে পারা যায়। আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণ ঋষি-গণের ভাষা অদ্ভুত রকম ভাবে পরিজ্ঞাত বলিয়া যাহা বাস্তব তাহাকে কাল্পনিক করিয়া তুলিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে ঋষিগণকে কল্পনার স্রষ্টা বলিয়া প্রমাণিত করিতেছেন। এতাদৃশ সৎকার্য্য করিতেছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের বংশ ও শ্রী অদ্ভুত রকমে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদিগের চৈতন্য হইতেছে না। তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঋষিগণ সত্য-দ্রষ্টা। যাহার বিকাশ চক্ষে দেখা যায় না, বিকাশ হইতে যাহার উন্মেষ, অথবা উন্মেষ-প্রবৃত্তি অনুভব অথবা নিরীক্ষণ অথবা ঈক্ষণ করা যায় না তাহা কখনও বিদ্যমান নাই এবং যাহা কখনও বিদ্যমান নাই তাহা কখনও সত্য নহে। যাঁহারা সত্যদ্রষ্টা তাঁহারা কখনও এবম্বিধ কাল্পনিক-বিষয়ক কথা বলিতে পারেন না।

বিশ্ব-তুনিয়ার বিভাগ সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে ভূ-প্রভৃতি সাতটী লোক যে বিদ্যমান আছে তাহা বুঝা যায় বটে, কিন্তু কোন্ 'লোক'টী কিভাবে (অর্থাৎ কোন্রূপে) কতখানি বিস্তৃত তাহা বুঝা যায় না।

ইহা সাম্, যজু ও ঋক্, এই তিনটী বেদে যথাক্রমে বুঝান হইয়াছে। উহার সমস্ত কথা এই সন্দর্ভে বুঝান সম্ভব হইবে না।

বিশ্ব-তুনিয়ার সাতটী বিভাগের কোন্টী কোন্রূপে কতখানি বিস্তৃত তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইলে মানুষের মাথার কেশ, কর্ণের বহির্ভাগ, হস্তাংশ, লিঙ্গ ও পদাংশ বাদ দিলে বাহির হইতে মানুষ কি রকম দেখায়, তাহা একবার ধারণা করিতে হইবে। তাহার পর মানুষের অন্তর কত ভাগে বিভক্ত তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে এবং অন্তর যে কয় ভাগে বিভক্ত, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধারণা করিতে হইবে।

মানুষের অন্তর কত ভাগে বিভক্ত, তাহা বুঝিতে হইলে "অন্তর" বলিতে কি বুঝায়, তাহা সর্ব্বাগ্রে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আপাতদৃষ্টিতে মানুষের মাংস ও রক্ত প্রভৃতি যেরূপ "অন্তরে"র অন্তর্গত, সেইরূপ তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিও অন্তরের অন্তর্গত। ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষায় ইন্দ্রিয়-শক্তি, মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে অন্তরের শক্তি বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগকে অন্তর বলা হয় নাই। মানুষের বাহ্যিক আকার যাহা হইতে উন্মেষিত ও বিকশিত হয়, ঋষির সংস্কৃত ভাষানুসারে তাহাদিগের নাম "অন্তর"।

শরীরাভ্যন্তরস্থ কোন্ কোন্ অংশের বিদ্যমানতাবশতঃ মানুষের আকার উন্মেষিত ও বিকশিত হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ মানুষের মেদে, দ্বিতীয়তঃ তাহার অস্থিতে, তৃতীয়তঃ মজ্জায়, চতুর্থতঃ বসায়, পঞ্চমতঃ মাংসে, ষষ্ঠতঃ তাহার রক্তে, সপ্তমতঃ তাহার চর্ম্মে মানুষের আকার উন্মেষিত ও বিকশিত হইতেছে। মানুষের চর্ম্ম যেরূপ সর্ব্বাঙ্গব্যাপী এবং তাহার আকার যেরূপ চর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে, সেইরূপ তাহার রক্ত, মাংস, বসা, মজ্জা, অস্থি এবং মেদ, এই ছয়টী বস্তুও সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও স্ব স্ব আকার-সংযুক্ত এবং তাহার প্রত্যেকটী মানুষের বাহ্যিক আকারের উন্মেষের ও বিকাশের সহায়তা করিতেছে।

মেদ হইতে চর্ম্ম পর্য্যন্ত মানুষের সর্ব্বাঙ্গে এই যে সাতটী আকার বিদ্যমান আছে, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মনের দ্বারা মোটামুটীরকম অনুভব করিতে পারিলে ভূ

হইতে সত্য পর্য্যন্ত সাতটী লোকের কোন্‌টী কোন্ রূপে কতখানি বিস্তৃত তাহা সংক্ষেপতঃ বুঝা অপেক্ষাকৃত অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ মেদ, অস্থি, মজ্জা ও বসার অংশ বাদ দিয়া মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের অংশ একত্রিত করিলে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী তাহার রূপ কিরূপ হয়, তাহার ধারণা করিতে হইবে। তখন ধারণা করা যাইবে যে, মাথার কতকাংশ গোল ও কতকাংশ বক্রাকার।

ভূ-খণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত নীলাকাশের যতখানি চোখে দেখা যায় তাহাও গোল।

মস্তিষ্কের মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের যতখানি অংশ গোল, তাহা ঐ নীলাকাশের গোলাংশের সহিত মিলাইয়া লইয়া, তদনুরূপ বিস্তৃত ভাবে যথাক্রমে মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের ললাট-ভাগ, ভ্রূ-ভাগ, চক্ষু ভাগ, কর্ণ-ভাগ, নাসিকা-ভাগ, ওষ্ঠ ভাগ, গ্রীবা-ভাগ, স্তন-ভাগ, বাহু-ভাগ, হৃদয়-ভাগ, উদর-ভাগ, নাভি-ভাগ, কটি-ভাগ, গুহ্যবিন্দু-ভাগ, উরু-ভাগ, জানু-ভাগ, খুর-ভাগ, অঙ্গুলি-ভাগ এবং নখ-ভাগ পর্য্যন্ত ধারণা করিতে পারিলে নীলাকাশের পশ্চাতে যে জন, তপ ও সত্যলোক আছে তাহা মিলিত ভাবে কতখানি দূর পর্য্যন্ত কিরূপ গতিতে বিস্তৃত তাহা মনের দ্বারা অনুভব করা যায়।

পাঠক, এইখানেই শিহরিয়া উঠিবেন না, মনে রাখিতে হইবে "ভূত-ভাব-ন" অথবা সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করিতে বসিয়াছেন। আমরা দেখাইতে বসিয়াছি যে, উহা সহজসাধ্য না হইলেও অসাধ্য নহে। "ভূত-ভাব-ন" অথবা সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে প্রত্যক্ষ করিবার কোন পন্থার সম্যক্ নির্দ্দেশ ঋষিগণ দিতে পারেন নাই বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা যে অতীব ভ্রান্ত এবং ঋষির শাস্ত্র না বুঝিতে পারিয়া যে ঐ মতবাদ পোষণ করেন, তাহা দেখান আমাদিগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন, তপ ও সত্যলোকের মিলিত বিস্তৃতি অনুভব করিবার জন্য উপরে যে পন্থার কথা বলা হইল তাহা মনের দ্বারা অনুভব করিবার চেষ্টা করিলে দেখা যাইবে যে, উহা অনায়াসসাধ্য নহে বটে, কিন্তু একেবারে অসাধ্য নহে। মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা "ভূত-ভাব-ন"কে প্রত্যক্ষ করা যায় না। সর্ব্বনিয়ন্তাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে যেরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন, সেইরূপ আবার মন, বুদ্ধি এবং আত্মারও প্রয়োজন হইয়া থাকে। উপরোক্ত পন্থায় অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, যথাক্রমে মন, বুদ্ধি ও আত্মা নিজের মধ্যে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠিবে। আগেই অসাধ্য অথবা দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিয়া হতাশ্বাস হইলে ঋষিদিগের এই কথাগুলি বুঝা ও উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

মানুষের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের মিলিতাংশ নীলাকাশের সহিত উপরোক্ত ভাবে মিলাইয়া অনুভব করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, নীলাকাশের যে গোলাংশটী আমাদিগের চক্ষুর দ্বারা ভূ-খণ্ডের উপরে দেখা যাইতেছে তাহা কেবলমাত্র মস্তিষ্কের গোলাংশ। ললাট-ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের নখ-ভাগ পর্য্যন্ত আর যে যে অংশ রহিয়াছে তাহার সমস্তই নীলাকাশ ও ভূ-খণ্ডের সন্ধির নিম্নে।

ইহার পর, জন, তপ ও সত্যলোক মিলিতভাবে কোন্ আকারে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহার কোথায় কতখানি পুরুত্ব (thickness), তাহা মনের দ্বারা অনুভব করিতে হইবে।

মানব শরীরের ললাটাদি কোন্ অংশে মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের মিলিত ভাগ কতখানি পুরু (thick) তাহা অনুভব করিতে পারিলে, জন, তপ ও সত্যলোকের মিলিত অবস্থান কোন্ স্থানে কতখানি পুরু তাহা অনুভব করা সম্ভব হয়।

জন, তপ ও সত্যলোক মিলিতভাবে কোন্ আকারে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহার কোথায় কতখানি পুরুত্ব তাহা অনুভব করিতে পারিলে ঐ তিনটী লোকের পৃথক্ পৃথক্ আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করা সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে।

নিজ শরীরের চর্ম্ম, রক্ত, মাংসের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পৃথক্ পৃথক্ আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করিতে পারিলে সত্য, তপ ও জনলোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। চর্ম্মাংশটী সত্য-লোক, রক্তাংশটী তপলোক এবং মাংসাংশটী জন-লোক।

নিজ শরীরের চর্ম্ম, রক্ত ও মাংসের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী পৃথক্ পৃথক্ আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করিয়া লইয়া সত্য, তপ ও জনলোকের পৃথক্ পৃথক্ আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করিবার নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে, মহ, স্ব, ভুব, ও ভূলোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুভব করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

নীলাকাশ হইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত অংশটীর সহিত স্বকীয় শরীরের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী "বসা" অংশটী পৃথক্ ভাবে মিলাইয়া লইলে মহ-র্লোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করা যায়।

উপরে চন্দ্র এবং নীচে ভূ-খণ্ড, এই দুইটী অবস্থানের কোন দুইটী বিন্দু সরলভাবে মিলাইলে যে অক্ষ-দণ্ড (axis) হয়, সেই অক্ষ-দণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া, মানুষের শরীরের মজ্জাংশটীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী যে আকার ও বিস্তৃতি তাহা মহ-র্লোক ও ভূখণ্ডের সন্ধি পর্য্যন্ত মিলাইয়া লইয়া অনুভব করিতে পারিলে স্ব-র্লোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করা যায়।

মানুষের শরীরের অস্থিভাগের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী যে আকার ও বিস্তৃতি, তাহাই ভূ-খণ্ড ও জলখণ্ডের সমতল-সূত্রে মহর্লোক ও ভূ-খণ্ডের সন্ধি পর্য্যন্ত মিলাইয়া লইলে যে আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব হয়, তাহাই ভুব-র্লোকের (অথবা ভূ-মণ্ডলের জল ও স্থল-মিশ্রিত ভাগের) আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব।

ভূ-খণ্ডের সমতল-সূত্রে মানুষের সর্ব্বাঙ্গব্যাপী মেদাংশের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব মিলাইয়া লইলে ভূ-লোকের আকার, (অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলের স্থল-ভাগের) বিস্তৃতি ও পুরুত্ব অনুভব করা যায়।

সত্য-লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভূ-লোক পর্য্যন্ত এই সাতটি লোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা বলা হইল, তাহা অনুভব করিতে পারিলে, বিশ্ব-দুনিয়ার বিভিন্ন অংশের অবস্থান সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য প্রতিভাত হইবে। এই সত্যগুলি প্রচলিত হিন্দু-জ্যোতিষ ও পাশ্চাত্ত্য-জ্যোতিষের বিরোধী।

আজকাল যাঁহারা প্রচলিত হিন্দু-জ্যোতিষ ও পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষে মজগুল, তাঁহারা অনেকেই আমাদের কথা ধারণা করিতে পারিবেন না ও ধারণা করিতে চাহিবেন না, তাহা আমরা জানি। ইহা ছাড়া, ভূ-লোক প্রভৃতির অবস্থান-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথাগুলির প্রত্যেকটী প্রত্যক্ষ করা যায় বটে, কিন্তু উহার কোনটী অপরকে প্রত্যক্ষ করান যায় কি না, তদ্বিষয়ে এখনও আমাদিগের সন্দেহ রহিয়াছে। এই হিসাবে এখনও পর্য্যন্ত ঐ কথাগুলি আমাদিগের প্রকাশ না করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু, ঐ কথাগুলি প্রকাশিত না হইলে 'ভূত-ভাবন'কে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় সম্বন্ধে ঋষিগণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহা আংশিক ভাবেও ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। কাষেই, প্রয়োজনবোধে ঐ কথাগুলি ব্যক্ত হইতেছে।

সাতটি লোকের আকার, বিস্তৃতি ও পুরুত্ব সম্বন্ধে যে যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা তলাইয়া চিন্তা করিলে নিম্নলিখিত সত্য কয়েকটি প্রতিভাত হইবে :—

(১) মহ, জন, তপ ও সত্য লোক অখণ্ডিত। মহ লোক ভূ, ভুব এবং স্ব, এই তিনটী লোককে সর্ব্বদিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

(২) জন-লোক মহ-র্লোককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;

(৩) তপ-লোক জন লোককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে;

(৪) সত্য-লোক তপ-লোককে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

(৫) পূজাকালে যে "ঘণ্টা" আমরা বাজাইয়া থাকি, তাহাকে "অর্দ্ধ-ঘণ্টা" বলিয়া ধরিয়া লইলে পূর্ণ ঘণ্টার যে রূপ হয়, তাহাই কতকাংশে "মহ-র্লোকে"র রূপ বলিয়া ধরিয়া লইলে ঐ পূর্ণ-ঘণ্টার অন্তরদেশে শিখরপ্রদেশ হইতে যতখানি পর্য্যন্ত সর্ব্বতোভাবে গোল ততখানি পর্য্যন্ত স্ব-র্লোক এবং তাহার নিম্নভাগ ভুব-র্লোক। ঐ ভুব র্লোকের কতকাংশ ভূ-লোক। এই তিনটী লোক খণ্ডিত।

(৬) সত্য, তপ, জন, ও মহ র্লোকের যে যে অংশ আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে নিপতিত রহিয়াছে,

তাহা পূর্ণাংশের অতীব সামান্য ভাগ মাত্র। বক্রী অংশ ভুব-র্লোকের নিম্নে অবস্থিত।

(৭) তারা, সূর্য্য ও চন্দ্র মহ-র্লোকে অবস্থিত এবং তাহারা প্রত্যেকেই অখণ্ড-মণ্ডলের অংশ।

(৮) মহ-র্লোকের ও স্ব-র্লোকের সন্ধিস্থানে অণুর বিকাশ হইয়া থাকে।

(৯) স্ব ও ভুব-র্লোক মহ-র্লোকের মধ্যে ভাসমান। আর, ভূ-লোক ভুব-র্লোকের মধ্যে ভাসমান।

"ভূত-ভাব-ন" অথবা সর্ব্ব-নিয়ন্তাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে ভূ-লোক হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত, এই সাতটী লোকের অবস্থান, আকার, বিস্তৃতি এবং পুরুত্ব (thickness) অনুভব করিয়া নিজ অন্তরের মধ্যে যে মেদ-প্রভৃতি সাতটী বিভাগ আছে, ঐ বিভাগগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ কি, তাহা অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে হয় এবং কোথা হইতে ঐ মেদ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহাও অনুভব করিতে হয়।

এই অনুভবে প্রবৃত্ত হইলে আপাততঃ "নিরীক্ষণ" করা যাইবে যে, শরীরের মধ্যে মেদ প্রভৃতি যেমন সাতটী অংশ আছে, সেইরূপ মেদের আকারধারণের প্রবৃত্তিসম্পন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণ শরীরের প্রত্যেক রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং হৃদ্-দেশে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মিশ্রণে আরও নিরীক্ষণ করা যাইবে যে, উহার আকাশ, বায়ু, তেজ, ও রসের প্রত্যেকটী সম্পূর্ণ বিকশিত। ঋষিগণ ইহার নামকরণ করিয়াছেন "হৃৎ"।

এই নিরীক্ষণ-কার্য্যে অগ্রসর হইলে আরও ঈক্ষিত হইবে যে, মেদের তলদেশে নাসিকার মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া মস্তকের মধ্যভাগ, মেরুদণ্ডের মধ্য-ভাগ, গুহ্য-বিন্দুর মধ্য-ভাগ, লিঙ্গের মধ্য-ভাগ, উদর-দেশের মধ্য-ভাগ, হৃদ্-দেশের মধ্য-ভাগ, গ্রীবার মধ্য-ভাগ, এবং মুখের মধ্য-ভাগব্যাপী একটী রেখা আছে। এই রেখা অতীব সূক্ষ্ম। এই রেখাকে ঋষিগণ "কুল" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এবং হৃদ্-দেশে যে আকারধারণের প্রবৃত্তিসম্পন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণ (mixture) বিদ্যমান রহিয়াছে, এই রেখা সেই মিশ্রণের (mixture-এর) সহিত মিলিত। ঐ রেখাতেও আকাশ, বায়ু এবং তেজ বিদ্যমান আছে। উহাতেও রসের সূক্ষ্মতম স্পর্শ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তেজের স্পর্শই অপেক্ষাকৃত অধিক। এই রেখার অন্তঃস্থিত আকাশ, বায়ু, এবং তেজ, ইহার কোনটীর স্পর্শই হৃদ্-দেশস্থিত আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের স্পর্শের মত বিকাশপ্রাপ্ত নহে।

শরীরের মধ্যভাগস্থিত আকাশ, বায়ু এবং তেজের ঐ রেখা ঈক্ষিত হইলে উহা সর্ব্বতোভাবে বহিরাকাশের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুভব করা সম্ভব হয়।

শরীরের মধ্য-ভাগস্থিত ঐ রেখা, হৃদ্-দেশ ও রন্ধ্রস্থিত আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণ এবং মেদ হইতে চর্ম্ম পর্য্যন্ত বিভাগ অনুভব করিয়া উহাদের পরস্পরের মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা অনুভব করিতে হয়।

ঐ অনুভব-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে যে, মানুষের শরীরে যে প্রতিনিয়ত মেদাদির বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার কারণ, শরীরের মধ্য-প্রদেশস্থ রেখার আকাশ, বায়ু ও তেজের মিশ্রণ। উহা হইতে হৃদ্-দেশ ও রন্ধ্রস্থিত আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণের (mixture-এর) বিকাশ হইতেছে এবং এই মিশ্রণ হইতে ক্রমে ক্রমে মেদ, অস্থি প্রভৃতির বৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। মেদাদির যে ক্ষয় হইতেছে, তাহার কারণ, মেদাদির বহির্ম্মুখী কার্য্য। বহির্ম্মুখী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শরীরের মধ্যস্থিত উপরোক্ত আকাশ, বায়ু এবং তেজের রেখা সরলতা হারাইয়া বক্রগতি গ্রহণ করে এবং তখন কোন অনুভব-কার্য্যই সম্ভব হয় না। এই সময় মেদাদির বৃদ্ধি স্থগিত হইয়া উহার ক্ষয় সাধিত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া শরীরের মধ্যস্থিত ঐ রেখা যে প্রতিনিয়ত বহিরাকাশ হইতে তন্মধ্যস্থিত আকাশ, বায়ু এবং তেজের মৃদু মৃদু সরবরাহ পাইতেছে তাহাও ঈক্ষিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত রেখাটীর দেখা পাইলে ঋষিগণ কাহাকে আত্মা, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন তাহার ধারণা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়া থাকে।

মজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া মজ্জা, বসা, মাংস, রক্ত ও চর্ম্মের বহির্ম্মুখী সম্বন্ধের নাম "ইন্দ্রিয়"। মজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া বহির্ম্মুখী ও চর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মজ্জা পর্য্যন্ত অন্তর্ম্মুখী সম্বন্ধের নাম "মন"।

ইন্দ্রিয় কেবলমাত্র বহির্ম্মুখী হইয়া থাকে। বহির্ম্মুখিতা এবং অন্তর্ম্মুখিতা এই উভয়ই মনের ধর্ম্ম। এই জন্য মনকে উভয়েন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে।

মজ্জা হইতে আরম্ভ করিয়া হৃৎ প্রদেশ ও রন্ধ্রস্থিত আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণের সহিত অন্তর্ম্মুখী সম্বন্ধের নাম "বুদ্ধি"।

বুদ্ধি কখনও বহির্ম্মুখী হয় না। উহা সর্ব্বদাই অন্তর্ম্মুখী। ইন্দ্রিয়োপভোগ-নিরত রাগদ্বেষপ্রমত্ত মানুষ ঋষির ভাষায় কখনও বুদ্ধিমান্ হইতে পারে না। হৃৎ-প্রদেশ ও রন্ধ্রস্থিত আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণ সর্ব্বতোভাবে নিরীক্ষণ না করিতে পারিলে বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে, ইহা বলা চলে না।

হৃৎ প্রদেশ ও রন্ধ্রস্থিত বায়ু, তেজ ও রসের মিশ্রণের (mixture-এর) সহিত শরীর-মধ্যস্থিত আকাশ, বায়ু ও তেজের রেখা এবং বহিঃস্থিত আকাশের সম্বন্ধের নাম "আত্মা"। কেবলমাত্র আত্মার দ্বারাই অখণ্ড-মণ্ডল প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হয়। সপ্তলোকের কোথায় কি থাকে, তাহা বিস্তৃতভাবে ঈক্ষণ করিবার ক্ষমতা আত্মার বিদ্যমান থাকে।

ইন্দ্রিয়ের যেরূপ ইন্দ্রিয়-শক্তি আছে, মনের যেরূপ মনন-শক্তি আছে, বুদ্ধির যেরূপ বোধ-শক্তি আছে, সেইরূপ আত্মারও শক্তি আছে। আত্মার শক্তির নাম "ধর্ম্ম"।

আত্মা সকলের কাছে বিকশিত হয় না বটে, কিন্তু মানুষমাত্রেরই আত্মা আছে এবং প্রত্যেক মানুষেরই আত্মার ধর্ম্ম একরূপ। পিতার বীজ ও মাতার শুক্রানুসারে মানুষের মেদাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং তদ্বশতঃ আত্মা, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশের পার্থক্য ঘটে। কিন্তু, বিভিন্ন মানুষের আত্মা কখনও বিভিন্ন হয় না। **কাযেই, মানুষের "ধর্ম্ম" কখনও একাধিক হইতে পারে না।** ইহারই জন্য ঋষিগণ সকল মানুষের জন্য "মানব-ধর্ম্ম"-নামক ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা সাধন করিয়াছিলেন।

"বুদ্ধি" ও "আত্মা" কাহাকে বলে তাহা যথাযথভাবে নিরীক্ষণ ও ঈক্ষণ করিতে পারিলে "ভূত ভাব-ন"কে প্রত্যক্ষ করিবার কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে।

বেদের এই অংশ বড়ই দুরূহ। এক ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা, হিব্রু ভাষা ও আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় "ভূত-ভাব-ন"কে ঈক্ষার কার্য্য যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না এবং যিনি কর্ম্মী নহেন তাঁহার পক্ষে উহা বুঝাও সম্ভব হয় না।

বাঙ্গালা ভাষায় যতদূর সম্ভব তাহা মোটামুটী ভাবে আমরা বলিবার চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ শরীরাভ্যন্তরস্থ কুল, হৃৎ ও মেদাদি অংশের মিলিত কার্য্যে আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য বিদ্যমান থাকে, তাহা আত্মার দ্বারা ঈক্ষণ করিতে হয়। তাহার পর, "কুল"কে বাদ দিয়া হৃৎ ও মেদাদি অংশের মিলিত কার্য্যে আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের প্রাকৃতিক কোন্ কোন্ কার্য্য বিদ্যমান থাকে তাহা বুদ্ধির দ্বারা নিরীক্ষণ করিতে হয়। এই ঈক্ষণ ও নিরীক্ষণ-কার্য্য সম্পাদিত হইলে রসবীজের বিকাশপ্রবৃত্তি সম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেষিত আকাশ, বায়ু, ও তেজের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তি ঈক্ষণ করা সম্ভব হয়।

রসবীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন অবিকশিত অথচ পূর্ণভাবে উন্মেষিত আকাশ, বায়ু ও তেজের মিলিত কার্য্যকে ঋষিগণ "শিব" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। এই কার্য্যের মধ্যে তাহার পরবর্ত্তী যে যে বিকাশশক্তি বিদ্যমান থাকে, সেই শক্তিকে সংস্কৃত ভাষায় "দুর্গা" নামে আখ্যাত করা হইয়াছে।

রস-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেষিত আকাশ, বায়ু ও তেজের মিলিত কার্য্যকে ও এই কার্য্যের শক্তিকে কেন অন্য কোন নামে অভিহিত না করিয়া যথাক্রমে "শিব" ও "দুর্গা" নামে অভিহিত করিতে হইবে তাহার বিচার পর্য্যন্ত ঋষিগণের শব্দ-শাস্ত্রে বিদ্যমান আছে।

এইরূপভাবে শরীরের মধ্যে "শিব" ও "দুর্গা"র সাক্ষাৎ পাইবার পর ভূ-লোকে ও ভুব-র্লোকে ও স্ব-র্লোকে আর কোথায়ও 'শিব' ও 'দুর্গা'র সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কি না, আত্মার সহায়তায় তাহার ঈক্ষণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন ঈক্ষিত হয় যে, রস-বীজের বিকাশ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেষিত আকাশ, বায়ু ও তেজের মিলিত ও অখণ্ডিত কার্য্য ও তাহার শক্তি ভূ-লোকের ও ভুব-র্লোকের প্রত্যেক বস্তুর ও চরাচর জীবের মধ্যে বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু ঐ কার্য্যের পূর্ণ-বিকাশ একমাত্র চর-জীবের মধ্যে এবং সম্পূর্ণ বিকাশ একমাত্র মানুষের মধ্যে রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও ঈক্ষিত হয় যে, স্ব-র্লোকের যে স্থানে খণ্ড-মণ্ডলের সূচনা হইয়াছে, অথচ উহা পূর্ণ অথবা সম্পূর্ণ হয় নাই, সেইখানের অনেকখানি জুড়িয়া কেবলমাত্র রস-বীজের বিকাশ-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন অবিকশিত অথচ উন্মেষিত আকাশ, বায়ু ও তেজের মিলিত ও অখণ্ডিত কার্য্য ও তাহার শক্তি বিদ্যমান আছে। এই সমতলের (plane-এর) উপরে আকাশাদি চারিটী ভূতের আর তাদৃশ অবস্থা দেখা যায় না। ইহার উপরে সর্ব্বত্রই ভূত-বীজগণের বিদ্যমানতা দেখা যায় বটে, কিন্তু কুত্রাপি আর "শিব" ও "দুর্গা"র অবস্থা দেখা যায় না।

ইহারই জন্য এখনও অনেকেরই মনে চলতি সংস্কার রহিয়াছে যে, শিব ও দুর্গার জন্মস্থান সুরলোকে এবং তাঁহাদিগের কার্য্য ত্রিলোকে।

স্ব-র্লোকের যেস্থানে "শিব" "দুর্গা"র উৎপত্তি তাহার পরবর্ত্তী সমতলে খণ্ড-মণ্ডল (অর্থাৎ যে মণ্ডল খণ্ডিত অণুর দ্বারা গঠিত এবং যে মণ্ডলে প্রাকৃতিক বিকাশ, বৃদ্ধি, সংখ্যার উৎপত্তি এবং ক্ষয়, এই চারিটী অবস্থা বিদ্যমান আছে সেই মণ্ডল) পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়াছে এবং যে চারিটি ভূতের বীজ "শিব-দুর্গা"র উৎপত্তির সমতল পর্য্যন্ত আংশিকভাবে মিলিত অথবা অখণ্ডিত ছিল, তাহার খণ্ডন আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই জন্য এখনও সাধারণে সংস্কার যে, "শিব" সংহারের কর্ত্তা।

শিবরূপী কার্য্যের উৎপত্তির পর অখণ্ড আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিত অবস্থা হইতে খণ্ডিত অবস্থার উৎপত্তি হইয়া তাহাদিগের খণ্ডিত শক্তির (অর্থাৎ দুর্গার) বিদ্যমানতা ও চারি রকমের কার্য্যবশতঃ জল, স্থল, চর জীব ও অচর জীব, এই চারি রকমের আকারের উৎপত্তি হইতেছে। একই শক্তি হইতে একই আকারসম্পন্ন বস্তুর উৎপত্তি না হইয়া ঘাত ও প্রতিঘাত-কার্য্যের মধ্য দিয়া কিরূপে চারি আকারের বস্তুর উৎপত্তি হয়, তাহা সামবেদে দেখান হইয়াছে এবং সাধারণের বুদ্ধিযোগ্য করিয়া লেখা হইয়াছে মার্কণ্ডেয় পুরাণে। ঐ ঘাত ও প্রতিঘাতের কার্য্য দৈত্য-দানবের সহিত চণ্ডীর যুদ্ধ। এই অংশের প্রকৃত অর্থ আজকালকার পণ্ডিত মহাশয়গণ অদ্ভুত রকমের ভালরূপে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই, ঋষি-প্রণীত গ্রন্থে সুরাসুরের একটা কাল্পনিক যুদ্ধের অবতারণা করিয়া থাকেন। পণ্ডিত মহাশয়গণকে বুঝিতে হইবে যে, "কল্পনা ও কাল্পনিক" প্রভৃতি শব্দ ঋষিগণের ভাষার গালাগালি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ কাল্পনিক কোন কথার প্রণেতা ছিলেন ইহা বলিলে অথবা মনে করিলে ঋষিগণকে ভীষণ ভাবে গালাগালি করা হইয়া থাকে এবং তাহার ফলে অদ্ভুত রকম ভাবে বংশ ও শ্রী বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

স্বকীয় শরীরের 'কুলে'র সহায়তায় আত্মার দ্বারা ঈক্ষণ-কার্য্য চলিতে থাকিলে সুরলোকের যে সমতলের (plane-এর) স্থানে স্থানে রস-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন চারিটী ভূতের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তি (অর্থাৎ শিব-দুর্গা) ঈক্ষিত হয়, সেই সমতলের বাকী স্থানে তেজ-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন চারিটী ভূতের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তি ঈক্ষিত হয়।

রস-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তিকে যেরূপ সংস্কৃত ভাষায় যথাক্রমে "শিব" ও "দুর্গা" নামে আখ্যাত করিতে হয়, সেইরূপ তেজ-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তিকে যথাক্রমে "মহেশ্বর" ও "শ্যামা" নামে অভিহিত করা হয়। তেজ-বীজের বিকাশপ্রবৃত্তিসম্পন্ন আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিত কার্য্য ও তাহার শক্তিকে অন্য কোন নামে অভিহিত না করিয়া "মহেশ্বর" ও "শ্যামা" নামে অভিহিত করিতে হইবে কেন, তাহার যুক্তি পর্য্যন্ত ঋষিপ্রণীত শব্দশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ

রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গের বিজ্ঞানাংশ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, মহেশ্বর ও শ্যামার কার্য্য না হইলে শিব ও দুর্গার কার্য্য হয় না এবং শিব ও দুর্গার কার্য্য না হইলে মহেশ্বর ও শ্যামার কার্য্য হয় না এবং চারিটী কার্য্য না হইলে অণুসম্বলিত খণ্ড-মণ্ডলের ও তৎস্থিত জল, স্থল, চর ও অচর জীবের উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহারই জন্য মহেশ্বর ও শিবকে এবং শ্যামা ও দুর্গাকে প্রচলিত সংস্কারানুসারে প্রায়শঃ একই অর্থে বুঝা হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগকে ক্ষয় ও মৃত্যুসম্বলিত জীবের স্রষ্টা ও আদ্যা-শক্তি বলা হইয়া থাকে।

ঈক্ষণ-কার্য্যে অগ্রসর হইলে আরও প্রতিভাত হইবে যে, স্ব-র্লোকের যে সমতলে মহেশ্বর, শ্যামা, শিব ও দুর্গার উৎপত্তি, সেই সমতলে আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিতভাবে পূর্ণ-উন্মেষের কার্য্য বিদ্যমান আছে বটে এবং তন্মধ্যে রস ও তেজের বিকাশ প্রভৃতিও ঈক্ষিত হয় বটে, কিন্তু উহার উপরিস্থিত সমতলে ঐ চারিটী বীজের পূর্ণ উন্মেষ পর্য্যন্ত ঈক্ষিত হয় না এবং তন্মধ্যে তেজ ও রসের বিকাশ-প্রবৃত্তিও পরিলক্ষিত হয় না। স্ব-র্লোকের ঐ সমতলে আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষ মাত্র এবং তন্মধ্যে স্থানে স্থানে রসের পূর্ণ উন্মেষ এবং স্থানে স্থানে তেজের পূর্ণ উন্মেষ পরিলক্ষিত হয়। এই সমতলে যে সমস্ত কার্য্য ঈক্ষিত হয়, তাহা অতীব ধীর এবং স্থির। উহার অন্তরে অনেক শক্তির আধার এবং তাহার উন্মেষপ্রবৃত্তি যে বিদ্যমান আছে তাহা সহজেই ঈক্ষিত হইয়া থাকে বটে, কিন্তু কোন শক্তিই পূর্ণ-ভাবে অথবা আংশিকভাবে উন্মেষিত নহে।

স্ব-র্লোকের এই সমতলে যে সমস্ত স্থানে আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের মিলিতভাবের আংশিক উন্মেষ মাত্র এবং তন্মধ্যে তেজের পূর্ণ উন্মেষের কার্য্য পরিলক্ষিত হয়, সেই সেই স্থানে "ব্রহ্মা" এবং যে সমস্ত স্থানে আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের মিলিত আংশিক উন্মেষ মাত্র এবং তন্মধ্যে রসের পূর্ণ উন্মেষ-কার্য্য পরিলক্ষিত হয়, সেই সেই স্থানে "বিষ্ণু" বিদ্যমান আছেন, ইহা বলা হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষ এবং তেজের পূর্ণ উন্মেষ বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহার মধ্যে কোন বিক-শিত শরীর বিদ্যমান থাকে না সেই কার্য্যের নাম 'ব্রহ্মা'। যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, তেজ ও রসের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষ এবং খণ্ডিতভাবে রসের পূর্ণ উন্মেষ বিদ্যমান থাকে, অথচ তাহার মধ্যে কোন বিকশিত শরীর বিদ্যমান থাকে না, সেই কার্য্যের নাম "বিষ্ণু"।

এই অংশের বিজ্ঞানভাগ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, ব্রহ্মার কার্য্য না থাকিলে, বিষ্ণুর কার্য্য হইতে পারে না এবং বিষ্ণুর কার্য্য না থাকিলে মহেশ্বর অথবা শিব এবং শ্যামা অথবা দুর্গার কার্য্য হইতে পারে না। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, তেজের পূর্ণ উন্মেষে সৃষ্টি, রসের পূর্ণ উন্মেষে রক্ষা এবং তেজের বিকাশ-প্রবৃত্তিতে ক্ষয় ঘটিয়া থাকে। ইহারই জন্য ব্রহ্মাকে বিশ্বের আদি স্রষ্টা, বিষ্ণুকে বিশ্বের আদি রক্ষক এবং শিবকে বিশ্বের আদি সংহারক বলা হইয়া থাকে। এই তিনের মিলনে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্য্য চলিতেছে, ইহা এখনও সাধা-রণ মানুষের চলতি বিশ্বাসরূপে বিরাজিত রহিয়াছে।

মহেশ্বর, শ্যামা, শিব ও দুর্গার জন্মস্থান যেরূপ স্বর্লোকে এবং তাঁহাদের প্রভাব অর্থাৎ বিকাশপ্রবৃত্তি, আংশিক বিকাশ, পূর্ণ বিকাশ ও সম্পূর্ণ বিকাশ যেরূপ যথাক্রমে জল ও স্থল, অচর জীব, চরজীব এবং মানুষের মধ্য দিয়া হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর জন্মস্থানও স্ব-র্লোকে এবং তাঁহাদিগের দুই-এরই বিকাশ-প্রবৃত্তি, আংশিক বিকাশ, পূর্ণ বিকাশ ও সম্পূর্ণ বিকাশ যথাক্রমে জল ও স্থল, অচর জীব, চরজীব এবং মানুষের মধ্য দিয়া ঘটিয়া থাকে।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপী কার্য্যের শক্তি বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু এই শক্তি পূর্ণভাবে উন্মেষিত নহে বলিয়া শিবরূপী কার্য্যের শক্তিকে যেরূপ দুর্গা বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহার অনেক কার্য্যও দেখান হয়, মহেশ্বররূপী কার্য্যের শক্তিকে যেরূপ শ্যামা বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহারও অনেক কার্য্য দেখান হয়, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর শক্তিকে যথাক্রমে ব্রহ্মাণী ও বৈষ্ণবী মাত্র বলা হইয়া থাকে এবং তাঁহাদিগের বিশেষ কোন কার্য্য দেখান হয় না। ব্রহ্মাণী-রূপী শক্তি হইতে

বৈষ্ণবীরূপী শক্তির এবং বৈষ্ণবীরূপী শক্তি হইতে শ্যামা-রূপী শক্তির উৎপত্তি হয়, ইহাই মাত্র বলা হয়।

ঈক্ষার কার্য্যে অগ্রসর হইলে, ইহার পর প্রতিভাত হইবে যে, স্ব-র্লোকের যে সমতলে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুরূপী কার্য্য বিদ্যমান আছে এবং আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষ মাত্র এবং তন্মধ্যে স্থানে স্থানে তেজের পূর্ণ উন্মেষ ও স্থানে স্থানে রসের পূর্ণ উন্মেষের কার্য্য চলিতেছে, উহার উপরিস্থিত সমতলে তাহাও বিদ্যমান নাই। স্ব-র্লোকের এই সমতলে আছে মাত্র আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের মিলিতভাবে উন্মেষ-প্রবৃত্তি এবং তন্মধ্যে স্থানে স্থানে তেজের পূর্ণ-উন্মেষ এবং স্থানে স্থানে রসের পূর্ণ-উন্মেষের কার্য্য।

যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, রস ও তেজের মিলিত ভাবের উন্মেষ-প্রবৃত্তি এবং তন্মধ্যে পৃথক্ ভাবে তেজের পূর্ণ উন্মেষ থাকে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "দিক্" বলা হয়।

যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, রস ও তেজের মিলিত ভাবের উন্মেষ-প্রবৃত্তি এবং তন্মধ্যে পৃথক্ ভাবে রসের পূর্ণ উন্মেষ থাকে, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় "কাল" বলা হইয়া থাকে।

ঋষি-প্রণীত শব্দ-শাস্ত্র সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যে যে কার্য্যের মধ্যে আকাশ, বায়ু, রস ও তেজের মিলিত ভাবের উন্মেষ-প্রবৃত্তি মাত্র এবং পৃথক্‌ভাবে তেজ ও রসের পূর্ণ-উন্মেষ মাত্র বিদ্যমান থাকে, তাহাকে যথাক্রমে "দিক্" ও "কাল্" ছাড়া অন্য কোন নামে আখ্যাত করা যায় না।

এই প্রসঙ্গের বিজ্ঞানাংশ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তেজের পূর্ণ-উন্মেষ না ঘটিলে অণুর বিকাশপ্রবৃত্তি ঘটিতে পারে না এবং অণুর পূর্ণ বিকাশপ্রবৃত্তি না ঘটিলে কোন "দিক্" উদ্ভাসিত হয় না। ইহারই জন্য স্ব-র্লোক-স্থিত ঐ "দিক্"রূপী কার্য্যকে বিশ্বের বায়ুভাগ, জল-ভাগ, স্থলভাগ ও অণু-সম্বলিত চরাচর জীবের দশটী দিকের স্রষ্টা বলা হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, রসের পূর্ণ উন্মেষ না ঘটিলে জীবের অণুর অন্তরে যে সৃষ্টি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়-শক্তি বিদ্যমান আছে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। ইহারই জন্য "কাল্"রূপী কার্য্যকে চরাচর জীবের বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের কারণ বলা হইয়া থাকে।

দিক্‌রূপী কার্য্যের উৎপত্তি হইবার পর কাল্‌রূপী কার্য্যের উৎপত্তি হয়, কাল্‌রূপী কার্য্যের উৎপত্তি হইবার পর ব্রহ্মারূপী কার্য্য ও ব্রহ্মাণীরূপী শক্তির উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মারূপী কার্য্য ও ব্রহ্মাণীরূপী শক্তির উৎপত্তি হইবার পর বিষ্ণুরূপী কার্য্য ও বৈষ্ণবীরূপী শক্তির উৎপত্তি হয়, বিষ্ণুরূপী কার্য্য ও বৈষ্ণবীরূপী শক্তির উৎপত্তি হইবার পর, মহেশ্বর ও শিবরূপী কার্য্য এবং শ্যামা ও দুর্গারূপী শক্তির উৎপত্তি হয় এবং তাহার পর ক্রমে ক্রমে আরও অনেক দেবরূপী প্রাকৃতিক কার্য্য ও দেবীরূপী প্রাকৃতিক শক্তির উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে বলিয়া প্রত্যেক দেব ও দেবীর পূজার সময় সর্ব্ব-প্রথমে দিক্, কাল্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও শিবের পূজার ব্যবস্থা ঋষিগণ প্রদান করিয়াছেন। আত্মার ঈক্ষণ-কার্য্যের দ্বারা প্রাকৃতিক কার্য্য ও তাহার শক্তি নিজের শরীরের ভিতর নিরীক্ষণ করা, অনুভব করা এবং দর্শন করা দেব ও দেবী-পূজার প্রধান উদ্দেশ্য। একটু অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, মানুষ যে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার মূলে প্রধানতঃ প্রকৃতির কার্য্য ও মানুষের শরীরস্থিত মেদাদির কার্য্য বিদ্যমান থাকে।

প্রকৃতির কার্য্য মানুষকে অন্তর্মুখী করিয়া অন্তর অনুভবের কার্য্যে এবং উহা নিরীক্ষণ করিবার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। শরীরস্থিত মেদাদির কার্য্য মানুষকে বহির্ম্মুখী করিয়া বাহির-অনুভব ও উপভোগের কার্য্যে উন্মত্ত করিয়া তোলে। শরীরস্থিত মেদাদির কার্য্যের ফলে মানুষের বুদ্ধির নিরীক্ষণপ্রবৃত্তি নষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং বিজ্ঞানের নামে কুজ্ঞানের উদ্ভব হয়। অন্যদিকে প্রকৃতির কার্য্য ঈক্ষণ, নিরীক্ষণ, অনুভব ও দর্শনে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত বিজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়।

"প্রকৃতির" কার্য্য হইতে যেরূপ মানুষের কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, সেইরূপ "পুরুষে"র কার্য্য হইতে মানুষের ঈক্ষণ, নিরীক্ষণ, অনুভব ও দর্শনের প্রবৃত্তি অথবা চল্‌তি কথায় বুঝিবার প্রবৃত্তি উদ্ভাসিত হয়।

"প্রকৃতি"র এক একটী কার্য্যের নাম "দেব" ও "পুরুষে"র এক একটী কার্য্যের নাম "দেবী"। অথবা, যে যে প্রাকৃতিক কার্য্যবশতঃ মানুষের প্রাকৃতিক কার্য্য-প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়া থাকে, সেই সেই প্রাকৃতিক কার্য্যের নাম দেব এবং প্রাকৃতিক এক একটী কার্য্য হইতে যে এক একটী পরবর্ত্তী পরিণতির শক্তির উৎপত্তি হয়, সেই এক একটী পরিণতি-শক্তির নাম "দেবী"।

শরীর-মধ্যস্থিত প্রত্যেক প্রাকৃতিক কার্য্যটী ও তাহার প্রত্যেক শক্তিটীকে ঈক্ষণ, নিরীক্ষণ, অনুভব ও দর্শন করিতে পারিলে মেদাদির কার্য্য অনায়াসেই প্রতিহত হইয়া থাকে এবং মানুষ সর্ব্বনাশের হাত হইতে মুক্ত হয়।

প্রত্যেক প্রাকৃতিক কার্য্য ও তাহার শরীর-মধ্যস্থিত প্রত্যেক শক্তিকে ঈক্ষণ, নিরীক্ষণ, অনুভব ও দর্শন করিবার কার্য্যের নাম দেব ও দেবীর পূজা।

তাহা না বুঝিয়া এবং তাহা না করিয়া ফুল, বিল্বপত্র, কোশাকুশী লইয়া পূজা করিতে বসিলে একদিকে যেরূপ পূজার কোন ফল লাভ করা সম্ভব হয় না; অন্য দিকে নিজেকে ও মানব-সমাজকে প্রতারিত করা হয়।

এতাদৃশ প্রতারণার ও তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নির্ব্বংশ হওয়া এবং নিজের ও সন্তান-সন্ততির শ্রীভ্রষ্ট হওয়া। পূজার নামে এতাদৃশ প্রতারণা করা অপেক্ষা পূজা না করাই সঙ্গত, ইহা ঋষিদিগের অভিমত। ঋষিদিগের এই অভিমত যে যুক্তিসঙ্গত তাহা বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান এবং প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুদিগের অবস্থার সহিত গোঁড়া হিন্দুদিগের অবস্থা তুলনা করিলেই দেখা যাইবে। গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যে কাপুরুষতা, চরিত্রহীনতা, ভিক্ষোপজীবিতা, চাটুকারিতা, মিথ্যাবাদিতা, শঠতা, কপটতা, মূর্খতা, এবং বুদ্ধিহীনতা প্রভৃতি অপগুণ যত অধিক পরিমাণে দেখা যায়, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, এবং প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ ঐ অপগুণ তত অধিক পরিমাণে দেখা যায় না। গোঁড়া হিন্দুগণ স্বাস্থ্যে ও অর্থবিষয়ে যত অধিক পরিমাণে দরিদ্র, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান, এবং প্রগতিসম্পন্ন হিন্দুগণ ঐ দুইটী বিষয়ে এখনও তত অধিক পরিমাণে দরিদ্র নহেন।

দিক্ ও কালের ঈক্ষা-কার্য্যে নৈপুণ্য লাভ করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলে প্রতিভাত হইবে যে, যে সমতলে দিক্ ও কাল বিদ্যমান আছেন এবং আকাশাদি চারিটী ভূত-বীজের মিলিত ভাবে উন্মেষপ্রবৃত্তি ও তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পৃথক্ ভাবে তেজ-বীজের ও রস-বীজের উন্মেষ-কার্য্য চলিতেছে, সেই সমতলের উপরিস্থিত সমতলে কোন ভূত-বীজেরই পৃথক্ ভাবে কোন উন্মেষের কার্য্য বিদ্যমান নাই। এই খানেই অখণ্ড মণ্ডলান্তর্গত মহর্লোকের আরম্ভ। এই সমতলের পুরুত্বের বহুদূরব্যাপী আছে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, তেজ ও রস বীজের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি এবং ঐ মিলিত অবস্থাতেই তেজ-ও রসের পূর্ণ উন্মেষপ্রবৃত্তি। এই খানে সমস্ত দ্রব্য-বীজ ও তাহার শক্তি 'অণু'-উন্মেষিত অবস্থায় আছে বটে, কিন্তু কোন দ্রব্য নাই। এখানে আছে কেবলমাত্র কর্ম্ম ও তাহার ঈক্ষা-সাধ্য রূপ। সে রূপ চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না, মনের দ্বারা অনুভব করা যায় না, বুদ্ধির দ্বারা নিরীক্ষণ করা যায় না। শ্বেত ও রক্তরূপের মিলনে যে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে তাহার বীজের উন্মেষকার্য্য এই সমতলে সূচিত হয়। এই রূপ-বীজ কেবলমাত্র আত্মার দ্বারা "ঈক্ষা" করা সম্ভব। চক্ষুর তারায় যে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ রহিয়াছে এবং তাহার পাতায় যে রক্তবর্ণ রহিয়াছে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া শ্বেত ও রক্তের মিলনে কিরূপে কৃষ্ণবর্ণের উদ্ভব হইতেছে, তাহা নিরীক্ষণ করিতে পারিলে এই রূপ-বীজকে অনুমান করা যায়।

যে কার্য্যে কেবলমাত্র আকাশ, বায়ু, তেজ ও রস-বীজের মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি এবং মিলিত অবস্থাতেই তেজ ও রসের পূর্ণ উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে এবং কোন ভূত-বীজের পৃথক্‌ভাবে কোন উন্মেষ অথবা বিকাশপ্রবৃত্তি থাকে না, সেই কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় "পুরুষ্" বলা হইয়া থাকে। এতাদৃশ কার্য্যকে যে "পুরুষ্" ছাড়া অন্য কোন নামে অভিহিত করা চলে না, তাহাও ঋষিপ্রণীত শব্দ-শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইতে পারে।

পুরুষ্-প্রসঙ্গের বিজ্ঞানাংশ বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, প্রকৃতির প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরে যে গুণ-উন্মেষিণী অথবা বিকাশশক্তির বিদ্যমানতা দেখা যায়

এবং স্থূল ও চরাচর জীবের মধ্যে যে অনুভূতি-গ্রহণের শক্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহার বীজ এই পুরুষের মধ্যে পূর্ণভাবে উন্মেষিত হয়। ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, পুরুষ্‌রূপী কার্য্যই "চন্দ্রে"র উন্মেষ-প্রবৃত্তি-সম্পাদক। পুরুষ্‌প্রসঙ্গে ঋষিগণ অনেক কথা শুনাইয়াছেন। তাহার প্রত্যেক কথাটী সাংসারিক জীবনে অতীব প্রয়োজনীয়। ঋষিদিগের ঐ কথাগুলি কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে তাহা জানি না। লোক-সমাজের অজ্ঞানতা ও অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে যে, লোক-রক্ষার্থ উহা অদূরভবিষ্যতে আবার প্রকাশিত হইবে। এই সন্দর্ভে উহা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে, এই মাত্র বুঝিতে পারি।

পুরুষ্‌-রূপী কার্য্যের মধ্যে শক্তি-বীজের উন্মেষ রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন শক্তির উন্মেষ নাই; কাযেই, তাঁহার কোন শক্তির কথাও বলা হয় না।

আত্মার সহায়তায় মহ-র্লোকে পুরুষ্‌-রূপী কার্য্যের ঈক্ষণ সম্পূর্ণ করিয়া তদুপরিস্থিত সমতলে অগ্রসর হইতে পারিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, মহ-র্লোকে যেরূপ আকাশ-বীজ, বায়ু-বীজ, তেজ-বীজ ও রস-বীজ, এই চারিটীরই মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, তদুপরিস্থিত সমতলেও ঐ চারিটী বীজেরই মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু পুরুষের ভিতর চারিটী বীজের মিলিত অবস্থাতেও যেরূপ তেজ ও রস-বীজের পূর্ণ উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, এইখানে তাহা বিদ্যমান নাই। এখানে আছে কেবলমাত্র চারিটী ভূত-বীজেরই মিলিতভাবে আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি এবং তন্মধ্যে মিলিত অবস্থাতেই কেবলমাত্র তেজের পূর্ণ উন্মেষ-প্রবৃত্তি। এইখানে জন-লোকের আরম্ভ। এই জন-লোক মহ-র্লোকের অন্তরালে সর্ব্ব-বিশ্বব্যাপী। নীলাকাশের পশ্চাৎ ভাগে ইহার আরম্ভ।

যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র চারিটী ভূত-বীজের মিলিত অবস্থায় আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে এবং মিলিত অবস্থাতেই তন্মধ্যে কেবলমাত্র তেজের পূর্ণ উন্মেষপ্রবৃত্তি ঈক্ষিত হইয়া থাকে, সেই কার্য্যের নাম সংস্কৃত ভাষায় "প্রকৃতি"। প্রকৃতি হইতে মানুষের মূল যে-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি তাহার জনন হইয়া থাকে বলিয়া নিছকভাবে প্রকৃতি যেখানে আছেন, সেইখানের নাম হইয়াছে জন-লোক।

"প্রকৃতি"-প্রসঙ্গের বিজ্ঞানও "পুরুষ্‌"-প্রসঙ্গের বিজ্ঞানের মত অতীব বিস্তৃত। তাহা এই সন্দর্ভে বাদ দিতে হইবে।

"প্রকৃতি"-প্রসঙ্গের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, যেখানে নিছকভাবে প্রকৃতি বিদ্যমান, সেই খানেই তারা ও আদিত্যের উন্মেষপ্রবৃত্তি সম্পাদিত হয়। ইহা ছাড়া আরও বুঝা যাইবে, যে-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি মহ-র্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভূ-লোক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার বীজ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির মধ্যে উন্মে-ষিত। ভাব-প্রবৃত্তি অথবা শক্তির যে উন্মেষ, বিকাশ ও বৃদ্ধি স্ব-র্লোক, ভুব-র্লোক ও ভূ-লোকের সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে তাহার বীজ পুরুষ্‌রূপী কার্য্যের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে উন্মেষিত আছে বটে, কিন্তু ভাব-বীজ প্রকৃতিরূপী কার্য্যের মধ্যে সম্পূর্ণ উন্মেষিত নহে। প্রকৃতিরূপী কার্য্যের মধ্যে উহার আংশিক উন্মেষ মাত্র বিদ্যমান আছে।

জনলোকের ঈক্ষাকার্য্য সম্পাদিত হইবার পর তদু-পরিস্থিত সমতলের অর্থাৎ তপোলোকের ঈক্ষাকার্য্যে উপনীত হইতে পারিলে পরিলক্ষিত হইবে যে, জনলোকে প্রকৃতিরূপী কার্য্যের মধ্যে যেরূপ আকাশাদি চারিটী ভূত-বীজের মিলিত অবস্থার আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি এবং ঐ মিলিত অবস্থাতেই তেজের পূর্ণ উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান আছে, তপ-লোকে তাহাও নাই। এখানে আছে কেবল মাত্র চারিটী মাত্র বীজের মিলিতাকারের বিদ্যমানতা এবং ঐ মিলিতাকারের মধ্যে তেজ ও রস-বীজের আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি।

যে কার্য্যের মধ্যে কেবলমাত্র আকাশাদি চারিটী বীজের মিলিতাকারের বিদ্যমানতা এবং কেবলমাত্র তেজ ও রস-বীজের আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে, সেই কার্য্যকে সংস্কৃত ভাষায় 'ঈশ্‌-বর্' অথবা (চলতি-ভাষায় 'ঈশ্বর্') বলা হইয়া থাকে।

'ঈশ্বর্'-জ্ঞানের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, পুরুষ্‌রূপী কার্য্যের মধ্যে যে ভাব-বীজের পূর্ণ-উন্মেষ

বিদ্যমান থাকে, 'ঈশ-বর্'-রূপী কর্ম্মের মধ্যে সেই ভাব-বীজের আংশিক উন্মেষ মাত্র সূচিত হয়।

'তপ-লোকে' ঈশ্বরের ঈক্ষাকার্য্য সাধিত হইবার পর 'আত্মা'র সহায়তায় অগ্রসর হইতে পারিলে, তপ-লোকের উপরিস্থিত সত্য-লোকের ঈক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে পরিলক্ষিত হইবে যে, আকাশ প্রভৃতি চারিটী ভূত-বীজের যে মিলিত আকার এবং মিলিত আকারমধ্যেই যে তেজ ও রস-বীজের আংশিক উন্মেষপ্রবৃত্তি 'ঈশ্-বর'-রূপী করণের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, তাহাও সত্য-লোকে পরিলক্ষিত হয় না। এখানে কেবলমাত্র ঈঙ্গিত হয় আকাশাদি চারিটী ভূত-বীজের বিদ্যমানতা এবং তেজ-বীজের উন্মেষপ্রবৃত্তির বীজ।

যে 'করণে'র মধ্যে কেবল মাত্র আকাশাদি চারিটী ভূত-বীজের বিদ্যমানতা এবং তেজ-বীজের উন্মেষপ্রবৃত্তির বীজ নিহিত থাকে, সেই 'করণ'কে সংস্কৃত ভাষায় ব্-র-হ্-ম (অথবা চলিত ভাষায় 'ব্রহ্ম') বলা হইয়া থাকে।

ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিজ্ঞান বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, তপ-লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ভূ-লোক পর্য্যন্ত যে পঞ্চ ভূত ও ভাবের উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ, উন্মেষ বৃদ্ধি, বিকাশ-প্রবৃত্তি ও বিকাশ বিদ্যমান আছে, তাহার বীজ ব্রহ্মরূপী করণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এই ব্রহ্মরূপী 'করণ' হইতে 'ঈশ্বর্' রূপী করণের, ঈশ্বররূপী করণ হইতে প্রকৃতির, প্রকৃতিরূপী করণ হইতে পুরুষ্‌রূপী করণের, পুরুষরূপী করণ হইতে দিক্-রূপী করণের, দিক্-রূপী করণ হইতে কাল্‌রূপী করণের, কাল্‌রূপী করণ হইতে 'ব্রহ্মা'রূপী কর্ম্মের, ব্রহ্মারূপী কর্ম্ম হইতে 'বিষ্ণু'রূপী কর্ম্মের, বিষ্ণুরূপী কর্ম্ম হইতে 'মহেশ্বর'রূপী কর্ম্মের এবং মহেশ্বর-রূপী কর্ম্ম হইতে 'শিব'রূপী কর্ম্মের উন্মেষ হইতেছে। শিবরূপী কর্ম্মের উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন গুণ অথবা দ্রব্য অথবা শব্দ স্পর্শাদি কর্ত্তামূলক কার্য্যের বিকাশ হয় না।

ইহা ছাড়া আরও দেখা যাইবে যে, মহেশ্বর-রূপী কর্ম্মের উন্মেষ না হওয়া পর্য্যন্ত কোন শক্তির বিকাশ হয় না। বিকাশযোগ্য যে শক্তি সর্ব্বপ্রথমে উন্মেষিত হন, তাঁহার নাম 'শ্যামা' এবং ঐ শক্তির প্রথম পূর্ণ উন্মেষ হয় কাল্‌রূপী করণের মধ্যে এবং কাল্‌রূপী করণের উন্মেষ হয় তারা, সূর্য্য ও চন্দ্র-নামক প্রকৃতি ও পুরুষের অবস্থান (অথবা দেবতা) এবং দিক্‌রূপী করণের উৎপত্তি হইবার পর। দিক্ ও কালের সংজ্ঞা ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের মূল সূত্রের নির্দ্দেশ যে শ্যামার মূর্ত্তির মধ্যে থাকা সম্ভব তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

সত্য-লোকের ঈক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পর আরও ঈক্ষাকার্য্যে অগ্রসর হইলে সর্ব্বত্র সত্যলোকই দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার কোন অন্ত পাওয়া যায় না। সত্য লোকের সর্ব্বত্রই অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় একই রকমের "ব্রহ্ম"-রূপী কারণ পরিলক্ষিত হয়। মানুষের গুহ্যদ্বার-বিন্দুতে যেরূপ একটী বিন্দু এবং সমবায়-সম্বন্ধযুক্ত বৃত্ত ও সরলরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সত্যলোকের সর্ব্বনিম্ন স্থানেও সমবায়সম্বন্ধযুক্ত একটী বিন্দু, একটী বৃত্ত ও একটী সরল রেখা ঈঙ্গিত হয়। ইহা হইতে ঋষিগণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ঐ বিন্দুটী ব্যোম (অর্থাৎ আকাশ-বীজ), বৃত্তটী বহ্নি (অর্থাৎ "তেজ-বীজ"), সরলরেখাটী "অম্বু" (অর্থাৎ বায়ু ও রস-বীজ) এবং তিনের মিলনেই 'ব্রহ্ম'রূপী করণের উন্মেষ হইতেছে। এই তিনটী ভূত-বীজ এবং তিনের মিলনেই ব্রহ্ম-রূপী করণের উন্মেষ।

একে ত' সত্যলোকের উপরে আর কোন লোক ঈঙ্গিত হয় না, তাহার পর আবার বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেকটীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান ঐ ব্রহ্মরূপী করণের জ্ঞান হইলেই সম্পাদিত হয়। ইহারই জন্য ঋষিগণ ব্রহ্মরূপী করণকেই বিশ্ব দুনিয়ার কারণ অথবা 'ভূত-ভাব-ন' বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

তিনটী বেদের উপরোক্ত অংশে প্রবিষ্ট হইতে পারিলে 'সর্ব্বনিয়ন্তাকে সর্ব্বতোভাবে জানা ও তাঁহার কার্য্য সর্ব্বতোভাবে উপলব্ধি করা মানুষের ত' দূরের কথা, এমন কি দেবতাদিগের পর্য্যন্ত অসাধ্য, এবম্বিধ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ঋষির সন্তান হইয়াও কোন বেদে, কথঞ্চিৎ পরিমাণেও প্রবিষ্ট হন নাই, ইহা বুঝিতে হয়।

এইখানে আমরা বলিয়া রাখি যে, বেদের কোন কথা এক ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত, হিব্রু ও আরবী ভাষা ছাড়া আর কোন ভাষায় সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নহে। ভট্ট ও আচার্য্যগণের দ্বারা প্রণীত যে ভাষাটী সংস্কৃত ভাষা-নামে আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণ লোক-সমাজে লোকের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া এবং না বুঝিয়া চালাইতেছেন, তাহার সাহায্যেও বেদের কোন কথা সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করা যায় না। কাজেই, আমাদিগের লেখায় দোষ ও ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী।

ভূত-ভাব-নকে কি করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে হয়, তাহার কথা বলিতে বসিয়া আমরা যে কয়টী সংস্কৃত কথা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি, তাহার যথাশক্তি সংজ্ঞা সঙ্গে সঙ্গেই দেওয়া হইয়াছে। ঐ সংস্কৃত কথাগুলির সংজ্ঞা ধারণা না করিতে পারিলে ভূত-ভাব-ন-সম্বন্ধীয় কোন কথাই আদৌ বুঝা সম্ভব হয় না। কাজেই, আমরা পাঠকবর্গকে এ সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা ছাড়া উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ (আংশিক উন্মেষ), উন্মেষবৃদ্ধি (পূর্ণ উন্মেষ), বিকাশ-প্রবৃত্তি, পূর্ণ-বিকাশ এই কয়টী কথাও প্রায় প্রত্যেকটী প্রসঙ্গে ব্যবহার করিতে হইয়াছে। ঐ কথাগুলির সংজ্ঞার পরস্পরের পার্থক্য কি, তাহা যথাযথ ভাবে না বুঝিতে পারিলে বক্তব্যের মর্ম্ম পরিস্ফুট হইবে না। তদ্বিষয়েও পাঠকদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। ব্রহ্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বেদে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহার সহস্রাংশের একাংশও আমাদিগের লেখায় প্রকাশিত হয় নাই তাহা সত্য, কিন্তু তথাপি এই সন্দর্ভের বক্তব্য বুঝিতে পারিলে আমাদিগের বেদ যে কোন্ বিষয়ে গৌরবের, তাহা বুঝা যাইবে এবং তখন ইহাও বুঝা যাইবে যে, আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণ আমাদিগকে বরাবর প্রতারিত করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা বেদের "ব" এবং ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষার "স"ও পরিজ্ঞাত নহেন। ইহা ছাড়া আরও বুঝা যাইবে যে, পাশ্চাত্ত্যগণ যাহাকে বিজ্ঞান বলিতেছেন, তাহা কু-জ্ঞান এবং তাহা মানবসমাজের ধ্বংস-সাধক, কার্য্যেও হইতেছে তাহাই। কি করিয়া জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা-শক্তির বৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে, তাহা জানিতে হইলে ভূমণ্ডলের অবস্থান কিরূপ, ভূমণ্ডলের সহিত তারা, সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হয়। কি করিয়া স্বাস্থ্য, মন ও বুদ্ধি ভাল রাখিতে হয়, কেন আমাদের স্বাস্থ্য, মন ও বুদ্ধি বিকৃত হয়, তাহার তথ্যও একমাত্র ঋষি-প্রণীত বেদ, বাইবেল ও কোরাণে লিখিত রহিয়াছে। আমাদিগের পণ্ডিত মহাশয়গণ যেরূপ ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা না জানিয়া বেদকে কিম্ভূতকিমাকার করিয়া তুলিয়াছেন, সেইরূপ পাদ্রী মহাশয়গণ ঋষি-প্রণীত হিব্রু ভাষা না জানিয়া এবং মৌলভী মহাশয়গণ ঋষি-প্রণীত আরবী ভাষা না জানিয়া বাইবেল ও কোরাণকে দ্বন্দ্বকলহমূলক কিম্ভূতকিমাকারে পরিণত করিয়াছেন।

আমাদিগের ব্রহ্ম-বিষয়ক প্রসঙ্গ একবার পড়িয়া বুঝা সম্ভব নহে। উহা বুঝিতে হইলে বারম্বার পড়িতে হইবে। বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় রহিয়াছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে, যখন পরিষ্কার দেখা যাইতেছে যে, "ভূত-ভাব-ন" অথবা বিশ্বদুনিয়ার সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বতোভাবে মানুষেরও প্রত্যক্ষ-যোগ্য এবং তাহার উপায় ঋষিগণই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তখন শ্রদ্ধেয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে-শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বিরুদ্ধ কথা পাওয়া যায় কেন, ইহার একমাত্র কারণ, যে-গ্রন্থগুলি সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে, তাহার কোন কথার মর্ম্ম সহস্র সহস্র বৎসরের পরবর্ত্তী কোন ব্যাকরণ অথবা অভিধানের সাহায্যে বুঝা সম্ভব নহে।

আমাদিগের পণ্ডিতমহাশয়গণ যে বিধিতে ঋষি-প্রণীত ভাষার অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা আদৌ ঋষিগণের শব্দ-শাস্ত্রসম্মত নহে।

ঋষিগণের ভাষা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে প্রত্যেক শব্দের লক্ষণ ও বৃত্তি পরিজ্ঞাত হইয়া শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিবার নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে হয়। তাহা একমাত্র ঋষি-প্রণীত শব্দ-শাস্ত্রদ্বারাই সম্ভব। ঋষিগণের সংস্কৃত ভাষা বুঝিবার জন্য আজ-কাল যে সমস্ত ব্যাকরণ ও অভিধান সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়, তাহার একখানিও

ঋষি-প্রণীত নহে। ঋষি-প্রণীত শব্দ-শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইয়া উপরোক্ত আধুনিক ব্যাকরণ ও অভিধানগুলি পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, উহাদের একখানিতেও ঋষি-প্রণীত শব্দ-শাস্ত্রের মূল কথা লিখিত হয় নাই এবং উহাদের প্রত্যেকখানিতে, অল্পাধিক পরিমাণে ঋষিগণের ভাষা বুঝিবার জন্য তাঁহারা যে-সমস্ত বিধি ও নিষেধের নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যস্থিত বিধিগুলিকে নিষেধ এবং নিষেধগুলিকে বিধি বলিয়া উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রত্যেক শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিতে হইলে সর্ব্ব-প্রথমে প্রয়োজন হয়, প্রত্যেক বর্ণের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া এবং বর্ণগুলির মধ্যে কোন্‌টী দ্রব্যবাচক, কোন্‌টী গুণবাচক এবং কোন্‌টী কর্ম্মবাচক তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া। ইহা ছাড়া বিবিধ বর্ণের মিলনে যে সমস্ত পদ গঠিত হয়, সেই সমস্ত পদ কোন্ ব্যক্ত অবস্থা অথবা অব্যক্ত অবস্থা অথবা জ্ঞ-অবস্থা প্রকাশক এবং ঐ পদগুলি দ্রব্যবাচক অথবা গুণবাচক অথবা কর্ম্মবাচক তাহাও জানিবার প্রয়োজন হয়। বর্ণ ও পদ-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তিনটী বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে পারিলেই পদের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব বটে, কিন্তু কেবল-মাত্র ঐ নৈপুণ্যের দ্বারাই বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করিতে হইলে, বর্ণ ও পদ-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তিনটী নৈপুণ্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে এবং তাহা ছাড়া আরও কিছু বিদিত হইবার প্রয়োজন হয়। বর্ণ ও পদসম্বন্ধীয় ঐ তিনটী নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে মন্ত্র ও তৎসঙ্গে সঙ্গে বেদের মূলভাগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয়, কারণ বেদের কুত্রাপি চলতি কথায় যাহাকে "বাক্য" বলা হয় তাহা ব্যবহৃত হয় নাই। এইরূপে একমাত্র বর্ণ ও পদ-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত তিনটী নৈপুণ্য অর্জ্জন করিতে পারিলে বেদের মূলভাগ কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরি-জ্ঞাত হওয়া সম্ভবযোগ্য হয় বটে, কিন্তু একমাত্র ঐ নৈপু-ণ্যের দ্বারা কোন বেদকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, কারণ উহা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ-জাত সাংসারিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় এবং ঐ জ্ঞান লিপিবদ্ধ হইয়াছে দর্শনে এবং তাহা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে বাক্যের অর্থ কিরূপে উদ্ধার করিতে হয় তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। "বর্ণ" ও "পদ"-সম্বন্ধীয় যে তিনটী নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহা অর্জ্জন করিবার পন্থা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে ঋষিপ্রণীত "নন্দিকেশ্বর-কাশিকা" ও "নন্দিকেশ্বর-লিঙ্গ-ধারণ-চন্দ্রিকা"-নামক দুইখানি গ্রন্থে। ঋষিগণের রচনাপ্রণালী এমনই আশ্চর্য্যজনক যে, রাজসিকতা ও তামসিকতা পূর্ণভাবে বিকশিত হইবার আগে কৈশোরে, অথবা রাজসিকতা ও তামসিকতা বিকশিত হইলেও কি করিয়া দ্বন্দ্ব, কলহ, রাগ এবং দ্বেষের ভাব সংযত করিয়া জিহ্বাকে সরল, সুস্থ ও পূর্ণ রাখিতে পারা যায়, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া, ঐ দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলে কোন আচার্য্যের বিনা সাহায্যে ঐ দুইখানি গ্রন্থ স্বতঃই উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তখন কাহারও বিনা সাহায্যে প্রত্যেক বর্ণের যথাযথ অর্থ এবং বিভিন্ন বর্ণের মিলনে যে সমস্ত পদ গঠিত হয়, তাহা কোন্ অবস্থায় কি-বাচক তাহা, বেদকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় শব্দসম্বন্ধীয় যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তদ্দ্বারা বেদকে কথঞ্চিৎ পরি-মাণে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা কোন বেদাঙ্গ অথবা উপনিষদ্ অথবা মীমাংসা অথবা সংহিতা বুঝিতে পারা সম্ভব হয় না। নন্দিকেশ্বর-কাশিকা ও নন্দিকেশ্বর-লিঙ্গধারণ-চন্দ্রিকা এই দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে বর্ণ ও পদ সম্বন্ধে যতটুকু জ্ঞান হয় এবং ঐ জ্ঞানের সহায়তায় বেদের যতটুকু জানা সম্ভব হয়, তাহার দ্বারা, ঋষিগণের রচনাকৌশলবশতঃ একমাত্র পূর্ব্বমীমাংসার কার্য্যকারণসঙ্গত অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পূর্ব্বমীমাংসার কার্য্য-কারণসঙ্গত অর্থ উদ্ধার করিবার সামর্থ্য অর্জ্জন করিতে না পারিলে কোন বেদাঙ্গ, অথবা উত্তরমীমাংসা, অথবা কোন দর্শন, অথবা কোন সংহিতার অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ইহা দ্বারা বুঝিতে হয় যে, পূর্ব্বমীমাংসা-খানি এমন ভাবেই রচিত হইয়াছে যে, উহা বুঝিতে হইলে কোন বাক্যজ্ঞানের প্রয়োজন হয় না এবং একমাত্র বর্ণ ও পদের অর্থোদ্ধার করিতে পারিলেই উহা সর্ব্বতোভাবে বুঝা সম্ভব হয়। পূর্ব্বমীমাংসাখানি বুঝিতে পারিলে, তখন বেদাঙ্গে প্রবেশ করা সম্ভব হয় ও তখন "নিরুক্ত"-

খানির অর্থ সর্ব্বতোভাবে উদ্ধার করিতে পারা যায়। "নিরুক্ত" পর্য্যন্ত পড়া হইলে অব্যক্ত ও ব্যক্ত অবস্থা-সম্বন্ধীয় যতকিছু কথা (অর্থাৎ পদ ও বাক্য) হইতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীর অর্থ সম্যক্ ভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু তখনও, ঐ কথাগুলির যে কি প্রয়োজন এবং ভাষা লিখিবার প্রণালীই বা যে কি হওয়া উচিত, তাহা বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। "নিরুক্ত" পর্য্যন্ত পাঠ করিলেও অন্যান্য বেদাঙ্গ, অথবা কোন দর্শন, অথবা উপনিষদ্ অথবা তন্ত্র, অথবা কোন সংহিতা, অথবা কোন পুরাণ সর্ব্বতোভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। নিরুক্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিলে উত্তরমীমাংসার অর্থ যথাযথ ভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় এবং উহার রচয়িতাগণ এমনই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও নিরুক্তে জ্ঞান সম্যক্ ভাবে অর্জ্জন করিতে না পারিলে কোন ক্রমেই উত্তর-মীমাংসায় কথঞ্চিৎপরিমাণেও প্রবেশ করা সম্ভব হয় না, পরন্তু পূর্ব্ব-মীমাংসা ও নিরুক্তের জ্ঞান অর্জ্জিত হইলেই অনায়াসে কোন ভাষ্য, অথবা আচার্য্যের বিনা সাহায্যে উত্তর-মীমাংসার প্রত্যেক কথাটী চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে।

উত্তর-মীমাংসার জ্ঞান যথাযথ অর্থে সম্যক্‌ভাবে অর্জ্জন করিতে পারিলে, স্বাভাবিক কোন্ কোন্ নিয়মে প্রত্যেক শব্দটী তাহার অব্যক্ত অবস্থা হইতে ব্যক্তি লাভ করিতেছে, তাহা সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব এবং তখন বেদাঙ্গান্তর্গত অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ অধ্যয়ন করা অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠেরও এমনই রচনা-কৌশল যে, পূর্ব্বমীমাংসা, নিরুক্ত এবং উত্তর-মীমাংসায় জ্ঞান সম্যক্‌ভাবে অর্জ্জন করিতে না পারিলে উহার একটি সূত্রও যথাযথভাবে বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না, অথচ পূর্ব্ব-মীমাংসা, নিরুক্ত ও উত্তর-মীমাংসার জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া পাণিনি পাঠ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, কোন ভাষ্য ও আচার্য্যের বিনা সাহায্যে উহার প্রত্যেক সূত্রের প্রত্যেক কথাটী অনায়াসেই কার্য্য-কারণের সঙ্গতিক্রমে চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতে থাকে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারিলে অন্যান্য বেদাঙ্গ, দর্শন, উপনিষদ্, তন্ত্র, সংহিতা ও পুরাণ যথাযথ অর্থে পাঠ করা সম্ভব হয় এবং তখন ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা কোন্ নিয়মে যথাযথভাবে লিখিতে হয়, তাহাও পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। এইরূপে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারিলে উপরোক্ত বেদাঙ্গ প্রভৃতির প্রত্যেক গ্রন্থখানির প্রত্যেক বাক্যটীর অর্থ যথাযথ ভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থগুলি যথাক্রমে অধ্যয়ন করিলেও উহাদের কোন-খানির মর্ম্ম যথাযথভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ঐ গ্রন্থগুলির বক্তব্যের মর্ম্ম কি, তাহা যথাযথভাবে ও সম্যক্ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হইতে হইলে অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ অধ্যয়ন করিবার পর যথাক্রমে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে পাতঞ্জল-দর্শন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে পারিলে জগৎ ও চরাচর জীবের মূল কোথায়, যাহা জগৎ ও চরাচর জীবের মূল তাহার উন্মেষ-প্রবৃত্তি, উন্মেষ, বিকাশ ও বৃদ্ধি কোন্ কোন্ নিয়মে হইয়া থাকে, চরাচর জীবের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের শক্তি কিরূপভাবে বিকশিত হইয়া থাকে এবং ঐ শব্দাদির বৃদ্ধি ও হ্রাসই বা কোন কোন্ নিয়মে সাধিত হয়, এবম্বিধ যাবতীয় তথ্যসমূহ পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয় বটে, কিন্তু তখনও ঐ তথ্যসমূহ যে যথাযথ, তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। এক কথায়, পাতঞ্জল-দর্শন পর্য্যন্ত যথাক্রমে অধ্যয়ন করিতে পারিলে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা সম্পূর্ণভাবে জানা সম্ভব হয় বটে, কিন্তু ঐ কথাগুলি যে যথাযথ তাহা উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না। পাতঞ্জল-দর্শন পর্য্যন্ত যথাক্রমে অধ্যয়ন করিতে পারিলে শব্দশাস্ত্র-পরিজ্ঞানের সমাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তখনও উহার সত্যতা সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধিযোগ্য হয় না। সম্যক্‌ভাবে ঐ সত্যতা উপলব্ধি করিতে হইলে তিনটী বেদের (অর্থাৎ ঋক্, যজু ও সামের) প্রত্যেক মন্ত্রটী যথাক্রমে অভ্যাস করিবার প্রয়োজন হয়।

ঋক্, যজু ও সামের প্রত্যেক মন্ত্রটী অভ্যাস করিতে হইলে যথাক্রমে বেদাঙ্গান্তর্গত শিক্ষা, ছন্দ, জ্যোতিষ ও কল্প পরিজ্ঞাত হইয়া আগম অর্থাৎ তন্ত্র শাস্ত্রের অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপে যথাক্রমে শিক্ষা, ছন্দ,

জ্যোতিষ ও কল্প পরিজ্ঞাত হইয়া তন্ত্র-শাস্ত্রের অভ্যাসে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলে ঋক্, যজু ও সামের প্রত্যেক মন্ত্রটীর অভ্যাস অনায়াসসাধ্য হইয়া থাকে এবং তখন উপরোক্ত সত্যতা উপলব্ধিযোগ্য হয়।

এইরূপে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহার তথ্য পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে এবং সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিলে অথর্ববেদের প্রত্যেক কথাটী হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় এবং তখন যে সংগঠনের দ্বারা প্রত্যেক জীবকে তাহার অর্থাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, অশান্তি, অসন্তুষ্টি, অকালবার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা সম্ভব, তাহা নির্ণীত হইতে পারে। জ্ঞান ও উপলব্ধিজাত অথর্ববেদকে ভিত্তি করিয়া মন্বাদি বিংশ সংহিতা রচিত হইয়াছে। কাযেই, ঐ সংহিতাগুলির কোনখানির মর্ম্ম যথাযথভাবে উদ্ধার করিতে হইলে এক দিকে যেরূপ যথাক্রমে পাতঞ্জল পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া শব্দ-শাস্ত্র সম্যক্‌ভাবে পরিজ্ঞাত হইতে হয়, সেইরূপ আবার তন্ত্র-শাস্ত্র ও বেদের মন্ত্রের অভ্যাসে নৈপুণ্য লাভ করিয়া যাবতীয় জ্ঞাতব্যের সত্যতা উপলব্ধি করিতে হয়।

ঋষি-প্রণীত ভাষা ও শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হইবার ও উপলব্ধি করিবার প্রণালী সম্বন্ধে আমরা যাহা যাহা লিখিলাম, তাহা আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত নহে। উহা ঋষিদিগেরই কথা। প্রয়োজন হইলে অথর্ববেদের কথা হইতে উহার সত্যতা প্রতিপন্ন হইতে পারে।

ঋষিদিগের শব্দ-শাস্ত্র, তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদিক সাধনা যে কত প্রয়োজনীয় এবং কত দুঃ ও সূক্ষ্মতম দর্শনসাপেক্ষ, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করা আমাদিগের উপরোক্ত কথাগুলি লিখিবার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া যাঁহারা ঐ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইবেন, তাঁহাদিগকে কোন্ পদ্ধতিতে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা জানাইয়া দেওয়াও আমাদিগের অন্যতম অভিপ্রায়। কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা পাঠকবর্গকে শব্দ-শাস্ত্র প্রভৃতি শিখাইতে বসিয়াছি। এতাদৃশ দাম্ভিকতা আমাদিগের নাই। সূক্ষ্মতম অনুভূতির উপর যে শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত, তাহা সর্ব্বতোভাবে ঋষিপ্রণীত সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। এমন কি, উহা ব্যক্ত করিবার জন্য ঋষিগণ যে কথাগুলি ব্যবহার করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার অন্য কোন কথার দ্বারা তাহা তাদৃশ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নহে। আমাদিগের মতে যতদিন পর্য্যন্ত ঋষি-প্রণীত সংস্কৃত ভাষা মানুষের পরিজ্ঞাত ছিল, ততদিন পর্য্যন্ত ঋষির শাস্ত্রের ভাষ্য করিবার কোন প্রয়োজন হয় নাই এবং উহার কোন চেষ্টাও হয় নাই। তৎপরবর্ত্তী কালে মানুষ যখন ঐ ভাষা সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া গিয়াছিল, তখন ঐ শাস্ত্র আর কেহ যথাযথভাবে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই ভাষ্য-সমূহের উদ্ভব হইয়াছে এবং ঋষির শাস্ত্রের আসল কথা লুক্কায়িত রহিয়াছে। ঋষিদিগের শাস্ত্রের যে সমস্ত ভাষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার কোনটিই প্রায়শঃ দুই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে। অথচ, ঋষি-প্রণীত গ্রন্থসমূহ যে কত প্রাচীন, তাহা কেহই সঠিকভাবে বলিতে পারেন না। উহার প্রত্যেকখানি যে দুই সহস্র বৎসর অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করা যায় না। যে গ্রন্থগুলি এত প্রাচীন তাহাদিগের ভাষ্য এত আধুনিক কেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগের উপরোক্ত কথার সত্যতা উপলব্ধি করা যাইবে।

উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ব্রাহ্মণগুলি রচিত হইয়াছিল বেদের মন্ত্রের অভ্যাসের সহায়তার জন্য। ঐ অভ্যাসে নিরত না হইলে উপনিষদ্ প্রভৃতির মর্ম্ম কথঞ্চিৎ পরিমাণেও উপলব্ধি করা সম্ভবযোগ্য হয় না। তন্ত্রের অভ্যাসে নৈপুণ্য লাভ করিয়া বেদের মন্ত্রের অভ্যাসে অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, আজকাল উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ব্রাহ্মণগুলি যে অর্থে বুঝা এবং প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহার কোনটীই ঋষি-প্রণীত মূলভাগের কথা নহে, পরন্তু প্রত্যেকটী বাজে কথায় পরিপূর্ণ।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচিত হইয়াছিল শব্দ-শাস্ত্র, তন্ত্র-সাধনা ও বেদ-সাধনার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশগুলি অল্পবুদ্ধি জনসাধারণের বুদ্ধি-যোগ্য করিবার জন্য। যথাক্রমে পাতঞ্জল পর্য্যন্ত শব্দ-শাস্ত্র, তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদিক সাধনায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলে রামায়ণ প্রভৃতির মর্ম্ম যথাযথভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া অনায়াসসাধ্য হয়। অন্য পক্ষে, শব্দ-

শাস্ত্র, তান্ত্রিক সাধনা ও বৈদিক সাধনায় কৃতকার্য্য না হইতে পারিলে এই রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ কোন ক্রমেই কথঞ্চিৎ পরিমাণেও বুঝিয়া উঠা সম্ভব হয় না। শব্দ-শাস্ত্র প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া, রামায়ণাদি গ্রন্থে প্রবেশলাভ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক অংশটি যে যে অর্থে বুঝা ও বুঝান হইতেছে তাহাও আদৌ ঋষি-প্রণীত মূলভাগের কথা নহে, পরন্তু উহার প্রত্যেকটীও বাজে কথায় পরিপূর্ণ।

জ্যোতিষ-শাস্ত্র এবং চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে যে ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ আছে তাহাও একই অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান অবস্থায় ঋষি-প্রণীত ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়া ঋষির শাস্ত্রের মর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত হইতে ও উপলব্ধি করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে নিজেদের দ্বন্দ্ব, কলহ, রাগ ও দ্বেষের ভাব সংযত করিয়া স্বকীয় জিহ্বাকে যথাসাধ্য পরিমাণে সরল, সুস্থ ও পূর্ণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রথমতঃ নন্দিকেশ্বর-কাশিকা, দ্বিতীয়তঃ নন্দিকেশ্বর-লিঙ্গধারণচন্দ্রিকা, তৃতীয়তঃ বেদ-পাঠ, চতুর্থতঃ পূর্ব্ব-মীমাংসা, পঞ্চমতঃ নিরুক্ত, ষষ্ঠতঃ উত্তর-মীমাংসা, সপ্তমতঃ অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ, অষ্টমতঃ গৌতম সূত্র, নবমতঃ বৈশেষিক, দশমতঃ সাংখ্য, একাদশতঃ পাতঞ্জল, দ্বাদশতঃ শিক্ষা, ত্রয়োদশতঃ ছন্দ, চতুর্দ্দশতঃ জ্যোতিষ, পঞ্চদশতঃ কল্প অধ্যয়ন করিতে হইবে। এইরূপে সমগ্র শব্দ-শাস্ত্র ও বেদান্ত অধ্যয়ন করিবার পর প্রথমতঃ তন্ত্র, দ্বিতীয়তঃ ঋক্‌বেদ, তৃতীয়তঃ যজুর্ব্বেদ, চতুর্থতঃ সাম্‌বেদ অভ্যাস করিতে হইবে। সাম্‌-বেদ পর্য্যন্ত অভ্যাস হইয়া গেলে যথাক্রমে অথর্ব্ব-বেদ ও মন্বাদি বিংশ সংহিতা পাঠ করিতে হইবে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এতগুলি বিভিন্ন শাস্ত্রের এতগুলি গ্রন্থ এক জীবনে অধ্যয়ন করিয়া উঠা সম্ভব নহে। কিন্তু, তাহা সত্য নহে। ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের বিষয়সমাবেশ ও রচনাপদ্ধতি এতই নৈপুণ্যপূর্ণ যে, সমগ্র শাস্ত্র অত্যন্ত বিস্তৃত হইলেও, ১০।১২ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করা খুবই সহজসাধ্য।

এক্ষণে ঋষি-প্রণীত গ্রন্থের ভাষা যথাযথভাবে বুঝিবার পদ্ধতি কেহ অবগত নহেন বলিয়া উপরোক্ত সমগ্র শাস্ত্রের দুই একখানি গ্রন্থও ৮।১০ বৎসরে পড়িয়া উঠিতে পারেন না।

এক্ষণে সংস্কৃত ভাষার নামে যাহা চলিতেছে, তাহা ভট্ট, আচার্য্য শ্রেণীর মানুষের দ্বারা প্রধানতঃ প্রণীত। উহাদের ভাষাজ্ঞানের দ্বারা কেবলমাত্র উহাঁদের প্রণীত ও তৎপর-বর্ত্তী গ্রন্থসমূহ পাঠ করা সম্ভব হয়। উহার দ্বারা কখনও ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ যথাযথভাবে বুঝা সম্ভব হইতে পারে না এবং হয় না।

ঋষিগণ তাঁহাদিগের শব্দ-শাস্ত্রে শব্দের অন্তর লক্ষ্য করিয়া শব্দ-লক্ষণ ও শব্দ-বৃত্তির নিয়মানুসারে অর্থোদ্ধার করিবার যে পদ্ধতি পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং নিরুক্তে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তদনুসারে কোন 'বাক্য' অথবা 'পদ' অখণ্ড-মণ্ডলাস্থিত কোন 'দ্রব্য-বীজ' অথবা 'কর্ম্মের' কর্ম্ম (অর্থাৎ উন্মেষপ্রবৃত্তি, উন্মেষ) সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে সেই পদ ও বাক্যে বিভক্তির ব্যবহার ও বিভক্ত্যর্থ গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের যুক্তি—যাহা যাহা খণ্ডিত অথবা বিভক্ত কেবলমাত্র তাহাদিগের কার্য্য-প্রসূত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মবাচক পদ ও বাক্যে বিভক্তির ব্যবহার হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহা যাহা অখণ্ডিত অথবা অ-বিভক্ত, তাহারা যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিভক্ত না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগের কার্য্যপ্রসূত কোন উন্মেষ প্রভৃতি অথবা বিকাশ প্রভৃতিতে বিভক্তির ব্যবহার হইতে পারে না, কারণ অখণ্ড অথবা অব্যক্তের অবস্থায় বিভক্তি কার্য্যতঃ বিদ্যমান থাকে না। ঋক্‌ ও যজুর্ব্বেদ পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত 'অণু'র উন্মেষ-প্রবৃত্তি আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্ব-দুনিয়ায় যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটী 'অখণ্ড'-মণ্ডলের অংশ। 'অণু'র উন্মেষ-প্রবৃত্তি আরম্ভ হইলেই যাহা আগে 'অখণ্ড' ছিল তাহা ক্রমে ক্রমে 'খণ্ডাকারে' বিকাশ লাভ করিতে আরম্ভ করে।

যথাযথ অর্থে কৃষ্ণ ও শুক্ল-যজুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে পারিলে জানা যাইবে যে, "ব্রহ্ম," "ঈশ্বর," "প্রকৃতি," "পুরুষ," "দিক্‌," "কাল্‌," "ব্রহ্মা," "বিষ্ণু," "শিব," "শ্যামা," "আকাশ," "বায়ু," "তেজ," "তারা" ও "সূর্য্যের" উন্মেষ

পর্য্যন্ত যাহা কিছু বিশ্ব দুনিয়ায় বিদ্যমান আছে তাহার প্রত্যেকটী অখণ্ড-মণ্ডলের অংশ। তেজের উন্মেষ সম্পূর্ণ হইবার পর রসের উন্মেষ হয় এবং তখন তৎসঙ্গে সঙ্গে "চন্দ্রে"র বিকাশ হইয়া থাকে। চন্দ্রের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অণুর উন্মেষ-প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়। তখন যাহা আগে অখণ্ড-মণ্ডলের অংশ ছিল, তাহা খণ্ডিত হইতে আরম্ভ করে এবং ক্রমে ক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, রস ও আকারের বিকাশ সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহার পর জল মণ্ডল, স্থল-মণ্ডল চর-জীব এবং অচর-জীবের উৎপত্তি হয়। কাযেই, ঋষি-দিগের উপদেশানুসারে ভূমণ্ডল হইতে চন্দ্র পর্য্যন্ত যে সমস্ত কর্ম্ম ঘটিয়া থাকে এবং দ্রব্য ও গুণ দেখা যায়, তৎসম্বন্ধীয় পদ ও বাক্যে বিভক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু চন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া নীলাকাশ পর্য্যন্ত ও নীলাকাশের মধ্যে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তৎসম্বন্ধীয় কোন পদ ও বাক্যে বিভক্তি ব্যবহৃত হইতে পারে না এবং ঐ সমস্ত পদ ও বাক্যের অর্থ উদ্ধার করিতে হইলে বিভক্ত্যন্ত পদের অর্থ গ্রহণ করিবার নিয়ম অনুসরণ করা চলে না। এক কথায়, "সর্ব্ব-নিয়ন্তা"র কোন কার্য্য বর্ণনার জন্ত ঋষিগণ যে সমস্ত পদ ও বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার কোনটীর অর্থ প্রচলিত ব্যাকরণানুসারে স্থির করা সম্ভব নহে। উহা স্থির করিতে হইলে কেবলমাত্র পূর্ব্বমীমাংসা ও নিরুক্তের নিয়ম অবলম্বন করিতে হয়। সেইরূপ আবার "দন্ত্য-ন" যখন কোন চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থ "না" হইয়া থাকে বটে, কিন্তু উহা যখন কোন আত্মা-গ্রাহ্য কর্ম্ম অথবা বুদ্ধি-গ্রাহ্য দ্রব্য-বীজ ও কর্ম্ম অথবা মনো-গ্রাহ্য কর্ম্ম, দ্রব্য-বীজ ও গুণ-বীজসম্বন্ধীয় বাক্যে ব্যবহৃত হয়, তখন তাহার অর্থে "না" গ্রহণ করা ঋষির শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তখন "ন" এর অর্থ হয়, "ব্রহ্ম-রূপের উন্মেষ", অথবা "রজো-গুণের উন্মেষ", অথবা "ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আকারের বিকাশ", অথবা "শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধের বিকাশ।" পূর্ব্বমীমাংসার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের চতুর্ব্বিংশ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাত্রিংশ সূত্র পর্য্যন্ত ঋষি-প্রোক্ত অর্থে বুঝিতে পারিলে "'ন' পূর্-উ-আ-তু-আৎ" (১ম অধ্যায়-২য় পাদ-২১ সূত্র)। "ন' তৎ-অর্থ-তু-আৎ লোকবৎ তসি অ চ শেষভূত তু আৎ" (২য় ১ম পাঃ ১২ সূত্র) হইতে এবং নিরুক্তের "ইন্দ্রিয় নিত্যং বচনং উৎ-উম্-বর-অ-অয়ণঃ তত্র চতুষ্টং 'ন' উপপত্ততে" এই সূত্রটী হইতে "ন"-সম্বন্ধীয় আমা-দিগের উপরোক্ত কথার সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারে। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠের "'ন' ধাতুলোপঃ আ র্ দ্-ধ-ধাতুকে" এবং উত্তরমীমাংসার "ঈক্ষতে-র্ 'ন' অশব্-দ-ম্" এই দুইটী সূত্রও "ন"-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত কথার পরিপোষক।

"ন"এর অর্থ উপলব্ধি করিবার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে "কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে।" উহা অভ্যাস করিবার বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তৈত্তিরীয়োপনিষদে।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের শিক্ষাবল্লীর ১০ম অনুবাকের দ্বিতীয় শ্রুতিটী যথাযথ অর্থে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

ঋষি-প্রণীত শব্দ-শাস্ত্রানুযায়ী শব্দের অন্তর পরীক্ষা করিবার পদ্ধতি অনুসারে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটীর যে অর্থ হইবে তাহা লিখিতে বসিলে আমাদিগের সন্দর্ভের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কাযেই, আমরা এখানে তাহা করিতে পারিব না।

আমরা "ন"-এর অর্থ সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বতোভাবে মানুষের প্রত্যক্ষের অযোগ্য, এমন কোন কথা ঐ শ্লোক কয়েকটীর মধ্যে থাকিতে পারে না এবং নাই।

শ্যামার চিত্রের মধ্যে দিক্ ও কালের সংজ্ঞা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মূলসূত্র নির্দ্ধারণের কোন নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কি না, এক্ষণে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্যামার মূর্ত্তির মধ্যে যে দিক্ ও কালের সংজ্ঞা ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের মূলসূত্র-নির্দ্ধারণের পন্থা রহিয়াছে, তাহা আমরা আগেই দেখাইয়াছি।

শ্যামার চিত্রের পট-ক্ষেত্রে যে চারিটী রং ব্যবহার করা হয়, পাদ পর্য্যন্ত লম্বিত কেশরূপে যাহা অঙ্কিত হয়, মুকুটে যে বিন্দু, সরল রেখা ও বৃত্তের সমাবেশ দেখান হয়, মুকুটের পশ্চাতে যে জ্যোতিঃ দেখান হয়, গলায়, বাহুতে ও [illegible] যে অলঙ্কার চিত্রিত হয়,

শ্যামার সমস্ত শরীরে যে বিবিধ রং ফলাইবার চেষ্টা করা হয়, কণ্ঠে ও কর্ণে যে রং এবং যে যে অলঙ্কার চিত্রিত হয়, গলায় যে যে মালা চিত্রিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথা যে সর্ব্বতোভাবে সত্য তাহা সম্যক্ ভাবে বুঝা যাইবে।

ঐ বিষয়ক বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নহে। কারণ, শ্যামার চিত্রে কি আছে অথবা নাই, তাহা বুঝিতে হইলে শ্যামাকে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইবে। শ্যামাকে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে হইলে পঞ্চতত্ত্ব ও দশমহা-বিদ্যা সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বতোভাবে বুঝিবার প্রয়োজন হয়। শ্যামা-বিষয়ক প্রধান প্রধান কথাগুলি লিখিতে হইলেও বহু পৃষ্ঠার প্রয়োজন হইবে।

এইখানে মনে রাখিতে হইবে, আধুনিক চিত্রকরগণ শ্যামাতত্ত্ব না বুঝিতে পারিয়া যেরূপ ভাবে শ্যামাকে চিত্রিত করিয়া থাকেন, সংস্কারবশে উহা সর্ব্বতোভাবে বিকৃত না হইলেও অনেকাংশে বিকৃত।

যাঁহারা এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদিগকে আমরা "কাশ্যপ-শিল্পং" নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থ যথাযথ ভাবে বুঝিতে পারিলে আমাদিগের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হইবে।

"কাশ্যপ-শিল্পং"-এর "একতলং", "দ্বিতলং", "ত্রিতলং", "চতুর্ভূমিঃ" প্রভৃতি শীর্ষক পটলগুলি অধ্যয়ন করিলে, দেব-দেবীর চিত্রে যে গতিশীল কার্য্যগুলির নক্সা অঙ্কিত করিবার স্থানের পরিচয় থাকে তাহা বুঝা যাইবে।

এই সমস্ত বিষয় অতীব উরুচ, আমরা তাহা লইয়া শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে বাদানুবাদ করিতে চাহি না। তাহার কারণ, শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যা যে কতখানি তাহা "হিন্দু" পত্রিকায় প্রবন্ধ নামে তাঁহার লেখা যে সমস্ত অপাঠ্য "ছাই-পাশ" বাহির হয়, তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "কোথায় মস্তিষ্ক?"-শীর্ষক প্রবন্ধের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"অত্রি ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে লেখা আছে, 'বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ'—"ব্রাহ্মণ দশ প্রকার।" ইহার পর তথাকথিত "চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ", "ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণ" প্রভৃতি ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপরোক্ত কথানুসারে বুঝিতে হয় যে, 'বিপ্র' শব্দের অর্থ 'ব্রাহ্মণ'।

অথচ, অত্রি-সংহিতাতেই 'ব্রাহ্মণ' ও বিপ্রের লক্ষণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

'জন্মনা-ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ
সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্ত্রিভি-
রেভিঃ এব চ॥
(অত্রিসংহিতা, ১৪০ শ্লোক)

সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা বুঝা যাইবে যে, 'ব্রাহ্মণ' ও 'বিপ্র' এই দুইটী কথা যদ্যপি একার্থক হইত, তাহা হইলে দুই-এর বিভিন্ন লক্ষণের কথা ঋষি প্রকাশ করিতেন না।

বাস্তবিক পক্ষে 'ব্রাহ্মণ' ও 'বিপ্র' এই দুইটী কথা একার্থক নহে। 'বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং' বলিতে বুঝায় যাহারা 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বগুলি জানিতে পারিয়াছেন তাঁহারা বিপ্র-নামের যোগ্য'। ইহা হইতে বুঝিতে হয় যে, ব্রাহ্মণ হইলে বিপ্রত্ব লাভ করিতে হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইয়াও মানুষ 'বিপ্র' নামের যোগ্য হইতে পারে।

'দেবো মুনির্দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রো নিষাদকঃ
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চাণ্ডালো বিপ্রা দশবিধাঃ স্মৃতাঃ'।
(অত্রিসংহিতা, ৩৬৪ শ্লোক)

এই শ্লোকটীর অর্থ 'যাঁহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তত্ত্বগুলি জানিতে পারিয়া বিদ্বান্ হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের উন্নতি ও অবনতি দশ শ্রেণীর হইয়া থাকে। উন্নতি ছয় রকম, যথা:—দেব, মুনি, দ্বিজ, রাজা, বৈশ্য এবং শূদ্র। অবনতি চারি রকম, যথা:—নিষাদক, পশু, ম্লেচ্ছ ও চণ্ডাল।'

আমাদিগের উপরোক্ত অর্থ যে কার্য্যকারণসঙ্গত, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝা যাইবে।

অত্রি-সংহিতার এই নির্দ্দেশানুসারে যাঁহারা আধুনিক হিন্দুয়ানী লইয়া গোঁড়ামী করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে অধঃপতিত এবং নিষাদক, পশু, ম্লেচ্ছ ও চাণ্ডাল বলিয়া অভিহিত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। অত্রি-সংহিতার উপদেশানুসারে ইহাঁদিগকে কোনক্রমেই শ্রদ্ধেয় মানুষ বলিয়া মনে করা যায় না।

"বঙ্গবাসী" নামক পত্রিকায় "পুঁইমাচা দর্শন"-শীর্ষক সন্দর্ভের মুখ্য কথা তিনটী ঃ—

(১) তিনি ('বঙ্গশ্রী'র লেখক) আদ্যা-মূর্ত্তির ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী আদ্যাশক্তির স্বরূপের সন্ধান না পাইয়া তাহাতে কাল ও স্থানের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের মূল সূত্র দেখিতে পাইয়াছেন এবং গতিশীল কার্য্যগুলির নকসা করিবার জ্ঞানের পরিচয়ও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

(২) হরি-হর-বিরিঞ্চ্যাদি বিবুধগণ কোটী কল্প-কাল ধ্যান করিয়াও যাঁহার স্বরূপের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে পারেন নাই, কলিকালের একটা কীটাণু-কীট তাহা পারিবে, ইহা বাতুলেই বিশ্বাস করিতে পারে।

(৩) এখনও যে ভারতের কোটী কোটী হিন্দু সাধকোত্তম স্বয়ং মহাদেবের উপদেশমত আগমোক্ত বিধানে কোশাকুশী ও ফুল-বিল্বদল লইয়া এই মূর্ত্তির পূজা করিয়া অভীষ্ট ফল লাভ করিতেছে, তাহাদের প্রাণে ব্যথা দেওয়ার এই কীটাণুকীটের কি অধিকার আছে?

ঐ তিনটী কথার উত্তর আমরা আগেই দিয়াছি। কাযেই, ঐ সম্বন্ধে আর আলোচনা করিব না।

যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে মনে হয়, 'বঙ্গবাসী'র লেখকটী গোঁড়া হিন্দুশ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাঁহাকেও অত্রিসংহিতার নির্দ্দেশানুসারে হয় নিষাদক, নতুবা পশু, নতুবা ম্লেচ্ছ, নতুবা চাণ্ডাল বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

উপসংহারে আমরা উপরোক্ত লেখকদিগকে মনে করাইয়া দিতে চাই যে, দাম্ভিকতা আর "বিদ্যা-বল" এক কথা নহে। দাম্ভিকতা ও ব্রাহ্মণ্য কখনও একসঙ্গে থাকিতে পারে না। শরীরে ঋষির রক্ত ধারণ করিয়া ভট, আচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণের মত ঋষির শাস্ত্রের বিপরীত ব্যাখ্যা করিলে নির্ব্বংশ ও হতশ্রী হইতে হয়। এই অপরাধেই ঋষির সন্তানগণ দুর্দ্দশার চরমে উপনীত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহারা পুস্তক বিক্রয় করিয়া অথবা আধুনিক ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটী ও গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিগ্রহণ করিয়া, অথবা ভৃতকাধ্যাপকতা করিয়া অথবা চাকুরীরূপে নফরগিরি করিয়া জীবন ধারণ করেন, অথচ ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব পোষণ করেন, তাঁহারা শাস্ত্রানুসারে "পশু"। ইহাঁরা বাস্তবিক পক্ষে পরোক্ষভাবে "চাণ্ডাল্য" গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরোক্ষভাবে উহা না করিয়া প্রকাশ্য ভাবে উঁহারা যদি চাণ্ডাল্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উঁহা-দের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে এবং তাহা হইলে হয় ত' উঁহাদের সন্তানগণের অবনতির গতি ফিরিয়া যাইতে পারে। আমাদিগকে যথেচ্ছ গালাগালি করিলেও তাহা আমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। শাস্ত্রের কথা নির্ভীক ভাবে বলিতে আমরা বাধ্য। স্ব স্ব সন্তান-সন্ততি-দিগের মুখের দিকে চাহিয়া আমরা এখনও ইহাঁদিগকে গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া সতর্ক হইতে অনুরোধ করিতেছি।

অদূর-ভবিষ্যতে যে পুনরায় ঋষি-প্রদর্শিত পথে মানবসমাজের শ্রেণীবিভাগ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

তখন ইহাঁরা কোন্ শ্রেণীতে পতিত হইবেন তাহা আমরা এখনও ইহাঁদিগকে ভাবিতে অনুরোধ করি-তেছি।

বিচিত্র জগৎ

এডেন

---শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাবেলম্যাণ্ডেব প্রণালীর প্রায় একশ মাইল পূর্বে এডেনের নির্বাপিত আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। আরবের উপকূলভাগের সাধারণ উচ্চতা অপেক্ষা এডেন পাহাড়ের

এডেনের মানচিত্র।

উচ্চতা ১৮০০ ফুট বেশী। এডেন একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য-কেন্দ্র; শুধু আরব দেশের নয়, ইথিওপিয়া ও সোমালিল্যাণ্ডেরও বটে।

মরুপ্রান্তস্থ এই শৈলদুর্গে এডেনের রক্ষীসৈন্যদল বাস করে। তাদের মধ্যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ সৈন্যই আছে। তা ছাড়া আছে হিন্দু, পার্শী, আরবীয় ও গ্রীক্ ব্যবসায়িগণ।

এডেনের সূর্যাকরতপ্ত বৃক্ষলতাহীন পাহাড় মানব-দেহের জীবনরস যেন চুষে নিচ্ছে। কুড়ি বর্গ-মাইল পরিমিত স্থানে শুধুই পাথর আর তপ্ত বালু ছাড়া আর বিশেষ কিছুই চোখে পড়ে না; ঘাস ত' একেবারেই নেই, গাছ মাঝে মাঝে দু'চারটে দেখা যায় এবং পাহাড়ের ফাটলে 'এডেন লিলি' নামে এ দেশের একমাত্র ফুল দেখতে পাওয়া যায়।

এডেন দুটি অংশে বিভক্ত, পুরান সহর ও আধুনিক এডেন সহর। দ্বিতীয়টা ষ্টীমার পয়েন্ট নামক স্থানের চারিধারে গড়ে উঠেছে। আধুনিক সহর প্রাচীন সহরের সঙ্গে পাঁচ

মাইল দীর্ঘ 'মা-আলা' রোড দ্বারা সংযুক্ত। প্রাচীন সহরটি আগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহের মধ্যে অবস্থিত; এই অগ্নিকটাহ এখন অবশ্য নির্ব্বাপিত এবং এর একটা ধার সমুদ্রের দিকে ধ্বসে পড়েছে।

১৮৩০ সালে এখানে জনৈক তরুণ বিটিশ নৌ-সেনাপতি তরবারি হাতে এইখানে ডাঙায় নামেন এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন নৌ-সেনা নিয়ে অগ্রসর হয়ে আরবীয়দের পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাড়িয়ে দেন। সহরের পিছনে অগ্নিকটাহের একটি খাদে অনেকগুলি চৌবাচ্চা আছে। এগুলি দেখতে সুরকী-চূণ দিয়ে গাঁথা চায়ের পেয়ালার মত। কেউ কেউ বলেন, এগুলি গাঁথা হয়েছিল ৬০০ খৃষ্টাব্দে কিংবা তারও পূর্ব্বে।

১৮৩৬ সালের পরে ইংরেজ কর্তৃক অনেকগুলি ভগ্ন চৌবাচ্চা মেরামত করা হয়েছিল। এডেন বৃষ্টিহীন দেশ। এক বছর অন্তর এখানে বৃষ্টি হয়; বার্ষিক বর্ষণের পরিমাণ, তিন ইঞ্চি মাত্র। এই ভীষণ জলহীন মরুদেশে দুর্লভ বৃষ্টিধারা সঞ্চিত করে রাখার উদ্দেশ্যেই যে এই চৌবাচ্চাগুলি পুরাকালে নির্ম্মিত হয়েছিল, এটা বেশ বোঝা যায়।

এখনও এডেনে মিষ্ট জল সমানই দুর্লভ। যখন বৃষ্টি নামে, জল নীলামের ডাকে বিক্রী করা হয় এবং ইহুদী ও আরবীয়েরা টিনে বা ছাগলের চামড়ার মশকে সেই জল নিজেদের ব্যবহারের জন্যে কিনে নিয়ে যায়।

বৃষ্টির জল বাদে সমুদ্রের জল বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্পকে জমিয়ে জল তৈরী করা হয়। বন্দরের ইউরোপীয় অধিবাসিগণ এই জলই পানের জন্যে ব্যবহার করে থাকেন। আরবীয়দের বিশ্বাস, যখনই চৌবাচ্চাগুলি জলে পুরো ভর্ত্তি হয়, তখনই তিনটি মানুষ জলে ডুবে মরবেই।

আমি জানি (এইচ. জি. সি. সোয়েনের বর্ণনা থেকে) একবার তিনটি লোক জলে ডুবে মারা যায়। আমার ভারতীয় ওভারসিয়ার এদের মধ্যে একজনকে চৌবাচ্চার জলে নীচের দিকে মুখ করে ভাসতে দেখে।

লোকটা যেখানে ভাসছিল, তার কয়েক ফুটের মধ্যে অন্ততঃ একশ লোক সে সময়ে উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মজ্জমান লোকটিকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেনি।

এডেন বন্দর বৃক্ষলতাহীন মরু বটে, কিন্তু এখানে বিভিন্ন রঙের খেলা বড় বিচিত্র। এডেনের সমুদ্রজলের রং ভূমধ্যসাগরের চেয়েও নীল, তার পেছনে চিত্রকর ভ্যান ডাইকের ছবির মত ধূসর বর্ণের ও গৈরিক বর্ণের শৈলমালা এই রঙিন পটভূমিতে প্রাচ্যদেশসুলভ বিভিন্ন পরিচ্ছদধারী জনমণ্ডলী।

এডেনের আগ্নেয়গিরি দুটি—একটির নাম 'জেবেল ইহ্সান,' অন্যটির নাম 'জেবেল সামসান্।' আমাদের বাংলো থেকে আমি আর আমার স্ত্রী কতবার জেবেল ইহ্সানের মোচাকৃতি ধূসর শিখরদেশের পিছনে কত অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত প্রত্যক্ষ করেছি।

বৃষ্টির জল সঞ্চিত করিবার চৌবাচ্চা।

জেবেল ইহ্সানের সানুদেশে বর্ত্তমানে একটি আরব ধীবরপল্লী অবস্থিত। আমাদের বাড়ীর জানালা থেকে বন্দরের দৃশ্যও ভারী সুন্দর।

ভিতরের বন্দর থেকে হয় ত একখানা আরবীয় বজরা ধীরে ধীরে বাহির সমুদ্রে পড়ে দক্ষিণ দিকে চলেছে। কখন দেখতে পাওয়া যায়, একদল কৃষ্ণকায় সোমালি মাল্লা গোল হয়ে ঘিরে বসে সান্ধ্য-ভোজ সম্পন্ন করছে।

আমার সোমালি ভৃত্য ইসমাইল বজরাখানার দিকে চেয়ে হয় ত বলে উঠত, 'আল্লার দোয়ায় আমরা একটু বাতাস পাব শীগগির।'

প্রায়ান্ধকার সমুদ্রবক্ষে দূরে হয় ত একটা উড্ডীয়মান মাছ জল থেকে প্রায় দশ বার ফুট লাফিয়ে উঠে আবার জলে পড়ে গেল; তার পেছনে কিছু দূরে আবার আর একটা, তার পেছনে আবার একটা।

নৌকার মাল্লারা একযোগে দাঁড় বাইছে ও চীৎকার করে বলছে 'ইয়াহুদী ও আল্লা!'

তারপরে সন্ধ্যার বাতাসে সমুদ্রের বুকে মৃদু ঢেউ দেখা দেয়, সোমালি মাল্লারা পিছন দিক থেকে জাহাজের সামনের দিকে চলে, জাহাজটা আরও দূরে দক্ষিণে চলে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃষ্ণবিন্দুর মত মিলিয়ে যায়।

আমরা, এডেন দুর্গের বড় বড় কামানের ছায়ায় যারা বাস করি, দিনে প্রখর সূর্য্যতাপে সামরিক কাজে ভূতের মত খাটি, আর রাত্রে ভীষণ গরমের জন্য ঘরে শুতে না পেরে নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের তলায় জমাটবাঁধা লাভা-প্রস্তরের ওপর বিছানা বিছিয়ে শুই। কতবার আমাদের মনে হয়েছে, ওই রকম একখানা পাল-তোলা নৌকো বেয়ে আমরাও বিলীয়মান সূর্য্যাস্তের পথে নতুন দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেব—যে দেশে বায়ু শীতল এবং বাতাসে সিডারের সুগন্ধ বেয়ে আসে।

কতবার দেখেছি ছোট ছোট হাঙ্গর বাইরের সমুদ্র থেকে সাঁতার দিয়ে এসে বন্দরের জলে ঢুকছে।

দু'এক মাস অন্তর প্রায়ই বাইরের সমুদ্র থেকে খুব বড় হিংস্র হাঙ্গর বন্দরের জলে এমনি ভাবে ঢুকে স্নানরত কোন ব্রিটিশ সৈন্যকে কিংবা বন্দরে নোঙ্গর করা জাহাজের আরোহীদের কাছে সাঁতারের কৌশল দেখিয়ে অর্থ-উপার্জ্জনে রত কোন কৃষ্ণকায় সোমালি বালককে ভয় দেখায়।

বালক-বালিকাদের এ ভাবে অর্থ-উপার্জ্জন সম্প্রতি পুলিশ থেকে বন্ধ করা হয়েছে।

হয়ত কোন জেলে জালবদ্ধ প্রকাণ্ড এক সোর্ড ফিস্‌কে জ্যান্ত অবস্থায় ডাঙায় নিয়ে এসে ফেলে; জেলে ডিঙি থেকে সেটা ডাঙায় পড়ে ধড়ফড় করতে থাকে।

এডেন বন্দরের এই সব দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার দৃশ্যই আমাদের এখানকার একঘেয়ে জীবনকে সরস করে রাখে।

ষ্টীমার পয়েন্ট থেকে পুরান এডেন সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত মা আলা রোডের ধারে সোমালিপুরা বলে ছোট একটা গ্রাম, এখানে সোমালি ও আরবীয় মাঝিদের বালির ওপর বসে তাদের ডিঙির পাল মেরামত করতে দেখা যায়।

ওদের চারি ধারে হয়তো দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষাকৃত ধনী ও সভ্য কোন আরবীয় ব্যবসাদার। তার পরণে দীর্ঘ রেশমী জেব্বা, গায়ে সোনালী জরির কাজ-করা ভেল-ভেটের ওয়েষ্ট-কোট। হয় ত পেরিম দ্বীপ থেকে আনীত ঝিনুকের স্তূপ কিংবা ভারতবর্ষ থেকে আমদানী চাউলের বস্তা আফ্রিকা চালান দেবার বিষয়ে মাঝিদের সঙ্গে লোকটা দর-কষাকষি করছে।

সহর থেকে দূরে পাহাড়ের খাদের মধ্যে জেবেল সামশানের শিখরের প্রায় হাজার ফুট নীচে পার্শী অধিবাসীদের শ্মশানগৃহ 'নীরব মন্দির'। পার্শীদের মধ্যে কেউ মারা গেলে শববাহী লোকজন দুরারোহ সোপানশ্রেণী অতিক্রম করে পাহাড়ের গায়ে ওঠে, দূর থেকে অনেক সময় দেখা যায়, 'নীরব মন্দিরের' ওপরে আকাশে চিল-শকুনির দল চক্রাকারে উড়ছে।

দুর্গদ্বারের বাইরে, একটুক্রো বালুকাময় ভূমিতে এক দল কৃষ্ণশ্মশ্রু ভারতীয় অশ্বারোহী সৈন্য তাঁবু ফেলে আছে। ওরা খাকির সামরিক পোষাক পরে বর্শা, তলোয়ার বা বন্দুক নিয়ে ছোট ছোট আরবী ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করে কিংবা কুঁজোগোমা আরবী দুই কুঁজবিশিষ্ট উটের ওপর চড়ে মরুভূমির দিকে প্রহরীর কাজে যায়।

এডেন বন্দর এবং আরব দেশের মধ্যে এই বালুময় সঙ্কীর্ণ জমিটুকু যেন উভয়কে সংযুক্ত করবার জন্যেই রয়েছে। এটা যেখানে গিয়ে আরব দেশের জমিতে ঠেকল, সেখানে 'শেখ ওথমান' বলে একটা আরব সহর।

শেখ ওথমান এডেন সহরেরই সহরতলী, সহরের বাড়্তি লোকেরা এখানে বাস করে।

এই গ্রামের পান্থশালায় ছোট একটি বাগান আছে, সেখানে জল-সেচনের খালের ধারে গাছের ডালে সন্ধ্যার সময় বুলবুলের ডাক শোনা যায়।

এই বাগানের খিড়কি দরজা দিয়ে বার হয়েই একে-বারে জনহীন মরুভূমির মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে।

এই মরুভূমির মধ্যে কৃষ্ণকায় আরবীয়েরা সহরের কাছাকাছি অবস্থিত দু'চারটে বর্ষায় জলের কূপের চারিপাশে জুরা জাতীয় কলাই ও মুসুরীর চাষ করে কোন রকমে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

মরুভূমির আরও ভিতরের দিকে সহর থেকে দূরে যারা বাস করে, তারা সাধারণতঃ ভ্রাম্যমান বেদুইন জীবন যাপন করে, কিংবা দুর্গের জিনিসপত্র উটের পিঠে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বয়ে নিয়ে গিয়ে সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে রুটী সংগ্রহ করে।

কখন কখন দেখা যায়, উটের নাকের দড়ি ধরে নিয়ে আরব সার্থবাহদল নিজের কাজে চলেছে, এদের পোষাকের নানা জায়গায় রূপোর বাঁটওয়ালা ছোরাছুরি গোঁজা, অথচ আসলে ওরা কিন্তু অত ভীষণ প্রকৃতির নয় যতটা তাদের দেখে মনে হয়,—হয়ত অনেক সময় দেখা যায়, তারা আপন মনে গান করতে করতে চলেছে।

পূর্ব্বে আরবীয়দের নিজেদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে লড়াই মারামারি চলবার সময়ে দুর্গ থেকে সৈন্যদল উটের পিঠে ছোট ছোট কামান নিয়ে বার হত যুদ্ধবিগ্রহ দমন করতে। এডেন বন্দরে সকালে উঠে চা-পানরত অধিবাসীরা দূরে মরুভূমির মধ্যে তাদের কামানের অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেত।

এডেনের কিছুদূরে চারিদিকেই আরব দেশের মরুভূমি।

এডেনের অনাবৃত শৈলমালা থেকে দূরের ইয়েমেনের উর্ব্বর শৈল পর্য্যন্ত এই মরুভূমি বিস্তৃত। এখানকার অধিবাসীরা তামাটে রংয়ের কিন্তু দেখতে নিতান্ত কুশ্রী নয়। অনেকের মধ্যে কিছু কিছু ইথিওপীয় রক্ত মিশ্রিত আছে।

আরবীয়দের বিভিন্ন দলের সর্দ্দারদের খুব খাতির। এরা ছোট ছোট বাড়ীতে বাস করে—বাড়ীগুলি দেখতে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী মধ্যযুগীয় প্রাসাদ-দুর্গের মত।

পাহাড়ী নদীখাদের ধারে এই সব বাড়ী। নদীখাদে সাধারণতঃ একটুখানি জল ঝিরঝির করে বয়ে যায়, কিন্তু এই নদীখাদগুলি বন্যার সময় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে।

জলসেচন দ্বারা গ্রামে গ্রামে সামান্য কিছু শস্য উৎপন্ন হয়—গ্রামগুলি অত্যন্ত নোংরা, অপরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক গ্রামের আবর্জ্জনা যুগ যুগ ধরে স্তূপীকৃত হচ্ছে গ্রামপ্রান্তের কোন একটা স্থানে; সেজন্য এবং খানিকটা আর্দ্র শস্যভূমির জন্যও বটে—গ্রামগুলি অস্বাস্থ্যকর ও ম্যালেরিয়াপূর্ণ।

এই গেল সম্ভ্রান্ত ও সচ্ছল আরব-অধিবাসীদের কথা।

এ ছাড়া মরুবাসী বেদুইন আরবীয় আছে—তারা অত্যন্ত দরিদ্র, সেকালের পল্‌তে-জ্বালা বন্দুক নিয়ে ঘোরে ফেরে। এদের বাসগৃহ মাটীর বা পাথরের। যারা আরও গরীব, তাদের বাসগৃহ পাহাড়ের গুহা।

বেদুইন আরবীয়েরা হিংস্র প্রকৃতির লোক। সামান্য একটু কাদা-গোলা জলের জন্যেও পরস্পরের সঙ্গে দাঙ্গা ঝগড়া মারামারি করতে অভ্যস্ত। সুরক্ষিত আরব

এডেনের সহরতলী শেখ ওথমান।

গ্রামগুলির বাহিরে মুক্ত স্থানে এদের প্রায়ই দেখা যায় কিংবা দেখা যায়, মরুনদান্ত পাহাড়ের কোলে এরা তাঁবু ফেলে উটের দল, ছাগলের দল নিয়ে বাস করছে।

মরু-দ্বীপগুলিতে জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত আরামের। এখানে পাহাড়ী নদীর স্রোতে ভূমি উর্ব্বর, তাল খেজুরের বাগান চোখ জুড়িয়ে দেয়, ফসলও বেশ উৎপন্ন হয়। মরুদ্বীপের গ্রামের মাঝখানে প্রাসাদ-দুর্গের মত বাড়ীতে গ্রামের জমিদার বাস করেন। গ্রামের অধিবাসীদের ওপর তাঁর যথেষ্ট আধিপত্য।

সমস্ত গ্রামখানি দেখায় মধ্যযুগের কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের মত। সেই ধরণের সভ্যতা, সেই ধরণের আইনকানুন এখনও এই সব মরু-দ্বীপের মধ্যে প্রচলিত।

এ সব বাড়ীর অভ্যন্তরে কিন্তু আধুনিকতার আলো খুব প্রবেশ করে নি, কেবল এইটুকু ছাড়া যে মাটীর মেজের ওপর একখানা দামী কার্পেট বিছান দেখা যাবে। আর দেখা যাবে, একখানা 'আরব্য রজনী' কিংবা ইমেনের ইতিহাস 'তারিখ অল ইমেন'। দেওয়ালে ঠেসানো আছে অনেকগুলো রৌপ্যখচিত বন্দুক ও ছোরা।

জমিদারের বাড়ীর চারিধারে গ্রামের বস্তিগুলি। সেখানে জেব্বা-পরিহিত জমিদার বা জমিদার পুত্রকে অশ্বপৃষ্ঠে দেখা যাবে। কিংবা হয়ত দেখা যাবে, গ্রাম্য বাজারের প্রধান সওদাগরকে। তার কোমরে খানিকটা কাপড় কোমরবন্ধ ধরণে জড়ান, তাতে অনেকগুলি

তিন জন আরবীয় বন্দুকধারী।

রৌপ্যখচিত ছোরাছুরি গোজা—মাথায় একটি রঙীন রুমাল বাঁধা।

এডেনের বাইরে নির্জ্জন মরুভূমিতে মানুষের ধনপ্রাণ খুব নিরাপদ নয়—যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা, এখানেও অনেকটা তেমনি।

মধ্য-এশিয়ার বর্ব্বরতা ও বিটিশ সভ্যতা এখানে একসঙ্গে মিশেছে, কিন্তু একটি অপরের সঙ্গে খাপ খেতে পারে নি।

এডেনের সীমার বাইরে পথিককে নিজেই নিজের পুলিশম্যান হতে হয়। বিটিশ আইনের ক্ষমতা সেখানে একেবারেই নেই।

এমন কি আরব গ্রামের সীমার মধ্যেও জমিদারের বাড়ী বা তাঁর অধিকৃত জমিতে পথিক অনেকটা নিরাপদ থাকতে পারে। তবে এই জমিদারের নামে আরবী ভাষায় পরিচয়-পত্র থাকা প্রয়োজন।

আমাকে একবার চাকুরীর খাতিরে এডেন সহর থেকে দূরে মরুভূমির ওপরে পর্ব্বতমালার পাদমূলে যেতে হয়েছিল পূর্ত্ত-বিভাগের একটি কাজের তদারক করতে।

কিন্তু সেখানে আমি একা যেতে পারি নি।

আমার পথের চারিধারে মরুভূমির মধ্যে যে সব দুর্দ্দান্ত বেদুইন আরবীয় বাস করে, তাদের মধ্যে পরস্পর গৃহ-বিবাদ চলছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা ছিল সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

সুতরাং সঙ্গে নিয়েছিলাম কুড়িজন ভারতীয় অশ্বারোহী সওয়ার, তা ছাড়া নোবাব ডাকেমের শেখ আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন তাঁর তরুণ পুত্রকে।

আমাকে যেতে হয়েছিল উটের পিঠে। এক কুঁজওয়ালা, দ্রুতগামী, পাৎলা চেহারার আরবী উট। আফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ড থেকে যে উট আসে তা আরবী উটের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর শ্রেণীর জীব, সাধারণতঃ সেগুলির ব্যবহার হয় মালপত্র বহন করতে।

আরোহীকে সাবধানে ও সন্তর্পণে উটে উঠতে হয়; ভাল ভাবে পিঠে চেপে বসতে না বসতে উটটা বসা অবস্থা থেকে লাফিয়ে খাড়া হয়ে উঠে পড়ে ও দ্রুত চলতে আরম্ভ করে। তারপর আরোহীকে শুধু উটের নাকের দড়ি ধরে থাকলেই চলবে; উট ঠিক তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে।

দিন-রাত্রি সমান দ্রুতবেগে উট চলবে। আরবী সাদা উট যেমন কষ্টসহিষ্ণু, তেমনি দ্রুতগামী। সারাদিনের মধ্যে অনায়াসে একশ মাইল পথ অতিক্রম করবে। ঘোড়া যেখানে পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রাম করতে চাইবে, আরবী উট সে পথ অতিক্রম করতে কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করবে না। পা দিয়ে গলার খাঁজ চেপে দিলেই উট আরও দ্রুত চলতে থাকে। তবে উটের পিঠে, বিশেষতঃ দ্রুতগামী আরবী উটের পিঠে চড়া অভ্যাসসাপেক্ষ। মেয়েরা যেমন পাশ-জিন ব্যবহার করে ঘোড়ার পিঠে চড়বার সময়, এবং দু'খানা

পা এক দিকে রাখে, উটের পিঠে চড়ে সকলকেই পা-ড়'খানা তেমনি ভাবে একই দিকে রেখে হাঁটু দিয়ে জিনের সামনের দিকের কাঠটা চেপে ধরতে হয়।

আরবীয়েরা উটের জিনে রেকাব ব্যবহার করে না বলে অনভ্যস্ত আরোহীর অত্যন্ত অসুবিধা হয়। আরবীয়েরা মাইলের পর মাইল এই ভাবে অতিক্রম করবে, কিন্তু যাদের অভ্যাস নেই, তাদের উটের পিঠে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গেলে বমির ভাব আসবে।

এডেন থেকে কিছু দূর উটের পিঠে গেলে লাহেজের ওয়েশীস। আরব রীতি-নীতি ও আইনের একটি আদর্শ স্থান লাহেজ্।

এডেনের ৪০ মাইল দূরে নোবাৎ ডাকিমের পর্ব্বতশ্রেণী থেকে ওয়াদি টিবান নামে স্রোতোবিনা নদী বার হয়েছে। কখনও নদীখাতের উপলরাশির উপর দিয়ে ক্ষীণস্রোতা ওয়াদি টিবান ঝির ঝির করে বয়, কখনও পূর্ণবাহিনী নদী-রূপে পাহাড় কেটে বার হয়ে কুড়ি মাইল পর্যন্ত মরুভূমির বুকের উপর বয়ে চলে।

তার পর নদীটা এক জায়গায় গিয়ে হঠাৎ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গিয়েছে—একটি শাখার নাম ওয়াদি কবির, অপরটির নাম ওয়াদি আস্ সাগির (ছোট ও বড় নদী)।

এই দুই শাখার সংযোগ-স্থলে যে উর্ব্বর ব-দ্বীপ, লাহে-জের ওয়েশিস্ সেখানে অবস্থিত। দুই নদী থেকে আর-বীয়েরা সুকৌশলে অনেকগুল খাল কেটে অনেকটা জায়গাকে উর্ব্বর করে রেখেছে। যেন একটি ছোটখাটো ইজিপ্ট।

লাহেজের সুলতান বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র। ১৯১১ সালে তিনি আরবীয় অনুচরবর্গ সঙ্গে নিয়ে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দিল্লী-দরবারে যোগ দিতে গিয়েছিলেন।

লাহেজ ছাড়িয়ে কুড়ি মাইল বিস্তৃত ভীষণ মরুভূমি একেবারে দূরের পাহাড়শ্রেণীর পাদমূল স্পর্শ করেছে। এ মরুভূমিতে যাতায়াত পথিকের পক্ষে নিরাপদ নয়—যে-কোনও সময়ে বেদুইন গুপ্ত দস্যুদের গুলিতে প্রাণ হারাবার সম্ভাবনা বিদ্যমান।

ওয়াদি টিবান নদীর উজানে উটের যাতায়াতের পথের ধারে আমি একবার কয়েকটি ভারবাহী উটের কঙ্কাল দেখেছিলাম—পথ থেকে ৫০ গজ দূরে প্রস্তর-স্তূপের আড়াল থেকে তাদের গুলি করে মারা হয়েছে।

নোবাৎ ডাকিমের জলহীন উষর খাল বেয়ে আরও ভেতরের দিকে গেলে বৃহৎ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদমূলে পৌছান যায়—এই পর্ব্বতমালা কোথাও কোথাও প্রায় ৮০০০ হাজার ফুট উঁচু এবং সমৃদ্ধিশালী সানা-আ প্রদেশের বহিঃ-প্রাচীর স্বরূপ।

সানা-আ প্রদেশে তুর্কী ও আরবীয়েরা ৫০ বছর ধরে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল—কখনও থামত কিছু-দিনের জন্য, আবার ওদের শত্রুতা ও মারামারি হত।

পৌরাণিক রাণী শেবা যখন নৃপতি সলোমনের সঙ্গে দেখা করতে যান, তখন এই ইমেন থেকেই তাঁর যাত্রা সুরু হয়—এই রকম প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইমেন তখন হাবসী উপনিবেশ ছিল।

লাহেজের পিছনের মরুভূমিতে ভীমবেগে বালুর ঝড় প্রবাহিত হয়—তখন দূরের পর্ব্বতমালা বালিতে ঝাপ্সা হয়ে যায় এবং কখনও কখনও একটা বালির প্রাচীর ঘুরে ঘুরে উড়তে উড়তে এডেন বন্দরের বাড়ীঘরে তাল ঠোকে—তখন এডেন সহরের নিরীহ অধিবাসীদের বাংলো-গুলো ধুলোবালিতে ভর্ত্তি হয়ে যায়, ঘরের মেঝেতে ও প্রত্যেক জিনিসে বেশ পুরু একটা বালির স্তর পড়ে যায়।

আরবীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, এডেনে ঘর ঝাঁট দিয়ে ঘরের আবর্জ্জনা বাহিরে ফেলে দাও, ঝড় এসে তখুনি যত আবর্জ্জনা আবার তোমার ঘরের মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে।

এডেনে প্রবাসীদের জীবন দুর্ব্বিষহ এই সব কারণে; মরুঝটিকা ত আছেই, তা' ছাড়া আছে ছোট-খাট বালুর ঘূর্ণী হাওয়া—চমৎকার, পরিষ্কার, নিবাত-নিষ্কম্প দিনেও এদের দেখা মেলে। শীতকালে ছায়ায় তাপযন্ত্রে নামে ৭৫ থেকে ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট্, গরমে ওঠে ৯৫° থেকে ১০০°।

অধিকাংশ প্রবাসীই দিন গুণতে থাকে, কবে এডেন থেকে যাওয়ার সময় উপস্থিত হবে; কিন্তু যাওয়া সব সময় ঘটে না, চাকুরী বা ব্যবসার খাতিরে থাকতেই হয়।

এখানকার যৎকিঞ্চিৎ যা সামাজিক জীবন—দুর্গ-রক্ষক ব্রিটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদের চেষ্টাতেই বজায় আছে। এরা না থাকলে এডেন বর্ব্বর সভ্যতার কোলে আবার ফিরে যাবে।

সূর্য্যাস্তের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে কতদিন কল্পনা করেছি, ছুটি পেলেই সোমালিল্যাণ্ডের উপকূলে যে ষ্টীমার-খানা মাল ও ডাক বহন করে নিয়ে যায়, ওই জাহাজে উঠে বেড়াতে যাব এডেন ছেড়ে। কল্পনা করেছি, ষ্টীমার ছেড়ে চলেছে, আমরা ডেকে বেড়াচ্ছি, সোমালি মাল্লারা ডেকের উপর সারবন্দী হয়ে নমাজ করতে বসেছে···

···তারপর সূর্য্য ডুবে যাবে, ফরাসী ও ব্রিটিশ কামানবাহী জাহাজ থেকে দু তিনটি রাইফেলের আওয়াজ শোনা যাবে—সূর্য্যাস্তের সময় 'রোল-কল্'-এর সময় জানিয়ে দিয়ে।

আমরা তখন বাইরের সমস্ত চিন্তা থেকে বিরত হয়ে মনকে জাহাজের দৃশ্যাবলীর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করব। কত বিভিন্ন রকমের মালের গন্ধ—চাল, খেজুর, কফি, বস্ত্র ত' আছেই; এ বাদে আছে ঘোড়া, আরবী উট, গো-চর্ম্ম, ঘৃত, ভেড়া ইত্যাদি।

অনেক সময় ভেড়ার দল এমন শক্ত করে বাঁধা থাকে যে, তাদের পিঠের ওপর দিয়ে হেঁটে ডেক থেকে সেলুনে যাতায়াত করা চলে···

হঠাৎ এ স্বপ্ন ভেঙে যায়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সন্ধ্যার শীতল বাতাস বইছে, এডেন বন্দরের গরম কেটে গিয়েছে। এডেনের প্রধান রাস্তায় এ সময় জনসমাগম একটু বেশী; লোকে দোকান বা অফিস থেকে বাড়ী ফিরছে। তাদের মধ্যে আছে আরবী মাল্লা, কয়লার কাজ থেকে ফিরছে কুলীর দল, তাদের গা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়লার গুঁড়োতে কাল।

আর আছে দীর্ঘাকৃতি, একহারা কৃষ্ণকায় সোমালি; এরা ধপধপে সাদা পোষাক পরে হাসিগল্প করতে করতে চলেছে। শ্রমসাধ্য কুলীর কাজ এরা সাধারণতঃ পছন্দ করে না, নিজেদের একটু স্বতন্ত্র রেখে গর্ব্বিত চালে চলাফেরা করে।

কোঁকড়ান চুলওয়ালা আরবী ইহুদীরা চলেছে অষ্ট্রিচের পালক-ভর্ত্তি ময়লা থলে পিঠে ফেলে বড় বড় জাহাজের আরোহীদের কাছে। অষ্ট্রিচের পালক বিক্রি করে এরা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ইউরোপীয় ট্রাউজার ও আলপাকার কোট পরণে পার্শীদেরও দেখা যাবে; এরা সহরের লোক, বোম্বায়ের বড় বড় সওদাগরী আপিস থেকে এসেছে।

কখন কখন দেখা যাবে, দু'জন আরবীয় চলেছে, দুজনে হয়ত পিতা এবং পুত্র, ঈসপের গল্পের ছবির মত একটা রুগ্ন গাধাকে হয় ত দুজনে কম্বলে বেঁধে কাঁধে করে যাচ্ছে।

ওদের পথে পড়বে, একদল ভারবাহী উট। প্রত্যেক উটের পিঠে একজন আরবী সওয়ার, হয়ত তারা উটের পিঠে শুয়েই গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কেবল সামনের উটটির চালক জেগে বসে আছে এবং রাস্তার লোকজনকে অনবরত পথ থেকে সরে একপাশ হতে বলছে।

কখন কখন মরুভূমির বেদুইন আরবীয়েরা এডেন বন্দরে বেড়িয়ে সহর দেখতে আসে। ওদের হাতে লম্বা লম্বা সেকেলে বন্দুক, এখন যেগুলি মিউজিয়মে রক্ষিত জিনিসের মত দেখায়। সহরে ঢুকবার পূর্ব্বে সেগুলি পুলিশের জিম্মায় রেখে আসাই নিয়ম।

বন্দুক যতই সেকেলে হোক, ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে জেদী ইমামের আক্রমণের সময় এই বন্দুকই ওদের বিশ্বস্ত অনুচরের কাজ করেছিল।

হয়ত একজন ব্রিটিশ সার্জ্জেন্ট সাইকেল চড়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে যাবে। কিংবা তিনজন করে ইংরেজ সৈন্য একত্র সদর্পে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে। তাদের সঙ্গে তাদের পোষা টেরিয়ার; কিপলিং-এর লেখার মধ্যে এদের যে ছবি অমর হয়ে আছে চিরদিনের জন্য।

আগ্নেয়গিরির অগ্নিকটাহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে মা-আলা রোড্, এই সময় তা ভিড়ে ভরে গিয়েছে, দিনের কাজ সেরে সবাই সহর থেকে ফিরছে আর পরস্পরের দৈনন্দিন কোন বিষয়কে অবলম্বন করে কথাবার্ত্তা বলছে।

রাস্তার অনেক ওপরে পাহাড়ের গায়ে প্রায় হাজার ফুট ওপরে একটা ক্ষুদ্র গুহার মুখ। প্রবাদ এই যে, এই গুহাতে বাইবেলোক্ত আবেলের সমাধি। কেউ কেউ বলে আরনের সমাধি। রাত্রে এই গুহার মুখে একটা আলো জেলে রাখা হয়।

অন্ধকার রাত্রে কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতের পটভূমিতে আলোটি জ্বলে ঠিক যেন একটি নক্ষত্র। দিন যদি পরিষ্কার থাকে, তবে একুশ মাইল দূরবর্ত্তী লাহেজের সুলতানের সাদা বাড়ী বন্দর থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

ঘর ও সংসার

—শ্রীবিনয় চৌধুরী

উত্তর-পোতার পৈতৃক সাতচালার পোড়ো ভিটাটা বৃষ্টির ধোয়াটে প্রায় সমতল হইয়া আসিয়াছিল, নেড়া এ বছর বেড়া দিরিয়া সেখানে পালং শাকের ক্ষেত করিয়াছে। সতেজ লকলকে শীষওয়ালা লোভনীয় চারাগুলি। কাদের একটা বাছুর বেড়ার ফাঁকে মুখ লাগাইতে গিয়া আঁচড় লাগিতে ফিরিয়া গেল।

কৈলাশ এতক্ষণ মজা দেখিতেছিল: 'কেমন বাছাধন, খাও পালংশাক—'

অগ্রহায়ণের বৈকাল। নেড়ার ঘরের দীর্ঘ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে উঠানে। জ্বরে ও বিজ্বরে নির্জীব কৈলাস উঠিয়াছিল ডাক্তারখানায় যাইবে বলিয়া। তার নিজের হাতটা একবার দেখাইয়া আসিবে আর কোলের মেয়েটার জন্যও একটু ঔষধ আনিবে, বড় ভুগিতেছে মেয়েটা। তবু যাই যাই করিয়াও ঘরখানার আশেপাশে ঘুরিতেছিল।

পটেশ্বরী কাছাকাছি না থাকিলে ঘরখানার চারিদিকে কৈলাস এমনি পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়। বড় পছন্দসই হইয়াছে ঘরখানা। চালের মটকা হইতে ভিত পর্য্যন্ত বারবার কৈলাশ মুগ্ধ সপ্রশংস দৃষ্টি বুলাইয়া লয়। কোথায় একটা গোলপাতা চালের বাঁধন খুলিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কোথায় একটা কুটা পড়িয়াছে দাওয়ায়, অতি সতর্ক দৃষ্টি কৈলাশের সর্ব্বদা সেদিকে। পা দিয়া মাড়াইয়া মাড়াইয়া ছাঁচতলার খোলামকুচিগুলি ভাঙ্গিয়া বিছাইয়া দেয় সযত্নে। চট করিয়া এপাশ-ওপাশ চাহিয়া দরজার তালাটা বার দুই টানিয়া দেখে, জানালার ফাঁক দিয়া একবার অকারণে উঁকি মারে ঘরের ভিতর।

পটেশ্বরী আসিয়া বলিল, "আনাচে কানাচে না ঘুরে একটু ওষুধ আনলে হ'ত না খুকীর জন্যে? মরে যাবে মেয়েটা বিনা চিকিচ্ছেয়?"

ধরা পড়িয়া গিয়া অপ্রস্তুত কৈলাশ রাগিয়া যায়।

"হচ্ছে, হচ্ছে, ভারি আত্তি।"

"হচ্ছে হচ্ছে কি? এরপর সন্ধ্যে হয়ে গেলে আর নড়বে না কি এক পা?"

পটেশ্বরীর কথার সুরে কর্ত্তৃত্বের আমেজ পাওয়া যায় আজকাল, কৈলাশকে ডিঙাইবার চেষ্টা ফুটিয়া ওঠে। চিরকালের জুলুম-করা স্বভাব কৈলাশের, এ বয়সে আর বদলাইবার নয়, তাই আধুনিক কালে পদে পদে আহত হয়। সাবালক ছেলের কথা অবশ্য ধর্ত্তব্য নয়, কৈলাশ ভাবিয়া পায় না, ভীরু স্বভাব পটেশ্বরীর এ সাহসের উৎস কোথায়! ক্ষুব্ধ কৈলাশ রাগিয়া চেঁচামেচি করে, পুরাতন বিক্রম প্রকাশ করিতে যায়, কিন্তু জোর পায় না, কোথায় সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। "পয়সা লাগবে না, কড়ি লাগবে না, গিয়ে নিয়ে আসবে। তাতেও তোমার আপত্তি। বাপ হইছিলে কেন তবে?"

"অন্যায় হয়েছে আমার। তোমাকে বিয়ে করাই আমার ঘাট হয়েছে। জ্বলে পুড়ে মলাম একেবারে। এই শীতে ঐ আলগা ঘরে থাকলে কচি মেয়ের ত' হবেই বাতশ্লেষ্ম।"

"তবু তুমি দুপা গিয়ে ওষুধ এনে দেবে না।"

"স্বর্গে বাতি দেবে ঐ মেয়ে। আমি যে মরছি নিজের জ্বালায়, সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই।"

"কেন, কি হয়েছে কি তোমার? পুরনো জ্বরে আর লোকে এইটুকু পথ হাঁটতে পারে না?"

কৈলাশ চুপ করিয়া রহিল, অল্পক্ষণ পরে হঠাৎ হাত-পা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "পারবে না কেন, খুব পারে। তারপর দুর্ব্বল শরীরে পথে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ি, ইট-পাটকেলে লেগে অপঘাতে মৃত্যু হোক্, শেয়াল-কুকুর টেনে ছিঁড়ে খাক, এই ত তুমি চাও, হবেও আমার তাই।"

"ঢঙ দেখলে গা জ্বলে যায়। যা খুসী হয় করগে"—পটেশ্বরী অন্যত্র চলিয়া গেল।

"অত তেজ থাকবে না চিরকাল! এই ছেলে যদি চোখের জলে নাকের জলে না করে ত' আমি বামুনের ছেলে না।"

বকিতে বকিতে কৈলাশ চলিয়া গেল এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করিয়া ঔষধ লইয়া ফিরিল। উদ্দেশে পটেশ্বরীকে খাওয়াইবার নির্দ্দেশ জানাইয়া দিয়া দাওয়ায় গিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের রাত্রি। গাছ-পালার ঘন অন্ধকারে এখানে ওখানে জোনাকী জ্বলিয়া উঠে; ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুড়া মানুষের হাড় পর্য্যন্ত জমিয়া আসে। বাগানের ওপারে দত্তদের কোঠাবাড়ীর বন্ধ জানালার ফাঁক দিয়া আলোর রশ্মি আসিয়া কিছু দূরে অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে।

হুঁকায় শেষ টান দিয়া কৈলাশ বলিল, "বিছানাটা করে দাও দেখিনি, শুয়ে পড়ি, কিছু খাব না আর আজ রাতে।" তারপর বিছানা পাতা হইলে গিয়া কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল।

ঔষধ খাইয়াও কিন্তু সে রাত্রে খুকীর সর্দ্দি কমিল না। জন্মাবধি রুগ্ন মেয়েটা, একটা না একটা রোগ লাগিয়াই আছে। সন্ধ্যার পর আবার জ্বর আসিয়াছে। জ্বরের তাপে গা দিয়া আগুন ছুটিতেছে। গরম তেল মালিশ করিল, বার বার সেঁক দিল পটেশ্বরী খুকীর বুকে পিঠে, একখানা কাপড় ভাঁজ করিয়া খুকীর সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জড়াইয়া দিল, আরও কি করিল, তবু খুকীর গলার ঘড়ঘড়ি কমিল না, নিঃশ্বাস ফেলিতে পারে না খুকী, থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠে। পটেশ্বরী মেয়ে কোলে করিয়া ঘরের মধ্যে কেরোসিনের আলোয় জাগিয়া বসিয়া রহিল।

যত রাত বাড়িতেছে, শীতও ততই চাপিয়া পড়িতেছে। চাঁচাড়ির দেয়ালের লেপিয়া-দেওয়া মাটি ইঁদুরে কাটিয়া দিয়াছে, রৌদ্র-বৃষ্টিতে চালের খড় পচিয়া ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে। আকাশ হইতে বারিধারার মত শীত যেন গলিয়া বর্ষিত হইতেছে, তেমনি পাতাল ফুঁড়িয়া হাড় কাঁপাইয়া ঠাণ্ডা উঠিতেছে ঘরের মেঝে দিয়া। দেয়ালে যেখানে যত ফাঁক দেখিয়া, পটেশ্বরী কাগজ ও ন্যাকড়া গুঁজিয়া দিল, যাহা কিছু ছিল, সব আনিয়া বিছানায় পাতিল—রাতটা ভালয় ভালয় কাটিলে পটেশ্বরী বাঁচে।

অভ্যস্ত হইয়া গেলে মানুষের অনুভূতি ভোঁতা হইয়া যায়, এমনি বিপদের দিন নহিলে পারিপার্শ্বিকের তীব্রতা সম্বন্ধে মানুষের চৈতন্য হয় না।

কৈলাসও জাগিয়া ছিল, এক সময় উঠিয়া বসিয়া বলিল "ও-ঘরে চল—"

পটেশ্বরী কথা কহিল না।

"আমি বলছি তুমি চল দিকিনি, তারপরে দেখে নেব কি করতে পারে সে হারামজাদা এসে···"

"না থাকত যদি ও ঘরটা কি করতে?"

ইচ্ছা থাকিলেও পটেশ্বরী যাইতে পারে না ও-ঘরে। এই সেদিন—দুপুরে নেড়া সাঙ্গপাঙ্গ লইয়া নতুন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তাস খেলিতেছিল। খুকীকে কোলে করিয়া পটেশ্বরী কাছে দাঁড়াইয়া খেলা দেখিতেছিল। এ-কথা সে-কথার পর পটেশ্বরী এক সময় হাসিয়া বলিয়াছিল —"খোকার বাবার দ্বারায় ত' হল না, এইবার—খোকার কল্যাণে তবু নতুন ঘরে শোওয়া যাবে—"

নেড়া ছাড়া আর সকলেই পটেশ্বরীর মুখের দিকে চাহিয়া ছিল।

"কি বলিস খোকা?"

"তা আর নয়"—নেড়া জবাব দিয়াছিল—"তোমরা আমার শত্রুতা করে বেড়াবে আর -"

"ও মা, শত্তুরতাই করতে গেলাম আবার কিসে? বাপমায় কি ছেলের শত্তুরতাই করে না কি?"

"সব বাপমায় করে না, তোমরা কর! অতগুলো টাকা যে রেখে গেলাম—তোমার কাছে, কি হল সেগুলো?"

"উনি বললেন—"

"তবে আর ঘরের দরকার কি?"

তারপর বন্ধুদের উদ্দেশ করিয়া নেড়া বলিল, "বলি নি কাউকে তাই—আমাদের বাবুকে গিয়ে কবে উনি একদিন বলে এসেছিলেন—আমার অল্প বয়স, কাঁচা পয়সা নিয়ে নাড়া-চাড়া করি—একটু যেন নজর রাখেন আমার উপর, শুনলে? নিজের বাপ গিয়ে এই সব বলে এলে কেউ রাখতে চায় লোক? কেবল···"

"তা উনি পারেন," পটেশ্বরী ছেলের মন রাখিতে বলিয়াছিল, "কিন্তু তোর বাবুও ত' বানিয়ে বলতে পারে?"

"হাঁ, আমি যে তার ইয়ার, বানিয়ে বানিয়ে আমাকে নইলে আর বলবে কাকে? যেখানে খুশী তোমরা থাক গে, এ ঘরের নাম কর না মোটে আমার কাছে···"

ছেলের উপর অভিমান পটেশ্বরীর, স্বামীর উপর রাগে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কৈলাশ বলিল, "আহাম্মুক তাই, বুঝলে না, তার ভালর জন্যেই বলেছিলাম।"

"বেশ ত', তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও, আমি যাব না।"

"হুঁ, আমার জন্যেই যেন যত ভাবনা।"

"না, ভাবনা সব আমার জন্যেই! ও-ঘরে যাই, তারপর গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে যাচ্ছেতাই বলুক, গাঁ শুদ্ধ লোককে ডেকে এনে! তোমার মত সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চামড়া নেই—"

"মানিনী রাধে একেবারে।"

সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পটেশ্বরী বলিয়া চলিল, "না হয় আজ গেলাম, কিন্তু আজ বাদে কাল যখন সে বউ নিয়ে আসবে, তখন ত' বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে দিতে হবে! তখন কোথায় যাবে?"

"বলিনি তখন পঁচিশ বার যে এখন বিয়ে দিও না ছেলের। সাত সকালে এক বিয়ে দিয়ে—"

"তা যাই বল, বিয়ে যখন তার হয়েছে, ঘর ত' তার চাই একটা? শোয়ার জায়গা পায় না বলে বউ আনতে পারে না।"

"বউ না আনলে আর চলছে না, না?"

"না, ন্যাকা, কিছু বোঝে না! নিজের দিক্‌টা একবার ভাব না? ফেলে যে বাড়ী ছেড়ে থাকতেই পারলে না কোনদিন?"

"সে কথা উঠছে কেন?"

"ওঠে সাধে।" খুকীর পাশে শুইয়া প'ড়িল পটেশ্বরী, শরীরের উষ্ণতা দিয়ে খুকীর শীত নিবারণের প্রয়াস তার। লোভ হয়। ও ঘরে গেলে রোগ কিছু সারিয়া যাইবে না এক মুহূর্ত্তে, তবু আঁটা-সাঁটা খটখটে, নতুন ঘর, নেড়ার প্রচুর লেপ-তোষক—একটু স্বস্তি পাইবে খুকী।

কতক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া কৈলাশ বলিল, "থাকতেও কষ্ট ভোগ করবে? সাধে কি আর বলে দশ হা'ত কাপড়েও কাছা আঁটে না মেয়ে মানষের!···কি, যাবে?"

"যাবে, যাবে ত' করছ, ঘরে তালা দিয়ে গেছে তা জান?"

"তাতেই আর কি, হুঁ—"

উঠিয়া চালের বাতা হইতে কৈলাশ একটা লোহার শিক বাহির করিয়া পটেশ্বরীকে দেখাইল।

কিছুক্ষণ সময় লাগিল ও ঘরে গিয়া সমস্ত গুছাইয়া লইতে। কৈলাশ এক কলিকা তামাক সাজিয়া বলিল—"গ্রাহ্যি করতে চাও না আজকাল আমার কথা। তোমার আমার জন্যে ত নয়, মেয়েটার কথা ত' ভাবতে হয়—শোন না বলি, ভাল বই মন্দ হবে না তাতে···"

হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে পটেশ্বরী জবাব দিল, "থাক্, ঢের হয়েছে, রাত দুপুরে আর বক্তিমেয় কাজ নেই—"

বাড়ী আসিয়া পরের বাড়ী গিয়া শুইতে ইদানীং নেড়া বড় লজ্জা পাইত। ঘর বাঁধিতে তাই প্রথমে কৈলাশ, তারপর পটেশ্বরীর কাছে কিছু কিছু করিয়া টাকা জমাইতেছিল, টানাটানির সংসারে দু' দুবারই কৈলাশ সেগুলা খরচ করিয়া ফেলে। বিবাহের পর এবার নিজে তদারক করিয়া নেড়া ঘর বাঁধিয়াছে। কৈলাশ বলিয়াছিল, সামনে যেমন হইতেছে হোক, দু'পাশেও অমনি দু'খানা চাল তোলা দরকার, ঘিরিয়া দিলে চমৎকার দুটা কামরা হইবে। একটাতে—

কথাটা শেষ করিতে দিল না নেড়া। ব্রাহ্মণের ঘরের মূর্খ, দু'পয়সা হাতে প'ড়িতেছে, একহাট লোকের সামনে কৈলাশকে, তার নিজের জন্মদাতা বাপকে অপমান করিয়া বসিল। কি ভ্যানর ভ্যানর করে কৈলাস, মোড়লী করিতে কে ডাকিয়াছে তাকে, বিদেশে থাকিয়া নেড়া পয়সা রোজগার করে, ভালমন্দ বোধ তার যথেষ্ট আছে।

থাকিলেই ভাল।—আহত, ক্রুদ্ধ কৈলাস দু'একটা শক্ত কথা বলিয়াছিল। বংশের কুলাঙ্গার অমন ছেলে বাপের কুপুত্র, থাকিলেই বা কি, গেলেই বা কি। ছেলেমেয়ের হাত ধরিয়া কৈলাশ গাছতলায় গিয়া দাঁড়াইবে, তবু ঐ পিশাচ পুত্রের বাঁধা ঘরে পদার্পণ করিবে না—

নেড়া জবাব দিয়াছিল, "দেখা যাবে···"

ঘর তৈরী হইল, বাসযোগ্য হইল, বাড়ী হইতে যাইবার সময় নেড়া ঘরে চাবি দিয়া গেল। এ কথা গ্রাম হইতে

গ্রামান্তরে সকলে শুনিল। কতদিন কাটিল, কৈলাশ ও ঘরের ছায়া মাড়াইল না।

সংসারে ঘর বাঁধিবার সাধ সর্ব্বজনীন; কারও পূর্ণ হয়, অধিকাংশেরই হয় না, অপরের বাঁধা ঘরের পিছনে সুদূর আশায় লুব্ধ চিত্ত ঘুরিয়া মরে। কঠিন আঘাতে প্রত্যাহত হয়, কিন্তু মায়া কাটে না।

দাওয়ায় খুঁটিতে বোধ হয় গরু বাঁধা ছিল, দড়ির টানা-টানিতে দাওয়ার মাটি ধ্বসিয়া গিয়াছে। সকালে উঠিয়া ব্যাপার দেখিয়া কৈলাশের বুকের ভিতরটা হায় হায় করিয়া উঠিল।

"দেখলে একবার কাণ্ডটা, আক্কেল বিবেচনাটা দেখলে একবার এ বাড়ীর লোকের। জ্যান্ত দাওয়াটা গোল্লায় দিয়ে রেখেছে।"

পটেশ্বরী পুরানো ঘরের দেওয়ালে গোবর লেপিতেছিল, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "দরদ যে উথলে উঠছে, তবু যদি ছেলে থাকতে দিত ঘরে।"

এক একদিন মেজাজ ভারি প্রসন্ন থাকে কৈলাশের, কিছু-তেই রাগে না। বলিল, "না দিক, তবু আমাদের কর্ত্তব্য ত' আমাদের কাছে, কু-পুত্র হয়েছে বলে কু-পিতা হতে হবে না কি?"

"না তাই বলছি—"

"বড় বলনেওলা এয়েছেন!" তার পর বলিল, "মাটি দিয়ে লেপে ঠিক করে দিও জায়গাটা।"

অবশ্যই কাজটা করিবে পটেশ্বরী, তবু কৈলাশকে দু'কথা শুনাইবার সুযোগ ছাড়িবে কেন? বলিল—"বয়ে গেছে আমার, আমি পারব না।"

"আলবাৎ পারবে—"

"বেশ, পারাও দেখি—"

"না পার, আমার কি? আমার বলার কথা, বলে রাখলাম—"

অন্ধকার ঘরের মধ্যে টানে টানে কৈলাশের কল্কিকার আগুন জ্বলিয়া ওঠে।

দিন আষ্টেক পরে। সকাল বেলা। পটেশ্বরী বড়ি দিবার জন্য ডাল বাটিতেছিল রান্নাঘরে। ও ঘরের দাওয়ায় খুকী শুইয়া তার সাত আট বছরের দিদির হেপাজতে। এ কয়দিনে খুকীর রোগ সারিয়া গিয়াছে। কৈলাশ পাড়া বেড়াইয়া আসিয়া উঠানে রৌদ্রে পিঠ করিয়া বসিল।

নেড়া ইতিমধ্যে আর বাড়ী আসে নাই, লোক মারফৎ কয়টা টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিল সংসার খরচ বাবদ। দুদিন আগে নেড়ার শ্বশুর আসিয়াছিল, এই পথে কোথায় যেন যাইতেছিল। বেহাই-বেহানের সাথে অমনি একবার দেখা করিয়া গেল। বেহানের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দিন দুই থাকিয়া আজ সকালে চলিয়া গিয়াছে।

রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া কৈলাশ উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করিল, "আর আছে না কি? সে দিন যে আনা হল? শুনছ?"

"না, কেন?"

"থাকবে কি করে? তিন বেলা অত লুচি মোহনভোগ করতে লাগলে আর কিছু থাকে?"

"তার মানে? যার জন্যে এল, তাকে বঞ্চিত করে পুঁজি করে রেখে দেব?"

"উলটা বোঝ কেন? তাই কি বললাম? তবে বাড়ীর লোকের জন্যেও ত' ছিটে ফোঁটা রাখতে হয়।"

"কেন দেওয়া ত' হয়েছিল তোমাকেও, না খাও যদি কার দোষ! জিনিষ ত ভারি, তার আবার সঞ্চয়!"

নিজেদের দুঃখকষ্ট ত চিরকাল আছেই, তাছাড়া নিত্য কিছু আসিবে না বেহাই। নেড়ার টাকাটাও ঠিক সময়ে হাতে পড়িয়াছিল। পটেশ্বরী কুটুমের আদর-আপ্যায়ন যথাসাধ্য করিয়াছিল। কৈলাশের চোখে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি ঠেকি-য়াছে। পটেশ্বরীকে শিক্ষা দিতে আমলেই আনে নাই সে লোকটাকে, ভাল করিয়া দুটা কথা পর্য্যন্ত বলে নাই। মাতু ঠাকুরের তামাকের আড্ডায় গিয়া বলিয়াছে, "দেখগে ওবাড়ী কি এলাহি কাণ্ড চলেছে। একটা গায়ের চাদর চাচ্ছি সেই আশ্বিন মাস থেকে, একটা পয়সা গলল না হাত দিয়ে, আর বেহাই-এর খাতিরে বহরটা একবার গিয়ে দেখে এস তোমরা।" এবং যতদিন রহিল ভদ্রলোক, কৈলাশ বাহিরে বাহিরে কাটাইয়াছে।

"জানি ত' আমার বেলা থাকে না কিছু সংসারে।"

"জ্বালা জ্বালা হয়েছে আমার। বলি, কুটুম্ব-সাক্ষেতের আদর-যত্ন করলে তোমার অত বাজে কেন? ছেলের পয়সায়

তার শ্বশুরকে থাইয়েছি, তুমিও এনে দাও না জিনিষপত্তর, কত রকম তোমাকে খাওয়াব'খন।"

কথা শোন একবার। বুড়া বয়সে কবে আছে, কবে নাই, কোথায় এটা সেটা পাঁচরকম করিয়া খাওয়াইবে কৈলাশকে, তা নয় উলটিয়া খোঁচা দিতে বৃহস্পতি! বলিহারি আক্কেল। কিন্তু ভুল করিয়াছে কৈলাশ, বিবাহ করিয়া মস্ত ভুল করিয়াছে জীবনে। তখন সে নায়েব ছিল সোনাবেড়ের কাছারির। মাসে অমন দুশ একশ কোন্ না সে উপায় করিয়াছে। বুঝিয়া চলিতে পারিত যদি, আজ তার ভাবনাটা ছিল কি? পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া বুড়া বয়সে অক্লেশে খাইতে পারিত না সে খুসীমত দুধটা ঘিটা?

কৈলাশ উঠিয়া গায়ের প্রাচীন ধূলিধূসর কোটটা খুলিয়া বেড়ার গায়ে রৌদ্রে মেলিয়া দিল। একটা পকেট ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যথাস্থানে লাগাইয়া মমতাপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কৈলাশ দুহাতের তালু দিয়া সেটা পাট করিতে লাগিল।

সব পণ্ডশ্রম হইয়াছে, এতকাল সে যে এত করিল সংসারের, সমস্তই ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে। নিজের স্ত্রী পর্য্যন্ত আজ আর মুখের দিকে তাকায় না, হায় রে বরাত, হায় রে সংসার!

পটেশ্বরী বলিল, "এত বকতেও পার, বাবা রে বাবা!"

কৈলাশ গায়ে মাখিল না কথাটা। সর্ব্বস্ব খুচাইয়া ফতুর হইয়াছে সে আজ, নইলে অমন সাতখানা ঘর সে তখনকার দিনে—

"কেবল ত' শুনেই আসছি চিরকাল"—ডালের গামলা লইয়া বাহিরে আসিয়া পটেশ্বরী বলিল, "মুখ না থাকলে সত্যপীর হয়ে যেতে।"

"থাম, থাম।"

"কেন, থামব কেন? ক্ষমতা ত' কত? কেবল ঐ এক কর্ম্মেই দড়।"

"চোপ রাও। নাই দিলে মাথায় ওঠ একেবারে।"

ছুটিয়া পটেশ্বরী খানিকটা তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেন মারবে না কি? এস না দেখি? আমার হাতেও এই আছে," বলিয়া ডালমাখা হাতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া দেখাইল। তারপর কৈলাশকে হেঁট মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল, "যত চোট্‌পাট আমার উপর, আসবে ত' সে শীগগির বাড়ী। তালা ভাঙ্গার মজাটা দেখো।"

"হাঁ হাঁ দেখব", অগ্নিদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিল, "হাতে মাথাটা কেটে নেবে তোমার ছেলে এসে। বেয়াদব মেয়েমানুষ কোথাকার।"

দিন দুই তিন কাটিয়াছে, বৈকালে নতুন ঘরের দাওয়ায় বসিয়া পটেশ্বরী কাঁথা সেলাই করিতেছিল। কোলের কাছে শুইয়া খুকী হাত-পা নাড়িয়া খেলা করিতেছিল। সেলাই করার ফাঁকে ফাঁকে একবার মুখ তুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, অর্থহীন কত কি বলিয়া খুকীর খেলায় যোগ দিতেছে। কখনও বা ঝুঁকিয়া পড়িয়া খুকীর দন্তহীন মুখে মুখ দিয়া আদর করে, খুকী না কি চমৎকার আদর খায়।

নেড়া চিঠি দিয়াছে, আজ সে বাড়ী আসিতে পারে। আসিলে বউমাকেও সঙ্গে লইয়া আসিবে। পটেশ্বরী তাদের জন্য দুপুরে ভাত-তরকারী রাঁধিয়া নষ্ট করিয়াছে, তারা আসিয়া পৌঁছায় নাই।

কৈলাশ বাড়ী নাই। কলিকাতায় গিয়াছে। সকালে উঠিয়া যথারীতি পাড়ায় বাহির হইয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া জানাইল, এক্ষণই ভাত চাই, তাকে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কলিকাতায় যাইতে হইবে, গাঙ্গুলীদের চপলা ঠাকুরণকে পৌঁছিয়া দিতে। সেখানে বাগবাজারের বাড়ীতে তাদের বড় ছেলের বিবাহ। ঘাটে নৌকা লাগান রহিয়াছে, এখনই রওনা হইবে। নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে ব্রাহ্মণের মেয়ে।

পটেশ্বরী শুনিয়া বলিল, "তোমাকে ধরে পড়েছে তার মানে? তবে যে শুনলাম, ভট্‌চাযি্য-বাড়ীর বঙ্কে নিয়ে যাবে?

"হাঁ, তোমাকে বলে গেছে কানে কানে। বলছি পীড়াপীড়ি করলে বামুনের মেয়ে।"

"পীড়াপীড়ি করছে না হাতী। লোকের ত' তাদের ভারি অভাব। তুমিই গিয়ে নিমন্তন্ন খাবার লোভে—"

"বেশ করেছি, কি করবে তুমি?" রুখিয়া কৈলাশ বলিল, "ভাত দিতে পারবে কি না বল।"

"বলছি না কি পারব না ?"

কৈলাশ খাইতে বসিলে পটেশ্বরী বলিল, "মেয়েমানষের ঘাড়ে সব ঝুক্কি না চাপিয়ে নেড়া এলেই যেখানে খুসী গেলে যেন ভাল হত।"

গরম ভাতের দলা গালে পুরিয়াছিল কৈলাশ, রাগে রাগে বলিতে গেল, "রেখে দাও তোমার ঝুক্কি।"

কিন্তু বিষম খাইয়া কাসিয়া ভাত ছড়াইয়া অনর্থ বাধাইল।

কাসি থামিলে নিজের গলায় হাত দিয়া কৈলাশ বলিল, "একখান দা নিয়ে এস, এনে সাবাড় করে দাও, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক, ঢের ঢের মেয়েমানুষ দেখিছি, এমন যমদূত ত'—"

পটেশ্বরী আর উচ্চ-বাচ্য করে নাই।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। নেড়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। পটেশ্বরী গিয়া ছেলের হাত হইতে পুঁটলিটা লইল। ব্যগ্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বউমাকে আনবি লিখেছিলি, তুই একা এলি যে? তারা এখন পাঠালে না বুঝি?"

দাওয়ায় উঠিয়া বসিয়া আলোয়ানটা পাশে রাখিয়া নেড়া বলিল, "না।"

পটেশ্বরী আলোয়ানটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল, "বাঃ বেশ জিনিষ তো, বেয়াই দিয়েছে বুঝি এবার? খুব গরম হয় না?"

কতক্ষণ এ কথা সে কথা চলিল। তারপর নেড়া বলিল, "গাড়ুটা দাও দিখিনি মা, ঘাট থেকে আসি, আচ্ছা থাক্, আমিই নিচ্ছি।"

ঘরে ঢুকিতে গিয়া নেড়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

"এ কি, ঘর খুললে কে?"

থতমত খাইয়া পটেশ্বরী জানাইল, "বড্ড অসুখ হয়েছিল খুকীর, তাই উনি বললেন—"

"উনি বললেন আর অমনি—?"

"না, উনি ঠিক বলেন নি, আমিই একরকম জোর করে—তুই রাগ করবি জানলে…"

গম্ভীর হইয়া নেড়া দাঁড়াইয়া রহিল কতক্ষণ। তারপর নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, "দুইদিন আর সইল না, বেশ আমি যখন কেউ না, ঘর নিয়েই তোমরা থাক।" নেড়া জামা-কাপড় লইয়া উঠানে আসিয়া পড়িল।

"এসেই আবার কোথায় চললি?" পটেশ্বরীও সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া আসিল।

নেড়া ততক্ষণ ছড়কা গলিয়া রাস্তায় পড়িয়াছে।

"ও খোকা, শোন্, ও খোকা।"

ধড়মড় করিয়া পটেশ্বরী উঠিয়া বসিল: "বাগো মিছিমিছি কি ভয়ই পেইছিলাম, ইস্, ঘাড়টা ব্যথা হয়ে গিয়েছে।" পটেশ্বরী খাবার সরঞ্জাম গুটাইয়া তুলিল।

ভয় কিন্তু পটেশ্বরীর মিছামিছি নয়। অনেককাল আগে উত্তর-পোতার ঘরে শুইয়া গভীর রাতে জাগিয়া স্বামী-স্ত্রীতে দরিদ্র সংসারে ভবিষ্যতের যে স্বপ্ন গড়িয়াছিল, জীবনের প্রত্যন্ত সীমায় আসিয়া সে স্বপ্ন ত' কবে ভাঙ্গিয়াছে, নিজেদেরও তারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। দিনের পর দিন কাটিয়াছে, তবু দুর্ভাবনা ঘুচিল না, একটা ভাবনা কাটিয়া বৃহত্তরের জন্য পথ ছাড়িয়া দিয়াছে মাত্র।

মিলনের পন্থা

…ইংরেজগণের স্বভাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ইহাঁরা ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে আদৌ খারাপ নহেন এবং ইহাঁদিগের যত কিছু দোষ, তাহা তাঁহাদিগের বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত শিক্ষাবশতঃ। যদি কিছু বর্জ্জন করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা তাঁহাদিগের ঐ বিপরীত বিজ্ঞান ও ঐ বিপরীত শিক্ষা। তাঁহাদিগের যে কূটনীতি, তাহাও ঐ বিপরীত বিজ্ঞান ও বিপরীত শিক্ষাবশতঃ। কাযেই, মানুষ হিসাবে তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের কূটনীতিমূলক কার্য্যের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের কূটনীতিমূলক কার্য্য যে কি ভারতবাসী ও কি ব্রিটেনবাসী, কাহারও পক্ষে আদৌ মঙ্গলপ্রদ হইতে পারে না, তাহা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতে হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে কোন্ পরিকল্পনায় ভারতবাসী ও ব্রিটেনবাসী প্রত্যেকের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির সমাধান সাধিত হইতে পারে, তাহা আবিষ্কার করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে।…

ইন্দ্রনাথ

—শ্রীকালিদাস রায়

এ যুগের লোক, বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায় ইন্দ্রনাথকে ভুলিয়া গিয়াছে। তরুণ সাহিত্যিকগণ হয়ত ইন্দ্রনাথের নামও শোনেন নাই। ইহার একটি কারণ, তিনি হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরীশচন্দ্র অথবা রমেশচন্দ্র যে শ্রেণীর সাহিত্যিক, সে শ্রেণীর সাহিত্যিক ছিলেন না। দ্বিতীয় কারণ, তাঁহার পুস্তকগুলির প্রচার হয় নাই। কোনও 'সাহিত্য-মন্দির' যদি তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা গৃহে গৃহে স্থান পাইত। তৃতীয় কারণ, তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পরিপোষকগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, অর্থাৎ বর্ত্তমান যুগের সামাজিক জীবনের গতি প্রগতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ সাহিত্যের সপ্তর্ষিমণ্ডলে স্থান পান নাই সত্য, কিন্তু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার স্থান বহু উচ্চে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার স্থান কোথায়, এ বিষয়ে আজও আলোচনা হয় নাই। আমার মনে হয়, সে আলোচনার সময় আসিয়াছে এবং যথাযোগ্য অপক্ষপাত সমালোচনা হইলে তাঁহার সাহিত্যিক মর্য্যাদা আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

যথাযোগ্য আলোচনা হইলে অনেক বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিকের মর্য্যাদা রাহুমুক্ত চন্দ্রমার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহার প্রমাণ, আমরা টেকচাঁদ ঠাকুর, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইত্যাদি সাহিত্যিকদের সম্পর্কে পাইয়াছি। দেশের লোক ইহাঁদের ভুলিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদের সম্বন্ধে কৃতী সমালোচকগণ যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহাদিগকে আজ আমরা সাহিত্যরথী বলিয়া স্বীকার করিতেছি।

ইন্দ্রনাথ ছিলেন গত শতাব্দীর শেষ ভাগের একজন সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব—অম্বিকাবাবু যেমন ছিলেন ফরিদপুরের, বৈকুণ্ঠবাবু যেমন ছিলেন বহরমপুরের, আনন্দবাবু যেমন ছিলেন ঢাকার, যদুবাবু যেমন ছিলেন যশোহরের, স্যর রাসবিহারী যেমন ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের, ইন্দ্রনাথ তেমনি ছিলেন বর্দ্ধমানের। আইন-ব্যবসায়ে তাঁহার যে পরিমাণ পশার-প্রতিপত্তি ছিল—তাহাতে তাঁহার খুব বেশি অবসর থাকিবার কথা নয়। সেকালের হাকিমরা যে অবসর পাইতেন, ইন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যবহারাজীব সে অবসরও পান নাই। নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ অবসর না পাওয়ার জন্য তিনি অনন্যব্রত হইয়া সাহিত্য-সেবা করিতে পান নাই—শ্রমসাপেক্ষ বা দীর্ঘকালের অনুশীলনসাপেক্ষ কোন কাব্য, উপন্যাস তিনি রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্যকে তিনি অবসরকাল-বিনোদনের সামগ্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নীরস, রুক্ষ কর্ম্মজীবনকে সরস করিয়া রাখিবার জন্যই তাঁহার সাহিত্য-চর্চ্চা। এইরূপ অবস্থায় যে সাহিত্য-রচনা স্বাভাবিক—তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি যদি অনন্যব্রত হইয়া সাহিত্য-সেবা করিতেন, তাহা হইলে তিনি বঙ্গসাহিত্যের সপ্তর্ষিমণ্ডলেই স্থান পাইতেন। একথা বলিবার কারণ, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের তিনটি ধর্ম্ম তাঁহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় ছিল। একটি লোকায়ত কাব্য-জগতের ঘটনাপরম্পরার প্রতি শিল্পিজনসুলভ ঔদাস্য। তিনি বহির্জগতের সমস্ত ব্যাপারকেই শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন। এই দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন বলিয়াই তথা-কথিত সভ্যতার সকল আয়োজন, বিধিব্যবস্থা ও অন্তঃসার-শূন্য ঘটাসমারোহ লইয়া হাস্য-পরিহাস করিতে পারিতেন। আর একটি গুণ—তাঁহার রচনারীতির সরসতা: এই সরসতার অর্থে আমি কৌতুক-রসিকতা বলিতেছি না, রচনাভঙ্গীর পারিপাট্য, শৃঙ্খলা ও মাধুর্য্যের কথা বলিতেছি। তৃতীয় গুণ ছিল—নিজের মাতৃভাষায় অগাধ অধিকার। অনেকে মনে করেন, বঙ্গভাষায় অগাধ অধিকারের অর্থ, সংস্কৃত ভাষায় অধিকার। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সম্বন্ধে এ কথা খাটে; বঙ্গভাষায় অধিকারের অর্থ তাঁহার কাছে ছিল, সংস্কৃত ভাষায় অধিকার। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র সরকার কিংবা ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার যেরূপ অধিকার ছিল, তাহা অনেক মহারথীদেরও ছিল না। ইন্দ্রনাথের রচনায় আমরা খাঁটি বাংলার ঘর-

সংসারের, মেলা-মজলিসের, গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের, হাটবাজারের, ঘাট-মাঠের ভাষা-সম্পদ্ প্রভূত পরিমাণে পাই। বাংলাভাষার যে idiom, ভূদেববাবুর ভাষায় চলতি গৎ, আজকালকার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের ভাষায়, লক্ষ্যার্থক ও ব্যঙ্গার্থক শব্দগুচ্ছ, ভূরি ভূরি পাইয়া থাকি। কেবল পিতৃভাষায় নয়, খাঁটি মাতৃভাষায় এই অগাধ অধিকারের জন্য তাঁহার রচনারীতি সর্ব্বত্র স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল, অনায়াস, স্বচ্ছন্দ বা সাবলীল হইয়াছে। সুদক্ষ লাঠিয়ালের হাতে যেমন লাঠি খেলা করে—বাঙ্গালা-ভাষা তাঁহার হাতে তেমনি খেলিয়াছে। একথা বলার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। তাঁহার সমসাময়িক অনেক সাহিত্যিকের রচনা পাঠ করিলে আমরা দেখি, তাঁহাদের রচনায় ভাব, চিন্তা ও বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্বের অভাব নাই—কিন্তু মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে তাঁহাদিগকে যে কঠোর প্রয়াস ও গলদ্‌ঘর্ম্ম আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমরা অস্বস্তিই অনুভব করি। ইংরাজিতে ভাবিয়া সংস্কৃত শব্দপরম্পরা দ্বারা তর্জ্জমা করিয়া অনেকস্থলে তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতেন—একদিকে ইংরাজী অন্যদিকে সংস্কৃতের প্রভাবে তাঁহাদের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলাভাষা হইয়া উঠিত না। এই যুগে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পক্ষপাতী ইন্দ্রনাথ তাঁহার মাতৃভাষার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন। ইন্দ্রনাথের রচনারীতি ও ভাষাবিন্যাস সম্বন্ধে যদি সম্যক্ আলোচনা হয়—তাহা হইলে ভাষার পুষ্টিসাধনে তাঁহার দানের প্রকৃত পরিমিতি হইবে।

ইন্দ্রনাথের অধিকাংশ রচনা ব্যঙ্গ-কৌতুকের রসে পরিষিক্ত। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নিজস্ব উচ্চাঙ্গের চিন্তাও অনেক ছিল। কিন্তু কখনও তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য, বিদ্যা জাহির করিবার জন্য, গুরুগিরি করিবার জন্য কিছুই লেখেন নাই। তিনি জানিতেন, বিদ্যা দুর্ল্লভ নয়—সরস করিয়া বক্তব্য প্রকাশের শক্তিই দুর্ল্লভ। যাহা সরস করিয়া বলিতে পারিবেন না, তাহা তিনি বলিতেন না। দেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য লোকের অভাব হইবে না—কিন্তু এ দেশের নানা দুঃখ-ক্লিষ্ট, শুষ্ক, জীর্ণ, নীরস জীবনে রসবর্ষণ করিতে পারে, এমন লোকেরই অভাব। এ-বিষয়ে তাঁহার সংযম ছিল অসীম। বিদ্যাপ্রকাশের লোভ সংবরণ করিয়া তিনি 'পঞ্চানন্দ' সাজিয়াছিলেন। রসিকতার মধ্য দিয়া হেলায়-শ্রদ্ধায় তিনি যে চিন্তা ও অনুভূতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহারও তুলনা নাই। সে সম্বন্ধে আজও কোন আলোচনা হয় নাই। আমাদের জাতীয়-জীবনে যত দুর্গতিই থাকুক—বাঁচিতে হইলে তরল হাস্য-প্রফুল্লতারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু গত শতাব্দীতে ইহার বিরুদ্ধে অভিযানের অন্ত ছিল না—এক দিকে ব্রাহ্ম প্রভাব দেশশুদ্ধ লোককে গম্ভীর করিয়া তুলিতেছিল—সে প্রভাবে হাস্য-পরিহাস একটা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবও লোকের মুখের স্বাভাবিক হাস্য হরণ করিয়া লইতেছিল—টোল-চতুষ্পাঠীর প্রভাব হাস্যরসকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর রস বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিল—দেশ নেতারা বলিতেছিলেন, দেশের চারিদিকে দুর্দ্দিন, এ দুর্দ্দিনে কি হাসি আসে, না হাসি শোভা পায়? এই ত' এক দিকের কথা। অন্য দিকে যাহাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বা সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব পড়ে নাই—ব্রাহ্ম প্রভাবের যাহারা ধার ধারে না—সহুরে হালচাল যাহারা জানিত না, তাহারা গ্রাম্য বৈঠকে, কবি, তরজা, যাত্রা, পাঁচালীর আসরে অশ্লীলতাকেই রসিকতা বলিয়া মনে করিয়া মাতামাতি করিতেছিল—রসের অভাবে তাহারা নর্দ্দমার কাদাজল তুলিয়া ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিল। পল্লীগ্রামের অধিবাসী অথচ সহরের বিখ্যাত উকিল ইন্দ্রনাথ এই দুইয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ভাবিলেন—এ-দেশটার হইল কি? হাস্যরস কি এদেশ হইতে উঠিয়া যাইবে?

তিনি তাই জীবনের ব্রত করিলেন—নির্ম্মল, শ্রুতিসুন্দর হাস্যরসের সঞ্চার করা। ইন্দ্রনাথের কৌতুক-বচনের বৈশিষ্ট্য, ইহা গ্রাম্য রসিকতার মত স্থূল নয়—কমলাকান্তের রসিকতার মত অত সূক্ষ্মও নয়—দুইয়ের মাঝামাঝি, সর্ব্বজনের অধিগম্য, তাঁহার রচনা পড়িয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া হাসিতে হয় না, অথচ গ্রাম্যতা-দোষও নাই।

পঞ্চানন্দের হাস্যরস তরল বটে, কিন্তু তাহাতে আবিলতা বা পঙ্কিলতা নাই।

বর্ত্তমানযুগে যে হাস্যরসিকতা সাময়িক সাহিত্যের ও সংবাদ-সাহিত্যের একটা প্রধান উপজীব্য, ইন্দ্রনাথ হইতেই তাহার সূত্রপাত বলা যাইতে পারে। আমরা

অনুমান করি, তাঁহার রচিত 'ভারতোদ্ধার কাব্য' হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য-কবিতা রচনার দীক্ষা লাভ হইয়াছিল।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসম্বন্ধে অতিরিক্ত রক্ষণশীল ছিলেন বলিয়া বর্ত্তমান যুগের লোকে তাঁহাকে একজন লোক-গুরু বলিয়া স্বীকার করেন না। দেশের সামাজিক জীবনে ইন্দ্রনাথ যুগপ্রবর্ত্তক ছিলেন না। যুগই তাঁহার সামাজিক আদর্শের প্রবর্ত্তনা দিয়াছিল। সে যুগে কতকগুলি গণ্যমান্য ব্যক্তি হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া বিজাতীয় ভাবের চরমে পৌছিয়াছিলেন, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ইন্দ্রনাথ দেখিলেন—তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেলে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যাইবে; হিন্দু সমাজ ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে—বিদ্রোহের নামে দেশে নিরীশ্বরতা বৃদ্ধি পাইতেছে। তিনি এই হিন্দু সমাজকে রক্ষার জন্য স্বধর্ম্মনিষ্ঠতার চরমের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বধর্ম্মনিষ্ঠতাকে কেহ বোধ হয় অপরাধ মনে করিবেন না। কিন্তু তিনি যুগধর্ম্মের দাবী অস্বীকার করিয়া রক্ষণশীলতার চরমের দিকে পিছু হটিয়াছিলেন—ইহাকেই অনেকে অপরাধ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু গত্যন্তর ছিল না। একদিকের চরমের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হইলে অন্যদিকের চরমে যাইতে হয়, নতুবা ভারকেন্দ্র থাকে না। এইভাবেই একটা সামঞ্জস্য বা synthesis এর সৃষ্টি হয়। যতদিন সে synthesis না আসে, ততদিন উভয় পক্ষ উভয় পক্ষকে অপরাধী মনে করে। কিন্তু যখন একটা সামঞ্জস্য ঘটে, তখন উভয় পক্ষই সত্যাভিব্যক্তির অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য হয়।

সে synthesis দেশে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় এবং যে পক্ষ সমাজকে ঘরের দিকে টানিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ আজ সেই পক্ষের একজন অগ্রণী বলিয়া তাঁহার যথাযোগ্য মর্য্যাদা পাইতে পারেন। বিপ্লবের মধ্যে আত্মহারা হওয়ায়, প্রবৃত্তির মুখে আত্ম-বিসর্জ্জন করায় গৌরব নাই—জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টাতেই গৌরব। বিপ্লবী, বিদ্রোহী বা বিরুদ্ধপক্ষের সহিত সন্ধি করা বিচক্ষণতার পরিচয় বটে, কিন্তু স্বকীয় আদর্শের জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও সেজন্য সর্ব্ববিধ ত্যাগস্বীকারে যে গৌরব আছে, সে গৌরব যুগধর্ম্মের খরস্রোতে আত্মবিসর্জ্জনেও নাই, বিরুদ্ধ আদর্শের সহিত সন্ধি বা রফাবন্দোবস্ত করাতেও নাই।

ভারতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য ইন্দ্রনাথ যে প্রচণ্ড চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, স্বকীয় আদর্শের জন্য তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—তাহার জন্য প্রাপ্য মর্য্যাদা আজ তাঁহাকে দিতেই হইবে।

সাহিত্য ও সমাজ

যখন সমাজের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়, তখন স্বতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্ভব হইতে থাকে এবং যে সমস্ত চিত্র কাম ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক, সেই সমস্ত চিত্র ঐ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কখনও অঙ্কিত করেন না। আর যখন সমাজের অবনতির অবস্থা চলিতে থাকে, তখন চিন্তাশীলতার বিলুপ্তি ঘটিতে আরম্ভ করে এবং যাহারা উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন, তাহারাও চিন্তাশীল বলিয়া আখ্যাত হইতে থাকেন। এই উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন গ্রন্থকারগণ যাহা অঙ্কিত করেন তাহা তথাকথিত আর্টের নামে প্রায়শঃ কাম ক্রোধাদি কুৎসিত মনোভাবের উদ্দীপক হইয়া থাকে এবং পরোক্ষভাবে মানুষের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এইরূপভাবে যে কোন সাহিত্যিক গ্রন্থ দেখিয়া সমাজের সমসাময়িক অবস্থা অতি অনায়াসে সুস্পষ্টভাবে অনুমান করা সম্ভবযোগ্য হয়।

বাঙ্গালার পথ-ঘাট ও অন্যান্য যোগসূত্র

—শ্রীসুশীল রায়

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান বিস্তৃত রেলপথ তৈয়ারী হয় গত শতাব্দীর শেষভাগে এবং বর্ত্তমান-শতাব্দীর প্রথম ভাগে। যখন রেলপথ প্রথম তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয়, তখন ভারতে বহুল পরিমাণে (অর্থাৎ দীর্ঘতায় ও সংখ্যায়) যাতায়াত করিবার লম্বা সড়ক ছিল এবং এই রেলপথ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উক্ত সড়কের পাশাপাশি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। তাহাতে সুবিধা ছিল বিস্তর, কারণ সহরে সহরে উক্ত সড়কাবলী যোগসূত্র গাঁথিয়াই রাখিয়াছিল, নূতন করিয়া পথ আবিষ্কারের উদ্যোগ করিতে হয় নাই। যে সকল স্থানে লোকসংখ্যা অধিক ছিল, সেই স্থানসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিবার নিমিত্তই রেলপথ ও সড়ক গড়িয়া ওঠে।

এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের লৌহবর্ত্মের সামান্য একটু ইতিহাস বলা অসঙ্গত হইবে না। ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। খৃষ্টাব্দ ১৮৫৩ সালে বোম্বাই নগরীর উপকণ্ঠে প্রায় কুড়ি মাইল দীর্ঘ রেলপথ প্রথম নির্ম্মিত হয়। এই রেলপথ প্রস্তুত করিবার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যে সকল স্থানে পণ্যাদি বিশেষ ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের বৃহৎ সামুদ্রিক বন্দর, (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও করাচী) যাহাতে সহজ ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে এবং দ্রব্য চালান দিবার পথ সংক্ষিপ্ত ও সুগম হইবার সুযোগ পায়।

ব্রিটিশ-ভারতে যে সকল উল্লেখযোগ্য রেলপথ স্থাপিত হইয়াছে, অথবা ভারত-সরকার যে সকল রেলপথের উন্নতির দিকে নজর রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে পাঁচটি (নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ, ঈস্টর্ণ-বেঙ্গল, ঈস্ট-ইণ্ডিয়ান, গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং বর্ম্মা রেলপথ) সরকার দ্বারা অধিকৃত বা পরিচালিত হইত; অন্য পাঁচটি সরকার দ্বারা অধিকৃত হইলেও কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হইত। উক্ত কোম্পানীগুলি সরকারের নিকট হইতে সাহায্য লাভ করিত।

ইহা ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র রেলপথ বে-সরকারী কোম্পানীর অধিকারে ছিল। কোন কোনটি কোম্পানীরই নিজস্ব সম্পত্তি ছিল এবং কোম্পানী তাহার পরিচালনা করিত, কোন কোনটি সরকার পরিচালনা করিতেন, অথবা সরকারের পক্ষ হইতে কোম্পানীই পরিচালনা করিত। ইহা ছাড়া খুবই সংক্ষিপ্ত ও অনুল্লেখযোগ্য কয়েকটি পথ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, অথবা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ব্যয়ে প্রতিপালিত হইত।

আমাদের দেশের চলাচলের পথের কথা বলিবার আগে এই ইতিহাসটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন বিবেচনা করায় এখানে তাহা লিখিত হইল। এবার দেখা যাক, চলাচলের সুবিধা থাকিলে চারিদিক্ হইতে (রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি) কতটা উপকার পাওয়া যায়।

ভারতের কৃষির রয়াল কমিশন এ-বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কি কি বলিয়াছেন, এখানে তাহারই সংক্ষিপ্ত সার দিতেছি।

চলাচলের সুবন্দোবস্তের সঙ্গে মাল-সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে উক্ত দ্রব্যাবলী অল্প খরচে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে এমন স্থানে লইয়া পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়—যেখানে সেই দ্রব্যের চাহিদা অধিক এবং এই কার্য্য দেশের বিবিধ স্থানের দ্রব্য-মূল্যের মধ্যে সমতা আনিয়া দিতে সক্ষম হয়; এই দুই প্রকার কার্য্য উৎপাদকের প্রাপ্য অর্থের উপর অনেকটা সুবিচার করিতে পারে। দ্রব্য-উৎপাদক দ্রব্য-চলাচলের সুবিধা থাকিলে বিবিধ বাজারে তাহার মাল পাঠাইতে পারে, ইহাতে তাহার লোকসানের আশঙ্কা খুব কম। কারণ যে-স্থানে তাহার দ্রব্যের তেমন চাহিদা নাই, সে-স্থানে মাল না পাঠাইয়া অন্যত্র সে তাহা অবিলম্বে চালান দিতে পারে। কিন্তু চলাচলের যদি তেমন সুবন্দোবস্ত না থাকে, তাহা হইলে মাল যাতায়াত করিবার পক্ষে সেটা একটি মস্ত বাধা এবং তাহাতে বাজার-দর বাড়িয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই চলাচলের সুবিধা যদি একেবারেই না থাকে, তাহা হইলে উৎপাদকেরা সম্পূর্ণ ভাবে স্থানীয় ব্যবসায়ীর হাতের মুঠার মধ্যে পড়িয়া যায়, কারণ সেই ব্যবসায়ী ভিন্ন আর কোনও ক্রেতা তাহার নাই। বাহিরের বাজার হইতে

জওহরলালের ঘোষণা
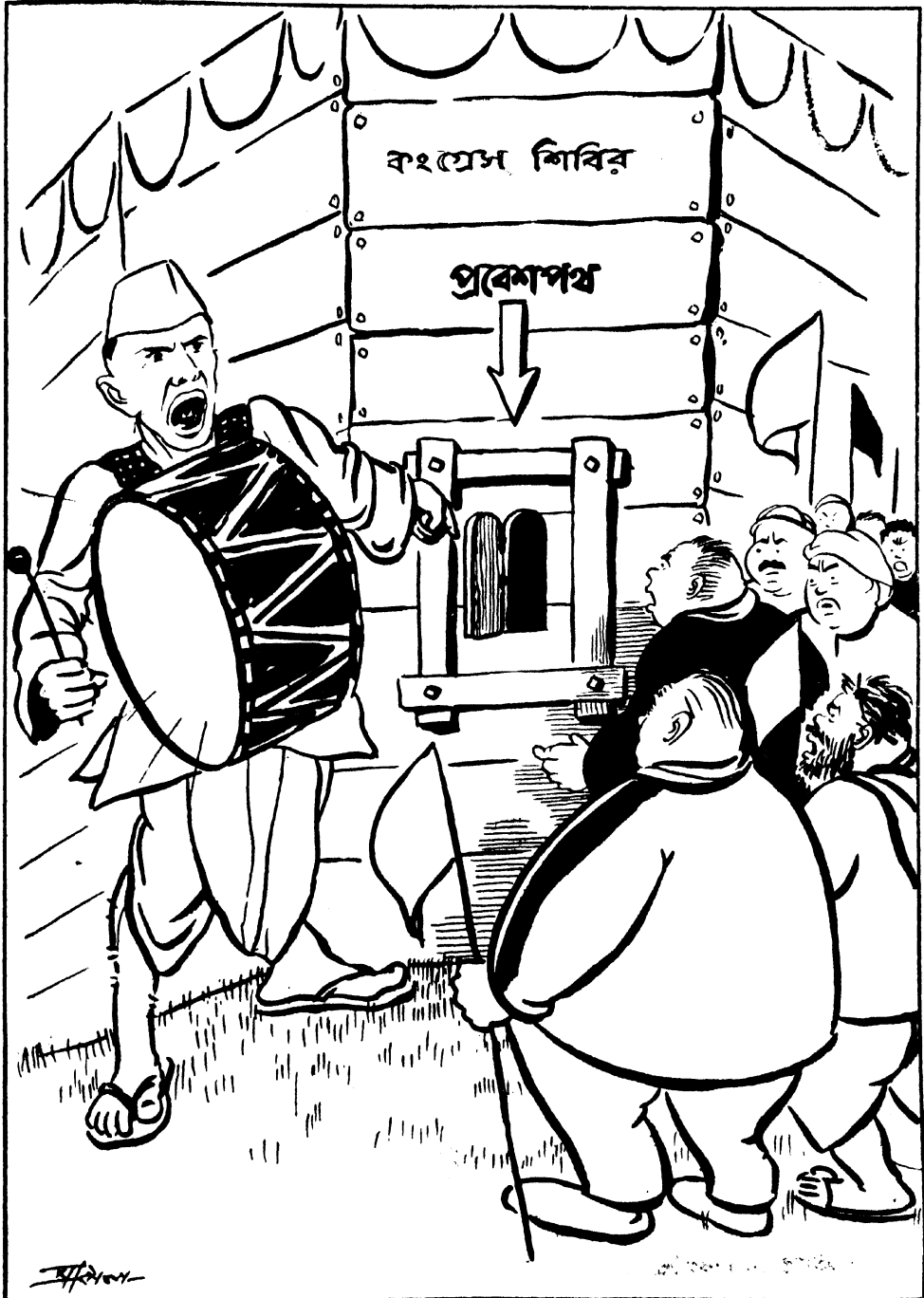
গত ১৮ই নভেম্বর বোম্বাই সহরের আজাদ ময়দানের বক্তৃতায় জওহরলাল বলিয়াছেন :—…সকল সম্প্রদায় ও দলকে বিভেদ ভুলিয়া [illegible]…

সে একেবারেই বিচ্ছিন্ন। এই সব ব্যবসায়ীদের নিজস্ব শকট, বলদ ইত্যাদি থাকার দরুণ তাহারা তাহাদের ক্রীত মাল লইয়া নিকটেরই কোন এক স্থানে গিয়া বিক্রয় করিয়া আসিতে পারে। কিন্তু উৎপাদকের নিজস্ব সরবরাহক না থাকায় তাহাকে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতে হইবে, তাহারই প্রতিবেশী ব্যবসায়ীর উপর। অতএব চলাচলের সুবিধা থাকিলে এই জুলুমবাজী কিংবা এইরূপ নির্ভরশীলতার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়াও উপযুক্ত যান-বাহন ও পথ-ঘাটের ব্যবস্থা থাকিলে সময় অযথা অপচয় হয় না এবং দ্রব্যের মূল্য যখন সময়ের উপর নির্ভর করিয়াই নির্দ্ধারিত হয়, তখন এ-দিকে খেয়াল রাখা দরকার। কোন স্থানের পথ-ঘাটের বিশেষ ব্যবস্থা থাকিলে নূতন শস্যকে অধিক সারবান্ ক্ষেত্রে আনিয়া ফেলা সম্ভব হয়, তাহাতে দ্রব্যোৎপাদনের সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া অনুপযুক্ত চলাচলের ব্যবস্থা বন্দিত্বেরই অন্য একটি রূপ; ইহাতে শারীরিক ও মানসিক অবনতি হয়। এক কথায় উৎপাদকের আয় সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে উপযুক্ত চলাচলের ব্যবস্থার উপর।

সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের সুযোগ-সুবিধাও উপযুক্ত যানবাহনের ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। গ্রামবাসিগণ পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে ছন্নছাড়া হইয়া পরিত্যক্ত থাকিলে তাহাদের উন্নতির কোন আশা করা অন্যায়। তাহাদের সঙ্গে উন্নততর মানবমণ্ডলীর চিন্তাধারার আদান-প্রদানের সুযোগ নির্ভর করে তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তার যোগসূত্রের উপর। অতএব এই যোগাযোগ যখন যানবাহন ও পথ-ঘাটই ঘটায়, তখন সেদিকে আমাদের নজর রাখিতে হইবে।

এই যোগাযোগ বর্ত্তমানে সংঘটিত হয় বিবিধ উপায়ে,যথা—

(১) রেলপথ

(২) সড়ক, অর্থাৎ শকটবাহী পথ

(৩) জলপথ

(৪) আকাশপথ

(৫) ডাক-ব্যবস্থা

(৬) টেলিফোন্

(৭) টেলিগ্রাফ

(৮) বেতার।

এক এক করিয়া এই আটটি বিষয়ে সামান্য আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

রেলপথ

বাঙ্গালায় রেলপথের দীর্ঘতা সর্ব্বসমেত ৩,৪৫০ মাইল। এই রেলপথ ত্রিবিধ, যথা, প্রশস্ত, নাতিপ্রশস্ত এবং অপ্রশস্ত। প্রশস্ত রেলপথ প্রদেশের বিভিন্ন জিলা ও ব্যবসায়-কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করিয়াছে। এই রেলপথ পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নগরে নগরে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া গিয়াছে। প্রদেশের এক প্রান্তে মহানগরী কলিকাতার সঙ্গে অন্যপ্রান্ত দার্জ্জিলিং-এর যোগ দেখা যাইতেছে পরপৃষ্ঠায় প্রকাশিত ছবি হইতে। একটি প্রধান রাস্তা হইতে বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ছবি দেখিয়া সহজেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, বাঙ্গালার প্রত্যেকটি জিলাকে এই রেলপথ বাহু বাড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই। দ্বিতীয় চিত্রে আমরা নাতিপ্রশস্ত পথের পরিচয় পাইতেছি, এখানে দেখিতেছি, নাতিপ্রশস্ত পথ প্রশস্ত পথের খাদ্য আহরণ করিয়া আনিয়া দিতেছে। পল্লীগ্রামের সঙ্গে সহরের যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছে নাতিপ্রশস্ত রেলপথ। এই দুইটি পথ মিলিয়া একটি জাল রচনা করিয়াছে, যাহা দ্বারা প্রদেশের প্রত্যেকটি প্রান্ত হইতে প্রত্যেককে ছাঁকিয়া তুলিয়া আনা সম্ভব। এই পথ প্রধানতঃ ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে নামে পরিচিত। বাঙ্গলায় নিম্নলিখিত পাঁচটি রেলপথ আছে :—

(১) ঈস্ট ইণ্ডিয়ান,—বহির্বঙ্গের সঙ্গে এই পথ বঙ্গের যোগাযোগ স্থাপনা করিয়াছে।

(২) বেঙ্গল নাগপুর,—এ-পথও বাঙ্গলা ডিঙ্গাইয়া বহি-বাঙ্গলায় গিয়াছে, সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানের সঙ্গে এই পথ বঙ্গের যোগাযোগ আনিয়াছে।

(৩) ঈস্টর্ণ বেঙ্গল ; ইহাই বাঙ্গলার নিজস্ব রেলপথ।

(৪) আসাম বেঙ্গল ; বঙ্গের সাথে আসাম এই পথ দ্বারা মিলিত হইয়াছে।

(৫) দার্জ্জিলিং হিমালয়ান্ ; সমতল ক্ষেত্র ও পার্ব্বত্য অঞ্চল কিংবা পর্ব্বতমালার মধ্যে এই পথ যোগাযোগ সাধন করিয়াছে।

করিতে হইবে। ১৯২১-২২ খৃষ্টাব্দের স্তম্ভটির উচ্চতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতেছি, প্রায় ৬০৮; অর্থাৎ ৬০৮০ লক্ষ পত্র ঐ বৎসর ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বনিম্ন তাহারই পরবর্ত্তী বৎসরে (১৯২২-২৩)। আমরা স্তম্ভের উচ্চতা হইতে দেখিতেছি ৫০৯, অর্থাৎ ৫০৯০ লক্ষ চিঠি লেন-দেন হইয়াছে।

এই ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে পোষ্ট-অফিস দ্বারা। অতএব এখানে তাহার সংখ্যা দেওয়া দরকার। বঙ্গদেশ-আসাম একত্রে ধরিয়া সরকার কর্ত্তৃক হিসাব প্রকাশিত হয়; এই কেন্দ্রে পোষ্ট-অফিসের সংখ্যা ৪৫০৯; ডাক-বাক্স ১১,৭৫০। হিসাবটি কিছুদিন পূর্ব্বের, সংপ্রতি এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

৪নং চিত্র।
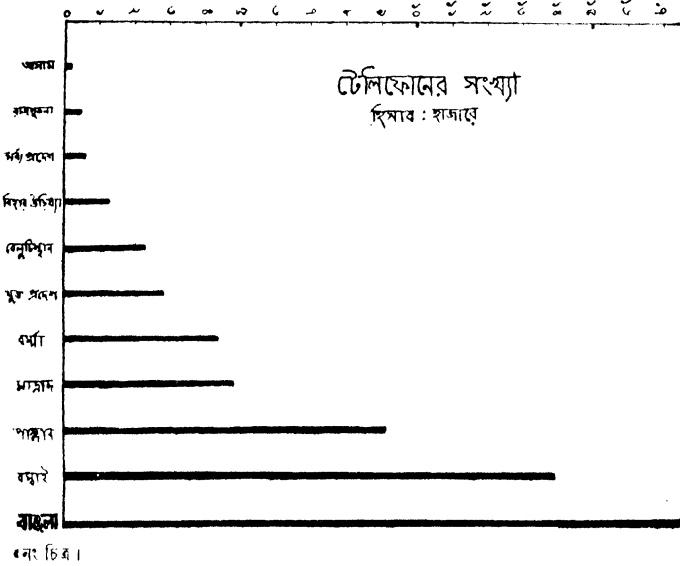
টেলিফোন্

টেলিফোন্ আর একটি ব্যবস্থা, যাহা দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলা ও সংবাদাদি প্রেরণ করা সম্ভব। ব্যবসায়ের উন্নতির সহায়করূপে টেলিফোনের স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে দেওয়া হয়। যদিও ইউরোপ বা আমেরিকার মত আমরা এখনও বিজ্ঞানের এই দানকে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গী করিয়া লইতে সক্ষম হই নাই, তবুও প্রদত্ত চিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারিব যে, ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশেই টেলিফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সংখ্যা প্রায় ১৭,৮০০। আসামে সর্ব্বাপেক্ষা কম, প্রায় ২৫০। বঙ্গের প্রত্যেকটি জিলার সঙ্গে (রেলকোম্পানী মারফৎ) প্রত্যেকটি জিলার টেলিফোন্ যোগ আছে। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীতেই ইহার ব্যবহার সর্ব্বাধিক।

টেলিগ্রাফ

টেলিফোন হইতে টেলিগ্রাফের ব্যবহার আরও অধিক। টেলিগ্রাফ নিভৃত গ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছে। অতএব কোন একটি ক্ষুদ্র গ্রামে দ্রুত সংবাদ পাঠাইতে হইলে আমাদের টেলিগ্রাফের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না। ইহা হইতে পাঠক-পাঠিকা ভুল বুঝিবেন না, কেবল গ্রামে গ্রামে সংবাদ প্রেরণের সময়ই যে আমরা টেলিগ্রাম ব্যবহার করি, আমি তাহা বলিতেছি না। সহরে সহরে সংবাদ প্রেরণও আমরা টেলিগ্রাফ দ্বারা করি।

বঙ্গদেশ-আসাম কেন্দ্রে ৯৯৮ জন টেলিগ্রাফিষ্ট সংবাদ-প্রেরণ কার্য্যে নিযুক্ত আছে এবং সামরিক বিভাগীয় সংবাদ প্রেরণের জন্য এই প্রদেশদ্বয়ে ৯ জন লোক বহাল আছে। প্রতি বছরে প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ টেলিগ্রাম সমগ্র ভারতবর্ষে হইয়া থাকে। পৃথক্ ভাবে বাঙ্গালার কোন হিসাব পাওয়া যায় না।

বেতার

সমগ্র বঙ্গে বেতারের শ্রোতা প্রায় ২০,০০০। বেতার দ্বারা সোজাসুজিভাবে পৃথিবীর প্রতি প্রান্তের সঙ্গে প্রতি প্রান্তের একরূপ যোগাযোগ সম্ভব হইয়াছে। উপযুক্ত যন্ত্র স্থাপনা করিলে যে-কোন সংবাদ যে-কোন স্থান হইতে ধরা সম্ভব।

উলট-পুরাণ

—শ্রীঅমলা দেবী

গাড়ী আসিয়া একটি ছোট নদীর ধারে দাঁড়াইল। সুনন্দা ও সুশান্ত গাড়ী হইতে নামিয়া খালি পায়ে নদীতে আসিয়া নামিল। নদীতে জল ছিল না, যতদূর দৃষ্টি যায় অভ্রকণাময় শুভ্র বালুকারাশি প্রভাতরৌদ্রে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; শুধু একটী ক্ষীণ জলধারা গলিত-রৌপ্য-প্রবাহের মত নদীর এক তীর ঘেঁষিয়া বহিতেছে। সিক্ত বালুকায় পদচিহ্ন আঁকিয়া সুনন্দা ও সুশান্ত জলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। জলের মাঝখানে একটা বড় পাথর। সুনন্দা আসিয়া তাহার উপর বসিয়া সুশান্তর দিকে তাকাইল। সুশান্তও আসিয়া তাহার পাশে বসিল। কয়েকটি রাখাল ছেলে-মেয়ে নদীর ধারে গরু চরাইতে-ছিল। মোটরগাড়ী দেখিয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল এবং কিয়ৎক্ষণ গাড়ীটাকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহারা আরোহীদের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনন্দা সুশান্তকে কহিল, 'ওরা কি মনে করছে, বলুন দেখি?'

সুশান্ত কহিল, 'কি করে জানব বল? ওদের জিজ্ঞাসা কর।'

সুনন্দা একটি ছোট মেয়েকে হাতছানি দিয়া ডাকিল, 'খুকী শোন্।'

খুকী ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা কহিল, 'এই শোন্ না'—অন্য ছেলেগুলাকে কহিল, 'দে তো রে ওকে পাঠিয়ে।'—ছেলেগুলা মেয়েটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া পাঠাইয়া দিল। মেয়েটি জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা মৃদু হাসিয়া কহিল, 'বল্ দেখি, ইনি আমার কে?'—মেয়েটা একবার সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ফিক্ করিয়া হাসিয়া কহিল, 'উ তুমার বর।'

সুনন্দার হাস্যরঞ্জিত মুখ মুহূর্ত্তে লজ্জায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, বেশ সপ্রতিভভাবে সে সুশান্তর দিকে তাকাইয়া কহিল, 'শুনলেন কি বলছে? আমার কাছে কিছু থাকলে ওকে বকশিস্ দিতুম।'

সুশান্ত হাসিয়া কহিল, 'ওর কথা যদি মেনে নিতেই হয় তো আমাকেই দিতে হবে'—বলিয়া পকেট হইতে মনি-ব্যাগ বাহির করিয়া একটা টাকা মেয়েটীর দিকে ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটা ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া রৌপ্য-মুদ্রাটির দিকে তাকাইয়া রহিল। বাকী ছেলে-মেয়েগুলা ছুটিয়া তাহার কাছে আসিয়া হাজির হইল এবং তাহাদের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ছেলেটা সকলকে ঠেলিয়া টাকাটা কুড়াইয়া লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিল। সুনন্দা কহিল, 'এই, তোরা সবাই মিলে ভাগ করে নিবি।' ছেলেটা কহিল, 'আজ্ঞে হাঁ৷ মা-ঠাকরুণ।'

নদীর দুই ধারে উঁচু পাড়। পাড়ের উপরে সবুজ ক্ষেত, রবিশস্যে ভরা। সুনন্দা ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ৷ রে—ওখানে কি সব চাষ হয়েছে?' ছেলেটা কহিল, 'যব, গম, আক্, কলাই। কলাইশুঁটি খাবেন মা-ঠান্?'

সুশান্ত কহিল, 'খাবে না কি? চল'—বলিয়া ছেলে-মেয়েগুলাকে ভাগাইয়া দিয়া, সুনন্দাকে লইয়া ক্ষেতের দিকে চলিল।

দুইজনে বালি ভাঙ্গিয়া গিয়া, নদীর পাড়ে উঠিতে লাগিল। আলগা মাটী পা দিবা মাত্র ভাঙ্গিয়া পড়ে। সুনন্দা আধুনিকা, যাহা করিতে সাধারণতঃ মেয়েদের লজ্জা হইবার কথা, সে তাহাই করিয়া লজ্জা ঢাকিতে চাহে। সুশান্ত তাহার আগে আগে চলিতেছিল, তাহাকে লজ্জা দিবার জন্য সে কহিল, 'বা রে! বেশ চলে যাচ্ছেন। হাতটা ধরুন, পড়ে যাচ্ছি যে!' সুশান্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, 'তাই না কি!' বলিয়া অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া সুনন্দার হাত ধরিয়া কহিল, 'রাঁচিতে একা পাহাড়ে উঠতে—আর এখানে—'সুনন্দা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'সব সময়ে সবাই সব জিনিষ পারে না কি!'

কড়াই-এর ক্ষেতে আসিয়া সুশান্ত কড়াইসুঁটি তুলিয়া সুনন্দার আঁচল ভর্ত্তি করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সুনন্দা কহিল, 'এতেই হবে, আসুন'—সুশান্ত তুলিতেই লাগিল। সুনন্দা ঝঙ্কার দিয়া কহিল, 'আসুন না! আর দরকার নেই, বলছি—' সুশান্ত হাসিয়া নিরস্ত হইয়া সুনন্দার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুনন্দা কহিল, 'চলুন।'

ক্ষেত হইতে একটু দূরে ঘাসের উপর দু'জন পাশা-পাশি বসিয়া কড়াইসুঁটি খাইতে লাগিল। সুনন্দা কহিল, 'ক্ষেতের মালিক যদি এখন এসে পড়ে?' সুশান্ত কহিল, 'এলেই বা। যুদ্ধ করব,' বলিয়া আস্তিন গুটাইল।

'আপনার হাতিয়ার কই?'

'হাতিয়ার নেই বা থাকল!' হাতের মাস্‌ল ফুলাইয়া কহিল, 'হাত আছে। এই বক্সিং-করা হাতের একটী ঘুসি খেলে তোমার জমির মালিক জমি নেবেন।'

মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুশান্তর পেশী-বহুল বলিষ্ঠ হাতের দিকে চাহিয়া সুনন্দা হাসিল।

সুশান্ত কহিল, 'কিন্তু সুনন্দা, এই না বলে পরের জিনিষ নেওয়াটা তোমাদের নীতি-শাস্ত্র-অনুসারে নিশ্চয়ই—'

'পাপ, কিন্তু আমি তো করিনি, আপনিই করেছেন।'

'কিন্তু তোমার জন্যেই তো করিছি।'

'তাতে আমার পাপ হবে কেন? আপনারই হবে—'

'Eternal feminine logic! বেশ। তা'লে আমি রত্নাকরের মত ধ্যানে বসে যাই।'

'আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে ভেঙ্গে দেব।'

'ভাঙ্গলেই হল কি না! ধ্যানের চোটে এক মিনিটে উই-ঢিপি গজিয়ে উঠবে।'

'উই-ঢিপি ভেঙ্গে আমি আপনাকে বাড়ী টেনে নিয়ে যাব।'

'তা হলে উই ঢিপি গজাই?'

'না, তার আগেই বাড়ী চলুন।'

মোটর গাড়ী ও স্কুল-কলেজ আধুনিক যুগের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, এ যুগে পূর্ব্ব-রাগের অসুবিধা ঘুচিয়া গিয়াছে। সুশান্ত ও সুনন্দার অপরাধ নাই। উভয়ের কথাবার্ত্তার মধ্যে কাব্য-বর্ণিত সেই পূর্ব্বরাগের ব্যবধান নাই বলিয়া পাঠক আমাদিগকে দোষ দিবেন না।

বাড়ী ফিরিবার পথে সুনন্দা কহিল, 'আভাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যেতে হবে, না?' সুশান্ত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'হুঁ।'

'আভাও ক'দিন কলেজ যায় নি; ওরও বোধ হয় অসুখ করেছে। ওদের ওখানে একটু থামতে হবে।'

'না না, দেরী হয়ে যাবে।'

'হোক গে',—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সুনন্দা কহিল, 'আপনার বুঝি আভাদের বাড়ী যেতে লজ্জা করছে, না? এই বাঁদরীটার সঙ্গে?'

গম্ভীরভাবে সুশান্ত কহিল, 'আমিও ত বাঁদর তোমাদের আভার মতে।'

হাসিয়া সুনন্দা কহিল, 'আপনি সেই চিঠিটার কথা বলছেন?' সুশান্ত ঘাড় নাড়িল।

সুনন্দা কহিল, 'দেখুন, ওতে আভার কোন দোষ নেই। আমিই ওটা এঁকেছিলুম।'

পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগ পর্দ্দার অন্তরাল হইতে বাহির হইত না। সুশান্ত সুনন্দার দিকে মুখ ফিরাইয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, 'তুমি এঁকেছিলে? আচ্ছা।' বলিয়া গম্ভীর হইয়া সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

সুনন্দা সুশান্তর দিকে স্নিগ্ধ নয়নে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, 'রাগ করলেন না কি?' সুশান্ত কহিল, 'রাগ করব না? তুমি আমাকে 'হনুমান' বলেছ!'

'তা কি করব! তুম্‌···আপনি (মুখে তাহার তুমি আসিয়া পড়িয়াছিল) যে রকম দিগ্বিদিকে লাফ দিতে আরম্ভ করেছিলেন! আমি শেকল দিয়ে আপনাকে শক্ত করে না বাঁধলে কি হ'ত কে জানে—' বলিয়া সুনন্দা হাসিতে লাগিল।

গাড়ী আসিয়া দামোদরবাবুর বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। দামোদরবাবু তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া কহিলেন, 'এই যে মা! এসেছ!'

সুনন্দা কহিল, 'আভা কেমন আছে, কাকাবাবু? কদিন কলেজ যায় নি। আমি ভাবলুম অসুখ হয়েছে।' দামোদরবাবু কহিলেন, 'আভা ভালই আছে মা।' সুনন্দা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

দামোদরবাবু সুশান্তকে কহিলেন, 'বাবাজীর কদিন যে

দেখাই পাওয়া যায় নি। ব্যাপার কি বল দেখি? আমি একদিন যাব ভাবছিলুম।'

সুশান্ত কহিল, 'বড় ব্যস্ত ছিলাম, কাকাবাবু।' সুশান্তর আত্মীয়তাসূচক সম্বোধনে প্রীতি হইয়া দামোদরবাবু কহিলেন, 'অমু বলছিল বটে, তা বাবাজী, কাজও চাই, আড্ডাও চাই।'

সুশান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, 'তা ত নিশ্চয়ই। বলেন ত এখনই।'

দামোদরবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, 'না বাবাজী। আজ আর না, বাড়ীতে অসুখ।'

সুশান্ত বিস্মিত হইয়া কহিল, 'অসুখ? কার?'

দামোদরবাবু কহিলেন, 'সব বলছি, এস বাবাজী।' বলিয়া বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলিলেন।

দোতলার সিঁড়ির মাথায় আভার সহিত সুনন্দার দেখা হইল। সে নীচে আসিতেছিল। সুনন্দাকে দেখিয়া আভা কহিল, 'এই যে সুনন্দা, কার সঙ্গে এলে?' সুনন্দা কহিল, 'আমাদের শান্তুবাবুর সঙ্গে, দিদির দেওর।'

'ওঃ সুশান্তবাবুর সঙ্গে বুঝি? ভাব হয়ে গেছে তা হলে।' ঘাড় নাড়িয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুনন্দা কহিল, 'হয়েছেই ত! কিন্তু তোমার খবর কি বল দেখি? ক'দিন কলেজে যাও নি, অসুখ না কি?'

আভা কহিল, 'আমার শরীর যে ভাল, তা ত দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে, আমার ঘরে বসবে চল; সেখানে সব বলব।'

আভার ঘরে গিয়া উভয়ে বসিল। সুনন্দা কহিল, 'হাঁ ভাই আভা, প্রণববাবুর খবর কিছু জান?'

আভা বলিল, 'প্রণব বাবুর খুব অসুখ।'

'তাই না কি! আমরাও তাই ভাবছিলুম। তাঁকেই দেখতে বেরিয়েছি; যাবে তুমি আমায় সঙ্গে?'

'প্রণববাবু ত এখানেই আছেন?'

বিস্মিত হইয়া সুনন্দা কহিল, 'এখানে আছেন?' আভা কহিল, 'হাঁ, কলেজে ওঁর অসুখের খবর পেয়েই বাবা আমাকে নিয়ে ওঁর বাসায় যান। সেখানে সেবা শুশ্রূষার অবস্থা দেখে জোর করে ওঁকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।'

সুনন্দা কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আভার পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর হাসিয়া কহিল, 'তা'হলে একেবারে নজর-বন্দী করেছ বল?"

তাহার কথার জবাব না দিয়া আভা কহিল, 'এখানে না আনলে ওঁকে বাঁচাতে পারা যেত না', একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, 'আমরা গিয়ে দেখলুম, একটা অপরিষ্কার ছোট ঘরে ময়লা বিছানায় পড়ে আছেন। ঘর অন্ধকার। আমরা যাবার পরে চাকর এসে লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল। প্রণব বাবু আচ্ছন্নের মত পড়ে আছেন। গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম, দিন চার জ্বর হয়েছে। চিকিৎসার কথা জিজ্ঞাসা করে জানলুম, চিকিৎসা হচ্ছে; ডাক্তার বাবু রোজ সকালে আসেন ও ওষুধ লিখে দেন। চাকরের মনে পড়লে, ওষুধ খাওয়ান হয়। কলেজের মাষ্টার বাবুরা ও ছেলেরা কেউ বিশেষ খবর নেয় নি। বাবা সমস্ত খবর শুনে প্রণব বাবুকে বাড়ীতে আনতে চাইলেন। প্রণব বাবু কিন্তু আপত্তি করতে লাগলেন, বললেন, কাউকে কষ্ট দেবার তাঁর ইচ্ছে নেই। অথচ, সেবা করতে আসবার মত কেউ আত্মীয়-স্বজন নেই, তাও বললেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলুম, তিনি যদি আমাদের এখানে না আসেন, তা' হলে আমাকেই তাঁর ওখানে থাকতে হবে, তাঁকে সে অবস্থায় ফেলে কিছুতেই আমি যাব না, শেষে বাধ্য হয়ে আমাদের এখানে আসতে রাজী হলেন।'

সুনন্দা কহিল, 'এখন কেমন আছেন?'

আভা কহিল, 'কাল থেকে একটু ভাল আছেন।'

'আমাকে একটু খবর দিলেই পারতে। আমি হয়তো তোমাকে কিছু সাহায্য করতে পারতুম।'

একটু হাসিয়া আভা কহিল, 'তুমিও তো তোমার রোগী নিয়ে ব্যস্ত ছিলে! তার জন্যে তোমাকে জানাই নি। তা'ছাড়া সেবার ভার সবটা আমার ঘাড়ে পড়ে নি; কলেজের ছেলেরা রাত্রে পালা করে জাগে।'

'কলেজের ছেলেদের কর্ত্তব্য-জ্ঞানটা সহসা প্রখর হয়ে উঠল কেন?'

আভা মুচকি হাসিয়া কহিল, 'কি জানি। ওদের মধ্যে না কি এখানে এসে সেবা করবার জন্যে হুড়াহুড়ি পড়ে গেছে। কাল একটী ফোর্থ-ইয়ারের ছেলে তো আমাদের

সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে গেল যে, সে না কি একটা সেবা-দল অর্গ্যানাইজ করেছে ; তার দলের ছেলে ছাড়া যেন আর কাউকে না আসতে দেওয়া হয়।

'বল কি !'

'হ্যাঁ। আমি বললুম, আর কারও দরকার হবে না। সে বললে, প্রণব বাবু যতদিন না চাঙ্গা হয়ে উঠছেন, ততদিন তাদের কেউ নিরস্ত করতে পারবেন না।'

'কিন্তু প্রণব বাবু চাঙ্গা হয়ে উঠে যেদিন তোমার ধার কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দেবেন, সেদিন ওদের নেহাৎ নিরাশ করে বিদেয় দিও না ভাই। মন ভরে না দিতে পার, লুচি-সন্দেশ খাইয়ে পেট ভরে দিও।'

'প্রণব বাবু ধার শোধ দেবেন, না, গা ঢাকা দেবেন, তা' কি করে জানব ভাই !'

'পাগল, প্রণব বাবুর মত মানুষ তা কখন করতে পারে !'

একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া আভা বলিল, 'তোমার কাছে লুকিয়ে কোন লাভ নেই, আমারও তাই সাহস, সুনন্দা ! ভাল আমাকে বাসতে না পারুন, আমার অমর্যাদা হতে নিশ্চয়ই দেবেন না। ওদিকে প্রণববাবুকে আমি বাড়ীতে এনেছি বলে, সহরে আমার কুৎসা রটেছে।'

'তাই না কি ?'

'হাঁা, কাল অমলদা এসেছিল, বলল যে ওদের বারের উকীলরা না কি ভারি রেগেছে।'

'ওদের রাগ কেন ভাই ! আমাদের প্রফেসাররা বরং রাগ করতে পারেন।'

মৃদু হাসিয়া আভা কহিল, 'ওদের খবর আমি জানিনে ভাই। হ্যাঁ উকীলরা না কি অমলদাকে যা তা শুনিয়েছে। সুশান্ত বাবুর কাছে কিছু শোন নি ?'

সুনন্দা কহিল, 'না, ভাই ! আমরা কিছু শুনি নি। তা'ছাড়া, শান্ত বাবু কোর্টে আড্ডা দেবার সময় তো আজকাল পান না, জামাইবাবু একটা কেস-এ ওঁকে লাগিয়ে দিয়েছেন।'

এমন সময়ে দামোদর বাবু ও সুশান্ত আভার কক্ষের সম্মুখ দিয়া রোগীর কক্ষের দিকে গেলেন। তাঁহাদের দেখিয়া আভা ও সুনন্দা কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ [ক]রিল।

প্রণব ঘুমাইতেছিল। নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে রোগীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া সকলে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। আভা কহিল, 'বাবা, সুশান্ত বাবুকে একটু চা খেতে বল।' দামোদর বাবু কহিলেন, 'তা আর বলতে, মা।' সুশান্তকে কহিলেন, 'বাবাজী, তোমরা আভার ঘরে বস, আমি নীচে হতে আসছি এখনি।'

সুশান্ত ও সুনন্দা আভার ঘরে বসিল। কিছুক্ষণ পরে আভা একটা থালায় চা ও খাবার আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিল, 'খাও ভাই সুনন্দা। ওঁকেও খেতে বল।'

সুশান্ত একটু বিলম্ব করিয়া কহিল, 'দেখুন আভাদেবী, আপনি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি কিছুতেই খাব না।'

আভা সুনন্দার দিকে চাহিয়া কহিল, 'আমি ক্ষমা করেছি।'

'সুনন্দার মারফৎ বললে হবে না, সরাসরি আমাকে বলতে হবে।'

'দেখুন সুশান্ত বাবু ! সুনন্দার পাশে যখনই আপনাকে দেখেছি, তখনই আপনাকে ক্ষমা করেছি।'

'শুধু ক্ষমা করলেই হবে না, আমি যে কোনদিন আপনাকে বিরক্ত করেছিলুম, সে কথা একেবারে ভুলে যেতে হবে।'

'আমি ভুলে গেছি সুশান্ত বাবু, আপনি এবার খান।'

দুই সপ্তাহ পরে। সময় সকাল আটটা। প্রণব তাহার কক্ষে জানালার ধারে একটা ইজি-চেয়ারে শুইয়া ছিল। তাহাকে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছিল। আভা এক বাটী গরম দুধ লইয়া প্রবেশ করিল। প্রণবের সহিত চোখো-চোখি হইতেই সে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে তাকাইল। প্রণব একদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

আভা কাছে আসিয়া দুধের বাটী আগাইয়া দিয়া কহিল, 'খান—'

প্রণব দুধ খাইয়া বাটীটা মেজেতে নামাইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেই আভা তাহা ধরিয়া লইয়া অদূরে একটা টেবিলের উপর রাখিল। তারপর একটা তোয়ালে লইয়া আসিয়া প্রণবের হাতে দিল। প্রণব মুখ মুছিয়া তোয়ালেটা

আভাকে দিল। আভা তোয়ালেটা যথা স্থানে রাখিয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেই প্রণব কহিল, 'আভা শোন—'

আভা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব কহিল, 'এখন তো অনেকটা সেরে উঠেছি, এর পর গেলে হয় না?'

আভা কহিল, 'আপনি তো এখনও কিছুই সারেন নি। ডাক্তার বাবু বলছিলেন, একটু অসাবধান হলেই অসুখ আবার ফিরতে পারে—'

'ডাক্তার বাবুর পছন্দমত সারতে হলে তো এখনও ছ'মাস এইখানে থাকতে হবে আভা।'

'থাকুন না, ক্ষতি কি?'

'ছিঃ আভা, তা কি হয়? এমনি তোমরা আমার জন্যে যা করেছ, তার ঋণ যে কি করে শোধ করব, তা ভেবে পাইনে।'

আভা তাহার চক্ষের পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রণবের চক্ষের উপর রাখিয়া কহিল, 'আপনি এখানে থেকে দয়া করে সেরে উঠলেই আমাদের ঋণ শোধ হবে।'

বিস্মিত কণ্ঠে প্রণব কহিল, 'আমি সেরে উঠলেই তোমাদের ঋণ শোধ হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝতে পারিনে, আভা। এ কদিনের অভিজ্ঞতা আমার জীবনে একেবারে নূতন।'

আভা চুপ করিয়া রহিল।

প্রণব বলিতে লাগিল, 'আমার বাড়ীতে মানুষ হয়েছি। অসুখের সময়ে একটু কাতর হলে, মামীমা ধমকাতেন; ছেলে-পিলেদের সরিয়ে নিতেন। পরের বাড়ীতে থেয়ে যখন পড়া-শুনা করতুম, তখন তো অসুখ হলে শুতে পর্য্যন্ত সাহস করতুম না, পাছে তাড়িয়ে দেয়।'

আভার চোখে জল আসিল। কহিল, 'আপনি এত কষ্টে মানুষ হয়েছেন?'

'কষ্ট এতদিন মনে হত না, আভা। এখন হচ্ছে। তখন ভাবতুম সেইটাই আমার স্বাভাবিক জীবন।...কোন সম্পর্ক নেই, কোন স্বার্থ নেই, অথচ পরের জন্যে লোকে এত করতে পারে।'

'কি আর করেছি? তা ছাড়া সম্পর্ক নেই বা বলছেন কেন? শিক্ষক-ছাত্রীর সম্পর্ক।'

'সে-রকম সম্পর্ক আরও অনেকের সঙ্গে আছে আভা। সুনন্দাও তো আমার ছাত্রী, কিন্তু একদিনও তো দেখতে আসে নি।'

'এসেছিল, আপনি তখন ঘুমুচ্ছিলেন।'

'তা হবে। কিন্তু তুমি কি করেছ বল দেখি? জোর করে আমাকে বাড়ী নিয়ে এলে, অক্লান্ত সেবা-যত্নে আমাকে সারিয়ে তুললে। অসুখের সময়ে যখনই চোখ খুলেছি, তখনই তোমাকে আমার বিছানার পাশে দেখেছি, উদ্বেগে ও আশঙ্কায় মুখখানি মলিন। আশ্চর্য্য হয়ে যেতুম। মাঝে মাঝে মনে হত স্বপ্ন দেখছি'—একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'মাঝে মাঝে ভুল হত।'

ঔৎসুক্যময় কণ্ঠে আভা কহিল, 'ভুল হত?'

'হ্যাঁ, মনে হত, সত্যিই তুমি আমার পরম আত্মীয়া।'

আভার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিল, 'পরমাত্মীয়া! মানে?'

প্রণব লজ্জিত হইয়া কহিল, 'ও কথা যেতে দাও, আভা। আমার যাওয়ার সম্বন্ধে একবার তোমার বাবাকে বল। আর, তুমি তো আজ কলেজ যেতে পার।'

আভা কহিল, 'আমি কলেজ গেলে আপনার কাছে থাকবে কে?'

'আমার কাছে কারও থাকবার দরকার কি?'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন? দুপুরে খাবার পরেই আপনার চোখ দুটি তো জড়িয়ে আসে। ঘুমলে শরীর খারাপ হবে, ডাক্তার বাবু বলেছেন।'

'তোমার মিছেমিছি কলেজ কামাই হচ্ছে।'

'কলেজ তো আমি আর যাব না।'

'কেন?'

'সে অনেক কথা। আমি চললুম। আমার কাজ আছে। দুপুর বেলায় যদি আমি থাকলে আপনার ভাল না লাগে, রামচরণকে পাঠিয়ে দেব।'

বলিয়া চাপা হাসিতে মুখখানি অপরূপ সুন্দর করিয়া আভা চলিয়া গেল। প্রণব একদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

দুপুর বেলায় আভা নিজ হাতে খাওয়াইয়া গেল। তার পর একটা নূতন মাসিক পত্র দিয়া কহিল, 'এইটা পড়ুন,

ঘুমুবেন না।' প্রণব কিছু বলিতে না বলিতেই সে চলিয়া গেল।

মাসিক পত্রিকার দুই চারি পৃষ্ঠা পড়িতেই প্রণবের মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। ভালও লাগিল না। আভা প্রতিদিন এই সময়ে গল্পের বই পড়িয়া শোনায়। ঘন ঘন হাই তুলিতে তুলিতে ও দরজার দিকে তাকাইতে তাকাইতে প্রণব বুঝিতে পারিতে লাগিল, যাহা তাহাকে ঘুম হইতে নিরস্ত করে, তাহা গল্প নয়, গল্পের পাঠিকা।

এমন সময়ে সরবে ঢেকুর তুলিতে তুলিতে, রামচরণ আসিয়া মেজের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, 'কেমন আছেন ম্যাষ্টর বাবু?'

প্রণব জবাব দিল, 'ভাল আছি রামচরণ।'

'ওঃ যা হয়েছিল আপনার। আমরা ভাবিনি, আপনি বাঁচবেন। দিদিমণির সেবাতেই এ যাত্রা থেকে গেলেন।'

'সত্যি, রামচরণ। দিদিমণি তোমাদের বেশ ভাল মেয়ে।'

'আজ্ঞে, নিশ্চয়। যেমন রূপ তেমনি গুণ। যার গলায় দিদিমণি মালা দেবে, সে তপিস্যা করছে।

'তপস্যা করছে? কোথায় হে?'

'আজ্ঞে হাঁ, ম্যাষ্টর বাবু। বিনি তপিস্যায় দিদিমণির হাতের মালা কাউকে পেতে হবে না, এ আমি বলে দিচ্ছি।'

প্রণব হাসিয়া কহিল, 'দিদিমণি তোমার কোথায়?'

'শোবার ঘরে। লেকাপড়া কচ্ছে বোধ হয়।' রামচরণ হাই তুলিয়া গা মুড়িয়া কহিল, 'খাবার পর একটু গড়িয়ে না নিলে—'

'তা তুমি ঘুমোও গে না।'

'দিদিমণি আপনার কাছে বসতে বললে কি না, তা ম্যাষ্টর বাবু, আপনি যদি আজ্ঞা করেন তো এইখানেই একটু গড়িয়ে নি।'

'কিছু দরকার নেই, রামচরণ। তুমি ঘুমোও গে।' রামচরণ যাইতে উদ্যত হইলে প্রণব কহিল, 'দিদিমণিকে এক গ্লাস জল দিতে বলে যেও।'

জল লইয়া আভা কক্ষে প্রবেশ করিল। কহিল, 'রামচরণকে যেতে দিলেন কেন? ঘুমিয়ে পড়বেন যে।'

'না, ঘুমুবো না। বেচারার ভারী কষ্ট হচ্ছিল।' জল খাওয়া হইলে আভা গ্লাসটি লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে প্রণব কহিল, 'বস না, আভা।'

আভা কহিল, 'না, আপনার ভাল লাগে না বলছিলেন।'

'তা তো আমি বলিনি, আভা। আমি বলছিলুম, তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে।' একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আর কলেজ যাবে না, এ কথা যে তুমি তখন কেন বললে, আমি বুঝতে পারিনি।'

'আমি কলেজ ছেড়ে দেব, হয়তো এখান হতে আমরা চলে যেতে পারি।'

বিস্মিত কণ্ঠে প্রণব কহিল, 'বুঝতে পারছি না আভা, আমাকে সব বুঝিয়ে বল।'

আভা একটা চেয়ারে বসিয়া কহিল, 'কি দরকার আপনার সব বুঝে?'

'বলতে যদি বাধা থাকে তো থাক, বলবার দরকার নেই।' প্রণবের মুখখানি বিষণ্ণ হইয়া উঠিল।

আভা কহিল, 'আপনার রাগ হল না কি!'

'না, রাগ কিসের!' বলিয়া প্রণব মাসিক পত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল।

আভা তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, 'রাগ করতে হবে না। শুনুন—সহরে আমার ভারী কুৎসা রটেছে।'

বিস্ময়াহত কণ্ঠে প্রণব কহিল, 'তোমার নামে কুৎসা? হেতু?'

'আপনাকে আমাদের বাড়ীতে এনেছি বলে।'

'সেই জন্যে তোমাদের এখান হতে পালিয়ে যেতে হবে?'

আভা চুপ করিয়া রহিল।

প্রণব উত্তেজিত ভাবে কহিল, 'আর এই কথা আমাকে তুমি জানাতে চাচ্ছিলে না? আমাকে তুমি কি ভাব, আভা? আমি শুধু নিতেই জানি, দেবার ক্ষমতা আমার কিছু নেই?'

আভা গম্ভীর ভাবে কহিল, 'কি দেবেন আপনি?'

'যে জীবন তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই জীবন দিয়ে তোমার সম্মান রাখব।'

'অর্থাৎ আত্মহত্যা করবেন। এবং লিখে রেখে যাবেন, হে সহরবাসী! শৃণ্বন্তু, আভা নির্দ্দোষ।'

'না না, তা নয়।'

'তবে ?'

'তুমি বুঝতে পারবে না, আভা। তোমার বাবাকে সব বুঝিয়ে বলতে হবে।'

আভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, 'আমাকেই বলুন না, স্যার।'

প্রণব একটু ভাবিয়া কহিল, 'আমি ভাবছিলুম, আমি যদি তোমাকে ?'

'কি আমাকে ?'

'মানে, তুমি যদি আমাকে—আমি অবশ্য অত্যন্ত অযোগ্য, —কিন্তু এ ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছিনে।'

আভা হাসি চাপিয়া কহিল, 'আমি বুঝতে পারলুম না, আমি আপনাকে ?'

'মানে, আমাদের যদি বে' হয়, তা'হলে সবাই চুপ হয়ে যাবে।'

আভা কহিল, 'সবাই চুপ করে যাবে সত্যি, কিন্তু আপনি যে মেয়েকে ভালবাসেন না, তাকে নিয়ে সারা জীবন ধরে জ্বালাতন হবেন।'

প্রণব নীরব।

আভা বলিতে লাগিল, 'কিছু করবার আবশ্যক নেই। আমরা এখান হতে চলে গেলেই সব আপনা হতেই থেমে যাবে।'

প্রণব মৃদুকণ্ঠে কহিল, 'বলতে সাহস হয় না, আভা। তা' ছাড়া তোমার মনের খবরও তো জানিনে।'

'আমার মনের খবর জানবার আবশ্যক নেই, আপনার কথা বলুন।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি।'

'কি করে বিশ্বাস করব ? আপনি তো পালাতে পারলে বাঁচেন।'

'সত্যি আভা, বাঁচবার জন্যেই পালাতে চাই। এখনও পালিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে, কিন্তু, আরও কিছুদিন এখানে থাকলে, একেবারে জড়িয়ে পড়ব। অথচ আমি নিশ্চয় জানি, তুমি আমাকে স্নেহ করতে পার, শ্রদ্ধাও করতে পার, কিন্তু ভালবাসতে কিছুতেই পারবে না।'

'সত্যি না কি ? আপনার মনস্তত্ত্বের বইয়ে বুঝি এ সব লেখা আছে ?'

প্রণব জবাব দিল না।

'কিন্তু আমার মন তো আপনাদের শাস্ত্র-মতে তৈরী হয়নি, কাজেই জেনে রাখুন—'

আগ্রহান্বিত কণ্ঠে প্রণব কহিল, 'কি আভা ?'

'কিছু না, আমি চললুম।'

প্রণব চট করিয়া আভার হাত ধরিয়া কহিল, 'চলে যেও না আভা। বল—'

মুখ লাল করিয়া আভা কহিল, 'আপনি ভারী বোকা! বুঝতে পারেন না কেন ?'

*

ইহার কিছুদিন পরে স্থানীয় সাহিত্য-পরিষদের এক সভায় সুশান্ত একটি গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিল। প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু, 'এ যুগের বিবাহ-সমস্যা।' প্রবন্ধে অনেক ভণিতা করিয়া সে প্রশ্ন তুলিয়াছে এই যে, যে-যুগে সামাজিক ও আর্থিক পরিবেশে পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা প্রায় দুঃসাহস হইয়া পড়িয়াছে, সে-যুগে নারীরা বিবাহে অগ্রসর হইলে ক্ষতি কি ? প্রবন্ধ-পাঠের সময় অমল প্রণব বাবুর পার্শ্বে বসিয়া ছিল। ঘন ঘন সমর্থনসূচক ধ্বনির মধ্যে একটু সময় করিয়া সে প্রণব বাবুর কাণের কাছে মুখখানি আগাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টিই পার্সন্যাল, ব্যক্তিগত। শানুর প্রতিভার ফল্গুধারায় ব্যক্তিগত প্রেরণায় প্লাবন আসিল। আপনার খবর কি ?'

প্রণব বাবু হাসিয়া মুখ নামাইলেন।

[সমাপ্ত

আশী বৎসর পূর্ব্বের বাংলা সাহিত্য

—শ্রীমতিলাল দাস

বাঙ্গালী জাতির নিন্দা—বাঙ্গালী ইতিহাসের প্রতি উদাসীন। এ কথা অসত্য নয়—আমাদের শ্রমবিমুখ অন্তর কষ্ট করিতে ক্লান্তি অনুভব করে, সহজকে সহজ হিসাবেই গ্রহণ করি। কিন্তু কালের প্রবাহ ও অভ্যুদয়ের গতি বুঝিতে হইলে ইতিহাসের পটভূমি চাই। বাংলা সাহিত্য বর্ত্তমানে মধুসূদন বঙ্কিম, রবীন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের অবদানে বিশ্বসাহিত্যের আসরে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইহাঁরা সকলেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংঘাতে বাংলাদেশে যে জাগরণ হইয়াছিল, তাহারই ফল। প্রাক্-মধুসূদন সাহিত্যে বিশ্বসাহিত্যে দেওয়ার মত লেখা আছে কেবল চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের গান এবং আমাদের অবজ্ঞাত পল্লীগীতি। মধুসূদনের প্রথম রচনা বাহির হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। বাংলা সাহিত্যের পোপ, কবি ঈশ্বরচন্দ্র ঐ সালে দেহত্যাগ করেন। মধুসূদনের প্রতিভার চমকপ্রদ বিকাশ চারিটি বৎসরে হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ — ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে শেষ। স্বাধীনতার উল্লাস-মন্ত্রের পুরোহিত রঙ্গলাল তাঁহার 'পদ্মিনী' কাব্য রচনা করেন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে।

এই সাল বাংলা সাহিত্যের যুগ-গণনায় ক্রান্তি-বর্ষ। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, সরকারী বিবরণ হইতে তাহা সঙ্কলন করিতেছি। *

সিপাহী বিদ্রোহের অগ্নি কেবল নিভিয়াছে। ভারতের বিরাট সাম্রাজ্য কোম্পানীর হাত হইতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

সেই সময়ে রেভারেণ্ড লং সাহেব এই বিবরণ দাখিল করেন।

ইহা হইতে জানি যে, ১৮৩৩-১৮৫৮, এই চৌঠীতে ৮০লক্ষ বই বিক্রয় হয়। এবং ইহার পূর্ব্ব অর্দ্ধ শতাব্দী পর্য্যন্ত ১৮০০ নূতন বই ছাপা হয়, তাহাদের অধিকাংশ অনুবাদ, ইংরেজী, পার্শী এবং সংস্কৃতের ভাষান্তর, কতক প্রতিভার নব সৃষ্টি। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩০ খানি বাংলা বই ছাপা হয়, তার পাঁচখানি কৃষ্ণলীলা, ২ খানি বিষ্ণুচরিত্র, ৪ খানি দুর্গামাহাত্ম্য, তিনখানি গল্প, পাঁচটি অশ্লীল এবং বাকিগুলি স্বপ্ন, সঙ্গীত, জ্যোতিষ ও চিকিৎসা-বিষয়ক।

১৮৫০ সালে স্রোত ফিরিল। বাঙ্গালী তখন উপকারী গ্রন্থ রচনায় মন দিল। ১৮৫২ সালে ৫০ খানি নূতন বই প্রকাশিত হয়, তার ভিতর ছিল ক্লাইভের জীবন চরিত, রবিন্সন্ ক্রুসো, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি। ১৮৫৭ সালে যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নিম্নে তাহার হিসাব দিলাম।

নাম	প্রকার	মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা
পঞ্জিকা	১৯	১,৩৬,০০০
জীবন-চরিত ও ইতিহাস	১৫	২০,১৫০
খৃষ্টধর্ম্ম সম্পর্কে	৮	৯,৫০০
নাটক	৮	৫,২৫০
শিক্ষা বিষয়ক	৪৬	১,৪৫,২০০
প্রেমোদ্দীপক	১৩	১৪,২৫০
উপন্যাস	২৮	৫৩,০৫০
আইন	৫	৪,০০০
বিবিধ	১২	১৮,৩০০
পুরাণ এবং হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ক	৮৫	৯৬,১৫০
নীতিকথা	১৯	৩৯,০০০
মুসলমানী বাংলা	২৩	২৪,৬০০
বিজ্ঞান	৯	১২,২৫০
সংবাদপত্র	৬	২,৯৫০
মাসিকপত্র	১২	৮,০০০
সংস্কৃত-বাংলা	১৪	১৫,০০০
মোট	৩৪২	৫,৭১,৬৭০

১৮৫৩ সালে সর্ব্ববিধ পুস্তকের তালিকা ছিল ৩,০৩,২৭৫। ইহা হইতে বুঝি যে তখন বাংলার প্লাবনের যুগ।

বাংলা বই তখন বিক্রয় করিত ফিরিওয়ালা। য়ুরোপীয় দোকানে বাংলা বই মিলিত না। চিৎপুর রোডের স্বনামখ্যাত বটতলাই ছিল বাংলা সাহিত্যের পালক ও পৃষ্ঠপোষক। বইয়ের ব্যবসা বেশ লাভজনক হইয়া উঠিয়াছিল। একজন দোকানদার মাসিক ৫০০৲ টাকা লাভ করিত।

* Annals of Indian Administration Vol. V. P. 38

প্রায় দু'শত ফিরিওয়ালা এই সব দোকানে কাজ করিত। তাহারা পাইকারী দরে কিনিয়া কলিকাতার বাঙ্গালী পাড়ায় এবং সহরের পাশে পাশে গ্রামে বিক্রয় করিয়া মাসে ৬।৮ টাকা আয় করিত। ফিরিওয়ালার এক একজনের একশ টাকা পর্য্যন্ত আয় ছিল। ফিরিওয়ালার সাহায্য না লইলে বই চলিত না—আলমারিতে পচিত।

পঞ্জিকার চল ছিল সকলের অধিক—দাম ছিল দুই আনা। জীবনের সকল কাজে পঞ্জিকাই ছিল বাঙালীর আশ্রয়।

লেখক বলিতেছেন—"A taste for history is not natural to Bengalis but it is springing up". ইতিহাসে এই অপ্রবৃত্তি আজিও গিয়াছে, একথা বলা সহজ নয়।

নাটক খুব লোকপ্রিয় ছিল।

> "In Calcutta and its neighbourhood the educated natives patronize dramas composed by Pandits which in popular language and sometimes with the sarcasm of a Moliere, condemn caste and polygamy. Shakespeare's 'Merchant of Venice' is one of the few translations of English plays in favour."

হুগলী কলেজের হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নামে এবং পরে 'রোমিও-জুলিয়েট' 'চারুমুখ-চিত্তহরা', ও ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 'ভিনিসের বণিক' অনুবাদ করিয়াছিলেন। তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ১৭৭৪ শকে লিখিত হয়—ইহাই বোধ হয় বাংলার আদি নাটক। 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক' পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন রচনা করেন। কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল এই পুস্তকে বর্ণিত আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে ইহা প্রথম অভিনীত হয়। ইহা ছাড়া পণ্ডিত-রচিত অন্য নাটকের সন্ধান আমি জানি না।

অশ্লীল ছাগ-সাহিত্যের বন্যায় বাংলাদেশ আজ বিপন্ন। যে লেখায় সাধনা প্রয়োজন, সে লেখা বাংলাদেশে চলে না। বাংলাদেশে শিক্ষা-বিস্তারের ফলে যে পাঠক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সম্প্রদায়ের অধিকাংশ কর্ম্মহীনা তরুণী বধূ, প্রৌঢ়া গৃহিণী আর বয়ঃসন্ধির কৌতূহল-উদগ্র কিশোর ও কিশোরী। অসহযোগের বন্যায় গৃহে পিতার,বিদ্যালয়ে শিক্ষকের শাসন গিয়াছে। চারিদিকে অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার রাজত্ব। প্রকাশকের দায়িত্ব নাই—পুস্তক-বিক্রেতার দায়িত্ব নাই, সমালোচক নাই, সঙ্গে প্রাণবস্তু, সমাজের জনমত নাই—কাজেই বাংলা সাহিত্যে আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

আমার বিশ্বাস ইহা নব-জীবনের পূর্ব্বাভাস। ইংরেজী সাহিত্যেও দেখি, দুটি বড় বড় যুগের মাঝে আসে বিষাদের যুগ, অবসাদের কাল, দৈন্য ও ক্লৈব্যের প্রবাহ। বাংলার বর্ত্তমান যুগও এই অন্তর্ব্বর দুঃখের যুগ—য়ুরোপীয় সাহিত্যের ভাবানুযোগে যে নবজাগরণ হইয়াছিল—তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। আগামী সাহিত্য জনচিত্তের জাগ্রত বোধের সাহিত্য, সে সাহিত্য দুনিয়াকে অবজ্ঞা করিবে না—কিন্তু তাহার ভিত্তি হইবে জনমন। সেই জনগণমন-অধিনায়কের সাক্ষাৎ নাই—তাঁহার আবির্ভাবের কোনও সাড়া পাই না, তবু আজ গ্লানির মাঝে আশা উৎসাহে আমাদের যাইতে হইবে সেই মহাপুরুষের যুগ-শঙ্খের ধ্বনি-মুখর শোভাযাত্রার দিকে।

সাহিত্যের জাগরণের পূর্ব্বক্ষণেও এইরূপ কুৎসিত ও অসুন্দরের প্রাদুর্ভাব ছিল।

> "A taste for obscene publications still prevails to a considerable extent, but the act against selling or exposing them to view is effective what a regard to morality could not do."

এই কথাটি ভাবিবার বিষয়—সত্য, নীতি ও চরিত্রের প্রতি আমাদের বুদ্ধি জাগ্রত নয়।

নানা কারণে দৌর্ব্বল্য ও হীনতা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। কাজেই যে সাহিত্য জাতির ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্লিষ্ট, পঙ্গু ও আড়ষ্ট করিবে, সে সাহিত্য যদি কলাবুদ্ধিতে নির্ব্বাপিত না হয়, তবে দেশের কল্যাণকামী আইন করিয়া তাহার প্রচার ও প্রসার বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

অবশ্য আমি puritan নই—গোঁড়ামি করিয়া এ-কথা লিখিতেছি না। আদিরস সাহিত্যের মূল রস, সে রস বিনা কাব্য ও সাহিত্য চলে না—তবে যে লেখা মানুষের পশুত্বকে জাগায়—কিশোর ও কিশোরীর চিত্তে দুর্নিবার ক্ষুধা জাগায়, সে কামায়ন বিষায়ন, একথা সকলে যেন মনে রাখেন।

বাংলা দেশ আজ যুগসন্ধির মুখে—আমাদের প্রাচীন সমাজ ভাঙ্গিতেছে, নূতন সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। বিদ্যালয়ে ও

কলেজে তরুণ ও তরুণীরা দলে দলে অবাধ মিশ্রণের সুযোগ পাইতেছে—হয়তো কুসংস্কারের ও অচলায়তনের বেড়া ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বীর্য্যের বোধ, সত্যের বোধ, কল্যাণের বোধ জাগিতেছে না।

দেশের শিক্ষায় ও শিক্ষা-মন্দিরে তপস্যার আদর্শ নাই। শিক্ষকদের মধ্যে তপস্বী নাই—ছাত্রদের মধ্যে তপঃ-সৌন্দর্য্য-পিপাসু শিষ্য নাই, চারিদিকে একটা মহা বিপ্লবের তাণ্ডবনৃত্য চলিতেছে। এই দুর্দ্দিনে সাহিত্য যদি পূতি-গন্ধময় হুঙ্কারজনক বিষবাষ্প ছড়ায়, তবে মজ্জাহীন, বীর্য্যহীন বাঙ্গালী যৌবনে বৃদ্ধ হইবে না, বৃদ্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে এবং সেই বুড়া শরীর ও মন লইয়া দুনিয়ায় দুর্দিনের পালা শেষ করিবে।

তখনকার দিনে সবচেয়ে সমাদৃত বই ছিল 'হিতোপদেশ' এবং 'চাণক্যশ্লোক'।

উপন্যাসের স্বাদ তখনই দেশবাসী পাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

> "Works of fiction are highly popular but the number printed does not render this fact very evident as the works called mythological would in many instances be more appropriately classed under the head fiction."

আইন সম্বন্ধে ১০০ বই ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবহার-তত্ত্বের আলোচনা কোনটিতে ছিল না। 'চিকিৎসার্ণব' নামে একখানি বইয়ের খুব প্রসার ছিল—এই বই ১২০০০০ বিক্রয় হইয়াছিল।

কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের আন্দোলন আধুনিক নয়—এই সালেই ইহা লইয়া উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রায় কুড়িখানি বই লেখা হইয়াছিল।

বাঙ্গালী-পরিচালিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর দৈনিকের আদর বাড়িয়াছে। তখন মাত্র ছয়টি কাগজ চলিত, সবগুলি দৈনিকও ছিল না—তাহাদের প্রচার ছিল ৩,০০০ হাজারের কম। জাতীয় জীবনে সংবাদ-পত্রের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। বাংলা কাগজের সংখ্যা বাড়িতেছে, পৃষ্ঠাসংখ্যা বাড়িতেছে, প্রচার বাড়িতেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, ভাব-গৌরব, আদর্শনিষ্ঠা বাড়িতেছে না, বরং কমিয়াছে বলিতে পারি।

সংবাদ-পত্র প্রায়শঃ কয়েকটি দলের ক্রীড়নক—তাহাতে অন্নহীন বেকারের দল সম্পাদক ও কর্ম্মী। সম্পাদনার কাজ সহজ নহে। তাহার জন্য চাই শিক্ষা ও সাধনা। সে শিক্ষা আমরা স্কুল ও কলেজে পাই না—কর্ম্মক্ষেত্রে সে সাধনায় অবসর কোথায়? তাই বাংলা কাগজ চলে ইংরাজী খবরের এবং ইংরাজী কাগজের উচ্ছিষ্ট বিতরণে। নির্ব্বিকার পাঠক তাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করে।

য়ুরোপে যাঁহারা খবরের কাগজ চালান, তাঁহারা এজন্য জলের মতন অর্থ ব্যয় করেন—বিশেষজ্ঞকে দিয়া বিশেষ প্রবন্ধ লেখান, তথ্যসংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন এবং প্রত্যেক জিনিষটিই ব্যবসার বুদ্ধিতে চালান, তাই তাহার জন্য অর্থ দেন। তাই লেখকের মধ্যে থাকে আপ্রাণ চেষ্টা, সংগ্রাহকের মধ্যে থাকে ভয়হীন উদ্যোগ।

বাংলায় পাঠক বাড়িতেছে। ইহাদিগকে দুনিয়ার খবর পণ্ডিতের চোখে, কৌশলীর চোখে দেখাইতে হইবে। পল্লবগ্রাহিতায় কতকাল আর দেশ ভুগিবে?

> "The oldest paper is the 'Chandrika', established in 1820 as the advocate of widow-burning and the old Hindu regime. The 'Prabhakar' is a daily journal begun in 1830, moderate in its tone and distinguished for the eloquence of its style and of its poetry. In 1838 the 'Purna Chandrodaya, and the 'Bhaskar' were started. The latter has long been considered the native paper of Calcutta. The 'Kaumudi' was started in 1829 by Rammohan Roy in opposition to the 'Chandrika'.

কাশীতে তখন যে সকল বাঙালী ছিলেন, তাঁহাদেরও কাগজ ছিল। বারাণসীকে বাঙালী উপনিবেশ বলা চলিত।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে সরকারী খবর জানাইবার জন্য 'বাংলা গবর্ণমেণ্ট গেজেট' প্রকাশ করা হয়।

তখনকার মাসিকপত্রের মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী' সর্ব্ব পুরাতন। ইহা ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। 'তত্ত্ববোধিনী' মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং আজিও চলিতেছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে The Vernacular Literature Society নামে একটি সমিতি গঠিত হয়—ইহাঁদের উদ্দেশ্য

খুড়োর কল

[সুকুমার রায় চৌধুরীর 'আবোল-আবোল'-এর অনুসরণে]

পাঞ্জাব সফরের এক বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র বলিয়াছেন :—"...জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভারতে সকলের জন্য দুই বেলা পেট ভরিয়া আহারের ব্যবস্থা করিতে চাই।..."

ছিল, যে সব বই স্কুল বুক সোসাইটি, বা মিশনারির ছাপান, সেই সব বই প্রকাশ করা। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ইহাঁদের মুখপত্র ছিল।

'কৃষিসংগ্রহ' ছিল Agri-horticultural Societyর মুখপত্র। ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন 'ভারতবর্ষীয় সভা-বিজ্ঞাপনী' নামে কাগজে নিজেদের মতবাদ প্রচার করিতেন। 'কলিকাতা' পত্রিকা তখন কেবল সবে আরম্ভ করা হইয়াছে। আর খৃষ্টানদের 'অরুণোদয়' নামে একটি কাগজ ছিল।

দেবদেবীর ছবি খুব চলিত। বাংলা গান সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন—

> "The Bengali songs do not include the love of mitre or war, but are devoted to Venus and the popular deities, they are filthy and polluting."

একজন গোঁড়া খৃষ্টানের লেখা—তবু এই মন্তব্যের মাঝে অনেকটা সত্য ছিল।

সংস্কৃতের প্রসার তখন কমিতেছিল।

> "The study of Sanskrit in connection with the Hindu religion is declining but more attention is paid to it as a philological instrument and a means of enriching the vernacular with terms and illustrations".

তখনকার দিনে বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান ছিল, তাহার মধ্যে প্রথম ছিল নর্ম্মাল স্কুল। কলিকাতা, হুগলি এবং ঢাকায় নর্ম্মাল স্কুল ছিল। 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সমিতি'র কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহাঁরা ১৮৫৭ পর্য্যন্ত ১৭ খানি পুস্তক অনুবাদ করেন।

'স্কুল বুক সোসাইটি' সাধারণতঃ স্কুলপাঠ্য পুস্তক ছাপিতেন। 'কলিকাতা বাইবেল সমিতি' প্রায় দশলক্ষ খৃষ্টানী বই ছাপিয়াছিলেন। আগ্রার সঙ্গে তুলনায় বাঙ্গালীদের প্রচেষ্টা কম ছিল। এই সনে আগ্রায় ৭ লক্ষ বই ছাপা হইয়াছিল।

অতীত বর্ত্তমানের জনক, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের প্রতিষ্ঠা। বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বতোমুখ বিকাশ ও পরিণতির জন্য যে চেষ্টা, তাহার কিছুই হয় নাই। সুখের বিষয়, বাংলা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আদরে আদরিণী। কিন্তু তবুও ফল বিচার করিয়া দেখিলে দুঃখিত হইতে হয়।

বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির নানা চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু সংহত শক্তিতে একাগ্র ও দৃঢ়সংকল্পিত চেষ্টার প্রয়োজন। এবিষয়ে দুইটি প্রতিষ্ঠান—বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাহিত্যপরিষদ্ নেতৃত্ব করিতে পারেন। দলাদলি ভুলিয়া স্বাভাবিক ও সহজ ভাবে বাঙ্গালী কি মাতৃভাষার সার্ব্বভৌম প্রতিপত্তির আয়োজনে লাগিবে না? কে উত্তর দিবে?

ধনতান্ত্রিকতা

...ধনতান্ত্রিকতার উচ্ছেদ সাধন করিবার জন্য সমাজ-তান্ত্রিকগণ যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা সমাজমধ্যে যে বিবাদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের মতে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়। প্রকৃত ধন কাহাকে বলে এবং কি হইলে বস্তুতঃ পক্ষে মানুষকে ধনী বলা যাইতে পারে, তাহা তলাইয়া বুঝিতে পারিলে দেখা যাইবে, বর্ত্তমান জগতে যাঁহাদিগকে ধনী বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা প্রায়শঃ প্রকৃতপক্ষে ধনী নহেন। চলতি হিসাবেও ইহাদিগকে প্রায়শঃ ধনী বলা চলে না, কারণ যাঁহারা ক্রোর ক্রোর টাকা নাড়াচাড়া করেন, তাঁহাদের প্রায়শঃ ততোধিক পরিমাণের দেনা থাকে। যাঁহাদের বা দেনা অপেক্ষা পাওনা অধিক, তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত টাকা থাকে প্রায়শঃ কোন না কোন রকমের কাগজে। যখন শস্যোৎপত্তির হ্রাসের জন্য অন্নাভাব আসন্ন হইয়া পড়ে, তখন ঐ কাগজ কার্য্যতঃ যে কোন কাযে লাগে না, তাহা জার্ম্মানীর দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই প্রতিভাত হইবে। এইরূপ ভাবে তলাইয়া চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এখন মানবসমাজ হইতে ধনী শ্রেণীর মানুষ প্রায়শঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ধনী এখন আর প্রায়শঃ নাই বটে, কিন্তু ধনীর চাল, অর্থাৎ ধনবত্তার আস্ফালন অনেকের মধ্যে যে বিদ্যমান আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদিগের মতে ঐ আস্ফালন নির্ম্মূল করিবার জন্য কোন প্রযত্ন অথবা বিবাদের প্রয়োজন হইবে না। কৃষক ও শ্রমজীবিগণের অন্নাভাবের তাড়নায় উহা অদূর-ভবিষ্যতে আপনা হইতেই শুষ্ক হইয়া যাইবে।...

চিত্র-চরিত্র

—শ্রীঅমিত রায়

মাইকেল মধুসূদন

১৮৬৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মাইকেল ব্যারিষ্টাররূপে হাইকোর্টে প্রবেশের জন্য দরখাস্ত করিলেন—এটা কেবল একটা গতানুগতিক প্রথা রক্ষার ব্যাপার, কিন্তু মধুসূদনের ভাগ্যে বিপরীত হইল—একজন জজ মন্তব্য করিলেন—"মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব-ইতিহাস সুবিধাজনক নহে।" তখন অনন্যোপায় মধুসূদন তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস যে সুবিধাজনক, তা প্রমাণ করিবার জন্য দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সার্টিফিকেট সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন।

কবি মধুসূদন নিজের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কাহারও কাছে সার্টিফিকেটের অপেক্ষা রাখিতেন না, স্বহস্তে অমরতার মুকুট মাথায় পরিয়া বন্ধুদের বলিতেন, 'এ কাব্য কি আমাকে অমর করিবে না?' কিন্তু সেই মধুসূদন কুবেরের সিংহ দরজায় প্রবেশে বাধা পাইয়া সরস্বতীর দরবারের মাল্যচন্দনের খ্যাতি ভুলিয়া প্রশংসাপত্র যাচিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস কেন যে সুবিধাজনক নয়, জজেরা তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, বোধ করি, মধুসূদনের সুরাপানের অখ্যাতি তাঁহাদের কাণে উঠিয়াছিল। জজেদের দোষ দেওয়া যায় না, ব্যারিষ্টার হইয়া সুরাপান করা দোষের নয়, কিন্তু ব্যারিষ্টার হইবার পূর্ব্বে একজন সাধারণ ব্যক্তি সুরা পান করিবে—এ স্পর্দ্ধা অসহ্য। পরিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া জজেদের মন্তব্য বিশ্বাস করিতে হইলে ধরিয়া লইতে হইবে, কোন ব্যারিষ্টার সুরাপান করেন না, কাজেই মধুসূদনের চরিত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিবার আদেশ হইল।

মধুসূদনের চরিত্র ও প্রতিভা সম্বন্ধে একগোছা প্রশংসাপত্র সংগৃহীত হইল; অবচেতন শ্লেষ বহিয়া সেগুলি আজিও তাঁহার জীবনীর মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। এ সব প্রশংসাপত্র একটা কথা প্রমাণ করে যে, এই কয় বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে এই ধারাটার যেমন উন্নতি ঘটিয়াছে, এমন আর কোন ধারার নয়। প্রশংসাপত্র রচনার রীতি অত্যুচ্চ প্রশংসা ও অতি নিম্ন নিন্দার মধ্যে দোল খাইতে খাইতে চলিয়াছে।

অবশেষে, এই সব প্রশংসাপত্রের বলে মাইকেল ২৫শে এপ্রিল হাইকোর্টে ব্যারিষ্টার রূপে প্রবেশ করিলেন। মধুসূদন প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিলাত গিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করা অসম্ভব নয়। কেবল আর একটি কথা প্রমাণের বাকি রহিল যে, ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে উন্নতি করা তাঁহার মত লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা প্রমাণ করিতে তাঁহার বেশী দিন সময় লাগে নাই।

মাইকেলের ব্যারিষ্টারী ব্যবসা সম্বন্ধে নানা মত আছে, তবে একটি বিষয়ে সকলেই একমত যে, যেমন তাঁহার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে এতে অসামান্যতা লাভ করা অসম্ভব নয়, তেমনি তাঁহার মত চারিত্রিক স্থৈর্য্য যাহার অপ্রচুর, তাহার পক্ষে এতে উন্নতি করা এক রকম অসম্ভব। আইন-ব্যবসায়ের সোনার খনির পথটা মরুভূমির সেই অঞ্চল দিয়া, যাহার দুই দিকে মরীচিকার নদী তরঙ্গিত। মাইকেল যদি জীবনের দুই কোটিতে গুণ পরাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিতেন—তবে হয়তো ঘটনা অন্য দিকে মোড় ফিরিত, কিন্তু সরস্বতীর হাঁস ও লক্ষ্মীর পেঁচাকে জুড়িয়া দিয়া পুষ্পকরথ চালাইতে তাঁহার প্রয়াস।

নিজের ঘরে যখন মামলা তৈয়ারী করিবার জন্য আইন অধ্যয়ন করা দরকার, তখন তিনি বসিয়া সখীসম্বাদ শুনিতেন; সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধব আসিলে আইনের বই ফেলিয়া রাখিয়া সাহিত্যালোচনা করিতেন; বন্ধুরা তাঁহার কাজের ক্ষতি হইতেছে মনে করিয়া উঠিতে চাহিলে তিনি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের জড়াইয়া ধরিতেন।

একদিন বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীকে দেখিয়া তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া নাট্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। এমন কি আদালত-গৃহে,

জজের সম্মুখে আইনের নীরন্ধ্র দেয়ালের মধ্যেও কবিতার বাসন্তিক বায়ু বহাইয়া দিতেন—

'Like a Machranga stoops the plaintiff.'

বারংবার লক্ষ্মীর পেচকের পরাজয় ঘটিতে লাগিল, সে প্রতিশোধের অবসরের আশায় অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল,—বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।

ব্যারিষ্টারী জীবনের প্রথম বছরেই মাইকেলের মাসিক আয় দেড় হইতে দু'হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল—; যে কোন ভদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে এ আয় যথেষ্ট। কিন্তু যাঁহার ভদ্রভাবে জীবন-যাপনের বার্ষিক আদর্শ চল্লিশ হাজার টাকা, তাঁহার পক্ষে এ টাকা একান্ত অপর্য্যাপ্ত। বিশেষ, মধুসূদনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বরাবর বেশি; হোটেলের সু-দীর্ঘ বিল; মদ্যভাণ্ডারের অপরিমিত দানসত্র; বিলাতের ঋণ, আর প্রতিমাসে স্ত্রী-কন্যার জন্য ইউরোপে প্রেরণ তিনশত টাকা! মধুসূদনের ঋণ সুদে ও আসলে শনৈঃ শনৈঃ গোকুলে বাড়িতে লাগিল; তবে ভরসা এই যে, গোকুলটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গৃহ।

মধুসূদনের হোটেলবাসের সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী লেখক বলিতেছেন, "স্পেনসেস্ হোটেলে মাইকেল মধুসূদন একাকী বাস করিতেন; কিন্তু তিনখানি বড় বড় ঘর তাঁহার অধিকৃত ছিল। তিনি বন্ধুবান্ধবদিগকে সতত পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত করিতেন। দেশী, বিলাতী, যিনি যেরূপ খানা খাইতেন, তিনি তাঁহাকে সেইরূপ খাদ্যদানে তৃপ্ত করিতেন। তাঁহার মদ্যের ভাণ্ডার সতত উন্মুক্ত ছিল। হাইকোর্টের এটর্নী-কৌঁসুলী হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজের সামান্য কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলকেই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে মদ্যপানের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেন। এমন কি, তাঁহার মুন্সী যখন কার্য্যান্তে বিদায় লইতে যাইত, তখন তিনি বলিতেন, "Moonshi, don't go away; Boy! give him a peg!" মধুসূদন যে মধুচক্র রচনা করিয়াছিলেন, গৌড়জন আনন্দে সে সুধা নিরবধি পান করিতেছিল।

কিন্তু অর্থে টান পড়িত; ইউরোপে যথাকালে টাকা পাঠান হইত না; মধুচক্রের বিল মৌমাছির হুলের তীক্ষ্ণতা লাভ করিত; হোটেলের কর্তৃপক্ষের মসৃণ ললাটে ঝড়ের পূর্ব্বাভাস বহিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি বলিত হইয়া উঠিত—তখন মাইকেলের মনে পড়িয়া যাইত, 'মাই ডিয়ার ভিড্‌কে।'

মাই ডিয়ার ভিড্,

> তুমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ জানিয়া সুখী হইলাম, কারণ তোমাকে অনুকূলের কাছ হইতে ইউরোপের জন্য এক হাজার টাকা লইয়া দিতে হইবে। যদি তুমি আর দশজনের মত ব্যক্তি হইতে, তবে তোমাকে আমার জন্য এ সব কাজে পুনরায় জড়াইয়া ফেলিতে দ্বিধা বোধ করিতাম। কিন্তু যদিও তুমি বাঙালী—তবু তুমি মানুষ—বন্ধুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, আমার বিশ্বাস, তুমি সবই করিতে পার।···আমি যা রোজগার করি, সবই হোটেলের খরচে যায়—কারণ এখানে আমি ঋণী হইয়া থাকিতে চাই না।···যদি তুমি ২৫শে তারিখের ফরাসী ডাকের পূর্ব্বে এই টাকা সংগ্রহ করিতে না পার, তবে ইউরোপে তাহারা অনাহারে মারা পড়িবে।'
>
> বাস্! শেষ ছত্রে অমোঘ বজ্র নিক্ষিপ্ত হইল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়—তারপরেও সুদীর্ঘ এক প্যারাগ্রাফে এ হেন সঙ্কটকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কর্ত্তব্য কি, সে বিষয়ে বিশদ্ আলোচনা আছে।

এ সব পত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনে কি ভাব উদিত হইত—এক একবার কল্পনা করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করি।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন—সংবাদ পাইয়া মধুসূদন ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন—কিন্তু পা মচকাইয়া শয্যাশায়ী—যাইবার উপায় নাই। তিনি একটি সনেট লিখিয়া পাঠাইলেন—

> "শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
> হে ঈশ্বরচন্দ্র! ·····
>
> *
>
> কবি পুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার"

ক্রন্দনের অর্থ-নৈতিক হেতু যথেষ্ট আছে, কারণ, মধুসূদনের ঋণসংগ্রহের জন্যও অন্ততঃ তাঁহার সুস্থ থাকা আবশ্যক! তবে এ সনেটের মূলে কি ভাব? বেদনা—না খোসামোদ?

মধুসূদনের শেষ জীবন অর্থের স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাতে পরিভ্রমণের ইতিহাস; অর্থের স্বর্ণ-মৃগও আয়ত্ত হইল না, কাব্যের সীতাও অপহৃত হইল!

একদিন তিনি একটি নূতন মূল্যবান্ পোষাক পরিয়া আয়নায় ছায়া দেখিয়া পাশের বন্ধুকে বলিয়া উঠিলেন 'Do I not look the Maharaja of Burdwan !' এই উক্তির মধ্যে তাঁর শেষ জীবনের ইতিহাস গুপ্ত। মিল্টন হইবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—এখন তিনি বৰ্দ্ধমানের রাজত্ব কল্পনায় ভোগ করিতেছেন।

আর একদিন কৃষ্ণনগরাধিপতি সতীশচন্দ্রকে অনুসরণ করিতে করিতে মধুসূদন বলিয়া উঠিলেন—'I see Krishna Chandra followed by Bharat Chandra !'

কবি-প্রতিভায় মধুসূদন নিশ্চয়ই নিজকে ভারতচন্দ্রের সমপর্য্যায়ী মনে করিতেন না,—অনেক উচ্চে! তবে কেন নিজকে ভারতচন্দ্র কল্পনা করিলেন? কারণ ভারতচন্দ্রকে অর্থাভাবে পড়িতে হয় নাই। কৃষ্ণনগরের দত্ত সম্পত্তি তাঁহার ছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার জীবনীকার লিখিতেছেন—

"একদিন মহারাজা কথাপ্রসঙ্গে মধুসূদনকে বলিলেন, 'এতদিন আমাদের ভারতচন্দ্র বঙ্গকবিদিগের মধ্যে প্রধান আসন অধিকার করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে সে আসন আপনি কাড়িয়া লইতেছেন।' এই কথার মধুসূদন বলেন—'আপনারা ভারতচন্দ্রকে ৩০০৲ টাকার গাঁতি দিয়াছিলেন, আমাকে কি দিবেন?' ইহা শুনিয়া মহারাজ সতীশচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মত সম্পত্তি থাকিত, আমি আপনাকে ৩০,০০০৲ টাকার জমিদারি দিতাম।'

বোধ হয় এমন রাজকীয় উক্তিতেও মধুসূদন সন্তুষ্ট হন নাই—কারণ ত্রিশ হাজার টাকায় তাঁহার কি হইবে? চল্লিশ হাজার হইলে তবে ভদ্রভাবে জীবন যাপন করা যায়।

শেষ বয়সে অর্থাভাবে পড়িয়া তিনি বৰ্দ্ধমানের মহারাজাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে রাজকবি নিযুক্ত করিতে।

গর্ব্বিত-স্বভাব মধুসূদন এ সব পরোক্ষ যাচ্ঞা কেমন করিয়া করিলেন? তবে কি অভাবের পীড়নে চিরকালের স্বভাবের অহঙ্কার দুরীভূত হইয়াছিল? না—এ সব প্রার্থনাও তাঁহার অহঙ্কারের একটা প্রকাশ! ভাবটা এই রকম—'আমি সত্যকারের প্রতিভাবান্ ব্যক্তি, তোমাদের আমি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করিবার সুযোগ দিতেছি, যদি বুদ্ধিমান্ হও গ্রহণ কর।'

২

১৮৬৯ সালের মে মাসে হেনরিয়েটা পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন—তখন মধুসূদন হোটেল ছাড়িয়া ৬নং লাউডন ষ্ট্রীটের প্রাসাদোপম বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, এখানে তিনি প্রায় তিন বছরকাল ছিলেন।

লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীকে প্রাসাদ বলাই উচিত—সুবৃহৎ অট্টালিকা, সুসজ্জিত কক্ষ, চারিদিকে সুন্দর উদ্যান ও লতাকুঞ্জ; ভাড়া মাসিক মাত্র চারিশত টাকা। এই বাড়ীতে মধুসূদন ঋণ-করা টাকায় বিলাসের পেখম মেলিয়া দিয়া সপরিবারে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কবির নিজের পাঠাগার ইউরোপ হইতে আনীত হোমার, দান্তে, ভার্জ্জিল, টাসো, শেকস্পীয়ার ও মিল্টনের আবক্ষ মূর্ত্তিতে সজ্জিত, মধুসূদনের ভাবগতিক দেখিয়া সকলে বোধ করি দারুভূত।

কবি সপরিবারে বেড়াইবার জন্য প্রকাণ্ড একখানি অশ্বশকট কিনিয়াছিলেন, বন্ধুমহলে 'গ্র্যাণ্ড ক্যারেজ' নামে প্রসিদ্ধ। মাসে দুই তিন দিন বিশিষ্ট বন্ধুদের লইয়া বড় রকম ভোজ চলিত; দ্বারকানাথ মিত্র হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইলে একটি বিরাট ভোজের আয়োজন হইল; প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পাচক প্রিন্স মাইকেলের পাচকের পদ অধিষ্ঠিত; সমস্ত দেখিয়া মনে হইত, মাইকেল তাঁর চল্লিশ হাজারী আদর্শ ভদ্রতার দরজায় গিয়া বুঝি পৌঁছিয়াছেন।

কিন্তু গণিতশাস্ত্র যেমন নিরপেক্ষ, তেমনি নির্দ্দয়। মাইকেলের ঋণ অমোঘ নিয়মে বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

১৮৭০-এ তিনি প্রিভি কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এই পদের মাসিক বেতন দেড় হাজার টাকা! কিন্তু দেড় হাজার টাকা অতল সৈকতে বারিবিন্দু! আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য না ঘটাতে মধুসূদনের দেনা ক্রমে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। আর সব চেয়ে বড় বিপদ্ এই যে, নূতন ঋণের পথ বন্ধ হইয়া আসিল। এমন কি বিদ্যাসাগরীয় বদান্যতাও আর নূতন ঋণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল না। মাইকেলের কাছে আয়ের অনেক উপায়ের মধ্যে ঋণও অন্যতম এবং বোধ করি সহজতম, ঋণের পথ বন্ধ হওয়াতে এতদিনে সত্যসত্যই মাইকেল ভাঙ্গিয়া পড়িলেন,

দুর্দ্দম পাহাড়ী নদের শরীর ও মনের দুই কূলে এক সঙ্গে ভাঙ্গন ধরিল।

পাওনাদারের ভয়ে বাড়ী হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইল, বাড়ী হইতে বাহির হওয়া বন্ধ হইবার সঙ্গে আয়ের পথ বন্ধ হইল, যে-সব বন্ধুবান্ধব তাঁহার এই দুর্দ্দিনে কাজ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, কাজ করিয়া দিয়া তাঁহাদের কাছে হইতে ফি লইতেন না। ফি লইতেন না, কিন্তু ঋণ লইতেন। একদিন এক বন্ধুর কাজ করিয়া দিয়া সে ফি বাহির করিতে উদ্যত হইলে, মাইকেল বলিলেন, 'সে কি আমি তোমার কাছে ফি লইতে পারি না। তবে যদি আমার গৃহিনীকে পাঁচটি টাকা ঋণ দিয়া আসিতে পার, তবে ভাল হয়, ঘরে আজ এক পয়সাও নাই।'

আবার রাধাকিশোর ঘোষ নামে একটি বন্ধুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, ঋণদাতাদের ভয়ে বাড়ী হইতে পাল্কী-বদ্ধ অবস্থায় আদালত পর্য্যন্ত যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ফিরিবার পথেও সেই পাল্কীবদ্ধ অবস্থা। রাধাকিশোর বাবু ফি দিতে চাহিলে, মধুসূদন সম্মত হইলেন না—শেষে অনেক পীড়াপীড়িতে রাজি হইয়া বলিলেন, এক বোতল বার্গেণ্ডি, আধ ডজন বিয়ার, এক শত মালদহের আম আমার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিও। এরকম ঘটনা একটি দুইটি নয়; সপরিবারে নুনাহারের সম্মুখে বসিয়া এমন ঘটনা প্রায় নিত্যই ঘটিত।

কিন্তু আর চলিল না, অবশেষে লাউডন ষ্ট্রীটের প্রাসাদ ছাড়িতে হইল। ১৮৭২-এ মধুসূদন সপরিবারে ইটালীর বেনিয়াপুকুর রোডে উঠিয়া আসিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বাজিৎপুরের ঘাট

—শ্রীদীপ্তিরাণী মজুমদার

ছাতনীর মাঠ বাঁও হাতে রেখে রশি পাঁচ ছয় দূর
বরাবর সোজা চলে গেলে পরে পুরানো বাজিৎপুর।
শ্মশান-ঘাট এর পশ্চিম দিকে, নীলকুঠী আরো পূবে,
দক্ষিণে ধূ ধূ তৃণহীন মাঠ বালুতে গিয়েছে ডুবে।
ভাঙ্গনেতে ভাঙ্গা পাড়ির উপর জোড়া বট 'পাইকর'
তাহারি তলায় দীমু বোরেগীর 'ছোন'-ওঠা চালা-ঘর।
আজ হেথা বসে শুধু মনে হয় পুরানো দিনের কথা
পদ্মার সেই ফেনিলোচ্ছল নিষ্ঠুর চপলতা!
কত ধনিকের সব কিছু নিয়ে এনে দেছে দুর্দ্দিন,
কত মন্দির, কুটীর, কবর এইখানে হল লীন!

অজানা দেশের পালতোলা তরী হলে তুফানের ভয়
লগী ও নোঙরে এর কূলে কূলে নিত এসে আশ্রয়।
সাবধানী বাঁশী বাজায়ে যখন আসিত জাহাজখানি
বিরহ মিলনে হত প্রাণীর অমুখর জানাজানি।
কত সজ্জন, কীর্ত্তিমানের পবিত্র পদ চুমি
ধন্য হয়েছে পল্লীমায়ের ঊষর ধূসর ভূমি।
পাশে স্নানঘাটে গাঁয়ের বধূরা দু'হাতে ঘোমটা খুলি
চেনা ও অচেনা যাত্রী দেখেছে কুতূহলী আঁখি তুলি।
আজ হেথা আর আসে নাকো কেউ সেই সেদিনের মত
অশ্রু ও হাসি সকলি হয়েছে কালের কুক্ষিগত।

বাজিৎপুরের ঘাটে আজ শুধু শ্মশানের হাহাকার,
পদ্মা মরেছে, মনে ও মাটীতে তবু স্মৃতি আছে তার।

ছোটনাগপুরের মালভূমি

—শ্রীকাননগোপাল বাগচী

বাঙ্গালা, বিহার বা উড়িষ্যার বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত বন্ধুর এই মালভূমি ছোটনাগপুর সহজেই পরিব্রাজকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আশ-পাশের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ছোটনাগপুর দাঁড়িয়ে আছে। শাসন-

জগদ্ধাত্রী পূজা (সেরাইকেলা)

তন্ত্রের দিক্ থেকে ছোটনাগপুরকে বিহারের অন্তর্গত করার কোন যুক্তি আছে কি না, জানি না, তবে ভূ-প্রকৃতির হিসাব করলে একে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গেই মেশাতে হয়। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, ছোটনাগপুর না কি দাক্ষিণাত্য মালভূমিরই অংশবিশেষ; শুধু তাই নয়, ছোটনাগপুর পৃথিবীর দৃঢ় অংশসমূহের অন্যতম—আজ প্রায় পঞ্চাশ কোটী বছর ধরে ভূমিকম্প বা আগ্নেয় উৎপাতের বিপর্য্যয় এখানে ঘটে নি।

তাঁরা আরও অনুমান করেন, বহু পূর্ব্বে, যখন এই মালভূমির জন্ম হয় নি, তখন এখানে বিরাজ করত উঁচু এক পর্ব্বত। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে জল, বাতাস ও সূর্য্যের তাপ ইত্যাদির প্রভাবে তার ক্ষয় হয়ে তৈরী হল ছোটনাগপুর মালভূমির। এখানকার পাহাড়, অধিত্যকা, নদী, সমস্তই প্রাচীনতার পরিচয় দেয়। হিমালয় প্রদেশের পাহাড়গুলো অল্পদিনের ব'লে তাদের মাথাগুলো এখনও কোণাকার আছে, কিন্তু এখানকার পাহাড়ের উপর অংশ সমস্তই অল্প-বিস্তর চ্যাপ্টা। অধিত্যকাগুলিরও অসমতা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হয়ে প্রায় সমান হয়ে এসেছে। তবে এই সমান ভাব সমতল প্রান্তরের মত নয়। অধিত্যকা বললেই আমরা ভাবি, উচ্চ স্থানে অবস্থিত সমতল ভূভাগ। কিন্তু ছোটনাগপুরের মালভূমি পর্য্যবেক্ষণ করলেই সে ধারণা বদলে যাবে। কি পাহাড়, কি অধিত্যকা, এমন কি অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিগুলিরও অল্প-বিস্তর একটা ঢাল আছে। কোন কোন অধিত্যকা কেন্দ্র হতে চারিদিকে, আবার কোন অধিত্যকা একধার হতে অপর পার্শ্বে গড়িয়ে যায়। ছোটনাগপুর পাহাড় বলা যায় না, কারণ পর্ব্বত অঞ্চলে খাড়া জমিই বেশী, অথচ এখানে ভূমি অল্প-বিস্তর চ্যাপ্টা, আবার সমতল প্রদেশ হতে এর পার্থক্য লক্ষিত হয় অসমান প্রকৃতি হতে। এই জন্যই একে মালভূমি বলা হয়।

বাঁধে মাছ ধরা

কুমার—সেরাইকেলা

বাঙ্গালা বা বিহারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বা আকৃতি হতে ছোটনাগপুরের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এখানে বিভিন্ন উপাদানের

পাথর দেখা যায়। তারা জল-বায়ুর সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ভূমির সৃষ্টি করে। এর জন্য জমির পার্থক্য অনুসারে গাছপালার প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হয়। তা ছাড়া কঠিন পাথরগুলো জল-বায়ুর উপদ্রব বেশী সহ্য করতে পারে বলে, তারাই পাহাড় ও উঁচু স্থানের গঠন করে। যে সব পাথর এর চেয়ে নরম, তারা বেশী ক্ষয় হয়ে মালভূমি বা অধিত্যকাতে পরিণত হয়। এ হতেও যে পাথর কোমল, তার সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। এসব আরও নিম্নস্থান, উপত্যকার সৃষ্টি করে। এই তিন শ্রেণীর ভূভাগই এখানে আছে।

ছোটনাগপুরের এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকা-সমাবেশের মধ্যে স্থানে স্থানে উঁচু পাহাড় বা 'ডুঙরি'গুলি দাঁড়িয়ে থেকে একটা বৈচিত্র্য এনে দেয়। এসব উঁচু ডুঙরির পাশ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যায় অসংখ্য জলধারা। অধিত্যকার নীচে গিয়ে তারা মিলিত হয়ে ছোট বড় নদীতে পরিণত হয়। ছোটনাগপুরের নদী সমতল প্রদেশের নদী হতে একেবারে পৃথক্। বাঙ্গলা বা বিহারের নদী-নালার মত এদের পাড়ে সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে উঠে নি বা কলকারখানাও বাঙ্গালার মত সুপ্রচুর নয়, তাই নদীগুলি প্রাণের স্পন্দনে অর্থাৎ স্রোতের বেগে ভরপুর। শুধু বর্ষাকালেই এই সব নদীতে জল থাকে, গ্রীষ্মের সময় কয়েকটি বড় নদী ভিন্ন অপর সবগুলিই শুকিয়ে যায়। তবু যে কটা দিন জল থাকে, মধুর কল্লোলে সমস্ত অঞ্চল মুখরিত করে। এই সব নদীর বেগ এমন প্রখর যে, কোন বাধাই

নাড়ী রৌদ্রে শুখাইয়া তাঁত প্রস্তুত করা হইতেছে

বৃষ্টির জলে নরম মাটি ধুইয়া গিয়া ছোট ছোট 'ডুঙরি'র সৃষ্টি হইয়াছে

সঞ্জয় নদী—স্রোতের বেগে পাহাড়ের গা ফাটিয়া বহিয়া চলিয়াছে

সহরে সরবরাহের জন্য নদীতে বাঁধ দিয়া জল-সঞ্চয়ের ব্যবস্থা

বৃষ্টির জলে অধিত্যকার প্রান্তভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে

বিজয় নদী—স্রোতের বেগে পাথরে গর্ত্ত হইয়া গিয়াছে

এরা গ্রাহ্য করে না, এমন কি পথে পাথর ইত্যাদি পড়লেও স্রোতের বেগে গর্ত্ত হয়ে যায়। জলপ্রপাত ও ঝরণা ছোটনাগপুরকে আরও সুন্দর করেছে। ছোটনাগপুরের সৌন্দর্য্য এই সব ছোট ছোট স্রোতস্বিনীদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ। কিন্তু বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময়ে জল থাকে না বলে কৃষিকার্য্যের জন্য এদের উপকার পাওয়া যায় না। একমাত্র মাছ ধরা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যে এদের ব্যবহার নেই।

ধান মাপা ও ধান ঝাড়া চক্রধরপুর রাজপ্রাসাদ

ছোটনাগপুরে বহু বন আছে এবং অনেকগুলি সংরক্ষিত। এ সব জঙ্গলে শালই প্রধান, তবে আশন, করঞ্জ, নিম, বাঁশ, মহুয়া ইত্যাদি গাছও আছে। শাল গাছ হতে এখানকার লোকে অনেক উপকার পায়। শালের তক্তা, জ্বালানি কাঠ, দাঁতন, ভাত খাওয়ার পাতা ও গৃহের সরঞ্জাম ইত্যাদি সমস্তই শালের। ছোটনাগপুরের জঙ্গল স্থানে স্থানে অত্যন্ত ঘন, আবার জায়গায় জায়গায় একেবারে বৃক্ষহীন। এর মূলে রয়েছে জমির পার্থক্য। এখানকার জঙ্গলে শিকারের উপযোগী জন্তু-জানোয়ারও প্রচুর আছে।

অন্যান্য মালভূমির মত ছোটনাগপুরও বাঙ্গলা বা বিহারের মত উর্ব্বর নয়। পশুচারণ এখানকার অধিবাসীদের জীবিকার্জ্জনের একটা প্রধান উপায় ছিল, তবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিক্ষেত্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। কতকগুলি ক্ষেত্র এতই শক্ত যে, স্বাভাবিক ঘাস ছাড়া সেখানে আর কিছু জন্মে না এবং সেই স্থানগুলি এখনও চারণভূমিরূপে রয়েছে। জঙ্গলগুলিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। বন হতে আদিম অধিবাসীরা বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্য আহরণ করে, যেমন দড়ী করার ঘাস, গাছের ছাল, তেল তৈরীর জন্য নিম, করঞ্জ ও মহুয়ার ফল ইত্যাদি। এইসব দ্রব্য বিক্রয় করে তারা অন্যান্য দ্রব্য, যেমন নুণ, তামাক, তুলা বা সূতা ইত্যাদি নিয়ে থাকে।

আজ-কাল ছোটনাগপুরের অনেকটা অংশ চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে চাষ করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য। বছরে মাত্র একবার চাষ করা যায়, অন্য সময় জমী শক্ত হয়ে যায় ও নদীগুলিও শুকিয়ে থাকে। অত্যন্ত ঢালু বলে এখানকার জমীতে জলও সঞ্চিত হয় না। প্রধান এবং একমাত্র উৎপন্ন শস্য হল ধান। অপেক্ষাকৃত নিম্ন স্থানগুলিতে বা জলাশয়ের কাছে শাক্‌-সব্জি অল্প পরিমাণে জন্মে। প্রত্যেক বর্ষাতেই জলের বেগে নরম মাটী ধুয়ে যায় বলে এখানকার জমী অত্যধিক শক্ত ও অনুর্ব্বর।

গ্রীষ্মের সময় পানীয় জলের জন্য ছোট ছোট কুয়ো এবং পুকুর, বাঁধ ইত্যাদি দেখা যায়। আধুনিক সহরগুলির কাছেই নদীতে বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চিত করার ব্যবস্থা আছে। এইগুলিও আবার অনেক সময় শুকিয়ে যায় এবং সময় সময় এই জন্য টাটাকোম্পানীকে দুর্ভাবনায় পড়তে হয়।

ছোটনাগপুরের অধিকাংশই আদিম অধিবাসী—কোল, সাঁওতাল বা নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের দিয়ে অধিকৃত। বহু পূর্ব্ব হতেই সমতল প্রদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে এরা এখানে আশ্রয় নিয়েছে। মারাঠা বা মুসলমান সৈন্যরা কখনই এ অঞ্চল অধিকার করতে কষ্ট স্বীকার করে নি—দুর্গমতা ও বাসের অসুবিধার জন্য পূর্ব্বে ছোটনাগপুর ভ্রমণকারীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি, সম্প্রতি হয়েছে। অসংখ্য টীলা ও নদী-নালা এবং অসমতার জন্য স্থানান্তরে যাওয়ার অত্যন্ত অসুবিধা থাকায় এসব অঞ্চলে ব্যবসা বা সভ্যতার বিনিময় সহজে ঘটে না। ফলে

এখানকার আদিম অধিবাসীরা অনেকটা অসংস্কৃত ও প্রাচীন মনোভাবাপন্ন থেকে গিয়েছে। সমস্ত বিষয়েই তাদের একটা রক্ষণশীলভাব দেখা যায়। স্বাভাবিক বেষ্টনীর জন্য ও প্রকৃতির কাছ হতে অনেক সাহায্য নেয় বলে এখানকার অধিবাসীরা প্রকৃতির প্রভাব পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বজায় রেখেছে। প্রকৃতি-পূজা, লতা-পাতার আভরণ ও নিসর্গ সম্বন্ধে কবিতা এদের প্রকৃতি-প্রীতির পরিচয় দেয়। স্বভাবও এদের খুব সরল ও অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি এখনও বজায় রেখেছে। বলা বাহুল্য, এরা বেশ স্বাস্থ্যবান ও কষ্টসহ।

এদের সঙ্গে আজকাল সংঘাত ঘটছে হিন্দু সংস্কৃতির। স্বাবলম্বী সমাজ-নীতি আজকাল কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই থাকতে পারছে না। বর্ত্তমান যুগই হচ্ছে আদান-প্রদানের। সেইজন্য কোল-সাঁওতালরাও হিন্দুদের কাছ হতে ব্যবসার জন্যই হোক্ বা দৈহিক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকার্জ্জনের জন্যই হোক্, মেলামেশার ফলে বহু ভাব ও চিন্তাধারা গ্রহণ করছে। পূজা-পার্ব্বণ ও আচার-ব্যবহারেও এই সব লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক অবস্থাও মানুষকে আচার-ব্যবহার পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য করায়। একটা উদাহরণ দিই। পূর্ব্বে কোলরা মৃতদেহকে দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে শুইয়ে দাহ করত। পরে ভস্ম সমাধিস্থ করে স্মৃতি নির্ম্মাণ করা হত। এখন জঙ্গল কমে যাওয়ায়, কাঠের মূল্য গিয়েছে বেড়ে। সুতরাং পূর্ব্ব প্রথারও পরিবর্ত্তন হয়েছে। দাহ না করে তারা এখন মৃতদেহকে পুঁতে দেয়, তবে পূর্ব্ব নিয়ম অনুযায়ী মাথাটা এখনও দক্ষিণ দিকেই থাকে। পরে অস্থি সমাধিস্থ করে।

শুধু আদিম অধিবাসীরাই যে, এখানে অন্য ধর্ম্মের সংঘাতে এসেছে তা নয়, এখানকার হিন্দুরাও কোল বা সাঁওতালদের পূজা-পার্ব্বণও অনেক মেনে নিয়েছে—বস্তুতঃ সভ্যতার বিনিময় ঘটেছে পরস্পরের—কারও কম, কারও বেশী। এ ছাড়া আজকাল খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রভাবও প্রচুর সঞ্চারিত হয়েছে উভয়ের ভিতর। পাশ্চাত্ত্য আদর্শে কৃত্রিম সভ্যতা আস্তে আস্তে এ সব দেশে এসে পড়ছে। টাটানগর, রাঁচী, চক্রধরপুর ইত্যাদি আধুনিক সহরগুলি এ বিষয়ে সহায়তা করছে। এর একটা কুফলস্বরূপ, গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহুলোক অনিশ্চিত বা কঠোর জীবন ধারণের উপায় পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ নিশ্চিত জীবিকার্জ্জনের উপায়গ্রহণের জন্য সহরে এসে মজুর হিসাবে বাস করছে। এতে গ্রাম ও সমাজ দুই-ই প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। প্রাচীন শান্তি ও সন্তোষের পরিবর্ত্তে দেখা যাচ্ছে, অসন্তোষ ও কুটিলতা। অনাড়ম্বর জীবনের স্থানে আশ্রয় পাচ্ছে স্বার্থপর, কৃত্রিম বসবাস।

ছোটনাগপুরে অধিকাংশ আধুনিক জনপদ সম্ভব হয়েছে এর খনিজ ধাতু সঞ্চয়ের জন্য। টাটানগর, ঘাটশীলা, হাজারিবাগ সমস্ত স্থানেই কোন না কোন খনিজ ধাতু আছে। অন্যান্য জনপদগুলি হয় ব্যবসাক্ষেত্র, নয় শাসন-কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া কয়েকটি দেশীয় রাজ্যও এখানে রয়েছে—যেমন ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা ও খরশোঁয়া।

...বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগকে কোনরূপ বিব্রত না করিয়া, অথবা উহাকে উপেক্ষা করিয়া দারিদ্র্য দূর করিবার কর্ম্মসূত্রে হস্তক্ষেপ করা সম্ভবযোগ্য হইতে পারে বটে এবং আপাততঃ তাহাই করা পরামর্শসঙ্গত বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যেরূপ সামাজিক শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহার পরিবর্ত্তন সাধন না করিতে পারিলে, জনসাধারণের দারিদ্র্য কখনও সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবযোগ্য হইবে না। বর্ত্তমান সামাজিক শ্রেণীবিভাগের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে বলিয়া, সকলকেই সামাজিকভাবে এক শ্রেণীর করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহা বলা চলে না এবং তাহা করা সম্ভবও নহে। কারণ, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, স্বভাবতই মানুষ একাধিক শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন মানুষ পঠন-পাঠন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যে স্বভাববশেই যেরূপ সুনিপুণ হইয়া থাকেন, শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। আবার কোন মানুষ শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যে স্বভাববশেই যেরূপ সুনিপুণ হইয়া থাকেন, শত চেষ্টা করিলেও পঠন-পাঠন ও তত্ত্বাবধানের কার্য্যে সেইরূপ সুনিপুণতা লাভ করিতে সক্ষম হন না। স্বভাবের এই নিয়মের বিরোধিতা করিবার আয়োজন করিয়া সকলকে একশ্রেণীভুক্ত করিতে চেষ্টা করা কখনও সুফলপ্রদ হইতে পারে না।...

—শ্রীঅপরাজিতা দেবী

৪১

'জন্মের মতন আহা ডাকিহ একবার
প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার—'

ঘরের দরজা ভেজানো, রাত্রে সরলা, মেজ-বৌ, সুখেন, শ্যামল বার বার আসিয়া দেখিয়া যায়, এজন্য বড়-বৌ ঘরে খিল দেয় না। রাত্রি অনেক, পিল্‌সুজের উপর ক্ষীণ সলিতার প্রদীপ—আলোর তেজ খুব কম। বিশালের গায়ে একখানা র‍্যাগ বুক পর্য্যন্ত ঢাকা, বড়-বৌ বসিয়া মাথায় বাতাস দিতেছে।

আস্তে কবাট খুলিয়া সুখেন আসিল, বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কহিল, 'কেমন আছেন?'

বড়-বৌ তেমনি স্বরে উত্তর দিল, 'জ্বর ছাড়েনি, এই জল খেলেন, ঘুম ভেঙ্গেছে খানিকক্ষণ।'

বিশাল মুখ ফিরাইয়া চাহিল, বলিল, 'বোস।'

সুখেন কাছে বসিয়া বিশালের গায়ে মাথায় হাত দিয়া দেখিল, বিশাল তাহার সেই হাতখানা চাপিয়া ধরিল, 'একটা কথা বলব?'

'কি কথা দাদা?'

সুখেনের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পাইয়া শ্যামল উঠিয়া আসিয়াছে, বিশাল বলিল, 'দুজন—তোরা দুজনেই আমার কথাটা শোন্, বড়-বৌ, বড়-বৌকে দেখিস্—'

'দাদা ও কি? ও কথা কেন? এই সব বুঝি ভাবছ? দেখো ভোরবেলাই তোমার জ্বর ছেড়ে যাবে—পরশু পথ্যি না কর তো আমার নাম শ্যামল নয়।'

'হোক্, সে ভাল কথা—কিন্তু তোরা বল্—বল্, বড়-বৌকে দেখবি।'

'দেখব—এই কথা শুনলে তুমি খুসী হও? আচ্ছা দেখব। যতদিন বাঁচি দেখব। কিন্তু তুমি ঘুমোও দেখি—রাত দুপুরে এই সব ভেবে মাথা গরম করা হচ্ছে।'

শ্যামলের উদ্দেশ্যে হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বিশাল সাগ্রহে সুখেনের দিকে চাহিল।

দুই হাতে বিশালের শীর্ণ হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সেই হাতের মধ্যে নিজের মুখে চাপা দিয়া সুখেন হঠাৎ ছেলে-মানুষের মতন কাঁদিয়া ফেলিল।

বিশালের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, ঘর নিঃশব্দ; শ্যামল ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুখেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমি হতভাগা, আমায় মাপ কর তুমি—'

'সুখেন থাম্।'

'না দাদা, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি, পশুর মতন ব্যবহার করেছিলাম।'

'সুখেন আমার মনে কোন কষ্ট নেই।'

দরজার কাছে মেজবৌয়ের অস্ফুট তর্জ্জন শুনিয়া শ্যামল বাহির হইয়া গেল, 'রুগীর ঘরে রাত দুপুরে এ কি কাণ্ড? তোমরা এ ঘরে এস না। আর—ঠাকুর-পো কি অজ্ঞান হয়েছে? এক্ষুণি সব বেরিয়ে এস—এই তোমাদের দেখতে আসা?'

আধ-ঘোমটা টানিয়া মেজ-বৌ ঘরে আসিল, সুখেন মাথা নীচু করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবামাত্র মেজ-বৌ তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহির হইল এবং দরজা টানিয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলিল, 'খিল দাও দিদি, কোন দরকার হলে দোরে দাঁড়িয়েই আমায় ডেকো, আমি জেগে রইলাম—সরলাও জেগে বসে রয়েছে।'

বড়-বৌ খিল দিয়া আসিয়া বিছানায় বসিল, বিশাল বলিল, 'কাঁদছিলে?'

বড়-বৌ অস্পষ্ট সুরে বলিল, 'না।' 'দেখি'—বিশাল বড়-বৌয়ের মাথার কাপড় খুলিয়া ফেলিয়া দিল—বলিল, 'কাঁদছ না? কেন?'

'কেন কাঁদব?'

'কেন কাঁদব? তোমার ভাবনা হচ্ছে না আমার জন্মে?'

'না, কিসের ভাবনা? কবিরাজ বলেছেন, তুমি সেরে উঠবে শীগগিরি। একটু বেদানার রস দিই?'

'থাক্; বড়-বৌ আমি সেরে উঠব ভেবেছ? না—আর আশা কর না—তবে তোমার জন্যে শান্তি পাচ্ছি না।'

বড়-বৌ বিশালের কপালে হাত দিয়া বলিল, 'এই তো জ্বর কমে আসছে—তুমি নিশ্চয় ভাল হবে—অনেকে অনেক কথা বলে আড়ালে—কিন্তু আমি জানি তুমি সেরে যাবে—আমার যে কেউ নেই—এক তুমি ছাড়া, তোমাকে ভগবান্ কখনও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—দেখো।'

বিশাল বড়-বৌয়ের নিশ্চিন্ত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল, 'এত ভরসা তোমার? আচ্ছা সত্যিই যদি যাই? আঃ, তোমাকেও যদি নিয়ে যেতে পারতাম সঙ্গে!'

'তাই ভাবছ? আচ্ছা যদিই তেমন দিন আসে—আমি যে করে হোক তোমার সঙ্গে যাব।'

'যাবে? যাবে? কেমন করে যাবে স্বর্ণ?'

'যেমন করেই হোক যাব, দেখো।'

'না—তেমন কাজ ক'রো না, আত্মহত্যা মহাপাপ, অমন কথা মনেও এনো না—তা হলে কোন জন্মেও আর তোমায় আমায় মিলবার উপায় থাকবে না। আমি যাই, দুঃখ নেই, কিন্তু তোমায় পেয়ে অভাগা আমি মর্য্যাদা বুঝি নি—বুঝলাম বড় দেরিতে—বড়-বৌ, তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে আমার আশা মেটে নি একটুও—আমি বাইরে যাই, ফিরে ফিরে আসি, শুধু তোমায় একবার দেখবার জন্য—তোমায় ছেড়ে আমি স্বর্গেও যেতে চাই নে—'

ঘরে মিটমিট করিয়া বাতি জ্বলিতেছে, বিশাল বলিল, 'আলোটা আর একটু বাড়িয়ে দাও।'

হাত বাড়াইয়া বড়-বৌ দ্বিতীয় সলিতাটি যোগ করিয়া প্রদীপের শিখা উজ্জ্বল করিয়া দিল। বিশাল দুই হাত বড়-বৌ-এর দিকে আগাইয়া ধরিল, দুই জন দুই জনের চোখের জল মুছাইয়া দিল। বড়-বৌ মৃদুস্বরে বলিল, 'ঘুমোও, ঘুমোও এবার।'

'না, ঘুম আসছে না,—দেখ, পাঁচ মাস বিছানায় পড়েছি, শুয়ে শুয়ে কেবল তোমার কথাই ভাবি, কত কষ্ট দিয়েছি—কত অপমান করেছি, বাড়ী শুদ্ধ সবাই লাঞ্ছনা করেছি, সব সয়েছ; কেমন করে তেমন নিষ্ঠুর হয়েছিলাম? আমায় যেতে দিয়ো না বড়-বৌ, তোমার কাছে—তোমার কাছে আমায় ধরে রাখ।'

৪২

'নীরবে পোহাল নিশি—'

সন্তোষকে লইয়া পিসিমার রাত্রেও শান্তি নাই। দুরন্ত ছেলের দিন-রাত সমান বায়না। রাত্রে দু তিনবার তাহার পিপাসা পায়—ক্ষুধা পায়, সমস্ত যোগাড় পিসিমার হাতের কাছে থাকে,—বার বার উঠিয়া ছেলে শান্ত করেন।

সে দিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া রাত্রি একটার আগে আর সন্তোষের চোখে ঘুম আসিল না, বিস্তর জ্বালাতন সহিয়া পিসিমা সবে দু'চোখ বুজিয়াছেন—অমনি সন্তোষ উঠিয়া বসিল এবং পিসিমা চমকিয়া জাগিতে না জাগিতে বিছানা ছাড়িয়া নীচে নামিয়া—দুয়ার দেখাইয়া কহিল, 'বাতাছা।'

'ও আমার কপাল, এই দুপুর রাতে বাতাছা খাবার সখ পড়ল তোমার? নাঃ, আর পারি নে বাপু তোকে নিয়ে, এই নিশুতি রাত—তোর হয়েছে কি? শীতের রাত্তির এমনি করে কাটায় মানুষে? ইষ্ট-দেবের নাম নেই—জপ-সন্ধ্যে, পূজো-আহ্নিক সব গেছে আমার তোমার পাল্লায় পড়ে, মা—তোর মার কাছে যা, বাতাসা, সন্দেশ, যা খুসী খা গিয়ে, আমার কেন উৎপাত এত!'

এত সব আক্ষেপ সন্তোষ গ্রাহ্য করিল না মোটেও, দুয়ারের কাছে গিয়া খিল ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল।

সন্তোষ ভাল করিয়া কথা বলিতে পারে না এখনও, কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান ছেলে, কাল দেখিয়াছে এ ঘরের বাতাসা ফুরাইয়াছে—কাজেই বড়মার কাছে না গেলে বাতাসা পাইবার উপায় নাই।

আজ হাটবার নয়, তবু পিসিমা সকাল বেলাই রাখালকে পাঠাইয়া বাতাসা আনাইয়া ভাণ্ডার-জাত করিয়া রাখিয়াছেন। দুয়ার খুলিতে হইল না, রঙীন সুতায় গাঁথা কড়িঝুলান শিকা

হইতে খান চারেক বাতাসা পড়িয়া দিলেন—সন্তোষ দেখিতে দেখিতে হাত তালি দিয়া উঠিল। বাতাসা হাতে সে বিছানায় গিয়া উঠিল, জলের গেলাস লইয়া পিসিমা তার পিছন পিছন গিয়া লেপ টানিয়া গায়ে দিতে দিতে বলিলেন, 'কর্ম্মভোগ! কর্ম্মভোগ আমার!—মা মজা করে ঘুমোচ্ছে আমার ঘাড়ে ছেলে চাপিয়ে, মরণ আমার, এখন বিছানায় পিঁপড়ে জড়িয়ে ধরুক আর কাণে মুখে নাকে ঢুকুক।'

পিঁপড়ের নাম শুনিয়া সন্তোষ উৎসুক হইয়া বিছানা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

'থাক্, থাক্—তোমায় আর দেখতে হবে না, এখন কতক্ষণে তোমার বাতাসা খাওয়া হবে—হাত ধুইয়ে দেব, তবে শোবে, কাল থেকে আর আমার কাছে নয়,—খুব আক্কেল হয়েছে আমার, মার ছেলে মার কাছে থাকবি, ফের এ ঘরমুখো হবি তো—'

ও ঘর হইতে সেজ-রায়ের গলার আওয়াজ শোনা গেল, 'বলি হলো কি?—দিদি, ও দিদি—পাজিটা বুঝি বজ্জাতি আরম্ভ করেছে, ও হতচ্ছাড়াটাকে দেব শোধনাশ্রমে পাঠিয়ে।'

পিসিমা একেবারে চুপ হইয়া গেলেন। রাত্রে এ ঘরের কাণ্ড কারখানা বাড়ীর সবাই টের পায়। তবে সেটা পিসিমা জানেন না। এ দিকে সন্তোষ মার কাছে শুইবার কথায় মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

'বাবা আমার, সোনা আমার, বকেছি? গাল দিয়েছি? ও মাণিক, তাই রাগ হয়েছে? বাতাসা খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে? না সোনা, তুমি কোথায় যাবে? সাত রাজার ধন মাণিক আমার—তোকে ছেড়ে আমি বাঁচি?' আদর করিয়া কোলে লইয়া পিসিমা সন্তোষকে শান্ত করিলেন।

সেজ-রায় আবার বলিলেন, 'দিদি, রাগ কর আর যাই কর, তুমি ওটাকে নষ্ট করলে,—দাও না দু'চার ঘা লাগিয়ে, আপদটা রোজ রাত্রে জ্বালিয়ে মারবে।'

'জ্বালায়, আমায় জ্বালায়, তোমাদের তাতে কি? রাত দুপুরে গালাগাল কেন? সোহাগী মেয়েগুলোকে নিয়েই মা বাপ অজ্ঞান, আমি না থাকলে ও বাঁচত? তোমরা কি কম ছিলে কেউ? একহাতে সকলকে মানুষ করেছি, কোন আশ্রমে ত পাঠাতে যাই নি? আশ্রমে পাঠাতে হয় বিবি মেয়েদের পাঠাও গে—ওকে ও-সব বলবে ত—'

সেজ-রায় আর কিছু বলিলেন না। তবে একটা চাপা হাসির সুর শোনা গেল। সেজ-বৌয়ের সুপারী কাটিবার শব্দও হইল। রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলে পান-তামাক খাওয়া সেজ-রায়ের অভ্যাস। হাসির শব্দটা তামাক খাইবার শব্দ বলিয়াই পিসিমা অনুমান করিলেন। দুইজনের কথাবার্ত্তার মৃদু শব্দ একটু একটু শোনা যায়—নিশ্চয় সন্তোষের কথা! পিসিমার রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।

হৈমন্তিক শস্যে বাড়ী বোঝাই। রাত থাকিতে উঠিয়া সেগুলি লইয়া কাজ সুরু হয়। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পিসিমা কৃষাণ-বধূদের কাজকর্ম্ম তদারক করেন। আজ অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ায় উঠিতে বেলা হইয়া গেল। ভিতর-বাড়ীতে আর না আসিয়া একেবারে ওদিক্‌কার দরজা খুলিয়া বাহির-বাড়ীতে গেলেন। দরজা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া গেলেন, সন্তোষ অঘোরে ঘুমাইতেছে।

দুই যা এক পালা সকালের কাজ সারিয়া আগুনের মালসাটা লইয়া একটু বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন, শীতও পড়িয়াছে খুব। সেজ-বৌ তামাকপাতা আগুনে পুড়াইতে দিয়া বারবার উল্টাপাল্টা করিয়া দিতেছেন। মেজ-বৌ বলিলেন, 'নে হয়েছে, যেন রুটি ভাজতে বসল। আমি হলে এতক্ষণ কোন্ কালে হয়ে যেত।'

সেজ-বৌ হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার যা পাতা পোড়ানর ছিরি, হয় পুড়িয়ে ছাই করবে, নয় কাঁচা থাকবে, ও দাঁতে দেওয়া না দেওয়া সমান।'

পাতাটি গুঁড়া করিয়া দুই যায়ে নিজ নিজ হাতে খানিক খানিক করিয়া লইয়া বাকিটুকু কৌটায় ভরিয়া রাখিলেন। মেজ-বৌ বলিলেন, 'ঠাকুর-কন্যাকে দিয়ে আসিগে একটু, সকাল থেকে এ দিকে আসেন নি।'

বলিতে বলিতে পিসিমা দেখা দিলেন—'বৌ, বৌ, গোয়ালঘরের কাছে দাঁড়িয়েছি, রাখালটা এখনও আসে নি, বাছুরগুলো ডেকে মরছে—ভাবলাম খুলে দিই, হে পরমেশ্বর, পরমেশ্বর! বিপদ্ আপদ্ যেন শত্তুরেরও না হয়, বিশ্বাস-বাড়ীতে কান্না শুনলাম, কি হল, কি হল না জানি, হরি গুরু!'

কাঁপিতে কাঁপিতে পিসিমা বসিয়া পড়িলেন, মুখ পাংশু, ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে, কোথাও কোন বিপদের আভাসমাত্রে পিসিমা হতজ্ঞান হইয়া যান।

'সে কি ঠাকুর-কন্যা, কি বলেন? চারু, আয় দেখি।'

ঊর্দ্ধশ্বাসে দুইজন ছুটিলেন।

পিসিমা সেইখানে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে বসিলেন, কিন্তু সব ভুলিয়া গিয়াছেন।

৭৩

দিন কয়েক পরে চোখ খুলিয়া বড়-বৌ দেখিল, রায়েদের মেজ-বৌ কাছে বসিয়া বাতাস দিতেছেন, পায়ের কাছে বিষণ্ণ-মুখী সরলা।

'কেন মেজ-খুড়ি-মা, কি হয়েছে আমার?' বলিয়া উঠিয়া বসিতে গিয়া বড়-বৌ মাথা ঘুরিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আবার মূর্চ্ছা।

এমনি করিয়া অৰ্দ্ধ চেতনা, মূর্চ্ছা ও জাগরণের মধ্যে আর কয়েক দিন কাটিল। মেজ-খুড়িমা সর্ব্বদা বড়-বৌকে লইয়া আছেন, সরলা ও মেজ-বৌ চোখ মুছিতে মুছিতে কেবলই বলে, 'বটঠাকুর ত গেলেন, দিদিও বুঝি যায়।

সেজ-বৌ বলেন, 'ও বাঁচবে না।' গিন্নিরাও সকল সময়ই বিশ্বাস বাড়ীতে থাকেন, তাঁহারাও বলেন, 'নাই বাঁচল, এই সঙ্গে যদি যায় ত ভাগ্যিমানী।'

সুখেন ডাক্তার-কবিরাজ আনিতেছে। বিশালের শোক ভুলিয়া বড়-বৌকে লইয়া ব্যস্ত। ইহাঁরই জন্য দাদা তার শেষ মুহূর্ত্তেও শান্তি পান নাই।

কিন্তু অচল অটল মেজ-বৌ, অসংশয়ে তিনি বলিলেন, 'কোন ভাবনা নেই, ও বাঁচবে, ঠিক বাঁচবে, না বাঁচলে সুখ খাবে কে? মরণ? মরণ নেই ওর, অখণ্ড পরমাই নিয়ে এসেছে, ও মরবে কেন?'

পরশমণির কান্নায় ও অভিশাপে পাড়াশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ! দিন নাই, রাত্রি নাই, নিজের ঘরের দুয়ারে বসিয়া বসিয়া কাঁদেন, গভীর রাত্রে সে কান্নার সুর আরও তীক্ষ্ণ আরও ভীষণ শোনায়: 'ও আমার বিশুধন, বুড়ীকে রেখে চলে গেলি? মা ছাড়া কিছু যে জানতিস নে বাবা, ডাইনী এমনই করলে, মাকেও ভুলে গেলি, ডাইনিটাকে নিয়ে দেশ বিদেশ ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে পরাণ দিলি বাবা, পরাণ দিলি—'

তন্দ্রায় ঢুলিতে ঢুলিতে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা সজাগ হইয়া আবার—

'ও পোড়াকপালি, আমার বিশুকে পেটে পুরে এবার নিশ্চিন্দি হলি লো, এবার নিশ্চিন্দি হলি, ভদ্দরঘরের বউ সোয়ামীর সাথে একা একা দেশ বেড়াতে যায়! তখনই জানি তোর মনে মতলব আছে, কি খাইয়ে আনলি লো ছাই-মুখি, কি খাইয়ে আনলি; বাছা আমার বাড়ীতে ফিরেই চলে গেল, তোর মনের সাধ মিটেছে, এবার নিশ্চিন্দ হয়ে বিবি-গিরি কর।'

মেজ-বৌ এক দিন রায়-বাড়ীর মেজ-বৌকে বলিল, 'খুড়িমা, রাত্তিরে দিদিকে নিয়ে বড় বিপদ্ হয়, ছেলে-পিলের জ্বালায় আমরা ত কাছে থাকতে পারিনে, সমস্ত রাত মাথা কুটো কুটি করেন। দিনে আপনি থাকেন, অনেকটা ভাল থাকেন, রাত্তির আসে, আমরা ভয়ে মরি। ভাসুর জ্বর, সরলা ঘর থেকে বেরুতে পারছে না, আমি একা কি করি? এতদিন বিছানায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, সে ছিল একরকম, এ যে আরও বিপদ হল।' মেজ-বৌ বলিলেন, 'ওকে রাত্তিরে আমার কাছে নিয়ে যাই তবে?'

'এদের কাছে বলে দেখি, উনি কিছু বলবেন না, কিন্তু ছোট ঠাকুর-পো বোধ হয় রাজী হবেন না।'

মেজ-বৌ নিজের ঘর ছাড়িয়া কোথাও থাকেন না, সুখেনকে বলিলেন, সুখেন কথাটা ভাল বুঝিল না, বলিল, 'আচ্ছা আমি থাকব বড়-বৌয়ের কাছে।'

এক রাত্রি দেখিয়াই সকাল বেলা সুখেন মেজ-বৌকে বলিল, 'খুড়িমা তুমি ছাড়া বড়-বৌকে বাঁচান দায়। সারা রাত কেঁদে খুন হয়েছে, একবার ঘাট, একবার বারবাড়ী, এই রকম করে যেখানে যেখানে দাদা বসে থাকতেন, লুটো-পুটি করে কেঁদেছে, তুমি নিয়ে যেয়ো রাত্তিরে ওকে তোমার কাছে',—কিন্তু একটু থামিয়া বলিল, 'কিন্তু দিনে বাড়ীতেই থাকবে, দাদা—'

মেজ-বৌ বলিলেন, 'বড্ড পাগল হয়েছে কি না, কিছু দিন পরে এতটা থাকবে না, বাড়ীর বৌ বাড়ীতে থাকবে বৈ কি,

আর কোথা যাবে? ওসব ঠিক হয়ে যায় বাবা, মেয়েমানুষের প্রাণ বড় কঠিন, সব সয়, সব সয়।'

৪৪

'ঢালি প্রেমবারি, পতিতে উদ্ধারি,
তাপিতে জুড়ায়ে বহিয়া চল।'

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেজ-বৌ মেজ-বৌয়ের ঘরে কাটান, সমস্ত দিন পরে নিরিবিলি দুইজনের সুখ-দুঃখের কথা, আরও পাঁচ রকম আলোচনার এই সময়টা। আজও বড়-বৌকে সান্ত্বনা দিয়া সেজ-রায়ের জন্য পান লইয়া সেজ-বৌ চলিয়া গেলে মেজ-বৌ ঘরে দুয়ার দিলেন। মেজ-বৌ এখন চৌকীতে শোন না, লেপ-তোষকও ব্যবহার করেন না। মেঝেতে কম্বল পাতিয়া বড়-বৌয়ের জন্য কাঁথা ও কম্বল আর এক প্রস্থ বাহির করা হইল। দীপটি হাতের কাছে রাখিয়া মেজ-বৌ বিছানায় বসিলেন।

বড়-বৌ বিছানার এক কোণে পড়িয়া রহিয়াছে, মেজ-বৌ তাহার মাথাটা বালিশে তুলিয়া দিলেন, জটা-বাঁধা রুক্ষ চুলের গোছা আঁটিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে বলিলেন, 'কেন অমন করিস? ভগবানের নামও ভুলে গেলি?'

'ও খুড়ি-মা, খুড়িমা কই ভগবান্? আমার ভগবান্ চলে গেছে, আর কার নাম করব আমি?'

'আগের কথা মনে কর স্বর্ণ, যখন বিশু তোকে ভাল বাসত না, তখন কার নাম নিয়ে শান্তি পেয়েছিলি?'

'জানিনে, জানিনে, কবে সে আমায় ভালবাসে নি? আমার মনে হয় না; শীতের রাত্রি, গায়ে লেপ টেনে টেনে দিয়েছে—গরমে সমস্ত রাত বাতাস করেছে, কেমন করে বাঁচব আমি? কেমন করে থাকব আমি? সমস্ত রাত যে পেত্নীর মতন ঘুরে বেড়াই, একবারও ত বলে না, 'ঘরে এস বড়-বৌ!' একেবারে কি ভুলে গেল খুড়িমা—একেবারেই ভুলে গেল আমায়?'

দুই চোখের জল বর্ষাধারার মত বহিতে লাগিল, মেজ-বৌ কোন বাধা দিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে বড়-বৌ বলিল, 'শোবে না তুমি?'

মেজ-বৌ শুইবার আগে নিয়মমত জপ, স্তব-স্তোত্র সব সারিয়া প্রণামশেষে উপসংহারস্বরূপ পাতা-পোড়ার কৌটাটি হইতে হাতে গুঁড়া ঢালিতেছিলেন, বড়-বৌয়ের প্রশ্নে তার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ, শোব এবার, হাত ধুয়ে আলোটা নিবিয়ে দি।'

আঁধার ঘরে মেজ-বৌয়ের গায় হাত রাখিয়া বড় বৌ বলিল, 'খুড়ি-মা তুমি কি করে শান্তি পেলে?'

গভীর নিশার নিস্তব্ধতার মধ্যে বড়-বৌয়ের ক্ষীণ ও দুঃখে ভরা স্বর বড় করুণ হইয়া বাজিল। মেজ-বৌ তার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, 'শান্তি কি পেয়েছি মা? শান্তি তাঁর সঙ্গেই গেছে, তবে সংসার রয়েছে, মনের ব্যথা মনেই চেপে থাকতে হয়, এই ঘরে তিনি থাকতেন, এ ঘর ছেড়ে কোথাও আমি থাকতে পারি নে। এক রাত্তিরের জন্যেও না, কারও অসুখ-বিসুখ হলে অবিশ্যি তার কাছে গিয়ে থাকতে হয়, কিন্তু সারারাত বসে কাটাই। ঠাকুর-কন্যার জ্বর হলে তিন রাত থাকতে হল তাঁর কাছে, কিন্তু একদণ্ডও শুই নি।'

'আচ্ছা খুড়ি-মা, আমি তা পারি নে কেন? আমি যে ঘরে ঢুকতেই পারি নে। ঐ ঘরে তাঁরই চিহ্ন সব জায়গায়, বুক ফেটে যায়।'

'মা, তুই যে এখন বড্ড পাগল, তাই। আমি এই ঘরটায় শুই কেন? শুই এই জন্যে যে চোখের পাতাটি নামলেই স্বপনে তাঁকে দেখি অন্য ঘরে, কিন্তু অন্য জায়গায় গেলে তা দেখি নে!'

'আমি যে একদিনও তাকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম না।'

'দেখবি কি করে? ঘুমুলে তবে না স্বপন, সারা রাত জেগে কাটালে আর কি হবে? যে যায়, সে-ই কি মায়া কাটাতে পারে? দেখা দেবার জন্যে তারও কি কম ইচ্ছে হয়? কিন্তু স্বপন ছাড়া তো দেখা দিতে পারে না।'

'খুড়িমা কি করে আমার চোখে ঘুম আসবে বলে দাও—বলে দাও তুমি, দুটি মাস যে ঘুম কাকে বলে জানি নি। আমি বিছানায় শুতে পারিনে, খালি বিছানায় কি করে শোব? ও খুড়িমা কতক্ষণে যে আমি ঘরে আসব সেই ভরসায় দরজার দিকে চেয়ে থাকত, এক একদিন কত রাত হয়েছে ভেবেছি ঘুমিয়ে পড়েছে, পা টিপে টিপে এসেছি, ঘুম না ভাঙ্গে, দেখি জেগে রয়েছে'—বলিতে বলিতে বড়-বৌয়ের বেদনা শতধারে কান্নায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

'স্বর্ণ, চুপ কর—চুপ কর মা, আচ্ছা একটা কথা শোন, এই যে দিন-রাত পাগলের মতন কেঁদে খুন হচ্ছিস, এতে কি লাভ হচ্ছে? যদি তোর মনে আশা থাকে স্বামীকে আবার পাবি, তবে আগে কান্না থামা, ভগবানের নাম কর, মন শান্ত কর, তা হলে রাত্রি হলেই ঘুম আসবে, আর ঘুমোলেই স্বামীকে পাবি, তার পরে সংসারের দেনা-পাওনা মিটিয়ে যাবার সময় হলে আপনি বিশাল এসে তোকে হাত ধরে নিয়ে যাবে। সে তোরই জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছে, কিন্তু তার কাছে যেতে হলে কি বিনা সাধনায় যেতে পারবি? অমনি ধারা করে তুকূল নষ্ট করতে বসেছিস, শেষে মরে গিয়ে কোনও থানে ঠাঁই পাবি নে, এমনি পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে হবে।'

কথাগুলি স্বর্ণ মন দিয়া শুনিল, শুনিতে শুনিতে কি একটা ভাবনার মধ্যে যেন ডুবিয়া গেল। মেজ-বৌ ক্রমে অনুভব করিলেন, তার কান্না থামিয়া আসিতেছে। আর কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তার গায়ের কম্বলখানি ভাল করিয়া টানিয়া দিলেন। [ক্রমশঃ

গোঁড়া

—শ্রীনারায়ণপ্রসাদ আচার্য্য

কিন্তু বন্ধু, এ কথাটা আমি স্পষ্ট করেই কই—
ভারতের বুকে জন্ম মোদের আমরা বিলাতী নই।
আমাদের যাহা জাতীয় জীবন আমাদের যাহা লক্ষ্য,
আমাদের যত ঝগড়া বিবাদ আর যত কিছু সখ্য,
তাহা আমাদেরি। আমাদের মাঝে ঘুম-ভোলা যেই সত্য,
জাগাও তাহারে তবে এ জাতির জাগিবে মনুষ্যত্ব।
হয় ত বাগানে ফোটে না ক' ফুল, তাই কাগজের ফুলে
সাজালে বাগান আসে কি মধুপ? ফল কি তাহাতে ফলে?
ভারতবর্ষে যে মানুষ চাই জানি সে মানুষ নাই,
সাজিব বঙ্গে তাই কি রঙ্গে নকল সাহেব ভাই?
সাহেবীয়ানা ত' আমাদের নয়, তাই শুধু খোসা লয়ে
টানাটানি করি, সাহেব হইতে পারি না সাহেব হয়ে।
ওদের সাহেবী সাধনা, মোদের সাহেবী বিলাস শুধু,
মোদের সাহেবী মোসাহেবী হায় মরণ মরুর ধূ ধূ ধূ ধূ।
হাজার চুরুট উজাড় করিয়া বাজার করিলে ছাই
হবে না সাহেব, জাহান্নমেতে যাবে শুধু জাতিটাই।
শতেক বাধার মধ্যেতে যদি একটু বাঙালী হও—
আপনার ভেবে যদি আত্মীয়-মুখপানে কভু চাও,
দেখবে তোমার সবটুকু, ভাই, খাপ খেয়ে গেছে বেশ,
এমনিতর এ সম্বন্ধটা দেশবাসী আর দেশ।
যতই শিখাও ফ্রয়েডি থিয়োরী, বুঝাও সাইকলজি,
স্নো ক্রীম মেখে ইডেনে ও লেকে যতই বেড়াও আজি,
তবুও দেখিবে হতাশ হৃদয়ে হায় বাঙালীর মেয়ে
মেম্ হল না ক', বাঙ্গালী জীবনও গেল তার বৃথা হয়ে।

হাঁ, তবে একটা কথা হ'চ্ছে যে আমরা একটু গোঁড়া,
গোঁ ধরে বসেছি ওদিকে এগুলে জাতিরে করিব খোঁড়া।
কিন্তু সাহেব হলেও নাচাব, বিশেষ কি লাভ হবে?
লাভের মধ্যে সাহেবিয়ানার খেয়ালে বাকীটা যাবে।
তার চেয়ে হয়ে সত্যিকারের সভ্যতা পানে চাঙ্গা,
এই গোঁড়াদের মাথায় মুগুর মারিও, করিও দাঙ্গা।
জাতেরে যখন পাঁচ-খানা রোগে ধরেছে তখন ভাই
টক্ ব'লে আর কি হবে? ওষুধ এই গোঁড়া লেবুটাই।
প্রণয়ী আজিকে পুরুষ হউক রমণী হউক নারী,—
গোঁড়ামি না হয় গোঁড়ামি লইয়া গুটাইল পাততাড়ি।
এস ফিরে এস অধঃপাতেতে যেয়ো না যেয়ো না আজ,
গোঁড়ামির ডাক নয় গো তূর্য্য বাজায় রুদ্র-রাজ।
অন্নবিহীন কত দেশ ভাই ছড়ায় মৃত্যু-শয্যা;
লজ্জা রাখার বস্ত্রবিহীনা মেয়েরা হায় রে লজ্জা!
হে দেশ-দরদী প্রাণের পূজক তরুণ তাপসগণ,
বিলাস-স্বপন হতে জাগো, শোন জননীর ক্রন্দন।
এই কি কাম্য, এই কি সাম্য হায় হায় আফশোষ
তাকাবে না কেউ মরে যাবে জাতি এই কি দৈবী রোষ?
দেশের যাহারা বক্ষের বল দশের আশার বাতি,
যাদের মুখের পানে চেয়ে দেশ কাটায় দুখের রাতি;—
সেই উন্নত আলোক-প্রাপ্ত তরুণ-তরুণী যত
মোহ-মরীচিকা পিছে ঘুরে মরে নিত্য অসংযত!
বাজাও বাজাও জাগার বিষাণ জাগ্রত ভৈরব,
ফিরে পাক এরা মনুষ্যত্ব, ভারতের বৈভব।

ঢাকার কাহিনী

—শ্রীরাধারমণ গোস্বামী

ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রকৃতি-পরিচয়*

ঢাকা জেলার অবস্থান পূর্ব্ববঙ্গে—উত্তর নিরক্ষ ২৩°-১৪´ ও ২৪°-২০´ কলার মধ্যে এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৮৯°-৪৫´ ও ৯০°-৫৯´ কলার মধ্যে।[১] উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা; উভয় জেলার সীমান্ত চিহ্নিত করিতেছে ব্রহ্মপুত্র, বানার ও বানচেরা নদীত্রয়। পশ্চিমে যমুনা (যমুনা অথবা যিনাই—ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহ) ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পদ্মা ঢাকা জেলাকে যথাক্রমে পাবনা ও ফরিদপুর জেলাদ্বয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। দক্ষিণে পদ্মা ও কীর্ত্তিনাশা। পূর্ব্বসীমায় মেঘনাদ নদ ঢাকা জেলাকে ত্রিপুরা জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে। সুতরাং দেখা গেল, ঢাকা জেলার প্রায় চতুর্দ্দিকেই নৈসর্গিক সীমা; একমাত্র উত্তরে কিছুটা স্থানে (জাঙ্গীরপুর হইতে যমুনা-তীরস্থ সুলপোগ্রাম পর্যান্ত) ঢাকা ও ময়মনসিংহের মধ্যে কোনও নৈসর্গিক সীমা লক্ষ্য করা যায় না।

ঢাকা জেলার পরিমাণ ফল ২৭৮২ বর্গমাইল।[২] উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৮৪ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৭৫ মাইল বিস্তৃতির দরুণ ঢাকা জেলার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনেকটা সমানাকারের হইয়াছে।

বিভাগের তিনটি বিভিন্ন আদর্শানুসারে ঢাকা জেলা তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম, প্রাকৃতিক বিভাগ; দ্বিতীয়, সাধারণ বিভাগ, এবং তৃতীয়, শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে মহকুমা-বিভাগ। বলা বাহুল্য, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের বিভাগ প্রকৃতিসৃষ্ট; তৃতীয় ক্ষেত্রে বিভাগের আদর্শ মনুষ্য-মস্তিষ্কপ্রসূত।

প্রাকৃতিক বিভাগে—মেঘনাদ নদ ও লক্ষ্যা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান পূর্ব্বঢাকা, লক্ষ্যা ও ধলেশ্বরীর মধ্যবর্ত্তী স্থান পশ্চিমঢাকা[৩] এবং ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান দক্ষিণঢাকা নামে পরিচিত। নদ-নদীর অবস্থানবৈচিত্র্যের জন্যই এই প্রাকৃতিক বিভাগ সম্ভব হইয়াছে। উপরি উক্ত তিনটি বিভাগের নৈসর্গিক সীমাও প্রধান ভাবে নদী দ্বারাই রক্ষিত। উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত লক্ষ্যা নদী জেলার উত্তরাংশকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছে। পরন্তু উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা গোটা জেলাকেই সাধারণভাবে দ্বিখণ্ড করিয়াছে।

সাধারণ বিভাগে ঢাকার পাঁচ অংশ, যথা:—(১) ভাওয়াল; (২) সোণারগাঁ ও মহেশ্বরদী; (৩) বিক্রমপুর; (৪) পারজোয়ার; (৫) বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সুলতানপ্রতাপ ও সেলিমপ্রতাপ। এখানে প্রত্যেক বিভাগের একটু সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ভাওয়ালের উত্তরে ময়মনসিংহ জেলা, পূর্ব্বে লক্ষ্যা নদী, মহেশ্বরদী ও সোণারগাঁ; দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা; ও পশ্চিমে তুরাগ নদী ও চন্দ্রপ্রতাপ।

মহারাজ অশোকের সমসাময়িক কীর্ত্তির নিদর্শন, প্রাচীন অট্টালিকা ও দীর্ঘিকার ধ্বংসাবশেষ, সর্ব্বোপরি মৃত্তিকার স্তরবৈশিষ্ট্য পর্য্যবেক্ষণে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন, ভাওয়াল অতি প্রাচীন স্থান।

---

* প্রবন্ধের প্রথমাংশ আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

১। এই অবস্থান-বিবরণ Imperial Gazetteer (1908) Vol. XI-এর বিবরণ অনুসারে লিখিত হইল। যতীন রায়, কেদার মজুমদার প্রভৃতি ঢাকার অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া উক্ত গণনারই আশ্রয় লইয়াছেন। তবে হাণ্টার সাহেবকৃত Statistical Account of Dacca District গ্রন্থে দ্বিমত দৃষ্ট হয়। তিনি লিখিয়াছেন—The District of Dacca lies between 24° 20´ 12´´ and 23° 6´ 30´´ north latitute, and 89° 47´ 50´´ and 91° 1´ 10´´ east longitude, তবে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে (যখন Hunter's Statistics প্রকাশিত হয়) ঢাকা জেলার আয়তন অধিকতর প্রশস্ত ছিল।

ঢাকা সহর উত্তর নিরক্ষ ২৩° ৪৩´-২০´´ এবং পূর্ব্বদ্রাঘিমা ৯০°-২৬´-১০´´ মধ্যে, ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল হইতে ৮ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

২। স্থাপনসময়ে ঢাকা জেলার আয়তন বর্ত্তমান আয়তন অপেক্ষা প্রায় ছয়গুণ বড় ছিল। James Taylor লিখিয়াছেন—এককালে এই জেলার বিস্তৃতি ছিল ১৫:৯৭ বর্গমাইল, কারণ ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা ফরিদপুর প্রভৃতি ঢাকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। (Taylor: Topography, p. 1.)

১৮১১ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর ও ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ ঢাকা কালেক্টরী হইতে পৃথক্ হইয়া যায়। বর্ত্তমান মাণিকগঞ্জ ও নবাবগঞ্জের কিয়দংশ ফরিদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আনুমানিক ১৮১৬ সালে ঢাকার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৭১ সালে ঢাকার প্রায় ৪৩৮টি গ্রাম বাখরগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কাছাড় ও শ্রীহট্ট জেলাদ্বয় ঢাকার পূর্ব্বোত্তর অংশ-রূপে পরিগণিত ছিল, পরে উক্ত সালেই শাসনকার্য্যের সুবিধার্থে উক্ত জেলাদ্বয় আসামের চীফ-কমিশনারের অধীনে নীত হয়। এইরূপে সঙ্কুচিত হইতে হইতে ঢাকা জেলা বর্ত্তমানে ময়মনসিংহ জেলারও তিনগুণ ছোট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। (See P. C. Gupta's Some Reminiscences of Old Dacca, p. 33, footnote,)

৩। কেহ কেহ এই স্থানকে মধ্য-ঢাকা বলিয়া অভিহিত করেন।

অষ্টম শতাব্দীতে ভাওয়াল পালরাজগণের অধীন হইয়া সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। কোনও কোনও স্থানে এখনও পালরাজগণের শাসনের বিক্ষিপ্ত চিহ্নাদি বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী গাজীবংশ ভাওয়ালকে সমধিক গৌরবান্বিত করেন। 'কোষাখালী' নামে যে খালের রেখা এখনও মিলায় নাই, ইহাই এককালে গাজীদের রণতরীর প্রধান ঘাঁটি ছিল।

মুঘল সম্রাটগণ এতদঞ্চলে লৌহখনির অস্তিত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে তাহার ইঙ্গিত আছে।১ বস্তুতঃ লোহাইদ, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে লৌহ-সংমিশ্রিত করকচপ্রাপ্তিতে পণ্ডিতগণ স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিয়াছেন যে, আইন-ই-আকবরীর ইঙ্গিত অমূলক নহে।

ভাওয়ালে এককালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের যে অপ্রতিহত প্রভাব ছিল, কাপাসিয়ার সুবৃহৎ মন্দির, তদভ্যন্তরে প্রস্তরফলক, শিবলিঙ্গ, যজ্ঞশালা, যজ্ঞকুণ্ড ইত্যাদির অস্তিত্ব হইতে তাহারই নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদীর পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ, দক্ষিণে মেঘনাদ ও ধলেশ্বরী; উত্তরে সিংশ্রী নামক নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদের কিয়দংশ; এবং পশ্চিমে লক্ষ্যা ও বানার। ব্রহ্মপুত্রের এক প্রবাহ মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হওয়াতে সোনারগাঁ পূর্ব্ব-পশ্চিমভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে সোনারগাঁ অতি প্রাচীন স্থান, বিচিত্র ঐতিহাসিক স্মৃতিতে বিজড়িত। জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, কোনও এক হিন্দুরাজার রাজত্ব সময়ে এখানে স্বর্ণবৃষ্টি হওয়াতে এই ভূখণ্ড সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁ আখ্যাপ্রাপ্ত হয়। ইহা কতদূর সত্য নির্ণয় করা কঠিন, তবে এ কথাও স্বীকার্য্য যে, স্বর্ণবৃষ্টি বা ঐ জাতীয় কিছু অসম্ভবের ব্যাপার নয়।১

সোনারগাঁয়ের উত্তরভাগের নাম মহেশ্বরদী। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে একজন ঐতিহাসিকের২ লিপিবদ্ধ বিবরণ উদ্ধৃত হইবার যোগ্য। "মহেশ্বর নামা জনৈক বৈদ্যবংশোদ্ভব ব্যক্তি প্রাচীন সুবর্ণগ্রামের ও তদ্বহিস্থ অনেক

১। Ayin-i-Akbari : Gladwin's translation.

১। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে বোম্বাই সহরে প্লাটিনম বৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া শ্রুত হওয়া যায়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে চীনদেশে বালুকাবৃষ্টি এবং ১৮১০ খৃঃ অব্দে হাঙ্গেরীতে রক্তবৃষ্টির বিবরণ অবগত হওয়া যায়।—যতীন রায়ঃ ঢাকার ইতিহাস, ১ম খণ্ড।

২। স্বরূপচন্দ্র রায়ঃ সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস।

স্থান স্বনামে এক নম্বরভুক্তে বন্দোবস্ত করেন। তাহাই ধীরে ধীরে মহেশ্বরদী নামে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের উভয় কূলেই এমন কি সহর সোনারগাঁর অনতিদূরেও কোনও কোনও প্রসিদ্ধ গ্রাম তপ্পে মহেশ্বরদীর অন্তর্গত দেখিতে পাওয়া যায়।" কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, মহেশ্বরদীর কোনও কোনও স্থানে লৌহখনি লুক্কায়িত আছে। অবশ্য আজ পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমির অনুসন্ধানে কি গবর্ণমেণ্ট, কি নাগরিক, কোনও পক্ষ হইতেই সজাগ চেষ্টা হয় নাই।

সাধারণতঃ সোনারগাঁ ও মহেশ্বরদীর সম্বন্ধে যে সকল ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করা হয়, উহার অধিকাংশই প্রবাদ ও জনশ্রুতি, তথাপি এই প্রবাদ হইতে যেটুকু বিবরণ জানিতে পারা যায়, অনন্যোপায় অবস্থায় তাহাকেও একটা মূল্য দিতে হইবে বৈ কি!

তৃতীয় ভাগ বিক্রমপুর। ঐতিহাসিক স্মৃতিসম্ভার ও ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ

সহরতলী—ঢাকা

হইয়া এই বিভাগ ঢাকা জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী। ধলেশ্বরী বিক্রমপুরের উত্তরসীমা রক্ষা করিতেছে, পূর্ব্বে মেঘনাদ, দক্ষিণে ইদিলপুর এবং পশ্চিমে পদ্মা ও চন্দ্রপ্রতাপ। বিক্রমপুরের প্রাচীনতা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বহুদিন হইতেই যে মতবিরোধ ও সন্দেহ ছিল, বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনোদ্ধারে উহার অবসান হইয়াছে। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান ঢাকা জেলারই অধিকাংশ প্রাচীনকালে বিক্রমপুর নামে আখ্যাত হইত। অবশ্য উহাতে ফরিদপুরেরও কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সমতট নামে প্রাচীনকালে যে বিরাট ভূখণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়, উহা যে উক্ত বিক্রমপুর, সে সম্বন্ধে অধুনা মতদ্বৈধ নাই। হিন্দুযুগে এবং মুসলমানগণের বঙ্গ-প্রবেশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে পর পর একাধিক রাজবংশ গৌরবের সহিত রাজত্ব করিয়া এ রাজ্যকে খুবই সমৃদ্ধ ও প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেনবংশ, বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশ, বর্ম্মবংশ প্রভৃতি আজ অনেককাল ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রশস্ত রথ্যা, বিপুলায়তন দীর্ঘিকা, ভগ্ন প্রাসাদ ও দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়া তাঁহাদের গৌরবোজ্জ্বল রাজত্বের স্মৃতির সৌরভ আজও বিক্রমপুরের জনগণের চিত্তাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গের অন্যতম "ভূঞাদ্বয়"—বিক্রমপুরের চাঁদরায় ও কেদাররায় মাতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষার্থে একনিষ্ঠ ব্রত গ্রহণ করিয়া মানবচরিত্রের যে এক সমুজ্জ্বল দিক্ লোকলোচনের সমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন, বিশ্ব-ইতিহাসের ব্যাপক পৃষ্ঠায় তাহার স্থান না থাকিতে পারে, গোটা পৃথিবীর ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের পার্শ্বে আপেক্ষিক মহিমার মানদণ্ডের নির্দ্দেশে তাহার দাবী না টিকিতে পারে, তথাপি তাহার নিজস্ব সত্তা ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। যুগে যুগে চাঁদ, কেদারের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহাদের স্বদেশকে উদ্দীপিত করিবে। ইহাই অন্ততঃ একদিকে, কোনও ঘটনার চরম ঐতিহাসিক মূল্য।

চতুর্থ ভাগ বাজু বা চন্দ্রপ্রতাপ, সেলিমপ্রতাপ ও সুলতানপ্রতাপ। উত্তরে ময়মনসিংহ; পূর্ব্বে তুরাগ নদী, ভাওয়াল ও বিক্রমপুর; দক্ষিণে পদ্মা; পশ্চিমে যমুনা।১ এই পরগণাত্রয়ের নামকরণ-রহস্যোদ্ঘাটনে গাজীবংশকে স্মরণ করিতে হয়। যে চাঁদগাজীর নামানুসারে চাঁদপ্রতাপ পরগণার নামকরণ হয়, তিনি "বার ভূঞার" অন্যতম ভূঞা ছিলেন। চাঁদগাজীর ভাই সেলিম ও সুলতানের নামানুসারে যথাক্রমে সেলিমপ্রতাপ ও সুলতানপ্রতাপ পরগণাদ্বয়ের নামকরণ হয়। কাসিমগাজী নামে গাজীবংশীয় অপর এক ভূস্বামী স্বীয় অধীন পরগণাকে কাসিমপুর আখ্যা প্রদান করেন। গাজীবংশের পূর্ব্বে এতদঞ্চল পালবংশীয়দের শাসনাধীনে ছিল। মাধবপুরের যশোপাল ও সাভারের হরিশ্চন্দ্রের রাজত্ব সময়েই এ রাজ্যের গৌরবের সর্ব্বাধিক পরিস্ফুরণ হইয়াছিল।

পঞ্চম অংশের নাম পারজোয়ার।২ এখানকার মাটি বালুকাময়। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এস্থান ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গার সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে পারজোয়ারের আকার নাতি-বৃহৎ এক দ্বীপের ন্যায়। ইহার অবস্থান-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ ইহাকে ঢাকা নগরীর দ্বারদেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

১। "১৮৪৫ খৃঃ অব্দের মে মাসে মাণিকগঞ্জ মহকুমা সংস্থাপিত হইলে উহা ফরিদপুরের সামিল ছিল, এবং তৎকালে মাদারীপুরের কতক অংশ ও আটিয়া থানা ঢাকা জেলার অধীন ছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও নবাবগঞ্জ থানার কতক অংশ ফরিদপুর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়; ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে আটিয়া থানা ঢাকা জেলা হইতে খারিজ হইয়া ময়মনসিংহ জেলায় পরিবর্ত্তিত হয়।"—যতীন রায়: ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, উপক্রমণিকা।

২। "'জোয়ার' শব্দের অর্থ 'অঞ্চল' এবং 'পার' অর্থে 'তট'; এজন্য ধলেশ্বরী (ইছামতী) ও বুড়িগঙ্গা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী এই দ্বীপাকার ভূখণ্ডের নাম পারজোয়ার হইয়াছে।"—যতীন রায়: ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড।

শাসনকার্য্যের সৌকর্য্যসাধনার্থে ঢাকা জেলাকে, ঢাকা সদর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ ও মাণিকগঞ্জ—এই চারিটি মহকুমায় বিভক্ত করা হইয়াছে। শাসন ব্যবস্থা আলোচনাকালে উক্ত মহকুমা চতুষ্টয়ের পরিচয় প্রদান করা যাইবে।

ঢাকা জেলার প্রাকৃতিক অবস্থার আলোচনা করিতে যাইয়া উহার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য না করিয়া উপায় নাই। এই জেলা একাধারে উর্ব্বরাভূমি-সমৃদ্ধ, গভীর অরণ্যসঙ্কুল এবং উষর গণ্ডশৈলশ্রেণী সজ্জিত। ঢাকার পশ্চিমাংশ পূর্ব্বাংশ হইতে উচ্চতর। ২০ হইতে ৫০ ফুট উচ্চ টিলা এখানেই দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা রক্তিমাভ, কঙ্করপূর্ণ এবং প্রচুর লৌহমিশ্রিত। অনুর্ব্বরতার জন্যই এতদঞ্চল অরণ্যসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার সময়ে পূর্ব্বঢাকার অধিকাংশ ও দক্ষিণঢাকার সম্পূর্ণভাগ জলে নিমজ্জিত হয়। পলিমাটী পড়িয়া ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া যায়, ফলে এই স্থানসমূহ কৃষিকার্য্যের উপযোগী হইয়াছে। বানার ও বংশী নদীর জলে চূণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু পদ্মার জলেই চূণের মাত্রা অধিক। পদ্মার জল অতিরিক্ত মাত্রায় ঘোলাটে হইবার কারণ সম্ভবতঃ এই। ঢাকার উত্তরাংশের মৃত্তিকাতে যেমন লৌহের মাত্রা বেশী, দক্ষিণাংশের মাটীতে তেমন চূণের মাত্রাধিক্য। দক্ষিণঢাকার কোনও কোনও স্থানের মাটী শক্ত ও কালো। এই স্থানের মৃত্তিকাতে উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ আছে। এই কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাকেই টেইলার সাহেব লিখিবার কালি বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন।১

এই জেলার মৃত্তিকাস্তরের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। উত্তরাংশে শ্বেতবর্ণ, পীতবর্ণ ও নীলবর্ণ মৃত্তিকাস্তরের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সহরাঞ্চলে রক্তবর্ণ কঙ্করময় স্তরের গভীরতা গড়ে প্রায় পনের ফুট; তন্নিম্নে পাঁচ ছয় ফুট গভীর এক পীতবর্ণ স্তর সজ্জিত; সর্ব্বনিম্নে মসৃণ বালুকাস্তর। নদীসমূহের উচ্চতার বিভিন্নতা ইত্যাদি কারণে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গভীরতায় জলের সন্ধান মিলে। তবে গড়ে এই গভীরতা আঠার হইতে বাইশ ফুট পর্য্যন্ত।

ঢাকা জেলার ভৌগোলিক বিবরণের প্রধান অধ্যায় এই জেলার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য নদনদীর প্রবাহ-বর্ণনা। এই জেলায় কেবল যে ক্ষীণকায় ও বিপুলকায় নদনদীর সংখ্যাধিক্য তাহা নহে, উক্ত নদনদীসমূহের বৈশিষ্ট্যই প্রধান ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এই বৈশিষ্ট্য আর কিছুই নহে, নদনদীর নিত্য প্রবাহ-পরিবর্ত্তন। যতীন রায় বলিয়াছেন, "নদী-প্রবাহের নিত্য পরিবর্ত্তন ঢাকা জেলার বিশেষত্ব। শত বৎসরের মধ্যে এতদঞ্চলে নদী কর্তৃক এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। স্থলভাগ জলে, জলভাগ স্থলে, এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটি প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে" (ঢাকার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড)। তদুপরি, এই প্রবাহ-পরিবর্ত্তন কেবল যে ভৌগোলিক গুরুত্ববিশিষ্ট তাহা নহে, ইহা অনেক দিন হইতেই বিশেষভাবে এতদ্দেশীয় লোকচরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং সাধারণভাবে ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পদ্মা ও কীর্ত্তিনাশার দৌরাত্ম্যে সন্ত্রস্ত ও বিব্রত না হইলে প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ঢাকাবাসী বাহিরে আপনার বিশিষ্ট কৃষ্টি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিত কি? যথাযোগ্য স্থানে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে।

এই প্রবাহ-পরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে ফার্গুসন সাহেবের মত উদ্ধৃত করেন। তাঁহার মতে ব-দ্বীপস্থ নদীসমূহের প্রবাহ-পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক ব্যাপার; কারণ বক্রভাবে বিকম্পন উক্ত নদীসমূহের
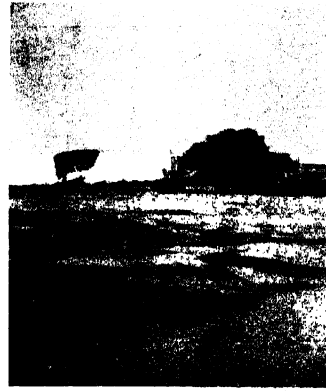
বর্ষায় বুড়িগঙ্গা

বিশেষত্ব। বক্র বিকম্পনের ফলে নদীর একতীর সমুচ্চ, অপর তীর সমতল ভূমিতে পরিণত হয়। সমতল ভূমি পাইলে নদীর স্রোতোবেগের গতি-প্রবণতা সেই দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন সেখানে নূতন নদীর উদ্ভব হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ফার্গুসন সাহেবের এই মতবাদ অনেকাংশে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ঢাকা জেলায় পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা প্রভৃতির উদ্দাম স্রোতোবেগের দরুণ অনেক নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, আবার অনেক প্রাচীন প্রবাহ বদ্ধস্রোত হইয়া জীর্ণদশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ঢাকা জেলা যদিও নদীমাতৃক স্থান, এখানে প্রধান নদনদী বলিতে যমুনা, পদ্মা, মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রই বুঝায়। অন্যান্য নদীসমূহ, যেমন ধলেশ্বরী, ইচ্ছামতী, লক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, বানার, বংশী, তুরাগ, বালু, এলামজানী, ইলিসামারী, তুলসীখালী প্রভৃতি উক্ত নদনদী-চতুষ্টয় হইতেই জন্মলাভ করিয়া উহাদের জলেই আপনাদের পুষ্টিসাধন করিতেছে।

যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ। রঙ্গপুরে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া

১।......In the southern division there are found small nodular masses of earth which appear to be composed of decayed vegetable matter. They are hard compact bodies of a jet black colour, and of so fine a substance, that when pulverized they are occasionally used by the natives to make ink.—Taylor, Topography, p. 8.

যিনাই বা যমুনা নামে ঢাকা জেলার পশ্চিমে বাইশকোদালিয়ার মোহানায় পদ্মার সঙ্গে মিলিয়াছে। যমুনার উৎপত্তিতে পদ্মা গতিবর্ত্তন করিয়া শ্রীপুর ধ্বংস করিল এবং কীর্ত্তিনাশা নামে আখ্যাত হইয়া পড়িল।

ঢাকা জেলায় পদ্মাই সর্ব্বাপেক্ষা খরস্রোতা নদী। পাবনা ও ফরিদপুরের সীমা রক্ষা করিয়া আসিয়া এই জেলার পশ্চিমে বাইশকোদালিয়ার মোহানায় যমুনার সঙ্গে মিলিয়াছে। পরে এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া আসিয়া জেলার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে মেঘনাদের সহিত মিলিয়াছে এবং পদ্মা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ-বাহিনী হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বে পদ্মা ফরিদপুর জেলার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেহেন্দিগঞ্জ থানার নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইত। পদ্মার এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়ল খাঁ নামে পরিচিত। গতিপরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র এই পদ্মা নদীতেই।

বুড়িগঙ্গা হইতে ঢাকার দৃশ্য

মেঘনাদ নদকে ঢাকার পূর্ব্বসীমা বলা যায়। ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বসীমা দিয়া বহিয়া আসিয়া ঢাকার পূর্ব্ব-উত্তরে ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই যুক্ত প্রবাহ মেঘনাদ নামে খ্যাত। মেঘনাদের পূর্ব্বতীরে ত্রিপুরা জেলা। উক্ত যুক্তপ্রবাহ পরে ঢাকার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থল হইতে পদ্মার সঙ্গমস্থল পর্য্যন্ত মেঘনাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০ মাইল। এই নদের জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। ইহার জলে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থ মিশ্রিত থাকায় ইহার জল এরূপ হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ হইতে বহিয়া আসিয়া ঢাকার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে। পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ করিয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বগামী হইয়াছে এবং কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া মেঘনার সঙ্গে মিশিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের যে অংশ ঢাকা জেলার অন্তর্ভুক্ত তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ১

ধলেশ্বরী যমুনার একটি বৃহৎ শাখা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা যমুনা অপেক্ষা প্রাচীন। ধলেশ্বরী এককালে স্বাধীন নদ ছিল, পরে প্রাকৃতিক কারণবশতঃ যমুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া উহাকে যমুনার শাখায় পরিণত করে। ধলেশ্বরী ঢাকা জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে আসিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে মেঘনায় পড়িয়াছে।

ধলেশ্বরীর এক শাখা বুড়িগঙ্গা। দৈর্ঘ্য ২৬ মাইল। সাভারের কাছে ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া পুনরায় নারায়ণগঞ্জের সমীপবর্ত্তী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে এই নদীর অবস্থা খুবই শোচনীয়।

শীতললক্ষ্যা বা লক্ষ্যা ব্রহ্মপুত্রের শাখা। উত্তরে ব্রহ্মপুত্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়াছে, পরে নারায়ণগঞ্জের দক্ষিণে গিয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে। অন্যান্য ক্ষুদ্রকায় নদীসমূহের পরিচয় সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া গেল :—

(নাম)	(উৎপত্তি)	(পরিণতি)
গাজীখালী	ধলেশ্বরী	ধলেশ্বরী
খুস্তার	"	"
বয়রাগাদি	"	"
বংশীনদী	ব্রহ্মপুত্র	"
তুরাগ	বংশীনদী	বুড়িগঙ্গা
টঙ্গীনদী	তুরাগ	লক্ষ্যা
বালুনদী	টঙ্গীনদী	"
আড়িয়ল খাঁ	ব্রহ্মপুত্র	মেঘনাদ
ইলসামারী	পদ্মা	ইছামতী
কীর্ত্তিনাশা	"	পদ্মা
কাচিকাটা	মেঘনাদ	কীর্ত্তিনাশা
সেরাজাবাদ নদী	"	মেঘনাদ
সালদহ নদী	মধুপুর জঙ্গল	তুরাগ নদী
লবণদহ	"	"

বস্তুতঃ অসংখ্য নদনদী ঢাকা জেলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়াছে। নদী-প্রবাহের আলোচনাকালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গেল—নদীসমূহের গতিপ্রবণতা দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ঢাকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণভাগ অপেক্ষাকৃত ঢালু। উপরি উক্ত প্রায় প্রত্যেক

১। "ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত টোকচাঁদপুরের পূর্ব্বদিকে আসিয়া মহেশ্বরদী পরগণার মধ্য দিয়া এই জেলায় প্রবেশ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া সোণারগাঁর পশ্চিমদিক্ দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার নিকট ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনায় পতিত হইত। ইহারই তীরে লাঙ্গলবন্দ ও পঞ্চমীঘাট অবস্থিত। এই নদী এখন সবানদী নামে অভিহিত হয়। শীতকালে এই নদীর অনেক স্থান শুষ্ক হইয়া শস্যক্ষেত্রে পরিণত হয়।"—কেদার মজুমদার : ঢাকার বিবরণ, ষষ্ঠ অধ্যায়।

নদীতেই জোয়ারভাঁটার নিয়মিত লক্ষণ প্রকাশ পায়। বুড়িগঙ্গাতে জোয়ার-ভাঁটার হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় আড়াই ফুট।

ঢাকা জেলার ভৌগোলিক বিবরণের অন্যতম প্রধান অধ্যায় উহার বনভূমির বর্ণনা। মধুপুরের বন বলিতে যে বিপুলায়তন অরণ্যসঙ্কুল স্থানকে বুঝায়, তাহা ঢাকা জেলার প্রায় সমগ্র উত্তরভাগ জুড়িয়া অবস্থিত। উহার দুই অংশ; পূর্বভাগ ভাওয়ালের গড় ও পশ্চিমাংশ কাসিমপুরের গড় নামে পরিচিত। এই বিশাল বনভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮০ মাইল, পরিসর ৪৫ মাইল। বনের উত্তরে ও পশ্চিমে গণ্ডশৈলমালা, ক্রমশঃ দক্ষিণে ও পূর্ব্বে ঢালু হইয়া আসিয়াছে। মৃত্তিকা কঠিন, লৌহমিশ্রিত, কঙ্করময় এবং রক্তবর্ণ। মধুপুর বন নিরবচ্ছিন্ন শৈলসমাকীর্ণ নয়, উচ্চভূমির নিরবচ্ছিন্ন সমাবেশও এখানে নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রক্তবর্ণ, কঠিন, মৃত্তিকাস্তূপ, স্থানে স্থানে উন্নতশির বৃক্ষরাজিসমাচ্ছন্ন অথবা তৃণাচ্ছাদিত হইয়া গৈরিক আভার এক রুদ্ররূপ প্রকাশ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুগভীর গহ্বর ও ঝিলসমূহও দেখা যায়। এই অরণ্যে পূর্ব্বে হিংস্র জন্তুর খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল, অধুনা বন অনেক পরিষ্কার হওয়ার দরুণ বন্য জানোয়ারের বাঁচিবার সুবিধাও কমিয়া আসিয়াছে।

ঢাকা জেলার মধ্যে মধুপুর অঞ্চলের ভূমির আপেক্ষিক উন্নতাবস্থাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে যাঁহারা সনিষ্ঠ গবেষণা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ব্লানফোর্ড সাহেব অন্যতম। এতদ্‌সম্বন্ধে তিনি তিনটি অনুমান উপস্থিত করিয়াছেন।১—প্রথম, নৈসর্গিক কারণবশতঃ উন্নতাবস্থাপ্রাপ্তি; দ্বিতীয়, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থানসমূহের স্বাভাবিক নিম্নতা; এবং তৃতীয়, ব্রহ্মপুত্র ভিন্ন অপরাপর নদী-প্রবাহ-আনীত মাটির স্তরের ক্রমশঃ উচ্চতা বৃদ্ধি। ব্লানফোর্ড সাহেব নিজে অবশ্য প্রথম অনুমানের উপরেই জোর দিয়া কোনও প্রচণ্ড ভূমিকম্পকেই প্রধান কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে যতীন রায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ ব্লানফোর্ড উপেক্ষিত উক্ত তৃতীয় অনুমানকেই যথার্থ কারণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

মধুপুরের মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্যবশতঃ এখানে উষ্ণোৎস আছে বলিয়া টেইলার সাহেব লিখিয়াছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে উহার অস্তিত্ব সন্দেহের বিষয়। তাঁহার মতে ঢাকার উত্তরাঞ্চলে বল্মিয়া বা পলাশের সমীপবর্ত্তী স্থানেও উষ্ণোৎস ছিল, বর্ত্তমানে তাহাও নিশ্চিহ্ন।

এককালে ঢাকার প্রাণিজগৎ খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং এই সমৃদ্ধির কেন্দ্রভূমি ছিল মধুপুর গড়। গড়ের নিবিড় নিস্তব্ধতা ও আরণ্য প্রকৃতিতে বর্দ্ধিত হইয়া চিতা ও ব্যাঘ্রশ্রেণী অস্বাভাবিক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠে। প্রায়ই বনভূমি হইতে বাহির হইয়া ইহারা গ্রামে গ্রামে অত্যাচার করিয়া বেড়াইত। অত্যাচার এতদূর ব্যাপক ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছিল যে, মুঘল গবর্ণমেণ্ট মধুপুরের সমীপবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্রহন্তা জায়গীরদারের জন্য নিষ্কর একপ্রকার ভূসম্পত্তির বন্দোবস্ত করেন। অদ্যাবধি উহা 'বাঘমারা তালুক' নামে পরিচিত। এতদঞ্চলে এককালে বন্যহস্তী ধরিবার খেদার প্রাচুর্য্য ছিল। নানা জাতীয় হরিণ, শশক, সজারু, কৃষ্ণভল্লুক, বন্য মহিষ প্রভৃতিরও সন্ধান পাওয়া যাইত। ইহারা আজ প্রায় নির্ম্মূল। মধুপুর গড় আছে, কিন্তু তাহার আরণ্য প্রকৃতি নিয়ত মনুষ্যহস্তে লাঞ্ছিত হইয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষের প্রাত্যহিক জীবন ক্রমেই সংঘাতবহুল হইয়া উঠিতেছে, জীবন-যাত্রা-পথে তাহার বিভিন্নমুখী ক্ষুধার ক্রমবর্দ্ধমানতা নূতন কথা নয়। কাজেই ধরাপৃষ্ঠে তাহারই বাসযোগ্য স্থানের অভাব বাড়িতেছে। এই নির্ম্মম প্রতিযোগিতার তীব্রতা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মত শক্তি পশুকুলের নাই। গৃহপালিত সাধারণ পশুপক্ষী ব্যতীত বৃহদাকার বন্য জন্তু জানোয়ার আজ বড় একটা চোখে দেখা যায় না। অন্যান্য অনেক জিনিষের মতই ঢাকা জেলার প্রাণিজগৎ আজ অতীতের ইতিহাস, তাহাও জীর্ণ। তবে এই প্রাণিজগতের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে আমরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আলোচনা করিব।

ঢাকা জেলার জল বায়ু সাধারণ স্বাস্থ্যের উপযোগী। ঋতুর লীলাবিলাস এখানে স্বচ্ছন্দ, তথাপি ছয় ঋতুর মধ্যে মাত্র তিন ঋতুর প্রকোপই বেশী লক্ষিত হয়। নিম্নবঙ্গের অন্যান্য স্থানের ন্যায় এখানে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাই প্রধান ঋতু। তন্মধ্যে, অন্ততঃ এক হিসাবে, বর্ষা ঋতুরাজ।

কনকসারের দীঘির একাংশ—ঢাকা

শীতের প্রকোপ জেলার উত্তরাংশে বেশী। প্রধান কারণ এই যে, দক্ষিণাংশে নদীবাহুল্য এবং উত্তরাংশ ঘনবিটপীসমাচ্ছন্ন হওয়ায় বায়ুপ্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য অনুভূত হয়। তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, শীতকালে এই জেলার তাপ আতিশয্যে ৮৭·৮° ডিগ্রী ও ন্যূনতায় ৫০·৪° ডিগ্রীর মধ্যে সংবদ্ধ থাকে। সুতরাং তুষারপাতনকারী প্রবল শৈত্য যে এখানে নাই, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কেবল ১৩১১ সনে মাঘমাসে এই জেলাতে প্রবল শীত ও তুষারপতন দেখা গিয়াছিল।

উত্তরাংশের বনভূমি ও দক্ষিণাংশের নদীবাহুল্য ঢাকা জেলাকে প্রবল গ্রীষ্মাতিশয্য হইতে রক্ষা করিয়াছে। কাজেই বঙ্গদেশের অন্যান্য অনেক

১। Medlicott and Blanford: Geology of India, Pt I.

জেলা হইতেই এই জেলাতে গ্রীষ্মের প্রকোপ কম। তাপের তারতম্য ৯৯·৩° ও ৬৫° ডিগ্রীর মধ্যে। শিলাবৃষ্টি সংঘটন গ্রীষ্মকালেই দেখা যায়।

গ্রীষ্মের পরেই বর্ষার একচ্ছত্রাধিপত্য আরম্ভ হয়। প্রকৃতপক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত বর্ষার প্রকোপ লক্ষিত হয়। ইহার প্রধান বাহন এই জেলার অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদনদীসমূহ। গ্রীষ্মের শেষের দিকেই নদীজল ক্রমশঃ স্ফীত হইতে থাকে, অতঃপর কিছুদিনের মধ্যে জেলার দুই একটি উচ্চ স্থান ব্যতীত (ভাওয়াল, কাসিমপুর, ঢাকা সহরের উত্তরাঞ্চল) সমগ্র স্থান নদীর স্ফীতজলে প্লাবিত হইয়া যায়। ঢাকা জেলা তখন এক অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। সমগ্র জেলা খণ্ড খণ্ড দ্বীপাকার, ইতস্ততঃ কাশপুষ্পগুচ্ছ নদী অথবা ক্ষুদ্রকায় জলাশয়সমূহের সীমানির্দ্দেশ করিতেছে, শস্যশীর্ষ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া বসুন্ধরার স্নেহের অনির্ব্বচনীয় মহিমার কথা ঘোষণা করিতে থাকে, চতুর্দ্দিকে একটা প্রশান্তির ছায়া—বর্ষা প্রকৃতই ঋতুরাজ।

বর্ষার সময়ে লোকের যে কিছুটা অসুবিধা হয় না তাহা নহে, কিন্তু তথাপি বর্ষা মঙ্গলের দূত। সম্বৎসরের আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিয়া এবং পললময় মৃত্তিকার সঞ্চয় দ্বারা ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া এই ঋতু এই জেলার যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে। বর্ষার জল নামিয়া যাইবার সময়ে কোথাও আবদ্ধ থাকিতে পারে না, কাজেই ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম। তবে ভাওয়াল ও মাণিকগঞ্জের পশ্চিমভাগে জল নিঃসরণের সহজ পন্থার অভাবেই বোধ হয় উক্ত অঞ্চলদ্বয় ম্যালেরিয়ার দ্বারা নিপীড়িত।

বায়ুর গতিপ্রবাহ সম্বন্ধে টেইলার সাহেব কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত তালিকা যথেষ্ট আলোকসম্পাত করিবে :—

এই তালিকা ১১ বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রস্তুত হইয়াছে :—

মাস	পূর্ব্ববায়ু	পূর্ব্ব-দক্ষিণ বায়ু	দক্ষিণবায়ু	দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ু	পশ্চিমবায়ু	উত্তরবায়ু	উত্তর-পূর্ব্ব বায়ু	উত্তর-পশ্চিম বায়ু	বাতশূন্যতা	মোট
	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন	দিন
এপ্রিল	১৫৭	৪১	৩২	৯	২২	৪	৩	৫	[illegible]	৩৩০
মে	১৮১	৪০	২০	৫	১৫	১	২	৭	৭০	৩৪১
জুন	[illegible]	৩২	১৫	৬	২	১	১	০	৮	৩৩১
জুলাই	২১১	৭০	৩৩	১৭	৬	১	১	০	৪	৩৪১
আগষ্ট	২১৬	৪১	৪৫	৭	১২	০	৮	০	১২	৩৪১
সেপ্টেম্বর	১২৬	৪৫	১৫	১৯	৩৩	১	৩	০	৫৬	৩২৮
অক্টোবর	১০৪	২১	৯	১১	৪৭	১৪	১৬	১৭	১০২	৩৪১
নভেম্বর	২৯	২	৬	১	৯৭	৫৬	৪	৪২	৯৩	৩৩০
ডিসেম্বর	১৪	০	৯	০	৭২	৩০	৩	৯২	১২৬	৩৪১
জানুয়ারী	২৫	০	২	৪	১৪৪	১৫	৪	৮১	৬৬	৩৪১
ফেব্রুয়ারী	২৭	৪	৭	৫	১১০	১২	২	৩৪	১০৭	৩০৮
মার্চ্চ	৮৮	৬	২৭	৮	১১০	৩	৫	১৩	৮১	৩৪১

(Taylor : Topography of Dacca, P. 15)

এইবার এই জেলায় প্রাকৃতিক বিপ্লবের কিছুটা পরিচয় দিলেই বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করা যায়। খুব সংক্ষেপে তালিকা সৃষ্টি করিয়া উপস্থিত করিলে উহা চুম্বকরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ভূমিকম্প :

সন ১৮৯৭—জেলার উত্তরাংশের খালবিলের মুখ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; রেলপথ বিধ্বস্ত হওয়ায় ট্রেণ চলাচল বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল।

সাল ১১৬৮—প্রবল ভূকম্পের অব্যবহিত পরে অত্যধিক জলবৃদ্ধি, বহু সংখ্যক জীবননাশ।

সাল ১২৫৩—তিনদিনব্যাপী অন্ততঃ বিংশতিবার কম্পন।

সাল ১২৫৭—চট্টগ্রাম ও ঢাকাতে কম্পন।

এতদ্ব্যতীত ১২৫৯, ১২৭০, ১১৩৮, ১১৮১, ১২৩৮, ১২৭৮ সালেও প্রচণ্ড কম্পন হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

জলকম্প :

ইহা স্বতন্ত্রভাবে অথবা ভূমিকম্পের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত হয়। ১৩০৯ সালের ব্যাপক জলকম্পের কথা ভুলিবার নহে।

জলপ্লাবন :

নদীবাহুল্য ও জেলার দক্ষিণাংশের অপেক্ষাকৃত নিম্নতাবশতঃ এখানে অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ অপেক্ষা জলপ্লাবনের প্রকোপ বেশী। ১৮৮৭-৮৮ সনে যে ভীষণ জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়া প্রায় ষাট হাজার জীবন বিনাশের কারণ হইয়াছিল, টেইলার সাহেব তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া-

ছেন। ১৭৬৯-৭০, ১৭৮৪, ১৮৩১-৩৪, ১৮৭০ ও ১৮৭৬ সনের জলপ্লাবন দেশের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছিল। শেষোক্ত জলপ্লাবন বাংলা ১২৮৩ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া উহা সাধরণতঃ 'তিরাশী সনের বন্যা' নামে পরিচিত। বর্ত্তমান বৎসরে এতদঞ্চলে বর্ষার জল অসম্ভব ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া সহস্র সহস্র লোকের যে প্রভূত ক্ষতি করিয়াছে, তাহাতে ইহাকেও উপরি উক্ত বন্যাসমূহের সহিত তুল্যাসন প্রদান করা চলে, অবশ্য যদি লোকের দুঃখদুর্দ্দশার মাত্রা দিয়া বন্যার পরিমাপ করা যায়।

ঝটিকাবর্ত্ত ঃ

সন ১৮৮৮—এই 'তুর্ণড' সমগ্র বঙ্গদেশে 'ঢাকার তুর্ণড' ও বিক্রমপুরে 'হাসাইলের ঝড়' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। ঢাকা সহরেরই অনেক ইষ্টকালয় ইহাতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

সন ১৯০২—ঢাকার দ্বিতীয় তুর্ণড। ইহাতেও অন্যান্য ক্ষতি ব্যতিরেকে বিস্তর জীবননাশ হয়।

১৩১০ সালে এতদঞ্চলে বিদ্যুৎপিণ্ড দেখা গিয়াছিল।

সমগ্র বৎসরে গড়ে মাত্র ৭৯.০৭ ইঞ্চি বারিপাত হওয়াতে ১৮৬১ সনে এই জেলায় অনাবৃষ্টি হইয়া পরবৎসর এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কারণ হইয়াছিল। তবে আজ পর্য্যন্ত অনাবৃষ্টির ফলে এই জেলার শস্যহানির খবর খুব কমই জানা গিয়াছে।

১২৭৬ সালে এই জেলায় শস্যহানিকর পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। উৎপাতের মাত্রা কিন্তু সৎসামান্যই। ১৮৬৬ সনে নারায়ণগঞ্জ, সুয়াপুর, ফুলবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে পঙ্গপাল কর্ত্তৃক শস্যহানির বিষয় জানা যায়।

ঢাকা জেলার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিচয় প্রদান করা হইল। পরিশেষে, এই জেলার ভৌগোলিক সংস্থান ইহার লোকচরিত্র কতদূর প্রভাবান্বিত করিয়াছে তাহাই আমরা বিবেচনা করিব। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—Geography is the root, History is the fruit, সমুদ্রমেখলাবেষ্টিত দ্বীপবাসী ব্রিটনদের সামুদ্রিক দক্ষতার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। দক্ষিণঢাকাবাসী কৃষকসম্প্রদায় (তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) উত্তর জেলাবাসীদের অপেক্ষা কর্ম্মক্ষমতায় ছোট। যেহেতু, প্রকৃতিদেবী দক্ষিণঢাকাকে অধিক উর্ব্বরা করিয়া অযাচিত স্নেহের পরিচয় দিয়াছেন। উত্তরাঞ্চলের কঠোর প্রকৃতি শেষোক্ত সম্প্রদায়কে অধিক সাহসী, কর্ম্মতৎপর ও কষ্টসহিষ্ণু হইতে বাধ্য করিয়াছে। এখানে জীবিকার্জ্জন খুব সহজ নয়। পক্ষান্তরে নদী-প্রকৃতি ও নদনদীবাহুল্য দক্ষিণাঞ্চলের লোকদের জীবনযাত্রার পথ সুগম করিয়াছে। নদীপথে বাণিজ্যিক অভিযান, নৌশিল্প, মৎস্যব্যবসায় প্রভৃতি নদীসম্পর্কিত কর্ম্মে লিপ্ত থাকিবার সুবিধা ও সুযোগ এদিকে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। এক্ষেত্রে অবশ্য উল্লেখযোগ্য যে, প্রাকৃতিক সুযোগ গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন আলোচনা করিতে গেলে উত্তরাঞ্চলকে বাদ দিলে চলে না। সেখানকার মৃত্তিকাস্তরের বৈশিষ্ট্য কোনও কোনও স্থানে মৃৎশিল্পের পরিপুষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

ঘোড়দৌড় বাজার—ঢাকা

ঢাকা জেলায় বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষে বিক্রমপুর শীর্ষস্থানীয়। যুগযুগান্তপুষ্ট কৃষ্টিগত ঐতিহ্য ইহার পিছনে। কিন্তু পদ্মা ও কীর্ত্তিনাশা যে রকম নির্ম্মমতার সহিত বিক্রমপুর ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে, তাহা যুগপৎ নৈরাশ্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। বিক্রমপুরবাসী দলে দলে ঘরছাড়া হইতেছে—যদিও এখানে অন্যান্য কার্য্যকরী শক্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের শূন্যতার অর্থ সমগ্র জেলার সর্ব্বাঙ্গীন মৃত্যু। সমগ্র বঙ্গদেশেও ইহার ফলাফল কম শোচনীয় হইবে না। তাই আজ প্রশ্ন, মুক্তির পথ কী? প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে যুঝিবার উপযুক্ত শক্তি কই?

[এই প্রবন্ধের আলোকচিত্রগুলি শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত]

পথ-নির্দ্দেশ

...ভারতবাসিগণ যেরূপ অর্থাভাব ও স্বাস্থ্যাভাবে জর্জ্জরিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার আশু প্রতিকার না হইলে তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হতশ্রী প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এতাদৃশ অবস্থায় যে রাস্তায় উহার প্রতীকার করা সময়সাপেক্ষ, সেই রাস্তা পরামর্শসিদ্ধ নহে। ঐক্যবন্ধনের জন্য যাঁহারা বক্তৃতার দ্বারা প্রতিনিয়ত চীৎকার করিতেছেন, তাঁহাদিগের কার্য্য আমাদিগের মতে, গভীর চিন্তাপ্রসূত নহে। শুধু মুখের কথার দ্বারা একটি দেশের সমস্ত লোককে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত করা সম্ভবযোগ্য নহে। এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়, যাহাতে মুখে কোন কথা না কহিলেও একমাত্র কার্য্যের ফলেই মিলন অনায়াসসাধ্য ও অনিবার্য্য হয়। যাহা অনায়াসসাধ্য নহে, তাহা কখনও জনসাধারণ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। ঐরূপ ব্যবস্থা না হইলে যে প্রকৃত মিলন সম্ভবযোগ্য হয় না, তাহার প্রমাণ স্বদেশীযুগের নেতৃবর্গের ও গান্ধীজীর কার্য্য। তাঁহারা মিলনের উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতার কোন ত্রুটি করেন নাই, অথচ ভারতবাসীর মিলন হওয়া ত' দূরের কথা, দলাদলি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই যদিও দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য দেশবাসীর মিলন সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজনীয়, তথাপি উহার কথা আপাতত ছাড়িয়া দিয়া কোন্ কার্য্যে উহা অনায়াস-সাধ্য হয় সেই কার্য্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে।...

বুদ্ধির-ঢেঁকী

—শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল

১

দোতালায় আমার শোবার ঘরের সামনের বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে, চাকর রামদীনকে বলেছি, এক পেয়ালা চা আনতে, এমন সময় বড় রাস্তায় একটা ভয়ানক সোরগোল শুনতে পেলাম। বড় রাস্তা আর তা থেকে বেরিয়েছে যে ছোট গলি, সেই মোড়ের উপর আমার বাড়ী। বাড়ীতে তখন থাকি একলা আমি, গৃহিণী তখন কোন কারণে ক'দিনের জন্য ভাইয়ের বাড়ী গিয়েছেন, আর তাঁর প্রতিনিধিস্বরূপ আমার অভিভাবকত্ব করবার ভার দিয়ে গেছেন, মেড়ুয়া চাকর রামদীন আর উড়িয়া ঠাকুর শালগ্রাম পাণ্ডার উপর। রামদীন তখন নীচে চা করছে, শালগ্রাম গেছে বাজার করতে, কাজেই ব্যাপারটা কি জেনে আসতে হুকুম করব এমন লোকও কেউ তখন ছিল না।

আমি যে দিক্‌টায় বসে ছিলাম সেটা গলির দিক্, সেই দিকের বারান্দাটা ঘুরে বড় রাস্তার দিকেও এসেছে। আলস্য ত্যাগ করে বারান্দা ঘুরে বড় রাস্তার দিক্‌টায় এসে দেখতে পেলাম, একটা লোক ছুটছে, আর তার পিছনে পিছনে ছুটছে একটা জনতা; ভাল করে লোকটাকে দেখবার অবকাশ পেলাম না—যেটুক্ চোখে পড়ল, তাতে দেখতে পেলাম কপালের একদিক্ বেয়ে রক্ত পড়ছে। লোকটা ছুটে এসে ঢুকল আমাদের গলিতে —অনুসরণকারীরা তখন অনেকটা পিছনে।

অনুসরণকারীর মধ্যে দুটো তিনটে লাল পাগড়ীও যাচ্ছিল। তাদের একজন হুইস্‌ল্ দিচ্ছিল। 'ধর! ধর! চোর! চোর!' চীৎকার, পুলিশের হুইস্‌ল্-এর শব্দ, তার সঙ্গে ট্রাম, বাস, লরী, গাড়ী প্রভৃতির শব্দ, সবগুলি মিলে একটা বিশ্রী অনৈক্যতানের সৃষ্টি করছিল। মনে হল, কোন গাঁটকাটা বা ছাঁচড়া চোরের পিছনে পুলিশের অভিযান, আর তাতে যোগ দিয়েছেন হুজুগপ্রিয় সহরের নিষ্কর্ম্মা পথচারী, বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়লাম।

আমার বাড়ীর দু'তিনটে বাড়ীর পরই আবার একটা গলি, আমাদের গলিটাকে কেটে বেরিয়ে গেছে। আমার দোতালার বারান্দা থেকে সেই গলিটারও অনেকটা দূর দেখতে পাওয়া যায়। ইজিচেয়ারে বসে সেই দিকে তাকিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেলাম না। অনুসরণ-কারীরা কিন্তু সেই গলি দিয়ে হল্লা করতে করতে ছুটে গেল। ভাবলাম—তাইতো লোকটা গেল কোথায়?

হঠাৎ আমার শোবার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, ঘরের ভিতর সেই লোকটা। কপালের রক্তের ধারাই তাকে দিল চিনিয়ে! আমার চোখ তার দিকে পড়তেই সে দুটি হাত জোড় করে আমার দিকে তাকাল। কোন কথা বলল না; কিন্তু তার চোখে মুখে ফুটে উঠল এমন একটা আকুল মিনতির ভাব যে, তা দেখে—চেঁচিয়ে ডাকতে যাচ্ছিলাম রামদীনকে—আর ডাকতে পারলাম না। তার পরিবর্ত্তে, আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে অন্যদিকের দরজাটা, যে-দিক্ দিয়ে রামদীনের আসবার পথ, সেইটা বন্ধ করে দিয়ে লোকটার সামনে এসে দাঁড়ালাম।

লোকটি খাটো-খোটো, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী, একহারা চেহারা, গায়ে একটা টুইলের সার্ট, পায়ে অ্যালবার্ট জুতো, দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক। জিজ্ঞাসা করলাম,— —'কি হে ব্যাপারটা কি? গাঁট কেটেছ?'

লোকটি এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, হাতজোড় করে বলল,—'দোহাই আপনার! আমাকে পুলিশে দেবেন না।'

আমি বললাম,—'কি করেছ সেটা খুলে বল, তারপর আমি বুঝব, পুলিশে দেব, কি দেব না?'

ভগ্ন-স্বাস্থ্য 'ভগীরথ'-এর স্বাস্থ্যান্বেষণ
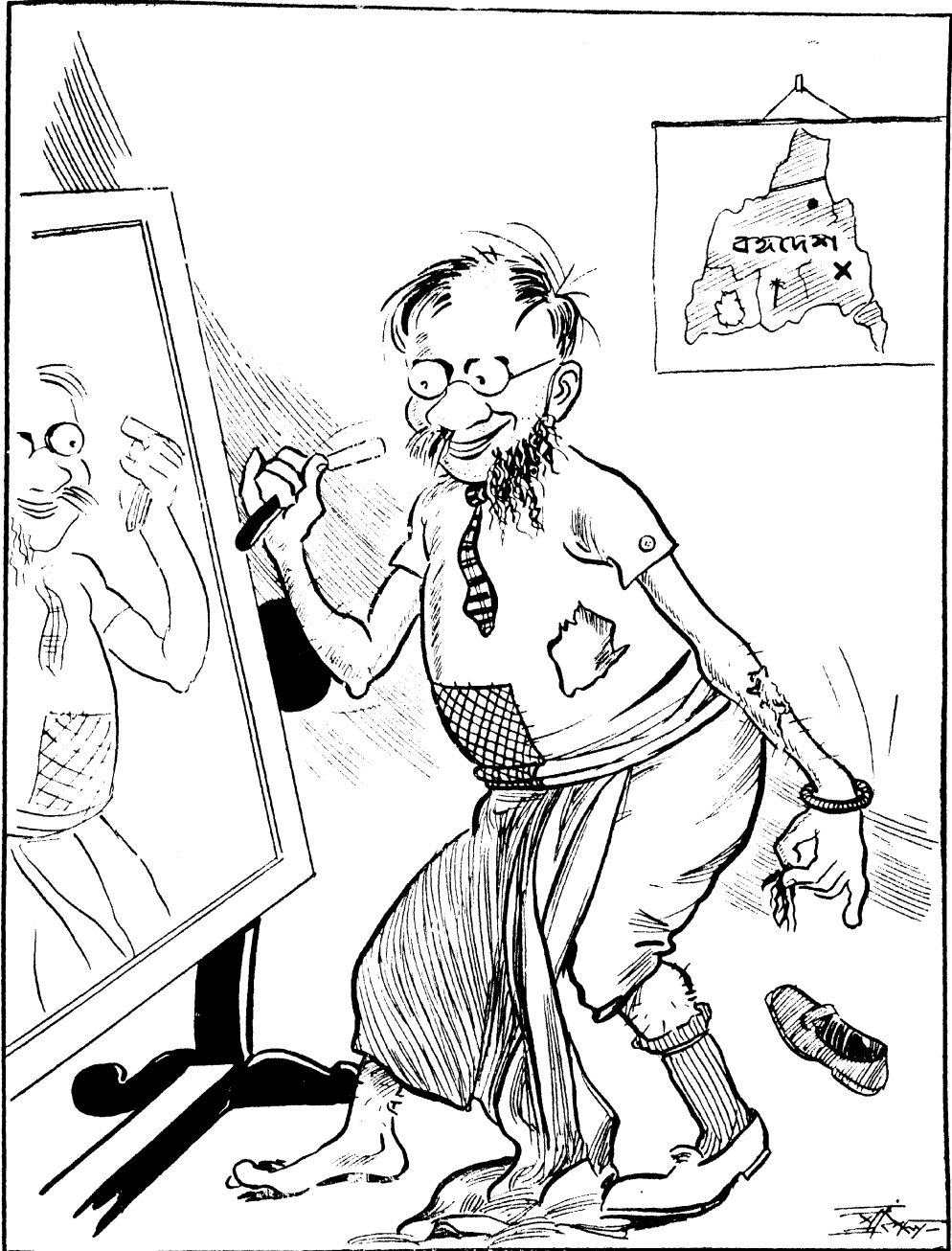
" কোথাও বা অরণ্যারোপণ, কোথাও বা বিল ও তড়াগ রক্ষা ও পোষণ, কোথাও নদীপথে বাঁধ দিয়া জলাশয় নির্ম্মাণ, কোথাও বা শুষ্ক নদীতে খরস্রোত নদীর বন্যা আনয়ন, কোথাও খাল খনন, কোথাও বা নদীর পঙ্কোদ্ধার বা মোহানার পরিসর বৃদ্ধি, নানা উপায় অবলম্বনে নূতন ভগীরথকে আজ মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গকে অস্বাস্থ্য ও কৃষির দুর্গতি হইতে এবং উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গকে সর্ব্বনাশী নদীভাঙ্গন ও প্লাবনবেগ হইতে বাঁচাইতে হইবে।"

[ক্ষয়িষ্ণু বাংলা—ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই অগ্রহায়ণ

লোকটা ধপ করে মেজের উপর বসে পড়ল; মনে হল যে, তখনই মূর্চ্ছা যাবে। পাশের টেবিলের উপর থেকে জলের কুঁজো গড়িয়ে একগ্লাস জল তাকে খেতে দিলাম। ঢক ঢক করে সে একগ্লাস জল খেয়ে ফেলল, তারপর এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে বলল,—'ওরা তো আবার এখানে আসবে না?'

আমি বললাম,—'না, ওরা সব মনে করেছে, তুমি ঐ গলিটা দিয়ে পালিয়েছ; ওরা সেইদিকে ধাওয়া করেছে।'

লোকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল,—'বেঁচেছি তা হলে।'

আমি বললাম,—'বেঁচেছ বলতে পারি না, তবে ওদের হাত থেকে বেঁচেছ বটে। এখন আমার হাত থেকে বাঁচবে কি না, সেইটাই হচ্ছে প্রধান কথা।'

লোকটা একবার আমার মুখের দিকে তাকাল, তারপর একটু হেসে বলল,—'ওঃ আপনি?—আপনি কখন পারবেন না আমাকে পুলিশে দিতে। সকল কথা শুনলে আপনি আমাকে দয়া না করে পারবেন না।'

লোকটা বলে কি? কোনদিন আমার সঙ্গে জানা শোনা নেই, একটা যা হোক কিছু অন্যায় কাজ করে এসেছে তাতেও সন্দেহ নেই, তবু সে ঠিক করে ফেলেছে, আমি তাকে পুলিশে দেব না—সাহস তো লোকটার কম নয়। কিন্তু কেন যেন, লোকটার সেই ম্লান হাসি, আর সেই মিনতিপূর্ণ চাউনি দেখে, তার মার্জ্জিত কথা শুনে, আমার মন কিছুতেই মানতে চাচ্ছিল না যে, এ রকম লোক কোন রকম একটা গুরুতর অপরাধের কাজ করতে পারে। যাই হোক, মনের সেই ভাবটাকে চেপে রেখে মুখে একটা কঠোরতার ভাব আনতে চেষ্টা করে একটু রুক্ষ কণ্ঠেই বললাম,—'ও সব ন্যাকাম রেখে, কি করেছ খুলে বল দেখি।'

লোকটা আমার মুখের দিকে আবার একবার তাকাল, একটু যেন সন্দেহ, একটু যেন দোমনা ভাব, বলবে কি না—তার মুখে অল্প সময়ের জন্য যেন জেগে উঠল, কিন্তু তারপরই সে আমার মুখে কি দেখতে পেল জানি না—তার মুখে ফুটে উঠল, আবার সেই হাসি, আর তার সঙ্গে একটা অগাধ বিশ্বাস, একটা একান্ত নির্ভরশীলতার ভাব। গলার স্বরটা হল একটু গাঢ়, উঠল একটু কেঁপে, বলল,—'আমি একটা লোককে খুন করেছি।'

২

কি সর্ব্বনাশ! লোকটা বলে কি? গাঁটকাটা নয়; চোর নয়, ডাকাত নয়, একেবারে খুনে! একটা বিস্ময়-সূচক শব্দ বেরিয়ে এল আমার মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা দিয়ে রামদীন হাঁকল—

"হুজুর চা লে আয়া—"

লোকটা চমকে উঠে চাইল এদিক্ ওদিক্, যেন পালাবার পথ খুঁজছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সে খুনে একথা জেনেও কেন যেন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা আশ্বাস-বাণী—

"ভয় নেই! ও আমার চাকর।—"

দরজা খুলে দিলাম, ট্রের উপর চা আর টোষ্ট নিয়ে রামদীন ঘরে ঢুকল। বেশী কথা রামদীন কোন দিনই বলে না, লোকটার দিকে বিস্ময়সূচক দৃষ্টিতে ড়-একবার মাত্র চেয়ে দেখল, তারপর চায়ের সরঞ্জাম একটি টীপয়ের উপর রেখে দাঁড়িয়ে থাকল, আমার আদেশের প্রতীক্ষায়। লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখি, বুভুক্ষিত দৃষ্টি দিয়ে সে তাকাচ্ছে ঐ চা আর টোষ্টের দিকে। রামদীনকে বললাম আর এক পেয়ালা চা আর টোষ্ট আনতে। রামদীন চলে গেলে আমি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—"চা খাবে?" লোকটি আমতা আমতা করে বলল,—"আজ্ঞে, আজ সারা দিন কিছু খাই নি।" চায়ের পেয়ালা আর টোষ্টের ডিস তার দিকে এগিয়ে দিলাম, তার চোখে ফুটে উঠল একটা কৃতজ্ঞ দৃষ্টি, সে ধীরে ধীরে খেতে লাগল। রামদীন নিয়ে এল আর এক পেয়ালা চা আর ক'খানা টোষ্ট। রামদীনকে ঐগুলি রেখে চলে যেতে বললাম।

লোকটি খেতে লাগল, আর আমি তার খাওয়া দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম, তার কথা। লোকটার মুখখানি আর চোখদুটি যেন একটা স্বচ্ছ দর্পণ, হুবহু প্রতিফলিত হয় তাতে মনের ভাবগুলির প্রতিবিম্ব। কথাগুলি বেশ মার্জ্জিত ও ভদ্র। এই লোকটা খুনে? লোকটার খাওয়া শেষ হল, আর এক পেয়ালা চা আর টোষ্ট যা ছিল,

আমি সেগুলিও এগিয়ে দিলাম তার দিকে, বললাম—"খাও।" সে যেন অপরাধীর মত, আমার মুখের দিকে তাকাল। একটা দারুণ সঙ্কোচের সঙ্গে বলল,—"আপনি খাবেন না?" আমি বললাম,—"আমি পরে খাব, তুমি খাও।—"

তার খাওয়া শেষ হল। একটা সিগারেট তাকে দিলাম। আমার সামনে সে খেল না, সিগারেটটা নিয়ে আড়ালে গিয়ে খেয়ে ফিরে এল। আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন একবার বল দেখি তুমি কে, আর ব্যাপারটাই বা কি?"

সে বলতে আরম্ভ করল, আমি শুনতে লাগলাম।

সে একজন জাহাজের কেরাণী, কলকাতা আর রেঙ্গুনের মধ্যে যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, সেই সব জাহাজে তাকে যাতায়াত করতে হয়। সংসারে তার কেবল মাত্র স্ত্রী, আজ বছর তিনেক হল তাদের বিয়ে হয়েছে। স্ত্রী সুন্দরী, বেথুন কলেজিয়েট স্কুলে মাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল। বিবাহের পর প্রথম দু'বছর তাদের বিবাহিত জীবন বেশ সুখেই কেটেছিল; তখন সে কাজ করত কোম্পানীর কলকাতার অফিসে, বারমাসই থাকতে হত কলকাতায়। তারপর তাকে বদলী করল জাহাজে, বছরের মধ্যে বেশী দিনই হ'তে লাগল তাদের ছাড়াছাড়ি। এর মধ্যে তাদের বিবাহিত জীবনে ধূমকেতুর মতন উদিত হ'ল এসে তার দূর-সম্পর্কিত এক মাসতুত ভাই। কলকাতার এক বড়লোকের এক বকাটে ছেলে।

একটা বাড়ীর মধ্যে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে তারা থাকত।

পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকত তার একজন সহকর্ম্মী বন্ধু আর সেই বন্ধুর স্ত্রী। তার সেই মাসতুতো ভাই আর তার স্ত্রীর মধ্যে, তার অনুপস্থিতি সময়ে কতগুলি বিসদৃশ ভাব লক্ষ্য করেছিল সেই বন্ধুর স্ত্রী, সে বলেছিল সে সব কথা তার বন্ধুকে, তার বন্ধুও তাকে আকার-ইঙ্গিতে সাবধান করেছিল, কিন্তু সে সব কথা সে বিশ্বাস করে নি। অগাধ বিশ্বাস ছিল তার স্ত্রীর উপর।

তাদের জাহাজ ডকে পৌঁছবার কথা ছিল কাল সকালে। সে তার স্ত্রীকে চিঠিতে তাই লিখেছিল, কিন্তু অনুকূল হাওয়া পেয়ে জাহাজ আজ বেলা দুটোতেই ডকে পৌঁছে যায়। জাহাজের কাজ সেরে রিপোর্ট আর কাগজপত্র অফিসে পেশ করে সে প্রায় বেলা তিনটের সময় বাসায় উপস্থিত হয়েছিল; অতর্কিত ভাবে উপস্থিত হয়ে সে এমন অবস্থায় তার স্ত্রীকে আর তার মাসতুতো ভাইকে দেখতে পায়, যাতে তার স্ত্রী যে বিশ্বাসহন্ত্রী, এ বিষয়ে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

এই পর্য্যন্ত বলার সঙ্গে সঙ্গে, তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল, বুঝতে পারলাম সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে কান্না চেপে রাখতে। আমি যে চেয়ারখানায় বসেছিলাম, সেটা থেকে উঠে, দেরাজের উপর যেখানে আমার সিগারেট-কেসটা ছিল, সেখানে গিয়ে তার দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার উদ্দেশ্য থাকল, তাকে বুঝতে না দেওয়া যে, সে যে দুর্ব্বলতাটাকে গোপন করতে চেষ্টা করছে, আমি তা' ধরতে পেরেছি।

অল্পক্ষণের চেষ্টায় আত্ম-সম্বরণ করে সে আবার বলতে আরম্ভ করল—

'প্রভাকে কত ভালবাসতাম, কি আসন তাকে দিয়েছিলাম নিজের অন্তরের মধ্যে, বলে বোঝাতে পারব না। তার এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ নিজ চোখে দেখার পরও সে যদি অনুতপ্ত হত, তা হলেও হয়তো সব ভুলে যেতাম। কিন্তু কি হল জানেন? আমার সেই মাসতুতো ভাই, সে আমায় করতে লাগল বিদ্রূপ, আর প্রভা যোগ দিল তার সঙ্গে।'

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম—'কি বিদ্রূপ করল তারা তোমাকে?'

'আমি দরিদ্র কেরাণী, প্রভার মত সুন্দরীকে বিয়ে করাই আমার বেকুবী হয়েছে, এই দারিদ্র্যপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রভাকে মানায় না, এই সব—'

'তার পর?'

'তার পর?' - লোকটা উন্মাদের মতন হেসে উঠল আর বলল,—

'তার পর সেই লোকটা আমাকে কি প্রস্তাব দিল জানেন? সে বলল যে, জানাজানি হয়ে যাওয়া ভালই হয়েছে, ঢাক ঢাক গুড় গুড় তারও আর ভাল লাগছিল

না। তার প্রভাকে চাই, প্রভাও তাকে চায়। সে আমাকে পাঁচ হাজার টাকার একখানা চেক দিতে প্রস্তুত, প্রভা নামে মাত্র আমার স্ত্রী থাকবে, তাকে এর চেয়ে ভাল বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হবে; লোকের মুখ বন্ধ করবার জন্য আমি যখন ট্রীপ থেকে ফিরে আসব তখন সেই বাড়ীতেই উঠব, কিন্তু প্রভার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকতে পারবে না।'

আমার হাতের সিগারেটটি পুড়ে এসে তখন আমার হাতের আঙ্গুলে প্রায় লেগেছে, কিন্তু আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি একদৃষ্টে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম, আর মর্ম্মাহত হয়ে শুনছিলাম, একটি সরল সুকোমল প্রাণের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধির করুণ কাহিনী।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি বললে তুমি এই প্রস্তাব শুনে?'

লোকটার কপালের শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, চোখের কোণে যেন আগুন জ্বলে উঠল, বলল, 'মুখে কিছুই বললাম না, ছুটে গিয়ে তাকে আক্রমণ করলাম। কি আস্পর্দ্ধা? ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভুলিয়েছে সে আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে, আবার সেই ঐশ্বর্য্যের দেমাকে টাকা দিয়ে সে চুণকাম করতে চায় আমার কলঙ্কের কালী?

'তার পর?'

'আক্রমণ করে কিছুই করতে পারলাম না। সে পুরো চার হাত জোয়ান, ডন-কুস্তি করে দেহটিকে বেশ তৈরী করেছে আর আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছেন; সে একটা ধাক্কা দিয়ে আমাকে দিল ফেলে, আর পায়ের জুতো দিয়ে আমার মাথায় দিল গোটা দুই ঠোক্কর, আর প্রভার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে,—ওগো তোমার ননীর পুতুল পড়ে গেল যে, ধরে তোল না। আর প্রভা, সেও এই রসিকতায় উঠল হেসে।'

'তার পর?'

'আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, উঠে চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, হাতের কাছে একটা টীপয়ের উপর ছিল ফল-কাটা বড় একখানা ছুরী, কখন সেটা তুলে নিয়েছি, কখন সেটা সেই পিশাচের বুকে বসিয়ে দিয়েছি কিছুই জানি না; ভগবান্ কি সয়তান, কে আমার হাতটাকে চালিয়ে দিল, কে আমাকে শক্তি দিল, আমি বলতে পারব না।'

৩

সে চুপ করে হাঁপাতে লাগল। তার পর এল একটা দীর্ঘ-কালব্যাপী নীরবতা। কিন্তু সেই নীরবতার প্রতি মুহূর্ত্তটির স্পন্দন, আমি আমার মনের মধ্যে অনুভব করতে লাগলাম, প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত আমার মনের মধ্যে সাড়া দিতে লাগল একটা বিরামবিহীন দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। মস্তিষ্কের সঙ্গে হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। একে নিয়ে কি করব? মস্তিষ্ক বলছিল, 'একে পুলিশে দাও নইলে ভবিষ্যতে তোমাকে পড়তে হবে হাঙ্গামায়, কিন্তু হৃদয় বলছিল—'একে আশ্রয় দাও, ভেবে দেখ, এই অবস্থায় পড়লে তুমি কি চাইতে।'

কিছুক্ষণ পরে এই নীরবতা ভঙ্গ করে লোকটি বলে উঠল—

'আমাকে কি করতে বলেন তা হলে?'

হৃদয়ের ওকালতিটাকে ঠেলে ফেলে দিতে চেষ্টা করলাম, বললাম—

'আমার মনে হয় তোমার উচিত নিজে গিয়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা আর সব কথা খুলে বলা। তোমার উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ ছিল, তোমার কোন সাজাই হবে না।'

'কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে কে? আমার স্ত্রী, সে তো আমার বিরুদ্ধেই বলবে।'

কথাটা মিছে বলেনি, পুলিশে আত্মসমর্পণ করলে উল্‌টো ফলও হতে পারে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি করতে চাও তা হলে?'

লোকটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল,

'আপনি যদি আমাকে ছেড়ে দেন আমি তাহলে পালাব।'

'কেমন করে কোথায় পালাবে?'

'আজ রাত্রে একটার সময় একখানা জাহাজ ছাড়বে, রেঙ্গুণ যাবে। তার কেরাণী আমার বিশেষ বন্ধু, তাকে

সব কথা বললে, সে আমাকে রেঙ্গুণ নিয়ে যাবে, আমি তার ক্যাবিনে লুকিয়ে থাকব।'

'তারপর?'

'তার পর কি হবে এখন ভাবতে পারি না প্রাণটা যদি একবার বাঁচে তখন একটা পথ হবে।'

'সেখানে গিয়ে খাবে কি? টাকা-পয়সা তোমার কাছে কিছু আছে?

পকেট থেকে একটা মনিব্যাগ বের করে সে ঢেলে ফেলল, দেখা গেল গোটা তিনেক টাকা আর ক'আনা পয়সা তাতে আছে। বলল,

'এই আমার সম্বল! মাইনে যখনই পাই, সামান্য কিছু হাত-খরচের জন্য রেখে সবই তার হাতে তুলে দিই।'

কিছুক্ষণ ধরে আবার নীরবতা, আবার আমার মনের মধ্যে সেই দ্বন্দ্ব, লোকটার মুখের দিকে তাকালাম, দেখলাম, একটা প্রবল উৎকণ্ঠার, আশা-নিরাশার একটা প্রবল ঘাত-প্রতিঘাতের করুণ ছবি ফুটে উঠেছে তার মুখে আর চোখে। মস্তিষ্কের সওয়াল-জবাব আর টিকল না, হৃদয়ের ওকালতিরই জয় হল।

আমার ওয়ার্ডরোব আলমারি খুলে একখানা কাপড়, একটা গেঞ্জি, একটা সার্ট আর একটা কোট বের করলাম, তাকে দিয়ে বললাম—

'ঐ বাথরুমে যাও, তোমার এই রক্তমাখা জামা-কাপড়গুলি খুলে ফেলে স্নান করে পরিষ্কার হয়ে এই জামকাপড়গুলি পরে এস।'

লোকটা তাই করল। স্নান করে আমার জামা-কাপড় পরে যখন সে বেরিয়ে এল, তখন তার চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে, জামাগুলি সামান্য একটু বড় হলেও একেবারে বেমানান হয় নি।

ড্রয়ার খুলে দশ টাকার চারখানা নোট আর খুচরো দশটি টাকা তার হাতে দিলাম। চোখ দুটি বড় বড় করে সে তাকাল আমার মুখের পানে, আর চোখের দুকোণ দিয়ে ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়তে লাগল জল। পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে সে করল আমায় প্রণাম। তারপর একবার হাত জোড় করে তাকাল উপরের দিকে।

ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে সে নেমে গেল, আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম, আবার একবার আমার পায়ের ধুলো নিয়ে মিশে গেল সে রাত্রির অন্ধকারে, পথ-চারী আর দশ জনের সঙ্গে।

একটা ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে ফিরে এলাম দোতালায়, আবার শুয়ে পড়লাম সেই ইজিচেয়ারে, আবার ডেকে রামদীনকে হুকুম করলাম, আর এক পেয়ালা চা।

৪

পরদিন সকাল বেলার দৈনিক কাগজগুলি, চা খেতে খেতে খুললাম। কাল লোকটার সঙ্গে অনেক কথাই চলেছে কিন্তু নামটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি। এত বড় একটা সাংঘাতিক হত্যাকাণ্ড বড় বড় হেড লাইনে আজ কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে, লোকটার নাম জানতে পারব, এই মনে করে পাতি পাতি করে কাগজের সব পাতা খুঁজলাম, কিন্তু কোনখানে ওরকম কোন ঘটনার কথা দেখতে পেলাম না। মনে হল, ঘটনাটা রিপোর্টার মশায়-দের চোখে এড়িয়েছে। বসে বসে ঐ লোকটার কথাই চিন্তা করছি, এমন সময় আমার বন্ধু শশধর বাবু, শ্যামপুকুর থানার অফিসার-ইন-চার্জ্জ এসে উপস্থিত হলেন। আদর করে তাঁকে বসিয়ে রামদীনকে বললাম চা আনতে।

শশধর বাবু বসলেন কিন্তু তাঁর মুখটা অত্যন্ত গম্ভীর; আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—'কি হে অমন মুখ ভার করে আছ কেন বলতো?"

শশধর বাবু আমাকে বললেন,—"বড় একটা অপ্রিয় কাজ করতে হবে ভাই, আশা করি আমাকে মাপ করবে। পুলিশের চাকুরী, জানই তো প্রয়োজন হলে নিজের ছেলের হাতেও হাতকড়ি দিতে হয়।"

আমার তখনই মনে হল কালকের ব্যাপারটা কোন রকমে প্রকাশ হয়েছে। তথাপি মনের ভাব প্রকাশ না করে একটু দেঁতো হাসি হেসে বললাম,—"বল না কি হয়েছে? এত ভূমিকা কেন?"

শশধর বাবু বললেন, কাল একটা লোক, খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে ধাওয়া করেছিল,

সঙ্গে বাইরের লোকজনও অনেক ছিল। এই গলির মোড়ে এসে, সে লোকটা এমন করে গা ঢাকা দেয় যে, পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। পুলিশ সাহেব হুকুম দিয়েছেন এই গলির দু'পাশের সব বাড়ী খানাতল্লাস করতে হবে।" কাজেই যদিও আমি তাঁর বন্ধু তথাপি কর্ত্তব্যের অনুরোধে তিনি আমার বাড়ীটা খানাতল্লাস করতে বাধ্য।

আমি হেসে উঠে, বললাম, "তোমার পুলিশ সাহেবের তো বেশ বুদ্ধি হে! কাল সন্ধ্যায় আসামী পালিয়েছে আর আজ বেলা ন'টা পর্য্যন্ত সে তোমাদের কাছে ধরা দেবার জন্য কোন একটা অপরিচিত বাড়ীর মধ্যে চুপ করে বসে আছে।"

শশধর বাবুও হাসলেন, বললেন,—"তুমি যা বলেছ ঠিক! তবে আমরা হুকুমের চাকর, হুকুম তামিল করতেই হবে। আর সে না থাকলেও হয় ত এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে যাতে আমাদের অনুসন্ধানের সহায়তা হবে।"

আমি বললাম, "তা বেশ ত' তুমি আমাদের বাড়ী খানাতল্লাস করতে পার।"

শশধর বাবু বললেন,—"আর খানাতল্লাস কি করব? তোমার বাড়ীর ঘর ক'খানা একবার ঘুরে যাই, গিয়ে একটা রিপোর্ট দিই গে—কিছু পাওয়া গেল না।"

এমন সময় চা এল, চা খেয়ে দু'জনে উঠলাম। নীচের তলার ঘরগুলিতে একবার করে ঢুকে শশধর বাবু বেরিয়ে এলেন, তারপর দোতালায় গেলেন, দোতালার ক'খানা ঘর দেখতেও বেশী সময় লাগল না; শেষে এসে ঢুকলেন আমার শোবার কামরায়। শোবার কামরার চার দিকে তাকিয়ে একবার দেখে, ঢুকলেন গিয়ে বাথরুমে। আমার তখন হঠাৎ মনে হল যে, সেই লোকটার রক্তমাখা জামা কাপড় বাথরুমেই পড়ে আছে, সরিয়ে ফেলা হয় নি। আমার বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগল। সেগুলি ত' শশধর বাবুর চোখ এড়াবে না।

আমার সন্দেহ সত্যে পরিণত হল—সেই জামা আর কাপড় হাতে নিয়ে শশধর বাবু বেরিয়ে এলেন, মুখ তাঁর অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, —"এ জামা কাপড়গুলি কার?"

আমি বুঝতে পারলাম আর গোপন করার চেষ্টা করা বৃথা, আমি তখন তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। কেবল বললাম না, লোকটা যে রেঙ্গুন যাবে সেই কথা। তার পরিবর্ত্তে বললাম যে, সে লোকটাকে কোন দূরদেশে যাওয়ার জন্য আমি পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে আমি দণ্ড নিতে প্রস্তুত আছি।

৫

শশধর বাবু একখানা সোফায় বসে পড়লেন, অনেকক্ষণ কথা কইলেন না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,—"বড়ই অন্যায় কাজ করেছ ভবেশ। আইনে যাকে বলে accessory after the crime, অপরাধ অনুষ্ঠানের পর অপরাধীকে সাহায্য করা—তুমি তাই করেছ, এর সাজাও নেহাৎ কম নয়, জেল তো হবেই।"

মস্তিষ্কের ওকালতি কাল অগ্রাহ্য করেছিলাম, আজ সে বলে উঠল—"কেমন আমার কথা কাল শোন নি এখন তার ফল ভোগ কর।"—নির্ব্বিরোধী লোক আমি, পুলিশ-হাঙ্গামা, ফৌজদারী মামলা, এ গুলির কথা শুনলেই আমার গায়ে জ্বর আসে। শশধর বাবুকে জড়িয়ে ধরলাম, বললাম—"ভাই, যা হোক একটা উপায় তোমাকে করতেই হবে।"

শশধর বাবু বললেন,—"তোমার মোটরখানা আনাও, চল দেখি, কোন উপায় করতে পারি কি না?"

মোটর এল, কাপড়-জামা একটা খবরের কাগজে জড়িয়ে নিয়ে শশধর বাবু মোটরে চেপে বসলেন; আমিও পাশে বসলাম। গাড়ী শ্যামপুকুর থানা যাবে ভেবেছিলাম, কিন্তু তা না হয়ে শশধর বাবু বললেন, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে যেতে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে "শতদল রঙ্গমঞ্চে"র সামনে গাড়ী দাঁড়াতে বলে শশধর বাবু নামলেন, আমাকেও নামতে বললেন। আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতে তিনি বললেন, এখানে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাবেন।

আমরা দু'জনে ভিতরে ঢুকলাম। একটা ঘরে কতকগুলি যুবক বসে গল্প-গুজব করছিলেন, আমরা

গিয়ে সেই ঘরে ঢুকতেই অভ্যর্থনার ধূম পড়ে গেল। শশধর বাবু সকলেরই পরিচিত, আমার সঙ্গে শশধর বাবু সকলের পরিচয় করে দিলেন; তাঁদের অনেকেরই নাম আমার পূর্ব্বে থেকেই জানা ছিল, তাঁরা বাংলার চিত্রাভিনয়ে অল্পাধিক খ্যাতিবিশিষ্ট সব অভিনেতা। আমাকেও সকলে খুব আদর অভ্যর্থনা করলেন, চা জল-খাবার প্রভৃতি এল। আমার কিন্তু এ সব কিছুই ভাল লাগছিল না। আমার মনের ভিতর একটা দুর্দ্দমনীয় চিন্তা, একটা ভবিষ্যতের আশঙ্কা কেবলই উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ সেই কামরার একদিকের দরজা খুলে একটি ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন, একটা বিস্ময়সূচক ধ্বনি আমার কণ্ঠ থেকে নির্গত হল। ইনি সেই ভদ্রলোক, যাঁকে আমি কাল রাত্রে রেঙ্গুণ যাবার সাহায্য করেছি। কি বলব ভাবছি, এমন সময় শশধর বাবু হেসে বললেন,—"পরিচয় করিয়ে দি, ইনি আমার বন্ধু রায় বাহাদুর ভবেশচন্দ্র বসু আর ইনি বাংলার নাট্য-জগতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা সুবিকাশ রায়।"

সুবিকাশ রায়—বাংলার নাট্যামোদীদের মধ্যে এ নাম কে না জানে? তা হলে কাল যাকে দেখেছিলাম সে কে? এমন চেহারার সাদৃশ্য তো খুব কম দেখা যায়। আর চিত্রে যে সুবিকাশ রায়কে দেখেছি—কৈ এমন চেহারা তো দেখেছি বলে মনে হয় না; অবশ্য আমরা দেখি মেক্-আপ। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকলে খাঁটী চেহারা দেখা মুস্কিল—এমনি ধারা সহস্র চিন্তা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে মনকে তোলপাড় করে তুলল। আমার মনের চিন্তা মুখেও প্রতিফলিত হয়েছিল বোধ হয়। শশধর বাবু হঠাৎ খুব হো হো করে হেসে উঠলেন, সবাই তাতে যোগ দিল। আর সুবিকাশ বাবু পকেট থেকে চার খানি দশ টাকার নোট আর খুচরো দশটা টাকা বের করে আমার সম্মুখে রেখে গম্ভীর ভাবে বললেন, "ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যর্পিত হল রায় বাহাদুর।"

আবার একটা হাসির রোল উঠল। হাসি থামলে শশধর বাবু ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বললেন।

অমর-জ্যোতি ফিল্ম কোম্পানী একখানা নূতন নাটককে চিত্ররূপ দিচ্ছেন। সেই নাটকের একটা দৃশ্যে নায়ক রক্তাক্ত কলেবরে রাস্তা দিয়ে দৌড়াবে এবং পুলিশ ও জনতা তাকে ধাওয়া করলে সে একটা বাড়ীর ভেতরে লুকিয়ে পড়বে—এমনি একটা দৃশ্য আছে। সেই দৃশ্যের অভিনয় কাল হচ্ছিল। আমার বাড়ীর দরজাটা খোলা ছিল বলে সুবিকাশ বাবু ঢুকে পড়েন এবং সিঁড়ির সামনেই আমার শোবার ঘর, ঝোঁক সামলাতে না পেরে একেবারে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েন। কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যাবেন মনে করছিলেন, এমন সময় আমার চোখে চোখ পড়ায় তাঁর হঠাৎ খেয়াল চাপে যে, একটু রগড় করলে মন্দ হয় না। তিনি ভেবেছিলেন, আমি তাঁকে পাকড়াও করে শ্যামপুকুর থানাতে নিয়ে যাব, কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে গেল অন্য রকম। কাযেই আমার বাসা থেকে বেরিয়েই তিনি শশধর বাবুর কাছে গিয়েছিলেন, শশধর বাবুও আজ আবার রঙ্গের উপর রসান দিয়ে আমাকে এখানে টেনে এনেছেন।

আমার বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।

আমি নোট কখানা আর টাকা কটা তুলে নিয়ে বললাম,—"যে অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য আমার কাল রাত্রে হয়েছে—তার মূল্য এই পঞ্চাশ টাকার অনেক বেশী; কাজেই আমি ঠকিনি, এ টাকাটা ফিরিয়ে নিলে আমিই সুবিকাশ বাবুর কাছে ঋণী হয়ে থাকব। সুবিকাশ বাবুও এ টাকা ফিরিয়ে দিলেন, কাযেই শশধর তোমার কাছে এই টাকাটা দিচ্ছি তুমি এর একটা ব্যবস্থা কর।"

শশধর বাবু বললেন,—"ব্যবস্থা করতে আর কি? বৌদি কবে আসছেন?"

আমি বললাম,—"কাল এসে পৌঁছাবেন।"

শশধর বাবু বললেন,—"তবে আর কি? এই পঞ্চাশ টাকা কালকেই আমি তাঁকে ধরে দেব আর পরশু দিন আমাদের সব্বাইর রাত্রিতে নেমন্তন্ন, কি বল হে তোমরা?"

টেবিল চাপড়ে, হাত তালি দিয়ে সকলে প্রস্তাবটার সমর্থন করলেন।

আমিও রাজী হলাম, তবে মনের মধ্যে বড় ভয় হল আমার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে গৃহিণীর বিশেষ উচ্চ ধারণা

কোন দিনই নাই এবং তিনি সে কথাটা সুযোগ পেলেই আমাকে না শুনিয়ে ছাড়েন না। বেরিয়ে এসে শশধরকে বললাম,—"ভাই ভোজের যোগাড় তো হবে—কিন্তু এই ব্যাপারটা যেন গিন্নীর কাণে তুল না।"

শশধর বলল,—"আরে রাম রাম তাও কি কখন হয়।"

নির্দ্দিষ্ট দিনের ভোজ হয়ে গেল। কয়েকটি বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াব, এই কথাই গিন্নীকে বলেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক শশধর, কথাটা ফাঁস করে একটু মজা দেখবার প্রলোভন কিছুতেই সম্বরণ করতে পারল না। গিন্নী সব কথা শুনলেন, আমি সেই সময় পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, শুনলাম গিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে শশধরকে বলছেন, "তোমার দাদাটি ঠাকুরপো একটী বুদ্ধির-ঢেঁকী—সে তো আমি চিরদিনই জানি।"

বঙ্গশ্রী

—শ্রীগোপেশ্বর সাহা

আজিকে প্রভাতে উষার আলোতে হেরিয়াছি রূপ তোর,
নয়নে লেগেছে মায়ার কাজল পরাণ হয়েছে ভোর।
বনে বনে নব ঋতু উৎসব, আকাশে সাগরে গান,
গুঞ্জরে অলি মুঞ্জরে কলি কেড়ে লয় মন-প্রাণ।
মাথার উপরে কোয়েলা গাহিছে দোয়েলা দিতেছে শিস্,
গৃহ-অঙ্গনে নাচে খঞ্জন রঞ্জনে দশদিশ।

ফুল-বাগিচায় দোল দিয়ে যায় দোল দেয় মোর প্রাণে,
পাপিয়ার গান মাতায় পরাণ মঞ্জু মুখর তানে।
মৃদু-কণ্ঠের প্রভাতী আলাপে ঘুম থেকে মোরা জাগি,
বাংলা মায়ের পল্লীতীর্থে আবার জনম মাগি।
চাহি না আমরা স্বর্গ মুক্তি, চাহি না কিছুই আর,
বাংলা মায়ের স্নেহের অঙ্কে হই যেন শিশু তা'র।

আঁকা বাঁকা নদী চলে নিরবধি নিরবধি কলতান,
পাহাড়ের মেয়ে চলে পথ বেয়ে করিতে আত্মদান;
সাগরের বুকে দোলার লহরী লহরীর বুকে দোলা,
গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী সবারি পরাণ ভোলা।
নীলিম গগনে উদিছে তপন মলয়া মুরছে ধীরে,
আশে পাশে তা'র রঙের বাহার মেঘেরা রয়েছে ঘিরে।

শিশির-সিক্ত মেদিনীর বুকে মুক্তার মালা দোলে,
শিউলী যূথিকা অতি ছোট যা'রা শুয়েছে মায়ের কোলে।
কদমের বনে শ্রাবণের মেঘ ঢালে সলিলের ধার,
গগনে গগনে ঘন গরজন চমকে দামিনী আর।
হোথায় মত্ত দাদুরীর রোল তা'র সাথে মিশে যায়,
সলিল-সিক্ত ধরণীর বুকে নবযৌবন ভার।

নিদাঘের তাপ হাহাকার করি প্রাণ জুড়াইতে আসে,
বকুলতলার স্নিগ্ধ পরশে প্রীতির গন্ধে ভাসে।
পথে প্রান্তরে শ্রান্ত পথিক তাপিত দগ্ধ হিয়া,
জুড়াইতে চায় এইখানে আসি আম্রকাননে গিয়া।
বুড়া অশথের তলায় জুটিয়া খেলিতে "ডাণ্ডাগুলি"
একদিনো কোনো রাখাল বালক করে নাই কভু ভুল।

ঝুরি ধরি তা'র ঝুলিছে কেহ বা কেহ বা দিতেছে দোল,
কলহাস্যের উৎস এখানে নিতি উঠে কলরোল।

শিমুলের তলে পীরের দরগা পাশে বারোয়ারী তলা,
এ পথে আমরা করি গতায়াত নিত্য এ পথে চলা।
পীরের সিন্নি কালীর মানত নিত্য এ-পথে আসে,
তিথি উৎসবে গাঁয়ের মানুষ সদা আনন্দে ভাসে।
মাঠে প্রান্তরে দিক্ দিগন্তে বাজে মোহনিয়া বাঁশী,
বাংলামায়ের মধুর মূরতি ভালবাসি ভালবাসি।

চারিদিকে এর মায়ার পরশ মরমে মমতা ভরা
বাংলা-মায়ের পূত অঙ্গনে নিখিল পড়েছে ধরা।
দেব-মন্দিরে কীর্ত্তনরোল ঘণ্টা কাঁসর বাজে,
পথ বেয়ে চলে বাউল পথিক অতি অপরূপ সাজে।
রাই জাগো রাই জাগো—বলি হেথা টহল গাহিয়া যায়,
তন্দ্রাজড়িত নয়নেতে বধূ কপাট খুলিয়া চায়।

হোথা মস্‌জিদে 'আজানে'র তালে ভাসিয়া আসিছে সুর,
যাত্রীরা করে যাত্রার সুরু—যাবে যে অনেক দূর!
শ্যামগঞ্জের কার্ত্তিকী মেলা 'বিশালী' নদীর পাড়ে,
কাতারে কাতারে লোক জমে সেথা উৎসব বারে বারে।
মেলায় চলেছে দোকানী পশারী যাত্রীরা আগুসার,
পাটনী হাঁকিয়া নৌকা খুলিছে করিতেছে পারাপার।

পাটনীর কড়ি দিয়ে যায় গণি হ'য়ে যায় সবে পার,
রহিম চাচার ভাল কারবার নাই বাকী নাই ধার।
এই গাঁয়েতেই মানুষ রহিম সাত পুরুষের বাস,
কারো চাচা সে যে কারো দাদু ওগো মনে নাই রোষ ত্রাস।
সরল সহজ প্রাণের মানুষ সকলেই ভালবাসে,
কত রাজ্যের কত নরনারী তা'র খেয়াঘাটে আসে।

আসে আর যায় পার হয় সবে সাথে নিয়ে যায় স্মৃতি,
এক নিমেষের ব্যবহারে তা'র ঝরে যে প্রাণের প্রীতি।
ক্রমে বেলা বাড়ে অরুণ-কিরণে জমে' উঠে কোলাহল,
শ্যাম প্রান্তরে রাখালেরা ধায় আগে ছুটে গাভীদল।
আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় ধেনুগুলি উর্দ্ধপুচ্ছে প্রাণ,
পিছে পিছে তার লেজটি দোলায়ে বাছুর ছুটিয়া যায়।

হেম-প্রান্তরে কৃষাণের আঁখি নেহারি' পক্কধান,
বুক ভরে উঠে পলকে গরবে মেতে উঠে তার প্রাণ।
প্রান্তর-বুকে লক্ষ্মীর বাস—লক্ষ্মী দেশের চাষী
সরল সহজ জীবন স্বভাব আমি যে রে ভালবাসি।
আমার প্রাণের দোসর সে যে রে মোর পরাণের ভাই,
প্রতিবেশী মোর আপনার জন তার চেয়ে কেহ নাই।

কৃষাণের বধূ ঝাঁটি দিয়ে যায় আপনার আঙিনায়,
চরণ-পরশে ধরণী-মাতার গরব বাড়িয়া যায়।
ছন্দে ছন্দে চলে বধূ ওই চরণে বাজিছে মল,
ঘোমটার ফাঁকে ডাগর নয়ন করিতেছে টলমল।
তুলসী-মঞ্চে সিঞ্চনে বারি বধূ মঙ্গল-করে,
অতি অপরূপ মহিমার ছবি দেখিয়া পরাণ ভরে।

ছোট ঘরবাড়ী লেপা চারি ধার ধবধবে পরিপাটি,
শত স্বর্গের নন্দন হ'তে বাড়া বাংলার মাটি।
এই বাংলার পল্লী-কুঞ্জে সাত পুরুষের বাস,
এই বাংলার ফলে জলে তা'রা বাঁচিতে করিত আশ;
এই বাংলার সুখে ও দুঃখে হাসি-কান্নার সাথে
বাংলা মায়ের বাঙালী ছেলেরা হাসে কাঁদে এক সাথে।

লুই পাস্তুর

—শ্রীনীলরতন কর

টার্টারিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণা

পাস্তুরের টার্টারিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণা রসায়ন-জগতে বিশেষভাবে স্মরণীয়। সে সম্বন্ধে বর্ণনার পূর্ব্বে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র সম্পর্কীয় কয়েকটি সাধারণ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এই রসায়ন শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়—কঠিন, তরল ও বায়বীয় বস্তুসমূহের অন্তর্নিহিত গঠন-প্রণালী, আকৃতি, প্রকৃতি, গুণাগুণ ও তাদের সংযোগ-বিয়োগের বিধি-নিয়ম। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বালুকণা, জীবানু, কীট-পতঙ্গ, তরুলতা, তৃণগুল্ম হতে আরম্ভ করে প্রকাণ্ড মহীরুহ, অতিকায় জীবদেহ, বিশাল গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য্য, তারকা, নীহারিকা প্রভৃতি যে কোন বস্তু হোক না কেন, তার প্রত্যেকটিই কতকগুলি মৌলিক পদার্থের সমষ্টি বা সংযোগের ফল। এই মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থ বহু প্রকার অণু পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার সমাবেশ মাত্র। ভিন্ন ভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলির লক্ষণ ও গুণাবলী বিভিন্ন রকমের। এক একটি অণু দুই বা ততোধিক পরমাণুর সম্মিলনে গঠিত। টার্টারিক অ্যাসিড এইরূপ কতকগুলি পরমাণুর সমাবেশে নির্ম্মিত "জৈব পদার্থ" বিশেষ। "জৈব পদার্থ" এই কথার অর্থ জন্তু অথবা উদ্ভিদ্-দেহজাত পদার্থ। জীবদেহজাত নানাবিধ দ্রব্যের প্রস্তুত-প্রণালী ও গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু প্রাচীন কাল হতে আলোচনা হয়ে আসছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা সুরু হয়েছে লাভোয়াজিয়ের সময় হতে। তৎপরে বৈজ্ঞানিক আলোচনা এত দ্রুত প্রসার লাভ করেছে যে, শত বৎসরের মধ্যেই এই শাস্ত্র রাসায়নিক বিজ্ঞান-বৃক্ষের একটি প্রধান শাখায় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে; শাস্ত্রটির নাম 'অর্গানিক কেমিষ্ট্রি' বা জৈব রসায়ন।

আধুনিক রাসায়নিকের মতে, জীবদেহ হতে যে সকল দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, সেগুলি কৃত্রিম উপায়েও প্রস্তুত করা সম্ভব। এ কথা পূর্ব্বকালে কেউই জানতেন বলে লিখিত ইতিহাসে পরিচয় পাওয়া যায় না। এই সময়ের পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা ভাবতেন যে, জীবদেহে হয় ত' 'ভাইটাল ফোর্স' বা প্রাণশক্তিরূপ এমন একটা অদ্ভুত শক্তি ক্রিয়া করছে, যার ফলে উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীদেহে নানাপ্রকার বস্তু গঠিত হচ্ছে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, জীব ও উদ্ভিদ্-দেহে যে সকল রাসায়নিক যৌগিক বস্তু বর্ত্তমান, তৎসমুদয় কেবল মাত্র নৈসর্গিক নিয়মে প্রাণশক্তির সাহায্যে সেই সব দেহেতেই প্রস্তুত হয়, মানুষ তৈরী করতে পারে না। কিন্তু রসায়নবিদ্ হ্বোয়লেয়ার, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইউরিয়া নামে এক জৈব বস্তুকে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করেন। সেই সময় হতে জৈব ও অজৈব পদার্থের জাতিভেদের ধারণা দূরীভূত হতে আরম্ভ করে। হ্বোয়লেয়ার-এর পর এমিল্ ফিসার আরও নানাপ্রকার জৈব পদার্থকে কৃত্রিম প্রণালীতে প্রস্তুত করে এ সম্বন্ধে নূতন নূতন প্রামাণিক তথ্য দেখান। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য জৈব পদার্থগুলিকে একটি পৃথক্ পর্য্যায়ভুক্ত করা হয়।

পাস্তুর ও তাঁহার জনকজননী।

প্রাণীশরীরজাত বস্তুগুলিতে প্রধানতঃ কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিনটি মৌলিক বস্তু বিদ্যমান। এ কারণে এই মৌলিক বস্তুত্রয়ে গঠিত পদার্থকে জৈব বস্তু নাম দেওয়া হয়েছে। টার্টারিক অ্যাসিডের অণুও নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন-পরমাণুর এক বিচিত্র সমাবেশে নির্ম্মিত। যেমন একই সংখ্যক ইষ্টকের বিভিন্ন রূপ সাজানোর ফলে বিভিন্ন আকৃতির গৃহাদি নির্ম্মিত হতে পারে, সেইরূপ একই সংখ্যক কার্ব্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণুর

সমাবেশ-বৈচিত্র্যে বিভিন্ন ধরণের টার্টারিক অ্যাসিড পাওয়া যায়। টার্টারিক অ্যাসিডকে বিভিন্ন ফলের রসে, বিশেষতঃ আঙ্গুরের রসে পটাশিয়ম্-হাইড্রোজেন টার্টারেট লবণরূপে পাওয়া যায়। পটাশিয়ম্-হাইড্রোজেন-টার্টারেটকে ($KHC_4H_4O_6$) অসংস্কৃত অবস্থায় এরাগল্ বা টার্টার বলে। এই টার্টার হতেই টার্টারিক কথার উৎপত্তি। টার্টার জলমিশ্রিত সুরাতে দ্রবীভূত হয় না। সেই জন্য দ্রাক্ষারস হতে প্রস্তুত মদ্যের পিপায় এই লবণটি পৃথক্ হতে থাকে। টার্টার বা এরাগল্, টার্টারিক অ্যাসিড প্রস্তুতের মূল উপাদান। অশোধিত টার্টারকে জল এবং খড়িমিশ্রিত করে ফুটালে তার

লুই পাস্তারের শৈশবের আবাস-স্থল ঃ আর্বোয়া। [ডক্টর অমূল্যচরণ উকীলের সৌজন্যে

কিয়দংশ চূর্ণালবণ আকারে পৃথক্ হয়ে যায় এবং বাকী অংশ ডাইপটাশিয়ম্-টার্টারেট লবণরূপে দ্রব অবস্থায় জলের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে ($2KHC_4H_4O_6 + CaCO_3 = CaC_4H_4O_6 + K_2C_4H_4O_6 + CO_2 + H_2O$)। তার পর ডাইপটাশিয়ম্ টার্টারেট দ্রব মধ্যে কাল্‌সিয়ম্ ক্লোরাইড মিশ্রিত করলে সমস্ত টার্টারিক অ্যাসিড চূর্ণালবণরূপে পৃথক্ হয়ে পড়ে। কাল্‌সিয়ম্ টার্টারেট-এ সালফিউরিক্ অ্যাসিড সংযোগ করলে চূর্ণ অংশটি ক্যাল্‌সিয়ম্ সালফেট আকারে আলাদা হয়ে যায়। অতঃপর সীসার চাদরমোড়া পাত্রের মধ্যে জলীয় পদার্থটি নিয়ে কম চাপে বাষ্পীভূত করলে সুন্দর জ্যামিতিক আকারবিশিষ্ট টার্টারিক অ্যাসিড দানা বাঁধতে থাকে। অ্যাসিডটি জান্তব অঙ্গারের সাহায্যে বিশোধিত করা হয়।

টার্টারিক অ্যাসিডকে ক্যালিকো প্রিন্টিং এবং বস্ত্রাদি রঞ্জনকার্য্যে 'রাগবন্ধিনী' (mordant) রূপে টার্টার এমিটিক্ আকারে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। তদ্ব্যতীত ঔষধ, ফেণায়িত পানীয়, কৃত্রিম মদ্য, বেকিং পাউডার প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতের উপাদান রূপে এবং আলবুমিন, শিরীষ, জিলেটিন ও জেলি-সংরক্ষক বস্তু হিসাবে এই অ্যাসিড ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

টার্টারিক অ্যাসিডের কথা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দ হতে জানা যায়। সুইডিস্ রসায়নবিদ্ শেলে এই অ্যাসিডটিকে মদের পিপায় সঞ্চিত টার্টার নামক বস্তু হতে আবিষ্কার করেন। শেলে মহাশয়ের আবিষ্কারের পঞ্চাশ বৎসর পরে কেস্‌টনেয়ার নামে এক টার্টারিক অ্যাসিডের কারিগর, কোন টার্টারিক অ্যাসিডের কারখানায় সেই অ্যাসিড প্রস্তুতকালে আর এক নূতন অ্যাসিডের সন্ধান পান। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই নূতন অ্যাসিডকে পুনর্ব্বার প্রস্তুতে সমর্থ হন নি। যাই হোক, তিনি সেই অ্যাসিডটিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করেছিলেন। গোল্‌দাক্ সেখানকার কারখানা পরিদর্শন করতে গিয়ে এই নূতন অ্যাসিডের নাম রাখেন রেসিমিক্ অ্যাসিড। তাঁর পরে বার্জেলিয়াস্ সে বিষয়ে গবেষণা করে তাকে পেরাটার্টারিক অ্যাসিড আখ্যা দেন।

পাস্তুর যখন টার্টারিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণা-কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন কেবল এই সাধারণ টার্টারিক অ্যাসিড এবং পেরাটার্টারিক বা রেসিমিক অ্যাসিডের কথা জানা ছিল। ১৮৪০ অব্দে জার্ম্মান রসায়নবিদ্ মিৎসার্লিক, বার্জেলিয়াসের পরীক্ষিত 'টার্টারিক্ এবং পেরাটার্টারিক্ অ্যাসিডের সোডিয়ম্ অথবা অ্যামোনিয়ম্ লবণ' বিষয়ে গবেষণা করে এই প্রকার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ঐ লবণদ্বয়ের সাধারণ প্রকৃতিতে কোন বৈষম্য নেই; উভয়ের স্ফটিকের আকৃতি সমরূপ, তাদের পরমাণুর সংখ্যা, সন্নিবেশ-পদ্ধতি ও দূরত্ব একই রকমের; অথচ একটি 'সমাবর্ত্তক আলোক-রশ্মি'র

গতিমুখ পরিবর্তিত করে, অপরটি করে না। মিৎসার্লিকের এই উক্তি পাস্তারের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। এ বিষয়ে বুঝতে গেলে প্রথমে আলোকের সমাবর্তন বা 'পোলারাইজেসন্' সম্বন্ধে জানা দরকার। ১৬৬৯ অব্দে এক ডেনিশ পদার্থবিদ্ আইস্ল্যাণ্ড হতে আনীত এক প্রকার স্বচ্ছ স্ফটিক (আইসল্যাণ্ড স্পার) নিয়ে পরীক্ষা করেন। স্ফটিকটি একটু অদ্ভুত ধরণের, তার ভিতর দিয়ে সব জিনিষই ডুটো করে দেখা যায়, অর্থাৎ প্রত্যেক আলোকরেখাটি তার ভিতর দিয়ে যাবার সময় এক দিকে না বেঁকে ডুভাগ হয়ে ডুই দিকে বেঁকে যায়। আলো যখন একটা স্বচ্ছ স্তর ভেদ করে কোন ভিন্নপ্রকার স্বচ্ছ স্তরের মধ্যে গিয়ে ঢোকে, তখন সে আগেকার সোজা পথ ছেড়ে দিয়ে সেখান হতে কোণাকুণি আর একটি সরল রেখা ধরে ছুটে চলে। এই তির্য্যক্ মুখে যাবার লক্ষণটির নাম 'তির্য্যগাবর্ত্তন (refraction)।' সাধারণতঃ আলোর তির্য্যক্গতিটি একমুখী। কিন্তু আইসল্যাণ্ড স্পারের মধ্যে তার গতি যুগ্মতির্য্যক্। আলোকের দ্বিধাভক্ত হয়ে তির্য্যক্ মুখে যাবার এই লক্ষণকে 'ডবল্ রিফ্রাক্সান্' বা যুগ্ম-তির্য্যগ্বর্ত্তন বলা হয়। এতিয়েন্ লুই মালুস্ আলোর যুগ্ম-তির্য্যগ্বর্ত্তন বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ-কালে এক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেন। একদা তিনি স্পার-স্ফটিকের ভিতর দিয়ে অস্তগামী সূর্য্যালোকে লুক্সমবুর্গ প্রাসাদের বাতায়নগুলি অবলোকন করছিলেন। স্ফটিকটি চক্ষের নিকট ধীর গতিতে আবর্ত্তন করতে করতে তিনি দেখতে পেলেন যে, স্ফটিকের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাতায়নের উপরিভাগের আলোর তীব্রতা কখনও বা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আবার কখনও কখনও ম্লান হয়ে যাচ্ছে। স্ফটিকটি আবর্ত্তনকালে আলোর এই যে একটি অদ্ভুত লক্ষণ তাঁর নিকট ধরা পড়ল, তিনি তার নাম রাখলেন 'পোলারাইজেসন' বা সমাবর্ত্তন। বিয়ো এবং আরাগো মালুসের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে আরও বহুবিধ তথ্য প্রকাশ করেন।

পোলারিমিটর বা সমবর্ত্তক যন্ত্রে নানারূপ কলাকৌশলে স্পার-স্ফটিক সাজান থাকে। সেই যন্ত্রের মধ্যে চিনি কিংবা টার্টারিক অ্যাসিডের সরবং রাখলে সমাবর্ত্তক আলোকরশ্মি দক্ষিণে আবর্ত্তন করে, কিন্তু টার্টারিক অ্যাসিডের পরিবর্ত্তে টার্পেন্‌টাইন অথবা কুইনিনের সরবৎ রাখলে সমাবর্ত্তক রশ্মি বামদিকে আবর্ত্তন করে। টার্টারিক অ্যাসিড, শর্করা প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যের সমাবর্ত্তক আলোকরশ্মিকে আবর্ত্তিত করার ক্ষমতা আছে তাদের 'অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ' পাদার্থ বা আলোক-সক্রিয় বস্তু বলে। পোলারিমিটরের সাহায্যে চিনির সরবতে কতখানি শর্করা আছে বলে দেওয়া যায়, আবার, তারই সাহায্যে বহুমূত্ররোগের হ্রাসবৃদ্ধি নিরূপণ করা যায়।

আলোক-সক্রিয় বস্তু ও তাদের রাসায়নিক লক্ষণের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ আছে, লুই পাস্তারের নিকট তার রহস্য সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, টার্টারিক অ্যাসিডের গবেষণাকালে। সে কারণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক্ হতে পাস্তারের এই গবেষণাটি খুব মূল্যবান্। তিনি দেখালেন যে, আলোক-নিষ্ক্রিয় রেসিমিক অ্যাসিড সমপরিমিত দক্ষিণাবর্ত্ত এবং বামাবর্ত্ত টার্টারিক অ্যাসিডের রাসায়নিক সংযোগ গঠিত।
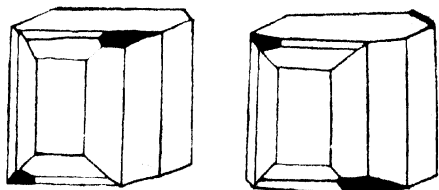
বিপরীত আলোক-সক্রিয়তা বিশিষ্ট টার্টারেট লবণের স্ফটিকদ্বয়।

সোডিয়ম-অ্যামোনিয়ম-রেসিমেট ($NaNH_4$ $C_4H_4O_6$, $4H_2O$) দ্রবকে মৃদু উত্তাপে ঘনীভূত করে তিনি কতকগুলি স্ফটিক বা দানা তৈরী করলেন। সেই স্ফটিকগুলি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, তাদের মধ্যে ডুইটি ভিন্ন আকারের দানা রয়েছে। একশ্রেণীর স্ফটিকের আকার যেন অপর শ্রেণীর স্ফটিকের প্রতিবিম্বস্বরূপ। যেমন দর্পণে প্রতিফলিত বিম্বে প্রকৃত মূর্ত্তির বিপরীত চিত্র প্রতিভাত হয়, এই ডুইশ্রেণীর স্ফটিকে পাস্তার সেইরূপ বিপরীত সামঞ্জস্য লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, কতকগুলি স্ফটিক বামমুখী আর কতকগুলি দক্ষিণমুখী। তিনি দ্বিবিধ স্ফটিকের সমমাত্রাসম্পন্ন দ্রব্য নিয়ে তার আলোক-সক্রিয়তা পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে, সমাবর্ত্তক আলোকরশ্মিকে বামমুখী স্ফটিক-দ্রব যতটা বামদিকে আবর্ত্তন করায়, দক্ষিণমুখী স্ফটিকদ্রব তাকে ঠিক ততটা দক্ষিণদিকে আবর্ত্তন করায়। তিনি সোডিয়ম্-অ্যামো-

নিয়ম-টার্টারেট লবণের দ্বিবিধ দানাগুলি বাছাই-প্রক্রিয়া দ্বারা পৃথক্ করে, তুইটি ভিন্ন পাত্রের মধ্যে বিশ্লিষ্ট করলেন। এইরূপে দক্ষিণাবর্ত্ত এবং বামাবর্ত্ত টার্টারিক অ্যাসিড পাওয়া গেল। সেই অ্যাসিডদ্বয়ের ঘনদ্রবকে সমমাত্রায় মিশ্রিত করে তিনি তা' হতে তাপের উদ্ভব লক্ষ্য করলেন। তখনই বুঝলেন যে, তুইটি অ্যাসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া চলছে। (কারণ কোন দ্রব্যের মধ্যে রাসায়নিক প্রক্রিয়া কালে, তা' হতে তাপ নির্গত হয় কিংবা তন্মধ্যে তাপ শোষিত হয়।) রাসায়নিক ক্রিয়াশীল মিশ্রিত দ্রবটি কিছুক্ষণ রাখার পর তিনি পাত্রের মধ্যে রেসিমিক্ অ্যাসিডের দানা সঞ্চিত হতে দেখলেন। এই পরীক্ষায় প্রমাণিত হল যে, কোন কোন আলোক-নিষ্ক্রিয় বস্তুকে, ভিন্ন রকমের আলোক-সক্রিয়তা বিশিষ্ট বস্তুতে পৃথক্ করা যেতে পারে এবং তুইটি বিপরীত আলোক-সক্রিয়তাসম্পন্ন দ্রবের সমমাত্রায় মিশ্রণে আলোক-নিষ্ক্রিয় বস্তু উদ্ভূত হতে পারে।

কোন বস্তুর বিভিন্ন আলোক-সক্রিয়তাসম্পন্ন রূপগুলি পৃথক্করণের জন্য বাছাই-প্রক্রিয়া ব্যতীত, পাস্তুর, আরও তিনটি প্রণালী আবিষ্কার করেন—

প্রথম—স্ফটিকীকরণ প্রণালী (methods of crystalization) রেসিমিক অ্যাসিডের গাঢ় সরবতের মধ্যে দক্ষিণাবর্ত্ত অথবা বামাবর্ত্ত অ্যাসিডের একটি ছোট দানা সংযোগের ফলে তদনুরূপ স্ফটিক পৃথক্ হতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয়—অপর দ্রব্যের সহিত রাসায়নিক সংযোগ-প্রণালী (methods of formation of derivatives)।

রেসিমিক অ্যাসিডের সহিত কোন কোন আলোক-সক্রিয় বস্তুর (বিশেষতঃ, অ্যালকালয়েড জাতীয় বস্তুর) রাসায়নিক সংযোগের ফলে বিভিন্ন দ্রবণশীলতাবিশিষ্ট আলোক-সক্রিয় বস্তু প্রস্তুত হয় এবং যেটির দ্রবণশীলতা অল্প সেইটি প্রথমে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে। যথা সিঙ্কোনিন নামক আলোক-সক্রিয় বস্তু রেসিমিক অ্যাসিডে সংযোগ করলে প্রথমে বামাবর্ত্ত অ্যাসিডটি 'টার্টারেট অব সিঙ্কোনিন' আকারে পৃথক্ হতে থাকে। টার্টারেট অব সিঙ্কোনিনে অ্যামোনিয়া সংযোগ করলে সিঙ্কোনিন আলাদা হয়ে যায় এবং অ্যামোনিয়াম টার্টারেট দ্রব অবস্থায় থাকে। সেই দ্রবকে পৃথক্ করে সলফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট করলে বিশুদ্ধ বামাবর্ত্ত টার্টারিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

তৃতীয়—খমীর বা জীবাণুর সংযোগ-প্রণালী (methods of ferments) :—

কোন আলোক-সক্রিয় বস্তুর বিভিন্ন আলোক-সক্রিয়তা-বিশিষ্ট রূপগুলির অধিকাংশ রাসায়নিক ধর্ম্মই একরূপ, কিন্তু তারা অধিকাংশক্ষেত্রে সমধর্ম্মী হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন জীবাণু তাদের রেসিমিক আকার হতে একশ্রেণীর আলোক-সক্রিয় বস্তু আত্মসাৎ করে অন্যবিধ আকারকে এরূপ অদ্ভুত ভাবে পৃথক্ করতে পারে যে বিস্মিত হতে হয়। পাস্তুর দেখেছিলেন যে, 'পেনিকিলিউম গ্লাউকুন' নামক বীজাণু রেসিমিক অ্যাসিডে ছেড়ে দিলে তারা ক্রমে ক্রমে সমগ্র দক্ষিণাবর্ত্ত অ্যাসিড উদরস্থ করে; ফলে বিশুদ্ধ বামাবর্ত্ত অ্যাসিড অবশিষ্ট থাকে।

অধিকাংশ আলোক-সক্রিয় বস্তুকে উত্তাপ সাহায্যে অথবা ক্ষার, অম্লাদি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে আলোক-নিষ্ক্রিয় বস্তুতে রূপান্তর-প্রণালীকে 'রেসিমাইজেসন' বলে। দক্ষিণাবর্ত্ত টার্টারিক অ্যাসিড জলে দ্রব করে উত্তাপ দিলে রেসিমিক ও মেসোটার্টারিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। রেসিমিক অ্যাসিডকে দক্ষিণ ও বামাবর্ত্ত অ্যাসিডে পৃথক্ করা যায়, কিন্তু মেসো-অ্যাসিডকে আলোক-সক্রিয় অ্যাসিডে পৃথক্ করা যায় না। দক্ষিণাবর্ত্ত, বামাবর্ত্ত, রেসিমিক ও মেসো-অ্যাসিডের কারণ সম্বন্ধে ফ্যান্ টু হফ, ল বেল প্রমুখ রসায়নবিদ্‌গণ বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কেবল টার্টারিক অ্যাসিড নয় আরও বহু রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন আলোক-সক্রিয় রূপের আবির্ভাব দেখা গেছে। ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার আলোক-সক্রিয়তাবিশিষ্ট আকার আছে। ১৮৭৩ অব্দে হ্বিশলিসেনাস্ ল্যাকটিক অ্যাসিডের আলোক-সক্রিয় রূপ সম্বন্ধে গবেষণা করেন। পাস্তারের টার্টারিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণা এবং হ্বিশলিসেনাস্-এর ল্যাকটিক অ্যাসিড বিষয়ে গবেষণার উপর ভিত্তি করে ফ্যান্ টু হফ এবং ল বেল উভয়ে নিরপেক্ষ ভাবে অনুসন্ধান-কার্য্য দ্বারা ষ্টেরিও আইসোমেরিজম্ সিদ্ধান্ত গড়ে তুলেছেন। কিন্তু লুই পাস্তারের টার্টারিক অ্যাসিড সম্বন্ধীয় গবেষণাফলেই সর্ব্বপ্রথম বিভিন্নভাবে

আলোক-সক্রিয় একই বস্তুর আকৃতিক বিভিন্নতা ধরা পড়ে এবং তিনিই তাদের প্রস্তুত-প্রণালী আবিষ্কার করেন।

বিয়োর সহিত সাক্ষাৎ: দিজঁ লিসের অধ্যাপক-পদে; ষ্ট্রাসবুর্গে

পাস্তুরের স্ফটিকতাত্ত্বিক গবেষণা নিয়ে প্যারীর বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর মধ্যে নানারূপে তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। জে. বি. ডুমা, বালার, বিয়োপ্রমুখ বিজ্ঞান-পরিষদের সভ্যগণ পাস্তুরের পরীক্ষাকার্যের পর্যালোচনা করেন। শ্রীযুক্ত বিয়ো, বালার মহাশয়ের নিকট পাস্তুরের গবেষণা বিষয়ে শ্রবণ করেও এ কথা বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন নাই যে, একল্ নর্ম্যাল হতে সদ্য 'ডক্টর' উপাধিপ্রাপ্ত এক তরুণ যুবক এরূপ সমস্যা সমাধান করেছেন, যা' মিৎসার্লিকের মত পণ্ডিতের নিকটেও দুরবগাহ। বালার মহাশয় পাস্তুরের অত্যন্ত সুখ্যাতি করায়, বিয়ো এই গবেষণার সত্যতা স্বয়ং পরীক্ষা করে দেখতে মনস্থ করেন।

এঁদের সকলকেই পাস্তুর নিজের শিক্ষকের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। তিনি বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বিয়োর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে এক পত্র দেন। প্রত্যুত্তরে বিয়ো লিখলেন—"তুমি যদি তোমার গবেষণা বিষয়ে গোপনে আমার কাছে প্রকাশ কর, তা হলে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। যে সকল যুবক অধ্যবসায় সহকারে নির্ভুল ভাবে কাজ করেন, তাঁদের কার্যকলাপ জানতে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত। আমি তাঁদের দেখে বাস্তবিকই আনন্দিত হই।"

পাস্তুর এই পত্র পেয়ে বিয়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। বিয়ো মহাশয় পাস্তুরের জন্য স্বহস্তে পরীক্ষিত পেরাটার্টারিক অ্যাসিডের কিয়দংশ রেখে দিয়েছিলেন। পাস্তুর যেতেই তিনি তাঁকে সোডা, অ্যামোনিয়া এবং পেরাটার্টারিক অ্যাসিডের বোতল এগিয়ে দিয়ে লবণটি প্রস্তুত করতে অনুমতি করলেন এবং পাস্তুরের কার্যের আদ্যোপান্ত লক্ষ্য করতে লাগলেন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে যখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে টার্টারিক অ্যাসিডের দানা পাত্রের মধ্যে সঞ্চিত হল, পাস্তুর তখন তরল পদার্থকে মুছে ফেলে একে একে, ক্ষুদ্রাকার স্ফটিকগুলি বিয়োর সামনে সজ্জিত করলেন। তারপর স্ফটিকের আকারের বৈষম্য অনুসারে বাম এবং দক্ষিণভাগে পৃথক্ করে রাখলেন। এই কার্যকালে বিয়ো পাস্তুরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্ফটিকগুলির দক্ষিণ ও বামমুখী আকৃতি অনুসারে সমাবর্তক আলোকরশ্মির প্রতিমুখ বিপরীত দিকে আবর্তিত হবে, এ কথা তিনি নিঃসন্দেহে স্বীকার করছেন কি না? পাস্তুর যখন বললেন যে, সে সম্বন্ধে তাঁর বিন্দুমাত্র সংশয় নেই, তখন বিয়ো নিজেই কাজের শেষটুকু করতে প্রবৃত্ত হলেন। বাম এবং দক্ষিণমুখী স্ফটিকের পৃথক্ পৃথক্ দ্রব
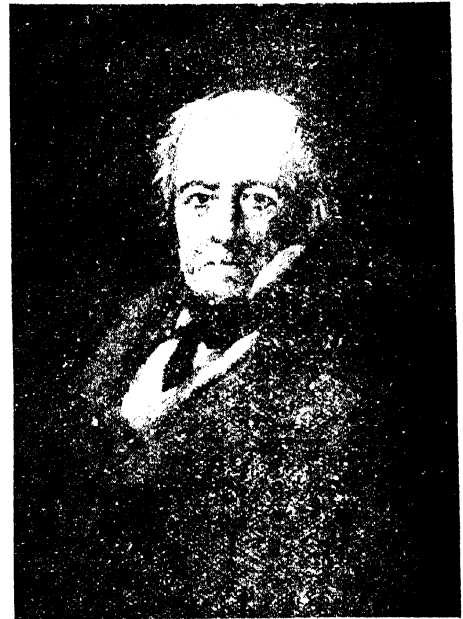
পদার্থবিদ্ জাঁ বাপতিস্ত বিয়ো।

প্রস্তুত করে তিনি প্রথমে বামাবর্ত্ত স্ফটিক-দ্রবকে যন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করলেন। পোলারিমিটার যন্ত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়োর মুখ হাস্যোৎফুল্ল হয়ে উঠল, তিনি সস্নেহে পাস্তুরকে অভিবাদন করে বন্ধুত্ব পদে বরণ করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর তরুণ বন্ধুর প্রতিভূস্বরূপ হয়ে, 'আকাদেমী দে সিয়ঁস' এই গবেষণাকার্য্য প্রকাশ করার ভার নিলেন। তিনি নিজে রেন্ো, বালার এবং ডুমার পক্ষ হতে পাস্তুরকে সমর্থন করে এই গবেষণাকে আকাদেমী হতে 'দৃঢ়রূপে অনুমোদিত' বলে ঘোষণা করার প্রস্তাব করেন।

বিয়ো প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ আলোকের আবর্ত্তিত সমাবর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান কর্‌ছিলেন। রসায়নবিদ্‌গণের সেদিকে বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না। তিনি একাকীই তাঁর কাজ করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে অস্তোন্মুখ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে একজন চিন্তাশীল উৎসাহী যুবকের সাহায্যে তাঁর কর্ম্মধারা জয়যুক্ত হওয়ায় তারই গৌরবস্মৃতি তাঁর আনন্দ বিধান করেছিল। তাই তিনি পাস্তারকে দিজঁতে যাবার সম্মতি দিতে অন্তরে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলেন।

দিজঁ লিসেতে একজন পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রয়োজন হওয়ায় শিক্ষা-মন্ত্রী পাস্তারকেই সেই পদে মনোনীত করেছিলেন। বালার মহাশয় বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বীক্ষণাগারের কাজে রাখবার অনুমতি পেলেন না। পাস্তার বিয়োর অধীনে কতকগুলি কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সেগুলিকে শেষ করার জন্য নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে অনুমতি পেলেন। কিন্তু বিয়ো শিক্ষা-বিভাগের এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি তাঁদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, 'শেষে ওরা তোমাকে এক ফাকুলতেতে পাঠাবে, স্থির করলে। বোধ হয় ওরা জানে না যে, ও কাজটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার চেয়ে বড় নয়; যদি জানত, এ রকম হু'তিনটি গবেষণার মূল্য কত!'

যাই হোক পাস্তারকে যেতে হল।

বীক্ষণাগারের কাজ ছেড়ে থাকতে প্রথম কয়েক সপ্তাহ পাস্তারের নিকট খুবই কষ্টকর বোধ হত। কিন্তু কোন উপায়ান্তর না থাকায় তিনি উত্তমরূপে অধ্যাপনা করার চেষ্টাতেই ব্যাপৃত হলেন। কাজটিকে পাস্তার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি শাপুইকে লিখলেন, 'ছাত্রদের জন্য পড়াশুনা করতেই আমার সময় চলে যায়। আমি দেখেছি যে নিজে পড়ে গেলে ক্লাশে খুব ভালভাবে বোঝাতে পারি; নয়ত আমার বক্তৃতা ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য হয় না।... ইতি ২০শে নভেম্বর, ১৮৪৮।'

তিনি খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যাপনা করছিলেন বটে, কিন্তু সেই কাজে কোনদিনই পূর্ণ তৃপ্তি পান নাই। কারণ পড়ান ও সেই বিষয়ে চিন্তা করা ব্যতীত তাঁর অন্য কিছু করার অবকাশ ছিল না।

১৮৪৮ অব্দের শেষভাগে বেঁজাসঁর বিদ্যা-প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান-বিভাগে জনৈক অধ্যাপক দীর্ঘ অবসর গ্রহণ করায় পাস্তার সেই স্থানে যেতে অভিলাষ করেন। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর হয় নাই বটে, কিন্তু তিনি আবেদন-পত্র পাঠাবার অনতিকাল পরেই আর এক স্থানে অধ্যাপক পদ পেয়েছিলেন। ষ্ট্রাস্‌বুর্গ ফাকুলতেতে একজন রসায়নতত্ত্বের অধ্যাপক প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সেই স্থানে নিযুক্ত হন।

পাস্তারের এক বাল্যবন্ধু সেখানকার পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রে পাস্তারের দিনগুলি খুব আনন্দের মধ্যেই অতিবাহিত হ'তে লাগল।

বিবাহ ও পারিবারিক জীবন, বৈজ্ঞানিকগণের সহানুভূতি, রেসিমিক অ্যাসিডের সন্ধানে, সম্মান এবং পুরস্কার লাভ

পাস্তারের ষ্ট্রাস্‌বুর্গ আকাডেমীতে গমনের অব্যবহিত পরে সেখানকার রেক্‌টর্ লোরঁ মহাশয়ের সহিত আলাপ হয়। এই লোঁর-র সঙ্গে বালার বীক্ষণাগারের ওগুস্ত লোরঁ-র কোন সম্পর্ক ছিল না। সহানুভূতিসম্পন্ন লোরঁ পরিবারের সহৃদয়তায় অত্যল্পকাল মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে পাস্তারের খুব ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়েছিল।

পাস্তার ১৮৪৯ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লোরঁ মহাশয়কে এই পত্রখানি লেখেন—

"মহাশয়, আমার পক্ষ হতে, আমার ও আপনার পরিবার সম্পর্কীয় একটি বিশেষ প্রস্তাবের বিষয় আপনাকে নিবেদন করছি......সে সম্বন্ধে আপনাকে মতামত নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকটি কথা জানান কর্ত্তব্য বিবেচনা করি।

"আমার পিতা জুরার অন্তর্গত আর্বোয়া সহরের এক চর্ম্মব্যবসায়ী। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মা গতবৎসর মে মাসে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন; এক্ষণে গৃহস্থালীর কার্য্যনির্ব্বাহ এবং পিতার সাহায্যের নিমিত্ত আমার ভগিনীই তাঁর স্থানে নিযুক্ত আছেন।

"আমাদের পরিবারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল, তবে যথেষ্ট ধন-সম্পদ্ নেই। যা'কিছু আমাদের আছে তার মূল্য পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ-এর বেশী হবে না। সে সমস্তই আমি ভগিনীকে সমর্পণ করব বলে বহুদিন পূর্ব্বে মনস্থ করেছি। কাজেই

নিজস্ব সম্পত্তি বলতে আমার কিছুই নেই। সুস্বাস্থ্য, সাহসিকতা ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পদ-মর্য্যাদা এই আমার একমাত্র সম্বল।

"আমি দুই বৎসর পূর্বে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পদার্থ-বিজ্ঞানে বিশিষ্টতা লাভ করে একল নর্মাল পরিত্যাগ করেছি এবং আঠার মাস আগে 'ডক্টর' উপাধি পেয়েছি। আমার যে সকল গবেষণাকার্য্যের বিবরণী আকাদেমীতে উপস্থাপিত করেছি তৎসমুদয় অতিশয় আদরের সহিত গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে শেষের গবেষণা-কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সমাদর পেয়েছে। তারই একটি বিবরণীপত্র এই সঙ্গে পাঠালাম।

"এই আমার বর্ত্তমান অবস্থা। যদি আমার রুচির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না ঘটে, তা হলে নিজেকে ভবিষ্যতে রাসায়নিক গবেষণাতেই পূর্ণ রূপে লিপ্ত রাখব। বৈজ্ঞানিক কার্য্যের দ্বারা কিছু খ্যাতি অর্জ্জন করলে আমার প্যারীতে যাবার ইচ্ছা আছে।

"শ্রীযুক্ত বিয়ো বহুবার আমাকে অস্তিত্বের বিষয় গভীর ভাবে চিন্তা করতে বলেছেন। আমি হয়ত দশ বা পনেরো বৎসরের মধ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে তদ্বিষয়ে সমর্থ হতে পারি। কিন্তু সেটা স্বপ্ন মাত্র, আমার তা' উদ্দেশ্য নয়। বিজ্ঞানকে আমি বিজ্ঞান বলেই ভালবাসি।

"এই বিবাহের প্রস্তাব করতে আমার পিতা নিজেই ষ্ট্রাসবুর্গে আসবেন। ইতি—

"পুনশ্চ—আমার বয়স গত ২৭শে ডিসেম্বরে ছাব্বিশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে।"

সপ্তাহ কয়েক পরে এই পত্রটির উপযুক্ত উত্তর পৌঁছিল। পাস্তুরের পিতা ষ্ট্রাসবুর্গে গিয়ে বিবাহের কথা স্থির করে আর্বোয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। লুই-এর ভগিনী ভ্রাতার গৃহস্থালী পরিচালনার জন্য সেখানেই থেকে গেলেন।

২৯শে মে লোর‍্যার কন্যার সহিত পাস্তুরের বিবাহের দিন ধার্য্য হল। লুই শাপুইকে লিখলেন, "আমি খুবই সুখী হতে পারব বলে বিশ্বাস করি। স্ত্রীর নিকট যে যে গুণ প্রত্যাশা করেছিলাম, সমস্তই তাঁর কাছে পেয়েছি। হয়ত তুমি বলবে যে, আমি সমস্তই ভালবাসার চক্ষে দেখছি। সে কথা সত্য, কিন্তু আমার মনে হয়, আমি কোনরূপ বাহুল্য প্রকাশ করি নাই। এ বিষয়ে আমার ভগ্নী জোসেফিন্‌ও আমার সঙ্গে একমত।"

বিজ্ঞানের ন্যায় অপরাপর বিষয়েও পাস্তুরের কিরূপ একাগ্রতা, স্পষ্টবাদিত্ব এবং সরলতা ছিল, এই পত্রে সেটি ভালভাবেই পরিস্ফুট দেখা যায়। লোর‍্যা মহাশয়কে লিখিত পত্রটিতেও তাঁর সেই সহজ, সরল ঐকান্তিক ভাব এবং বিজ্ঞান-প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবিক তিনি বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলেই ভালবাসতেন, তার মধ্যে অপর কিছুর প্রত্যাশা নিতান্তই গৌণ ছিল।

সন্দেহের কুহেলিকাচ্ছন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণারাজ্যের প্রবেশ-পথে চলতে গিয়ে তাঁর মনে কত প্রকার সংশয় জাগত, কত রকমের উদ্বিগ্নতা তরঙ্গায়িত হত; আবার কিছুদূর যেতে পুনরুজ্জীবিত আশা তাঁর দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখে উৎসাহের অরুণ আভা এঁকে দিত, তাঁর চিন্তাবিষ্ট চোখে উল্লাসের প্রখর দীপ্তি ফুটিয়ে তুলত।

পারিবারিক জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পাস্তুরগৃহিণী স্বামীর এই সকল সংশয়, উদ্বেগ, আশা ও আনন্দের অংশ গ্রহণ করতেন; আর সাংসারিক অন্যান্য কাজের চেয়ে, রাসায়নাগারের গবেষণা-কার্য্য অনেক বড়, এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করতেন। কিছুদিন বাদে ষ্ট্রাসবুর্গ ফার্মাসিউটিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক লোয়ার মহাশয়ের সহিত তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হয়। সে সময়ে শ্রীযুক্ত লোয়ার পাস্তুরের সহায়তায় বিজ্ঞানে ডক্টর উপাধি লাভের চেষ্টা করছিলেন। তাঁর নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় ছিল, হেমিহেড্রাল আকৃতির স্ফটিকের আলোক-সক্রিয়তা সম্পর্কীয় কয়েকটি তথ্য। এই কার্য্যে পাস্তুরের পরামর্শ তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

পাস্তুর ১৮৫১ অব্দে ষ্ট্রাসবুর্গ আকাডেমীর কার্য্যাবকাশে অ্যাসপার্টিক্ এবং ম্যালিক অ্যাসিড সম্বন্ধীয় নূতন গবেষণার তথ্য নিয়ে প্যারীতে যান। সেখানে বিয়োর সঙ্গে সেই সকল অ্যাসিডের আণবিক গঠন, আকৃতি, রসায়নতত্ত্ব ও আলোক-বিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা কথা আলোচনা হয়। পাস্তুরের গবেষণা-কার্য্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে বিয়ো তাঁকে অত্যন্ত প্রশংসা করেন।

ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে পাস্তুর শাপুইকে লিখলেন,

"আমার আগামী বৎসরের কার্য্য-পদ্ধতি ঠিক হয়ে গেছে। এ কাজে আমি শীঘ্রই এগিয়ে যাব বলে আশাকরি······

······আমার মনে হয়, আমি রহস্যের প্রান্তে এসে পৌঁছেছি, তার নিবিড় আবরণীখানি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। যে তমিস্র রজনীর পথ বেয়ে আমি চলেছি তা খুবই দীর্ঘ বলে বোধ হয়, কিন্তু সেজন্য কোন অভিযোগ করছি না। আমার ক্লাশের পড়া সহজেই তৈরী হয়ে যায়, সপ্তাহের মধ্যে প্রায় পাঁচদিনই আমি বীক্ষণাগারে কাটাতে পারি। আমাকে অনেক সময়ে পাস্তার মহাশয়ার গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, তখন তাঁকে এই বলে প্রবোধ দিই যে, তাঁকে আমি প্রথিতনাম্নী করে তুলব।"

পাস্তার পূর্ব্ব হতেই তাঁর কর্ম্মের সাফল্য দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু সে বিষয়ে তিনি কারও কাছে বলতে সাহস করতেন না, তাঁর কর্ম্মের সাথী ছাড়া; যিনি একাধারে তাঁর গৃহিণী, সচিব, বন্ধু ও কর্ম্মসঙ্গিনী ছিলেন।

সে সময়ে তাঁর সমস্তই শ্রী ও সমৃদ্ধির প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। একটি নবীন অতিথি তাঁদের গৃহখানি সর্ব্বদাই হাস্যমুখর করে রাখত। নির্বিঘ্ন, নিরুদ্বেগ কর্ম্মের মধ্যে শিক্ষকগণের পরামর্শ, সাধুবাদ ও অনুমোদনের উৎসাহ তাঁর জীবনকে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল।

পাস্তারের কাজের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছিল। পদার্থবিদ্ সেনার্মো তাঁকে ১৮৫২ অব্দের প্রথমে অ্যাকাডেমির সভ্যপদে বরণ করতে মনস্থ করেন। পাস্তারের বয়স তখন ত্রিশও অতিক্রম করে নাই। সেনার্মো অতিশয় হৃদ্যতার সহিত বলেছিলেন যে, সাধারণ পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগে একটা পদ খালি আছে, লুইকে সেইস্থানে নেওয়া হোক। কিন্তু বিয়ো সে কথার প্রতিবাদ করে তাঁকে রসায়ন বিভাগে নিতে প্রস্তাব করেন। পাস্তারকে তিনি সস্নেহ আন্তরিকতার সহিত লিখেছিলেন—

"তোমার কাজ পদার্থ-বিজ্ঞান অপেক্ষা রসায়ন-জগতে অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছে; তোমার আবিষ্কারটি প্রকৃতপক্ষে রসায়নতত্ত্বেরই অন্তর্ভুক্ত, সে হিসাবে কাজটি খুবই উচ্চশ্রেণীর, কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তোমার কাজ একটি পূর্ব্বপ্রচলিত পদ্ধতিরই প্রয়োগ মাত্র।

"যাঁরা না জেনে শুনে তাড়াতাড়ি ভিত্তিহীনভাবে তোমাকে তোমার প্রকৃত দাবীর বহির্ভূত সম্মান দানে ইচ্ছা করেন, তাঁদের কথা শুন না।

"তা'ছাড়া তুমি নিজেই দেখতে পাবে যে, নিজ কর্ম্মের দ্বারা গত চার বৎসরের মধ্যে কি ভাবে তুমি প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছ। সর্ব্বসাধারণের এই সম্মানের স্থান, যা' তুমি স্বীয় চেষ্টায় অর্জ্জন করেছ, তার মধ্যে নির্ব্বাচনের হ্রাসবৃদ্ধির কোন অধিকার নেই।

"প্রিয় বন্ধু, আমাকে সময় হলেই পত্র দিও এবং এটি নিশ্চয় জেনো যে, তোমার মত ব্যক্তির উপর আমার আগ্রহ ও অনুরাগের জন্যই এই বৃদ্ধ বয়সেও আমার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা অক্ষুণ্ণ আছে।

—ইতি তোমার বন্ধু।"

বিয়োর এই সৎপরামর্শ পাস্তার কৃতজ্ঞতাভরে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়সহকারে ডুমাকে এই কথা লিখেছিলেন যে, রসায়ন-বিভাগেও কোন পদ খালি থাকলে তিনি তজ্জন্য আবেদন করবেন না।

উত্তরে ডুমা লিখলেন "তুমি কি মনে কর যে, দেশের একল নর্ম্যালের যে গৌরব তোমার রসায়নতাত্ত্বিক গবেষণায় বৃদ্ধি পেয়েছে, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছি? আমি যে দিন মিনিষ্ট্রীতে পদার্পণ করেছি সেই দিনেই তোমাকে legion d'honneur-এর গৌরবজনক ক্রশ দেবার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। যদি তোমায় আমি বিজয়মাল্যে ভূষিত করতে পারি, তা'হলে যে কিরূপ তৃপ্ত হব তা' তোমার ধারণার বহির্ভূত। জানি না কি অসুবিধার জন্য সে বিষয়ে এত বিলম্ব হচ্ছে। আমরা যা নির্দ্ধারণ করেছি, সে সম্বন্ধে তোমার কি অভিমত? যখন এই পদে এক্ষণে অপর কেউ অধিষ্ঠিত নেই, তখন সে স্থানে তুমিই যে নির্ব্বাচিত হবে, এ কথা নিঃসন্দেহ। আমরা বিজ্ঞানের পক্ষে কল্যাণকর এই ন্যায্য দাবী নিশ্চয়ই বলবৎ রাখব। যে বিজ্ঞানের তুমি একজন প্রধান গৌরব, আশ্রয় ও আশাস্থল, তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা'কিছু প্রয়োজন, উপযুক্ত সময়ে তা' আসবেই।

ইতি তোমার আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষী—।"

এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠিয়ে পাস্তার তাঁর পিতাকে লিখেন—

"আপনি বোধ হয় ডুমা মহাশয়ের এই পত্র দেখে গৌরব অনুভব করবেন। পত্রটিতে আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি। আমার কাজের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এ কথা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু সেজন্য নিজেকে এত ভূয়সী প্রশংসা পাবার যোগ্য বলে বিশ্বাস হয় না।"

[ক্রমশঃ

১০ই ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ :—গত শুক্রবার প্রাতে লাট-প্রাসাদে গবর্ণর ব্র্যাবোর্ণের

রেশম-শিল্পের অবতারণা ও মুর্শিদাবাদ রেশমের পরিস্থিতি

—শ্রীকিরণেন্দু বাগ্‌চী

রেশম-শিল্পের অতীত এবং বর্ত্তমান ইতিহাস

১৯০৩ সালেও এই মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৫,০০০ হাজারেরও অধিক লোক তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত এবং সেই সময় এই জেলায় ২,৫০০ হাজারের অধিক তাঁত চলিত। এ দেশের বসনীদের ভিতর অধিকাংশই হিন্দু এবং জাতিতে তাঁতি। ইহা ছাড়া কৈবর্ত্ত, বৈষ্ণব, চণ্ডাল, মাল ও বাগ্‌দী (ইহারা সকলেই হিন্দু) এদেশে রেশমের কাজ করিয়া থাকে। মুসলমান যাহারা বস্ত্র বুনিয়া থাকে, তাহাদিগকে এ দেশে মুগা বা জোলা বলা হয়।

দুবরাজ নামে মুর্শিদাবাদের বালুচরে এক বিখ্যাত তন্তুবায় ছিল। সে জাতিতে ছিল চামার, প্রথম কর্ম্ম-জীবনে সে নিজের জাত-ব্যবসা আরম্ভ করে। কিছুদিন পরে ঐ কার্য্য পরিত্যাগকরতঃ ঢোল তৈয়ারী সুরু করে এবং কিছুকাল পরে ইহাও ছাড়িয়া গিয়া টম্ টম্ তৈয়ারী আরম্ভ করে। ইহাতেও তাহার মন বসে না, পরে সে এক কবি-গানের দল গঠন করে। নিরক্ষর হইলেও অনতিকাল মধ্যে এক জন বিচক্ষণ কবি-গায়ক বলিয়া দেশে বিশেষ পরিচিত হইয়া পড়ে। দু'এক বৎসর গানের পর দুবরাজ ইহাতেও ইস্তফা দিয়া বালুচরের একজন সুদক্ষ মুসলমান বসনীর নিকট শিক্ষানবিশী সুরু করে। উক্ত তন্তুবায় বস্ত্রের উপর ঝাঁপের সাহায্যে নানারূপ প্যাটার্ণ তুলিতে পারিত। দুবরাজ তাহাই শিখিতে লাগিল। অল্প দিনের ভিতর দুবরাজ এ জেলার সর্ব্বপ্রধান প্যাটার্ণের কারিগর বলিয়া পরিগণিত হইল। দুবরাজের অধ্যবসায় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার পর হইতে ঝাঁপের কার্য্যে এরূপ পারদর্শী তন্তুবায় এ জেলায় আর দৃষ্টিগোচর হয় না।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে করেমপুর ঘাট বন্দরে তাঁতিরামবাবুর পরিবার রেশম-শিল্পের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বাড়ীতে অনেক কয়খানি তাঁত ছিল এবং এই রেশমের ব্যবসা করিয়া ঐ পরিবার যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন। অধুনা তাঁহাদিগের বাড়ীতে পূর্ব্ব প্রথা সংরক্ষণার্থ মাত্র দুটি একটি তাঁত রাখিতে দেখা যায়। পূর্ব্বে এ জেলার অধিকাংশ মধ্যবিত্ত লোকেরা রেশম-শিল্পে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'গভর্ণমেণ্ট মনোগ্রাফে' দেখিতে পাওয়া যায়, বহরমপুরের কয়েকজন ভদ্রলোক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রেশম-শিল্পের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগী হন এবং তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যে উৎকৃষ্ট বস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া বিদেশে প্রতিযোগিতা সুরু করেন। এই সকলের মধ্যে এস্. এস্. বাগচী (সুধাংশুশেখর বাগচী), দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কালীদাস প্রেমজী, ধরম্‌সি কাজী এবং গোপাল দাস মুকুন্দলাল মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। 'মনোগ্রাফ' লেখে,—'S. S. Bagchi, the winner of the Gold-Medals at the International Exhibitions of Paris and London, does some amount of directing, which has resulted in the improvements which have characterised of late years, the Silk weaving industry of Jangipur.' অদ্যাপি দুবরাজের সহস্ত-নির্ম্মিত একখানি বোনা নামাবলী এস্. এস্. বাগচী মহাশয়ের দোকানে দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রখানিতে ঝাঁপের কার্য্য দেখিয়া বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। এক কালে যে সাধারণ ঠক্‌ঠকি তাঁতে (flyshuttle) এরূপ সুন্দর ঝাঁপের কার্য্য হইতে পারিত, ইহা এখন বিস্ময়ের জিনিষ বলিয়া অনুমান হয়। অধুনা 'জ্যাক্‌আর্ট'

তাঁতে নানা প্রকার নক্সার কাজ হইতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার মৃজাপুরে যোগেন্দ্রনাথ বাঘড়ে নামক জনৈক তাঁতি দুইখানি এবং তথাকার অন্য একজন একখানি জ্যাকআর্ট তাঁত চালাইতেছে। স্থানীয় রেশম-বয়ন স্কুলে দুইখানি ঐ প্রকার তাঁতে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। মোট পাঁচখানির বেশী জ্যাকআর্ট তাঁত এ জেলায় নাই। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে এই তাঁত অনেকগুলি চলিতেছে।

নিম্নে এ জেলার প্রধান কয়েকটি রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত-কারক স্থানের নাম প্রদত্ত হইল :—

গরদ—মৃজাপুর, দফরপুর, রামডহর, আমুইপাড়া, বালুচর, ইসলামপুর প্রভৃতি।

মটকা—ইসলামপুর, বেলডাঙ্গা, ভাবতা, নেয়াল্লিসপাড়া, গোয়ালজন প্রভৃতি।

বহরমপুর এণ্ডী ও তসর—বেলডাঙ্গা, ভাবতা, কাঁদী নেয়াল্লিসপাড়া, গোয়ালজন ইত্যাদি।

এণ্ডী বস্ত্র পূর্ব্বে এ জেলায় তৈয়ার হইত না। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ ভূমিকম্পে যখন এ দেশের চাষাদিগের ভিতর অন্নাভাবে এক অসহনীয় হাহাকার রব উত্থিত হইল, সেই সময় বঙ্গীয় রেশম বিভাগের কর্ত্তা উদারহৃদয় মিষ্টার এন. জি. মুখার্জ্জি মহাশয় এ জেলায় এক প্রকার রেশম বস্ত্রের সৃষ্টি করেন। নিকৃষ্ট মটকার সূতা, যাহা এদেশে "ছেনে টোপা" মটকা নামে পরিচিত, সেই সূতাকে ব্যবহারযোগ্য করিয়া ঐ সূতার দ্বারা একপ্রকার থান তৈয়ার করাইয়া তাহার নাম দেওয়া হয় "বহরমপুর এণ্ডী" বা "মুর্শিদাবাদ এণ্ডী"। মুখার্জ্জি মহাশয় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত চাষীদিগের দুঃখ-দূরীকরণার্থ ১১,০০০ টাকা ব্যয়ে বাংলার নানা স্থান হইতে "ছেনে টোপা" সূতা সংগ্রহ করিয়া এবং আসাম হইতে কিয়ৎপরিমাণ নকল এণ্ডী সূতা আনাইয়া ১৫০ ঘরের অধিক মটকা-বসনীদের বিতরণ করেন এবং এই সকল সূতাদ্বারা উন্নত প্রক্রিয়ায় বস্ত্র নির্ম্মাণ করাইবার জন্য বহরমপুরের এস. এস. বাগচী মহাশয়কে অনুরোধ করেন। এস. এস. বাগচী মহাশয় উহা হইতে অতি অল্প মূল্যের নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট সুটের থান প্রস্তুত করান। সেই সময় কলিকাতার হোয়াইটওয়ে লেডল এণ্ড কোং এই থান এস্থান হইতে ক্রয় করিয়া বিদেশে রপ্তানীর দ্বারা দেশে এই দুর্দ্দিনে বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। সেই সময় ঐ এণ্ডীর একটি সুট-প্রমাণ থান ৪॥৫ টাকাতেও পাওয়া যাইত। আজকাল ৭॥৮ টাকায় একটি এণ্ডীর থান পাওয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট মনোগ্রাফ লিখিতেছেন :—"The imitation Assam Silks or Murshidabad Endis, as they are now called, are sold specially by one Berhampore firm (S. S. Bagchi & Co.), and the samples shown (No. 21 to No. 31) are taken from their pattern-book." ১৯০৩ সালের 'Monograph on the Silk Fabrics of Bengal' পুস্তকে উক্ত প্যাটার্ণগুলির ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। ৴১ এক সের ছেনে টোপা মটকার মূল্য ৩৲ হইতে ৫৲ টাকা।

পূর্ব্বে মৃজাপুর গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় সরকার, জয়কৃষ্ণ মণ্ডল হরিমোহন সাহানা প্রভৃতি, ইসলামপুরের নটকৃষ্ণ রাণ এবং বালুচরের দুবরাজ ও কুতুব সেখ এ-জেলার অতি সুদক্ষ বসনী বলিয়া পরিগণিত হইত। মৃত্যুঞ্জয় সরকারের হস্ত-নির্ম্মিত পাকোয়ান বস্ত্র, দুবরাজ-পুত্র নারায়ণচাঁদের তৈয়ারী বালুচরী টেবিলক্লথ এবং কুতুব সেখের তৈয়ারী গরদের শাল, গরদের পাগড়ী এবং স্কার্ফ প্রভৃতি মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশের রেশম বস্ত্রের ভিতর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। বালুচরের দুবরাজ, কুতুব সেখ এবং নারায়ণচাঁদ ছাড়া অন্য কোন বসনী বিশেষ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বুনিতে পারিত না। ইহার প্রধান কারণ, দুই একজন ব্যতিরেকে অন্যান্য তাঁতিরা স্থানীয় ভদ্রলোকদের কোন দিনই বিশেষ কোন পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই। ইহা ছাড়া বালুচরের মাড়োয়ারী মহাজনেরা চিরদিনই তাঁতিদের দাদন দিয়া বিদেশী সূতার দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া ভারতের নানাস্থানে এই জেলার রেশম বস্ত্র বলিয়া চালান দিয়া অধিক লাভবান্ হইবার চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছেন। অধুনা মৃজাপুরের অবস্থাও প্রায় এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এদেশের ভদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসার অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক না থাকায় মাড়োয়ারী

মহাজনেরা মৃজাপুর গ্রামটিকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছেন। গরীব তাঁতিদের কিঞ্চিৎ অর্থ কর্জ্জ দিয়া অথবা পূর্ব্ব হইতে কিছু টাকা দাদন দিয়া এখানে বিদেশী রেশম আমদানী করতঃ তাহার দ্বারা বস্ত্র বুনাইয়া অন্যত্র চালান দিতেছেন। মৃজাপুরে পূর্ব্বে ৮০০ খানি তাঁত চলিত; পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ৩০০ খানিতে দাঁড়াইয়াছিল; এখন অবস্থা অধিক শোচনীয় হইয়াছে। এখন প্রায় ২৫০ খানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। দিন দিন এদেশের ব্যবসার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে বাংলা সরকার এবং জনসাধারণ এ শিল্পের প্রতি অধিক নজর না দিলে অচিরে যে ইহার ধ্বংস সুনিশ্চিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আপনারা শুনিলে অবাক হইবেন, এ জেলার অনেক ব্যবসায়ীরা প্রায় চারিশতের অধিক তাঁতে বিদেশী রেশমের দ্বারা বস্ত্র নির্ম্মাণ করাইতেছে এবং তাঁহাদের প্রচেষ্টায় ঐ সকল বিদেশী সূতার বস্ত্র সর্ব্বত্র 'মুর্শিদাবাদ রেশম' বলিয়া বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ অসৎ উপায় অবলম্বনে যাহাতে মুর্শিদাবাদের রেশম-শিল্পের বিনাশ সাধন না হইতে পারে, সে বিষয় আমরা বাংলা সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অনুরোধ করি। সম্প্রতি শুনা যাইতেছে, এক ব্যক্তি জাপানী সূতার এজেন্ট হইয়াছেন। স্থানীয় অধিকাংশ বসনীরাই বাধ্য হইয়া ব্যবসায়ীদের উক্ত প্রকার অসৎ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করিতে বাধ্য হয়। মৃজাপুরে মাত্র দুই এক ঘর ভিন্ন সকল তাঁতিরাই মাড়োয়ারী মহাজনদের নিকট ঋণদায়ে জড়িত। স্থানীয় শিল্পের অবনতির আর একটি প্রধান কারণ, আমাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে রেশম সূতা প্রস্তুত হয় না। ইহার কারণ প্রয়োজনানুযায়ী রেশমগুটীর চাষ নাই। কাজেই রেশমসূত্রের মূল্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মহার্ঘ। এখানে একটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য করিবার আছে। উপস্থিত ভারতবর্ষের জন্য বৎসরে রেশম সূতার প্রয়োজন ৪৫,০০,০০০ লক্ষ পাউণ্ড, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে বৎসরে ইহার অর্দ্ধেক পরিমাণও রেশমসূতা প্রস্তুত হয় না।

এ জেলার জঙ্গীপুর মহকুমায় দুইটি, বেলডাঙ্গায় এবং রাঢ় দেশের ভদ্রপুরে রেশম 'ফিলেচার রিলিং (কলের সাহায্যে রেশম সূতা কাটা)' কারখানা আছে। ইহা ছাড়া দেশীয় প্রথায়, অর্থাৎ ঘাইয়ে সূতা কাটিবারও একটি কারখানা মৃজাপুরের সন্নিকটে দৃষ্ট হয়। দশ বৎসর পূর্ব্বে হাতীবাঁধা নামক স্থানে একটি রিলিং কারখানায় বহুল পরিমাণে রেশম সূতা প্রস্তুত হইত, কিন্তু রেশমগুটীর অভাব হওয়ায় হাতীবাঁধার কারখানা আজকাল উঠিয়া গিয়াছে। অন্যান্য যে সকল রিলিং কারখানা এখন আছে, তাহাও মাঝে মাঝে গুটীর অভাব বন্ধ হইয়া যায়। কাটনীরা এখনও যে সামান্য পরিমাণ গুটী উৎপন্ন করিতেছে, তাহাও ক্রমে উৎকৃষ্ট বিছনের অভাবে বন্ধ হইয়া আসিতেছে। ঐ কারণে ঘাইয়ে সূতা কাটাও খুব কমিয়া গিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রধানতঃ চাষী স্ত্রীলোকেরাই দেশীয় প্রথায় গরদ এবং মটকার সূতা কাটিয়া থাকে। এই কাটনীদের ভিতর মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। বর্ত্তমানে /১ একসের গরদ সূতার বাজার দর ৮॥০ হইতে ১১॥০ টাকা।

এ জেলার মটকা বস্ত্র নির্ম্মাণে ইসলামপুরই (চক্) প্রধান। এই ইসলামপুরে এখন প্রায় পাঁচশত ঘরের অধিক বসনী মটকা বস্ত্র তৈয়ারী করে। মটকা বস্ত্র ছাড়াও ইহারা ১১হাত অথবা ১৩হাত এবং ৩৫ ইঞ্চি বহরে কম দরের প্লেন গরদ থান নির্ম্মাণ করে। আজকাল বাজারে মটকা সূতার দর /১ এক সের ৪॥০ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৭॥০ টাকা পর্য্যন্ত। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মটকা সূতার নাম "বাবালী মটকা"। এরূপ উৎকৃষ্ট সূতা আজকাল সচরাচর বাজারে পাওয়া যায় না। নিকৃষ্ট মটকা সূতার নাম "ছেনে টোপা", ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূতা ৩৲ টাকা সেরে পাওয়া যাইত। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও বেলডাঙ্গায় উৎকৃষ্ট মটকা প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত। কিন্তু এখন বেলডাঙ্গার রেশম-শিল্পের অতি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, অদ্যাবধি স্থানীয় যে সকল কাটনী এবং বসনী রেশম শিল্পে ব্যাপৃত আছে, তাহাদিগের ভিতর অধিকাংশেরই দুই বেলার অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থা নাই।

মুর্শিদাবাদ রেশম-শিল্পের জাতি ভাগ

(১) গাউন-পিস্—ইউরোপীয় উচ্চস্তরের মহিলারা অনেকেই মৃজাপুরী পাকোয়ান রঙীন বস্ত্রের গাউন ব্যবহার করিতেন, কিন্তু সম্প্রতি ইহার চাহিদা একেবারেই কমিয়া গিয়াছে। কোন কোন বাঙ্গালী ভদ্রলোকও এই পাকোয়ান চোগা, চাপকান, কোট ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(২) হাওয়াই বা রেশম মসলীন—এই কাপড় অত্যন্ত পাতলা। এই মসলীন বস্ত্রে চাদর, উৎকৃষ্ট বালাপোষের ঢাকনা (যাহাকে মুর্শিদাবাদী মল্‌মল্ বলা হয়), হাওয়াই শাড়ী, পাঞ্জাবীর থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং ধনী ব্যক্তিদের গৃহেই ইহার চলন দেখা যায়। মৈমনসিং জেলাতেও রেশম মসলীন তৈয়ার হয়। এখানকার মৃজাপুরে এই বস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়।

(৩) শাল, চাদর, টেবিল কভার এবং পাগড়ী—সাধারণতঃ এই বস্ত্রের কাজ পাকোয়ান সূতার সাহায্যেই হইয়া থাকে। রেশম সূতাকে নানা প্রকার রং করিয়া বস্ত্রের উপর নক্সা উঠাইয়া শাল, পাগড়ী, টেবিল-কভার প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়।

(৪) ধুতি, জোড় ও শাড়ী—একত্রে পর পর ধুতি এবং চাদর বোনা থাকিলে তাহাকে জোড় বলা হয়। জোড় সাধারণতঃ এদেশে বিবাহ, উপনয়নাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ধুতি পূজার্চ্চনাদিতে ব্যবহৃত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা এবং বাংলা দেশে সচরাচর অবস্থাপন্ন বিধবারা এবং বৃদ্ধেরা সাদা গরদ ধুতি ব্যবহার করিয়া থাকেন। গরদ শাড়ী অনেক প্রকারের হইতে পারে। মৃজাপুরের গরদ শাড়ী প্রধানতঃ পাকোয়ান সূতার দ্বারাই বোনা হইয়া থাকে। বয়নীরা নানা নক্সাপেড়ে কাপড়ের জমীতে বুটি প্রভৃতি উঠাইয়া এই সকল শাড়ী বুনিয়া থাকে। সাধারণতঃ প্লেন এবং চাটাইপাড়ের শাড়ীই ইহাদের ভিতর অধিক প্রচলিত। সোণালী এবং রূপালী জরীপাড় বস্ত্রও ইহারা বুনিয়া থাকে। একখানি উৎকৃষ্ট জরীপাড় এগার হাত ৪৫ ইঞ্চি শাড়ীর মূল্য ১৯৲ টাকা হইতে ২৩৲ টাকা। ঐ প্লেন এবং চাটাইপাড় শাড়ীর মূল্য ৮৲ টাকা হইতে ১৫৲ টাকা। ব্লাউসপিস্ সমেতও এই শাড়ী কিনিতে পাওয়া যায়। বালুচরে কম মূল্যের সূতার শাড়ী প্রস্তুত হয়। উহার মূল্য ৬৲ হইতে ১০৲ টাকা।

(৫) মেখলা—ইহা এক প্রকার উৎকৃষ্ট কোরা রেশম থান। আসামীরা এই থান কাপড় এখান হইতে বহুল পরিমাণে ক্রয় করিয়া থাকে। সেখানকার স্ত্রীলোকেরা এইসকল বস্ত্রে মুগা প্রভৃতি সূতার দ্বারা নানারূপ সূচী-শিল্পের নক্সা উঠাইয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। আজকাল বাজারে ছাপা শাড়ীর অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে। সেই সকল অধিক মূল্যের ছাপা শাড়ীগুলি এই থানের উপর ছাপা হইয়া থাকে। যদিও এই সকল শাড়ী মুর্শিদাবাদের ছাপা শাড়ী বলিয়া বাজারে চলিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় রেশম বস্ত্র ছাপার কারখানা একটিও দেখা যায় না। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে রেশম বস্ত্র ছাপাইয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আর এক প্রকার কম দরের কোরা থান এ দেশে তৈয়ার হইয়া থাকে। উহার বেশীর ভাগ ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা কোট প্রভৃতির ভিতরকার লাইনিংয়ের জন্য আজ পর্য্যন্তও কিছু কিছু ক্রয় করিয়া থাকেন। বর্ত্তমানে ৬॥০ গজ × ৪৫ ইঞ্চি সাদা নিরেশ কোরা থানের মূল্য ৪॥৶০ হইতে ৪৸৶০। সাদা মাঝারি থানের মূল্য ৫৲ হইতে ৫।০ টাকা এবং সাদা সরেশ থানের মূল্য ৫॥০ হইতে ৬॥০ টাকা। ৬॥০ গজ × ৪৫ ইঞ্চি ছাপা শাড়ীর দর ৮৲ হইতে ১৭৲ টাকা।

(৬) রুমাল—ইহা পাকোয়ান অথবা ডবল সূতার দ্বারা তৈয়ার হইয়া থাকে। নানা প্রকার প্যাটার্ণের রুমাল মৃজাপুরের তাঁতিরা বুনিয়া থাকে।

এই জেলায় আর এক প্রকার রুমাল তৈয়ার হয়। তাহা ১৮ ইঞ্চি স্কোয়ার হইতে ৩৬ ইঞ্চি স্কোয়ার পর্য্যন্ত হয়। ইহা 'কারমাইকেল' রুমাল নামে পরিচিত। বৃক্ষাদির রংয়ের দ্বারা বহরমপুর কুঞ্জঘাটার একজন মুসলমান এই রুমাল ছাপিয়া থাকে। এই প্রকার দেশী রংয়ের সাহায্যে ছাপার কাজ করিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে নাই। ১৯১১ সালে যখন মাননীয় লর্ড কারমাইকেল বাংলা দেশের গভর্ণর হইয়া আসেন, তখন স্বর্গীয় এস. এম. বাগ্‌চী এবং

পরলোকগত দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য প্রমুখ দুই জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় এই রুমাল ছাপা হয় এবং "কারমাইকেল রুমাল" নাম দিয়া লেডী কারমাইকেল মহোদয়াকে উপহারের দ্বারা সম্মানিত করা হয়। তদবধি ইহা কারমাইকেল রুমাল নামেই দেশ-বিদেশে পরিচিত। অনেক ইউরোপীয় ভদ্রমহিলারা ইহা স্কার্ফ রূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মৃজাপুরে ডবল সূতায় প্রস্তুত কিনারায় চুড়িযুক্ত একখানি ১৮″ × ১৮″ রুমালের মূল্য।৶০, ৷৷০ আনা। কারমাইকেল রুমাল ১৮″ × ১৮″ মূল্য ৮০ হইতে ১৲ টাকা। ৩৬″ × ৩৬″ কারমাইকেল রুমালের মূল্য ২৲ হইতে ৩৲ টাকা।

(৭) ছাপা নামাবলী—রুমাল ছাপাইবার নিয়মেই এখানে কোরা চাদরের উপর দেব-দেবীর নামযুক্ত এক প্রকার নামাবলী ছাপা হয়, যাহা এ দেশের ভগবদ্ভক্ত এবং ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতেরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(৮) মটকা, তসর ও কেটে—মটকার উৎকৃষ্ট ধুতি, শাড়ী, জামার থান প্রভৃতি ইসলামপুরেই বেশীর ভাগ বোনা হয়। এই সকল বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে মহারাষ্ট্র দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। মটকা ধুতি বাংলা দেশে সাধারণতঃ বৃদ্ধ, বিধবা এবং বসনী স্ত্রীলোকদের ব্যবহার করিতে দেখা যায়। এ দেশের মেয়েরা পূজার্চ্চনাদির কার্য্যে মটকা শাড়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। মটকার সূতা রাঙাইয়া নানারূপ চেক এবং রঙীন থান বোনা হয়। পূর্ব্বে এ জেলায় উৎকৃষ্ট মটকার স্যুটের থান বোনা হইত না। তসরের কাজও এখানে মোটেই হইত না। কেটের কাজও তদ্রূপ ছিল। গত ১৯০১ সালে এস. এস. বাগ্‌চী মহাশয় মটকা, তসর, কেটে প্রভৃতির সূতার দ্বারা উৎকৃষ্ট থান তৈয়ারের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হন এবং ভাবতার বসনীদের দ্বারা এই তিন প্রকার থান বুনাইতে আরম্ভ করেন। সাধারণতঃ চার খেই সূতা একত্রে পাকাইয়া পুনরায় ঐ পাকান চারিটি সূতা একত্রে পাকাইয়া ঐ সূতা টানার সাহায্যে তখন হইতে যে বস্ত্র বোনা হইয়া আসিতেছে, তাহাই স্থানীয় চৌতারী থান নামে পরিচিত। কেটে সূতা চারিটি একত্রে পাকাইয়া স্যুটের থান বোনা হইত। সাত আট তার ছেনে টোপা সূতা একত্রে পাকাইয়া উহার টানার দ্বারা বাঙ্গালী সূতার পোড়েনের সাহায্যে আর এক প্রকার উৎকৃষ্ট মটকার থান তৈয়ার হইত। পরে দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কয়েকজন তন্তুবায় দ্বারা ঐ প্রকার বস্ত্র বুনাইতে কৃতচেষ্ট হন।

বর্ত্তমানে মটকা ধুতির বাজার দর ১০ হাত × ৪৫ ইঞ্চি ৪৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা, শাড়ী ১০ × ৪৪″ বা ১১ × ৪৫″ ইঞ্চি ৪৷৷০ হইতে ১৮৲ টাকা, মটকা চাদর ৫৲ টাকা হইতে ১৮৲ টাকা।

(৯) এণ্ডী—ইহার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(১০) বালাপোষ—ভারতবর্ষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বালাপোষ বহরমপুরে প্রস্তুত হইয়া থাকে। শীতের সময় বহু বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি অন্যান্য শীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে মুর্শিদাবাদী বালাপোষ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধনী ব্যক্তিরাই প্রধানতঃ রেশমী বালাপোষ ব্যবহার করেন। একখানি রেশমী বালাপোষের মূল্য ১৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

ব্যবসায়-কেন্দ্র :—এ জেলার বহরমপুর সদরের 'খাগড়া' বাজার রেশম ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। জেলার তাঁতি অথবা মহাজনেরা চতুর্দ্দিক্ হইতে বস্ত্র আনিয়া খাগড়া ব্যবসায়ীদিগের নিকট সরবরাহ করে। এই বাজার হইতে চাহিদা অনুযায়ী বস্ত্রাদি বিদেশে চালান হইয়া থাকে। বহরমপুর, বালুচর এবং মৃজাপুরের কয়েকজন মাড়োয়ারী আড়তদার কোরা রেশমের থান ভারতের অন্যত্র চালান দিয়া থাকে।

১৮৯১ সালে বঙ্গের তুঁত-চাষ এবং রেশম উৎপাদনকারী চাষীর সংখ্যা তালিকা :—

জেলা	তুঁত জমির পরিমাণ	তুঁত এবং রেশম উৎপাদনকারী চাষীর সংখ্যা	জনপ্রতি জমির পরিমাণ
বীরভূম	২,০০০ একর	৮,২৪৯	১/৪ একর
বাঁকুড়া	২০০ "	৯৭৮	১/৫ "
মেদিনীপুর	১৮,৫০০ "	৩,৫৬৯	৫ "
হুগলী	২০০ "	৮৩	২ "
মুর্শিদাবাদ	৬২ ৯০০ "	৩১,৬৯৮	২ "
রাজসাহী	৮০০ "	৮,৭৯৩	১/১১ "
মালদহ	৫০,০০০ "	৩৮,৪৩৩	১ ১/৩ "

মোট পরিমাণ ১,৩৪,৬০০ একর

(উপরি উক্ত তালিকাটি Monograph of Bengal হইতে প্রদত্ত হইল।)

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের দুইটি বৈদেশিক রেশম কোম্পানী লুইস পিয়েন এণ্ড কোং এবং ওয়াটসন এণ্ড কোম্পানী (মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী) ১,৫৫,৪৫২ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, এবং ইটালী দেশে বাংলা দেশ হইতে রেশম রপ্তানীর হার :—

১৮৯৬-১৯০০ সাল	৬,৩২,১৬৪ পাউণ্ড।
১৯০১-১৯০২ সাল	৬,৪৩,৭১৩ পাউণ্ড।

১৮২৯ সালে বিদেশের চাহিদা মিটাইয়া ভারতবর্ষ কেবল মাত্র ইংলণ্ডেই ১৩,৮৭,৭৫৪ পাউণ্ড রেশম রপ্তানী করিয়াছে। ১৮৬৮-৬৯ সালে ২৪,০৫,৫০০ পাউণ্ড রেশম, ১৯০৯-১০ সালেও ২০,৭৫,৬১২ পাউণ্ড রেশম বিদেশে রপ্তানী হয়।

১৮৯৮ সাল হইতে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গের রেশম পণ্যের বিদেশে রপ্তানী তালিকা :—

সাল	গুটী	চশম (Waste)	রেশম বস্ত্র
১৮৯৮-৯৯	৫১,২৮,৩০ পাউণ্ড	১০,৪৬,৫৪১ পাউণ্ড	১২,৬১,৩০০ গজ
১৮৯৯-১৯০০	৭,২২,২৭৬ "	১২,১৭,৪৩২ "	১২,১৭,৩৩২ "
১৯০০-০১	৫,৫৯,৭৭৬ "	১০,৩০,৫২৩ "	১১,৭৫,৯২৪ "
১৯০১-০২	৭,২৭,৬৫১ "	১১,৬৫,৭৫৪ "	৮,৫৪,০৯২ "

১৯০০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে ১৩,৭৬৪ মণ রেশমগুটী কলিকাতায় চালান হইয়াছিল।

১৯০১ সনের মুর্শিদাবাদ জেলার রেশম শিল্পে ব্যাপৃত চাষীর সংখ্যা :—

পলুপালক	তুঁতগাছ উৎপাদনকারী	গুটী হইতে সূতা উৎপাদনকারী	বসনী (তাঁতী)	মোট সংখ্যা
১০,৭৬১	৩১,৬৯৮	১৫,৪৪১	২৬,৮০১	৮৪,৭০৫

১৯০১ সনে সমগ্র বঙ্গদেশে ১,৩১,০০০ একর জমীতে তুঁত গাছের চাষ হইত। ক্রমে তাহা কমিয়া ১৯৩১ সালে ২৬,০০০ একরে দাঁড়াইয়াছিল; বর্ত্তমানে মাত্র ২৩,০০০ একরে দাঁড়াইয়াছে। এমন এক সময় গিয়াছে, যে সময় ভারতের চারি ভাগ উৎপন্ন রেশমের ভিতর বঙ্গ দেশই তিন ভাগ উৎপন্ন করিত।

১৯০১-২ সালের বঙ্গে উৎপাদিত রেশমগুটীর তালিকা :—

জেলা	রেশম গুটী	
বৰ্দ্ধমান	২০	মণ
বীরভুম	১৬,০০০	"
বাঁকুড়া	২,০০০	"
মেদিনীপুর	৩৭,০০০	"
হুগলী	২০০	"
হাওড়া	১০০	"
চব্বিশ পরগণা	২০	"
নদীয়া	২০০	"
মুর্শিদাবাদ	৭২,০০০	"
রাজসাহী	১৮,০০০	"
বগুড়া	৪০০	"
মালদহ	৭০,০০০	"
মোট—	২,১৫,৯৪০ মণ (সমগ্র বঙ্গে)	

(উপরিউক্ত তালিকাটি Monograph of Bengal হইতে প্রদত্ত হইল।)

যে সময়ের কথা বলিতেছি, ঐ সময় গড়পড়তা প্রতি ব্যক্তি দুই মণ হিসাবে রেশম উৎপাদন করিত।

খবর লইয়া জানা গিয়াছে, গত অগ্রহায়ণ মাসে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং মালদহ জেলায় আনুমানিক মাত্র ২৫০ মণ রেশমগুটী উৎপাদিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গের রেশম-শিল্পের অবনতির কয়েকটি প্রধান কারণ :—

(১) রেশমকীটের ব্যাধি।

(২) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাওয়া।

(৩) ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে চীন, জাপান, ইটালী ও ফ্রান্স প্রভৃতি বৈদেশিক রেশমের ক্রমোন্নতি এবং এ দেশে তাহার প্রভাব বিস্তার।

(৪) অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বিদেশী রেশমের আমদানী।

(৫) বাংলার তুঁত-পত্র-উৎপাদনকারী চাষীদিগের তুঁত জমীর খাজনা অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়া (১৮৮৬ সালে মুর্শিদাবাদ, বীরভুম, মালদহ, প্রভৃতি জেলায় তুঁত জমীর খাজনা বিঘা প্রতি ১৬৲ টাকা ধার্য্য করা হয়, সে

ক্ষেত্রে ধানী জমির খাজনা হয় বিঘা প্রতি কেবল মাত্র ১॥০ টাকা।)

(৬) উৎকৃষ্ট রোগশূন্য বীজের অভাব।

রেশম-শিল্পের বর্ত্তমান অবনতির মূল কারণ সম্বন্ধে আমার মনে হয় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ দায়ী :—

(১) উন্নত প্রণালীর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রেশম-তত্ত্ববিদের অভাব।

(২) পলু উৎপাদনে বিশেষ কোন বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বিত না হওয়া।

(৩) রেশমকীটের আহারের জন্য উৎকৃষ্ট তুঁত-পত্রের অভাব।

(৪) রোগশূন্য স্বাস্থ্যবান্ বীজের অভাব।

(৫) রেশমগুটীর প্রধান অভাব।

(৬) উন্নত প্রণালীতে সূতা কাটিবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকা।

(৭) কলের তাঁতে রেশম-বস্ত্র বুনিবার ব্যবস্থা না থাকা।

(৮) অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের বৈদেশিক রেশম-বস্ত্র, নকল রেশম-বস্ত্র এবং ঐ সূতার চালানে এ দেশের বাজার ছাইয়া যাওয়া।

বর্ত্তমানে জগতে এরূপ দেশ অতি বিরল, যে-দেশ স্বকীয় উন্নতিকল্পে পরীক্ষিত প্রথা অবলম্বন করিতেছে না, কিন্তু আমাদের বাংলা দেশের, এমন কি ভারতবর্ষেও এ অভাব যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাপান, চীন, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি রেশম-উৎপানকারী দেশসমূহে এই শিল্পের উন্নতির জন্য বহু প্রকার উপায় অবলম্বিত হইতেছে। জাপান বঙ্গদেশ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ নহে, কিন্তু বর্ত্তমানে জাপান দেশে শিল্পকলা এরূপ মাত্রায় প্রসারতা লাভ করিয়াছে যে, কেবলমাত্র রেশম-শিল্প-শিক্ষার জন্যই ঐস্থানে তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; আর দুর্ভাগা বাংলার, এমন কি, ভারতের এই শিল্প দিন দিন ধ্বংসের অতল তলে নিমজ্জিত হইতেছে এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে বিদেশী রেশম ও কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি দ্রুত গতিতে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় ভারতের সকল বাণিজ্যকেন্দ্রগুলিকে ক্রমান্বয়ে গ্রাস করিয়া বসিতে চেষ্টা পাইতেছে। মনে হয়, ইহার একটি প্রধান কারণ এ দেশের প্রয়োজনাধিক পলুর চাষ না হওয়ায় রেশম-সূত্রের অধিক মূল্য ধার্য্য হওয়া এবং ক্রমে উৎপন্ন রেশমও নিকৃষ্ট হইয়া পড়া; অপর পক্ষে ভারতবর্ষ রেশম শিল্পের একটি সুযোগ্য স্থান হইলেও এদেশে উন্নত প্রণালীতে রেশম-শিল্পশিক্ষার বিশেষ কোন সুযোগ্য প্রতিষ্ঠান নাই।

১৯৩১-৩১ সালে বঙ্গদেশে উৎপন্ন সরকারী রেশম তালিকা :—

উৎপন্ন রেশম সূতা ১০,০১,০০০ পাউণ্ড মূল্য ৫০০০০০০, টাকা
চশম (Waste) ৫,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্য ১,২৫,০০০, টাকা

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে চশম রপ্তানী :—(মাত্র কয়েকটি বৎসরের তালিকা প্রদত্ত হইল)

১৯০১-২ সালে ১১,৬১,৭৫৪ পাঃ. ইহার ভিতর বাংলা হইতে ১,৮২,১৬২ পাঃ
১৯২৫-২৬ " ৬৭,১৬,৯৬ " মূল্য ৭৫,৯৬,৩৮, টাকা।
১৯৩০-৩১ " ৩,৯৫,৪২২ " মূল্য ৪,২৮,০৮০, টাকা।
১৯৩১-৩২ " ২,৯২,৬৩১ " মূল্য ১,৫৩,৮৫২, টাকা।

(উক্ত তালিকা The Indian Tariff Board's report হইতে প্রদত্ত হইল)

গত কয়েক বৎসরের ভারতে আমদানী বিদেশী রেশমের তালিকা :—

সন	রেশমগুটী এবং সূত্র	রেশম বস্ত্র	অন্যান্য রেশম সূত্র
১৯৩২-৩৩	১,১৭,২৬,২৮১ পাঃ	৩,১৬,১০,৯০০ গজ	৫,০৫,০৫,২০১ পাঃ
১৯৩৩-৩৪	৭১,৭৯,২৮৮ "	২,৮৮,৮৫,৮৬২ "	৩,৫১,৮২,৩৬৪ "
১৯৩৪-৩৫	৫৭,৪৩,৩০২ "	২,৭৯,৬২,৯৫১ "	৫,৩৮,৫১,৮১৩ "
১৯৩৫-৩৬	৫৭,৭৩,১২৯ "	২,১৯,৯১,৫৪১ "	৪,৭৫,০২,৯৩১ "
১৯৩৬-৩৭	৬৯,৪১,৫৪৭ "	১,৭৭,৪৫,২৫৪ "	৫,৭৩,০৩,৩৩৯ "

(উপরোক্ত তালিকাটি India's Seaborne Trade হইতে প্রদত্ত হইল)

ভারত সরকারে ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে দেখা যায় যে, বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ভারতের অনুমানিক সাড়ে এগার লক্ষ গজ রেশম বস্ত্র তৈয়ার হয় এবং উহার ভিতর তুঁতপত্রভুক গুটী হইতে প্রায় ৭,৮৩,০২৪ গজ বস্ত্র তৈয়ার হয়। তৈয়ারী বস্ত্রের মূল্য প্রায় বার লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

১৯১৬ সালেও ভারতবর্ষে আনুমানিক ৩১,০১২,০০০

পাউণ্ড রেশমগুটী এবং ২,২৭৬,৮০০ পাউণ্ড পরিমাণে রেশম সূত্র উৎপাদিত হইয়াছে; তন্মধ্যে বঙ্গদেশই ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড গুটী ও ৫,০০,০০০ পাউণ্ড রেশম-সূত্র উৎপাদন করিয়াছিল।

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদ জেলাই ন্যূনকল্পে কোটি টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানী করিয়াছে; কিন্তু কালপ্রবাহে বৈদেশিক রেশম যে কিরূপে আমাদের দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা দর্শাইবার জন্য ভারতে বিদেশী রেশমের আমদানীর উপরোক্ত তালিকা দুইটি প্রদত্ত হইল।

১৫৩০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা বঙ্গে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হয় এবং সর্ব্বপ্রথম হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। পর্ত্তুগীজ আগমনের কিছুদিন পর ওলন্দাজেরা তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে ভারতে আগমন করেন। ওলান্দাজদিগের পর ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্যোপলক্ষে উপস্থিত হন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলণ্ডের মহারাণীর নিকট হইতে প্রাচ্যে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বশেষে ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য একটি সুইডিস কোম্পানী গঠিত হয়। ওলন্দাজগণ চুঁচুড়া, বরাহনগর, কালিকাপুর (মুর্শিদাবাদ) ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। ইংরাজদিগের ভিতর সর্ব্বপ্রথম স্যর টমাস রো জাহাঙ্গীর বাদশাহের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার সনন্দ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বিহার ও বঙ্গে বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে শাহ্ সুজার রাজত্ব সময়ে ইংরাজ কোম্পানীর মিষ্টার ব্রিজম্যান ষ্টিফেন্স হুগলীতে তাঁহাদের প্রধান কুঠী নির্ম্মাণ করেন এবং এই কুঠীর অধীনে বালেশ্বর, পাটনা, কাশীমবাজার (মুর্শিদাবাদ) ও রাজমহলে ইংরাজদের বাণিজ্যালয় স্থাপিত হয়। ক্রমে ইংরাজদের কাশীমবাজার, রাজমহল, পাটনা, মালদহ ও ঢাকায় রেশম-কুঠী স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে কাশীমবাজার প্রধান। নবাব সায়েস্তা খাঁর বাংলা শাসনের সময় ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ও দিনেমারগণ বঙ্গে কুঠী নির্ম্মাণের আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ফরাসীরা চন্দননগর, সৈদাবাদ (ফরাসডাঙ্গা-মুর্শিদাবাদ), ঢাকা, পাটনা ও বালেশ্বরে কুঠী স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে অষ্টেণ্ড কোম্পানী বঙ্গে বাণিজ্যার্থে উপস্থিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ে একচেটিয়া মেয়াদ শেষ হইলে ইহারা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল রেশম কুঠীগুলি হস্তান্তরিত করিয়া চলিয়া যায়; ইহার পর মেসার্স ওয়াটসন্ এণ্ড কোং, লুইস পেন এণ্ড কোং, বেঙ্গল সিল্ক কোং, জেমস লায়াল এণ্ড কোং এবং অ্যাণ্ডারসন্ রাইট এণ্ড কোং রেশম-ব্যবসায়-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্পকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে বর্ত্তমানে চাই দেশবাসী জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া ধনী ব্যক্তিদিগের এবং বঙ্গীয় সরকারের এই শিল্পের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করা। সরকার পক্ষের প্রয়োজন হইতেছে, বিদেশী রেশম-সূতার এবং রেশম-বস্ত্রের প্রতিযোগিতা হইতে বাংলা, তথা ভারতের রেশম-শিল্পকে রক্ষা করা। 'সেরিকালচার' নার্শারীগুলিতে যাহাতে অধিকপরিমাণে উৎকৃষ্ট জাতের পলু জন্মাইতে পারে, সে বিষয় দৃষ্টি দেওয়া। বর্ত্তমানে প্রধান সমস্যা হইয়া দাড়াইয়াছে স্বাস্থ্যবান্ গুটীর। উপযুক্ত এবং চাহিদা অনুযায়ী উৎকৃষ্ট গুটী পাইলেই ক্রমে এই শিল্পের উন্নতি হইতে পারে। এই প্রকার গুটী পাইতে হইলে চাই তার পুষ্টিকর আহার এবং উপযুক্ত বাসস্থান। পলুর আহারের জন্য চাই, তুঁতের চাষ। তুঁত জমী হইতে তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়া তাহাতেও যথেষ্ট লাভবান্ হওয়া যায়। ব্যবসার উন্নতি করিতে হইলে চাই, অধিক পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন করা; অধিক পরিমাণ বস্ত্র পাইতে হইলে ঠক্‌ঠকি তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র বুনিয়া বৈদেশিক রেশম-বস্ত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব; এই কারণে অল্প মজুরীতে অল্প সময়ে অধিক কাপড় পাইতে হইলে চাই কলে কাপড় বোনা। অনুরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন সূতা কাটিবার ক্ষেত্রে। যাই অপেক্ষা কলের সাহায্যে সূতা কাটা (filature reeling) অধিক প্রয়োজন। ইহাতে স্বল্প সময়ে অধিক সূতা পাওয়া যাইবে, অপেক্ষাকৃত মজুরী কম লাগিবে। তা ছাড়া ইহার প্রধান সুবিধা হইতেছে এই যে, সূতাতে মোটেই অসমান
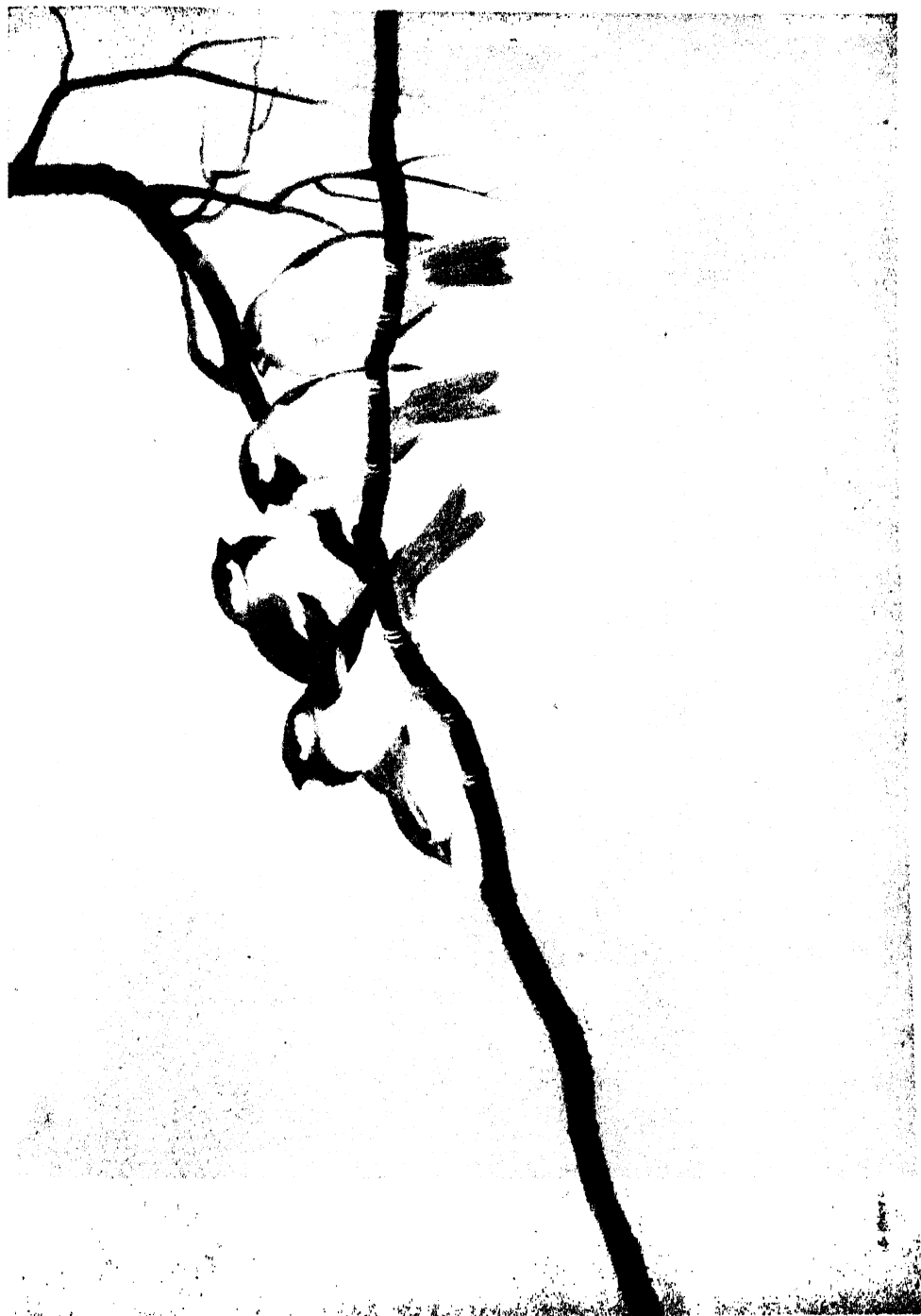
ভাব থাকিতে পারিবে না। সমান সূতার চাহিদা বাড়িলেই অধিক পরিমাণে গুটীপোকার প্রয়োজন হইবে; তখন গুটীর চাষও বাড়িয়া যাইবে এবং একটি গুটী হইতে ৩৫০ বা ৪৫০ গজ সূতার পরিবর্ত্তে যাহাতে ইটালী, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের ন্যায় বড় গুটী উৎপন্ন করিয়া অধিক সূতা পাওয়া যায়, সে বিষয় লক্ষ্য হইবে। বড় গুটী পাইতে হইলে প্রয়োজন উৎকৃষ্ট বীজের এবং পলুর পুষ্টিকর আহারের। অল্প খরচায় অধিক পাতা পাইতে হইলে তুঁতের ঝোপ গাছই ভাল, ইহাতে অনায়াসে অধিক পাতা পাওয়া যাইবে। চাষী যাহাতে অল্প মূল্যের কোন প্রকার সার জমীতে দিয়া তাহার দ্বারা লাভবান্ হইতে পারে, সেরিকালচার ডিপার্টমেন্টের সেই সকল বিষয় শিক্ষা দানের প্রয়োজন। সম্প্রতি বহরমপুরে যে কটন মিলটি খুলিবার চেষ্টা চলিতেছে, আমার মনে হয়, সেই মিলের মূলধনের কিয়ৎ পরিমাণ যদি কর্ত্তৃপক্ষ রেশম শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিয়া মিলে কয়েকখানি রেশমের power-loom বসান এবং কিছু অর্থ যদি ফিলেচার রিলিং (filature reeling)-এ ব্যয় করেন, তাহা হইলে এই শিল্পের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারে। পূর্ব্বকথিত ব্যবস্থানুযায়ী রেশম-বয়ন হইতে আরম্ভ করিয়া পলুর চাষ পর্য্যন্ত যদি তাঁহারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কর্ত্তৃপক্ষ যে যথেষ্ট লাভবান্ হইবেন সে বিষয় সন্দেহ নাই এবং অপর পক্ষে এই সৎপ্রচেষ্টার দ্বারা বহু দুঃস্থ তন্তুবায় পরিবার এবং বেকার যুবক অন্ন-কষ্টের কবল হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, দেশে প্রচুর পরিমাণে রেশমগুটি উৎপন্ন না হইলে রেশম-শিল্পের কোন উন্নতিই সাধিত হইতে পারে না।

ক্ষণ স্বপ্ন

—শ্রীরমণী চক্রবর্ত্তী

সমুদ্র-সৈকতে আজি হেরিলাম তুমির সন্ধ্যায়,
সুদূর দিগন্তে যেথা মিশিয়াছে পৃথিবীর সীমা;
পরিম্লান মূর্ত্তি তব; বারিবিন্দু ঝরে সর্ব্ব গায়,
নয়নে সঞ্চিত যেন আকাশের সমস্ত নীলিমা।

কবোষ্ণ নিশ্বাস সম বহি যায় দাক্ষিণ সমীর,
আকাশের এক প্রান্তে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ জ্বলে;
দুইটি চরণ ঘেরি নৃত্যলীলা সফেণ উর্ম্মির,
সমুদ্র-পাখীর দল মহাশূন্যে গান গেয়ে চলে।

মৃত্যুর পিঞ্জর হ'তে অকস্মাৎ এলে কি বাহিরে,
আমার কল্পনা পথে দেখা দিলে অপরূপ রূপে;
বেদনার যে উচ্ছ্বাস জাগে মোর আঁখিপ্রান্ত ঘিরে,
বার্ত্তা তার পশিল কি মরণের অন্ধকার কূপে?

থাকো তবে ক্ষণকাল ছায়ারূপা মানসী আমার,
তামসী রাত্রির বুকে ক্ষীণজ্যোতি দীপশিখা সম,
দেখি আমি দাঁড়াইয়া একপ্রান্তে বালুকা-বেলার,
ক্ষণিকের এই স্বপ্ন স্থির হয়ে থাক্ বক্ষে মম।

আধুনিক বাংলা কবিতা

—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে 'আধুনিক যুগ' বলিতে আমরা অনেক সময়ে ইংরেজ-আমলের গোড়া হইতেই ধরি। কিন্তু এখানে কথাটিকে তত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হইতেছে না। বাংলা-কাব্যে ইংরেজ-আমলে যে নবযুগের আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রথম পর্ব্বের গুরু মধুসূদন, আর দ্বিতীয় পর্ব্বের নেতা রবীন্দ্রনাথ। আমি এখানে 'আধুনিক' অর্থে দ্বিতীয় পর্ব্বের কাব্য-সাহিত্যকেই গ্রহণ করিতেছি।

মধু-হেম-নবীন পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাব্য-রচনার অবকাশে কদাচিৎ আপন হৃদয়ের সুখ-দুঃখের গান গাহিয়াছেন। বিহারীলালের হৃদয়-গীতি সেদিন সাহিত্য-কুঞ্জের এক প্রান্তে কোথায় বাতাসে মিলাইয়াছে, সে যুগে কেহ ভাল করিয়া লক্ষ্যই করে নাই।

নগরীর পাষাণ-বেষ্টনে থাকিয়া যে দিন বালক রবীন্দ্র-নাথের মন মুক্ত প্রকৃতির স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই তিনি বিহারীলালের সংসার-পলাতক কবি-কল্পনাকে ভালবাসিয়াছিলেন। তার পর এই প্রকৃতি-মুগ্ধ মন কখনও দেশ দেশান্তরের বিচিত্র পথে ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়াছে, কখনও বা শান্তস্নিগ্ধ পল্লীপ্রান্তে বিশ্রাম মাগিয়াছে, আবার কখনও বা আলোকে অন্ধকারে, সুখে ও দুঃখে জীবন-দেবতার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

সংসারের হাসি-অশ্রু রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছে বটে, কিন্তু কখনই তিনি সংসার-বন্ধনে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেন নাই; বারে বারে তিনি তাঁহার একতারাখানি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

আপন হৃদয়ের পরিচয় দিয়া কবি বলিয়াছেন, "আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী।" সত্যই তিনি সুদূরের পিয়াসী; কখনও তাঁহার মন স্বপ্নপথে রজনীর অন্ধকারে শিপ্রানদীতীরে চলিয়াছে, কখনও তিনি "পরিণতফলশ্যাম জম্বুবনচ্ছায়ে দশার্ণ গ্রামের" কল্পনায় বিভোর; কখনও "পথশূন্য তরুশূন্য প্রান্তর অশেষ, সুদুর্গম দুরদেশের" ছবি আঁকিতেছেন; কখনও মনশ্চক্ষে দেখিতেছেন,—

"সমুদ্রের তটে
ছোট ছোট নীলবর্ণ পর্ব্বত সঙ্কটে
একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল,
জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল,
জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরি-মধ্যপথে
সঙ্কীর্ণ নদীটি চলি' আসে কোনমতে
আঁকিয়া বাঁকিয়া।"

মানুষের কথা বলিতে গিয়াও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কথা বেশী করিয়া ভাবিয়াছেন। প্রকৃতির কোলে যুগযুগান্ত এই জীবনের মেলা। মানুষের হাসিকান্নায় প্রকৃতি আপন সুর মিশাইতেছে। আমাদের রক্তে রক্তে তাহার আলো-বাতাস কি যেন গান গাহিয়া যায়। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রকৃতির সহিত মানব-মনের এই যোগাযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় গল্পে, উপন্যাসে, গানে। 'গিরিবালার কথা বলিতে গিয়া কবির মেঘ ও রৌদ্রের লীলা মনে পড়িয়াছে, 'ক্ষুধিত পাষাণে' রাত্রির মোহাবেশ কবি-মনকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, শিশুকন্যার "যেতে নাহি দিব" কথাটিতে তিনি সারাবিশ্বের মর্ম্মবাণী শুনিতে পাইয়াছেন। আবার 'মঞ্জুলিকা'র যৌবন-চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার চোখে পড়িয়াছে:

"জানলা ধরে' চুপ করে' সে বাইরে চেয়ে থাকে,
যেখানে ঐ সজনে গাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে—
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশটারে পাগল করে দিবস-রাতি।"

গৃহের সীমানা ছাড়িয়া প্রকৃতির উদার উন্মুক্ত রাজ্যে তাঁহার অবাধ বিচরণ। তাঁহার মনে হয়,—

"আমি বাহির হইব বলে'
সারাদিন যেন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।"

ঘরের মোহ বাঁধিতে চায়, অমনি বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হইয়া ওঠে;—কবিমন বলে:—"এ মোহ ক'দিন থাকে? এ মায়া মিলায়।"

যে সংসার-বন্ধন হইতে রবীন্দ্রনাথ বারে বারে মুক্তি চাহিয়াছেন, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেই বন্ধনেরই মুগ্ধ গায়ক। সংসারের প্রতিদিনকার ছোটখাট সুখ-দুঃখ, দাম্পত্য জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান, সঙ্কোচ-ভয়—এই সকলই তাঁহার অধিকাংশ কবিতার উপাদান। দূর দিগন্তের হাতছানি তাহাতে নাই, গৃহের স্নিগ্ধ ছায়া তাহাতে বিস্তৃত হইয়া আছে।

"চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি
রূপের পূজারী।
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপবৃন্দাবনে বসি'
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।"

ভোগে অনাসক্তির সুর তাঁহাতে নাই, প্রিয়ার বাহু-বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থনা তিনি করেন নাই; সংসারের রূপে-রসেই তাঁহার আনন্দ; ভোগাসক্তির একটি মধুর সুর তাঁহার কবিতাগুলিতে জড়িত হইয়া আছে।

"দাও দাও একটি চুম্বন
মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে
দুর্জ্জয় বানের মুখে ভাসাইয়া দিব সুখে
দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবন।"

"নারী-মঙ্গল", "গান শোনা", "দীপহস্তে যুবতী", "লাজ ভাঙ্গানো"—সর্ব্বত্রই সংসার-জীবনের বিচিত্র মাধুরী। রবীন্দ্রনাথের বেলায় মনে হয়, মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতি তাঁহার প্রিয়তর, দেবেন্দ্রনাথের বেলায় তাহা নহে; তিনি মানুষেরই রূপে, মানুষেরই গুণে তন্ময়। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে স্বর্গীয় কবি মনোমোহন ঘোষের নিম্নোদ্ধৃত ছত্র কয়টি মনে পড়ে:

"বনের মর্ম্মর চেয়ে মানুষের কলধ্বনি কত না মধুর॥
জীবন-কানন-কোণে অজানা পাতাটি যেই গাহে মৃদু সুর,
সেও কত আছে সুখে! থামাও প্রকৃতি তব বিফল গুঞ্জন,
বাতাসের সাথে প্রেম, হয় কি? পাতার সাথে চলে আলাপন?*
[লেখকের অনুবাদ]

তাঁহার এই সংসার-প্রেমই পরে ভগবৎ-প্রেমের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। "অশোকগুচ্ছ", "গোলাপগুচ্ছ", "শেফালিগুচ্ছে" যে ডালি তিনি সাজাইয়াছিলেন তাহাই একদিন "অপূর্ব্ব নৈবেদ্য" হইয়া উঠিয়াছে।

*

স্বভাব-কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায়ও এই ভোগাসক্তির সুর সুমধুর হইয়া বাজিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সকল মাধুরী ইহাঁদের কবিতায় আছে, কিন্তু মনের রসায়নে ইন্দ্রিয়-মোহ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে; ইহা স্থূল দেহবাদ মাত্র নহে, দেহের প্রতিমায় আত্মারই উপাসনা। গোবিন্দচন্দ্র তাই মুক্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন:

"আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।
আমি নাহি বুঝি পাপ,
নাহি বুঝি অভিশাপ,
কনকের গৃহে কিসে নরক সংগ্রহ:
জড় কিসে নীচ তুচ্ছ
আত্মা কিসে মহা উচ্চ,
আমি ত বুঝিনা ভেদ, তোমরাই কহ।
সে কি গো সোহহং নয়?
'আমি' পূর্ণ বিশ্বময়,
অনন্ত পুরুষ আমি আদি পিতামহ।
প্রকৃতি দেহার্দ্ধ মম,
প্রাণাধিক প্রিয়তম,
মহাকাল দেখে নাই তাহার বিরহ!
* * *
থাক্ তা'র শত পাপ
থাক্ শত অভিশাপ
সে আমার বিধাতার মহা অনুগ্রহ!
আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংস সহ।"

যে যত্নকৃত অতি-লালিত্য আজ বাংলা কবিতার প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোথাও কোথাও হয়ত কবি অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন, ভাষা ঈষৎ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাঁহার কবিতা প্রাণহীন ছলনামাত্র নহে, অন্তরের অদম্য আবেগে পরিপূর্ণ, সাবলীল পৌরুষ-দীপ্তিতে সমুজ্জল, সর্ব্বত্র সজীব, সতেজ ও বেগবান্। কোনও মতবাদ বা স্বপ্ন হইতে নয়, বাস্তব-জীবন হইতেই তাঁহার

* "O murmur of men more sweet than
all the wood's caresses,
How sweet only to be an unknown leaf that sings
In the forest of life! Cease, Nature, thy whisperings,
Can I talk with leaves or fall in love
with breezes?"
[London: Songs of Love and Death]

কবিতার জন্ম, তাই তাঁহার কবিতা হইতে কবিকে চিনিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। "মোক্ষদা", "কিশোরী", "কাঁথাসেলাই", "পাঠ", "পুষ্পসজ্জা", "ফুলদানী"—সকলই দৈনন্দিন জীবনের ছবি। ছবিগুলি তাঁহার হাতে স্পষ্ট ও সুন্দর হইয়া ফুটিয়াছে। রুক্ষ, তীব্র ভাষায় যে অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করা যাইতে পারে, আপাত-লালিত্য অপেক্ষা যে শাণিত শব্দ-তীর সহজে হৃদয় বিদ্ধ করিতে পারে, গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। জননীর কোল হইতে সন্তান বিদায় লইয়া চলিয়াছে—কে জানিত ইহাই শেষ বিদায় হইবে? নৌকা চলিয়াছে, মাতা এক দৃষ্টে চাহিয়া আছেন,—

> "স্নেহময় সে চাহনি, সে বন্ধন হায়
> দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।"

"দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়।" কথাগুলি ঝঙ্কার-মধুর নহে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী কথা কিছুই হইতে পারিত না।

*

দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্ত, ইঁহারাও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক। দেশপ্রেমের গানে দ্বিজেন্দ্রলাল সারা দেশকে মাতাইয়াছেন; ঐ সকল গানের শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত। হাসির গানে তাঁহার তুলনা নাই। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সরল ভাষা ও ঋজু প্রকাশ-ভঙ্গীর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রেম ও বাৎসল্য-রসের কয়েকটি কবিতা অতি মধুর ও হৃদয়স্পর্শী; কিন্তু অন্য কোনও কোনও কবিতা গদ্যময়, নীরস হইয়া পড়িয়াছে। রজনীকান্তের অধিকাংশ রচনাই গান। গানগুলিতে সরল আন্তরিক অনুভূতির পরিচয় আছে।

*

প্রগাঢ় অনুভূতি ও শিল্পসঙ্গতির অপূর্ব্ব মিলন হইয়াছে, অক্ষয়কুমার বড়ালের কবিতায়। প্রত্যেক মূর্ত্তি তাঁহার নিপুণ হস্তে পাথর কুঁদিয়া গড়া; প্রত্যেকটি চিত্র বলিষ্ঠ রেখায় ও সংযত বর্ণ-বিন্যাসে অপরূপ। শিল্পের ও সাহিত্যের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা:

> "কাব্য নয়, চিত্র নয়, প্রতিমূর্ত্তি নয়
> ধরণী খুঁজিছে শুধু হৃদয়, হৃদয়।"

তাঁহার হৃদয় অনুভূতিশীল; কিন্তু সে অনুভূতি ফেনিল ভাবোচ্ছ্বাসে আপনাকে নিঃস্ব করিয়া ফেলে না; তাহা সংযত এবং গভীর। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি যেন গম্ভীর-স্বরে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে বাহিরে আসিতেছে; যতটুকু শুনিতেছি, তাহার অন্তরালে এক মহাসমুদ্রকে অনুভব করিতেছি। ক্ষুদ্র 'শঙ্খে' সমুদ্র-কল্লোল স্তম্ভিত হইয়া আছে। লঘু চাপল্যে তিনি আপন অনুভূতিকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দেন নাই, অল্প কথায় তাহাকে জমাট করিয়া ঘনাইয়া তুলিয়াছেন।

"বঙ্গভূমি" কবিতার প্রত্যেক কলিতে বঙ্গের গৌরবময়ী মূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। সুনিশ্চিত সাহসের সহিত শক্তের পাথর কাটিয়া তিনি এই মূর্ত্তি রচনা করিয়াছেন। আবার চিত্রণ-নৈপুণ্যের ও ধ্বনি-ঝঙ্কারেরও অভাব নাই।

> "বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
> বসে' আছ মেঘমগ্ন হে অসিতবরণা
> নক্রকুল নতমুণ্ড পড়ি' পদমূলে
> তুলি' শুণ্ড করিযূথ করিছে বন্দনা।"

অথবা—

> "নিস্তব্ধ জয়ন্তীচূড়ে সান্দ্র অন্ধকার
> কণ্টকী লতায় ছেয়ে গিরি-ভূমি ভরি'
> গহ্বরে গহ্বরে বন্য বরাহ হুংকার
> বহিছে উত্তর বায়ু শিহরি' শিহরি'।"

এই সকল অংশে বিষয়ানুযায়ী শব্দ নির্ব্বাচনে দক্ষতা এবং বর্ণনার সতেজ বলিষ্ঠ ভঙ্গী কাব্য-রসিকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে।

'এষা' তাঁহার পত্নী বিয়োগের বেদনার কাব্য। এরূপ মর্ম্মস্পর্শী শোক কাব্য বাংলা ভাষায় আর নাই। প্রত্যেকটি বর্ণনাই সত্য, কবি-গৃহের ও কবি-মনের যথাযথ চিত্র, প্রত্যেকটি কবিতাই গভীর আন্তরিক অনুভূতিতে পূর্ণ। প্রাণের স্বতঃ-উৎসারিত বাণী বলিয়াই তাহা প্রাণকে এমন গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

*

রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যে নানা দেশের নানা ভাষার হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় তাহার চিহ্ন

সুপ্রচুর। "তীর্থসলিল" ও "তীর্থরেণু"তে তিনি সারা পৃথিবীর সাহিত্য-তীর্থের সলিল ও রেণু সংগ্রহ করিয়াছেন। বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিচিত্র ভাব, ভাষা, তথ্য ও শব্দের উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। ঐতিহাসিক বৃত্তাবলীতে তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় আছে। কিন্তু এই বহুমুখী জ্ঞান তাঁহার হৃদয়কে নীরস, কঠোর করিয়া ফেলে নাই। শিশুর মত কৌতূহলী দৃষ্টি তাঁহার ছিল। তিনি সহজ সরল সৌন্দর্য্যের পূজারী। ব্রত, পুরাণ, রূপকথা, বাংলার বিচিত্র উৎসব ও শিল্পকলা, দেশী ও বিদেশী সাহিত্য তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছে। নানা দেশের নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁহার কবিতায় খাঁটি বাংলার ছবিই বেশী ফুটিয়াছে, খাঁটি বাংলার প্রাণের সুরই প্রায়শঃ ধ্বনিত হইয়াছে। যুগ সমস্যার প্রভাব তাঁহার অনেক কবিতার উপর পড়িয়াছে, কিন্তু যেখানে তিনি স্বপ্নরাজ্যে পলাতক অথবা প্রকৃতির রূপমাধুর্য্যে মুগ্ধ, সেইখানেই তাঁহার কবিতা সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে।

*

করুণানিধানের অনেক কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের সুমধুর ছন্দোঝঙ্কার ও স্বপ্নদৃষ্টি আছে। 'টলমল মেঘের মাঝারে' তিনি যেন ঘর বাঁধিয়াছেন, সেখানে মেঘেরই ছায়া, মেঘেরই বর্ণবিন্যাস।

"পিছন পানে চাইছু ফিরে অন্ধকারে,
চন্দ্রকলা ডুবছে মেঘের সিন্ধু পারে;
ঝিক্‌মিকিছে জলের স্রোতে তারার ভাতি—
চলেছি আজ এক ঠিকানায় হারিয়ে সাথী।
মাটীর প্রদীপ জ্বল্‌ছে নীরব নায়ের 'পরে
কইছে কথা ঢেউয়ের ফেনা কলস্বরে।"

জীবনের দুঃখ-বেদনাও তাঁহাকে কোমল ভাবে স্পর্শ করিয়াছে; বিষাদের মৃদুকরুণ সুর একটি দীর্ঘশ্বাসের মত মেঘে-মেঘে সঞ্চারিত।

"চাঁদের হাসি ডুবল কবে পাহাড়গুলোর পিঠে,
সুধার নেশা লাগছে না আর মিঠে,
বুড়ো হয়েই গেছে সে চাঁদ আমার সাথে সাথে।
নেই-সে চুমু শারদ-জোছনাতে,
চুম্বকেরই টানে যখন যুগল এসে মিলত হাতে হাতে
টান পড়িত ফুলের সে 'ছিলা'তে।"

শুধুই অস্ফুট মেঘমায়া ও সমীরের মৃদু সঞ্চার নহে, বলিষ্ঠ কল্পনার এবং গম্ভীর মেঘমন্দ্রধ্বনির পরিচয়ও তাঁহার কাব্যে রহিয়াছে।

"জলবেণী রম্যা রেবা　　হিল্লোলিয়া বরকান্তি
উন্মাদিনী প্রায়
অরণ্য নেপথ্য পথে　　তরঙ্গিছে শিলাঙ্গনে
ভুজঙ্গ ধারায়;
কুন্দবর্ণ বারিধূমে　　আবরি' সীমন্ত বাস
ধায় আত্মহারা,
কবে তুমি, হে নর্ম্মদা　　বিদারিলে মন্ত্রবলে
মর্ম্মরের কারা?
*　　*　　*
পৌর্ণমাসী অর্দ্ধরাতে　　জ্যোৎস্নালোকে কন্দালসে
অলিন্দের 'পরে
দ্রাক্ষারসে টলমল　　স্বর্ণপাত্রে শশিবিম্ব
চুম্বিত অধরে,
আবর্ত্তশোভন নাভি,　　অলঙ্কৃত কটিতট
হংস মেখলায়,
কোথায় রূপসী রেবা　　ভুলাইলে কালিদাসে
যৌবন-বিভায়?"

কালিদাসের প্রভাবকে এমন করিয়া আপন করিতে, তাঁহার ধ্বনি-ঝঙ্কার ও শব্দমাধুর্য্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন বিমোহন চিত্র আঁকিতে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এ-যুগের আর কোন কবিই এতদূর সফলকাম হন নাই।

পৌরাণিক কল্পনার সুগম্ভীর মহিমা তাঁহার কাব্যের দুই এক স্থলে নূতন করিয়া রূপায়িত হইয়াছে। ভগবানের বিরাট সৃষ্টিলীলার রূপ কি মোহন গাম্ভীর্য্যে কবি আঁকিয়াছেন!

"পদ্মাবতী হেরিল স্বপন
মরুৎ ডমরু মন্দ্রে উতরোল অম্বুধি গর্জ্জন,
বিসর্পিত জলে স্থলে নিশীথের নয়নকজ্জল,
ক্ষিপ্ত নভে জলস্তম্ভ, সংজ্ঞাহারা জ্যোতিষ্কমণ্ডল,
সেই সান্দ্র সমুদ্রের অন্ধকার বৃন্ত সরোবরে
ফুটে কা'র লীলাপদ্ম? ডাকে তারে যুগ-যুগান্তরে।"

যে কবিকে নির্ঝরের নৃত্যচ্ছন্দ বাজাইতে শুনিয়াছিলাম, তাঁহারই কবিতায় এ কি সাগর তরঙ্গের উচ্ছল কলরোল!

ইঁহাদের সমসাময়িক কবিগণের মধ্যে প্রমথনাথ রায় চৌধুরীর এবং ৺সতীশচন্দ্র রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ সতীশচন্দ্রের রচনায় প্রকৃত কবিত্বের দীপ্তি আছে।

সত্যেন্দ্রনাথ কোমল ছন্দোঝঙ্কারে, ললিত তরল শব্দ-বিন্যাসে বাঙালীর কানকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন, মোহিতলাল বাংলা কাব্যে আনিয়াছেন পৌরুষ-দৃপ্ত একটি নূতন ভঙ্গিমা। মধুসূদনের মেঘমন্দ্রধ্বনি, অক্ষয়কুমারের সংযত বলিষ্ঠ কল্পনা, সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাশীলতা এবং দেবেন্দ্রনাথের সংসার-প্রীতি তাঁহার কবি-মনকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে: জীবন-রহস্য-মগ্ন কবি 'গভীর সুরে গভীর কথা' বলিতে চাহিয়াছেন; বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রোত্তর যুগে ভাষার যে শৈথিল্য আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে উপেক্ষা করিয়া তিনি যেন পূর্ব্বতন যুগের আদর্শের প্রতি বেশী ঝুঁকিয়াছেন, কিন্তু সতর্কভাবে সে যুগের দোষত্রুটি পরিহার করিয়া গিয়াছেন। 'স্বপন-পসারী'তে তিনি একদিন স্বপন ফিরি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর 'বিস্মরণী' ও 'স্মর-গরলে' তাঁহার জীবন-নিষ্ঠাই ব্যক্ত হইয়াছে; আর লঘু মেঘমায়া নয়, মর্ত্ত্যের মাটিতে দাঁড়াইয়া তিনি জীবন-মরণ-মগ্ন সুগম্ভীর গান গাহিয়াছেন।

তাঁহার কবিতায় দুঃখ ও অতৃপ্তির সুর বাজিয়াছে। তীব্র ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং ভোগে অতৃপ্তি—অন্তরের এই দ্বন্দ্বে কবি জর্জ্জরিত। কামনা প্রাকৃতিক শক্তি, তাহারই নিকট মানুষের নিত্য পরাজয় কবিকে বিহ্বল করিয়াছে। দেহ ছাড়া প্রাণ নাই, 'রূপতান্ত্রিক' কবি দেহকে উপেক্ষা করিতে পারেন না,—

"জানিতে চাহি না আমি কামনার শেষ কোথা আছে
ব্যথায় বিবশ, তবু হোম করি' জ্বালি কামানল।"

কিন্তু দেহের উপাসনায় প্রাণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, মনে হয়,

"প্রাণভরা সেই গানে লেগেছে হিমেল হাওয়া
আজি এ দিনান্ত বরষায়,
নেমেছে সকাল সন্ধ্যা, বৃথা মুখপানে চাওয়া,
ছন্দ নাই, ভাবা না জুয়ায়।
নিদ্রাহারা দীর্ঘরাত্রি কেমনে হইব পার
দুস্তর তিমির-তরঙ্গিণী?
বনপথে শিবাদের অশিব চীৎকার
তৃণদলে ঝিল্লীর শিঞ্জিনী!
তার মাঝে তুমি কোথা, হা অভাগা পুরোহিত!
কোথা আশা, কোথা সে পিপাসা?
প্রাণযজ্ঞে দেহ কোথা? কোথা রক্ত সুলোহিত
সঞ্জীবন শক্তিমন্ত্র ভাষা?"

নানাদিক্ হইতে ভাবপ্রবাহ তাঁহার কাব্যে বহিয়া আসিয়াছে। 'বেদুঈন,' 'নাদিরশাহের জাগরণ,' 'নাদির-শাহের শেষ,' 'হাফিজের অনুসরণে' প্রভৃতি কবিতায় নূতন সুর বাজিয়াছে। 'শেষ শয্যায় নূর জাহান' অতি মধুর ও করুণ নাটকীয় গীতি-কবিতা। এই সকল কবিতায় পারিবেশ-সৃষ্টিতে কবি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শব্দ গ্রন্থন ও বর্ণনাভঙ্গী অনন্যসাধারণ এবং বিষয়ানুযায়ী। প্রয়োজনমত আরবী পারসী শব্দ মিশাইয়া তিনি মুস্‌লিম জীবনের একটি স্বাভাবিক পরি-মণ্ডল রচনা করিয়াছেন। 'দিল্‌দরিয়া নীল দরিয়া দারাজ ঢুলঢুল্'—'বেদুঈনের' এই পংক্তির পড়িবার পরেও কাণে ও মনে ঝঙ্কার লাগিয়া থাকে। 'নটকান্-রাঙা আলোটি পড়েছে মিনার চূড়ায় শাহদারায়' বা 'টুক্‌টুকে নব নীলা কবুতর আলিসার পরে আর না নাচে' যেন ভাষায় আঁকা মোগল যুগের ছবি,—পরিষ্কার, স্বচ্ছ, সুন্দর। আবার উপনিষদ্ হইতে বিষয়বস্তু আহরণ করিয়া 'মৃত্যু ও নচিকেতা'য় তিনি জীবন-মরণ-রহস্যের যে সুগম্ভীর রূপ দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। এই সব প্রাচীন কাহিনীর অবতারণায় যে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও প্রগাঢ় উপলব্ধির প্রয়োজন, মোহিতলালে তাহা আছে; তাই বিষয়ের মর্য্যাদা তাঁহার হাতে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। গীতি-ঝঙ্কার অনেক কবিতায় থাকিলেও, তাঁহার কল্পনা প্রধানতঃ গাম্ভীর্য্য ও প্রগাঢ়তার পক্ষপাতী। তাই সনেটের গাঢ় বন্ধনে ও ক্লাসিকাল বিষয়-বর্ণনে তাঁহার কল্পনা সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্য-লাভ করিয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন স্বভাবের চিত্রকর। বাংলার রূপ-শতদল তাঁহার কাব্যে পাপ্‌ড়ি মেলিয়াছে। যখন

"নিঝুম রাতি, সুপ্ত সবাই রুদ্ধ-দুয়ার ঘরে
ভিজে শেওলা-নীড়ে ঘুমায় মরাল, চখী ঘুমায় চরে,
কেবল বুনো-ঝাউয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত ব্যাকুল বায়।"

তখন 'পদ্মা-চরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে' বসিয়া তিনি জ্যোৎস্না লক্ষ্মীর রূপ দেখিয়াছেন। আবার

শরৎ পূর্ণিমায় ঘরে ঘরে যখন লক্ষ্মীপূজার আয়োজন, কবি তখন শ্রীসম্পদের মধ্যে দেবীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্রাবণের দিনে

"হের নদীতীরে শরবনে
জাগে মরমর ধ্বনি
দেখ নদীনীরে ঢেউয়ে ঢেউ
ফুঁসিয়া উঠিছে ফণা।"

—এমন দিনে তিনি প্রিয়ার সঙ্গ চাহিয়াছেন গম্ভীর ধ্বনি-ঝঙ্কারেও তিনি অনিপুণ নহেন।

"শরাস্তৃত সরোবর, তীরে তীরে তারি তালীবনশ্রেণী
শ্যামল সরসী শিরে পদ্মবিভূষণা শেবালের বেণী।
ধীরে নামে সন্ধ্যাসতী নবর অঞ্চল অম্বরে লুটায়ে
ঝিল্লীর মঞ্জীরমালা ঝিমিঝিমিঝিমি বাজে পায়ে পায়ে।"

অথবা

"শৈবাবৃত শেবালের শ্যামায়িত স্বচ্ছ অবকাশে
হংস-কারণ্ডব দলে বিশ্রামের সাড়া পড়ে আসে,
আতৃপ্ত গদ্গদ কণ্ঠে, বিধূনিত সিক্ত পক্ষপুটে;
পদ্মগন্ধে ঝিল্লীছন্দে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হয়ে উঠে।"

তাহার প্রমাণ।

কবি কালিদাস রায় তাঁহার 'পর্ণপুট' লইয়া কবি সমাজে সসম্মান অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। বঙ্গ-পল্লীর বিচিত্র রূপমাধুরী তাঁহার কবিতায় নিপুণ তুলিতে কেবল পল্লীর প্রাকৃতিক শোভা নহে, পল্লীবাসীর প্রতিদিনকার সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ায় সেই চিত্রমালা মনোহর।

"চালের বাতায় ঝিঁঝিঁপোকাগুলো বুক চিরে চিরে ডাকে,
উঠিতে বসিতে টিক্‌টিকি পড়ে ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে।"

বিধবা 'কৃষাণী'র আঁধার কুটীরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে, গৃহকাজ ভুলিয়া সে উন্মনা হইয়া যায়; বিপত্নীক 'কৃষক' 'ক্ষেতের কাজ করতে' গিয়া উদাস হইয়া ওঠে; দুঃখিনী কুড়ানী 'পোষের বিষম কন্‌কনে শীতে' ছোট্ট ঝুড়িটি লইয়া ধান কুড়াইতে বাহির হয়; 'পল্লীবালা' পর-ঘরে গেলে কাজ-কর্ম্ম অচল হইয়া পড়ে, পল্লীজীবনের এই সত্যকার চিত্রগুলি স্পষ্ট রেখায় কবি আঁকিয়াছেন। পল্লী-কবিতার মত তাঁহার বৈষ্ণব কবিতাগুলিও মধুর ও সরস। 'দধীচি', 'দুর্ব্বাশা,' 'প্রহ্লাদ,' 'ধ্রুব,' প্রভৃতি কবিতায় একটি সুন্দর পৌরাণিক সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

কুমুদরঞ্জন একদিন কুণ্ঠাভরে তাঁহার 'দীন পল্লীর মেঠো গান' লইয়া সাহিত্য-সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন; বাঙালী সেদিন তাঁহাকে সমাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল। তিনিও প্রাণ খুলিয়া দুঃখিনীর আমগাছ, পুত্র-হারা কটার মা, —অজয়-তীরের পল্লী-জীবনের অনেক কাহিনী আমাদের শুনাইয়াছিলেন; আমরা শুনিয়াছিলাম। আজ তিনি তাঁহার মেঠোগানের সেই মিঠা সুর হারাইয়া ফেলিয়াছেন।

পল্লী-কবিতায় প্রাচীন পল্লী-গাথার সুর সংযোগ করতে চাহিয়াছেন তরুণ পল্লীকবি জসিমউদ্‌দীন। তাঁহার 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এবং অনেক খণ্ডকবিতা প্রকাশ-রীতির নূতনত্বের দিক্ দিয়া উল্লেখযোগ্য।

স্নিগ্ধ মধুর কবিতার রাজ্যে নজরুল আনিয়াছেন তাঁহার উন্মাদ রণগীতি। অশান্ত, চঞ্চল, দুর্ম্মদ জীবনের আহ্বান রবীন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র ও মোহিতলালে মধ্যে মধ্যে ইতিপূর্ব্বে ধ্বনিত হইলেও, নজরুলের 'বিদ্রোহী' ও 'প্রলয়োল্লাসে'র আত্মহারা ভাবাবেগ সম্পূর্ণ নূতন। হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতি তাঁহার হৃদয়ে সমন্বয়ের পথ খুঁজিয়াছে, বাঙালীর হৃদয় লইয়াই তিনি এ দেশীয় ভাব-কল্পনার বিচিত্র সম্পদকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে প্রধানতঃ দুইটি সুর—রুদ্রের ও মধুরের। 'অগ্নিবীণা'য় যে শিখা আকাশ-স্পর্শী হইয়া উঠিয়াছে, 'ছায়ানটে' তাহা সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত; সেখানে লতায়-লতায় স্নিগ্ধ বনতল জুড়িয়া নামিয়াছে সন্ধ্যার করুণ ছায়া। তাঁহার কোমল গীতিমালায় আছে কাননের ছায়া-নৃত্য আর পুষ্প-লতার কোমলতা।

দুঃখ-দৈন্য-জর্জ্জরিত কর্ম্মভারক্লান্ত আধুনিক জীবনের বাস্তব রূপও বাংলা কবিতায় দেখা দিয়াছে। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় বোধ হয় ইহার প্রথম সূচনা। 'ডাক হরকরা'র ত্রস্ত ব্যস্ততায়, বিষম বোশেখী রোদে ষ্টেশনের যাত্রীদের হুড়াহুড়িতে এবং আধুনিক যুগের জটিল জীবন-সমস্যায় তাঁহার কল্পনা এক নব-রসের সন্ধান পাইয়াছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আধুনিক জীবনের রূপ আরও সজীব হইয়া ফুটিয়াছে। ইহার দুঃখ, দৈন্য,

দুর্ব্বলতা, নাগরিক জীবনের নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক গতি, বর্ত্তমান সভ্যতার শোচনীয় পরিণাম বেদনা-কম্পিত ভাষায় তাঁহার কবিতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ধরিত্রীর কোলে দেবতা আসেন,

কিন্তু দুইদিন পরে দেখি,

"কোথা মোর ভগবান্?
জীর্ণ গৃহ, আবর্জ্জনা চারিদিকে,
তার মাঝে আলোহীন বায়ুহীন কক্ষে
ছিন্ন শয্যা'পরে শুয়ে
দেবতা আমার
ফেলে দীর্ঘশ্বাস!
আলোকের দেবতার আলো নাহি মিলে,
মিলে না'ক' বায়ু।
রজনীর লক্ষ তারা চেয়ে-চেয়ে খোঁজে আর কাঁদে,
দেবতারে খুঁজে নাহি পায়।"

শহরের ভাড়াটে কুঠিতে আমরা যাই, 'নদীর স্রোতের জঞ্জাল সম আসিয়া জুটি'; কেহ কাহাকেও চিনি না, পাশা-পাশি থাকিয়াও অপরিচিত রহিয়া যাই।

"ওধারের ঘরে তাহাদের ছেলে
বুঝি বা ধুঁকিছে জ্বরে
এধারে প্রবাসী স্বামিটির লাগি
বধূটি শুকায়ে মরে।
নীচে মজ্‌লিসে সারাদিন গোল,
চলিছে দাবার ঘুঁটি,
ভাড়াটে কুঠি।"

দিনের পরে দিন চলিয়া যায়, বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার দিন আসে, অপরিচয়ের ব্যবধান তেমনই রহিয়া যায়।

"শুধু কোনদিন সঙ্গবিহীন
বিদ্রোহ করে প্রাণ,
কঠিন দেয়ালে করাঘাত করে
ঘুচাইতে ব্যবধান।
জোটে না আড়াল, ব্যাকুল হৃদয়
নিজে মরে মাথা কুটি'
ভাড়াটে কুঠি।"

নবীন কবিদের মধ্যে কেহ কেহ পুরাতন রীতিতেই নিজেদের ভাব ও অনুভব ব্যক্ত করিতেছেন, কেহ কেহ নূতন প্রকাশ-রীতির সন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের রচনা স্থানে স্থানে সুন্দর হইলেও এখন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কেহ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের বা পরিণত কবিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই, এ জন্যই তাঁহাদের রচনা স্থায়ী গৌরব অর্জ্জনের যোগ্যতা লাভ করে নাই।*

* তালতলা সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত।

ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ

...আজকালকার ভারতীয় নেতৃবর্গ যেরূপ বলিয়া থাকেন যে, স্বাধীনতা না হইলে ভারতবাসীর অর্থাভাব প্রভৃতি কিছুই দূর করা সম্ভব নহে, সেইরূপ বলা আমাদিগের মতে, কোনরূপ প্রকৃত কাজের কথা না বলার অনুরূপ। যখন নয় মণ তেল পুড়ান সহজসাধ্য নহে, তখন নয় মণ তেল না পুড়িলে রাধা নাচিবে না, এতাদৃশ উক্তির সমর্থন করা বর্ত্তমান নেতৃত্বের পক্ষে শোভনীয় হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে কাহারও অবস্থার কোনরূপ উন্নতি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সাধিত হইবে না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান পরাধীন অবস্থায় যাহা যাহা করা ভারতবাসিগণের আয়ত্তাধীন এবং সহজসাধ্য, তাহার মধ্যে কি কি করিলে ভারতবাসিগণের প্রত্যেকের অর্থাভাব প্রভৃতি সম্যক্ পরিমাণে বিদূরিত হইবে, তাহার আলোচনায় দেখা যায়, ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি দূর করিবার জন্য যে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, সেই সেই পন্থায় অন্যান্য দেশের মানুষের অর্থাভাব প্রভৃতিও সম্যক্‌ভাবে বিদূরিত হইতে পারে। ভারতবাসিগণের অর্থাভাব প্রভৃতি বিদূরিত না হইলে অন্য কোন দেশের আর্থিক সমস্যা প্রভৃতি কোন সমস্যাই সম্পূর্ণভাবে সমাধান করা সম্ভব হইবে না, কারণ, ভারতবাসিগণ আধুনিক পণ্ডিতগণের মতানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দশাপন্ন হইলেও, প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দেশবাসীর মত ভারতবাসিগণের চরিত্রহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা তত অধিক পরিমাণে মজ্জাগত হয় নাই। ইহা ছাড়া, অন্যান্য দেশের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা যেরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার উন্নতি সাধন করা যেরূপ কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, ভারতবর্ষের জমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতা এখনও তত অধিক পরিমাণে বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহার উন্নতি সাধন করাও তত কষ্টসাধ্য নহে।...

মৈমনসিংহ-পরিচিতি

—শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী

প্রাকৃতিক বিবরণ ও ব্যবসা-বাণিজ্য*

মৈমনসিংহের প্রধান নদ ব্রহ্মপুত্র। মেঘনা ও যমুনা নদীও প্রাকৃতিক সীমা রক্ষা করিয়াছে বলিয়া উহাদিগকে মৈমনসিংহের মধ্যে ধরিতে পারি।

কালিকা-পুরাণে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনী রহিয়াছে। পরশুরাম মাতৃহত্যা-পাপে যেন কণ্ঠস্থিত পরশু হইতে কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিতেছিলেন না, তখন ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিয়া শাপমুক্ত হন। কাজেই সর্ব-মানব হিতার্থে পরশুরাম সেই ব্রহ্মকুণ্ডের বারিরাশিকে গিরিকুণ্ড হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন। সেই হইতেই লৌহিত্যবারি তীর্থরাজ লৌহিত্যনদ বা ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত।

এই ত গেল ইহার পৌরাণিক কাহিনী, আবার এই ব্রহ্মপুত্রের গতি ও উৎপত্তি লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতান্তর রহিয়াছে। এক দল বলিতেছেন, ব্রহ্মপুত্র মানস-সরোবর হইতে বাহির হইয়া হিমালয়ের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া বাঙ্গালার মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়া সাগরে পড়িয়াছে। ডাক্তার গ্রিফিথস্ বলেন ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মকুণ্ড বা লৌহিত্যসরোবর হইতে উৎপন্ন হইয়া মানসসরোবর-উদ্ভূত সেংপো-র সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গের অভিমুখে নিম্নে নামিয়া আসিয়াছে।†

ব্রহ্মপুত্র আসাম হইয়া চিলমারির নিকট দিয়া পূর্ব্ব-দক্ষিণাভিমুখে টোক পর্য্যন্ত মৈমনসিংহ জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। টোকের কাছে ব্রহ্মপুত্র ঢাকা ও মৈমনসিংহের সীমারেখারূপে দুই জেলাকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ বর্ত্তমান সময়ে আড়ালিয়া নামে পরিচিত। এই প্রবাহ মঠখোলার নিকট হইতে ধলেশ্বরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা টোকের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া শীতলক্ষ্যা নামে নারায়ণগঞ্জের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। এই দুই নদীর সঙ্গমস্থলকে লাঙ্গলবন্ধ বলে।‡

মুসলেম ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেন যে, সেই সময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মপুত্র নদ অতি বিশাল ছিল—গঙ্গার তিনগুণ ছিল বলিয়া প্রকাশ। আইন-ই-আকবরী-তে বলে যে, তৎকালে ব্রহ্মপুত্র দশ মাইল প্রশস্ত ছিল—সেরপুর হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত ইহার পরিধি ছিল। আইন-ই-আকবরী-র মতে এই সেরপুর ও জামালপুর পারাপার করিতে 'দশ কাহন কড়ি' দিতে হইত। অনেকে বলেন, এই জন্যই সেরপুরকে 'দশ কাহনিয়া সেরপুর' বলে। কোন কোন স্থানে ব্রহ্মপুত্র ১২ মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত ছিল। ব্রহ্মপুত্রের প্রবল স্রোতাবর্ত্ত তৎকালে এত ভীষণ ছিল যে, তৎকালীন কালেক্টর Byard সাহেব মৈমনসিংহে প্রাচীন নগর স্থাপন করিয়া জেলা স্থাপনের বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"এত ভীষণ নদীর তীরে সদর মহকুমা স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত নয়—অন্ততঃ আমার তাহাই মনে হয়। এই নদী যে কোন মুহূর্ত্তে সহর গ্রাস করিতে পারে। বেগুনবাড়ীর কুঠি এই ভীষণ নদী গ্রাস করিয়াছে।"

সেই ব্রহ্মপুত্র আজ আর নাই। স্থানে স্থানে আজকাল ইহার এমন অবস্থা হইয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেই তাহা হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কোন কোন স্থানে মাত্র এক হাঁটু জল থাকে। অনেকে বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনার উৎপত্তি হওয়াতে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র সেই কারণে প্রশস্ততা হারাইয়াছে।*

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যমাংশে যে জরিপ-কার্য্য হয়, তাহার নক্সায় দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র এই জেলার ১৩২০ একর ৩ রোড ২৬ পোল জমি বিস্তার করিয়া আছে এবং এই ভূমির পরিমাপ করিলে ২০৮১ বর্গ-মাইল হয়।

১৭৭৮ সালে রেনেল সাহেব এক মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাঁহার মানচিত্রে তিনি যমুনা নদীর উল্লেখ করেন নাই। অথচ তাঁহার ঠিক ত্রিশ বৎসরের পরে, অর্থাৎ ১৮০৮ সালে বুকানন হ্যামিলটন এই জেলার জরিপ করিয়া যে মানচিত্র প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে হঠাৎ এই নদী কি করিয়া উদ্ভূত হইল? হ্যামিলটন সাহেবের মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই জনায়ী নামে ব্রহ্মপুত্রের সংলগ্ন যে খালটি ছিল, তাহাই কালক্রমে যমুনা নামে পরবর্ত্তী কালে আরও বেগবান্ হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

১৭৭৮ সাল পর্য্যন্ত যমুনা নদীর কোন উল্লেখ বঙ্গদেশের মানচিত্রে আমরা পাই নাই। ব্রহ্মপুত্রই তখন সমস্ত নদনদীকে আপনার বুকে আশ্রয় দিয়াছে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের মধ্যেই প্রাকৃতিক কারণে দাওকোবার সন্নিকটে ব্রহ্মপুত্রের মুখে পলি পড়িতে আরম্ভ করে। কিছুদিনের মধ্যেই এই পলি পড়িয়া নদীর মুখ বন্ধ হইয়া যায়। তখন সেই জলপ্রবাহই জনায়ী খালের মধ্য দিয়া আরও প্রবলতর স্রোত লইয়া যমুনা নদীর আকার ধারণ করে।

* প্রবন্ধের প্রথমাংশ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

† Journal of the Asiatic Society of Bengal—P. 315-18.

‡ প্রবাদ, চৈত্রমাসের অষ্টমী তিথিতে এখানে স্নান করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হয়। এই পুণ্যলোভে প্রতি বৎসর এখানে স্নানার্থীর অসম্ভব ভীড় হয়।

* In my opinion, I presume that if Javuna does not take a new course, Brahmaputra will be dried up to mere sand and there will be no trace of it in the future.—Collector's Letters—dated 29. 7. 1866—by H. J. Reynolds.

যমুনা নদী এই জেলার ৯৪ মাইল জমি অধিকার করিয়া আছে। ইহা এই জেলার উত্তর প্রান্ত হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জেলার সীমা-রেখাকে চিহ্নিত করিয়া রহিয়াছে। ম্যাপে দেখা যায়, ১৮৫০ সালে ৪১,০৫৪ একর, ৯ পোল অর্থাৎ ৬৪·১৩ বর্গ মাইল জমি এই নদী অধিকার করিয়া আছে। যমুনা হেরসাগরের সহিত যুক্ত হইয়া পদ্মায় গিয়া পড়িয়াছে। বাইশকোদালিয়া মোহনা এই সঙ্গম-স্থলকেই বলে। বর্ষাকালে এখন যমুনা বিশাল আকার ধারণ করে। স্থানে স্থানে ৬।৭ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

মৈমনসিংহের পূর্বসীমা ধরিয়া যে নদী প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম মেঘনা। মেঘনার দুইটি শাখা রহিয়াছে—একটি ধনু, অন্যটি ঘোরা-উত্রা। ঘোরাউত্রা, জয়নসাহী ও ধনু নসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুড়ীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। মৈমনসিংহের মত এইরূপ নদীবহুল দেশ বাঙ্গালায় খুব অল্পই আছে।

এই জেলায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল ও বিশাল দিগন্তবিস্তৃত হাওর* আছে। এই হাওরগুলি বর্ষাকালে অতি ভীষণ রূপ ধারণ করে। এই জেলার নিম্ন প্রদেশকে ভাটি বলে। এই ভাটি দেশে বর্ষাকালে দিগন্তবিস্তৃত মাঠের মধ্যে তৎসংলগ্ন বিলের মধ্যে জল জমিয়া কোন কোন স্থানে দশ মাইল পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। শুধু যে বিস্তৃতির দিক্ হইতেই ইহা বিশাল রূপ ধারণ করে তাহা নয়, এই জলখণ্ডের গভীরতাও নেহাত্ কম হয় না। কোন কোন স্থানে এই হাওরের জলের গভীরতা ১০ হইতে পনের হাতের মধ্যে হইয়া থাকে।

বিভিন্ন পরগণায় যে সমস্ত হাওর আছে আমরা তাহার নাম করিতেছি।

মৈমনসিংহ পরগণায়—মাকরা ও গোবিন্দচাতল। খালিয়াজুরী পরগণায়—চিলমুগা। হাজরাদি পরগণায়—বড় হাওর; আলাপসিং পরগণায়—জড়চেলা; আটিয়া পরগণায়—নড়াইল; পুখুরিয়া পরগণায়—হাওদাবিল; সেরপুর পরগণায়—টেচলি ও আড়ুয়া ভেড়ুয়া; জয়নসাহী পরগণায়—বাঙ্গলা, বাহেরচাতল, দেওয়া; নসিরুজিয়াল পরগণায়—নরুনসার, জালিয়ার হাওর, গণেশের হাওর ও তলার হাওর; সুসঙ্গ পরগণায়—জারিয়া, রাজধলা, নালিয়া ও মগরা। এই সমস্ত হাওর অনেক সময় বর্ষাকালে নদীর সঙ্গে সংযুক্ত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে নদীর মাছ আসিয়া হাওরে আশ্রয় গ্রহণ করে। বর্ষার শেষে যখন জল কমিয়া যাইতে থাকে, তখন এই সমস্ত হাওর হইতে প্রচুর মাছ ধরা হয়। এই সমস্ত হাওরের মাছই নিকটস্থ সহরে সরবরাহ করা হয়।

এই জেলার বন-ভূমিও নেহাত্ কম নয়। মধুপুরের গড় বলিয়া প্রসিদ্ধ যে গড় আছে, তাহা এই জেলারই একটি অতি বৃহৎ বন-ভূমি। এই বন-ভূমি জেলার দক্ষিণ প্রান্তসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া কাঠবাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সীমান্ত রক্ষা করিয়াছে। পূর্বে এই জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর বন্য পশু বর্তমান ছিল। হাতী, শূকর, মহিষ, হরিণই বেশী ছিল। পূর্বে হাতীর খেদাতে বহু হাতী ধরা পড়িয়া প্রচুর অর্থাগমের সুবিধা হইত। এখন হাতী একেবারেই নাই এবং গড়ের ছোট-বড় প্রায় সকল গাছই জ্বালানী কাঠের জন্য ব্যবহৃত হওয়ায় গড় প্রায় বৃক্ষ-শূন্য হইতে চলিয়াছে। পূর্বে গড়ে প্রচুর বৃক্ষাদি থাকাতে এই অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইত। বর্তমানে গড়ের বৃক্ষাদি নষ্ট হইবার পর হইতেই বৃষ্টিপাত যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে এবং নিকটস্থ গৃহস্থগণও আপনাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের কথা লইয়া অভিযোগ করে। এক কালে এই মধুপুরের গড় জনসাধারণের ভীতি সঞ্চার করিত। দস্যু-তস্করের ভয়ে সন্ধ্যার পর পথিক বহুজন-সমাগম না হইলে অথবা বিশেষ প্রয়োজন না হইলে গড় পার হইত না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের সময় এই গড় বহু সন্ন্যাসীর আশ্রয়স্থল ছিল। মধুপুর গড়ের পরিমাণ ৪২০ বর্গমাইল। গড়ের ভূমি কঙ্কর ও প্রস্তরময়, সমতল-ভূমি গড় কিছু উন্নত, অর্থাৎ সমতল-ভূমি হইতে গড় অনুমান ৬০ হইতে ১০০ ফিট উচ্চ।

মৈমনসিংহের পার্ব্বত্য প্রদেশ

মৈমনসিংহের উত্তর সীমায় কিয়ৎ পার্বত্য অঞ্চল আছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের নাম সুসঙ্গ পরগণা। সুসঙ্গের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারীদিগের নাম মৈমনসিংহের ইতিহাসে সু-প্রসিদ্ধ। এই পার্বত্য অঞ্চল প্রায় সবটুকুই এক কালে এই ভূম্যধিকারীদিগের দখলে ছিল। সুসঙ্গের ভূম্যধিকারীদিগের বাসস্থানের নাম 'দুর্গাপুর' এবং বেসরকারী নামেও পরিচিত হয়। সুসঙ্গের পার্বত্য অঞ্চল পার্বত্য আইনে ১৮৬৯ সন হইতে খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্বতের সহিত আসাম-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।*

পূর্বে এই সুসঙ্গের গারো পাহাড়ে প্রচুর হস্তী ছিল। খেদা করিয়া বৎসরে বহু-সহস্র টাকার হাতী ধরিয়া ভারতের সর্বত্র রাজা-মহারাজা-দিগের নিকট বিক্রয় হইত। সুসঙ্গের মহারাজাগণ পুরুষানুক্রমে এই পার্বত্য প্রদেশের হাতীর মালিক ছিলেন। এই খেদায় তাঁহাদের বৎসরে বহু সহস্র টাকা আয় হইত।

১৮৭৯ সালে সরকার খেদা করিয়া হাতী-ধরা বন্ধ করিয়া দেন।† এই আইন জারি হইবার বহুদিন পর পর্যন্তও অর্থাৎ ১৮৮৪ পর্যন্ত, সুসঙ্গের মহারাজা খেদা করিয়া হাতী ধরিতেন। এই সনের শেষের দিকে সরকার মহারাজার এই অধিকারেও হস্তক্ষেপ করেন। ১৯শে মে হইতে মহারাজাও গারো পাহাড়ে হাতী ধরিতে পারেন না। বর্তমানে প্রয়োজন বোধ করিলে মাত্র গবর্ণমেণ্ট খেদা করিয়া হাতী ধরিতে পারেন।

* হাওর—মৈমনসিংহে ইহার উচ্চারণ—আওর—সাগর—সাঅর—হাঅর—হাওর—আওর। মৈমনসিংহের উচ্চারণে আত্ম মহাপ্রাণ প্রায়ই অল্পপ্রাণ হইয়া যায়। যেমন, হাতী—আতি। সাগরের মত বিশাল রূপ ধারণ করে বলিয়াই এই জলখণ্ডের নাম আওর বা হাওর।

* Garo Hill Act—XII of 1869.

† Elephant Preservation Act of 1879.

ইংরেজ শাসনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই জেলায় হাতীর যে উপদ্রবের কাহিনী শোনা যায়, তাহার তুলনায় এখন এ জেলা হইতে বন্য-হস্তী একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই ঠিক হয়। ইংরেজ শাসনাধিকারে পর্য্যন্ত দলে দলে বন্য হস্তী আসিয়া মাঠের ফসল নষ্ট করিয়া যাইত। * সেই সময় প্রথম প্রথম গবর্ণমেণ্ট খেদা করিয়া বন্য-হস্তীর উপদ্রব হইতে ক্ষেতের ফসল বাঁচাইতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার রেকর্ড পাওয়া যায়। † দুই এক বৎসর এই উপায় অবলম্বন করিবার পর যখন গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে, ইহাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে তখন এই খেদা করিয়া বন্য-হস্তীর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ে আর অগ্রসর করিলেন না। কাজেই, খেদা সেই সময় হইতেই একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। ‡

ব্যবসা ও বাণিজ্যের উপযোগী হাটবাজার

জেলার প্রত্যেকটি মহকুমাকে ভাগ করিয়া লইয়া আমরা ইহার প্রধান প্রধান হাটবাজারের ও মেলার নাম করিব। অতঃপর যে যে হাট, বাজার ও মেলা হইতে কাঁচামাল রপ্তানি হয়, তাহারও বিবরণ দিব।

সদর বাজারের নাম—ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ, মুক্তাগাছা, দাপুনিয়া, বেগুণবাড়ী, গৌরীপুর, নতুনবাজার, বলা, বিশাল, বয়ড়া, মাকটিয়া, ঈশ্বরগঞ্জ, নান্দাইল, জাঙ্গালিয়া, পয়ারপাড়, বালিয়াচড়া, (রাম অনুগঞ্জ) গয়েশপুর।

টাঙ্গাইলের হাটবাজার

টাঙ্গাইল, এলেঙ্গা, পোড়াবাড়ী, নাগরপুর, জামুকী, পিংনা, জগন্নাথগঞ্জ, সুবর্ণখালী, গোপালপুর, মধুপুর, কেদারপুর, মীর্জ্জাপুর, শিরামপুর, পুটিয়াজানি, ভাদিয়া, রতনগঞ্জ, কুকড়হর, পাথরঘাটা, কাগমারী, বলাপাড়া, পালিশা, বাশাইল, নন্দনপুর, বৈকুণ্ঠগঞ্জ, করটিয়া, এলাসিন।

জামালপুরের হাটবাজার

জামালপুর, বাশালী, বালীজুড়ী, তারাগঞ্জ, বক্সীগঞ্জ, ইসলামপুর, সেরপুর, নালিতাবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, মাদারগঞ্জ।

কিশোরগঞ্জের হাটবাজার

কিশোরগঞ্জ, ভৈরববাজার, এগারসিন্দুর, হুসেনপুর, মীর্জ্জাপুর, নিকলী, কটিয়াদী, করিমগঞ্জ, কালীয়াচাপড়া, তাড়ারকান্দি, বাজিতপুর, ফতেপুর, হিলচিয়া, আটপাড়া, নীলগঞ্জ, তাড়াইল।

* W. Wroughton's Settlement Rep rt of 1787.

† Collector's Letter to Board of Revenue Dated 11. 6. 1800.

‡ Mss. Record Nos. 9225. 9226 and 9310—Letters of the Board of Revenue.

নেত্রকোণার হাটবাজার

নেত্রকোণা, কেন্দুয়া, ফতেপুর, গোবিন্দগঞ্জ, নারায়ণডহর, মোহনগঞ্জ, লক্ষ্মীগঞ্জ, আমতলা, বাউসী, চিরাম, দুর্গাপুর, রূপগঞ্জ।

মেলা

এই জেলায় বিভিন্ন পর্ব্ব উপলক্ষে অনেকগুলি মেলা হয়। সরকার এই সমস্ত মেলার নাম, সময় ও জনসংখ্যা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সেই সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী একটি তালিকা দিতেছি।

সদর মহকুমা		
রথমেলা, উচাখিলা	১মাস	লোকসংখ্যা ১২০০
রথমেলা, খালবেলা	১মাস	লোকসংখ্যা ২০,০০০
পৌষ-সংক্রান্তি, বিরুনীয়া	১৫ দিন	লোকসংখ্যা ১২০০
চৈত্র-সংক্রান্তি, শিবগঞ্জ	১মাস	লোকসংখ্যা ১২০০
চৈত্র-সংক্রান্তি, গুপ্তবৃন্দাবন	১মাস	৫০০০
কিশোরগঞ্জ মহকুমা		
কিশোরগঞ্জ, ঝুলন মেলা	২মাস	লোকসংখ্যা ১৫০০০
হুসেনপুর, দোল মেলা	১মাস	লোকসংখ্যা ৫০০০
ভোগবেতাল, রথমেলা	১মাস	লোকসংখ্যা ৫০০০
জামালপুর মহকুমা		
জামালপুর মেলা	১মাস	লোকসংখ্যা ২০,০০০
নেত্রকোণা মহকুমা		
ইলাচিয়া, পৌষ-সংক্রান্তি মেলা	১মাস	লোকসংখ্যা ২০,০০০

এই সকল মেলা পূর্ব্বে যে রূপ জাঁকজমকের সহিত হইত এখন আর সেই রূপ হয় না। জনসাধারণের মধ্যে প্রবল আর্থিক সঙ্কট হওয়াতে মেলায় আর পূর্ব্বের মত কাঁচামাল আমদানী-রপ্তানী হয় না। পূর্ব্বে এই সকল মেলা হইতে প্রচুর কোষ্টা রপ্তানী হইত। এখন আর সেই রূপ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ২৫ বৎসর পূর্ব্বে চাউল অপেক্ষা পাট কম রপ্তানী হইত। বর্ত্তমানে পাটই রপ্তানী হয়। এবং চাষারা কাঁচা টাকার লোভে প্রচুর পাট উৎপন্ন করিয়া প্রতিযোগিতায় সেই অনুপাতে মূল্য পায় না। পূর্ব্বে ঘরে টাকা না থাকিলেও আহার থাকিত। এখন সেই ব্যবস্থা আর নাই। কারণ ভাত ঘরে থাকিলে নুণ দিয়াও তাহা খাওয়া চলে। পাটের বেলা তাহা হয় না। ১৮৭০ সালে মাত্র ৭৫,০০০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের হিসাব লইলে দেখা যায়, তৎস্থানে তাহা অপেক্ষা প্রায় ১৬ গুণ অধিক জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সস্তা সৌখীন জাপানী জিনিস সমস্ত মেলা ও হাট দখল করিয়া আছে।

ভৈরববাজার, সুবর্ণখালি, করিমগঞ্জ, দত্তের বাজার এই জেলার আমদানী-রপ্তানীর প্রধান স্থল। এই সমস্ত গঞ্জে কার্পাস, সুপারি, লঙ্কা, মরিচ, প্রভৃতি ত্রিপুরা হইতে রপ্তানী হয়, দক্ষিণ দেশ হইতে নারিকেল আসে, পশ্চিম প্রদেশ হইতে গোরু-ভেড়া আসে, শ্রীহট্ট হইতে কমলা ও নেবুপাতি ইত্যাদি ফল আমদানী হয়; কলিকাতা হইতে চিনি, কাপড়, লোহা, গম

এবং বর্ম্মা মুলুক হইতে চাউল আমদানী হইয়া থাকে। ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে এখান হইতে চাউল অধিক পরিমাণে রপ্তানী হইত। আমদানীর কোন আবশ্যক হইত না।*

শুকনা মাছ বা শুটকী এই জেলার একটি প্রধান রপ্তানীর বস্তু। কোম্পানির আমলে ফরাসী ও ওলন্দাজগণ এই জেলা হইতে প্রচুর শুকনা মাছ পশ্চিম দেশে রপ্তানী করিত। চুলদিয়া ও নালিয়াতুরীতে তৎকালে এই ফরাসী ও ওলন্দাজদিগের দুইটি প্রধান ব্যবসার-স্থান ছিল।

৩০,৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই জেলায় পণ্যদ্রব্য এত বেশী উৎপন্ন হইতে যে, তখনকার আমদানী হইতে রপ্তানি তিন গুণ অধিক ছিল।† এমন কি পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসিবার প্রয়োজন হইত না। শতকরা দশজনও বিলিতি কাপড়-ক্রেতা পাওয়া যাইত না।‡

পূর্ব্বে এই জেলা হইতে প্রচুর পশুচর্ম্ম রপ্তানি হইত। ১৮৭৩ সনে চামড়া রপ্তানির অপরিমিত বৃদ্ধি দেখিয়া জেলার কালেক্টর কারণ অনুসন্ধান করেন। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, ঢাকার চামড়া-ব্যবসায়ীদিগের দালালগণ গৃহস্থের গো-মহিষকে গোপনে বিষ-প্রয়োগপূর্ব্বক হত্যা করে এবং এই ভাবে চামড়া সংগ্রহ করে। ইহা ধরা পড়িবার পর এক নূতন আইন প্রবর্ত্তন হওয়াতে চামড়া ব্যবসায় মন্দা হইয়া পড়ে এবং ক্রমে চামড়া ব্যবসা একেবারে বন্ধই হইয়া যায়। এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই জেলায় প্রচুর নীল উৎপন্ন হইত এবং সেই নীল এখান হইতে বিদেশে রপ্তানি হইত। ১৮৭২ সালের General Administration Report-এ পাওয়া যায় যে, এই জেলার বিজাপুর চা বাগান হইতে ৫৩৬০ পাউণ্ড চা রপ্তানি হয়। নালিতা বাড়ীর নিকট ডালু নামক যে গ্রাম আছে, তাহার কার্পাস তুলা এ জেলার প্রসিদ্ধ বস্তু।

সকলেই অবগত আছেন যে, এক কালে বাঙ্গালার বস্ত্রশিল্প সমস্ত জগতের ঈর্ষার বস্তু ছিল। ঢাকার মসলিন প্রসিদ্ধ এবং মৈমনসিংহও বস্ত্রশিল্পের দিক হইতে একেবারে শূন্য ছিল না। বাজিতপুরের মসলিন ও কিশোরগঞ্জের জামদানী দিল্লীর বাদশাহগণেরও চিত্তবিনোদন করিত। মুসলমানদিগের পর হইতেই এই সকল বস্ত্র ব্যবসায়ের উপর ওলন্দাজদিগের দৃষ্টি পড়ে। ওলন্দাজগণ বাজিতপুর ও কিশোরগঞ্জে কুঠি নির্ম্মাণ করিয়া মসলিনের ব্যবসায়ে মনোযোগ দেন। তাঁহাদিগের পর আসেন ইংরেজগণ। তাঁহারা আসিয়া ওলন্দাজদিগকে হটাইয়া দিয়া সেই ব্যবসা নিজেরা একচেটিয়া করিয়া লন।

কিশোরগঞ্জের পরামাণিকগণ এককালে প্রসিদ্ধ মসলিন ব্যবসায়ী ছিলেন। ধরিতে গেলে তাঁহাদের উৎসাহেই বহুদিন পর্য্যন্ত এই পতনশীল মসলিন বস্ত্রশিল্প বাঁচিয়া ছিল। ইংরেজদের পরে তাঁহারাই এই শিল্পের প্রকৃত কর্ণধার ছিলেন। কিছুদিন হইতে তাঁহাদের ব্যবসায়ে অবনতি ঘটিয়াছে। তৎসঙ্গে এই বস্ত্রশিল্পেরও অবনতি ঘটিয়াছে। মসলিন আজ আর নাই বলিলেও চলে। তবে এখনও বস্ত্রশিল্প বিনা উৎসাহেই কর্ণধারহীন অবস্থায় কোনরূপে বাঁচিয়া আছে। আজও কিশোরগঞ্জের জামদানী চাদর ও গোলাবদন খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া বস্ত্রশিল্পের জগতে বাঁচিয়া আছে। টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বাজিতপুরেও মিহি কাপড় ও চাদর প্রস্তুত হয়। এই মহকুমার পাথরাইল এবং ছোট বিন্যাফের গ্রামের তাঁতিগণ উৎকৃষ্ট রেশমী কাপড় প্রস্তুত করে। ইহার চাহিদা নিতান্ত কম নহে। নেত্রকোণার নিকট সাজিকোণা গ্রামের গাঁওচাদির এই জেলায় বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই জেলায় উৎকৃষ্ট কাঁসার কাজও হয়। জামালপুর মহকুমার ইসলামপুরে উৎকৃষ্ট কাঁসার জিনিষ প্রস্তুত হয়। কাগমারীও কাঁসার জিনিষের জন্য প্রসিদ্ধ। কিশোরগঞ্জের লোহার জিনিষের প্রসিদ্ধি এই জেলায় সুপরিচিত। করগাঁয়ের খাঁড়া ও বাজিতপুরের দা, বটি, খাঁতি এ জিলায় প্রতি ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করে।

জামালপুরের নিকট বজ্রপুরে মাটির জিনিষ খুবই উৎকৃষ্ট। ভাওয়ালের পাটি এই এই জেলায় খুবই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে এই জেলায় কোন খনি দেখা যায় না। আকবরের রাজত্বের সময় এখানে লৌহখনি ছিল বলিয়া ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। *

* In an ordinary year of production is estimated to be about 135 lacs of maunds of rice of which about 27'5 lacs are exported, the remainder being consumed in the District.

—District Administration Report 1873-4.

† I should roughly estimate the money value of the exports as being fully three times that of the import.

Ibid

‡ They (Countrymen) and their families wear the cheapest of cloths, markins and such-like coarse county cloth and eat coarse rice seasoned with chillies grown on their lands to use their own pharse, Mota Bhat Mota Kapar, so that imports such as European piece goods of better sorts would not find purchasers in more than perhaps one tenth of the inhabitants of the given area. *Ibid*

* Ayeen-i-Akbary by F. Gladwin, Page 301.

পরিণাম

—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

১

'ও কাগজওয়ালা, পুরান কাগজ কিনবে?'

'হ্যাঁ বাবু, কিনব বৈকি! পুরান কাগজ কেনাই যে আমাদের ব্যবসায়।'

'সের কি দরে কিনতে পার?'

'ইংরেজী কাগজ দু' আনা ছ'পয়সা—আর বাংলা কাগজ চার পয়সা সের দরে কিনতে পারি।'

'বল কি হে! বাংলা ইংরাজী ভেদে কি কাগজের দামও কম বেশী হয় না কি?'

'আজ্ঞে হাঁ, যে রকম বিক্রী হয়, আমরাও তো সে রকমই কিনবো? ইংরেজী কাগজের কাগজটা ভাল, তাই তার দামও বেশী।'

সবই তো একই কাগজ, তবে দামে এত তফাৎ কেন?'

'কি করব বাবু? বাজারে এই রকম বিক্রী হয়।'

'তোমরা দেখছি বাপু, এখানেও কালা ধলা—ইংরাজী বাংলার ভেদ-রেখা ফুটাতে চেষ্টা করছ—আচ্ছা, ইংরাজী লেখা অমনি কাগজের সের কত করে কিনতে পার?'

'সে কি রকম কাগজ? কোথায় কাগজ? দেখান তো'—এই বলিতে বলিতে ফিরিওয়ালা অমিয়র দিকে অগ্রসর হইল। অমিয় তাহাকে তাহাদিগের ক্ষুদ্র খোলা ঘরের অপরিসর দাওয়ার একদিকে বসাইয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ভিতর হইতে বস্তা বাঁধা কতকগুলি লেখা কাগজের খাতা টানিতে টানিতে বাহিরের দাওয়ায় লইয়া আসিল। তারপর সে ফিরিওয়ালার দিকে তাকাইয়া বলিল—'এই রকম খাতা কি দরে কিনতে পার?' ফিরিওয়ালা তখন কোন জবাব না দিয়া বস্তার মধ্য হইতে একটা খাতা টানিয়া বাহির করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তাহা পরীক্ষা করিল, তারপর সে একটু অন্যমনস্ক ভাবে—যেন একটা বড় আশা ভঙ্গ হইয়াছে এমন ভাব দেখাইয়া—অত্যন্ত তাচ্ছিল্যসহকারে বলিল, 'তা, বাবু, এ কাগজে তো আমার কোন কাজ হবে না—বাজারে এ চলে না—ঠোঙ্গা তৈরী করবার জন্যই আমরা পুরান কাগজের আমদানি করি—এ কাগজে সে কাজ তো হবে না—আমাদের কাছে এর কোন দামই নেই।' এই বলিতে বলিতে ফিরিওয়ালা উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর যেন চলিয়া যাইতে উদ্যত এমনই ভাব দেখাইতে লাগিল। অমিয়ভূষণ স্বভাবতঃ একটু অল্প-ভাষী; তারপর গ্রামে সাধারণতঃ পুরান কাগজের ফিরিওয়ালা অহরহ জুটে না, তাই সে অনেক দিন পর বড় আশা করিয়া এই ফিরিওয়ালাকে রাস্তায় পাইয়া ডাকিয়া আনিয়াছিল, মনে করিয়াছিল, যে-দামেই হউক, নিশ্চয়ই খাতাগুলি বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থের সংস্থান করিতে পারিবে। সেই অর্থের সাহায্যে সে কলিকাতায় যাইবে চাকুরীর সন্ধানে। সে বিমর্ষ মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ফিরিওয়ালা তাহার দিকে তাকাইয়া কি ভাবিয়া অনেকটা সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিল, 'আচ্ছা বাবু, আরও কাগজ আছে—না, এই-ই সব?' অমিয়ভূষণের শুষ্ক প্রাণে যেন জল আসিল—জমাট অন্ধকারের মধ্যে যেন সে আশার আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইল,—সে তাড়াতাড়ি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—'কিনবে? হ্যাঁ, আরও কাগজ আছে—কত চাই?'

ফিরিওয়ালা তখন আবার দাওয়ায় আসিয়া বসিল। অমিয়ভূষণ সানন্দে ভিতর হইতে আরও কয়েক বস্তা লেখা খাতা বাহির করিয়া আনিল। তারপর কোন প্রকার দরদস্তর না করিয়া ফিরিওয়ালা বেশ একটু হৃষ্ট চিত্তে খাতাগুলি এক এক সের করিয়া ওজন দিতে লাগিল—আর অমিয়ভূষণ অনিমেষ লোচনে বি. এ. অনার্স ক্লাসের ও এম. এ. ক্লাসের অধ্যাপকদিগের প্রদত্ত তাহার বড় আদরের—বড় যত্নের—সেলি, বায়রণ, সেক্সপিয়ার, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কীটস্ প্রভৃতির নোটগুলির দিকে তাকাইয়া রহিল।

সে এই নোটগুলি মুখস্থ করিয়াই তো এম. এ. পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছে—ভাগ্যক্রমে যদি কোন বে-সরকারী কলেজে অধ্যাপকের কাজ জুটে তাহা হইলে সেও আবার এই নোটের সাহায্যে কতগুলি লোককে পরীক্ষা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করিবে, এই ভাবনায় সে এই সুদীর্ঘ কাল সেই নোটগুলি আগলাইয়া ছিল। কিন্তু দারিদ্র্যের বৃশ্চিক-জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া—বিশেষতঃ চাকুরীর চেষ্টার জন্য সময় সময় যে সামান্য অর্থের প্রয়োজন হয় তাহাও কোন প্রকারে সংস্থান করিতে না পারিয়া শেষে সে অনন্যগতি হইয়া তাহার শেষ সম্বল এই নোটগুলি—ছেঁড়া কাগজের দরেই বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছে।

ওজন করিবার সময় হঠাৎ একটা খাতা ফিরিওয়ালার পাল্লা হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়া খুলিয়া গেল—সেখানে সেই নোটের পাশে আবার লাল, নীল পেন্সিলে অমিয়-ভূষণের নিজের হাতে কত রকম দাগ—কত কিছু লেখা রহিয়াছে—সেদিকে চোখ পড়া মাত্র তাহার প্রাণটা যেন হঠাৎ 'ছ্যাঁৎ' করিয়া উঠিল—কোথায় যেন বড় লাগিল—মুখখানি চকিতেমাত্র অত্যন্ত মলিন হইয়া পড়িল, দেখিতে না দেখিতে চোখের কোণেও কয়েক ফোঁটা জল আসিয়া জমা হইল। একটু অন্যমনস্ক হইবার জন্য অন্য দিকে তাকাইল—ঠিক এই সময়ে তাহার মাতা সুলোচনা ও বোন অণিমা পাশের বাড়ী হইতে কয়েকটা শশা—একখানি লাউয়ের ফালি ও পাঁচ সাতটা কাঁচা পেঁপে লইয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুলোচনার স্বামী—অমিয়ের পিতার মৃত্যুর পর হইতে এই ভাবে প্রতিবেশীদের এটা-সেটার সাহায্যেই কোন রকমে তাহাদিগের ক্ষুদ্র সংসার চলিয়া আসিতেছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া দাওয়ায় ফিরিওয়ালাকে খাতাগুলি ওজন করিতে দেখিয়া অণিমা দাদাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—'দাদা, খাতাগুলির নাকি তোমার খুবই দরকার? আজ আবার তুমি সেগুলি বিক্রী করছ কেন?' অমিয় অন্য দিকে তাকাইয়া ছিল, অণিমার কথার কোন জবাব দিল না—জবাব না পাইয়া মাও কৌতূহলী হইয়া সেই প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন—'হ্যাঁরে অমু, আজ আবার তোর নোটের খাতাগুলি বিক্রয় করছিস কেন? এই সেদিন তো সমস্ত পুরান বই—'

মায়ের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই অমিয়ভূষণ বলিয়া উঠিল—'মা, তুমি তো জান, আমার নগদ কয়েকটা টাকার বড়ই প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে—আমাকে আর একবার চাকরীর চেষ্টায় কলকাতায় যেতেই হবে—তোমাদের দুঃখ-কষ্ট আর তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না—এম. এ. পাশ ক'রেও এই দু'বছরে একটা দশ টাকার চাকরীরও সংস্থান করতে পাচ্ছি না। এই গত বছর তোমার শেষ সম্বল—বালা জোড়া পর্য্যন্ত বিক্রী করেও কলকাতা একবার ঘুরে এলাম, কিন্তু কই কিছুই তো করতে পারলাম না! এইবার আর একবার চেষ্টা করব—তাই পয়সার যোগাড় করছি।' এত দুঃখেও সুলোচনার হাসি পাইল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'পাগলা, খাতা বিক্রী করে কত পয়সা পাবি, শুনি?'

'মা, তুমি জান না, পাছে তুমি বাধা দেও, তাই বলি নি—আমার সোনার মেডেলগুলি সব স্যাকরার দোকানে দিয়ে এসেছি—তারা আমায় সে জন্য একশ টাকা দেবে বলেছে, তা ছাড়া আমার এম. এ-র বইগুলি বিক্রী করেও আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ টাকা পেয়েছি—খাতাগুলি বিক্রী করে কি পাঁচ টাকাও পাবো না! কি বল ফিরিওয়ালা?'

ফিরিওয়ালার কাণে অমিয়ভূষণের কথাগুলি পৌঁছিল কি না জানি না, তবে সে তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া মনে মনে কি যেন হিসাব করিয়া বলিল—'বাবু, আর কিছু কাগজ দিতে পারেন? তা হলে হিসাব ঠিক হয়।'

'দেখি—পারি কি না' এই বলিয়া অমিয়ভূষণ বাড়ীর মধ্যে গেল, তারপর সে আর এক তাড়া কাগজ আনিয়া ফিরিওয়ালার সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

সুলোচনা তখনও সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন—ভিতরে যান নাই। তিনি কাগজের তাড়াটি দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—'সে কি, অমু, ভুলে তুই তোর সার্টিফিকেটগুলি দিয়ে দিলি না তো?'

'হাঁ, মা, তবে, ভুলে না—ইচ্ছা করেই আমি আমার ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ., বি.এ., এম.এ., ও ল'য়ের প্রিলিমিনারী ও ইণ্টারমিডিয়েটের সার্টিফিকেটগুলি সবই দিয়ে দিলম—তবু কয়েকটা পয়সা আসুক। ঘরে রেখে শুধু

পোকার খোরাক যোগাড় করে লাভ কি? কি বল মা? তা ছাড়া মা, জান, এইগুলিই আমার যত অনিষ্টের মূল। এইগুলির দিকে তাকালেই আমার ভেতরে কি রকম যেন একটা অহমিকা ভাব জেগে উঠে—সাধারণ কাজে আর আমার মন উঠে না; মনে হয়, আমি শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ সেন শর্ম্মা এম. এ.—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ-মেডেলপ্রাপ্ত কৃতী ছাত্র—আমি কেন সামান্য শ্রমিকের মত কাজ করতে যাব? ফলে হয় অষ্টরম্ভা লাভ! তা না হলে গেল বছর জসীমদ্দীন কাকা যখন তাঁ'র ছেলে কামালুদ্দীনের সঙ্গে কলার চাষ করতে বললেন, আমি কি তখন তা অমন ভাবে উপেক্ষা ক'রে উড়িয়ে দিতে পারতুম? আমি তো তাঁর কথা শুনে হেসেই কুটপাট। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিপ্রাপ্ত নানা উপাধিধারী, বৈদ্যকুলোদ্ভব, বহুসম্মানভাজন অমিয়ভূষণ কি না মা সরস্বতীর সহিত যার কখনও সাক্ষাৎ হয় নি, সেই কামালুদ্দীনের সঙ্গে কলার চাষ করব! অসম্ভব, অসম্ভব, একেবারে পাগলের প্রলাপ-উক্তি। কিন্তু মা, সেই কামালুদ্দীনের কলার চাষে এই এক বছরে কত লাভ হয়েছে জান? একটা হাজার টাকা! আর আমার আয়? আমি মানী, জ্ঞানী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের বহু-প্রশংসিত, অসাধারণ প্রতিভাবান্ ছাত্র—আমাকে কয়েকজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্যই এক একখানি ক'রে মায়ের যে কয়েকখানি অলঙ্কার ছিল তা সমস্ত বিক্রী করে শেষে বাস্তু ভিটাখানি পর্য্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছে—অথচ সংসারে আমরা তিনটী মাত্র প্রাণী—আমি, মা ও একমাত্র বোন অণিমা। আমার আর খায় কে? কি বল মা? সত্যি বলছি, আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা—যত শীগগির আমরা এ কথা ভুলতে পারব ততই আমাদের মঙ্গল। তাহা না হ'লে আমাদের না খেয়েই মরতে হবে। আমরা মরি, দুঃখ নাই—কিন্তু আমাদের চোখের সামনে যে মা-বোন ক্ষিধের জ্বালায় ছটফট করে মরবে, তা তো সহ্য করতে পারব না। তাই সঙ্কল্প করেছি মা, যে ক'রেই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত যে কোন দিন কোন রকমের সম্পর্কও আমার ছিল, আমাকে তা ভুলতে হবে—মনের ভেতর হতে সেই স্মৃতি—সেই স্কুল কলেজের পুরান সমস্ত স্মৃতি সমূলে উৎপাটিত করে আমাকে নূতন মানুষ হতে হবে; নূতন মানুষ হয়ে—নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আবার একবার অদৃষ্টের সহিত বুঝব, তারপর যা হয়—।'

এই সময় হঠাৎ অত্যন্ত অতর্কিতভাবে ফিরিওয়ালা তাহার কাংসবিনিন্দিত স্বরে বলিয়া উঠিল—'এই নিন বাবু, আপনার কাগজের দাম।' এই বলিয়া সে অমিয়ভূষণের পায়ের কাছে দুইটী টাকা ও একটী আনি রাখিয়া দিল।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত অমিয়ভূষণ তাহার মাকে উপলক্ষ্য করিয়া মনের আবেগে যাহা বলিয়া যাইতেছিল, ফিরিওয়ালার কিন্তু সেদিকে আদৌ কোন লক্ষ্য ছিল না। সে এক মনে কাগজগুলি ওজন করিতেছিল আর মনে মনে কি যেন একটা হিসাব করিতেছিল। তারপর সে অমিয়ভূষণের সম্মুখে দু'টী টাকা ও একটী আনি রাখিয়া এই বলিয়া উঠিয়া পড়িল—'এ কাগজে আমাদের তেমন তো কোন কাজ হবে না, যা হোক তবুও বাবু, ৵১০ পয়সা দরেই নিলুম। মোট কাগজ ॥২।৵০ ছটাক, কাজেই একুণে আপনি পাবেন ২৷১০ আনা।' ফিরিওয়ালার কথায় হঠাৎ বাধা পাইয়া কিছুক্ষণের জন্য অমিয়ভূষণ কেমন যেন একটু বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তারপর অবস্থাটা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাকাইয়া দেখে, ফিরিওয়ালা তাহার কাগজের বোঝা পিঠে ফেলিয়া বেশ একটু ত্বরিত গতিতে ইতিমধ্যেই অনেকটা দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। অমিয় নিজের কথায় এতক্ষণ এমন তন্ময় ছিল যে, ফিরিওয়ালা কি ভাবে কত কাগজ যে ওজন করিল, কিছুই সে জানিতে পারিল না—কিন্তু এক্ষণে সে এমন ব্যস্তসমস্ত ভাবে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল যে, তাহাতে তাহার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ হইল—কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করা আর সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যেই সে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। টাকা বাজাইতে গিয়া দেখে, একটা টাকা অচল—কম বাজে—খানিকটা অংশ ঘসা। কিন্তু এখন আর উপায় নাই—লোকটা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। হিসাবেও গণ্ডগোল। ৵১০ পয়সা দরে ॥২।৵০ ছটাকের মূল্য ২৷১০

পয়সা নহে তার কিছু বেশী। একটা সাধারণ ফিরিওয়ালার কাছে এমন ভাবে বিড়ম্বিত—প্রতারিত হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র অমিয়ভূষণের রীতিমত লজ্জা ও দুঃখ হইল। পাছে মা-বোন কিছু জানিতে পারেন—জানিয়া প্রাণে দুঃখ পান, এই আশঙ্কায় সে তখন টাকা দুইটা কোঁচায় গুঁজিয়া এক প্রকার বিনা বাক্যব্যয়েই সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। সুলোচনা ও অণিমা অমিয়ভূষণের মানসিক অবস্থা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারিলেও হঠাৎ তাহার এমন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া কিছুক্ষণ বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অমিয়ভূষণ চলিয়া যাওয়ার পর তাহারাও বিমর্ষ ভাবে ভিতরে চলিয়া গেল।

২

'মা, আজও তো দাদার কোন পত্র এল না।'

'তাই তো ভাবছি অণি, কিন্তু কুল-কিনারা যে কিছুই পাচ্ছি না। যে অমু সপ্তাহে অন্ততঃ তিন বার মায়ের সংবাদ না নিলে চলত না—পত্রের মধ্যে কম পক্ষে দুই তিন বার খোঁজ করা হত, অণি কেমন আছে—সেই অমু আজ এক বছর যাবৎ একেবারেই চুপচাপ—ব্যাপার যে কিছুই বুঝতে পারছি না—আর ভাবতেও যে পারি না। অণি, যা লক্ষীটী আমার, পাশের বাড়ীর খোকাকে একবার ডেকে আন। তাকে আর একবার ও-পাড়ার জিতেনের কাছে পাঠাই। সে তো বলেছিল, অমু ভাল আছে, দুই এক দিনের মধ্যেই তার পত্র পাব। কই দুই এক দিনের যায়গায় যে দুই এক সপ্তাহ হতে চলল—কিন্তু আজও তো—' আর কথা বলা হইল না, হঠাৎ তাঁহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠিল—তিনি চারি দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার বুকের মধ্যে ভীষণভাবে ধরফড়ানি আরম্ভ হইল। মুখ হইতে তাঁহার আর কোন কথা বাহির হইল না, আস্তে আস্তে অসাড়ের মত মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িলেন। তার পরই বৈহুঁস। অন্য কেহ হইলে এই অবস্থায় অত্যন্ত অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিত। কিন্তু অণিমার মায়ের অবস্থা জানা ছিল। কিছু দিন যাবৎ মধ্যে মধ্যে তাঁহার এই প্রকার অবস্থাই হইতেছে। যখনই কোন ভাবনা-চিন্তার মাত্রাধিক্য হয়, তখনই তিনি যেন কি রকম হইয়া পড়েন—কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার বাহ্যজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়—আবার চোখে মুখে জলের ছিটা দিলে—মাথায় হাওয়া করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই সুস্থ হন। সুস্থ হইয়াই আবার পূর্ব্বের মত কাজ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করেন। তখন লোকে বুঝিতে পারে না যে, মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাঁহার উপর দিয়া এই প্রকার একটা জীবন-মৃত্যুর ভীষণ বাত্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। তবে ইহাতে যে তিনি দিন দিনই দুর্ব্বল ও রুগ্নদেহ হইয়া পড়িতেছেন, তাহা তাঁহার দিকে তাকাইলেই বেশ বুঝা যাইত। কিন্তু কি করা যায়! বাঙ্গালার বহু নিঃস্ব দরিদ্রকেই এই রকম ভাবে তিল তিল করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে।

অণিমার মাও আজ ছয় মাস যাবৎ এই ভাবেই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। হঠাৎ তিনি অসুস্থ হইয়া লুপ্তজ্ঞান হইলে অণিমা তাড়াতাড়ি এক ঘটী জল লইয়া আসিয়া তাঁহার চোখে, মুখে ও মাথায় জলের ছিটা দিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে অণিমার বন্ধু লতা মায়ের নির্দ্দেশে কাকীমায়ের জন্য কয়েকটা কাঁঠালের বীচি লইয়া তাহাদিগের বাড়ীতে আসিয়াছিল। কাকীমাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিয়া সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল।

অণিমা বলিল—'ভাই লতা, মায়ের এ রকম মাঝে মাঝে প্রায়ই হয়। তুমি ভয় পেও না—ওখানে হাতপাখাখানি রয়েছে—তুমি ভাই, একটু বাতাস কর—মা এক্ষণি সুস্থ হবেন।'

লতা হাত-পাখাখানি আনিয়া খুব জোরে জোরে হাওয়া করিতে লাগিল।

অণিমাদের বাড়ীর নিকট দিয়াই গ্রাম্য লোকের চলাচলের রাস্তা। লতা হাওয়া করিতেছে আর জানালা দিয়া বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। হঠাৎ সে 'জিতেনদা, জিতেনদা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। জিতেনদা, ওরফে জিতেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। অণিমা-লতার প্রতিবাসী, এই গ্রামেরই লোক—দক্ষিণপাড়ায় তাহাদের ঘর। পূর্ব্বে সে গ্রামেই থাকিত। লোকের আপদে-বিপদে সে ছিল প্রধান সহায়, তাই সে গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেরই পরিচিত—সকলেরই বিশেষ

আপনার লোক। বৎসর দুই হয় অভাবের তাড়নায় অর্থের সন্ধানে তাহাকেও কলিকাতা-প্রবাসী হইতে হইয়াছে, কিন্তু তবুও সে সুযোগ পাইলেই একবার গ্রামে ছুটিয়া আসে—পল্লীমায়ের স্নেহ-শীতল অঞ্চলে কয়েকদিন বাস করিয়া আবার সহরে চলিয়া যায়। সদ্য কলিকাতা-প্রত্যাগত এই জিতেনের মুখেই অমিয়র মা সুলোচনা সংবাদ পাইয়াছিলেন, অমিয় ভাল আছে—দুই একদিনের মধ্যেই তিনি তাহার পত্র পাইবেন, আশাহত হইয়া এই জিতেনের নিকটই লোক পাঠাইবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং লতা যখন "জিতেনদা" "জিতেনদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল তখন সুলোচনা একবার চোখ মেলিয়া তাকাইলেন।

জিতেন কলিকাতায় থাকিলেও বহু চেষ্টা করিয়াও অমিয়র কোনই সন্ধান পায় নাই। সে আজ ছয়মাস পূর্ব্বের কথা। জিতেন কলিকাতা হইতে একবার বাড়ী আসিলে সুলোচনা সংবাদ পাওয়া মাত্র তাহার নিকট ছুটিয়া যান ও তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন। জিতেন কিন্তু তখন তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। সে শুধু শুনিয়াছিল, অমিয় কলিকাতায় আসিয়াছে তাই দুই তিন দিন সে আপনা হইতেই তাহার সন্ধান করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। তারপর নানা কাজের মধ্যে সে অমিয়র কথা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া অমিয়র মায়ের নিকট সমস্ত শুনিয়া সে তাহাকে কথা দিয়া গিয়াছিল যে, এবার কলিকাতায় গিয়া যে করিয়াই হউক অমিয়র সন্ধান করিবে ও তাহাকে সমস্ত জানাইবে। তাই সে কলিকাতায় গিয়া পরিচিত, অপরিচিত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, নানাধরণের হোষ্টেল, মেস,—এমন লোক ও স্থান নাই যেখানে অমিয়র খোঁজ করে নাই, কিন্তু কেহই তাহাকে তাহার কোন খোঁজ দিতে পারে নাই।

এদিকে অমিয়র মাতা পুত্রের কোন সংবাদ না পাইয়া পাগলের মত হইয়াছেন। কলিকাতায় গ্রামের যাহাদিগের আত্মীয়স্বজন থাকে—কিংবা যাহাদিগের সহিতই কলিকাতার কোন সম্পর্ক আছে, অমিয়র মাতা তাহাদিগের নিকটেই গিয়া তাঁহার পুত্রের সন্ধান করিবার জন্য নানা-প্রকার কাকুতিপূর্ণ মিনতি করিতে থাকেন। তাহার করুণ আবেদন অনেকেরই মর্ম্মস্পর্শ করে, তাই তাহারা সকলেই নানা ভাবে অমিয়র সন্ধান করিতে থাকে। কিন্তু কেহই তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে না।

জিতেনও প্রায় প্রত্যেক দিনই বাড়ী হইতে হয় মায়ের কিংবা স্ত্রীর পত্রে অমিয়র মাতা বোনের অবস্থা জানিতে পারে ও অমিয়ের সন্ধান করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইতে থাকে, তাহা ছাড়া নিজেও অমিয়র মায়ের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে যে, যে-রকম করিয়াই হউক সে অমিয়কে খুঁজিয়া বাহির করিবে কিন্তু তাহার যে সকলরকমের প্রচেষ্টাই একেবারে ব্যর্থ হইবে, তাহা সে তখন কল্পনাও করিতে পারে নাই। অবশ্য সে জানিত, কলিকাতা বিরাট সহর, এখানে এক প্রতিবাসী পর্য্যন্ত অপর প্রতিবাসীর কোন খোঁজ রাখে না, কিন্তু তাহার ভরসা ছিল, সে নিজে না পারিলেও তাহার বাল্যবন্ধু অমিয়ের বিশেষ পরিচিত পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর ভোলানাথ বাবুর সাহায্যে দুই এক মাসের মধ্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। কিন্তু দুই এক তো দূরের কথা, ছয়মাস উত্তীর্ণ হইল তবুও সে কিংবা ভোলানাথ বাবু তাহার কোন পাত্তা পাইল না। ভোলানাথ বাবুর সহকর্ম্মীরা তো কবুল জবাব করিলেন, 'আমরা হলপ করিয়া বলিতে পারি, এই ভাবের এই প্রকার চেহারার অমিয় নামক কোন যুবক কলিকাতার করপোরেশনের হদ্দায় কোথায়ও নাই।'

এই সমস্ত কারণে জিতেন্দ্র মহা মুস্কিলে পড়িল। তাহার গ্রামে যাওয়াই দায় হইল—ছয়মাস পর্য্যন্ত তাই সেও গ্রামে যায় নাই—যাইতে সাহস করে নাই, তবে হঠাৎ একটা জরুরী কাজে তাহাকে বাধ্য হইয়া দুইদিনের জন্য গ্রামে আসিতে হইয়াছিল। সেই যে কথা আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। জিতেন ভয়ে ভয়ে অতি সতর্কতার সহিত, অমিয়ভূষণের বাড়ীর কেহ জানিতে না পারে যে, জিতেন বাড়ী আসিয়াছে, এমনি ভাবে ষ্টেশন হইতে বাড়ীর দিকে যাইতেছিল, পথে সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে সেই অমিয়র মাতা ও বোনের সহিতই তাহার সাক্ষাৎ। তখন তাহাদিগের একান্ত ব্যাকুলতা-

মাখা ঔৎসুক্যপূর্ণ করুণ প্রশ্নের উত্তরে সে এতদিন পর বলিতে পারিল না—'আমি অমিয়র সম্বন্ধে কিছুই জানি না'—তাই সে তাড়াতাড়ি বিশেষ কিছু চিন্তা না করিয়াই বলিল, 'অমিয় ভাল আছে। দুই একদিনের মধ্যেই তাহার পত্র পাবেন।' কিন্তু সে ভাল রকমই জানিত, তাহার এই উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাই সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ী হইতে পালাইবার জন্য দিন গণিতেছিল কিন্তু 'এ-কাজ' 'সে-কাজ' প্রভৃতি নানাকাজের অনুরোধে আজকাল করিয়া তাহার আর যাওয়া হইতেছিল না। ইতিমধ্যে আবার একদিন অমিয়দের পাড়াতেই তাহার একটা বিশেষ কাজ পড়িল।

প্রথমে জিতেন্দ্র লতার ডাক শুনিতে পায় নাই, এমন ভাণ করিয়াই হন হন করিয়া ছুটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু লতা তাহাকে এমনি ভাবে কর্ণপটাহভেদকারী চীৎকারধ্বনি করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল যে, তাহার পক্ষে ডাক না শুনিবার ভাণ করাও আর সম্ভব হইল না। সে লতার দিকে তাকাইল।

লতা তাহাকে বাড়ীর ভিতরে আসিতে বলিলে সে ভিতরে গেল। অমিয়র মা জিতেনকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি পরিহিত বস্ত্রাদি সংযত করিয়া মাথার উপরে একটু কাপড় টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিলেন। জিতেন তাহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই তিনি বলিলেন, 'বাবা জিতেন, অমুর তো কোন পত্র পেলুম না, সত্য বল বাবা, অমু ভাল আছে তো? অমু ভাল থাকলে একখানি পত্র পর্য্যন্ত লিখছে না, বিশ্বাস করতে তো পাচ্ছি না—বাবা খুলে বল না?'

বলিয়া জিতেনের জবাব শুনিবার আগেই 'বাবা অমু, তোর চাকরীর দরকার নেই, তুই কোলের ছেলে একবার কোলে ফিরে আয়, একবার তোকে দেখে প্রাণ শীতল করি বাবা, টাকা পয়সা আমরা কিছু চাই না বাবা, কিছু চাই না' এই বলিয়া সুলোচনা 'হাউ' 'হাউ' করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠিক এই সময় 'তুমি টাকা পয়সা না চাইতে পার বটে, মা, আমার কিন্তু চাই' বলিতে বলিতে একজন পক্ককেশ বৃদ্ধ সেখানে আসিয়া হাজির হইল। সকলে চাহিয়া দেখিল, সে গ্রামের সর্ব্বজন-পরিচিত ব্যক্তি নবীন মুদী। নবীন মুদী কোনপ্রকার ভূমিকা না করিয়াই বলিয়া যাইতে লাগিল—'মা আর তো অপেক্ষা করতে পারি না—অমুবাবু টাকা পাঠাবেন, এই ভরসা দিয়েই তো আজ এই এক বৎসর যাবৎ ধারে মাল নিচ্ছ। তোমরা তো রোজই বল, ৪।৫ দিনের ভেতরেই টাকা পাবে—কিন্তু একটি পয়সাও দিচ্ছ না—আবার আজ কি না বলছ টাকা চাই না। তা বেশ, তোমরা টাকা চাও আর না চাও আমার তাতে কি? আমার টাকা কয়েকটি আজ সাফ জায়গায় রাখ—টাকা না পেলে আমি আর উঠছি না। তোমাদের বুজরুকী আমি সব বুঝতে পেরেছি। আমার নিষেধ সত্বেও আবার কোন মুখে কাল ধারে চাল আনবার জন্য দোকানে লোক পাঠালে? জেনে রেখ, নবীন মুদী দাতব্যখানা খুলে বসে নি?' এই বলিয়া আরও কিছু সে বলিতে যাইতেছিল, এই সময় অণিমা সলজ্জ ভাবে বলিল—'নবীন কাকা, আমরা তো কাল আপনার দোকানে চাল আনবার জন্য লোক পাঠাই নি। দু'দিন যাবৎ ঘরে চাল বাড়ন্ত জেনে অচলাদি' মাকে না বলেই আপনার দোকানে ছুটে গিছল; মা সেজন্য তাকে বকে দিয়েছেন পর্য্যন্ত। আমার একটা জামার হাতের সেলাইটুকু মাত্র বাকী—সেইটুকু হয়ে গেলেই আমি কিছু পয়সা পাবো, তাতেই আবার আমাদের দু'এক দিন চলবে।'

'তা চলবে বই কি, কাকেও কিছু দিতে না হলে আমারও চলে। তা চলুক, আমার টাকা কয়েকটি কবে, কি ভাবে দেবে বল তো? অমু—অমু! অমু যে টাকা দেবে তা তো বুঝতেই পারছি। অমুর স্বভাব যে শেষ কালে এমন ভাবে নষ্ট হবে, তা কিন্তু আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি। বয়স-কালে বিয়ে-থা না দিলে এই রকমই হয়ে থাকে বটে! তা না হলে কে বিশ্বাস করবে—একটা নয়—দু'টা নয়—চার চারটা পাশ—খুব ভাল পাশ—তবুও দু'বছরে দু'টা টাকা আয় করতে পারে নি—কে বিশ্বাস করবে এই আজগুবি কথা? আমরা যে একেবারে গো-মূর্খ, আমরাও বাড়ী বসে যে করে হোক, সামান্য একটা দোকান থেকেই মাসে ৫০টা টাকা আয় করি। তারপর কলকাতা সহর—টাকার গোলা—চার চারটা পাশ;

বলে কি না, চাকরী জোটে না। সব বাজে কথা—সব বাজে কথা। তা যাক, আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের কাজ কি? আমার টাকা কয়েকটা দিয়ে দেও বাপু, আমি চলে যাই, আমি আর অপেক্ষা করতে পাচ্ছি না। আমার সামান্য পুঁজি, লোকের কাছে এত পড়ে থাকলে দোকান চলবে কি করে? ঘর-সংসার চালাব কি করে? তোমাদের মত আমাদের মুখ দেখলে তো কেউ পয়সা দেবে না?'

ক্রমে নবীন মুদীর কথা শ্লীলতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছে দেখিয়া জিতেন্দ্র বেশ একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িল, কিন্তু বাহিরে সে সেই ভাব প্রকাশ না করিয়া উত্তেজনা-ক্ষুব্ধ সংযত ভাষায় এই সময় নবীনকে বাধা দিয়া বলিল—'আচ্ছা নবীনজেঠা, অমিয়দের নিকট তোমার কত টাকা পাওনা?' নবীন এতক্ষণ জিতেন্দ্রের দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখে নাই। কে একজন বাজে লোক মনে করিয়া সে ঘরে ঢুকিয়া বিরক্তিবশতঃ নিজের বক্তব্যই বলিয়া যাইতেছিল—অন্য কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না। এক্ষণে জিতেন্দ্রের কণ্ঠস্বরে তাহার চমক ভাঙ্গিল। সে জিতেন্দ্রের দিকে তাকাইয়া নিজের সাময়িক অসংযত উক্তিজনিত লজ্জায় কেমন যেমন একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল—মুখে তাহার তাড়াতাড়ি বেশী কথা জোগাইল না। জিতেন্দ্র তাহার এই কুণ্ঠাজড়িত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল—'জেঠা, তোমাকে তো আমরা বহু কাল হ'তেই জানি, তোমার যে এতটা অধঃপতন হয়েছে—তুমি যে জিহ্বার সংযম ভাব একেবারে হারিয়েছ, তা তো জানতুম না—জানলে তোমায় কি আমাদের মা-বোনের সঙ্গে এমন অবাধে মিশতে দিতুম—না, আমরা তাহাদিগকে যখন তখন নিশ্চিন্ত মনে তোমার দোকানে পাঠাতুম। তুমি জেনে রেখো—'

এই সময় সুলোচনা—অমিয়র মা দরজার আড়াল হইতে—ইতোমধ্যে তিনি মেঝ হইতে উঠিয়া সেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি গ্রামের কাহার নিকট বাহির হইতেন না,—জিতেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—'বাবা জিতু, উনি দেবতা, ওঁকে তুমি ভুল বুঝ না, ওঁকে বলে দেও, আমাদের বাড়ী ঘর যাঁর নিকট বন্ধক রয়েছে, তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের সমস্তটাই কিনতে রাজী হয়েছেন। দলিল রেজিষ্টারী হলেই তিনি এই জন্য তাঁর সুদ আসল বাদ দিয়েও আমাদিগকে নগদ কিছু দিতে সম্মত আছেন। সেই টাকা পেলেই আমরা ওঁর প্রাপ্য সমস্ত টাকা দিয়ে দেব। ফাঁকি দেব না।'

'সে কি কথা, মা? আমি কি তাই বলছি না ভাবছি? তবে কি না মা আমার সামান্য পুঁজি—বাকী পড়ে থাকলে চলে কি করে, তাই তাগাদা করি—তা তাগাদা করেও পাওয়া যাচ্ছে কৈ?"

ঠিক এই সময় গ্রামের জমিদারের একজন পাইক আসিয়া দাওয়ায় উঠিল। অমিয়দের সামান্য যে জমি-জমা আছে পূর্ব্বে তার উপস্বত্ব হইতেই তাহাদের ক্ষুদ্র সংসার একপ্রকার চলিয়া যাইত, কিন্তু সেদিন এখন আর নাই। গত ১০ বৎসরের মধ্যেই জমির এমন একটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, তাহাতে সংসার চলা তো দূরের কথা—জমিদারের খাজনাও হয় না—এদিকে তাঁদের অন্য কোন রকমেরও আয় নাই, কাজেই এই ৪ বৎসর যাবৎ জমিদারের খাজনাও বাকী পড়িয়াছে, তাই জমিদারের নায়েব খাজনা তাগাদা করিবার জন্য আর একবার পাইক পাঠাইয়াছে। পাইক বার বার হাটাহাঁটি করিয়াও কিছু আদায় করিতে পারিতেছে না, অথচ নায়েবকে একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা জমিদারের সদরে জমা দিতেই হইবে—তাই সে সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও তাগাদা করিবার জন্য বার বার পাইক পাঠাইতেছিল। গত রাত্রিতেও পাইক একবার অমিয়দের বাড়ী ঘুরিয়া গিয়াছে। তাহাকে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাদের নগদ টাকা-পয়সা তো দূরের কথা, ঘরে এমন কোন ঘটী, বাটী, থালা, কিম্বা তৈজসপত্রও নাই যাহা বিক্রয় করিলে জমিদারের খাজনা শোধ করা সম্ভব হয়। সুতরাং পাইক যেন শুধু শুধু তাদের বাড়ী যাতায়াত না করে। অমুর একটা সুবিধা হইবেই—তখন জমিদারের পাওনা তাঁরা কড়া-ক্রান্তিতেই পরিশোধ করিয়া দিবেন। কিন্তু তবুও ১২ ঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই আবার পাইক আসিয়া হাজির হইয়াছে দেখিয়া সর্ব্বদুঃখসহা, ধৈর্য্যের

প্রতিমূর্ত্তি সুলোচনারও এইবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল। কিন্তু উপায় নাই। অবস্থা বিশেষে মানুষকে মুখ বুঝিয়া সমস্তই সহ্য করিতে হয়। সুলোচনা পাইককে লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই নিজের অবস্থা স্মরণ লইয়া আত্মসংযম করিলেন। তিনি শুধু অণিমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অণিমা মা, ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে সমস্ত দেখিয়ে দাও, যা খুসী উনি জমিদারের জন্য নিয়ে যান—আমাদের যদি কোনও সম্বল থাকত বাপু, পূর্ব্বেই জমিদারের টাকা পরিশোধের একটা ব্যবস্থা করতাম।'

'তা কি জানি না মা'? আমি কি চোখ বুঝে তোমাদের বাড়ী যাওয়া-আসা করি? আমি কি লক্ষ্য করিনি, তোমাদের জল খাওয়ার জন্যও ঘরে একটা কাঁসার বাটী কি গেলাস নেই, অভাবে পড়ে তোমরা সবই বিক্রী করেছ—এখন তোমাদের জল পর্য্যন্ত মাটীর ভাঁড়ে খেতে হয়। তোমাদের নফর আব্বাস অন্ধ নয়—তার চোখ আছে, সে সবই দেখতে পায়, কিন্তু কি করি মা, অর্থ-পিশাচ নায়েবটার জ্বালায় আমায় ছুটাছুটি করতে হচ্ছে। সব দিন সকলের সমান যায় না। মনে কিছু করো না মা—আব্বাসকে ক্ষমা কর—'এই বলিতে বলিতে কোন দিকে না তাকাইয়া সে হন হন করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আব্বাসের কথাগুলি এমন মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে উপস্থিত সকলের প্রাণেই ইহাতে আঘাত করিল। আব্বাস চলিয়া যাওয়ার পর কিছু সময়ের জন্য সেখানের কেহই কোন কথা বলিতে পারিল না। নবীন মুদীর প্রাণেই যেন কেন কথাগুলি বিশেষ-ভাবে বিঁধিল। সে তাঁর নিজের উক্তির জন্য বড়ই অনুতাপদগ্ধ হইল, কাজেই সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না।

'তবে এখন আসি, মা' বলিয়া তাড়াতাড়ি সে সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। জিতেন্দ্রের ইচ্ছা হইল, সে তাহার পকেট হইতে কয়েকটা টাকা দিয়া এখনই উহাদের কতকটা সাহায্য করে, কিন্তু পাছে তাহাতে অমিয়র মা ক্ষুণ্ণ হন—তাঁহার আত্মসম্মান আহত হয়, সেই আশঙ্কায় সে সহসা তাহা করিতে সাহস করিল না। তবে যে প্রকার অবস্থা সে আজ প্রত্যক্ষ করিল, তাহাতে এই সম্পর্কে কোন একটা ব্যবস্থা না করিয়া যাওয়াও তাহার পক্ষে খুব কষ্টসাধ্য হইল। তাই সে অণিমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'কাকীমা, আপনাদের কয়েকটা টাকার আশু বিশেষ প্রয়োজন বলেই আমার মনে হল। কত টাকার দরকার আমায় বলুন, আমি এখন চালিয়ে দেই—তারপর হয় আমি কলকাতায় অমিয়র কাছ থেকে টাকা কয়েকটা চেয়ে নেব, আর না হয় অমিয়র টাকা পেলে আপনিই আমায় দিয়ে দেবেন। কি বলেন কাকীমা?' এই বলিয়া জিতেন্দ্র কাকীমার উত্তরের জন্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইল। কাকীমায়ের মুখের ভাব কি মুহূর্ত্তের মধ্যে অভাবনীয় রকমের পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জিতেন্দ্রের তখন মনে হইল, তাহার পক্ষে এই কথা না তোলাই ভাল ছিল, যা হোক, সুলোচনা কিন্তু বেশী কোন কথা বলিলেন না। তিনি ধীর অথচ দৃঢ় ভাবে জানাইলেন, তাঁহাদিগের সম্প্রতি কোন টাকার প্রয়োজন নাই, দরকার হইলে তিনি নিজেই টাকা চাহিবেন, তবে জিতেন যেন তাড়াতাড়ি অমিয়র সংবাদটা তাঁহাকে জানায়। সুলোচনার মনের দৃঢ়তা দেখিয়া জিতেন এই সম্বন্ধে কোন আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। সে তখন নিরুপায় হইয়া আবার তাঁহাকে সেই পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি দিয়া অণিমা ও লতার নিকট বিদায় লইয়া চিন্তিত ভাবে নিজের কাজে চলিয়া গেল।

এই ঘটনার পরের দিনই সুলোচনার নিকট একটা মনিঅর্ডার আসিল। 'মনিঅর্ডারের কুপনে লেখা ছিল "মা, তোমাদের খরচের জন্য ২৫টি টাকা পাঠাইয়া দিলাম।

ইতি অমিয়ভূষণ।

টাকা অপেক্ষা এতদিন পর যে অমিয়ের একটা সংবাদ পাওয়া গেল, ইহাতেই মা ও মেয়ে আনন্দে বিভোর হইল; তাহারা তাড়াতাড়িতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল না, টাকা-প্রাপ্তির রসিদ ফিরিয়া যাওয়ার কোন ঠিকানা মনিঅর্ডার ফর্ম্মে আছে কি না। পিয়ন চলিয়া যাওয়ার পর এই সম্পর্কে তাহা-দের হুস হইল। তারপর কুপনে কোন ঠিকানা আছে কি না খুঁজিতে গিয়া দেখিল, কুপনে কোন ঠিকানা নাই।

*

ডিজে. রায়ের 'সাজাহান' এই রূপ ভাবে গত-জীবনের গৌরব স্মরণ করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছেন, স আর কি দিন গিয়াছে জাহানারা।' গান্ধী-চরিত্রের ই দিক্ টা বিশেষ করিয়া লক্ষ্যের বিষয় হইতেছে, যেথায় কখন তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার এবং ১৯২০।২১ সালের তিহাস স্মরণ করেন। ইহাই কি ভীমরতি?

অন্যত্র বলিয়াছে—পণ্ডিত জওহরলাল খাদিকে স্বাধীনতার চাপরাশ বলিয়াছেন। কাহার নিকট এই উক্তির মূল্য ধরা পড়িয়াছে? কংগ্রেস-কর্মীর যদি এই বিশ্বাস থাকিত, তবে খাদি 'চলতি চাক্তি' (current coin) হইয়া যাইত। কোন মূল্যেই স্বাধীনতা মহার্ঘ্য নহে, স্বাধীনতা বাবুর তুল্য প্রাণবায়ুর জন্য কোন্ ব্যক্তি কি না দান করিতে পারে?

কিন্তু স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের অধিবাসীরা মুহুর্মুহু আকাশের দিকে চাহিয়া শেষ প্রায় নির্গত হইবার আশঙ্কায় দিন যাপন করিতেছে।

অনন্তর গান্ধীজী কংগ্রেস-পতাকা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন, খাদি, চরখা ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য, কায় ইহারই প্রতীকসমূহ অঙ্কিত হইয়াছে। উহা কার্য্যকর হইলে বিনা আইন-অমান্য আন্দোলনেই স্বাধীনতা হইতে পারে।

*

ইহাই যদি কংগ্রেস-পতাকার অর্থ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই পতাকা অর্থহীন। বর্ত্তমানে খাদি কি চরখা চালাইতে গেলে দেশের মধ্যে অনৈক্যের বিস্তার হয় ইহা একাধিকবার প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং খাদি ও চরখার পাশে 'সাম্প্রদায়িক ঐক্য' টিকিতে পারে না। সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে 'স্বাধীনতার চাপরাশ'কেও শত হস্ত দূরে রাখিতে হইবে—স্বাধীনতার চাপরাশের জোরে স্বাধীনতা মিলিবে না, ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইলে বিনা চাপরাশেই স্বাধীনতা মিলিয়া যাইবে। কথাটা ধাঁধা নহে—দেশের স্বাধীনতাকামী ভলণ্টিয়ার দল ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

উপসংহারে তিনি খাদির প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা রাখিয়া কংগ্রেসী প্রদেশসমূহে খাদি ও কুটীর-শিল্প বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একটি বিশেষ মন্ত্রী নিয়োগের কথা বলিয়াছেন, এবং দেখাইতে চাহিয়াছেন, কৃষি ও রাজস্ব-মন্ত্রীর সহযোগিতায় খাদি সকল দিক্ দিয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে।

*

অর্থাৎ, বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়; গান্ধীজী আইন করিয়া দেশে খাদি চালাইবার পক্ষপাতী। আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার অদৃষ্টের ইহাই পরিহাস!